রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৬১শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৮

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

# লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

# বিষয়-সূচী

# বিবিধ প্রসঙ্গ

# চিত্রসূচী

## রঙীন চিত্র



## একবর্ণ চিত্র

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৬৮ | ১ম সংখ্যা

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

বিগত ৫ই অক্টোবর মাদুরায় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির দুই দিনব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়। অধিবেশনের শেষে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার স্বভাবগত উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই অধিবেশনকে গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দীপনাসূচক বলিয়া ঘোষণা করেন। এখানেও তিনি জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন—তবে আরও এক ধাপ উচ্চগ্রামে। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রবিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ যাহাই বাধুক ভারত বিভাগ আর কোনক্রমেই সহ্য করা হইবে না বা ঐরূপ প্রস্তাবে কোনও প্রকার আপোষ স্বীকার করা চলিবে না। ভারত বিভাগের আরম্ভ হয় পাকিস্থান সৃষ্টিতে। সেই বিভাগজনিত দুঃখ-দুর্দশা আমরা এখনও ভোগ করিতেছি। ভারতকে আরও বিভক্ত করিলে আমাদের উদ্ধারের আশা আর থাকিবে না।

ইহা অতি কঠোর সত্য এবং বহু পূর্ব্বেই একথা দৃঢ়ভাবে বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলা সোজা, তাহা কাজে পরিণত করা অতি কঠিন কেননা, সংহতির মূলে যে আন্তরিক প্রেরণার প্রয়োজন তাহার পরিপন্থী নানা শক্তি এখন এদেশে সক্রিয়। সেকথা আমরা পরে আলোচনা করিব—জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেস কর্ম্মীদের সতর্কীকরণের জন্য বলেন যে, তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। "নির্ব্বাচনের তুচ্ছ টিকিটের" জন্য তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিতণ্ডা করা উচিত নয় কেননা, "ভারতের ঐক্যের জন্য হাজার হাজার নির্ব্বাচনের টিকিট ডাষ্টবিনে ফেলা যাইতে পারে।" ভারতের ঐক্য ও ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা একই বিষয় এবং ঐক্যের সাধনাই ভারতের জয়যাত্রার পথ, একথা তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

আমরা বুঝিলাম সব কিছুই। কিন্তু যাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলা হইল তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত তাহা নির্ণয় করিবে কে? আমরা ত জানি এই অধিবেশনের একমাত্র কারণ নির্ব্বাচনী টিকিটের ব্যবস্থা। এবং অন্য সব কিছুই অবাস্তব। পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ সাধারণ জনগণকে মাদুরার ময়দানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ইহা নিশ্চিত কিন্তু সেই উদ্দীপনার ফল ভোগ করিবে তাহারাই যাহারা ঐ তুচ্ছ "নির্ব্বাচনের টিকিট" সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাচকদিগকে বহুপ্রতিশ্রুতি দিয়া পরীক্ষায় পাস হইলে পরে, পরের পাঁচ বৎসর দেশের ও দশের কল্যাণ চিন্তাকে জলাঞ্জলি দিয়া নিজ স্বার্থ পুষ্টির কাজে ব্যস্ত থাকিবে।

প্রথম দিনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীঢেবর খসড়া নির্ব্বাচনী ইস্তাহারকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনিও নির্ব্বাচন সম্পর্কে নীতিমূলক অনেক কথা বলেন। সে বক্তৃতার সারাংশ এইরূপ:

কংগ্রেসের যে নির্ব্বাচনী ইস্তাহার পেশ করা হইয়াছে তাহা বিবর্ত্তনের অবিচ্ছিন্ন ধারারই প্রতিফলনস্বরূপ এবং ইহা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার সুযোগ দিবে। তিনি বলেন, কংগ্রেসের ভবনগর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়াই ওয়ার্কিং কমিটি এই খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীঢেবর বলেন নির্ব্বাচনী ইস্তাহার দেশের অধি-

বাসীদের বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টারই অংশস্বরূপ। সেই কারণেই এই ইস্তাহার সম্পর্কে বিবেচনার বিরাট্ দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর বর্ত্তাইয়াছে ; কারণ, আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য দেশের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করা ছাড়াও ইহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া আছে। সেই কারণেই তিনি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ইহার বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন।

নির্ব্বাচনে যাঁহারা ভোট দিবেন তাঁহারা অতি দরিদ্র ও অশিক্ষিত। সেই কারণে নৈতিক দায়িত্ব দলের উপর বর্ত্তাইয়াছে। জনসাধারণকে দলের এই আশ্বাস দেওয়া উচিত যে, ইস্তাহারকে লঘুভাবে গ্রহণ করা হয় নাই এবং কৃত্রিম উপায়ে কিছুই করা হইবে না।

ব্যক্তিগত অথবা দলীয় দৃষ্টিকোণ হইতে নির্ব্বাচনকে বিচার করিলে চলিবে না। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া দেশবাসীকে যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তাহা পূরণ করার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই ইহা বিচার করিতে হইবে।

দায়িত্ব খুবই মহৎ, কিন্তু বিরাট্। কংগ্রেসকর্ম্মিগণ যাহাতে জনসাধারণকে বুঝাইতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ইস্তাহারের মর্ম্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল করিতে হইবে।

কংগ্রেস যে কোন উপায়ে ভোট সংগ্রহ করিতে চায় না। ইহাকে একটি উদ্দেশ্য পূরণ করিতে হইবে এবং জনসাধারণের সহিত একাত্ম হইলেই তাহা সম্ভব।

শ্রীডেবর স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তীকালের সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া বলেন, ইস্তাহারে পাঁচটি সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, শিল্পের ক্ষেত্রে নূতনের প্রবেশে উৎসাহদান, শিল্প সমবায়ের সম্প্রসারণ এবং গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের কথা ইহাতে আছে।

ইস্তাহারে সমবায় সমিতিগুলি ও ক্ষুদ্র সংস্থাকে সাহায্যের কথাও বলা হইয়াছে এবং পরিকল্পনায় ইহার জন্য ব্যবস্থাও আছে।

বলা বাহুল্য শ্রীযুত ডেবরের প্রস্তাব সমর্থিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। এবং ডেবর ভাই যাহা বলিয়াছেন তাহাও সত্য। কিন্তু এখানেও এই একই কথা চলে। আমরা দেখি যে গুণীজনের কথা নির্ব্বাচনের মুখে সর্ব্বসাধারণকে জানানো হয়। লোকের ধারণা জন্মায় যে, ঐ বাক্য বুঝিবা প্রত্যেকটি নির্ব্বাচনকামী টিকিটধারীর অন্তরের কথা। কিন্তু একবার নির্ব্বাচনের কাজ হইয়া গেলে পরে কে কার কথা শোনে ?

দেশের লোককে যাঁহারা এই ভাবে প্রতারিত করিয়া বিগত দুই নির্ব্বাচন পার করিয়াছেন, আমরা জানিতে চাই সেই সকল মহানুভববর্গের মধ্যে শতকরা কয়জনকে এবার বাদ দেওয়া হইয়াছে। যতদিন না সে সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যায় ততদিন "সবঝুট হ্যায়" বলিয়া ঘোষণা করাই শ্রেয়।

## জাতীয় সংহতি

নয়া দিল্লীতে চার দিন ব্যাপী আলোচনার পর বিগত ১লা অক্টোবর জাতীয় সংহতি সম্মেলন শেষ হয়। সংহতির পরিপোষণকল্পে ছয়টি নির্দ্দেশযুক্ত এক খসড়া বিবেচিত ও প্রকাশিত করার পর প্রধানমন্ত্রী এক ভাষণ দিয়া সংহতির পালা শেষ করেন। ঐ ছয় দফার কার্য্যধারা এইরূপ :

১। কোনও রাজনৈতিক দল এমন কোনও কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবেন না যাহাতে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম্মমতাবলম্বী বা ভাষাভাষীদিগের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিরোধের সৃষ্টি হয়।

২। কোনও রাজনৈতিক দল জাতিগত, গোষ্ঠীগত, ধর্ম্মগত বা ভাষা হইতে উদ্ভূত কোনও অসন্তোষজনক ব্যবস্থা বা সমস্যার প্রতিকারের জন্য, আপোষ মীমাংসার সকল পথে পূর্ণ চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে এমন কোনও আন্দোলন চালাইবেন না যাহাতে জনসাধারণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মনান্তর বা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

৩। কোনও অবিচারের প্রতিকার বা দাবীর সমর্থনে কোনও রাজনৈতিক দল আন্দোলন সুরু করিলে, মারপিট বা হাঙ্গামা যাহাতে না হয় সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন। যদি সেরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও হাঙ্গামা হয় তবে আন্দোলনের নেতৃবর্গ তৎক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করিবেন।

৪। কোনও দল বিরোধী দলের শোভাযাত্রা, জলসা বা সম্মেলনে কোনও রূপ বাধাবিঘ্নের বা প্রতিরোধের চেষ্টা করিবেন না।

৫। সরকার আইন ও শান্তি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করার সময় জনস্বাধীনতা বিরোধী এরূপ কোনও বিধি নির্দ্দেশ দিবেন না যাহাতে রাজনৈতিক দলগুলির সাধারণ কার্য্যক্রমে বাধা পড়ে।

৬। সকল শ্রেণীর ও স্তরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধি-

কারীগণ নিজের বা দলীয় লোকের স্বার্থের পোষণে সে ক্ষমতার ব্যবহার করিবেন না বা অন্য দলীয় লোকের স্বার্থহানি করিবেন না।

এই ছয়টি অপরূপ বিধিনিষেধ আলোচনা করা বৃথা, কেননা কোন দলের কেহই এগুলি মানিবেন না—বিশেষে যখন অমান্য করিলে শাস্তির ভয় নাই। অবশ্য পাঁচ নম্বর দফা সরকার বিরোধী দলগুলির হাতে একটা নূতন অস্ত্র দিল। এখন শান্তি রক্ষার বা পথে-ঘাটে গোলমাল নিরোধের জন্য যাহা কিছু সামান্য ব্যবস্থা আছে সেগুলিও "জনস্বাধীনতা বিরোধী" বলিয়া তাঁহারা চীৎকার করিবেন এবং দৈনিক কাগজে তাহা ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হইবে। পাড়িত ও বিব্রত হইবে সাধারণ জন—তাহাতে কোন রাজনৈতিক দলের কি বা আসে যায়!

অবশ্য একটি সর্ব্বদলীয় সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে সংখ্যালঘুদের অভাব-অভিযোগ পরীক্ষা ও অবিচারের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকিবে এবং রাজনৈতিক বা ঐরূপ উদ্দেশ্যে অনশন, ধর্ম্মঘট, ইত্যাদিতেও ঐ সংস্থা প্রতিকার ব্যবস্থা করিবে। সম্মেলনে শিক্ষা ও ভাষা সম্পর্কে আলোচনা বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন :

"সম্মেলনে বলা হইয়াছে, জাতীয় সংহতি রক্ষায় শিক্ষার স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও আমূল সংস্কার সাধন প্রয়োজন। শিক্ষার মধ্য দিয়া শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা ও দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মুখ্যমন্ত্রিগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন সম্মেলনে তাহা অনুমোদিত হয়। শুধু কাগজেকলমে না করিয়া বাস্তবে উহা কার্য্যকরা করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রিগণ তিনটি ভাষা শিক্ষার যে প্রস্তাব করিয়াছেন সম্মেলনে তাহাতে সম্মতি জানান হয়।

স্থির হয়, হিন্দিকে আন্তঃরাজ্য সংযোগ সাধনের উপযোগী ভাষায় উন্নীত করিতে হইবে। ভাষার এইরূপ বিবর্ত্তন সাধনে যথেষ্ট সময় লাগিবে বলিয়া অন্তর্বর্ত্তীকালে ইংরাজী উহার স্থলাভিষিক্ত হইবে, সুতরাং এইদিক দিয়া শিক্ষার মাধ্যমিকস্তরে হিন্দি ও ইংরেজী শিক্ষাদান বিশেষ প্রয়োজন।"

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নেহরু এক ভাষণ দিয়া সম্মেলন শেষ করেন। তাঁহার মতে নানা ব্যর্থতা ও দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও ভারত এখন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রগতির পথে চলিয়াছে এবং যে কোনও দেশের অগ্রগতির সহিত ভারতের প্রয়াস ভালভাবেই তুলনীয়। তিনি এই সম্মেলনে সকল দলের মধ্যে ভারতের সমস্যাবলী সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেন—যদিও এই ঐক্য তিনি কোথায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন আমরা জানি না। আমরা অবশ্য জানি যে, সকল দলেরই শতকরা ৯৯ জন নেতা জনসাধারণের স্বার্থকে বলি দিয়া নিজ স্বার্থপূরণে আগ্রহান্বিত। এইটুকু ঐক্য সর্ব্বদলে আছে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত নেহরু আরও বলেন যে, এই সম্মেলনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়া "ভারতের প্রতি ভক্তি, ভারতের জনগণের প্রতি আস্থা ও আমাদের মিলিয়ামিশিয়া কাজ করার যোগ্যতার" পরিচয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহও নাই যে, প্রজাতন্ত্রী ভারতের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং আমরা যেন স্বপ্নেও না ভাবি, যে সব ভ্রান্ত প্রবণতার সাক্ষাৎ আমরা ইতস্ততঃ পাইতেছি, সেগুলি সেই ভিত্তিকে ক্ষুণ্ন করিবে।

"একটি বিবৃতি গ্রহণ করিয়াই সম্মেলন সব সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এমন দাবি করা নিশ্চয় বাড়াবাড়ি, তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য্য যে, সমস্যাবলী সমাধানে এই সম্মেলন দেশে এক অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিবে।"

পণ্ডিতজী যেটুকু উৎসাহ উদ্দীপনা এই সম্মেলনে পাইয়াছেন, আমরা কিন্তু তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। কেননা বর্ত্তমানে এই দেশে "জাতীয় সংহতি" একটা নিরর্থক স্তোকবাক্য মাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। স্বাধীনতার পূর্ব্বে যে সকল জাতিগত ও গোষ্ঠীগত বিরোধ প্রচ্ছন্ন বা স্বল্প-প্রকাশিত ছিল এখন সেগুলি প্রচণ্ডরূপে দেখা দিতেছে, সকল প্রান্তে ও সকল স্তরে। এবং তাহার মূল খুঁজিতে হইলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও লোকসভা ইত্যাদিতে দেখিতে হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় কয়জন ক্ষমতাপন্ন মন্ত্রী আছেন, যাঁহারা সত্য সত্যই গোষ্ঠীগত এবং দলগত পক্ষপাত দোষে দোষী নহেন? কয়জন বলিতে পারেন যে, তিনি বা তাঁহারা যোগ্য লোকের উপর অবিচার করিয়া আত্মীয় বা অনুগত তোষামোদীজনের পোষণ করেন নাই? লোকসভায় কয়জন আছেন, যে বা যাঁহারা নিজের স্বার্থ ও দলের স্বার্থ ভুলিয়া নির্ভয়ে দেশের ও দশের স্বার্থে মুখ খুলিয়াছেন? এবং একথা কি সত্য নহে যে, কেন্দ্রের

দৃষ্টান্তেই বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা, বিধান পরিষদ, ইত্যাদিতেও অনাচার ও অবিচার ছড়াইয়া পড়িতেছে ?

এই অনাচার ও অবিচারেই দেশের শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্র সঞ্চালন ব্যবস্থা আজ ব্যর্থ ও কলুষিত হইয়াছে। স্বার্থান্ধ মন্ত্রীর পক্ষে যোগ্য লোকের মূল্যায়ন অসম্ভব, একথা ত আজ সারা দেশে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণিত হইতেছে। যোগ্যতার অনাদরের ফলেই অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ লোক আজ শাসনতন্ত্রে ও সঞ্চালন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবল হইয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে, একথা কি মন্ত্রীমহাশয়েরা বা লোকসভা, রাজ্যসভা, ইত্যাদির ধুরন্ধরবর্গ জানেন না বা বুঝেন না ?

দেশে যখন এইরূপ ব্যাপক ভাবে দুর্নীতি, অনাচার ও অত্যাচার চলিতেছে তখন সেখানে জাতীয় সংহতির কথা উত্থাপন করা এক প্রহসন মাত্র। পচা কুমড়ার দেহতত্ত্বের গান গাহিয়া তাহাকে চিরস্থায়ী করা যায় না, একথা কি আমাদের কর্ণধারগণ বুঝিতে অসমর্থ ?

যদি দেখিতাম যে, দেশে অন্তর্ঘাতি বিবাদ-বিচ্ছেদের প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণের কোনও আন্তরিক ইচ্ছা এই "জাতীয় সংহতি" পালাগানের কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে, তবে বুঝিতাম যে, সুদিন হয়ত নিকটেই, না হয় সুদূরেও দেখা দিয়াছে। বোধ হয় ঐকতানে বিঘ্ন ঘটাইবার ভয়ে ঐরূপ বেসুরো বেতালা কথা ধ্বনিত হয় নাই।

জাতীয় সংহতি ত দূরের কথা কংগ্রেসের ভিতরেই সংহতি কোথায় ? কোন্ প্রদেশের কংগ্রেসী দল আভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ ও চক্রান্তে জর্জ্জরিত নয় ? কংগ্রেস ত টি কিয়া আছে শুধু বিরোধী দলের অধিকতর অযোগ্যতা ও দুর্ব্বলতার দরুন। দেশাত্মবোধের অভাব সেগুলিতে আরও প্রখর আরও প্রবল। স্বার্থশূন্য ও যোগ্যলোকের সমাদর সেখানে আরও কম। জাতীয় সংহতি যে সকল দেশে যে সকল জাতির মধ্যে দেখা গিয়াছে, ইতিহাসে আমরা দেখি সেই সকল দেশে কঠোর আত্মসংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, শিক্ষা ও শাসনতন্ত্রের মূল আধার বলিয়া স্বীকৃত ও দৃঢ়ভাবে চালিত ছিল। সকল জাতিরই উত্থান-পতন ঐ নিয়মানুবর্ত্তিত্ব ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবহারে সংযমের বেশী-কমের অনুপাতে হইয়াছে। স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার যেখানেই ব্যাপক ভাবে [illegible]য়াছে সেখানেই জাতীয় সংহতি লোপ পাইয়াছে।

ঐ কঠোর আত্মসংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সংস্কৃত "বিনয়" শব্দের প্রকৃত অর্থ, ইংরেজীতে যাহাকে বলে, discipline। আজ বিনয় বলিতে আমরা বুঝি মৌখিক ও বাহ্যিক শিষ্টাচার এবং এখন তাহার দেখা পাই আমরা ভণ্ড ও খলের অঙ্গভূষণ রূপে। প্রকৃত বিনয় লক্ষ লোকের মধ্যে দুই-পাঁচজনের মধ্যে দেখা যায় এবং তাঁহাদের পরিচয় জানে কয়জনে ?

জাতির শীর্ষস্থলে যাঁহাদের আসন তাঁহারাই যদি স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থ-সর্ব্বস্ব হইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতি পদে করেন, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজ রাজকর্ম্মচারীও হইতেছে অনাচারী দুর্নীতিপরায়ণ ও দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারপ্রবণ। দুরাচার জর্জ্জরিত ও অত্যাচার প্রপীড়িত রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতির কথা জবাহরলাল নেহরু আনিয়াছেন কোন মুখে ও কোন লজ্জায় আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। দুর্ব্বল সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচারের আরম্ভ ত রাষ্ট্রের উর্দ্ধতন সোপানেই, সেখানেই জাতীয় সংহতিতে ভাঙ্গনের প্রথম ফাটল দেখা যায়।

আবার এই সকল স্বেচ্ছাচারীও তাঁহাদের নিজ নিজ দলের তাড়নার অধীন। দলের মধ্যে চক্রান্ত ও বিশ্বাস-ঘাতকতা এখন সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়াইতেছে সুতরাং দলপতি নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে দলের মধ্যে প্রবল যাহারা তাহাদের সকল অনাচার অত্যাচারে সায় দিতে বাধ্য থাকেন, কেননা যে লোক নিজস্বার্থে বা নিজগোষ্ঠী পোষণে প্রতিনিয়ত নীচ কাজ করিয়া যাইতেছে বা মানিয়া লইতেছে, সে অপরের অনাচারে বাধা দিবে কোন সাহসে ?

একদল লোক আজ সারা ভারতে হিন্দিকে রাজ ভাষা ( রাষ্ট্রভাষা নয় ) করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, যাহার মাতৃভাষা হিন্দি সে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ও যোগ্যতা নির্ব্বিচারে সকল রাজকার্য্যে ও সকল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করিবে। এই অপচেষ্টাই ভাষাগত বিদ্বেষ ও বৈষম্যের মূল একথা এখন ত সুস্পষ্ট, তবুও ছলে-বলে-কৌশলে সেই চেষ্টাই প্রশ্রয় পাইতেছে।

হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থন আমরা করিয়াছিলাম স্বাধীনতা লাভের বহু পূর্ব্বে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাইতে হইলে হিন্দির ব্যাকরণ, পরিভাষা শব্দমালার যে সংশোধন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন, তাহা হিন্দির জয়গানকারী মহাশয়গণের সাধ্যের অতীত।

## ধ্বংসের পথে মধ্যবিত্ত বাঙালী

বাংলার ও বাঙালীর অতীত গৌরবের আকর ছিল বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ স্তরে। শুধু বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে নয় ব্যবসা-বাণিজ্যে ও যন্ত্র চালনার কৌশলে বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলার তথা ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। সমাজের এই স্তরেই সেই সব বাংলার সুসন্তানের জন্ম হইয়াছিল যাহাদের দেহমনে একাধারে বুদ্ধি, অধ্যবসায়, আত্মসংযম ও কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল। সেই সঙ্গে ছিল ইহাদের মধ্যে প্রগতি-স্পৃহা, আত্মনির্ভর ও সাহস, যাহার বশে বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তান ঘর-দুয়ারের মোহ ছাড়িয়া, দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া, নিজ দেশকে ও সমাজকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। বাংলার সেই গৌরবময় যুগে, বাঙালীর কীর্ত্তি ও যশ অর্জ্জনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, প্রগতি অভিযানের নায়কদিগের গরিষ্ঠ অংশ—বলিতে কি, দুই-চারিজন ছাড়া প্রায় সকলেই আসে এই মধ্যবিত্ত সমাজ-স্তর হইতে।

আজ বাঙালীর দৈন্যের দিন। গৌরব গিয়াছে অস্তাচলে, সাহস, অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরের অভাবে এবং কর্ম্মনিষ্ঠা ও আত্মসংযম বিসর্জ্জন দেওয়ার ফলে। এখন আছে শুধু উচ্ছ্বসিত ও অফুরন্ত বিক্ষোভস্পৃহা এবং শ্লোগানের মোহ। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালী ত হটিয়াছেই, এখন সে "নিজ-বাসভূমেও পরবাসী" হইতে চলিয়াছে নিজেদের আত্মঘাতি, হঠকারিতা, অদূরদর্শিতা ও দলীয় স্বার্থান্ধতার ফলে।

সম্বিতহারা বাঙালীর এখন আছে কি? পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ধনসম্পত্তির অস্থাবর অংশ ত বিভক্ত ও বেহিসাবি খরচ এবং উপার্জ্জনের অভাবে ফুরাইতে চলিয়াছে। ছিল কিছু গৃহ-সম্পত্তি, যাহাতে আশ্রিত সাহসী পূর্ব্ব-পুরুষের অপদার্থ সন্তানেরা, চাণক্য কথিত "কাক-কাপুরুষা নরার" ন্যায়, ক্ষার-জলপান করিয়াও টিঁকিয়া ছিল। এখন অভাবের তাড়নায় ও নগর উন্নয়নের ঠেলায় একে একে সে সবই নীলামের মাল হইয়া দাঁড়াইতেছে। বেচিতেছে অভাবগ্রস্ত বাঙালী, কিন্তু কিনিতেছে অ-বাঙালী। ফলে এই মহানগরীতে মধ্যবিত্ত বাঙালীর উচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইতে বেশীদিন লাগিবে না মনে হয়।

উপায় কি? প্রতিকার কি করে হয় সে কথা বিবেচনা করিতেও বাধা আছে। এবং সেই বাধাও বাঙালীরই সৃষ্টি। পৌরসভায় এই কথার আলোচনা দাবি করিয়া এক প্রস্তাব আসে পৌর কল্যাণ ব্লকের এক সদস্যের নিকট হইতে। এই সংবাদ দিয়াছেন বিগত ১লা অক্টোবরের 'লোকসেবক'। সেই খবরের সঙ্গেই দেখি ইউ সি. সি. দলের নেতা আপত্তি করেন ঐ প্রস্তাবে কোনও "নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নাই" বলিয়া এবং ফলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই, আলোচনার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

দার্জ্জিলিং অঞ্চলে এখন আন্দোলন চলিতেছে বাঙালী ও বাংলা ভাষার উচ্ছেদের জন্য। আন্দোলন চালাইতেছে গোরখা লীগ, অর্থাৎ যাহারা কোনকালেই ঐ অঞ্চলের অধিকারী ছিল না এবং যাহাদের অপেক্ষা বাঙালীর অধিকার সেখানে শতগুণেরও অধিক। এই আন্দোলনের পিছনেও আছে এক বাঙালী রাজনৈতিক দল যাহারা বিদেশীর ইঙ্গিতে রাষ্ট্রের ধ্বংস চেষ্টায় ব্যস্ত।

## পশ্চিমবঙ্গ পুলিস কমিশন

'যুগান্তর' বিগত ৬ই অক্টোবর নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন:

কলিকাতা, ৫ই অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত পুলিস কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন কি না সেই সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিস দপ্তরের সুপারিশে রাজ্য সরকার এই কমিশন গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি পুলিস-মন্ত্রী কমিশনের মেয়াদ আরও বর্দ্ধিত করিতে আপত্তি করিয়াছেন। পুলিস-মন্ত্রীর এই আপত্তিতে সরকারী মহল বিস্ময় বোধ করিতেছেন। সরকারী আদেশ অনুযায়ী ৩১শে অক্টোবর (১৯৬১) কমিশনের মেয়াদ শেষ হইবে। এই সময়ের মধ্যে কমিশনের রিপোর্ট সম্পূর্ণ হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, পুলিস-মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর নিকট লিখিত এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, পুলিস বাহিনীর পুনর্গঠনের ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করার কাজে কমিশনের এত দেরি হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কমিশনের সময়কাল ইতিমধ্যে কয়েকবার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। তাই কমিশনের সময়কাল আর বৃদ্ধি করা উচিত হইবে না।

আরও প্রকাশ যে, কমিশনের চেয়ারম্যান সম্প্রতি রাজ্য সরকারের নিকট এক পত্র লিখিয়া ইহার সময়কাল বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, কমিশনের কাজ এখনও কিছু বাকি আছে। অতএব ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে তাঁহাদের পক্ষে রিপোর্ট দেওয়া যাইবে না।

জানা গিয়াছে যে, চীফ সেক্রেটারী তাঁহার নোটে বলিয়াছেন, কমিশন নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদের সময়কাল ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

অন্যদিকে নিজের দপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী নিযুক্ত একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনের কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিভাগীয় মন্ত্রী কর্তৃক ইহার মেয়াদ বর্দ্ধিত করিতে আপত্তি জানানোর পশ্চাতে অন্য কোন কারণ আছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। পুলিস মহলে অনুমান করা হইতেছে যে, বিধানসভার বিগত অধিবেশনে কলিকাতা পুলিসের রিভলবার কেলেঙ্কারী সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টি উঠিয়াছিল। পুলিস কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় ভূতপূর্ব্ব চীফ সেক্রেটারী শ্রী এস. এন. রায় এই অভিযোগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে পুলিশ কমিশনের চেয়ারম্যান বোম্বাই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী কে. সি. সেন একখানি স্বহস্তলিখিত পত্র রাজ্য সরকারের নিকট এই সাক্ষ্য সংক্রান্ত সংবাদের সমর্থন জানান। প্রকাশ, পুলিস বাহিনীর উচ্চতম মহলের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর গুরুতর অভিযোগ এবং কমিশনের চেয়ারম্যান-পত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় পুলিস-মন্ত্রী নাকি বিরক্ত হইয়াছেন। অবশ্য ভূতপূর্ব্ব চীফ সেক্রেটারী শ্রীএস. এন. রায় এই অভিযোগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে পুলিস কমিশনের চেয়ারম্যান বোম্বাই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী কে. সি. সেন একখানি স্বহস্তলিখিতপত্রে রাজ্য সরকারের নিকট এই সাক্ষ্য সংক্রান্ত সংবাদের সমর্থন জানান। প্রকাশ, পুলিস বাহিনীর উচ্চতম মহলের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর গুরুতর অভিযোগ এবং কমিশনের চেয়ারম্যান-পত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় পুলিস-মন্ত্রী নাকি বিরক্ত হইয়াছেন। অবশ্য ভূতপূর্ব্ব চীফ সেক্রেটারীর অভিযোগ সম্পর্কে কোন তদন্তের ব্যবস্থাও করা হয় নাই। সমস্ত বিষয়টি আপাততঃ ধামা চাপা দিবার চেষ্টা হইতেছে।

সংবাদটি আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত করে নাই। এই মন্ত্রীমহাশয়ের কার্য্যকলাপ বহুদিন হইতেই একটু অন্যরূপ, সুতরাং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তাঁহার কাজে সকল সময় পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে পুলিস কমিশনের কাজ শেষ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কমিশনের চেয়ারম্যান অতি যোগ্যব্যক্তি এবং যে কাজের ভার কমিশনের উপর অর্পিত আছে তাহারও গুরুত্ব সমধিক। এক্ষেত্রে কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া যদি কাজ শেষ করিতে দেওয়া হয় তবেই ভাল, নহিলে মন্ত্রীমণ্ডলীও সাধারণের চক্ষে কিছু নামিতে পারেন। কেননা যে সন্দেহের আভাস যুগান্তরের রিপোর্টে রহিয়াছে এবং শেষের দিকে ধামাচাপা দেওয়ার কথা যাহা লিখিত হইয়াছে দুইটিরই ক্ষালন অত্যাবশ্যক। নহিলে মন্ত্রীসভার উপর সাধারণের আস্থা কমিবে এবং একথা বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্ব্বেও অনেক কারণে ঐ আস্থার তহবিলে জমা অপেক্ষা খরচ হইয়াছে অধিক।

বিধান পরিষদে বা সভায় অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রীসভায় এখন কোনও ভয় নাই কেন না বিরোধী দলগুলির ওজন কম এবং নানা কারণে তাঁহাদের অধিকাংশেরই খ্যাতি, প্রতিপত্তি কমিবার দিকেই চলিয়াছে। কিন্তু দেশের লোক একেবারে মূকবধির বা নির্জীব নয়—যদিও সরকারী ব্যবস্থায় তাহাদের সেই পর্য্যায়েই সামিল করা হইয়াছে। পাকিস্থানে মুসলীম লীগ The awful majesty of the peoples will দেখিয়াছিল। আমাদের মন্ত্রীমহাশয়েরাও সেই দিন ডাকিয়া আনিতে চেষ্টিত মনে হয়।

## খণ্ড বিখণ্ড ভারত

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ এক মহাদেশ ছিল ও তাহাতে নানা ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু মূলত একই সভ্যতায় অনুপ্রাণিত অনেক জাতি ও গোষ্ঠীর অন্তর্গত বহু কোটি নরনারীর বাস ছিল। এই সকল লোকে পরস্পরের ভাষা না বলিতে পারিলেও, কিছু কিছু কথা বুঝিতে সক্ষম হইতেন এবং বহু ভারতবাসীই একাধিক ভাষা জানিতেন। যথা, বাংলা দেশের জনসাধারণ উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল, বিহার, প্রভৃতি দেশের ভাষা উত্তমরূপে না জানিলেও কিছু কিছু বুঝিতে সক্ষম এবং ঐ ভাবে দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দক্ষিণ দেশবাসীরা অল্পাধিক বুঝিতে পারেন। কিন্তু পরস্পরের আচার ব্যবহার, খাদ্য, বস্ত্র, সঙ্গীত, নৃত্য এবং ঐ সকলের মূলে যে দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহ্য রহিয়াছে তাহার সমাদর ও উপলব্ধিতে ভারতীয় সকল জাতির মধ্যে একটা ঐক্য ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা লক্ষিত হয় যাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এই সকল ভারতীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা কোন সময় এক কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সভ্যতার গণ্ডির অন্তর্গত ছিলেন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কন, বয়ন,

কারুশিল্প, অস্ত্রবিদ্যা, শক্তিচর্চ্চা, ভৈষজ্য, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিলেও ঐ পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা যে একই মূল কৃষ্টি ও সভ্যতা হইতে উদ্ভব তাহা আরও পূর্ণরূপে প্রমাণ হইয়া যায়। অর্থাৎ ভারতের জাতিগুলির বিভিন্নতা কেবলমাত্র স্থানীয়তা সম্ভুত; এবং মূল কৃষ্টি ও সভ্যতা বিচারে এই সকল জাতিই এক মহাগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপাখ্যান, রাগ-রাগিণী, তাল, মুদ্রা, বোল এবং মন্ত্র, রীতি, নীতি ও পদ্ধতি বিচার করিলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। অর্থাৎ এই মহাদেশ ও মহাজাতি স্থান, কাল ও অবস্থার দোষে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে বারে বারে ও বহুবিধ ভাবে; কিন্তু সেই বিঘটন কখনও সভ্যতা ও কৃষ্টির যে সূত্রে সকল বিভিন্ন জাতিগুলি গাঁথা, সেই সূত্রটিকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে নাই। বিভিন্নতা-প্রসূত যে বৈচিত্র্য তাহা বহু ভিন্ন ভিন্ন রত্নের একত্র মিলিত শোভার মতই এক অপরূপ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়া ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এই অবস্থা কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে আর রহিল না।

ঐ বৎসর এই মহাদেশের ছয় আনা অংশ ব্রিটিশ প্ররোচিত ও নব সৃষ্ট পাকিস্থান নামে অভিহিত হইয়া ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া অন্য দেশ বলিয়া আখ্যাত হইল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথাকথিত নেতাগণ ব্রিটিশের সহিত মিলিত হইয়া ভারতের এই চরম অপমান মানিয়া লইয়া "স্বাধীনতা" লাভ করিলেন। পাকিস্থান জন্মলাভ করিবামাত্র ভারতের শত্রুতায় পূর্ণ আগ্রহে লাগিয়া পড়িল। প্রথমে হায়দ্রাবাদ ও পরে জুনাগড় ও কাশ্মীরে সশস্ত্র আক্রমণ করিয়া পাকিস্থান ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে তৎপর হইল। হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট জয়লাভ করিলেন কিন্তু কাশ্মীরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভুলে আমরা অর্দ্ধেক কাশ্মীর হারাইলাম। এই পর্য্যন্ত ভারতের খণ্ডন কর্ম্মের কর্ম্মী বিদেশীগণ। কিন্তু অতঃপর ভারতের নিজের রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ দেশের ভিতর দেশ সৃষ্টি করিয়া ভারতকে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া নিজেদের ভোগে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। এক একটি প্রদেশ এক একটি "রাজ্য" হইয়া দাঁড়াইল এবং রাজ্যের মধ্যেও জাতিগত দলাদলির সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। কোথাও কোনও জাতি বিশেষের প্রভাব প্রবল ভাবে প্রকট হইয়া উঠিল; আবার কোথাও অপর কোন প্রকার দলের শক্তি প্রবলতম হইল। যথা বাংলায় পূর্ব্ব অথবা পশ্চিম বঙ্গের বাসিন্দাদিগের পরস্পর বিরোধ অথবা অতুল্যবাবুর দল কিংবা প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দল বলিয়া যাহা কিছু ঘটে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজশক্তি একচেটিয়া করিবার চেষ্টা। এবং এই রাজশক্তি অর্থে বুঝিতে হইবে চাকুরি, কণ্ট্রাক্ট, লাইসেন্স, পারমিট, কোটা, প্রভৃতির ভাগবাটোয়ারা। দেশসেবা নহে, দেশ সেবন। ইহা যে বাংলা দেশের বিশেষত্ব তাহা নহে। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ কিংবা বিহারের ভূমিহার-কায়স্থ সংগঠন ঐ একই প্রেরণা হইতে উদ্ভুত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও দলগত আর্থিক লাভ। কেন্দ্রীয় "রাজ্যে"ও দেখা যায় মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী, শিখ অথবা কাশ্মীরবাসীর শক্তি আহরণের প্রচেষ্টা। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে হিন্দুস্থানী ভাষা-ভাষী সাধারণের ব্যবসার ও অর্থ লাভের দাবী মানিয়া লওয়া। এবং ইংরেজী কিংবা অপর কোন ভাষাতে যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহাদিগকে দাবাইয়া রাখা। এই উদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষা কি ও সে ভাষা কাহাদের মাতৃভাষা এই সকল বিষয়ে মিথ্যার প্রচার কেন্দ্রীয় "রাজ" দরবার হইতে চালান হইতেছে। যথা, পাঞ্জাবী ভাষা হিন্দির সহিত প্রায় এক বলিয়া যাহা প্রচার করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা। কারণ পাঞ্জাবী ভাষা প্রথম—আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষা ও হিন্দী দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ভাষা। অর্থাৎ পাঞ্জাবীর সহিত বাংলা অথবা গুজরাটি ভাষার সম্বন্ধ নিকটতর। বর্ত্তমানে যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে হিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যা বাড়াইয়া বলিবার "বিশ কোটি লোকের ভাষা হিন্দী।" এই মিথ্যা প্রচার বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় রাজদরবার হইতে প্রচারিত হইতেছে। বস্তুতঃ প্রকৃত হিন্দী ভাষাভাষী পাঁচ কোটিও নাই। মৈথিলী, ভোজপুরী, মাগধি, অর্দ্ধমাগধি, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, ইত্যাদি সকল ভাষাই এখন "হিন্দি" বলিয়া চলিতেছে। এই ভাষার লড়াই তাহার চরমে নামিয়াছে আসামে। সেখানে সংখ্যা বাড়াইয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া, পাকিস্থানী গুণ্ডা আমদানী করিয়া, রাজশক্তির অপব্যবহার করিয়া ও অন্যান্য ঘৃণ্য উপায়ে জাতি বিশেষের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছে।

এই যে সকল ঘটনা ও নীচ আগ্রহের প্রগতি, ইহার মূলে রহিয়াছে কংগ্রেসী রাষ্ট্রনীতি ও কংগ্রেসের নেতাদিগের শক্তি অথবা অর্থে লোলুপতা। এই জন্য সম্প্রতি যে সভা করিয়া জাতীয় সংগঠনের কথা ভারতের জনসাধারণকে কংগ্রেসের নেতাগণ শুনাইয়াছেন, সে সকল বাণী কংগ্রেসের লোকেদেরই শুনিবার প্রয়োজন অনেক

অধিক। ভারতবাসীদিগকে পরস্পরের সহিত লড়াইয়া ব্রিটিশ রাজত্ব প্রায় দুই শত বৎসর চলিয়াছিল। আজ কংগ্রেস রাজত্ব চালাইবার জন্যও সেই ঘৃণ্য পন্থার অনুসরণ করা হইতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? বিভিন্ন প্রদেশে বহু সংখ্যক মদমত্ত গুণহীনের দল দেশ দখল করিয়া "রাজত্ব" করিতে পূর্ণ আগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছে। এই সকল লোকের সকলের মিলিত জ্ঞান ও বিচক্ষণতা একটা ছোট স্কুল চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্কুল না হইয়া একটা কারখানা কিংবা কোনও অপর প্রতিষ্ঠান চালাইবার ক্ষমতাও এই "রাজন্যবর্গের" সমবেত ভাবে নাই। অথচ ইহারা দেশের উপর নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে এতই ব্যগ্র যে, সেই জন্য ইহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই।

জাতীয় সংগঠন ও জাতীয়তা সংরক্ষণের জন্য আমরা জনসাধারণকে বলি যে, তাঁহারা যেন রাষ্ট্রীয় নেতাদিগের কথায় ভুলিয়া নিজেদের শক্তি তাহাদিগের হস্তে তুলিয়া না দেন। আগামী নির্ব্বাচনের যুদ্ধে শুধু যেন বাছাই করা গুণীজনকেই সকলে ভোট দেন। কংগ্রেস অথবা অপর কোন রাষ্ট্রীয় পার্টির প্ররোচনায় নির্গুণ ও নিষ্কর্ম্মা অপদার্থ ব্যক্তিদিগকে যেন উচ্চস্থানে না বসান হয়। ভারতবাসী যদি আজ নিজের শক্তি ও নিজের ভবিষ্যৎ নিজেদের হাতে রাখিতে শিখেন তাহা হইলে আর পণ্ডিত নেহরুর মত মহৎ ব্যক্তিকে নিজের দলের সকল অপকর্ম্মের সাফাই গাহিয়া ভারতে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। কংগ্রেসের সভায় জাতীয় সংগঠনের কথা শুনিতে ঠিক ভূতের মুখে রাম নামের মতই হইয়াছে। যাহাদের পাপ তাহারাই যদি সর্ব্বসাধারণকে তাহাদিগেরই সাহায্যে পাপ দূর করিতে বলে তাহা অপেক্ষা অধিক হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে। জাতীয় সংগঠন ও সংরক্ষণের একমাত্র উপায় হইতেছে কংগ্রেসের ধর্ম্মের অভিনয় ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণের সত্য অধিকার ও উন্নতির দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সে কার্য্য কম্যুনিষ্ট অথবা অন্য কোন মতলবি দলের সাহায্যে হইতে পারে না। হইতে পারে যদি ভারতের জনসাধারণ চালাকিবাজির পূজা ছাড়িয়া আবার সত্যের পূজা ও অনুসরণ করিতে শিখেন। নিজের ভবিষ্যৎ নিজেদের হাতে রাখা প্রয়োজন। শঠলোকের প্ররোচনাকে নেতৃত্ব বলিয়া ভুল করিলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অ

## যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও এই রাজ্যের অন্যতম প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবীণ জননায়ক যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা বর্দ্ধমানে তাঁহার নিজ-গ্রামে গত ২১শে সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল।

যাদবেন্দ্রনাথ ১৮৮৬ সনের জুলাই মাসে বর্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বর্দ্ধমান রাজ কলেজে এবং পরে কলিকাতার রিপণ কলেজ ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতে এম. এ. পাস করেন এবং আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বি-এল ডিগ্রী লাভ করেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের বীজ উপ্ত হয়। ১৯১১ সনে ওকালতি পাস করিয়া আদালতে যাইতে সুরু করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি এই কাজে লিপ্ত থাকিতে পারিলেন না, ওকালতি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। আইন অমান্য করিয়া তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৫ সনে তিনি প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ সনে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। কিন্তু ঐ বৎসরেই তিনি মন্ত্রিসভা হইতে চলিয়া আসেন। পরে ১৯৪৮ সনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিলে পাঁজাকে তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সনের জানুয়ারী মাসে সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া, তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং পুনরায় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ইহার পর পাঁজা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যাদবেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন ও অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন বলিয়া, অনেকেরই ধারণা ছিল তিনি লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানিতেন না। বোধ হয় এই কারণেই অনেকেই তাঁহাকে এড়াইয়া চলিত। তিনি সত্যিকার গান্ধীবাদী ছিলেন। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য, এই সব আদর্শ মানুষ একে একে চলিয়া যাইতেছেন।

## পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'প্রবাসী'-কার্য্যালয় আগামী ২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) সোমবার হইতে ১১ই কার্ত্তিক (২৮শে অক্টোবর) শনিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

# স্যর নীলরতন সরকারের জন্ম-শতবার্ষিকী

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ভারতবর্ষে যে সকল স্বনামধন্য মনীষীশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় স্যর নীলরতন সরকার তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৬১ সনে তাঁহার জন্ম ও ১৯৪৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতি তরুণ বয়সেই তাঁহার কর্মজীবনের আরম্ভ এবং কঠোর একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি বহু অসামান্য গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসা, মৌলিক চিন্তা, দেশীয় শিল্প, অর্থনীতি—সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা ও কর্মপদ্ধতি দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। তাঁহার উদার মতবাদ ও ভূয়োদর্শন তাঁহাকে লোকোত্তর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

স্বর্গীয় স্যর নীলরতন সরকারের শতবার্ষিকী জন্মমহোৎসব এই কলিকাতা সহরে সপ্তাহাতীতকাল ধরিয়া ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও এই উৎসব শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত পালিত হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে জীবনী গ্রন্থ, স্মারক গ্রন্থ, বক্তৃতা ও রচনাবলীর সংগ্রহ-পুস্তক প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়াতে ভারতে ও ভারতের বাহিরেও তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকীর যথেষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। ১৮৮৯-১৯৪৩ সন পর্যন্ত তিনি তাঁহার অপূর্ব মনীষা নানা লোকহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার উপার্জিত সম্পদ জনসাধারণের হিতার্থে দান করিয়াছিলেন। জনকল্যাণে তাহার এই ত্যাগস্বীকার জাতির ইতিহাসে চিরদিন অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে রয়েল কমিশন নীলরতন সরকারের মতামত জানিতে চাইলে তিনি স্পষ্ট ভাবে জানাইয়াছিলেন যে, "শুধু আই-এম্-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডাক্তারের জন্য গবর্ণমেন্টের অত আগ্রহ কেন? গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপযুক্তরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত সরকারী বা বেসরকারী ডাক্তারেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে সমান কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। আই-এম-এস্ পাশ ডাক্তারেরা য পদগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন সেগুলিতে অন্য ভাবে পাশ করা উপযুক্ত কৃতী ডাক্তারের নিয়োগে আপত্তি কি থাকিতে পারে? এ বিষয়ে লোক্যাল গবর্ণমেন্টের অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং বিলাতের সেক্রেটারী-অব-ষ্টেটের হাত হইতে এ ক্ষমতা ভারত গবর্ণমেণ্ট বা লোক্যাল গবর্ণমেন্টের হাতে ফিরাইয়া আনা উচিত। উচ্চ-বেতনভুক্ বিদেশী আই-এম-এস কর্মচারীদিগের নিয়োগে শুধু যে ভারতীয়দিগের পক্ষে চিকিৎসাক্ষেত্রে উচ্চ পদপ্রাপ্তির আশা অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা নহে, মনের উপরেও একটা বিদ্বেষ ও বিরাগের ছায়া পড়ে। এতদ্বারা ভারতীয় কৃতীব্যক্তিদের অবমাননাই করা হয় এবং তাঁহাদিগকে চিরটাকাল একরকম সংকারীরূপেই থাকিতে হয়।"

১৯২৮ সনে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল কনফারেন্সের সভাপতিরূপে স্বর্গীয় নীলরতন সরকার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, "কোন জাতির প্রাণের দায়িত্ব ভিন্ন-জাতির হস্তে থাকা অনুচিত। নিজের দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার সেই দেশেরই লোকের হাতে থাকিলে কার্য্য-ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা প্রসূত অনেক সুফল পাওয়া যায়। বাংলা দেশের ম্যালেরিয়ানিবারণী সমিতি, স্বাস্থ্যরক্ষা সঙ্ঘ, সমাজ সেবা সমিতির কার্য্যকলাপ দেখিয়া এ বিষয়ে অনুকূল মত পোষণ করা সহজ হইয়া পড়ে। তবে গবর্ণমেণ্ট হয়ত উচ্চপদে বিদেশী নিয়োগই পছন্দ করেন এবং দেশের লোক নিজের হাতে কোন কিছুর ভার লইলেই অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা সহযোগিতা করিতে চান না। স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত ও স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজ ও আচার্য জগদীশ বসু প্রতিষ্ঠিত বসুবিজ্ঞান মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া এরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। গবর্ণমেন্টের উপেক্ষায় জাতির মনে একটা নৈতিক অবসাদ ও বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। উন্নত বিজ্ঞান চর্চার ফলে পাছে পরাধীন জাতির মধ্য হইতে কোন বিশ্বজয়ী প্রতিভার আবির্ভাব হয়, এই শঙ্কাতেই বিদেশী সরকার এ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা বা আনুকূল্য করিতে চাহেন না।

"ভারতবর্ষে আমরা দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। ইহাতে জাতীয় মর্যাদার দিক হইতে হানিকর অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় চিকিৎসাক্ষেত্রের উচ্চপদস্থ অফিসার ও কর্তৃপক্ষ অধিকাংশক্ষেত্রে সামরিক আই-এম-

এস এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়াই উচ্চপদস্থ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা অসামরিক জনসাধারণের কথা কতটা ভাবিতে পারেন বা তাহাদের অবস্থা অনুধাবন করিতে পারেন? অথচ তাঁহারা যদি ছাড়িতে চাহেন না ও সরকারী অনুমোদনও পাইয়া থাকেন। ইহাতে ভারতীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারতীয়দের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আইন সভায় ইহার সম্বন্ধে কোন আলোচনার ঢেউ উঠিলে তাহা বিদেশী গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা ও নিষ্ক্রিয়তায় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।—একটা কথা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপীয়দের চিকিৎসার জন্য ও অনিশ্চিত যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য এই সকল বিদেশী চিকিৎসকদিগকে ভারতে সংরক্ষণ করা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে আই-এম-এস অফিসারদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের একদেশদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতে বেসরকারী ইউরোপীয় চিকিৎসকের অভাব নাই এবং প্রতিভাবান্ ভারতীয় চিকিৎসকও দুর্লভ নহেন, এরূপক্ষেত্রে শুধু ইউরোপীয়দিগের জন্য সাহেব আই-এম্-এস্ ডাক্তারদিগকে ভারতে আটকাইয়া রাখিবার হেতু কি?"

১৯৩৯ সনে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগের ছাত্রদিগের সভায় স্বর্গীয় নীলরতন সরকার মহাশয় বলেন, "শুধু রোগ নির্ণয় ও ঔষধ প্রয়োগদ্বারা নিরাময় করিলেই চিকিৎসকদিগের কর্তব্য শেষ হয় না, যাহাতে দেশে ঐ রোগ ছড়াইয়া পড়িতে না পারে বা উপযুক্ত যত্ন ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাহাতে ঐ রোগ দেশ হইতে দূরীভূত হইতে পারে, তাহারও দায়িত্ব রহিয়াছে চিকিৎসকমণ্ডলীর উপর। দেশের লোক যাহাতে স্বাস্থ্যসুখের অধিকারী হয়, সেরূপ ব্যবস্থাও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে।

"চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রারম্ভে ছাত্রদিগের আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলির অধ্যয়ন ও গবেষণা একান্ত আবশ্যক। রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ যাহাতে না জন্মিতে পারে তাহার প্রচেষ্টা জনকল্যাণের এক সার্থক রূপ। ইহাতে চিকিৎসকদিগের মানবতা ও মর্যাদা এমন এক উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয় যাহাতে তাঁহাদের ত্যাগস্বীকার ও জনহিতব্রত গৌরবময় হইয়া উঠে। বিজ্ঞানসাধনার প্রাণ গবেষণা। গবেষণাস্পৃহা না থাকিলে বিজ্ঞানশিক্ষা নিরর্থক। অনেক সময় দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ছাত্রেরা গবেষণা হইতে দূরে থাকেন। জনসাধারণ যদি গবেষণার মূল্য বুঝিতে পারেন এবং শিক্ষিত সমাজও যদি গবেষণাকার্যে উৎসাহ দেন তাহা হইলে রাষ্ট্রের দিক হইতে নিশ্চয়ই সাহায্যলাভ ঘটিবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ গবেষণায় আত্মনিয়োগকারী ছাত্রের সংখ্যা অল্প।

"এদেশে চিকিৎসাবিদ্যায়তন ও হাসপাতালগুলির সংখ্যা পর্যাপ্ত বা আশানুরূপ নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষে প্রতি ১২৬ বর্গমাইলে একটি হাসপাতাল বা ডাক্তারখানা আছে এবং উহা ৪১০০০ লোকের সুবিধার জন্য। অতসংখ্যক লোকের জন্য মাত্র একটি হাসপাতাল বা ডাক্তারখানা কি যথেষ্ট? এখনও এদেশে বহু হাসপাতাল স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ডাক্তারখানাও চাই। বিনা চিকিৎসায় বহুলোক মারা যায় কেন, এ সমস্যার উৎপত্তি ত এখানেই। ভারতবর্ষ এমন একটা বিরাট্ দেশ যেখানে মূক নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণ উপযুক্ত জ্ঞান ও তত্ত্বাবধানের অভাবে সহজেই পীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহাদিগের সেবার মাধ্যমে দেশের ও জাতির উন্নতিবিধান করা প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্তব্য। অর্থের ও ক্ষমতার মোহ যেন চিকিৎসকদিগকে গ্রাস না করে। যাহাতে শিক্ষার পরিধি বাড়ে ও দেশে বহুসংখ্যক শিক্ষায়তন ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়, সেদিকে সকলের মিলিতভাবে আন্তরিক প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

"এটা বৈজ্ঞানিক যুগ। চিকিৎসাবিদ্যার সাফল্যের জন্য অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিরও একান্ত আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশের নানা স্থানে কি ভাবে সুচিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায় এবং কিরূপ যন্ত্রপাতি সে সব স্থানে ব্যবহৃত হয় তাহারও সন্ধান রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষে সেইসব যন্ত্রপাতি আমদানী করা কি ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে তাহাও বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। চিকিৎসাবিদ্যা এমনই অসাধারণ যে, তাহাতে কোনপ্রকার গোঁজামিল দেওয়া চলিতে পারে না।"

১৯১৫ সনের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে স্বর্গীয় নীলরতন সরকার জগতের ধর্মমত সম্বন্ধে এক অপূর্ব বক্তৃতা প্রদান করেন। "প্রত্যেক ধর্মের মূলতত্ত্ব জনসেবা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী—প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই একেশ্বরবাদিত্বের গভীর তত্ত্ব রহিয়াছে। প্রকৃতির ভিতর দিয়াই মানুষের ঈশ্বর-চেতনা আসে। মূর্তিপূজার গণ্ডি পার হইয়া আসিলে মানুষ এই অধ্যাত্মজ্ঞানের অধিকারী হয়।

"জগতে নানা ধর্মের সংঘাত ঘটিলেও মূলতঃ একেশ্বরবাদিত্বের দিকেই জগৎ অগ্রসর হইতেছে। ধর্মই জন-

মতকে গঠিত করে ও ভারত ধর্মের নামেই পাগল। ধর্মের বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষা সহজসাধ্য নহে। মানুষের বোধশক্তিজন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে ধর্মের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশ ঘটিয়া থাকে। সেই ভাব তাহাকে ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর অন্তর্চেতনায় লইয়া যায়। বিশ্বজনীন ধর্মভাবের উন্মেষ তখনই হয়, যখন মানুষ গণ্ডিত্বের মোহ ত্যাগ করিতে পারে।"

ভারতের শ্রমশিল্প সম্বন্ধে নীলরতন সরকার প্রগতিশীল মনোভাব পোষণ করিতেন। "ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, জার্মানী, জাপান ও ইংলণ্ডের মত শিল্পপ্রধান দেশ নহে। ভারতবর্ষকে উন্নতি লাভ করিতে হইলে শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, জগতের শিল্পপ্রধান দেশগুলির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানী ও জাপান ভারতবর্ষের শিল্পক্ষেত্রে তেমন আদর না পাইলেও, বর্তমানে ইংলণ্ডের সাহায্যে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি ঘটিতে পারে। ভারতবর্ষ কাচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ করুক আর ইংলণ্ড সেগুলি সেখানে শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগাক, ইহাই যদি ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক হয় তবে তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

"ভারতবর্ষে কাঁচামালের অভাব নাই। এই কাঁচামালকে যান্ত্রিক শিল্পের মাধ্যমে এই দেশেই রূপান্তর ও ব্যবহারোপযোগী করা যাইতে পারে। কিন্তু এজন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, শিক্ষা ও গবেষণা পাওয়া গিয়াছে কি? এ ছাড়া, মূলধনের প্রশ্নও এই সঙ্গে উঠে। বড় বড় কলকারখানার জন্য যে বিরাট মূলধন আবশ্যক, তাহা হয় সরকারী সাহায্যে, অথবা জনসাধারণের সমবায় প্রচেষ্টা জোগাড় করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত মূলধনে এরূপ বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সহজ কথা নহে। তাছাড়া ব্যবসায়ীমন না হইলে এরূপ প্রচেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। বাঙালীদের ব্যবসায়ক্ষেত্র প্রশংসনীয় নহে। সেখানে ব্যবসায়-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার একান্ত অভাব। কিন্তু তবুও দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য, যৌথভাবে কোন শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত করা ও বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত করা। তত্ত্বাবধানের ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকিলেই উহা অনেকটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে ও সেই দিক দিয়া বহু প্রকার সাহায্যলাভও ঘটিতে পারে।

"কিন্তু জগৎ-জোড়া প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাল রাখিয়া ভারতের শ্রমশিল্প টিকিয়া থাকিতে পারিবে কি? এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত শিক্ষার ও ধৈর্যের অভাব ইহার প্রধান অন্তরায়। একবার মাদ্রাজের ডিরেক্টরস্ অব্ ইনড্রাষ্ট্রিজ দক্ষিণ ভারতের কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে এল্যুমিনিয়াম ও ক্রোম চামড়া সরবরাহ করিয়া দেশে শিল্পোন্নতি ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। শেষে দেখা গেল, সে শিল্পপ্রতিষ্ঠান অল্পদিনের মধ্যেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুমান করা সহজ নহে। ভারতে ব্যক্তিগত শ্রমশিল্পের অবস্থা প্রায়ই এইরূপ শোচনীয়। গবর্ণমেণ্টের যে সকল গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহাদের সাহায্য লইয়া নূতন শ্রমশিল্পে অগ্রসর হওয়া উচিত। শুধু মূলধন থাকিলেই হয় না, শিক্ষা ও কর্মতৎপরতা থাকা চাই। এসব ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের উচিত নূতন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখিলে তাহাকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করা।

"এ দেশে এমন কতকগুলি শ্রমশিল্প আছে যেগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চিনি ও নীলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু মূলতঃ এগুলি কৃষির সাফল্যের উপর নির্ভর করে। কাঁচামালের সরবরাহ না হইলে কলকারখানা চলিবে কিরূপে? দেশলাই, পেন্সিল, কলম, প্রভৃতির জন্য চাই বনবিভাগের বৃক্ষ সরবরাহ। তার পর উৎপন্ন মাল কাটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ ও ক্রয়বিক্রয়ের প্রচেষ্টা থাকা অত্যাবশ্যক।

"টাটা লৌহ প্রতিষ্ঠানকে গবর্ণমেণ্ট সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। বস্ত্রশিল্প, কাংস্যশিল্প, প্রভৃতিতে গবর্ণমেণ্ট টাকা ধার দিয়া ঐগুলি চালু রাখিতে পারেন। অনেকক্ষেত্রে উপযুক্ত জামিনদারের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় তাহার অভাব না ঘটিতে পারে।

"দেশের ব্যাঙ্কগুলিও এক্ষেত্রে অগ্রগামী হইয়া পথপ্রদর্শন করিতে পারেন। জাপান ও ফ্রান্সে ব্যাঙ্ক হইতেই শ্রমশিল্পে অর্থ সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

"গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে আরও একটি কর্তব্য আছে। স্থানে স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র ও গুদামঘর করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি নিজ তত্ত্বাবধানে ঐ সকল পরিচালনা করেন, তবে তাহাতে যথেষ্ট সুফল ফলিতে পারে। এ বিষয়ে জাপান গবর্ণমেণ্টের নীতি অনুসরণযোগ্য।

"মহাযুদ্ধের ফলে বর্তমানে দেশে যে প্রকার অর্থনৈতিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

"শ্রমশিল্পের প্রধান কার্যদ্বয়—আহরণ ও বিতরণ। এ বিষয়ে রেলপথের সাহায্যও অত্যাবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট হইতে যতদূর সম্ভব কমমূল্যে আমদানী ও রপ্তানীর ভাড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য, এখনও যে স্বল্পমূল্যে যাতায়াত খরচ নাই, তাহা নহে।

"মিষ্টার এস. সি. ঘোষ দেখাইয়াছেন, রেলকর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ই, আই, রেলের ৫৫০ মাইলের মালের ভাড়া মণপ্রতি ।৵১০; জি. আই. পি. রেলের ভাড়া ৷৷১৫। সুতরাং রেলের সুবিধাজনক ভাড়া বর্তমান থাকিলে দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতি ঘটিবে। এ সম্পর্কে সমগ্র দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট একসঙ্গে হাত মিলাইয়া সহযোগিতা করিলে অদূর-ভবিষ্যতে শ্রমশিল্পের যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

স্যর নীলরতন সরকার ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে এমন এক অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যাহার জন্য বৈদেশিক শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অসঙ্কোচে তাঁহাকে জয়মাল্য দিয়াছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা তাঁহার ভূয়োদর্শন ও পাণ্ডিত্যে শুধু মুগ্ধ হন নাই, তাঁহাকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ১৯২০ সনে ইউরোপ ভ্রমণ-শেষে এডিনবার্গে পৌঁছিলে তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল্-এল্ ডি এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি. সি. এল. উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকমণ্ডলী তাঁহার গুণরাজি উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইয়াছিলেন।

স্যর নীলরতন সরকার শুধু বাঙালীর গৌরব নহেন, চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মান এতদূর উন্নত করিয়াছিলেন যে, আজও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষীমণ্ডলী তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি, ধর্মজীবনে লোক-কল্যাণব্রত, কর্মক্ষেত্রে দেশপ্রাণতা, জাতীয় মর্যাদাবোধের দৃঢ়তা স্যর নীলরতন সরকারের চরিত্রে এক অনন্যকরণীয় আদর্শ সৃষ্টি করিলেও ভারতবর্ষের নবজাগ্রত শিল্পায়তন-গুলির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন। এ দেশের লক্ষ লক্ষ শিল্পকুশলী ব্যক্তিকে কি করিয়া উপযুক্ত কাজে লাগাইতে পারা যায় সে সম্বন্ধে তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করিতেন। ব্যবসা ও কারিগরি শিক্ষা যাহাতে এদেশে বহুল প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে তিনি নিজে নানাভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা করিতেন। বহু বোর্ড, কমিটি ও ফ্যাকাল্‌টির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক রাখিয়া তিনি অসীম আগ্রহভরে দেশের কাজ করিয়া যাইতেন। ভারতবর্ষে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল এবং ঐ ভাব নিজের কর্ম অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এরূপ কলেজ স্থাপনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ—"কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ" তাঁহারই এই প্রবল প্রচেষ্টার ফল।

সংযতবাক্ দৃঢ়চেতা এই কর্মতপস্বী মানুষটির মুখে কেহ কখনও রূঢ় বা অপ্রিয় কথা শোনেন নাই। কাহারও সহিত মতের মিল না হইলেও তিনি কখনও বিরাগপ্রসূত কোন সমালোচনা করিতে জানিতেন না। দেশের ও দশের কল্যাণ হইবে এরূপ কোন কাজে তিনি লিপ্ত হইলে, পরের বাহবা শুনিবার জন্য তিনি কোনদিনই উৎসুক হন নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও ভাইস্-চ্যান্সেলার রূপে তাঁহার নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার যে পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন, তাহা চিরদিনই দেশবাসীর স্মরণ থাকিবে। স্নাতকোত্তর বিভাগের কলা ও বিজ্ঞান—এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সর্বপ্রধান ছিলেন। ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকা কালে তিনি এ দেশে শিক্ষা-প্রসারের গলদ কোথায় এবং তাহার প্রতিকার কি ভাবে হইতে পারে এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটকে শেষে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পরিণত করা হয়।

জীবনের শেষাংশে তিনি বিশ্বভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এত লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে থাকিয়াও তিনি এ দেশে চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সাধনে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

স্যর নীলরতন সরকারের জন্ম-শতবার্ষিকীতে দেশবাসী সশ্রদ্ধ ভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে। যে দুর্লভ মানবতা যে সচেতন আত্মমর্যাদা, যে জাগ্রত দেশপ্রেম ও যে অক্লান্ত কর্মপ্রবণতা তাঁহার জীবনে আমরা দেখিতে পাই ইতিহাস শুধু তাহা লিখিয়া রাখিবে না, মানুষ চিরদিন তাহা আদর্শ বলিয়াই গ্রহণ করিবে।

# চারণ ও ক্ষত্রিয়

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

[ চারণ ভাই ক্ষত্রিয়াঁ, জাঁঘর খাগ তিয়াগ।
খাগ তিয়াগা বাহিরা, জাঁসু লাগ ন ভাগ ]
(দোহা, মহারাজ মানসিংহ রাঠোর)

১

রাজস্থানে ডিঙ্গল সাহিত্যে এবং রসিক সমাজে ব্রাহ্মণ, চারণ, সন্ন্যাসী, যতি ( জৈন সাধু ) ফকির এবং শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরের পূজারী ক্ষত্রিয়—এই ছয় সম্প্রদায়কে সংক্ষেপে সম্মানার্থে "ষড়দর্শন" এবং ব্যঙ্গার্থে ষট্‌ব্রণ বলা হয়। ইঁহারা পুণ্যার্থীর দর্শনীয় জীব, কিন্তু ধর্মভীরু গৃহস্থের পক্ষে পীড়াদায়ক ব্রণও বটেন; পীড়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। ইঁহাদের মধ্যে চারণ সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কাজনক ব্রণ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজপুতানা, মালব, গুজরাট, কাঠিয়াবাড় এলাকায় বিশ লক্ষ টাকা আয়ের নিষ্কর জমি মৌরসীসত্বে একাধিক শতাব্দী হইতে চারণ সম্প্রদায় ভোগ করিয়া আসিতেছে। সেকালে ক্ষত্রিয় মনে করিতেন চারণেরা তাঁহাদের নিতান্ত আপন জন, লেন-দেন এক ঘরের ব্যাপার। ক্ষত্রিয়ের সহধর্ম্মিণীর ন্যায় ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্টলক্ষ্মীও দ্বিভুজা; এক হাতে খড়্গ, অন্য হাতে দান-কমণ্ডলু। ক্ষত্রিয় চারণের প্রতি "ত্যাগ" বিমুখ হইলে ক্ষত্রিয়ের হাত হইতে তরবারি, এবং অধিকার হইতে ভূমি খসিয়া পড়িতে বিলম্ব হয় না।

এই চারণ জাতি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের একটি বড় সমস্যা। উক্ত সমস্যার বিচার ইতিবৃত্তের অধিকারের বাহিরে। চারণ জাতির উৎপত্তি ও বৃত্তি সম্বন্ধে চারণের অভিমত না জানিয়া শুধু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া কোন নূতন কুলপঞ্জিকা উহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। সেকালে চারণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর অনন্যনির্ভরতা এই প্রবন্ধে মুখ্যতঃ আলোচনা করা হইবে।

২

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে একদিন মহামহোপাধ্যায় চারণ-কুলতিলক মুরারিদানজী (মৃত বিঃ ১৯৭১ = খ্রীঃ ১৯১৪) এবং মুন্সী মহম্মদ মখদুম যোধপুর রাজদপ্তরে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং যোধপুরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মুন্সী দেবীপ্রসাদজীর ঘরে বসিয়া মহারাজার কাছে আর্জ্জি লিখাইতেছিলেন। দরখাস্তের নীচে মখদুমজী "তাবেদার" ( বশংবদ ) লিখিয়া নাম দস্তখত করিলেন। লেখক চতুর্ভুজ পঞ্চোলী[১] উহা দেখিয়া মুরারিদানজীর দরখাস্তের নীচেও "তাবেদার" শব্দ লিখিলেন। দরখাস্ত পড়িয়া শুনাইবার সময় মুরারিদানজী বলিলেন, "দবাগীর"[২] শব্দ লিখ। সুযোগ পাইয়া সুরসিক দেবীপ্রসাদজী পঞ্চোলীকে ধমক দিয়া বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! মহামহোপাধ্যায় দেবতা হইয়া গিয়াছেন, তুমি লিখিলে "তাবেদার"? মুরারিদানজী হাসিয়া বলিলেন, হাঁ ঠিক! এই সময় মুরারিদানজী চারণ জাতিকে দেবযোনি সপ্রমাণ করিয়া চারণোৎপত্তি বিষয়ক এক পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মীসন শাখার চারণ সূরজমল বুন্দী দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় "বংশভাস্কর" নামক ঐতিহাসিক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় "মহাভারত"; ইহার বিষয়বস্তু রাজপুত জাতির মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত। ভাট-চারণের খ্যাত ও গীত এবং ডিঙ্গল ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ রাজপুতগণের ছন্দোবদ্ধ জীবনী বংশভাস্কর মহাকাব্যের মূল উপাদান। চারণ জাতির উৎপত্তি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সূরজমল প্রাচীনকালের সূত ( স্তুতিপাঠক ) হইতে চারণ জাতির উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন এবং

---

১। পঞ্চোলী রাজপুতানায় কায়স্থ রাজকর্ম্মচারী সাধারণ উপাধি ব্রাহ্মণ, মহাজন, গুজর ইত্যাদি সকল জাতির মধ্যে পঞ্চোলী পদবী প্রচলিত আছে; সুতরাং পঞ্চোলী পদবাচক শব্দ, জাতিবাচক নয়। ( দ্রঃ 'গুলেরী' প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৬১ পাদটীকা )। এই "পঞ্চকুল" শব্দের প্রকৃত অর্থ হিন্দী পঞ্চ বা পঞ্চায়েত। বাংলা "পাঞ্জেন" সিন্ধুনদীর অপর পারে "পাঞ্জলি" পদবী হইয়া গিয়াছে, পাঞ্জানি ( পঞ্চজনী ) জাতিতে 'ক্ষত্রী'। আমার এক ছাত্রের এই উপাধি ছিল, তাহার আদি নিবাস সীমান্তপ্রদেশ।

২। "দবাগীর" ডিঙ্গল ভাষায় 'আশীর্ব্বাদক" অর্থে ব্যবহার হয়। ইহা ঠিক শুদ্ধ নয়। এই ফার্সী শব্দের অর্থ "আশীর্ব্বাদাক্ষী", "দবাগো" লিখিলেই আশীর্ব্বাদক বুঝায়।

চারণ জাতির যাচক মোতীসর, রাবল, ঢোলী, ভাট ইত্যাদির চারণ-স্তুতির উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। কশ্যপ ঋষির অভিশাপে সুমিত্রক নামক সূতের বংশ নষ্ট হইয়াছিল। এই বংশের আর্য্যমিত্র নামক সূত মহাদেবের বৃষ নন্দিকেশ্বরের সেবা করিয়া বর পাইয়াছিলেন যে, নাগকন্যা অবরীর গর্ভজাত সন্তানগণ তাঁহার কুলবৃদ্ধি করিবে। কথিত আছে ঐ সময় হইতে আর্য্যমিত্রের বংশ সূত উপাধি ত্যাগ করিয়া চারণ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন এই অবরী সমুদ্রের পৌত্র বাসুকী নাগের কন্যা।

বংশভাস্কর মহাকাব্যের সুযোগ্য টীকাকার সোদা বারহঠ্ শ্রীকৃষ্ণসিংহজী এবং মহামহোপাধ্যায় চারণ মুরারিদানজী চারণোৎপত্তি সম্বন্ধে বংশভাস্কর প্রণেতার সহিত একমত নহেন; যেহেতু এই বিষয়ে মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি হইতে কোন শাস্ত্রীয় আস প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া স্বরজমল কেবল মোতীসর ইত্যাদি যাচকগণের মন-গড়া স্তোকবাক্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই পণ্ডিতদ্বয়ের শাস্ত্রমূলক যুক্তির আলোচনা মানববুদ্ধির বিদ্রোহের যুগে প্রীতিকর হইবে না। যাহা হৌক, বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসজ্ঞ এবং ইংরেজী শিক্ষিত কোন প্রাচীনপন্থী চারণের সহিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সাজিয়া যদি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার করেন তাহা হইলে যাহা তথ্য পাওয়া সম্ভব উহা নিম্নে প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিত হইল—

(১) চারণ জাতি ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়?

চারণ "জাতি" নহে, একটি কুল। চারণগণকে "কুল" বলা হয়। চারণ ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয়ও নহে। চারণ কোন বর্ণেরই অন্তর্গত নহে, চারণকুল বর্ণব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়াছিল, চারণ "আর্য্য" অর্থাৎ দেবতা। সে যুগে আর্য্য এবং অনার্য্য দস্যু এই দুই জাতিই ছিল

(২) চারণকুলের আদি নিবাস কোথায় এবং চারণকুলের প্রতিষ্ঠাতা কে?

আদি নিবাস স্বর্গ। কুলের প্রতিষ্ঠাতা কেহ নাই, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়ং, (মতান্তরে বিষ্ণু ভগবান্), যিনি প্রজাপতি মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর ও গুহ্যকগণকে পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিয়াছিলেন [শ্রীমদ্‌ভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধ, দশম অধ্যায়]; তাঁহাকে চারণকুলের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করিতে পার।

(৩) স্বর্গে আপনাদের কার্য্য কি ছিল?

মর্ত্ত্যে যাহা করিতেছি স্বর্গেও উহা করিতাম, অর্থাৎ দেবতার উপাসনা। স্তুতি দ্বারাই আমাদের উপাসনা ক্ষত্রিয়েরা আমাদের মত আর্য্য অর্থাৎ দেবতা। এখন যেমন ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যাদি কাজ ব্রাহ্মণ করিয়া থাকে তেমন আর্য্য বা দেবতার কার্য্য স্বর্গে দেবতাই করিত. চারয়ন্তি কীর্ত্তিং ইতি চারণাঃ। স্বর্গে দেবতার যশ, মর্ত্ত্যে ক্ষত্রিয়ের যশ প্রচার চারণের কার্য্য। ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গেই চারণ মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছিল

(৪) স্বর্গ হইতে চারণ ও ক্ষত্রিয় চলিয়া আসিলেন কেন? আসিবার পর স্বর্গের দেবতাগণের সঙ্গে উঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল?

প্রজাবৃদ্ধিই আগমনের কারণ। আগমনের পরেও স্বর্গে ক্ষত্রিয়গণের যাতায়াত ছিল। যাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহারা যাইতে পারিত না। ক্ষত্রিয় ও দেবতার গোত্র একই ছিল, যথা, রাজা শর্য্যাতি ও ইন্দ্র শর্য্যাতি (ইন্দ্রের অপর নাম)৩ উভয়ের গোত্রের নাম শর্য্যা। মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, দশরথ, অর্জ্জুন ইত্যাদি অনেকে স্বর্গে দেবকার্য্য সমাধা করিয়া মর্ত্ত্যে ফিরিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় না হইলে দেবতারা উপবাসী থাকিতেন, দৈত্যের উৎপীড়নে স্বর্গেই টিঁকিতে পারিতেন না। অন্যপক্ষে দেবতার বর ও শক্তি না পাইলে ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করিয়া রাজত্ব করিতে পারিত না।

(৫) আপনাদের স্বর্গটা কোথায় ছিল?

জ্যোতিশশাস্ত্র যেখানে নির্দ্দেশ করিয়াছে সেইখানেই আছে। সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায়ের ভুবনকোষ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে স্বর্গ শূন্যে নয়, পৃথিবীপৃষ্ঠেই একটা স্থান। হিমালয় পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগ দেবভূমি স্বর্গ। এই ত সেদিন হার্ণেলী সাহেব আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে লিখিত ভূর্জ্জপত্রের পুঁথি তিব্বত হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে নাকি লেখা আছে তিব্বত দেশের নাম ছিল ত্রিবিষ্টপ (স্বর্গ)।

হিমাচল প্রদেশে কিন্নর জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নেপালে নাকি গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ আছে। সকলেই আচারভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যুধিষ্ঠির হিমালয়ের পরে বালুকাভূমি অতিক্রম করিয়া স্বর্গে পৌঁছিয়াছিলেন, সুতরাং স্বর্গ আলতাই কিংবা উরাল পর্ব্বত হইতেও পারে। ঐ স্থানের কাছাকাছি আর্য্যের পিতৃভূমি উত্তরকুরু, যেখানে অশ্বমুখ জাতির বাসস্থান, যে দেশ অর্জ্জুন অস্ত্রবলে জয় করিতে পারেন নাই। স্নেহ-

৩। দ্রষ্টব্য, গুলেরী গ্রন্থ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৫।

বশীভূত হইয়া জ্ঞাতিগণ তাহাকে কিছু চাঁদা দিয়াছিল মাত্র।

(৬) দেবতাগণের দুইটা স্বর্গ কেমন করিয়া বর্ত্তমানে অনার্য্য জাতি জয় করিল?

যাহারা জয় করিয়াছে তাহারা সকলেই অনার্য্য নহে। অসুর-দৈত্য আর্য্য দেবতার শত্রুভাবাপন্ন জ্ঞাতি ভাই, কশ্যপ ঋষির পত্নী দিতির গর্ভজাত দৈত্য, দেবতারা অদিতির সন্তান আদিত্য। দেবতারা দৈত্যের কাছে অনেক বার পরাজিত হইয়া স্বর্গ হারাইয়াছে। দৈত্যের বাহুবল অধিক, বুদ্ধির জোরে দেবতা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে, দেবতারা সমুদ্রমন্থনে দৈত্যকে ফাঁকি দিয়াছিলেন, বলিরাজাকে পাতালে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। দেবতাদের মধ্যে মহাদেবের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছু কম। তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অসুরকে বর দিয়াই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। ভগবতী শক্তিমাতা আবার চারণের ঘরে আসিবেন। যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের লোপ হওয়ায় দেবতারা ক্ষীণবল হইয়াছে, ক্ষত্রিয় জাতি মোহগ্রস্ত হইয়াছে। শক্তিমাতার কৃপায় ক্ষত্রিয় আবার জাগিবে, দেবতারা ক্ষত্রিয়ের বাহুবলে স্বর্গ ফিরিয়া পাইবেন।

(৭) ক্ষত্রিয় জাতির সহিত চারণকুলের ঐতিহাসিক সম্পর্ক কত পুরাতন?

পাণ্ডুরাজার স্ত্রী ও পুত্রগণকে হস্তিনাপুরে কাহারা আনিয়াছিল? চারণেরা সে যুগে হিমালয়ে তপস্যা করিতেন, পাণ্ডুরাজা তাঁহাদের আশ্রয়ে বাস করিতেন, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভীষ্ম পাণ্ডবগণকে পৌত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাপার কিছু অসম্ভব নয়। বালক উদয় সিংহ শিশোদিয়া, রাঠোর চুণ্ডা এবং অজিত সিংহ রাঠোর চারণের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, চারণের কথায় জ্ঞাতিগণ তাঁহাদিগকে রাজা রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

মহাভারতে আছে:

"তং চারণসহস্রাণাং মুণিনামাগমং তদা।
শ্রুত্বা নাগপুরে নৃণাং বিস্ময় সমপদ্যতে॥

নাগকুলের রাজধানী প্রথমে হস্তিনাপুরে ছিল। নাগেরা সাপ নহে, আর্য্য ক্ষত্রিয়। সর্পের মত খল ও কোপণ স্বভাব বলিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয়কুল ইহাদিগকে নাগ বলিত। তাহারা বাসুকির পূজক ছিল এবং সমস্ত উত্তর ভারতে নাগকুলের রাজত্ব ছিল। মিবাড়ের আদি রাজধানী ছিল নাগদা বা নাগহ্রদ। মথুরামণ্ডল ও খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে যদু ও কুরুবংশ নাগকুলকে বিতাড়িত করিয়াছিল। নাগ-দুহিতা উলুপী সর্পিনী ছিলেন না। এক ক্ষত্রিয়কুল প্রবল হইয়া অন্য ক্ষত্রিয়কুলের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। বিজিতকুল ক্ষত্রিয় গৌরব হারাইয়া কৃষিকর্ম্মাদি অবলম্বন করিয়া পতিত হইয়াছে। রাজস্থানে এই শ্রেণীর বহু রাজপুত আছে। উত্তর প্রদেশে নাগবংশী বৈশ্যজাতি আছে, মীরাঠের তাগা ব্রাহ্মণ তক্ষক নাগের বংশ। অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা এখন অন্য কুলজী খাড়া করিয়াছে।

(৮) চারণ জাতিকে প্রশংসাসূচক "অবরী কা কেড" বলে কেন? এই জনশ্রুতির মূল কি?

নাহ্যমূলাঃ জনশ্রুতি। সুতরাং ইহার মূলে কিছু আছে। মাতুলবংশ কীর্ত্তিমান ও শক্তিশালী হইলে আর্য্যগণ মাতার সন্তান বলিয়া গৌরব বোধ করিত। না হয় লিচ্ছবীপুত্র, যাদবীপুত্র শব্দ কোথা হইতে আসিল? চারণকুল হয়ত প্রাচীন কালে অবরী-পুত্র নামে আত্মপরিচয় দিত। অবরী বাসুকিনাগের কন্যা। বাসুকিকে সমুদ্রের পৌত্র বলা হয়। লবণ-সমুদ্রের আবার পুত্র-পৌত্র হয় নাকি? বরুণ সমুদ্রের দেবতা, নাগেরা বরুণ পূজা করিত। আর্য্যজাতি বেদোক্ত সমস্ত দেবতার পূজক হইলেও উহাদের মধ্যে এক এক কুলে এক এক বিশিষ্ট দেবতার উপাসনা হইত, যাহাকে ইষ্ট (ইষ্টদেবতা) বলা হয়। এই কালেও শিশোদিয়ার ইষ্টদেবতা শিব (একলিঙ্গজী), চৌহানের আশপূরী, রাঠোরের চামুণ্ডা, কচ্ছবাহকুলের সীতারামজী। বরুণের প্রতীক সমুদ্র, সমুদ্রের প্রতীক মহাসর্প। নাগরাজ বাসুকি বরুণের উপাসক ছিলেন, উপাসক পুত্রস্থানীয়। রূপক বহুরূপী হইয়া স্বয়ং বাসুকিকে সহস্রশীর্ষ সর্প করিয়াছে, হৈহয় অর্জ্জুনকে সহস্রবাহু করিয়াছে, রাবণকে দশমুণ্ড করিয়াছে, এবং রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড় মিত্রগণের পশ্চাতে লাঙ্গুল জুড়িয়া দিয়াছে। মানুষের বুদ্ধির দৌড় অপেক্ষা কল্পনার দৌড় বেশী, এবং মূর্খের কাছে কল্পনা অতিবাস্তব, অপ্রাকৃত কিছু আমদানী না করিলে মূর্খকে বুঝাইতে পারা যায় না। অন্যকে মূর্খ বানাইতে গিয়া ব্রাহ্মণ ততোধিক মূর্খ হইয়াছে।

(৯) যদি এই জনশ্রুতির ব্যাখ্যা এরূপ হয়, তাহা হইলে সূত-মাগধ ইত্যাদি সঙ্করবর্ণ হইতে চারণের উৎপত্তি—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আপত্তি কি?

প্রথম কথা, স্তাবক কিংবা সারথী অর্থে সূত সঙ্করবর্ণ নহে। সঙ্করবর্ণ খাড়া করিয়া জাতিনির্দ্দেশ শাস্ত্রের হেঁয়ালী, ব্রাহ্মণের ধাপ্পাবাজি। দরিদ্র ক্ষত্রিয় পুরুষানুক্রমে রথচালনার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া পতিত হইলে সূত হয়। স্তুতিপাঠে বিদ্যা ও কবিত্ব শক্তির

প্রয়োজন হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির পক্ষে সূত-মাগধের বৃত্তি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। ভৃতিভুক সেবক হইয়া ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয় সূত-মাগধ হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা, সূত আর্য্যমিত্রের বংশজগণ সূত উপাধি পরিত্যাগ করিয়া চারণ উপাধি গ্রহণ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না, তাঁহারা প্রবলতর মাতুলকুলে বিলীন হইয়া নাগ উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন। "সূত" ঋষির নাম কিংবা উপাধিও হইতে পারে। সাধারণ স্তাবককে বাসুকি নাগকন্যা দিবেন কেন? ক্ষত্রিয় রাজগণ ভক্তি-পরবশ হইয়া মহর্ষিগণকেই কন্যাদান করিতেন; সুতরাং আর্য্যমিত্র চারণ ঋষি ছিলেন অনুমান করাই সঙ্গত। তাঁহার চারণ বংশধরগণ তপস্বী না হইয়া সংসারী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যাঁহাদের পদবী গিরি, পুরী তাঁহারা আসলে শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-ত্যাগী গিরি-পুরীর বংশধর, তাঁহারা পূর্ব্বাশ্রমের জাতিত্ব হারাইয়াছে। চারণকুল সম্ভবতঃ প্রথমে নাগ ক্ষত্রিয়গণের আশ্রিত ছিল, পরে অন্যান্য ক্ষত্রিয়বংশের আশ্রিত যাচক হইয়া শাস্ত্র ও কাব্যচর্চ্চা করিত, যজমানের বংশ-কীর্ত্তি রক্ষা করিত।

(১০) চারণকুল দেবভাষা সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে অপভ্রংশ ভাষার চর্চ্চা করিবার হেতু কি?

বুদ্ধদেব সুপণ্ডিত হইয়াও অবজ্ঞাত পালি ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিবার হেতু কি ছিল? শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয় বিদ্যাচর্চ্চা সাধারণতঃ করিত না; সুতরাং যাহা দেশের কথিত ভাষা উহা গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া চারণেরা ক্ষত্রিয়ের চিত্তবিনোদন করিত।

চারণকুল সংস্কৃত কাব্যও লিখিয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে চারণের দান সামান্য নয়। নবম শতাব্দীর কবি এবং "কাব্য-মীমাংসা"-প্রণেতা যাযাবরীয় রাজশেখর কে ছিলেন?[৪] লোকে "যাযাবরীয়" শব্দের অর্থ করিয়াছে যাযাবর ঋষির পুত্র। ঋষি কেবল ব্রাহ্মণ হয় না, চারণেরাও তপস্যা করিত, তাঁহাদের আশ্রম ছিল, তাঁহাদিগকে মুনি বলা হইত,—যদিও মুনি শব্দ বর্ত্তমানে জৈনপণ্ডিতেরা একচেটিয়া করিয়াছে। রাজশেখরের পিতা যদি কোন বানপ্রস্থী ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে তিনি সুষ্ঠু "পরিব্রাজকীয়" শব্দ লিখিতেন, যাযাবর বা "বেদে" বলিতেন না। চারণেরা আদিকাল হইতেই যাযাবর, যেখানে ক্ষত্রিয় সেখানেই তাহাদের গতি। চারণকুলের যাযাবর স্বভাব সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে গুর্জ্জরাধীশ জয়সিংহ দেব সোলাঙ্কী (সোলাংখী) চারণ কুলপতি মহাবদান্যকে আনর্ত্ত দেশ (বর্ত্তমান কাঠিয়াবার) রাজ্য দান করিয়াছিলেন।[৫] কিছুকাল ঐ দেশে থাকিয়া যাযাবর চারণকুলের আদিম ভ্রমণ প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ চারণ মরু-স্থলীর দিকে চলিয়া আসিল, যাহারা স্থিতিশীল হইয়া ঐ দেশে থাকিয়া গেল উহারা জাতিচ্যুত হইল; উহারা কাছেলা চারণ নামে এখনও পরিচিত। যাযাবর মরু-চারণ-ই স্বর্গত্যাগী দেবযোনি চারণগণের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ডিঙ্গল কাব্যে চারণদিগকে এই যাযাবর স্বভাবের জন্যই ইংগ (ইংগঃ) অর্থাৎ যদৃচ্ছাচারী বলা হইয়াছে।

(১১) তাহা হইলে চারণ কি প্রাচীন যাযাবর পশুপালক জাতি? চারয়ন্তি গবান্ ইতি চারণাঃ—ব্যাকরণ অনুসারে ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে; বিশেষতঃ নন্দিকেশ্বরের সেবা সম্বন্ধে যখন জনশ্রুতি প্রচলিতই আছে।

ইহা সম্ভাবনা ও অনুমানের বাহিরে নয়; হইতেও

৪। কবিরাজ রাজশেখর যাযাবরীয় কবিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বংশ তাঁহার পূর্ব্বে 'অকালজলদ', 'সুরানন্দ', 'তরল', এবং কবিরাজ প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত (কাব্যমীমাংসা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২২৭) রাজশেখর দেবযোনির মধ্যে চারণকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, (মূল পৃঃ ২৯), এবং অন্যত্র কোথায়ও চারণ জাতির উল্লেখ করেন নাই। যাযাবরীয় মতানুসারে ষড়ঙ্গ বেদের সপ্তম অঙ্গ অলঙ্কার শাস্ত্র (উপকারকত্বাদ্ মূল পৃঃ ৩) চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানের সহিত ("পঞ্চদশং কাব্যম্ বিদ্যাস্থানম্") কাব্য যাযাবরীয় মতে পঞ্চদশ, বিদ্যাস্থানের (মূল পৃঃ ৪) মধ্যে সাহিত্য পঞ্চম বিদ্যা, চতুঃষষ্টিকলা উপবিদ্যা (পৃঃ ৫)। রাজশেখরের মত কবির দশ অবস্থার (degree of excellence) মধ্যে ষষ্ঠস্থানবর্ত্তীগণ মহাকবি; যিনি মহাকবির এক অবস্থা উপরে উঠিয়াছেন তিনি কবিরাজ (ডিঙ্গল কবিরাজা); অর্থাৎ তিনি স্বয়ং এবং অল্প আর কয়েকজন! (এই কবিরাজা উপাধি এবং আত্মশ্লাঘা-ব্যাধি চারণের মধ্যে উৎকট; বর্ত্তমান শতাব্দীর মহামহোপাধ্যায় মুরারিদান-কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ "যশোভূষণম্" এই বিষয়ে রাজশেখরের উপর টেক্কা দিয়াছে।)

রাজশেখর পরবর্ত্তীকালে যাযাবর কবি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সময়কাল আঃ ৮৮০-৯২০ খ্রীঃ। তাঁহার পিতা দুর্দ্দুক বা দুহিক মহামন্ত্রী ছিলেন, মাতার নাম শীলা দেবী। তিনি কনৌজের গুর্জ্জর প্রতিহার বংশীয় রাজা মহেন্দ্র পালের উপাধ্যায় ছিলেন। তিনি চৌহান্ বংশীয়া বিদুষী অবন্তী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই কবি এবং প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার অনুরাগী। রাজশেখর ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, নিঃসন্দেহ কিছু পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না।

৫। বংশ ভাস্কর, দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা, পৃঃ ৪৬-৪৭।

পারে। ইহাতে অপ্রশংসার কি আছে? আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়গণ বহিরাগত যাযাবর আর্য্যজাতিগণের নিকট হইতে সোম ক্রয় করিতেন! আর্য্যজাতিও আসলে যাযাবর পশুপালক ছাড়া কি ছিলেন? ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত আর্য্য বা দেবতা স্বর্গ হইতে অস্তাচল পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যভূমিতে আসিয়া তাঁহারা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্ন "ব্রাত"-এ (hordes) বিভক্ত হইয়া যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্রাত পশ্চিম হইতে সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া এই দেশে স্থিতিশীল ও সুসভ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রকৃত আর্য্য এবং অন্যান্য "ব্রাত" হইতে স্বতন্ত্র হইলেন। উঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত "ব্রাত" পরে পরে আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়াছিল উহারাও আর্য্য হইয়া গেল। আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যবংশ অনেকদিন যাযাবর পশুপালক ছিলেন। পরে ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ভূমি জয় করিয়া পশুর পরিবর্ত্তে প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহারা রাজন্য (ক্ষত্রিয়) হইয়া গেলেন। আর্য্যদের মধ্যে যাঁহারা শান্তিপ্রিয় তাঁহারা পশুপালন ও কৃষিকার্য্য বৃত্তিহিসাবে পুরুষানুক্রমে গ্রহণ করিলেন, এবং এই জন্যই ক্ষত্রিয়ের এক ধাপ নীচে নামিয়া বৈশ্যবর্ণ হইয়া গেলেন। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ কুলপতি তাঁহাদের বংশধরগণ অগ্নি ও বেদাধ্যয়ন রক্ষা করিয়া এক ধাপ উপরে উঠিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া গেলেন। গোধন ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কি ধন ছিল? পরস্পরের ভূমি ও গোধন হরণ, এবং নামের জন্য লুটের টাকায় মাঝে মাঝে যজ্ঞ করা ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কোন কাজ ছিল? রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজস্থানে যজ্ঞ ব্যতীত অন্য প্রাচীন ধারা বজায় রাখিয়াছে। পশুহরণের জন্য সাহসিক কার্য্যকে ডিঙ্গল ভাষায় 'ধাড়া' বলে।

ক্ষত্রিয়ের যাযাবর জীবনযাত্রার পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, শর্য্যাৎ বা শর্য্যাতির পুত্রী সুকন্যার কাহিনী। তিনি "গ্রাম" সমেত একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতেন। "গ্রাম" অর্থাৎ ভূমি সম্পর্ক শূন্য শকট-বাসস্থলী তখন চলমান ছিল, যেমন রাজপুতানায় যাযাবর "গ্রাম" এখনও আছে। চারণেরা মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য আর্য্যজাতির মত যাযাবর পশুপালক ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পশুপালন কিন্তু চারণের বংশানুক্রমিক পেশা নয়। রঘুরাজার পিতা দিলীপ বশিষ্ঠের নন্দিনী ধেনুর সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ আভীর গোপালক ছিল অনুমান করিতে হইবে?

(১২) নট এবং চারণ কি সগোত্র? মনুস্মৃতি এবং অমরকোষে পাওয়া যায়,

"চারণাস্তু কুশীলবাঃ"।

দুইটা প্রমাণ এক এবং কোনটাই গ্রহণযোগ্য নহে। অমরসিংহ জাতিতত্ত্ব বিচার করেন নাই, শব্দকোষ লিখিয়াছেন। অমরকোষের পূর্ব্বে সঙ্কলিত মনুসংহিতায় যাহা আছে অমরকোষে উহাই নকল করা হইয়াছে। মনুসংহিতা যাহা বর্ত্তমান রূপ পাইয়াছে উহা সংহিতাই নহে, সংহিতা সূত্রের আকারে লিখিত হইত। মনুস্মৃতি মনুসংহিতা নহে। এই স্মৃতি পরবর্ত্তীকালের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি; যেকালে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য লোপ পাইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য ও রাজসেবা ইত্যাদি লাভজনক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেদবিমুখ হইয়াছিল। চারণ ব্রাহ্মণকে গুরু এবং যাজক রূপে মান্য করিলেও ক্ষত্রিয় সমাজে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চারণের প্রভাব-প্রতিপত্তি চতুর্গুণ ছিল। চারণের গীতও খ্যাত ব্রাহ্মণের সংস্কৃত প্রশস্তি অপেক্ষা ক্ষত্রিয় সমাজে অধিক জনপ্রিয় ছিল, যদিও সর্ব্বভারতীয় আর্য্য ভাষা বলিয়া সংস্কৃতের চর্চ্চা চারণ জাতির পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। চারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী দান পাইয়াছিল। মনুস্মৃতির এই উক্তি ব্রাহ্মণের স্বার্থসংঘাতজনিত ঈর্ষাপ্রসূত। স্মৃতি অপেক্ষা চাক্ষুষ প্রমাণ নিশ্চয়ই অধিক গ্রহণীয়। চারণ জাতির মধ্যে নৃত্য, গীত, অভিনয় কোনদিন ছিল না, এখনও কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। চারণের গীত কণ্ঠ-সঙ্গীত নহে, এবং চারণ-কবিতা ঠিক গানের উপযোগী নহে; চারণ স্বরচিত ডিঙ্গল গীত-প্রশস্তি সামবেদের ন্যায় আবৃত্তি করিত। ব্রাহ্মণ প্রতিযোগিতায় হারিয়া বলিত,

"ব্রাহ্মণকা কবিত কুছ ভাট লেগেয়ে, কুছ চারণ।"

মুরারি কবি (আঃ অষ্টম শতাব্দী) রাজাদের গীত ও খ্যাতের প্রতি পক্ষপাতিত্বে আশঙ্কান্বিত হইয়া ক্ষত্রিয় সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন,

চর্চ্চাভিশ্চারণানাং ক্ষিতিরমণ! পরাং প্রাপ্য সংমোদলীলাং।

*       *       *

গীতং খ্যাতং ন নাম্না কিমপি রঘুপতেরদ্য যাবৎ প্রসাদা।
দ্বাল্মীকের্ধাত্রীং ধবলয়তি যশোমুদ্রয়া রামভদ্রঃ॥

রঘুবংশীয় রাজগণের কীর্ত্তি গীত খ্যাতের দ্বারা ধরিত্রীকে ধবলিত করে নাই; বাল্মীকির রামায়ণই করিয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের ঐতিহাসিক উপাদান কোথায় পাইয়াছিলেন? ইহা সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, কথিত ভাষায় গীত ও খ্যাতের মধ্যে উপাদান ছিল, বাল্মীকি ঐগুলিকেই সংস্কৃত করিয়া

ব্যের রূপ দিয়াছেন। চারণের গীত ও খ্যাত লমান রাজত্বে বহু নষ্ট হইয়াছে, অনাদৃত অবস্থায় নও নষ্ট হইতেছে। রাজস্থানের সূর্য্যচন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ের ত্ত ডিঙ্গল ভাষার কিংবা চারণের অকর্ম্মণ্যতায় লুপ্ত াছে কি ?

উদ্মাবশতঃ কিঞ্চিৎ অবান্তর কথা আসিয়া পড়িল। ় কথা, মনুস্মৃতি কিংবা অমরকোষ গ্রন্থ পাণিনি রণ কিংবা বৃহৎ-সংহিতার মত জাতি ও দেশ সম্বন্ধে াণিক গ্রন্থ নহে। দ্বিতীয় কথা এক গোত্র হইলেই ত হয় না। রাজস্থানে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ়। রাঠোর এবং চারণ এই উভয় কুলের মধ্যে বত, ধূহর, চান্দাবত গোত্র আছে বলিয়া তাহারা জাতি ?৬ প্রাচীন নট, কুশীলব, রাজস্থানের অন্ত্যজ র মধ্যে গণ্য "ডোম" জাতি। তাহাদের স্ত্রীলোক য়, নাচে, গান গায়।

১৩) চারণ জাতির উৎপত্তি কি কাত্যায়ন শ্রৌত ব্রাত্যস্তোম বর্ণিত মগধদেশীয় ব্রাত্য "ব্রহ্মবন্ধু" "ক্ষত্রবন্ধু" হইতে সিদ্ধ করা যায় না ?

তক্ষণ কি শুনিয়াছ ? তুমি ব্রাত্যস্তোম পড়িয়াছ না নামই জানা আছে ? ব্রাত্যধন যাহা যজ্ঞান্তে শীয় ব্রহ্মবন্ধুগণ গ্রহণ করিত উহার মধ্যে কি কি াকিত ? বলদ হাঁকাইবার প্রতোদ ; কাল রং-এর কাল পাড়ের ধুতি ; কুমার্গগামী লৌহকীলকাদি , রজ্জুবদ্ধ পাটাতন যুক্ত গ্রামীণ যান অর্থাৎ এই "গাড়া", গলায় রূপার চাঁদি, দুইপাশে সেলাই লোমযুক্ত ভেড়ার চামড়া, কোমর কিংবা পেটে র "দামনী", সরু এবং বক্র উর্দ্ধশীর্ষ উপানহ— নর মধ্যে আমার এই সেলিমশাহী নাগরা জুতা ানটা চারণদের ব্যবহার্য্য ?

মান যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সকলেই আচার-ব্যবহারে লৌকিক অর্থে চারণ ব্রহ্মবন্ধু নয়, সর্ব্বতোভাবে , কিন্তু ব্রাত্যস্তোমের ক্ষত্রবন্ধু নয়। "ব্রাত"(যাহাকে তে বলে (horde) হইতে ব্রাত্য হইয়াছে। া বন্যস্বভাব যাযাবর আর্য্যগোষ্ঠী অসংস্কৃতভাষী দস্যুজীবি জাতি। ব্রাত্য বৈদিক ঋষি হইয়াছে, াহ্মণ হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের হইয়া গিয়াছে, চারণ হইতে পারে নাই ; কারণ গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব চারণের বিপরীত। যাহারা লুট করিত, তাহারা যাচক হইবে কেন ? এত কথার দরকার কি ? তোমার কোন মতলব আছে নাকি ?

৩

সাক্ষাতকার সমাপ্ত হইল ! নাগকন্যা "অবরী" মধ্য-এশিয়ার উরালশৃঙ্গের স্বর্গভ্রষ্ট যাযাবর অবরজাতির (The Abars), কিংবা বিশ্বামিত্রের কবলে বশিষ্ঠের রুষ্টা কামধেনুর রোমনির্গত যোদ্ধা অনার্য্য আভীর জাতির দুহিতা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না।

চারণকে আপাততঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তরালে ত্রিশঙ্কুর মত রাখিয়া আমরা চারণজাতির সামাজিক ব্যবস্থা আলোচনা করিব।

কাছেলাচারণ এবং মরুচারণের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক নাই। কাছেলা স্ত্রীলোকের পর্দা নাই, পুরুষ হাল চাষ করে ; তাহারা আচার-ব্যবহারে শূদ্র। মরুচারণ-গণকে বিসোত্রা বলা হয় (অর্থাৎ ১২০ শাখায় বিভক্ত)। পিতার নাম, গ্রামের নাম, কিংবা কোন মহৎ কার্য্যের স্মারক হিসাবে গোত্রের নাম হইয়াছে। যথা : দেবল ঋষির সন্তান দেবলগোত্র৭। ভগবতী একটি মাটির পুতুলে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন ; এই জন্য ঐ ব্যক্তির বংশের নাম মাদা হইয়াছে (মৃত্তিকা=ডিঙ্গল মাদা)। নরসিংহ নামক ভাছলিয়া শাখার চারণ অনেক সিংহ শিকার করিয়াছিলেন বলিয়া নাহড়রাও (পুরিহর) তাঁহাকে সিংহ-ঢাহক উপাধি দিয়াছিলেন। এইজন্য ডিঙ্গল ভাষায় ইঁহার গোত্রের নাম সংঢায়চ হইয়াছে। চণ্ডকোটি নামক কবি তাঁহার কবিতায় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ছয় ভাষা মিশ্রিত করিয়াছিলেন বলিয়া মিশ্রণ নাম পাইয়াছিলেন।

---

৬ বংশ ভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭৬-৭৭।

৭। দেবল ঋষির বংশধর এখনও আছে, এই কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিনা। সংস্কৃত "দেবকুল" বাংলা ভাষায় দেউল, ডিঙ্গল ভাষায় দেবল (Dewal) হইয়াছে। দেউল শব্দের মঙ্গলকাব্যাদিতে দেবমন্দির অর্থে প্রয়োগ পাওয়া যায়, কিন্তু দেবকুল কোন কালেই দেব-মন্দির ছিল না, উহার মধ্যে দেবতার মূর্ত্তি থাকিতনা, এক এক রাজবংশের মৃত রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি থাকিত। দেবকুল নগরের বাহিরে কিছুদূরে নির্ম্মিত হইত।

দেবকুলের রক্ষক ব্রাহ্মণকে দেবকুলিক বলা হইত। প্রত্যেক রাজার ইতিবৃত্ত জানা না থাকিলে দেবকুলিক হওয়া যাইত না। এই পদ নিশ্চয়ই পুরুষ-পরম্পরাগত ছিল। ইঁহাদের কার্য্য মধ্যযুগের চারণের মত। সুতরাং দেবকুলিক-ব্রাহ্মণ চারণকুলে মিশিয়া গিয়াছে অনুমান অসঙ্গত নয়। দেবকুলিক ভাসের প্রতিমা নাটকের একটি চরিত্র। দেবকুলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত গুলেরীর এক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে (গুলেরী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১১৩-১৩৫)।

চণ্ডকোটির বংশজ হইতে মীসন গোত্র হইয়াছে। বংশ-ভাস্কর মহাকাব্যের কবি সুরজমল মীসন এই গোত্রীয়। রাঠোরকুলের বারহঠ (দ্বারস্থ) চারণের পূর্ব্বজগণ দলবদ্ধ হইয়া ঘেরা দিয়া পশুচারণ করিতেন। এইজন্য উহাদিগের গোত্রের নাম রোহড়িয়া৮ হইয়াছে। দধ্‌বাড়া নামক গ্রামবাসী চারণের বংশজ দধ্‌বাড়িয়া গোত্র। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্যামলদাসজী (মিবাড়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাস বীরবিনোদ প্রণেতা) এই গোত্রীয় ছিলেন। নিকট জ্ঞাতিগোষ্ঠির (বান্ধব, ভ্রাতা অর্থে) মধ্যে বিবাহ হয় না; চারণ ভিন্ন অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ। মরুচারণ রাজপুতের মত আভিজাত্যাভিমানী, জীবনযাত্রাও রাজপুতের মত। চারণ স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশীন, পুরুষেরা বহু বিবাহ করে, মদ্যমাংস খায়, দাসীপুত্রে পরিবার ভারাক্রান্ত করে। উহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা বিদ্যাচর্চ্চা, বিশেষতঃ অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বাড়ীতে ছাত্র রাখিয়া অধ্যাপনা করেন। কবিত্ব-শক্তি চারণের স্বভাবজ, মুখে মুখে স্থানে-অস্থানে যে চারণ কবিতা শুনাইতে পারেন না সে চারণই নয়। চারণ দেখিলেই রাজপুত বলিবে, "যশ্‌ করো"। চারণ গো-ব্রাহ্মণের মত অবধ্য, চারণ রাজদ্রোহীর শাস্তি নির্ব্বাসন। চারণদিগের গ্রামকে বিবদমান রাজপুত সেকালে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র জ্ঞান করিত, পলায়িত শত্রু চারণের গ্রামে আশ্রয় লইলে তাহাকে অনুসরণ করা হইত না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ডাকাতেরা চারণের গ্রামে ডাকাতি করিত না, চোর চুরি করিত না বলিয়া শুনা যায়।

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চারণের সহিত ক্ষত্রিয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল। ক্ষত্রিয়ের জীবনযাত্রায় ব্রাহ্মণ পোষাকী (formal) চারণ আটপৌরে। দেউড়ি-দরবারে, আড্ডা-মজলিসে, গুপ্ত মন্ত্রণায় এবং লড়াই-শিকারে রাজপুতের নিত্যসঙ্গী চারণ; এবং নিতান্ত অভাবেও রাজপুতের অন্নের অর্দ্ধাংশের ভাগী। আদর্শ রাজপুতের মনের অবসাদ এবং নিঃসঙ্গতা স্ত্রী-সান্নিধ্য দূর করিতে পারিত না; ইহার জন্য আবশ্যক হইত অফিম ও চারণ। গুরু-পুরোহিত সঙ্কটের সহায়, উঁহারা দূর হইতে নমস্য, মনের দুর্ব্বলতা ইঁহাদের নিকট হইতে গোপনীয়। বৈশ্য কায়স্থ বিশ্বস্ত হইলেও উহারা প্রজা, বেতনভুক্ ভৃত্য, উহাদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হইলে রাজপুতের মর্য্যাদা হানি হয়। এই উভয় সঙ্কট হইতে রাজপুতের ত্রাতা একমাত্র চারণ, যিনি পূজ্য হইয়াও উপদেশক ও বন্ধুর স্থান পূর্ণ করিতে পারিতেন। চারণ মতলবী চাটুকার নহে, মুখের উপর রাজপুতকে কড়া কথা শুনাইবার সাহস চারণ ব্যতীত অন্য জাতির ছিল না।৯ ব্রাহ্মণের মত কথায় কথায় চারণ ক্ষত্রিয়কে অভিশাপ দিত না। রাজপুতের সুসময়ে চারণ যেমন দরাজহাতে দান পাইয়াছে, তেমনি দুঃসময়ে রাজপুতের হাতে স্ত্রীর অলঙ্কার তুলিয়া দিতে এবং নিজের শরীরকে দায়বদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণীয় চারণের উদারতার অনেক উদাহরণ আছে।

৪

যোধপুরের মহারাজা ভীমসিংহ (মৃত্যু ১৮০৩ খ্রীঃ) তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র এবং রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মানসিংহকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। মানসিংহ পলাতক অবস্থায় সিরোহীর রাও বৈরীশালের নিকট স্ত্রী-পুত্রের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ভীমসিংহের ভয়ে বৈরীশাল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অনুচরবর্গের সহিত মানসিংহ জালোর দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া বৎসরাধিক কাল আত্মরক্ষা করিলেন; তাঁহার পক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে অনেকে নিহত হইল, কেহ কেহ তাঁহাকে ত্যাগ করিল; অধিকন্তু দুর্গমধ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। ভীমসিংহের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে জালোন দুর্গের

৮। দলবদ্ধ হইয়া পশুচারণ করিতে করিতে বিকানীরের নানাজাতি দিল্লীর কাছাকাছি এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্য্যন্ত আসিত, ইহা আমি দেখিয়াছি। যাযাবর চারণ জাতিও বোধহয় এককালে এই প্রকার "চারয়ন্তি" করিত। যাহারা এখনও এই কার্য্য করে তাহারা গড়রিয়া, যাহারা কবিতা চর্চ্চা করিয়াছিল তাহারা হয়ত রোহড়িয়া চারণ হইয়া গিয়াছে।

৯। শাহপুরার রাজা উম্মেদ সিংহ শিশোদিয়া (সময়কাল— অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক) অত্যন্ত দাতা, গুণগ্রাহী, পরাক্রান্ত এবং পাপিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করাইয়া পৌত্র-প্রপৌত্র এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন জ্ঞাতিগণকে নির্ম্মূল করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রেয়সীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র জালিম সিংহকে নিষ্কণ্টক উত্তরাধিকার প্রদান। এই রাবণের ভয়ে শাহপুরা যখন সন্ত্রস্ত তখন সরসিয়া গ্রাম নিবাসী মহড়ু শাখার চারণ কৃপারাম রাজদরবারে প্রকাশ্যে শুনাইয়া দিলেন,

…………তৈঁ আগে খাঁধা বহুতঃ।
ঢেলক চীতোড়াহ, অব তো ছোড় উমেদসী॥

অর্থাৎ, দুষ্কার্য্য অনেক করিয়াছ। তোমার সামনে অনেক খাদ। হে চীতোড়িয়া-পালক উম্মেদ সিংহ! এখন ত নিবৃত্ত হও!

ইহার পর উম্মেদ সিংহ কুলনাশ কার্য্যে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, জ্ঞাতি-মুখ্যগণ রক্ষা পাইল। (বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৭০)।

মানসিংহ চরম অবস্থার সম্মুখীন হইলেন; অর্থ ও খাদ্যাভাবে হয় আত্মসমর্পণ না হয় মৃত্যু। বনশূর শাখার চারণ জুগ্‌তা মানসিংহের সহিত অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময় চারণ জুগ্‌তা প্রাণ ধারনের জন্য ভিক্ষা করিবার অজুহাতে দুর্গের বাহির হইয়া কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং অবরোধকারী ক্ষত্রিয়গণের নিকটও ভিক্ষা পাইতেন। কিছুদিন পরে ভীমসিংহ ইহা জানিতে পারিয়া হুকুম পাঠাইলেন, চারণকে বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না, তাহাকে কেহ ভিক্ষাও দিবে না। চারণ জুগ্‌তার পরিবার জালোরেই ছিল। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে গিয়া বলিলেন, যাহা কিছু আছে দাও। জুগ্‌তার স্ত্রী সধবার চিহ্ন ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কার ও সঞ্চয় স্বামীর হাতে সমর্পণ করিলেন। জুগ্‌তা মানসিংহকে বলিলেন, এই সম্বলে যতদিন চলে ততদিন যুদ্ধ করিতে পারেন। ইহার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খবর পৌঁছিল, অধার্ম্মিক ভীমসিংহের মৃত্যু হইয়াছে, সামন্তগণ কুমার মানসিংহকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

রাজ্যারোহণের পর মহারাজা মানসিংহ চারণ জুগ্‌তার স্ত্রীর জন্য এক লক্ষ মুদ্রার (দাম ? চল্লিশ দামে তখনকার আকবরশাহী এক টাকা) আভূষণ উপহার রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং জুগ্‌তাকে "লক্ষ-প্রসাদ" দানের সহিত বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের পাড়্‌লাই নামক গ্রাম দিয়াছিলেন। জুগ্‌তার মৃত্যুর পর মহারাজা মানসিংহ এক শোক-গীতিতে তাঁহার পুত্র ভৈরবদানকে নিজের "ভাইয়ের মত ভাই" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

মহারাজা মানসিংহ পূর্ব্ব-কৃত অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ সিরোহীরাজ বৈরীশালের রাজ্য ছারখার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিরোহী ছোট রাজ্য। চৌহানের সাহস, আবুরপাহাড় এবং মিবাড়ের সহায়তায় সিরোহী বহুদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে সিরোহী জায়গীর দিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে সিরোহী যোধপুরের অধীনে সামন্ত রাজ্য হইল। মানসিংহ বৈরীশালের উপর এক লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করিলেন; জরিমানা দিতে না পারিলে কারাবাস। বৈরীশালের যুদ্ধ করিবার শক্তি ছিল না, জরিমানা দেওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। সিরোহীর চারণেরা অনেক গ্রাম নিষ্কর চারণোত্তর হিসাবে ভোগ করিত। তাহারা একত্র হইয়া এক আপোষের প্রস্তাব করিল; এক বৎসরের মধ্যে বৈরীশাল জরিমানার টাকা শোধ করিবেন এবং সমস্ত চারণ সম্প্রদায় এই টাকার জন্য জামিন থাকিবে। মানসিংহ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সৈন্যদল ফিরাইয়া আনিলেন। বিপদ-মুক্ত হইয়া বৈরীশাল ঐ টাকা দিতে অক্ষম কিংবা অসম্মত হইলেন। চারণ-মুখ্যগণ পণ রক্ষার জন্য যোধপুরে গিয়া মানসিংহের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা মহারাজাকে বলিলেন, মহারাজা তাহাদের সমস্ত গ্রাম হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া যতদিন জরিমানার টাকা না পাইবেন ততদিন তাহারা অন্য ক্ষত্রিয়ের যাচক হইয়া পরিবার পালন করিবে। মানসিংহ চারণ-মুখ্যগণকে এক এক ঘোড়া ও শিরোপা দিয়া বিদায় করিলেন, জরিমানার টাকা সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য হইল না।

বৈরীশালের মৃত্যুর (বিঃ সম্বত ১৮৬৫ খ্রীঃ ১৮০৮) পর তাঁহার পুত্র উদয়ভাণ সিরোহীর গদীতে বসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তীর্থযাত্রা করিয়া ফিরিবার পথে পালির নিকট মানসিংহের আদেশে উদয়ভাণ বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইলেন। উদয়ভাণ পিতার জরিমানার টাকা শোধ করিয়া কিছুদিন পরে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

৫

ক্ষত্রিয় উপকার শীঘ্রই ভুলিয়া যায়; অপকার দীর্ঘকাল মনে রাখে। চারণের স্বভাব ইহার বিপরীত। অপমান ব্যতীত যজমানের সর্ব্ববিধ অপরাধ চারণ ক্ষমা করিয়া থাকে, এবং অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়াও ভূতপূর্ব্ব প্রভুর দান ও অনুগ্রহ চিরকাল স্মরণ করে এবং উহার প্রতিদানের সুযোগ পাইলে প্রাণ দিয়া ঋণ মুক্ত হয়।

শাহপুরার রাজা উম্মেদ সিংহ শিশোদিয়া ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পৌষ মাসে তাঁহার জ্ঞাতি বনেড়ার জায়গীরদার সর্দ্দারসিংহ শিশোদিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। বনেড়া হইতে দুই ক্রোশ দূরে রাজা উম্মেদ সিংহ শিবির স্থাপন করিয়া তাঁহার পৌত্র কুমার রণসিংহকে অগ্রগামী সেনাদলের রণাধ্যক্ষরূপে বনেড়া দুর্গ অধিকার করিবার আদেশ দিলেন; এবং রণসিংহের সহিত তিনি তাঁহার প্রীতিপাত্র বিশ্বাসভাজন চারণ দেবাকে পাঠাইলেন। চারণ দেবা মিবাড়ের সোদা-বারহঠ বারুর বংশজ। বনেড়ার অধীনস্থ গীহড়থা গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস ছিল। কোন কারণে বনেড়ার জায়গীরদার সর্দ্দার সিংহের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় দেবা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বনেড়া ত্যাগ করিয়া শাহপুরা চলিয়া আসিয়াছিলেন। উম্মেদ সিংহ আশা করিয়াছিলেন চারণ দেবা বনেড়ার

উপর শোধ তুলিবার জন্য রণসিংহকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিবেন।

শাহপুরার অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া রাজা ভীমের অযোগ্য বংশধর সর্দ্দার সিংহ দুর্গ এবং অন্তঃপুর অরক্ষিত রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রণসিংহ শহর অধিকার করিবার পর চারণ দেবা দ্রুতগতি রাজান্তঃপুরের রক্ষীশূন্য প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং মৃত্যু কৃতনিশ্চয় করিয়া অসি-চর্ম্ম-হস্তে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় বিজয়ের উল্লাসে মত্ত লুণ্ঠনলোলুপ শাহপুরার সৈন্যদলের গতিরোধ করিলেন। যাহারা নিকটবর্ত্তী হইতেছিল তাহাদিগকে দেবা সাবধান করিয়া গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, আমার মৃতদেহের উপর দিয়া আজ বনেড়ার অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ।

চারণের মারমুখী মূর্ত্তি দেখিয়া আক্রমণকারিগণ ভীত চকিত ভাবে পিছনে হটিল, কেহ বলপ্রয়োগে সাহসী হইল না। কুমার রণসিংহ কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া দুই ক্রোশ দূরে রাজা উম্মেদ সিংহের কাছে খবর পাঠাইলেন। উম্মেদ সিংহ অশ্বারোহণে অন্তঃপুরের সম্মুখে পৌঁছিয়া দেবার কাছে একাকী নিরস্ত্র উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আজ আপনি অকৃতজ্ঞ সর্দ্দার সিংহের জন্য যাহা করিলেন, আমার বংশজগণের জন্য উহাই করিবেন—এই আমার প্রার্থনা। দেবা রাজার সঙ্গে শাহপুরা চলিলেন, সেনাদল বনেড়া ত্যাগ করিল, সর্দ্দার সিংহের ধনমান রক্ষা পাইল।

অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শাহপুরার রাজা পূর্ণাধিকার সহ ( উদক্ আঘাট ) যেই গ্রাম চারণ দেবাকে দান করিয়াছিলেন উহা বর্ত্তমানে খেড়া দেবপুর নামে বংশভাস্কর মহাকাব্যের টীকাকার এবং দেবার বংশজ বারহঠ্ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের অধিকারে রহিয়াছে।[১০]

রাজপুত-গৌরব-গোধূলির মুহূর্ত্তরাগ রঞ্জিত আকাশে যে তিনটি নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল, উহাদের একটি বিশ্রুত-কীর্ত্তি কবি ও যোদ্ধা বারহঠ্ চারণ করণীদানজী; দ্বিতীয় নক্ষত্র ছিলেন নীতিজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজাধিরাজ সওয়াই জয়সিংহ এবং তৃতীয় ছিলেন মহারাজা বখ্ত সিংহ রাঠোর। ইঁহারা প্রত্যেকেই শুধু ইতিহাস নয়, নাটক-উপন্যাসের নায়ক হইবার উপযুক্ত চরিত্র।

যোধপুর রাজ্যের বারহঠ্ চারণ করণীদানজী বাল্যে ও যৌবনে কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠিত পুস্তকের তালিকা দেখিলেই পণ্ডিতের চক্ষুস্থির হয়। রাজ-দরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইলে সে কালের প্রসিদ্ধ চারণগণকে কি রকম একনিষ্ঠ ভাবে দীর্ঘকাল কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ইতিবৃত্ত এবং জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন করিতে হইত,—উহা করণীদানজীর রচিত সূর্য্যপ্রকাশ মহাকাব্য হইতে অনুমান করা যায়। শস্ত্র এবং শাস্ত্র উভয় বিদ্যাতে পারদর্শী না হইলে চারণ ক্ষত্রিয় যজমানের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না। করণীদানজী অসমসাহসিক যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

সওয়াই জয়সিংহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিজয় সিংহকে বঞ্চিত করিয়া আম্বের রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কূটনীতি আশ্রয় করিয়া পৈত্রিক রাজ্য চতুর্গুণ করিয়াছিলেন, নিজের রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কলিযুগে শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, মালবের সুবাদারী পাইয়া তিনি সিপ্রা নদীর জলে স্নানপূর্ব্বক মোগল সম্রাটের সুবা মালব চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-পেশোয়া প্রথম বাজীরাওকে উদক্ দান করিয়াছিলেন। জয়পুর শহর, মান-মন্দির ইত্যাদি জয়সিংহের অন্যান্য কীর্ত্তি সর্ব্বজনবিদিত, তাঁহার অকীর্ত্তির মধ্যে মোগল সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ পেশবা প্রথম বাজীরাও উহার প্রতিদানে জয়পুরের প্রকাশ্য দরবারে মহারাজাধিরাজের মুখে গড়্গড়ার ধূঁয়া ছাড়িয়াছিলেন। জয়পুরাধীশ মনকে প্রবোধ দিলেন,

---

[১০] দ্রঃ বংশ ভাস্কর, দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃঃ ৬৯।

শাহপুরার রাজা ( স্ত্রীর প্ররোচনায়? ) কনিষ্ঠ পুত্র জালিম সিংহকে উত্তরাধিকারী করিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র অদ্বৈত সিংহের প্রাণনাশ করাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অদ্বৈত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রণসিংহকে হত্যা করিবার জন্য কালা মিয়াঁ নামক মুসলমানকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন কালা মিয়াঁ রণসিংহের উপর তলোয়ার চালাইতে গিয়া রণসিংহের পুত্র ভীমসিংহের খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাশায়ী হইল।

চারণ দেবার কাহিনী ( Modern Review, February, 1957 ) এবং আমার Studies in Rajput History ( Nopani Lectures, C U.; Srichand & Sons, Delhi ) পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাকে Ran Singh, son of Rajah Umed Singh, লেখা আছে। বংশ ভাস্করের ভূমিকায় ৬৯ পৃষ্ঠায় উম্মেদ সিংহ সম্বন্ধে উপরের para-তে বনেড়া অভিযান এবং নীচে উম্মেদ সিংহের দুষ্কৃতির বর্ণনা আছে। টীকাকার উপরে "পুত্র" এবং অন্য কাহিনীতে "পৌত্র" লিখিয়াছেন। আমি এই অসংগতি পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই। 'পুত্র' শব্দ নিশ্চয়ই ছাপার ভুল, টীকাকারের নহে। এই স্থলে উহা সংশোধন করা গেল। পূর্ব্বকৃত অনবধানতার জন্য বিশেষ লজ্জিত।

হাজার হোক "দখিনী"১১ ত বটেই! তাঁহার সভাকবি বর্ণিত ১০৯ সংখ্যক মহান্ কার্য্য-তালিকায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

বালক বখ্‌ত সিংহের মতি-গতিও শার্দ্দুল-পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার মাতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজা অজিত সিংহকে সাবধান করিয়া বলিতেন, তুমি যখন একাকী থাক, ঘরে এই ছেলেকে আসিতে দিও না। মহারাজা অজিত সিংহ এককালে অসীম শারীরিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; বৃদ্ধ বয়সে জোর তত ছিল না, কিন্তু ঝাঁজ ছিল কড়া। তিনি স্ত্রীর কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন এবং বলিতেন, রাখ, রাখ, এই হাতের এক চড়েই তোমার ঐ চ্যাংড়া ছেলে একেবারে ঠাণ্ডা হইবে।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় কৃষ্ণা-দ্বাদশীর রাত্রিতে যখন পিতামাতা গভীর নিদ্রামগ্ন, বখ্‌ত সিংহ পিতার শিয়রে রক্ষিত তরবারির দ্বারা এমন হাত-সাফাই করিয়া বাপের গলা কাটিয়া ফেলিলেন যে, বাপ শব্দও করিতে পারেন নাই; রক্তে বিছানা ভিজিয়া গায়ে কাঁটা না দেওয়া পর্য্যন্ত মাও জাগেন নাই। ইহার পর বখ্‌ত সিংহ রক্তাক্ত তরবারি লইয়া বুরুজের উপরে এক ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রহিলেন। পরের দিন সর্দ্দারগণ তাঁহাকে নীচে আসিতে অনুরোধ করাতে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, আমি এই কাজ করি নাই; দাদা (অভয় সিংহ) আমাকে করিতে বলিয়াছিল; এই দেখুন তাঁহার চিঠি! এই বলিয়া তিনি চিঠি নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং নির্ভয়ে নামিয়া আসিলেন। বৃদ্ধা মাতা "সতী" হওয়ার সময় অভিশাপ দিয়াছিলেন, যে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে মারবাড়ের ভূমিতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার স্থান হইবে না।

মহারাজা অভয়সিংহ ভ্রাতাকে পিতৃহত্যার প্রতিজ্ঞার পুরস্কার স্বরূপ নাগোরের স্বাধীন রাজত্ব দিয়াছিলেন। বখ্‌ত সিংহ ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যোধপুরের গদী অধিকার করিবার জন্য তিনি সওয়াই জয়সিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অভয় সিংহ যখন বিকানীর দুর্গ অবরোধ ব্যাপারে অত্যন্ত বিব্রত, তখন বখ্‌ত সিংহের আমন্ত্রণে সওয়াই জয়সিংহ বিরাট্ বাহিনী ও তোপখানা লইয়া লুনী নদী অতিক্রমপূর্ব্বক যোধপুর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। রাঠোরের ভূমিতে কচ্ছবাহের ধৃষ্টতায় বখ্‌ত সিংহের রাঠোর-রক্ত মাথায় উঠিল। তিনি নাগোর হইতে বিকানীরে গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, এবং বিকানীরের অবরোধ না উঠাইয়া যোধপুর রক্ষার ভার তাঁহাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। অভয় সিংহের সম্মতি পাইয়া বখ্‌ত সিংহ আমন্ত্রিত কচ্ছবাহকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য চলিলেন। ইহা কিন্তু রাঠোরের সমবেত শক্তির পক্ষেও দুষ্কর কার্য্য ছিল। মহারাজাধিরাজ সওয়াই জয়সিংহ স্থিরবুদ্ধি বিচক্ষণ যোদ্ধা, সৈন্যবল অনেক বেশী, আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত এবং তোপখানা রক্ষিত। রাঠোর সংখ্যায় অল্প, সম্বল বর্শা ও তরবারি, সেনাধ্যক্ষ হিসাবে বখ্‌ত সিংহের মাত্র যুদ্ধে হাতেখড়ি। কোন অতর্কিত আক্রমণ জয়সিংহের সাবধানতায় সম্ভবপর হইল না। লুনী নদীর উত্তর তীরে রাঠোর দুর্গাদাসের ভূতপূর্ব্ব জায়গীরে অবস্থিত গাংগানী নামক স্থানে বখ্‌ত সিংহ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আট হাজার রাঠোর অশ্বারোহী ছিল। ব্যূহবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে বখ্‌ত সিংহ তাহাদিগকে বলিলেন, যাহাদের বাঁচিবার প্রয়োজন ফুরায় নাই তাহারা চলিয়া যাইতে পারে। পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর লৌহকীলক-সদৃশ ব্যূহমুখে থাকিয়া ভীমকর্ম্মা বখ্‌ত সিংহ তোপখানার অগ্নিবৃষ্টিতে আগ্নেয়-স্নান করিয়া অসিহস্তে দুই দুইবার সমগ্র শত্রুবাহিনী বিদীর্ণ করিয়া তৃতীয় আক্রমণের জন্য স্বস্থানে বিজয়োল্লাসে ফিরিয়া আসিলেন, কতজন মরিল কেহ হিসাব রাখে নাই। সকলের মাথায় খুন চাপিয়াছে; পাঁচ হাজারের মধ্যে তখন ষাটজন যোদ্ধা জীবিত ছিল! উহাদের মধ্যে বখ্‌ত সিংহের পার্শ্বে অশ্ব-পৃষ্ঠে চারণ করণীদাস অন্যতম। করণীদাস দৃঢ়কণ্ঠে রণোন্মত্ত রাঠোরগণকে বলিলেন, তৃতীয়বার আক্রমণ সুবুদ্ধির কাজ হইবে না, কচ্ছবাহের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। জয়সিংহ এই ষাটজন অশ্বারোহীর উপর প্রতি-আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না; তিনি দ্রুত যুদ্ধস্থল হইতে হতাবশিষ্ট সেনা লইয়া পলায়ন করিলেন। বখ্‌ত সিংহ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, যে পাঁচ হাজার যোদ্ধা তাঁহার মরণের সঙ্গী হইয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নিজের হঠকারিতায় মৃত্যুর কবলে রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন, এবং শোকে অধীর হইয়া বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজধানী নাগোরে ফিরিয়া বখ্‌ত সিংহ আবার গোঁফে চাড়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, ভগ্‌ত-কে (ভক্ত—জয়সিংহ) আমি আম্বেরের দুর্গ হইতে টানিয়া বাহির

১১। দখিনী শব্দ হিন্দুস্থানে "বাঙ্গাল" অর্থে ব্যবহার হয়। ঢাকার বাঙ্গাল কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের পাড়াগাঁর লোককেই বাঙ্গাল বলে।

করিয়া ছাড়িব। ইতিমধ্যে সওয়াই জয়সিংহ মারবাড় বিজয়ের উৎসব উপলক্ষে বখ্‌ত সিংহের এক দেবমূর্ত্তির সহিত আম্বেরের এক দেবীমূর্ত্তির মহা ধূমধামে বিবাহ দিলেন। ঐ দেবমূর্ত্তি যুদ্ধের সময় কচ্ছবাহগণের হাতে পড়িয়াছিল। দেবতার বিবাহের পর জয়পুরাধীশ বর-বধূকে নাগোরে যৌতুকসহ পাঠাইয়া দিলেন। বখ্‌ত সিংহ গলিয়া জল হইয়া গেলেন। জয়সিংহের এই চালে বখ্‌ত সিংহ আম্বেরের প্রিয় কুটুম্ব বৈবাহিক হইয়া গেলেন।

বখ্‌ত সিংহ অভয় সিংহের পুত্র রাম সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে যোধপুরের গদী অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে পুষ্করতীর্থে বখ্‌ত সিংহ এবং সওয়াই জয়সিংহ পরম বন্ধুভাবে মিলিত হইলেন। পুষ্কর সেকালে রাজস্থানের Geneva—নিরপেক্ষ দেবভূমি যেখানে বিগ্রহ ও রক্তপাত করিতে কোন রাজপুত রাজা সাহসী হইতেন না। উভয় পক্ষে আদর-আপ্যায়ন চলিতে লাগিল। একদিন এক সামাজিক মজলিসে জয়পুর ও যোধপুর নৃপতি একত্রিত হইলেন। বখ্‌ত সিংহ একাধারে বীর পণ্ডিত এবং কবি; সওয়াই জয়সিংহ বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁহারা চারণ-কবি করণীদানকে উপস্থিত মত (extempore) কিছু শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। কবির এক দোহা শুনিয়াই নৃপতি-দ্বয়ের মুখ লাল হইয়া গেল। তাঁহারা দুইজনেই গাংগানীর রণক্ষেত্রে রণদুর্ম্মদ-চারণের অসির অশনি-সম্পাত দেখিয়াছিলেন; পুষ্করক্ষেত্রে উল্লাসমুখর সমাজ-গোষ্ঠীতে এইবার চারণের কণ্ঠে তাঁহাদের কাণে কালের ভেরী বাজিয়া উঠিল।—

জৈপুর ও জোধাণপত, দোনোঁ থাপ উথাপ।
কুরম মারয়ো ডীকরো, কমধজ্জ মারয়ো বাপ॥

জয়পুর নৃপতি এবং যোধবংশপতি উভয়ে সৃষ্টি উলট-পালট করিতে পারেন। কূর্ম্ম (কচ্ছবাহ জয়সিংহ) মারিয়াছেন জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং কামধ্বজ (রাঠোর মারিয়াছেন বাপ!

ক্রমশঃ
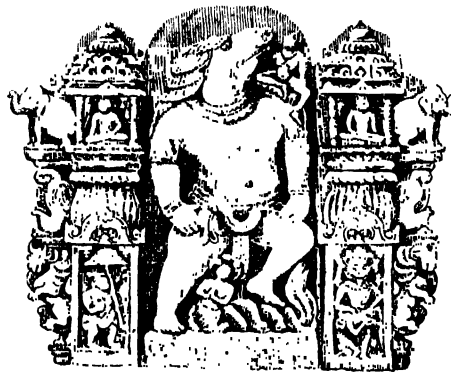
# বান

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আলের ওপর ছোট ছোট বিন্দু।

প্রত্যেক বছর এক দৃশ্য। ঠিক বছরের এই সময়টা। বল্লভপুর ছেড়ে চলেছে সবাই। মাথায় পোঁটলা। পিছনে স্ত্রী পুত্র পরিজন।

মাতঙ্গীর জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। ঢেউয়ের গর্জন। ফেনার ঝিলিক্। প্রবল আক্রোশে আছড়ে আছড়ে পড়ে বাঁধের ওপর। বছরের অন্য সময় সরু সুতোর মতন কৃশতনু। নীলচে জলের ছোট্ট ধারা। মাতঙ্গীর সঙ্গে সাগরের যোগ আছে। তাই জলে নীলের আভাস। লবণাক্ত স্বাদ। বর্ষায় মাতঙ্গী যৌবন পায়। এপার-ওপার দেখা যায় না। উন্মত্ত জলস্রোত কূল ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলে।

বাঁধের বয়সের হদিশ কারো জানা নেই। মাটি তুলে তুলে জলস্রোত আটকাবার প্রচেষ্টা, অনেকটা বালিমাটি দিয়ে যৌবন বাঁধবার প্রয়াস। কেউ বলে গৌড়ের শেষ রাজাদের কীর্তি, কেউ বলে না, বল্লভপুরের আদি অধিবাসীরা মাথায় ক'রে মাটি বয়ে বয়ে এনে তৈরী করেছে এই বাঁধ। নোনা জলের অত্যাচার থেকে ফসল বাঁচাবার জন্য।

কিন্তু প্রত্যেক বছর এক ইতিহাস। সর্বনাশের এক চেহারা। মাঝরাতে বিরাট একটা গর্জন। ঘুমন্ত বল্লভপুর চম্‌কে জেগে ওঠে। প্রবল কলরোল। বাঁধের ফাটল দিয়ে শতধারায় মাতঙ্গীর জল নেমে আসে ধানক্ষেতের ওপর। কচি কচি ধানের চারা কেঁপে কেঁপে উঠে তলিয়ে যায় সেই স্রোতে। মাঠ-ঘাট পার হয়ে চাষীদের বাড়ীর উঠানে এসে পৌঁছায়। ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ। মাটির দেয়াল ধ্বসে ধ্বসে পড়ে, খড়ের চাল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গরু, ছাগল, মাঝে মাঝে অসাবধানী ছোট ছেলেমেয়েরা ভেসে যায় সেই আবর্তে।

আজকাল সাবধান হয়েছে বল্লভপুর। বাঁধের ফাটল শুরু হলেই বেরিয়ে পড়ে ছেলেমেয়ে বৌয়ের হাত ধ'রে, তৈজসপত্র আর বীজধান মাথায় নিয়ে।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মিলনচক, নবীনপুর, লোচনপুর, দৌলতবাগ, কেউ কেউ হাসনাবাদ পর্যন্ত চ'লে যায়। দু'মাস লাগে জল সরতে। এই দু'মাস ছন্নছাড়া যাযাবর জীবন। মাঠে-ময়দানে আস্তানা। পুরুষরা জনমজুরের কাজ করে, মোট বয়, ঘর মেরামত করে। মেয়েরা বাড়ীতে বাসনমাজা, ঘর নিকানোর কাজ নেয়।

দু'মাস পরে আবার ফিরে আসে, ঠিক একভাবে। এক পথ ধ'রে।

ধানক্ষেতের চিহ্নও দেখতে পায় না। ক্ষেতের ওপর জল নেই, শুকনো সাদা একটা আস্তরণ। নুনের দাগ। সেই নুনের তেজে ধানচারাগুলো হেজে লাল হয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায়।

আবার কাজ শুরু হয় ধ্বসে-পড়া ঘরবাড়ী মেরামত। চেঁছে চেঁছে লবণস্পৃষ্ট মাটি তুলে ফেলে নতুন ক'রে সার দেয় মাটিতে। সবশেষে বাঁধের ফাটল সারায়।

মাতঙ্গী তখন কূলপ্লাবিনী নয়, ধীরগামিনী। ঢেউ নেই, স্রোত নেই, গাঁয়ের মুখচোরা মেয়ের মতন সলাজ-গতি, ভীরুচিত্ত।

কিন্তু একদিন রুখে দাঁড়াল। মাটির মানুষ জলের দুর্জয় স্রোতের বিরুদ্ধে। বল্লভপুরের সবাই নয়, শুধু অর্জুন মণ্ডল।

এ গাঁয়ের লোক নয়, নতুন এসেছে। বন কেটে, জলাজমি ভরিয়ে বসতবাটি তুলেছে। মানুষ বলতে দু' জন। স্বামী আর স্ত্রী। অর্জুন আর দামিনী। চওড়া বুক, সরু কোমর, মাথায় একরাশ উচ্ছৃঙ্খল পিঙ্গল চুল, তীক্ষ্ণ দু'টি চোখ। সারা শরীরে পেশীর ঢেউ। সেই তুলনায় দামিনী ক্ষীণকায়া, ফ্যাকাসে রং, উদাস চাউনি। চলে আস্তে, কথা বলে আরো আস্তে।

এদিকেরই মানুষ নয়। এসেছে পূর্ব-বাংলা থেকে। সখ ক'রে নতুন দেশ দেখার জন্য নয়, নতুন জমিতে পত্তন করার বাসনায় নয়, তাড়া খেয়ে এসেছে। প্রাণ বাঁচাতে, মান বাঁচাতে।

সাগরের কূলে বাস ছিল। শ্রম ও নীলজলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজেদের ঘরবাড়ী বাঁচিয়েছে, ক্ষেত-খামার রক্ষা করেছে। জলের ধারে বাস, জলের সঙ্গে শত্রুতা তাদের পুরুষানুক্রমিক। জলে তাদের ভয় নেই।

সেই জন্যই অর্জুন মণ্ডল বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

গ্রামের চণ্ডীতলায় ঢ্যাঁরা পিটিয়ে লোক জড় করা

হয়েছিল। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ছিল, পঞ্চায়েতের কর্তারা, মোড়ল। অর্জুনই কথাটা বুঝিয়ে বলল। লোহার মতন শক্ত দুটো হাত নেড়ে, একরাশ চুল বাতাসে উড়িয়ে।

পালাব কেন, মরদ হয়ে জলের ভয়ে পালাব দেশ ছেড়ে! জমিজায়গা রাক্ষসীর মুখে ফেলে দিয়ে।

তা নয় ত আর উপায় কি অর্জুন? সবাই যে তলিয়ে যাব, ভেসে যাব মাতঙ্গীর জলে।

তলাবও না, ভাসবও না। বুক ঠুকে দাঁড়াব। ওই কাদামাটির বাঁধকে শক্ত করব ইট দিয়ে, কাঁকুরে মাটি দিয়ে। মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে।

ক্ষেপেছে লোকটা. নির্ঘাৎ ক্ষেপেছে। এ কি চার-হাতের মামলা যে, সবাই ধরাধরি ক'রে ইট এনে সাজাবে বাঁধের ওপর, দুটো শালের গুঁড়ি এনে ফেলবে।

আড়াই মাইল লম্বা বাঁধ। মাতঙ্গী যেখানে বেঁকেছে সেখানটা সব জুড়ে। এ বাঁধ শক্ত করা কি কথার কথা!

হ্যাঁ, কথার কথা। কতলোকের বাস এই বল্লভপুরে। জোয়ানমদ্দ মিলিয়ে পাঁচশ' জনের কম নয়। বাঁধ শক্ত করার আগে মন শক্ত করতে হবে। হাত লাগাতে হবে সবাইকে। যখন মাতঙ্গী ক্ষীণাঙ্গী, হৃততেজ, তখন বাঁধতে হবে তাকে।

অর্জুন অসাধ্য সাধন করল।

ছেলে, বুড়ো কেউ রেহাই পেল না। মেয়েরাও নয়। অর্জুনের নির্দেশে এক দল গেল গাছ কাটতে, আর এক দল কাঁকর মাটির সন্ধানে। মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা ঝুড়ি বোঝাই মাটি আনতে লাগল। জোয়ানমদ্দরা দড়ি বেঁধে গাছের গুঁড়ি আনল টেনে টেনে।

প্রথম প্রথম দু' একজন আপত্তি করেছিল।

নটবর, ফকির, আমিনুদ্দিন।

মণ্ডলের পো, মেয়েদের রেহাই দাও। এত শক্ত কাজে ওরা পারবে না। যা করবার আমরাই করি।

অর্জুন শোনে নি। মাথা দুলিয়ে বলেছে, পারবে না, মানে? বানের জল কি কেবল মরদদেরই ভাসিয়ে নিয়ে যায় না কি? মেয়েছেলেদের ছোঁয় না? জলের ডর কি কেবল আমাদের?

অর্জুনের বাঁকা বাঁকা কথা শুনে সবচেয়ে আগে ঝুড়ি হাতে বেরিয়ে এসেছে অর্জুনের বৌ দামিনী। সোজা পথ ধ'রে হেঁটে গিয়েছে টিলার দিকে। আশপাশে নোনা নরম মাটি। এ মাটি জলের দোসর, স্রোত আটকাতে পারে না, একটুতে গ'লে কাদা হয়ে যায়। কাঁকর মাটি আছে টিলার গায়ে। চেঁছে আনতে হবে।

দামিনীর পিছন পিছন আরো অনেক বৌ-ঝি ছুটে গিয়েছে। তাদের চলার ধরন দেখে অর্জুন মুচকি মুচকি হেসে বলেছে, প্রাণের ভয় সবারই আছে। না বেরিয়ে উপায় কি!

প্রথমে বড় বড় গাছের গুঁড়ি, ফাঁকে ফাঁকে কাঁকর মাটি তার ওপর আবার গাছের মোটা মোটা ডালপালা। অনেক উঁচু হয়ে গেল বাঁধ, অনেক মজবুত।

তবু দু' একজন সন্দেহ প্রকাশ করল।

হ্যাঁগো, মণ্ডলের পো, পারবে ত জল ঠেকাতে, না কি এত মেহনত সব মাটি?

অর্জুন একটু দূরে ব'সে বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করে। সারা শরীরে দরদর বেগে গড়িয়ে পড়ছে ঘামের ধারা। পরিশ্রমে চওড়া বুকটা তালে তালে ওঠা-নামা করছে।

একটু দম নিয়ে বলে, মাতঙ্গী তো ছার, মাতঙ্গীর বাপ তেড়েফুঁড়ে এলেও সুবিধা করতে পারবে না। বল্লভপুরের আর ভয় নেই।

ফকির মুখ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে বলল, দেখা যাক। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। মাতঙ্গীর ক্ষেপবার সময় হয়ে এল।

এবার আর অর্জুন কোন উত্তর দিল না। মুখ টিপে টিপে হাসল।

বাঁধ মেরামত হবার দিন তিনেক পরে সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামল। সারাটা দিন মেঘে আকাশ কালো হয়েই ছিল। বিজলীর ঝিলিক, বাজের গর্জন। সারাটা রাত চলল বৃষ্টি। একটানা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অর্জুন জানাশোনা সব ঠাকুর-দেবতাকে ডাকল। বৃষ্টিতে বাঁধের মাটি যদি ধুয়ে যায়, আলগা হয়ে যায় গাছের গুঁড়ি, তা হলে বল্লভপুরে অর্জুন আর মুখ দেখাতে পারবে না। সারা গাঁ ছি ছি করবে।

এমন অবস্থা হবার কথা নয়। ঠিক এইভাবে সাগরের জল আটকেছে। একটি ফোঁটা জল ঢোকে নি ক্ষেতে।

অর্জুন যখন বাড়ী থেকে বেরোল তখনও ভাল ক'রে আলো ফোটে নি। গাছের ঝোপে ঝোপে অন্ধকার। আলের ওপর দিয়ে বাঁধের কাছ বরাবর এসে দেখল, আরও দু'একটা মূর্তি আলোছায়ায় নড়াচড়া করছে।

কাছে যেতেই চেনা গেল। নটবর আর ফকির।

ফকির জাপটে ধরল অর্জুনকে। আরে সাবাস মরদ। কাজের কাজ করেছ।

আরে ছাড়ো ছাড়ো, নিজের চোখে বাঁধটা দেখে আসি আগে।

তিনজনে পাশাপাশি চলল। বল্লভপুরের তিনজন

জোয়ান চাষী। বাঁধের কাছে গিয়ে তিনজনেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠল।

কাঁকুরে মাটি বৃষ্টির চাপে সিমেন্টের মতন শক্ত হয়ে গিয়েছে। গাছের গুঁড়ি যেন কুমিরের গা। একটি ফোঁটা জল লাগে নি কোথাও। বৃষ্টির ঝাপটা যখন সামলাতে পেরেছে, তখন মাতঙ্গীর তেজও সইতে পারবে।

দেখছ কি ফকির, অর্জুন হেসে উঠল, এ একেবারে লক্ষ্মণের গণ্ডি। সীতার বেরোবার সাধ্য নেই।

এবার কথা বলল নটবর, কিন্তু মা জানকীকেও বাইরে আসতে হয়েছিল তো, রাবণের শিকার হয়ে?

পলকের জন্য একটু ম্লান হ'ল অর্জুনের মুখ। দু' চোখে বিষাদের ছায়া। সামলে নিয়ে বলল, এখানে রাবণও সুবিধা করতে পারবে না। এ গণ্ডি আরো কঠিন, আরো নিরেট।

দেখাই যাক। নিবারণ হাসল।

দেখা গেল। বর্ষার মুখে মাতঙ্গী ফুঁসে উঠল। শান্ত, সলাজ ভঙ্গিমা কোথায় তলিয়ে গেল। আরো নীলচে হ'ল জল। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার ঝালর। গর্জনে, আবর্তে এক মাতঙ্গী যেন শত মাতঙ্গী হয়ে উঠল।

বল্লভপুরের সবাই ত্রাসে বিবর্ণ হয়ে গেল।

আকাশের রং মেটে। পাখীরা চীৎকার ক'রে দিগন্তে উধাও হ'ল। বাতাস বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে।

প্রকৃতির এ চেহারার সঙ্গে বল্লভপুরের লোকের খুব পরিচয় আছে। আর একদিন কি দুদিন। বান ডাকবে মাতঙ্গী নদীতে। স্রোতের চাপে বাঁধ খান্ খান্ হয়ে পড়বে। প্রবল উচ্ছ্বাসে বাঁধের ফাটল দিয়ে জলধারা ক্ষেতে এসে পড়বে। সব নাবাল জমি ভ'রে যাবে। আস্তে আস্তে চাষী-গৃহস্থের উঠানে গিয়ে ঢুকবে।

দাওয়ায় ব'সে অর্জুন মণ্ডল এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। ঘোলাটে আকাশ। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে স্রোতের কলরোল। অনেক উপরে চিল উড়ছে চক্রাকারে। লক্ষণ ভাল নয়। মাতঙ্গীর জল বাড়ছে। বাঁধ একটু উঁচু হয়েছে, নয়ত কানায় কানায় ভ'রে যেত।

হঠাৎ অর্জুনের চোখে পড়ল। দৃষ্টি নামাতেই।

মাঠের ওপর দিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় বৃন্দাবন চলেছে বৌ-ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে।

যে দুঃস্বপ্ন অর্জুন ভুলতে চায়, তারই ছায়া চোখের সামনে।

হেই বৃন্দাবন, বৃন্দাবন।

দু'হাত চোঙার মতন ক'রে অর্জুন ডাকল। এলো-মেলো হাওয়ায় ডাক ঠিক পৌঁছোচ্ছে না। হারিয়ে যাচ্ছে মাঝ পথে।

তবু বৃন্দাবন শুনতে পেল। দাঁড়িয়ে পড়ল মাঠের ওপর।

অর্জুন ছুটে গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে।

সব নিয়ে তুমি যাচ্ছ কোথায়?

আর থাকতে সাহস হচ্ছে না মণ্ডল। আমার ভিটে আবার মাতঙ্গীর সবচেয়ে কাছে। তার পথের ওপর আমি। একটা ল্যাজের ঝাপটায় একেবারে তলিয়ে যাব।

তলিয়ে যাব না বৃন্দাবন। ভুলে যাচ্ছ কেন বাঁধ আমরা আরো উঁচু করেছি, শক্ত করেছি।

দেবতার শক্তির কাছে মানুষের শক্তি কিছু নয় মণ্ডল। আমরা এতদিন ধ'রে যা গড়েছি, এক নিমিষে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তুমি পথ ছাড়। যেতে দাও। এখন রওনা না হলে সন্ধ্যের আগে মিলনচকে পৌঁছতে পারব না।

দেবতার শক্তি এ নয় বৃন্দাবন, এ দানবের শক্তি। দেবতার শক্তি এ ভাবে চুরমার ক'রে সবকিছু ভাঙে না। মানুষের জীবন তচনচ করে না। দানবের শক্তির চেয়ে মানুষের শক্তি অনেক বড়। আমরা দানবের মতন গায়ের জোর হয়ত রাখি না, কিন্তু আমাদের বুদ্ধির জোর অনেক বেশী। তোমার পায়ে ধরছি বৃন্দাবন, তুমি যেও না। তোমরা যদি এমনি ভাবে পালিয়ে যাও, তবে লোকের মনের জোর ক'মে যাবে। ভেড়ার পালের মতন সবাই দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াবে।

কিন্তু কোন্ সাহসে আমি থাকব মণ্ডল? পরিবারের ছেলেপুলে হবে, শরীরের এই অবস্থায় মাতঙ্গীর মুখের কাছে থাকি কি ক'রে?

অর্জুন এগিয়ে এসে বৃন্দাবনের দুটো হাত জাপটে ধরল, তোমাদের ভার আমি নিলাম ভাই। তোমার দায়বিপদ্ সব আমার ঝক্কি। তুমি আমার ঘরে এসে ওঠো। যখন দরকার বুঝব, স'রে যাব। কিন্তু শেষ চেষ্টা করব, এমনিতে হাল ছাড়ব না। আমরা যখন স'রে যাব, তখন তুমি যেও আমাদের সঙ্গে, তার আগে নয়।

বৃন্দাবন কিছুটা বুঝল, কিন্তু কান্নাকাটি শুরু করল

বৌ আর ছেলেপুলেরা। তার বুড়ী পিসী তো লুটিয়ে পড়ল পথের ওপর।

আবার অভয় দিল অর্জুন।

আমি কথা দিচ্ছি ভাই, তোমাদের সব দায়বিপদের ভার আমি নিলাম। বিপদ্ যদি সত্যিই আসে, তো তোমাদের নিরাপদ্ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও আমার।

বৃন্দাবন নিমরাজী হয়ে উঠে এল অর্জুনের আস্তানায়, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পরিজনও এল।

ঠিক সেই রাত্রে। মেঘগর্জনের মতন গুরুগম্ভীর শব্দ। মনে হ'ল মত্ত ঐরাবত বুঝি ছুটে আসছে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে। পায়ের চাপে মেদিনী থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। শুঁড়ের আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে গাছপালা।

দাওয়ায় অর্জুন উৎকর্ণ হয়ে ব'সে রইল। পাশে বৃন্দাবন। ঘরের মধ্যে বৃন্দাবনের পিসী আর বৌকে জড়িয়ে ধ'রে ছেলেপুলেরা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। দামিনী শুধু ধীর, স্থির। দেয়ালে হেলান দিয়ে বিড় বিড় ক'রে ভগবানের নাম জপ করতে লাগল।

প্রচণ্ড আওয়াজ। মনে হ'ল প্রমত্তা মাতঙ্গী অট্টহাস্য ক'রে অবহেলায় চুরমার ক'রে ফেলল বাঁধের বাধা। সারা বল্লভপুরের মেহনতের ফল মাটি আর কাঠের স্তূপকে ধুলিসাৎ ক'রে দিল।

প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে অর্জুন ছুটে বেরিয়ে গেল বাঁধের দিকে।

ওটা শুধু বাঁধ নয়, অর্জুন মণ্ডলের ইজ্জৎ, তার পৌরুষ। সমস্ত বল্লভপুরের সম্মান আর শ্রমের প্রতীক। ওই বাঁধ ভাঙলে অর্জুন সারা গাঁয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। অন্ধকারে অবয়ব ঢেকে গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে।

যেতে যেতে অর্জুন চীৎকার করল, নটবর, ফকিরদা, আমিহৃদ্দিন মিয়া।

তীক্ষ্ণ শরের ফলার মত বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা অর্জুনের গায়ে এসে বিঁধছে। ঝাঁকড়া চুল বেয়ে, পেশী-পুষ্ট শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। পথ দেখা যাচ্ছে না। সামনের সব কিছু ঝাপ্সা।

এত শব্দে অর্জুনের ডাক কারো কানে যাবার কথা নয়। কিন্তু অর্জুন থামল না। একলা মাতঙ্গীর মুখো-মুখী হতে বুঝি ভয় পাচ্ছে অর্জুন। সাগরের চেয়েও মাতঙ্গী আরও ভীষণ, আরও কীর্তিনাশা।

আবার অর্জুন চেঁচাল, নটবর, আমিহৃদ্দিন।

আল বেয়ে বেয়ে সাবধানে এগিয়ে চলল। সেই কানফাটানো শব্দের শেষ নেই। মাতঙ্গী বুঝি বল্লভ-পুরকে মুছে দেবে সম্পূর্ণ ভাবে।

হাতড়ে হাতড়ে বাঁধের ওপর গিয়ে অর্জুন উঠল। পাগলের মতন ছুটোছুটি করল একদিক্ থেকে অন্যদিকে।

হেরে গেছে মাতঙ্গী। বল্লভপুরের সম্মিলিত শ্রমের কাছে মাথা নুইয়েছে।

দু'এক জায়গায় মাটি সামান্য ধুয়ে গেছে। অল্প ফাঁক হয়ে গেছে গাছের গুঁড়ি। কিন্তু কাঁকুরে মাটি বজ্রের শক্তিতে আঁকড়ে ধরছে। মাতঙ্গীর দম্ভ চূর্ণ করেছে। তার লবণাক্ত জলের এক বিন্দু এপারে আসে নি। আসতে দেয় নি।

বৃষ্টির জোর কম। মাতঙ্গী পাগলের মতন মাথা খুঁড়ছে বাঁধের গায়ে। সমস্ত শক্তি দিয়ে। বাধা পেয়ে ফেনিল উচ্ছ্বাসে নিজের বুকে আবর্তের সৃষ্টি করছে। প্রচণ্ড শব্দে ঢেউ প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এ শব্দ মাতঙ্গীর বিজয়োল্লাস নয়, তার হাহাকার।

আনন্দে অর্জুন হাততালি দিয়ে উঠল। আবার চিৎকার ক'রে ডাকল, নটবর, ফকিরদা, আমিহৃদ্দিন।

অস্পষ্ট বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে আর একটা মানুষের কাঠামো দেখা গেল। নটবর এগিয়ে আসছে। হাতের লাঠি ঠুকে ঠুকে। পথ চিনে চিনে।

কাছে আসতেই অর্জুন সবেগে নটবরকে জড়িয়ে ধরল।

নটবর, আমরা জিতেছি। আমাদের তৈরি বাঁধ ভাঙতে পারে নি রাক্ষুসী মাতঙ্গী।

আলিঙ্গনের বেগে দু'জনেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। প্রথমে নটবর তার পর অর্জুন। কর্দমাক্ত দু'টি দেহ আবার উঠে দাঁড়াল। বাঁধের ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াল। যেখানে একটু মাটি স'রে গেছে, ক্ষেত থেকে মাটি নিয়ে লেপে দিল সেখানে। ঠেলে ঠেলে গাছের গুঁড়ি ঠিক ক'রে দিল। প্রয়োজনবোধে ছোট ছোট ডাল দিয়ে ভরাট ক'রে দিল।

একটু পরেই সারা বল্লভপুর ভেঙে পড়ল আলের ধারে। মেয়েরা শাঁখ বাজাল। উলুধ্বনি দিল। পুরুষরা জাপটে ধরল অর্জুন মণ্ডলকে।

আর ভয় নেই। মাতঙ্গী এ বছর বল্লভপুরের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

পরের দিন থেকে বল্লভপুরের চোখে অর্জুন মণ্ডল যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠল। মানুষ নয়, দেবতা। তাকে মাঝখানে রেখে সারা গাঁ প্রদক্ষিণ করল সবাই। গাজনের

সময় যেমন গান গায়, ছড়া কাটে, তেমনিভাবে আমোদ করতে করতে।

পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট নিজে এসে পিঠ চাপড়াল। বলল, সাবাস জোয়ান্। তোমার কথা আমি লিখব সরকারকে। তোমাকে ইনাম দেবার যেন বন্দোবস্ত করে।

উত্তরে অর্জুন হাত যোড় করেছে, আমার একলার কাজ নয় হুজুর। ছেলে-বুড়ো সবাই খেটেছে। মেয়েরাও বাদ যায় নি। ইনাম দিতে হলে সারা গাঁকে দেবেন। নদী আর মানুষের লড়াইয়ে আমরা জিতেছি আজ্ঞে। আমাদের ঘরদোর, ক্ষেত-খামার, বৌ-ছেলেপুলে বাঁচাতে পেরেছি, এই বড় কথা। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদ।

পর পর দিন-সাতেক চলল নদী আর বাঁধের রেষারেষি। আরও উদ্দাম হ'ল মাতঙ্গী, আরও দুর্বার। বাঁধের বুকে আছড়ে আছড়ে পড়ল সমস্ত শক্তি দিয়ে, কিন্তু মাটির একটি কণা খসাতে পারল না। গাছের একটি গুঁড়ি স্থানচ্যুত হ'ল না।

আবার শান্ত হ'ল মাতঙ্গী। পরাজিত, হৃতবল, ক্ষীণকায়া।

গাঢ় সবুজ হ'ল ফসলের চারা। শীর্ষমুখে শীষের ইসারা। অন্ন, অন্ন, অন্ন। চাষীদের স্বপ্ন আর সাধনা, ভবিষ্যৎ।

বল্লভপুর অর্জুন মণ্ডলকে ভুলল না।

নিশ্বাস ফেলার সময় নেই অর্জুনের। দূর দূর গাঁয়ে যাত্রাগান। অর্জুন মণ্ডলের নিমন্ত্রণ আসত। আসরের মাঝখানে তাকে বসিয়ে তবে পালা শুরু হ'ত। কবিগান, সভা-সমিতি, পাঁচজন লোক এক জায়গায় হলেই তার ডাক পড়ত। প্রথম প্রথম অর্জুন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত, কিন্তু শেষকালে ধরা দিত। নামের প্রলোভন এড়াতে পারত না।

সারা বল্লভপুর মাতল অর্জুনকে নিয়ে। প্রত্যেকটি লোক অর্জুনকে ঘিরে রইল।

একটা লোকের কাছ থেকে কিন্তু ক্রমেই অর্জুন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সে দামিনী। সকাল থেকে অর্জুন টো টো ক'রে ঘোরে। ধান কাটা শেষ। ক্ষেতের কাজ নেই। শুধু একবার খেতে আসে দুপুরবেলা। কোন কোন দিন আবার তাও আসে না। বাইরে কারও বাড়ী আহার জুটিয়ে নেয়।

ভাতের থালা কোলে ক'রে ব'সে ব'সে দামিনী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বেলা পড়লে নিজে খেয়ে নেয়। রাতের বেলাও পায় না অর্জুনকে। প্রায়দিনই তার যাত্রাগান থাকে কিংবা পাঁচালী। সারা বল্লভপুরের মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছে অর্জুন, শুধু বুঝি নিজের বাড়ীর দিকে চাইবার চোখটাই কানা।

একদিন দামিনী ব'লেই ফেলল।

ফতুয়াটা বাঁশের আল্না থেকে টেনে নিয়ে অর্জুন বাইরে পা বাড়াচ্ছিল, দামিনী সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার তোমার বল ত?

কিসের কি ব্যাপার?

দিন নেই, রাত নেই, হুট্ হুট্ ক'রে বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছ। বাড়ীতে কতটুকু থাক। না, বাড়ীতে বুঝি মন বসে না?

চেয়ে চেয়ে অর্জুন দেখল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দামিনী। মুখে, গালে নীল শিরার জট। স্বাস্থ্য তার কোনকালেই ভাল নয়। স্বাস্থ্য ভাল নয় ব'লেই ছেলে-পুলে হ'ল না। এখন যেন আরও রোগা দেখাচ্ছে। আরও বিবর্ণ।

বাড়ীতে মন আর বসাতে পারলে কই। ধ'রে রাখবার মতন বাঁধনই দিতে পারলে না।

হাসতে হাসতে কথাটা শুরু করলেও দামিনীর মুখের দিকে চেয়ে অর্জুন আর হাসতে পারল না। এক মুহূর্তে দামিনীর মুখের রক্ত কে যেন শুষে নিল। উদাস দু'টি চোখের দৃষ্টি। কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। থর্ থর্ ক'রে ঠোঁট দু'টো শুধু দু'একবার কেঁপে উঠল।

অর্জুন আর দাঁড়াল না। ক্ষেত-খামার বোঝে, জলের সঙ্গে লড়াই করার সময় অসীম বিক্রম, হৈ-হল্লাও মন্দ লাগে না, কিন্তু চোখের জল আর থম্থমে মুখ-চোখের ভঙ্গির সামনেই সে মুশকিলে পড়ে। কি কথা বলবে বুঝতে পারে না, কি উত্তর দেবে, তাও না। চুপ্চাপ্ দাঁড়িয়ে থাকে, নয়ত পালিয়ে বাঁচে।

অর্জুনের যেমন দুঃখ, দামিনীরও তাই। বাঁধন যদি অর্জুনের না থাকে, তবে দামিনীই বা হাঁড়ি-বেড়ি আগলে ব'সে থাকবে কেন? কিসের প্রত্যাশায়। তবু অর্জুন হৈ চৈ নিয়ে মেতে থাকে, তার বাইরের জীবন আছে নিশ্ছিদ্র, অনবসর। দামিনীর কি আছে! প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করে কচি হাতের স্পর্শের অভাব, শিশুর কলধ্বনির!

যত দিন যাচ্ছে, তত যেন স'রে যাচ্ছে অর্জুন। বাড়ীতে যতটুকু থাকে, বেশ গম্ভীর। খুব প্রয়োজন না হলে কথাই বলে না। অথচ দামিনী জানলা দিয়ে

দেখে যখন পাড়ার লোকদের সঙ্গে হৈ হৈ করে, তখন যেন তার অন্য চেহারা।

অর্জুনেরও তাই। দামিনীর যেন প্রাণ নেই। আস্তে কথা বলে, আস্তে চলে। দু'জনের ত কাজ, তাই করতেই তার সারাটা দিন কেটে যায়। পূর্ব-বাংলায় থাকবার সময় তবু একটু শক্তি ছিল দামিনীর। ক্ষেত-খামারের কাজ করত অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। শরীরের কোন রোগ নয়, রোগ মনের। কবিরাজ তাই বলেছে। কোলে ছেলে না এলে এ রোগ সারার নয়।

দামিনী অর্জুনের দোষ দেয়। কাছাকাছি হলেই কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সংসারে মন নেই মানুষটার। কেবল বাইরের দিকে নজর। নিজের জমিজমাই নয়, পড়শীদের কার কোথায় অসুবিধা, অর্জুন বুক দিয়ে পড়ে। নিজের সংসার জাহান্নমে যাক, রসাতলে যাক, সংসারের আর একটা মানুষ, তার কোন খেয়াল নেই।

ইদানীং দামিনী আরও যেন খিটখিটে হয়েছে। কথায় কথায় ঝগড়া করে, চৌকাঠে মাথা ঠোকে, কেঁদে ভাসায়।

ব্যাপার দেখে অর্জুন আরও বাইরে বাইরে কাটায়।

ঠিক এমনই সময়ে এল এক দরবেশ। এক মুখ দাড়ি, কাঁধে বিরাট্ ঝোলা। তার মধ্যে শিকড়-বাকড়, ওষুধপত্র।

অর্জুন বাড়ী ছিল না। দরবেশকে দামিনী ডেকে দাওয়ায় বসাল। বলা যায় না। এদের কাছে অনেক সময় অনেক জিনিস থাকে। কবিরাজেরা যার সন্ধান জানে না, এমনি কোন্ ওষুধ বা শিকড়।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দামিনী নিজের দুঃখের কথা বলল। লজ্জার মাথা খেয়ে।

দরবেশ সব শুনল। হেসে বলল, এ আর বেশী কথা কি। আছে, তিব্বতীবাবার ভাল ওষুধ আছে। তবে দাম একটু বেশী লাগবে আর কিছু সময়। মাস তিনেক ত বটেই।

দামিনী রাজী। নিষ্ফলা, বন্ধ্যাজীবন যদি মাস তিনেক পরে পুষ্পিত হয়ে ওঠে, তার জন্য সে সব করতে রাজি।

দরবেশ আসা-যাওয়া শুরু করল। দামিনীর হাতে কবচ বেঁধে দিল। এলোচুলের আড়ালে এক শিকড়। এ ছাড়া কিছু লতাপাতা বেটে খাওয়াল। কাজ হবে, নিশ্চয় কাজ হবে। তবে এ সব কথা স্বামীকে বলা একদম বারণ। তা হলেই সব খতম।

প্রায় মাস তিনেক পর।

পাশের গাঁয়ে অর্জুন যাত্রা শুনতে গিয়েছিল। শহরের দল। খুব জমে উঠেছিল। আসরে একটু শব্দ নেই। কেউ একটু নড়েচড়েও বসছে না। কিন্তু অর্জুনের ভাল লাগে নি। মারপিট নেই, গরম গরম কথা নেই, কেবল কান্না আর কান্না। যে কান্নার ভয়ে দামিনীর সংসার থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক সেই ব্যাপার।

হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে অর্জুন এগিয়ে চলল। গরম কাল এই সময় পথে-ঘাটে আবার সাপের উপদ্রব হয়। আচম্কা ল্যাজে পা দিলেই সর্বনাশ। হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে অর্জুন ঠুকৃতে ঠুকৃতে চলল।

বাড়ীর কাছাকাছি এসেই অর্জুন থেমে গেল। উঠানের ওপর দু'টো মানুষের ছায়া। একেবারে পাশাপাশি।

হাতের লাঠিটা শক্ত ক'রে ধ'রে রাংচিতা আর ফণিমনসার ঝোঁপের পিছন দিয়ে গুঁড়ি মেরে অর্জুন এগিয়ে চলল। ঝাঁকড়া একটা কুলগাছ। তার পিছনে নিঃশব্দে ব'সে পড়ল।

ফ্যাকাসে চাঁদের আলো। তার মধ্যে দামিনীকে বেশ চেনা গেল। পাশে দাড়িওয়ালা একটা জোয়ান। লোকটাকে অর্জুন কোনদিন দেখেছে ব'লে মনে করতে পারল না। আশপাশের চার-পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তার চেনা, কিন্তু এ লোকটা বোধ হয় ভিন্‌দেশী।

এখানে থেকে তোমার লাভ কি বল দামিনী? এই ত তোমার জীবন। সংসার বলতে কয়েকটা হাঁড়িকুঁড়ি হাতা। আসল মানুষটা ত মুখ ফিরিয়ে দেখেও না। বাইরে বাইরে স্ফূর্তি ক'রে কাটায়। তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে। ঘর দেব, সুখ দেব, আমি থাকব সঙ্গে সঙ্গে। যার জন্য তোমার দেহমনের এই অবস্থা, তার স্বাদ পাবে। একেবারে ভর্তি সংসার।

খুব ফিস্ ফিস্ ক'রে দামিনী কি বলল, কান খাড়া ক'রেও অর্জুন শুনতে পেল না।

লোকটা আবার বোঝাতে লাগল।

ঘরের মানুষটা তোমায় চায় না দামিনী। চাইলে এমন ক'রে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াত না। রাতের পর রাত বাইরে কাটাত না। তুমি শুধু রান্নাবান্না ক'রে তার মুখের কাছে ধরবে। শরীরপাত ক'রে সংসারের কাজ করবে দাসী-বাঁদীর মত। যে সংসারে আদর নেই, ভালবাসা নেই, সে সংসারে থেকে কি লাভ বল? এ ত পরের সংসার আগলে ব'সে আছ তুমি।

এবার দামিনী কিছু বলল না, কিন্তু তার দাঁড়াবার

শ্লথ ভঙ্গি দেখে এটুকু বোঝা গেল, বাধা দেবার শক্তি যেন তার ক'মে এসেছে। লোকটার মিষ্ট মিষ্ট কথায় সে সংসারের টান ভুলছে। নিজেকে ভুলছে।

এই সুযোগে লোকটা দামিনীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

কুলগাছের পিছনে ব'সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে অর্জুন সব দেখল। কথাটা সত্যি। সারা বল্লভপুরের খোঁজ-খবর নিয়েছে অর্জুন। তিন গাঁয়ের লোকেদের সুখ-দুঃখের সন্ধান করেছে। অবহেলা করেছে বাড়ীর মানুষটাকে। যাক দামিনী। যেখানে গিয়ে শান্তি পায়, ভালবাসার আশ্রয় পায়, সেখানেই যাক। কিছু বলবে না অর্জুন। কোন বাধা দেবে না।

পাড়ার লোকদের কিছু একটা ব'লে দিলেই হবে। শরীর সারাতে মাসীর বাড়ী চ'লে গিয়েছে দামিনী। শরীর ভাল ক'রে না সারা পর্যন্ত বল্লভপুরে ফিরবে না।

তার পর। তার পর কিছু একটা বানিয়ে বললেই হবে। আর নেই দামিনী। সব শেষ হয়ে গেছে।

তবু সুখী হোক দামিনী। শান্তি পাক।

লোকটা প্রায় টানতে টানতে দামিনীকে নিয়ে চলল। দু'হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে অর্জুন চেয়ে চেয়ে দেখল।

একটু এগিয়েই দামিনী মুখ ফেরাল। ম্লান চাঁদের আলোয় চক্ চক্ ক'রে উঠল তার দু'টো চোখ। পরণের হাল্কা সবুজ রং-এর শাড়ীটা বাতাসে উড়ছে। এলো-খোঁপা খুলে পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে চুলের রাশ। বিবর্ণ, নীরক্ত ঠোঁট দু'টো থরথরিয়ে কাঁপছে।

ঠিক এক। কোন তফাৎ নেই।

হাতের লাঠিটা মুঠোর মধ্যে ধ'রে অর্জুন মণ্ডল উঠে দাঁড়াল।

বান আসবার আগে, ঘোলাটে আকাশের নীচে, এলোমেলো হাওয়ায় ঠিক এমনি ক'রে কেঁপে কেঁপে ওঠে কচি ধানের চারা। ভয়ে এমনি ভাবেই নুয়ে পড়ে মাটির ওপর। ঠিক মনে হয়, বলে, রক্ষা কর, রক্ষা কর। বাঁধ ভেঙে প্লাবন আসছে। ক্ষেতের বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে আমাদের। লবণাক্ত স্পর্শে মাটির মিষ্ট স্বাদ ভুলিয়ে দেবে।

আবার বান আসছে। বল্লভপুরের বাঁধ যেমন উঁচু হয়েছে, মজবুত হয়েছে, তেমনি শক্ত আর মজবুত করতে হবে ঘরের বাঁধ। বাইরের জলের উদ্দাম স্রোতে ফসল নষ্ট না করতে পারে, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে মানুষকে ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া না করে।

হুঁশিয়ার। বজ্রগর্জনে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে অর্জুন মণ্ডলের পেশীপুষ্ট দেহটা বিদ্যুতের গতিতে ছিট্‌কে এসে পড়ল কুলগাছের আড়াল থেকে। মাতঙ্গীর চেয়ে কুটিল, মাতঙ্গীর চেয়েও আবর্ত-সঙ্কুল, মতলববাজ এক মানুষের সামনে।

# চিরসুন্দর রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, মানুষ বুড়ো বয়সেই সুন্দর হয়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা কিন্তু এ কথার সাক্ষ্য দেয় না। আমরা দেখতে পাই যে-মানুষটা যৌবনে সুন্দর ছিল, বুড়ো বয়সে তার প্রাক্তন সৌন্দর্যের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। দাঁত প'ড়ে গেছে, চোয়াল ব'সে গেছে, চুল সাদা হয়ে গেছে, চামড়া কুঁচ্‌কে গেছে, রং জ্ব'লে গেছে। এক-আধজন লোক এই নিয়মের ব্যতিক্রম—রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। শুধু বুড়ো বয়সেই নয়—রবীন্দ্রনাথ সব বয়সেই সুন্দর ছিলেন। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছবি আছে—একেবারে বালককাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত। এই ছবিগুলি যদি কেউ মন দিয়ে দেখেন তবে কোন বয়সের ছবিকেই অসুন্দর ব'লে মনে হবে না। কারণ তিনি সব বয়সেই সমান সুন্দর ছিলেন।

আমরা যখন তাঁকে দেখেছি তখন তাঁর সৌন্দর্যের মধ্যাহ্নকাল। তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মতিথি শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯১১ সনে প্রথম প্রতিপালিত হয়েছিল। তার পর আবার বুড়ো বয়সে বাংলা দেশের বাইরে তাঁকে দেখলাম দিল্লীতে, ১৯৩৭ সনে। তিনি "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য নিয়ে অভিনয় দেখাতে বেরিয়েছিলেন। তখন তাঁর সৌন্দর্যের রূপ পরিবর্তন হয়েছে—সে রূপ অস্তগামী সূর্যের, কিন্তু তবু কিরণোজ্জ্বল ছটায় উদ্‌ভাসিত। বেশ মনে আছে, নয়া দিল্লীর রিগ্যাল থিয়েটারে ( Regal Theatre ) "চিত্রাঙ্গদা" অভিনয় দেখানো হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ডান পাশে একটা দীর্ঘ আরাম-কেদারায় আধ-শোওয়া অবস্থায় ব'সে আছেন। মাঝে মাঝে নাচের সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন এবং আবৃত্তি করছেন। প্রেক্ষাগৃহে ( auditorium ) সামনের সিটে কয়েকজন বর্ষীয়সী মার্কিন মহিলা অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে চুপি চুপি বললেন, "Look at him, look at him, he looks like Jesus." ( চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, ওঁকে ঠিক যীশুখৃষ্টের মত দেখাচ্ছে। ) তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৬ বছর।

মার্কিন মহিলারা কোন্ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যীশুর সাদৃশ্য দেখেছিলেন সে কথা তাঁরাই বলতে পারেন, তবে কেবলমাত্র দৈহিক সৌন্দর্যের দিক্ দিয়ে নয়, সেটা নিশ্চিত বলা যায়। যীশু বলতে আমাদের মনে একটা ধর্মপ্রাণতা এবং আত্মত্যাগের অতুলনীয় চিত্র মনে জাগে। সম্ভবতঃ মার্কিন মহিলাদের মনেও সেই চিত্র জেগেছিল এবং তাঁরা সেই দিক্ দিয়ে যীশুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য কল্পনা করেছিলেন। আমার বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথকে শুধু দেহের দিক্ দিয়ে সুন্দর দেখলে তাঁর সৌন্দর্যের সামান্য অংশই দেখা হবে। রাজা-রাজড়া এবং অভিজাত সমাজে অনেক সুন্দর পুরুষ দেখা যায়, কিন্তু কেবলমাত্র দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য তাঁদের কেউ রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথের দেহের সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁর মনের সৌন্দর্যের, তাঁর আত্মার সৌন্দর্যের যোগ হয়েছিল। তাই সবটা মিলে এমন একটা সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ তাঁর আশেপাশের এবং অন্যান্য লোকদের মুগ্ধ করত।

তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় আমরা যখন কাছে ছিলাম তখনও এটা দেখেছি। সব মহাপুরুষদেরই মনের মধ্যে বোধ হয় একজন চিরন্তন শিশু বাস করেন। নয়ত অন্য বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ লোকেরা যা করেন না বা করতে সঙ্কোচ বোধ করেন, মহাপুরুষেরা তা বিনা দ্বিধায় করেন কি ক'রে ?

এমনি একটা ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি যাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের এবং আত্মিক-সৌন্দর্যের এক অপরূপ প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলাম। তখন আমি পনেরো বছরের বালক—এর মহিমা বুঝতে পারার বয়স হয় নি। উত্তরজীবনে এর মূল্য বুঝতে পেরেছি। আমার নিজেকে নিয়ে ঘটনা ব'লে প্রকাশ করতে আমি বিব্রত বোধ করছি। কিন্তু আমি যেটুকু তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি সেইটুকুর বিবরণ আমিই দিতে পারি—অন্য কারও পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

১৯১১ সন—গরমের জন্য শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছুটি হচ্ছে। প্রথম শুনলাম, এই ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং যাচ্ছেন। দার্জিলিং কখনও দেখি নি—রবীন্দ্রনাথকে

গিয়ে ধরলাম, আপনাদের সঙ্গে আমিও দার্জিলিং যাব, বাড়ী যাব না। রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন। কয়েক দিন পরে শুনলাম, বাড়ী পাওয়া গেল না বা ঐরকম কোন কারণে দার্জিলিং যাওয়া হ'ল না। তার বদলে ঠাকুর ষ্টেটের জমিদারি শিলাইদহে যাওয়া হবে। আমিও সঙ্গে যাব স্থির রইল।

তখন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং জামাতা নগেন গাঙ্গুলী শিলাইদহে থেকে জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। ওঁরা দু'জনে রবীন্দ্রনাথকে নিতে শান্তিনিকেতনে এলেন। আশ্রম থেকে দিনেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাবেন স্থির হ'ল। আমরা সকলে মিলে কলকাতায় এলাম এবং সেখানে একদিন থাকার পর দ্বিতীয় দিন সকালবেলা চাটগাঁ মেলে রওনা হলাম। বেলা দশটা নাগাদ কুষ্টিয়া পৌঁছলাম। ওঁদের নিজের লঞ্চ সেখানে অপেক্ষা করছিল। আমরা তাইতে উঠে গোড়াই নদী দিয়ে যেতে লাগলাম। ক্রমশঃ পদ্মা নদীতে গিয়ে পড়লাম এবং পাবনা শহর বাঁ হাতে রেখে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে শিলাইদহে পৌঁছে গেলাম। যেখানে লঞ্চ থামল সেখান থেকে নদীর তীর অনেকটা দূর। একজন বরকন্দাজ কোলে ক'রে আমাকে ডাঙায় নামিয়ে দিল মনে আছে।

আশ্রমে থাকতে আমি শুনেছিলাম যে, ইতিপূর্বে অজিতবাবু (আমাদের ইংরেজির শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী) গুরুদেবের সঙ্গে বোটে শিলাইদহে থেকেছেন। মনে মনে অনুমান করেছিলাম যে, আমারও বুঝি সেই দুর্লভ সৌভাগ্য হবে। কিন্তু তখন শিলাইদহে কুঠিবাড়ী তৈরি হয়েছে—বোটে থাকার আর দরকার নেই। আমরা সকলে মিলে গিয়ে কুঠিবাড়ীতে উঠলাম। রবীন্দ্রনাথ তিনতলার ঘরে রইলেন, দোতলায় রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নগেনবাবু এবং মীরা দেবী—আর একতলায় স-এস্রাজ দিনেন্দ্রনাথ এবং আমি। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিন লেখায় ডুবে থাকেন, খাওয়ার টেবিলেও আমার ডাক পড়ে না। সুতরাং দিনরাত্রির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের কোন সুযোগই আমার হয় না। মনে হ'ল এর চেয়ে আশ্রমে ভাল ছিলাম। ইচ্ছা করলেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে পারতাম। এখানে সেটা হচ্ছে না। অথচ উপায় কি করি তাও ঠাহর করতে পারি নি।

একতলার বারান্দায় একটা চিঠির বাক্স ছিল। রবীন্দ্রনাথের রোজ যত চিঠি আসত পিয়ন সেই বাক্সে রেখে যেত—পরে চাকর সেগুলো নিয়ে তিনতলায় রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে দিত। আমরাও চিঠি লি[illegible] ঐ বাক্সে ফেলে রাখলে পিয়ন এসে নিয়ে যেত এব[illegible] স্থানীয় পোষ্ট অফিসে তাতে টিকিট লাগিয়ে পাঠি[illegible] দিত। আমাদের টিকিট লাগাতে হ'ত না। একদি[illegible] আমি বুদ্ধি ক'রে রবীন্দ্রনাথের নামে একখানা চিঠি লিখলাম এবং ঐ চিঠির বাক্সে ফেলে রাখলাম। তাতে আমার অন্তরের দুঃখকে রূপ দিয়েছিলাম। যথাসময়ে চাকর অন্যান্য চিঠির সঙ্গে আমার চিঠিও রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেল অর্থাৎ একতলা থেকে আমার চিঠি তিনতলায় রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছে গেল।

রবীন্দ্রনাথ যদিও তখন নোবেল প্রাইজ পান নি কিন্তু তিনি তখনো যথেষ্ট ব্যস্ত লোক—সর্বদাই লেখার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। তখন একসঙ্গে "রাজা" (King of the Dark Chamber) এবং "জীবন-স্মৃতি" লিখছেন মনে আছে। এমন লোকের সান্নিধ্য লাভ করতে পারছি নে, এমন কথা লেখা একজন পনেরো বছরের ছেলের পক্ষে শুধু দুঃসাহস নয়, অনর্থক আব্দারও বটে। কিন্তু আমারও তখন আজকের জ্ঞান ছিল না। অন্য যে-কোন সাধারণ এবং অভিজ্ঞ লোকের কাছে এই নিয়ে আমাকে ধমক খেয়ে চোখের জলে ভাসতে হ'ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি করলেন সেই কথাই এখানে উল্লেখ করছি।

সেদিন অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল সন্ধ্যার আগেই রবীন্দ্রনাথ একতলায় নেমে এলেন। তাঁর সাধারণ প্রোগ্রাম ছিল সন্ধ্যার পর রথীন্দ্রনাথ এবং নগেনবাবু আপিস থেকে এলে দোতলায় নেমে আসা এবং সারাদিন ধ'রে যা লিখেছেন তা পড়ে শোনানো। সেদিন একতলায় এসে একটা লম্বা আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়লেন এবং আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি পায়ের কাছে গিয়ে বসলাম।

সে রাত্রির কথা জ্বলন্ত ভাবে আমার মনে আছে। সান্নিধ্য ত চেয়েছিলাম কিন্তু কি কথা দিয়ে বেশিক্ষণ আমি সেই মহাপুরুষকে আটকে রাখতে পারি? তাই কিছু পরেই তাঁর উঠে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি নিজের মন দিয়ে একটি অনভিজ্ঞ কিশোর-মনের দুঃখ বুঝেছিলেন। তিনি সমানে সেই আরাম-কেদারায় শুয়ে রইলেন এবং আমি পায়ের কাছে ব'সে রইলাম। রাত্রিটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের। খানিক রাত হওয়ার পরে চাঁদ উঠল এবং কুঠি-বাড়ীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের বাঁ পাশের শান-বাঁধান চাতালে জ্যোৎস্না চকচক করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ অনেক রাত্রে উঠে গেলেন এবং উঠে যাওয়ার আগে আমি প্রণাম করলাম।

রবীন্দ্রনাথ আমার চিঠির উল্লেখ করেন নি, আমিও

করি নি। কিন্তু আমার ব্যথা জানানো যে ব্যর্থ হয় নি তা আমি বুঝেছিলাম। আজ তাই ভাবি যে, মহাপুরুষদের কাছে ছোট-বড়, সামান্য-অসামান্য, কোন কিছুরই কি পার্থক্য নাই?

আমাদের ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা কানে আসত। কেউ বলতেন তিনি ব্রাহ্ম, তিনি বড়লোক, কেউ বলতেন তিনি যা লেখেন তা অস্পষ্ট, বোঝা যায় না, ইত্যাদি অসংলগ্ন মন্তব্য। মনে করেছিলাম কালক্রমে এ সব অসার কথাবার্তা নিজেদের তুচ্ছতার জন্যই ম'রে গেছে। কিন্তু এতদিন পরেও এখানকার একজন শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তির মন্তব্য শুনে বিমূঢ় বোধ করছি। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতিকে স্ত্রীভাবাপন্ন এবং দুর্বল ক'রে দিয়ে গেছেন। এই ধারণার মূল কোথায় সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। বিধাতা রবীন্দ্রনাথকে যে রূপ দিয়েছিলেন তাতে নারীজনসুলভ কান্তি এবং লাবণ্যের প্রাচুর্য ছিল, তাঁর বাবরি চুল ছিল, তিনি সমস্ত জীবন ধ'রে কবিতা লিখে গেছেন এবং তিনি শরীরে ও মনে কাউকে আঘাত দিয়েছিলেন, এমন উদাহরণ নেই। সুতরাং তিনি বীর্যের প্রতিনিধি নন, এই ধারণা হয়ত কারও কারও মনে আছে। কিন্তু এটা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দূর থেকে একটা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। যাঁরা কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ শরীরে এবং মনে অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, বার মাস রাত্রি ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করতেন। শান্তিনিকেতনের দারুণ গরমে দুপুরেবেলা একটা কাঠের টেবিলে (অর্থাৎ বনাত দিয়ে মোড়া নয়) ব'সে নিবিষ্ট মনে লিখছেন—জানালার শার্সিগুলো সব খোলা রয়েছে এবং সেইখান দিয়ে পাহাড়ী রুক্ষ প্রান্তরের তপ্ত ঝড়ো হাওয়া এলোমেলো ভাবে ঘরে ঢুকছে—ওঁর সেদিকে লক্ষ্য মাত্র নেই। অথচ ওঁকে চাকরিও করতে হ'ত না কিংবা দুপুরে যদি একটু বিশ্রাম করেন তবে তার জন্য দোষ দেওয়ারও কিছু ছিল না। কিন্তু কর্মের নিরলস সাধনা ছিল রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের একটা প্রধান দিক্।

অনেকে নিরর্থক আস্ফালনকে বীরত্ব ব'লে মনে করেন—গরম গরম বুলি আওড়ানোকে ওজঃশক্তি ব'লে ভুল করেন। সেই তথাকথিত বীর্য অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল না। কিন্তু যে বীর্য মানে অকুতোভয়তা, যে বীর্য ত্যাগের পথ প্রশস্ত করে, সেই বীর্য রবীন্দ্রনাথেরই ছিল। তাঁর বাণীর থেকে এর হাজারো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা না ক'রে তাঁর কাজ দিয়েই এর প্রমাণ দেব। ১৯১৯ সনের কথা মনে করুন, যখন স্যর মাইকেল ও' ডায়ারের হুকুমে জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজারো নিরীহ, নিরস্ত্র ভারতবাসী জেনারেল ডায়ারের গুলীতে পশুর মত মরেছিল। স্বদেশবাসীর এই নিরুপায়তা, অসহায়ের এই তীব্র অপমান রবীন্দ্রনাথকে কাঁটার মত বিঁধেছিল। তিনি প্রতিবাদ করতে উন্মুখ, অথচ দেশে প্রতিবাদ করার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। মহাত্মাজী গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করতে রাজি হলেন না। বাংলা দেশে চিত্তরঞ্জন দাশ এর নেতৃত্ব করতে চাইলেন না। দেশ তখন ব্রিটিশের ভয়ে থরহরি কম্প। সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ ক'রে ৩০শে মে তারিখে ইতিহাস রচনা করলেন। সম্মান ত্যাগ করাটা তত বড় কথা নয় (যদিও সেটা সহজ নয়) যত বড় হ'ল এর মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদের যে আবেগ স্পন্দিত হ'ল তার উদাত্ত বীর্য। তিনি লিখলেন, "* * * The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions by the side of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. * * *"

নির্যাতীতের জন্য, নিপীড়িতের জন্য, দুঃস্থ ক্লিন্ন মানবের জন্য তাঁর এত বেদনা, এত কাতরতা বলেই তিনি কবি, তাই তিনি ঘোষণা করেছেন—

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক্ মনের
মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে
তুমি থেকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি।
এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি
কত ভালবেসেছিনু আমি।"

কেউ কেউ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলেই এমন মহামানব হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। সে ধারণা ভুল ব'লে আমার মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যেগুলি মহৎ গুণ সেগুলি তিনি নিজের চিন্তাধারার অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছিলেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁর মূল আশ্রয় ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য, সভ্যতা এবং সাধনা। বাল্যকাল থেকে নিজেদের বাড়ীর উপনিষদোক্ত আব-

হাওয়ায় এবং বিশ্বাসে তিনি মানুষ হয়েছিলেন ; মহর্ষি-দেবের সাধনা তিনি চাক্ষুষ করেছিলেন। তাঁর পক্ষে অন্য-রকম হওয়া সহজ ছিল না। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, তার নাম দিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। তাতে প্রবর্তিত করলেন ঋষিযুগের আশ্রমের রীতিনীতি—রাত্রি ৪টার সময় শয্যাত্যাগ, নিজেদের ঘর নিজেরা ঝাঁট দেওয়া, প্রাতঃস্নান, উপাসনা, ইত্যাদি। দু'বেলা সমবেত উপাসনার মন্ত্র বেছে দিলেন উপনিষদ্ থেকে। জুতা পায়ে দেওয়া এবং ( আমাদের সময়ে ) মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই রীতিনীতি কোনক্রমেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুগামী বলা যায় না।

তুলসীদাসের একটা কথা আছে যে,মানুষ যখন জন্মায় তখন সে কাঁদে, কিন্তু তার মা-বাবা-আত্মীয়স্বজন সকলে তখন হাসে। মানুষের জন্ম জীবন সার্থক করতে হলে এমন হওয়া চাই যে, সে যখন মরবে তখন সকলে যেন কাঁদে এবং সে নিজে যেন হাসতে হাসতে চ'লে যেতে পারে। এই কষ্টি-পাথরে বিচার ক'রে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের দেশে না জন্মাতেন এমন একটা অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারি নে। তিনি একই সময়ে সনাতন এবং পুনর্নব। আমাদের চিন্তাধারার এমন কোন পর্যায় বা অধ্যায় নেই যেখানে তাঁর প্রতিভার ছাপ আগে থেকেই পড়ে নি কিন্তু তাঁর প্রতিভার অবিস্মরণীয় দান হ'ল এই যে, তিনি মানুষের জীবনকে সুন্দরতর, মধুরতর এবং আলোকোজ্জ্বল করে দিয়ে গেছেন। তিনি না জন্মালে আমরা জানতাম যে, জীবনটা শুধু একটা কোলাহল—এখানে স্বার্থসিদ্ধি এবং আত্মতৃপ্তির ভোগই হ'ল একান্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীত দিয়ে, নৃত্য দিয়ে, সৌজন্য দিয়ে এবং সর্বোপরি ঈশ্বরাভিমুখীনতা দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেছেন যে, জীবনের মসীলিপ্ত খণ্ড যে রূপটুকু আমরা নিত্য দেখি তাই একমাত্র নয়। এখানে নৃত্য-গীত-কাব্য-মুখর একটি অখণ্ড সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করাও সম্ভব। এ শুধু কাব্য রচনা ক'রে নয়, যাঁরা তাঁর "চিত্রাঙ্গদা", "ফাল্গুনী", "নটীর পূজা", "বাল্মীকি-প্রতিভা", প্রভৃতি গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখেছেন তাঁরাই তার দুর্লভ রস আস্বাদন করেছেন। আমাদের সময় বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দু'দিন উপাসনা-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিতেন। তাঁর সেই প্রার্থনার ভাষণগুলি একত্র ক'রে শান্তিনিকেতন সিরিজ বই ছাপা হয়েছে। আমি যতদিন ছিলাম এই ভাষণ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতাম—চ'লে আসার সময় খাতাখানি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এসেছিলাম। এর কারণ প্রার্থনার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ যা বলতেন তা পরে তাঁর স্মরণ থাকত না। সপ্তাহের দু'দিন ছাড়া বর্ষশেষ, নববর্ষ, প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলিও ছিল। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের মাথায় একটা বড় ঘণ্টা টাঙ্গানো ছিল—রবীন্দ্রনাথ তার দড়ি ধ'রে নিজে বাজাতেন। তখন শুভ্র পাজামা এবং আলখেল্লা পরিহিত মুদিতচক্ষু রবীন্দ্রনাথকে যীশুখৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করা স্বাভাবিক ছিল।

শান্তিনিকেতন সিরিজে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্ছে, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা প্রতি মুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে —তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান। * * * ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।"

( সপ্তম ভাগ, পৃঃ ১-৫ )

রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিকেই আলঙ্কারিকেরা বলেছেন তাঁর Personality, অ্যারিস্টটলের ( Aristotle ) মতে মানুষের সর্বোত্তম বিকাশ হ'ল Truthful transmission of personality, সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সর্বোত্তম মানুষ।

উপনিষৎ বলেছেন,

"কোহো বা হ্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ,
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

এই আকাশ যদি আনন্দে পূর্ণ না হ'ত তবে মানুষ কোথায় থাকত, কি ক'রে বাঁচত? এই জগতের চলমানতার একমাত্র কারণ হ'ল আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে সেই আনন্দ ছেঁকে এনে মর্ত্যে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন।

# গদ্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘজীবনের কাব্যসাধনাতে ঋতু পরিবর্তন ও রীতি পরিবর্তন ঘটেছে বারেবারে। একই ভাবক্ষেত্র থেকে রস আহরণ ক'রে যেমন তিনি নিজেকে সতেজ রাখতে পারেন না, তেমনি তাঁর প্রকাশও যেন নানা সময়ে বিভিন্ন রূপের অভিসারে যাত্রা করে। কাব্য ও সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র শিল্পরূপের সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় এসে আমরা দেখি তাঁর ছন্দের পেয়ালাখানা গেছে ভেঙ্গে—রূপের বর্ণালীতে নেমে এসেছে যেন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া। গদ্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ রূপের জগৎ থেকে এক রূপাতীত সৌন্দর্যের জগতে যাত্রা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে এই নূতন রীতির প্রচলনকে অনেকটা পরীক্ষামূলক মনে করলেও তা হঠাৎ-পাওয়া কিছু নয়। এই গদ্যকাব্যের পূর্বাভাস রয়েছে এমন কি তাঁর গদ্যরচনাতেও। 'প্রাচীন সাহিত্য', 'শেষের কবিতা' গ্রন্থ এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'নিশীথে', প্রভৃতি ছোট গল্পেও গদ্যকাব্যের পূর্বাভাস কিছুটা পাওয়া যায়। তবে এই গদ্যরচনা যে একেবারে গদ্যকবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, একথা বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় 'লিপিকা'তে (প্রকাশকাল—১৯২২)। পদ্যের মত পংক্তিবিন্যাস ক'রে ছাপান না হলেও এর মধ্যে গদ্য-কবিতার ঝঙ্কার আছে। 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "ছাপাবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মত খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ" (ভূমিকা—পুনশ্চ)। 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী', প্রভৃতিতে যে গদ্যকবিতার প্রবর্তন হয় তার স্পষ্ট সূচনা 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু 'বলাকা' (১৯১৬) থেকেই কবি ছন্দের নিরূপিত প্রতি পংক্তির মাত্রাবন্ধনকে অস্বীকার ক'রে ছন্দকে অনেকখানি মুক্ত ও সাবলীল করেন। আর 'বলাকা'র ছন্দের পূর্বরূপ আমরা দেখতে পাই 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়। 'বলাকা'য় কবি অনেকদূর এগিয়ে এলেও এতে পদ্যের শব্দবিন্যাসগত রীতি ও অন্তঃমিলের বন্ধন একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি। এ সম্বন্ধে কবি বলেছেন, "চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডিভাঙ্গা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম. তার নাম 'নিষ্ফল কামনা'। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়া-ভাঙ্গা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য়, 'পলাতকা'য়। এতে ক'রে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এল বটে, তবু মেয়ে কম্পার্টমেণ্ট রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দোরীতির বাঁধন খুলল না" (গদ্যছন্দ—ছন্দ)। এই বন্ধনকেও অস্বীকার ক'রে ভাবের নিরঙ্কুশ প্রকাশে কাব্যরস সঞ্চার করা যায় কি না তারই পরীক্ষা চলেছে গদ্যকবিতার আঙ্গিকে। "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে ছন্দোমুক্তি সাধনার ফলেই গদ্য-কবিতার আবির্ভাব হয়েছে। মুক্তক ছন্দে যে সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল তারই পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে এই গদ্যকবিতায়" (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন)।

অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস যে রবীন্দ্রমানসে বহুদিন থেকে ছিল, একথা অবশ্য-স্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গীতাঞ্জলির ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ প্রকাশিত হলে ইংরেজী-শিক্ষিত সুধীমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এতে কাব্যে গদ্যরীতির যে সমর্থন তিনি বাইরের থেকে পেলেন তাতে আরো উৎসাহিত হলেন। তাঁর মনে হ'ল যে, ইংরেজী গদ্যে রূপ না দিয়ে গীতাঞ্জলির "পদ্যে অনুবাদ করলে হয়ত তা শিকৃত হ'ত, অশ্রদ্ধেয় হ'ত।" গদ্যকবিতা রচনার অনেক পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছন্দের বন্ধন খোলার চেষ্টা করেছেন। ব্রাত্য রবীন্দ্রনাথ কোনরূপ বন্ধনের গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন না। কাব্যে কবির ভাবকল্পনার স্বচ্ছন্দপ্রকাশ হতে হবে, এই ধারণা রবীন্দ্র-নাথের বরাবরই ছিল। তাই আমরা একেবারে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের সময় থেকেই ছন্দের বন্ধন খোলার চেষ্টা দেখতে পাই। 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতা এর প্রমাণ। এখানে পুরাণো ছন্দের বাঁধন অনেকটা খ'সে গেছে। তার পর মানসীর 'নিষ্ফল কামনা'তে একেবারে 'বলাকা'র পূর্বরূপ এসে গেল। 'বলাকা'-'পলাতকার' পর আরো অগ্রসর হয়ে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা কবির মনে এই প্রশ্ন ছিল; এবং লিপিকাতেই কবি এই পরীক্ষা করেন।

লিপিকাতে পদ্যের মত পদ ভেঙে সাজান না হলেও পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলীর গদ্যকবিতার রূপ এখানে ধরা পড়ে।

কাব্যে এই গদ্যরীতির প্রবর্তনের মূলে কবির প্রধান উদ্দেশ্য, গদ্যকবিতার মারফৎ কাব্যের অধিকারকে বিস্তৃত করা। এই নূতন রীতি অবলম্বনের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি" (ভূমিকা—পুনশ্চ)। তাই এসব কবিতায় রূপের চেয়ে ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে বস্তু বা বিষয়গৌরবের উপর কবি আপন বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা স্মরণীয় যে, ঠিক গদ্যকবিতা রচনার সমকালীন রূপরেখার বাহুল্যবর্জিত তার চিত্রশিল্প রচনা। এখানে যেন কবি এক রূপাতীত অন্তঃসৌন্দর্যের ধ্যানলোকে বিচরণ করেছেন। তাঁর অন্তর্নিহিত রূপাতীত সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় এই উভয় ক্ষেত্রেই। কবি আজ গদ্যকাব্যের বাহুল্যবর্জিত ভাষার দোসর খুঁজে পেয়েছেন কোপাই নদীর ছন্দে

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

অলঙ্করণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য আপনাকে সহজে প্রকাশ করতে পারে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকে নেওয়া জাবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন এই কাহিনীটি, "যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হ'ত তাহলে হাল্কা হয়ে যেত।" আসল কথা হ'ল কাব্য একান্তভাবে ছন্দের উপর নির্ভর করে না। আন্তরিক সার্থকতাতেই কাব্যের গৌরব। গদ্যকবিতা সসজ্জ নয় ব'লে এবং ছন্দের বাঁধন খ'সে যাওয়াতে একে কাব্যের জাতে তোলা হবে না, এমন কথা আজ আর কেউ বলতে পারে না। বরঞ্চ "আজ গদ্যকাব্যের উপর প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়" (কাব্য ও ছন্দ—সাহিত্যের স্বরূপ)।

রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক গদ্যকবিতা রচনা করেছেন যার বিষয়বস্তু এত সুন্দরভাবে অন্য কোনরূপে প্রকাশ করা যেত না। পদ্যকবিতায় সেই লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর 'ছেলেটা'র রূপটা বিলুপ্ত হয়ে যেত। আর বেঙের খাঁটি কথা, গুবরে পোকার কাহিনী ও সেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডির আভাসটুকুও পাওয়া যেত না। আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি, মরা বেড়ালের ছানা, 'ছাই-পাঁশ আরো কত কি', প্রভৃতি আটপৌরে পরিবেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ পরিচয় ছন্দোবদ্ধ কবিতায় এমন জীবন্তভাবে ফুটে উঠতে পারত না। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ জিনিষকেও কবি তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। আর সেইসঙ্গে রূপায়িত করেছেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনাকে। কবি এখানে সাধারণ মানুষের বিচরণক্ষেত্রে নেমে এসে তাদের বুকের কথা ও মুখের ভাষাকে কাব্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু কবির অন্তরের ইচ্ছা ও আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে নি ব'লে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সঙ্কীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

* * * *

আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, আমি জানি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

তাই কবি 'কৃষাণের জীবনের শরিক' অনাগতকালের সেই কবিকে আহ্বান জানিয়েছেন:

এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের;
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার;
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

কিন্তু কবির অন্তরের ইচ্ছা ও আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করেনি ব'লে এই নূতন রীতির কাব্যমূল্য কিছুমাত্র ক'মে যায় নি। কাব্য হিসাবে যে এটা সার্থকতা লাভ করেছে তাতেই এর চরমমূল্য। আর গদ্যকবিতার স্রষ্টা হিসাবে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ভাবীকালের লেখকদের জন্য যে পথ তৈরী ক'রে গেছেন সে পথে গমন ক'রে আধুনিক কবিগণের মধ্যে কেউ কেউ আরো বৈচিত্র্য সৃষ্টি ক'রে একে সার্থকতরো পরিণামের দিকে এগিয়ে

দিয়েছেন। তাঁদের মধ্য দিয়েও পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা একেবারে সাধারণ গদ্য রচনার মতও নয়, পদ্য ও নয়। এখানে যেন 'গদ্যেপদ্যে একটা রফানিষ্পত্তি চলছে।' হয়ত ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, "Poetry sheds no tears 'such as Angels weep', but natural and human tears; she can boast of no celestial Ichor that distinguishes her vital juices from those of prose; the same human blood circulates through the veins of them both." (Preface to Lyrical Ballads—Wordsworth.) সাধারণ গদ্যের মত গদ্যকবিতার বাক্য রচিত নয়। শব্দচয়ন, পর্ববিন্যাস ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তা সাধারণ প্রচলিত গদ্য হতে পৃথক্। আবার সুনিরূপিত ছন্দোবদ্ধ কবিতাও নয়। কিন্তু গদ্যকবিতাতেও একটা ছন্দের আভাস রয়েছে—একে একেবারে ছন্দোহীন বলা চলে না। সাধারণ গদ্য রচনায়ও ছন্দের আভাস মধ্যে মধ্যে ফুটে উঠে, অবশ্য সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকে না; কিন্তু গদ্যকবিতার সর্বাঙ্গই ওরকম ছন্দের আভাসে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতায় একদিক্ দিয়ে কাব্যরসকে যেমন ধ্বনিরূপের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, অন্যদিকে নেহাত গদ্যত্বের নীরসতা থেকে গদ্যকবিতাকে রক্ষা করেছেন এর অন্তরে একটা ছন্দ জাগিয়ে।

গদ্যকবিতায় ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যেমন কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হ'ল, তেমনি বিষয়বস্তুর মধ্যেও একটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া গদ্যকবিতায় আমাদের আরো একটা বড় প্রাপ্তি হ'ল, শিল্পরূপের বহু বিষয়ের মধ্যেও কবি এখানে একটা বিরাট্ সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন! যেমন:

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

আবার একই কবিতায় কাছাকাছি দেখতে পাই—

জীবপালিনী আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।

শিল্পরূপের দিক্ থেকে এখানে পরস্পরের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেও কোমলে-কঠিনে মিলে একটি একাত্মতার সঞ্চার হয়েছে। এখানে আমরা একটি harmonious art-এর স্বাদ পাই।
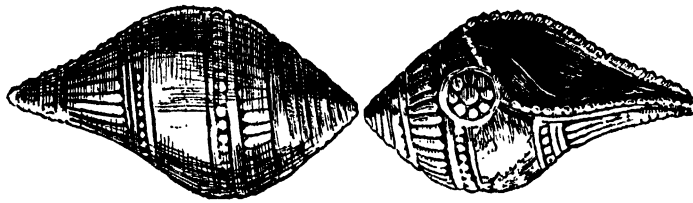
# প্রতীক্ষা

শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

বাড়ী ফিরে আর জবাব দিই নি ওঁদের।

কিই বা লিখবার ছিল। রতনবাবু যে কাহিনী বললেন তার পর আর কিছুই বলার ছিল না। যুথির বিয়ে ওখানে হবে না। বিয়ে দিলেও সুখী হতে পারবে না সে কোনদিন এটুকু বুঝেছিলাম বেশ।

কৈলাস দাদুই এ সম্বন্ধটা নিয়ে এসেছিলেন। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ দাদু এসে হাজির।

—তিনু, যুথির বিয়ের জন্য একটা পাত্তর ঠিক করেছি। তাঁরা দেখতে এসেছেন যুথিকে।

ভাবলাম ভালই হ'ল। দাদু আমাকে খুবই স্নেহ করেন! ওঁর দৌলতে যদি যুথির বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে কি ভালই যে হবে!

—তা হলে ওঁদের নিয়ে আসি ভেতরে? বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে হলাম ভারী বিব্রত। কি সর্বনাশ। আগে না জানিয়ে এই ভরা দুপুরে খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর ভদ্রলোকদের নিয়ে এলেন কিনা আমার বাড়ীতে। ভেবেছিলাম দাদুর বাড়ীতেই বোধ হয় উঠেছেন তাঁরা। খাওয়া দাওয়াও সেখানে হয়েছে। অমন তো কত লোকই দাদুর ওখানে এসে থাকেন।

—তাই নাকি? তাহলে ওঁদের এনে বসাই ঘরে! তাই ত কোথায় বসাব! বাইরের ঘরের তো ঐ অবস্থা! বাড়ীর মধ্যেই—

দাদু একগাল হেসে বললেন—আরে ভাববার কিছুই নেই! ও আমার খেঁদার দেওরের পিসতুতো শালার কি রকম আত্মীয় হয়!

দাদুর আত্মীয়তার সূত্র শোনার সময় ছিল না। বাইরে গিয়ে আপ্যায়িত ক'রে নিয়ে এলাম ভদ্রলোককে। একজনই এসেছেন।

বেঁটে খাটো ভদ্রলোক। বয়স চল্লিশ পঞ্চাশ বা তার কাছাকাছি কিছু একটা হবে। পুরুষসিংহের মত এক জোড়া গোঁফ—চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। পোষাক পরিচ্ছদে বেশ সৌখীন ব'লেই মনে হ'ল।

ভদ্রলোককে এনে বসালাম আমার হাতল ভাঙা আর ছারপোকার বাসা ঠাকুর্দ্দার আমলের চেয়ারটায়। তাড়াতাড়িতে ছেঁড়া জামা কাপড়, ময়লা তেলচিটে বিছানাটা সরাবার অবকাশ পাই নি। গৃহিণী তাড়াতাড়িতে কোন রকমে একটা চাদর দিয়ে লজ্জা রক্ষার চেষ্টা করছিলেন বোধ'হয় কিন্তু সুযোগ পান নি।

জলযোগের সময়ই ভদ্রলোকের উন্নাসিকতা চোখে পড়ল। চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন আমার ভাঙা ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র। দোকানে মিষ্টি যা পেয়েছিলাম তা অখাদ্য না হলেও ভদ্রলোক নাকমুখ সিটকিয়ে একটি অতি কষ্টে গলাধঃকরণ ক'রে, ফেলে রাখলেন বাকী-গুলোকে।

দুপুর বেলা। হাতে নেই টাকা পয়সা। কি যে করি। তাড়াতাড়ি হবে মনে ক'রে খিচুড়ি আলুভাজা ইত্যাদি ব্যবস্থা করলাম। অন্য কিছুতে অনেক দেরী হবার সম্ভাবনা এটা সবিনয়ে নিবেদন করলাম।

বিশুবাবু বিরক্তিতে নাক মুখ কুঁচকে বললেন—খিচুড়ি? এ খাওয়া যায় না!

—আজ্ঞে! কিছুই এ সময়ে জোগাড় করা সম্ভব হ'ল না! অত্যন্ত লজ্জিত! আপনার সম্মান রাখতে না পারার ত্রুটি—

ভদ্রলোক মুখের ওপরই চট ক'রে ব'লে বসলেন—আমি হলে এ করতাম না।

সত্যিই মরমে ম'রে গেলাম। অপমানে আর লজ্জায় চোখমুখ যে লাল হয়ে উঠেছে বুঝতে পারছিলাম। শরীর গরম হয়ে উঠেছে। চুপ ক'রেই রইলাম। ভগ্নাদায়।

সারাক্ষণের মধ্যে একবার শুধু মনে হ'ল, ভদ্রলোক প্রসন্নদৃষ্টি মেলে ধরলেন। যুথিকে দেখে খুশী হয়েছেন মনে হ'ল। লাল চোখদুটো দিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে দেখলেন ওকে। যে রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলেন বিশুবাবু, মনে হ'ল শুধু বাইরেটাই নয়, যুথির অস্থি মেদ মজ্জার মধ্যে তার বড় বড় চোখের অনুসন্ধানী আলো দিয়ে যেন যাচাই ক'রে নিলেন এটুকু সময়ের মধ্যে।

বিশুবাবু যাবার সময় আরও দু একবার খিচুড়ির খোঁটা দিয়ে বিদায় নিলেন। যাবার সময় বার বার ব'লে গেলেন আমাকে পাত্র দেখতে যাবার জন্য।

ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তায় তাঁর ওখানে যাবার উৎসাহ

পাই নি একটুও। তবু তাঁর পক্ষ থেকে বার বার অনুরোধ ও পত্রাঘাতের ঠেলায় আর দাদুর কথা এড়াতে না পেরে দাদুকে সঙ্গে নিয়েই পাত্র দেখতে রওনা হলাম একদিন।

যাওয়া মাত্র ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করলেন সাদরে। অভ্যর্থনা করলেন বাড়ী নিয়ে গিয়ে নয়। বাইরে।

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি। বসতে চাই একটু। সঙ্গে দাদামশাই। ভেবেছিলাম ব'সে আলাপ পরিচয়ের পালা সাঙ্গ ক'রে ঘুরে দেখব এদিক্ ওদিক্।

উপায় নেই। ভদ্রলোক বাড়ীতে না নিয়ে বাড়ীর চার পাশে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন তাঁর সম্পদ্। বাড়ীর পাশেই বড় পুকুর, খামার বাড়ীতে বিরাট বিরাট ধানের মড়াই। পুকুর পাড় থেকে দোতলা প্রকাণ্ড চকমিলানো বাড়ীটাকে দেখায় যেন ছবির মত। সত্যি দেখবার মত বাড়ী।

—এই দেখুন আমাদের পুকুর! আধ মণ পর্যন্ত মাছ আছে!

—তাই নাকি?

—ঐ যে দেখছেন বড় মাঠটা! ওর সব জমিই আমাদের···

—বাঃ! চমৎকার!

—এই দেখুন খড়ের পালা!

সত্যিই চেয়ে থাকতে হয়! লম্বা আর উঁচু বড় বড় খড়ের পালা তিন চারটি। খামার বাড়ীটা অনেকটা জায়গা নিয়ে। ধান পিটানো হয় নি তখনও। ধান সমেত খড়ের পালা। সোনালি ধানের শীষ ঝুলছে পালা থেকে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেন উথলে পড়ছে লক্ষ্মীশ্রী।

সূর্য ডোবে ডোবে। পাখীরা সব ফিরছে আপন আপন বাসায়। চারদিকে নীড়ে ফেরার সূচনা।

আমাদেরও মনটা ছটফট করছিল আশ্রয়ের জন্য।

—চলুন এবার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি! ভদ্রলোকের জিদ চেপেছে আমাদের মত দরিদ্রদের তাঁর ঐশ্বর্য দেখাবার। মনে পড়ল, আমার বাড়ী ঘরের অবস্থা আর খিচুড়ি খাওয়ার দুর্ভোগ এখনও ভুলতে পারেন নি ভদ্রলোক। সেদিন আমার সামর্থ্য আর আপ্যায়নকে যে ভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে এসেছিলেন তা যে তিনি করতে পারেন এ প্রমাণ দিতে চান তিনি ভাল ভাবেই।

বেশ কয়েক মাইল হেঁটে এসেছি। সঙ্গে বুড়ো দাদু। সারা মাঠ ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে ভেবে প্রমাদ গুণলাম। ভদ্রলোক কিন্তু আমাদের কথা ভাববার সময় পাচ্ছেন না। ফিরিস্তি দিয়ে চলেছেন তাঁর ঐশ্বর্যের।

—আমি কিছু বলবার আগেই দাদু মুখ খুললেন।

—আর ঘুরতে হবে না বাবাজী! বুড়ো মানুষকে মেরে ফেলবে নাকি?

এবারে বুঝি সম্বিৎ ফিরে পেলেন বিশুবাবু। ক্ষান্ত হলেন মাঠ দেখানো থেকে। বললেন—তবে দাঁড়ান! আসছি!

দু মিনিটের মধ্যেই বিশুবাবু ফিরে এলেন একখানা মাছ ধরা জাল নিয়ে। তার পর আমাদের পুকুরের পাড়ে দাঁড় করিয়ে নিজেই জাল ফেলে মাছ ধরলেন। বেশ কয়েকটা বড় মাছ।

খুশীই হলাম মনে মনে। যাক, আহারাদিটা ভালই হবে।

বিশুবাবু একটা বড় মাছ আমার মুখের কাছে তুলে ধ'রে বললেন—দেখেছেন?

দেখব কি! মাছের আঁশটে গন্ধ ছাড়িয়ে এবারে যে গন্ধটা এতক্ষণ অল্প অল্প পাচ্ছিলাম সেটা তীব্র হ'ল। ভদ্রলোক মাছ দেখাতে এসে তাঁর মুখটা আমার মুখের কাছে এনেছিলেন।

চাকরবাকরদের হাতে সব মাছ তুলে দিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দাদামশাইকে বললাম—দাদামশাই গন্ধ পাচ্ছেন একটা?

—আরে মাতাল! বুঝছি না মদ খেয়েছে?

আমি বুঝেছি অনেক আগেই। দেখতে এসেছি পাত্র। তাকে না দেখিয়ে, আমাদের বসবার বা জল খাবার এখন কি এক কাপ চা খাবার সুযোগ না দিয়ে যে ভদ্রলোক বিদেশী অতিথিকে মাঠে মাঠে ঘুরিয়ে ঐশ্বর্য দেখিয়ে বেড়ান, তিনি যে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই সেটা বুঝতে সময় লাগে নি।

বিশুবাবুর বাবাই বাড়ীর কর্ত্তা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছেলেকে জানেন ভালভাবেই। দেরী দেখে বেরিয়ে এলেন বাড়ী থেকে। আদর ক'রে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

—বাবা! ওদের একটু মাঠটা ঘুরিয়ে আনতাম—এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝা গেল ভদ্রলোকের কথায় জড়তা, চোখ দুটো ক্রমেই ঘোর লাল হয়ে উঠছে।

বৃদ্ধ তীব্র আপত্তি জানালেন—না না, ওঁদের জলখাবারের ব্যবস্থা করেছি, বিশ্রাম করতে দাও এখন।

বৃদ্ধ ভুজঙ্গবাবুর দৌলতে আমরা গিয়ে উঠলাম ওঁদের দোতলায়। বিরাট বারান্দা। সেখানেই বসার ব্যবস্থা

হ'ল আমাদের। ঝক্ ঝক্ করছে মেঝে। তার ওপর পেতে দেওয়া ফরাস।

জল খেতে খেতেও কিসের একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম। কর্ত্তা আলবোলার নলটা মুখে লাগিয়ে কথা বলছিলেন আমাদের সঙ্গে। বিশুবাবু এসে বসলেন একেবারে আমার মুখের কাছে।

ভদ্রলোক এলেন। এসেই বসলেন আমাদের পাশে। তাঁকে অনুরোধ করলাম সামনে এসে বসতে। যাঁর হাতে বোন দেব তাঁকে যাচাই করতে হবে সামনা-সামনি। মুখোমুখি হওয়া চাই।

বয়স আটাশ ত্রিশ, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, একটু উদাস ভাব। টিউশনি করেন আর স্থানীয় একজন ধনী মহাজনকে গীতা পড়িয়ে শুনিয়েও কিছু উপায় করেন। বাড়ী বিশুবাবুদের পাশাপাশি, কি রকম আত্মীয় হন বিশু-বাবুর। ধানের জমিও আছে কিছু। মোটামুটি চ'লে যায়।

আমাদের সুমুখে তিনি ব'সে। এতটুকু কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নেই। চেয়ে আছেন শূন্যে, হাতে গীতা।

অল্প বয়স। এই বয়সেই গীতা হাতে কেন? ধর্মভাব জাগা ত এ বয়সে স্বাভাবিক নয়? কেমন সন্দেহ হ'ল যেন। আমিই সুরু করলাম কথা বলতে।

—আপনি ত বিবাহিত? প্রশ্ন ক'রেই একবার তাঁর মুখের দিকে আর একবার তাঁর হাতের গীতার দিকে চেয়ে রইলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

হঠাৎ আমার বেখাপ্পা প্রশ্নে ঘরের সমস্ত লোক চমকে উঠেছে বুঝতে পারলাম। বিশুবাবুর নেশা ছুটে যাবার উপক্রম। ভুজঙ্গবাবুর মুখের নলটা প'ড়ে গেল কোলের ওপরে। দাদামশায় ছটফট ক'রে উঠলেন। ভদ্রলোক থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলে আমতা আমতা ক'রে জবাব দিলেন, হাঁ! এবারে তাঁর দৃষ্টি উদাস নয়, মাথাটা ঝুলে পড়েছে, চেয়ে আছেন মেঝের দিকে।

বিশুবাবু ছোট্ট ক'রে একটু কাশলেন। তার পর ছেলেটার দিকে আর একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ-লেন—বড় বড় চোখ দুটি যেন আরও বড় হয়ে উঠল। বললেন—তা ঠিকই। সে কথা আমিও বলেছিলাম যে বিয়ে হয়েছে—তবে—

—আপনি যদি দয়া ক'রে আমায় দু'টি কথা বলতে দেন ওঁর সঙ্গে—

বিশুবাবু নিশ্চল হয়ে ব'সে রইলেন বলির পাঁঠার মত।

—আপনার স্ত্রী মারা গেছেন কত দিন হ'ল? কি হয়েছিল?

আবার তাঁর হাতের গীতার দিকে চেয়ে রইলাম। গীতা যখন তিনি মানেন তখন গীতা হাতে মিথ্যা বলতে পারবেন না নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন ক'রেই আড়চোখে চেয়ে দেখছিলাম বিশুবাবুর দিকে। তিনি ইসারা করছেন ভদ্রলোককে উঠে যেতে।

একটু ইতঃস্তত: ক'রে ভদ্রলোক গীতাটা বিশুবাবুর হাতে দিয়ে 'আসছি এখনই' ব'লে চ'লে গেলেন।

ভদ্রলোকের নাম রতন রায়। রতনবাবুর যাওয়ার পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। বিশুবাবু অন্য কোন প্রসঙ্গ তুলতে পারলেন না, এমনই ঘরের আবহাওয়া গিয়েছিল পাল্টে। সারা ঘরটায় একটা থমথমে ভাব। বৃদ্ধ ভুজঙ্গবাবু চোখ বুঁজে গড়গড়ার নল টেনে চলেছেন। আমরা অপেক্ষা করছি রতনবাবু ফিরে আসবেন ব'লে।

যে দরজা দিয়ে তিনি বাইরে গিয়েছেন সেই দিকে মধ্যে মধ্যে দেখছি যদি আসেন। এমন সময় দেখলাম তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বিশুবাবু এবং ভুজঙ্গবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে আমাকে ইসারায় ডাকছেন।

বিস্মিত হলাম। এঁরা আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী। এঁদের বাদ দিয়ে আমাকে কি কথা বলতে চান। কৌতূহলও হ'ল। উঠলাম।

—আচ্ছা আসি একটু! দাদু আপনিও চলুন।

বাইরে এলাম।

—যদি দয়া ক'রে আমার সঙ্গে একটু আসেন।

কথা না ব'লে রতনবাবুর সঙ্গে চললাম। গ্রাম দু'জনে নামলাম মাঠে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চাষীরা মাঠ থেকে ফিরছে কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে। রাখাল ছেলেরা গরুর পাল নিয়ে ক্লান্তদেহে বাড়ীর দিকে চলেছে।

কারও মুখে কথা নেই। দু'জনে চলছি পাশাপাশি। এতক্ষণে একটু যেন ভয় পেলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। মাঠ জনশূন্য। যেদিকে চাই সেদিকে শুধু ধু ধু করা মাঠ। এখন আর একজন মানুষকেও দেখা যায় না কোথাও। পিছন ফিরে চাইলাম। হাঁটতে হাঁটতে গ্রামকে দূরে ফেলে এসেছি।

আকাশের দিকে চাইলাম, পাখীরা ফিরছে আপন আপন বাসায়। কাকের দল ঝগড়া করতে করতে ফিরছে আস্তানায়। অনেক উপরে বকের দল ক্লান্ত-পাখা মেলে চলেছে উড়ে।

ভয় হ'ল একটু। কি মতলব রতনবাবুর। কথা বলেন না কিছু। সবটাই যেন রহস্যময়। এই রহস্যের কিছুটা ধ'রে ফেলেছি ব'লে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ডেকে আনেন নি তো!

আড়চোখে দেখছিলাম ওঁকে। কই সেরকম মতলব তো মনে হয় না। হলেই বা কি করবেন। শক্তিতে পারবেন না আমাকে। তবে তাঁর নিজের দেশ।

—চলুন ঐ ব্রিজের ওপর গিয়ে বসি।

কাছেই দেখলাম একটা ব্রিজ। নীচেয় ছোট্ট নদীর মত একটা নালা মাঠটার বুক চিরে চলে গিয়েছে। নদীটা পার হবার জন্যই বুঝি মাঠের মাঝখানে এই ব্রিজ।

দু'জনে বসলাম ব্রিজের ওপর। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ। চারিদিক নিঝুম। কেবল ঝিঁঝিঁ পোকাদের একটানা শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। অনেক দূরে কোন রাখাল বুঝি তার বাড়ী-না-ফেরা গরুর নাম ধরে ডাকছে। তার চীৎকারের শব্দ ফাঁকা মাঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে চারদিকে।

রতনবাবু হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন—বলুন কাউকে বলবেন না? আপনাকে সব কথা বলব বলে ডেকে এনেছি।

বললাম—আপনার ব্যক্তিগত কথা শুনতে চাই না রতনবাবু! আমার বোনকে আপনার হাতে দিতে চাই। সে সম্পর্কে যেটুকু জানার জানতে চাই ততটুকু।

—সে সম্পর্কেই বলব, কিন্তু আপনি ওঁদের কাউকে বলবেন না? আপনাকে সব কথা খুলে বলব বলেই ডেকে এনেছি এই নির্জনে!

ভদ্রলোকের সব কথা খুলে বলার আগ্রহ ও আন্তরিকতা এমনভাবে তাঁর কথায় প্রকাশ পেল আর সেই সঙ্গে আমার কৌতূহলকে উনি এমন ভাবে বাড়িয়ে দিলেন যে আমারও আগ্রহ বাড়ল। বললাম—বলুন?

বিয়ে করেছিলাম বছর দুই আগে। অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন আমার স্ত্রী। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা। বিয়ের পর বেশ সুখেই ঘর করছিলাম আমরা। এত সুখ যে আমার মত লোকের ভাগ্যে জুটবে তা ভাবি নি কোনদিন। ছেলেবেলায় মা বাবাকে হারিয়েছিলাম। দুঃখে দুঃখেই কেটেছে। বিশুবাবু আমার সম্পর্কে কাকা হন। ওঁদের সাহায্য পাই সামান্যই। তবু নিজের চেষ্টায় আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপর অর্থাভাবে আর পড়তে পারি নি। অনেক কষ্ট পেয়েছি জীবনে, বিয়ে করে ভুলেছিলাম সে কষ্ট। বেশ ছিলাম···

রতনবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। এক মিনিট রইলেন বসে দূরে মাঠের দিকে চেয়ে। তারপর সুরু করলেন আবার।

স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতাম। কি ভালই যে বাসতাম তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। স্ত্রী বাপের বাড়ী যেতে চাইলেও পাঠাতাম না। তাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না। যদিও বুঝতাম পাঠান উচিৎ, তবু পাঠাতাম না। ওঁর এক কাকা আসতেন মাঝে মাঝে। আর কেউ আসতেন না শ্বশুরবাড়ী থেকে।

ভদ্রলোক আবার চুপ করে রইলেন একটু। তারপর সুরু করলেন। এবারে একটু চমকে উঠলাম ওঁর কথায়। যেন মনে হ'ল অন্য কেউ কথা বলছে। এত আস্তে আর চাপা সুরে মনে হ'ল কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে রতনবাবুর।

এক রাত্রে আমার স্ত্রী ওঁর ঐ কাকার সঙ্গে চলে গেলেন!

চারদিক নিস্তব্ধ। পাখীরা ফিরে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ওঁর চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন মাঠের মধ্যে হাহাকার করে ফিরছে। কথা বন্ধ হয়ে এসেছে। একটু নড়ে বসলাম আমি। মনটা বিষাদে আর ওঁর প্রতি সহানুভূতিতে ভরে গেল।

তার প্রেমে এতই বিভোর ছিলাম যে, কাকার এই ঘন ঘন যাওয়া-আসার মধ্যে অন্য কিছু দেখার চেষ্টা করি নি। যখন চলে গেল বেরিয়ে, বুঝলাম।

আবার কথা বন্ধ করে বসে রইলেন ভদ্রলোক। গলাটা ধরে এসেছে বুঝতে পারছিলাম।

জানেন অনেকদিন ধরে তার অপেক্ষা করে ছিলাম। ভেবেছিলাম ফিরে আসবে একদিন, কিন্তু আর এল না। লক্ষ্মী আর ফিরে আসবে না! আর কোনদিনই সে আসবে না!

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন ভদ্রলোক ছেলেমানুষের মত।

কি বলে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভুলে গিয়েছি এর সঙ্গেই বোনের বিয়ে দেবার জন্যে এসেছি কথাবার্তা বলতে। মনে ছিল না নিজের স্বার্থের কথা। ওর চোখের জলে নিজের কথা ভুলে গিয়েছি কোন সময়। বন্ধু হিসাবে একজন ব্যথাতুরকে কি বলে সান্ত্বনা দেব ভাবছি শুধু তাই। আর ভাবছি রতনবাবু তার স্ত্রীকে কি ভালই না বাসতেন! ভদ্রলোক এখনও ভুলতে পারেন নি স্ত্রীকে।

দুজনেই চুপ করে বসে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রতনবাবু বললেন—সে আর আসবে না, না?

জবাব দিতে পারি নি। জবাব দেবার ছিল না কিছু। আসতে আসতে বলেছিলেন—এ সব শুনেও কি আপনার বোনকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন?

আসার সময় বিশুবাবুকে বলে এসেছিলাম পত্র দেব। পত্র আর দিই নি। পত্র দিলে কি লিখতাম?

# ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

### অক্ষয় মূর্ত্তি

একদা একটি ইঁদুর প্রদীপের একটি জ্বলন্ত সলতা নিয়া চন্দ্রাতপের উপর নিক্ষেপ করে ; ফলে রেশমের চন্দ্রাতপ জ্বলিয়া উঠে এবং বিহারে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। ইহার ফলে সপ্ততল-বিহারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া যায়। রাজা, রাজকর্ম্মচারী এবং জনসাধারণ সকলেই এই ঘটনায় মর্ম্মাহত হন। তাঁহাদের মনে হইল—চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তিটি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ৪।৫ দিন পরে যখন পূর্ব্বদিকের একটি ক্ষুদ্র বিহারের দ্বার উন্মোচন করা হয়, তখন তাহার মধ্যে চন্দনকাষ্ঠের আসল মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়২৩। সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বিহারের পুনর্নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করিলেন। দ্বিতল পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হওয়ার পরই তাঁহারা মূর্ত্তিটিকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েন ও তাও-চিং জেতবনে প্রবেশ করিয়া যখন ভাবিতে লাগিলেন "এখানেই ভগবান্ তথাগত সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর বাস করিয়াছিলেন", তখন তাঁহাদের অন্তরে দুঃখের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সীমান্তবর্ত্তী (চীন) দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা সমভাবাপন্ন বন্ধুগণের সহিত এতগুলি রাজ্য ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কিছু-সংখ্যক বন্ধু স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে মানবজীবনের নশ্বরতার পরিচয় দিয়াছেন ; আর আজ তাঁহারা দেখিলেন সেই স্থান, যেখানে বুদ্ধ বাস করিতেন, অথচ আজ আর তিনি নাই।

ব্যথিতচিত্তে যখন তাঁহারা এই সকল কথা ভাবিতেছিলেন ; তখন দলে দলে ভিক্ষুরা আসিয়া জানিতে চাহিলেন—কোন্ দেশ হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন, "আমরা হান (চীন) দেশ হইতে আসিয়াছি২৪।" ভিক্ষুরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য ! সীমান্তবর্ত্তী দেশের লোকেরা আমাদের ধর্ম্ম জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছে।" অতঃপর তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "আমরা বা আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা কেহই হানদেশের লোকদিগকে ধর্ম্ম জানিবার জন্য এখানে আসিতে কদাপি দেখি নাই।"

### অন্ধের নেত্র লাভ

### যষ্টির গল্প

এই বিহার হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে চারি লি দূরে "নেত্রলাভ" নামে একটি উদ্যান আছে। প্রাচীনকালে বিহারপার্শ্বে বাস করিবার উদ্দেশ্যে ৫০০ জন অন্ধ লোক এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বুদ্ধ তাহাদের সম্মুখে নিজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার ফলে তাহারা সকলেই পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল২৫। আনন্দের আতিশয্যে তাহারা নিজেদের যষ্টিগুলি ভূমিতে রাখিয়া মাটিতে মস্তক ঠেকাইয়া বুদ্ধকে প্রণাম করে। যষ্টিগুলি তখনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমে বিশালতা প্রাপ্ত হয়২৬। কেহই এইগুলিকে কাটিতে সাহস করে না।

---

২৩। অগ্নিকাণ্ডের ফলে সপ্ততল বিহারের অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তিটিও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ নরপতি অন্যান্য ধার্ম্মিক বৌদ্ধদের সহায়তায় ৪,৫ দিনের মধ্যেই উৎকৃষ্ট শিল্পীকে দিয়া অনুরূপ আর একটি চন্দনকাষ্ঠের মূর্ত্তি গোপনে প্রস্তুত করাইয়া উল্লিখিত ক্ষুদ্র বিহারটির ভিতরে অন্যের অগোচরে স্থাপন করেন। পরে এই নবনির্ম্মিত মূর্ত্তিটিকেই আসল মূর্ত্তি বলিয়া প্রচারকরতঃ নূতন বিহার নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে ইহাকে স্থাপন করা হয়

২৪। চৈনিক পর্য্যটক এবং ভারতীয় শ্রমণদের মধ্যে নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায় আলাপ হইয়াছিল। ফা-হিয়েন যেখানেই গিয়াছেন, সেখানকার শ্রমণদের সহিতই আলাপ-আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; ইহা হইতেই বুঝা যায় সেই সময়ে সংস্কৃত একটি আন্তর্জাতিক ভাষা ছিল এবং সকল দেশের ( অন্ততঃ প্রাচ্যের ) উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই এই ভাষা অল্পবিস্তর জানিতেন।

২৫। এই ৫০০ জন লোক ধর্ম্মবিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিল বলিয়াই তাহাদিগকে অন্ধ বলা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে যে অজ্ঞতাকে অন্ধতা-রূপে বর্ণনা করা হইত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে তাহার বহু প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।  
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই শ্লোকটি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বুদ্ধের মুখে ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ শুনিয়া ঐ সকল লোকের অজ্ঞতা দূরীভূত হয়, এবং তখন তাহারা জ্ঞানরূপ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। এই ঘটনাটিকেই রূপকের আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

২৬। সম্ভবতঃ উল্লিখিত ৫০০ জন অন্ধ লোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিহারে চলিয়া আসিয়াছিলেন। বিহারে আসিবার সময় তাঁহারা পূর্ব্বাশ্রমের অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত যষ্টিগুলিও ফেলিয়া দেন। ঐ সকল

ফলে একটি বিশাল উদ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। উদ্যানটির উল্লিখিত নাম হওয়ার ইহাই কারণ। জেতবন-বিহারের ভিক্ষুরা মধ্যাহ্নভোজনের পর এই উদ্যানে গিয়া ধ্যানমগ্ন হন।

জেতবন হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে ৬।৭ লি দূরে মাতা বিশাখা২৭ অন্য একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই বিহারে তিনি বুদ্ধদেব ও তাঁহার দলের সন্ন্যাসী-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। এই বিহারটি এখনও বিদ্যমান আছে।

সুদত্ত

জেতবন-বিহারে ভিক্ষুদের জন্য যে সকল বিখ্যাত ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে এক একটি করিয়া ফটক ছিল। বিহারের চারিপার্শ্বে যে উন্মুক্ত মাঠ আছে, বৈশ্যপ্রধান সুদত্ত উহাকে স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা আবৃতকরতঃ ক্রয় করিয়াছিলেন। বিহারটি ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বুদ্ধ অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা অধিক দিন এখানে বাস করিয়া নিজধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এখানকার যে যে অংশের উপর দিয়া তিনি ভ্রমণ করিতেন এবং যে যে অংশে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাদের সর্ব্বত্রই পরবর্ত্তী কালে স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; এবং প্রত্যেকটি স্তূপের এক একটি বিশেষ নাম আছে। এই স্থানেই সুন্দরী একজন লোককে হত্যা করিয়া বুদ্ধের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিল২৮।

যষ্টি সম্ভবতঃ এমন সব বৃক্ষের কাঁচা ডাল দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল যাহার ফলে পরিত্যক্ত যষ্টিগুলির বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি হইতে নূতন চারাগাছ গজাইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা এই সকল গাছকে পবিত্র মনে করিত এবং নিজেরা ত এইগুলি ছেদন করিতই না, অন্য কাহাকেও ছেদন করিতে দিত না।

২৭। সন্ন্যাসিনী বিশাখা সদাশয় দানবীর অনাথপিণ্ডকের পত্নী ছিলেন। শ্রাবস্তীনগরীর ধনকুবের সুদত্ত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর অনাথপিণ্ডক নামে পরিচিত হইতে থাকেন। সম্ভবতঃ অনাথ বা নিরাশ্রয় লোকদিগকে পিণ্ড অর্থাৎ অন্নদান করিতেন বলিয়াই তিনি এই নামটি পাইয়াছিলেন।

২৮। এই ঘটনাটি সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। Julien বলেন - একজন দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ (হিন্দু) একটি বেশ্যাকে বধ করিয়া বুদ্ধের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। Samuel Beal বলেন—এই হত্যাকাণ্ডটি কয়েকজন ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। Beal-এর মতে যে বেশ্যাটি নিহত হইয়াছিল তাহারই নাম সুন্দরী। বস্তুতঃ গ্রন্থের পাঠ দেখিয়া মনে হয় একজন সুন্দরী (beautiful) বেশ্যা কোন পুরুষকে হত্যা করিয়া নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধের উপর হত্যার অপরাধ চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

জেতবনের পূর্ব্বদিকে ফটকের বাহিরে উত্তরপ্রান্তে ৭০ পদ দূরে রাস্তার পশ্চিমদিকে বসিয়া বুদ্ধ ৯৬টি ভ্রান্ত মত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। রাজা, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা এবং বহু গৃহস্থ ও অন্যান্য লোক উক্ত আলোচনা শুনিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। এই সময়ে চঞ্চমনা নাম্নী একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত নারী হীন প্রবৃত্তিবশতঃ নিজের পেটে কাপড় বাঁধিয়া আসিয়া বলে যে, বুদ্ধদেব তাহাতে অপগর্ভ উৎপাদন করিয়াছেন। দেবরাজ শক্র এবং অন্যান্য দেবতারা শ্বেত মূষিকের রূপ ধারণ করিয়া তাহার কোমরের রশিগুলি কাটিয়া দেন, এবং ফলে তাহার পেটে জড়ানো কাপড়গুলি নীচে পড়িয়া যায়। এই সময়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং উক্ত নারী জীবন্ত অবস্থায়ই নরকে পতিত হয়২৯। এই স্থানেই দেবদত্ত বিষাক্ত নখরের দ্বারা বুদ্ধকে আহত করিতে চেষ্টা করেন এবং জীবন্ত অবস্থায় নরকে নিক্ষিপ্ত হন৩০। এই উভয় স্থানই জনগণ-কর্ত্তৃক পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

বিহার ও দেবালয়

যে স্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন, তথায় ৬০ হাতেরও অধিক উচ্চ একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বুদ্ধের একটি মূর্ত্তি উপবিষ্ট অবস্থায় স্থাপন করা হইয়াছে। রাস্তার পূর্ব্বদিকে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী-দের একটি দেবালয় আছে; উহা 'ছায়াবৃত' নামে পরিচিত বিহার ও দেবালয় মাত্র ঐ রাস্তাটি দ্বারাই ব্যবহিত। এই দেবালয়টিও ৬০ হাতের অধিক উচ্চ।

২৯। এই গল্পটি নেহাৎ রূপকের আকারে লেখা। প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত নারীর অভিযোগ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে একটি বালককে উহার পেটের কাপড় ধরিয়া টানিবার জন্য বলা হয়। বালকটি ঐরূপ করিলে পেটের বাঁধা কাপড় খসিয়া পড়ে এবং নারীর ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া যায়। বালকের পরিধানে সম্ভবতঃ শ্বেতবর্ণ পোষাক ছিল; এই কারণে তাহাকে শ্বেত-মূষিকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। দেবরাজ শক্র যেমন নিরপরাধকে রক্ষা করেন, উক্ত বালকের কার্য্যের ফলেও তেমনি নিরপরাধ বুদ্ধ অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; এই কারণেই সম্ভবতঃ বালকটিকে ছদ্মরূপী দেবরাজ শক্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩০। এই দেবদত্ত আনন্দের ভ্রাতা এবং শাক্যমুনির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। কথিত আছে যে, দেবদত্ত এইভাবে বুদ্ধের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিলে সহসা তাঁহার চারিদিকে প্রচণ্ড অগ্নির সৃষ্টি হয় এবং তিনি আত্মরক্ষার জন্য চীৎকার করিয়া বুদ্ধকেই ডাকিতে থাকেন (James Legge, The Travels of Fa-Hien, Page 60 foot note 3)। সম্ভবতঃ বুদ্ধের অনুচরেরা পূর্ব্বেই টের পাওয়ায় দেবদত্তের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তিনি এই অপরাধের জন্য কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ঘটনাটিকেই অতিরঞ্জিত আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইহার 'ছায়াবৃত' নাম হওয়ার কারণ এই যে, সূর্য্যের পশ্চিমাকাশে অবস্থানকালে উক্ত বিহারের ছায়া এই দেবালয়ে পড়িত; কিন্তু সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে অবস্থান করিবার সময় দেবালয়ের ছায়া উত্তরদিকে পতিত হইত; বিহারের উপর পড়িত না৩১।

### প্রদীপ অপসারণ

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা এই দেবালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, বিধৌতি, ধূপদীপ ও পূজোপহার প্রদান প্রভৃতির জন্য কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিল। একদা প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, দেবালয়ের সমুদয় প্রদীপ বুদ্ধমন্দিরে অপসারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ঐ সকল শ্রমণেরা আমাদের দীপগুলি লইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা পূজা বন্ধ করিব না।" সেই রাত্রিতে ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই পাহারায় রহিল; কিন্তু তাহারা দেখিল যে, তাহাদের উপাসিত দেবগণ নিজেরাই ঐ সকল প্রদীপ বুদ্ধমন্দিরে লইয়া গিয়া বুদ্ধের আরতি করিতেছেন৩২। এইরূপ করার পর দেবতারা সহসা অদৃশ্য হইয়া যান। এই ঘটনা হইতে উক্ত ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধের প্রভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, এবং তদবধি নিজ নিজ পরিজনবর্গ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, উক্ত ঘটনা ঘটিবার সময়ে জেতবনের চতুষ্পার্শ্বে ৯৮টি বৌদ্ধমঠ ছিল এবং একমাত্র একটি মঠ ছাড়া বাকি সবগুলিতেই ভিক্ষুরা বাস করিতেন।

### নানা ধর্ম্ম

এই মধ্যরাজ্যে (মধ্যপ্রদেশে) আমাদের (বৌদ্ধদের) মত হইতে ভিন্ন ৯৬টি ভ্রান্ত মত আছে। এই সকল ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের প্রত্যেকটিতেই ইহলোক ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। প্রত্যেকটি মতেরই অসংখ্য সমর্থক আছে এবং তাহারা সকলেই ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে। তাহাদের কাহারও ভিক্ষাপাত্র বৌদ্ধদের ভিক্ষাপাত্রের অনুরূপ নহে। তাহারা সকলেই নব নব পন্থায় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, এবং রাস্তার পার্শ্বে বিশ্রামাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। পথিকদের সুবিধার জন্য ঐ সকল বিশ্রামাগারে পৃথক পৃথক কক্ষ, শয্যা এবং খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাও তাহারা করিয়া দেয়। অতিথি হিসাবে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতিও তাহারা সমান ভাবেই আদর-আপ্যায়ন করিয়া থাকে।

দেবদত্তের সমর্থকদের দল এখনও বিদ্যমান আছে। তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন বুদ্ধের নিয়মিত অর্চ্চনা করিয়া থাকে; কিন্তু শাক্যমুনি বুদ্ধের অর্চ্চনা করে না। শ্রাবস্তী নগরীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে চারি লি দূরে, যে স্থানে ভগবান্ তথাগত শাক্যি-রাজ্য আক্রমণেচ্ছু রাজা বিরূধকের৩৩ সম্মুখীন হইয়া পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তথায়ও একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

উল্লিখিত নগরীর ৫০ লি পশ্চিমে অবস্থিত তু-বেই৩৪ নামক নগরে পরিব্রাজকেরা উপস্থিত হইলেন। এখানেই কাশ্যপ-বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে তিনি তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং যেখানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, এই উভয় স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভগবান্ কাশ্যপ তথাগতের সমগ্র দেহাবশেষের উপর আর একটি বিরাট স্তূপ রচিত হইয়াছে।

অতঃপর পর্য্যটকেরা শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ১২ যোজন দূরে অবস্থিত 'নপেইকিয়া' শহরে উপস্থিত হইলেন। ইহা ক্রকুচন্দ-বুদ্ধের জন্মস্থান। যে স্থানে ইনি স্বকীয় পিতার সহিত মিলিত হন এবং যেখানে

৩১। বর্ণনা দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায়, বিহার এবং দেবালয়ের অবস্থানের বৈশিষ্ট্যই এইরূপ হওয়ার কারণ। সূর্য্যের পূর্ব্বাকাশে অবস্থানকালে সব কিছুর ছায়াই উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমদিকে পতিত হয়; সুতরাং ইহার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। দেবালয়টি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ছিল; সুতরাং পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধেরা বিহার নির্ম্মাণ করিবার সময় উত্তমরূপে চিন্তা করিয়াই বিহার-মঠটিকে দেবালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফলে বিকালের দিকে মঠের ছায়া দেবালয়ের উপর পড়িত।

৩২। এই গল্পটি যদি যথার্থই সত্য ঘটনার ভিত্তিতে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে ইহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিতে পারি। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ-শ্রমণেরা দেবালয়ের রক্ষকদিগকে বশীভূত করিয়া দেবালয়ের যাবতীয় পূজোপহার বিহারে (বৌদ্ধমন্দিরে) লইয়া যাইত। ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিতগণ ইহার প্রতিবিধান মানসে যখন নিজেরাই পাহারায় রহিলেন, তখন সম্ভবতঃ সশস্ত্র সিপাহীদের সাহায্যে শ্রমণেরা পুরোহিতদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ঐ সকল প্রদীপাদি পূজোপহার লইয়া গিয়াছিলেন। পুরোহিতেরা দেবতাদের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রতীকার প্রার্থনা করিলেও যখন কোন দৈবশক্তি তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিল না, তখন তাঁহারা পরবর্ত্তীকালের কালাপাহাড়ের ন্যায় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ পুরোহিত যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে সাদরে বৌদ্ধ-মঠে নিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৩৩। Eitel বলেন, ইহা কপিলাবস্তু রাজ্যেরই নামান্তর।

৩৪। ক্যানিংহাম, স্যামুয়েল বীল প্রভৃতি মনীষীদের মতে ইহা একটি গ্রামের নাম। ইহার বর্ত্তমান নাম তদোয়া (Tadwa) এই গ্রাম সাহারা-মহৎ হইতে পশ্চিমদিকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত।

পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, তাহাদের প্রত্যেকটি স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত আছে। তারপর এই স্থান হইতে উত্তর-দিকে এক যোজনেরও কম দূরে কনকমুনি-বুদ্ধের জন্ম-স্থানে তাঁহারা উপস্থিত হন; ইনি যেখানে নিজ পিতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, তাহাদের প্রত্যেকটি স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত আছে।

অতঃপর তাঁহারা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া এই স্থান হইতে এক যোজনেরও কম দূরে অবস্থিত কপিলাবস্তু-নগরে উপস্থিত হইলেন। তখন এখানে না ছিলেন কোন রাজা, না ছিল লোকবসতি। ইহা ছিল জনশূন্য মৃত্তিকার স্তূপ-বিশেষ। কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক ভিক্ষু এবং ২০।৩০টি পরিবার, সাধারণ লোক তখন এখানে বাস করিতেছিলেন। শুদ্ধোধনের প্রাচীন প্রাসাদের স্থানে শাক্যমুনি ও তদীয় জননীর মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। যে স্থানে শাক্যমুনি শ্বেতহস্তী আরোহণ-করতঃ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিবার সময় পরিদৃষ্ট হইয়া-ছিলেন এবং যেখানে তিনি জরাগ্রস্ত লোকটিকে দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পূর্ব্বদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া-ছিলেন—এই উভয় স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

### অলৌকিক কার্য্য

যে স্থানে অসিতমুনি শিশুর দেহে বুদ্ধচিহ্ন দেখিয়া-ছিলেন, যেখানে নন্দ প্রভৃতির সম্মুখে শাক্যমুনি একটি হস্তীকে প্রাচীরের উপর দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, যে স্থানে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে একটি শর নিক্ষেপ করিলে উহা ৩০ লি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ-করতঃ এমন একটি ফোয়ারা সৃষ্টি করিয়াছিল যে, অদ্যাপি পথিকেরা তাহা হইতে জলপান করিয়া থাকে, যে স্থানে বুদ্ধ বিদ্যাভ্যাস সমাপনান্তে পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যেখানে ভীষণ ভূমিকম্পের সময় পাঁচশত জন শাক্য উপাসির নিকট গিয়া ভক্তি নিবেদন করিয়াছিলেন, যে স্থানে বুদ্ধ দেবতাদের নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন এবং ঐ কার্য্য করিবার সময় তাঁহার পিতা যাহাতে তথায় না আসিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে চারিজন দেবতা চারিটি দ্বারে পাহারা দিয়াছিলেন, যে স্থানে বুদ্ধ অদ্যাপি পরিদৃশ্যমান ন্যগ্রোধ বৃক্ষটির মূলে উপবেশন করিয়াছিলেন, এবং ঐ সময়ে মহা-প্রজাপতি তাঁহাকে একটি সঙ্ঘালি উপহার দিয়াছিলেন, যে স্থানে রাজা বৈদূর্য্য শাক্যের বীজ বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সকলে মৃত্যুর পর স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন,৩৫ এই সকল স্থানের প্রত্যেকটির উপর এক একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

### বুদ্ধের জন্ম

উত্তর-পূর্ব্বদিকে কয়েক লি দূরে ছিল রাজার কৃষি-ক্ষেত্র। এখানে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া শাক্যমুনি কৃষক-দিগকে অবলোকন করিতেন। নগরীর পূর্ব্বদিকে ৫০ লি দূরে লুম্বিনী নামে একটি উদ্যান ছিল। এখানে (শুদ্ধোধনের) রাণী পুষ্করিণীতে নামিয়া স্নান করিয়া-ছিলেন। পুষ্করিণীর উত্তর তীরে উঠিয়া ২০ পদ ভূমি অতিক্রমকরতঃ তিনি হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক একটি বৃক্ষের শাখা ধারণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি পূর্ব্বমুখী হইয়া শাক্যমুনিকে প্রসব করেন। ভূমিতে পতিত হইবা-মাত্র শাক্যমুনি সপ্তপদ ভূমি অতিক্রম করিয়া যান৩৬। দুইজন নাগরাজ আসিয়া এই সময়ে তাঁহাকে স্নান করাইয়াছিলেন৩৭। যে স্থানে তাঁহারা এই কার্য্যটি করেন, তথায় অবিলম্বে একটি কূপ খনন করা হয়। এই কূপ এবং রাণীর স্নানের পুষ্করিণী হইতে অদ্যাপি শ্রমণেরা জলপান করিয়া থাকেন।

সকল বুদ্ধেরই চারিটি নিয়মিত ঘটনার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে যথা—( ) যেখানে তাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করেন, (২) যেখানে তাঁহারা প্রচলত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, (৩) যে স্থানে তাঁহারা নিজ ধর্ম্মের প্রচার ও ব্যাখ্যা এবং পরধর্ম্মের দোষ উদ্‌ঘাটন করেন, এবং (৪) যেখানে তাঁহারা স্বকীয় জননীর মঙ্গলার্থে ত্রয়োস্ত্রিংশৎস্বর্গে আরোহণান্তে অবতরণ করেন। এই সকল বুদ্ধের সম্পর্কে বহু স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করে, এবং তাঁহাদের কর্ম্মাবলীদ্বারাও অনেক স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

---

৩৫। কথিত আছে যে, রাজা বৈদূর্য্য কপিলাবস্তু নগরী অধিকার করিয়া শাক্য-নৃপতির পরিবারস্থ ৫০০ জন (কাহারও কাহারও মতে ১০০০ জন) নারীকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে চাহেন। কিন্তু ঐ সকল নারী তাঁহাতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাদের হাত, পা কাটিয়া তাঁহা-দিগকে একটি পুষ্করিণীতে প্রোথিত করা হয়। শাক্যরাজ পরিবারের সমুদয় নারী এইভাবে নিহত হইলে বুদ্ধ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক নিহত নারীকে স্রোতাপন্ন করিয়া দেন। এক শ্রেণীর উচ্চস্তরের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে স্রোতাপন্ন বলে। তাৎপর্য্য এই যে, পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধগণ এইভাবে নিহত স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদিগকে স্রোতাপন্নের মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

৩৬। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অন্য লোক আসিয়া তাঁহাকে স্নানাদি করাইবার জন্য সপ্তপদ ভূমি দূরে নিয়া স্থাপন করে।

৩৭। সম্ভবতঃ নাগবংশীয় দুইজন চিকিৎসক বা শুশ্রূষাকারীর উপর নবজাতকের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার পড়িয়াছিল।

কপিলাবস্তু নগরী একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য-বিশেষ। এখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। রাস্তায় চলিবার সময় শ্বেতহস্তী ও সিংহের আক্রমণের ভয়ে সকলকেই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়৩৮।

রামস্তূপ

বুদ্ধের জন্মস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে পাঁচ যোজন দূরে 'রাম' নামে একটি রাজ্য আছে৩৯। এই রাজ্যের রাজা বুদ্ধদেবের পূতাস্থির একাংশ লাভ করিয়া ইহার উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপটি রামস্তূপ নামে বিখ্যাত। এই স্তূপের পার্শ্বেই একটি সরোবর আছে। উক্ত সরোবরে একটি নাগ বাস করে এবং সে সর্ব্বদাই উল্লিখিত স্তূপে বিবিধ উপহার প্রদান করিয়া থাকে৪০।

আলোক ও নাগরাজ

এক সময়ে সম্রাট অশোক আটটি বিখ্যাত স্তূপ বিনষ্ট করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে ৮৪,০০০ স্তূপ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। সাতটি স্তূপ বিনষ্ট করিবার পর তিনি এই স্তূপটি ধ্বংস করিতে আসেন। এই সময়ে উল্লিখিত নাগ তথায় উপস্থিত হইয়া সাদরে তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে লইয়া যায় এবং স্তূপে অমূল্য দ্রব্যসম্ভার উপহার দিয়া বলে—"আপনি যদি ইহার চেয়ে ভাল উপহার দিতে পারেন, তাহা হইলে স্তূপ ধ্বংস করুন; আমি আপনাকে বাধা দিব না৪১।" অশোক বুঝিলেন—এইরূপ মহামূল্য উপহার পৃথিবীর কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং তিনি স্তূপটি ধ্বংস না করিয়া ফিরিয়া যান।

কালক্রমে এই স্থানটি অরণ্যে পরিণত হয়। তখন স্তূপের যত্ন করিবার মত কেহই সেখানে ছিল না। এই সময়ে একদল হস্তী প্রত্যহ তথায় আসিয়া নিজেদের শুঁড়ের জলদ্বারা স্তূপটিকে স্নান করাইত এবং নানা স্থান হইতে পুষ্প ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি আনিয়া তথায় ফেলিয়া দিত৪২। একদা কোন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজা স্তূপে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসিয়া হস্তীদলের সম্মুখীন হন। তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠেন এবং নিকটবর্ত্তী বৃক্ষগুলির অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন হস্তীরা স্তূপে জলসেচ ও অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে তখন তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই সময় হইতে উক্ত নৃপতি রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি নিজ হস্তে স্তূপ ও ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া স্থানটিকে অতিশয় পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিয়া তোলেন। তিনি ভিক্ষুদের জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং উহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। অদ্যাপি এই বিহারে ভিক্ষুরা বাস করিতেছেন। ইহা অধিকদিন পূর্ব্বের ঘটনা নহে। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই একজন না একজন শ্রমণ এই বিহারের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন।

কুশনগর

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে চারি যোজন দূরে অবস্থিত যে ভূমিখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া সিদ্ধার্থ ছন্দককে অশ্ব ও রথসহ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মিত আছে। এখান হইতে পূর্ব্বদিকে চারি যোজন দূরে অবস্থিত অঙ্গার স্তূপে৪৩ গিয়া ফা-হিয়েন উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেও একটি বিহার আছে। পূর্ব্বাভিমুখে আরও

৩৮। স্থানটির চারিদিকে শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম অরণ্য থাকায় সিংহ, শ্বেতহস্তী প্রভৃতি দুরন্ত জানোয়ারেরা প্রায়ই পথিকদিগকে আক্রমণ করিত।

৩৯। শাক্যবংশীয় নৃপতিরা নিজেদিগকে অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন। রাম নামক রাজ্যটির নামও সম্ভবতঃ শ্রীরামের নামানুসারে রাখা হইয়াছিল।

৪০। সরোবরের তীরে যে নাগপূজক (নাগবংশীয়) নৃপতি (বা সর্দ্দার) বাস করিতেন তাঁহার আরাধ্য নাগটির বাসস্থান এই সরোবরে ছিল বলিয়াই বোধ হয় তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই নৃপতি মনে করিতেন, তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য উক্ত নাগেরই কৃপার ফল; সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত উপহারগুলিকেও তিনি তদীয় আরাধ্য নাগের দেওয়া বলিয়াই প্রচার করিতেন।

৪১। নাগরাজের অকৃত্রিম ভক্তি এবং অসাধারণ সেবার পরিচয় পাইয়া সদাশয় নৃপতি অশোক তাঁহার অনুরোধে স্তূপটির ধ্বংসসাধনে বিরত থাকেন।

৪২। হস্তীদের স্বভাবই এই যে, তাহারা শুঁড়ের জল পার্শ্ববর্ত্তী নানা দ্রব্যের উপর ছিটাইয়া দেয়। অরণ্যের অভ্যন্তরে যে স্থানটি ফাঁকা ছিল, স্বভাবতঃই হস্তীরা তথায় সমবেত হইত, এবং স্তূপটি সেখানে থাকার ফলে উহার উপর তাহারা শুঁড়ের জলও নিক্ষেপ করিত। ভক্ত বৌদ্ধগণ ইহাকে বুদ্ধের অলৌকিক প্রভাবের ফল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। রাজার বৈরাগ্য ভাবাবেশবশতঃই হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে বাংলা দেশের এক বিরাট ধনী সহসা "বেলা যায়" এই দুইটি মাত্র শব্দ শুনিয়া ভাবাবেশে আপ্লুত হন এবং তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

৪৩। বুদ্ধের শব যেখানে সৎকার করা হয় তথায় কিছু অঙ্গার (সম্ভবতঃ তাঁহার শ্মশানের) অবস্থিত ছিল। এই অঙ্গারের উপর যে স্তূপটি নির্ম্মিত হয়, তাহাই অঙ্গারস্তূপ নামে বিখ্যাত। Beal এবং Giles ইহাকে "Tope of ashes" বলিয়াছেন। James Legge অনুবাদ করিয়াছেন 'Charcoal tope" শেষোক্ত অনুবাদটিই ঠিক হইয়াছে।

১২ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা কুশনগরে উপস্থিত হইলেন। এই নগরীর উত্তরদিকে নিরঞ্জনা-নদীতীরে দুইটি বৃক্ষের মধ্যস্থলে বুদ্ধদেব উত্তর শিয়রে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার শিষ্য শুভদ্র৪৪ সিদ্ধিলাভ করেন। এই স্থানেই সোনার পাতে করিয়া ৭ দিন ধরিয়া বুদ্ধের নিকট উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। এই স্থানেই বজ্রপাণি তাঁহার সোনার গদা পরিত্যাগ করেন৪৫ স্বয়ং এখানেই ৮ জন নৃপতি বুদ্ধের দেহাবশেষ ভাগ করিয়া নেন। উল্লিখিত স্থানগুলির প্রত্যেকটিতেই স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহা আজও পূর্ণ গৌরবে বর্ত্তমান আছে। এই নগরীর লোকসংখ্যা অতি নগণ্য এবং অধিবাসীরা সকলেই ভিক্ষু।

এখান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ১২ যোজন পথ অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সেই বিখ্যাত স্থানে পৌঁছিলেন, যেখানে লিচ্ছবিবংশীয় নৃপতিরা পরিনির্ব্বাণের সময় বুদ্ধকে অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বুদ্ধ তাহাদিগকে নিষেধ করেন এবং তাহারা যখন তাঁহার নিষেধ শুনিতে অনিচ্ছুক হন, তখন তাহাদের আগমনে বাধা দেওয়ার জন্য মধ্যপথে এক গভীর পরিখা খনন করান। আশীর্ব্বাদের চিহ্ন হিসাবে নিজ ভিক্ষাপাত্রটি দিয়া তিনি তাহাদিগকে স্বরাজ্যে ফিরাইয়া দেন। এই স্থানে একটি লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে উল্লিখিত বিবরণ ক্ষোদিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

### বৈশালী

উল্লিখিত নগরী হইতে পূর্ব্বদিকে ১০ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া পরিব্রাজকেরা বৈশালী রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী বৈশালী নগরীর উত্তরদিকে এক বৃহৎ অরণ্য আছে। উক্ত অরণ্যের অভ্যন্তরে একটি দ্বিতল-বিহার এবং আনন্দের দেহাবশেষের অর্দ্ধেকের উপর নির্ম্মিত একটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। উল্লিখিত দ্বিতল-বিহারে বুদ্ধদেব বাস করিতেন।

নগরীর অভ্যন্তরে অম্বাপালী নাম্নী এক নারী বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তি নিবেদনের উদ্দেশ্যে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত বিহারটি এখনও নূতনের মতই রহিয়াছে। নগরীর দক্ষিণদিকে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে একটি উদ্যান বিরাজিত। বুদ্ধদেবের নিবাসের জন্য অম্বাপালী এই উদ্যানটি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। পরিনির্ব্বাণ লাভের প্রাক্‌কালে যখন বুদ্ধদেব পশ্চিম দ্বার দিয়া এই নগরী হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন তিনি একবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া তাকান, এবং নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে নগরীটিকে দেখিয়া অনুচরদিগকে বলেন, "এখানে আমি শেষবারের মত পাদচারণ করিলাম।" যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়া তিনি এই কথাটি বলিয়াছিলেন, তথায় পরবর্ত্তীকালে একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত নগরীর উত্তর-পশ্চিমদিকে ৩ লি দূরে আর একটি স্তূপ আছে ইহা "শরাসন-পরিহার" (Bows and weapons laid down) নামে পরিচিত। উল্লিখিত স্তূপের এবম্বিধ নাম হওয়ার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

### মাংসপিণ্ড প্রসব

কোন রাজার এক হীনবংশীয়া স্ত্রী একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন। এই রাজার রাজ্য ছিল গঙ্গা-তীরে অবস্থিত। উক্ত রাজার উচ্চবংশীয়া অপর পত্নী ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া বলেন, "তুমি একটি অমঙ্গলের চিহ্ন প্রসব করিয়াছ", এইরূপ বলিয়া তক্ষণাৎ তিনি উল্লিখিত মাংসপিণ্ডটিকে একটি কাঠের বাক্সে পুরিয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন। ভাঁটির দিকে অন্য এক রাজ্যের রাজা যখন গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন তখন এই বাক্সটিকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি উহা জল হইতে তুলিয়া লন। বাক্সটি খুলিয়া তিনি দেখিলেন—ইহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক সহস্র শিশু অবস্থান করিতেছে৪৬।

### সহস্র শিশু

প্রত্যেকটি শিশুর আকৃতি অপরটি হইতে ভিন্ন, এবং তাহারা সকলেই পুরুষ। কোন শিশুর দেহে কোনরূপ

৪৪। ইনি বারাণসীবাসী ব্রাহ্মণ। কথিত আছে এই ব্রাহ্মণ ১২০ বৎসর বয়সে বুদ্ধের নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। James Legge-এর লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি (Travel of Fa-Hien, page 71, foot note 1) যে, যেদিন এই ব্রাহ্মণ আসিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেইদিন রাত্রিতেই তাঁহার মুক্তি ঘটে।

৪৫। কেহ কেহ বলেন, এই বজ্রপাণি শব্দ ইন্দ্রকে বুঝাইতেছে। অন্যদের মতে ইহাদ্বারা কোন শক্তিমান রাজপুত্রকে বুঝাইতেছে। সোনার গদা বজ্রপাণির প্রভূত ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। আমার মনে হয় বজ্রপাণি কোন ধনবান ব্যক্তির (রাজা বা শ্রেষ্ঠীর) নাম ছিল।

৪৬। মহাভারতোক্ত গান্ধারীর মাংসপিণ্ড প্রসব এবং তাহা হইতে শতপুত্র উৎপাদনের কাহিনী অবলম্বনেই সম্ভবতঃ এই গল্প রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা সর্ব্বদাই হিন্দুদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে সমুৎসুক; সুতরাং মহাভারতোক্ত শতপুত্র এখানে সহস্রপুত্রে পরিণত হইয়াছে।

বিকলতা ছিল না। রাজা শিশুদিগকে নিজ প্রাসাদে আনিয়া পালন করিতে লাগিলেন।

স্তূপের গল্প

কালক্রমে এই সকল শিশু দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, রিপুঞ্জয় বীরপুরুষে পরিণত হইল। অবশেষে এক সময়ে তাহারা তাহাদের জন্মদাতা পিতার রাজ্য আক্রমণ করিল। তাহাদের এই আসল পিতা তখন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। রাজাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া তাঁহার হীনবংশীয়া পত্নী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা উত্তর করিলেন, "ঐ রাজার সহস্রসংখ্যক দিগ্বিজয়ী পুত্র আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, ইহাই আমার দুঃখের কারণ।" তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আপনি অনর্থক দুশ্চিন্তা করিবেন না। নগরীর পূর্ব্বদিকে প্রাচীরের উপর একটি অলিন্দ নির্ম্মাণ করুন; তাহা হইলে আক্রমণকারীরা আসিলে আমি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে পারিব। রাজা তাঁহার কথামতই কাজ করিলেন। অতঃপর শত্রুরা সমাগত হইলে রাজপত্নী বলিলেন, "তোমরা আমার পুত্র। কি কারণে তোমরা এইরূপ অস্বাভাবিক বিদ্রোহ করিয়াছ?" তাহারা উত্তরে বলিল, "তুমি কে যে আমাদের মা বলিয়া পরিচয় দিতেছ?" নারী উত্তর করিলেন, "তোমরা যদি বিশ্বাস না কর তাহা হইলে সকলে আমার দিকে তাকাইয়া মুখব্যাদান কর।" শত্রুরা এইরূপ করিলে তিনি হস্তদ্বারা নিজের স্তন চাপিয়া ধরিলেন এবং প্রত্যেকটি স্তন হইতে ৫০০ কলসী পরিমিত দুগ্ধ বহির্গত হইয়া সহস্র যুবকের মুখে পতিত হইল৪৭। আক্রমণকারীরা বুঝিতে পারিল, তিনি যথার্থই তাহাদের জননী। তখনই তাহারা ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিল। তাহাদের উভয় পিতা এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকবুদ্ধ হইলেন। উল্লিখিত প্রত্যেক বুদ্ধদ্বয়ের দুইটি পৃথক স্তূপ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

সহস্র বুদ্ধ

কোন সময়ে ভগবান্ তথাগত বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "এই স্থানেই আমি পূর্ব্ববর্ত্তী এক জন্মে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।" তাঁহার এই কথা হইতে উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া বৌদ্ধেরা তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সহস্র বালক বর্ত্তমান ভদ্রকল্পের সহস্র বুদ্ধ ভিন্ন আর কেহ নহেন।

ধনুর্ব্বাণ-পরিহার স্তূপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বুদ্ধদেব দীর্ঘকাল জীবনধারণ না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "আজ হইতে তিন মাস মধ্যে আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব।" এই সময়ে রাজা মার (মদন) আনন্দকে এমনি অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিনি দীর্ঘকাল বাঁচিবার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ পর্য্যন্ত করেন নাই। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে ৩।৪ লি দূরে আর একটি স্তূপ আছে। উক্ত স্তূপ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ইতিহাস শোনা যায়।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালীর কিছুসংখ্যক ভিক্ষু দশবিধ ধর্ম্মের ভুল ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। অতঃপর ধর্ম্ম সংশোধনের জন্য আহূত হইয়া ৭০০ ভিক্ষু বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া এখানে সমবেত হন; এবং দশবিধ ধর্ম্মের যথার্থ ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থসমূহ প্রচার করেন৪৮। পরবর্ত্তীকালে এই স্থানেই একটি স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এই স্তূপটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে চারি যোজন দূরে পঞ্চ-নদের সঙ্গমস্থলে৪৯ তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। যে সময়ে আনন্দ পরিনির্ব্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে মগধ হইতে

---

৪৭। প্রাচীন ভারতে সহস্র শব্দটি খুব বেশী সংখ্যা বুঝাইবার জন্যও ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ শত্রুপক্ষের অসংখ্য বীর সৈন্যকে সহস্র রাজ-পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অগণিত শত্রুসৈন্য রাজধানী অবরোধ করিলে যখন রাজসৈন্য কিছুতেই তাহাদিগকে হটাইতে পারিল না, তখন রাণী কৌশলে তাহাদিগকে পুত্র সম্বোধন করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা সৃষ্টিকরতঃ সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ উল্লিখিত অসম্ভব গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।

৪৮। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে বৈশালী নগরীতে এই মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহা দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি নামে পরিচিত। এই সভায় দশবিধ ধর্ম্মের ব্যাখ্যামূলক যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার নাম 'বিনয়পিটক' কথিত আছে. প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতি রাজগৃহ নগরে মহাস্থবির কাশ্যপের সভাপতিত্বে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪১০ অব্দে হইয়াছিল।

৪৯। এই পঞ্চনদ যে সিন্ধুর উপনদীগুলি নহে তাহা স্থানের পারিপার্শ্বিক বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়। এই পঞ্চনদ বৈশালী ও পাটলি-পুত্র নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয় সমালোচকেরা কেহই নিশ্চিতরূপে এই স্থানটি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক James Legge লিখিয়াছেন:

**'This spot does not appear to have been identified. It could not be far from Patna" (The Travels of Fa-Hien by James Legge. Page 75, foot note 2).**

বৈশালীতে যাইতেছিলেন, তখন দেবতারা রাজা অজাতশত্রুকে এই সংবাদ দিয়াছিলেন। রাজা অজাতশত্রু এক মনোজ্ঞ রথে আরোহণ করিয়া একদল সৈন্যসহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক নদীতটে উপস্থিত হন। অপর পক্ষে বৈশালীর লিচ্ছবীরাও আনন্দের আগমন-সংবাদ জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এইরূপে উভয়পক্ষের লোকেরা নদীতীরে উপস্থিত হইলে আনন্দ ভাবিতে লাগিলেন, যদি তিনি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হন, তাহা হইলে রাজা অজাতশত্রু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, আবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেও লিচ্ছবিদের ক্রোধের সীমা থাকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নদীর মধ্যস্থলেই সমাধিস্থ হইয়া নিজ দেহ দগ্ধকরতঃ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তাঁহার দেহাবশেষ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া নদীর উভয়তীরে প্রেরিত হইল। ফলে প্রত্যেক রাজাই তাঁহার দেহাবশেষের অর্দ্ধাংশ লাভ করিয়া ইহার উপর এক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন।

—০—

কার্ল মার্ক্সকে একবার একটি ছাপানো প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। প্রশ্নগুলি এবং তিনি সেগুলির যে উত্তর দিয়েছিলেন তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হ'ল।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| মানুষের মধ্যে তার কোন্ বিশেষ গুণটি আপনার বেশী ভাল লাগে? | নিরাড়ম্বর সরলতা। |
| পুরুষদের বিশেষ ক'রে? | শক্তিমত্তা। |
| স্ত্রীলোকদের বিশেষ ক'রে? | নমনীয়তা। |
| আপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য? | লক্ষ্যে একাগ্রতা। |
| সুখ বলতে আপনি কি বোঝেন? | সংগ্রাম। |
| দুঃখ বলতে কি বোঝেন? | পরাভব স্বীকার। |
| মানুষের কোন্ দোষকে আপনি ক্ষমার যোগ্য মনে করেন? | অপরের কথায় বিচারহীন বিশ্বাস। |
| কোন্ দোষকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণার যোগ্য মনে করেন? | দাস্যভাব। |
| আপনার বৃত্তি কি? | গ্রন্থকীট-বৃত্তি। |
| প্রিয় খাদ্য? | মাছ। |
| প্রিয় নীতিবাক্য? | সমস্তকিছুকে সন্দেহের চোখে দেখবে। |

# প্রলয় পয়োধি জলে

( পুণায় বন্যা—১২-৮-১৯৬১ )

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অনুক্রমণিকা

পুণার উত্তরে বার মাইল দূরে পুণ্যসলিলা ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে সন্ত তুকারামের স্মৃতিপূত দেহুগ্রামে মহাদেব পলুস্কর ছিলেন নামকরা মারাঠী ওস্তাদ। তাঁর একমাত্র মাতৃহারা পুত্র প্রহ্লাদ পিতার কাছে পাঁচ বৎসর বয়স থেকে তালিম নিয়ে পনর-ষোল বৎসরেই "আধা ওস্তাদ" উপাধি পেয়ে খ্যাতির পেতে আরম্ভ করল। ওস্তাদি গানকে পেশা ক'রে অর্থকরী বিদ্যা ব'লে বরণ করার পথ ছিল ওর সোজাই, কেবল বেঁক নিল ওদের গৃহ-বিগ্রহ বিঠ্‌ঠলের কোন গূঢ় চালেই হবে। নৈলে প্রহ্লাদ এই সময়ে তুকারামের প্রভাবে প'ড়ে যাবে কেন? মহাদেব পলুস্কর ছিলেন পুরো সংসারী, কাজেই পুত্রের মধ্যে বৈরাগ্যের আভাস দেখে ভয় পেয়ে কাছের গ্রাম লোনাবালার এক বন্ধুর সুলক্ষণা কন্যা সাবিত্রীর সঙ্গে পুত্রের জোর ক'রেই বিবাহ দিলেন। তখন প্রহ্লাদের বয়স উনিশ, সাবিত্রীর—পনের।

কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে। শুভ-বিবাহের দশদিন পরেই মহাদেব হঠাৎ ইহজগত থেকে বিদায় নিলেন। প্রহ্লাদ শোকে-দুঃখে বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে গেল কাউকে কিছু না ব'লে। সাবিত্রী কেঁদে কেঁদে পিতৃগৃহে ফিরে এল।

নানা তীর্থ-পর্যটন ক'রে নানা ঘাটের জল খেয়ে প্রহ্লাদ কাশী পৌঁছল বছর দুই পরে। সেখানে হঠাৎ এক দীপ্যমান্ বাঙালী গৃহী গুরুর সঙ্গে দেখা—নাম বিষ্ণু ঠাকুর। মুগ্ধ হয়ে প্রহ্লাদ তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে শিখল দুটি জিনিষ: ইষ্টে শ্রদ্ধা ও বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা শিখল আরও উৎসাহে বৈষ্ণব কবিদের কীর্তনে গভীর রস পেয়ে। বিষ্ণু ঠাকুর তার নিষ্ঠা ও কীর্তন ভক্তিতে প্রীত হয়ে তাকে বললেন বৈষ্ণব লীলাবাদের গূঢ় তত্ত্ব। বললেন, "বাবা, যদি খাঁটি বৈষ্ণব হতে চাও ত মায়াবাদ ছাড়তে হবে। আর যদি আমার অন্তরঙ্গ শিষ্য হতে চাও তাহলে সন্ন্যাস ছেড়ে গৃহী হতে হবে।" প্রহ্লাদ তখন বলল যে, সে বিবাহিত। শুনে তিনি আরও প্রসন্ন হয়ে বললেন, "এই-ই ত চাই বাবা! সন্ন্যাসবাদ হিন্দুধর্মের অগুন্তি শাখার একটি শাখা বা ধারা মাত্র। মূল হিন্দুধর্মের বাণী হ'ল সর্বস্বস্তিবাদ। তাই আমাদের অবতার রামকৃষ্ণ বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, অত্রি, গৌতমাদি মুনি-ঋষিরা সবাই ছিলেন গৃহী। ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব অম্বরীষ জনক থেকে আরম্ভ ক'রে রায় রামানন্দ, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ জ্ঞানী ভক্তদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। এঁরা কেউই 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' জপ করতে করতে হিমালয়ে প্রয়াণ ক'রে ভূমিশয্যা বরণ করেন নি। গুরু নানক কবীর তুকারাম… আরও কত-শত মহাপুরুষ ও মরমিয়া সাধক গৃহস্থাশ্রমে থেকেই ভগবানকে লাভ করেছেন। অন্তত আমার বহিরঙ্গ শিষ্য না থেকে যদি অন্তরঙ্গ অনুব্রতী হতে চাও তাহলে তোমাকে গৃহে থেকেই সাধনা করতে হবে, বদ্ধজীব হয়ে নয়, জীবন-মুক্ত হয়ে—'জৈসে জলমে কমল অলেপ'—জলে পদ্মের মতন নির্লিপ্ত থেকে। গৃহিণী গৃহস্থালি সন্তান এ সব ত বাধা নয় বাবা, আসল বাধা হ'ল মোহ, আসক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, গর্ব। উপনিষদেও দেখতে পাবে বলেছে'প্রজা চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ'—কিনা স্বাধ্যায় ও বংশরক্ষা দুই-ই চাই। কেবল পরিবারকেন্দ্র বা আত্মকেন্দ্র হয়ে না, ভগবৎকেন্দ্র হয়ে—সবার মধ্যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করার আদর্শ-উদ্বুদ্ধ হয়ে। তোমার মতন উজ্জ্বল, সমৃদ্ধ আধার আমি চাইছিলাম বাবা, যে পারবে গৃহী হয়েও পরম ভাগবত হবে। অকারণ তুমি তুকারামের প্রতি আকৃষ্ট হও নি। গৃহস্থাশ্রমে থেকেই এই মহাপুরুষ সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশের মুখোজ্জ্বল ক'রে গেছেন—এমন কি, অবিদ্যা স্ত্রীও তাঁকে যোগভ্রষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু ভয় পেয়ো না, তোমাকে আমি বলছি না এমন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে। সাবিত্রীকে তুমি দীক্ষা দাও যথার্থ সাবিত্রী অর্থাৎ সহধর্মিণী হবে—শয্যাসঙ্গিনী নয়। গৃহস্থাশ্রমে থেকেই দেখাও তোমরা দু'জনে—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ দম্পতি কেমন আদর্শ ভক্ত ও ভক্তিমতী হতে পারে—আর হলে সে-বিকাশ কেমন সুন্দর তথা সমৃদ্ধ। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। তাঁরা সবাই নমস্য। কেবল দেখতে হবে কার

কি স্বভাব, স্বধর্ম। তোমার আমার স্বধর্ম গৃহ ছেড়ে বনে যাওয়া নয়। কবীরের গানে আছে না :

কুঁ্য ঘর ছোড়কে বন জাউঁ ?
প্রীতম শ্যামল জব ঘর আরে
ঘরকো কুঁ্য ন সজাউঁ ?

তুমি এই পথে চলবার অধিকারী, তাই তুমি গৃহকেই করো বৃন্দাবন, স্ত্রীকে—সহধর্মিণী, ভগবতী। চণ্ডীতে বলে নি কি : 'বিদ্যাঃ সমস্তাঃ তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—অর্থাৎ প্রতি নারীই ভগবতীর এক একটি রূপ। এই-ই হ'ল পূর্ণ সত্য, শোভন সত্য, উদার সত্য—নারী নরকের দ্বার হয় কেবল তখনই যখন সে হয় কামিনী। কিন্তু আসলে সে ত তা নয়—সে যে শক্তিস্বরূপিণী, ভগবতী। শুধু এই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিতে পারি। সন্ন্যাস, মায়াবাদ, কৃচ্ছ্রবাদ—ওসবে আমি নেই। শেষ শুধু একটি কথা বলি তোমাকে : স্বামী স্ত্রী যখন উভয়েই এক সঙ্গে ভক্তি ও ধর্মকে বরণ করে তখনই তাদের জীবন পূর্ণ ও অমৃতময় হয়ে উঠে—এ আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বাবা—পুঁথিপড়া জ্ঞান থেকে নয়।

প্রহ্লাদের বুকে উৎসাহের জোয়ার জেগে উঠল। ও বার বৎসর গুরু-গৃহবাস ক'রে বিশেষ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের লীলাকীর্তন গেয়ে 'কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি' অর্জন ক'রে যখন গুরুকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিল তখন মাঝপথে ট্রেনে স্বপ্নে দর্শন পেল কৃষ্ণ ওরফে বিঠ্‌ঠলের, আর আদেশ পেল—গুরুবাক্য মেনে গৃহীদের মধ্যে অনাসক্ত ভক্ত দম্পতি হয়ে সাধনা করলে তবেই পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করবে। পরে বিষ্ণু ঠাকুরকে একথা চিঠিতে লিখতে তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার দর্শন অভ্রান্ত। কেবল একটি কথা তোমাকে ফের মনে করিয়ে দিই যে কথা ভাগবতে বিষ্ণু অবতার ভগবান্ কপিল বলেছিলেন শিষ্যা মাতা দেবহূতিকে :

যো মাং সর্বেষু ভুতেষু সন্তম্ আত্মানম্ ঈশ্বরং।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
সর্বভুতের অন্তরবাসী পরমেশ্বররূপী আমায়
ছাড়িয়া যে-মূঢ় পুজে প্রতিমারে—ভাস্মতে ঢালে
ঘৃত সে হায়!"

প্রহ্লাদ দেহুবে ফিরে এসে সাবিত্রীকে দীক্ষা দিল। বলল, তাকে কোন্ পথে চলতে হবে। সাবিত্রী ছিল স্বভাবেই ভক্তিমতী তথা পতিব্রতা। স্বামীর মধুর ভজন' দীপ্ত ব্যক্তিরূপ ও অনাবিল স্নেহে সে অভিভূত হয়ে প্রণাম ক'রে বলল, "তুমি শুধু আমার গুরু নও, ইষ্ট। তুমি যে পথে চালাবে আমি চলব, কথা দিচ্ছি।"

দু' বৎসর বাদে সাবিত্রীর কি আনন্দ! এমন সুন্দর ছেলে! প্রহ্লাদ ছেলের "কার্তিক" নাম দিয়ে গুরুদেবকে লিখল। তিনি লিখলেন, "আশীর্বাদ। কেবল এখন থেকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য—স্ত্রী হবে সহধর্মিণী।" সাবিত্রী গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য ক'রে নিল।

প্রহ্লাদ বিষ্ণুঠাকুরকে লিখল, "আশীর্বাদ করুন গুরুদেব, যেন ব্রত ভঙ্গ না হয়। আমি যে দুর্বল।"

গুরুদেব লিখলেন, "নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ। পারবে যদি সত্যি পারতে চাও। আর পারলে দেখবে স্ত্রী যখন সধর্মিণী হয় তখন যুগলে সাধনা—সে কি আনন্দের।" অতঃপর ওদের দাম্পত্য জীবন হয়ে দাঁড়াল সাধক সাধিকার জীবন—ভজনৈকনিষ্ঠ, কৃষ্ণৈকান্ত।

কয়েকটি শিষ্য হ'ল—প্রহ্লাদ পুণায় কয়েকটি ছাত্রও পেল, তাদের ভজন শেখাত। অভাব ওদের সামান্য—চলে যেত টায় টায়! কিন্তু অবস্থা স্বচ্ছল না হলেও এ ভক্ত দম্পতির জীবন সত্যিই হয়ে উঠল "অমৃতময়"। প্রহ্লাদ গুরুদেবকে প্রণাম জানিয়ে লিখে দিল একথা। তিনি উত্তর দিলেন :

"আশীর্বাদ গ্রহণ কর। দেখলে ত—আমি মিথ্যা বলি নি? নারী শক্তিস্বরূপিনী। কেবল এখন থেকে আরও নির্ভর চাই ভগবানে। তাই উপার্জন আর নয়—গ্রহণ কর আকাশবৃত্তি গৃহীব্রহ্মচারী!"

"তথাস্তু" বলে ওরা নিল আকাশবৃত্তি। অতঃপর দেহুতে শুধু গাইত তুলসীদাস মীরাবাইয়ের ভজন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কীর্তন, গুরু নানকের শবদ, কবীর দাদুর দোঁহা—সর্বোপরি তুকারামের বিখ্যাত অভঙ্গ—যা শুনে স্বয়ং শিবাজি মুগ্ধ হয়ে এসেছিলেন এই পল্লীগ্রামেই কবি সাধুকে প্রণাম করতে ও ভেট দিতে। এই প্রসঙ্গে তুকারামের আশ্চর্য অপ্রতিগ্রহী ভক্তির কথা বলতে বলতে প্রায়ই প্রহ্লাদের চোখে ধারা বইত। বলত সে :

"কি অপরূপ মানুষই ছিলেন ভক্তরাজ তুকারাম কি নির্লোভ অনাসক্ত। শিবাজি তাঁর মুখে অভঙ্গ শুনে যখন তাঁকে কিছু দান করতে আগ্রহী হলেন তখন তুকারাম মুখে মুখে একটি অভঙ্গ বেঁধে ছত্রপতিকে অনুরোধ করলেন,

"দিবট্যা ছত্রী ঘোড়ে
হেঁ তোঁ বর্যতি ন পড়ে॥
আম্হী ঢেণেঁ সুখী॥
ম্হণা বিঠ্‌ঠল বিঠ্‌ঠল মুখী॥

কণ্ঠী মিরবা তুলসী।
ব্রত করা একাদশী॥
ম্হনরা হরিচে দাস।
তুকা ম্হণে মজ হে আস॥"

সভায় বাঙালী শ্রোতা থাকতে এর অনুবাদ গাইতেন সঙ্গে সঙ্গে :

"ছত্র দীপ বাজী চাহি না মহারাজ !
ধনমানের নহি প্রার্থী আমি।
আমার বরণীয় শুধু শ্রীনাথ আজ,
দিয়েছি তাঁরি পায়ে প্রাণ প্রণামী।
তুকার শুধু প্রভু, একটি আছে আশ :
তুলসী মালা পরি' কণ্ঠে তব
হরির হয়ে দাস করিয়া উপবাস
গাহিও নাম তাঁর, মহানুভব !"

প্রহ্লাদ আকাশবৃত্ত ব্রহ্মচর্য-ব্রত নিয়ে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপবাসাদি ক'রে "হরির দাস" হতে পেরেছিলেন বলেই আরও উজিয়ে উঠতেন এ অভঙ্গটি গাইতে গাইতে। বলতেন, গাঢ়কণ্ঠে প্রায়ই যে, তাঁর সাধনার তথা জীবনের আদর্শ—এই নির্লোভ গৃহী সন্ন্যাসী, যিনি সংসারে থেকেও সংসারী হন নি, রাজসম্মান পেয়েও যাঁর কাছে "বিত্ত ধন" চিরদিনই "মৃত্তীকে সমান"—মাটির মতনই উপেক্ষণীয় ছিল।

* * * *

তবু তাঁকে গুরু হতেই হ'ল : একটি দুটি ক'রে শিষ্য আসতে লাগল আশ-পাশের গ্রাম থেকে। তিনি "গুরু" উপাধি পছন্দ করতেন না। তাই সবাই তাঁকে "সাধুজি" বলে ডাকা সুরু করল। কিন্তু নাম নিয়ে ত কথা নয়—আর ফুল ফুটলে তার সৌরভকে বেঁধে রাখবে কে? ঠাকুরের কৃপা যে ফুটেছিল তাঁর হৃদয়ের নাম-মৃণালে প্রেমের ফুল হয়ে। ফল যা হবার ফলমান প্রতিষ্ঠা তাঁকে তুলে ধরল লোকচক্ষুর সামনে। তিনি বিচলিত হলেন। এ ত তিনি চান নি। তুকারামের অভঙ্গ গাইবেন সাশ্রুনেত্রে : "মান দম্ভ চেষ্টা হেঁ ত শূকরাচী বিষ্ঠা"—যশমান রাজসিক উদ্যম প্রতিষ্ঠা—এ সব ত শূকরী বিষ্ঠা।

তিনি ছিলেন স্বভাবে সত্যনিষ্ঠ। তাই ঠিক করলেন এ চলবে না, তাঁকে যেতেই হবে ফের ফিরে গুরুগৃহে, কিংবা হিমালয়ে—আরও এই জন্যে যে দেখলেন কার্তিক তাঁর মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে দেখতে দেখতে। একদিন সারারাত প্রার্থনা করলেন তুকারামের মূর্তির সামনে—"আর বন্ধন নয় প্রভু। এখন দাও মুক্তি। যদি শেষরক্ষা না হয়, পুনর্মূষিক হতে হয় তবে সে বড় লজ্জা।"

এমনি সময়ে দেখতে দেখতে মহামারী—বসন্ত। সাবিত্রী ভয় পেয়ে কিছুদিনের জন্যে পিতৃগৃহে যেতে চাইল স্বামী-পুত্র নিয়ে। কিন্তু প্রহ্লাদ গুরুদেবকে একথা লিখতেই তিনি তিরস্কার ক'রে লিখলেন, "সে কি কথা? আর্তের সেবা ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে যাবে শ্বশুরালয়ে? আমার মাথা হেঁট ক'রো না।"

সাবিত্রী কান্নাকাটি করল, কিন্তু প্রহ্লাদ অচল-অটল। গুরুর আদেশ।

এই সময়ে প্রতিবেশীর গৃহে বসন্ত হ'ল, বিধবা মা ও তার একমাত্র শিশু-পুত্রের ; মা মারা গেল। প্রহ্লাদ শিশুকে নিয়ে এলেন নিজের কুটীরে।

শিশু বাঁচল না। শ্মশানে তাকে দাহ ক'রে এসে প্রহ্লাদ প্রথম সত্যি ভয় পেয়ে গেলেন : কার্তিকের বসন্ত।

বহু চেষ্টায়ও তাকে বাঁচানো গেল না। সাবিত্রী মর্মাহত হয়ে পিতৃগৃহে চ'লে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার বসন্ত হ'ল, দু'দিনেই সব শেষ।

প্রহ্লাদ চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। দু'দিনে "অমৃতময়" জীবনের এ কি পরিণতি? গুরুদেবকে লিখলেন মনঃকষ্টে, "হয়ত আমি অজ্ঞাতে যশমান-প্রতিষ্ঠার ক্ষুধাকে লালন ক'রে থাকব—চেয়ে থাকব পুত্রের প্রতি মমতার বন্ধনে সুখের আশ্রয়?"

উত্তরে বিষ্ণুঠাকুর তাকে লিখলেন, "না, তোমার স্বভাব সরল, ঋজু, পবিত্র। তোমার পতন হবে না আর। তবে পরীক্ষা আরো অনেক বাকি। কিন্তু গৃহ শূন্য হয়ে গেছে ব'লে দুঃখ করলে তুমি কোন্ মুখে, যার গৃহে ঠাকুরের বিগ্রহ আসীন! তোমাকে বলি নি কি যে, গৃহস্থাশ্রমের সাধনপথ কুসুমাস্তৃত নয়? লোকে বাইরের ভাগই দেখে। গৃহী বৈষ্ণবকে করতে হবে মান ত্যাগ। পলায়নী মনোবৃত্তি আর যাকেই সাজুক গৃহী সাধুকে সাজে না।

"তুমি জিজ্ঞাসা করেছ কেন তোমাকে সইতে হ'ল এতবড় শোক স্ত্রী-পুত্রকে একসঙ্গে দিতে হ'ল বিদায়? এ-প্রশ্নের উত্তর পাবে পরে—যখন সব আঘাতকেই ঠাকুরের দান ব'লে গ্রহণ করতে পারবে পুরোপুরি। তাছাড়া একটি কথা মনে রেখ যে, শোকতাপ যে পায় নি সে অপরের শোকতাপের মর্ম বুঝতে পারে না কখনই।

কিন্তু এ হ'ল সান্ত্বনার কথা, ব্রতের নয়। তোমাকে সব আগে মনে রাখতে হবে তুমি কি ব্রত নিয়েছ—পরম নির্ভয়ে আকাশবৃত্তি, ঠাকুরের চরণে একান্ত আত্মসমর্পণ। এ-জন্যে তোমাকে প্রতি রক্তকাঁটাকেই গোলাপ ক'রে ফুটিয়ে তুলতে হবে, প্রতি বেদনারই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তাঁর বিধানকে পদে পদে শিরোধার্য ক'রে। এ যদি না পার তবে ত আত্মসমর্পণ হয়ে দাঁড়াবে মুখের কথা।

"তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর: না। অন্য কোথাও গিয়ে সঙ্ঘপন্থী হলে তোমার চলবে না। তোমাকে ওখানে থেকেই তাঁর কাজ করতে হবে—জীবের সেবা করতে হবে শিবজ্ঞানে, নাস্তিকতার আবহেই বিতরণ করতে হবে আর্তকে অভয়, অজ্ঞানকে ভক্তির সৌরভ।"

প্রহ্লাদ মেনে নিলেন। ফলে পুণায়ও তাঁর কয়েকটি শিষ্য হ'ল এক এক ক'রে।

এদের মধ্যে একটি মারাঠী দম্পতী তাঁকে ধরল যে, মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীতে ভজন-কীর্তন অভঙ্গের আসর বসাতেই হবে—গ্রামের ফুলটি হয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে ফুটে ঝ'রে গেলে চলবে না, শহরেও বিঠ্ঠলের নামসৌরভ বিতরণ করতে হবে। তিনি প্রথমে রাজি হন নি, কিন্তু সখারাম আত্রে শুধু ভক্ত ছিল না, ছিল শক্ত। তার উপর তার স্ত্রী অনসূয়া ছিল সত্যিকার সহধর্মিণী, কৃষ্ণভক্তি ছিল যার সহজাত। এমন শিষ্য-শিষ্যার উপরোধ ঠেলা যায় কি? অগত্যা সাধুজি—তাঁকে সবাই এই নামেই ডাকত—মাঝে মাঝেই পুণায় এসে সখারামের তিনতলায় মস্ত হলঘরে তুকারামের অভঙ্গ গাওয়া সুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে গীতা ও ভাগবত পাঠও সুরু হ'ল। ভিড় বাড়তেই থাকে, বহু ভক্ত ও ভক্তিমতী তাঁর মুখে হিন্দী ভজন, মারাঠী অভঙ্গ সংস্কৃত স্তোত্র তথা বাংলা কীর্তন শুনে চোখের জল ফেলত। বলতে ভুলেছি, বাঙালী গুরুর কাছে কুড়ি বৎসর থেকে তিনি চমৎকার বাংলা বলতে শিখেছিলেন, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসের কীর্তনও গাইতেন নিখুঁৎ বাংলা ঢঙে।

সখারামের অবস্থা ভাল। উচ্চশিক্ষিত বিলেত-ফেরত। প্রকাশক। বয়স পঁয়ত্রিশ। নারায়ণ পেঠে মস্ত তিনতলা পাথরের বাড়ী। পাথর পুণায় সস্তা, তাই শহরের অনেক বাড়ীই পাথরের। নিচের তলায় গুদামঘর ও প্রেস, দোতলায় সখারাম অনসূয়াকে নিয়ে থাকত চারটি ঘরে। ওদের সন্তান হয় নি—কাজেই দোতলায় বেশ আরামেই থাকত বৈকি। তিনতলায় ছিল একটি বড় হলঘর, একটি ছোট ঘর আর ছাদ, ছাদের সঙ্গে একটি কুঠরি। সাধুজির কাছে দীক্ষা নেবার পরে এই ঘরদু'টি ওরা তাঁর জন্যে সাজিয়ে রাখল। তিনি পুণায় এলে শুধু ওদের ওখানেই থাকতেন ও ভজন করতেন নানা পূজা-পার্বণে।

সখারামের বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপারে একটি অনাথ আশ্রম। সেখানে বারোটি অনাথ বালক আর কুড়িটি মারাঠী ও সিন্ধি অনাথিনী থাকত—কুড়ি থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের। এরা প্রায় সবাই সখারামের ওখানে "সাধুজি"-র ভজনে যোগ দিত।

অনাথাশ্রমের দক্ষিণ দিকে একটু দূরে মুতা নদীর খুব কাছেই একটি ছোট এ তলা বাড়ীতে দু'টি ঘরে থাকত ভক্তি। মারাঠী মেয়ে, বিধবা, বয়স বছর ত্রিশ। একটি মাত্র সন্তান—মণি দশ মাসের শিশু। বড় সুন্দর ছেলে, অনাথাশ্রমে তাকে আদর করতে মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যেত। নিঃসন্তানা অনসূয়ারও ছিল সে বড় আদরের। ভক্তিকে তিনি বলতেন বোন, ভক্তি তাঁকে বলত দিদি। অনসূয়া ভক্তির চেয়ে বছর দুই বড়।

ভক্তিও ছিল স্বভাবে ভক্তিমতী। মারাঠী মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সাধুসন্ত দেখলে উজিয়ে ওঠে, ভক্তিসঙ্গীতে—বিশেষ ক'রে অভঙ্গে—চোখের জল ফেলতে তাদের জুড়ি নেই। কাজেই ভক্তিও দিদির সঙ্গে সাগ্রহেই তুকারামের এই পরম ভক্তের কাছে দীক্ষা নিল। নারায়ণ পেঠে এরা ছিল ওঁর অন্তরঙ্গ-বৃত্তের মধ্যে।

দীক্ষা নেওয়ার ঠিক আগেই ভক্তি বিধবা হয়। স্বামীর জীবনবীমার ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে সে সখারামের হাতে দেয়, সে নিজের প্রেসের ব্যবসায়েই টাকাটা খাটায়। ফলে ভক্তি মাসে শতাধিক টাকা পেত। এ ছাড়া সে খুব সুন্দর পশম বোনার কাজ জানত। পাড়ায় তার স্বভাবের গুণে অনেক গৃহিণীই তাকে সানন্দে কাজ দিতেন। এতে ক'রেও সে মাসে গড়ে পঞ্চাশ-ষাট টাকা উপায় করত। তাতেই ওর চ'লে যেত।

কিন্তু ভক্তি ছিল স্বভাবে অনলস আর সেবাব্রত ছিল তার স্বধর্ম—বলতেন সাধুজি। তাই সে অনাথাশ্রমে বিনা মাইনেয় কাজ নিয়েছিল ও সেখানে বারোটি অনাথ বালককে পড়াত হিন্দি ও ইংরেজি। উদ্বৃত্ত সময়টুকু ধ্যান, পূজা ও জপে কাটাত গৃহবিগ্রহ মুরলীধরের সামনে।

সাধুজির আর একটি প্রিয় শিষ্য ও শিষ্যা ছিল

আলোক আর তার কুমারী মেয়ে নমিতা। পুণার বাঙালীদের মধ্যে আলোক সাধুজির অন্তরঙ্গ হ'তে পেরেছিল প্রধানতঃ তার গানের জন্যে। ছেলেবেলা থেকেই সে মারাঠী ওস্তাদ রেখে রীতিমত শিখেছিল বিষ্ণু দিগম্বরের রাগসঙ্গীত তথা হিন্দিভজন; নমিতাকেও শিখিয়েছিল। সাধুজির কাছে দীক্ষা নেওযার পরে উভয়ে তাঁর সঙ্গে তুকারামের অভঙ্গ গেযে মারাঠীদের বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশী নমিতাও ছিল সুকণ্ঠী, গাইত সাধুজির সঙ্গে। পিতাপুত্রী দু'জনেই চমৎকার মারাঠী বলতে পারত। আলোকের পিতা ছিলেন পুণার নামকরা ডাক্তার। আলোকের জন্মভূমিও পুণা। তাই বিলেত থেকে ফিরে এসে সে পিতার উত্তরাধিকারী হ'ল সহজেই এবং পসারও হ'ল তার দেখতে দেখতে—শুধু সে নিপুণ ডাক্তার ছিল ব'লেই নয়, স্বভাবের গুণেও বটে, পুণার বনেদি বাসিন্দা ব'লেও বটে।

কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে? ও বিলেত থেকে ফিরে পসার হ'তেই একটি সুন্দরী মারাঠী নার্সকে বিবাহ করার পরেই স্ত্রীকে হারায়। নমিতাকে জন্ম দিয়েই বধূ ইহলোক থেকে বিদায় নেন আঁতুড় ঘরে। মাতৃহারা কন্যাকে আলোক প্রায় হাতে ক'রে মানুষ করেছিল বললেই হয়। ফলে ওদের সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল এমন সহজ তথা সুন্দর হয়ে যে, সবাই মুগ্ধ হ'ত। বলত বাপ ত নয়—বন্ধু, আর মেয়ে ত নয়—মন্ত্রী।

সাধুজির কাছে নমিতা দীক্ষা নিয়েই পণ নিল—চিরজীবন কুমারীই থাকবে। চাইল নার্স হ'তে। নার্সের কাজ শিখছিল পুণাতেই—বিখ্যাত সাসুন হাসপাতালে। আলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ।

সাধুজি আলোককে ভালবাসতেন আরো ওর অকপট ব্যবহারের জন্যে। কথায় কথায় বলতেন প্রসন্নকণ্ঠে, "ভাবের ঘরে ওর চুরি নেই। কিন্তু স্বভাব-বিশ্বাসী সখারাম আলোককে ভালবেসে তুইতোকারি করলেও আলোক ধর্মের নানা আচার-বিচারকে হেসে উড়িয়ে দিতে গেলেই রেগে আগুন হ'ত। ফলে এ দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে "বাক্যের ঝড়" প্রায়ই ওড়াত "তর্কের ধূলি"। কি ভাবে—একটু নমুনা না দিলেই নয়। গল্পের সুরুও সেখান থেকেই।

এক

সেদিন দশহরা লক্ষ্মীপূজা—২৩শে জুন, ১৯৬১। অনসূয়া যথাবিধি গঙ্গাপূজা করার পরে সাধুজি গাইলেন:

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে!
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে!
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিম্,
তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।"

তার পরে আলোক ও নমিতা গাইল:
"পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে"।

গানের পরে আলোক হঠাৎ ব'লে বসল, "সত্যি সাধুজি, আমার সময়ে সময়ে অবাক্ লাগে ভাবতে—আমরা নদীকে কত সহজে দেবীর পদে বসাতে উজিয়ে উঠি! আপনিই ত বলছিলেন দেহু-র ইন্দ্রায়ণী নদীর উদ্ভব-কাহিনী—ইন্দ্রের অর্ঘ গ'লে পুণ্যসলিলা ইন্দ্রায়ণীর স্রোত হ'ল—অমনি হাজার হাজার সাধক সেই জলে স্নান ক'রে গদ্গদ!"

সখারাম টুকল: "বাঃ! ওরাও কি জর্ডন নদীকে পুণ্যসলিলা ব'লে না? পল রোবসনের Ole man river—"

আলোক বলল, "ও কিছু না। আমরা যেমন ধূপকে বলি পবিত্র—জাপানীরা ফুলকে। আমাদের গঙ্গাদেবী হলেন গঙ্গামাতা মহাদেবী—শিবের ঘরণী—যাঁকে ভক্তি করলে 'সুখমুক্তি' হাতে হাতে। এইমাত্র সাধুজিই ত গাইলেন। আর এ-সার্টিফিকেট দিলেন কে? না, জ্ঞানের মূর্তবিগ্রহ শঙ্করাচার্য। তেমনি দেখনা—এমন যে-জোয়ান দ্বিজেন্দ্রলাল যিনি যৌবনে হিন্দুধর্মের কোন সনাতন আচারকেই ছেড়ে কথা কন নি—তিনিও কিনা লিখলেন প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই: 'পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে' তখন তুমি গঙ্গামা, দয়া ক'রে 'বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।' না রে না—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী···এ সব নদীকে ভক্তি করতে না করতে আমাদের চক্ষে বয় ধারা, বক্ষে উচ্ছ্বাস! বিলেতে আমার এক খাস সাহেব বন্ধু বলতেন আমাকে বাঁকা হেসে:

"জলকে দেবী ব'লে স্তব ক'রে রাতারাতি স্বর্গের সিঁড়ি পার হবার সাধনা—এ তোমরাই পার বন্ধু! আমরা, ছাপোষা মনিষ্যি, জলের মধ্যে দেবিয়ানার কলকল্লোল শুনতে পাই না—শুধু শুনতে পাই হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের গলাগলি করলে কি হয় সেই খোসখবর।"

নমিতা টুকল: "তুমি কি যে বাবা! সাধুজির সামনে এমন ঢঙে কথা বলে?"

আলোক বলল, "বলে না, সাধুজি? যদি ধমকে বলেন, 'না', মেনে নেব বাধ্য-শিষ্য হয়ে।"

সাধুজি হেসে বললেন, "না না বাবা, বল না যা প্রাণ চায়। তোমার খাস সাহেবদের বিজ্ঞানের আত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা কত গভীর যেদিন বুঝবে সেদিন অন্য সুর গাইবে—বিশ্বাসের সুর, সংশয়ের বেসুর ছেড়ে।"

আলোক বলল, "আপনার সংশয়ের 'পরে কি যে জাতক্রোধ! কেন সংশয়ও কি বিধাতার সৃষ্টি নয়—শুধু কি বিশ্বাসই পথ দেখায়, সংশয় কি নানা আবর্জনা সাফ ক'রে বিশ্বাসের পথিকৃৎ হয় না বলতে চান?"

সাধুজি বললেন, "বাপ্‌রে! এমন দুঃসাহসিক কথা বলতে পারি? মক্কেল হারাবার ভয় নেই?"

আলোক হেসে বলে, "আপনি কেবলই এড়িয়ে যান। কিন্তু সত্যি বলুন ত—যোগী কবি এই কি ভুল বলেছেন যখন তিনি গেয়েছিলেন:

"They are but the slaves of light
Who have never known the gloom?"

ব'লেই বাংলায় আবৃত্তি করে:

"তারা শুধু আলোকের ক্রীতদাস হায়
জানে নি জীবনে যারা কভু তমসায়।"

সাধুজি তবু ধরাছোঁওয়া দিলেন না, বললেন, "যদি ভুল না ব'লে থাকেন তাহলে তোমায় কিন্তু বাবা মহা মুশকিলে পড়তে হবে—একটিও দাস পাবে না কোনদিন।"

আলোক একটু আশ্চর্য হ'য়ে বলে, "কেন সাধুজি?"

সাধুজি মুখ টিপে হাসলেন, "কারণ আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও এমন একটি মানুষও খুঁজে পাবে না, যে জীবনে অন্ধকারের খপ্পরে না প'ড়েই সরাসর আলোর গৌরীশঙ্করে তাঁবু ফেলেছে।"

আলোকও নাছোড়বন্দ, বলে, "না সাধুজি, বার বার অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না। আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার। বলতেই হবে আপনাকে—সত্যিই কি কেউ সংশয়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়েই সটাং পৌঁছতে পারে যথার্থ বিশ্বাসে?"

সাধুজির ঠোঁটে হাসি আরো যেন বাঁকা হ'য়ে উঠল, বললেন, "বাবা, সংশয় ত আমাদের দেহ-মন-প্রাণের তন্তুতে তন্তুতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এ-হেন ছিনে-জোঁকের ওকালতি নাই বা করলে? ঘর হাজার বন্ধ ক'রে রাখলেও মাটিতে ধুলো জমে। তাই ব'লে কি সুবুদ্ধি বলে, 'যাকে ঠেকানো যায় না তাকে প্রশ্রয় দেওয়াই উচিত?' না বাবা, আমার গুরুদেব উঠতে-বসতে আমাকে শাসাতেন একটি লাখ কথার এক কথার ধমকে, যে, আমরা জানার মতন অনেক কিছুই জানতে পারি না—জানতে চাই না ব'লে। এই না চাওয়ার মূলে ঘুপ্‌টি মেরে রয়েছে ঐ যত নষ্টের গোড়া সংশয়। তোমরা কথায় কথায় বিলিতি বুলি কপচাও, knowledge is power, কিন্তু রাজসিক যাজ্ঞিক হ'তে গিয়ে বেমালুম ভুলে ব'সে আছ যে, ভারতে আমরা যে প্রজ্ঞাকে 'শক্তিদাত্রী' উপাধি দেই তার নাম পরাবিদ্যা ওরফে আত্মজ্ঞান। এ পরমা শক্তির বর পায় কেবল সেই ভাগ্যবান্ যে তার মনের জমিতে বিশ্বাসের আবাদ ক'রে সোনা ফলিয়েছে—যার সংস্কৃত নাম শ্রদ্ধা, সাহেবি নাম faith, তাই ত ঠাকুর গীতায় বলেছেন অত জোর ক'রে যে জ্ঞানের আলো আসে শ্রদ্ধার প্রণালী বেয়েই, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

সখারাম টুকল, "কিন্তু ও শ্রদ্ধাবান্ হবে কী দুঃখে সাধুজি, যদি আপনি ওকে ধমকে না দিয়ে ধরেন কাকুতি-মিনতির সুর?" ব'লেই আলোকের দিকে চেয়ে, "গুরু-করার পরে এ কী সব ফাজিল তর্ক শুনি? গীতায় বলে নি কি যে 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি?"

আলোকের রোখ চেপে গেল, বলল, "এ তোর গাজোয়ারি কথা সখারাম! সংশয় যদি মানুষকে শুধু সর্বনাশের পথেই রওনা ক'রে দিত তাহ'লে আজ ওদেশে বিজ্ঞানীদের এ অদ্ভুত সমৃদ্ধি হ'ত কি?"

সখারাম হো হো ক'রে হেসে উঠল, "সমৃদ্ধি ত ঘণ্টা! সারা জগৎ আজ ভয়েই কম্পমান—কখন অনীয়ান্ দেবতা মহীয়ান্ অপদেবতা হয়ে ফেটে পৃথিবীকে চৌচির করবেন—অথচ সঙ্গে সঙ্গে জাঁক কত, 'দেখ, আমরা আকাশে উল্কাবেগে পৃথিবীর চারদিকে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরে কী দুর্দান্ত দাপট দেখাচ্ছি গতির দামামা বাজিয়ে!' শুধু কি তাই? আস্ফালন কত, আজ চাঁদে ঢুঁ মারব কাল মঙ্গলগ্রহে লাফ দিয়ে নিষ্কর জমিতে সোনা ফলাব, পরশু শনির বুকে গুঁতিয়ে বুঝিয়ে দেব আমরা কে? শনির দশা কথাটা সাধুজির মুখেই শুনেছি তোমাদের বাংলা প্রবচনে। হাসব না কাঁদব ভেবে পাই নে—শান্তি গেল, ভক্তি গেল, মৈত্রী, করুণা, সহিষ্ণুতা, সংযম, তপস্যা, সব গেল চুলোর দোরে—রইল শুধু গতির আর হুজুগের দুর্ভোগ! উত্তর দিক দিয়ে হিমালয়ের চূড়ায় ওঠা হ'ল—এবার দক্ষিণ দিক দিয়ে হানা দেব—অমনি সবাই সঘনে হাততালি, 'উঃ! এঁরাই তো অতিমানব!' শুনবি মজা? আমি গত বছর

আমেরিকা গিয়েছিলাম অহুকে নিয়ে। ও তো হেসেই কুটি-কুটি—এক ডজন ধূম্রলোচন পাল্লা দিলেন পরস্পরের সঙ্গে কে কতক্ষণ একটানা সিগার ফুঁকতে পারে। যে সাতাত্তর ঘণ্টা পারল সে জিতে পেল তিন হাজার ডলার পুরস্কার। ভাবতে পারিস? হুজুগের হাঁকডাকে ভুলে কোন্ গোলকধামের পানে চলেছে ওরা বিজ্ঞানের খাসতালুকে?"

আলোক তেতে উঠে বলল, "সিগার প্রতিযোগিতা আর আকাশে ঘোরার প্রতিযোগিতা এক হ'ল? কী বলছিস রে মূঢ়? বিশ্বাস বিশ্বাস জপতে জপতে শেষে কি তোর বুদ্ধি লোপ হ'ল না কি? সাধুজি! কী বলেন আপনি? আপনাকেই সালিস মানলাম। রায় দিতেই হবে।"

সাধুজি স্নিগ্ধ হেসে বললেন: "ধীরে, রজনী! ধীরে! মুনি-ঋষিরা বলেন, 'অশান্ত কখনো সত্যের দিশা পায় না, আর তর্কাতর্কি আনে অশান্তিই সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে।' তাই উপনিষদে বলেছে 'নৈষা তর্কেন মতিরাপণীয়া'। আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো তবে আমি শুধু বলতে পারি আমার কাছে সেই পরম-বেদ্যই উপাস্য, মন বুদ্ধি তর্ক যুক্তি যাঁর নাগাল পায় না।" ব'লেই সখারামের দিকে চেয়ে, "তুমি ওদের হুজুগ আর গতির নেশার কথা তুললে। কথাটা ভুল বলো নি। কারণ গতি আনে একটা তীব্র স্নায়বিক উত্তেজনা যাতে ক'রে দিগ্ভ্রম হয় প্রায়ই। কিন্তু সেই সঙ্গে এও কি সত্যি নয় যে, স্থিতিকে গতিই সম্পূর্ণ করে? কিংবা ধরো, বলা যেতে পারে—স্থিতির প্রশান্ত মহিমার বা সমাধির শাশ্বত রসের রসিক হ'তে শিখি আমরা তখনই যখন ঠেকে শিখি যে, হুজুগে হাওয়ার হাওদায় চেপে শান্তিলোকে পৌঁছানো যায় না। নির্লক্ষ্য গতির রথে চ'ড়ে শেষে চোরাবালিতে পৌঁছিয়ে তবেই না আমরা খুঁজতে সুরু করি আস্বর্যমান অচল-প্রতিষ্ঠ আনন্দ্ লোকের চাবিকাঠি। হয়েছে কি জানো? ওদের বেসামাল প্রাণশক্তিই ওদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারছে শক্তির মদে মাতাল ক'রে। তাই ওরা থামতে পারছে না। অন্তরের মধ্যে অমৃত সমুদ্র কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দেবারও সময় নেই, তাই চলো গৌরীশঙ্করে, মেরুজয়ে, সমুদ্রের অতলে, বাষ্পবায়ুলোকের ওপারে। একেই ওরা নাম দিয়েছে গতির প্রগতি, বিশ্বাতীত বস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞান সিদ্ধি। এ-তাগিদেরও প্রয়োজন আছে, পূর্ণতম আত্মবোধের অগ্রদূত হয়েই হয়ত এসেছে এ-যুগে এই গতির নেশা হুজুগের হামবড়াই। হয়ত অবিশ্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে শেষে গতিক্লান্ত হ'য়েই ওরা অবশেষে হঠাৎ এমন কোন একটা দিব্য চেতনা লোকের দিশা পেয়ে যাবে ফলে ওদের চোখের ঠুলি খসে পড়বে আর তখন ওরা দেখতে পাবে অন্তরাত্মার গহনলোকে যে-অফুরন্ত ঐশ্বর্য বৈচিত্র্য চমক আমাদের আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে, তার কাছে বস্তু জগতের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারও নগণ্য। তখন এই সব নাস্তিক বিজ্ঞানীরাই হয়ে উঠবে রাতারাতি আশ্চর্য আস্তিক। আমাদের খাম-খেয়ালী ঠাকুরটি কাকে যে কবে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় টেনে তাঁর আপন ক'রে নেন, কেউ কি জানে বাবা?"

নমিতা খুব মন দিয়ে শুনছিল, হঠাৎ আলোকের পানে তাকিয়ে বলল: "বাবা! কাল পরমহংসদেবের কথামৃত পড়তে পড়তে তাঁর একটি উপমা বড় চমৎকার লাগল। মনে আছে তোমার—তিনি বলতেন, একটা পাখি অকূলপাথারে জাহাজের মাস্তুলে ব'সে। একবার উড়ে উত্তরে যায়, ফিরে আসে কূলের দেখা না পেয়ে। তার পর দক্ষিণে, পূর্ব, পশ্চিমে। ঘুরে ঘুরে কোন দিকেই কূল-কিনারার দিশা না পেয়ে সে শেষটায় কায়েম হ'য়ে মাস্তুলের উপরেই বসল—জাহাজ যেখানে নিয়ে যায়। অর্থাৎ হতাশাই শেষে এল শাপে-বর হ'য়ে, দিল নিশ্চিন্তির পরম দিশা। এরই নাম বুদ্ধি আত্ম-সমর্পন—বহুদূরের পর কুটীচক, না সাধুজি?"

অনসূয়া খুশী হ'য়ে বলল: "বেশ বলেছিস তুই। কী বই বললি—কথামৃত?"

ভক্তি বলল: "হ্যাঁ দিদি। পড় নি তুমি? এর অনুবাদ হয়েছে ইংরাজীতে। আমার কাছে আছে, পড়বে?

সাধুজি বললেন প্রসন্ন কণ্ঠে, "হ্যাঁ মা, তোমরা সবাই প'ড়। এ যুগের গীতা হ'ল 'কথামৃত'—বলতেন আমার গুরুদেব। আমি কতবারই যে পড়েছি!" ব'লে নমিতার দিকে চেয়ে, "তবে কি জানো মা? শুধু পড়লেই হয় না। ঐ কথামৃতেই দেখতে পাবে ঠাকুর বলেছেন, 'সময় না হ'লে হয় না।' তাই ত অনেক ঘুরে তবে আসে শান্তির তৃষ্ণা, অনেক ঘা খেয়ে তবে আসে পরম নির্বেদ। তবে এ আমি দেখেছি মা যে, মেয়েরা স্বভাবে তর্কের ঘুরপাকের বিরোধী ব'লেই শান্তির ভক্তির প্রেমের পূজারিনী হতে পারে পুরুষদের চেয়ে সহজে। পুরুষ ছাড়তে বেগ পায় আমির অভিমান—মমকার আর অহঙ্কার। কিন্তু তোমরা, মেয়েরা, যদি একবার ভালবাস আর ভালবাসতে তোমরা

পুরুষদের চেয়ে বেশি পটু, মানতেই হবে—তাহলে আত্মসমর্পণের ডাকে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সহজে সাড়া দিতে পারে। তাই ত বৈষ্ণবরা বলেছেন—গোপীরা যে-বাঁশি শুনে এত সহজে ঘর ছেড়েছিল সে-বাঁশি শুনতে হ'লে প্রতি হৃদয়কে হ'তে হবে হিয়া-রাধা, যার শুধু একটি কামনা—যা কিছু আছে সবই তাঁর চরণে প্রেমের আনন্দে প্রণামী দেওয়া। তুমিই কাল গাইছিলে না—কী গানটি যেন? গাও না মা, তর্ক ঢের হয়েছে—এবার গান করুক্ শান্তিকণ্ঠ।''

নমিতা গাইল গুন গুন ক'রে আলোকের সঙ্গে—

কৃষ্ণের মঞ্জীরে মন্দ মৃদু সমীরে
ধায় কালিন্দীতীরে রাধা-হিয়া অভিসারে।
মন্থর আশা কুঞ্জে নন্দন ফুল মুঞ্জে
মর্ম ভৃঙ্গ গুঞ্জে বসন্ত ঝঙ্কারে॥
দোল-দোল দোল গানে জয়-জয়-জয় তানে
উধাও অলখপানে রাধাহিয়া সুখ-স্বপ্নে।
অচিনের অনুরাগে ঘুমন্ত প্রেম জাগে
মধুরের ঢেউ লাগে—মিলন-তৃষ্ণা লগ্নে॥
অম্বর গলে পুলকে, দ্যুলোক নামিল ভূলোকে,
সন্ধ্যার ছায়া অলকে জ্যোৎস্না দুলায় মালা।
অদেখা বঁধুর বাঁশি বাজিল চিত উদাসি'
"আয় আয় ব্রজবাসী! আয় আয় ব্রজবালা!"
রাধা-হিয়া গায় উছলি' "লহ বল্লভ, সকলি,
শুনি' ঘরছাড়া মুরলী চিনেছি তোমারে স্বামী!
তোমারেই চির সুন্দর! চেয়েছি যুগ-যুগান্তর,
তনু মন প্রাণ অন্তর চরণে সঁপি প্রণামী।''

সাধুজি শুনতে শুনতে ভাবস্থ। বললেন ভাবমুখে, "এই এই—এই-ই হ'ল সত্যের সত্য মা! আর সবই বড় জোর আংশিক সত্য। শুধু এই তনু মন প্রাণ—সর্বস্ব—তাঁর চরণে নিবেদন ক'রে তবে মানুষ পেতে পারে তাঁর পায়ে ঠাঁই—যেখানে পৌঁছলে সব তর্কাতর্কির শান্তি; সব ঘুরে মরার সমাপ্তি; সব গতির মোহের ক্লান্তির অবসান। তখনই ভক্ত বলে, 'প্রভু, ভবভয় হতে তারণ কর—পাহি মাং কৃপয়া দেব অগতীনাং গতির্ভব', তিনি বরাভয় দিয়ে বলেন, 'মা ভৈঃ, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—আমি যাকে রাখি, তাকে মারে কার সাধ্য'?"

আলোক একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, "অভয় পেতে না চায় কে সাধুজি? কেবল—না, সখারাম ফের রাগ করবে।"

অনসূয়া হেসে বলে, "না না, বলুন দাদা।"

আলোক বলে, "কেবল যদি একবার দেখতে পেতাম স্বচক্ষে, তবে বর্তে যেতাম।"

সাধুজি হেসে ফেললেন, "যদি কি দেখতে পেতে? ভগবানকে? না, পরব্রহ্মকে?"

আলোক হেসে বলে, "না, বাড় এখনও অতটা বাড়ে নি। আমি শুধু দু'একটা দৃষ্টান্ত দেখতে চাই যে, এ ঘোর কলিতেও ঠাকুর কথা দিয়ে কথা রাখেন—তাঁর ভক্ত ম'রেও মরে না।" ব'লেই করজোড়ে, "একবার দেখান না সাধুজি! শুনেছি আপনি নাকি পারেন দেখাতে।"

সাধুজি দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই বাবা। আমি কে বল দেখাবার? কতটুকুই বা বুঝি তাঁর লীলার ছন্দের? জানি ত হাড়ে হাড়ে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি বাবা, যে, অযোগ্য হয়েও আমি ঠাকুরের অপার করুণার কিছু ছিটেফোঁটা পেয়েছি, আর ভক্তি প্রেম কাকে বলে একটু দেখতে পেয়েছি এই বিশ্বাসের পথেই। তাই ত তোমাদের বলতে পারি এও জোর ক'রে যে, সত্যি সত্যি বিশ্বাস যে করে সে তাঁর করুণা পায়ই পায়। কাজেই বিশ্বাসকে নিয়ে যারা হাসা-হাসি করে তাদেরকে বলতেই হবে 'দুর্ভাগা'—কেননা করুণা আসার প্রণালীটাই তারা বুঁজিয়ে দেয় সংশয়ের বাঁধ তুলে। তাদের জন্যে দুঃখ হয় বৈকি, তাদের এখনও অনেকদিন ভুগতে হবে ব'লে। তবে তারাও শেষে পাবেই পাবে বিশ্বাসের চাবি, ভক্তির দিশা, তৃষ্ণার জল। ঠাকুর কাউকেই ফেলেন না বাবা—অসুরকেও একদিন না একদিন দেবতা হতেই হবে। গুরুদেব বলতেন, 'শ্রীক্ষেত্রে কেউই অভুক্ত থাকে না, তবে কেউ প্রসাদ পায় সকালে, কেউ বা সন্ধ্যায় এই যা'।"

দুই

গুজরাটি বস্ত্রবণিক্ মনুভাই কাপাডিয়া সঙ্গম ব্রিজের কাছে মুতা নদীর পাড়ে একটি চমৎকার ছবির মত বাংলোয় হাঁকডাক ক'রেই থাকত। কলকাতার দু'দুটি মিল্‌এ সে বিস্তর টাকা উপায় করেছিল। আলোক ও নমিতা তার নাম দিয়েছিল "টাকার কুমীর"। বাস্তবিক মনুভাইয়ের বাংলো একটা দর্শনীয় নিলয় ছিল—বাগান, হট হাউস, সুইমিং পুল—কি নেই?

কিন্তু বঙ্কুবিহারীর চাল ত ঋজু নয়। তাই ডাক-সাইটে নাস্তিক, নিযুতপতি মনুভাই কাপাডিয়ার ঘরণী হয়ে এল কিনা গরীব ঘরের এক অশিক্ষিতা সেকেলে মেয়ে গৌরী, যে শুধু ভগবানে নয়, ভুত প্রেত দৈত্য দানা

দেখে আমারও হিংসা হয় রমা। তবে ভয়ও হয় ভাই—মিথ্যা বলব না। ভাবি—যদি এমন দেবতুল্য পিতা না পেতাম (যিনি বলেন, বিয়ে মানুষের একবারই হয়) তাহলে না জানি কি হ'ত আমার! যদি আমার সংসার হাতে এই হাল হ'ত তাহলে কি আমি পারতাম তোর মতন এ দুর্ভাগ্যকে ঠাকুরের বর ব'লে মেনে নিতে? না রমা, তোকে আশীর্বাদ করবার স্পর্ধা আমার নেই। তবে তোকে দেখতে ইচ্ছা হয়, তোর সেবা করতে ইচ্ছা হয় তোর এ দুর্লগ্নে।"

উত্তরে রমা লিখল, "দিদি, ভরসা যখন দিয়েছ তখন ঠাঁই দেবে দু'টো দিন? আমার আজ আট মাস। উনি পাঠাতে চান পুণায়—মার কাছে। কিন্তু 'আমার মা'—ভাবলেও হাসি পায় না কি? অথচ উনি বলেন, কলকাতায় ওঁর নানা কাজ, কাজেই—কি করি বল ত? মেটার্নিটি হাসপাতালে যাবার কথা আমি ভাবতেও পারি না যে!"

নমিতা এ চিঠি দেখিয়ে আলোককে ধরল, "ওকে এখানেই আনতে হবে বাবা। তুমি ডাক্তার—সব দিক্ দিয়েই ত ভাল।"

আলোক আর্দ্র-কণ্ঠে মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বলে, "মা, মনটি তোমার মমতার মাখন দিয়ে গড়া। কিন্তু যা হবার নয় তা ভেবে কি হবে বল? মনুভাই কিছুতেই রাজী হবেন না। বলবেন, এতে তাঁর মাথা-কাটা যাবে। সংসারী ত হও নি মা, তাই জান না আজও যে সংসারীরা সব পারে, কেবল ঠাট বজায় রাখতে না চেয়ে পারে না।" ব'লে বাঁকা হেসে, "অপি চ, শ্রীলশ্রীযুক্তা শোভনা দেবী কি অশোভন কিছু করতে পারেন?"

নমিতা রুখে উঠে বলল, "আচ্ছা দেখ, আমি পারি কি না।" ব'লে একাই মোটর হাঁকিয়ে ছুটল মনুভাইয়ের ওখানে।

মনুভাইয়ের গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, "তা কখনও হয়? আমাকে সমাজে বাস করতে হয়, লোকের কাছে মুখ দেখাতে হয়। আমি নিজে গিয়ে ওকে নিয়ে আসছি। প্রসব এখানেই হবে।"

নমিতা বাইরে আসতেই মনুভাই তার পিছনে পিছনে এসে বলল, "শোন নমিতা, শোভনা কি বস্তু আমি জানি, কেবল আমি অমানুষ হয়ে গেছি আজ···" ব'লে চোখের জল চেপে, "নইলে কি মেয়ের এ অবস্থা হ'ত আজ? ওর কিসের অভাব ছিল?"

নমিতা রুষ্ট স্বরে বলল, "লজ্জা করে না আপনার পুরুষ হয়ে কাঁদুনি গাইতে? বাবা বলছিলেন, সংসারীরা চায় ঠাট্ বজায় রাখতে। কিন্তু আপনার ঠাট্‌ই বা কোথায় শুনি? কে না জানে আজ আপনি কার কথায় ওঠেন-বসেন? তবু চান লোকে ভাল বলবে শুধু মেয়েকে এখানে এনে রাখলে?"

মনুভাই বলল, "না, চল একটু এগিয়ে। শোভনা শুনতে না পায়—চল তোমার মোটরে একটু দূরে।"

নমিতা ওকে মোটরে তুলে নিয়ে মোড় পার হতেই মনুভাই বলল, "আমি ঠিক করেছি যে, ফের উইল করব—রমাকে অর্ধেক সম্পত্তি লেখাপড়া ক'রে দেব। অপরাধ যা করেছি তার আর উপায় নেই, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। তোমাদের শুধু বলা যে, তোমরা আমাকে জোর দিও—আমি আজ···" বলতে বলতে চোখ মুছে··· "বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে—ডাক্তার বলেছে।"

নমিতার মুখ নরম হয়ে গেল, "সে কি?"

মনুভাই বলল, "আমার পেটের মধ্যে ক্যান্সার হচ্ছে। কিন্তু সে যাক্। আমি গোপনে উইল পাল্‌টে ফেলব—কেবল তোমরা আমাকে একটু জোর দিও—তুমি, ডাক্তারবাবু আর আত্রেজি।"

নমিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলল, "বেশ কথা। আমরা আছি সবাই আপনার পিছনে। কেবল আপনি কথার খেলাপ করবেন না বলা রইল—আর দেরি করবেন না, কালই উইল পাল্‌টাবেন। কেমন ত?"

মনুভাই বললেন, "কালই? বাঃ, সে কেমন ক'রে হয়? আমার যে রমাকে আনতে আজই কলকাতা যেতে হবে···"

নমিতা ঝোঁকের মাথায় বলল, "আমি যাব—ভাববেন না।"

## চার

পাঁচদিন পরে নমিতা রমাকে তার পিতৃগৃহে পৌঁছে দিয়ে গেল অনসূয়ার ওখানে। সেখানে গিয়েই দেখে সাধুজি! আনন্দে প্রণাম ক'রে বলল, "বাবা যে বললেন ষ্টেশনে যে, আপনি দেহুতে?"

সাধুজি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, "ভক্তি কাল দেহুতে গিয়ে সব বলেছে আমাকে। তাই আমি আজ সকালে এসেছি রমার খবর নিতে। সে কেমন আছে?"

নমিতা বলল, "শরীর খুব খারাপ। তবে মনের জোর অদ্ভুত।" ব'লে রমার চিঠির কথা বলল আদ্যন্ত। পরে বলল হেসে, "ও বলে, ও মনে জোর পেয়েছে শুধু আপনারই আশীর্বাদে।"

সাধুজি হাত নেড়ে বললেন, "না না না না। আমি কে বাবা? আমার কতটুকুই বা শক্তি? এ সবই ঘটে তাঁর প্রসাদে যিনি অন্ধকারকে জড়ো করেন, বিদ্যুতের ফুলঝুরি ফোটাতে। ব'লেই হেসে, "সাধে কি তাঁর নাম ত্রিভঙ্গ মা! তাঁর যে চলনই বাঁকা, উল্টোপাল্টামিতেই আনন্দ। তাই না তিনি নিঃস্ব করেন বিশ্ব দিতে। তোমাদের বাংলা প্রবচনেই ত আছে—গুরুদেবের মুখে প্রায়ই শুনতাম, ঠাকুরের একটি প্রিয় গান হ'ল:

'যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ,
তবু যে না ছাড়ে আশ, হই তার দাসের দাস'।"

ব'লে পর পর অনসূয়া ও ভক্তির দিকে চেয়ে, "তাছাড়া তোমাদের 'মাসী' বলেও দিনে রাতে—বলতে বলতে বোনঝি বীরবালা হয়ে দাঁড়াবে না ত কি হবে অবলা?" ব'লেই নমিতার দিকে চেয়ে, "না, এ আমার কথার কথা নয় মা। ওর শরীর অপটু হওয়ার দরুণই ওকে আরও হাত পাততে হয়েছে মনের কাছে—নইলে ও দাঁড়ায় কোথায়, কার জোরে বল? ও সত্যিই চেয়েছিল মনের বা ইচ্ছার জোর যাই বল। শুনবে? একবার ও দেখতে গিয়েছিল আলোকের মোটরে। আমি ভজন গাইছিলাম বিগ্রহের সামনে। এক ঘর লোক। সন্ধ্যা আটটা হবে। ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে এক কাঁকড়া-বিছে কামড়াল ওকে। আলোক বিছেটাকে তখনই মেরে ফেলল। কিন্তু ও টু-হাঁও করল না, শান্ত-মুখে এসে বসল, ও এক ঘণ্টা সমানে ভজন শুনে আলোকের সঙ্গে ফিরে গেল—যেন কিছুই হয় নি। আলোক বলে নি?"

নমিতা বলল, "হ্যাঁ, বলেছিলেন।" ব'লে একটু থেমে, "বাবা সেদিন বলছিলেন একটি কথা, বলব?"

সাধুজি হেসে বললেন, "দয়াল ঠাকুরের দয়ার বিরুদ্ধে ত? জানি ও কালও ফের বলেছে আমাকে।"

নমিতা উৎসুক কণ্ঠে বলল, "কি?"

সাধুজি বললেন, "আমি ওকে যেই বলেছি, 'রমাকে বল শুধু ঠাকুরকে ডাকতে, আর ভাবতে—তাহলে সব বিপদই কাটবে—' অমনি ও যেমন দুমদাম ক'রে কথা বলে জানই ত—ব'লে বসল, 'তাঁকে ডাকলেই যদি বিপদ্ কাটত সাধুজি, তাহলে কি আর জগতের এ-চেহারা হ'ত আজ—বিশেষ ক'রে মেয়েদের? এই দুর্ভাগা মেয়েটার কথাই দেখুন না। এত ভক্তিনিষ্ঠা মনের জোর যার—তাঁকে যে এত ডাকে চোখের জলে তার আজ কি অবস্থা বলুন ত? বাপ থেকেও নেই, স্বামী রক্ষক হয়েও দেয় গঞ্জনা উঠতে-বসতে—শেষে এই একান্ত অসহায় অবস্থায় এমন কি আমাদের কাছেও আশ্রয় নিতে পারল না। কেন? না সমাজে ওর বাপের ঠাট বজায় রাখতে হবে।' ব'লে রেগে গিয়ে, 'আর দেখুন তো ওর সৎমাটিকে—যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি কুটিল—অথচ তারই কিনা আজ বোলবোলা—সব সম্পত্তি হ'ল একা তার! না সাধুজি। আপনার সাধের ঠাকুরটি দ্বাপরযুগে হাতে মারতেন না ভাতে জানি না, কারণ চোখে দেখি নি তাঁর কীর্তিকলাপ। কিন্তু স্বচক্ষে যা দেখি দিনের পর দিন তাতে ত কেবল রামপ্রসাদের অভিযোগের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মায়ের এমনি বিচার বটে
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে তার কপালেই বিপদ ঘটে'।"

নমিতার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, "বাবার ভা—রি—"

সাধুজি হেসে বললেন, "না মা। ও সেভাবে বলে নি। এ সত্যিই ভালবাসার অভিমান—যেমন রামপ্রসাদের। তাই ত আমি এত উপভোগ করি ওর মিষ্টি রাগ। নৈলে কি আমি হেসে জবাব দিতে পারতাম পিঠ পিঠ গীতাকে ঢেলে সাজিয়ে?"

নমিতা সকৌতূহলে শুধাল, "ঢেলে সাজিয়ে?"

সাধুজি হেসে বললেন, "আমি বললাম, বাঙ্গি বা! এবার তুমি গীতার একটা নতুন সংস্করণ বার ক'রো ঐ শ্লোকটা শুধরে দিয়ে:

'বিনাশায় হি সাধূনাং পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাম্
অধর্মস্থ স্বরাজার্থং সম্ভবামি যুগে যুগে'।"

ব'লেই থেমে গম্ভীর হয়ে, "কিন্তু ঠাকুর মিথ্যা বলতেই পারেন না। তাই তোমাদের বলছি আমি বড় গলা ক'রেই মা, যে, ঠাকুর আমার ঠুঁটো নন। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার নয়, কেবল মনে রাখা চাই এ হ'ল শেষরক্ষার কথা। কারণ তাঁর লীলা পোক্তাই হবার জন্যে অনেক সময়েই মিথ্যার প্রথম দিকে হয় জয়।"

অনসূয়ার মুখের মেঘ কেটে গেল, বলল, "আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা! কারণ, মনকে বোঝালেও প্রাণ কাঁদে মেয়েটার জন্যে। অথচ ওর দজ্জাল সৎমা কিছুতেই আমার এখানে আসতে দেবে না। আমি কত ক'রে বললাম তাকে কাল। কিন্তু সে মিষ্টি হেসে বলল, সে কি হয় দিদি, এ-সময়ে কি মেয়েকে কোন মা প্রাণ ধ'রে আর কোথাও থাকতে দিতে পারে? দেখুন একবার ওর ঢং। ম'রে যাই—মেয়ের জন্যে ভেবে ভেবে ত ঘুম হচ্ছে না। কেবল বাবা!"...ব'লে চোখে আঁচল দিয়ে,

"আপনি আশীর্বাদ করুন যেন এমন মেয়েটার দুর্গতি না হয়।"

সাধুজি ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, "মা, তিনি কাকে কোন্ আঘাটা থেকে কোন্ ঘাটে টেনে তোলেন কেউ কি জানে?"

ভক্তি টুকল, "কিন্তু মন যখন কাতর হয় তখন জানতে যে চাই বাবা! আরো দুঃখ হয় ভাবতে—শেষমেশ কিনা আমারই বোন হয়ে দাঁড়ালো এমন কুচক্রা, নিষ্ঠুর, লোভী—কি নয় শুনি?"

সাধুজি বললেন, "কিন্তু জানবে কেমন ক'রে? মন দিয়ে ত? ভাগবতে ভীষ্ম বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে:

'ন হ্যস্য কর্হিচিৎ রাজন্! পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যাদ্ধি জিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি॥'

অর্থাৎ যোগী ঋষিরাও টের পান না তাঁর গূঢ় চাল—কখন বোড়ের চালে কিস্তি মাৎ করবেন কি ভাবে।"

নমিতা একটু হাসে, "আমাদের ঘরোয়া বাংলায় বলে এই কথাই একটু অন্যভাবে সাধুজি, যে, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।"

সাধুজি প্রসন্নকণ্ঠে বললেন, "সাধু সাধু! কেবল আর একটু জুড়ে দিতে চাই আমি—যেকথা ওস্তাদজি নিজেই ফাঁস করেছেন রুক্মিণীকে এক অসতর্ক মুহূর্তে, যে, তিনি শেষ রাত্রে বাঁচান সব আগে তাঁদেরই, যাঁরা নিঃস্ব অকিঞ্চন, কেননা তিনি নিজে নিঃস্ব অকিঞ্চন ব'লে সবচেয়ে ভালবাসেন দুঃস্থকেই:

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বৎ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।"

## পাঁচ

রমা পিতৃগৃহে ফিরে এল জুলাই মাসের ৫ই তারিখে। একেই শরীর দুর্বল তার উপর পিতৃগৃহে নিত্য অশান্তি ওকে নিয়েই। দুদিনেই যেন ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এর চেয়ে যে স্বামীর গঞ্জনাও ছিল ভালো। শেষে আর না পেরে নমিতাকে টেলিফোন করল, "একটি বার এসো ভাই। কাকাবাবুকেও নিয়ে এসো—এক্ষণি। মা গেছেন বাজারে, বাবাও বাড়ি নেই। দেরি ক'রো না কিন্তু। কথা আছে।"

আলোককে নিয়ে নমিতা ছুটল তক্ষণি মোটরে। রমা নমিতাকে দেখেই জড়িয়ে ধ'রে ভেঙে পড়ল কান্নায়।

আলোক জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে রমা?"

"আমাকে নিয়ে চলুন কাকাবাবু এখান থেকে—আজই। নৈলে আমি বাঁচব না।"

নমিতা আলোকের মুখের দিকে তাকাল। আলোক মাথা হেঁট ক'রে ভাবে।

এমন সময়ে ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

রমা দোর খুলে দিতেই দেখে অনসূয়া, সঙ্গে সাধুজি।

আনন্দে ওর ম্লান মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "সাধুজি!!"

অনসূয়া ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ মা। সাধুজি নিজে থেকেই এলেন, বললেন, তোমার বড় দরকার।"

রমা ওঁর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম ক'রে বলল, "কত করুণা আপনার!...সত্যিই আমি কেবলই ভাবছিলাম আপনার কথা। ভাবছিলাম...ছুটে যাই দেখতে। কেবল...এখন ত আমার মোটর চড়া বারণ...তাই..."

ব'লেই মুখ নিচু করল।

সাধুজি হেসে বললেন, "জানি মা। ডাক পৌঁছেছিল। তাই ত আমি ছুটে এলাম। চ'লো বসি। কথা আছে। তোমার মা-বাবা ফিরবার আগেই কেটে পড়তে হবে তো।"

রমার সুরে কৌতূহল জেগে ওঠে, "মা-বাবা বাড়ী নেই আপনি কেমন ক'রে জানলেন। নমিতাদি টেলিফোন করেছিল না কি?"

সাধুজি দ্ব্যর্থক হাসি হেসে বললেন, "না মা, টেলিফোন করেছিল বটে একজন, কিন্তু বাঁশির মারফৎ, তারের নয়।"

রমা অতিথিদেরকে বৈঠকখানা ঘরে মস্ত ফরাসে বসিয়ে সাধুজিকে বলল, "এবার বলুন—কি ব্যাপার।"

সাধুজি বললেন, "আগে শুনি, তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চ'লে যেতে চাইছ কেন?"

রমা আশ্চর্য হয়ে বলল, "কেমন ক'রে জানলেন? আন্দাজ?"

সাধুজি ফের হাসলেন, "অবান্তর কথা থাক্—তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও আগে—তোমার বাবা-মা ফিরলেন ব'লে।"

রমার মুখে হঠাৎ মেঘের ছায়া নেমে এল, সে মুখ নিচু ক'রে বলল, "প্রবীর আজ আমাকে..." বলতে বলতে চোখ ওর জলে ভ'রে এল... "যা তা ব'লে গাল দিয়েছে—আমার মা'র ছবি, আপনার ছবি—সব টান মেরে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে..." ওর চোখের জল আর বাধা মানে না।

অনসূয়া ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে মাথাটি গভীর স্নেহে বুকে টেনে নিয়ে বলল, "তুই চল্ এক্ষণি আমার সঙ্গে। তোকে এ নরককুণ্ডে আর থাকতে দেব না কিছুতেই।

সাধুজি অনসূয়ার মাথায় হাত রেখে শান্তকণ্ঠে বললেন, "না মা। ওকে এখানেই থাকতে হবে এখন। সেই কথা বলতেই আমি ছুটে এসেছি।"

নমিতা আতপ্ত স্বরে বলে, "এখানেই থাকতে হবে? কেন গুরুদেব? নরকে ব'সে মাথা না খুঁড়লে কি স্বর্গের সিঁড়ির খোঁজ পাওয়া যায় না?"

সাধুজি কোমল কণ্ঠে বললেন, "রাগ ক'রো না মা। মনে রেখো তুমি দীক্ষা নিয়েছ।"

নমিতা মাথা নিচু ক'রে বলে, "আমার অন্যায় হয়েছে গুরুদেব। কিন্তু ওকে এখানেই থাকতে হবে কেন—বলুন দয়া ক'রে—আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

সাধুজি বললেন, "তুমি তো ঠাকুরের কথামৃত পড় রোজই। মনে আছে তিনি কী বলতেন? যে সয় সে-ই রয়?"

অনসূয়া চোখের জল মুছে বলে, "আপনি যখন আদেশ করছেন বাবা, তখন কি আর বলব বলুন? কেবল ভয় হয়—এমন লক্ষ্মীপ্রতিমাকে পাছে অকালে বিসর্জন দিতে হয়।"

কথাটা শেষ হ'ল চোখের জলে।

সাধুজি বললেন, "ঠাকুর অর্জুনকে বলেছিলেন 'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'—যে মন্ময়তা কাটিয়ে তন্ময় হয় তাকে তিনি সমস্ত বিপদ্ থেকে তারণ করেন।" ব'লে ফের সেই দ্ব্যর্থক হাসি হেসে: "ভক্তকে তিনি একটু পরীক্ষা করেন মাঝে মাঝে।"

আলোক টুকল, "সবই ত বুঝলাম সাধুজি। কিন্তু সবাই ত আপনার মতন তন্ময় হতে পারে না—তাই সয়ে যাও বললেই হয় না। পরীক্ষার চাপ বেশি হ'লে যদি ভেঙে পড়ে?"

সাধুজি বললেন, "বাবা, একটা ধোপাও তার গাধার পিঠে এমন বোঝা চাপায় না যাতে সে ভেঙে পড়ে। আমাদের দয়াল ঠাকুরটি কি ধোপার চেয়েও বোকা যে তিনি তাঁর ভক্তকে এমন চাপ দেবেন যাতে সে পিষে যাবে? তাছাড়া একটা কথা ভুলো না—ভুলো না—ভুলো না, যে, কৃপা পাওয়ার দায়িত্ব আছে। যে যত বড় হয় তাকে তত সইতে হয়। গড়পড়তাদেরকে অধীরতা মানায়, মহৎকে না।" ব'লে রমাকে, "তোমার মাসীমা ভক্তিকে দেখে কি শিখলে—যদি তার নির্ভর থেকে শিখতে না পার? জান ত—ওর স্বামী মারা যাওয়ার পরে এক ধনী ওকে বিয়ে করতে চায় ওর রূপে পাগল হয়ে—বলে, 'আমি তোমাকে রাণীর হালে রাখব।' ও বলেছিল, 'আমি দীক্ষা নিয়েছি—রাণীর হালে থাকতে চাই না, ঠাকুরের পায়েই থাকব তাতে আমার যে-হালই হোক না কেন।' পারবে না মা, এমন মাসীর মুখ রাখতে?"

রমার চোখের জলে হাসি ফুটে উঠল, "পারব বাবা!"

ছয়

রমাকে আশীর্বাদ ক'রে সাধুজি নমিতাকে রমার কাছে রেখে ফিরে গেলেন দেহুতে। আলোক নিয়ে গেল তাঁকে মোটরে। দেহুর পুণ্যসলিলা ইন্দ্রায়ণী নদীতে স্নান ক'রে ওর মনের তাপ জুড়িয়ে গেল। সাধুজির ঘরে এসে বসতে সাধুজি বললেন, "আজ আর তর্ক প্রশ্ন আলোচনা নয় বাবা। আশ্রয় মেলে শুধু ভজনে, নামগানে, তাঁর শরণ নিলে। গাও শুধু আত্মসমর্পণের গান। ধর ফের নমিতার বাঁধা ঐ গানটি—ওর গান বড় সুন্দর। মেয়েরা সহজেই চলে হৃদয়ের হুকুমে। বড় প্রাণস্পর্শী ওর সেই গানটি যেটি রমা সেদিন ওর সঙ্গে গাইছিল—'তমসা যখন ছেয়ে আসে।' যাকে তোমরা, সাহেবরা বল—rings true. আলোকও এ গানটি বড় ভালবাসত। আজ মনটাও ওর ভার ছিল রমার কথা ভেবে, তাই গান জমে উঠল দেখতে দেখতে শুধু সুরেলা হয়ে নয়, ভজন হয়ে। গাইল:

তমসা যখন ছেয়ে আসে
অকূলে জপিতে যেন পারি:
"সে আমারে বাসে, ভালোবাসে,
রবো আমি তারি অভিসারী।"

শৈল তাহার দুর্গম,
কালোয় আলো সে মুখ ঝাঁপে,
তবু সবি নয় ছায়া-ভ্রম
অপার-বাঁশরী প্রাণে কাঁপে।

গায় সে: "অচিন পাথারে যে
দেয় ঝাঁপ স্মরি' কাণ্ডারী,
না জেনেও জানে আঁধারে সে
সুধাও ক্ষুধার অভিসারী।"

গানের শেষে সাধুজি অনেকক্ষণ ভাবসমাধিতে মগ্ন থেকে একদৃষ্টে তাঁর ঘরের সামনে তুকারামের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে হঠাৎ বললেন, "তুকারাম আমার আদর্শ কেন জান? কারণ জীবনে নানা দুঃখ দৈন্য দুর্ভিক্ষের সঙ্গে তিনি গেছেন, অভাব অনটন

উপবাসের মধ্যেই কেটেছে তাঁর সারা জীবন—তবু কোন দিন তাঁর ইষ্ট বিঠোবা বিষ্ণুর পায়ে ছাড়া আর কোথাও ঠাঁই চান নি। কৈশোরেই বাপ মাকে হারালেন—সতেরো বৎসর বয়সে, দুর্ভিক্ষে স্ত্রী মারা গেল, একুশ বৎসর বয়সে নিরন্ন—সঙ্গতিপন্ন হ'ল পথের ভিখারী। কিন্তু ঐ যে বললাম—তুকারাম ত চান নি সম্পদ্, প্রতিষ্ঠা, সংসার, পরিবার, দেহসুখ। দিনের পর দিন অনশনে অর্ধাশনে কাটাতেন নামকীর্তনে হয় ইন্দ্রায়ণীর তীরে না হয় বিঠোবার মন্দিরে। তাঁর একটি অভঙ্গে তিনি গেয়েছেন—"

বলেই সুর ক'রে :

"চাইল আমায় জনে জনে করতে নাথের চরণ ছাড়া।
ধন মান সুখ চায় না তুকা—বোঝে না সংসারী যারা॥
বিঠল করেন দাস যাকে তাঁর—দীক্ষা সে পায় তাদের কাছে
যারা হরির দাস হয়—তাঁর চরণ রেখে বুকের মাঝে॥
সাধু তাদের নাম—যারা রয় সব ছেড়ে তাঁর চরণ ধরি।
প্রেমের ঋণে তাদের কাছেই পড়েন বাঁধা বন্ধু হরি॥"

সাত

১০ই জুলাই সখারামের ওখানে সাধুজি ভজন করলেন। অনাথাশ্রমের দাসীরা, মেয়েরা ও শিশুরা সবাই তুকারামের ভজনে তাঁর সঙ্গে দোয়ার দিল। ১১ই সকালে সাধুজিকে আলোক ফের দেহুতে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরতেই নমিতা বলল, "বাবা, শুনছি নাকি পনশেট বাঁধ টলমল টলমল করছে।"

আলোক হেসে উড়িয়ে দিল: "দূর! যত সব alarmistএর দল। ভয় দেখাতে ওদের কি যে আনন্দ! একটা গুজব পেলে হয়! তিলকে তাল করে—"

নমিতা একটু ভেবে বলল, "কিন্তু বাবা···যদি ধর এটা গুজব না হয়—তা হলে রমার কি অবস্থা হবে? না বাবা, ওকে এখানে আনিয়ে রাখ। ওদের বাড়া যে ঠিক নদীর পাড়েই—আর লোকে বলছে হঠাৎ জল আসবে—কখন যে আসবে কেউ জানে না! আর ওর যে অবস্থা বুঝতেই ত পার—ছুটতেই পারবে না।"

"আরে দূর! পুনায় কখনও বন্যা হয়? শুনেছে কেউ?"

"তুমি বাবা কি যে! শুনছি পনশেট বাঁধ ভাঙলে, সেই বিপুল জলের তোড়ে নাকি খড়গবাসলার বাঁধও ভাঙতে পারে। তা হলে?"

আলোক হাসে, "একা রামে রক্ষা নেই তা সুগ্রীব দোসর। পনশেটে শানালো না, তার উপর চাই খড়গবাসলা! কোত্থেকে জোটাস তুই এসব গুজব?"

নমিতা বলল, "সাসুন হাসপাতালে। যে নার্সের কাছে কাজ শিখতে যাই না? তারাই বলছিল।"

আলোক হো হো ক'রে হেসে উঠল, "এতক্ষণে বোঝা গেল। ওদের একঘেয়ে জীবনে এই ধরণের গুজবই শুধু আনে হৈ চৈ—রোমাঞ্চ, রোমান্স।"

"কিন্তু ধর যদি বন্যা সত্যি আসেই রাতদুপুরে, রাত দুপুরে যখন রমা থাকবে ঘুমিয়ে—"

"ওঃ! যদি—যদি—যদি! যাঃ—পালাঃ! না না, শোন্—তোকে বলতে ভুলে গেছি—সেদিন সাধুজী তোর 'তমসা যখন ছেয়ে আসে' গানটি আমার মুখে ফের শুনতে চাইলেন।"

"বাঃ! তুমি কি ওটা জান? মানে, ওর সুর?"

"ঠিক জানি না—তবে তানেই মেরে দিলাম! কিন্তু তান ব'লে নয়—সাধুজি খুব সুখ্যাতি করছিলেন তোদের। বললেন, 'মেয়েরা হৃদয়ের হুকুম মেনে চলে সহজেই—আর যারা বলে—তুকা উবাচ—তাদের প্রেমের ঋণে হরি বাঁধা পড়েনই পড়েন।' ব'লেই হেসে, এ-হেন ঋণগ্রস্ত হরি ঋণ শুধবেন কি রমারূপিণী ঋণদাত্রীকে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে? যাঃ!"

আট

১২ই জুলাই সকাল বেলা দশটায় সখারাম আলোকের ওখানে ছুটে এ'ল মোটর সাইক্লে। বলল, "শুনছি নাকি পনশেট বাঁধ ভাঙল ব'লে।"

আলোক চা খেতে খেতে বলল, "নমিতাও কাল সকালে বলছিল এ-গুজবের কথা—রটিয়েছে তার সবজান্তা সখী নার্সরা। যত সব! নে—চা খা।"

সখারাম বলল, "না রে, 'যত সব' টব নয়। এবার শুনছি সঙিন ব্যাপার! আমাকে কাল রাতে বলেছেন একজন ইঞ্জিনিয়র যিনি পনশেট বাঁধের খবর রাখেন। তাই আমি ভাবছি—রমাকে নিয়ে আয় এখানে, আর দেরি করিস নি। হঠাৎ জল এলে ও ত ছুটতে পারবে না?"

নমিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "বলি নি বাবা? তোমার সব তাতেই অবিশ্বাস।"

সখারাম হেসে বলে, "যে সাধুকে অবিশ্বাস করে সে কি অসাধুকে গড় করে নাকি? না—আমি বলি কি—হয়ত বাঁধ না ভাঙতেও পারে—তবু সাবধানের মার নেই এও কি বিশ্বাস করবি নে?"

এম্ ন সময়ে ক্রিং ক্রিং ক্রিং !···

আলোক টেলিফোন ধরতেই অনসূয়ার কণ্ঠ, "দাদা! আপনার বন্ধুকে এক্ষণি পাঠিয়ে দিন। পনশেট ড্যাম ভেঙেছে।"

"সত্যিই ভেঙেছে, না গুজব ?"

"সত্যিই ভেঙেছে। মুতা নদীতে হু হু ক'রে জল আসছে। হয়ত···"

হয়ত-টয়ত নয়। শুনছি জল আর একটু বাড়লেই টেলিফোন, বিজলি বাতি, পাখা সব বন্ধ—"

বলতে বলতে খট্ শব্দ—টেলিফোন নীরব। নমিতা ঘরের একটি সুইচ টিপল—বৃথা! আলোক ছুটল মোটরে কাছের "পাওয়ার হাউস"-এ খবর নিতে। তারা বলল মেঘলা মুখে—শুধু যে শহরের বহু তারই বিকল তাই নয়—"কম্‌সে কম্" সাত-আট দিনের আগে বিদ্যুৎ চলবে না, হয়ত মাসখানেকও পুণাবাসীদের লণ্ঠন জ্বেলে রাত কাটাতে হ'তে পারে।

আলোক মোটর নিয়ে বাড়ি ফিরেই দেখে ওর এক সিন্ধি রুগী বন্ধু সাইকেলে ছুটে এসেছে দারুণ ভয় পেয়ে। বলল তাদের পল্লী "ওয়াকডে বাড়ি"-তে কুল কুল ক'রে জল আসছে। "কি হবে, ডাক্তারবাবু?" শুধালো সে কাঁদো কাঁদো মুখে, "শুনছি সারা পুণা শহর ডুববে।"

আলোক জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে বললে, "অত ভয়ের কারণ নেই—আমি আসছি, দেখি কি করতে পারি—কেবল দেখবেন প্যানিক না হয়। দরকার হলে আমার বাড়ির সামনে মাঠে তাঁবু খাটানো যাবে—ভড়কাবেন না, কারণ গণেশবিন্দে জল আসবে না।"

নয়

আলোক নমিতাকে মোটরে নিয়ে ছুটল "ওয়াকডে বাড়ি"-র অভিমুখে, সেখান থেকে সঙ্গম ব্রিজে যাবে রমার খবর নিতে।

কিন্তু কৃষি কলেজের উত্তর দিকে পৌঁছতে না পৌঁছতে কলরব! ওয়াকডে বাড়ি-তে এসেই চক্ষুস্থির! এ কি ব্যাপার! শুধু যে নানা বাড়ির নীচু প্রাঙ্গণে জল থৈ থৈ করছে তাই নয়—মিনিটে মিনিটে বাড়ছে, চোখে স্পষ্ট দেখা যায়। দু' একটি বাড়ির বাগানে এক হাঁটু জল ঠেলে চীৎকার করতে করতে আসছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা। রাস্তাটা চার-পাঁচ ফুট উঁচু ব'লে সেখানেই সবাই জমায়েৎ হচ্ছে। প্রতি বাড়িরই দোতলার জানলায়, ছাদে, পাঁচিলে কেবল মানুষের মাথা আর মাথা ঝুঁকে দেখছে জলের কাণ্ড! মুখচোখে তাদের ভয়ের অন্ধকার। কেবল কয়েকটি ছ' সাত বছরের শিশু নেচে কুঁদে আহ্লাদে আটখানা।

একটা বাড়ি থেকে এক পঙ্গু বৃদ্ধকে দু'জন যুবক ধরাধরি ক'রে টেনে আনছে। কুকুর-বেড়াল সাঁতার দিচ্ছে। দু' একটি বাড়ির বাগানে শিশুরা পার হচ্ছে কোমর জলে মগ্ন বয়স্কদের কাঁধে চড়ে। ওকে দেখে ওর কয়েকটি সিন্ধি বন্ধু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "কি হবে ডাক্তার বাবু?" ও কি উত্তর দেবে ভাবছে এমন সময়ে দু' তিনটি সিন্ধি মহিলা ওদের মোটরের দিকে ছুটে এসে নমিতার হাতে গুঁজে দিল ওদের গহনার বাক্স।

নমিতা চিন্তিত মুখে আলোককে জনান্তিকে বলল, "ওরা বলছে চারদিকে চোর। তবে বাড়ি রেখে আসি? রাস্তায় ঘোরা চলে কি পরের গহনা নিয়ে?"

আলোক অগত্যা মোটর ফেরাল বাড়ির দিকে। বাড়িতে গহনাগুলি লোহার সিন্দুকে পুরে তবে যাবে রমাদের পাড়ায়। একটু দেরি হয়ে গেল—কিন্তু এখনো ত জলের তেমন তোড় হয় নি। রমা কিন্তু ডুবে যাবে না—ছাদও ত আছে।

মোটরে চলতে চলতে নমিতাকে একথা বলতেই সে বলল, "কিন্তু তুমি ভুলে গেলে বাবা, ওদের ছাদে উঠবার সিঁড়ি যে বন্ধ!"

"বন্ধ? সে কি?"

"বাঃ। রমা সেদিন বলছিল না—প্রবীর এত দুরন্ত যে ও ছাদের পাঁচিলে চড়বেই চড়বে। বেটক্করে পড়েও গিয়েছিল তবে ভূমিশয্যায় নয়—ছাদে। তাই মনুভাই দেয়াল গেঁথে ছাদের পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।"

আলোক বলল হেসে, "প্রবীরকে দেখলে আমার মনে হয় কার কথা বলব?"

"কার?"

"ওডহাউসের সেই ছেলেটার কথা—যাকে বার্টি বলত pest, excreseance ও মূর্তিমান্ epidemic!"

নমিতা হাসে, "সত্যি। আট বছরের শিশুর স্বভাব যে এমন হয়, যে দেখলেই গা জ্বালা করে···

ওমা! এ কি কাণ্ড! রমা? তুই কোত্থেকে?"

ওদিক থেকে রমার মোটর এসে দাঁড়াল। আলোকের গেটের সামনে। বেলা তখন ঠিক এগারটা।

দশ

নমিতাকে দেখেই রমা ভেঙে পড়ল কান্নায়। নমিতা ওকে ধ'রে ভিতরে নিয়ে গেল।

সারথি আলোকের একটি রুগী—মনুভাইয়ের প্রতি

বেশী—সিন্ধি, নাম মির্চন্দানি। আলোককে একান্তে ডেকে বললেন, "দজ্জালটার কাণ্ড !"

"কি ব্যাপার !"

"তা জানি না। তবে মেয়েকে বার ক'রে দিয়েছেন। ও গেটের বাইরে বসে কাঁদছিল।"

"বার ক'রে দিয়েছেন মেয়েকে? এ অবস্থায়? মনুভাই কোথায় ছিলেন?"

মির্চন্দানির মুখ ঘৃণায় তিরছা হয়ে গেল, "ওর কথা আর বলবেন না। ওটা কি একটা মানুষ?—যে স্ত্রীর কথায় বাঁদর নাচে।"

"তাই বলে—"

"সে আর বলে কি হবে? কেবল দুঃখ হয় ভাবতে—এমন মেয়ে যার—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা!—কিন্তু যাই—শুনছি পনশেট বাঁধ ভেঙেছে। আমার বাড়ি মুতা নদীর খুব কাছে না হলেও ভাবনা হয় বৈকি। কারণ শুনছি খড়গবাসলার বাঁধও নাকি ভাঙতে পারে। বাজে গুজব কিনা জানি না, তবু সাবধান হওয়া ভাল। সাধুজি কেমন আছেন?"

"ভালই—দেহতে শান্তিতে আছেন সব দিক্ দিয়েই।"

"ও কথা বলবেন না। কত ভাবেন তিনি আমাদের সবার জন্যে! সেদিন এসেছিলেন আমার মেয়েকে দেখতে তার টাইফয়েড শুনে। আর তিনি আসবার পরদিনই আপনি বললেন বিপদ কেটে গেছে, মনে আছে?"

"তিনি এসেছিলেন তার আগের দিন? জানতাম না ত।"

নমিতা বারান্দা থেকে ডাকল, "বাবা! রমা মূর্চ্ছা গেছে—এস শীগ্‌গির!"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি।"

আপনি ওকে সামলান ডাক্তারবাবু। আমি যাই।

এগার

মিনিট কয়েক বাদে রমার মূর্চ্ছা ভাঙলে একটু একটু করে তার কাছে ওরা যা শুনল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, ৫ই জুলাই রমাকে নিয়ে নমিতা পুণায় ফিরে আসার পর দিন সকালেই সখারাম অনসূয়া মনুভাইকে ডেকে পাঠায়। মনুভাই নারায়ণ পেঠে হাজির হতেই সখারাম একটি বড় উকিলের কাছে ওকে পেশ ক'রে দিয়ে বলে, "তুমি আজই একটা নতুন উইল কর। রমাকে অন্তত তোমার সম্পত্তির সিকি অংশ দিতেই হবে। মনুভাইকে বেশি বলতে হয়নি, কারণ আত্মধিক্কারে তিনি গভীর মানসিক অশান্তিতে ছিলেন। কাজেই সেদিন তখনি তখনি নতুন উইল ক[রা] হয় রমাকে সম্পত্তির চার আনা দিয়ে। কথাটা ও গোপন রাখতেই চেয়েছিল, কিন্তু কানাঘুষোয় শোভনা কানে ওঠে আজই সকালে। কে একজন "নিস্বা[র্থ] পরোপকারী" টেলিফোন করে ওকে খবরটা জানি[য়ে] দিয়েছিল।

"আর কোথায় যাবে?" বলল রমা কেঁদে। "[মা] আমাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়ে শেষে চুলে মুঠি ধ'রে চড় মেরে বললেন, 'দূর হ! এক্ষণি—এ[ই] মুহূর্তে! আমি দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছি। এক্ষ[ণি] এক কাপড়ে বেরিয়ে যা'।"

নমিতা বলল, "আর তোমার বাবা?"

রমা বলল, "তিনি কি আর মানুষ আছেন ভাই। মা'র সামনে তিনি কেঁচো হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আমার কষ্ট হ'ল। আমি সোজা বেরিয়ে এলাম।' বলে থেমে অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে, "চেঁচামেচি শুনে মির্চন্দানি পাশের বাড়ী থেকে আমাদের গেট পর্যন্ত ছুটে এসে আমাকে গেটের বাইরে বসে কাঁদতে দেখে ডেকে তাঁর ওখানে নিয়ে গিয়ে মোটরে ক'রে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।" ব'লে রমা ফের চোখে আঁচল দিল।

আলোকের খানিকক্ষণ বাক্‌স্ফূর্তি হ'ল না। পরে বলল, "আর মনুভাই? ঠায় বসে রইলেন এ অবস্থায়?"

নমিতা বাধা দিয়ে বলল, "বেশ হয়েছে। শাপে বর। ওখানে থাকলে তোর কি হ'ত কে জানে?"

রমা নমিতার কোলে মুখ ডুবিয়ে শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে—এমন সময়ে বাইরে গোলমাল।

আলোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেই দেখে সার সার লোক ছুটেছে চতুঃশৃঙ্গী কালীমন্দিরের দিকে। মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে, সেখানে রোজই যাত্রীরা ধর্ণা দিতে যায় সাঁঝ-সকালে, কিন্তু এভাবে ভয় পেয়ে জনতাকে ছুটতে ওরা কখনও দেখেনি।

আলোক গেট পেরিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে?" সে মারাঠীতে বলল একগঙ্গা কথা, সবটুকু আলোক ধরতে পারল না কারণ তার ভাষা দেহাটি মারাঠী—তবে ভাবার্থটা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না, পুণা ডুবল ব'লে, সঙ্গম ব্রিজ ভেঙে গেছে, গণেশ রোডেও জল এল বলে—এখন প্রাণ বাঁচাতে হলে শুধু পাহাড়ে ওঠা ছাড়া: গত্যন্তর নেই। ব'লেই সে আঙুল দিয়ে দেখাল পাহাড়ের চূড়ায়। আলোক সবিস্ময়ে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে, অবাক কাণ্ড, তাই ত! সার দিয়ে পিঁপড়ের মতন খুদে খুদে মানুষ চলেছে, একদল

কালী-মন্দিরের পাহাড়ে, আর একদল ওদিক্‌কার উন্নততর চূড়ায় যেখানে আলোক কতবার বেড়াতে গেছে নমিতাকে নিয়ে।

এই সময়ে রমা আর নমিতা বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। আলোক ফিরে বারান্দায় গিয়ে এ নতুন খবের কথা বলতেই রমা অধীর হয়ে বলল, "গুজব নয়, কাকাবাবু! আমি সকালে দেখে এসেছি মুতার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে—মির্চন্দানিজি আমাকে বলছিলেন, খড়্‌গাবাসলার বাঁধ ভাঙ্গলে শুধু রাস্তা বা ব্রিজ নয়—নদী-তীরের বাড়িগুলোর একটাও বাঁচবে না—বিশেষতঃ একতলা বাংলোগুলো। কি হবে কাকাবাবু! বাবা··· বাবা···" ব'লে ও টেলিফোন করতে ছোটে।

কিন্তু তখন কে কাকে টেলিফোন করে? সব নিশ্চুপ। শহরের বিদ্যুৎপ্রবাহও ঠাণ্ডা। রমা আরও ভয় পেয়ে গেল। ওকে ভরসা দিয়ে নমিতার জিম্মায় রেখে আলোক মোটর হাঁকিয়ে চলল সঙ্গম ব্রিজের দিকে। এর পরে আর গুজব ব'লে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

রাস্তায় কি ভিড়! পথে প্রথমেই পড়ে রেডিওর আফিস, সেখানে নেমেই চক্ষুস্থির। অধ্যক্ষ মুখ মেঘলা করে বললেন অনেক কথা গড় গড় ক'রে, তার সারমর্ম এই যে, লকৃড়ি ব্রিজ, নিউ ব্রিজ, সঙ্গম ব্রিজ সব জলের নীচে—খড়্‌গাবাসলার বাঁধ ভেঙ্গেছে বেলা এগারটায়। পুণার প্রায় অর্ধেক জলমগ্ন, হয়ত আরও বাড়বে বন্যার জল।

আলোক উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটল সঙ্গম ব্রিজের দিকে মনু-ভাইয়ের খবর নিতে। গিয়ে যা দেখল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না।

শীর্ণ মুতা নদী প্রায় পদ্মার মত বিপুলকায়া ধারা করেছে। আর জলের সে কি গর্জন! নিরীহ নারীরা যে এক মুহূর্তে দৈত্যের মতন মহাকায় হতে পারে কে ভেবেছিল?

সঙ্গম ব্রিজের চিহ্নও নেই। রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে নানা বাগানে নৌকো ক'রে উঁচু রাস্তার দিকে লগি ঠেলে আসছে কত যে ছেলে-মেয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা! মোতায়েন-করা পুলিস ও সৈনিকরা নানা বাড়ির বাসিন্দাদের ট্রাকে ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছে কোথায় কে জানে? সম্ভবতঃ কোন "রিলিফ ক্যাম্প"-এ। রাস্তার মোড়ে সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে বহু আরোহী মজা দেখছে। একজন দুষমন চেহারার লোককে জিজ্ঞাসা করতেই সে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিল যে, সাইকেল "সেফ"—যদি জল হঠাৎ এদিক পানে লাফিয়ে আসে ত সাইকেলে ক'রে চম্পট দেবে চোখের পাতা না পড়তে। আলোক মনে মনে বলল, "বাহবা, বাহবা! আর সেই সঙ্গে অবিশ্যি ঐ সজাগ চোখ এদিক্ ওদিক্ ঢুঁড়বে কোন্ কর্তাহীন বাড়ীতে ঢুকে কি হাতিয়ে নেওয়া যায়", (ও মিথ্যে সন্দেহ করে নি, দু'দিন বাদেই কাগজে বেরিয়েছিল—একজন ডাকসাইটে গুণ্ডা পনেরটি বাড়ি থেকে পনেরটি রেডিও চুরি ক'রে বামাল ধরা পড়েছে।)

হঠাৎ চমকে ওঠেঃ ধপাং ধ-স! ব্রিজের কাছে একটা মস্ত গাছ মাটির সঙ্গে ধ্ব'সে পড়েই তীরবেগে ছুটল ঢেউয়ের মাথায়। ঝন্ ঝন্ ঝনঝাং—ঐ ডান দিকে একটা মালগুদামের টিনের ছাদ ভেঙে পড়ল—আর ঢেউগুলো তাকে ছোবল মারা সুরু করল অসহ্য ক্রোধে। ওদিকে আর এক বিচিত্র দৃশ্য! অগণ্য পাটল-রাঙা মহাকায় ঊর্মিনাগিণী ফণা তুলে ছুটেছে ফুঁশতে ফুঁশতে—কাকে ছোবল মারবে! এদিকে ডাঙায় ছোট ছোট গাছ সবই ডুবে গেছে শুধু কয়েকটির উপরের মাত্র দু'একটি ডাল দেখা যাচ্ছে। মহীরুহগুলির ডালে ডালে লোক আপ্রাণ চীৎকার করছে, চাদর নেড়ে পুলিশকে ডাকছে, "বাঁচাও বাঁচাও!" কিন্তু জলের এ-বিপর্যয় তোড়ে নৌকো নিয়ে সেখানে পৌঁছবেন কোন্ কাণ্ডারী? কয়েকটি দোতলা বাড়ির জানলা থেকে এক রাশ মাথা ঝুঁকে সভয়ে দেখছে চেয়ে নিরীহ মুতা নদীর উন্মাদিনী মূর্তি। এখানে ওখানে নীচু জমিতে খাপরার ছাদে, লালরঙা অর্ধবৃত্তাকার টিনের ছাদে বন্যার্তেরা কাঁপছে ভয়ে। সর্বোপরি, চারদিকে সে কী চীৎকার, সোরগোল! খানিকটা বস্তিতে আগুন লাগলে যেমন হয়।

আলোক স্বভাবে ভীরু বা 'নার্ভাস' নয়, কিন্তু এ যে শ্মশানকালীর তাণ্ডব নৃত্য প্রলয়ের হিংস্র ক্রোধের তালে তালে! বুকের মধ্যে জেগে ওঠে সভয় সম্ভ্রম—awe!

হঠাৎ জল আরো ফুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে একদল ছুটল পিছন দিকে। গেল, গেল, গেল! রাশি রাশি পিঁপে, কেনেস্তারা, টেবিল-চেয়ার আসবাবপত্র উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। ওদিকে একটা পাড় ভেঙে পড়ল। আহা! দশ পনের জন লোক জলে প'ড়েই ভেসে চলল চীৎকার ক'রে পাগলের মত। কিন্তু কে কাদের বাঁচাবে? ঊর্মিদৈত্যদের এ-মল্লভূমিতে নৌকো ভাসাবে কোন্ ভীমকাণ্ডারী? হঠাৎ পাশের

একজন বলল, "দেখুন দেখুন! গরু বাছুর মানুষ মোষ চলেছে সঙ্গম ব্রিজের উপর দিয়ে। সত্যিই তো! আলোকের বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বয়—হৃৎপিণ্ড পঞ্জরে হাতুড়ি মারছে। ও মনুভাইয়ের কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হঠাৎ মনে হয়—হয়ত কল্পান্তে যে প্রলয়ের বর্ণনা পুরাণে পড়া যায় সে-প্রলয়ের আভাস দিতেই আসেন শ্মশানকালী থেকে থেকে—কিম্বা বলা যেতে পারে—যখন আমরা ভুলে যাই শিবকে তখন বোধহয় হুহুঙ্কারে রুদ্র আসেন আমাদের মনে করিয়ে দিতে যে, জীবনের নগণ্য দ্বীপটির চারপাশেই রাশি রাশি মৃত্যুর করাল জল! বাইবেলের একটি বিখ্যাত সূক্ত মনে বেজে ওঠে:

"In the midst of life we are in death!"

হঠাৎ ওর চেতনা ফিরে এল—এ কী! মনুভাইয়ের খবর নিতেই এখানে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা না? রমা জিজ্ঞাসা করলে কী বলবে? রাস্তা থেকে একটু বাঁদিকে একটা কাঁকরের রাস্তা, তার পরেই মনুভাইয়ের বাংলো। ও কাঁকরের রাস্তায় পা বাড়াতেই এক সৈনিক হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে বলল, "ওদিকে যাবেন না স্যর্; জল বাড়ছে।"

"আমার এক বন্ধুর—"

সৈনিক হাসল, "ওদিকে সব বাড়িই ডুবে গেছে স্যর্! বন্ধু কী করছিলেন? ঘুমাচ্ছিলেন? ব'লেই স্যর নামিয়ে, মাপ করবেন, কিন্তু দয়া ক'রে এখন এখানে ভিড় করবেন না। খড়গবাসলার বাঁধও ভেঙেছে—এ-বন্যা তারই জল। পানশেটের পিটে খড়গবাসলা। কাজেই জল আরো অনেক উঠবে। আপনি ফিরে যান—কোথায় থাকেন?"

"গণেশ খিন্দ রোডে—চতুঃশৃঙ্গী মন্দিরের কাছে।"

"ওঃ। বেঁচে গেছেন।

"কিন্তু আমার বন্ধু—"

"আপনাকে কে ঐ ডাকছে চাদর নেড়ে—"

আলোক চম্‌কে বাঁদিকে তাকাতেই দেখে একটা বাদামী রঙের টালির ছাদে একটি মাত্র মানুষ আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে। আলোক চম্‌কে ওঠে, ঐ ত মনুভাই বটে! এতক্ষণে আলোককে দেখতে পেয়েছে ভিড়ের মধ্যে! কিন্তু একী মূর্তি!—জামা ভিজে, চুল উস্কো-খুস্কো, চোখ লাল!

আলোক ছুটে যাবে—এমন সময়ে সৈনিক ওর বাহু চেপে ধরল, "কোথায় যাচ্ছেন স্যর? ডুবে মরতে? বড় রাস্তা ছাড়বেন না—যদি আত্মহত্যা করতে না চান।"

"আমার বন্ধু যে—মনুভাই কাপাডিয়া।"

"অ্যাঁ! ক্রোরপতি শ্রেষ্ঠী—স্যর্ মনুভাই!"

আলোকের এত দুঃখেও হাসি পায়, "টেকচাঁদ! কী নামই করেছ জাদু!" কিন্তু হাসি চেপে বলে, "হ্যাঁ তবে শুধু স্যর নন, কে-সি-আই-ই। এহেন মহাজনকে না বাঁচালে মান থাকে?" ব'লেই তার হাত ছাড়িয়ে জলে নামে···হাঁটু জল···কোমর জল...বুক জল···আর এক পাও এগুনো অসম্ভব। স্রোত প্রবল। ত্রস্ত সৈনিকটি ছুটে এসে একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল, "যদি যাবেনই এই দড়িটা ধরুন অন্ততঃ।" আলোক ফের হাসে মনে মনে, "ক্রোরপতি শুনলে টনক্ না ন'ড়ে পারে?" যাহোক্ ও দড়ি ধ'রে ভরসা পেয়ে টালির ছাদের কাছে পৌঁছে এবার গলা জলে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, "মনুভাই, বাঁচতে যদি চান ত নেমে আসুন এক্ষনি আর কালবিলম্ব না করে—ভয় নেই এখানে পাঁচ ফুটের বেশি জল হবে না—আমি আছি দড়ি ধ'রে। ওরা টেনে তুলবেই তুলবে আমাদের দু'জনকে।

মনুভাই পাগলের মতন হাহাকার করে উঠল, "শোভনা···প্রবীর ভেসে গেছে···বাঁচান তাদের ডাক্তারবাবু···দোহাই···"

এত দুঃখেও আলোকের হাসি এল, "যদি ভেসে গিয়ে থাকে তাহলে বাঁচাব কেমন ক'রে?"

মনুভাই পাগলের মত নদীর দিকে দেখিয়ে, "ঐদিকে ঐদিকে—"

সৈনিক চেঁচিয়ে ধম্‌কে বলে, "সে হবে এখন—আগে আপনি নেমে আসুন ত।"

মনুভাই বলল, "আমি এখানে বেশ আছি—শোভনা—প্রবীর—"

আলোক উর্মি দেখিয়ে বলল, "বেশ আছেন? মাথা খারাপ! এ-টালির ছাদ কখন ভেঙে পড়বে কে বলতে পারে? কথা শুনুন, নেমে আসুন—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝাঁপ দিন যদি বাঁচতে চান। কিছু ভয় নেই আমি ধরব—ডুবে যাবেন না। এখানে এখনো ডুব-জল হয় নি, কিন্তু হ'ল ব'লে।"

মনুভাইয়ের তখন সাড় এল—ঝপাং ক'রে জলে পড়ল ঝাঁপিয়ে। আলোক এক হাতে দড়ি অন্য হাতে মনুভাইয়ের কব্জি চেপে ধ'রে টেনে এনে বড় রাস্তায় ওর মোটরে তুলে হর্ণ দিয়ে চলল ফিরে।

মনুভাই কপালে করাঘাত করে হাহাকার ক'রে উঠল, "আমার সব গেছে ভাই···ছেলেমেয়ে···স্ত্রী···"

আলোক মোটর থামিয়ে বলল, "অশান্ত হবেন না। আপনার মেয়ে অন্ততঃ বেঁচেছে।"

মনুভাই ককিয়ে কেঁদে ওঠে, "আপনি আমাকে ভোলাচ্ছেন ডাক্তারবাবু। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি...সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল...আহা···মা-হারা মেয়ে···আমি কাপুরুষ, নরাধম···একটি কথাও কইতে পারলাম না স্ত্রীর ভয়ে। তার একটু পরেই জল এল—শোভনা ও প্রবীর টাল সামলাতে পারল না···মেয়েটাও নিশ্চয় রাস্তায়ই ডুবে মরেছে···ঠিক হয়েছে···আমার সাজা হবে না ত হবে কার?" ব'লে বুক চাপড়ায়, মাথার চুল টেনে ছেঁড়ে।

আলোক ওর দু'হাত চেপে ধ'রে ধমকালো, "পুরুষ মানুষ না? থামুন। বলছি, রমা রাস্তায় ডোবে নি! মির্চন্দানি তাকে গেটের বাইরে থেকে মোটরে তুলে নিয়ে আমার ওখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে।"

"রমা বেঁচেছে? বেঁচেছে?" মনুভাই লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরেই ভেঙে পড়ে, "আমার প্রবীর···শোভনা, ও হো হো হো হো! আলোক আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সোজা মোটর চালিয়ে দেয়। মিনিট কয়েক পরে যখন মোটর ওর বাংলোয় পৌঁছল তখন পিছনের সীটে মনু-ভাইয়ের সংজ্ঞা নেই। মূর্চ্ছা গেছে। মন্দের ভালো।

মনুভাইকে ধরাধরি ক'রে তাকে নামালো সবাই মিলে।

## বারো

মনুভাইকে ডাক্তারি "ষ্ট্রেচার"-এ ক'রে ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিয়ে নমিতা রমাকে ধাত্রী মোতায়েন ক'রে বাইরে এসে চাপা স্বরে আলোককে বলল, "বাবা! আমার কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না! এ কি ভাবা যায়?"

আলোক ওর দিকে চেয়ে বলল, "সত্যি...আমার··· কি বলব? মনে কেবলই ঝংকার দিয়ে উঠছে সাধুজির সেদিনকার একটি কথা, ঠাকুর কোন্ শয়তানকে যে কোন্ বোড়ের চালে কখন কিস্তি মাৎ করবেন আগে থাকতে কেউ আন্দাজ করতে পারে না।"

নমিতা সোৎসাহে বলল, "যা বলেছ বাবা! আমিও ভুলতে পারছি না।"

আলোক উঠে বারান্দায় পায়চারি করে চিন্তিত মুখে। নমিতা সঙ্গ নেয়। বলে, "কি ভাবছ বাবা?"

"একটা প্রশ্ন মনে জাগে—"

নমিতা হেসে ফেলে, "বাবা বাবাঃ—তোমার মনে প্রশ্ন যেন সমুদ্রের ঢেউ—একটা ভাঙতে না ভাঙতে আর একটা গর্জে ধেয়ে আসে! কেবল আমি জানি কি ভাবছ তুমি।"

"কক্ষনো না।"

"বাজি?"

"বলতে পারলে তুই পাবি ঘোড়া। না পারলে আমাকে দিতে হবে হাতী।"

"এরি নাম fairness বটে। তবে ঘোড়া ঘোড়াই সই—মোটর হাঁকাতে হাঁকাতে হাত হয়ে উঠল হাতা। ঘোড়ায় চড়লে হাত একটু বিশ্রাম পাবে ফুলোও কমবে। তুমি ভাবছিলে, সাধুজি জানতেন কিনা যে, রমাকে ওরা যথাকালে তাড়িয়ে দেবেই দেবে—যার ফলে তার প্রাণ বাঁচবে আর কুচক্রী কৈকেয়ী ও শিশু দুঃশাসন ভেসে যাবে।"

আলোক আশ্চর্য হয়ে বলল, "কি ক'রে জানলি?"

নমিতা বলল, "তোমাকে এতদিন বলি নি। থেকে থেকে কেমন যেন একটা পর্দা খুলে যায় চোখের সামনে, বিশেষ ক'রে ধ্যানের পরে। তখন পরিষ্কার দেখতে পাই কে কি ভাবছে। তবে ইচ্ছে করলে পারি না—সাধুজিকে একদিন বলেছিলাম—"

রমা ডাকল, "বাবা জেগেছেন।"

ওরা গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই মনুভাই ফের চোখ বুজল। নমিতা জিজ্ঞাসা করল চা আনবে কি না?

রমা বলল, "দেখ বাবা, কাকাবাবু এসেছেন আর দিদি জিজ্ঞাসা করছেন একটু চা খাবে?"

মনুভাই মাথা নাড়ল, পরে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "বড় দুর্বল।"

* * *

নমিতা বেশি ক'রে দুধ দিয়ে চা ক'রে মনুভাইকে খাওয়াবার পরেই সে নেতিয়ে পড়ল। রমা ত্রস্ত নেত্রে আলোকের দিকে তাকাতেই আলোক বলল, "না। মূর্চ্ছা নয় এবার। ঘা খেয়েছে ত বিষম। ঘুমিয়ে পড়েছে। Utter prostration—যত ঘুমোয় ততই ভাল।"

দোরে ঠক্···ঠক্···ঠক্···

নমিতা ছুটে বেরিয়ে এসে দোর খুলেই, "এ কী? সাধুজি!" বলেই গড় হয়ে প্রণাম।

আলোক রমাকে নিয়ে বেরিয়ে প্রণাম ক'রে সাধুজিকে বসালো নিয়ে গিয়ে পূজার ঘরে।

"কী ব্যাপার—সাধুজি?"

"খবর নিতে হবে নারায়ণ পেঠে।"

আলোক বলল, "অসম্ভব। মুতার যে রণচণ্ডীমূর্ত্তি

দেখে এলাম সঙ্গম ব্রিজে—নারায়ণ পেঠে নিশ্চয় এখন অন্তত বিশফুট জল। তাছাড়া এখন ত সব ব্রিজই বন্ধ—ওপারে পৌঁছবেন কী করে?"

"হোলকার ব্রিজ শুনছি খোলা আছে।"

"সন্দেহ।"

"না বাবা। আমি দেহু ক্যান্টনমেণ্ট থেকে এলাম একটা মিলিটারি লরিতে। আমাকে সাধু দেখে ওরা তুলে নিল দয়া করে। তাদের মুখেই শুনলাম যে, কেবল হোলকার ব্রিজের উপর দিয়েই মোটর যেতে দিলে।"

আলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "তাহলে একটু বসুন আপনি, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।"

সাধুজি বললেন, "না, বসব না। আমিও যাব।"

নমিতা মিনতির সুর ধরে, "আমিও বাবা! লক্ষ্মীটি!"

"কিন্তু মনুভাই?"

রমা বলল, "আমি তো আছি। আপনি যদি পারেন খোঁজ নিয়ে আসুন অনুমাসীর আর মাসীমার।"

তের

তিনজনে বেরুল। রাস্তায় ভিড় আরো ফুলে উঠেছে...অশ্রান্ত শোভাযাত্রা চলেছে গৃহহারা ভয়ত্রস্ত নর-নারীর। সঙ্গে সঙ্গে অজস্র সাইকেল, গরুর গাড়ি, হাতে-ঠেলাগাড়ি, কোথাও বা ভদ্র ঘরের মা চলেছেন শিশুকে হয় কোলে নিয়ে না হয় প্যারাম্বুলেটরে। তবে অধিকাংশই চলেছে ছোট ছোট জটলায়—দেখলেই মনে হয় এক একটি দরিদ্র পরিবার চলেছে তাদের নগণ্য যথাসর্বস্ব নিয়ে। সাধুজি আঙুল দিয়ে দেখালেন পাহাড়ের দিকে। সেখানে পিল্ পিল্ ক'রে লোক উঠছে।

হোলকার ব্রিজে পৌঁছতেই এক অফিসার বাধা দিলেন। বলল, "কোথায় যাবেন?"

"ওপারে।"

"আপনাদের বাড়ি ওপারে?"

"না।"

"তাহলে মাপ করবেন। শুধু পুলিশ, মিলিটারি আর যাদের ওপারে বাড়ি তারা যেতে পারে।"

নমিতা বলল, "নারায়ণ পেঠের খবর বলতে পারেন কি?"

অফিসার হাসলেন, "নারায়ণ পেঠ? One of the worst affected areas. নারায়ণ পেঠ আজ ভেনিস হয়ে গেছে। কেবল রাস্তায় গণ্ডোলা চলতে পারে না—এই যা।"

নমিতা আলোককে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "বড় অফিসার।"

সে শুনতে পেয়ে হেসে বলে, "এখন আর বড় ছোট নেই, ম্যাডাম। জল সবাইকে কাঁধ সমান করে দিয়েছে। তাছাড়া দেখবেন মজা? বাঁদিকে তাকান—ঐ গাছের উপরে।"

ওরা তাকালো। নীচু ভূমিতে জল থৈ থৈ করছে। একটি জলমগ্ন গাছের শুধু একটি ডাল উচ্ছ্রিত হয়ে দুলছে। সে ডালে একটি বেড়াল, একটি পুষ্টকায় ইঁদুর আর দু'টি সাপ নিশ্চল হয়ে পাশাপাশি আসীন যেন co-existence মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে।

* * *

আলোক মোটর ঘোরাতেই সাধুজি বললেন, "জংলি মহারাজ রোডের দিকে একবার গেলে হয়। সেখানে যেতে দেবে কি?"

অফিসার শুনতে পেয়ে বললেন, "জংলি ব্রিজের অর্ধেক জলে ডুবে গেছে। একটিও দোতলা বাড়ির মাথা জলের উপরে নেই। শম্ভাজি পার্কও তথৈবচ। জল আরও বাড়বে। তাই বেশিদূর যাবেন না। আর একটি অনুরোধ, সাইট সীইং এখন থাক। পুলিশ ও মিলিটারি যে কাজের ভার নিয়েছে সে কাজে বাধা পাচ্ছে যাঁরা জল দেখতে বেরিয়ে ভিড় করে ফুর্তি করছেন তাঁদের জন্যে।"

সাধুজি হেসে বললেন ইংরেজিতে, "আমরা ঠিক তাদের দলে নই। নারায়ণ পেঠে আমার এক বন্ধু আছেন। জংলি মহারাজ রোডেও। আমার এই বন্ধুর বাড়িতে দু'জন বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা চাই আরও দু'একজনকে ছেঁকে তুলতে—যদি পারি অবশ্য।

অফিসার টুপি খুলে সসম্ভ্রমে বলল, "I beg your pardon Sadhuji, don't take it personally please!"

চোদ্দ

কিন্তু জংলি মহারাজ রোডে মোটর ভাণ্ডেকারের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। রাস্তায় মাঝপথে আর এক অফিসার আটকালেন।

"কোথায় যাবেন?"

"আর বি আপ্তে রোড।"

"ওঃ! সেখানে এক বাঁশ জল।"

নমিতা জিজ্ঞাসা করল, "জল কি আরও বাড়ছে?"
ন বেলা তিনটে।

অফিসার বললেন, "না। কমার দিকেই—thank ! তবে মনে ত হয় না যে, সন্ধ্যার আগে নারা আর. বি. আপ্পে রোডে পৌঁছতে পারবেন। দেখুন—দেখছেন? ঝাঁন্সির রাণীর ঘোড়া বেচারি গেছে।" ব'লে হাসে, "তবে রাণী বোধ হয় এ যাত্রা বেঁচে গেলেন ত্রিশ ফুট উঁচুতে তাঁকে ঘোড়ায় চড়ান হয়েছিল বলে। আর ঐ দেখুন—দেখছেন? শম্ভাজি পার্কের ঐ গাছে কি ঝুলছে?"

নমিতার বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠল, "ও—"।

অফিসার হাসল, "ম্যাডাম, বাড়ী যান। এখানে নানা ডালে নানা ভাবে মানুষ ঝুলছে আমি একা আজ তিনটি মানুষকে নামিয়েছি। আপনি এ সব দৃশ্য সইতে পারবেন না—তাই বলছি বন্ধুদের খবর নিতে চান কাল নেবেন—কিংবা সন্ধ্যার পরে—জল নেমে গেলে। এখন আমাদের কাজ করতে দিন।" বলেই এগিয়ে গেল এক পুলিশের ট্রাকের কাছে। সাধুজি হেসে নমিতাকে বললেন, "যখন কোন দিকেই কূল-কিনারা পাওয়া গেল না তখন কুটীচক হওয়াই পন্থা মা!"

ওরা ফিরল।

*　　*　　*

মনুভাইয়ের প্রবল জ্বর। একশ' চার ডিগ্রী। বিকারের ঘোরে কেবল বকে, "শোভনা প্রবীর·· ওদিকে নয়···এদিকে···ওহো মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিলাম ···ধিক্···সব ডুবে গেল···ও হো হো···"

পনর

রমা সাধুজির পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বলে, "বাবা, এত বড় শাস্তি···তার উপরে বাবার পেটে ক্যান্সার···" কথাটা শেষ হয় চোখের জলে।

সাধুজি ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, "না মা, শাস্তি তিনি দেন না! প্রসাদ দেওয়াই তাঁর স্বভাব। তবে কি জান? আমরা মানুষ ত—তাই ভাবি আমাদের ছন্দেই তিনি চলেন ভাল লোককে বকৃশিস দিয়ে আর মন্দ লোককে দণ্ড দিয়ে। আসল ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তিনি জগৎ করবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা নিয়ম-কানুন করেছেন। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে—বিষ খেলে মরবে, স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করলে মোটামুটি সুস্থ থাকবে,দীর্ঘজীবি হবে, সুকর্ম করলে মনে শান্তি পাবে, দুষ্কর্ম করলে অশান্তি। সাড়ে পনর আনা মানুষ এই নিয়মগুলি মেনে বা না মেনে চ'লে সুখী হয় বা দুঃখ পায়। কেমন? এই হ'ল জাগতিক নিয়ম। কিন্তু আর একটা শক্তি আছে—তাঁর করুণা। সে চলে তার নিজের নিয়ম মেনে। সে কখনও পাপীকে মারে তারই কর্মফলের ডাণ্ডায়। কখনও ভক্তকে বাঁচায় অগ্নি পরীক্ষায়। পাপী যখন পাপ ক'রেই চলে—বুঝেও বোঝে না যে ভগবানের নিয়মকানুন না মানলে ভুগতেই হবে তখন কখনও কখনও তাঁর এই করুণাকেই ধরতে হয় রুদ্রমূর্তি—বা রণচণ্ডী-মূর্তি, যাই বল। এরই নাম—আমাদের পরিভাষায়—শাস্তি বা দণ্ড। কিন্তু তিনি এ শাস্তিকে শাস্তি ব'লে ধরেন না যে কথা ভাগবতে বলেছে কালিয়দমন অধ্যায়ে। কালিয় বালগোপালকে ছোবল মেরে রক্ত বমি ক'রে যখন নেতিয়ে পড়ল তখন নাগপত্নীরা এসে ঠাকুরকে স্তব ক'রে বলল, 'ব্যস্ আর না। আমরা বুঝতে পেরেছি, কালিয়ও ঠেকে শিখেছে যে তোমার ক্রোধও তোমার করুণারই ছদ্মরূপ, ক্রোধো হি তে অনুগ্রহ এব সম্মতঃ।' যখন মানুষ করুণাকে শিব রূপে বরণ না করে তখন শিবই আসেন রুদ্র হয়ে। লক্ষ্মী আসেন চণ্ডী হয়ে, গোপাল আসেন চক্রধর হয়ে। কিন্তু শাস্তি দিতে নয়—তাঁর জগৎচক্রকে সামনের দিকে চালাতে। আমাদের তিনি সুবুদ্ধিও দিয়েছেন দুর্বুদ্ধির সঙ্গে। তিনি চান বৈ কি—আমরা শুভবুদ্ধিকেই সারথি করি। কিন্তু আমাদের তিনি ইচ্ছার ওরফে বাছাই করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন সেই সঙ্গে। নইলে পাপ পুণ্য ভক্তি অভক্তির কোন মানেই থাকে না—বিশ্বলীলা হয়ে দাঁড়ায় একটা জবরদস্তি—পুতুল নাচ। তাই নাস্তিক হবারও অধিকার আছে প্রত্যেকেরই—কেবল নাস্তিক হলে তার ফলও ভুগতেই হবে—মানে, দাম দিতেই হবে—আজ না হোক কাল, এ জন্মে না হোক পরজন্মে। মনুভাইয়ের নাস্তিকতার ফল এ জন্মেই ফলল—এও তাঁর করুণাই বটে। নইলে হয়ত তাকে আরও কত জন্ম ভুগতে হ'ত কে জানে?"

আলোক বলল, "কিন্তু এ সবই কি মেনে নেওয়ার যুক্তি নয়? যে মানতে না চায়?"

সাধুজি বললেন, "না বাবা, যুক্তি আমি দিতে চাই নি। কারণ আস্তিক বা ভক্ত যে মেনে নেয় সে মানার আনন্দেই, যুক্তির নির্দেশে নয়। তাই শাস্ত্রে বলেছে ভক্ত হতে সেই পারে যে ভক্ত হতেই জন্মেছে, যাকে তিনি পেয়ে বসেছেন, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। এই জন্যই তোমাদের কাছে আমি চাই—তোমরা মেনে নেবে, কেননা তিনি তোমাদের বরণ করেছেন আপন বলে। এইখানেই দেখতে পাবে দুটো সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র প্রকৃতি বা

স্বভাবের বিপরীত রীতি, একদিকে মহুভাই আর এক-দিকে রমা গোরী। মহুভাই গৌরীর ভক্তি-বিশ্বাস এত কাছ থেকে দেখেও চাইল না সে-রঙ্গে রঙ্গিয়ে উঠতে, রমাকে সত্যিই স্নেহ করা সত্ত্বেও পারল না তার সরল ছন্দে ভগবান্‌কে মেনে নিতে—কেননা তাকে তিনি আগে থেকে বরণ করেন নি, আপন ক'রে টেনে নেন নি। কিন্তু—ব'লে রমার দিকে চেয়ে সস্নেহে, "তুমি মা সহজেই সাড়া দিতে পারলে, ঝুঁকতে পারলে আস্তিকতার দিকে —ঠিক যেমন মহুভাই সাড়া দিতে চাইল না ব'লে রয়ে গেল রোখালো নাস্তিক ভোগবাদী, ভোগবাদী থেকে দুর্বল, দুর্বলতা থেকে শেষে স্ত্রৈণ। নাস্তিকের নাস্তিকতার কর্মফল অনেক সময়ে এই ভাবেই টেনে আনে বুদ্ধিভ্রংশ। তবু ঠাকুরের একটু করুণা সে পেয়েছিল তোমাকে ভালবেসে। তাই মরতে মরতে বেঁচে গেল। কিন্তু এ আলোচনা আজ থাক্ মা। আজ তুমি শুধু এই প্রার্থনাই যেন করতে পার যে, যাঁকে মেনে তুমি করুণা পেলে ব'লেই শাপ তোমার কাছে এল বর হয়ে, ঘটাল অঘটন, যার ফলে তোমাকে খেদিয়ে দেওয়ার দরুণই তুমি বেঁচে গেলে—যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া না হ'ত তা হলে তুমি বন্যায় ভেসে যেতে—এই অঘটনটা ঘটাল তাঁর যে করুণা তাকে বরণ কর আরও আরও আরও। বরণ করা মানে—শোক পেলে প্রশ্নকে প্রশ্রয় দিও না। যেটুকু দেখতে পেয়েছ তাঁর কৃপার নিদর্শন ভক্তদের মাঝে, সাধুদের মাঝে, মহৎ মানুষের মাঝে, দয়া প্রীতি সহিষ্ণুতা মাধুর্য এই সব সাত্ত্বিক গুণের মাঝে—সেইটুকু থেকেই আরও তাঁকে আঁকড়ে ধর এই সরল বিশ্বাসে যে, যিনি আমাকে এমন প্রত্যক্ষভাবে কৃপাধন্য করেছেন তাঁর বিশ্বলীলা বুঝতে আমি না পারলেও তাঁর চরণে যদি শরণ নিতে পারি তাহলে যেটুকু বোঝা আমার দরকার সেটুকু তিনি বুঝিয়ে দেবেনই দেবেন। এক কথায়, ভক্ত হতে যে পেরেছে ভাগ্যবশে সে যেন নিজেকে ধন্যজ্ঞান করে তাঁর করুণার স্পর্শেই ভক্তি জেগেছে ব'লে—তর্ক-যুক্তিতে যেন সে ডাক না দেয় ভক্তি বিশ্বাসের তরফে ওকালতি করতে। সে যেন চায় কেবল একটি জিনিষ—তাঁর পায়ে শরণাগতি। ব্যাস্। কারণ তাহলেই হবে সে কৃতার্থ—আপ্তকাম, শেষে তাঁর বাহন লীলাসাথী। এর পরে আর কি চাই মা? তিনি কি ভাগবতে বলেন নি—'আমাকে যে ভক্তি করে সে অমৃত হয়—ময়ি ভক্তি হি ভূতানাম্ অমৃতত্বায় কল্পতে?'"

ষোল

পরদিন মহুভাইয়ের জ্বর আরও বাড়ল, একশ' পাঁচ ডিগ্রী। রমা আলোককে বলল, "তা হোক, আমি আছি। আপনি একটিবার মাসীমাদের খোঁজ নিয়ে আসুন যদি পারেন।"

মহুভাইকে আর একটা পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ওরা তিনজন বেরুল ফের মোটরে সকাল আটটায়। নমিতা সঙ্গে ক'রে নিল কয়েকটি ধুতি, শাড়ী, ব্লাউস, ইত্যাদি।

সাধুজি আলোককে হেসে বললেন, "দেখলে বাবা, আমাদের সঙ্গে মেয়েদের প্রভেদ? ওরা যে আখের ভেবে চলে—তাই আকাশ ধ্যান করলেও মাটিকে ভোলে না।"

* * *

গোলকার ব্রীজ দিয়ে ঘুরে নারায়ণ পেঠে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। পথে যে ভিড়—প্রতি দু'-মিনিট অন্তর মোটর দাঁড় করাতে হয়। আবালবৃদ্ধ-বণিতার জটলা সর্বত্র। তার উপর মোড়ে মোড়ে মোতায়েন-করা পুলিশ, সৈনিক, ট্রাক, সাইকেল···কি নয়?

কিন্তু নারায়ণ পেঠ অবধি গাড়ী নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পিঙ্গল পাঁকের সন্ততি রেখে তবে রাক্ষসী বন্যা প্রস্থান করেছে। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলতে হয়·· যে পিছল!···রাস্তা থেকে জল স'রে গেছে বটে। কিন্তু যে সব বাড়ি একটু নীচু ভিতে দাঁড়িয়ে তাদের প্রাঙ্গণে জল এখনও থৈ থৈ করছে। একটি বাড়িও অক্ষত নেই। বহু বাড়িরই ছাদ দেয়াল ধ্বসে গেছে, একটি বাড়িরও দোর দাঁড়িয়ে নেই। রাস্তার দু'ধারে স্তূপাকৃতি ইঁট কাঠ টিনের ছাদ, আবর্জনা, মরা কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর। এক একটা বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে শোনা যায় কান্না, কোনটা মৃদু, কোনটা প্রবল—হাহাকার। পুলিশ এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে টেনে টেনে বার করছে কাগজ বই ভাঙা আসবাবপত্র—দু'এক জায়গায় মৃত শিশু। নমিতা শিউরে উঠে চোখ ফিরিয়ে চলে এগিয়ে।

আলোক বলে, "তুই না এলেই পারতিস্ নমিতা! ফিরতে চাস?"

নমিতা চকিতে ব্লাউসের হাতায় চোখের জল মুছে পাংশু মুখে বলে, "না না চল, আমি পারব। রমাকে গিয়ে মুখ দেখাতে হবে ত!"

সাধুজি হেসে বললেন, এই ত চাই মা, অবলা না—বীরবালা!"

সতের

সখারামের বাড়ীর এ কি অবস্থা! আলোক শিউরে ওঠে। দু'দিন আগেও যে-বাড়ীতে ওরা সাধুজির ভজনে দোয়ার দিয়েছে সবাই মিলে—ভক্তি অনসূয়া সখারাম আলোক নমিতা ভাণ্ডেকর—সে বাড়ীর নীচের তলায় একটা দোরও দাঁড়িয়ে নেই! উঠানে শুধু একটা কুকুর আর একটা হুলো বেড়াল শুয়ে। গুদাম ঘরগুলির সব কাগজপত্র ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে—উঠানে, রাস্তায়, সিঁড়ির সামনে—কোথায় নয়? এখানে ওখানে ভাঙা টেবিল চেয়ার টুল কাৎ হয়ে প'ড়ে। ভিজে কাপড়ের, কাগজের ও কাঠের যোগফলে গড়ে উঠেছে এক দুষ্কারজনক গন্ধ। নমিতা নাকে কাপড় দেয়।

* * *

তিনতলায় সাধুজিকে তাঁর আসনে বসিয়ে ওরা বসল তাঁকে ঘিরে।

অনসূয়া জোর ক'রে প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করে, "বাবা! শুধু আপনার এই ঘর দু'টিতেই জল ঢোকে নি—দেবতার ঘর বলে।"

সাধুজি হেসে বলেন, "না মা—শুধু তিনতলার ঘর ব'লে। কিন্তু···ওখানে ছাদে সার সার কারা শুয়ে?"

সখারাম উত্তর দেয়, "অনাথাশ্রমের শিশুরা। কাল সারারাত ক্ষিদেয় ও ভয়ে কেঁদে আজ ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা! তিনতলায় শুধু একটু শুকুনো মুড়ি আর চিঁড়ে ছিল।"

সাধুজি বললেন, "এদের নিয়ে এলে কখন? কাল রাতেই?"

সখারাম বলল ম্লান হেসে, "নিয়ে আসিনি—টেনে তুলেছি। কেবল একটি শিশুকে বাঁচান গেল না—মণি।'

নমিতা চম্‌কে উঠল, "মণি? ভক্তি মাসীমার—?"

সাধুজি বললেন, "আহা! ভক্তি কোথায়?"

অনসূয়া বলল, "সেও সারারাত কেঁদে আজ সকালে ঘুমিয়ে পড়েছে—পাশের ঘরে। ডাকব?"

"না থাক। শুনি ইতিহাস কি ক'রে এদের টেনে তুললে।"

নমিতা চোখের জল দাবিয়ে রেখে অনসূয়াকে বলল, "ভক্তি মাসীমা মণিকে তোমাদের জিম্মায় রেখে গেল না কেন?"

সখারাম উত্তর দিল, "কেউ কি জানত এমন কাণ্ড হবে চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে? প্রথমে পানশেট ড্যাম্ ভাঙতেই এখানে রাস্তায় এক কোমর জল। তার পরই খড়গবাসলার বাঁধ ভেঙে দেখতে দেখতে পঁচিশ ফুট জল বেলা বারোটায়। যেন একটা সমুদ্র ঢুঁ মারল। ভক্তি তখন অনাথাশ্রমে। বেরুতে পারল না কোন-মতেই। শুনুন বলি—সে কাহিনী শোনবার মত বৈ কি!"

আঠার

অনসূয়া সাধুজিকে বলল, "জানেনই ত ভক্তি আমাদের সামনের এই অনাথাশ্রমে বিনা মাহিনায় পড়ায় কয়েকটি অনাথ ছেলেকে। এদের মধ্যে দু'টি ছেলে মারা গেছে গত বৎসর কলেরায়। ভক্তি প্রাণপণে সেবা করেছিল তাদের—কিন্তু বৃথা। এখন ওকে পড়াতে হয় মোটমাট বারটি ছেলেকে—নয় থেকে বার বৎসরের মধ্যে তাদের বয়স।

"ওর কুটিরটি মুতা নদীর প্রায় পাড়ে। ছোট্ট কুটির, দুটি মাত্র ঘর। একটি দাই মণির তদারক করে ও যখন বাইরে যায়, কি অনাথাশ্রমে পড়াতে আসে।

"ভক্তি স্বভাবে একটু চাপা মেয়ে, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। বড় বেশি কারুর সঙ্গে মেশে না, গল্পগুজবেও ও নেই। ও আসে কেবল এখানেই রোজ সন্ধ্যায়—যখন আমরা ভজন করি। ব্যস। বাকি সময়টা ও ধ্যান-জপেই কাটায় কিংবা পড়ে বা পড়ায়। মণিকে ওর বেশি দেখতে হ'ত না ওকে বোতলে দুধ খাওয়ানো সুরু হওয়া থেকে। কিন্তু মণি বলতে ও অজ্ঞান—জানেনই ত। হবে না? ওর যত স্নেহ পড়েছিল গিয়ে যে ঐ একরত্তি নয়নতারাটির 'পরে। তাই ত ওর নাম দিয়েছিল ও 'নয়নমণি'।

"কাল সকালে ও ঠিক দশটায় অনাথাশ্রমে গিয়েছিল যেমন রোজই যায়। ছেলেদের এগারটা পর্যন্ত পড়িয়ে ও দোতলায় গিয়েছিল একটি রুগ্ন মেয়েকে দেখতে। কারুর সেবা করতে পেলে ও আর কিছুই চায় না। সাধে কি সবাই ওকে এত ভালবাসে?

"ও গিয়ে দুঃখিনী মেয়েটির মাথা টিপে দিচ্ছে এমন সময়—সওয়া এগারোটায় অনাথাশ্রমের উঠোনে হঠাৎ হু হু ক'রে জল ঢুকতে সুরু করে। ছেলেরা তখন উঠোনে খেলা করছিল। জল ঢুকল এমনি তোড়ে যে, ওরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে আর কি!

"ভক্তি চিৎকার শুনে দুড় দুড় ক'রে নিচে নেমে আসতে না আসতে উঠোনে হাঁটুজল! সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের তিনটি চাকরাণী ও কুড়িটি বাসিন্দা মেয়ে—না উনিশটি, কারণ একটি দোতলায় শয্যাশায়ী—চিৎকার করতে করতে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। ভক্তির বুকের মধ্যে ছাঁৎ ক'রে উঠল মণির কথা ভেবে—আরো

এই জন্যে যে, ওর কুটিরটি মুতার প্রায় পাড়েই। ওর বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠেছে ছুটে নিজের ঘরে ফিরে যেতে কিন্তু হবি তো ঠিক সেই সময়েই এল ওর অগ্নিপরীক্ষা—ছেলেরা 'মা মা মা!' ব'লে হাত বাড়িয়ে ওকে ডাক দিল তাদেরকে বাঁচাতে।

"ও বলল আমাকে, 'দিদি, আমি রাস্তার দিকে ছুটে যাব—ঠিক এমনি সময়ে এই শিশু কয়টি কেঁদে উঠল—দু'তিন জন কোনমতে জল থেকে উঠে আমাকে আঁকড়ে ধরল দু'হাতে। আমার মনের মধ্যে বেজে উঠল সাধুজির একটি কথা: শুধু নিজেরটিকে ভালবাসার নাম মায়া, সবাইকে ভালবাসার নামই দয়া। একটা বন্ধ করে, অন্যটা মুক্তি দেয়। কিন্তু অবুঝ মন কি মানা মানে দিদি? সে শুধু বলে, যাও এদের ছেড়ে নিজেরটিকে বাঁচাতে। মণি একটি কাঠের দোলনায় শুয়ে ঘুমচ্ছিল যখন আমি অনাথাশ্রমে আসি। দাইটার 'পরে তো আর বিশ্বাস রাখা যায় না। তাছাড়া, এখানেই যখন এত জল তখন আমার কুটিরের ঘরে নিশ্চয় জল আরো বেশি। আমার প্রতি তন্তু যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, দেরি কোরো না ছুটে যাও—মণিকে বাঁচাও। আমার ঘর অনাথাশ্রম থেকে কাছেই, তখনি বেরুলে পৌঁছতে পারতাম বৈকি তিন-চার মিনিটের মধ্যেই—সাঁতারও ভালোই জানি, রাস্তায় ডুব জল হ'লেও ভয় ছিল না। কিন্তু এই যে অসহায় শিশু কয়টি—যারা শুধু আমাকেই মা ব'লে আঁকড়ে ধরছে—তাদের কোন্ প্রাণে বন্যা রাক্ষসীর মুখে তুলে দিয়ে নিজের ধন সামলাতে যাব? কিন্তু বেশি ভাববার তখন সময় ছিল না। তাই বললাম মনে মনে, ঠাকুর, বল দাও, আমি দুর্বল। তবু আমাকে পারতেই হবে যে, না পারলে নিজের চোখে ছোট হয়ে যাব।

"বলতে বলতে দিদি, বলল ভক্তি জল-ভরা চোখে, মনে আমার বিপর্যয় বল এসে গেল। আমি স্পষ্ট শুনলাম গুরুদেবের স্বর, পারবি পারবি পারবি—আর পারতেই হবে তোকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলাম—সত্যি দিদি, শুধু যে ভয় পালিয়ে গেল তাই নয়, মনে হ'ল আমি সব পারি। মুখে বলতে অনেক সময় লাগছে কিন্তু ভয় পাওয়া, ঠাকুরকে ডাকা, গুরুদেবের স্বর শোনা, অভয় হওয়া সবশেষে অভয় দেওয়া—এসবই পর পর ঘটে গেল যেন বিদ্যুদ্বেগে। আমি ওদের "কোন ভয় নেই" ব'লেই গাছকোমর বেঁধে বার বার জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে টানতে টানতে এক এক ক'রে ওদের নিয়ে সিঁড়ির প্রথম পৈঠেয় পৌঁছে দিয়ে বললাম উপরে পালা ছুটে—আমি এলাম ব'লে।

"কিন্তু দেখতে দেখতে সিঁড়িতেও জল উঠল। তখন দেখি একটি খোঁড়া আট বছরের ছেলে উঠোনের জলে ভেসে চলেছে বাইরের দিকে—না আরও একটি দশ বছরের কানা ছেলে।

আমি ক্লান্ত হলেও ফের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ছেলেবেলায় সাঁতারে নাম করেছিলাম। এই সময়ে খুব কাজে এল। কারণ তখন উঠোনে ডুব জল। স্রোতও প্রবল। তবু শেষ দু'জনকে হাঁফাতে হাঁফাতে কোনমতে টেনে তুললাম। ওরা প্রায় অজ্ঞান কিন্তু দুই চড় মেরে ওদের সজাগ করে ওদের হাত ধ'রে ছুটলাম সিঁড়ি বেয়ে উপরে। বাকি দশজন ততক্ষণে উপরে একতলার বারান্দায় হাঁপাচ্ছে। আর দাসীরা মেয়েদের সঙ্গে একজোটে কেবল আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও বলে।

"আমি আগুন হয়ে উঠলাম। বললাম, তোদের লজ্জা করে না? এই শিশু কয়টিকে ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে এলি একটিবারও মনে হ'ল না তোদের এরা কত অসহায়? আমি যদি আজ না থাকতাম তবে এই বারটি শিশুর কি একটিও বাঁচত? ওরা লজ্জিত হয়ে বলল, মাপ করবেন—আমরা ভয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

"কিন্তু তখন বিতণ্ডার সময় ছিল না। কারণ এই কথা বলতে না বলতে—দেখ দেখ করতে করতে জল দোতলায় উঠে এল। ওরা তখন প্রথম আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। আমি এক এক ক'রে আগে শিশুদের তুললাম আমাদের আশ্রমের টিনের ছাদে।

"ছাদটা উঁচু ছিল। ওরা যখন চূড়ায় উঠে বসল তখন আমরাও উঠলাম কোনমত প্রকারে।"

অনসূয়া বলল, "এ সব আমরা অবশ্য ভক্তির কাছে পরে শুনেছিলাম—আগে বললাম ব্যাপারটা বোঝাতে।"

আলোক বলল, "তোমরা কী করছিলে?"

সখারাম বলল, "করবার আর কী ছিল বল? একতলা ছাপিয়ে দোতলায় জল উঠতেই আমরা তাড়াতাড়ি তিনতলায় উঠে এলাম। কিন্তু ছাদে এসেই হতভম্ভ হয়ে গেলাম। সামনেই ভক্তি পঁয়ত্রিশটি প্রাণীকে নিয়ে ওদের টিনের ছাদে! আমাদের পাথরের বাড়ি ভয় ছিল না—কিন্তু ওদের টিনের ছাদে এতগুলি মানুষের ভার ভাবতে পারিস্? ভক্তিকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মণি কোথায়?' সে চোখের জল আঁচলে মুছে ধরা গলায় বলল, 'ঠাকুরের পায়ে। কিন্তু যে গেছে

ছার কথা থাক। এখন এদের বাঁচাবার কী হবে? জল যে আরও উঠছে হু হু করে'!"

উনিশ

নমিতা অনসূয়াকে বলল, "মণিকে বাঁচাতে আপনারা কেউ গেলেন না?"

অনসূয়া বলল, "জল এত হঠাৎ উঠে এল দেখ্ দেখ্ করতে করতে যে বেরুবার উপায় ছিল না। তাছাড়া আমরা ভেবেছিলাম জল ঠেলে উঠতে না উঠতে ভক্তি মণিকে নিয়ে আমাদের এখানেই ছুটে আসবে। ও যে তখন অনাথাশ্রমে একথা মনেও হয় নি। তাছাড়া বন্যাটা এমন তোড়ে এল ও চারদিকে এমন দারুণ চিৎকার সুরু হ'ল যে আমরা প্রথমটা হক্‌চকিয়ে গেলাম।"

সাধুজি বললেন, "যাক্। তার পর?"

সখারাম বলল, "ছাদে আসুন আগে। নইলে বোঝাতে পারব না।"

ওরা গিয়ে ছাদে পাঁচিলের কাছে দাড়াতে সখারাম বলল, "ছবিটা আগে মনে ছ'কে নিন। ঐ সামনের ছাদ—ত্রিশ ফুট দূরে ওখানে ভক্তি, অনাথাশ্রমের তিনটি দাসী, কুড়িটি মেয়ে নানা বয়সের আর বারটি শিশু ঐখানে বসে—হ্যাঁ, ঐ সামনের টিনের ছাদে—আমাদের এই পাঁচিলের চেয়ে একটু উঁচুতে—দেখছেন ত? আচ্ছা। এই ত গেল পয়লা নম্বর। নম্বর দুই—আমাদের এই ছাদের দু'তিন ফুট নিচেই রাস্তা হয়ে গেছে নদী—তাতে স্রোত চলেছে প্রবল। তেসরা—এই অশ্বথ গাছটি দেখছেন ত—এই ডালটি আমাদের ছাদে—আর ঐ ডালটি ওদের ছাদের ঠিক উপরে। বন্যাকে যদি বলা যায় রাক্ষসী তবে এই গাছটিকে বলতে হয় দেবদূত। এই হ'ল ভূমিকা। এবার শুনুন ড্রামার ব্যাপার।" ব'লে হাত নেড়ে উদ্দীপ্ত স্বরে সখারাম বলে চলল:

"ভক্তির প্রশ্ন শুনে অনু আমার দিকে তাকাল। কি করা যায়—ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি জাল—ঐ যে দেখছেন কুণ্ডলী-পাকানো মোটা দড়ি—দড়িই হ'ল আমাদের রক্ষক। আমাদের নানা মালপত্র বাঁধবার জন্যে এই দড়ি জমা করা থাকত ঐ ছোট ঠুরিটিতে—ঐ লকড়িগুলোর পাশে। আমি একটা মোটা দড়ি হাতে ক'রে এনে ভক্তিকে দেখিয়ে বললাম, এই দড়ি আমি ছুড়ে ফেলছি ধর—তোমরা ওদিকে, আমরা এদিকে। এই দড়ি বেয়ে যদি ওরা এক এক ক'রে আসতে পারে তাহলে হয়—এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।' ভক্তি বলল, 'বেশ—যখন এ ছাড়া আর পথ নেই—' বলতে বলতে আমাদের বাড়ীর পাশেই একটি একতলার খাপরার ছাদ ভেসে গেল সশব্দে। তার উপরে ব'সে ভয়ে কাঁপছিল দু'টি ভাই বোন—মেয়েটির নাম উমা, বয়স উনিশ-কুড়ি, ভাইটির নাম বরুণ বয়স বছর পনর। দু'জনেই আমার প্রেসে কাজ করত। খাপরার ছাদটা ভেসে যেতেই ওরা চিৎকার ক'রে সাঁতার দিয়ে কোন মতে এসে ঐ যে নিচের ল্যাম্পপোষ্ট না?—ওর দু'ধারের দুটো ডাণ্ডা চেপে ধরল।

"দেখছেন ত—ল্যাম্পপোষ্টটার ডাণ্ডা দুটো আমাদের দোতলার জানলার প্রায় সামনে? আমার মাথায় ফের একটা বুদ্ধি গজাল। আমি ভক্তিকে 'একটু রোসো' ব'লেই নিচে নেমে গেলাম একটি মোটা লকড়ি নিয়ে। এতক্ষণে আমার দোতলার প্রতি ঘরে জল প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঠেছে—মাত্র হাত দুই বাকি। আমি করলাম কি সাঁতার দিয়ে ঘরে ঢুকে খোলা জানলার কাছে পৌঁছে লকড়িটা বাড়িয়ে দিয়ে ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে ঠেকান দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম বরুণকে: 'এই লাঠি বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে এস—আমি টেনে নেব।'

"বরুণ লাঠি ধ'রে ঝুলে পড়তেই উমাও এল ঐ ভাবেই। আমি ঘরের মধ্যে ওদের টেনে খাটে দাঁড় করিয়ে দিলাম। পরে বললাম, এবার সাঁতার দিয়ে চল দোরের পানে—কারণ খাট ছেড়ে দিলেই ডুব জল, সাঁতার দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভাগ্যে ওরা সাঁতার জানত—তাই বেঁচে গেল। এই হ'ল আমার প্রথম পতিতোদ্ধার, সাধুজি।" ব'লে একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে বলল, "বরুণ আর উমাকে নিয়ে ছাদে উঠে আসতেই দেখি সে আর এক বিচিত্র কাণ্ড! বলে না truth is stranger than fiction? কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি সাধুজি! কারণ যা দেখলাম তা অভাবনীয়—অনু—" ব'লেই স্ত্রীকে বলল, "তুমিই বল তোমার কাহিনী।"

অনসূয়া বলল, "উনি নিচে নেমে যেতেই আমার ভয় হ'ল পাছে ভক্তিদের ছাদটাও অমনি পাশের খাপরার ছাদের মতনই ধ্বসে পড়ে। কারণ ভক্তিদের টিনের ছাদ ত, মড়মড়ও করছিল, ভেঙ্গে পড়তে কতক্ষণ? তাই বরুণ উমার ভাবনা ছেড়ে আমি দড়ি ছুড়লাম। কিন্তু তখন বাতাস উঠেছে—আর বেশ জোর বাতাস—দড়ি কিছুতেই অতদূর পৌঁছয় না—কেবলই জলে পড়ে যায়। তখন মাথায় এক ফন্দি এল। আমার ছেলেবেলায় খুব গাছে ওঠা অভ্যাস ছিল। সাঁতারও শেখাই এখানে এক স্কুলের মেয়েদের, কাজেই দেহও অপটু নয়—তাই ভরসা ছিল যে, সামনের জলে পড়ে গেলে সাঁতার দিয়ে ফিরে

আসতে পারব আমাদের ছাদে। যা হোক গুরুমন্ত্র জপ করতে করতে দড়ির এক প্রান্ত এই lightning conductor-এর গোড়ায় চৌকোনা পাথরটার সঙ্গে কষে বেঁধে খোলা প্রান্তটা নিয়ে গাছে উঠে এ ডাল ও ডাল ক'রে দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ওপারের ছাদের উপরকার ঝুলন্ত ডালে। ভক্তি ভয়ে আপ্রাণ হাঁকছে, 'কি কর দিদি! মরবে যে—ফিরে যাও···' কিন্তু শুনছে কে? আমি ডাল থেকে লাফ দিয়ে নামলাম ঠিক ভক্তির পাশেই। বললাম, 'এই আমি ধরছি ভক্তি, তুই দড়ি বেয়ে ঝুলে পড়।' ভক্তি বলল, 'আমার গায়ে কি তোমার মত জোর আছে দিদি?' আমি বললাম, 'তুই কি বোকা রে! এতদিন সাঁতার দিয়েও এটুকু জানিস না যে জলে শরীরের ভার কমে যায়? তুই দড়ি ধ'রে ঝুললে তোর কোমর অবধি জলে ডুবে থাকবে—তার পর দেখছিস ত এ-দড়িটা নীচু হয়ে ঝুঁকে গিয়ে লেগেছে আমাদের ছাদের কার্নিসে। তুই হাতে হেঁটে আর পায়ে জল ঠেলে সড় সড় ক'রে পিছলে পৌঁছে যাবি—যদি শুধু দড়িটা না ছাড়িস।' ততক্ষণে জল আরও উঠেছে—প্রায় আমাদের ছাদের কার্নিস পর্যন্ত।"

"বলতে বলতে" বলল অনসূয়া "দেখি উনি ছাদে ফিরে এসেছেন।" ওঁকে চেঁচিয়ে বললাম, "এদের পাঠাচ্ছি আমি—গ্রহণ করবার ভার তোমার।"

উনি খুশী হয়ে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই, আমি এদিক্ থেকে ঠিক লুপে নেব, তুমি শুধু ওদিক্ থেকে এক এক ক'রে পাঠাও শীগ্‌গির—জল আরও উঠছে।"

ততক্ষণে জল আরও একহাত উঠে প্রায় আমাদের কার্নিসে ঠেকেছে। কাজেই ভক্তি দড়ি ধ'রে ঝুলে পড়তেই ওর প্রায় বুক পর্যন্ত জলে। ফলে ও সহজেই পৌঁছল, ওর পরে মেয়েরাও এক এক করে। কিন্তু মুশকিল হ'ল ঐ বারটি শিশুকে নিয়ে। মাত্র দশ-বার বৎসরের ছেলে ত, তাই প্রথমটায় ডরিয়ে উঠেছিল বৈ কি। কিন্তু একে একে মেয়েদেরও যেতে দেখে তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় ভবানী!' ব'লে। তারা মারাঠি ছেলে ত—শিবাজি জন্মেছিলেন এই দেশেই—বললাম ওদের দিলাশা দিয়ে। তাতে ওরা আরও উজিয়ে উঠল। ফল হ'ল আশাতীত—এক এক ক'রে তিনটি দাসী কুড়িটি মেয়ে ও বারটি ছেলে পৌঁছে গেল আমাদের ছাদে আধ ঘণ্টার মধ্যে। আর বড় সময়েই পৌঁছেছিল কারণ দেখতেই ত পাচ্ছেন। জখম ছাদটা বাতাসে কি রকম দুলছে—আর কিছুক্ষণ ওরা থাকলে নিশ্চয়ই ভেঙে পড়ত হুড়মুড় ক'রে। আর তখন কে বাঁচাত ওদের বলুন?"

সখারাম বলল, "সত্যি সাধুজি! আমার কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল যখন একে একে ওরা সব দড়ি বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে ওদিক থেকে এদিকে আসতে লাগল পিছলে পিছলে—পায়ে জল ঠেলে হাতে হেঁটে।" ব'লেই আলোকের দিকে চেয়ে হেসে, "যদি তুই দেখতিস্ সে-দৃশ্য তাহলে হয়ত তোর আর সন্দেহ থাকত না যে শেক্সপীয়র মিথ্যে বলেন নি যখন তিনি হ্যামলেটে বলেছিলেন,—

"There's a divinity that shapes our ends,
Rough hew them how we will."

ব'লেই থেমে, "আর এ-লাইন দু'টি আমার আরও বেশি ক'রে মনে পড়েছিল কখন বলব? যখন ওঃ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সেরা অ্যাড্‌ভেঞ্চারটিই বলতে ভুলে গেছি—মাথায় কি একটা ভাবনা ঘুরছে আজ? উল্টোপাল্টা কতরকম চিন্তার কুরুক্ষেত্র :—শোন্ বলি।"

ব'লে থেমে দম নিয়ে সখারাম বলল, "সবাই যখন চ'লে এল তখন শেষ ছেলেটি দড়ি ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ হাত ফস্কে জলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনু ঝাঁপ দিল। কেবল ওকে ধন্যি বলি যে দড়িটা ছাড়ে নি। নৈলে ওরা বাঁচত না স্রোতে ভেসে যেত।"

নমিতা শিউরে উঠল, "মাগো! অনুদি ঝাঁপ দিল! ধন্যি!"

অনসূয়া বলল হেসে, "ধন্যির কি আছে—যখন হাতে দড়ি ছিল? বলি নি আমি মেয়েদের সাঁতার শেখাই? আমাকে শেখাতে হয় কি ক'রে ডুবুডুবুদের বাঁচাতে হয়। তা ছাড়া স্রোতটা ছিল আমাদের বাড়ী থেকে অনাথাশ্রমের দিকে তাই আমি ঝাঁপ দিতেই ছেলেটা আমার কাছে ভেসে এল চিৎকার ক'রে। সত্যিকার বিপদ্ হয়েছিল তখন। কারণ আমি যদি একটি বার তার কোমর ধরতে পারতাম তাহলে সহজেই তাকে টেনে আনতে পারতাম—আরো এই জন্যে যে দড়ি ছিল আমার হাতে। কিন্তু সে ডুবে গিয়ে ভয়ে আমার দুই পা চেপে ধরল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম, চেঁচিয়ে বললাম, 'পা ছেড়ে দে, আমার কোমর ধর। কিন্তু ভয়ে সে এমনি চেপে ধরল আমার পা যে, আমি নিশ্চয়ই ডুবে ভেসে যেতাম ঐ স্রোতে যদি না উনি চেঁচিয়ে আমাকে বলতেন, 'কোন ভয় নেই, কেবল দড়ি ছেড় না।' বলতে বলতে আমাকে কার্নিসের কাছে টেনে এনে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিতেই ওঁর হাত চেপে

ধরলাম। তার পর ভক্তি ধরল আমার এক হাত, উনি অন্য হাত।"

সখারাম এবার আলোকের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "বল্ এবার—মনে হয় কি না যে, শেক্সপীয়র একটুও ভুল বলেন নি যখন তিনি বলেছিলেন, 'মানুষ ভুলচুক ক'রে সব তছনছ করলে হবে কি, ঠাকুর যে আড়াল থেকে সব ভাঙাচুরাই মেরামত করছেন, রওনা ক'রে দিচ্ছেন দিশাহারাকে ধ্রুবলক্ষ্যের পথে'।"

আলোক হাসল না, বলল, "বিশ্বাসীর ভর বিশ্বাসে—তার উপর কথা চলে না। কিন্তু···বলে অনসূয়ার দিকে চেয়ে, আজ আর তর্ক-যুক্তি নয় দিদি! আমার মন একেবারে টইটুম্বুর হয়ে গেছে। আমি বয়সে তোমার চেয়ে বড়, কিন্তু তোমাকে প্রণাম না ক'রে থাকতে পারছি না আজ।"

অনসূয়া চেঁচিয়ে বলে, "কি করেন, কি করেন দাদা!" কিন্তু কে শোনে? আলোক গড় হয়ে প্রণাম করে ওকে।

সখারাম, "কি পাগল!" বলতেই ফের ঢিপ্ ক'রে ওকে আর এক প্রণাম।

সখারাম হেসে বলে, "এর মানে? স্ত্রী বীরবালা হলেই যে তার স্বামী পুংলিঙ্গে বীরবালক ব'নে যায় একথা ত পাণিনিতে নেই।"

নমিতা চুপ ক'রে সাধুজির পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল জল-ভরা চোখে, হঠাৎ চোখ তুলে হেসে বলল, "তা না থাকতে পারে মামাবাবু, কিন্তু সিংহী যে খরগোসের গলায় মালা দেয় না একথা স্বয়ংবরা-সংহিতার প্রথম পাতায়ই আছে। সত্যি অনুমাসীমা, তুমি তুমি··· তুমি···যা দেখালে আজ···" বলেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

অনসূয়া, "কি পাগলামি করছিস, তোরা সবাই মিলে বল্ তো? বিপদে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায় ব'লেই আজও চন্দ্রসূর্য উঠছে রে। নইলে কি এ-জগৎকে উদ্ধার করতে নামতে ঠাকুরের টনক নড়ত, না তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের পাঠাতেন এ-পৃথিবীতে?" ব'লেই সাধুজির দিকে তাকিয়ে, "না, এ আমার মেয়েলি উচ্ছ্বাস নয় বাবা! আমি সত্যি বলছি আপনাকে—আমার মনে প্রথমটায় খুবই ভয় এসেছিল। কিন্তু তার পরেই জাগল ধিক্কার আপনার একটা কথা মনে ক'রে যে, রিপু আমাদের ছয়টা নয় সাতটা আর এই শেষের রিপু ভয়কে জয় না করলে বৃথা তাঁর জয়গান। অমনি বল এসে গেল যে কোত্থেকে···

সাধুজি হেসে বললেন, "সব বলই আসে সেই এক-জনার কাছ থেকে মা। সাধুসন্ত মুনিঋষিও যাঁর প্রসাদ পেয়ে অভয় হয় তুমিও তাঁরই প্রসাদে পারলে যা...যা পেরেছ।" বলতে বলতে তাঁর গলা ধ'রে এল, বললেন গাঢ়কণ্ঠে, "মা কি বলব তোমাদের এরপরে? শুধু বলি যে এখানে গুরুকেই তোমরা গৌরব দিলে শিষ্য-শিষ্যা হয়ে।"

অনসূয়া ও সখারাম, "কি যে বলেন!" "বলেই যুগপৎ তাঁকে প্রণাম করল। সাধুজি তাদের মাথায় হাত রেখে চোখ বুঁজে চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ।···ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটের কোণে দিব্য হাসি।

চোখ চেয়ে বললেন সখারামকে, "আমার মনে পড়ছে একটা গল্প, শোন বলি।"

"দেবতা আর অসুর মিলে পুরাকালে সমুদ্র মন্থন করেছিল অমৃতের লোভে। কিন্তু উলটো উৎপত্তি হ'ল—উঠল করাল কালকূট—কালো বিষ। তখন প্রজাপতিরা শিবকে স্তব ক'রে প্রার্থনা করলেন, 'ত্রাহি মাং শরণাপন্নান্ ত্রৈলোক্যদহনাদ্ বিষাৎ—আমরা আপনার শরণাগত, এই দারুণ বিষের দাহ হ'তে আমাদের বাঁচান।' তখন করুণাময় সদাশিব পার্বতীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'আহা, দেখ দেখ সতী। প্রাণ-ভয়ে জীব আমার কাছে অভয় চাইছে—এদের ত্রাণ না ক'রে কি আমি থাকতে পারি?'

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি মাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ··
পরমারাধনং তদ্ হি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ॥

সাধুরা ক্ষণভঙ্গুর প্রাণকে বিসর্জন দিয়েও পরকে রক্ষা করেন—আর এই রক্ষা করার নামই নিখিলহৃদয়বাসী পরমপুরুষের চরম আরাধনা।' ব'লে তিনি আর্তদের রক্ষা করতে আকণ্ঠ বিষ পান করলেন—যার ফলে তাঁর কণ্ঠ কালো হয়ে গেল, নাম হ'ল তাঁর শিতিকণ্ঠ বা নীলকণ্ঠ।"

এই সময়ে ভক্তি এসেই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সাধুজি তার মাথা কোলে টেনে নিয়ে ভাবমুখে ব'লেচললেন:

"এই-ই তো চাই মা—এই হ'ল সবচেয়ে বড় সাধনা, সবার বড় মুক্তি মেলে এই একটি মাত্র পথে—'আমি ও আমার' এই অজ্ঞান থেকে মুক্তি—যখন আমি আমি না ব'লে জীব বলে তুহুঁ তুহুঁ বা তিনি তিনি।"

* * *

ভক্তি ওঁর কোল থেকে মাথা তুলে মুখ নিচু করে থাকে। একটি কথাও বলে না···শুধু তার চোখ থেকে টপ টপ ক'রে দুই বিন্দু অশ্রু পড়ে সাধুজির পায়ে। ···আঁচল দিয়ে মুছে তাঁর পায়ে মাথা রাখে।

অনসূয়াই প্রথম কথা বলে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বাবা?"

"কী মা?"

অনসূয়া আঁচলে চোখ মুছে বলে, "যতই বলি বাবা, অবুঝ মন যে মেনেও মানতে চায় না···কেবলই মন টোকে, ঠাকুর যদি সত্যিই দয়াঘন প্রেমঘন দুঃখহারী হন তবে...তবে যে দয়াময়ীর কৃপায় পঁয়ত্রিশটি প্রাণী বাঁচল···তার বুকে কেন তিনি এত বড় শেল হানলেন? এরও কি প্রয়োজন ছিল? তিনি কি ইচ্ছে করলে ওর··· ওর অন্ধের নড়িটিকে বাঁচাতে পারতেন না?"

সাধুজি ভক্তির মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তার জলভরা চোখে চোখ রেখে কোমলকণ্ঠে বললেন, "কাঁদে না মা! জগতে লক্ষ লক্ষ মা আছে যারা পুত্রশোক পেয়ে জ্বলে পুড়ে মরেছে। কেবল এমন মা-র দেখা মেলে···বহুভাগ্যে যে দুঃখের আগুনে ঝলকে ওঠে কাঁচা সোনার কান্তিতে।" ব'লে ওর দু'টি হাত কোলে টেনে এনে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "কি আর তোমাকে বলব বলো মা, যে···যে দীক্ষা নিতে এসে দীক্ষা দিয়ে যায় তাকে বলে ঠাকুরের সাধনা।···"

ভক্তি আকুল কণ্ঠে বলে, "অমন কথা বলবেন না গুরুদেব! শুধু আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

সাধুজির চোখের জলে হঠাৎ ফুটে উঠল এক অপূর্ব হাসি, তিনি মুখ তুলে উপরের দিকে চেয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, "ঠিক স···স···সময়েই এসেছ ঠাকুর···শুধু তুমিই পার তাকে আ···আশীর্বাদ করতে যার হৃদয়ে তো···তোমার নামের বর ফুটে উঠেছে প্রেমের চাঁদ হয়ে···যার আলোয় আমির অ···অ অমাবস্যা গেছে কেটে···রা···রা···রাখো ঠাকুর ওর মাথায় হা···হা···।"

নিশ্চুপ···কেউ কথা কয় না··শুধু সাধুজির গাল বেয়ে দুই বিন্দু অশ্রু নামে ধীরে ধীরে।

* * *

হঠাৎ ওরা চম্‌কে ওঠে···নিচে ঘন ঘন হর্ণ···"আত্রে জী!···আত্রে জী!"

কুড়ি

আলোক সখারামের সঙ্গে নিচে নেমে যায়। দোরের কাছে গিয়েই ওরা চম্‌কে ওঠে। সখারাম বলে, "আপনি?—এ কী!"

অফিসারের কাঁধে মণি নেতিয়ে। আলোকের বুকে কে যেন হাতুড়ি মারে, "আহা! এ নিষ্ঠুর পরিহাসের কী দরকার ছিল্—মৃত শিশুকে মা-র কোলে ফিরিয়ে দিয়ে! ঠাকুরের এ কী লীলা!"

অফিসার সখারামকে একগাল হেসে বলল, "আপনি কাল্ রাত্রে খবর দিয়ে কী যে ভাল করেছিলেন—! আমরা সব থানায় ঘাঁটিতে খবর দিয়েছিলাম দোল্‌নাটির বর্ণনা দিয়ে। কাল রাত দশটায় হোলকার ব্রিজের ওদিকে যে-কবরস্থান আছে না? সেখানে যেতে হয়েছিল জলে ভেসে-আসা বহু মানুষ গরু আসবাব পত্র আটকে আছে খবর পেয়ে।' সেখানে গিয়ে সে সব টেনে টেনে ট্রাকে তুলতে গিয়ে টর্চ ফেলে দেখি দোল্‌না—সোজা হয়েই আছে—আর তার মধ্যে শুয়ে এই শিশু! ভাবতে পারেন? ঘুমাচ্ছে অকাতরে—ঠোঁটের কোণায় এক ফালি হাসির আলো—যেন দেয়ালা করছে।"

সখারাম লাফিয়ে ওঠে, "ঘুমচ্ছে! মরে নি!"

অফিসার হেসে বলে, "তবে আর বলছি কী? দোল্‌নাটি ওর নৌকো হয়ে নিশ্চয় সোজা ছুটেছিল ঢেউয়ে ঢেউয়ে। কবরস্থানে একরাশ লতাপাতার মধ্যে পড়ে আটক—তাই ওলটায় নি।" ব'লেই উৎফুল্ল হয়ে, "আমরা তুলে নিয়ে এসে সেঁক দিলাম। দুধও খেল ও পরমানন্দে। আজ আমরা কাগজে ছাপতে দিয়েছি অনাথাশ্রমে শিশুদের দড়ির ব্রিজ বেয়ে রক্ষা পাবার কাহিনী আর এই ছেলেটির দোলনার নৌকোয় বন্যা-বিহারের কাহিনী। যদিও জানি অনেকেই বিশ্বাস করবে না এ-হেন অঘটন। বলবে—news-paper stunt!"

সখারাম আনন্দে অধীর হয়ে ঘুমন্ত শিশুকে বুকে টেনে নিয়ে চিৎকার ক'রে ডাকল, "ভক্তি! ও ভক্তি! দেখ্ দেখ্ কে এসেছে রে, কে এসেছে!"···

ছুটে নেমে এল ভক্তি, পিছনে অনসূয়া—সবশেষে সাধুজি। ভক্তি মণিকে দেখেই চিৎকার ক'রে বুকে টেনে নিল। অনসূয়া শিউরে উঠল আনন্দে, "এ কী! ছেলে বেঁচে?"

অফিসার বলল, "ওর গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি মা। তবে ভিতরে নিয়ে গিয়ে কেবল সেঁক দিন।"

ভক্তি মণিকে বুকে নিয়ে গড় হ'য়ে সাধুজিকে প্রণাম ক'রে হারাধনের মাথা ঠেকাল তাঁর পায়ে। সাধুজি তাকে বুকে তুলে নিয়েই গান ধ'রে দিলেন—

চোখে জল, মুখে হাসি:
প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশবধৃত-মীন শরীর জয় জগদীশ হরে...*
অনাথাশ্রমের মেয়েরা এসে যোগ দিল···
রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল···
ঝংকার বেজে উঠল শত কণ্ঠে,
জয় জগদীশ হরে···

---

* প্রলয়ে নিমজ্জিত বেদ তুমি তুলিলে
অবতরি' সিন্ধুর সলিলে—
মীনরূপ তরী করি' শরীরে।
জয় জয় জগদীশ হরি হে!
আচার্য বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার-কৃত অনুবাদ

# জাতীয় জীবনে আদিবাসীদের স্থান

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

ভারতের আদিবাসী বা উপজাতিদের বিচিত্র জীবন ও রীতিনীতি নিয়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় আজকাল অনেক লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শুধু উপজাতি জীবনের যে দিকগুলি আমাদের চোখে বিচিত্র ঠেকে তাকে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ঐ দিকগুলির আড়ালে রয়েছে যে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বহুমুখী সমস্যা, তার খবর ক'জনে রাখে? যে বৈচিত্র্যের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই তার উৎস এবং সামগ্রিক রূপটিকে বোঝার চেষ্টাই বা কতটুকু হয়? অথচ সেদিকে প্রচেষ্টা হওয়া সবচেয়ে বেশী দরকার। আর প্রয়োজন আমাদের জাতীয় জীবনে উপজাতিদের স্থান কি হবে নির্ণয় করা। এদের সম্বন্ধে সমাজ ও রাষ্ট্র দুইয়েরই গুরু-দায়িত্ব আছে। ভারতের সংবিধানে উপজাতি উন্নয়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জনমত অবহিত এবং সচেতন না হলে কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

ভারত সরকারের রচিত তালিকা অনুসারে সারা ভারতে ৫৭২টি উপজাতি আছে। সংবিধানে এদের কয়েক বৎসরের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। কারা কারা ঐ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ঠিক করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের উপজাতিদের একটি তালিকা বা তপশীল তৈরী করেন। সেই থেকে এরা তপশীলভুক্ত উপজাতি নামে পরিচিত। এদের আদিবাসী নামেও অভিহিত করা হয়। কেননা এদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল ভারতের প্রাচীনতম অর্থাৎ প্রাক্-আর্য্য ও প্রাক্-দ্রাবিড় যুগের অধিবাসী। তপশীলভুক্ত উপজাতি বা আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যা হ'ল দুই কোটি ছত্রিশ লক্ষ। ১৯৫১ সনের লোকগণনায় ধরা হয়েছিল এক কোটি একানব্বই লক্ষ। কিন্তু পরে ভারত সরকার আরও অনেকগুলি উপজাতিকে তপশীলভুক্ত করায় সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। ভারতের মোট জনসংখ্যার হিসাবে নগণ্য হলেও কয়েকটি রাজ্যে আদিবাসীদের আনুপাতিক সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। যেমন আসামে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৯.২ ভাগ হ'ল আদিবাসী। সংখ্যার দিকে সব চাইতে বেশী উপজাতীয় লোক আছে মধ্যপ্রদেশে ও বিহারে, উভয় রাজ্যেই তাদের সংখ্যা ৪০ লক্ষের উপরে। তার পরে যথাক্রমে বোম্বাইতে ৩০ লক্ষ; উড়িষ্যাতে ২৯ লক্ষ; অন্ধ্রে ৮ লক্ষ; পশ্চিম বাংলায় ৭ লক্ষ; রাজস্থানে ৩ লক্ষ। তাছাড়া কেরল, মাদ্রাজ, মহীশূর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরাতে কিছু কিছু আদিবাসী আছে।

১৯৫১ সনের লোকগণনা (Census) অনুসারে এদের বেশীর ভাগ অর্থাৎ ১৯১ লক্ষের মধ্যে ১৭২ লক্ষ হ'ল কৃষিজীবী। কৃষি ছাড়া কয়লা ও লোহার খনি, চা, কফি ও রবার বাগিচা, সরকারের বন-বিভাগ এবং বে-সরকারী কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতির অধীনে কাজ করে প্রায় ১৮।১৯ লক্ষ। আর পরশ্রমভোগীর সংখ্যা অত্যন্ত কম অর্থাৎ মাত্র এক লক্ষ। বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, কৃষিজীবীদের মধ্যে বেশীর ভাগ হ'ল গরীব ও ভূমিহীন। তাদের উপর অন্-উপজাতীয় জমিদার এবং মহাজনদের শোষণ অত্যন্ত প্রচণ্ড। যে সব লোকেরা কয়লা খনি, চা-বাগিচা ইত্যাদিতে এবং বনবিভাগ বা ঠিকাদারদের অধীনে কাজ করে তাদের অবস্থার সম্প্রতি কিছু কিছু উন্নতি হলেও সেদিন পর্য্যন্ত সবদিক দিয়ে শোচনীয় ছিল।

শুধু অর্থনৈতিক দিক বা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে আদিবাসী সমস্যার আসল চেহারার কিছুই বোঝা যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে হ'লেও সেই সমস্যার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিতির চেষ্টা করা হবে।

ভাষা, রীতিনীতি এবং সামাজিক অগ্রগতির স্তরের দিক দিয়ে উপজাতিদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। দেখা যায়, একদিকে যেমন কিছু কিছু উপজাতি আদিমতম যুগের অবস্থায় পড়ে আছে, অন্যদিকে তেমনি কয়েকটি কৃষি সংস্কৃতির পর্য্যায়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। সব চাইতে পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে কোচিনের পাহাড় ও বনের অধিবাসী 'কাদার', 'মালাপস্তরম্', 'আরান্দান', 'পানিয়ার', মাদ্রাজে নালাইমাল্লাই পাহাড়ের 'চেনচু', দক্ষিণ কানাডার 'কোরাগা' ও 'মালেকুদিয়া', 'সোলাগা', বোম্বাই রাজ্যে 'কঠোদি' এবং

'কাতকরী', ছোটনাগপুরের 'বিরহোড়', গাড়োয়াল অঞ্চলের 'বনমানুস' ইত্যাদি। এরা এখনও কৃষিকার্য্য শেখে নাই। তাদের জীবিকার প্রধান উপায় হ'ল ছোট ছোট পাখী ও জন্তু শিকার এবং বনজাত জিনিস যথা, ফল, মধু, লতাপাতা, গুল্ম, আঠা প্রভৃতি সংগ্রহ। নৃতত্ত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী এরা হ'ল খাদ্য সংগ্রহকারী (food gatherer); এখনও খাদ্য উৎপাদক (food producer) হতে পারে নাই। এরা এখনও কোন এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাসে অভ্যস্ত হয় নাই। এই স্তরের কয়েকটি উপজাতি গাছের বল্কল, লতা ইত্যাদির দ্বারা দড়ি বা অন্য জিনিস, বাঁশের চুপড়ি, মাছ ও পাখীধরা জাল, তীর-ধনুক ইত্যাদি তৈরী এবং ঐ সবের বিনিময়ে প্রতিবেশী অন্-উপজাতির লোকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। 'আরান্দান' উপজাতির লোকেরা সেদিন পর্য্যন্ত পাহাড়ের গুহায় বাস করত। এখনও 'আরান্দান', 'মালাপন্তরম্', 'বিরহোড়' প্রভৃতি স্থায়ী গৃহ-নির্ম্মাণ বা স্থায়ীভাবে বসবাসে অভ্যস্ত হয় নাই। তারা কোন রকমে ঘাস বা পাতা দিয়ে তৈরী অস্থায়ী আশ্রয়ে বাস করে। কিছুদিন আগেও ঘাস বা লতাপাতার আবরণই ছিল এদের পরিচ্ছদ। সম্প্রতি কাপড়ের চলন হয়েছে।

উপরোক্তদের তুলনায় একটু উন্নত উপজাতিদের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড় অঞ্চলের 'মালয়ারিয়ান', 'মালা-পুলিয়ান', 'থাণ্টাপুলিয়ান', 'উরালি', 'মুথুভন', 'কানিক্কর', তামিলনাদের 'ইরুলা', উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের 'পাহাড়ী খরিয়া', উড়িষ্যার 'জুয়াঙ্গ', 'পাহাড়ীবন্ডো', রাজমহল পাহাড়ের 'পাহাড়িয়া'দের নাম করা যায়। এই দ্বিতীয় স্তরের উপজাতিরা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে আদিম-ধরনের কৃষি অর্থাৎ 'ঝুম চাষ' করে। ইংরেজীতে এই ধরনের কৃষিকে Shifting Cultivation বলা হয়। জঙ্গল কেটে তাতে আগুন লাগান হয় এবং পরে সেই ছাইয়ের নীচের মাটিতে সামান্য গর্ত্ত ক'রে বীজ ছড়ানো হয়। দু'তিন বৎসর পর পর এই ধরনের চাষের ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই জন্যেই এই স্তরের উপজাতিরা কোন এলাকায় স্থায়ী হতে পারে না। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এদেরও পরিচ্ছদ ছিল ঘাস বা লতাপাতার আবরণ। এদের মধ্যে 'উরালি'রা গাছের উপরে, মাটি থেকে প্রায় ৫০,৬০ ফুট উঁচুতে ঘর তৈরী করে। বয়ঃসন্ধি, মাসিক ঋতুকাল এবং সন্তান প্রসব ইত্যাদি সময়ে মেয়েরা অন্যদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার জন্য ঐ সব ঘরে আশ্রয় নেয়।

তৃতীয় স্তরের উপজাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মাদ্রাজের নীলগিরি পাহাড়ের 'টোডা', অন্ধ্রের 'এনাদি', রাজস্থান থেকে অন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'লম্বাডি', হিমাচল-প্রদেশের চম্বা জেলার 'গদ্দি' ও 'গুজ্জর'। এরা সবাই যাযাবর বা অর্দ্ধ-যাযাবর এবং এদের প্রধান জীবিকা হ'ল পশুপাল। 'টোডা'দের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কাজের কেন্দ্র হ'ল মহিষ। মহিষের দুধ দোয়ানো এদের কাছে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের অনুরূপ। দুধ দোয়ানো থেকে সুরু করে সমস্ত স্তরের কাজে পুরোহিতরা আগে অনুষ্ঠান পালন করে। মেয়েদের দুগ্ধ দোহনের স্থানের কাছে যেতে দেওয়া হয় না। টোডাদের অপর বিশেষত্ব হ'ল চোঙ্গের মত আকারের গৃহ। পশুপালন ছাড়া তারা কাঠের কাজ এবং মেয়েরা সূচীকর্ম্মে খুব দক্ষ। সম্প্রতি এরা কিছু কিছু কৃষির কাজও সুরু করেছে।

লম্বাডি, গুজ্জর, গদ্দি প্রভৃতিরা পশুপালন ও দুগ্ধজাত জিনিস বিক্রয় ছাড়া নানারকম হাতের কাজে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দেয়।

উন্নতির পরবর্ত্তী স্তরে রয়েছে নীলগিরি পাহাড়ের 'কোটা' ও উইনাদ জেলার 'উরালি কুরুম্বার', গোদাবরী উপত্যকার 'কোয়া', মধ্যপ্রদেশের 'আগারিয়া' এবং ছোট-নাগপুর অঞ্চলের 'অসুর' ইত্যাদি। এদের বলা যায় প্রতিবেশী উপজাতিদের 'বিশেষজ্ঞ কারিগর'। স্মরণাতীত কাল থেকে এরা বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প এবং লোহা-গলানো, ঢালাই এবং লোহার যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কাজে দক্ষতা লাভ করেছে। প্রতিবেশীদের ঐ সব জিনিস সরবরাহ ক'রে তার বদলে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে ব'লে এরা কৃষিকার্য্যের দিকে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য এরা কৃষিতে একেবারে অনভিজ্ঞ নয় এবং প্রয়োজন মত জীবিকা সংস্থানের জন্য তার সাহায্য নিয়ে থাকে। 'কোটা', 'কোয়া', 'উরালি কুরুম্বার' প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি কাজে এবং পশুচারণে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দেয়। 'কোটা'রা অন্যান্য উপজাতির বিবাহাদি উৎসবে বাদকের কাজও ক'রে থাকে।

উপজাতিদের মধ্যে সমাজ বিকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপস্থিত হয়েছে কৃষিজীবিরা। এরা বহুকাল ধরে কোন না কোন রূপে কৃষিকে জীবিকার প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই স্তরের উপজাতিদের মধ্যে যথাক্রমে 'ঝুম'-চাষ পাহাড়ের গা কেটে তৈরী ক্ষেতে চাষ (terrace cultivation) এবং সমতল-ভুমিতে লাঙ্গলের দ্বারা চাষ—তিনটি পদ্ধতিই প্রচলিত। জনসংখ্যার দিক দিয়েও কৃষিজীবি উপজাতিরা অন্যান্যদের তুলনায়

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

শারদ প্রভাতে

সম্মানের আসন দখল করে আছে। যথা, 'গোণ্ড'—৩২ লক্ষ; 'সাঁওতাল'—২৮ লক্ষ; 'ভীল'—২২ লক্ষ; 'ওরাওঁ' —৬½ লক্ষ; 'মুণ্ডা'—৭ লক্ষ; 'খোন্দ'—৩ লক্ষ; 'শবর'—৪ লক্ষ; 'হো'—৩,৮০,০০০; 'নাগা'—২,৮০,০০০; 'খাসি' —আড়াই লক্ষ; 'ওরলি'—১,৪২,৭০০। গোণ্ডদের বাসভূমি প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশে ও বর্ত্তমান অন্ধ্রের এক অংশে। সাঁওতালদের বিহারে ও পশ্চিম বাংলায়, ভীলদের মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান ও বোম্বাই প্রদেশে; ওরাওঁ, মুণ্ডা এবং হো-দের বিহারে; খোন্দদের উড়িষ্যায়; শবরদের উড়িষ্যা ও অন্ধ্রে; নাগা এবং খাসিদের আসামে; ওরলিদের বোম্বাইতে। উপরোক্তরা ছাড়া এই স্তরের উপজাতিদের মধ্যে পড়ে মহীশূরের 'এরবা', মধ্যপ্রদেশের 'হলবা', 'ভুঁইয়া'; উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের 'গদব', উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে 'থারু' এবং আলমোরা জেলার 'কুথালিয়া বোরা'; পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলের 'টোটো', তরাইয়ের 'মেচ' এবং দার্জ্জিলিং পাহাড়ে 'লেপচা'; আসামে 'গারো'; 'রাভা' ও 'কাছাড়ী ইত্যাদি।

ভাষার দিক দিয়েও উপজাতিদের মধ্যে বহু তফাৎ আছে। হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল "ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপজাতিরা যথা, 'নাগা', 'গারো', 'রাভা', 'লেপচা' প্রভৃতিরা হ'ল ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষাভাষী। 'খাসি' দের ভাষা আলাদা এবং অষ্ট্রিক বা কোলমুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ছোটনাগপুর ও মধ্য ভারতের বেশীর ভাগ উপজাতি কোলমুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাভাষী। এদের মধ্যে ওরাওঁদের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর একটি শাখা বলে পরিগণিত হয়। দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ গোদাবরী উপত্যকা থেকে মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরল প্রভৃতি রাজ্যের উপজাতিরা নিজেদের প্রাচীন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কি তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল তা আজও জানা যায় নাই। বর্ত্তমানে তারা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অর্থাৎ তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালম্ অথবা তাদের কোন উপভাষাভাষী হয়ে পড়েছে। ভীলদের বর্ত্তমান ভাষা 'ভীলী' আর্য্য গোষ্ঠীরই একটি শাখা। ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব-বিভাগের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চলের 'আকা', 'ডাফলা' প্রভৃতি উপজাতির ভাষায় ইন্দো-আর্য্য ভাষা গোষ্ঠীর প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন স্তরের উপজাতিদের মধ্যে 'মাতৃসত্ত্বাক' ও 'পিতৃসত্ত্বাক' দুই ধরনের সমাজেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। তার সঙ্গে সমাজ বিকাশের স্তরের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। যেমন একেবারে দক্ষিণ ভারতের একেবারে পশ্চাৎপদ উপজাতিগুলির অনেকের মধ্যে এখনও 'মাতৃসত্ত্বার' প্রচলন আছে। আবার 'কাদার'-দের সমাজ 'মাতৃ' বা 'পিতৃ' কোন সত্ত্বাকেই এককভাবে মেনে চলে না। তাদের মধ্যে উভয় সত্ত্বারই আধিপত্য। 'উলাদ্দান'দের সমাজ রয়েছে এক মধ্যবর্ত্তী স্তরে। সেখানে কোন লোকের সম্পত্তির অর্দ্ধেক পায় তার নিজের ছেলেরা এবং বোনের ছেলেরা পায় বাকী অর্দ্ধেক। মাতৃসত্ত্বাক সমাজের একটি প্রথা অর্থাৎ মাতুল ভাগিনেয়ীর বিবাহ এদের মধ্যেও প্রচলিত। 'উরালি'-দের সমাজ মাতৃসত্ত্বাক কিন্তু স্ত্রী বাস করে স্বামীর গৃহে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সম্পত্তির অধিকারী। ছেলেরা বাপের সম্পত্তি পায় কিন্তু মাতুলের সম্পত্তি পায় না। যেখানে কোন ছেলে নাই সেখানে মেয়েরা সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। মৃতকের ছেলে বা মেয়ে কেউ না থাকলে সম্পত্তি পায় ভাগিনেয়। টোডারা পিতৃসত্ত্বাক এবং তাদের সমাজে মেয়েদের স্থান পুরুষের অনেক নীচে। দুগ্ধদোহন ইত্যাদি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে মেয়েদের যোগদান নিষিদ্ধ। এদের মধ্যে সেদিন পর্য্যন্ত বহু স্বামিত্বের প্রচলন ছিল। কৃষিজীবী উপজাতিদের মধ্যে 'খাসি', 'গারো', 'রাভা' প্রভৃতি ছাড়া আর প্রায় সবাই পিতৃসত্ত্বাক। কোল গোষ্ঠীর উপজাতিরা পিতৃসত্ত্বাক হলেও মেয়েরা সেখানে যথেষ্ট সম্মান ও মর্য্যাদার অধিকারিণী।

বিভিন্ন উপজাতিদের ভিতর সমাজ বিকাশের স্তর এবং রীতিনীতিগত অনেক পার্থক্য থাকলেও অনু-উপজাতীয়দের তুলনায় তাদের কতকগুলি মূলগত সাদৃশ্য এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ:

(ক) উপজাতীয় অর্থনীতি ছিল প্রকৃতি-ভিত্তিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ তাদের জীবিকা সংস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজন নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হয় (১) শিকার, মাছধরা ও বনজাত দ্রব্য সংগ্রহ নতুবা (২) শিকার ও সংগ্রহের সঙ্গে আদিম ধরনের 'ঝুম' চাষ অথবা (৩) যেখানে স্থায়ী ভাবে কৃষিকে প্রধান অবলম্বন করা হয়েছে সেখানে তার পরিপূরক হিসাবে শিকার ও সংগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের প্রয়োজন মেটানো। তাদের মধ্যে যে হস্তশিল্পের প্রচলন আছে তারও উদ্দেশ্য ছিল দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিসের চাহিদা মিটানো এবং ভিত্তি ছিল বনজ পদার্থের ব্যবহার, যথা, গাছের পাতা, লতা, বল্কল প্রভৃতির সাহায্যে নানা জিনিস বানানো। কৃষিজীবীদের অনেকের মধ্যে হস্তশিল্প যথেষ্ট বিকশিত হলেও তার চরিত্র নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর তাগিদের দ্বারা স্থির হয়েছে। যে সব উপজাতি 'কারিগর' হিসাবে বিকাশলাভ করেছে তারা বিশেষজ্ঞতা

অর্জ্জন করলেও তাদের কার্য্যকলাপ রয়ে গেছে উপজাতি সমাজের চাহিদার কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উপজাতিদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে বনের সঙ্গে সম্পর্ক খুব গভীর। বন শুধু প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে না, তা হ'ল দেবতাদের বাসস্থান এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্র। যে সব ক্ষেত্রে উপজাতিরা কৃষিজীবী হিসাবে স্থায়ীভাবে জনপদে বাস করে সেখানেও তারা স্থান নির্ব্বাচন করে বনের কাছাকাছি। আর জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রাম প্রতিষ্ঠার সময় প্রাচীন অরণ্যের সাক্ষীস্বরূপ এক জায়গায় কতকগুলি গাছ অক্ষত রেখে দেয়। সাধারণতঃ সেটাই হয় পূজার স্থান।

(খ) উপজাতিদের সমাজ ও অর্থনীতিতে যৌথ প্রকৃতি খুব স্পষ্ট এবং প্রধান। যারা একেবারে আদিম স্তরে বাস করে তারা সমবেত জীবন যাপন করে। গ্রামের গড়ন দেখলেই সে কথা স্পষ্ট হয় উঠে। পরিবার আলাদা আলাদা হলেও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের বেশীর ভাগই হয় সমবেত ভিত্তিতে। এই সব উপজাতিদের অনেকের মধ্যে পরিচ্ছদ, শিকারের হাতিয়ার প্রভৃতি ছাড়া অন্য জিনিসের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব নাই। শিকার ও সংগ্রহের বনভূমি গোটা সমাজের সম্পত্তি। যে সব ক্ষেত্রে 'ঝুম' চাষের প্রচলন হয়েছে সেখানে চাষের জমির মালিক হ'ল গোটা সমাজ। প্রত্যেক বৎসর এক একটি পরিবারকে নতুনভাবে জমি বিলি করা হয়। যদি এক বৎসর কারুর ফসল খারাপ হয় তবে পরের বছর সেই পরিবারকে দেওয়া হয় সব চাইতে ভাল জমিটি। এদের গ্রামে এখনও ফসলের যৌথ গোলার অস্তিত্ব দেখা যায়। সেখান থেকে দুঃস্থ ও অক্ষমদের সাহায্য করা হয়।

কৃষিজীবীর স্তরে এসে উপজাতি সমাজের যৌথ প্রকৃতিতে ভাঙ্গন ধরলেও তার অবশেষগুলি এদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। চাষের জমি স্থায়ী ভাবে পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত হলেও বন, পশুচারণভূমি ইত্যাদির মালিক গোটা গ্রাম সমাজ। চাষযোগ্য জমির কিছু অংশও গ্রামদেবতা এবং পূর্ব্বপুরুষদের সেবার জন্য চিহ্নিত করা থাকে। ওগুলি গোটা গ্রামের সম্পত্তি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পত্তি ব্যতীত হস্তান্তর বা বিক্রয় করা চলে না।

(গ) সামাজিক সম্বন্ধ তথা সমাজের গোটা কাঠামো গড়ে উঠেছে রক্ত এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের বনিয়াদের উপর। প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে দেখা যায় যে, একাধিক শাখা আছে এবং শাখাগুলি আবার বিভিন্ন 'কৌমে' বিভক্ত। এক শাখার সঙ্গে সাধারণতঃ অপর শাখার বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, তেমনি স্বকৌমে বিবাহ নিষিদ্ধ। এক অঞ্চলে বসবাসের দরুণ প্রতিবেশী উপজাতিদের সঙ্গে সখ্য ও পারস্পারিক সাহায্য কর্ত্তব্যরূপে স্বীকৃত হয়। কিন্তু উপজাতি সমাজের দ্বার অন্-উপজাতীয়দের জন্য দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ।

অনেক উপজাতির মধ্যে 'কৌম' (clan)গুলি প্রতীক 'ভিত্তিক' অর্থাৎ কোন জীবজন্তু বা গাছ, ফল, পাথর ইত্যাদিকে কৌমের প্রতীক হিসাবে গণনা করা হয়। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই 'কৌম'গুলির যে প্রতীক (*totem*) থাকে তা নয়।

প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে অন্য উপজাতির রান্না খাদ্য, খাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ বিধিনিষেধ আছে। কিন্তু অন্-উপজাতির লোকের তৈরি খাদ্য গ্রহণ বা তাদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক গুরুতর অপরাধ বলে পরিগণিত।

(ঘ) উপজাতিদের নীচের স্তরে সামাজিক ভেদাভেদের লেশমাত্র নাই বলা চলে। নারীপুরুষে শ্রমবিভাগ এবং দুই একটি হস্তশিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ ছাড়া অন্য ধরনের সামাজিক তারতম্য বড় একটা চোখে পড়ে না। গ্রামের প্রধান, পুরোহিত প্রভৃতির কিছু বিশেষ ভূমিকা আছে সত্য কিন্তু সমাজের অন্যদের তুলনায় এদের স্বতন্ত্র বা উচ্চ স্থান দেওয়া হয় না। তাদের দশের একজন হিসাবেই বাস ও নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। কৃষিজীবিদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকদিন আগে 'রাজা' বা 'প্রধান' ও এক ধরনের 'অভিজাত' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে সামাজিক পার্থক্যের সূত্রপাত হ'লেও তা খুব ব্যাপক বা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নাই। পার্থক্য তথা শ্রেণীভেদের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে নিম্নলিখিত কারণগুলির দরুন: কোন একটি 'কৌমে'র জনসংখ্যা অন্যের চাইতে বেশী হ'লে; অথবা যারা কোন জনপদ প্রতিষ্ঠা করেছে তারা পরের আগন্তুকদের তুলনায় জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি বিশেষ সুবিধার অধিকারী হয়েছে; আনুষ্ঠানিক কারণে হয়ত অতীতে কোন 'কৌমে'র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছিল এবং পরে তা বংশানুক্রমিক হয়ে গেছে। এইভাবে যে পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের উত্তর পুরুষ বা যারা কোন না কোন কারণে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে তারা কতকটা বিশেষ মর্য্যাদার অধিকারী হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, উপজাতিদের

'রাজা', 'প্রধান' বা 'অভিজাতেরা' সমাজের উর্দ্ধে অবস্থিত নয়। তারা উপজাতি-সমাজের একটা অঙ্গ হিসাবে থাকে ও সামাজিক সম্পত্তির ভিত্তিতে মর্য্যাদা ভোগ করে। অনেক ক্ষেত্রে 'রাজা' বা 'প্রধান' উপজাতি-সঙ্ঘের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। যে সব ক্ষেত্রে তারা বংশগত ভাবে প্রাধান্যের অধিকারী হয় সেখানেও পঞ্চায়েতের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে বাধ্য থাকে।

(ঙ) উপজাতিদের সামাজিক সংগঠনের ভৌগোলিক ভিত্তি হ'ল গ্রাম। গ্রামের পরিচালনা ভার থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্ব্বাচিত 'প্রধান' ও গ্রামবৃদ্ধদের পঞ্চায়েত বা সভার হাতে। গ্রামের প্রধান কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামের প্রধান ও পুরোহিত একই লোক। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা লোক প্রধান ও পুরোহিতের কাজ করে। উভয়ের ভূমিকা সুনির্দ্দিষ্ট।

অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে উপজাতিদের বৃহত্তর সঙ্ঘ গঠিত হয়। সেখানেও প্রত্যেক গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় সঙ্ঘের পরিচালনার জন্য সভা বা পঞ্চায়েত। কৃষিজীবী উপজাতিদের মধ্যেই বৃহত্তর সঙ্ঘের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। বছরে একবার আনুষ্ঠানিক শিকার উপলক্ষ্য করে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত গ্রামের লোকেরা মিলিত হয়।

(চ) যৌথচেতনা, কার্য্যকলাপ ও সংহতিবোধ হ'ল উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রাণ। একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, তারা ভূতপ্রেতের পূজা করে। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। আসল কথা হ'ল যে, উপজাতিদের বিশ্বাস পৃথিবীর সব কিছু অর্থাৎ জীবজন্তু, গাছপাথর, পাহাড় নদী, ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে প্রাণ আছে। পৃথিবী ও প্রকৃতি প্রাণময়। তারা মনে করে যে, যাদু-বিদ্যা এবং অনুরূপ নানা অনুষ্ঠানের সাহায্যে সেই শক্তিকে নিজেদের কাজে লাগানো যেতে পারে। উপজাতিদের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই প্রায় শিকার, সংগ্রহ ও কৃষির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন শিকার অভিযানের আগে বা কৃষিকাজ সুরু করার প্রারম্ভে যে সব অনুষ্ঠান করা হয় তার উদ্দেশ্য হ'ল ঐ সব কাজে সাফল্য কামনা। আর ঐ সব কাজের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলিতে বনদেবতা, ধরিত্রীমাতা এবং পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা হয়। পূর্ব্বপুরুষের পূজা উপজাতীয় বিশ্বাসের একটি প্রধান স্তম্ভ।

ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান সবই গোটা গ্রামসমাজ সমবেতভাবে পালন করে। কৃষিজীবীদের স্তরে আদিম যৌথ অর্থ-নীতিতে ভাঙন ধরলেও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে। জমি পরিবারের সম্পত্তি হলেও চাষ সুরু করা বা ফসল কাটা ইত্যাদি প্রত্যেক কাজের আগে সমস্ত গ্রামবাসী যৌথভাবে অনুষ্ঠান পালন ক'রে তবে কাজে হাত দেয়।

উপজাতিদের নৃত্য, গীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপের প্রায় ষোল আনাই অনুষ্ঠিত হয় সমবেত ভাবে। উপজাতি সঙ্ঘের বৃহত্তর সংস্কৃতিকে বাৎসরিক আনুষ্ঠানিক শিকার অভিযানের মাধ্যমে জীবিত রাখা হয়েছে।

(ছ) উপজাতিদের সংস্কৃতিতে রূপকথা, উপকথা ইত্যাদির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সবের মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্যের ধারা ও পরম্পরা বজায় থাকে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয় দুঃখকষ্ট ও অভাবের অতীত আনন্দময় জীবন এবং প্রকৃতির উপরে জয়লাভের সঙ্কল্প আত্মপ্রকাশ করে রূপ-কথার মারফতে। এই সব রূপকথা, উপকথা, লোকগীত প্রভৃতির মধ্যে মানবমনের বিকাশ সম্বন্ধে অনেক অমূল্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রায় সমস্ত উপজাতির ভাণ্ডার এদিক দিয়ে সমৃদ্ধ। এমন কি যাদের খুব পশ্চাৎপদ বলে ধরা হয় তাদের মধ্যেও এসব জিনিসের প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। একজন বিখ্যাত নৃতত্ত্ব-বিদের মতে 'কাদার'দের বিশ্বসৃষ্টির কাহিনার মধ্যে পৃথিবার প্রাচীনতম ধর্ম্মগুলির যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। অপর একজনের মতে টোডাদের উপকথা ও দেবতাদের পূজার মন্ত্রে সুমেরীয় দেবদেবীর নামের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। এনাদি ও লম্বাড়িদের মত যাযাবর-দের সঙ্গীতে ও নৃত্যে নিপুণতা খুব প্রসিদ্ধ এবং এদের সঙ্গীতের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত।

জীবন ও প্রকৃতির সাথে উপজাতীয় সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক। তাই তার মধ্যে স্বাভাবিক মাধুর্য্যের স্বাদ পাওয়া যায়।

আজ এরা অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে সত্য। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্ত্তনে আদিবাসীদের অবদান যে কত গভীর সে সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালে আমরা কিছু কিছু ধারণা লাভ করেছি। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী (Sylvain Levy), জাঁ প্রুশিলস্কি (Jean Pruzilsky), ডাঃ হাটন (Dr. Hutton) এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জীর মত মনীষীদের গবেষণা সেদিকে আলোকপাত করেছে। আমাদের পূজাপার্ব্বণ,

ব্রত ও পল্লীগ্রামের অনেক আচার অনুষ্ঠানের উপর আদিবাসী সংস্কৃতির ছাপ ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পুরাণের কাহিনী, লোককথা ও গীত, প্রবাদ ইত্যাদির উপর তার প্রভাব ক্রমশঃ স্বীকৃতি হচ্ছে। আর্য্যভাষার ভারতে আগমনের পর ক্রমঃপরিবর্তন এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলিতে পরিণতির প্রক্রিয়ার পিছনে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রভাব ত বটেই, এমন কি প্রাক্-দ্রাবিড়, বিশেষতঃ কোলগোষ্ঠীর ভাষাগুলির প্রভাবের বিষয় এখন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণার প্রধান অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এমন কি কোন কোন পণ্ডিতের মতে ব্রহ্ম এবং জন্মান্তরবাদের উৎসও খুঁজতে হবে অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে।

উপজাতিদের বর্তমান অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হ'ল তারা বহু শতাব্দী ধরে ভারত ইতিহাসের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। বিস্মৃত অতীতের কোন অধ্যায়ে উন্নততর সভ্যতার অধিকারী আগন্তুকদের সঙ্গে সংঘর্ষে পিছু হটে তারা দুর্গম অরণ্য পর্ব্বতে আশ্রয় নেয়। যারা পিছনে রয়ে যায় তারা উন্নততর সংস্কৃতির পরিবেশে থেকে কালক্রমে নিজস্ব ভাষা ও সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে। যারা অরণ্যে ও পর্ব্বতে আশ্রয় নেয় তারা তাদের আদিম জীবনযাত্রার ধারা মোটামুটি অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে বিদেশী ও দেশী মুনাফা-শিকারীদের শোষণে তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার বনিয়াদ বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে। একদিকে যৌথজীবনের ভিত্তিতে গড়া অর্থনীতির কাঠামোর উপর এবং অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসিত সমাজ-সংগঠনের উপর নেমে আসে প্রচণ্ড আক্রমণ। চা ও রবার বাগিচা গড়ে তোলার তাগিদে, জমিদার ও মহাজনদের শোষণে তাদের জীবিকার প্রধান ভিত্তি বন ও জমি পরকবলিত হতে থাকে। বিদেশী সরকার তাদের উপর জোর করে 'সভ্য ধনতান্ত্রিক' জগতের আইন-কানুন চাপিয়ে দিয়ে সমাজের ভিত্তিকে দেয় দুর্ব্বল করে। অবশ্য আদিবাসীরা বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত সেই সংগ্রামের জের চলেছে। বার বার হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসী অভ্যুত্থান। ১৭৭২ সনে মালপাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ১৮৩০ সনে সিংভূমে হো বিদ্রোহ, ১৮৪৬ সনে খোন্দদের অভ্যুত্থান এবং ১৮৫৫ সনে সাঁওতাল মহা-বিদ্রোহের কাহিনী সুপরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে যখন পাজাসীর ও কোট্টায়ামের রাজারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন যথাক্রমে 'কুরিচিয়া' এবং 'মুল্লাকুরুম্বার' উপজাতির লোকেরা তীরধনুক নিয়ে তাঁদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। বড় রকমের বিদ্রোহ ছাড়াও অবাধ্য উপজাতিদের শায়েস্তা করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বহুবার শাস্তিমূলক অভিযান পাঠিয়েছে যথা: ১৭৭৪ সনে জয়ন্তীয়া পাহাড়ে, ১৮৩৩ সনে খাসিপ্রধানদের সঙ্ঘের বিরুদ্ধে, ১৮৫০-৯০ সনের ভিতরে চীন-লুসাই পাহাড়ে, আবরদের বিরুদ্ধে ১৯১২ সনে এবং নাগাদের বিরুদ্ধে ১৮৭৮ এবং ১৯৩৯ সনে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বারই উপজাতিদের প্রতিরোধ নৃশংসভাবে দমন করে। পরে অবশ্য উপ-জাতীয়দের স্বার্থরক্ষার নামে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল-গুলির জন্য কতকগুলি বিশেষ আইন পাস হয়। কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। আইনগুলি ভাঙনকে ঠেকাতে বা অন্-উপজাতীয় শোষণকে বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টাও করে নাই। ফলে বিদেশী ও দেশী শোষকদের মুনাফা-মৃগয়া অব্যাহত থেকেছে। অন্যদিকে গবর্ণমেণ্ট সুকৌশলে চেষ্টা করেছে যাতে উপজাতীয়দের বিক্ষোভ অন্ উপজাতীয় ভারতবাসীর বিরুদ্ধে চালিত হয়।

পরবর্ত্তী যুগে উপজাতীয় এলাকাগুলি শাসন সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল হিসাবে গঠিত হয়। পরিণামে সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি হতে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ যাতে উপজাতীয় এলাকার সীমানার বাইরে থেকে ফিরে যায় সেজন্য ব্রিটিশ সরকারের কৌশলের অন্ত ছিল না। তবু ১৯২১ সনে অন্ধ্রে সীতারাম রাপুর এবং ১৯৩০ সনে নাগাদের মধ্যে রাণী গুইদালোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে।

একে ত উপজাতিদের দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াতে রয়েছে অন্-উপজাতীয়দের সম্বন্ধে সন্দেহের মনোভাব। তার উপর ঐসব কারণের দরুন সে সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হতে বাধ্য। এই ব্যবধান বিশেষভাবে বাড়িয়ে তোলে বিদেশী মিশনারীরা। তদানীন্তন সরকারের ছত্রচ্ছায়া-তলে মিশনারীরা উপজাতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার সুরু করে। সেই সঙ্গে তারা অবশ্য কিছু পরিমাণে শিক্ষাপ্রচার, হাসপাতাল খোলা ধরনের সৎকাজ করেছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাদের শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার খ্রীষ্টান এবং অ-খ্রীষ্টান উপজাতীয়দের মধ্যে প্রাচীর তুলে দিয়েছে, সমাজের ভাঙনকে দিয়েছে এগিয়ে। অন্যদিকে উপজাতীয় জন-গণকে রেখেছে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলির সমাবেশের ফলে যা অবস্থা দাঁড়ায় তা হ'ল নিম্নরূপ :

(১) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে জনসমষ্টির জীবনে যতটুকু উন্নতি ঘটেছে উপজাতীয় অঞ্চলের জনগণ তা থেকেও বঞ্চিত এবং পশ্চাৎপদ হয়ে আছে।

(২) তারা যে শুধু সামাজিক অগ্রগতির দিক থেকে অনেকগুলি স্তর পিছনে পড়ে আছে তাই নয়। সমাজ ও অর্থনীতির ভিত্তিতে ফাটল ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাচীন বিশ্বাস, ধারণা এবং মূল্যবোধের গোড়াতে লেগেছে কঠিন আঘাত। অথচ তার বিকল্প পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে নেমে এসেছে হতাশা ও অবসাদের মনোভাব। ডাঃ ভেরিয়ার এলুইনের (Dr. Verrier Elwin) মতে একশ্রেণীর লোক আধুনিক সভ্যতার সংস্রবকে সহজে আয়ত্ত করে নিতে পেরেছে। তাদের সংখ্যা অবশ্য খুবই অল্প। এই শ্রেণীর উপজাতীয়দের মধ্যে পড়ে অতীতের অভিজাত সম্প্রদায়ের বংশধরেরা অর্থাৎ বর্ত্তমানের উপজাতীয় প্রধান, রাজা এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাঃ এলুইন 'গোণ্ড' রাজা ; ভীল ও নাগা প্রধান বা সর্দার ; ভুঁইয়া জমিদার ; সাওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁদের অনেকে পাশ্চাত্যধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।

এই মুষ্টিমেয় লোকদের কথা বাদ দিলে উপজাতীয়দের জীবনে 'সভ্যতা'র সংস্পর্শ অমঙ্গল ছাড়া আর কিছু ডেকে আনে নাই।

(৩) অন্-উপজাতীয় জনসমষ্টির সঙ্গে উপজাতীয়দের জীবনযাত্রার ধরন, চেতনা, মননভঙ্গী ও মূল্য বিচারের মাপকাঠি ইত্যাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য ত আছেই। উপরন্তু একটা অবিশ্বাসের ব্যবধান দূরত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। সুতরাং তাদের উন্নয়নের কোন পরিকল্পনায় যেমন দুই-আড়াই হাজার বছরের অনগ্রসরতা অতি অল্প সময়ে অতিক্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে তেমনি সেই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক পুনর্বাসনের প্রচেষ্টার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে বিচারের অভাবে আমরা অনেক সময় এক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালে কয়েকটি কৃষিজীবী ও অপেক্ষাকৃত উন্নত উপজাতির মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ হতে থাকে। তারা ওঠে স্বাধিকারের দাবীতে মুখর হয়ে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ এবং ভ্রান্ত নেতৃত্বের দরুন তাদের আওয়াজ তথা কার্য্যকলাপ বিপথগামী হয়ে পড়ে। যেমন হয়েছে নাগাদের বেলায় ; সাম্রাজ্যবাদী চরদের প্ররোচনায় তারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবীতে আত্মঘাতী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে। নাগা জনসাধারণকে ঐ নেতৃত্বের কবলমুক্ত করে ঠিক পথে নিয়ে আসতে হলে তাদের সমগ্র ঐতিহাসিক পটভূমিকে বোঝার চেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপজাতিদের আন্দোলনের নেতৃত্ব রয়েছে বিদেশী মিশনারীদের কাছে শিক্ষিত লোকদের হাতে। তাঁদের মানসিক গড়নের দরুন ন্যায্য দাবীও বিভেদমূলক এবং বিকৃত রূপ নেয়। তাই বলে আমরা যদি শুধু উপরের অভিব্যক্তিগুলি দেখে বিচার করতে বসি তবে গুরুতর ভুল করা হবে। যে কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজন তা হ'ল সমস্যার মূল অনুসন্ধানের দ্বারা সঠিক সমাধানের চেষ্টা।

উপজাতিদের সামনে পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরতে হবে যে, তারা নিজস্ব সত্তা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের জাতীয় জীবনে সমান মর্য্যাদা এবং অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের বৈশিষ্ট্যগুলির সবই যে আদিম ও বর্ব্বর বলে বর্জ্জনীয় তা নয়। উপরের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ পেলে উপজাতি-জীবনের অনেক দিক আবার ভারতের সাধারণ সংস্কৃতির ভাণ্ডারে অমূল্য উপঢৌকন দিতে পারবে। তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে সংস্কার প্রয়োজন তা সার্থকভাবে আসতে পারে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টায়। অর্থাৎ উপজাতি-সমাজের মধ্য থেকেই সংস্কারের তাগিদ আসা চাই। বাইরে থেকে উন্নয়নের নামে কোন পরিবর্ত্তন চাপিয়ে দিতে গেলে হবে ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই ; উন্নয়নের কর্ম্মসূচীকে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে কার্য্যকরী করতে যাওয়ায় উপজাতিদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের সামাজিক কাঠামো, মননভঙ্গী এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। আর যতদূর সম্ভব তাকে রূপায়িত করার দায়িত্ব দিতে হবে উপজাতীয়দের উপর। অন্যদিকে অন্-উপজাতীয় জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যাতে মনের মিল গড়ে ওঠে সেজন্য ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত ঐক্যের সত্যটিকে নানা দিক থেকে জীবন্ত করে তুলতে হবে।

# রুদ্ধ কবাট

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

১

অনেক দিন বাদে বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে দেখা। কাছারির রোয়াকে ঘরোয়া কথায় কুৎসার আমদানি হতে জমে গিয়েছিলাম। কেচ্ছার গল্পে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারি নি। শীতকাল, দেখতে দেখতে চারধারে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় নীলকুঠির দিক্ থেকে করুণ আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম, নারীর কণ্ঠস্বর। ওদিকটায় বদ্‌নাম আছে। লোকে অনেক কথা বলে। ঘোর সন্ধ্যায় এমন একটি জায়গা থেকে ত্রাসের ডাক শুনলে রহস্যের প্রশ্ন ওঠে বৈকি। জিজ্ঞাসা করতে হ'ল, ব্যাপার কি বল ত? বাঁড়ুজ্জে আমার কথায় কান না দিয়ে দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল, তার পর আপন মনে বলে চলল, এরই মধ্যে ছয়টা বেজে গেল! সস্তার তিন অবস্থা। ঘড়িটা ঠিক পিছিয়ে পড়েছে। আদ্দিকালের পুরাণো জিনিস, ওজনদরে কেনা। জোড়াতাড়া দেয়া কলকব্জা কত আর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলবে। তবু ঘড়ির ঘণ্টাকে মানতে হয়। যাই ঠিক ক'রে আসি। কাল আবার ট্রেন ধরতে হবে। আদালতে হাজিরা না দিলেই নয়। সাক্ষীটা শেখান নাম মনে রাখতে পারলেই রক্ষা। ভাগ্নেকে খুড়ো সাজিয়ে জেরার সামনে ঠিক রাখা চাট্টিখানি কথা? মামলার ব্যাপারে নাজেহাল হয়ে গেলাম। শেষ পর্য্যন্ত নায়েবগিরি না ছাড়তে হয়।

ঘড়ি মেলানর পর শুনলাম, মন্ত্রপাঠের মত বিড় বিড় ক'রে কি সব বলছে। ছেলেবেলা থেকে চেঁচিয়ে চিন্তা করা ওর স্বভাব। ভাবলাম, মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে শত্রুপক্ষকে অভিশাপ দিচ্ছে। কাছে আসতে বুঝতে পারলাম, দুর্গানাম জপছিল। একপ্রকারের ধার্ম্মিক থাকে যারা পুণ্যের খাতাতেও হিসাব রাখে। বাঁড়ুজ্জে উক্ত প্রকৃতির ধার্ম্মিক। ছয়টার আগে ঠাকুরের নাম মুখে আনতে চায় নি পাছে ভক্তির উচ্ছ্বাসে অপব্যয় এসে পড়ে। হিসাবের কড়াকড়িতে আমার কোন স্বার্থ ছিল না। ওদিকে মাথা না ঘামিয়ে, ঘড়ি মেলাল কিসের সঙ্গে জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। জিজ্ঞাসা করতে হ'ল, সময় ঠিক করলে কেমন করে?

উত্তর যা শুনলাম, তা অবান্তর কথা। বললে, ঐ পথেই যখন যাবে তখন সব কথা না শুনলেই নয়? আজ অমাবস্যা, তায় শনিবার, এর উপর যোগ ঘটেছে ঐ মেয়েটার ডাক। একেবারে ত্র্যহস্পর্শ। সব কয়টিই অমঙ্গলের সঙ্কেত। রাত্রে একটা কিছু না ঘটলে বাঁচি। ভয়কে হেঁয়ালীর সঙ্গে জড়িয়ে দেয়ায় কৌতূহল রুখে উঠেছিল। আবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, এখন যে ছয়টা তা জানলে কেমন করে?

বাঁড়ুজ্জে উত্তর দিল, একান্তই যখন নাছোড়বান্দা তখন বলছি, কিন্তু কিছু ঘটে গেলে আমাকে দোষ দিও না। তোমার সামনেই অন্তর্য্যামীকে জানিয়ে দেয়া ভাল যে, স্বেচ্ছায় কাহিনী বলছি না। অজ্ঞাত শক্তির সামনে সাক্ষী রেখে জবাবদিহি শেষ হবার পর বাঁড়ুজ্জে আমার গা ঘেঁসে বসল, তার পর সুরু করল। ঐ যে ডাক শুনলে ওর সঙ্গে যুগযুগান্তর আগের ঘটনা জড়িয়ে আছে। প্রতি অমাবস্যায়, সন্ধ্যা ছয়টার সময় মেয়েটা ঐ ভাবে তারস্বরে ডেকে ওঠে। কেন ডাকে তা জানলেও বলা নিষেধ, বিশেষ করে রাতের বেলায়। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন নীলকুঠির ম্যানেজারবাবু ছিলেন দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী মানুষ, বাঘ আর গরুকে একঘাটে জল খাওয়াতেন। তাঁর দাপটে আশেপাশের গ্রামের লোক তটস্থ হয়ে থাকত। সমস্ত ঝি-বৌদের একলা ঘাটে যাবার জো'টি ছিল না। মনমত কোন চেহারা নজরে পড়লেই ওৎ-পাতা ম্যানেজারবাবুর চরেরা ধরপাকড় করে কুঠির দিকে নিয়ে যেত। সে-সব কথা শুনলে আজও রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ধরে-আনা জ্যান্ত মানুষকে ওরা বলত, মাল। এই যে আমাদের কাছারি বাড়ী, এটা ছিল মাল আমদানির আড়ৎ। এইখান থেকে বাছাই করা জিনিষ রপ্তানি হ'ত বড়কর্ত্তার কাছে। কাটা খাল দিয়ে, ছোট্ট নৌকায়, মানুষ চালান দেওয়া ছিল নিয়ম। পাল্কীর ব্যবহার যে একেবারে হ'ত না এমন নয়। মাল বাছাই-এর ভার ছিল ম্যানেজারবাবুর উপর। খাঁটি ও খেলোয়াড় জিনিষ নিজে না পরখ করে মুনিবের কাছে পাঠাতেন না। কর্ত্তারা, গররাজী মানুষ দেখলে, ম্যানেজারের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়তেন,

এমন কি ফেরত পাঠাতেও বাধত না। তোযাজকে জীইয়ে রাখার ধৈর্য্য কর্ত্তাদের ছিল না। এই কারণে কড়া মানুষকে তৈরী করতে সময় লাগত। তৈরী করার প্রথায় কতরকম চাল যে চলত তার বিশদ বর্ণনা দিতে হলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

মেয়েটির কথায় ফিরে আসি। রূপের তার হাঁক-ডাক ছিল, তবে লোকে বলত তার চলা-ফেরা একটু কেমনতর, অর্থাৎ হঠাৎ দেখলে, কি বলে, কেমনতরই মনে হ'ত। সমস্ত বয়সের এমন একটি সাজোয়ান মেয়ে, বিশেষ করে সে যখন কেমনতর, তখন এককথায় নজরে লেগে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। রপ্তানির দুর্লভ সম্পদ্ যখন পরীক্ষার জন্য ম্যানেজারবাবুর সামনে ধর' হ'ল তখন তিনি কারণে ছিলেন। প্রথম দর্শনেই চোখ ঝল্‌সিযে গেল। মজামনে রূপের তাত লাগায় হুকুম দিযে দিলেন, "ওকে তৈরী করে নিয়ে আয়।" সব মানুষকে যে ইচ্ছামত তৈরী করা যায় না একথা যদি সেবকের দল জানত তাহলে আজকে কাহিনী বলার দরকারই হ ত না। তৈরী করার জন্য সামান্য চেষ্টাতেই লোকেরা বুঝল, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। এমন একটি প্রাণীকে খেলিযে তৈরী করতে হলে ম্যানেজারের মত ওস্তাদের কাছেই ছেড়ে দেওয়া ভাল।

ম্যানেজারবাবু কালক্ষণ দেখে শুভকার্য্যে নামতেন। এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হ'ত। সোজা কথা, উগ্র-তরলের সাহায্যে মনকে তাতিয়ে নিতেন, নিজেকেও তৈরী করে নেবার জন্য। তৈরী হবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময ছিল সন্ধ্যা ছয়টা। দিনের পর দিন, সন্ধ্যা এল, ছয়টা বাজল, নিজে তৈরী হলেন কিন্তু যাকে তৈরী করার জন্য এত আযোজন তাকে কিছুতেই বশে আনতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত লোক লাগিয়ে দিলেন পীড়নের জন্য। পীড়নের সময়ও নির্দ্ধারিত হ'ল সন্ধ্যা ছয়টায়। ঐ সময় নির্য্যাতনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ম্যানেজার-বাবু পীড়নের আসর গুলজার করে বসতেন। মেয়েটির কাতর ধ্বনি শুনে বীভৎস সৌখিনতায় আত্মতৃপ্তি খুঁজতেন। এইভাবে কিছুদিন মেয়েটির চিৎকার শোনা গিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল কেউ জানে না। হঠাৎ বাঁড়ুজ্জে চুপ করে গেল। কে যেন ওর মুখ চাপা দিযে কথা বন্ধ ক'রে দিল। পরক্ষণে পৈতে হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিছু দেখলে?

বাঁড়ুজ্জের কথা ভয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। আর বেশী কিছু বলতে পারল না।

অন্ধকারের ভিতর বাঁড়ুজ্জে কি দেখল জানি না, আমার নজরে কিছু পড়ে নি। উত্তর দিলাম, না।

বাঁড়ুজ্জে আরো গা ঘেঁসে বসল, তার পর কানের কাছে এসে চুপি চুপি বললে, লণ্ঠনের আলোয়, উঠানেই দেখলাম যে। এমন একটি সত্যকে অস্বীকার করায় বাঁড়ুজ্জে আমার মুখের দিকে অবাক্ হযে তাকিযে রইল। বুঝলাম, আমার কথা বিশ্বাস করে নি খুব সম্ভবতঃ ত্র্যহস্পর্শের প্রভাব বাঁড়ুজ্জের উপর ভর করেছিল। বাতিক-গ্রস্ত লোককে বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আস্তানায় ফেরার জন্য প্রস্তুত হলাম। সঙ্গে লণ্ঠন আমি নি, আর দেরী করা উচিত হবে না। অন্ধকারে পথ চলতে সাপের গায়ে পা পড়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের নয। বাঁড়ুজ্জের কাছে বিদায নিতে যাব, এমনি সময়ে দেখলাম, সদর রাস্তা ধরে, ধপ্‌ধপে সাদা কাপড়-পরা একটি মেয়ে নীল-কুঠির দিকে চলেছে। ও রাস্তায সন্ধ্যার সময় একলা হাঁটার মত সাহস কোন মেয়ের থাকতে পারে ধারণা করাও শক্ত। সন্দেহ এসে গেল, বাঁড়ুজ্জের দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম না ত? আমার পক্ষে ঐরূপ সম্ভব নয়, কারণ অশরীরীর ভয়ে কখনো কাবু হই নি। এই ত কয়দিন হ'ল বাজী রেখে কালী দীঘির শ্মশানে সারারাত একলা কাটিযে এলাম। কোথায় কাপালিক সন্ন্যাসী আর কোথায় তার শবসাধন। আমি যে ভয় পাবার পাত্র নই তা প্রমাণ করার জন্যই লণ্ঠন নিয়ে উঠানে নামতে যাব এমনি সময় বাঁড়ুজ্জে খপ্ ক'রে আমার কাপড় টেনে ধরল। ছেলেমানুষি ভাল লাগল না, কাপড় ছিনিয়ে উঠানে নেমে পড়লাম। সদর রাস্তায় পৌঁছাতেই মেয়েটি যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকে হন্ হন্ করে চলতে লাগলাম। হাঁটার গতি প্রায় দৌড়ের সমান হয়ে গিযেছিল তথাপি মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না। সোজা রাস্তা, কোনদিকে মাইল খানেকের মধ্যে বাঁক নেই, দু'পাশে বেতের কাঁটা বন ও নীলকর সাহেবদের কাটা খাল। খাল পাঁকে ভরা, পা পড়লে চোরাবালির মত তলিযে যেতে হয়। এমন একটি জায়গায় মেয়েটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।

খটকা নিয়ে ফিরতে হ'ল। বাঁড়ুজ্জে বললে, খুঁজতে গিয়েছিলে বুঝি? যা করেছ তা করেছ, অমন কাজটি আর করতে যেও না। তোমাকে জড়ালে গণ্ডা পুরে যাবে। প্রাণের মায়া থাকলে এইটুকু জেনে রাখা ভাল যে, ওর নজর লাগায় ইতিমধ্যে তিন জন গত হয়েছে। আমি বলি, আজকের রাতটা আমার এখানেই থেকে যাও। সত্যি কথা বলতে কি, যা দেখলাম তার

পর, আর একলা থাকার সাহস নেই। অনুরোধের পিছনে এমন একটা ভয়ের আভাস পেলাম যে বেচারাকে একলা ফেলে যেতে মন চাইল না। আমার আশ্বাস-বাণী শুনে বন্ধুর ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল।

পরের দিন মহাল-ফেরতা বরকন্দাজ এল ছাউনি-ওয়ালা গরুর গাড়ী নিয়ে। দলিল-ভর্ত্তি তিন-চারটে প্যাঁটরা গাড়ীতে বোঝাই ক'রে বাঁড়ুজ্জে বরকন্দাজ সহ স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেল। যাবার সময় বিশেষ ভাবে বলে গিয়েছিল, আমি যেন তার অনুপস্থিতিতে কয়েকদিন কাছারি বাড়ীতে থাকি। তাড়াহুড়ায় অনেক দরকারী দলিল লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে, শত্রুর দল খোঁজ পেলে কাজ গুছিয়ে নেবে।

আমার ঘরটান বলতে কিছু ছিল না। একা মানুষ, কোথায় থাকি তার জন্য জবাবদিহির আশঙ্কা না থাকায় বন্ধুর অনুরোধ মানলাম। আমার সখের মধ্যে ছিল মাছ ধরা এবং সুযোগ পেলে বল্লম দিয়ে শুয়োর মারা। বল্লমের কৃপায় চামার মহলে আমার প্রতিপত্তি ছিল। সাহস ও শক্তির জন্যে না হলেও, বরাহ হত্যায় ওদের ভোজের যোগাড় ভালই হ'ত। কিছুদিন থেকে এ দিকটায় দাঁতাল বরাহের উৎপাত খুবই বেড়ে উঠেছে। শিকারীর কাছে এ সব খবর পৌঁছাতে সময় লাগে না। আমি নিজেই ঠিক করেছিলাম, বাঁড়ুজ্জের কাছারি বাড়ীতে আড্ডা গেড়ে কয়েকদিন সখ মিটিয়ে যাব। কপাল-গুণে মেয়েটির চিৎকারে যাচিত সুযোগ পেয়ে গেলাম।

বাঁড়ুজ্জে চলে যাবার পরই চামারদের সর্দ্দারকে ডাকিয়ে পাঠালাম। সর্দ্দারের সঙ্গে কথা হ'ল, বললে, দু'জন লোক পাঠিয়ে দেবে। লোকটা প্রতিশ্রুতি রেখেছিল, বিকেলের দিকে দু'জন লোক এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন চেনা, নাম রঘু। বেজায় জোয়ান দেহে মেদের বাহুল্য মাত্র নেই। মাথাটা কেমন অস্বাভাবিক ভাবে চ্যাপটা, দেখলেই মনে হয় ভিতরে সার পদার্থের অভাব আছে। আমি যে জন্যে ওদের সাহায্য চেয়েছিলাম তাতে মাথার কাজ বিশেষ নেই। নিরাপদ স্থান থেকে শুয়োর হাঁকিয়ে আমার দিকে চালাতে পারলেই ওদের কর্ত্তব্য শেষ।

গত রাত্রের কথা মাথায় ঘুরছিল, নীলকুঠির দিকে ঘুরে না আসতে পারলে স্থির হতে পারছিলাম না। দিনের বেলা জায়গাটা দেখে আসতে পারলে, ওখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ভেবেচিন্তে করা যায়। সংক্ষেপে, ডবল মতলব নিয়ে নীলকুঠির চৌহদ্দি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। রঘুর হাতে ধারাল টাঙ্গি দিয়ে বললাম, চলু, নীলকুঠির আওতায় ঘুরে আসি, ভাল ক'রে ঝোপ পেটাতে পারলে তোদের মনের মত কিছু পাওয়া যেতে পারে। ওদিকে মানুষ চলে না, নিরিবিলিতে শুয়োরের আড্ডা ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। নীলকুঠির নাম উঠতেই, তাড়াতাড়ি ধারাল অস্ত্রটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, শুয়োরের সঙ্গে যদি আর কিছু বেরিয়ে আসে? প্রশ্নের সঙ্গে আতঙ্ক জড়িয়ে ছিল। বুঝলাম, আর কিছুর উল্লেখে কি জানতে চেয়েছে। ভয় কাটিয়ে দেবার দরকার থাকায় জোর দিয়েই বলতে হ'ল, ওখানে আবার কি থাকবে? যা শুনেছিস তা বাজে কথা। চামারের ছেলে, টাঙ্গি চালাতে জানিস না! লোকে শুনলে তোকে বলবে কি? এ অঞ্চলের চামাররা বাস্তবিকই বেজায় সাহসী। ওদের মধ্যে সাহস দেখান সেরা গুণ। এই কারণে পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে অনেকে ডাকাতি করতে গিয়ে, জেল খেটেছে, খুন হয়েছে, আর কত কি ঘটেছে তার ঠিক নেই। রঘুর সাহসের প্রতি কটাক্ষ করেও ফল পেলাম না। লোকটা মাথা চুলকে বললে, নীলকুঠির কথা ত সর্দ্দার বলে নি। ঝোপ ভাঙ্গতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সাঁজের বেলায় ও তল্লাটে থাকছি না। বাবু, এক বৎসরের ভিতর ওখানে তিন জনে সাবাড় হয়ে গেল। যারা ম'লো তারা কিছুই করেনি বাবু, কেবল বিলাতী মদ খুঁজতে গিয়েছিল। নীলকর সাহেবদের নাকি পিপে ভর্ত্তি মাল ওখানে মজুত আছে। মহুয়া আর ধেনো খাওয়া অভ্যাস, সাহেবী চালের পিছনে যাওয়া কেন? সাঁজের বেলাতেই গা ঢাকা দিয়ে কাজ সারতে গিয়েছিল। ওদিকে যাওয়া আর কি সব দেখা, তার পরই কি হ'ল কে জানে। জ্বর নিয়ে বাসায় ফিরল সঙ্গে সঙ্গে দু'জনারই তড়কা। কচিমুদ্দিন ওঝা এসে কত ঝাড়ফুঁক করল, কিছুই হ'ল না, দু'জনাই জোড়ে মরল। ওদের আগে যে গিয়েছিল সে ত উবেই গেল। আজও তার পাত্তা নেই। অনেকে বলে, পুলটি গ্রামের খাঁ-রা ওকে গুমি করে দিয়েছে। পুরাণো রেষারেষি থাকলে আমাদের মধ্যে অমনটি হয় বটে, কিন্তু আসল কথা তা নয়। লোকটাকে ঐ, নাম করতে নেই, সেই নিয়েছে। দোহাই বাবু, ওদিকটা ঘাঁটিও না। রঘুর কথা শুনে আর একটা লোকও বিগড়ে বসল।

অবস্থা যে রকম দাঁড়াল তাতে একলা যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকল না। এরই ভিতর আকাশ ঘোর ঘটা করে কালো হয়ে এসেছে। মাঘের শেষে দু'চার পশলা বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু আকাশের এইরূপ সাজগোজ

সচরাচর দেখা যায় না। সন্ধ্যা হবার আগে ফিরতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়তে হয়।

কাছারি বাড়ী থেকে নীলকুঠি খুব বেশী দূর নয়। মাইলখানেকের কিছু বেশী হবে। পা চালিয়ে চলেছিলাম, অল্প সময়ের ভিতর গম্যস্থলে এসে পৌঁছালাম। সদর রাস্তার ধারেই পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী। পাঁচিলের বেশীর ভাগই ধ্বসে গিয়েছে। কতক অংশ হেলে পড়েছে। মোটা গাছের শিকড় বেঁধে না রাখলে ধূলিসাৎ হয়ে যেত। প্রবেশপথের রাস্তা বেশ চওড়া, দেউড়ি দিয়ে স্বচ্ছন্দে দুটো গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে। দেউড়িতে দরজা না থাকলেও ভিতরে আসায় বাধার অভাব নেই। ঘন বাবলা গাছের ঝোপ থেকে আরম্ভ করে যত রকমের আগাছা ও কাঁটাবন নির্ব্বিবাদে বেড়ে উঠেছে।

বল্লমের ডগা দিয়ে পায়ের তলায় আগাছা ও মাথার উপর ডালপালা সরিয়ে এক-পা দু'-পা করে এগুচ্ছিলাম। হাত দিয়ে ডাল সরাতে গিয়ে সাপ ধ'রে ফেলা কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। অভিজ্ঞতা কাছে থাকায় সাবধানতাকে অগ্রাহ্য করতে পারি নি। রাস্তা অতীত যুগে খোয়া দিয়ে বাঁধান হয়েছিল, এখনও তার প্রমাণ দুই-এক জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু বেশীর ভাগই ধুলোয় চাপা পড়েছে। ধুলোর উপর যে সব জানোয়ারের পায়ের দাগ পড়েছে তাতে বোঝা যায়, শুয়োরেরই আনাগোনা বেশী। সাপ ও শেয়ালের গতায়াতও আছে। চলতে চলতে বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছালাম। একতলা হলে কি হয়, আকার তার ছোটখাট প্রাসাদের মত। সামনেই বেজায় চওড়া ও তেমনই লম্বা বারান্দা, মেজে শ্লেট জাতীয় কাল পাথরে বাঁধান। খুব সম্ভবতঃ সাহেব-মেমদের জোড়ে নাচের ব্যবস্থা এইখানেই হ'ত। দরজা-জানালা নেই বললেই চলে। যে কয়টি এখন চৌকাঠের সঙ্গে লেগে আছে সেগুলিও অকেজো। মরচের কৃপায়, খোলা জানালা বন্ধ হয় না এবং বন্ধকেও খোলা সম্ভব নয়। বারান্দাতেও ইচ্ছামত চলাফেরার বিঘ্ন অনেক। মেজেতে বাঁধান পাথর এমন ভাবেই স্থানচ্যুত হয়েছে যে, নজর ঠিক না রাখলে কথায় কথায় ঠোক্কর খেতে হয়। তাছাড়া ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে ভয়াল গর্ত্তের সমাবেশ, কোথা থেকে কি যে উঁকি মারবে ঠিক নেই। ফাটল-বাসীদের এড়ালেও ছাদ ফুটো ক'রে নেমে-আসা গাছের শিকড় সারা বারান্দায় পল্টনের মত 'অ্যাটেনশনে' দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় একটির গায়ে আর একটি লাগা। যেগুলি বটের বংশ-জাত সেগুলির সংখ্যাই বেশী।

বারান্দার পাশেই সারবন্দী ঘর। একটি ঘর থেকে আর একটিতে যেতে হলে বারান্দা ঘুরে যেতে হয়, দ্বিতীয় পথ নেই। দেয়ালে শ্যাওলার আবরণ যেখানে নেই সেখানে পঙ্কের পালিশ এখনও জৌলুস বজায় রেখেছে। দেয়ালে এক জায়গায় দেখলাম, পেরেকের আঁচড় দিয়ে তাড়াতাড়ি বাংলায় কিছু লেখার চেষ্টা হয়েছিল। কাছে এসে পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু উপযুক্ত আলোর অভাবে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হ'ল না। তবু যেটুকু পড়তে পারলাম তাতে বুঝলাম, লেখক বা লেখিকাকে কেহ বাধা দিয়েছিল, শেষের দিকে পেরেকের আঁচড় লম্বা হয়ে গিয়েছে। যতটুকু পড়তে পেরেছিলাম তা এইরূপ—"আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে—।" অসমাপ্ত সঙ্কেত রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠল। এ ঘর ছেড়ে একটার পর একটা ঘর পরীক্ষা করতে লাগলাম। কোথাও আর কোন লেখার হদিশ পেলাম না। শেষ পর্য্যন্ত বারান্দার অন্তিম কোণায় এসে উপস্থিত হলাম। এইখানেই শেষ ঘরের কবাট টিকে গিয়েছে এবং ভিতর থেকে বন্ধ। উই-পোকার অত্যাচারেও শিশু-কাঠকে জখম করতে পারে নি। জোর দিয়ে খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ফল পেলাম না। কবে যে এই দরজা বন্ধ হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত। পাল্লা ও চৌকাঠের মাঝে ডগা থেকে নীচ পর্য্যন্ত ছোট ও বড় মাকড়সার জালে ভরা। কোনটিতেই কীটের অস্তিত্ব নেই, ওরাও বহু দিন আগে মরেছে। চিন্তার বিষয় হ'ল, কি করে ঘরের ভিতর ঢোকা যায়। পিছন থেকে রাস্তা বার করাও অসম্ভব, কাঁটাযুক্ত বেতের ঝাড় নিজেরাই জড়ামুড়ি ক'রে ঠাস-বুনন তৈরী করে নিয়েছে। শরীরের প্রতি মায়া থাকলে ওদিকে যাওয়া চলে না।

পথ বার করার চিন্তায় অনেকক্ষণ কেটে গেল। খোঁজার তাগিদে এমনই বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম যে, সময় কখন সন্ধ্যার দিকে হেলেছিল বুঝতে পারি নি। ঘোলাটে আকাশের ঝাপ্সা আলো মাথায় নিয়ে বার হওয়াই ঝকমারি হয়েছিল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যার কোন প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। কি করব ভাবছি, এমনই সময় মুষলধারায় বৃষ্টি নামল, তার সঙ্গে ঝড় ও বজ্রপাত। দেখতে দেখতে অন্ধকারে ডুবতে লাগলাম। একে শীতের রাত, তার উপর ভিজে বাসায় ফিরলে নিউমোনিয়ার আক্রোশ থেকে নিষ্কৃতি নেই, তার পর চিকিৎসার জন্য ওঝা ডাকতে হলে রঘুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। মৃত্যুকে ডেকে চতুর্থের অভাব পূরণ ক'রে দেবার ইচ্ছা ছিল না। রাতটা নীলকুঠিতেই কাটিয়ে

দেব কি না ভাবছি, এমনই সময় সেই পরিচিত আর্ত্তনাদ শুনলাম। কে যেন মেয়েটির গলা টিপে ধরেছে, কথা যা বার হচ্ছে তা বোঝা যায় না। আওয়াজ আসছিল কোণার ঘর থেকে। হঠাৎ আওয়াজ থেমে গেল এবং পরক্ষণেই দেখলাম, কালকের সেই মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, স্থির-দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখছে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, ও দৃষ্টি কথা বলে। চাহনির ভাষায় আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, খুঁজো না, ফিরে যাও, ফিরে যাও। যে দৃশ্যের সামনে পড়েছিলাম তাতে সাহস হাতছাড়া হবার যোগাড় হয়েছিল। ভয়কে এড়াবার কোন উপায় না থাকায় কি করব ভাবছি, এমনই সময় অনুভব করলাম, গোড়ালিতে কি একটা জড়াচ্ছে। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। ক্ষণিকের জন্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম, সঙ্কট অবস্থায় কি ভাবে মনে বল পেয়েছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ সমস্ত শক্তি দিয়ে পা ঝাড়া দিলাম। ঝাঁকুনিতে পায়ে জড়ান জীবটি ছিট্‌কে দূরে গিয়ে পড়ল। দূরে পড়লেও ওদের চরিত্র বিশ্বাস করা চলে না, আড়ষ্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। সামান্য নড়াচড়া দেখলেই তেড়ে আসবে। বেশ খানিকক্ষণ অটল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। কান খাড়া করে থাকতে হ'ল কোন নড়াচড়া শব্দের দিকে। সমস্ত চিন্তা এদিকে দেওয়ায় নারীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে ভুলে ছিলাম। নিজের অজ্ঞাতেই একটু পরে ঐ দিকে মুখ ফেরালাম, মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না। গোড়ালিতে বুকে-হাঁটা জীবটি জড়িয়ে না ধরলে হয়ত অন্ধকারেই খোঁজার চেষ্টা করতাম, সাহসকে হাতছাড়া হতে দিতাম না।

এই সময়ের ভিতর ছাদের ফুটো থেকে যে জল ঝরছিল তা বুঝতে পারি নি। জায়গা বদল করে একটু স'রে দাঁড়ালাম। সেখানেও নিস্তার পেলাম না। বাধ্য হয়ে এখান থেকে ওখান যেতে যেতে দেখি, ঘুরে ফিরে আবার সেই কোণার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি কমল বটে কিন্তু বন্ধ ঘরের ভিতরে যে সব শব্দ সুরু হ'ল তা শুনলে রোঁয়া খাড়া হয়ে ওঠে। ভিতরে অনেকগুলি মানুষ একসঙ্গে কথা বলছিল, ওদের উচ্চারণ তালগোল পাকানো, অর্থকরণ সম্ভব হ'ল না।

এই ভাবে যখন ভয়ের আনাগোনা চলছিল তখন বুঝলাম, বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। মন বেশ কাবু হয়েছে, শরীরও অবসাদগ্রস্ত। কোথাও বসার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু স্থির হয়ে বসি কোথায়? ছাদ বয়ে জল পড়ার বিরাম নেই। সমস্ত বারান্দা ভিজে চপ্‌চপে হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ হানার অপেক্ষায় রইলাম, যদি একটা থান ইট কোথাও পাওয়া যায়। ভাগ্যক্রমে আলো পেতে কাছেই প্রার্থিত বস্তুটি দেখতে পেলাম। উচ্চাসনের ব্যবস্থা হতে কবাটের গায়েই ঠেসান দিয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ বাদে ঝড় ও বৃষ্টির কতকটা বিরাম হ'ল। সামনে অভেদ্য অন্ধকার যেন কালো নীরেট পাথরের দেয়াল তুলে দিয়েছে। চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে বসে রইলাম। কত রাত হ'ল কিছুই জানি না। কাঠে হেলান দেয়ায় যেটুকু আরাম পেয়েছিলাম, তাতেই তন্দ্রার ঘোর এসে গেল। অর্দ্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় যেসব ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম তাদের বর্ণনা দেয়া বৃথা, কারণ, সব কিছু যোগসূত্র-বিচ্ছিন্ন। শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরের দিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। প্রথমেই মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, অনুমানের উপর নির্ভর করে সেই জায়গাটি পরীক্ষা করলাম, কোন পদচিহ্ন নেই। শূন্যচারিণী না হলে, ভেজা নরম মাটিতে কোন দেহের গতায়াত লুকানো সম্ভব নয়। নারী অন্তর্ধান করার পর ঐ জায়গায় একটি শুয়োরকে দেখেছিলাম। চতুষ্পদীয়ের খবর নিতে গিয়ে একটি গোটা পালের সন্ধান পাওয়া গেল। যেটি পালের গোদা সেইটিই আমাকে মানুষ ভেবে সন্দিগ্ধ হয়েছিল। চার পায়ের উপর সমস্ত দেহের সমভার রাখা মানেই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। নেহাত কপাল জোর, তাই যা ঘটা উচিত ছিল তা ঘটে নি। রাত্রের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখলাম, দৃষ্টি প্রতারণা করলেও এখানে অনেক কিছু আছে যাদের সঠিক খবর পেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অযথা ভয় থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যেতে পারে। স্থির করে ফেললাম, আবার আসতে হবে এবং পরীক্ষার জন্য যতটা সময় পারি এইখানেই কাটাব।

২

তিন দিন হয়ে গেল, বাঁ,জ্জের দেখা নেই। এই কারণে আমার কোন অভিযোগ ছিল না। বরং অনুপস্থিতি আমার কাজেই লাগছিল। রোজই নীল-কুঠিতে যাই, আঁচড়-কাটা লেখা পড়ি, প্রতিটি ঘরে পরীক্ষা চলে, বিশেষ কিছু ফল পাই না। যে ঘরে মেয়েটির চোখ বলেছিল, "ফিরে যাও" সেই ঘরে ঢুকলেই, ফেরার চেয়ে খোঁজার টান বেড়ে উঠতে লাগল। দেয়ালে আঁচড়-কাটা কয়েকটি কথা প'ড়ে নানারকম মানে করতে লাগলাম। রুদ্ধ কবাটকে নিয়েই চিন্তা জড়িয়ে ছিল। কবাট খুলতে না পারি, ঐ ঘরে ঢোকার নিশ্চয় অন্য কোন

পথ আছে। হয়ত লেখক বা লেখিকা এ খবর জানত এবং নিশ্চয় এই ঘরেই পথ নির্দ্দেশের কোন সঙ্কেত রেখে গিয়েছে।

ঘরে একটি মাত্র জানালা। জানালার ঠিক পিছনেই বাবলা গাছের ভিড়। একটি ডাল ঘরের ভিতর এসে পড়েছিল। সরু ডালকে অস্বাভাবিক ভাবে নড়তে দেখে অদ্ভুত লাগল। শুধু ডাল নড়ছিল না, তার সঙ্গে জড়ান একটি মোটা লতাকে দেখলাম সচল হয়ে উঠেছে। দৃষ্টি-ভ্রমের দরুণ ঝাপসা আলোয় এখানে অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু দিনের বেলায়, অচল ডাল নড়ে-চড়ে লম্বা হতে পারে, এমনটি স্বচক্ষে দেখে দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যে চলন্ত লতা ঘরের ভিতর এসে পড়ল। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, একটি পূর্ণকায় সাপ, একেবারে জাত গোক্ষুর। খানিকটা আমার দিকে আসতেই হঠাৎ ফণা তুলে স্থির ভাবে আমাকে দেখতে লাগল। হাতেই বল্লম ছিল, কালবিলম্ব না করে মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলাম। লক্ষ্যভেদ ভালই হয়েছিল। বল্লম সাপের মাথা ভেদ ক'রে কাঠের মত কিছুর উপর বিঁধে গেল এবং যে ভাবে পড়ল সেই ভাবেই বাঁকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। এর পরেই বল্লম-বিদ্ধ সাপের বাকি দেহটার দারুণ ভাবে উত্থান-পতন সুরু হ'ল। যতবার মাথার কাছে দেহাংশ আছাড় খেয়ে পড়ছিল ততবারই বল্লমের তলায় ফাঁপা জায়গার সঙ্কেত পাচ্ছিলাম।

পাথরে বাঁধান মেজের তলায় ফাঁপা আওয়াজ আমার অনুসন্ধিৎসু মনকে উত্তেজিত করে তুলল। সন্দেহকে শান্ত করতে হলে সাপের মাথা যেখানে আটক পড়েছে সেই জায়গাটি ভাল করে দেখতে হয়। জায়গাটা শুধু ফাঁপা নয় কাঠের আড়াল দিয়ে ঢাকা। নিশ্চয় ওখানে কাঠের সিন্দুক জাতীয় কিছু পোঁতা আছে। যদি সিন্দুক হয় তাহলে ওর ভিতর অনেক কিছুর খবর পাওয়া যেতে পারে। ওখানে যেতে হলে সাপের নড়া-চড়া আগে বন্ধ করতে হয়। বিষধরের মাথাকে একে-বারে থেঁতলে না দিলে বুকে-হাঁটা জীবটি তার দাঁতকে কাজে লাগাতে পারে। মনে পড়ল, গত রাত্রে খুঁজে পাওয়া থান ইঁটের কথা। বারান্দা থেকে সেটি তুলে এনে, মাথাটা একেবারে পিষে দিলাম। সাপ এমন জীব যে মাথা না থাকলেও সময় মত মরতে চায় না। দেহের ওলটপালট সমান ভাবেই চলছিল। কামড়ের ভয় না থাকলেও দৃশ্যটি ভীতিপ্রদ। পকেটে শিকারীর ছুরি ছিল, তাই দিয়ে গলার কাছ থেকে মাথাটা কেটে ফেল-লাম। এর পর কাঠের কামড় থেকে উদ্ধার করার জন্য বল্লমকে টান মারলাম; কাঠ, মরণ কামড় কামড়ে ছিল, সিন্দুকের ডালা পর্য্যন্ত খানিকটা উঠে এল। সবটা খুলল না, বল্লমের পিছনটা দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ায়। যেটুকু খুলেছিল তাতেই এক ঝলক আলো আমার মুখের উপর এসে পড়ল। মাটির তলায় সূর্য্যালোক আমাকে স্তম্ভিত করে দিল। পুনরায় সিন্দুকের ডালা বন্ধ ক'রে তার উপর দাঁড়ালাম তার পর বল্লমকে টেনে-হিঁচড়ে বহু কষ্টে উদ্ধার করলাম। বল্লম উদ্ধার করতে গিয়ে সিন্দুকের ডালার উপর যে নড়াচড়া হয়েছিল তাতে পুরু ধুলো অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। পায়ের তলায় দেখলাম, একটি বড়সড় পিতলের আংটা। ওখান থেকে স'রে এসে আংটা ধ'রে টান দিতে সমস্ত ডালা খুলে গেল। নীচে দেখি ধাপের পর ধাপ পাথরের সিঁড়ি রয়েছে। বেজায় উঁচু ধাপ এবং সিঁড়ি খাড়াই ভাবে নীচের ঘরে নেমে গিয়েছে —মেঝে থেকে ঘরের ছাদ হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় কিন্তু সিঁড়িটি ব্যবহার করতে হলে বাঁশের মইয়ের মত ব্যবহার না করে উপায় নেই অর্থাৎ মইয়ের দিকে মুখ রেখেই নামা-ওঠা করতে হয়, নামবার সময় সামনে তাকান চলে না। নীচে পরীক্ষার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল, কিন্তু প্রবেশ-পথের ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কবাট নিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেলাম। ডালাটি খুললে কব্জার গঠনের জন্যে খাড়াই থাকে উল্টা দিকে, মেজের উপর পড়ে যায় না।

ভিতরে যাওয়ার পর হাওয়া বা অন্য কোন কারণে কবাট বন্ধ হয়ে গেলেই ত চমৎকার। কবাটের ওজন অনুমানের সাহায্যে কতকটা ঠিক হতে সাহস পেলাম; পড়ে গেলেও মাটির তলায় জীবন্ত গোর হয়ে যাব না। নীচে নামা সম্বন্ধে তখন সামান্য দ্বিধা ছিল, কারণ কবাট খুলতেই কেমন একটা উগ্র গন্ধ পেয়েছিলাম। বদ্ধ বায়ু বিষাক্ত হয়ে থাকলে মারাত্মক বিপদ্‌কে সঙ্গে নিয়েই ওদিকে যেতে হবে। কিছুক্ষণ প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকায় বুঝলাম, গন্ধ সুরার, আগেকার গল্পের সঙ্গে সত্যের যোগ খুঁজে পাওয়ায়, নির্ভয়ে নীচে নেমে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই উগ্র গন্ধের সূত্র ধরা পড়ল, দেখলাম সারে সারে কাঠের পিপে সাজান রয়েছে এবং একটি দেয়ালে খুব বড় দরজা, নিশ্চয় এই দিক্ দিয়ে সুরা-ধারগুলি ঘরে আনা হ'ত। একটি পিপে কোন কারণে ফুটা হয়ে গিয়েছিল তারই তলায় অনেকটা জায়গার রং মেজের অন্য অংশের তুলনায় আলাদা। রং কতকটা রক্ত শুকিয়ে যাবার মত।

ঘরটি যে কোন-সময় সাহেবদের রস-ভাণ্ডার হিসাবে

ব্যবহৃত হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। ঘরের ভিতর আলো আসার ব্যবস্থাও বিস্ময়কর। দেয়ালের উপর অনেকগুলি আয়না এমন বিচিত্র ভাবে সাজান যে, সমস্ত দিন রোদের ছটা কোন না কোনটা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ঘরের মাঝখানে এসে পড়ে। হয়ত ঘরের বাইরেও সূর্য্যালোক গ্রহণের জন্য ঐরূপ আয়োজন আছে। আসবাবপত্রের মধ্যে একটি কাঠের টেবিল ও চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। একটি দেয়ালের গায়ে তিনটি কাঁচের আলমারী। সব কয়টিই দেয়ালের ভিতরে ঢোকান এবং বন্ধ। আলমারীর ভিতরে নানা রকমের সুরাপাত্র, সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আজও সেগুলি যথাস্থানে বিরাজ করছে। স্থাপত্যের সঙ্গে আলমারীর যোগ থাকায় তিনটিতে কেমন খাপছাড়া লাগছিল। গরমিলের স্থানটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মাটির গাঁথুনি খানিকটা ধ্বসে যাওয়ায়। গরমিলের জায়গা মাত্র এক ইঁটের দেয়াল, যেখান থেকে ইঁট ধ্বসে গিয়েছে সেইখানে ভিতর দিকে গাঢ় অন্ধকারের সৃষ্টি হওয়ায় দূর থেকেই অনুমান করা চলে ভিতরটি ফাঁপা। নিশ্চয় কোন আকস্মিক ঘটনাকে আড়াল দেবার জন্যে ঐরূপটি ঘটেছিল। ধ্বসে-যাওয়া গর্ত্তের কাছে বল্লমের উল্টো দিক্ দিয়ে ঠেলা মারতে অনেকগুলি ইঁট একসঙ্গে তলায় পড়ে গেল। খানিকটা জায়গা ফাঁপা হয়ে যেতে একটি ঘরের প্রবেশপথ বেরিয়ে পড়ল। ভিতরে মসী কালো অন্ধকার, তার উপর বিটকেল গন্ধ। ভিন্ন উপদ্রবেরও কমতি ছিল না। উপর থেকে নেমে-আসা গাছের শিকড়, দেয়ালের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে স্প্রিংয়ের মত ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। তার সঙ্গে দুই একটা ভাঙা ইঁটের টুকরাও গায়ে এসে পড়ল। দম দেয়া চাবুকের মত শিকড়ের কশাঘাতে প্রায় দাগী হবার যোগাড় হয়েছিলাম। একটু পিছিয়ে এসে ভাবতে লাগলাম, এদের উৎপাত এড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢোকা যায় কেমন করে। চিন্তা বেশী দূর এগোবার আগেই আকৃষ্ট হলাম একটি নরমুণ্ডের প্রতি। ইঁটের স্তূপের ভিতরে দেখলাম, মানুষের মাথার খুলি। কতকগুলি ইঁট সরাতে দেহাংশের অনেক হাড় বেরিয়ে পড়ল, তার সঙ্গে চুড়ি পরা একটি হাতের হাড়ও ছিল। গহনার নকসা পুরাতন। কোন একদিন কার নিটোল মাংসকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ছিল। হত্যার রহস্যে জড়িয়ে পড়লাম।

কল্পনা যখন অতীতের সম্ভব অসম্ভব কাহিনী গড়ে তুলছিল, সেই সময় ঘর অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। উপরে আলো বাতাস আসার ফাটল থেকে সোঁ সোঁ শব্দ সুরু হ'ল। যেন প্রেতলোকবাসী প্রহরীদের ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস একযোগে একই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছে। মড়ার নিঃশ্বাসে বায়ু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। হাড় কাঁপানী ঠাণ্ডার সঙ্গে শুনছি মেঘগর্জ্জনের মত হুঙ্কার। মহা নিদ্রার কোলে জেগে উঠেছে পুঞ্জীভূত নরকঙ্কাল, চোখের সামনে দেখছি ওদের নড়াচড়া। হঠাৎ একটি হাড় ঠিকরে এসে পড়ল আমার পায়ের তলায়। হাড়ের চলাফেরা দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। জায়গাটি পরিত্যাগ করার জন্য দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না, সর্ব্বাঙ্গ পঙ্গুর মত হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মড়ার খুলি শূন্যে উঠে পড়ল, তার পরই সুরু হ'ল চোয়ালের উত্থান-পতন। দাঁতে দাঁতে কি সাংঘাতিক সংঘর্ষণ। মুণ্ড এতক্ষণ আমার মুখের সামনেই দুলছিল কতকটা বড় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। ঘড়ি দোলা-যন্ত্র-চালিত সময় ধরে নির্দ্দিষ্ট পথে চলে কিন্তু কঙ্কালের অস্থিরতা আসছিল অন্তরের আবেগ থেকে, বোধ হয় অতীতের কাহিনী বলতে চায়। একবার আমার কানের অতি নিকটে আসতে নীচের চোয়াল খানিকটা খুলে গেল কিন্তু যা বলতে চাইল তা বলা হ'ল না। এরই মধ্যে দেখি, চোখের শূন্য কোটরে দৃষ্টির সঞ্চার হয়েছে। মড়ার চোখ জ্বলছে। তার উপর আবেষ্টনীর নিস্তব্ধতায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। মনে হয়, ভূগর্ভের তলায় সমাধির মধ্যে আটক পড়েছি। ঝড় ওঠার আগে গুমট যেভাবে আকস্মিক আলোড়নের নির্দ্দেশ দেয় সেইভাবে শব্দহীন আবেষ্টনী কোন সাংঘাতিক ঘটনার সঙ্কেত দিতে লাগল। অস্বস্তিকর আশঙ্কা চাক্ষুষ হতে সময় নিল না। হঠাৎ দোলায়মান নরমুণ্ড ঝড়ের বেগে আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কঙ্কাল প্রাণবান্ হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড চুম্বনে আমার ঠোঁট ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। পৈশাচিক রস-নিবেদনে চতুর্দ্দিকে জয়োল্লাসের প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলাম। কখন ভয়াল অট্টহাসি, কখন কর্কশ সঙ্গীতালাপ, কখন উন্মাদের করতালি। আর কত রকম শব্দ শুনছিলাম তার বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বুভুক্ষু কঙ্কাল, জীবন্ত মাংসের আস্বাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। রসনার সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত শান্ত হতে পারছিল না। মুণ্ড পুনরায় আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বাধা দেবার অধিকার না থাকায় যে কোন নির্লজ্জ আচরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কঙ্কাল অদৃশ্য হয়ে

গেল। পর মুহূর্ত্তে দেখলাম একটি পূর্ণাঙ্গী নারী অগ্ন্যুত্তপ্ত যৌবনশ্রী নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। তার কোমলে কঠিনে মেশা নিটোল অঙ্গে অঙ্গে আগুনের উত্তাপ থাকলেও সান্নিধ্য জ্বালাময় নয়। গঠনের মাধুর্য্যে প্রতিটি অঙ্গ প্রতিটির সহিত এমন ভাবেই সামঞ্জস্যের যোগ ঘটিয়েছে যে মনে হয় লাবণ্যময়ী, অতীতের ক্ষণস্থায়ী সাময়িক সম্পদ্ দেখাবার জন্যই ব্যস্ত নয়, সুন্দর যে কালজয়ী হতে পারে তাই প্রমাণ করার জন্য রূপ ও রেখার অন্তর্নিহিত সত্যকে আমার সামনে ধরেছে। আমি বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। কোন যাচ্ঞা ছিল না, কেবল দেখার মধ্যেই আনন্দ পাচ্ছিলাম। আপনহারা অবস্থায় কতক্ষণ এই ভাবে মোহনরূপ দেখছিলাম বলতে পারি না। নারীর যৌবনদীপ্তি ক্রমে আমার দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত মোহাচ্ছন্নের মত হয়ে পড়লাম। এই অবস্থায় দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন ঘটল, দেখলাম সুন্দরীর রূপের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এখন সে আবরণের আড়াল টানলেও অবগুণ্ঠিতার শ্লথ বেশে যে স্বচ্ছতার আভাস ছিল তা তার উদ্ধত যৌবনকে শাসনাধীন করতে পারে নি। বসনের বাধা অগ্রাহ্য করে তা আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। উত্তেজনার ইঙ্গিত পাচ্ছি সর্ব্বাঙ্গের মৃদু কম্পনে। যে নারীর অনাবৃত রূপকে অল্পক্ষণ আগে ভোগাতীত ভেবেছিলাম, যে সৌন্দর্য্যের সান্নিধ্যে মন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই অবর্ণনীয় রূপকেই বসনের আচ্ছাদনে ভিন্নভাবে দেখছি।

সতর্কিত লজ্জার সঙ্কেতে স্নিগ্ধ কান্তি বাসনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতে পারছি তার অলঙ্ঘনীয় প্রভাব ধীরে আমার উপর শক্তি বিস্তার করছে। সারাটা জীবন একটা আদর্শ অনুসরণ করে নিজেকে কঠোর সংযমের প্রাচীরের মধ্যে আটকে রেখেছিলাম, সেই বিশ্বস্ত আশ্রয় ভেঙে চুরমার হতে বসেছে।

নারীর ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিল। খঞ্জনাক্ষী চাহনির দ্বারা আমাকে অনুসরণের ইঙ্গিত দিয়ে ঘরের দিকে চলে যেতে লাগল। প্রবেশপথে যেসব বাধা ইতিপূর্ব্বে অলঙ্ঘনীয় ছিল এখন সেগুলি অন্তর্দ্ধান করেছে। তার পিছনে চলতে লাগলাম।

অন্ধকারের ভিতর কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম বলতে পারি না। একটার পর একটা ঘর পার হয়ে শেষ পর্য্যন্ত একটি বাঁধান সিঁড়ির সামনে উপস্থিত হলাম। বেশ চওড়া সিঁড়ি, ধাপগুলিও সহজ ব্যবহারযোগ্য। ভূগর্ভেরা মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা দেখলে অনুমান করা চলে, এখানেও লোকসমাগমের ব্যবস্থা হ'ত।

নারী শেষ ধাপ অতিক্রম করে চাতালের উপর দাঁড়াল। চাতালের সামনেই বৃহৎ দরজা। দরজার উপর বিশেষ প্রথায় টোকা মারতে কবাট ধীরে খুলে যেতে লাগল। ভিতরে মস্ত বড় ঘর। এখানেও অন্ধকারের অভাব নেই কিন্তু কেন বলতে পারি না, দেখার কোন অসুবিধা ছিল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত নারীকে অনুসরণ করছিলাম। অনেকটা চলার পর একটি দেয়ালের সামনে মেয়েটি দাঁড়াল, তার পর চোখের ইসারায় আমাকে ডাকল। আমি কাছেই ছিলাম, আরও কাছে আসতে বলায় ভীতি-জড়িত পুলকে ভিতরটা দুরু দুরু করে উঠল। রক্ত-শোষক চুম্বনের কথা ভুলি নি, ভাবতে লাগলাম, সত্যই কি এই অসামান্যা সুন্দরীর দৃঢ় অধর-পেষণে আমার ওষ্ঠ রঙীন হয়ে উঠেছিল? কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, অমন মাংস-পরিপুষ্ট গঠন, মড়ার হাড়ের উপর গ'ড়ে উঠেছে। বিদেহিনীকে তাই এখন আর ভয় নেই। ধীরে নারীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। প্রতিটি পদবিক্ষেপে আমাদের মাঝে ব্যবধান কমে যাচ্ছে, হৃদয়ে ভূমিকম্পের মত আলোড়নের অনুভূতি পাচ্ছি, আর এক পা অগ্রসর হলেই ছোঁয়ার নাগালে এসে পড়ি কিন্তু তার আগে বাধা পেলাম। নারী ঊর্দ্ধে হাত তুলে জানিয়ে দিল "আর না!"

এর পর যা শুনলাম তা নিরস উপদেশ, ছদ্মবেশী নীতির শাসন। শাসনের বাণী আমাকে জানিয়ে গেল "সবই ভুল, রূপের আকর্ষণ—কেবল মায়ার ডাক। এততেও কি বুঝতে পার নি? যে ভোগের বিনিময়ে দীর্ঘ কালের ব্রতকে ধ্বংস করতে চলেছ, সংযমের প্রতি হত-শ্রদ্ধ হয়েছ, তা বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী। যে রূপের আকর্ষণে তুমি নিজেকে হারিয়েছ, তা প্রাণহীন ও অসাড়। দেহী ও বিদেহী উভয়েরই রূপ এই জায়গায় প্রাণহীন ও অসাড়। অসাড়ের কাছ থেকে যেটুকু সাড়া পাও তা তোমারই ভাবনার প্রতিধ্বনি, যে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে তুমি আত্মহারা তাকে তুমিই রূপ দিয়েছ।" উপদেশ-বাণী হঠাৎ থেমে গেল। আবেষ্টনী পুনরায় নিস্তব্ধতার চাপে ভারগ্রস্ত হয়ে উঠল। মন বিদ্রোহী হয়েছিল, স্থিরচিত্তে ভাবলাম, হোক ক্ষণস্থায়ী, হোক প্রাণহীন অসাড়, হোক আমারই প্রতিধ্বনি, এই নারীকে আমার প্রয়োজন আছে। এ নারী কল্পনায় জন্মালেও

তার অস্তিত্ব আমার কাছে অবাস্তব নয়। চাহনির ইসারায় বলে গেছে সে আছে এবং আমার জন্যই আছে। সে যেখানেই থাক তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

সঙ্কল্প স্থির হয়ে গিয়েছিল কিন্তু দিশাহারাকে পথ দেখাবে কে, আমার গন্তব্যস্থানই বা কোথায়, কাকেই বা খুঁজতে চলছি? বশীকরণ শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সুন্দরীকে অনুসরণ করেছিলাম, তখন কোন্ দিক্ দক্ষিণ, কোন্ দিক্ উত্তর খোঁজ নেবার অবসর ছিল না। ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে লাগল কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়ার আগেই অন্ধকার ভয়াল রূপ নিয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। এমন রূপ কখনও দেখি নি। বর্ণনা দিতে হলে বলতে হয়, দেহ নেই, নাক নেই, কান নেই, চোখ নেই, সংক্ষেপে কিছুই নেই, কেবল একটি আকৃতিহীন বিশাল মুখগহ্বর, আমি সেই গহ্বরের ভিতর অবর্ণনীয় শোষণের টানে ঢুকে যাচ্ছি। আমার মুখ সামনের দিকেই রয়েছে অথচ গতি পিছন দিকে। আমার অবস্থা কতকটা সরীসৃপের গলাধঃকরণকালীন ভেকের মত। বায়ুহীন পথে পিছু হেঁটে চলেছি। সবই বুঝছি অথচ কিছু করবার নেই। অন্ধকারের গ্রাস থেকেও আমার মুক্তি নেই কারণ, যাবতীয় দৃশ্যবস্তুকে আত্মসাৎ করাই অন্ধকারের ধর্ম্ম।

এক জায়গায় দেখলাম, ক্ষীণ আলোকরশ্মি একটি শব্দের রূপ নিয়েছে। অনুমানের সাহায্যে যেটুকু পড়তে পারলাম তা "দক্ষিণ", একটি তীরফলকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিশেষ দিকের নির্দ্দেশ দিচ্ছে, নারী ঐ দিকেই যেতে বলেছিল। নির্দ্দেশের পিছনে রূঢ় রসিকতা আত্ম-গোপন করে ছিল, কারণ তীরের ফলক যে দিক্‌কেই দক্ষিণ ব'লে স্থির করুক তা অনির্ভরযোগ্য। ইতিমধ্যে শোষণ-শক্তির টান থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। অন্ধকারে চলার সময় একটি শুকনো কাঠে ঠোক্কর খেয়েছিলাম। লম্বা পাত্‌লা কাঠ, ঠিক্‌রে গিয়ে পড়ল তীর-সংযুক্ত শব্দের উপর। তার পরেই দেখি তীরের মাথা শোওয়া অবস্থায় নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

রোমাঞ্চকর দৃশ্য। জড়কে আপন গতিতে সচল হয়ে উঠতে দেখলে যে কোন সাহসী পুরুষকে ভয়াক্রান্ত হতে হয়। প্রথমটা আমাকেও বিচলিত হতে হয়েছিল, তবে এই জাতীয় অনেক ঘটনার সহিত ইতিমধ্যে পরিচয় হওয়ায় স্থিরচিত্তে কারণ খোঁজায় কোন অসুবিধা হ'ল না। আবিষ্কার করলাম, যেখানে তীরের উপর কাঠ ঠিক্‌রে পড়েছিল সেইখান থেকেই মেজেকে নীচের দিকে ঢালু করা হয়েছে।

যে কারণেই তীর সচল হয়ে থাক, সন্দেহ রইল না যে, আমাকে পথ দেখাবার জন্যই দিক্‌নির্ণয়ের অস্ত্রটি অপেক্ষা করছিল। সর্ব্বশক্তি সংগ্রহ ক'রে নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে দিলাম। পথ-প্রদর্শক সামনে থাকায় চলার কোন বাধা পেলাম না। খানিকটা নীচে নামতেই আলোর সন্ধান পেলাম। এখানেও আগের প্রথায় উপর থেকে সূর্য্যরশ্মি সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে।

পথ একটি ঘরের সামনে এসে শেষ হ'ল। জায়গাটা চেনা চেনা লাগছিল, ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে বুঝলাম, ঠিক এই ঘরে না হলেও যে উগ্রগন্ধ আমাকে অভ্যর্থনা জানাল তার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে পরিচয় হয়েছে। সামনেই দেখলাম সেই বিরাট্ কবাট। বায়ু চলাচলের জন্য উপর দিকটা কাটা এবং জাল দিয়ে ঢাকা। দরজার জোড়ের জায়গায় যেটুকু ফাঁক ছিল তারই ভিতর দিয়ে দেখলাম, বাস্তবিকই ওপাশে পিপেগুলি সাজান রয়েছে। এদিকে আসার সময় কতকগুলি পাতলা কাঠের টুকরো নজরে পড়েছিল। খুব সম্ভবতঃ এগুলি কোন পরিত্যক্ত পিপের ভগ্নাংশ। এদিক্‌টা মেজেকে ঢালু করার উদ্দেশ্য ধরা পড়ল, পিপেগুলিকে এই পথ দিয়েই ঘরের ভিতর নেওয়া হ'ত।

হতাশ হয়ে গেলাম। আমি ত শুকনো কাঠ আর দুর্গন্ধযুক্ত পিপের সন্ধানে এখানে আসিনি। ছলনাময়ীর পীড়াদায়ক পরিহাসে মর্ম্মান্তিক অভিযোগ উঠছিল।

এই সময় অতি নিকটেই দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলাম। সান্ত্বনার ইঙ্গিতে মন আনন্দে ভ'রে উঠল। কিন্তু প্রত্যাশা সার্থক হ'ল না। দারুণ উচ্ছ্বাস প্রতিহত হতে মর্ম্মাহত হয়ে অদৃশ্যাকে জানাতে চাইলাম, হৃদয় নিষ্পেষণ করা তোমার কাছে কৌতুকের বিষয়। রক্ত-রঙে রাঙ্গা চুম্বনের যে চিহ্ন রেখে গেলে তা কেবল ক্রীড়ার অঙ্গ। হৃদয় বলতে তোমার কিছু নেই, তুমি অসাড়, তুমি জড়, তুমি কেবল মজ্জাহীন কঙ্কাল।

কঙ্কাল কথাটা মনে আসতেই সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। মুহূর্ত্তে বিকট সত্য আমাকে বাস্তবের সামনে ধ'রে দিল। যে আবেষ্টনীতে মোহাবিষ্ট হয়েছিলাম, যেখানে ভুলে-যাওয়া যৌবনকে অতীতের সমাধি থেকে উদ্ধার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম সেই স্থান থেকেই পরিত্রাণের জন্য উন্মাদের মত পথ খুঁজতে লাগলাম। অন্ধকূপ থেকে বার না হতে পারলে দূষিত বায়ুর নিঃশ্বাসেই হয়ত আমাকে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হবে। যে সময় পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলাম ঠিক সেই সময় মাথার উপর জোরে কবাট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনলাম। সঙ্গে

সঙ্গে সাঙ্ঘাতিক হুড়োমুড়ি ও জানোয়ারের মত বিকট চিৎকার সুরু হ'ল। বাঁচা ও মরার মিলন-উৎসবের জন্য যেন প্রেতলোকে হুল্লোড় চলেছে। এখুনি এখান থেকে বার না হলে আমাকে বাসরঘরে নিয়ে যাবে। ফুল-শয্যা সেখানে সাজান আছে। ছলনাময়ী আমারই জন্য অপেক্ষা করছে। মড়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার চিন্তায় মৃত্যু যেন ঘটা ক'রে আমাকে বরণ করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল।

এই সময় আবার মাথার উপর গোঙানির আওয়াজ শুনলাম। পর মুহূর্ত্তে উপর থেকে রক্তের ধারা কাঁধ ও মাথা ভিজিয়ে দিল। পৈশাচিক লীলার আয়োজন মাথার উপরেই হয়েছিল। হত্যার ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে না পেলেও অনুমানে কোন বাধা ছিল না। ভাবলাম ধ্বংসের মহোৎসব হয়ত আমাকে দিয়েই শেষ হবে। চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র কবাটের দিকে তাকালাম, ঐ পথেই পাতালপুরীতে প্রবেশ করেছিলাম। বিকট চিৎকারের সঙ্গে আহত বরাহের আর্ত্তনাদ মিলে যাওয়ায় বিচার করে দেখলাম, আমার ধারণা ভুল হয়েছিল। আসলে উপরেও প্রেমের অভিযান চলেছিল, প্রণয়িনীর দখল নিয়ে। পশুর সমাজে প্রেমের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য করুণার প্রশ্ন ওঠে না। বল প্রয়োগেই সর্ত্তের মীমাংসা হয়ে থাকে এবং বিজয়ীকে স্বয়ম্বরা সব সময় স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করলেও দণ্ডের ভয়ে বরমাল্য দিতে বাধ্য হয়; এটা আদিম কালের রীতি, পশুর সমাজে শৃঙ্খলার জন্য বিশেষভাবে ফলপ্রদ। শৃঙ্খলার প্রয়োজনে যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল তারই ফলে কোন একটি জন্তর গায়ে জোর ধাক্কা লেগে খোলা কবাটের ডালা সবেগে মাটিতে এসে পড়ে। রক্ত বর্ষণের কারণও মল্লযুদ্ধ। আহত জন্তটি কবাটের উপরই এসে পড়েছিল। আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় আর উঠতে পারে নি।

ঘটনার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হতে, সিঁড়িতে ওঠার চেষ্টা করলাম। কয়েক ধাপ উঠতেই মাথাটা ঘুরে গেল। দীর্ঘকাল মাটির তলায় দূষিত বায়ুর নিঃশ্বাস নেয়ার দরুণই বোধ হয় এই রূপটি ঘটেছিল! ভাবলাম এই অবস্থায় খাড়াই ধাপগুলি ব্যবহার করতে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু এখানে বেশীক্ষণ থাকলে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। গত্যন্তরে টলায়মান শরীর নিয়েই উপরে উঠতে হ'ল। কবাটের কাছে আসতে বন্ধ দরজা নীচ থেকে চাড় দিলাম। খোলা গেল না। অতিকায় আনুমানিক বরাহের ওজন তিন থেকে সাড়ে তিন মণ হবে; ঐ ভার তোলা সম্ভব হ'ল না। নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির দিকে মুখ রেখে হাত ও পায়ের উপর ভর দিয়েই নামতে হয়েছিল, নামার সময় উপরে আবার গোঙানির শব্দ শুনলাম। শিকারীর অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিল, মৃত্যু-যন্ত্রণায় জানোয়ার অস্থির হয়ে উঠেছে। অস্থিরতার ফলে দরজার একটি কোণা ফাঁক হয়ে গেল; খুব সম্ভবতঃ একধারে ওজন বেশী পড়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম ফাঁকের ভিতর থেকে একটি শুয়োরের লেজ ঝুলে পড়েছে।

নীচে নেমে মেজের উপর বসে পড়তেই আরও বেহুঁসের মত হয়ে গেলাম। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ কোন বিষাক্ত কীটের কামড়ে চম্‌কে উঠলাম। একটি ক্ষুদ্রকায় তেঁতুলে বিছে আমার সামান্য নড়াচড়ায় নরম মাংসের সন্ধান পেয়ে হুল ফোটানর লোভ সামলাতে পারে নি। স্বধর্ম্ম রক্ষার পর শতপদী চ'লে গেল বটে কিন্তু পদহীন বিষাক্ত জীবের আস্তানায় অন্য কাহারও অপেক্ষায় থাকা বিপদ্‌জনক ভেবে উঠে পড়লাম।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার, উপরে উঠে দরজায় সামান্য চাড় মারতেই কবাট খুলে গেল। মাটির তলা থেকে উপরে এসে দেখি, বাস্তবিকই শুয়োরটা মরেছে, একতাল রক্তের উপর কবাটের বাইরে পড়ে আছে। বিরাট্ দাঁতাল বরাহ, পেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছে। প্রেমের দরবারে আত্ম-বলিদানের এইরূপ দৃষ্টান্ত আগেও দেখেছি সুতরাং বিচলিত হবার কিছু ছিল না।

ভোর হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্ত শরীরে মুক্ত ও স্নিগ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাস নিতে পারায় বিশেষ আরাম পেলাম। ধুলো-ভরা মেজেতেই ব'সে পড়লাম। প্রাণভরে জিরিয়ে নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। কতকটা নিশ্চিন্ত ভাব আসায়, ভূগর্ভের ঘটনা একটির পর একটি চোখের সামনে চলচ্ছবির মত ভেসে যেতে লাগল। রুদ্ধ কবাটের রহস্য, পাতালপুরীতেই রেখে যেতে হ'ল ব'লে দুঃখের কিছু ছিল না। ভেবে দেখলাম, যে সব ঘটনা চাক্ষুষ করেছি সেগুলিকে মনগড়া দৃশ্য ব'লে উড়িয়ে দেয়া চলে না। যে নারীর যৌবনশ্রী আমাকে সম্মোহিত করেছিল, যে মাদক-শক্তির আকর্ষণে আমার সুপ্ত কামনা সজাগ হয়ে উঠেছিল, সেই শক্তিকে ত কোন সময়, কোন পরিবেশে অস্বীকার করার উপায় নেই। একই রূপে নারী বহুরূপী। সুতরাং ছলনাকে ক্ষেত্রবিশেষে তার একটি প্রকৃতিগত গুণ ব'লে ধরতে হয়। আবেষ্টনী ও সাময়িক মনের অবস্থা বুঝে রূপসী যদি মায়াজাল বিস্তার করেই থাকে, ভোগলিপ্সায় আমি সম্পূর্ণ আত্মহারা

হয়েই থাকি, তাহলেও বলব না আমার সন্ধানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এক রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আর এক রহস্যের সহিত পরিচয় হয়েছে। নারী রহস্যময়ী বলেই তাকে জানার চেষ্টা আজও চলেছে। আমি যেটুকু জানতে পেরেছি সেইটুকুই আমার মস্তবড় লাভ। আত্মপ্রশ্নে সঙ্গত যুক্তি সহায় হতে সান্ত্বনা পেলাম। ভাবলাম, যে রহস্যদ্বার অনাদিকাল থেকে রুদ্ধ তাকে খোলার চেষ্টা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু না।

কাছারিতে ফেরার কথা মনে পড়ল। নীলকুঠিতে যা দেখেছি বা শুনেছি তা আমার কাছে সত্য ও বাস্তব হলেও কেহ বিশ্বাস করবে না জানি,তবে ঘটনাগুলির সূত্র অনুসরণ করলে বলা যায় কোন সময় এদিকে যে দুর্লভ মালের আমদানি হ'ত তাতে সন্দেহ নেই। ঘটনার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য কিছু থাক বা না থাক, এখানে একাকী রাত্রিবাস করেছি শুনলে বাঁড়ুজ্জে খাঁটি সত্যকে নিছক মিথ্যা প্রমাণ করাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠবে। আগের ঘটনা নিয়েই ত ইতিমধ্যে চোখ ঠেরেছে। কেচ্ছার প্রচারও বাঁড়ুজ্জের কাছে একটি ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার। সারা গ্রামের লোক ওর কাছে আসে দীক্ষা নিতে। আমার সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ হলে মূলধনকে সুদে খাটিয়ে এমনি ফাঁপিয়ে তুলবে যে, বাকি জীবনে বেকার বসে থাকার অবসর পাবে না। সারাটা জীবন ব্রহ্মচারীর পথানুসরণ করে এসেছি, এ বয়সে অযথা চরিত্রস্খলনের দুর্ণাম বহন করার ইচ্ছা ছিল না। অবাঞ্ছনীয়কে সামলাতে হলে একটি বিশ্বাসযোগ্য গল্প তৈরী থাকা দরকার। মালমসলা নাগালেই ছিল, নতুন প্রথায় বরাহ শিকার সম্বন্ধে কিছু বলব ঠিক করে ফেললাম।

কাছারিতে ফিরে লোক সংগ্রহ করতে সময় লাগল না। নীলকুঠিতে পেটকাটা বরাহ দেখে অনেকেই খুশিমত গল্প গ'ড়ে নিল। মিথ্যার আশ্রয় না নিয়েও শিকারের খ্যাতি ভালভাবেই প্রচার হ'ল। এই ঘটনার পর বাঁড়ুজ্জে নাকি সন্ধ্যা হলেই ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিত।

—০—
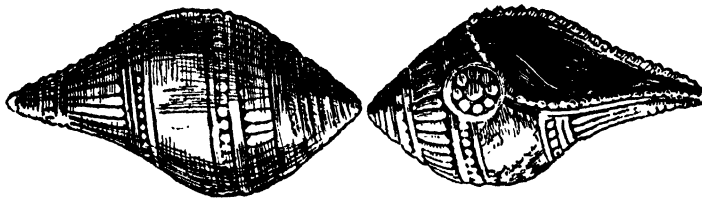
# মহাজাগতিক রশ্মি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

### আবিষ্কার এবং তথ্যানুসন্ধান

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "আয়নীভবন-কক্ষ" ( Ionization chamber ) নিয়ে পরীক্ষা করার সময় বিজ্ঞানীরা বাতাসে এক প্রকার অদৃশ্য এবং রহস্যময় আলোক-রশ্মির সন্ধান পেলেন। এই আলোক-রশ্মি এত শক্তিধর যে, যে সব পদার্থ 'এক্স-রে' বা রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ তাও এই নূতন রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ ব'লে প্রমাণিত হ'ল। যেমন, সাধারণ রঞ্জন-রশ্মি $\frac{1}{১৬}$ ইঞ্চি পুরু সীসার পাতই ভেদ ক'রে যেতে পারে না, কিন্তু এই নূতন রশ্মির শতকরা অন্ততঃ ২০ ভাগ ৪ ইঞ্চি পুরু সীসার পাত ভেদ ক'রে চ'লে যায় অনায়াসে।

ইতিপূর্বে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌল ( Radioactive element ) আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে, এই সব মৌল-ঘটিত যৌগিক পদার্থ থেকে সতত রশ্মি বিকীর্ণ হয়। কাজেই বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মনে করলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে ইতস্ততঃ যে সব তেজস্ক্রিয় মৌলের খনিজ ছড়ানো রয়েছে তা থেকেই এই রশ্মি সতত উৎসারিত হয়ে আসছে। এই মতবাদ যাচাই ক'রে দেখার উদ্দেশ্যে তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হ'ল।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন মার্কিন-বিজ্ঞানী ম্যাক্লেনান ১৯০৭ সনে। তিনি গবেষণাগারের মধ্যে এবং বাইরে তথ্যানুসন্ধান ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, শীতকালে ওণ্টারিও হ্রদের মাঝখানে জমাট-বাঁধা বরফের উপরে বসেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। এই সব পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, পার্থিব শিলা থেকে এই রশ্মি নির্গত হচ্ছে, এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর মতে এই রশ্মির উৎপত্তি হচ্ছে হয়ত বায়ুমণ্ডলে, নয়ত পৃথিবীর বাইরে সুদূর নক্ষত্রলোকে।

এ জন্য বিজ্ঞানী-গোকেল বেলুনে ক'রে বায়ুমণ্ডলে অভিযান চালালেন ১৯০৯, ১৯১০ এবং ১৯১১ সনে। তিনি সবচেয়ে উঁচুতে ১৪,০০০ ফুট অবধি উঠতে সক্ষম হলেন। তাঁর যুক্তি হ'ল, যদি পার্থিব শিলা থেকে কিংবা বায়ুমণ্ডলে এই রশ্মির উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে যত উপর দিকে ওঠা যাবে এই রশ্মির পরিমাণ তত কমে যাবে। কিন্তু গোকেল দেখলেন, যত উপরে ওঠা যায় এই রশ্মির পরিমাণ কমা ত দূরের কথা, ক্রমশঃ আরও বাড়তে থাকে।

এর পর অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী হেস্ এবং জার্মান বিজ্ঞানী কোল্হোয়েস্টার বেলুনে ক'রে আরও কয়েকটি সফল অভিযান চালালেন ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সনের মধ্যে। এঁরা প্রায় ৩০,০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত উঠে তথ্য সংগ্রহ করলেন। দেখা গেল, সমুদ্র-পৃষ্ঠে এই রশ্মির যে পরিমাণ তার ১০ গুণ হয় এই উচ্চতায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এই রশ্মির উৎপত্তি হয় পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন স্থানে, সেখান থেকে বায়ুস্তর ভেদ ক'রে এসে এই রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়।

১৯১৪ সনে আরম্ভ হ'ল প্রথম মহাযুদ্ধ। এ জন্য গবেষণার কাজ বন্ধ রইল কয়েক বছর। তার পর ১৯২৫ সনে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন মার্কিন বিজ্ঞানী মিলিকান ও তাঁর সহকারীবৃন্দ। স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁরা এত নূতন তথ্য সংগ্রহ ক'রে ফেললেন যে, এই অজ্ঞাত রশ্মির সকল গুপ্ত-রহস্যই প্রকাশিত হয়ে পড়ল বিজ্ঞানীদের কাছে।

বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম প্রদেশে তথ্যানুসন্ধানের জন্য মিলিকান এক নূতন এবং সহজ পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন। একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র পর পর দুটো বেলুনের সঙ্গে বেঁধে উপরে পাঠানো হ'ল। উপরের বায়ুস্তর ক্রমশঃ পাতলা হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে গিয়ে প্রসারিত হওয়ার ফলে উপরের বেলুনটি ফেটে যাবে। যন্ত্রটি তখন অন্য বেলুনে ভর ক'রে ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসবে। এই সহজ পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের আরও অনেক উচ্চস্তরের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ল। দেখা গেল, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অজ্ঞাত রশ্মির পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। আরও বোঝা গেল যে, এই রশ্মি বায়ুমণ্ডলে বিশেষ শোষিত হয় না। অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ ধারণা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিধর এই রশ্মি।

মিলিকান এর পর সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে

অবস্থিত পাহাড়িয়া হ্রদের জলে যন্ত্র নামিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, জলের যত নীচে যাওয়া যায় এই রশ্মির পরিমাণ তত কমে। মিলিকান আরও দেখলেন, এই রশ্মি এত শক্তিধর যে, উপরের বায়ুস্তর ভেদ ক'রে আসা সত্ত্বেও তা আরও ৫০ ফুট গভীর জলের স্তর অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। হিসাব ক'রে দেখা গেল, এই রশ্মি অনায়াসে ৬ ফুট পুরু সীসার স্তরও ভেদ ক'রে যেতে পারবে, এত শক্তিধর এই রশ্মি।

এই সময় উইল্‌সন, এডিংটন প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা বললেন, সম্ভবতঃ দূরবর্তী কোন স্থানে বজ্রপাতের ফলে উৎপন্ন উচ্চবিভব-সম্পন্ন ইলেকট্রন-স্রোত থেকেই এরূপ রশ্মির সৃষ্টি হয়। মিলিকান এই যুক্তিও খণ্ডন করলেন একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে। তিনি উঁচু পাহাড়ে-ঘেরা এমন একটি হ্রদ বেছে নিলেন, যাকে মহাজাগতিক রশ্মি ধরার এক প্রাকৃতিক দূরবীন ব'লে মনে করা যায়। আশে-পাশে বজ্রপাতের ফলে ইলেকট্রন প্রবাহ যদি সৃষ্টি হয়ও তবে তা পাহাড়ে প্রতিহত হবে। সুদূর অন্তরীক্ষ থেকে আগত রশ্মিগুলিই শুধু যন্ত্রে পৌঁছাতে পারবে। এখানে যে সব তথ্য সংগৃহীত হ'ল তাতে সন্দেহাতীত-রূপে প্রমাণিত হ'ল যে, উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণ করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

এই ভাবে নানারূপ পরীক্ষা ক'রে মিলিকান বুঝলেন যে, পৃথিবীর বাইরে, সম্ভবতঃ সুদূর নক্ষত্রলোকে, সৃষ্টি হয়ে অশ্রুতপূর্ব এবং প্রখর শক্তিধর এক প্রকার আলোক-রশ্মি অবিরল ধারায় বর্ষিত হচ্ছে পৃথিবীর উপরে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীর সর্বত্র এর অবাধ গতিবিধি। দিবারাত্রির পরিবর্তনের ফলে কিংবা ছায়াপথের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির জন্য এর তীব্রতার ( intensity ) হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষ উপলব্ধি করা যায় না। এই সব কারণে মিলিকানই সর্বপ্রথম এর নামকরণ করলেন, "Cosmic rays" বা মহাজাগতিক রশ্মি।

গাইগার-মুএলার কাউণ্টার এবং মেঘকক্ষ

মহাজাগতিক রশ্মি অদৃশ্য, তাহলে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কি ক'রে? এতকাল আয়নীভবন-কক্ষের ( Ionization chamber ) সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছিল। ক্রমে আরও উন্নতধরনের যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হ'ল। তাদের মধ্যে "গাইগার-মুএলার কাউণ্টার" ( Geiger-Mueller counter ) এবং মেঘকক্ষের ( Cloud chamber ) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আয়নীভবন-কক্ষের কার্যপ্রণালী বিশেষ জটিল নয়। এতে একটি ধাতব সিলিণ্ডারের মাঝখানে অন্তরিত অবস্থায় ( insulated ) একটি ধাতব তার থাকে। তারটি উচ্চ বিভবে ( high potential ) এমনভাবে আহিত ক'রে ( charged ) রাখা হয় যে, বিভব-বৈষম্য আর একটু বাড়লেই তড়িৎ ঝিলিক্ দেবে। এই অবস্থায় যদি কোন আহিত কণিকা হঠাৎ সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সেখানকার বায়ুকণাগুলি আয়নিত হয় ( ionise )। সঙ্গে সঙ্গে মাঝের তার থেকে সিলিণ্ডারের দিকে দ্রুত তড়িৎ-মোক্ষণ হয়।

গাইগার-মুএলার কাউণ্টারে এইরূপ একটি আয়নী-ভবন-কক্ষের সঙ্গে একটি অ্যাম্‌প্লিফায়ার বা শব্দপ্রসারক যন্ত্র এমন ভাবে লাগানো থাকে যে, এরূপ ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দ হয়। বিকল্প ব্যবস্থায় মুহূর্তের জন্য একটি লাল বাতি জ্বলে ওঠে। এজন্য কাউণ্টারের মধ্যে কোন আহিত কণিকা ( charged particle ) প্রবেশ করা মাত্রই তা টের পাওয়া যায়।

উইল্‌সনের মেঘকক্ষ যন্ত্রটির গঠন জটিল হলেও তার কার্যপ্রণালী মোটেই জটিল নয়। আমরা জানি, অধিক চাপের অধীনস্থ কোন গ্যাসের চাপ হঠাৎ কমিয়ে দিলে তা দ্রুত প্রসারিত হয়। এর ফলে তার উষ্ণতা অনেকটা কমে যায়। ধূলিকণামুক্ত একটি আবদ্ধ কক্ষ জলীয় বাষ্প দ্বারা সংতৃপ্ত (saturated) ক'রে রাখা হয়। এর বিস্তার যদি হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে ঐ বাষ্প প্রসারিত হয়ে আরও ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে এবং তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-বিন্দুতে পরিণত হতে চাইবে। ধন বা ঋণ তড়িৎযুক্ত কণিকামাত্রই তার গতিপথস্থিত অণু-পরমাণুর কণাগুলিকে আয়নে পরিণত করে দেয়। আর এই সব আয়নিত কণাকে আশ্রয় ক'রে আরও সহজেই জলবিন্দুর সৃষ্টি হতে পারে। বাস্তবিক বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব-প্রদেশে এই পদ্ধতিতেই জলীয় বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। কাজেই মেঘকক্ষ যখন বিস্তার লাভ করছে সেই মুহূর্তে যদি কোন আহিত কণিকা ঐ কক্ষে প্রবেশ করে—তবে তার গতি-পথস্থিত জলীয় বাষ্প জমে একটি ধূমায়িত রেখার সৃষ্টি করবে। তাহলে ঐ ধূমায়িত রেখাপথ দেখেই আহিত কণিকাটির গতিপথের নির্দেশ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা যথোপযুক্তভাবে ঐ কক্ষ আলোকিত করে রাখেন এবং ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন দিক্ থেকে ঐ কক্ষের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। এইভাবে অনেক সহজেই মহাজাগতিক রশ্মির গতিবিধির ফটো তোলা সম্ভব হয়েছে।

এই সব আহিত কণিকার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য
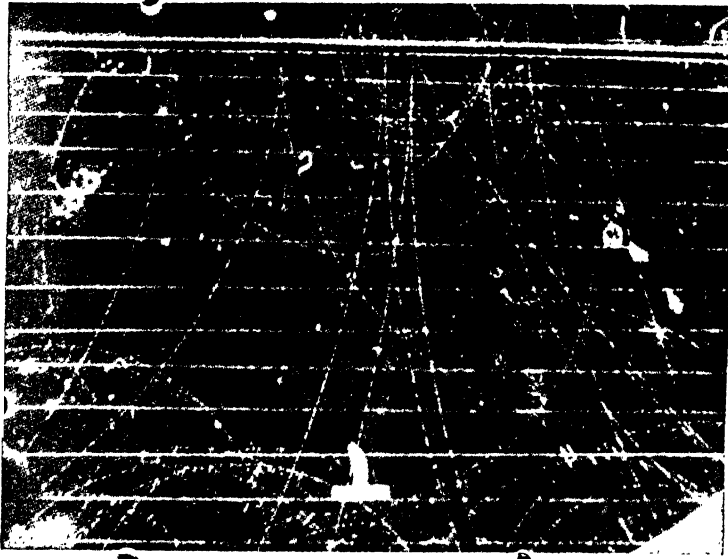
গামা ফোটনের ইলেকট্রন সৃষ্টি।

সাধারণতঃ মেঘকক্ষটি একটি শক্তিশালী চুম্বকের মাঝে রাখা হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রে আহিত কণিকার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে অনায়াসে বলা যায়, তা ধন অথবা ঋণ তড়িৎ-যুক্ত এবং তার ভর কিরূপ।

পর পর কয়েকটি কাউন্টার এবং মেঘকক্ষ এমনভাবে সাজিয়ে রাখা যায় যে, তাদের সাহায্যে একটি মাত্র মহাজাগতিক রশ্মির গতিপথ অনুসরণ করা যায় এবং রশ্মিটি যখন মেঘকক্ষে প্রবেশ করে তখন স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার গতিবিধির ফটো তোলা সম্ভব হয়। এই ভাবে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে আরও অনেক নূতন এবং বিচিত্র তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে।

### মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ

১৯৩২ সনে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী রোসি প্রমাণ পেলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ এক সময় হয়ত এক সঙ্গে অনেক মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ হয়। মেঘ-কক্ষেও এর প্রমাণ পাওয়া গেল। মেঘকক্ষের মধ্যে একটি সীসার পাত রেখে দেখা গেল, একটি মহাজাগতিক রশ্মি যখন সীসার পাত অতিক্রম করে তখন তা থেকে এক জোড়া বা কয়েক জোড়া নূতন রশ্মির উৎপত্তি হয়। একেই বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ ( cosmic ray showers )।

একটা ইলেকট্রন তড়িৎবলক্ষেত্রে এক ভোল্ট বিভব বৈষম্যের ভিতর দিয়ে যখন যায় তখন তার শক্তির যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে বলা হয় এক 'ইলেকট্রন-ভোল্ট' ( Electron volt )। ১৯২৮ সনে বিজ্ঞানী ডিরাক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ১·২ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্টের ( MEV ) বেশি শক্তিধর গামা-রশ্মি যদি কোন কেন্দ্রকের (nucleus) নিকট দিয়ে যায় তবে তা একজোড়া পজিট্রন-ইলেকট্রনে পরিণত হবে। বর্তমান কালের পরীক্ষায় ডিরাকের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। মেঘকক্ষে গৃহীত ফটোতে দেখা গেছে যে, অনুকূল পরিবেশে গামা-রশ্মি ফোটন সত্য সত্যই এক জোড়া পজিট্রন-ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়। এদের ভর সমান, আর তড়িৎ-আধার সমান কিন্তু বিপরীতধর্মী, অর্থাৎ একটি পজিটিভ অন্যটি নেগেটিভ। কাজেই চৌম্বক ক্ষেত্রে এদের গতিপথ সমানতালে দু'দিকে বেঁকে যায়।

এজন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, যখন একটি গামা-রশ্মি ফোটন (এক কোয়ান্টাম শক্তি) একটি কেন্দ্রকের নিকট দিয়ে যায় তখন তার শক্তির কিছু অংশ হঠাৎ এক জোড়া পজিট্রন-ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই কণিকা দুটিতে গতি-বেগ সঞ্চারিত হয় অবশিষ্ট শক্তিটুকুর সাহায্যে। এইরূপ কণিকা আবার চলতে চলতে যখন অন্য একটি কেন্দ্রকের নিকটে যায় তখন তার গতিবেগ মন্দীভূত হয়, এই অবস্থায় তা থেকে পুনরায় সৃষ্টি হয় গামা-রশ্মি ফোটনের।

এই ভাবে শক্তি ( photon ) থেকে আহিত কণিকা ( charged particle ) এবং তা থেকে আবার শক্তির সৃষ্টি হতে পারে পর্যায়ক্রমে। এজন্য একটি থেকে দু'টি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, এইভাবে কণিকার সংখ্যা আংকিক নিয়মে বেড়ে যেতে পারে। এই কারণে হঠাৎ এক সময় কতকগুলি আহিত কণিকার বর্ষণ হ'তে দেখা যায়।...২ নং চিত্রে দেখা যাবে, মেঘকক্ষে প্রথমে একটি মাত্র মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকা এগিয়ে চলেছে, কিন্তু সীসার পাত ভেদ ক'রে যাবার সময় তা থেকেই অনেকগুলি আহিত কণিকার উদ্ভব হয়েছে। আবার ৩ নং চিত্রের বর্ষণের জন্য দায়ী নিশ্চয়ই একটি ফোটন, কারণ, মেঘকক্ষে আগত রশ্মির কোন ফটো ওঠে নি। কাজেই তা আহিত কণিকা হতে পারে না, আহিত কণিকা হ'লে মেঘকক্ষে তার ফটো নিশ্চয়ই উঠত। এ সব পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল, সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে আগত প্রাথমিক পর্যায়ের রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে যেসব দ্বিতীয় পর্যায়ের রশ্মি উৎপন্ন হয় সেগুলিই প্রধানতঃ বর্ষণের জন্য দায়ী। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এইরূপ বর্ষণের মধ্যে আহিত কণিকার সংখ্যা যেরূপ হয়, ফোটনের সংখ্যাও প্রায় সেইরূপই থাকে।

মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ। প্রথমে একটি মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকা এগিয়ে চলেছে, কিন্তু সীসার পাত ভেদ করে যাবার সময় তা থেকেই অনেকগুলি আহিত কণিকার উদ্ভব হয়েছে।
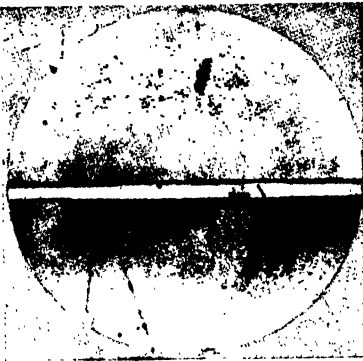
মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ। এই চিত্রে বর্ষণের জন্য দায়ী একটি ফোটন, কারণ মেঘকক্ষে আগত রশ্মির কোন ফটো ওঠেনি। আহিত কণিকা হলে মেঘকক্ষে তার ফটো নিশ্চয়ই উঠতো।

### মহাজাগতিক রশ্মির প্রকৃতি

তীক্ষ্ণ রঞ্জন-রশ্মি মাত্র ½ ইঞ্চি পুরু সীসার পাত ভেদ করে যেতে পারে। গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও কম এবং তা কয়েক ইঞ্চি পুরু সীসার পাত ভেদ ক'রে যেতে পারে। এই অজ্ঞাত রশ্মির কঠিন বাধা ভেদ ক'রে চলার ক্ষমতা আরও অনেক বেশি। তাই লক্ষ্য করে মিলিকান বলেন, এই রশ্মি যদি তরঙ্গধর্মী হয়, তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই আরও কম হবে।

কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা ( intensity ) ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র সমান নয়। বিষুব রেখার উপর এর তীব্রতা সবচেয়ে কম এবং যে স্থানের অক্ষাংশ যত বেশি সেখানে এই রশ্মির তীব্রতাও তত বেশি হয়। এথেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর যে চৌম্বক ক্ষেত্র আছে তারই উপর এই রশ্মির তীব্রতা অনেকখানি নির্ভর করছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গামা-রশ্মির উপর চুম্বকের কোন প্রভাব নেই। পক্ষান্তরে ধন বা ঋণ তড়িৎযুক্ত কণিকা অতি সহজেই চুম্বক দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই এই রশ্মি তরঙ্গ-ধর্মী হতে পারে না, দ্রুত-গতিশীল ধন বা ঋণ তড়িৎযুক্ত কণিকা হওয়াই সম্ভব।

মহাজাগতিক রশ্মি যে কেবল সূর্যের দিক থেকেই আসছে তা নয়, মহাকাশের সবদিক থেকেই এই রশ্মি বর্ষিত হচ্ছে পৃথিবীর উপর। বিজ্ঞানীরা এখন জানতে পেরেছেন যে, বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে প্রাথমিক পর্যায়ের যে রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে তার উপাদান নানারূপ আহিত কণিকা। শতকরা ৯১ ভাগ হ'ল ধন-তড়িতাবিষ্ট প্রোটন কণিকা বা হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক, ( nucleus ) কিন্তু এদের গতিবেগ এত বেশি যে, সহস
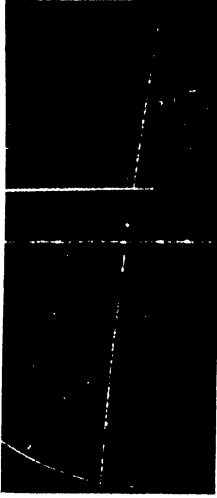
একটি মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকার গতিপথ। পুরু তামার পাত অতিক্রম করা সত্ত্বেও তার গতিপথে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি।

একটি মেসন-কণার গতিপথ। সবচেয়ে স্পষ্ট রেখাটি মেসন-কণার গতিপথ নির্দ্দেশ করছে।

প্রোটন বলে চেনা কঠিন। ৮ ভাগ হ'ল আল্‌ফা কণিকা বা হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক, আর ১ ভাগ হ'ল অন্যান্য ভারি পরমাণুর কেন্দ্রক।

প্রাথমিক পর্যায়ের কণিকাগুলি মহাশূন্য থেকে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তরে অবিরত প্রচণ্ডবেগে বর্ষিত হচ্ছে। এরা ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ক'রে সেখানকার পরমাণুগুলিকে প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলে। এর ফলে সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজাগতিক রশ্মি। এরাই ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হয় অবিরল ধারায়।

সৌরদেহে যে ভাঙ্গাগড়া চলছে, তার পরিমাণ সব সময় একরূপ থাকে না। এর পরিমাণ সবচেয়ে কম দেখা যায় ১৯৫৪ সনে, আর সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সনে। এই সময়কার পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে বোঝা গেছে যে, সূর্যের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারেই মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। প্রতি ১১ বছর পর পর সৌর-কলঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধিও এই কালচক্রের আবর্তন অনুসারেই ঘটে। কাজেই বলা যায় যে, এর মূলে রয়েছে সূর্যদেহের তড়িচ্চুম্বকীয় নানারকম ক্রিয়া।

১০ থেকে ১৫ সেণ্টিমিটার পুরু সীসার পাত ভেদ ক'রে এসব রশ্মিকণিকা কতদূর প্রবেশ করতে পারে, তা পরীক্ষা করে এদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে প্রোটন, ইলেক্‌ট্রন এবং পজিট্রন। এদের বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মির 'সফট কম্পোনেণ্ট' ( soft component )। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে মেসট্রন বা মেসন ( Mesotron or Meson )। এর ভর ইলেক্‌ট্রনের প্রায় ২০০ গুণ; তড়িৎ-আধান ধন বা ঋণ যে কোনরূপ হতে পারে। এর শক্তি অনেক বেশি, তাই ইহা বহু জিনিস ভেদ ক'রে যেতে সক্ষম। একে বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মির 'হার্ড কম্পোনেণ্ট' ( hard component )। সৌরকলঙ্কের পরিমাণ যখন সবচেয়ে কম থাকে, তখন এই হার্ড কম্পোনেণ্টের তীব্রতা শতকরা ৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা আর একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। সৌরকলঙ্কের সর্বাধিক বৃদ্ধির সময় যত এগিয়ে আসে, ততই মহাশূন্য থেকে বহু শক্তিশালী রশ্মি পথভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। কিন্তু এরা কিছুদূর এসেই বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারে না। অনেকের ধারণা, কোন কোন সৌরকলঙ্কের দরুণ মহাজাগতিক রশ্মির পথ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণে যে গ্যাসরাশি উৎসারিত হয়, তাই এই রশ্মিকে পৃথিবীতে পৌঁছাতে বাধা দেয়।

মহাজাগতিক রশ্মি তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতই মানুষের

এবং অন্যান্য জীবের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। আমাদের একান্ত সৌভাগ্য যে, আমাদের চারিদিকে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের রক্ষাকবচ। বায়ুমণ্ডলই আমাদের প্রতিনিয়ত মহাজাগতিক রশ্মির অনিষ্টকারী প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করছে। কারণ বায়ু থাকাতেই প্রাথমিক পর্যায়ের রশ্মি সোজাসুজি ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। তাছাড়া পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মিকণিকাগুলি সবই চৌম্বক মেরুর দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তাই ভূ-পৃষ্ঠের জনাকীর্ণ অঞ্চলে এরূপ রশ্মির তীব্রতা তেমন উপলব্ধি করা যায় না।

### মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি

মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন যে, মহাজাগতিক রশ্মি হ'ল অত্যন্ত শক্তিধর আলোকরশ্মি বা ফোটন, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম। তখন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিন্‌স বলেছিলেন, সূর্য বা নক্ষত্রের প্রচণ্ড উষ্ণতায় পরমাণু থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন, প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাঁধনমুক্ত বিপরীতধর্মী এই সব তড়িৎ-কণিকা প্রচণ্ডবেগে ছুটাছুটি করতে থাকে। এই ভাবে একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি ইলেকট্রনের সংঘর্ষ হলে বিপরীতধর্মী তড়িৎ-কণিকার প্রবল আকর্ষণে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে যে পরিমাণ পদার্থ লোপ পায় তাই থেকে সৃষ্টি হয় খানিকটা শক্তি বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন ফোটন ( Photon )। এই ভাবে জড়-কণিকার বিলয় হয়ে তার পরিবর্তে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত, আর পৃথিবীর উপর তারই বর্ষণ চলছে অবিরল ধারায়। এজন্য জিন্‌স বলেছেন, এই বিশ্বে যা কিছু দৃশ্যমান তা চিরকালের জন্য অদৃশ্যমানে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে ( Forever the tangible changes into the intangible )।

কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণায় দেখা গেল, প্রাথমিক পর্যায়ের মহাজাগতিক রশ্মির উপাদান বিভিন্নরূপ আহিত কণিকা। তাই মিলিকান বললেন, এই বিশ্বে একদিকে যেমন জড়ের বিলয় হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি নূতনের সৃষ্টিও হয়ে চলেছে সমান তালে। সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীতে অবিরত জড়ের বিলয়ের ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে তা মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে চলবার সময় চরম শৈত্যের প্রভাবে তরঙ্গ-সংঘের দল পাকিয়ে আবার প্রোটন, ইলেকট্রন, প্রভৃতি জড়-কণিকার রূপ নিচ্ছে। আর এদেরই একটা অংশ হয়ত অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে পৃথিবীর উপরে।

তবে এ সম্পর্কে ১৯৪৯ সনে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ফের্মী যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন তাকেই বর্তমানে সবচেয়ে যুক্তিসহ বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে সব সময়ই অনেক আহিত কণিকা ছড়ানো থাকে। বিভিন্ন নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী মহাশূন্যে যে সব ধূলিরাশি ( Interstellar dust ) আছে সে সব সম্ভবতঃ চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন। নক্ষত্র স্থির নয়, কাজেই একথা ভাবা অন্যায় নয় যে, বিভিন্ন নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী ধূলিরাশিও দ্রুত সঞ্চরণশীল। কাজেই দ্রুতগতিশীল এবং চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন এই সব ধূলিরাশির প্রভাবে স্বল্প বেগসম্পন্ন আহিত কণিকার ভরবেগ ( momentum ) ক্রমশঃ বাড়বে। বিভিন্ন স্থানের ধূলিরাশির গতিবেগ বিভিন্ন দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই একথা সহজেই অনুমেয় যে, স্বল্প বেগসম্পন্ন একটি আহিত কণিকা এইরূপ ধূলিরাশির ভিতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ বেগ সঞ্চয় করতে থাকবে এবং পরিশেষে তাই প্রচণ্ড ভরবেগসম্পন্ন, অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্তিধর মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকায় পরিণত হতে পারবে।

বিজ্ঞানী লরেন্স যে সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন তাতে চৌম্বক ও তড়িৎ-বলক্ষেত্রের সুষম প্রয়োগের ফলে আহিত কণিকার বেগ কল্পনাতীতরূপে বাড়ান সম্ভব হয়েছে, আর এইরূপ প্রচণ্ড শক্তিধর কণিকাকে পরমাণু ভাঙ্গার কাজে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করাও সম্ভব হয়েছে। কাজেই মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি সম্পর্কে ফের্মীর এই মতবাদ একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন, মহাশূন্যে এই সব আহিত কণিকার আবির্ভাব হ'ল কি ক'রে? বিজ্ঞানীরা বলেন, সম্ভবতঃ এক একটি 'সুপারনোভা' ( Supernova ) থেকে এই সব কণিকা উৎসারিত হয়ে এসেছে। আমরা জানি, নক্ষত্রের অভ্যন্তরে অতি ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণের ফলেই তা সুপারনোভায় পরিণত হয়। গত নয় শত বছরের মধ্যে মহাকাশে মাত্র তিনটি সুপারনোভার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকেই সূর্যের সমপরিমাণ জড়-পদার্থ মহাশূন্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। তার এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ জড়-পদার্থও যদি ২০০ মিলিয়ন-ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসহ বিচ্ছুরিত হয়েছে ব'লে কল্পনা করা যায়, তাহলেই আমাদের নক্ষত্রজগতে মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সময় বিশেষে

সূর্যদেহ থেকে বিপুল পরিমাণ আহিত কণিকা উৎসারিত হয়। তবে এদের শক্তির পরিমাপ মূল মহাজাগতিক রশ্মির তুলনায় অনেক কম। একটি সুপারনোভা সূর্যের তুলনায় অনেক বেশী উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে, কাজেই তা থেকে যে আরও অনেক বেশী শক্তির আহিত কণিকা আরও অনেক বেশী পরিমাণে উৎসারিত হবে, সে কথা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়।

ফের্মীর মতবাদ খুবই যুক্তিসহ এটা ঠিক। কিন্তু তবুও বলব, বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি সম্পর্কে আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। কারণ পরীক্ষাগারে দেখা গেছে যে, অবস্থা বিশেষে জড়-কণিকা থেকে শক্তিতে এবং শক্তি থেকে জড়-কণিকায় রূপান্তর ঘটতে পারে অতি সহজেই। আইনস্টাইনের সূত্র থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং এই রশ্মি জড়-কণিকার ধ্বংসাবশেষ, না এ থেকে মহাশূন্যে নূতনের সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তা নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন।

কালের স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি অনন্তের পথে। অতীতের সেই দুরন্ত, জলন্ত পৃথিবী ক্রমে শান্ত হয়ে বর্তমানে তার শস্য-শ্যামলা রূপ ধারণ করেছে। এর মাঝে যে কত কোটি কোটি বছর কেটে গেছে তার হিসাব করাই কঠিন। অতীতের সেই অজ্ঞাত বিস্মৃত-কালের পথে বিজ্ঞানী তাই পিছু হাঁটতে লাগলেন এবং অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে পৃথিবীর একটা কোষ্ঠী তৈরী করলেন। কিন্তু সৃষ্টির সুরু হ'ল কি ক'রে, কোথায় এবং কি ভাবে, তার সঠিক মীমাংসা করা আজও সম্ভব হ'ল না।

বিজ্ঞানী তাই কল্পনার চোখে দেখছেন, এমন একদিন ছিল, যখন না ছিল পৃথিবী, না ছিল গ্রহ-তারা; সৃষ্টির আদি অণু-পরমাণু বা ইলেকট্রন প্রোটন কণিকারও জন্ম হয় নি তখনও। বিশ্ব-চরাচর ব্যাপ্ত করেছিল শুধু বিজ্ঞানীর কল্পিত ঈথর-সমুদ্র—নিরাকার, নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থির-নিস্পন্দ। স্রষ্টার অঙ্গুলি-স্পর্শে সেই শান্ত ঈথর-সমুদ্রে জেগে উঠল ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটাছুটি করতে করতে ক্রমে তারা দল বেঁধে গড়ে তুলল প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন কণিকা। তার পর কোটি কোটি বছর ধ'রে সৃষ্টি এগিয়ে চলল স্বাভাবিক নিয়মে। প্রোটন, ইলেকট্রন আর নিউট্রনের বিচিত্র সমাবেশে তৈরী হ'ল অণু-পরমাণু, গ্রহ-নক্ষত্র, আরও কত কি, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর মিলনে গ'ড়ে ওঠে নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর!

শক্তি ঘনীভূত হয়েই জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আবার মহাকাশের দিকে দিকে দেখা যায়, জড়বস্তুর বিলয়েই নিত্য নূতন শক্তির সৃষ্টি হয়ে চলেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেই সব শক্তি ঘনীভূত হয়েই আবার নূতন নূতন নক্ষত্রের সৃষ্টি ক'রে চলেছে কি না, তা কে জানে? এই ভাবে বিশ্বের দিকে দিকে হয়ত ভাঙ্গা-গড়ার বিচিত্র খেলা চলেছে অনাদি অনন্তকাল ধরে। এর আরম্ভ যে কোথায়, আর এর শেষই বা কোথায়, কখন হবে, তা কে বলবে?

# ॥ তোমার নাম ॥

**শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

নাম, শুধু নাম।
তার চেয়ে সুচেতন আলো-কে প্রণাম
জানাবার মতো অবসর
আমাদের নেই। এই হৃদয়ের ঘর
এখন এমন ভাবে ঘৃণায় পিছল
যাতে আজ অসম্ভব কালির লিখন থেকে আত্মার উজ্জ্বল
অনুভবে পথ হেঁটে যাওয়া।
আজ তাই শূন্য মনে শুধু গান গাওয়া।

নাম, তবু নাম।
বৎসরে একটি দিন অতীত স্মৃতির মুখ চেয়ে থামলাম।
দেখলাম, তোমার সঙ্গীত
প্রস্তরে জীবন আনলো, প্রলাপে সম্বিত।
তোমার প্রাণের স্পর্শে আসমুদ্র হিমাচল গঙ্গা নামলো,
অঝোর বর্ষণে
নবজন্ম আষাঢ়ের গানে
সিক্ত হ'লো পলিমাটি। মনে হ'লো আকালের ভয়
ভারতবর্ষের ছিলো; কিন্তু আজ ভাগীরথী মৃত্তিকা দুর্জয়।

হায়, শুধু নাম।
সব স্মৃতি ধুয়ে গেলে থাকে শুধু অক্ষমের লজ্জার প্রণাম।
কোথায় ভারতবর্ষ? কোথা গঙ্গা? কোথা ভগীরথ?
কোথায় তোমার স্বপ্ন? আগাছা জঙ্গল ভেঙ্গে চলে
গেলে অস্পষ্ট যে পথ
সখানে বাঘের থাবা, আধখাওয়া মানুষের দেহ;
এক-পা যেতে প্রচণ্ড সন্দেহ।
সর্বত্র পাষাণ পুরী! পাষাবতী! অসংখ্য ইঁদুর...
বাস্তের ধান যায়, যায় প্রেম, মানবতা দূর থেকে দূর
পশুর দাঁতে ও নখে, শ্বাপদের রক্তে যায়! এই দেশ,
তোমার স্বদেশ,
স্বাধীন স্বদেশে আজ সকলেরই ভিক্ষুকের বেশ,
সকলেই শবযাত্রী! জননীর মৃতদেহ কাঁধে করে
সমারোহে যায়
দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, যায় নরকের শেষ প্রান্তে! দুর্বহ লজ্জায়
চেতনা বিবর্ণ মুখ ঢেকে যায় অন্ধকার রাত্রির তিমিরে,
অন্ধ ক্ষোভে দেখতে চায় নিজ গর্ভ ছিঁড়ে
কোথা আছে নবজন্ম? কত দূর? কত কাল?
আর কত কাল
সইতে হবে এমন আকাল?

মানতে হবে শুধু তিথি! ধূপ দীপ মালা ও চন্দনে
স্মৃতিকে করতে হবে অক্ষমের পূজা, তিথি শেষে ক্লান্ত মনে
বইতে হবে দারিদ্র্যের মার, দাস-জীবনের গ্লানি
রাত্রি দিন! রাত্রিদিন
শান্তিহীন, নিদ্রাহীন, অন্নহীন
আর কত কাল এই অমানুষ নপুংসক জীবনের নিরর্থক ভার
সইতে হবে!...শুকনো গাঙ্গে আর কবে নামবে আষাঢ়?
সেদিন যদি না আসে এখনো, রক্তাক্ত দেহে তবে
সর্বাঙ্গে প্রহারক্ষত চেতনা থাকবে শুয়ে; মৃত্যুর গৌরবে
তোমার নাম-কে দেবে মানুষের মন্ত্রের সম্মান।
আর যত উচ্চকণ্ঠ কলরব, স্মৃতির ভাসান
তিথিমত আসে যায়! রীতিমত অনুষ্ঠানে অদীক্ষিত
ভক্তের ভাষণ
শোনা যায় অর্থহীন, আত্মহীন নাম, শুধু নাম উচ্চারণ॥

# পল্লী-পূজারি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিবেদিত জীবন তাহার, কাটতো গ্রামের গণ্ডিমাঝ,
তবু তাকে বাসতো ভাল, কুতূহলী লোক সমাজ।
নিত্য বনের-বুড়ার শিরে দিত সে দুধ গঙ্গাজল,—
অংশ পেতেন সোমনাথ এবং দেশের দেবী-দেব-সকল।
পিঞ্জর তার হোক না ছোট—সুধার চকোর অন্তরে—
চক্রবালের অন্তরালে পংক্তি ভোজন দিন করে।

গ্রামের মধুর বেসাতি তার, পুঁজি তাহার হোক না কম—
সকল দেশের বুকের মধুর জানে সে স্বাদ এক রকম।
পূজা করে একই জনায়—একই কুসুম-সাজিতে—
ধরা-ভরা আত্মীয় তার—হয় না তাদের বাছিতে।
দেব-দেউলের কাছেই বসত, ইচ্ছা নাহি কোথাও যাই—
সুন্দর তার না হোক জীবন—অকুৎসিত তা বটে ভাই।

লেখা পড়া কমই জানে—অভিজ্ঞতা অধিক নয়—
কিন্তু হ'ল কিশোর থেকে হরির সাথে পরিচয়।
'দীনবন্ধু দাদার দধি' পান করেছে নিভৃতে—
চায় না সে আর অন্য কিছু—দাবী কেবল অমৃতে।
প্রতিদিনই তার জীবনের শেষ সেটি দিন ভাবে সে—
লভে নূতন দিব্য জীবন অনুভূতির আবেশে।

জানে ত্রিভুবনেশ্বরীর উর্দ্দিবিহীন সে ভৃত্য—
করে তাঁরি দিনমজুরি জীবনধারণ নিমিত্ত।
বন্ধুরা কয়—জাগাও যুগ ও রাষ্ট্র সমাজ চেতনা—
চেতনা কি নাই তাহাদের, থাকলে সেথা যেত না।
চিন্তামণির ভার বহে যে ধন্য এবং প্রসন্ন—
গরুড় পাখী খামকা হবে 'কাদাখোঁচা' কি জন্য ?

বিস্ময়ই সে ছিল গ্রামের!—ক্ষুদ্র সে এক টুনটুনি—
চোখে তাহার গোমুখী আর বুকে মরুর গুমটুনি!
সুস্থেও অসুস্থ সদাই—যাপতো দিন অস্বস্তিতে।
বলতো, 'প্রভু, বজ্র গড়াও আমার বুকের অস্থিতে।'
'সোমনাথেরে লাভ করিয়া জীবন তাহার ধন্য হায়—
বলতো, তাঁরে ক্রয় করেছি—উমার মত তপস্যায়।'

কুট্‌তো মাথা মহামায়ার রাঙা পায়ে ঘা হেনে—
ভগীরথ সে—ছাড়বে নাক গঙ্গা তাহার না এনে।
ভাবতো না কো মূল্য তাহার, শুনবে তারে চিনবে কে ?
ঘৃণায় অভিশাপ দিত সে "সার এলিজা ইম্পেকে।"
উদ্ভট এবং অদ্ভুত হউক, এ বিশ্বাস তার ছিল স্থির—
এ বাঙলারই 'নন্দকুমার', 'হিটলার' হ'ল জার্ম্মানীর।

অনুরাগী ভক্ত ছিল সে যে গান্ধীমহাত্মার—
মাহাত্ম্য তাঁর বুঝতো—গভীর অর্থ ছিল তার কথার।
বলতো, "নয় কো একটা ছুটো—কোন যুগেতে কে পারে?
কৃতিত্ব তাঁর সমগ্র এক পতিত জাতির উদ্ধারে।
গরিমা তাঁর মহিমা তাঁর—হয়তো কালে লোপ হবে
অবতারের তালিকাতে অমর তাঁহার নাম র'বে।"

তার খেয়ালের দেয়ালিতে উজল হ'ত চতুর্দ্দিক্—
পল্লীমাতা রইতো চেয়ে মুখের পানে নির্নিমিখ।
তেমন মানুষ দরকারী নয়—কিন্তু বিরল এই ধরায়—
ছিটায় সে যে শান্তি-সলিল—পারিজাতের বীজ ছড়ায়।
অভ্র, আবীর, অক্ষরেতে খেয়াল খাতা ভর্ত্তি তার—
আকাঙ্ক্ষী সে আশীর্ব্বাদী প্রসাদী এক বেলপাতার।

# ব্যাধ

শ্রীকালিদাস রায়

অহিংসক পশুপাখী করি’ বধ জীবনধারণ
করে যত হিংস্র জীবগণ।

বনরাজ্য তাহাদেরি, তাহাদের হ’লে অংশীদার,
স্বভাবতঃ সুরু হলো চিরশত্রুতার।

তাহারাও বধ্য হলো, ব্যাধ তব আয়ুধের গুণে
তুমি যে প্রবল তব চর্মবর্ম অসি শর তূণে।

পশুর সম্বল শুধু নখর দশন,
শাণিত সক্রিয় দূরে তব প্রহরণ।

একটি বিষাক্ত শর, সিংহের বিক্রম
তার কাছে তাও তুচ্ছ, দুর্বল, অক্ষম।

দুর্বল মানুষ সেও পশুদেরই প্রায়,
তোমার খাদ্যের তবু ভাগ নিতে চায়।

প্রয়োজন তাদেরও দমন,
দিনে দিনে হলো আরো সাংঘাতিক তব প্রহরণ।

সার্থক হইল শেষে চণ্ডী মা’র বর,
বনকাটা রাজ্য তব, তুমি কালকেতু-বংশধর।

—*—

# হে মহাজীবন

শ্রীকরুণাময় বসু

আমার এ চিত্তলোকে ব্যাপ্ত হোক হে মহাজীবন
তোমার অমেয় স্পর্শ ; বিকেন্দ্রিক তৃষ্ণাহীন মনে
নামুক নির্জন শান্তি, অতীত প্রাচীন বনচ্ছায়ে
স্তব্ধ গোধূলির মতো হোক মোর হৃদয়-প্রান্তর।

সত্য জানি যান্ত্রিক সভ্যতা আচ্ছন্ন করেছে আজ
দৈনন্দিন জীবনযাত্রারে ; চম্পা-বনে শুক্লা সন্ধ্যা
আজ নেই, আজ নেই উদাসীন বসে থাকা মন,
শুধু আছে মুখ বুজে সহ্য করা জীবন-যন্ত্রণা।

তবু ভাবি হৃদয়ের পার থেকে ডাকে যদি কেউ,
কোমল করুণাভরা দুটি চোখে শান্ত ভালোবাসা ;
বলে দেয়, এই পথ, যে পথে ধূসর অন্ধকারে
চিরযাত্রী বাসাভাঙা পাখিদের ডানার মিছিল।

আমি আছি, আছি প্রতিদিন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়
মাতৃক্রোড়ে ক্রীড়ারত সন্তানের আনন্দ বিস্তারি’ ;
রৌদ্র-ছায়া-পুলকিত জীবধাত্রী পৃথিবীর শেষে
অজ্ঞাত মায়ের স্নেহ চিরদিন মর্মে এসে লাগে।

সেই স্নেহ, অজানিত ব্যাকুল চঞ্চল কণ্ঠস্বর
ক্ষণে ক্ষণে দোলা দেয়, আমি খুঁজি আমার হৃদয়ে
সে অপূর্ব কণ্ঠধ্বনি ; আকাশের নক্ষত্র-ক্রন্দনে
সেই সুর, সেই ডাকা, সেই তার জীবন-দর্শন।

# সন্ন্যাসী-ডাঙ্গা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

[ ছোট স্টেশন চিরোটি, ভাগীরথীর পশ্চিম পারে, মুর্শিদাবাদ জেলায়। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠেছে তার রুক্ষ গৈরিক প্রান্তরে। বাংলার শেষ স্বাধীন রাজার ও রাজত্বের উপর মহাকাল তার রাঙ্গামাটির চাদর বিছিয়ে রেখেছেন এখানে। ]

চিরোটিতে কারও করোটি কি যাবে পাওয়া
সেই রাক্ষস করেছে যাদের গ্রাস ?
কিংবদন্তী কিংবা এ ইতিহাস !
চারণের গাথা বুঝিনে তোমার, হাওয়া !
কোথা গেছে রাজা, রাজ্য ও সেনাদল
ছত্র, চামর, সোনার সিংহাসন,
কপাটবক্ষ, বনবিহঙ্গ মন,
বন্দনাগীত-মুখরিত সভাতল !
হে পথিক ! তুমি হারিয়েছ বুঝি দিশা ?
ধূসর পাষাণ বিস্মৃতি মুখে মাখা,
ছায়া বিছিয়েছে মৌন মরণ-পাখা,
সূর্য্য মাথায়, তবু ঘন কালো নিশা !
আছে কি তোমার গোপন যাদুর কাঠি ?
গেরুয়া মাটির কপালে বুলাও তবে,
এ ঘুমের দেশ ভরে যাবে কলরবে,
খুলে যাবে দ্বার, কুয়াশার ঘোর কাটি'।
কান পেতে শোন করে ক্রন্দন কারা
শূন্য কূপের নির্জন বুক হতে,
ঝিল্লীর রোলে, বল্মীক-পর্বতে,
মরীচিকা চিকে, সময়ের স্রোতে হারা !

মায়েরা বুনেছে ঘুম পাড়ানিয়া গান
সেই অতীতের করুণ সুরের রেশে,
ধূপছায়া দল মিলালো দিকের শেষে,
ডুবে গেছে চাঁদ অস্ত আকাশে ম্লান।
শুধু স্মৃতিভারে বুড়ো, বাঁকা মেরু বট ;
হাজার খড়্গ তালের পাতায় পাতায়,
রক্তের লেখা কোন্ আলেখ্যর খাতায়,
অকারণে বউ মাঠে ঘোরে, কাঁখে ঘট।
দিনে, রাতে, মাসে, বছরে, শতকে ঠাসা
খড়োঘর আর পড়ো ভিটে গ্রামগুলি,
ঘূর্ণীর খুর উড়ায় হলুদ ধূলি,
ঝরা পাতা নিয়ে খেলা নিয়তির পাশা।
কিষাণেরা শুধু ভেঙ্গে চলে ক্ষেতে ঢেলা,
উলঙ্গ শিশু কালো মহিষের পিঠে,
ধানের গন্ধে অঘাণ বায়ু মিঠে,
একতারা হাতে গায় বাবাজী চেলা।
একবার তবু দাঁড়াও, পথিক ! এসে
এ মহা শ্মশানে, শোণিতপাংশু মাঝে
জহরব্রতে দুর্জয় পণ বাজে,
ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী উঠে হা হা রবে হেসে।

# যৌবন ও প্রেম

শ্রীসুনীতি দেবী

যৌবন যদি উতল সাগর হয়,
প্রেম তবে তার ঢেউয়ের মাথার ফেণা ;
সরসীর মত নিথর যখন রয়
অতল প্রেমের সন্ধান মিলিবে না।
যৌবন যবে ঝরণার মত ছোটে
প্রেম সে তখন নেচে নেচে সাথে চলে,
নদী সম যবে বাঁধা থাকে দুই তটে
প্রেম যে তখন জোয়ার জাগায় জলে।

যৌবন যবে গিরির মতন স্থির,
প্রেমের তখন তুষার-শুভ্র রূপ,
আকাশের মত যখন সে গম্ভীর,
প্রেমের আগুনে জ্বলে যে পূজার ধূপ।
যৌবন-হ্রদে ফোটে যে প্রেমের ফুল
কালের দহনে কখন শুকায়ে যায়,
স্মৃতির ভ্রমর খুঁজিয়া ফেরে আকুল,
দখিনা বাতাস কেঁদে বলে, হায়, হায়

# কোন পর্য্যটককে

শ্রীমতী বাণী রায়

অন্ধকার মুহুর্মুহু আজও শিহরিত
চাবুকের বিক্ষুব্ধ আঘাতে।
অন্ধকার ঘিরে
অনেক দিনের চেনা ধ্যানমূর্ত্তি কার
ধ্যানে আসে ফিরে!
জাগ্রত চক্ষুর দৃষ্টি যদি উন্মীলিত—
অন্ধকার শুধু অন্ধকার!
মানসলোকের ধ্যান মেলে না আমার
বাইরের পটে।
চিহ্ন কই কোথায় তোমার?
দুইটি পায়ের চিহ্ন ফোটে মাঠেঘাটে;
অনেক যোজন পথ করে অতিক্রম:
হিমালয়-তুহিনের শুভ্র বালুচরে,
কুমারিকা অন্তরীপ পদধূলো পেল।
পথেতে অহল্যা কোন?
তুমিই পাথর,
আর কি পাথর তুমি পারো উদ্ধরণ?

যুগল পায়ের চিহ্ন লোটে পথে পথে:
পদচিহ্নে ভরা আজ মাঠ আর হাট:
ধীরে তারা অগ্রসর,
ধীরে ধীরে চলে,
আমার সান্নিধ্য-লুপ্ত পথে পদভর।
যুগল পায়ের চিহ্নে ধরেছে কুসুম;
নবীন পল্লবস্থিতি ধুলোর আঁচড়ে;
মনে পড়ে, তাই আজ শুধু মনে পড়ে,
তোমার বিরহে, বন্ধু, জীবনে কি ঘুম!

তুমি চলে গেছো দূরে—
হয় নি তো বলা,
প্রাণের গোপন বাণী; হয় নি তো শোনা
কতখানি প্রিয় আমি।
শুধু আজ জানি,
চরম-পরম সত্য ভাল করে জানি,
তোমার জীবন, পান্থ, শুধু পথচলা।

# দৃশ্যের অন্তরালে

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সমস্ত নিহিত থাকে সজ্জিত দৃশ্যের অন্তরালে,
ক্ষুধা, হিংসা, তৃষ্ণা কিংবা অতৃপ্তির অদৃশ্য বিন্যাসে
মনুষ্যচরিত্র থাকে সমর্পিত: ঈষৎ আভাসে
প্রতিরুদ্ধ আকাশেও মেঘ জমে তীব্র গ্রীষ্মকালে।
প্রতিগামী আকাঙ্ক্ষারা প্রতীক্ষায় ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যায়,
কেবল প্রমত্ত বেগ নিরন্তর বৈর-নির্যাতনে;
বসন্ত বুলায় স্নেহ প্রকৃতিতে বিবর্ণ পাতায়,
শীতল বিলাপ জমে সংসারের পশ্চাদ্‌যাবনে।

ক্ষুধায় কামার্ত কেউ, তৃষ্ণা কিংবা হিংসায় জর্জর,
সমস্ত ভদ্রতা শুধু সংস্থাপিত শান্ত অভিনয়ে;
প্রতিরোধে প্রতিবাদে সর্বদা সন্তপ্ত কণ্ঠস্বর,
বিদীর্ণ জীবন কাঁপে অজ্ঞতার প্রতিবাদী ভয়ে।

তবুও বসন্ত আসে বনে বনে পলাশের ডালে,
সমস্ত আড়াল ক'রে সজ্জিত দৃশ্যের অন্তরালে॥

# সে নহি

সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

নয়

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে নব-জাগরণের অরুণ-প্রভা সঞ্চারিত হয়েছিল তামিলনাদ তাতে উদ্বেলিত হয়েছিল সবচেয়ে কম।

১৮২৮ সনে রামমোহন রায় কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন; সে বছরেই সতীদাহ প্রথা কানুন দ্বারা নিষিদ্ধ হ'ল। দু'বছর পরে রামমোহন মুঘল বংশধর বাহাদুর শাহের দাবী প্রমাণ করতে যখন ইংলণ্ডে গেলেন, তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী দেশের রাজধানী পারীতে গিয়ে ফরাসী বিপ্লবের উদাত্ত উদ্দীপক বাণী স্বাধীনতা, ঐক্য, ভ্রাতৃত্বের প্রতি পদানত ভারতের প্রণতি জানান। ইংরেজ নৃপতি চতুর্থ উইলিয়মের রাজ্যাভিষেকে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে একাসনে বসবার সম্মান পেলেন রাজা রামমোহন রায়; পারীতে পেলেন বিপুল গণ-সম্বর্ধনা; নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীর চিত্ত সর্বপ্রথম অনাস্বাদিতপূর্ব উত্তেজনায় উদ্বেলিত হ'ল। একই সময়ে স্যর সৈয়দ আহমেদ খান উত্তর ভারতে মুসলমানদের মধ্যে নব-জাগরণের সূচনা করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ভারতবর্ষে নিশ্চিতভাবে প্রবাহিত হতে সুরু করল। ব্যাপক মানস-বিপ্লবে যাঁরা সুযোগ্য কর্ণধারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তাঁদের মধ্যে বোম্বাইয়ে দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ-শা-মেহতা, দীনশা ওয়াচা, তেলাঙ্গ, তিলক; বঙ্গে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল; উত্তর ভারতে দয়ানন্দ, শ্রদ্ধানন্দ, লাজপৎ রায়।

তামিলনাদে অনুরূপ কোন সমাজ-মানস-সংস্কারক আন্দোলন গ'ড়ে উঠল না। স্তিমিত ধারায় তার খানিকটা আলো সঞ্চারিত হ'ল মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বোম্বাইয়ে প্রার্থনা-সমাজ স্থাপিত হ'ল; তার মাধ্যমে ভাণ্ডারকর, রাণাডে, নারায়ণ চন্দ্রভারকর, সমাজ-সংস্কারে অবতীর্ণ হলেন। প্রায় একই সময়ে মহারাষ্ট্রে পরমহংস মণ্ডল নামে এক গুপ্ত সমিতি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করল, বিধবাদের বিবাহের জন্যে আন্দোলন গ'ড়ে তুলল। ১৮৯০ সনে রাণাডে, তিলক প্রমুখ পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে একত্র চা-বিস্কুট আস্বাদ ক'রে সমাজ থেকে নির্বাসিত হলেন; শাস্ত্রীয় মতে শুচি-শুদ্ধ হবার পর তাঁরা পুনঃপ্রবেশের অনুমতি পেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজ-সংস্কার বন্যার মত মহারাষ্ট্রকে প্লাবিত করে তুলল।

বঙ্গে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবেত প্রচেষ্টায় যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তিপথ অনর্গলিত হ'ল, তার প্রেরণা অচিরে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ভারতবর্ষে। রামমোহনের কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেলেন দাদাভাই নৌরজী; বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের জন্য সম্মানিত স্থান অর্জিত হ'ল এঁদের দু'জনের প্রতিভায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভাণ্ডারকর ও তিলক ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যের অমর সম্পদ্ পৃথিবীর কাছে খুলে ধরলেন; তৎক্ষণাৎ পশ্চিমের মনীষিগণ আকৃষ্ট হলেন; বহুশতাব্দীর ব্যবধানের পর ভারত ও ইউরোপের পুনরায় জ্ঞান বিনিময় সুরু হ'ল।

রমেশচন্দ্র দত্ত, রাণাডে ও নৌরজী ইতিহাস ও অর্থনীতি রচনার প্রবর্তন করলেন; আশুতোষের চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হ'ল; জগদীশ বসু ও রামানুজম্ বিজ্ঞান ও গণিতে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন; হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ও আনন্দকুমারস্বামীর মাধ্যমে ভারতীয় কলা পুনর্জন্ম পেল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও মহম্মদ ইকবাল ভারতবর্ষকে সাহিত্য দিলেন। বাংলার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, পঞ্জাবে আর্যসমাজ, মুসলমানদের আঞ্জুমান-ই-হিমায়াৎ-উল্-ইস্লাম, মহারাষ্ট্রের গণপতি ও শিবাজী উৎসব: এসব মিলে সর্বভারতীয় আধ্যাত্মিক বিপ্লব তৈরী হ'ল। তার সঙ্গে বহুদিনের অবরুদ্ধ মনন-শক্তি ভাববন্যায় মুক্তি পেয়ে, পশ্চিমের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরম্ভ হ'ল ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন।

১৮৮৫ সনের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই সহরের

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোডে গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে, বাহাত্তর জন প্রতিনিধির একত্রিত সংকল্পে, অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম নামে বহুদূরদর্শী জনৈক ইংরাজের পৌরোহিত্যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হ'ল। সভাপতি নির্বাচিত হলেন বঙ্গসন্তান উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডব্লু. সি. বোনার্জি।

যে তামিল-সমাজে নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা সাবিত্রী বিদ্রোহ করল তাতে না ছিল ঈশ্বরচন্দ্র, না ব্রাহ্মসমাজ, না আর্য সমাজ। ভারতব্যাপী বিবর্তন-বন্যা তামিলনাদে প্রাচীনতার বাঁধ ভাঙতে পারে নি। কংগ্রেসের প্রথম কয়েক অধিবেশনে তামিলনাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন; তাঁদের বেশির ভাগ হাইকোর্টের বিচারপতি, অথবা বিখ্যাত আইনজীবী। প্রথম অধিবেশনে সর্বপ্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন "হিন্দু" পত্রিকার সম্পাদক, জি. সুব্রাহ্মনিয়া আয়্যার। কংগ্রেসের শৈশবে যাঁরা নেতৃত্ব করতে এগিয়ে এসেছিলেন—স্যর এস. সুব্রাহ্মনিয়া আয়্যার, ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়্যার, স্যর শংকরন্ নায়ার, স্যর ভেপা রামেশম্, টি. ভি. শেষগিরি আয়্যার, পি. আর. সুন্দর আয়্যার, স্যর পি. এস. শিবস্বামী আয়্যার, এমন কি স্যর সি. পি. রামস্বামী আয়্যার তাঁরা সকলেই নরমপন্থী, সংরক্ষণশীল; সামাজিক পুনর্গঠনে তাঁদের সায় ছিল না; জাতীয় আন্দোলন উগ্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

ইতিহাসের পাতা অর্থপূর্ণ পরিহাসে ভরা। তামিলনাদে গত একশ'বছরে যে একটিমাত্র আন্দোলন বহুজনের চিত্ত আলোড়িত করেছে তার নায়িকা ইংরেজ রমণী অ্যানি বেসান্ত। বর্তমান কালের ইতিহাসে মানব-প্রগতির জন্যে যে কয়জন নারী আজীবন বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণা, অ্যানি বেসান্ত তাঁদের একজন। স্বদেশে এমন কোনও প্রগতিমূলক আন্দোলন ছিল না যাতে অ্যানি বেসান্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি; জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রত্যক্ষ আন্দোলন চালিয়ে তিনি একদা বহু মানুষের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রবাদ থেকে নারীর ভোটাধিকার পর্যন্ত একের পর এক প্রতিষ্ঠিত-স্বার্থের বুকে ভীতিসঞ্চারক কার্যে অ্যানি বেসান্ত আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অসামান্য বুদ্ধি, সুতীক্ষ্ণ বিচার শক্তি, গভীর মমতাবোধ, অসাধারণ বাগ্মিতা ও লেখন-সৌকর্য তাঁকে সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রসিদ্ধি দিয়েছিল।

পরিণত বয়সে অ্যানি বেসান্ত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে আকৃষ্ট হলেন। গ্রহণ করলেন রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাট্স্কির শিষ্যত্ব। মাদাম ব্লাভাট্স্কি বিশ্বাস করতেন পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন ভারতীয়। ভারতবর্ষে এসে অ্যানি বেসান্ত বারাণসীতে থিয়োসোফিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন। কালে থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র মাদ্রাজ সহরে স্থানান্তরিত হ'ল। অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে মাদ্রাজে এই কেন্দ্র পৃথিবীর মন আকর্ষণ করল। প্রথম কয়েক বছর অ্যানি বেসান্ত আধ্যাত্মিক কাজে নিমগ্ন রইলেন। থিয়োসোফিক্যাল আন্দোলনে তামিলনাদের অনেক বুদ্ধিজীবী যোগ দিলেন।

সাবিত্রী এসে অ্যানি বেসান্তের কাছে দাঁড়াল আধ্যাত্মিকতার টানে নয়, জীবনের সন্ধানে।

ধর্মরাজ নামে যে যুবককে অ্যানি বেসান্ত নির্দেশ দিলেন, তার পেছনে পেছনে সাবিত্রী ফটক অতিক্রম ক'রে উদ্যানের বুকচেরা রাস্তা পেরিয়ে, বড় দালানবাড়ীর মধ্যে ঢুকল। প্রবীণা একটি রমণীকে ডেকে ধর্মরাজ আদেশ করল সাবিত্রীকে ভেতরে নিয়ে স্নান, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে। নতদৃষ্টি সাবিত্রীকে উদ্দেশ্য করে ধর্মরাজ বলল, "আপনি স্নান করে কিছু খেয়ে নিন। তার পর বিশ্রাম করুন।"

সাবিত্রী দাঁড়িয়ে রইল।

ধর্মরাজ তার দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দিল, "এখানে সব কিছু ব্রাহ্মণের হাতে তৈরী। খেতে আপনার আপত্তি হবার কথা নয়।"

সাবিত্রী এক পা এগিয়ে আবার থামল।

ধর্মরাজের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, "উনি আমার জন্য কিছু করবেন ত?"

ধর্মরাজ মৃদু হেসে বলল, "তাই ত মনে হচ্ছে।"

চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ানক অস্থিরতার মধ্যে কাটবার পর অ্যানি বেসান্ত সাবিত্রীকে ডেকে পাঠালেন। কম্পিত-বক্ষ সাবিত্রী তাঁর সামনে চেয়ারে বসল, ধর্মরাজের সহায়তায় অ্যানি বেসান্ত তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। পিতার কাছে ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে প্রাথমিক যে শিক্ষাটুকু সাবিত্রী পেয়েছিল, তার পরিচয় পেয়ে অ্যানি বেসান্ত সন্তুষ্ট হলেন।

সাবিত্রীর কাহিনী শুনে বেদনা-গম্ভীর অ্যানি বেসান্ত বললেন, "তোমার জন্যে ব্যবস্থা করেছি।"

আশা-তপ্ত চোখে সাবিত্রী তাকিয়ে রইল।

"আমার এখানে শিক্ষার্থীদের থাকবার ব্যবস্থা নেই। ম্যারিনার কাছে সরকার উইডোস্ হোম স্থাপন করেছেন। তোমাকে সেখানে যেতে হবে। ওঁরা তোমার থাকা,

খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। হাতের কাজ দিলে কিছু অর্থ তুমি উপার্জন করতে পারবে।”

অ্যানি বেসান্ত শেষ না করতেই সাবিত্রী বলে উঠল, “আমার পড়া?”

“তুমি পড়বেও,” মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন অ্যানি বেসান্ত। “তুমি নিশ্চয় পড়বে। আমাদের বিদ্যালয় আছে, তাতে তুমি পড়তে পারবে। সরকারী স্কুলেও পড়তে পার।”

“আপনার স্কুলে পড়ব।”

“তাই ভাল। তোমার বয়স হয়েছে, কিন্তু তোমাকে নীচে থেকে সুরু করতে হবে। তোমার কথা হেড মিস্ট্রেসকে বলে দেব। যত্ন নিয়ে পড়াবেন।”

“কবে ভর্তি হব?”

“কাল তুমি ওইডোস্ হোমে যাবে। ধর্মরাজ নিয়ে যাবে তোমায়। এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে।”

“এত দেরী?”

এক সপ্তাহ খুব বেশি দেরী নয়।” প্রশ্রয়-হাসি ফুটল অ্যানি বেসান্তের মুখে। “তোমার বয়সে এক সপ্তাহ দীর্ঘকাল। বড় হলে দেখবে মোটেই দীর্ঘ নয়।”

সাবিত্রী উঠল। অ্যানি বেসান্ত আবার বললেন, “ যেখানে যাচ্ছ, স্থান ভাল নয়। বড় বিপন্ন। বড় চাপ। তোমার মনে জোর আছে ত?”

সাবিত্রী শুধু ঘাড় নাড়ল।

“তা হলে তুমি তৈরি থেকো। ধর্মরাজ কাল সকালে তোমায় নিয়ে যাবে।”

সাবিত্রী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পরক্ষণে কি মনে হ'ল, অ্যানি বেসান্তের কাছে এসে গড় হয়ে প্রণাম করল।

অ্যানি বেসান্ত সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন।

বৃদ্ধ বয়সেও সাবিত্রী আম্মা সে পরম আশ্বাস হাতের স্পর্শ ভুলতে পারেন নি। এখনও, আজও, বহু দূর পথ অতিক্রান্ত জীবনের অন্তিম লক্ষ্যের বিষণ্ণ ব্যর্থতার কাছাকাছি এসেও, অনেক সময় সাবিত্রী আম্মা সেদিনের সেই হাতের স্পর্শ মাথায় অনুভব করেন। আজও তাঁর দেহ শিহরিত হয়। দেহে দেহে স্পর্শে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ জাগে, বিরাট্ শক্তি জন্ম নেয়। মানুষের অঙ্গস্পর্শে মানুষ বদলে যায়। সাবিত্রী আম্মার জীবনে একাধিকবার এ রকম আশ্চর্য বিভূতি-লাভ সম্ভব হয়েছে। তের বছর বয়সে অ্যানি বেসান্তের আশীর্বাদ হস্তের আশ্বাস-স্পর্শ যেমন তাঁকে সুদীর্ঘ সংগ্রামের জন্যে তৈরি করেছিল, তেমনি আর একদিন, আর একজনের পাথর-কঠিন কুসুম-কোমল হাতের স্পর্শ তাঁকে বৃহত্তর মহত্তর সংগ্রামের পথে নামিয়েছিল। সেদিনকার কথাও সাবিত্রী আম্মা বিস্মৃত হন নি। আবার অন্য একদিন অন্য একজনের দেহ-স্পর্শ তাঁকে জ্বলিয়ে দিয়েছিল, নিজের দেহে যে এত আগুন সে খবর, তার আগে, কোনও দিন কি তিনি জানতেন?

ম্যারিনা মাদ্রাজ নগরীর সমুদ্র-সৈকত। প্রশস্ত রাজপথ বক্ররেখায় বিস্তারিত। সমুদ্রতীরের অদূরে, অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশে, বিধবা-ভবনের গোলাকার গৃহ। চারদিকে উঁচু প্রাচীর। ভেতরকার কঠিন বিষণ্ণতা স্থাপত্যে মূর্ত। সন্ধ্যা নামলে চতুর্দিক জনবিরল হয়ে যায়। গোলাকার বাড়ি আরও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

ধর্মরাজ ঘোড়ার গাড়ি ক'রে সাবিত্রীকে বিধবা-ভবনে পৌঁছে দিল। অ্যানি বেসান্তের নামে বিধবা-ভবনে খাতির পেল সাবিত্রী। বিপুলদেহা ডবল-চিবুক অধ্যক্ষা সাবিত্রীকে বসবার জন্যে চেয়ার দিলেন। ধর্মরাজ অ্যানি বেসান্তের নাম ক'রে সাবিত্রীর পড়াশোনার আশু ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাল। সাবিত্রীকে চমৎকৃত ক'রে আরও বলল, “মিসেস বেসান্তের ইচ্ছে টাকা-পয়সার অভাবে এঁর বিদ্যাশিক্ষায় ব্যাঘাত না হয়। প্রয়োজন হ'লে টাকা তিনি পাঠিয়ে দেবেন।”

কাগজপত্র সই ক'রে ধর্মরাজ বিদায় নেবার সময় সাবিত্রী তাকে বিনম্র ভঙ্গিতে বলল, “আপনি মাঝে মাঝে আসবেন ত?”

“আসতে ত হবেই,” ধর্মরাজ জবাব দিল। “মিসেস বেসান্ত আপনার ভার আমার ওপরেই দিয়েছেন।”

অকারণ লজ্জায় কান গরম হ'ল সাবিত্রীর। মুখে বলল, “আপনার দয়া।”

এবার সুরু হ'ল সাবিত্রীর জীবন-সংগ্রাম। অনেকগুলি বছর, যার সমবেত স্মৃতি সাবিত্রী আম্মার জীবনে এক পরম অভিজ্ঞান। পুরুষ অনেক বিপর্যয় অতিক্রম ক'রে অনেক দুঃখ-কষ্ট পরাজয় ক'রে মানুষ হয়। প্রতি দেশে, প্রতি যুগে জীবন-যুদ্ধে পুরুষের জয় বারংবার বিঘোষিত। কিন্তু মেয়েদের সংগ্রাম একেবারে আলাদা। প্রতি মুহূর্তে তাদের লড়তে হয় দৃঢ়-শিকড় সংস্কারের সঙ্গে, পুঞ্জীভূত নিষেধ, পল্লবিত বাধার সঙ্গে। তার চেয়েও শক্ত, প্রতিদিন সংগ্রামী মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় নিজের মান, মর্যাদা, শুচি, ন্যায়, নীতি। তার প্রস্ফুটিত দেহ হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় দুশমন। নিজেকে প্রকাশ

করবার সঙ্গে সঙ্গে বহু যত্নে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয়। মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে প্রতি পদে বন্ধনের শৃঙ্খল আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

বিধবা সাবিত্রীর কুমারী দেহমন তার সবচেয়ে বড় শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল।

উইডোস হোমে সাবিত্রীর সঙ্গে আরও একুশটি বিধবা। তাদের অধিকাংশ জীবনে পরাজয় মেনে নিয়েছে। কোনও মতে জীবিকা-সংস্থান তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বার জন সাবিত্রীর চেয়ে অনেক বড়—বাইশ থেকে ত্রিশ বছর তাদের বয়স। পাঁচ জন সাবিত্রীর চেয়ে সামান্য বড়। ছ'টি তার সমবয়সী। আর ছ'টি তারও চেয়ে ছোট। যারা বয়স্কা, তাদের মন ক্ষুদ্র, দৃষ্টি ময়লা। যারা কুড়ির নিচে, তাদের মন বিষণ্ণ, নিরুৎসাহ। সাবিত্রীর সমবয়সীরা তবু একটু জীয়ন্ত। উইডোস হোমের সঙ্গেই হাত-শিল্প কুটীর। তাঁত বসান হয়েছে আটটা। অনেক রকম হাত-বোনা জিনিসের ব্যবস্থাও আছে। আশ্রিতাদের সবাইকে হাতের কাজ শিখতে হয়। তারা যে-সব পণ্য তৈরী করে তার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হোমের একমাত্র উপার্জন। বিধবা-ভবন অবশ্য চলে সরকারী ও বেসরকারী বদান্যতায়।

প্রথম দিন হ'তে সাবিত্রী গভীর মনোনিবেশে জীবন-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। অল্পদিনে হস্ত-শিল্পের অনেক চারু কাজ তার আয়ত্তে এসে গেল। সকাল থেকে রাত্রি, নিষ্ঠুর অভিনিবেশে নিজের সবটুকু শক্তি সে নিযুক্ত করল ভবিষ্যৎ নির্মাণে। হোমের ক্লেদ-ক্লিন্ন দিকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখবার সময়টুকু পর্যন্ত নিজেকে সে দিল না। তার বিরুদ্ধে অনেকবার অনেক নালিশ দানা বেঁধে উঠল; কোনটাই শেষ পর্যন্ত টিঁকল না। সেবাপরায়ণতায় সবার অন্তর সে অল্প-বিস্তর জয় করল। অধ্যক্ষা পর্যন্ত তাঁর ওপর মোটামুটি খুশী হলেন। কাজে-কর্মে তার নির্ধারিত অংশের অনেক বেশি সে ক'রে যেতে লাগল। কিন্তু তার প্রধান অভিনিবেশ পঠনে। অনেক দূরে স্কুল। হেঁটে যেতে আসতে হয়। সাবিত্রীর ক্লান্তি নেই। অখণ্ড প্রচেষ্টায় বিদ্যাভ্যাসে সে দ্রুত এগিয়ে গেল। পাঁচ বছর পরে সাবিত্রী বেশ ভালভাবে ম্যাট্রিক পাস করল।

ধর্মরাজ প্রতিসপ্তাহে একবার নিয়মিত তার খোঁজ নিতে আসত। সাধারণতঃ রবিবারে, যেদিন সাবিত্রীর ছুটি। কুশল প্রশ্ন ক'রে, খোঁজ-খবর নিয়ে চ'লে যেত। তাদের সম্পর্ক বেশ একটু অস্বাভাবিক ছিল! অ্যানি বেসান্তের নির্দেশে তাঁর আশ্রিতা একটি মেয়ের শুভাশুভ দেখবার দায়িত্ব পালনের বাইরে সাবিত্রীর প্রতি নিজস্ব, ব্যক্তিগত কোনও উৎসাহ ধর্মরাজ প্রকাশ করত না। সাবিত্রীও তার সঙ্গে কথা বলত শান্ত সংকোচে, কোমল দূরত্বের ব্যবধানে। সে যেন আর কারুর প্রতিনিধি মাত্র, তার স্বকীয় কোন সত্তা নেই। ব্যক্তিগত কোনও সংলাপ তাদের হ'ত না। সাবিত্রীর স্বাস্থ্য, পড়াশোনা, কাজ-কর্মের সংবাদ ধর্মরাজ নিরুত্তাপ নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করত। এ ছাড়া যা কথাবার্তা হ'ত তার সবটুকুই অ্যানি বেসান্তকে নিয়ে। ধর্মরাজ অ্যানি বেসান্তের ভক্ত, তাঁর থিয়োসোফিক্যাল আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী। তার কাছে সাবিত্রী শুনতে পেত, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কত নামজাদা নারী-পুরুষ বেসান্ত-দর্শনে সমাগত হন; কি ভাবে থিয়োসোফী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তিকে নিয়ে যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন এ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে গ'ড়ে উঠেছিল তার আশ্চর্য কাহিনীও ধর্মরাজ সাবিত্রীকে শোনাত। কৃষ্ণমূর্তিকে থিয়োসোফীর জাবন্ত প্রামাণ্য নিদর্শনরূপে দাঁড় করিয়ে অ্যানি বেসান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন তার বিবরণ দিতে ধর্মরাজ উত্তেজিত হয়ে উঠত; সাবিত্রী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে যেত, কিন্তু অন্তরে তার পুলক জাগত না। অ্যানি বেসান্তের ধর্মচর্চা সাবিত্রীর মন, সেই তারুণ্যের তরল দিনগুলিতেও উদ্বেল করে নি। ধর্মরাজের সঙ্গে তার নিরুত্তাপ সম্পর্কের এও একটা প্রধান কারণ।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর একদিন ধর্মরাজ এসে সাবিত্রীকে বলল, "আপনাকে সোসাইটিতে যেতে হবে।"

"কেন?"

"মিসেস বেসান্ত ডেকেছেন।"

বড় আনন্দ হ'ল সাবিত্রীর। এতগুলি কঠিন বছরে একবারও তাকে অ্যানি বেসান্ত ডেকে পাঠান নি। ধর্মরাজ নিয়মিত খোঁজ-খবর করেছে, তাই সাবিত্রী জেনেছে তিনি তাকে বিস্মৃত হন নি। ম্যাট্রিক পাশ করার পর মনে মনে সে জীবনের আর এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হবার চঞ্চল সমস্যা অনুভব করছিল। কলেজে পড়বার বড় ইচ্ছে; রোজগার করবার বড় প্রয়োজন। বিধবা-ভবনের অধ্যক্ষা উপদেশ দিচ্ছিলেন ট্রেনিং নিয়ে স্কুলে চাকরির জন্যে তৈরী হতে। এ পরামর্শের ব্যবহারিক উৎকর্ষ সাবিত্রী জানত। কিন্তু অন্তর তার সমুদ্রের মত বিক্ষুব্ধ। বিদ্রোহে উদ্বেল বীচিমালায় দূরদুরান্তগামী ব্যাকুল, নির্বাধ প্রবাহের আকর্ষণ অহরহ সাবিত্রীকে টানছে। সমুদ্রের পারে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতদিন তার কেটে গেছে ঢেউ-এর বিশৃঙ্খল উন্মত্ততা দেখে

দেখে। অজ্ঞাত-জন্ম এক একটা বিরাট্ ঢেউ অচানক পাড়ের বালু মসৃণ গা বেয়ে উঠে এসেছে। সাবিত্রীর মনে হয়েছে, তার বুকের ঢেউগুলিও অমনি উদ্দাম, মুক্তির জন্যে ব্যাকুল। সমুদ্র, বার বার সাবিত্রী বলেছে, তুমি আমার সখা। একমাত্র তোমারই দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে একটু চিনতে পারি। আমাকে প্রসারিত কর, আমিও দেখবে সমুদ্র হয়েছি। আমাকে প্রবাহিত হতে দাও, দেখবে কত কূল ছাপিয়ে আমি বয়ে গেছি, আমার দিগন্ত আকাশে বিলীন। আমার বুকে কান পেতে শোন, লক্ষ বীচিমালার শাণিত ঐকতান।

বিমানে চেপে ধর্মরাজের সঙ্গে সাবিত্রী আডিয়ার এল। এই প্রথম ধর্মরাজের পাশে সে বসল, তার অঙ্গ ধর্মরাজের অঙ্গ স্পর্শ করল। জীবনে এই প্রথম যাকে পর-পুরুষ বলা যায় এমন একজনের অঙ্গে সাবিত্রীর অঙ্গ-স্পর্শ হ'ল, লজ্জা পেল সাবিত্রী, সংকুচিত হ'ল, ধর্ম-রাজের অতি সুভদ্র ঔদাসীন্যে আশ্বস্তও হ'ল, কিন্তু নিজেই অকিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করল, পুলকিত হ'ল না।

মস্তবড় বই-পত্র-কাগজে সমাকীর্ণ টেবিলে অ্যানি বেসান্ত কাজ করছিলেন। সাবিত্রীর পানে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। দু' চার মুহূর্ত নীরবে দেখলেন তাকে। তার পর বললেন, "মাই গড্, তুমি ত বড় সুন্দর হয়েছ!"

সাবিত্রীর সর্বদেহে এ-ক'টি কথা কেমন একটা জ্বালা ধরিয়ে দিল। তখন তার আঠার বছর পূর্ণ হয়েছে। সে যে সুন্দরী বার বার সবাই তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিজের মনে এ উপহাস-করুণ সত্যকে একটুও প্রশ্রয় সে দেয় নি। বিধবা-ভবনের প্রবুদ্ধ আত্মনিগ্রহ দেহ-বিলাসের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। এ প্রতিকূলতা সাবিত্রী শুধু মেনে নেয় নি, কল্যাণকর মনে করেছে। কোনও দিন সে সাজে নি, প্রসাধন করে নি, ভাল ক'রে নিজের দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখে নি। তথাপি সে জানতে পেরেছে প্রকৃতি কোন্ উদার অপচয়ে তার দেহকে পরিপূর্ণ সম্ভারে সাজিয়ে তুলেছে। দৃঢ় মজবুত দেহে সাবিত্রী রোগ কাকে বলে জানে নি, পরিশ্রমে সে অকাতর, কর্মনিষ্ঠায় অটল। কৃচ্ছ্রসাধনে তার সমকক্ষ বিধবা-ভবনে কেউ নেই। মোটা শাড়ী, মোটা কাপড়ের ব্লাউজ ছাড়া কিছু সে পরে নি। পায়ে কোনও দিন জুতা ব্যবহার করে নি। তবু তার বর্ণ নিকষিতহেম, দেহ সুঠাম, সুগঠিত, সুছন্দিত; আয়ত চোখে গোধূলির বিষণ্ণ ঔজ্জ্বল্য।

অ্যানি বেসান্ত সাবিত্রীকে সামনে চেয়ারে বসালেন। অসমাপ্ত কাজ সেরে নিতে কয়েক মিনিট কেটে গেল। এ কম্পিত অবসরে সাবিত্রী তার চিত্তহারিণীকে নয়ন ভ'রে দেখল। পাঁচ ছ'বছরে বেশ খানিকটা বদলে গেছেন অ্যানি বেসান্ত, চুল পেকেছে, চামড়ায় ভাঁজ। কিন্তু কী আশ্চর্য তেজোদীপ্ত কান্তি সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত, কী অসামান্য মনীষায় উজ্জ্বল বড় বড় দু'টি চোখ! যৌবনে অ্যানি বেসান্ত সুন্দরী ছিলেন, যৌবন থেকেই তিনি বিদ্রোহী। বহু পথে সকল-ব্যর্থ সে বিদ্রোহ এখন যেন আর এক নতুন সুদৃঢ় সংকল্পে তাঁর বার্ধক্য-সুঠাম দেহে নতুন এক অদেখা তারুণ্য এনেছে।

কাজ শেষ ক'রে অ্যানি বেসান্ত সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

বললেন, "এবার তুমি কি করবে?"

মৃদুস্বরে সাবিত্রী বলল, "ঠিক করতে পারিনি না।"

"কলেজে পড়তে চাও?"

সাবিত্রীর চোখে ঝিলিক্ খেলে গেল। মুখে সে বলল, "নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা দরকার।"

অ্যানি বেসান্ত বললেন, "তার সময় আছে। তুমি পড়। কুইন্স্ কলেজে তোমার ভর্তির ব্যবস্থা ধর্মরাজ ক'রে দেবে। তুমি হস্টেলে থাকতে পার, যদি উইডোস্ হোমে ভাল না লাগে।"

"সে ত অনেক খরচ।"

"তার জন্যে ভেবো না। তোমার যাতে মাইনে না লাগে তার ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি তো বেশ ভাল পাশ করেছ।"

সাবিত্রী কান পেতে বুকের মধ্যে সমুদ্র-গর্জন শুনতে পেল।

"ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মেয়েদের শিক্ষা," অ্যানি বেসান্ত বললেন। শিক্ষা না পেলে তোমাদের মুক্তি নেই। মাদ্রাজে তোমরা বাংলা ও মহারাষ্ট্র থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছ। এখানে কোন সংস্কারক আন্দোলন পর্যন্ত হয় নি এখনও। পুরাতনের শাসন সমান দাপটে চলছে। অথচ প্রাচীন রীতি-নীতির শৃঙ্খল না ভাঙলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি অসম্ভব।"

সাবিত্রী প্রত্যেকটি কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করল। মিসেস বেসান্ত বলে চললেন, "ভারতবর্ষ এক বিরাট্ সন্ধিস্থলে এগিয়ে চলেছে। তুমি কংগ্রেসের নাম শুনেছ?"

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল সে শুনেছে।

"কংগ্রেস তাড়াতাড়ি সংগ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। যাঁরা এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে আবেদন-নিবেদন-কারীরা সব পিছিয়ে যাচ্ছেন, অথচ নতুন কোনও নেতৃত্ব গ'ড়ে উঠছে না। এ অবস্থা বেশিদিন চলবে না। চার-

দিকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে, হয়ত যে-কোন দিন য়ুরোপে লড়াই লেগে যাবে। লড়াই লাগলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের সত্যিকারের মূল্য বুঝতে পারবে, আর তখনই আসবে আমাদের প্রকৃত সুযোগ। সে সুযোগ পূর্ণ ব্যবহারের জন্যে দেশকে তৈরী করতে হবে।"

কথাগুলি অ্যানি বেসান্ত বলছিলেন নিজের মনে, সাবিত্রীকে নয়; সাবিত্রী কিছু বুঝতে পারছিল না, শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছিল। হঠাৎ অ্যানি বেসান্ত থেমে গেলেন। চিন্তাকুল চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর বললেন, "তুমি এসব বুঝবে না এখন। তুমি পড়াশোনা কর। নিজেকে বড় কিছুর জন্যে তৈরী কর। কেবল বেঁচে থাকবার জন্যে শৃঙ্খল ভেঙে সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছ, এমন যেন না হয়। বেরিয়ে যখন এসেছ তখন বড় কিছু করবে, যাতে তোমার মুক্তি আরও অনেককে প্রবুদ্ধ করে।"

সাবিত্রীর দেহ বার বার কেঁপে উঠল।

অ্যানি বেসান্ত বললেন, "আমাদের সবার মধ্যে ঐশী শক্তি আছে। জন্ম-জন্মান্তর আমরা এগিয়ে চলেছি। তুমি অনেক এগিয়ে চলবার জন্যে নিজেকে তৈরী কর। ভারতবর্ষের বড় প্রয়োজন শৃঙ্খল-ভাঙা নারীর।" একটু থেমে, সস্মিত দৃষ্টিতে, "হয়ত একদিন শাগ্‌গির আসবে যখন তোমাকে আমার দরকার হবে। সেদিন যেন আমি হতাশ না হই।"

সে প্রয়োজন সত্যিই একদিন হয়েছিল। সাবিত্রী আম্মা এখনও শিহরিত মনে ভাবেন সে মহালগ্নের কথা। সেদিন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দিন। বড় আনন্দের, বড় বেদনার দিন। আজকের এই পরিণত দিবসের অপচিত রৌদ্রালোক, অগ্রসর অন্ধকার, সব কিছুর সূচনা সেদিন।

সাবিত্রী ভর্তি হ'ল কুইন্‌স কলেজে। সাবিত্রীর মন এবার দ্রুত প্রসারিত হ'তে লাগল। পঠনে অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে সে যা পেল তাই পড়ল। বিধবা-ভবন থেকে হষ্টেলে স্থানান্তরিত জীবনের আস্বাদ তার জীবন-তৃষ্ণা তীব্র করল। সবচেয়ে যা তাকে আনন্দ দিল তা হচ্ছে হষ্টেল ও কলেজ-জীবনের উন্মুক্ত আবহাওয়া। সাবিত্রী কেবল পড়ার বই-এ নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে রুচি যা চায় তাই পড়তে লাগল। প্রথম সে রাজনীতি পড়ল, পড়ল দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য। তামিল সাহিত্যে অনুরাগ তার গভীর হ'ল। প্রাচীন তামিল মহাকাব্য 'সিলাপ্পাধিকরম্' পড়তে পড়তে তার চোখের সামনে জন্মভূমি মাদুরাই বার বার এসে দাঁড়াল। রাজপুত্র ইলাঙ্গো-আডিগল এক সাধারণ বণিক্-দম্পতির মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে এ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চের-বংশীয় নৃপতি সেনগুট্টুভমের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ইলাঙ্গো-আডিগল; এক জ্যোতিষী এসে ভবিষ্যদ্বাণী করল যে তিনিই রাজা হবেন, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নয়। ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাজা বিষাদে নিমগ্ন হলেন, আর পিতার সে দুঃখ দেখে ইলাঙ্গো সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে গেলেন। বহুদিন পরে কবিরূপে রাজ্যে ফিরে এলেন তিনি। জ্যোতিষীর বাণী সত্যি হ'ল—চের রাজাদের কাউকে ইতিহাস স্মরণ-মাত্রের বেশি মর্যাদা দেয় নি, কিন্তু 'সিলাপ্পাধিকরমের মহাকবি ইলাঙ্গো আজও অমর।

ইলাঙ্গোর হাতে-গড়া কোভলম্ ও কেন্নাঙ্গীর মিলন-বিরহ-বিপর্যয়ের কাহিনী পড়তে পড়তে সাবিত্রীর চোখ জলে ভ'রে আসে, বিশেষ ক'রে রাজার আদেশে নিরপরাধ স্বামীর মৃত্যুর পরে কেন্নাঙ্গীর ভীষণ আক্রোশ, মাদুরাই সহরের রাস্তায় রাস্তায় তার নিষ্ঠুর অভিশাপ উচ্চারণ, সে অভিশাপের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ হাজার অগ্নিশিখায় নগরীর ধ্বংস। রাজাকে লক্ষ্য ক'রে কেন্নাঙ্গীর শোক-দগ্ধ কথাগুলি সাবিত্রী কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারে না:

'যদি আমি সতী নারী হ'য়ে থাকি
তাহ'লে এ নগরীর আজই শেষ দিন,
যেমন আজই শেষ দিন অবিচার-দুষ্ট নৃপতির।
আমার অভিশাপে আজই এ নগরী
ধূলিসাৎ হবে, সত্যতা প্রমাণ করবে আমার কথার।'
এই ব'লে সে নিষ্ক্রান্ত হল প্রাসাদ থেকে,
সহরের পথে পথে সবাইকে চেঁচিয়ে বলল,
"চার-মন্দিরে সুশোভিত মাদুরাই নিবাসীগণ,
তোমরা শোনো, যেমন শুনছেন স্বর্গের দেবতারা;
যেমন শুনছেন মুনি-ঋষিগণ:
এ রাজার নগরীকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি,
যে রাজা অন্যায়ভাবে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে।"

কেন্নাঙ্গী যেই তার অভিশাপ উচ্চারণ করল,
অমনি অগ্নিদেবের জ্বলন্ত মুখ খুলে গেল,
যে দেবতারা নগরীকে রক্ষা করেছিলেন
তাঁরা সবেগে পলায়ন করলেন।'

সাবিত্রী বার বার কেন্নাঙ্গীর কাহিনী পড়ে আর ভাবে, কই, কোথায় নারীর সে তেজ? সে কি শুধু

কবির কল্পনা? সহস্র অন্যায় সহ্য করেও কি আমরা বিদ্রোহ করব না, জ্বলব না, জ্বালাব না? ভাবতে ভাবতে সাবিত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠে, পরক্ষণে গভীর ক্লান্তি নেমে আসে তার সবটুকু সত্তায়। নিজেকে মনে হয় দুর্বল, অর্থহীন, নিস্তেজ।

সাবিত্রীর যুবতী অন্তরে গভীর ছাপ ফেলল আরও দু'জন তামিল-কবি, একেবারে দু-কালের, একেবারে আলাদা জাতের। কবি-চক্রবর্তী কাম্বনের 'রামায়ণম্' তামিল সাহিত্যের উজ্জ্বলতম মণি। কাম্বনের 'রাম-কথাই' পড়তে পড়তে সাবিত্রীর মন সপ্তরঙে রঙীন হয়ে উঠত। রাম দেবাদিদেব বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু কি অপূর্ব সুন্দর মানুষ! সাধারণ মানুষের কবি কাম্বনের হাতে গুহক, সুগ্রীব, বালী, বিভীষণ, এমন কি রাবণের চরিত্রও আশ্চর্য জীবন্ত মানুষ হয়ে সাবিত্রীর চোখে ভেসে উঠত।

সাবিত্রী আম্মার আজও মনে পড়ে, লজ্জারুণ অষ্টাদশী লুপ্ত সাবিত্রীকে সকরুণ কৌতুকে মনে পড়ে, যে-সাবিত্রীর দৃশ্যপটে রামায়ণের মহাকাব্যিক জনসঙ্গম ভেদ ক'রে রাম-সীতার প্রথম প্রেমের ছবি জ্বলন্ত সুষমায় সরস-রঙীন প্রলোভনে বার বার মূর্ত হয়ে উঠত। কাম্বনের রাম মিথিলার পথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখতে পেলেন, রাজ-প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে পরমযৌবনা সীতা:

'এক অপূর্ব সৌন্দর্য-স্বপ্ন
বন্যার প্লাবনের মত ব'য়ে গেল
রামচন্দ্রের চোখের সামনে।
যেন এক স্বর্গের প্রতিমা।
কুসুমের কুমারী কামনা।
অকৃত্রিম অনাদি সুষমা।
যে মধুর গন্ধে উন্মত্ত ভ্রমর,
যে ছন্দের সন্ধানে ব্যাকুল কবি।
অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে কুমারী কন্যা।
মৃত্যু-বর্ষী বর্শার চেয়ে ধারাল, অপরাজেয়
তার দৃষ্টি।
সৃষ্টির সবটুকু মাধুরিমা পরিস্ফুট তার দেহে।
পাহাড় ও দুর্গ, প্রস্তর ও নবনী
গ'লে মিশে কোমল, নরম হয়ে
পড়েছে সে দেহ।

দু জোড়া আঁখি মিলল।
দু জোড়া আঁখি ক্ষুধার্ত আলিঙ্গনে মিলল।
হঠাৎ-উদ্বেল দুটি চিত্ত
মিলে মিশে এক হয়ে গেল।
রাম তাকিয়ে রইলেন কন্যার চোখে,
কন্যা তাকিয়ে রইল রাম-নেত্রে।
সে দ্বৈত-দৃষ্টিতে তাদের হৃদয়
শৃঙ্খলিত হল;
ধনুর্ধর রাম, কৃপাণ-আঁখি সীতা
আশ্চর্য বিনিময়ে একে অন্যের
অন্তর প্লাবিত ক'রে দিল।'

পড়তে পড়তে সাবিত্রী স্মৃতির গহনে খুঁজে বেড়ায় একজোড়া চোখে। মনে আছে, মনে নেই, চেষ্টা করলে আজও মনে করা যায় মুণ্ডিত মস্তক কৃষ্ণবর্ণ একটি যুবকের ছোট ছোট তরল দুটি চোখ। সে চোখ সাবিত্রীর আঁখি সন্ধান করার সুযোগ পায় নি, শুধু সলোভ কৌতূহলে কয়েকবার দেখেছে। সাবিত্রী কেবল একবার সে চোখ ভাল ক'রে দেখে নিয়েছিল, লুকিয়ে, দুর্দম্য কৌতূহলে। তার পর একদিন আসন্ন শুভ-লগ্নের প্রদীপ্ত দ্যোতনা মৃত্যুর করাল অন্ধকারে ডুবে গেল।

ইলাঙ্গো-আডিগল ও কাম্বন যেমন সাবিত্রীর মধ্যে চিরন্তনী নারীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, তেমনি তার চিত্তের মৃদু-জ্বলন্ত বিদ্রোহ ইন্ধন পেয়েছিল ভারতীর কবিতায়। সাবিত্রীর কলেজ-জীবনের প্রারম্ভে ভারতীর জাতীয় কবিতার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তামিলনাদে সাড়া প'ড়ে গেল; ছাত্র-মহলেই সে সব কবিতা পড়া হ'ত সবচেয়ে বেশী। পরবর্তীকালে ভারতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল সাবিত্রী আম্মার; যৌবনের উচ্ছ্বাস ও কল্পনা দিয়ে গড়া কবির চেহারার সঙ্গে বাস্তব জীবন্ত সুব্রাহ্মনিয়া ভারতীর অমিল দেখে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন। কিন্তু কুইন্‌স্‌-কলেজে-পড়া আঠার-উনিশ বছরের সাবিত্রীর নিঃসঙ্গ অন্তর্জ্বালায় ভারতীর কবিতা অন্য পদার্থ ছিল। দেশপ্রেম ব'লে যে একটা চিত্তদাহী আদর্শ আছে, ভারতবর্ষ বলতে যে এক বাস্তব চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে, স্বাধীনতার নাম উচ্চারণ করতে হৃদয়ে যে পুলক-সঞ্চার হয়, ভারতীর কবিতা পড়ার আগে সাবিত্রী তা জানতে পারে নি।

কলেজ-জীবনে অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে থাকলে মাঝে মধ্যে সাবিত্রীকে ডেকে পাঠাতেন; কখনও-সখনও সে নিজেও আডিয়ারে এসে হাজির হ'ত। এখানকার কাজ-কর্মের অনেক কিছু সে বুঝতে পারত না, কিন্তু অনুভব করত নতুন কিছুর উত্তেজনা থিয়োসোফার শান্ত বাতা-

বরণকে উদ্বেলিত করেছে। বর্তমান শতাব্দী তখন মাত্র প্রথম দশক উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় দশকে পা দিয়েছে। প্রাচ্যে জাপানের নতুন শক্তির চমকপ্রদ আবিষ্কার ভারতবর্ষে যে চিত্ত-চাঞ্চল্য এনেছিল, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নবতর জাতীয় জাগরণে সমস্ত দেশে তা পরিব্যাপ্ত। নতুন কোন জীয়ন-কাঠির স্পর্শে বহুশতাব্দী-নিদ্রিত দৈত্য জেগে উঠেছে; অথচ এ নবলব্ধ শক্তি কোন্ পথে নিযুক্ত হবে নেতারা তার সন্ধান পাচ্ছেন না। নেতৃত্বের অভাবে বাংলায় সন্ত্রাসবাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার অগ্নি-ঝিলিক ছড়িয়ে পড়েছে পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে। পুরাতন নরমপন্থী কংগ্রেস-নেতারা হয় রঙ্গমঞ্চ থেকে স'রে পড়েছেন, নয় আত্মকলহে ডুবে আছেন। এদিকে য়ুরোপে রণভেরী বেজে উঠছে।

এমন অবস্থায় একদিন সাবিত্রীর জীবনেও রণভেরী বেজে উঠল। কেন হ'ল, কেমন ক'রে হ'ল সাবিত্রী আম্মা আজও ভাল বুঝতে পারেন না। আজ এই তেষট্টি বছরের স্তিমিত দীপালোকে সেদিনকার উত্তেজনার পরিণামটুকুই যেন বেশী চোখে পড়ে। জীবন কখনও পরিপূর্ণ দেয় না, পরিপূর্ণ বঞ্চনা করে না। জীবনের একটা বজ্রকঠোর রসিকতাবোধ আছে। অনেক দেবার মধ্যেও সে ফাঁকি রেখে দেয়; অনেক বঞ্চনার মধ্যেও তৃপ্তির বীজ লুকিয়ে রাখে।

ধর্মরাজের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কখনই একেবারে নির্বাধ হয় নি। স্বভাব-গম্ভীর আপাত-উদাসীন নিরুত্তেজ এই মানুষটিকে সাবিত্রী ঠিক বুঝতে পারে নি, বোঝবার বড় কিছু কৌতূহলও হয় নি। সে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে অ্যানি বেসান্তের একান্ত অনুগত অনুচরের নির্জীব ভূমিকায় আবদ্ধ রেখেছে, সাবিত্রীর সঙ্গে নিজস্ব কোন সম্পর্ক গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করে নি। যখন শান্ত অনুনয়ে সে সাবিত্রীকে তার সমস্ত অসুবিধা, সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করেছে, এমন কোন ভাব দেখায় নি যে, সে নিজেই তার কল্যাণে, প্রগতিতে উৎসাহী; কেবল বুঝতে দিয়েছে, অ্যানি বেসান্তের নির্দেশ সে মেনে যাচ্ছে মাত্র। গির্জায় গিয়ে কনফেশন করবার সময় ক্যাথলিক দ্বিচারিণী যেমন পাদ্রীকে মানুষ মনে করে না, ধর্মরাজের কাছে নিজের সমস্যার কথা বলতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হয় নি সে রক্তে-মাংসে-গড়া এক যুবকের সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় অভিজ্ঞানের সেতু তৈরী করছে।

একদিন টাউন-হলে জনসভায় গিয়েছিল সাবিত্রী সুব্বারাও পাম্তলুর বক্তৃতা শুনতে। ফিরবার পথে দেখতে পেল তার জন্যে মাউণ্ট রোডের এক মোড়ে অপেক্ষা করছে ধর্মরাজ।

"আপনি কি ক'রে জানলেন আমি মিটিং-এ গেছি?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল সাবিত্রী।

"হষ্টেলে গিয়েছিলাম।"

"কিছু কাজ আছে?"

"একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"বলুন।"

"কথাটা আপনার সম্বন্ধে।"

"আমার সম্বন্ধেই ত সব কথা আপনার সঙ্গে।" মৃদু হাসল সাবিত্রী।

"সমুদ্রের পারে গিয়ে বসবেন?"

একটু বিস্মিত হ'ল সাবিত্রী। ধর্মরাজের গলার স্বর যেন সামান্য কাঁপল। তাছাড়া, সমুদ্রপারে ব'সে কথাবার্তার অনুরোধ এর আগে কখনও সে করে নি।

"চলুন। আমাকে আটটার মধ্যে ফিরতে হবে।"

"আমি জানি।"

টুকরো কথোপকথনে তারা সমুদ্র-সৈকতে উপনীত হ'ল। সমাগত সন্ধ্যায় সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গাম্ভীর্য। পাতলা অন্ধকার নেমেছে দিক্‌চক্রবালে; আকাশে একে একে তারা জেগে উঠছে—চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী। হালকা অন্ধকার তরল রহস্যের আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে অজ্ঞাতকুল সমুদ্রের গায়ে। ঢেউ-এর একটানা গর্জনের সঙ্গে অন্ধকারের গোপনীয়তা মিলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে সাবিত্রী নিজের অন্তরের সহজ যোগাযোগ আবিষ্কার করল।

সমুদ্রপারে জনবিরল একটি স্থান বেছে নিয়ে দু'জনে বসল।

কিছুক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। সাবিত্রী তন্ময় বিস্ময়ে সমুদ্র-গর্জন শুনতে লাগল। এক একটা ঢেউ হঠাৎ প্রগল্‌ভ উচ্ছলতায় অন্য ঢেউগুলির অঙ্কিত সীমানা অতিক্রম ক'রে সাবিত্রীর পা পর্যন্ত এসে পড়ছে, তার নীরব নিষেধ কানে তুলছে না। সমুদ্রের ঢেউ দেখে সাবিত্রীর তৃপ্তি নেই। যেন সে দিনের পর দিন বসে বসে সমুদ্র দেখতে পারে; পরিবর্তিত বর্ণচ্ছটার প্রতিটি মূর্চ্ছনা তার মনে রঙের তরঙ্গ তোলে। অথচ কি পরম গোপনীয়, কি সরস-রমণীয় এ তরঙ্গ তা জানে কেবল সাবিত্রী, আর বুঝি জানে, অন্তত আভাসে, সমুদ্র।

ধর্মরাজ হঠাৎ ব'লে উঠল, "আপনাকে যা জিজ্ঞেস

করব তা নিতান্ত ব্যক্তিগত। বড় প্রয়োজনে এ প্রশ্ন আমায় করতে হচ্ছে। যদি আপত্তি থাকে, জবাব দেবেন না। অন্তত অপরাধ নেবেন না।"

এমন ভণিতা ক'রে ধর্মরাজ কোনদিন কথা বলে নি। সে গম্ভীর স্বল্পভাষী মানুষ; সহজ, পরিষ্কার ব্যবহার। সাবিত্রী অবাক হ'ল।

শুধু বলল, "বলুন।"

"আপনি কি বিধবা হয়েই সারা জীবন কাটাবেন?"

হঠাৎ সাবিত্রীর চোখের সামনে সমুদ্র দারুণ আক্রোশ-উল্লাসে গর্জে উঠল, অজ্ঞাত বাঁধন ছিঁড়ে ঢেউগুলি আকাশ পর্যন্ত তাণ্ডবে নেচে উঠল; সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গভীর বিষাদে ঘনকালো হ'ল। উন্মত্ত বাতাস এসে সাবিত্রীর অন্তরে আকস্মিক-প্রজ্জ্বলিত আগুনকে বহ্নিশিখায় প্রবাহিত করল।

ধর্মরাজ বলল, "স্বামীর ঘর আপনি করেন নি। বলতে গেলে আপনি কুমারী। সমাজের একটা ভয়ানক অন্যায় প্রবল বিদ্রোহে আপনি অস্বীকার করেছেন। পিতৃকুলে আপনার স্থান নেই। আপনি একা। আজ মিসেস বেসান্ত আছেন, তাঁর অনুগ্রহে আপনি নবজন্ম পেয়েছেন, পৃথিবীর কঠিন মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার শক্তি আপনার হয়েছে। কিন্তু মিসেস বেসান্ত চিরদিন থাকবেন না। তাঁর কাল শেষ হয়ে আসছে। এবার তিনি ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ ত্যাগ ক'রে রাজনীতিতে ঢোকবার আয়োজন করছেন। তাতেই তাঁর পতন অনিবার্য। জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে আপনি একেবারে একা হয়ে পড়বেন। একটু ভাবলে বুঝতে পারবেন এই একার অর্থ কি নিদারুণ। নানা রকম কুচরিত্র লোক আপনার পেছনে লাগবে। আপনি নিরপরাধ হলেও লোকে আপনার নামে কুৎসা দেবে। তামিল-সমাজ আপনি জানেন। কেউ আপনাকে গ্রহণ করবে না। স্কুলে কাজ পাবেন, জীবনে স্থান পাবেন না। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে যাবে আপনার মন, পৃথিবীকে আপনি ঘৃণা করবেন, জীবনকে বিদ্রূপ। এই যদি পরিণতি, তা হলে আপনার এত সংগ্রামের, কঠিন বিদ্রোহের দরকার ছিল কি?"

সাবিত্রী অতি কষ্টে নিজেকে শাসন ক'রে নীরব নিশ্চল রাখল।

ধর্মরাজ ব'লে গেল, "আজ সাত-আট বছর হ'ল আমি আপনার দেখাশোনা করছি মিসেস বেসান্তের নির্দেশে। ক'দিন পরে বি. এ পাশ ক'রে আপনি স্বাধীন হবেন। আপনাকে দেখাশোনা করবার আর দরকার হবে না। আপনার সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগও আমার থাকবে না। রাজনীতি আমি একেবারে পছন্দ করি না। মিসেস বেসান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি তাঁর আধ্যাত্মিকতার গুণে, তাঁর রাজনীতি আমাকে একটুও টানে না। তিনি রাজনীতিতে যোগ দিলে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি হবে তাও আমার এখন জানা নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই, অতএব, আমি আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। মিসেস বেসান্তের সঙ্গেও আমার কথাবার্তা হয়েছে। সারাজীবন নিজেকে বঞ্চিত রেখে শেষে একদিন আপনি নিঃসঙ্গ নিঃস্ব হয়ে পড়বেন, এ কথাটা আপনাকে ভেবে দেখতে বলি। একেবারে অবক্ষিত হয়ে জীবনে আপনি দাড়াতে পারবেন কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে। আবার বলছি, আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, পুরুষগুলি অত্যন্ত লোভী, মেয়েরা সহানুভূতিহীন। তা ছাড়া, সমাজে নতুন পথ তৈরী করবার লোকের বড় দরকার। বঙ্গদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত এ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের ছেলের বিবাহ দিয়েছেন বিধবা মেয়ের সঙ্গে। বিধবা-বিবাহ বঙ্গে চালু হয়েছে। মহারাষ্ট্রে রাণাডে, তিলক, প্রভৃতি নেতারা বিধবা-বিবাহের জন্য আন্দোলন করছেন। পঞ্জাবে আর্যসমাজ বিধবা বিবাহ সমর্থন করছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কোনও সমাজ-সংস্কারক আন্দোলন হয় নি। আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে সম্মান করেছি, অর্থ দিয়ে আমেরিকা পাঠিয়েছি, কিন্তু আমাদের মাটি থেকে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন নি। আমরা চিরন্তনকে আঁকড়ে ব'সে আছি, তার চাপে আমাদের জীবন যে নিঃশেষ হতে চলেছে সেটুকু পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ছে না। আপনি পবিত্র জীবন-তৃষ্ণার দুরন্ত তাড়নায় গৃহত্যাগ করেছেন, কত কষ্ট, কত কৃচ্ছ্র সহ্য করেও বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। আপনার বিদ্রোহ কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে? কোনও একটা স্কুলমাষ্টারী নিয়ে সমাজের সমস্ত নিন্দা, উপেক্ষা, লোভ ও প্রতারণা থেকে নিজেকে কোন মতে বাঁচিয়ে রাখবার ভীরু প্রয়াসের অন্ধকার পথে চলতে চলতে একদিন তিক্ত, ব্যর্থ, অপচিত হয়ে এমন সংগ্রামে শুভ জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবেন? এ কথাগুলি আমি আপনাকে ভেবে দেখতে বলি।"

এত কথা যে ধর্মরাজ একত্র একটানা বলতে পারে সাবিত্রী আগে জানত না। মনে মনে সে কৃতজ্ঞ হয়েছিল সন্ধ্যার অন্ধকার ও সমুদ্রের গর্জনের জন্যে। অন্ধকার তাকে আড়াল দিয়েছিল, সমুদ্রগর্জন তার অন্তরের উদ্বেলতা লুকিয়ে রেখেছিল। ধর্মরাজের কথা শুনে সে বুঝল না তার আসল তাৎপর্য কি। শীতল নিরুত্তেজিত

যুক্তিতে কান-জ্বালা, মন-জ্বালা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে, নিজেকে তার আন্তরিক শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা ছাড়া অন্য কিছুতে দাঁড় করায় নি। তার কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ এ প্রসঙ্গে আছে কি না সাবিত্রী ঠিক বুঝতে পারল না। একবার মনে হ'ল হয়ত অ্যানি বেসান্তের নির্দেশেই ধর্মরাজ কথাটা তার কাছে তুলেছে; পরের মুহূর্তে ভাবল, তাহলে মিসেস বেসান্তের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সে কেন ইঙ্গিতে জানাল? নারী-সুলভ কৌতূহল হ'ল ধর্মরাজের সত্যিকারের অভীপ্সা জেনে নিতে, কিন্তু কৌতূহল, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা চেপে চেপে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, কৌতূহল জেগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ধর্মরাজ উঠল। বলল, "আটটা বাজতে বড় দেরী নেই। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দি।"

সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল। শেষ ঢেউটা এসে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের তলায়। পাতলা অন্ধকারে চকচকে সফেন ঢেউ প্রসারিত উজ্জ্বল হাসিতে বালুর গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। কান পেতে সাবিত্রী শুনতে পেল সমুদ্রের অতল বুক থেকে মহা-গম্ভীর সঙ্গীত ভেসে আসছে। তাকিয়ে দেখল লক্ষ বীচিমালায় সমুদ্র তাকে অজ্ঞাত অনাস্বাদিত সঙ্ঘাতের পথে আহ্বান জানাচ্ছে।

সময় কম ছিল, তাই ঘোড়ারগাড়ী নিল ধর্মরাজ। পথে একটাও কথা হ'ল না। ধর্মরাজ অত্যন্ত গম্ভীর। সাবিত্রী আত্মমগ্না।

এ ঘটনার তিন মাস পরে ধর্মরাজের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ হ'ল।

ধর্মরাজ সাবিত্রীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে নি। বিয়ে হ'ল অ্যানি বেসান্তের নির্দেশে। তিনি একদিন সাবিত্রীকে ডেকে অনেক কথা বললেন। সে কথাগুলি সাবিত্রী আম্মার আজও পরিষ্কার মনে আছে। তার আগে একুশ বছরের সাবিত্রী নিজেকে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রে দেখেছে। তার বিবাহিত স্বামীর কোনও চিহ্ন দেহে নেই, মনেও প্রায় নেই। আজ বার্ধক্যের অবসর-প্রাপ্ত মনে যদি-বা সেই মুণ্ডিত-মস্তক তরুণ কৃষ্ণবর্ণ ছেলেটির অর্ধেক-কল্পিত মুখখানা সাবিত্রী আম্মা অনেক খুঁজে কদাচিৎ বার করতে পারেন, সেদিনকার ভাবনা-তপ্ত সাবিত্রীর মনে তার ছায়াটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। বিয়ে করবে না, এমন কোন কঠিন সঙ্কল্প সাবিত্রী তার অন্তরে দেখতে পায় নি। শান্ত বিচার-বিবেচনায় মনে হয়েছে বিয়ে করাই ভাল। তক্ষুণি প্রশ্ন জেগেছে, বিয়ে করব কাকে? ধর্মরাজকে? অন্তর পুলকিত হয় নি। ধর্মরাজ কি আমাকে বিয়ে করতে চায়? তার সঙ্গে জীবন-যাপনের আস্বাদ কেমন হবে? বহুদিনের পরিচিত হলেও তাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ মানুষ ব'লে ভাববার প্রয়োজন হয় নি, সেও ভাববার অবকাশ দেয় নি। সমুদ্রতীরে সেই সন্ধ্যার পরে আর তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা হয় নি। দু'বার সে এসেছে; একবার কুশল জানতে, দ্বিতীয়বার বেসান্তের আহ্বান জানাতে। সামান্যতম বিশৃঙ্খলতাও তার আচরণে প্রকাশিত হয় নি।

অ্যানি বেসান্ত সাবিত্রীকে আধ ঘণ্টা ধ'রে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে নানা যুক্তি দেখাবার পর তাঁকে খানিকটা অবাক্ ক'রে সহজ কণ্ঠে সাবিত্রী প্রশ্ন করল:

"আপনি আমাকে বিয়ে করতে বলছেন?"

"বলছি।"

"আমি আজ যা সবটুকুই আপনার দয়ায়। আমার অকল্যাণ আপনি কখনও ভাববেন না। তবু প্রশ্ন করছি, আপনি কি বিধবা-বিবাহ নামক সংস্কারকে এগিয়ে নেবার জন্যে আমায় বিয়ে করতে বলছেন, না আমার ভালর জন্যে?"

"দুটোই।"

"আপনি যদি আদেশ করেন, আমার মনের অনেক সংশয় কেটে যায়।"

অ্যানি বেসান্ত গম্ভীর হয়ে একটু ভাবলেন। তার পর ধর্মরাজকে ডেকে পাঠালেন।

ধর্মরাজ এসে কাছে দাঁড়াতে অ্যানি বেসান্ত বললেন, "ধর্মরাজ, সাবিত্রী রাজী আছে। আজ থেকে তিন সপ্তাহ পরে শুভদিন আছে। তোমাদের সেদিন বিবাহ হবে।"

ধর্মরাজ উদ্দীপ্ত গম্ভীর চোখে সাবিত্রীর দিকে চেয়ে রইল। সাবিত্রী নিচু মাথা কিছুতেই তুলতে পারল না। ধর্মরাজ আনত হয়ে অ্যানি বেসান্তকে প্রণাম করল। সাবিত্রী তখনও নত-দৃষ্টি ব'সে রইল।

সিভিল ম্যারেজ আইনে তাদের বিয়ে হ'ল। শহরে বেশ কিছু আলোড়ন হয়েছিল বিয়ে নিয়ে, সাবিত্রী আম্মার সব মনে আছে। বিয়েতে কিছু উদারপন্থী মানী লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন। অ্যানি বেসান্তের ইচ্ছে ছিল হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহকে পাকা ক'রে দেন। কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নি ব'লে তা সম্ভব হ'ল না। মিসেস বেসান্ত নিজে দাঁড়িয়ে বিবাহ সম্পন্ন করালেন; বর-বধূকে আশীর্বাদ করলেন।

বিয়ে ক'রে ভাল হয়েছিল কিনা তেষট্টি বছরে সে

প্রশ্ন অবান্তর। জীবনটা যে বদলে গিয়েছিল তাতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই।

ধর্মরাজকে ভালবাসতে পারে নি সাবিত্রী; সে তার ভাগ্যের দোষ। অনেক বছর যে মানুষটাকে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি মনে হয় নি, স্বামীর ভূমিকায়ও তাকে কেমন যেন অবাস্তব, বেমানান মনে হয়েছিল। তা ছাড়া, সাবিত্রীর মন পরিষ্কার ছিল না। সর্বদাই সবকিছুর কাছে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হ'ত। অপর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভারের সামনে দাঁড়িয়ে অতি ক্ষুধার্ত যেমন মাঝে-মধ্যে খেতে পারে না, তার অবস্থাও ছিল তেমনি। জীবনে প্রথম দেহ-সম্ভোগের আশ্চর্য আনন্দেও সাবিত্রী কখনও পরিপূর্ণ অধীর হতে পারে নি। কেমন যেন মনে হয়েছে, তার সব পাওয়া চুরি ক'রে পাওয়া, সব আনন্দ নিষিদ্ধ ফল খাবার আনন্দ।

বিবাহিত জীবনে অমৃতের সন্ধান তাই পায় নি সাবিত্রী। ধর্মরাজ তার এই গোপন যন্ত্রণার খবর রাখত না। স্বভাবত সে স্বল্পভাষী, আত্মনিমগ্ন; সাবিত্রী কৃচ্ছ্র-সাধনের পথে চলতে চলতে আত্মদমনে অভ্যস্ত। ধর্মরাজ বিধবা-বিবাহে বিশ্বাসী হয়ে পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রে সাবিত্রীকে বিয়ে করেছিল, এ সত্য জানতে তার দেরী হয়েছিল। বিয়ের পরে বার বার আপনার রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধবিহ্বল ধর্মরাজের সন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে সে ব্যথা পেয়েছে, বিস্মিতও কম হয় নি। মনে তার দুরন্ত প্রশ্ন উঠেছে, কেন ধর্মরাজ নিজের উৎসাহে আমায় বিয়ে করল? শুধু কি আমায় স্বামিত্বের পরিরক্ষণে নিরাপদ করতে? বিয়ে ক'রেও ধর্মরাজ এত সহজে নিজেকে দূরে রেখেছে, এ নিয়ে কোনও ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনাও তাদের মধ্যে হয় নি।

এমনি ক'রে বছর আড়াই কাটবার পর সাবিত্রী বুঝতে পারল ধর্মরাজের জনক হবার ক্ষমতা নেই।

মাতৃত্বের ক্ষুধায় তখন সে জ্বলে উঠেছিল। সে কি দুর্বিসহ জ্বালা। যে জ্বালায় মাটির বুকের মধ্যে ফাটবার জন্যে বীজ কাঁদে, যে জ্বালায় মেঘ ফেটে বৃষ্টি নামে, কুমারী কুঁড়ি ফেটে ফুল হয়। সে জ্বালায় সাবিত্রী কি করত ঈশ্বর জানেন, যদি অ্যানি বেসান্তের ডাক না আসত; জীবনের আর একটা ভীষণ-উত্তপ্ত রাস্তা খুলে যেত; জমানো দুঃখ, কামনা, ব্যর্থতা নতুন বন্যায় যেত ভেসে।

অ্যানি বেসান্তের ডাকে সাবিত্রী নামল রাজনীতিতে। ধর্মরাজ বাধা দিল না। শুধু বলল, আমাদের ব্যবধান আরও বেড়ে যাবে।

সে কথা সাবিত্রীর কানে পরিহাসের মত বাজল।

কয়েক বছর ধরেই ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে পথ-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ১৯১৫ সনের প্রথম দিকে গোখেল মারা গেলেন, শেষ দিকে স্যর ফিরোজ শা' মেহতা। বৃদ্ধ দীনশা ওয়াচা প্রায় দৃষ্টিহীন। স্যর নারায়ণ চন্দ্রভারকর রাজনীতি ত্যাগ ক'রে জজিয়তী করছেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মুধলকর, সুব্বা রাও পান্তলু, এঁদের কারুর নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই। স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ইংরেজের কাছে পুরস্কারের জন্যে হাত বাড়িয়েছেন। পৃথক্ কারণে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দু'জনেই কংগ্রেসের বাইরে; লালা লাজপৎ রায় আমেরিকায়। বোম্বাই কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বস্তুতপক্ষে অন্য পথের মানুষ। তিলক সবেমাত্র জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পেয়েই নরম ও চরম পন্থীদের একত্র করবার কাজে লেগে গেছেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে নতুন এসেছেন, এখনও নির্দিষ্ট পথে কাজ সুরু করেন নি। মহাযুদ্ধের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যেরা অসামান্য বীরত্ব দেখিয়ে বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। গান্ধী ও তিলক দু'জনেই যুদ্ধে ইংরেজের পূর্ণ সাহায্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছেন। কিন্তু যুদ্ধে ভারতের ভূমিকাকে কেন্দ্র ক'রে তিনটি মতবাদ তখন দেশে পরিস্ফুট। সুরেন্দ্রনাথের মত নরমপন্থীরা যুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে পুরস্কার দাবী করেছেন; তিলক সবেমাত্র ভারতবর্ষের "অধিকারের" কথা তুলেছেন, গান্ধী যুদ্ধ-সাহায্যের বিনিময়ে কিছুই চাইছেন না, সম্রাটের সেবা করেই তিনি পরিতৃপ্ত।

এই যুগসন্ধিক্ষণে অ্যানি বেসান্ত রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯১৪ সনে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল তাঁর হোম রুল লীগ। বিপন্ন মানব-সভ্যতার বীরোচিত সাহায্য ক'রে ভারতবর্ষ আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করেছে, এই ছিল অ্যানি বেসান্তের রাজনীতির মূল কথা। সে স্বাধীনতা চায় না, ইংরেজ সাম্রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসন পেলেই ভারতবর্ষ পরিতুষ্ট। স্বায়ত্ত-শাসন সে ভিক্ষা করছে না, এ তার দাবী, তার অধিকার। এই অধিকারের ধ্বনি তুলে অ্যানি বেসান্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুললেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতের সপক্ষে প্রবল জনমতের সৃষ্টি করলেন। নরম ও চরম পন্থীদের একত্র করতে ব্যর্থ চেষ্টার পরে তিলকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ্যানি বেসান্ত যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে চরম-পন্থীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯১৭ সনে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রীর ভাষণে অ্যানি বেসান্ত

সগৌরবে ঘোষণা করলেন, "আমাদের হোম রুল আন্দোলন আশ্চর্য বলশালী হয়েছে দলে দলে মেয়েদের যোগদানে। নারীসুলভ বীরত্ব, ধৈর্য ও স্বার্থত্যাগ দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে মেয়েরা দশগুণ এগিয়ে নিয়েছে। হোম রুল লীগের সবচেয়ে কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান, কর্মী ও নেতাদের মধ্যে সমস্ত ভারত থেকে এগিয়ে-আসা মেয়েরা বিশিষ্ট। আর মাদ্রাজের মেয়েদের সবচেয়ে গৌরব যে পুরুষদের শোভাযাত্রা যেখানে আটকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে তাদের শোভাযাত্রা গেছে এগিয়ে; মন্দিরে মন্দিরে দেশমাতৃকার পূজা দিয়ে বহু মানুষের মনের অন্ধকার তারা ঘুচিয়েছে।"

প্রতিনিধিদের আসনে ব'সে সে ভাষণ শুনল সাবিত্রী।

কয়েক বছরের মধ্যেই অ্যানি বেসান্ত পিছিয়ে পড়লেন, ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন নতুন পথে অভিনব নেতৃত্বে এগিয়ে চলল। সাবিত্রীও চলল এগিয়ে। তখন সে প্রবাহিণী। পথ তার অনন্ত।

১৯১৭ থেকে ১৯২০, এই চার বছরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারা একেবারে বদলে গেল। সারা দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলে গান্ধী আন্দোলনের কেন্দ্র-বিন্দু হলেন। দেশ জাগল ব্যথায়, অপমানে, উৎপীড়নে, প্রবঞ্চনার দহনে। গান্ধীর সঙ্গে হাত মিলালেন একদিকে প্রবীণ নতুন নেতাগণ—মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, বিঠলভাই প্যাটেল, অন্যদিকে নতুন দীক্ষায় নতুন দৃষ্টি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত নবীনের দল—জবাহরলাল, সুভাষ বসু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, আবদুল গফুর খান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত আশীর্বাদ ও প্রশস্তিতে গান্ধী-ভূমিকা অধিকতর আলোকিত হ'ল।

এ আলোর ছটা পড়ল সাবিত্রীর জীবনে।

অ্যানি বেসান্তের হোম রুল আন্দোলন যুদ্ধান্তে ব্রিটিশ দমননীতির ধাক্কায় ভেঙ্গে গেল। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করল, মিসেস বেসান্ত এ দাবীর সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারলেন না। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তিনি সংগ্রামের তীব্রতা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁকে পরাস্ত করল। দেশ এক অভিনব আলোক-বন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; জাগল চাষী, মজদুর, যুবক, নারী; এক কথায় সমস্ত জনসমুদ্র জেগে উঠল। সাবিত্রী জেগেই ছিল, এবার বিরাটতর জাগরণে মিশে গেল। ধর্মরাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেলহীন দীপশিখার মত ব্যথাতুর ম্লান; তাতে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। সে অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে সাবিত্রী মুক্তি-সংগ্রামের আলোয় ঝাঁপ দিল।

১৯১৯ সনে রাওলাট আইনের দৌরাত্ম্যে ভারতবর্ষ যখন আর্ত, বিহ্বল, গান্ধী একদিন আধ-নিদ্রা আধ-জাগরণে নতুন সংগ্রামপথের সন্ধান পেলেন। দেশব্যাপী হরতালের আহ্বান করলেন গান্ধী, আর তক্ষুনি দেশ জেগে উঠল। এই হরতালের পরিণতি হ'ল, দু'বছর পরে, প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে। আন্দোলনের জন্যে, দেশবাসীকে তৈরীর জন্যে, অক্লান্ত গান্ধী ভারতবর্ষ পর্যটন করতে করতে ১৯২১ সনের সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজে উপস্থিত হলেন। শবরীর মত বুঝি সাবিত্রী এ মহাদিনের অপেক্ষা করছিল। অ্যানি বেসান্তের নির্দেশে গান্ধী-অভ্যর্থনার বিরাট্ আয়োজনে সাবিত্রী উঠে-পড়ে লেগে গেল। আয়োজন যখন সমাপ্ত-প্রায়, এবং গান্ধী মাদ্রাজে আসবার পথে মাদুরাই শহরে, তখন সাবিত্রী আর এক নাটকীয় কাজ ক'রে বসল। তের বছর বয়সে লুকিয়ে সে মাদুরাই ত্যাগ করেছিল, আজ একত্রিশ বছর বয়সে সোজাসুজি সে মাদুরাই উপস্থিত হ'ল।

সে দিনটি সাবিত্রী আমার মনে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৯২১ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সেদিন অর্দ্ধ-নগ্ন ফকির হয়ে মহাত্মা হলেন। পরের দিন কারাইকুড়িতে বক্তৃতা দিতে যাবার কথা। আগের দিন সকাল দশটায় সেদিন নাপিত এসে গান্ধীর মাথা কামিয়ে দিল। দীর্ঘাকৃতি টিকি ও সামনের একটি ফোগলা দাঁতে গান্ধীকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। বাইশে প্রত্যূষে গান্ধী শয্যাত্যাগ করলেন; স্নানান্তে বাস-বসন চিরদিনের জন্যে বর্জন করলেন। এক হাত চওড়া এক টুকরা খদ্দর তাঁর লজ্জা নিবারণ করল।

সেদিন সকাল আটটায় সাবিত্রী মহাত্মার পায়ে প্রণাম করল। মাথায় হাত বুলিয়ে গান্ধী প্রশ্ন করলেন, "তুমি কে বেটি?"

সাবিত্রী শুধু বলল, "আমি আপনার শিষ্যা।"

মহাত্মা আবার তার মাথায় হাত বুলালেন। চোখের জলে সাবিত্রীর গাল ভেসে গেল।

মাদ্রাজে গান্ধী-অভ্যর্থনায় সাবিত্রী মুখ্য অংশ গ্রহণ করল। সাবিত্রী আমার আজও মনে আছে, অ্যানি বেসান্ত,—ছোট ছোট সাদা চুল ও আলখাল্লায় তাঁকে একজন বৃদ্ধ পুরুষের মত দেখাচ্ছিল—শ্রীনিবাস শাস্ত্রী-দের সঙ্গে চেয়ারে বসে আছেন খালি গায়ে চিন্তাকুল মহাত্মা, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতে চিবুক ন্যস্ত। মেয়েদের অভ্যর্থনা সভায়ও তেমনি নিরাবৃত-দেহ গান্ধী, কিন্তু মুখে কি প্রশান্ত হাসি। আরও মনে আছে জনসভায় অ্যানি

বেসান্তের আগে আগে রসিকতা করতে করতে এগিয়ে যাওয়া গান্ধী, শুধু কোমরে একটুকরো শুভ্র খদ্দর, হাতে খদ্দরের ঝুলি!

দশ-বার বছর এক বিরাট্ নেশায় কেটে গেল সাবিত্রীর। দুই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিন বার তার জেল হ'ল। গান্ধীর অনুমতি নিয়ে সে সবরমতী আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, সেখানকার গঠনমূলক কাজে নিজেকে পূর্ণ নিযুক্ত করল। এককালের নিঃসহায় নির্ভীক সাবিত্রী দেশনেত্রী হ'ল। এখন সবাই তাকে বলে সাবিত্রী বহিন্।

জীবন যে কোন্ অমোঘ রহস্যের চাপে কোন্ অজানা আশ্চর্য পথে মোড় নেয়, মানুষ তার কতটুকু বুঝতে পারে? দিনের বেলা প্রাচীর-গায়ে গাছের ছায়ার মত বার বার তার চেহারা বদলে যায়। জীবন বার বার পেছন থেকে এসে আমাদের চমকে দেয়।

সাবিত্রীকে যে যৌবন-উত্তর অধ্যায়েও জীবন আবার ভয়ানক চমকে দেবে তার জন্যে সে একটুও প্রস্তুত ছিল না।

শিষ্য-শিষ্যাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে গান্ধীর মনোযোগ সজাগ ছিল। সাবিত্রীর সবকথা তিনি জানতেন, স্বামীর সঙ্গে শীতল সম্পর্কের কথাও। সাবিত্রীর নিজস্ব প্রত্যয়ে হস্তক্ষেপ না ক'রে তাঁর উপদেশ ছিল, স্বামীর সঙ্গে সে যেন শান্ত, নম্র, শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। সাবিত্রীরও তাই ইচ্ছে। ধর্মরাজ ধর্মচর্চায় নিমগ্ন; সাবিত্রীর রাজনৈতিক ভূমিকার সে অনুমোদন করে নি, বাধাও দেয় নি। সাবিত্রীকে যে আদর্শের টানে সে বিবাহ করেছিল তা পূর্ণ হবার পরিতৃপ্তিকে সে যথেষ্ট পুরস্কার মনে করত। গত পনের ষোল বছরে কিছু বিধবা বিবাহ যে তামিলনাদেও সম্ভব হয়েছে, তার সাহসী কর্মের এ শুভ পরিণামে সে সন্তুষ্ট ছিল। সাবিত্রীকে যে সে মাতৃত্ব দিতে পারে নি, তাতে তার দুঃখ ছিল, লজ্জা ছিল না। বস্তুতপক্ষে জন্মদানের শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিল সে নিজে, না সাবিত্রী, এ নিয়ে তার কিছু নীরব সন্দেহ ছিল। সাবিত্রীর সন্দেহ ছিল না একটুও। কিন্তু কোনও দিন এ নিয়ে ধর্মরাজ বিবাদ করে নি। মনে মনে কেবল বলেছে, সব কিছুর ক্ষমতা সবাকার থাকে না, সব কিছুর প্রয়োজনও না। তোমাকে পত্নীত্ব দিয়েছি, তাই যথেষ্ট। মা না হলেও তোমার চলবে।

উনিশ শ' বত্রিশ সনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সাবিত্রী সবরমতী আশ্রমে ফিরে এসেছে। একদিন ধর্মরাজ এসে উপস্থিত হ'ল। বিস্মিত হ'ল সাবিত্রী, খুশীও হ'ল, ভয়ও পেল। ধর্মরাজ বলল, তার দেহ ভাল যাচ্ছে না, সাবিত্রীকে দেখবার হঠাৎ বড় ইচ্ছে হ'ল, তাই হঠাৎ চ'লে এসেছে। সাবিত্রী স্বামীকে যত্নের ত্রুটি করল না, সম্মানের কার্পণ্য করল না। কিন্তু দেখতে পেল তাদের সম্পর্ক পাথরের মত জমে গেছে, কোনও উত্তাপেই আর গলছে না। তার আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে পঞ্চাশোর্ধ ধর্মরাজ সে সম্পর্কে দেহের আগুন লাগাল। সাবিত্রী গলল না। কিন্তু হায় ভগবান্, হায় ভগবান্, ধর্মরাজ দু' মাস পরে বিদায় নেবার পর বিয়াল্লিশ বছরের সাবিত্রী জীবনে সর্বপ্রথম মাতৃত্বের পথে লজ্জায় দুর্বল পা বাড়াল।

উনিশ শ' তেত্রিশ সনে জন্ম হ'ল সরোজার।

তাকে জন্ম দিতে সাবিত্রী মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত চ'লে গিয়েছিল। কিন্তু সে বাঁচল। খবর পেয়ে ধর্মরাজ এসে উপস্থিত হ'ল। সাবিত্রী এবার তাকে গ্রহণ করতে পারল না।

"তুমি এ আমার কি সর্বনাশ করলে?" জ্বালাময় চোখে প্রশ্ন করল সাবিত্রী।

"কেন? সর্বনাশ কি হ'ল? তুমি ত মা হ'তে চেয়েছিলে।"

"সে একদিন ছিল। কোন্‌দিন তা আজ ভুলে গেছি। আজ এই বুড়ী বয়সে এ শাস্তি কেন দিলে আমায়। লজ্জায় আমি কারুর কাছে কতদিন দাঁড়াতে পারি নি। এই শিশুকে নিয়ে আমি কি করব। কে ওকে মানুষ করবে?"

"তুমি চ'লে এসো আমার সঙ্গে।"

"তা আর হয় না। আমার কর্তব্য এখন অন্য। সে কর্তব্য আমি ত্যাগ করতে পারব না। তা ছাড়া, এতদিন পর তোমার সঙ্গে—না, তা আর হয় না।"

"অর্থাৎ তুমি রাজনীতি ছাড়তে পারবে না! নিজের মেয়ের জন্যেও না!"

"রাজনীতি নয়। দেশের মুক্তি। গান্ধীজি ডাকলেই আমি আবার বেরিয়ে পড়ব।"

"তোমাকে ছাড়াও দেশের মুক্তি হবে।"

"হবেই ত। কিন্তু দেশের মুক্তি ছাড়া আমার মুক্তি হবে না। আমি বন্দী হয়ে আছি সে শৃঙ্খলে, যে-শৃঙ্খলে দেশ বাঁধা।"

"ওর কি ব্যবস্থা করবে?"

"তুমি ওকে মানুষ করবে। এটুকু তুমি আমার জন্যে ক'রো।"

"আমি?" অসহায় নির্বুদ্ধি দৃষ্টিতে তাকাল ধর্মরাজ। "আমি পারব?"

"তোমাকে পারতেই হবে।"

সরোজা কেমন ক'রে কোথায় কবে মানুষ হ'ল সাবিত্রী আম্মা ভাল ক'রে জানেন না। তার এক বছর বয়সে তিনি আবার জেলে গেলেন। আশ্রমে রয়ে গেল সরোজা। আট মাস পরে সাবিত্রী আম্মা ফিরে এলেন। সরোজার বাল্যকাল কাটল সবরমতী আশ্রমে। আঁধারে-আলোকে ভারতবর্ষ মুক্তির পথ খুঁজছে। এমনি ক'রে কেটে গেল তৃতীয় দশক। উনিশ শ' সাঁইত্রিশে সাবিত্রী আম্মা কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধিতা ক'রে রাজা-গোপালাচারির বিরাগভাজন হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি নতুন সংগ্রামের সম্ভাবনায় মেতে উঠলেন। বিয়াল্লিশে পুনরায় কারাবাস হ'ল। জেলে ব'সে জানতে পারলেন, সরোজাকে ধর্মরাজ মাদ্রাজে এক কনভেন্টে ভর্তি ক'রে দিয়েছে। হষ্টেলে সে বাস করে। ছেচল্লিশে মুক্তি পেলেন সাবিত্রী আম্মা, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর। মাদ্রাজে গিয়ে বার বছরের সরোজাকে দেখে তাঁর বহু অতীতের আর একটি সদ্য-বিবাহিত' দ্বাদশী মেয়ের কথা মনে পড়ল। দুই পৃথিবীর পারে তারা দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝখানকার অনন্ত ব্যবধানে একমাত্র সেতু সাবিত্রী আম্মা। বড় দুর্বল, বড় ক্ষীণ মনে হ'ল সেতুকে।

বছর খানেক পরে নেতাদের একজন সাবিত্রী আম্মাকে প্রশ্ন করলেন, "এবার আপনি কি করবেন?"

বিস্মিত সাবিত্রী আম্মার মুখ দিয়ে জবাব বেরিয়ে এল, "কেন? কাজ কি সব ফুরিয়ে গেছে?"

"ফুরোয় নি। বদলে গেছে।" সুবিজ্ঞ দূরদৃষ্টি দেখিয়ে নেতা বললেন। "এতদিন আমরা ভেঙ্গেছি। এবার গড়ব।"

"খুব বেশি কিছু ভেঙ্গেছি বলে ত মনে হচ্ছে না। অবশ্য একমাত্র দেশটাকে ছাড়া," বিষণ্ণ হাস্যে সাবিত্রী আম্মা জবাব দিলেন।

"ও কথা তুলে আর লাভ নেই," উষ্ণ হলেন নেতা। "যা হয়ে গেছে তা নিয়ে শোক বৃথা। এবার আমাদের দেশ শাসন করতে হবে। পুনর্গঠন করতে হবে।"

"আগে শাসন, পরে পুনর্গঠন?" সাবিত্রী আম্মার কণ্ঠে শ্লেষ ফুটে উঠল।

"দুই-ই একসঙ্গে", দৃঢ়তার সঙ্গে টেবিল চাপড়ে ঘোষণা করলেন নেতা।

"আমি গান্ধীর চেলা। শাসনে লোভ নেই। এক আত্মশাসন ছাড়া।"

"গান্ধীর চেলা আমরা সবাই। ওতে একচেটিয় দাবী কারুর নেই।"

"তা সত্যি।"

"আমাদের কিছু মহিলা মন্ত্রী চাই। আপনি মাদ্রাজে মন্ত্রী হতে রাজী আছেন?"

"না।"

"কেন?"

"প্রথম কথা, মন্ত্রিত্বে আমার লোভ নেই। দ্বিতীয় মাদ্রাজে আমার স্থান নেই। মাদ্রাজ আমায় কোনও দিন ক্ষমার চোখে দেখবে না। তামিল সমাজ আপনি জানেন না।"

"তাহলে?"

"আমি সবরমতীতে ফিরে যাব। আর, যদি গান্ধীজি ডাকেন, তাঁর পিছু নেব।"

গান্ধীজি ডাকেন নি সাবিত্রী আম্মাকে। পত্রের উত্তরে জানিয়েছিলেন, দুর্গম পথে জীবনের সায়াহ্নে তিনি পা বাড়িয়েছেন, সেখানে সাবিত্রী আম্মার মত বৃদ্ধার যাওয়া উচিত হবে না। তার চেয়ে হরিজন সেবা নিয়ে ওয়ার্ধায় কাজকর্ম করলে তিনি বেশি খুশী হবেন। আদেশ মেনে নিয়ে সাবিত্রী আম্মা ওয়ার্ধায় চলে এলেন। কিন্তু কাজে আর তেমন মন বসল না। কংগ্রেস দেশ-শাসনের উদ্যোগে আর সব কিছু ভুলে গেছে। জনকল্যাণ, দেশ-গঠন, সমাজ-নির্মাণ সব নতুন রাষ্ট্রের গর্বিত দায়িত্ব। রাজদরবারের বাইরে সব কিছু অনাদৃত, অবহেলিত।

গান্ধীর মৃত্যুর পর অনাদর অবহেলা আরও বেড়ে গেল। সাবিত্রী আম্মা এই নিঃসঙ্গ অবকাশ সইতে পারলেন না। কোন এক অভাবিত নেশায় দেশ কোথায় যেন ধেয়ে চলেছে, কে পেছনে পড়ে রইল, কোন্ পুরাতন জীর্ণ আদর্শের টানে, তাকিয়ে পর্যন্ত দেখবার সময় নেই। পঁচিশ-ত্রিশ বছর দেশের অগ্রগামী সেনার সঙ্গে চলবার পর আজ এই নির্বাসিত জীবন তাঁর অসহ্য হ'ল।

একদিন সুযোগমত সেই দেশনেতার কাছে নিজের দুরবস্থার কথা নিবেদন করলেন সাবিত্রী আম্মা।

তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, "যখন বলেছিলাম তখন কানে তোলেন নি, এখন ত কিছু করা মুশকিল। একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

"কতদিন?"

"কি ক'রে বলি? খুব বেশি দিন হয়ত নয়। ভাববেন না, আপনাকে আমরা ভুলে গেছি।"

অর্থাৎ ভুলে যে যাই নি সে আমাদেরই মহত্ত্ব।

আমরা সহকর্মীদের মনে রেখেছি। না রাখলেও দোষ হ'ত না। কিছু অতীত-বিস্মৃত আমরা নই। সাবিত্রী আম্মার কান গরম হ'ল লজ্জায়, অন্তর আহত হ'ল দৈন্যে। বলবার, করবার কিছু নেই। তাই চুপ ক'রে রইলেন।

বছর খানেক পরে কনষ্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির সভ্যা মনোনীত হলেন সাবিত্রী আম্মা। ষাটের কাছাকাছি এসে আবার নতুন জীবন স্থুরু হ'ল। ১৯৫২ সনের নির্বাচনে মাদ্রাজ তাঁকে টিকেট দিতে রাজী হ'ল না। কেন্দ্রীয় নেতাদের চেষ্টায় বোম্বাই থেকে তিনি স্বল্পায়াসে নির্বাচিত হলেন। তাতে সাবিত্রী আম্মা দুঃখিত হলেন না; বরং স্বপ্রদেশে স্বীকৃতি না পেয়ে তাঁর চিত্ত প্রাদেশিক সীমানার বাইরে প্রসারিত হ'ল।

সরোজা কি ভাবে কোন্ প্রভাবে বড় হ'ল সাবিত্রী আম্মা তার সন্ধান রাখতে পারেন নি। যে আত্মজার জন্ম তাঁকে আনন্দ দেয় নি, নির্দিষ্ট প্রত্যাশা-জর্জর দিনের বহু পরে এসে যে বিনাদোষে অম্বাগত, তাকে বুকে চেপে মাতৃস্নেহের অবরুদ্ধ পিপাসা মেটাবার সুযোগ এ জীবনে আর তাঁর হ'ল না। তবু কালের গতিতে পরিবর্তিত মনে মাঝে মাঝে অসহায় কাতরতা অনুভব করেছেন, হঠাৎ অকারণে সব কিছু খালি লেগেছে। সুযোগ হলে এমন অনুভূতির টানে মাদ্রাজে গিয়ে মেয়েকে কয়েকবার দেখে এসেছেন। তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, হৃদয়ের গহন গোপন আর্ত কামনা হাত বাড়িয়ে সরোজাকে কাছে টানতে চেয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই দুই পৃথিবীর মাঝখানে অতল সমুদ্রের ব্যবধান দেখতে পেয়েছেন। স্বল্পভাষিণী সরোজার চোখে-মুখে কুমারী সারল্যের অন্তরালে সাবিত্রী আম্মা দুর্বোধ্য কাঠিন্যের আভাস পেয়েছেন। মেয়ের সঙ্গে কথার চেয়ে নীরবতার আদান-প্রদানই বেশি; নীরব সরোজার চোখে তাকিয়ে মনে হয়েছে, সে যেন অনেক কিছু দেখে নিচ্ছে, অনেক বেশি বুঝে ফেলেছে, যেন তার দৃষ্টির কাছে ফাঁকি ঢোকবার উপায় নেই। কোনও কিছুতেই সরোজার উৎসাহের উচ্ছ্বাস নেই, কোনও কিছু যেন সে জোর ক'রে চায় না, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার স্তিমিত। কিন্তু বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, মেধা ধারাল। হষ্টেলে থেকেও সে প্রধানত নিঃসঙ্গ, নিরুচ্ছ্বাস।

ধর্মরাজ নিয়মিত তার খোঁজ করেন, কিন্তু বাবার সঙ্গেও তার সমান ব্যবধান। একমাত্র-বড়-মিল স্বল্পভাষণ তাদের ব্যবধানকে যেন আরও পাকা করেছে। ধর্মরাজ বার্ধক্যে ধর্ম নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু সরোজাকে সে পথে একেবারে টানতে পারেন নি।

একদিন বলেছিলেন, "তুমি তোমার মায়ের মত ধর্মে উদাসীন হয়েছ।"

উত্তরে সরোজা চট্ ক'রে বলে উঠেছিল, "আমি আপনার মত রাজনীতিতেও উদাসীন।"

সরোজা যেবার বি. এ. পাস করল সাবিত্রী আম্মা লোকসভায় নির্বাচিত হলেন। সরোজাকে অনুরোধ করে প্রথমবার দিল্লীতে আনালেন। ভাবলেন, এক সঙ্গে বাস করলে ব্যবধান কমবে। তা হ'ল না। বরং ব্যবধান বাড়ল। সরোজার মধ্যে সাবিত্রী আম্মা বার বার নিজের যুবতী জীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজলেন। পেলেন না। তাঁর নিজের সৌন্দর্য ছিল শান্ত, দীপশিখার মত কোমল। সরোজা বহ্নি-শিখার ন্যায় তীক্ষ্ণ, ধারাল। তাঁর অন্তরে ছিল বিদ্রোহের অদম্য দুঃসাহস। সরোজার মধ্যে কেবল জলন্ত অস্থিরতা। তাঁর জীবনের গতি ছিল আদর্শের পথে প্রসারিত; সরোজা জীবনের উত্তাপই যেন অনুভব করে না। তিনি করেছিলেন বলিষ্ঠ কৃচ্ছ্রসাধন। সরোজা করছে কুপিত আত্ম-পীড়ন।

একদিন মেয়েকে কাছে ডেকে সাবিত্রী আম্মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি এবার কি করবে?"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে সরোজা উত্তর দিয়েছিল, "আমার কি কিছু করা দরকার?"

"কিছু একটা করবে ত জীবনে?"

"কেন?"

"কিছু না ক'রে জীবন তোমার কাটবে?"

"না কাটলে তখন দেখা যাবে।"

"বিয়ে করবে?"

এমন অকপট বিতৃষ্ণা সরোজার মুখে ফুটে উঠেছিল যে সাবিত্রী আম্মা চমকে উঠেছিলেন।

তবু আবার প্রশ্ন করেছিলেন, "করবে বিয়ে?"

সরোজা উত্তর দেয় নি।

"বিদেশে গিয়ে পড়বে?"

"ইচ্ছে নেই।"

"মাদ্রাজে এম. এ. পড়বে?"

"এখন ত নয়।"

"তবে?" বড় অসহায় বোধ করেছিলেন সাবিত্রী আম্মা।

পরের দিন লোকসভা থেকে ফিরে আসতে রামস্বামী বলেছিল, সরোজা বিকেলের গাড়ীতে মাদ্রাজ চ'লে গেছে।

এক সপ্তাহ পরে মেয়ের চিঠি পেয়েছিলেন সাবিত্রী আম্মা। কন্যাকুমারীতে থেকে লেখা। "আমাকে নিয়ে কেউ ভাবলে আমি আরও অস্থির বোধ করি। তোমরা এতদিন আমাকে একা থাকতে দিয়েছ। ভবিষ্যতেও যদি দিতে পার তা হলেই তোমাদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা হতে পারবে। আমার সমস্যা আমাকে সমাধান করতে দাও।"

সরোজার কি সমস্যা সাবিত্রী আম্মা মা হয়েও, জানেন না। এ যেন অন্য পৃথিবীর অন্য গ্রহের সমস্যা।

সে ঘটনার পরে মেয়েকে তিনি ঘাঁটান নি। বছরে দু' তিনবার সে তাঁর কাছে আসে, এবার এসে একটা দৈনিক কাগজে ছোট রকমের কাজও জোগাড় করেছে। সে তার নিজের মনে থাকে। মাঝে-মধ্যে তাকে বন্ধু-বান্ধব সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচিত করবার চেষ্টা করেন সাবিত্রী আম্মা, কিন্তু এমন বিদ্রূপাত্মক তার ব্যবহার যে তিনি নিজেই লজ্জা পান, শঙ্কিত হন, দুর্বল বোধ করেন। দেববাণীকে পেয়ে কেন জানি তাঁর মনে হঠাৎ একটু নতুন আশা হ'ল। দেববাণী একালের মেয়ে হলেও তার সংগ্রাম, সমস্যার সঙ্গে সাবিত্রী আম্মা নিজের জীবনের যোগসূত্র দেখতে পান। যে সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ভিন্ন কালে, অন্য পথে, বৃহত্তর জীবন-বৃত্তে দেববাণী যেন সে সংগ্রামই অন্যরূপে চালিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া, দেববাণী মা। সে তাঁর গোপন গভীর ব্যথা বুঝবে। এ সব ভেবে সাবিত্রী আম্মা দেববাণীর শরণাপন্ন হয়েছেন। সরোজা তাঁর কাছে অচ্ছেদ্য রহস্য, অজ্ঞাত শঙ্কা, সদাসঙ্গী বেদনা। দেববাণী হয়ত এ রহস্যের সমাধান করতে পারবে।

অন্তত তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারবে সরোজা কোন্ বৃত্তে প্রদক্ষিণ করছে, সে কে, সে কেন, সে কার।

ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল সাবিত্রী আম্মার। জীবনে বহুদিন যা হয় নি, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম আসবার ঠিক আগে দু'টি নারীমূর্তি তাঁর তন্দ্রাজড়িত চোখের সামনে ভেসে উঠল। কুড়ি বছরের বিধবা কুমারী সাবিত্রী, আর কুড়ি বছরের কুমারী সরোজা। দু'জনে চেয়ে আছে দু'জনের দিকে। অপরিচিতের বিস্মিত দৃষ্টি। দু'জন দু'জনকে বলছে, আমি তুমি নই। তুমি আমি নও।

ক্রমশঃ
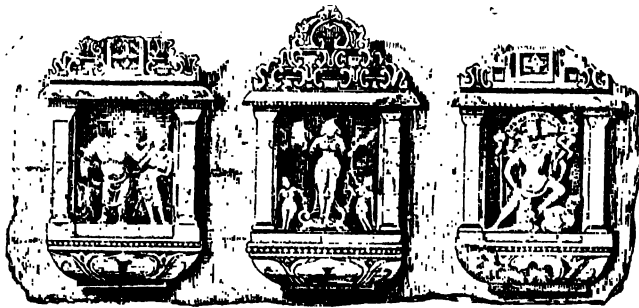
# রামানন্দ-যোগেশচন্দ্র-সংবাদ

শ্রীসুখময় সরকার

[ 'প্রবাসী'-প্রতিষ্ঠাতা ভারতমুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং 'প্রবাসী'র নিয়মিত লেখক মহামনীষী আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি নিবিড় বন্ধুত্ব-সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ ছিলেন। আট বৎসরের অধিককাল আমার

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জীবনে আচার্য যোগেশচন্দ্রের সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি রামানন্দবাবুর কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। আমি রামানন্দবাবুর কথা শুনিতে ভালবাসি দেখিয়া তিনিও আগ্রহ-সহকারে আমাকে তাঁহার কথা শুনাইতেন। বোধ হয় ভাবিতেন, ভবিষ্যতে আমি সেসকল কথা লিখিতে পারি। ( কিন্তু হায়! আমার লেখনী তেমন শক্তিশালিনী নয়। ) একই কথা এত অধিকবার শুনিয়াছিলাম যে, তাহা প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং কিছু কিছু নোট করিয়াও রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে 'প্রবাসী'র হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই দুই লোকোত্তর পুরুষের সংলাপ-কণিকা সঙ্কলন করিয়া 'প্রবাসী'-পাঠককে উপহার দিতেছি। এই রচনাটি 'প্রবাসী'র ষষ্টি-বার্ষিক স্মারকগ্রন্থে স্থান পাইলে বোধ হয় ভাল হইত। কিন্তু দোষ আমারই, যথাসময়ে রচনাটি পাঠাইতে পারি নাই। এই 'সংবাদে' যে স্থান-কালের উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা আনুমানিক হইলেও কাল্পনিক নহে। ]

এক

ইং ১৯১২ সন, অক্টোবর মাস। বাঁকুড়া-ইস্কুলডাঙ্গায় যোগেশচন্দ্রের বাসা-বাটী। তিনি অসুস্থ হইয়া, অল্পকাল হইল, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত কটক হইতে বাঁকুড়ায় আসিয়াছেন। একদা বৈকালে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রামানন্দ তাঁহার বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। গৌরকান্তি, পুষ্ট দেহ, প্রশান্ত চক্ষু, গম্ভীর মুখ। যোগেশচন্দ্র একটি কম্বলের আসনে উপবিষ্ট।

রামানন্দ। নমস্কার! আমি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

যোগেশ। নমস্কার, নমস্কার! স্বাগত, সুস্বাগত! বসুন ঐ চেয়ারে।

রামানন্দ। না, না। এই আপনার পাশেই বসি ( কম্বলের আসনের একপার্শ্বে বসিলেন )। তার পর— এখানে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে ত?

যোগেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হচ্ছে।

রামানন্দ। বাঁকুড়া কেমন লাগছে আপনার?

যোগেশ। আপনাকে ত আগেই চিঠিতে লিখেছিলাম, বাঁকুড়া আমার একেবারে অজানা নয়! আমি এখানে ছেলেবেলায় এক বছর কাটিয়েছি। এখানকার জেলা-ইস্কুলেই আমার ইংরেজী হাতে-খড়ি হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি যে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে ছাদে উঠে ঘুড়ি উড়াতাম, তার নাম মনে পড়ছিল না। আমার গৃহশিক্ষকের মূর্তিখানি মনে আছে, নামটি মনে পড়ছিল

না। আপনাকে এসব কথা লিখেছিলাম। দিনকুড়ি পরে আপনার চিঠিতে দেখি, আপনি আমার বাঁকুড়া-বাসের হাট-হদ্দ সমুদয় আবিষ্কার করেছেন। আপনি শিক্ষক না হ'য়ে টিকটিকি-পুলিস হ'লে এতদিন নাম করতে পারতেন। (উভয়ের হাস্য)।

রামানন্দ। আচ্ছা, আপনিও ত কিছু কম যান না। বলুন ত, আমি যে বাঁকুড়ার লোক, একথা আপনি জানলেন কেমন ক'রে।

যোগেশ। আপনি তখন 'প্রদীপে'র সম্পাদক থাকতেন এলাহাবাদে। তৃতীয় বর্ষের 'প্রদীপে', বোধ হয় ১৮৯৯ সনে আপনি দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র সমালোচনা করেছিলেন। দীনেশবাবু কতকগুলি শব্দ অপ্রচলিত বলেছিলেন, কতকগুলি পুরাতন শব্দের অর্থও ধরতে পারেন নি। আপনি দেখিয়েছিলেন, বাঁকুড়ায় সে-সকল শব্দ প্রচলিত আছে, এই এই অর্থে। হফ্‌টন-সাহেব-কৃত বাংলা-ইংরেজী অভিধানেও সেই অর্থ। তখন আমি বুঝি, আপনার নিবাস বাঁকুড়া।

রামানন্দ। সর্বনাশ! আপনার চোখে ধুলো দেওয়া ত সহজ নয়। বিজ্ঞানের শিক্ষক আপনি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) আচ্ছা, আমার কথা কবে আপনি প্রথম শুনেছিলেন?

যোগেশ। ওগো! সে কি আজকের কথা? ১৮৯২ সনে আমি প্রথম আপনার নাম শুনতে পাই। সে বছর কলকাতায় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আপনি আতুরদের জন্য এক আশ্রম খুলেছিলেন। আপনারা নিজদিকে নারায়ণের দাস মনে করতেন। তাই 'আতুরাশ্রম' নাম না দিয়ে 'দাসাশ্রম' নাম দিয়েছিলেন। আংশিক ব্যয়নির্বাহের জন্য আপনারা 'দাসী' নামে একটি ছোট মাসিক পুস্তক প্রকাশ করতেন। আশ্রমের পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন আমার এক পুরাতন ছাত্র মৃগাঙ্কধর রায়। 'দাসী'তে লিখতে তিনি আমায় অনুরোধ করেন। আপনি ছিলেন 'দাসী'র সম্পাদক। 'দাসী'তে দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখতেন। সেই অবধি আপনাকে আমি চিনি। যদিও চাক্ষুষ পরিচয় হ'ল আজ—এই বিশ বৎসর পরে! (উভয়ের মুখে বিস্ময়, চোখে দীপ্তি)।

রামানন্দ। আমার অনুরোধ, আপনি বাঁকুড়ায় স্থায়ীভাবে বাস করুন। আপনাদের আরামবাগে ত শুনেছি, ভীষণ ম্যালেরিয়া। বাঁকুড়ায় আপনি সুস্থ থাকবেন।

যোগেশ। এখনও ত আট-দশ বছর কটকেই থাকতে হবে। তার পর কি হবে, বলতে পারি না। তবে আপনার প্রস্তাব খুব সমীচীন বলেই মনে হচ্ছে। ছেলেবেলায় আরামবাগে আমি ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগেছি। দু'টি বছর বেঁচে ছিলাম না মরে ছিলাম, জানি না।

রামানন্দ। আমারও আজ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। শীতকালে আমরা তিন-চারজন বন্ধু মিলে পাঠকপাড়ার বাড়ী থেকে বেরিয়ে দু' মাইল দূরে নূতন-চটিতে ডক্টর অবিনাশ দাসের বাড়ীতে নুন নিতাম; তার পর পাঁচবাঘা গ্রামে মিশ্রদের বাড়ীতে কুল খেতে যেতাম: সে আরও দু' মাইল হবে। মিশ্রদের গাছে বড় বড় কুল হ'ত। কুল খাবার জন্য চার মাইল অকাতরে হেঁটেছি—এখন আর সে উৎসাহ নেই।

যোগেশ। আপনার উৎসাহ এখনও কিছু কম দেখছি না।

রামানন্দ। ছেলেবেলার কথা শুনুন তবে। যখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি তখন মিষ্টার আর. সি. দত্ত এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি স্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, স্কুলের মধ্যে যার ইংরেজী-রচনা উৎকৃষ্ট হবে, তিনি তাকে প্রাইজ দেবেন। আমি সে প্রাইজ পেয়েছিলাম। বাঁকুড়া সম্বন্ধে লিখবার কথা ছিল। আমি লিখেছিলাম, Chandidas, the foremost poet of Bengal, was the glory of Bankura.

যোগেশ। (সবিস্ময়ে) এই কথা লিখেছিলেন আপনি!

রামানন্দ। আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, লিখব না কেন?, এখন না কি প্রমাণ দিতে হবে! যাক, সে সব ছেলেবেলার কথা। এখন বাঁকুড়াকে কেমন দেখছেন?

যোগেশ। আপনি আমার যে-বাল্যবন্ধুকে আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ছাড়া এখানে আমার জানাশোনা কেউ নেই। আমি বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াই, লোক-চলাচল দেখি। আমার বোধ হচ্ছে, বাঁকুড়া অতি দরিদ্র। আমি কয়দিনে শতাবধি লোক দেখে থাকব। কিন্তু স্থূলকায় একজনকেও দেখি নি। দোহারা কিছু আছে। কিন্তু অধিকাংশই একহারা, শীর্ণ।

রামানন্দ। মোটা একজনও দেখতে পেলেন না?

যোগেশ। না। মনে হয়, লোকে যথোচিত আহার পায় না। বাঁকুড়া এক জেলার প্রধান নগর। যদি নগরেই

এই দশা, গ্রামের দশা আরও শোচনীয় মনে হয়। সকলের মুখ শুষ্ক, মলিন।

রামানন্দ। (নীরব, মুখ শুষ্ক ও মলিন হইয়া উঠিল, কিয়ৎকাল পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া) আর কি দেখলেন?

যোগেশ। আর যা দেখলাম, তাতেও মনে হয়, পুষ্টিকর তেজস্কর আহারের অভাবে এখানকার লোকের মুখে উৎসাহের চিহ্ন নেই।

রামানন্দ। (প্রসন্ন মুখকান্তি মেঘাচ্ছন্ন হইল। কথাটা যেন নূতন শুনিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর বিষণ্ণ মুখে) আজ তবে আসি। আবার সাক্ষাৎ হবে। নমস্কার!

যোগেশ। আসুন। নমস্কার!

দুই

ইং ১৯২১ সন, আগষ্ট মাস। যোগেশচন্দ্র তখন কটক কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য বাঁকুড়ায় আসিয়াছেন। এখনও ভাড়া বাড়ীতে আছেন, নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয় নাই। ইতোমধ্যে রামানন্দ বাঁকুড়ারই স্কুল-ডাঙ্গায় জমি ও বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। সে বাড়ী যোগেশচন্দ্রের বাসাবাটী হইতে অধিক দূরে নহে। একদা বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে রামানন্দ যোগেশচন্দ্রের বাসা-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম সাক্ষাতের পর নয় বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, দেশে বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, গঙ্গার বহু জল সাগরে গড়াইয়াছে। উভয়েই প্রৌঢ়দশা অতিক্রম করিয়া বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপস্থিত।

যোগেশ। আসুন, আসুন! আমার কি সৌভাগ্য! আপনি যথার্থ সাজাত্যমতি, আপনাকে শত শত নমস্কার।

রামানন্দ। আপনাকে সহস্র নমস্কার! আপনি লোকগুরু। কিন্তু 'সাজাত্যমতি' না কি বললেন, ওর অর্থ কি?

যোগেশ। সাজাত্যমতি মানে Nationalist যাঁরা ভারতভূমিকে মাতৃভূমি জ্ঞান করেন, তাঁরা সজাত। সজাতের ভাব—সখ্য, সমদুঃখতা, মৈত্র ঐক্য। সাজাত্য-বৃদ্ধির জন্য আপনি 'প্রদীপে' দেশহিতৈষী স্মরণীয়-কীর্তি নরনারীর চরিতপ্রকাশ করতেন। 'প্রবাসী'তেও করছেন। কংগ্রেস ভারত-সাজাত্যমতিদের মহাসভা। আপনি তার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখেন।

রামানন্দ। সত্য সে কথা। 'প্রদীপে' আমি রাজনীতি-চর্চা করি নি, কিন্তু 'প্রবাসী'তে—

যোগেশ। হ্যাঁ, বারমাসিক পুস্তকে আপনিই সর্বপ্রথম রাজনীতি চর্চা আরম্ভ করেছেন।

রামানন্দ। আবার আমায় ভাবিয়ে তুললেন। বারমাসিক পুস্তক—সে আবার কি জিনিস?

যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি
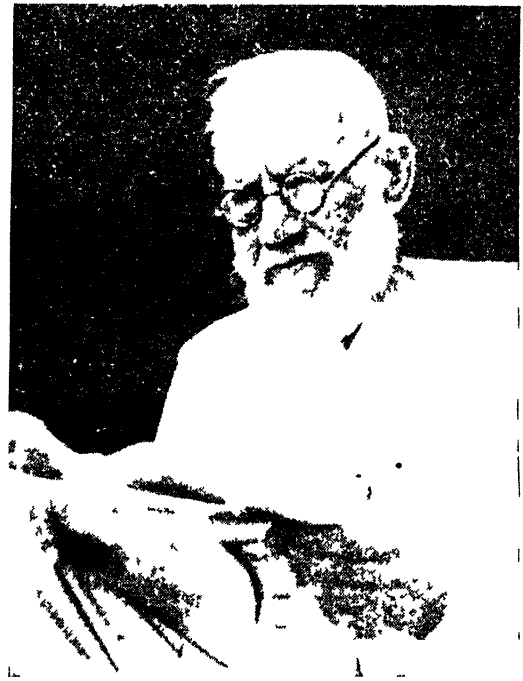
যোগেশ। আপনারা যাকে 'মাসিক পত্রিকা' বলেন, আমি তারেই বলি 'বারমাসিক পুস্তক'। ধরুন এই—'প্রবাসী'—বাঁধান বই, একে কেমন ক'রে পত্র বা পত্রিকা বলি? দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অবশ্য পত্র বা পত্রিকা বটে। পাতা বাঁধা নয়, খোলা। 'প্রবাসী'কে মাসিক পুস্তক বলাই ঠিক। কিন্তু তাতেও এমন বুঝায় না যে, এটি সাধারণ পাঠকের জন্য নানা লেখকের রচিত পুস্তক। অতএব 'বারমাসিক' এই নাম হলেই ভাল হয়। 'বার' শব্দ সংস্কৃত, এর অর্থ 'সমূহ', 'অনেক'। যেমন, বার-ওয়ারী পূজা, অনেকের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজা। ধর্মপুরাণে 'বারমতি পূজা', বহু ধর্মরাজের পূজা।

রামানন্দ। যুক্তি-তর্কে আপনার সঙ্গে আমি পারব না, কেউ পারবে না। কিন্তু কথাটা কি জানেন? সাধারণ লোকে যুক্তিতর্কের বড় ধার ধারে না। 'বার-মাসিক' বললেই ভাববে, বার মাস যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, অথবা বার মাস অন্তর প্রকাশিত হয়।

যোগেশ। লোকের সে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার ভার আপনাদের, বারমাসিক-সম্পাদকদের।

রামানন্দ। সম্পাদকদের কর্তব্য সম্বন্ধে আজ আমায় কিছু উপদেশ দিন।

যোগেশ। ছি ছি, অপরাধী করবেন না আমাকে। আপনাকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই। আপনি এখানেই থাকুন, কলকাতা যাবেন না। এখান থেকেই ত আপনি কাগজ দু'খানা চালাচ্ছেন। প্রভেদ বুঝতে পারছি না।

রামানন্দ। চালাচ্ছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অসুবিধা হয়। আমার সহকারীদিকে লিখতে হয়, এখানে অমুক বই দেখে পূরণ ক'রে নেবেন। সব সময় স্মৃতির উপর নির্ভর করতে পারা যায় না। আর, নানা-দিকে এত জড়িয়ে পড়েছি, কলকাতায় না থাকলে চলে না।

যোগেশ। আপনি এত এত বই পড়েন, লেখকদের এত লেখা পড়েন, মনে থাকে সব?

রামানন্দ। স্মৃতিশক্তি আগে খুব প্রখর ছিল, ইদানীং কমে গেছে। যখন আমি এখানকার জেলা-স্কুলে পড়তাম Bain's English Grammar আমাদের পাঠ্য ছিল। একবার আমাদের মাষ্টারমশায় আমাদের অবহেলা দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন। পরদিন যে ক'পাতা পড়া ছিল, আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলেছিলাম।

যোগেশ। ধন্য আপনি। আমার স্মৃতিশক্তি কখনও এত প্রখর ছিল না, এখনও নয়। হ্যাঁ, অনেকদিন থেকে একটা কথা আপনাকে জানাব ভাবছিলাম। আমি 'প্রদীপে'র সম্পাদককে লিখেছিলাম, "আমার নামে আর প্রদীপ পাঠাবেন না।" ভদ্রলোক কিছু মনে করেন নি ত?

রামানন্দ। কেন সে কথা লিখেছিলেন তাঁকে?

যোগেশ। আপনি 'প্রদীপ' ছাড়বার পর দেখলাম 'প্রদীপে'র ঘৃত নিঃশেষ হয়ে গেছে। নূতন সম্পাদকের হাত দিয়ে এমন কদর্য গল্প বেরিয়েছে, আমি পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। পরের মাসেও দেখলাম সেই রকম অপাঠ্য, অশ্রাব্য গল্প। তাই আমার নামে 'প্রদীপ' পাঠাতে নিষেধ করেছিলাম। সে দুঃখ আজও যায় নি। পাঁজিতে এমন সব কুৎসিত বিজ্ঞাপন ছাপা হয় যে, সামনের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে তবে বাড়ীতে রাখতে পারা যায়।

রামানন্দ। দেখুন, শুধু প্রবন্ধ আর আদর্শমূলক গল্প ছাপলে কোন মাসিক পুস্তকই চলবে না—পাঠক ত সব এক জাতের নয়। তবু আমি 'প্রবাসী'কে আদর্শভ্রষ্ট হতে দেব না। আমার দেহান্তের পর কি হবে জানি না; আমি কিন্তু 'প্রবাসী'র শুচিতা রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। আচ্ছা, আজকের মত বিদায় হলেম। নমস্কার!

যোগেশ। নমস্কার!

তিন

ইং ১৯২৮ সন, গ্রীষ্মকাল। বাঁকুড়া নূতনচটিতে যোগেশ-চন্দ্রের গৃহ নির্মিত হইয়া গিয়াছে। রামানন্দ বাঁকুড়ায় আসিয়াছেন। একদিন বৈকালে অহল্যাবাঈ রোডের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ের সাক্ষাৎ। যোগেশচন্দ্র নব-নির্মিত গৃহে রামানন্দকে লইয়া আসিলেন। আদর-আপ্যায়নের পর আলাপ সুরু হইল। আচার্য যোগেশচন্দ্রের হাতে একখানি 'প্রবাসী'।

যোগেশ। সত্যই আপনি 'প্রবাসী'কে আদর্শভ্রষ্ট হ'তে দেন নি। সব কাগজেই দেখছি থিয়েটরের নট-নটিদের কথা আর তাদের চিত্রে পাতাগুলো ভর্তি! আর চৌদ্দ আনা ভুয়া গল্প, যেগুলো পড়লেই লেখকের বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি 'প্রবাসী'র শুচিতা রক্ষা করছেন। আপনি মহাসত্ত্ব, তাই যুগের বন্যায় ভেসে যান নি।

রামানন্দ। আপনাদের আশীর্বাদ।

যোগেশ। ছি ছি, ওকথা বলবেন না। ব্রাহ্মণ আপনি। আচ্ছা, আপনার মাসিকের নাম 'প্রবাসী' রাখলেন কেন? আপনার প্রবাস-কালে এর জন্ম বলে কি?

রামানন্দ। অনেকেই ঐ রকম মনে করেন। কিন্তু 'প্রবাসী' নামের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু নেই। ভাবটা হচ্ছে—"নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হলে।"

যোগেশ। সাধু, সাধু। আমি কি সাধে বলি, আপনি যথার্থ সাজাত্যমতি?

রামানন্দ। আমার প্রতি আপনার অশেষ অনুগ্রহ।

যোগেশ। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ ততো-ধিক। আপনি চিরদিন আমার প্রতি অনুকূল। আমি

যখন যা লিখেছি, আপনি তখন তাই নিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন। কখনও একটা শব্দ, এমন কি একটা শব্দের বানান কাটেন নি।

রামানন্দ। আপনার রচনার উপর হাত দেব আমি?

যোগেশ। সম্পাদকের সে অধিকার আছে। আমি যখন বাংলা অক্ষর-সংস্কারে মগ্ন ছিলাম, কত বিজ্ঞজনে উপহাস করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, নূতন অক্ষর দ্বারা বাংলাভাষার সর্বনাশ হবে। অক্ষর ও বানান যে এক পদার্থ নয়, সেটা বোঝাতে পঁচিশ বছর লেগেছে। সার জে. সি. বোস আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি বানান পরিবর্তন করতে চান?" একমাত্র আপনি আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আমার উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছিলেন। আপনি দ্বিরুক্তি না ক'রে আমার নূতন অক্ষরে লেখা প্রবন্ধ ছেপেছেন। কম্পোজিটর বিরক্ত, টাইপ নাই; প্রিণ্টর বিরক্ত, টাইপ ভেঙ্গে যায়। তবু আপনি ছেপেছেন। আপনার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।

রামানন্দ। আর, আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকল বাংলা ভাষা, বাঙ্গালী জাতি। সেই সঙ্গে আমিও।

যোগেশ। একটা কথা বলি। 'প্রবাসী'র এই রঙ্গিন মঞ্জুষার জন্যে নিশ্চয় অনেক খরচ হয়; কিন্তু মঞ্জুষা থাকে না, খ'সে পড়ে দিন কয়েকের মধ্যে। আমি এত খরচের প্রয়োজন বুঝতে পারি না।

রামানন্দ। মঞ্জুষা কি? মলাট?

যোগেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামানন্দ। বড় মধুর নামটি ত? কিন্তু আপনি একবার লিখেছিলেন, বহিরাবরণ সুশ্রী হওয়া চাই।

যোগেশ। সুশ্রী অবশ্যই হওয়া চাই। কিন্তু তার জন্য দামী কাগজ, রঙ্গিন চিত্রের প্রয়োজন কি?

রামানন্দ। আচ্ছা, এবার মঞ্জুষার ব্যয়-সংক্ষেপ করতে চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই বহু উপদেশ পাই। এবার বাঁকুড়ায় এলেই সকলের আগে আসব আপনার কাছে। আজ উঠি। নমস্কার!

যোগেশ। নমস্কার।

### চার

ইং ১৯৩৪ সন, শীতকাল। নূতনচটিতে যোগেশচন্দ্রের 'স্বস্তিক' নামক গৃহে তাঁহার পাঠকক্ষ। একদিন সকালে রামানন্দ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

রামানন্দ। বিদ্যানিধিকে অভিবাদন করি। কুশলে আছেন ত?

যোগেশ। নমস্কার, নমস্কার। আজ্ঞে হ্যাঁ, জগদম্বার কৃপায় কুশলেই আছি। কবে এলেন?

রামানন্দ। এসেছি কাল বিকালে। আজ প্রথমেই এলাম আপনার কাছে।

যোগেশ। আমার সৌভাগ্য। ভারতের নির্ভীক মুক্তিদূত আপনি। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক মুক্তির কথা শোনালেই হবে না। এবার কিছু সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা শোনান।

রামানন্দ। কি ভাবে?

যোগেশ। (বারান্দায় রক্ষিত একটি প্রস্তর-প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এটি দেখছেন?

রামানন্দ। (দেখিয়া) আহা! কি অপরূপ! ত্রিভঙ্গ-সংস্থান, সহাস্যবদন, কি মূর্তি এটি?

যোগেশ। আপনিই বলুন না।

রামানন্দ। (প্রতিমার নিকটে গিয়া) নীচে সাতটি ঘোড়া! মনে হচ্ছে সূর্য-মূর্তি।

যোগেশ। ঠিক ধরেছেন।

রামানন্দ। কোথায় পেলেন এটি?

যোগেশ। কোতলপুরে এক দীঘি খুঁড়তে গিয়ে এটি পাওয়া যায়। যুগলকিশোর সরকার নামে এক কবিরাজ আমায় এটি দিয়ে গেছেন। আমি সন্ধান পেয়েছি, বাঁকুড়ার নানাস্থানে এমন অপরূপ প্রতিমা ছড়িয়ে আছে। সে সব একজায়গায় এনে একটি সুন্দর মিউজিয়ম হতে পারে। মিউজিয়মের নামও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি —"চণ্ডীদাস পুরাকৃতি-ভবন।" দেশের লোকে জানুক তাদের অনবদ্য শিল্পকলা, অতুলনীয় ভাস্কর্য। আপনি কি বলেন?

রামানন্দ। বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের অধ্যাপক আপনি; আপনার মুখে একথা শুনে আনন্দে, গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে। আপনি এ সম্বন্ধে লিখতে থাকুন, আমি 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করতে থাকি। এ ছাড়া আমার আর কি সাধ্য আছে, বলুন?

যোগেশ। ওতেই হবে। শিক্ষিত সমাজের চোখের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই বাঁকুড়ার গৌরবময় ইতিহাসের উপাদান। আপনি আমার সহায় হ'ন।

রামানন্দ। বাঁকুড়া আপনার জন্মস্থান নয়, তবু বাঁকুড়াকে এত ভালবাসেন আপনি?

যোগেশ। হ্যাঁ, আমি বাঁকুড়াকে ভালবেসে ফেলেছি, আমি বাঁকুড়ী হয়ে গেছি।

রামানন্দ। সর্বান্তঃকরণে আমি আপনার সহায়তা

করব। আপনি তাড়াতাড়ি লেখা পাঠান। বাঁকুড়ায় প্রস্তাবিত মিউজিয়ম সম্বন্ধে আমি আগামী মাসের 'প্রবাসী'তেই লিখব।

পাঁচ

ইং ১৯৩৮ সন। বিষ্ণুপুরে কাপড়ের কল বসাইতে উদ্যোগী হইয়া রামানন্দ মাঝে মাঝে সেখানে আসেন, বিষ্ণুপুরে আসিলে বাঁকুড়াতেও আসেন। একদা ইস্কুল-ডাঙ্গার বাড়ীর সংলগ্ন মাঠে বসিয়া দুই-এক জন বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে ছিলেন। এমন সময় যোগেশ-চন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাব

যোগেশ। আনন্দময় পুরুষকে নমস্কার!

রামানন্দ। জ্ঞানযোগী পুরুষকে নমস্কার!

যোগেশ। আপনিই আমাকে বাঁকুড়ায় এনেছেন, কিন্তু আপনাকে দেখতে পাই না। এই চার বছরের মধ্যে আর দেখা নেই; কী ব্যাপার, বলুন ত?

রামানন্দ। সময়ের বড় অভাব হয়েছে সম্প্রতি।

যোগেশ। তা ত দেখতেই পাচ্ছি। আর ধন্য আপনার ক্ষমতা। এই বয়সে দু'খানা বড় বড় মাসিক পুস্তক যথাসময়ে চালিয়ে আসছেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধ বাছাই করা একমাত্র কাজ হ'লে বরং বুঝতে পারতাম। কিন্তু মাসে মাসে প্রবাসীতে 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' আর মডার্ণ রিভিয়ুতে 'নোটস্' লিখছেন। সে দুই পুস্তক এক বিষয়ের নয়, একটি অপরটির অনুবাদ নয়। কত বই, কত সংবাদপত্র, কত সাময়িক পুস্তক পড়তে হয়, ভাবতে হয়, ধারণা করতে হয়। তার পর টিপ্পনী করতে পারা যায়। আমরা বাইরের লোক, বারমাসিক-সম্পাদকের কষ্ট বুঝতে পারি না। তা ছাড়া, আজ এখানে যাচ্ছেন, কাল সেখানে বক্তৃতা করছেন, সেন্সাস রিপোর্ট মুখস্থ রেখেছেন, আটঘাট বেঁধে আইন বাঁচিয়ে লিখছেন, মানহানির ধারা মনে রাখছেন। এত কাজ কেমন ক'রে করেন, ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যাই।

রামানন্দ। চালিয়ে ত আসছি।

যোগেশ। তা ত দেখছি।

রামানন্দ। আমার পিতৃপুরুষ ভট্টাচার্য ছিলেন। তাঁদের আলোচালের গুণে আর আশীর্বাদের ফলে চালাচ্ছি।

যোগেশ। আপনার পিতৃপুরুষ ভট্টাচার্য ছিলেন না কি?

রামানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার পিতৃদেব ভট্টাচার্য-কর্ম আর ভট্টাচার্য উপাধি ত্যাগ ক'রে কুলোপাধি 'চট্টোপাধ্যায়' করেছেন।

যোগেশ। অনেকদিন থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ভাবছি। আপনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু অথচ 'প্রবাসী'তে তাঁর 'সোনার তরী'র বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাপিয়েছিলেন। এটা কেমন হ'ল?

রামানন্দ। সমালোচনা করেছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল যদি অকবি, অরসিক, অব্যবসায়ী হতেন, তাহলে তাঁর সমালোচনা লঘুচিত্তের বামাগি মনে করা চলত। কিন্তু তা যখন নয়, তখন সে সমালোচনা প্রকাশ করব না কেন? তা ছাড়া 'সোনার তরী'র অস্পষ্টতা-দোষ আরও অনেকেই দেখিয়েছেন আমিও কবিতাটি অস্পষ্ট মনে করি।

যোগেশ। আপনি আদর্শ বারমাসিক-সম্পাদক (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, Editor-এর বাংলা 'সম্পাদক', এটা কি ঠিক?

রামানন্দ। আপনি কোন্ শব্দ ঠিক মনে করেন?

যোগেশ। Edition যদি 'সংস্করণ' হয়, তবে Editor সংস্কর্তা। লেখকদের রচনা তিনি ত সম্পাদন করেন না, বরং সংস্কার করেন।

রামানন্দ। আগেও বলেছি যুক্তিতে আপনাকে পারব না। কিন্তু 'সম্পাদক' এত ব্যাপক ভাবে চলে গিয়েছে, 'সংস্কর্তা' আর নূতন ক'রে চালানো সম্ভব ব'লে মনে হয় না।

যোগেশ। আজ উঠি। পত্র লিখলে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবেন।

রামানন্দ। এক-আধটু দেরী হ'লে অপরাধ নেবেন না। আমাকে সব কাজ একা করতে হয়।

যোগেশ। একজন সেক্রেটারী রাখুন।

রামানন্দ। সেক্রেটারী রাখার মত টাকা নাই যে।

যোগেশ। আপনি কি এতই দরিদ্র?

রামানন্দ। দরিদ্র বৈ কি। আমি যে বাঁকুড়াবাসী। সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন আপনি আমায় শুনিয়েছিলেন, বাঁকুড়াবাসী দরিদ্র। বাঁকুড়ার দারিদ্র্য কিসে দূর হবে, তাই চিন্তা করছি। বিষ্ণুপুরে কাপড়ের কল বসাবার চেষ্টা সেই চিন্তারই ফল।

ছয়

ইং ১৯৪২ সন (বাং ১৩৪৯)। পূজার ছুটি—বিজয়া-দশমীর দিন। যোগেশচন্দ্র ইস্কুল-ডাঙ্গার বাটীতে রামানন্দকে বিজয়া-সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছেন।

যোগেশ। ব্রহ্মিষ্ঠ চূড়ামণি, নববর্ষে আপনার বিজয় হোক।

রামানন্দ। নিখিল বিদ্যাবিৎ বিদ্যানিধির বিজয় কামনা করি। (উভয়ে আলিঙ্গন। আসন গ্রহণান্তে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া) জানেন না আমি ব্রাহ্ম?

যোগেশ। জানি বলেই ত 'ব্রহ্মিষ্ঠ চূড়ামণি' সম্বোধন করেছি। আপনি এ যুগের যাজ্ঞবল্ক্য।

রামানন্দ। সে কি! আমি যে মোক্ষ-সম্বন্ধে নির্বাক।

যোগেশ। নির্বাক থাকাই ভাল। চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্ম-অর্থ-কাম, এই ত্রিবর্গ আপনার আলোচনার বিষয়। কিন্তু 'প্রবাসী'তে আপনি যা লেখেন, তাতে ত আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। আমি জানি, আপনি আদর্শ ব্রাহ্ম।

রামানন্দ। আপনি আমায় বোঝেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার ছেলেবেলার অনেক বন্ধু আমাকে ঠিক বুঝতে পারেন না। তাঁরা ভাবেন, ব্রাহ্ম হয়ে আমি বুঝি তাঁদের সমাজ থেকে বাইরে চ'লে গেছি।

যোগেশ। আপনার কোন্ বন্ধু এ কথা ভাবেন, জানি না। কিন্তু হিন্দু-সমাজ এ কথা ভাবলে হিন্দু মহাসভা বার্ষিক সম্মেলনে আপনাকে সভাপতিত্বে বরণ করতেন না।

রামানন্দ। তা যেন হ'ল। কিন্তু আজ বিজয়ার দিনে আপনি 'নববর্ষ' না কি বললেন?

যোগেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। যজুর্বেদের কালে এই বিজয়ার দিনেই নববর্ষ হ'ত। সে প্রায় ২৫০০ বছর আগেকার কথা। তখন শারদবিষুব দিনে বৎসর আরম্ভ হ'ত; তাই সংস্কৃতে 'শরৎ' শব্দের এক অর্থ 'বৎসর' হয়েছে।

রামানন্দ। কথাটা নূতন মনে হচ্ছে। আমরা বরাবর শুনে আসছি—'বিজয়া' হ'ল রামচন্দ্রের রাবণ-বধ উপলক্ষ্যে বিজয়োৎসব। একথা পুরাণেও ত রয়েছে।

যোগেশ। হ্যাঁ, কয়েকটি পুরাণে আছে, সে সব অর্বাচীন। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণেই যে নেই সে কথা। কিছুদিন যাবৎ পুরাণ নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।

রামানন্দ। আপনি আর বাকী রাখলেন না কিছু। আচ্ছা, 'প্রবাসী'তে এ সম্বন্ধে লিখুন না।

যোগেশ। লিখব, অনেক কথা লিখব এ সম্বন্ধে। আপনি ছাপবেন ত?

রামানন্দ। নিশ্চয়ই। ভারত-সংস্কৃতির সত্যরূপ আপনি আবিষ্কার করতে থাকেন, আর আমি তাই জনগণের জ্ঞান-গোচর করতে থাকি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

যোগেশ। আপনি যথার্থ দেশভক্ত। জগদম্বার কৃপায় আপনি শতায়ু হোন। আজ তবে বিদায় হলেম। নমস্কার।

রামানন্দ। নমস্কার। কিন্তু বিদায়ের আগে আর একবার আলিঙ্গন দিয়ে যান। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে। (আলিঙ্গন করিতে করিতে উভয়ের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ইহার পর আর কখনও উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই।)
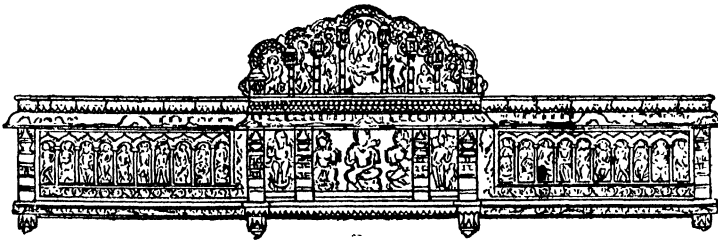
# একটি দাঁতের জন্যে

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

শ্রীমতী শ্যামলী গুহের সেই বয়স, যে বয়সে দাঁতে কামড়ায়। মানে অন্যের দাঁতে নয়, যেমন কুকুর, কিংবা সাপ, কিংবা (দাঁত থাকলে) বিছার নামও করতে পারেন, তার নিজের দাঁতই তাকে কামড়ায়।

দন্তশূল।

বুধবার বিকেল থেকে যন্ত্রণা সুরু হ'ল। যন্ত্রণা-নিবারক যতরকম ঔষধ আছে, কিছুতে কিছু হ'ল না। সেঁক দিতে সারা মুখ ফুলে কুমড়োর মত হ'ল।

আহার বন্ধ। তাঁকে নিয়ে বাড়িশুদ্ধ সকলেরই নিদ্রা বন্ধ। সে কী যন্ত্রণা আর কাৎরানি! সারা দিনরাত ভদ্রমহিলা কাটা ছাগলের মত ছটফট্ করেন।

কিন্তু উপায় নেই। রবিবার পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতেই হ'ল। দাঁতের ডাক্তারের কাছে যে নিয়ে যাবে, শ্রীগুহ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

তিনি ঠিকেদারী করেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সকাল সাতটায় চা-খাবার খেয়ে বার হন, দুপুরে কোনদিন খেতে আসবার সময় পান, কোনদিন তাও পান না। ফেরেন হিসাব-নিকাশ সেরে রাত ন'টা, দশটা, এগারটায়।

তাঁর অবসর রবিবারে।

রবিবারে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে দাঁতটা তিনি তুলে দিলেন। আর কিছুদিন পরে বাঁধিয়েও দিলেন।

এক বৎসর পরে শ্রীমতী গুহের আর একটি দাঁত একই প্রকার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে।

শ্রীমতী প্রমাদ গণলেন। শ্রীগুহও বাড়ি নেই। কখন ফিরবেন তারও স্থিরতা নেই যে, পরামর্শ করবেন কি ডাক্তারখানায় যাবেন।

স্থির করলেন, গোটা দুই যন্ত্রণানাশক বড়ি ত খেয়ে নেওয়া যাক, তার পরে যা হয় দেখা যাবে।

তাই হ'ল। দু'টি বড়ি পর পর গলাধঃকরণ করলেন।

কিন্তু মনে হ'ল গলায় কি যেন আটকে গেছে। গলার নিচে যেন যায় নি। গলার কাছটা খুস খুস করছে।

করুক। বড়ি যখন, তখনই নিশ্চয়ই গ'লে গলার নিচে চ'লে যাবে। কতক্ষণ আর প্রবেশপথে আটকে থাকবে?

এই ভেবে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লে অন্ধকারে চোখ বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে যন্ত্রণ কমতে পারে।

অনেকক্ষণ এইভাবে শুয়ে রইলেন।

কিন্তু যন্ত্রণার কিছুমাত্র উপশম হ'ল না। গল মধ্যেও তেমনি খুস খুস করছে। বড়িটা গলে নি নিশ্চয় গ'লে পেটের মধ্যে না গেলে উপশম হবেই বা কি করে

চোখ বন্ধ ক'রে শ্রীমতী আরও কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন যন্ত্রণা উপশমের প্রতীক্ষায় এবং স্বামীর প্রত্যাগমনে প্রতীক্ষাতেও।

সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে তাঁর কিরকম একটা অভ্যা হয়ে গেছে যে, স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত তাঁ কোন সমস্যারই সমাধান হয় না—কি ব্যক্তিগত, f গার্হস্থ্য।

শ্রীগুহ এলেন রাত্রি ন'টায়।

—শুয়ে যে!

ক্ষীণকণ্ঠে শ্রীমতী গুহ উত্তর দিলেন, দাঁত।

—দাঁত!—শ্রীগুহের চক্ষু চরকবৃক্ষ! আবার দাঁত বললেন, কোন্ দাঁত? কি দাঁত?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। কখনও মনে হচ্ছে উপরের দাঁত, কখনও মনে হচ্ছে নিচের দাঁত। তাছাড়া

—তাছাড়া?

—তাছাড়া যন্ত্রণা কমাবার দুটো বড়ি খেলাম। মনে হচ্ছে একটা বড়ি গলায় আটকে গেছে। সেই থেকে গলার মধ্যে খুস খুস করছে। কিছুতে নিচে নামছে না।

টাইটা খুলতে খুলতে শ্রীগুহ বললেন, ওটা কিছু নয়। এখনই গ'লে নেমে যাবে।

—তাই ভেবেই ত চুপ করে শুয়েছিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, নামছে না ত। বরং অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে। মনে হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। খুব কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীমতী গুহের গণ্ড বেয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু নামল।

শ্রীগুহ বিচলিত হলেন। দাঁতের কথায় তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আগের দাঁতটা খুব ভুগিয়েছিল।

বড়ির কথায় কিছু পরিমাণ আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু চোখের জল তাঁকে বিচলিত করল।

ভুক্তভোগীরা জানেন, একটা বিশেষ বয়সে এই বিচলিত ভাবটাই সাংঘাতিক। ভয়ের চেয়েও সাংঘাতিক।

টাইটা আর খোলা হ'ল না। শ্রীগুহ গৃহিণীর পাশে খাটের উপর বসলেন: কই, হাঁ কর ত দেখি।

শ্রীমতী হাঁ করলেন।

ঝুঁকে প'ড়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখা গেল না।

—আরেকটু হাঁ কর ত।

শ্রীমতী আরও হাঁ করলেন। আরও, আরও! চোয়াল ফাটবার উপক্রম। তথাপি কিছু দেখা গেল না।

শ্রীগুহ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

—কি দেখলে?

শ্রীগুহ বললেন, দেখলাম, সময় যখন খারাপ হয়, তখন এইরকমই হয়।

—কি রকম?

—পোড়া শোলমাছ জলে পালায়। বরানগরে একটা বাড়ি হচ্ছে। ভিৎ খোঁড়া হয়েছে। কালকের বৃষ্টিতে ধারের মাটি গ'লে ভিৎ বুঁজে গেছে। এলাচপুরের রাস্তায় একটা পুল হচ্ছে। অবশ্য কিছু ভেজাল চালিয়েছিলাম। অমন কত চালিয়েছি। বেশী লাভের জন্যে চালাতেই হয়। কখনও তার ধাক্কা আমার ওপর আসে নি। এবার আমারই ওপর পড়ল। কালকের বৃষ্টিতে পুলটি কাৎ হয়ে গিয়েছে।

—একটু বেশী ভেজাল দিয়েছিলে বোধ হয়।

—হয়ত দিয়েছিলাম। কিন্তু এর আগে ওর চেয়ে কত বেশী ভেজাল দিয়েছি। পুলও কাৎ হয়েছে। কিন্তু বিলের টাকাটা আদায় হবার পরে। এবারে সে সময়ও পেলাম না। লাভ দূরে থাক, হয়ত লোকসানই হবে।

সমবেদনায় শ্রীমতী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

শ্রীগুহ বললেন, তার পরে দেখ, একটা বড়ি, গলতে কতটুকু সময় লাগে? গলছে না।

শ্রীমতী বললেন, সন্দেহ হচ্ছে বড়িটাও ভেজাল। পাথরকুচি কিংবা সিমেণ্ট।

বাধা দিয়ে শ্রীগুহ বললেন, সিমেণ্ট নয়। এখনকার সিমেণ্ট বিশুদ্ধ গঙ্গামাটি। তৎক্ষণাৎ গ'লে যাবে। তবে ওই যা বলেছ, পাথরকুচি হতে পারে।

শুনে এই অস্বস্তির মধ্যেই শ্রীমতী হেসে ফেললেন।

শ্রীগুহ বললেন, দাঁতটা খুলে রেখেছ কেন? হাসলে বিশ্রী দেখায়।

—খুলে রেখেছি! খুলে রাখব কেন?

—ওই ত রেখেছ।

শ্রীমতী ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে দাঁতে হাত দিলেন। নেই ত।

শ্রীমতী খাট থেকে ব্যস্ত ভাবে নেমে পড়লেন: কোথায় খুলে রাখলাম!

খুঁজতে লাগলেন। অনেক শখের, অনেক দুঃখের দাঁত। দাঁতের বাটিতে নেই। বালিশের নিচেও না। কলঘরে গিয়ে দেখে এলেন। সেখানেও নেই। চেষ্ট-অফ-ড্রয়ারের মাথায়, টিপয়ের উপর, টেলিফোনের পাশে, অ্যাশ-ট্রে'র ভিতর,—যেখানে যেখানে থাকা সম্ভব এবং সম্ভব নয় সমস্ত স্থান, বাড়ীখানা প্রায় তোলপাড় ক'রে খোঁজা হ'ল, ঝি-চাকর-কর্তা-গিন্নী সবাই মিলে।

না, কোথাও পাওয়া গেল না।

একটি দাঁত। যত ছোটই হোক, চোখে না পড়বার মত ছোট নয়।

শ্রী এবং শ্রীমতী হতাশভাবে শয়নকক্ষে ফিরে এলেন। অনেক দুঃখের দাঁত। তার চেয়ে বেশী, অধরের প্রান্ত টোল খেয়ে যায়। হাসলে বিশ্রী দেখায়। এ বয়সে বিশ্রী দেখানটা কোন ভদ্র-মহিলাই পছন্দ করেন না।

সুবিধার মধ্যে এই হ'ল যে, ডামাডোলের মধ্যে শ্রীমতীর দাঁতের যন্ত্রণা সেরে গেল। কিন্তু তা তিনি টেরও পেলেন না।

শ্রীগুহ বললেন, উড়ে ত আর যায় নি। চুরি করবার জিনিসও নয় যে, কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে। কোথাও আছে নিশ্চয়। তুমিই রেখেছ। ভাল করে ভেবে দেখ, কোথায় রাখতে পার।

শ্রীমতী গুহ ভাবতে লাগলেন।

চিন্তিত চোখ চঞ্চলভাবে ঘোরে বিভিন্ন কোণে।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একসময় স্থির হয়ে গেল। চোখ বিস্ফারিত এবং বাষ্পাচ্ছন্ন। মুখ পাংশু।

—কি হ'ল?

শ্রীমতী বলতে পারছেন না। শুধু ঢোঁক গেলেন। ঠোঁট কাঁপে অথচ কথা বেরোয় না।

শ্রীগুহ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কি হ'ল! কি হ'ল গো?

বার-কয়েক চেষ্টার পর অবশেষে শব্দ বার হ'ল, যদিও ক্ষীণ এবং জড়িত, ওইটেই গিলে ফেলি নি ত?

—এ্যাঁ!

—আমার মনে হচ্ছে—

কথা শেষ হ'ল না। শেষ হবার দরকারও হ'ল না। নির্ঘাৎ ওই দাঁতটাই গলায় আটকে আছে। ঔষধ একটা সামান্য বড়ি, যত ভেজালই হোক, গলতে এতখানি সময় নিতে পারে না।

শ্রীগুহ ছুটলেন পাশের ঘরে টেলিফোন করতে তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে—শিগ্‌গির এস। গৃহিণীর গলায় একটা দাঁত আটকে গেছে।

—দাঁত! কার দাঁত?

—তাঁর নিজেরই। অবশ্য আসল নয়, নকল।

—এখনই যাচ্ছি।

শ্রীমতী লজ্জিতভাবে বললেন, ছিঃ! উনি জানতে পারলেন আমার একটা নকল দাঁত ছিল। কি ভাববেন কে জানে!

—কি আর ভাববেন? বড় জোর ভাববেন, তোমার বয়স। সে আর এমন কি দুশ্চিন্তার কথা!

দশ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার এলেন।

গলার মধ্যে আলো ফেলে দেখলেন। একবার সামনা-সামনি, একবার এপাশ ফিরিয়ে, একবার ওপাশ ফিরিয়ে।

হতাশভাবে বললেন, নাঃ! কিছু দেখা গেল না। কিন্তু দাঁতটাই যে গিলেছেন, ঠিক জানেন?

শ্রীগুহ বললেন, ঠিক কেউ কিছুই জানে না। কিন্তু দাঁতটা মুখের মধ্যে ছিল, নেই। গলায় কি একটা আটকেও গেছে। অনুমান হচ্ছে দাঁতটাই।

—অসম্ভব নয়। তাহলে আমার নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হয়। আমার গাড়ী রয়েছে। চলুন।

ডাক্তারের গাড়ীতে শ্রী এবং শ্রীমতী গুহ নার্সিং হোমে রওনা হলেন। রাত্রি তখন এগারটা।

দাঁতই বটে।

কোন কোন নকল মায়ের মত নকল দাঁত যেমন খেতে দেয়, তেমনি মাঝে মাঝে যন্ত্রণাও দেয়।

শ্রীমতী গুহ নার্সিং হোমে পৌঁছুলেন রাত এগারটায়। তার পরে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে বস্তুটি এবং তার অবস্থান নির্ণীত হ'ল। তার পরে দন্ত নিষ্কাশনের পালা।

শ্রীগুহ বাইরে করিডরে একটা চেয়ারে বসে আছেন ত আছেনই। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখেন, বারটা··· একটা···ছুটো···

অনেকগুলো দুঃসহ, জমাট, ভারী মুহূর্ত। সহজে নড়তে চায় না। রাত্রে এক ফাঁকে বাড়ি গিয়ে দু'টি খেয়ে আসার সময় হয়ত ছিল—বাড়ি কাছেই, কিন্তু প্রবৃত্তিও ছিল না, ক্ষুধাও না। মুহূর্তগুলি কালো কালো, ক্ষুদে-ক্ষুদে অথচ ভারী ভারী দৈত্যের মত তাঁর মাথা থেকে ঘাড়, ঘাড় থেকে পিঠ বেয়ে পা দিয়ে একটি একটি করে আস্তে আস্তে নেমে যায়।

শ্রীগুহ ঠায় বসে।

এমনি ক'রে ব'সে থেকে থেকে যখন তিনি ভুলে গেলেন তিনি কে, কোথায় বসে আছেন এবং কেন, তখন একটি নার্স এসে জানিয়ে গেল, দাঁত বার হয়েছে।

শ্রীগুহ চমকে উঠলেন, কার দাঁত?

—আপনি শ্রীগুহ না?

—নিশ্চয়।

—তাহলে?

বেশী কথা বলার সময় নার্সের নেই। সে চলে গেল।

তখন রাত আড়াইটে।

ঠিক বটে। তিনি শ্রীগুহ এবং শ্রীমতী গুহের গুহায়িত দন্ত-নিষ্কাশনের জন্যেই এখানে আসা। সেই দন্ত অবশেষে নিষ্কাশিত হয়েছে।

দুঃসহ মুহূর্তগুলিকে পিঁপড়ের মত দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শ্রীগুহ সোজা হয়ে বসলেন।

আরও কিছু পরে তাঁর বন্ধু ডাক্তার এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, জ্ঞান হয়েছে। এখন নিয়ে যাওয়ার কি করবে? আমার গাড়ি ত তখনই ছেড়ে দিয়েছি।

—ট্যাক্সি?

—ট্যাক্সি কি পাওয়া যায়? বিশেষ এত কাছের জন্যে?

—না।

—তাহলে?

শ্রীগুহ নিঃশব্দে সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন।

অবশেষে ডাক্তার বললেন, একটা কাজ করা যায়।

ভাসতে ভাসতে একখানা কাষ্ঠখণ্ডের দেখা পাওয়া গেল। উৎসুক, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শ্রীগুহ ডাক্তারের দিকে চাইলেন।

—এখনও অন্ধকার আছে।

শ্রীগুহ বাইরের দিকে চাইলেন।

—তোমার বাড়িও দূরে নয়।

তা নয়।

—আমি জনচারেক লোক দিচ্ছি। আর একটা ষ্ট্রেচার। নিয়ে যেতে পারবে না?

—কেন পারব না ?

সেই ব্যবস্থা হ'ল। তা ছাড়া উপায় ছিল না। 'বেড'টা খালি করা দরকার। আরও একটি গুরুতর রোগী অপেক্ষা করছে। তার অস্ত্রোপচারে দেরি করা চলবে না।

অন্যদিকে শ্রীগুহের তাড়া ছিল। আহার নেই, নিদ্রা নেই, রাতটা এইভাবে কাটল। সকাল থেকেই আবার প্রচুর কাজ হাঁ করে রয়েছে। একটা পাইক-পাড়ায়, একটা ঢাকুরিয়ায়, তৃতীয়টা গার্ডেন রীচে। না গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

এখন নিয়ে যেতে পারলে, ঘুম যদিও হবে না, কিন্তু স্নান করে চা খেয়ে সূর্যোদয়ের মুখে বেরিয়ে পড়তে পারবে।

শ্রীমতী গুহের জ্ঞান হয়েছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলে সাড়া দেন। কিন্তু কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব।

আগে শ্রীগুহ। পিছনে মনুষ্যবাহিত ষ্ট্রেচারে শ্রীমতী।

পথ নির্জন। অন্ধকার।

বড় রাস্তার মোড়টা ঘুরে মিনিট দশেক গেলেই বাড়ি। শ্রীগুহ এতক্ষণ পরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

যাক্। বাড়ি এসে গেল।

এমন সময় একটা কনষ্টেবল সামনে এসে দাঁড়াল।

—কেয়া ?

—আপকো থানামে যানে পড়ে গা।

—থানামে! শ্রীগুহ থতমত খেয়ে গেলেন। হামকো নেহি বাবা, তোম দুসরে কিসিকো ঢুঁড়তা।

—নেহি বাবু। চলিয়ে।

লোকগুলোকে বললে, এই, মুর্দা উঠাও।

শ্রীগুহ বললেন, হাম ইঞ্জিনিয়ার হায়, জানতা ?

বিরাট্ গোঁফের ফাঁকে কনষ্টেবল হাসলে: লাটসাহেব হোনেসে ভি যানে পড়ে গা। চলিয়ে।

কি সর্বনাশ! বলে কি! লাটসাহেবেরও ওর হাতে নিস্তার নেই। শ্রীগুহ চঞ্চলভাবে চারিদিকে চাইলেন। যদি চেনা-অচেনা কোন লোক পাওয়া যায়। কিন্তু বালীগঞ্জের একটা কুলীও এত ভোরে ওঠে না। একটা কুকুর-বেড়ালও না।

শ্রীগুহকে যেতে হ'ল।

থানা-অফিসার ঘরের মধ্যে বসে।

গ্যাস অথবা ক্লোরোফর্ম অথবা তজ্জাতীয় কোন ঔষধের ঘোরে আচ্ছন্ন ষ্ট্রেচারশুদ্ধ শ্রীমতী গুহ ও বাহক-চতুষ্টয়কে অন্য একটি কনষ্টেবলের জিম্মায় রেখে এই কনেষ্টবলটি শ্রীগুহকে নিয়ে সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

—হুজুর! একঠো মুর্দা লায়া।

—মুর্দা! থানামে! অফিসারটি চমকে উঠলেন। মর্গে না নিয়ে এখানে কেন ?

এতক্ষণে ব্যাপারটা শ্রীগুহের কাছে কিছুটা পরিষ্কার হ'ল। ষ্ট্রেচারবাহিতা শ্রীমতীকে বুদ্ধিমান কনষ্টেবল মৃতা মনে করেছে।

ব্যস্তভাবে শ্রীগুহ বলতে গেলেন, স্যার!

অফিসার ধমক দিলেন, থামুন। আগে ওর কথা শুনতে দিন।

তিনি কনষ্টেবলের দিকে চাইলেন।

সেলাম ক'রে কনষ্টেবল বললে, হুজুরকা হুকুম হোনেসে হুঁয়াই লে যায়েগা।

কনষ্টেবল চ'লে যাচ্ছিল, অফিসার থামিয়ে বললেন, দাঁড়াও। ডায়েরীটা লিখে রাখি।

লিখতে লাগলেন। তারিখ, সময়, কনষ্টেবলের নাম লিখে কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় পাকড়ালে ?

কনষ্টেবল জায়গাটার বর্ণনা দিলে।

—কতজন লোক নিয়ে যাচ্ছিল ?

কনষ্টেবল লোকের সংখ্যা বললে।

—কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছিল ?

কনষ্টেবল বললে।

ওটা স্পষ্টত কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের দিকের রাস্তা।

অফিসার শ্রীগুহের দিকে চেয়ে কুটিল হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মশাই, ভোর হবার আগেই লাস জ্বালিয়ে দেবার মতলব ছিল নাকি ?

ধমক খেয়ে শ্রীগুহ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন। এখন বললেন, লাস কি বলছেন মশাই ? দেখতেই লাস, ভেতরে কিছু নেই।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। ভেতরে যা কিছু আছে সে আপনার মধ্যে। কিন্তু মতলবটা কি ছিল ভেঙে বলুন ত। ভোর হবার আগে জ্বালিয়ে দেওয়া ?

—আমি ? ওঁকে জ্বালাব ? শ্রীগুহ হো হো করে হেসে উঠলেন। উনিই আমাকে আজীবন জ্বালিয়ে আসছেন।

—আর জ্বালাবেন না। এখন উনি মর্গে যাবেন। আপনার নাম-ঠিকানা বলুন।

শ্রীগুহ আকাশ থেকে পড়লেন: মর্গে যাবেন কি মশাই?

—মুর্দা আমরা মর্গেই পাঠাই।

—মুর্দা কাকে বলছেন? উনি আমার স্ত্রী।

অফিসার হেসে বললেন, আপনার স্ত্রী ব'লে কি মুর্দা হতে নেই? আজ আমি মুর্দা হতে পারি। কাল আপনি মুর্দা হতে পারেন। পরশু ওই কনষ্টেবল লাস ধরেছে, ও মুর্দা হতে পারে। কি বল রামস্বভগ! পার না?

—নেহি হুজুর।

—আচ্ছা। ওর মুর্দা হবার ইচ্ছে নেই। যাই হোক, নাম-ঠিকানাটা চটপট্ বলুন দেখি। আপনাকে হাজতে পুরে ফেলি। দরওয়াজা!

শ্রীগুহের চোখ কপালে উঠল: হাজতে পুরবেন কি মশাই! আমি করেছি কি?

—একটি মৃতদেহ পাচারের চেষ্টা করছিলেন।

—মৃতদেহ কোথায় পেলেন? আমার স্ত্রী জীবিত। নার্সিং হোম থেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম।

—ষ্ট্রেচারে ক'রে? অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

—কি করব? ট্যাক্সি কি পাওয়া যায়?

অফিসার থমকে গেলেন।

—আপনি বলছেন জীবিত?

—আমার কথায় বিশ্বাস করে কাজ কি? নিজেই গিয়ে দেখবেন চলুন না।

—তাই ত।

অর্থাৎ এই দেখবার কথাটাই কারও খেয়াল হয় নি।

—চলুন ত। দেখিগে।

কনষ্টেবল সকলকে নিয়ে এল ষ্ট্রেচারের কাছে।

শ্রীমতী গুহের তখন বেশ জ্ঞান হয়েছে। অলসভাবে ষ্ট্রেচারে শুয়ে ছিলেন। ওদের পায়ের শব্দে চোখ মেলে চাইলেন।

—আমি কোথায়?

ব্যস্তভাবে অফিসারটি বললেন, এই যে, আপনি এখানে একটু বিশ্রাম করছেন মা। এখনি বাড়ি যাবেন।

বাহকদের ইঙ্গিত করলেন ষ্ট্রেচার তোলবার জন্যে।

শ্রীগুহকে হাতজোড় করে বললেন, কিছু মনে করবেন না স্যার। একটু ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও অন্ধকার রয়েছে। চুপি চুপি ষ্ট্রেচারে ক'রে দিব্যি নিয়ে যেতে পারবেন।
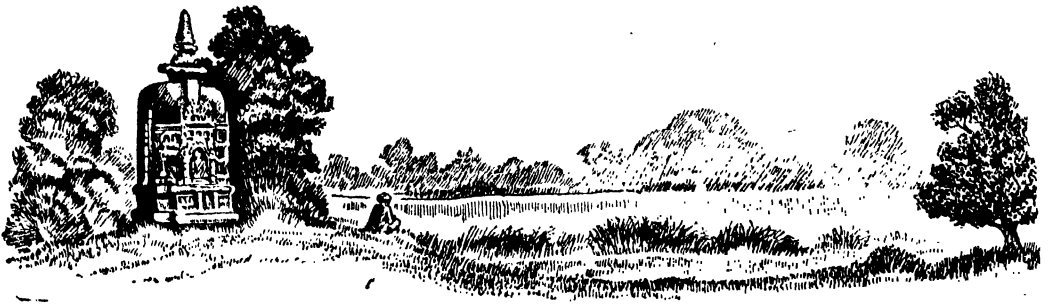
লেডি নির্ম্মলা সরকার
( স্যর নীলরতন সরকারের সহধর্ম্মিণী )

# গতি ঘোষের ভিটে

শ্রীগিরিবালা দেবী

এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় তরু-পল্লবে পরিবেষ্টিত ছায়ানিবিড় গতি ঘোষের পুণ্য ভিটে। সেই সঙ্গে হৃদয়ের পটভূমিকায় ফুটে ওঠে সদাহাস্যময়ী, কৌতুকপ্রিয়া বৌঠানকে।

আমি মাতাপিতার প্রথম সন্তান; দাদা, দিদি, বৌদির মধুর সম্পর্কের আস্বাদ জানতাম না। তখন সবে বাল্যজীবন শেষ করে কৈশোরে পদক্ষেপ করেছি। আমার চোখের আগায় তখনও যৌবনের বাসন্তী-শ্রী অলকার দ্বার খুলে দেয় নাই।

সেই সময় আমার দূর সম্বন্ধের পিসীমার ছেলে ডাক্তার দাদা আমাদের পল্লীগ্রামে এলেন ডাক্তারী করতে। সঙ্গে তাঁর নবপরিণীতা দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী-বধূ শীতলদাসী।

দেবী শীতলার দুয়ার-ধরা মেয়ে তাই নাম শীতলদাসী। আমার মা-ঠাকুমারা শীতলের থেকে 'শীতলি' ক'রে নিলেন বধূকে।

দাদা দ্বিতীয় বার বিয়ে করলেও তখনও তাঁর বয়েস সাতাশ-আটাশের বেশি ছিল না। দাদার প্রথম পক্ষ দুই বছরের এক মেয়ে ও সদ্যজাতা আর একটি কন্যা রেখে পিত্রালয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। মেয়ে দু'টি লালিত-পালিত হচ্ছিল মাতুলালয়ে তাদের দিদিমার কাছে। দিদিমা বৃদ্ধা, শিশুর পরিচর্য্যা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। দাদার আত্মীয়স্বজন তেমন কেউ ছিলেন না। থাকবার ভেতরে এক বাল-বিধবা দিদি ছিলেন। তিনি আবার সংসারে আসক্তি-বিহীনা, আজন্ম কাশীবাসিনী। তাই বাধ্য হয়েই দাদাকে পুনরায় বিবাহ করতে হয়েছিল।

বৌঠান ছিলেন গঙ্গাতীরের শহরতলীর মেয়ে। গাঁয়ে এসে কোথাও তাঁর বাধল না। এখানে সমবয়স্কা আর কারুকে না পেয়ে আমাকেই তিনি স্নেহে-প্রীতিতে সহচরী রূপে বরণ করে নিলেন। সংসারের কাজে, স্নানে, ভোজনে, গল্পে আমি হলাম বৌঠানের প্রধানা সাথী।

আজন্ম তটিনীতটে বাসের ফলে বৌঠানের নদীর প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। বাড়ীতে পুকুর ও কূপ থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্রোতোশীলা নদীতে স্নান না করলে তৃপ্তি হ'ত না। গ্রামের প্রাণস্বরূপিনী কলস্বরা নদীটি ছিল আমাদের গৃহের অনতিদূরে। নদীতে যাবার সঙ্কীর্ণ বন-পথের বামে শ্রেণীবদ্ধ প্রাচীন শিরীষ গাছের সারি। দক্ষিণে গতি ঘোষের ভিটে। সমতল জমি হতে অনেকটা উঁচুতে ছিটে বাঁধা। প্রশস্ত চতুর্শালা জমির চার কোণে চারটে মাটির ঢিপি, বর্ষা ও বৃষ্টির জলে ধুয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা। চার ভিটের মাঝখানে বৃহৎ আঙ্গিনায় শেওড়া, ভাঁটি, কালকাসুন্দী গাছের ঝাড়। ভিটের গা ঘেঁষে ডাইনে পাঁচটা ঝাঁকড়া আম্রবৃক্ষ। শাখা-প্রশাখায় বিজড়িত হয়ে আকাশে মাথা তুলেছে। ভিটের পেছনে বিস্তীর্ণ এক মাঠ। মাঠের শেষে গভীর ডোবা। ডোবার পরপারে ঘন বংশকুঞ্জ সীমানা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। তার পরে নদীর তীর। ভিটের অন্য দুই পাশে সীমানা দখল ক'রে প্রাচীর দিয়ে রেখেছে বট, পাকুড়, তেঁতুল, বেল, কুল ও কদম গাছের সারি। বুড়ো ঠাকুরদাদার কোলে আদরের নাতিদের মতন বিশাল তরুর ফাঁকে ফাঁকে নোনা-আতা, পেয়ারা, গন্ধরাজ, টগর, কামিনী ও জবাফুলের গাছ। ফুল নিত্য ফুটে নিত্য ঝরে যায় ধরণীর সুশীতল বক্ষে। পুষ্প-অর্চ্চনায় বা করবী-রচনায় তাদের স্থান হয় না। ফলের সময় ফলভারে বৃক্ষ নত হয়ে পড়ে। ক্রমে ফল পাকে, মৃত্তিকায় টুপ্ টুপ্ করে খসে। গোচারণরত রাখাল বালকের দল গতি ঘোষের ভিটেয় গরু চড়াতে এসে ডাল ভেঙে ফল খায়, মাটি থেকে কুড়িয়ে নেয়। ফলে উদর পূর্ণ ক'রে মনের আনন্দে বাঁশের বাঁশী বাজায়। যার বাঁশী নেই সে মেঠোসুরে গান গায়, "তাইরে নারে, নাইরে না। আর তো ব্রজে যাব না ভাই, যেতে পরাণ নাহি চায়। ব্রজের খেলা ফুরিরে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়।"

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী লাহিড়ীরা বর্ত্তমানে গতি ঘোষের ভিটের মালিক। কে ছিল গতি ঘোষ, তা আমার অজানা। কবে সে এখানে ছিল, কবে কোথায় চলে গেছে জানি না। শৈশব থেকে দেখে আসছি গতি ঘোষের ভিটে, শুনে আসছি ভিটের নাম। একত্রে সংযুক্ত পঞ্চ আম্রবৃক্ষের কি যেন এক কাহিনী আছে। তা সুকুমারমতি অপরিণতবয়স্ক বালক-বালিকার কাছে গোপনীয় জনশ্রুতি। সযত্নে গোপন করে রাখা হয়।

নদীর পথে পা বাড়ালেই প্রথমেই চোখে পড়ে

লাহিড়ীদের বিরাটকায় বকুল গাছ। লোকের অনুমান, বকুল বৃক্ষের বয়স হাজার বছরের ওপরে। যুগযুগান্তরের সাক্ষীস্বরূপ সে অনন্তকাল অখণ্ড হয়ে বিরাজিত। অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া তার বৃহৎ কাণ্ড। ঋতু বিশেষে বকুল ফুল ঝরায় রাশি রাশি। বৌঠান বকুল ফুলের অনুরাগিণী। তাঁর চিত্তবিনোদের আশায় আমি কোঁচড় ভরে কুড়িয়ে এনে দেই। তাঁর মাল্য-রচনায় সহায়তা করি। বৌঠান মালা গাঁথতে খুব ভালবাসেন, রাশি রাশি বকুল ফুল দিয়ে মালা গেঁথে তাঁর শয়ন-গৃহের খাটের ছত্রীতে ঝুলিয়ে রাখেন। শুধু তাঁর ঘর নয়, ফুলের মরসুমে আমাদের সারা বাড়ীটাই বকুল সৌরভে সুবাসিত হয়ে থাকত।

আমার কিন্তু বকুল ফুলের চেয়ে ফলের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। হলুদ বর্ণের থোকা থোকা ফলে বকুলের শাখা ভ'রে যায়। তরুতলে মেলা বসে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের, ওপরে মেলা বসে বিহঙ্গের। পাকা ফলের লোভে সুদূর থেকে উড়ে আসে পাখীর ঝাঁক। নীড়-বাসীদের সঙ্গে তাদের বেধে যায় তুমুল কলহ ও মারা-মারি। সে কি কিচির-মিচির শব্দ, সে কি সুধাবর্ষী সুর-লহরী! মৌমাছিরাও সাগ্রহে যোগ দেয় পাখীদের সঙ্গীত-আসরে গুণ গুণ রবে।

শিরীষ ফুলের কেশর বারিধারার মত ঝরে পড়ে সঙ্কীর্ণ বনপথতলে। পথটা মণ্ডিত করে রাখে কুসুম-স্তবকে। ক্রমে ফুল শুকিয়ে ফলে পরিণত হয়, ফল শুকিয়ে আবার বাদ্যযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে অনবরত বাজনা বাজতে থাকে। ঝনর-ঝনর, ঝিন্-ঝিন্ শব্দের বিরাম বিচ্ছেদ থাকে না। ভিটের পরপার থেকে সুবিস্তীর্ণ নিবিড় বংশকুঞ্জ কি এক চাপা অব্যক্ত ক্রন্দন ধ্বনিতে বাজনার তালে তালে তাল দিয়ে মাথা নাড়ে। পঞ্চ আম্রবৃক্ষের সঙ্গে বকুলের দিবানিশি চলে কিসের এক ইঙ্গিত ইসারা। মেঠো দম্‌কা হাওয়া ছুটে এসে সায় দেয় ফিস্‌ফিস্ করে। এদের ভেতরে চলতে থাকে কিসের কানাকানি! কে শোনে ওদের অব্যক্ত অস্ফুট ভাষা, আলাপ-বিলাপ?

আমি বৌঠানের সঙ্গিনী হয়ে শিরীষ ফুলে বিছানো পথে স্নান করতে যাই, ভরা-ঘট কাঁখে নিয়ে ফিরে আসি।

আমাদের বাড়ীতে বৌঠানের ভারী আদর, এক কাশীবাসিনী ননদিনী ভিন্ন তাঁর শ্বশুরকুলে কেউ নেই। দিদির কাশীতে একখানা বাড়ী আছে। দাদা এতদিন সেখানে থেকেই ডাক্তারী করতেন, কিন্তু সেখানে পসার না হওয়াতে এখানে এসেছেন আশায় আশায়।

বৌঠানের সরল সদানন্দ প্রকৃতির জন্যে আমার ঠাকুমা, মা-কাকীমারা সকলে তাঁকে অত্যন্ত ভাল-বাসতেন। বেচারার শ্বশুরকুলে স্নেহ করবার কেহ নেই, হেসে-খেলে যা খুশি করুক—এমনি ভাব তাঁদের।

বাড়ীর মেয়েদের স্নানের পরে বৌঠান আমাকে নিয়ে স্নানে যাবার সময় নির্দ্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, ঘরের বের হয়ে চাপাস্বরে ছড়া-কাটা আর গান গাওয়া।

সেদিন গতি ঘোষের ভিটের গা দিয়ে আমরা নদীর ঘাটে যাচ্ছিলাম। বৌঠান আধ-ঘোমটার ভেতর থেকে গুন্ গুন্ করছিলেন, "ননদিনী, বলো নগরে ঘরে ঘরে—ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী, কৃষ্ণপ্রেমসাগরে।"

"ছিঃ, রাস্তায় বেরিয়ে একি করছ? লোকে যে নিন্দে করবে।" আমি সচমকে চোখ তুললাম। দাদা খালি গায়ে খালি পায়ে মলিন ধুতি পরে গতি ঘোষের ভিটে অতিক্রম ক'রে আসছেন। তাঁর গা বেয়ে টপ্ টপ করে জল ঝ'রে পড়ছে—পেছনে ছোক্‌রা চাকর মটর। তার হাতে জালতি ও পলো। অন্য হাতে এক খালুই বোঝাই মাছ।

দাদার মৎস্যপ্রিয়তা বিশেষ বিদিত। মাছ ধরতে তিনি খুব ভালবাসেন। সে ছিপ দিয়েই হোক, জাল ও পলো দিয়েই হোক। একদিনও মাছ না ধ'রে তিনি থাকতে পারতেন না।

বর্ষাকালে গতি ঘোষের ভিটের ডোবা বাঁশবনের ভেতর দিয়ে নদীর সঙ্গে এক হয়ে যায়। স্রোতের প্রবল টানে ছোট-বড় মাছের ঝাঁক এসে আশ্রয় নেয় ডোবার মধ্যে। বর্ষান্তে জল কমে যায়, জলা প্রায় অর্দ্ধ শুষ্ক হয়ে ওঠে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে কোমর জলের বেশি জল থাকে না। সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় পড়ে যায় মাছ মারার ধুম। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রজনীর অন্ধকারে গোপনে গৃহস্থের আনাচে-কানাচে ডোবা-নালা-জলায় মাছ চুরি করতে এসে কখনও কখনও সর্প দংশনে প্রাণ হারায়।

প্রভাত হতে বেলা দশ-এগারটা অবধি দাদা থাকেন রোগীদের নিয়ে। তার পরে স্নানের পূর্ব্বে খানিকটা সময় তাঁর অতিবাহিত হয় মৎস্য শিকারে। পল্লীগ্রামে বেলা একটার আগে কেউ ভোজন করে না। পল্লীবাসী-দের স্নানাহার ধীর, মন্থর গতিতে।

প্রত্যহ স্নানের আগে দাদা প্রচুর মাছ নিয়ে ঘরে ফেরেন। বৌঠান পাবনা জেলার। মাছের প্রাচুর্য্যে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন। কিন্তু অত মাছ যে কোথা থেকে আসে, কোথায় তাদের লীলাভূমি, সে প্রশ্ন তাঁর হৃদয়ে জাগে না। আজ শিকার ও শিকারীকে সামনে পেয়ে

মাছের আধারস্থান নির্ণয় করতে বৌঠানের উৎসাহের অন্ত রইল না।

তখনও গ্রামে দিবালোকে স্বামী সম্ভাষণের প্রচলন ছিল না। রঙ্গময়ী চঞ্চলা বৌঠান গৃহবেষ্টনীর মধ্যে সে প্রথা যথাযথ না মেনে চললেও পথে দাঁড়িয়ে মটর চাকরের সম্মুখে এত বড় দুঃসাহসের কাজ করতে পারলেন না। তাই আয়ত আঁখির তীক্ষ্ণশর দাদার প্রতি নিক্ষেপ ক'রে ঘোমটা টেনে দিলেন, বুক সমান ঘোমটার মধ্য থেকে চুপে চুপে দাদাকে ভেংচাতে লাগলেন, "ছিঃ, রাস্তায় একি করছ? লোকে নিন্দে করবে? ভদ্রলোক মাছ মেরে বেরালে কি কেউ নিন্দে করে না? এ মাছের কাঁড়ি থাকে কোথায়? সে জায়গা আমাকে দেখাতে হবে?"

দাদা বললেন, "হাঁ, সেইটে এখনও বাকা। জলায় তোমাকে নিয়ে গেলে পাড়ায় ঢিঢি পড়ে যাবে। তোমার যে বাহনটি সঙ্গে রয়েছে, তাকে বললেই দেখিয়ে দেবে। এখানে তার অজানা কিছু নেই।"

"থাক বা না থাকুক, তবু তোমারই দেখান উচিত। বুড়ো বয়েসে দুই সন্তানের বাপের ফের বিয়ে করতে লজ্জা হয় নি? যত লজ্জা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার সাহচর্য্যে?"

নিমেষে দাদার গৌর আনন রক্তিমবর্ণ ধারণ করল। তিনি বারেক আমার দিকে চেয়ে অঙ্গুলি তুলে স্ত্রীকে শাসন ক'রে গৃহের পথ ধরলেন। বৌঠান পেছনে খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলেন।

২

দাদা আড়াল হওয়া মাত্র বৌঠান অবগুণ্ঠন কমিয়ে দিয়ে বললেন, "চল্ মিছরি, তোদের মাছের জলাটা আমাকে দেখাবি চল্। ওমা, মুখখানা তোর এমন হাঁড়ি হয়ে গেল কেন রে? হ'ল কি?"

"হবে আবার কি? তুমি যখন-তখন দাদাকে বুড়ো বল কেন?"

"বাবা, কি ন্যাকা তুই মিছরি? 'ন্যাকা আঙুলি চাল্‌সেকানা জল বলে খাস চিনির পানা।' ভ্রাতৃপ্রেমের জলন্ত পরাকাষ্ঠা। বয়স যাই হোক না কেন, কিন্তু যে দোজবর তাকে সবাই বুড়োই বলে।"

"তোমার দোজবরে যদি এত ঘেন্না, তা হলে বিয়ে না করলেই পারতে?"

"না, যত বোকা ভেবে রেখেছি, তুই তা নোস্ মিছরি —কাঁচা ফলের গায়ে আস্তে আস্তে রংয়ের ছোপ লাগছে। বাংলাদেশের পিতৃহীন গরীব ঘরের মেয়ে নিজের বিয়ের কর্ত্তা কি নিজে হতে পারে? তোর দাদা আমার খুবই পছন্দের বর, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কথাটা আমি মোটেই সইতে পারি না। আমার মত ধাড়ী মেয়ে গলায় নিয়ে আমার মা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময় আমার মাসামা গেলেন কাশীতে তীর্থ করতে। তোর দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে মাসীমা তীর্থফল এনে দিলেন মাকে। পনের দিনের ভেতরে বিয়ে হয়ে গেল। বর বলে বর, একেবারে দুই মেয়ের বাপ। সতীন মরবার সময় রেখে গেছে আমার জন্যে দুটো ছেঁড়া কাঁথা। সেই কাঁথার আগুন আমার বুকে জ্বলছে ধিকি ধিকি।" বলতে বলতে বৌঠান গতি ঘোষের ভিটেয় দ্রুতবেগে অগ্রসর হলেন।

আমি নিঃশব্দে তাঁর অনুসরণ করে মুখের পানে চাইলাম। একি তাঁর মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন! সহৃদয় সুকোমল আভা সে মুখ থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। কেমন যেন এক রুক্ষ কঠিনতা সে মুখে বিরাজ করছে। সুবৃহৎ কৃষ্ণ তারকাযুক্ত দুই চক্ষু জ্বলছে হীরক খণ্ডের মত। তাঁর এ রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। আমি সভয়ে সেইখানে থম্‌কে দাঁড়ালাম।

বৌঠান এগিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে থামতে দেখে ফিরে এসে বললেন, "একি, তুই দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? তোর দাদাকে বুড়ো বলেছি সে রাগ এখনও যায় নি? কে তোর নাম মিছরি রেখেছিল? আমি হলে নিম রাখতাম। নিম তিতো গিমে তিতো, আর তিতো খর, সবচেয়ে বেশী তিতো দুই সতীনের ঘর।" ছড়া কেটে বৌঠান সস্নেহে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন ডোবার দিকে। আমি আড়-চোখে একবার তাঁর পানে চাইলাম। স্নেহে কৌতুক-হাসিতে সেই সুন্দর মুখখানি ঝলমল্ করছে।

মাঠ পার হয়ে আমরা ডোবার তীরে উপনীত হলাম। নদীর ভাঁটার টানে জলাশয়েরও টান ধরেছে। কোমর জলের বেশী জল নেই। পারের ঝাঁকড়া ছাতিম ও পিঠালি গাছ জলের উপরে হেলে মুখ দেখছে। কিন্তু এখন দর্পণ-স্বচ্ছ নাই। ক্ষণকাল পূর্ব্বের আলোড়নে জল ঘোলা হয়ে গেছে। ঘোলাজলে ক্ষুদ্র মাছের ঝাঁক বিচরণ করছে। জলে ছায়া ফেলে একদল ভুবনচিল 'চিহ্নি চিহ্নি' শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। বিচিত্র বর্ণের মাছরাঙ্গা পাখী শিকার লক্ষ্য ক'রে ছোঁ দিয়ে চোখের পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ডুমুর গাছে ব'সে আছে পক্ষীকুলের দানবস্বরূপ মস্ত এক বাজ। তার চক্ষু রক্তবর্ণ, ভীষণ ধারাল নখর। তীক্ষ্ণধার ঠোঁট। আমাদের সাড়া পেয়ে

বাজ পাখী উড়ে গেল। জলের গা ঘেঁষে চক্রাকারে বসেছিল সারি সারি বক। আমাদের আবির্ভাবে তারা পালিয়ে গেল না। পোষা হাঁসের মতন উঁচু পাড়ের ওপরে স'রে যেতে লাগল।

আমাদের ছোটমহলে একটা সংস্কার ছিল। আকাশের নীচে চিল উড়লে বলা হত, "চিলমামারে ভাই, খড়কে ভাজা খাই।" আর ভুবনচিল নাকি দেবতার প্রতিনিধি, তাকে দর্শন করা শুভ, দেখামাত্র বলার নিয়ম, "ভুবনচিলের দেখলাম গলা, ভুবনচিল খায় দুধ কলা।"

বৌঠানের আগমনে তাঁর ছড়া-পাঁচালির বন্যায় নগণ্য তৃণের মতন আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। সবসময় নিয়ম-কানুন মনে থাকে না। এখন মনে পড়ল, বৌঠানের অগোচরে আমি ভুবনচিলের উদ্দেশে যুক্ত করপুটে চুপে চুপে বললাম, "ভুবনচিলের দেখলাম গলা, ভুবনচিল খায় দুধ কলা।"

বৌঠান জলা নিরীক্ষণ ক'রে অবোধ বালিকার মতন আনন্দে অধীর হয়ে জলে নেমে পড়লেন। অনেকক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাসমান ছোট মাছগুলির প্রতি পলকহারা নেত্রে চেয়ে রইলেন।

তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে আমি ডাকলাম, "বৌঠান, এখন উঠে এস, চল চান করতে যাই? বেলা হয়েছে, আর দেরী করলে কিন্তু বকুনি খেতে হবে?"

বৌঠান সবেগে ঘাড় নাড়েন, "কিসের বকুনি? তোর দাদা ত জেনেই গেছেন আমরা এখানে আসব। এত মাছ ফেলে আমি এক্ষুনি যেতে পারব না, মিছরি। মাছ-গুলো ওরা ফেলে গেল কেন?"

"ও আবার মাছ! এদেশে কেউ খায় না।"

"খেতে জানলে ত খাবে? চুণোমাছের বাটি-চচ্চরি যে কি উপাদেয় তা তোকে রেঁধে খাইয়ে দেখাব। তুই গামছাখানা নিয়ে একটিবার জলে নেমে আয়, লক্ষ্মী, চারটে মাছ ছেঁকে তুলে নেই?"

আমার চোখ চড়কগাছ, "তুমি কি বলছ বৌঠান, ভদ্রলোকের মেয়ে জলায় মাছ ধরবে? কেউ দেখলে রক্ষে থাকবে না। চুণোপুঁটি খেতে চাও, দাদাকে বলব, তিনি ঝাঁকা ভ'রে কাল নিয়ে দেবেন। আমি জলে নামতে পারব না, জলে মস্ত মস্ত জোঁক আছে।"

বৌঠান কোমল স্বরে মিনতি করতে লাগলেন, "কৈ জোঁক নেই ত। যদি তোর পায়ে লাগে, আমি ছাড়িয়ে দেব। জোঁকে আমার ভয় করে না। এ গর্তের ভেতরে কারোর নজরে পরবার ভয় নেই। কাল অবধি এ মাছ থাকবে কি না—যে সাঙ্গোপাঙ্গ জুটেছে এক বেলার ভেতরেই শেষ করে দেবে। মিছরি, সোনা মেয়ে, আমার কথা শোন, একটুখানি নেমে আয়।"

মিষ্ট বাক্যের মোহ আছে। আমি মোহগ্রস্ত হয়ে জলে নেমে বৌঠানের গামছার প্রান্ত ধরলাম।

বৌঠান পুলকিত হয়ে সুর ভাঁজতে লাগলেন,
"শ্যাম চরণ ছাড়িয়া কেন দাও না, আমি কি রূপসী ছার?
আমা সম আছে আর, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না।"

ঘণ্টা দুই তাণ্ডব নর্ত্তনে মেতে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এক গামছা মাছের পুঁটুলি নিয়ে আমরা যখন উঠে এলাম, তখন ভরা দুপুর। প্রখর রৌদ্রতাপে চারিদিক উত্তপ্ত। উতলা বাতাসে রৌদ্রের জ্বালা বিকীরণ করছে। জলার সর্ব্বাঙ্গে কাদা-মাটিতে মাখামাখি, ভেজা শাড়ী বেয়ে জল ঝরছে। খোলা চুল পিঠে লোটাচ্ছে।

সামনে ছায়া-সুনিবিড় আম্র তরুতল পেয়ে বৌঠান ধুপ্‌ ক'রে ব'সে পড়লেন পঞ্চ আম্রবৃক্ষের শিকড়ের আসনে। আমি মাছ নামিয়ে স্থান নিলাম বৌঠানের পায়ের কাছে।

প্রান্তর হতে ঘূর্ণি বাতাস ছুটে এসে আমাদের ক্লান্তি দূর করতে লাগল। তখন বসন্তকাল, মুকুলে আমগাছ ভ'রে গেছে। মুকুল ঝরছিল আমাদের মাথায়। মুকুলের গন্ধে বনভূমি সৌরভাকুল। শাখায় লুকিয়ে কোকিল ঝঙ্কার তুলেছে, "বৌ কথা কও" পাখী আর্ত্তনাদ করছে গাব গাছে। বংশকুঞ্জ থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুর বিলাপ তান। শিরীষ ফলের বাজনা বাজছে ঝন্‌ঝন্‌। বকুল তলা মর্ম্মরিত।

চারদিকের এত সমারোহ আমার ভাল লাগল না। ভাল লাগার চোখও আমার ছিল না। তখন সে বয়সও হয় নি। আমি বৌঠানকে তাড়া দিলাম, "এখন কোথায় চান করবে বৌঠান, নদীর ঘাটে গেলে লোকে সং ভাববে। পুকুরে যেতে গেলে বাড়ীর সকলে দেখে ফেলবে।"

"ভীতু কোথাকার, ভয়ে সারা হচ্ছে। আমরা সদর দিয়ে না ঢুকলে কেউ দেখতে পাবে না। চল্‌, বাগানের ভেতর দিয়ে পুকুরে গিয়ে নাইগে। নেয়ে-ধুয়ে পরিষ্কার হলে কেউ টের পাবে না?"

"কিন্তু মাছ দেখে জিজ্ঞেস করলে বলবে কি?"

"বলব সত্যি কথা, গতি ঘোষের ডোবার মাছ। নিজেরা ধরেছি না বললেই হ'ল। দেখ্‌রে, আমার এখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করছে না। এমন সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি নি, গাছপালা ভিটেটাকে ঘিরে

বেড়া দিয়ে রেখেছে। এই ভিটেয় আমার যদি একটা চালা-ঘরও থাকত! তা হলে আমি এখানেই থাকতে পারতাম। মাঠটায় ধানের ক্ষেত হ'ত, দক্ষিণের ভিটেয় ফুলের বাগান। চারদিকে তরকারীর গাছ বুনতাম, ঝুড়ি ঝুড়ি তরকারি হ'ত। গাছের ফল, ফুল, তরকারি মাঠের ধান, জলার মাছ। কি মজা—কিচ্ছু কিনতে হত না।

"আমার কত সাধ যায় রে চিতে,
মলের আগে চুট্‌কী দিতে।"

জানতাম দাদা অস্থায়ীরূপে এখানে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসেছেন। কাশীতে তিনি পসার জমাতে পারেন নি, তাই আশায় আশায় গণ্ডগ্রামে অবস্থিতি। এখানে সুবিধা না হলে ফের তাঁরা ফিরে যাবেন।

পল্লীগ্রামে ডাক্তার-কবিরাজের বাঁধাধরা আয়ের আশা কম। দরিদ্র গ্রামবাসীরা চিকিৎসকের সঙ্গে দাদা, কাকা, মামা, ইত্যাকার সম্বন্ধ পাতিয়ে কলামুলো উপহার দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে দাদা ক'দিন কাটাবেন? আমি বুদ্ধিহীনা হলেও কিছু কিছু বুঝতে শিখেছি। ডাক্তারীতে অর্থাগম না হলে দাদাদের ফিরে যেতে হবে সেই কাশীতে। কিন্তু এখানে ঘর বাঁধলে আমার স্নেহময় দাদা, প্রীতিময়ী বৌঠান বাঁধা পড়ে যাবেন ভিটের মায়ায়। সেই ক্ষীণ আশায় আশান্বিত হয়ে আমি সাগ্রহে বললাম, "সত্যি বৌঠান, খুব সুন্দর জায়গা এটা। আমাদের বাড়ীর থেকে অনেক, অনেক ভাল। তুমি দাদাকে বলে এই ভিটের উপরে ঘর তুলে নাও। কাশী অনেক দূর, সেখানে বুড়োরা মরতে যায়। তোমরা সেই বিশ্রী জায়গায় আর যেও না।"

বৌঠান হাসলেন, "তুই কাশীতে যাস নি বলেই মন্দ বলছিস। চমৎকার জায়গা! দিদির বাড়ীটাও খুব সুন্দর। বড় রাস্তার উপরে দোতলা। দিদির ত কেউ নেই, বাড়ীটা ভাইকেই লিখে দিয়েছেন, কিন্তু আমি সেখানে থাকতে পারলাম না। কাশীর কালভৈরব আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

কাশীর কালভৈরবের গল্প ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম, আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে তাড়িয়ে দিলেন?"

মুহূর্ত্তে বৌঠানের শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি গম্ভীর হ'ল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়ে জলতে লাগল। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "তুই ছেলেমানুষ, আমার কথা বুঝতে পারবি নে। আমার কালভৈরব হ'ল ওঁর প্রথম পক্ষ। আমার সতীন মরেও ম'রে নি, কাশী ভ'রে রেখে গেছে তার গুণের সৌরভ। ননদের দিনরাত এক বুলি, 'সুষমার রান্না যে একদিন খেয়েছে, সে ভুলতে পারে না। সে কি কুটনো কুট্‌ত, ঠিক যেন জিরে! তার পান সাজায় বোঁটায় ক'রে চুণ দিতে হ'ত না।' এমনি ধরনের ব্যাখ্যা শুনে শুনে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে। দিদির সঙ্গে দিদির ভাইটিরও যোগ ছিল সমানে। আলনায় কাপড় গোছানো ঠিক হয় নি। বিছানায় ঘামের গন্ধ হয়েছে। তার নিমকি ভাজার স্বাদ ছিল অপূর্ব্ব। ছিল ত ছিল, একজনার সাজানো সংসারে আর একজনাকে টেনে আনা কেন? ধ্যানের দেবীর ধ্যানে জীবন কাটালেই বেশ হ'ত। সকলে ধন্য ধন্য করতে।"

মানব-জীবনের দ্বন্দ্ব জটিলতার সঙ্গে তখনও আমার পরিচয় ছিল না। একের প্রসঙ্গে অপরের অন্তর্দাহের মর্ম্ম আমি বুঝতে পারলাম না। তবু কিছু বলা দরকার, তাই বললাম, "অত কথা শোনার চেয়ে তুমি আমাদের কাছে এসে ভাল করেছ, বৌঠান। কৈ, দাদা এখানে ত একবারও সুষমা বৌঠানের নাম করেন নি?"

"না, সেই জন্যেই আমি অনবরত জপিয়ে জপিয়ে এখানে ওঁকে টেনে এনেছি। সেখানে তেমন আয় ছিল না, আশায় আশায় এখানে এসেছেন। এখানে এসে আমি স্বামী পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি। আমি এদেশ ছেড়ে আর কোথাও যাব না মিছরি, এই ভিটেয় ঘর বাঁধব। সে কাঁটা দুটোও প'ড়ে আছে মামার বাড়ীতে। তাদেরও আনতে হবে। নিজেদের বাড়ী না হলে সে আপদ-জঞ্জাল রাখব কোথায়?"

"তাদের এনে আমাদের কাছেও রাখতে পার, বৌঠান। তোমার এত ভাল লেগেছে—এখানেই ঘর তুলে নাও। দাদাকে বললে তিনি নিশ্চয় তোমাকে বাড়ী করে দেবেন। তোমাকে বড্ড ভালবাসেন, যা চাইবে তাই পাবে।" ব'লে আমি গামছায়-বাঁধা মাছ নিয়ে পথে পা বাড়িয়ে দিলাম।

দাদার ভালবাসার উল্লেখে নিমেষে বৌঠান স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। জয়ের গৌরবে উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভ'রে গেল।

শিকড়ের আসন থেকে নেমে বৌঠান সবিস্ময়ে বললেন, "এ কি আবার মিছরি? কে যেন আমগাছ থেকে আমার গায়ে এক মুঠো শুক্‌নো ঝর্‌ঝরে মাটি ফেলে দিলে?"

আমি সভয়ে চলার গতি বাড়িয়ে বললাম, "মাটি দেবে কে? আমের মুকুল ঝ'রে পড়েছে। তুমি চ'লে

এস, দেরী ক'রো না। ভরা-দুপুরে গাছতলায় থাকতে নেই।"

বৌঠান চলে এলেন আমার পেছনে পেছনে।

আমি একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইলাম ভিটের দিকে। আমার মনে হ'ল নিবিড় আম্রপল্লবে লুকিয়ে কে যেন হাসছে খল্‌খল্‌ শব্দে। সেই হাসির প্রতিধ্বনি হচ্ছে শিরীষ ফলে, বাঁশের বনে, বকুলের মর্ম্মরিত শাখায়।

৩

'দিব্য-গঠনা, ভুবনবিজয়ী নয়না' বৌঠান এতদিন বৃথা তাঁর আজানুলম্বিত কুঞ্চিত ঘনকাল কেশে ফিরিঙ্গি খোঁপা বেঁধে বকুলফুলের মালা জড়ান নি, সুগঠিত নাসিকায় সোনার লবঙ্গফুলের ঝিলিক দিয়ে, পানের রসে পরিসিক্ত বাঁকা বেলকুঁড়ি ঠোঁটে দাদার প্রতি হাসির শর নিক্ষেপ করেন নি। নির্ম্মল ললাটের কাঁচপোকার টিপের কি মাদকতা রাখেন নি? মৃণাল বাহুমূলে গোছাভরা রেশমী চুড়ির গায়ে মোটা মকরমুখো বালা কি নিরর্থক জলতরঙ্গ বাজিয়েছে ঝন্‌ঝন্‌, ঝিন্‌ঝিন্‌? না, সব কিছুরই মূল্য আছে।

কয়েকদিন পরে জানতে পারলাম দাদা গতি ঘোষের ভিটেয় নিজের ভিটে গড়তে সঙ্কল্প করেছেন। এ সংবাদে পাড়ার সকলে উল্লসিত। দাদার মত পাশ-করা ডাক্তার এ অঞ্চলে একটিও ছিল না। লাহিড়ীরা সাগ্রহে নামমাত্র মূল্যে গতি ঘোষের ভিটে দাদাকে ছেড়ে দিলেন। ডাক্তারকে বেঁধে রাখা কম নির্ভরতার কথা নয়।

বৌঠান আনন্দে উৎসাহে দিশাহারা। আমিও পুলকিত। কিন্তু সেই পুলকের মধ্যে কোথায় যেন একটুখানি কাঁটার আভাস খচ্‌খচ্‌ করছিল। সে কাঁটা আমগাছ থেকে বৌঠানের গায়ে সেদিনের মাটি নিক্ষেপ। শুধু একদিন নয়, আরও একদিন আছে। গোবর কুড়ানী তুফানী বড় গরীব। মাঠে মাঠে গোবর কুড়িয়ে তাতে 'ঘসি' তৈরি ক'রে বাড়ী বাড়ী বিক্রি ক'রে জীবনধারণ করত। মাঠ থেকে গোবর সংগ্রহ ক'রে একদা মধ্যাহ্নে সে বিশ্রাম করছিল গতি ঘোষের ভিটেয় আমগাছের তলায়। তারও গায়ে মাথায় ঝ'রে পড়েছিল শুকনো ঝরঝরে মাটি।

সেকথা শোনার পরে আমি ভ্রমেও ওখানে পদক্ষেপ করি নি। আমার সেখানে যাবার কোন প্রয়োজনও হয় নি। কিন্তু সেদিন যেতে হয়েছিল বৌঠানের জন্য বাধ্য হয়ে। কিন্তু তুফানীর বিষয় তাঁকে আমার বলা হ'ল না।' আমি যে তাঁদের কাছে কাছে বেঁধে রাখতে চাই; হারানোর ভয়ে যেটুকু জানি তাও প্রকাশ করতে পারি না।

দাদা কাজের মানুষ, কাজ কখনও ফেলে রাখেন না। বৌঠানের নূতন নীড় রচনার আগ্রহে দাদা মনে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করতে বিলম্ব করলেন না।

দাদার সঞ্চয় অল্প, কাজেই ইঁট বা টিনের দিকে তিনি অগ্রসর হতে পারলেন না। বিশেষতঃ সেকালে সাধারণ গৃহস্থেরা ইঁট-সুরকীর তেমন ধার ধারতেন না। অবস্থাপন্ন জমিদার বা জোতদারদের ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা মধ্যবিত্তদের নিকটে গর্ব্ব প্রচার করত।

গতি ঘোষের দক্ষিণের ভিটে ফুলবাগানের জন্যে রেখে দিয়ে দাদা পূবের ভিটেয় প্রকাণ্ড এক আটচালা ঘরের পত্তন দিলেন। ঘরের মেঝে ও দেয়াল পাকা হবে। চাল ছনের। একখানা ঘরের ভিতরে দেয়াল দিয়ে তিনটি কামরার ব্যবস্থা হ'ল। প্রথমটা ডাক্তারখানা, অন্য দু'টি শয়নের।

উত্তরের ভিটেয় রন্ধনশালা ও ভাঁড়ার ঘর। বৃষ্টি ও বর্ষায় ভিটের মাটি ধুয়ে গেছে, মাটির প্রয়োজন প্রচুর। দলে দলে মেঠেলরা এল ঝুড়ি ও কোদাল নিয়ে। করাতীরা আমগাছের নীচে কাঠ চিরে তক্তা করে। ছুতোর মিস্ত্রীদের দরজা-জানালা তৈরির ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে পাড়া প্রকম্পিত। ঘরামীরা লেগে গেল খুঁটি পুঁতে ঘর ছাইতে। চারিদিকে কলরব কোলাহল; ব্যস্ততার আনাগোনা। সহসা নিদ্রিত গতি ঘোষের ভিটে সজাগ হয়ে উঠল। কোথায় মিলিয়ে গেল বাঁশবনের অট্টহাসি, আম্রপল্লবের ফিস্‌ফিস্‌। শিরীষ ফলের ঝনর ঝনর। বকুলবৃক্ষের মর্ম্মর ধ্বনি। মানুষের মেলায় শিশুদের মিছিলে গম্‌গম্‌ করতে লাগল শূন্য ভিটে।

সারাদিন চলে নীড় রচনার কত আয়োজন, যত্ন চেষ্টা; মানুষরাই গ'ড়ে তোলে আশার সৌধ, বিরামের আশ্রয়।

দিনের বেলা অত মুটে-মজুরদের ভেতরে ভিটেয় যাওয়া বৌ-মানুষের সম্ভব হয় না। তাই সন্ধ্যায় দাদা বৌঠানকে নিয়ে যান, কতটা গড়া হয়েছে দেখাতে। আমাকেও যেতে হয় বৌঠানের সঙ্গিনী হয়ে।

রজনীর গভীরতা নেমে আসে কাননের ফাঁকে ফাঁকে। নিস্তব্ধতার নিবিড়তায় ভুবন ভরে যায়। কি এক অজানা-অলীক বিভীষিকায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাই।

সেদিন ঠাকুমা বললেন, "শোন্‌ শীতলি, একটা কথা বলি, তুই রাতে-বিরাতে বাড়ী দেখতে আর যাস নে। এতই যদি দেখার সখ্‌ দিনের বেলায় দেখে আসিস। এ সময় গাছতলা দিয়ে তোর নদীতে যাওয়াও ভাল নয়। সাবধানে থাকা দরকার।"

বৌঠান খিল্‌খিল্‌ করে হাসেন, "আপনার এত ভয় কিসের, দিদিমা? গাছের ডালে কি ভুত-প্রেত ব'সে

থাকে ? বড় মামীমার কথায় আমি কোল-আঁচলে গেরো দিয়ে রেখেছি সর্ব্বক্ষণ। চুলে কুটো দিয়ে রেখেছেন, তাতেও কি দোষ খণ্ডে না ?"

ঠাকুমার সতর্কতার মর্ম্ম তখনও বুঝতে পারি নি। পারলাম আরও কিছুদিন পরে। বৌঠানের সাধের সময়।

কয়েক মাস পরে বৌঠানের একটি ছেলে হ'ল। হাস্যমুখরা কৌতুকময়ী তরুণীকে জননীর পদে যেন মানাচ্ছিল না। সকলেই কি মা হ'তে পারে ? মাতৃত্বের সাধনা প্রিয়াতে থাকে না।

বৌঠানের সদানন্দ প্রকৃতির জন্যে ঠাকুমা ছেলের নামকরণ করলেন 'সদানন্দ'।

সদানন্দ আমার মা'র কাছে লালিত-পালিত হয়। বৌঠান প'ড়ে থাকেন গতি ঘোষের ভিটেয়। কখনও ডোবার ধারে, কখনও তটিনী-তটে। গুরুজনদের মৃদু ভর্ৎসনায় সময় সময় ছেলেকে কোলে নিতে হয়, দুধ খাওয়াতে হয়। লোক দেখিয়ে ছেলেকে আদর ক'রে ঘুমপাড়ানী গানও গাইতে হয়।

অবশেষে বৌঠানের অতি সাধের গৃহ-নির্ম্মাণ শেষ হয়ে গেল। দাদারা চ'লে গেলেন তাঁদের নূতন বাড়ীতে। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে দাদা তাঁর মেয়ে দু'টিকে আনালেন। মেয়েরা শান্তশিষ্ট। বড়টি ছয় বছরের, ছোটটি চার। নাম হাসি ও খুসী।

দাদার দিদিকেও আনতে হ'ল কাশী থেকে, বাড়ীতে ভাড়াটিয়ে বসিয়ে। আজন্ম ব্রহ্মচারিণী, তপপরায়ণা দিদির হঠাৎ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে গেল। তিনি তাঁর আরাধ্য-দেবতা বিশ্বনাথ ও দাদাকে ভিন্ন বিশ্ব ভুলে গেলেন। বিশ্বনাথের পূজো, স্তব-স্তুতিতে তাঁর ভুল হয় না।

প্রভাতে জলায় স্নান সেরে নিয়ে তিনি ফুলের সাজি হস্তে বিচরণ করেন গতি ঘোষের ভিটের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। বিল্বদলে ও আকন্দ-ধুতরো ফুলে ডালা ভ'রে যায়। বৃক্ষের অন্তরাল হতে চোখে পড়ে শুভ্রবসনা শীর্ণকায়া এক প্রৌঢ়া নারীর বিচরণশীল মূর্ত্তি। বনতল ঝঙ্কৃত হতে থাকে দুর্ব্বলকম্পিত স্বরে, "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং। পরশুমৃগাবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং"—

সযত্নে পূজা-সম্ভার সংগ্রহ ক'রে দিদি তাঁর পাথরের বানেশ্বর শিবলিঙ্গ নিয়ে পূজোয় বসেন। যে পূজোর আচমন, ভূতশুদ্ধি ধ্যান প্রণাম বিসর্জ্জন কোথাও ভুল হয় না।

বৌঠান শুদ্ধাচারে হবিষ্য রান্না করে ভোগের স্থানে এনে রাখেন। পূজো শেষ হতে কোন দিন দু'টো বাজে, কোন দিন তিনটে। তার পরে প্রসাদ গ্রহণ। আবার সন্ধ্যা সমাগমে সুরু হয় জপ, স্তব পাঠ, "প্রভুমীশমনীশ"

দাদার শত প্রশ্নে 'হাঁ, না-র' বেশী কথা বলেন না। কিন্তু স্নেহের ছোট ভাইটিকে চিনে রেখেছেন বিলক্ষণ রূপে। ননদিনীর প্রতি বৌঠানের বিরাগের লেশটুকুও নেই। কেন আর থাকবে ? দিদি যে ভুলে গেছেন সুষমাকে, তার রন্ধন-নৈপুণ্য, তাম্বূলপরিচর্য্যা দাদার হৃদয় হতে সুষমা মুছে গেছে। মুছে যাওয়াই কালের বিধান। হাসি, গল্পে, গানে, সংসারের কর্ম্মকুশলতায় বৌঠান স্বামীর হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। এখন দাদা একান্ত শীতলাভিমুখী।

হাসি, খুসী আমতলায় খেলার ঘর করেছে। থাকে থাকে রেখে দিয়েছে ঘরকন্নার মাটির হাঁড়ি, সরা, নারিকেলের মালা। দাদা ছুতোর দিয়ে তাদের একটা ছোট্ট ঢেঁকি তৈরি করে দিয়েছেন। সারাদিন ঢেঁকিতে পাড় পড়ছে—ঢেঁকুস্-ঢুঁকুস্। মেয়ে দু'টি মাকে জানে না, বাবাকেও এতদিন চেনে নি। তাদের শিশুচিত্ত ছোট ভাইটিকেই অবলম্বন করেছে। সদানন্দ দিদিদের কাছেই থাকে আমতলায়। বৌঠান হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। তাঁর ধাতে শিশুপালন আসে না।

গ্রামের সরল জীবনযাত্রা। আড়ম্বর নেই, বিলাসিতা নেই। শত অসুবিধার মধ্যেও শান্তির স্নিগ্ধধারা ঝির্‌ঝির্ করে বয়ে যায়।

দাদা তেমনি অবকাশ সময় মাছ ধরতে যান। বৌঠান বাগান-বাগিচা নিয়ে মত্ত। তাঁর একটি সাধ এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে, আমতলায় একটা বেদী-গাঁথা।

গতি ঘোষের সেই নির্জ্জন নিরালা ভিটে মুখর হয়েছে শিশুর হাসিতে, বালিকার কলকোলাহলে। তরুণীর গীত-গাথায়। চির-অন্ধকার ভিটেয় প্রদীপ জ্বলে দপ্ দপ্ করে। আলোকরশ্মি তেরছা হয়ে লুটিয়ে পড়ে শিরীষ তলায়, পথের ওপরে। গতি ঘোষের ভিটের সংসার-তরণী বয়ে যায় তর্ তর্ বেগে। কোথায়ও বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, দিনের পরে রাত আসে, রাতের পরে আবার প্রভাত। প্রভাতের সোনার আলোয় রাঙ্গিয়ে দেয় আম গাছের মাথা।

হরিদাস বোষ্টম নাম বিলোতে আসে গতি ঘোষের ভিটেয়—

"আমার শপথি লাগে না যাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি ;

থাকিও তরুর ছায়ে মিনতি করিছে মায়ে,
রবি যেন না লাগয়ে গায়।"

৪

বছর ঘুরে বর্ষা এসেছে, এবার নদীতে বান ডেকেছে অনেক আগে। পথ-ঘাট, ডোবা-নালা ঘোলা জলে ভরে গেছে। গতি ঘোষের ভিটের মাঠ, জল, বাঁশ বনের তলা নদীর সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। স্রোত বয়ে যাচ্ছে খরতর বেগে। আমতলাতেও জল জমেছে পায়ের পাতা ডোবার মত।

সেদিন ভোর হতেই বৃষ্টি ঝরছিল টিপি টিপি। বর্ষণ যত না হোক্, গর্জ্জন অনেক বেশি।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থেমে গেল বটে কিন্তু গর্জ্জনের বিরাম হ'ল না। মেঘের সঙ্গে প্রমত্ত পবনের যেন যুদ্ধ বেধে গেল। নালার ব্যাঙেরা একটানা সুরে সুর ভাঁজতে লাগল।

ঠাকুমা জপের মালা নিয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছেন। মা, কাকীমা রন্ধনশালায়। আমি মা'র কাছে নাগপঞ্চমীর উপাখ্যান শুনছি। এমন সময় ঝড়ের বেগে বৌঠান এসে হাজির। রেকাবীর ওপরে কলার পাতায় ঢাকা গরম মাছের ঝোলের বাটি নিয়ে।

মা রাগ করলেন, "তোর কিসের আক্কেল শীত্লি, রাত-বেরাতে অত জল-ঝড়ের ভেতরে কেউ ঘরের বের হয় না কি। কালও একরাশ মাছ পাঠিয়েছিলি, আজ আবার রান্না মাছ না আনলে চলত না?"

"সামান্য একটু এনেছি মামীমা, মিছরির জন্যে। ভরা বর্ষায় ডিঙ্গি নৌকায় ছাতা মাথায় দিয়ে মাছ ধরা। সব দিন ভাল মেলে না। বেলা ভোর ব'সে ব'সে ক'টা সরল পুঁটি পেয়েছিলেন। মিছরি ভালবাসে, তাই দিয়ে গেলাম।"

মা বললেন, "তুই হাত ধুয়ে ঐ পিঁড়েয় একটু বোস্। বিকেলে গোটা কত ছাতুর মোয়া করেছিলাম। তোর জন্যে রেখে দিয়েছি, তুই খেয়ে ওদেরটা নিয়ে যা।"

বৌঠান বলেন, "না, মামীমা, এখন আমার ব'সে মোয়া খাবার সময় নেই। ভাত চড়িয়ে এসেছি, পুড়ে যাবে। কাগজের ঠোঙ্গায় করে দিন, নিয়ে যাই।"

মা মোয়া আনতে গেলে আমি বৌঠানের এঁটো হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে বললাম, "তুমি এত রাতে একা একা আর কখনও এস না বৌঠান। ঠাকুমা টের পেলে বকুনি দেবেন। তোমার ঝি-চাকর রয়েছে, তাদের কারুকে সঙ্গে আনলেই পারতে।"

বৌঠান আঁচলে হাত মুছে জবাব দিলেম, "হাঁ এত পথ আসতে সৈন্য-সামন্ত, লাঠি-সোঁটা নিয়ে আ বৈকি! আমি তোর মতন ভয়-কাতুরে নই। 'হাতি পিঠে আসে যায়, হাম্বা দেখে মূর্চ্ছা যায়।' দরকার হ সারা গাঁ আমি এখন টহল দিয়ে আসতে পারি।"

মা মোয়া এনে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ভাগ্ন জপ-তপ হয়েছে নাকি? শুয়ে পড়েছেন কি? আহ অমন মানুষের এমন দশা।"

"না, এখনও জপ-তপ করছেন, শোবেন বারট একটায়।" বলতে বলতে বৌঠান ব্যস্ত হয়ে বাড়ালেন।

মা হাঁকডাক সুরু করে দিলেন, "ওরে মটর, পাতালি লণ্ঠন নিয়ে শগ্গির বেরো। গতি ঘোষের ভিটে শীতলিকে এগিয়ে দিয়ে আয়।"

মটর, পাতালী আলো নিয়ে আসতে না আসতে বৌঠান পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দূর থেকে তাঁর গীতস্বর ভেসে আসতে লাগল—

'মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায়রে,
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা, আয় আয়, আয়রে।"

রাত্রি শেষে ঝড়ের মাতন থেমে গেছে। আকাশে গর্জ্জন নেই, বর্ষণ নেই। বিষণ্ণ প্রকৃতি কিসের বিষাদে যেন থম্ থম্ করছে।

আমি ঠাকুমার পাশে শয়ন করেছিলাম। ঠাকুমা সবে উঠে ঘরের দরজা খুলেছেন এমন সময় দূর থেকে একটা গোলমাল শোনা যেতে লাগল! পরক্ষণে দাদার বালক ভৃত্য বিহারী ছুটে এল, "সর্ব্বনাশ হইচে, তোমরা আসেন, পিসিমা আমতলার জলে পইরে মরে গেইচে।"

মুহূর্ত্তে সকল গৃহদ্বার মুক্ত হ'ল, সকলে ছুটল গতি ঘোষের ভিটেয়।

তখন দিদিকে আমতলা থেকে তুলে আঙ্গিনায় শোয়ান হয়েছে। তাঁর পরিধানে সেই কুন্দশুভ্র বসন, মুখে অপার্থিব হাসি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আঙ্গুলে অষ্টধাতুর অঙ্গুরী। শরীরের কোথায়ও আঘাতের চিহ্ন নেই, পরিধেয় থান জলে সিক্ত।

রাত্রে কখন যে কি ভাবে এত বড় কাণ্ড সঙ্ঘটন হয়েছে, সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল না। প্রতিদিনের মত দিদি হাসি খুসীর কাছে শয়ন করেছিলেন। দাদা, বৌঠান সদানন্দকে নিয়ে শুয়েছিলেন পাশের কামরায়। দুই ঘরের মাঝখানের দরজা ঈষৎ ভেজানো ছিল।

বিহারী শুয়েছিল খিল এঁটে ডাক্তারখানায়। ঝি খেয়েদেয়ে বৃদ্ধা মার কাছে গিয়ে শোয়।

ভোরের আবছা আলোকে প্রথমে বৌঠানের চোখে পড়ে এই নিদারুণ দৃশ্য। বৌঠান চিৎকার করে ছুটে গিয়েছিলেন দিদির প্রাণহীন দেহ আমতলা থেকে তুলে আনতে।

সহসা থেমে গেল গতি ঘোষের ভিটের আনন্দকলরব —অন্তরীক্ষ থেকে নেমে এল শোকের অন্ধকার, বিষাদের বিলাপ-তান।

এর পরে সুরু হ'ল মৃত্যুর উৎসব। চৌকীদার এল, থানায় খবর গেল, দারোগাবাবু এল তদন্তে। সমস্ত শেষ হলে দিদির নশ্বর দেহ ভস্ম হয়ে গেল নদীতটের শ্মশানে।

দিদির শোচনীয় মৃত্যুতে দাদা মর্ম্মাহত হয়ে কাঁদলেন —প্রতিবেশীরা চোখ মুছতে লাগল। হাসি-খুসীর গণ্ড বেয়ে অঝোরে ঝ'রে পড়ল অশ্রুজল। শুধু বৌঠান কাঁদতে পারলেন না। তাঁর ভেতর-বাহির অকস্মাৎ শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি ঝটিকাছিন্ন লতার মত, তৈলহীন প্রদীপের মত রূপান্তরিত হয়ে গেলেন।

পরের দিন হতে সূচনা হ'ল বৌঠানের মূর্চ্ছা রোগের।

ঠাকুমা সবাইকে আমাদের বাড়ীতে এনে রাখলেন। কিন্তু তাতেও বৌঠানের পীড়ার উপশম হ'ল না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে বের করা যায় না, হাসির ঝরণা তাঁর থেমে গেছে। চোখের দৃষ্টি ভীতগ্রস্ত। আমি সারাদিন অনুনয় করি, "বৌঠান, তুমি এমন হলে কেন? আর কারোর ননদ কি মরে না?"

মা সস্নেহে সান্ত্বনা দেন, "শীত্‌লি, তুই কি ভাবিস, কিসের ভয় পাস মা, এত? বল্‌, বলে বুকের বোঝা নামিয়ে দে।"

বৌঠান তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ হাসি হাসবার চেষ্টা ক'রে যেন বলতে গিয়ে শিউরে থেমে যান। বলা হয় না।

বৌঠানকে নিয়ে সকলেই বিব্রত হয়ে পড়লেন, বিশেষ করে দাদা। তাঁদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে এ অবস্থায় স্থান ত্যাগ ভিন্ন আরোগ্যের আশা কম।

দিদির কাশীর বাড়ীটা তিনি দাদাকেই লিখে দিয়েছিলেন। বাড়ীর নীচে ভাড়া আছে। ওপরটা ওঁদের তৈজসপত্র দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দাদার প্রকৃত সংসার ত সেখানেই, এখানে আসা বৌঠানের প্ররোচনায় —যাঁর জন্যে এত আয়োজন, তাঁকে বাঁচাতে হলে যে এসব পরিত্যাগ করে যেতে হবে।

দাদা কাশীতে ফেরার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ঘর-দোর বিক্রী করে দিলেন। তৈজসপত্র বিলিয়ে দিলেন। তিলে তিলে যা গড়ে উঠেছিল, তা ভাঙ্গতে বেশী সময় লাগল না।

বৌঠানদের বিদায়ের সময় মা কেঁদে বললেন, "সেরেসুরে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসিস, মা। এবার আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পেছনের জমিতে তোর ঘর তুলে দেব। গতি ঘোষের ভিটে চিরকালের অপয়া, কারোর ভোগে লাগতে দেখি নি। তোর অত পছন্দ হয়েছিল, ভেবেছিলাম সতীলক্ষ্মীর সংস্পর্শে ভিটের দোষ কেটে যাবে। তা হ'ল কৈ? তোরা মিছরির বিয়ের সময় আসতে ভুলিস নে। মিছরি যে তোর বড় স্নেহের।"

অসহায়া বালিকার মত বৌঠান মাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে পরে চুপে চুপে বললেন, মিছরির বিয়ের সময় আমি আসব, মামীমা। আমি যদি ভাল হতে পারি, ওরা যদি আমাকে সারতে দেয়।"

"কারা তোকে সারতে দেবে শীত্‌লি? কাদের কথা তুই বলছিস?"

বৌঠান জবাব দিলেন না, নির্ব্বাক্ হয়ে রইলেন। তাঁর অব্যক্ত কাহিনী অব্যক্ত রয়ে গেল। তাঁরা চ'লে গেলেন।

মাসখানেক পরে কাশী থেকে দাদা পত্রে জানালেন যে আমার বড় ভালবাসার আদরের বৌঠান আর নেই। অজ্ঞান অবস্থায় খাট থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

এই অশুভ সংবাদে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। আকুল হয়ে ছুটলাম গতি ঘোষের ভিটেয়। সেখানে গেলেই যেন বৌঠানের দেখা পাব, ধরতে পারব।

কাকীমা পাতালীকে নিয়ে যে আমার অনুসরণ করছেন সেটা লক্ষ্যও হ'ল না।

গতি ঘোষের শূন্য ভিটে আবার ধু-ধু করছে। কোথায়ও আবরণ নেই, আচ্ছাদন নেই। বৌঠানের তুলসী গাছ, বেগুনের চারা ছাগলে মুড়িয়ে খেয়েছে। বর্ষার ধারায় বাঁধা ভিটে জায়গায় জায়গায় ধ্বসে গেছে। আমতলা আগাছার জঙ্গলে ভ'রে গেছে। আমার ভয়-ভাবনা নেই।

আমি বৌঠানের শয়ন-ভিটেয় লুটিয়ে ডাকতে লাগলাম, "বৌঠান, বৌঠান!"

আমার আর্ত্তনাদে জলার পাশ দিয়ে শুভ্র বসনা দিদি যেন বাঁশের বনে লুকোলেন। আমগাছের ঘন পল্লবে লুকিয়ে কে যেন ফিস্ ফিস্ করলে, "মিছরি, মিছরি, আয় আয়।"

কাকীমা আমাকে টেনে আনলেন গৃহে।

আমার পেছনে গতি ঘোষের ভিটে হাহাকার করে কাঁদতে লাগল।

# আমাদের জাতি লভুক বিজয়

প্যাট্রিস্ লুমুম্বা

অনুবাদক—শ্রীকৃষ্ণধন দে

নৃশংস রাত্রির বুকে পারো যদি আরো কেঁদে ওঠ,
কৃষ্ণাঙ্গ ভ্রাতারা মোর,—তোমাদের দেহ-চূর্ণ আজো
উন্মত্ত ঝঞ্ঝার বুকে বিকীর্ণ হয়েছে দিকে দিকে
ধরিত্রীর ক্রোড় ভরি'। ঐ তুঙ্গ পিরামিড শ্রেণী
—ও যে তোমাদেরি গড়া! রাজ্যজয়-লিপ্সুদের সেনা
একদা তোমরা ছিলে! তবু দেখ কলঙ্ক-অক্ষরে
কি লেখা ললাটে তব,—"দাসত্ব অথবা মৃত্যু লহ।"

নিবিড় অরণ্যতলে, লোকালয় হতে বহু দূরে,—
রক্তাক্ত নখরদন্তে যারা নিত্য লভিছে মরণ,
অথবা দুর্জয় ব্যাধি ধীরে ধীরে করিতেছে গ্রাস,
বিষাক্ত সর্পিনীলতা হরিতেছে প্রাণশক্তি যার,
—তারা যে তোমারি ভ্রাতা, চিরবন্ধু, আত্মার আত্মীয়,
একই রক্ত কৃষ্ণদেহে,—উৎপীড়নে চিরপিষ্ট জাতি!

মনে পড়ে একদিন তোমাদেরি এ পুণ্যভূমিতে
এল শ্বেতাঙ্গের দল, মরণের চেয়ে ভয়ঙ্কর!
—লুঠে নিল স্বর্ণ তব, তোমাদেরি সতীত্ব নারীর
অট্টহাস্যে নিল কাড়ি,—তোমাদের পুত্র ও ভ্রাতার
অসঙ্কোচে নিল প্রাণ, তোমাদের সন্তানসন্ততি
পাঠাল নির্মম চিত্তে গো-মহিষ-ছাগলের প্রায়
বদ্ধ করি' অন্ধকূপে সাগরপোতের কক্ষতলে
কোথায় অজানা দেশে! দুর্বিসহ নিদারুণ শ্রমে
পশুত্ব লভিল তারা। কেহ বা মরিল যন্ত্রণায়।
"কার্পাস" দেবতা যেথা, "ডলার" সম্রাট্ হয়ে রয়,
সেখানে কঠোর শ্রমে উদয়াস্ত খেটে খেটে তারা
পশুসম খাদ্য পায়, অগ্নিবর্ষী নিদাঘের দিনে
স্বেদোক্ত বিকৃতমুখে সহে তারা রূঢ় নির্যাতন!

নির্বাক্ বিদীর্ণ বক্ষে তারা তবু করেছে প্রার্থনা—
"এই কৃষ্ণকায় জাতি যেন বেঁচে থাকে ভগবান্!"

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপার্শ্বে কোন এক শীত-ক্লিষ্ট রাতে
চঞ্চল কঙ্কালছায়া আজো যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে
অরুন্তুদ যাতনায়, অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গের ওই
উচ্ছল সঙ্গীতস্রোত মত্ত হয়ে ফেরে ঐকতানে
চটুল নৃত্যের ছন্দে মদিরাবিহ্বল লালসায়!
ভাসে দম্ভলোভীদের ক্রূর তীক্ষ্ণ রূঢ় অট্টহাসি!

কৃষ্ণকায় ভ্রাতা মোর, তোমার উদাত্ত কণ্ঠস্বর
বলুক তাদের ডাকি'—"এ পৃথিবী শুধু তোমাদের?
আমরা কি কেহ নহি? মাতা বসুন্ধরা আজো তার
শ্যামল স্নেহের ছায়ে আমাদের করে নি পালন?
দেয় নি কি সুধারস কণ্ঠে ঢালি' নিত্য নব নব?
জাগে নি কি মাতৃকণ্ঠে শ্বেতাঙ্গের শত নিপীড়নে—
—আমার এ কৃষ্ণকায় সন্তানেরা—আহা, বেঁচে থাক্!

হে দুর্দম স্বাধীনতা, অন্তরের বহ্নিশিখা লয়ে
জেগে ওঠ,—দাও বল, দাও স্পৃহা, অগ্নিবর্ষী চোখে
দাও সে সঙ্কল্প নব, অনাগত সূর্যের কিরণে
দাও পথ, দাও শক্তি! অন্তহীন সম্মুখে দুস্তর
গর্জিছে সময়সিন্ধু। তারি তটে তুলি উচ্চ শির
বরণ করিয়া লব স্বাধীনতা, আকাঙ্ক্ষার ধন।
আকাশে প্রখর সূর্য, ধরণীর ধূলি বহ্নিময়,
দুঃসহ তৃষ্ণায় পৃথ্বী আমাদের রক্তবিন্দু যত
করুক শোষণ,—আর অতীতের কলঙ্কমলিন
লুপ্ত হোক ইতিহাস!—জেগে ওঠ হে কঙ্গো আমার,
জেগে ওঠ হে আফ্রিকা,—নির্জিতের রক্তাক্ত স্বাক্ষর।

## উৎসে হাঁক দেয়

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

মনের সংলাপ শান্ত হয় যদি
দেখবে প্রীতরঙ্ মামুলি, নিরবধি
সময়···অনায়াস সাগরে বিস্তৃত
যে-ঢেউ নদীকূলে মুঠিতে স্বীকৃত।

তোমার বাহুকোণে যে ছিল সম্মত
সে যদি মাথা তোলে সটান, অনুগত
বাঁধন খুলে খুলে অন্য হাওয়া চায়
অন্য উত্তাপ তাও কী অন্যায়
তাও কী অপরাধ! দিও না ধিক্কার—
বরং হও তার মুক্ত উদ্ধার:
বাড়াক বাহু দূর নীল আকাঙ্ক্ষায়—
দিও না সাড়া তুমি কলুষ রটনায়।

নদীর মতো তার সাহসী সন্ধান,
বিলালে উৎসাহ, হয় তো হতে পারে
শাখায় প্রশাখায় বিশাল উদ্যান।

দীপ্ত অনুরাগ শাখায় উঁকি মারে—
মিথ্যে বুকে বাঁধো আবেগ শ্রীরাধার।
বরণে দ্বিধা কেন প্রাণের বিস্তার!

উৎসে হাঁক দেয় চড়াই-উতরাই,
হাঁকছে নিরবধি সময়, যাই যাই!

## ছোটখাটো মানুষ যাঁরা ছোট থাকেন নি

| নাম | উচ্চতা |
|---|---|
| নেপোলিয়ন বোনাপার্ট | ৫´ ৪´´ |
| বেনিতো মুসোলিনি | ৫´ ৬´´ |
| যোসেফ স্টালিন | ৫´ ৬´ |
| এনড্রু কার্নেগি | ৫´ ৪´´ |
| সেন্ট্ ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার | ৪´ ৬´´ |
| ইমানুয়েল কান্ট্ | ৫´ |
| লাড্উইগ ফোন বিঠোফেন | ৫ ৪´ |
| এ্যাড্মিরাল নেল্সন | ৫´ ৪´ |

এদেশে মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রভৃতি অনেকেই দীর্ঘাকৃতি লোক ছিলেন না।

# পদ্মমধু

(প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)

শ্রীরাণু ভৌমিক

যখন তোমার মনে হবে চারিদিকে অসীম অন্ধকার—যখন মনে হবে আলোর সূর্য আর উঠবে না—তখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর। যখন তোমার দুঃখের পসরা এত ভারী হয়ে উঠবে যে, তুমি তার নীচে চাপা পড়ে যাবে—তখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর। যখন বেদনার আঘাতে আঘাতে মন অসাড় হয়ে যাবে, বেদনাবোধটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না—তখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর। যখন দুঃখ তোমার মনে জমে জমে জমাট বরফে পরিণত হবে, শত চেষ্টাতেও অশ্রুধারায় বেরিয়ে এসে তোমাকে মুক্তি দেবে না—তখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর।

দেখবে আকাশ থেকে আলোর রথ নেমে আসবে। সেই রথে প্রসন্নবদন জ্যোতির্ময় মূর্তি, তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুখে মৃদু হাসি। সেই হাসির ছটায় চারিদিক্ আলোকিত হয়ে উঠবে, অন্ধকার কেটে যাবে। তোমার চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল পড়বে—জীবনের শূন্যতা পাবে পূর্ণতা।

পণ্ডিতমশাই, আজ আপনার কথা মনে পড়ছে। বার বার, কত বার আপনি এই কথাগুলি বলেছেন। সূর্য অস্ত যেত, শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে যেত ধীরে ধীরে, ঘন সবুজ গাছের মাথায় স্নিগ্ধ অন্ধকার নেমে আসত মায়ের চুমুর মত—তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করতাম। মাথা নীচু করেই শুনতাম আপনার খড়মের শব্দ। প্রণাম শেষ করেই ছুটে চ'লে যেতাম ঘরে, মাদুরটা এনে পেতে দিতাম বারান্দায়।

কি একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে আপনি আসতেন। এখনও কিছুটা মনে আছে।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

—অর্থ কি পণ্ডিতমশাই? জিজ্ঞেস করতাম আমি।

—অর্থ! খড়ম ছেড়ে দাওয়ায় বসতে বসতে আপনি একটু হাসতেন। আপনার মাথার টাক অন্ধকারে চকচকিয়ে উঠত। উজ্জ্বল দু'টি চোখ, রোদে-পোড়া তামাটে রং, খাঁড়ার মত নাক। আপনাকে দেখে মনে হ'ত একটা পুরানো চুল্লী—যাতে অনেকদিন থেকে আগুন জ্বালান হয়েছে, যাতে এখনও বহুদিন আগুন জ্বলবে।

—সব মধু, মধু···মধু···মধু। আকাশ মধু ক্ষরণ করিতেছে, বাতাস মধু বহন করিতেছে, নদীতে মধুর স্রোত। পৃথিবী মধুময়। আর···

—আর কি?

—সবচেয়ে মধুময়ী তুমি—নারী।

পণ্ডিতমশাই, আপনি মেয়েদের বলতেন নারী।

—শুধু, নারীই মধুময়ী। ইচ্ছে করেই কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর মেশাতাম আমি।

হ্যাঁ, শুধু নারীই মধুময়ী। নারীর ওষ্ঠে মধু, কণ্ঠে মধু, হৃদয়ে মধু। পুরুষের সৃষ্টিকে সে ধারণ করে, সৃজন করে, পালন করে। তাই ত পৃথিবী এত মধুতে ভরা।

হঠাৎ পেছন থেকে হো হো ক'রে হেসে উঠত প্রতাপ। ওর এই একরকম আসবার ধরণ ছিল। কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়াত বুঝতে পারা যেত না।

—মধু নয়, মধু নয় বিষ, হাসতে হাসতে দাওয়ায় বসে পড়ত প্রতাপ। বিষ···বিষ···বিষ। আকাশ বিষ ক্ষরণ করিতেছে, বাতাস বিষ বহন করিতেছে, নদীতে বিষের স্রোত। পৃথিবী বিষময়, আর···

ঠিক আপনার মত কণ্ঠে কথাগুলি ব'লে, বিদ্রূপভরে আমার দিকে তাকাত।

কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতাম না, আর কি? রাগে শরীর জ্বলে যেত আমার। জানতাম ও কি বলবে।

—আর সবচেয়ে বিষময়ী তুমি—নারী।

পরক্ষণেই ওর কণ্ঠ সহসা গম্ভীর হয়ে উঠত।

—হ্যাঁ, পৃথিবী বিষে ভরা। শুধু তাই নয়, বিষের চক্রে ঘুরে ঘুরেই সে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন না, কি বিষের চক্রে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। নিজের বিষের জ্বালায়, নিজেরই প্রাণ-বিন্দুর চতুর্দিকে বন্‌বনিয়ে ঘুরছে সে। সর্বগ্রাসী ক্ষিদে তার। আশেপাশে যা পাবে সবই টেনে নিতে চায় নিজের মধ্যে। তবু তার আত্মজেরা ছিটকে বেরিয়ে আসে। তাদের মনেও ত বিষ-জ্বালা কম নয়।

ততক্ষণে, বাবা, মা, এসে বসেছেন—কোণে বসেছেন ও বাড়ীর বিধবা ন' খুড়ীমা।

—কি? প্রতাপের সেই বিষের থিয়োরী, বাবা হেসে বলেন।

—হ্যাঁ, আমার সেই বিষের থিয়োরী। শুধু আমার নয়, পৃথিবীর সব বুদ্ধিমান্ লোকেরই এই কথা। Struggle for existence—জীবন-যুদ্ধে জয়ী হও—তবে বাঁচবে। এই যুদ্ধ—শক্তির সঙ্গে শক্তির নয়—শক্তির সঙ্গে খলতার। যার মনে যত বিষ, যে যত খল, কপট, সেই বাঁচবে।

—কি সব আজেবাজে বকছ। অসহ্য হয়ে উঠত বলেই আমি বাধা দিতাম। ও আমার কথা শুনত না, আমার দিকে তাকাত না, নিজের মনেই বলতে থাকত, প্রাগৈতিহাসিক জীবদের কথা মনে করুন। কি বিরাট্ তাদের দেহ—কি অসীম তাদের শক্তি। তবু তাদের নিঃশেষ ক'রে মানুষ আজ এখানে দাঁড়িয়েছে। পশুকে শেষ করে দিয়ে মানুষ এখন পরস্পরের প্রতি বিষ ছড়াচ্ছে। এক দেশ অপর দেশকে শেষ করছে—এক জাতি অপর জাতিকে। এর পরে মানুষ ঘরেই বিষ ছড়াবে—বাপ, ছেলে, মা, মেয়ে, ভাই, বোন কারও কোন সম্পর্ক থাকবে না কারও সঙ্গে। বিষ···বিষ···সর্বত্রই বিষ।

একটু থেমে পণ্ডিতমশাইর দিকে চেয়ে আবার বলত, আপনারা পুরাণো পরিত্যক্ত যুগের লোক। আপনারা ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ। তাই দুর্বলতার অবলম্বন এক ভগবান্‌কে সৃষ্টি করে রেখেছেন, তিনি আবার মঙ্গলময়—মধুময়। ছিঃ ছিঃ!

জোরে হেসে উঠতেন পণ্ডিতমশাই। বলতেন, যা মধু তাই ত বিষ রে। তোরা কালো চশমা পরেছিস রে···কালো চশমা পরেছিস। তাইত সব জিনিষ কালো দেখাচ্ছে।

একটি সুন্দর ফুল হাওয়াতে ভেসে ভেসে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে—ক্রমে সে শুকিয়ে গেল, তার প্রাণবিন্দু থেকে জন্ম নিল একটি ফল। তুই এতে দেখছিস বিষ, ফুলটাকে শেষ ক'রে ফল বেরিয়ে আসে—আর আমি দেখছি প্রেম—মধু—কি ভাবে মধুর আবেশে ফুল থেকে ফল হয়, ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে মহীরুহ, মহীরুহ থেকে আবার ফুল···এই ভাবেই সৃষ্টি বেঁচে আছে।

প্রতাপ আর কোন কথা বলত না। ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবত। আমি চাইতাম আকাশের দিকে—চাঁদের আলোয় আকাশ ভরে গেছে—সে জ্যোৎস্না যেন স্বপ্ন-লোকের তন্দ্রামাখানো। চারিদিকে অপূর্ব নীরবতা। আকাশের তারাগুলি নীরব, বাঁশের বন নীরব, নীরব আমাদের সভা। মধু···মধু···মধু···চারিদিকে শুধু মধুর আবেশ। দাওয়ার পাশে সন্ধ্যামণি ফুলগুলি মণির মত জ্বলছিল। তুলসীতলার বাঁধানো জায়গাটি অপরূপ স্নিগ্ধ পবিত্রতায় ভরা। রজনীগন্ধা আর হাস্নাহানার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আমাদের কাজলী কোণের দিকে শুয়ে আছে ওর বাছুর নিয়ে। ওর সর্বদেহে পরিপূর্ণতা ও তৃপ্তির আবেশ।

পণ্ডিতমশাই, তখনই আপনি বলেছিলেন ঐ কথাগুলি। কি জানি কেন—একবার তাকালেন প্রতাপের ভ্রূকুঁচকান মুখের দিকে। তার পরে মিষ্টকণ্ঠে বললেন, যখন তোমার মনে হবে চারিদিক অসীম অন্ধকার—যখন মনে হবে আলোর সূর্য আর উঠবে না—তখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর। যখন তোমার দুঃখের পসরা এত ভারী হয়ে উঠবে যে, তুমি তার নীচে চাপা পড়ে যাবে—তখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর। যখন বেদনার আঘাতে তোমার মন অসাড় হয়ে বেদনাবোধটুকুও থাকবে না, তখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর। যখন দুঃখ তোমার মনে জমে জমে জমাট বরফে পরিণত হবে, শত চেষ্টাতেও অশ্রুধারায় বেরিয়ে এসে তোমাকে মুক্তি দেবে না—তখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর।

দেখবে, আকাশ থেকে আলোর রথ নেমে আসবে। রথে প্রসন্নবদন জ্যোতির্ময় মূর্তি। তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুখে মৃদু হাসি। সেই হাসির ছটায় চারিদিক্ আলোকিত হয়ে উঠবে—অন্ধকার কেটে যাবে—

মৃদু-মিষ্টি বাতাস, স্বপ্নভরা জ্যোৎস্না, আর আলোয়-ধোয়া সন্ধ্যামালতী ফুলগুলির পাশে বড় অদ্ভুত শুনিয়েছিল কথাগুলি। মনে হয়েছিল, সত্যই বুঝি আকাশ থেকে আলোর রথ নেমে এল। ছায়াপথ পেরিয়ে সে রথ ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়াত। তাকিয়ে দেখলাম প্রতাপের ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে গেছে—অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছে, আর তখন ওকে সত্যই সুন্দর দেখাল।

পরক্ষণেই কিন্তু ওর ভ্রূ দু'টো আবার কুঁচকাল—কোন কথা না ব'লে উঠে গেল ও।

তারপর রাত বাড়ে। জ্যোৎস্নার স্বপ্ন আরও মধুর হয়ে ওঠে। আপনি মা, বাবা, ন' খুড়ীমার সঙ্গে কত কথা নিয়ে আলোচনা করেন—সে সব কিছুই আমার কানে যায় না। চোখের সামনে দেখতে থাকি সেই আলোর রথ। জ্যোতির্ময় মূর্তি নেমে এলেন—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে আলোর পদ্মটি আমার হাতে দিলেন। পদ্মের মধুর গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখি, তখনও আপনারা গল্প করছেন—চাঁদ আকাশের মাঝখানে।

—একি! তোমরা ঘুমুবে না?

—হ্যাঁ, রাত হ'ল। ব'লেই উঠে পড়তেন আপনি। কোন কথা না ব'লে চ'লে যেতেন। খানিকটা দূর থেকেই ভেসে আসত আপনার উচ্চকণ্ঠের শিবস্তোত্র।

তারপরে আমরা যেদিন কলকাতায় চ'লে এলাম সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। আপনি তখন বড় মেয়ের বাড়ীতে ছিলেন। আমাদের কলকাতায় আসাটা হঠাৎ হয়ে গেল। গ্রামের যে স্কুলটায় বাবা কাজ করতেন একদিন কি কারণে ঝগড়া ক'রে কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলেন। বললেন, চাষবাস ক'রে খাব। এটা একটি বাজে কথা —কারণ চাষের জমি এক টুকরোও ছিল না আমাদের, আর থাকলেও বাবা কোনদিনই নিজের হাতে চাষ করতে পারতেন না। হয়ত বাবার ঐ গোলমাল মিটে যেত, বাবা ঐ স্কুলেই ফিরে যেতেন। কিন্তু তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটল—যাতে সবই উল্টে গেল।

দু' বছর আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একটা স্কুলে দরখাস্ত করেছিলেন বাবা। এতদিন পরে নিয়োগপত্র এল। বাবা খুবই উৎফুল্ল। আমরা সবাই খুশী। গ্রাম থেকে শহরে যেতে কে না চায়? শুধু মাকেই মনমরা দেখলাম। বললেন, তোর বাবার ভবঘুরে মন ত—একজায়গায় টিকতে পারে না। সেদিনই জানলাম যে, আমরা এই গ্রামের অল্পদিনের অধিবাসী—সে অল্পদিনও অবশ্য অনেক দিন—আমার তখনও জন্ম হয় নি।

কলকাতায় এলাম। দেড়খানি ঘরের সংসার। বাবার চাকরি হ'ল। ভাইদের মধ্যে যে দু'টি বড় তারা স্কুলে ভর্তি হ'ল। আমিও একটা স্কুলে ভর্তি হলাম। বেশ ছিলাম। দু' বছর এমনি কাটল। তার পরে বাবা একদিন বললেন, স্কুলে খুব গোলমাল হচ্ছে, বোধ হয় চাকরি থাকবে না।

—চাকরি থাকতেই হবে, নইলে কি না খেয়ে মরব—রেগে গেলেন মা।

কিন্তু চাকরি থাকল না। এ স্কুলটাই অমনি। সেক্রেটারী কোন শিক্ষককেই দু'তিন বছরের বেশী টিকতে দেন না। শিক্ষকরা যা মাইনে পেতেন অর্থাৎ খাতায় যা লেখা থাকত তা থেকে সেক্রেটারী পাঁচ টাকা কখনও বা দশ টাকা নিজে নিয়ে নিতেন আর সেইজন্যই কোন শিক্ষককে পুরাণো হতে দিতে চাইতেন না।

চাকরি গেলে বাবা মাকে আশ্বাস দিয়ে উজ্জ্বল মুখে বললেন, ভেব না, শীগ্‌গিরই একটা কাজ পেয়ে যাব।

মা মুখটা একটু কালো ক'রে চুপ করেই রইলেন।

দিন দিন বাবার মুখের ঔজ্জ্বল্য কমতে থাকে আর মায়ের মুখের কালোছায়া গাঢ়তর হয়। বাবা চাকরি পান না। দুটো টিউশনি ছিল তাতেই কোনরকমে চলছে।

মায়ের রাগ, দুঃখ, দুর্দশাভরা মুখের দিকে যদিও তাকাতে পারি—তাকাতে পারি না বাবার অপরাধীর মত ম্লান মুখখানির দিকে। সকালে বেরিয়ে যান রাত দশটায় ফেরেন—কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেন না। যেটুকু সময় বাড়ীতে থাকেন চুপচাপ এক কোণে মুখ নীচু করে ব'সে থাকেন।

সেদিন রাত্রে থালার ভাত নিঃশেষ ক'রে বাবা একটু-ক্ষণ চুপ করে ব'সে রইলেন—মা মুখ নীচু ক'রে বসে-ছিলেন। অনেকদিন থেকেই বিশেষ কথা বলেন না। আজও বললেন না, শুধু মুখটা আরও নীচু হয়ে গেল—আরও কালো দেখাল।

বুঝতে পারলাম হাঁড়িতে আর ভাত নেই—নইলে মা বাবাকে দিতেন। আজ মায়ের সম্পূর্ণ উপবাস।

সে রাত্রেই ঠিক করলাম চাকরি করব। স্কুল অনেক-দিন ছেড়েছিলাম, কিন্তু সহপাঠিনী কয়েকজনের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। তাদেরই একজনকে সব কথা বললাম।

—তুই ত এখনও ম্যাট্রিক পাশ করিস নি—কি কাজ করবি। যদি টাইপ শিখতে পারিস তবে কাজ পাবি।

মেয়েটিই ব্যবস্থা করে দিল। ওরই এক বান্ধবীর বাবার টাইপ শেখাবার স্কুল আছে। কোন ফী লাগবে না—এবং যতক্ষণ খুশি শিখতে পারব।

বাড়ীতে কিছুই বলবার দরকার হ'ল না। বাবা সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকেন না। মা কি রকম গম্ভীর হয়ে থাকেন—মনে হয়, কোন কথা বলতে ওঁর ভাল লাগছে না। আমি সমস্ত দিন টাইপ করতাম। পনের দিনে তিন মাসের শিক্ষা শেষ করলাম।

টাইপ-স্কুলের ম্যানেজার আমার অবস্থা জানতেন—উনিই একটা চাকরি খুঁজে দিলেন।

বিরাট্ অফিস। মেয়ে টাইপিষ্ট-ই ওখানে আমাকে নিয়ে আটটি। তাছাড়া আরও ত কতরকম কর্মচারী আছে।

বাড়ীতে গিয়ে মাকে বললাম, চাকরি পেয়েছি। মা কোন উত্তর দিলেন না। জানি, ওঁর মনে আঘাত লাগল। মেয়ে চাকরি ক'রে মাইনে এনে দিচ্ছে, আর সেই টাকায় উনি সংসার চালাচ্ছেন—কোন বাঙালী মা-ই এটা সহ্য করতে পারে না।

বাবা কিন্তু খুব খুশী হয়ে উঠলেন। সেদিনই একসঙ্গে

অনেক কথা বললেন, কলকাতার স্কুলে ট্রেনিং পাশ না করলে চাকরি পাওয়া যায় না। তুই কয়েকদিন যদি একটু চালিয়ে নিতে পারিস তবে আমি চাকরি না খুঁজে ট্রেনিংটা পড়ে নেব।

—তাই নাও, উত্তর দিলাম।

আমাদের অফিসে পাঁচটি মেয়েই এ্যাংলো—দু'জন শুধু বাঙালী, আমাকে নিয়ে তিনজন হ'ল। বাঙালী মেয়ে দু'টির মধ্যে একটি আধা-এ্যাংলো, শ্যাম্পু করা ঘাড় ছাঁটা চুল, ঠোঁটে লাল টকটকে লিপষ্টিক আর চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজী কথা। আমার দিকে এমন বিদ্রূপ ও বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকাত যে আমি তাকাতেই পারতাম না। আর একটি মেয়ের নাম প্রভা। তার সঙ্গে প্রথম দিনই আমার ভাব হয়ে গেল। ও ইণ্ডিয়ান-ক্রিশ্চিয়ান। কাজ বিশেষ কিছুই নেই—শুধু সময় মত হাজিরা দেওয়া। বিরাট হলের পর্দাঢাকা অংশে আমরা বসতাম।

—তোমার ওপর খুব রেগে আছে মিস বাগচী—প্রভা হাসতে হাসতে বলে।

—কেন?

—তুমি যে খু-ব সুন্দরী।

আমার সৌন্দর্যের সঙ্গে মিস বাগচীর রেগে যাওয়ার কি সম্পর্ক বুঝতে পারলাম না।

এইভাবেই পুরো এক বছর কেটে গেল। আমাদের সংসারে শান্তি ফিরে এসেছে। বাবার ট্রেনিং পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। তাছাড়াও, প্রাইভেটে বি. এ. দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। হাসতে হাসতে বলেন, তুই ত আমার মেয়ে নস্—আমার মা। ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলে আবার মারবি না ত?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমিও হেসে উত্তর দিই।

সেদিন প্রভা বলে, কাল মালিক আসছেন। এইবার তোমার মাইনে বাড়বে।

আমার চাকরি পাবার আগে থেকেই মালিক বিলেতে ছিলেন—এতদিন পরে ফিরে আসছেন।

—মালিক যতবার বিলেতে যান—ফিরে এসে তোমাদের মাইনে বাড়িয়ে দেন বুঝি? প্রশ্ন করি।

প্রভা খুব হাসে। বলে, যাঃ, সকলের কেন? তোমার—শুধু তোমার।

ওর হাঁসি দেখে খটকা লাগে। আমার মাইনে অবশ্য খুবই কম তবুও ··

মালিক আসবার পরদিন থেকেই অফিসে চাঞ্চল্য। বাইরের লটর হা ব্যাপার কিছুই দেখতে পাই না—কিন্তু তবুও সকলের দ্রুত হাঁটা-চলা, আসা-যাওয়া বুঝতে পারি—আমাদের টাইপিষ্ট মহলে সাড়া জাগে—ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলে—খিল্‌খিলিয়ে হাসে—শুধু অচঞ্চল প্রভা আর আমি—

প্রভা ওদের দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসে—বলে, বৃথাই ফাগুন হাওয়া—তার পরে নিজের মনেই সুর ভাঁজে, এ বসন্ত যাবে অকারণ।

—কি! কি ব্যাপার বল ত? না জিজ্ঞেস ক'রে পারি না।

—ব্যাপার! প্রভা ওর ছোট ছোট চোখ দু'টি টেনে হাসে, ব্যাপার জিজ্ঞাসা করছ, বন্ধু। দু' একদিন পরে ত তুমি নিজেই জানতে পারবে।

আমি চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকি। একটু পরে ও বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, বলব—টিফিনের সময়।

টিফিনের সময়ে প্রভা আমাকে বাইরে নিয়ে যায়—রেষ্টুরেণ্টের একটা ছোট কেবিনে আমরা দুজনে বসি।

—আমাদের মালিকের মনে মেয়েদের সম্বন্ধে দারুণ ঘৃণা, কোন ভূমিকা না করেই প্রভা বলে, এবং ঘৃণারই প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় মেয়েদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার। এবং এই জন্যই উনি অফিসে মেয়েদের চাকরি।···

—ছিঃ ছিঃ, কি সব বলছ তুমি? এখানে কাজ···

—কাজ? প্রভার ছোট ছোট চোখ দু'টি হঠাৎ জ্বলে ওঠে, কতটা কাজ তুমি করেছ এই এক বছরে।

—কাজ করি নি···বিশেষ···, একটু সময় চুপ ক'রে থেকে বলি, কিন্তু কাজ করতেই এসেছি।

—তুমি কাজ করতে এলেও এরা তোমাকে কাজ করতে রাখে নি—শোন, এক বছর আগেই মালিকের ফেরবার কথা ছিল এবং তখনই তোমাকে রাখা হয়েছিল—বুঝেছ···।

আমি চুপ ক'রে আছি দেখে আবার বলে, তবুও গেঁইয়ার মত তাকিয়ে আছে ··

—আমি ত গেঁইয়াই—গ্রামের মেয়ে—

—গ্রামের মেয়ে ত শহরে মরতে এসেছিলে কেন? কি সব সখ?

—সখ? থাক সে সব কথা, আমাকে এখন ব্যাপারটা গুছিয়ে বল ত।

—আমাদের মালিক লোক খুবই ভাল—কিন্তু বড় লোক ত নেশা আর কি। ব্যাপারটা খুবই সরল—একদিন বিকেলে পাঁচটা বাজতে যখন পনের মিনিট বাকী থাকবে, তখন ওঁর খাস বেয়ারা নিতাই এসে বলবে, দিদিমণি, আজ সাহেব অফিসের পরে আপনাকে থাকতে

বললেন। তার পরে, আমরা সবাই চলে যাব—অবশ্য বাইরের অফিসে ম্যানেজার এবং আরও অনেকে থাকবে তখন মালিক তোমাকে ডাকবেন—এবং···।

প্রভা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

—তুমি! রুদ্ধশ্বাসে বলি।

—আমি? প্রভা হাসতে হাসতেই বলে, আমি? না ভাই। আমি দারিদ্র্যের জন্য দয়া পেয়েছি। আমার চেহারাটা দেখছ ত—একে করুণা করা যায়, কামনা করা যায় না—

—আমি। আমিও ত খুবই গরীব।

—মালিক বলবেন, যার দেহে এত রূপ সে গরীব কিসে। রূপ এবং রূপা ত শুধু একটা আকারের তফাৎ।

—এ থেকে মুক্তি পাবার কি উপায়!

—খুবই সহজ। ছুটির পরে যখন উনি অফিসে থাকতে বলবেন—তখন থাকবে না—তবে চাকরিও সেই সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

—কিন্তু, কেউ যদি ভেতরের কথা না জেনে থেকে যায়—যদি ভাবে সত্যই কোন কাজ আছে...

—কেউ যাতে ভুল না বোঝে সেজন্যই ত আমি আছি। জোরে হেসে ওঠে প্রভা, কাউকে ভুল বোঝাতে মালিক চান না।

—ওঃ। চমকে উঠি, তাহলে···

—হ্যাঁ। মনিবের আদেশেই আমি তোমাকে সব খুলে বলছি—আগেও বলেছি—পরেও বলব—এমন কি রেষ্টুরেন্টের বিলও অফিস থেকে দিয়ে দেওয়া হবে।

চুপ করে রইলাম। সামনে যে মেয়েটি বসে আছে তাকে এতক্ষণ আমার বন্ধু বলেই ভেবেছিলাম—কিন্তু তা সে নয়। সেও সেই বিরাট্ যন্ত্রের একটি অংশমাত্র—যে যন্ত্রটি সাঁড়াশীর মত চেপে এক একটি মেয়েকে নারকীয় গহ্বরে ফেলছে।

আমরা বেরিয়ে এলাম। বিকেলেই, নিতাই এসে সামনে দাঁড়াল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম পাঁচটা বাজতে পনের মিনিট বাকী।

—সাহেব আপনাকে আজ পাঁচটার পরে থেকে যেতে বললেন, নিতাই বলে।

—আমাকে! থরথরিয়ে কেঁপে উঠি, আমাকে!

সব মেয়েরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু প্রভার মুখটা অন্যদিকে ফেরান।

—আমার···আজ···একটু কাজ ছিল—থেমে থেমে বলি।

নিতাই কোন কথা না বলে চ'লে যায়, পরক্ষণেই ফিরে এসে বলে, তাহলে, কাল কাজটাজ সেরে আসবেন।

স্পষ্ট, পরিষ্কার দাবী। কোন জায়গায় একটুও ফাঁক নেই—একটুও আব্রু নেই।

পাঁচটা বাজল। কারও সঙ্গে কোন কথা বলি নি। কিন্তু ট্রাম-ষ্টপেজে এসে প্রভা গায়ে পড়ে বলে, এখন বিকেল পাঁচটা—কাল দশটা অনেক সময় পাবে ভাববার—

অত সময় আমার দরকার নেই—তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিই, আমি যা ভাববার তা ভেবেই নিয়েছি।

—কি?

—আত্মাকে হত্যা করার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক সহজ।

প্রভা হেসে ওঠে। ওর সেই নির্লজ্জ উদ্ধত হাসি। বলে, প্রথমে ওইরকমই মনে হয়। এ সব বড় বড় কথা বইতে পড়তে বেশ—শুনতেও বেশ—কিন্তু···

ট্রাম এসে গিয়েছিল। ও ট্রামে উঠে পড়ে। আমি উঠি না। ওর সঙ্গে যেতে ইচ্ছে হয় না আমার।

কিন্তু নেই আমার জীবনে, বেঁচে থাকাটা এমন কিছু বড় জিনিস নয়—যে জন্যে আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রী করতে হবে।

আর তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া সেই সন্ধ্যা—নানা রঙে রঙিন পাথরের মত ঝিকমিকে সন্ধ্যামালতী ফুল—নীল সাগরের বুকে-ভাসা চাঁদ, আর হাস্নাহানা-রজনীগন্ধার তীব্র মিষ্ট গন্ধ—মধু···মধু···পৃথিবী মধুতে ভরা···

বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে চা হাতে নিয়েই আমি মাকে বলতে গেলাম, মা, জান, আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি···কিন্তু, তার আগেই মা হাসিমুখে বলেন, একটা স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে তোর বাবার কথা হয়েছে—ট্রেনিং পাশ করলেই সেখানে চাকরি পেয়ে যাবেন—এ ভাবে পড়তে পারলে নিশ্চয়ই পাশ করবেন—চাকরি পেলেই তুই কাজ ছেড়ে দিবি—আহা, মুখখানা তোর শুকিয়ে গেছে—

—ট্রেনিং পরীক্ষা—সে ত এখনও অনেক দেরী···

—কি রে! কথা বলছিস না যে? ক্লান্ত হয়ে গেছিস্···

—ক্লান্ত! না, মানে···একটা কথা বলছিলাম...

কথা শেষ করবার আগেই দু'টি ভাই বোন ছুটে এসে ঘরে ঢোকে—ভাইটি ঘরে ঢুকেই আমার গলা জড়িয়ে

ধরে, জান দিদি, আমি এবারে ফার্ষ্ট হয়েছি, নতুন ক্লাশে উঠেছি—কালই কিন্তু আমাকে বই কিনে দিতে হবে।

আমি কোন উত্তর দিই না।

—শোন দিদি, বোনটি কাছে এসে বলে, ওবাড়ীর মিঠু একটা জামা পরেছে—তুমি ত আসছে মাসে আমাকে একটা জামা কিনে দেবেই—মিঠুর মত জামা কিনে দিও।

তখন উঠে যাই, কিন্তু, রাত্রে মনে প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাকে বলি, মা, চাকরিটা যদি…

—কেন রে? ওরা কিছু বলেছে…। এক মুহূর্তে মায়ের মুখ কালো হয়ে যায়।

—না।

—তবে? তোর কষ্ট হচ্ছে, না রে? কচি মেয়ে। এই ক'টা মাস কোন রকমে চালিয়ে নে—তোর বাবার চাকরিটা হলেই ছেড়ে দিবি—

মাকে কি করে বোঝাব যে তখন চাকরী ছাড়বার প্রয়োজন হবে না—

—তুই খেয়ে নে—তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়্।

—না, পরে খাব।

ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম, বার বার ডাকাডাকিতে যখন নেমে এলাম তখন বাবার খাওয়া অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। তিনি খুব উৎফুল্ল মুখে বলছেন, চচ্চড়িটা চমৎকার হয়েছে—হাঁড়িতে ভাত আছে ত—আজ ভাত কম পড়ে যাবে…

মা হেসে উত্তর দিলেন, তুমি নাও না—যা পার।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল সেই দৃশ্য—বাবা সবকটি ভাত খেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছেন—মায়ের মুখ নীচু…

আত্মহত্যা করতে পারি কিন্তু হত্যাকারী হতে পারি না—আয়নায় দাঁড়িয়ে-থাকা কালো মুখটির দিকে তাকিয়ে বলি—বিদায়। পদ্মা রায়—বিদায়।

পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে রইলাম—মা বোধ হয় ভাবলেন—শরীর ভাল নেই—ডাকলেন না—শেষে যখন আটটা বাজে তখন বললেন, কি হ'ল তোর? ওঠ্। অফিসে যাবি না?

—অফিস! হ্যাঁ, অফিসে ত যেতেই হবে। কিন্তু যদি না যাই।

—শরীর খারাপ লাগলে যাস্ না—টেনে টেনে যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলেন মা।

একটু হাসি। আর প্রসাধন শেষ ক'রে, খেয়েদেয়ে অফিসে যাবার পথে এমন কি অফিসে ঢুকেও সেই হাসিটি বজায় থাকে ঠোঁটের কোণে…

কিন্তু, চেম্বারে বসেই কোথা থেকে দারুণ ভয় আমার মন অধিকার করে বসে। একটু পরেই প্রভা আসে—আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে নিজের সীটে গিয়ে বসে।

বিশেষ কোন কাজ নেই—কোন কাজ করিও না। নত চোখে টাইপের অক্ষরগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একমনে বলতে থাকি, আমি নিতান্ত একাকী—তুমি আমাকে রক্ষা কর।

কিন্তু, কোন আলোর রথ আমাকে রক্ষা করতে নেমে আসে না। পাঁচটা বাজবার পনের মিনিট আগে নিতাই এসে ছুটির পরে থাকবার কথা বলে যায়।

তার পরে পাঁচটা বাজে। একে একে সবাই চলে যায়—তার একটু পরেই মালিকের ঘরে আমার ডাক পড়ে। অনেকক্ষণ থেকে কিছুই ভাবছিলাম না—মনটা কি রকম যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল—ধীরে ধীরে সাহেবের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই।

—একি! তুমি!

চম্‌কে তাকাই। সামনেই চক্‌চকে কালো বিরাট্ টেবিল—নানারকম দামী দামী ঝক্‌ঝকে আসবাবের মাঝখানে বসে আছে—প্রতাপ—

প্রতাপ! মৃদু নিঃশ্বাসের মতই কথাটা মনে উঠেই মিলিয়ে যায়।

—তুমিও? আর কি! নরক গুল্‌জার। হো হো করে হেসে ওঠে প্রতাপ। মনে আছে, সেই চাঁদের আলো—তুলসীতলা—বিষ…বিষের কথা বলতাম না—এই সেই বিষ—হাতের গ্লাসটা তুলে ধরে—টক্‌টকে লাল পানীয়—

প্রতাপের মুখে সেই পুরাণো কথা শুনে সম্বিত খুঁজে পাই—মনে হয় যেন অনেকদিন আগের মতই কিশোর-কিশোরী আমরা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছি—

—বিষ। তবে তুমি খাচ্ছ কেন? ঠিক সেদিনের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করি।

—বিষ-ই ত খাওয়া প্রয়োজন। নইলে পৃথিবীর বিষের সঙ্গে পাল্লা দেব কি করে?

—কি বিষ এত তোমার জীবনে? প্রশ্ন করি।

জোরে হেসে ওঠে প্রতাপ—আমার জীবন—আমার জন্মই যে বিষে ভরা—জন্মেছিনু ভর্তৃহীনা জাবালার ক্রোড়ে—বুঝলে!

একটু পরে আবার বলে, কি? অমনি ঘৃণা হ'ল ত? কিন্তু, কোন মেয়েকে আমি ঘৃণা করতে দেব না—বরং তোমাদের সবাইকে পৃথিবীর কাছে ঘৃণার পাত্র করে তুলব—এই আমার মিশন্।

খুব ভাল মিশন্! বিদ্রূপভরে এ কথা বলি—

বলতে পারি—প্রতাপকে দেখেই সমস্ত ভয় চলে গিয়েছিল আমার—ও যেন একটি অসুস্থ শিশু।

ওর খুব কাছে গিয়ে বলি, একটি মেয়েকে ঘৃণা ক'রে তোমার পৃথিবী বিষে ভ'রে গেছে, আর একটি মেয়েকে ভালবেসে কি তা মধুতে ভ'রে উঠতে পারে না—

প্রতাপ স্থির চোখে তাকায়। ওর চোখের সেই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব কেটে গিয়ে দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসে—ধীরে ধীরে ওর মুখটা নরম হয়—পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে বলে, যেটুকু একটু মধু কিশোর-স্মৃতিতে ছিল—তাও বুঝি এসে বিষে ভ'রে দিলে।

—আমার এখানে এসে দাঁড়ানটাই তোমার কাছে সত্য হ'ল—দাঁড়ানর পেছনের ইতিহাস জানতে চাইলে না—

—ইতিহাস!

—হ্যাঁ। ইতিহাস জানতে হবে। জানতে হবে আত্মত্যাগের কোন্ অপরূপ মাধুর্যের প্রেরণায় মানুষ নিজেকেও বিলিয়ে দেয়। হয়ত তোমার মাকে যা ভাবছ তিনি তা নন—আমারই মত এক আত্মত্যাগিনী—হতভাগিনী।

প্রতাপ চুপ ক'রে থাকে, গ্লাসে চুমুক দিতেও ভুলে যায়। হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই।

ওর মুখোমুখি দাঁড়াই, বলি, আমার চোখের দিকে তাকাও, কি দেখছ?

—মধু। পদ্মমধু।

# বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই শ্বেতাঙ্গ প্রভুর পদাঘাতে কৃষ্ণাঙ্গ কুলীর পিলে ফেটে মৃত্যুর ঘটনা কমে আসছিল। কিন্তু রেলওয়ের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর দ্বারা ভারতীয় নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতে লাগল। কিভাবে এর প্রতিকার করা যায় তা ভাবতে লাগলাম। কেননা, ভারতীয় নারীর অসম্মান সমস্ত ভারতবর্ষের অপমান ব'লে আমরা মনে করলাম। কোর্টে নালিশ হলে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর ন্যায়বিচার হ'ত না। তারা হয় মুক্তি লাভ করে, না হয় সামান্য দণ্ড পায়। তাই আমরা স্থির করলাম যে, দু'চারজন অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিলেই সমস্ত শ্বেতাঙ্গ-প্রভুরা সতর্ক হবে। পুনরায় এমনি অপরাধ করতে সাহসী হবে না।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে গোমেশ (Gomez) নামে এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী একজন ভারতীয় রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করল। যথারীতি অভিযোগ হ'ল, কিন্তু সুবিচার হ'ল না। এই গোমেশকে চরম দণ্ড দেব ব'লে স্থির করলাম। খবর পেলাম গোমেশ চাঁদপুর ষ্টেশনে বদলি হয়ে এসেছে। নরেন্দ্রমোহন সেন, ও একজন পুরাতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাবেন এই কার্য সমাধা করতে। সঙ্গে থাকবে একজন স্থানীয় যুবক যাতে পশ্চাৎ অপসরণের সময় নিরাপদ পথ বেছে নেওয়া যায়।

তাঁরা চাঁদপুর গেলেন বটে, কিন্তু ঠিক আক্রমণের সময়ই কার্য সম্পন্ন না করে তাঁরা ফিরে এলেন। ফিরে এসে নরেনবাবু আমার নিকট সমস্ত খুলে বললেন। ব্যর্থতা হয়েছিল দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য। তার সম্বন্ধে নরেনবাবু যা বললেন তা খুবই বিচিত্র। প্রথম দু'দিন আক্রমণ করতে গিয়েও কার্য শেষ পর্যন্ত পৌঁছাল না। কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নরেনবাবুর মনে হ'ল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে দুর্বলতা এসেছে। তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তৃতীয় দিন ঠিক আক্রমণের মুখে নরেনবাবু যখন রিভলবার খুলে ছুটে গিয়ে গুলি করবেন, ঠিক সেইক্ষণে দ্বিতীয় ব্যক্তি নরেনবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, "নরেন, থাম থাম, আগে আমার কথা শোন।"

পরে তিনি নিজ দুর্বলতার কথা স্বীকার করে বললেন, "আমি আর সে মানুষ নেই। আমার মনে পরিবর্তন এসেছে। আমি দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়েছি। আমি আর তোমাদের সঙ্গে চলতে পারব না। এ্যাদ্দিন নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখেছি। আজ আর না বলে পারলাম

না। হঠাৎ যেদিন বৃদ্ধ পিতাকে দেখলাম ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ঠক্ ঠক্ করে শীতে কাঁপছেন সেদিন থেকেই আমার মনে দুর্বলতা প্রবেশ করেছে। আমাকে সংসারী হতে হবে, অর্থোপার্জন করতে হবে।"

নরেনবাবু তাকে বললেন, "তুমি যে অকপটে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করলে, তারজন্য খুবই সন্তুষ্ট হলাম। কোন হৈ-চৈ না করে, কাউকে কিছু না বলে সক্রিয় কর্মপন্থা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাও। তোমার আর কোন সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন নেই। কাউকেই কিছু বলব না, বা তোমার নিন্দে রটবে না। তবে বুঝতেই পার দু'এক জনকে একটু জানিয়ে রাখতে হবে।"

ফিরে এসে নরেনবাবু আমাকে সব কথা বললেন। ইচ্ছে করেই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম প্রকাশ করলাম না। তিনি ছিলেন সমিতির নেতৃস্থানীয় একজন পুরাতন বিপ্লবী এবং আমার সিনিয়র। অনেক বছর ধ'রে তিনি পলাতক জীবন যাপন করছিলেন এবং তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট ছিল। মানুষের চরিত্র যে কি রকম দুর্জ্ঞেয়, কি অবস্থায় কখন হঠাৎ মনের আমূল পরিবর্তন এসে যায় তা দেখাবার জন্যই বিষয়টা উল্লেখ করলাম।

প্রথম যুগে সমিতির গৃহত্যাগী-সভ্যরা আর বাড়ী ফিরে যেতে পারত না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিল। পরে যে ঘটনার উল্লেখ করলাম তার পরে আরও দু'একটা এমনি ঘটনা হওয়ায় স্থির করলাম যে, বিশেষ কোন অসুবিধে না থাকলে—যেমন ধরা পড়বার সম্ভাবনা না থাকলে, গৃহত্যাগী সকলকেই অস্থায়ীভাবে বাড়ী যেতে দেব। প্রয়োজন বোধে বাড়ী ঘুরে আসতে বরং উৎসাহিতই করব। যেহেতু গৃহত্যাগ করেছি, সুতরাং ওমুখো আর হব না, আত্মীয়, প্রিয়-পরিজনের মুখ আর দেখব না, এমনি কঠোরতার মধ্যে এক রকমের দুর্বলতা লুকান থাকে। এমনি বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যেই গৃহের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ একান্ত অজ্ঞাতেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং সে জন্যই হঠাৎ কোন সামান্য ঘটনায় মনের মধ্যে বিপর্যয় ঘটে যায়। আত্মপ্রকাশ সহসা হলেও, আসলে কিন্তু কঠোরতার আবরণের মধ্যে গৃহের প্রতি আকর্ষণের অঙ্কুর উদ্গম হয়। কিন্তু যাতায়াত ও মেলা-মেশার দ্বারা গৃহ ও বাহিরকে এক ক'রে ফেলতে পারলে সম্পর্কটা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কমে যায়।

অবশ্য বাড়ী যেতে দিয়েছি এবং সে আর ফিরে আসে নি এমন দৃষ্টান্তও আছে। গৃহত্যাগী কর্মীটির নাম ছিল সম্ভবতঃ দেবেন্দ্র দাস। এই কাহিনীতে এ নামেই অভিহিত ছিল। বাড়ী ছিল নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বারদী কিংবা বৈদ্যেরবাজার অঞ্চলে। যে সময়ের কথা বলছি তখন সে নৌকোয় থাকত। কেননা, সমিতির যে কয়েকখানা নৌকো ছিল সেগুলি ডাকাতি কিংবা তদনুরূপ কোন কার্যের সময় ভিন্ন খালি ফেলে রাখলে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। তাছাড়া নৌকোগুলি সর্বদা চালু রাখলে অনেকেই নৌকো চালনা শিখতে পারে, দেশের জলপথগুলি ভাল করে চিনতে পারে। ফলে আমাদের সমিতির সভ্যরা নৌকো চালনায় এমন নৈপুণ্য অর্জন করেছিল যে, ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তারা পদ্মা-মেঘনা নদীতে পাড়ি জমাতে পারত। এমন কি নোয়াখালি ও বরিশালের দিকে নদীর মোহনা সমুদ্রের পার পর্যন্ত নৌকোয় যাতায়াত করতে পারত। বিনা কারণে নৌকো চলাচলে জল-পুলিসের সন্দেহ উদ্রেক করতে পারে এজন্য নৌকোয় মাল চালানর ব্যবস্থা স্থির করলাম। নারকেল, সুপোরি, ধান বোঝাই করে, সভ্যরাই মাঝি-মাল্লা সেজে বড় বড় শহর বন্দরে নিজেরাই সুবিধে মত দরে বিক্রয় করত। অনেক সময় শহরের রাস্তায় এবং বাজারে বসেও মাল বিক্রয় করতে হ'ত। ফলে ঘাট এবং রাস্তার পুলিসের হাতেও কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি। কারণ কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করা চলবে না।

দেবেন্দ্র দাসের কাহিনী এমনি একটা ব্যাপারের যোগসূত্র ধরেই সুরু হয়। দেবেন্দ্র নোয়াখালি থেকে এক চালান নারকেল ঢাকায় এনে রায় সাহেবের বাজারের সামনে খাল থেকে মাল নামিয়ে রাস্তায় বসে খুচরো বিক্রী করছিল। এমন সময় সেখানে ওর কাকা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেবেন্দ্রকে দেখেই চিনতে পারলেন। গৃহত্যাগের পর থেকে অনেকদিন যাবতই তাঁরা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রকে চিনতে ভুল করলেন না। কথা সুরু করতেই দেবেন্দ্র কিন্তু নিজের পরিচয় বেমালুম অস্বীকার করল। কিন্তু ওর কাকা নাছোড়বান্দা। সে হাঁকডাক সুরু করতেই অন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের আশঙ্কা ও বিপদ বুঝে ইসারায় অপর সঙ্গীর উপর দোকানের ভার অর্পণ করে সে স্থান পরিত্যাগ করল। খুড়া মহাশয় তার পিছু নিল। নিরুপায় দেখে আমার বাসস্থান মিনার্ভা হোটেলের কাছাকাছি এক জায়গায় কাকাকে দাঁড় করিয়ে অনেক আশ্বাস দিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল।

সমস্ত শুনে আমি দেবেন্দ্রকে একবার বাড়ী ঘুরে আসবার জন্য উপদেশ দিলাম। সে কিন্তু কিছুতেই যাবে

না, বলল—"দেশের কাজে গৃহত্যাগ করেছি, আবার গৃহে ফিরে যাব? তা হয় না। আমি বাড়ী যাব না।" অনেক বুঝিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ী যেতে রাজী করালাম। বাড়ী থেকে ফিরে আসবার জন্য পথ-খরচা বাবদ টাকাও দিলাম। বলে গেল সে শীগগিরই ফিরে আসবে। সেই দেবেন্দ্র আর ফিরে আসে নি। পুরোপুরি সংসারী হয়ে গৃহীর জীবন যাপন করতে লাগল।

১৯১২ সনের ১লা নভেম্বর কুমিল্লা শহরের এক বাড়ীতে সমিতির কয়েকজন সভ্য অস্ত্রশস্ত্র এবং লোহার সিন্দুক ভাঙার যন্ত্রপাতিসহ গ্রেপ্তার হন—আদিত্য দত্ত, রমেশ ব্যানার্জি, রমেশ দাশগুপ্ত, ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। ডাকাতির ষড়যন্ত্র ও চেষ্টার অভিযোগ পুলিস আনয়ন করে। মকদ্দমায় আদিত্য দত্ত এবং আর কয়েকজন মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু বাকী সকলের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আদিত্য দত্ত বরিশাল জেলায় সমিতির কাজে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল এবং সেখানে সে নিশিকান্ত নামে পরিচিত ছিল। 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়'এই নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ হয়। পুলিস যখন নিশিকান্তকে গ্রেপ্তার করবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল তখন যে সে তার আসল নাম আদিত্য দত্ত রূপে কুমিল্লা জেলে, এ কথা কর্তৃপক্ষ অনেক দিন জানতে পারেন নি।

আদিত্য দত্ত কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হলেও পরে তাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলি করা হয় এবং সেখান থেকেই সে মুক্তিলাভ করে। কুমিল্লায় গ্রেপ্তারের সময় তার জামাকাপড় আর পুলিস আলিপুর যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেয় নি। ফলে মুক্তির সময় পুলিস এক হাত চওড়া ছোট্ট এক টুকরো কাপড় পরতে দিল। সেও তাই কোমরে জড়িয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কলকাতা ঘুরে বেড়াল দলের লোকের সন্ধানে। দৈবক্রমে সন্ধ্যাবেলায় কলেজ স্কোয়ারে একজন পরিচিত সভ্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে যাওয়ার কথা একবারও ভাবে নি। সব কিছুর উর্দ্ধে সমিতির কাজ। সমিতির প্রয়োজ[...] গৃহে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের [...] নয়।

আদিত্য দত্ত সমিতির একজন বিশ্বাসী, সাহ[...] কঠোর পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী সভ্যরূপে পরিচি[...] ছিল। বলপ্রয়োগের কাজে সে খুব উপযুক্ত ছিল। বি[...] প্রথমে তাকে পাঠান হ'ল ময়মনসিংহ জেলায় একটা নগ[...] গ্রামে পাঠশালায় শিক্ষকের কাজ করতে। নিকটব[...] রেলষ্টেশন থেকে সেখানকার দূরত্ব ছিল ২৬ মাইল এ[...] এ পথ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে হ'ত। আদি[...] দত্তও খুসী মনেই এ কাজে গেল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ত[...] পালন করেছিল। সে যেমন বহু বলপ্রয়োগের কা[...] অংশ গ্রহণ করেছে আবার তেমনি একটানা একঘে[...] কাজে যেতেও অস্বীকার করে নি!

সাধারণত মনে হতে পারে যে, বিপ্লবীরা কত রোমাঞ্চ[...] কর ধারণা নিয়েই না গৃহত্যাগ ক'রে সমিতির কার্যে লি[...] হয়। পিস্তল-বন্দুক নিয়ে কত হত্যা, ডাকাতি, গুলি[...] ছোড়া এবং আরও কতরকমের উত্তেজনামূলক কাজই ন[...] সে করতে পারবে। কিন্তু আমাদের নীতি ছিল, [...] কর্মীর মধ্যে কেবল উত্তেজনার প্রতি আকর্ষণ থাকত, [...] কেবল হৈ-চৈ চাইত, যার মতি অস্থির হ'ত, তাকে[...] আমরা গৃহত্যাগ করাতাম না এবং খুন বা ডাকাতির ম[...] কোন চাঞ্চল্যকর কাজেও পাঠাতাম না। যে সব কর্মী[...] মধ্যে এ সব কার্যে অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা পরিদৃষ্ট হ'ত তাদেরকে আমরা এমনি কার্যের উপযুক্ত মনে করতাম না। আমরা চাইতাম সে সব কর্মী দ্বারা এ সব কাজ করাতে, যারা এ কাজ কর্তব্যজ্ঞানে নিষ্কামভাবে করতে পারবে এবং এর প্রতি কোন স্পৃহা থাকবে না।

আদিত্য দত্ত যখন আলিপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করে, আমিও তখন কলকাতায় এক পলাতকের আশ্রয়ে একসঙ্গে দুজনে বাস করি। আমার নামে তখন 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার' ওয়ারেণ্ট। ক্রমশঃ

—০—

*দিকে চ্যাপ্‌টা এবং কোণাকুনি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। একটির বেলাতেও এর ব্যতিক্রম নেই। ঢিপিগুলির এই গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যেই* এদের নির্ম্মাতা কীটদের 'চুম্বকধর্ম্মী শ্বেতপিপীলিকা' বলা হয়।

ঢিপিগুলিতে বসবাসের প্রকোষ্ঠগুলি সাধারণতঃ বাইরের দিক্ ঘেঁষে থাকে, যাতে আলো হাওয়া পাবার সুবিধা হয়। ভিতর মহলের প্রকোষ্ঠ-গুলিতে এই চুম্বকধর্ম্মী শ্বেতপিপীলিকারা তাদের আহার্য্য, কাটা ঘাস, সঞ্চয় ক'রে রাখে। এই ঘাস তারা শীতের প্রারম্ভে সংগ্রহ করতে সুরু করে এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়, ঘাস যখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়, তখন তা দিয়ে এরা কাজ চালায়।

সাধারণতঃ একটু ভিজে স্যাঁৎসেঁতে জায়গা এই বল্মীক-নির্ম্মাণের জন্যে নির্ব্বাচিত হয়, এবং নির্ব্বাচনের সময় চারদিক্ বেশ খোলামেলা কি না সেদিকেও নজর রাখা হয়।

স. না.

## কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণরক্ষা

মনে করুন আপনার চোখের সামনে হঠাৎ কেউ জলে ডুবে গেল, বহু আয়াসে আপনি তাকে উদ্ধার করে আনলেন বটে, কিন্তু তখন তার দম বন্ধ হয়ে গেছে। অবিলম্বে শ্বাসক্রিয়া ফিরিয়ে আনতে না পারলে লোকটিকে বাঁচানো যাবে না। এদিকে আপনার সাহায্যকারীও আর কেউ সেখানে নেই। এখন এ অবস্থায় আপনার করণীয় কি?

আমেরিকান রেড্‌ক্রশ সোসাইটিতে মুখের সাহায্যে ফুসফুসের ভেতর বায়ু সঞ্চালনের যে পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়, সেটি জানা থাকলে এ রকম পরিস্থিতিতে আপনাকে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে হবে না। জলে ডুবে, বৈদ্যুতিক শক্ লেগে অথবা অন্য যে কারণেই হোক্ কারুর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সঙ্গে সঙ্গেই সুফল পাওয়া যায়। মুখের সাহায্যে মুখের ভেতর দিয়ে অথবা মুখের সাহায্যে নাকের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে বায়ু সঞ্চালনের এইটেই যে সকলের চেয়ে কার্য্যকর পদ্ধতি একথা আজ একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে।

*এবার কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া ফিরিয়ে আনবার প্রক্রিয়াগুলি বলা হচ্ছে:*

১। উদ্ধার-করে-আনা লোকটির ঘাড়ের নীচে হাত দিয়ে মাথাটা এমন ভাবে নীচের দিকে কাত ক'রে রাখুন যেন তার চিবুক থাকে উপরের দিকে খাড়াভাবে (চিত্র নং ১)।

তারপর ২ এবং ৩ নম্বর চিত্রের নির্দ্দেশমত চোয়াল টেনে অথবা চেপে ধরুন। চোয়াল থাকবে যেন ঠেলে-বের-হওয়া অবস্থায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে গলার পেছন দিক থেকে জিহ্বামূল সরে যাওয়ার দরুন ফুসফুসের ভেতরে বাচলাচল অব্যাহত হয়।

## জলে-ডোবা লোকের বেলায় কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া

এটা জেনে রাখা দরকার যে, জলে ডোবার দরুণ যে লোক মারা যায় তার মৃত্যুর কারণ বাতাসের অভাব—ফুসফুসে বা পাকস্থলীতে জল আটকে থাকা নয়।

জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি অচৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্বাস নেবার উদ্দেশ্যে জলের উপর ভেসে থাকবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এতে শক্তিক্ষয় হয় এবং প্রচুর পরিমাণে জল গিলে ফেলবার সম্ভাবনা থাকে। পাকস্থলীতে যে খাদ্য জমা থাকে তার সঙ্গে এই জল মিশ্রিত হয়ে বায়ুচলাচলের পথে বাধা জন্মায়; ফলে উদ্ধারকারীর চেষ্টা ব্যাহত হয়। কাজেই এ ধরণের কোনো বাধা আছে কিনা প্রথমে তা বুঝতে হবে এবং যদি থাকে তা হলে পেটের ভেতর থেকে ঐ জল এবং খাদ্য বের করে ফেলবার জন্যে চটপট যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যদি মুখের ভিতরে বাহির-থেকে-ঢোকা কোনো কিছু পরিলক্ষিত হয়, তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে সেটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে—আঙুলের চারপাশে একটা নেকড়া জড়িয়ে নিতে পারলে ভালো হয়।

২। এবার খুব চওড়া হাঁ করুন এবং হাঁ-করা মুখ অত্যন্ত আঁটসাট ভাবে জল-থেকে-তুলে-আনা লোকটির মুখের উপরে রাখুন আর সঙ্গে সঙ্গে দুই আঙুল দিয়ে সাঁড়াশীর মত চেপে ধ'রে তার নাকের ছিদ্র দুটি বন্ধ করে ফেলুন (চিত্র ৪); অথবা আপনার গালের চাপ দিয়েও তার নাকের ছিদ্র বন্ধ করে ফেলতে পারেন (চিত্র ৫); কিংবা লোকটির মুখ বন্ধ করে তার নাকের উপরে আপনার মুখও রাখতে পারেন (চিত্র ৬)। কিভাবে মাথা রাখতে হবে, চোয়াল প্রসারিত করতে হবে এবং নাকমুখ বন্ধ করতে হবে ৬নং চিত্রটি ভালো করে দেখলেই তা বোঝা যাবে।

এই সব প্রক্রিয়ার পর খুব জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে দিয়ে দম বন্ধ-হয়ে-যাওয়া লোকটির মুখ অথবা নাকের ভিতরে বাতাস চালনা করতে থাকুন। দাঁতের ভেতর দিয়েও বাতাস চালনা করা যেতে পারে, এমন কি দাঁতের পাটি দু'টি যদি বন্ধ থাকে তা হলেও। শ্বাসনালীতে বায়ুসঞ্চালনের পথে কোনো বাধা আছে কি না প্রথম ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হতে হবে।

৩। এবার আপনার মুখ সরিয়ে আনুন। মাথাটা পাশের দিকে নিয়ে যান এবং দম-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া লোকটির ফুসফুসের ভেতর থেকে
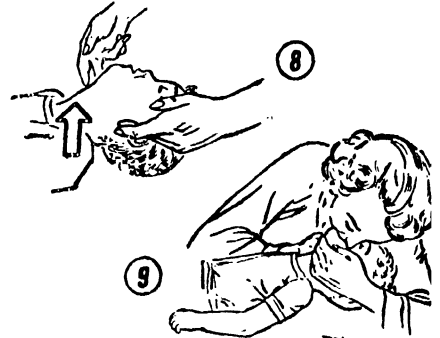
বেগে বায়ু ফিরে আসছে কি না কান পেতে শুনুন এবং এই বায়ুর বদলে বায়ু ফিরিয়ে আনার প্রয়াস সফল হয়েছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন্। আবার আগেকার মত ফুঁ দিয়ে ফুসফুসে বাতাস ঢোকান।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বেলায় গভীরভাবে খুব জোরে ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢোকাবেন, প্রত্যেক মিনিটে যেন প্রায় বারোটি ক'রে শ্বাসক্রিয়া হয়। শিশুদের বেলায় কিন্তু শ্বাসক্রিয়া হবে অপেক্ষাকৃত অগভীর, মিনিটে কুড়িটি হলেই চলবে।

বাতাস ত আপনি ফুঁ দিয়ে ঢোকালেন, কিন্তু তার বদলে বাতাস যদি না পান তা হলে চটপট লোকটিকে পার্শ্বদেশের উপর ভর দিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করুন। এবং তার দুই কাঁধের মধ্যবর্ত্তী চওড়া জায়গায় ক্ষিপ্রহস্তে কতকগুলি ঘুঁষি বা থাপ্পড় মারুন। বাইরে থেকে প্রবিষ্ট কোনো কিছু যদি আটকে থাকে, এর দরুণ তা স্থানচ্যুত হবে ( চিত্র ৭ )।

আবার বাইরের জিনিস সরিয়ে ফেলবার জন্যে তার মুখের ভেতরে আপনার অঙ্গুলি চালনা করুন।

যারা সরাসরি মুখে মুখ লাগাতে চান না তারা লোকটির মুখ অথবা নাকের ওপরে একটি কাপড় রেখে তার ভেতর দিয়ে বায়ু সঞ্চালিত করতে পারেন। পাতলা কাপড় বাতাস-বিনিময়ের পথে বড় একটা বাধা জন্মায় না। শুধু জলে ডোবা নয়, যে কোনো কারণে শ্বাস বন্ধ হ'লে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

## ছোট বাচ্চা এবং শিশুদের জন্য 'মুখ-থেকে-মুখে' পদ্ধতি

যদি শিশুর মুখের ভেতর বাইরে থেকে ঢোকা কোনো কিছু পরিলক্ষিত হয় তা হলে পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে তা পরিষ্কার করে ফেলুন।

১। শিশুকে তার পিঠের ওপর ভর দিয়ে শোয়ান এবং দুই হাতের আঙুলের সাহায্যে তলদেশ এবং পিছন দিক্‌কার চোয়াল এমন ভাবে তুলে ফেলুন যেন এটি থাকে ঠেলে-বের-হওয়া অবস্থায় ( চিত্র ৮ )।

২। শিশুর মুখ এবং নাকের উপরে আপনার মুখ রাখুন। নাকমুখ এমন ভাবে বন্ধ করতে হবে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে। তার পর অগভীর ভাবে ফুঁ দিয়ে দিয়ে শিশুর ফুস্‌ফুসের ভেতরে বাতাস ঢোকাতে থাকুন ( চিত্র ৯ )। এই বায়ুসঞ্চালন-ক্রিয়া করতে হবে মিনিটে প্রায় কুড়িবার হিসাবে।

বায়ু চালনা করতে গিয়ে যদি বাধা পান তা হলে চোয়াল আবার পূর্ব্বনির্দ্দেশমত তুলে ধরুন। বায়ু চলাচলের পথ তখনো যদি বন্ধ

থাকে তা হলে শিশুর দুই পায়ের গিঁটে ধরে ( মাথা নীচের দিকে রেখে ) মুহূর্ত্তকাল ঝুলিয়ে রাখতে হবে ( চিত্র ১০ ) অথবা একটি বাহুর উপর তাকে উল্টো ভাবে রেখে ( চিত্র ১১ ) দুই কাঁধের মাঝখানকার চওড়া জায়গায় খুব ক্ষিপ্রভাবে দুটি অথবা তিনটি থাপ্পড় দিতে হবে বায়ু চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো জিনিস যদি থাকে ত এই প্রক্রিয়ার দরুণ তা অপসারিত হবে।

শিশু হোক, বয়স্ক হোক্ সকলের বেলায়ই একটা কথা মনে রাখতে হবে, যদি বমি করে তা হলে তাড়াতাড়ি তাকে পার্শ্বদেশের উপর ভর দিয়ে শুইয়ে রেখে তার মুখ মুছিয়ে দেবেন, তার পর আবার তাকে পূর্ব্বাবস্থায় রেখে প্রক্রিয়া আরম্ভ করবেন।

আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। জলে ডুবেই হোক্ বা বৈদ্যুতিক শক, বিষক্রিয়া অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক্ দম বন্ধ হয়ে গেলে এই উপায়ে মুখের ভিতর দিয়ে বায়ুসঞ্চালন ক'রে শ্বাসক্রিয়া ফিরিয়ে আনতে পারা যায়।

ন. ভ.

## রোগীর উপর রঙের প্রভাব

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কি আশ্চর্য্য মেয়ে ছিলেন তিনি। এই মহীয়সী নারী জীবন উৎসর্গ করেছিলেন পীড়িত মানুষের সেবায়। আজ পৃথিবীর সকল দেশে কত মেয়ে 'নার্সিংকে' পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই পেশার পথিকৃৎ হিসাবে অমর হয়ে আছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। কিন্তু খুব কম লোকেই একথা জানেন যে, কি সাধারণ কি মানসিক রোগের হাসপাতাল উভয়ত্রই বর্ণ-চিকিৎসা ( Colour Therapy ) যে রোগনিরাময়ের পক্ষে কতদূর সহায়ক হতে পারে তা সেই কত কাল আগেই তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন—"ব্যাধির উপর সুন্দর সুন্দর দ্রব্যের, বিশেষতঃ রঙের জলুসের প্রভাব যে কত বেশী সে সম্বন্ধে আমরা আদৌ সচেতন নই।"

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পী আড্রিয়ান হিল যখন মিডহার্ষ্ট, সাসেক্সের 'কিং এড্‌ওয়ার্ড দি সেভেনথ্ স্যানাটোরিয়ামে' রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন সেই সময়ে তাঁর এক পুরনো বন্ধু তাঁর বিছানার লাগাও টেবিলের ওপর ফুলের যোগান দিতেন। সাধারণতঃ Cyclamen ফুলই তিনি আনতেন। পীড়িত শিল্পী এই ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে ছবি আঁকবার কথা ভাবতেন। এমনি ভাবে বেশ কিছুদিন কাটল। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠল। একদিন তিনি একটি প্রস্ফুটিত Cyclamen ফুল এঁকে ফেললেন। সেই হ'ল এক অভিনব উপায়ে তাঁর আরোগ্যলাভের সূচনা।

রোগমুক্ত হবার পরে আড্রিয়ান হিল 'আর্ট বনাম ব্যাধি' ( Art versus Illness ) নামক একখানি পুস্তকে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন এবং অন্যান্য রোগীদের তাঁর নিজস্ব বর্ণচিকিৎসা-পদ্ধতির অনুরক্ত করে তুলবার জন্যে বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করতে লাগলেন।

অনেকে হয়ত এটা ভেবে অবাক হতে পারেন যে, কেবল মাত্র রং কিভাবে অসুস্থ শরীর বা মনের ওপর ক্রিয়া করতে পারে ?

বর্ণচিকিৎসক বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "হাঁ, তা ক'রে থাকে, কেননা রঙের আছে রোগীর মনকে চাঙ্গা করে তুলবার ক্ষমতা। রং আবার উৎসাহ দমিয়ে দিয়ে মনকে দুর্ব্বল করেও ফেলতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ঘন নীল রঙের দেয়ালওয়ালা কক্ষের কথা—যা বাস্তবিকই ভীতিজনক। সেই কক্ষে থাকলে মন হতাশায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং নানা অপ্রীতিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে দিন-রঙের দেয়াল-ওয়ালা কক্ষ মনে সুখানুভূতির সঞ্চার করে।

এখন এর তাৎপর্য্য কি এই যে, যেহেতু ঘন নীল রঙ হচ্ছে মহাকাশের ভয়াবহ শূন্যতার, আর দিন-রং প্রাণের উৎস সূর্য্যের আলোর দ্যোতক কাজেই মনের উপর এই দুই রঙের যে প্রতিক্রিয়া হয় তা পরস্পর-বিরোধী।

আড্রিয়ান হিল নিজের বেলায় রঙের মধ্যে রোগনিরাময়ের যে শক্তি আবিষ্কার করলেন তা যাতে অপরের ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হয়ে উঠলেন। এই হল বর্ণচিকিৎসার সূচনা, এখন ব্যাপক-ভাবে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আমাদের মনের উপর রঙের প্রভাব সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক সবুজ রঙের কথা। এতে মনকে স্নিগ্ধ করবার গুণ এত বেশী যে, সেদিক দিয়ে সবুজকে বলা যেতে পারে আদর্শ রং। শহরের ইঁট কাঠের গাথুনি ছেড়ে যখন আমরা সবুজ মাঠে অথবা বনে যাই তখন প্রকৃতির শ্যামলতাই আমাদের মনকে খুশী করে তোলে। বর্ণ-চিকিৎসায় কিন্তু যে-কোন ক্ষেত্রেই যে-কোন প্রকার সবুজ রং কার্য্যকর হবে না। যে-রোগী খুব দুর্ব্বল, খুব কড়া সবুজ অথবা খুব কড়া হলদে রং সে বরদাস্ত করতে পারে না। ওষধ নির্ব্বাচন ঠিক হলেও অতিরিক্ত মাত্রায় তার প্রয়োগে যেমন অপকার হয় তেমনি দুর্ব্বল রোগীদের উপর কড়া সবুজ রঙের প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকরই হয়ে থাকে।

ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করবার জন্যে যে সকল ক্ষেত্রে বর্ণচিকিৎসা প্রযুক্ত হয় সেগুলিতে রোগী শুধু যে নিষ্ক্রিয়ই থাকে তা নয়, তাকে সক্রিয়ও হতে হয়। যেমন ধরা যাক্ তাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের কতকগুলি প্রতিরূপ দেখানো হ'ল। সে হয়ত ছবি আঁকার অ আ ক খ ও জানে না। কিন্তু তাকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজে চেষ্টা ক'রে এর অনুরূপ একটি ছবি আঁকবার জন্যে প্রণোদিত করা হল।

ছবি যখন আঁকা হ'ল তখন নিজের ভিতরকার এক অপ্রত্যাশিত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে রোগী নিজেই যে শুধু বিস্মিত হ'ল তা নয় তার বন্ধু-বান্ধবেরা পর্য্যন্ত রীতিমত অবাক হয়ে গেল। রোজ এই ক্ষমতার অনুশীলনের প্রভাব অপরিসীম। এর দরুন রোগীর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সুস্থ সবল এবং রোগমুক্ত হয়ে ওঠে। এমন কি তার আঁকা ছবি নিকৃষ্ট কিংবা মাঝারি রকমের হলেও তার ব্যত্যয় হয় না।

মানসিক ব্যাধির বেলায় ছবি আঁকার প্রতিক্রিয়া দ্বিবিধ। এতে একদিকে রোগী যেমন রূপসৃষ্টির মাধ্যমে নিজের মনের ভার লাঘব করে, অন্যদিকে মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষেও তেমনি তার স্নায়বিক বৈকল্যের আসল কারণের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

এক রোগী যখনই সূর্য্যের ছবি আঁকত তখনই আঁকত কালো রঙ দিয়ে। সে ছিল বিষণ্ণ প্রকৃতির, সর্ব্বদা অবসাদগ্রস্ত। তার কাছে সূর্য্যের প্রীতিকর উজ্জ্বল আলো ছিল না থাকারই সামিল। আর এক রোগী এমন সব ছবি আঁকত যাতে ফুটে উঠত প্রতিরক্ষার বিভিন্ন প্রণালী। গোলাবাড়ীর একটি ছবি সে এঁকেছিল, সেটি এক সারি গাছপালা, একটি বৃত্তাকার প্রাচীর এবং পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। সে ছিল স্নায়ুরোগগ্রস্ত এবং দুর্ঘটনা ও শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তার যে আকাঙ্ক্ষা তারই প্রতীক হচ্ছে এই ছবিটি।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সাম্প্রতিক কালে এটা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে-কোন শ্রেণীর রোগী রঙের সাহায্যে ছবি আঁকার মত সৃষ্টিধর্ম্মী যে-কোন কাজই করুক না কেন, তা তাকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এবং এই কাজ তাঁদেরও সহায়ক হয়—রোগীর

সেবা করতে, তাকে নানারকম ভাবে সাহায্য করতে সকল সময়েই যাঁরা এগিয়ে আসেন।

ন. ভ.

## অথ হৃদ্‌যন্ত্রঘটিত

আপনার হার্ট বা হৃদ্‌যন্ত্র নিয়ে আপনি কি খুব দুশ্চিন্তা ভোগ করেন? যদি তাই হয়, তা হলে মনে রাখবেন আপনি একা নন, আরো এমন বহু লোক আছেন যাঁরা রীতিমত সুস্থ, কিন্তু হার্ট নিয়ে তাঁদের অকারণ দুর্ভাবনার অন্ত নেই। এঁদের বেশীর ভাগই কিন্তু স্নায়বিক রোগগ্রস্ত নন। বুদ্ধিবিবেচনাও এঁদের আছে, কিন্তু হার্টের অসুখ সম্বন্ধে নানা আজগুবি গল্পে বিভ্রান্ত হয়ে এঁরা কেউ কেউ একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। তা ছাড়া সিনেমাও তাঁদের মনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে না। কোনো ছবিতে হয়ত দেখানো হয়েছে এক হার্টের রোগী সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন চাকা-ওয়ালা চেয়ারে সওয়ার হয়ে, অথবা অসহায় ভাবে শুয়ে আছেন বিছানায়—দেখে মনে হয় যেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। নিজের হার্টের অসুখের কথা ভেবে যিনি উদ্বিগ্ন, সিনেমায় এই ধরণের দৃশ্য দেখবার পর তিনি হয় ত একেবারে ভেঙে পড়লেন। "শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর" এই কথাই সব সময় তাঁর মনে জাগতে লাগল।

অনেকে মনে করেন, হার্টের অসুখ হলেই আর রক্ষা নেই, অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত, একেবারে ভিত্তিহীন। আসলে বেশীর ভাগ হার্টের রোগীই দীর্ঘজীবী হন এবং হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার পর কাজ করবার ক্ষমতা নিয়েই বহুদিন বেঁচে থাকেন। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা এঁদের মনে রাখা দরকার যে, যদি এঁরা নিয়মিতভাবে পরিমিত মাত্রায় ব্যায়াম না করেন তা হলে কিন্তু স্বল্পায়ু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দীর্ঘকাল যাবৎ এই বিশ্বাস অনেকের মনে বদ্ধমূল যে, হৃদ্‌রোগ মানেই অশক্ত হয়ে পড়া, বা অকালে মৃত্যুর কবলিত হওয়া। কিন্তু চিকিৎসাসম্পর্কিত নথিপত্রে এমন সব ভূরি ভূরি 'রেকর্ড' পাওয়া যায় যা এই দীর্ঘকাল-প্রচলিত বিশ্বাস অপ্রমাণ করে। অবশ্য একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আপনি যদি আপনার হার্ট সম্বন্ধে উদাসীন হন তা হলে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, অথবা যদি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন ত সেটাকে হাল্‌কা ভাবে গ্রহণ করলেই চলবে।

বস্তুতঃ, যে তিনটি অবস্থা যাবতীয় হৃদ্‌যন্ত্র-ঘটিত রোগের শতকরা নব্বই ভাগের জন্য দায়ী তাদের আসল হেতু কি চিকিৎসকেরা তা এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি। সেই তিনটি হচ্ছে বাতজনিত জ্বর, হৃদ্‌পিণ্ডের শিরাগুলির কঠিনত্বপ্রাপ্তি এবং উচ্চ রক্তের চাপ।

হৃদ্‌রোগ সম্বন্ধে সবচেয়ে পল্লবিত যে সকল আজগুবি কথার সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের মূলে রয়েছে সম্ভবতঃ এই ধারণা যে, বুকে ব্যথাই হচ্ছে এ রোগের একমাত্র সুনিশ্চিত লক্ষণ। যাবতীয় লক্ষণের মধ্যে এইটিই মনকে সকলের চেয়ে বেশী আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

বুকে কোনো কারণে ব্যথা হলেই ঘাবড়ে যাবেন না। মনে রাখবেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আপনার হার্টের অবস্থার সঙ্গে বুকের বেদনার কোনোই সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া হৃৎকম্প, আলস্য, মূর্চ্ছার ভাব, বিলম্বিত শ্বাসক্রিয়া, পা ফুলে যাওয়া প্রভৃতি আর যে সকল লক্ষণকে হৃদ্‌রোগের বিপদসঙ্কেত ব'লে মনে করা হয় তাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। কথাটা সাধারণ ভাবেই বলা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কোনো কিছু থাকতে পারে যার জন্যে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন। কাজেই পূর্বোক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে কোনো একটা দেখা দিলে সেটা হৃদ্‌যন্ত্র-ঘটিত নিজে নিজে এ সিদ্ধান্তে না পৌঁছে আপনার চিকিৎসককে ডেকে পাঠাবেন এবং রোগনির্ণয়ের ভারটা দেবেন তাঁরই উপরে।

আপনার দেহের ভিতরে কি ক্রিয়া চলছে তার উত্তম নির্দেশক হচ্ছে আপনার হার্ট। আপনি যখন ঘুমিয়ে থাকেন তখন এর স্পন্দন হয় মিনিটে পঞ্চাশ থেকে ষাট বার, আর আপনি যখন জেগে উঠলেন তখন এর স্পন্দন হবে দ্রুততর—মিনিটে ৮০ বার। কোনো কারণে মন যদি উদ্বিগ্ন হয় তা হলে মিনিটে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনসংখ্যা হয় দ্বিগুণ। নার্ভাস হয়ে পড়লে চামড়ার সংলগ্ন রক্তবাহী শিরাগুলির ভিতর দিয়ে রক্তচলাচলের উপর প্রতিক্রিয়া হয়, তখন সঙ্কীর্ণতর ধমনীগুলির ভিতর দিয়ে সমপরিমাণ রক্ত চালনা করবার জন্যে হৃদ্‌পিণ্ডকে অতিরিক্ত খাটুনি খাটতে হয়।

আপনার হার্টের আকৃতিটি যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে আপনাকে মনোযোগী হতে হবে। এবং আপনি চেষ্টা করলেই তা পারেন। পরিমিত ব্যায়াম, যেমন জোরে হাঁটা, সম্ভবপর হলে ঘোড়ায় চড়ে এক চক্কর দিয়ে আসা, পুরোপুরি স্বাস্থ্যবান লোকের পক্ষে যেমন তেমনি হৃদ্‌রোগীদের পক্ষেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সকল মাংসপেশীর ন্যায় হৃদ্‌পিণ্ডেরও সঞ্চালন এবং ব্যবহার প্রয়োজন।

এবার খাদ্যের প্রসঙ্গ। এই সম্পর্কে আসল বিষয় যা মনে রাখা দরকার সেটি হচ্ছে এই যে, যেহেতু এক সময় যে রকম প্রচণ্ডভাবে আপনি ব্যায়ামাদি করতেন এখন আর তেমনটি করেন না সেজন্য খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে আপনাকে সতর্ক হতে হবে। পেশাদার ব্যায়ামবীরদের অতিরিক্ত খাদ্যের যে প্রয়োজন আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা দিব্যি দিনের পর দিন চালিয়ে যান গুরু-ভোজন যদিও তাঁদের বেশীর ভাগ সময়ই কাটে অফিসে চেয়ারে বসে। এঁদের কিন্তু আহারে সংযম অত্যাবশ্যক। হৃদ্‌যন্ত্রের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভোজনের গুরুতর প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

শত সহস্র লোক তাদের হৃদ্‌যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাচ্ছে যদিও তারা নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করে এবং যথোপযুক্ত পরিমাণের ভাইটামিন ও প্রোটিন গ্রহণ ক'রে থাকে। সম্প্রতি জনৈক বিশেষজ্ঞ শাসন বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ১৭৬ জন সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। উপসংহারে তিনি বলেছেন যে, অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী তাঁদের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা দুই-ই নষ্ট ক'রে দিয়েছে। টিফিনের ছুটির সময় কোথায় তাঁরা কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আরামে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগাছা করতে করতে জলযোগ করবেন, তা না করে অফিসে বসেই তাঁরা খাবার সাপটান।

আজকের দিনে রেডিও, টেলিভিশন, ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বহু লোক যত কথা জানেন তার চেয়ে অনেক কম জানেন নিজেদের হৃদ্‌যন্ত্র সম্বন্ধে। হৃদ্‌যন্ত্রঘটিত নানা যন্ত্রণা পরিহারের একটি শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে আসল তথ্যগুলি জানা, সম্পর্কিত, আজগুবি কথাগুলিকে উপেক্ষা করা, এবং 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং' ত্যাগ করা।

ন. ভ.

# মাকড়সা

শ্রীআভা পাকড়াশী

(প্রতিযোগিতার গল্প)

"সুবিমলবাবু! যদুনাথ সরকারের 'হিষ্ট্রি অফ অওরঙ্গজেব'-খানা কি আপনি পড়ছেন?" রমলার ডাকে বিরক্তচিত্তে একটু চম্‌কেই মুখ তোলে সুবিমল। মাইনাস্ এইট্ পাওয়ারের পুরু-চশমার আড়ালে চোখ দু'টিতে এখন ইতিহাসের ঘোর। যাক্, তবু যে আজ এক ডাকেই শুনতে পেয়েছেন, এতেই কৃতার্থ হয়ে রমলা আবার পূর্ব্বকৃত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে।

আজও সুবিমল একটু হেসে বলে, "আশ্চর্য্য! যে বইটাতে আমার দরকার সেটাই আপনার চাই দেখ্‌ছি।"

রমলাও সামান্য হাসি মাখিয়ে প্রত্যুত্তর দেয়, "এটা উভয়তঃ। কালকেই ত আপনি আমার কাছে ভিনসেণ্ট স্মিথ-এর 'হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া'খানা চাইতে গিয়েছিলেন।"

সুবিমল বলে, "নাঃ এভাবে আর চলছে না দেখ্‌ছি, 'রাঘবন্'কে বলে দিতে হবে প্রত্যেক বই-এর অন্ততঃ দু'খানা ক'রে কপি রাখতে।

দু'জনের কেউই কিন্তু রাঘবনকে আর কিছু বলে না শেষ পর্য্যন্ত। অনুযোগ অভিযোগই সার। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ন্যাশানাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান রাঘবন্‌ই এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। দু'জনকে পাশাপাশি অ্যালকবে জায়গা দিয়ে। কাঠের পার্টিসন-করা ছোট ছোট এক সার ঘর। পড়বার জন্য টেবিল, চেয়ার। দরকারি বই রাখার তাক্। সুন্দর নির্জ্জন পরিবেশ। সবচেয়ে কোণের দুটো ঘর বল্‌তে গেলে এদের জন্যই ছেড়ে দিয়েছেন রাঘবন। লোকটি যেমন ভদ্র তেমনি স্মার্ট। ওর সুন্দর ব্যবহার ও ব্যবস্থার জন্য কারও অনুমাত্র অনুযোগ করার উপায় নেই। যে বই দরকার চাইবার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। আর বইয়ের যেমন যত্ন, তেমনি সাজাবার কায়দা জানেন এই ভদ্রলোক।

এবার ওদের দু'জনের কারুরই আর কোন অসুবিধা নেই, ওরা মিলেমিশে পড়ে। তবে এখন একজন ইচ্ছে ক'রে অন্যের দরকারী বই বেশীক্ষণ আট্‌কে রাখে, যাতে সে বার বার চাইতে আসে। আর অন্যজনও এর দরকারী বই ফেরত দেবার অছিলায় অনেকসময় হয়ত না পড়েই ফেরত দেয়। এরা দু'জনেই কিন্তু নিজেকে ঠকায়। অবশ্য কেউই নিজের কাছে এই মনোভাবের স্বীকৃতি দেয় না। রমলা এম. এ. পড়ছে ইতিহাস নিয়ে, সে ভাব্‌ছে অধ্যাপক সুবিমলের কাছে এই যে সে মাঝে মাঝে যায়, এ শুধু আলোচনার মাধ্যমে কতকগুলো কঠিন্ প্রশ্নোত্তরের মীমাংসার জন্যই। সুবিমল থিসিস্ লিখছে মোগল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে। এই গুরুগম্ভীর চিন্তার মাঝখানে রমলার সঙ্গ, তার মনে হয় অনেকক্ষণ গুমোটের পর এক ঝলক্ ঠাণ্ডা বাতাস। মাঝে-মধ্যে এদের কোন একজন যদি না আসে অন্যজন তার জন্য প্রতীক্ষা করে। চিন্তিত হয়।

ধীরে ধীরে রমলা আবিষ্কার করে সুবিমল এখন আর সবসময়ে আগের মত বইয়ের দিকেই নিবিষ্টচিত্তে তাকিয়ে থাকে না, মাঝে মাঝে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে থাকে। রমলাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে যেন কৈফিয়ত দেবার সুরে বলে, "চিড়িয়াখানার বাঘটা কেমন ডাক্‌ছে দেখেছেন? ক'দিন থেকে সমানে চীৎকার করছে। এত ডিষ্টার্ব্ব করছে লেখাপড়ার।"

রমলা বলে, "কাল আমার স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। শুন্‌লাম, ঐ বাঘটার বাঘিনী মরে গেছে। তাই ক'দিন থেকে অমন অশান্ত হয়ে রয়েছে।"

সুবিমল বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে অন্যমনস্কের মত বলে, "তা ওরা ঐ বাঘটাকে নতুন একটা বাঘিনী এনে দিলেই ত পারে।"

"চেষ্টা ত করছে, লোকও পাঠিয়েছে আনতে এই ত শুন্‌লাম, এই যে আপনার টড্-এর রাজস্থান।"

উৎফুল্ল হয়ে সুবিমল বলে, "আরে ওটা আপনার কাছে ছিল বুঝি? দেখি দেখি?" নিয়ে পাতা উল্টাতেই রমলার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'রাজস্থানের গৌরব' শীর্ষক প্রবন্ধখানা বেরিয়ে পড়ে। খানিকটা পড়েই সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে সুবিমল বলে, "চমৎকার লেখেন ত? পয়েণ্টস্‌গুলিও খুব উপযুক্ত দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি আমার একটু কাজে লাগবে। সবটা ভাল ক'রে প'ড়ে কাল ফেরত দেব কেমন?" রমলার মনোগত উদ্দেশ্যও ছিল প্রবন্ধটি ওকে পড়ান। আবার বলে সুবিমল, "আচ্ছা,

স্কুলে পড়িয়ে দুপুরে লাইব্রেরীতে আসার সময় পান কি করে ?"

রমলা নম্রভাবে বলে, "সকালে যাই স্কুলে পড়াতে। আর ইতিহাস নিয়ে প্রাইভেটে এম. এ. দেব বলে তৈরী হচ্ছি। এইটাই ফাইনাল ইয়ার। মাঝে মাঝে অবশ্য লেকচার অ্যাটেণ্ড করতে হয়।"

সুবিমল বোঝে ও এই জন্যই কখনও কখনও আসে না।

রমলার এই উদ্যম, পড়াশুনার দিকে আগ্রহ, সুচিন্তিত প্রবন্ধ সহজেই সুবিমলের মনকে আকর্ষণ করে। এই মেয়েটির কমনীয় শ্রী, মধুর স্বভাব ওর উপোসী-মনে সাড়া জাগায়। ক'দিনের কথাবার্ত্তায় যা জেনেছে তাতে বুঝেছে,আত্মীয়স্বজনহীন, দেশ বিভাগের দায়ে ভুক্তভোগী, মেয়েটি বড় অভাবী, কিন্তু স্বাবলম্বী। একাই থাকে হষ্টেলে। ওর প্রতি সমবেদনায় মনটা ভ'রে ওঠে সুবিমলের। এই দীপ্তিময়ী মেয়েটির সুযোগ ও অর্থের অভাবে ঠিকমত স্ফুরণ হচ্ছে না যেন। অথচ ইচ্ছে করলেই ত সে···তাহলে দীপুর উপর কি অবিচার করা হবে? আর কলি? সে অবশ্য এখানে থাকতেই ওকে বিয়ে করার জন্য বহুবার তাগাদা দিয়েছে। কিন্তু নিজে পছন্দ করে—তা আর কি করা যাবে? কলি কি এখন কানাডা থেকে এসে তার জন্য পাত্রী খুঁজে দেবে? সিভিল অ্যাভিয়েসনের ডাইরেক্টর স্বামী অমলেন্দুর সঙ্গে যতই কেননা সে ট্যুরে বিদেশে থাক, তবু যে ওর মনের মধ্যে আছে সেই চিরন্তনী বঙ্গ-রমণীর কল্যাণীমূর্ত্তি। একথা তার চেয়ে আর কে বেশী জানে? তাদের বাড়ীর ঐতিহ্য যাবে কোথায়? তারই ত বোন এই কল্যাণী! রমলাকে ভাল লাগবে তারও।

রমলা ভাবে ভদ্রলোক এত বিদ্বান, এত বড়লোক, তবু কি নিরহঙ্কার। বড় যেন নিঃসঙ্গ মনে হয় ওঁকে। এই বয়সেই কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব। শুনেছে উনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। ভদ্রলোক মৃতদার। একটি দশ-বার বছরের ছেলে আছে। দেরাদুনে পড়ে। যদি এই অসহায় পরনির্ভর মানুষটির ভার তার হাতে পড়ত? পরক্ষণেই সচকিত হয়ে ভাবে ছিঃ, নির্লজ্জের মত এ কি ভাবছে সে? ওদিকে বাঘটা সমানে গর্জ্জাচ্ছে আর কাতরাচ্ছে তার বাঘিনীর বিরহে। বেলভেডিয়রে এই ন্যাশানাল লাইব্রেরী থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানাটা খুবই কাছে।

বাঘ বাঘিনী পেয়েছে। ওরা দু'জনে একসঙ্গেই সেদিন 'জু'তে গিয়েছিল ··· ···

এরা এখন একটা অ্যালকবেই পড়াশুনা করে। একটা বই থেকেই দু'জনে গবেষণা করে। সাহায্য করে দু'জনে দু'জনকে।

রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করেছে সুবিমল রমলাকে। কেউ আপত্তি করে নি। যদিও সুবিমল ব্যানার্জ্জি আর রমলা মুখার্জ্জিতে বিয়ের বাধা হয় না। তবু সুবিমল ইচ্ছে করেই কোন হৈ চৈ আড়ম্বরের মধ্যে যায়নি। চেনা-জানা কয়েকজনকে ঘিরেই একটা পার্টি জমিয়েছিল। তাতে কন্যাপক্ষের এসেছিল কয়েকটি হষ্টেলের মেয়ে ও স্কুলের টিচার, আর বরপক্ষের গুটিকয় অধ্যাপক ও বন্ধু। কল্যাণী না থাকায় মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিল বৈকি সুবিমলের। কিন্তু কি-ই বা করা যাবে? কবে ওখানকার ইন্ডাষ্ট্রিয়াল একজিবিসন শেষ হবে তবে ছাড়া পাবে অমলেন্দু। কানাডা গবর্ণমেন্টের আমন্ত্রণে বিভিন্ন দেশ তাদের শিল্পসম্ভার ডিসপ্লে করার জন্য পাঠিয়েছে। ভারতও ভাগ নিয়েছে। এরোপ্লেন সংক্রান্ত ব্যাপারেরও অনেক কিছু আছে, তারই তত্ত্বাবধায়ক অমলেন্দু। সহজে কি আর ছুটি পাবে? বছর ত ঘুরে গেল, এখনও কতদিন লাগবে কে জানে? যাক্, চিঠিতে ওদের সব ভালভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

পরিণত বয়সেই শুভ-পরিণয় হ'ল দু'জনের। দু'জনে দু'জনকে পেয়ে সার্থক হয়েছে এটুকু বোঝা যায়। তবে প্রেমে উচ্ছ্বাস এদের নেই। জল যেখানে গভীর, সেখানে কি আর ঢেউ-এর চাঞ্চল্য থাকে? পিতৃদত্ত বিরাট্ বাড়া সুবিমলের। সেই আমলের বাবুর্চ্চি, খানসামা, তারাই সংসারটা পুরাতন চালেই চালিয়ে চলেছে। রমলার উপদেশ দরকারও হয় না ওদের। রমলা বোঝে এই জন্যই সুবিমলকে পরনির্ভর মনে হ'ত।

ওদের বিবাহিত জীবনের তিন মাস কেটে গেল। রমলার এম. এ. পরীক্ষার ফল বেশ ভালই হয়েছে। সুবিমলও ডক্টরেট পেয়েছে। এবার ওদের সামনে একটা প্রধান পরীক্ষা। দীপু ওদের কিভাবে নেবে। ছেলের গরমের ছুটির সময় হয়ে এল। ওরা ঠিক করল দু'জনে মিলেই দেরাদুন যাবে দীপুকে আনতে।

ঝক্ ঝক্ শব্দে ট্রেন ছুটে চলেছে। এ যাত্রা ওদের কাছে মধুর হয়ে উঠেছে–দু'জনের বলা কবিতায়। কখনও শেলি কখনও বাইরনের সাহায্য নিচ্ছে ওরা। আবার সব ছেড়ে রবিঠাকুরের সঞ্চয়িতার সঞ্চয় থেকে একে অপরকে হৃদয়ের গভীর বাণী উৎসারিত করে দিচ্ছে। তবে সব ছাড়িয়ে দু'জনেরই মনে এখন এক আশঙ্কা ফুটে উঠছে।

থেকে আঘাত না পায় এইটুকুই আশা করে সে। দীপুর কথা উঠলেই রমলা তাই কৌশলে ছেলেটির স্বভাব, পছন্দ, কিসে তার ঝোঁক—এই সব জেনে নেবার চেষ্টা করে। সুবিমল বেচারী লাজুক, মুখচোরা মানুষ। তবে বেশ রাসভারী। ছোট ছেলেদের সঙ্গে কেমন ক'রে মিশতে হয় তা সে ভাল জানে না। তাই ওতপ্রোতভাবে ছেলের সঙ্গে কখনই মেশে নি। একটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছে বরাবর। তার যেন কেমন লজ্জা করছে রমলাকে নিয়ে ছেলের সামনে দাঁড়াতে। ভাবছে একা এলেই হ'ত। তাই ট্রেন যত দেরাদুনের দিকে এগুচ্ছে, এদের কবিতার ফোয়ারাও ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসছে। শেষে দেরাদুনে এল গাড়ী।

রাজপুর রোড ধ'রে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি 'সেণ্ট-জোসেফস্ অ্যাকাডেমির' দিকে। দু'জনেই চুপ, আন্মনা। স্কুলের গেটের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াতে রমলার হাতে একটা চাপ দিয়ে নেমে গেল সুবিমল।

অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে রমলা গেটের দিকে। যদিও দীপু তার কেউ নয়। সেকালের হিসেবে সম্পর্কটা মধুরও নয়। তবুও অকালে-হারানো তার ছোট ভাইটির কথা আজ কেন বারে বারে মনে পড়ছে। আর যে ছেলেটি আসছে সে যে তার প্রিয় সুবিমলেরই একটি অংশ। তাকে আপন করতে পারলে সুবিমলের ভাল-বাসা আরও প্রগাঢ় হবে নাকি তার প্রতি? যে তাকে সার্থক করেছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে প্রতিদানও ত কিছু দিতে হবে? ঐ আসছে ওরা। Dove গ্রে রং-এর বুশসার্ট আর লাইট গ্রে রং-এর সামার ইউনিফর্মে মোড়া ছেলেটি বড্ড রোগা না? মুখটা অনেকটা সুবিমলেরই মত। তবে রোগা মুখে চোখ দু'টো যেন বেশী বড় বড় লাগছে। আর পাতলা ঠোঁটে চাপা চিবুকে কেমন যেন একটা কাঠিন্য ফুটে উঠেছে কি? এবার একেবারে ট্যাক্সির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। দীপুর জিনিসপত্র কেরিয়ারে তোলা হচ্ছে। সুবিমল কি বলছে, মাথা নীচু করে শুনছে দীপু। চোখ নীচু করেই উত্তর দিচ্ছে। গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল সুবিমল, দীপু তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সস্নেহে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল রমলা। ছেলেটি কিন্তু বেশ ভদ্রভাবে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে একটু দূরত্ব রেখে রমলার পাশেই বসল। সুবিমল বোধ হয় ওকে ওখানেই বসতে বলে দিয়েছে।

কলকাতায় ফিরেছে ওরা। এখন সুবিমলের কলেজ বন্ধ। রমলারও অখণ্ড অবসর। স্কুলের কাজটা ত ছাড়িয়েই দিয়েছে সুবিমল। না হলেও এই গরমে ছুটিই থাকত। বাড়ীতে সংসারের বিশেষ কিছুই দেখতে হয় না তাকে। দীপু এসে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে তার স্থান করে নিয়েছে। মনে হয় কখনই বাপের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মেশেনি ও। বাপও সহজভাবে ডাকেনি কাছে। খেলনা, পোষাক, বই কিনে দিয়েই কর্ত্তব্য শেষ করেছে। তবে এখন, রমলার নির্দ্দেশে সকালে ব্রেকফাষ্টের পর সুবিমল ঘণ্টাখানেক ধরে ওর পড়াশুনো দেখে আর বাংলা পড়ায়। ইংরেজী স্কুলে দিলেও বাড়ীতে ছেলেকে বাংলা বলতেই অভ্যেস করিয়েছে বরাবর। তাই ও বাবাকে বাপি বলে, ড্যাডি বলে না। এদের বাড়ীতে মাতৃভাষার কদর আছে খুব। বিদেশী কেতার অন্ধ অনুকরণ করে নি এরা, স্বীকরণ করেছে। বেশ ভাল লাগে রমলার। এই পরিবেশে নিজেকে এত দিনে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে ও। কিন্তু দীপুর মধ্যে শিশুসুলভ চপলতা যেন একেবারেই নেই। অত ছোটতে পরিবার ছাড়া হয়ে স্কুলে মানুষ হওয়ার দরুণ নিয়মের নিগড়ে-বাঁধা একটা যন্ত্র হয়ে গেছে যেন ছেলেটি। খুব ভদ্র, অমায়িক, বাধ্য ছেলে দীপু, তবু কি একটা যেন নেই ওর মধ্যে। পড়তে আর ছবি আঁকতে খুব ভালবাসে। ঐ নিয়েই থাকে। ঠিক টাইম মত খেতে আসে টেবিলে। কোন কিছু চেয়ে খায় না। খানসামা সার্ভ করার সময় প্রয়োজন মত তুলে নেয়। বেশ নিপুণভাবে কাঁটা চামচ ধ'রে খায়। টেবিল ম্যানার্স শিখেছে বটে। কেমন একটা গণ্ডি যেন নিজের চারদিকে টেনে রেখেছে ঐ অতটুকু দশ বছরের ছেলে। যা সরিয়ে ওকে কিছুতেই আপন করে কাছে টেনে নেওয়া যায় না। সেই প্রথমদিন ট্যাক্সিতে পাশে বসেও যেমন দূরত্ব রক্ষা ক'রে বসেছিল, আজও তেমনি নিরাপদ দূরত্বই বজায় রেখেছে। কোন দিনই কি এই ব্যবধান ঘুচবে না?

এই না-পাওয়ার বেদনা ম্রিয়মাণ করে তোলে রমলাকে। দুর্ব্বিসহ অখণ্ড অবসরে তা যেন আরও পীড়াদায়ক ব'লে মনে হচ্ছে। ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এই ছেলেকেই সে আপন ক'রে কাছে টেনে নেবে। মধুর মা ডাক শুনবে ওর মুখে। এই প্রতিজ্ঞার উৎস কোথায় খুঁজতে গিয়ে অনুভব করে যতই সে আধুনিকা হোক না কেন, তবু মনের মধ্যে মমতার উৎস ঠিকই বইছে। তারই প্রেরণা ওর মনে সৃষ্টি করেছে এই মাতৃত্বের ক্ষুধা।

সুবিমল বলে, "অমন মুখ শুকনো করে বসে থাক কেন রমলা? তুমি আবার পড়াশুনো সুরু কর না। কোথায় গেল তোমার সেই উৎসাহ?" নিজে সে বেশীর ভাগ সময় বই নিয়ে লাইব্রেরী ঘরেই কাটায়। ছেলে বাড়ীতে আসার পর থেকে সংযত হয়েই থাকে। যখন তখন

আর আগের মত কবিতা আবৃত্তি সুরু করে না। তবে রমলা কাছে এলেই চোখে একটা আনন্দের ঝিলিক্ হেনে যায়। সত্যি, পড়াশুনোতেও আর উৎসাহ পায় না রমলা। তন্ময় হয়ে আর বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে পারে না সে। একটা পরাজয়ের বেদনা অহরহ তার মনে কাঁটার মত বাজে। বহুরকমে দীপুকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু রমলাকে দেখলেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে দীপু। তবে কি ওর মনে কোন অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে? না হলে কিসের এই বিরাগ?

সুবিমল বলে, "কেমন লাগছে দীপুকে?"

কি বলবে রমলা? অনুযোগ করার ত কিছু নেই। কোন ত্রুটি নেই দীপুর ব্যবহারে। আপনি ছাড়া কথা বলে না তার সঙ্গে। সে ঘরে গেলে তাড়াতাড়ি সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। যা জিজ্ঞেস করে বিনীতভাবে তার উত্তর দেয়। কি অভিযোগ করবে সে এই ছেলের নামে? তবু বলে, "একটু গম্ভীর প্রকৃতির, তবে বেশ ছেলে।"

সেদিন রমলা নিজের ঘরে একটু বিশ্রাম করছে দুপুর বেলায়। সুবিমল লাইব্রেরী ঘরে। এমন সময় তারই বয়সী একটি তরুণী হঠাৎ সে ঘরে 'দাদা' ব'লে ঢুকেই আবার তাকে দেখে পরক্ষণেই বের হয়ে যায়। পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে দীপু তাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে,"একি পিসীমা! তুমি এসে গেছ? আমি জানিই না? কবে এসেছ তুমি?" রমলার বুকটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে ওঠে, কবে সেদিন আসবে? যেদিন দীপু তাকেও অমনি সহজ ভাবে কাছে টেনে নেবে? এই তবে কল্যাণী? কি হ'ল? অমন করে তাকে দেখেই স'রে গেল কেন? উৎকর্ণ হয়ে সে মন দেয় বাইরে ওদের কথায়।

"হাঁরে দীপু, দাদার খাটে ঐ ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন উনি কে রে?"

"ওঁকে বাবা এনেছেন।"

"সে কি রে? কে ও? কোত্থেকে এনেছেন?"

"তা কি জানি। তবে বাবার বউ উনি।"

"মানে দাদা বিয়ে করেছে? আর আমি তার কিছুই জানি না? তোর বাবা কই?"

"লাইব্রেরী ঘরে।"

"চল ত দেখি?" কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে রমলা। এই তার পরিচয় দীপুর কাছে? বাবার বউ সে, তার কেউ নয়। তাকে দেখে কল্যাণী কি ভাবল? ছিঃ ছিঃ! সুবিমলের চিঠি 'ও' পায়নি নাকি?

না সত্যিই চিঠি পায় নি কল্যাণী। তখন ওরা কানাডার ওদিকে 'কুয়োবেক্', 'টোরণ্টো' এই সব শহরগুলি দেখতে বেরিয়েছিল। এগ্‌জিবিসন্ শেষ হওয়ার পরই বেরিয়ে পড়েছিল ওরা। সে খবর আবার সুবিমল জানত না। কানাডাতে থাকার সময়ে পার্টি, ডিনার, লাঞ্চের মাধ্যমে কল্যাণী ওদেশের বহু পরিবারের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছিল। বিদেশে গেলে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যেমন মনকে আকৃষ্ট করে, পরিতৃপ্তি দেয়, তেমনি বহুরকম লোকের সংস্পর্শে আসার দরুণ অভিজ্ঞতাও বাড়ে, হৃদয়ও প্রসারত্ব লাভ করে। এই উঁচু সুরে বাঁধা মন নিয়ে কল্যাণী এসেছিল ব'লে, সহজেই মেনে নিল রমলাকে। যতক্ষণ ছিল অনর্গল কথা বলল রমলার সঙ্গে। ওর স্বভাব একেবারে সুবিমলের বিপরীত।

যাবার সময় বলে গেল, "দাদাকে হঠাৎ এসে খুব অবাক্ করে দেব ভেবেছিলাম, তা নিজেই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম ভাই, তোমাকে দেখে। যাক্ বাবা, এত দিনে বাড়ীটা মানাল। এই খাঁ খাঁ শূন্যপুরীতে একটুও আসতে ইচ্ছে করত না আমার। কাল কিন্তু আমার ওখানে নেমন্তন্ন রইল তোমাদের। ইস্, মীনুটা কি যে খুশী হবে? আর ও ত জানেই না এখনও।"

রমলা বলে, "না ভাই সে হবে না, কাল তোমরা আমাদের কাছে খাও। আগে গুছিয়ে বস তোমরা, তার পর আমরা যাব না হয়।"

খুশী হয়ে সম্মতি দেয় কল্যাণী। মনে মনে ভাবে বিবেচনা আছে মেয়েটির। যাবার সময় দীপুকে নিয়ে যায় সঙ্গে করে। সিঁড়িতে নামতে নামতে বলে, "জান দাদা! দীপু কি বলছিল বৌদিকে?" দীপুর টানাটানিতে আর কথাটা শেষ করতে পারল না। ওপরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রমলা শুনল, কল্যাণী বলছে দীপুকে, "ওঁকে মা বল না কেন দীপু? উনি তোমার মা হন।"

না, মা বলে না দীপু রমলাকে। ও চাকরদের ডাকলে তাড়াতাড়ি তাদের গিয়ে বলে, "উনি ডাকছেন শুনতে পাচ্ছ না?" এটা ওর এটিকেট্। কোন ভাল জিনিষ নিজে রেঁধে খেতে দিলে বলে, "বেশ সুন্দর হয়েছে।" কোন জিনিষ পেয়ে খুশী হলে ধন্যবাদ দিতে শিখেছে স্কুলে। এটাও তেমনি কেতাদুরস্ত ভাবের প্রকাশ। কিন্তু যা ভেবেছিল তা ত নয়। ওর মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসের ত অভাব নেই। শুধু অভাব তারই বেলায় সেটা প্রকাশের।

পরদিন কল্যাণী এল। স্বামী অমলেন্দু আর মেয়ে মিনুকে নিয়ে। অমলেন্দুর লম্বা-চওড়া চেহারার সঙ্গে চঞ্চল স্বভাব আর প্রাণখোলা হাসি মিলেছে বেশ।

মেয়েটিরও কোন আপন-পর জ্ঞান নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নানা প্রশ্নে, গল্পে মুখর হয়ে উঠে আপন ক'রে নিল রমলাকে। চিরুণী এনে হাতে দিয়ে বলে, "চুলটা একটু ঠিক করে দাও ত মামী।" বেশ ভাল হয়েছে, মা আমাকে ম্যামি বলতে দেয় না কিছুতেই। না দিল, আমি কেমন 'মামী' পেয়ে গেলাম। এক দণ্ড স্থির নয়। চুল আঁচড়ানর সময়ে সমানে দু'হাতে রমলার গলার হার হাত দিয়ে টেনে টেনে ঠিক করছে। মেয়েটি প্রায় দীপুরই বয়সী, হয়ত কিছু ছোট হবে। ওদেশে এতদিন থাকার দরুণ বাংলা পরিষ্কার বলতে পারে না। ইংরেজী বলে বেশীর ভাগ। তা হোক, প্রাণ আছে মেয়েটির মধ্যে। বেশ লাগে রমলার। ওর এই কারণে-অকারণে রমলার কাছে আসা, দীপু কিভাবে নিচ্ছে লক্ষ্য করে রমলা। প্রথম প্রথম ওকে খালি ডাকছে দূরে দাঁড়িয়ে, লোভ দেখাচ্ছে কোন নতুন খেলার। পরে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখছে; কোন হাসির কথা হলে মুখ নীচু ক'রে হাসছে। আবার চারদিকে একবার সশঙ্ক দৃষ্টিপাতে দেখে নিচ্ছে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে কি না। সারাদিন রইল ওরা।

এর পর থেকে প্রায়ই দু'বাড়ীর যাতায়াত হয়। দীপু এখন বলতে গেলে বেশীর ভাগ সময় পিসীমার বাড়ীতেই কাটায়। তবে তার ব্যবহারে কোন ত্রুটি নেই। লাঞ্চ বা টি-এর সময় এসে পৌঁছতে না পারলে ফোনে জানিয়ে দেয়। রমলার মনে হয় ও যেন আরও দূরে স'রে যাচ্ছে। সুবিমলকে কিছু বলতে পারে না, পাছে সে মনে করে তার বোনের বাড়ী দীপুর যাওয়া ওর পছন্দ নয়। কিন্তু সুবিমল সেদিন নিজেই বলল, "দীপুটা যেন বাড়ী-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।" এই সুযোগ হাতছাড়া করল না রমলা। বলল, "আমার একটা কথা রাখবে?" "বিয়ের পর এই প্রথম তুমি একটা কিছু চাইছ। সাধ্যের অতীত না হলে রাখব বৈকি।" উত্তর দেয় সুবিমল।

"বেশ, তবে চল না এই গরমটা বাইরে কোথাও কাটিয়ে আসি। দীপুর স্কুল খুলতে ত এখনো এক মাস বাকি। তবে একটা কথা, গুচ্ছের লোকজন সঙ্গে নিতে পাবে না। এ বিষয় আমি যা বলব মানতে হবে কিন্তু।"

"যথা অভিরুচি। কিন্তু বাইরেটা চেনা-শোনার কোন্ বাইরে? যেখানে কেউ নাই নাইরে?"

ওর গানের ভঙ্গিমা দেখে হেসে রমলা বলে, "চল না পুরী যাই।"

"বোঝা গেল কোন্ বাইরে। তাহলে বি. এন্. আর. হোটেলে একটা ঘরের জন্য লিখে দি। হোটেলটা—।"

কথার মাঝখানেই রমলা বলে, "না না, হোটেল নয়। ছোট্ট একটা বাড়ী চাই। বেশ সমুদ্রের ধারে হবে, সামনে একটু বাগান থাকবে, খানচারেক ঘর হলেই হয়ে যাবে আমাদের।"

"আচ্ছা, তবে সমরেশকে বলি। ওদের বাড়ী আছে একটা। এ সময় ত ওরা যায় না। তবে বন্ধ বাড়ী, পড়ে আছে।"

"থাক্ না, সে আমি পরিষ্কার করে নেব। সেজন্য ভেব না তুমি।"

রমলা ঠিকই বুঝেছে। কল্যাণীর কাছে আভাসে যা জেনেছে আর নিজেও যা লক্ষ্য করে দেখেছে তাতে ওর মনে হয় দীপুর তার ওপর বিরাগ নেই ঠিক, যা আছে তা সঙ্কোচ। এই সঙ্কোচের জন্যই তার কাছে সে সহজ হতে পারছে না। তাই ও ঠিক করেছে এই চাকর-খানসামা ঘেরা, নিয়মের অনুশাসনে বাঁধা বাড়ীটা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে দীপুকে। এই পরিচিত পরিবেশ থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে গেলে হয়ত ওর মনের জড়তা কেটে যাবে। ওকে সহজে কাছে পাবে ও। এই সম্পদ জিনিষটা স্বাচ্ছন্দ্যের, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের অন্তরঙ্গতায় বড় বাধার সৃষ্টি করে। সুবিমলকেই কি সে নিবিড়ভাবে কাছে পেয়েছে? যেমন ভাবে তার মা, বাবাকে পেয়েছিলেন।

দিনাজপুরের সামান্য স্কুল মাষ্টার ছিলেন ওর বাবা। সন্ধ্যেবেলা ওদের দুই ভাই-বোনকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। মাঝখানে লণ্ঠনটা জ্বলত। ঘরের কোলে দালানে মা রান্না করতেন। ধীরে ধীরে রাত বাড়্ত। ঝিঁঝিঁর ডাক সপ্তমে উঠত। মণ্টু ঘুমে ঢুলতে সুরু করত। মা তখন খেতে ডাকতেন। সেই মাটির দালানেই গোল করে তিনখানা পিঁড়ি লাগালাগি ক'রে পেতে তিনি ওদের খেতে দিতেন। কুপির আলো পড়ত তাঁর লালপাড় ঘেরা মুখে। মাটির হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে তুলে দিতেন সকলের পাতে। সেই পরিবেশনে কি মমতার স্পর্শ। বাবার সঙ্গে কত সুখ-দুঃখের কথা বলতেন তখন। কি করে দু'টি বেশি ভাত তাঁকে খাওয়াবেন এই চিন্তা। ঠিক অমনি না হোক, তবু একটা ঘরোয়া পরিবেশ গড়ে তুলবে সে পুরী গিয়ে। কল্যাণী ত সেদিন বলছিলই, ও ভাই ছোট থেকে মা কেমন জানে না, এখন বড় হয়ে হঠাৎ মা পেয়ে কেমন লজ্জায় পড়েছে বেচারী। তোমাকে ও যে চায় না তা নয়। এই ত মিনুকে যখন আম সাজিয়ে দিই, খেতে দিই, চেয়ে চেয়ে

দেখে আর মিনুকে বলে, এত বড় মেয়ে মা'র কাছে জামা তে লজ্জা করে না তোর। সত্যি এই লজ্জাটাই ঙে দিতে হবে ওর।

স্বর্গদ্বারের ওপর সুন্দর ছোট্ট বাড়ীখানি। সামনে টু বাগান। ঠিক রমলা যেমনটি চেয়েছিল। ভারী ী হয় রমলা। কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঘর সাফ্ তে লেগেছে। সাহায্য করছে দীপু। প্রথমে ড্রয়িং-টা নিয়ে পড়েছে ওরা। বুড়ো মালিটা কোনরকমে র মেঝেগুলো ধুয়ে রেখেছে, জিনিষপত্র ধুলোয় ভরা। য় এসেছে শুধু রামু। একেবারে আনকোরা নতুন র। ইচ্ছে করেই পুরাণো লোকদের আনে নি না। তারা সঙ্গে এলেই আবার ঐ বাড়ীর অভ্যস্ত ল এদেরও চালিয়ে ছাড়ত।

দীপু বড় মুশকিলে পড়েছে। ছোটবেলা থেকে স্নেহ-লবাসার স্পর্শে বঞ্চিত হয়ে ডিসিপ্লিনের মধ্যে বড় হয়ে ছে সে। অন্য ছেলেরা যখনই ছুটি ফুরিয়ে গেলে া ফিরেছে, তাদের গম্ভীর মুখ, ছলছল চোখ, লুকিয়ে া, অবাক করেছে দীপুকে। কথা বলতে গেলেই া মায়ের যত্নের কথা, বাপের স্নেহের কথা, ছোট -বোনের দুষ্টুমির কথা ব'লে শেষ করতে পারে না । ঐ পরিবেশ ছেড়ে এসে এই নিয়মের নিগড় ে কত কঠিন হয়ে বাজছে, বেশ বুঝত দীপু। কিন্তু র্য্য, তার ছিল উল্টো। বিশেষ করে গত বছর মাও ছিল না। স্কুলে ফিরে গিয়ে স্বস্তি পেয়েছিল সঙ্গী-সাথীহীন স্নেহমমতার স্পর্শবিহীন ছুটির দিন-। কোনমতে কেটে যাওয়ায় বেঁচেছিল। সময় যেন র মত চেপে বসত তার ঘাড়ে। অবশ্য বাবাকে ভালবাসে। কিন্তু ঐ গম্ভীর মানুষটিকে ভয় পায় চেয়ে বেশী। এর চেয়ে খানসামা আবদুল, চাকর া এরা তবু তার সঙ্গে গল্প করত। এবার কিন্তু কে হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেছে ও। কই তার ত হাসেন না তিনি। বরং সে কাছে গেলেই কেমন য় হয়ে যান। অথচ ঐ ওঁর সঙ্গে ত বেশ হেসে কথা । এই জন্যই ওঁকে প্রথমটা ভাল লাগত না ওর। এসে বাবাকে যেন পুরোপুরি দখল করে নিয়েছেন। বশীক্ষণ বাবার সামনে থাকতে তার কখনই ভাল না। আর সেই ওঁরই কথায় বাবা তাকে পড়াতে করলেন। কেন সে কি রেজাল্ট খারাপ করেছে? রেণ্ড ফাদার কত ভালবাসেন তাকে। আর বাংলা বই ত সে নিজেই পড়ে। এইজন্যই ত বাড়ীতে ত না সে ইদানীং। তবে এখন? এখন কিন্তু খারাপ লাগে না বিশেষ। মিনু বলছিল, কেন আমি ওঁর কাছে যাই না? পিসিমা বলছিলেন, উনি তোমার মা হন, কেন ওঁকে মা বলে ডাক না? পিসিমা যেমন মিনুর মা সেইরকম? মনে পড়ে যখনই সে সহজভাবে ওঁর কাছে এগিয়ে যেতে গেছে, কেউ না কেউ এসে পড়েছে। এই ছেলেমানুষি করতে দেখলে তারা কি ভাববে ওকে? ছিঃ! এখন মুশকিল হয়েছে রামুটা বাপির সঙ্গে বাজারে গেছে। আর ওঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে খালি ওঁকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে। একটা কিছু ব'লে ডাকতে হবে ত? ডাকবে নাকি মা বলে? মনে মনে দু'বার ডাকে মা, মা। ভালই লাগে।

"ও দীপু একা অতবড় টেবিলটা টেনো না তুমি, বুকে লাগবে বাবা! দাও আমি ধরি। বাঃ, বেশ হয়েছে, এই জানলার ধারে বসে এই টেবিলটায় আমরা চা খাব। কেমন সমুদ্র দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বেশ ভাল হবে, না?" খুসী মনে মাথা নেড়ে সা'য় দেপুয় দী।

এমনি করে প্রত্যেক ব্যাপারে ওর মতামত নেয় রমলা। আস্তে আস্তে দীপুর মনের জড়তা সঙ্কোচ কেটে আসছে মনে হয়। যেমন সেদিন খেতে বসে খাবার টেবিলের তলায় একটা ছোট টুল দেখে রমলা বলে, "এটা এখানে কে রাখল?" একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে দীপু বলে, "আমি রেখেছি। আপনার পা তুলে বসে খাওয়া অভ্যেস।" এই টেবিলটার নীচে কাঠের রড্টা নেই, তাই। আনন্দে চোখে জল আসে রমলার। তবে ত সে পারে। এইত আশার আলো দেখেছে সে। ভাব প্রকাশের ক্ষমতা না থাকুক, এতদিনে সুন্দর একটি সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাচ্ছে রমলা।

দুপুরের রান্না করতে গিয়ে গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে রমলা। দীপু বার বার যাতায়াত করছে রান্নাঘরের দরজার সামনে দিয়ে। বাড়ীতে বাপি নেই। রামু ঘর পরিষ্কার করছে। পিসীমা আমের জেলি করতে গিয়ে অমনি ঘেমে উঠেছিলেন আর মীনু তাই দেখে দৌড়ে গিয়ে একটা পাখা এনে বাতাস করছিল তাঁকে, এই দৃশ্যটা আজ বারে বারেই কেন বা মনে পড়েছে তার। রমলা দীপুকে দেখতে পেয়ে ডাকে, বলে, "মাংসটা একটু চেখে দেখবে দীপু, নুন দিয়েছি কি না?"

চাখ্তে চাখ্তে দীপু রমলার ঘামে-ভেজা মুখের দিকে চেয়ে বলে, "আপনার এই গরমে রাঁধ্তে কষ্ট হচ্ছে, আর আজিজ ওখানে মজা করে ব'সে আছে।

হেসে, খুসীর সঙ্গে রমলা বলে, কই মাংস কেমন খাচ্ছ বল্লে না ত?

"সুন্দর হয়েছে। সত্যি খুব ভাল রাঁধেন আপনি।"

এই নতুন উচ্ছ্বাসের মুখে আরও হয়ত কিছু বলত কিন্তু এমন সময় সুবিমল এসে দাঁড়াল। আজ কিন্তু রমলা দীপুকে চলে যেতে দিল না। হাত ধরে বসিয়ে বলল, মালপো করেছি, একখানা খেয়ে তবে হাত ধোও। উঠে যাচ্ছ কেন?" যে ছেলে পারতপক্ষে বাপের সামনে পড়তে চায় না তার পক্ষে শাস্তি বৈকি। কিন্তু যখন সুবিমলকে একটা প্লেটে দুখান মালপো দিয়ে দীপুর পাশে বসে খেতে বল্‌ল রমলা, আর সুবিমল দীপুর খালি প্লেটে নিজের থেকে একখানা তুলে দিয়ে বল্‌ল, "আমি একটাই খাই, আবার ভাত খেতে হবে ত? কি রে দীপু, কেমন হয়েছে মালপো?" আবার রমলাকে বলল, "জানো মালপো খেতে ও খুব ভালবাসে।"

রমলা বলে, জানি, তাই ত করেছি।

কেমন যেন একটা সুখের রোমাঞ্চ হয় দীপুর মনে। তবে ত এরা চায় তাকে। দু'জনেই চায়। এদের দু'জনের মাঝে অবাঞ্ছিত নয় তবে সে। মীনু তার মা-বাবার মাঝে বসে যেমন আব্দার করত আর সে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকৃত। আর এখন ত সেও তেমনি ব'সে আছে।

পরদিন রমলাকে বলে দীপু, "বাপির জন্য একটা ইজিচেয়ার হলে বেশ হত। উনি বাড়ীতে সবসময় ইজিচেয়ারেই বসেন ত?"

"ঠিক বলেছ দীপু। আনতে হবে একটা।"

এই কথা সুবিমলকে বলে রমলা। কৃতজ্ঞতায় ভ'রে ওঠে সুবিমলের মন। দীপুর মনের আর স্বাস্থ্যের এই দ্রুত পরিবর্ত্তন ওরও চোখে পড়েছে বৈকি। সত্যি ঠকে নি সে। তার সংসারে দরকার ছিল রমলার। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত বিয়ের পর একমাত্র স্বামীটি নিয়ে মেতে না উঠে, প্রাচুর্য্যের মধ্যে গা না ভাসিয়ে এই যে অন্যের ছেলেকে আপন ক'রে নেবার চেষ্টা, এতে যেন নতুন করে চেনে সে রমলাকে। সাংসারিক কাজের মধ্যে ব্যস্ত রমলার মধ্যে যেন সে তার গৃহলক্ষ্মীকে খুঁজে পেয়েছে। শুধু কি তাই, তাদের বাপ ছেলের মধ্যেকার এতদিনকার ব্যবধানও কৌশলে ঐ রমলাই সরিয়ে দিয়েছে।

খাবার ঘরের ওপরে মাচার মত খানিকটা জায়গা ঢালাই করা। যত সব অকেজো জিনিস জড় করবার স্থান বোধ হয় ওটা। নীচে থেকে রমলার মনে হল ওর একটা বেতের র‍্যাকে অনেক পুরাণো বই রয়েছে যেন। আর ভাঙ্গাচোরা একরাশ জিনিষের ভেতর একটা ডেক্‌-চেয়ার দাঁড় করান রয়েছে মনে হ'ল। তার লাল রংয়ের ক্যাম্বিসটা দেখা যাচ্ছে। পুরাণো বইয়ের প্রতি ঝোঁক তার বরাবর। তায় ইতিহাস ছিল তার প্রিয় সাবজেক্ট। মনে হয় পুরাণো ঐ হলদে রংয়ের ছেঁড়া পাতাগুলোর মধ্যে কত না অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে। এ ছাড়া ঐ ডেক্‌চেয়ারটা হলে সুবিমলের খুব সুবিধে হয়। কেউ নেই কাছাকাছি। সুবিমল গেছে ওরই ফরমাস্ মত উল কিনতে। রামু দোকানে গেছে। দীপু বাগানে। রান্নাঘর থেকে ছোট্ মইটা টেনে এনে নিজেই উঠে পড়ে রমলা। কোন রকমে একটা পা সিমেণ্টের ওপর রাখতেই অন্য পায়ের ধাক্কায় মইটা পড়ে গেল। টেবিলের ওপর পড়াতে কাচের ফুলদানিটা ভেঙ্গে গেল ঝন্ ঝন্ শব্দে।

ঠিক্ সেই সময় দীপু একরাশ ফুল নিয়ে ঘরে ঢুকছিল ফুলদানিটায় সাজাবে বলে। রমলা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে অস্ফুটে 'উঃ' বলেই ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে একটা বিরাট মাকড়সা দেখে। এই মাকড়সার সম্বন্ধে তার ভীষণ একটা দুর্ব্বলতা আছে। বিশ্রী রোঁয়াশুদ্ধ পাগুলো নিয়ে এগিয়ে আসছে ওটা তার দিকে। আবার চেঁচিয়ে উঠে পিছিয়ে আসতে যায় রমলা। নীচে থেকে দীপুর আতঙ্কমেশান চিৎকার শোনা যায়—

"ও কি করছেন পড়ে যাবেন আপনি?" "আঃ ঝুলোনা অমনি করে পড়ে যাবে যে? দাঁড়াও যাচ্ছি আমি।"

এবার কান্নাভিজে গলায় রমলা ডাকে, "শীগ্‌গির এস তুমি, ওটা আমার দিকে এগুচ্ছে।"

মইটা লাগিয়ে তর্ তর্ ক'রে উঠে এসে দীপু বলে, "কি? কি হয়েছে?"

রমলা ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে ওর ছোট বুকে মাথাটা গুঁজে দিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, "ঐ দেখ না বাবা! কত বড় মাকড়সাটা এগিয়ে আসছে। না না, তুমি যেও না ওটার কাছে।"

"ওমা! এত বড় মেয়ে হয়ে তুমিও মিনুর মত মাকড়সাকে ভয় পাও? ছিঃ, তুমি একটা ভীতু মা।" রমলার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যেই ধ'রে রেখে একটা পা বাড়িয়ে জুতো দিয়ে চেপে দেয় ওটাকে দীপু।

রমলা ঘেন্নায় শিউরে উঠে ওকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে।

চেঁচামেচি শুনে সদ্য-আনা উল কাঁটা মাটিতে ফেলে সুবিমলও তখন মই বেয়ে উপরে উঠেছে।

সম্পূর্ণ সহজভাবে দীপু তাকে বলে, "জান বাপি! মা না, মাকড়সা দেখে ভয় পায়।"

"সত্যি না কি? ভাগ্যি তুমি ছিলে, না হলে কি হ'ত?" এখানেই ত দীপুর গর্ব্ব। দুর্ব্বল মাকে রক্ষা করেছে সে ভয়ের হাত থেকে। এই আধিপত্যই দিল তাকে মা বলার অধিকার।

পরিতৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুবিমলের মুখ। মাতৃত্বের গৌরবে, সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল রমলা আরও বেশী করে মুখ লুকোয় দীপুর বুকে।

ঐ জালবোনা মাকড়সাটার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন এদের মধ্যেকার এতদিনের সঙ্কোচ-আবরণের জালটাও ছিন্নভিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

# বন্দিনী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

যে সময়কার কথা বলছি সেটা ছিল ইংরেজ রাজত্বের প্রবল প্রতাপের যুগ। ইতিহাসে দেখা যায় যখনই কোন উৎপীড়নকারী রাজশক্তি ক্ষমতার শিখরে পৌঁছায় তখনই তার পতনও সুরু হয়। ১৯৩০-৩৪ সনের কথা। পরাধীন ভারত বিদেশী শাসনের গোলামির ছাপ ললাট থেকে মুছে ফেলতে অধীর। মহা অত্যাচারী বিক্রমী বৃটিশ সরকারকে সাঁড়াশির মত দু'দিক থেকে আক্রমণ ক'রে ধরেছিল অহিংস কংগ্রেস এবং সহিংস বিপ্লবিগণ। ক্রুদ্ধ বৃটিশ সিংহ গর্জে উ'ঠে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাদের কামড়ে ধরছিল এবং লৌহ-কপাটের ভিতর আছড়ে ফেলছিল। কেউ সেখানে ফাঁসীর মঞ্চ অবধি পৌঁছে জীবনের জয়গান গাইতে পেরেছেন, কেউ লোহার গরাদের মধ্যে থেকেই বুক ফাটিয়ে গেয়ে উঠেছেন—

"শিকল পরা ছল মোদের
এই শিকল পরা ছল।
শিকল প'রেই শিকল তোদের
করব রে বিকল।"

হিজলী মহিলা বন্দীনিবাসের মধ্যে অমনি ক'রে গাইতেন প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম। বিরাট্ হিজলী জেলের প্রাঙ্গণের একপাশে ছোট্ট হাসপাতালের বারান্দায় প্রফুল্লনলিনী জেল কাঁপিয়ে গাইছেন—

"ভয় দেখিয়ে করছ শাসন
জয় দেখিয়ে নয়,
ভয়ের টুঁটি ধরব টিপে
করব তারে লয়।"

গলাটা হঠাৎ নামিয়ে এনে অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে এবং চোখ দু'টো যেন ফাঁসিকাষ্ঠে নিবদ্ধ রেখে গাইতেন—

"আপনি মরে মরার দেশে
আনব বরাভয়,
ফাঁসির পরেই আনব হাসি
মৃত্যু জয়ের ফল
মোদের শিকল পরাই ছল।"

ফাঁসির দড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে উৎসুক প্রফুল্লনলিনীর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কল্পনায় হয়ত তিনি তাঁর অতীত জীবন ভাবছেন, ভবিষ্যৎকেও আহ্বান করছেন। হিজলী বন্দীনিবাসের হাসপাতালের পিছনে তখন সূর্য অস্ত যায়—রক্তরাঙা সন্ধ্যায় "পশ্চিম দিগ্‌বধূ দেখে সোনার স্বপন।" হিজলীর সেই টকটকে লাল সন্ধ্যা বুঝি প্রফুল্লনলিনীর মনের আকাঙ্ক্ষা বিরাট্ পশ্চিম আকাশের গায়ে স্পষ্ট ক'রে লিখে চলত।

ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ওয়ার্ডে লক্‌আপ হ'তে হবে। তালাবন্ধ-হওয়া প্রফুল্লকে আর গান গাইতে শোনা যেত না।

কুমিল্লার কন্যা প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুমিল্লায় ১৯১৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী। পিতা রজনীকান্ত ব্রহ্ম, মাতা রঙ্গবাসী দেবী।

তেজস্বী পিতা ছিলেন মোক্তার। তিনি কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ক'রে কোর্ট বর্জন করেন। পরিবারটাই হয়ে ওঠে স্বদেশী ভাবাপন্ন। পিতার প্রিয়কন্যা পেয়েছিলেন পিতার তেজ ও প্রেরণা। পার্থক্য এইটুকু যে, প্রফুল্লনলিনীর ছিল বিপ্লবের পথ। কুমিল্লার বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগদান করেছিলেন তিনি ১৯২৯ সনে।

১৯৩০ সনে অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন প্রফুল্ল ফৈজুন্নেসা

গার্লস হাই স্কুলে। পড়াশুনায় ভাল ছাত্রী ছিলেন। সে সময়ের বিপ্লবীরা পড়াশুনাকে নয়, বিপ্লবীশক্তি আহরণকেই প্রথম স্থান দিতেন। স্কুলে শান্তি ঘোষ ছিলেন প্রফুল্লনলিনীর সহপাঠী। প্রফুল্লর সহজাত বুদ্ধি অঙ্গুলি হেলনে নির্দেশ করল শান্তি ঘোষের দিকে। সেই স্কুলেই পড়তেন সুনীতি চৌধুরী। সুপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলিকে কিশোরী প্রফুল্লনলিনী কি ক'রে যেন আপন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিনে নিতেন। তিনি তাঁদের বিপ্লবী দলে যোগদান করবার পথ দেখিয়ে দিলেন। দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। একে একে অনেকগুলি অগ্নিকণা জমে উঠল কুমিল্লার ছোট্ট শহরটিতে। পশ্চাতে থেকে বিপ্লবের শিক্ষা দিতেন রাজনৈতিক নেতাগণ। তখনও সকল কিশোরী বিপ্লবী দলে যোগদান করেন নাই, কেবল প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল ১৯২৯ সনে।

১৯২৯ সনে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কুমিল্লায়ও প্রচণ্ড বিক্ষোভ মাথা খাড়া করে। প্রফুল্লনলিনী এবং তাঁর বন্ধুদের হৃদয়েও একটা আলোড়ন জাগে।

১৯৩০ সনে সমগ্র ভারতে যখন প্রবলবেগে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হ'তে থাকে তখন কুমিল্লাতেও তা দানা বেঁধে ওঠে। আন্দোলিত হয়ে উঠল সেখানে তরঙ্গের পর তরঙ্গ। প্রফুল্ল এবং তাঁর কিশোরী বন্ধুরা সভা, শোভাযাত্রা এবং পিকেটিং-এ যোগদান করতেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতেন বড়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে।

পুলিস মোটা মোটা লাঠি হাতে দল বেঁধে ছুটে আসত নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নির্দয়ভাবে লাঠিচার্জ করতে। তৎক্ষণাৎ নারীদের পশ্চাতে রেখে পুরুষের দল দৌড়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে লাঠির আঘাত খেতেন।

ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর লাঠিচার্জের পর রক্তাক্তদেহ ও আহত বীরদের সেবা করবার ভার পড়ত নারীদের উপর। সেবাকেন্দ্র ছিল কুমিল্লা টাউন হল, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের দালান, প্রভৃতি স্থান। বড়দের সঙ্গে প্রফুল্লনলিনী এবং তাঁর কিশোরী বন্ধুরাও আহতদের সেবা করতে যেতেন সেখানে। আহতদের রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে কিশোরীদের মন ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠত—কিছু একটা কাজ করবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত। জনতার উপর ইংরেজের অত্যাচার কুমিল্লার যুবশক্তিকে তখন প্রচণ্ড ঘা দিয়ে চলেছিল। কিশোরীদের মনে হ'ত ইংরেজ তাড়াতে পারলে তবেই আসবে আমাদের দেশের কল্যাণ।

ওদিকে বিপ্লবী নেতাগণ এই সব কিশোরীদের মনের ক্ষেত্রকে আরও উপযুক্ত ক'রে প্রস্তুত করবার জন্য বিপ্লব-সংক্রান্ত পুস্তক পড়তে দিতেন। মহেশ প্রাঙ্গণে গিয়ে মেয়েরা লাঠি, ছোরা খেলা এবং প্যারেড করা শিখতে থাকেন। আবার ময়নামতী পাহাড়ে গিয়ে অভ্যাস করতে থাকেন রিভলবার ছুঁড়তে।

পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে কিশোরীরা লাঠি, ছোরা খেলা শেখাবার এবং বিপ্লবাত্মক পুস্তক পড়াবার মধ্য দিয়ে মেয়েদের সংগঠন করতে থাকেন। উৎসাহের একটা প্রবল বন্যা কুমিল্লা শহরকে যেন প্লাবিত করে তুলেছিল।

ফৈজুন্নেসা স্কুলের গার্লস গাইডে ইংরেজের জাতীয় পতাকা "ইউনিয়ন জ্যাক"কে স্যালিউট করতে বলা হ'ত। কিশোর হৃদয়গুলি বিদ্রোহ করে উঠত। গার্লস্ গাইড বয়কট ক'রে তাঁরা সংগঠন করলেন ছাত্রী-সঙ্ঘ। প্রফুল্লনলিনী তার সভানেত্রী, শান্তি ঘোষ সম্পাদিকা এবং সুনীতি চৌধুরী ক্যাপ্টেন।

স্কুলে ছুটির পরে তাঁরা ডিবেট করতেন। ডিবেটের বিষয় থাকত—মেয়েদের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করা উচিত কি না, অহিংস অথবা সহিংস কোন্ উপায়ে স্বাধীনতা আসবে, ইত্যাদি। স্কুলের কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে নোটিশ দিয়ে ছুটির পর ডিবেট করা বন্ধ করে দেন।

১৯৩০-৩১ সনে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, প্রভৃতি মেয়েরা বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী। দলের নেতাগণ এই কর্মীদের রিভলবার লুকিয়ে রাখতে দিতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নিহত বিপ্লবীদের ছবির এ্যালবাম্ গোপন ক'রে রাখতে দিতেন। এ্যালবামে ইংরেজের গুলীতে বিদ্ধ বিপ্লবীদের মৃতদেহগুলির ছবি কিশোরীদের বিপ্লবী কাজে প্রেরণা যোগাত। এ্যালবাম-গুলি গোপনে বিক্রী করতে গিয়ে এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবীদের মামলার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে উত্তেজনার আবেগে কিশোরীদের মন ফেটে পড়তে চাইত। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী অনন্ত সিংহের ভগ্নী ইন্দুমতী সিংহ সেই সময়ে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন। তিনি এই মেয়েদের বলতেন, পুজো ইত্যাদি আনন্দ উৎসবে খরচ না ক'রে সেই টাকা বিপ্লবীদের জন্য দিলে বেশি বড় কাজ করা হয়। প্রফুল্ল এবং তাঁর বন্ধুরা উৎসবের জন্য টাকা খরচা না ক'রে বিপ্লবীদের জন্য টাকা খরচ করতে শিখলেন।

১৯৩১ সনের প্রথমার্ধে কুমিল্লায় একটি ছাত্র-কনফা-রেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কিশোরীদল যে ছাত্রীসংঘ গ'ড়ে

তুলেছিলেন সেই সংঘের ছাত্রীরা ছিলেন ছাত্র-কনফারেন্সের সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগ স্বেচ্ছাসেবিকা। ক্যাপ্টেন সুনীতি চৌধুরী প্রায় ৫০.৬০টি ছাত্রীকে প্যারেড শিখিয়ে তৈরী করে তুলেছিলেন।

ইতিমধ্যে অনেকগুলি বিপ্লবী ঘটনা বাংলা দেশে ঘ'টে যেতে থাকে। ১৯৩১ সনের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পেডি সাহেবকে গুলী ক'রে নিহত করেন বিমল দাশগুপ্ত। পেডি, ডগ্‌লাস্‌, বার্জ পর পর তিন জন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে মেদিনীপুরে নিহত করেন বিপ্লবীরা।

কলকাতায় ১৯৩১ সনের ২৭শে জুলাই বিচারক গার্লিককে কোর্টের মধ্যে বিচার-আসীন অবস্থায় সর্বসমক্ষে গুলী করে নিহত করেন কানাই ভট্টাচার্য। বিপ্লবীদের প্রতি গার্লিক যে ফাঁসী ও দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডবিধান করতেন তা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেন তিনি। শত্রুর হাতে ধরা না দিয়ে কানাই ভট্টাচার্য নিজেও তৎক্ষণাৎ সেখানেই সাইনাইড খেয়ে আত্মবলি দেন।

১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী ক্যাম্পের বন্দীশালায় সিপাইসান্ত্রীরা নিরস্ত্র রাজবন্দীদের উপর হঠাৎ গুলী চালায়। সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেন নিহত হন।

এই সমস্ত ঘটনাবলী সেদিন সমস্ত দেশকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তুলেছিল। কুমিল্লার ঐ কিশোরীর দলও আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, তাঁরাও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। গুরুতর কোন বৈপ্লবিক কাজে আত্মোৎসর্গ করবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা দলের নেতাদের বার বার তাগিদ দিতে থাকেন। তখন কুমিল্লার যুগান্তর দল স্থির করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের প্রতীক কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলী করা হবে।

বর্তমানের বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ ১৯৩১সনে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন ক্রমান্বয়ে তিনদিন ধ'রে অবিরাম সাঁতার দেখাতে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের রাণীর দীঘিতে এই সাঁতারের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সের যোগদানের কথা ছিল। দলের নেতাদের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রফুল্লনলিনী প্রস্তুত হয়ে নির্ধারিত দিনে রাণীর দীঘিতে ষ্টিভেন্সকে গুলী করতে যান। কিন্তু ষ্টিভেন্স সেই সভায় উপস্থিত হলেন না। বিপ্লবী প্রফুল্লনলিনীর আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেল।

তার পর প্রফুল্লনলিনী ও শান্তি ঘোষ দু'জনে মিলে ক্রমাগত রাজনৈতিক দাদাদের পীড়াপীড়ি করতে থাকেন কিছু একটা বৈপ্লবিক কাজে তাঁদের পাঠাবার জন্য। দাদারা অনুমতি দিলেন। এবারে প্রথমে প্রফুল্লনলিনী এবং শান্তি ঘোষ দু'জনেই ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলী করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু পরে দলের নেতাগণ মনে করলেন যে, সকলেই যদি সামনে এগিয়ে যায় তা হলে প্রতিষ্ঠান রক্ষা হবে কি ক'রে? অথচ বৈপ্লবিক কাজে নিশ্চিতভাবে সফল হবার জন্য গুলী করতে দু'জনের যাওয়া প্রয়োজন। অতএব এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পুরাতন কর্মী হিসাবে প্রফুল্লনলিনী বাইরে থাকবেন এবং আত্মগোপন ক'রে কাজ করে যাবেন। শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী দু'জনে ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলী করতে যাবেন। প্রফুল্লনলিনী দলের নেতাদের আদেশ মেনে নিলেন।

প্রফুল্ল ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলী করবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে প্রস্তুত থাকলেও সেই কাজের গৌরব অর্জন করেন নাই। যুদ্ধের সময় নেতার আদেশ নতমস্তকে মেনে নিতে হয়, এই ডিসিপ্লিন তাঁরা শিখেছিলেন। যাঁরা পশ্চাতে থেকে শক্তি যোগান বিপ্লবের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকতে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু বিপ্লবের ধারাপথে এই সব নীরব কর্মীর দান কি কম?

১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে তাঁর বাংলোতে গিয়ে গুলী ক'রে নিহত করেন এবং তাঁরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন। পুলিস কিন্তু প্রফুল্লনলিনীকেও আর বাইরে থাকতে দেয় নি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ১৪ই ডিসেম্বর তারিখেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আত্মগোপন ক'রে কাজ করবার সুযোগও প্রফুল্ল আর পান নাই। পুলিস প্রথমে রাখে তাঁকে কুমিল্লা জেলে, পরে হিজলী জেলে। তিনি ছিলেন রাজবন্দী বা ডেটিনিউ। মহিলা রাজবন্দীদের জন্য সুরক্ষিত ছিল হিজলী মহিলা বন্দীনিবাস।

হিজলী জেলে ঢুকলেই সপ্রতিভ এই জীবন্ত মেয়ে প্রফুল্লনলিনী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বড় বড় চোখ দু'টো জল্‌ জল্‌ করছে, নাকটি সুতীক্ষ্ণ, যেন মাথা নীচু করতে জানে না। হাসলেই দাঁত কয়টি ঝক্‌ ঝক্‌ করছে। জেল-জীবনের প্রচণ্ড আঘাতগুলি তাঁকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় নি কোনদিন। তাঁর দৃপ্ত চোখের ভাষা যেন এই কথাই বলত, "ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।"

হিজলী জেলে গিয়ে কত স্বদেশী গানই তিনি গাইতেন। কুমিল্লায় সাহিত্যিক অজয় ভট্টাচার্য গান লিখ-

তেন, তাতে সুর বসাতেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। সেখানে অজয় ভট্টাচার্য নিজে সামনে ব'সে থেকে গান শেখাবার নির্দেশ দিতেন প্রফুল্লনলিনী, শান্তি ঘোষ ও তাঁদের কিশোরী বন্ধুদের। গান শিখতেন তাঁরা কংগ্রেস-নেত্রী হেমপ্রভা মজুমদারের বাড়ীতে।

জেলের ভিতরে গিয়ে বন্দী প্রফুল্লনলিনী গানের মধ্য দিয়েই যেন নিজের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা সার্থক করতে চাইতেন। গলা ছেড়ে গাইছেন তিনি অজয় ভট্টাচার্যের গান—

"জাগো হে সুপ্ত অগ্নিবীর
স্বর্গসীমায় ক্রন্দন ছায়
বন্দী ধরিত্রীর।
ঝঞ্চা জাগাও অগ্নিশ্বাসে
মৃত্যু মরুক আজ তরাসে
ভস্ম কর অত্যাচার
দশ শ' শতাব্দীর।"

মাঝে মাঝে খাদে নামিয়ে এনে গম্ভীর কণ্ঠে গাইতেন—

"শিকল দেবীর বোধন যেথা
মায়ের পূজা হয় না সেথা
চূর্ণ কর তুচ্ছ শিকল
উচ্চে রহুক শির।"

প্রফুল্ল আবার অজয় ভট্টাচার্যেরই গান ধরেছেন, যেন জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করতে করতে গাইছেন—

"জয়তু পতাকা জয়
... ... ...
নবারুণ রাগে জাগিয়া মানব
হেথায় রচিল সৃষ্টি মহান্
বিধাতা মানিবে এ নব বিধান
কে বলে ভারত শূন্য শ্মশান!"

শুধু অজয় ভট্টাচার্যের নয়, প্রফুল্ল গাইতেন রক্ত গরম-করা নজরুলের গান—

"ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর
প্রাচীর ভেদি।
কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার
পাষাণ বেদী।"

এমনি করে কত গানই গেয়ে যেতেন প্রফুল্লনলিনী। বছর খানেক পরে তাঁর বন্ধু শান্তি ঘোষকে নিয়ে আসে হিজলীতে। ষ্টিভেন্স হত্যার পর শান্তি তখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত। দুই বন্ধু প্রফুল্লনলিনী ও শান্তির মিলন হয়েছিল হিজলী জেলে ১৯৩৩ সনে বছর দুয়েকের জন্য। শান্তির উদাত্ত কণ্ঠের অফুরন্ত গানের ধারা হিজলী জেলের রাজবন্দিনীদের মাতিয়ে রেখেছিল। জেলখানা তখন গানের ঝরণায় মুখরিত।

দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিনী শান্তি ঘোষ ও বীণা দাসকে হিজলী মহিলা বন্দীনিবাসে প্রায় বছর দুয়েক রাখার পর অন্য জেলে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। হিজলী জেল রাজবন্দী মেয়েদের কাছে তখন নিঝুম হয়ে পড়ল। প্রফুল্লনলিনীরও শরীর ভাল থাকছিল না।

অবশেষে ১৯৩৬ সনে পুলিস প্রফুল্লকে কুমিল্লার কাকসার গ্রামে এবং পরে কুমিল্লা শহরে স্বগৃহে অন্তরীণ ক'রে রাখে। অন্তরীণ থাকাকালে তাঁর এ্যাপিণ্ডিসাইটিস হয়। স্থানীয় ডাক্তারগণ প্রথমে তাঁর রোগ ধরতে পারেন নি। রোগ যখন অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে তখন হয়ত অপারেশন করাবার সময়ও আর বিশেষ ছিল না। অসহনীয় উৎকণ্ঠায় তাঁর পিতা তাঁকে একবার কলকাতা নিয়ে যাবার জন্য আকুলভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু পুলিস চিকিৎসার শেষ চেষ্টার জন্যও প্রফুল্লনলিনীকে কলকাতা নিয়ে যাবার অনুমতি দিল না। বিনা চিকিৎসায় অস্ফুট মুকুলটি অকালে ঝ'রে গেল ১৯৩৭ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী।

প্রতিহিংসাপরায়ণ বিদেশী গবর্ণমেণ্ট শুধু যে তাঁকে অকালে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল তাই নয়, মৃত্যুর পর যাঁরা শ্মশানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন তাঁদের উপরও কম নির্যাতন করে নাই। এই ছিল পরাধীন ভারতের বীর সৈনিকদের পুরস্কার।

প্রফুল্লনলিনী একেবারে ওপারে গিয়েই চিরমুক্তি পেয়েছিলেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে মৃত্যু পর্যন্তও মুক্তি দিতে সাহস করে নাই।

সেদিন এ পৃথিবীর এক অজ্ঞাত পাখী বুঝি নন্দন-কাননে ব'সে গান গাইছিল:

"আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে
বাজিছে তারা
জানি হে জানি, তাও—
হয় নি হারা।"

# সহজাত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম আমিই আবিষ্কার করি ওকে।

হাড় জিরজিরে ক্ষয়া দেহ, পাঁশুটে রং, চোখ বা মুখের কোন শ্রীছাঁদ নাই। একটু জোরে চলতে গেলেই ট'লে পড়ে। গলার স্বরটি কিন্তু জোরালো। কাছে গেলেই তারস্বরে প্রতিবাদ করে। সদর-দরজার লাগাও যে চোর-কুঠুরিটা আছে—কয়লা, ঘুঁটে রাখার জন্য তৈরী হলেও ওটা আপাতত ছেঁড়া কাগজ, কাঁথা, মাদুর, কাঠের টুকরো, ফুটো কলসী, ভাঙা লোহা, প্রভৃতি অব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের জঞ্জালে ভর্ত্তি। ওই আবর্জ্জনার স্তূপে না জানি কোন্ ফাঁকে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন চলতে শিখেছে, তাই গোপন আশ্রয় থেকে মাঝে মাঝে বার হয়ে আসছে। আমায় দেখে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেল। আপন মনে খানিক গোঁ গোঁ শব্দ করল—তার পর অতি দ্রুত ওই আবর্জ্জনা স্তূপে গিয়ে ঢুকল।

কৌতূহলী হয়ে ওর পিছু পিছু গেলাম। গিয়ে দিখি, ছেঁড়া কাঁথার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ভীত অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আধ-ভেজানো দোরের দিকে—আর গর গর করছে। নিতান্তই আওয়ারা জীব! কবে কোথা থেকে কেমন করে এখানে এসেছে—কেউ জানে না।

ছেলেমেয়েরাও পিছু পিছু এসেছিল। আমাকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারতে দেখে ওরা জিজ্ঞাসা করল, কি বাবা?

বললাম, একখানা বাসি রুটি নিয়ে আয় দেখি।

বেড়াল বুঝি? দুধ-মাখা ভাত আনব? মেয়ে বলল।

ভাত হয়েছে? তবে তাই আন্।

ক'টা বাচ্চা হয়েছে? আমি একটা নেব বাবা। আমিও নেব। ওরা তিন ভাই-বোন এক সঙ্গে কলরব করে উঠল।

বললাম, মোটে একটা। বেড়ালের বাচ্চা নয়, কুকুরের।

কুকুর! ওদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

একজন তাড়াতাড়ি দুধ-মাখা ভাত নিয়ে এল। ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার ক'রে ভাতগুলি ঢেলে দিলাম। বাচ্চাটার গরগরানি থেমে গেল, ক্ষুধার্ত্ত চোখ দুটো জ্বল-জ্বল্ করে উঠল, কিন্তু শয্যা ছেড়ে এগিয়ে এল না।

ছেলেদের বললাম, সব চলে আয়। আমরা থাকলে ও খাবে না। দেখছিস নে—ভয় পেয়েছে!

আমরা স'রে এলাম।

দু'এক দিনেই ওর প্রাথমিক ভয়টা কিছু ভেঙে গেল। দেখা গেল বাচ্চাটা উঠোনে চলাফেরা করছে। কাছে গেলেই কিন্তু ফুরুৎ করে চোর-কুঠুরিতে আত্মগোপন করছে। ভয়টা যেন ভেঙেও ভাঙছে না।

মেয়ে বলল, নাম ধ'রে না ডাকলে ও বুঝতে পারবে না। ওর একটা নাম রাখ বাবা।

বললাম, তুই বল না ভেবে-চিন্তে কি নাম রাখা যায়?

ওর নাম থাক দুর্গা। একটুও না ভেবে মেয়ে উত্তর দিল।

ওর বড় ভাই রতন হেসে উঠল, ইস্—মেয়ের কি বুদ্ধি, কুকুরের নাম দুর্গা!

মেয়ে রুখে উঠল, তুমি জান ত ভারি! গরুর নাম যদি লক্ষ্মী দুর্গা হয়—কুকুরের নাম কেন—

ছেলে বলল, আর যদি মদ্দা বাচ্চা হয়?

তাহলে—তাহলে ওর নাম থাকবে কেলো।

ওরা সবাই হেসে উঠল।

কুকুরটা ভয় পেয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

দুধ-মাখা ভাত ওর সামনে রেখে স্ত্রী হেসে বললেন, ইস্—কাঁপছে দেখ! ভীতুর একশেষ! ওকে ভীতু ব'লে ডাকব।

বললাম, তাহলে বাইরের লোকের সাহস বেড়ে যাবে। বরং ওর নাম থাক ভিটু।

ও আবার কি বিটকেলে নাম?

গম্ভীরভাবে বললাম, বৈজ্ঞানিক নাম। এই যে অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমার এত নাম শুনছ আজকাল, ওদের বাপ-ঠাকুর্দা হ'ল গিয়ে ভি-টু। জার্ম্মেনী ওই অস্ত্রটি ছেড়ে ইংলণ্ডকে প্রায় ঘায়েল করে এনেছিল।

ছেলেরা হাততালি দিয়ে উঠল, বাঃ—বেশ নাম। ভিটু—ভিটু।

ইতিমধ্যে বাচ্চাটা দুধ-মাখা ভাত খাচ্ছিল। কোলাহলের শব্দে ছোট লেজটি পিছনের পায়ের তলায় গুটিয়ে পুনরায় দেয়ালের কোল ঘেঁসে দাঁড়াল। ভয়-ভয় চোখে চাইতে লাগল আমাদের পানে।

ছেলেরা ডাকল, আয়—আয়, কুর—কুর—কুর। ভিটু—ভিটু।

সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা-তালুর সংযোগে চুক্-চুক্ শব্দ তুলল।

সেটিও কোলাহল, কিন্তু সুরটার অর্থ আলাদা। বুঝতে পারল বাচ্চা। ওর দেওয়াল-ঘেঁষা ভঙ্গিটা সহজ হ'ল—ছোট্ট লেজটা পদাশ্রয় মুক্ত হয়ে অল্প অল্প কাঁপতে লাগল।

ছেলেরা উৎসাহিত হয়ে চুক্ চুক্ শব্দের ঐকতান তুলল।

লেজটা ঘন ঘন আন্দোলিত হতে লাগল। বেশ বোঝা গেল—নামটা ওর পছন্দ হয়েছে।

* * * *

বাড়াটার চারদিকে খাটো পাঁচিল, দক্ষিণদিকটা আবার ভাঙ্গা—খানিকটা অরক্ষিতই বলা যায়। অবশ্য এই বৈজ্ঞানিক যুগে চোরেদের পক্ষে পাঁচিল, কাঁটা-তারের বেড়া, লোহার গরাদে কিংবা মজবুত তালা কোনটাই বাধা নয়। পুরাতন দিনের সিঁদকাঠি সম্বল করে ওরা ত আর দুঃসাহসিক অভিযান করে না—রীতিমত আধুনিক হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে বা'র হয়। রাতের পৃথিবীতে ওদের করুণার উপর নির্ভর ক'রে আমাদের রাত শেষ হয়। ভিটুকে পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। ওই দুর্ব্বল প্রাণীটি অবশ্য চোর ঠেকাতে পারবে না, কিন্তু স্বভাবগত নিয়মে উচ্চকণ্ঠের দ্বারা গৃহস্থকে সজাগ করতে পারবে। সে বড় কম আশ্বাসের কথা নয়।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করবেন, তোমাদের মত স্বল্পবিত্তের ঘরে চুরি করার মত সম্পত্তি কি-ই বা আছে?

তার উত্তরে বলব, যাঁদের অনেক আছে তাঁরা ত নদী-গোত্রজ। নদী থেকে বিশ-পঞ্চাশ, এক'শ-দু'শ কলসী জল তুলে নিলেও কূলের কোলে দাগ পড়ে না, কিন্তু আমাদের জল থাকে কলসীতে। দু-চার গেলাস ঢাললেই তা শূন্যগর্ভ। অল্প ক্ষতিতে এবং অল্প শোকে আমরা অত্যধিক কাতর হই। হওয়া স্বাভাবিক। দ্রুত ক্ষয় পূরণের সামর্থ্য যে আমাদের নাই।

অতএব কুকুরটাকে পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি। রান্নাকের এক কোণে ছেঁড়া একখানি চট চার-ভাঁজ করে বিছিয়ে ছেলেরা দিব্য একটি শয্যা তৈরী করেছে। কয়েকখানা ইটের বেড় দিয়ে অস্থায়ী ঘরের চৌহদ্দিটা মোটামুটি খাড়া করেছে। নেহাৎ পাতের ফেলাছড়া ভাত দিয়েও ওরা সন্তুষ্ট নয়। হাঁড়ি থেকে আরও দু' মুঠো ভাত নিয়ে তার সঙ্গে সামান্য একটু দুধ—কখনও বা মাছের কাঁটা-চোকরা মিশিয়ে খেতে দিচ্ছে। আবার হিম নিবারণের জন্য ওর গায়ে একখানা চট চাপিয়ে দিতেও ভুলছে না। এমনি পরিচর্য্যা চলছে ভিটুর।

কিন্তু শ্বা স্বভাবে এই আরাম শয্যাটা তেমন উপভোগ্য নয় হয়ত। সকালে উঠে দেখি চটগুলো এক ধারে এলোমেলো গুটানো রয়েছে—খালি মেঝের উপর চারটি পায়ের সঙ্গে লেজ ও মুখ এক ক'রে কুণ্ডলীকৃত ভিটু পরম আরামেই নিদ্রা যাচ্ছে। সারারাত্রি ছুটোছুটি ও চীৎকার করে বাড়ী পাহারা দিয়েছে হয়ত।

ছেলে বলে, বাবা, কুকুর খুব প্রভুভক্ত জীব, নয়?

মেয়ে বলে, গল্প পড় নি? আমাদের পাঠ্য বইয়ে কত গল্প আছে।

বললাম, কুকুর মানুষের অনেক উপকার করে। দরকারী চিঠিপত্র নিয়ে যায়, চোর ডাকাত খুনীদের ধরতে সাহায্য করে, বরফের দেশে—বরফ চাপা-পড়া মানুষকে বাঁচায়।

গল্প বল না বাবা?

দেশের এবং বিদেশের গল্প বলতে হয়। ওরা শোনে আর সেই সব অমিত কীর্ত্তিমান সারমেয় পুঙ্গবদের জায়গায় আমাদের ভিটুকে বসায়। বলে, শিখিয়ে দিলে আমাদের ভিটুও সেই চাষীর কুকুরটার মত অন্ধকার রাতে লণ্ঠন মুখে করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। পারবে না বাবা?

মেয়ে বলে, আর ছোট দাদুর কুকুরটার মত সাপ মারতে পারবে?

ছেলে বলে, নিশ্চয় পারবে।

সেই গল্পটি আর একবার বল না বাবা।

বলি, সে ত গল্প নয় রে—সত্যি ঘটনা। তখন আমরা দেশে থাকতাম। ইস্কুলে পড়ছি। সেই সময়ে ভুলি ব'লে একটা দেশী কুকুর ছিল আমাদের। কাকা পুষেছিলেন। ভারি শিকারী তেজী কুকুর ছিল সে। তার প্রতাপে কুকুর, শেয়াল, বেড়াল, সাপ কিছুই আসতে পারত না বাড়ীর ত্রিসীমানায়। কত যে সাপ মেরেছিল কুকুরটা তার ইয়ত্তা নাই। একবার গ্রীষ্মকালে হ'ল কি—আমরা দাওয়ায় শুয়ে আছি—ঘরে দুয়োর-জানালা সব খোলা। ভুলি পাহারায় রয়েছে—চোর-ছ্যাচড়ের

সাধ্য কি বাড়ীতে ঢোকে। এমন সময় পিছনের জানালা দিয়ে ইঁদুর ধরতে ঘরে ঢুকেছে সাপ। কুকুরটা তা লক্ষ্য করেছে। সঙ্গে সঙ্গে জানালা গলিয়ে ও-ও ঘরে ঢুকেছে। দুয়োর দিয়ে অবশ্য ঢুকতে পারত, কিন্তু দুয়োর জুড়ে আমরা সার সার শুয়ে রয়েছি দাওয়ায়। আমাদের গায়ের উপর দিয়ে না গেলে ঘরে ঢোকার উপায় নেই। যাই হোক, জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে সাপটাকে ধরেছে। ধরার সময় হয়ত সামান্য হুটোপুটি হয়েছিল। সেই শব্দে কাকার ঘুম ভেঙে গেছে। কাকা 'হেই' ব'লে লাঠিটা একবার দাওয়ার মেঝেয় ঠুকেই জানালা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছেন। তখন সাপটাকে মুখে ক'রে জানালা গলিয়ে বাইরে আসছিল ভুলি। লাঠিটা এসে ওর পায়ে লেগেছে, তবু ও সাপাটাকে ছাড়ে নি। সেটাকে মুখে করে সোজা উঠোনে নেমেছে। পরের দিন সকালে উঠে কাকা নিজের ভুল বুঝতে পেরে হায় হায় করে উঠলেন। সে সময়ে লাঠিটা যদি ছুঁড়ে না মারতেন তাহলে এমন দুর্ঘটনা হ'ত না। সকালে দেখা গেল, সাপটা মরে পড়ে আছে উঠোনে—তার পাশে ভুলিও পড়ে আছে। পুত্রশোকে মানুষ তেমন করে কাঁদে না—যেমন সেদিন হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন কাকা।

কেমন করে কুকুরটি মরল বাবা? লাঠি খেয়ে?

না রে। ওই যে সাপটাকে মুখে করে জানালা দিয়ে বাইরে আসছিল—সেই সময়ে লাঠির ঘা খেয়ে একটু অসাবধান হয়েছিল ভুলি। সেই সুযোগে সাপটা ওকে কামড়ে দিয়েছিল হয়ত। কিংবা সাপটাকে পুরোপুরি কায়দা করতে পারে নি।

গল্প শুনে ছেলেরা মুষড়ে পড়ে। ভিটুর উপর ওদের স্নেহের মাত্রাটা বেড়ে যায়। বলে ভিটুকে আমরা কখনও মারব না বাবা। ও ঠিক ভুলির মত হবে—দেখবে।

* * *

ভিটু ক্রমে বড় হয়ে উঠল। দেখতে সুন্দর হ'ল, পরাক্রম বাড়ল। আর বাড়ল চাঞ্চল্য। সর্ব্বদাই ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে—একটু শব্দ হলেই চীৎকার। বাড়ীতে অন্য কুকুর ত দূরের কথা, কাক চিল বসবার যো নাই। ছেলেরা ওকে নিয়ে খেলা করে। ভিটু না হলে ওদের হুটোপুটি লাফঝাঁপ জমে না।

গৃহিণী বলেন, কুকুরটা ভারি আস্ত্রী সো, আর চালাকও। এমন কথা বুঝতে পারে। আর জন্মে নিশ্চয় মানুষ ছিল।

হেসে বলি আর জন্মে নয়—জন্ম জন্মান্তর থেকে ওরা মানুষের সঙ্গী—বন্ধু। পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রথম যে প্রাণীকে মানুষ সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিল—সে ওই কুকুর। মানুষের সঙ্গই ওদের সবচেয়ে প্রিয়। হাজার হাজার বছর মানুষের সঙ্গে থেকে তার হাবভাব, চালচলন, কর্ম্মপ্রকৃতি, কথার সুর ওরা জেনে নিয়েছে। মানুষের আদর, অবহেলা, শাসন, ঘৃণা, ইঙ্গিত, ইসারা চট্ করে ধরতে পারে ওরা। ভাব এখানে ভাষার অভাব পূরণ করেছে। দেখনি—জিভে তালুতে চুক্ চুক্ শব্দ তুলে—'আয় তু' ব'লে ডাকলে ওরা ছুটে আসে, খুব আস্তে 'হেই' বললে দূরে স'রে যায়।

গৃহিণী হেসে বললে, এই সুরু হ'ল মাস্টারী।

ওটা আমাদের প্রকৃতিগত বিদ্যা। নিজেদের বয়স বাড়লে কম বয়সীদের দেখে মনে হয়—আহা এরা কিছুই জানে না। কিছু জ্ঞান বিতরণ করি।

গৃহিণী বললেন, আপাততঃ আমায় কিছু বুদ্ধি বিতরণ কর দেখি। পুজোর ছুটিতে যদি কাশী যাই, ভিটুর ব্যবস্থা কি হবে?

সে আর শক্ত কি? মনার মা-কে বলব চাট্টি চাট্টি ভাত ওকে দিয়ে যাবে। দিন দশেকের মামলা বৈ ত না।

মনার মা গরীব মানুষ। ওকে কিন্তু চাল কিনে দিও।

নিশ্চয় দেব। আর দশ দিনের মাইনেও কাটব না—যদিও এই ক'দিন বাসন মাজার পরিশ্রম ওর থাকবে না।

···সেই মত ব্যবস্থা করে কাশী যাত্রা করলাম।

কাশীতে বেড়াতে যাইনি। আমার এক কাকা স্ত্রী-পুত্র মারা যাওয়ার পর কাশীবাসী হয়েছিলেন। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল—উনি কাশীবাস করছেন। ইচ্ছা ওইখানেই দেহ রেখে শিবত্বলাভ করবেন। পত্র এসেছে, ওঁর জীবন-সঙ্কট পীড়া।

প্রথমে স্থির হয়েছিল—আমি একাই যাব।

স্ত্রী আপত্তি তুললেন, তা কেন—দুদিন পরেই ত পুজোর ছুটি পড়ছে—আমরা সবাই যাব।

খরচের দোহাই পেড়েও ওঁকে নিবৃত্ত করা যায় নি। ছেলেরাও আব্দার ধরল যাবার। কাশীতে কত দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, দুর্গাবাড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ আশ্রম, সারনাথ, নতুন বিড়লা মন্দির···ওরাই বা ছাড়বে কেন!

বেশ আনন্দেই কাটল ক'টা দিন।

একটু সুস্থ হলে কাকা বললেন, আমিও ফিরব তোদের সঙ্গে।

সে কি!

হাঁ। অনেক দিন হয়ে গেল—বাংলায় যাই নি। দেশে যাবার ভারি ইচ্ছে করছে। ভয় কিরে—মরি ত সেইখানেই স্বর্গলাভ হবে। কাকা হেসে বললেন।

ওরে—সেই দেশ কি কাশীর চেয়ে কম রে? সেই বাড়ীখানি—যেখানে আমার ছেলেবেলা—আর জীবনের অর্দ্ধেকেরও বেশী সময় কেটেছে। সেই ঘরে যদি মরি—কাশী প্রাপ্তিই হবে।

কাকাকে নিয়ে ফিরলাম।

দেশে এসে উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেলেন।

স্ত্রী বললেন, যার যেখানে কেনা মাটি—দূরে থাকবার যো কি?

কাকার শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে কলকাতায় এলাম প্রায় এক মাস পরে।

* * * *

বাসায় এসে দেখি ভিটু নাই। মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কুকুরটা গেল কোথায়? মরে গেল নাকি?

মনার মায়ের মুখে শুনলাম, কুকুরটা পাশের বাড়ীতে আছে।

কেন—ও কি খেতে পায় নি?

জেরায় স্বীকার করল মনার মা মাত্র এক সপ্তাহ ও ভাত রেঁধে দিতে পারে নি। ওর দেওর-ঝির শক্ত অসুখ হওয়াতে ও দেশের বাড়ীতে গিয়েছিল। কি করবে না গিয়ে! আত্মীয়স্বজনের বিপদে আত্মীয়জন যদি না যায়, তবে আর আপনজন কিসের।

আমি ওর কৈফিয়তে কান দিই নি, ভাবছিলাম অন্য কথা। জানি, কুকুররা এক জায়গায় থাকতে পারে না। ভিটুও সারাদিন বাড়ীর মধ্যে থাকত না। গলির আশে-পাশে ঘুরত, এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাওয়া-আসা করত। সারাদিন—সন্ধ্যা থেকে রাত এক প্রহর পর্য্যন্ত হয়ত ওর কোন পাত্তা নেই, কিন্তু ভোর বেলায় উঠে দেখতাম রোয়াকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আরও জানি, যেখানে মানুষের সাড়া-শব্দ নেই—সে জায়গাও ওরা পছন্দ করে না। প্রায় এক মাসকাল আমরা বাড়ী ছিলাম না—তাই হয়ত অন্যত্র গেছে।

যাই হোক, ছেলেরা তার স্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে, ভিটু, ভিটু।

ডাকটা কানে পৌছল বোধ করি। ভিটু এসে দাঁড়াল, এবং ধীরে ধীরে লেজও নাড়তে লাগল। কিন্তু পরিচিত ডাক শুনে যেমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে—লেজ নেড়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে গায়ে উঠে আদর জানাতে চায়—তেমন উদ্দাম হয়ে ত উঠল না। এসেছে বটে, কেমন উদাসীন ভাব। লেজ নাড়ছে বটে, সমস্ত মন-প্রাণ এক করে আনন্দ জানাচ্ছে না। কেন এমন হ'ল?

ছেলেরাও এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করল। বলল, বাবা, কুকুরটার অসুখ করেছে।

ভাবলাম—হবেও বা, আমাদের অদর্শনে কুকুরটা মন-মরা হয়ে গেছে।

কিন্তু অসুখ নয়। একটু বাদে দেখি, আর একটি কুকুর উঁকি মারছে সদর দরজায়। চোখ পড়তেই ভিটুর কান খাড়া হয়ে উঠল—সর্ব্বদেহে যেন তড়িৎ সঞ্চার হ'ল। অস্ফুট একটা আনন্দ-ধ্বনি করতে করতে ছুটে বা'র হয়ে গেল।

মাত্র চারটি সপ্তাহে এ কি ব্যতিক্রম স্বভাবের!

* * * *

গৃহিণীকে বললাম, মাত্র চার সপ্তাহে কুকুরটা বদলে গেছে, দেখেছ?

গৃহিণী মৃদু হেসে বললেন, সময়কালে মানুষের স্বভাবও বদলে যায় অমনি।

কি করে?

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। ভিটু আর একলা নেই, সঙ্গী জুটেছে। দুপুরবেলায় ভাত দিয়েছিলাম, ও নিজে খেলে না। সঙ্গীটা ম্যাক্ ম্যাক্ করে গিলতে লাগল ও চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু বলল না?

কেন বলবে! হাসলেন গৃহিণী। মেয়ে সঙ্গী যে। মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করলে নিন্দে হয় না পুরুষের?

বুঝলাম, ভিটুর পৃথিবীতে নতুন ঋতুর আবির্ভাব হয়েছে। নব অনুরাগের কাজল ও দু-চোখে টেনে দিয়েছেন সৃষ্টি-রূপিণী প্রকৃতি। প্রভুভক্তির রংটা এখন স্বভাবতঃই ফিকে। অনুরাগের মত্ততা না কাটলে ও পূর্ব্ব স্বভাবে ফিরে আসবে না।

* * * *

কিন্তু তাই বা হ'ল কই! সে আশাও যে মিথ্যা হয়ে গেল।

শীত পড়ল জাঁকিয়ে ওদের বসন্তকাল শেষ হ'ল—ভিটু আমাদের বাড়ীতে ফিরল না।

কেন ফিরল না? প্রায় মাসখানেকের অদর্শন, তার মধ্যে কি এমন অনাদর ছিল যা শ্বা-বৃত্তিকে স্পর্শ করল।

কিংবা রোদ জল হিম বাঁচানো একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় মূল্যে পূর্ব-প্রভুদের ভুলে গেল? ওরা ত নিমকহারাম নয়—

গৃহিণী বললেন, যাই বল কুকুরটা নিমকহারাম। এত আদর-যত্ন সব ভুলে গেল। আসে বটে সকালে-দুপুরে—সে শুধু খাবার তালে।

উনি যত বিরূপই হন—পাত কুড়োনো ভাত ও মাছের কাঁটা সযত্নে তুলে রাখেন বাটিতে। খাওয়া হলে ডাকেন—মৃদু কণ্ঠে। ভাত খেয়েই কিন্তু দে দৌড়। যতক্ষণ খাওয়া না হয়—অপেক্ষা করে। খাওয়া শেষ হলে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ায় না।

গৃহিণী বলেন, নিমকহারাম—নিমকহারাম। কুকুর যে এমন হয়—এই প্রথম দেখলাম। আমাদের বাড়ীতে খাবে, পাহারা দেবে অন্যের বাড়ী। ছি—ছি।

একটি আশ্চর্য্য জিনিস লক্ষ্য করলাম একদিন।

সেদিন যথারীতি আহারের চেষ্টায় বাড়ীতে ঢুকছিল ভিটু, আমি সামনে পড়াতে থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে কি এই প্রীতি-প্রকাশ?

তিরস্কারের সুরে বললাম, খুব হয়েছে—আর আদর জানাতে হবে না। বেইমান—নিমকহারাম কোথাকার।

জানি না আমার স্বরে কি পরিমাণ তিক্ততা মেশান ছিল—মুহূর্ত্তে ওর লেজ নাড়া বন্ধ হয়ে গেল। একটুখানি থমকে দাঁড়াল ও, তার পর বাড়ীর মধ্যে ঢুকল না··· মাথা নামিয়ে বার হয়ে গেল।

স্ত্রীকে বললাম, দেখলে ত...মানুষের মত ওদেরও বোধশক্তি কেমন সজাগ?

স্ত্রী বললেন, আহা···বেচারাকে তাড়ালে ত? এখন কাঁটা-মাখা ভাতকটি কাকে দিই বল ত?

যথেষ্ট কাক রয়েছে···ভাত খাবার প্রাণীর অভাব কি? গৃহিণী ভাতক'টি বাটি ঢাকা দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন।

* * *

বেশ কিছুদিন কাটল।

কুকুরটার কথা এখন তেমন মনেই ওঠে না। চার পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত ওটা সহজ হয়ে এসেছে। তবু মেঘ করলে যেমন আকাশের পানে দৃষ্টি পড়ে, ঝড় উঠলে যেমন গাছপালায় তার রূপটিকে প্রত্যক্ষ করি··· তেমনি কুকুরটার আচরণ মাঝে মাঝে মনে খোঁচা দেয়। ভাবি হাজার হাজার বছর মানুষের সঙ্গ লাভ করে ওরাও বুঝি মানুষের কতকগুলি বৃত্তিকে স্বভাবগত করে নিয়েছে! সম্পদের সুখাসনে আসীন হয়ে দুঃখ বাদলের দুর্য্যোগভরা দিনগুলিকে ভুলে যাওয়া তার মধ্যে একটি। ভুলে যাওয়াটাই স্বভাবধর্ম্ম, হয় ত বা জীবনধর্ম্ম। নানা প্রকারের আঘাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এ এক সহজ উপায়।

যাক্, একটি একটি ক'রে সাতটি বছর কাটল। ভিটুকে প্রায় ভুললাম। ভুললাম মানে ··ও যে একদিন আমাদের অন্তরঙ্গ আশা ও আকাঙ্ক্ষায় অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে ছিল—সেই বোধটুকু আর রইল না।

তবু···গোপনচারী বৃত্তিরা দীর্ঘকালেও নিষ্ক্রিয় হয় না। মাঝে মাঝে দু'একটি ঘটনায় তা বুঝতে পারি। তখন ভারি উৎপাত সুরু হয় মনে।

একবার গলির মোড়ে ক'টা মরা ইঁদুর কারা যেন ফেলে গিয়েছিল। এই পাড়ার কয়েকটি কুকুর তা খেয়ে মারা যায়। অমনি হৃদপিণ্ডটা ধ্বক্ করে উঠ্‌ল। ভিটু ওই বিষাক্ত ইঁদুর খায় নি ত? পাশের বাড়ীতে উঁকি মেরে দেখি···শীতের রোদে সর্ব্বাঙ্গ মেলে দিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে ভিটু। বুক হাল্কা করে ভারী নিঃশ্বাসটা বার হয়ে গেল। যাক্, বাঁচলাম।

আর এক দিন দেখি···পথ দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কুকুর-ধরা গাড়ী যাচ্ছে। লাঠি হাতে দু'টো যমদূতাকৃতি লোক চলেছে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে। গাড়ীর মধ্যে কয়েকটা কুকুর। শিকের ফাঁকে ওদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত চেহারা আর অসহায় জুল্‌জুলে দৃষ্টি দেখে বুকটা কেঁপে উঠল। ভিটু পথে বার হয় নি ত? বকলসহীন বেওয়ারিশ কুকুরগুলিই ত ওদের লক্ষ্য। হে ভগবান্, ভিটু যেন এ সময়ে পথে বার না হয়, গাড়ী চ'লে গেলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কোনদিন বা অপর কুকুরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ ভিটুকে বাঁচাতে ওর প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইঁট ছুঁড়ে মেরেছি, কেন এই পক্ষপাতিত্ব? নিম্নমুখী নদীস্রোতের মতই মনের গতি বুঝি। স্নেহ-সুধাসিক্ত মন।

আর একদিন ধাক্কা খেলাম প্রচণ্ডভাবে·· বড়ছেলে যেদিন খবর দিল, বাবা, ভিটু আর বাঁচবে না।

সে কি রে···কেমন করে বুঝলি?

অজয়দের বাড়ীতে শুয়ে আছে ··নড়তে পারছে না, ওরা দুধ দিয়েছে···পাঁউরুটি দিয়েছে, খায় নি।

শুনে স্ত্রী বললেন, আহা—তাই ক'দিন দুপুর বেলায় আসছে না। রোজ ভাত রাখি—কাকে খেয়ে যায়। ক্ষমতা নেই—আসবে কেমন করে।

অথচ আশ্চর্য্য সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ওকে দেখলাম··· আমাদের ঘরের রোয়াকে আশ্রয় নিয়েছে। যেখানে

ইটের সীমানা ঘিরে, চট বিছিয়ে ছেলেরা ওর রাতের আশ্রয় তৈরি করে দিয়েছিল—ঠিক সেইখানটিতেই এসে শুয়েছে। লোম-ওঠা শীর্ণ দেহ, পাঁজরার হাড়গুলো ঠেলে উঠেছে, মুখখানা ফুলো-ফুলো। চোখে উদাস দৃষ্টি। এই পৃথিবীর আলো, রূপ, ধ্বনি, গন্ধ কিছুই বুঝি ওর চেতন-শক্তিকে উদ্দীপ্ত করতে পারছে না। ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

ডাকলাম, ভিটু।

ছেলেরা ডাকল, ভিটু—ভিটু।

মাথা তুলল না, লেজের ডগাটা সামান্য কেঁপে উঠল। শক্তি নাই, বোধশক্তিটুকু সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়নি।

বললাম, ভাল ঝঞ্ঝাট—সাত আট বছর পরে এই-খানেই মরতে এল কুকুরটা!

আমার বিরক্তি-মেশানো খেদোক্তি কি ওর কানে পৌঁছল?

*　*　*

ভোরবেলায় উঠে দেখি ভিটু নাই। আশ্চর্য্য, অমন মুমূর্ষু চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় গেল কোথায়?

ছেলেদের বললাম, দেখতো রে অজয়দের বাড়ী গেল কি না?

না—অজয়দের বাড়ীতে যায় নি। আশেপাশের কোন বাড়ীতেই না। এ পথ, সে পথ, মাঠ, গলি, ঘরের আনাচ-কানাচ—তন্ন তন্ন করে খুঁজলে ওরা। ভিটু কোথাও নাই।

পুরো একটা দিন কাটল—ভিটুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

সন্ধান মিলল তার পরের দিন বেলা এগারোটায়। নর্দ্দমা সাফ করতে এসে জমাদার বলল, বাবু, ঘরে একটা কুকুর মরে আছে। ঝাড়ু নিতে গিয়ে দেখলাম।

সেই ছোট ঘরখানির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

দেখি ছেঁড়া কাঁথার উপর সাদাকালোয় চিত্রিত মাথাটি রেখে শুয়ে আছে ভিটু। যেন ঘুমুচ্ছে আরাম করে। মৃত্যু আসন্ন বুঝে আর পরাশ্রয়ে থাকতে পারে নি—ফিরে এসেছে আপন আশ্রয়ে—বাল্য কৈশোরের আশ্রয়ে। ঐখানেই ওকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম।

গৃহিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আহা—কেনা জায়গা!

তাই বটে। হাজার বছর মানুষের পাশে পাশে ছায়ার মত অনুসরণ করে—মানুষেরই একটি প্রবল মনোবৃত্তি কি আশ্চর্য্যভাবেই না শ্বা-প্রকৃতি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সেই বৃত্তিই ভিটুকে নিমকহারামীর অপকলঙ্ক থেকে মুক্তি দিতে পারল আজ।

# ডবল আত্মহত্যা

- পরিমল গোস্বামী -
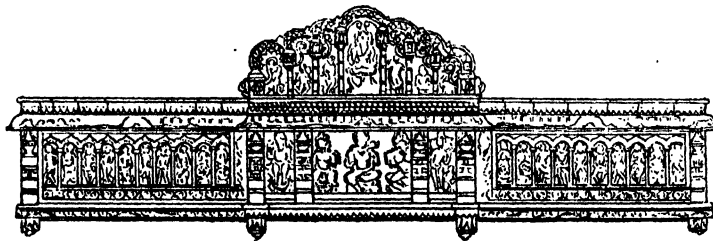
ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সম্প্রতি একটি অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করে নিষ্কর্মা অবস্থায় ছিল। অবশ্য নিষ্কর্মা অবস্থায় সে বেশি দিন থাকে না। বড় জোর দিন সাতেক। এই কর্মহীন কয়েকটা দিন সে যে মাঝে মাঝে পায় এটাকে সে সৌভাগ্য বলেই মনে করে।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে ব্রজবিলাস এক মহিলার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী সন্ধানের ভার নিয়ে যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল, তা ডিটেকটিভ জগতে দুর্লভ। সে বহুকালের বাল্যবিবাহজাত নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে খুঁজে পেয়েছিল। অনেক প্রমাণসহ সে আবিষ্কার করেছিল যে সে নিজেই সেই নিরুদ্দিষ্ট স্বামী। এর জন্য স্ত্রীর যাবতীয় সম্পত্তি সে পেয়ে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই ফিরে-পাওয়া স্ত্রী তার মারা গেছে কয়েক বছর হ'ল।

ব্রজবিলাস বিয়ে করবে না বলেই পণ করেছিল ডিটেকটিভ জীবনের গোড়ায়। মনের জোর তার আগে অবশ্য খুব ছিল না, কিন্তু ক্রমে খুব বেড়ে গেছে। অথচ ভাগ্যের পরিহাস স্ত্রী তার জুটে গেল দৈববশত। তার শ্বশুরের সঙ্গে তার বাবার দেনাপাওনা নিয়ে কিছু গোলমাল হয়, তার জন্য দু'বছরের শিশুবধূকে তার বাবা আর বাড়ীতে আনেন নি এবং নিজের মৃত্যু হওয়াতে চার বছর বয়স্ক পুত্র ব্রজবিলাসকে এ খবরটা জানাবার কোন সুযোগ পান নি, কিংবা কোন দিন জানাবেন না বলেই মনে মনে ঠিক করেছিলেন।

ব্রজবিলাসের সহকারী শম্ভু, সে একটি মেয়ের অপহৃত অলঙ্কার উদ্ধারের কাজে নেমে অবিমৃষ্যকারিতাবশত তাকে বিয়ে করে বসেছিল, সৌভাগ্যবশত তার স্ত্রীও মারা গেছে। দু'টি মৃত্যুই সৌভাগ্যসূচক এ জন্য যে, ডিটেকটিভের কাজে দীক্ষা নিলে স্ত্রী থাকলে চলে না, বিশেষ করে প্রাইভেট ডিটেকটিভের। তবে দুর্ভাগ্য শুধু এইটুকু যে, এরা দু'জন বিখ্যাত লোক অথচ স্ত্রীহীন তাই ঘটকের আক্রমণ এদের জীবন থেকে শান্তি হরণ করেছে। আর, ঠিক এই জন্যই এরা ছুটি পেলে নিজেদের বাড়িতে থাকতে পারে না, বাইরে চলে যায়।

বর্তমানে এমনি অবস্থায় ব্রজবিলাস ও শম্ভু পুরীর একটি হোটেলে কয়েক দিনের ছুটি উপভোগ করছিল।

শরতের সকালবেলার প্রসন্ন রোদের সঙ্গে সমুদ্রের মৃদু গর্জন মিশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, পৃথিবীতে চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, জাল, জোচ্চোরি প্রভৃতি অপরাধ যে আছে সে কথা আপাতত তাদের মনেই পড়ছে না।

কিন্তু মনে পড়তে বেশি দেরি হ'ল না। ব্রজবিলাস তার প্রিয় পানীয়ে প্রথম চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করল। এ কি দিয়েছে খেতে? বিখ্যাত 'ভারত মলটেড মিল্ক' ভিন্ন অন্য কোন পানীয় সে খাবে না নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, তবু তা দেয় নি কেন ওরা?

হৈ হৈ কাণ্ড। হোটেলের ম্যানেজার বিব্রত, ব্যস্ত এবং ত্রস্ত। তিনি সন্ধান নিয়ে দেখলেন ঠিক জিনিসই দেওয়া হয়েছে। বোতল এনে দেখালেন। কিন্তু ব্রজবিলাসের সন্দেহ ঘুচল না। সে বলল, 'একেবারে খোলা হয় নি এমন বোতল দেখতে চাই।"

তাই আনা হ'ল। এক ডজন কেনা হয়েছিল সম্প্রতি —তারই একটি ব্রজবিলাস নিজে খুলে নিজে তৈরি করে খেয়ে আবার মুখ বিকৃত করল। বলল, "এ জিনিস আসল নয়।"

ঠিক সেই মুহূর্তে কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল। ব্রজবিলাসকে জরুরি দরকার।

ব্রজবিলাস টেলিফোন ধরে জানতে পারল এক ধনী ব্যবসায়ী তাকে ডাকছেন। তিনি এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

ব্যাপারটি অত্যন্ত সংক্ষেপে যা শোনা গেছে তা হচ্ছে এই যে, একটি অজ্ঞাত লোক নিজেকে একজন বড় কমিশন এজেন্ট রূপে নিজের পরিচয় দিয়ে তার কাছে প্রায় এক লক্ষ টাকার নকল 'ভারত মলটেড মিল্ক' বিক্রি করে গেছে।

অতএব ব্রজবিলাস ও শম্ভুকে ফিরে আসতে হ'ল পর দিনই। ছুটি দু'টি দিনও ভোগ করা চলল না।

ব্রজবিলাস কলকাতায় এসে যা জানতে পারল তা হচ্ছে এই—

মল্লিক, দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানির অধিক্রম মল্লিক ভারত মলটেড মিল্কের অন্যতম প্রধান এজেন্ট। ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক হচ্ছেন রামমনোহর শেঠ। তিনি মল্লিক, দত্ত অ্যাণ্ড কম্পানিকে একেবারে দশ হাজার বোতলের বেশি বেচেন না। তাঁর আরও এজেন্ট আছে, এবং প্রত্যেকের বরাদ্দ ঠিক করা আছে। এবং এই মলটেড মিল্কের এমন সুনাম, ভারতে ও ভারতের বাহিরে এর এত প্রচার যে, যত পরিমাণ মালই কেনা হোক বিক্রি সুনিশ্চিত। তাই এই মলটেড মিল্কে টাকা ঢালতে কোন এজেন্টেরই কার্পণ্য নেই।

একদিন একটি লোক অধিক্রম মল্লিকের কাছে এসে প্রস্তাব করল যে, ভারত মলটেড মিল্কের তিনজন এজেন্ট তাঁদের বরাদ্দ এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছেন, তাঁদের সেই বরাদ্দ অর্থাৎ তিনজনের মোট ৩০ হাজার বোতল মলটেড মিল্ক অধিক্রম মল্লিক ইচ্ছা করলে কিনতে পারেন। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, কেননা প্রচার হলে ঐ তিনজন এজেন্টের সঙ্গে শেঠ আর ভবিষ্যতে কোনো কারবার করবেন না, ফলে তাঁদের এজেন্সি নষ্ট হয়ে যাবে। অধিক্রম মল্লিক যদি এই মাল কিনতে চান তাহলে তিনি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন।

অধিক্রম মল্লিকের কাছে এ প্রস্তাব শুধু লোভনীয় নয়, একেবারে আশাতীত। এত বড় একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ তিনি ছাড়তে পারেন না। অতএব তিনি ঐ তিনজন এজেন্টের সমস্ত মাল—মানে ৩০ হাজার বোতল একদিনে কিনে ফেললেন। শোভাবাজারে অবস্থিত তাঁর নিজস্ব গুদামে উপস্থিত থেকে তিনি মাল ডেলিভারি নিলেন, এবং সেইখানে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিলেন। উপরন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এ প্রতিশ্রুতি তাঁর নিজের স্বার্থেও দরকার ছিল।

এই ৩০ হাজার বোতল প্রায় সবই বাজারে ছাড়া হয়েছে। এত চাহিদা যে, ঘরে ষ্টক বেশি দিন থাকে না, পরিমাণ যাই হোক। কিন্তু গত দশ-পনেরো দিন ধ'রে প্রত্যেক জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে এ জিনিস খারাপ, মানুষের অখাদ্য। অনেকেই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অনেকে ভয় দেখাচ্ছে পুলিসে খবর দেবে ব'লে। ক'দিন আগে অধিক্রম মল্লিক একটা বোতল রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়েছেন, তাতে বোঝা গেছে এর কোনো এক বা একাধিক উপাদান এতই খারাপ যে, এ মলটেড মিল্ক সবই নষ্ট ক'রে ফেলা উচিত।

অধিক্রম মল্লিকের সামনে ব'সে ব্রজবিলাস সব শুনছিল মনোযোগ দিয়ে।

"শেঠ কি বলে

"তাঁকে কিছুই বলা হয় নি। তাঁকে বলা মানে, আর এক জটিলতা বাড়ানো। শুনলেই চটে যাবেন।"

ব্রজবিলাস কয়েক মিনিট চোখ বুজে চিন্তা ক'রে বলল, "বেশ আমি এ কেস্ হাতে নিচ্ছি। আমাকে তিন দিন সময় দিতে হবে। আমি নিজে ভারত মলটেড মিল্কের ভক্ত, কাজেই আমার এ বিষয়ে অতিরিক্ত একটা ইন্টারেস্ট আছে।"

"মাত্র তিন দিন!—এ তো একেবারে আশাতীত। যত শীগ্‌গির হয় ততই আমি দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচব।" ব'লে তিনি ব্রজবিলাসের হাতে একখানা মোটা অঙ্কের চেক্ তুলে দিলেন। ব্রজবিলাস তা পকেটস্থ ক'রে উঠে পড়ল।

ব্রজবিলাস ও শম্ভু পথে চলেছে, পায়ে হেঁটে। এভাবে চললে পথে অনেক কিছু দেখা যায়। তা ভিন্ন দিনরাত গাড়িতে চ'লে চ'লে মাঝে মাঝে পায়ে-হাঁটা ব্রজবিলাসের একটা বিলাস।

তখন সন্ধ্যা। পথে আলো জ্বলছে একে একে। ব্রজবিলাস শম্ভুকে বলল, "চল, গঙ্গার ধারে গিয়ে কিছুক্ষণ বসা যাক। শেষ বর্ষার বৃষ্টিহীন গুমোটে ঘরে ফিরতে ইচ্ছা হচ্ছে না।"

শম্ভু বলল, "এটি শরৎ কাল।"

ব্রজবিলাস বলল, "বর্ষাকালেরই শেষ দিকের অংশকে শরৎ কাল বলা হয়।"

ওরা চিৎপুর রোডের কাছাকাছি জায়গায় ছিল এতক্ষণ, তাই গঙ্গার ধারে যাওয়ার ইচ্ছা।—বেশি দূর নয়।

ওরা গলি দিয়ে চলছিল। এমন সময় একটি পিস্তলের গুলি ব্রজবিলাসের পিঠে এসে লাগল। ফিরে দেখতে পেল আততায়ী গুলি ক'রেই ছুটে আর একটা সরু গলিতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শম্ভু জিজ্ঞাসা করল, "কি মনে হয়?"

ব্রজবিলাস বলল, "শত্রুপক্ষ ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছে। কিন্তু শম্ভু, তুমি পরীক্ষা ক'রে দেখ তো গুলিটা পিঠে ঢুকে বুক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে কি না। বেরিয়ে গেলে গুলিটা কুড়িয়ে নাও।"

শম্ভু ব্রজবিলাসের দু'টি পাঁজর চেপে ধ'রে গুলিতে পিঠে যে ফুটো হয়েছিল তাতে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, ঠিক, গুলি বুক ফুটো ক'রে বাইরে বেরিয়ে গেছে—আমি ফুটো দিয়ে তোমার সামনের আলো দেখতে পাচ্ছি।"

ব্রজবিলাস বলল, "যাক বাঁচা গেল, গুলিটা বাইরে বেরিয়ে যাওয়াতে সুবিধাই হ'ল। তুমি কুড়িয়ে নাও গুলিটা। আর দু'দিকের ফুটো দু'টো প্লাগ করে দাও। তোমার ব্যাগে তো তুলো প্লাস্টার সব আছে।"

প্লাগ করা হলে গুলিটাও সহজেই পাওয়া গেল। সেটি শম্ভু তার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল।

ব্রজবিলাস চলতে চলতে বলতে লাগল, "মনে পড়ছে একবার টাইগ্রিস নদীর ধার দিয়ে চলবার সময় শত্রুপক্ষের একটা তীর ঠিক এই রকম পিঠে ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।"

শম্ভু বলল, "আপনার মুণ্ডুটাও ত তারা কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল।"

"তোমার দেখছি সে কথা মনে আছে। অথচ সেদিন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না।"

"সে ঘটনা সবই আমি জানি।"

শম্ভুর কথাটা শেষ হতে না হতে একটা গুণ্ডা-চেহারার লোক তার পাশ দিয়ে ছুটে গেল, এবং যাবার পর দেখা গেল শম্ভুর একখানা হাত সে ধারাল ছোরায় কেটে দিয়ে গেছে।

ব্রজবিলাস বলল, "বুঝতে পারছি অপরাধী ধরতে তিনদিনের বেশি লাগবে না। অপরাধী ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। তুমি তোমার হাতখানা মাটি থেকে তুলে ব্যাগে রেখে দাও। ডান হাতটাই কেটেছে দেখছি। আচ্ছা শম্ভু, বলতে পার অপরাধী হলেই এত বোকা হয় কেন? তারা কেন এই সামান্য খবরটা জানে না যে, ডিটেকৃটিভ কোনো অবস্থাতেই মরে না, কোনো অবস্থাতেই অক্ষম হয় না? তবে কেন তারা এত ঝুঁকি নিয়ে এ সব বাজে কাজ করে?"

শম্ভু তার ডান হাতখানা বাঁ হাতের সাহায্যে মাটি থেকে তুলতে তুলতে বলল, "নির্বোধ আছে বলেই সংসারে এত বৈচিত্র্য এত আনন্দ।"

"দেখ শম্ভু, এখন তত্ত্বকথা রাখ। এখন গঙ্গার ধারে একটুখানি চুপচাপ ব'সে দেহমন জুড়িয়ে নাও, হাতখানাও জুড়ে নাও, তত্ত্ব চেপে রাখ।"

ব্রজবিলাস গঙ্গার ধারে মাটির উপর ব'সে পড়ে, পাইপ টানতে টানতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। শম্ভু গঙ্গার আলো আঁধারের শোভা দেখতে দেখতে কাটা হাত জুড়তে লাগল। এর মধ্যে ব্রজবিলাস অন্তত তিনবার স্বগতোক্তি করে উঠল, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'—এবং সর্বশেষ বলল, 'বোধ হয় পেয়েছি।'

## দুই

রামমনোহরের ভারত মলটেড মিল্কের কারখানা বিরাট। তার কত বিভাগ। কোনো বিভাগের সঙ্গে কোনো বিভাগের সম্পর্ক নেই। যেন একটি বিরাট গোলক-ধাঁধা। মালিকের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ব্রজবিলাস ও শম্ভু সেখানে এসেছে কারখানা দেখতে। রামমনোহর অবশ্য নকল মলটেড মিল্ক বাজারে কে ছাড়ল তাকে ধরবার জন্য থানায় আবেদন জানিয়েছেন, সেজন্য থানার দারোগাও ক'দিন ধরে সেখানে যাতায়াত করছেন, সেদিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ওঁরা এখন যেখানে সবাই সমবেত হয়েছেন সেটি কারখানার একটি প্রাইভেট অংশ। দারোগা ব্রজবিলাসকে দেখেই (যেমন সব দারোগাই প্রাইভেট ডিটেকৃটিভ দেখে হয়ে থাকে) মহা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ব্রজবিলাসকে বললেন, "এখানে ব'সে আপনি পলাতক প্রতারককে ধরবেন ভেবেছেন দেখে আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি।"

এ কথার জবাব দিল শম্ভু। সে বলল, "আপনি যেখানে এসেছেন, সে স্থান আমাদের কাছে অস্থান হবে এমন ভাবছেন কেন? অবশ্য যদি আপনি জলযোগ করতে এসে থাকেন তবে মাপ করবেন।"

"সত্যিই আমি অপরাধী ধরতে এখানে আসি নি। এসেছেন আপনারা। কারণ আপনাদের অলৌকিক

মতো আছে। হয়তো দু'জনেরই হাতে জালান্ধরের কবচ বাঁধা আছে, তাই আপনারা ইচ্ছা করলে মাটির নিচে থেকে অপরাধী টেনে বার করতে পারবেন।" ব'লে দারোগা খুব হাসতে লাগলেন।

ব্রজবিলাস বলল, "হয়ত তাই করতে হবে। কাজটা নতুন নয় আমার কাছে। একবার একটা নির্দিষ্ট সময়ে অপরাধী খুঁজে দেব কথা দিয়েছিলাম। শুধু কথা রাখার জন্য নিরেট দেয়াল ভেঙে তার ভিতর থেকে অপরাধী বার করেছি। কিন্তু থাক সে কথা।"

ব্রজবিলাস ও শম্ভু রামমনোহরের অনুমতি নিয়ে তাঁর একজন লোকের সঙ্গে কারখানাটি ঘুরে ঘুরে দেখতে গেল। এই কারখানা তার অত্যন্ত প্রিয় বলে বোধ হল, কারণ এখানকার প্রস্তুত মলটেড মিল্ক তার প্রিয়।

কারখানার কাজ কয়েকদিন বন্ধ ছিল, কারণ বাজার নকল মালে ছেয়ে গেছে—প্রচার হয়ে যাওয়াতে এজেন্টরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। যে সব দোকানে দু'চারটে আসল ছিল তাও বিক্রি হচ্ছে না।

ব্রজবিলাস কথাটা শুনে দুঃখিত হ'ল। তার পর সে কারখানাটা মোটামুটি দেখে পূর্বস্থানে ফিরে এসে আনন্দে শিস দিতে লাগল। দারোগা এবং রামমনোহর দুজনেই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

এমন সময় ব্রজবিলাস একটু অস্থিরপনা প্রকাশ করতে লাগল। মনে হ'ল যেন মাথাটা ঠিক নেই। আর এই সময়েই দারোগা রামমনোহরকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলেন। বলছিলেন, ব্রজবিলাস একটি গাধা, তার উপর মাথা খারাপ।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। ব্রজবিলাস দারোগাকে বলে বসল, "মশায় আমার সঙ্গে একটু নাচবেন? আসুন না, আমাকে এখন বড্ড নাচে পেয়েছে। ভাল ভাল বিলিতি নাচ নাচব, দেশীও দু-একটা।"

দারোগা মহা বিরক্ত ভাবে বললেন, "বুঝতে পেরেছি ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য আপনাকে এখন অনেক কিছুই দেখাতে হবে।"

ব্রজবিলাস হো হো করে হেসে উঠে বলল, "আমাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভ জীবনে ঐ নাচই একটু আনন্দ। এই দেখুন"—ব'লে শম্ভুর হাত ধ'রে টেনে আঙিনায়, এবং দু'জনে অতি উত্তেজনাপূর্ণ নাচ আরম্ভ করল। শম্ভুর হাত সম্পূর্ণ জোড়া লেগে গেছে, তাই তার কোন অসুবিধা হ'ল না। তবে সে বুঝতে পারল না ব্রজবিলাস ঠিক এই মুহূর্তে নাচতে আরম্ভ করল কেন। কি উদ্দেশ্য এই নাচের তা সে ভেবে পেল না। অনেকক্ষণ নাচল, কত নাচ—ফক্সট্রট, ট্যাঙ্গো, কাঁকা, তাণ্ডব, মণিপুরী।

নাচ শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে এসে আসনে বসে পড়ল দু'জন। ব্রজবিলাস রামমনোহরকে বলল, "বিনা পয়সায় নাচ দেখিয়েছি, আমাদের এক পেয়ালা ক'রে গরম মলটেড মিল্ক খাওয়ান তো দেখি। নইলে চাঙ্গা হতে পারছি না।"

অনেকদিন পরে খাঁটি জিনিসের স্বাদ পেয়ে ব্রজবিলাসের মন খুশি হয়ে উঠল। তখন উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, "কি ক্ষতিই না হ'ল আপনার এই নকল মাল বাজারে প্রচার হয়ে। আপনার সবচেয়ে বড় এজেন্ট সর্বস্বান্ত হলেন, আপনি সুনাম হারালেন। উপরন্তু আমি আপনার সীমায় অনধিকার প্রবেশ করে আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করে দিলাম, সেজন্য মাপ চাই আপনার কাছে। নাচতে ইচ্ছে হলে নিজেকে ঠেকাতে পারি না।"

শম্ভু মনে মনে ভাবল 'আর কোথাও তো তোমাকে নাচতে দেখি নি এর আগে।'

দারোগা বললেন, "Empty vessel sounds much—শূন্য কলসীতে শব্দ বেশি হয়।"

রামমনোহর বললেন, "ও কথা বলবেন না, দারোগাবাবু। ব্রজবিলাসবাবু যতবার ইচ্ছা এখানে এসে নাচতে পারেন।"

ব্রজবিলাস বলল, "দারোগাবাবু ঠিকই বলেছেন, শূন্য কলসীতে শব্দ বেশি হয়। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত।"

ব্রজবিলাস এখান থেকে বেরিয়ে শম্ভুকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে পাঠাল অধিক্রম মল্লিকের কাছে। নিজে গেল বড় থানায়। সেখানে সে পুলিসের বড় কর্তার সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা ধ'রে নানা জরুরী বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। পুলিস-কর্তা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ব্রজবিলাস টেলিফোনে রামমনোহরকে জানিয়ে দিল সন্ধ্যায় আরও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। অপরাধীর প্রায় সন্ধান পাওয়া গেছে, এখন কেবল একটুখানি বাকি। সেইটি তাঁর সামনে আলোচনা হওয়া দরকার। তিনিও যখন অপরাধী আবিষ্কারে সমান আগ্রহশীল এবং এতে অধিক্রম মল্লিকের আর তাঁর স্বার্থ যখন এক, বরং তাঁরই বেশি, তখন সব আলোচনা তাঁর সামনে হওয়াই ভাল। অধিক্রম মল্লিকও সেখানে

ব্রজবিলাস ও শম্ভুর নাচ

উপস্থিত থাকবেন। আপনার সেই পূর্ব-পরিচিত দারোগাকেও থাকতে বলবেন। আরও দু-একজন বন্ধু থাকবেন তাঁর সঙ্গে।

রামমনোহর খুব আনন্দের সঙ্গে এদের নিমন্ত্রণ জানালেন।

তিন

সন্ধ্যাবেলা নির্দিষ্ট সময়ে ব্রজবিলাস ও শম্ভু এবং পুলিসের কর্তা (সাধারণ পোষাকে) এসে পৌঁছল মলটেড মিল্কের কারখানার সেই পূর্ব-পরিচিত অংশে। ব্রজবিলাস বলল, "রামমনোহরবাবু, আমাদের অভ্যর্থনার জন্য কিছু আয়োজন করেছেন নিশ্চয়। কিন্তু কিছুই দরকার নেই, আপনি এক পেয়ালা করে মলটেড মিল্ক খাওয়ান, আর কিছু না।"

সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল গরম পানীয়। ব্রজবিলাস পেয়ালায় চুমুক দিয়েই চাঙ্গা হয়ে উঠল। এ পানীয় তার প্রাণস্বরূপ। দিনে আট-দশবার খাওয়া চাই।

ইতিমধ্যে দারোগাও এসে পৌঁছলেন। তিনি কিছু আগেই রামমনোহরবাবুকে ফোন করেছিলেন ব্রজবিলাস কতদূর এগোল জানতে। রামমনোহরবাবু বলেছে "সবটাই ধাপ্পা', তবে সন্ধ্যায় তিনি আবার আসবেন কেন, জানি না। অধিক্রম মল্লিকও আসবেন। সম্ভব তাঁকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে। আপনাকে সে সময় তিনি থাকতে বলেছেন, অতএব আপ আসুন।"

"তাই নাকি? তা হলে আমি নিশ্চয় যাব। সন্ধ্যা আমার ছুটি, কোনো জরুরী কাজ নেই হাতে।"

দারোগা এসেই বড় কর্তাকে শাদা পোষাকে দে থমকে গেলেন, এবং তাঁকে ওখানে চেনা যে নিষেধ তাঁর শাদা পোষাকই প্রমাণ। এ শিক্ষা আগে পাওয়া।

ব্রজবিলাস তবু কিছু শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি অ কথা পাড়ল। বলল, "এক অদ্ভুত কাহিনী আপনাদে আজ বলব। নকলের ইতিহাসে এ একটি সম্পূর্ণ অভিন ঘটনা। কেননা এ জিনিস আমি এর আগে কখনও শুনি নি। আমি যখন প্রথম অধিক্রম মল্লিকের কা থেকে অভিযোগ পাই যে, কোনো এক [illegible]

৩০ হাজার বোতল নকল মিল্ক দিয়ে ঠকিয়ে গেছে, তখন থেকে আমি তিনটি সূত্রের কথা ভাবছি। প্রথম হচ্ছে মলটেড মিল্ক এখানে আর কার দ্বারা তৈরি সম্ভব। দুই, বাইরে থেকে নকল মলটেড মিল্ক আমদানি হয়েছে কি না। তিন, এক সঙ্গে ৩০ হাজার বোতল মলটেড মিল্ক তৈরির ক্ষমতা স্থানীয় কোন্ কারখানার আছে।

"এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি নানা সূত্র থেকে। সে সব কথা বলবার দরকার নেই এখন। তবে তার ফলে জানতে পেরেছি—প্রথমটি অসম্ভব, দ্বিতীয়টি অসম্ভব। অতএব তৃতীয় প্রশ্নটি ভরসা। আমি দেখেছি একটি মাত্র কারখানাই এটি করতে পারে এবং তা রামমনোহর শেঠের কারখানা।"

রামমনোহর এ কথায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্রজবিলাস তাকে বলল, "চঞ্চল হবার কোন কারণ নেই—আমি যা বলতে যাচ্ছি তা সবটা আগে শুনুন।

"এর পরের সমস্যা হ'ল, এ কারখানা বাইরের অপর কেউ লীজ নিয়ে অথবা সাময়িকভাবে ভাড়া নিয়ে রামমনোহরবাবুর অজ্ঞাতে এ কাজ ক'রে গেছে কি না। এইটি সবচেয়ে সম্ভব ব'লে আমার মনে হয়েছে এবং যদি কেউ এ কাজ করে থাকে তবে তার নেতা নিশ্চয় অধিক্রম মল্লিক।

"কিন্তু কারখানা ঘুরে যা দেখলাম তাতে তা অসম্ভব বলেই মনে হ'ল। কারণ মল্ট তৈরিতে যে সব প্রক্রিয়া প্রয়োজন এবং যে পরিমাণ যব দরকার, তা যবের যোগানদারদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি একমাত্র রামমনোহর শেঠের নামেই দেওয়া হয়েছে যেমন বরাবর দেওয়া হয়। অন্য কোনো নতুন ব্যক্তি এত যব কখনও কেনেন নি সম্প্রতি কালের মধ্যে।

"কিন্তু যে এজেন্সির মারফত ফুলক্রীম দুধের গুঁড়ো কেনা হয় তাঁদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি রামমনোহর শেঠ অল্প কিছুদিন সে দুধ কেনা বন্ধ করেছেন।

"অতএব ধ'রে নিতে হয়, তাঁর কারখানা কিছুকাল বন্ধ আছে. অতএব তার সুযোগ নিয়ে কোনো প্রতারক তাঁর জিনিস নকল করে বাজারে ছেড়েছে।

"যে কারখানায় আজ আমরা এখন উপস্থিত আছি, সে কারখানার সুনাম সর্বত্র। এঁদের তৈরি মলটেড মিল্ক বিদেশী যে-কোনো মলটেড মিল্কের সঙ্গে তুলনীয়। এবং আমি নিজে তার ভক্ত। সেই কারখানার সুনাম এবং ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে চলেছে মাত্র ত্রিশ হাজার বোতল নকল মিল্ক বাজারে ছাড়াতে। আর এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন এঁদের একজন প্রধান এজেন্ট, যিনি প্রতারকের কথায় ভুলে এবং বেশি লাভের লোভে প'ড়ে আজ প্রায় এক লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েছেন।

"আপনারা কে কত বড় আঘাত সহ্য করতে অভ্যস্ত জানি না, তবু একটি বড় আঘাত আমি আপনাদের সবাইকে দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন যে, রামমনোহরবাবু নিজেই নিজের জিনিস নকল ক'রে খুব চতুর বুদ্ধি খেলিয়ে বাজারে ছেড়েছেন। আর এই কাজে তিনি তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং বড় এজেন্টকে পথে বসিয়েছেন।"

রামমনোহর শেঠ এ কথায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, "পাগলের প্রলাপ শুনছেন আপনারা। উনি যা বললেন তার প্রমাণ কোথায়?"

ব্রজবিলাস বলল, "একটুখানি ধৈর্য ধরুন। তার আগে আমি গোটাকত কথা বলে নিই—

"অসাধু লোক কোনো সুবিখ্যাত জিনিসের নকল করে লোক ঠকাতে চায় কেন? চায় এই জন্য যে, এতে অপরিমিত লাভ। সেই লোভে পড়েছেন রামমনোহর শেঠ। এবং পড়েছেন প্রধানত দু'টি কারণে। মল্ট এ দেশে তৈরির ব্যবস্থা থাকলেও প্রচুর পরিমাণ গুঁড়ো দুধ বাইরে থেকে আনতেই হয়—অথচ বাধা হয়েছে সেইখানে। আমদানীর পরিমাণ গেছে কমে, তাই কারখানার ভীষণ লোকসান হতে চলেছে। এমন সময় কর্পোরেশন থেকে মানুষের খাদ্যের অযোগ্য রূপে বাতিল-করা বহু গুঁড়ো দুধ যা যুদ্ধের সময় গুদামে প'ড়ে থেকে পচে গেছে তারই অনেকগুলো পিপে এক প্রতারক দলের হাতে গিয়ে পড়ে। তারাই এঁর কাছে এই দুধের সন্ধান দেয়, এবং বহু পরিমাণ অখাদ্য গুঁড়ো দুধ চোরা পথে পাবার সম্ভাবনা দেখে রামমনোহরবাবুর মাথায় শয়তান ভর করে। তিনি ভেবে দেখলেন কারখানা এমনিতেই অচল হতে চলেছে, অতএব এই ভাবে কিছু মোটা লাভ ক'রে লোকসানের টাকাটা তুলে নিয়ে কারখানা কিছুদিন বন্ধ রাখবেন। তাতে দু'দিক দিয়ে তিনি লোকের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। প্রথমতঃ লোকে জানবে অন্য কেউ তাঁর জিনিস নকল করেছে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর নিজের কারখানা বন্ধ থাকায় তাঁর সম্পর্কে লোকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবে। তা ভিন্ন নিজের জিনিস নিজেই কেউ যে জাল করতে পারে এমন কল্পনাও কেউ করবে না।"

রামমনোহর শেঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বললেন, "প্রমাণ নেই। আপনি বাজে বকছেন।"

ব্রজবিলাস খুব শান্ত স্বরে বলল, "কয়েকজন লোক

লাগবে প্রমাণ দেখাতে। দারোগাবাবু, আপনার বাঁশি আছে?"

"আবার কি নাচবেন আর আমি বাঁশি-বাজাব?"

"না থাকে এই নিন", ব'লে একটি পুলিসের হুইসল তাঁকে দিয়ে বলল, "একবার বাজান।"

দারোগা ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পাশে বড়-কর্তাও উপস্থিত, মনে পড়ল, তাই তিনি বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। তার ফলে বাইরে আরও একটা বাঁশি বাজল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ডজন কনষ্টেবল এসে উপস্থিত হ'ল।

ব্রজবিলাস রামমনোহরের দিকে চেয়ে বলল, "এখনও অবিশ্বাস আছে?—কাল আমি যে নেচেছিলাম এখানে তা যে বৃথা যায় নি তা তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। শূন্য কলসীতে শব্দ বেশি হয় দারোগা একথা আমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, কিন্তু আমি নেচে নেচে পরীক্ষা করছিলাম, পায়ের নিচে কোনো ফাঁপা জায়গা আছে কি না। দেখলাম সবটাই প্রায় শূন্য কলসীর আওয়াজ।"

ব্রজবিলাস অতঃপর কনষ্টেবলদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে বলল "এই জায়গায় একটি গোপন দরজা আছে। সেটি চাপা দেওয়া আছে, তুলে ফেলতে হবে। তোলার পর দেখা যাবে এর নিচে নকল মলটেড মিল্ক এখনও হয়ত কয়েক হাজার বোতল জমা আছে।"

রামমনোহর নীরব। তাঁর মুখ নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। দারোগা বিস্ময়ে কাঁপছেন। ব্রজবিলাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা উল্টে গেছে। তাঁর এখন চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। এত বড় একটা অপরাধীর সঙ্গে মিশছেন বন্ধুর মতো, অথচ কিছুই অনুমান করতে পারেন নি।

রামমনোহরের চোখেমুখে এক অস্বাভাবিক সংকল্প। তিনি হঠাৎ উঠে ড্রয়ার থেকে একটি রিভলবার বার করে ব্রজবিলাসকে লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাতে লাগলেন। দুটি গুলি আবার তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল। ঠিক এই সময় পুলিসের কর্তা স্বয়ং রামমনোহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই রামমনোহর একটি গুলি নিজের মগজে চালিয়ে দিলেন। তাঁর সব শেষ হয়ে গেল।

ব্রজবিলাসের জন্য দারোগা এবং অধিক্রম মল্লিক অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করতে যেতেই পুলিসের বড়কর্তা দারোগাকে বললেন, "পুলিস লাইনে এতদিন কাজ করছেন, এটা জানেন না যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কখনও মরে না?"

দারোগা লজ্জিত হলেন শুনে।

ব্রজবিলাস বলল, "রামমনোহর আত্মহত্যা দু'ভাবে করলেন। নিজের ব্যবসা হত্যা করলেন এবং নিজেকে হত্যা করলেন। ইনি ক'দিন আগেও আমার বুকে গুলি বিঁধিয়ে ছিলেন, গুলিটি কুড়িয়ে রেখেছি, মিলিয়ে দেখুন একই গুলি, একই রিভলবার থেকে ছোঁড়া। আর আমার টাইপকরা সিদ্ধান্তও রেখে দিন।

পরবর্তী কর্তব্যাদির ব্যবস্থা হ'ল। সে জটিল ব্যাপার, তার বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে অধিক্রম মল্লিকের কাছ থেকে জানা গেল রামমনোহর তাঁর কাছে ৩০ হাজার টাকা পান। পুলিসকর্তা বললেন "ওটাই এখন যা আপনার লাভ হ'ল, বাকি ষাট হাজার টাকার কথা ভুলে যান।"

সবাই বিদায় হলে দারোগার বিশেষ অনুরোধে ব্রজবিলাসকে থানায় যেতে হ'ল। সেখানে গিয়ে দারোগা ব্রজবিলাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে কঠিন আলিঙ্গনে বেঁধে ক্রমাগত চুমো খেতে লাগলেন।

ব্রজবিলাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এর চেয়ে ভাল আর কিছু ভাবতে পারলেন না তিনি।
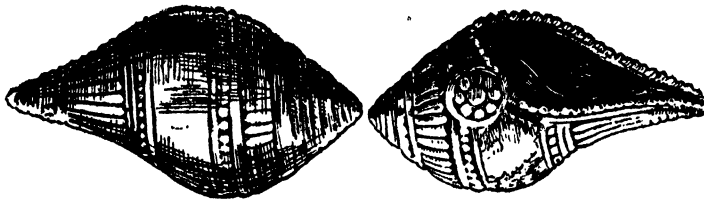
# বিবর্ণ সবুজ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কিছুদিন ধরেই কুমারের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। যাঁরা ওকে বিশেষ ভাবে জানে, একান্ত অন্তরঙ্গ, এটা তাঁদেরই অভিমত। প্রৌঢ় কুমার নাকি হঠাৎ যৌবনে ফিরে এসেছে। এক অভূতপূর্ব্ব প্রাণচাঞ্চল্যে সে বেগবান হয়ে উঠেছে। বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যের আড়াল থেকে পঁচিশ বছরের যৌবন থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে, আত্মপ্রকাশ করছে, প্রগল্‌ভ হয়ে উঠছে।

ছেলেমেয়েদের পানেও কুমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সে হাতে হাত রাখতে ওরা কেউ ভরসা করে নি। বিস্মিত হয়েছে। বিপন্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের পানে চেয়ে দেখে কাজের অজুহাতে অন্যত্র চ'লে গেছে।

কুমারের বর্ত্তমান চেহারাটা আশেপাশের সকলের কাছেই অচেনা। তার দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম, সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকা—সবকিছুই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া এগুলো এড়িয়ে চলতে সুরু করেছে। দিনের বেশির ভাগ সময় তাকে তার সাপ্তাহিক বিশ্রাম-কুঞ্জে দেখা যাচ্ছে। বিশ্রাম করবার জন্য নয়। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাগানরক্ষক দিনের পর দিন যত ফাঁকি দিয়েছে সেই ফাঁকগুলি তাকে দিয়েই বুজিয়ে নিতে কুমার তৎপর হয়ে উঠেছে।

বাংলো-সংলগ্ন লনটি ইতিমধ্যেই মসৃণ রূপ ধারণ করেছে। চতুর্দ্দিকের সীমানার তারের বেষ্টনীকে আশ্রয় করে যে লতাগাছগুলি আপন খুশিতে নিয়ম শৃঙ্খলার বাধা অগ্রাহ্য করে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল তাদেরকেও সুসম ক'রে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। উপেক্ষিত ফুলের গাছগুলিও স্নেহের স্পর্শে আর সযত্ন সেবায় সজীব হয়ে উঠেছে। বাংলোটির দেহেও রূপের ঝলক্ ফুটে উঠেছে। বহুদিন পরে তার দেহ মার্জ্জনা ক'রে রং বার্ণিশের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। প্রৌঢ় কুমারের হিসাবী আর পরিণত মন যুবক কুমারকে এতদিন ধরে কড়া নির্দ্দেশ দিয়ে যা কিছু করিয়ে নিয়েছে তার পরিণতির পানে দৃষ্টি পড়তে যুবক কুমার তুষ্ট হতে পারে নি। বরং একটা নরম বেদনামিশ্রিত অনুভূতি থেকে থেকে তাকে পীড়া দিচ্ছে। মনের একটা দিক যখনই বলেছে সুন্দর···অপর দিকটা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করেছে। এ সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রাণের স্বাভাবিক আলোড়ন কোথায়, উপচে-পড়া রূপের মাধুর্য্য কোথায়··· কুমারের হিসাবী মন তৃপ্ত হলেও বেহিসাবী যৌবন সঙ্গোপনে অতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে।···

স্ত্রী শিখা ইদানীং স্বামীর চলাফেরা, কথা বলা, ইত্যাদির মধ্যে অনেক দিন পূর্ব্বের হারিয়ে-যাওয়া একটি মধুর উদ্দাম সুরের সন্ধান পেলেও নিঃশব্দে লক্ষ্য ক'রে চলেছে। আচমকা নাড়া পেয়ে অতীতের যে দিনগুলি তার মনের পর্দ্দায় রূপ পরিগ্রহ করেছে সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে শিখার তেমন ভাল লাগে না। হয়ত নিজের বর্ত্তমান বয়েসের কথাটা ভুলতে পারে নি বলেই শিখা হোঁচট খাচ্ছে।

স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, তোমার ব্যাপার কি বল দেখি—

সুন্দর ভাবে হাসতে হাসতে কুমার জবাব দেয়, ব্যাপার কিছু আছে বুঝি?

শিখা বলে, জবাব ত তুমিই দেবে—

তেমনি হাসি মুখেই কুমার বলল, বেশ ত··জবাব তাহলে আমিই দেব। তবে আর ক'টাদিন তোমাকে ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে হবে।

শিখা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমাকেও দেখছি সাস্‌পেন্সের মধ্যে রাখতে চাও তুমি··

কুমার মৃদুকণ্ঠে বলে, তার জন্যে তোমার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?

শিখা বলল, হ্যাঁ। আমার দিবা-নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে।

কুমার একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, অর্থাৎ—

শিখা জবাব দিল, দিনের মধ্যে না হোক পঞ্চাশ বার আমাকে টেলিফোন তুলতে হয়। সকলেরই এক প্রশ্ন। তুমি নাকি ভয়ানক মিষ্টিরিয়াস হয়ে উঠেছ।

কুমার হেসে বলে, তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেই ত চুকে যায়।

শিখা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দেয়, তাদের প্রশ্ন যে আমারও প্রশ্ন—নইলে জবাব তাঁরা নিশ্চয় পেতেন।

কুমার হেসে উঠে বলল, তাতেও কিন্তু তোমার দিবা-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটত শিখা। তবুও তুমি যখন জানতে চাইছ তখন উত্তরটা শুনে রাখ। তাদের বল যে, আগামী সপ্তাহে আমি নিজেই তাদের সব কথা জানাব।

শিখা রাগ করতে গিয়েও সামলে নিল। করুণ হেসে বলল, শিখাও কি ওঁদের থেকে আলাদা নয়! একই দলভুক্ত!

কুমার হেসে উঠল, ভাবনায় ফেললে শিখা—

শিখা রাগ ক'রে বলে, তা হলে থাক।

শিখা চ'লে যাবার জন্য পা বাড়াতেই কুমার তার একখানা হাত ধ'রে ফেলে স্নিগ্ধ হেসে বলল, তোমাকে কানে কানে বলছি। নির্দ্দিষ্ট দিনের আগে আর দ্বিতীয় কান করবে না এ প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে।

দিলাম, অধৈর্য্য ভাবে শিখা বলল।

কথাটা শেষ করতেই শিখা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তার মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় কুমারের মনে হ'ল, শিখার যেন রূপান্তর ঘটেছে। ওর কোটরগত চোখ দু'টি এক বিস্ময়কর আবেগে যেন টল্‌টল্‌ করে ভেসে উঠেছে। এমনি চোখের দৃষ্টি, এমনি মুখের একটি নরম আর মিষ্টি ভাব একসময় ঐ মুখখানিতে ছিল এ কথাটা কুমার আবার নতুন করে অনুভব করল। তার অনুভূতির স্থূল প্রকাশ ঘটবার উপক্রম হতেই কিন্তু শিখা নিজেকে গুটিয়ে নিল। বাধা দিয়ে বলল, বুড়ো বয়েসে এ আবার কি রোগ···

কুমারও সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল—খানিকটা চুপ্‌সে গেল। সর্ব্বপ্রথমেই তার সুমনা আর সুতপার কথা মনে হ'ল। তার বড় এবং মেজ মেয়ে। দু'টিই বি-এ পড়ছে।···

কুমার কতকটা বিব্রতভাবে স্ত্রীর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতেই আবার নতুন করে বর্ত্তমানকে হারিয়ে ফেলল। বুড়ো বয়েসের রোগটার প্রতি ইঙ্গিত করলেও শিখা নিজে কিন্তু ছেলেমানুষ হয়ে গেছে! নইলে ওর মুখের ঐ চপল হাসিটি কুমারের কাছে এত মিষ্টি লাগত না। মুখে যত কথাই বলুক না কেন অন্তরের নির্ম্মল আনন্দের সংযত প্রকাশ তার সর্ব্বাঙ্গে একটা সবুজের ছোপ মাখিয়ে দিতে পারত না। ওর কণ্ঠস্বরে, চোখের তারায়, পাশে এসে দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গিটির মধ্যে পর্য্যন্ত একথা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যৌবনের চাপল্য গাম্ভীর্য্যের পোষাক পরে নিজেকে আড়াল করবার চেষ্টা করলেও কুমারের কাছে শিখা ধরা পড়ে গেছে।

কুমারের কিছুক্ষণ পূর্ব্বের পিছিয়ে-যাওয়া মনটা আবার অনেকখানি এগিয়ে গেল। তার পরিকল্পনার সঙ্গে বেশ খানিকটা রং আর রস মিশিয়ে কুমার এক স্বপ্নিল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

শিখা লজ্জা-জড়ান কণ্ঠে কথা কয়ে উঠল, না না ও আমি পারব না। লজ্জা করবে।·শেষ পর্য্যন্ত তোমাকেই কিন্তু সবদিক সামলাতে হবে।···তাছাড়া সুমনা, সুতপা···শেষের দিকে শিখা যেন কথা ক'টি নিজেকেই শোনাল। কুমারের কানে গিয়ে পৌঁছাল না। সে তখনও একটি কথাই মনে মনে আবৃত্তি করছে;···লজ্জা···লজ্জা··

কুমার একসময় হেসে উঠে বলে, সত্যি বলছ তোমার লজ্জা করবে···

শিখা চুপি চুপি বলে, করবে···সত্যি সত্যিই করবে।···

টেলিফোন বেজে উঠল।

কুমার বলে, সাড়া দাও শিখা।

শিখা আপত্তি জানায়, না তুমি দাও।

টেলিফোন সমানে বেজে চলেছে। কুমারের এক কথা।

শিখা বলে, নিশ্চয় তোমার কোন বন্ধু। আমি আর পারিনে বাপু। যা বলবার তুমিই বল।

কুমার শিখার পিঠের উপর একখানি হাত রাখে। অনুরোধ ক'রে বলে, আজকের দিনটি তুমিই চালিয়ে নাও শিখী···লক্ষীটি···

শিখা···শিখা ভিতরে ভিতরে দুলে ওঠে। কবে কত বছর পূর্ব্বে ঠিক এমনি করেই এক যুবক তার কানের কাছে মুখ এনে পাগলের মত বিহ্বল কণ্ঠে ডাকত, শিখা···শিখী···আর শিখা···ভাল লাগত, বড় ভাল লাগত শিখার। সে হারিয়ে যেত। তলিয়ে যেত—এক হয়ে যেত।

কুমার পুনরায় অনুরোধ করল, সাড়া দাও শিখী—

শিখার হাতখানি আস্তে আস্তে টেলিফোনটি তুলে নিল, হ্যালো, হ্যাঁ, আমি শিখা। কে দত্ত সাহেব? না কোন নতুন খবর নেই। অন্ধকারেই আছি। আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। আমিও আপনার সঙ্গে এক মত। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ চোখে পড়ছে না। কি বলছেন? আধুনিক উপন্যাসের পটভূমিকা? আমার মনের কথাই আপনি ব'লে ফেলেছেন। নিশ্চয় জানাব, সত্যি বলতে কি আমিও আপনার মত উৎকণ্ঠিত হয়ে দিন গুণছি। অ্যাঁ? শেষের পাতাটা উল্টে পরিণতিটা অর্থাৎ শেষ অঙ্কটা দেখে নিতে বলছেন? কিন্তু পটভূমিকা ছাড়া আর কিছুই যে আমার হাতের কাছে নেই দত্ত সাহেব। আচ্ছা নমস্কার।

শিখা মিষ্টি করে একটু হেসে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল।

কুমার প্রাণভরে অনেকক্ষণ হেসে নিয়ে বলল,

চমৎকার বলেছ। এর চেয়ে ভাল ক'রে জবাব আমিও দিতে পারতাম না।

শিখা খুশী হ'ল। ঠিক এমনি ঘনিষ্ঠ ভাবে স্বামীকে বহুদিন সে কাছে পায় নি। তাঁর কর্ম্মব্যস্ত জীবনের আশে পাশে এত বেশি বাইরের ভিড়, যে বাধ্য হয়েই শিখার নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য উপায় তার ছিল না। বিয়ের পরের গোটা কয়েক বছরের মধুর স্মৃতি মাঝে মাঝে তাকে উতলা করে তুলেছে। নিজেকে নানা উপচারে সাজিয়ে নিবেদন করতে গিয়ে বহুবার শিখাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। নাগাল পায় নি। হতাশার গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে এক সময় তার মনের একটা দিককে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছিল। কিন্তু তার এই মর্ম্মান্তিক পরাজয়ের কথা বাইরে কোনদিন প্রকাশ করে নি। হয়ত সংসারের নিয়মই এই। আর সে স্বামীর প্রিয়া নয়—তার গুটি কয়েক সন্তানের জননী। এই নতুন অধিকারের মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের সকল কামনার পরম প্রাপ্তি ঘটবে। শিখা এই পথ ধরেই বছরের পর বছর চিন্তা করে এসেছে। শুধু চিন্তাই করে নি। চিন্তার সঙ্গে তার কর্ম্ম ও চলার পদ্ধতিরও সমন্বয় ঘটিয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে একটা অব্যক্ত বেদনায় তার অন্তরাত্মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। যা দূরে সরে গেছে তাকেই কাছে পেতে আকুল হয়ে উঠেছে। আর অন্তরের এই বুভুক্ষা ব্যর্থ হয়ে প্রকাশ্যে ভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছেলে-মেয়েরা তটস্থ হয়ে মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। চাকর-বাকর গালমন্দ শুনে আড়ালে গিয়ে কটূক্তি করেছে আর স্বামী বিরক্ত হয়ে আরও দূরে সরে গিয়েছেন। শিখা ভিতরে যত জ্বলেছে বাইরে তত গরম হল্কা ছড়িয়ে আশে পাশের সকলকে ঝল্সে দিয়েছে। এ সব পুরাণো কথা—বহু বছর পূর্ব্বের কাহিনী। প্রায় মুছেই গিয়েছিল শিখার মন থেকে। হয়ত আজও তাকে এভাবে নাড়া দিত না যদি স্বামী তাকে আবার নতুন করে তার স্বপ্ন-রাজ্যের সিংহদ্বার খুলে না দিতেন।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কুমার পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে শিখাকে একই ভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হ'ল শিখী? এমন চুপচাপ ব'সে ভাবছ কি?

একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে মৃদু হেসে শিখা জবাব দিল, ভাবছিলাম তোমার কথা আর আমার নিজের কথা। আচ্ছা আমার একটা প্রশ্নের সত্য জবাব দেবে?

না না শিখী তুমি আবার বড্ড বেশি সিরিয়াস হয়ে উঠেছ। কুমার লঘু কণ্ঠে বলতে থাকে, তোমাকে ঠিক মানাচ্ছে না।

কুমারের কথা বলার ধরনে শিখাও হাসিমুখে বলল, মাঝে মাঝে একটু সিরিয়াস না হলে কিন্তু মানায় না।

একটু থেমে শিখা পুনরায় বলে, তার চেয়ে বল এই উৎসবের আয়োজনের তাগিদ তোমার মনে দেখা দিল কেন? এ কি শুধু একটা সাময়িক খেয়াল না আর কিছু?

শিখার কথার ধরনে, তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির মধ্যে যেন কিছু প্রত্যাশার আভাস। কুমারের সজাগ দৃষ্টির কাছে তা ধরা পড়ল। সে স্নিগ্ধ হেসে বলল, হঠাৎ স্থির করে ফেললাম শিখা···তোমাকে হয়ত আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু বিশ্বাস কর ভিতর থেকে আমি বড় অদ্ভুত একটা তাগিদ অনুভব করলাম। আত্মা বলল, সাড়া দাও···সাড়া দাও। আমার দৃষ্টি গিয়ে একটি বিশেষ তারিখের উপর আটকে গেল। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। চোখের সামনে অনেক উজ্জ্বল বাতির মধ্যে শুধু একটি সবুজ বাতিই জ্বলতে লাগল।···

কুমার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

শিখা স্থির। চোখে স্বপ্নের আবেশ। ধীরে ধীরে সে স্বামীর একান্তে এসে দাঁড়াল। তার চোখে চোখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলল, সত্যি বলছ জ্বলতে লাগল? আর সে আলোটা সবুজ···একটুও তাতে হলুদের ছোপ লাগে নি?···

শিখার এতখানি আবেশ-বিহ্বল ভাব কুমারকে রীতিমত বিস্মিত করলেও সে খানিকটা খুশী হ'ল। মৃদু কণ্ঠে স্ত্রীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে বলল, একেবারে কাঁচা সবুজ কোথাও হলুদের আভাস মাত্র নেই।

কথাটা সম্পূর্ণ শেষ করতে পারে না কুমার। সুমনা আর সুতপা কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। ওদের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

মেয়েদের সাড়া পেয়েই কুমার পাশের ঘরে চলে গেল। প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বহু বছরের অভ্যাস বশেই তাকে যেতে হ'ল। একটা সোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে কুমার চোখ বুজে আছে।

ঘরে ঢুকেই সুমনা প্রথমে কথা কইল, ট্যাক্সি করেই চলে আসতে হ'ল।

শিখা শুধু একটুখানি হাসল।

সুমনা পুনরায় বলল, ভাইস-চ্যানসেলার মারা

গেলেন। কলেজ ছুটি হয়ে গেল। কিন্তু তুমি মা ট্যাক্সি করে চলে আসার কৈফিয়ৎ চাইলে না যে বড়!

শিখা মিষ্টি করে একটু হেসে জবাব দেয়, তোদের মা বুঝি শুধু কৈফিয়ৎই চায়।

সুতপা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। মাকে অপলক দৃষ্টিতে দেখছিল সহসা সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, ইউ লুক ভেরি সুইট টু-ডে মাম্।

সুমনা সায় দিয়ে বলল, সত্যিই তোমাকে আজ ভারী মিষ্টি লাগছে মা।

শিখা ইঙ্গিতে পাশের ঘর দেখিয়ে দিতেই ওরা মা'র অত্যন্ত কাছে সরে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, বাবা এমন অসময় যে—

এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শিখা অন্য প্রসঙ্গে এল, তোমাদের খাবার কি এখুনি খাবে, না যেমন রোজ খাও সেই সময় খাবে?

সুমনা জানায়, পরেই খাবে।

সুতপা বলে, তবে এক কাপ চা কিংবা কফি হলে বড় ভাল হয় মা।

সুমনা বলল, মনে হচ্ছে আমারও এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না।

পাশের ঘরে বসে থাকলেও মেয়েদের প্রত্যেকটি কথাই কুমারের কানে গেল। কি জানি কেন মনে মনে খানিক বিব্রত হ'ল।

পরদিন।

খুব সকালেই কুমার তৈরি হয়ে নিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সকলের ঘুম ভাঙার আগেই সে বার হয়ে যাচ্ছে, আজও সেই ভাবেই প্রস্তুত হয়েছে।

শিখা এসে তার পাশে দাঁড়াল। কুমার অবাক হ'ল, কিন্তু সাদর আহ্বান জানাতে দেরি করল না, কিগো শিখারাণী তুমি এত ভোরে?

অপ্রত্যাশিত ঘটনাই বটে। দুদিন পূর্ব্বেও এমনি একটা প্রশ্ন করা হলে শিখা জ্বলে উঠত। আজ কিন্তু সে লজ্জিত হ'ল।

বলল, তোমার ব্রেকফাষ্ট রেডি। না খেয়ে যেও না।

কিছুক্ষণ কুমারের মুখে কথা ফুটল না। পয়সার তার অভাব নেই, যে বস্তুটির ছিল···

সম্পূর্ণ ক'রে ভাবতে পারল না কথাটা। শিখা বলছিল, কিগো কথাটা শুনতে পাও নি।

উৎফুল্ল কণ্ঠে কুমার বলল, শুনেছি বৈ কি শিখা। আর সেই সঙ্গে ভাবছিলাম কি জান?

শিখা মুখ তুলে তাকাল।

কুমার বলতে থাকে, বাগানে কাজ করতে করতে রোজই মনে হ'ত কিছু একটা হলে বড় ভাল হ'ত। আজ আর সে অভাব বোধটা থাকবে না শিখা।

কুমার থামতেই শিখা পুনরায় কথা কয়ে উঠল, আজ থেকে আমিও গিয়ে তোমার সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক বাগানে থাকব।

কুমার হেসে উঠে বলে, তুমি কি তা পারবে শিখা? বাড়ীর ভিতরটা এখনও ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারিনি। তোমার অসুবিধে হবে যে।

হবে না। দৃঢ়কণ্ঠে শিখা জানায়। তাছাড়া গুছিয়ে দেবার জন্যই ত আমার যাওয়া দরকার

কুমার শিখার বাহুমূলে একটু চাপ দিয়ে পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক দেবী।

শিখা অপাঙ্গে একবার স্বামীর দিকে তাকাল। বলল, আমার আর একটি নিবেদন আছে। মেয়েদের গাড়ী আমি ব্যবহার করতে চাই না। তোমার গাড়ীটা গোটা এগারোর সময় একবার পাঠিয়ে দেবে?

দেব—কুমার জবাব দেয়।

ঠিক সময় গাড়ী এল। শিখা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে চলে যেতেই একটা বড় টিফিন-ক্যারিয়ারে দু'জনার মত দুপুরের খাবার নিয়ে শিখা গাড়ীতে এসে উঠল। কুমারের পছন্দমত গোটা দুই তরকারী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আজ শিখা রান্না করিয়েছে। বহু বছর পরে আবার সে যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছে।

যথাসময় মুখোমুখী বসে দু'জনে খাচ্ছে। খাদ্য-দ্রব্যের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কুমার উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, এত সব করেছ কি শিখা রাণী। বহু দিনের উপবাসী ঘুমন্ত রসনাকে জাগিয়ে দিয়ে ভাল করলে না তুমি।

শিখা মুখ তুলে তাকাল। তার দু'টি চোখ জলে ভরে উঠেছে।

কুমারের চোখে পড়তেই সে বিব্রত কণ্ঠে বলতে থাকে, এই দেখ—আরে হ'ল কি তোমার শিখা। কিছু অন্যায় কথা বলেছি কি আমি? ···

কুমারের পাতে খানিকটা দৈ-মাছ তুলে দিয়ে ভিজে গলায় শিখা বলল, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

কুমার আশে পাশে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে শিখার গাল টিপে দিয়ে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলল, তুমি পাগল, শিখারাণী তুমি একটি আস্ত পাগল।

এর পরে শিখা সত্যি সত্যিই যেন পাগল হয়ে উঠল। ওর পাগলামির উন্মত্ত বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে কুমারের দম ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু মুখে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই।

বছরের পর বছর যত উচ্ছ্বাস আর আবেগ, কথা আর গান উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে প্রায় শুকিয়ে যেতে বসেছিল, আজ অনুকূল আবহাওয়ায় তা প্রাণ পেয়ে এক-সঙ্গে জেগে উঠেছে শিখার মনে। একে রোধ করবার ক্ষমতা বুঝি শিখার নিজেরও আর নেই।

অবশেষে বহু প্রতিক্ষিত দিনটি উপস্থিত হ'ল। কুমারের বিশ্রাম-কুঞ্জ আজ বিবাহ-বাসরে রূপান্তরিত হয়েছে। গাছে গাছে, লতা কুঞ্জে, বাইরের প্রবেশ দ্বারে সর্ব্বত্রই সবুজ আলোর ছড়াছড়ি। লাল নয়, নীল নয়, হলুদ নয়, শুধু সবুজ।

একে একে কুমারের বাল্যবন্ধুরা সস্ত্রীক সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শিখা আর কুমার তাদের পরম সমাদরে গ্রহণ করেছে।

বিসমিল্লার সানাই এতক্ষণে বেজে উঠেছে।

সকলেই একে অপরকে প্রশ্ন করছে, ব্যাপার কি? কেউ কিছু জানে কি না?

দত্ত সাহেব শিখার পিছু নিয়েছেন, শেষ অঙ্কে ত এসেই গেছি এবারে শেষটুকু বলে ফেলুন শিখা দেবী।

আলোতে, সানাইয়ের মধুর আলাপনে, আর সমবেত সকলের কলগুঞ্জনে স্থানটি মুখরিত। শিখার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে—বুকের মধ্যে নৃত্যের ছন্দায়িত দোলা। সে দিনেও ঠিক এমনি করেই দুলে উঠেছিল। আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে।

দত্ত সাহেব পুনরায় আবেদন জানালেন, কুমার নিশ্চয় আমাদের বেকুব বানাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনে নি—আমরা বিয়ে বাড়ীতে এসেছি কি না অন্ততঃ এ খবরটা জানাবেন কি?···

শিখা খিল খিল করে হেসে উঠে জবাব দিল, তাতেই বা ক্ষতি কি দত্ত সাহেব। তিনি যদি ঠকাতে চেয়ে থাকেন আপনারাও ঠকিয়ে চলে যান। হৈ চৈ করে খাওয়া দাওয়া করে প্রস্থান করবেন। সে দিক থেকে ত্রুটি হবে না এ আশ্বাস আমি দিতে পারি।

বুঝলাম—দত্ত সাহেব বললেন, কিন্তু উপলক্ষ্যটা কি সেটা কি অজ্ঞাতই থেকে যাবে?

শিখা হাসিমুখে বলে, বিবাহ···

দত্ত সাহেবের কণ্ঠে বিস্ময়, বি-বা-হ···কিন্তু কার!

শিখা নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, আবার কার···আমার ·· আপনাদের বন্ধুর···আমরা সিলভার জুবিলী করছি যে···

দত্ত সাহেব এতক্ষণে হা হা করে হেসে উঠলেন। মুহূর্ত্তমাত্র কিছু চিন্তা করেই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বন্ধুদের মধ্যে চলল শলাপরামর্শ তার পরেই দত্ত আর দেবের দু'খানি গাড়ী বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পরে যা সুরু হ'ল তা বর্ণনার অতীত। বন্ধুরা পড়ল কুমারকে নিয়ে আর বন্ধুপত্নীরা শিখাকে নিয়ে। বিয়েবাড়ীর উৎসবকেও ওরা হার মানিয়েছে চপল হাসি-ঠাট্টার ঝড় তুলে। একটি শান্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উৎসব-প্রাঙ্গণ সহসা সমবেত উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডবে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দেব আর দত্তর গাড়ী ফিরে এসেছে।

এল ফুল, এল ফুলের মালা। পঁচিশ বছর পূর্ব্বের আর একটি দিনকেও ওরা আজ ম্লান করে দিতে চায়।

সুমনা আর সুতপা সহসা উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে নিঃশব্দে সরে গেল। তাদের অনুপস্থিতি কারুর চোখে পড়ল না। সকলের দৃষ্টিই তখন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত।

সুমনা আর সুতপা। তেইশ আর বাইশ বছরের দুটি ফোটা ফুল। হাসি, খেলায়, আনন্দে উৎসবে আর পড়া-শুনার মধ্যেই ওদের দিন কাটছিল। হঠাৎ আজ ওদের এমন কি হ'ল?···

খাবার টেবিলে ওদের অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সকলেই একই প্রশ্ন করল। সুমনা আর সুতপা নাকি বহু পূর্ব্বেই গাড়ী নিয়ে চ'লে গিয়েছে। ড্রাইভার ফিরে এসে এইমাত্র খবর দিল।

উৎসব আনন্দের ছন্দ কেটে গেল। অন্ততঃ দু'জনার কাছে। এক বিশিষ্ট রেস্তোঁরা থেকে রসনা-তৃপ্তিকর বহু খাদ্য দ্রব্য এসেছে। শিখার আর কুমারের মুখে সব যেন কেমন তেতো লাগছে। আর ফুলের মালা আর বোকে-গুলিও যেন এরই মধ্যে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

শিখাকে কুমার বিয়ে করেছিল পঁচিশ বছর আগে। তখন তার বয়েস খুব বেশি হলে কুড়ি।

তার বড় মেয়ের বয়েস আজ তেইশ আর মেজর বাইশ।

কুমার চমকে উঠল। তার চোখের সম্মুখে সব কটা সবুজ আলো যেন দেখতে দেখতে হলদে হয়ে যাচ্ছে আর শিখার ঢলঢলে মুখখানি···

কুমার গভীর ভাবে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

# স্মৃতিচিত্র

শ্রীসীতা দেবী

স্বর্গীয় নীলরতন সরকার মহাশয়কে কখন যে আমি প্রথম দেখেছিলাম তা মনে পড়ে না। তিনি বাবার প্রথম জীবনের বন্ধু ছিলেন, তবে আমি সম্ভবতঃ আমার সাত-আট বৎসর বয়সের আগে তাঁকে দেখি নি, কারণ আমার জন্মের মাস ছয় পরেই বাবা সপরিবারে এলাহাবাদে চলে যান সেখানকার এক কলেজে অধ্যক্ষের কাজ নিয়ে। এলাহাবাদে আমরা তের বৎসর ছিলাম। তবে মধ্যে মধ্যে মাঘোৎসব উপলক্ষে কলকাতায় সাত-আটদিন করে কাটিয়ে যেতাম। কলকাতায় এলেই বাবার বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী নিমন্ত্রণ হ'ত, এমনই দেখা করতেও যাওয়া হ'ত। মায়ের কাছে ডাঃ সরকারের অনেক গল্প শুনতাম, কি রকম আশ্চর্য্য চিকিৎসক তিনি ছিলেন, সেই বিষয়েই বেশীর ভাগ গল্প। তাঁকে দেখবার তাই কিছু আগ্রহ বালিকা বয়সেই ছিল। দু'চারবার দেখে গিয়েও ছিলাম।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন বরাবরের মত কলকাতায় চলে এলাম আমরা, তখনই তাঁকে ভাল করে চিনলাম। বাঙালীর সংসারে আর যারই অভাব থাক, অসুখ-বিসুখের অভাব থাকে না। সুতরাং প্রায়ই ডাক্তারের দরকার হ'ত। বাবার ডাক্তার বন্ধু ছিলেন অনেকগুলি কিন্তু নীলরতনবাবু এসে না দাঁড়ালে কোন রোগী বা রোগিণীর মন উঠত না আমাদের বাড়ীতে। তাঁর সময় অত্যন্তই মূল্যবান্ ছিল, তবু তিনি সামান্যতম অসুখেও এসে আমাদের যত্ন করে দেখে যেতেন। তিনি চিকিৎসা করলে অসুখ না সেরেই পারে না, এই ছিল আমাদের বাল্যকালের বিশ্বাস।

খুব অল্প বয়সে তাঁর সম্বন্ধে ভাল ধারণা হবার আর একটা কারণ ছিল। মাঘোৎসবে যে বালক-বালিকা সম্মেলন হ'ত, তাতে নীলরতনবাবু সমাগত ছেলে-মেয়েদের খুব ভূরিভোজন করাতেন। তাঁর পরলোকগত একটি পুত্রের স্মৃতি-তর্পণ হিসাবেই এটি হ'ত ব'লে শুনেছি।

পনের-ষোল বৎসর বয়সে একবার দার্জ্জিলিং-এ যাই, ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা দেবার পরে। লোকের এসব জায়গায় এসে স্বাস্থ্যের উন্নতিই হয়, আমার বেলায় হ'ল উল্টো। এসেই জ্বরে পড়লাম, সে জ্বর আর কিছুতে ছাড়তেই চায় না। জ্বরটা বেশী দূর উঠত না, কাজেই তাতে আমার তত দুঃখ ছিল না, কিন্তু সাবু আর বার্লির জল ছাড়া কিছুই খেতে পেতাম না, এইটাতেই ছিল মারাত্মক আপত্তি। পাহাড়ের হাওয়ায় ক্ষিদেও বোধ হয় বেশী পায়। কিন্তু যে ডাক্তার আমায় দেখছিলেন, রোগীদের পথ্য সম্বন্ধে তাঁর বড় কড়াকড়ি ছিল। আবার এসেই প্রশ্ন করবেন, "কি খেতে ইচ্ছা করে?" যাই বলি, কিছুই তাঁর মনঃপূত হয় না, বলেন, "এটা ত দেওয়া চলে না।"

এই এক কথা শুনে শুনে চটে যেতে আরম্ভ করলাম। অবশেষে একদিন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বেশ ঝাঁঝাল গলায় বললাম, "আমের অম্বল আর রসগোল্লা খেতে ইচ্ছে করে।"

ডাক্তারবাবু অবিচলিত মুখে সেই একই উত্তর দিলেন, "ওটা ত দেওয়া চলে না," এই ব'লে তিনি বাড়ী চ'লে গেলেন। রাগ করে সাবু বা বার্লি কিছুই খাব না ঠিক করলাম।

আমার কপাল ভাল ছিল, ঠিক এই সময় নীলরতন-বাবুর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া আমাকে দেখতে এসে হাজির হলেন। ব্যাপার শুনে বললেন, "তুই আমাদের ডাক্তারকে call দে দেখি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সত্যিই হ'লও তাই। আমার রোগের খবর শুনে নীলরতনবাবু সেইদিনই বিকেলে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমার অদ্ভুত আবদার শুনে বললেন, "তা খেতে পার অল্প ক'রে।" নিজে কাঁচামিঠা আম পাঠিয়ে দিলেন, মাকে বলে দিলেন খুব বেশী চিনি দিয়ে অম্বল রেঁধে দিতে। আশ্চর্য্য, এই পথ্য পরিবর্ত্তনের গুণেই আমার জ্বর ছেড়ে গেল, আর এল না।

কলকাতায় তাঁদের বাড়ী আমাদের সারাক্ষণই যাওয়া-আসা চলত, উপলক্ষ্য থাকলেও, না-থাকলেও। মেয়ে অনেকগুলি তাঁর ছিল। তা ছাড়া ভাইঝি ভাগ্নীরাও অনেকেই থাকতেন। এঁদের সঙ্গে আমাদের খুবই ভাব হয়ে গেল, কাজেই তাঁদের পারিবারিক সব উৎসবেই আমাদের ডাক পড়ত। উৎসব প্রায় সব সময়েই লেগে

থাকত তাঁদের বাড়ীতে। এত বড় একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্রাহ্ম-সমাজে আমি আর দেখি নি। নীলরতনবাবুকে অনেকেই হয়ত খুব সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী ভাবতেন, কারণ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিছুটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্নই ছিল, কিন্তু ভারতীয় আদর্শ যে তাঁর মনের মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়ে আছে, তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যেত। এতগুলি মানুষ তাঁর বাড়ীতে বাস করত, কিন্তু মনে হ'ত সকলেই সুখে আছে, আনন্দে আছে। বিরাট্-গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি ছিলেন তিনি, কিন্তু কখনও তাঁর নামে কোন অভিযোগ শুনি নি।

অত্যন্ত কাজের লোক ছিলেন তিনি। চিকিৎসকের কাজ ছাড়াও অন্য কতরকম কাজের সঙ্গে যে তিনি জড়িত ছিলেন তার ঠিক নেই। দেশের শিক্ষা, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, এ সব বিষয়ে নিরন্তর চিন্তাই যে শুধু করতেন তা নয়, হাতে-কলমে করে দেখিয়ে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর উপার্জ্জন ছিল বিপুল, খরচ ছিল বিপুলতর। কত রকম কাজে যে তিনি ব্যয় করতেন, তা বলে শেষ করা যায় না। এত কাজের মধ্যেও তাঁর অতন্দ্রিত দৃষ্টি ছিল ছেলেমেয়েদের নানা বিষয়ে শিক্ষার দিকে। তাদের মানসিক বিকাশ যাতে কোনদিকে ব্যাহত না হয়, সকলরকম ব্যবস্থা করতে তাঁর কখনও ভুল হ'ত না। সন্তান-বাৎসল্য, আত্মীয়-বাৎসল্য তাঁর মধ্যে যে রকম দেখেছি, এমন আর কোথাও বড় একটা দেখি নি।

একবার তাঁদের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে গিয়ে মাসখানেক ছিলাম। সেটা ১৯১৩ কি ১৯১৪-এর অক্টোবর মাস। ট্রেনে ফার্ষ্ট ক্লাশেই সবাই চললাম। আমাদের দেশে তখনকার দিনে প্রৌঢ়বয়স্ক কর্ত্তা যদি গৃহিণী এবং ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোথাও যাত্রা করতেন, তাহলে অনেক সময় তাঁরা একসঙ্গে যেতেন না। নীলরতনবাবুর অনেকগুলি পরিচিত লোক ঐ ট্রেনে যাচ্ছিলেন। তাঁদের ভিতর একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "সকলে একই সঙ্গে যাচ্ছেন নাকি ?"

নীলরতনবাবু বললেন, "তা ছাড়া আর কি করা যায় ?"

সেই পণ্ডিত মূর্খটি বললেন, "আমরা নিজেরা যাই বটে ফার্ষ্ট ক্লাশে, তবে পরিবারবর্গ সেকেণ্ড ক্লাশেই যান।"

নীলরতনবাবু বললেন, "দু' ভাগ করার দরকার থাকলে আমিই সেকেণ্ড ক্লাশে যেতাম, ওঁরা ফার্ষ্ট ক্লাশে যেতেন, বা তার চেয়েও উঁচু কোন ক্লাশ থাকলে তাতে যেতেন।"

সপরিবারে বেরলে, বাঙালী সংসারে সকলে প্রায়ই কর্ত্তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তাঁর যেন কোন সেবা-যত্নের ত্রুটি না হয়। তিনি নিজে বিশেষ কারও আদর-যত্ন করতে যান না। নীলরতনবাবু এ ক্ষেত্রেও ছিলেন সাধারণের ব্যতিক্রম। যতক্ষণ আমরা পথে ছিলাম, সারাক্ষণ তিনি দৃষ্টি রেখে চললেন সকলের সুখ-সুবিধার দিকে।

দার্জ্জিলিঙে Glen Eden বলে তাঁদের একটি সুন্দর বাড়ী ছিল। খুব আনন্দেই সেখানে আমরা একটা মাস কাটিয়েছিলাম। শহরের ভিতরের সব ক'টা বেড়াবার জায়গা ত অল্পদিনেই চষে ফেলা গেল। তার পর দূরের জায়গাগুলিতেও পাড়ি জমান হতে লাগল। আমরা, অল্পবয়সীরা, কোথাও কোথাও নিজেরাই যেতাম, আবার মধ্যে মধ্যে বড়রাও সঙ্গে যেতেন। সিঞ্চলে গিয়ে সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তে Mount Everest দেখব ব'লে একবার বেরলাম। বেশ বড় দল, সবাই প্রায় অল্পবয়স্ক, বড়দের মধ্যে নীলরতনবাবু স্বয়ং এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু। পথ অনেকখানি, সবটাই চড়াই। সুতরাং শীতের ভোররাত্রে নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে চড়ার কল্পনাটা কিছুই আরামপ্রদ মনে হ'ল না। প্রায় সবাই ডাণ্ডিতে উঠলাম। নীলরতনবাবু, দু'জন যুবক বন্ধুকে নিয়ে হেঁটে যাওয়া ঠিক করলেন। আমরা ত সবাই যার যতরকম গরম-কাপড় ছিল সব পরে এবং তার উপরে ভুটিয়া কম্বল জড়িয়ে প্রায় ভাল্লুকের রূপ ধারণ করলাম। কিন্তু দেখা গেল নীলরতনবাবু অপেক্ষাকৃত হাল্কা পোষাকেই যাচ্ছেন। মেয়েরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় বললেন, "যতটা carry করতে পারব, তার চেয়ে বেশি কাপড় প'রে লাভ কি ?"

যদিও তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে, তবু দেখা গেল আমাদের চেয়ে তিনি ক্ষমতা রাখেন বেশি। ডাণ্ডিবাহকদের সঙ্গে সমানে হেঁটে তিনি টাইগার হিলের ডাক-বাঙলায় এসে উঠলেন। আমরা সেই নিদারুণ শীতে যতখানি কাতর হলাম, তিনি তার অর্দ্ধেকও হলেন না।

তখনকার দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার তিনি ছিলেন, কিন্তু কখনও ডাক্তারী ফলাতে ভালবাসতেন না। যত-কম ওষুধ খাইয়ে ও কম খোঁচাখুঁচি করে রোগীকে খাড়া ক'রে দেওয়া যায়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখতেন। আমার বাবার একটা খুব বড় ফোড়া হয়। নীলরতনবাবু প্রথম দিকে বাবাকে দেখতে আসতে পারেন নি। কি একটা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। অন্য চিকি-

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার

জন্ম ১লা অক্টোবর ১৮৬১ — মৃত্যু ১৮ মে ১৯৪৩

পচার করাই ঠিক করলেন। বাবাকে টেবিলে শুইয়ে যখন প্রায় chloroform দেওয়া আরম্ভ হচ্ছে, তখন নীলরতনবাবু এসে উপস্থিত হলেন। ভাল ক'রে সব দেখেশুনে বাবাকে টেবিল থেকে নামিয়ে দিতে বললেন। এমনি চিকিৎসায় সেরে যাবেন এই মত দিলেন। তাই-ই হ'ল।

বহুদিন পরে আমি নিজেও একবার তাঁর কল্যাণে অস্ত্র করার হাত থেকে অব্যাহতি পাই। একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আমাকে পরীক্ষা করে মত দিলেন যে, অবিলম্বে অস্ত্র করা দরকার, দুরারোগ্য ব্যাধির সূচনা হয়েছে। আমাকে তখনি হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়ে যেতে অনুরোধ করলেন।

হঠাৎ এ রকম ব্যাপারের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হাসপাতালে না গিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলাম নীলরতনবাবুর কাছে। তিনি সব দেখেশুনে বললেন, "থাক্ না এখন। অত তাড়াতাড়ি operation করবার দরকার নেই। একটু change-এ যাও, ওষুধ-বিষুদ ভাল ক'রে খাও, তার পর দেখা যাবে।" তাই করলাম, এবং বেঁচেও গেলাম। এ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগের কথা।

তাঁর সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি চোখে দেখলেই যেন মানুষের অর্দ্ধেক রোগ সেরে যেত। বিদেশে-বিভূঁয়ে অনেক সময় ছেলেপিলের অসুখ নিয়ে কত না বিপদে পড়েছি। কাকে ডাকব ভেবে পাই নি, কি চিকিৎসা করাব ভেবে পাই নি। তখন খালি এঁর কথাই ভাবতাম। ইনি কাছে থাকলে ত আর কিছু ভাবতে হ'ত না।

বৃদ্ধবয়সে যখন নিজেও অসুস্থ হতে আরম্ভ করেছেন, তখনও ডাকলে কখনও আসতে অস্বীকার করতেন না। চিকিৎসাকে তিনি শুধু জীবিকা অর্জ্জনের উপায় ভাবতেন না, মানবহিতৈষণার অঙ্গই ভাবতেন। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" ভগবৎভক্ত ব'লে তাঁর কোন প্রসিদ্ধি ছিল না, কিন্তু মনে হয় যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক না হলে আর্ত্ত মানবের সেবায় কোন মানুষ এমন করে চিরটা জীবন উৎসর্গ করতে পারে না।

—*—

# সরকার শতবার্ষিকীর সার্থকতা

শ্রীপরিমল গোস্বামী

চিন্তা ও কর্ম্মজগতে ইংরেজ আমলের বাংলা দেশে যে সব মনীষী স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের সবারই আবির্ভাব একটা বিশেষ সময়-সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সে সময়-সীমা মোট এক শ' বছর বা সামান্য বেশি। তার আগে আমাদের দেশে মোটের উপর এক রকম মানবতা বোধ ছিল—যাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দেশের জ্ঞানীরা মানুষকে পরকালের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার সাধনা করে গেছেন। তাঁদের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে এইটিই মানুষের চরম লক্ষ্য এবং মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। আর ঠিক এই কারণেই আমাদের দেশের কখনও ইতিহাস-ভূগোল লেখা হয় নি, যা হয়েছে তা দেশাতীত স্থান ও কালের। স্বর্গ এবং নরক সম্পর্কে আমাদের ইতিহাস এবং ভূগোল দুইই পূর্ণাঙ্গ।

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন জড়ধর্মে দীক্ষিত হয়, অর্থাৎ ইহকালের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ঐহিক শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং ইহকালের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জেগে ওঠে হঠাৎ। আমাদের নিজস্ব আত্মিক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে আমরা ইউরোপের আমদানি সেই জড়ত্বের সাধনায় মেতে উঠলাম—যে জড়ত্ব মানুষের সেবা করা চরম মনে করে, যে জড়ত্ব ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্ম দেয়, যে জড়ত্ব রেডক্রস্ গঠন করায়, যে জড়ত্ব টাইটানিক জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘাড়ে চেপে শিশু নারীকে বাঁচবার অগ্রাধিকার দেওয়ায় এবং পরিশেষে ক্যাপটেনকে জলে ডুবিয়ে মারে।

আমি যে সময়-সীমার কথা উল্লেখ করেছি—সেটি হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দী। এরও আগে এই জড়ত্ব প্রথম ভর করে রাজা রামমোহন রায়ের স্কন্ধে। তিনিই প্রথম পরম কল্যাণময়, আত্মিক ব্যাখ্যায় উজ্জ্বল বিধবাদাহ থেকে দেশকে ফেরাবার চেষ্টা করেন। তার পর থেকে ইহকালের শিক্ষা, মানব সেবা, সমাজ সেবা, প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই বাংলা দেশে বিরাট এক এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। জ্ঞান-জগতে, কর্ম্মজগতে এবং সমাজে যে সব রীতি তাদের নিজ নিজ আয়ু এবং সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েও জঞ্জালের মত টিঁকে আছে তাদের সরিয়ে তার স্থানে নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করব, যা অন্যায় মনে করা হচ্ছে তা হঠিয়ে দেব—এই উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা নির্ভীক

ভাবে কর্মক্ষেত্রে নেমেছিলেন। এ জাতীয় কাজ এঁদের আপন স্বার্থসিদ্ধি বা লাভের জন্য নয়, আত্মপ্রচারের জন্য নয়, সব সময়ে তা সবার লাভের জন্য—এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা অধিকাংশ সময়েই দৈহিক, মানসিক এবং আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেছেন। এই কাজ তাঁদের কারোই চাকরির খাতিরে নয়, বাধ্যতামূলক নয়, আপন আপন বৃত্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক গৌণ, মুখ্য সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে। এ সবই স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজ। দেশের লোকের প্রতি গভীর মমত্ববোধই এর মূল প্রেরণা। তাঁরা এজন্য জীবন থেকে আরামকে বর্জন করেছিলেন, নিজের অর্থ ব্যয় করে এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ক্ষতি সহ্য করেও।

বাংলা দেশে এ রকম কর্মীর নাম করা যেতে পারে অন্তত পঁচিশ জনের। একটি শতাব্দীর হিসাবে খুব বেশি নয়, কিন্তু বাংলা দেশের ভাগ্যে নিঃসন্দেহে এই সামান্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। তা ছাড়া এঁদের কর্মের বহির্ব্যাপ্তি সমস্ত সমাজের ক্ষেত্রে, ভিতরের দিকে তা দেশের মর্মদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

ডাক্তার নীলরতন সরকার এই দলের অন্যতম। চিকিৎসকরূপে তিনি বড় ছিলেন, নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তাঁর সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এলেই রোগীর মনে আপনা থেকেই আশা জেগে উঠত, এ সবই সত্য কথা। কিন্তু এটি তাঁর কৃতিত্বের দিক মাত্র। এদিকে তাঁর প্রতিভা ছিল অসামান্য এবং সে কথা দেশে প্রবাদ-বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর এ কৃতিত্বের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন মহৎ চরিত্র। এ দুইয়ের মিলন সচরাচর ঘটে না। রবীন্দ্রনাথও নীলরতন সরকার সম্পর্কে এই কথাটির উপরেই জোর দিয়েছিলেন—"মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বড় না হলে বড় চিকিৎসক হওয়া যায় না।"

অগণিত অসহায় রোগীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেছেন এবং শুধু তাই নয়, যেখানেই প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানেই তিনি রোগীদের মধ্যে ওষুধ এবং পথ্য বিলি করেছেন। এটি তাঁর চরিত্রের একটি বড় দিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের মানুষের প্রতি তাঁর কতখানি মমত্ববোধ ছিল, এটি তার একটি প্রমাণ। এ কাজ তিনি করেছেন দেশের লোককে ভালবেসে। কোনো বাইরের প্রয়োজনে নয়, নামের জন্য নয়, অন্তরের প্রেরণা থেকে।

দেশকে তিনি আন্তরিক ভাবে ভালবাসতেন বলেই ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলন ও দেশের নবজাগরণের সেই রোমাঞ্চকর প্রাণস্পন্দন থেকে দূরে থাকতে পারেন নি, তিনি তাঁর সাংখ্যমত অর্থ নিয়ে এসেছিলেন তার মঙ্গলাচরণের মুহূর্তে। মনে দৃঢ়সংকল্প—দেশকে জাগাতে হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে হবে। গোঁড়ামি বর্জন করে দেশের লোক যাতে শিল্প কাজে যোগ দিতে পারে তার জন্য তিনি নিজের সঞ্চয় অকৃপণ ভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ট্যানারি, তাঁর সাবানের কারখানা, তাঁর নিজের ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ কিনে তরুণ চিকিৎসকদের হৃদরোগ পরীক্ষা শেখান, এ সমস্তই তাঁর চরিত্রের এক অদ্ভুত সুন্দর দিক।

জীবনে তাঁর অলস মুহূর্ত বলতে কিছু ছিল না, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন; তিনি আদর্শবাদী ছিলেন কিন্তু স্বপ্নবিলাসী বা visionary কদাচ নয়; শ্রমবিমুখ বাঙালীর সামনে তিনি শ্রমের মর্যাদা তুলে ধরেছিলেন।

তার পর জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকেও তাঁর মনোযোগ ছিল সমান ভাবে যুক্ত; জীবন থেকে তিনি শিক্ষার কোনো একটি বিশেষ অঙ্গ রেখে বাকিটা ছাড়তে বলেন নি; শুধু স্পেশালাইজেশনের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। মনকে সব দিকে জাগ্রত ক'রে দেওয়াই সকল শিক্ষানীতির আদর্শ, তাই দেখা যায় তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমন প্রতিভার অধিকারী হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট আর্টস এবং সায়েন্স দু'টি বিভাগেই পালা করে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি বাংলা দেশে সমাজে এবং শিক্ষার সকল বিভাগে সংস্কারক রূপে নিজ ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন, অথচ সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে, তাঁর কোনো কাজের মধ্যেই নাটকীয়ত্ব ছিল না, কারণ তাঁর বিজ্ঞাপন প্রচারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি ছিলেন ষোল-আনা কর্মী, তাই কাজ ফেলে বাগ্‌জাল বিস্তারের তাঁর সময় ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। নীরব অথচ গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ কর্তব্য সাধনের মধ্যেই তিনি আপন সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন।

উচ্চচিত্তবৃত্তি, সবল চরিত্র এবং প্রশস্ত হৃদয়—এই তিনের যোগে নীলরতন সরকার সমসাময়িক বাঙলার হৃদয়ে উচ্চ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসন পেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মের ভিতর দিয়ে দেশসেবার আদর্শটিকে আমরা যাতে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তারই পরিকল্পনা তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিষ্ঠার সঙ্গে করা হচ্ছে এ উৎসবের সার্থকতা সেইখানে।

# স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সাত

দিন কয়েক এমনি করেই গেল।

কতকটা যেন ছকবাঁধা রাস্তায় জীবনটা ফেলবার চেষ্টা। সব কিছু অল্পবিস্তর ঘড়ি-ধরা নিয়মে বাঁধা।

সকালে উঠে নিজের ঘর-দোরের যৎসামান্য কাজকর্ম সেরেই আশুবাবুর হেঁসেলে গিয়ে লাগা। দুপুরে ও রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরের নির্জনতা আছে বটে, কিন্তু বাকিটা আশুবাবুর হেঁসেল ও সংসারের ছন্দেই বাঁধা।

আশুবাবু সেখানে অবশ্য অবাধ কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছেন, স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছামত কাজ করা সুবিধে। আশুবাবুর সংসার চালাবার ভারও তার উপরই ক্রমশঃ যেন এসে পড়ছে। শুধু হেঁসেল নয়, অন্য সব-কিছুও দেখাশোনা করবার দায়িত্ব।

এ দায়িত্ব ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চাপাবার ধরণ যদি আশুবাবু সচেতন ভাবে উদ্ভাবন করে থাকেন তাহলে তাঁকে বিচক্ষণ বলতে হয়।

একটু একটু করে কর্তৃত্ব যে তার হাতে জমছে তা শোভনাকে যেন টের পেতেই দেওয়া হয় নি।

হেঁসেলের কাজ শেষ হবার পর মধু হয়ত বলেছে, আজ মুদিখানার ফর্দ করে দিতে হবে দিদিমণি। বাবু বলেছেন এখন থেকে মাসকাবারী সওদা আসবে।

আশুবাবু নিজেই হয়ত খেতে বসে বলেছেন এক সময়ে, বালিশ-বিছানাগুলোর সব বড় দুর্দশা হয়েছে। আমার সঙ্গে আজ একবার যাবে মা দোকানে? বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, এই সব তাহলে বছর-খানেকের মত কিনে নিশ্চিন্ত হই।

ট্রাম রাস্তার দোকান-পাড়ায় আশুবাবুর সঙ্গে যেতে হয়েছে তার পর। বাসে বড় ভিড়। আশুবাবু রিক্শতে করেই নিয়ে গেছেন।

যেতে যেতে নানান বিষয়ে কথা বলেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে নিজের বা শোভনার কোন প্রসঙ্গ তোলেন নি, তবে তাঁর নিজের আত্মীয়-স্থানীয়া একটি মেয়ের যে কাহিনী কথায় কথায় বলেছেন, তাতেই তাঁর মনে শোভনার বিষয়ে কতখানি আন্তরিক দুশ্চিন্তা আছে তা বোঝা গেছে।

কাহিনীটা এমন কিছু নয়। একটি মেয়ে দু'টি শিশু সন্তান নিয়ে অকালে বিধবা হয়ে কেমন ক'রে নিজের চেষ্টায় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় নিজের জীবন ও চরিত্র নিষ্কলুষ রেখে সেই সন্তানদের মানুষ করে তোলে তারই ইতিহাস।

মামুলী হলেও এই ইতিহাসের মধ্যে প্রেরণা পাবার নিশ্চয়ই কিছু আছে।

আশুবাবু অন্ততঃ তা মনে করেন। এই কয়দিনেই তাঁর কাছে এ ধরণের দৃষ্টান্তের কথা কয়েকবার শোভনাকে শুনতে হয়েছে।

প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেই একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়েগুলির চরিত্রবল। ভাগ্যের কোন আঘাতেই তারা নিজেদের এই সম্পদটি হারায় নি। চরম দুর্যোগ ও দুর্দশার মধ্যে তারা তাই চরিত্রের তেজেই দীপ্ত হয়ে আছে।

শোভনা নীরবেই এ-সব কথা শুনেছে। সেও যেমন কোন মন্তব্য করে নি, আশুবাবুও তেমনি কাহিনীটুকু বলেই অন্য প্রসঙ্গে চ'লে গেছেন।

দোকানে গিয়ে আশুবাবু বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর ছাড়া আরো বেশী কিছু কিনেছেন। নিজের ধুতি ও জামার কাপড়ের সঙ্গে দু'টি শাড়ী যখন পছন্দ করতে বলেছেন, শোভনা তখন ইচ্ছে করেই কোন আপত্তি জানায় নি। দোকানের লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে আপত্তি জানানটা অশোভন লেগেছে বলেই বোধ হয়।

ফেরবার পথে আশুবাবুই তার অনুক্ত আপত্তি নিজে থেকে খণ্ডন করেছেন অপ্রাসঙ্গিক ভাবে।

হঠাৎ বলেছেন গম্ভীর ভাবে—তুমি শাড়ী জোড়া কিনে দেওয়ায় হয়ত ক্ষুন্ন হয়েছ মা। কিন্তু তাহলে চলবে না। তোমার শাড়ী কেন, আরো অনেক কি প্রয়োজন। এ-সব প্রয়োজনের জিনিষ আমার কাছে বিনা প্রতিবাদেই তোমায় নিতে হবে। এটাকে দয়া দান মনে করো না, তাহলেই লজ্জার বা গ্লানির কিছু থাকবে না।

শোভনা অবশ্য বলতে পারত—দয়ার দান ছাড়া কি মনে করব?

কিন্তু কিছুই সে বলে নি। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হতে যেমন পারে নি, তেমনি আপত্তি জানিয়ে এই সহৃদয় বৃদ্ধকে সামান্য একটু আঘাত দিতেও তার বেধেছে।

কিন্তু মনে মনে তখনই সে সঙ্কল্প করেছে, সব সমস্যার এই প্রায় অলৌকিক সমাধানের উপায় সে বেশী দিন আঁকড়ে ধ'রে থাকবে না।

সেই সঙ্কল্প নিয়েই কয়েকদিন বাদে সকালের রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল দুপুরবেলায়।

আশুবাবু তখন একটু বিশ্রাম করছেন তাঁর ঘরে। তাঁকে কিছু না জানিয়েই তাই যাওয়া সম্ভব হ'ল।

তিনি জানতে পারলে বাধা বোধ হয় দিতেন না। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে প্রশ্ন হয়ত করতেন।

অনাবশ্যক কৌতূহল বা অভিভাবকত্ব প্রকাশ না করলেও ক'দিন থেকে তিনি আগের তুলনায় ব্যক্তিগত প্রশ্ন দুটো-একটা করতে সুরু করেছেন, শোভনা লক্ষ্য করেছে। এটা তাঁর স্নেহেরই পরিচয় সন্দেহ নেই। সে স্নেহের আন্তরিকতাই তাঁকে ওটুকু অধিকার দিয়েছে।

তবু শোভনার পক্ষে সেটা অস্বস্তিকর।

বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে সে রকম কোন প্রশ্ন করলে, শোভনা মিথ্যা কিছু বলতে পারত না। কিন্তু সত্য কথা বলাটা উভয়ের পক্ষেই অপ্রীতিকর হ'ত।

শহরের বড় রাস্তা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে হেঁটে এসে তাই শোভনা একটু নিশ্চিন্তই হ'ল। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে মধু বা আর কারুর সঙ্গে দেখা হয় নি বলেই আরো নিশ্চিন্ত।

শোভনা আজ খেয়াল-খুশি মত ঘোরবার জন্য বেরোয় নি। মনে মনে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য ঠিক করেই রওনা হয়েছে। নির্দিষ্ট গন্তব্য আর উদ্দেশ্য।

ক'দিন ধরে অনেক ভেবে-চিন্তে এই ঠিকানাতেই প্রথম যাওয়ার কথা সে স্থির করেছে।

ঠিকানাটা শহরের প্রায় অপর প্রান্তে। আদি কলকাতার পুরাতন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পাড়ায়।

বাস্ থেকে নেমে শোভনা যখন গলিটার মুখে গিয়ে পৌছায় তখন বেলা মাত্র একটা।

এই অবেলায় কারুর বাড়ী গিয়ে ওঠা হয়ত শোভন নয়, বিশেষ করে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পর যদি এ যাওয়া হয়। কিন্তু শোভনা নিরুপায়। এই দুপুর-বেলাটি ছাড়া তার অবসর আর নেই। বিকেলের মধ্যে না পারুক, সন্ধ্যের আগে তাকে ফিরতেই হবে। ট্রাম-বাসের এই ভিড়ের সময় শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তখন সময় মত পৌছোবার ভরসা করা যায় না। দেরি করে এলে আশুবাবু মনেও যদি কিছু করেন, মুখে নিশ্চয় কিছু বলবেন না। কিন্তু শোভনা তার নিজের আচরণে যৎসামান্য ত্রুটিটুকুও রাখতে চায় না; আশু-বাবুর দিক্ থেকে যদি অহেতুক স্নেহ হয়, তার দিক্ থেকেও থাকবে কঠিন কর্তব্যপরায়ণতা, যা হিসেব করা মূল্য দেওয়া-নেওয়ার উর্ধ্বে।

সঙ্কোচ ও দ্বিধা নিয়েও তাই দুপুরবেলাতেই তাকে আসতে হয়েছে।

বাড়িটা চিনতে অবশ্য কোন অসুবিধাই হয় না। পাড়াটার চেহারা এই ক'বছরেই কিছু বদলেছে। কিন্তু এ বাড়িটার প্রাধান্য এখনও নতুন কোন ইমারৎ খর্ব করতে পারে নি।

বাড়িটা এখনও যেন ঠিক সেই প্রথম দেখার দিনের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন পরিবর্তন তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সেই ছবির মত সদ্য যেন রং-করা ঝকঝকে চেহারা। গেটে সেই দরোয়ান। দোতলা পর্যন্ত সেই লতানে ফুলের বাহার।

গেট দিয়ে ঢোকবার সময় দরোয়ান একবার ভ্রূকুটি করেছিল মাত্র, কিন্তু বাধা দেয় নি। বাধা দোতলার সেই বারান্দা দিয়ে চেনা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত কোথাও পায় নি। পেল একেবারে দরজার সামনেই।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। টোকা দিয়ে ডাকবে কি না ভাবছে এমন সময়ে একটি বর্ষীয়সী ঝি এসে আপাদ-মস্তক একবার ভালো করে দেখে নিয়ে একটু রূঢ় ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চাই বাছা?

সম্বোধনটা সম্মানের নয়। তবু তা গায়ে মাখলে এখন চলে না। শোভনা হেসে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে জানাল। প্রথমে দুখী বৌ নামটা একেবারে জিভের ডগায় এসে গেছল। অতি কষ্টে সামলেছে।

তোমাদের গিন্নি মা'র সঙ্গে দেখা করতে চাই, বলাতেও তেমন কোন ফল হ'ল না। ঝি একটু অপ্রসন্ন মুখেই বললে, তিনি ত এখন কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। বিকেলবেলা এসো।

শোভনার এই ঝি'র কাছে বহুদূর থেকে এসেছে ব'লে দেখা করবার জন্যে অনুনয়-বিনয় জানাতে প্রবৃত্তি হ'ল না। সে একটু শুষ্ক স্বরেই বললে, বিকেলে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি অনেক দূরে থাকি। তোমার

মাকে বোলো, এ পাড়ায় যে শোভা বৌ থাকত সে দেখা করতে এসেছিল। কথাগুলো ব'লে শোভনা ফিরেই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ভেতর থেকে ছিটকিনি খোলার শব্দ পাওয়া গেল।

দরজা খুলে এবার যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে শোভনা অবাক্।

এই কি সেদিনের সেই দুখী বৌ, যার নামটা হিংসে করেই কেউ দিয়েছে বলে সেদিন সন্দেহ করা স্বাভাবিক ছিল!

দুখী বৌ-এর সাজ-পোশাক থেকে চেহারায় আচরণে তখন অন্ততঃ দুঃখের কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় নি।

এ দুখী বৌ কিন্তু স্পষ্টই যেন দুঃখের প্রতিমূর্তি।

সাজ-পোশাক গয়না সবই আছে এখনো। কিন্তু আসল মানুষটার সমস্ত বাইরের আবরণ ভেদ ক'রে অন্তরের ব্যথিত দীন চেহারাটা যেন আর লুকানো যাচ্ছে না।

দুখী বৌও শোভনাকে চিনতে না পেরেই বোধ হয় খানিকক্ষণ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আনন্দে এসে তার দু'টি হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে—তুমি আসবে আমি ভাবতেই পারি নি, ভাই। ভাগ্যিস্ আমি বাইরে ঝির সঙ্গে তোমার কথাবার্তা শুনে দরজাটা খুললাম, নইলে তুমি নিশ্চয় অভিমান করে চ'লে যেতে। আমি জানতেও পারতাম না।

শোভনা এই উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনার ধরণ সত্যিই আশা করে নি। দুখী বৌ-এর সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সেটা নিবিড় অন্তরঙ্গতায় পৌঁছোয় নি কোনদিনই।

আজকের এই অভ্যর্থনার আকুলতার মধ্যে দুখী বৌ-এর নিজের করুণ নিঃসঙ্গতাই কি ফুটে উঠছে?

শোভনাকে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর বসিয়ে কথা বলবার ধরণে তাই মনে হ'ল।

দুখী বৌ তখনও সহজ ভাবেই আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ করত, কিন্তু কোথায় যেন নিজেকে রাশ টেনে ধ'রে রাখছে বলে মনে হ'ত। সেই রাশটাই যেন আজ নেই।

দুখী বৌ-এর বুকের মধ্যে যেন কথার স্রোত রুদ্ধ হয়ে ছিল। শোভনাকে পেয়ে সেই রুদ্ধ স্রোত হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে।

দুখী বৌ এক নিঃশ্বাসে যত কথা বলে গেল, প্রশ্নও করে গেল তার মধ্যে তত।

কি ভাগ্যি, সে সব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই। নইলে শোভনা অসুবিধাতেই পড়ত।

প্রশ্ন তার অজস্র ও বিচিত্র। শোভনারা এ বাড়ি ছেড়ে উঠে গেল কেন? শোভনার ছেলেপুলে হয়েছে কি না? এতদিন একবার দেখা করতে আসে নি কেন? আসার অসুবিধে থাকলে একটা চিঠিও ত দিতে পারত। তা দেয় নি কেন? এখন কোন্ পাড়ায় তারা আছে? শোভনার স্বামী এখন কি কাজ করে? শোভনা এত রোগা হয়ে গেছে কেন?

শোভনা সুবিধে মত কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিলে, কয়েকটার দিলে না।

এই উচ্ছ্বসিত আলাপের মধ্যে নিজের বক্তব্যটা কি ভাবে যে জানাবে তা ঠিক করে উঠতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

দুখী বৌ আদর-যত্ন আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলে না কোন দিক্ দিয়ে।

বিকেলেই চ'লে যেতে হবে জেনে জোর ক'রে চা-জলখাবার খাওয়ালে অসময়ে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটার নতুন কি কি পরিবর্তন হয়েছে তা দেখালে। মাঝে কিছুদিনের জন্যে যেখানে বেড়াতে গেছল সেই দক্ষিণ-ভারতের ভ্রমণ-কাহিনী সবিস্তারে বলে সেখানে তোলা সব ছবির অ্যাল্বাম্ এনে সামনে ধরলে। যতক্ষণ শোভনা সেখানে রইল, সমস্তক্ষণই কথার স্রোত বইয়ে রাখলে দুখী বৌ। শোভনার মনে হ'ল, এ কথার স্রোত থামলেই কোন এক মরুরুক্ষ হৃদয়ের চড়া ঠেলে বেরিয়ে পড়বে, এই যেন দুখী বৌ-এর ভয়।

বিদায় নিয়ে ফিরে যাবার সময় শোভনা নিজের কথাটা বলবার একটু বুঝি সুযোগ পেল। কিন্তু সে সুযোগ আর নেওয়া হ'ল না।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে পর্যন্ত দুখী বৌ তাকে এগিয়ে দিতে নামছিল। ছেঁড়া ময়লা থান-পরা একটি প্রৌঢ়া সিঁড়ির নিচে দুখী বৌ-এর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল।

প্রৌঢ়া দুখী বৌ নামবার সঙ্গে সঙ্গে গদগদ ভাষায় যা জানাল তাতে বোঝা গেল, দুখী বৌ-এর কথায় তার স্বামী প্রৌঢ়ার একটি ছেলের কোথায় একটা চাকরি করে দিয়েছেন। প্রৌঢ়া সেই জন্যেই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে।

দুখী বৌ একটু অস্বস্তির সঙ্গে সে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস

যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি থামিয়ে শোফারকে গাড়ি বার করতে বললে।

গাড়ি যে তার জন্যেই ডাকা হতে পারে, শোভনার তা কল্পনাতীত। কৃতজ্ঞ প্রৌঢ়া চ'লে যাবার পর একবার মনে হ'ল, তার কথাটাও এই সময়ে ব'লে ফেলা যায়।

কিন্তু তখন শোফার এসে সেলাম ক'রে কাছে দাঁড়িয়েছে আর দুখী বৌ শোভনাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসার জন্যে হুকুম দিচ্ছে।

একদিকে বিস্ময়ে বিহ্বলতায়, আর-একদিকে নিজেরই কুণ্ঠায় আসল কথা কিছুই শোভনার বলা হ'ল না।

শুধু একটু মৃদু প্রতিবাদ সে জানাতে পারলে—গাড়ি আবার কেন?

নয় কেন ভাই! বিকেলে গাড়িটা ত বসেই থাকে। তোমার নতুন বাসাটা বরং রামসেবক চিনে আসুক।

শোভনা এর পর নীরবেই গাড়িতে উঠে বসল। তার নতুন বাসাটা যে রামসেবকের মত খানদানী ড্রাইভারকে দেখাবার নয় তা আর কি করে সে বোঝাবে।

রামসেবককে গাড়ি নিয়ে শোভনার বাসা পর্যন্ত সেদিন যেতে হ'ল না। দরকারের অছিলায় বড় একটা বাজারের কাছেই নেমে শোভনা তাকে বিদায় দিলে।

সেখান থেকে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি ভিড়ের একটি বাসে বাসায় ফিরতে ফিরতে শোভনার মনে হ'ল নিজের ব্যর্থ অভিযানের হতাশার চেয়ে দুখী বৌ-এর সব থেকেও কিছু না থাকার বেদনার রহস্য যেন বড় হয়ে উঠেছে।

ক্রমশঃ

## "সংক্রামক"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমরা ছয়জন যাত্রী ছিলাম; এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নবদম্পতি, একটি একেবারে সদ্য-বিবাহিত বাঙালী যুবক, বধূ সহ-ই এবং তাদের পরিচারিকা, এদিকে আমি নিজে। আমি এই ষ্টেশনেই উঠলাম, ওরা আগে থেকেই ছিল ব'সে। তিনখানা বার্থ আমরা আলাদা-আলাদা ক'রে দখল করে রয়েছি। পরিচারিকাটি প্রৌঢ়া, একটু বার্ধক্য-ঘেঁসাই, ওদের বেঞ্চে একটু গুটিয়ে-সুটিয়ে নিদ্রা দিচ্ছে।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দম্পতিটিও সদ্য বিবাহিত। ঘেঁষা-ঘেঁষি হয়ে ব'সে একে অন্যের হাতে হাত দিয়ে মনে হয় যেন নিজেদের সান্নিধ্যের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে করতে যাচ্ছে। শুধু মূর্তির মতো চুপ করে ব'সে থাকাই নয়, প্রকাশ্যে হ'লে আমরা যেগুলোকে বে-আদবি বলি তারও এক-আধটা নমুনা ছাড়ছে মাঝে মাঝে। একে তো ওরা ওগুলাকে ধরেই না, তার ওপর আমার স্বজাতিও নয়, সুতরাং কোনরকম কুণ্ঠার বালাই নেই। যুবকটির চোখে একটু গোলাপী নেশার ভাবও রয়েছে মনে হ'ল।

বাঙালী দম্পতিটি, যেমন বলেছি, একেবারেই সদ্য-বিবাহিত। তার সব রকমই চিহ্ন রয়েছে দেহে-আভরণে; কোণে, পরিচারিকার হেফাজতে টোপর আর মুকুট পর্যন্ত। বসে রয়েছেও দু'জনে সেই ভাবেই অপরিচয় এবং নূতন লজ্জার একটি সুষ্ঠু ব্যবধান রক্ষা করে, পরস্পর থেকে প্রায় হাত দুয়েক তফাতে। গাড়িতে এর বেশি আর পাব কোথায়?—এ ভাবটুকু বেশ স্পষ্ট।

বড় ষ্টেশন, গাড়িটা একটু বেশিক্ষণই দাঁড়াল। বরযাত্রীর দলটা পেছনে কোথায় বসেছে, বরের দু'টি বন্ধু প্ল্যাটফরমেই দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করল খানিকটা, হাসি-মস্করার ওপর দিয়েই। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দম্পতি এক-ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে, গার্ড হুইসিল দিলে বন্ধুদের একজন বলল—"ওহে ভায়া, দেখে শেখো, Life is short (জীবন অল্পস্থায়ী)"।

বধূটির মাথায় ঘোমটা আজকালের হিসাবে একটু বেশিই নীচু, ওরা আসতে আরও একটু নামিয়ে অল্প ঘুরে বসেছিল, কথাটা শুনে আর একটু নামিয়ে দিল।

আমি এদিককার বার্থের পিঠে ঠেসান দিয়ে বই পড়ছি। অবশ্য নিতান্ত একটানাই নয়।

গাড়ি ছেড়ে মাঠের দিকে বেশ খানিকটা বেরিয়ে এলে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটি অল্প একটু স'রে এল এদিকে। কিছু বলতে চায় মনে হওয়ায় একটু ভ্রূ কুঁচকে চাইতে বলল—"Babu, would you mind if we come over to your berth! It is so stuffy this end." (আপনার বার্থে চলে এলে কিছু কি মনে করবেন? এদিকটা বড় গুমোট যেন)।

আমরা এদিকে জানলার ধারের দুটো বার্থ নিয়ে বসে আছি, ওদেরটা ভেতরের দিকে, ওপরের পাখাতেই যা কিছু করে। বললাম—"You are quite welcome" (স্বচ্ছন্দেই আসতে পারেন)। বই, খবরের কাগজ যা ছড়ানো ছিল, সামটে-সুমটেও নিলাম। যুবকটি উঠে

তরুণীটির দিকে ঘুরে বলল—"Come on pretty, it's so airy over there" (চলে এসো মাণিক, ওদিকটা দিব্যি হাওয়া কেমন)।

মেয়েটি ঠোঁট দুটি জড়ো করে মানের কূজনই তুলল, বলল—"Not I; please yourself. I am quite comfortable here" (আমি যাচ্ছি না, খুশি হয় তুমি যেতে পার। এখানেই দিব্যি আরামে আছি)।

যুবক একটু কৌতুকের হাসি ঠোঁটে ক'রে সবটুকু শুনল, তার পর নিজের দু'টি আঙুল চুম্বন ক'রে হাতটা ওদিকে একটু ঝেড়ে দিয়ে বলল—"Well, so long, darling. Don't take on." (তা হলে আসি সোনা আমার, দুঃখু করো না)।

কপট বিদায় নিয়ে আমার সামনাসামনি এসে বলল—"She is glum" (গোমড়া মুখ ক'রে বসেছে)। নিজেও গাল দুটো ফুলিয়ে গোমড়া মুখের নকল ক'রে একটু হাসল, অবশ্য ওদিকে পেছন ফিরেই। আমায়ও হাসতেই হ'ল একটু, বয়সের খাতির করবে না ত?

কাছেই বসল আমার। আলাপ সুরু করে দিল—কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে বাড়ি। নূতন বিবাহ করে মধুচন্দ্রিকা (হনিমুন) করতে বেরিয়েছে দু'জনে। মুসৌরি চলেছে, সেখানে দিন কতক কাটিয়ে যাবে কাশ্মীর।...কাশ্মীর শুনেছে ভূস্বর্গ, তা ওদের জীবনের এই ক'টা স্বর্গীয় দিন সেখানে কাটাতে না পারলে নিজেদের ওপর অবিচার করা হবে না? আমার কি মত?...ডোরার মতন মেয়ে জগতে নেই, দেখলে মনে হয় না যে স্বর্গ থেকে একটা এঞ্জেল (পরী) নেমে এসেছে?...আমি কি বলি?...বেশ, মানছি তো? কতো ভালো আমি! ধন্যবাদ। আমি এটা ধ্রুবসত্য বলে ধরে নিতে পারি সেও ওর এঞ্জেলকে সুখী করবেই, করবেই, করবেই...

প্রায় একতরফা সংলাপের খানিকটা সংক্ষিপ্তসার। হঠাৎ ঘুরিয়ে নিয়ে একটু এগিয়েও এসে ওদিককার দম্পতিটির দিকে উল্টো-বুড়ো আঙ্গুলের একটু ইসারা করে বলল, "Aren't they newly wed, too, Babu?" (ওদেরও কি নূতন বিয়ে নয়?)

বললাম, "Quite newly. They were married only last night." (একেবারেই নতুন। মোটে কাল রাত্রে বিয়ে হয়েছে)।

"With their consent, Babu, eh?" (তাদের মত নিয়েই ত?)

"Oh yes, surely." (তা বৈ কি, নিশ্চয়)।

"Then why are they so funny! Behaving like quite strangers!" (কিন্তু তাহলে এমন হাস্যকর ভাবে অপরিচিতের মতন ব্যবহার কেন?)

"We don't court before marriage, you know. So they don't know each other quite enough to be free and talkative." (আমাদের মধ্যে বিয়ের আগে পূর্বরাগ নেই, কাজেই ওরা পরস্পরকে এতটা জানে না যে সহজ ভাবে মেলামেশা আর আলাপ-সালাপ করতে পারে)।

বাঙালী যুবকটি কয়েকবারই ঘুরে ঘুরে দেখেছে, বোধ হয় কানে গেছে কিছু কিছু, টের পেয়েছে ওদের কথাই হচ্ছে। এবার আমার কথায় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটি এমন কৌতুক বিস্ময়ে মুখ তুলে শিস্ দিয়ে উঠল, যে ও ভাল ভাবেই ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। চোখোচোখিও হয়ে গেল দু'জনে। এ আমার দিকে চেয়ে বলল,

"Shall I tell him?" (বলব ওকে?)

"Tell what?" (কি বলবে?)—বিস্মিত হয়ে উঠলাম আমি।

মাথাটা একটু চুলকাল, বলল,

"Tell him...tell him that...eh, yes, tell him that life is so short—as the other chap said just now."

(বলব—বলব—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে—ঐ ছেলেটি যেমন বললে, বলব জীবনটা অল্পস্থায়ী)।

"He will take offence" (রাগ করবে)—আমি বললাম।

ঠোঁট দু'টো জড়ো ক'রে একটু মাথাটা দোলাল। হঠাৎ উঠে প'ড়ে বলল, "My sweetie, sweetie Dora has taken offence, Oh, I must be gone, Babu." (আমার মিষ্টি ডোরা রাগ করেছে বাবু, চললাম)।

অল্প জীবন থেকে যেটুকু বাদ পড়ল সেটুকু পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে যেন আরও নিবিড় হয়ে বসল দু'জনে।

বইয়ে মন দিলাম আমি। এক্স্প্রেস্ গাড়ী; ষ্টেশন মাড়িয়ে মাড়িয়ে ছুটে চলেছে।

পরের ষ্টেশনে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দম্পতি নেমে গেল। ওদের এখানে গাড়ী বদল। নামবার আগে যুবকটি আমার সঙ্গে বিদায়ী করমর্দন করতে এসে হাতটা ধরে করুণনেত্রে চেয়ে বলল, "Well Babu, tell them that life is short, they must make the most of it; please do." (ওদের বল, জীবনটা ক্ষণস্থায়ী, যতটা পাওয়া যায় বের করে নিতে হবে তার মধ্যে থেকে। হ্যাঁ, নিশ্চয় বল)।

একটু হেসে বললাম, "How can I?" (কেমন

করে তা পারি )। "Poor dears !" ( আহা বেচারি ) —ব'লে ওদের দিকে একটা দৃষ্টি হেনে, একটা হাল্‌কা নৈরাশ্যের শিস্ ছেড়ে নেমে গেল।

অবশ্য না বললেও কাজ হ'ল।

পিপাসা পেয়েছে। গাড়ীর বরফ লেমনেডের বিক্রেতা-লোকটাকে না দেখে নিজেই নেমে গেলাম। একেবারে পেছনের দিকে ব'লে ফিরতে একটু সময় গেল, গাড়িতে যখন উঠলাম তখন গার্ড বাঁশি বাজিয়েছে। লোকটাও আমার পেছনে পেছনে এসেছে, আমি বসতে বোতলের ছিপি খুলে, বরফশুদ্ধ গেলাসে জলটা ঢেলে আমার হাতে দিল। বোতলটা দিয়ে নেমে গেল। গাড়িও দিল ছেড়ে।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, গেলাসটা একটু নেড়ে নিয়ে মুখ তুলে চুমুক দিতে গিয়ে ওদিকে নজর পড়ে যেতে দেখি দুজনের মধ্যে দূরত্বটা অনেকখানি কমে গেছে। জীবনের স্বল্পতার সম্বন্ধে চেতনার আর একটা লক্ষণ দেখলাম বধূটির ঘোমটা বেশ খানিকটা গেছে উঠে। বসে আছেও দুজনে এমন ভাবে সামনা সামনি হয়ে যে বেশ বোঝা যায়, আলাপ আরম্ভ করবার প্রস্তুতি নয়, খানিকটা যেন হয়েই গেছে, আমি এসে পড়তে গেছে থেমে।

এ ভাবটা অবশ্য রইল না, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ-বিরতি যে দীর্ঘ করা চলে না এটা বুঝেছে ওরা দুজনে। আমি গেলাসটা নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিলাম রয়ে রয়ে। শেষ হওয়ার সঙ্গে গেলাস রেখে একেবারেই বইয়ের অন্তরালে চলে গেলাম। যখন একটা গল্প শেষ হতে আপনিই বইটা অভ্যাস মত নেমে গেছে, নজর পড়ল দূরত্ব আর প্রায় নেই বললেই হয়, অবশ্য বাঙালী দম্পতি হিসাবে যতটা রয়-সয়; আর পুরোদমে আলাপ চলছে। দুজনের মুখ অবশ্য বাইরের দিকেই। বইটা তুলে নিয়ে আর একটা গল্পে মন দিলাম। গাড়ি ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই কোন দিকে।

এর পর যখন এ গল্পটাও শেষ হতে দৃষ্টিটা আবার সেইভাবে সামনে গিয়ে পড়ল ( অভ্যাস ত ম'লেও যায় না ), দেখি আর একটু পরিবর্তন হয়েছে, এবার একটু বিশিষ্ট রকমেরই। অবশ্য দূরত্বটা আগের মত ভদ্র রকমই আছে, তবে এবার বধূর একটি হাত যুবকটির হাতের মধ্যে, এবং সংলাপের ধারাও গেছে একটু বদলে। একটু জোর এবং ঘন ঘন, মুখের ভাবও দুজনের গম্ভীর। অবশ্য কলহজাতীয় কিছু নয়, তবে—"হ্যাঁ নিশ্চয়···দ্যুৎ··· মিলিয়ে দ্যাখো···তা কখনও হতে পারে?" এই গোছের কতকগুলি শব্দ ভেসে আসতে—(জোর ফিসফিসানিতেই) বোঝা গেল কোন একটা ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য চলছে। তার পর আমি বইটা তুলে আবার নেপথ্য অবলম্বন করতে যাব,—ওদিকে ফিরেই ওদের চলছিল, যুবকটি হঠাৎ ঘুরে বলল—"দয়া করে শুনুন।"

বইটা সরিয়ে নিতে সেকেণ্ড কয়েক স্থির দৃষ্টিতে চেয়েও রইল আমার মুখের পানে, কি যেন মেলাচ্ছে; প্রশ্ন করল "ইয়ে···কিছু মনে করবেন না, আপনি কি অমুক লেখক?" নামটা করল।

বললাম, "হ্যাঁ।"

একটা যেন বিপর্যয় ঘটে গেল। এর হাতটা আলগা হয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বধূটি নিজের হাতটা টেনে নিয়ে সট্ করে একেবারে হাত দুই-আড়াই গেল সরে। ঘোমটাটুকুও একেবারে আধ হাত নেমে গেল কপালের নীচে, সেই সঙ্গে ঐ দিকে ঘুরে একটু দোলা, যার মানে হয়—'কেমন, দেখলে ত?

পরের ভদ্রতাসঙ্গত কথাটুকু বলতে একটু দেরিই হয়ে গেল যুবকের। বলল, "ও! আমিও তাই ভাবছিলাম—কোথায় যেন দেখেছি, কোন সভাসমিতিতেই হোক, বা হয়ত ফটোই।···নমস্কার।"

কথা চালানো অস্বস্তিকর হবেই বেচারির পক্ষে, আমি প্রতি-নমস্কারটুকু করে আবার বইয়ের আড়াল হয়ে নিলাম।

মন বসাতে পাচ্ছি না কিন্তু একেবারেই আর। কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটির সেই কথা দু'টি—"পুওর ডিয়ার্স্!" আমার দোষ নেই, তবুও একটা অনুতাপ হচ্ছে—আমিই প্রতিবন্ধক হলাম শেষ পর্যন্ত!

গাড়ির গতিবেগ ক্রমেই এসেছিল, ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। অনুতাপের মধ্যে চিন্তা ক'রে একটা ভেবেও ঠিক করে নিয়েছি। গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, গলা ঝেড়ে নিয়ে বললাম, "যখন চেনা হয়ে গেল, একটু উপকার করতে হবে তোমায় বাপু।"

"কি বলুন।" আগ্রহের সঙ্গেই ঘাড়টা এগিয়ে উত্তর করল যুবক।

"তেমন কিছু নয়, আমার এই জিনিসগুলোর ওপর একটু নজর রাখা। আগের ষ্টেশনে আমার একটি পরিচিত লোক উঠলেন দেখলাম, একটু আলাপ করে আসি তাহলে।"

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে বললাম, "বেশ ত? যাই তাহলে?"

মাথাটা অল্প কাৎ করেই সম্মতিটা জানাল, একটু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে।

আমি নামতে একজন প্রৌঢ় বেহারী ভদ্রলোক একটা স্যুটকেস হাতে করে উঠলেন। তা উঠুন, ক্ষতি নেই। উনি ত আর 'অমুক' লেখক নন।

# রূপকথার ষাট বছর

শ্রীইন্দিরা দেবী

রূপকথার প্রতি প্রাপ্ত-বয়স্কদের অনেকেরই যে মনোভাব তা উন্নাসিকতার পরিপোষক ব'লে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রূপকথা যেন একান্তভাবে ছোটদের ভুলিয়ে রাখার একটা সাহিত্যিক কৌশল—এ মতবাদও অনেকেই সমর্থন করে থাকেন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সীমা যাদের জীবনে অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁরা রূপকথা-বিলাসীদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে থাকেন তা অনেকটা কৃপা-মিশ্রিত অবজ্ঞা। কিন্তু বয়স্ক-মনের সমগ্র পরিচয়টি যাঁদের চোখে ধরা পড়েছে তাঁরা জানেন যে, রূপকথার প্রতি বয়স্কদের মনোভাবে যদি উন্নাসিকতার কোন পরিচয় পাওয়াই যায় তাহলে সে উন্নাসিকতা নেহাৎই বাইরের খোলস—অন্তরের আসল পরিচয়টি গোপন করার একটি ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। যাঁদের জীবনের চক্র অর্ধপথ উত্তীর্ণ হয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমা লঙ্ঘনে উদ্যত—কিংবা যাঁরা প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছেন তাঁদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন থাকে একটি চিরলোভাতুর শিশুমন—নিজের অজ্ঞাতেই কত সময় বৃদ্ধের খোলস খ'সে পড়ে, বয়সের আবরণ বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে আসে স্বভাব-চঞ্চল একটি সতেজ শিশুমূর্তি, তাদের কাজে দেখা যায় চপলতা, কথার ভিতর প্রলাপের সফলতা—দু'হাত ভ'রে কেড়ে নিতে চায় জীবনের সঞ্চয় থেকে মুঠো মুঠো আনন্দ। পিছনে ফেলে আসা জীবনের ক্ষণ-আনন্দের মুহূর্তগুলো তার মনের আকাশে ছড়িয়ে দেয় ইন্দ্রধনুর রং, তার কল্পনায় ভেসে ওঠে অতীত জীবনের রহস্যঘন কল্পলোক। যে কল্পলোক থেকে বয়স বাড়ার অপরাধে সে সমাজের চক্ষে বহুকাল থেকে নির্বাসিত হয়ে রয়েছে। সেই হারিয়ে-যাওয়া কল্পলোকের দিকেই বার বার ফিরে তাকায় তার লুব্ধ মন—তাই রূপকথার প্রতি সকল বয়সের, সকল স্তরের মানুষেরই স্বাভাবিক আকর্ষণ। রূপকথার রাজ্যের সর্বত্র বিচরণের অবাধ অধিকারী শিশু, কিন্তু সেই নিষিদ্ধ রাজ্যের রুদ্ধ-দ্বারের একটি সামান্যতম ছিদ্রপথও যদি ভাগ্যক্রমে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তারই কামনা করে অ-শিশু আখ্যাধারী মানুষ।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষের ক্ষেত্রেই রূপকথার প্রতি দেখা যায় এমনি দুর্নিবার আকর্ষণ। অতীতকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। রূপকথার জনপ্রিয়তার মূলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই অতিশয় স্পষ্ট সরল সত্যটি। তাছাড়া বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয় যে বহুতর তিক্ত অপ্রিয় অভিজ্ঞতা তার নিরসনের জন্যেও প্রয়োজন অ-বাস্তব, কল্পনাশ্রয়ী চিত্র-লোকের। নিছক, নিরেট, ষোল-আনা বাস্তব সত্য জীবনের ভার দুর্বিষহ করে তোলে—তাই অ-বাস্তব অলৌকিক জগতের সন্ধানে ফেরে মানুষের মন।

এ কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে, শিশুমনের কাছে রূপকথার আবেদন যত গভীর আর মর্মস্পর্শী, শৈশব যাদের বহুকাল অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের কাছে রূপকথার আবেদন অত গভীর হতে পারে না। বাইরে জমাট অন্ধকার, দূরে একটানা ঝিঁঝির ডাক, ঘরের কোণে মাটির প্রদীপ, সেই আধো-আলো অন্ধকারে যেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের ছায়াগুলো কাঁপছে, ঘন হয়ে ভিড় ক'রে ব'সে আছে তারা ঠাকুরমা কিংবা দিদিমাকে ঘিরে, তাদের সবগুলো ইন্দ্রিয় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে দিদিমার মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথা শোনার জন্যে—পক্ষীরাজ ঘোড়ার সওয়ার রাজপুত্র, সাত-সমুদ্র, তেরনদী, তেপান্তরের মাঠ, তার মাঝখানে পাতায় পাতায় ঢেকে-যাওয়া বুড়ো অশত্থগাছ, সেই গাছের ডালে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী—তাদের কাছে জেনে-নেওয়া রাজপুত্রের পথের সন্ধান—সাতমহলা বাড়ীর লোহার দরজা পার হয়ে শ্বেতপাথরে তৈরী কক্ষ—তার দুধের মত সাদা পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে কুচবরণ রাজ-কন্যা, একপাশে এলিয়ে রয়েছে তার মেঘবরণ চুল—সৃষ্টি করে এক অপূর্ব, রহস্যমধুর মায়ালোক। শিশুর কাছে এ জগতের আকর্ষণ দুর্নিবার—বয়স্কের চোখেও ধরা পড়ে এই মায়ালোকের হাতছানি।

যুগযুগান্ত পার হয়ে চলেছে মানুষের জীবনের কত পরিবর্তন-চিহ্নিত যাত্রাপথ। কর্মব্যস্ততার তাড়নায়

অভাব দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, উন্মত্ত হিংসার তাণ্ডবে অতিষ্ঠ মানুষ বলেছে—সংগ্রাম-সর্বস্ব এই দানব-জীবনে নেই কোন কবিতার স্থান তাই 'কবিতা তোমায় দিলেম ছুটি।' কিন্তু এ মনোভাব স্থায়ী হয় না, পরক্ষণেই মনে হয়, এই সর্বাত্মক বন্ধন থেকে চাই মুক্তি—অবাস্তবের প্রলেপ দিয়ে নিরসন করতে চায় বাস্তবের রূঢ় আঘাত।

রূপকথার সৃষ্টি মানুষের কল্পলোকে;—তার প্রথম আবির্ভাব তাই সন তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। লোক-সাহিত্যের অঙ্গীভূত রূপকথা কোন এক বা একাধিক-সাহিত্যিকের সৃষ্টি নয়। বহু যুগ আর বহু-জনের সাধনায় আত্মপ্রকাশ করেছে রূপকথাশ্রয়ী সাহিত্য। গত ষাট বছরের সাহিত্যের হিসাব মেলাতে গেলে রূপ-কথাশ্রয়ী সাহিত্যের কথা আলোচিত না হলে সে হিসাবে থেকে যাবে অনেকখানি ফাঁকি। ঊনবিংশ শতক থেকেই রূপকথাকে সাহিত্যের আসরে আমদানী করার যে চেষ্টা চলেছিল, সে রূপকথা ছিল অ-ভারতীয় সাহিত্যভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে খাঁটি বাংলার রূপকথাকে সাহিত্যের দরবারে এনে হাজির করলেন স্বনামধন্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ঠাকুরমার ঝুলি বা বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের ভূমিকা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখককে সমগ্র বাংলা দেশের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দন জানিয়ে-ছিলেন তাতে তিনি লিখেছেন :

"ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায়! এই মোহন-ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের Fairy Tales আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে·····দক্ষিণা বাবুকে ধন্য। তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"

দক্ষিণারঞ্জনই বাংলার ছোটদের হাতে প্রথম তুলে দিলেন বাংলার আদি ও অকৃত্রিম লোক-সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখার থেকে সংগ্রহ-করা ফুল ফল। বাঙালীর প্রাণরসে সিক্ত এই ফল ফুলের সাজিটি স্বাভাবিক ভাবেই কেড়ে নিল ছোটদের পল্লববাহী লোভাতুর মন। এতকাল ধরে তাদের কল্পনার ক্ষুন্নিবৃত্তি চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা সকলেই বিদেশী ঝুলি নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে যিনি ছিলেন অগ্রগণ্য তাঁর নাম আজকের শিশুরা দূরের কথা, বড়রাও পর্যন্ত ভুলে যাবার উপক্রম দেখা যাচ্ছে। বিদেশী রূপকথা তিনি বাংলা ভাষায় তর্জমা ক'রে বাঙালী ছেলেমেয়েদের কাছে পরিবেশন করেছিলেন—তিনি স্বর্গীয় মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। আজ থেকে একশো বছর আগে তিনি Hans Anderson-এর রূপকথার কতকগুলো কাহিনী ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় তর্জমা করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা থেকে জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত সে যুগের বয়স্করা পর্যন্ত এই অনুবাদ-গ্রন্থগুলি উৎসাহের সঙ্গে পড়তেন। পরবর্তী চল্লিশ বছর ধ'রে শিশুসাহিত্যের কলেবর আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও ছোটদের উপযোগী সাহিত্যের আসরে রূপকথা পরিবেশনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় নি। এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন স্বনামধন্য যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ১৩০১ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রকাশিত হাসি ও খেলা বইটিতে তিনিই সর্বপ্রথম 'সাতভাই চম্পা'র রূপকথাটি পরিবেশন ক'রে শিশুসাহিত্যিকদের কাছে তুলে ধরলেন এক নূতন অচেষ্টিতপূর্ব আদর্শ। এ বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও একজন অগ্রণী ছিলেন—শিশু ( এবং বড়দেরও ) পরম প্রিয় সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর ক্ষীরের পুতুল প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে ৬৫ বছর আগে। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। অবনীন্দ্রনাথের

এই রচনা প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পরেই আত্মপ্রকাশ করে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর লেখা 'সাতভাই চম্পা' এবং 'নাপিত ও শেয়াল'। দ্বিতীয় বইখানা 'টাকডুমাডুম্' নামে নাটকাকারে পরে শিশুদের অভিনয় উপযোগী করে প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদন, যোগীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপকথা পরিবেশন করে থাকলেও বাংলার লোক-সাহিত্য থেকে সংগৃহীত রূপকথা ভিত্তি করে ব্যাপকভাবে তাকে শিশু-সাহিত্যে আমদানী করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন, "তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন—তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে।" ঠাকুরদার ঝোলাও রূপকথাশ্রয়ী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অনুপম কীর্তি।

দক্ষিণারঞ্জন শিশু-সাহিত্যের রংমহলের যে কথাটির জালাবরণ ঘুচিয়ে তাকে উদ্ভাসিত করে তুললেন পাঠক সমাজের কাছে—সেই অনাবিষ্কৃত কক্ষের রত্নভাণ্ডার আকৃষ্ট করেছিল পরবর্তী সাহিত্যিকদের দৃষ্টি। দক্ষিণারঞ্জনের পরবর্তীকালে রূপকথাশ্রয়ী যে সব কাহিনী পরিবেশিত হয়েছিল—তাদের মধ্যে সর্বাধিক শিশুপ্রিয়তা (জনপ্রিয়তাও বলা চলে) অর্জন করেছিল শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা। এটি মৌলিক রচনা নয়। শ্রীশচন্দ্র বসু কর্তৃক সংগৃহীত এবং ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত Folk Tales of Hindusthan থেকে অনুবাদ ক'রে শান্তা ও সীতা দেবী হিন্দুস্থানী উপকথা প্রকাশ করেছিলেন। অনুবাদ গ্রন্থ হলেও এটি মূল গ্রন্থের মত সুখপাঠ্য।

শান্তা ও সীতা দেবীর অনূদিত এই গ্রন্থটি (সম্প্রতি

বইটি পুনমু্দ্রিত হয়েছে) প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু একমাত্র সাঁওতালী উপকথা ছাড়া দেশীয় লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত কোন বই রূপকথাশ্রয়ী সাহিত্যের সংখ্যা বা কলেবর আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করে নি। অথচ পশ্চিম দেশীয় বিদ্বজ্জনেরা অক্লান্ত আগ্রহে ও নিরলস শ্রমে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গেছেন। সাঁওতালদের লোক-সাহিত্য, বাসুদের দেশে প্রচলিত কাহিনী, আঙ্গামী নাগাদের দেশের কিংবদন্তীমূলক উপন্যাস 'জাতক' উপাখ্যানের মতই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে। এই সব লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সবগুলি কাহিনীই শিশুমনের উপযোগী নয়; কিন্তু অনেকগুলি উপন্যাসই যে শিশুমনের আদর্শ খাদ্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিশু-সাহিত্যের সেবায় যাঁরা নিজেদের প্রতিভা নিয়োজিত করেছেন তাঁদের দৃষ্টি আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত শিশুমনের উপযোগী রূপকথার প্রতি সবিনয়ে আকর্ষণ করি—এতে শিশু-সাহিত্যের দৈন্য ঘুচবে, দেশের নাড়ীর সঙ্গে পরিচিতি ঘটবে শিশুমনের আর-বয়স্ক-মনের অধিকারীরাও এই রূপকথার আলোতে হারিয়ে-যাওয়া, পিছনে ফেলে-আসা কল্পলোকে (অন্ততঃ সাময়িক ভাবে) প্রবেশের পথটিও তাঁদের দৃষ্টিপথে উদ্ঘাটিত হয়েছে, দেখতে পাবেন।

অনামী—দিলীপকুমার রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

কবি, সংগীতকার, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, পত্রলেখক, ভাষাবিদ্ এবং অধ্যাত্মবাদী ও যোগী—একাধারে এত গুণের সংমিশ্রণ একালে আমাদের দেশে বোধ হয় একমাত্র একজনের মধ্যেই সম্ভব হয়েছে। শিক্ষিতজনেরা সে-নাম জানেন। বৈশেষিক জ্ঞানের যুগে বহু-গুণান্বিত ব্যক্তির কদর কম; সন্দেহাকুল সময়ে বিশ্বাসীর ভাগ্যে জোটে অখ্যাতি, এমন-কি উপহাস! প্রচুর গুণের অধিকারী দিলীপকুমার রায়ের উপরে বিধাতার দান অকৃপণ বর্ষিত হলেও, এবং বিশ-তিরিশ দশকের খ্যাতিমানদের স্নেহসুধারস লাভ করা সত্ত্বেও, সমসাময়িক জনের সুখ্যাতি তাঁর উপরে কৃপণতাই করেছে। তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টিতে সর্বাধুনিক বিদগ্ধজনের পরম নির্লিপ্ততা; তাঁর ব্যক্তিত্ব বিচারে প্রবল অনীহা।

বিশুদ্ধ সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠিতে তাঁর সাহিত্যকে মূল্যবান্ বলা হয়ত কঠিন। কিন্তু কবিত্ব ও যোগিত্বের সম্মিলনে তাঁর যে ভাব-সত্তার সৃষ্টি হয়েছে তা নিশ্চয়ই অনুধাবন ও বিচারের অপেক্ষা রাখে। এ-দিক দিয়ে দেখতে গেলে দিলীপকুমার একক, অনন্য। দীর্ঘদিন বাদে তাই তাঁর 'অনামী'র পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ হাতে আসায় তাঁর রচনাও, তার চাইতেও বড়, তাঁর সত্তা বিচারের সুযোগ পাঠক-সাধারণ পাবেন।

ভূমিকায় দিলীপকুমার বলেছেন: জীবনের সায়াহ্নে মনে হ'ল 'অনামী'র দ্বিতীয় সংস্করণে আমার শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি চয়নিকা প্রকাশ করে রেখে যাই তাঁদের জন্যে যাঁরা ভাগবতী কবিতার রস পান। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু সম্প্রতি আমাকে লিখেছিলেন সাবধান করতে চেয়ে—যে আমার ভক্তসত্তা আমার সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে। তাঁর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। যাঁর আলোতে ভুবন আলো তাঁর ধ্যানে যদি আমার ভক্তসত্তা আমার আর সব সত্তাকে ছাপিয়ে ফুলের মতন ফুটে ওঠে তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় পরিণতি আর কি হতে পারে?

'অনামী'র বর্তমান সংকলনে আমার আগেকার অনেক কবিতাকেই বাদ দিতে হয়েছে আমার নানা প্রিয় গান ও কবিতার ঠাঁই করতে যেগুলির দ্বারা আমি পরিচিত হতে চাই তাঁদের কাছে যাঁরা 'অনামী'কে নামের মন্দিরে আবাহন করে নামভজনে নামীকে পেতে চান।'

উপরের স্পষ্ট বক্তব্যের পর সংকলনের সাহিত্যিক মূল্য খুঁজতে যাওয়া প্রায় বিড়ম্বনারই নামান্তর মনে হবে। অন্ততঃ আধুনিক নিছক সাহিত্যিকেরা যে তা করতে যাবেন না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কিন্তু দিলীপকুমারের সমগ্র সত্তায় যাঁদের আগ্রহ আছে, ঔৎসুক্য আছে, তাঁরা কষ্ট করে কাব্য, সংগীত ও চিঠিপত্রের এই সংকলনটি পাঠ করলে [illegible] সন্ধান পাবেন।

প্রায় স' চারশো পৃষ্ঠার এই পুস্তকের সূচীতে আছে—

(১) মণিমঞ্জুষা—নানা কবির কবিতার অনুবাদ: ব্যাসদেব, কালিদাস, ভবভূতি থেকে সুরু করে শেকস্পীয়ার, কীট্স্, বোদলেয়র, গ্যেটে হয়ে নানক কবীর, দাদু থেকে অরবিন্দ, হারীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি।

(২) কবিতাকুঞ্জ খাতে দিলীপকুমারের নানান কবিতা, শ্রীরামকৃষ্ণ কণিকা, সনেট, প্রভৃতি।

(৩) গীতি-গুঞ্জন—নানান গান।

(৪) মীরা-ভজন—মন্ত্রশিষ্যা, কন্যাপ্রতিম ইন্দিরা দেবীর হিন্দি 'সুধাঞ্জলি' গীতাবলির অনুবাদ এবং,

(৫) ইংরেজী ও বাংলা পত্রাবলী।

কবিতার ভাষান্তর সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের প্রশংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও মণিমঞ্জুষার সকল কবিতা সার্থক অনুবাদ-ধন্য বলা কঠিন, অন্ততঃ বর্তমানের বিচারে। কবিতাগুলি বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন মেজাজের কবির হলেও অনুবাদক যেহেতু একই কালের একই ব্যক্তি তাই সব অনুবাদের ভিতরেই প্রায় একজাতীয় সুরের রেশ পাওয়া যায়, অনেক সময় ভাষারও। তাছাড়া Style is the man কথাটি ত পূর্ণ সত্য লাভ করেছে দিলীপকুমারে।

সংগীতে যাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে তাঁরা জানেন সংগীতশিল্পী হিসাবে দিলীপকুমারের স্থান কোন শীর্ষে। গীতি-গুঞ্জনের সংগীত, যার অনেকগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন খ্যাতিমান্ সুরকার ও সংগীতের সুরে রচিত, বাংলা সংগীতরাজ্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করবে যদি দিলীপকুমারের অননুকরণীয় গায়ন-পদ্ধতিতে তা গীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারতমাতা শীর্ষক সংগীতটি (অনামী, পৃঃ ১১১ কবিতাকুঞ্জ) গীতি-গুঞ্জনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। (সম্ভবতঃ ১৯৪৮ সনের নেতাজী দিবস অনুষ্ঠানে মহাজাতি সদনে দিলীপকুমার ওটি পরিবেশন করবার কালে উল্লেখ করেন যে ওটি ফরাসী জাতীয় সংগীত মার্সাই-এর সুরে রচিত—বর্তমান সমালোচক সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।)

এ সংকলনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, কি ভাববাদী কি যুক্তিবাদী, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, সকলের কাছেই এর পত্রাবলী। ইতিপূর্বে দিলীপকুমারের পত্রাবলী 'অনামী', ১ম সংস্করণ তীর্থংকর, Among the Great প্রভৃতি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এ-সংকলনে প্রকাশিত পত্রের বেশীর ভাগ বাদ দিয়ে কিছু নতুন পত্র বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। কাব্য সংগীত ছাড়া এই পত্রাবলী দিলীপকুমারের মানসিক গঠন বোঝবার বড় সহায়ক। তাছাড়া প্রায় সমসাময়িক বাংলা দেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীর ভাব-কল্পনার কিছু স্পর্শ এই পত্রাবলীতে পাওয়া যায় যা নিঃসন্দেহে মূল্যবান্। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও মোহিতলাল প্রভৃতি বাংলায় এবং কবি জর্জ রাসেল (এ ই), সমারসেট মম, শাহেদ সুরাবর্দি, সুভাষচন্দ্র, কৃষ্ণপ্রেম (রোনাল্ড নিকসন), প্রভৃতি ইংরাজীতে যেসব পত্র লিখেছেন তার মানবিক মূল্য বড় কম নয়। আর

সর্বোপরি আছে শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর সারাংশ : শিষ্যের মনের বহুতর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, বহুতর সন্দেহের নিরসন করেছেন গুরু। অপরের বক্তব্যের উপরে মন্তব্যও করেছেন।

বাংলা পত্রে সুভাষচন্দ্র তাঁর কতকগুলি সামাজিক রাজনৈতিক মত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রস ও কৌতুকবোধে সমুজ্জ্বল। মোহিতলালের তিনখানি চিঠিতে ঐ সাহিত্যধর্মীর ('আমার সাহিত্যই একমাত্র ধর্ম, উহাই আমার আধ্যাত্মিক সাধনারও অঙ্গ, বাণীই আমার একমাত্র সাধন-বিগ্রহ…') বিশ্বাস ও দার্ঢ্যের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি মোহিতলালের সম্পর্কে দিলীপকুমারের চিঠিতে একটি পরম সত্যের ইঙ্গিতও লাভ করা যায় : নিছক সাহিত্যের আদর্শে কেউ শত্রু বৃদ্ধি করে না; There is no such thing as public worry, Sir; there is only private worry (ডক্টর জনসন)।

অধিকতর চিত্তাকর্ষক ইংরাজী পত্রাবলীর মধ্যে এ. ই, কৃষ্ণপ্রেম, স্যর পল ডিউক্স্, প্রভৃতির পত্র যোগ, ভক্তি, ইত্যাদি নিয়ে বেশী ব্যাপৃত। সুভাষচন্দ্রের পত্রের অংশবিশেষ শ্রীঅরবিন্দের হাসির উদ্রেক করেছে (At Subhas's conscientious hesitations between Krishna and Shiva and Shakti I could not help indulging in a smile)। সমারসেট মমের চিঠিতে উপন্যাসকারকে একটি প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আর যাঁর চিঠি, ভাষা, বক্তব্য ও ভঙ্গিতে আকর্ষণ জাগায় তিনি শাহেদ সুরাবর্দি। হিন্দুধর্মের প্রতীক-তত্ত্ব ছেদনে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

অরবিন্দের চিঠির সারাংশসমূহ এ অংশের, তথা এ পুস্তকের, সবচেয়ে মূল্যবান্ অংশ। যোগ বা অধ্যাত্মের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও পৃথিবীর নানান মনীষী সম্পর্কে তাঁর নানান মন্তব্য- তাঁর অপূর্ব সুন্দর ইংরেজীতে হাস্যরসের সোনার জলের আভায় যা সমুজ্জ্বল- অভাবনীয় পাণ্ডিত্যের ঋজুতায় আমাদের স্তম্ভিত করে। আর সবচেয়ে উপভোগ্য তাঁর সেই চিঠিটি যেখানে কৌতুকের ভিতর দিয়ে বিশ্বাস আর যুক্তির দ্বন্দ্ব, আস্তিক্যবুদ্ধি ও নাস্তিকতার পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

বাংলা পুস্তক প্রকাশনার এই স্বর্ণযুগে প্রকাশক যে-ভাবে এই মূল্যবান্ (ছ'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা) পুস্তক প্রকাশ করেছেন তা প্রায় অভাবনীয়। অজস্র ছাপার ভুল, নিকৃষ্ট বাঁধাই (বোর্ডেও নয়) এবং নিরাভরণ অঙ্গসজ্জা বাস্তবিকই পীড়াদায়ক।

প্রণব মজুমদার

**ঋগ্বেদ**—প্রথম অষ্টক—বাংলা পদ্যানুবাদ। ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ। ভারত সংস্কৃতি পরিষৎ, ব্লক কে প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলা গদ্যে ঋগ্বেদের সমগ্র বা অংশ-বিশেষের অনুবাদ একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য অনুবাদ কবিতায় রচিত। ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল অনুবাদক ডক্টর দাশ বেদ বাণীর যেরূপ মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই হৃদয়ের দরদ মিশাইয়া বাংলা ভাষায় সুললিত ছন্দে গাঁথিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন---

"বেদ অনির্বচনীয়ের স্পর্শমুখর নিত্যকালের কবির কবিতা। সে ছন্দ জাগেনি পরিমিতির মাপে, অপরিমিতির উদ্বেল উচ্ছ্বাসে সে আকুল, তাই বেদস্রষ্টা ঋষিরা কর্তৃত্বের বোঝা বইতে চাননি---তাঁরা বলেছেন এ অপৌরুষেয় আবির্ভাব। অন্তরের গভীর গহনে স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতের মত এ অক্ষয় বাণী এসেছে তাঁদের কণ্ঠে।"

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—ধর্ম আর ব্রহ্ম একমাত্র বেদ থেকেই জা যায়—ধর্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে। বেদ লোকবিদ্যাও বটে, রহস্য বিদ্য বটে—একাধারে পরা আর অপরার সমাবেশ। ঋগ্বেদের মন্ত্র দি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত কিন্তু যাগযজ্ঞই ঋঙ্মন্ত্রের একমাত্র প্রতিপা নয়। যজ্ঞার্থ মন্ত্রের সঙ্গে ঋগ্বেদে আছে নানারূপ জাগতিক তথ্য কথা, আর আছে কল্যাণময় আধ্যাত্মিক বিবেচন—

অধ্যাত্মমধিদৈবমধিযজ্ঞং বাধিকৃত্য ত্রেধেমং মন্ত্রং ব্যাচক্ষতে' বৈদি মন্ত্র জ্ঞানের ভাণ্ডার। এই মন্ত্ররাশি যিনিই শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে বিশ্লে করিয়া দেখেন, তিনিই ইহার জ্ঞানের ঐশ্বর্যে অভিভূত হইয়া পড়েন ঋগ্বেদ সংহিতায় আছে—"মহাকাশতুল্য ঋঙ্মন্ত্রের অক্ষর মধ্যে সম দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন; যে ব্যক্তি তাহা জানে না, সে ঋক্ দিয়া কি করিবে? যাঁহারা সে রহস্য জানেন, তাঁহারা জ্ঞান-মণ্ডলে অবস্থা করেন।"

একালের বেদাধ্যায়িগণ অনেকেই দেবপ্রাণ বৈদিক ঋষির অন্তরতম আকূতির দিকে দৃষ্টি দেন না; কেহ বা বেদমন্ত্রের যাগার্থ উপযোগিতা মাত্র বিচার করেন, কেহ বা মন্ত্রবাক্যে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান মাত্র করেন। অথচ বেদ স্বয়ং বলিয়াছেন--

যে ব্যক্তি ঋক্ সাম যজুঃ অথর্বের মূল তত্ত্ব অনুধাবন করে না, অথচ বেদ অনুশীলন করে, সে অজ্ঞ। সে শিরোভাগ বাদ দিয়া কবন্ধ লইয়া নাড়াচাড়া করে।

আরাধ্যের সহিত 'অভেদ উপলব্ধিই সাধনার চরম কথা' এই তত্ত্বটি ঋগ্বেদের বর্তমান অনুবাদক তাঁহার অনুবাদের মুখবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন---সাধারণের কাছে 'বেদ জীবনবাদ প্রচার করে।' 'এই মর্ত্য-জগতের পিছনে রয়েছে এক অমর্ত্য দ্যুতি---তারই কিরণজালে জীবন নূতন রঙে রঙীন হয়ে ওঠে, নূতন রসে রসান্বিত হয়ে ওঠে।' ডক্টর দাশ অনুবাদে সর্বত্র বেদবাক্যের এই তাৎপর্য ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহাদের মুখে ঋগ্বেদের স্তবগান উচ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহারা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড ও অমিত শক্তির অন্তহীন বৈবিধ্যের প্রকাশ। ঋষিরা তাঁহাদের বন্দনা গাহিয়াছেন কখনও আর্তির বেদনায় কাতর হইয়া, কখনও সৃষ্টির বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া, কখনও প্রেমের প্রেরণায় বিহ্বল হইয়া। ডক্টর দাশ এই ভাব লইয় ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার বাচনভঙ্গি ও বিন্যাস-কৌশল সরল সরস অথচ সবল। দুই-একটি উদাহরণে তাহা স্পষ্ট হইবে।—

অগ্নি তোমায় পূজা করি, হে পুরোহিত হব্যবাহন।
রত্নধারক ঋত্বিক্ হোতা, হে দেবতা যজ্ঞপাবন॥
হও হে প্রিয় পিতার মতন, অনায়াসে দর্শনীয়;
স্বস্তিকাম মোদের পাশে রও হে তুমি বরণীয়॥

বৈদিক ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

তোমরা দোঁহে বহুকর্মা নেতৃযুগল দেবগেহে
গ্রহণ কর স্তুতি মোদের দোঁহার অবাধ অগাধ স্নে

ইন্দ্রের কাছে নানা জনে নানা প্রার্থনা জানায়—

মহারণে বিজয় চেয়ে পুত্রকাম পুত্র লাগি
প্রজ্ঞাকাম বিপ্রজনে স্তুতি করে তোমার লাগি।

দুরিতহারী জলের উদ্দেশ্যে আবেদন—

করেছি পাপ যে কিছু হায় হয়ত জানি, নয় না জানি
যা কিছু মোর মিথ্যা দ্রোহ ধুয়ে ফেল জলরাণী॥

জগতের দোষ দুর্নীতি শাসন করেন। তাঁহার নিকট নিবেদন আছে

অজ্ঞ জনে বিধান যেমন নিত্য ভাঙে এই জগতে,
হে দেবতা বরুণ ওগো ভেঙেছি হায় তোমার ব্রতে ॥
হনন যেন না কর দেব ক্রুদ্ধ হয়ে অনাদরে
মোদের পাপে রুষ্ট হয়ে না মার হায় ক্রোধের ভরে ॥

র আগমনে ঋষি লক্ষ্য করিলেন —

জ্যোতির মাঝে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি নামল ঊষা ঐ গগনে
বিচিত্রতার দীপ্ত কিরণ ছড়িয়ে পড়ে সব ভুবনে ॥
কেউ বা জাগে ধনের লাগি, কেউ বা জাগে অন্ন তরে,
কেউ বা জাগে যজ্ঞ তরে, কেউ বা ইষ্ট যাচ্ঞা করে,
প্রকাশ করেন বিশ্বভুবন বিশ্বজনের হিতের লাগি,
চলেন সবাই আপন কাজে তন্দ্রা হতে ভোরে জাগি ॥

ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকে আটটি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ডক্টর দাশ অধ্যায়টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা করিয়া 'অধ্যায়পরিচয়' লিখিয়াছেন। বিষয়বস্তু বুঝিবার পক্ষে উক্ত আলোচনা বেশ উপযোগী হইয়াছে।

ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক সমগ্র গ্রন্থের আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। ঋগ্বেদের ১০২৮টি সূক্তের মধ্যে এই অংশে আছে ১২১টি সূক্ত। অনুবাদক জানাইয়াছেন যে, তিনি অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ করিবেন না। ইহা দুঃখের কথা। তবে প্রথম অষ্টকের পদ্যানুবাদ পাঠ করিলে পাঠকগণ বেদে আদরবান হইবেন এবং সমগ্র ঋগ্বেদের পরিচয় লাভে কৌতূহলী হইয়া উঠিবেন বলিয়া মনে করি।

**ঋগ্বেদ**—প্রথম খণ্ড প্রথম অষ্টকের প্রথম চারি অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। বেলুড়, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি টাকা।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত অনূদিত ও আলোচিত গীতা, চণ্ডী, প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ধর্মজিজ্ঞাসুর নিকট সুপরিচিত। স্বামীজী এখন বেদের বঙ্গানুবাদে হাত দিলেন। তিনি আলোচ্য প্রথম খণ্ডে ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের অর্ধাংশ প্রথম চারি অধ্যায়ের অনুবাদ দিয়াছেন। তাঁহার বঙ্গানুবাদ সায়ন-ভাষ্যের অনুগামী। তিনি পাদটীকায় বহু বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়াছেন। সমগ্র ঋগ্বেদ এইভাবে অনূদিত হইলে বেদবিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় এক বাঞ্ছনীয় সংযোজন ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীজী তাঁহার সুদীর্ঘ উপক্রমণিকার মধ্যে পরিচয়, খিল গ্রন্থ, ছয় বেদাঙ্গ, উপাখ্যান, ঋষি ও দেবতা, বেদানুশীলন ও ঋগ্বেদ দর্শন এই শিরোনামায় বেদ সম্পর্কে নানা কথার অবতারণার মধ্যে নিরুক্ত ব্রাহ্মণাদির আলোচনা করিয়াছেন, বেদের টীকা, ভাষ্য, প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন, বৈদিক আখ্যানের তাৎপর্য বুঝাইয়াছেন, ঋষি ও দেবতার বিবরণ লিখিয়াছেন এবং কোন কোন বৈদিক গ্রন্থের কাল নির্ণয়ে মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। উপক্রমণিকার সমগ্র আলোচনাটি বিশেষতঃ 'ঋগ্বেদ দর্শন' তথ্যবহুল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দেশে বিদেশে বেদ সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হইয়া গিয়াছে, স্বামীজী নানা প্রসঙ্গে

তাহার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি গ্রন্থশেষে 'পরিশিষ্টে'র মধ্যে পাঁচজন প্রাচীন ও নবীন বেদব্যাখ্যাতার জীবন, রচনা ও কার্য্যাবলীর পরিচয় যোগ করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সায়ণাচার্য, হোরেস হেম্যান উইলসন, রমেশচন্দ্র দত্ত, দুর্গাদাস লাহিড়ী ও মাধবাচার্য এই পাঁচ জনের কথা পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে। বেদানুশীলনের ইতিহাসে অনুসন্ধিৎসু বাঙালী পাঠকের পক্ষে স্বামীজীর গ্রন্থখানি উপাদেয়।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

## উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ :

হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ফার্ম্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ৬।১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য সাত টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি এককথায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জীবন-দর্শন। সত্যই এই উনিশ শতকটি বাংলার গৌরবময় যুগ। এই যুগে একই সঙ্গে বহু প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাদেরই একজন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মের তুলনায় খ্যাতি সামান্য। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, তাঁহার সম্বন্ধে প্রচার কমই হইয়াছে, এবং যাহা হইয়াছে তাহাও অনেকাংশে তথ্যে ভুল।

অনেকেই বলেন, ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন চঞ্চল প্রকৃতির। যে চঞ্চলতা তাঁহাকে কোথাও স্থির হইয়া বসিতে দেয় নাই। ইহা স্বাভাবিক। অনুসন্ধিৎসু যুবক সত্যের সন্ধানে নিরন্তর ঘুরিয়া মরিয়াছেন। যাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছেন, তাহাকেই পরিহার করিয়াছেন। কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি কর্ম্ম বিষয়ে। এই বিশ্বাস লইয়াই তিনি যৌবনের প্রথম দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হইলেও তিনি কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে যীশুখৃষ্টকে সকল ধর্ম্মগুরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা করিয়া লন। এই বিশ্বাসই তাঁহাকে পরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, নিজের দেশকে কিন্তু বিস্মৃত হন নাই বা উপেক্ষা করেন নাই। বরং ভারতের প্রতি অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রভাব দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করিতে পারিবেন। আবার অপরদিকে ক্যাথলিক ধর্ম্মকে ভারতীয়করণের চেষ্টাও তাঁহার মধ্যে ছিল। এই সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন : "উপাধ্যায়জী আজও আমাদের দেশে **misunderstood** হইয়া আছেন। তিনি বাঁড়ুজ্যে বংশে শ্রীরাম ঠাকুরের সন্তান। তরুণ বয়সে তিনি কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপর আবার খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী হন ও গেরুয়াধারী হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন কাটাইতে থাকেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্য আচার পালন করেন। তিনি নিরামিষাশী ও ছুঁৎমার্গী ছিলেন। মধ্যবয়সে তাঁহার প্রবল ঝোঁক হইল বেদান্তের উপর খৃষ্টধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইজন্য তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে **excommunicated** হন। তৎপর তিনি ইংলণ্ড গিয়া বেদান্ত প্রচারে যত্নবান হন।"

এই সামান্য কয়টি কথায় উপাধ্যায় চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে, বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্ম-বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।"

এই শ্রদ্ধাবশেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রহ্মবান্ধবকে আহ্বান করেন। অবশ্য একবৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁহাকে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে হয়। এই চলিয়া আসিবার কারণ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে তাহার নিরসন করিয়াছেন। গ্রন্থকার সে পত্রটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃষ্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।"

উপাধ্যায় সম্বন্ধে এইরূপ বহু জনশ্রুতি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। গ্রন্থকার এক একটি করিয়া সেগুলিরও নিরসন করিয়াছেন। এহেন উপাধ্যায়ের বিপ্লবী সংস্পর্শে আসাও একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে ইহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। "……লর্ড কর্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়-সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হ'ল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালিজাতকে কৃশ ক'রে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মরলি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্ত মথনে যে আবর্ত্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে-ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

যেসব স্বদেশ-প্রেমিক সে-সময় এই আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং যাঁদের নাম পুরোধায় চিহ্নিত হইয়া আছে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁদের চাইতে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না, বরং ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী। তবু এই লোকটির কথা খুব কম লোকই ভাল করিয়া জানে। তাঁহার সম্বন্ধে কোনো বইও বিশেষ কেহ লেখেন নাই। দু-একখানি যাহা পাওয়া যায়, তাহা ভাসা ভাসা কথায় লেখা এবং তথ্যে ভুল। এই অভাব দূর করিলেন বর্ত্তমান লেখক। তিনি শুধু ভুলগুলি দেখাইয়া ছাড়েন নাই, নজীর হিসাবে প্রমাণও খাড়া করিয়াছেন। এই কাজে হরিদাসবাবুকে কি বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তবে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এরূপ একখানি বই-এর প্রয়োজন ছিল। বাংলা দেশের ইহা সম্পদ হইয়া রহিল।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ]

যুদ্ধযাত্রা (১)

( পাচান কাঙড়া চিত্র )
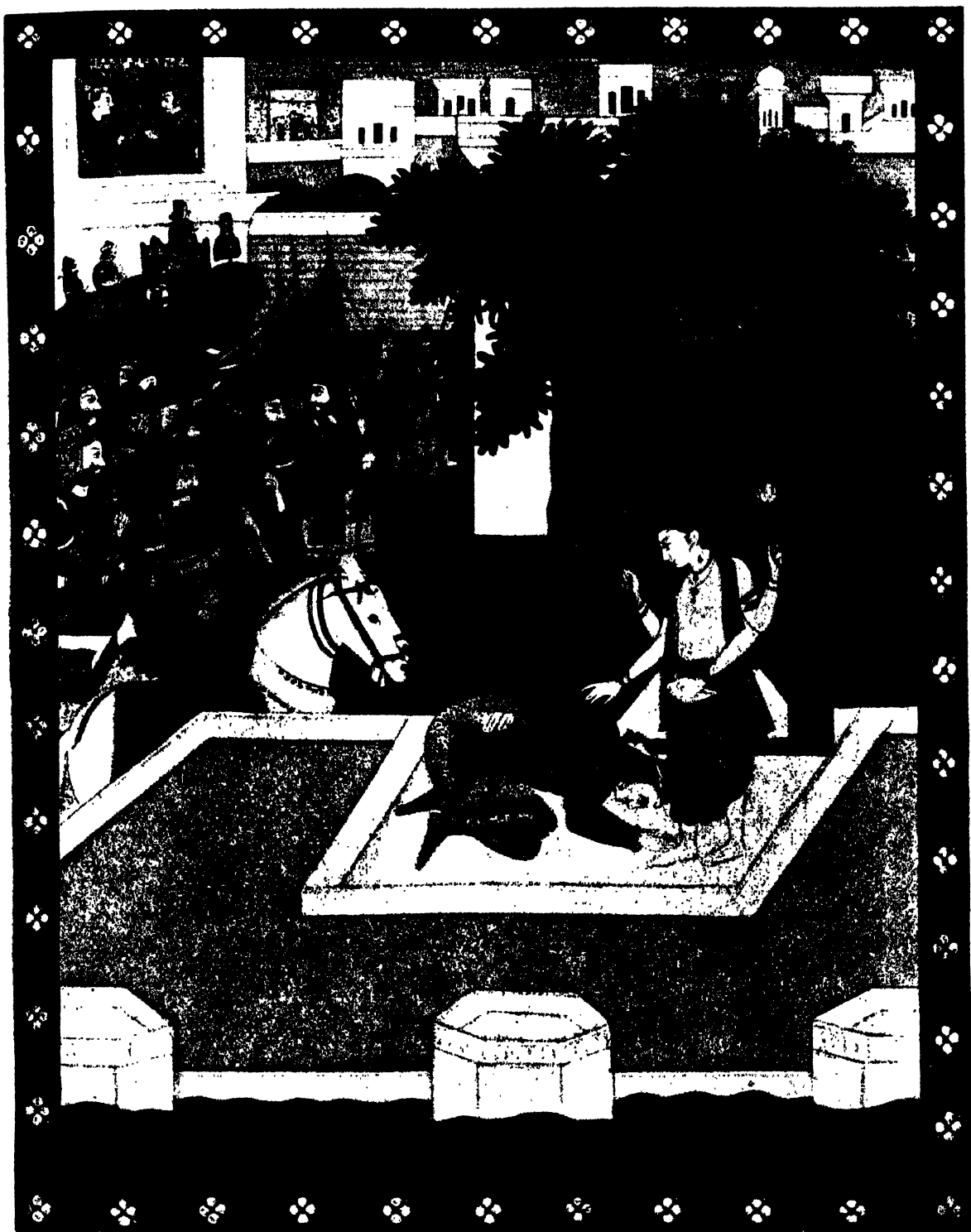
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
২য় খণ্ড
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
২য় সংখ্যা

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## নেহরু-কেনেডি সংবাদ

পণ্ডিত নেহরু গত মাসে মার্কিনী প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। মার্কিন দেশের সাংবাদিকমহল তাহার পূর্ব্বে সমস্ত নিরপেক্ষ দেশ ও জাতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি ও হেয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন। বিশেষে পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে ঐ দেশে যে মতবাদের প্রচার চলিতেছিল তাহাতে ভারত সরকার ও ভারতবাসী সম্পর্কে বিশেষ তীব্রভাষার ব্যবহার ও পণ্ডিত নেহরুকে উপহাস লক্ষণীয় ছিল। যুগোশ্লাভিয়ার নিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকা বিষয়ে এবং তাহার পর পণ্ডিত নেহরুর মস্কো যাত্রা ও মিঃ ক্রুশ্চভের সঙ্গে সাক্ষাতকারের সম্পর্কেও মার্কিন সংবাদপত্রে হয় বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত, নয়ত সে বিষয়টিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা হয়। এইরূপ অবস্থায় পণ্ডিত নেহরুর যুক্তরাষ্ট্র সফরের কথা ঘোষিত হয়। পণ্ডিত নেহরুর যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাইবার মুখে—যে কোন কারণেই হউক—কয়েকটি ছাড়া প্রায় সকল কাগজেরই সুর কিছু সংযত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নেহরুকে আব্রাহাম লিঙ্কন ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সঙ্গে তুলনীয় বলিয়াছেন এবং অন্য ভাবে তাঁহার সমাদর যথেষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু প্রধানতঃ দুইজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা ও জগতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনাই চলে। পণ্ডিত নেহরু আগেই জানাইয়াছিলেন যে, মধ্যযুগের রাজসিক আড়ম্বরে সম্বর্দ্ধনা তিনি চাহেন না এবং ব্যবস্থাও সেই মতই হয়।

এই চারদিনব্যাপী বিচার-বিবেচনা ও আলোচনার সম্পর্কে দুইজনই পরে বলেন যে, কাথাবার্ত্তা প্রীতিপূর্ণ ও লাভজনক হইয়াছে। এবং সবশেষে দুইজনে ঐ বিষয়ে একটি সংযুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে নূতন তথ্য অল্পই আছে কিন্তু এটা বুঝা যায় যে, পণ্ডিত নেহরু ও প্রেসিডেণ্ট কেনেডি দুইজনেই পরস্পরের মতবাদ এবং বহির্জগত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে অত্যন্ত খোলাখুলি কথা বলিয়াছেন। এইরূপ আলোচনার ফলে কাহারও আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে বা অন্যবিষয়ে মত পরিবর্ত্তন কিছু হইয়াছে কি না জানা যায় না তবে উভয়েই পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বহির্জগতের বিষয়ে তথ্য সম্পর্কে নূতন জ্ঞান কিছু পাইয়াছেন মনে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে ভারত ও ভারতবাসীগণ সম্পর্কে কতকগুলি বিকৃত ধারণা চলিত আছে। ইহার মূলে ঐখানের অনেকগুলি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের অপপ্রচারের ফল রহিয়াছে। পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের বিষময় ফলে সারা জগতের সাংবাদিক ক্ষেত্রই অল্পবিস্তর নীতিভ্রষ্ট ও অবনত হইয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও তাহার পরিচয় অনেক কিছুই পাওয়া যায়।

পণ্ডিত নেহরু ও প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সংযুক্ত বিবৃতি প্রকাশের পরে যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক মহলের প্রতিক্রিয়ার যেটুকু সংবাদ এখানে পৌঁছিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, সেখানের সাংবাদিকরা মনে করেন উভয়েরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও প্রায় তাহাই আছে। কিন্তু সকল প্রশ্নের যে নীতিগত ভিত্তি আছে, দুই দেশের দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই পরস্পরের কথায় স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন যে সেখানে দুইজনেরই বিশ্বাস ও বিচার এক এবং সেই বিশ্বাস ও বিচারের বিষয়ে ইঁহাদের বা এই দুই জাতির মধ্যে কোনও পার্থক্য বা মতদ্বৈধ নাই। এই নীতিগত ঐক্যের কথা সাংবাদিক জগতে যদি যথাযথভাবে স্বীকৃতি ও প্রচারের সুযোগ লাভ করে তবে এই

দুই দেশের মধ্যে মনের মিল না হউক, পরস্পরের বিষয়ে বুঝিবার সহজ ও সরল পথ খুলিয়া যাইবে।

সংযুক্ত বিবৃতিতে বুঝা যায় যে, পণ্ডিত নেহরু ও প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নিজ নিজ দেশের বহির্জগত সম্পর্কে ব্যবহারিক নীতি বিষয়ে সম্যক্ ও বিশদ বিবরণ দিয়াছেন এবং দীর্ঘ আলোচনাও করিয়াছেন, যাহার ফলে পরস্পরের রাষ্ট্রনীতি ধারা সম্পর্কে ভুল ধারণার অবকাশ অনেক কমিয়া গিয়াছে। এবং এই আলোচনার সূত্রেই সারা বিশ্বের অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কাপূর্ণ অঞ্চলগুলির বিষয়েও সম্যক্ আলোচনা হয়। বার্লিন, কঙ্গো, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, এই সকল দেশের সমস্যাগুলির বিচারও সেই সঙ্গে চলে। বিচারের ফলাফল সম্পর্কে যাহা বিবৃতিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই তবে বুঝা যায় যে, উভয়েই পরস্পরের কথা বিশ্বাস ও সৌহার্দ্দ্যের সঙ্গে লইয়াছেন।

বিবৃতির শেষে বলা হইয়াছে যে, এই কয়দিনের বিচার, আলোচনা ও ব্যাখ্যানের ফলে বিশ্বশান্তির বিষয়ে উভয়েরই কাম্য পথে চলার সুবিধা হইবে এবং উভয়ে পরস্পরের উপর বিশ্বাস রাখিতে সমর্থ থাকিবেন। ভবিষ্যতেও উভয়েই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিতে ইচ্ছুক এ কথাও বলা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী অধিকারী মহলের এই কথাবার্ত্তার বৈঠকগুলির সম্পর্কে মতামত যাহা পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে, উহার মধ্যে যে যে ক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মতভেদ হয়, সেগুলির সঙ্গে কোন পক্ষেরই নিজ স্বার্থ-জড়িত কোনও প্রশ্ন ছিল না। মতান্তর হয় প্রত্যেক বারই বহির্জগত সম্পর্কে কার্য্যক্রম ও রাষ্ট্রনীতির ব্যবহারিক প্রণালী বিষয়ে। তাহা সত্ত্বেও মূলতঃ ও নীতিগত ভাবে দুই দিকের আদর্শ এক হওয়ায় দুই দিকেরই নিজ পথে চলার অল্পবিস্তর সুবিধা হওয়ার কথা। কেননা খোলাখুলি কথাবার্ত্তা হওয়ার ফলে উভয় পক্ষই আন্তর্জ্জাতিক কূটনীতির অনেক গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। প্রেস ক্লাবের সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক আদান-প্রদানে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য কেন হয় তাহার কারণের অতি সহজ ও সরল ব্যাখ্যা দেওয়ায় সাংবাদিকমহল সেটা বুঝিতে পারিয়াছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতায় পরমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা ও পরমাণু যুদ্ধ পরিহার, বিশ্বশান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা এবং উপনিবেশবাদ উচ্ছেদ সম্পর্কেই অধিক ঝোঁক দেওয়া হয়। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণকে একটি কমিটি গঠন করিয়া বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার প্রসারের জন্য ভূতাত্ত্বিক বর্ষ পালনের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বিশ্বসহযোগিতা বর্ষ পালনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিদিগকে অবহিত হইতে বলেন।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, এই ঔপনিবেশিক অধিকারের কামনাই যুদ্ধের আশঙ্কার মূল কারণ।

কিন্তু তাঁহার মতে ঐ সকল বিষয় অপেক্ষা বর্ত্তমানে যুদ্ধ ও শান্তির কথাই হইল বহুগুণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গের আরম্ভেই পণ্ডিত নেহরু বলেন, পরমাণবিক অস্ত্র মূলতঃ অধর্ম্মের প্রতীক এবং অশুভ, বিশ্বব্যাপী চুক্তি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিনা উহার পরীক্ষা ও ব্যবহার নিরোধ সম্ভব নহে। স্বেচ্ছায় উহার পরীক্ষা ও প্রস্তুত করার অঙ্গীকার মাত্র দিলে তাহাতে এই সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হইবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বক্তৃতায় তিনি জগতের সকল শক্তিমান জাতিকেই সম্পূর্ণ ও সম্যক্‌ভাবে নিরস্ত্রীকরণের চিন্তা করিতে সাগ্রহ অনুরোধ জানান। সমস্ত মানব-সমাজের সকল চেষ্টা, সকল শক্তি এখন নিয়োগ করা উচিত পরমাণবিক যুদ্ধ নিরোধে। গর্ত্তের ভিতর ত্রস্ত মূষিকের মত থাকিয়া বাঁচিবার চেষ্টা না করিয়া, আশঙ্কার কারণটি দূর করার চেষ্টা প্রয়োজন।

নিরস্ত্রীকরণেও পরস্পরের দোষত্রুটি না ধরিয়া সম্মিলিত চেষ্টায় বিশ্বশান্তি স্থাপনা কেন হইবে না, এ প্রশ্নও তিনি করেন। মোটের উপর পণ্ডিত নেহরুর যুক্তরাষ্ট্রের সফর এই দুই দেশের মধ্যে পরস্পরের বিষয়ে ভুল ধারণার অবকাশ কিছু কমাইয়াছে। ঐ দেশের সংবাদে মনে হয় যে, কৃষ্ণ মেননের অপ্রিয় উক্তিজনিত যে বিরক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কিছুটা কমিয়াছে। কিন্তু হিসাব-নিকাশের শেষে ফলাফল কি দাঁড়াইবে বলা যায় না। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যেখানে পৌঁছাইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত নেহরুর মতামত বা নীতিবাদ কে কতটা গ্রাহ্য করিবে তাহা বলা অসম্ভব, নিজ দেশেই তাঁহার নীতিবাদ যখন প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

## দেশের ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরু

বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর উদ্বেগ আমরা বুঝিতে পারি এবং বিদেশের লোকেও—অন্ততঃপক্ষে বিদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মহলের লোকেও তাঁহার মনোভাবকে আন্তরিক জানিয়া সে বিষয়ে সমর্থন

জানাইয়াছে। কিন্তু যেটা আমরা বুঝিতে অক্ষম এবং বিদেশের লোকেও যাহাতে বিভ্রান্ত হয় সেটা হইল তাঁহার স্বদেশের অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট অবস্থা। যে ভাবে দেশ চলিতেছে তাহাতে রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিশ্বাস-ঘাতকদিগের সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে এবং দেশের লোকও গৃহবিবাদ ও অন্তর্কলহে জর্জ্জরিত হইতে চলিয়াছে। তাহার উপর আছে অভাব-অনটনের জ্বালা এবং আমলাতন্ত্রের যথেচ্ছাচারের যন্ত্রণা। বিদেশের লোকে ভাবে, যে ঘরের আগুন নিভাইতে অক্ষম সে বিশ্বের দাবানল নিভাইতে যায় কেমনে? বোধ হয় তাঁহার নিজ গৃহের ব্যবস্থায় বিশ্বশান্তির প্রয়োজন, এই কথা তিনি এবার মার্কিন সাংবাদিকদিগকে খোলাখুলি বলায় তাহারা অবস্থাটা বুঝিয়াছে।

দেশে ত হিংসার বহ্নি চতুর্দ্দিকে, অহিংসা শুধু মুখের কথায়। এবং সেই হিংসার পথেই দেশের ভবিষ্যৎ ক্রমে অন্ধকারের মুখেই চলিতেছে। মুখের কথায় প্লাবনের জলও আটকায় না আগুনও নিভানো যায় না। অথচ সেই মুখের কথায় আমাদের নেতৃবর্গ জাতীয় সংহতির সবকিছু করিতে পারিবেন এই আশা রাখেন।

পাঞ্জাবে মাষ্টার তারা সিং এখনও সেই পাঞ্জাবী সুবার জন্য লালায়িত। তবে এতদিন পরে ঘোড়ার চালে বাজিমাৎ না করিতে পারায় বড়ের চাল ধরিয়াছেন। মাষ্টার তারা সিং পুরাণো খেলোয়াড়। সেই ব্রিটিশ আমলে ইহার সঙ্গে চুক্তি করিতে গিয়া সিকন্দর হায়াৎ খাঁ মন্ত্রীত্ব খোয়াইয়াছিলেন এবং তাহার পরের মন্ত্রীসভাও বিলক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

স্বাধীনতার পরে মাষ্টার তারা সিং পুনর্ব্বার অর্দ্ধেক পাঞ্জাবেও সেই পুরাণো চাল চালিতে আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য একই, সেই শিখের একচ্ছত্র রাজত্বের স্থাপনা, যেখানে আকালীর আধিপত্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সার্ব্বভৌম, যাহার সম্মুখে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই মাথা ঝুঁকাইবে। এ সকল কথা কিছু আমাদের কল্পনাসৃষ্ট নয়, আমরা অতি স্পষ্ট ভাষায় মাষ্টার তারা সিংয়ের দলের লোকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়াছিলাম দিল্লীতে, যখন প্রথম বার পাকিস্থানের নমুনায় শিখস্থান স্থাপনার চেষ্টা হয়।

তখন পুরাণো দিল্লী নয়া-দিল্লীতে নানাস্থানে অহোরাত্র শামিয়ানা খাটাইয়া খালসাদিগের বীরত্বের কাহিনী শোনানো চলিতেছে ভাষণে, গানে। লঙ্গরখানায় কড়া প্রসাদ তৈয়ারী ও বিতরণ চলিতেছে এবং পথে-ঘাটে উত্তেজিত শিখ কৃপাণ ও তরবারি বাঁধিয়া ঘুরিতেছে মাষ্টার তারা সিংয়ের আগমনের প্রতীক্ষায়। সকলের মুখে এক কথা, মাষ্টার তারা সিং তিনশত আকালীর "জঠা" লইয়া স্পেশাল ট্রেনে দিল্লী আসিতেছেন। তার পর হয় শিখস্থান নয় দিল্লীতে রক্তগঙ্গা।

কিন্তু তখন সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের হস্তে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সূত্র। তাঁহার এক ভ্রূকুটিতেই মিলাইয়া গেল মাষ্টার তারা সিংয়ের স্বপ্ন। দেশের লোকও বুঝিল যে, শিখ বলিতেই শুধু এক আকালিই নয়, অন্য শিখও আছেন যাঁহাদের স্বাতন্ত্রের ধারণা উন্নত ও অনুরূপ, এবং পাঞ্জাবী হিন্দুর সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ়তর। মাষ্টার তারা সিংও বুঝিলেন যে, ঐ পথে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এবং তিনি নূতন পন্থা ও নূতন কৌশলের আশ্রয় করিলেন। এবং সেই ভাবেই নানা ফিকির-ফন্দীতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে কি না জানা যায় না। কিন্তু ঐ সকল চালের ফলে শিখ ও অ-শিখ হিন্দুর মধ্যে একটা ভেদজ্ঞান ক্রমেই প্রবল হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের সংহতিকামী মহাশয়গণ সেদিকে দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত করিয়াছেন বা করিতেছেন একথা মনে হয় না।

তার পর আসামে বাঙালীর কথা। আসামে বাঙালীর বিরুদ্ধে অভিযানের আরম্ভ হয় বহুদিন পূর্ব্বে, ইংরাজের ভেদনীতির চালের ফলস্বরূপে। বাংলায় তখন "গজ-চক্র" মন্ত্রীত্বের আমল, অর্থাৎ ডায়ার্কি (Dyarchy) তখন চলিতেছে। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা চলিয়াছে তাহাতে আসামী ভাষাভাষী ও মুসলিম লীগের ধ্বজাবাহীদিগের সংযুক্ত অভিযান বাঙালী হিন্দুর বিরুদ্ধে সমানে চলিয়া আসিতেছে। আজ মুসলীম লীগের ভারতে পুনরুত্থানের দিনে আমরা দেখিতেছি যে আসাম দখলের সেই চেষ্টাই চলিতেছে, তবে প্রচ্ছন্ন ভাবে—মুসলীম লীগের দিক হইতে—এবং আরও সুগঠিত ও সুপরিচালিত রূপে, যাহাতে মনে হয় ইহার পিছনে পাকিস্থানের আর্থিক ও কুটনৈতিক সাহায্য পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে।

স্বাধীনতার পর আসামে বাঙালী হিন্দুকে দলিত ও পদানত করিবার চেষ্টা পদে পদে হইয়াছে। অন্য সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আসাম সরকারের বাঙালী হিন্দু-বিদ্বেষ নগ্ন ও নির্লজ্জ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে বিগত দুই বৎসরের মধ্যে। এবং আমরা আসামের অ-বাঙালীর কাছে সাক্ষ্য পাইয়াছি যে, প্রথম বারের অগ্নিকাণ্ড ও খুন-জখমে এক শ্রেণীর মুসলমানের হাতই ছিল বেশী

যাহারা আসামে অনুপ্রবেশ করিয়া বিগত দশ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

তাহার পর শিলচরের ব্যাপার। এ বিষয়ে শোনা যাইতেছে যে পূর্ণ তদন্ত হইবে সুতরাং এখন বিশেষ কিছু বলা উচিত নয়, যদিও সেই তদন্ত কবে হইবে এবং তাহার ফলাফল প্রকাশিত হইবে কি না সেখানে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট আছে।

এখন যাহা আমরা দেখিতেছি তাহাতে বুঝি যে বাঙালীর উপর এই অমানুষিক অত্যাচারের জন্য আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মনে কোনও বেদনা বা লজ্জার অনুভূতি নাই। আসামের যে কয়জন বাঙালী কংগ্রেসী ঐ প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদে তাঁহাদের আসন ত্যাগ করেন তাঁহাদের উপর যে নির্দ্দেশ আসাম কংগ্রেস কমিটি দিয়াছেন এবং আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহাদের সরাইয়া অন্য কয়েকটি বাঙালীকে মনোনীত করার যে চাল চালিয়াছেন তাহা যেমন নির্লজ্জ তেমনি অসৎ। জানি না কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের ধুরন্ধরগণ এ বিষয়ে কি করিবেন। এবং জানি না পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটিই বা এই বাঙালী দলন ও নিপীড়ন সম্পর্কে কি করিবেন। বোধ হয় কিছুই না, কেননা, কিছু করিতে গেলে অল্প কিছু পৌরুষ এবং সামান্য কিছু স্বজাতিপ্রেম প্রয়োজন, যে দুটিরই নিদারুণ অভাব আজিকার বাংলার কংগ্রেসে ও কংগ্রেস সরকারে।

তার পর আসে কেরলদেশের কথা। সেখানে ত রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আগুন জ্বলিয়াই আছে। ঐ অতি-ক্ষুদ্র প্রদেশে একদিকে শিক্ষার প্রসার উন্নত, অন্যদিকে—বোধ হয় সেই কারণেই—দলগত ভাবে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিচ্ছেদ যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। কোনও এক দলের পক্ষে শাসন-তন্ত্রের পূর্ণ অধিকার লাভ সম্ভব নয় সেখানে এবং সেই কারণে একাধিক দলের মিলিত চেষ্টায় প্রাদেশিক শাসন ও বিধান চালাইতে হয়। বর্ত্তমানে, আসন্ন নির্ব্বাচনীর মুখে, ঐরূপ জোট বাঁধা সরকারে তিন দিকে ফাটল দেখা দিয়াছে এবং তিন দলই মুখ ফিরাইয়া নিজ নিজ পথ দেখিতেছেন। বলা বাহুল্য এমত অবস্থায় সেখানে জাতীয় সংহতির যে-রূপ দেখা যাইতেছে তাহা অতি অপরূপ!

তাহার পর দলগুলির ভিতরের কথা। পণ্ডিত নেহরুর দল কংগ্রেসের দল এবং তাহার প্রদেশ উত্তর প্রদেশ। সেখানে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি সে বিষয়ে কি কিছু বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োজন? কি ভাবে সম্পূর্ণানন্দকে হটাইয়া চন্দ্রভানগুপ্ত মন্ত্রীত্বের গদি দখল করিয়াছেন এবং কি ভাবে সেই অধিকার কায়েম রাখিবার জন্য নানা প্রকার চাল চলিতেছে, এ ত এখন ঐ-অঞ্চলে সাধারণ কথা। বিহারেও শ্রীবাবুর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্কলহ কিরূপ ছড়াইয়াছে তাহাও এখন সাধারণ কথা এবং আর কিছু দিন পরে উহা সংবাদপত্রে স্থান একেবারেই পাইবে না, কেননা যে কথা সকলে জানে সেটা সংবাদ নয়। অন্য প্রদেশগুলিতেও অবস্থা কম বেশী একই রূপ তবে কোথাও বা দক্ষ লোক চক্রে বসিয়া আছেন—যেমন পশ্চিমবঙ্গে—এবং যাহা কিছু চলিতেছে তাহা অতি গভীরে এবং কোথায়ও বা ঝগড়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখা দিয়াছে।

এই সকলের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু যেন ধ্যানস্থ। তিনি কি শীর্ষাসনের অভ্যাস আরও ব্যাপক করিয়া তুলিতে চাহেন? নহিলে দেশের এই অবস্থার প্রতিকার চেষ্টার ত কোনও লক্ষণ দেখা যায় না তাঁহার কথাবার্ত্তায় বা কার্য্যকলাপে।

## লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ভট্টাচার্য্য

বিগত ৪ঠা এপ্রিল সকালবেলা লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গুণীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য কয়েকজন সহকারী লইয়া বনগাঁর নিকটে, ভারত সীমান্তরেখার এপারে জরীপ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় এক সশস্ত্র পাক্‌-বাহিনী প্রথমে তাঁহাদের উপর স্টেনগানে গুলী চালায় এবং কর্ণেল ভট্টাচার্য্য আহত হইয়া পড়িয়া গেলে, তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া পাকিস্থান সীমান্ত পার করিয়া লইয়া যায়। তাহার পর পাকিস্থান সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, তিনি পাকিস্থান এলাকার ভিতরে গুপ্তচর হিসাবে প্রবেশ করেন এবং ঐ অভিযোগে তাঁহার সামরিক আদালতে বিচার হয়।

ঘটনা ঘটে ২৪ পরগণার বয়রাগ্রামে এবং সেই গ্রামের ৪জন অধিবাসী এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তাহাদের সাক্ষ্য ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তৃক কমিশনে গ্রহণ করাইবার জন্য পাকিস্থানী আইন অনুযায়ী দরখাস্ত করা হয় কিন্তু সামরিক আদালত তাহা অগ্রাহ্য করে এবং সাক্ষীদের ঢাকায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার আদেশ দেওয়া হয়। কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের কৌঁসুলি শ্রীগুরু ঘটক বলেন যে, সামরিক আদালতকে জানান হয় যে, বর্ত্তমানে পাসপোর্ট, ভিসা, ইত্যাদির বাধা-নিষেধ থাকায় ঐ সাক্ষী-দিগকে ঢাকায় লইয়া সাক্ষ্য দেওয়ান সম্ভব নয় এবং তাহারা যাইতেও পারে নাই। সুতরাং বিচারের শুনানী প্রকৃতপক্ষে এক তরফাই হয়। এই বিচারে কর্ণেল

ভট্টাচার্য্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন একথা বলা বাহুল্য। তাঁহাকে আট বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে বিগত ১১ই নবেম্বর। অবশ্য শোনা যায় যে, এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্থানে আপিল করার ব্যবস্থা আছে এবং তাহার বিষয় চিন্তা চলিতেছে।

অন্যদিকে এই প্রশ্ন সাধারণ ভাবে সকলেরই মনে আসিয়াছে যে, ভারত সরকার এ বিষয়ে কি করিতেছেন ও করিবেন। প্রথমদিকে যখন সামরিক আদালতে বিচারের প্রশ্ন উঠে তখন কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের পক্ষে কৌঁসুলি নিয়োগের বিষয়ে ভারত সরকার বলেন যে, তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে ঐ মোকদ্দমার সহিত জড়িত হইতে চাহেন না কেননা, তাঁহাদের মতে কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সবটাই মিথ্যার ভিত্তিতে গড়া, কেননা অপরাধী পাকিস্থানী সরকারের ঐ সামরিক দল যাহা দস্যু-দলের মত ভারত সীমান্ত পার হইয়া এই কাজ করিয়াছে। যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ও আক্রান্ত পক্ষকে আসামী হিসাবে বিচারের সম্মুখীন করা হইয়াছে সেই মিথ্যার উপর গড়া বিচারই ত প্রহসনমাত্র, সেখানে ভারত সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে তথাকথিত আসামী পক্ষকে কি সাহায্য করিবেন? যাহা হউক ব্যবহারজীব শ্রী জি. ঘটককে কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের সপক্ষে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি এই বিচারের ব্যাপারে, অনেক বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের পক্ষে যাহা সত্য তাহা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীঘটক বলেন যে, কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের সামরিক পুরুষোচিত মনোবল ও আত্মসম্মান জ্ঞান অটুট ও অক্ষুণ্ণ আছে। এবং কোন হিসাবে দয়াভিক্ষা বা অন্যকিছু করিয়া তিনি ভারতের সৈন্য-বিভাগের যে গৌরব আছে তাহা ম্লান করিবেন না। ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিন্তু ভারত সরকার কি করিবেন তাহাই এখন মূল প্রশ্ন। এইভাবে যদি আমাদের সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া দস্যুদলের ন্যায় পাক্‌ সামরিকবাহিনী যথেচ্ছাচার করে তবে আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনই বা কি এবং তাহার সার্থকতাই বা কতটুকু? পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ, চুরি-চামারি, রাহাজানি এ ত সীমান্ত অঞ্চলে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু এই জাতীয় অত্যাচারও কি আমাদের মূকবধির ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতে হইবে?

শোনা যায়, আগামী ডিসেম্বরে আয়ুব খাঁর সহিত পণ্ডিত নেহরুর এক বৈঠক বসিবে এবং সেখানে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিবে। কিন্তু পাকিস্থানীদিগের সহিত বোঝাপড়া করা আমাদের শ্রীনেহরুর ক্ষমতার অতীত। নিজের মতলব পুরা করিতে হইলে কিভাবে পণ্ডিত নেহরুকে মধুময় স্তোকবাক্যে গলাইয়া কাদা করিয়া ফেলা যায়, সে কায়দা লিয়াকত আলি হইতে আয়ুব খাঁ পর্য্যন্ত সবাই এক এক হাত দেখাইয়াছেন। এবং এক্ষেত্রেও যে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবে আমরা মনে করি না। এখানে একমাত্র উপায় যদি ঐ বৈঠকের পূর্ব্বে পণ্ডিত নেহরুর সহিত এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট বোঝা-পড়া হয় যাহাতে এই ব্যাপারে তাঁহার মনে চেতনা দেওয়া হয় যে, এরূপে প্রতি পদে আক্রান্ত ও অপমানিত হওয়ায় আমাদের দেশের সামরিকবিভাগের লোক হতোদ্যম এবং দেশের সাধারণজন ধৈর্য্যচ্যুত ও ক্রুদ্ধ হইতেছে।

শোনা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীদল এই ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের বিচলিত হইবার কারণ ভারতের প্রতিরক্ষা, জাতীয় মান-মর্য্যাদা বা কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের মঙ্গল চিন্তাজনিত নহে। এই নির্ব্বাচনের মুখে যখন বিপক্ষদল প্রশ্ন করিবে ভারত সরকার কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ সেনানীর মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য কি করিয়াছেন, তখন তাহার কি উত্তর দেওয়া যাইবে। শোনা যায় এই জন্য নেহরু-আয়ুব বৈঠকে এই বিষয়টি উত্থাপনের ও জরুরী-ভাবে আলোচনা করাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী পক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিশেষভাবে চাপ দিবেন। তবে এই চাপের সুফল কিছুই হইবে না। যদি না ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ে এইরূপ ঘটনার গুরুত্ব কতটা এবং এ বিষয়ে অবহিত না হইলে সামরিকবিভাগ ও দেশের জনসাধারণের মনের উপর কিরূপ বিষময় প্রতিক্রিয়া হইবে সে কথা অতি স্পষ্টভাবে পণ্ডিত নেহরুকে বুঝাইতে পারা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী কর্ত্তাদের মধ্যে সে বিষয়ে নিজেদেরই চেতনা বা জ্ঞান যে বিশেষ কিছু আছে জানা যায় না। তবে আশা করা যায় যে, এ বিষয়ে দেশের সাংবাদিক মহলে বিশেষ চর্চ্চা হইবে এবং পণ্ডিত নেহরুকে সতর্ক করা হইবে, কেননা ইহা প্রধানতঃ সাংবাদিকেরই কর্ত্তব্য—এই অভাগা দেশে!

## আসন্ন নির্ব্বাচনে পাকিস্থানী কূটনীতির খেলা

বিগত ৫৭ সনের নির্ব্বাচনে কলিকাতায়, মুর্শিদাবাদে এবং সাময়িক ভাবে ২৪ পরগণায় কয়েকটি গুপ্ত ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছিল যেখানে পাকিস্থানী টাকা এবং পাকিস্থানী প্রচারের অন্য সহায়ক বস্তু—যথা পোস্টার,

পুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল, ইত্যাদি বিতরণের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা হয়। এই গুলির কেন্দ্রীয় দপ্তর কোথায় ছিল বলা বাহুল্য, কিন্তু কার্য্যকরী ঘাঁটি ছিল কলিকাতায় ধর্ম্মতলা অঞ্চলের ৫টি অঞ্চলে। সেখানে পাকিস্থানী গুপ্তচরের দল তাহাদের এজেন্টদিগের মারফৎ কাজ চালায়। এই এজেন্টগুলি সবাই কিছু পাকিস্থানী ছিল না এবং সকলে মুসলমানও ছিল না। অবশ্য মুসলমান ভোটারদিগের মধ্যে প্রচার মুসলমানেই করে এবং সেই প্রচার-কাজ মজবুত করার জন্য পার্কসার্কাস ও ইটালী অঞ্চলে কয়েকটি ছোট বড় গুণ্ডার দলকেও "রসদ" জোগানো হয়। সেই গুণ্ডার দলের অনেকেই দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিল।

আবার নির্ব্বাচনের পালা আসিয়াছে এবং আমরা আবার নানাপ্রকার কাণাঘুষা শুনিতেছি। ২৯শে কার্ত্তিকের আনন্দবাজার পত্রিকা এ বিষয়ে একটি সংবাদ দিয়াছেন তাহা আমরা আংশিক ভাবে নীচে উদ্ধৃত করিলাম। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গতবারে যে-সকল প্রার্থী ঐ ভাবে পাকিস্থানের গুপ্ত সাহায্য পাইয়াছিল তাহারা সকলেই মুসলমান ছিল না, এবং তাহারা একাধিক কংগ্রেস-বিরোধী দলের সভ্য ছিল। এই সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া হয় না বলা বাহুল্য এবং ইহাতে শুধু নির্ব্বাচনে সাহায্য নয়, সরকারী পক্ষের প্রবল প্রার্থীর নির্ব্বাচন ব্যর্থ করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য দানও করা হয় যাহাতে বিপক্ষের প্রচার সবল ও সতেজ হয়।

নির্ব্বাচন এখন আসন্ন এবং অভিযান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে সুতরাং পাকিস্থানী কুটনীতির চাল এখন সক্রিয় ভাবে চলিতেছে। উর্দ্দু ও বাংলায় লেখা নানা প্রকার পুস্তিকার বিলি আরম্ভ হইয়াছে এবং নানা তথাকথিত মৌলবী ও মৌলানা পাকিস্থানের টাকায় পেট মোটা করিয়া ভারত-বিরোধী প্রচারে নামিয়াছেন। "নয়া কাশ্মীর" নামে একটি ভারত বিরোধী উর্দ্দুতে লেখা পুস্তিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। সেই সূত্রে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছেন:

"আরও নানাসূত্র হইতে জানা গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা চাগাইয়া তুলিবার জন্য শুধুমাত্র উর্দ্দু পুস্তকের সাহায্যই লওয়া হইতেছে না, এই কাজের কাজী যাহারা সেই পাকিস্থানী গুপ্তচর চক্র আরও নানা উপায়ের সাহায্য লইতেছে।

"তাহাদের ক্রিয়াকলাপ কোন্ কোন্ খাতে বহিতেছে আমরা তাহার কয়েকটি নমুনা দিতেছি:

(১) আগামী নির্ব্বাচনে ভারতের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

(২) হোটেল, রেস্তোঁরা, বন্দর এলাকা, ধর্ম্মীয় স্থান, প্রভৃতি সুবিধাজনক জায়গাগুলিতে ভারত-বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক প্রচার।

(৩) জব্বলপুর ও আলিগড়ের হাঙ্গামার দোহাই পাড়িয়া ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার।"

"পুলিসী সূত্রে প্রকাশ, পাকিস্থানী গুপ্তচর চক্রের লোকেরা শুধু পাকিস্থান হইতেই আমদানী হয় না, এক শ্রেণীর ভারতীয় নাগরিকও এই চক্রের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়াছে।

"কলিকাতা ও আসামের মধ্যে জলপথে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থাটি নির্ব্বাচনের কিছু পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দিবার জন্য জয়েণ্ট ষ্টীমার কোম্পানীর মোটা বেতনের মাষ্টার, সারেং, প্রভৃতি এক হাজার কর্ম্মচারী একযোগে পদত্যাগের যে হুমকি দিয়াছেন, তাহা আদৌ আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য নহে, উহার পশ্চাতে গভীর একটি রাজনৈতিক চাল বর্ত্তমান, সে কথা রাজ্য সরকারের কোন কোন মহল প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। প্রকাশ, উদ্ভূত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক প্রতিনিধি দল শীঘ্রই রাজ্য সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন।

"যে সকল মুসলমান নেতা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম প্রার্থীরা যাহাতে রাজ্য বিধান সভার আসন দখল করিতে পারে, পাকিস্থানী গুপ্তচর চক্র তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

"'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' জিগির এখন আর কলিকাতা বা পার্শ্ববর্ত্তী সীমান্ত জেলাগুলিতে নূতন নয়। ইহার সহিত সম্প্রতি কতকগুলি নূতন জিগীরও যুক্ত হইয়াছে। 'মুসলমান মুসলমানকো ভোট দেঙ্গে, দুসরেকো নেহি', 'জব্বলপুর ঔর আলিগড়কা বদলা লেনে হোগা'—এই দুইটি শ্লোগান বর্ত্তমানে বেশী চালু হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের মুসলমানদের উপর 'অবিরাম অবিচার অত্যাচার চলিতেছে' নানাভাবে মুসলমানদের ভিতর এই মিথ্যা প্রচার করা হইতেছে। জনৈক ওয়াকিবহাল ব্যক্তি বলেন, জেহাদের একটি মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উত্তর প্রদেশ, প্রভৃতি প্রান্তে গড়িয়া তোলাই পাকিস্থানী গুপ্তচর চক্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এই দুইটি সীমান্তবর্ত্তী

রাজ্যের বিধান সভায় পাক্-দরদী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটানো। তৃতীয় উদ্দেশ্য, শান্তিপ্রিয় সংখ্যালঘুদের—যাহারা মনেপ্রাণে সত্যই ভারতীয়—মনোবল ভাঙ্গিয়া দেওয়া।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' অবশ্য বলিয়াছেন যে, পুলিসী মহল ও পশ্চিমবঙ্গ স্বরাষ্ট্র বিভাগ এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ও সচেতন। কিন্তু আমরা তাহাতে কোনও নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ পাইতেছি না। দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এবং সেখানে পণ্ডিত নেহরু ও কৃষ্ণমেননের চিন্তাধারা কখন কোন্ দিকে ছুটিয়া কি অঘটন ঘটায় তাহার কোনও ঠিক নাই। পশ্চিমবঙ্গের মুখপাত্র যাঁহারা তাঁহারা ত নিজ নিজ ভিক্ষাপাত্র সামলাইতেই ব্যস্ত, এ বিষয়ে কি তাঁহারা পণ্ডিত নেহরুর সামনে মুখ খুলিতে সাহস পাইবেন?

## রাজ্যশাসন ও জড়বাদ

বর্ত্তমানযুগে রাজ্যশাসন ব্যক্তিগত অধিকারের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ পূর্ব্বকালে যেরূপ উত্তরাধিকার-সূত্রে অথবা যুদ্ধ জয়ের লাভ হিসাবে কোন রাজা অথবা সম্রাট কোন রাজ্য বা সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার শাসনভার গ্রহণ করিতেন; এবং তৎপরে নিজ ইচ্ছা অনুসারে রাজ্য বা সাম্রাজ্য শাসন করিতেন; বর্ত্তমান-কালে তাহা ঘটিতে পারে না। কোন দেশ অথবা দেশ-সমষ্টির উপর শাসন অধিকার লাভ করিতে হইলে, আধুনিক রীতি অনুসারে স্থানীয় জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত সেই শাসনকার্য্য চলিতে পারে না। এবং সেই সম্মতি লাভ কখনও সম্ভব হইতে পারে না যদি না শাসন সংক্রান্ত রীতিনীতি পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিয়া যাঁহারা শাসন-কার্য্যের ভার লইতে চাহেন তাঁহারা (বা তিনি) সাধারণের নিকট উপস্থিত হন। জনমত বর্ত্তমানে রাজশক্তি ও শাসন অধিকারের মূল এবং জনমতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কোন স্থায়ী শাসন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া যে দেশশাসন চলিতে পারে না তাহা নহে; কিন্তু সেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের অন্তরালে জনমত না থাকিলেও জনবল থাকা অবশ্য প্রয়োজন। অর্থাৎ বহু লোকের সাহায্যে দল পাকাইয়া গায়ের জোরে রাজকার্য্য চালনা অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহা কোন রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত নহে এবং তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইতেও পারে না ইহার কারণ বর্ত্তমান মানবের স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ। ক্ষণিকের উত্তেজনায় কোন দেশের জনসাধারণ কোন ব্যক্তিকে একাধিপত্য দান করিতে পারে; কিন্তু তাহা কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

সুতরাং আধুনিক কোন রাষ্ট্রনীতি বহুজন-সমর্থিত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই, তবে তাহা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। এক বা অল্পসংখ্যক লোকের বাক্যের মোহে ভুলিয়া অথবা তাহাদিগের নিষ্ঠুর ও পাশব শক্তিজাত ভীতিতে বহু লোকে কোন শাসন প্রণালী কিছুকালের জন্য মানিয়া লইতে পারে; কিন্তু সে মানিয়া লওয়াকে কোন রাষ্ট্রনীতি বলিয়া প্রচার করা মূঢ়তা। কারণ রীতিনীতি সেইগুলিই সত্য ও যথার্থ যাহার মূলে কোন শুদ্ধ ও পবিত্র আদর্শ আছে। পাশব শক্তির প্রাবল্য কোন নীতির কারণ হইতে পারে না, কারণ সে শক্তি সর্ব্বদাই ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়শীল। ব্যক্তি নিজের প্রাধান্যে মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে পারেন যে তাঁহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সকল কৃষ্টি, আদর্শ ও জীবন ধর্ম্ম হইতেও উপরে এবং সর্ব্ব মানব তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিজেদের মনের সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন; কিন্তু এই জাতীয় মনোভাব বিকৃত ও মানব-প্রগতি বিরুদ্ধ।

রাজনীতি যতই বস্তুবাদের উপর নির্ভর করিয়া চলুক না কেন, তাহার মূলে সত্য আদর্শ, সুনীতি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকিলে তাহা মানব-প্রাণকে কখন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। এবং এই আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে সে রাজনীতিতে মানুষ কখন পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে পারে না। অর্থাৎ সে রাজনীতি ও শাসন-পদ্ধতি যতই না বাস্তব ভাবে লাভজনক হউক না কেন জন-সাধারণের শ্রদ্ধা জাগ্রত করিবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে না। সেই জন্য বস্তুবাদ কখনও আধ্যাত্মিক ও আদর্শ-বাদী প্রেরণার উপরে উঠিতে পারে না। খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, কিম্বা অপর যাহা কিছুই হউক না কেন তাহার উৎপাদন বণ্টন ও ভোগের রীতির মূলে ন্যায় ও সত্য ধর্ম্মের স্থান পূর্ণরূপে না থাকিলে সে বাস্তব ঐশ্বর্য্য অভাব মোচন না করিয়া মানব-জীবনের দুঃখ কষ্ট আরও বাড়াইয়া তুলিবে। ন্যায়, ধর্ম্ম ও সুবিচার যদি থাকে তাহা হইলে অভাব থাকিলেও দুঃখ থাকে না। এবং ন্যায় ও নীতি না থাকিলে, বহু ঐশ্বর্য্য থাকিলেও ব্যক্তি বা সমাজ মহা দুঃখে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হয়। এই সকল কারণে ধর্ম্ম, সত্য, সুনীতি ও ন্যায় সকল বাস্তব ঐশ্বর্য্যের উপরে স্থান লাভ করিয়া থাকে। এবং ন্যায় ও ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত, জড়বাদ অথবা বস্তুতন্ত্রের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ফল নহে। যাঁহারা জড়বাদ ও বাস্তব

ঐশ্বর্য্য লইয়াই মশগুল থাকেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে প্রাণহীন দেহ যেমন শীঘ্রই পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়; ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা হারাইলে সমাজ ও রাষ্ট্রও তেমনি শীঘ্রই ধ্বংসের অতলে চলিয়া যায়। তাই যাঁহারা কর্ম্মী ও বাস্তব ঐশ্বর্য্যের পরিকল্পনায় বিভোর, তাঁহাদিগকে আমরা এই কথাই বারম্বার বলিতে চাই যে, তাঁহারা যেন বস্তু আহরণে মত্ত হইয়া মানবাত্মাকে ভুলিয়া না যান। বিরাট্ বিরাট্ বস্তু গঠন প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যহীনতা দোষে বিফল হইয়া যাইতে পারে এবং সেই প্রকার বিফলতার উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম ও অপরাপর উন্নত মানবসভ্যতার কেন্দ্রসকল অতীতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এই সত্য ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাবে। মহা বিপ্লব হইয়াও মানুষের উপকারে অসমর্থ হইয়াছে আধ্যাত্মিক আদর্শহীনতার ফলে। ফরাসী বিপ্লবের পরে নেপোলিয়নের আবির্ভাবে ইহা দেখা যায়।

আজ ভারত অতিমাত্রায় বস্তুবাদ ও জড়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে উন্মুখ। ভারতের অতি-মানব সমাজে আজ জড়বাদ ও বস্তুতন্ত্র অবাধে উচ্চ আসনে স্থাপিত ও সংরক্ষিত। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় শিষ্যবর্গ আজ আধ্যাত্মিকতা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারেন না বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে তৎপর। এই অবস্থায় ভারতের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজী উত্তমরূপে জানা থাকিলেও এই সকল নেতাগণ নিজ আত্মাকে mess of pottage-এর জন্য বিনাশের পথে লইয়া যাইতে অনিচ্ছুক নহেন। কারণ ঐশ্বর্য্যের মোহ; বাস্তবের সহজ অনুভূতির আবেগ ও অন্যান্য বস্তুবাদাক্রান্ত দেশের সভ্যতার আকর্ষণ। আমরা আজ জগৎ সভ্যতার ইতিহাস ভুলিয়া সেই আদর্শহীন অধর্ম্মের পথে চলিয়াছি, যে পথে মানুষ বারবার চলিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। শুধু পূর্ণতর ভোগের আয়োজনই যদি মানব-জীবনের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে মানব-ইতিহাসে এতবার এতগুলি বৃহৎ বৃহৎ সভ্যতা বিনষ্ট হইল কেমন করিয়া? বস্তুবাদের চরমে আনিয়া সফলতার চূড়ান্ত করিয়া সর্ব্বনাশ হয় কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর কি তাহা না জানিয়া জড় ঐশ্বর্য্যের পথে অগ্রসর হওয়া বিপদজনক। মনের ও প্রাণের ঐশ্বর্য্য লইয়া কলহ বিবাদ হয় না। তাহা অপরকে দিলেও পরিমাণে কমিয়া যায় না। হরণ না করিয়াও তাহা গ্রহণ করা যায়।

অ

## বিশেষজ্ঞদিগের মতামতের কথা

যাঁহারা রাষ্ট্রে অথবা সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া জনসাধারণের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদিগের বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করা একটা নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতির অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। বিষয় যাহাই হউক না কেন, নেতাদিগের সকল বিষয়েই একটা না একটা মত থাকিবেই। এবং সাধারণতঃ সে মত অপর সকল ব্যক্তির মত হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মানীর পরস্পর সম্বন্ধ অথবা রুশ, চীন ও আমেরিকার জার্ম্মানজাতির ভবিষ্যত প্রগতির দিক্‌নির্ণয়ে অধিকার প্রভৃতি প্রশ্ন ও সমস্যা ভারতের জননেতাদিগের নিকট অতি সহজ বিষয়। তাঁহারা অবলীলাক্রমে প্রত্যেকটি বিষয়েই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভিৎনামে রুশদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হইতে পারে কি না বিপ্লবীদিগের সুবিধার জন্য এ কথার উত্তরও ভারত নেতাদিগের বিচার্য্য। পরমাণু কিম্বা পরব্রহ্ম, জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতা অথবা অন্য যে কোনও বিষয়ই হউক না কেন আমাদিগের রাষ্ট্রীয় মহামুনিদিগের নিকট তাহার বিচার সহজেই হইয়া যায়। সম্প্রতি নূতন গঠিত রামকৃষ্ণ কৃষ্টিকেন্দ্রে এক জননেতা বলেন যে, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা বোধ ততটা প্রবল নহে যতটা তিনি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে উদগ্র। বলিবার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, আধ্যাত্মিকতা লইয়া সকলে ব্যস্ত হইলে ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণ কঠিন হইবে। কারণ অর্থ যদি ধর্ম্মের জন্য ব্যয়িত হয় তাহা হইলে ট্যাক্স দিবার জন্য আর কিছু বেশী বাকি থাকে না। সেই জন্য সকলে যদি একপ্রাণ হইয়া শুধু ফ্যাক্টরী গঠনে লাগিয়া পড়েন ও আত্মাকে বাদ দিয়া শুধু উদরে মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে দেশের অধিক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ দেশনেতাদিগের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। অধিক মাত্রায় ধর্ম্ম, পরমার্থ ও ভালমন্দ বিচার করিতে আরম্ভ করিলে দেশবাসীর জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইলে নেতাদিগের দ্বারা পরিবেশন করা মিথ্যা ও অন্যায়ের খোরাক সাধারণে অতটা নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ না করিতে পারে। নীতি, ন্যায় ও সত্য সম্বন্ধে সজাগ হইলে জনসাধারণ আর পণ্ডিত নেহরুকে না মানিতে পারে। ভগবানে বিশ্বাস বাড়িয়া চলিলে ক্রমশঃ কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্ট দলে বিশ্বাস কমিয়া যাইতে পারে। এবং সর্ব্বোপরি বাহিরের জগতের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া থাকিলে ভারতে কি হইতেছে সে কথা বিচার করিবার সুযোগ অতটা আর থাকিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জড়বাদ প্রচার; ভগবানে,

ধর্ম্মে, আধ্যাত্মিকতায়, সত্যে কিম্বা ন্যায়ে অনাস্থা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া এবং লাওস, ভিৎনাম, কঙ্গো অথবা জার্ম্মানীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে শিখান, ভারতরাষ্ট্রকে নেতাদিগের কবলে আড়ষ্টভাবে আবদ্ধ রাখিবার উপায় মাত্র। যদিও সকল রাষ্ট্রনীতি ও অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার মূলে রহিয়াছে ধর্ম্ম, সত্য ও ন্যায়ের কথা; যদিও রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদ অর্থাৎ সাম্য, স্বাধীনতা, বিশ্বমানবপ্রীতি, সত্যাগ্রহ ও ন্যায় মূলতঃ আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইতেই উদ্ভূত। তাহা হইলেও যখন রাষ্ট্রবিশেষে অন্যায় ও অধর্ম্ম প্রকট হইয়া উঠে তখন সে রাষ্ট্রের সাধারণের পক্ষে মূল সত্যগুলি ভুলিয়া শুধু বাস্তবে যাহা পাওয়া যায় তাহা লইয়াই নমোঃ নমোঃ করিতে থাকাই নেতাদিগের দিক হইতে বাঞ্ছনীয়। ইহাকেই বলে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন মত গঠিত করিয়া লওয়া। কোথাও কোথাও শুনা যায় "মগজ ধোলাই" করিয়া জনমত গঠিত করারও রীতি আছে। প্রাচীন কালে মুনি-ঋষিগণ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতেন। আজ বস্তুবাদের ক্ষেত্রে সেই কৃচ্ছ্রসাধন অভাব-অনুভূতির গভীরতার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইতেছে। শুধু "নাই, নাই"। "চাই বেশী বেশী; কিন্তু পাই অতি অল্পই।" এই অভাব বোধ আজকালকার মানুষকে একটা বাধ্যতামূলক ত্যাগ শিক্ষা দিয়া তাহার মধ্যে ক্রমশঃ সেই পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিতেছে; যাহার সহিত পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের অমৃতত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষার সবলতার তুলনা করা যাইতে পারে। তুলনা করা আদর্শের ও সভ্যতার দিক দিয়া অত্যন্ত গর্হিত হইলেও মানসিকভাবে জাতিকে যে একটা নূতন পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহার ব্যাখ্যান হিসাবে সে তুলনা ব্যবহার-যোগ্য। আধুনিক জগতে বস্তুর মূল্য আত্মার ও আধ্যাত্মিক সত্তানিচয়ের মূল্যের সহিত তুলনায় অনেক অধিক। এক ছটাক বস্তু এক সের প্রমাণ ন্যায়, সত্য বা ধর্ম্মের অপেক্ষা মূল্যবান ও অধিক কামনার বিষয়। এই কারণেই সকল ইতিহাস, সকল কৃষ্টি, সকল মনোবৃত্তি ও সকল জন-মঙ্গলের কথা আজ মাপকাঠি ও দাঁড়িপাল্লা দিয়া বিচার করা সম্ভব হইয়াছে। কুকুরকে খাবারের লোভ দেখাইয়া মানবাত্মার বিশেষ বিশেষ ভাবের কথার মূল অনুসন্ধান করা হইতেছে। কুকুর কেন ল্যাজ নাড়ে এবং না নাড়িলে কেমন করিয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল আন্দোলন শিখাইতে হয় তাহা প্রত্যেক জননেতার জানা প্রয়োজন। নেতৃত্ববাদের ইহাই মূল কথা। জড়বাদেরও। অ.

## রেলওয়ে দুর্ঘটনার সম্বন্ধে

কিছুকাল পূর্ব্বে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনাতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিল ও আরও অনেক অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে আহত হইয়া অথবা সর্ব্বস্ব হারাইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল, আমাদিগের দেশ-শাসকদিগের মধ্যে সে কারণে বিশেষ কোনও ক্ষোভ অথবা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। অন্য কোন দেশে ঐরূপ রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটিলে অন্ততঃ রেলওয়ের বড় বড় কর্ম্মচারী ও মন্ত্রীমহলে গোলযোগের সূত্রপাত হইত। কাহারও চাকুরি যাইত, কেহ "সাসপেণ্ডেড" হইত এবং হয় ত কোন মন্ত্রী আত্মসম্মান বোধ হেতু কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া দিতেন। কিন্তু আমাদিগের এই ভাই বেরাদারির পরস্পর সমর্থনের মুল্লুকে ঐরূপ জনহিতকর পথে রাজকর্ম্মচারী ও মন্ত্রিগণ কখনও চলিতে চাহেন না। তাঁহারা নিজেদের চামড়া বাঁচাইয়া চলিতে জানেন এবং জনসাধারণের যতই ক্ষতি হউক না কেন, তাঁহাদিগের নিজেদের দোষ কখনও ধরা পড়িবে না, ইহা আমরা সকলেই জানি। সাফাই গাওয়া সম্বন্ধে ভারতের রাজকর্ম্মচারীদিগকে অপর দেশের কেহ কিছুই শিখাইতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বদাই নির্দ্দোষ ও অপরের দোষ ব্যতীত এ দেশে কখন কোন সাধারণের ক্ষতিকর কিছু ঘটিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপর যাহারা দোষ করে অথবা সাধারণের ক্ষতি করে, তাহারাও কখনও ধরা পড়ে না। ভারতের ন্যায় অপরাধী ও দোষীদিগকে এত উত্তম করিয়া অন্য কোন দেশে শাস্তির হাত হইতে বাঁচান হয় না। অপরাধের সংখ্যা ভারতে যত বাড়িয়া চলে, ততই আরও কম লোকে শাস্তি পায়। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, ভারতে অপরাধ কিছু কেহ করিলে প্রথমতঃ অপরাধীকে না ধরিয়া এক দফা লাভ হয়। তৎপরে নির্দ্দোষ কাহাকেও ধরিয়া চালান দিয়া ও পরে তাহাকে নির্দ্দোষ মানিয়া লইয়া দ্বিতীয় দফা লাভ হয়। দোষীকে বাঁচাইবার জন্য উচ্চ-স্তরের বহু বিশিষ্ট লোকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন; কারণ ঐ জাতীয় লোকেরা নির্ব্বাচন-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সৈনিক বলিয়া পরিচিত এবং সেই জন্যই তাহাদিগের জন্য রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের "অতিবিশিষ্ট" লোকেদের গৃহের দরজা সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে। সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ যাহারা করে তাহারাই ভারতবর্ষে বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী।

এই অবস্থায় কাহার দোষে ঐ রেলওয়ে দুর্ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল তাহা কোনও দিন জানা যাইবে না। শুনা যাইবে যে কোন অজানা অপরাধী বা লুঠেরার দল রেল লাইনের "নাট-বোল্ট" খুলিয়া দুর্ঘটনাটি ঘটাইয়াছিল।

কিন্তু যদিও বারে বারে ঐ "সাবোটেজের" কথা আমরা শুনি তাহা হইলেও কোন দিন কোন "সাবোটর" ধরা পড়িয়াছে বলিয়া শুনি নাই। রেললাইন যদি যে কেহ যখন খুসী খুলিয়া ও তুলিয়া ফেলিতে পারে, রেলগাড়ী লুঠ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য কিম্বা শুধু অকারণ পুলকে; তাহা হইলেও সেইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী ত ঐ রেল-কর্ম্মচারী ও পুলিশগণই। তাঁহারা যদি অপরাধ নিবারণ করিতে বা অপরাধীদিগকে ধরিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বেতন দিয়া ভরণপোষণ করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া অপর লোক নিযুক্ত করাই ত সুবুদ্ধির কথা। তাহা করা হয় না কেন? নিষ্কর্ম্মা লোক যাঁহারা রাখেন তাঁহাদিগকেও উচ্চ পদ হইতে দূর করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, কোনও প্রকার শাস্তি যদি কাহারও না হয় তাহা হইলে অপরাধ ও ক্রুটির কখনও শেষ হইতে পারে না।

ঐ রেলওয়ে দুর্ঘটনার পরে শুনা যায়, পুলিশ আহত লোকদিগকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষার চেষ্টাতে বাধা দিয়া নিজেদের "ফরম" ভর্ত্তি করিতে ব্যস্ত ছিল। গোপালভাঁড় যেরূপ নদীর ঢেউ গুণিবার কার্য্য করিতে গিয়া সকল নৌকা থামাইয়া দিয়া মাঝি-মাল্লাদিগের নিকট ঘুষ লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; আমাদিগের "ফরম" পূরণ কার্য্যও প্রায় সেইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ মরুক, বাঁচুক, ঘর-দুয়ার-সম্পত্তি তাহাদিগের নষ্ট হউক কিন্তু "ফরমে" যথাযথ ভাবে লেখা কখনও বন্ধ হইতে পারে না। এবং লেখা বন্ধ করিয়া মানুষের প্রাণ বা সম্পদ রক্ষা করিতে হইলে কিছু দক্ষিণার ব্যবস্থা প্রয়োজন। কল্পনাশক্তিহীন জনমেবাব্রতে বীতরাগ সমাজদ্রোহী রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসন একান্ত প্রয়োজন। এই সকল ব্যক্তিই প্রধানতঃ দেশের সকল দুঃখ-কষ্টের মূলে রহিয়াছে। সকল পাপের প্রশ্রয়-দাতা, সকল অপরাধীর রক্ষা কর্ত্তা ও সকল অন্যায়ের সমর্থনকারী এই সকল দেশশত্রুগণ ও তাহাদিগের পোষণ-কর্ত্তা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণই ভারতের বর্ত্তমান অবনতির কারণ। ভারতের জনসাধারণের বর্ত্তমানে উচিত সর্ব্বক্ষেত্রে সাধারণের তরফ হইতে অনুসন্ধান ও অপরাধ নিবারণের চেষ্টা করা। রাষ্ট্রশাসন অর্থে যাঁহারা বুঝেন শুধু খাজনা আদায় করিয়া ইচ্ছামত অপব্যয় করা মাত্র, তাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বকালীন বাদশাদিগের সাদৃশ্যই লক্ষ্য করা যায়। তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের মানুষ নহেন এবং তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে অপসৃত করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। অ.

## পরমাণু বিস্ফোরণ যুদ্ধ

আধুনিক যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইতেছে মানব সমাজে দুইটি অতিকায় দলের সৃষ্টি ও সেই দুই দলের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বিভেদের ফলে আর একটি মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা। এক দলের বিশ্বাস যে সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধের কোনও হাতিয়ার না থাকিলেও তাহারা স্বাধীনভাবে সংগ্রাম চালাইয়া চলিয়া নিজ ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, এবং তৎপরে তাহারা "স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে" ভোট দিয়া নিজেদের প্রয়োজন ও পছন্দমত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিলিব্যবস্থা করিয়া লইয়া মানব-জাতির ব্যক্তিত্বের অধিকার পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে পারে। দারিদ্র্য দোষ থাকিলেও না কি মানুষ মাথা উঁচু করিয়া নিজের অধিকার রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এবং এই কারণে চতুরের চাতুর্য্য ও পরস্ব নিজ করায়ত্ত করিবার চেষ্টাকে কোনরূপে দমন না করিয়াও মানব-স্বাধীনতা অবাধে বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। অপর দলের বিশ্বাস বহু লোকের বহু মত ও দাবী-দাওয়া থাকিলে মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলি বাড়িয়া চলিতে থাকে। এমন কি মানুষের দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক শোষণকার্য্যও বহু লোকের দ্বারা না হইয়া শুধু এক পথে চালিত হইলে বিষয়টা সহজ হইয়া যায়। এই কারণে শুধু রাষ্ট্রমাত্রই যদি শোষণ হয় তাহা হইলে মানুষের দুঃখ ও অভাবের লাঘব না হইলেও তাহার কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় মনের শান্তি বৃদ্ধিলাভ করে। এবং বড় বড় বিষয়ে মতামত দিবার সুযোগ না থাকায় সেই শান্তি আরও পূর্ণতর হয়। এমন কি বেতন বৃদ্ধির দাবী অথবা কাহারও বিরুদ্ধে আর্থিক দাবীর কারণে অভিযোগ করিয়া আদালত গমন প্রভৃতি স্বাধীন মানুষের নিত্যকর্ম্মের বিষয়গুলি থাকিতে পারে না বলিয়া মানুষের সুখের সীমা থাকে না। যদিও মূলতঃ উভয় প্রকার রাষ্ট্র ও সমাজ নীতিরই মতলব একই; অর্থাৎ অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা বহু সংখ্যক লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা, তাহা হইলেও মানব সমাজে এই দুই বিভিন্ন পন্থার অনুসরণে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়া আণবিক বিস্ফোরণের কারণ আরও প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। এক দল বর্ত্তমানে বিশেষ আগ্রহে বিস্ফোরণকার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন অপর দল ইতিপূর্ব্বে সেই কার্য্যই করিয়াছিলেন, এবং পুনর্ব্বার যে করিবেন না তাহারও কোন আশা দেখা যায় না। পৃথিবীতে অপরাপর বহু জাতি আছে যাহারা এই উভয় দলের কাহারও সহিত যোগদান

করে নাই। অবশ্য তাহাদিগের রাষ্ট্র ও সমাজনীতি ঐ দুই দলেরই কাহারও না কাহারও মতই। অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক বিলিব্যবস্থা তথাকথিত "ডিমক্র্যাটিক" বা সাধারণতন্ত্র অনুগত। তাহার অর্থ এই নহে যে, ভারতের সাধারণের অবস্থা কিছুমাত্র ভাল। দারিদ্র্য, অভাব অন্যায় ও অধর্ম্ম ভারতের রাষ্ট্রে ও সমাজে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের মানুষ স্বাধীন ভাবেও না খাইয়া থাকে, এবং রাষ্ট্রের চাকুরি করিয়া হুকুম তামিল করিয়া পুরা পেট খাইবারও তাহার সংস্থান নাই। ভারতের জননেতাগণ আজকাল বিশ্বের দরবারে যজমান খুঁজিয়া বেড়ান ও কোনও মুর্খ যদি তাঁহাদিগের স্তোকবাক্য শুনিতে প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে ভারত কিছু দক্ষিণা অর্জ্জন করিতে পারে—অন্ততঃ কর্জ্জ হিসাবে। অপরাপর সকল জাতি, যাঁহারা আণবিক যুদ্ধ বা অন্য কোনও প্রকার যুদ্ধ চাহেন না, তাঁহারাও যুদ্ধপারগ এই দুই মহাদলের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াই চলেন। অর্থাৎ যুদ্ধকে ততটা অধর্ম্ম কেহই ভাবেন না। যে যুদ্ধ চাহে তাহাকে অপাঙ্‌ক্তেয় কেহই মনে করেন না। যুদ্ধ-ইচ্ছার কারণে কোন জাতিই অপর কোন জাতির নিকটে হেয় প্রতীয়মান হয় না। এই অবস্থায় যুদ্ধ পৃথিবী হইতে কখনও নির্ব্বাসিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অ

## সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার সংগ্রামের বীর যোদ্ধা প্রখ্যাত-শ্রমিক-নেতা, অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই অক্টোবর পরলোকগমন করিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র ১৮৮৫ সনে ফরিদপুর জেলার নড়িয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সনে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চাঁদপুরে লর্ড কার্জ্জনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সনে কোচবিহারে প্রত্যক্ষভাবে তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৪ সনে শান্তিনিকেতনে তাঁহার সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয় এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৯১৭ সনে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়ার কমিশন নিয়ে চিকিৎসকরূপে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯১৯ সনে সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে তিনি বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ১৯২০ সনে তিনি অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উহার আজীবন সভাপতি ছিলেন। এই আশ্রমের নামকরণ করেন গান্ধীজী।

১৯২১ সনে ডাঃ সুরেশচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে তিনি প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ সনে তিনি কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন ও পরে পি. এস. পি-তে যোগদান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, আগষ্ট আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে যোগদান করিয়া তাঁহার গ্রামে স্বাধীন সরকার পত্তন করেন। ১৪ দিন স্বাধীন সরকার পরিচালনার পর সুরেশচন্দ্র গ্রেপ্তার হন।

সুদীর্ঘকালের কর্ম্মিত্ব ও সেবকতার দ্বারা, প্রেরণাময় আদর্শ বরণ করিয়া এবং ত্যাগ ও দুঃখক্লেশের দীক্ষা সানন্দে গ্রহণ করিয়া অল্পসংখ্যক যাঁহারা বৃহত্তর জন-জীবনে নায়কতার প্রতিষ্ঠা ও গৌরবলাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদেরই অন্যতম।

## ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসু

গত ১৭ই অক্টোবর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও রাজনৈতিক নেতা ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসু লণ্ডনের সেণ্ট প্যানক্রাস হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫২ বৎসর হইয়াছিল।

ডক্টর অতীন্দ্রনাথ ঢাকা জেলার মালখা নগরের কৃতী সন্তান। নিজ গ্রামেই অতীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৯২৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আই-এ এবং বি-এ (অনার্স) পরীক্ষায়ও তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন।

জেলে বন্দীদশায়ই তিনি এম-এ পরীক্ষা দেন। তাঁহার পি-এইচ-ডি'র থিসিস—উত্তর ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। সম্প্রতি তিনি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে গবেষণা করিতেছিলেন।

অতীন্দ্রনাথ যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁহার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন সুরু শ্রীসংঘে। ১৯৩১ সনে রাজ-নৈতিক অভিযোগে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সী জেল ও বক্সার ক্যাম্পে কাটাইবার পর ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সালতলায় নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ১৯৪২ সনে দ্বিতীয়বার ডক্টর বসুর কারাজীবন সুরু হয়। এবার মুক্তি পান ১৯৪৬ সনে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে জড়িত। এক সময় ডক্টর বসু এই দলের জাতীয় কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ও ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীরূপে ১৯৫২ সনে তিনি আসানসোল কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য

নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫৭ সন হইতে তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।

তাঁহার মত কৃতী সন্তানের এই অল্প বয়সে মৃত্যু বড়ই মর্ম্মান্তিক।

## অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র

গত ১১ই অক্টোবর বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত খগেন্দ্রনাথ মিত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

খগেন্দ্রনাথ ১৮৮০ সনে যশোহর জেলার ধুলগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ সনে ইংরাজী ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া তিনি বি. এ. পাস করেন। এম. এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০২ সন হইতে '২৮ সন পর্য্যন্ত রাজসাহী, কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হ'ন। ইহার ৪ বৎসর পরে খগেন্দ্রনাথ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ, কাউন্সিল অব ষ্টেট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং রবিবাসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষিত-সমাজে তিনি উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

## অতুলচন্দ্র ঘোষ

গত ১৫ই অক্টোবর মানভূমের জনপ্রিয় নেতা অতুলচন্দ্র ঘোষ পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সনের ২রা মার্চ্চ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার খণ্ড-ঘোষ গ্রামে অতুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অতুলচন্দ্রের শৈশব ও কর্ম্মজীবন মানভূমে অতিবাহিত হয়। ১৮৯৯ সনে তিনি পুরুলিয়া জেলা স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে ১৯০৫ সনে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে ওকালতী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, ১৯০৮ সনে আইন পরীক্ষায় পাস করেন।

অতুলচন্দ্র যখন ওকালতীতে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়, সেই আন্দোলনে অতুলচন্দ্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় মানভূমের ঋষিকল্প মনীষী নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তও সরকারী জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ঋষি নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র রাজনৈতিক জীবনে একই গ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক কর্ম্মীদের বাসস্থান ও কর্ম্মস্থলের কেন্দ্ররূপে পুরুলিয়া শিল্পাশ্রম নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। এই নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র উভয়েই মহাত্মা গান্ধীর জীবনা-দর্শকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদর্শে সমগ্র জেলার কর্ম্মজীবন তথা জনজীবন গড়িয়া তুলিতে বিভিন্ন কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তন করেন।

১৯৪৬ সনে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া শাসন-শক্তির সুযোগ গ্রহণ করার প্রস্তুতি-রূপে অতুলচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সমগ্র জেলাব্যাপী তিন সহস্রাধিক গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠন করেন। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ১৯৪৭-৪৮ সনে এই পঞ্চায়েৎগুলি দেশের স্বাধীন সরকারকে যে ভাবে সহায়তাদান করে এবং জনজীবনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্য করে—তাহাতে সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়।

১৯৪৮ সনে স্বাধীন ভারতে নূতন এক সংগ্রামের অধ্যায় রচিত হয়। এই সময়ে মানভূম প্রভৃতি বাংলা-ভাষী অঞ্চলে বিহার সরকারের হিন্দী সাম্রাজ্য-নীতি অতি উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং স্বাধীন ভারতের স্বদেশী সরকারের সর্ব্ব-ব্যাপক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনে সমগ্র পঞ্চায়েতের ধারা-ব্যবস্থা জন-গণের সংগ্রামমণ্ডলীতে পরিণত হয়। এই সময় কংগ্রেসের সহিত মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া 'লোকসেবক সঙ্ঘ' গঠন করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর বিহার আমলের দীর্ঘ নয় বৎসর বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়া ব্যাপক জনমুক্তি আন্দোলন, বিরাট টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলন, নিরাপত্তা আইন-বিরোধী আন্দোলন, প্রভৃতি যে সকল সংগ্রামাত্মক ঐতিহাসিক আন্দোলন দেখা দেয় —অতুলচন্দ্র সেই সকল আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া নেতৃত্ব করেন। ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একীকরণের এক উদ্ভট পরিকল্পনা দেখা দিলে, তাহার বিরুদ্ধে তথা বিহারের বাংলাভাষী জনগণের দাবির প্রতি সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনে অতুলচন্দ্রের নেতৃত্বে এক সহস্রাধিক কর্ম্মী পদব্রজে ১৯৫৬ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া হইতে বঙ্গসত্যাগ্রহে যাত্রা করে। যাত্রাপথে বাংলার গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে অতুলচন্দ্র ও তাঁহার বাহিনী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও আন্তরিক অভ্যর্থনার দ্বারা বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হন।

এই ব্যাপক আন্দোলনের ফলে মানভূম জেলার কিয়দংশ পুরুলিয়া জেলারূপে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতুলচন্দ্রের জীবনে ইহাই তাঁহার শেষ সংগ্রাম।

# চারণ ও ক্ষত্রিয়

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

(৬)

দিগ্‌বিজয়ী কবি করণীদান যেখানে গিয়াছেন সেখানেই রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। যোধপুর রাজ্যের সুলবাড়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী, গোত্রের নামই "কবিয়া"। রাঠোর বংশের ইতিহাসমূলক "সূর্য্যপ্রকাশ" নামক মহাকাব্য রচনা করিয়া করণীদান মহান্ সৎকার পাইয়াছিলেন। মহারাজা অভয় সিংহ কবি করণীদানকে কবিরাজা উপাধি ভূষিত করিয়া "লক্ষপ্রসাদ" দান দিয়াছিলেন। অধিকন্তু মারবাড় রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মাণ্ডোবরের (মান্দোর) তোরণদ্বারে কবিকে হাতীর উপর চড়াইয়া বিরাট্ শোভাযাত্রার সহিত দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী যোধপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং এই শোভাযাত্রায় মহারাজা অশ্বারূঢ় হইয়া হাতীর আগে আগে চলিয়াছিলেন। কবি মহারাজাকে প্রশংসা করিয়া যে দোহা শুনাইয়াছিলেন উহার প্রথম ছত্র—"অশ চড়িয়ো রাজ্য অভো, কিব (চারণ) চাঢ়ে গজরাজ।"

সম্ভবতঃ মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মহারাজা বখতসিংহের নিকট হইতে কোন কূটনৈতিক প্রস্তাব লইয়া কবি করণীদান মিবাড়ে গিয়াছিলেন। কবি মিবাড়ের উপর সুপ্রসন্ন ছিলেন না। পরলোকগত মহারাণা দ্বিতীয় অমরসিংহ (১৬৯৮-১৭১১ খ্রীঃ) ভাট চারণের দৃষ্টিতে মহাপাপী ছিলেন। ব্রাহ্মণ চারণ ভাট মিলিত হইয়া উদয়পুরে ধর্ণা দিয়াছিল। মহারাণার কঠোরতা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই দেখিয়া রাজপুরোহিত নিজ হইতে ছয় লক্ষ টাকা এবং খেমপুরের দধ্‌বাড়িয়া চারণ তিন লক্ষ টাকা দিয়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও চারণ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিলেন; কিন্তু ভাটেরা ধর্ণা ত্যাগ করিল না। মহারাণা খবর পাইলেন সত্যাগ্রহী ভাটেরা বিছানার মধ্যে রুটি-মিঠাই লুকাইয়া রাখে। তাঁহার হুকুমে ভাটের ডেরার উপর হাতী ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং পলায়িত ভাটগণের বিছানার মধ্যে নাকি রুটি-মিঠাই পাওয়া গিয়াছিল (সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন)।১ ইহার পরে উদয়পুরের পাঁচ মাইল উত্তরে আম্বেরী নামক স্থানে দুই হাজার ভাট বুকে পেটে ছোরা মারিয়া আত্মহত্যা করিল; মহারাণা ভাটদের ৮৪ গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিলেন। অমরসিংহের মৃত্যুর পর মহারাণা দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহজী (১৭১১-৩৪ খ্রীঃ) রাজ্যারোহণ করিয়া পিতাকে স্বর্গে না উঠাইলেও প্রজাপালন, দানশীলতা এবং গুণগ্রাহিতার জন্য বিপুল যশ লাভ করিয়াছিলেন। কবি করণীদান দরবারে উপস্থিত হইয়া মরুভাষায় স্বরচিত পাঁচটি "গীত" অর্থাৎ কবিতা মহারাণাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মহারাণা কবিকে বলিলেন, ইহা কি গীত না মন্ত্র? ধূপার্চ্চনার দ্বারা মন্ত্রের আরতির বিধান আছে। যদি আপনার অনুমতি হয় আমি গীতকে মন্ত্রজ্ঞানে ধূপের আরতি করিব, না হয় "লক্ষ-প্রসাদ" দান গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। ইহার প্রত্যুত্তরে করণীদানজী বলিলেন, এই কয়েকদিন পূর্ব্বেই শাহপুরার রাজা উম্মেদ সিংহ এবং ডুঙ্গারপুর রাজ্যের মহারাবল শিব সিংহ আমাকে "লক্ষ-প্রসাদ" দিয়াছেন, এই দান আরও হয়ত অনেকে দিবেন। আর্য্যদিবাকর আপনি, মহারাণার হাতে আমার গীত ধূপ পাইলে ধন্য হইবে। মহারাণা গীতের পাতাগুলির যথাবিধি ধূপার্চ্চনা করিয়াছিলেন, অধিকন্তু "লক্ষ-প্রসাদ"ও কবিকে দিয়াছিলেন।২

(৭)

মিবারের মহারাণা প্রথম জগৎ সিংহ (রাজ সিংহের পিতা, রাজ্যকাল, ১৬২৮-৫২খ্রীঃ) দানশীলতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজা ও সামন্তবর্গ অপেক্ষাও কবিগণ তাঁহার নিকট অধিক অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ করিত। যোধপুর রাজ্যের পোলপাত (দ্বারস্থ) চারণ রোহড়িয়া করণীদান (এই নামের একাধিক ব্যক্তি ছিলেন),

১। ওঝা; রাজপুতানেকা ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৯১৯-৯২০।

এই যুগের সত্যাগ্রহ এবং অনশন ব্রতেও ভেজালের অপবাদ শুনা যায়। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় আমাদের বাড়ীর নিকট ঢাকা বোর্ডের ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কয়েকদিন সত্যাগ্রহ করিয়াছিল। পরে শুনা গেল ছাত্রেরা নাকি গোপনে পালা করিয়া খাইয়া আসিত। ডুব দিয়া জল খাইলে নাকি নিরম্বু একাদশীর বাবাও টের পায়না।

২। বংশ ভাস্কর, দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃঃ ৫১।

একবার রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে উদয়পুর গিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে পাঁচশত কদম [পাদক্ষেপ] দূরে জগদীশের মন্দির পর্য্যন্ত অগ্রবর্ত্তী হইয়া জগৎসিংহ চারণকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—যে সম্মান স্বয়ং যোধপুরের মহারাজাও মিবারে পাইতেন না। জগৎসিংহের দরবারে মারবাড় রাজ্যের মোখড়া গ্রামনিবাসী সংঢায়চ শাখার চারণ হরিদাস অনেক দান সম্মান পাইয়াছিলেন এবং মহারাণার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। একদিন অনবধানতাবশতঃ হরিদাস মহারাণার সম্মুখে শেখাবটির (বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্যের উত্তরাংশ) এক ক্ষুদ্র রাজ্য টোডলমলের উদারতা, দানশীলতা, ইত্যাদি সদ্‌গুণের উচ্চপ্রশংসা করিয়া বসিলেন।

ক্ষত্রিয় স্বভাবতঃ পরকীর্ত্তি অসহিষ্ণু। ক্ষত্রিয়ের দানশ্লাঘা ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যশ্লাঘার মতই স্পর্শকাতর। টোডলমলের প্রশংসায় মহারাণার অভিমানের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। মহারাণা চারণকে বলিলেন, ঐখানে যাইয়া দেখুন; কি দান পাইলেন আমাকে আসিয়া বলিবেন।

চারণ তথাস্তু বলিয়া শেখাবটি যাত্রা করিলেন। হরিদাস উদয়পুর ঠিকানার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন শুনিয়া টোডলমল ছদ্মবেশে পাল্‌কীবাহক সাজিয়া অন্যান্য পাল্কীবাহকগণের সহিত হরিদাসের পাল্কীর ডাণ্ডা কাঁধে তুলিয়া চলিলেন; ঠিকানায় পৌঁছিয়া হরিদাস ইহা জানিতে পারিলেন। উদয়পুরে কয়েকদিন আতিথ্যগ্রহণ করিবার পর হরিদাস বিদায় লইবার সময় টোডলমল দক্ষিণাস্বরূপ উদয়পুরসমেত ৪৫ গ্রাম তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। হরিদাস এই দান স্বীকারে অসম্মত হইয়া বলিলেন, চারণের কাজ ক্ষত্রিয়ের বৈভব বৃদ্ধি, ক্ষত্রিয়কে রাজ্যশূন্য করা নহে। টোডলমল পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন, আপনার এইরূপ সঙ্কোচের কোন কারণ নাই, আমি অসিবলে অন্যভূমি জয় করিয়া লইব। হরিদাস অগত্যা কয়েকটা গ্রাম স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট রাজ্য আশীর্ব্বাদস্বরূপ টোডলমলকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

মহারাণা জগৎসিংহ ইহা জানিতে পারিয়া হরিদাস এবং টোডলমল উভয়ের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, তাঁহার আত্মম্ভরিতার অগ্নিতে শান্তিবারি বর্ষিত হইল। হরিদাস মহারাণাকে এক প্রশস্তি শুনাইয়া উভয় পক্ষের প্রতি সুবিচার করিয়াছিলেন—

দোয় উদয়পুর উজলা, দুহুঁ দাতার অবল্ল।
ইকুতো রাণো জগতসী, দুজো টোডরমল্ল॥

দুই জন দানশীল রাজার দান গৌরবে দুই উদয়পুর কীর্ত্তিভাস্বর। ইঁহাদের একজন (মহা) রাণা জগৎসিংহ, দ্বিতীয় টোডলমল্ল॥

ইহা পৌরাণিক কাহিনী নয়; এই যুগের ঐতিহাসিক ঘটনা। শেখাবটির অন্তর্গত খাণ্ডেলার রাজা রায়সাল আকবর বাদশাহর প্রসিদ্ধ মনসবদার। ইনিই আকবরনামায় বর্ণিত রায়সাল দরবারী। সম্রাট রায়সালের কনিষ্ঠ পুত্র ভোজরাজকে উদরপুরের ঠিকানা সহ ৪৫ গ্রাম জায়গীর দিয়াছিলেন। টোডরমল্ল ভোজরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী; টোডলমলের বংশ বর্ত্তমানে খেতড়ী, সুরজগড়, মলসীসর, নবলগড় ইত্যাদি ঠিকানার রাজা।

সম্রাট শাজাহানের বিশ্বস্ত মনসবদার বীরাগ্রগণ্য বুন্দীরাজ সত্রসাল হাড়া বড় দাম্ভিক প্রকৃতি ছিলেন। কোন সময়ে মহিয়ারিয়া গোত্রের চারণ দেবা বুন্দী গিয়াছিলেন। ছত্রসাল তাঁহাকে সম্মান আপ্যায়ন যথেষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু চারণের মন উঠিল না। একদিন কবিসম্বর্দ্ধনার আসর হইতে বাহির হইয়া চারণ দেবা দেখিলেন বুন্দীরাজ তাঁহার চটিজোড়া হাতে লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। রাজার বিনয়ে দেবা নিজের অভিমানের জন্য লজ্জিত হইলেন এবং দোহার ছন্দে প্রশংসা করিলেন—

পাণাঁ গহ পৈজার, সুকব অগা ধরতাঁ সতা।
হিক হিক বার হাজার পহ সুমাঁ মাথৈ পড়ী॥

[জুতা হাতে তুলিয়া সত্রসাল সুকবির সামনে রাখিলেন। এক এক পাটির বার বার হাজার জুতা অন্য রাজাদের মাথায় পড়িল।]

সত্রসালের পৌত্র রাও ভোজ মীসন শাখার চারণ ঈশ্বরদাসকে দুই ক্রোশ অগ্রসর হইয়া স্বাগত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পাল্‌কীতে বসাইয়া নিজে পাল্‌কীর ডাণ্ডায় কাঁধ দিয়াছিলেন। রাও ভোজ পূজার অক্ষতের (আতপ তণ্ডুলের) পরিবর্ত্তে মুক্তার দানার দ্বারা চারণের পাদপূজা করিয়া তাঁহাকে বুন্দীর প্রতোলী-পাত্র (পোতপাল বারহঠ) রূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ভোজের বংশজ মহারাওরাজা বিষ্ণুসিংহ চারণ ঈশ্বরদাসের বংশ-বরেণ্য বদন কবিকে নিজের কাঁধের উপর পা রাখাইয়া হাতীতে চড়াইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং হাতীর আগে আগে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন।[৩]

ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে চারণ-কবি যে সম্মান লাভ

৩। দ্রঃ ভূমিকা পৃঃ ৫০-৫১, বংশ ভাস্কর।

করিয়াছেন, কাব্যপ্রতিভা যে শ্রদ্ধা পাইয়াছে, উহা কদাচিৎ অন্যত্র দেখা যায়।

৮

রাজপুতানা এবং মহারাষ্ট্রে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজ্য অধিকার করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই দুই স্থানে তিনি জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। রাজপুতানা অপেক্ষা মহারাষ্ট্রের কৃতিত্ব অধিক; যেহেতু মহারাষ্ট্রের দেশপ্রেম রাজপুতানার মত রাজ-কেন্দ্রিক ছিল না; ক্ষত্রিয়েতর বর্ণ জাতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুতানায় ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্বে অন্য সম্প্রদায় সমান বীরত্বে যুদ্ধ করিয়াছে, ক্ষত্রিয় অসমর্থ হইলে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া দেশরক্ষা করিতে পারে নাই।

রাঠোর দুর্গাদাসের নেতৃত্বে মারবাড়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে চারণ ব্রাহ্মণ বৈশ্য এবং আদিবাসী সকলেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কবিরাজা চারণ বাঁকী দাস রচিত "রাজরূপক" কাব্যে উহার অনেক উদাহরণ রহিয়াছে।

যে মুষ্টিমেয় যোদ্ধা আওরঙ্গজেবের অবরোধ ভেদ করিয়া মহারাজ যশোবন্তের দুগ্ধপোষ্য-শিশু অজিতকে দিল্লীর যশোবন্তপুরা হইতে দেশে পৌঁছাইয়াছিল উহাদের মধ্যে দিল্লীর যুদ্ধে চারণ সাঁড়ু এবং মীসন শাখার রতন প্রাণদান করিয়াছিলেন। আশ্রয়প্রার্থী শাহজাদা আকবরকে (আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহীপুত্র) সপরিবার সুদূর দাক্ষিণাত্যে পৌঁছাইবার জন্য যে পাঁচশত নির্ভীক অশ্বারোহী দুর্গাদাসের অনুগমন করিয়াছিল উহাদের মধ্যে ছিলেন চারণ সাঁড়ুর পুত্র যোগীদাস, ভারমল, সারো, ধাহুর পুত্র আসল এবং বিট্টু কান্‌হো।

মুসলমান সেনানায়কগণ অকৃতকার্য্য হইবার পর বিদ্রোহী রাঠোরগণকে দমন করিবার জন্য আওরঙ্গজেব তাঁহার বিশ্বস্ত মনসবদার রাঠোর সংগ্রাম সিংহকে (প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মহেশদাস রাঠোরের পৌত্র) যোধপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অজিতের পক্ষাবলম্বী রাঠোর সর্দ্দারগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় যোধপুরের বারহঠ চারণ কেশরী সিংহ উঁহাদের মুখপাত্র রূপে সংগ্রাম সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্তুতি ও তিরস্কারে সংগ্রাম সিংহ এতদূর বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, নিজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মারবাড়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বসিলেন; মারবাড়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাঠোর দুর্গাদাসের পর তাঁহার কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক। দরবারী ইতিহাসে সংগ্রাম সিংহ বিদ্রোহিগণের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন লেখা আছে; কেন দিয়াছিলেন উহা আমরা রাজ-রূপক কাব্য হইতে জানিতে পারি।

যাচক হইয়াও চারণ জাতি কাহারও কাছে মাথা নত করে নাই, ঐশ্বর্য্যের বিরাট পরিবেশের মধ্যে আপন দারিদ্র্যে সঙ্কুচিত হয় নাই; নিজের যোগ্যতম বিশ্বাস হারায় নাই। চারণের এক উপাধি তকব অর্থাৎ তার্কিক, কথায় চারণের সঙ্গে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। সভায়, মজলিসে চারণের পক্ষে পরাজয় স্বীকার ক্ষত্রিয় যজমানের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় অপেক্ষা অধিক অপমানজনক ছিল। বাগ্মিতার সহিত ধূর্ত্ততার সংমিশ্রণ না হইলে সভা জয় হয় না, এই গুণে চারণকে বীদগ (সংস্কৃত বিদগ্ধ) বলা হয়।

মহড়ু শাখার চারণ জাড়া মহারাণা প্রতাপের অযোগ্য ভ্রাতা জগমালের সহিত মিবাড় রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন অপরাজেয় যোদ্ধা ও সুকবি খান খানান্ আবদুর রহিম চারণ জাড়ার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কবির প্রশংসাসূচক ডিঙ্গল ভাষায় এক দোহা লিখিয়াছিলেন। চারণ জাড়া বড় বেয়াড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। যেখানে আবদুর রহিমকে সটান দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত সেইখানে সম্রাটের দরবারে চারণ জাড়া একদিন বসিয়া পড়িয়াছিলেন। রাজপুরুষগণ শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ধমক দেওয়াতে জাড়া উঠিলেন না, একটা দোহা শুনাইয়া দিলেন—

পগে ন বল পতশাহ, জীভাঁ জস বোলাঁত নৌ।
অব জস অকবরকাহ, বৈঠা বৈঠা বোলস্যাঁ॥৪

অর্থাৎ বাদশাহের মত আমার পায়ে জোর নাই, জিহ্বাতেই কিছু যশগান করিবার বল। এখন বসিয়া বসিয়াই আকবর শাহর যশ (প্রশস্তি) পড়িব।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারেও চারণের সম্মান ছিল। তিনি আত্মজীবনীতে এক চারণ-কবির কবিতার অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই চারণ কর্ত্তৃক পিতা ও পুত্রের তুলনাত্মক তুল্য-প্রশংসা জাহাঙ্গীরকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জয়সলমীর পতি রাবল বুধসিংহের মৃত্যুর পর তেজসিংহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং

৪। বংশ ভাস্কর, দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃঃ ৪৮।

গদীর ন্যায্য অধিকারী অখৈ সিংহের উত্তরাধিকার হরণ করিয়া অখৈ সিংহকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। অখৈ সিংহ পলাতক হইয়া উজলাঁ নামক গ্রামে সংঢায়চ শাখার চারণ কান্‌হার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কান্‌হা শুধু অখৈ সিংহের ছয় মাস পর্য্যন্ত ভরণ-পোষণ করেন নাই। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় জয়সলমীরের অধিকাংশ সামন্ত অখৈসিংহের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন এবং উঁহাদের সাহায্যে তেজ সিংহকে বিতাড়িত করিয়া অখৈ সিংহের রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

কে বলিবে চারণ কেবল ক্ষত্রিয়ের শোষক, চাটুকার যাচক?

৯

তরবারি প্রাণ হরণ করিতে পারে, মানাভিমানীর মান হরণ করিতে পারে না। মানের জন্য ক্ষত্রিয় জাতি শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়াছেন, চারণের কাছে যোড়-হাত হইয়া রহিয়াছেন। মুসলমানকে কন্যাদান করিয়া কচ্ছবাহ্‌ বংশের কলঙ্ক রটিয়াছিল। রাজা মানসিংহ এই কলঙ্কের দাগ হাল্‌কা করিয়া মিথ্যা কীর্ত্তির প্রভায় ঢাকিবার জন্য নগদ টাকা, হাতী, গ্রাম ইত্যাদি লইয়া সর্ব্বসাকুল্যে ছয় ক্রোড় দাম (চল্লিশ দামে আকবরশাহী এক টাকা) দান করিয়াছিলেন। "এই অন্যায় দান বিপ্র, সূত (চারণ) বন্দীজন (ভাট) বণ্টন করিয়া লইয়া গণিকা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক (কচ্ছবাহ কুলের) যশ অতি বিস্তার করিয়াছিল।"[৫]

এই বিষয়ে সেকাল এবং বর্ত্তমান কালের মধ্যে পার্থক্য নাই। এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ভাট চারণের প্রাপ্য এক শ্রেণীর সাংবাদিক এবং ঐতিহাসিক উক্তবিধ কার্য্যের জন্য ভাগাভাগি করিয়া লইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, মানসিংহের এই পনর লক্ষ টাকার দান বৃথা হয় নাই, ভবিষ্যতে ইহার সুফল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইতে পারে।[৬]

মোটা দক্ষিণা পাইলে চারণদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ঢেঁকীর যশও গাইতেন; কিন্তু চারণেরা যাহা কিছু রক্ষা করিয়াছেন উহার মধ্যে এমন জিনিস আছে• যাহার সত্যতা সমর্থক মোগল দরবারের সমসাময়িক চিঠিপত্র পাওয়া যায়। (চারণ-শ্রুতি, যথা—

আম্বেরের মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহকে দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রাণনাশ করাইতে চাহিয়াছিলেন এবং এই জন্য রতনূ গোত্রের চারণ জগন্নাথকে অনেক লোভ দেখাইয়াছিলেন। এই লোভ তুচ্ছ ও অযোগ্য জ্ঞান করিয়া জগন্নাথ সমস্ত ব্যাপার মীর্জ্জা রাজাকে বলিয়া দিলেন এবং বড় কৌশল করিয়া দিল্লী হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিলেন। এই কার্য্যের প্রত্যুপকারস্বরূপ মীর্জ্জা রাজা চারণ জগন্নাথকে বার্ষিক পাঁচশ হাজার মুদ্রা (দাম, ৪০ দামে এক টাকা) আয়ের জীবিকা (ভূমিদান) দান করিয়াছিলেন। জগন্নাথের বংশধরগণ এখন (বিংশশতাব্দীতে) নাঁগল ঝোণ্ডুঁদা, ভোজপুরিয়া, প্রভৃতি গ্রামে বিদ্যমান (বংশ ভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৬৬।)

আসল ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। এক বড় গুজর রাজপুত মেবাতের (বর্ত্তমান আলোয়ার রাজ্যের প্রাচীন নাম) কোন এক জায়গায় জয়সিংহের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জয়সিংহ সামান্য আঘাত পাইয়াছিলেন। শাহাজাদা দারাশুকোর প্ররোচনায় আততায়ী এই কার্য্য করিয়াছে বলিয়া জয়সিংহ দারাকে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। ঐ চিঠি পাওয়া না গেলেও উহার প্রত্যুত্তরে দারা যে চিঠি জয়সিংহকে লিখিয়াছেন উহাতে জয়সিংহের চিঠির বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে এবং ঐ চিঠির নকল আচার্য্য যদুনাথ জয়পুর হইতে আনিয়াছিলেন। উহাতে দারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—"আমি বড়-গুজরকে প্ররোচনা দিয়াছি ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনি যাহা প্রমাণ পাইয়াছেন পাঠাইবেন।..." একমাত্র আপনার ভাগিনেয়ী বলিয়া আমি অমর সিংহের কন্যার (নাগোরের রাও; যশোবন্তের পিতার জ্যেষ্ঠ এবং ত্যজ্য পুত্র) সহিত কুমার সুলেমান শুকোর সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি—

---

৫। বংশভাস্কর দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৩৪১, মূল দ্রষ্টব্য।

৬। জয়পুরের একটা ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিয়া দেওয়ার সর্ত্তে জয়পুর দরবার স্বর্গবাসী •আচার্য্য যদুনাথকে খাস দপ্তর হইতে ফার্সি আখবারাত (সংবাদ তালিকা ইত্যাদি) গুলির নকল লইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ইতিহাস অপ্রকাশিত অবস্থায় জয়পুরে• পড়িয়া রহিয়াছে। উহার যে অংশে লেখা হইয়াছে মানসিংহের পিসী ও ভগিনীকে যথাক্রমে আকবর ও তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর বিবাহ করিয়াছিলেন উহা বাদ দেওয়ার জন্য আচার্য্য যদুনাথকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। যদুনাথ লিখিয়াছিলেন একটি শব্দও তিনি পরিবর্ত্তন করিবেন না। জয়পুর দরবারের বক্তব্য ঐ দুই কন্যা আসল রাজকুমারী ছিলেন না, শুনা যায় অন্য জাতের মেয়ে ডোলায় চড়াইয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল (!!)

শুনা যায় জয়পুরের প্রামাণ্য ইতিহাস লেখা হইতেছে। উহার উপাদান হয়ত রাজা মানসিংহ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহা এতদিন আঁধারে ছিল, স্বাধীনতার পর আলোকে আসিতে বাধা নাই।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব পিতার বিরুদ্ধে জয়সিংহকে সপক্ষে আনিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত শত্রুতার সদ্ব্যবহার তিনি জানিতেন, তাঁহার চর সম্ভবতঃ এই বড়গুজরকে (যাহার সহিত জয়সিংহের বৈর ছিল), প্রলোভন দেখাইয়া জয়সিংহকে হত্যা করিবার প্ররোচনা দিয়াছিল। যদি চেষ্টা বিফল হয় এবং বড়গুজর ধরা পড়িয়া সত্য প্রকাশ করে, এই সম্ভাবনার জন্য এই চারণ জগন্নাথকে হাত করা হইয়াছিল এবং দারা তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া মীর্জ্জা রাজার কাছে মিথ্যা সংবাদ দিয়া রাখিয়া ছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য, রাজা যদি মারা যায় ভালই; বাঁচিয়া থাকিলেও ততোধিক ভাল; কারণ রাজা দারার দারুণ শত্রু হইবেন। রাজা জগন্নাথকে পুরস্কার দিয়াছিলেন এই কথা ঠিক। চারণের মুখে জনশ্রুতি কালক্রমে কি ভাবে ইতিহাস বিকৃত করে ইহাই উহার৭ নমুনা।

১০

মালব ও রাজস্থানে বিদ্বান চারণ সর্ব্বত্র রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। রাঠোর, শিশোদিয়া এবং চৌহান কুলের মধ্যে চারণের প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। আম্বেরের কচ্ছবাহ দরবার ছিল সর্ব্বভারতীয়। দক্ষিণী পণ্ডিত, পুরবিয়া ব্রাহ্মণ এবং পিঙ্গল হিন্দীর কবিগণ মরুচারণ অপেক্ষা জয়পুরে অধিক সমাদৃত হইতেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডারে চারণ জাতির শ্রেষ্ঠ অবদান সুসংস্কৃত মরুভাষা এবং কাব্য-সমৃদ্ধ মরু সাহিত্য, যাহাকে ডিঙ্গল হিন্দী বলা হয়। রাজপুতনার ঊষরভূমি এবং বালুকা-সমুদ্র বস্তুতঃ চারণের কণ্ঠেই ভাষা পাইয়াছে। যাযাবর পশুপালকের অপভ্রংশমূলক একটি কথিত উপভাষাকে সুসাহিত্যের বাহন করিয়া আভিজাত্যের গৌরবদান করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। বহু শতাব্দী ব্যাপী চারণের একনিষ্ঠ বাণী—সাধনার দ্বারা এই বিরাট্ সাফল্য সম্ভবপর হইয়াছে। অপর পক্ষে ইহাও সত্য, একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতির দান চারণের সর্ব্ববিধ সাংসারিক অভাব দূর না করিলে, ক্ষত্রিয়-রাজারা গুণগ্রাহী না হইলে মধ্যযুগের চারণ-প্রতিভা অর্দ্ধস্ফুট-অনাঘ্রাত মল্লিকা কোরকের ন্যায় মরুর বুকে অকালে ঝরিয়া পড়িত; উহার সৌরভ দূরদূরান্তে ক্ষত্রিয়ের রাজসভা এবং মোগল দরবারকে উতলা করিত না।

পৃথ্বীরাজ-রাসো প্রমুখ রাসো কাব্যের ধারা চারণ জাতি বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রবহমান রাখিয়াছে। চারণ-কবির একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র ছিল; চারণ-কাব্যে কল্পনার বৈচিত্র্য নাই, সমসাময়িক ইতিবৃত্ত উহার প্রাণবস্তু। বাংলা দেশের কাব্যরসিকগণ বলিতে পারেন ডিঙ্গল ভাষার কাব্য ছন্দোবদ্ধ গদ্য বিবৃতি, অতিশয়োক্তি-ভারাক্রান্ত ইতিহাসের কঙ্কালমাত্র; ওজঃগুণ ও ধ্বনি মাহাত্ম্য ব্যতীত চারণ-কবিতার অন্য সম্পদ নাই।

বাংলা দেশে যেমন ভদ্রতার খাতিরে হাতুড়ে বৈদ্যকেও কবিরাজ বলিতে হয়, রাজস্থানে যে চারণ হয়ত কস্মিনকালে কবিতা মুখে আনে নাই তাহাকেও অন্য জাতির লোক, কবি কিংবা ঠাট্টা করিয়া কবিরাজা বলে! কবিরাজা কিন্তু যশলুব্ধ পণ্ডিত ও কবিগণের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। ক্ষত্রিয় রাজারা এই উপাধি দানের অধিকারী ছিলেন। উদয়পুরের সুবিখ্যাত পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদাসজী একমাত্র চারণ, যিনি কাব্য না লিখিয়া "কবিরাজা" হইয়াছিলেন। শ্যামলদাসজী বিঃ সম্বত ১৯৩২ (১৮৭৫ খ্রীঃ) সালে উদয়পুর দরবারে তাজিমী সরদারের সম্মান পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ মহারাণা দাঁড়াইয়া যাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন (ফার্সি তাজীম=সং অভ্যুত্থান) ঐ শ্রেণীভুক্ত হইলেন; এক বৎসর পরে হাত বাড়াইয়া করমর্দ্দনের অধিকার, উহার এক বৎসর পরে পায়ে সোনার "লংগর" (পায়ের কড়া) ধারণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। মহারাণা সজ্জন সিংহজী (রাজত্বকাল খ্রীঃ ১৮৭৪) বিঃ ১৯৩৫ পৌষ শুক্লা তৃতীয়া দিবসে শ্যামলদাসজীর গ্রাম ঢোকলিয়ার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ দিন তিনি শ্যামলদাসজীকে কবিরাজা উপাধি, সোনার একজোড়া পায়ের "তোড়া", পাগড়িতে বাঁধবার জরীর টুকরা (অতি উচ্চ সম্মান সূচক) এবং অনুগ্রহের প্রতীক আরও বহু দ্রব্য দিয়াছিলেন। মহারাণা আরও পাঁচবার শ্যামলদাসজীর গ্রামের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে (বিঃ ১৯৪৪-১৮৮৭ খ্রীঃ (

---

৭। Dara Shukoh, second edition.

বংশ ভাস্কর আচার্য্য যদুনাথ ব্যবহার করিয়াছেন, আমিও করিয়াছি। চারণের উপর আমার বিশেষ আস্থা ছিল না। সমসাময়িক প্রমাণের বিরোধী হইলেই আমি চারণকে পূর্ব্বে সরাসরি বিদায় দিতাম। দারার জীবনী লিখিবার সময় উক্ত কাহিনীর আসল সত্য যে এইরূপ হইতে পারে উহা তখন চিন্তা করি নাই। বৃদ্ধ বয়সে ধৈর্য্য কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে, বুদ্ধিও হয়ত পাকিয়াছে। যাহা হৌক, গবেষকগণ আশা করি ভবিষ্যতে চারণের কাহিনী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করিয়া উহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য কিছু আছে কি না ধৈর্য্য সহকারে বিচার করিবেন।

চৈত্র শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে মহারাণা সজ্জন সিংহ, যোধপুরের মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ এবং কিষণগড়ের মহারাজা সার্দ্দুল সিংহ একযোগে শ্যামলদাসজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। উদয়পুরের প্রজার ভাগ্যে এই প্রকার গৌরব লাভ আর কখনও ঘটে নাই।

১১

রাজপুত দরবারে বিশিষ্ট চারণগণ প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দারের মত অধিকার ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। বংশভাস্কর প্রণেতা বুন্দী দরবারের মহাকবি মীসন সুরজমল "ঠাকুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ডুঙ্গরপুরের মহারাবল উদয় সিংহ মতিয়ারিয়া শাখার চারণ সবাসিংহকে কবিরাজা উপাধি ও পায়ের সোনার কড়া (লংগর) দিয়াছিলেন। জয়সলমীরের মহারাবল বৈরীশাল রতনু শাখার চারণ শিবদানকে কবিরাজা উপাধি ও পায়ের স্বর্ণভূষণ দিয়াছিলেন। বিকানীরের মহারাজা ডুঙ্গরসিংহ বাটু শাখার চারণ বভুতদানকে (বিভূতিদান) কবিরাজা উপাধি এবং সংগায়চ শাখার চারণ খুমদানকে একগ্রাম সহ "ঠাকুর" উপাধি দিয়াছিলেন। কোটার মহারাও রামসিংহ মতিয়ারিয়া শাখার চারণ ভবানীদানকে কবিরাজা উপাধি এবং স্বর্ণভূষণ রৌপ্যদণ্ড, ছত্র-চামর, ইত্যাদি অন্যান্য অধিকার সহ (privilege) প্রদান এবং তাঞ্জামে (খোলা পাল্কি, সুখপাল রাজকীয় সম্মানের পরিচায়ক) চড়িবার অধিকার দিয়াছিলেন।৮

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে চারণ-প্রতিভার বহুমুখী স্ফুরণ রাজস্থানকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। শ্যামলদাসজীর পরে যিনি রাজপুতানায় ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাইয়াছিলেন তিনি "আসিয়া" শাখার চারণ কবিরাজা মুরারিদান (১৮৩০-১৯১৪ খ্রীঃ)। মুরারিদানজীর পিতা ভারতদান এবং পিতামহ "রাজরূপক" কাব্যপ্রণেতা বীরীদাস। তিনি পিতার নিকট ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া জৈন-পণ্ডিত যতি জ্ঞান-চন্দ্রজীর নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়স হইতে তিনি যোধপুর রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ মুরারিদানকে "লক্ষপ্রসাদ" মহাদান দিয়াছিলেন এবং বিদায়ের সময় যোধপুরের সুরজপোল তোরণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন, লোহাপোল দরজায় চারণ দানের হাতীতে চড়িয়া মাথার উপর চামর দোলাইয়া নিজের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। ইহার পর চল্লিশ বৎসর বয়সে মুরারিদান যোধপুর জিলার হাকিম নিযুক্ত হইয়া রাজসেবায় উচ্চ হইতে উচ্চতম স্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন, দেওয়ানী আদালতের অধিকর্ত্তা, আপীল-আদালতের জজ, জেনারেল সুপারিন্টেনডেণ্ট ইত্যাদি সকল পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মকুশলতায় বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুরারিদান যোধপুর শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। রাজকার্য্যের বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেও চারণের সরস্বতী বিনোদন ব্যাহত হয় নাই।৯

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (বিঃ ১৯৫১) মুরারিদান তাঁহার "যশোবন্ত যশভূষণ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ ("যশোভূষণ" কাব্যের নায়ক) এই জন্য তাঁহাকে কবিরাজা উপাধি এবং দ্বিতীয়বার "লক্ষপ্রসাদ" মহাদান দিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে মুরারিদান প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দারগণের দুর্লভ অধিকার এবং অনুগ্রহের চিহ্ন লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা ও রাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজসংস্কার কার্য্যেও ব্রতী হইয়াছিলেন। বিবাহাদি উৎসবে রাজপুতের অপব্যয়, চারণের উৎপাত এবং ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময়ে যাঁহারা রাজপুত-

৮। বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃ, ৫২-৫৩।

ব্রাহ্মণ এবং শ্রেষ্ঠ জাতির মান্য ব্যক্তিগণও বিশেষ বৃত্তির জন্য তাজাম (অনুমান), পায়ের স্বর্ণভূষণ ইত্যাদি অধিকারের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির অধিকার জীবিতকাল পর্য্যন্ত, কিন্তু চারণের অধিকার পুরুষানুক্রমে, এমন কি পোষ্যপুত্রও উক্ত অধিকার বঞ্চিত হয় না। উক্ত চারণগণের পায়ের স্বর্ণভূষণ ইত্যাদি উহাদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিগণ দরবারে যাইবার সময় ব্যবহার করেন।

৯ মুরারিদানের প্রকাশিত পুস্তক "যশোবন্ত যশভূষণ" এবং 'চারণখ্যাতি', অপ্রকাশিত এবং অসম্পূর্ণ গ্রন্থ হিন্দী কাব্য বিহারী-সৎসই-র টীকা, নায়িকা ভেদ, এবং বর্ণিত বিষয়ক "আর্যনির্ণয়" এবং "বৃহৎ চারণ খ্যাতি (দ্রঃ [illegible] গ্রন্থ প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৯-৮০) যশোভূষণ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের গৌরব লাভ করিয়াছে। মুরারিদানজী [illegible] কবিরাজের দ্বিতীয় রাজশেখর [illegible] সংস্কৃত করি [illegible]। তিনি রাজশেখরের উপর উঠিয়াছেন

ভোজ সময় নিরখী নহি [illegible] কো [illegible]।
সে নিরখী জস [illegible] সময়

অর্থাৎ রাজা ভোজের সময় ইত্যাদি কাব্য-শাস্ত্রকারগণের যে সমস্ত ভুল ধরা পড়ে নাই উহা বাহির হইয়াছে যশোবন্তের সময় (দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ)।

হিতকারিণী সভা সংস্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, মুরারিদান উহাদের মধ্যে অন্যতম। পঞ্চাশ পার হওয়ার পূর্ব্ব হইতে মুরারিদানের খ্যাতি সমস্ত রাজপুতানায় প্রসার লাভ করিয়াছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা সজ্জন সিংহ এবং যোধপুরাধীশ একত্র মুরারিদানজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

যখন স্বামী দয়ানন্দের আর্য্যসমাজ আন্দোলন পাঞ্জাব ও পশ্চিম-ভারত তোলপাড় করিতেছিল, এবং স্বয়ং মহারাণা সজ্জন সিংহ দয়ানন্দের শিষ্য হইয়া গিয়াছেন বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল তখন কবিরাজা মুরারিদান মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উদয়পুর গিয়াছিলেন। এই সময় মহারাণা জরা ও ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শয়ন ঘরে মুরারিদানকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়াই মুরারিদানের চক্ষুস্থির! মহারাণা তখন বুকের উপর শিবলিঙ্গ রাখিয়া পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন। মুরারিদানজীর সন্দেহ নিবারণ করিবার জন্য মহারাণা বলিলেন, আমার ইচ্ছা আপনি জানিয়াই ফেলিয়াছেন। রাজার কর্ত্তব্য নিজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্বার্থের ভাবনা ত্যাগ করিয়া যে কার্য্য লোকহিতকর উহাই গ্রহণ করা। স্বামিজীর সঙ্গে বিরোধ করিলে আমার আস্তিকতা যেমন আছে তেমনই থাকিবে, কিছুমাত্র বাড়িবে না, পরন্তু স্বামিজীর দ্বারা যে অনেক হিতকার্য্য হইতেছে, আমার বিরোধিতা উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, প্রজারা যে প্রেরণা পাইতেছে উহা পাইবে না।

মুরারিদানের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক "বংশ ভাস্কর" গ্রন্থের টীকাকার শাহপুরা নিবাসী চারণ শ্রীকৃষ্ণসিংহ মহারাণা সজ্জন সিংহের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসিংহজী বহু বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বংশ ভাস্করের টীকা লিখিয়া না গেলে এই রাজপুত মহাভারত আধুনিক কোন প্রসিদ্ধ হিন্দী পণ্ডিতেরও সম্পূর্ণ বোধগম্য হইত না। মহারাজা সজ্জন সিংহ তাঁহাকে তুর্কী ঘোড়া, স্বর্ণভূষণ, ইত্যাদি দান করিয়াছিলেন, এবং রাজকীয় বড় নৌকাতে বসিবার এবং মহারাণার আগে আগে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া চলিবার অধিকার দিয়াছিলেন, যাহা প্রথম শ্রেণীর সকল সর্দ্দার পাইতেন না। মহারাণা সজ্জন সিংহের উত্তরাধিকারী মহারাণা ফতেসিংহ তাঁহাকে হাতী এবং কয়েক হাজার টাকা দান দিয়াছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে চারণ ও ক্ষত্রিয় অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কৃষ্ণ-সুদামা ছিলেন। এক ছপ্পয় (ষষ্ঠপদী) কবিতায় শ্রীকৃষ্ণসিংহজী লিখিয়াছেন—

সুদামা রীত মাধব সরস কৃষ্ণ সজ্জন স্বীকারিয়ো।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যোধপুরের মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ এবং কিশনগড়ের রাজা শার্দ্দূল সিংহ উদয়পুর আসিয়াছিলেন। মহারাণা সজ্জন সিংহ পিছোলা হ্রদের মধ্যবর্ত্তী জগনিবাস মহলে তাঁহার নব-নির্ম্মিত সজ্জন বিলাস প্রাসাদের ভিতর যে জলাশয় তৈয়ার করাইয়াছিলেন উহাতে স্নান করাইবার জন্য উঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন। নৃপতিত্রয়ের অতি অনুগৃহীত কয়েকজন সঙ্গে গিয়াছিলেন, উহার মধ্যে চারণ শ্রীকৃষ্ণসিংহও ছিলেন। জলকেলি ও মদ্য পান খুব চলিতেছিল। যোধপুরাধীশ সাঁতার জানিতেন না, তিনি স্নান করিয়া জলাশয়ের পশ্চিম কিনারার ঝরোকায় বসিয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। চারণের উচ্ছিষ্ট মদের পিয়ালা যশোবন্ত সিংহ যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানেই রাখা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণসিংহের যখন আবার মদ্যতৃষ্ণা জাগিল মহারাজা ঐ উচ্ছিষ্ট পেয়ালা ভরিয়া শরাব তাঁহার মুখের কাছে ধরিলেন। চারণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ইহাতে আপত্তি জানাইলেন। মহারাজা বলিলেন, আপনারা এত পূজনীয়, যাঁহাদের জুতা আমরা উঠাইতে পারি, ঝুটা পেয়ালা কোন কথা?

মহারাণা সজ্জন সিংহের মৃত্যুর পর এক শোকগীতিতে চারণ আক্ষেপ করিয়াছেন, গলা জড়াইয়া ধরিয়া শরাবের পেয়ালা আমার মুখে আর কে তুলিয়া দিবে? (দৈ গলবাঁহী জে দিয়া, মদ-প্যালা মনুহার।)

১২

মধ্যযুগে রাজস্থানের যে ক্ষত্রিয় মহামহীরুহ-বীথির আশ্রয়ে দুর্দ্দিনে নির্য্যাতিত হিন্দুর ধর্ম্ম ও আর্য্য-সংস্কৃতি আত্মরক্ষা করিয়াছিল, স্বাধীন ভারতে কালধর্ম্মে সাম্যবাদের ঝঞ্ঝা উহাকে ভূপাতিত করিয়াছে, চারণ জাতি আশ্রিতা বল্লরীর ন্যায় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হইয়া শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় অসিবলে আর কীর্ত্তিসম্পদ আহরণ করিবে না, চারণগীতির মেঘমন্দ্র ধ্বনি আর্য্যরক্তে আবার বিদ্যুৎ সঞ্চার করিবে না। কালধর্ম্ম অনতিক্রমণীয়, তবে পরভৃত চারণ তথা স্ববীর্য্যভুক্ ক্ষত্রিয়ের ভবিষ্যৎ কোথায়?

চারণের জন্য ভবিষ্যতের সংকেতবার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে একজন ইংরেজী শিক্ষিত সমাজদ্রোহী চারণ। তাঁহার স্বাধীন চিন্তাপ্রবণ মন গতানুগতিক সনাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজস্থানে সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। তিনি

বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কুলের উপর চারণ জাতির অন্ন-নির্ভরতা ভবিষ্যতে উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতির পরিপন্থী হইতে বাধ্য, [illegible] চিরকাল বামন হইয়াই থাকিবে, অর্থনৈতিক চাপে বিব্রত ক্ষত্রিয় দীর্ঘদিন চারণ-পালন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িবে। এই বিদ্রোহী চারণ যাচকবৃত্তি ত্যাগ করেন। স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের পথ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। [illegible] শেষ বয়সে তিনি অর্দ্ধাশনে চিকিৎসার অভাবে অকালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তবুও পণভঙ্গ করিয়া তাঁহার রাজা-মহারাজা বন্ধুর দান গ্রহণ করেন নাই। ইঁহার নাম আজকাল কেহ জানে না যেহেতু তিনি কংগ্রেসী ছিলেন না। নিজের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রে নিজের ঢোল বাজাইতেন না। সমসাময়িকগণের নিকট ইনি রাজপুতানার প্রথম সাংবাদিক প্রথম মুদ্রাযন্ত্র (রাজস্থান-[illegible]) প্রতিষ্ঠাতা প্রথম হিন্দী দৈনিক পত্রিকার (রাজস্থান-সমাচার) সম্পাদক হিসাবে সুপরিচিত হলেন।

[illegible] সমর্থদানজী প্রথম বয়সে স্বামী দয়ানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া [illegible] আর্য্যসমাজী হইয়াছিলেন, "হিন্দু" শব্দ পছন্দ করিতেন না, [illegible] করিয়া নিয়মিত সন্ধ্যা-হোমাদি করিতেন। আর্য্যসমাজের "বৈদিক প্রেস" মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালক হন। সমর্থদানজী যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বোম্বে, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদ, আজমীর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। আর্য্যসমাজে ইঁহার প্রতিষ্ঠা পরিচায়ক বেদ-ভাষ্যের প্রথম সংস্করণের মুখপত্রে সমর্থদানজীর নাম। স্বামিজীর মৃত্যুর পর সমর্থদানজীর মোহভঙ্গ হইল। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন, দলের খাতিরে নিজের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না; প্রতিনিধি-সভার দ্বাদশ জন প্রভুর সেবা পূর্ব্বপুরুষের যাচক বৃত্তি অপেক্ষাও তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। সমর্থদানজী স্বোপার্জিত অর্থে আজমীরে হাবেলী প্রস্তুত করিয়া স্থায়ী ভাবে ঐখানে বাস করিতে লাগিলেন, আর্য্যসমাজ ত্যাগ করিয়া সনাতনী হইলেন, সন্ধ্যাগায়ত্রীকে চিরদিনের মত বিদায় দিলেন, ক্ষত্রিয়ের চারণ বিশ্বচারণের ভূমিকায় নামিলেন। আজমীরে রাজস্থান যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া তিনি [illegible] অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশনের কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিন পরে নিজের সম্পাদনায় রাজস্থান-সমাচার নামক হিন্দী পত্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে অর্দ্ধসাপ্তাহিক এবং অবশেষে দৈনিক বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার এবং দেশসেবার মৌলিক চিন্তাধারা রাজস্থান-সমাচারকে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে উন্নীত করিল, প্রতিষ্ঠা ও অর্থ জোয়ারের মত আসিতে লাগিল। যোধপুরের স্যর প্রতাপসিংহ, উদয়পুর, বিকানীর, প্রভৃতি রাজ্যের মহারাণা, রাজা-মহারাজা এবং জায়গীরদার মহলে রক্ষণশীল অথচ সংস্কারব্রতী মনীষী সমর্থদানজীর প্রভাব এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহারা অনেক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ইংরেজ সরকারেও তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল। Chief Commissioner এবং A. G. G. তাঁহার কাছে আসিয়া পরামর্শ লইতেন।

দৈনিক পত্রিকার স্বত্বস্বত্বী পালন চারণের কর্ম্ম নহে। পত্রিকা হইতে লাভ উঠাইবার জন্য যে ব্যবসায় বুদ্ধির প্রয়োজন উহা সমর্থদানজীর ছিল না। তিনি লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন, লক্ষাধিক টাকা ঠাট বজায় রাখিবার জন্য খরচ করিয়া ভাঁড়ার টানে ঋণের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি কাহারও দ্বারস্থ না হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তখনও কয়েক লাখ টাকা খরচ করিয়া ভারতবর্ষের এক বিপুল ইতিহাস কয়েক খণ্ডে ছাপাইবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা স্যর প্রতাপসিংহজী তাঁহাকে পাত্রপাল চারণ রূপে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও সমর্থদানজী মহারাজার যাচকতা স্বীকার করেন নাই। একটি নয় বৎসরের কন্যা রাখিয়া, বিরাট দৈন্যের মধ্যে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর অকাল আহ্বান অকম্পিত চিত্তে সমর্থদানজী গ্রহণ করিলেন।

চারণের সম্মুখে এই বলিষ্ঠ পৌরুষের আদর্শ রহিয়াছে, রাজস্থান-সমাচার রাহিত অভয় বাণী রহিয়াছে, "সত্যে নাস্তি ভয়ং ক্কচিৎ।"১০

১০ [illegible] নবীন ভারতের উদ্বোধন [illegible] (বর্ষা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৫)

# টাকামারির জঙ্গলে

শ্রীসত্যপ্রকাশ রায়

কেঁচো খুঁড়তে সাপ ওঠা—প্রবাদবাক্য হলেও, আজগুবি নয়। কথাটা স্মরণ রাখা ভাল,—বিশেষতঃ জঙ্গলে। প্রস্তুত থাকলে বিব্রত হবার ভয় থাকে না; তার উল্টোটা হলে মুশকিল।

তখন উত্তরবঙ্গের এক ছোট শহরে কেমন করে জানি না, আমার বন-প্রীতির কথা লোকের কানে পৌঁছল। দু'চার জন সঙ্গী-সাথী জুটল—শিকারও কিছু করা গেল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। ডুয়ার্স অঞ্চলের শীত না গেলেও বনে ও মনে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। শিকারীর মন চঞ্চল। তারাও ত কবি, নাই বা বেরুল তাদের প্রাণের কথা কবিতার ছন্দে, ছাপার অক্ষরে। প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়ে, কেতাব পড়ে কবি হওয়া চলতে পারে—শিকারী হওয়া কখনও নয়। পাখীর গান, পাতার মর্মর, সবুজের সমারোহ যার মনকে নাড়া দেয় না, সে আর যা খুশি হতে পারে, শিকারী নয়। শিকারে প্রাণী-হত্যা উপলক্ষ, অংশমাত্র। শিকারের আনন্দ তার পরিবেশে।

দু'দিন অফিস ছুটি—কি যেন একটা পরব উপলক্ষে, হোলি বা বকর্-ঈদ্। প্রতিবেশী ডিভিশন্যাল ফরেস্ট-অফিসার নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁর এলাকায়। প্রধান অতিথি প্রতিবেশী অপর পদস্থ অফিসার সপরিবারে। স্থানীয় এক বিশিষ্ট পরিবারের শিকার-প্রীতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এলাকার জঙ্গলের মালিকানা গেলেও, শিকারের মালিকানা যায় নি। আর যায় নি শিকারের সখ, সরঞ্জাম ও শিষ্টাচার। আমরা গিয়ে বলতেই সানন্দে অনুমতি দিলেন, সঙ্গে দিলেন চারটি হাতী, চারটি তাঁবু ও আবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম।

আসামের প্রান্তে ফরেস্ট 'বিট-হাউস'কে কেন্দ্র করে শিকারের ব্যবস্থা স্থির হ'ল। নির্জন বনরাজ্যে জাগল প্রাণের সাড়া। ছুটির দু'দিন আগে যাওয়ার সময় ফরেস্ট অফিসার অনুরোধ করে গেলেন আমরা যেন ছুটি হতেই বেরিয়ে পড়ি। আমার পক্ষে প্রথম দিন যাওয়া সম্ভব হ'ল না। প্রধান অতিথি পাশের বাড়ী থেকে যথাসময়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং পরের দিন ভোরবেলা হাজির হওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। মেয়েরাও আবদারের সুরে তার পুনরাবৃত্তি করলেন। হাত নেড়ে তাঁদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানালাম, কিন্তু মনে যেন কিসের একটা অস্বস্তি রয়ে গেল।

আমি প্রাচীনপন্থী মানুষ। 'পথি নারী বিবর্জিতা'—আমার বেদবাক্য। কাজের সঙ্গে খেলা মেশানো আমার ভাল লাগে না। তার চেয়েও খারাপ লাগে শিকারকে ছেলেখেলা মনে করা। যাক, পরের দিন রাত্রিশেষে 'জীপ' যোগে যাত্রা করা গেল। কিছু সরকারী কাজও করার ছিল। কথা ছিল 'ষ্টেনোগ্রাফার'কে যাওয়ার পথে তার বাসা থেকে তুলে নেব। তার একটু বিশেষ আগ্রহও ছিল; কারণ, তার নিজের বাড়ী ওই অঞ্চলে। তাছাড়া শিকারে সঙ্গে গেলে আহারাদির ব্যবস্থা নেহাৎ মন্দ হয় না এবং শিকার যদি খাদ্য হয় তবে ভাগও মেলে।

আমার এই পরমভক্ত অনুচরটিকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে, নদীর চরায় রাতে-বেরাতে কতদিন কতভাবে যে বিব্রত হয়েছি তার অন্ত নেই। বেমালুম শ্মশ্রুগুম্ফ-হীন, ঈষৎ বক্রদৃষ্টি এই যুবকটির সঙ্গ ও সান্নিধ্য অনেকেই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। আমার কিন্তু তাকে দেখে মায়া হ'ত। সে যে আমার নিত্যসঙ্গী। তাছাড়া অনাদৃত মানুষের প্রতি আমার একটা সহজ দুর্বলতা আছে। আমি নিজেও যে তাদেরই একজন। কিন্তু আজ যেন তাকে সঙ্গে নিতে সাহস হ'ল না। তাকে তুলে নিতে ইচ্ছে করে ভুলে গেলাম।

সঙ্গে চলল দেহরক্ষী রামবাহাদুর—ডাক ও টিফিন-বাক্স বিছানা আর পথের চিরসহচর দো-নলা বন্দুকটি। উষাযাত্রা ক'রে ভোর পাঁচটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম পিচঢালা সরকারী রাস্তা বেয়ে পূবের দিকে। দিক্‌দিগন্ত তখনও কুয়াসায় ঢাকা। হেডলাইট জ্বেলে মন্থর গতিতে চলল গাড়ী। ক্রমে পূবের আকাশ ফিকে ও পরে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সোনালী রৌদ্ররশ্মিতে উভয় পার্শ্বের তরুশীর্ষ ও ক্ষেতগুলি ছেয়ে গেল। ডাইনে-বাঁয়ে বিস্তীর্ণ সরষে-ক্ষেতে হলুদ ফুলের অপূর্ব রং-এর খেলা ও মিঠেকড়া গন্ধ। ন্যাড়া পলাশ গাছের মাথায় মাথায় রক্তরাঙা ফুলসম্ভার। ডালে

ডালে ঝোপে ঝোপে ঘুঘু-দোয়েল-শ্যামার প্রভাতী সুরের আলাপ। উত্তর আকাশের প্রান্তে ধ্যানমগ্ন নাগাধিরাজের চূড়ায় সোনালী স্বপ্নজাল। তার কোল ঘেঁষে তুনিবার কুয়াশা মাথায় করে মৌনী জয়ন্তী পাহাড়। গাড়ী থেকে নেমে এই উৎসবের যিনি স্রষ্টা তাঁকে যুক্তকরে প্রণাম করলাম; আর প্রাণ ভরে সারা অঙ্গ দিয়ে গ্রহণ করলাম উত্তরভূমির স্নেহস্পর্শ, যার মায়া এজন্মে কাটানো সম্ভব হবে না, জন্মজন্মান্তরেও না।

এগিয়ে চলল গাড়ী তীব্রতর বেগে। অদূরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে রোদ পোহাচ্ছে বন্য কুক্কুট-কুক্কুটীর দল; তার খানিকটা দূরে এক ময়ূর-দম্পতি। পথে বেরোলেই আমার বন্দুকে গুলী ভরা হয়ে যায়। একদিকে একটি বড় ও অপরদিকে একটি ছোট ছিটেগুলী। গুলী আজও ভরা ছিল, কিন্তু কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছি—কিসের মায়াজালে। অন্তরে শুনতে পেলাম—

'ন খলু ন খলু বাণং
সন্নিপাত্যোয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে।'

—হাতের গুলীভরা বন্দুক হাতেই রয়ে গেল। ছুটে চলল জীপ-গাড়ি।

সকাল সাতটা নাগাদ ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি রাজপুরুষোচিত শিকারের আয়োজন বটে। বিট্-হাউসের প্রাঙ্গণে পাশাপাশি পড়েছে তুষারধবল বিরাট্ দুই তাঁবু। একটি পুরুষ ও অপরটি জেনানাদের জন্য। তার সংলগ্ন দু'টি ছোট তাঁবুর শৌচাগার। আমি একটু শীতকাতুরে; তাই আমার ব্যবস্থা হয়েছে বিট্-হাউসের এক কক্ষে। সবে বন্ধু-বান্ধবীরা প্রাতঃকৃত্যাদি সারছেন। আমার গাড়ী প্রাঙ্গণে ঢুকতেই একটা সম্বর্দ্ধনার হুল্লোড় পড়ে গেল। সকলের চোখে-মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে, সকলেই যেন অত্যন্ত মুখর। অত্যন্ত উপভোগ করলাম এই দৃশ্যটি। একজনের দিকে তাকালে আর একজন ওধার থেকে হাত ধ'রে টানে তার কথা শোনবার জন্যে। আমাদের এক কবি নাকি বলেছিলেন—

'কী সুখ যে হেন কালে
গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে মন যার পুড়েছে হুতাশে।'

—হুতাশে মন পোড়ানর দরকার নেই। এম্‌নি বনে আসুন—দেখুন কি আনন্দ। এদের কথার যা নির্যাস গ্রহণ করা গেল—তা হচ্ছে এই,—কাল বিকেলে হাতী চ'ড়ে মেয়ে-পুরুষ সকলে বনে ঘুরেছেন, দেখেছেন কত লতাপাতা ফুল, পাখী-জীবজন্তু। শিকার করা হয়েছে কিছু পাখী, যার কিছুটার সদ্ব্যবহার রাত্রিতে হয়েছে এবং অবশিষ্টের সংগতি মধ্যাহ্নে হবে। আর বুঝতে পারলাম, প্রাতরাশের পর মেয়েরাও শিকারে বেরোচ্ছেন। মাহুতরা হাতীগুলিকে তৈরী ক'রে অপেক্ষা করছে—সুনন্দা, মায়ারাণী, তেজসিং, ভীমবাহাদুর। কাছে যেতেই দলের সর্দার মফিজ সেলাম ক'রে আবদার জানাল, তার হাতীতে চড়তে হবে। বহুকালের পুরাণো মাহুত মফিজ—বুড়ো হয়ে গিয়েছে তবু আদব-কায়দায় ও শিকার-সন্ধানে তার জুড়ি মেলে না। হেসে বললাম—আজ নয় মফিজ, মেয়েরা যাবেন শুনছি—তুমি তাঁদের নিয়ে যাও। পেছন ফিরে দেখি মা লক্ষ্মীরা সব প্রস্তুত, ছোটরা শ্ল্যাক্‌ ও জ্যাকেটে, বড়রা শাড়ী ও ব্লাউজে। সকলেরই মাথায় রঙীন বড় রুমাল বাঁধা, চোখে নীল চশমা, হাতে ক্যামেরা ও ঠোঁটে সিঁদুর। প্রভাতের সোনালী রোদে যেন এক ঝাঁক প্রজাপতি। দেখে আনন্দ হ'ল, কিন্তু মনটা ভাল লাগল না। প্রাতরাশের জন্য তাঁবুতে ঢুকে প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতেই বুঝলাম, সকলেরই ইচ্ছা, মেয়েরাও যান। একান্তে ডেকে ফরেস্ট অফিসারকে বললাম—কাল ত সখের শিকার হ'ল আজ সকালটা না হয় 'সিরিয়স' শিকারের চেষ্টা করা যাক; বিকেলে বরং ফের মেয়েদের নিয়ে যাওয়া যাবে। তিনি শিকারী মানুষ। আমার কথা বুঝলেও অতিথিদের সেন্টিমেন্টে ঘা দিতে রাজী হলেন না। তাই দুর্মুখের ভূমিকা নিজেকেই গ্রহণ করতে হ'ল। মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য বিপদের কথা উল্লেখ করলাম আর শোনালাম ঐ অঞ্চলে শোনা এক ভয়ঙ্কর রসালো শিকার কাহিনী—কেমন ক'রে এক পাষণ্ড ব্যাঘ্র দুর্যোধন একদিন এই জঙ্গলে শিকার-লীলামত্তা এক দ্রৌপদীর অঞ্চল আকর্ষণ ক'রে রসভঙ্গের সৃষ্টি করেছিল এবং কেমন ক'রে সঙ্গীয় বীরপুঙ্গবেরা সেই অশিষ্টাচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মূর্চ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। গল্প শুনে প্রধান অতিথি বললেন, ওটি আপনার বন্ধুপত্নীকে শোনান—আমি বললে গৃহবিবাদের সম্ভাবনা। বন্ধুবর অনুমতি দিলেও সে কাহিনী তাঁর পত্নীকে শোনাতে পারলাম না, কারণ তাঁর নিজের কন্যা ও অন্যান্য তরুণীরা তাঁকে ঘিরে আছে। তাছাড়া তাঁকে আমি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর শ্রদ্ধা ও সম্মান দিই।

এমন সময় একটা খবর এল যাতে সমস্যাটি আরও জটিলতর হয়ে উঠল। রামবাহাদুর বুটের ঠোক্করে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে জানাল, বাইরে 'দেওয়ানীয়া' সেলাম জানাতে এসেছে। উত্তরবঙ্গের গণ্ডগ্রামের চাষী মুসলমান মাতব্বর। বক্তব্য সংক্ষেপ। 'বুড়ীর ব্যাটা, উয়ার বলদ

রাত দুইফরে নিয়া গেল—হুজুরের যাওয়া খায়।' রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে উহারা বুড়ার ব্যাটা বলে। 'যাওয়া খায়' মানে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। জীবনে অনেক নালিশ ফরিয়াদ শুনেছি, কিন্তু তা কানে এমন মধু বর্ষণ করেছে কি? কার মুখ দেখে প্রভাত হয়েছিল, জানি না। ভাগ্যিস্ আমার ষ্টেনোগ্রাফার সঙ্গে আনি নি। প্রমাদ গণলেও ভগবান্‌কে মনে মনে অসংখ্য প্রণাম জানালাম। এর জন্মই ত কাজকর্ম ফেলে চল্লিশ মাইল পথ আসা। হাতী চ'ড়ে পাখী মারার সখ আমার নেই। কিন্তু এর পর আর মেয়েদের নিয়ে কেমন ক'রে বেরোন যায় ভেবে বেতাল হয়ে গেলাম। তাঁবুর ভেতরে ফিরে প্রধান অতিথিকে সংবাদটি জানালাম এবং আমি একা একটা হাতী নিয়ে এই খবরটা একটু দেখে আসার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করলাম। প্রধান অতিথি বন্ধুবৎসল ব্যক্তি। আমার প্রতি তাঁর অশেষ স্নেহ। তাই আমার এই বেখাপ্পা প্রস্তাবে ফল হ'ল। সিদ্ধান্ত হ'ল একবার সবাই মিলে বাঘের ব্যাপারটা দেখে আসা যাক;—মাইল খানেকের পথ বৈ ত নয়।

তাঁবু থেকে আধ মাইল দূরে একটা ছোট পাহাড়ী নদী পার হয়ে লোকটার বাড়ী পৌঁছে দেখা গেল, গোয়াল-ঘরের একদিকের বেড়াটি ঝড়ে দুমড়ানো অবস্থায় প'ড়ে আছে। একটা শালের খুঁটিতে একটি মোটা দড়ির ছেঁড়া অংশ ঝুলছে। অদূরে প্রাঙ্গণে একটা বিরাট্‌কায় সাদা ধব্‌ধবে বলদ বাঁধা—সন্ত্রাসের ভাবটা তখনও কাটে নি। বুঝলাম এর জোড়ারটি 'বুড়ার ব্যাটা'র উদরস্থ হয়েছে। বাড়ীর প্রাঙ্গণের প্রান্ত থেকে আরম্ভ হয়েছে ঘন পুঞ্জীবন। তারই ভেতর দিয়ে টেনে নেওয়ার চিহ্ন ও রক্তের দাগ ধ'রে নদীর ধারে একটা ছোট জঙ্গলের ধারে এসে পৌছান গেল। পাওয়া গেল দুই সারি সহজ পায়ের দাগ নদী ও জঙ্গলের মধ্যে। নিশ্চিত হওয়া গেল, শার্দূল-প্রবর এই ঝোপের মধ্যে নৈশাহার ও নদীতে জলপান ও আচমন-সমাপনান্তে পুনরায় এখানেই সুখনিদ্রা উপভোগ করছেন। আমাদের সঙ্গে কোন 'বিটার' ছিল না। সবশুদ্ধ চারটি হাতীতে আমরা কয়েকজন সখের শিকারী। এখান থেকে আসল ফরেস্ট অনেকটা দূর; তাই এ গো-খাদক জীবটির জাত সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ ছিল। কারণ এ অঞ্চলে সাধারণতঃ লেপার্ডের রাজত্ব। বনসম্রাটের আগমনে কোন আইন-গত বাধা না থাকলেও সন্দেহের অবকাশ ছিল। তা রাজাই হউন আর সম্রাটই হউন, আকার ও শক্তিতে যে বিরাট্ তা সুনিশ্চিত।

আমি ও ফরেস্ট-অফিসার সানন্দে বিটারের ভূমিকা গ্রহণ করলাম; কারণ অবশিষ্টেরা বিশেষ আতিথি-পর্যায়ভুক্ত। একবার জঙ্গলের চারিদিক্ পর্যবেক্ষণ ক'রে অপর দু'টি হাতীর আরোহীদের সম্ভাব্য পথের ধারে বসিয়ে দিয়ে, আমরা দু'জন অপর প্রান্ত থেকে আস্তে আস্তে শিকারের দিকে অগ্রসর হতেই মনে হ'ল, কি যেন অতি সন্তর্পণে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রাইফেলের গগন-বিদারী শব্দে বনভূমি কেঁপে উঠল। এক মিনিটের নিস্তব্ধতা। এক তরুণ অতিথি চেঁচিয়ে উঠলেন—'হিট্ দি টাইগার' অর্থাৎ বাঘের গায়ে গুলী লেগেছে। এ তাঁর ভ্রান্ত ধারণা বা বৃথা আস্ফালন। আঘাত পেলে বাঘ গর্জন ক'রে উঠত। আমি ও ফরেস্ট-অফিসার উভয়ে হাতীর পিঠ থেকে দৃষ্টি ও হাসি বিনিময় ক'রে এগিয়ে চললাম। একটু যেতেই আমার ডাইনের দিকে আসামীলতার ঝোপের মাথায় একটা আলোড়ন দেখতে পেলাম এবং সে আলোড়ন যেন ক্রমে এদিকেই আসছে। 'বিটার'-এর ভূমিকায় নেমেছি ব'লে আমার বন্দুকের উভয় নলেই বড় টিটে গুলী ভরা। কি করা উচিত তা স্থির করার পূর্বেই দেখতে পেলাম, হঠাৎ সে আলোড়ন আরও ডাইনের দিকে ঘুরে চলেছে। বুঝতে পারলাম, বাঘ এবার এ জঙ্গল ছেড়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে যাবে। অতএব আর কালক্ষেপ সঙ্গত হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আলোড়নের মূলাধারকে লক্ষ্য ক'রে ডাইনের ঘোড়া টিপতেই গর্জন ক'রে বাঘ লাফিয়ে উঠল। সকলের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'ল। গতির মোড় ফিরিয়ে বাঘ এই জঙ্গলের মাঝখানে এসে কোথায় যেন নির্খোজ হয়ে গেল। সাঁড়াশী অভিযানের গতিতে এগিয়ে চলেছি দুই ধার থেকে আমি ও ফরেস্ট-অফিসার। হঠাৎ আমার হাতী কু···উ···উ···শব্দ ক'রে বাঘের সান্নিধ্যের সন্ধান দিল। অদ্ভুত জীব এই হাতী। শিকারে না গেলে এদের বুদ্ধিমত্তার ধারণা করা যায় না। আমরাও দারুণ উত্তেজনায় এগিয়ে চললাম সামনের দিকে—লতা-জঙ্গল দলিত পিষ্ট ক'রে। আমার সামনের দিকে পর পর দু'বার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। আশা হ'ল, বোধ হয় পরিশ্রমের শেষ হ'ল। হা! এবারও সেই একই ফল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বাঘ শিকারীর পাশ কাটিয়ে তীব্রবেগে সামনের মাঠ পার হয়ে অপর জঙ্গলে প্রবেশ করল।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্ল্যানিং-এর পালা। ফাল্গুনের বেলা বেড়ে উঠেছে। মাথার উপরে রৌদ্র তীব্রতর মনে হচ্ছে। শিকারের প্রথম পর্বের অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাস যে

এমন অসীম অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত হবে তা অভাবনীয় না হলেও তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে মন রাজী হ'ল না। সত্যি সত্যি 'রিয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' দেখে অনেকেরই উৎসাহের জোয়ারে ভাঁটার টান দেখা গেল। এর চেয়ে পাখী-শিকারে যাওয়াই ঢের ভাল ছিল—ঐ আফশোসের গুঞ্জনও এদিক্-ওদিক্ থেকে কানে আসছিল।

হস্তী বাহকতা ঐশ্বর্যের প্রতীক হলেও তার পৃষ্ঠদেশ মানবকের অবয়াঙ্গের পক্ষে বিশেষ সুখপ্রদ নয়। তাই অনেকক্ষণ বাদে ভূমি স্পর্শ করার আনন্দে প্রধান অতিথি রণে ভঙ্গ দিলেন। তাঁর সহচর স্থানীয় শিকারী ফাজিল মিঞা তার নড়বড়ে একনলা বন্দুক নিয়ে দখল ক'রে রইলেন হাওদাটি। প্রধান অতিথি আশ্রয় নিলেন এক বিরাট বৃক্ষশাখায়। তার পর আবার প্রথম পর্বের পুনরাবৃত্তি। অতিথিরা দুইজন এক হাওদাতে—ফাজিল মিঞা অন্যটিতে। আমি ও ফরেস্ট-অফিসার দুই হাতীতে বিগারের ভূমিকায়। অচিরাৎ পুনরায় পর পর দুইবার তোপধ্বনি ও ব্যাঘ্রের অক্ষত অবস্থায় বনান্তর-গমন।

বেলা দ্বিপ্রহর। মুখর বনভূমি স্তব্ধপ্রায়। কেবল মাঝে মাঝে ঝোপের আড়াল থেকে কোন ঘুঘু-দম্পতি—'বন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে নিভৃতে করিতেছিল বিশ্রম্ভ-কূজন।' অদূরে প্রসারিত মাঠে মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মায়া-মরীচিকা; রুদ্র বুঝি কান পেতে আছেন কোন রাখালিয়া বাঁশীর সুরের আশায়। অবস্থাভেদে মনুষ্য-প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে, বনেরও ঘটে। ঠিক বলা হ'ল না। বনই ত প্রকৃতি। তাই রূপান্তর এমন আর কোথায়! প্রভাতের সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নের মৌননীরবতায়, নিশার প্রহরে প্রহরে যে বৈচিত্র্যের ইন্দ্রজাল নামে তা দেখার চক্ষু ভগবান সকলকে দেন না জানি, কিন্তু যাঁদের দেন তাঁরা নমস্য। কবিত্ব এসে পড়ল। সত্যি কথা—দেহের ক্লান্তিতে শিকারের নেশায় ও বনের মায়ায় মিলে একটা শান্ত মাদকতার প্রলেপ সারা দেহমনে অনুভব করছিলাম। ক্ষুধা-পিপাসা-বিশ্রাম প্রভৃতি সহজ জৈব প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে এক মোহময় রাজ্যের সীমা-রেখায় যেন পৌঁছে গিয়েছি। কান কিছুতেই যেন তাড়া নেই। এই বনের কোলে এমনি ক'রে জীবনটা কেটে যায় না?

ইরাণী কবি ওমরের এ রসের স্বাদ জানা ছিল কিনা জানি না। থাকলে, নিশ্চয়ই তিনি বাব্যগ্রন্থ নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকার স্বপ্ন দেখতেন না। অবশ্য, তাঁর অন্য যে দু'টি ইরাণী বস্তুর উপর দৃষ্টি ছিল তার কথা আলাদা। মাদৃশ ইতর জনের পক্ষে সে দ্রাক্ষাফল অতিশয় অম্ল।

এ দার্শনিক ভাবটা কেটে গেল ফরেস্ট-অফিসারের তাড়ায়। বেচারীর ঘাড়ে এতগুলি অতিথি তাদের খানাহার থেকে সুরু ক'রে যাবতীয় বিনোদনের ভারে বিব্রত। তাছাড়া, সত্যিকারের শিকারী মানুষ। এই একটানা ছেলেখেলায় বোধ হয় ধৈর্যের বাঁধ কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে থাকবে। স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসিটি মুখে রেখেই বললেন, 'বেলা ত অনেক হ'ল এবার বর' শেষ ক'রে ফেলা যাক।' আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, আপনি জায়গা নিয়ে বসুন—আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি—শেষ ক'রে ফেলুন। আমার উপর তার এ বিশ্বাসের কারণ খুঁজে পেলাম না। ছোট্ট একটা আসামী বুনো লতার জঙ্গল—পাতাগুলি রোদে ঝ'রে গিয়েছে, লতাগুলিও প্রায় শুকনো। তলায় ঝরাপাতা ছাড়া অন্য কোন জঙ্গল নেই—পরিষ্কার দেখা যায়। সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের জঙ্গল থেকে বাঘটা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ। উত্তর দিকে ছোট্ট একটু মাঠ পার হলেই সীমাহীন শালবন, কাজেই বাঘের সহজগতি ঐদিকে। বন্ধুর অনুরোধ আর উপেক্ষা না করে বড় ফরেস্টের গা ঘেঁষে ঝোপের আড়ালে ছোট মাঠটা সামনে ক'রে প্রস্তুত হয়ে বসলাম হাতীর উপরে। এবার বন্দুকে ভরা রইল একদিকে বুলেট ও অন্যদিকে বড় ছিটে গুলী। আর একবার ভাল করে বন্দুক পরীক্ষা ক'রে উন্মুখ হয়ে বসে রইলাম বাঘের প্রতীক্ষায়।

ফাজিল মিঞা ইতিমধ্যে সরে পড়েছেন। বিট্ করছেন ফরেস্ট-অফিসার একা। বনের মাঝখান দিয়ে সোজা উত্তর দিকে মচ্ মচ্ করে এগিয়ে আসছে তাঁর হাতী। একটু পরেই সাদা রুমাল নেড়ে ইশারায় জানিয়ে দিলেন বাঘ আমার দিকে আসছে। অচিরাৎ জঙ্গলের শেষ প্রান্তে দেখতে পেলাম ব্যাঘ্ররাজের মুখ-কমল। একবার ডাইনে ও বাঁয়ে তাকিয়ে একটু দ্বিধা অতিক্রম করে সে পাড়ি ধরল সোজা মাঠের উপর দিয়ে আমার দিকে। আমার বুক দুরুদুরু করে উঠল, আনন্দ ও ভয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণে। নিমেষের মধ্যে বুকের আলোড়ন থেমে গেল। ক্ষণেক পূর্বের দার্শনিক কবিত্বময় জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে দেহ ও মন যেন হঠাৎ এক দানবিক কঠোরতার বর্মে আবৃত হয়ে গেল। বিদ্যুৎ-বেগে কোল থেকে বন্দুক উঠে গেল কাঁধের ওপর। সেফ্টি ক্যাচ তুলে বন্দুকের ট্রিগারে আঙ্গুল দিয়ে দাঁতে দাঁত মিলিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করেছি। হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম

পর পর দু'টি গুলীর আওয়াজ। বাঘের অদূরে মাটিতে রাজ্যের ধূলা উড়ে গেল। এই বালখিল্য কৌতুকের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ব্যাঘ্ররাজ পুনরায় পিছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। ডাইনের দিকে তাকিয়ে দেখি, শতখানেক গজ দূরে আমার সোজাসুজি লাইনে হাতীর উপরে রাইফেল হাতে বসে আমাদের অতিথি দলের দুই তরুণ শিকারী বন্ধু।

দুঃখে ক্ষোভে ও বিরক্তিতে ফরেস্ট-অফিসার ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কি করলেন আপনারা?' এ যে শিকারের আইনে কত বড় অন্যায় তা তিনি জানতেন। তাই তাঁর সমস্ত শিষ্টতাবোধকে অতিক্রম করে বেরিয়ে এল ঐটুকু ক্ষোভের ইঙ্গিত। আর কালক্ষেপ বা আলাপ-আলোচনার কথা না ভেবে আমি বেগে চালিয়ে দিলাম আমার হাতী বাঘের পেছনে এবং ফরেস্ট-অফিসারকে চেঁচিয়ে বললাম প্রস্তুত হতে। তিনি একবার বললেন, 'না, এ হয় না।' আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে বাঘকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম তাঁর একেবারে সামনে। এবার তিনি বন্দুক তুললেন—দু'টি আওয়াজ হ'ল একটু পর পর। একটা বিরাট্ গর্জন—খানিকটা গোঁঙানি ও একটু ঘড়ঘড় শব্দ। ব্যস্, লেজটা বার কয়েক একটু কেঁপে সোজা হয়ে থেমে গেল। নিজেরাই টেনে বাইরে নিয়ে এলাম। মেপে দেখলাম, দশ ফুট দু' ইঞ্চি। তুলে দিলাম হাতীর পিঠে। তাঁবুতে পৌঁছানোর পরের অবস্থা নাই বা বললাম।

# ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী

চতুর্থ খণ্ড[১]

[ পাটলিপুত্র হইতে বারাণসী ও দক্ষিণ-ভারত ঘুরিয়া পুনরায় পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন ]

নদী অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে এক যোজন পথ অগ্রসর হইয়া ভ্রমণকারীরা পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানেই ছিল মগধরাজ অশোকের রাজধানী। নগরীর কেন্দ্রস্থলে প্রাচীন রাজপ্রাসাদটি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থিত প্রতিটি কক্ষ পিশাচগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। অশোকের নির্দ্দেশে পিশাচেরা পাথরের উপর পাথর বসাইয়া অত্যুচ্চ প্রাচীর ও বিশাল সিংহদ্বারযুক্ত এই সুরম্য প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ইহার অলৌকিক শিল্প-চাতুর্য্য এখনও মানুষের বিস্ময় উৎপাদন করে। কোন মানুষের পক্ষেই এইরূপ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট বিচিত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ সম্ভব নহে।[২]

অশোকের এক ছোট ভাই অর্হৎ হইয়া নির্জ্জনে তপস্যার আনন্দ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। ইনি ছিলেন একাধারে রাজার স্নেহের ও শ্রদ্ধার পাত্র। রাজা অশোক তাঁহার এই ভ্রাতাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ রাজপরিবারে বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকিবে না। সন্ন্যাসী-ভ্রাতা পর্ব্বতবাসের প্রশংসাপূর্ব্বক রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলে, রাজা পুনরায় বলিলেন—"কেবলমাত্র আমার নিমন্ত্রণটি রক্ষা কর। আমি তোমার জন্য নগরীর অভ্যন্তরে একটি পর্ব্বত রচনা করিয়া দিব।"

উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য রাজা একটি ভোজের আয়োজনকরতঃ পিশাচদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"আগামী কল্য তোমরা সকলে আমার নিমন্ত্রণ

১। ভূমিকাসহ প্রথম খণ্ড ভারতবর্ষ (ফাল্গুন ১৩৬৬) পত্রিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড প্রবাসী (মাঘ ১৩৬৭) পত্রিকায় এবং তৃতীয় খণ্ড শেষোক্ত পত্রিকায় (আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩৬৮) প্রকাশিত হইয়াছে।

২। প্রাচীন-ভারতীয় হিন্দুদের অন্যান্য গুণের ন্যায় তাঁহাদের শিল্পচাতুর্য্যও অসাধারণ ছিল। বৌদ্ধ-নৃপতি অশোক হিন্দু শিল্পীদিগকে দিয়া প্রাসাদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-লেখকেরা হিন্দু শিল্পীগণের এই মহান অবদানকে পিশাচের কার্য্য বলিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। হিন্দু জনসাধারণের প্রতি বৌদ্ধেরা ঘৃণার ভাব পোষণ করিত, এই সকল বর্ণনা হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়।

রক্ষা করিবে। তবে আসিবার সময় প্রত্যেকে বসিবার জন্য একটি আসন লইয়া আসিও; কারণ তোমাদিগকে বসাইবার মত পর্য্যাপ্ত আসন আমার নাই।"

### কৃত্রিম পর্ব্বত

পর দিন প্রত্যেকটি পিশাচ এক এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যেকটি প্রস্তর দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ৪।৫ পদ পরিমিত ছিল। তাহাদের উপবেশনের প্রয়োজন শেষ হইলে রাজার অনুরোধে তাহারা পাথরের উপর পাথর বসাইয়া একটি পর্ব্বত রচনা করিল। ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে চারিটি বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা একটি কক্ষ নির্ম্মাণ করা হইল। এই কক্ষটি ৩০ হাতেরও অধিক দীর্ঘ, ২০ হাতেরও অধিক প্রস্থ এবং ১০ হাতেরও অধিক উচ্চ ছিল।৩

### রাধাস্বামী

এই নগরীতে রাধাস্বামী নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ছিলেন মহাযান-পন্থীদের অধ্যাপক। তাঁহার বিচারবুদ্ধি এবং জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং তাঁহার চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক। এই দেশের রাজা তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকেই রাজগুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ কোন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইয়া রাজার দর্শনার্থী হইলে রাজা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিতেন। কোন কারণে রাজা তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলে ইহার অব্যবহিত পরক্ষণেই ব্রাহ্মণ জল দ্বারা হস্ত ধৌত করিতেন (কারণ, নৃপতির স্পর্শ দ্বারা নিজের দেহের পবিত্রতা নষ্ট হউক, তাহা তিনি চাহিতেন না)। এই ব্রাহ্মণের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ছিল এবং সমগ্র রাজ্যের লোক তাঁহাকে সম্মান করিত। এই একটিমাত্র লোকের পাণ্ডিত্য দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা কোন স্থানেই আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর উপদ্রব করিতে সাহস পাইত না।

### মঞ্জুশ্রী

অশোকের স্তূপের নিকটে মহাযান-পন্থীদের একটি সুন্দর সুবিশাল ধর্ম্মশালা ছিল। হীনযান-পন্থীদের জন্যও অপর একটি ধর্ম্মশালা ছিল। উভয় ধর্ম্মশালাতে ৬।৭ শত ভিক্ষু বাস করিতেন। তাঁহাদের সদাচার ও পাণ্ডিত্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। নানা দেশ হইতে অসংখ্য শ্রমণ, ছাত্র এবং অন্যান্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসু লোক যথার্থ ধর্ম্মমত জানিবার জন্য এই ধর্ম্মশালায় আগমন করিত। এই ধর্ম্মশালাতে মঞ্জুশ্রী নামে একজন বিখ্যাত অধ্যাপকও ছিলেন। সমগ্র রাজ্যের শ্রমণেরা, বিশেষতঃ মহাযান-পন্থী ভিক্ষুগণ ইঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

### দানধর্ম্ম

মধ্যদেশের সমুদয় নগর হইতে এই রাজ্যের নগরীগুলি অধিকতর বিখ্যাত এবং আয়তনেও বিশাল ছিল। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই ধনবান্ ও সমৃদ্ধিশালী ছিলেন এবং দানধর্ম্মের ব্যাপারে তাঁহারা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতেন।

### রথযাত্রা

প্রতি বৎসর দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে এখানকার লোকেরা একটি 'প্রতিমার শোভাযাত্রা' উৎসব করিতেন। একটি চারি চাকার রথ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর বাঁশ দিয়া একটি পাঁচতলা মন্দির নির্ম্মাণ করা হইত। মধ্যস্থলে একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার সহিত বংশখণ্ড সমূহ বাঁধিয়া এই স্তূপাকৃতি, বিংশতি হস্তেরও অধিক উচ্চ মন্দিরটি প্রস্তুত করা হইত। সাদা রেশমের মত উর্ণাতন্তুময় বস্ত্র দ্বারা এই পাঁচতলা মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ইহার উপর নানাবর্ণের চিত্র অঙ্কন করা হইত। স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতু দ্বারা দেবতাদের অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহাদিগকে রেশমী কাপড় পরাইয়া মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হইত। চারিপার্শ্বে চারিটি আসনের উপর এক-একটি 'উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি' স্থাপন করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের পার্শ্বে এক-একটি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিও রাখা হইত।

এই শোভাযাত্রায় ন্যূনাধিক ২০টি রথ ব্যবহার করা হইত। প্রত্যেক রথই সুন্দর এবং নানাবর্ণে চিত্রিত থাকিত বটে; কিন্তু তথাপি প্রত্যেকটির রচনায় ও কারুকার্য্যে বৈশিষ্ট্য থাকিত। উৎসবের দিনে সমগ্র রাজ্যের ভিক্ষু ও শ্রমণেরা বহুসংখ্যক গায়ক ও বাদকসহ তথায় সম্মিলিত হইতেন। তাঁহারা পুষ্পধূপাদির সহিত নিজেদের ভক্তি নিবেদন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বৌদ্ধদিগকে নগরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেন। এইরূপে নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দুই রাত্রি তথায় বাস করিতেন। এই দুইদিন সারারাত্রি প্রদীপ জ্বলিত এবং মনোজ্ঞ সঙ্গীত ও পূজা চলিত। অন্যান্য রাজ্যও এই নিয়মেই উৎসব হইত।

---

৩। হিন্দু-শিল্পীগণই "পাষাণ পিশাচ" নামে অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

### অনাথ আশ্রম ও দাতব্য-চিকিৎসালয়

বৈশ্যজাতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বড় বড় সহরে অনাথাশ্রম ও দাতব্য-চিকিৎসালয়সমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন। সমগ্র দেশের দরিদ্র, অনাথ, বিধবা, বিপত্নীক ও নিঃসন্তান নরনারী এবং খঞ্জ ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই সকল অনাথাশ্রম ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ে আশ্রয়লাভ করিত এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হইত। বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা রোগীদের তত্ত্বাবধান করিতেন। রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য সরবরাহ করা হইত এবং তাহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উত্তম ব্যবস্থা ছিল। আরোগ্যলাভের পর রোগীরা স্বেচ্ছায় অন্যত্র চলিয়া যাইতেন।

### অশোকের স্তূপ ও স্তম্ভ

রাজা অশোক যখন ৮৪,০০০ স্তূপ নির্ম্মাণের অভিপ্রায়ে ৭টি প্রাচীন স্তূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন তিনি সর্ব্বপ্রথম যে স্তূপটি নির্ম্মাণ করেন, তাহা এই নগরী হইতে দক্ষিণদিকে ৩ লি অপেক্ষা কিছু বেশী দূরে অবস্থিত। উক্ত স্তূপের পুরোভাগে বুদ্ধের একটি পদচিহ্ন আছে, এবং তাহার উপর একটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিহারের দ্বার উত্তরদিকে। ইহার দক্ষিণদিকে ১৪।-৫ হাত পরিধিবিশিষ্ট একটি স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভটি ৩০ হাতেরও অধিক উচ্চ এবং ইহার উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্ষোদিত রহিয়াছে—

"অশোক সমগ্র জম্বুদ্বীপ ভিক্ষুসম্প্রদায়কে দানকরতঃ পুনরায় উপযুক্ত মূল্য দ্বারা উহা তাঁহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। এইরূপ কার্য্য তিনি ৩ বার করিয়াছেন।"

উল্লিখিত স্তূপের উত্তরদিকে ৩।৪ শত পদ দূরে রাজা অশোক নেলে[৪] নামক নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত নগরীর অভ্যন্তরে ৩০ হাতেরও অধিক উচ্চ একটি পাষাণ-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর একটি সিংহ স্থাপন করা হইয়াছে। নেলে-নগরী নির্ম্মাণের ইতিহাস সন, তারিখ ও মাসের নামসহ উল্লিখিত স্তম্ভের গাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে।

### শক্রের অঙ্গুলি-চিহ্ন

এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে নয় যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটি প্রস্তরবহুল নির্জ্জন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতের শীর্ষদেশে যে স্থানে বুদ্ধ উপবেশন করিলে দেবরাজ শক্র তাঁহার আনন্দ-বিধানের জন্য দেবতাদের বীণাবাদক পঞ্চশিখকে লইয়া আসিয়াছিলেন, তথায় একটি প্রস্তর নির্ম্মিত দক্ষিণমুখী কক্ষ নির্ম্মিত আছে। এই স্থানে শক্র পর্ব্বতগাত্রে অঙ্গুলি স্থাপন সহকারে ৪২টি বিভিন্ন বিষয়ে বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল অঙ্গুলি-চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে[৫] এবং তাহার উপর একটি বিহারও নির্ম্মিত হইয়াছে।

### শারিপুত্রের জন্মস্থান

এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা নালন্[৬] নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রামে শারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিনির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে আবার এখানেই ফিরিয়া আসেন। যে স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন, তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

### নূতন রাজগৃহ

আরও পশ্চিমে এক যোজন দূরে রাজা অজাতশত্রুর নির্ম্মিত নূতন রাজগৃহ নগরে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। এই নগরে দুইটি ধর্ম্মশালা ছিল। পশ্চিমদিকে নগরদ্বারের বাহিরে ৩০০ পদ দূরে রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপটি সু-উচ্চ, বৃহৎ, কারুকার্য্যখচিত এবং সুন্দর।

### প্রাচীন রাজগৃহ

নগরীর দক্ষিণ দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে ৪ লি পরিমিত রাস্তা অতিক্রম করিলে একটি সমতল ভূমিতে প্রবেশ করা যায়। এখানে পাঁচদিকে পাঁচটি পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত একটি গোলাকার ক্ষেত্র আছে। পর্ব্বতগুলি এমনভাবে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে, মনে হয় যেন কোন নগরীর বহিঃপ্রাচীর। এখানে রাজা বিম্বিসারের প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৫।৬ লি এবং উত্তর-দক্ষিণে ৭।৮ লি বিস্তৃত।

---

৪। এই নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান বা অন্যান্য পরিচয় সম্বন্ধ সমালোচকেরা কেহই নিশ্চিতরূপে কিছু বলিতে পারেন নাই। অধ্যাপক James Legge-এর মতে ইহা পাটলিপুত্রের প্রান্তবর্ত্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ছোট শহর ( The Travels of Fa Hien." by James Legge, Page—80 foot note—3).

৫। এই সকল অঙ্গুলি চিহ্ন নিশ্চয়ই ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছিল।

৬। ইহা নালন্দার সংক্ষিপ্ত নাম। এখনকার বিখ্যাত মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরে রচিত হয়।

এখানেই শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সর্ব্বপ্রথম উপসেনকে (শাক্যমুনির পঞ্চভক্তের অন্যতম) দেখিয়াছিলেন। এখানেই নির্গ্রন্থেরা অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। এখানেই রাজা অজাতশত্রু একটি কৃষ্ণবর্ণ হস্তীকে মদ্যপানে উন্মত্ত করিয়া বুদ্ধকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন।[৭] এই নগরীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি তির্য্যগাকৃতি ভূমিতে অম্বাপালী-নির্ম্মিত উদ্যানে জীবক (বিম্বিসার ও অম্বাপালীর পুত্র) একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া ১,২৫০ জন শিষ্যসহ তথায় আসিয়া বাস করিবার জন্য বুদ্ধকে আহ্বান জানাইযাছিলেন। উল্লিখিত প্রত্যেকটি স্থানই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কিন্তু নগরের অভ্যন্তরভাগ জনহীন প্রান্তরে পরিণত হইযাছে।

### গৃধ্রকূট

এই উপত্যকায় প্রবেশপূর্ব্বক দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়া ১৫ লি পথ অতিক্রমকরতঃ তাঁহারা গৃধ্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। ইহার শিখরদেশ হইতে ৩ লি নীচে পর্ব্বতের উপর একটি দক্ষিণমুখী গুহা আছে। এই গুহামধ্যে বুদ্ধ ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে ৩০ পদ দূরে আর একটি গুহা আছে। এই দ্বিতীয় গুহাটিতে বসিয়া যখন আনন্দ ধ্যান করিতেছিলেন, তখন মারনামক খলপ্রকৃতি দেবতা একটি বৃহৎ গৃধ্রের রূপধারণপূর্ব্বক গুহামুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল।[৮] বুদ্ধ তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতাবলে পার্শ্ববর্ত্তী গুহা হইতে পর্ব্বতের ভিতর দিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক আনন্দের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ভয় দূরীভূত হয়।[৯] পক্ষীর পদচিহ্ন এবং পর্ব্বতমধ্যস্থিত উল্লিখিত ছিদ্রটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।[১০] এই ঘটনা হইতেই উক্ত পর্ব্বতের নাম হয় গৃধ্রকূট।[১১]

### দেবদত্ত

গুহার সম্মুখে চারিজন বুদ্ধের চারিটি উপবেশন-স্থান রহিয়াছে। প্রায় শতাধিক অর্হৎ এখানকার এক-একটি গুহায় বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সকল গুহাও অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। যে স্থানে বুদ্ধ তাঁহার পাষাণ-গৃহের সম্মুখে পূর্ব্ব-পশ্চিমে পাদচারণ করিবার কালে অদূরে লুক্কায়িত দেবদত্ত[১২] তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহা বুদ্ধের পদাঙ্গুলি আহত করে, সেই স্থানে উক্ত প্রস্তরখণ্ডটি এখনও পড়িয়া রহিয়াছে।

### পর্ব্বতশিখরে পূজা

বুদ্ধ যে কক্ষে বসিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র তাহার ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের ভিত্তিটুকু এখনও দেখা যায়। এই পর্ব্বতের চূড়াটি সুন্দর, সবুজ বর্ণ এবং অতিশয় উচ্চ। পাঁচটি পর্ব্বতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ। নূতন

---

৭। ফা-হিয়েন সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর হিন্দু-বিদ্বেষী বৌদ্ধের মুখে অজাতশত্রুর উপর আরোপিত এই মিথ্যা কলঙ্ক-কাহিনী শুনিয়াছিলেন। বিনয়-পিটক নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়- এই ব্যাপারের সঙ্গে দেবদত্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাস্তবিক বুদ্ধকে মারিবার জন্য হস্তীটিকে মদ্যপান করান হইয়াছিল কি না, ইহা সন্দেহের বিষয়। অজাতশত্রু যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সর্ব্বদা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, উল্লিখিত প্রকার অপকর্ম্ম অজাতশত্রুর পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। অজাতশত্রুর চরিত্র আলোচনার জন্য মৎপ্রণীত "অজাতশত্রু ও পূজারিণী" শীর্ষক প্রবন্ধ (মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩৫) দ্রষ্টব্য।

৮। সম্ভবতঃ হঠাৎ একটি বাজপাখী আসিয়া আনন্দের গুহাদ্বারে বসিলে তিনি অত্যন্ত ভীত (সম্ভবতঃ ভয়ে মূর্চ্ছিত) হইয়াছিলেন।

৯। আনন্দের গুহাদ্বারে বাজপাখীটিকে বসিতে দেখিয়া বুদ্ধ নিকটবর্ত্তী গুহা হইতে লোকজন সহ আসিয়া বাজপাখীটিকে তাড়াইয়া দিয়া গুহার প্রবেশ করেন এবং ভয়ে মূর্চ্ছিত-প্রায় আনন্দের স্কন্ধে হস্ত দিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন এই ঘটনাটিকেই সম্ভবতঃ অলৌকিক রূপ দেওয়া হইয়াছে।

১০। পর্ব্বতগাত্রে গুহামধ্যে সম্ভবতঃ পূর্ব্ব হইতেই একটি ছিদ্র ছিল। এই সময় হইতে উক্ত ছিদ্রটির সঙ্গে উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনার গল্পটিকে যুক্ত করা হয়। পক্ষীর পদচিহ্ন নিশ্চয়ই পরবর্ত্তীকালে ভক্তগণ কর্ত্তৃক রচিত।

১১। গৃধ্রকূট শব্দের প্রকৃত অর্থ—গৃধ্রের (গৃধ্রপক্ষীর) মত কূট (শিখর) যাহার। এই পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গ আকারে গৃধ্রের মত ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ পর্ব্বতের এইরূপ নাম হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধেরা ইহার নামের সঙ্গে যে গল্পটি যুক্ত করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই কাল্পনিক।

১২। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে দেবদত্তকে বুদ্ধের আত্মীয় এবং তাঁহার প্রবল শত্রুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দেবদত্ত না কি বুদ্ধের প্রত্যেক অবতারেই তাঁহার শত্রুরূপে অবতীর্ণ হন। আমার মনে হয়—দেবদত্ত ছিলেন একজন উগ্র প্রকৃতির গোঁড়া হিন্দু। ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম না-ও হইতে পারে। দেবদত্ত শব্দের অর্থ 'দেবায় দত্ত' অর্থাৎ যিনি দেবতার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মের সংরক্ষণ এবং স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধ-বাদীদের দমনের জন্য নিজের জীবন পণ করিয়া কর্ম্মে অবতীর্ণ হন, তিনি দেবদত্ত নামে পরিচিত হইতে পারেন।

নগরীটিতে ফা-হিয়েন ধূপকাঠি, পুষ্প ও তৈলপ্রদীপ আনিয়া উহা পর্ব্বত-শিখরে লইয়া যাইবার জন্য দুইজন স্থানীয় ভিক্ষুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুষ্প, ধূপ ও প্রজ্জ্বলিত প্রদীপমালাদ্বারা স্বহস্তে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ফা-হিয়েনকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাইতেছিল। তিনি অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন, "এখানেই বুদ্ধ 'সুরাঙ্গমসূত্র' রচনা করিয়াছিলেন। আমি ফা-হিয়েন এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিলাম—যখন বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব নহে। এক্ষণে আমি কেবলমাত্র তাঁহার পদচিহ্ন এবং বাসস্থানই দেখিতে পাইতেছি।" এই কথা বলিয়া সেই পাষাণ-গৃহের সম্মুখে বসিয়া তিনি তারস্বরে সুরাঙ্গমসূত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সারারাত্রি সেখানে থাকিয়া প্রাতঃকালে তিনি নগরী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

### বাঁশবন ও গিরিগুহা

প্রাচীন নগরীর বাহিরে আসিয়া ৩০০ পদ ভূমি অতিক্রমকরতঃ তাঁহারা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে করণ্ড বাঁশের বাগান দেখিলেন। ইহার মধ্যে অদ্যাপি একটি বিহার বিদ্যমান আছে। এই বিহারে বহুসংখ্যক শ্রমণ বাসকরতঃ ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। বিহারের উত্তর দিকে ২৩ লি দূরে রহিয়াছে শ্মশানক্ষেত্র।

পর্ব্বতের উপর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিছুদূর গিয়া পশ্চিম দিকে ৩০০ পদ অগ্রসর হইলে তাঁহারা পিপ্পল নামক গিরিগুহায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যহ আহারের পর বুদ্ধ এই গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতেন।

### প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি

পশ্চিমাভিমুখে আরও ৫।৬ লি অগ্রসর হইয়া তাঁহারা পর্ব্বতের উত্তরদিকের পাদদেশে অবস্থিত শ্রুতপর্ণ নামক গুহায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেই বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর ৫০০ জন অর্হৎ মিলিত হইয়া সূত্র রচনা করিয়াছিলেন।[১৩] সূত্রগুলি রচিত হইলে পর তাঁহারা তিনটি সুসজ্জিত উচ্চ আসন স্থাপন করিলেন। বামদিকের আসনে বসিলেন শারিপুত্র এবং দক্ষিণদিকেরটিতে বসিলেন মৌদ্গল্যায়ন। সদস্যদের সংখ্যা ৫০০ হইতে ১ কম ছিল। মহাকাশ্যপ সভাপতি হইয়া মধ্যের আসনে বসিলেন। আনন্দ তখন গুহাদ্বারের বাহিরে ছিলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এই স্থানে পরে যে স্তূপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পর্ব্বতমালার মধ্যে অনেকগুলি কক্ষ আছে। এই সকল কক্ষে বিভিন্ন অর্হৎ ধ্যান করিতেন।

### ভিক্ষুর আত্মহত্যা

পুরাতন নগরীটিকে বামদিকে রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখে তিন লি অগ্রসর হইলে দেবদত্তের পাষাণগৃহ এবং তাহা হইতে ৫০ পদ দূরে একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ, কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এখানে একজন ভিক্ষু বাস করিতেন। একদা তিনি একাকী পাদচারণ করিবার কালে চিন্তা করিতেছিলেন—"এই দেহটি নশ্বর। ইহা দুঃখ ও বিলাসের উপকরণমাত্র। ইহাকে কিছুতেই বিশুদ্ধ মনে করা যায় না। এই দেহ আমার বিরক্তির ও অস্বস্তির কারণ হইয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একখানা ছুরিকা গ্রহণকরতঃ আত্মহত্যায় উদ্যত হইলেন। এই সময়ে তিনি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন—"ভগবান্ বুদ্ধ আত্মহত্যা নিষেধ করিয়াছেন।" আবার তিনি ভাবিলেন—"হ্যাঁ তিনি ইহা করিয়াছেন; কিন্তু আমি এক্ষণে মাত্র একটি আততায়ীকে বিনাশ করিব।"

তৎক্ষণাৎ তিনি ছুরিকাদ্বারা নিজের গলা কাটিয়া ফেলিলেন। কিছু মাংস কাটিবার পরই তিনি শ্রুতপর্ণত্ব[১৪] লাভ করিলেন। অর্দ্ধেক মাংস কাটিবার পর তিনি অনাগামিন্ এবং সম্পূর্ণ গলা কাটিবার পর অর্হৎ হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

### গয়া

এই স্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে চারি যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তীর্থযাত্রিগণ গয়া নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নগরীর অভ্যন্তর ভাগ ছিল একেবারে জনশূন্য। পুনরায় দক্ষিণমুখী হইয়া ২০ লি পথ অতিক্রমকরতঃ তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইলেন তথায় বোধিসত্ত্ব ৬ বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানের চারিদিকে ছিল কেবলই অরণ্য।

এখান হইতে ৩ লি পশ্চিমে গিয়া তাঁহারা সেই স্থানটিতে উপস্থিত হইলেন, যেখানে স্নান করিতে গিয়া

---

১৩। শ্রুতপর্ণ নামক এই বিখ্যাত গুহাটি বৌদ্ধ-সঙ্গীতির জন্য অজাতশত্রুর আদেশে রচিত হইয়াছিল (James Legge 'The Travels of Fa-Hien", Page 85, foot note—2)। অজাতশত্রু নিজে এই সঙ্গীতির ব্যয়ভারও বহন করিয়াছিলেন।

১৪। উচ্চ-স্তরের বৌদ্ধ সাধকদিগকে চারিটি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়; যথা- (১) শ্রুতপর্ণ (২) সকৃদাগামিন্ (৩) অনাগামিন্ এবং (৪) অর্হৎ।

বুদ্ধ জলমগ্ন হন এবং একজন দেবতা একটি বৃক্ষশাখা নত করিয়া দিলে পর তাহা অবলম্বন করিয়া জল হইতে উঠিয়া আসেন।

যে স্থানে গ্রাম্য-মেয়েরা বুদ্ধকে মিষ্টান্ন উপহার দিয়াছিলেন, তাহা এখান হইতে ২ লি উত্তরে অবস্থিত এবং যে স্থানটিতে তিনি একটি বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নে পাষাণের উপর পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক উক্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা এখান হইতে আরও ২ লি উত্তরে অবস্থিত। উল্লিখিত বৃক্ষ এবং পাষাণটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রস্তরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৬ হাত এবং উচ্চতায় ২ হাতের অধিক। মধ্যভারতের জলবায়ু এইরূপ নাতিশীতোষ্ণ যে, এখানকার বৃক্ষগুলি সাধারণতঃ কয়েক হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকে। এমন কি কোন বৃক্ষের পরমায়ু ১০ হাজার বৎসর হইতেও দেখা যায়।

### ছায়ামূর্ত্তি

এখান হইতে উত্তর পশ্চিমদিকে অর্দ্ধ যোজন দূরে পর্ব্বত-গাত্রে একটি গুহা আছে। এই গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক বোধিসত্ত্ব পশ্চিমমুখী হইয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট হন। এই সময়ে তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন—"যদি আমার বুদ্ধত্বলাভের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে যেন এখন একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে।" সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতগাত্রে বুদ্ধদেবের একটি ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এই ছায়ামূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে ছিল তিন ফুটের অধিক।[15] অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে।

### দৈববাণী

এই সময়ে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইল এবং দেবতারা শূন্যে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"কোন বুদ্ধই এই স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না। এই স্থানে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধ যোজনের অনধিক দূরে যে পত্রবৃক্ষটি আছে, তাহারই নীচে অতীতের সকল বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের বুদ্ধগণও সেইখানেই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।" এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা গান করিতে করিতে সেই দিকে রাস্তা দেখাইয়া চলিলেন।[16] পত্রবৃক্ষে পৌঁছিয়া বোধিসত্ত্ব উহার নীচে একটি কুশাসন পাতিয়া তদুপরি পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন।

### যুবতীগণের বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তি

এই সময়ে মাররাজের প্রেরিত ৩টি সুন্দরী যুবতী বোধিসত্ত্বকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মার নিজেও একই উদ্দেশ্যে দৈত্য সৈন্যগণসহ দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ভূমির উপর রাখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য সৈন্যগণ অন্তর্হিত হইল আর যুবতী তিনটি বৃদ্ধা নারীতে পরিণত হইয়া গেল।[17] উল্লিখিত প্রত্যেকটি স্থানেই স্তূপ ও বুদ্ধ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি তাহা পূর্ণগৌরবে বিদ্যমান আছে।

### বিভিন্ন স্তূপ ও বিহার

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ যেখানে ৭ দিন বৃক্ষের ধ্যান করিয়া বিমুক্তির আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, যে স্থানে পত্রবৃক্ষের নীচে তিনি ৭ দিন পূর্ব্ব-পশ্চিমে পাদচারণ করিয়াছিলেন, যেখানে দেবগণ সপ্ত ধাতু-নির্ম্মিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ৭ দিন ধরিয়া তাঁহাকে বিবিধ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, যে স্থানে ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নীচে তিনি একটি চতুষ্কোণ প্রস্তরের উপর পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলে ব্রহ্মদেব আসিয়া তাঁহার নিকট অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, যে স্থানে চারিজন দেবরাজ তাঁহাকে ভিক্ষাপাত্র দান করিয়াছিলেন, যেখানে ৫০০ জন বণিক্ তাঁহাকে রুটি ও মধু দান করিয়াছিল এবং যে স্থানে তিনি কাশ্যপ ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের সমুদয় শিষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছিলেন—এই সকল স্থানের প্রত্যেকটিতেই স্তূপসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বুদ্ধ যে স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তথায় তিনটি বিহার আছে। প্রত্যেকটি বিহারেই শ্রমণেরা বাস করিতেছেন।

---

১৫ সম্ভবতঃ এই গল্পটি পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। উল্লিখিত স্থানটির প্রতি তীর্থ-যাত্রীদের আকর্ষণ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গিরিগুহার অভ্যন্তরে কোন অনুপম স্থানে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপনকরতঃ সম্মুখের কোন পরিচ্ছন্ন প্রস্তরের উপর উহার প্রতিবিম্ব পড়িবার ব্যবস্থা পরবর্ত্তীকালে করা হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

১৬। স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকেই সম্ভবতঃ এখানে দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৭। বোধিসত্ত্বের তপোবিঘ্ন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অন্যায় তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য কেহ ৩ জন সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিল। কিন্তু যুবতীরা বোধিসত্ত্বের নিকটে যাওয়ামাত্র তাঁহার অনাবিল ব্যক্তিত্ব ও তপস্যা-প্রসূত তেজঃ তাহাদিগকে এমনি অভিভূত করিল যে, তখনই তাহারা কামভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণে উৎসুক হইল। এই সময় হইতে তাহাদের আচার-আচরণ বৃদ্ধা নারীদের মত ধর্ম্মভাবযুক্ত হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ তাহাদের বার্দ্ধক্য সমাগম কল্পনা করা হইয়াছে।

চারি পার্শ্বের অধিবাসীরা শ্রমণদিগকে এত অধিক পরিমাণে খাদ্যাদি সামগ্রী দান করে যে, কখনও তাঁহাদের কোনরূপ অভাব হয় না। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের আচারগুলি কঠোরতার সহিত পালন করেন। বুদ্ধদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত যে সকল নিয়ম শ্রমণেরা মানিয়া চলেন, এখানকার শ্রমণগণও উপবেশন, শয্যাত্যাগ, সভাক্ষেত্রে প্রবেশ, প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে সেই সকল নিয়মই পালন করিয়া থাকেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের সময় হইতেই চারিটি বৃহৎ স্তূপের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে এবং আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহা অস্বীকার করে নাই। উল্লিখিত চারিটি প্রধান স্তূপের স্থান যথা —(১) বুদ্ধের জন্মস্থান, (২) তাঁহার বুদ্ধত্বলাভের স্থান, (৩) যে স্থানে তিনি প্রথম ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, এবং (৪) যেখানে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

### অশোকের রাজ্যলাভের হেতু

অশোক পূর্ব্ববর্ত্তী এক জন্মে শৈশবে একদা রাস্তায় খেলা করিবার সময় ভ্রমণরত কাশ্যপ-বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আহার্য্য ভিক্ষা চাহিলে বালক অশোক সন্তুষ্টচিত্তে এক মুষ্টি মৃত্তিকা তাঁহাকে দান করেন। বুদ্ধ মৃত্তিকামুষ্টি গ্রহণকরতঃ উহা ভূমিতে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু এই মৃত্তিকা দানের ফলে অশোক সমগ্র জম্বুদ্বীপের পরাক্রান্ত সম্রাট হন।[১৮]

### নরক দর্শন

একদা রাজ্য পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া অশোক দুইটি পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তির জন্য রচিত একটি নরক দেখিতে পান।[১৯] মন্ত্রীদিগকে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর করিলেন—"দৈত্যরাজ যম দুর্ব্বৃত্তদের শাসনের জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"দৈত্যরাজ যম যদি দুর্ব্বৃত্ত মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই রকম নরক নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমি মানুষের রাজা হইয়া এইরূপ আর একটি নরক কেন নির্ম্মাণ করিব না?"

### কৃত্রিম নরক

ইহার পরই রাজা তাঁহার মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে এইরূপ একটি নরক নির্ম্মাণ করিয়া তথায় দুর্ব্বৃত্ত মানুষদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। মন্ত্রিগণ উত্তরে জানাইলেন যে, একমাত্র অতি দুর্ব্বৃত্ত লোক ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ নরক নির্ম্মাণ বা পরিচালন করা সম্ভব নহে।[২০] রাজা তখনই দুর্ব্বৃত্ত লোকের অনুসন্ধানে কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

কর্ম্মচারীরা খুঁজিতে খুঁজিতে একটি জলাশয়ের তীরে একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ লোককে দেখিতে পাইল, এই লোকটির মাথার চুল হলুদে এবং চক্ষু সবুজবর্ণ। সে পা দিয়া বঁড়শীর সাহায্যে মাছ ধরিতেছিল এবং এই মাছের প্রলোভন দেখাইয়া পশু-পক্ষীদিগকে নিকটে আহ্বান করিতেছিল। এই ভাবে প্রলুব্ধ হইয়া যে সকল পশুপক্ষী তাহার কাছে আসিতেছিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকেই সে বাণবিদ্ধ করিয়া বধ করিতেছিল। একটি পশু বা পক্ষীও পলাইয়া যাইতে পারিতেছিল না।

এই লোকটিকে সঙ্গে লইয়া রাজ-কর্ম্মচারীরা অশোকের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি গোপনে তাহাকে বলিলেন—"চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র তোমাকে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার অভ্যন্তরে সর্ব্বপ্রকার ফুল-ফলের বাগান রচনা করিয়া সুন্দর জলাশয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে উত্তম স্নানের ঘাট বাঁধিয়া দিবে। ইহা যেন এতই মনোমুগ্ধকর হয় যে, দর্শকমাত্রেই ইহাতে প্রবেশের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। ইহার দ্বারগুলি থাকিবে সুদৃঢ়। যখনই কোন লোক এই রক্ষিত স্থানে প্রবেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাপকারী বলিয়া ঘোষণাকরতঃ তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। কিছুতেই তাহাকে আর বাহিরে যাইতে দিবে না। এমন কি আমি নিজেও যদি ইহার মধ্যে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাকেও 'পাপী' বলিয়া ঘোষণা করিবে, এবং ছাড়িয়া না দিয়া একই নিয়মে শাস্তি দিবে। এক্ষণে আমি তোমাকে এই প্রস্তাবিত নরকের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলাম।"

অল্পক্ষণ পরেই এক ভিক্ষু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে সেই নরকের দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। নরকরক্ষীরা তাহাকে দেখিবামাত্র ধরিয়া লইয়া গেল

---

১৮। হিন্দু ও বৌদ্ধেরা মনে করেন সম্পত্তি বা রাজ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি পাপের ফলে হইয়া থাকে। অশোক ধূলিমুষ্টি দান করিয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তিনি জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন।

১৯। সম্ভবতঃ রাজ্য পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া অশোক উল্লিখিত স্থানে কোন পুরাণ পাঠকের মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়াছিলেন। ইহাকেই অতিরঞ্জিত আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২০। রাজার পরিকল্পিত নরকে নিরীহ হিন্দুদিগের নির্য্যাতন করা হইবে বলিয়া মন্ত্রীরা বুঝিতে পারেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁহারা রাজার নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে অসম্মত হন।

এবং নিয়মমত শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। ভিক্ষু অতিশয় ভীত হইল এবং রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া মধ্যাহ্নভোজন সারিবার জন্য তাহাদের নিকট একটু সময় ভিক্ষা করিল।

ইহার অব্যবহিত পরক্ষণেই আর একটি লোক (হিন্দু ?) তথায় প্রবেশ করিলে তাহারা সেই লোকটিকে যাঁতাকলে নিক্ষেপ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া ভিক্ষুর অন্তরে নরদেহের নশ্বরতা ও ব্যাধিপ্রবণতার কথা জাগিয়া উঠিল। তিনি মনুষ্য-দেহকে জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী জানিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। অবিলম্বে প্রহরীরা তাঁহাকে ধরিয়া উষ্ণ জলের কটাহে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু ভিক্ষুর মুখে তখন আনন্দের হাসি দেখা যাইতেছিল। আগুন নিভিয়া গেল এবং কটাহের জল শীতল হইল। কটাহের মধ্যস্থলে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইল এবং ভিক্ষু তাহার উপর বসিয়া রহিলেন।২১

প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট গিয়া এই অসম্ভব কাহিনী বিবৃতকরতঃ ইহা দেখিবার জন্য তাহাকে আসিতে অনুরোধ করিল। রাজা উত্তর করিলেন—"আমি পূর্ব্বে এমন এক আদেশ দিয়াছি যে, এখন আর সেখানে যাওয়ার সাহস আমার নাই।" রক্ষীরা বলিল—"ইহা ত সাধারণ ব্যাপার নহে। অবিলম্বে মহারাজের সেখানে যাওয়া উচিত। মহারাজ বরং পূর্ব্ব আদেশের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন।"

রাজা তখন তাহাদের অনুসরণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষু তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলে রাজা তাহা বিশ্বাস করিলেন এবং তাঁহার শুভ-বুদ্ধির উদয় হইল। রাজা তৎক্ষণাৎ নরক ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং তাঁহার অতীত আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। এই সময় হইতে রাজা তিনটি মহামূল্য উপদেশে বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন এবং নিয়মিত একটি পত্রবৃক্ষের নীচে বসিয়া নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই তিনি আট প্রকারের ত্যাগব্রত অবলম্বন করেন।

### পত্রবৃক্ষের ছেদন ও পুনরুজ্জীবন

"রাজা প্রত্যহ কোথায় যান ?"—জিজ্ঞাসা করিয়া রাণী মন্ত্রীদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে প্রত্যহ পত্রবৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট দেখা যায়। তখন রাজার অনুপস্থিতির সুযোগে রাণী তাঁহার লোকজন দ্বারা পত্রবৃক্ষটি কাটাইয়া ফেলিলেন। রাজা যখন পত্রবৃক্ষটির এই অবস্থা দেখিলেন, তখন দারুণ মনোবেদনায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীরা তাঁহার চোখে-মুখে জল ছিটাইতে লাগিলেন এবং ফলে বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল।

রাজা তখন পত্রবৃক্ষের ছিন্নমূলের চারিদিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া উক্ত ছিন্নমূলের উপর ১০০ কলসী গব্যদুগ্ধ ঢালিয়া দিলেন। তার পর তিনি মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যদি বৃক্ষটি বাঁচিয়া না উঠে, তাহা হইলে আমি আর উঠিব না।" তিনি এই কথা উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি গজাইতে লাগিল।২২ এই বৃক্ষটি বর্ত্তমানে প্রায় ১০০ হাত উচ্চ এবং ইহা এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে।

---

২১। নগরী মধ্যে বৌদ্ধদের জন্য বহু মঠ ও অন্নসত্র ছিল; সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন পথিকেরই আশ্রয়ের অভাব ঘটিত না। অপরপক্ষে হিন্দুদের জন্য এইরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকায় হিন্দু-পথিকদিগকে আশ্রয়ের সন্ধানে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে হইত। এই ভাবে আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে হিন্দু পথিকেরা প্রায়ই উল্লিখিত কৃত্রিম নরকে প্রবেশ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইত

ঘটনাচক্রে একদিন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষালাভের আশায় এই নরকে প্রবেশ করেন। তখন নরকরক্ষী ভীষণ ফ্যাসাদে পড়িল। সাধারণ নিয়ম অনুসারে সে আগন্তুক ভিক্ষুর মৃত্যু-দণ্ডের ব্যবস্থা করিবে না রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবে ? এই সময়ে একজন হিন্দু সেখানে প্রবেশ করিল এবং তাহারা সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটিকে যাঁতাকলে ফেলিয়া বধ করিল। রক্ষীরা বুঝিতে পারিল—এখন যদি তাহারা ভিক্ষুকে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের এই নিদারুণ পক্ষপাতিত্বের জন্য তাহারা জনসাধারণ কর্ত্তৃক ধিকৃত হইবে। আবার বৌদ্ধরাজার শাসনে ভিক্ষু-বধও হয় ত মার্জ্জনার চক্ষে দেখা হইবে না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া নরকরক্ষীরা সমস্যা সমাধানের জন্য এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিল। ভিক্ষুকে একটি শীতল জলের কটাহে রাখিয়া তাহার নীচে অল্প একটু অগ্নি দিয়া নিয়ম রক্ষা করা হইল। ভিক্ষু প্রথমে ভয় পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কোন বিপদ্ ঘটিবে না, তখন তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। নরকরক্ষীরা কটাহে উপবিষ্ট ভিক্ষুকে পদ্মফুলের দ্বারা পূজা করিতে লাগিল।

এদিকে রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলে তিনি নিজেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে সেই দিন হইতে হিন্দু-বিদ্বেষী রাজা অশোক হিন্দু নির্য্যাতনের মারাত্মক যন্ত্রস্বরূপ এই নরকটি বন্ধ করিয়াছিলেন।

২২। প্রকৃত ঘটনা সম্ভবতঃ এই যে, রাজার মানসিক বৈক্লব্য দেখিয়া রাণী ও মন্ত্রীরা পরামর্শকরতঃ একটি নূতন পত্রবৃক্ষের চারা অবিলম্বে তথায় রোপণ করিয়াছিলেন।

### গুরুপদ পর্ব্বত ও পবিত্র মৃত্তিকা

এখান হইতে দক্ষিণদিকে তিন লি অগ্রসর হইয়া পর্য্যটকেরা গুরুপদ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। মহা কাশ্যপ এখনও এই পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি একটি গর্ত্ত করিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছেন।২৩ এই গর্ত্তে কোন মানুষ প্রবেশ করিতে পারে না। মূল গর্ত্তের মধ্যে অনেক নীচে একপ্রান্তে একটি কোটর আছে। এই কোটরে কাশ্যপের সম্পূর্ণ দেহ অদ্যাপি অবস্থান করিতেছে। গর্ত্তের বাহিরে যে মৃত্তিকা দ্বারা তিনি নিজের হাত শুচি করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের লোকেরা মাথায় কোনরূপ পীড়া অনুভব করিলে এই স্থানের মৃত্তিকা দ্বারা পীড়িত স্থানে প্রলেপ দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ বোধ করে।২৪

এই পর্ব্বতের উপর এখনও পূর্ব্বকালের ন্যায় অর্হতেরা বাস করিতেছেন। আমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাসী ভক্তেরা প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশ হইতে এই পর্ব্বতে আসিয়া কাশ্যপের নিকট অর্ঘ্য নিবেদন করেন। যে সকল ভক্তের বিশ্বাস অতিশয় দৃঢ়, তাঁহাদের নিকট রাত্রিকালে অর্হতেরা আসিয়া আলাপ-আলোচনা করেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের যাবতীয় সন্দেহ নিরসন করিয়া অদৃশ্য হইয়া যান।২৫

এই পর্ব্বতের উপর প্রচুর পরিমাণে হজল (hazal)২৬ জন্মে। এখানে সিংহ, ব্যাঘ্র ও নেকড়ের সংখ্যা এত বেশী যে, সতর্ক না হইয়া চলা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক।

### পাটলিপুত্র ও অরণ্য-বিহার

গঙ্গাতীর ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইলেন। দশ-যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তিনি 'অরণ্য' নামক বিহারে পৌঁছিলেন। পূর্ব্বে এখানে বুদ্ধ বাস করিতেন, এবং বর্ত্তমানে ইহা বহু শ্রমণের বাসস্থান।

### বারাণসী

একই রাস্তায় পশ্চিম দিকে চলিতে চলিতে আরও ১২ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ফা-হিয়েন কাশীরাজ্যের অন্তর্গত বারাণসী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এই নগরীর উত্তর-পূর্ব্বদিকে ১০ লি-র চেয়ে কিছু বেশী দূরে অবস্থিত 'ঋষির বন্যমৃগ' নামক প্রান্তরে অবস্থিত অন্য একটি বিহারে তিনি পৌঁছিলেন। এই স্থানে পূর্ব্বে একজন প্রত্যেক বুদ্ধ বাস করিতেন এবং প্রত্যহ রাত্রিকালে হরিণেরা আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া বিশ্রাম করিত। ভগবান্ তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের প্রাক্কালে দেবতারা আকাশে দৈববাণী করিয়াছিলেন—"শুদ্ধোদনের পুত্র সংসার ত্যাগ এবং জ্ঞানলাভ করিয়াছে; সুতরাং এখন হইতে ৭ দিনের মধ্যে সে বুদ্ধত্ব লাভ করিবে।" প্রত্যেক বুদ্ধ তাঁহাদের কথা শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। এই সময় হইতেই উক্ত প্রান্তরটি 'ঋষির বন্যমৃগ' নামে পরিচিত হয়। ভগবান্ তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের পর এখানে একটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কৌণ্ডিন্য ও তাহার চারিজন সঙ্গীকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার জন্য বুদ্ধের ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহারা ইহা বুঝিতে পারিয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিল—"এই শ্রমণ গৌতম ৬ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছে। এই সময়ে সে একটি শনবীজ ও একটি তণ্ডুলকণা ভিন্ন আর কিছুই আহার করিত না। এক্ষণে লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া সে শরীর, বাক্য ও চিন্তা দ্বারা নিজ মত প্রচারে ব্রতী হইয়াছে। এইরূপ মত প্রচার করিয়া তাহার লাভ কি? আজ যখন সে আমাদের নিকট আসিবে, তখন আমরা সতর্ক থাকিব এবং তাহার সহিত আলাপ করিব না।"

বুদ্ধ যে স্থানে গমন করিলে পাঁচজন লোকের প্রত্যেকেই দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল; তথা হইতে ৬০ পদ ভূমি উত্তরে যে স্থানে তিনি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া নিজ ধর্ম্মমত প্রচারে ব্রতী হন এবং কৌণ্ডিন্য ও অপর চারিজনকে ধর্ম্মান্তরিত করেন, সেখান হইতে উত্তর দিকে আরও ২০ পদ দূরে যেখানে তিনি মৈত্রেয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; এবং দক্ষিণ দিকে ৫০ পদ দূরে যে স্থানে এলাপত্র নাগ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কখন আমি এই নাগদেহ হইতে মুক্তিলাভ করিব?"—এই সকল স্থানের প্রত্যেকটিতেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। এখানে

---

২৩। সম্ভবতঃ মহাকাশ্যপের জীবিতকালের নির্দ্দেশ অনুসারে এখানকার একটি গভীর গর্ত্তে তাঁহার শব প্রোথিত করা হইয়াছিল।

২৪। বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকায় বিশেষ বিশেষ গুণ থাকে; সুতরাং মৃত্তিকার গুণে এইরূপ ব্যাধি আরোগ্য হওয়া সম্ভব।

২৫। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আতিশয্য থাকিলে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা স্বপ্নযোগে মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও ভক্তেরা স্বপ্নযোগেই অর্হৎদের দর্শন লাভ ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

২৬। ফল বা বৃক্ষের নাম।

দুইটি বিহার আছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতেই শ্রমণেরা বাস করিতেছেন।

### কৌশাম্বী

'বন্য মৃগ' নামক প্রান্তরে যে বিহারটি অবস্থিত আছে, তাহা হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে ১৩ যোজন দূরে কৌশাম্বী নামে একটি রাজ্য আছে। এই রাজ্যে 'ঘোচির বন' নামক বিহারটি অবস্থিত। এই বিহারে বুদ্ধ বাস করিতেন। এখনও পূর্ব্বকালের ন্যায় বহু সংখ্যক ভিক্ষু এই বিহারে বাস করেন। ইঁহাদের অধিকাংশই হীনযান-মতাবলম্বী।

এখান হইতে পূর্ব্বদিকে ৮ যোজন দূরবর্ত্তী স্থানে বুদ্ধ একটি দুর্ব্বৃত্ত দানবকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছিলেন। উল্লিখিত স্থানটিতে এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে বুদ্ধ ভ্রমণ বা উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকটির উপরই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার অন্য একটি বিহারে সহস্রাধিক শ্রমণ বাস করেন।

### পারাবত-বিহার

এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে ২০০ যোজন দূরে 'দক্ষিণ' নামে একটি দেশ আছে। উক্ত দেশে কাশ্যপ-বুদ্ধের নিকট সমর্পিত একটি বিহার বিদ্যমান। একটি বৃহৎ পাষাণ-পর্ব্বত কাটিয়া এই বিহারটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহা পাঁচতলা-বিশিষ্ট এবং ইহার সর্ব্বনিম্ন তলাটির আকৃতি হস্তীর মত। এই নিম্নতলায় মোট ৫০০টি কক্ষ আছে। দ্বিতীয় তলাটি সিংহের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং ইহাতে ৪০০টি কক্ষ বিদ্যমান। তৃতীয় তলার গঠন অশ্বের ন্যায় এবং ইহার কক্ষ সংখ্যা ৩০০। চতুর্থ তলাটি ষাঁড়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং ইহাতে ২০০টি কক্ষ বিরাজিত। পঞ্চম তলার আকৃতি পারাবতের মত এবং ইহার কক্ষ সংখ্যা ১০০। সব কিছুর উপরে আছে একটি ফোয়ারা। ইহার জল সকল সময়েই কক্ষগুলির সামনের দিকে পড়ে এবং ইহার বারিধারাসমূহ কক্ষগুলিকে বেষ্টন করিয়া কখন সোজাভাবে, কখনও বা বক্র ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই ভাবে সর্ব্বনিম্ন তলা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া এই জলধারা নিম্নতলার কক্ষগুলির দ্বারপ্রান্তে পতিত হয়। প্রত্যেকটি কক্ষে শ্রমণেরা বাস করেন এবং ঘরের ভিতর আলো ঢুকিবার জন্য পার্শ্ব-দেশের কতকগুলি প্রস্তরে ছিদ্র করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রতিটি কক্ষের চারি কোণে পাথর কাটিয়া সিঁড়ি তৈরী করা হইয়াছে। এই সকল সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠা যায়। বিহারের উপর তলার আকৃতি পারাবতের মত থাকায় ইহা পারাবত-বিহার নামে পরিচিত। সকল সময়েই অর্হতেরা এই বিহারে অবস্থান করেন।

পারাবত-বিহারের চারিদিকে আছে শুধু দুর্গম পাহাড়। কোথাও মানুষের বসতি নাই। বহু দূরে কতকগুলি গ্রাম আছে বটে; কিন্তু ঐ সকল গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা বৌদ্ধ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য ধার্ম্মিক লোকদিগকে গ্রাহ্যই করে না। ঐ সকল গ্রামের লোকেরা প্রায়ই দেখিতে পায়—পক্ষধারী মানুষেরা উড়িয়া আসিয়া বিহারে প্রবেশ করিতেছেন।[২৭]

এক সময়ে যখন দূরদেশ হইতে ভক্তগণ এই মঠে আসিতেছিলেন, তখন ঐ সকল গ্রামের লোকেরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে—"তোমরা উড়িতেছ না কেন? অন্যান্য যে সকল ভক্তকে আমরা দেখিয়াছি তাহারা সকলেই ত উড়িয়া আসে।" আগন্তুকেরা উত্তর করেন—"আমাদের পাখা এখনও রীতিমত গজায় নাই।"[২৮]

'দক্ষিণ' নামক রাজ্যটিতে রাস্তাঘাটের সুবিধা না থাকায় ইহা অতি দুর্গম। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বৈদেশিকেরা যথেষ্ট টাকা পয়সা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি আনিয়া এই দেশের রাজার হাতে দেয় এবং তিনি তাহাদের সঙ্গে পথ-প্রদর্শক পাঠান। এক এক দল পথ-প্রদর্শক নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পর্য্যটকদিগকে আর এক দলের তত্ত্বাবধানে দিয়া আসে। সকল দলের পথ-প্রদর্শকেরাই তাঁহাদিগকে সংক্ষিপ্ত রাস্তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ফা-হিয়েন এই রাজ্যে যান নাই বটে; কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাগত লোকদের মুখে এই দেশ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

### আবার পাটলিপুত্র

বারাণসী হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা পাটলিপুত্র নগরে পৌঁছিলেন। ফা-হিয়েনের আসল

---

২৭। এই বিহারটি দুর্গম স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এবং ইহার চারিদিকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী খর-প্রকৃতির লোকদের বাসস্থান থাকায় তীর্থযাত্রী বৌদ্ধেরা সর্ব্বদাই ছদ্মবেশে গোপন পথে এখানে যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের যাতায়াতের সময় যাহাতে রাস্তায় কোন বিপদ না ঘটে, এই উদ্দেশ্যে প্রচার করা হইত যে, তাঁহারা শূন্যপথে তথায় যাতায়াত করিয়া থাকেন।

২৮। আগন্তুকদের এই কথাটি দ্ব্যর্থক। সাধারণ অর্থে ইহাকে গ্রহণ করিয়া অজ্ঞ লোকেরা বিভ্রান্ত হইয়াছে। অথচ প্রকৃত অর্থ এই যে, আগন্তুকেরা দূরদেশ হইতে আসিতেছেন বলিয়া গোপন পথের সন্ধান তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। এই দ্বিতীয়ার্থটি বাচ্য বা লক্ষ নহে; ইহা ব্যঙ্গ।

উদ্দেশ্য ছিল—বিনয়-পিটকের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তিনি দেখিলেন—বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা মুখে মুখে বিনয়-পিটকের বিধানগুলি শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু কোথাও কোন লিখিত গ্রন্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। এই কারণে তাঁহাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মধ্য-ভারতে আসিতে হইয়াছিল।

এই স্থানে মহাযান-পন্থীদের মঠে তিনি বিনয়-পিটকের একখানা লিখিত পুস্তক দেখিলেন। বুদ্ধের জীবদ্দশায় প্রথম মহাসম্মেলনে মহাসঙ্ঘিকের যে সকল বিধান গৃহীত হইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। মূল গ্রন্থখানা জেতবন-বিহারে সুরক্ষিত ছিল এবং অন্যান্য ১৮টি শাখার প্রত্যেকটিতে উহাদের নিজস্ব গুরুর মতগুলিই সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইত; কিন্তু তথাপি কতকগুলি ছোটখাটো বিষয়ে বেশ কিছু পার্থক্যও দেখা যাইত। ফা-হিয়েন যে পুস্তকখানা পাইলেন, তাহাতে সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ ছিল।

৬।৭ হাজার গাথাবিশিষ্ট সর্ব্বাস্তিবাদের বিধানগুলিও তিনি গ্রন্থাকারেই লাভ করিলেন। চীন দেশের শ্রমণেরা এই সকল বিধানই মানিয়া চলেন; কিন্তু ইহার কোন লিখিত পুস্তক না থাকায় তাঁহারা কেবল মুখে মুখেই ইহার প্রচার করিতেন। অধিকন্তু তিনি 'সম্যক্তাভিধর্ম্মহৃদয়' শাস্ত্রের ৬।৭ হাজার গাথাবিশিষ্ট একখানা গ্রন্থও লাভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ২,৫০০ গাথার একটি সূত্রগ্রন্থ, পরিনির্ব্বাণ—বৈপুল্য সূত্রের প্রায় ৫,০০০ গাথা-বিশিষ্ট একটি অধ্যায় এবং মহাসঙ্ঘিক অভিধর্ম্মগ্রন্থেরও পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইলেন।

ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ফা-হিয়েন এই রাজ্যে তিন বৎসর বাসকরতঃ বহু সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতে শিখিলেন এবং বিনয়-পিটকের বিধানগুলি লিখিয়া লইলেন। তাও চিং যখন মধ্যদেশে আসিয়া এখানকার শ্রমণদের সুশৃঙ্খল ও উন্নত আচরণসমূহ লক্ষ্য করিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন—চীনদেশের শ্রমণেরা কত নিম্নস্তরের অঙ্গহীন আচারসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে না পারি, ততদিন যেন আর চীনদেশে আমার জন্ম না হয়।" তিনি এই দেশেই থাকিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

ফা-হিয়েন আসিয়াছিলেন মুখ্যতঃ বিনয়-পিটকের সম্পূর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে; সুতরাং তিনি একাই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।
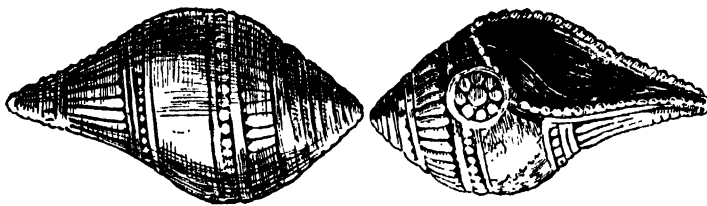
# আলোক-তপস্যা

(প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত গল্প)

শ্রীসলিল মিত্র

রাত বারটা। স্তব্ধ নিঃঝুম রাত। টাইমপিস্ ঘড়িটার টিক্ টিক্ শুধু কানে আসে। বাইরে উত্তুরে হিমেল হাওয়া, শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের জ্যোছনা। পূবের জানলাটা খোলা। মহীতোষ তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে, বিধুমণি বিদ্যাপীঠের দিকে। হিমের কণা এসে চোখে-মুখে লাগে, ঝাপ্সা হয়ে আসে দৃষ্টি, আবছা লাগে জ্যোৎস্নারাত--হিমের কণার জন্যে দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে আসে না, ঝাপ্সা হয়ে আসে চোখের জলের জন্যে!

সুদীর্ঘ পঁচিশটা বছর হৃদয়ের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে, প্রীতি-মমতা দিয়ে যাকে পালন করা হ'ল, যে অবোধ শিশুকে দেওয়া হ'ল পূর্ণ সামর্থ্য—বিধির নির্বন্ধে তাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে চিরটাকালের জন্যেই···সমস্ত বাঁধনকে শিথিল করে নয়, ছিন্ন করে। সে যে কি মর্মান্তিক ব্যথা তা ভাষায় অব্যক্ত, উছলে-পড়া চোখের জলেই তার প্রকাশ। মহীতোষ তাকিয়ে থাকেন, শুধু তাকিয়েই থাকেন মৌন-গম্ভীর শুভ্র বিদ্যাপীঠের দিকে। ওরই প্রশস্ত অবয়বের মধ্য থেকে কি যেন পেতে চাইছেন মহীতোষ।

সেই পঁচিশ বছর আগে—

সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে বাংলা-পল্লীর বুকে। অন্ধকার তখনও গাঢ় হয় নি। বিধুমণি বিদ্যাপীঠের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমহীতোষ মিত্র, বি. এ., বি. টি। ঈষৎ পাশের পুরাণো প্রায় জীর্ণ বাড়ীখানাই সম্ভবতঃ বিদ্যালয় গৃহ। মনে হয়, অদূরেই ছাত্রাবাস। আলোর ক্ষীণ আভাস সেখান থেকেই আসছে, ছেলেদের সুর করে পড়ারও অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি। ফটক পার হয়ে আর একটু এগিয়ে গেলেন মহীতোষ। ছাত্রাবাসের সামনেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

—আচ্ছা, এইটাই কি বিধুমণি বিদ্যাপীঠ?—ভদ্রলোককে শুধালেন মহীতোষ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন ত? কোথা থেকে আসছেন আপনি?

একটু আশ্বস্ত হলেন মহীতোষ, স্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, কুক্সমগ্রাম, বীরভূম থেকে।

ভদ্রলোক আর একটু এগিয়ে এলেন সামনে।

—কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার নামটা যদি—

—না-না, মনে করবার কি আছে! নাম আমার মহীতোষ মিত্র।

—বুঝেছি এবার! আপনিই আমাদের নতুন মাষ্টার মশাই হবেন বুঝি? নমস্কার স্যার। আসুন—আসুন।

ভদ্রলোক বোর্ডিংয়ের কর্মকর্তা, স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষকও—নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন মহীতোষকে। চা-জল-খাবার খাইয়ে তাঁকে তৃপ্ত করলেন। তার পর নিয়ে গেলেন তাঁকে নতুন কোয়ার্টারে। বললেন, আপনি চুপচাপ বসে থাকুন, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি, 'না' বলবেন না কিন্তু। ভদ্রলোক নিজে হাতেই সব গোছ-গাছ করে দিলেন। মহীতোষ এই মানুষটির ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না।

রাত্তিরে অন্যান্য মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে আলোচনা চলল—স্কুল কেমন, পরিবেশ কেমন, গত পাঁচ বছরের প্রোগ্রেস কেমন হয়েছে, ইত্যাদি।

পরের দিন বেলা দশটায় অফিস রুমে বসে সমস্ত কাজ বুঝে নিলেন মহীতোষ। সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপরে তুলে নিলেন এই বিদ্যাপীঠের।

ছুটি হয়, ছাত্ররা চলে যায়, মাষ্টারমশাইরাও। বিকেলটায় হেডমাষ্টার মহীতোষ কোথাও যান না। স্কুলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ান—আর কি যেন কত কি চিন্তা করতে থাকেন। যেন কত নতুন পরিকল্পনার খসড়া আঁকতে থাকেন নিজের মনের খাতাখানায়।

···এই-ই বিধুমণি বিদ্যাপীঠ—আজকে যার গুরু-দায়িত্ব তিনি নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন—এর সম্মান, কল্যাণ, উন্নতি—সব কিছুই আজ তাঁর উপরে নির্ভর করছে। যে অঙ্কুরগুলো আলো বাতাসের আশায় এখানে মাথা তুলতে চায়—তাদের আলো দিতে হবে, জ্ঞানের আলো, সত্যের নির্দেশ, কর্মের প্রেরণা।···ভাবেন মহীতোষ, কি করে সেটা সম্ভব হবে, কি করে তিনি জেলে দিতে পারবেন উজ্জ্বল জ্ঞানের বর্তিকা প্রত্যেকটি কচি-কোমল মনে; কি করে পারবেন তিনি এই জীর্ণ বিদ্যাপীঠের সংস্কার-সাধন করে একে সত্যিকারের

আশ্রম করে গ'ড়ে তুলতে! কবেকার পুরোণো এই বিদ্যালয় গৃহ, জীর্ণ হয়েছে, দু'দশ বছর পরে হয়ত বাসযোগ্য থাকবে না এর সুসংস্কার না করলে। স্কুলের রেকর্ড দেখে মনে হচ্ছে, বছর বছর ছাত্র-সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে—ঠাঁই চাই, ঠাঁই চাই!

স্কুলের সম্পাদকমশাই নাকি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে ঝলোঝলো—হেডমাষ্টার মহীতোষ সেটা জানতে পারলেন এবং কোন দ্বিধা না করে চললেন তিনি সম্পাদক মশাইয়ের বাড়ী। যে বিদ্যাপীঠের কর্মকর্তা আর্থিক অবস্থায় এত উন্নত—সে বিদ্যাপীঠের অবস্থা এমন শোচনীয় থাকবে কেন?

আলোচনা হ'ল সম্পাদক রাজীব চৌধুরীর সঙ্গে মহাতোষের। মহীতোষ বললেন, শীগ্‌গির স্কুলটার সংস্কারের কাজে হাত লাগান দরকার, আর তার সঙ্গে স্কুল বাড়ীটা বাড়ান আরও দরকার। ছাত্র-সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে চলেছে—

একটু হাসেন রাজীববাবু, কথা বলেন, তবে একটু চুপি চুপি—জানেন, ঐ বিধুমনির বংশধরদের সঙ্গে আমাদের চিরদিনের দ্বন্দ্ব! আপনি যদি একটা ব্যবস্থা করতে পারেন তা হলে ঐ বিদ্যাপীঠের পূর্ণ সংস্কার করতে আমি রাজী আছি।

—কি ব্যাপার? বলুন—বলুন। একটু খোলাখুলি ভাবে জানতে চাইলেন মহীতোষ।

—'বিধুমণি বিদ্যাপীঠ' নামটায় একটা ক্রস দিয়ে ওটাকে আমরা আমাদের বাবার নামে 'প্রতুল স্মৃতি বিদ্যাপীঠ' করতে চাইছি স্যার। এখন আপনিই ত সব, চেষ্টা করে দেখুন না?

রাজীববাবুর কথায় গম্ভীর হলেন হেডমাষ্টার মহীতোষ। বললেন—দেখুন, মহৎ উদ্দেশ্যে যাঁরা মহৎ কিছু সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টিকে মাধ্যম করেই তাঁরা অমর। সেই অমরত্বকে ক্ষণিক নেশায় অপমান করার স্পর্ধা কারও না থাকাই উচিত—তবে হ্যাঁ···নিজের উত্তেজিত ভাবকে প্রশমিত করে বললেন আবার—আপনি যা বললেন ভাল ভাবে চিন্তা করে কাল আপনাকে জানাব।···আচ্ছা, নমস্কার।

এক অস্বস্তি মনে নিয়ে রাজীববাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন মহীতোষ। প্রশস্ত ললাট তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত।

পরের দিন। তিনি জানালেন রাজীববাবুকে, কোন মানুষের কীর্তির উপরে আর এক মানুষের নাম খোদাই করার অর্থ—উভয়কেই অপমান করা। আপনারা এক কাজ করুন—নতুন এক সৌধ নির্মাণ করে তাতেই আপনাদের শ্রদ্ধেয় পিতার স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখুন—সেটা সুরুচিরই পরিচয় দেওয়া হবে। আরো অনেক কিছু বললেন মহীতোষ: আরো অনেক তথ্যপূর্ণ যুক্তি দিলেন এবং আশ্চর্য ভাবে সাফল্য লাভ করলেন তিনি। শিক্ষিত মনের রাজীববাবু বুঝলেন কথাগুলো। এবং তিনি কথা দিলেন, এই বিদ্যালয়ভবন নতুন রূপ নিয়ে গড়ে উঠবেই।

হেডমাষ্টার মহীতোষ ঝাপ্‌সা চোখ দুটোকে হাতের তালু দিয়ে মোছেন, আবার ভালভাবে তাকান রাতের জ্যোৎস্নাস্নাত বিরাট সৌধটার দিকে। পবিত্র একটি মঠের মত দেখাচ্ছে ঐ সৌধটিকে। প্রায় পনেরটা বছরের পরিশ্রম আর কর্মতৎপরতায় গড়ে উঠেছে ঐ 'প্রতুলভবন', বিধুমণি বিদ্যাপীঠের নবতম কীর্তি। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন রাজীববাবু ঐ বিদ্যাপীঠকে সত্যিকারের আশ্রম করে গ'ড়ে তোলার অনুপ্রেরণায়। এর যা সুনাম-কীর্তি তার মূলে ত মহীতোষ নিজেই। তাঁর মনের থেকে যদি প্রেরণা না আসত তবে সম্ভব হ'ত কি এমন বাণী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা? কত বাধা, কত সংশয় ছিল এই কাজে···কিন্তু কূটনীতি নিয়ে এগিয়ে গেছেন মহীতোষ, বলেছেন দৃঢ়কণ্ঠে: পথটাকে সোজা করতে হলে নিজের হাতে কোদাল চালিয়ে মাটি কাটো। তিনি তাই নিজের ব্যক্তিত্ব আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির কোদালে কুটিলতার, দ্বন্দ্ব-বৈষম্যের মাটি কেটে পথ তৈরী করেছেন। কত মানুষ, কত শিক্ষক-ছাত্র তাঁকে উপহাস করেছেন, বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু তিনি শুধু অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ছাত্রদের কাছে: জীবনটাই ঘোরালো। এগিয়ে যাও তার নানা অলি-গলি পেরিয়ে—পথের শেষ পাবেই। থমকে যেও না, ভয় পেও না উপহাস আর বিদ্রূপে।

সেদিনের সব কথা একটি একটি করে মনে পড়ছে প্রায় বৃদ্ধ মহীতোষের মনে। মনে পড়ছে সেই বিয়াল্লিশ-আন্দোলনের সময়কার একটি ঘটনা। ছাত্রেরা ইস্কুলে আসে, কিন্তু পড়াশুনোর ধার ধারে না। নানান্ হৈ-হুল্লোড়েই মেতে থাকে সব সময়। একদিন কয়েকজন স্বদেশীলোক এসে ছাত্রদের মাতিয়ে তুলল। 'বন্দেমাতরম্' করতে করতে বেরিয়ে গেল কয়েকজন ছাত্র। সামনেই অস্থায়ী পুলিস-ক্যাম্প। ছাত্র ক'জন এ্যারেষ্টে হয়ে চলে গেল থানায়। স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন ব্যাপারটা হেডমাষ্টার মশাই। মাথায় হাত দিয়ে কি যেন ভেবে নিয়েই অফিসরুমে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি পথে। চৈত্র-শেষের রোদের উত্তাপকে অগ্রাহ্য

করে ছুটলেন তিনি চার মাইল দূরের থানায়। থানায় কেন? আটক-হওয়া ছাত্রদের উদ্ধার করতে। খেলার ছলে তারা ভুলের পথে ছুটে গেছে—তাদের ফেরাতে হবে না সে-পথ থেকে? থানায় গিয়ে ইনস্পেক্টর সাহেবকে বুঝিয়ে, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে এনেছেন তিনি ছাত্রদের।

ইস্কুলে ফিরে একরাশ কাগজ জড়ো করে তাতে আগুন জ্বেলেছেন হেডমাষ্টার মহীতোষ। ছাত্রেরা ত অবাক্। এ আবার কি খেয়াল মাষ্টারমশাইয়ের!

মাষ্টারমশাই তাদের ডাকলেন: এগিয়ে এসো তোমরা। থানা থেকে ফিরে-আসা ছেলেরা এগিয়ে এল। গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করলেন মহীতোষ: নাও, এই জ্বলন্ত আগুনে হাত দিয়ে বসে থাক কিছুক্ষণ! দাও, হাত দাও!

কিন্তু কে তাঁর এমন আদেশ পালন করবে! সবাই চুপ। একটি ছেলে এগিয়ে এল আগুনে হাত দিতে, হাতটা আগুনে দিয়েই বার করে নিল মুহূর্তে। মনে মনে হাসলেন হেডমাষ্টার মশাই। বললেন, এবার বাইরে এস সব। ছেলেরা বাইরে গেলে বললেন তিনি, তোমরা একটা হুজুগের পিছনে ছুটে চলেছিলে। 'বন্দে-মাতরম্' বলে চেঁচিয়ে এ্যারেষ্টেড হয়ে থানায় গেলেই দেশোদ্ধার করা হয় না। দেশ উদ্ধার করতে সত্যিকারের সাধনার দরকার, শিক্ষার দরকার, নিজের মনকে তৈরী করা দরকার। জ্বলন্ত আগুনে মুহূর্তের জন্যেও যারা হাত দিতে ভয় পায়, ইংরেজের গোলা-গুলীর সামনে তারা দাঁড়াবে কোন্ সাহসে? প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা অমর। সেই সাহস থাকা চাই—তবেই দেশোদ্ধার। যাও, যদি সাহস থাকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার, তবে দেশোদ্ধারের কাজে লেগ, নয়ত সত্যিকারের দেশপ্রেমিকদের কাজের বাধা হয়ে পথ আগলে থেক না।

তাঁর উপদেশ কাজে লেগেছিল। ভীতু যারা, পিছিয়ে এসেছিল। মাত্র দু'টি ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আগুনে। তারা আর ফিরে আসে নি। আজো সবার অলক্ষ্যে হেডমাষ্টারমশাই সেই দু'টি মহাজীবনের উদ্দেশ্যে চোখের জলের তর্পণ দেন।

আকাশের চাঁদটা অনেকখানি নেমে গেছে পশ্চিমে। আবার অন্ধকার নেমে এল। বিদ্যাপীঠ মন্দির ধ্যানমৌন তপস্বীর মত স্থির গম্ভীর। হিমানী-কণায় ঘোলাটে তার রূপ। প্রায় অর্ধ-জীবনের স্বপ্নকে সার্থক করে যে সৃষ্টি, যার মাঝে নিজেকে দীর্ঘ পঁচিশটা বছর নিবিষ্ট রেখে নীরবভাবে সত্য জ্ঞান ও সুন্দরের তপস্যা—কালকেই তার ইতি। জীবনে সব পাওয়ার মাঝেও সব হারাণোর শূন্যতা তাঁর বুক জুড়ে।

টাইমপিসের টিক্‌টিক্, ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর, খোলা জানলার মাঝ দিয়ে শীতের আমেজ এসে ঢুকছে ঘরে। জানলাটা বন্ধ করে স'রে এলেন মহীতোষ নিজের বিছানায়। লেপখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু ঘুম কই? চোখের পাতা বুজেছে, কিন্তু মনশ্চক্ষের পাতা? সে যে গত পঁচিশ বছরের ছবিটা গভীর ভাবে দেখে নিচ্ছে, কোথাও কোন খুঁত রইল কি না!

সকাল হতেই বোর্ডিং-এর ছেলেদের আর শিক্ষকদের মধ্যে ব্যস্ততার ভাব। বেলা দশটায় হেডমাষ্টার মশাইকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হবে। ওদিকে 'হল্‌ঘর' জম-জমাট। প্রায় হাজার ছাত্র-ছাত্রা, শিক্ষকমণ্ডলী, ম্যানেজিং কমিটি, প্রাক্তন ছাত্রদের বিপুল সমাবেশ। কিন্তু বড় বিষাদ-গম্ভীর সেই পরিবেশ।

মহীতোষ গম্ভীর হয়ে পায়চারী করছেন নিজের কোয়ার্টারে। আজকের এই মর্মান্তিক বেদনাকে নিজের সংযম-কঠোরতায় দমিত রাখতে চান তিনি। সভানুষ্ঠানে যোগদানের কোন স্পৃহা তাঁর নেই—তবুও যেতে হবে।

ক্লাস টেনের দু'টি ছাত্র এসে তাঁকে নিয়ে গেল সভায়। নিজের আসনে গিয়ে স্থির হয়ে বসলেন তিনি। মৌন-ধ্যানমগ্ন পূজারী এই বিদ্যামন্দিরের।

কত বক্তৃতা, কত বিরহ-বেদনার বাণী উচ্চারিত হ'ল। অটল-অনড় তবু মহীতোষ। চোখে একফোঁটা জল নেই, মুখে ভাষা নেই, সমস্ত অনুভূতিই যেন মন থেকে লুপ্ত হয়েছে তাঁর।

স্তব্ধ ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি এবার নড়ে উঠল। উঠে দাঁড়ালেন হেডমাষ্টার মহীতোষ। শূন্যের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলেন তিনি। বলতে সুরু করলেন, একদিন এসেছিলাম কাজের তাগিদে—আজ কাজ ক'রে চলে যাচ্ছি, কাঁদবার কোন প্রয়োজন এতে নেই। কিন্তু কাজের মাধ্যমে জীবনের যে কীর্তি প্রতিষ্ঠা, যাকে প্রীতি প্রেম স্নেহ-মমতায় লালিত করা, বুকের ভালবাসাটুকু যাকে সঁপে দেওয়া—তাকে ছেড়ে যেতে হলে চোখ ফেটে জল আসবেই, বুক হাহাকার করবেই —তীব্র বিরহ-যন্ত্রণা অনুভূত হবেই মনের মধ্যে!

কথা বলতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালেন হেডমাষ্টার মশাই, একটা যন্ত্রণাকে বুঝি সহ্যের মধ্যে আটকে রেখে

আবার বললেন, জ্ঞানের পূজারী আমি, মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধ'রে জ্ঞান-সাধনা করেছি—বাইরে থেকে সবাই জুগিয়েছেন নানা উপকরণ। আজ আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। এবার নতুন পূজারীর আগমনে পুরাতনের বিদায়। নিজের কীর্তি, নিজের সৃষ্টিকে মানুষ ত্যাগ করতে বাধ্য—এটাই চিরকালের নিয়ম!···আজ আমি হলুদে পাতা, ঝ'রে যেতে আমাকে হবেই! শাখাকে আঁকড়ে থেকে নূতনের পথকে রোধ করব কোন্ অধিকারে? কিন্তু তবু কেন যেতে ইচ্ছে করে না, মন মানে না? এই মন্দিরের স্তরে স্তরে দীর্ঘ দিনের মায়া, সেই মায়া যেন আমায় জড়িয়ে ধরে বলছে, ওগো পূজারী, কোথায় যাবে তুমি? কেন যাবে? আমি তোমাকে ধরে রাখতে চাই নিবিড় করে! তুমি যেও না—যেও না!···সবাই যেন চিৎকার করে বলছে, 'যেতে নাহি দিব!'···কিন্তু তবু, তবু আমায়···বলতে বলতে হুটো চোখের কোল দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ল হেডমাষ্টার মশাইয়ের। আর কিছু তিনি বলতে পারলেন না, হাতের তালু দিয়ে হুটো চোখকে চেপে ধরলেন—অশ্রুকে বৃথা বাধা দেবার চেষ্টা তাঁর!

আজকের দিনটাই শুধু এখানে অবস্থান হেডমাষ্টার মশাইয়ের। কাল সকালেই সপরিবারে নিজের সেই ফেলে-আসা গাঁয়ের দিকে ছুটে চলা। বিধুমণি বিদ্যাপীঠের সঙ্গে একেবারে ছেদটানা।

হুপুরে। ঘরের একটা কোণে চুপচাপ বসে থাকেন হেডমাষ্টার মশাই। যাবার আগের মুহূর্তেও দেবার মত কিছু দিয়ে যেতে পারলেন তিনি। নিজের সমস্ত শক্তি আর সামর্থ্য দিয়ে একটি সাধারণ বিদ্যালয়কে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করে যেতে সক্ষম হলেন। এর জন্যে কি না করতে হয়েছে তাঁকে। অসময়ের অঝোর বৃষ্টি পাঁচদিন ধরে, সারা পশ্চিমবঙ্গে বন্যাপ্রাবল্য। তারই মাঝে ছাতাটি মাথায় ধ'রে ইষ্টিশানে গেছেন, গাড়ি ধরেছেন, সরকারী দপ্তরখানায় মন্ত্রীদের পাশে বসে হাত জোড় করে অনুরোধ করেছেন, নিজের গুণে তাঁদের মুগ্ধ করেছেন। তাই ত আগামী বছরই সম্ভব হবে 'সর্বার্থসাধক' বিদ্যালয়ে'র কাজ আরম্ভ হওয়া। হেডমাষ্টার মহীতোষ তা দেখতে পাবেন না। না-ই-বা পেলেন দেখতে, হুঃখ কি তাতে? গোড়াপত্তন তিনি ত করতে পারলেন, সেইটাই ত বড়কথা!

রাত্তির এগারটা হবে। ইস্কুলের বেয়ারা রেণুপদ কি একটা কাজ থেকে ফিরছিল, থমকে দাঁড়াল হেডমাষ্টারের অফিসরুমটার সামনে। কিসের যেন একটা ছায়া-মূর্তি ঘরের মধ্যে! টর্চ্‌টা জ্বালতেই দেখতে পেল রেণুপদ, হেডমাষ্টারমশাই বসে আছেন চুপ করে তাঁর চেয়ারখানায়। রেণুপদ এগিয়ে গেল: এ কি! মাষ্টারমশাই, আপনি? অন্ধকারে কেন বসে আছেন?

কেমন যেন চম্‌কে উঠলেন মহীতোষ; বললেন, পঁচিশ বছর ধরে আঁকা ছবিটা ঠিক হ'ল কিনা দেখছি!

—এই অন্ধকারে?—রেণুপদ অবাক্।

—হ্যাঁ রে, অন্ধকারেই ত স্পষ্ট দেখা যায়!

—না-না, কি করছেন আপনি স্যার! শরীর অসুস্থ আপনার। চলুন, বাসায় চলুন।

রেণুপদর তাড়া খেয়ে একটু বিচলিত হলেন মহীতোষ। বললেন, দাঁড়া রে বাবা একবার—মাকে একটা প্রণাম করে যাই!···ইস্কুলবাড়ীটার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মহীতোষ নীরবে। চোখ ফেটে জল আসতে চাইল বেয়ারা রেণুপদর। একে ছেড়ে যেতে কি যে ব্যথাই না পাচ্ছেন উনি!

ভোরের বাসে যাবেন মহীতোষ। খবর শুনে স্থানীয় ছাত্ররা বাস্ ষ্টপেজে এসে হাজির। মাষ্টারমশাইকে ঘিরে ধরল সবাই। প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে ব্যস্ত। নীরবে দাঁড়ালেন মহীতোষ। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠলেন এমনিই। চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন, কিসের জন্যে তোরা আবার জ্বালাতে এলি শেষ সময়টায়? কেন, ওরে কেন আবার জট পাকাতে এলি বাঁধনে?···কথা বলতে গিয়ে হু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল তাঁর···জলের ধারা ত নয়—যেন অন্তরের আশীর্বাদের ধারা! নিজেকে তাদের মাঝ হতে মুক্ত করে নিয়ে বাসে উঠলেন তিনি। ড্রাইভারকে বললেন, নাও, তাড়াতাড়ি বাস্ ছাড়। আর সহ্য করতে পারছি না। স্টার্ট্ দাও না গাড়িটায়! কি করছ এখনো?

বাস্ ছুটে চলল রেল-ইষ্টিশানের উদ্দেশে। পূর্বদিগন্তে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বিধুমণি বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীমহীতোষ মিত্র।

পূবের আকাশে রক্তিমাভা, নবারুণের আগমনী-সূচনা। সমস্ত কীর্তিকে রেখে পুরাতন তার জীর্ণবুকে স্মৃতিটুকুকে আঁকড়ে চলে যায়···নতুন আসে। সে আসবেই!

# বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

অনুশীলন-সমিতির আরম্ভের যুগ থেকেই পুলিনবাবু ভারতবর্ষের বাইরে—ইউরোপ, আমেরিকায় কিছু কিছু লোক পাঠাতে চেষ্টা করছিলেন। তার নির্দেশ মতই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার নাগ এবং আরও কয়েকজন বিশেষ করে সমিতির কাজেই বিদেশে গিয়েছিলেন। পুলিনবাবুর উৎসাহে কয়েকজন ছাত্র সভ্যও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য গেলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশ থেকে কি কি সাহায্য আমরা পেতে পারি, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং তা নিয়ে আসা যায় কি না। তিনি অবশ্য জোর দিতেন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ শিক্ষার দিকে। আমাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আমরাই তৈরী করব, এই আকাঙ্ক্ষা তার চিরকালই প্রবল ছিল আন্দামান দ্বীপান্তর বাসের পর ফিরে এসে, এবং ১৯২০ সনেও তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর গুহও এই উদ্দেশ্যেই বিদেশে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সৈয়দ বন্দর কিংবা ইটালী পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন (১৯১০)।

তার পর, আমরা যখন ( ১৯১০-১২ ) সম্পূর্ণ গুপ্ত সমিতির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলাম, তখন আমাদের বৈদেশিক নীতি ছিল—বিদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের সাহায্যের জন্য কিছু করা যায় কি না, পৃথিবীতে ইংরেজের প্রকৃত শত্রু কারা, কারাইবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস নিজেদের স্বার্থেই কামনা করে। অর্থাৎ ব্রিটিশের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতে পৃথিবীতে যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, তাতে ইংরেজের বিপক্ষে কোন্ কোন্ শক্তি থাকবে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কি ব্যবস্থা করা যায়, এক কথায় বিদেশী শক্তিচয়ের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব বাধলে আমরা তার কি সুযোগ গ্রহণ করতে পারি—এ সমস্ত কথা আমরা চিন্তা করতে লাগলাম। কেননা, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজের বিপদ আমাদের সুযোগ এনে দেবে।

তখন ব্রিটিশই ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তি। তারা চেয়েছিল সারাটা দুনিয়াই তাদের পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে। সেজন্য তারা পৃথিবীর শক্তিসাম্য এমন ভাবে রাখতে উদগ্রীব থাকত, যাতে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সংঘবদ্ধ না হতে পারে। সে সময় ব্রিটিশের নৌশক্তি মান ছিল পৃথিবীর যে কোন দু'টি শক্তির মিলিত নৌবল হতে অধিকতর শক্তিশালী (Two power standard)। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যে আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে এ তারা চাইত না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই নবজাগ্রত জার্মানী ব্রিটিশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। জার্মানীও সাম্রাজ্য বিস্তারের সংকল্প নিয়ে নৌশক্তি বৃদ্ধির আয়োজন করল। পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতা ভোগের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড়ানতে জার্মানী ইংরেজের প্রধান শত্রুরূপে পরিগণিত হ'ল। দুপক্ষই মিত্র সংগ্রহ করে আপন আপন শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগল; এবং এদের রেষারেষির ফলে বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটায় পৃথিবী আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এই আসন্ন যুদ্ধের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। সুতরাং বিদেশে পাঠাবার লোক খুঁজতে লাগলাম। কেদারেশ্বর গুহকেই বিদেশে পাঠান স্থির হয়। তিনি নিজেও যাওয়ার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত তার আগেকার পাশপোর্টের মেয়াদও শেষ হয়ে যায় নি। তাছাড়া তিনি ছিলেন সমিতির একজন পুরাতন বিশ্বাসী সভ্য। স্থির হ'ল কেদারবাবুর বিদেশে যাওয়া, থাকা এবং চলাফেরার যাবতীয় খরচ সমিতিই বহন করবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেদারবাবু ১৯১২, সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী চলে গেলেন। নরেনবাবুর নির্দেশ মত আমি কেদারবাবুর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা ও যোগাযোগ রক্ষা করতে লাগলাম। পত্রালাপের জন্য সংকেত ঠিক করে রাখলাম ( cypher )। টাকা পাঠাতাম সাধারণতঃ ডাচ্ ব্যাঙ্কের মারফত। তারই অনুরোধে আমরা তাকে আমেরিকা যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। কেদারবাবুর বিদেশে কাজকর্ম এবং বিশ্বযুদ্ধ ( প্রথম ) আরম্ভ হওয়ার পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানীর সাহায্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা কি কি হয়েছিল তা যথাস্থানে উল্লেখ করব।

কেদারবাবুর জার্মানী যাওয়ার পূর্বে তিনি এবং

আমি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরে গিয়েছিলাম। ইতোপূর্বেই ঐ দিকে একটা বিপ্লবী দল গ'ড়ে উঠেছিল। মনোমোহন বর্মণ হয়েছিলেন এদের নেতা। পশ্চিমবঙ্গে কার্তিক দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল এবং এক দলের মতই চলতেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিঘাটি ও নেত্রা ডাকাতি সম্পর্কে কার্তিক দত্তের নাম খুব ছড়িয়ে পড়ে। সেকালে ঢাকার বররা ডাকাতিতে যেমন শশী সরকারের নাম, রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতিতে যেমন সুশীল সেনের নাম, তেমনি বিঘাটি ডাকাতি সম্পর্কে কার্তিক দত্তের নাম খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের ফলে দলটি ভেঙ্গে যায়। তখন কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর অঞ্চলের এই দলটি নিজেরাই অনুসন্ধান ক'রে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন।

বিঘাটি ডাকাতির সমসাময়িক কিশোরগঞ্জ বাজিতপুরেও একটি চমকপ্রদ ডাকাতি হয়।

এ দলটিকে যখন অনুশীলনের সঙ্গে মিলিত করে নেওয়া স্থির হয় তখন এও স্থির হয় যে, অনুশীলনের 'প্রতিজ্ঞা'ও এদের গ্রহণ করতে হবে। এবং দলীয় বিশিষ্ট সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করে তাদেরকে উপযুক্ত মনে করলে সমিতির আগ্ন ও অন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়ে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করব। এ উপলক্ষেই আমি ও কেদারবাবু কিশোরগঞ্জ গিয়েছিলাম।

কেদারেশ্বর গুহর পিতা তখন কিশোরগঞ্জ শহরে সরকারী কর্মচারী। বিদেশ যাত্রার পূর্বে পিতামাতার সঙ্গে দেখা করতে তিনি সেখানে গেলেন, এবং আমার পক্ষেও যাতায়াত ও সেখানে দু'দিন থাকার একটা সুযোগ হ'ল। সেকালে কিশোরগঞ্জে রেল-লাইন বসে নি। ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনের গফরগাও ষ্টেশনে নেমে সতের মাইল পথ হেঁটে এবং মাঝপথে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে কিশোরগঞ্জ যেতে হ'ত।

মনোমোহন বর্মণ ও তার দলীয় বিশিষ্ট সভ্যদের আগ্ন ও অন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়ে আনলাম। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শরীর কেটে রক্ত বার করে তাই দিয়ে নাম দস্তখত করেছিল।

এই দলের সঙ্গে যে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেয় তার নাম হচ্ছে ঢাকার বসন্ত ভট্টাচার্য। সে এই দলেরই লোক এবং কার্তিক দত্তের সহকর্মী ছিল। সে নিজে সমিতির সভ্য হয় এবং এই দলটিকে পরামর্শ দেয় সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য।

এই বসন্ত ভট্টাচার্যই পরে পুলিসের গুপ্তচর হয়ে আমাদের সব খবর গোয়েন্দা পুলিসে যোগাতে থাকে। ফলে তাকে গুলী করে প্রাণদণ্ড দিতে হয়। ঘটনাটা যদিও পরেই ঘটেছিল তবু এখানেই তা উল্লেখ করছি:

একদিন ফরিদপুরের জগদ্‌গুরু জগদবন্ধুর প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী রমেশ চক্রবর্তী মাণিকগঞ্জ ষ্টীমারে দুপুর রাতে ঢাকা ষ্টীমার ষ্টেশনে নামেন। পরদিন আমাকে খবর দিলেন যে, তিনি বসন্ত ভট্টাচার্যকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখেছেন এবং তাকে যেন আর বিশ্বাস না করা হয়।

সে সময় ব্রহ্মচারী রমেশ চক্রবর্তী বিদ্বান, চরিত্রবান এবং সাধু-প্রকৃতির লোক হিসেবে বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অনুশীলন-সমিতির সভ্য ও অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তার সঙ্গে সমিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার পরামর্শ ও উপদেশ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতাম। ব্রহ্মচর্য বিষয়ক পুস্তকাদি তিনি লিখেছিলেন এবং নিজেও নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী ছিলেন।

তার কথা শুনে বসন্ত ভট্টাচার্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতেই তার চরিত্র সম্বন্ধে নানাকথা শুনতে পেলাম। তাকে সারা দিনরাত্রি চোখে চোখে রেখে, সে কোথায় যায় কি করে, সমস্ত সংবাদ সংগ্রহার্থে সমিতির খুব বিশ্বাসভাজন ও দায়িত্বশীল সভ্য খগেন্দ্র চৌধুরীকে নিযুক্ত করলাম। খগেনবাবু তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে একেবারে বেশ্যালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। পরে অন্য লোকের নিকট শুনলাম বসন্ত মদ্যপানও সুরু করেছে।

মদ্যপান, বেশ্যালয়ে গমন এবং বিলাসিতার জন্য টাকা বসন্ত পায় কোথা থেকে? তার বাড়ির অবস্থা ছিল অতি শোচনীয় এবং নিজেও সে এক পয়সা উপায় করত না। নিজের পারিবারিক দারিদ্র্যের বর্ণনা করে আমার কাছে অর্থ সাহায্য চাইত। যত টাকা চাইত তত দিতাম না বটে, তবে কিছু কম দিতাম যাতে সে হাতছাড়া না হয়ে যায়, এবং তাকে কিছুতেই বুঝতে দিতাম না যে তাকে সন্দেহ করি। তখন পর্যন্তও তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ হয় নি।

যখন গোয়েন্দা পুলিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ করার যুক্তিযুক্ত কারণ পেলাম, তখন তাকে আরও খাতির করতে লাগলাম যাতে তার বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্র তাকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলা যায়। গুপ্তচরবৃত্তির খবর পাকাপাকি পেয়ে তাকে এমন ভাবে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে তাকে হত্যা করার কোন যোগসূত্রই না পাওয়া যায়। এ কাজের ভার দেওয়া হ'ল একজন বিশিষ্ট পুরাতন কর্মীর উপর। স্থির হয়েছিল যে, সে বসন্তকে বারদি কি বৈদ্যেরবাজারের

কাছে মেঘনা নদীর ধারে কোন কাজের ছুতোয় নিয়ে গিয়ে শেষ করতে। কিন্তু লোকটির দীর্ঘসূত্রতায় এবং দক্ষতার অভাবের জন্য খুব দেরি হতে লাগল।

এদিকে রমেশ চৌধুরী এবং আরও দু'তিন জন গ্রেপ্তার হ'ল ঢাকার বাবুরবাজার এক বাড়ীতে। এদের সকলেই সমিতির গৃহত্যাগী-সভ্য। এদের নামে ১০৯ ধারায় মকদ্দমা দায়ের হয় এবং রমেশ চৌধুরী জামীনে মুক্তি লাভ করে।

সে সময় কুমিল্লার ডাকাতি ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিসের হাতে একটা কাগজ পড়েছিল যাতে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণকারী এবং তাদের কার হাতে কি অস্ত্র থাকবে তা লিখিত ছিল। তার মধ্যে ছিল পরিতোষ—automatic ( অটোমেটিক ), অর্থাৎ পরিতোষের হাতে অটোমেটিক পিস্তল থাকবে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রমেশ চৌধুরীর দলীয় নাম ছিল পরিতোষ। কিন্তু পুলিস তা জানতো না। এ বিষয় বলতে গিয়ে যে সময়ের কথা লিখছি তখন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। আমার নামেও ওয়ারেন্ট বার হয়েছে। যাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—a man named Paritosh ( পরিতোষ নামীয় একজন লোক )। কিন্তু পুলিসের জানা না থাকায় রমেশ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে, জেলে রেখে এবং পরে তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েও পরিতোষের সন্ধান পেল না।

বসন্ত ভট্টাচার্যের কথায় ফিরে আসা যাক্। রমেশ চৌধুরী একদিন তাদের মকদ্দমার শুনানীর শেষে আদালত থেকে বার হয়েই অনেক কষ্টে গুপ্তচরদের দৃষ্টি চলতে চলতেই ফাঁকি দিয়ে একেবারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। সে বলল—"আজ আদালতে গোয়েন্দাদের সঙ্গে বসন্তকে দেখলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করে অঙ্গুলি নির্দেশে কি বলেই মুখ লুকিয়ে সরে গেল। আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম।"

রমেশবাবু ছিলেন প্রধান নেতৃত্বের অন্যতম। সুতরাং তার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, অবিলম্বে বসন্তকে শেষ করতে হবে। একজনের শৈথিল্য এবং দক্ষতার অভাবে যখন কাজটা গোপনে করা গেল না, তখন প্রকাশ্যেই কার্য সমাধা করা যাক। এই নির্দেশ দিয়ে আমি বিশেষ কাজে কলকাতায় চলে গেলাম। তিন-চার দিনের মধ্যেই ঢাকা বাঙ্গলাবাজারে সন্ধ্যাবেলা রিভলবারের গুলীতে বসন্ত ভট্টাচার্য নিহত হয়।

বরিশাল সম্পূরক ষড়যন্ত্র মামলার ( Supplementary Conspiracy case ) সময় তখনকার গোয়েন্দা পুলিসের বড় কর্মচারী Colson ( কলসন ) সাক্ষীতে বলেছিলেন যে, বসন্ত ভট্টাচার্য পুলিসের সংবাদদাতা ছিল এবং তার পূর্ণ স্বীকৃতি ( Ful confession ) লিখিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যেই বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করে।

সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত সমিতির বহু সভ্যকেই হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু প্রতিবারই এত অনুসন্ধান করে নিঃসন্দেহ হতে হয়েছে—পাছে কোন নির্দোষীকে শাস্তি দেওয়া হয়—যে অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি সাধিত হয়ে যাওয়ার পর শাস্তি বিধান করা হয়েছে। গোড়াতেই কাজ শেষ করতে পারলে এত ক্ষতি হ'ত না।

পূর্ব কথায় ফিরে আসছি। কিশোরগঞ্জে মনোমোহন বাবুদের সঙ্গে কার্য সমাধা করে ময়মনসিংহ শহরে গেলাম। তথায় পূর্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করলাম। তখন তার বয়স খুব কম। বয়স অনুপাতে তাকে আরও ছোট দেখাত। বিদ্যা যাই থাক না কেন, তার বুদ্ধি, উদ্যমশীলতা, নিষ্ঠা দেখে মনে হ'ল উপযুক্ত লোকই কাজে হাত দিয়েছে। বিপ্লবীর সমস্ত গুণই তার মধ্যে আছে। পূর্ণই নেতৃত্বের উপযুক্ত।

সেখান থেকে গৌরীপুর গিয়ে রমণী দাস মহাশয়ের সঙ্গে জেলার কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝতে পারলাম যে, এমন ধীর, স্থির, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান লোকই জেলা পরিচালনার উপযুক্ত। সেখান থেকে গিয়েছিলাম জামালপুর ও ধানহাটায়। রবীন্দ্রমোহন সেন বাল্যকাল কাটিয়েছেন জামালপুরে সেখানে বিপ্লবান্দোলনের বীজ তিনিই বপন করেছিলেন, এবং সমিতির ভিত্তি এমন পাকা করে রেখেছিলেন যে, জামালপুর সর্বদাই সমিতির কার্যে পুরোভাগে থাকত।

ধানহাটার প্রিয়নাথ রায় ছিলেন জমিদার। তিনি ছিলেন সমিতির স্তম্ভ-স্বরূপ। তিনি যে কেবল সর্বপ্রকার কার্যে সাহায্য করতেন, তা নয়, নিজেও খুন ডাকাতি প্রভৃতিতে যোগদান করতেন।

সেকালে ধর্মের প্রতি বিপ্লবীদের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। স্বদেশ-সেবা, দেশের উদ্ধারকার্যে আত্ম-বিসর্জন, জনসেবা, পরহিতে আত্মদান সমস্তই ধর্ম-সাধনার অঙ্গ বলে বিপ্লবীরা মনে করত। ব্রহ্মচর্য পালন সমিতির সভ্যদের অবশ্যপালনীয় ছিল। সমিতিতে ছেলেদের আকর্ষণ করবার প্রথম সোপান হিসেবে এবং

প্রাথমিক সভ্যদের সঙ্গে আলোচনার প্রধান বিষয়ই হ'ত ধর্ম ও ব্রহ্মচর্য। তা ছাড়া পৌরাণিক কাল থেকে সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যারা জনহিতে কিংবা অন্য কোন মহৎ কার্যে আত্মদান করেছিলেন তাদের উপাখ্যানই হ'ত সকলের প্রধান পাঠ্য ও আলোচ্য বিষয়।

সমিতি ধর্ম-সঙ্ঘ নয়, কিন্তু ধর্মই ছিল প্রাণ-স্বরূপ। নরসেবাই ছিল নারায়ণ সেবা। কাজেই সাধু-সন্ন্যাসীর উপর বিপ্লবীদের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লব-সাধনার ভিত্তিই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, ভগবদ্‌গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। শুধু যে প্রেরণাই এসেছে এই তিন উৎস থেকে তা নয়, বিপ্লবের সাধনা কি এবং আদর্শই বা কি তাও বিপ্লবীরা জানতে পেরেছে এবং গ্রহণ করেছে।

পূর্বেই বলেছি স্বয়ং পি. মিত্র মহাশয় একজন যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজে যোগ-সাধনা করতেন এবং সমিতির সভ্যদেরও তা করতে বলতেন। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন মহাযোগী। অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যারাই দেশসেবা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানাতেন সমিতির সভ্যরা তাদের প্রতিই আকৃষ্ট হ'ত। আমাদের সমিতি থেকে বহু সভ্য সন্ন্যাসী হয়েছিল এবং যে ব্যক্তি সেই আশ্রমেই যোগদান করেছেন সেখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী সত্যানন্দ (সতীশ দাশগুপ্ত), স্বামী নির্বাণানন্দ (সূর্য্য সেন) স্বামী সহজানন্দ (নগেন সরকার), স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ (প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত), স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ (সতীশ চক্রবর্তী), স্বামী সমুদ্ধানন্দ (ধীরেন দাশগুপ্ত), নরেন মহারাজ (নরেন্দ্র সেন) এবং আরও অনেকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। স্বামী গম্ভীরানাথের প্রধান শিষ্য হয়েছিলেন স্বামী শান্তিনাথ (ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অক্ষয় দত্ত)। স্বামী সত্যানন্দ পুরি (প্রফুল্ল সেন) ছিলেন পরবর্তী কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তার কথা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব।

লোকালয়ে বিচরণকারী ধর্মপ্রচাররত স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও কোন সমিতির সভ্য তাদের শিষ্য হয় তা আমাদের কাম্য ছিল না। কারণ তাতে মন্ত্রগুপ্তি নষ্ট হ'ত। সমিতির কাজে যে আত্মোৎসর্গ করেছে, সমিতির নিয়মানুবর্তিতা, সমিতির প্রতি আনুগত্য এবং সমিতির মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করে চলবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, সে আর একজনকে গুরু বরণ করে তেমন ভাবে তার অনুগত হবে এ আমরা চাইতাম না। দ্বিধা-বিভক্ত আনুগত্য জীবনে চলতে পারে না। কেউ কোন সাধুর তেমন শিষ্য হলে তাকে সমিতির কাজ পরিত্যাগ করতে বলতাম।

শুনেছি যতীন মুখার্জি মহাশয় নাকি স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য বা ভক্ত ছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক বিপ্লবী কর্মী নাকি তার শিষ্য হয়েছিলেন। বাংলার বিপ্লব যুগের আদি পুরুষদের অন্যতম শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সন্ন্যাস অবলম্বন করে নিরালম্ব স্বামী নাম গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী যেমন দেখতে তেমনি চমৎকার আলাপী পুরুষ ছিলেন। তিনি সাহস, ত্যাগ, দেশসেবা, প্রভৃতি সম্বন্ধে বলতেন এবং দেশকর্মীদের ও বিপ্লবীকর্মীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এ সব কারণেই তার কাছে সময় সময় যেতাম।

আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়-মঠের প্রতি। কলকাতায় গেলে এ দু'স্থান ছিল আমাদের অবশ্য গন্তব্যস্থল। সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রাপ্ত হয়ে পলাতক অবস্থায়ও সারাদিন বেলুড়-মঠে কাটিয়ে এসেছি। সোনারং আমাদের সমিতির কেন্দ্রে যে ঠাকুরঘর ছিল সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি ছিল এবং তারই পূজার্চনা হ'ত। রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েও আমরা বিপ্লব আদর্শের প্রতিই প্রেরণা পেতাম। বেলুড়মঠের ভক্তগণ অনুরূপ ব্যাখ্যা করতেন। এ কারণেই আমরা রামকৃষ্ণভক্ত হওয়া সত্ত্বেও আদর্শের দিক দিয়ে একটা ভিন্ন মত পোষণ করতাম।

ফরিদপুরের জগদ্‌গুরু জগৎবন্ধু মৌনী হলেও তার প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী রমেশ চক্রবর্তী বলতেন যে, জগৎবন্ধু বিপ্লবী আদর্শ সমর্থন করতেন এবং বৃটিশ রাজত্বের ধ্বংস কামনা করতেন।

তখন সিলেট জেলায় স্বামী দয়ানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছিল। তার আশ্রম ছিল অরুণাচল। শিষ্যবর্গসহ তিনি জেলায় জেলায় ভ্রমণ করতেন এবং খোল কর্তাল ও নৃত্যসহ অহোরাত্র কীর্তন করাই ছিল এদের প্রধান কাজ। এরা কতকটা উগ্রপন্থী সন্ন্যাসী ছিল। যেখানেই যখন যেত সেস্থান সরগরম হয়ে উঠত। কারুর বাধাই এরা মানত না। পুলিস এদের পেছনে লেগেই ছিল। কিন্তু এরা পুলিস বা সরকারী বাধা সম্পূর্ণ তুচ্ছ করত। মাঝে মাঝে পুলিস এদেরকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরত। রমেশ চৌধুরী একবার

ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে স্বামী দয়ানন্দ ও তার প্রধান শিষ্য মহেন্দ্রনাথ দে এবং আরও দু'এক জনের সঙ্গে একই কক্ষে কিছুদিন বাস করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ দে খুব বিদ্বান ও চিন্তাশীল ছিলেন। রমেশ চৌধুরী এদের মধ্যে স্বদেশী-ভাব বা বিপ্লবীদের প্রতি কোন আকর্ষণ দেখতে পান নি।

যদিও আমাদের দু'একজন সভ্য এদের সঙ্গে মিশে দয়ানন্দের শিষ্য হয়েছিল, কিন্তু আমরা এদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতাম না। তবে বৃটিশ-বিরোধী বলে সন্দেহ করে পুলিস এদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত এবং এদের উপর নির্যাতন করত—এ কারণেই এদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জন্মাত।

সিলেট জেলার মৌলভী বাজার মহকুমায় জৎসী গ্রামে দয়ানন্দের শিষ্য-শিষ্যাগণ সরকারী হুকুম অমান্য করে হরিসংকীর্তন করতে থাকেন। তখন মৌলভী বাজারের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গর্ডন. আই. সি. এস. সশস্ত্র পুলিসবাহিনী নিয়ে কীর্তনরত দলকে আক্রমণ করে গুলী বর্ষণ করে। গুলীর আঘাতে মহেন্দ্রবাবুর মৃত্যু হয় এবং বহুলোক আহত হয়। সর্বোপরি, কীর্তনরত মহিলাদের উলঙ্গ করে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। এ ঘটনায় সমস্ত দেশ শিউরে উঠল। ধর্মকার্যে বাধাদান ও এমনি নৃশংস অত্যাচারে দেশের লোক অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এরূপ হয়েছিল যে, সরকারী এই নৃশংস কার্যের তীব্র প্রতিবাদও হ'ল না। সুতরাং এ কার্যের জন্য অত্যাচারীকে চরম দণ্ডদান করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করলাম। অনুশীলন-সমিতিই অপরাধীকে দণ্ডদান করবে।

আমরা স্থির করলাম যে, এ কার্যের জন্য দায়ী গর্ডন সাহেবকেই প্রাণদণ্ড দিতে হবে। বোমার আঘাতে নিহত করা হবে বলে ঠিক করা গেল। সিলেট জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লালমোহন দে-কে ঢাকায় ডেকে এনে সমস্ত কথা বললাম এবং তিনি সিলেট প্রত্যাবর্তন করলেন সমস্ত বন্দোবস্ত করার জন্য।

আমি তখন ঢাকা কলেজের মিনার্ভা হোষ্টেলে থাকতাম। যোগীন্দ্র চক্রবর্তী সদ্য কারাদণ্ড ভোগ করে জেলের বাইরে এসে এই হোষ্টেলেই আমাদের এক সভ্যের অতিথি হিসেবে থাকতেন। জেল ফেরত তিনি আর গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে সমিতির কার্যে আত্ম-নিয়োগ করবার জন্যই তিনি থেকে গেলেন। তিনি খুব সাহসী কর্মী ছিলেন। তাকে আমি গর্ডনের কথা বলা মাত্রই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। স্থির করলাম যোগীন্দ্র চক্রবর্তীই এ কার্যের নেতৃত্ব করবেন। বোমা ছোড়বার জন্য কিভাবে প্রস্তুত হতে এবং কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা তাকে শিখিয়ে দেওয়া হ'ল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতা গিয়ে বোমা নিয়ে এলেন।

স্থির হ'ল যোগীন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারাপ্রসন্ন বল এ কার্যের জন্য যাবেন। বীরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়কে এ কার্যে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাকে অন্যত্র নিযুক্ত করার কথা ছিল।

আমি গেলাম ঢাকা রেলষ্টেশনে ওদের গাড়ীতে তুলে দিতে। বিপদ ঘটলে, অর্থাৎ জানাজানি হয়ে গেলে তার প্রতিকারের জন্য আরও দু'তিন জন গিয়েছিল।

তখনই ষ্টেশনে ময়মনসিংহ থেকে আর একখানা ট্রেন এল, এবং তাতে এলেন অমৃত সরকার। তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে অমৃত সরকারকে যোগীন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

নিরাপদে তারা রওনা হয়ে গেলেন। কার্যোপলক্ষে কয়েক দিন কলকাতা থাকার পর যেদিন নরেন্দ্রমোহন সেন ফিরে এলেন, সেদিন ষ্টেশন থেকেই একখানা খবরের কাগজ হাতে করে এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন —কি ব্যাপার, কাকে কাকে পাঠিয়েছিলেন? এই দেখুন সংবাদ! খবর বেরিয়েছে Bomb outrage at Maulavi Bazar, Assassin killed (1917 March) (মৌলভী বাজারে বোমার আক্রমণ, আততায়ী নিহত—মার্চ, ১৯১৭)। নরেনবাবুকে বিস্তারিত বললাম। তিনি কলকাতা যাওয়ার পূর্বেই এ কাজ অনুমোদন করে গিয়ে-ছিলেন, কেবল কে কে যাবে তার নামের তালিকা তখনও ঠিক হয় নি।

যাই হোক, বিস্তারিত খবর জানবার জন্য ব্যস্ত হলাম। আর যারা গিয়েছিল তাদেরই বা কি হ'ল? কেউ গ্রেপ্তার হয় নি বলে আমাদের অনুমান হ'ল; তবে আহত হয়ত নিশ্চয় হয়েছে। এই সমস্ত ভেবে, খবর পাওয়ার জন্য ও আহতদের সেবার জন্য ঔষধ, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি সহ নলিনী ঘোষ ও আর একজনকে সিলেটে পাঠান হ'ল। তারা গিয়ে কোন সন্ধান করতে না পেরে ফিরে এল।

কয়েকদিন চলে যাওয়ার পরও কোন সংবাদ পেলাম না! নানান দুশ্চিন্তায় যখন দিন কাটাচ্ছি সে অবস্থায় একদিন বিকেলবেলা শ্রীশ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় বসে আমরা কয়েকজন এ বিষয়েই আলোচনা

করছি। এমনি সময় লালমোহন দে শুষ্ক মুখে ক্লান্ত দেহে ঘরে ঢুকে সংবাদ দিলেন যে, অমৃত সরকার ও তারাপ্রসন্ন দে খুব সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন এবং যোগীন্দ্র চক্রবর্তী নিহত হয়েছেন। তারা সবাই নৌকোয় আছেন। মৌলভী বাজার থেকে ঢাকা পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ নৌকোতেই এসেছেন। কেবল সতর্কতা অবলম্বনের জন্য দু'বার নৌকো বদল করেছেন। আর বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাকে স্নান করতে বললাম। শ্রীশ্রীশবাবু আমার পিসতুত ভাই, তার স্ত্রীকে (আমার বৌদি) জিজ্ঞেস করলাম ভাত আছে কিনা। তিনি বললেন—আছে। আহারাদির পর লালমোহন দে-কে সঙ্গে নিয়ে নদীর ঘাটে গেলাম।

সমস্যা হ'ল পুলিস ও জনসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে এমনি সাংঘাতিক আহতদের নৌকো থেকে নামিয়ে কিভাবে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। স্থির করলাম সহরে কোন বাসায় না নিয়ে গিয়ে নদীর ঘাটেই পান্‌সী (বজরা) ভাড়া করে আহতদের রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। কিন্তু কথা হ'ল এই যে, আমরা যুবক, কোন গোয়েন্দা আমাদের চিনে ফেলতেও পারে। সুতরাং একজন বয়স্ক লোকের প্রয়োজন। এই কারণে ঢাকায় ইম্পিরিয়েল সেমিনারী স্কুলের শিক্ষক এবং আমাদের সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন ঘোষকে ডেকে আনলাম।

ঘাটে বাঁধা একটা পান্‌সীতে আহতদের তুলে নিলাম। আহত হওয়ার পর থেকে এক সপ্তাহেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে, এর মধ্যে ক্ষতস্থান ধোওয়া বা ঔষধ কিছুই দেওয়া হয় নি। আহতস্থান পচে দুর্গন্ধময় হয়েছে। নিকটে যাওয়া কঠিন। অমৃত সরকারের উরুতে ভয়ানক আঘাত লেগেছিল এবং সেখানে প্রকাণ্ড ক্ষত হয়েছিল। তারাপ্রসন্ন বলের সর্বশরীরে আঘাত লেগে ঘা হয়েছিল—সর্বাঙ্গে পিন আর লোহার টুকরো ফুটেছিল। এদের দু'জনেরই সমস্ত শরীরের চাপ চাপ হয়ে রক্ত জমা হয়েছিল। কিভাবে যে এরা এদ্দিন জীবিত ছিল তাই আশ্চর্য মনে হ'ল। এদের নিরাপদে রেখে কি করে বাঁচান যায় তাই আমাদের চিন্তা হ'ল। কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে এদের চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করতে হবে!

চিকিৎসার জন্য আনলাম সমিতির বিশ্বাসভাজন সভ্য ও অকৃত্রিম সমর্থক চাঁদণীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাস মহাশয়কে। তার সুচিকিৎসায় অমৃত সরকার ও তারাপ্রসন্ন বল ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কয়েক মাস পরেও তারাপ্রসন্নের শরীর থেকে পিন্ ও লোহার টুকরো অস্ত্রোপচার করে বার করা হয়েছে। শুনেছি লর্ড হার্ডিঞ্জের শরীর থেকে তিন মাস পরেও পিন্ বার করতে হয়েছিল।

পান্‌সীতে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হলেন কয়েকজন বিশ্বাসী সভ্য—তার মধ্যে পুরাতন গৃহত্যাগী সভ্যও ছিল।

একসঙ্গে অনেক দিন থেকেও শুশ্রূষাকারীরাও কি ব্যাপার জানবার জন্য উৎসুক হয় নি বা আহতরাও কোন গল্প করে নি। নিষ্প্রয়োজনে কেউ কিছু জানতে পারল না।

দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষিপ্ত বোমা, ময়মনসিংহে ব্যবহৃত বোমা, এবং মৌলভী বাজারের বোমা, এ সমস্তেরই বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী করেন সুরেশ দত্ত ও মনীন্দ্র নায়েক আর আবরণ করেন অমৃতলাল হাজরা।

মৌলভী বাজারে যা ঘটেছিল তা এবার বলছি! যোগীন্দ্র চক্রবর্তী নিলেন বোমা, অমৃত সরকার ও তারাপ্রসন্ন বলের হাতে রিভলবার সহ লালমোহন দে এদেরকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। স্থির ছিল পথে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রফুল্ল রায় নামে একটি যুবক মৌলভী বাজারেরই ছেলে অপেক্ষা করবে। কার্যনির্বাহের পর যোগীন্দ্রবাবুরা প্রফুল্লর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সে যোগীন্দ্রবাবুদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে।

খবর পাওয়া গেল ম্যাজিষ্ট্রেট বাড়ী নেই—কোথায় গেছেন। তখন যোগীন্দ্রবাবুরা বাংলোর ঘেরাওর মধ্যে ঢুকে প্রবেশ পথের একধারে ফুলগাছের আড়ালে বসতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ বোমাটি যোগীন্দ্র চক্রবর্তীর হাত থেকে ফস্‌কে মাটিতে পড়ে যায়। প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফেটে গেল। বিস্ফোরণের ফলে তিনজনই আঘাতের চোটে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। যোগীন্দ্র চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং তাকে এ অবস্থায় দেখে অপর দু'জন ঐরূপ আহত অবস্থাতেই হামাগুড়ি দিয়ে বার হয়ে আসে। পরে লালমোহন দে এদেরকে নৌকো করে খাল, বড় নদী মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা নদী, প্রভৃতি কয়েক শত মাইল অতিক্রম করে ঢাকা শহরের সদরঘাটে এসে উপস্থিত হয়। পথে কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নি। এমন অবস্থাও গেছে যখন মনে হয়েছে যে, আহতদের মৃত্যু বুঝি আসন্ন! সর্বোপরি পথে কয়েক জায়গায় জল-পুলিসের নৌকো ও ষ্টিমলঞ্চ এদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কোন সন্দেহের উদ্রেক না করায় অবশ্য ছেড়ে দিয়েছে।

সরকার যোগীন্দ্র চক্রবর্তীর মৃতদেহের ফটো তুলে খবরের কাগজ মারফত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল—যে কেহ এই মৃতদেহ সনাক্ত করতে পারবে—শুধুমাত্র নাম বললেই চলবে, তাকে পনের হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং পুরস্কার প্রাপকের নাম গোপন রাখা হবে। কয়েক বৎসর পর্যন্ত ব্রিটিশ-গোয়েন্দা এই মৃতদেহ কার তা জানতে পারে নি।

গর্ডন সাহেবকে গোপনে পাঞ্জাবে বদলী করা হ'ল। সেখানেও (লাহোরে) আমাদের তরফ থেকে তার উপর পুনরায় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু সেখানেও সে দৈবক্রমে বেঁচে যায়। ক্রমশঃ

# সুখ-মৃত্যু

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প)

শ্রীমলয়কান্তি বসু

আমার শক্ত রোগ হয়েছিল। মাস সাতেক ছিলাম হাসপাতালে। প্রথম দিকে খুব খারাপ লাগত। কেবলই মনে হ'ত আমি আর বাঁচব না। মনে হ'ত চারপাশের জীবন্মৃত মানুষগুলোকে দেখে, সবাই বুঝি কোনো প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে, শেষের প্রতীক্ষা।

শেষের দিকে সয়ে এসেছিল। শেষদিকে বরং ভালই লাগত। হাসপাতাল ছাড়তে বুঝি দু'ফোঁটা জলও ঝরেছিল চোখে।

প্রথম দিনে প্রথম এসেই ওকে দেখলাম। সাদা একটা লোক রক্তহীন, চামড়া হলুদে। চোখ ঢাকা মাইনাস গ্লাসে। আমার মনে হ'ল চোখটা লাল—চোখটা বুঝি আগুন ছড়াচ্ছে।

যদিও প্রথম দিকে দিনগুলো ভালই লাগত না, একেবারেই না—তবু ওকে ভাল লাগত। হয়ত অমন বিষাক্ত অনড় সময় কাটাতে কতগুলো বই দিয়েছিল পড়তে, সেই জন্যই হতে পারে প্রথম এসেই সেই নির্ব্বান্ধবের রাজ্যে যেন একটু প্রীতির আলো দেখেছিলাম সেই চোখে।

ও কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশী পড়ত। আমি একটু পড়েই বই নাবিয়ে হাঁপাতাম। ও বইয়ে এমন ডুবত, বুঝি হাঁপানরও প্রয়োজন নেই। সময় সময় তাই ওর বুকের দিকে তাকিয়ে দেখতাম—ওঠে নাবে ত?

এর পর অবশ্য ও ছাড়া আরও ভাল লাগার উৎস পেয়ে গেলাম। বেতার ছিল, একটা দু'টো খেলা ছিল—তাস, দাবা, কেরম। প্রথম ত ভয়ে ভয়েই কাটল, পরে বেতারটাতে হাত দিতে অভ্যেস হতে অনড় সময়টা আস্তে আস্তে চলতে সুরু করল।

আরও যা ছিল, তারাও কম কিছু নয়। কতগুলো সুডৌল হাত আর নরম মুখ। মেয়ে মাত্রেরই বুঝি নরম মুখ হয়। দিনে দু'জন আর রাতে এক—এই তিনজনকে সমস্ত মাস ধ'রে পেতাম।

সবাই যে নরম ছিল তা নয়। মুখে নরম হলেও জিভে অনেকেই গরম ছিল। আমাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলত। কিন্তু আবার কেউ কেউ ছিল পরম। না—পরমা। আকৃতি-সুকৃতিতে অনিন্দিতা।

ভাগ্যির শিকে ছিঁড়ত কম। পরমারা কচিৎ আসত, তবে আসার পর পুরো এক মাস ধ'রে পেতাম। আর সে মাসটা আমরা স্বপ্নের মত কাটাতাম।

আমরা তাদের ডাকতাম সিস্টার। পৃথিবী শুদ্ধ সবাই তাই বলে, কিন্তু সিস্টার ত ভাবতাম না! মীরা রায় যেদিন এল সেদিন ত উৎসব! মীরা রায়ের রূপ, স্বরূপ আমরা অনেক আগে হতেই অন্তরস্থ করেছি। ও বলল, এবার হানা-হানির পালা।

আশ্চর্য্য ওর ভাবার ক্ষমতা। অথচ এত সুন্দর ক'রে ভাবা আমার কোনদিনই হ'ত না। আর সেজন্য যে অনুতাপ তা ত বলতেই যাচ্ছি পরে।

ওর এই ভাবার ক্ষমতাই কিন্তু প্রথমে আমার ভাল লাগার সুযোগ দিয়েছিল। সে মাসে চোকো মুখে

চৌকো চশমায় সিস্টার যেদিন এল সেদিনও তেমনি আচম্‌কা ও বলে উঠল—চোখটা ভাল নয়।—কেন?—হাসল, ওর হাসিটা ছিল মহুয়া, হেসে বলল, দেখই না। দেখলাম। দিন পনের যেতে না যেতেই কেলেঙ্কারী ক'রে বিদায় নিলেন।

আমার খুশী হলেই খুশী। সত্যিই ত তুমি যা বলেছিলে! কল্‌কল্‌ ক'রে মুখে কৌতুকোজ্জ্বলতা নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। 'হুঁ—বেশ' ছোট্ট একটু উত্তর। মুখটা নিস্পৃহ। আমার যেন কেমন কেমন লাগল। এই কেমন-কেমনটা অনেকদিন যায় নি আমার।

ওর মুখে একটা নীল বেদনা ছিল। হাসলে তাই বেদনা মধুর দেখাত। তাই বুঝি ও সুন্দর ছিল। তখন বলি নি কিন্তু এখন বলছি—সে লাল চোখ আর নীল মুখ বড় সুন্দর ছিল।

এখনও সুরু করতে পারি নি যা লিখতে চাই। তাই সংক্ষেপ করতেই হবে। ধৈর্য্য বা সময় নয়, কালি-কলমে আমার চিরকালই ভীতি।···

ভয়টা তখন আমার অন্যরকম ছিল। অবশ্য প্রদীপ ত ভয় করবেই সবিতাকে। সে ভয় নয়, এই লেখাকেই ভয় করতাম, ও কিন্তু লিখতও। কি কে জানে। দেখাত না। শুধু একদিন দেখিয়েছিল। আমি ঝল্‌সে গিয়েছিলাম তার তাপে।

লিখেছিল ও মীরা রায়কে। সেদিন সত্যটার মুখোমুখি হলাম। আমি ওর প্রতিযোগী নই—কোনদিন হতে পারব না। সেই থেকেই লেখাকে আমার ভয়। হৃদয় তখন আমার ঈর্ষায় ক্ষোভ-জর্জ্জরিত।

সেই থেকে ঈর্ষাটাকে আর তাড়াতে পারলাম না। ওর বুদ্ধিটা এত চিকণ কেন, এত প্রখর কেন! খালি ভাবতাম।

কিন্তু আমার যে কিছুই ছিল না—গান ছিল না—তুলি ছিল না। ওর যে সব ছিল। সবই ছিল ওর। হাসাতে পারত, হাসতে পারত, মধুক্ষরা কথা কইতে পারত। চারদিকের জোড়া জোড়া চোখ ওর দিকে ধ'রে রাখতে পারত। আরও কত পারত! সব চমৎকার, সব অপূর্ব্ব। ওর নাম 'সুন্দর' হলেও পারত।

···কিন্তু আমি মীরা রায়কে অনেক পেছনে রেখে এলাম। একটু থামি, একটু ভাবি—ও আসুক···

ও এসেছে। ফুল নিয়ে এসেছে। আমার আর ওর জন্য। আমি ত আত্মহারা। প্রথম দিন ত! পরে চোখে পড়ল, বাটোয়ারা সমান নয়—ওকে একটা রক্ত গোলাপ বেশী।

ওকে আরও একটা কিছু দিয়েছিল। একটা কবিতার বই—শুষ্ক শাখার মুকুল। ভেতরে 'তোমাকে' (ছাপান নয়), বইটা ও না পড়ে দিল আমাকে। কবিতা ত! তবু মন্দ লাগল না। আজ ভাবি সেদিন কবিতাও ভাল লেগেছিল আমার। কিন্তু আমার নরম ধাত ছিল না।

ও পরে বলল—নামটা হয় নি। হবে—সবুজ মুকুলে শীর্ণতা। বুঝিনি তেমন কিছু।

কিন্তু বুঝলাম। এসব বোঝাতে হয় না—এরা প্রকাশ হয়। ঢেকে রেখেও ঢাকা যায় না। বোঝাটা কষ্টকর ছিল। কষ্টকর ওটাকে বোঝার নয়, ওটা বুঝে কষ্টকর হ'ত হজম করা। কেন কষ্টকর তা লিখছি। ও পুরোপুরি বাইরে এল। ২৭ নম্বরের খাসিয়া ছেলেটি গীটার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, "দেখি রে! নিয়ে আয় ত দেখি।"

খাসিয়া হাঁ হয়ে গেল।—ওটা তোমার কাছেই থাক মাষ্টার। 'বা রে! রোজ কি আর বাজাতে মন যায়।' অথচ ও-ই রেখে দিয়েছিল বাজনাটা কতদিন! চেয়ে এনে রেখেছিল—যা ওর স্বভাব নয়। তাই আমি বুঝতে সুরু করলাম। যখন ওটা রেখেছিল তখন রোজ বাজাত। অদ্ভুত, সময় বেছে—ভোর হবার একটু আগে। তখন চারটে, ওয়ার্ড-বয় আমাদের মশারী সবে গোটাচ্ছে। ওরাও থেমে থেমে কাজ করত তখন। এত কান্না ওই ক'টা তারে ধরতে পারে না, অসম্ভব। তাই তারের নয়, কান্নাটা মনের।

কান্না যদি বাজনা থামতেই থামত তা হলে হ'ত। কিন্তু তা হ'ল না। দিন কয়েক আমরা চুপি চুপি সবাই কাঁদলাম। কাঁদলাম পরিজন-প্রিয়দের স্মৃতি-সিক্ত হয়ে।

শেষ পর্য্যন্ত সবাই বলল, অমন করে আর বাজিও না। ও শুনত না; একদিন তের বছরের সন্তুকে কাঁদতে দেখে থেমে গেল।

থেমে ঠিক গেল না। ওই বাজনাতেই সুরু করল হাসাতে। প্রাণ খুলে নয়—অতটা বোধ ছিল না, শক্তিও নয়। তবু বাজনা চমৎকার লাগত। ও আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখের হাসি হাসত—দেখ কেমন নাচাচ্ছি। হাসত ওর আঙ্গুলের তারগুলো।

আমরা জোরে হাসতাম না, ভেতরে চোট লাগবে। মীরা রায় হাসত। প্রাণ মেলে। ওর ত আর রোগ নেই। আমার পরে মনে হয়েছিল, বাজনার কান্না থামাতে মীরা রায়েরও হাত ছিল।

ও তখনও নেই। মহুয়া তখন ঝিক্‌মিক্‌ করত। মীরা রায় পালস্‌-রেট্‌ নিত ওর কাছে অনেক দেরী করে রয়ে। আর এমনিতেও হাসত। হাসত ডাক্তার

প্রেম বি-বি-এস-কে নিয়ে—প্রেম-বিদ্যা বিশারদী শাস্ত্র !! —ওরই উদ্ভাবনী। মীরা খুশির হাসিতে কল্‌কল্ করে উঠত।

মাস শেষে মীরা রায় চলে গেল অন্য বিভাগে। কিন্তু গেলেও গেল না। ওর টেবিলে লাল গোলাপ শুকোতে পেত না। নিজেও আসত, একটু অফ্ পেলেই। পরে আসত টক্‌টকে লাল রক্তাম্বরী।

তখন ওরা দু'জনে মিলে হাসত। মীরা রায় আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে ওর মনে। ছোট ছোট দলে গুন্‌গুন্ চলত ওদের নিয়ে। হ্যাংলামো—পাগল হয়েছে মেতে গিয়ে ··রোগটা বাড়াবে আর কি...এমনি আরও,আরও ! যারা চুপচাপ থাকতে পারল না, তারা ওর সঙ্গে কলহ করল। গালিগালাজের হররা বইল। (তখন ওর 'হানাহানি'র কথাটা আমার মনে পড়ত। ২৭ নম্বরের খাসিয়া শুধু বলত—আফ্‌তার অল, গীতর রিসাইতেল ইস সুপার্ব আন্দার হিম্। ট, ড বলতে পারত না ও।

আমাদের চক্রে চক্রান্তগুলো ওর কানেও আসত, কিন্তু গায়ে লাগত না ওর। মহুয়া বিদ্রূপে মিটিমিটি হাসত।

একদিন হাসছে। দু'জনেই ব'সে। আমি আমার, ও ওর স্প্রিংয়ের বিছানায়। কি নিয়ে যেন। ও হাসতে হাসতে হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। আচম্‌কা থেমে গিয়ে চশমাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘর্মাক্ত কপালের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল মুখ ঢেকে। আমি বুঝলাম ওর খারাপ শরীর আরও খারাপ হয়ে গেল।

শুয়ে ছিল ও দিন সাতেক, তার পরেই আবার হাসতে লাগল। আবার পড়াশুনার পাহাড় নিয়ে পড়ল। কথা বলতে বলতে কি ভীষণ হাঁপাত তখন। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠতাম, কি রকম হাঁপাচ্ছ তুমি—শুয়ে পড়। 'তুমি বড্ড ভীতু। বইটাতে পড় নি, ভাল হয়ে গেলেও কিছু কিছু লক্ষণ রয়ে যায় দেহে।'···আমার কিন্তু ভরসা হ'ত না। ও বুঝত। ওর ক্ষমতাই ছিল বোঝা। তাই বলল, কি হ'ল। এর পরেই অন্য একটা মজার কথা ব'লে রস ছড়িয়ে প্রচুর হাসতে লাগল।

কিন্তু তা হলেও দেখতাম ও নিভে যাচ্ছে। নীল মুখ বেদনায় আরও নীল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিভতে লাগল আর যেন জ্বলে উঠতে লাগল। এ যেন শিখার অন্তিম উত্তরণ। লাল চোখে আরও উজ্জ্বলতা, আরও প্রখরতা জমা হতে লাগল। আর তাই দেখে বিস্ময়ের গুজগুজ বন্ধ হয়ে গেল আমাদের। আমরা যেন আঁধারে ডুবে যেতে লাগলাম। ওর দিকে চেয়ে অন্ধকার দেখি। এত আলো, প্রতিভার এত শৌর্য্য এক লোকে থাকে কি করে। লাল চোখ ত নয়, যেন সূর্য্য।

আর এই সূর্য্যের দিকে চেয়ে ধেয়ে এল মীরা রায়। রক্তাম্বরী নিত্যিনৈমিত্তিক হ'ল ওয়ার্ডে। কবিতার বইটা খুলে বসত। আর মীরা রায়ের শাদা মরাল গ্রীবা বেয়ে শব্দের মুক্তোগুলো ছড়িয়ে পড়ত :

> তোমার সন্দেহ আর দ্বিধা
> আর হতাশার নোংরাগুলোর ঝোলায় বেঁধে
> কোণঠাসা কর।
> ধুলো ঝেড়ে ঐ রঙীন ঝাঁপিটা খোলো,
> যেখানে খুশি আর হাসির চকমকি আছে
> আর আছে আশার বুলবুলিটা,
> যে বলে—আছে, আছে, আছে···

আর ও যখন পড়ত :

> তুমি এই আঁধার রাতকে জ্বালবে জ্বালবে,
> নেভা মোর মন খুশির আলোতে জ্বলবে জ্বলবে।

গম্ গম্ করত। আমরা বলতাম, অত বড় হল্‌ত, তাই অমন শোনায়। বলতাম হিংসেতে।

দু'জনে ওরা পাশাপাশি পড়ত।

> এ পৃথিবীতে কিছুই শেষ নয়,
> শেষ নয় আকাশ বাতাস
> শেষ নয় সাগর পাথার,
> এ জীবনও তাই শেষ নয়
> শেষ নেই এ আশার,
> ভালবাসার···

তখন বাজত সিম্‌ফনি। মাত্র দু'টি যন্ত্রে দু'টি সুর বাঁধা। করুণ আর অরুণ, মীরা রায়ের আর ওর।

এও আবার অন্য রকম শোনাত রাত্রে। খুব কম যদিও তবুও রাতে আসত মীরা রায়। কি ক'রে কে জানে। অবশ্য আটটা—কিন্তু আমাদের দু'পহর রাত। তখন সব সুর বদলে যেত পড়ার। ওর গলা নেবে যেত খাদে আর মীরা রায় আবেশের হাত বাড়িয়ে বলত :

> এ সীমানায় কেউ নেই,
> শুধু তুমি আর আমি।
> এ অন্ধকার কি নীরব
> এসো একে মুখরতায় ভরে তুলি···

অন্তর যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ত শব্দগুলো বেয়ে আর আমি কাঁপতাম যন্ত্রণায়। না পাওয়ার যন্ত্রণা, হতাশার যন্ত্রণা। আমার ঘুম হ'ত না। তখন ত স্ক্রীন দিয়ে ঢেকে রেখেছে ওকে। হাউস-ফিজিশিয়ানের চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি ওকে নিয়ে। শরীর ওর দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

বুঝি আরও নেবে যেত, মীরা রায় না থাকলে। তখন শুনতাম ও বলছে, 'সব সাধ মিটে গেল। যে পাওয়া পাই নি তাও পেলাম তোমাকে পেয়ে। তবু যে রইল!' 'কি রইল', মীরা রায় ফিসফিস করে বলত। তার পরেই নীরবতা নাবত ঘেরা স্ক্রীন ঘিরে। আর ওটার অখণ্ডতা আমাকে সন্দেহের পীড়নে পীড়িত করত।

ঘুম আসত তাই রাতের শেষ দিকে। সেদিনও তেমনি ঘুমের পাওনা মিটিয়ে দেরিতে উঠে দেখি স্ক্রীন নেই, ওর তোষকটা ভাঁজ করা। ও চলে গেল! আমি হু হু করে কেঁদে উঠলাম। আশ্চর্য্য, ওকে আমি এত ভালবেসেছিলাম!

* * *

যা লিখলাম, সবই ওদের কথা। আমি শুধু দেখেছি, শতাংশের দশমাংশ মনে রেখেছি। পাশাপাশি ছিলাম—৪নং ৫নং বেডে তবু শুনি নি। হিংসেতে কান ঝাঁ ঝাঁ করত। তাতে ওদের কি! মীরা রায় ত পরোয়াই করত না। তাই শেষের দিকে ছেড়ে দিয়েছিলাম অতটা হিংসে করা। আর এখানে যা বললাম, তার প্রায় অনেকটাই শেষের দিকের কথা।

আমি মাস ছয়েক পর ভাল হয়ে বাড়ী গেলাম। প্রায় ভালই সবাই হয় ওখানে। কিন্তু হ'ল না ত ও। ব্যতিক্রম। মীরা রায়কেও দেখি নি আর, একদিন ছাড়া। অনেক পরে।

এ সব যে লিখব তাও ভাবি নি কোনদিন। কোনদিন ভাবি নি আবার মীরা রায়ের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু দেখা হ'ল রাস্তায়, চমকে উঠে থামলাম, অমন রক্ত মেখে চলতে একজনকেই দেখেছি।

সোজাসুজি বলল, চল কিছু খাব। রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। খাওয়া শেষে বলল, 'কি খাওয়ালে, পেট ভরল না!' সাড়ে পাঁচ টাকার বিল মিটিয়ে গম্ভীর মুখে উঠছি, ও হাত ধ'রে বসাল, বলল:

—'আশ্চর্য্য হয়েছ, ভাবছ এত খেয়েও ক্ষুধা মিটল না! কিন্তু অনেক সময় সত্যি ক্ষুধা মেটে না,—মেটে মনে, তেমন একটা মন পেলে। কিন্তু তেমন মনই বা কোথায়!' একটু হেসে ও থামল।

আমি ওর হাসিতে যেন পুরোণো দিনের আলো ভেসে উঠতে দেখলাম। ওর কথাও ঝিলিক্ দিয়ে গেল মনে। মনের জ্বালায় কিনা জানি না, বলে উঠলাম:

'কই পারলে না প্রেম দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকাতে?'

ও হাসল, সেই পুরোণো গন্ধমাখা হাসি।

—'তুমি সেই বোকাই রয়ে গেলে, প্রেম দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকান যায়? ওতে যে রোগ আরও বাড়ে, মৃত্যু আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে···আর আমিও তাই চেয়েছিলাম।'

—'কি যা-তা বলছ।' বিস্ময়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'সত্যি, চেয়েছিলাম শেষ হয়ে যাক্। ওর রোগের প্রতিটি অনারোগ্য লক্ষণ জেনেই তা ভেবেছিলাম। জানতাম ও বাঁচবে না, তাই ওকে ভালবাসতে সুরু করলাম।'

—'কপট বেশ্যা কোথাকার?' আমার সমস্ত বঞ্চনা, সমস্ত জ্বালা, সমস্ত ঘৃণা যেন দাঁতচাপা শব্দ ক'টিতে বেরিয়ে এল।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তার পর পাতলা হাসি একটু হাসল। বলল, 'না, কপট নই। আমার ভালবাসাতে কপটতা ছিল না। থাকতই যদি, রোগের ভয়, ভবিষ্যৎহীনতা, ওর হতভাগ্যতা কোথায় আমাকে পেছিয়ে নিয়ে যেত!' ও আবার থামল···'কিন্তু তা ত নয়, একটা বঞ্চিত জীবনকে—প্রতিভাই বল—ছিল না প্রতিভা? সেই বঞ্চিতকে আমি পৃথিবীর একমাত্র স্বর্গীয়বস্তু ভালবাসা দিলাম। অমন একটা মনের সামনে যখন মরণ নাচছে, তখন চাইলাম সুখের স্পর্শ দিয়ে বিদায় বেলাটা মধুর করে দিতে। আমার কামনাটাকে তুমি বড় ছোট করে দেখলে!'

—০—

# মেরুজ্যোতি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

মেরুপ্রদেশে ছ' মাস দিন, আর ছ' মাস ধরে চলে একটানা রাত্রি। তবে রাত্রির অন্ধকারে মাঝে মাঝে ফুটে উঠে এক রকম আলো। সে হ'ল অরোরার আলো, আমরা যাকে বলি মেরুজ্যোতি। সে অদ্ভুত, অপার্থিব। সমস্ত দিগন্ত ব্যেপে যেন রক্তাভ আলোর বন্যা বয়ে যায়।

মেরুজ্যোতি প্রকাশ হওয়ার সময় সব প্রথমে দিগন্তে উষার আলোর মত একটা আভা দেখা দেয়, কুয়াশার রাতে সার্চলাইটের আলোর মত। এজন্য ফরাসী দার্শনিক গাসেন্দি ১৬২১ সনে এর নাম দেন Aurora, যার অর্থ হ'ল উষা। উত্তর মেরুপ্রদেশে যা দেখা যায় তার নাম "অরোরা বোরিয়ালিস্" (Aurora Borealis), আর দক্ষিণে যা দেখা যায় তার নাম "অরোরা অষ্ট্রালিস্" (Aurora Australis)।

মেরুজ্যোতির দৃশ্য খুবই বিস্ময়কর। প্রথমে উষার মত যে আভা দেখা যায়, তার জ্যোতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। মেরুজ্যোতি যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন তার কাছে চাঁদের আলোও যেন ম্লান হয়ে যায়। এই আলো ধীরে ধীরে আকাশের উর্ধ্ব প্রদেশে উঠে গিয়ে নানা বর্ণ এবং নানা আকার ধারণ করতে থাকে। কখনও দেখায় রামধনুর মত, আবার কখনও আলোর ছটার মত ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। কখনও বা বর্ণালীর পর্দা দুলতে থাকে দিগন্তে, তার খাঁজে খাঁজে খেলা করে তরল আলোর প্রস্রবণ। আবার কখনও বা দেখা যায় কতগুলি উজ্জ্বল খিলানের মত। মনে হয়, আলোর খিলানগুলি এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে এবং নানা রঙের মনোমুগ্ধকর একটা আলোর ঝলকের সৃষ্টি করেছে আকাশে। আলোর ঐ খিলানগুলি কখনও স্থির থাকে, কখনও সামনে-পিছনে দুলতে থাকে, আবার কখনও বা হাওয়ার মুখে পতাকা যেমন কাঁপে তেমনি করে কাঁপতে থাকে। ঐ আলোর খিলানের নীচেই দেখা যায় ভীষণ অন্ধকার, যেমন দেখা যায় প্রদীপের নীচে।

মেরুজ্যোতির রং সাধারণতঃ সবুজ, ধূসর অথবা বেগনী বলে মনে হয়। কখনও বা দেখায় গোলাপী, আবার কখনও রক্তরাঙা। কখনও হয় ত দেখা যায়, ঘোর লাল রঙের ঝালর থেকে যেন ঝাঁটার মত অনেক আলোক রশ্মি বেরিয়ে আসছে। ১৯৪৯ সনে একবার লাল মেরুজ্যোতি এবং সেই সঙ্গে লাল পাড় বসান সবুজ ঝালরের মত আলো দেখা গিয়েছিল।

মেরুজ্যোতি কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা যায় না। নিরক্ষ রেখা থেকে যত মেরু অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় তত মেরুজ্যোতির আবির্ভাব হতে থাকে। তবে গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূল ঘিরে মোটামুটি উপবৃত্তাকার একটি অঞ্চলেই মেরুজ্যোতি দেখা যায় সবচেয়ে বেশি।

মেরুজ্যোতির ফটো তোলার উদ্দেশ্যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এমন ক্যামেরা আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে একসঙ্গে সমগ্র আকাশের ফটো তোলা যায়। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে এর সাহায্যে প্রতি মিনিটেই একটি করে ফটো তোলা হয়। এই সময় দৈবাৎ মেরুজ্যোতি দেখা দিলে তার স্বরূপ ফুটে ওঠে এই ফটোতে। শুধু তাই নয়, স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর স্থায়িত্বকালও লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এইভাবে মেরুজ্যোতি সম্পর্কে অনেক বিচিত্র তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক, তাই একটি চুম্বক-শলাকাকে ঝুলিয়ে রাখলে তা উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে স্থির হয়। অবশ্য ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তা ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ রেখার সঙ্গে একটি কোণ সৃষ্টি করে রয়েছে, একে বলা হয় 'বিচ্যুতি' (Declination)। আবার চুম্বকটি অনুভূমিক রেখার সঙ্গেও একটি কোণ সৃষ্টি করে থাকে, একে বলা হয় 'বিনতি' (Dip or Inclination)। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রকৃত বল-রেখা বা তার ক্ষেত্রের প্রাবল্য সাধারণতঃ অনুভূমিক তলে থাকে না, তা বিনতি অভিমুখে ক্রিয়া করে। অবশ্য তাকে অনুভূমিক ও উল্লম্বরেখার দু'টি উপাংশে ভাগ করা যায়। অনুভূমিক উপাংশকে বলা হয় 'অনুভূমিক প্রাবল্য' (Horizontal Intensity)।

বিচ্যুতি, বিনতি বা অনুভূমিক প্রাবল্য, এদের সমষ্টি-গত ভাবে বলা হয় 'চুম্বকীয় মূলরাশি' (Magnetic Elements)। এর মান যে কেবল স্থান ও কালভেদে

এক সঙ্গে সমগ্র আকাশের চিত্র গ্রহণ করা যায় এরূপ একটি ক্যামেরা

পরিবর্তিত হয় তা নয়, সময় সময় এর মান হঠাৎ খুব বেশি মাত্রায় পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা তারই নাম দিয়েছেন 'চৌম্বক ঝড়' (Magnetic Storm)। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, যতক্ষণ চৌম্বক ঝড় থাকে ততক্ষণ ধরে চুম্বক-শলাকা এলোমেলো ভাবে দিক্ নির্দেশ করে, বেতারবার্তা প্রেরণে ও গ্রহণে অসুবিধা হয় এবং মেরুজ্যোতির দীপ্তি ও স্থায়িত্ব বেড়ে যায়।

মেরুঅঞ্চলগামী এক অভিযাত্রীদল সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, আকাশে মেরুজ্যোতির গতির সঙ্গে চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপের একটা নিকট-সম্বন্ধ আছে। তাঁরা দেখলেন, মেরুজ্যোতির অবস্থান অনুসারে চুম্বক-শলাকা কখনও পূবে, আর কখনও পশ্চিমে বিক্ষিপ্ত হয়।

চুম্বকের সঙ্গে তড়িতের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, তা আমরা জানি। একটা তারের ভিতর দিয়ে যখন তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকে, তখন তার চারদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তাই তার নিকটে অবস্থিত চুম্বক-শলাকা বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষেপের দিক্ ও মাত্রা নির্ভর করে তড়িৎ-প্রবাহের দিক্ ও পরিমাণের উপর।

পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্যদেহে সৌরকলঙ্ক দেখা দেওয়ার পরেই পৃথিবীতে দেখা দেয় চৌম্বক ঝড়। শুধু তাই নয়, চৌম্বক ঝড় এবং মেরুজ্যোতির আবির্ভাব হয় একই সঙ্গে। তাই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সৌরকলঙ্ক থেকে ছুটে-আসা তড়িতাবিষ্ট কণিকাই হ'ল চৌম্বক ঝড় এবং মেরুজ্যোতি সৃষ্টি হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ।

হিসেব করে দেখা গেল, সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের প্রায় ২৬ ঘণ্টা পরে পৃথিবীতে চৌম্বক ঝড় অথবা মেরুজ্যোতি দেখা দেয়। বোঝা গেল, সৌরকলঙ্ক থেকে এমন কিছু ছুটে আসে যার গতিবেগ সেকেণ্ডে ১,৫০০ কিলোমিটার। কিন্তু সূর্য থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যেসব আলো আসে তাদের সবারই গতিবেগ হ'ল সেকেণ্ডে ৩×১০¹⁰ সেন্টিমিটার (১,৮৬,০০০ মাইল)। তাছাড়া যার জন্য চৌম্বক ঝড়ের উৎপত্তি তা আলোর

উপরোক্ত ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত অরোরার আলোক চিত্র

সমধর্মী হতে পারে না, চৌম্বকীয় মূলরাশি পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে তা তড়িতাবিষ্ট কণিকার সমষ্টি হতে বাধ্য।

আর একটা কথা, কোন কোন জায়গায় ঠিক ২৭ দিন পর পর মেরুজ্যোতি দেখা যায়। নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার পাক খেতে সূর্যের লাগে প্রায় ২৭ দিন। এজন্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সূর্যপৃষ্ঠে এমন কতগুলি জায়গা আছে যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে আহিত কণিকা উৎসারিত হয়ে আসে। তাই ২৭ দিন পর পর ঐ জায়গা যখন পৃথিবীর দিকে ঘুরে আসে তখনই পৃথিবীতে মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ঘটে।

একটি নলের মধ্যে খুব অল্প চাপে গ্যাস ভর্তি করে রেখে দুই প্রান্তে উপযুক্ত বিভব বৈষম্য প্রয়োগ করলে তড়িৎ-ক্ষরণ হয় এবং ধনাগ্র (Anode) থেকে ঋণাগ্র (Cathode) পর্যন্ত প্রসারিত একটি আলোক-স্তম্ভ দেখা যায় (Positive Column)। এর রং নির্ভর করে নলের মধ্যে অবস্থিত গ্যাসের প্রকৃতির উপর। যেমন, নলের মধ্যে বাতাস থাকলে আলোর রং হয় পাটলবর্ণের। হাইড্রোজেন থাকলে নীল বা লাল, নাইট্রোজেন থাকলে লাল, নিয়ন থাকলে লাল, হিলিয়াম থাকলে হলদে, আর্গন থাকলে নীল, ইত্যাদি। বড় বড় শহরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ আলোর সাহায্য নেওয়া হয়।

বর্ণালী-বিশ্লেষণ-যন্ত্রে এই আলো পরীক্ষা করলে নলের মধ্যে অবস্থিত গ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট রেখা লক্ষ্য করা যায়। মেরুজ্যোতির বর্ণালী পরীক্ষা করেও এরূপ কতকগুলি রেখার সন্ধান পাওয়া গেছে। এর ফলে বোঝা গেছে যে, মেরুজ্যোতির উৎপত্তি হয় সাধারণতঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সোডিয়াম, প্রভৃতি আহিত কণিকার একটানা স্রোতের জন্যই। তাছাড়া বর্ণালীর সূক্ষ্মপ্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে আরও বোঝা গেছে যে, সূর্যদেহ থেকে এক ঝাঁক প্রোটন (হাইড্রোজেন আয়ন) সেকেণ্ডে প্রায় ৩,৩০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে
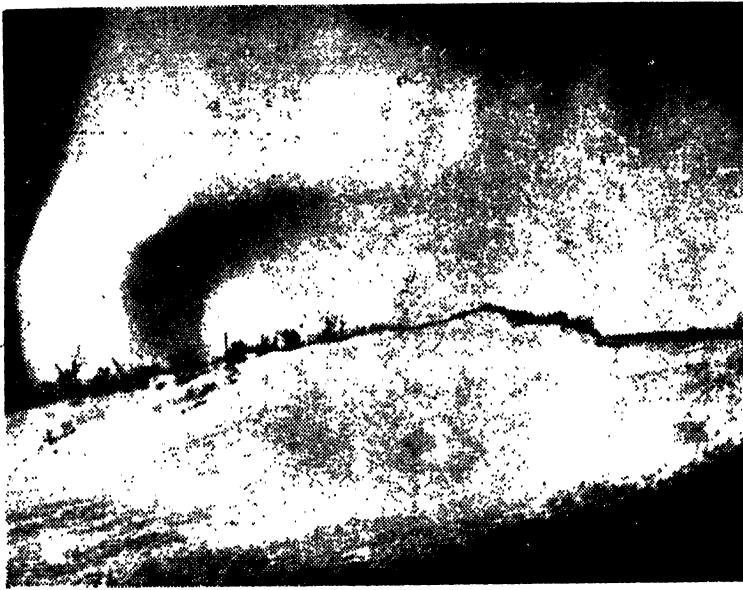
সূর্য-পৃষ্ঠে কলঙ্ক দেখা দেওয়ার প্রায় ২৬ ঘণ্টা পরে পৃথিবীতে দেখা দেয় মেরু জ্যোতি

আসে পৃথিবীর দিকে, আর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের পরমাণু থেকে একটি করে ইলেকট্রন ছিনিয়ে নিয়ে একদিকে সৃষ্টি করে হাইড্রোজেন পরমাণু, অন্যদিকে সৃষ্টি করে নানারূপ আয়নিত কণিকা।

সূর্যদেহ থেকে আগত আহিত কণিকার সঙ্গে মেরু-জ্যোতির সম্পর্ক নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা জাহাজে করে উত্তর-মেরুপ্রদেশে গিয়ে সেখান থেকে মহাকাশে রকেট পাঠিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এর ফলে বোঝা গেছে যে, পৃথিবীর মানুষ অরোরার যে আলো দেখে তার অবস্থান ভূ-পৃষ্ঠের ৫০ থেকে ৭০ মাইল ঊর্ধ্বে। অবশ্য অরোরা থেকে উৎসারিত এক্স-রে বা রঞ্জন-রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলে আসে ভূ-পৃষ্ঠের ১৫ মাইলের মধ্যে।

এইসব কারণে বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন যে, সৌরকলঙ্ক থেকে যেসব আহিত কণিকা উৎসারিত হয়ে আসে সেগুলি ঝাঁক বেঁধে ছুটে এসে যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন সেখানে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়, আর তারই ফলে সৃষ্টি হয় চৌম্বক ঝড় এবং মেরুজ্যোতি। এইসব কণিকার সংঘাতে বায়ুর অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন অণুগুলি তড়িতাবিষ্ট হয়, অর্থাৎ আয়নিত হয় ( Ionization ) এবং ইতস্ততঃ ছুটোছুটি ক'রে আরও নূতন নূতন তড়িতাবিষ্ট কণিকার সৃষ্টি করে। পৃথিবী একটি বিশাল চুম্বক। কাজেই এই কণিকাগুলি বায়ুমণ্ডলে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে না পড়ে পৃথিবীর দু'টি চৌম্বক মেরুর দিকে ছুটে যায়। তখন হাল্কা গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-ক্ষরণ আরম্ভ হয়, আর তারই ফলে উৎপন্ন হয় নানা রঙের ঝালর, যেমন করে একটি নলের মধ্যে অল্প চাপে সংরক্ষিত গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে পাওয়া যায় নানা রঙের আলো। আর এজন্যই মেরুজ্যোতি শুধু মেরুপ্রদেশেই দেখা যায়, নতুবা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকেও এই জ্যোতি নিশ্চয়ই দেখা যেত।

মেরুজ্যোতি বহুকাল ধরেই বিজ্ঞানীদের মনে বিস্ময় জাগিয়েছে, তাঁদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁদের বিস্মিত মনে প্রশ্ন জেগেছে, দুই মেরুতেই কি একই সঙ্গে এরূপ জ্যোতি দেখা যায়? এতকাল এ সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাই বিজ্ঞানীদের এই কৌতূহল মেটাবার জন্য আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিদ্যা বৎসরে (International Geophysical Year 1957-58) সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সম্মিলিতভাবে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সনের ২৮শে জুন তারিখে সঙ্কেত ধ্বনিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১২৬টি স্টেশন থেকে

শিক্ষিত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল সূর্যের উপর। শুধু তাই নয়, উন্নত দেশগুলির বিজ্ঞানীরা সব দুই মেরুপ্রদেশে বসে ঘড়ি ধরে মেরুজ্যোতি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে লাগলেন। এর ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, উত্তর-মেরুতে মেরুজ্যোতি দেখা দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দক্ষিণমেরুতেও মেরুজ্যোতি দেখা দেয়। মেরু-জ্যোতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুমান যে বহুলাংশে ঠিক তাও এইসব পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে *

* চিত্রগুলি ইউনাইটেড স্টেটস ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

# ফেরিওয়ালা

## শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

জীবন যদি মেঘ হয় বা মেঘ যদি জীবন হয় ত ক্ষতি কি! নিরঞ্জন ভাবে এই মিলনটাই ঠিক। ভাস, কেবল ভেসে চল। তা নইলে আর বেঁচে সুখ কি!

নিরঞ্জন কবি নয়, নিরঞ্জন ফেরিওয়ালা। আর সাত জন ফেরিওয়ালার মত। তবে নিরঞ্জন বেচা-কেনা লাভ-লোকসান ছাড়া অন্য কথাও ভাবে। একদিন হঠাৎ কুড়ি টাকা লাভ হলে যে-আনন্দ, কোন কোন ভাবনা ভেবেও নিরঞ্জন ঠিক সেই রকম আনন্দ পায়।

নিরঞ্জনের ভাবনা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে জড়িয়ে থোরে না। সে এমনিই, তার বাঁধাবাঁধি নেই, অকারণ। কোন অজানা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে, কি মেলায় বিক্রির শেষে রান্নাবান্না সেরে নদীতে নাইতে নেমে, কি ট্রেন-ফেল হয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে সারারাত চুপ ক'রে ব'সে বা শুয়ে থাকার সময় নিরঞ্জনের ওপর এই সব ভাবনারা ভর করে। ভাল লাগে, বেশ লাগে। মনের মধ্যে কত কি কাঁপে, আস্তে বাতাসে যেমন গাছের পাতা কিংবা নদীর জল কাঁপতে থাকে।

জীবনে যে এত আনন্দ নিরঞ্জনের মত এমন আর কে জানে! তবু লোকে এত হাহাকার করে কেন? অভাব, রোগ, মনের আরও বাঁকাচোরা কত দুঃখ।

নিরঞ্জনের কি অভাব নেই? অনেক অভাব, অনেক ফুটো। তবু আনন্দের কি কমতি আছে। যত কষ্ট, তত আনন্দ।

ভাগ্যিস্ মামা তাকে সেই ক্লাস সেভেনে সব বিষয়ে শূন্য পাওয়ার জন্যে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই ত জীবন এত ভরা-ভর্তি লাগছে। লেখাপড়া শিখে কি হয়! নিরঞ্জন কি জীবনের এই খোলা হাটে এমনি ঘুরে-ফিরে এত আনন্দের স্বাদ পেত! সে নিজের মনে মনেই ব'লে, মামা, তোমাকে পেন্নাম করি, এই পথের ধুলোয় দণ্ডবৎ হয়ে তোমাকে পেন্নাম করি। তোমার দোর বন্ধ ক'রে কত বড় এই পৃথিবীর দোর খুলে দিয়েছিলে। তাই ত এই খোলা হাটের আনন্দ, জীবনের এত মিষ্টি, এত নোনা স্বাদ!

নিরঞ্জনের মাঝে মাঝে কান্না পায়। বাবার কথা কিছু মনে নেই, মায়ের একটা অস্পষ্ট আভাস আছে, কিন্তু তার মুখ সে কিছুতেই মনে করতে পারে না। যদি একটা ফটো থাকত। কত বাড়িতে সে আসে-যায়। শাড়ী দেয়, ব্লাউজ দেয়, চুড়ি, চুলের ফিতে, সেণ্ট্, সাবান, তরল আলতা কত কি দেয়। কোন মহিলাকে তার ভাল লাগলে সে ভাবে তার মা বুঝি ঠিক এমনি ছিল। মাসের পর মাস সেই বাড়ীর ওপর কেমন একটা অদ্ভুত টান তার এসে যেত। তার পর একদিন কোন অতর্কিত আঘাতে সে মোহ ভেঙে যেত। আবার অন্য কোন জেলায়, অন্য কোন নতুন বাড়ীতে সেই ভুলের মায়া-রাজ্য সে গ'ড়ে তুলত, আবার ভাঙত। যেন মনের সঙ্গে কেবল কল্পনার পুতুল-খেলা।

বর্ষাকালটা কলকাতায় প'ড়ে থাকতে হয়। ধরণ-ধারণ হলে 'বেরয় বেহালা কি চেতলা, মেটেবুরুজ কি বেলেঘাটার পাড়ায় পাড়ায়। দুপুর বেলা বাড়ী বাড়ী

মেয়েরাই তার প্রধান খদ্দের। শহরে দোকানের ভিড় থাকলেও বিক্রি-বাট্টা মন্দ হয় না। খেয়ে, ঘর-ভাড়া দিয়ে, কুলি-খরচা বাদে বাকিটা সে রেখে দেয় পুজো আর শীতের মরসুমের হরেকরকম নতুন নতুন মাল কেনার জন্যে।

তার পর একদিন কালো আকাশের মুখ কেমন এক মন-কেমন-করা আলোয় হেসে ওঠে। শরৎ এসে যায়। নিরঞ্জনও বাক্স-প্যাঁট্রা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাংলা দেশের এ-জেলায় ও-জেলায়, গ্রামে গ্রামে, মেলায় মেলায়। কখনও ট্রেনে, কখনও বাসে, কখনও নৌকায়। তার পর গ্রীষ্ম কাটিয়ে আবার বর্ষায় ফেরে কলকাতায়। চেতলার দিকে এক পাতানো পিসির বাড়ীর বাইরের একটা চালা তার কলকাতার আস্তানা। পিসি ভাড়া নিতে চায় না, বলে, তুমি বাবু থাক ক'দিন? ভাড়াটাড়া আর কি দেবে, যদ্দিন তোমার ইচ্ছে থাক। নিরঞ্জন তবু শোনে না, মাস গেলে দুটো ক'রে টাকা পিসির হাতে গুঁজে দেয়।

কলকাতার এই বর্ষাকালটা যেন একটা অন্ধকূপের জীবন। খোলা আকাশ, আলো, রোদ-হাওয়ার জন্যে তার প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু কলকাতায় তাকে আসতেই হয়। নইলে মাল গস্ত হয় না। তার যারা সব খদ্দের তাদের পছন্দসই মাল কলকাতা ছাড়া আর কোথায় মিলবে। কতরকম অর্ডার, কত পছন্দ ক'রে ঘুরে ঘুরে তাকে সব জোগাড় করতে হয়। নতুন ফ্যাশনের নতুন মালও যে তাকে দূর মফস্বলের শহরে গ্রামে চালু করতে হয়। তা নইলে আরও ত কত ফেরিওয়ালা আছে, তার মধ্যে নিরঞ্জনেরই বা এত আদর কেন।

সবাই ব'লে, হ্যাঁ নিরঞ্জনের নজর আছে বটে! যে-টি যা-কে যেমন মানায়, সে খুঁজে খুঁজে ঠিক এনে দেবে। ব্লাউজের ছাঁটই বল আর শাড়ীর রংই বল। শাড়ীর এমন সব পাড় আনবে, তা যেমনি সুন্দর তেমনি নতুন।

ব্লাউজের রংয়ের সঙ্গে শাড়ীর মিল, এমন কি চুলের রিবন্‌ও তার সঙ্গে মানিয়ে সে আনে। এ সব বিষয়ে মেয়েদের চেয়েও সে ওস্তাদ। যেসব মেয়েদের বিয়ে হবে আর যেসব মেয়েদের নতুন বিয়ে হয়েছে তারা নিরঞ্জনকে পেলে আর ছাড়ে না। তার জন্যে দিন গোণে। দেরি ক'রে এলে অনুযোগ করে।

নিরঞ্জন বলে, কি করব দিদিমণি, ভাল জিনিস কি সহজে মেলে। তোমাদের জন্যে যা তা জিনিস ত আর আনতে পারি না। বাজার ঘুরতে ঘুরতে হয়রাণ হয়ে গেছি। নইলে আরও দিন পনের আগে আসতে পারতাম।

নিরঞ্জনের সব বাঁধা ঘর, বাঁধা খদ্দের, বাঁধা সময়। শরৎ আর হেমন্তটা তার বীরভূম আর বর্ধমানে কাটে, তার পর শীতের মরসুমে যায় নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া। তার পর ফিরতি পথে যায় চুঁচড়ো, চন্দননগর, শ্রীরামপুরে। সময় হলে চ'লে যায় নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়ার দিকে। তার মাঝে শীতের সময় মেলার মরসুম ত আছেই। কখনও কখনও একই রাস্তায় দু'বার যেতে হয়। কি মাঝপথে খেয়াল চাপল ত যেদিকে যাচ্ছিল, তার উল্টো দিকে চ'লে গেল।

পরের বচ্ছরে ঠিক নিয়মমত হাজির হয়ে যায় নিরঞ্জন।

গিন্নিরা বলেন, ওমা, তুমি তাহলে বেঁচে আছ ফিরিঅলা। আমরা এই বলাবলি করছিলাম, সে ত ফি বছর এমনি সময় আসে, হঠাৎ কি হ'ল। তা কি হয়েছিল, বল দিকি ছেলে?

নিরঞ্জন কত সময় মন রেখে সত্যি-মিথ্যে বানিয়ে বলে। নয়ত বলে, কি বলব মাসিমা, হঠাৎ খেয়াল চাপল চ'লে গেলাম জয়দেব-কেঁদুলির মেলায়, তার পর ওখান থেকে মুর্শিদাবাদ। এদিকে আর আসা হ'ল না।

সেবার বক্রেশ্বরের মেলার কথা নিরঞ্জনের খুব মনে থাকবে। দু'তিন দিন সে কি বেঘোর জ্বর, হুঁস্ ছিল না। বীরভূমের ম্যালেরিয়া, দলাদলা কুইনিন্ খেয়ে তবে যায়। তার পর যেদিন পথ্যি পেল, তার সঙ্গী নিতাই আলু-ঝিঙে দিয়ে বাগদা চিংড়ির ফট্‌কা ঝোল আর ভাত রান্না ক'রে দিয়েছিল। সঙ্গে হলদে পাতি লেবু। হলদে পাতি লেবুর গন্ধ নাকে এলে সেই বক্রেশ্বরের জ্বর আর পথ্যির কথা মনে পড়ে। অজান্তেই তার কেমন জিভে জল আসে। আবার যদি জ্বর হয়, ঠিক অমনি পথ্যি করবে সে।

জ্বরের কথা মনে হলে দুলেদের সেই বৌটির কথাও মনে পড়ে। আগুনের খাপ্‌রার মত রূপ, হয়ত কোন সুবেশ, সুন্দর লম্পটের লোভ আর সম্ভোগের পাঁকের ফুল। চুড়ি কিনলে, পুঁথির মালা কিনলে, আরশি কিনলে। মেলার পাশেই কোন বস্তিতে থাকত। রোজ দোকানে একবার আসা চাই-ই। নিরঞ্জন একটা চিরুণী তাকে এমনি দিয়েছিল। জ্বরের জন্যে দোকান বন্ধ করতে হয়েছিল। মেয়েটি রোজ আসত, তার কাছে বসত। একদিন মাথা-গা-হাত-পা টিপেও দিয়েছিল।

জ্বরে কি তখন তার হুঁস ছিল। সে কি শীত আর কাঁপুনি। একটু তখন ভাল হয়েছে, কালো মোষের মত চৌকোমুখো এক জোয়ান মদ্দ হঠাৎ দোকানের ভেতরে ঢুকে তেড়ে উঠে বললে, শালা আমার মেয়্যা-মানোষকে ভাগিয়ে লিবার তালে আছ। শালো, জান্ খেযা লিব। ব'লে মেয়েটার চুল ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টান্তে টান্তে নিয়ে গেল, তু আয়, আজ তুর চাম্টা খুল্যা লিব। মেয়েটার স্বামী।

সে মরসুমে ভাল বিক্রি হয় নি। মেলার শেষে সে যখন বাঁধাছাঁদা ক'রে গরুর গাড়ীতে রওনা হবে, মেয়েটি হঠাৎ সেই ভোর বেলায় এসে বললে, দোকানদার, তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি ওই খুনেটার ঘরে আর রইব নি।

নিরঞ্জন বললে, আমার সঙ্গে কোথা যাবি লক্ষ্মী বোন! ছিড়ে কেটে তোকে কি নষ্ট করতে পারি? চিরকাল তোকে মনে রাখব, চোখ বুজোলেই তোর মুখ দেখতে পাব।

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

এমনি চোখ বুজোলেই কত মুখ মনে পড়ে। কত গ্রামে, কত জেলার শহরে শহরে তার দিদিমণি, বড়দিমণি, রাঙ্গা বৌদি, ছোট বৌদি, মেজ বৌদি, বড় বৌদি, পিসিমাতে, দিদিমা-ঠাকুরমাতে ভরা-ভরতি। তার বাংলা দেশজোড়া পর, কত পাতান আত্মীয়। হ'লই বা তাদের সঙ্গে বছরে ক'দিন দেখা, হ'লই বা তারা কেউ নয় তার, হ'লই বা তাদের সঙ্গে তার কেনা-বেচার সম্বন্ধ। নিরঞ্জন সারা বছর তাদের নিয়েই মেতে থাকে।

দুপুর বেলা কুলির মাথায় মোট-ঘাট চাপিয়ে নিরঞ্জন বন্ধ দরজার কড়া নাড়ে।

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় আওয়াজ আসে, কে?

আমি নিরঞ্জন, বড়দিমণি, আমি নিরঞ্জন।

ভেতরে চাপা গুঞ্জন শোনা যায়, ফেরিঅলা, ফেরিঅলা এসেছে।

তার পর নিরঞ্জন ভেতরে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে ব'সে তার বাক্স-প্যাঁটরা খোলে।

মেয়ে, বৌ, গিন্নিবান্নিরা সব চারদিকে ঘিরে আসে।

এই যে দিদিমা, নবদ্বীপ থেকে আপনার হরিনামের ঝুলি এনেছি।

ওমা, তোর মনে আছে? দিদিমা তাঁর দোমড়ান আর ফোক্‌লা মুখে হাসি ভ'রে বলেন।

মনে থাকবে না, কি বলেন।

কত দাম রে ছেলে?

আট আনা দিদিমা।

দিদিমার মুখ দেখে বোঝা যায় দিদিমা খুব খুসী হয়েছেন। দিদিমণি, এই তোমার চুড়ি, নতুন উঠেছে, 'পথে হ'ল দেখা' চুড়ি। সমুদ্দুরের মত নীল। নিরঞ্জনের হাতে কাঁচের চুড়ি ঝক্ ঝক্ করে।

দিদিমণি হেসে বলেন, সমুদ্দুর দেখেছ না কি ফেরিঅলা?

দেখি নি আবার, একবার পুরীতে রথের মেলায় গিয়ে পড়েছিলাম।

দিদিমণি চুড়ি পরে।

মেজ বৌদি এই নাও তোমার ব্লাউজ, একবারে নতুন ডিজাইন্, কলকাতায় সবে উঠেছে।

এমনি ক'রে শাড়া, বডিস্, পেটিকোট, চুলের ফিতে, ভ্যানিটি ব্যাগ কত কি বিক্রি করে নিরঞ্জন। কিছু দাম বাকি থাকে। এখনও ত দিন সাতেক আছে নিরঞ্জন এই মফস্বলের শহরে। পরশুদিন সে বাকি দাম নিয়ে যাবে।

আবার আর এক বাড়ী।

ঠাকুমা, তোমার তুলসীর মালা এনেছি, খাস নবদ্বীপ ধামের।

এনেছিস্ ছেলে, বাঃ বাঃ বেশ মালা রে!

কত দাম বাবা?

এক টাকা।

বড় বৌদি, এই নাও তোমার চুলের গুছি।

মর'-মানুষের চুলটুল নয় ত? বড় বৌদি নাক সিঁটকিয়ে বলেন।

না, না, বড় বৌদি, এ আমার জানা-শোনা জায়গা থেকে কেনা। দেখ না কেমন জেল্লা। নিরঞ্জন দেখিয়ে বলে।

মেজ বৌদি বলে, ওমা, এ কি ব্লাউজের ছিরি নিরঞ্জন? এ যে কর্তাদের ফতুয়ার মত হাত কাটা, আর ঘাড়ে গলায় এত ফাক?

এ-ই ত কলকাতায় চল্‌ছে বৌদি, একবারে হাল ফ্যাসানের। একে স্লিভলেশ ব্লাউজ ব'লে। ভি-নেক্, রাউণ্ড নেক্ সব রকম আছে।

মেজ বৌদি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, কলকাতার মেয়েদের কি লজ্জা-সরমের বালাই নেই? এ প'রে আবার বেরন যায় নাকি, ম্যাগো!

মেজ বৌদি কাশ্মীরী কাজ-করা একটা অরগ্যাণ্ডির হাফ-হাতা ব্লাউজ নিলে।

গ্রামের ঘাটে

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা।

[ প্রবাসী ১৩৩৭, মাঘ হইতে পুনর্মুদ্রিত

হায়দ্রাবাদের নির্ম্মল-শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি
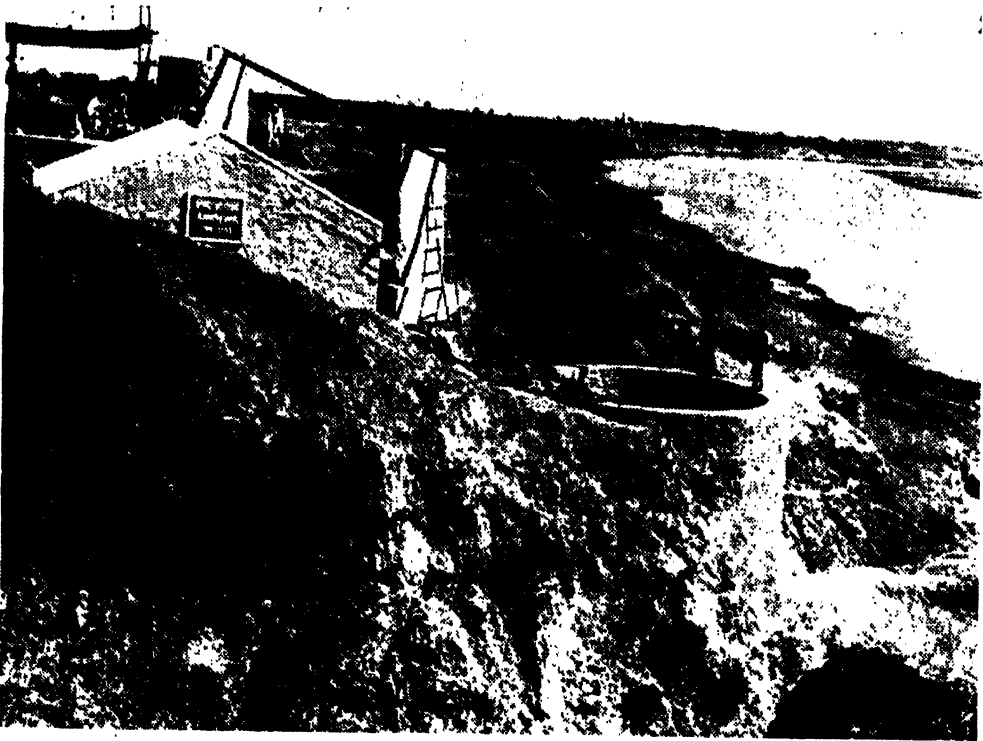
বোম্বাই প্রদেশের উচ্চস্থানে নির্ম্মিত কূপ হইতে সমবায়মূলক সেচ-ব্যবস্থা।

বড় বৌদি মেয়ের জন্যে নীল জমির ওপর ছোট ছোট সাদা ফুলের প্রিণ্ট, নেকটাই-দেওয়া একটা ফ্রক নিলেন। বুকের কাছটায় সুন্দর স্মোকিং-এর কাজ।

ছোট বৌদি শহরের মেয়ে। তক্কে তক্কে ছিলেন। ওরা উঠে গেলে নিরঞ্জনের কাছ থেকে হাত-কাটা ভি-নেক ব্লাউজ একটা নিয়ে বললে, দাম কত এটার ফেরিঅলা?

সাড়ে চার টাকা বৌদি।

ছোট বৌদি টাকা দিয়ে দিলেন।

ভেতর থেকে বড় বৌদি হাঁকলে, ওলো ছুটকি, কি করছিস্, নিবি নাকি কিছু?

না, নেব না দিদি, দেখছি। ছোট বৌদি জবাব দিলেন। পেটকাপড়ের তলায় ব্লাউজটা লুকিয়ে নিয়ে ছোট বৌদি ভেতরে চ'লে গেলেন।

নিরঞ্জনের কাছে চাতুরিটুকু ধরা পড়ে। সে টিপে টিপে হাসে।

পাউডার, স্নো, সুগন্ধি সাবানও কিছু বিক্রি হয়। বিক্রি হয় এক আনায় আশীটা ছুঁচ, সেফ্‌টিনের পাতা।

নিরঞ্জনের প্যাঁট্‌রা নয় ত, ঠাকুমা বলেন, একবারে চোদ্দ ভুবন।

নিরঞ্জন এবার যায় শ্রীশ উকিলবাবুর বাড়ী। সেখানেও ঐ একই বৃত্তান্ত।

অতর্কিত আঘাতও আসে। হুগলীর মুন্সেফ্‌বাবুর স্ত্রীকে দেখে কি জানি, কি তার মনে হয়েছিল। নিরঞ্জন বলেছিল, আপনাকে দেখলে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। আপনি ঠিক আমার মা।

এ মন-রাখা কথা নয়, কোন ফন্দির জন্যেও নয়। নিরঞ্জনের এমনি পাগলামি মাঝে মাঝে হয়।

মুন্সেফ্‌বাবুর স্ত্রী মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলেন, মা? তোমার মা হতে কেন যাব বাপু। ফেরিওয়ালা ছেলে? তিনি নিষ্ঠুর শ্লেষের হাসি এনেছিলেন।

নিরঞ্জন মুখ চুণ হয়ে চুপ ক'রে গিয়েছিল।

নিরঞ্জনের জীবনটা এমনিই চলছিল একটা ছোট্ট তরতরে নদীর মত, আপনার মনের ঢেউ নিয়ে আপনিই দুলত। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ কোথা থেকে একদিন যেন কোন্ অকূল সমুদ্রের হাওয়া এসে লাগল। নিরঞ্জনের সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ঘটনাটা ঘটল সেবার নবদ্বীপে, বনচারীর বাগানে।

প্রতিবারের মত এবারও সে মাল-পত্তর নিয়ে এসেছিল নবদ্বীপে। এখানে এলে সে বনচারীর বাগানে মঞ্জরী দাসীর বাড়ীতে থাকত। একটি ঘর তার জন্যে বরাদ্দ ছিল। ওখানেই থাকত, খেত। দিন পনের কি কুড়ির জন্যে একটা ভাড়াও দিত। আরও ঘর ছিল মঞ্জরী মাসির, মেলা বা পর্বের সময় যাত্রীদের জন্যে।

সকাল বেলা উঠে বাজার-হাট সেরে রান্না চাপিয়ে দিত। ফাল্গুনের দিকে হ'লে আলু সজ্‌নে ডাঁটার সঙ্গে সর্ষেবাঁটা দিয়ে ইলিশ মাছের মাখো মাখো ঝোল, আর গরম ধোঁয়া-ওড়া ভাত। ভরা শীতের সময় ফুলকপি কড়াইশুঁটি দিয়ে গঙ্গার বড় বড় বাচা মাছের ঝোল। তরকারি রেখে দিত, রাত্তিরে দুটো ভাত ফুটিয়ে নিত। মাঝে মাঝে চিনি কাঁচালঙ্কা মেখে পাকা কয়েৎ বেলের চাট্‌নি, সঙ্গে বড় একটা লাল মাকড়া বেগুনও কোন কোন দিন পুড়িয়ে নিত; সে কি মিষ্টি স্বাদ আর সুগন্ধ!

মঞ্জরী মাসির বয়েস হয়েছে। কাঁচাপাকা চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা। গলায় তুলসীর মালা, নাকে রসকলি। মঞ্জরী নিরঞ্জনকে ভারি ভালবাসত। বলত, বাবার আমার গৌরের মত চেহারা। যেমন রং, তেমনি মুখশ্রী। তুই বেটা অমন ছোট ছোট ক'রে পশ্চিমাদের মত চুল ছাঁটিস্ কেন? বড় বড় চুল রেখে দে, কাঁধের কাছে থোকা থোকা দুলবে, বড় বাহার হবে রে।

নিরঞ্জন হাসত।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত মঞ্জরী মাসি, কোথায় বাড়ী, সংসারে কে আছে। তার পর সব শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলত, একবারে চালচুলোহীন দিগম্বর। বাঁধবার কেউ নেই, তাই অমনি ভেসে ভেসে বেড়াস্। গৌর না করুন, যদি হঠাৎ ভালমন্দ হয়, কে দেখবে। কাঁহা কাঁহা না ঘুরিস্। এক এক বচ্ছর আসিস্ না, বড় ভাবনা হয় রে বাবা।

আবার বলত, যার কেউ নেই, তার ওপর গৌরের দয়া থাকে রে বাবা।

এবারে এসে নিরঞ্জন অবাক হয়ে গেল। পাঁচ-ছ' বচ্ছর তার যাতায়াত, কোনদিন সে শোনে নি, মঞ্জরী মাসির মেয়ে আছে। ষোল-সতের বছরের সুন্দরী মেয়ে আষাঢ়ের পাহাড়ী নদীর মত। এতদিন ছিল শান্তিপুরে পিসির বাড়ী। পিসির ছেলেপুলে হয় নি, পিসি ভালবাসে, ছাড়ে না। ওখানেই স্কুলে পড়ত, পিসি পাত্তরও দেখেছিল। ছেলে কেষ্টনগরে আবগারি আপিসে কাজ করে। মঞ্জরীর তাতে মত নেই। সে মেয়েকে

কাছে আনিয়েছে। বিয়ে দিতে হয় সেই দেখেশুনে দেবে। তার ত টাকার কমতি নেই।

মঞ্জরী বলে, দাও ত বাবা, রাধারাণীকে ভাল একটা বেলাউজ। ঐ ডুরে নীল শাড়ীটা ত বেশ, কত দাম বাবা?

নিরঞ্জন তাই বাক্স থেকে সবচেয়ে ভাল কাজকরা মাদ্রাজী সিল্কের একটা ব্লাউজ দিলে। মাদ্রাজী ডুরে নীল শাড়ীটা দেখিয়ে তার অভ্যাস মত বললে, দেখ দিদিমণি, তোমার পছন্দ হয় কি না? ব্লাউজের সঙ্গে রঙের খুব মানান হবে।

মঞ্জরী বললে, ওকে আর দিদিমণি কেন বাবা, রাধারাণী বলেই ডেকো।

ডুরে শাড়ীটা রাধারাণীর খুব পছন্দ। রাধারাণী শান্ত, কথা বলে কম। দুটো উজ্জ্বল বড় বড় চোখ মেলে নিরঞ্জনের শাড়ী-ব্লাউজ-ভর্তি বাক্সগুলো দেখছে, তাকে দেখছে।

তার পর নিরঞ্জন রাঁধে-বাড়ে, একটা ঠিকে কুলির মাথায় মোট দিয়ে ফিরি-তে বেরয়। কখনও যায় মহাপ্রভু পাড়ায়, কখনও পোড়ামাতলার দিকে, কখনও গতি রায়ের বাঁধের দিকে, কখনও সমাজবাটির আশে-পাশে।

দেখতে দেখতে কত নতুন বাড়ী হয়ে গেছে। কত নতুন লোক এসেছে। কত বাস্তুহারা পরিবার নতুন ঘর-সংসার বেঁধেছে। চড়া-পড়া গঙ্গা কত ছোট হয়ে গেছে। মঞ্জরী মাসির মুখে শুনেছে আগে গঙ্গা নাকি অনেক চওড়া ছিল। ওপারের দিকে চাইলে ঝাপসা দেখাত। এপারে কাচের মত নীল জল, মাঝখানে সরু রেখায় ভাগ হ'য়ে ওপারের পাড় পর্যন্ত গেরুয়া-রাঙ্গা জল। আশ্চর্য, দুটো মিশ খায় না। আলাদা হয়ে সমুদ্রের দিকে দিনরাত বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে শুশুকগুলো ভুস ক'রে জলের ওপর ভেসে উঠে ডিগ্‌বাজি খেয়ে আবার তলিয়ে যাচ্ছে।

রাধারাণী মায়ের সঙ্গে সেজেগুজে পিঠের ওপর লম্বা বেণুনি ঝুলিয়ে সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে যায়, কোনদিন বা সমাজবাটিতে কীর্তন শুনতে বেরয়। রাত্তিরে ফেরবার সময় মঞ্জরী মাসির সঙ্গে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। মঞ্জরী বলে, কি গো ছেলে, কি রান্নাবাড়ি হচ্ছে?

নিরঞ্জন হেসে বলে, আজ একটু খিচুড়ি চাপিয়েছি মাসিমা।

বেশ, বেশ, ব'লে মঞ্জরী বাড়ীর ভেতর চ'লে যান। বেটাছেলের হাতা-খুন্তি নাড়া দেখে রাধারাণীর বেশ আমোদ লাগে। নিরঞ্জন সে হাসির আভা যেন অন্ধকারেও দেখতে পায়।

সেদিন সকাল বেলা নিরঞ্জন নিজের ঘরে ব'সে একটু হিসেবপত্তর করছে। রাধারাণী এসে হাজির। সবে স্নান করেছে, একরাশি ভিজে কালো চুল পিঠে ছাপিয়ে পড়েছে।

দেখুন, আপনার কাছে ভাল কাঁচের চুড়ি আছে? রাধরাণী শুধোল।

আছে। নেবে? নিরঞ্জন একটা বাক্স খুলে চুড়ি বার করলে। এ দিল্লীর প্ল্যাষ্টিকের চুড়ি, কাচের চুড়ির মত সহজে ভাঙবে না। ভারি মানাবে। হাত ভর্তি ক'রে নিরঞ্জন রঙ্গীন চুড়ি পরিয়ে দিলে। বললে, আজমীরের ভাল টিপ আছে, নেবে?

রাধারাণী বললে, কই দেখি?

নিরঞ্জন টিপ দেখালে। নানা রঙের, কত রকমারি ডিজাইনের।

রাধারাণী খুসী হয়ে বললে, ওমা, কি সুন্দর।

নাও তোমার যেগুলো পছন্দ।

রাধারাণী চারটে বেছে নিলে। তার পর বললে, কত দাম বলুন।

নিরঞ্জন বললে, থাক, এর আর দাম দিতে হবে না, ও আমি তোমায় দিলাম।

রাধারাণী ঘোরতর আপত্তি ক'রে বললে, না, না, তা হবে না।

নিরঞ্জন কি ভেবে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তাহ'লে গোটা একটা টাকাই দাও। তোমার চুড়ি হ'ল ত বার আনা আর টিপ এক আনা ক'রে চার আনা।

রাধারাণী তার আঁচল থেকে খুলে এক টাকার একখানা নোট দিল।

নিরঞ্জন হাত পেতে নিল। রাধারাণী চ'লে গেল। নিরঞ্জন আবার তার রান্নাবান্নায় মন দিলে।

পৌষ মাসটা শেষ হ'লেই নবদ্বীপের পালা সাঙ্গ ক'রে ঠিক ছিল যাবে কাটোয়া হ'য়ে লাভপুর তার পর সাঁইথিয়া।

কিন্তু হঠাৎ একদিন নিরঞ্জন প্রবল জ্বর নিয়ে ডেরায় ফিরল। পরদিন সকালে মঞ্জরী মাসি খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে নিরঞ্জন জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছে।

তার পর ডাক্তার এল। জ্বরটা বাঁকা। চোদ্দদিন ভুগে নিরঞ্জন সুস্থ হ'ল। মায়ে ঝিয়ে রাতদিন তার

সেবা করেছে। এই চোদ্দদিনে সে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে।

রাধারাণী একবাটি সাবু এনে দিল। মঞ্জরী তার কাছটিতে ব'সে ছিল।

নিরঞ্জন তার দুর্বল ক্ষীণ গলায় বললে, মাসিমা, আপনারা না থাকলে এবার আমি মরে যেতাম।

মঞ্জরী বললে, বালাই ষাট, ও কথা বলতে নেই ছেলে।

নিরঞ্জন বললে, আপনাদের অনেক খরচ পত্র হয়েছে। আমি সেরে উঠে—

মঞ্জরী বললে, এখন ও সব থাক না। তুমি আগে সেরে ওঠ ভাল ক'রে, গায়ে-গতরে জোর পাও। পরে হিসেব পত্তর কর। তার পর হেসে বললে, ছেলে আমার একেবারে পাকা ব্যাপারী।

রাধারাণী হেসে বলে, ওঃ জ্বরের ঘোরে আপনি কি ভুল বকতেন। বড়দি অমুক এনেছি, রাঙ্গাদি তমুক এনেছি ভারি মানাবে। জ্বরের ঘোরেও কাকে কি পরলে মানাবে, সেটি ভোলেন নি দেখছি। কাল ত পথ্যি পাচ্ছেন, বলুন দেখি কি খেতে ইচ্ছে হয়।

নিরঞ্জনের ভারি ভাল লাগে। ওর চোখের দিকে চাইলে মানুষের সব অসুখ যেন কোথায় পালিয়ে যায়।

শীর্ণ মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে নিরঞ্জন বললে, আলু আর ঝিঙে দিয়ে বাগ্‌দা চিংড়ির ঝোল, আর পাতিলেবু।

মঞ্জরী হেসে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা তাই তোমায় দেব। রাধারাণীকে বললে, ঘোঁতনকে কাল সকাল সকাল বাজারে পাঠাস্‌। ঝিঙে ত শীতকালে পাওয়া যায় না। আবার বাগ্‌দা চিংড়ি এখন পেলে হয়। না পেলে আলু পটল দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল খাবে। কি বল ছেলে?

নিরঞ্জন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

তার পর নিরঞ্জন আস্তে আস্তে সেরে উঠল। তার মুখের রঙ ফিরে এল।

নিরঞ্জন বলে, মাসিমা, এবার ত আমি সেরে উঠেছি। আপনারা আর কতদিন আমার জন্যে কষ্ট করবেন। এবার আমিই না হয় দু'টি ক'রে ফুটিয়ে নেব।

মঞ্জরী রাধারাণীকে উদ্দেশ করে বলে, শুনেছিস্‌ হ্যাটার কথা। গায়ে গত্তি লেগেছে কি না, অমনি বন পানে ধাইছে।

নিরঞ্জন আর কি বলবে! অগত্যা চুপ করে গেল।

মনের ভেতর যে পাখিটা তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এ ডাল থেকে ও ডালে, এ বন থেকে আরেক বনে চলে যায়, ঘর বাঁধে না। সে যেন আবার উড়তে চাইছে। দিনরাত তার ডানা ঝাপ্‌টানি নিরঞ্জন শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ডানা দুটো কে যেন কঠিন ডোরে পাক দিয়ে দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। আর আশ্চর্য, সে নিজে সাধ ক'রে নিজের হাতে সেই ডোর তার ডানার পরতে পরতে পরিয়ে নিচ্ছে।

ধুলোটের মেলা আসছে। যাত্রীরা আসছে, মঞ্জরীর ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

এক আশ্চর্য বিকেলে পশ্চিমের আকাশ যখন রঙে রঙে রূপকথার মত মেঘের কত রাজপ্রাসাদ, কত রাজকন্যা গড়ছে আর ভাঙছে তখন মঞ্জরী মাসি কথাটা পাড়লে।

তোকে আর ছেড়ে দিচ্ছি না বাবা, তুই যে কি মায়ায় আমায় বেঁধে ফেলেছিস্‌। নিরঞ্জনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মঞ্জরী বলতে লাগল। আমার রাধারাণীকে আমি তোর হাতে সঁপে দেব। এখানে থিতু হয়ে আমার চোখের সামনে তোরা দু'টিতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক্‌, আমি বড় সুখে আমার শেষের দিন ক'টা কাটিয়ে যাই।

নিরঞ্জন যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। বললে, সে কি ক'রে হবে মাসিমা?

মঞ্জরী বললে, কেন হবে না ছেলে? তুই কায়েত আমরা বোষ্টম। আর তা ছাড়া আমি চোখ বুজলে তোদেরই ত সব। স্বরূপগঞ্জে, এখানে ধান জমি আছে। এই বাড়ী, শান্তিপুরে একটা বাড়ী আছে, ভাড়া পাই। তোকে এই নবদ্বীপের বাজারে আমি কাপড়ের দোকান ক'রে দেব। মাথায় মোট নিয়ে আর দশ দোরে ঘুরতে হবে না। রাধারাণীকে কি তোর পছন্দ হয় না?

নিরঞ্জন বললে, রাধারাণীর তুলনা হয় না মাসিমা। আমি আমার নিজের কথা বলছি। আমি লেখাপড়া জানি না, আমার ত কোন গুণ নেই। আমাকে ওর পছন্দ হবে কেন?

মঞ্জরী হেসে বললে, এই কথা। পাগল ছেলে। আমি আমার মেয়ের মন না জেনে কি বলছি? গুণ কার কোথায় কি আছে বাবা সে বলা বড় কঠিন। তোকে আজ ছ' বচ্ছর দেখছি। রাধারাণী তোর হাতে সুখী হবে। আমার গৌর বলছে। তুই শুধু বল্‌ তোর অমত নেই।

নিরঞ্জন বললে, তুমি আমার মায়ের মত। তোমার কথায় না বলবার ক্ষমতা আমার নেই মাসিমা।

মঞ্জরী ভারি খুসী হ'লেন। তা হ'লে এই ফাল্গুনেই তোদের দু'হাত এক ক'রে দেব। ব'লে গৌরের উদ্দেশে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলেন।

রাধারাণীও বোধ হয় শুনেছে কথাটা। আর যখন তখন ছুট্ বলতে তার ঘরে আসে না। আর তা ছাড়া ধুলোটের যাত্রীরা সব চারদিকে। বাড়ী গম্ গম্ করছে। এখন সে ভেতরে গিয়ে দু'বেলা খেয়ে আসে। মঞ্জরীর সঙ্গে গল্প করে। রাধারাণীর সঙ্গে দু'চারটে কথা হয়। ঘোঁতনা এসে তার ঘরটর ঝেড়েঝুড়ে দিয়ে যায়। তক্তপোষের চাদর পাল্টে দেয়। একদিন ফুল লতাপাতার নক্সা-করা একটা ওয়াড় তার বালিশে পরিয়ে দিয়ে গেল। বোধ হয় রাধারাণী নিজে হাতে করেছে।

কাজ নেই, কর্ম নেই, দিনরাত বসে থাকতে নিরঞ্জনের আর ভাল লাগে না। সেদিন দুপুর বেলা একটা কুলি ঠিক ক'রে সে বাক্স-প্যাটরা নিয়ে বেরচ্ছে।

রাধারাণী বোধ হয় ভেতর থেকে দেখতে পেয়েছিল। তার ঘরের সামনে এসে বললে, কোথায় যাচ্ছেন?

নিরঞ্জন হেসে বললে, এই একটু মহাপ্রভু পাড়ার দিকে যাচ্ছি। অসুখের জন্যে ক'টা বাড়ীতে যাওয়া হয় নি, কতকগুলো মাল কাটিয়ে আসি।

রাধারাণী গম্ভীর হয়ে বললে, না, আপনার যাওয়া হবে না।

নিরঞ্জন হেসে বললে, কেন আমি ত ভাল হয়ে গেছি। শরীরে বেশ জোর পাচ্ছি। কাঁহাতক আর বসে থাকা যায় বল।

রাধারাণী সে কথার ধার দিয়েই গেল না। বললে, বাড়ী বাড়ী মেয়েদের ব্লাউজ শাড়ীর মানান্ করিয়ে, কাচের চুড়ি পরিয়ে মন-যোগানর কাজ আর নাই করলেন। আর তা ছাড়া কে দু'টো উঁচু-নিচু কথা বলবে —সে আমার—মানে আমাদের ভাল লাগবে না। বলতে বলতে তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি আবার বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল।

নিরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কুলিটাকে কিছু পয়সা দিয়ে ছেড়ে দিলে।

বিকেলের দিকে নিরঞ্জন বেরিয়ে পড়ল মতিরায়ের বাধের দিকে। দু'এক দিনের মধ্যেই মেলা বসবে। কতদূর দূর থেকে বাউল বাবাজীরা এসে অস্থায়ী আখড়া বেধেছে। কোথাও একতারার টুং টুং আওয়াজ উঠছে, কোথাও ডুবুগী আর খঞ্জনীর বোল, দেহতত্ত্বের গান ধরেছে। পাশে ইট পেতে উনুনে কোথাও ভাত ফুটছে। কোথাও গরম তেলে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আলু পটলের ভাজি চড়াচ্ছে। পাশে আটা মাখা হচ্ছে, রুটি হবে।

এখানের মেলা শেষ হবে, আবার অন্য জায়গায় গিয়ে এমনি খোলা আকাশের তলায় এরা নতুন ক'রে আনন্দের হাট বসাবে। নিরঞ্জনের অজ্ঞান্তেই একটা ভারি নিশ্বাস বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল।

ওখানেই মতির সঙ্গে দেখা হ'ল। মতি তারই মত ফেরিওয়ালা। মতি বললে, কি নিরঞ্জন মেলায় দোকান দেবে না? তোমায় খুঁজছিলাম। সবাই এল, নিরঞ্জন কোথায়? কি ব্যাপার মুখ অত শুকনো কেন? এবার দোকান দেবে না?

নিরঞ্জন বললে, না ভাই, এবার আর দেওয়া হ'ল না। মতি চলে গেল।

তার পর ঘুরতে ঘুরতে কত রাত হয়ে গেল, খেয়াল নেই। শীতের আকাশে অসংখ্য তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে। নিরঞ্জন কখন নবদ্বীপ রেল-স্টেশনে এসেছে, কখন কলকাতার টিকিট কেটেছে, তার ঠিক খেয়াল নেই। কি যেন এক স্বপ্নের ঘোরে সে সব ক'রে যাচ্ছে। গুম্ গুম্ করতে করতে কড়া আলোর মশাল জ্বালিয়ে রেল এসে পড়ল। নিশি-পাওয়া লোকের মত নিরঞ্জন একটা কামরায় চড়ে বসল। মনের ভেতর থেকে কে যেন একবার কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, তোর মাল-পত্তর! নিরঞ্জন মনে-মনেই যেন তাকে জবাব দিল, থাক্, ও সব থাক্, রাধারাণীর জন্যে রইল।

তার পর সিটি বাজিয়ে রেলগাড়ী ধক্ ধক্ আওয়াজ করতে করতে বেগ সঞ্চয় করতে লাগল। নিরঞ্জনের মনে হ'ল, ও যেন তার নিজেরই বুকের শব্দ।

কলকাতায় ফিরে ক'দিন সে আর তার খোপ থেকে বেরল না। ক্ষিদে পেলে সামনের চায়ের দোকানে চা বিস্কুট-টিস্কুট খেয়ে কোন রকমে চালিয়ে নিল। তরিবৎ ক'রে রান্নাটান্না আর ভাল লাগল না।

পাতানো পিসি বললে, কি রে বাপু, এবার যে বড় মাঘ মাসেই ফিরে এলি?

নিরঞ্জন কোন রকমে জবাব দিয়ে বললে, আবার বেরব পিসি। মাল গস্ত করতে এলাম।

দিন কয়েক পরে নিরঞ্জন সব ভাবনা চিন্তা ঝেড়েঝুড়ে সাফ হয়ে দাঁড়াল। আবার তার মালপত্তর তুলে নিয়ে পথে বেরল। এবারে আর শাড়ী, ব্লাউজ, চুড়ি নিয়ে দোরে দোরে ঘোরা নয়। হাওয়ার শূন্যে যেন একটা

অদৃশ্য নিষেধ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে এখনই ঠেলে ফেলে দূরে সরিয়ে দিতে মন যেন চাইল না।

এবার তার পাড়ি ট্রেনে ট্রেনে, কখনও বজবজ, কখনও ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিংয়ের লাইনে। কখনও চলে যায় রাণাঘাটের দিকে। সঙ্গে টিনের স্যুটকেশ আর কাঁধে ঝোলানো বড় ঝোলায় থাকে সেণ্ট্, সাবান, সিঁদুর, তরল আলতা, আশ্চর্য মলম, আরও কত রকম দাওয়াই, দাঁতের মাজন, ছুরি, কাঁচি, সেফ্‌টিপিন, আবার বইও আছে। লক্ষীর পাঁচালি, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, গোপাল ভাঁড়, সচিত্র প্রেমপত্র, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা, লতাপাতার গুণ, টোটকা চিকিৎসা, আরও সব হরেক রকম বটতলার বই।

মন্দ লাগে না, কত রকম লোক, ভিড়, চীৎকার, মারামারি, ঠেলাঠেলি। জীবনটা যেন বুনোবাঘ। কারও হাতিয়ার আছে। কারও শুধু খালি হাত। লড়াই, লড়াই, অবিরাম লড়াই। মনের সঙ্গে ইনিয়ে-বিনিয়ে গুণ গুণ করার সময় নেই, অবকাশ নেই।

টুকটাক্ বিক্রি হচ্ছেই। খরচ-খরচা বাদে লাভও মন্দ থাকে না। পারতপক্ষে সে হাওড়ার কোন লাইনে যায় না। শুধু মেলার সময় মনটা কেমন হু হু করে।

আগে হোটেলের ভাত তরকারিতে তার বড় ঘেন্না ছিল। এখন আর তা নেই। নিজে হাতে রান্না করার কথা মনে হলে তার গায়ে যেন জ্বর আসে।

এই ফাল্গুনে দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল। হাতে অনেক টাকাও জমেছে।

দোলের দিন পাঁচেক বাকি।

শিয়ালদহ স্টেশনে একদিন দেখা হয়ে গেল নিবারণের সঙ্গে। নিবারণ তুখোড় মেলা-বাজ ফেরিওয়ালা।

সে একবার নিরঞ্জনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, কি হে নিরঞ্জন, এ আবার কি ভোল? তাই বলি, গেল কোথায় লোকটা। তা মেলায় যাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? নবদ্বীপে রাসের মেলায় নেই, জয়দেব কেঁদুলিতে নেই, লাভপুর, তালিতের কোন মেলায় নেই। ব্যাপার কি হে?

নিরঞ্জন ম্লান হেসে বলে, নতুন লাইন ধরিছি বড়দা, বিক্রি-বাট্টা মন্দ নয়। লাভও বেশ।

নিবারণ হাত নেড়ে বললে, আরে ছো:। ট্রেনে ট্রেনে চেল্লাচিল্লি ক'রে লাফাই ঝাঁপাই, এ সব কি আমাদের পোষায়। না: না: ছাড়ছি না এবার, আমরা সবাই যাচ্ছি ঘোষপাড়ার মেলায়। তুমিও চল।

নিরঞ্জন যখন কথা দিল সে যাবে, তবে নিবারণ তাকে ছাড়ল। নিবারণের বছর তিরিশ বয়েস, তার চেয়ে বছর চারেক বড়। তাকে খুব স্নেহ করে।

যাবার সময় নিবারণ আবার বলে গেল, যাওয়া চাই-ই। তোমার জন্যে জায়গা রিজার্ভ ক'রে রাখব।

নিবারণ যেন একটা হারিয়ে-যাওয়া পুরাণো হাওয়া বইয়ে দিয়ে গেল। নিরঞ্জন এ বাজার সে বাজার ঘুরে মালপত্তর কিনল। তার পর মেলার দু'দিন আগে রওনা হ'ল ঘোষপাড়ায়।

সতী-মা'র মেলা আগের মত না হ'লেও, সেই বিরাট্ আম-বাগান জুড়ে এখনও খুব ধুমধাম। কলকাতা থেকে, পাশাপাশি জেলার গাঁ গঞ্জ ভেঙ্গে বহু লোকজন, বউ, ঝি, ঝিউড়ি এসে জুটেছে। ভিড় করেছে বাস্তুহারা মেয়ে-পুরুষের দল। সার্কাসের তাঁবু, বায়স্কোপের তাঁবু পড়েছে। লাউডস্পীকারে দিনরাত্তির কত রকমের গান বেজে চলেছে।

বহুদিন পরে নিরঞ্জন বুকের ভেতর সেই আনন্দের গুর গুর শব্দ শুনতে পেল।

তার দোকানের এদিকে মতি, ওদিকে নিবারণ। হাসি গল্পে, তামাসায় সময় যেন বুলবুলির মত গান গেয়ে গেয়ে উড়ে যাচ্ছে। শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

মতির দোকানে চুড়ির বড় বাহার। যেন রাশি রাশি কাচের ফুল ফুটে আছে। ঝিউড়ি মেয়েদের খুব ভিড়। মতি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

সেই ভিড়ের দিকে চেয়ে নিরঞ্জনের হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল। বেশি ত দূর নয়। গঙ্গাটা পেরিয়ে একটুখানি রাস্তা। মঞ্জরীমাসি রাধারাণীকে নিয়ে এ মেলায় আসতেও ত পারে। তাহ'লে—তাহ'লে, দেখা হ'লে সে কি বলবে।

নিরঞ্জন ভারি অন্যমনস্ক হয়ে গেল! দু'একটা খদ্দের জবাব না পেয়ে ফিরে গেল। একজনের কাছ থেকে পয়সা নিতে ভুলে গেল। একজনকে ভাঙ্গানি বেশী দিয়ে দিলে।

কৌতুহল সে আর চেপে রাখতে পারলে না। নিবারণকে ডেকে বললে, একটু দেখ ত বড়দা। একটা দরকারে একটু যাচ্ছি। ব'লে সে যেন দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

তার কেমন বিশ্বাস হ'ল, নিশ্চয়ই ওরা এসেছে। ভিড়ের মধ্যে সে খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল। দূর থেকে দু'একজনকে মঞ্জরীমাসী বলে ভুল ক'রে হন্তদন্ত হয়ে সামনে এসে আবার ফিরে গেল। হিমসাগরের ঘাটে ভিড়ের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলে, তার পর গেল

ডালিমতলায়। এখানে-ওখানে যেখানে মেয়েদের ভিড় সব জায়গায় দেখল। না তারা নেই।

দু'তিন ঘণ্টা সময় যে কোথা দিয়ে চলে গেছে, নিরঞ্জন টেরই পায় নি।

ফিরে আসতে নিবারণ তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি হে, কোথায় গিয়েছিলে? অ্যাঁ, কি দরকার বল না।

নিরঞ্জন আস্তে আস্তে বলে, ছিল একটা দরকার।

বিক্রি-সিক্রিতে দেখি তোমার মন নেই। হ'ল কি তোমার? নিবারণ অনুযোগ ক'রে বলে। কত খদ্দের ফিরে গেল।

নিরঞ্জন তখন মনে মনে ভাবছে, মেলার আরও ত দিন ছয়েক বাকি। এর মধ্যে তারা এলেও আসতে পারে। নিজের মনের সঙ্গে সে একটা রফা ক'রে নিলে। কাল না হয় পরশু না হয় তার পরের দিন আসতেও ত পারে। সে খুশী হয়ে অনেক দিন পরে সজনে ডাঁটা দিয়ে বাটা মাছের ঝোল রাঁধলে, ভাত চড়িয়ে স্নান সেরে নিলে। তার পর গরম গরম ভাত পদ্মপাতায় ঢেলে খেতে বসল। ঝোল-মাখা এক গ্রাস ভাত মুখে তুলেই সে থু থু ক'রে ফেলে দিলে। একবারে আলুনি, তরকারিতে নুন দিতে সে বেমালুম ভুলে গেছে। কোন রকমে নুনটুন মেখে খাওয়া সেরে সে দোকানে বসে ঢুলতে লাগল।

বিকেল থেকে আবার মেলা জমে উঠল। নিরঞ্জন বিক্রি করছে আর পাশে মতি, নিবারণের দোকানের ভিড়ের দিকে নজর রাখছে। মনে মনে তার ভারি আফশোষ হ'ল, কেন সে চুড়ি নিয়ে এল না মেলায়।

পাঁচদিনের দিন মেলায় ভাঁটা পড়ে এল। ভাঙ্গা হাট। যাত্রীরা এবার যাই যাই করছে, ঘরে ফেরার তাড়া। দোকানে দোকানে শেষ মরসুমের ভিড়। যার যা বাকি আছে, কিনেকেটে পোঁটলা বাঁধছে। নিরঞ্জনের সে দিকে মন নেই। প্রতিদিন সন্ধ্যা, রাত সে শুধু ভিড়ের দিকে চেয়ে থাকে। দোকান থেকে হঠাৎ উঠে যায়। এখানে খোঁজে, ওখানে খোঁজে। তার পর শুকনো মুখে ফিরে আসে।

নিবারণ গজ গজ করে, বলি নিরঞ্জন কি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? দোকান হ'ল লক্ষ্মী, তার আয় পয় যদি না দেখ ত কুটুমুটু এলে কেন? তোমায় ভূতে পেয়েছে নাকি হে?

নিরঞ্জন মনে মনে আজ ঠিক বুঝতে পারলে, হ্যাঁ, ভূতেই পেয়েছে তাকে। নইলে যে বাঁধনের ভয়ে সে পালিয়ে এল, সে ত যায় নি। সে ছায়ার মত তার পেছনে পেছনে ঘুরছে, ইচ্ছেমত তাকে ঘোরাচ্ছে। হাওয়ার মত অদৃশ্য জালে তাকে শতপাকে বেঁধে ফেলেছে। কোথায় পালাবে সে! তার মন, শরীর সব সেই জালের সুতায় জড়িয়ে পড়েছে। সুতা নয়, যেন কঠিন লোহার শিকল, হাত দিলে ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে ওঠে।

সাতদিনের দিন মেলা একবারে ভেঙ্গে গেল। আম-বাগান খাঁ খাঁ করতে লাগল। নিমফুলের কড়া-গন্ধ ফাল্গুনের হাওয়াকে মত্ত করে তুলেছে। তার ঘ্রাণে যেন পাগলামির মাতন লাগে।

নিরঞ্জন হঠাৎ নৈহাটিতে নেমে গেল।

মতি বললে, কি হে নামলে যে, কলকাতায় ফিরবে না?

নিরঞ্জন বললে, না, কাজ আছে। বলে সে হন্‌হন্ ক'রে স্টেশনের টিকিট ঘরের দিকে চলে গেল। তার হাতে স্যুটকেশ, কাঁধে ঝোলা। কিছুই বিক্রি হয় নি। অর্ধেকের বেশি মাল যেমন এনেছিল, রয়েই গেছে।

তার যেন আর তর সইছে না। পারত যদি এক্ষুণি উড়ে চলে যেত। মনের সঙ্গে নিষ্ঠুর লুকোচুরি খেলার এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না নিরঞ্জনের।

টিকিট ঘরের সামনে গিয়ে টিকিটবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে জানল, একটু পরেই ব্যাণ্ডেলের ট্রেন ছাড়বে।

নবদ্বীপের গাড়ী কি সঙ্গে সঙ্গে পাব? নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

টিকিটবাবু দেয়ালে টাঙ্গানো তালিকা দেখে বললেন, না, ঘণ্টা তিনেক পরে। একটা একান্নোয় নিমতিতা প্যাসেঞ্জার পাবে তার আগে কোন গাড়ী ত' দেখ'ছি না।

তাহলে, নবদ্বীপের একটা টিকিট দিন বাবু। থার্ড ক্লাস।

টিকিট নিয়ে নিরঞ্জন ট্রেনে চাপল।

ব্যাণ্ডেলে নেমে প্লাটফর্মের কলে হাত-মুখ ধুয়ে একটা বেঞ্চির ওপর বসল নিরঞ্জন। ট্রেনের এখনও অনেক দেরি।

অনেক দিন বিদেশে কাটিয়ে ঘরে-ফেরার টিকিট নিয়ে কেউ যখন ট্রেনের জন্যে অধীর অপেক্ষায় বসে থাকে, তখন আনন্দ, উৎকণ্ঠার যে মিশ্র অনুভূতি তার মনে দোল খেতে থাকে, নিরঞ্জনেরও ঠিক তেমনি হচ্ছে।

কত বিচিত্র উৎকণ্ঠা, লজ্জা, আনন্দ জলের ঢেউয়ের

মত গায়ে গায়ে লেগে ভেঙে যাচ্ছে, গোল হয়ে দুলে দুলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জরী হয়ত কেঁদেই ফেলবে। অমন করে না বলে কয়ে কোথায় চলে গেলি ছেলে, কেন গেলি? আমরা মায়ে-ঝিয়ে ভেবে ভেবে মরি। মাথায় হাত বুলিয়ে বলবে, ভাল ছিলি ত বাবা, পাগলা, ছেলে আমার বদ্ধ পাগল। তার দু'চোখ হয়ত জলে চিক্‌চিক্ করে উঠবে। মেয়েকে ডেকে বলবে, ও রাধারাণী দেখ, দেখ, কে এসেছে দেখ।

রাধারাণী হয়ত অভিমানে মুখ ভার করে থাকবে, তার সঙ্গে কথাই বলবে না। অনেক সাধ্য-সাধনা করলে তবে যদি তার দয়া হয়। যদি বানিয়ে বলা যেত যে, পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কি বনবিবি মন্তর দিয়ে কোথায় কোন্ অগম বনে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পথ পায় না, শেষে বনবিবির নাম করে অনেক কেঁদে, অনেক মানত করে, ঘুরে ঘুরে তবে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তাই ত চেহারার এই হাল। নিরঞ্জন নিজের মনেই হাসে। এ কথা আজকাল কেউ আবার বিশ্বাস করে নাকি। তা হলে আরও রেগে যাবে না! তবে সত্যি কথা বলাই ভাল। দেখ, ভেবেছিলাম কোন বাঁধন আমার সইবে না। পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় যাব? তুমি এই এখান থেকে বসে বসে আমায় হাজার পাকে বেঁধেছ। আমি পারি নি, আমি হেরে গেছি। আমার সব অপরাধ মার্জনা করে, আমায় ক্ষমা কর।

নিরঞ্জনের মনে হঠাৎ কথাটা ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। অনেক দিন পরে ত যাচ্ছি। এক বছরেরও ওপর। রাধারাণীর জন্যে একটা ভাল শাড়ী, ব্লাউজ, কিছু চুড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়? রাধারাণী নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে।

নিরঞ্জন ধড়মড় করে উঠে ব্যাণ্ডেল বাজারের দিকে হন্‌হন্ করে চলে গেল। এখনও দু' ঘণ্টা সময় আছে।

বাজার ঘুরে ঘুরে চল্লিশ টাকা দিয়ে একটা আকাশী-রঙের ঢাকাই শাড়া কিনলে, রঙ মিলিয়ে চেলি পিসের একটা ব্লাউজ নিলে। কিন্তু মনের মত কাচের বা প্লাষ্টিকের চুড়ি পেল না। মঞ্জরী মাসির জন্যে নিলে ফরাশডাঙ্গার মিহি থান কাপড় একখানা।

ভারি খুসী হয়ে সে ষ্টেশনে ফিরে এল। ভাগ্যিস্ কথাটা ঠিক সময় মনে হয়েছিল। সে নিজেই নিজেকে খুব তারিফ করতে লাগল।

কিছু খেয়ে নিলে হয়। কিন্তু আর বেশি সময় নেই। ওখানে পৌঁছে ওসব হবেখন।

চারদিকে ইঞ্জিনের ধ্বস্‌ধ্বস্ আওয়াজ। ও পাশের ইয়ার্ড লাইনে মালগাড়ীর সান্টিং হচ্ছে। জাহাজের মত বাঁশি বাজিয়ে মেল ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। তীক্ষ্ণ সিটি দিতে দিতে বর্ধমান লাইনের কোন্ গাড়ী পৌঁছে গেল। কোন্ গাড়ী কলকাতার দিকে ছুটল ঝক্‌ঝক্ আওয়াজ করতে করতে। চারদিকে ভিড়, ওঠা-নামা, দৌড়াদৌড়ি। নিরঞ্জনের মনে ছবি যেন।

শেষকালে হুড়মুড় করে নিমতিতা প্যাসেঞ্জার এসে গেল, পুরো একঘণ্টা লেট্ করে। নিরঞ্জন তার ঝুলি-ঝোলা নিয়ে উঠে পড়ল ইঞ্জিনের দিকে একটা কামরায়।

ট্রেন হুহু করে ছুটে চলেছে। এতক্ষণ ছিল ভাল। এখন রাজ্যের এলোমেলো উল্‌টো-পাল্‌টা চিন্তা মনে ভিড় করে ছুটে ছুটে আসছে। নিরঞ্জন ভাবলে এমনি চুপচাপ বসে থাকলে, এরা তার মাথা খারাপ করে দেবে, তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে। এখনও দু' ঘণ্টার রাস্তা।

নিরঞ্জন সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঝুলির ভেতর থেকে একহাতে কয়েকটা ছোট বড় শিশি, আর এক হাতে কয়েকটা বই নিয়ে তার অভ্যস্ত জোর গলায় কামরার যাত্রীদের উদ্দেশ করে বলতে লাগল, ভাল দাঁতের মাজন আছে, দাঁতে ব্যথা, দাঁত নড়া, দাঁতে রক্তপড়া দু'দিন ব্যবহার করলে ম্যাজিকের মত কাজ হবে। আশ্চর্য মলম আছে, কাটা ঘায়ে, পোড়ায়, মাথা-ধরায় সঙ্গে সঙ্গে আরাম পাবেন। সিঁদুর আছে, তরল আলতা, সেণ্ট্, সাবান, ভাল কোম্পানীর ভাল ভাল জিনিস, যার দরকার আছে বলুন। বই আছে, লক্ষ্মীর পাঁচালি, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, লতাপাতার গুণ, টোটকা চিকিৎসা, গোমহিষের চিকিৎসা। গোপালভাঁড় আছে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে যাবে। উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা আছে, সিনেমার হাজার মজা, একশো ছবি, কারো দরকার থাকে বলুন। এদিক-ওদিক থেকে কিছু লোক কিনলে। কেউ আশ্চর্য মলম, কেউ দাঁতের মাজন, কেউ দু' একখানা বই। নমুনার শিশি থেকে কারো কারো রুমালে সেণ্ট্ লাগিয়ে দিলে। সুগন্ধে কামরা ভুরভুর করে উঠল। দু'এক শিশি সেণ্ট্ও বিক্রি হ'ল।

তার আশ্চর্য মলম, দাঁতের মাজন ক্রেতার ওপর ম্যাজিকের মত কাজ করুক আর নাই করুক, তার ওপর অদ্ভুত কাজ করল। চিন্তা ভাবনা সব কোথায় হাওয়ায় উড়ে গেল। দ্বিগুণ উৎসাহে সে ট্রেণের এ কামরা থেকে ও কামরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার সুন্দর চেহারা, সুন্দর গলা, সুন্দর বলবার কায়দায় হুহু করে মাল কাটতে লাগল।

অম্বিকা কালনা স্টেশনে গাড়ী থামতে সে যখন আর একটা নতুন কামরায় উঠল, তখন সোজা যার চোখের ওপর চোখ পড়ল, সে রাধারাণী। সিঁথিতে সিঁদুরের মোটা দাগ, সুখ আর আনন্দের গোলাপী আভায় তার সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা সোনার চশমা-পরা এক সুবেশ যুবক। খুশীতে উজ্জ্বল মুখ। হয়ত রাধারাণীর বর।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। রাধারাণী মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। তার ফিকে নীল রঙের পাতলা বেনারসীর ঘোমটা ঢাকা প্রকাণ্ড খোঁপা, মাঝখানে সোনার ফুল চিক্‌চিক্‌ করছে। সোনার চুড়ি আর কঙ্কন-পরা দু'টি হাত জানলার বাজুতে রেখেছে।

নিরঞ্জনের মাথাটা একবার বন্‌বন্‌ করে ঘুরে উঠল। সে পাশের বাঙ্কের লোহার শেকল ধ'রে কোনরকমে সামলে নিলে। পুরো একটা মিনিট সে তার ভরা-সর্বনাশের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল। তার পর যেন এক মত্ত হাওয়া তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে তাকে মাতিয়ে তুলল।

এবার আর আশ্চর্য মলম নয়, দাঁতের মাজন নয়। এক হাতে একটা ছোট শিশি উঁচু করে ধ'রে পরিষ্কার সুন্দর গলায় আরম্ভ করলে, মন্দার-কান্ত সেণ্ট আছে, স্বর্গের মন্দার-পারিজাতের মত গন্ধ, একটি ফোঁটায় সাত দিনের আনন্দ ধ'রে রাখে। কার চাই বলুন। কৃষ্ণকলি তরল আলতা, এমন চোখ-জুড়ান লাল রঙ আর কোন আলতায় নেই। পরে আনন্দ, পরিয়ে আনন্দ, দেখে আনন্দ। একটি শিশি নিয়ে দেখুন। সস্তা জায়গার সস্তা জিনিস নয়, কলকাতার বড় কোম্পানীর নাম করা জিনিস। যার রূপের দরকার তিনি রূপ পাবেন, যিনি সুন্দর তিনি আরও সুন্দর হবেন। রূপের কদর যাঁদের মনে, এ তাঁদের জন্যে। বলুন, কার চাই। সে যেন সওদা ফিরি করছে না, সে যেন শ্লোক উচ্চারণ করছে। সে নমুনা শিশি থেকে রুমালে রুমালে সেণ্ট্‌ মাখিয়ে দিল। কামরার আবহাওয়া ক্ষণিকের জন্যে মিষ্টি স্নিগ্ধ সৌরভে ভ'রে উঠল।

বেশ কয়েক শিশি সেণ্ট্‌, তরল আলতা বিক্রি হয়ে গেল। রাধারাণী যে সীটে বসেছিল নিরঞ্জন সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে সেই যুবককে উদ্দেশ করে বললে, নিন্‌ না স্যার, এক শিশি নিয়ে পরখ করে দেখুন। যুবকটি বাইরের দিকে তাকিয়ে কাঠ-হয়ে-বসা রাধারাণীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বললে। রাধারাণী মাথা নেড়ে বোধ হয় তার অসম্মতি জানাল।

নিন্‌ না স্যার, একবার নিয়ে দেখুন, এমন জিনিস আর পাবেন না।

রাধারাণীর বর মৃদু হেসে এক শিশি তরল আলতা, এক শিশি সেণ্ট নিলে।

বাঘনাপাড়া স্টেশন ছেড়ে গেল। নিরঞ্জন নামল না। সে সমানে তার সওদার অসংখ্য গুণকীর্তন করে চলেছে। যখন আর বলার বা কেনার আর কোন অবকাশ নেই, তখন নিরঞ্জন বার করল তার বই। কিছু বই বিক্রি হ'ল।

রাধারাণী সেই যে নিজের মুখকে আড়াল করে ব'সে আছে, সে মুখ আর সে ফেরাল না। নিরঞ্জনের বড় ইচ্ছে হচ্ছিল, আর একটি বার সেই মুখটি দেখে সে সাধ মিটিয়ে নেমে যাবে। সে সাধ বোধ হয় তার মিটবে না।

ধাত্রীগ্রাম স্টেশন ছেড়ে গাড়ী ছুটেছে সমুদ্রগড়ের দিকে। দুটো ভার এখনও তার ঝোলায় আছে। সে ভার তাকে নামাতেই হবে। মরিয়া হয়ে সে রাধারাণীর বরের সামনে সেই ঢাকাই শাড়ী আর ব্লাউজ মেলে ধ'রে সুরে যতখানি অনুনয় ক'রে বলা সম্ভব বললে, স্যার, এই শাড়ী আর ব্লাউজটা অর্ডারি ছিল, কিন্তু যে নেবে সে দেশ ছেড়ে হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। জলের দামে দেব। যদি নেন গরীবের বড় ভাল হয়।

শাড়ীর রঙ, পাড়, বুটি, আঁচলা সবই ভাল, ব্লাউজটাও সুন্দর। রাধারাণীর বর আবার রাধারাণীর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বললে। রাধারাণী না ফেরাল মুখ, না দেখল শাড়ী। যেমন বসেছিল, তেমনি বসে রইল।

নিরঞ্জন আবার অনুনয় করে বললেন, উনি লজ্জায় বোধ হয় বলতে পাচ্ছেন না। আপনি দেখুন স্যার, বড় ভাল জিনিস। যাঁর জন্যে আনা তিনি থাকলে আর—

নিরঞ্জন কথাটা শেষ করতে পারল না। তার গলাটা যেন হঠাৎ আটকে গেল।

রাধারাণীর বরের পছন্দ হয়েছিল। মাত্র পঁচিশ টাকা দাম শুনে আর কোন কথা না বলে নিয়ে নিল।

সমুদ্রগড় স্টেশনে গাড়ী থামতেই নিরঞ্জন নেমে গেল। অন্য আর এক কামরায় উঠে ভূমিকম্পে ভেঙ্গে-পড়া বাড়ীর মত শক্ত কাঠের সীটের ওপর হেলে পড়ে চুপ করে এক জায়গায় বসে রইল।

তার পর এক সময় নবদ্বীপ স্টেশনে এসে গাড়ী থামল। সে জানলা দিয়ে দেখল, রাধারাণী, রাধারাণীর

বর মোটঘাট নিয়ে নামল। স্টেশনের গেট পেরিয়ে যাবার সময় রাধারাণী বোধ হয় একবার পেছন ফিরে চাইল। হয় ত নিরঞ্জনের দেখার ভুল।

গাড়ী ছেড়ে দিল। নবদ্বীপ ষ্টেশন, রাধারাণী, রাধারাণীর বর সব ধুয়ে মুছে কোথায় মিলিয়ে গেল। ফাল্গুনের বেলা পড়ে এসেছে। চারদিকে অন্ধকারের ছায়া নেমে আস্‌ছে।

নিরঞ্জন কাটোয়া স্টেশনে নেমে গেল। টিকিটটা কাটোয়া পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে যা দাম দেবার দিয়ে দিলে।

তখন রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে আস্‌ছে। সে স্টেশন পার হয়ে গঙ্গার দিকে চল্‌ল। অনেকক্ষণ নির্জ্জন নিস্তব্ধ গঙ্গার তীরে ব'সে রইল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। আবছা জ্যোৎস্নায় গঙ্গার অধীর স্রোত রূপোর মত চক্‌ চক্‌ করছে। হাওয়ায় মৃদু ছল ছল শব্দ উঠছে। নিরঞ্জন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তার পর তার ঝোলা স্যুটকেশ একটার পর একটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝপ্‌ ঝপ্‌ ক'রে দুটো শব্দ উঠল। স্রোতের ওপর লক্ষ্মীর পাঁচালি, সচিত্র প্রেমপত্র, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা ভেসে ভেসে যেতে লাগল।

নিরঞ্জন নিজের পাগলামিতে নিজেই হো হো করে জোরে হেসে উঠল।

আবার তাকে বাক্স, প্যাঁটরা কিনতে হবে। গাঁয়ে গাঁয়ে, শহরে শহরে তার জন্যে কতজন দিন গুন্‌ছে, ভাবছে, রাগ করছে। সে ম'রে গেছে ভেবে কেউ হয় ত কোন সময় ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। না, তার বাঁধা ঘর, বাঁধা খদ্দেরদের সে আর কষ্ট দেবে না।

তার কাজ হ'ল, যার রূপ নেই, তাকে রূপ সঞ্চয় করে এনে দেওয়া, যার রূপ আছে তাকে আরও অপরূপ করা। সুন্দরকে আরও সুন্দর করা। তার সাজ, বাহার মৌমাছির মত এখান থেকে, ওখান থেকে খুঁজে পেতে এনে যাকে যেমন মানায় তার হাতে তুলে দেওয়া। যাতে প্রণয়ী পুরুষের চোখে নেশা লাগে। নিভৃত ঘরের নিভৃত আলো ক্ষণ স্বর্গের বিভ্রম এনে দেয়।

অপরের চোখে নেশা লাগলে চল্‌বে কেন? রূপ-যৌবনকে সাজাবার ভার তাহলে কে নেবে?

নিরঞ্জন শহরের আলো, জনতা, কোলাহল, লাউড-স্পীকারের গান লক্ষ্য করে শান্ত পায়ে এগিয়ে চলল।

# "পণ্ডিত পরিবারের তিনটি ঘটনা"

শ্রীপুষ্প দেবী

সেটা বোধ হয় ১৯১০ সন হবে। খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে বেড়াতে গেছি এলাহাবাদে। সেখানে তখন বিরাট্‌ কংগ্রেস একজিবিসন হচ্ছে। আমি গেছি বন্ধুর বাড়ী। ভীষণ ঘটা শুনলাম, খানিক দূরে দূরে বিশ্রামাগার স্থাপন হয়েছে—তার সাজ সজ্জাও রাজকীয়। মহামূল্যবান আসবাবপত্র ও আলোর ঝাড়ে রীতিমত ঝলমল করছে ঘরগুলি। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে গোরা সেপাই মোতায়েন করেছেন পূর্ণভাবে শান্তি-রক্ষার জন্য। আইন করেছেন যথোচিত নিদর্শন অর্থাৎ ব্যাজ না দেখালে কারুকে ঢুকতে দেবে না তারা সভামণ্ডপে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমিও গেছি বন্ধুর সঙ্গে একজিবিসন দেখতে। আমার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে কেতা-দুরস্ত ফিটফাট্‌ সাজে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চলেছেন। বন্ধু পাশ থেকে বললেন, "পণ্ডিত মতিলাল নেহরু" কী বুদ্ধিদীপ্ত তেজস্বী সৌম্য চেহারা—মন আনন্দে ভ'রে উঠল। এমন সময় হৈ হৈ উঠল সভায়। ঘটে গেল এক ঘটনা—মুহূর্ত্তের মধ্যে। গোরা প্রহরী বেত বাড়িয়ে আটকাল পণ্ডিতজীকে। ঝরঝরে ইংরেজীতে পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করলেন, 'আমায় আটকাচ্ছো কেন?" প্রহরী উত্তর দিল, "অর্ডার নেই বলে।" থমথমে মুখে পণ্ডিতজী বললেন, "জান, আমিই প্রেসিডেণ্ট! আমার আদেশ মতই সব নিয়ম তৈরি হয়েছে?" প্রহরী উত্তর দিলেন, "অত জানার আমার দরকার নেই, আমার ওপর যা নির্দ্দেশ আছে আমি সেই মত কাজ করব।"

এধারে সভায় নিদারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত, লোকে লোকারণ্য সভাস্থল—কোন রকমে পেরিয়ে কম্পিত কলেবর এক কেরাণী ছুটে এসে বেতের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মতিলালজীর জামায় ব্যাজ আটকে দিলেন—নামল বেতের আটকানি। স্যালুট করে সরে দাঁড়াল সে। ভুলে ব্যাজ পরে আসার কথা মনে ছিল না তাঁর, তাতেই ঘটেছে এই বিপত্তি। আবার দাঁড়িয়ে গেলেন পণ্ডিতজী। পার্স বের করে একখানা নোট দিলেন প্রহরীর হাতে—প্রশান্ত হাস্যে ভরে উঠল তাঁর সুন্দর মুখ—বললেন, "নাও, তোমার পানীয়র জন্য দিলাম এটা, তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণেতে ভারী খুশী হয়েছি।" নোটটি দশ টাকার কি তদূর্দ্ধ বলতে পারি না—কারণ দূর থেকে অত দেখার উপায় ছিল না। তবে পাঁচ টাকার নোটের তখন চলন ছিল না, কাজেই দশ টাকার হওয়াই সম্ভব। আর তদূর্দ্ধ বললাম শুধু পণ্ডিতজী বলেই, কারণ তাঁর মুক্ত হস্ততা জগৎ বিখ্যাত।

এর পরের ঘটনা তরুণ সাংবাদিক অমল হোমের সঙ্গে। তখন ছোট্ট একটা ঘর নিয়ে অমল হোম কাজ করতেন। এলাহাবাদ থেকে তখন একখানি সংবাদপত্র বার হ'ত। তাতে সহ-সম্পাদক ছিলেন তরুণ হোম। এই বুদ্ধি-উজ্জ্বল যুবকটিকে বড় স্নেহ করতেন পণ্ডিতজী। প্রায়ই সস্নেহে আমন্ত্রণ জানান তাঁকে। দ্বিপ্রাহরিক আহার অধিকাংশ দিনই সম্পন্ন হয় তাঁর সঙ্গে—নানা জ্ঞানগর্ভ সরস আলোচনার মধ্য দিয়ে। এমন সময় হঠাৎ চিঠি পান শ্রী হোম যে, তাঁর বাবা-মা আসতে চান এলাহাবাদ দেখতে। তাঁরা জানতে চেয়েছেন হোমের কোন অসুবিধা আছে কি না তাতে। সানন্দে হোম উত্তর দেন—"বিন্দুমাত্র নয়, তোমরা রওনা হও।" দীর্ঘদিন পিতৃমাতৃ দর্শনে বঞ্চিত পিপাসু মন অধীর হয়ে ওঠে তাঁদের অভ্যর্থনার আয়োজনে। একখানি মাত্র ঘর—তাতে নেয়ারের খাটে নিজে শোন। কিন্তু বাবা-মা এলে অন্ততঃ একখানা তক্তপোষের একান্ত প্রয়োজন। অফিসে প্রয়োজনীয় কাজটুকু সেরেই হোম বেরিয়ে যান তক্তপোষের খোঁজে। আরও দু'চারটে টুকিটাকি জিনিস চাই। লাঞ্চ খাওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে পণ্ডিতজী এসে খোঁজেন "হোম কোথায়?" সন্ত্রস্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের একজন সাহসে ভর করে জানান, তাঁর বাবা-মা এলাহাবাদে আসবেন খবর পেয়ে তিনি না খেয়েই তক্তপোষ কিনতে গেছেন। পণ্ডিতজী বললেন, "তাঁকে এলে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে বলে দিও, জরুরী কথাবার্ত্তা আছে।" ফিরে এসে হোম সব শুনলেন। এবার হোম শুধু বিব্রতই হলেন না একটু বিরক্তিও বোধ করলেন। আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেছে যা হোক্। সকাল বেলা বাবা মা এসে পড়বেন এরি মধ্যে জরুরী কাজ পড়ে গেল মতিলালজীর? বেশ অপ্রসন্ন ভাব নিয়েই পণ্ডিতজীর লাঞ্চে যোগদান করলেন শ্রী হোম। প্রথমে ত ভীষণ বকুনি খেলেন দুপুরের রোদে না খেয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। তার পর তন্ময় হয়ে গেলেন কাজের কথার মধ্যে। অনবরত নানা প্রসঙ্গ চলছে—তার মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন পণ্ডিতজী। এধারে মনে মনে অধীর হয়ে উঠছেন শ্রী হোম। তার পর যখন খেতে বলেছেন হোমকে তখন হোম বললেন, "আজ আমায় ক্ষমা করুন, এখন খাবার উপায় নেই। আমায় এক্ষুণি আবার বাজারে যেতে হবে তক্তপোষটি আনার জন্য।" কৌতুকভরা হাসিতে ভ'রে উঠল পণ্ডিতজীর প্রশান্ত মুখখানি। তিনি বললেন, "তার চেয়ে খেয়ে অফিসের কাজ সেরে বাড়ী গিয়ে দেখ কেমন করে সাজান হয়েছে তোমার বাবা-মা'র ঘর। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন তাঁরা আমার অতিথি।" বিকেলে যথারীতি অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন শ্রী হোম—দেখেন তাঁর শোবার ঘরে সাজানো ডবল বেড খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলনা কোথাও এতটুকু বাদ নেই।

এর পরে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সুযোগ্যা কন্যা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের একটি ঘটনা দিয়ে আমি আমার এ প্রবন্ধটি শেষ করব।

প্লেন ছাড়ছে—হঠাৎ খবর এল এয়ার হোষ্টেস্ অসুস্থা—প্রবল মাথার যন্ত্রণায় তিনি মাথা তুলতে পারছেন না। প্লেনে পাইলট, রেডিও অপারেটর আর তরুণ ইঞ্জিনীয়ার দেবব্রত ঘোষ। তাঁরা ত প্রমাদ গুণলেন। কিন্তু কাজ ত বন্ধ হবার নয়—নিরুপায় হয়ে শ্রী ঘোষ আনাড়ী হাতে ছুরি ধ'রে রুটি কাটতে শুরু করলেন। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আর তাঁর দুই মেয়ে। উঠে এলেন বিজয়লক্ষ্মী—তার পর তরুণ ঘোষকে সম্বোধন করে বললেন, "ইয়ংম্যান্ গেট আউট—এসব আমাদের কাজ, তুমি স'রে এস—শুধু বলে দাও তোমাদের কোথায় কি আছে?" নিজের দুই মেয়েকে সাহায্যের জন্য ডেকে নিলেন তিনি, তার পর নিপুণ হাতে আহার্য্য সাজিয়ে ২৫ জন যাত্রীকে আহার বিতরণ করলেন মাতৃমহিমায়।

যেমন পিতা তেমনি কন্যা।

* উপরোক্ত ঘটনা দুটি প্রত্যক্ষদর্শী পিতৃবন্ধু সতীনাথ ঘোষ মহাশয়ের কাছে শোনা।

# পাশ্চাত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

সেদিন আমার এক গুজরাতী কবি বন্ধুকে বললাম, "সম্প্রতি ধরা পড়ে গেছে যে রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশযাত্রা' বোদলেয়ার ও র‍্যাবোঁর কবিতা পড়ে লেখা।"

তিনি বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর গভীর পরিচয়। তিনি হেসে বললেন, "হতেই পারে না। বোদলেয়ার ও রবীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন মার্গের কবি। জীবনের প্রতি তাঁদের অ্যাপ্রোচ-ই আলাদা।"

তারপর তিনি বললেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে গুজরাতে অখো অর্থাৎ অক্ষয় বলে একজন কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ আমি সম্পাদনা করছি। লক্ষ্য করে অবাক্ হচ্ছি, জার্মান ভাষার কবি রিলকের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল আছে। একই রকম উপমা, একই রকম চিত্রকল্প।"

আমি হেসে বললাম, "তা হলে কে ধরা পড়ে গেছেন? অখো না রিলকে?"

আমরা দু'জনে একমত হলাম যে কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত হন নি, সাদৃশ্যটা আকস্মিক। সাহিত্যের ইতিহাসে অমন হয়ে থাকে। বহুবার হয়েছে। কেন যে অমন হয় তা বলা যায় না। বোধ হয় এই জন্যেই হয় যে মানুষ বিভিন্ন হলেও মানুষের মন অভিন্ন। অভিজ্ঞতাও অভিন্ন। দেশকালের সীমান্ত রেখার দ্বারা নিবদ্ধ নয়।

একবার আমি এ নিয়ে মহাবিপদে পড়েছিলাম। "রূপদর্শন" নামে আমার একটি গল্প আছে। গল্পটি পড়ে আমার সম্পূর্ণ অচেনা এক ভদ্রলোক আমাকে লেখেন, "এ ত আমার জীবনের গল্প। আপনি কার কাছে শুনলেন। নিশ্চয়ই আমার চিরশত্রু অমুকের কাছে শুনে থাকবেন। ছি ছি! এমন শত্রুতা কি করতে হয়! আমি আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি যে আপনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে নিয়ে গল্প লিখলেন?"

ও গল্প পরের মুখে শোনা গল্প নয়। ওটা লিখতে লিখতে কত রকম মোড় নেয় সে আমিই জানি আর জানেন আমার গৃহিণী। তেমনি আমার আর একটি গল্প—"মন মেলে ত মনের মানুষ মেলে না।" তখন যে ছিল শিশু সে সাবালক হয়ে বলল, "এ গল্প আপনি চেখভের ডারলিং পড়ে লিখেছেন।" হা ভগবান্! এসব পাঠকের সঙ্গে তর্ক করে কে!

কিন্তু "রূপদর্শনে"র পাঠক সম্বন্ধে বলছিলাম। বলা শেষ হয় নি। একবার পাটনা গিয়ে শুনি, এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে ব্যাকুল। আমার যদি সময় থাকে তা হলে পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা করে যাবেন। ইনিই তিনি যাঁর জীবনের গল্প আমি বাটপাড়ি করে পেয়েছি। বেশ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষটি। কিন্তু ওই যে একটি কমপ্লেক্স। সেটি হাজার যুক্তি দেখালেও যাবার নয়। পাঁচ মিনিট কেন, এক ঘণ্টা কি আরো বেশী সময় আমি তাঁকে দিই। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন থেকে মুছে ফেলা গেল না যে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমার গল্পের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। সাদৃশ্য থাকতে পারে কিছু। কিন্তু আমি তার জন্যে দায়ী নই। তাঁর সেই শত্রুটিকেও আমি চিনি নে।

এ কাহিনী কিন্তু এখানে শেষ নয়। বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক বললেন, "এই আপেলগুলি আমি আপনার জন্যেই এনেছি। ওঁরা পাঠিয়েছেন। নিতেই হবে।"

বড় বড় এক ঝুড়ি আপেল। আমি পথে খাবার জন্যে একটা কি দুটো নিতে রাজী ছিলাম। তিনি কিন্তু আস্ত ঝুড়িটাই আমার গাড়ীতে তুলে দিলেন। কোন আপত্তি শুনলেন না। গল্প লিখে আমি সফল হয়েছি।

আর একটি ঘটনা বলি। "হাসন সখী" বলে আমার আর একটি গল্প আছে। এই গল্পটি যখন লিখি তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে হঠাৎ একটি মেয়ে এসে আমার বাড়ীতে উঠবে। টি বি হাসপাতাল থেকে অকালে ছাড়া পেয়েছে, কোথায় যাবে জানে না। অনেক দিন পরে শুনলাম সে মধুপুরে যায়, সেরে ওঠে, কে একজন তাকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। কলকাতায় পরে একদিন ওরা এসে আমাকে প্রণাম করে গেল। সঙ্গে ওদের শিশু। তা হলে কি আমি "হাসন সখী" লিখেছিলাম ওদের গল্পটি স্বচক্ষে দেখে বা স্বকর্ণে শুনে? তা

নয়। জীবনও অনেক সময় সাহিত্যের অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে তাও নয়। এটা পুরোপুরি আকস্মিক। এতে শুধু এ সত্যই প্রমাণ করছে যে মানুষের মন অভিন্ন। মানুষের মন দেশকালের সীমারেখা মানে না। মানুষের জীবনেরও অদৃশ্য প্যাটার্ন আছে।

সুতরাং কেউ কারও দ্বারা প্রভাবিত নাও হতে পারে। পরে জন্মালেও।

অথচ আমরা প্রায়ই শুনি যে অমুক অমুকের দ্বারা প্রভাবিত। আর সাধারণতঃ প্রভাব যাঁর উপর পড়ে তিনি প্রাচ্য, আর যাঁর প্রভাব পড়ে তিনি পাশ্চাত্য। রিলকের উপর অখোর প্রভাব পড়তে পারে না। তিনি যে পাশ্চাত্য। সুতরাং অখোর উপরেই রিলকের প্রভাব পড়া উচিত। যদি না তিনি হতেন সপ্তদশ শতাব্দীর।

পশ্চিমের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ঐতিহ্য আজকের নয়। দেড় শতাব্দীর। আবার এর বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিক্রিয়ার ঐতিহ্যও আজকের নয়। এটাও কিছু কম দেড় শতাব্দীর।

ইংরেজ না এলে, ইংরেজী ভাষা প্রবর্তিত না হলে, ইংরেজী সাহিত্যের বা ইংরেজীর মারফৎ ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে বাংলা সাহিত্য সেই ভারতচন্দ্রের যুগেই পায়চারি করতে থাকত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবই হত না। এ সাহিত্যের গঙ্গোত্রী ভারতের মানসসরোবর থেকে এসেছে। কিন্তু এর গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ইউরোপের ভূমধ্য সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর এরাও এসে মিলেছে। এদের সঙ্গে মেলানোর ভার যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রামমোহন রায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও নগণ্য নন। পূর্ব পশ্চিমের মিলন ঘটনার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা তাঁর কাছে পুরুষানুক্রমে স্বতঃসিদ্ধ ছিল। কারণ তিনি ছিলেন রাজা রামমোহনের উত্তর সাধক ও "প্রিন্স" দ্বারকানাথের পৌত্র। এঁরা উভয়েই পশ্চিমের মাটিতে দেহরক্ষা করে সে মাটিকে আপনার করে নিয়েছিলেন।

পশ্চিম অপরের পক্ষে সুদূর হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর-বংশীয়দের কাছে নির্বান্ধব ছিল না। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বিবাহ হয়েছিল ইংরেজের ঘরে। সত্যেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে থেকে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্যে তৈরি হন। রবীন্দ্রনাথ সতেরো বছর বয়সে লণ্ডনে পড়েছিলেন। পরে আবার সেখানে গিয়ে ব্যারিষ্টার হতেন, এই ছিল তাঁর পিতার অভিপ্রায়। বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ হ'ল বলে কি তাঁর জীবনের পাশ্চাত্য পর্ব হাওয়া হয়ে গেল? বিস্তর ইংরেজী বই পড়তে হয়েছিল তাঁকে, বিস্তর ইংরেজী বই তিনি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে পড়েছিলেন। অনেক ইংরেজী কবিতা তিনি নিজের হাতে খাতায় তুলেছিলেন। লঘুচেতাদের মত তিনি গণনা করেন নি যে, এটা আমাদের, ওটা ওদের। শেলী কীটস টেনিসন সুইনবার্ণ স্বদেশী না বিদেশী এ প্রশ্ন তাঁর মত কবিপ্রকৃতির মানুষের পক্ষে অবান্তর বা গৌণ। আর তিনিও তাঁদেরই মত রোমান্টিক বলে একই ভাবের ভাবুক। ধাত বলে একটা জিনিষ আছে, সেটা জাত-কুলের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

আর সেই রোমান্টিক ধারা কেবল যে একটিমাত্র দেশে নিবদ্ধ ছিল তা নয়, প্রবাহিত হচ্ছিল একটা মহাদেশের উপর দিয়ে, আটলান্টিকের ও-পারেও তার বিস্তার ছিল। তার সম্পর্ক বিশেষ একটা স্থানের সঙ্গে নয়, বিশেষ একটা কালের সঙ্গে। বিশেষ একটা কি দুটো শতাব্দীর সঙ্গে। ইতিহাস যে কেবল ইউরোপ আমেরিকাকে আধুনিক যুগে উপনীত করে দিয়ে ক্ষান্ত ছিল তা নয়, এশিয়াকে আধুনিক করাও তার কল্পনায় ছিল। আর ইতিহাস কাজ করে মানুষেরই মাধ্যমে। আধুনিক যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে একটি হ'ল রোমান্টিক পর্যায়। এই পর্যায়ই বা কেন ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে নিবদ্ধ থাকবে? একেও চালিয়ে যেতে হবে মহাদেশ থেকে মহাদেশে। মানুষেরই মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তেমনি তাঁর স্বকাল সম্বন্ধেও। যেকালে জন্মেছেন সেকালের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হতে হলে পশ্চিমযাত্রা না করে উপায় নেই। কারণ স্বদেশের রাজধানী যেমন কলকাতায়, স্বকালের রাজধানী তেমনি লণ্ডনে। বা প্যারিসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই রকমই ছিল। ইদানীং বলা যেতে পারে নিউ ইয়র্কে। বা মস্কোতে। পরবর্তী বয়সে তিনি নিউইয়র্ক ও মস্কোতেও যান স্বকালের নাড়ী টিপতে। তাঁর মত টনটনে কালচেতনা বাংলা দেশে বিরল। তিনি যখন কলকাতা থেকে শিলাইদায় বা পতিসরে যেতেন জমিদারির কাজে তখন তাঁর সঙ্গে একরাশ ইংরেজী বই যেত। বিদেশী বলে নয়। স্বকালীন বলে। ও ছাড়া আর কোন উপায়েই তিনি স্বকালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারতেন না। জমিদারি থেকে কলকাতায় ফিরলে ছুটে যেতেন থ্যাকার কোম্পানীর বইয়ের দোকানে। ইংরেজী বই কিনতেন। বৈদেশিক বলে নয়, আধুনিক বলে। চিন্তার দিক্ থেকে

আপ-টু-ডেট হবার জন্যে তাঁর মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তা ছাড়া তাঁর সিভিলিয়ান ও ব্যারিষ্টার বন্ধুদের আড্ডায় কল্কে পেতে হলেও ত হালফিল ইংরেজী বই পড়া চাই। নইলে তাঁরা ভাববেন অর্ধশিক্ষিত জমিদারনন্দন। যে-সমাজে তিনি মিশতেন সে-সমাজের কারও চেয়ে তিনি কম হাল ফ্যাশানের ছিলেন না। এমন কি পোশাকে প্রসাধনেও।

আমরা মনে মনে একটি স্বদেশী ঋষির ছবি এঁকে বসে আছি বলে তাঁর বেলা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা উঠছে। অন্যের পক্ষে যেটা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব তাঁর পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক। কারণ তিনি স্বকালের সঙ্গে একাকার। আর স্বকাল ত সারা দুনিয়া জুড়ে। তার মূল স্রোত ত পশ্চিম ইউরোপে। অতি বাল্যকাল থেকেই তিনি তার সঙ্গে যুক্ত। কেবল বই পড়ে নয়, গান শুনে, গান বেঁধে, বাজনা কিনে, বাজনা বাজিয়ে। তেমনি ছবি দেখে, ছবি এঁকে। এখানে আমি পরিষ্কার ভাবে বলে রাখতে চাই যে ইউরোপেরও প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে সেটা তেমন প্রত্যক্ষ নয় যেমন ইউরোপীয়দের কাছে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগে যাত্রা করেন নি। করেছিলেন ইউরোপের আধুনিক যুগে। আমরাও সাধারণতঃ তাই করে থাকি। সেইজন্যে ইউরোপ বলতে আমরা বুঝি আধুনিক যুগের ইউরোপ। আমাদের কবিদের মধ্যে একমাত্র মাইকেলকেই দেখি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপ সম্বন্ধে সচেতন হতে। ইংরেজীতে না লিখে বাংলায় লিখলে আর একজনের নাম করতাম। শ্রীঅরবিন্দ। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এঁরা ঢের বেশী ইউরোপীয়।

আসলে হয়েছে এই যে, আমাদের কাছে দেশকাল গুলিয়ে গেছে। আমরা দেশকে ভাবি কাল। কালকে ভাবি দেশ। ইউরোপকে ভাবি আধুনিক। আধুনিককে ভাবি ইউরোপ। রবীন্দ্রনাথও এই মানসিক অভ্যাসের উর্ধ্বে ছিলেন না। পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটানর জন্যে তাঁর মধ্যে যে উৎসাহ ছিল সে উৎসাহ হোমার ভার্জিল বা প্লেটো অ্যারিস্টটল বা দান্তে পেত্রার্কার প্রতি উন্মুখ ছিল না। ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের অভাব। ইউরোপ তাঁর কাছে আধুনিক ইউরোপ। অথচ ভারতবর্ষ প্রাচীন। যখনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের তুলনা করতে গেছেন তখনি লক্ষ্য করি, তিনি তুলনাটা করেছেন আধুনিক ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের নয়, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের নয়, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের। অর্থাৎ বৃদ্ধের সঙ্গে বালকের। একজনের আছে শুধু অতীত, আরেকজনের আছে শুধু বর্তমান। এ ধরনের মিলন সমানে সমানে নয়। এ যেন একটি পুরনো বোতল থেকে পুরনো মদ ও আরেকটি পুরনো বোতল থেকে নতুন মদ নিয়ে ককটেল বানানো।

মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ স্বকালকেই খুঁজতে বিরিয়ে ইউরোপে যান, ইউরোপকে খুঁজতে বেরিয়ে ইউরোপে যান নি। তাঁর ইউরোপ রেনেসাঁসের পরবর্তী আধুনিক ইউরোপ, তার পূর্বের প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ইউরোপ নয়। সেইজন্যে ইউরোপকে ইণ্টারপ্রেট করার ভার তাঁর উপরে পড়ে নি। অথচ ভারতবর্ষকে ইণ্টারপ্রেট করার ভার তাঁর উপরে পড়ে ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" প্রকাশনের সময় থেকেই। সে ভারত প্রধানত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত। ইউরোপীয় পাঠকদের চোখে তিনি প্রাচীন প্রাচী'র বাণীমূর্তি। তারা তাঁর আধুনিক রূপ দেখতে চায় নি। বুঝতে পারে নি। তাই তাঁকে আবার যেতে হ'ল পশ্চিমের দরবারে। এবার তসবীর হাতে। এবার যেন মনে হ'ল চিনেছে তাঁকে আধুনিক বলে। আধুনিক বলে চিহ্নুক এইটেই তিনি চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় বলে চিহ্নুক এটা ত তিনি চান নি। ইউরোপীয় বলে তারাও তাঁকে চেনে নি। কোন দিনই তিনি ইউরোপীয় বলে পরিচয় দেন নি, দিতে চান নি। ইউরোপীয় হলে ত পরিচয় দেবেন। ইউরোপীয় তিনি কোনকালেই ছিলেন না। সেদিক্ থেকে তিনি পুরোপুরি ভারতীয়।

তাঁর উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যা পড়েছে তা একজন ভারতীয়ের উপর স্বকালের প্রভাব। যুগধর্মের প্রভাব। ধাতটা রোমাণ্টিক বলে ইউরোপীয় বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু সব ইউরোপীয় কবি রোমাণ্টিক নন। রোমাণ্টিক ধারার বহু পূর্বে ইউরোপ ছিল, বহু পরেও থাকবে। রোমাণ্টিকতা ও ইউরোপীয়তা একার্থক নয়, এককালীন নয়। সত্যিকার পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ঢের বেশী পড়েছে মাইকেলের উপর, শ্রীঅরবিন্দের উপর।

স্বদেশ ও স্বকাল একসঙ্গে উভয়কেই ভালবাসা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন আধুনিক যুগকে ও তার কেন্দ্রস্থল পশ্চিম মহাদেশকে ভালবেসেছিলেন। ইংরেজ জাতির উপরেও তাঁর ছিল অপার প্রীতি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়াতে সেকালের বড় বড় সাহেবসুবোরা অভিনয় দেখতে বা সামাজিকতা করতে যেতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইউরোপীয় বন্ধুদের জন্যে খোলা ছিল বাগানবাড়ীর দ্বার। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে একটা উল্টো স্রোত

বইতে স্থুরু করে। ইংরেজরাও আর সে ইংরেজ নয় যারা সমান ভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছুক, ভারতীয়দের শ্রদ্ধা করতে প্রস্তুত। ভারতীয়রাও আর সে ভারতীয় নয় যারা ইংরেজ রাজত্বকে বিধির বিধান বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত। দেশীয় স্বার্থের সঙ্গে বিদেশী স্বার্থের বিরোধ দিন দিন প্রকট হতে থাকে। সামান্য একটু চ্যালেঞ্জের ভাব দেখলেই ইংরেজ নিজ মূর্তি ধারণ করে। যেন আর একটা সিপাহী বিদ্রোহ বাধল বলে! সামাজিক সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে কি করে? ছিন্ন হয় না, কিন্তু তার মধ্যেও বিরোধের শনি ঢোকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইংরেজরা একান্ত সাম্রাজ্য-সচেতন, ভারতীয়রা একান্ত স্বদেশ-সচেতন। স্বদেশ-সচেতন থেকে অতীত-সচেতন। অতীত-সচেতন থেকে অতীত-উপাসক। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে কোথাও কোন মিল খুঁজে পায় না। আধুনিক ইউ-রোপের দিকে তাকালে কেবল অসুরের প্রতাপ দেখে, তাদের শুক্রাচার্য বিজ্ঞানের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন। পশ্চিমের কাছে বিজ্ঞান ছাড়া শেখবার আর কিছু নেই। ইউরোপের শিল্প, ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন একদা আকর্ষণ জাগিয়েছিল। তখন তার দরুন কেউ লজ্জিত হয় নি। এখন এল লজ্জিত হয়ে বিকর্ষণ বোধ করার যুগ। আধুনিক ইউরোপের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকে নিবদ্ধ করা হ'ল প্রাচীন ভারতের উপরে। আমাদের কী নেই যে আমরা পরের কাছে যাব! ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাই যেন আমাদের পরাধীন করেছে, বাড়তে দিচ্ছে না, বাঁচতে দিচ্ছে না। দাস মানসিকতার সৃষ্টি করে বিদেশী প্রভুত্বকে সহনীয় করেছে, দৃঢ়মূল করেছে। রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন হতে হলে সাংস্কৃতিক অর্থে নিঃসম্পর্কীয় হতে হবে। সমাজে যেমন তফাৎ থাকতে হবে শিক্ষাতেও তেমনি। হৈ হৈ করে যাঁরা একদিন ইংরেজী শিখে অগ্রগামী হয়েছিলেন তাঁদেরই বংশধরদের মধ্যে দেখা দিল ইংরেজীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংস্কৃতের উপর অচলা ভক্তি। অবিকল টুলো পণ্ডিতের মত। যদিও ইংরেজী এঁরা কেউ ছাড়লেন না। "বিলেতফেরৎ টানছে হুঁকো সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চায্যি।"

ছুনিয়াটাকে ছু'ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হ'ল। এক ভাগে আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, নীতি, সমাজ। অন্য ভাগে আধিভৌতিকতা, বিজ্ঞান, কূটনীতি, রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ সমাজ গড়েছে, রাষ্ট্র গড়ে নি। ইউরোপ রাষ্ট্র গড়েছে, সমাজ গড়ে নি। এই ধরনের থীসিস ও অ্যান্টি-থীসিস খাড়া করে একদল বললেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। মিলন কোনদিন হবে না।" আরেকদল বললেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। মিলন ঘটাতেই হবে।" অর্থাৎ থীসিস ও অ্যান্টিথীসিসের সিন্‌থেসিস সম্ভব ও সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ে বিশ্বাস করতেন, এ বিশ্বাস তিনি রাজনৈতিক সংঘাতের দিনেও ত্যাগ করেন নি। কিন্তু যে ছু'টি পক্ষের সমন্বয় তাঁর অন্বিষ্ট ছিল সে ছু'টি পক্ষ কি বাস্তব না মনগড়া? কেমন করে তিনি ধরে নিলেন যে, ভারত আধ্যাত্মিক ও ইউরোপ তা নয়? কি দেখে তাঁর ধারণা জন্মাল যে, ভারত গড়েছে সমাজ ও ইউরোপ গড়েছে রাষ্ট্র?

থীসিসটাই ছিল ভুল। অ্যান্টিথীসিসটাও। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" যেই আবিষ্কৃত হ'ল অমনি ধ্বসে পড়ল এই তাসের কেল্লা। মহাভারত না হয় কবিকল্পনা, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক স্বরূপ ত নিরেট বাস্তব। হারিয়ে-যাওয়া বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ ভারতের বাইরে পাওয়া গেল। বৌদ্ধদর্শনও ইউরোপীয় দর্শনের মত তথাকথিত জড়বাদী। প্রাচীন ভারতের যে ছবি ফুটল তা হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আঁকা ছবি নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবনে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, যদিও রামমোহনের ধারার থেকে সরে যান নি। ছুই নৌকায় পা রাখতে তাঁর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছিল। "গোরা"র পর তিনি হিন্দু পুনরুত্থান-বাদীদের আওতার বাইরে চলে যান। কিন্তু তার পরেও পূর্বোক্ত থীসিস তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়ে নি, ছাড়ল আরও অনেকদিন পরে। নোবেল প্রাইজের পরেও তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের আধ্যাত্মিকতা বনাম বস্তুপরায়ণতার কথা বলে বেড়িয়েছেন। সমাজ বনাম রাষ্ট্র নিয়ে তাঁর চিন্তা পূর্বের জের টেনে চলেছে। বেশ একটা পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল রুশভ্রমণের পরে। ইতিমধ্যেই তার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গেছল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকে পূর্ব-পশ্চিমের থীসিস অ্যান্টিথীসিস অন্তর্হিত বা অদৃশ্য। তা বলে পূর্ব-পশ্চিম এক হয়ে গেল বা উড়ে গেল তা নয়। শুধু বিরোধকল্পনাটাই প্রত্যাহৃত হ'ল। রামমোহনাহুগ রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল সুরের সঙ্গে এর মিল আছে। আত্মপর ভেদবুদ্ধি তাঁর মধ্যে যদি এসে থাকে তবে সেটা স্বদেশের পরাধীন দশার প্রেরণায়।

পরাধীনতার বেদনা অন্তরে নিত্য বহন করলেও মনের দরজা-জানালা তিনি নিত্য খোলা রেখেছিলেন। খোলা রাখার জন্যে তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড প্যাশন ছিল।

দেশের নামে জাতির নামে যখনি দরজা-জানালা বন্ধ রাখার প্রস্তাব উঠেছে তখনি তিনি প্রচণ্ড প্যাশনের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর যত না বিরোধ, স্বদেশের কূপমণ্ডুকদের সঙ্গে ততোধিক। তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন যে ভারতের পরাধীনতার কারণই হ'ল ওই কূপমণ্ডুকতা। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ, অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, মানবাত্মার অভিনব প্রকাশের প্রতি বিমুখভাব, যে জগতে জন্মেছি সেই জগতের পূর্ণ পরিচয় নিতে অনাগ্রহ, বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি সাগর-গিরি লঙ্ঘনের জন্যে অহরহ যে আহ্বান জানাচ্ছে সে আহ্বানের প্রতি অসাড়তা। দেশের স্বাধীনতার জন্যে পঙ্গু ও অন্ধ হতে হবে এমন কোন বিধান তিনি মানতে রাজী ছিলেন না, কারণ অমনি করেই দেশ পরাধীন হয়েছিল। ওই শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করেই।

দরজা-জানালা নিত্য খোলা রাখলে আলো-বাতাস ঢুকবেই। সে আলো-বাতাস প্রকৃতির আলো-বাতাসেরই মত এক দেশ থেকে অপর দেশে যায়, যেখানে তার আধিক্য সেখান থেকে যায় যেখানে তার ন্যূনতা সেখানে। একদা সে ভারত থেকে চীনে গেছল, জাপানে গেছল। ভারতে এসেছিল গ্রীস থেকে, ইরাণ থেকে। এই যে অবিরত যাওয়া-আসা, একে বেড়া দিয়ে বন্ধ করতে গেলেই বিপত্তি। অপর পক্ষের যুক্তি হ'ল, বাঁধ না দিলে সব ভেসে যাবে যে। ভারতের আপনার বলতে আর কিছু থাকবে না। ভারত আর ভারত থাকবে না। হয়ে যাবে কালো ইংলণ্ড। ভারতীয়রা হবে কালো ইংরেজ। ভারতীয় সংস্কৃতি হবে নকল ইউরোপীয় সংস্কৃতি। পরাধীনতা যদি মানসিক হয়, আত্মিক হয় তবে ওর চেয়ে বড় বিপদ্ আর কি হতে পারে! সুতরাং রোধ কর পাশ্চাত্ত্য প্লাবন।

রবীন্দ্রনাথ যে অপর পক্ষের যুক্তিতে ভোলেন নি তা নয়, তবু মোটের উপর রামমোহন দ্বারকানাথের পক্ষেই রয়েছেন ও তার দরুন নিন্দাবাদ সয়েছেন। সঙ্কীর্ণতা প্রচার করে সুলভ প্রশংসা কুড়োতে যান নি। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকেও সতর্ক থাকতে হয়েছে যাতে পশ্চিম থেকে জোয়ার এসে সত্যি সত্যি ভারতের মহত্তম আদর্শকে ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। ভারতের অন্তরতম বাণীকে স্তব্ধ করে না দেয়। প্রতিপক্ষের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ রক্ষণযোগ্য ও রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু তাঁরা না করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বর্ধনযোগ্য ও বৃদ্ধি করতেই হবে। তাঁদের ভারতীয়তা কোন্ অতীত শতাব্দীতে শেষ হয়ে গেছে। তাঁর ভারতীয়তা অশেষ। তাঁদের ভারতসত্তায় বিশ্বের স্থান নেই। তাঁর ভারতসত্তা বিশ্বকে বরণ করে এনে আপনার করতে, আত্মসাৎ করতে ব্যাকুল।

তাহলে মোদ্দা কথাটা কি দাঁড়াল? রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়েছে কি পড়ে নি? পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়ে তাঁকে ভারতীয়তাভ্রষ্ট করেছে কি করে নি? এর উত্তর, জানালা দরজা খোলা রাখলে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়বেই। কিন্তু ভারতীয়তা হতে ভ্রষ্ট করবে এতখানি শক্তি কি তার আছে? বরং ভারতীয়তাকে পুষ্ট করবে, যদি ভারতীয় আত্মার শক্তি তার চেয়ে বেশী হয়। রবীন্দ্রনাথের সহজাত জারক শক্তি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে জীর্ণ করে তাঁর জীবনের তথা সৃষ্টির পুষ্টি সাধন করেছে।

হাঁ, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়েছে বই কি। আদিপর্ব থেকেই পড়েছে। অন্তিম পর্বেও তার রেশ আছে। তাঁর শেষ বয়সের জগৎ যে কোনো একজন আধুনিক ইউরোপীয় কবি ও শিল্পীর জগৎ। আধুনিকতম পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান থেকেই তিনি তাকে লাভ করেছেন। উপনিষদ্ থেকে নয়। তা বলে উপনিষদ্ থেকে, বাউলের গান থেকে, আপনার ধ্যান থেকে তিনি যা পেয়েছিলেন তাকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তঃসার ত সেই। রবীন্দ্রনাথ একদিক্ দিয়ে যেমন শেলী কীটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ টেনিসন ব্রাউনিং প্রভৃতি রোমান্টিক ইউ-রোপীয় কবিদের পর্যায়ভুক্ত তেমনি আরেক দিক্ দিয়ে বাল্মীকি ব্যাসদেব কালিদাস বাণভট্ট বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস মীরা কবীর প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কবি কথাকার সাধক গায়কদের পরম্পরাভুক্ত। বাউল বৈষ্ণবদেরও। একটিকে বলা যেতে পারে স্বকালের ধারা। আরেকটিকে স্বদেশের ধারা। দুই বিচিত্র ধারায় এমন অনায়াস অধিকার ও বিহার ইতিহাসে অপূর্ব।

কিন্তু এ হেন সব্যসাচীরও সীমাবন্ধন ছিল। প্রাচীন গ্রীস থেকে বহমান ইউরোপীয় ক্লাসিকাল ধারায় রবীন্দ্র-নাথের আকণ্ঠ নিমজ্জনের প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে ভারতীয় ক্লাসিকাল ধারায় তিনি আজীবন মগ্ন। দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রোমান্টিকদের তিনি অন্তরঙ্গ হলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ জুড়ে যে রোমান্টিকবিরাগী বা রোমান্টিকবিরোধী মোহমুক্ত মেজাজ দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করা দূরে থাক, বিকর্ষণ বোধ করেন। তাঁর অভ্যাস

মতো দরজা জানালা খোলা যদিও তিনি রেখেছিলেন সেই হাড় কাঁপানো হিমেল হাওয়া তাঁর মনে ফুল ধরাতে পারে নি, বরং ঝরিয়ে নিয়ে গেছে পরম কারুণিক বিশ্ব-পিতার উপর একান্ত নির্ভরতা। ঈশ্বরের বদলে তিনি মানুষের দিকেই আরো বেশী করে ঝুঁকেছেন। প্রকৃতির দিকেও। মোটের উপর উত্তরসামরিক ইউরোপের বা আমেরিকার সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা ঘটে নি। এলিয়ট বা পাউণ্ড বা অডেন বা পরবর্তী বয়সের ইয়েটস, কারো সঙ্গে তিনি তেমন সাযুজ্য অনুভব করেন নি।

আধুনিক ইউরোপের স্বকালকেই যদি রবীন্দ্রনাথের স্বকাল বলি, তবে লক্ষ্য করি, প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি তাঁর স্বকালের সঙ্গে তাল রেখে দৌড়তে পারছেন না। ব্রাউনিং থাকলে তিনিও কি পারতেন? উত্তরসামরিক যুগে ঘোষণা করতে ভরসা পেতেন কি যে,

"God's in His Heaven,
All's right with the world."

উত্তরসামরিক যুগ বলেছি, বলতে পারতুম উত্তরবৈপ্লবিক যুগ। মানুষের চেতনা ও প্রত্যয় ও আদর্শ ও নীতি সব কিছুতে ভাঙন ধরেছে। ভাঙনের পরে হয়ত গঠনের দিনও আসবে, কিন্তু গঠন ঠিক আগেকার ছাঁচে নয়। প্রাক্‌সামরিক ইংরেজ কবিসমাজ দিশেহারা। ফরাসী কবিসমাজও তাই। জার্মানীতে ও ইটালীতে ফাসিস্ট কমিউনিস্টের দ্বৈরথ কবিকুলকেও উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়ে মহামূল্য উপদেশ দিয়ে আসেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিয়ে আসেন না তাদের মোহ-মুক্তি ও হতাশা ও হতবিশ্বাস, তাদের উন্মত্ত মতবাদ-ঘটিত দ্বন্দ্ব। যে সব উপাদান দিয়ে উত্তরসামরিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য রচিত। অবশ্য তিনি বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কি। কিন্তু সত্তা দিয়ে বোধ করেন নি এর সমগ্রতা। যেমন করেছিলেন টলস্টয় তাঁর শেষ জীবনে।

আসলে রবীন্দ্রনাথকে দেবার মতো আর কিছু ছিল না ইউরোপের। বরং কিছু ছিল রাশিয়ার। সোভিয়েট রাশিয়ার। অথচ ইউরোপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল না। বহুকালের টান। ইউরোপের দৃষ্টিতে তিনি একজন প্রাক্‌সামরিক যুগের আদর্শবাদী মিষ্টিক, একজন উর্ধ্বচারী স্বপ্নদ্রষ্টা। কিন্তু এই রক্তাক্ত ধরণীর ক্লেদকর্দমের বাণী-মূর্তি নন। সাম্প্রতিককালের প্রতিনিধি নন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথেরই ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হয়েছিল। তার থেকে গান নিয়ে গির্জায় গাওয়া হয়েছিল। গথিক ছাঁদের হরফে ছাপা সোনার জল দেওয়া কার্ড আমিও পরে দেখেছি। তিন-তিনজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া কবি বা কবিপত্নী তার অনুবাদ করেছেন বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আঁদ্রে জীদ, গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল, Jimenez-জায়া। এমন ভাগ্য কবে কার হয়েছে! এমনি কত লোকের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। সারা বিশ্বে।

রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়েছে এটা আধখানা সত্য। বাকী আধখানা সত্য হচ্ছে, পশ্চিমের উপরেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। কিছু নিয়েছিলেন বলেই তিনি কিছু নেওয়াতে পেরেছিলেন। নইলে ইউরোপ কি আর কারো হাত থেকে কিছু নেয়! সমন্বয় না ঘটুক, বিনিময় ঘটেছে। "দেবে আর নেবে মিলিবে মেলাবে, যাবে না ফিরে", কবির এই মন্ত্র অমোঘ।
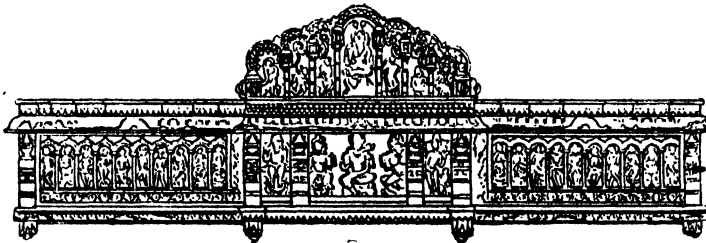
# খেলাঘর

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত)

শ্রীবিভা সরকার

জান বন্ধু! রাত্রে ঘুম হয় না—প্রার্থনা করি। সে প্রার্থনা আমার পরমতমের পায়ে গিয়ে পৌঁছায় না, আমি ব্যর্থ হয়ে যাই। আতুর হয়ে উঠে মন বিহ্বল বেদনায়। আমি যে পারছি না বন্ধু! কিছুতেই পারছি না মনকে বাঁধতে—চিত্তকে স্থির করতে।

মানুষ যে অবলম্বন চায়—আঁকড়ে ধরতে চায়।

কালবৈশাখীর ঝড় কি দেখেছ বন্ধু! সে হঠাৎ আসে—সব লণ্ডভণ্ড করে ভেঙ্গে-চুরে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে যায়। তেমনি করেই ঝড় উঠল আমারও জীবনে, অকারণে, অপ্রত্যাশিতভাবে। একটি রাতে কি থেকে কি হয়ে গেল। পায়ের তলার নরম মাটি কঙ্করে কণ্টকে ভরে উঠল। বিষাক্ত হয়ে উঠল নিঃশ্বাসবায়ু। সে কালরাত্রি, সে ভয়ঙ্কর রাত্রিও শেষ হয়ে গেল—জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ঘূর্ণি। তার পর নিজেকে দেখলুম এক উদ্বাস্তু উদ্ধার-শিবিরের দর্শনীয় জীবরূপে। সে যে কি দুঃসহ দুর্বিষহ মুহূর্ত্ত, বোঝাব কেমন করে!

কত ভালবাসায় মানুষ নীড় গড়ে। বিশেষ করে মেয়েমানুষ। আমিও বুঝি গড়েছিলাম আমার জীবনের সবটুকু নিঃশেষ করে, নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিয়ে একখানি ছায়াঘন মমতায়-ভরা নীড়। ভেবেছিলাম, বিশ্বাস করতাম সে ঘরকে আমার একান্ত আপন বলেই। সে যে আমার অঙ্গের অঙ্গস্বরূপ, প্রাণ হতে প্রাণস্বরূপ। তবু আজ আমি আমার সেই পরম প্রিয়অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। বিকলাঙ্গ দেখেছ ত ভাই? বিকলাঙ্গও বেঁচে থাকে, আমিও বেঁচে আছি—কিন্তু বোবা-প্রশ্নে মনকে শুধাই, এও কি সেই আমি? কোনও উত্তর পাই না। আমার পৃথিবী আজ বোবা হয়ে গেছে—দেখছি তার ভয়ঙ্করী স্বার্থ-কলুষিত রূপ। দেখেছি মানুষের মনুষ্যত্বহীন নগ্নছবি। আমি আজ মূক হয়ে গেছি বিহ্বল বেদনায়।

দেবতা কোথায়?—হাতড়ে মরি বুকের ভেতর। মাথা কুটি সেই নিষ্ঠুরের পায় যাঁর স্মরণে আজন্ম জ্বেলেছি তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার প্রদীপটি। বুকের ভেতরটা যে হাহাকার করে। দেবতা আমার হারিয়ে যায়। কোনও সান্ত্বনা খুঁজে পাই না। প্রার্থনা আমার ব্যর্থ হয়ে যায়।

এ আতুরতার কি আমার শেষ আছে—কালসমুদ্রে উত্তীর্ণ করতে কই সে আমার কর্ণধার? হঠাৎ যে তুফান উঠল। সে তুফানে আমার সোনার তরী ডুবে গেল। লণ্ডভণ্ড হয়ে ভরাডুবি হয়ে গেল। অথৈ জলে হাবুডুবু খাই। তীর কি পাব কোনও দিন?

দুঃখ পেয়ো না বন্ধু! আরও আছে।—দীর্ঘ বাইশ বছর ধ'রে যে স্বামীর ছায়ার ছায়া, কায়ার কায়া হয়ে আপন সত্তা বিলিয়ে দিয়েছিলাম, আমার দুঃখের দিনে আমার একান্ত প্রয়োজনের দিনে, সে আমায় চিনতে পারল না বা চিনল না। চমকে ভাবলাম, এ কি সত্যি! উনি আমি কি পর? আমরা যে চিরন্তন। আমরা যে এক। কত ছোট ছোট ঘটনা, কত নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের আশা-আনন্দের দোলায় দোলা জীবন-স্মৃতির এক-একটা পাতা কে যেন চোখের সামনে উল্টে চলে।

—আমি যে গাঁয়ের মেয়ে, নেহাতই নাবালিকা এসেছিলাম বাপের ঘর ছেড়ে, এঁরই হাত ধরে এঁর ঘরে। তার পর বাইশটি বছর ধ'রে এ ঘরেই ত আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। তবু আমার এত বড় দুঃখের দিনে সে আমায় চিনল না। আমার চোখের জল মোছাল না।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—সেই ছেলে বয়সের ছেলেমানুষি। সেই পুতুল খেলার কথা। একদিন খেলতে খেলতে এক খেলার পুতুল ভেঙে গিয়েছিল। কেঁদেছিলাম সেদিন ছেলেমানুষি কান্না। আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বামী শুনেছিলেন। গুরুজনের দৃষ্টি এড়িয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সেই দূর গঞ্জের হাটে আবার আমার খেলাঘর ভরে দিতে। লুকিয়ে লুকিয়ে পুকুর পাড়ে হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই পুতুলগুলি। কি আগ্রহ আমার মুখের হাসিটি ফিরিয়ে আনার জন্য—আর আজ সেই মানুষ কিনা আমার ভাঙ্গাঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমায় চিনতে পারল না—চিনল না। দোষ দেব কাকে? মনে ভাবি আজ বুঝি আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আজ আমি যেন বিসর্জ্জনের পর দুর্গাদালান। উৎসবের অবসানে পরিত্যক্ত উৎসব-গৃহ। দীপান্বিতা রাত্রি শেষের এলোমেলো রূপ, যে রূপে প্রভাতের নির্ম্মল মহিমা লজ্জায় থমকে যায়। সূর্য্য বুঝি উদিত হতে দ্বিধা করে, পাছে লোকচক্ষে জেগে ওঠে ধরিত্রীর সে শ্রীহীন মালিন্য।

তার পর আরও আছে। আজ যে মনের আকাশে সব ভিড় করে আসে। কি আগ্রহ, কি আকুলতা ঐ মানুষটির মধ্যে দেখেছি। আমাদের প্রথম সন্তান সুহাস আমার কোলে এল। সত্যই বলছি, তুই বিশ্বাস কর্ এতদিন যে সব সুখ-দুঃখ দু'জনে এক হয়ে গ্রহণ করেছি। বুঝতে পারি নি আমি আর সে পর। ওরা ছাড়া যে আমার জগতে আর কিছুই ছিল না।

মন্দিরে যে পূজা নিবেদন করেছি, সে ত ওদেরই মঙ্গল-কামনায়। সন্ধ্যায় যে গৃহ-দীপটি জ্বেলেছি, সে ত ঐ দীপটি জ্বলে থাকারই চিরন্তন কামনায়।

কিন্তু আজ আমার এ কি হ'ল—এ কোন্ ঝড় এক সঙ্গে আমার সমস্ত আলো নিভিয়ে আমার বিশ্বাসের ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাতারাতি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি এ মানব কেন দানবের রূপ নিল—এর যে কোনই সদুত্তর পাই না। যারা আমার ওপর অত্যাচার করল, আমায় অসম্মান করল, তারাও ত এতবড় ক্ষতি করতে পারে নি। তারা শুধু ঝড়ই তুলেছিল—প্রদীপটি ত নেভাতে পারে নি! সে ত তেমনি মহিমায়, তেমনি প্রেমেই অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে বুকের মধ্যে সবার দৃষ্টির আড়ালে একান্ত বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে তেমনি করেই জ্বলেছিল। তাকে যে আমার পরমতমই একটি ফুৎকারে নিভিয়ে দিলে।

এ কি মরুময় রূপ এ শ্যামলা বসুন্ধরার!—কিন্তু এ মাটি মায়ের বুকে ঋতুতে ঋতুতে নব নব উৎসবের সমারোহ আবার জাগবে। তেমনি করেই হবে বার মাসে তের পার্ব্বণ। গৃহস্থের ঘরে ঘরে আসবে পোষড়া। নবান্নের উৎসব হবে। বোধনের বাজনা বাজবে। শুধু আমিই থাকব দূরে এঁটো পাতার মত অস্পৃশ্য, অনাদৃত!

আমরা কতবড় অন্ধবিশ্বাস নিয়েই না চলি বন্ধু! এ বুঝি ভালই হ'ল। এ না হলে ত এমন করে জগৎকে চেনবার অবকাশ পেতাম না। আমার আমার করে কত না আমাদের গর্ব্ব, কত না চাওয়া পাওয়া। ছেলেটাকে আমার আমায় একবার চোখের দেখা দেখতে দিলে না! একেবারে অস্বীকার করলে আমায়।

স্তম্ভিত হয়ে চেয়েছিলাম মুখের পানে। চোখে চোখ পড়তে মুখ নামিয়ে নিলে। অকম্পিত কণ্ঠে বললে, চিনি না আমি।

ধরণী রসাতলে গেলেও বুঝি এত অবাক্ হতাম না। তবু এই সত্য হ'ল জীবনে—খেলাঘর আমার ভেঙেই গেল!

# উত্তরাখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

ইংরাজি ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে দিল্লী এবং মিরাটে আসেন। তখন আমি মিরাটে চাকরি করি। সুতরাং সমস্ত ঘটনা আমার হুবহু মনে আছে, যদিও তারপর চব্বিশ বছর পেরিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের এই দুই জায়গায় পরিভ্রমণের কাহিনী ইতিপূর্বে কোথাও লেখা হয় নি—এ কাহিনী বেশ একটু কৌতুহলোদ্দীপক, কেননা এর মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী দুই জনের জীবনের বিশেষ একটি ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে।

প্রথম খবর প্রকাশিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা'র দল নিয়ে দিল্লী আসছেন এবং সেখান থেকে লাহোর পর্যন্ত যাবেন। এই খবর জানতে পেরে মিরাটের আমাদের এক তরুণ বন্ধু—তাঁর নাম জয়তারা চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথকে তার করলেন যে, তিনি যদি একবার ঐ দল নিয়ে মিরাটে আসেন তবে মিরাটবাসীরা কৃতার্থ হবেন। এই সময় আমাদের একটু সুবিধাও ছিল—রবীন্দ্রনাথের এই পরিভ্রমণের যিনি ব্যবস্থাপক (impresario) তাঁর নাম হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর ভাই শরদিন্দু ঘোষ মিরাটে আমাদের সঙ্গে চাকরি করতেন। সুতরাং হরেনবাবু মিরাট শহরের নাম জানতেন এবং হয়ত বা তিনি মিরাটে আসার অনুকূলে কবিকে কিছু চাপ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এ সব ঘটনায় কিছু ফল হ'ত না। আসল কথা হ'ল, রবীন্দ্রনাথ জয়তারার টেলিগ্রাম পেয়ে ভেবেছিলেন জয়তারা একজন মহিলা—সুতরাং মহিলার আবেদন তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। কিন্তু আসলে জয়তারা আমাদের একজন পুরুষ বন্ধুর নাম। রবীন্দ্রনাথের সম্মতি পেয়ে জয়তারা নীগার (Nigar) নামক একটা পুরাণো সিনেমা হল ভাড়া নেন। এই উপলক্ষ্যে ঐ প্রেক্ষাগৃহটির সংস্কারসাধন করা হয়, রং ফেরানো হয় এবং লতাপাতা ও ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়। তারপর জয়তারা মিরাটবাসী সকলের কাছে রবীন্দ্রনাথের মিরাট আগমনের তারিখ প্রচার করেন এবং টিকিট বিক্রয় করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রের মেয়ে এবং জামাই (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা জয়শ্রী দেবী এবং তাঁর স্বামী কুলদাপ্রসাদ সেন) এই সময় চাকরি উপলক্ষ্যে মিরাটে পোষ্টেড্ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দিল্লী পৌঁছানর খবর পেয়ে মিঃ সেন, জয়শ্রী দেবী এবং আমি ওঁদের মোটরে করে দিল্লী গেলাম। রবীন্দ্রনাথ পার্টি নিয়ে কাশ্মীরী গেটে দিল্লীর একজন রইস্ সুলতান সিংয়ের বাগানবাড়ীতে ছিলেন। আমরা বেলা দশটা নাগাদ দিল্লী পৌঁছালাম—মিঃ সেন আমাকে রবীন্দ্রনাথের বাসস্থানে নামিয়ে দিয়ে সস্ত্রীক তাঁর বড়মামা মিঃ গুপ্তর বাসায় স্নানাহার করতে চলে গেলেন।

আমি ওখানে পৌঁছে শুনলাম, রবীন্দ্রনাথ বাসায় নেই, সারদা উকিলের সম্পর্কিত "মডার্ণ স্কুল" দেখতে গিয়েছেন। আমি একটুখানি অপেক্ষা করার পর রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন—সঙ্গে অনিল চন্দ। আমি প্রণাম করলাম। অনিলবাবু জিজ্ঞাসুমুখে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন। রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন, "তোমাদের প্রাক্তন।" তখন অনিলবাবু আমাকে হাসিমুখে প্রতিনমস্কার জানালেন।

আহারাদির পর অনিলবাবু এবং সুধাকান্তদার কাছে রবীন্দ্রনাথ দিল্লী আসার পরে কি ঘটনা ঘটেছে তার ইতিহাস শুনলাম। আমরা যেদিন গিয়েছি তার আগের দিন মহাত্মা গান্ধী গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি গুরুদেবের কাছে অনুযোগ করেন যে, তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সে (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৭৬) এই নৃত্যনাট্য নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর কাছে ভাল লাগে না। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমি কি করব? আমার জীবনের শেষ দিনগুলি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, (My last days are clouded) বিশ্বভারতীর অনেক দেনা রয়েছে—এই উপায়ে সেই দেনা শোধ করতে চাই। নইলে মরেও আমি শান্তি পাব না। তখন মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করেন, ঋণের পরিমাণ কত? রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রায় চৌষট্টি হাজার টাকা। মহাত্মাজী বলেন, এই টাকা পেলে আপনি সোজা শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন, আর কোথাও দল নিয়ে যাবেন না, আমাকে এই কথা দিতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ বলেন, টাকা পেলে নিশ্চয় তাই চলে যাই। এই কথা শুনে মহাত্মাজী

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং তারপর উঠে চলে গেলেন।

বাস্তবিক তখন রবীন্দ্রনাথ খুব বুড়ো হয়েছিলেন—এই ঘুরে বেড়ানোর ক্লান্তি তাঁর আয়ুকে ক্ষয় করে আনছিল। আমি তাঁকে সেবার অনেক বছর পর দেখলাম—চোখের পাতায় জল জমে, কানে অনেক কম শোনেন, অথচ তাঁর এই কম শোনাটা বুঝতে পারছি তা দেখানোর জো নেই। খাবার টেবিলে খেলেনও সামান্য। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে তাঁর অবশ্য পরিশ্রমের কাজ কিছু ছিল না। তিনি ষ্টেজের ডান পাশে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতেন এবং সূত্রধারের মত কবিতা আবৃত্তি করে মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে যোগ রক্ষা করতেন। কিন্তু প্রধানতঃ তাঁকে দেখতেই দর্শকবৃন্দ আসত। সুতরাং তাঁর উপস্থিত থাকাটা অপরিহার্য ছিল। আর তাঁর শান্তিনিকেতনের অভ্যস্ত জীবন-প্রণালী থেকে দূরে থাকাই তাঁর শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশের কারণ ছিল।

যাই হোক, আমরা যেদিন ওখানে পৌঁছেছিলাম সেইদিন বিকালে আমার সামনেই মহাত্মাজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই চৌসট্টি হাজার টাকার একটা হুণ্ডি এনে রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। মহাত্মাজীর কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথাও একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মহাত্মাজী কি করে ঐ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তার ইতিহাসও মিঃ দেশাইয়ের কাছে শুনেছিলাম। মহাত্মাজী রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিড়লাভবনে গিয়ে সমস্ত দিন গুম হয়ে রইলেন। রাত্রেও তাঁর নিদ্রা হ'ল না। ভক্তের দল অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরা মহাদেব দেশাইয়ের শরণাপন্ন হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? বাপুজীর ঘুম হচ্ছে না কেন? মহাদেব দেশাই বললেন, কি ব্যাপার তাত জানি নে। বাপুজী আমাকে ত কিছু বলেন নি। তবে কাল উনি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা দেনা শোধ করার কথা উঠেছিল। হয়ত সেই ব্যাপারটাই ওঁর মনের মধ্যে বসে ওঁকে পীড়া দিচ্ছে। তখন তাঁরা সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়েবাত্? আচ্ছা, টাকাটা কত? মহাদেব দেশাইয়ের মুখে অঙ্কটা শুনে কয়েক মিনিটের মধ্যে চার-পাঁচ জন শেঠ মিলে টাকাটা দিয়ে একটা হুণ্ডি মহাদেব দেশাইয়ের হাতে এনে দিলেন। সেই হুণ্ডি বিকেলে মহাদেব দেশাই রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে এসেছেন।

তখন নিউদিল্লী রিগ্যাল থিয়েটারে 'চিত্রাঙ্গদা' দেখানোর আয়োজন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কাপড় পরে নিউদিল্লী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মহাদেব দেশাই আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন যে, এই নৃত্য-নাট্যের এইটি শেষ অভিনয় (last show)।

খবরটা কি রকম করে বলতে পারিনে মিরাট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বোধ হয় মিরাট থেকে কেউ কেউ দিল্লীতে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন এবং তাঁরা খবরটা জেনে ফেলেছিলেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাছে দরবার করতে এলেন। এঁদের মধ্যে হরেনবাবুর ভাই শরদিন্দুবাবু, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেজর অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (এখন কলকাতায় N. C. C.-র কর্মাধ্যক্ষ) প্রধান। তাঁরা বললেন, যে-কোন উপায়েই হউক কবিকে মিরাট যাওয়ার জন্য রাজি করতেই হবে। আমরা নিগার থিয়েটার সংস্কার করা প্রভৃতির খরচের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মিরাটবাসীদের কাছে পয়সা নিয়ে অ্যাডভান্স বুকিং করেছি—কবিকে নিয়ে যেতে না পারলে তারা আমাদের মাথা চাঁটি মেরে উড়িয়ে দেবে—মিরাটে আর আমরা মুখ দেখাতে পারব না। কাজেই ...ইত্যাদি, ইত্যাদি। তা ত বুঝলাম, কিন্তু উপায় করি কি? এর মধ্যে দু'জন মহাপুরুষের আত্মসম্মানের প্রশ্ন নিহিত রয়েছে। বলার ত মুখ নেই। কিন্তু তাঁরা নাছোড়বান্দা। ভগবানের নাম স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে পড়লাম। মিরাটের আবেদনটা সকাতরে জানালাম। তিনি বললেন, তুই ত ভিতরের ব্যাপার সবই জানিস। এ অবস্থায় আমি এখন কি করতে পারি? আমি বললাম, জানি বলেই ত বলতে এসেছি, কিন্তু এর মধ্যে আর একটা দিক্ বিবেচনা করার আছে, সেটা কেউ ধর্তব্য বলে মনে করছেন না। মিরাটের লোকদের পক্ষে আপনাকে দেখার এই শেষ সুযোগ। তাদের অধিকাংশই আপনাকে ইতিপূর্বে দেখে নি এবং ভবিষ্যতেও যে দেখবে এমন সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থায় আপনি যদি এত কাছে এসে (দিল্লী থেকে মাত্র ৪২ মাইল) ফিরে চলে যান তবে তাদের আফশোষের কি সীমা-পরিসীমা থাকবে? রবীন্দ্রনাথ একটু নরম হলেন। বললেন, কিন্তু আমার কি করবার আছে? আমি ত যেতে গররাজি নয়। তবে হ্যাঁ, তুই যদি মহাত্মাজীর কাছ থেকে তাঁর সম্মতি আনতে পারিস্ তবে একটা উপায় হতে পারে। আমি সোৎসাহে বললাম, সে আমরা এখুনি নিয়ে আসছি।

মহাত্মাজীর ক্যাম্পে ফোন করে জানা গেল, তিনি রাত্রি দশটার গাড়ীতে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছেন—এখন ক্যাম্পে নেই, ষ্টেশনে রওয়ানা হয়ে গেছেন। অনিলবাবু এবং

আমি তখুনি স্টেশনে ছুটলাম। মহাত্মাজী একখানি থার্ড-ক্লাস কামরায় বসে আছেন—তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের দ্বারা কামরাখানি বোঝাই। প্রবেশদ্বারে স্বেচ্ছাসেবক দাঁড়িয়ে আছে—আমাদের ঢুকতে দেবে না। বললে, পায়ার ছুঁনে নেই দেগা (মহাত্মাজীর পা ছুঁতে দেব না)। আমরা বললাম, আমরা পা ছুঁতে চাই না—অনুগ্রহ করে তাঁকে বল টেগোরের কাছ থেকে আমরা এসেছি। মহাত্মাজী সম্মতি দিলে তারা আমাদের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিল। আমরা মিরাটের কেস্ সবিস্তারে পেশ করলাম। তিনি সমস্ত শুনে একটুখানি হাসলেন এবং তার পর বললেন, আচ্ছা, তাই হবে, কিন্তু এইটি যেন তাঁর শেষ অভিনয় দেখানো হয়—(All right, but this should positively be the last)।

রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় মহাত্মাজীর সম্মতির কথা জানিয়ে আমরা সেই রাত্রে সাড়ে দশটার ফ্রন্টিয়ার মেলে মিরাটে ফিরে এলাম। পরের দিন অভিনয়।

সকাল বেলা মিরাট কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় গাড়ী নিয়ে কবিকে আনতে দিল্লী চলে গেলেন। হরেন ঘোষ নৃত্যনাট্যের দলের লোক নিয়ে সকালেই মিরাট এসে পৌঁছুলেন।

কবি বিকাল ৪টার সময় সোজা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী জয়শ্রী দেবীর বাসায় গিয়ে উঠলেন। তাঁরা আগে থাকতেই কবিকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। সেই-খানে বসে বসে কলমের উল্টো পিঠ দিয়ে একখানি ছবি এঁকে জয়শ্রী দেবীকে উপহার দিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে নিগার সিনেমায় যাওয়ার পথে একবার খ্যাত-নামা চিকিৎসক ডাঃ প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য বসেন। সেখান থেকে সাড়ে চারটা নাগাদ বাঘপতের নবাব জামসেদ আলি খাঁর বাসভবনে কবিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চা-পার্টিতে কবিকে সম্বর্ধিত করা হয় এবং ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়।* এখানে মিরাটের নাগরিকদের একটা অনাড়ম্বর জলসা গোছের হয় এবং মিরাটের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কবির সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া হয়। ডাঃ গৌর ঘোষের কন্যা সুষমা (এখন বেঁচে নেই) ঐ জলসায় হাঁসের ডিমের খোলার উপর রবীন্দ্রনাথের নাম লিখে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন মনে আছে। এর পর কবিকে মিরাট টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে মিরাট অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তার পর কবিকে নিগার সিনেমা হলে নিয়ে যাওয়া হয়। স্টেজের নীচে তাঁর জন্য সিংহাসন প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেখানে বসে তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় কবি মোটরযোগে দিল্লী ফিরে যান। রাত্রে নিগার সিনেমা হলে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়।

আগে যে বলেছি, এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের মিরাট আসা না হলে মিরাটের লোকেরা তাঁকে দেখতে পেত না, এ কথা অতিরঞ্জিত নয়। এই তাঁর প্রথম মিরাট আগমন এবং এই শেষ।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেকে বাহবা নেওয়ার জন্য কবির জীবনের ঘটনাকে বানিয়ে বলছেন বা অতিরঞ্জন করছেন এমন অপবাদ কাগজে পড়েছি। সেই কারণে কবির এই পরিভ্রমণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের নাম আমি দিয়েছি যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন। সন্দিগ্ধ পাঠক প্রয়োজন হলে এই লেখার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারবেন।

* এই ফটোগ্রাফের কপি মিরাটের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং জননায়ক ইন্দুভূষণ বসু মহাশয়ের ভবনে সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁরা এই ফটো স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত করতে রাজি নন। ....
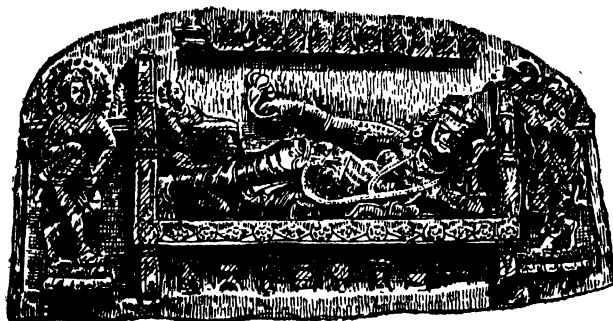
# নদীতীরে জগদীশচন্দ্র

অধ্যাপক মৃণাল ঘোষ

জগদীশচন্দ্র বারম্বার পৃথিবীর বহুস্থান পর্য্যটন করে বীরের মত সংগ্রাম করে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর জয়মাল্য লাভ করেছিলেন। বিশ্বপর্য্যটক জগদীশচন্দ্র লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, গ্লাসগো, লিভারপুল, প্যারিস, সোর্বোন, বার্লিন, মিউনিক, ভিয়েনা, ব্রুসেলস, প্রাগ, ষ্টকহলম, জেনেভা, নিউইয়র্ক, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, ক্যালিফোর্ণিয়া, টোকিও, কায়রো, ইত্যাদি বহুস্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। যেদেশে, যেখানেই তিনি গেছেন, অবসর পেলেই নদীতীরে ছুটে গেছেন। তাঁর জীবনের পরমতম সুহৃদ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সারা-জীবন তিনি নদীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।

জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে—

বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রাম। চারিদিকে নদী আর খাল। এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে চলাচলের পথ নদী। বাড়ীর নীচেই নদী। ন'বছরের কিশোর জগদীশচন্দ্র অপার বিস্ময়ে প্রতিদিন নদীর জোয়ারভাঁটা দেখতেন, কান পেতে শুনতেন তীরের ওপর আছড়িয়ে-পড়া ঢেউ-গুলোর অবিশ্রান্ত কুলুকুলু ধ্বনি। অন্তহীন জলস্রোতের দিকে চেয়ে চেয়ে কৌতূহলী বালকের অন্তরে সেদিন জেগে ছিল সেই শাশ্বত প্রশ্ন—নদী তুমি কোথা থেকে আসছ? নদী উত্তর দিয়েছিল—মহাদেবের জটা থেকে। সেদিন বালক জগদীশচন্দ্র জানতেন না যে তাঁর চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট রবীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতে একদিন আট বছর বয়সে তাঁরি মত বিমুগ্ধ চোখে বসে থাকবেন পেনেটির বাগানে গঙ্গাতীরে।

ইংলণ্ডে, কেম্‌ব্রিজে—

১৮৮১ সনে লণ্ডনে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে তিনি সবে-মাত্র এসেছেন কেম্‌ব্রিজে—বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য। ক্রাইষ্টস্ কলেজে যখন ভর্তি হলেন তখনও তিনি ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে আসা জ্বরে মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত হতেন। রোজ বিকেলে এবং ছুটির দিনে ইংরেজ সহপাঠিদের সঙ্গে নদীতে নৌকা চালাতেন এবং বাইচ খেলতেন। কেম্‌ব্রিজের স্মৃতি প্রসঙ্গে তিনি জগদ্বিখ্যাত দুইজন বিজ্ঞানী অধ্যাপক লর্ড র‍্যালে এবং অধ্যাপক ভাইন্‌সের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন আর বলতেন কেমন করে নদীতে রোজ দাঁড় টেনে তিনি তখন শরীরে বল পেয়ে-ছিলেন।

ফরাসী চন্দননগরে, গঙ্গাতীরে—

চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বাগানে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' লেখা সুরু করেন, যে গৃহটিকে বিশ্বকবি তাঁর কবিজীবনের উদ্বোধন তীর্থ বলে অভিহিত করে-ছিলেন তারি কিছু দক্ষিণে দিনেমারডাঙ্গা। ফরাসীদের পূর্ব্বে ঐ স্থানটি দিনেমারদের অধিকারে ছিল। কেম্‌-ব্রিজের 'ট্রাইপস্' এবং লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি. এস. সি. ডিগ্রী নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময় জগদীশ-চন্দ্র ছুটির অবসর যাপনের জন্য দিনেমারডাঙ্গায় ভাগীরথী তীরে একটি বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে প্রতিবেশী দুই একজন ধর্ম্মপ্রাণ স্নানার্থী ব্রাহ্মণ দেখতেন যে,সেই নবাগত দীর্ঘদেহী সুদর্শন মানুষটি গঙ্গাতীর সংলগ্ন বাড়ীর বারান্দায় একটি চেয়ারে সূর্য্যোদয়ের সময় কখন ধ্যাননিমগ্ন ঋষির ন্যায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, কখন বা বিস্ফারিত নয়নে মুগ্ধ বিস্ময়ে নদীর জলধারার দিকে চেয়ে রয়েছেন।

সেই বাড়ীর পাশ দিয়ে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ যে পথটি গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছেছে, সেই পথে স্নানার্থিনী পল্লীবধূরা দেখতেন এক একদিন সকালে সেই সৌম্যদর্শন আত্ম-ভোলা মানুষটি বনে-বাদাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কে জানে সেদিন সেখানে 'চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ'য়ের মধ্যে একটা বনচাঁড়াল গাছ কিম্বা ছোট একটি লজ্জাবতী লতা দেখতে পেয়ে কৌতূহল আর বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে থম্‌কে দাঁড়াতেন কি না? আবার প্রতিদিন অপরাহ্নের মৃদু আলোকে দেখা যেত একখানি শাদা রংয়ের ছোট বোট, গায়ে তার বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা DOLF সেই নদীতীরের বাড়ীর ঘাট থেকে মাঝ গঙ্গার দিকে ভেসে চলেছে। একজন মাঝি আছে কিন্তু আরোহী জগদীশচন্দ্র এক একবার নিজেই দাঁড় টানছেন। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় আকাশ রিমঝিম করছে, গঙ্গার জল কাঁপছে সেতারের তারের মত আর আরোহী বুঝি বা 'আকাশ সঙ্গীতের সুরসপ্তক' শোনবার জন্য উৎকর্ণ

হয়ে ব'সে রয়েছেন। মাথায় তাঁর একরাশ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ আর চোখ দুটো কোন্ 'অদৃশ্য আলোকে'র সন্ধানে পশ্চিম আকাশে স্থির নিবদ্ধ।

লণ্ডনে, হাইড পার্কে, সার্পেণ্টাইনের ধারে—

১৯০০ সনে স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি ধন্য প্যারীর মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মহাসভায় বক্তৃতার পর জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডে গেলেন। সেখানে ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের ব্র্যাডফোর্ড সভায় জীব ও অজীবের মধ্যে প্রাণের সমতা এবং সৌসাদৃশ্যের বিষয় বক্তৃতায় স্তম্ভিত করে দিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীদের। সেই সময় সার অলিভার লজ, ব্যারেট প্রভৃতি পদার্থবিদ্‌রা তাঁকে বিলাতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালাবার প্রস্তাব করেন। ব্র্যাডফোর্ড বক্তৃতার পর তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। অস্ত্রোপচারের পর তাঁর "পতিব্রতা অতুলনীয়া সহধর্মিণী"১ অবলা বসু এবং তাঁর "কার্য্যের ও রচনায় উৎসাহদাত্রী"২ ভগিনী নিবেদিতার সেবা-শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভের পর দূর প্রবাসেও লণ্ডনের হাইড পার্কস্থিত Serpentine সরোবরের তীরে প্রতিদিন তাঁরা কিছু সময় অতিবাহিত করতেন।

উক্তি (১) স্বামী বিবেকানন্দ (২) রবীন্দ্রনাথ

শিলাইদহে, পদ্মাতীরে—

১৯০২ সনে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান লিলিয়ান সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক ভাইনসের আমন্ত্রণে 'যান্ত্রিক উদ্দীপনায় সাধারণ উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া' সম্বন্ধে পরীক্ষা-সহ বক্তৃতায় ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রখ্যাত শারীর-বিজ্ঞানী এবং প্রাণীবিজ্ঞানীদের চমৎকৃত ক'রে প্যারীর Societe de Physiqeue-এ বক্তৃতাদির পর জগদীশচন্দ্র যখন স্বদেশে ফিরলেন তখন রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরে শিলাইদহে। ইয়োরোপে ২য় বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর ক্লান্ত দেহমন নিয়ে জগদীশচন্দ্র এলেন কবির আমন্ত্রণে তাঁরি স্নেহচ্ছায়াতলে বিশ্রামলাভ মানসে পদ্মাতীরে। যন্ত্র-সভ্যতার বিকট লীলাভূমি পাশ্চাত্ত্য জগতের কর্ম্মকোলাহল থেকে মুক্তিলাভ ক'রে জগদীশচন্দ্র পদ্মার নির্জ্জন তীরে শিলাইদহে কবিভবনের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হলেন।

জগদীশচন্দ্র ভারতের বহুস্থান এমন কি তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের ক্রোড়ে কেদার বদরী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেছেন, বৈজ্ঞানিক অভিযানে দশবার ইয়োরোপের বহুদেশ পর্য্যটন করেছেন, কিন্তু পদ্মাতীরে শিলাইদহের স্মৃতি জীবনে তিনি কোনদিন ভুলতে পারেন নি। প্রিন্স ক্রপটকিন, রোম্যাঁ রোল্যাঁ, জর্জ্জ বার্ণাডশ'প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষিগণ বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি বাঙালী বিজ্ঞানীর অতুলনীয় প্রতিভা দর্শনে বিমুগ্ধ চিত্তে অভিনন্দন জানিয়েছেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এলবার্ট আইনষ্টাইন যাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছিলেন—"জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যতগুলি তথ্য পরিবেষণ করেছেন, তার যে কোনটির জন্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা উচিত," বিজ্ঞানলক্ষ্মীর বরপুত্র এই মানুষটির হৃদয়মন কিন্তু চিরদিন আলোকিত করে রেখেছিল রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকশিখা। গদ্যে, পদ্যে সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। পদ্মাতীরে শিলাইদহে অবসর বিনোদনের সময় বিজ্ঞানাচার্য্যের অনুরোধে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কবিসম্রাট একটি করে সদ্যরচিত গল্প তাঁকে শোনাতেন। পদ্মাতীরের এই স্মৃতি জগদীশচন্দ্রের মানসপটে চিরজাগ্রত ছিল। সেই আনন্দময় দিনগুলির কথা স্মরণ করে কি আবেগভরা ভাষায় জগদীশচন্দ্র কবিকে লিখেছিলেন:

"আমাদের স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন, শহরের গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া নীরব অথচ কর্ম্মঠ ভাবে যেরূপ কাটাইতেছ, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। আর সেই সুন্দর নদী, বালুচর, পল্লীগ্রাম ইত্যাদিতে আমার একরূপ নেশা জন্মিয়াছে।"

এই পদ্মাতীরেই একদিন সন্ধ্যাবেলায় জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একটা কবিতা শোনাতে বললেন। কবিগুরু জিজ্ঞাসা করলেন—কোনটা? বিজ্ঞানতপস্বী বললেন, সুরদাসের প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র অন্তর্গত এই কবিতাটি কিছু দীর্ঘ। ১৮৮৮ সনের ২২—২৩ জ্যৈষ্ঠ, দুইদিন ব্যাপী ইহার রচনাকাল। অননুকরণীয় সঙ্গীতময় কণ্ঠে কবি আবৃত্তি করলেন কবিতাটি:

"* * * * *
* * * * *

আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে—
একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া
রব আমি বারো মাস

* * * * *
* * * * *

বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি ?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি,
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি
স্নিগ্ধ আনত আঁখি ?
* * * * *
* * * * *
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।"

বিমুগ্ধ শ্রোতা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বললেন, জান বন্ধু সুরদাসের দৃষ্টিহারা চোখে যে বিশ্ববিলোপ আঁধারের কথাটি তুমি তোমার কাব্যের মধ্যে অনুপম ভাষা ও ছন্দে গেঁথে রেখেছ, তার স্বরূপটির পরিচয় আমার বিজ্ঞান-তপস্যার মধ্যে আমিও একদিন পেয়েছিলাম। গত জুন মাসে লণ্ডন ফোটোগ্রাফিক সোসাইটিতে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'দৃষ্টি ও ফোটোগ্রাফী।' চোখে যা দৃষ্টি পড়ে তা ক্ষণিকের, তা মিলিয়ে যায়, তার রেশ, তার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগ্রত স্মৃতিরূপে থেকে যায়। কিন্তু ফোটোর ছবি একেবারে হুবহু মুদ্রিত হয়ে যায়। যা momentary, কি উপায়ে তার মধ্যে আণবিক আড়ষ্টতা সঞ্চার করে, তাকে permanent করে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। সুরদাস যখন তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরির দ্বারা নিজের চোখ অন্ধ করতে যাচ্ছিল, তখন তার মনে হয়েছিল চির-অন্ধকারের যবনিকার অন্তরালে পলক-হীন স্মৃতি চিরন্তন হয়ে থাকবে। সাগরপারে ইংলণ্ডে বক্তৃতার সময় হঠাৎ আমার মনে হ'ল আমার এই আবিষ্কারের সত্য তুমি ত আমার অনেক আগে ১৮৮৮ সনে উপলব্ধি করেছ এবং ভক্ত সুরদাসের মুখ দিয়ে সেই চিরন্তন সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছ।

বন্ধুর কথা শুনে, পদ্মাতীরে শান্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন—জগদীশ, তুমি শুধু বৈজ্ঞানিক নও, তুমি কবি!

### ইজিপ্টে, নাইলের তীরে

ছাব্বিশ বছর পরে, ১৯২৮ সনে ইয়োরোপে নবম বৈজ্ঞানিক অভিযানের সময় ভিয়েনা, মিউনিক, জেনেভায় বক্তৃতা শেষ ক'রে ফেরার পথে মিশর সরকারের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র এলেন কায়রোয়। সেখানেও একদিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নাইলের তীরে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। ভাস্করাচার্য্য, নিউটন, ডারুইন, আইনষ্টাইন, প্রভৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের স্থান যে শ্রেণীতে, জগদীশচন্দ্রের স্থানও সেই শ্রেণীতে। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি এই বিজ্ঞানাচার্য্য প্রতিদিন ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত আরাধনা প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় নিয়মিত পাঠ ক'রে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করতেন। কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাঁকে সারাজীবন অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছিল :

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি,
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

"They who see but one, in all the
changing manifoldness of this universe,
unto them belongs Eternal Truth—
unto none else, unto none else."

J. C. Bose.

—o—

# কানাইলাটের গল্প

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প)

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

ছোটখাটো মানুষটি। লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশী নয়। একমাথা ঈষৎ কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গোলগাল মুখটি। চোখ দু'টি সাধারণ। সবসময়ই যেন একটা বিষণ্ণতা মাখানো তাতে। নাকটি মোটা। অগ্রভাগ স্ফীত। একটি চাঁদির চশমা সেখানে শোভা পাচ্ছে। বগলে ছাতা নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে-হাঁটা পথে ঘুরে বেড়ায়।

কানাই চাটুজ্যের কথা বলছি—

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পাঁচাল ও সোনামুখীর গ্রাম অঞ্চলে একডাকেই তাকে চিনবে সবাই। তবে কানাই চাটুজ্যে বা কানাইবাবু ব'লে কেউ ডাকে না, লোকে বলে ঘটকঠাকুর। অন্তরঙ্গরা ডাকে কানাইলাট ব'লে।

বাঁকুড়া জেলার লালমাটির দেশ। কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর, বিড়াই, শিলাবতী এ সব অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তবে শুকনো থাকে নদী। বছরের অনেকটা সময়ই। শুধু বর্ষাকালেই ভিন্নরূপ। তখন দু'কানা ছাপিয়ে জল বয়ে যায়। মাঝে মাঝে বান নামে। আকস্মিক বান। এ অঞ্চলে হড়পা বান বলে। তবে বেশীক্ষণ থাকে না সে বান। পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টি হলে নদী ফুলে ফেঁপে উঠে। দু'কানা ভ'রে যায় তার মাটি গোলা লাল জলে। তার পর দু' একদিনের মধ্যেই জল নেমে যায় ঢালু অঞ্চলে কিংবা অন্য কোন নদীতে গিয়ে পড়ে।

বিড়াই নদীর ধারে পাঁচাল গাঁয়ে কানাই চাটুজ্যের বাড়ী। পাঁচ মাইল দূরের ইষ্টিশনে নেমে হাঁটাপথে বাড়ী ফিরছিল কানাই। ছোট ছোট পায়ে দীর্ঘ পদক্ষেপ ফেলে জোরে হাঁটছিল সে। পথটা মাঠের উপর দিয়ে গ্রামে এসে ঢুকেছে।

গাঁয়ে ঢুকবার মুখে একটা পেয়াল গাছের ঝোপ। কটু ঝাঁঝালো গন্ধ গাছটার। সেখানেই রাখো খুড়ো অপেক্ষা করছিল। কানাইকে দেখে উচ্চৈস্বরে বললে, কি খবর লাটবাহাদুর, কুথা থেকে আসা হচ্ছে?—

কানাই সুরসিক। স্থানবিশেষে উপযুক্ত কথা বলতে স ওস্তাদ। এ ব্যাপারে তার পেশাটাই তাকে সাহায্য করেছে বেশী। উত্তরে সে হেসে বললে, 'আর বল না খুড়ো। যেতে হয়েছিল গিয়ে তোমার লাটভবনে। ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলেক কিনা। সেই খাওয়া-দাওয়া সারা হলে ত আসছি'।

ধূলিধূসরিত দু'টি পা। হাঁটু অবধি লালধুলোয় মাখা। পায়ে তালিমারা কেড্‌সের জুতো। পরনে ময়লা পুরাতন একটা পাঞ্জাবী। কোরাধুতি নিম্নাংগ বেষ্টন ক'রে রয়েছে। হাতে রং-চটা বহু ব্যবহৃত ছাতাটি।

রাখহরি একনজরে বেশভূষাটি নিরীক্ষণ করে বললে, 'তা সন্ধ্যের দিকে এস না। আটচালায় ব'সে লাটভবনের কথা শোনা যাবে।'

কানাই চাটুজ্যে এগিয়ে চলল। আসলে সে আসছে বীরভূমের এক অজ পাড়াগাঁ থেকে। সেখানকার মুখুজ্যেরা বর্ধিষ্ণু পরিবার। তাদের বাড়ীর একটি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে ঘটকালি করছে কানাই। ঘটকালিই তার পেশা। প্রজাপতির অফিসটি তার ঝুলির ভেতরেই থাকে। গ্রাম অঞ্চলে ঘটকালি। বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না তেমন। তবু কেমন একটা নেশা আছে। যে বাড়ীতে যায় সেখানে চব্যচোষ্য ভোজনটা পায়। ঘটককে তুষ্ট করতে সব মেয়ের বাপই চায়। ছেলের বাপও ফেলতে পারে না। হয়ত মোটা মতন পাইয়ে দেবে ঘটক। সেই আশাতেই তাকে তোয়াজ করতে সুরু করে। বীরভূমের এই মুখুজ্যে বাড়ীর মেয়েটির বিয়ে দিতে পারলে মোটা কিছু আশা করছে কানাই। অন্ততঃ শ'খানেক টাকা। সুবিধে মত পাত্রও একটি আছে তার হাতে। বর্ধমান জেলার জৌগ্রাম অঞ্চলে বাড়ী। মাটকোঠা বাড়ী ছেলের। ডাক্তারি পাস দিয়েছে কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। এমন পাত্রে কন্যা পড়লে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন মুখুজ্যেমশাই। তেমন কিছু দাবী করলে কানাইকে বিমুখও করতে পারবেন না। হাঁটতে হাঁটতে সেই কথাই ভাবছিল কানাই—

কাল ভোরে উঠেই তাকে রওনা দিতে হবে আবার বর্ধমানের সেই গাঁয়ের দিকে।

বাড়ী পৌঁছে হাতের পুঁটুলিটা নামিয়ে রাখল কানাই। বউকে দেখতে পেল না। হয়ত জল আনতে

গেছে ঘাটে। ছেলেমেয়েগুলোও যেন কোথায় লুকিয়েছে।

গামছা নিয়ে খিড়কির দুয়ার খুলে পুকুর ঘাটে এল। একটা নুয়ে-পড়া খেজুরগাছ। তার নীচেই ঘাট। হাত-পা ধুয়ে নিল কানাই। তার পর পিঁড়ি পেতে দাওয়ায় ব'সে গামছাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল।

একটু পরেই বউ ক্ষ্যান্তবালা এসে বাড়ী ঢুকল।

—'ওমা, তুমি কখনকে এলে?'

কানাই বলল, 'এই ত খানিক আগে।'

ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে ধরল। চার ছেলেমেয়ে। বড় মেয়েটি পনেরোয় পা দিয়েছে। বিয়ের যুগ্যি কন্যে। ওর কথা ভেবে চিন্তা হয় কানাইয়ের। চোখে ঘুম আসে না রাতে। তেমন একটি ছেলে যদি পেত। শুধু ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না, এমনি অবস্থা হলেই সে সন্তুষ্ট। কিন্তু ঘটক হয়েও সুবিধে মত পাত্র সে পায় নি। পাত্র কি আর জোটে না? তবে খাঁই বড় বেশী। সে খাঁই মেটানোর সাধ্যি কানাইয়ের নেই।

এক কাঁসি মুড়ি নিয়ে খেতে বসল কানাই। আখের গুড় দিয়ে জল মেখে খেতে লাগল। ক্ষ্যান্তবালা ওর পাশে ব'সে হাওয়া করতে লাগল ওকে। মুড়ি চিবোতে চিবোতে কানাই বলল, 'জানো গো, এই মুখুজ্যে বাড়ীর মেয়াটির বিয়ে যদি দিতে পারি তবে মোটা মতন হবেক কিছু।'

'কুথাকার মেয়াগো?' ক্ষ্যান্ত জিজ্ঞেস করে।

'বীরভূমের বকুলতলা গাঁয়ের। সে অনেক দূর হ'ল গিয়ে—'

'তা বিয়ার ঠিক হ'ল কিছু?'

'ঠিক একটা করতেই হবেক। কালই তো আবার রওনা দিচ্ছি।'

'ওমা সে কি গো? কালই বেরাবে নাকি?'

'হঁ। টাকা ক'টা তোমাকে দিতেই তো ইদিক বাগে আসা। নইলে উখান থেকেই চলে যেতম।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ক্ষ্যান্ত। তার পর পাখা থামিয়ে বলল স্বামীকে—'তা আমাদের উমার একটা পাত্তর-টাত্তর দেখ না একবার।'

এ প্রশ্নের উত্তর দিল না কানাই। মুড়ি চিবোতে চিবোতে কি যেন ভাবতে লাগল। ঘটকালি তার পেশা। এ লাইনে অনেক অভিজ্ঞতা তার। লাল খেরো খাতায় বাংলা দেশের গ্রাম অঞ্চলের অনেক মানুষ-জনের বংশকুলুজী লিখে রেখেছে সে। তবে পাত্তর জোগাড় করা অন্য কথা। সে শুধু চেষ্টায় হয় না। তার সংগে চাই টাকার ক্ষ্যামতা। না হলে ছেলের বাপ কিছুতেই হাসিমুখে কথা কইবে না আর। ক্ষ্যান্তবালা ভালমানুষ মেয়ে। এত কথা সে বুঝতে পারবে না।

রোদ ওঠার আগেই কানাই বেরিয়ে পড়ল। পাঁচ মাইল পথ হাঁটতে হবে। মেঠো পথ। ডালভাঙ্গা ক্রোশ। পাঁচ মাইল কথাতেই বলে। কানাইয়ের মনে হয় পথটা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী। আমডোব গাঁয়ের ভিতর দিয়ে রাস্তা। কানাই চাটুজ্যে হন্ হন্ করে হেঁটে চলল। পথের ধারে জগৎ মোড়লের বাড়ী। মোড়লকে এড়িয়ে যেতে চায় কানাই। জগৎ মোড়লের মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করেছিল সে। বর্ধমান ছাড়িয়ে পাঁচথুপী গাঁয়ে শ্বশুরঘর হয়েছে মেয়ের। তবে মনোমত ঘরবর হয় নি। সে বাড়ীতে শ্বাশুড়ী খাণ্ডারণী। মেয়েকে শাস্তি করে বড়। জগৎ কতদিন তাকে বলেছে সে কথা। অবিশ্যি কানাই গায়ে মাখে নি। সে হেসে উত্তর দিয়েছে, 'তা আমি কি করব মোড়ল? ঘটক তোমার হ'ল গিয়ে নিমিত্ত। মেয়ের সুখ-দুঃখ সব কপালের লেখন। ঘটককে দোষলে কি হবে?'

ইষ্টিশনে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। ছোট লাইনের গাড়ী। দোলে বেশী, চলে কম। কানাই জানালার ধারে ব'সে একটি বিড়ি ধরাল। একজন পরিচিত লোক ওকে ডেকে বলল, 'ঘটকঠাকুরের ইদিকে কুথায় যাওয়া হবেক?'

গন্তব্যস্থানের নাম বলল কানাই? লোকটি উঠে এসে ওর কাছে বসল।

'তার পর কি খবর তোমাদের গো?' কানাই একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করল।

'খবর আবার কি? তবে ভাইঝির যে বিয়াটি তুমি দিলে সে'টি সুবিধার হ'ল নাই।'

'ক্যানে? অসুবিধার কি হ'ল?'

'জামাই নেশাটেশা করে। নেশা ক'রে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মারধোর করে মেয়াটাকে কখনো কেমন'—লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কানাই বলল, 'তা পুরুষমানুষ একটু নেশামন্দ করবেক বৈ কি। উয়াতে মন খারাপ করলে চলবেক কেনে?'

'তাই বলে মারধোর করবেক মেয়াটাকে? তুমি কেমনধারা মানুষ গো?'

কানাই চুপ করে রইল। এ কথার সে জবাব দিতে পারল না। আসলে এ লাইনের এই দোষ। মেয়ে যদি অসুখী হয় ঘটককে দোষতে ছাড়ে না কেউ। কেউ কেউ শাপমন্যিও করে। কিন্তু মেয়ে সুখী হলে অন্ত

কথা। তখন ঘটকের কোন প্রশংসা নেই। পয়মন্ত মেয়ের কথা বলতে খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে আত্মীয় পরিজনরা। ঘটকঠাকুর শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। অবিশ্যি কিছু কিছু অন্যায় কাজ সে না করেছে তা নয়। সে কথা কানাইয়ের চিরদিন মনে থাকবে। মন চায় নি সে কাজ করতে। তবু করেছে সে কাজ। পেটের দায়ে। অন্নের জন্যে। করেছে ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে। তাদের গাঁয়ের নারাণ মুখুজ্যের বিয়ে দিয়েছিল কানাই। পৈতৃক বিঘে দশ জমি পুঁজি নারাণের। একটা আম-বাগানও আছে ছোটমত। সেই নারাণের খুব ভাল একটি বিয়ে দিয়েছে কানাই। আমোদপুরের মেয়ে। বাপের অবস্থা বেশ বাড়বাড়ন্ত। নারাণের কথা তিনগুণ বাড়িয়ে বলেছিল কানাই। ছেলে লাখরাজ জমির মালিক। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘের কম নয়। আম-কাঁঠালের বাগান, পুকুর, সবই আছে। মেয়ের বাপ কিছু খোঁজ-খবর করেছিল। কিন্তু অতদূর থেকে এত খবর জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। বিয়েতে বেশ কিছু পেয়েছিল নারাণ। কানাইকেও ভাল বিদায়ী দিয়েছিল। তার পর অবিশ্যি জানাজানি হয়ে গেল সব ব্যাপারটা। সে গ্রামে কানাই এখন আর পা বাড়াতেও সাহস করে না। বউটা কিন্তু আজও তাকে শাপমন্যি দেয়। ঘাটে ব'সে ক্ষারে-সেদ্ধ কাপড় কাচতে কাচতে ঘটকঠাকুরের নির্বংশ কামনা করে সে। করুণ সুরে প্রার্থনা জানায় আকাশের দেবতার কাছে। কানাই কতদিন ভেবেছে—কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। বলবে, 'আমায় আর গালমন্দ দিও নি মা তুমি।' কিন্তু তাও সে পারে নি। সাহস করে ঘেঁসতেই পারে নি বউটির কাছে।

আর একটি মেয়ের কথাও সে কোনদিন ভুলবে না। এখনও পথ চলতে চলতে কোনদিন মেয়েটিকে সে দেখতে পায়। গাঁয়ের পথে কিংবা পুকুর ঘাটে। কোচডি গাঁয়ের হারাণ ঘোষের মেয়ে। হলুদ-পাখীর মত রং। একঢালা কালো কালো চুল। বড় বড় আয়ত দু'টি চোখে সমাহিত বিষণ্ণতা। খুব বড় ঘরেই সম্বন্ধ হয়েছিল মেয়েটির। সোনামুখীর বোসেদের বাড়ী। বিখ্যাত বংশ। প্রচুর ভু-সম্পত্তি। শুধু একটুকু দোষ ছিল ছেলেটির। হাঁপানির টান ছিল। মাঝে-মধ্যে হ'ত। তবে বড় বড় বিলিতী ওষুধে প্রায় সেরে এসেছিল অসুখ। মেয়ের বাড়ীতে জেনেশুনেও কথাটা গোপন করেছিল কানাই। না করেও উপায় ছিল না। এ ধরণের বড় সম্বন্ধ বছরে দু' একটার বেশী হাতে আসে না। তাই ডাক পড়লে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে কানাই। মোটা বিদায়ীর লোভে যেমন ক'রে হউক চার-হাত এক করে দিতে চায়। এখানেও কৃতকার্য হয়েছিল কানাই। চার হাত এককরে দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরই অসুখটা বাড়ল। হয়ত নূতন বিয়ের অত্যাচারে। বেশীদিন লাগে নি। মাত্র ছ' মাস। ডাক্তার-বদ্যি ওষুধপত্তরের কোন ত্রুটিই হয় নি। ছ' মাসের শেষে বিধবা হয়ে ফিরে এল মেয়েটি। আজও কোচডি গাঁয়ের পথে মেয়েটিকে মাঝে মাঝে দেখতে পায় কানাই। নিরাভরণ মূর্তি, পরণে সরু-পাড় শাড়ী। পথ দিয়ে হেঁটে গেলে বিষণ্ণ চোখে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে অভিযোগ নেই, নেই শাপমন্যির আভাস! শুধু একটা করুণ বিষণ্ণতা। কানাইয়ের বড় কষ্ট হয় মেয়েটিকে দেখলে।

দিন-সাতেক পরে ফিরে এল কানাই। জ্যোগ্রামের ছেলেটিকে সে জোটাতে পারে নি। সামান্য একটা কারণে ভেস্তে গেল। অবিশ্যি কানাইয়ের মত অভিজ্ঞ লোকের এ ভুলটা হওয়া উচিত হয় নি। মেয়ের ঠিকুজির সঙ্গে মিল হ'ল না ছেলের। কানাইয়ের উচিত ছিল না ঠিকুজি দেখান। আগে ছেলের কোষ্ঠী চেয়ে নিতে হ'ত তাকে। তার পর গাঁয়ের দৈবককে দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে একটা ঠিকুজি সে করিয়ে নিতে পারত। তাহলে আর কোন ঝামেলাই হ'ত না। কানাই বড় মুষড়ে পড়ল। আবার একটি ভাল ছেলের জোগাড় করতে হবে। এমন কাজ ত আর ঠেলে ফেলতে পারবে না। এ ধরণের কাজ বছরে ক'টাই বা হাতে আসে।

সকালবেলায় শিবদালানে বসে মজলিশী গল্প জুড়েছে কানাই। গ্রাম অঞ্চলে কাজকর্মহীন বাউণ্ডুলে লোকের অভাব নেই। অল্প কিছু জমিজেরাও আছে। তাতেই মোটা ভাত কাপড়টা চলে। সকালে আড্ডা, দুপুরে ঘুম আর রাতে তাস, পাশা কিংবা যাত্রাগানের আসরে বসে সময়টা কাটে।

'তা খুড়ো, আবার কবে যাচ্ছ বাইর দিকে?' পরাণ সাউ শুধাল কানাইকে।

'দিন কতকের মধ্যেই বেরাব আবার। তবে ইবারে কলকেতা যাব। ভাল একটি পাত্তরের খোঁজ পেয়েছি। সেখানেই যাব গিয়ে একবার—'

'গাজনের আগেই ফিরছ ত?'

'নিশ্চয়! গাজনে কি বাইরে থেকেছি কুনোদিন?' কানাই হেসে জবাব দিল।

'ইবারে ভাল দলের বায়না করতে হবেক কিন্তু। তুমি ফিরে এস গিয়ে চটপট্—

উৎসাহে পরাণ সাউ ডগমগ। ঠিক জোয়ারের আগে ভরা নৌকার মত। চৈত্রমাস স্বরু হয়েছে। গাজনের আর দেরি নেই বেশী। রোদের তেজ হয়েছে বেশী। বেশীক্ষণ বসা যায় না রোদে। ইতিমধ্যেই গাজনতলায় ঢাকে কাঠি পড়েছে। নিমফুলের গন্ধে বাতাস ভ'রে উঠেছে—

কানাই ব'সে ভাবছিল তার মেয়ে উমার কথা। সত্যি বড় হয়েছে উমা। এবার একটা পাত্তর না দেখলে নয় আর। ভেবেচিন্তে একটি ছেলের কথাও মনে করেছে কানাই। নবাসন গাঁয়ের চক্রবর্তীদের ছেলে। বেশী জমিজমা নেই। বিঘে পাঁচেকের বেশী নয়। তবে ছোট একটা দোকান আছে। মুদীর দোকান। সব মিলিয়ে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হয় না। নবাসন গিয়ে সেই ছেলেটিকেই ধরবে কানাই। তবে তার আগে বকুলতলা গাঁয়ের মুখুজ্যে মশাইয়ের মেয়ের বিয়ের একটা ঠিক করতে হবে—।

দিন দুই পর। ভোরে উঠে পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কানাই। খানিক বেলা হলেই রোদ উঠবে প্রচণ্ড। তাই পা চালিয়ে জোর জোর চলছিল সে। আমডোব গাঁয়ের জগৎ মোড়ল পথের ধারে বসে। যেন ভাম হয়ে বসে আছে লোকটা। সমস্ত বাড়ীটা থেকে একটা চাপা কান্নার রোল উঠছে। কানাই ভেবেচিন্তে কোন হদিস পেল না। ওকে দেখে জগৎ মোড়ল বিশ্রী ভাষায় গালাগালি ক'রে উঠল।

অবাক হয়ে কানাই বলল, 'কি ব্যাপার মোড়ল? মিছামিছি গালমন্দ করছ কেনে?—'

'কেনে? আমার মেয়াটাকে কোন শত্তুরের হাতে সঁপে দিতে বললে তুমি? মা আমার গলায় দড়ি নিছে গো। কাল যে খবর পেলম রেতে—' জগৎ ডুকরিয়ে কেঁদে উঠল।

কানাই স্তম্ভিত হয়েছিল। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে সে আশংকা করেনি। খাণ্ডারণী মেয়ের শাশুড়ী। শাস্তি করত বউটাকে। গালমন্দ দিত। সেই জ্বালাতেই আত্মহত্যা করেছে মেয়েটি। নিজেকে শেষ করে দিয়েছে এই জ্বালাযন্ত্রণা এড়ানর জন্য। কানাইয়ের মুখে আর কোন কথা সরেনি।

ইষ্টিশনে পৌঁছে একটা বাঁধানো বেদীগোছের জায়গার উপর পা ছড়িয়ে বসল সে। আজকের সকালটা বড় খারাপ ভাবে স্বরু হয়েছে। দিনটা কেমন যাবে কে জানে? একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল সে।

তার চমক ভাঙল একটি মেয়ের ডাকে। কানাই ফিরে তাকাল। মেয়েটি বলল, 'আমায় চিনতে পারছেন ঘটকমশাই?'

'তোমায় মা? না ঠিক চিনতে ত পারছি না।'—

'দেবীজোড় গাঁয়ের মেয়ে আমি। আমার বাবার নাম জানেন না আপনি?'

এতক্ষণে কানাইয়ের মনে পড়ল। দেবীজোড় গাঁয়ের কায়স্থদের মেয়ে। দেবীর মতই রূপ মেয়েটির। ঘন কৃষ্ণ পক্ষে ঢাকা চোখ দু'টিতে কি সুন্দর লাজবিনম্র দৃষ্টি।

কানাই হেসে বলল, 'এবার চিনতে পেরেছি মা। তোমার বিয়ের যে ঘটকালি করেছিলাম আমি। সে কত দিন হ'ল আজ। তা পাঁচ বছর খুব হবেক, কি বল?'

মেয়েটি লজ্জারুণ মুখে চেয়ে রইল তার দিকে।

'সংগে এটি ছেলে বুঝি মা? তা জামাই কোথায়?' কানাই জানতে চাইল।

ছেলেটি ফুটফুটে ফর্সা। বছর তিনের বেশী বয়স নয়। সে অবাক চোখে কানাইকে দেখতে লাগল।

একটু পরেই জামাইয়ের সংগেও দেখা হ'ল। সে সিগারেট কিনতে কাছাকাছি কোন দোকানে গিয়েছিল। কোথায় যেন সরকারী কাজ করে। ছেলে আর স্ত্রীকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে।

কানাই দু'হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল।

ডাউন ট্রেনে ওরা চ'লে গেল। কানাই যাবে অন্য দিকে। তার ট্রেনের তখনও আসতে দেরি আছে। ছেলেটিকে আদর করে সে বলল, 'এবার আসি গিয়ে দাদু ভাই। ট্রেন যে ছেড়ে দিবেক।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। সমস্ত ষ্টেশনটা নিম ফুলের উগ্র স্ববাসে ভরে গেছে। চৈতের বাতাস মদির। কেমন মাতাল করা মনে হয়। একটু আগে শোনা দুঃসংবাদটা এতক্ষণে অনেকখানি ভুলতে পেরেছে সে। মনটা আবার কাজের নেশায় নেচে উঠতে চাইছে। কানাইয়ের মনে হ'ল সুখদুঃখ পৃথিবীতে চিরদিনই আছে। তবে তার ঘটকালিতে সকলেই অসুখী হয় নি। দেবীজোড় গাঁয়ের মেয়েটির মত স্বামী-পুত্র নিয়ে অনেকেই সুখী হয়েছে।

আসলে নিয়তিই ত সব? সে ত উপলক্ষ্য মাত্র।

লাল মোরাম বিছানো প্ল্যাটফর্মটার উপর দাঁড়িয়ে সে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

# আমাদের আইন ও লেডী চ্যাটার্লি

কেভিন্ ও'সালিভান্

সম্প্রতি লণ্ডনের ওল্ড বেইলির আদালতে 'পেঙ্গুইন্' পুস্তক-প্রকাশকদের একটি দুর্দান্ত বিচার হয়ে গেল।

তাঁদের বিরুদ্ধ অভিযোগ এই যে, তাঁরা নাকি সাহিত্যের নাম করে অশ্লীল লেখা ছাপিয়ে বাজারে প্রকাশ করেছেন! যথা 'লেডী চ্যাটার্লিস্ লাভার' নামক বইটির একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ বার করেছেন—আপত্তিজনক অংশগুলি ছেঁটে বাদ না দিয়ে। এই মোকদ্দমাটি সাহিত্য-জগতের এবং আইনজগতের একটি অতি স্মরণীয় ঘটনা। সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে চিরন্তন প্রশ্নগুলি আমাদের মনে জাগে—এই বিচারসভায় তার সবগুলিই সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শিত হ'ল।

লরেন্স জীবিত অবস্থায় আমাদের শাসন-কর্তাদের হাতে দারুণ কষ্টভোগ করে গেছেন। একবার তো আদালতের হুকুমে তাঁর আঁকা কয়েকটি ছবি পুড়িয়েই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে বাধ্য হয়েই সকলের স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর বইগুলি ঘরে ঘরে পড়া হয়েছে—অনেককে মুগ্ধ করেছে—তাঁর আদর্শ ও বক্তব্যবিষয় নিয়ে কত আলোচনা ও তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলেছে। গ্রীক পুরাণের ফিনিক্স্ পক্ষীর মতন তাঁর সেই প্রচণ্ড, উদ্দাম শক্তিও শেষ পর্য্যন্ত যেন ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হয়ে এল, এবং সকল উঁচুদরের সাহিত্যিকদের চরম পুরস্কারস্বরূপ—তাঁকেও যেন সাহিত্য-জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'ক্ল্যাসিক' লেখকদের মধ্যে স্থান দেওয়া হ'ল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ব্যাপার নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলমাল রয়ে গেল। 'লেডী চ্যাটার্লিস্ লাভার' নামক তাঁর উপন্যাসটি সাহিত্যের মাপকাঠিতে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, কর্ত্তৃপক্ষদের চোখে সেটা তখন ধরা হ'ল মারাত্মক উপদ্রবের মতন! আমাদের আইন-কর্ত্তাদের কাঁচি-চালান, ভেজাল সংস্করণ ছাড়া—লরেন্স সাহেবের খাঁটি হাতে লেখা বইটি আপনার পড়বার সখ জাগলে, চুপি চুপি চলে যেতে হ'ত প্যারিস—এবং শুল্কবিভাগের কর্ত্তাদের এড়িয়ে, বর্ষাতির গহ্বরে লুকিয়ে আনতে হ'ত একটি কপি!

'পেঙ্গুইন্' পুস্তক প্রকাশনী এ বছর পঁচিশ বছরে পড়ল। সেই আনন্দে তাঁরা ঠিক করলেন যে, 'লেডী চ্যাটার্লি'র সম্পূর্ণ সংস্করণ একটা ছাপিয়ে দেখা যাক্ না কি হয়। হবার মধ্যে হ'ল এই যে, ছদ্মবেশী কয়েকটি গোমড়ামুখো পুলিস হাজির হ'ল 'পেঙ্গুইন্' কোম্পানীর বড়কর্ত্তা, সার এলান লেনের অফিসে। তাদের হাতে ছিল আদালতের সমন। তিনি তাদের বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করে, সাক্ষ্যস্বরূপ তিরিশ কপি বই পাঠিয়ে দিলেন তাদের হাতে। কিছুই গোপন করা হ'ল না—

ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় সেইটাই পরখ করতে চাইলেন।

আমাদের শাসনতন্ত্রের ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ আইনে সাহিত্যিক অশ্লীলতা বিষয়ে অত্যন্ত বিশদভাবেই আজ্ঞা দেওয়া রয়েছে। ইংলণ্ডের আইনের চোখে যা অশ্লীল ধার্য্য হয় তা ছাপার হরফে প্রকাশ করা গুরুতর অপরাধ। যে সাহিত্যের সংস্পর্শে এলে ওঁদের মতে পাঠকের মন 'দূষিত' হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—তাকেই ওঁরা অশ্লীল নামে ভূষিত করেন। কিন্তু এই অশ্লীলতা-নিবারণী আইনের এক অংশে লেখা আছে যে, 'দূষিত' সেই লেখাটির মধ্যে যদি সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক কোন গুণ অথবা শিল্পনৈপুণ্য লক্ষণীয় হয় তবে তাকে ক্ষমা করা যেতেও পারে। এবং সেই গুণের প্রমাণস্বরূপ কোন অভিজ্ঞ সমর্থককে আদালতে হাজির করানোও আইনে বাধে না! কোন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষী হিসাবে হাজিরা দিতে এর আগে একবারও প্রয়োজন হয়নি—তার কারণ, এই নতুন আইনটি জন্মলাভ করার পর 'পেঙ্গুইন'দের বিরুদ্ধে মামলাটিই সর্ব্বপ্রথম। মিস্টার জাষ্টিস্ বার্ণ বাইরন্ আদালতে কাজ সুরু করতে যেদিন বিচার-শালায় ঢুকলেন—নিয়মমতন সভাস্থ সকলে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সেদিন তো শুধু 'পেঙ্গুইন' পুস্তক প্রকাশকদের বিচার সুরু হ'ল না—নতুন আইনটিকেও সেই সঙ্গে যাচাই করা হ'ল এবং লরেন্সের প্রতি ও তাঁর আদর্শের প্রতি আমাদের সামাজিক মনোভাবেরও একটি কড়া বিচার হয়ে গেল।

জেরাল্ড গার্ডিনার সাহেব দেশের একজন সেরা উকীল। তিনিই 'পেঙ্গুইন্'দের পক্ষ নিয়ে ওকালতী সুরু করলেন এবং সেই সঙ্গে আর এক আদালতে র‍্যাণ্ডল্ফ চার্চ্চহিলের হয়ে লড়াই চালালেন। সাহিত্য-জগতের মহারথীদের তিনি আদালতে যেমন নিপুণ কৌশলে চালনা করছিলেন—মনে হচ্ছিল যেন কোন সার্কাসের সর্দ্দার কয়েকটা পোষা সিংহের উপর ওস্তাদি চালাচ্ছে। আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে ও উপন্যাসটির সাহিত্যিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিবরণ দিতে, সব জড়িয়ে পঁয়ত্রিশ জনকে হাজির করানো হয়েছিল। বয়েস অনুপাতে একধারে ছিলেন ই এম ফস্টার সাহেব, অন্যদিকে শ্রীমতী বার্ণাডাইন ওয়াল—যিনি একুশ বছর বয়সে, কেম্ব্রিজে ইংরাজীর 'ট্রাইপসে' প্রথম দাঁড়িয়ে বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন।

ই, এম, ফস্টার বারে বারেই বললেন যে, লরেন্স তাঁর সমকালীন লেখকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুধু নয়—ইংল্যাণ্ডের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নীতিনিষ্ঠ, শুদ্ধাচারিতার যে একটি ঐতিহ্য কয়েকজন গড়ে তুলেছেন, লরেন্স তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উলিচের বিশপের মতে অপরাধী উপন্যাসটি পাঠকের মনে একটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার সৃষ্টি করে—কারণ বইটি পড়বার পর আমরা বুঝতে শিখি যে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধটি একটি অতি অন্তরঙ্গ পবিত্র পূজার মত—যেখানে দৈহিক কামনাকে পরমাত্মার আরাধনার কাজে লাগানো যায়।

জুরিদিগের সুবিধার জন্য মূল গ্রন্থটির উপর গুরুত্বপূর্ণ, সাহিত্যিক সমালোচনাও কয়েকজনের কাছে পাওয়া গেল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অক্সফোর্ডের ডাঃ হেলেন গার্ডনার, কেম্ব্রিজের ডাঃ গ্রেহাম্ হাও এবং ডাঃ জোন বেনেট্ আর নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিভিয়ান্ ডি সোলা পিন্টো। এই প্রথম অভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সমালোচনার মানদণ্ডে দেশের আইনকে মাপা হ'ল। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সবটাই যে লরেন্সের প্রশংসায় ভরপুর ছিল তা নয়, কিন্তু বইটি যে নৈতিক ও সাহিত্যিক দিক্ দিয়ে সেই যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক এ বিষয়ে সকলেই একমত হলেন।

নম্রভাষায় 'চার অক্ষরের কথা' বলে যেটিকে বারে বারে উল্লেখ করা হয়েছে—বইটির ভিতরে সেই কথা-গুলির প্রাচুর্য্য নিয়ে তুমুল আলোচনা হ'ল। তার কারণ সর্ব্বাগ্রে এই কথাগুলির জন্যই বইটিকে অশ্লীল ধরা হয়েছিল। সর্ব্বসাধারণ-ব্যবহৃত সরকারী পায়খানার দেয়ালে যে ধরনের কথা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে—সেইগুলিকে আমাদের বিদ্বেষ-মুক্ত করা সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে লরেন্স সাহসিকতার পরিচয় হয়ত দিলেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সমালোচকের মতে এটি সাহিত্য রুচির দিক্ দিয়ে একেবারেই অচল হয়ে রইল।

আমাদের সবক'টি অভিজ্ঞ সাক্ষীদের মধ্যে লিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ রিচার্ড হগার্ট এই সমস্যাটির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অনুভূতিশীল ব্যাখ্যা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, আদালতে আসার পথে একটি ইট-কাঠের গাঁথুনীর কাজে ব্যস্ত মিস্ত্রীকে আলোচ্য ওই 'চার অক্ষরের কথা'টি তিনি উচ্চারণ করতে শুনেছেন। তিনি আরও বললেন যে, যাকে কখনও কুলী মিস্ত্রীদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে—সে সৌভাগ্য তাঁর নিজেরই হয়েছিল,—সেই জানবে এই কথাগুলি কি পরিমাণ প্রচলিত হয়ে উঠেছে জনসাধারণের মুখে। সে ক্ষেত্রে বইটির মধ্যে সাধারণ-ব্যবহৃত এই

কথাগুলি থাকার জন্য সেটিকে নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত হাস্যকর কাজ। অবশ্য যে ধরণের সাহিত্য পাঠকের মনকে কলুষিত করে তা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ রাখা উচিত—কিন্তু 'লেডী চ্যাটার্লি', মিঃ হগার্টের মতে ঠিক তার বিপরীত কাজ করেছে। লরেন্সের মতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কটি জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান্ বস্তু। তাঁর ধারণা, সামাজিক জীবন আমাদের কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মতৃপ্ত গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে ফেলছে। তার ফলে আমরা পরস্পরকে এমনই সন্দেহ করতে ও অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি যে, মানবধর্মী, সহজ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে জীবন চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই তিনি বলেছেন যে, স্ত্রী-পুরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের পরিপূর্ণতায় আসল মানব-প্রকৃতির বিকাশ এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে উপলব্ধি করার এই সত্য উপায়।

বাস্তবিক, এই ধরণের মোকদ্দমার অপরাধীর পক্ষের সমর্থক ও সাক্ষী হিসাবে মিঃ হগার্টকে আদর্শ বলা যেতে পারে। লরেন্সেরই মতন তিনি দরিদ্র শ্রমিক পরিবারে জন্ম লাভ করেছিলেন এবং নিজের চেষ্টায় বড় শহরে এসে কর্মচঞ্চল নাগরিক জীবনের নির্লিপ্ত, উদাসীন প্রতিবেশকে অগ্রাহ্য করে, আপন উদ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তির পর বৃত্তি অর্জ্জন করে,অবশেষ সর্ব্বোচ্চ 'ডাক্তার' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। লরেন্সেরই মতন তাঁর মধ্যে একটি গভীর, নৈতিক সততা প্রকাশ পেয়েছে—এবং সেই জন্যই তাঁর জীবন-ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন রেষারেষি ঘটে নি। তফাৎ শুধু এই যে লরেন্সের মত তিনি আদর্শবাদিতার ঢেউয়ে নিজেকে একেবারে সঁপে না দিয়ে বাস্তবজগতের শক্ত মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। তাঁর রসবোধ গভীর, তাই তাঁর কৌতুকপ্রিয় মন সাদাসিধে মানুষের নগণ্য সাধারণ জীবনধারার সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলে নি। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখিত ওঁর অপূর্ব্ব বইটি ( The Uses of Literacy ) ভারতবর্ষে বিশেষ পড়া হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ইংলণ্ডে কলকারখানা, অথবা খনি-সংক্রান্ত কারণে গঠিত ছোট শহরে যে সব শ্রমিক পরিবারগুলি বসবাস করেন, তাঁদেরই দৈনিক জীবনের ছোটখাটো সমস্যাগুলির সঙ্গে জড়িত এই বইটি। সুতরাং বহির্জ্জগতের পাঠকের পক্ষে তার রস গ্রহণ করা হয়ত কিছুটা কঠিন হবে। কিন্তু বইটিতে তাঁর উদার সহানুভূতির সাহায্যে তিনি শ্রমিক-জীবনের এমন একটি যথার্থ আন্তরিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন যে, বইটির নাম না করে পারলাম না। তাছাড়া শ্রমিক-সমাজের উপর গণশিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে উনি যা লিখেছেন তাতে মনে হয়, জুরি-বেঞ্চের উপর বসা ওই বারোটি উৎসুক-চিত্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিক মহারথাদের আলাপ করিয়ে দেবার মতন লোক একমাত্র ঐ মিঃ হগার্ট।

বইটির দোষগুণ নিয়ে তিনদিনব্যাপী তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর বোঝা গেল যে, বাদীপক্ষের উকীল মিঃ গ্রিফিতস-জোনস অবশেষে হার মানছেন। সরকারের পক্ষের কোন সাক্ষী তিনি দাঁড় করান নি, সুতরাং প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করতে সুবিধে পেলেন না। তৃতীয় দিন মিঃ গার্ডিনার সভাস্থ সকলকে জানালেন যে, পঁয়ত্রিশটি অভিজ্ঞ সাক্ষীর বক্তব্য শোনাবার পরও তাঁর হাতে আরও ছত্রিশটি প্রখ্যাত সাক্ষী তৈরী আছেন, প্রয়োজন হলে তাঁদেরও হাজির করাতে তিনি প্রস্তুত, তবে আর বোধহয় প্রয়োজন হবে না।

অবশেষে দুই উকীলই তাঁদের বক্তব্য শেষ করলেন। জুরিদের প্রতি মিঃ গার্ডিনারের শেষ অনুরোধ হ'ল এই যে, বিগত দিনের কোন কোন জুরিদের মত তাঁরা যেন এই বিশেষজ্ঞদের অভিমতগুলিকে অগ্রাহ্য না করেন—এককালে হার্ডি, শ, ইব্সেন, ওয়াইল্ড ও জয়েসের বই-গুলিও এই ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এ বইটি একটি একনিষ্ঠ আদর্শবাদীর অকপট, আবেগবিহ্বল মনের উচ্ছ্বসিত বিকাশ মাত্র। লরেন্সের গভীর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সমাজকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল না হলেও, তাঁকে এবং তাঁর লেখাকে অন্যায় অপবাদের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা আমাদের করা উচিত নয় কি? অন্যের মতের বশবর্ত্তী হয়ে পাঠকেরা যেন লরেন্সের উচ্চ আদর্শের কথা ভুলে না যান।

বাদী পক্ষের সরকারী উকীল মিঃ গ্রিফিতস জোন্স্ খুব খানিকটা আস্ফালনের পর তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। বইটির একটি বিশেষ অংশকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন যে, দৈহিক কামনার এতটা প্রকট বিবরণী পাওয়া যায় একমাত্র চেরিং ক্রসের একটি পাড়ায়, নয়ত প্যারিসের কয়েকটি অলিগলিতে আর নয়ত একদম পোর্ট সৈয়দে।

বিচারক তাঁর রায় দিলেন অত্যন্ত কাঠখোট্টা নিরস একটি ভাষণ—এতগুলি অভিজ্ঞ লোকের মতামত তাঁকে একদম স্পর্শ করে নি বলে মনে হ'ল। এরপর 'জুরি'রা বেরিয়ে গেলেন। তিন ঘণ্টা পরে জানা গেল 'পেঙ্গুইন' পক্ষেরই জয় হয়েছে—তাঁরা নির্দ্দোষ! চারদিকের

স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনি আদালতের দারোয়ানের ধমকেতে চট্ করে থেমে গেল।

এখন তো সব চুপচাপ। আপনাদের লিখব বলে কলম ধরেছি আর ওদিকে সারা দেশে 'পেঙ্গুইনের' সুপরিচিত সাদা ও গেরুয়া মেলানো মলাট-মোড়া বইগুলি সাড়ে তিন শিলিং দামে চড়চড় বিক্রী হচ্ছে। পাঁচ লক্ষ কপি ছাপা হবে এবং তার থেকে চার হাজার পাউণ্ডেরও বেশী টাকা লরেন্সের ভূসম্পত্তির অন্তর্গত হবে।

এক প্যাকেট সিগারেটের চেয়েও সস্তা এক কপি 'লেডী চ্যাটার্লি'—এটা কি ভাল হ'ল? আলোকপ্রাপ্ত সমাজে দায়িত্বহীন কতগুলি বুদ্ধিজীবির মুখে মুখে কয়েকটি জনরব চালু করে দেওয়া নিতান্তই সহজ, যেমন, 'তফাৎ যাও'। অথবা 'বাঁধ ভেঙে দাও' কিম্বা 'আর্টের পথ আলাদা', ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে, বইটিকে এভাবে অশ্লীল বলে নিষিদ্ধ রাখলে লরেন্সের লেখার সরল মাধুর্য্যটি চিরকাল অন্যায় অপবাদে দুষ্ট হয়ে রইত।

লরেন্স জীবিতকালে উচ্ছ্বসিত আবেগে যে সব ভাবষ্যদ্বাণী করেছিলেন—অবশেষে তার কিছুটা বলবৎ হয়েছে বলে মনে হয়। কিছুদিন আগে কেউ ভাবতেই পারতেন না যে, এই 'ওল্ড বেইলী'র আদালতে কয়েকটি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, ভাবগম্ভীর লোক একত্রিত হয়ে দৈহিক প্রেমের মর্ম্মার্থ নিয়ে এতদিন ধরে তর্কাতর্কি চালাতে পারেন! এই বিচারের ফলে লরেন্স এই প্রথম জনসাধারণের চোখে পবিত্র জীবনের বার্ত্তাবাহক হিসাবে প্রমাণিত হলেন। কিন্তু মজা হল এই যে, যদিও বইটি পড়লে পাঠকের মন দূষিত হবার কথা নয়—তবু এক-ধরণের কামুক, অতি কৌতূহলী মনের পক্ষে এই লেখাটির আসল মর্ম্ম বোঝা একেবারে অসম্ভব বলেই লরেন্সের লেখার শান্ত সৌন্দর্য্যটি তাদের নোংরা হাসিতে ও ঠাট্টায় একেবারে কলুষিত হয়ে যাবে। এই ধরণের প্রতিক্রিয়া লরেন্সের নজরে পড়লে তিনি মর্ম্মাহত হতেন। এ রকম ইতর মন তিনি কোনদিন সহ্য করতে পারেন নি এবং আজ তাঁর মৃত্যুর পর তাদের কৌতূহলী চোখের সামনে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত করা হলে তাঁর প্রতি একরকম অন্যায় করা হবে বলে আমার বিশ্বাস।
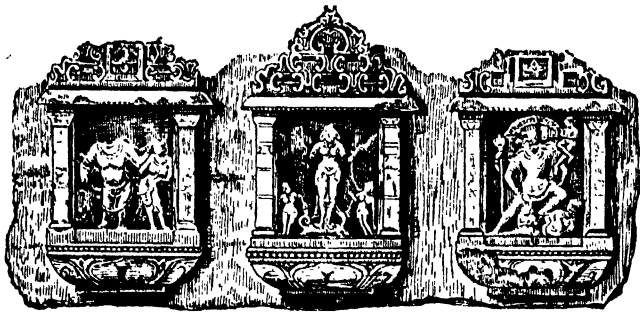
# ছন্দ পতন

শ্রীসলিল রায়

'শ্রীচরণেষু' লিখতে গিয়ে কলম থেমে গেল, যাঁর উদ্দেশ্যে এই চিঠি লেখা তিনি আমার শিক্ষক, প্রায় উনিশটি বছর আগে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম। তিনি আমাদের শেখাতেন চিত্রাঙ্কন, এ ত ছিল তাঁর বিদ্যালয়ে কর্তব্য-পালন। কিন্তু বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরেও অনেকেই সুযোগ পেত তাঁর সঙ্গে মিশবার। যাদের মনেই রঙ তুলির নেশা ধরত (সংখ্যা যদিও স্বাভাবিক ভাবেই অল্প) তাদের প্রত্যেককেই তিনি আঁচড়ে, তুলিতে ছন্দ ফুটিয়ে একান্ত আপন করে নিতেন, কিন্তু এত অন্তরঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কোনদিন তাঁকে চরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করতে পারি নি। উনিশটি বছর কেটে গেছে, কিন্তু সেকথা এখনও ভুলি নি। এখনও যেন শুনতে পাই, ক্লাসের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ক্রাচেসের সেই নিষ্ঠুর খট্ খট্ শব্দ, যৌবনে উনি কোন এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন, যার ফলে তাঁকে চিরজন্মের মত হারাতে হয়েছিল একটি পায়ের অর্ধাংশ। এক পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে সঙ্কোচ হ'ত, আজও তাই হ'ল 'শ্রীচরণেষু' লিখতে গিয়ে। হয়ত এ আমার মনগড়া সঙ্কোচ, হয়ত তাই, তাই সুরু করলাম—

পূজনীয় মাষ্টারমশায়,

প্রায় উনিশটি বছর আগে আমি আপনার ছাত্র ছিলাম, এইটুকুই আমার যা কিছু পরিচয়ের সূত্র, আজ ঘটনাচক্রে আপনার দ্বারস্থ হতে হ'ল এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। আপনার সংস্পর্শে যে ক'টি বছর কাটিয়েছিলাম তার স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়। তা ছাড়া মাঝে মাঝে নতুন পুস্তকের প্রচ্ছদ-শিল্পী পরিচয়ে আপনার নাম দেখতে পাই। একবার কোন এক চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত আপনার অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রের সমালোচনা এক সাময়িকীর পাতায় পড়েছিলাম। এগুলো দেখলে আপনার কথা নতুন করে মনে পড়ে, আপনার স্নেহাতুর সঙ্গ লাভের জন্য মনটা ব্যকুল হয়ে ওঠে। আপনি হয়ত সুরুতেই আমাকে চিনবার চেষ্টা করবেন, স্মৃতির থলি হাতড়ে হাতড়ে অনেক মুখ চোখের সামনে মেলে ধরবেন, কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি ম্লান, কোনটি অস্পষ্ট মুখের মেলা, শত শত মুখ, সেই অস্পষ্টদের ভিড়েই আমাকে না হয় একটু ঠাঁই দিলেন।

চিত্রাঙ্কন শেখাতে শেখাতে আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি ও কাহিনী শোনাতেন, ওগুলো ছিল আমাদের বাড়তি লাভ। মোহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আপনি প্রায়ই আর্নল্ডের "লাইট অফ এশিয়া"র বিখ্যাত লাইনটি উদ্ধৃত করতেন, সিদ্ধার্থ ছন্দককে বললেন :

"Friend that love is false which clings to love for selfish sweets of love"

অথবা বুদ্ধদেব স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন :

"I loved thee most because I loved so well all living souls."

ও লাইনগুলো এখনও ভুলি নি, আর ভুলি নি আপনার বলা বাইবেলের সেই সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি, আপনি প্রায়ই "গুড সামেরিটান" এর কথা বলতেন, গল্পটি শেষ করে প্রশ্নচ্ছলে বলতেন,

"Which of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?" আমরা পাঁচ-ছয়জন প্রায় সমস্বরে বলে উঠতাম, "He that shewed mercy on him." সৎ প্রতিবেশীর এই আদর্শ ভুলি নি তাই প্রথম থেকেই তপনের প্রতি আমি আকৃষ্ট হলাম।

আমার অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগের সময় আমি যখন সম্পূর্ণ অসহায়, তখন তপন তার সহানুভূতি আর সহৃদয়তা দিয়ে আমার মন জয় করে নিল, তা ছাড়া বাড়ীর পাশেই থাকায় ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েই গেল, কর্মের ব্যাপারে আমাদের কোন মিলই ছিল না, ও কারখানার কর্মী—কারিগর আর আমি শিক্ষক। ওর মধ্যে সবচেয়ে যা ভাল লেগেছিল তা হ'ল ওর যন্ত্র-কুশলতা। আর কর্মিষ্ঠ স্বভাব। আরও দুটো ব্যাপারে আমি একান্তই শূন্য, ও যখন নিপুণ হাতে ঘড়ি, কলম, কল সারিয়ে ফেলত। ওর কুশলতায় আমার মনে আনন্দ হ'ত। এই বোধ হয় নিয়ম, প্রত্যেক মানুষেরই যেমন কোন একটি বিশেষ বিষয়ে—যেমন, চিত্রে, সঙ্গীতে, লেখায়

দক্ষতা থাকে তেমনই প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবেই অভাবও থেকে যায়। তাই না বৈপরীত্যে মানুষের আকর্ষণ বাড়ে। তপনের বন্ধুত্ব আসলে আমার জীবনে কতকগুলি অভাবের পরিপূরক হয়ে এল। আমিও তার হলাম ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ। তপন অসঙ্কোচে তার নিঃসঙ্গতার কথা বলত। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে যখন ও বাসায় ফিরত, তখন কারও কোমল হাতের সেবা লাভের জন্যে ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। আমি বুঝেছিলাম ও বন্ধনে আগ্রহ, তাই ওর কাকীমার প্রস্তাবে ও যখন রাজী হয়ে গেল আমি আনন্দিতই হলাম। বিয়ে হয়ে গেল, বধূ সুশ্রী, আলাপ হ'ল। বললাম, তপন এতদিন ধূলিমলিন শঙ্খের মত অযত্নে পড়েছিল, এবার আপনি তাকে ধুয়ে মুছে এক ফুৎকারে বাজিয়ে দিন। হেসে উত্তর দিয়েছিল "তাই নাকি?"

তপনের মা বাবা নেই, কাকা কাকীমাই সব, কাকা জাহাজ কোম্পানীতে চাকরি করেন। থাকেন বাইরে বাইরে নদীর ঘাটে ঘাটে। কাকীমা বৌকে পেয়ে আদর ক'রে কাছে টেনে নিলেন আর তপনের বৌ নতুন পরিবেশে স্নেহের স্বাদে আশ্বস্ত হ'ল। একদিন গেলাম ছুটির দিন দুপুরে, দেখি সুচারু, তপনের বৌ'র নাম সুচারু, একতাল কাগজে-আঁকা ছবি মুছে মুছে সাজিয়ে জড়ো করছে। স্বাভাবিক কৌতূহলেই এক একখানি ক'রে ছবিগুলি তুলে চোখের সামনে ধরলাম। বিস্ময়ে আনন্দে মনটা ভ'রে গেল। প্রত্যেকটিতে নীচের দিকে কোণায় স্পষ্ট সুন্দর ছাঁদের মেয়েলি অক্ষরে লেখা নাম, সুচারু। ছবিতে কৌতূহলী চোখ রেখেই প্রশ্ন করলাম, বৌদি আপনি ছবি আঁকেন না কি? বলেন নি ত? এ গুণ কোথায় পেলেন? সুচারু একটু যেন লজ্জায় পড়ল, ক্ষণ পরে লজ্জা কাটিয়ে বলল, সবই বাবার কাছে শেখা, মাকে ত ছেলেবেলাতেই হারিয়েছি। বললাম, এখানে আঁকেন না কেন? এমন গুণটা নষ্ট করছেন? বলল, এঁকেছিলাম একটি, তার পর বন্ধ করে দিয়েছি। কাকীমা আঁকাটাকা পছন্দ করেন না। চাইলাম দেখতে সেই ছবিটি, এনে দিল, তপনদের বাড়ীর পাশেই এক মুসলমান পরিবারের বাড়ী। ছাদে উঠলেই দেখা যায়, তারই একটি চিত্র। খড়ের চালা, মাটি দিয়ে নিকোনো দাওয়া। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বধূ তাকিয়ে আছে এক-দৃষ্টে বাচ্চা ছেলেটার দিকে, চোখেমুখে স্বর্গীয় আনন্দ। উঠোনে এক পাল মুরগী। বাচ্চা ছেলেটা ধান ছিটিয়ে দিচ্ছে আর মুরগীগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে গায়ে গা দিয়ে। যেন একটি সুখী পরিবার। আর মোরগটা গলা ফুলিয়ে ঝুঁটি উঁচিয়ে কবরটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনেই একটি কবর, কামিনীফুলের গাছের নীচে। কবরটা ছায়া ছায়া। বললাম, ছবিটা আশ্চর্য ভাল লাগল, জীবন্ত ছবি। কিন্তু কবরটা ঢোকালেন কেন? ওটা না হয় বাদই দিতেন? সুচারু বলল, ওটাও জীবন্ত, ওটাও সত্য। ওই শিশু, মুরগী, গাছ, রোদ আর ফুলের মত ওটাও জীবন্ত, মৃত্যুতে। জীবনেরই অঙ্গ, নয় কি? আশ্চর্য হলাম, বললাম, আপনার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতে হয়। না, তপনটা ভাগ্যবান্ বলতে হবে! হেসে উত্তর দিল সুচারু—আপনিই বা আর কেন ভাগ্যহীন থাকেন, বলুন না একটি ভাগ্যবতী জোগাড় করে আনি। সুচারুর কথা আরও অনেক জেনেছি, আর অবাক হয়ে গিয়েছি। তপন, সুচারু, আমি কতদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে গিয়েছি গঙ্গার বালুচরে। একদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা, বালুচরে আমরা নিরালায় বসলাম। আমিই বললাম, একটা গান শোনান না বৌদি। তখন সমস্ত অন্তর আকুল করে গাইলেন। 'রোদন ভরা এ বসন্ত কখনো আসে নি এর আগে'। সমস্ত বাসন্তী প্রকৃতি যেন কেঁদে উঠল হাহাকারে, বেদনায়। কণ্ঠে অপূর্ব মাধুর্য আর দরদ। কে জানে হয়ত পরিবেশ গুণেই অত ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল পূর্ণিমা রাত্রি বুঝি বালুচরের বুকে লুটিয়ে প'ড়ে অঝোরে কাঁদছে! গান থামলে আবার চুপ, ক্ষণেক পরে বললাম, অপূর্ব, আজ দেখলাম ফুলের আর একটি পাঁপড়ি খুলল। আপনার এত গুণ বৌদি! আর ঠিক পরিবেশে মনের মত গানটিও গাইলেন? হেসে বলল সুচারু, এই ফাল্গুনী রাত্রে 'আজি বারি ঝরে' গাইলে ভাল শোনাত? আমি হেসে উঠলাম, তপন কিন্তু হাসল না।

তার পর একদিন গানও থেমে গেছে, চিঠির আকার দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, সংক্ষেপে শেষ করি। মনোরম দীঘির টলমল কালো জলে ভেসে বেড়াত শুভ্র হংসদল, দীঘি গেল মজে, পাড় গেল ধ্বসে, পরিত্যক্ত পড়ে রইল দীঘি।

ইতিমধ্যে তপনের সন্তান হয়েছে, পুত্র সন্তান। তার পরও তিনটি বছর কেটে গেছে। কিন্তু জানি না আনন্দ কেন বেদনার বোঝা নিয়ে এল। সেই থেকেই তপনদের সংসারে অশান্তির ছায়াপাত। অশান্তি বাড়ল সেদিন থেকে যেদিন তপনের কাকা কর্ম থেকে অবসর নিয়ে বাড়ীতে বসলেন। তপনের কাকার কথা একবারেই বলা হয় নি। ওঁর একটি কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে। একদিন আমায় বাগানে দাঁড়িয়ে কথায় কথায়

বললেন, এই নিষ্ফলা গাছটা কেটে ফেল। বললাম, কেন?

নিষ্ফলা গাছ রেখে লাভ কি? অমঙ্গল হয়। পরক্ষণেই বুঝেছিলাম এটা সন্তানহীন পিতার আক্ষেপের প্রকাশ। তপনের কাকী নিঃসন্তান। হয়ত তাই তপনের সন্তান হওয়ার পর থেকেই ওর কাকা-কাকীমার বুভুক্ষু অন্তর ওদের সন্তানকে কাছে টেনে নিলে। এত কাছে যে, বলতে গেলে সুচারুর স্নেহের আঙিনার বাইরে। একি সত্যই পিতৃমাতৃ হৃদয়ের সন্তান স্নেহের অতৃপ্ত ক্ষুধা, না আর কিছু? তপনের কাকাকে আমি বলতাম প্রসপারো। "টেমপেষ্ট"-এর সেই নির্বাসিত প্রসপারো। উনি চিরটা কাল কাটিয়েছেন নদীর কুলে কুলে জাহাজ ঘাটে। এক একটা জনশূন্য ঘাট। লোকালয় মাইল দুই দূরে। হয়ত শ্মশানের ঠিক পাশেই ঘাট। এদিকে বিস্তীর্ণ বালুচর, বাসস্থান বলতে খড়ের ছোট চালা। আর মাল মজুতের গুদাম ঘর। সঙ্গী বলতে ওঁর একটি "অতি পুরাতন ভৃত্য"। আমি বলতাম Ariel. কখন একটি জাহাজ আসবে, তারই প্রত্যাশায় পড়ে থাকা। তখনই হবে দুটো মানুষের সঙ্গে দেখা। ওও বা কতটুকু, মাল তোলার তদারকিতে সময় পেরিয়ে যায়। পণ্যবাহী জাহাজগুলো মাল বোঝাই হলে নিঃসঙ্গ ঘাটকে যেন বিদায় দিয়ে রাত্রির অন্ধকারকে বাঁশীতে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মিলিয়ে যায়। আমার প্রসপারো, তপনের কাকা, মনে মনে বলেন "আ রিভোরা।" আবার পরের দিন, দিনেই হয়ত, একটা জাহাজ এসে লাগল আর না হয়ত এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল অথচ একটি জহাজেরও দেখা নেই। সেই নির্জন নদীকূলে নিশুতি রাত্রে ভয়ে আশঙ্কায় কত না দিন কাটিয়েছেন আমার প্রসপারো। একদিন শীতের রাত্রে ভেজানো জানালাটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল। আঁতকে উঠলেন, বাইরে নিটোল অন্ধকার। একটি করুণ আওয়াজ ক্রমশঃ তাঁর কুটিরের দিকে এগিয়ে আসছে, কুছ খানে দো, কিছু খেতে দাও। তার পরই দরজায় আঘাত দেওয়ার শব্দ। সে আর থামতে চায় না। আর তাঁর বুকের কাঁপুনিও থামতে চায় না। অত শীতেও ঘেমে উঠলেন। পাশে ভৃত্য শুয়ে, সাহস নেই ডেকে ওঠান। মনে হয় একটা শবও আসে না ছাই, 'হরিবোল' ধ্বনিটা শুনলেও যেন সাহস পাওয়া যায়। এরকম কত না রাত কেটে গেছে, পরে হয়ত শুনেছেন ও একটা পাগল। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে শ্মশানে আসে আর গৃহস্থের দরজায় ধাক্কা দিয়ে যায়। এই হিম-শীতল নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে তপনের কাকা ছুটে আসতেন বাড়ীতে। কিন্তু এক দু'দিনের বেশী থাকতে পারতেন না। এখানেও যে শুকনো বালুচর, উনি বলতেন। আমি হেসে বলতাম, আপনার প্রসপারো নামটা নেহাৎ ভুল হয় নি। উনি বলতেন, কিন্তু মিরাণ্ডা কই? সেই পবিত্র স্বর্গীয় শিশুর মুখের মধ্যেই না প্রসপারো পেয়েছিলেন তাঁর ভরসার খনি অন্তরের শক্তি!

তবে কি নিঃসঙ্গতা মানুষকে অমানুষ করে তোলে? একটি শিশুর অভাবে মানুষের অন্তর ছাই হয়ে যায়? তাই হবে, তা না হলে তপনের কাকা সুচারুর প্রতি অমন বিরূপ হলেন কেন? আমার যাতায়াত (যা ইদানীং কদাচিৎ হ'ত) তা ওদের চোখে অশোভন ঠেকল, দেখতে দেখতে সন্দেহটা বিষাক্ত ঘায়ের মত বেড়ে গেল। একদিন বাড়ী ফিরে চোখ পড়ল একটি খামের চিঠিতে। লোকাল চিঠি, একটু অবাকই হলাম, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে খুললাম, সুচারুর চিঠি।

আমার চিঠির আকার দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে, তবু সুচারুর চিঠির কথা আপনাকে না জানিয়ে পারছি না, মাষ্টারমশায়। আপনি যে শিল্পী, আপনি বেদনার গভীরত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। আর তা ছাড়া আপনাকে সব জানাতেও হবে, আপনার কাছে উত্তর চাই একটি প্রশ্নের। সুচারু লিখেছে, "অনেক দিন আসেন নি। জানি কেন? ভালই করেছেন, আপনার আসা এরা সন্দেহের চোখে দেখে। আচ্ছা, বলতে পারেন, মানুষের মন এত সঙ্কুচিত হয় কেন? শিক্ষার অভাব বললে ধৃষ্টতা মনে হবে,কিন্তু হয়ত তাই। আপনার প্রসপারোর আচরণ দিন দিন ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, শুধু আমাকে নয় আমার বাবাকে নিয়েও যা-তা বলেন, বলেন কুশিক্ষা পেয়েছি, চিত্র আর কাব্যি শিখেছি, কিন্তু হাতা নাড়তে, ছেলে মানুষ করতে শিখিনি! ছেলেকে ওঁরা যে ভাবে মানুষ করছেন দেখলে কান্না পায়। ভগবান্, এ কোথায় আমাকে এনে ফেললে! আর আপনার বন্ধু? কারখানা, ওভারটাইম আর বাড়ীতে এলে হাতুড়ি আর যন্ত্রপাতি। বলে, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, সৌখীন ব্যাপার। সংসারে চলে না, কোথাও বেরোতে পাই না, এমন কি ছাদে গিয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। কিন্তু পারি না যে, ছাদে দাঁড়ালেই আপনার প্রসপারো সন্দেহ করেন, লজ্জায় ম'রে যাই। বাবার কথা ভাবি, ওঁর ঔদার্য সকলে পায় না কেন? কতদিন তাঁকে চিঠি দিই নি, চিঠি পাইও নি অনেক দিন,

কি জানি কেমন আছেন, বদ্ধ জলার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি।"

দেখতে দেখতে আবার একটি বছর শেষ হয়ে এল। চৈত্রের মাঝামাঝি। পাতা ঝরা সুরু হয়ে গেছে, নিষেধের কড়া চোখ এড়িয়ে সামনের বারান্দায় দুপুরে দাঁড়াই। ছোট্ট গলিটা শুকনো পাতায় ছেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে রাজপথের দমকা হাওয়া গলিতে ঢুকে পাতাগুলোকে ইতস্ততঃ জড়ো করে ছিটিয়ে দিয়ে উদ্দাম গতিতে বেরিয়ে যায়। বিভ্রান্ত পাতাগুলো কপোত-ভীরু চোখে বায়ুর গতিপথের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার পাতা ঝ'রে পড়ে—ঝর্ ঝর্ ঝর্। তার মর্মর ধ্বনি মনটা আকুল করে দেয়, মনে হয়।

> "অতি নিবিড় বেদনা বন মাঝে রে
> আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে
> দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
> আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে"

মনটা খাঁ খাঁ করে, ইচ্ছে করে ছেলেটাকে বুকের কাছে টেনে নিই, কিন্তু সে পথেও অর্গল, ও ত কাকীমার কোলের কাছে ঘুমিয়ে। কতটুকু আর ওকে কাছে পাই, কি ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা, বলুন ত? আপনার প্রসপারোর ঘাটে ঘাটে কি এত নিঃসঙ্গতা ছিল? আপনার বন্ধুর সঙ্গ পাইও না। পেতে আকাঙ্ক্ষাও হয় না। ওকে মনে হয় একটা লৌহ কুঠার, যা আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। ভাবুন ত কি ভীষণ নিঃসঙ্গ জীবন! সেই ছবিগুলো গেছে, ওগুলোকে একদিন আমার সামনেই দাহ করে দিলে। তুলি গেছে, রঙ গেছে, "সঞ্চয়িতা" কাকার ঘরে পুরাণো পাঁজিগুলোর সঙ্গে কীটের খাদ্য হয়ে আছে, কেঁদে কেঁদে ম'রে যাই, বেলা গড়িয়ে এলে শাসন উপেক্ষা করেই ছাদে পালাই। মনে শান্তি আসে, দৃষ্টি মেলে দিই আপন আনন্দে।"

"পাশের মুসলমান বাড়ীর বৌটি ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে। মাতাল স্বামীটা মারধোর করত। অন্যত্র ঘর বেঁধেছে, ওদের ত বাধা নেই। কবরের পাশে সেই কামিনী ফুলের গাছটা নেই। কবরটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। পাঁচিলটা জায়গায় জায়গায় ধ্বসে গেছে। ইচ্ছে হয় একটা ছবি আঁকি। ন্যাড়া কবর, উঠোনের মাঝখানে, উঠোনের চার দিকের দেওয়ালগুলো ভগ্নদশায়, কিন্তু দুয়ারটা বেশ শক্ত ক'রে বন্ধ, দাওয়ায় একটা শীর্ণ কুকুর প্রহরা দিচ্ছে, ঠিক যেন আপনাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন জীর্ণ জীবন-ধারা আগলে আছে তপন, কাকাবাবুর দল।"

"স্বল্প দূরে দক্ষিণে দেখা যায় স্টেশন, সন্ধ্যার দিকে একটা গাড়ী আসে, ছাড়ে। স্টেশনে চাঞ্চল্য প'ড়ে যায়। শিরীষের মাথায় লাল ফুলগুলো যেন আরও লাল হয়ে ওঠে। ট্রেনটা বাষ্প ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যায়। আমিও ত যাত্রী! ভাবি, আমায় একবারটি কেন নিয়ে যায় না? সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন, শেষ আভাটুকু আশীর্বাদের মত পশ্চিমের কোণটিতে উজ্জ্বল। নদীর স্থির শান্ত জলে লোহিতাভা। নদীর পানে নিবিড় চোখে চেয়ে আছে আকাশ। কাছে, আরও কাছে আকাশ যেন নেমে আসছে, তাই বুঝি জলে রক্তাভায় ফুটে উঠেছে তটিনীর শরমের শোনিমা।"

"যা বলতে চাই তা বলাই হ'ল না। মনটাকে বাঁধতে চাই, পারি না, চেষ্টা করি দশজনের মত সংসারনিষ্ঠ হয়ে উঠি, পারি না। মন যে আমার রূপাতুর, রূপে, রসে, গন্ধে বিহ্বল হয়ে যায়। মনকেই বা দোষ দিই কেন? দোষ ত আমার বাবার, কেন তিনি আমার মনটিকে শৈশব থেকে জেলে দিলেন আলোর দিকে। তিনি কি জানতেন না শিথিল মন নিয়ে—হ্যাঁ, শিথিলই বলব—বৈচিত্র-বিমুখ, কর্মক্লিষ্ট সংসারে আমি হাঁপিয়ে উঠব। কি প্রয়োজন ছিল আমার মনের মধ্যে রূপের সাধ জাগিয়ে তোলার?"

"এবার বলে ফেলি কুশ্রী, কদর্য, একটা কথা। দু-এক দিন আগের ঘটনা, সন্ধ্যায় পালিয়েছিলাম ছাদে, চারদিকে চেয়ে দেখলাম, ফুলের মেলা, হলুদ রঙ, লাল রঙ ফুল, কখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে খেয়ালই হয় নি। কাঁদছিলাম, বাবার কথা, ভাইটার কথা ভেবে কাঁদছিলাম। খেয়াল হ'ল যখন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম, দেখলাম ও উঠে আসছে, ওর মুখ দেখে মনে হ'ল একটা জন্তু এগিয়ে আসছে আমার দিকে, আর পরিত্রাণ নেই, সন্ধ্যের পরও নিষিদ্ধ স্থানে! এ ত ক্ষমাহীন অপরাধ? তা ছাড়া সান্ধ্য কর্তব্যকর্মেও অবহেলা হয়ে গেছে, আপনার প্রসপারোর বাতের অঙ্গে সেবা হয় নি, ওর পিঠের কার্বাঙ্কল-এ সেঁক পড়ে নি। ত্রুটি ত অবশ্যই হয়েছে, তা বলে ও যে এতটা বীভৎস হবে ভাবি নি, ও প্রায় ধাক্কা দিয়ে আমায় নীচে ঠেলে দিলে, তার পর 'পতন ও মূর্চ্ছা' নাটকে ত পড়েইছেন।"

"এক সন্তানহীন বৃদ্ধ-দম্পতী আর এক যন্ত্র-সর্বস্ব বৈচিত্রহীন, কল্পনাহীন, জীর্ণপ্রাণ মানুষের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারলাম না, এই যা আমার অপরাধ। আপন সন্তানের পূর্ণ স্নেহে বঞ্চিত হলাম, রঙ হারালাম, গান ভুললাম, এখন ত শয্যাশায়ী, হাতে যন্ত্রণা আরও

বেড়েছে, আপনার প্রসপারো আর বন্ধু আরও তীব্র হয়ে উঠেছেন, তাঁদের অনুশোচনার অন্ত নেই, আমি না কি রজনীগন্ধার কলি! আপনার প্রসপারো কথা বলেন ভাল।"

"কাঁদি, কেবল কাঁদি, এদের দোষ দিয়ে কি লাভ। সেবা আর পাতিব্রত্যের বাইরে নারীকে আর কোন আনন্দের সুযোগ দিতে এরা নারাজ, তাই না আমার ছবিগুলো পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, রঙ গেল, তুলি গেল, গান গেল। বলতে পারেন, বাবার কি প্রয়োজন ছিল আমার মনের মধ্যে রূপের সাধ জাগিয়ে তোলার? আর তাই যদি দিলেন, কেন আমাকে মনের মত সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার সুযোগ দিলেন না?"

মাষ্টারমশায়, সুচারুর চিঠির প্রায় সবটাই তুলে দিলাম, আমি অবাক হয়ে শুধু তপন, ওর কাকার কথাই ভেবেছি। যান্ত্রিক তপন, নিঃসঙ্গ কাকা, সুচারুর মধ্যে সাধারণ এক গৃহস্থ বধূকে খুঁজতে গিয়ে ভুল করে বসল, কুশ্রী সন্দেহে, গঞ্জনায় বিষময় ক'রে দিল একটি স্বচ্ছন্দ জীবন। বেদনার গভীরে হারিয়ে গেল সুচারু।

আপনি শিল্পী। আপনি বুঝবেন ওর মনের বেদনা। আমি শুধু ওর প্রশ্নটাই আপনাকে করছি, আপনি কেন, কেন ওর মনকে আলোর পানে মেলে দিয়েছিলেন? কেন, আপনি ওর মনে রূপের সাধ জাগিয়েছিলেন?

আমাকে ক্ষমা করবেন, মাষ্টারমশায়, আমি আপনাকে দুঃখ দিতে এত বড় কাহিনী লিখতে বসি নি। ঘটনাচক্রে উনিশটি বছর পরে আপনাকে চিঠি দিচ্ছি, যদিও জানি, এ চিঠি আপনার পঙ্গুত্বের যন্ত্রণাকে আরও দুঃসহ করে তুলবে। যে সন্দেহের ঝড়ে একটা সুন্দর জীবন ঝ'রে পড়ল, তার উৎসে আমি একথা ভাবতেও অনুশোচনায় মন দগ্ধ হয়ে যায়। সুচারুর সঙ্গে মিশেছি, অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছি। গল্পে, গানে, অনেক দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে, কিন্তু সম্পর্ক কখনও মলিন হয় নি। আর সুচারু, ফুলের মত শুভ্র, পবিত্র। ওর মুক্ত প্রকৃতি আর নির্মল সঙ্গলাভের ব্যাকুলতা পাশের মানুষকে কাছে টেনেছিল, তাও সে কতদিন হয়ে গেল। সেদিনই আমি তপনের মনের ক্ষোভ টের পেয়েছি, স'রে এসেছি দূরে। কিন্তু তপন আর ওর কাকার মন থেকে সন্দেহের দাগ মুছে আসতে পারি নি।

সুচারুকে কি উত্তর দেব, ওর প্রশ্নটাই খালি ঘুরে ঘুরে মনে আসছে, "কি প্রয়োজন ছিল আমার মনে রূপের সাধ জাগিয়ে তোলার? কেন আমাকে মনের মত সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার সুযোগ দিলেন না বাবা?" এ ত অভিমান। আপনি শিল্পী, শিল্পীর মমতা দিয়ে ওর মন ফুটিয়েছিলেন, আপনি কি আজ পারবেন, পারবেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে? ইতি—

চিঠিটা ফেলতে গিয়ে ফিরে এলাম, কোনদিন ফেলতে পারব কি না জানি না।
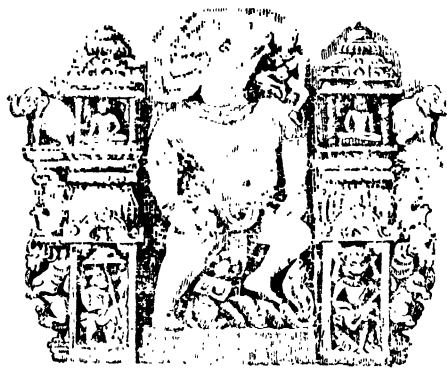
## কর্মের দাসত্ব

শ্রীকালিদাস রায়

উদ্বেগ, অশান্তি, দৈন্য, ব্যাধি-জ্বরা এত দুঃখ শোক,
তার মাঝে লয়ে ক্লান্ত, বাষ্পজালে ক্ষাণ দৃষ্টি চোখ
ক্ষুধায় দিনের পিণ্ড না গিলিলে নয়,
স্নানান্তে বসনান্তরও প্রতিদিন পরিতেও হয়।
নিত্যকার প্রয়োজন দাবি যত গৃহীর জীবনে,
যত দাবি সমাজ-শাসনে
সকলি মিটাতে হয় কড়ায় গণ্ডায়,
ভুল ত্রুটী অপরাধ বিবেচনা কভু কি খণ্ডায়?
এলে বন্ধু আত্মীয় স্বজন
তারেও করিতে হয় হাসিমুখে মিষ্ট আপ্যায়ন।
সৌজন্যে অনবধান, কোন ত্রুটী অতিথি সৎকারে
চলেনাক সমাজে সংসারে।
মর্মপীড়া যত হোক কর্মধারা করে নাক ক্ষমা
অকর্মেতে, যত কৃত্য হয়ে থাকে জমা
সকলি সাধিতে হয় শ্লথ হস্তে, যদিও দুর্ভর
কোন কাজই হয় নাক সর্বাঙ্গ সুন্দর,
ঘটে তায় কত ত্রুটী! ঘটায় তা নব বিড়ম্বনা
যতটুকু ভুলায় বেদনা
তার চেয়ে ঢের বেশী ঘটায় তা ভুল
শেলাহত অঙ্গে যেন শূল।
কর্ম যেন মূলধনী প্রভু
ক্ষমা সে-ত জানে নাক কভু
নিয়তির পীড়নের অজুহাত সেখানে না চলে,
কিণাঙ্ক কঠিন চর্ম, মর্ম তার কিছুতে না গলে।
গতানুগতিক চিরপ্রথা
তার সাথে নিত্য ভৃত্য পালনের ব্যথা
অতিক্রমি সর্ব দুঃখ করে হাহাকার
কর্মবাস গৃহস্থের এই ত সংসার।

—

## এবার ভ্রূ মধ্যে এস

শ্রীমণীন্দ্র রায়

( প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতা )

বস্তুর আড়ালে ও কে জলধারা হাতে নিয়ে নারী
আকাশগঙ্গার ঢেউয়ে ভেসে চলে অশ্রুত নিস্বনে!
এই আমি, এই বৃক্ষ, এই অন্ন, গৃহ, তরবারী
ডুবে যায়, দ্রব হয়, অন্য উপলব্ধির প্লাবনে।

সে বড় অদ্ভুত! সে কি পলায়ন? সে কি ফিরে আসা?
না কি সে ঈক্ষণ, শুধু ফিরে দেখা? যেমন কবিরা
কাব্য রচনার কালে পান করে সকল পিপাসা—
নিজেই বাগান, নিজে মক্ষিকা এবং মধু ক্রীড়া!

আহা সেই একাকার! একাকার, কেন না তখন
ইন্দ্রিয়ের সব তার এক দুই দিনের সংখ্যায়
যদিও আক্রান্ত, তবু স্পন্দমান সব স্বরধ্বনি
এক দুই তিন নয়, মিশে যায় সুরের বন্যায়।

অথচ স্বতন্ত্র আমি, লোভে কাঁপি, ঈর্ষায় স্বকীয়
পরাজয়ে ছিন্নভিন্ন; একে চাই ওকে করি ঘৃণা;
আকণ্ঠ জঞ্জালে ডুবে ক্রমে নিজে নিজেরও অপ্রিয়—
এ পোড়া পাহাড় আর বুকে আমি বইতে পারি না।

কোথায়, কোথায় তুমি জলধ্বনি, ঝরো ঝরো ধারা!
নয় সেই প্রেম, যার হাঁটু জলে ডোবে না শরীর।
এস তীক্ষ্ণ শরাঘাতে অর্জুনের উচ্ছ্বিত ফোয়ারা,
মিটাও ভীষ্মের তৃষ্ণা রণস্থলী-শায়িত শান্তির।

বস্তুর আড়ালে তুমি আকাশ বাহিনী দিকে দিকে।
অণুতে অণুতে তুমি ভোগবতী পাতাল নন্দিনী।
মুক্তির সমান্তরালে চিরকাল এই পৃথিবীকে
অমৃতের আশা দিয়ে চিরকালই রয়ে গেছ ঋণী।

স্বপ্ন করো, মগ্ন করো, করো প্রাণ আত্মার বসতি।
কেন্দ্রে টানো, কামনায়, কামাগ্নির ধাতুর ঘর্ষণে।
অশ্রু ঘাম রিরংসার দাহে তুমি এস স্নিগ্ধ জ্যোতি,
এবার ভ্রূ মধ্যে এস মমতার তৃতীয় নয়নে॥

# সেবাব্রতী হুইট্‌ম্যান

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কবিদের মধ্যে হুইট্‌ম্যানের জীবন একদিক দিয়ে অনুপম। কথায় এবং কর্ম্মে এমন একটা অদ্ভুত মিল আর কোন কবির জীবনে ঘটেছে ব'লে মনে হয় না। আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়ে হুইট্‌ম্যান স্বেচ্ছায় আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬২-১৮৬৪ সনের মধ্যে তিনি যে চিঠিগুলি লেখেন তাঁর মাকে—তাদের মুকুরে কবির জীবনের একটা আলেখ্য অপরূপ গরিমায় ফুটে উঠেছে। মার্কিন যুবকেরা আহত হয়ে রোগশয্যায় প'ড়ে আছে। আত্মীয়-স্বজন কত দূরে। একটু ভালবাসা, একটু সৌহার্দ্দ পাবার জন্যে তাদের মনে কি ব্যাকুলতা ?

হুইট্‌ম্যান তাঁর কবিহৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসা এবং সহানুভূতি নিয়ে আহতদের সেবায় ব্রতী ছিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর হাসপাতাল ছিল তাঁর ঘর-বাড়ী। উত্থানশক্তিরহিত আহত এবং পীড়িত যারা তাদের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে কবি বসতেন। তাঁর জামার এবং পাতলুনের পকেটগুলি ভর্ত্তি থাকত চকোলেটে, লজেন্সে, কমলালেবুতে, আরও অনেকরকমের মুখরোচক টুকিটাকি খাবার জিনিসে। বাইবেল থাকত; কলম এবং চিঠি-লেখার কাগজপত্রও থাকত। চুরুট ত থাকতই। কিছু খুচরো মুদ্রাও সঙ্গে নিতেন।

কেউ বলত বোনের সংবাদ অনেকদিন পায় নি। কবি তার পাশে ব'সে চিঠি লিখে দিতেন। হাসপাতালে পীড়িতদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি লেখা ছিল তাঁর একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। কোন মৃত্যুপথযাত্রী তাঁকে অনুরোধ করত বাইবেল থেকে কিছু প'ড়ে শোনাতে। কবি বাইবেল পড়তেন ধীরে ধীরে। পড়তেন কি ক'রে খ্রীষ্ট ক্রুশকাঠে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন, তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তগুলি কেমনভাবে কেটেছিল। মুমূর্ষু শুনে সান্ত্বনা পেত। কৃতজ্ঞতায় তার চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

হাসপাতালের আহতদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যাদের বলা যায় কপর্দ্দকশূন্য। ব্রুক্‌লিনের এবং বোস্টনের বন্ধুদের সাহায্যে কবি অর্থসংগ্রহ করতেন। সৈনিকেরা অল্প-স্বল্প যা পেত তাই তাদের কাছে আশাতীত ব'লে মনে হ'ত। চারিদিকের দৃশ্য কি করুণ ! ঝুপ্‌ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে, সজল বাতাসে আহতদের আর্ত্তনাদ আসছে ভেসে, চারদিক্ অন্ধকার। এমনি সব পটভূমিতে কবি আপন কর্ত্তব্য ক'রে গিয়েছেন অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে। অন্তহীন দুঃখের মধ্যে কত নোংরামি তাঁর চোখে পড়ত ! মরণোন্মুখ সৈনিকের পকেট থেকে টাকা যাচ্ছে চুরি। রক্ষকেরা ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ! কবির দৃষ্টিকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারত না। মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে কবি শুনতেন চারিদিকে কাতরধ্বনি ! হৃদয় তাঁর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত ! অন্তর ছাপিয়ে বইত অশ্রুর নদী। হাসপাতালে কম্বলশয্যায় পড়ে আছে হাজার হাজার আহত। হুইট্‌ম্যান তাদের পাশে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাতাস ক'রে চলেছেন ; রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছেন তাদের ললাটের ঘর্ম্ম ! তাদের কানে শোনাচ্ছেন আশার বাণী ! এই পটভূমিতে জগতের আর কোন কবিকে আমরা দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

মাকে লেখা চিঠিগুলি প'ড়ে মনে হয়, কবি একটা নূতনতর মনোভাব নিয়ে আহতদের সেবাকার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। দুঃখের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন মনের মধ্যে একটা সঙ্কল্প নিয়ে। সেই সঙ্কল্প আর্ত্ত-মানুষের নিঃসঙ্গ হৃদয়ে সান্ত্বনা দেবার সঙ্কল্প, তার অবসন্ন প্রাণকে আশায় উদ্দীপ্ত করবার একটা বলবতী ইচ্ছা। রুগ্ন দেহটারও যদি কিছু স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা যায় ! He stepped in when doctors and nurses stepped out. হুইট্‌ম্যানের জীবন-চরিতকার Henry Seidel Canbej-র মন্তব্যটি চমৎকার ! হাসপাতালে যারা শয্যাশায়ী তাদের দৈহিক দুঃখটাই কি সব ? ওরা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে একটা অরাজক অনীশ্বর জগতে ! ওদের দিগন্তে আশার কোন চিহ্নমাত্র নেই ! ওদের জীবনের সমস্ত আলো যেন দমকা বাতাসে নিবে গেছে ! চোখে-মুখে ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বাড়ীর জন্যে মনের মধ্যে কি হাহাকার ! কতদিন মা-বোনের মুখ দেখে নি ! হায়রে ঘরছাড়া তরুণের দল !

এমনি একটা বেদনার জগতে হুইট্‌ম্যানের বসতি। নিজেকে তিনি বিকীর্ণ করতে করতে চলেছেন তাদের মধ্য দিয়ে যাদের নৌকাডুবি হয়েছে মাঝদরিয়ায়। কণ্ঠে তাঁর অপরাজেয় আশার বাণী, অন্তরে প্রেমের সিন্ধু। নিজেকে দিচ্ছেন, কেবলই দিচ্ছেন। সে দেওয়ার মধ্যে কোথাও কার্পণ্যের লেশমাত্র নেই। সেই আত্মদান শুষ্ক কর্ত্তব্যবোধ থেকেও নয়। সেবার মধ্যে মিশে আছে মাতৃহৃদয়ের জীবন্ত অনুভূতি। অনেক আগে কবি লিখেছিলেন :

Behold, I donot give lectures or a
little charity,
When I give I give myself.

কবিদের জীবনের ইতিহাসে আপনাকে এই নিঃশেষে উৎসর্গ ক'রে দেবার দৃষ্টান্ত বিরল।

আধুনিক চিকিৎসার ইতিহাসে মনকে একটা উল্লেখ-যোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। পীড়িতের মনটা যদি চাঙ্গা না হয়, অস্ত্রোপচার এবং ঔষধের দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাবে না। আমি সেরে উঠব—এরকমের একটা সঙ্কল্প থাকা দরকার পীড়িতের মনে। Whitman gave them the will. হুইট্‌ম্যান ডাক্তার ছিলেন না। কিন্তু একটা কাজের মত কাজ তিনি করলেন। আত্মীয়-স্বজন ঘর-বাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন আর্ত্তদের মনের মধ্যে তিনি জাগালেন 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—বাঁচবার এই ইচ্ছা। কবি-জীবনের কল্লোলধ্বনি শোনালেন তাদের কানে। যারা ছিল আশাহত তারা উৎকর্ণ হয়ে শুনল প্রাণের আহ্বান।

কিন্তু দিনে দিনে এই যে আত্মদান—এর মূল্য দিতে হ'ল কবিকে। শরীর ছিল তাঁর চমৎকার। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হ'ত একজন মানুষ যাচ্ছে। যেমন চওড়া, তেমনি লম্বা। কিন্তু মানুষের শরীর ত ইস্পাতে তৈরী নয়। দেহ কত আর সইবে? অতিরিক্ত পরিশ্রমে কবির অমন মজবুত দেহ অবশেষে ভেঙে পড়ল। শেষ পর্য্যন্ত প্যারালিসিসে তিনি পঙ্গু হয়ে গেলেন। হাসপাতালে সেবা-কার্য্যে ব্রতী থাকবার সময়েই রোগ তাঁর শরীরে বাসা বাঁধল। ১৮৭৩ সনে এল রোগের চরম আক্রমণ। কবির জীবন-চরিতকার লিখেছেন: The destroying flame (to change the figure) was lit in these war years; after 1873 he was burnt out.

যুদ্ধ হুইট্‌ম্যানের মনের উপরে ভেঙে পড়ল কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত। তাঁর আঁখির উপর থেকে আবরণ গেল স'রে। তাঁর স্বদেশ ডুবতে বসেছিল জড়বাদের পঙ্ককুণ্ডে। ভোগসর্ব্বস্ব হাজার হাজার নরনারী ডলারের স্বপ্নে বিভোর। মেঘে মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। মানুষের এই কি শোচনীয় আধ্যাত্মিক দুর্গতি? এমন সময় আরামের মোহজালকে ছিন্নভিন্ন ক'রে এল 'সাজ' 'সাজ' রব। সেই সঙ্গে এল মানুষের আকস্মিক রূপান্তর। যুদ্ধের ঝড় ডেকে আনল দিগন্তপ্রসারী দুঃখ; কিন্তু সেই সঙ্গে আনল জাতির নবজন্মের আলো। ফুরিয়ে গেল আরামশয্যায় সুখে রাত্রিযাপনের অধ্যায়। ফুরিয়ে গেল অর্থসঞ্চয়ের পঙ্কিল নেশা। সমস্ত দুর্ব্বলতাকে সবলে সরিয়ে ফেলে বেরিয়ে এল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতা। গৃহকোণে যারা অবগুণ্ঠিত ছিল নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ নিয়ে মহান্ মৃত্যুর সঙ্গে তারা মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধের কল্যাণে। কোথায় প'ড়ে রইল ঘর-বাড়ী, কোথায় প'ড়ে রইল বাগ্‌বাগিচা। একটা মহান্ আদর্শের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘর-ছাড়া তরুণের দল আনন্দিত সর্ব্বনাশের পথে এসে দাঁড়া'ল। আসুক দুঃখ, আসুক মৃত্যু! সেই মৃত্যু ডেকে আনবে নবজীবনের বসন্তকে। রণদামামা হুইট্‌ম্যানের অবসন্নচিত্তে নতুন আশা জাগিয়ে দিল।

যুদ্ধ আর একদিক দিয়ে হুইট্‌ম্যানের কাছে এল দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। গণতন্ত্র তাঁর কাছে ছিল কবিমনের সোনালি স্বপ্ন। হাসপাতালের জীবন সেই স্বপ্নকে সত্যে রূপান্তরিত করল। হাসপাতালে তিনি হাজার হাজার মার্কিন যুবকদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন মনুষ্যত্বের মহিমা। হুইট্‌ম্যানের সামনে খুলে গেল একটা নূতনতর জগতের তোরণদ্বার। হাসপাতালে রোগশয্যার পাশে ব'সে ব'সে তিনি দেখতে লাগলেন যৌবনের এ কি গরিমাময় রূপ। একটা আদর্শের জন্যে নিজেকে বলি দেবার এ কি দেবদুর্লভ শৌর্য্য। সমাজের উচ্চস্তরে অর্থলালসা যতই বলবতী হোক্ না কেন, জনসাধারণের অন্তরের মহিমা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হবার নয়। The divine average seemed to prove itself when called upon. চরম দুঃখের কষ্টিপাথরে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল, অগ্নিপরীক্ষার দিন এলে জনসাধারণ আপনাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হয়না। গণতন্ত্রের শিকড় রয়েছে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে—এই বিশ্বাস হুইট্‌ম্যানের কাব্যজীবনে নিয়ে এল একটা নূতন সুর।

যুদ্ধ শেষ হ'ল, তাঁবু গুটিয়ে সৈনিকেরা ফিরে গেল আপন আপন গৃহে। হুইট্‌ম্যানেরও হাসপাতালের জীবননাট্যে পড়ল যবনিকা। শুশ্রূষাকারী কবি আবার লেখনী নিয়ে বসলেন। সুরু করলেন তাঁর নিজের অভিযান—গণতন্ত্রের আদর্শকে সত্য ক'রে তুলবার অভিযান। যুদ্ধের দুর্য্যোগের রাতে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করলেন তার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি Drum-Taps এ। যুদ্ধ নিয়ে আজ পর্য্যন্ত যত কাব্য লেখা হয়েছে পৃথিবীতে তাদের মধ্যে Drum-Taps একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। যুদ্ধের এই কবিতাগুলিতে একটি সত্য অপরূপ মহিমায় প্রকাশ পেয়েছে আর এই সত্য হ'ল: The people are sound, vigorous, and sweet, especially the young.

# উৎসর্গ

শ্রীকানাই দত্ত

লোকটি মারা গেল। সেই বৃদ্ধ লোকটি। যাকে শেষ কার্তিকের অস্পষ্ট কুয়াশায় আচ্ছন্ন সকালে মলিন জীর্ণ এক কম্বলে শরীর ঢেকে কাশতে কাশতে হাঁপাতে হাঁপাতে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছিল শীতাংশু। বৃদ্ধও এক পলক থমকে দাঁড়িয়ে তার নতুন প্রতিবেশী এই ভদ্রলোককে দেখেছিল। যাঁর নাম শীতাংশু। এবং এঁকে সৌখিন পর্যটক হিসেবে চিনে নিতে বৃদ্ধকে নিশ্চয়ই ভাবতে হয় নি। যেহেতু সে ঘাটশিলার বাইশ বছরের বাসিন্দা। তথাপি তাকে একটু চিন্তিত দেখাল। অবিশ্যি সে-চিন্তার চেহারা দেখে নিতে শীতাংশুকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। বাইশ বছরের বিনিময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, প্রবঞ্চনার শত হস্ত এই পাজামাবেশী ভদ্রলোকের উদ্দেশে প্রসারিত হয়ে আছে এখানে। যা প্রত্যেক স্বাস্থ্যপ্রদায়ী স্থানের বিশেষ এক ঋতুমাহাত্ম্য। কিন্তু এক্ষেত্রে শীতাংশুকে সাবধান করে না দিলে, বৃদ্ধের মনে হ'ল, কর্তব্যপালনে কোথায় যেন তার ত্রুটি থেকে যাবে।

তাই বৃদ্ধটির হলুদ চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি বার বার শীতাংশুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠানামা করল এবং শ্বাসকষ্টজনিত আয়াসে উচ্চারিত কথার চাপে বিবর্ণ ঠোঁট দু'টি দুমড়ে গেল। শীতাংশু অবিশ্যি কোন কথা বলে নি। শুধু মুখে মৃদু হাসি ছড়িয়ে বৃদ্ধের শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠের সাবধান-বাণীকে সযত্নে মনে রাখবার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরতে চাইল। বৃদ্ধটিও অতঃপর দ্বিরুক্তি না করে সুযোগসাপেক্ষ পুনরালাপের বাসনা জানিয়ে গন্তব্যপথে পা বাড়াল।

শীতাংশু একটা সিগারেট ধরিয়ে চলমান বৃদ্ধের ন্যুব্জ দেহভঙ্গির দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে শিস টানতে টানতে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। প্রাতঃকালীন ভ্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে নিতে নিতে স্বভাবতই বৃদ্ধটি-সম্পর্কিত কৌতূহলাক্রান্ত কয়েকটি জিজ্ঞাসার শরীর তার মনে আনাগোনা করেছিল। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, সেদিন বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে মৃত্যুর সুতীক্ষ্ণ আঁচড় শীতাংশুর চোখকে নিঃসন্দেহে ফাঁকি দিয়েছিল।

যথাযথ এক মাসের ব্যবধানে বৃদ্ধটির মৃত্যুর দিন, একথা বিশেষত মনে এল শীতাংশুর। মনে হ'ল প্রথম দর্শনের দিনেই লোকটির মৃত্যু-সম্ভাবনার চিন্তা উদয় হওয়া কত স্বাভাবিক ছিল! বয়সের আঘাতে জর্জরিত মেরুদণ্ড আর জীবনধারণের বিড়ম্বনায় বলিরেখা-কলঙ্কিত শরীর কি সেই অলক্ষ্য, অলঙ্ঘনীয় নির্দেশনামা জারি করে নি?

রাত্রি এখন দেড়টা। এইমাত্র প্রতিবেশীদের সমবেত চেষ্টার ফলে হাড়-হিমকরা শীতার্ত বাতাসে বৃদ্ধটির মৃতদেহ সুবর্ণরেখার বালুকাশয্যায় ঘুমোতে গেল। ভীতিমুক্ত শীতাংশুর চোখে ঘুম নেই। অথচ মৃত্যুর অনুষঙ্গ এই রাত্রি এতদিন তার কাছে এক আতঙ্ক ছিল।

আজই সন্ধ্যায় যখন ফুলডুমরি পাহাড়ের সেই শালগাছটা—যার একটি ডালে এক দম্পতি তাদের প্রেমের দায়ভাগ মরণের হাতে নিঃশেষে সমর্পণ করেছিল, সেই মহাপুণ্যবান্ শালগাছটা তাকে মরতে ডেকেছিল, তখন সে ভয় পেয়ে চিৎকার করতে গিয়ে চিৎকার করতে না পেরে এক বোবা কান্নায় রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে ছুটে নেমে এসেছিল অ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তার নিরাপত্তায়।

তার পর বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধটির মৃত্যুর অবধারিত ঘোষণা এক নারীকণ্ঠ-ধ্বনিত তীব্র চিৎকার শুনে প্রথমে শীতাংশু তার আতঙ্কিত চেতনায় অতসীর মায়ের ক্রন্দনকণ্টকিত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত অভিশাপ ব'লে ভুল করেছিল। সাময়িক বিস্মৃতি তাকে বুঝতে দেয় নি যে, সে এখন কলকাতায় নেই, আর পণ্ডিতিয়া রোডের সেই বিষ খেয়ে মরতে-চাওয়া অতসী নাম্নী মেয়েটির জননীর ক্রন্দন কখনও সোচ্চার হতে পারে না। কিন্তু এই রাত্রি দেড়টার পর যখন কয়েকটি মানুষের সম্মিলিত পায়ের শব্দ আর অনুচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হরিধ্বনি অন্ধকারের অলক্ষ্য গহ্বরে আত্মগোপন করল, উত্তীর্ণ সন্ধ্যার সেই চিৎকার ক্লান্তিতে স্তিমিত হয়ে-আসা গোঙানি হয়ে মৃতদেহটির পিছু পিছু হারিয়ে গেল, যখন প্রতিদিনের মত একটানা এক হিক্কার শব্দ শীতাংশুর ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে না, তখন শীতাংশুর মনে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই। আশ্চর্য!

আশ্চর্য বই কী! এই ঘাটশিলার দেখা মৃত্যু—

শীতাংশুর গোচরীভূত প্রথম মৃত্যু—ওকে ঘাটশিলা থেকে সাময়িক নির্বাসন দিয়েছে। পৌঁছে দিয়েছে কলকাতায়, পণ্ডিতিয়া রোডের সেই বাড়িতে, যেখানে স্বল্পালোকিত ছাদের প্রান্তদেশে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সেখানের সেই পরিবেশ ত আরও আতঙ্কজড়িত। অধিকতর দুর্ভাবনা-পীড়িত। কেননা, সেই চিলেছাদের অস্পষ্ট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-থাকা অতসীর বাঁকা ঠোঁটে এক শপথের তীব্র তরবারি-ঝলক। ঘনকৃষ্ণ চোখের মণি আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে স্থিরনিবদ্ধ। অতসীর কোমল লতার মত শরীর যে সিদ্ধান্তের কাঠিন্যে থমকে-থাকা বিদ্যুতে রূপায়িত হয়েছে তার লক্ষ্য শীতাংশু, শীতাংশুর ভালোবাসা। যে ভালোবাসার ওপর বিশ্বাস অর্পণ করে অতসী শীতাংশুকে একটি গৃহকোণের নিবিড় সান্নিধ্যে বাঁধতে চায়। কিন্তু শীতাংশু আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার পক্ষপাতী। অতসীর পক্ষে তা যে সম্ভব নয়। তার প্রবল অসম্মতিকে অস্বীকার করেই অতসীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে অধাণের শেষ সপ্তাহের একটি দিনে। অতএব মৃত্যুই শ্রেয় পন্থা। তাই অতসীর দেহে, মনে, চোখের দৃষ্টিতে, উত্তোলিত বাহু-আন্দোলনে, উন্মুক্ত বেণীবন্ধনে, হাওয়ায় আছড়ে-পড়া শাড়ির আঁচলে পরিত্যক্ত শ্মশানের ভীষণতা। অর্থাৎ নির্বাসিত শীতাংশুর জগতেও একই মৃত্যুভয়ের প্রতিফলন। অথচ শীতাংশুর আর কোন ভয় নেই। আশ্চর্য নয় কি!

শীতাংশু অতসীকে বিয়ে করতে চায় নি। সেকথা অতসীকে পরিষ্কারভাবে জানাতে চেয়েছিল। তার সামনে অতসীর মৃত্যুকামনা একটা ছোট শিশির মধ্যে বন্দী হয়ে ছট্‌ফট্ করছিল বলে জানাতে সাহস করে নি। অন্যথা আজকের বিষণ্ণ রাত্রি সেই বৃদ্ধটিকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারত না, প্রথম সাক্ষাতে জীবনে সর্বস্বান্ত দেখেও যার এই পরিণতির চিন্তা মনে আদৌ উদয় হয় নি। কলকাতার এক সওদাগরী অফিসের ছোট কেরাণী শীতাংশু সেন এতক্ষণ তার অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের কাছে অতসীর প্রেমের এক বিয়োগবিধুর কাহিনী গড়ে তুলে দরজা-জানালা বন্ধ-করা ঈষদুষ্ণ ঘরের নির্জন শয্যায় একটি নিটোল ঘুমের কোলে শুয়ে থাকতে পারত। অথবা, উত্তর কলকাতার এক সংকীর্ণ গৃহের বাসিন্দা শীতাংশুর চেতনায় পণ্ডিতিয়া রোডের এক বিবাহ উৎসবের মধুর রাগিণী ধ্বনি তুলত? এইমাত্র শীতাংশুর স্মরণ হ'ল, অতসীর বিয়ে স্থির হয়েছিল এই রাত্রিরই কোন এক শুভলগ্নে।

অতসীর বিয়ে! শীতাংশু অবাক্ হ'ল। গত এক মাসের বিরতিহান সংগ্রামে রক্তাক্ত হৃদয় কিছুতেই অতসীর বিবাহসম্ভাবনাকে মেনে নিতে পারে নি। বার বার সব চিন্তা আচ্ছন্ন করে অতসীর মৃত্যুচিন্তা স্পষ্ট জেগে উঠেছে। অথচ আজ কী সহজে অতসীর বিয়ের কথা ভাবতে পারল!

উত্তর কলকাতার ঘরে শুয়ে যে সম্ভাব্য বিবাহকে স্বীকার করতে পারে নি শীতাংশু, দূরত্বের সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে আজ সেই বিবাহের ছবি তার মানসপটে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। অতসী যে মরে নি, একথা শীতাংশু যেন এখন সংশয়হীন বিশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারে। শীতাংশুর এই অজ্ঞাতবাস যেন এবার তাকে জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে উত্তীর্ণ করে দিল।

ঘরের কোণে জ্বালানো লণ্ঠনের নৃত্যশীল শিখা দেওয়ালের চুনবালি-খসা যে স্থানে ছায়া ফেলেছে, সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর শীতাংশুর মনে হ'ল যেন অতসীর মুখখানি আস্তে আস্তে রেখায়িত হয়ে উঠছে। এ-অতসীর সঙ্গে শীতাংশুর কোন পরিচয় নেই। ছাদের অন্ধকারে-দাঁড়ানো দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে-ধরা মুখ নয়, দৃঢ় আঙুলে আটকে-রাখা বিষের শিশিতে লক্ষ্য স্থিরনিবদ্ধ নয়। বঙ্কিম সিঁথিতে কোন শপথের ক্ষুরধার নেই। এ-মুখে দু'টি ঠোঁটের সঙ্গমে মৃদুহাসির স্রোতস্বিনী। সিঁদুররঞ্জিত সোজা সিঁথি লাল চেলীতে অর্ধ-অবগুণ্ঠিত। গুঁড়ো গুঁড়ো সিঁদুরের ছোঁয়ায় লালচে মুখে ভবিষ্যতের এক মধুর স্বপ্ন জড়ানো। অতসীর জীবন-প্রদীপ নেভে নি। মোহময় অগ্নিশিখা রূপে উজ্জ্বল।

ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের বাঁশি সময়ের ঘোষণা শুরু করেছে। বহু লোকের পায়ের শব্দ ও কথাবার্তার সঙ্গে জড়িত এক মৃদু কান্না শীতাংশুকে চকিত করে দিল। বুঝল ওরা ফিরে এসেছে। ভাবল শীতাংশু, বৃদ্ধটির শেষ সম্বল চামড়ায়-ঢাকা কয়েকটি হাড় পৃথিবী থেকে মুছে গেল। আর ভাবল যে, বৃদ্ধটি তার মৃত্যু দিয়ে শীতাংশুর মন থেকে অতসীর মৃত্যুচিন্তা নিঃশেষে মুছে দিয়ে গেল। এই এক মাসের জীবনযাপনের একটি মুহূর্তও যে-চিন্তা থেকে সে অব্যাহতি পায় নি।

বৃদ্ধটির সঙ্গে ত কতবার দেখা হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধটির আসন্ন মৃত্যুর কথা যেমন একবার মনে হয় নি, তেমনি সে কোনদিন ভাবতে পারে নি যে, অতসীর মরণকামনা একটা ছলনা মাত্র। বস্তুত ঘাটশিলার এই সীমিত জীবনে শীতাংশুর নিকট বৃদ্ধ ও অতসী জীবন ও মৃত্যুর কুক্ষিগত দুই তারা হয়ে জেগে ছিল। আজও তাই

আছে। শুধু তারা পরস্পরের কক্ষ-পরিবর্তন করেছে মাত্র।

বাংলা-বিহারের সঙ্গমস্থল এই দেশটির সাথে নিবিড়তর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শীতাংশু বৃদ্ধটির সম্পর্কিত অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। জেনেছে, বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের এক বেপরোয়া যুবক বাবা, মা প্রভৃতি আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে বিবাদ করে একমাত্র জেদ আর স্ত্রীকে সম্বল করে ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে ঠেকেছিল। ভালোবাসার পাত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে গিয়ে যে বিবাদের সূত্রপাত। তারপর সময় তার ওপর কী অপরূপ প্রতিশোধ নিল! ভালোবাসার শেষ কানাকড়ি পর্যন্ত খরচ করে যুবকটি দেউলে হয়ে গেল। যে-স্ত্রীর জন্যে সে আবাল্য-বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন, শান্তশ্রী গ্রামের বন্ধন ছিন্ন করেছিল, পরিণামে যুবকের উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল হাত বহুবার সেই স্ত্রীর অঙ্গ নির্বিচারে ক্ষত-কণ্টকিত করল। মহুয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে কত রাত শালের জঙ্গলে সাঁওতালী মেয়ের পাথুরে যৌবনে মাথা ঠুকল। কেননা, স্ত্রী তখন গৌণ।

এই মনোবিকলনের মূল খুঁজতে গিয়ে শীতাংশু কথায় কথায় একদিন বৃদ্ধকে কয়েকটি সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিল। বৃদ্ধ একটুখানি ফ্যাকাশে হেসে উত্তর করেছিল, বাবুমশায়, আমরা চাষীর ঘরের ছেলে। গগনে একটুখানি মেঘ দেখলে মনটা উদোস মেরে যায়। জলে-কাদায় লাঙ্গল কাঁধে ছুটোছুটি করতে সাধ যায়। এ দেশে তেমন মেঘ আর দেখলাম না। ওর জন্যে আমি সব ছাড়লাম। কিন্তু ও আমায় কী দিল? একটা ছেলে ইস্তক না। জাত খুইয়ে ফেলেছি আমি। সারাদিন কুলি খাটিয়ে বাড়ী ফিরে বৌটার গায়ে দু'ঘা বসাতে না পারলে হাতটা বড় নিস্‌পিস্ করে।

স্ত্রীর প্রতি লোকটির ভালোবাসার এই পরিণতি শীতাংশু বোধ হয় বুঝতে পারে। বুঝতে পারে কোমলা বাংলার সবটুকু মমতা এই রুক্ষ কঠিন দেশ শোষণ করে নিয়েছে। মেঘরঙা ধানক্ষেত ভালোবাসাকে যে লালিত্য দান করেছিল, শাল-সেগুনের দৃঢ়সংবদ্ধ অরণ্য কর্কশ হিংস্রতা দিয়ে তা মুছে দিয়েছে।

এই একটি দিন শীতাংশুকে বড় বেশি বিচলিত করেছিল। মনে হয়েছিল বৃদ্ধটি ও তার ভালোবাসার ইতিহাস একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পরিচিত জগতের সকল মানুষের প্রেমের পরিণতি বুঝি এমনি একমুখীন। প্রতিনিয়ত প্রেমের মর্মমূল থেকে রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। কোথাও বৃদ্ধের ন্যায় শারীরিক পীড়নের মাধ্যমে। অন্যত্র অন্য পন্থায়।

ভাবতে ভাবতে এক সময় শীতাংশুর মনে হ'ল, অতসীকে সে মুক্তি দিয়ে এসেছে। অতসী তা বোঝে নি। শীতাংশু কি এইভাবে বুঝেছিল? জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পথে অন্তরায় হবে এই আশঙ্কায় অতসীকে বিয়ে করতে শীতাংশুর মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু সে-কথা অতসীকে জানাতে ভয় পেয়েছিল সে। আজ ইচ্ছে করছে, ভালোবাসার সূচনা ও উপসংহারের সজীব উদাহরণ এই বৃদ্ধকে অতসীর সামনে তুলে ধরতে। যাতে বুঝতে পারে, শীতাংশুর হাতের কী যন্ত্রণাদায়ক পীড়ন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণাজাত অগ্নিজ্বালা থেকে যুবকটি অবশ্য এক সময় মুক্তি পেল। বাইশ বছরের প্রতিটি দিন-রাত্রির দেনা শোধ করতে করতে সব আগুন নিঃশেষে ছাই হয়ে গেল। বয়সের রেখা ঝরে গিয়ে দেহের প্রতিটি গ্রন্থি শিথিল হয়ে গেল। ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের ধূসরতা ছাড়া আর কোন রঙ অবশিষ্ট থাকল না। স্ত্রীর অঙ্গে যেখানে আঘাতের ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, সেখানে দুর্বল স্নায়ুর পীড়নে কাম্পিত হাতের স্পর্শ মাখিয়ে তৃপ্ত থাকতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর পুরোনো ক্ষতের বেদনা তাতে কতটুকু মোছে? বরং অক্ষম বৃদ্ধের শারীরিক পীড়নের এও এক বিকল্প ভেবে জ্বালা তীব্রতর হয়।

আর জঙ্গলের রাত তাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন প্রতি সকালে দুই মাইল পথ হেঁটে জঙ্গলে পৌঁছে সারাদিন কুলি খাটিয়ে নখদন্তহীন লালসায় কুলিকামিনদের উচ্চকিত যৌবনের ওপর ক্লান্ত দৃষ্টি মাখিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতে হয়। ফিরে হাঁপাতে হয়।

এই আসা-যাওয়ার পথেই বৃদ্ধটির সঙ্গে দেখা হয়েছে শীতাংশুর। প্রথম প্রথম ওর চলমান দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে মনে হয়েছে, সারাদিন হেঁটেও বোধ হয় জঙ্গলে পৌঁছতে পারবে না। পরে বুঝেছে, লোকটি চলে শক্তিতে নয়, অভ্যাসে।

আর বৃদ্ধকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে অতসীর কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়ি থেকে মেয়েটি মরণের ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কেমন করে টের পেয়ে গেছে শীতাংশুর ঠিকানা। রাঙা মাটির ধুলো-ওড়ানো পথের প্রান্তে ঐ বুঝি অতসীর প্রিয় লাল শাড়ির আঁচল হাওয়ায় উড়ে গেল। রাজবাড়ির পিছনে অস্পষ্ট আলো-আঁধারে

জঙ্গলের বুকচেরা পায়ে-হাঁটা পথে কতদিন অতসীর উচ্চকিত হাসির তীব্রতা ক্ষীণ হতে হতে অবশেষে কান্না হয়ে গলে ঝরে পড়েছে সুবর্ণরেখার কালো জলে। কত দিন সন্ধ্যায় নির্জন, নির্বান্ধব, আদিগন্ত মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছে দূরে অস্পষ্ট হরিণ-ডুমরি পাহাড়ের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডে যেন অতসীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, 'শীতাংশু, আমার মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী।' শীতাংশু কি পাগল হয়ে যাবে! অতসী তাকে মরণের সঙ্গী করে নিয়ে যাবে!

কিন্তু এই বৃদ্ধটি আবার তাকে জীবনের কক্ষে টেনে এনেছে।

শীতাংশু ঘড়ির দিকে তাকাল। ভোর হতে আর দেরি নেই। অন্যদিন এতক্ষণ সে বেড়াতে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়। আজ আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। গত সন্ধ্যায় ফুলডুমরির সেই শালগাছের হাতছানি পেয়ে শীতাংশু সঙ্কল্প করেছিল কলকাতা ফিরে যাবে। সে-সঙ্কল্প এখন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধটি তার মৃত্যু দিয়ে শীতাংশুর সব চিন্তাধারা ওলটপালট করে দিল। শীতাংশু কলকাতায় ফিরতে চেয়েছিল। অতসীর আত্মদানের বেদনা তাকে এক স্থির জীবনবোধে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরতে চেয়েছিল।

এখন সে-আশ্রয় ভেঙে গেছে। অতসীর হাত থেকে বিষের শিশি খসে পড়েছে। তার বদলে জীবনের মধুর স্বপ্নে দু'হাত ভরা। সেখানে শীতাংশুর নিঃশ্বাস আটকে আসবে এবার।

না না। শীতাংশু আর ফিরতে পারবে না। কোন-দিন কলকাতা ফিরতে পারবে না। অবশিষ্ট জীবন তাকে এই লালমাটির দেশে ক্ষয় করতে হবে। এই তার ভাগ্যলিপি যা এই বৃদ্ধ লোকটি তার বাইশ বছর জীবনের অবসান দিয়ে লিখে গেল। কলকাতাকে আর কীসের প্রয়োজন শীতাংশুর? সওদাগরী অফিসের এক কনিষ্ঠ কেরাণীর মৃত্যু হলে ক্ষতি কী! বৃদ্ধটির পরিত্যক্ত কুলি খাটানোর জংলী চাকরিটা কি চেষ্টা করলে জোটানো যাবে না!

আর বাড়ি ফিরে কোনদিন যদি অতসীর কথা মনে হয়! যদি তার খুশিয়াল চোখের তারা শীতাংশুর মনে নাচতে থাকে! তার কোলে নবজীবনের কুসুমকোরক হাসতে থাকে! তাতে-ই বা ভয় কীসের? সেদিন না হয় আবার জঙ্গলেই ফিরে যাবে শীতাংশু। আকণ্ঠ মহুয়া খাবে। তীব্র, ঝাঁঝালো মহুয়া। বুক যখন তরল আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে উঠবে তখন কে যে অতসী, কে যে নয়, টের পাবে না শীতাংশু।

# বাংলা ভাষার মুদ্রণের সমস্যা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা

শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশ ভারতবর্ষে মুদ্রণের অগ্রদূত—এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ প্রথম বাংলা দেশেই হয়েছে, এবং মুদ্রণ-সৌকার্য্য ও নিষ্ঠায় বাংলা এখনও শীর্ষস্থানে, এ দাবী আমাদের আছে। কেরী সাহেবের উৎসাহে—বাঙালী পঞ্চানন কর্মকার। প্রথম বাংলা অক্ষরের ছাঁচ তৈরী বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয় প্রকাশের শতবর্ষ পূর্তিও দু' তিন বছর আগে হয়ে গেছে। তার পরে সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাংলা লাইনো উদ্ভাবন পরবর্তী স্মরণীয় কীর্তি। এ সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় মুদ্রণের ও মুদ্রিত পুস্তকের সুলভ প্রকাশে বহুবিধ সমস্যা আছে।

ভাষাগত সমস্যা ত আছেই। ইংরেজীর তুলনায় বাংলা বর্ণমালার বিপুলায়তন আমাদের প্রথম বাধা। ভাষার সমস্যা বা বর্ণমালার বিপুলায়তন সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভবতঃ মুদ্রকের আওতার বাইরে। কিন্তু আমরা দেখি যেখানে ইংরেজিতে মাত্র দু'টি টাইপ-কেসে কাজ চলে, সেখানে বাংলার প্রয়োজন হয় চারটি কেসের। ইংরেজিতে দু'টি কেস থাকলেও অক্ষর-যোজকের প্রধানতঃ সামনের কেসে কাজ চলে, কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তাকে সামনে-উপরে-ডাইনে-বাঁয়ে এই চারটি কেস হাতড়ে বেড়াতে হয়। আর ইংরেজিতে সামনের অর্থাৎ প্রধান কেসের অক্ষরবিন্যাস করা হয়েছে অক্ষর ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা বা প্রাচুর্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার

ভিত্তিতে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বাংলার ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা চেষ্টা করা হয় নি। বাংলা টাইপ-কেসের অক্ষরবিন্যাসের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম জড়িত করা হয়—বলা হয় বিদ্যাসাগরী সাট। কিন্তু আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এ সম্বন্ধে যদি কোন যোগাযোগ হয়ে থাকে তা শুধু তাঁর নাম ব্যবহারে বাংলা-মুদ্রণবিদ্‌কে পাংক্তেয় করবার জন্যে। অথবা সে সময়ে বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশী মুদ্রককে বাংলা অক্ষর যোজনায় অল্লায়াসে অভ্যস্ত করবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সাট বা অক্ষর-বিন্যাস প্রবর্তন করেন। তা না হলে ইংরেজিতে যেখানে t n d, সেই খোপেই ত ন দ কি করে রাখা হয়? অথবা u m c-এর স্থলে য ম ক বা v l b-এর স্থলে হ ল ব রাখার যুক্তিকে আর যাই বলা যাক না কেন—এটা যে প্রাচুর্যের ভিত্তিতে নয় সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। কেননা ইংরেজিতে t n d ও বাংলা ত ন দ-এর পারস্পরিক প্রাচুর্য এক নয়। ফলে অক্ষরযোজককে অযথা চারটি কেসে হাতড়ে মরতে হয়, তার অক্ষর-যোজনার দক্ষতা অযথা বাধা পায়। এই হ'ল হাতে অক্ষরযোজনায় অব্যবস্থার আভাসমাত্র। যান্ত্রিক অক্ষর-যোজনার ক্ষেত্রেও সেই অবৈজ্ঞানিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি। কোনও কী-বোর্ডে বাংলা অক্ষরবিন্যাস বর্ণানুক্রমিক, অর্থাৎ ক খ গ ঘ এইরূপ; কিন্তু ইংরেজিতে কী-বোর্ড বর্ণানুক্রমিক নয়, যেমন—q w e r t ইত্যাদি। ইংরেজিতে t অক্ষরের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি বলে তার স্থান কেন্দ্রস্থলে আর the শব্দটির প্রাচুর্য সর্বাধিক, সেইজন্য অক্ষরগুলিকে কী-বোর্ড অপারেটরের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে রাখা হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য, ইংরেজী টাইপরাইটার ও যান্ত্রিক অক্ষরযোজনার কী-বোর্ড বিন্যাস একই, দুই স্থলেই মুণপ্র্যাট সাহেবের গবেষণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। লাইনো কী-বোর্ড বিন্যাসে বাংলা অক্ষরের প্রাচুর্য গণনা সম্বন্ধে কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে ব'লে মনে হয় যেমন—প্রথম সারির e t a o i n-এর স্থলে া ি ে ন্ য ী ও দ্বিতীয় সারিতে s h r d l u-এর স্থলে অ ত র ব ল গ ইত্যাদি; যদিও এই বিন্যাসে প্রাচুর্যের গুরুত্বকে পুরোপুরি স্বীকার করা হয় নি বলে মনে হয়, ফলে হাতে বা যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষরযোজনার—দুই ক্ষেত্রেই বর্তমান অক্ষরবিন্যাস উৎপাদনকে ব্যাহত করে; ইংরেজীর অর্ধেক মাত্র উৎপাদন বাংলাতে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে অনুবাদের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠার সংখ্যাধিক্য যোগ করলে অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, মাতৃভাষায় মুদ্রিত পুস্তকক্রেতাকে দেড় থেকে দ্বিগুণ বেশি দাম দিতে হয়। অবশ্য বর্ণমালার আপেক্ষিক বিশালতামূলক অন্তরায় আছে। বাংলা অক্ষরের সংখ্যাকে হ্রাস করা যায় কি না এই সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন আছে। এই গেল বাংলায় উৎপাদনঘটিত সমস্যা।

এখন টাইপ ডিজাইন বিষয়ে আসা যাক্। শুধুমাত্র একরকম টাইপকেই ক্যাপ, স্মলক্যাপ, ক্যাপ-স্মলক্যাপ, লোয়ার ও ইটালিক—এই পাঁচ রকম ভাবে অক্ষর সাজিয়ে ইংরেজী শব্দকে আপেক্ষিক গুরুত্ব দেওয়ার সুবিধা আছে। সহস্র প্রকার টাইপ কেসও আছে ইংরেজীতে। ঔপন্যাসিকের চিন্তাধারা যেমন নায়ক-নায়িকার সংলাপের সাহায্যে প্রকাশ পায়, নাট্যকারের সৃজনী-প্রতিভা যেমন রূপকার ও মঞ্চ-সজ্জাকরের সহ-যোগিতায় সম্পূর্ণতা লাভ করে, মুদ্রক তেমনই লেখককে সাহায্য করে বিভিন্ন টাইপ কেস ব্যবহার ক'রে বিষয়বস্তু অনুসারে বক্তব্যকে পাঠকের কাছে আকর্ষণ সঞ্চার করতে। তাই কবিতা, লঘু সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ব্যবসায় প্রসারমূলক পুস্তিকা, প্রভৃতি মুদ্রণে বিভিন্ন টাইপ কেস নির্বাচনের যে সুবিধা আছে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই হোক বা ঔষধের বিজ্ঞাপনই হোক—একই টাইপ ফেস ব্যবহার করতে হয় বাংলা মুদ্রককে। লেখককে সাহায্য করবার কোন সুবিধাই বাংলা মুদ্রকের নাই। বিভিন্ন প্রকার কাগজ ব্যবহারে অথবা বিভিন্ন প্রকার মুদ্রণপদ্ধতি অবলম্বনে বাংলা টাইপ ফেসের বিভিন্নতা নাই। অক্ষরের সেরিফ বা মাত্রার তারতম্য অথবা মাত্রাহীনতার দ্বারা বিষয়বস্তুকে বিশিষ্টের ছাপ দিয়ে সুপাঠ্য করে তোলার সুবিধাও এক্ষেত্রে নাই।

অবৈজ্ঞানিক কী-বোর্ড বা টাইপ কেস বিন্যাস ও টাইপ ডিজাইনের সঙ্কীর্ণতার জন্য সমস্যার কথা বলা হ'ল। এ ছাড়া বাংলা টাইপের সাইজ আর এক সমস্যা। তাই পৃষ্ঠাপ্রতি শব্দসংখ্যাও বাংলার পক্ষে অসুবিধাজনক। শব্দ পরিধির কথা বাদ দিলেও চেম্বারস্ অভিধানের আয়তনে বাংলা অভিধানের প্রকাশ অবাস্তব।

বাংলা ভাষার ব্যবহারে অক্ষরপ্রাচুর্য গণনার কিছু প্রচেষ্টাও করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা, অন্যান্য উপন্যাস ও সংবাদ-সাহিত্য, ইত্যাদির প্রায় দশ সহস্র শব্দ গণনার কিছুটা আভাস এখানে দেওয়া যেতে পারে। সর্বাধিক ব্যবহৃত অক্ষর া প্রতি শত অক্ষরে ব্যবহারের সংখ্যা ১৪·৪৫, হিন্দীতে ৮·৬২; র ৭·৩১ হিন্দীতে ৪·৬২; ন ৫·৯৭ হিন্দীতে ৩·৩৫; ত ৪·৭৮

হিন্দীতে ৬·৭; ব ৩·৮৫ হিন্দীতে ১·৮৮; ি ৪·০৪ হিন্দীতে ৪·৩৫; ই ২·০৫ হিন্দীতে ·৬৭৬; ঈ ·০০৪ হিন্দীতে ·৪৩; য ·৮১ হিন্দীতে ৩·৭; ে ২·৯৭ হিন্দীতে ৬·৩৯ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই প্রাচুর্য গণনার কাজ আরও অভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা উচিত—এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

উপরের সমস্যাগুলি অনেকটা টেকনিক্যাল ধরনের এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত সমাধান সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ ছাড়াও বাংলা ভাষায় মুদ্রণকে উন্নত করার ব্যাপারে সাহিত্যিক-সাধারণের দায়িত্ব প্রচুর। এখন বানান বিভ্রাটের কথা বলছি। ইংরেজীতে বিকল্প বানানের ব্যবস্থা থাকলেও তার প্রয়োগ ও অবকাশ সীমাবদ্ধ। সেই বিকল্প বিভ্রাটকেও মুদ্রক আয়ত্তে এনেছে হাউস-স্টাইল প্রবর্তনের দ্বারা। কিন্তু আমি জানি না, বাংলা মুদ্রকের হাউস-স্টাইল বা আদৌ স্টাইল আছে কিনা। আমার একই অভিযোগ লেখকের সম্বন্ধেও। দ্বিত্বজনিত বিকল্প ব্যবহার অথবা বিদেশী শব্দের শৃঙ্খলাহীন বানানপদ্ধতির কথা কিংবা হাইফেনের বিড়ম্বনা অথবা মিলনের দীর্ঘতার কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহারের যথেচ্ছ বানান পদ্ধতির দ্বারা লেখক মুদ্রককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারেন। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন বানানপদ্ধতি। আবার একই লেখকের বিভিন্ন রচনার বা একই রচনায় বিভিন্ন বানান। উদাহরণ স্বরূপ: করে কোরে ক'রে, কর কোর ক'রো, হল হ'ল হোল, ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বজনীন বা সার্বজনীন, অর্থনৈতিক বা আর্থনীতিক, বংগ বা বঙ্গ এর কোন্‌টা শুদ্ধ কিংবা সবটাই শুদ্ধ এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন না লেখক লেখার সময়ে বা মুদ্রক ছাপার সময়ে। লেখক নায়িকাকে পুকুরে ডুবিয়ে মারুন বা না মারুন, স্নানান্তে নায়িকার সঙ্গে নায়কের দৃষ্টি বিনিময় হোক বা না হোক, কোন ক্ষেত্রেই মুদ্রকের কিছুমাত্র আপত্তি নাই; শুধু এই ঘটনাগুলি শুদ্ধ ও অবিকল্প বানানের দ্বারা হোক—মুদ্রক এইটুকু প্রত্যাশা করে। বানান সমস্যা সম্বন্ধে লেখকরাই যদি সম্মিলিত কর্মদ্যোগে প্রবৃত্ত হন এবং সাধারণ লেখকের কাছে মোটামুটি গ্রাহ্য একটা বানান-বিধির প্রবর্তন করতে পারেন, তা হলে বাংলা মুদ্রণের উন্নতির বিষয়ে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করা হবে। তা না হলে প্রুফের জন্য কপি-প্রিপ্যারেশনের কাজ ফেলে রাখা ও বাড়ি তৈরার পর প্ল্যানের পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা—একই পর্যায়ে দাঁড়াবে।

পূর্বে টাইপ ডিজাইনের উল্লেখ করেছি। গত কয়েক বৎসরে বাংলায় নতুন নতুন টাইপ ফেস চালু হয়েছে। তার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা এখানে করব না। শুধু এইটুকু মাত্র বলাই যথেষ্ট যে, হেডিং ও টেক্সট বা শির ও দেহ কোনটার মধ্যে সামঞ্জস্যের বিষয় চিন্তা করা হয় নি এই সব টাইপ ডিজাইনে। ইটালিক ফেসের প্রচলন বেশি হয় নি। যেখানে হয়েছে সেখানে বিভিন্ন ফেসে বিভিন্ন ঢাল অথচ সহস্র প্রকার ইংরেজী ইটালিকে ঢাল একই অর্থাৎ ১৭°। হাতে লাইনো বা মনো (ইণ্টার-টাইপে বাংলা এখনও হয় নি)—এই তিন পদ্ধতির অক্ষর-যোজনায় তিন প্রকার টাইপ ফেস ব্যবহার করা হয়। টাইপ ডিজাইন সম্বন্ধে কথা শেষ করার আগে ইংরেজীর d p-এর আরোহ বা অবরোহের দৈর্ঘ এবং সেই সঙ্গে x-হাইটের সঙ্গে টাইপ ডিজাইনের সম্বন্ধ এবং ব্যবহারের সুখ-সুবিধা বিষয়ে বাংলায় প্রয়োগের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সংক্ষেপে সমস্যা ত্রিবিধ: (১) টাইপ কেস বা কী-বোর্ডের অক্ষরবিন্যাস প্রাচুর্যের ভিত্তিতে করা, (২) বিষয়-বস্তুকে অনুসরণ করা যায় ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে বা বিভিন্ন কাগজে মুদ্রণ করা যায় এমন টাইপ ফেসের এবং সেই সঙ্গে ছোট টাইপের প্রবর্তন করা এবং (৩) বানানবিধি প্রণয়ন করা।

# জল আর জলের মাটি

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত

শ্রীনির্ম্মলেন্দু মান্না

আরও সয়ে যাওয়া হরিকান্তর পক্ষে অসম্ভব।

সে জানে লোকটাকে ছেড়ে দিলে ওর পক্ষে কাজ জোটানো শক্ত, খুব কঠিন, ও মাঠে যাবে, কোদাল ধরবে, নালি কেটে জল আনবে, আল বেঁধে জল ধরবে, সব ঠিক—কিন্তু থেকে থেকে ও একটা গল্প জুড়বে, পাশে একটা লোক জুটেছে কি আর দেখতে নেই, বাস্, ও একটা কথা আরম্ভ করবে, আর সে কথা ব'লে কথা, নিজের দেশের কথা, গ্রামের কথা, ওর সেই সব সুন্দর ঘরদোরের কথা, সেই সব সোনার জমির কথা—আরে বাবা, তোর জমির অত সোনা ফলানোর গল্পের চোটে যে আমার জমি মরুভূমি হয়ে যায়, সে খেয়াল আছে কি!

প্রথম প্রথম হরিকান্তও সে সব শুনত, বলা ভাল, শোনবার মত সহ্যশক্তি অর্জন করত, কেননা সন্ধ্যার পর সদর ঘরে যখন দশজন গ্রাম-প্রতিবেশী এসেছে খালের জল নিয়ে সরকারের সঙ্গে সুদীর্ঘ বিরোধের একটা মীমাংসা করতে, যখন তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ আঁটতে হবে, ওদিকের ঘরটায় ছেলে যখন পড়তে বসেছে এবং তার দিকে নজর রাখা প্রয়োজন বোধ করছে হরিকান্ত, তেমন সময় নান্‌কু মাহাতো যদি এসে বলে, তার পর হুজুর হামাদের গাঁওমে হোয়েছে কি—

এবং এই ভূমিকার পর যদি এমন এক গ্রামের কাহিনী সবিস্তারে ফেঁদে বসে যে জায়গাটা হরিকান্তর অদেখা অথচ অপরিচিত নয়, যে অঞ্চলের ছবি সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, চতুর্দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক অপরূপ আধা অরণ্যভূমি, পাহাড়ের গায়ে গায়ে শাল-জঙ্গল, সেখানে মাঝে মাঝে বুনো হাতীর পাল নামে, আর বর্ষাকালে বুনো হাতীর মত মেঘ পাহাড় ঘিরে ঘিরে নেমে আসে, পাশের সেই নদীটা ফুলে ওঠে আর তারা স্বপ্ন দেখে সোনালী ফসলের—

তখন হরিকান্তর সহনশক্তির একটা মস্ত পরীক্ষা হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়ার পর ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে হরিকান্ত সদরে বসে, সে ভেবে পায় না, কি ক'রে গ্রামীরা বাঁচবে, কি ক'রে এই চড়া জলকর সমস্যাটা মিটবে, ঠিক হয়েছে গাঁয়ে ঢ্যাঁড়া পেটানো হবে: কেউ নিয়ো না খালের জল। কিন্তু এ ত মরণের পথ, কিন্তু আর অন্য উপায়ই বা কোথায়—কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তর পায় না হরিকান্ত, ক্রমে রাত গভীর হয়ে আসে, অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করে কখন নান্‌কু গুটি গুটি পায়ে মিটমিটে চোখে এগিয়ে এসেছে তার কাছে, তার শক্ত সমর্থ পেশল দেহটা কেমন অদ্ভুত রকম অসহায় আর নমনীয় হয়ে ওঠে, তার সংগ্রামী চোখে-মুখে কেমন একটা ভীরু আকাঙ্ক্ষার আবেশ জেগে ওঠে, ইজিচেয়ারের পাশটায় স'রে এসে বলে, তার পর উপরসাল যা হ'ল আপনি জানছ কি বাবু—

সব জানে হরিকান্ত, জানা ছাড়া তার যে গতি নেই, হয়ত সে বছর পাহাড়ী নদীতে খুব বন্যা হয়েছিল, কিংবা হাতীর পাল পাকা ফসলে মই টেনেছিল কিংবা ফাঁদ পেতে খুব সুন্দর এক তুলতুলে বন-খরগোস ধরে এনেছিল ঐ নান্‌কু মাহাতো।

ওর কথায় কেমন একটা মাদকতা আছে, কথার মদ ও গিলেছে, ওর নেশা কথার নেশা, খুব রাত্তিরে যখন সমস্ত গ্রাম শয্যা নিয়েছে, যখন ঝিঙে ক্ষেতে কচি ঝিঙে-ফুল ঘুমিয়ে পড়েছে, যখন গ্রামের সকলের হয়ে খালের জলের কথা চিন্তা করছে হরিকান্ত তখন নান্‌কুর কথা-গুলো অর্দ্ধমনস্ক ভাবে শুনতে খারাপ লাগে না, তারও যে ইচ্ছে অমনি একটা গ্রাম সে গ'ড়ে তুলবে যার পাশ দিয়ে সারা বছর বইবে জলধারা, যার মাঠে মাঠে উপ্‌চে পড়বে ফসলের অজস্র ঐশ্বর্য। লেখাপড়া শিখে এসে সে যে গ্রামেই রয়ে গেল তার কারণ শুধু পৈতৃক জমিজমা নয়, তার অনেক দিনের গ্রামগড়ার স্বপ্নও বটে।

মনের কোথায় যেন এতটুকু প্রশ্রয় ছিল নান্‌কুর জন্যে।

কিন্তু আর না, অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর ব্যবহার। চৈত্রের কাল শেষ হয়ে এল। পটল ক্ষেতে জল নেই। পুকুর থেকে ছিঁচ ব্যবস্থা করতে হয়েছে হরিকান্তকে। অনেকটা জল টেনে নিয়ে যেতে হবে, অনেক খরচা পড়ে গেল, কিন্তু উপায় নেই, খালের জল পাওয়া যাবে না।

এ হেন সময়ে ও নাকি আজ সারাদিন খালপাড়ে বসেছিল, আপনমনে বিড় বিড় করে বকছিল আর খুব গরম লাগলে খালের জল দুই আঁচলা ভ'রে গায়ে-মুখে মাখছিল, মাথায় দিচ্ছিল।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হরিকান্ত বেরিয়ে গিছল, গোটা কুমারমঙ্গল ইউনিয়ন জুড়ে একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গ'ড়ে উঠছে, হরিকান্তর ওপর অনেক দায়িত্ব, এখন ত তার নিজের চাষের দিকে নজর দিলে চলে না।

সন্ধ্যের দিকে তেতেপুড়ে বাড়ী ফিরল হরি, নান্‌কুর কাণ্ড শুনেই রেগে উঠল, হাঁক দিল, নান্‌কু—

—যাইছি হুজুর—

একেবারে জলভর্তি বালতি মগ, সাবান, তোয়ালে নিয়ে নান্‌কু হাজির। হরিকান্তর মুখ দেখে মাথা নীচু করে বললে, পহলে ঠাণ্ডা হয়ে নিন, উস্‌কো বাদ বকাঝকা উ সব করবেন, কাল ডোঙায় জল ছিঁচবো, আমার সাথে বহুৎ লোক লাগবে।

কাল অসুরের মত খাটবে নান্‌কু। এক দিনের ত্রুটি এক ঘণ্টায় শুধরে নেবে। ওর সঙ্গে ডোঙা ধ'রে পাল্লা দিতে গিয়ে দু'তিনটে লোক হিম্‌সিম্ খেয়ে থাকে।

হরিকান্ত নিজেকে সামলে নিল। রাগটা গিয়ে পড়ল ছেলের ওপর, সন্ধ্যার মুখে বেচারা পড়তে বসতে না বসতেই হরিকান্ত হুঙ্কার দিল, চেঁচিয়ে পড়তে কি হয়, তোদের বয়েসে আমাদের মুখে ফেনা উঠে যেত। পাড়ার দশটা লোক জানতে পারত হ্যাঁ পড়া তৈরী হচ্ছে।

এ অঞ্চলের অনেক লোক জড় হ'ল রাত্রে। আগামী কালই গণ-আবেদন যাচ্ছে। আশা নিরাশায় দোল খাচ্ছে মানুষগুলো। কোন্ দূর পাহাড়ে নদী থেকে জলধারা নেমে আসছে, কত পরিকল্পনা, নদীতে সারা বছর জল থাকবে, নদী থেকে খালে জল যাবে, একটুখানি জমিতে একটু জলস্রোত ঘিরে মানুষের কত আশা, কত বাসনা, কিন্তু এ কি হ'ল! এত চড়া সেচকর তারা দেবে কি ক'রে!

হরিকান্তর চোখে ঘুম নেই। সেদিন অনেকক্ষণ সদরে বসে রইল। অনেক দূরের দখিনে হাওয়া কাছে এল আর দূরে চ'লে গেল কিন্তু নান্‌কু আজ আর কাছ ঘেঁষল না।

আজ, এই প্রথম নান্‌কুর বদলে হরিকান্তই স্মরণ করল দূর এক পাহাড়তলী গ্রামের কথা, অনেক ক্লান্ত চিন্তার ভিড় সরিয়ে আপনি তার স্মরণে এল: সেই নদীটি তির্ তির্ করে বয়ে চলেছে, মোষের পাল নিয়ে ছেলেরা তার তীরে এসেছে, বালি খুঁড়ে স্বচ্ছ জল সঞ্চয় করছে আর পায়ের ছাপ দেখে বলাবলি করছে, কাল রাতে কতগুলো হরিণ এখানে জল খেতে নেমেছিল।

হরিকান্ত দু'একবার মৃদুকণ্ঠে ডাকল, নান্‌কু—নান্‌কু—

* * * *

ছেলেটা পাশের ঘরে পড়ছে। বেশ জোর গলায় পড়েই চলেছে।

আকাশে অনেক তারা। বড় অন্ধকার। কখন চাঁদ উঠবে কে জানে। দম্‌কা এলোমেলো হাওয়ায় তারাগুলি নিবু নিবু হয়ে আসছে মনে হচ্ছে।

ছেলেটা পড়েই চলেছে। নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

দীর্ঘ প্রবাসের পর নদীর জল—তাদের নদীর জল সাগরে মিলে গেল, যেখানের জল সেখানে চলে গেল, খাল বেয়ে ক্ষেতে এল না। চাষীর স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। ব্যর্থ হয়েছে তাদের আবেদন। বিফল মনোরথ হরিকান্ত। শূন্যের জটিল নক্ষত্রসজ্জার দিকে চেয়ে আছে সে।

আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ। এবার কোন্ পথ! গণঅভিযান! কে দেবে তার নেতৃত্ব। সেখানে যে অনেক বলিষ্ঠ রক্তস্বাক্ষরের প্রয়োজন। তবে কি তার প্রথম যৌবনে যেদিন সে গ্রামসেবার ব্রত নিয়েছিল সেদিনের ভেতর আজকের এই দিন ছিল, এই সংগ্রামের শপথ, এই কঠিন প্রতিজ্ঞাপাঠ, ধীরে ধীরে অন্য মানুষ হয়ে ওঠা, কে জানে, সে নিজে কি হবে কে জানে?

জীবনের সাজান ছক এলোমেলো হয়ে যায় হরিকান্তর কাছে, এত স্তব্ধতা অসহ্য লাগে, চীৎকার করে সে, বলি ঢুলছিস নাকি কান্ত, থামলি কেন, তোদের বয়েসী একটা ছেলে পড়লে পাড়াসুদ্ধ লোক জানতে পারবে নে?

অধীর অস্থির হয়ে ওঠে হরিকান্ত, এ সময়ে যে কেউ কাছে আসুক, যা হোক কিছু বলুক, এই স্তব্ধতা একটা যন্ত্রণা, সেই সব মানুষের উদাহরণ চাই—যারা পাথরে সোনা ফলিয়েছে, যারা অরণ্যকে শস্যক্ষেত্র করেছে, যারা মরুভূমিতে মাটি এনেছে, নান্‌কু কোথায়—নান্‌কু—

* * *

কয়েকটা দিন ঝড়ের মত্ততায় কেটে গেল, স্নানাগারের সময় নেই হরিকান্তর, বিরাট আন্দোলনের দায়িত্ব এসে পড়েছে তার ওপর, এ অঞ্চলের মাটি-ঘেঁষা মানুষগুলি গভীর বুভুক্ষায় সংহত হচ্ছে, উড়ো মেঘের দল কালবৈশাখীতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, তাদের চোখে বিদ্যুৎ, বুকে বজ্রের শক্তি। চল নগরে, চল শাসনকেন্দ্রে, আমরা মরব না। না—পরাজয় মানবে না হরিকান্তর পরিণত যৌবন, সে পিছু হটবে না, সে রোধ করবে আসন্ন দুর্ভিক্ষের রোষ, সে বন্ধ্যা মাটিকে করবে সবুজ শ্যামল। সকলের সমবেত ইচ্ছার সঙ্গে মিশে গেল তার অন্তরের

আকৃতি, নিজেকে সে ভুলল, মুছে গেল তার অবসরের আকাশ, এক বিরাট্ শক্তিকে চালনা করার মন্ত্র সে যেন পেয়ে গেছে। প্রস্তুত হও, চল আমার সঙ্গে, চল নগরে—

নানকু আজকাল রোহিণীকান্তর কাছে বসে, ওর সব কথা বুঝে উঠতে পারে না তবু কি যেন বুঝতে চায়, কোন এক বন্য জলধারার বিচিত্র মতিগতির কথা শোনে নান্‌কু, সেই উন্মাদ জলশরীর নাকি তাদেরই ক্যানালে বহমান, খালের ধমণীতে সেই এক উপলাস্তৃত নির্ঝরিণী হৃদয়ের ওঠা-পড়া।

শুনতে শুনতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নান্‌কু। তার গ্রামের কথায় চলে আসে। পাহাড়-ঘেরা গ্রাম। পাহাড় ঘিরে অরণ্যের জমজমাট চিত্রল শাড়ী। কাল যায়। অনেক অচেনা মানুষের আনাগোনা। গাছপালা ফাঁকা হয়ে এল লোভী কুঠারের মুখে। কাঁকর মাটি নেমে এল নদীখাতে। পুরাণো পথ ছেড়ে নতুন পথ ধরল নদী। ক্রমে সে সর্বনাশী হয়ে উঠল। তবু—তবু তাদের সেই ছোট ছোট মাটির ঘর, তাদের সেই শূয়োর বাচ্চাগুলো, আর এক ঝাঁক মুরগী, সেই চেনা মানুষের সরল সংসার, অত্যন্ত অভ্যস্ত পরিচিত জীবনযাত্রা, সব এত প্রিয় ছিল নান্‌কুর কাছে—

আবেগে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। দু-একটা কথা বলার ব্যর্থ চেষ্টা করে তার পর থেমে যায়।

গ্রাম ফাঁকা। মাঠ ধূ ধূ করছে। চাষীরা গেছে শহরে। মিছিল ক'রে, লাল শালু হাতে নিয়ে। রোহিণী-কান্তর চোখে পড়ল কাণ্ডটা। খালপাড় ধ'রে ধ'রে নদীর কাছে চলে এসেছে নানকু। একটা মরা বাবলার তলায় ব'সে সে মাটি মাখছে আপন মনে। নদীর নরম পলি। মাঝে মাঝে পাড় বেয়ে স্বল্প স্রোতের কিনারে নেমে যাচ্ছে। আঁচলা ভ'রে জল নিয়ে কি যেন দেখছে গভীর ভাবে, গন্ধ শুঁকছে আবার সযত্নে নদীতে ঢেলে দিচ্ছে।

—নানকু—চীৎকার করে উঠল রোহিণীকান্ত, তুই যে বড্ড এখেনে, চ' আমার সঙ্গে বাড়ী চ', গরুগুলোকে জাব দিবি বলে আমি কখন থেঙে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। নান্‌কুর হাত ধ'রে হিড় হিড় করে টানতে লাগল সে, চত্তিরের রোদে তোর মাথা গরম হয়েছে, বাবুকে বলে দোব, কাজ নেই কম্মো নেই খালি পাগলামি—

সেই রাত্রে রোহিণীকান্তর বাবা ফিরল কিন্তু সে কথাটা আর বলা হ'ল না। শহরের পথে পুলিস বাধা দিয়েছিল। পিচ-গলা রাস্তায় তারা বসে পড়েছিল। শান্তভাবেই অপেক্ষা করছিল। তাদের শুষ্ক উপবাসী মূর্তিগুলিকে ঘিরে ক্রমশঃ ভিড়ের জনতা বাড়ছিল, মাটি ছেড়ে চলে-আসা একদল তৃষার্ত মানুষের উদাহরণ দেখে যেন অনেক বিচ্ছিন্ন মানুষের প্রতিবাদ প্রাণ পেয়ে উঠছিল, একটা প্রবল চিত্তক্ষোভ প্রধূমিত হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। চেনা-অচেনায় মেশা মানুষের মধ্য থেকে দু'চার বার শ্লোগান উঠল, লাল শালু আন্দোলিত হ'ল, অকস্মাৎ পেছন থেকে থান ইট ছুটল পুলিসের ভ্যান লক্ষ্য করে, হরিকান্ত অনেক চেষ্টা করল সবাইকে শান্ত করার জন্যে, অতি দ্রুত কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। পুলিস লাঠি চালিয়েছে, জনতা ছিঁড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, মাথার ওপর দিয়ে আধলা ইট ছুটেছে। হঠাৎ কোমরে লাঠির এক ঘা। সে বসে পড়েছিল, কিন্তু তার আগেই চোখ পড়ে গিছল দূরের দিকে। মাথার ওপর দিয়ে ইটগুলো এবার ফিরে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর দিকে। আর একটা উঁচু লাঠি তার শির লক্ষ্য করে তীব্রবেগে ছুটে আসছে, বাঁচতে হবে, যে রকম করে হোক বাঁচতে হবে। সজোরে সেটাকে সে পাশে ঠেলে দিলে, রগের পাশটা ফেটে গেল, আর একটু হলেই বাঁ চোখটা যেত। আর তার পরেই অমন প্রখর দিনের আলো সব অন্ধকার হয়ে এল তার কাছে।

অন্ধকার রাত। গ্রামের লোকেরা হরিকান্তকে ধরাধরি করে গ্রামে ফিরে নিয়ে এসেছে। মাথায় মোটা একটা ব্যাণ্ডেজ। একপাশটা রক্তে ভেজা।

বাড়ীতে অনেক লোকের আনাগোনা। চেনা মানুষের ভিড়। দু'হাতের শক্তিতে সে মৃত্যুকে সরিয়ে দিয়েছে, রক্তস্নানে সে যেন নতুন জীবন লাভ করে উঠে আসছে। পারবে, হরিকান্ত এখনও তাদের পথ দেখাতে পারবে। নানা যুক্তি পরামর্শ চলে। কাল ট্যাড়া পড়বে, চাষ বন্ধ, সরকারের চড়া করের প্রতিবাদে তারা সেচ নেবে না জমিতে। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াতে পেরেছে ওরা, আর ওদের ভয় নেই।

দুর্বল হরিকান্তর চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে আসতে চায়, তবু সে চেয়ে থাকে, নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে যেন অন্বেষণ করে গভীর আগ্রহে।

রাত অনেক হ'ল। মানুষ জন সব চলে গেছে। শ্রান্ত হরিকান্ত আস্তে আস্তে ডাকল, নান্‌কু—নান্‌কু—

—আসছি হুজুর, কাছে এল সে।

—আর চাষের কাজ নেই রে, তুই আর কোন দুঃখে এখেনে থাকবি বল, ধীরকণ্ঠে বলল হরিকান্ত, তোর দেশের অনেক গল্প শুনিছিরে, আহা, বড় সুন্দর সে দেশ, তোকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করব, তুই দেশে ফিরে

যা, চাষ আবাদ করগে যা, আমার দেশ মরুভূমি, তোকে আর কি করতে রাখব বল্।

হরিকান্ত নীরব হ'ল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা।

—কি রে চুপ করে রইলি কেন, হরিকান্তর শ্রান্ত দৃষ্টিতে বিস্ময়, নিজের অমন সোনার ভিটে ছেড়ে এই পোড়া দেশে এয়েছিস কেন হতভাগা—

—হামার তো কোন মুলুক নেই, কান্নাকরুণ কণ্ঠে বলে উঠল নান্কু।

—নেই? তার মানে? হরিকান্ত তাকাল তার দিকে, কি হ'ল তোর গাঁয়ের?

—হোই যে বড়কা বাঁধটো বানিয়েছে না, নরম ভিজে গলায় বলল নান্কু, তারই পানির নীচে সব তলিয়ে গেল যে—

এ কথা যার সে যে তার একান্ত অপরিচিত, অকস্মাৎ হরিকান্ত অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল, এ মানুষের ত ঠিকানা নেয়া হয় নি।

—তোর বউ?

—সে গাঁও ছেড়ে আসতে চাইলে না, সেখানে সে পাথর বইছিল, এখন ত আর তাকে—

নান্কুর চোখ দু'টি জলে টল্ টল্ করছে।

—তোর ছেলে? কোন রকমে প্রশ্ন করল হরিকান্ত, তারও কথা ফুরিয়ে এসেছে।

কোন রকমে নান্কু বললে, উ তো রাঁচীতে রিক্সা টানছিল, কে যে কোথায় হামি কি করে বলব, আর কিছু জানে না, জানে না—কেমন একটা হা হা ধ্বনিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে সে ছুটে পালিয়ে গেল। সে যেন তার জীবনের অকরুণ সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে পারছিল না, তার এতদিনের জীবনকাহিনী তার চোখের সামনে জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে—এ যেন সে সইতে পারছিল না।

নান্কু সেই গ্রামের গল্প বলত যে গ্রামের চেয়ে সত্য অন্য কিছু নান্কুর অস্তিত্বের বেদনার কাছে ছিল না অথচ যে গ্রাম পৃথিবীর ইতিহাস থেকে চিরকালের মত নিঃশব্দে মুছে গেছে, জলের তলায় তলিয়ে গেছে, সে দেশের প্রাণস্রোত স্তব্ধ হয়েছে কিন্তু তার কাহিনী কখনও পায় নি পরিশেষ, বাস্তবে যাকে সে কখনও পাবে না, পেতে পারে না, তার মানচিত্র সে স্বপ্নের মধ্যে তৈরি করে নিয়েছিল, আরও সমৃদ্ধ রূপে, সুন্দরতর সুরে, আর সেই জন্যেই জল আর জলের মাটি—জলের তলার নরম মাখন মাটির প্রতি অমন গভীর প্রত্যয়ের ভালবাসা, অমন সপ্রেম আকর্ষণ, অমন উতরোল উন্মাদনা···

রাত্রির স্তব্ধতা চিরে চিরে একটা ক্লান্ত আবৃত্তির গুঞ্জন কানে আসছে দূর থেকে, রোহিণীকান্ত পরীক্ষার পড়া পড়ে চলেছে প্রাণপণে: নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? ইহার দ্বারা লেখক এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিপন্ন করিতে চান যে—

কি আর প্রতিপন্ন হবে! কত দূরের কোন এক অজানা গ্রামের মাটি আজ তাদের জমিকে উর্বর করতে পারত, অনেক জলমগ্ন পল্লীর অদৃশ্য স্পর্শ থাকতে পারত তাদের সোনালী ফসল, হায়, সব সাগরে চলে গেল। কোনদিন কি মোহনায় নব ব-দ্বীপ জন্ম নেবে?

স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে হরিকান্ত ধরা গলায় বলল, ওকে মনে মনে পড়তে বল গো, হ্যাঁ, চুপ করে, মনে মনে। আপন মনে বলল, আমায় স্তব্ধতা দাও—অতল জলের।

# সে নহি
# সে নহি
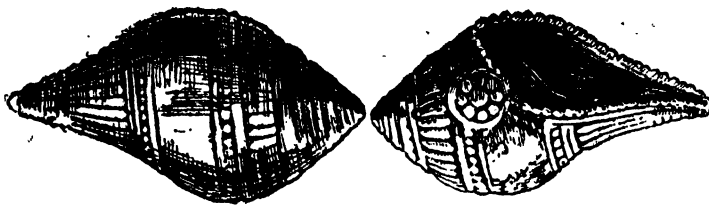
শ্রীচাণক্য সেন

দশ

দেবকুমার ও হিমাদ্রির চিঠি এক ডাকে এসেছে। একাধিকবার পঠিত পত্র দু'খানি টেবিলের ওপর সযত্নে রেখেছে দেববাণী। বাসন্তী দেবী স্নান সেরে পূজায় বসেছেন। রাইটিং প্যাডে ঝুঁকে প'ড়ে দেববাণী পত্র লিখছে হিমাদ্রিকে। খোকনকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে। দুটো চিঠিই সঙ্গে নিয়ে দেববাণী বেরুবে। মনে মনে হিসেব ক'রে দেখেছে আজ নানা কাজের ভিড়। তবু সন্ধ্যার দিকটা খালি। মাকে নিয়ে আজ বেড়াতে যাবে। বেশির ভাগ সময় মা ঘরে বন্দী। তাতে তাঁর নালিশ নেই। বই প'ড়ে, উল বুনে, কিছু না ক'রে দিব্যি তাঁর সময় কাটে। কিন্তু দেববাণীর মনে ক্ষোভ জমে ওঠে: মাকে নিয়ে সে যথেষ্ট বেড়াতে পারছে না। সন্দেহ হয় মা বুঝি অনুক্ষণ তার কথাই ভাবেন। অনুভব করে মা'র দৃষ্টি বার বার তার মুখে নিবদ্ধ। মা যেন আমার মধ্যে কি খুঁজে বেড়ান। আমাকে জানতে চান, স্পষ্ট ক'রে দেখতে চান। মা'র ধারণা আমি কোনও গোপন রহস্য আমার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। মা সেই রহস্যের সন্ধান করেন। দেববাণীর অস্বস্তি লাগে, দুঃখ হয়। তুমি যে দেববাণীকে দেখতে চাইছ, মা, সে নেই, নেই। সে হ'তে পারত; হয় নি। হ'তে গিয়েও সে হ'ল না।

কেন হ'ল না, দেববাণী জানে, তার কারণ সামনে টেবিলে সযত্ন-রক্ষিত দু'খানি পত্র কঠিন বাস্তবে রূপায়িত ক'রে রেখেছে। কাঁচা হাতের মিষ্টি-মধুর চিঠির কাছে দেববাণী মা; পাকা হাতের গুরু-গম্ভীর স্নেহ-স্নিগ্ধ পত্রের নিকটে দেববাণী—কে? নারী? বান্ধবী? দেবকুমার, খোকন, আর ছোট নেই; দু'বছর পরে সে স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়বে। আপাতত সুইট্জারল্যাণ্ডে দল বেঁধে ভ্রমণে গেছে, চিঠিতে স্ফূর্তির আমেজ। তবু যেন ছত্রে ছত্রে দেববাণী একমাত্র অগ্রজের নীরব নিঃশব্দ অনুচ্চারিত সদাসঙ্গী বেদনার মৃদু করুণ ঝংকার শুনতে পায়। যে-অতীত তার জীবনে অবলুপ্ত, দেবকুমার তার জীবন্ত প্রতিভূ। তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারায়, ভাসা ভাসা বড় বড় চোখে, রোমশ দেহে, মোটা ওষ্ঠাধরে, এমন কি ডান পায়ে ভর দিয়ে সামান্য বেঁকে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে যে মানুষের আতঙ্কিত ছবি ফুটে ওঠে, দেববাণীর অতীত জীবনে একদা তার প্রধাতনতম প্রাধান্য ছিল। দেবকুমার জানে তার জীবনে পিতার স্থান চিরদিনের জন্যে শূন্য। এ শূন্য সে এমন নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে, এমন বিনা-প্রশ্নে, রাত্রি যেমন অন্ধকারকে মেনে নেয়, দেববাণী কোনও দিন তার কাছে তাকে পিতৃহীন করবার কোনও কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দিতে পারে নি। দেববাণী জানে তার একমাত্র সন্তান অনুত্তর নির্বাক প্রশ্ন অন্তরে বহন করছে, নিঃসঙ্গ অবসরে হয়ত বা জীবনমঞ্চের অন্তরালে অজ্ঞাত-অস্তিত্ব জনককে ঘিরে কল্পনার অসত্য জাল বুনেছে, যা দেববাণীর সাধ্য নেই নিশ্চিহ্ন করে।

খোকন যত বড় হচ্ছে তত সে রহস্যময়। মা হয়েও দেববাণী তাকে বুঝতে পারে না, অব্যক্ত জিজ্ঞাসায় দূর-দুরান্তের ব্যবধানে তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। নিজের জীবনটাকে, অপরাজেয় জীবন-তৃষ্ণায়, আসন্ন ধ্বংস থেকে সে বাঁচিয়েছে, কৃপণ বিধাতার অনুদার হাত থেকে সার্থকতা যতটুকু সম্ভব ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু একমাত্র পুত্রকে গৃহের শান্ত উত্তাপে উন্মেষিত করতে পারে নি; পিতার তপ্ত স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে। বিদেশে, অসমঞ্জ পরিবেশে, তাকে মানুষ করতে বাধ্য হয়েছে দেববাণী। আমেরিকায় প্রথম যখন নিয়ে গিয়েছিল খোকনের বয়স তখন মাত্র সাত বছর; তখন থেকেই সে স্বভাব-নীরব; বড় বড় চোখের অনুক্ত প্রশ্ন নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনও কষ্ট সে দেয় নি। সে দৃষ্টি দেববাণী বেশিদিন সহ্য করতে পারে নি। ভাঙা জীবনকে জোড়া দিয়ে পুনঃনির্মাণের তাগিদে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে সংক্ষিপ্ত অবসরের সবগুলি মুহূর্ত খোকনকে সমর্পণ ক'রেও দেববাণীর নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে; খোকনের গম্ভীর বেদনাতুর চাহনি বার বার তার চোখে জল এনেছে। তিন বছর আমেরিকায় রেখে প্রথম

সুযোগে সে খোকনকে লণ্ডনে ভাল স্কুলে দিয়েছে পাঠিয়ে। মার্কিন দেশের চেয়ে ইংলণ্ডে তার লেখাপড়া ভাল হবে, নিজেকে বুঝিয়েছে। কিন্তু কিসের, কোন অশরীরী দুঃখের তাড়নায় যে সে পুত্রকে দূরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে এক মুহূর্ত নিজের কাছে তা গোপন থাকে নি।

এত বড় পৃথিবীর অনেক নগরে-সহরে দেববাণীর জীবন আজ পরিব্যাপ্ত। তবু তার গভীরতম সত্তা বাঁধা পড়ে আছে খোকনের কাছে। বাপ থেকেও যে পিতৃহীন মাতৃ-পরিচয়ে সে যেন গর্বিত বোধ করে এ আকাঙ্ক্ষা দেববাণীর চিত্তকে বহুদিন দগ্ধ করেছে। ছুটির অবসরে মা ও ছেলে মিলিত হ'লে দেববাণী খোকনের সুখ ও আনন্দের বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নি। নিশ্চিত প্রত্যয়ে সে জানে, খোকন তাকে ভালবাসে। তার চরিত্রে উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু সে যে কত নিঃসহায় ভাবে মাকে একমাত্র বন্ধু ও আত্মীয় ব'লে জানে, দেববাণীর তা অজানা নেই। তার প্রতিটি চিঠিতে মা'র জন্যে নীরব আকুলতা সঙ্গোপনে প্রকাশিত। এই যে সুইট্জারল্যাণ্ডে সহপাঠিদের সঙ্গে একত্র আনন্দের অবকাশে লিখিত তার সদ্য-প্রাপ্ত পত্র, তাতেও সে ব্যাকুলতা প্রস্ফুটিত। খোকন লিখেছে, "ইণ্ডিয়া তোমার ভাল লাগছে, আশা করি। যদি ভাল না লাগে, ছুটি ত তোমার আছে, চলে এস এখানে।" খোকন ডাকছে, দেববাণী চোখ বুজে ভাবল, খোকন আমায় ডাকছে। এই বিরাট্ পৃথিবীতে অনেক আহ্বানের মধ্যে এ ডাক বুঝি সবচেয়ে বড়।

কিন্তু, দেববাণী মনে করতে চমকে উঠল, আরও একজন তাকে ডেকেছে। সে আহ্বানও কঠিন, নির্মম। হিমাদ্রি লিখেছে, তুমি ফিরবার পথে কয়েকদিনের জন্যে এখানে হ'য়ে যেয়ো। এ ডাকও গম্ভীর, অনুচ্ছ্বাস। পাহাড় যেমন মেঘকে ডাকে, তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য। খোকন ও হিমাদ্রি, দুজনেই আমায় ডাকছে। একই পৃথিবীকে একসঙ্গে ডাকছে সূর্য, চন্দ্র। একজন ডাকছে তার ভয়ানক তেজ দিয়ে; অন্যজন অসীম কোমলতায়। দেববাণীর চিত্ত প্রগল্ভা নদীর মত দু'ধারায় বইতে চাইছে; কিন্তু সে জানে তা সম্ভব নয়। একসঙ্গে সে গঙ্গা-যমুনা হ'তে পারবে না। মাতৃস্নেহে পুণ্যতোয়া গঙ্গা, দরদী দয়িতের প্রেমে উচ্ছল যমুনা: দেববাণীর জীবনে বুঝি এ দু'য়ের মিল লেখা নেই। পূর্ণতা অসম্ভব জেনেও জীবন কেন যে নতুন ফুল ফোটাবার করুণ কামনায় কাতর হ'য়ে ওঠে বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ দর্শনে দেববাণী এ প্রশ্নের জবাব পায় নি। যে স্বামীকে জীবন থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, তার জীবন্ত প্রতিনিধি দাবীই সে মেটাতে পারছে না; এ দারিদ্র্যকে উপেক্ষা ক'রে কেন আবার হিমাদ্রির মত অমন আপাত-সম্পূর্ণ মানুষও তার কাছে হাত পাতল, কেনই বা নিজের দৈ মুহূর্তে বিস্মৃত হ'য়ে আত্মা তার দেবার ব্যাকুলতা উদ্বেলিত হ'ল, দেববাণী জানে না। শুধু জানে, দিতে চেয়েও দিতে না পারার দুঃসহ দুঃখে জীবন তার ভারী হয়ে উঠেছে; এ ভার লাঘবের পথ নেই, পথ নেই।

হিমাদ্রি লিখেছে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আন বিজ্ঞানের কাজ। বৈজ্ঞানিক কেবল বিশ্লেষণ করে না, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয় করে। হিমাদ্রি তার নিজের জীবনে সবকিছুর সমন্বয় ক'রে নিয়েছে, বাইরে, পোষাকে পরিচ্ছদে, চেহারায় সে যেমন বিশৃঙ্খল, ভেতরে সে তেমনি বিপরীত। তার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই; সে চির-প্রসন্ন। অন্ততঃ দ্বন্দ্বের ভাগী সে কাউকে করে না, নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বকে পরিপাক করে। তার মধ্যে সেজন্যে তপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা কঠিন বাধার দেওয়ালে মাথা খুঁটে মরে না। দেববাণী শুধু একবার তাকে জ্বলে উঠতে দেখেছিল, দেখে তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে দহনও হিমাদ্রি হজম করে নিয়েছে। আজ সে শুধু শান্ত, সমাহিত আহ্বান। তার আহ্বানে কাড়াকাড়ি নেই। জুলুম নেই। জোর করার দাবী নেই। অগ্নি-শিখা পতঙ্গকে ডাকছে না; তৃষ্ণার্ত ধরণী ডাকছে না বর্ষার ধারাকে। এ যেন সমুদ্র ডাকছে নদীকে, নদী ডাকছে নির্ঝরিণীকে। বলছে না, আমার মধ্যে তোমার সমাপ্তি। বলছে, আমার মধ্যে তোমার মুক্তি, তোমার বিকাশ।

প্রথম দিনই, অনেক, অনেক দিন আগের কথা সে, হিমাদ্রিকে দেখে দেববাণার বুক কেঁপে উঠেছিল। তখন সে বি. এস-সির ছাত্রী। এক বান্ধবীর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেল হিমাদ্রিকে। বান্ধবীর টিউটর। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র। ভরা-সরা গোলগাল মুখে থমথমে গাম্ভীর্য; ছোট একজোড়া প্রজ্জ্বলিত চোখে পুরু কাচের চশমা। দীর্ঘ ঋজু, প্রকাণ্ড মস্তক জঙ্গলাকীর্ণ। খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী আধ-ময়লা।

হিমাদ্রি হঠাৎ এসে গিয়েছিল। সেদিন তার পড়াবার কথা নয়। নির্দিষ্ট দিনে আসতে পারবে না বলে এসে গিয়েছিল যদি সেদিন পড়ান হয়ে যায়। দেববাণীর বান্ধবী পড়তে চায় নি। বলেছিল, "আজ আমার বন্ধু

দেববাণী এসেছে। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ভাল মেয়ে। আজ পড়ব না।"

হিমাদ্রি তাকিয়েছিল দেববাণীর চোখে। দেববাণী হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়ে কেঁপে উঠেছিল। কি জ্বলন্ত দৃষ্টি! অমন গম্ভীর থম্‌থমে মুখের ওপর অমন জ্বলন্ত চোখ লোকটিকে কেমন ভয়াবহ করে তুলেছে! সে যেন অনেক উঁচু থেকে অনেক কিছু গভীর ঔদাস্যে দেখে নিচ্ছে; পরিবেশ থেকে অনেক দূরে; মাঠের মাঝখানে প্রাচীন বট যেমন মাঠ থেকে অনেক দূরে।

বট যখন কথা বলল, দেববাণীর চমক লাগল। আশ্চর্য গম্ভীর কণ্ঠস্বর, অথচ কি অদ্ভুত শান্ত! সে বলল, "তা হলে আমি যাই। আপনারা গল্প করুন।"

বান্ধবী বলে উঠল, "একটু বসবেন না? এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যান।"

হিমাদ্রি বসল। ওরা দুজনেও বসল আড়ষ্ট, অপ্রতিভ হয়ে। বান্ধবী দু'একটা টুকরো কথা বলল। হিমাদ্রি বিশেষ সাড়াশব্দ করল না। এক সময় বান্ধবী উঠে গেল চা আনতে। বটগাছের সঙ্গে একা বসে দেববাণী ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করল। এবার তাকে অবাক করে হিমাদ্রি কথা বলে উঠল।

"আপনাদের কলেজে প্রফেসর রমেশ চ্যাটার্জি আমার মাষ্টার মশাই।"

দেববাণীর কেমন মজা লাগল। হিমাদ্রির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বিবৃতি যেমন বেখাপ্পা তেমনই অবান্তর। তবু সে যে কথা বলল, তাতে দেববাণী খানিকটা আশ্বস্ত হ'ল।

"তিনি আমাদেরও পড়ান।"

"কলকাতায় অমন ভাল কেমিষ্ট্রির প্রফেসর আর নেই।"

"খুব ভাল পড়ান।"

"ওঁর স্ত্রী পাগল।"

এবার দেববাণী হাসি চাপতে পারল না। তাকে হাসতে দেখে হিমাদ্রি রীতিমত বিস্মিত হ'ল।

এমন ভাবে তাকাল যার পরিষ্কার অর্থ, কারুর স্ত্রী পাগল শুনলে যে পাগল নয় তার হাসি পাবার কথা নয়।

সে জ্বলন্ত চাহনি দেববাণীর হাসিকে মুহূর্তে নির্বাপিত করল। অপ্রস্তুত হয়ে দেববাণী বলল, "তাই বুঝি?"

"অনেক দিন।"

"খুব ভাল নোট দেন।"

হিমাদ্রি কিছুক্ষণ নীরব রইল। তার পর আবার বলে উঠল, "ক্রষ্ট্যাল নিয়ে ওঁর অনেক মৌলিক গবেষণা আছে। পৃথিবীর অনেক দেশে বৈজ্ঞানিক মহলে উনি সুপরিচিত।"

ভাগ্যিস হিমাদ্রি ক্রষ্ট্যাল কথাটা উচ্চারণ করেছিল! দেববাণী অথৈ জলে মাটির সন্ধান পেল। ক্রষ্ট্যাল—কেলাস —সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য অনেক, জ্ঞান কম। সে ব'লে বসল, মূল পাথর থেকে কেলাসন প্রথায় কি করে বিভিন্ন মিশ্রিত ধাতু তৈরী হয় সে ভাল বুঝতে পারে না। বলার সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি উৎসাহিত হয়ে উঠল; হঠাৎ হাওয়া বটবৃক্ষকে নাড়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ কেলাসন-প্রথার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মুখর হ'ল। গলিত প্রস্তর তাপহীন হবার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে বিভিন্ন ধাতু আলাদা হয়ে যায়; যে সব ধাতুতে লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম বেশি, সেগুলি সর্বাগ্রে কেলাসিত হয়। দেববাণী এ সব কথা আগেও শুনেছে, কিন্তু আজকার ব্যাখ্যা মনে হ'ল অন্য রকম, কিছুটা বক্তার ব্যক্তিত্বে, অনেকখানি তার জ্ঞানের গভীরতায়, বর্ণনার প্রাঞ্জলতায়। ইতিমধ্যে বান্ধবী চা নিয়ে এসে তাদের আলোচনায় নিমগ্ন দেখে অতিশয় বিস্মিত। দেববাণীর প্রশ্নের সূক্ষ্মতায়, মননের আগ্রহে, বুদ্ধির প্রখরতায় হিমাদ্রিও খুশী হয়ে উঠল। প্রায় ঘণ্টা-খানেক চলল তাদের আলোচনা। উঠবার সময় আশ্চর্য সরল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে সে বলে ফেলল, "মন দিয়ে পড়ুন। বিজ্ঞানে আপনার নিষ্ঠা আছে মনে হচ্ছে।

এ ভাবে হিমাদ্রি এল দেববাণীর জীবনে। না, ঠিক এল না, তার জীবনের সংকীর্ণ পরিধির এক পাশে এসে দাঁড়াল। এ ঘটনার কয়েক মাস পরে দেববাণী একদিন হিমাদ্রিকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করল। তার পর থেকে মাঝে-মধ্যে সে আসত; বিজ্ঞানের কথা শোনাতে, দুরূহ সমস্যাকে যাদু বলে সহজ সরল করে দিতে তার সরল সহজ আনন্দ দেববাণীকেও স্পর্শ করত। বিজ্ঞানকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রেরণা দেববাণী যাদের কাছে ছাত্রজীবনে পেল তাদের মধ্যে হিমাদ্রির স্থান স্বকীয় গৌরবে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।

হিমাদ্রি গুরুগম্ভীর পাহাড়ের নিশ্চল বিরাটত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; দেববাণীর জীবন-ঝরণা তার পাশ দিয়ে বয়ে গেলেও তাকে যেন স্পর্শ করল না। বিজ্ঞান ছাড়া দেববাণীর অস্তিত্ব হিমাদ্রির কাছে এত অর্থহীন যে বিজ্ঞানের বাইরে হিমাদ্রির অস্বিত্বও দেববাণীর কাছে অর্থ-পূর্ণ মনে হবার সুযোগ পেল না। বি. এস-সি. পরীক্ষার বছরে দেববাণীর জীবনে যে তুফান উঠল তার কোনও খবর হিমাদ্রির জানবার প্রয়োজন হ'ল না। মাসে এক-দিনের বেশি দেববাণীদের ফ্ল্যাটে তার আসা হ'ত না। কুমারী-জীবনের তপ্ততম দিনগুলিতেও এই একটি দিনের

প্রশান্ত মননশীলতার জন্যে দেববাণী উৎসুক হয়ে থাকত। কিন্তু বুদ্ধি ও বিদ্যাচর্চার বাইরে দেববাণীর জীবন আদিম ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডবে উৎপাটিত হ'ল তার খবর হিমাদ্রি পেল না। যেদিন পেল সেদিনকার তার বেদনার্ত চাহনি আজও দেববাণী ভুলতে পারে না।

হিমাদ্রি দরজায় মৃদু শব্দ ক'রে অপেক্ষমান। দেববাণী গৃহত্যাগের জন্যে তৈরী। বাসন্তী দেবী ও দেববাণী হতাশ বেদনায় পাথর। দ্বিতীয়বার দরজায় শব্দ হতে দেববাণীই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। অন্য দিন যেমন ধীর পদক্ষেপে ভেতরে আসে, তেমনি এল হিমাদ্রি। তাকে দেখে চমকে উঠল দেববাণী। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত তার আগমন। বাসন্তী দেবী ও দেবযানী নির্বাক। অমন যে বাস্তব-উদাসীন হিমাদ্রি, তারও মুহূর্তে মনে হ'ল আজকের অপরাহ্ণ অস্বাভাবিক সংকট-সংকুল। অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকাল তিনটি অপ্রকৃতিস্থ মুখে। কিছু বুঝতে পারল না। খোলা দরজার একটিতে ভর দিয়ে নির্বাক নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ দেববাণী বলে উঠল, "আমি চলে যাচ্ছি।"

দুর্বোধ্য লাগল কথাগুলি হিমাদ্রির কাছে। তবু সে কিছু না বুঝেই বলল, "কোথায়?"

উত্তরে দেববাণীর মুখে কথা এল না।

এবার বলে উঠলেন বাসন্তী দেবী। বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। এত বড় সংকটে এই প্রথম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি সবার সামনে।

বুঝতে হিমাদ্রির সময় লাগল। কিন্তু বুঝতে সে পারল। নত-দৃষ্টি দেববাণীকে বলে উঠল, "আপনার পড়া?"

উত্তর দিতে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেববাণী থমকে গেল। ব্যথায় বিকৃত সে মুখ। পুরু কাচের চশমা ফেটে দু'চোখ দিয়ে বেদনা ঝরছে।

মৃদু অর্ধ উচ্চারিত জবাব দিল দেববাণী, "পড়া চলবে।"

"পরীক্ষা দিতে পারবেন ত?" হিমাদ্রি আবার প্রশ্ন করল।

"আশা ত করছি।"

বাসন্তী দেবী চিৎকার ক'রে উঠলেন, "মিথ্যে কথা। ওর পড়া এই শেষ হ'ল। যেখানে যাচ্ছে সেখানে বিদ্যার নামলেশ নেই। ও জানে না, কিন্তু আমি জানি, ওর পড়াশোনা সব গেল।"

দেবযানী বলল, "মা, তুমি চুপ কর। ও যেতে চাইছে ওকে যেতে দাও। ভাল মনে, আশীর্বাদ ক'রে, ওকে যেতে দাও।"

বাসন্তী দেবী আবার কেঁদে উঠলেন, "না, না, আমি পারব না, পারব না।"

হিমাদ্রি বুদ্ধিহীন দৃষ্টিতে এক অবিশ্বাস্য নাটকের বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখল। অল্প সময়ে সে বুঝতে পারল এ দৃশ্যাঙ্কে দর্শকের স্থান নেই। যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ফিরে দাঁড়াল। দেববাণীকে সম্বোধন ক'রে বলল, "আপনার মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চার সম্ভাবনা ছিল। তা নষ্ট হ'লে বড় দুঃখের হবে।"

হিমাদ্রি সিঁড়ি দিয়ে ভারী পদক্ষেপে নেমে গেল।

এর পরে কয়েক বছর দেববাণী হিমাদ্রিকে দেখে নি। বাসন্তী দেবীর কাছে কয়েক বার যে সে তার খোঁজ নিয়েছে তাও দেববাণীর জানবার কথা ছিল না। এক দিন পরাস্ত দেহমন ও অতিশয় অসুস্থ শিশুপুত্র নিয়ে সে যখন মা'র কাছে ফিরে এল, মা'র জোরে আবার পড়া শুরু করল, সেদিন আবার তার হিমাদ্রিকে মনে পড়ল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারল হিমাদ্রি তখন লণ্ডনে।

আরও তিন বছর কেটে গেল। দেববাণীর জীবনে কঠোর সংগ্রামের বছর সেগুলি। তাদের ইতিহাস, দেববাণী আজও মনে মনে বলে, কোনও দিন যেন লেখা না হয়। এক অপরাজেয় জননীর দুঃসাহসী কন্যার জীবনের পাতায় পাতায় তাদের অত্যাচারের চিহ্ন নীরবে চিরদিন লুকিয়ে যান; কেউ যেন তাদের টেনে বাইরে না আনে।

এম. এস-সি পরীক্ষা দিচ্ছে দেববাণী। বিজ্ঞান কলেজের প্রবেশ-পথের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে সে পরীক্ষার্থীর স্বাভাবিক তাড়াতাড়িতে, হঠাৎ একটা পুরুষ এসে তার গতিপথ অবরোধ করল। ভয়ে আতংকে পাণ্ডুর হ'ল দেববাণী, অত তাড়া সত্ত্বেও, পা চলল না। লোকটা দেববাণীকে কিছু বলল, দেববাণী ভয়ানক আপত্তিতে ফিরে দাঁড়াল। লোকটা হাত বাড়িয়ে দেববাণীর হাত ধরতে গেল, দেববাণী ত্বরিৎ গতিতে আরও স'রে দাঁড়াল। তক্ষুণি তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, হঠাৎ অপ্রস্তুত লোকটাকে নতুন কিছু করবার সময় না দিয়ে দেববাণী দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

খানিক দূরে বারান্দা থেকে এ দৃশ্য আর একজন দেখছিল। সে নেমে এসে লোকটার সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে মানুষটা কেমন ঘাবড়ে গেল।

হিমাদ্রি বলল, "চ'লে যান এখান থেকে।"

সে প্রতিবাদ করল, "যাব? কেন যাব? আমি—"

হিমাদ্রি বলল, "আপনি কে আমি জানি। চলে যান। নইলে ভাল হবে না।"

লোকটা তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার পর নেমে গেল।

প্র্যাকৃটিকাল পরীক্ষা ছিল দেববাণীর। পরীক্ষা শেষ ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে সে বাইরে যাবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় হিমাদ্রি এসে সামনে দাঁড়াল।

তাকে দেখে এমন অবাক হ'ল দেববাণী যে, কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না।

যখন হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাতে গেল, দেখতে পেল পুরু কাচের আড়ালে হিমাদ্রির প্রদীপ্ত চোখ ব্যথায় থর থর কাঁপছে।

"আপনি এখানে?" প্রশ্ন করল দেববাণী।

"আমি এখানে কাজ করছি।" মৃদুস্বরে গম্ভীর জবাব দিল হিমাদ্রি।

"কতদিন হ'ল?"

"প্রায় এক বছর।"

"তাই নাকি? কৈ, জানতে পারি নি ত?"

অর্থাৎ, খবর করেন নি কেন? এ পরোক্ষ প্রশ্নের জবাব দিল না হিমাদ্রি।

"পড়াচ্ছেন?"

"রিসার্চ করাচ্ছি। নিজেও করছি।"

"আমি এখানে এসেছি জানলেন কি ক'রে?"

হিমাদ্রি একটু দেরি ক'রে জবাব দিল, "দেখতে পেলাম।"

"কখন?"

"যখন সকাল বেলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিলেন।"

মুখের কথা ফুরিয়ে গেল দেববাণীর। চতুর্দিক কেমন অন্ধকার হয়ে এল। জোর ক'রে নিজেকে সামলে নিল দেববাণী। কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

তার সেই লজ্জা-করুণ নীরবতায় যুক্ত হ'ল হিমাদ্রির বেদনা-মৌন গাম্ভীর্য। দু'জনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হিমাদ্রি বলে উঠল, "বাড়ী যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় থাকেন এখন।"

"সেই হাতিবাগানেই, মা'র কাছে।"

"চলুন, পৌঁছে দি।"

"কেন? আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন?"

"চলুন। একা যাওয়া আপনার ঠিক হবে না।"

জীবনে এক পরম দুর্দিনে আবার হিমাদ্রি এসে উদয় হ'ল। সত্যি, উদয় হ'ল। সে যে খুব ঘন ঘন আসত তা নয়, নিজের কাজে ডুবে থাকত দিনরাত। মাসে দু'দিনের বেশি আসবার সময় তার হ'ত না। সে যে অনেক কিছু আগ্রহ দেখাত তাও নয়। উজ্জ্বল গাম্ভীর্যে প্রতিনিয়ত নিজেকে আকর্ষণীয় দূরত্বে সরিয়ে রাখত। কিন্তু দেববাণীকে সে বুঝতে দিত, জানতে দিত, মা ছাড়া তার আরও একজন হিতৈষী আছে, বন্ধু আছে। এম. এস-সিতে দেববাণীর খুব ভাল রেজাল্ট হ'ল না, দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম হ'ল। ইচ্ছে, রিসার্চ করে। দরকার চাকরি করার। বি. এস-সির পরে অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। রিসার্চের সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হ'ল। তবু যে সে পেয়ে গেল, কেউ না বললেও, দেববাণী জানত, সে কেবল হিমাদ্রির চেষ্টায়। রিসার্চ করতে গিয়ে দেখল বিজ্ঞান কলেজে কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চর্চা হয় না, মনুষ্য-চর্চাও প্রচুর হয়ে থাকে। লেবরেটরীতে আর একটি মেয়েও রিসার্চ করত; দেববাণী দেখতে পেল সে তাকে এড়িয়ে চলে। রিসার্চে তার কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত ভাল হবার অপরাধে সে এই সহকর্মিণীর বিরাগভাজন। একদিন সবার সামনে সে মেয়েটি দেববাণীকে ভয়ানক অপমান করে বসল। তার বিবাহিত জীবন নিয়ে এত বিশ্রী, বিস্বাদ কথাও যে কেউ বলতে পারে, দেববাণীর তা ধারণার বাইরে ছিল। সে প্রতিবাদ করল না, নিজের মনে কাজ ক'রে যেতে লাগল। পরের দিন ডিপার্টমেণ্টের প্রধান অধ্যাপক তাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছে দেববাণী যা শুনল, তার চেয়ে মৃত্যুও বুঝি তার ভাল ছিল। চোখ ফেটে জল আসতে চাইল, নিজেকে শাসন করতে গিয়ে সে একটা কথাও বলতে পারল না।

তার নীরবতাকে অধ্যাপক অভিযোগের স্বীকৃতি বলে ধ'রে নিলেন। কণ্ঠস্বরে দুঃখের ঝংকার তুলে বললেন, "আমাদের সব দিক মানিয়ে চলতে হয়। এদেশে এখনও রিসার্চের সুযোগ বড় কম। ছাত্রছাত্রীরাই এখানে কাজের সুযোগ সর্বাগ্রে পেয়ে থাকে। আপনার ছাত্রজীবনে ত অনেক বছরের ফাঁক পড়ে গেছে। আপনাকে নেওয়াই আমাদের উচিত হয় নি। তার ওপর যদি ছাত্রীরা আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপত্তি তোলে, তা হলে আমাদের অবস্থা আরও ডেলিকেট হয়ে ওঠে।"

"আপনি কি আমাকে রিসার্চ ছেড়ে দিতে বলেন?" দেববাণী এতক্ষণে কথা বলতে পারল।

"তাই বলি।"

"আমার কিছুই আপনি জানেন না। যদি বলি, যা শুনেছেন, তার মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই, আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না। আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারি এমন ক্ষমতাও আমার নেই। তবু, সত্যের খাতিরে আমি বলছি, যা শুনেছেন সব মিথ্যে। এ শুনেও যদি আপনার ইচ্ছে হয় আমাকে রিসার্চ করতে না দেবার, আপনি আমায় তাড়িয়ে দিন। স্বেচ্ছায় রিসার্চ আমি ছাড়ব না। আজ কেন, কোনও দিন না।"

এক মুহূর্ত দাঁড়াল না দেববাণী। নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে চলে এল। বাড়ীর পথে ট্রামে উঠতে গিয়ে হঠাৎ কি মনে ক'রে রাস্তা পার হয়ে অন্যপথের বাসে উঠে বসল। বৌবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে নেমে খুঁজতে খুঁজতে বার করল "শান্তি-নিবাস"। হিমাদ্রির মেস।

সামনে সারি সারি কাপড়, খেলনা, মনোহারী দোকান। পাশ কাটিয়ে খানিক পেছনে শান্তি-নিবাসের অন্ধকার প্রবেশ-পথ। তখনও সন্ধ্যার দেরি আছে, কিন্তু শান্তি-নিবাসে রজনীর অন্ধকার। কোনও মতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এসে দেববাণী দেখতে পেল খালি গায়ে লুঙ্গি-পরা একজন লোক অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশে ব'সে আছেন কাঠের চেয়ারে।

স্ত্রীলোক দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"কাকে চাই?"

"এখানে ডা: হিমাদ্রি বসু থাকেন?"

"থাকেন।"

"তিনি আছেন?"

"সে খবর তিনিই কেবল বলতে পারেন। আমি মাসকাবারে টাকা পাই বটে, কিন্তু তিনি কখন আমার মেসে থাকেন তা জানতে পারি নে।"

"ওঁর ঘর কোনদিকে?"

"বাঁ দিকে এগিয়ে যান। ত্রিশ নম্বর ঘর। দাঁড়ান, আলো জেলে দি।"

ত্রিশ নম্বর ঘরের কাছে এসে দেববাণী দেখল তালা ঝুলছে। হিমাদ্রি নেই। এরকম সময় সে মেসে ব'সে থাকবে ভাবাই দেববাণীর ভুল হয়েছে। কিন্তু তার বড় ক্লান্ত, অসহায় মনে হ'ল নিজেকে। কাল হয়ত কলেজে গিয়ে দেখবে তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, লেবরেটারাতে তার নির্দিষ্ট স্থানে অন্য কেউ কাজ করছে। তখন? তখন সে কি করবে? এমন সুন্দরভাবে তার কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল, অধ্যাপক ভাদুড়ী এত খুসী, নিজের উৎসাহ নেশায় দাঁড়িয়েছে, এখন, এইভাবে, বিনা অপরাধে, মিথ্যা অপবাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, তাকে কি বেরিয়ে যেতে হবে?

সামনে একটা টুল ছিল, তার ওপর ব'সে পড়ল দেববাণী।

কতক্ষণ ব'সেছিল কে জানে, হঠাৎ হিমাদ্রির গলা শুনে চম্‌কে উঠল।

"আপনি? আপনি এখানে?"

অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল দেববাণী।

"আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"আমার কাছে? এখানে? কেন?"

দেববাণী লক্ষ্য করল হিমাদ্রি তাকে ঘরে নিয়ে বসতে দিল না। জানতেও চাইল না কখন সে এসেছে, কতক্ষণ সে অপেক্ষা করছে।

"বড় বিপদে প'ড়ে এসেছি।"

"তা ত বুঝতেই পারছি। কি বিপদ্ ঘটল আবার?"

দেববাণী কোনওমতে ঘটনার বিবরণ দিল। গুছিয়ে বলার শক্তি আর নেই।

হিমাদ্রি শুনল। কিছুক্ষণ ভাবল। তার পর বলল, "ঠিক আছে। আপনি যান।"

"আমার রিসার্চের কি হবে?" আর্তনাদ ক'রে উঠল দেববাণী।

"কি আবার হবে? রিসার্চ করবেন।"

"আমাকে তাড়িয়ে দেবে না ত?"

"না। তাড়াবে কেন?" কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে এল হিমাদ্রির।

রিসার্চের দ্বিতীয় বছরে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করতে হ'ল দেববাণীকে। জীবনের আর একটা কুৎসিত পরিচ্ছেদ। সুরুতে যা ছিল পরমরমণীয়, তার শেষ হ'ল কদর্যতার চরমে। নর-নারীর যে সম্পর্ক একান্ত নিজস্ব, যেখানে কৌতূহলী পৃথিবীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ, তাকে কলুষ-কালিমায়, গরল-হলাহলে জঘন্য ক'রে আদালত নামক নির্দয় হাটে সবার সামনে হাজির করার মধ্যে গভীর লজ্জা, তীব্র বেদনা, দাহিকা কুরুচি। অপজাত বিবাহের দুঃসহ বোঝা দেববাণী বইতে পারত যদি তাকে অপমান ও নোংরামির গভীরতম গহ্বরে তা টেনে না আনত। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে দেববাণীর শিশুপুত্রের জীবন নিয়ে সংশয় উপস্থিত হ'ল। তার নিজের শারীরিক নিরাপত্তাও বিপন্ন। আদালতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা সরকার, পুলিস, উকিল-ব্যারিষ্টার। একসঙ্গে একাধিক মামলায় জড়িয়ে পড়ল দেববাণী। লালবাজার ও রাইটার্স বিল্ডিং, আলিপুর কোর্ট আর

টেম্পল চেম্বার্স। কলকাতার জটিল মাহাত্ম্য ঘোষণা ক'রে যে-সব প্রাচীন রহস্যময় প্রতীক্, তাদের সঙ্গে চাক্ষুস বিস্বাদ পরিচয় হ'ল দেববাণীর। এক প্রকাণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় সে পাক খেল ; নিংড়ে, চুষে বার ক'রে নিল শত্রু-মিত্র সবাই তার সবটুকু অবশিষ্ট জীবনরস, তবু সে শেষ পর্যন্ত মরল না, ভাঙল না, ফুরিয়ে গেল না, শুধু অন্তর হ'ল তার মরুভূমি, আত্মা উপবাসে শীর্ণ, দেহ পাথরের মত নির্জীব, কঠিন।

সবচেয়ে প্রয়োজন টাকার। বাসন্তীদেবীর সারা জীবনের সবটুকু পুঁজি নিঃশেষ হয়ে গেল। তাঁর মাষ্টারীর মাইনেতে সংসার চলে কোনমতে, বাড়তি দাবী মেটে না। মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তে দেবযানী হুটো ট্যুইশনি নিল। দেববাণীর সকাল বেলা ট্যুইশন, হুপুরে রিসার্চ, বিকেলে আবার ট্যুইশন! তাতেও ধর্মের কল নড়তে চাইল না। কোন সান্ধ্য-কলেজে কাজের জন্যে উঠে প'ড়ে লাগল দেববাণী।

চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে, এমন সময় কাজ জুটে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। সান্ধ্য-কলেজ থেকে নয়। প্রতিষ্ঠিত কোন কলেজ থেকে ডাক এল একদিন, বিনা দরখাস্তে।

কলেজের প্রিন্সিপাল নামকরা শিক্ষাবিদ্। পক্ককেশ, শান্ত-সৌম্য চেহারা। তাঁর সামনে চেয়ারে ব'সে অমন গভীর হুর্দিনেও দেববাণীর চিত্ত অকারণে নিজে থেকেই আশ্বস্ত হ'ল!

"আপনার চিঠি পেয়ে দেখা করতে এসেছি," বিনীত দেববাণী নিবেদন করল।

অধ্যক্ষ দেববাণীকে কিছুক্ষণ দেখলেন। নিরীক্ষণ সুরু হ'ল গুরুতর গাম্ভীর্যে, শেষ হ'ল অকৃত্রিম প্রসন্নতায়।

"তোমার নাম দেববাণী?" সহাস্যে প্রশ্ন করলেন অধ্যক্ষ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খুব বিপদে পড়েছ?"

বিস্মিত চোখে তাকাল দেববাণী। কিছু বলতে পারল না।

"এখানে কাজ করবে?"

"কাজ পাব আমি?"

"পাবে। আমার একজন কেমিষ্ট্রির লেকচারার চাই। তুমি কালই লেগে যাও।

"কালই?"

"কেন? কিছু অসুবিধা আছে?"

"আমি বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ করছি।"

"জানি। হুপুরে হু'ঘণ্টা তোমার ক্লাস থাকবে না। রিসার্চ তুমি চালিয়ে যেতে পারবে। শুনেছি তুমি বেশ ভাল কাজ করছ ওখানে।"

"তা হ'লে বড় সুবিধে হয়।"

"আমাদেরও বেশ ভাল লেবরেটরী আছে। তুমি যদি চাও, কলেজের পরে তোমার কাজের ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

"সুযোগ পেলে আমি রাত্রেও কাজ করতে পারি।"

"অসুবিধে হবার কথা নয়। দারোয়ান রাত্রে ডিউটি দেয়। শুধু লেবরেটরী পিয়নকে তুমি কিছু টাকা দিয়ে দিও।"

"আপনার অসীম দয়া।"

"তা হ'লে কাল আসছ।"

"নিশ্চয়।"

"সোজা আমার কাছে চ'লে এস। আমি তোমায় ক্লাসে নিয়ে যাব।"

দেববাণীর ওঠার কথা, কিন্তু সে ব'সে রইল।

"কিছু বলবে?" অধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন।

"আমার কথা আপনি সব জানেন?"

"কিছু কিছু জানি।" তিনি মৃদু হাসলেন।

"কি ক'রে?"

"ছোট্ট একটা পাখী এসে ব'লে গেল আমায়," জোরে হেসে উঠলেন তিনি। "কি ক'রে জানলাম তাতে তোমার দরকার নেই।" একটু থেমে বললেন, "শুধু মনে রেখ জীবন নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ নয়, সুখও নয়। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলো আছে। এই হ'ল বিধাতার ব্যবস্থা। তা যদি না হ'ত আমরা কেউ লড়তে পারতাম না, সত্য চিরদিন মিথ্যার কাছে হার মানত, অর্থ, শক্তি, হিংসা চিরদিন জয়ী হ'ত। জীবনে পদে পদে দেখতে পাবে এক কল্যাণময়ী শক্তি ঘোর বিপদের দিনে তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সংগ্রামের পথে আলো ছড়িয়ে দেবেন তিনি। আচ্ছা, তুমি এস। আমার ক্লাস নিতে হবে।"

গভীর পরিতৃপ্তি, জ্বলন্ত আত্ম-বিশ্বাস, মানুষে পুনর্জাত শ্রদ্ধা নিয়ে দেববাণী বাড়ী ফিরল। শুধু এ জন্যে নয় যে তার বড় সমস্যার অনেকখানি সমাধান হ'ল; প্রধানতঃ এ জন্যে যে তার দৃষ্টি গেল খুলে, অন্তরে অশুভের অন্ধকার ভেদ ক'রে শুভের আলো জ্বলে উঠল। প্রিন্সিপাল বসাকের মত মানুষ পরবর্তী জীবনে বিদেশে দেববাণী অনেক দেখেছে; যাঁরা সহানুভূতি ও করুণার প্রদীপ অনুক্ষণ ব'য়ে চলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পান

না, কোনও সংগঠিত ক্ষমতা, এমন কি রাষ্ট্রও, যাঁদের ন্যায়-বুদ্ধি বিচার-বোধকে ভয় বা প্রলোভনে দুর্বল করতে পারে না। এঁদেরই জন্যে বিদেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও জ্ঞানচর্চার পবিত্র স্বাধীন কেন্দ্র; রাজনীতি ও ক্ষমতানীতি, স্বার্থ ও লোভ বহু পথে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ করতে পারে নি।

দু'সপ্তাহ দেববাণী কলেজে পড়াচ্ছে। চার দিন হ'ল কলেজের লেবরেটরীতে রাত্রে সে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছে। যে বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ, তাই নিয়ে রাত্রেও তার কাজ। সন্ধ্যার পর সে এসে লেবরেটরীতে ঢোকে, দশটা পর্যন্ত কাজ করে। আজ চতুর্থ দিনে একটা জটিল এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট তাকে এমন বেঁধে ফেলল, দশটা বেজে যাওয়া সে টের পেল না। পিওন মধুয়া দু'তিনবার ঘুরে গেল। তাকেও লক্ষ্য করল না দেববাণী। রাত্রি যখন এগারটা, মধুয়া এসে বলল, "আজ বাড়ী যাবেন না?"

দেববাণী ঘড়ি দেখে লজ্জা পেল।

"এগারটা! তোমার ত বড় দেরি হয়ে গেল মধুয়া।"

"আপনার দেরি হ'ল না?"

"কিন্তু—" ইতস্তত: ক'রে দেববাণী যোগ দিল, "কিন্তু কাজ ত শেষ হ'ল না, মধুয়া।"

"বাকীটা কাল করবেন।"

হাসল দেববাণী। "তার উপায় নেই, মধুয়া। হয় আজই শেষ করতে হবে, নয় কাল আবার প্রথম থেকে সুরু।"

"তা হ'লে?" মধুয়ার কণ্ঠস্বর অপ্রসন্ন।

"তুমি এক কাজ কর।"

"বলুন।"

"এই টাকা নাও। আমার বাসায় একটা খবর দিয়ে বাড়ী চ'লে যাও।"

"আপনি?"

"আমি কাজ শেষ ক'রে দারোয়ানকে চাবি দিয়ে যাব। তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসে কাল লেবরেটরী সাফ ক'রে রেখ কলেজ সুরু হবার আগে।"

আরও ঘণ্টা খানেক কাজের পর দেববাণী প্রত্যাশিত ফল পেল। আনন্দে নেচে উঠল মন। নির্জন, নিস্তব্ধ লেবরেটরী কাঁপিয়ে উল্লাসে ব'লে ফেলল, "বাব্বাঃ, এতক্ষণে পাওয়া গেল!"

দরজায় কে যেন বলে উঠল, "রাতও গভীর হ'ল।"

ভয়ানক চমকে গেল দেববাণী। কিছু দেখবার, বুঝবার আগেই আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে দারোয়ানকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাবে, এমন সময় দেখতে পেল হিমাদ্রিকে।

"এত রাত্রে আপনি এখানে এলেন কি ক'রে?" আশ্বস্ত, খুশী, দেববাণী ব'লে উঠল।

"অনেকক্ষণ ধ'রে আমি আপনার কাছাকাছি রয়েছি।"

"কোথায়? দেখতে পাই নি ত!"

"দেখতে পাবার কথা নয়। আমি ডাঃ বসাকের কাছে ছিলাম।"

কলেজের উপরে তেতলায় প্রিন্সিপালের বাসস্থান। বসবার ঘর থেকে লেবরেটরী দেখা যায়।

"উনি রাগ করেন নি ত!"

"বলছিলেন, এত বেশী পরিশ্রমে দেহ ভেঙ্গে যেতে পারে।"

"সলিউশনটা কিছুতেই হচ্ছিল না।"

"এবার হয়েছে ত?"

"তা হয়েছে।"

"বাড়ী যাবেন না?"

"যাব।"

"খেয়েছেন?"

"খেয়েছিলাম।"

"তা হলে চলুন।"

"এত রাত্রে আপনি—"

"তবে কি একা যাবেন?"

"দারোয়ানকে বললে সে পৌঁছে দেবে।"

"দারোয়ান পারবে না। তার অসুখ।"

"আপনি কি ক'রে জানলেন?"

"ডাঃ বসাক বললেন।"

"চাবিটা?"

"আমাকে দিন। দারোয়ানের ঘরে দিয়ে আসছি।"

এই হ'ল হিমাদ্রি। চলতে চলতে দেববাণী ভাবল। পাহাড়ের মত উঁচু। এসেছিল ডাঃ বসাকের সঙ্গে দেখা করতে বেশী রাত ক'রে। দেখতে পেয়েছে লেবরেটরীতে কাজ করছে দেববাণী। নিশ্চয় দেখেছে, পিয়ন মধুয়া চলে গেল। বোধ হয় ডাঃ বসাক উদ্বিগ্ন হয়েছেন তার বাড়ী ফেরা নিয়ে। দারোয়ান অসুস্থ। অমনি হিমাদ্রি বলেছে, আমি একটু অপেক্ষা ক'রে যাই। ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চলে যাব। হিমাদ্রি চিরকল্যাণদাতা শিব। উপকার করে, সাহায্য এনে দেয় নীরবে, উদাসীন দাক্ষিণ্যে। তাকে ধন্যবাদ জানান, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা, বৃথা। বট গাছের ছায়া যারা উপভোগ করে বটকে তারা ধন্যবাদ দেয় না। কেউ উপেক্ষা করে,

কেউ-বা পূজা করে। হিমাদ্রিকে ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। সে এত বড়, এত মহান যে তাকে মানুষ ব'লে মনে হয় না। দেববাণীকে কলেজে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে; ডাঃ বসাকদের মনে স্নেহ ও সহানুভূতি তৈরী ক'রে রেখেছে। সব জেনেও দেববাণী এ প্রসঙ্গ তুলে হিমাদ্রিকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নি। হিমাদ্রি দেবে, দেববাণী হাত ভ'রে নীরবে গ্রহণ করবে, এই তার নিয়ম। হিমাদ্রিকে দেবার কিছু নেই। তার চাইবার কিছু নেই।

চলতে চলতে হিমাদ্রি প্রশ্ন করল, "থীসিস কবে দাখিল করছেন?"

"আরও মাস ছয়েক লাগবে।"

"কাজ ভাল এগোচ্ছে?"

"মন্দ নয় একেবারে।"

"আজ কোন্ সলিউশন আটকে গিয়েছিল?"

"একটা নতুন ফুড সলিউশন করতে হচ্ছে জার্ম-ফ্রি বিড়াল-ছানাগুলির জন্যে।"

"হ'ল শেষ পর্যন্ত?"

"তা হ'ল।"

"ভারতবর্ষের ল্যুই পাস্তুর না হ'য়ে ওঠেন?"

"আমারও তাই ভয়।"

"আপনার কাজ সফল হ'লে খুব নাম হবে। ফাইলেরিয়া নিয়ে বিশেষ কাজ হয় নি এখনও।"

"জানি। কিন্তু আমি কতটুকু করতে যাচ্ছি?"

"এই ত প্রথম ধাপ। এর পরে বিদেশে গিয়ে রিসার্চ করবেন।"

"বি-দে-শে!" চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল দেববাণী।

"যেতেই হবে। বিজ্ঞান বড় কঠিন মনিব। যদি বিজ্ঞান চান, আরও রিসার্চ করতে হবে। রিসার্চ করতে হ'লে বিদেশে যেতে হবে। অত্যন্ত সোজা কথা। X-এর নামগন্ধ নেই।"

"আপনি মানুষকে বড় নাচাতে পারেন।"

"যে নাচবার সে নিজেই নাচে। তাকে নাচাতে হয় না।"

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরব। কলেজ থেকে হাতিবাগান বেশী দূর নয়। মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু কলকাতা এখনও স্বাভাবিক হয় নি। ট্রাম বন্ধ হ'য়ে গেছে। বাস চলছে দু-একটা। ট্যাক্সি ভাড়ার নিশান জ্বালিয়ে চ'লে যাচ্ছে। হিমাদ্রি আর দেববাণী হাঁটছে। এমন জনতা-মুখরিত কলকাতা এখন অনেক শান্ত। আকাশে ম্লান চাঁদ উঠেছে। কলকাতা মহানগরীর আলোকিত বুকে তার ক্ষীণ রশ্মি লজ্জায় মিশে গেছে। চলন্ত ভিক্টোরিয়ার হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান ঘোড়ার গতি থামিয়ে ওদের সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করছে, কোথা যাবেন বাবু? আসুন না, পৌঁছে দি। আরামে যাবেন।

দু'জনে ফুটপাথে স'রে গেল। দেববাণী বলল, "আপনি ত খান নি এখনও?"

"খেয়েছি।"

"দুপুরে?"

"না। রাত্রেই।"

"ডাঃ বসাকের ওখানে?"

"হ্যাঁ।"

"উনি আপনার খুব চেনা?"

"উনি আমার গুরু। আমার মাষ্টার মশাই।"

"তাই আপনাকে এত স্নেহ করেন?"

"অমন লোক পৃথিবীতে খুব বেশী নেই।"

"তাই মনে হচ্ছে।"

"এমন নিরহঙ্কার, সহানুভূতিশীল, দরদী শিক্ষক কলকাতায় দ্বিতীয় আছেন কি না জানি নে। এমন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকও খুব বেশী নেই।"

"অথচ তেমন কিছু ত করলেন না জীবনে।"

"তার একটা করুণ ইতিহাস আছে।"

দেববাণী আগ্রহে চুপ ক'রে রইল। কিন্তু হিমাদ্রি সে ইতিহাস বলল না। প্রশ্ন করতে সাহস হ'ল না দেববাণীর।

"আপনার গোলমাল সব মিটে গেছে?"

"প্রায়।"

"তার মানে, সব মেটে নি।"

"সহজে এসব নোংরা ব্যাপার মিটতে চায় না। অসংখ্য জালে এক নোংরা অন্য নোংরার সঙ্গে বাঁধা। একবার জড়িয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই।"

"হাইকোর্টের রায় ত আপনার সপক্ষে হ'ল।"

"তা হ'ল।"

"খোকনের পূর্ণ ভারও আপনি পেয়ে গেছেন।"

"তা গেছি।"

"এখন বাকি মামলাগুলো?"

"দুটো মিটেছে। দুটো এখনও ঝুলছে।"

"উনি কোথায়?"

"জেলে।"

"কতদিনের জন্যে?"

"শুনছি ত সাত-আট বছর।"

"তাহলে দীর্ঘদিনের জন্যে আপনি নিশ্চিন্ত।"

"কে জানে? কোথা থেকে কখন আবার কোন্ বিপদ্ এসে যায় কে বলতে পারে?"

"টাকাকড়ির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন?"

"সবটা পারি নি। উকিল-ব্যারিষ্টারের টাকা মা'র গয়না বেচে দেওয়া হয়েছে। ধার-কর্জগুলি কিস্তিতে শোধ করার ব্যবস্থা করেছি। একটা বাদে।"

"দেবযানী ট্যুইশন ছেড়ে দিয়েছে?"

"দিচ্ছে কৈ? দেওয়া ওর বড় দরকার। পড়ার সময় পাচ্ছে না। পাস করা মুস্কিল হবে।"

বাসার কাছে এসে দেখা গেল ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। বাসন্তী দেবী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

"মা'র কাণ্ড দেখুন!"

"আপনার কাণ্ডটা আগে দেখা দরকার।"

"আমি আবার কি করলাম?"

"রাত বারোটায় বাড়ী ফিরলেন।"

"একা ত ফিরি নি।"

"একাই ফিরতে হ'ত আজ।"

"হ'ত না। আপনি ঠিক এসে যেতেন।"

বলে ফেলেই দেববাণী লজ্জা পেল। কিন্তু বুঝতে তার সময় লাগল না, লজ্জার কোনও কারণ নেই। হিমাদ্রিকে সব বলা যায়। যেমন সব বলা যায় বটগাছকে। সে শোনে না, শুনেও বোঝে না, বুঝেও বলে না।

বাড়ীর ছোট গলির মধ্যে ঢোকবার সময় হিমাদ্রি বলল, "কলেজ থেকে আপনি হাজার দুই টাকা পেতে পারেন।"

"কি ক'রে?"

"ডাঃ বসাককে বললে তিনি ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

"অমন কিছু ফাণ্ড আছে বুঝি?"

"অত জানবার দরকার নেই আপনার। আজ ত বুধবার, সোমবার আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে টাকার কথা বলবেন। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা শোধ করলেই চলবে।"

দরজা খুলতে বাসন্তী দেবী নীচে নেমে এলেন।

হিমাদ্রি বলল, "উনি বারোটা পর্যন্ত কলেজে লেবরেটরীতে কাজ করছিলেন। পিয়ন চ'লে গিয়েছে, দারোয়ান অসুস্থ। ভাগ্যিস আমি ডাঃ বসাকের ওখানে খেতে এসেছিলাম। তাই পৌঁছতে পারলাম।"

বাসন্তী দেবী দেববাণীকে কাছে টেনে নিলেন।

হিমাদ্রিকে বললেন, "বেঁচে থাকো বাবা। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

দেববাণী বলল, "খোকন ঘুমুচ্ছে, মা?"

"না, তোর জন্যে জেগে ব'সে আছে।"

হিমাদ্রি বলল, "আমি চলি।"

দেববাণী জিজ্ঞেস করতে গেল, কি ক'রে যাবেন? করল না। প্রশ্ন অবান্তর।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলল, "মা, সোমবার দু' হাজার টাকা পাব।"

"কোথা থেকে?"

একটু চুপ থেকে দেববাণী বলল, "কলেজ থেকে ধার। মাসে পঞ্চাশ টাকা শোধ দিতে হবে। কাল থেকে দেবযানীকে আর পড়াতে যেতে দিও না।"

বাসন্তী দেবী বললেন, "আজ মাসের একুশে। এ ক'টা দিন যাক। ও মাস থেকে ছেড়ে দিতে বলব।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দেববাণী মনে মনে বলল, এ দু' হাজার টাকাও কে দিচ্ছে আমি জানি। শুধু নিচ্ছি, দু' হাত পেতে কেবল নিচ্ছি। দেবার আমার কিছু নেই, কিছু নেই। ক্রমশঃ

## যুক্তিহীনে তু বিচারে

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। কোনো পল্লীগ্রামের এক যুবক তখন সত্য বি. এ. পাস করেছেন। আশপাশের দশবিশখানা গাঁয়ের মধ্যে তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় গ্রাজুয়েট,—তখনকার দিনে এক মহার্ঘ এবং দুর্লভ বস্তু বিশেষ। বি. এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন এই খবর চারদিকে রটে যাওয়ার পর আশপাশের তো বটেই, দূরদূরান্তরের গ্রাম থেকেও তাঁকে দেখবার জন্যে অনেকে তাঁদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিলেন। ইনি যে খুব মাথাওয়ালা ছেলে গাঁয়ের মেয়েমহলে পর্যন্ত সে কথা নিয়ে আলোচনা হ'ত। তাঁর বি. এ. পাশের খবর শুনে এক বর্ষীয়সী বিধবা মুখখানা হাঁড়িপানা করে বলেছিলেন—"তা হবে না কেন? ওর বাবা ছোটবেলা থেকে ওকে রুই মাছ, কাতলা মাছ, মৃগেল মাছ, কত মাছের মুড়োই না খাইয়েছে। তাই তো মাথাটা ওর মগজে ভর্তি। খাওয়াও দেখি আমার মাখন ননীকে (তাঁর দুই নাতি) এমনিভাবে মাছের মুড়ো। ভারি তো দু চারটে পাস দিয়েছে। ওরা দুভায়ে একলাফে ওকে ডিঙিয়ে যাবে।"

সম্প্রতি আমেরিকান পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশনের নিকট প্রদত্ত, নিউ ইয়র্ক য়ুনিভার্সিটির ডক্টর কিলেণ্ডার-এর এক রিপোর্টের এক জায়গায় দেখে আশ্চর্য হতে হল যে, আজকের দিনের আমেরিকার কলেজের ছাত্রদের এক তৃতীয়াংশের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল যে, মাছ বাস্তবিকই 'মগজ'বৃদ্ধিকারক খাদ্য।

সংস্কারের এমনি প্রভাব যে, তা যুক্তির ধার ধারে না—চল্লিশ বছর আগেকার বাংলা দেশের এক অশিক্ষিতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে এ বিষয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানে বর্তমান জগতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশের কলেজের ছাত্রদের কোনো পার্থক্য নেই।

ডাক্তার কিলেণ্ডারের তথ্যানুসন্ধানে আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রের মনে এমনিতর নানা কুসংস্কার বিদ্যমান যেমন: গর্ভবতী স্ত্রীলোক যদি নিয়মিতভাবে সঙ্গীত শোনে তা হলে তার সন্তান সঙ্গীত-প্রতিভা নিয়ে জন্মায়, জলের মধ্যে পুষ্টিকারক ক্যালোরি আছে। প্রতি পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে একজন বিশ্বাস করে যে, গর্ভাবস্থায় মা যদি কোনো কারণে আতঙ্কগ্রস্ত হয় তা হলে সন্তানের পক্ষে কুৎসিত ও কদাকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সকল বিশ্বাসের সপক্ষে বিন্দুমাত্রও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই—বরং এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যার দরুণ এই সকল ধারণা নস্যাৎ হয়ে যায়।

আপনি যদি যুক্তিবাদী হন তা হলে এই ধরণের ব্যাপার সমূহ আপনার নিকট অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে তার থেকে মুক্ত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়।

একটা কথা আছে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"। কোনো জিনিষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বরং ভালো কিন্তু অল্প জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর হেতু পর্যন্ত হতে পারে।

যেমন ধরুন বাজ-পড়ার কথা। একটা পুরনো প্রচলিত প্রবাদ এই যে, একই জায়গায় বাজ কখনো দু'বার পড়ে না। এ কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে সদ্য বাজ-পড়া গাছের নীচে আশ্রয় নিয়ে বহু লোক মারা গিয়েছে বলে জানা যায়।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য কিন্তু এই যে, কোনো গাছ একবার বজ্রাহত হলে পর সেটি হয়ে যায় বিদ্যুৎ পরিবাহী (Conductor) এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার যে কোনো অংশ অপেক্ষা এর উপরে পুনরায় বজ্রপতনের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

সর্ব্বসাধারণের মনে নানা বিষয়ে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান তার পুরা ফিরিস্তি দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়, নীচে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছে।

অনেকেরই বিশ্বাস যে, মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থিতি বুকের বাঁদিকে; বস্তুতঃ এটি আছে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। এ সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা কিন্তু একদিক দিয়ে শাপে বর হয়েছে। এর দরুণ বহু লোকের প্রাণরক্ষা হয়েছে। পুলিস রেকর্ড থেকে দেখা যায়, যারা বুকে গুলী করে বা ছোরা বসিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোক ব্যর্থকাম হয় এই জন্যে যে, হৃদ্‌যন্ত্রটি যে কোথায় সেটা তাদের জানা নেই।

প্রচলিত সিদ্ধান্ত এই যে, যারা আত্মহত্যা করবে বলে শাসায় তারা কখনো কার্য্যতঃ তা করে না এবং আত্মহত্যা প্রায়শঃই সাময়িক পাগলামির প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৌলতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। নিউ হ্যাম্পশায়ার ষ্টেট হসপিটালের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেভিড জে. ভ্যাইন সম্প্রতি এক সভায় ঐ ষ্টেটের ১০০ জন আত্মহত্যাকারীর সম্বন্ধে তাঁর তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল বিবৃত করেন। তিনি বলেন, এদের মধ্যে অর্দ্ধেকে আত্মহত্যা করবে বলে আগেই শাসিয়েছিল এবং মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ কোনো না কোনো রকম মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল।

অনেক অবৈজ্ঞানিক আজগুবি কথার সৃষ্টি হয়েছে মেয়েদের কেন্দ্র করে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে, পুরুষের চেয়ে তাদের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্রতর। আসলে কিন্তু দৈহিক আয়তনের তুলনায় মেয়েদের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ঈষৎ বৃহত্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিল্প ক্ষেত্রে যে সকল তথ্যানুসন্ধান হয়েছে তার নিরিখে দেখা যায় যে, মেয়েদের যদি শিখবার সুযোগ দেওয়া যায় তা হলে কেবলমাত্র যাতে প্রভূত শারীরিক শক্তির প্রয়োজন তা ছাড়া যাবতীয় যান্ত্রিক কার্য্য সম্পাদনে তারা পুরুষদের সমকক্ষ।

এবার স্নায়ুতন্ত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে, কঠোর পরিশ্রমের দরুণ আপনার স্নায়বিক বৈকল্য (Nervous breakdown) হতে পারে? নর্থওয়েষ্টার্ণ য়ুনিভার্সিটির মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ জন জে. বি. মর্গান এর মতে, না, তা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন, এই বৈকল্যের মূলে রয়েছে বিবিধ প্রক্ষোভ (emotion) জনিত প্রতিক্রিয়া। তিনি বলেন কঠোর পরিশ্রম নয়, কিন্তু উদ্বেগ, মানসিক উত্তেজনা, ইত্যাদি পরিণামে মনকে একেবারে বিকল করে দেয়।

এলগিয়ো কুমারীদের বিবাহ-প্রস্তুতি

সর্বসাধারণের মধ্যে আরো একটি বহুল প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, যারা ব্যায়ামাদি করে না তাদের চেয়ে ব্যায়ামকারীগণ অল্প বয়সে মারা যায়। মিশিগান ষ্টেট য়ুনিভার্সিটির উদ্যোগে দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ১১৩০ জন প্রাক্তন কুস্তিগীর এবং যারা কখনো ব্যায়ামাদি করে নি এমন ১১৩০ জনের একটি পরিসংখ্যান অনুসারে জানা যায় যে এই উভয় শ্রেণীর লোকই মারা যায় প্রায় একই বয়সে এবং একই সময়ে। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে, গরম খাবার আপনাদের দেহের উত্তাপ বাড়ায়। খাদ্যবিশারদ কিন্তু অন্যরকম বলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, ক্যালোরির মাত্রা যদি কম হয় তা হলে গরম খাবার আর ঠাণ্ডা খাবারে কোনো পার্থক্য নেই। নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরিই উত্তাপ উৎপন্ন করে, খাদ্যের তাপমাত্রার সঙ্গে এই উত্তাপের কোনো সম্বন্ধ নেই।

আহারের পরে নিদ্রার প্রসঙ্গ। এটা মেনে নেওয়া সমীচীন যে, পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করতে হলে রোজ আপনার অন্ততঃ আট ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের সঙ্গে আপনার মতের গরমিল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে, কোনো দু'জন লোকেরই ঠিক সমপরিমাণ নিদ্রার দরকার হয় না। একজনের হয়ত দশ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন, আর একজনের মাত্র পাঁচ ঘণ্টা হলেই চলে। নিদ্রা সম্বন্ধে গবেষণাকারীগণ বলেন যে, আপনি কয় ঘণ্টা ঘুমালেন তার চাইতে আপনার নিদ্রা কিরূপ গভীর হ'ল সেইটেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরকারী গবেষণাগার, প্রভৃতি থেকে ১৪,০০০ খাদ্যবিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত 'দি আমেরিকান ডায়েটেটিক এসোসিয়েশন' নামক সংস্থা খাদ্য সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আরো কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের প্রয়াস পেয়েছেন।

এই সংস্থার সিদ্ধান্তের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে এই :—

(১) দুগ্ধপান দাঁতকে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

(২) ভাজা আলু হজম করা কঠিন নয়।

(৩) মার্গারিনের চেয়ে মাখনে বেশী ক্যালোরি নেই।

(৪) পীতবর্ণ ডিমের চেয়ে সাদা ডিম বেশী পুষ্টিকর নয়। ইত্যাদি।

এমনি অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। যথোচিত বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগ্রত হলেই এই সকল বিষয়ে অজ্ঞতা দূরীভূত হতে পারে। এমনিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ যে শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, স্কুল কলেজের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মনে এই ধারণা জন্মাবার জন্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবহিত হতে হবে। যুক্তিহীন বিচার এবং কুসংস্কারের ফল ক্ষেত্রবিশেষে যে কিরূপ মারাত্মক হতে পারে অল্প বয়স থেকেই তৎসম্বন্ধে অবহিত হওয়া সমীচীন।

## এলগিয়োদের বিচিত্র প্রথা :
## কুমারী-নির্ব্বাসন ও কুমীর-তোষণ

এলগিয়োরা কেনিয়ার এক যাযাবর আদিম জাতির লোক। এদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সবই অদ্ভুত। স্মরণাতীত কাল থেকে এলগিয়োদের সমাজে এমন একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, আইনের সাহায্যেও যা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নি।

সমর্থত্ব-প্রাপ্ত হবার পর এলগিয়ো কুমারীদের বাড়ী থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর তাদের জন্যে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত বেড়া-দিয়ে-ঘেরা একটি জায়গায় রাখা হয়। এ যেন অনেকটা নির্ব্বাসনের মত। ওখানে অবস্থানকালে কুমারীদের ঘোমটায় মাথা ও মুখ এবং আর একটি লম্বা বস্ত্রখণ্ডে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হয়। এই মস্তক এবং গাত্রাবরণ

পরার রেওয়াজ এদের মধ্যে চলে আসছে বংশপরম্পরাক্রমে। এই জবড়জঙ্গ পোশাক প'রে বনের ভেতরে কুমারীরা যখন পাশাপাশি বসে থাকে তখন তাদের দেখায় কিম্ভূত-কিমাকার। শুধু খোলা পাগুলি দেখে এগুলি যে মনুষ্যমূর্ত্তি সেটা আঁচ করতে পারা যায়।

এমনি ভাবে পুরো তিনটি মাস কুমারীদের রাখা হয় পুরুষদের চোখের আড়ালে। সমাজের সকলের চেয়ে বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে নিয়োজিত করা হয় এদের তত্ত্বাবধানের জন্যে। কুমারীদের যাবতীয় ফাইফরমাশ খাটতে সে বাধ্য।

কুমারীদের এই নির্ব্বাসনকালে সমাজের সকল যুবককে অবস্থান করতে হয় পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপঝাড়গুলিতে। সেখানে খাওয়া-থাকা ইত্যাদির সকল ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই করতে হয়।

কুমারীদের এই যে তিন মাস নিভৃতবাস, এ হ'ল বিয়ের প্রস্তুতি-পর্ব্ব। এই পর্ব্বের অবসান হলে পর একদিন মাদলের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে নিস্তব্ধ বনভূমি। সেই আওয়াজ শুনে তারা বুঝতে পারে যে, এবার তাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এরা গৃহে প্রত্যাগত হলে পর মহা সমারোহে সুরু হয় এক সামাজিক অনুষ্ঠান। বেশ কিছুদিন ধ'রে চলে পানভোজন এবং উদ্দাম নৃত্য। তার পর কনে নির্ব্বাচন করা হয় এবং যথারীতি বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে।

যুগযুগান্তর ধ'রে এলগিয়োদের মনে অনেকগুলি কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, যখন কোনো সর্দ্দারের মৃত্যু হয় তখন তার আত্মা গিয়ে প্রবেশ করে একটি কুমীরের দেহে। লোকান্তরিত সর্দ্দারের নামে হয় কুমীরটির পরিচিতি এবং যথাসময়ে ঐ নামে ডাকলে নাকি সাড়াও পাওয়া যায়। এই কুমীরের তুষ্টিসাধনের জন্যে এলগিয়োরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

রোজই নাকি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক খাবার সহ নদীতীরে যায় এবং নাম ধ'রে কুমীরটিকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলতে থাকে—"এস, খাবার নাও।" কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কুমীরটি জলের ওপর ভেসে ওঠে এবং তীরে এসে প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো খাদ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার করে।

কতকগুলি কুমীরকে এমন ভাবে রাস্তাঘাট শিখানো হয়েছে যে, হঠাৎ তাদের মধ্যে কোন একটা হয়ত নদী ছেড়ে একটি রাস্তার উপর দিয়ে হেলে-দুলে চলতে চলতে গ্রামের একেবারে কেন্দ্রস্থলেই এসে হাজির হয়। সেখানে তার সামনে ছুঁড়ে দেওয়া হয় অনেকগুলি মুরগীর বাচ্চা অথবা ছাগল-ছানা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এলগিয়োরা নিজেরা বরং উপোস করবে, কিন্তু কুমীরের মধ্যে যে মৃত ব্যক্তি বাস করে তাকে কখনও উদর-পূর্ত্তি করে খাওয়াতে ভুলবে না। এই কুমীর-তোষণ এদের সমাজে একটি পুণ্যকৃত্য বলে গণ্য হয়।

## শুক্র কি মনুষ্যবাসের উপযোগী?

পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হচ্ছে শুক্র। এটি রহস্যময়ও বটে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, গ্রহটির অঙ্গ ত আমরা দেখতে পাই না। আমাদের চোখে পড়ে সেই পাণ্ডুর পীত মেঘমালা যা এই গ্রহটিকে সকল সময় ঘিরে থাকে। মেঘে-ঢাকা এই গ্রহটির রহস্য শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রাশিয়ানরা এমন একটি রকেট মহাশূন্যে পাঠিয়েছে যা শুক্রের পাশ দিয়ে চলে যাবে (অবশ্য গ্রহটির খুব নিকট দিয়ে এটি যাবে না), ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শুক্র গ্রহের অভিমুখে আগামী বৎসরে একটি রকেট প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
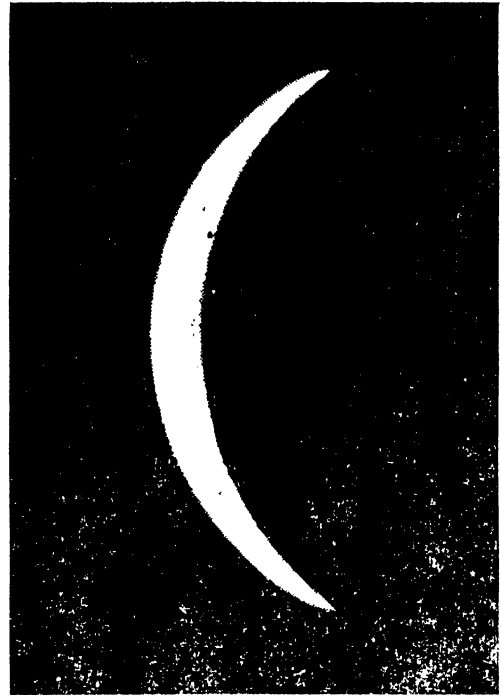
মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটরীতে নীল আলোতে তোলা শুক্রগ্রহের ফোটোগ্রাফ

ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কার্ল সাগান—(যাঁর মতে এই গ্রহের প্রতিকূল পরিবেশ আপাততঃ মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী) মহাকাশে উপনিবেশ স্থাপনকারীরা শুক্র গ্রহে যাতে আরামে বাস করতে পারে তার উদ্দেশ্যে একটি অভিনব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রস্তাব করেছেন।

যেহেতু দূরবীক্ষণের সাহায্যে শুক্রের পৃষ্ঠদেশ দেখা কারুর পক্ষেই সম্ভবপর হয় নি সেজন্যে এই গ্রহটি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। এ সম্পর্কে মোট চারিটি থিয়োরি বা সিদ্ধান্ত আছে।

(১) বিন্দু বিন্দু বারিপতনের দরুন এটি আর্দ্র এবং জলাভূমি দ্বারা বেষ্টিত। (এই সিদ্ধান্তের সমর্থকদের মতে শুক্রের মেঘমালা হচ্ছে আমাদেরই মেঘের মত জলীয় বাষ্প।)

(২) এটি মহাসমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে নিমজ্জিত।

(৩) এটি একটি বিরাট তৈল-প্রবাহ দ্বারা আচ্ছাদিত।

(৪) এটি একটি মরুভূমি—শুষ্ক, বাত্যাবিক্ষুব্ধ এবং ধূলির মেঘে আচ্ছন্ন।

'সায়েন্স' পত্রিকায় এই সকল পরস্পরবিরোধী মতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সাগান প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—"শুক্র-গ্রহে যাঁরা মনুষ্য প্রেরণের পরিকল্পনা করছেন তাঁরা এ কথাটা ভেবে অতিমাত্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়বেন যে, এই অভিযাত্রীদের সঙ্গে প্রত্নোদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ (Paleobotanist), মণিকবিদ্যাবিৎ (mineralogist), পেট্রোলিয়াম ভূ-বিদ্যাবিৎ এঁদের মধ্যে কাকে পাঠাতে হবে, না কি গভীর-সমুদ্রের ডুবুরী একজনকে পাঠালেই চলবে।

সাগান মনে করেন, নূতন যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলোর দরুন কেবল মাত্র চার নম্বর সিদ্ধান্ত ছাড়া বাকিগুলো ধোপে টেকে না।
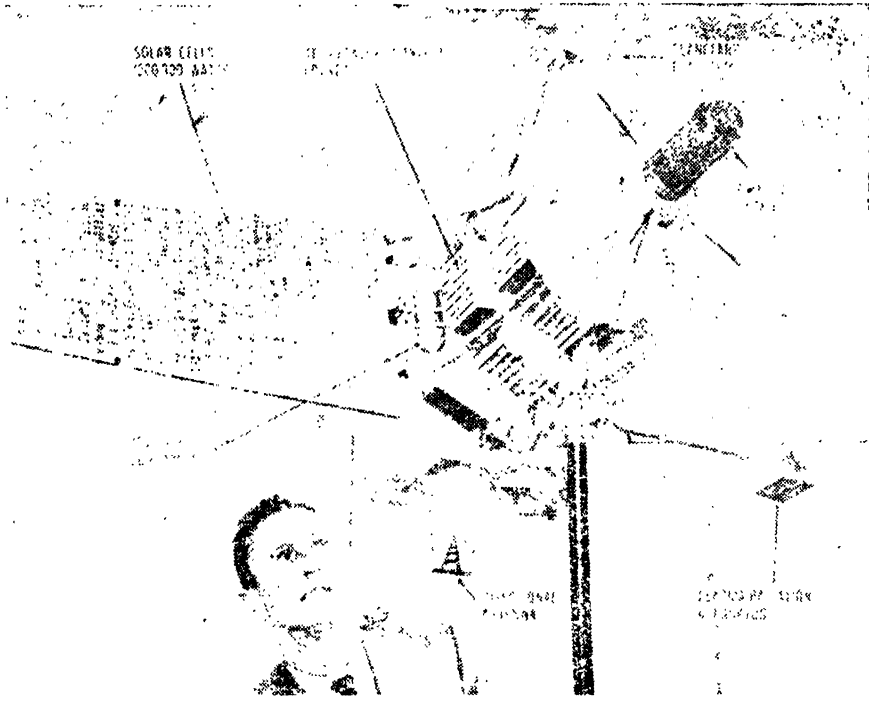
শুক্রানুসন্ধানী মহাকাশযানের মডেল

এই ধারণা কিন্তু পুরোপুরি অভ্রান্ত নয়। শুক্রের রহস্যোদ্ঘাটনের মূল সূত্রের সন্ধান করতে হবে তার উত্তাপের (temperature) মধ্যে। শুক্র-পৃষ্ঠের উত্তাপ ৬০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি এই উত্তাপ এত প্রখর যে, তার দরুন একটি জলাভূমি শুকিয়ে যেতে পারে, একটি seltzer সমুদ্র বাষ্পীভূত হতে পারে অথবা একটি বিরাট তৈল-প্রবাহ বিশুষ্ক হওয়াও কিছু আশ্চর্য নয়।

শুক্রে কোনো প্রকার তরল জল (liquid water) থাকতে পারে না। ওখানকার মেঘমালা হচ্ছে বিরাট তুষার-স্ফটিক স্তরসমূহ (ice crystals)। কিন্তু সেগুলি ত্রিশ মাইল ঊর্ধ্বে, সেখানে প্রচণ্ড শীত। এই মেঘ থেকে কখনও বৃষ্টিপাত হয় না। শুক্রপৃষ্ঠ হচ্ছে আসলে জীবশূন্য, শুষ্ক, বাতাসে ক্ষয়প্রাপ্ত বন্ধ্যা জমি।

এমত অবস্থায় শুক্রে কোনো জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। প্রাণের বিকাশ হয় ধীরে ধীরে, উষ্ণ জলীয় পদার্থের মধ্যে; এবং মনে হয় যে শুক্রে তা কখনও ছিল না! কাজেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, শুক্রে কখনও প্রাণের উদ্ভব হয় নি।

প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কিত এই সকল ভয়াবহ তথ্য কিন্তু সাগানকে দমাতে পারে নি। তিনি বলেন, শুক্র-গ্রহে গৃহের আরাম যদি উপভোগ করতে হয় তা হলে এর তাপমাত্রা কমিয়ে ফেলা এবং বায়ুমণ্ডলে (atmosphere) যাতে অক্সিজেন উৎপন্ন হতে পারে সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে— আর কিছু করণীয় নেই। সাগান মনে করেন যে, এই কাজটি সাধিত হতে পারে, নীল-সবুজ শেওলা (algae) দ্বারা। এক প্রকার আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ (microscopic plant) এই শেওলা মহাকাশ অভিযাত্রীদের পক্ষে কলম্বাসের কম্পাসের মতই অপরিহার্য।

এই অগণিত আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ—যা বাতাসে ভেসে বেড়াবে—ছিটিয়ে দেওয়া হবে শুক্রের মেঘমালার মধ্যে। সেখানে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডায়োক্সাইড, মেঘমালার তুষার-স্ফটিকসমূহ (ice crystals) থেকে জল এবং সূর্যের আলো গ্রহণ করে তারা কার্বোহাইড্রেট তৈরি করবে এবং অক্সিজেন অবমোচন করবে। এমনি ভাবে কার্বন ডায়োক্সাইড নিঃশেষিত হয়ে উৎপন্ন হবে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন। কার্বন ডায়োক্সাইড ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা নেমে যেতে থাকে। তাপমাত্রা নামবার অব্যবহিত পরেই মেঘমালা থেকে নিঃসৃত জলের পরিমাণ কমে যায়। জলীয় বাষ্পের অভাবের দরুন তাপমাত্রা আরও হ্রাস-প্রাপ্ত হয়।

এমনি ভাবে শুক্রের পৃষ্ঠদেশের শৈত্য যখন জলের স্ফুটনাঙ্কের (boiling point) নীচে গিয়ে দাঁড়াবে তখন বুঝতে হবে যে, ওখানকার জমি তৈরি হয়েছে। তার পর তরল জলপূর্ণ (liquid water) জলাশয়সমূহের সৃষ্টি হবে, অতঃপর বৃষ্টি পড়তে থাকবে। এই বৃষ্টিপাতের দরুন বায়ুমণ্ডলে স্থিতিলাভ করবে কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস। কিন্তু পরে এমন একটি কার্বন ডায়োক্সাইড স্তরের পত্তন হবে যা বহুলাংশে আমাদের পৃথিবীর উপকার কার্বন ডায়োক্সাইড স্তরের অনুরূপ। ক্রমে শুক্র হয়ে উঠবে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যবাসের উপযোগী।

সাগানের নিবন্ধটি বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে শুক্র-গ্রহ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কালটেক-এর জেট প্রপালসন ল্যাবরেটরি কর্তৃক ম্যারিনার 'এ' অভিধাযুক্ত ১,০০০ পাউণ্ড ওজনের একটি মহাকাশযান নির্মিত হচ্ছে। এটির ভ্রমণ-পথের দূরত্ব অধিকতর (দুই কোটি ষাট লক্ষ মাইল) বলে, চন্দ্রে প্রেরণের জন্যে পরিকল্পিত ১৯৬১ সনের জুন মাসে নির্মিত সারভেয়ার অপেক্ষা এর নির্মাণ-কৌশল উন্নত ধরণের। এই মহাকাশযানটির একটি

মডেলের ছবি এখানে দেওয়া হ'ল। আসল যন্ত্রটির উচ্চতা হবে আট ফুট, সৌর প্যানেলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের পরিসর ১৯ ফুট।

শুক্রে অবতরণ করা ত বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয় কাজেই এটি পার্শ্বদেশ দিয়ে গ্রহটিকে পরিক্রমা করবে। মঙ্গলে পাঠাবার জন্যে নির্ম্মিত ম্যারিনার 'বি' নামক আকাশযানটিও আকৃতিতে ম্যারিনার 'এ'-র অনুরূপ।

ম্যারিনার-'এ'র মহাকাশযাত্রা শুরু হবে আগামী ইংরেজী বৎসরের গোড়ার দিকে। তিন মাস মহাশূন্য পরিক্রমা করে এটি আবার যথাস্থানে ফিরে আসবে।

ন. ভ.

# আর এক অপরাহ্ণ

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প)

শ্রীকবিতা সিংহ

সাদার্ন এভিনিউ থেকে কেদার দত্ত লেন দারুণ চড়াই। ভাঙতে এত কষ্ট হয়। তিনি হাঁটতে সুরু করেন দুহাত পিছনে বেঁধে। তাঁর গুরু স্কন্ধের দু'পাশ থেকে দু'খানা পেশল হাত পিছনে পরস্পরের আঙুল মুঠিয়ে থাকে, রক্তে ফেটে-পড়া করতল থেকে বেগুনি রঙের নোটের কোণাগুলো উঁকি মারে। থামের মত ভারি ভারি পায়ের কোলের কাছে কুঞ্চিত রোম মেষশিশুর মত খেলতে খেলতে চলে তাঁর কালোফিতে পাড় ধুতির কোঁচানো কোঁচা। সাদার্ন এভিনিউর রাস্তা তাঁর কাছে সুন্দর সমতল। দু'পাশের শোভন বাড়ীগুলো তাঁকে যেন মাছ মনে ক'রে জলের মত আশ্রয় দেয়। আসলে চড়াই সুরু বকুলতলার মোড় থেকে। ভাঙাবাড়ীর কেরাণীপাড়া তাঁর গলা শুকিয়ে দেয়। মুঠোর নোট তিনি পকেটে লুকিয়ে ফেলেন। পিছনে-বাঁধা দু'হাত খুলে কখনও পকেটে রাখেন, কখনও পাশে, কখনও যেন রোদ ঢাকছেন এই ভাবে কপালে। তবু বকুলতলার গা থেকে বেরুনো কেদার দত্ত লেনের মোড়ে এলেই গ্যাসপোষ্টের আলোটা তাঁকে দোলের দিনে বালতি-গোলা রঙের মত নির্লজ্জ আলোর বন্যায় নাইয়ে দেয়। কপালের ঘাম মোছবার ছল ক'রে তিনি মুখে রুমাল চাপা দেন। তাঁর এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে গলির মধ্যে টুপ ক'রে ঢুকে পড়া দেখলে সোনাগাছির মোড়ে দাঁড়ান বেলফুলের গোড়ে-বাঁধা কব্জি, মুখে রুমাল চাপা-দেয়া ভদ্রসন্তানদের কথা মনে পড়ে। অন্ধকারে এলে তিনি কীটের মত চমৎকার স্বস্তি পান। সে হিসেবে কেদার দত্ত লেন চমৎকার অন্ধকার। এই রাস্তায় খুব কম লোক আছে যারা স্থায়ী। সাদার্ন এভিনিউর সিংহ-লজের কোন বয়সী পুরুষের নিজের মহিমা পরীক্ষার এই লেবরেটারির খোঁজ তারা রাখে না। সারে সার ধোপার আস্তানার সামনে দিয়ে তিনি হেঁটে যান। হ্যাজাকের আলোয় গন্‌গনে কয়লার ওপর শাল ইস্ত্রির আভাকে তিনি রক্তের নিকটতম আত্মীয় মনে করেন। কর্পোরেশন স্কুলের শ্রীহীন বাড়ীটার পাশের গোয়ালার আড্ডা ডিঙোতেও খুব একটা ভয় ধরে না তাঁর, আসলে তিনি ভয় পান বিলাসমোহন পালকে। যে বিরাট্ ব্যারাক বাড়ীতে ঢুকবেন তার উল্টাদিকে গাড়ী-বারান্দায় ব'সে থাকে বিলেস পাল। সারা বিকেলটা গড়ায়। লোকটা ওঁর চেনা। জলপাইগুড়ির চা বাগানের একটা ছোট শেয়ারহোল্ডার ছিল। কিন্তু সেজন্য নয়, চেনা ব'লে নয়, লোকটা তাঁর সমবয়সী হয়েও নিজেকে বুড়ো ভাবে ব'লে। তিনি ভাবতেও পারেন না কি করে অমন কষির কাপড় আল্‌গা ক'রে ঝুলে-পড়া পলিত উরুর কথা মনে না রেখে লোকটা না বাঁধানো নষ্ট দাঁতে নাতি-নাতনির সঙ্গে গল্প করে সময় কাটায়। না পুরুষ না নারী বার্দ্ধক্যের এই বৃহন্নলা জীবন কি বিষম বিবমিষার। অপরাহ্ণের পড়ন্ত আলোয় লোকটার মুখের রেখাগুলো, মুখের ছায়াগুলো যেন একটা উপহাসের মত তাঁর চোখে এসে বাজে।

তিনি ছুটে ফ্ল্যাটবাড়ীর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করেন। সিঁড়ি দিয়ে তাঁর ভারি জুতো ভরা পা দুটো উঠতে থাকে। প্রতি পদক্ষেপে একটা দাম্ভিক অধিকার তিনি ছড়িয়ে দিতে জানেন। তাঁর পায়ের তলার অধিকৃত যতটুকু বসুন্ধরা ততটুকু যেন সম্পূর্ণ তাঁর।

নিজের তৈরি উপগ্রহের খুব কাছে এসে পড়েছেন

তিনি। সাদার্ন এভিনিউর বড় বড় জানালা-দরজাওয়ালা আলোকিত সিংহ-লজ তাঁর এই সৃষ্টিকে ক্ষমা করে নি। তিনি নিজেই সিংহ লজে ব'সে এই গ্রহকে কি বিষম মিথ্যেই না মনে করেন। বাঈজি রাখা তারা সহ্য করে, সহ্য করে ভাড়া বাড়ীতে ভুলিয়ে-আনা ময়নার পোষ মানানো। কিন্তু নিজেরা মা-মরা ছেলেকে মানুষ করবার অজুহাতে কন্যা-বয়সিনী কোন মহিলাকে বিয়ে করা মেনে নেয়া সিংহ-লজের পক্ষে সত্যিই অসহ্য। কারণ এখানে এসে যাচ্ছে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিলিব্যবস্থার প্রশ্ন। কিন্তু তাঁর সমস্যা সেখানে নয়। কারণ সিংহ-লজের আত্মীয়রা অন্যায় ভাবে যা প্রমাণ করতে চায়, তিনি নিজেও মনে মনে তাই ভাবেন। গোমস্তার মেয়ে সাবিত্রীকে তিনি সত্যিই বিয়ে করেছেন। কিন্তু মনে মনে জানেন তাকে তিনি রেখেছেন। মুশকিলটা বাধছে এখানেই। বিয়েটা একটা মুহূর্তের ভুল। মুহূর্তের ফুলই বটে। তার তলায় যে কণ্টকিত ফল তা তিনি দেখেন নি কেন সেটাই আশ্চর্য্যের। তিনি যখন বল্লভপুরের দীঘিতে ছিপ ফেলতেন—স্নান করতে নামা বৌঝিরা তখন আর জল থেকে উঠত না। যদি তাঁর চোখে পড়ে যায়, তাঁর বজরায় তাঁর বাগানবাড়ীতে তাদের যেতে হবে এ ছিল রক্ত গরম দিনের একটা সিদ্ধ ঘটনা। সেই সব লাল ঘোড়া চালানো বিকেলগুলো তাঁর রক্তের মধ্যে ছুটে বেড়ান থামায় নি। কতদিন তিনি চাবুক মারতে পারেন নি, না ঘোড়ার পিঠে না মানুষের। জমিদারীর আয়ু কবে নিভেছে। পাকিস্থানের ধানজাম থেকে আর আসে না কামিনী ধানের সওগাত, পুকুরের মাছ, ঘি, আম, কাঁঠাল! কিন্তু সমস্ত শরীরে অভ্যাসটা আপসায়। বালতির জলের মধ্যে জিয়োনো মাছের ল্যাজের ঝাপটা আরও বেশি।

তাই মনের নিভৃতে তিনি জানেন বিয়ে করে তিনি ভুল করেন নি। বরং বিয়ে তাঁর বয়সকে কিছু কাজ দিয়েছে। সেই শ্রম না হলে তিনি কোমরের কষি চুলকে কাটাবার বার্দ্ধক্য পেতেন। তা তিনি পান নি। সিঁড়ির তৃতীয় বাঁকে এসে তিনি খানিকটা হাঁপিয়ে পড়লেন। ধুলোমাখানো স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে চোঁয়ান মরা আলোয় তাঁর শরীর প্লাবিত হলে তিনি তা ঝেড়ে তাদের ফেলে দিলেন। হয় নিদাঘ, না হলে রাত্রি। আলোর পরেই অন্ধকার হোক এ তাঁর সইবে, কিন্তু এই চোঁয়ান গড়ান ক্লীব অপরাহ্ণ তিনি চান না।

পকেট থেকে রুমাল বের করতে হ'ল তাঁকে। তিনি স্তম্ভিত হয়ে ভাবলেন, অত্যধিক ঘামছেন যেন। কলপ-দেয়া চুলের তলার হাল্‌কা-হওয়া টাকে চুলকোনি পেলেন। মূল্যবান্ একটা পাঁজি কাটা সালসার বিজ্ঞাপনের জন্য আচম্‌কা একটা আছে ত? ভাল করে পকেট হাতড়ালেন। আজ সকালে বোতল ও গ্লাস পেতেও শক্তিবর্দ্ধক সঞ্জিবনী সুরা খেতে ভুলেছেন মনে পড়ল তাঁর। কেন ভুলেছেন তাও। তবু স্মৃতির বাক্স খুলে তার উঁকি দেয়া কিছুতেই বন্ধ করতে পারলেন না। সিঁড়ির তৃতীয় বাঁকে এসে তাঁর পাদুটো জুতোর মধ্যে যেন অল্প অল্প কাঁপল। কার জন্য? সীতা?

এই বাড়ীর তিনতলায় এক মেরুণ কাঠের দরজার ওপাশে তাঁর পৃথিবী। তিনি এই গ্রহের একমেব। তিনিই আকাশ, তারা, সূর্য্য, চন্দ্র আর সময়। তিনিই বায়ু। গ্রহাধিপতি তিনিই এই গ্রহের একমাত্র খবর। এই মহিমার অনেক তলায় লিলিপুটের মত তাঁর সম্বন্ধ বন্ধন। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এবং প্রথম পক্ষের বিনায়ক। এ বাড়ীতে ছেলে হওয়া সত্যি নয় যতক্ষণ না তিনি তাকে সত্যি করছেন। এক রমণীর সময় জীবন-গতি মিথ্যে। তিনিই এখানে বল্লভপুরের সামন্ত যুগের ইতিহাসকে পরিণত রেখেছেন ঘটমান ঘটনায়। নিজের এই কতিপয় প্রজা ছাড়া কোথায় তাঁর আস্ফালন? তাই এই বিয়ের প্রয়োজন ছিল তাঁর। সন্তান সংসার নয়, প্রজার প্রয়োজনে তিনি প্রজাপতি। সীতার জন্য সে অধিকার হারাতে তিনি রাজি নন। লিলিপুটরা বড় হয়ে সমান হয়ে যাক বা দৈবাৎ তাঁর চেয়ে বড় হয়ে যাক, এ চাইবার মত উদার গলিভার তিনি নন। তার চেয়ে একটি রঙিন খেলনা হারানো অনেক ভাল।

তিনি যখনই আসেন তখনই বেল টেপেন না; চোরের মত দরজায় কান পাতেন। বন্ধ দরজার ওপাশে খেলনার বিপ্লব তাঁর মজার লাগে। হয়ত সেবার বহুদিন পরে আসা। হয়ত ওপাশে চাল নেই, তেল নেই, উনুনের চিতেও নিভন্ত। সাবিত্রীকে তিনি টাকা দেন না। কখনও না। ভাঁড়ার ভ'রে খোরাক, বাক্স ভরে শাড়ি, কিন্তু হাত ভরে টাকা না। যাতে সে কোলের শিশুদেরও এক পয়সার বেলুন কিনে দিতে পেরে নিজের ইচ্ছার চাষ করতে পারে। গোমস্তার গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে এই ত যথেষ্ট, কলে জল, আলোয় বিদ্যুৎ, আবার কি?—সাবিত্রীও চালাক। আর তার চালাকিগুলো ঠিক তার মত বিষম ছোট। মাঝে মাঝে এই অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাগও ধরে তাঁর, হাসিও পায়। তাই তিনি যখন আসেন বলে আসেন না, বা যখন আসব বলেন তখন আসেন না। কারণ তিনি বেল বাজালেই

সাবিত্রী নিজেকে বদলে নেয়। দরজা খুললেই তারা সবাই মিলে বিবিধ কারণে টাকা চাইতে আরম্ভ করে। ঘরে ঢুকে বিছানায় দেখেন বিষম ছেঁড়া চাদর। তাঁর ছাড়া পাঞ্জাবীটা উঁচু হুকে টাঙাতে গিয়ে সাবিত্রীর ব্লাউজের পিঠটা ইচ্ছাকৃত ফেঁসে যায়। এই জন্যই তিনি বেগুনি নোট না নিয়ে আসেন না। এই জন্যেই তিনি বলে আসেন না। সাবিত্রীর আসল রূপ তিনি দেখতে চান, আসল বিছানা, আসল ব্লাউজ। সাবিত্রীর ওপর তাঁর অব্যক্ত ঘৃণা যেন বুনো ছাগলের চারাগাছ মুড়োনোর মত করে সাবিত্রীর ছোট্ট ব্যক্তিত্বটুকুকেও মুড়োতে চায়। সাবিত্রীর সামনেই তিনি সাবিত্রীর চেয়ে দশ বছরের ছোট তার সৎ ছেলে বিনায়ককে ডেকে সাবিত্রীর গতিবিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। সাবিত্রীর কতটুকু গতি, কোন্ পার্ক, কোন্ সিনেমা পর্য্যন্ত তা জেনেও তাঁর এই খোঁজে। কি আশ্চর্য্য, সাবিত্রীর মুখে কোন অপমানের কথা ফুটে ওঠে না। সাবিত্রী অসাড়। সে একথাও জানে না যে, সত্যিই তিনি তাকে রেখেছেন। এই বোধটাই তিনি চোখে দেখতে ভালবাসেন। কলিং-বেলের শাদা মাথাটার ওপর বুড়ো আঙুলটা আলতো ঠেকিয়ে যে-কোন মুহূর্ত্তে তাকে চেপে ধরবার স্বাধীনতা রেখে তিনি দরজায় কান দিয়ে বিপ্লবের খোঁজ করেন। সাবিত্রী চিৎকার করছে—আর পারি না, যতক্ষণ আছে ততক্ষণ খোঁজ। এ কি যন্ত্রণা, আমরা কি করি, কি পরি, কি খাই, কোন কিছু দেখে না, বিনু তুমি একটা ঝি-এর চাকরি দেখ, এর চেয়ে ঝিবৃত্তিও ভাল।

ঠিক এমনি সময় তিনি বুড়ো আঙুলের চাপটা নিবিড় করে ধরেন; অনেকক্ষণ ধ'রে কণ্ঠরোধ করে থাকেন শাদা বোতামটার। শুকনো মরুভূমিতে ঝরণার কুলুকুলু ধ্বনির মত দরজার ওপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ঘণ্টানাদের ধাতব ধ্বনি। এ যেন ধুধু রুক্ষতায় ঝরণার ঝিরু ঝিরু ঝিরু। অন্ন জল পানীয়, তিনি খুশী থাকলে চাই কি একটা সদলবল সিনেমাও—এই আশ্বাসে সাবিত্রীর মুখ কাঁচামাটির পুতুলের মত বদলে যায়। ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরের শোকেস তার একমাত্র খরিদ্দারের পছন্দের মত নিজের প্রত্যেকটা কোণ সাজিয়ে ফেলে…

সাবিত্রীর নম্র বিনীত হাসির পাশ কাটিয়ে তিনি ভেতরে ঢোকেন। মুঠো মুঠো বেগুনি নোট ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। লোভার মত সাবিত্রী যতটা পারে কুড়িয়ে নেয়। সঞ্চয় রাখে। দূর-পানীয়-জল-গ্রামের মানুষগুলো যেমন সারাটা ঝর্ণা নিজেদের বালতিতে তুলে নিতে চায়।…

পিছনে মেরুণ-মেহগনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি কি চমৎকার তাঁর জগতের মধ্যে চলে আসেন। এখানকার আজ্ঞাবহ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে যেন আবার মহালের ফরাস ফিরে পান। হাতের তামাকের নলটা আবার আপসাতে ইচ্ছে করেন। আজও কান পাততে ইচ্ছে করল তাঁর। ইচ্ছে করল বিপ্লবের শব্দ পেতে। কিন্তু দরজার ওপাশের স্থির মৃত নিঃশব্দ তাঁকে বিষম একটা ভয়ের মধ্যে এনে ফেলল। তিনি ভাবলেন, দরজার ওপাশে আর সেই সব মানুষ, ঘর, বস্তু নেই। নিজের আরক্তিম বুড়ো আঙুলটা বোতামের শাদায় রাখতে গিয়ে আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, আজ তাঁর ভারি থামের মত দুটো পাও জুতোর মধ্যে টলে উঠল। অপরাহ্ণের বিষম মরা আলোটাও তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে কখন। এই সিঁড়ির ধুলো-ভরা নোংরা অন্ধকারের বর্ত্তুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধ হয় তিনি কোন ঝিমিয়ে-পড়া বৃদ্ধের মত সাবিত্রীর চিৎকার, সীতার চুড়ির শব্দ স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়ে তুলতে চাইলেন। সীতা তা হলে আর নেই। সীতা আর বিনায়ক চলে গেছে। তিনি তাঁর পৃথিবীর মেরুণ-রঙের দরজায় মাথা কুটতে চাইলেন। বোধ হ'ল কে যেন তাঁর সাঁজোয়া খুলে নিচ্ছে।

সীতার মত বউ এ বাড়িতে কখনো আসে নি। সাবিত্রীও এ বাড়ির বধূদের তুলনায় কিছু নয়। তবুও সে রবি বর্ম্মার ছবি থেকে নেমে-আসা দময়ন্তীর মত। বউ করতে হলে এ বাড়ির ছেলেরা হারাণো দিনের সৌন্দর্য্য সংজ্ঞা থেকে কখনো বিচ্যুত হয় নি। সেই সুমন্থরা, মদালসা, শ্রোণীভারাক্রান্তা, পদ্মপলাশলোচনা, স্ফুটমল্লিকাধারা, কুঞ্চিত কেশা—তিনি তাই সাদার্ণ এভিনিউর সিংহ-লজে বসে হুমকি দিয়েছিলেন সীতার কোন এক সম্পর্কিত মামাকে। বিষম ছোট্ট, অকিঞ্চিৎকর, টিপেমারার মত লোকটা। তাঁর বিকেলের মৌতাতলাল চোখ দুটো দেখে ভয় পেয়েছিল। অজান্তে পেছু হটেছিল তাঁর শিকার-করা বাঘের হাঁ-করা মডেলটার দিকে—দুটোকে এক সঙ্গে ঘুরতে দেখলে গুলী করে মারব কিন্তু। বিয়ে, আমার ছেলের সঙ্গে একটা মুদির মেয়ের? কিন্তু বিনায়কের জন্যেই ওদের বিয়ের পর পালিয়ে থাকার আস্তানাটায় যেতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁকে দেখে শরাহত সাপিনীর মত ফিরে তাকিয়েছিল সীতা। তাতে তিনি বেশ একটা পুরাণো দিনের মজা পেয়েছিলেন। বাগান বাড়ির ঘরে খড়ের বিছানায়-শোয়া বিষ-দাঁত না ভাঙা সাপিনীর মত সীতার চোখ। কিন্তু দিন আর পরিবেশের তফাতে অর্থাৎ এই দিন আর এই পরিবেশে সেদিনের তিনি যদি হতেন, যা করতেন সেদিনও তিনি তাই করে-

ছিলেন তাঁর অঢেল দয়ার বন্যায় বিনায়ককে কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়ে সীতার বিস্ময় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। সুন্দরী বাদিনীদের রাজ্যে এই সামান্য চিত্রলাকে তাঁর নতুন খেলনার মত মনে হয়েছিল। এ্যাকিলিসের গোড়ালির মত তাঁর নিজের পাকা পরিণত মনের মধ্যেকার সেই চিরকেলে কাঁচা, কচি, দামাল, যৌবন-শিশুকে তিনি এই রঙিন খেলনা দিয়েছিলেন। এই শিশু, শিশুদের ব্যতিক্রম ছিল না বলেই নতুন খেলনা ছিল তার হুজুগ। তিনি এই ইচ্ছাময়ী খেল্‌নার। খেল্‌নার-ইচ্ছাকে গরুর ল্যাজের উপরকার মাছির মত আলস্যে সহ্য করছিলেন। কিন্তু এক পকেট নোট, থলি-ভরা বাজার, বাড়ির সকলের জন্য প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে এসে ফেলে দিয়েও তিনি রসগোল্লার চারপাশের পিঁপড়েদের মধ্যে সীতাকে ফেলেন না। কারণ বিনায়কের সঙ্গে মনান্তরে সীতার নাকি মন খারাপ। তাঁর মনে হ'ল মন খারাপ নয় সীতার চোখ খারাপ। দিনের বেলায় নবগ্রহস্পিতা সূর্য্য যখন সহস্রদ্যুতি, তখন তাঁর কোলের শিশু-বধূকে কে আবার দেখতে পায়।

কিন্তু তা হলে তিনি কি দিয়ে অধিকার করবেন এই ইচ্ছাময়ীকে। কি নিয়ে আসতে হয় এই কালো ছিপ্‌ছিপে ভীষণ নতুন ধরনের একালিনীর কাছে।

কিন্তু সাবিত্রীর চক্কর দেয়াই তাঁকে সম্বিৎ দিল। চিরকালের কেঁচোকে ধীরে ধীরে সাপ করে দিচ্ছে এ বাড়ির এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী। সাবিত্রী অবাক্ হয়ে দেখেছিল, সীতা কেমন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে। কথা না ব'লে অন্য ঘরে শুয়ে নির্য্যাতন করে। রাগ হলে শ্বশুর-শাশুড়ীর উপস্থিতিও ভুলে যায় সীতা। সেই ভুলে যাওয়া দেখে ষোল বছর বয়সে ছেড়ে-আসা বল্লভপুরের নিজের সামাজিক জীবনের কথা মনে পড়ে যায় হয়ত সাবিত্রীর। সীতা রাগ ক'রে বাপের বাড়ি চলে গেলে বিনায়ক খায় না, সীতার সঙ্গে ভাব হলে বিনায়ক পকেটে ফুল আনে এবং সর্ব্বচূড়ান্ত তিনি সিনেমার টিকিট কেটে এনে বিনায়কের জ্বর দেখলে একথা ভাবতেও পারেন না, সীতা কি করে না গিয়ে বাড়িতে থেকে বিনায়কের মাথায় ওডিকলন লাগায়। এই বিবাহিত দম্পতির নিজস্বতার উপদ্রবে তাঁর পৃথিবীতেও বিপ্লব ঘনাতে থাকে। এক মধ্যরাত্রে সাবিত্রী, হ্যাঁ সাবিত্রীকেই তিনি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ধ'রে আনতে বাধ্য হন। বাথরুমে কেরাসিনের বোতল আর ছেঁড়া-শাড়ি তাঁকে বলে দেয় সাবিত্রী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। সাবিত্রার মধ্যে আত্মহত্যা করবার মত অন্তর্দ্দাহ কেন এল তা জানতে পেরেছিলেন তিনি। চাঁদের আলোধোওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিনায়কের জানলায় চোখ রেখে শুধু শাশুড়ীর বুকের নীলহিংসা জ্বলেনি সাবিত্রীর চোখে, মুগ্ধ বিস্মিত বালবিধবার মত সে সকালে-ঝগড়া-হওয়া দম্পতির রাত্রির পায়ে-ধরা দেখছিল। তার কাছে তখনি কি তাঁর পৃথিবী একটা কিছু নেই বুদ্‌বুদ্ হয়ে উড়ে গেল। সাবিত্রী জীবনের চরম ফাঁকিটাকে ধ'রে ফেলছে একথা জানতে পেরে তিনি খেল্‌না ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। সীতার প্রতি হঠাৎ তাঁর অকরুণতা খুব কদর্য্য হয়ে উঠেছিল পরের দিনগুলিতে।

সকাল বেলা সালসা খেতে গিয়েও বোতল গ্লাস বের করে তিনি খেতে পারেন নি। সীতার সদর্প চিঠিতে তাঁর শক্তি শুষে নিয়েছিল। আশ্চর্য্য, আরও আশ্চর্য্য, ওরা নাকি তাঁকেই করুণা করতে এসেছিল, ওরা নাকি চায়না এই অদ্ভুত অসামাজিক পরিবেশে তাঁদের ভবিষ্যৎ সন্তানকে রাখতে।... কলিংবেলের বুকে ভারি আঙুল ফেলবেন কি? শক্তি তাঁর আঙুল থেকে চলে গেল। ভারি বেলে-পাথরের থামের মত পা দুটো জুতোর মুঠোয় কাঁপা থামান গেল না কিছুতেই। তিনি একটি বিষম অকরুণ বধুর কথা ভেবে চারিপাশে অন্ধকার দেখলেন। তার পর অন্ধকার হঠাৎ অকরুণাকে কত যে করুণাময়ী করে হঠাৎ আলো হয়ে গেল।

তাঁর বেল্ শুনে সে ত কখনও নিজেকে বদলায় নি। নিজের বিয়েতে পাওয়া ফুল-কাটা চা-দানিতে কে চা এনে দিত? তাঁর ভালোবাসার খাবার রান্না করতে শিখত কে, তাঁর কাছে বসে শিকারের গল্প শুনত সীতাই ত। তিনি যা চাইতেন শুধু সে তা করত না। রাজা এলে তবক চাপাতে হয়, অন্য রকম আড়ষ্ট হতে হয়, নাকের চারপাশে মাছি ঘুরলেও কোন দিকে তাকাতে নেই। সে জানত না। সে বোধ হয় তাঁকে রাজা বলে ভাবত না, বাবা বলেই ভাবত। কিন্তু সে বাবা বলে ডাকলে তিনি কি অপ্রস্তুত না হতেন। বেশি বেশি মনে হ'ত। কারণ বিনায়ক পারতপক্ষে তাঁকে ডাকত না। সাবিত্রীর শিশুরা ডাকত বাবু বলে। তিনি তাদের নিয়ে কোনদিন পার্কে যেতেন না। যদি কেউ তাঁকে ওদের দাদু ভাবে। সেই সীতাই তাঁর পাঞ্জাবি ইস্ত্রী করতে গিয়ে পেয়েছিল যৌবন-সৃষ্টি ওষুধের পাঁজিকাটা বিজ্ঞাপনটা। তিনি তার সবুজ অবর্ণনীয় মুখখানা দেখেছিলেন। তিনি গুলিপাকিয়ে কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হ'ল, সীতা তার মনের মধ্যকার তিনিকে—ঐ কাগজের টুকুরো ক'রে ফেলে

দিয়েছে, সেই থেকে সীতা আর তাঁকে বাবা বলে নি।

আজ এই করুণাময়ীর ঘৃণায় তিনি এতটুকু হলেন, তিনি এতবড় হলেন। ভেঙে গিয়ে নতুন হতে পেরে এই প্রজা আর রাজার পৃথিবীকে নতুন করে আবিষ্কার করার কথা ভাবলেন। এই মেরুণ-রঙা দরজার ওপাশে কোন স্বামী-স্ত্রী নেই, শ্বশুর, শাশুড়ী বধূ, পুত্র, কন্যা থাকতে পারে না। তিনি এক লোভী সিংহের মত এক নামে সংহত। যারা সংহত নয় তারা একত্র হবে প্রজাপুঞ্জের কত জোড় নিয়ে। তাদের অন্য নাম নেই। আজ তাঁর বুড়ো আঙুলটা তিনি বেলের উপর শেষ পর্য্যন্ত চেপে ধরলেন। অন্ন, জল, আশ্বাসের সেই ধাতব সুরেলা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়তে থাকল। দরজা খুলে দিল সাবিত্রী। দরজার ফ্রেমের মধ্যে লালপাড় শাড়ি-পরা সাবিত্রীর মূর্ত্তিটা কেমন তরল মনে হ'ল তাঁর। তিনি অভ্যস্ত হাতে পকেটের নোট হাতড়ালেন, এই প্রথম তাঁর হাতে উঠে এল খোপদোস্ত আদ্দি। নোট-বিহীন নিজের অস্তিত্ব নিয়ে এ বাড়ীর দরজায় দাঁড়ান তিনি ভাবতে পারলেন না। নিজেকে কল্পনা করতে গিয়ে মনে হ'ল, তিনি এক ঘুরন্ত বলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। অর্থহীন যৌবনহীন তিনি এ পৃথিবীতে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারেন না একথা জানলেন। অর্থহীন যৌবনহীন তিনি যে অস্তিত্ব-হীন তা জানতে পেরে সাবিত্রীর দিক্ থেকে পেছু হটতে লাগলেন তিনি। সাবিত্রীর শাড়ির লাল পাড় তাঁর মুখের চারপাশে জ্যোতির মত জ্বলছে। নির্নিমেষ চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে তিনি মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। কাকে তিনি করুণা করতে গিয়েছিলেন? তিনি নিজেই কি অসহায় করুণ! জীবন বিদ্যুতের বাতির মত পূর্ণ যৌবন আলোর পর দপ্ করে অন্ধকার নয়। দারুণ দুপুরের দাবদাহর পর অপরাহ্ণের সোনালী, সোনালী থেকে হলুদ, হলুদ থেকে কমলা, কমলা থেকে জরদ, জরদ থেকে লালে গিয়ে সূর্য্যের সেই মহৎ নিভে যাওয়ার পর তিনি কেন তারকা-ঝলমল রাত্রির মধ্যে চলে যেতে পারবেন না?

—ওরা চলে গেছে, না?

সাবিত্রী নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন।

—আমি আজ যাই সাবিত্রী, আজ আমি টাকা আনিনি। অবাক্ হয়ে তাকাতে শিখেছে সাবিত্রী। অদ্ভুত তাচ্ছিল্য করে হাসতে শিখেছে—তবু এস।

অসহ্য সুখে তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল। নিজের শেষ অনুগত প্রজার মৃত্যু ঘটে গেছে। মেরুণ-রঙা দরজার ওপাশের হাওয়ায় এই পৃথিবীর নিয়ম। ভীষণ লজ্জায় পকেট থেকে সযত্নে রাখা পাজির বিজ্ঞাপনটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন তিনি। মনে মনে হাজার বার ডাকলেন, বৌমা, বৌমা, বৌমা! আঃ এতদিন বাদে সামনের বাড়ির বারান্দায় বসি আল্লা করে, পলিত উরুর লজ্জা মনে না রেখে যে নষ্ট-দাঁত লোকটা ব'সে ব'সে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে গল্প করে, তার মুখের সমস্ত রেখা চিনতে পারলেন তিনি। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নিজের নাতিদের কাছে যেতে যেতে তিনি সেই গল্পটা নিজেকে মনে মনে বলে রাখলেন, যে গল্পটা তাঁর দাদু তাঁকে বলেছিলেন, যাতে তিনি মারা গেলেও সেই উজ্জ্বল তারা দু'টির মধ্যে সে তাঁর প্রাণকে অপূর্ব্ব দু ফোঁটা স্মৃতিজলে বাঁচিয়ে রাখে!

তাঁর নাতি!

## শুদ্ধিপত্র

কার্ত্তিক মাসের দিলীপকুমার রায়ের গল্পের ভুলগুলি অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ করা হইতেছে।

| পৃঃ | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৭৮ | ১৬ | তাকে | কাকে |
| ৭৭ | ১৫ | বিষ্যাৎ | বিষাৎ |
| ৭৭ | ২১ | মাধবঃ | সাধবঃ |
| ৫৩ | ২৩ | বহুদূরের | বহুদক |
| ৬৭ | ২৯ | নারীরা | তটিনী |
| ৬২ | ১২ | যার্দ্ধজিজ্ঞাসয়ং | যদ্বিজিজ্ঞাসয়া |

অনিবার্য্য কারণে "স্তব্ধ প্রহর" উপন্যাসের কিস্তি এ মাসে ছাপা হ'ল না।

প্রবাসীর আয়োজিত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী মাসে ছাপা হবে।

**রবীন্দ্রায়ণ**—প্রথম খণ্ড। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। বাক্ সাহিত্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা গ্রন্থের আবির্ভাব প্রত্যাশিত ঘটনা। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' আমাদের প্রত্যাশা-পূরণ গ্রন্থ। আলোচ্য প্রথম খণ্ডে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বর্গের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচেতনা, শিল্পভাবনা, সংগীততত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে। আলোচ্য খণ্ডে বাংলা দেশের প্রখ্যাত সুধীজনদের অনেকেই লিখেছেন এবং যত্ন করে লিখেছেন (যা আমাদের দেশে সচরাচর ঘটেনা)। ফলে এই সমালোচনা গ্রন্থখানি শিক্ষিত বাঙালীর কাছে দীর্ঘকাল ধ'রে সমাদৃত হবে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই মূল্যবান গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছেন শ্রুতকীর্তি শ্রীপুলিনবিহারী সেন। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু সন্নিবেশ, দুর্লভ ও মনোহর চিত্র প্রকাশ, বিষয়ভেদে সেগুলির নিখুঁত উপস্থাপনা, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ সবই তাঁর সূক্ষ্ম রুচি ও রসবোধের পরিচয়বাহী। রুচির এবং আভিজাত্য গ্রন্থের সর্বত্র দৃশ্যমান।

এই সঙ্কলনে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের যথাক্রমে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাভাষা', 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষাব্যবহার' ও 'রবীন্দ্রনাথের শব্দ' প্রবন্ধ তিনটিতে রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ অথচ স্বল্পালোচিত অধ্যায় আলোচিত হয়েছে। বিশেষত তরুণ লেখক গবেষক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের নিষ্ঠা আমাদের অভিনন্দনের যোগ্য। তবে তিনি 'ত্বরিত', 'দুর্ভর' শব্দগুলি সংস্কৃতমূল দেখান নি কেন বোঝা গেল না। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'আড়িয়া' 'বিহান' 'বেলাটুকু পোহালে' শব্দগুলি এখানে থাকলে ভালো হ'ত। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোড়ার দিকের লেখায় কলকাতার 'ককনি' কিছু কিছু ব্যবহার করেছিলেন। সেগুলির উল্লেখ থাকা দরকার। সুকুমার সেন মহাশয়ের আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'ভাষা ব্যবহার' নিয়ে ও শ্রীঅমলেন্দু বসুর রচনা 'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা' দুটি পরিপূরক প্রবন্ধই অনবদ্য রচনা। 'Poetic image'এর প্রতিশব্দ অমলেন্দুবাবু তৈরী করেছেন 'বাক্‌প্রতিমা'। রূপকল্প, চিত্রকল্প, প্রভৃতি দ্বারা Image-এর ব্যাপক ও নির্মিত রূপটি ধরা যায়না। সেদিক থেকে 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দ অনেক সুষ্ঠু। অমলেন্দুবাবু ঐতিহাসিক ক্রম ধরে

আলোচনা করলে বিষয়টি আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। কেননা ১৯৩০ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে বাঁক ঘোরা লক্ষিত হয়, সেখানে Image-এরও রূপান্তর ঘটে গেছে অনিবার্যভাবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীভবতোষ দত্তের 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ, শব্দতত্ত্ব, বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের আলোচনা খুবই সঙ্গত। ভবতোষবাবু শ্রম ও সততার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরীদের ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির একটি তথ্যবহুল ও বিচারসহ রূপ উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাস প্রসঙ্গে শ্রীকানাই সামন্ত ও শ্রীআলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের রচিত 'দামিনী' ও 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ' দু'টি প্রবন্ধ আছে। কানাইবাবুর রচনাটিতে বিশ্লেষণ ও আস্বাদন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে—এমন স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন আলোচনা আজকাল কম চোখে পড়ে। আলোকরঞ্জনের রচনাটিতে চিন্তার মৌলিকতা আছে কিন্তু তার 'অতিরেক' লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে গোড়া থেকেই বঙ্কিমী প্রভাবের বাইরে আনবার প্রচেষ্টায় তিনি অকারণ তৎপর হয়েছেন। ফরস্টর সংজ্ঞা দেওয়া 'Round' চরিত্রের সৃষ্টি বঙ্কিমের 'প্রবণতা ও কৃতিত্বের' বাইভূত ছিল এই মন্তব্যে সাহসিকতা আছে কিন্তু মানসিকতা নেই। নৈবেদ্য ও চোখের বালিকে সমসূত্রে গ্রথিত করাও অনৈতিহাসিক কেননা, 'বিনোদিনী'র জন্ম আগেই হয়েছে। তা ছাড়া শেষের দিকের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দস্তয়েভস্কির স্বাধর্ম নির্ণয় অনেকে হয়ত মেনে নেবেন না।

ছোট গল্প প্রসঙ্গে শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ও শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরীর প্রবন্ধ দু'টি স্থান পেয়েছে। অজিতবাবুর লেখাটিতে তথ্যে বা ব্যাখ্যানে বিশেষ নতুন কিছু নেই কিন্তু রচনাগুণে প্রবন্ধটি সুন্দর হয়েছে। বিনয়েন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি শুধু গল্পগুচ্ছের প্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা, অজিতবাবুর প্রবন্ধেও ঐ বিষয় আলোচিত হয়েছে। কেউই 'তিনসঙ্গী' সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করেন নি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রকাব্যের তিনজগৎ' প্রবন্ধে প্রকৃতি, মানব ও ঈশ্বর চেতনার উৎসস্বরূপ জোড়াসাঁকো, শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনের নিসর্গভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' উপনিষদের মর্মকথা কবির চেতনায় ও কাব্যে কী গভীরভাবে অনুস্যূত হয়েছে তার বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস' এক নতুন দিক থেকে লেখা। কালিদাসের কাব্যে তাঁর জীবন, যুগ, সৌন্দর্য ও ধর্মবোধ [illegible]রূপ যে ভাবে ধরা পড়েছে লেখক তাকে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত [illegible]রেছেন। তিনটি প্রবন্ধই চিন্তাসমৃদ্ধ।

এই সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ প'ড়ে তবু প্রশ্ন থেকে যায়। কেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে কোনও পূর্ণাঙ্গ এখানে নেই? সে অভাব প্রমথবাবু, সুকুমারবাবু বা অমলেন্দুবাবুর প্রবন্ধে পূরণ হয় না; বিশেষত রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ থাকলে ভালো হ'ত। 'রবীন্দ্রনাথের' নাটক প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি সকল পাঠককেই বিস্মিত করেছে।

তবু বলি এই সঙ্কলনখানি দীর্ঘক[illegible]র শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের কাছে একখানি নির্ভরযোগ্য [illegible] বই হিসাবে গণ্য হবে। সম্পাদক ও প্রকাশককে পুনরায় [illegible] নিয়ে এই সমালোচনা শেষ করছি।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
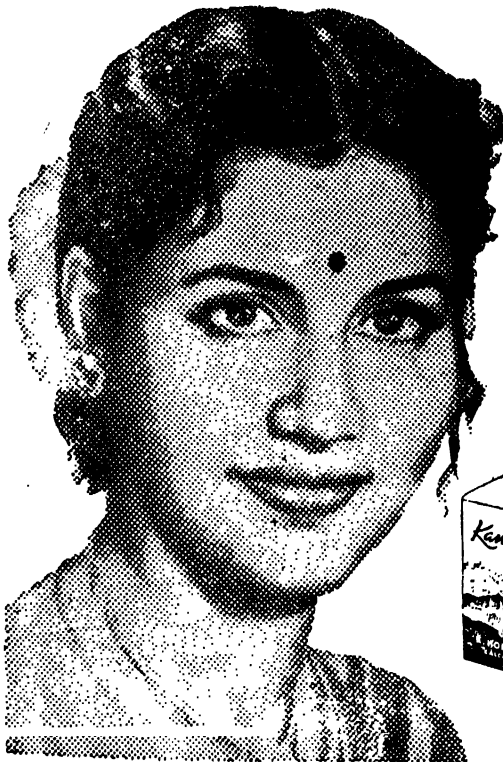
**বৈদিকী**—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক বাণীতীর্থ, ২৬।২ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। পত্রাঙ্ক ৭০, মূল্য ২ টাকা।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত কবির পাকাহাতের অনবদ্য অনুবাদ। শুধু অনুবাদ বলিলে ভুল হইবে, ঋক্‌বেদের কয়েকটি বিশিষ্ট সূক্তের কাব্যানুবাদের মধ্যে কাব্যবস্তু যে বহুলাংশে বজায় আছে, এটা পড়িবার সময়ে বেশ লক্ষ্য করা যায়। সে হিসাবে এগুলিকে অনুবাদ না বলিয়া নূতন আধুনিক বাংলা কবিতাও বলা চলে। "সে যুগের মানুষের হৃদয়ের কথা, চিন্তাভাবনার কথা এবং সে যুগের প্রকৃতির রূপ-ছবি" ঋক্‌বেদের কয়েকটি সূক্তে যেমনটি আছে প্রবীণ সুকবি অরীন্দ্রজিৎ-বাবু অতি সুন্দর ভাবে অনুবাদের মধ্যেও তাহা বজায় রাখিয়াছেন। সুদূরতম বৈদিক যুগের উদ্দেশে তিনি বলিতেছেন—

"হায় ঋষি, হায়! কোথা সেই দিন, কোথা দেবতার রথ!
মাঝখানে আজ মহাশূন্যের দুর্বার পর্বত!
বৃথা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যায় যজ্ঞ-অনল-শিখা,
কোথায় হারাল তরুণ প্রাণের অরুণ অমৃতশিখা!
চাঁদে আজ বুঝি ততো সুধা নাই, শুখায়েছে সোমলতা,
আহুতি-পিয়াসা দেবতা আসিয়া কহে না পুণ্যকথা,
আজ সুদূরের সেই দিনগুলি ঋষির অমৃতবাণী
শুধু রেখে গেছে পুঁথির পাতায় অদ্ভুত মোহ হানি!
আজও প্রতিদিন তেমনি প্রভাতে নবীন সূর্য উঠে,
তেমনি হাসিয়া তরুণী উষার আঁচল ধরিতে ছুটে
আজও অরণি-মন্থনে বনে অনল উঠিছে জ্বলি,
আজিও মরুৎ বজ্র হানিয়া চলিছে আকাশ দলি,
আজও নবীন-নীরদপুঞ্জ ছেয়ে যায় নীলাকাশ,
আজও দেবতা বর্ষণ ঢালি মিটায় ধরার আশ!
কত সুন্দর, কত মনোহর! তবু যেন মনে হয়
প্রাণের পাত্র ভরে না'ক সব—খানিক শূন্যময়!
সেদিন প্রভাতে সূর্য চাহিয়া গেয়েছিল যেই প্রাণ
তাহার খানিক হারায়ে ফেলেছি, নাহি আর সন্ধান!"

যাঁহারা নানা কারণে মূল ঋক্‌বেদ বা তাহার যথাযথ অনুবাদ পড়িয়া দেখিবার সুযোগ পান না তাঁহারা এ পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

**ভগবান রমণ মহর্ষি**—হরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

রমণ মহর্ষির জীবন-চরিত বড় একটা দেখা যায় না। গ্রন্থকার সেই অভাব দূর করিয়াছেন। ষোল বৎসরের বালক বেঙ্কটরমণের মনে যে প্রশ্ন উদিত হয় সাধারণ বিচারে ইহাকে অস্বাভাবিক মনে হইলেও, ইহা প্রাক্তন। ইঁহারা সংসার করিতে আসেন না পূর্বের অসম্পূর্ণ কাজের জন্যই তাঁহাদের আসিতে হয়। নহিলে অরুণাচলের নাম শোনামাত্রই বালকের সমগ্র সত্তায় অনুভূতি জাগে কি করিয়া?

আলোচ্য গ্রন্থে রমণের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখিয়া গ্রন্থকার তাঁহার জীবন-দর্শনের কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছেন। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে যে জটিল বিষয় লইয়া মহর্ষি আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপদেশের মর্মকথা ইহাই—"নিজেকে জ্ঞান-বিচারের দ্বারা বিশ্লেষণ করো নিজেকে—অর্থাৎ 'আমি কে' নিরন্তর এই জিজ্ঞাসা দ্বারা নিজ সত্তাকে করো আবিষ্কার।"

ভক্ত যাঁরা, এই রসে রসিক যাঁরা তাঁদের এই অমূল্য গ্রন্থখানি খুবই ভাল লাগিবে।

**তীর্থাঞ্জলি**—শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি রহস্যোপন্যাস। গ্রন্থকার যে রহস্যের অবতারণা করিয়াছেন, মৌলিকতার দিক হইতে গ্রন্থকারকে শক্তিশালী বলা চলে। কারণ, গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। সাধারণত ডিটেক্‌টিভ বা রহস্যোপন্যাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, এ গ্রন্থ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এই কারণে, ইহা সাহিত্য হইয়াছে। সাহিত্যিকের হাতে পড়িলে, এই ধরনের গ্রন্থও যে সাহিত্য হইতে পারে তাহা নারায়ণবাবুর এ বই না পড়িলে বুঝা যাইবে না। বইখানি সকল পাঠকেরই ভাল লাগিবে একথা জোর করিয়া বলা চলে।

**রসসার তন্ত্র**—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আরোগ্য নিকেতন, ৭১ বি, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৩.২৫ ন. প.।

আয়ুর্বেদে রস-বিজ্ঞান একটি বিরাট অধ্যায়। অবশ্য আয়ুর্বেদে মূল চিকিৎসার ধারা অন্যরূপ ছিল। ভেষজ-ঔষধই ছিল তাহার প্রধান উপকরণ। চরকাদিতে তাই কোথাও রস-চিকিৎসার উল্লেখ নাই। রস-চিকিৎসার প্রারম্ভিক কাল বৌদ্ধযুগে। অবশ্য গোড়া ভক্তের কথা ছাড়িয়া দিলে—এই প্রবর্তন ভালই হইয়াছে। কারণ, এই বিজ্ঞানের যুগে রস-চিকিৎসা ছাড়া প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। গবেষণা করিলে, ইহার আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবার সুযোগ আছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, রসতন্ত্রের ত অনেক বই বাজারে আছে, তবে ইন্দুবাবু স্বতন্ত্র একখানি বই লিখিতে গেলেন কেন? তিনি নিজেও ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন, বিভিন্ন গ্রন্থ চতুর্দিকে ছড়াইয়া আছে,—ইন্দুবাবু সকলগুলিকে একজায়গায় গ্রথিত করিয়াছেন ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। আর সেদিক দিয়াও ইহার মূল্য অনেকখানি। বিশেষ করিয়া গ্রন্থকার প্রত্যেকটি ধাতুর শোধন, জারণ-মারণ এবং তাহার গুণাগুণ উল্লেখ করিয়া শিক্ষার্থীদের ত বটেই, চিকিৎসকদেরও উপকার করিয়াছেন।

গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ]

সম্রাট আকবর ও তাঁহার সভাসদবর্গ
( প্রাচীন মোগল চিত্র হইতে )
শ্রীমতী কমলা দেবীর সৌজন্যে

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৬৮

৩য় সংখ্যা

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বিগত ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে লোকসভায় চীন সম্বন্ধে ভারতের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে যে বিতর্ক হইয়াছে তাহা প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভারতীয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্বাধীনতা অল্পদিনের এবং স্বাধীনতা রক্ষা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা এখনও অতি অল্প, এ কথা এখন প্রত্যেক চিন্তাশীল ও দেশাত্মবোধযুক্ত ব্যক্তির নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। লোকসভার বিতর্কে কয়েকটি বিষয় অতি পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, আমরা যাঁহাদের উপর এই নিদারুণ গুরুতর সমস্যা—অর্থাৎ চীনের ভারত বিজয় অভিযান প্রতিরোধের ব্যবস্থা—অর্পণ করিয়াছি, তাঁহারা সেই কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থতার ও অনভিজ্ঞতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু দীর্ঘদিন এই সমস্যার বিষয় দেশের লোকের নিকট প্রকাশ করেন নাই, উপরন্তু বহু সময় বাজে চিঠিপত্রে নষ্ট করিয়া চীনাদের দুরভিসন্ধি পূরণের দীর্ঘ সুযোগকাল তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানেও তাঁহার এ বিষয়ে চিন্তাধারায় বিভ্রান্তির পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে। বিদেশীরা এ বিষয়ে কি ভাবিবে, জগতে শান্তিবাদ নামক আকাশকুসুমের উদ্যানে কি অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে, যদি ভারত নিজ আত্মস্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করে, এই সকল চিন্তাই তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ওদিকে চীনারা একদিকে কেবল অভিযোগ-অনুযোগ এবং ভীতি প্রদর্শন করিয়া সময় লাভ করার জন্য মিথ্যার জাল রচনা করিতেছে এবং অন্যদিকে সেই সুযোগে ভারত আক্রমণ ব্যবস্থা পূর্ণ করার অক্লান্ত ও অফুরন্ত আয়োজন করিয়া চলিতেছে।

চীন এখন ভারতের শত্রুতায় কোনও কিছু ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রাখিতেছে না। আমাদের যে প্রতিবেশী মনের মধ্যে বিদ্বেষের হলাহল পূর্ণমাত্রায় রাখিয়া কখনও বা মিষ্টবাক্যে কখনও বা হুমকি দিয়া নিজের পরস্ব ও পররাষ্ট্র লোলুপতা চরিতার্থ করিবার জন্য সদাই প্রস্তুত সেই প্রতিবেশী পাকিস্থানের সঙ্গেও এখন চীন মোকাবিলা চালাইতেছে। কেননা ভারতকে সম্মুখ আক্রমণে হটাইতে পারা দুরূহ, যদি না পিছন হইতে অস্ত্রাঘাতের জন্য গুপ্ত আততায়ীর ব্যবস্থা এবং দেশের অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতক পঞ্চমবাহিনীর পূর্ণ সহায়তা পাওয়া যায়। এই সবকিছুই এখন স্পষ্টভাবে ঘোষিত সংবাদে পাওয়া গিয়াছে এবং লোকসভার বিতর্কে সে বিষয়ে আলোক-পাতও অনেকখানি করা হইয়াছে।

লোকসভার বিতর্কে সকল বিরোধী দলেরই বক্তা,—বলাবাহুল্য, কম্যুনিষ্ট দল ছাড়া—তীব্র মন্তব্যপূর্ণ ভাষায় সরকারী নীতি ও কার্য্যক্রমকে সমালোচনা করেন। কংগ্রেস দলের যাঁহারা এই বিতর্কে যোগদান করেন, তাঁহাদেরও কথায় কংগ্রেসী নীতির পূর্ণ ও সজোর সমর্থন ছিল। শুধু শ্রীখাদিলকর কতকটা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন মাত্র। তিনি বলেন যে, বিরোধীদল নির্ব্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এইভাবে সরকারের "লেজ মুচড়াইতেছেন"। এই যুক্তি যে কত অসার তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না, কেননা নির্ব্বাচন আসন্ন বলিয়াই এই ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে একথা মনে

করিতে পারে শুধু নেহরুর চাটুকারবর্গ এবং তাহাও বিরোধী দলের খোঁচা খাইলে পরে এবং নির্ব্বাচন আসন্ন বলিয়াই এখন দেশের লোকের জানা প্রয়োজন যে কি প্রকার লোকের উপর আমরা দেশরক্ষার ভার আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য অর্পণ করিতে চলিয়াছি।

কংগ্রেস দলে যাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব বোঝেন তাঁহারা এরূপ অপরূপ যুক্তির অবতারণা করেন নাই। শ্রীযুক্তা সুশীলা নায়ার বলেন যে, ভারতের চতুর্দ্দিকের সীমান্ত চীন ও পাকিস্থানের ন্যায় "কুম্ভীরে" পরিবেষ্টিত এবং এরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সবল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিতান্তই প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, সরকার (অর্থাৎ শ্রীনেহরু) "ভুল পরামর্শ" অনুযায়ী কাজ করিয়া তিব্বত চীনের হাতে ছাড়িয়াছিলেন কেননা চীন ভারতের বন্ধুত্বের কাণাকড়িও মূল্য ধরে না। শীত ও উচ্চতার অজুহাতে হিমালয় অঞ্চলকে প্রহরীশূন্য করিয়া রাখা উচিত হয় নাই তিনি মনে করেন, কেননা ইহাতে চীনকে আমাদের এলাকা দখল করার সুযোগ দেওয়া হয়।

ডাঃ রামসুভাগ সিং বলেন যে, চীন শুধুমাত্র যে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইতেছে তাহাই নয় উপরন্তু সিকিম ও ভুটানের মত অঞ্চলগুলিকে নিজের আওতায় আনিতে বিশেষ চেষ্টিত। তিনি বিপজ্জনক পরিস্থিতি হিসাবে এই সকলের প্রতিরোধ ব্যবস্থার যোজনা চাহেন। এই সব কংগ্রেসী দলের লোকেও ঐভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু বিরোধীপক্ষের মন্তব্যই কঠোর ও তীব্র নিন্দাবাদপূর্ণ ছিল এবং তাহার মধ্যে এমন অনেক কিছুই ছিল যাহাতে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হয় এ বিষয়ে কর্ত্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হইতেছেন নহিলে ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁহাদের চেতনার অভাব রহিয়াছে।

সমস্ত লোকসভা আচার্য্য কৃপালনী প্রদত্ত এক সংবাদে চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হয়। কৃপালনী বলেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, উত্তর সীমান্তের ভারতীয় রক্ষী সেনাদের প্রতি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী আদেশ দিয়াছেন যে, যেন তাহারা চীনাদের উপর গুলী না চালায়।

এই সকল তীব্র বিতর্কের আরম্ভ হয় জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্তব্যে। তিনি সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, সরকার অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিকে লঘুভাবে চিত্রিত করিতেছেন এবং তিনি দাবি করেন যে, চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ ছিন্ন করার জন্য। তিনি বলেন যে, চীনাদের নূতন নূতন আক্রমণের সংবাদ গোপন করিয়া রাখার চেষ্টা এবং ঘটনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করার জন্য সরকার জনগণের আস্থা হারাইয়াছেন।

শ্রীবাজপেয়ী চীনের প্রতি ভারতের নীতির কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন, বিশ্বের সম্মুখে চীন আমাদিগকে হেয় করিতে চাহে, আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াই তাহা সে চাহে না এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারত তাহার প্রভাব বিস্তার করুক, ইহাও সে মনে-প্রাণে কামনা করে না।

তিনি বলেন, চীনের প্রতি আমাদের রাজনীতি-সংক্রান্ত ও কূটনৈতিক-সম্পর্কিত নীতি ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের পরাজয় ঘটিয়াছে। কূটনীতিকদের আসন সহ দর্শকদের সকল আসনই আজ পূর্ণ ছিল।

জনসঙ্ঘ নেতা ভারত সরকারকে চীনের সহিত কূট-নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বলেন। তিব্বতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারও ভারত সরকারকে সমর্থন করিতে বলেন। নেপালের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক এবং যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার ন্যায় লাদক অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য শ্রীবাজপেয়ী ভারত সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি সমূহের কয়েকটি উল্লেখ করিয়া জনসঙ্ঘ নেতা বলেন, তাঁহার আশঙ্কা যে, চীনারা তাঁহাদের প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের সুযোগ লইবেন। শ্রীনেহরুর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে ভিত্তি করিয়া ১০ই নবেম্বর তারিখে প্রেরিত ভারতের বক্তব্যকে চীনারা অগ্রাহ্য করিতে পারে। তিনি বলেন, চীনারা সীমান্তের এই দিকে না অপর দিকে নূতন পরীক্ষা ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে, শ্রীনেহরু নিশ্চয়তার সহিত তাহা বলিতে পারিতেছেন না। শ্রীমেনন আবার ওয়াশিংটনে বলিয়াছেন যে, ভারতের মাটিতে কোন চীনা সেনাবাহিনী নাই। চীনের নিকট ভারত তাহার যে বক্তব্য প্রেরণ করিয়াছে, শ্রীনেহরু বা শ্রীমেনন তাহা আদৌ কেহ দেখিয়াছেন কি না সে সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীঅশোক মেটা সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্যতার উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও চীনা আক্রমণের ঘটনাকে গোপন রাখার চেষ্টা করায় শ্রীমেটা ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর এইরূপ আচরণের কঠোর সমালোচনা করেন।

সরকারের বিরুদ্ধে শ্রীমেটার আর একটি অভিযোগ হইল যে, চীনাদের আক্রমণে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে, সরকার তাহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন না। শ্রীমেটা বলেন, বড় বড় কথা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করিয়া ঘটনার গুরুত্বকে লাঘব করার চেষ্টা করা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমেটা বোম্বাইয়ে প্রদত্ত পরিবহন ও যোগাযোগমন্ত্রী ডঃ সুব্বারায়ণের বিবৃতির উল্লেখ করেন।

ডঃ সুব্বারায়ণ বলিয়াছেন যে, ভারতের আসল ভয় রহিয়াছে ভারত-পাক সীমান্তে, চীন ভারতের পক্ষে ভয়ের কারণ নহে। শ্রীমেটা বলেন, পাকিস্থান হইতে কি বিপদ দেখা দিতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। তিনি বলেন, পাকিস্থান যে ভারতের শত্রু, ইহা তাঁহারা জানেন এবং ভারতও তাহার শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছে।

শ্রীমেটা মন্তব্য করেন যে, সরকারের অনুসৃত নীতি ও চীনা আক্রমণ সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা উভয়ই দ্ব্যর্থবোধক। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা সুস্পষ্ট কি না শ্রীমেটা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, যে এই সকল বিতর্কের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মুখপাত্র হীরেন মুখার্জ্জী, সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও তথ্য গোপনের কোনও সমালোচনা করেন নাই, বরঞ্চ পণ্ডিত নেহরু ও কৃষ্ণ মেননের কার্য্যক্রমের সমর্থন জানান!

পরদিন এই বিতর্কের জবাব দিবার সময়, (৫ই ডিসেম্বর) পণ্ডিত নেহরু প্রথমেই এক নূতন সংবাদ দেওয়ায় লোকসভায় বিষম চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তিনি জানান যে, নূতন পত্রে চীন বহু মিথ্যার অবতারণা করিয়া এই ভয় দেখাইয়াছে যে, যদি ভারত সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ, পথঘাট ও রক্ষীঘাঁটি নির্ম্মাণ, ইত্যাদি বন্ধ না করে তবে চীনা সৈন্যবাহিনী হিমালয় পার হইয়া তাহার পাদদেশে উপস্থিত হইবে—অর্থাৎ ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণ সামরিক অভিযান চালাইবে।

এই সূত্রে পণ্ডিত নেহরু এই প্রথম বার লোকসভায় বলেন যে, তাঁহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা বিফল হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন।

পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতায় অসংখ্য উদ্ধৃতি ছিল এবং একদিকে বিরোধী দলের ক্রুদ্ধ মন্তব্য ও অন্যদিকে পণ্ডিত নেহরুর চাটুকারবর্গের উচ্চহাস্যে বক্তৃতায় কোন বিশেষ জোর দেখা যায় নাই। পণ্ডিত নেহরু অযথা আচার্য্য আচার্য্য কৃপালনী বিরক্ত হইয়া লোকসভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

পণ্ডিত নেহরুর ৮০ মিনিট ব্যাপক বক্তৃতার সারাংশ আনন্দবাজার পত্রিকা যাহা দিয়াছে তাহার দুই অংশ নীচে উদ্ধৃত হইল। চীনের শেষ নোট (৩০শে নবেম্বরের) বিষয়ে অন্য কথার সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ভারতের জমিতে চীনাদের ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ তাহারা যথারীতি অস্বীকার করিয়া বলিয়াছে যে, তিনটি স্থলের মধ্যে একটিতে কোনও ঘাঁটি নাই এবং অন্য দুইটিতে বহুদিন যাবৎ ঘাঁটি আছে। পণ্ডিত নেহরু মনে করেন যে, একটি ঘাঁটি হয়ত তাহারা তুলিয়া দিয়াছে।

"ভারতের অভিযোগ উড়াইয়া দিয়া চীন একথাও বলিয়াছে যে, তাহাদের ১৯৫৬ সনের মানচিত্রের সীমান্ত-রেখা বদল করা হয় নাই—১৯৬০ সনের মানচিত্রে সেই রেখা প্রায় হুবহুই আছে।

"প্রধানমন্ত্রী বলেন—চীনের এই কথা সত্য নয়। চীনা অফিসারদের সহিত আলোচনাকালেও ভারতীয় অফিসাররা দুইটি মানচিত্রের পার্থক্যের বিষয় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন।

"প্রধানমন্ত্রী বলেন—চীনের আরও অভিযোগ: সীমান্তে ভারতের সামরিক তৎপরতা বাড়িয়াছে, নূতন নূতন চেক-পোষ্ট স্থাপন করা হইয়াছে, বরাহোতিতেও একটি ঘাঁটি রহিয়াছে। এই সম্পর্কে যে কারণ দর্শান হইয়াছে চীনের নিকট তাহা "ধোপে টিঁকে না ও প্রায় বিপজ্জনক।" অতএব "এই কারণ মত যদি কার্য্য করা হয় তবে তথাকথিত ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের শিখর হইতে উহার দক্ষিণ পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সৈন্য পাঠাইবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার চীনা সরকারের থাকিবে।"

"ম্যাকমেহন লাইনের বৈধতা চীনা নোটে অস্বীকার করা হইয়াছে।

"প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সদস্যদের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, চীনা আক্রমণের সমস্যা দল বিশেষের সমস্যা নয়—জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার গুরুত্বকে তিনি কোনদিনই ছোট করিয়া দেখেন নাই বা চীনা আক্রমণ সংক্রান্ত সংবাদ সভার নিকট একবার ছাড়া কখনই গোপন করেন নাই।

"প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সহজ সরল কথাটি হইল এই যে, সামরিক ধরনের কোন ব্যবস্থা যদি আমরা গ্রহণ করিতে

আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে" এবং প্রস্তুত থাকিতে হইবে ব্যর্থতার পরিণাম সম্পর্কেও। সেই জন্যই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিয়া তোলার জন্য সব সময়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। এই ব্যাপারে নিজেদের সামরিক উপদেষ্টাদের পরামর্শমতই চলিতে হইবে।

"প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের চীন নীতির সংক্ষিপ্তসার হইল—"সব সময়েই বন্ধু থাকিবে নিজেকে বিলাইয়া দিবে না।" লোকে অনেক সময় সৌজন্যকে ভীরুতা বলিয়া ভাবে। "এমন ভাবা মনের গোপন ভয়েরই নিদর্শন। আমরা চীন সমেত সকল দেশেরই বন্ধু, কিন্তু দরকার হইলে চীনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াইও করিব।"

"প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে, "পঞ্চশীলের পাঁচটি অনুজ্ঞাই শুধু কোন সভ্য দেশ তাহার আন্তর্জ্জাতিক নীতির ব্যাপারে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। কেননা ইহা বিকল্প যুদ্ধ।"

"চীনের বিরুদ্ধে পঞ্চশীল লঙ্ঘনের ভিযোগ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, চীন তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে।

"উত্তর সীমান্তের প্রহরারত সৈন্যদের গুলী চালাইতে নিষেধ করা হইয়াছে—এই অভিযোগকে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন যে, গত দেড় বৎসরে ভারত তাহার উত্তর-সীমান্তে রক্ষা-ব্যবস্থাকে অনেক বেশী দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে।

"প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাঁহার তিব্বতনীতি নির্ভুল, ভারতের স্বার্থরক্ষাই উহার উদ্দেশ্য। অবশ্য দশ বৎসর পূর্ব্বেই কিছুটা বিপদের আশঙ্কা করা সত্ত্বেও চীনকে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু চীন সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখে নাই। "আমার ভুল হইয়াছে এখানেই।"

"উপসংহারে শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন—"চীন মহান দেশ, বিরাট দেশ, আমাদেরই প্রতিবেশী। কিন্তু অকুতোভয়ে যে কোন চ্যালেঞ্জেরই মোকাবিলা করিতে আমরা প্রস্তুত।"

"সীমান্তে চীনা তৎপরতার যে একটিমাত্র সংবাদ প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় জানান নাই বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা হইল, আকসাই চীন এলাকায় চীনের সড়ক নির্ম্মাণ সংক্রান্ত। না জানানর কারণ সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হইতে চাহিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত নেহরু এই সওয়াল-জবাবের ব্যাপারে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আশ্বস্ত হইবার কিছুই নাই। তবে বিপক্ষ দলের অভিযোগে যদি তাঁহার কোনও জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে তবে তাহা আশার কথা। আচার্য্য কৃপালনীর উদ্দেশ্যে যে ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তিনি তাঁহার চাটুকারবর্গকে আনন্দিত করিয়াছেন, তাহাই জগতকে বুঝাইবে যে, জবাহরলাল নেহরুর মানসিক অবস্থা ঐরূপ স্তুতিপ্রিয়তার ফলে কোন্ নিম্নস্তরে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীঅশোক মেটা এবং শ্রীবাজপেয়ী এই বিতর্কে দেশের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া আমাদের উপকার করিয়াছেন। যাহারা কংগ্রেস বলিতে বুঝে শুধু নিজ স্বার্থপূর্ত্তির উপায় মাত্র এবং দেশের ও দশের প্রতিনিধিত্বের কর্ত্তব্য বলিতে বুঝে পণ্ডিত নেহরুর—বা অন্য কোনও বড়কর্ত্তার—চাটুকারবৃত্তি, সেই অপদার্থদিগের এইরূপ বিতর্কে কোনও চেতনার উদয় হয় নাই নিশ্চয় কেন না তাহা অসম্ভব। তবে পণ্ডিত নেহরুর দেশপ্রেম সম্বন্ধে, কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই, অবকাশ আছে তাঁহার পরামর্শ-দাতাদিগের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে, এবং আছে পণ্ডিত নেহরুর সে বিষয়ে চৈতন্যোদয় বিষয়ে। দেশরক্ষা ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরু মনে করেন—অন্ততঃ এই ঘৃণ্য ও নীচ চাটুকারমণ্ডলী নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিতে সদাই ব্যস্ত—যে তিনি দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন। সে ধারণা কত ভুল সে কথা এই বিতর্কে চিন্তাশীল লোক মাত্রেই জানিয়াছে এবং সেই সঙ্গে জানিয়াছে কূটনৈতিক জগৎ।

প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর "সাফাই গাওয়া" কিছুমাত্রও সফল হয় নাই। এই অতি-বুদ্ধিমান বাচালও সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি যে প্রতিরক্ষা বিষয়ে অযোগ্যতার পরিচয় চতুর্দ্দিকে দিয়াছেন ও দিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। পণ্ডিত নেহরুর এবং আরও অনেক কংগ্রেসী ধুরন্ধরের—কপালের ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের—এই দোষ যে নিজের দেশের কোনও নিঃস্বার্থ ভদ্রলোক তাঁহার কাছে যাইতে পারে না, কেননা নীচ চাটুকারের সংস্পর্শে দিবারাত্র থাকায় তাঁহাদের অনেক প্রকার অসৌজন্য ও অভদ্র ব্যবহারের অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে স্বার্থান্বেষী ও কুটিল লোকের হাতে পণ্ডিত নেহরু নিত্য নিয়ত পড়েন—যেমন এই প্রতিরক্ষা ব্যাপারে।

বিরোধী দলগুলি এই ব্যাপারে দেশের উপকার করিয়াছে। শুধুমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

## গোয়া

গোয়ার পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় নাই। পণ্ডিত নেহরু লোকসভায় ঐ পরিস্থিতি "অসহ্য" বলিয়াছেন এবং ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থায় কোন ফল না হওয়ায় এখন "অন্য ব্যবস্থা" গ্রহণ করা হইবে। সামরিক প্রস্তুতি বিষয়ে অনেক সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে এবং কোন কোনও সংবাদপত্রে সংবাদ ও গুজব মিশাইয়া উত্তেজনাজনক সংবাদ ফলাও করিয়া পরিবেশন করিতেছেন।

জানি না এ বিষয়ে সত্যাসত্য কতটা কি, তবে একথা নিশ্চয়, যে গোয়াবাসীরা ভারতীয় এবং তাহাদের জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করার জন্য ভারত সরকারের দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল অনেক পূর্ব্বেই। ভারতে পর্তুগালের মত অনুন্নত দেশের উপনিবেশ থাকিবে একথা শুনিতেও গ্লানিকর।

এই প্রসঙ্গ লিখিবার সময় একটি সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ব্রেজিল রাষ্ট্রের দূত পর্তুগাল সরকারের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে মধ্যস্থের কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এবং একথাও লেখা হইয়াছে যে, ভারত সরকার শুধুমাত্র একটি সর্ত্তে কথাবার্ত্তা বলিতে রাজী আছেন, যথা, পর্তুগালের ভারতীয় উপনিবেশ ছাড়িয়া দেওয়া! ঐ সর্ত্তে পর্তুগাল রাজী হইবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কেননা তাহার ধারণা যে, তাহার পিছনে পশ্চিমের অনেক কয়টি প্রবল রাষ্ট্র সাহায্য করিতে দাঁড়াইবে। তাছাড়া আমাদের প্রতিবেশী ত সকল সময়েই প্রস্তুত ভারতের অনিষ্ট ও ভারতের শত্রুতা করিতে এবং এ ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বেই পর্তুগালকে সাহায্য করিতে প্রস্তুতি জানাইতে তাঁহাদের পক্ষ হইতে ত্রুটি হয় নাই।

গোয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও নানা গুজব সম্প্রতি এখানের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে সেগুলির মধ্যে শুধু এইমাত্র সঠিকভাবে বুঝা যায় যে, পর্তুগাল গোয়ায় অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশের আয়োজন দ্রুত করিয়া চলিয়াছে। সে আয়োজন বিষয়ে নানা কথার মধ্যে বুঝা যায় যে, সংঘর্ষের সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহা পর্তুগাল বুঝিয়াছে।

এই অবস্থার পরিণতি কিভাবে হইবে কেহই জানে না, তবে গোয়ার স্বাধীনতা প্রায় নিশ্চিতের পর্য্যায়ে আসিয়াছে।

সামান্য উদ্বেগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। লণ্ডনের সংবাদে সম্প্রতি জানা যায় যে, "গোয়ার ব্যাপার লইয়া ভারত বলপ্রয়োগ করিবে না বলিয়া ব্রিটেন ভারতের নিকট আন্তরিক আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

"ব্রিটেন পর্তুগাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকটও সংযম রক্ষার জন্য আবেদন জানাইয়াছে এবং প্ররোচনা বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিয়াছে।

"ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, গোয়ার সংঘর্ষ আসন্ন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

"লণ্ডনস্থ পর্তুগীজ রাষ্ট্রদূত 'লর্ড প্রিভিসীলের' (উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এডোয়ার্ড হীথ) সহিত গতকল্য সাক্ষাৎ করেন। 'লর্ড প্রিভিসীল' গোয়ায় যে উত্তেজনা দেখা দিয়াছে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।"

নয়াদিল্লীতে ব্রিটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কূটনৈতিক বাক্যালাপের বিষয়ে লিখিবার সময়ে জানা গিয়াছে যে, "মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীজন গলব্রেথ নয়াদিল্লীতে শ্রীদেশাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। করাচি যাত্রার প্রাক্কালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া গিয়াছিলেন।

"ভারতে ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যর পল গোরবুথও প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোয়ার ব্যাপারে তাঁহার সরকারের উৎকণ্ঠার কথা জানান। তিনি বলেন যে, গোয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে ব্রিটেন সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে।

"প্রকাশ, পর্তুগালও ব্রিটেনকে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

"নিউইয়র্ক টাইমস" গোয়ার গণভোট গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

"পত্রিকাটি বলিয়াছেন—ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে গোয়া-দখল মোটেই দুষ্কর নয়, কিন্তু পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যে ভাবে বড় বড় নানা বিরোধ হিমসিম খাইতেছে, ছোটখাট যুদ্ধও এখন পরিহার করা কর্ত্তব্য।

"সমস্যা সমাধানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উদ্দেশে লণ্ডনের প্রায় সকল সংবাদপত্রই কিছু না কিছু পরামর্শ দিতেছে।

"'দি টাইমস' পত্রিকা লিখিয়াছে 'গোয়ার ব্যাপারে শ্রীনেহরু যে কিরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছেন, তাহা কমন-ওয়েলথের ভিতরের ও বাহিরের দেশগুলি বেশ বুঝিতে

"'দি টাইমস' আরও লিখিয়াছে, 'গোয়া এখন ভারতের এক রাজনৈতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে শ্রীনেহরু যেন তাঁহার কর্তৃপক্ষকে গোয়ায় নতুন করিয়া রক্তপাত ঘটানো হইতে নিবৃত্ত করেন।"

অন্যদিকে মার্কিন সংবাদপত্রে গোয়া সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর আস্ফালন বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক কথাও লেখা চলিতেছে যাহার মর্ম এই যে, এই উত্তেজনা চীনের আক্রমণ লইয়া হয় নাই কেন ?

চীনের ব্যাপারে ভারতের মান-ইজ্জত বিদেশে যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা ঐ সকল মন্তব্যে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। কিন্তু একথাও সত্য যে, এতদিন না ব্রিটেন না মার্কিন কাহারও গোয়ার ব্যাপারে কিছু টনক নড়ে নাই। এখন যখন সামরিক সংঘর্ষ আসন্নপ্রায় তখন দেখা যায় যে, ঐ দুই দেশই সালিশ করার জন্য তৎপরতার একশেষ দেখাইতেছেন। তবে সবকিছুই নির্ভর করিতেছে পর্তুগালের সরকারি দলের মনোবৃত্তির উপর। গোয়া রাখার চিন্তা যদি এখনও তাহারা আঁকড়াইয়া থাকে তবে যুদ্ধ ছাড়া উপায় দেখা যায় না।

## গোয়ার ভিতরের কথা

এখন ক্রমশঃ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, গোয়াতে ভারত গবর্ণমেন্টের পর্তুগীজের শত অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার কারণ কি। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ব্রিটিশের হুমকি ও কিছু কিছু আমেরিকানের পর্তুগাল প্রীতি। ভারত সরকার ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না যে, গোয়া হইতে পর্তুগালকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তাহাতে ভারতের এই দুই 'বন্ধু'র বন্ধুত্ব কতটা শত্রুতায় পরিণত হইবে। ব্রিটিশ প্রায় খোলাখুলি ভাবেই জানাইয়াছেন যে, পর্তুগালকে সামরিক উপায়ে গোয়ার সাম্রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করিলে তাহারা ভারত সরকারের সেইরূপ কার্য্যের সমর্থন ত করিবেনই না, বরং তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহারা ঐরূপ অবস্থায় পর্তুগালকে সাহায্য করিতেও বাধ্য হইতে পারেন। ব্রিটিশের নিকট কমনওয়েলথ বড় অথবা উত্তর অ্যাটলাণ্টিক সামরিক সন্ধি বড় ইহা ঠিক পরিষ্কার নাই। বিশেষ করিয়া কমন-ওয়েলথের যদি কোন "কালো" সভ্যের সহিত "নেটো" সামরিক দলের কোন "শাদা" সভ্যের ঝগড়া হয় তাহা হইলে বিষয়টা সত্য সত্যই জটিল হইয়া দাঁড়ায়। বহির্ভূত ও আন্তর্জ্জাতিক নীতির ক্ষেত্রেও বর্জ্জিত, তাহা হইলেও গোয়া পর্তুগালের অংশ কি না অথবা তাহা পর্তুগালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশ মাত্র, এই জাতীয় আলোচনা তর্কের খাতিরে উত্থাপিত করা বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিতে অজানা নহে। কূটতর্ক ও কূট রাজনীতি পরস্পর সংযুক্ত এবং ব্রিটিশ ইতিহাসে এই দুইয়ের একত্র আবির্ভাব বহুবার লক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকা অবশ্য কূট রাজনীতিতে ব্রিটিশের সমকক্ষ নহেন। তাঁহারা বলিয়া ফেলিয়াছেন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ থাকা উচিত নহে। কিন্তু একথা বলেন নাই যে, গোয়া পর্তুগালের অংশ নহে এবং ভারতের অন্তর্গত পর্তুগীজ উপনিবেশ মাত্র, এবং গোয়াবাসীর পক্ষে পর্তুগালের সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করা সাধারণতন্ত্র অন্তর্গত স্বাধীনতাবাদের দিক দিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোন নূতন নীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে তখনই বিশ্ববাসী স্বীকার করিয়াছেন যে, সে নীতি সর্ব্বদেশে গ্রাহ্য হওয়া উচিত। সুতরাং যদি ব্রিটিশের পক্ষে ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত হইয়া থাকে তাহা হইলে পর্তুগালকে গোয়াতে নিজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেওয়া ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ। ফ্রান্সও নিজ ভারতীয় সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যও ভারতে ও অন্যত্র শেষ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় পর্তুগালের জন্য অন্য নীতি অবলম্বন করা মহাজাতিদিগের পক্ষে কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত নহে। ভারতের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া গোয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত কি না তাহার বিচার দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ গোয়া ভারতের অন্তর্গত এবং সেই হিসাবে গোয়ার স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতার অন্তর্গত। কিন্তু ব্রিটিশ হয়ত গোয়াকে আর একটি ক্ষুদ্র পাকিস্তান বানাইয়া ভারতের অঙ্গে কাঁটার মত নিবিষ্ট করিতে ইচ্ছুক। ভারতও যদি নিজের অহিংসা ধর্ম্মের অভিনয় পূর্ণ রাখিতে চাহেন তাহা হইলে গোয়াতে যুদ্ধযাত্রা অসুবিধার হইতে পারে। কিন্তু ভারতের অহিংসা ধর্ম্ম কঙ্গোতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মহাজাতি সঙ্ঘের নির্দ্দেশে। সুতরাং ভারতের এই অহিংস-নীতি মহাজাতি সঙ্ঘের কথামত অদল-বদল হইয়া থাকে। এবং যেখানে মহাজাতি সঙ্ঘের কোন আদেশ ও নির্দ্দেশ নাই; যথা ভারতের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশগুলিতে; সেখানেও ভারত সরকার অহিংসা ধর্ম্ম ভুলিয়া বন্দুক ব্যবহার করিতে দ্বিধা করেন না। অর্থাৎ এই অহিংসা-নীতি সত্য-নীতি নহে, শুধু সুবিধা ও অপর জাতিদিগের সহিত ব্যবস্থার কথা। ভারতের স্বাধীনতা

হইতেছে একথা ভারতবাসীকে কে বুঝাইবে? ভারতবাসীর শিক্ষিত জনসাধারণের যদি আত্মসম্মানজ্ঞান ও স্বাধীনতাবোধ পূর্ণমাত্রায় থাকিত তাহা হইলে কংগ্রেসের পরপদলেহনপন্থা ও কম্যুনিষ্টের রুশ-চীনের দাসত্ব আহরণ চেষ্টার তাঁহারা যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু ভারতের শিক্ষিত সমাজের সুবিধাবাদ ও চালাকির পূজার নিদর্শন আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। টাকার জন্য, নাম কিনিবার জন্য আমরা সকল প্রকার সম্মান ও মর্য্যাদার হানিকর রফা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি। এই অবস্থায় যদি আমাদিগের দেশের তথাকথিত নেতাগণ আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া অথবা চীনের নিকট মাথা নিচু করিয়া বিভিন্ন প্রকার থলিতে বিভিন্ন প্রকার দান গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমাদিগের আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। আমরা নিজেরা যদি উন্নত মত, পন্থা ও নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতাম তাহা হইলে আমরা দুর্নীতিপরায়ণ জননেতাদিগকে কখনও সাহায্য করিতাম না অথবা তাঁহাদিগের কথায় টলিয়া তাঁহাদিগের দুর্নীতির সহায়তা করিতাম না। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে বলা উচিত যে, জাতীয় নেতৃত্বের ও রাষ্ট্রীয় দলগুলির দোষ-গুণের জন্য দায়ী প্রধানতঃ জাতির শিক্ষিত সমাজ। ভারতের শিক্ষিত সমাজে প্রকৃত ধর্ম্ম ও ন্যায়ের যে কোনও আদরই নাই, একথা বলা চলে না। বহু লোকের ধর্ম্ম ও ন্যায়জ্ঞান আছে কিন্তু সংগঠিত, সংযত ও মিলিতভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। যাহাদিগের মধ্যে সেই শক্তি আছে তাহারা অধিক সংখ্যায় মতলবের দাস ও নীতি তাহাদিগের মতলব হাসিল করিবার অস্ত্রমাত্র। এই কারণেই আমরা আজ পাকিস্থান, চীন ও বিশ্ব মহাজাতি সঙ্ঘের দ্বারা অপমানিত ও হুকুমের চাকর হিসাবে চালিত। অর্দ্ধ শতাব্দীকালব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়া ও লক্ষ লক্ষ লোকের সকল ত্যাগের উপর জাতীয়তা গঠিত করিয়া এই যদি পরিণতি হয় তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়াই মনে হয়।

অ

## বিশ্ববাসী হইতে শেখা

নিজের দেশে বহু অন্যায় ও অধর্ম্ম প্রকটভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও যদি কোন নেতাকে পৃথিবীর অপরাপর দেশে ধর্ম্ম ও ন্যায় স্থাপন করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে সেই প্রকার ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নিজের দেশের চুরি ডাকাইতি না থামাইয়া যদি কেহ স্বদেশের পুলিশ পাহারা বিদেশে পাঠাইয়া দিতে চাহেন, অথবা যদি নিজ দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হওয়া সত্বেও ঔষধাদি বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া গৌরব অনুভব করেন তাহা হইলে বিষয়টা সহজবোধ্য থাকে না। এই বিদেশের প্রতি ভালবাসার কারণ কি হইতে পারে? প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশ অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে এবং ক্রমাগত বিদেশে যাইবার ইচ্ছা ও বিদেশীদিগের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিবার আগ্রহও সেই বিদেশ ও বিদেশীপ্রীতিরই ফল। অপর ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশে পার্টিবাজির ফলে নেতা বিশেষের সমালোচক অনেক থাকে ও কোন কথা বলিলেই দুইটি দশটি কড়া কথা শুনিতে হইতে পারে। কিন্তু বিদেশে সকল কথাই বাহবার সহিত বিদেশীরা শুনিয়া থাকে। বাহবাপ্রার্থী লোকের পক্ষে ভিন্ন দেশ গমন সেই দিক হইতে আরামদায়ক ও সুবিধাজনক। স্বদেশে বন্ধুর অভাব নাই; তাহা হইলেও বিদেশে যাইবার প্রয়োজন কি? উত্তর: স্বদেশে দল পাকাইয়া চূড়ান্ত করা হইয়াছে। এখন বিদেশে দল বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে আরও বৃহত্তর দলের আবির্ভাব হইতে পারে। দেশনেতার পক্ষে বিশ্বনেতৃত্বের আকাঙ্খা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু দেশবাসীর পক্ষে বিশ্ববাসী হইয়া যাওয়া ততটা সহজ নহে, কারণ বিশ্বের নিকট ছোট ছোট দাবীদাওয়া লইয়া গিয়া বিশেষ কোন লাভ কাহারও হয় না। স্থানীয় জল সরবরাহ, মাছের দর অথবা ঘৃতে ভেজালের কথা ওয়াশিংটনে অথবা লণ্ডনে কেহ শুনিয়া তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিবে এ আশা করা বৃথা। ধর্ম্মতলায় পকেটমার, টালিগঞ্জে কিম্বা হাবড়ায় গুণ্ডামি অথবা শ্রীরামপুরে ডাকাতির কথা স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ডে শুনাইয়া লাভের আশা অল্পই। বড়বাজারের জুয়াচুরির মীমাংসা নিউইয়র্কে হইতে পারে না। বেকারের চাকুরি, অভুক্তের খাদ্য, গৃহহীনের বাসস্থান প্রভৃতি অভাবের কথা কাহারও পক্ষে ছয় হাজার মাইল দূরে গমন করিয়া বলা সম্ভব নহে। সেই জন্যই সাধারণ লোকে বৃহত্তর আদর্শের সন্ধানে দূর-দূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহে না। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব ও অভিযোগ যাহার, তাহার পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া তোলা স্বাভাবিক নহে।

অপরপক্ষে একথাও সত্য যে আন্তর্জ্জাতিক ঢং-এ যিনি সকল কিছু দেখিতে চাহেন, তিনি নিকটের লোকেদের ছোট ছোট নালিশ ও অভাব মিটাইতে পারেন না। টেলিস্কোপ দিয়া যেমন পুস্তক পাঠ সম্ভব হয় না; ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের নিকট যেমন কন্যার বিবাহের খরচের টাকা প্রার্থনা

করা যায় না; অতি উচ্চ আদর্শ ও অতি বড় নজর তেমনি ক্ষুদ্র ঘরোয়া বিষয়ের সহিত ছন্দে মেলে না। খাবার, বাসস্থান, বস্ত্র, ঔষধ, শিক্ষা, চাকুরি, আত্মরক্ষা কিম্বা ঐ জাতীয় বিষয় যে ক্ষেত্রে অতি বৃহৎ সমস্যা, সে ক্ষেত্রে কঙ্গোর রাজনীতি অথবা রুশ-আমেরিকার ঝগড়ার আলোচনা করিয়া কাহার কি সুবিধা হইতে পারে? পুরাতন কালের ভাষায় আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার হয় না।

ভারতের জনসাধারণের অভাব ও দুঃখদৈন্যের আলোচনা করিলে সহজেই দেখা যাইবে যে, কঙ্গোর জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অথবা নূতন নক্সার নূতন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কথা তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিতে পারে না। আমাদিগের দেশের লোকের নিকট খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব থাকা এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও লুঠপাট হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না থাকাই অতি বড় কথা এবং তাহাদিগকে খাদ্যের পরিবর্ত্তে যদি রুশিয়ার সহিত মিত্রতা অথবা আমেরিকার দরবারের গল্প পরিবেশন করা হয় তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে অসন্তোষের সূচনা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। "হিন্দি চীনি ভাই ভাই" বলিয়া নর্ত্তন করিয়া আমাদিগের কি লাভ হইয়াছে তাহা এখনও কেহ ভুলিয়া যায় নাই। সুতরাং যদি কোন জননেতা উক্ত নর্ত্তনে যোগদান করিবার কিছু পরেই চীনা বিতাড়ন পরিকল্পনার আবৃত্তি আরম্ভ করিয়া সেই খাতিরে সাধারণের সাহায্য দাবী করিতে চাহেন; তাহা হইলে তাঁহার দাবী সাধারণের নিকট গ্রাহ্য নাও হইতে পারে। যে বৃক্ষের যে মাটির সহিত শিকড়ের যোগ আছে সে বৃক্ষ স্বভাবতঃই নিজস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে ও সেখানে সকলকে ছায়া ও ফল-ফুল দিয়া আনন্দিত করে। কিন্তু যদি সেই বৃক্ষ কোন অলৌকিক প্রেরণার ফলে সচল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার শক্তি আহরণ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে শিকড় ছিন্ন হইয়া কাষ্ঠশকটে পরিণত হইতে হইবে, এবং সেই অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে তাহার জন্মস্থানের পশুপক্ষী-মানুষের সখ্য ও প্রীতিরক্ষা করা কঠিন হইবে। কারণ স্থানীয়তা একটা মহাগুণ স্থানীয় লোকের নিকট। কলিকাতার চিকিৎসক কিম্বা বোম্বাইয়ের অধ্যাপক যেমন উলুবেড়িয়ার বাসিন্দাদিগের নিকট বন্ধু ও সহায়ক বলিয়া ব্যবহারিক ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না; চিরভ্রাম্যমান পরগুণমুগ্ধ কোন পরিব্রাজক-রাষ্ট্রনেতাও তেমনি অকেজো বলিয়াই প্রমাণ হইবেন ও তাঁহাকে কোন স্থানের কোন লোকই অন্তরে অন্তরে নেতা বলিয়া চাহিবে না। যাঁহার মনপ্রাণ বহির্জগতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে ও থাকিতে চাহে—তাঁহাকে দিয়া ভারতের জনসাধারণের আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষার কার্য্য হইতে পারে এবং তাঁহার পক্ষে উচিত হইবে পররাষ্ট্রসচিবের কার্য্য করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্য্য তিনিই করিতে পারিবেন যিনি প্রধানতঃ ও মূলতঃ মনেপ্রাণে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদিগের দেশে দলবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত, উভয় ভাবেই বিদেশ ও বিদেশীয়দিগের আরাধনা করা হইয়া থাকে। দলবদ্ধ ভাবে বিদেশী সভ্যতার অনুশীলন বিশেষ দোষাবহ নহে এবং বহুক্ষেত্রে তাহা শিক্ষার অঙ্গমাত্র। অপরের ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্য, নৃত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, প্রভৃতির চর্চ্চা জাতীয় সভ্যতাকে উন্নত করে এবং জগত সভ্যতার পূর্ণতর বিকাশেও সাহায্য করে। কিন্তু এই যে অপরের কৃষ্টি উপভোগের ব্যবস্থা ইহার জন্য অপর দেশের রাষ্ট্রনেতাদিগের তোষামোদ ও অপর দেশের ব্যবসায়ীদিগকে (খাল কাটিয়া) নিজ দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনার কোনও প্রয়োজন হয় না। বরং ইহাতে উল্টাফল হইতেই দেখা যায়। কারণ রাষ্ট্রনেতা ও মহাজনদিগের মধ্যে কৃষ্টির প্রকাশ বিশেষ লক্ষিত হয় না এবং ঐ জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ-পরিচয় গভীর হইতে আরও গভীরে পৌঁছাইলে, সভ্যতা বিনিময় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে আরম্ভ করে। আমাদিগের দেশের রাষ্ট্রনেতা এবং ধনপতিগণ আমাদিগের সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতীক বলিয়া পরিচিত নহেন। রাষ্ট্রীয় দপ্তর ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলিতে শিল্পকলা, সাহিত্য সঙ্গীতের স্থান কোথায়? সেইজন্য রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসাগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের সহিত মেলামেশা করার সহিত সভ্যতা বিনিময়ের কোন সম্বন্ধ নাই। এবং ঐ সকল ক্ষেত্রের "অতিগুরু" লোকেদের দেশ-বিদেশে ঘোরাফেরার ফলে ভবিষ্যৎ ঝগড়ার বুনিয়াদ গঠিত হয় মাত্র। কারণ সাংসারিক বিষয়াসক্তিসংক্রান্ত যোগাযোগ হইতেই বিবাদের জন্ম হয়। এইজন্য মিত্রতার অভিযান রাষ্ট্রীয় অথবা বাণিজ্যের পথে চালিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা দলবদ্ধভাবে "আদর্শ" বিনিময় করিয়া নিজেদের ও জগতের সকলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে যত্নবান হন, তাঁহাদিগকে আমরা মধ্যযুগের "পূত"-রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও আধুনিক রুশীয়-ইউগোস্লাভ-চৈনিক-অ্যালবানী রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিতে বলি। ইহা করিলে দেখা যাইবে যে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া অথবা পরের পুকুরে জাল ফেলা

উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। সকলে মিলিত হইয়া থাকা এক পরিবারের লোকেদের পক্ষেই সম্ভব হয় না; সুতরাং দূর-দূরান্তরে প্রাণের বন্ধু খুঁজিয়া বেড়ান মূর্খেরই শোভা পায়। দলবদ্ধভাবে পরসখ্যসাধনা সুতরাং বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কোন মতলব সিদ্ধির জন্য কেহ কেহ লোক জুটাইয়া ঐরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে শেষ অবধি মতলব সিদ্ধিও হয় না এবং দেশের বিশেষ ক্ষতিই হইবার সম্ভাবনা হয়। যাঁহারা দল পাকাইয়া নিজ দেশবাসীদিগকে অপর দেশের প্রতি নির্ভরশীলতা শিখাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে মতলবেই তাহা করুন না কেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের ফল দেশের ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় কোন নূতন আদর্শের অনুসরণ, ঋণ করিয়া অর্থ আহরণ অথবা সন্ধিস্থাপন; উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, অতিরিক্তমাত্রায় পরমুখাপেক্ষী কখনও সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। ভারতে এক সময়ে "সায়েব হওয়ার" একটা যুগ আসিয়াছিল। তখন বহুলোকে নিজভাষা, নিজকৃষ্টি, নিজ-চালচলন ত্যাগ করিয়া কষ্ট-কল্পনা ও কৃচ্ছ্রসাধনের সাহায্যে সায়েব হইবার চেষ্টা করিতেন। আজ অনেকে ঐরূপ নিন্দনীয় আগ্রহেই আমেরিকান, রাশিয়ান এমনকি চীনা হইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইতেছেন। ইহা এই স্বাধীনতা-প্রয়াসের দেশে বড়ই আশ্চর্য্য। রাষ্ট্রীয় দলগুলির নির্লজ্জ মতলব ও সুবিধাবাদই এই সকল চেষ্টার মূলে রহিয়াছে। কিন্তু যেহেতু আমাদিগের রাষ্ট্রীয় দলের "অতিগুরু" ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তা খুব উচ্চাঙ্গের নহে সেইজন্য অপর দেশের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে আমাদিগের লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনাই প্রবলতর। এখন অবধি এই জাতীয় ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ়তর করিয়া আমরা শুধু অত্যধিক মূল্যে অপেক্ষাকৃত কর্ম্মের অযোগ্য যন্ত্রাদি ক্রয় এবং শহরে শহরে নিষ্কর্ম্মা শ্রমবাদীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সমালোচনা শতকরা একশত ভাগ সত্য না হইলেও অধিকাংশে সত্য একথা নিঃসন্দেহ এবং অভ্রান্ত। যন্ত্রবিজ্ঞান, কারখানা গঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদিগের ততটা না থাকায় আমরা অপর দেশের যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল তাঁহাদিগের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতে পারি; কিন্তু সেই সাহায্য লওয়ার জন্য মাহিনা দিয়া লোক নিযুক্ত করিলেই হইতে পারে। তাহার জন্য দেশের সম্পদ বন্ধক দিয়া বিদেশে কর্জ্জ করিয়া ও দেশবাসীকে মাশুল খাজনা রাজকরের দাবীতে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া একটা বিরাট অশান্তি, অসুবিধা ও দেশব্যাপী অভাবের সৃষ্টি করার আবশ্যক হয় না। হইয়াছে, ক্ষুদ্র দলগত মতলব হাসিল ও বিদেশীপ্রীতির বাহুল্য হেতু। ইহার জন্য দায়ী কয়েকজন দলপতি। সাধারণতন্ত্রে সাধারণের মতের কোন মূল্য নাই ভারতবর্ষে। জনমত বলিতে দলমত বুঝিতে হইবে এবং দলমত বলিতে কয়েকটি মাত্র দলপতির মতই বুঝিতে হইবে। এইজন্য দলবদ্ধভাবে মত প্রচার ও পোষণের অর্থ এই দেশে কয়েক ব্যক্তির গোঁয়ার্তুমি, কষ্টকল্পিত আদর্শবাদ ও ধার-করা রাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাস। এই জাতীয় মতবাদের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব অথবা বাঞ্ছনীয় নহে।

ব্যক্তিগত বিচারে কাহার কি ভাল লাগে তাহা কেহ নিয়মবদ্ধ করিতে পারে না। খাদ্য, বস্ত্র, সঙ্গ, সখ, আকাঙ্ক্ষা ও মনের আবেগ সকলের নিজের নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুবর্ত্তী হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এই দিক দিয়া যে-কোন অতিগুরু বা অল্পগুরু ব্যক্তি যথেচ্ছা আত্মমত অনুসারে চলিতে পারেন। স্বাধীন মানুষের অধিকার ইহাই। কিন্তু নিজে বিদেশে বিবাহ করিলে দেশবাসী সকলেই বিদেশী বিবি আহরণ করিতে বাধ্য হইবেন, একথা অতিবড় অন্যায় কথা। নিজেদের মতামত, অভিলাষ, আগ্রহ দেশবাসীর স্কন্ধে চাপাইবার অধিকার কোন জননেতার থাকা উচিত নহে। আমরা কিন্তু নেতাদিগের অনেক অন্যায় ও যথেচ্ছাচার সহ্য করিয়া থাকি। ইহা গুণ নহে, অতিবড় দোষ।

অ

## রেলওয়ে দুর্ঘটনা নিবারণ

মানুষ যদি নিজের কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে পালন না করে এবং সেই কর্ত্তব্যের সকল খুঁটিনাটির প্রতি সকল সময়ে দৃষ্টি না রাখে, তাহা হইলে এই অবহেলা ও গা-ঢিলা দিয়া যেমন তেমন করিয়া কাজ শেষ করার ফল সর্ব্বদাই বিশেষ বিপদজনক ও হানিকর হয়। রেলওয়ের কার্য্য যাঁহারা চালাইতেছেন, উপর হইতে নীচ অবধি, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কার্য্যে শ্রদ্ধা যে নাই তাহার প্রমাণ শুধু প্রাণহানিকর বড় বড় দুর্ঘটনা হইতেই পাওয়া যায় না; নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য চালনার মধ্যেও দেখা যায় যে, রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ শুদ্ধ আগ্রহে শ্রদ্ধার সহিত নিজেদের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিতে চাহেন না। সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, রেলওয়ে ট্রেন সময়ে চলিতেছে না, গাড়ীগুলি পরিষ্কার নহে এবং ভাঙ্গাচুরা। রেলওয়ের প্রহরীগণ অর্দ্ধ-সুপ্ত অর্দ্ধ-জাগ্রত এবং চুরি খুন ইত্যাদি রেলওয়েতে অহরহ হইতেছে। ষ্টেশনগুলি অত্যন্তই নোংরা এবং জল,

খাদ্য প্রভৃতি অপরিষ্কার ও খারাপ ভাবে প্রস্তুত। ট্রেনে স্থানলাভ প্রায় অসম্ভব এবং ঘুষঘাস চলে বলিয়া মনে হয়, রেলওয়েতে যাতায়াত নানা কারণেই অসন্তোষকর। অর্থাৎ রেলওয়ের সাধারণ পরিচালনা হইতেই বুঝা যায় যে, তাহার কর্মী ও ওপরওয়ালা কাহাকেও বিশেষ প্রশংসা করিবার কিছু নাই। তাঁহারা ওপর হইতে নীচ অবধি কোনপ্রকারে বেগারঠেলা ধরনে কাজ চালাইয়া চলেন ও তাঁহারা যাহা করেন তাহা অপেক্ষা উন্নততর ভাবে কাজ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনটিই নাই। তাহা হইলে মাঝে মাঝে যে রেলওয়েতে বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কারণ যেখানেই কর্ম্মে অবহেলা আছে ও উত্তমরূপে কার্য্য করিবার কোনও চেষ্টা নাই, সেখানেই বৃহৎ ভাবে কিছু একটা ঘটিয়া যাওয়া শুধুমাত্র যোগাযোগের কথা। বহু লোকের সমবেত কর্ম্মে অনিচ্ছার ফল সর্ব্বদাই বিষময়; এবং শ্রীজগজীবনরাম যতই নিরামিষ ভোজন, মদ্যপান-বর্জ্জন ও হাতজোড় করিয়া ধর্ম্মের কথা বলা অভ্যাস করুন না কেন, তাঁহার অধীনে যে সকল ব্যক্তি কাজ করেন তাঁহারা ক্রমশঃ কর্ম্মে অপারগ হইতে হইতে বর্ত্তমানে কার্য্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে নিম্নতম স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন রেলওয়ের মন্ত্রীত্ব হইতে শ্রীজগজীবনরামের অবসর গ্রহণ করা এবং তাঁহার স্থলে কোন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা। যিনি কোন কার্য্য করিতে অপারগ, তাঁহার নিকট কাজ অথবা অকাজের প্রতিকার কিছুই আশা করা ভুল। কংগ্রেস রাজত্বে বহু কর্ম্মক্ষমতাহীন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় দল সংগঠনের জন্য উচ্চ উচ্চ পদে বসান হইয়াছে এবং তাহার ফলসর্ব্বত্রই বিশেষ ক্ষতিকর হইয়াছে। বিগত চৌদ্দ বৎসর ইহা দেখিয়াও কংগ্রেস নিজেদের জাতীয় অবনতিকর পন্থার কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। বর্ত্তমানে শতাধিক লোকের প্রকটভাবে প্রাণহানি হওয়াতে রেলওয়ে মন্ত্রীর দরবারে নাড়াচাড়া পড়িয়াছে; কিন্তু অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা যদি গোল হইয়া বসিয়া কর্ম্ম কি করিয়া যথাযথ ভাবে সিদ্ধ হয় এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে কি সে মীমাংসা নিশ্চয় হইবে বলিয়া মনে হয়? না ওয়াই অধিক সম্ভব এমন কি প্রায় নিশ্চয়। প্রথমতঃ কর্ম্মে যাহারা অপারগ তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইলে সকল কিছুই অচল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগের প্রতিকার বিচক্ষণ চিকিৎসকের দ্বারাই সম্ভব। রুগী নিজে নিজের রোগ সারাইতে সচরাচর পারে না। জগজীবনরামও সেইরূপ নিজের কার্য্যের ত্রুটি নিজে দূর করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ হইতে বিদায় দেওয়া প্রয়োজন।

ভারত সরকারের সকল বিভাগেই কর্ম্মে অক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ডাক ও তার বিভাগ আর একটি বড় উদাহরণ। এখানে অবশ্য চিঠি ও তার বহু বিলম্বে পাইলে কাহারও অপঘাত মৃত্যু হয় না; সেই জন্য কথাটা বিশেষ আলোচিত হয় না। কিন্তু এইভাবে সামাজিক মঙ্গলকারক এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান ঢিমে-তালে চালাইয়া পরোক্ষভাবে জাতির কতটা লোকসান হইতেছে তাহার বিচার কে করিবে? কোর্ট পুলিসের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অল্পে শেষ করা সম্ভব হইবে না। এই দুই বিভাগে কতশত কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া কংগ্রেসরাজ যত অল্প কাজ পাইতেছেন, তাহার তুলনা পাওয়া যায় না এই দুনিয়ায়। ভারতের সকল মিউনিসি-প্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, পি. ডব্লিউ. ডি., ট্যাক্স-মাশুল আদায় বিভাগ এবং নবগঠিত ব্যবসায়ী কর্পোরেশনগুলি দেখিলেও ঐ এক কর্ম্মক্ষমতাহীনতাই উৎকট ভাবে দৃষ্ট হয়। অ

## পর্তুগাল ও আমেরিকা-ব্রিটেন

পূর্ব্বপ্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পরের খবর অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকা পর্তুগালকে চাপ দিয়া শান্তির পথে গোয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। ইহা সত্যসত্যই শান্তি ও গোয়ার গোলযোগের মীমাংসার জন্য করা হইতেছে অথবা হাতে সময় পাইয়া পর্তুগালের যুদ্ধের ব্যবস্থা পূর্ণতর করিবার সুবিধা সৃজনের জন্য, তাহা বলা যায় না। ব্রিটেন না কি পর্তুগালকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা উভয় জাতির মধ্যে বহু পুরাতন সন্ধি থাকিলেও, বর্ত্তমান ভারত-পর্তুগাল দ্বন্দ্বে কোন সৈন্য দিয়া পর্তুগালকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র দিবেন কি না একথা বলা হয় নাই। ব্রিটেন পর্তুগালের মামলা জাতি সঙ্ঘের দরবারে শুনাইবার জন্য উঠাইতে পারেন বলিয়া জানাইয়াছেন। মামলাটা কি তাহা আমরা ঠিক জানি না। সম্ভব এই যে, ভারত সরকার গোয়াবাসীদিগকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করিতেছেন ও গোপনে প্ররোচিতও করিতেছেন। কিন্তু কথাটা হইতেছে যে, যদি গোয়াতে পর্তুগালের সাম্রাজ্য বজায় রাখিবার জন্য অবাধে সৈন্য প্রভৃতি বাহির হইতে আসিতে পারে, তাহা হইলে স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সাহায্যের জন্য ভারত হইতে

সৈন্য যাইতে পারে না কেন? অর্থাৎ পর্তুগাল ও ভারত এই দুই দেশের কোনটিই গোয়াতে সৈন্য পাঠাইবেন না অথবা পাঠাইবেন; যেমন ব্যবস্থা হয়। সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ একথা কখনও বলিতে পারেন না যে সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক মূল্য স্বাধীনতাবাদের অপেক্ষা অধিক। সুতরাং হয় সকল বাহিরের লোক (পর্তুগীজ ও ভারতবাসী) গোয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউন; নয় সকলে সমাধিকারে তত্র গমন করিয়া নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুন। ভারতের মাটিতে (ভৌগোলিক) ভারত অপেক্ষা পর্তুগালের অধিকার বেশি হইতে দেওয়া ন্যায়ত গ্রাহ্য নহে।

অ

## সম্মুখে নির্ব্বাচন যুদ্ধ

অতি নিকটেই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব। এই সময়ে বহুলোকই ভোটের জন্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। অধিকাংশেরই কোন বিদ্যাবুদ্ধি অথবা সদ্‌গুণ থাকিবে না, শুধু পার্টির নামে তাঁহারা সাধারণের নিকটে আসিয়া ভোট চাহিবেন। পার্টিগুলিও মোটামুটি বলিতে গেলে নিষ্কর্ম্মা এবং দুর্নীতিপরায়ণ। কংগ্রেস সাধারণের নিকট রাজকর ও মাশুল হিসাবে যত সহস্র কোটি টাকা আদায় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তাঁহারা উপযুক্তপ্রমাণ সমাজ সেবার ও অপরাপর সমাজ হিতকর কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া কেহ মনে করে না। অপব্যয় ও অন্যায়ভাবে সাধারণের অর্থ পরহস্তগত হইতে দেওয়া কংগ্রেসের প্রধান অপযশের কথা। চুরি, ডাকাইতি জুয়াচুরি এবং নীচ কার্য্য দেশে বাড়িয়াই চলিয়াছে। কংগ্রেস তাহার প্রশ্রয়দাতা বলিয়াই অনেকে মনে করেন। কম্যুনিষ্টপার্টি দেশের শত্রু জাতিদিগের গুপ্ত সহায়ক বলিয়া পরিচিত। বাকী পার্টিগুলি অকেজো। এ অবস্থাতে যাঁহারা পার্টির সহিত যুক্ত নহেন তাঁহাদিগের মধ্যেই বাছাই করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দেশবাসীর কর্তব্য।

অ

## শ্রীশচন্দ্র সরকার (হাবুল সরকার)

হাবুল সরকারের মৃত্যুতে ভারত একজন অতি বড় খেলোয়াড়কে হারাইলেন। শুধু খেলোয়াড় নহেন, হাবুল সরকার চিরকুমার থাকিয়া দীর্ঘকাল খেলার মাঠের যুবকজনের গুরু ও প্রেরণাদাতা বলিয়া আদৃত হইয়াছেন। তিনি ভদ্রতা, নীতিজ্ঞান ও ক্রীড়াক্ষেত্রের সাধনার প্রতীক ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শীল্ড বিজয়। মোহনবাগানের দলে তিনি ফরওয়ার্ড খেলিয়াছিলেন। হকিতে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দিগের মধ্যে একজন ছিলেন। ক্রীকেটে তাঁহার যশ বহু উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছিল ও টেনিসেও তাঁহার নাম বিখ্যাত ছিল। এই সর্ব্ব ক্রীড়া-বিশারদ ব্যক্তি কলিকাতার ময়দানে আর আসিবেন না ইহা ভাবিয়া সকল খেলোয়াড়ই শোকার্ত্ত। ইঁহার মধুর স্বভাব সত্যের আরাধনা ও সকল বিষয়ে নিষ্ঠা ভারতের যুবকজনের অনুকরণীয়। মৃত্যুকালে হাবুল সরকারের বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর। ইনি এই বয়সেও ছেলেদের ক্রীকেট খেলার শিক্ষার জন্য নিজে খেলার মাঠে নামিতেন।

অ

## অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গত ৫ই ডিসেম্বর অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ পরলোকগমন করিয়াছেন। শুধু অধ্যাপক বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে ভুল করা হইবে। জীবনের বহুক্ষেত্রে তাঁহার গভীর আগ্রহ এবং সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সঙ্গীত, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রায় গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে বাঙালীর চিন্তাজগতের এক বহু-আলোচিত ও গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল।

১৮৯৪ সনে ধূর্জটিপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায় একজন আইনজীবী ছিলেন। হেয়ার স্কুল ও বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৯০৯ সনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার কলেজী শিক্ষা হয় সেণ্টজেভিয়ার্স ও রিপণ কলেজে। ১৯১৩ সনে তিনি ইংরেজী অনার্সে প্রথম হন। ইহার পর তিনি ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। পরে কিছুদিন তিনি বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২২ সনে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ও ১৯৫৪ সনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কৃতবিদ্য পণ্ডিতের অভাব নাই। হৃদয়বান ভদ্রলোকও দেশে অনেক আছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হৃদয়-মাধুর্য্যের, জাগ্রত রস-জ্ঞানের সঙ্গে বাকপটুতার সমাবেশ হইলে মানুষ যে কতখানি আকর্ষণীয় হইতে পারেন, ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তাহারই উদাহরণস্থল এবং যাঁহারা তাঁহার

সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একথা স্বীকার করিবেন, একালে বাংলা দেশে অনেক হিসাবে তিনি ছিলেন অনন্য। বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ও অত্যাশ্চর্য্য নানা অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে যদিও তাঁহার জীবন সমৃদ্ধ, কিন্তু তাহাতে বৃহৎ মানুষটির সন্ধান মিলে না। তাঁহার সত্যকার পরিচয় ছিল তাঁর মননশীলতায়। তাঁহার আরও বৈশিষ্ট্য ছিল, পাণ্ডিত্য তাঁহার মাথায় ভার হইয়া চাপে নাই, তা তাঁহাতে আনিয়াছিল জীবন্ত গতিবেগ। তাই তাঁহার ছিল একটি সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন, আর এই জন্যই পণ্ডিত হইয়াও তিনি ছিলেন শিল্পী।

তিনি অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তার মধ্যে তিন খণ্ডে সমাপ্ত অন্তঃশীলা, আবর্ত্ত, মোহানা উপন্যাসই প্রধান। আজ বাংলা দেশ একজন বিশিষ্ট মনস্বী পণ্ডিতকে হারাইল এবং তাঁহার স্থান বাঙালীর চিন্তা-জগতে বহুদিন অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে লিখিত—ও সাপ্তাহিক "অমৃতে" প্রকাশিত—তাঁহার লেখায় বুঝা যায় যে, তাঁহার চিন্তা ও কল্পনার জগতে বিচারের শক্তি, সবল ও সরস রহিয়াছে তবে নিদারুণ রোগে জীর্ণ ও দগ্ধ শরীরের শেষদশা আগতপ্রায়। এই অবস্থাতে তাঁহার মানস-চিত্রপটের বিভিন্ন দৃশ্যের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার অভাব যেন আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

## সরলাবালা সরকার

গত ১লা ডিসেম্বর বিশিষ্ট সাহিত্যিক সরলাবালা সরকার পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৭৫ সনের ১০ই ডিসেম্বর গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের কাঁঠালপোতা গ্রামে সরলাবালা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের প্রথম পাঠ তিনি পান পিতা কিশোরীলাল সরকারের নিকট হইতে। পরবর্ত্তী জীবনের বিদ্যাভ্যাস হয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ ডাক্তার সরসীলাল সরকারের নিকট।

সরলাবালা ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেপথ্য প্রেরণাদাত্রী। সেই সময়কার বিপ্লবী বাঘা যতীন, মানবেন্দ্র রায় তাঁহার নিকট আশ্রয় পান, একথা তিনি তাঁহার জীবন-কথায় বলিয়া গিয়াছেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার কাব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৯৪ সনে ১২ বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের তিনি ছিলেন ভাগিনেয়ী।

উনিশ শতকের বাংলা দেশের এই মেয়েটি পরম নিরিবিলিতে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে আপনাকে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত করিয়া তুলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাঁহার দেশপ্রীতি ও সাহিত্যানুরাগ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অটুট ছিল। তাঁহার বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—বিশেষ করিয়া ভারতী, বালক, প্রদীপ, প্রবাসী ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৫৩ সনে গিরীশ-চন্দ্র ঘোষ লেকচারার নিযুক্ত করেন।

## গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাস

গত ৫ই নভেম্বর গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাস পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি ছিলেন প্রবাসী অফিসের একজন সাধারণ কর্ম্মচারী। কিন্তু সাধারণ হইয়াও তিনি যেভাবে ৩৫ বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত 'প্রবাসী'র সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। তিনি খুব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সুদক্ষ হাতের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

১৯২৮ সনে বাঁকুড়া জেলার জামতাড়া গ্রামে এক দরিদ্র কায়স্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা করেন, কিন্তু সে কাজ তাঁহার ভাল লাগে না। অতঃপর ১৯২৬ সনে প্রবাসী অফিসে যোগদান করেন। সেই হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটানা ৩৫ বৎসর কাজ করিয়া গিয়াছেন। এইদিক দিয়া তাঁহার এই আদর্শের তুলনা হয় না। তিনি নির্বিরোধী ও অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু আকস্মিক নয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

# রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"দু'একটা লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করে কি হবে। তার চেয়ে মানুষের সেবা কর্। দুর্ভাগাদের ভালবাস্। জীবন সার্থক হবে।"

১৯৩২ সনের অক্টোবর মাস। মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের অব্যবহিত পরের ঘটনা।

পূর্ববঙ্গে অনুন্নত জনগণের উন্নয়নের জন্য আর্যসমাজ বিশ্বভারতীর কাছে কর্মী চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে সে কথা জানালাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন—"তুই যা।"

আমি তখন বিদ্যাভবনের গবেষক বিদ্যার্থী। সংস্কৃতের লুপ্তগ্রন্থ তিব্বতী ভাষা থেকে উদ্ধার করছি—সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি।

মন স্থির করতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগল। তার পর গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে বেরিয়ে পড়লাম।

কলকাতায় আর্য সমাজের কার্যালয়ে গেলাম—রবীন্দ্রনাথের পত্র নিয়ে। কার্যাধ্যক্ষ বললেন—"হয় সমস্ত দেশ ঘুরে আপনি আপনার কর্মস্থল বেছে নিন, নয় কোন এক জায়গায় ব'সে প'ড়ে কাজ আরম্ভ করে দিন। যা আপনার ইচ্ছা।"

পুনরায় গুরুর উপদেশের প্রয়োজন হ'ল। রবীন্দ্রনাথ তখন খড়দহে। গঙ্গার তীরে তাঁর দোতলা বাড়ী। গঙ্গার উপর তাঁর 'বোট' পদ্মা।

তিনি আমায় এক রাত আট্‌কে রাখলেন। বললেন, "আজ থাক্। কাল সকালে কথা হবে।"

দোতলার উপরে চিলেকোঠায় রাত কাটালাম। কি সুন্দর দৃশ্য! প্রায় সারারাত জেগে কাটল।

সকালে তাঁর কাছে যেতেই বললেন—"দেশকে না দেখে, না চিনে তার সেবা করবি কি! প্রথমে দেশটাকে ঘুরে দেখ্। দেখবি, কত নতুন কথা, জানতে পারবি—যা বই পড়ে পাস্ নি। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা লিখে রাখিস্।"

গুরুর আশীষকে পাথেয় ক'রে আমি আমার দেশ পরিক্রমা শুরু করলাম। প্রথমে মধ্য ও পূর্ববঙ্গের কতক অংশ দর্শন করে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এলাম। সেখানে বীরভূম জেলায় কিছুদিন ঘুরতে হ'ল। তার পর উত্তরবঙ্গ অভিমুখে রওনা হলাম। উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে একদিন দার্জিলিঙ পৌঁছলাম। শুনলাম, রবীন্দ্রনাথ সেখানে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

তিনি খুব খুশী হলেন। আমার অভিজ্ঞতার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। ডায়েরি রাখছি কি না জানতে চাইলেন।

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আমি আমার কাজে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ী জাতির অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আমি দার্জিলিঙ এসেছি। এর পর কালিম্পঙ যাব। কোথাও বেশিদিন থাকার সময় নাই। এক বছরের মধ্যে বাংলা ও আসাম ঘুরতে হবে।

জীবনে কখনও হয়ত কিছু পুণ্য সঞ্চয় করেছিলাম। সেই পুণ্যের ফলস্বরূপ কয়েকদিনের জন্য স্বর্গবাস হ'ল। দার্জিলিঙে এসে এই কথাই বার বার মনে হতে লাগল।

কিন্তু ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। এখানে এসেও আমার কর্মের বিরাম নাই। অবশ্য একই সঙ্গে রথ দেখা এবং কলা বেচা দুই-ই চলেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ এবং তথ্য সংগ্রহ দুই-ই এক সঙ্গে করে চলেছি।

সেদিন সারাদিনের পরিশ্রমের পর পরম আরামে কম্বলে কবলিত হয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করছি; নয়নে নিদ্রার অমৃত প্রলেপ—সহসা ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তন্দ্রা ছুটে গেল। কে আমার নাম ধ'রে ডাকছে। বড়ই বিস্মিত হলাম। এখানে আমি প্রায় অপরিচিত। রাত দশটায় আমার কাছে এখানে আসে কে?

বাইরে বেরিয়ে এলাম। লোকটিকে চিনলাম না। সে বললে—"আমি বাবা মশায়ের (রবীন্দ্রনাথের) বাড়ী থেকে আসছি। তাঁর অসুখ। তাই মা আপনার খোঁজ করতে পাঠালেন।"

আমি অবাক্ হয়ে বললাম—"তুমি আমার খোঁজ পেলে কি করে?"

সে উত্তেজিত হয়ে বললে—"সহজে কি পেয়েছি মশায়। দার্জিলিঙের কোন হোটেল বাকি রাখি নাই—হয়রান্ হয়ে গেছি।"

আমার ঠিকানা গুরুদেবকে জানাই নাই। জানাবার

প্রয়োজন মনে হয় নাই। তাছাড়া ঠিকানারও কিছু ঠিক ছিল না। বেচারীর তকলিফ বড় কম হয় নাই। এই শীতের রাতে সারা দার্জিলিঙ চ'ষে বেড়িয়েছে। অথচ এই হোটেলটি গুরুদেবের বাড়ীর কাছে।

খান দুই কম্বল ঘাড়ে ক'রে তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের বাড়ী রওনা হলাম। মিনিট কুড়ির মধ্যেই সেখানে পৌঁছলাম।

বসবার ঘরে বৌঠান (প্রতিমা দেবী), রানীদি (নির্মলকুমারী মহলানবিশ) এবং আঁকশিদি (অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়)১ আমার আগমনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে ছিলেন।

আমাকে দেখেই বৌঠান বলে উঠলেন—"আঃ বাঁচালে! বাবা মশায়ের অসুখ। ওঁরও (রথীদার) শরীর ভাল নয়, আমরা বড় অসহায় বোধ করছিলাম।"

রাত্রিজাগরণের সংকল্প নিয়েই এসেছিলাম। তাঁরা কিন্তু আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন। সকলের সমবেত নির্বন্ধাতিশয্যে আমাকে শুতেই হ'ল। তাঁরা আমায় আশ্বাস দিলেন—"প্রথমে আমরা জাগি, তার পর তুমি জাগবে।"

কিন্তু আমি যখন জাগলাম, তখন আর রাত্রি নাই। রীতিমত সকাল। অত্যন্ত লজ্জা পেলাম। তাঁরা শুধু বললেন—"লজ্জার কারণ নেই, তোমাকে জাগাবার প্রয়োজন হয় নাই।"

গুরুদেব তখনও নিদ্রিত। তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই আমি বেরিয়ে পড়লাম, কথা দিতে হ'ল—রাত্রে ঐ বাড়ীতেই থাকব।

সেদিন রাত্রেও যথারীতি সেখানে উপস্থিত হলাম। রাত জাগবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম—কিন্তু বৌঠানেরা সকলে মিলে পূর্বরাত্রের মতই আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন এবং ঠিক পূর্বরাত্রের মতই সকালে আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হ'ল।

বিষণ্ণ মনে আমি তাঁদের অনুযোগ করলাম—"কেন আমাকে ওঠান নি?" তাঁদের সেই এক উত্তর—"প্রয়োজন হয় নি।"

ইতিমধ্যে পাশের ঘর হতে গুরুদেব আমায় ডাক দিলেন। কাছে যেতেই বললেন—"হ্যাঁ রে! তুই নাকি রাত জেগে আমার সেবা করতে এসেছিস্। তুই ত ভারি বোকা! জীবনে প্রথম দার্জিলিঙ এসেছিস, আর কখনো এ সুযোগ হবে কি না তার ঠিক নেই। ক'দিন এখানে আনন্দে ঘুরে বেড়াবি, তা না এক বুড়োর সেবায় রাত জাগতে এলি?"

আমি মনে মনে হাসলাম। কত যে রাত জেগেছি, আর কত যে সেবা করেছি তার খবর নিশ্চয়ই তাঁর জানা নেই।

যাই হোক, গুরুদেবের সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর দু' দিনেই সেরে গেল। আমাকেও আর রাত জাগতে হ'ল না। আমি আমার হোটেলে ফিরে গেলাম।

এর দিন দুই পরের কথা। দার্জিলিঙের কাজ আমার শেষ হয়েছে। নেবে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি—এমন সময় আবার গুরুদেবের কাছ হতে আহ্বান এল।

গিয়ে শুনলাম—তাঁরা একটা জলসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের এস্রাজীর অভাব। আমাকে থাকতে হবে।

রথীদা বললেন—"এর জন্য যদি তোমার ছুটির প্রয়োজন থাকে, তা হলে বাবা তোমার কর্তাদের লিখে ছুটি মঞ্জুর করবেন।"

আমি বললাম—"ওঁর চিঠি দেবার প্রয়োজন নাই। আমিই লিখে দিচ্ছি।" জলসার আখড়াই পূর্বেই শুরু হয়েছিল, গুরুদেবের অসুখের জন্য ক'দিন বন্ধ ছিল। আবার পুরাদমে তা চলতে লাগল।

গুরুদেব এবং শ্রীমতী হাতী সিং (এখন ঠাকুর)২ এই দু'জনই জলসার প্রধান অবলম্বন। শ্রীমতীদি ছাড়া শান্তিনিকেতনের আর কোনো সঙ্গীতজ্ঞা ছাত্রী বা ছাত্র তখন দার্জিলিঙে ছিলেন না। বেড়াতে এসেছেন—এমন দু-এক জন সুকণ্ঠীকে জড় ক'রে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তালিম দেওয়া হতে লাগল। সঙ্গীত-শিক্ষার ভার পড়ল অরুন্ধতী দেবীর (আঁকশিদির) উপর। তিনিই এ বিষয়ে তখন যোগ্যতমা।

জলসার দিন সমাগত। অথচ তবলচী নাই। শেষে চরম সংবাদ এল—তবলচী পাওয়া যাবে না।

এ ত আচ্ছা ফেসাদ। রথীদা জানতেন আমি কিছুদিন প্রবল উৎসাহে তবলা ও পাখোয়াজ অভ্যাস করেছিলাম। আমার উপর তবলা বাজাবার হুকুম হ'ল। এস্রাজীর অভাব ততটা গুরুতর নয়—রথীদাও তা পূরণ করতে পারেন।

ওস্তাদজীর সঙ্গে সঙ্গত করেছি। কিন্তু কোনদিন এমন জনসভায় বাজাই নাই। এখন এই সঙ্গীন অবস্থায় সেই বিদ্যা নিয়েই প্রস্তুত হতে হ'ল।

১। প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

২। শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাতা নৃত্যশিল্পী; বর্তমানে শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী।

দার্জিলিঙে বড় 'হল' ছিল না। যে 'হল' ছিল তাতে বড় জোর দু-চারশ' লোক ধরে। সহজেই সে 'হল' ভ'রে গেল। টিকিট ফুরিয়ে গেছে, হল-এ স্থান নাই—তবু টাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন, এমন বহু ইউরোপীয় দর্শক-দর্শিকা আকুল মিনতি ক'রে ঢুকে পড়লেন।

গুরুদেবের আবৃত্তি এবং শ্রীমতী হাতী সিং-এর নাচ, এই দুই প্রধান আকর্ষণ। হ'লও তা চমৎকার। অন্যরাও৩ অবশ্য তাঁদের পাঠ ভালই করেছিলেন।

আমি ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে ঠেকা দিচ্ছিলাম। প্রথমতঃ জনসভায়—বিশেষ গুরুদেবের সামনে কখনো বাজাই নাই। দ্বিতীয়তঃ গুরুদেব জোর বাজনা পছন্দ করেন না এবং সর্বোপরি তাঁর তীক্ষ্ণ কান এবং তীব্র কটাক্ষ—যা প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ব্যক্তির মনেও ভীতি উৎপাদন করে—তার কথা আমার ভাল করেই জানা ছিল।

গুরুদেবই কিন্তু ইশারায় বার বার আমায় জোরে বাজাতে বললেন। আমি তখন নির্ভয়ে যত জোরে পারি বাজিয়ে গেলাম। শ্রীমতীদির সেই নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে জোর বাজনারই প্রয়োজন ছিল।

মোটের উপর জলসা খুবই ভাল হয়েছিল। গুরুদেব নিজেও খুশী হয়েছিলেন। চতুর্দিক্ হতে অনুরোধ আসতে লাগল—আর একদিন হোক। রথাদারও পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গুরুদেব কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন—"এই ছোট হল-এ পরিশ্রম পোষায় না।"

দার্জিলিঙের এই মধুর স্মৃতির পাথেয় সংগ্রহ ক'রে আবার আমার যাত্রা শুরু হ'ল।

৩। বহিরাগতদের মধ্যে যাঁরা সেদিন সেই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের আর একজনের কথা স্মরণ হচ্ছে—তিনি ঢাকার স্বামীবাগের শ্রীমতী প্রতিভা সোম। এখন তিনি স্বনামখ্যাতা শ্রীপ্রতিভা বসু। সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গীতসাধনাও আশা করি তাঁর অব্যাহত আছে।

# নিম ফুলের গন্ধ

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

শ্রীসুরজিৎ মুখোপাধ্যায়

উঠোনে পা দিতেই গন্ধটা নাকে এল। বুনো-বুনো অচেনা একটা গন্ধ। এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন রমলা সেন। তার পর আবার চলতে সুরু করলেন।

নিম ফুলের গন্ধ। সীমানা পাঁচিলের ওপারে সেই আদ্যিকালের নিম গাছটায় অজস্র ফুল ফুটেছে। হলদে সাদায় মেশান ছোট ছোট অজস্র ফুল। আর তার থেকে এলোমেলো হাওয়ায় ভেসে আসছে ঐ বুনো-বুনো অচেনা গন্ধটা। গতকাল বা পরশু ত গন্ধটা এ রকম ছুটোছুটি, লুটোপুটি করে নি? তাহলে কি একটা রাতের ভেতরে গাছটা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল? না, সে কখনও হতে পারে না। কয়েক প্রহরের মধ্যে গাছের শাখাগুলো ফুলের ভারে নুয়ে পড়া অসম্ভব। হয়ত এই দুদিন হাওয়ারা এত চপল ছিল না, দামাল ছেলের মত দাপাদাপি করে নি, কিংবা তাঁর মনটা একটা জটিল সমস্যার বিনুনী খুলতে ব্যস্ত ছিল। মনটা যখন কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়, সমস্যার হ্রদে ডুব দিয়ে সমাধানের মুক্তো খোঁজে, তখন দৃশ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ সব মিথ্যে হয়ে যায়। বুঝি সেই কারণেই গতকাল কি পরশু গন্ধটা তিনি টের পান নি। নইলে—

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন রমলা সেন। খয়েরী রঙের সু'টা একটা পাথরে ঠোকর খেয়েছে। আর দু'পা পরেই স্কুলের সিঁড়িটা। পলাশপুর গার্লস হাই স্কুলের নুতন দোতলা বিল্ডিংসের সিঁড়ি। কুড়ি গজ দূরে স্কুলের শেওলাধরা পুরানো একতলা বাড়ীটা এখন মিসট্রেসদের কোয়ার্টার। ওখান থেকে আসতে এক মিনিটও সময় লাগে না। অথচ এরই মধ্যে তিনি কেমন যেন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

করবী ফুলের মত লাল সিঁড়িগুলো দ্রুত পেরিয়ে গেলেন রমলা সেন। করিডরে যে সব মেয়েরা ছুটোপুটি

করছিল, গল্পে মশগুল ছিল, তারা একপাশে স'রে দাঁড়াল, অপলক চোখে টুল ছেড়ে উঠল স্কুলের দারোয়ান গমবাহাদুর, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সোজা 'হেডমিস্ট্রেস্' ফলক আঁটান সুইংডোর ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। আজ তাঁর কোন ক্লাস নাই। শরীরটাও খারাপ। কপালের দু'পাশে একটা অস্ফুট যন্ত্রণা থেকে থেকে মোচড় দিচ্ছে। খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে ধীরে-সুস্থে এলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। কিন্তু তিনি যদি ধীরে-সুস্থে আসেন, নিয়মভঙ্গ করেন, তাহলে অন্যকে নিয়ম মেনে চলতে বলবেন কোন্ ভরসায়? 'আপনি আচারি ধর্ম, অপরে শিখাবে।' না, সামান্য অসুস্থতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

স্কুলের কাজগুলো সারতে সারতে টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেল। করিডরে আবার সেই কলরব। মেয়েদের কিচিরমিচির। কলিং বেলটায় চাপ দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিলেন রমলা সেন। নীল রঙের পরদাটা সরিয়ে ঘরে ঢুকল স্কুলের পুরানো চাকর বনমালী।

—'এই চিঠি দুটো হেডক্লার্ক বিজয়বাবুকে দিয়ে বলবি যেন আজকেই রেজেষ্ট্রী করে পাঠান হয়, আর এই ফাইলটা সেক্রেটারীর বাড়ীতে দিয়ে আসবি।'

বনমালী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

চেয়ারটা পেছনে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন রমলা সেন। মিস্ট্রেসদের কমনরুমে একবার যাওয়া দরকার। নইলে ওরা অভিমান করবে। শিক্ষয়িত্রী হলে কি হবে, একেবারে ছেলেমানুষ।

ওরা মানে, সুধা, মীনা আর শর্মিলা। বয়স তিন জনেরই পঁচিশের নীচে। একেবারে সদ্য সদ্য পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। এখনও ওদের মুখে ভাল করে এঁটে বসে নি শিক্ষয়িত্রীর গম্ভীর মুখোসটা। কেমন যেন বেমানান লাগে। রমলা সেনের কঠিন নিয়মের আগলটাকে ওরা যেন ভেঙ্গে দিতে চায়। কে জানে তাই হয়ত তিনি ওদেরকে একটু বেশী স্নেহ করেন।

রমলা সেন ঘরে ঢুকতেই ওরা হৈ হৈ করে উঠল।

—'ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা।' মিহি গলায় আবৃত্তির ঢেউ তুলল বাংলার টিচার শর্মিলা রায়। চোখের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমাদের কাতর প্রার্থনা এতক্ষণে আপনার কানে গেল রমলাদি?'

—'দুঃখ রইল রমলাদি, আপনার মত কাজের মানুষ হতে পারলাম না।' অঙ্কের টিচার সুধা মিত্র কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—'আমাকে তোদের কি এতটুকু ভয় করে না রে?' সস্নেহ হাসি হাসলেন রমলা সেন।

—'সত্যি করে বলব,' ভুগোলের টিচার মীনা সরকারের চোখ দুটো কৌতুকোজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'আপনি যখন অফিসে বসে থাকেন, তখন সুইংডোর ঠেলতে হাত কাঁপে, কিন্তু যখন সহকর্মিণী তখন কিছু না। আপনি জুজুবুড়ী নাকি যে ভয় করবে?'

জুজুবুড়ীই ত। চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলেন রমলা সেন। বয়স ত কিছু আর কম হ'ল না? দুপুরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিকেলের উঠোনে এসে পড়েছেন। মিস্ট্রেসদের মধ্যে এক মিসেস ভৌমিকই তাঁর চেয়ে বড়। মনে মনে হিসেব করলেন তিনি—সেই একুশ বছর বয়সে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ ক'রে স্কুলে ঢুকেছিলেন। তার পর প্রাইভেটে বি. এ. দিয়েছেন, বি. টি. পাশ করেছেন। হেডমিস্ট্রেসও হয়েছেন দশ বছর হ'ল। এতগুলো বছর আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের অপসৃতির মত কখন যে হারিয়ে গেল, রমলা সেন বুঝে উঠতে পারেন না। মাঝে মাঝে হিসেব করতে বসলে অবাক্ হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা প্রশান্তিও অনুভব করেন। এতগুলো বছর স্কুলের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন বলেই ত পলাশপুরে আজ এই মেয়েদের হাইস্কুল। নতুন ঝক্‌ঝকে দোতলা বাড়ি। নইলে এখনও সেই জুনিয়র হাইস্কুল থাকত। আর সেই রঙ-ওঠা টিনের সাইনবোর্ডটা।

—'বড় দিদিমণি।'

রমলা সেন মুখ ফেরালেন। স্কুলের ঝি সৌরভী তাঁর চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—'কিরে?'

—'আজকের দুপুরের ডাকে এই চিঠিগুলো এসেছে, বিজয়বাবু দিলেন।'

—'ও!' রমলা সেন হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলো নিলেন। তিনটে এসেছে বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন থেকে। সেগুলো আলাদা করে রাখলেন। পরের চিঠিটা স্কুলের সংস্কৃত-টিচার কল্যাণী তালুকদারের। 'কল্যাণী, বীথি, রেবা—সব গেল কোথায় সুধা?'

—'কল্যাণী, রেবাদি কোয়ার্টারে গেছেন, আর বীথি সম্ভবতঃ লাইব্রেরীতে।' জবাব দিল সুধা মিত্র।

নিঃশব্দে চিঠিটা সরিয়ে রাখলেন রমলা সেন। অবশিষ্ট নীল রঙের খামটা তুলে নিতেই তাঁর ঠোঁটের কোণে

ভেসে-থাকা অস্পষ্ট হাসির রেখাটা মিলিয়ে গেল। উল্টে-পাল্টে, এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘুরিয়ে দেখলেন চিঠিটা। না, তাঁর অনুমান মিথ্যে নয়।

—'সৌরভী।' গম্ভীর স্বরে ডাকলেন রমলা সেন। 'ক্লাস নাইনের অমিতা ব্যানার্জীকে ডেকে নিয়ে আয় ত।'

সৌরভী দরজার ফিকে নীল পরদাটা সরিয়ে বেরিয়ে যেতেই শর্মিলা, সুধা, মীনা পরস্পরের দিকে তাকাল। আলোকের আশ্বাস নয়, দুর্যোগের মেঘাভাস। শর্মিলা মৃদুস্বরে বলল, 'কি হ'ল রমলাদি?'

—'অমিতা ব্যানার্জীর চিঠি এসেছে।' এনভেলাপটার দিকে চোখ রাখলেন তিনি, 'ফ্রম শ্যামলী চৌধুরী, বোলপুর।'

—'অমিতার চিঠি এসেছে, তাতে'—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মীনা সরকার।

—'তাতে উদ্বিগ্ন হবার কি আছে, তাই না মীনা?' একটা বিচিত্র হাসির রেখা ফুটে উঠল রমলা সেনের ঠোঁটে। 'একটা ছেলে স্কুলের ঠিকানায় একটি মেয়েকে প্রেমপত্র লিখবে, তাতে চিন্তার কি কোন কারণ নাই?'

—'শ্যামলী চৌধুরী ছেলে?' সকলের চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস।

—'হ্যাঁ ছেলে!' কথাটার ওপর জোর দিলেন রমলা সেন। 'কেননা এখানে মেয়েদের কোন হস্টেল নেই। সব মেয়েই স্থানীয়। তাদের কোন চিঠি এলে বাড়ীর ঠিকানায় আসবে, স্কুলের ঠিকানায় নয়। আর চিঠিটার মলাটে শুধু পলাশপুর ডাকঘরের ছাপ। মানে চিঠিটা এখান থেকেই ডাকে দেওয়া হয়েছে।' একটু থামলেন রমলা সেন। পরে কতকটা অন্যমনস্কের মত বললেন, 'এরকম ঘটনা আগেও দু'একবার ঘটেছিল।'

—'আগে একবার ঘটেছিল ব'লে চিরকাল ঘটবে তার কোন মানে নাই।' আবহাওয়াটাকে লঘু করতে চাইল সুধা মিত্র। 'এ আপনার একটা অবসেসন।'

—'অবসেসন!' জ্বলে উঠলেন রমলা সেন। হাতের চিঠিটা ছুঁড়ে দিলেন সুধা, মীনা, শর্মিলার দিকে। 'তোরাই ছাখ্‌ আমার ধারণা সত্যি কি মিথ্যে।'

একটু ইতস্তত: করে খামটা ছিঁড়ে ফেলল শর্মিলা। নীল রঙের তিনপাতা চিঠি। মুক্তোর মত নিটোল হরফে ভরা। শর্মিলার দু'পাশ থেকে সুধা, মীনাও ঝুঁকে পড়ল চিঠিটার দিকে।

"মিতা,

রোজ বিকেলে রোদ্দুরটা ম'রে গেলে আমারও ম'রে যেতে ইচ্ছে করে। এ বিকেল সোনা ঝরায়, কিন্তু তোমার ছোঁয়া আনে না। কতদিন—"

চিঠিটা উল্টে দিল শর্মিলা। শেষ লাইনে চোখ রাখতেই তার কানের ফর্সা লতি দুটো লাল হয়ে গেল।

"জান, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম, তুমি আমার বুকে মুখ রেখে শুয়ে আছ। আমার এ স্বপ্ন কবে সত্যি হবে মিতা?"

অশ্লীল। অপাঠ্য। চিঠিটা খামের মধ্যে পুরে রমলা সেনের দিকে এগিয়ে দিল শর্মিলা।

—'আপনার কথাই ঠিক রমলাদি। শ্যামলী নয়, শ্যামল। কিন্তু—"

চুপ করে গেল শর্মিলা। অমিতা ফিকে নীল পরদাটা সরিয়ে চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

—'এসো অমিতা।' বসার ভঙ্গিটাকে ঋজু করলেন রমলা সেন।

অমিতা পায়ে পায়ে সামনে এল। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। ভাসা ভাসা চোখ। ভুরু দুটো টানা টানা। সারা মুখে একটা সপ্রতিভ ভাব।

—'বোলপুরের শ্যামলী চৌধুরী তোমার কে হন?' রমলা সেন নিরুত্তাপ স্বরে প্রশ্ন করলেন।

পায়ের দিকে চোখ নামাল অমিতা। একটু থেমে বলল, 'আমার মামাতো বোন।'

—'আর শ্যামল?'

নিরুত্তর। মাথাটাকে আরও নীচু করল অমিতা। মুখটা প্রায় দেখা যায় না। চিবুকটাকে কেউ যেন বুকের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।

এবারে ঝল্‌কে উঠলেন রমলা সেন। 'ছি: ছি: ছি:! আমার সামনে মিথ্যে কথা বলতে তোমার এতটুকু বাধল না? তোমার এতটুকু লজ্জা হ'ল না? এই ক'বছরে তুমি এই শিক্ষা পেয়েছ, ছি:!'

অনেকখানি জ্বালা উগরে দিয়েও ক্ষান্ত হলেন না রমলা সেন। মাথার ভেতরে কোথায় ধিকিধিকি একটা চুল্লী জ্বলছে। আর তারই তাপে শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। অমিতা যদি মিথ্যে কথা না বলত, নকল শ্যামলী চৌধুরীকে চেনে না জানাত, তা হলে বোঝা যেত, এমন কেউ লিখেছে যে অমিতার অপরিচিত। কিন্তু মিথ্যে কথার মধ্যে এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ছেলেটা তার চেনা। শুধুমাত্র চেনাই নয়, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ঘনিষ্ঠ।

এতবড় অপরাধকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না তিনি।

স্কুলের সাদা দেওয়ালে যে কলঙ্কের আঁচড় টানবে, তার কিছুতে নিষ্কৃতি নেই।

কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য আনলেন রমলা সেন। দৃঢ় অথচ চাপা স্বরে সকলের উদ্দেশে বলতে শুরু করলেন, 'স্কুলের উদ্দেশ্য কি? কর্ত্তব্য কি? স্কুল কেবলমাত্র বুলি শেখানোর জন্য নয়। তার উদ্দেশ্য ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করা। তাদের মানসিক, নৈতিক চারিত্রিক—সব রকমের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা। এই উন্নতি যাতে খণ্ডিত বিঘ্নিত না হয়, সরস্বতীর সাধনপীঠ যাতে নিষ্কলঙ্ক থাকে, তার দিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।'

নানা রকম উদাহরণ সহযোগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাগুলো বলে থামলেন রমলা সেন। সমস্ত ঘর জুড়ে একটা থমথমে আবহাওয়া। শর্মিলা-সুধা-মীনা, সবাই চিত্রার্পিত। পরদার ওপারে কৌতূহলী মেয়েদের আনাগোনা। উঁকিঝুঁকি।

ঘরে উপস্থিত সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অমিতার দিকে তাকালেন রমলা সেন। 'তুমি সেই শুচিতা নষ্ট করেছ। স্কুলের সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছ। তাই—'

আবার এক মুহূর্ত চুপ করলেন তিনি। বিচারকের মত ধীরকণ্ঠে বক্তৃতার উপসংহার টানলেন। 'তাই কাল থেকে তুমি আর স্কুলে আসবে না। আর তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দিও তোমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন। যাও।'

অমিতা মুখ নীচু ক'রে বেরিয়ে গেল। শিক্ষয়িত্রীরা সব উঠে দাঁড়ালেন। টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে গেছে। রুটিনটায় এক পলক চোখ রেখে সবাই একে একে বেরিয়ে গেলেন। ঘর ছাড়ার আগে মীনা সরকার কি যেন বলতে গিয়ে পারল না। ঠোঁট কামড়াল। রমলা সেনের ব্যক্তিত্ব নামে বস্তুটার মুখোমুখী হবার সাহস অন্য সকলের মত তারও নেই।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে অলস হাতে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন রমলা সেন। দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে। তার পর চেয়ারটাকে টেনে আনলেন জানালার কাছে।

পশ্চিমের জানালা। সূর্য এখনও প্রায় মাঝ বরাবর, তাই রোদ্দুর ঘরে মাথা গলায় নি। কেবল কপাটের কোণে এক চিল্‌তে লেগে রয়েছে। সাদা অথচ হলদেটে। অনেকটা থান কাপড়ের মত।

বাইরে খোয়া-ওঠা রাস্তাটায় থির্‌থির্ করে রোদ কাঁপছে। তার ওপারে শিরিষ গাছের ঘন ছায়ায় নিরালা ডাক বাংলোটা কেমন নিঝুম, নিস্তব্ধ। ফাঁকা উঠোনটায় একটা কুকুর পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। এদিক-ওদিকে কয়েকটা শালিখ। রাস্তাটার শেষ প্রান্তে লম্বা দীঘিটা শান দেওয়া ছুরির ফলার মত রোদ্দুরে ঝিক্‌ঝিক্, চিক্‌চিক্ করছে।

আকাশটার কি রঙ? নীল না সাদা? মাথা ঘুরিয়ে লক্ষ্য করতে গিয়ে চোখ দুটো প্রায় বুজে ফেললেন রমলা সেন। অগ্নিস্রাবী আকাশ। তাকান যায় না।

অমিতার শাস্তি কি একটু কঠোর হয়ে গেল? না, তিনি ঠিকই করেছেন। একটা ফুলে কীট দেখা দিলে, তা যত সুন্দরই হোক, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছিঁড়ে ফেলা উচিত। নইলে বাগানের সৌন্দর্য অটুট রাখা যাবে না। এখানে মায়ার স্থান নেই। মমতার প্রশ্ন নেই।

ঢঙ-ঢঙ-ঢঙ-ঢঙ-ঢঙ। চমকে উঠলেন রমলা সেন। মণিবন্ধে বাঁধা ছোট্ট ঘড়িটায় চোখ রাখলেন। তিনটে। আশ্চর্য, নিটোল দু'টি ঘণ্টা হারিয়ে গেছে মৌনতার অতলে। আর সেই নীরবতার সুযোগ নিয়ে রোদ্দুরটা নিঃসঙ্কোচে চেয়ারের হাতল ছুঁয়েছে।

উঠে পড়লেন তিনি। শ্লথ পদবিক্ষেপে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। একেবারে করিডরের প্রান্তে। কিছু ভাল লাগছে না আজ। কপালের দু'পাশে সেই যন্ত্রণাটা জোনাকী পোকার মত টিপটিপ করছে। বুকটা কেমন ভার-ভার। কাঁচা সুপুরি খাওয়ার পর যেমন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, দমবন্ধ-দমবন্ধ লাগে, অনেকটা সেই রকম।

রেলিঙে অবসন্ন হাতটাকে রেখে দূরে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিলেন রমলা সেন। পূর্বদিকে সীমানা-পাঁচিলের ওপারে সেই আদ্যিকালের নিম গাছটা স্থির হয়ে আছে। বুনো-বুনো গন্ধটা এখন আর নেই। ফুলন্ত শাখাগুলো নেতিয়ে পড়েছে রোদ্দুরে। তাঁর মতনই ক্লান্তি, অবসাদ যেন ওদেরকে জড়িয়ে ধরেছে। গাছটার প্রায় নীচের দিকে দুটো কাক। অনেক পাতার গলিপথ বেয়ে সূর্যের তেজটা যেখানে মলিন, সেই ডালে বসে ওরা কা-কা করছে।

মনে মনে ভাবলেন তিনি। অমিতাকে তিরস্কারটা বড় বেশী রূঢ় হয়ে গেছে। আর একটু কম করলেই ভাল হ'ত। শোভন হ'ত। অমিতাকে চরম শাস্তি ত দিয়েছেন তিনি। স্কুলের দরজাটা চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছেন তার সম্মুখে। তার পর আবার কি দরকার ছিল রূঢ় কথার, তিরস্কারের?

কপালের পাশে একটা রূপোলী চুল ঘামে লেপটে গিয়ে কিচকিচ করছে। ডান হাত দিয়ে চুলটা সরিয়ে দিলেন তিনি। একটুও হাওয়া নেই। এক পশলা যে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হবে, তারও কোন সম্ভাবনা নেই। নির্মেঘ আকাশ। কয়েকটা চিল শুধু পাক খাচ্ছে এখানে-ওখানে মন্থরগতিতে।

রেলিঙ থেকে হাতটা তুলে নিয়ে চলতে শুরু করলেন রমলা সেন। পাঁচটা পিরিয়ডের ঘণ্টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। ক্লাসগুলো একবার ঘুরে দেখা দরকার। অন্যদিন ফোর্থ পিরিয়ডেই একবার টহল দিয়ে আসেন। আজ সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। সব গোলমাল, ওলট-পালট। আজকের দিনটা যেন অন্যদিনের সঙ্গে এক নয়। কেমন এলো-মেলো। খাপছাড়া।

এ ঘরে সুধা বোর্ডের উপর একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজ এঁকেছে। তার ভেতরে একটা বৃত্ত আঁকবার চেষ্টা করছে চক আঁটা মোটা কাঠের কম্পাস দিয়ে। পাশের ঘরে শর্মিলা রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে ব্যস্ত। ও যেন তার পঠিত সমস্ত বিদ্যাটুকু উজাড় করে দিতে চায়। একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটল রমলা সেনের ঠোঁটে। একে একে ঘরগুলো পেরিয়ে গেলেন তিনি।

কোণের ঘরটায় কিসের একটা গুঞ্জন যেন। মিস্‌ট্রেস্ নেই নাকি? বিরক্তিতে তাঁর ভুরু দুটো নীড় ছাড়ার আগের মুহূর্তে পাখীর ডানার মত একটু বেঁকে উপরে উঠে গেল। দূর থেকে তাকালেন তিনি। ক্লাস নাইন। এ ঘণ্টায় ত স্বাতী মৈত্রর জিযোগ্রাফী। মনে পড়তেই অত্যন্ত লজ্জা পেলেন রমলা সেন। ইস্, একেবারে ভুলে গেছেন। স্বাতী সেই দ্বিতীয় ঘণ্টায় চলে গেছে শরীর খারাপ বলে। এ পিরিয়ডে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিংবা নিজে। আজ সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। কপালের দু'পাশে সেই যন্ত্রণাটা বুঝি তাঁর স্মৃতিকেও বিকল করে দিয়েছে। শ্লথ পদক্ষেপে ক্লাসটার প্রথম দরজার কাছাকাছি হতেই থমকে দাঁড়ালেন রমলা সেন। শেষ বেঞ্চে বসে কারা যেন গল্প করছে জোরে জোরে। আর তাঁর নাম উচ্চারণ করছে। দরজার একটা কপাট ভেজান ছিল। রমলা সেন কান রাখলেন।

—'এর পর কোথায় পড়বি রে, অমিতা?' কে যেন হাঁসের মত বিশ্রী গলায় প্রশ্ন করল।

—'আর পড়ব না ভাই। বাইরে কোথাও পড়ার মত সামর্থ্য কই? বাবার ত ঐ চাকরি। তার পর আমরা ভাইবোন মিলে সাতজন। কি করে—' উত্তর দিতে গিয়ে বিষণ্ণ গলাটা তলিয়ে গেল। উত্তরদাত্রী নিশ্চয়ই অমিতা; ভাবলেন রমলা সেন। কানটাকে আর একটু সতর্ক করলেন।

—'রমলাদির এটা ভীষণ অন্যায়।' কে যেন প্রাজ্ঞের মত গম্ভীর গলায় বলল। 'ঐ ত রণুকে চার-পাঁচ জন চিঠি লেখে, ক্লাস টেনের অজন্তাদি প্রতিদিন ক্লাসে তার লাভারের চিঠি আনে। এ ত সবাই জানে। এই একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করা রমলাদির মোটেই উচিত হয় নি।'

—'আসলে কি জানিস, হিংসে, হিংসে।' অমিতা মুখিয়ে উঠল, 'রমলাদির ঐ ত চেহারা। ওকে কেউ কোন দিন দুলাইন চিঠি লিখেছে ভেবেছিস্?'

আর কিছু শুনতে পেলেন না রমলা সেন। কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। মনে হ'ল কানের গভীরে কেউ গরম সীসে ঢেলে দিয়েছে। দু'হাতে কান চাপা দিয়ে টলে পড়তে গিয়ে কোন রকমে চৌকাঠ ধ'রে নিজেকে সামলালেন। তার পর দেওয়াল ধ'রে ধ'রে নিঃশব্দে ফিরে এলেন অফিসে। অমিতাকে মাত্রাতিরিক্ত তিরস্কার করার কোন কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তবে কি তাঁর অবচেতন মনে 'জেলাসী'র উদ্ভব হয়েছিল? অবরুদ্ধ কামনা প্রতিহিংসার মাধ্যমে চরিতার্থতা চেয়ে-ছিল? না—না। না—না। হিংসে নয়। ঈর্ষা নয়। জেলাসী নয়। সে বয়স অনেক পেছনে ফেলে এসেছেন। স্কুলের চারিত্রিক শুচিতা অটুট রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। স্কুলের কল্যাণের জন্যই তিরস্কার করেছিলেন। অসহায়ের মত যুক্তিটাকে আঁকড়ে ধরলেন রমলা সেন। একটা কামনা সফল হতে না পেরে প্রতিহিংসার পথ ধরেনি, সকলের কল্যাণের জন্য সাময়িক ভাবে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। এই সহজ, সরল সত্যটাকে ইচ্ছে করেই বিকৃত করেছে অমিতা। তাঁর চেহারা সম্বন্ধে বিশ্রী কটূক্তি করেছে।

আর ভাবতে পারলেন না রমলা সেন। কপালের দুই প্রান্ত তেল ছিটকে-যাওয়া লণ্ঠনের মত দপ দপ করছে। খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে ঘাড়ের নীচে। বড্ড গরম। ঘামে সারা শরীর একেবারে ভিজে গেছে। উত্তরের জানালাটা খোলা। কিন্তু বাতাস আসছে না। পূর্বদিকের জানালার কপাট দুটো ভেজান। একবার কলিং বেল টিপে বনমালীকে ডাকবেন ভাবলেন। না—থাক্। বইয়ের র‍্যাকটা ছুঁয়ে জানালার দিকে এগোলেন তিনি। তাঁর মুখে পরাজয়ের কালি মাখিয়ে হেসে হেসে বিজয়ীর মত চলে যেতে চায় অমিতা নামে সতের বছরের এক যৌবন। না, এ পরাজয়কে কিছুতেই তিনি স্বীকার

করবেন না। কপাটটার দিকে হাত বাড়ালেন রমলা সেন।

জানালাটা খুলে দিতেই এক ঝলক হাওয়া এসে ঢুকল। আর তার সঙ্গে সেই বুনো-বুনো অচেনা গন্ধটা।

গন্ধটা অপরিচিত কি? ভাবতে ভাবতে ফিরে এলেন রমলা সেন। না, গন্ধটা বুনো-বুনো নয়। অচেনা নয়। প্রত্যেক বছর ঐ নিম গাছটায় ফুল ধরেছে, আর গন্ধটা হাওয়ায় ছড়িয়েছে। কত কাল ধরে এই ফুল ফোটা আর সুবাস ছড়ানর খেলা চলেছে তার ঠিকানা নেই। বস্তুত, গন্ধটাকে তিনি চিনতে চান নি। গন্ধটাকে দূরে দূরে রাখতে রাখতে একদিন অপরিচিত বোধ হয়েছে। গন্ধটা দিয়ে হৃদয়কে সুরভিত করবার মত অবকাশ তাঁর জোটেনি। তাই বার বার অচেনা মনে হয়েছে। আর বুনো-বুনো।

রমলা সেন সোজা হয়ে বসলেন। কলিং বেলটায় চাপ দিতেই বনমালী ঢুকল ঘরে।

—'ক্লাস নাইনের অমিতাকে ডেকে আন ত।'

বনমালী বেরিয়ে গেল। রমলা সেন জানালাটার দিকে তাকালেন। বিকেলের আলোয় নিম গাছটা অপরূপ হয়ে উঠেছে। ডালে ডালে শালিখের মেলা বোধ হয় কোন নাটকের মহড়া দিচ্ছে। উপরে অগাধ-বিস্তৃত-প্রসন্ন-নীলাকাশ। কোথাও কোন রেখা নেই মসৃণ-অকলঙ্ক-নিটোল।

জুতোর শব্দে মুখ ফেরালেন তিনি।—'এখানে এস অমিতা।'

অমিতা এগিয়ে এল। চেয়ারের কাছাকাছি এসে চোখ রাখল মাটিতে।

রমলা সেন সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখলেন।—'শোন, চেষ্টা করলে স্বভাবের পরিবর্তন ঘটান যায়। এমন কোন ভুল বা ভ্রান্তি নেই, যা সংশোধন করা যায় না। রত্নাকরও বাল্মীকি হয়েছিলেন। পারবে না তুমি স্কুলের শুচিতা বজায় রাখতে? নিয়ম মেনে চলতে?'

অমিতা বিস্ময়ে চোখ তুলল। রমলা সেনের গম্ভীর কঠোর মুখটা এক আশ্চর্য কোমলতায় প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। রুদ্রাক্ষের রুক্ষতা নয়, চন্দনের শীতলতা।

এ রমলাদিকে সে চেনে না। জানে না।

সম্মতি জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলল অমিতা।

# অরণ্যচারী সাঁওতাল ও দামিন-ই-কো

শ্রীকালীপদ ঘটক

শতাধিক বর্ষ পূর্বের কথা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। বর্তমান সাঁওতাল পরগণা জেলার রাজমহল ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া নির্যাতিত সাঁওতাল জাতির মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ-বহ্নি অকস্মাৎ সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া তদানীন্তন ইংরেজ সরকারকে যে কতখানি সচকিত ও পর্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহার রক্তাক্ত ইতিহাস পুরাতন পুঁথির পাতায় কিছু কিছু লিপিবদ্ধ আছে। আদিম মাটির অতি আদিমতম অধিবাসী যাহারা, সভ্য জাতির ইতিহাসে যাহাদের শ্রেণীসংজ্ঞা অসভ্য ও অনার্য বলিয়া চিহ্নিত হইয়া আছে, ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের মতই সাঁওতাল জাতিও তাহাদের অন্যতম। নিরক্ষর সরল ও শান্তিপ্রিয় এই সাঁওতাল যাযাবরের দল দেশ-দেশান্তর হইতে ক্রমাগত বিতাড়িত হইয়া দুর্ভেদ্য জঙ্গল সমাকীর্ণ এই পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপনের সূচনায় মনে মনে কিছুটা যেন ভরসা পাইল। চারিদিকে পর্যাপ্ত বনসম্পদ্ ও গিরি নদী উপত্যকা। মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ। পায়ের নীচে ধরণীর কোমল মৃত্তিকা। এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ মুগ্ধ করিল নবাগত সাঁওতালদের। বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় ও নগ্নগাত্র যাযাবর এই সাঁওতালের দল এইরূপ পরিবেশেই জীবনযাপনে অভ্যস্ত। নির্জন বনভূমি ও দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ সাঁওতালদের প্রিয় আবাসভূমি। বন্যজন্তুর ভয় তাহারা করে না, ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ প্রভৃতি বনচারী হিংস্র প্রাণী তাহাদের চিরসঙ্গী, চিরদিনের প্রতিবেশী। ইহাদের ভয় শুধু মানুষকে। কুচক্রী ও বুদ্ধিমান্, চতুর ও স্বার্থপর এক শ্রেণীর মানুষ তাহারা দেখিয়াছে, যাহাদের স্বার্থবুদ্ধি ও হৃদয়হীনতা এই সাঁওতাল জাতিকে পুনঃ পুনঃ ভিটা-

দলদলির পাহাড়

মাটি হইতে উৎখাত করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে দেশান্তরী হইতে বাধ্য করিয়াছে। তাহাদের এই পলাতক যাযাবর জীবনের কোথায় গিয়া যে পরিসমাপ্তি তাহা তাহাদের অজ্ঞাত। জনমানবহীন এই বিস্তীর্ণ বনভূমি, ইহাই হয়ত তাহাদের পক্ষে অতি নিরাপদ্ ও উপযুক্ত আশ্রয়। জনপদ ও লোকালয় হইতে বহুদূরে সাঁওতাল পরগণার এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া সাঁওতালগণ স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হইল। এখানকার আদিম অধিবাসী পাহাড়িয়া নামক অপর এক বন্যজাতি পাহাড়ের উপর ঘর বাঁধিয়া বহু পূর্ব হইতেই এই 'দামন' বা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, পাহাড় হইতে ইহারা কিছুতেই নীচে নামিতে চাহে না। পাহাড়ের তরাই ভূমিতে যৎসামান্য চাষ-আবাদ, ফলমূল সংগ্রহ, বন্য জীবজন্তু শিকার করিয়াই ইহারা পরম নিশ্চিন্তে জীবনধারণ ও কালাতিপাত করিয়া থাকে। নিম্নভূমির আকর্ষণ পাহাড়িয়াদের নিকট ব্যর্থ। তাই বহিরাগত সাঁওতালদের আগমনে ও নিম্নভূমিতে তাহাদের বসতিস্থাপন প্রয়াসে পাহাড়িয়ারা কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই। পরন্তু 'দামন' অঞ্চলে তাহাদের সমগোত্রীয় অপর এক বন্য জাতির সমাগমে তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষা ও বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে তাহারা যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে ভাবিয়া পাহাড়িয়াগণ সাঁওতালদের প্রচেষ্টায় কোনরূপ বাধা দেয় নাই। সেই শুভলগ্নে অপর দিক্ হইতে সাঁওতালদের প্রেরণা যোগাইয়া তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা দিলেন 'পন্টিন সাহেব', ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দামিন-ই-কোর তত্ত্বাবধায়ক মিঃ জেম্‌স্ পন্টেট।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত রাজমহলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী এই পার্বত্য প্রদেশে একমাত্র পাহাড়িয়া ছাড়া অপর কোন জাতির অস্তিত্ব ছিল না। কোনরূপ সরকারী আইন শৃঙ্খলা বা প্রচলিত নিয়ম-কানুন কোনদিনই তাহারা মানিয়া চলিত না। দুঃশীল ও স্বেচ্ছাচারী এই পাহাড়িয়াগণ মাঝে মাঝে পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া নিরীহ গ্রামবাসী-দের ধনসম্পদ্, শস্যসম্ভার ও গবাদি পশু, ইত্যাদি অবাধে লুণ্ঠন করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়া পড়িত। তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দুর্বল শাসন ব্যবস্থার ফলে পাহাড়িয়াদের এই স্বেচ্ছাচারিতা অবাধ গতিতে চলিতে থাকে। তাহাদিগকে দমন করিয়া তাহাদের এই দুষ্কার্যের প্রতিবিধান করা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বহুকাল যাবৎ আদৌ সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে ভাগলপুরের তদানীন্তন কলেক্টার মিঃ অগাষ্টাস ক্লিভল্যাণ্ডের অপূর্ব কর্মদক্ষতা ও অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পাহাড়িয়াগণ কিয়ৎপরিমাণে আইন শৃঙ্খলার পথে আগাইয়া আসে এবং তাহাদের অনেকেই ইংরেজ সরকার প্রদত্ত কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। ভারতের তাবৎ আদিবাসী

গোষ্ঠীর মধ্যে রাজমহলের পাহাড়িয়াগণই সর্বপ্রথম ইংরেজ শাসনের আওতায় আসে। তৎপূর্বে পাহাড়িয়াগণ ব্রিটিশ কোম্পানী ও তাহাদের মুখপাত্র জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও খণ্ড বিদ্রোহ পরিচালিত করিয়াছিল। মিঃ ক্লিভল্যাণ্ডের মধ্যস্থতায় এবং তাঁহারই পরিকল্পিত নীতি ও শাসন ব্যবস্থা অনুসরণের ফলে পাহাড়িয়ারা শেষ পর্যন্ত কিছুটা শান্ত হয়। এই সময় এই পাহাড়িয়া অধ্যুষিত দামন অঞ্চলকেই দামিন-ই-কো ( The Skirt of the Hills ) বা পাহাড়িয়া অঞ্চল নামে অভিহিত করা হয়। প্রভাবশালী পাহাড়িয়া সর্দারগণকে দামিন-ই-কোর শাসনকার্যে ইংরেজ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে আহ্বান করা হয় এবং তাহাদের উপর শাসনকার্যের কিছু কিছু দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া সরকার পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট বৃত্তির ও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় (বাৎসরিক প্রায় পনের হাজার টাকা)। মিঃ ক্লিভল্যাণ্ড পাহাড়িয়াদের সজ্ঘবদ্ধ করিয়া 'ভাগলপুর হিল্ রেঞ্জার্স' নামে একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং দামনবাসী পাহাড়িয়াদের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিচক্ষণ পাহাড়িয়াদের লইয়া 'হিল এসেম্বলি' বা পাহাড়ী পরিষদ নামে একটি বিচার পরিষদ গঠন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। মিঃ ক্লিভল্যাণ্ডের ইহা এক স্মরণীয় কীর্তি। পাহাড়িয়াদের মধ্যে তিনি এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন যে, আজ পর্যন্ত পাহাড়িয়ারা তাঁহার কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। পাহাড়িয়াদের নিকট তিনি 'চিলমিলি' সাহেব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ক্লিভল্যাণ্ডের মৃত্যু হয়।

ইহার প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জন পেটি ওয়ার্ডের ব্যবস্থাপনায় দামিন-ই-কোর চতুর্দিকে প্রস্তরস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া দামন অঞ্চলের নির্দিষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়। তৎকালীন ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া একমাত্র পাহাড়িয়াদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা এই দামিন-ই-কো প্রদেশ গঠন করা হয়। ইহার মোট পরিমাণ ছিল ১৩৬৬·০১ বর্গমাইল। পাহাড়িয়ারা তাহাদের অধিকারভুক্ত জমিজমার জন্য সরকারকে কোন খাজনা দিত না। তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য সরকারপক্ষ হইতেও এ বিষয়ে কোন চাপ দেওয়া হয় নাই, পরন্তু যে কোন উপায়ে তাহাদের বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার পাহাড়িয়াদিগকে রাজস্বের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও অলস ও নিষ্কর্মা পাহাড়িয়াদের দিয়া দামন অঞ্চলের কোনরূপ উন্নতিবিধান বা শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া উর্বর নিম্নভূমিতে শস্য ফলাইবার চেষ্টা তাহারা কোনদিনই করে নাই। ইহার একমাত্র কারণ শ্রমসাপেক্ষ কাজ-কর্মে পাহাড়িয়াদের কোনকালেই তেমন উৎসাহ ছিল না। সুতরাং ইংরাজ সরকারের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট সীমারেখা টানিয়া পাহাড়িয়াদের জন্য দামিন-ই-কো নামক স্বতন্ত্র একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা সম্ভব হইলেও কার্যত ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। দামন প্রদেশ ঠিক পূর্বের মতই গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ও অনগ্রসর দামন অঞ্চলেই পর্যবসিত হইয়া রহিল। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে সাঁওতালদের আগমনের পর। এই প্রসঙ্গে আমরা সাঁওতালদের পূর্বকথা কিছু বিবৃত করিয়া পরে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সাঁওতাল জাতির প্রাচীন ইতিহাস নিরক্ষর ও স্বল্পমতি সাঁওতালদের নিকট হইতে বিস্তারিত ভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। তাহাদের বংশপরম্পরায় কতকগুলি প্রাচীন উপাখ্যান ও কিংবদন্তি ঠিক রূপকথার মত এ পর্যন্ত তাহাদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত সেই উপাখ্যান ও উপকথাগুলি অনুসরণ করিয়া আমরা তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও জীবনধারা সম্বন্ধে কিছু পর্যালোচনা করিব।

সাঁওতালদের আদি বাসভূমি যে কোথায় ছিল, অথবা পুরাকালে তাহারা কোন্ স্থান হইতে কোথায় গিয়া কতদিনের জন্য বসতি স্থাপন করিয়াছিল, সঠিক ভাবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সর্বপ্রথম তাহারা সিরি নামক কোন এক অরণ্যের অন্তর্গত হিহিরি-পিপিরি নামক কোন এক স্থানে বসবাস করিত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সিরি নামক অরণ্য ও হিহিরি-পিপিরি নামক স্থান যে কোথায় তাহা সঠিক ভাবে জানা যায় না। কেহ কেহ সাঁওতালী পিপিরি শব্দের অর্থ প্রজাপতি ধরিয়া হিহিরি-পিপিরি অর্থে প্রজাপতির দেশ অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশ বলিয়া উক্ত স্থানের অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্তই অনুমান মাত্র। হিহিরি-পিপিরি বলিয়া সত্যই কোন স্থান ছিল কি না তাহা সঠিক ভাবে প্রমাণ করা শক্ত। ইহা যেন ঠিক রূপকথার প্রবালদ্বীপ বা তেপান্তরের মাঠের মতই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট এক কাল্পনিক দেশ বিশেষ। সুতরাং সাঁওতাল-

দামিন-ই-কোর একটি সাঁওতালপল্লী

দের আদি বাসভূমি হিসাবে হিহিরি-পিপিরির নামটি শুধু জানিতে পারা যায়। পরবর্তী তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে কিছুটা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিব। সাঁওতালী উপাখ্যান-বর্ণিত পুরাকাহিনী ও সেই সঙ্গে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য অনুসরণ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, কয়েক শত বৎসর পূর্বে হাজারীবাগ অঞ্চলের চাই নামক স্থানে সাঁওতালদের বসবাস ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহম্মদ তোগলকের সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম আলি কর্তৃক চাই অধিপতি জৌরা নামক জনৈক সাঁওতালরাজের গড় অধিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ফিরোজ শা'র রাজত্বকালে ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ইব্রাহিম আলির মৃত্যু হয় এবং হজরৎ ফতে খাঁ দৌলা উক্ত গড়ের কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। ফতে খাঁ'র মৃত্যুর পর গড়সন্নিকটবর্তী তাঁহার সমাধিস্থানে একটি দরগা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্মিত উক্ত চাই গড়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি কিছু কিছু বর্তমান আছে। উক্ত স্থানের চার মাইল দূরে হাজারীবাগের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত চম্পা নামক স্থানে মানসিং নামক জনৈক সাঁওতাল-রাজ মুসলমান আগমনের সংবাদ পাইয়া বশ্যতা স্বীকারের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করে। চম্পার কোয়েন্দিগড়ে কিসকু নামক অপর এক ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী সাঁওতাল-রাজের রাজ্যশাসনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিসকুর মৃত্যুর পর দৈবক্রমে বীরহোড় বংশজাত মাধো সিং নামক অপর এক ব্যক্তির হস্তে রাজ্যের সমগ্র কর্তৃত্বভার চলিয়া যায়। মাধো সিং যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাতিশয় শক্তিমান্ ও প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং সাঁওতালরাজ কিসকুর স্থলাভিষিক্ত হইয়া বিপুল বিক্রমে রাজ্যশাসন করিতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে মাধো সিং-এর জন্মবৃত্তান্ত ও রাজ-পরিবারে আশ্রয়লাভ বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোয়েন্দিগড়ের অধিপতি সাঁওতাল-রাজ কিসকুর রাজত্ব-কালে তাহার রাজ্যসীমার মধ্যে বীরহোড় নামক এক জাতি বাস করিত। বৃত্তি হিসাবে তাহারা ছিল রজ্জু-প্রস্তুতকারক। সাঁওতাল-রাজ কিসকুর হস্তীশালায় যতগুলি হস্তী ছিল—নিয়মিত ভাবে তাহাদের বন্ধন-রজ্জু সরবরাহ করাই ছিল বীরহোড়দের একমাত্র উপজীবিকা। এ বিষয়ে যথারীতি তত্ত্বাবধান ও রজ্জুসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল তাহাদের উপর। বীরহোড়দের শৈথিল্যবশতঃ হস্তী-বন্ধনের রজ্জুগুলি হঠাৎ এক সময় জীর্ণ হইয়া পড়ে। যথাসময়ে নূতন রজ্জুর ব্যবস্থা না হওয়ায় একদিন হঠাৎ গভীর রাত্রে হস্তীগুলি জীর্ণ-রজ্জুর বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া আস্তাবল হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং যদৃচ্ছ বিচরণ করিয়া কোয়েন্দিগড়ের শস্যক্ষেত্রগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে

ব্যাপকতর শস্যহানির দুঃসংবাদ সাঁওতাল-রাজ কিসকুর গোচরীভূত করা হইলে কিসকু অতিশয় কুপিত হইয়া উঠে এবং বীরহোড় সর্দারদের অবিলম্বে বাঁধিয়া আনিয়া বিচারশালায় হাজির করিবার হুকুম দেয়। কিন্তু বীরহোড়দের আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সংবাদ লইয়া জানা গেল কোয়েন্দিগড়ের বীরহোড় পল্লীগুলি একেবারে জনমানবশূন্য। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাতারাতি তাহারা স্ত্রীপুত্র-পরিবার সহ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

সাঁওতাল-রাজ কিসকু কয়েকজন অনুচর সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহণে বাহির হইয়া পড়িল বীরহোড়দের অনুসন্ধানের জন্য। গভীর অরণ্যসঙ্কুল সম্ভাব্য পথ ধরিয়া বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াও আর তাহাদের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সাঁওতাল-রাজ কিসকু অশ্ববল্গা সংযত করিয়া পথিমধ্যে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। কোথা হইতে যেন কচিকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত একটি রোরুদ্যমান সদ্যজাত শিশু সদ্যরচিত একটি শালপাতার শয্যার উপর অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, পলায়মান বীরহোড়দলের কোন গর্ভবতী নারী জঙ্গলের মধ্যে সন্তান প্রসব করিয়া পথিপার্শ্বে শিশুটিকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। রাজশাসনের আত্যন্তিক ভীতিই এই ভাবে সন্তান ফেলিয়া সদ্যপ্রসূতা জননীর পলায়নের একমাত্র কারণ। সাঁওতাল-রাজ কিসকু মনে মনে একটু বিচলিত হইল এবং বীরহোড়দের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইয়া উক্ত শিশুকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া গেল কোয়েন্দিগড়ে। পুত্রাধিক স্নেহ যত্নে রাজপরিবারের মধ্যে লালিতপালিত হইতে লাগিল এই বীরহোড় বংশধর। নাম হইল তাহার মাধো সিং। যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় বলীয়ান ও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল এই বীরহোড় নন্দন। সাঁওতালরাজ কিসকুর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী স্বরূপ মহাশক্তিধর ও দোর্দণ্ডপ্রতাপ দৈবানুগৃহীত এই মাধো সিং ঘটনাচক্রে কোয়েন্দিগড়ের একমাত্র অধীশ্বর ও প্রজাকুলের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিল।

মাধো সিং সাঁওতাল রাজের রাজ্যসম্পদ্ লাভ করিয়াই শুধু ক্ষান্ত রহিল না। শেষ পর্যন্ত রাজবংশের এক নবযৌবনা কুমারী কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক ও তৎপর হইয়া উঠিল। তাহার এই অসঙ্গত প্রস্তাবে চম্পার সাঁওতালগণ অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়ে। যেহেতু বীরহোড় বংশীয় মাধো সিং সাঁওতালদের দাসবংশ সম্ভূত এবং সেই কারণে তাহাদের নিকট নীচকুলোদ্ভব অন্ত্যজ বলিয়া পরিগণিত—সেই হেতু সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘনপূর্বক জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়া সাঁওতালদের পক্ষে বীরহোড়ের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা কোনরূপেই চলিতে পারে না। সাঁওতাল সমাজে ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ মাধো সিং সদর্পে ঘোষণা করিল তাহার প্রস্তাবে সাঁওতাল-সমাজ সম্মত না হইলে বলপূর্বক কন্যা অপহরণ করিয়া তাহার সিঁথিমূল সিন্দুর লিপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে। সাঁওতালেরা মহা সমস্যায় পড়িল। চম্পার একচ্ছত্র অধিপতি দোর্দণ্ডপ্রতাপ মাধো সিংকে গায়ের জোরে বাধা দিবার শক্তি সে সময় আর সাঁওতালদের নাই। সমাজের মুখ্যব্যক্তিগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, বিজাতীয় বীরহোড়ের কবল হইতে সাঁওতালী বংশমর্যাদা যেমন করিয়া হউক রক্ষা করিতে হইবে। তাহার জন্য যদি সাঁওতালদের ভিটামাটি ছাড়া হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। তথাপি দাসবংশজাত বীরহোড়ের সহিত সাঁওতাল-কন্যার বিবাহসম্পর্ক কোন মতেই স্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া দেশত্যাগে তাহারা কৃতসংকল্প হইয়া উঠিল। হঠাৎ একদিন রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, চম্পারাজের সাঁওতাল বস্তিগুলি জনমানবশূন্য। চম্পার ত্রিসীমানার মধ্যে একটি সাঁওতালকেও আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া স্ত্রীপুত্র-পরিবারসহ তাহারা দলবদ্ধ ভাবে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাধো সিং বহু চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদের ধরিতে পারে নাই।

সাঁওতালদের বিড়ম্বিত যাযাবর জীবনের এইখানেই সূত্রপাত। সুখ-সমৃদ্ধিশালী চম্পারাজ্যের আনন্দময় দিনগুলি আজ পর্যন্ত সাঁওতালেরা অতি দুঃখের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। বংশপরম্পরায় প্রচলিত রূপকথার ন্যায় চাই চম্পার পূর্বস্মৃতি আজিও সাঁওতালদের মনে বিষাদঘন করুণ একটি স্বপ্নাবেশের মত জাগিয়া আছে।

চম্পা হইতে এইভাবে গৃহত্যাগ করিবার পর পথিমধ্যে সাঁওতালগণ জোহন পাইকা ও কপিকরণ নামক দুইজন অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ করে। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় নাকি দয়াপরবশ হইয়া সাঁওতালদের চম্পা হইতে বহির্গমনে সহায়তা করিয়াছিল এবং ইহারাই নাকি দেবতার তুষ্টিসাধনের জন্য বোঙ্গা পূজার পদ্ধতি সাঁওতালদের শিখাইয়া দেয়।

অতঃপর সাঁওতালেরা দলবদ্ধ ভাবে নিরাপদ্ আশ্রয়ের

সন্ধানে দেশদেশান্তর অতিক্রম করিয়া দূর দুরান্তে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের পুরাকাহিনী হইতে জানা যায়, সাঁওতালেরা নাকি চম্পা হইতে প্রথমে ছোটনাগপুরের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়। তাহাদের আগমনের পূর্ব হইতেই উক্ত অঞ্চলে মুণ্ডা নামক অপর এক বন্যজাতি বাস করিত। মুণ্ডারা আগন্তুক সাঁওতালদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেও শেষ পর্যন্ত তাহাদের এখানে মন টিঁকিল না। চারিদিকে বনজঙ্গল কাটিয়া সাফ করা হইয়াছে, পতিত জমি প্রায় নাই বলিলেই হয়, ইতিপূর্বেই সেগুলি পূর্ববর্তীয়দের দ্বারা অধিকৃত ও শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এখানে তাহাদের জীবনধারণের উপযুক্ত অবলম্বন কোথায়?

দেশান্তরী সাঁওতালের দল মুণ্ডা-অধ্যুষিত এই নূতন পরিবেশে আসিয়া বিশেষ কোন আলোর সন্ধান পাইল না। ছোটনাগপুর পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত বাসভূমির সন্ধানে পুনরায় তাহারা দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেল, দলবদ্ধ ভাবে প্রথমে ঝালদা, তথা হইতে ভূমিজ কোল-অধ্যুষিত পাতকুম ও তাহার পর মানভূম অতিক্রম করিয়া রাজা হাম্বির সিং-এর অধিকারভুক্ত [illegible] নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হয় এই সাঁওতালের দল।

এখানে কিছুকাল বসবাস করিবার পর সাঁওতালেরা উপলব্ধি করে যে, রাজা হাম্বির সিংয়ের এলাকায় হিন্দু-সভ্যতা ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য খুব বেশী। রাজা হাম্বির সিং নিজে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়া রাজপুত উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া তাহাদের সম্যক্ ধারণা জন্মিল যে, এখানে বসবাস করিতে হইলে অবিলম্বে তাহাদের নিজস্ব ধর্মমত বিসর্জন দিয়া স্থানীয় ধর্মমত গ্রহণ করা ছাড়া সাঁওতালদের আর গত্যন্তর থাকিবে না। কিছুদিন হইতে সাঁওতালদিগকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করাইবার জন্য পরোক্ষ একটা প্রচেষ্টার ভাব ক্রমশই যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছিল। কোনরূপ প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে অবিলম্বে যে ইহা সাঁওতালদের পক্ষে অনিবার্য হইয়া উঠিবে সে সম্বন্ধে তাহাদের মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। নূতন এই ধর্মান্তর সমস্যা দেখা দিতেই সাঁওতালেরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা বোঙ্গার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া অপর কোন অজ্ঞাত দেবদেবীর উপাসনা করা ত সাঁওতালদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া সাঁওতালেরা হঠাৎ একদিন সদলবলে সেখান হইতে পুনরায় নিঃশব্দে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে গিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই পথের দুঃখ, দুর্বহ যাযাবর জীবন, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ অনির্দিষ্ট কোন্ অচেনার সন্ধানে আবার সেই নিরুদ্দেশ যাত্রা।

এখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ধরিয়া সাঁওতালেরা পুনরায় অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে সাওন্ত নামক স্থানে গিয়া সদলবলে উপনীত হয়। এই সাওন্ত অঞ্চলে তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করিয়াছিল এবং এই স্থানে আসিবার পর সাময়িক ভাবে তাহাদের যাযাবর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই স্থানে তাহাদের বসবাস সাঁওতাল জাতির ভ্রাম্যমান জাতীয় জীবনের ইতিহাসে বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কেহ কেহ বলেন, এই সাওন্ত নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়াই নাকি তাহাদের নাম হইয়াছে সাঁওতাল। তৎপূর্বে তাহারা নিজদিগকে শুধু 'হড়' বলিয়া পরিচয় দিত। সাঁওতালী ভাষায় 'হড়' শব্দের অর্থ মানুষ। অনেকের মতে এই সাওন্ত নামক স্থান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এবং বর্তমান শিলদার সহিত অভিন্ন।

এই ভাবে বহু প্রকার দুঃখকষ্ট ও দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিন অতিবাহিত করিবার পর সাঁওতালেরা সাওন্তে গিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত মনে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং অপেক্ষাকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়া জীবনযাপন করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু এখানেও তাহাদের সুখশান্তি শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নাই। পুনরায় এক নূতন উপসর্গ আসিয়া দেখা দিল। সাওন্ত-রাজের লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হইল সাওন্তবাসিনী এক সাঁওতাল রমণীর উপর।

সাঁওতালেরা বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ একটি সঙ্গীতপ্রিয় জাতি এবং সাঁওতাল রমণীগণ সবিশেষ নৃত্যগীত-পটীয়সী। উন্মুক্ত আকাশতলে বাঁশী বানাম মাদল লাগরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সংযোগে সাঁওতালী গীত ও সাঁওতাল রমণীগণের সাবলীল নৃত্যভঙ্গি যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাদের নিকট ইহার বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সাঁওতালদের এক নাচ-গানের মজলিসে সাওন্ত-রাজ এক সাঁওতাল রমণীর নৃত্য দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। এই ব্যাপারে সাঁওতালেরা আর একটিবারের জন্য অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠিল। চম্পার পুনরাবৃত্তি। সাঁওতাল রমণীর উপর নারীলোভী বিজাতীয়ের লোলুপ দৃষ্টি। প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাহারা বহু চিন্তা করিল। কিন্তু ইহার আর প্রতিকার কি, সাওন্ত-রাজের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন অনিবার্য। রাজরোষ হইতে তাহাদের

সাঁওতালপল্লী মধ্যে অবস্থিত 'বুড়া-বুড়ীর' থান

সাঁওতালী ভাষায় করুণ কণ্ঠে একবা উচ্চারণ করিয়াছিল—বিদায়—সাও বিদায়। পথ হইতে পথান্তরে ' বাড়াইল ভাগ্যবিড়ম্বিত সাঁওতা দল। দিক্ হইতে দিগন্তরে সু হইল আবার যাযাবর নিরুদ্দে' যাত্রা।

ভবিষ্যৎ সাঁওতাল পরগণা নীলাঞ্জন নিবিড় মায়া সাওন্তহার সাঁওতালদের দূর হইতে যেন হা ছানি দিয়া ডাকিতেছে। তাহাদে এই নিপীড়িত মানবাত্মার মর্মান্তিক অন্তর্দাহ এখানে হয়ত কিছু জুড়াইলেও জুড়াইতে পারে।

এই স্থানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উত্তরোত্তর অতি-মাত্রায় বংশ-বৃদ্ধিবশত সাঁওতালদের জনসংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছিল এবং পূর্বের ন্যায় সমষ্টিগত ভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করাও সকলের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না।

এক একটি বৃহৎ দলের কিছু কিছু অংশ তাহাদের যাত্রাপথের স্থানে স্থানে পিছনে পড়িয়া রহিয়া যায় এবং স্ত্রীপুত্র-পরিবারসহ সেই অঞ্চলেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এইভাবে হাজারীবাগ মানভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুর বর্ধমান প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় কিছু সংখ্যক সাঁওতাল সেই সময় হইতেই স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং গোষ্ঠীগত ভাবে নির্জন প্রান্তর বা বন্যপরিবেশে ছোট ছোট কুটীর বাঁধিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে ক্রমশ তাহারা সেই সেই স্থানের স্থায়ী বাসিন্দারূপে পরিগণিত হইয়া যায়। সাঁওতালদের বৃহত্তর দলগুলি ইহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া বিপুল সংখ্যায় ক্রমাগত উত্তরমুখে অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে। তাহাদের পবিত্র তীর্থ দামোদর নদ অতিক্রম করিয়া সদলবলে তাহারা প্রবেশ করিল গিয়া রাজমহলের সন্নিহিত মাল পাহাড়িয়া অধ্যুষিত বর্তমান সাঁওতাল পরগণার গভীর এক অরণ্য প্রদেশে। পূর্বে উল্লিখিত দামিন-ই-কো বা পাহাড়িয়া অঞ্চলের আশেপাশে গিয়া দলে দলে তাহারা সমবেত হইতে লাগিল। এই সেই দামিন-ই-কো, যাহার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাযাবর এই সাঁওতালের দল দীর্ঘকাল পরে চাই চম্পার দুঃখ ভুলিবার মত সাময়িক একটা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল।

ধনপ্রাণ ও নারী-মর্যাদা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিবে কে? প্রতিকারের শুধু একটি মাত্র পন্থা সাঁওতালদের জানা আছে, যাহা তাহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব আবিষ্কার। কুলকন্যার সম্ভ্রম রক্ষার্থে উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে তাহারা সেই পন্থাই অবলম্বন করিল। সাওন্তের মায়া কাটাইয়া বিক্ষুব্ধ সাঁওতাল দলে দলে গৃহত্যাগ করিয়া আবার ছড়াইয়া পড়িল দূরদূরান্তে। ইতিবৃত্ত এই কথাই বলে। সেদিন যে তাহারা কতখানি ব্যথা বুকে চাপিয়া এই ভাবে পুনরায় মাটি মায়ের কোল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিতান্ত অসহায়ের মত সাওন্তের উপনিবেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের সেই বেদনার্ত বিহ্বল মানসচিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা কিন্তু কল্পচক্ষে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—সুদীর্ঘকাল সাওন্ত-বাসের অবসানে এই স্থান হইতে বিদায় লইবার সময় গৃহহারা সাঁওতালগণ উপনিবেশের কুটীরগুলির দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অতি অসহায় ভাবে ক্ষণেকের জন্য অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিল। হয়ত বা তাহারা সযত্নমার্জিত পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনার উপর ভূমিষ্ঠ হইয়া শেষবারের মত গড় করিয়া গিয়াছিল তাহাদের প্রিয় দেবতা মারাং বুরুর অনুচর বাস্তু বোঙ্গার উদ্দেশে। স্ত্রীপুত্র-পরিবারসহ সাওন্তের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া হয়ত বা তাহারা আর একটি বারের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পিছন ফিরিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হয়ত বা তাহাদের

# সে নহি
# সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

পরের বছর ডক্টরেট পেল দেববাণী।

প্রঃ বসাক ওকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করলেন। বললেন, "ডক্টরেট পেয়েছ ব'লে রিসার্চ ছেড়ে দিও না বাণী। এবার আলাদা লেবরেটরী বানিয়ে নাও। কাজ ক'রে যাও। এখনও কিছুই হয় নি তোমার।"

খোকনকে দেববাণী স্কুলে ভর্তি ক'রে দিল। বাসন্তী দেবী আপত্তি করেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে, এখনই স্কুল!

আপত্তি শুনল না দেববাণী। "স্কুলে যাক, মা," সে বুঝিয়ে বলল, "একটু তাড়াতাড়িই সুরু করুক। আমরা তো পাঁচেই স্কুলে গেছি।"

ক'বছর পরে জীবনে কিছুটা আলো দেখতে পেল দেববাণী। সময় হ'ল নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখবার! দেখল, তার দেহ রুক্ষ, কৃশ, কালো হয়ে গেছে, চোখের নিচে কালি, মাথার চুল অর্ধেক খালি। দেখল, মুখের চামড়ায় বয়সের নির্দয় কুঞ্চন। দেখতে গেল, ক' বছরে মা'র চুল পেকে গেছে, মা বুড়ী হয়ে যাচ্ছেন। মুখে যতটা সম্ভব হাসি রেখে চলেন বাসন্তী দেবী, খোকনকে নিয়ে খেলা করেন, খোকনের কাছে রূপকথার গল্প বলেন, আর বলেন গ্রামের কথা, তাঁর দাদার কথা। কিন্তু, দেববাণী দেখল, মা ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। দেববাণী আরও দেখল, দেবযানী গম্ভীর হয়ে গেছে, আগের মত উচ্ছল নেই! জীবনের ক্লেদকিন্ন দিকটা এ-বয়সে সে বড় বেশি জেনে ফেলেছে। মনে হ'ল, সে বড় ক্ষতি ক'রে ফেলেছে দেবযানীর। যে-বয়সে জীবনকে তার জানা উচিত রঙিন, সুন্দর, আশ্বাসময়, সুস্থ, সবল, পরিপূর্ণ আনন্দ ব'লে, সে দেখতে পেয়েছে আবর্জনার স্তূপ, পঙ্কিল কামনা, খল ছলনা, কুটিল প্রতারণা। সে গান ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গ ছেড়েছে, শান্ত কমনীয় তার দু'টি চোখে নীরব ব্যথা, অব্যক্ত নালিশ।

দেববাণী আরও দেখল, দুরু দুরু বুকে, চাপা আতঙ্কে দেখল, খোকন, তার একমাত্র সম্বল দেবকুমার, তাদের জীবন-প্রাঙ্গণ হতে কলঙ্কে অপসৃত তার জন্মদাতার সুপ্রকাশ ছাপ নিয়ে বেড়ে উঠছে। যে মানুষটা ঝড়ের মত এসে দেববাণীর জীবন তচনচ্ ক'রে দলিত ধ্বংসাবশেষ পেছনে ফেলে চিরদিনের মত পলাতক, তারই প্রতীক হয়ে একমাত্র আত্মজ দেববাণীর চোখের সামনে বিকশিত হবে, ভাবতেও তার অন্তর অস্থির হয়ে উঠল। যে-কোন উপায়ে দেবকুমারকে, তার খোকনকে, মানুষ করতে হবে, সত্যিকারের মানুষ। পিতৃপরিচয় সে বহন করবে না জীবনে; সে শুধু তার মায়ের ছেলে। মা ছাড়া পৃথিবীতে আপনার তার থাকবে না কেউ। সন্তান জীবনের রসদ পায় পিতার কাছে। পিতার হাত ধ'রে সে প্রথম চলতে শেখে জীবনের পথে। বড় হয়ে হাত পাতে, বলে, দাও আমায় তোমার অভিজ্ঞান। মা লালন করে, পিতা পালন করে। দেববাণী বুঝল, তাকে দুই-ই করতে হবে। তাকে হতে হবে খোকনের বাবা, মা। তারই হাত ধ'রে খোকন জীবনের পথে প্রথম চলতে শিখবে; তারই কাছে হাত পেতে অভিজ্ঞান চাইবে। কি দেবে তাকে দেববাণী? দিতে হলে দেববাণীকে সঞ্চয় করতে হবে। কেবল ব্যথা, অপমান, লাঞ্ছনা, প্রতারণার অভিজ্ঞান পুত্রের হাতে সে তুলে দিতে পারবে না। দেববাণী বুঝল, তার সামনে এখনও অনন্ত সংগ্রাম। খোকনের প্রাণ ভ'রে যায়, এমন মা তাকে হতে হবে। শুধু খোকন ভাববে না, জানবে না তার মা প্রবঞ্চিতা দুঃখিনী। তাকে জানতে হবে, তার মা জননী, সে জন্ম দেয়, পালন করে, পথ দেখায়, প্রেরণা দেয়, জীবনে পূর্ণতা আনে।

১৯৪৬ সনের গ্রীষ্মে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাতাবরণ ভয়ানক উত্তপ্ত। রাজনীতিতে দেববাণীর আকর্ষণ নেই, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার আশু সম্ভাবনায় সেও খানিকটা উত্তেজিত। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ওপর দিয়ে গত ক' বছরে যেসব গুরুতর ঘটনার প্লাবন বয়ে গেছে, জীবনের জটিল সমস্যায় জড়িত দেববাণী তাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতে পারে নি। কিন্তু পাখী প্রভঞ্জনে উদাসীন হলেও উন্মাদ পবন উল্লসিত অত্যাচারে তার ছোট্ট বাসাটুকুকে বিপর্যস্ত করে। তেমনি

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ দেববাণীর জীবনকে ছিন্নভিন্ন করেছে। মহাযুদ্ধ নামক ঘোরকৃষ্ণ কুটিল দুর্ঘটনা অশ্লীল অন্যায় পথে অর্থ রোজগারের পথ সুগম না করলে দেববাণীর বিবাহিত জীবন হয়ত এত সহজে ভেঙে যেত না। যে মানুষটিকে সুর-সঙ্গীতের সম্মোহনে স্বেচ্ছায় সে স্বামিত্বে বরণ করেছিল, অর্থ ও বিলাসের দুষ্ট আমন্ত্রণ তাকে লালস ক'রে তুলল, দেববাণী তার দ্রুত বিপথ-গতি প্রতিরোধ করতে পারল না। বিশ্বযুদ্ধের প্রতি সে অতিশয় বীতরাগ ছিল; যুদ্ধের অন্তর্বর্তী রাজনীতি তার মনকে বিশেষ আকর্ষণ করে নি। কিন্তু ইংলণ্ডে শ্রমিক দল শাসনভার পাওয়ার পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যখন হঠাৎ আশু সম্ভাব্য বাস্তবে পরিণত হ'ল, কলেজে, লেবরেটরীতে, বাড়ীতে সর্বদাই এই নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা, দেববাণীও কিছুটা উত্তেজিত হ'ল, মনে আশা জাগল, দেশ স্বাধীন হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো দিগন্ত-প্রসারিত হবে, ভারতবর্ষেই সে উচ্চতর রিসার্চ শেষ করার সুযোগ পাবে। একদিন হিমাদ্রি এলে সোৎসাহে দেববাণী আসন্ন স্বরাজ-প্রসঙ্গের অবতারণা করল।

হিমাদ্রি কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখাল না। দেববাণীর সংযত স্বপ্ন-বিন্যাসের উত্তরে শুধু বলল, "আপনার মা'র শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

যেমন দ'মে গেল দেববাণী তেমন আশ্চর্য হ'ল।

"খুবই খারাপ হয়েছে," সে সায় দিল। "যতটা বাইরে থেকে দেখায়, তারও বেশি।"

"দেবযানীকেও খুব ভাল মনে হচ্ছে না।"

"ওর শরীর মন দুই-ই খারাপ।"

"একটা কাজ করুন।"

"কি?"

"মাসখানেকের জন্যে কোথাও বেড়িয়ে আসুন সবাই।"

"আমিও দু'একবার ভেবেছি কথাটা।"

"গিরিডিতে আমাদের একটা ছোট বাড়ী আছে। বাবা তৈরী করেছিলেন। এখন ওটা খালি। আপনারা ওখানে অনায়াসে থাকতে পারবেন। নোংরা হয়ে গেছে। সাফ ক'রে নিতে হবে।"

"মা কি যেতে রাজী হবেন?"

"রাজী করিয়ে নিন।"

"দেবযানী বলবে ওর পড়ার ক্ষতি হবে।"

"শরীর ভেঙে গেলে পরীক্ষা দেবে কি ক'রে?"

চারজনে প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা হ'ল। দেখা গেল, বাসন্তী দেবীর উৎসাহ আছে, দেবযানীও রাজী। দেববাণী টাকার কথা তুলল, কিন্তু বাড়ীভাড়া যখন লাগবে না, খরচ তখন শাসনের বাইরে নয়।

"কলেজের ধার মাসদুই শোধ না করলেও চলবে" হিমাদ্রি উপায় বাৎলে দিল।

দেববাণী বিষণ্ণ হাসল। "জানি। না শোধ করলে বা কি?"

বাসন্তী দেবী ভাবলেন, চেঞ্জে গেলে মেয়ের ভেঙে-পড়া শরীর তাজা হবে। মনে নতুন শক্তি পাবে। তিনি সোৎসাহে রাজী হলেন। দেবযানীও তাই ভাবল, সঙ্গে সঙ্গে আরও ভাবল, এ শ্বাস-রোধ-করা পরিবেশ থেকে একটু মুক্তি পাওয়া যাবে। দেববাণী ভাবল, মা'র দেহ-মনের উপকার হবে। বেচারা দেবযানী হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। আমিও একটু অবসর পাব ভাববার, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের নতুন সমীক্ষা করবার।

জুন মাসের মাঝামাঝি ওরা গিরিডি গেল। জুলাই মাসে কলকাতায় বাধল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। গিরিডির স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ায় সবার দেহ-মনেরই উন্নতি হয়েছিল। সবচেয়ে আনন্দে ছিল খোকন। কিন্তু দাঙ্গা বাধবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। চিন্তা হ'ল হিমাদ্রির জন্যে।

বৌবাজারের মেস ত্যাগ ক'রে হিমাদ্রি এণ্টালীতে দু'খানা ঘর নিয়েছিল। নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার বুদ্ধি হিমাদ্রির একেবারে নেই। বাসন্তী দেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। দেববাণীকে বললেন, "চিঠি লিখে দেখবি?"

"তুমি লিখতে পার।"

"কোথায় লিখব?"

"মেসে লিখে লাভ নেই। কলেজও হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। তবু কলেজেই লেখ।"

চিঠির উত্তর এল না।

দেববাণী ডাঃ বসাককে লিখল। কলেজ কবে খুলবে জানতে চেয়ে চিঠির অবতারণা ক'রে হিমাদ্রির খবর চেয়ে শেষ করল। ডাঃ বসাক জবাব দিলেন। কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ। অবস্থার উন্নতি হলে দেববাণী জানতে পারবে। হিমাদ্রি দিন পনের আগে বেঁচে ছিল তিনি নিশ্চিত জানেন, কারণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এখন সে কোথায় কেমন আছে তাঁর জানা নেই। যে-ভাবে সে ধর্ম-নির্বিশেষে প্রাণ রক্ষার কাজে লেগে গেছে, তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না সান্ত্বনা এই, সে ভাল করছে, মঙ্গল করছে, ভগবানের কাজ করছে, যার চেয়ে বড় কাজ মানুষ করতে পারে না

গিরিডির পাহাড়ী নির্জনতায় দেববাণী তার জীবনে

হিমাদ্রি-ভূমিকার সমীক্ষা করতে চেষ্টিত হ'ল। শুধু দেববাণী নয়, বাসন্তী দেবী ও দেবযানীও হিমাদ্রি-মুখর। তিনজনে একত্র হলে প্রধান আলোচনার বিষয় হিমাদ্রি; তিনজনের একক অবসরেও তার নিত্য আসা-যাওয়া। দেববাণী দেখতে পেল, তার জীবনের কঠিনতম সংগ্রাম-অধ্যায়ে হিমাদ্রি নামক মঙ্গলময় মানুষ বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। বলতে গেলে এমন কোনও সার্থকতা সে অর্জন করে নি যাতে হিমাদ্রির সৃষ্টিশীল সহায়তা নেই। রিসার্চ করবার সুযোগ থেকে কলেজে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত প্রতিবার সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে হিমাদ্রির প্রসারিত হাত, দাক্ষিণ্যে উজ্জ্বল। অথচ কি নৈর্ব্যক্তিক হিমাদ্রির এই বন্ধু-ভূমিকা! জানতেও দিতে চায় নি নিজের অস্তিত্ব, বাহবা দূরের কথা, কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই, যেন নদীর স্বাভাবিক গতির মত তার সহানুভূতি, মমতা, করুণা। শূন্যতার ব্যথা নিয়ে দেববাণী দেখতে পেল, হিমাদ্রির খুব কিছু সাংসারিক পরিচয় পর্যন্ত সে জানে না। সাধারণত হিমাদ্রি নিজের কথা বলে না। কথা আজকাল সে অনেক বলে, কিন্তু সবটাই প্রায় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে, নয় ত কোন বুদ্ধিগত সমস্যা। মা মাঝে মাঝে বাড়ী-ঘর, পরিবার-পরিজনদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন, স্বল্পতম জবাব দিয়েছে হিমাদ্রি। তা থেকে জানা গেছে হিমাদ্রি শৈশবে মাতৃহীন, যৌবনে পিতৃহীন। উত্তর কলকাতায় তার একখানা পৈতৃক বাড়ী আছে; তাতে ভাড়া খাটছে। বাবা তার জন্যে কিছু অর্থ রেখে গেছেন। এলাহাবাদে কাকা ও দ্বারভাঙ্গায় পিসী ছাড়া, সে পৃথিবীতে প্রায় নিরাত্মীয়। বাবা দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন; সংসারে উদাসীন, শেষ জীবনে প্রায় সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। হিমাদ্রি অনেককে চেনে, কিন্তু বন্ধু তার কম। এটুকু বাহ্যিক পরিচয় যে হিমাদ্রি-চরিত্র বুঝবার পক্ষে অপর্যাপ্ত, দেববাণী তা জানে। যেমন, দেববাণী জানে, বেশভূষায় উদাসীন, আহারে-বিহারে-শয়নে-আরামে নিরাকাঙ্ক্ষ হলেও, জীবনকে হিমাদ্রি প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। চিত্ত তার কোমল, প্রাণ স্পর্শকাতর, মন ভাবালু। দেববাণী দেখতে পেল তার অন্তরে হিমাদ্রির জন্যে নিভৃতে সঙ্গোপনে একটি বিশিষ্ট স্থান তৈরী হয়ে আছে। সে লজ্জিত হ'ল না। হিমাদ্রি ত পুরুষ নয়, মানুষ। সে কোনও দিন জানবে না, বুঝবে না, দেববাণীর গোপন শ্রদ্ধা। যে দেববাণীকে সে প্রায় নিজের মাহাত্ম্যে সৃষ্টি করল, তার প্রস্ফুটিত বিকাশে সে তৃপ্ত হবে, নিভৃত মনের সন্ধান করবে না।

সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ বসাকের চিঠিতে কলেজ খোলার নোটিশ পেয়ে দেববাণীরা কলকাতায় ফিরে এল। এসেই দেববাণী হিমাদ্রির খোঁজ পেল। সে শান্তি সেনার অন্যতম অধিকর্তা হয়ে কলকাতার গুরুতর আহত মানবের সেবা করছে।

দেখা হতে প্রায় একমাস। সেদিনের কথা দেববাণী ভুলতে পারে না।

কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছে দেববাণী। বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ দেখতে পেল অন্য ফুটপাথে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়ল হিমাদ্রি।

দিগ্‌বিদিক্ খেয়াল না করে দেববাণী রাস্তা পার হতে গেল। ছুটে-আসা মোটর গাড়ী চীৎকার তুলে ব্রেক কসল তার এক-ইঞ্চি নিকটে। রাস্তার লোক হৈ হৈ ক'রে উঠল; চোখের নিমেষে ভিড় জ'মে গেল। অথচ বিব্রত, হৃদ্-কম্পিত, ত্রস্ত দেববাণী ভিড়ের মধ্যেও দেখতে পেল, হিমাদ্রি এগিয়ে-আসা বাসে উঠবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

কোনও মতে দৌড়ে এসে হিমাদ্রির পাশে দাঁড়াল দেববাণী।

"হিমাদ্রিবাবু?"

এতক্ষণে হিমাদ্রির নজর পড়ল। দেববাণীকে দেখে সে অবাক্ হ'ল, খুশীও হ'ল।

"আচ্ছা! আপনি? এতদিন কোথায় ছিলেন?"

অসহ্য লাগল দেববাণীর।

"বেশ লোক আপনি। গিরিডিতে পাঠিয়ে দিলেন, ব্যস্। কোন খোঁজ-খবর নেই। চিঠি লিখে জবাব পাওয়া যায় না। একমাস হ'ল কলকাতায় ফিরেছি, দেখা নেই। আজ আপনাকে ট্রাম থেকে নামতে দেখে রাস্তা পার হতে মারা যাচ্ছিলাম। এত লোক ভিড় করল, আর আপনি দিব্যি ট্রাম থেকে নেমে বাসে উঠে হাওয়া হচ্ছিলেন!"

এতগুলি কথা উত্তেজিত হয়ে বলতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল দেববাণী।

হিমাদ্রি কেমন হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল। "আপনারই অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল? কি সর্বনাশ! লাগে নি ত?"

"না। লাগে নি। লাগলেও আপনি দেখতে পেতেন না। আমি গাড়া চাপা প'ড়ে ম'রে গেলেও আপনি বাসে উঠে দিব্যি চ'লে যেতে পারতেন।"

আমতা আমতা করে হিমাদ্রি বলল, "আমি কি ক'রে জানব আপনি রাস্তা পার হচ্ছিলেন? কলকাতায় ত

রোজ অ্যাক্‌সিডেণ্ট। আমার বড় তাড়া। এক্ষুনি হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে।"

"তবে যান উঠুন। ঐ ত বাস আসছে হাওড়া স্টেশনের।"

"হ্যাঁ, চলি। বাসায় আসব'খন।"

"সে আপনার দয়া।"

"আসব, কালই আসব। সন্ধ্যের পর।"

তাকে এগোতে দেখে দেববাণী জামা ধ'রে টানল।

"কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ। বলব। যাদের এত দয়া করেন, তারাও মানুষ, একথাটা মনে রাখবেন।"

বড় অপমান হয়েছিল দেববাণীর। কিন্তু ট্রামে ব'সে রাস্তা অতিক্রম করতে করতে অপমান বোধ কেটে গেল। লাভ নেই, সে বলল নিজেকে, লাভ নেই। হিমাদ্রির ওপর রাগ ক'রে কোনও লাভ নেই। তাকে সাধারণ মানুষের স্তরে টেনে আনবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা আহত হয়ে দেববাণীকে অপমান করেছে। চেষ্টা না করলে, অপমান নেই। পাহাড় কেটে মূর্তি তৈরী হতে পারে, পুরো পাহাড়টাকে ত মূর্তি ব'লে ভাবা যায় না। হিমাদ্রি একটা জমাট মাহাত্ম্য। তাকে শুধু মানতে হবে, তাকিয়ে দেখতে হবে। বন্ধুত্বে বিগলিত করা যাবে না।

পরের দিন সন্ধ্যের পর ঠিক এল হিমাদ্রি।

সবাই ঘিরে বসল তাকে। অনুযোগ অভিযোগ শেষ হতে চায় না বাসন্তী দেবীর ও দেবযানীর। ওরা এত বলল যে দেববাণীকে আর কিছু বলতে হ'ল না।

হিমাদ্রি দাঙ্গার কথা বলতে গিয়ে ব্যথায়, দুঃখে, লজ্জায় অস্থির হয়ে উঠল। মানুষকে সে চিরদিন বড় ক'রে দেখে এসেছে; সে যে এত নীচ, এত জিঘাংসু, এত প্রাণহীন, সে কোনও দিন ভাবতে পারে নি। হিংসা যে এত বীভৎস, কোনও দিন জানে নি হিমাদ্রি। মানুষের পশুত্ব যে হিংস্রতম পশুকেও বহু গুণ হার মানায়, সে যে যেটুকু সভ্যতা বিসর্জন দিয়ে অনায়াসে নৃশংস বর্বর হতে পারে, ফিরে যেতে পারে হাজার হাজার বছর নিমেষে পেরিয়ে আদিম অরণ্য যুগে, যেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, নেই নারীর সম্মান, শিশুর অসহায় কান্নায় দুঃখবোধ, নেই স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, শুধু আছে রক্তের প্রতি রক্তের পাশব আহ্বান, আর কঠোর উলঙ্গ হিংসা, হিমাদ্রি কোনও দিন জানে নি, জানতে চায় নি। সংঘবদ্ধ কাপুরুষতার চরম নিদর্শন তাকে গভীর ভাবে আহত করেছে। দাঙ্গার মরুতপ্ত দিনগুলি সে কেমন ক'রে কাটিয়েছে ভাল মনে নেই। শুধু মনে আছে, বিপন্ন মানুষের করুণ আর্তনাদ, ভীরু কাপুরুষ মানুষ-পশুর জঘন্য হিংস্রতা। সে সব দিন ত কেটে গেছে, কিন্তু তার মনে এখনও মরুর দহন; চোখ বুজলে বীভৎস দৃশ্যগুলি বার বার ভেসে ওঠে অন্ধকারের পর্দায়; মন তার অশান্ত, অস্থির।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিয়ে বাসন্তী দেবীর মনোভাব অন্য রকম, কিন্তু হিমাদ্রির যন্ত্রণা এত স্পষ্ট যে তিনিও ওর কোনও কথার প্রতিবাদ করেন নি। হিমাদ্রির কথা শেষ হলে তিনি বললেন, "তুমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাও।"

"আগুন থেকে পালিয়ে শান্তি নেই। আগুন না নিবলে পালান যাবে না।"

অর্থাৎ হিমাদ্রি কোথাও যাবে না। আগুন থেকে পালাবে না।

আপন মনেই এক সময় হিমাদ্রি ব'লে উঠল, "শীগ্‌গির শুনছি দেশ স্বাধীন হবে।"

"তাতে আমাদের কি?" বাসন্তী দেবী বললেন, "আমরা ত পাকিস্তানে যাব।"

"দেশ স্বাধীন হবে, এই স্বপ্ন নিয়ে কত যুগ কেটে গেল। কত বীর প্রাণ দিল, কত মা পুত্র হারাল, কত স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছল। আর যখন সেই অতি-কাম্য স্বাধীনতা দরজায় এসে দাঁড়াল, আমরা চমকে উঠলাম তার বীভৎস চেহারা দেখে। ঘৃণা, হত্যা, আত্মকলহ দিয়ে যদি স্বাধীনতাকে বরণ করতে হয়, দেখা যাবে, তার মধ্যে অনেক গলদ লুকিয়ে আছে, সে স্বাধীনতা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে না, কেবল পিছু টানবে।"

সেদিন সন্ধ্যায় সবচেয়ে নীরব ছিল দেববাণী। তার কেবল ইচ্ছা হচ্ছিল, হিমাদ্রিকে ভাল ক'রে দেখে। দেখতে পেল, পাহাড়ের গা বেয়ে কোমল ঝরণা নেমে গেছে মৃদু কলতানে। অথচ পাহাড় বুঝি তা জানেও না। অমন কমনীয় ধারা তার পাথরকে বিন্দুমাত্র নরম করে নি। তার রুক্ষতাকে করে নি একটুও স্নিগ্ধ।

যাবার আগে দেববাণীকে একা পেয়ে হিমাদ্রি বলল, "একটু কাজ আছে আপনার সঙ্গে।"

দেববাণী অপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকাল।

"বিদেশে যাবেন?"

"বি—দে—শে?"

"আমেরিকায়।"

"কেন? কি করে?"

"পড়তে। রিসার্চ করতে।"

হিমাদ্রি না হয়ে অন্য কেউ এমন অসম্ভব কথা বললে

দেববাণী হেসে উঠত। হিমাদ্রির কথায় হাসা যায় না। সে ব্যাকুল হ'ল। "কি বলছেন আপনি?"

"শিকাগো য়ুনিভারসিটিতে পড়বার ও রিসার্চ করবার একটা স্কলারশিপ আছে। আপনি পাচ্ছেন। আগামী মাসেই যেতে হবে। তৈরী হোন।"

ঘরের দেয়ালগুলি কেমন ন'ড়ে উঠল। দেববাণী দাঁড়িয়েছিল, ব'সে পড়ল। "আমি স্কলারশিপ পাচ্ছি মানে? আমি কেন পেতে যাব? কে দেবে আমায়?"

হিমাদ্রি হেসে ফেলল। "আপনি পাচ্ছেন আপনার কাজের সুনামে। দিচ্ছে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট।"

"না। এ হতে পারে না।"

"হতে পারে না মানে? যাবেন না?"

"স্কলারশিপ আমি পেতে পারি না। নিশ্চয় আপনি পেয়েছিলেন, না নিয়ে আমায় দিচ্ছেন। বলুন, সত্যি ক'রে বলুন।"

হিমগিরির গাম্ভীর্যে হঠাৎ অনেক দূরে স'রে গেল হিমাদ্রি। কথা বলল যেন আকাশ থেকে।

"আমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। যাওয়ার ইচ্ছেও নেই আমার। তাছাড়া, আমি ইংলণ্ডে কাজ ক'রে এসেছি, দ্বিতীয়বার বিদেশে যাবার এখন আমার প্রয়োজন নেই।"

"আপনার প্রয়োজন আছে। অনেক কাজ আরও আপনাকে করতে হবে। বিদেশে না গেলে বড় রিসার্চের সুযোগ পাবেন না। আপনি যান।"

চোখে জল এসে গেল দেববাণীর।

হিমাদ্রি আবার বলল, "আপনার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করার আগ্রহ আছে, নিষ্ঠা আছে। বৈজ্ঞানিকের যে তিনটি গুণ সবচেয়ে দরকার সবই আছে আপনার। তাছাড়া—" একটু থামল হিমাদ্রি—"তাছাড়া, অনেক বড় ভাল কিছু না করতে পারলে অতীত থেকে আপনি মুক্তি পাবেন না।"

দেববাণী স'রে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের আধ-অন্ধকার বাড়ীগুলির দিকে। তার পর ফিরে এসে চেয়ারে বসল।

"কলেজে ছুটি পাব?"

"পাবেন। ডাঃ বসাকই স্কলারসিপের জন্যে পাত্র নির্বাচন করেছেন।"

"আপনাকে নির্বাচন করেছিলেন?"

"আপনার কথাও তাঁর মনে ছিল।"

"ক' বছরের স্কলারশিপ?"

"দু' বছর।"

"সব খরচ কুলিয়ে যাবে?"

"মনে ত হচ্ছে।"

"যাওয়ার খরচ?"

"ওদের।"

"থাকার ব্যবস্থা?"

"ওরাই ক'রে দেবে।"

"আমার ধারগুলো যে সব শোধ হয় নি এখনও? এখানকার খরচ চলবে কি ক'রে?"

"সে কথা আমরা ভেবেছি। সম্ভবত শিকাগো গিয়ে আপনি পার্ট-টাইম পড়াবার কাজ পেয়ে যাবেন।"

"যদি না পাই?"

"পাবেন।"

"অর্থাৎ যেতে আমাকে হবেই?"

"যাওয়া আপনার দরকার। যাওয়া আপনার উচিত।"

"আগামী বছর দেবযানীর পরীক্ষা। টাকা বেশি লাগবে। এই দেড় বছর এখানকার খরচ। মাসে মাসে ধার শোধ…"

"ওসব ভাবলে আর যেতে পারবেন না। আপনার মা ত কাজ করছেন। দরকার হলে কলেজ থেকে আরও কিছু ধার পেয়ে যাবেন। হাজার খানেক টাকা মা'র কাছে রেখে যান। তিন মাসের মধ্যে এত টাকা রোজগার করবেন যা এখানে দশ বছর পরেও মাইনে হবে না।"

"কলেজ থেকে ধার? মানে, আপনার টাকা?"

"আমি কেন দেব? ডাঃ বসাক দেবেন আপনাকে।"

সকরুণ হাসল দেববাণী।

হাতিবাগানের ছোট্ট ফ্ল্যাটে সে-রাত্রে নিদ্রা এল না। হিমাদ্রি চ'লে যাবার পর দেবযানী ও বাসন্তী দেবী অপ্রত্যাশিত খবর শুনে যুগপৎ অবাক্, আনন্দিত ও বিষণ্ণ হলেন। বাসন্তী দেবী দেববাণীকে উৎসাহ দিলেন। "হিমাদ্রি ঠিক বলেছে। তোর যাওয়া দরকার। এদিককার কথা ভাবিস নে। আমার কাজটা ত যায় নি এখনও। চ'লে যাবে খরচ।"

"তুমি ত বলবেই।" দেববাণীর কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তা। "তোমার না আসছে বছর রিটায়ার করার কথা?"

"চাইলে দু'এক বছর টিঁকে থাকা যাবে।"

"আমি অতদূরে চ'লে গেলে তুমি—তোমরা—থাকতে পারবে?"

"তুই ত আরও অনেক দূরে চ'লে গিয়েছিলি।"

"তোমার শরীরটা ভাল নেই।"

"খুব ভাল আছে। আমরা কি তোদের দাদুদা ও কাঁকর-যুগের মেয়ে? খাঁটি দুধ-ঘি খেয়ে ছোটবেলায় আমাদের দেহ তৈরি হয়ে গেছে। সহজে এ দেহ ভাঙবার নয়।"

"তাই যেন হয় মা, তাই যেন হয়। তুমি অনেক বছর, অনেক যুগ বেঁচে থাক। তোমার সব দুঃখ, সব অপূর্ণতা পূর্ণ করবার সুযোগ আমাদের দাও।"

"আমার সুখ-দুঃখ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা সব তোদের নিয়ে। তোরা সুখী হলে, সার্থক হলে আমার সব সাধ শেষ। সুখী তুই জীবনে আর হ'বি না। অন্তত সার্থক হ'।"

দেবযানীর দিকে তাকিয়ে দেববাণী বলল, "তুমি কিন্তু হুট্ ক'রে একটা যা-তা বিয়ে ক'রে বস না।"

"সম্ভাব্য পাত্রদের লিস্ট তোমায় পাঠিয়ে দেব, তুমি নির্বাচন ক'রো।"

"না, ইয়ার্কি নয়। এম-বি পাস করলেই ডাক্তার হয় না।"

"ডক্টরেট পেলেই বৈজ্ঞানিক হয় না।"

"হয় না-ই ত। তাই দেখছিস না আমি আমেরিকা যাচ্ছি।"

"আমিও বিলেতে গিয়ে এফ-আর-সি-এস পড়ব।"

"পড়বিই ত। কিন্তু বিয়ে করলে আর পড়া হবে না।"

"হতেও ত পারে।"

"তেমন কাউকে যদি পাস তাহলে অন্য কথা।"

"দেখছ, মা? ইনি এখুনি শিকাগো থেকে আমাকে পরিচালনা করছেন।"

বাসন্তী দেবী হাসলেন। কিন্তু মন তাঁর তখন গ্রীষ্ম-আকাশের মত উদাস হয়ে গেছে। বর্তমানের ওপর ভবিষ্যৎ ক্ষীণ ছায়া ফেলছে; তিনি যেন হঠাৎ-পাওয়া নতুন চোখে বহু দূর দেখতে পাচ্ছেন। জীবনের তাড়না কি প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে! তাঁরই মেয়ে দেববাণী সার্থকতার সন্ধানে চলল সুদূর শিকাগো। সমুদ্র, মহাদেশ, বিচিত্র সভ্যতা, ভাষা, মানুষের ব্যবধান নেমে আসছে তাঁর ও দেববাণীর মধ্যে। একদিন, বেশি দেরী নেই সেদিনের, দেবযানীও হয়ত চ'লে যাবে বিদেশে। যাবেই, দেববাণী তার উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। ঐ যে শিশু ছেলেটি বিছানায় নিদ্রিত, সেও চ'লে যাবে। সে বড় হবে বিদেশের অচেনা-অজানা পরিবেশে, মাতৃভাষা ভুলে যাবে, কোনও দিন দেশে ফিরবে কি না কে জানে? সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করতে বসেছে, একদিন ক'রে ফেলবে, যা ছিল একান্ত রূপে বাসন্তী দেবীর নিজের। নিজের দেহের অন্তস্তলে দু'টি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি; কত দুঃখে, কত আনন্দে তাদের গ'ড়ে তুলেছেন। কিন্তু রক্ষা করতে পারছেন না, পারা যাবে না। তাঁদের জীবনের পরিধি ছিল গ্রামে সীমিত; শহরে তার অতিরিক্ত বিনীত বিস্তার। এরা যেন সারা পৃথিবীর। এরা চ'লে যাবে। প'ড়ে থাকবেন শুধু তিনি, অতীতের বন্দী। প'ড়ে থাকবেন স্মৃতি নিয়ে, স্নেহ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে।

"কি ভাবছ মা?"

"ভাবছি, তুই যখন মস্ত নাম-করা বৈজ্ঞানিক হবি, মা'র কথা মনে থাকবে?"

"না, তা ভাবছ না। এমন নিষ্ঠুর মিথ্যে প্রশ্ন তোমার মনে আসতে পারে না। তুমি কি ভাবছ আমি জানি।"

"বল্ ত?"

"তুমি ভাবছ, আজ আমি আমেরিকা যাচ্ছি, কাল দেবযানী বিলেত যাবে। তখন তুমি একেবারে একা।"

"বুঝলি কি ক'রে?"

"আমিও যে তাই ভাবছি, মা।"

যাওয়ার ব্যবস্থা শেষ হতে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। চতুর্থ সপ্তাহে দেববাণীর যাত্রা। বিদায় নিতে গেল সে ডাঃ বসাকের কাছে।

আদর ক'রে বসালেন তিনি দেববাণীকে। কলেজের তিনতলায় প্রশস্ত ফ্ল্যাটে ডাঃ বসাক একা থাকেন।

ঠিক একা নয়, তিনি, চাকর রামদীন, আর হাজার পাঁচেক বই। বই ছড়ান ফ্ল্যাটের সর্বত্র, বিছানায়, কার্পেটে, আরাম-কেদারায়, বারান্দার টেবিলে।

"এস দেববাণী। বিদায় নিতে এসেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বস। একটু কফি খাবে ত? না, না, তোমাকে গিয়ে তৈরি করতে হবে না। রামদীন বেশ ভাল কফি বানায়।"

দেববাণী ডাঃ বসাকের পাশে সোফায় বসল।

"সব ঠিক-ঠাক?"

"আজ্ঞে।"

"কান্নাকাটি সুরু হয়ে গেছে?"

"না। এখনও হয় নি।"

"হবে, এমন আশা আছে ত?"

"মা সহজে কাঁদেন না। খুব সাহস আছে মা'র।"

"শুনে সুখী হলাম। মা'দের সাহস থাকলে সন্তানরাও সাহসী হয়।"

"ছোট বোনটা বোধ হয় কেঁদে ফেলবে।"

"কাঁদতে দাও। বড় মিষ্টি, দেববাণী, বুঝলে, বড় মিষ্টি আমাদের এই কান্না। বিদায়ের দিনে চোখের জল বড় মিষ্টি। পশ্চিমে বিয়ের পর মেয়েরা হাসতে হাসতে বিদায় নেয় বাপ-মা'র কাছে; আমাদের মেয়েরা নেয় চোখের জলে। তাই আমাদের বিয়ে ভাঙে না।"

"ফিরে এসে আমি আপনার কাছে কাজ করতে চাই। সে সুযোগ আমার থাকবে ত?"

"থাকবে, নিশ্চয় থাকবে। ফিরে ত এস আগে। হয়ত দেখবে বিদেশেই রয়ে গেলে।"

"না, না। আমার মা আছেন যে।"

"মা'র চেয়েও বড় জিনিস, দেববাণী, জীবন। জীবন টানলে তুমি ফিরবে কি ক'রে? ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছ না?"

"দু'বছরের জন্যে—"

"এখন অবশ্য নিতে পারবে না। বছর খানেক বাদে নিয়ে নিযো। এখানে ফেলে রেখ না।"

"এ কথা কেন বলছেন?"

"ছেলে কাছে থাকলে তোমার ও ছেলের দু'জনারই ভাল হবে। তোমার দায়িত্ববোধ সজাগ থাকবে। ছেলে মানুষ হবে।"

"মা একেবারে একা হয়ে যাবেন।"

"হবেনই ত। জীবনের নিয়মই এই। বাবা-মা একা হয়ে যায়। বার্ধক্য মানেই একা।"

"আপনাকে চিঠি লিখলে উত্তর পাব ত?"

"পেতে পার কখনও কখনও। চিঠি লেখা আমার কোনও দিন আসে না।"

"আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। ভগবানের আশীর্বাদে আপনার স্নেহ পেয়েছি। আমার জীবনের এক খুব বড় পাওয়া। আমাকে আশীর্বাদ করুন আপনি।"

দেববাণী গড় হয়ে প্রণাম করল।

তার পিঠে হাত বুলাতে গিয়ে ডাঃ বসাক দেখতে পেলেন অনেক, অনেক দূরে, বিলীয়মান বিদেশী পরিবেশে অদেখা-অচেনা অতি-পরিচিত অত্যন্ত-আপনার একটি মেয়ে একবার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল।

যৌবনে এক বিদেশিনীকে বিবাহ করেছিলেন ডাঃ বসাক। একটি কন্যা হয়েছিল। স্ত্রী একদিন কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এক ইতালিয়ান আর্টিস্টের সঙ্গে। তাঁদের খোঁজ তিনি আর রাখেন নি। তার পর আর বিয়েও করেন নি। সারাজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কেটে গেছে। স্ত্রীর কথা মনে পড়ে না বিশেষ। কিন্তু, যে শিশু-কন্যাকে এক অস্থিরচিত্ত ফরাসী মহিলা পিতার বুক থেকে একদিন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, কল্পনার কুযাসা-ঘন পথে তার ছায়া মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করে। অতীতের সঙ্গে ডাঃ বসাকের একমাত্র সংযোগ এই অস্পষ্ট, হঠাৎ-আসা, তখুনি হারিয়ে-যাওয়া, ছায়া।

এয়ারপোর্টে যেতে পারবে না হিমাদ্রি, কাজ আছে জরুরী; তাই দেববাণীর যাত্রার আগের দিন দেখা করতে এল। এমন সময় এল যখন তাকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল দুই বোনে আর মায়ে।

বাসন্তী দেবী বলেছিলেন, "হিমাদ্রি যাবে না এয়ারপোর্টে?"

দেববাণী জবাব দিয়েছিল, "জানি না ত।"

"নিশ্চয় যাবে।"

"কিছু বলা যায় না, মা। দিনরাত গান্ধীজীর কাছে বেলগাছিয়ায় প'ড়ে থাকেন। হয়ত খেয়ালই থাকবে না কাল আমার যাবার দিন।

"তোর যত বাড়াবাড়ি! আমি ত দেখতে পাই ভদ্রলোকের সব বিষয়ে পুরো খেয়াল।"

"সব বিষয়ে?"

"অন্ততঃ তোর বিষয়ে।"

হঠাৎ রঙিন হয়ে উঠল দেববাণী। যত না রঙিন, তার চেয়ে বেশি বিব্রত।

"বড ফাজিল হয়েছিস তুই।"

"সত্যি কথা বললেই ফাজলামি হয। তোর রিসার্চ করা দরকার, হিমাদ্রিদার পুরো খেয়াল ছিল না? তোর চাকরি চাই, টাকা ধার চাই, এমন কি তোর আমেরিকা যাওয়া চাই—এসব খেয়াল ওঁকে কে করিয়ে দিয়েছিল?"

"চুপ কর্।" চেঁচিয়ে উঠল দেববাণী।

বাসন্তী দেবী মৃদু হেসে বললেন, "হিমাদ্রিকে দেখে আমার ছোটবেলার একজনকে মনে পড়ে। সেও ছিল এমনি গম্ভীর, এমনি কোমল, এমনি উদার।"

"সেই তোমার দেশপ্রেমিক দাদা, না মা?"

বাসন্তী দেবী এ প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। বললেন, "বাণী, একটা কথা বলি। তোর কি মনে হয় হিমাদ্রি একেবারে নিঃস্বার্থ হয়ে এত উপকার করছে?"

দেববাণীর বুক কাঁপল। "জানি নে, মা। আমার মনে হয় না ওঁর কোনও স্বার্থের দাবী আছে কারুর ওপর।"

"কথাটা ক'দিন হ'ল আমি ভাবছি," বাসন্তী দেবী

বললেন। "তোর জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রধান পুরোহিত হিমাদ্রি। এত কিছু তোর জন্যে সে করেছে, করছে। একদিন যদি কিছু দাবী ক'রে বসে?"

"কি দাবী করবে, মা? আমার কি আছে? কি উনি পেতে পারেন?"

"তাই ত। তবু কি জানিস? দিনকাল বদ্‌লে গেছে, জীবনের রীতি-নীতিও নতুন হয়েছে।"

"মা, তুমি কি বলছ?" আর্তনাদ ক'রে উঠল দেববাণী।

"আজ কিছু বলছি না। শুধু এটুকু ছাড়া, একদিন যদি তোর প্রয়োজন হয় আমাকে জিজ্ঞেস করার, অনুমতি আমি এখুনি দিয়ে রাখছি। কে জানে, কখন আছি, কখন নেই।"

"সে প্রয়োজন হবে না, মা।"

"না হ'লে ত কথাই নেই। জীবনে এই ছিল তোর প্রকৃত পাওয়া। আমি চিরদিন পথ চেয়ে ছিলাম এমনি একটি ছেলের, যে আসবে বিজয়ী বীরের মত তোর জীবনে, শান্ত, নির্ভীক, উদার, কোমল। সে এল, কিন্তু বড় দেরী ক'রে এল।"

"মা, তুমি আজ আমায় এমন ক'রে ব্যথা দিচ্ছ?"

"অনেক ব্যথা তোকে আরও পেতে হবে, বাণী, সত্যকে যদি গ্রহণ করবার সাহস না পাস্।"

দেবযানী বলে উঠল, "বড় নাটুকে হয়ে উঠছে আবহাওয়া।"

হেসে ফেললেন বাসন্তী দেবী। "তোরাই ত বলিস, জীবন নাট্যশালা, আমরা সবাই অভিনেতা।"

"আমি বলি না। আমি ডাক্তার, কবি নই। তোমাদের দুজনেরই অসুখ করেছে।"

"কি অসুখ?"

"অসুখের নাম হিমাদ্রি।"

এমন সময় খোলা দরজা দিয়ে ভারী ভারী পা ফেলে ঢুকল হিমাদ্রি। তিন জনে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'ল।

"আমার কথা হচ্ছে মনে হ'ল?"

"আপনি একশ' নব্বই বছর বাঁচবেন, হিমাদ্রিদা," দেবযানী চেঁচিয়ে উঠল। "দাঁড়ান, দশ বছর গ্রেস দিয়ে দুশো বছরই ক'রে দিলাম।"

"একেবারে যযাতি ক'রে দিলে যে!" বলল হিমাদ্রি। "তা, হঠাৎ আমার প্রতি ডাক্তার এত সদয় কেন?"

"আমরা ভাবছিলাম বাণীদির যাত্রাদিনের তারিখটা আপনি বেমাম ভুলুলে গেছেন; মাস খানেক পরে হঠাৎ উদয় হয়ে প্রশ্ন করবেন, তোমার দিদি কবে যেন আমেরিকা যাচ্ছেন?"

সকলে হেসে উঠল। হিমাদ্রি বলল, "আমাকে এমন অখেয়ালী মনে হ'ল কেন?"

"আমার হয় নি, মা'র হয়েছে।" দেবযানী উঠতে উঠতে জবাব দিল, "আমি প্রতিবাদ করছিলাম। বলছিলাম, আসল ব্যাপারে আপনার পুরোপুরি খেয়াল আছে।"

"আসল ব্যাপারে!"

"মানে, বড় বড় কাজে। এই ধরুন, হিন্দু-মুসলমানদের ছেঁড়া হৃদয় জোড়া লাগান, প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি-চাই, মৈত্রী-চাই, শ্লোগান তুলে মুচিপাড়ায় ঘুরে বেড়ান, কারুর চাকরির দরকার হ'লে···"

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল দেবযানী। তার স্বভাব এমনিতেই একটু উচ্ছল। হিমাদ্রির সঙ্গে এ বাড়ীতে সে সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যবহার করে। কিছুক্ষণ কথা-বার্তার পর বাসন্তী দেবীও স'রে গেলেন।

হিমাদ্রি বলল, "কাল সন্ধ্যে থেকে আমি আটকা। আপনাকে সি-অফ্ করতে দমদম যেতে পারব না। তাই আজ দেখা ক'রে গেলাম।"

"এসে ভাল করেছেন," দেববাণী নিবেদন করল। "দু'একটা দরকারী কথা ছিল।"

"তা হ'লে ওগুলো আগে হয়ে যাক।"

"অনেক দূরে চ'লে যাচ্ছি; আপনিই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আপনার কিন্তু একটা দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে।"

"এমন ভাবে বলছেন যেন খুব কিছু অন্যায় ক'রে ব'সে আছি।"

"অন্যায় করেছেন, কি করেন নি, আপনি বুঝবেন। আমি শুধু দায়িত্বের কথা বলছি।"

"বলুন।"

"দেবযানী ও মাকে দেখাশোনা করতে হবে।"

"খোঁজখবর রাখব।"

"চিঠি লিখবেন।"

"তা লিখব। আপনিও কোন বিপদ্-আপদ্, অভাব-অসুবিধার কথা লিখতে সঙ্কোচ করবেন না।"

"তেমন অবস্থায় পড়লে লিখতে হবে বৈ কি।"

"আর কিছু কাজের কথা আছে?"

"আছে। সাবধানে থাকবেন। নিজেকে বাঁচিয়ে চলবেন।"

কথাগুলি কেমন অদ্ভুত ঠেকল হিমাদ্রির কানে।

ছোটবেলা মাতৃহীন, নারীর স্নেহ-প্রীতির তাপ গায়ে লাগে নি বড় একটা।

আস্তে জবাব দিল হিমাদ্রি, "চলব।"

"কবে যাবেন আমেরিকা?"

"কৈ? আমার যাবার ত কোন কথা নেই। যাচ্ছেন ত আপনি?"

"আপনি যাবেন না?"

"কি ক'রে বলি? যদি দরকার ও সুযোগ হয় যাব।"

"যেখানেই যান, যাবেন কিন্তু। নিজের সুযোগ আমাকে দিলেন। এবার নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিন তাড়াতাড়ি।"

"দরকার বোধ করলে আপনাকে লিখব। চাকরির ব্যবস্থা ক'রে রাখবেন, আমি চ'লে যাব।"

"খোকনকে এখন রেখে গেলাম। পরে হয়ত ওকে নিয়ে নেব। এ কাজটাও আপনাকে করতে হবে।"

"এমন কিছু কাজ নয়।"

"এটুকু ছেলে একা যেতে পারবে?"

"খুব। বি. ও. এ. সি-তে পাঠিয়ে দেব। ওরা বাচ্চাদের খুব যত্ন ক'রে পৌঁছে দেয়। এখানে তুলে দেব, আপনি ওখানে নামিয়ে নেবেন।"

"ব্যস্, কাজের কথা আর নেই।"

"আমি এখন যাচ্ছি নে। একেবারে খেয়ে যাব।"

খুশী হয়ে দেববাণী মাকে বলতে গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সবাই মিলে গল্প হ'ল সেদিন। হিমাদ্রি এর আগে কখনও এত দীর্ঘকাল এমন খোলা প্রাণে এ বাড়ী ব'সে গল্প করে নি।

কাল দেববাণী চ'লে যাবে। বড় শূন্য হয়ে যাবে এ বাড়ী। তাই প্রয়োজনের সময় সে কাছে স'রে এল। কথাবার্তায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, আমি আছি। তোমাদের পাশে আমি আছি।

এগারটা বাজলে সে বিদায় নিল। যাবার আগে, যা কখনও কোনদিন করে নি, এমন অনেকগুলো কাজ কয়েক মিনিটে সে ক'রে গেল।

খোকনকে কোলে তুলে আদর করল। কোলে বসিয়ে রাখল কিছুক্ষণ।

দেবযানীকে একবার 'তুই' ব'লে ফেলল। আবার 'তুমি বলতেই দেবযানী ভয়ংকর আপত্তি জানাল। হিমাদ্রি বলল, "বেশ, তোকে তুই-ই বলব। তোকে কখনো তুমি বলব না।"

যাবার আগে বাসন্তী দেবীর খুব কাছে এসে বলল, "দেববাণীর জন্যে ভাববেন না, মা। অনেক বড় হয়ে উনি ফিরে আসবেন। মাঝে মাঝে আমি আসব। দরকার হ'লে খবর দেবেন। একটা কার্ড লিখে দেবেন, নয়ত ডাক্তারকে দিয়ে কলেজে ফোন করাবেন।"

'মা' বলতে গিয়ে হিমাদ্রির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। বাসন্তী দেবী তার মাথায়, মুখে, পিঠে ও বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল দেববাণী একা। নীচের দরজার সামনে দু'জনে বিদায় নিল।

"চলি। পৌঁছে চিঠি দেবেন।"

"দেব।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাববেন না। ভয় পাবেন না।"

"না।"

"আসি তা হ'লে।"

"একটা কথা।"

"কি?"

"এত যে করলেন আমার জন্যে, এ ভার আমি বইব কেমন ক'রে?

"ভার? কথাটা বুঝলাম না।"

"আজ না বুঝলেও একদিন বুঝবেন। আমি ত কিছু করতে পারলাম না আপনার জন্যে? কোনও দিন পারব না। এ ভার আমাকে শুধু ব'য়েই বেড়াতে হবে।"

"ও। ঋণ শোধ করার কথা বলছেন?" হাসল হিমাদ্রি। "সে সুযোগ অনেক পাবেন। আপনি মস্ত বৈজ্ঞানিক হবেন, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আপনার খ্যাতি, অনেক টাকা হবে আপনার। তখন হিসেব ক'রে ঋণ শোধ দেবেন। হিসেব আমিও রাখছি। সুদ-আসল সব আদায় ক'রে নেব।"

দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াল। হিমাদ্রি হাত তুলে নমস্কার করল। "চলি। আবার দেখা হবে।"

"আসুন।"

হিমাদ্রি চ'লে গেল। দীর্ঘ দেহ তার ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় দীর্ঘতর দেখাল। বড় বড় পা ফেলে, একবারও পেছনে না তাকিয়ে, চ'লে গেল হিমাদ্রি।

দরজায় দাঁড়িয়ে দেববাণীর মনে হ'ল যে ইচ্ছে, যে-কর্তব্য, সে চেপে গেল, তা না চাপলেই বুঝি ভাল করত। বড় ইচ্ছে ছিল, প্রণাম ক'রে হিমাদ্রির পদধূলি নেয়। এর আগে কোনও পুরুষকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় নি, গুরুজন ব্যক্তিদের ছাড়া। পারল না। আর কোনও দিন পারবে কি না কে জানে।

ক্রমশঃ

# ভানুসিংহের পদাবলীর ছন্দ

শ্রীআনন্দমোহন বসু

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের বালক-কবি চ্যাটার্টনের১ কাহিনী শুনেছিলেন তাঁর জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কাছে। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের অনুকরণে এমন কবিতা রচনা করেছিলেন যে, অনেকেই তা আধুনিক কবির রচনা ব'লে ধরতে পারেন নি। চ্যাটার্টনের কথা কবির মনের মধ্যে বেশ একটা স্থান নিয়ে ব'সে ছিল। কবি তখনও কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন নি, বয়স তখন তাঁর বোধ করি চৌদ্দ বছর হবে, এই সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সঙ্কলিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'২ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। এই পদাবলীর মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা (ব্রজবুলি) বালক-কবির পক্ষে তখন দুর্বোধ্য হলেও তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তীব্রভাবে। পূর্বশ্রুত চ্যাটার্টনের বিবরণ কবির কল্পনাকে এই সময় উল্লসিত করে তোলে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণে কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষায় কবিতা রচনা করতে। এক মেঘলা দিনের মধ্যাহ্নে তিনি 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে' গানটি লিখে ফেললেন। এর পর এই নূতন রচনার নেশায় কবি অনেকগুলি গান লিখলেন, কিন্তু স্বনামে প্রকাশ করলে পাছে এই লেখার সমাদর না হয়, তাই চ্যাটার্টনের অনুবর্তনে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তার অঙ্গাবরণ নিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুর'৩।

নিজের রচনা সম্বন্ধে কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, 'ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমান—আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।'৪

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভানুসিংহের পদাবলীকে মেকি বলেছেন শুধু যে,অনুকরণে রচিত তাই বলে নয়, এর মধ্যে তিনি ভাবের কৃত্রিমতা লক্ষ্য করেছিলেন ব'লে। অর্থাৎ ভাষা-ছন্দে বাইরের চাকচিক্য এগুলির ঠিক প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর মত হলেও, বৈষ্ণব সাধক কবির সে প্রাণগলান সুর এতে নেই। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এর ভাব ও সুর নয়, এর বাইরের অলংকরণ অর্থাৎ ছন্দ, তবু বলব, ক্ষেত্র বিশেষে ভানুসিংহের কোন কোন পদে 'আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলান ঢালা সুর'ও শুনতে পাওয়া যাবে।

কবির বয়স যখন ষোল বছর তখন 'ভারতী'তে ভানুসিংহের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয় (১২৮৪ সালে)। কবিতাগুলি কিছুকাল পূর্বে রচিত হয়েছিল। এই পদাবলীর প্রথম গানটি সম্বন্ধে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'।" তখন কবির বয়স ষোল বছরের বেশি হবে না। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে; কবির বয়স তখন তেইশ। এই গ্রন্থের সব কবিতা এক সময়ে রচিত নয়, কোন কোনটি অপেক্ষাকৃত বড় বয়সের রচনা।

---

১। চ্যাটার্টন (টমাস চ্যাটার্টন, এ-ডি ১৭৫২-১৭৭০) বাল্যকাল থেকেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন এবং ইংরেজ-কবি চসারের সময়ের (পঞ্চদশ শতাব্দী) কবিদের অনুকরণে অনেক কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাগুলিকে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর কবিদের রচিত ব'লে প্রচার করেন এবং তাঁর অধিকাংশ কবিতা ব্রিষ্টলের একজন কল্পিত সন্ন্যাসী (monk) কবি টমাস রাউলির রচিত ব'লে অভিহিত করেন। যে কবিযশের প্রত্যাশায় চ্যাটার্টন এই অনুকৃতি-কাব্য রচনা করেছিলেন, সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে তা লাভ করলেও গ্রে, ম্যাশন, ওয়ালপোল, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের কাছে তিনি কোন সহানুভূতি পান নি। তাই দারিদ্র্যে ও হতাশায় বালক-কবি চ্যাটার্টন সতের বৎসর বয়সে আর্সেনিক বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন।

২। তিন খণ্ডে প্রকাশিত; প্রকাশকাল ১৮৭৪-৭৬। কবির বয়স তখন ১৩-১৪ বছর।

৩। ভানুসিংহ ঠাকুর—ভানু (রবি) সিংহ (ইন্দ্র বা নাথ) ঠাকুর।

৪। জীবনস্মৃতি, ভানুসিংহের কবিতা, পৃঃ৮৫, সংস্করণ, ১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ।

বর্তমানে আমরা রবীন্দ্ররচনাবলীতে প্রকাশিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামক কাব্যগ্রন্থে কুড়িটি কবিতা পাই, আর 'গীতবিতান'-এ পাই অতিরিক্ত দু'টি গান। এই নিয়ে মোট বাইশটি গান পুস্তকাকারে মুদ্রিত পেয়েছি। কাব্যের ১৩ ও ১৯ সংখ্যক গান গীতবিতানে বর্জিত হয়েছে, আবার গীতবিতানের ১৪ ও ১৫ সংখ্যক গান দু'টি কাব্যগ্রন্থে নেই। উভয় গ্রন্থ মিলিয়ে এই বাইশটি গানই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বালক-কবি ভানুসিংহ প্রাচীন পদকর্তাদের অনুকরণে কবিতা রচনা করতে গিয়ে ছন্দের দিক্ দিয়ে কতদূর সফলতা লাভ করেছিলেন, তার আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কবি বলেছেন, 'পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হ'ত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে'; তাই পদকর্তাদের অনুকরণে পদ রচনা করতে গিয়ে, তিনিও ব্রজবুলি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। এই ভাষাকে কবি তাঁর এই বাল্যবয়সে কতখানি দখলে আনতে পেরেছিলেন, তা আমরা ভানুসিংহের গীতগুলি পড়লেই বুঝতে পারি। এই পদগুলি উপযুক্ত শব্দ, অলংকার ও ছন্দ প্রয়োগের এক অনবদ্য নিদর্শন।

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষায় (ব্রজবুলিতে) পদ রচনা করতে গিয়ে 'মাত্রাছন্দ' ব্যবহার করেছেন; রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই গীতগুলি রচনা করেছেন মাত্রাছন্দে। ব্রজবুলিতে রচিত প্রাচীন পদাবলীর মাত্রাছন্দ ও আধুনিক বাংলা কবিতার মাত্রাছন্দ এক নয়; ভানুসিংহের পদাবলীর মাত্রাছন্দের সঙ্গেও আধুনিক মাত্রাছন্দের এই প্রভেদ বর্তমান। ব্রজবুলির মাত্রাছন্দ সংস্কৃত মাত্রাছন্দের সঙ্গে তুলনীয়, উভয়ের মাত্রাগণনা পদ্ধতি একই প্রকার।

সংস্কৃত ছন্দ দুই প্রকার—বৈদিক ও লৌকিক। লৌকিক ছন্দও প্রধানত দুই প্রকার—বর্ণ বা বৃত্তছন্দ, জাতি বা মাত্রাছন্দ। 'ছন্দোমঞ্জরী'-কার গঙ্গাদাস বলেন—

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসঙ্খ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥
[ছন্দোমঞ্জরী, প্রথমঃ স্তবকঃ, শ্লোক ৪]

—"অর্থাৎ যাতে চারটি পাদ থাকে তার নাম পদ্য। পদ্য বৃত্ত ও জাতিভেদে দ্বিবিধ—অক্ষর-গণনা-নিয়মে নিবদ্ধ পদ্যের নাম বৃত্ত এবং মাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত পদ্যের নাম জাতি।"

এই মাত্রাসংখ্যা গণনার নিয়ম কালিদাসের 'শ্রুতবোধঃ'-এ পাই—

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন॥
একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্॥
[শ্রুতবোধঃ, শ্লোক ২-৩]

—"অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের পূর্ব, অনুস্বার যুক্ত এবং বিসর্গ-যুক্ত অক্ষরকে গুরু, আর পাদের শেষস্থ অক্ষরকে বিকল্পে গুরু গণ্য করতে হবে। লঘুস্বর একমাত্রা, গুরুস্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জনবর্ণ অর্ধমাত্রা বলে জ্ঞাতব্য।"

বাংলা ছন্দকেও আমরা প্রধান দুই ভাগে ভাগ করে থাকি—দলমাত্রিক (syllabic), এবং কলামাত্রিক (moric)।[৫] কিন্তু বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত রীতিতে মাত্রা গণনা করা হয় না। আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দে স্বরের লঘু-গুরু হিসাবে মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ও অপভ্রংশ রীতিতে রচিত প্রাচীন বাংলা কবিতার ছন্দে (যেমন চর্যাপদ, ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলী) সাধারণতঃ স্বরের লঘু-গুরুভেদ মানা হ'ত। তবে সংস্কৃতে যেমন পাদান্তেই শুধু বিকল্প ব্যবস্থা আছে (পাদান্তস্থং বিকল্পেন), প্রাচীন বাংলা কবিতায় অনেক সময় স্থানে-অস্থানে এই 'বিকল্প' ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন পদকারদের আদর্শে বাল্যবয়সে তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেছিলেন বলে, পদকারদের ছন্দের দোষ-গুণ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে।

## ২

কাব্যগ্রন্থ এবং গীতবিতান মিলিয়ে ভানুসিংহের যে বাইশটি গীত পাওয়া যায়, তার সবকটিই মাত্রাছন্দে রচিত। বাংলা ছন্দকে আমরা যে প্রধান দুইটি রীতিতে ভাগ করেছি, দলমাত্রিক (syllabic), এবং কলামাত্রিক (moric), তার মধ্যে কলামাত্রিক রীতির আবার দুইটি ভাগ দেখান হয়েছে, সরল কলামাত্রিক (simple moric), এবং জটিল কলামাত্রিক (complex moric)। বাংলা ছন্দে সাধারণ্যে পরিচিত স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রবোধবাবুর দেওয়া পরিভাষায় 'দলমাত্রিক', মাত্রাবৃত্ত ছন্দ 'সরল কলামাত্রিক', এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দ 'জটিল কলামাত্রিক'। সরল কলামাত্রিক ছন্দেরও আবার দুইটি রীতি, নব্যরীতি ও প্রাচীন রীতি। নব্যরীতিতে রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতা রচনা করেছেন এবং আধুনিক কালের কবিরা ক'রে থাকেন, আর প্রাচীন রীতির ব্যবহার দেখতে পাই

৫। লেখকের 'বাংলা ছন্দের দ্বিজাতি ও ত্রিজাতিবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৬৭। পৃষ্ঠা ৬৯৪।

চর্যাপদে, বৈষ্ণব পদাবলীতে (প্রধানতঃ ব্রজবুলিতে রচিত), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গানটিতে।

ভানুসিংহের পদাবলীর গানগুলিকে পর্বরচনার বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বাইশটি গানের তিনটি প্রধানত ছয় মাত্রার পর্ববিশিষ্ট; আঠারোটি আট মাত্রার পর্ববিশিষ্ট; এবং বাকী একটি গীত নয় মাত্রার পর্ববিশিষ্ট।

ছয় মাত্রার পর্ববিশিষ্ট গীত তিনটি—কাব্যগ্রন্থের ২, ৫, ৮ সংখ্যক গীত। ছন্দোলিপি দ্বারা গীতগুলির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হ'ল।৬

২ সংখ্যক গীত

০০০ ০০০ | ॥০॥ |
শুনহ শুনহ | বালিকা | (৬+৫ মাত্রা)

॥০ ০০০ | ॥০॥ |
রাখ কুসুম | মালিকা | (৬+৫ মাত্রা)

—০ | —০ | ॥০০ ০০ |
কুঞ্জ | কুঞ্জ | ফেরনু সখি |

॥০—০ | ॥০॥ |
শ্যাম চন্দ্র | নাহিরে |

(৬।৬।৬।৫ মাত্রা)

৫ সংখ্যগীত

০০০ ০০০ | ॥০‿॥ |
সজনি সজনি | রাধিকা লো |

॥০ ০০০ | ॥০॥ |
দেখ অবহু | চাহিয়া |

০০০ ০০০ | ॥০ —‿ |
মৃদুল গমন | শ্যাম আওয়ে |

০০০ ॥০ | ॥০॥ |
মৃদুল গান | গাহিয়া |

(৬।৬।৬।৫ মাত্রা)

৮ সংখ্যক গীত

০০০ ০০০ | —০ ॥‿ |
গহন কুসুম | কুঞ্জ মাঝে | (৬।৬=১২ মাত্রা)

০০০ ০০০ | —০ ॥‿ |
মৃদুল মধুর | বংশি বাজে |

০০০ ॥০ | ॥০ ॥‿ |
বিসরি ত্রাস | লোক লাজে |

০০০ ॥‿ | ॥‿ ॥ |
সজনি আও | আও লো |

(১২+১২+১২+১১)

এই গীতটির স্তবক গঠন চৌপদীর ন্যায়।

আট মাত্রার পর্ববিশিষ্ট গীত আঠারোটি, কাব্যগ্রন্থের ১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ সংখ্যক এবং গীতবিতানের ১৪, ও ১৫ সংখ্যক গীত।

১ সংখ্যক গীত

॥০ ০০০ ০০ | ০০০ ০০০ ০০ |
ভানু কহত অতি | গহন রয়ন অব |

০--০ ০॥০ ॥ ॥ |
বসন্ত সমীর শ্বাসে |

॥ ০০--০০ | --০--০০০ |
মোদিত বিহ্বল | চিত্তকুঞ্জতল |

--০ ॥০॥ ॥ ॥ |
ফুল্ল বাসনা বাসে |

(৮।৮।১১, অথবা ৮।৮।৮।৪ মাত্রা)

উল্লিখিত আঠারোটি গীতের মধ্যে অধিকাংশেরই অনুরূপ আটমাত্রার পর্বে ছন্দোলিপি হবে, তবে ষোলো সংখ্যক গীতটির মিশ্র স্তবক এবং উনিশ ও কুড়ি সংখ্যক গীত দু'টির চৌপদী স্তবক লক্ষণীয়।

১৯ সংখ্যক গীত

০০ ০০ ॥০ ০ | ॥-- |
তুঁহু মম শ্যাম স | মান |

॥০ ০০০ ০০ | ॥০ ০॥০০ |
মেঘ বরণ তুঝ | মেঘ জটাজুট —

--০ ০০০ ০০ | --০ ০০০ ০০ |
রক্ত কমল কর | রক্ত অধর পুট |

॥০ ০॥০০ | ০০০ ॥০০০ |
তাপ বিমোচন | করুণ কোর তব |

--০ ০০০ ০‿ | ॥-- |
মৃত্যু অমৃত করে | দান |

(৮+৮ | ৮+৮ | ৮+৮ | ৮+৪,
অর্থাৎ ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১২ মাত্রার চৌপদী)।

কুড়ি সংখ্যক গীতটিও অনুরূপ

নয়মাত্রার পর্ব' শিষ্ট গীত একটি,—এগার সংখ্যক গীত।

১১ সংখ্যক গীত

০০০ ০০ ০০০০ |
বচন মৃদু মরমর |

॥‿০০ ০০০০
কাঁপে রিঝ থরথর

৬। ছন্দোলিপিতে ব্যবহৃত বিবিধ চিহ্ন:
'০' মুক্তদল (open syllable একমাত্রা; '॥' মুক্তদল (গুরুস্বর) দুইমাত্রা; '‿' মুক্তদল (গুরুস্বর) সঙ্কুচিত একমাত্রা এবং রুদ্ধদল (closeds yllable) সঙ্কুচিত একমাত্রা; '—' মুক্তদল (লঘুস্বর) সম্প্রসারিত দুইমাত্রা এবং রুদ্ধদল দুইমাত্রা।

০০‿ ০০ ০০০০ |
শিহরে তনু জরজর |
০ ০০০০ ‖ ০ |
কুসুমবন মাঝ |

—(৯ | ৯ | ৯ | ৭, অথবা ৫ + ৪ | ৫ + ৪ | ৫ + ৪ | ৫ + ২ মাত্রা, এবং চৌপদী ঢঙে স্তবক গঠিত)।

ভানুসিংহের পদাবলীর এই যে মাত্রাছন্দ বা 'প্রাচীন রীতির সরল কলামাত্রিক ছন্দ' এতে লঘুস্বর একমাত্রার, গুরুস্বর দুইমাত্রার, হলন্তদল (closed syllable) দুই-মাত্রার এবং 'পাদের শেষে' লঘুস্বর বিকল্পে (পাদান্তস্থং বিকল্পেন) দুইমাত্রার। তবে ছন্দোলিপিতে দেখা গেল, কোন কোন ক্ষেত্রে এই সূত্রের স্খলন-পতন-ত্রুটি যে না ঘটেছে তা' নয়।

৩

'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনায় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-পদকারদের কেবলমাত্র ভাব ও ভাষারই যে অনুকরণ করেছিলেন তাই নয়, ছন্দের ক্ষেত্রে পর্ব ও স্তবক রচনার দিক্ দিয়েও প্রাচীন কবিদের অনুবর্তন করেছেন। তাঁর এই ছন্দ রচনায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ-দাস, জগদানন্দ, বলরামদাস, প্রভৃতি পদকর্তাদের ছন্দ-গঠনের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের দু'টি পদের সঙ্গে ভানুসিংহের অনুরূপ পদের তুলনা করলে ছন্দের অভিন্নতা ধরা পড়বে। 'গীত-গোবিন্দ'-এর একটি পদ[৭],—

০০০০‖ ‖ | ০০০ ০‖ ‖
রতিসুখসারে | গতমভিসারে
০০০ ০ ‖ ০০
মদনমনোহর | বেশম্
০ ০০ ০—০ ০ | ০০০ ০—০০
ন কুরু নিতম্বিনি | গমনবিলম্বন-
০০০০ — ০০ | ‖ —
মনুসর তং হৃদ | য়েশম্

—বৈ-প, পৃ ১১, ১১ সংখ্যক পদ।
[ ৮ | ৮ | ৮ | ৪ = ২৮ মাত্রা ]

এর সঙ্গে তুলনীয় ভানুসিংহের,—

০০০ ০‖ ‖ | ০০০০ ‖ ‖
তৃষিত নয়ানে | বনপথ পানে
০০‖ ‖০ ০ | ‖ ‖
নিরখে ব্যাকুল | বালা
‖০ ০ ‖ — | ‖ ০ ০‖ —
দেখ ন পাওয়ে | আঁখ ফিরাওয়ে |
‖ ‖ ০০ ০০ | ‖ ‖ |
গাঁথে বন-ফুল | মালা |

—ভানু, ৯ সংখ্যক পদ।
[ ৮ | ৮ | ৮ | ৪ = ২৮ মাত্রা ]

'গীতগোবিন্দ'র আর একটি পদ,—

০০ ০০ ০০ ‖ | ০০ ‖০০ ‖ |
সমুদিতমদনে | রমণীবদনে |
--০০০ ০ ‖ ০ ‖ |
চুম্বনবলিতাধরে |
০০০০ ০ ০— | ০ ০ ০ ০০০— |
মৃগমদতিলকং | লিখতি সপুলকং |
০০ ০০ ০০ ‖ ০ ‖ |
মৃগমিব রজনীকরে |

—বৈ-প, পৃ-১১, ১৫ সংখ্যক পদ।
[ ৮ | ৮ | ১১ = ২৭ মাত্রা ]

তুলনীয় ভানুসিংহের ১০ সংখ্যক পদ,—

০ ০০০ ‖ ০০ | ‖ ০ ০ ‖ ০০
রিঝমনভেদন | বাঁশরি বাদন
০ ‖ ০০০ ‖ ‖ ০
কঁহা শিখলি রে কান
‖ ‖ ০০০০ | ০০০ ০ ০০ ০০
হানে থিরথির | মরম-অবশকর
০০ ০০ ০০০০ ‖ ০
লহু লহু মধুময় বাণ
[ ৮ | ৮ | ১১ = ২৭ মাত্রা ]

পূর্বে আলোচিত ২৮ মাত্রার অনুরূপ অসংখ্য পদ বিদ্যাপতিতে পাই; একটি উদ্ধৃত হ'ল,—

০ ০ ০ ০ ‖ ‖ | ০০০ ০ ‖ ‖
এক তনু গোরা | কনয় কটোরা
০ ০০ ‖ ০ ‖ ০ ‖ ০
অতনু কাঁচলা উপাম
‖ ০ ০০০ ০০ | ০০ ০ ০ ‖ ০০
হার হরল মন | জনু বুঝি ঐসন
‖ ০ ০ ‖ ০০ ‖ —
ফাঁস পসারল কাম

বৈ-প, পৃ—৭৭, পদসংখ্যা ১২।

আটমাত্রার পর্ববিশিষ্ট পদগুলির মধ্যে ১৬, ১৯ এবং ২০ সংখ্যক পদ তিনটির চৌপদী রীতির ছন্দোপংক্তি এবং স্তবক গঠন লক্ষণীয়। এই চৌপদীগুলিকে ৬০ মাত্রার (৮ + ৮ | ৮ + ৮ | ৮ + ৮ | ৮ + ৪) ছন্দোপংক্তিবিশিষ্ট 'দীর্ঘ চৌপদী' বলা যেতে পারে। এই ধরণের চৌপদী বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে খুব কম কবিই রচনা করেছেন।

৭ বর্তমান আলোচনায় প্রাচীন পদকর্তাদের যে সব পদ ব্যবহৃত হয়েছে, সবই 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত, শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' থেকে গৃহীত। বৈ-প = বৈষ্ণব পদাবলী।

চৈতন্যপরবর্তী 'সিংহভূপতি' নামক একজন পদকর্তার একটি পদের সঙ্গে ভানুসিংহের অনুরূপ পদ তুলনীয়,—

লাজে নত ভয়ে | নিকটে আওব |
রসিক ব্রজপতি | হিয়ে সম্ভাষব |
কামকৌশল | কোপ-কাজর |
তবহুঁ রাজব রে |
কবহুঁ কোকিল | কূজন কুহু কুহু |
কবহুঁ কপোত | কণ্ঠরব মুহুঁ |
করজ শাসন | কলা আসন |
কুচ্ছ ন-ছোড়ব রে | [ সিংহভূপতি ]
[ বৈ-প, পৃষ্ঠা-৭৮৫, পদসংখ্যা-৭ ]

ইংরেজী কাব্যসাহিত্যেও অনুরূপ স্তবক গঠন লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত Sir Thomas Wyatt (১৫০৩-১৫৪২), Michael Drayton (১৫৬৩-১৬৩১), Robert Burns (১৭৫৯-১৭৯৬), Bret Harte (১৮৩৬-১৯০২), প্রভৃতি কবিগণ অনুরূপ চৌপদী স্তবক রচনা করেছেন। আবার কোন কোন ইংরেজ-কবি পঞ্চপদীও রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে Thomas Lodge নামক ষোড়শ শতাব্দীর এক কবির 'Rosalind's Madrigal' নামক পঞ্চপদী কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

রবার্ট বার্ণসের 'The Vision' নামক কবিতার একটি চৌপদী স্তবক,—

I saw thy pulse's maddening play,
Wild-send thee pleasure's devious way,
Misled by Fancy's meteor-ray,
By passion driven ;
But yet the light that led astray
Was light from Heaven.

—এর সঙ্গে তুলনীয় ভানুসিংহের একটি স্তবক,—

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়,
করল বিযম পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না লো, না দিবে বাধা,
কঠিন হিয়া সেই হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।
[ ভানু, ১৬ সংখ্যক পদ ]

ভানুসিংহের ৮ সংখ্যক পদটি ছয়মাত্রার পর্বে গঠিত, অনুপ্রাসে অনবদ্য একটি চৌপদী। অনুরূপ ছয়মাত্রার পর্ববিশিষ্ট চৌপদী জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, জগদানন্দ, গোবর্ধনদাস প্রভৃতি পদকর্তা রচনা করেছেন, কিন্তু ভানুসিংহের উক্ত পদটি অসামান্য।

ভানুসিংহের ৮ সংখ্যক পদের একটি স্তবক,—

--o --o | --o --‿ |
মন্দ মন্দ | ভৃঙ্গ গুঞ্জে |
o oo o oo | --‿ --‿ |
অযুত কুসুম | কুঞ্জে কুঞ্জে |
ooo oo o | --‿ --‿ |
ফুটল সজনি | পুঞ্জে পুঞ্জে |
oo o ‖ o | ‖ o ‖ |
বকুল যূথি | জাতি রে |
[ ৬+৬ | ৬+৬ | ৬+৬ | ৬+৫ মাত্রা ]

—এর সঙ্গে তুলনীয় গোবিন্দদাসের একটি পদ—

o oo ooo | ooo --o
অরুণ বরণ | চরণ কঞ্জ
o oo oo o | ooo --o
তরুণ তরণি | কিরণ গঞ্জ
‿‿o ‖ o | ooo--o
গোবিন্দদাস | হৃদয়রঞ্জ
--o‿‿o | ‖ o o
মঞ্জু মঞ্জীর | বোলনি
[ বৈ-প, পৃষ্ঠা-৬৩৫, পদসংখ্যা-২১৬ ]

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভানুসিংহের পদাবলী 'কাব্যগ্রন্থ' এবং 'গীতবিতান'-এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পাঠভেদ লক্ষ্যণীয়। এর জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ছন্দোলিপির তারতম্য হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই উভয় গ্রন্থের মধ্যে ছন্দের মূল কাঠামোর পরিবর্তন হবে না।

—•—

# সেই রাত

শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্ত

বেশ কয়েকদিন বাদে অণিমা এ ওয়ার্ডে রাত্রের ডিউটিতে এল। তিন মাস করে কাটিয়ে এসেছে সার্জিক্যাল, ম্যাকেঞ্জি আর বেকার ব্লকে। তার পর এখানে। রাত্রের ডিউটিতে।

দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই এসেছে অণিমা।

ডাঃ মুখার্জী বললেন, অনেকদিন বাদে এ ওয়ার্ডে এলেন সিস্টার। একুশ নম্বর পেশেণ্টের ওপরে একটু নজর রাখবেন। টিকেটে সব-রকম ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া রয়েছে। অসুবিধায় পড়লে আমাকে ডাকতে দ্বিধা করবেন না।

অণিমা জিজ্ঞাসা করল, সিরিয়াস কিছু?

একটু থেমে ডাক্তার মুখার্জী বললেন, আপনার ব্যাচে গীতা দেবী রয়েছেন। উনি ত এ ওয়ার্ডেই রয়েছেন; এ পেশেণ্ট সম্বন্ধে সব জানেন। আপনি সিনিয়র। তাই আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি।

ওঃ। অণিমা শুধাল, কি ট্রাবল্ পেশেণ্টের?

নিউমোনিয়া কেস। দুটো লাংই জখম হয়েছে।

থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর। অণিমা বলল।

কিন্তু এই ছোট্ট কথাটি বলতে তার গলা কাঁপল। মৃদু একটা কম্পন। ছোট্ট ঢেউ-এর মত সে কম্পনটুকু শেষ সীমায় না যেতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

ডাঃ মুখার্জীর কানে সে কাঁপুনিটুকু ধরা পড়ল না। তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু অণিমা দাঁড়িয়ে রইল। কেননা সেই কম্পনটুকু তার স্মৃতির তলদেশে গিয়ে পৌঁছেছে।

অমনি হয়। নিউমোনিয়ার কথা শুনলে তার মনে আলোড়ন আসে।

বিনয়কে মনে পড়ে। একটি সাধারণ মানুষ। কিন্তু স্বপ্ন ছিল অসাধারণ হবার। সে সম্ভাবনাও ছিল। প্রতিভার বিকাশে জীবন্ত হয়ে উঠছিল তার আঁকা ছবিগুলো।

সমস্ত সম্ভাবনাকে ডুবিয়ে দিল নিউমোনিয়া।

বিনয় মরল। আর মরেও বেঁচে রইল অণিমা। শাঁখা ভাঙল, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলল।

বিনয় যে তার স্বামী। ভালবেসে বিয়ে করেছিল। দশ বছর আগে বিনয় তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা মথিত করে যে দীর্ঘশ্বাসটি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, অতি সন্তর্পণে আর কষ্টে অণিমা তার প্রকাশ ব্যাহত করল।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চোখ বুঁজে। তার পর তাকাল আলোর দিকে। ফ্লোরেসেণ্ট টিউব লাইটগুলো দুধ-সাদা দেখাচ্ছে। শান্তির প্রতীক হ'ল শ্বেত। ওই আলোর দিকে তাকিয়ে অণিমা তার মনটাকে অশান্তির ছোঁয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইল। শান্তি পেতে চাইল।

গোটা ওয়ার্ডটার চব্বিশখানা বেডের দিকে একবার ক'রে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অণিমা এগিয়ে গেল অপর প্রান্তে। রিপোর্ট খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখতে বসল।

না। আজকে নতুন কোন পেশেণ্ট আসে নি। রিলিজ হয় নি। মারাও যায় নি কেউ।

গীতা এল ডিউটিতে। দশটা বেজে দশ মিনিট।

টেবিলের অপর পাশের চেয়ারে সে বসল।

অণিমাদি, দুপুরে বেশ ঘুমিয়েছ মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু গোটা দিন খেটেছি। বাড়ী গিয়েছিলাম জান ত! একটুও বিশ্রাম পাই নি।

অণিমা হাসল। বলল, বেশ ত, ভোরের দিকে একটু বিশ্রাম নিও। গীতা, শত কাজ থাকলেও নাইট ডিউটি দিয়ে, কিম্বা নাইট সুরু হবার আগের দুপুরে ভাল করে ঘুমিয়ে নিও। কাজকর্ম পরে করবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে, ঘুম হোক কি না হোক, বিছানা ছাড়বে না। পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। নইলে স্বাস্থ্য থাকবে না।

কোন পেশেণ্ট যেন জল খেতে চাইছে। গীতা তারই উদ্দেশে এগিয়ে গেল।

ঘুরে ঘুরে অণিমা দেখে নিল চব্বিশটা পেশেণ্টের টিকেট। একুশ নম্বর ছাড়া বিশেষ জরুরী কেস নেই। ওরই দিকে নজর দিতে হবে।

ছেলেটিকে দেখে এসেছে অণিমা। ডাঃ মুখার্জী মিথ্যা বলেন নি। দশ বছরই হয়ত হবে ওর বয়েস। ছিপ্ছিপে চেহারা। তবু যেন মুখখানা একটু ভরাট।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ছেলেটি প'ড়ে রয়েছে। থেকে থেকে স্ফীত হয়ে উঠেছে নাসারন্ধ্র। আর বুকের ভেতর থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠছে।

এতটুকু ছেলে কেন এমন কষ্ট ভোগ করছে? এ রোগের কি কষ্ট তা অণিমা ভাল করেই জানে। বিনয় যে এতেই শেষ হয়েছে। কি ভীষণ যন্ত্রণা পেয়েছে বিনয়। তখনও ত পেনিসিলিনের ব্যাপক প্রসার হয় নি। হলে বিনয় হয়ত অমনি করে যেতে পারত না।

অণিমা ওর পাল্‌স্‌ দেখে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

অণিমা বলল, গীতা, একুশ নম্বরের পেশেণ্টকে রাত একটাতে পেনিসিলিন দিতে হবে। আড়াইটাতে এ্যালকোসিন।

জানি অণিমাদি। কিন্তু ওকে ইনজেক্‌শন 'পুশ' করা কষ্টকর ব্যাপার। ছেলের যা বাহানা! বলতে গেলে আমাদের একজনকে ওর পাশে ব'সে থাকতে হয়েছে সব সময়ে।

গীতার চোখে-মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠল। বলল, তবু ভরসা, তুমি রয়েছ। তোমার কাছে বাচ্চারা ভাল থাকে। আমি ত ওকে সামলাতেই পারি না।

অণিমা একটু হাসল। বলল, একটা ছোট্ট ছেলেকে সামলাতে পার না তা আবার বলছ? গীতা, মেয়েরা মায়ের জাত। মা যখন হবে, ছেলেকে সামলাবে কি ক'রে?

শেষের কথা ক'টি বলতে তার মুখে বেদনার ছায়া পড়ল। গলার স্বরও বিকৃত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে সামলে নিল অতি কষ্টে।

মেয়েরা মায়ের জাত। নিজের কানেই কথা ক'টি বাজল। মায়ের জাত। কিন্তু সে মা হতে পারল না। কোনদিন মা হবে না। তাকে মা বলে ডাকবে না কেউ।

বিনয় তাকে একটা সন্তান দিয়েও যেতে পারে নি।

সন্তান নেই। কিন্তু সন্তানকে দেবার মত বুক-ভরা ভালবাসা আছে। আছে স্নেহ, আছে মমতা।

জেনারেল ব্লকের এই মেডিকাল বিভাগটি এরই মধ্যে নিঝুম হয়ে পড়েছে। কোন রোগী হয়ত ঘুমুচ্ছে, কেউ রোগ-যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন। কেউ বা নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছে।

বাইরে অন্ধকার রাত। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে। ভারি ভাল লাগছে হাওয়াটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অণিমা। আগেকার মত একে চেপে রাখতে চেয়েছিল। পারে নি। অতৃপ্ত আর বুভুক্ষ মনটার এক রাশি বেদনা তার সমস্ত চেষ্টাকে ঠেলে দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের রূপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। টানা-টানা শব্দটা ওষুধ আর ফিনাইলের গন্ধের সঙ্গে হাওয়াতে মিশে কোথায় গিয়ে যেন পৌঁছল।

এই মুহূর্তে অণিমাকে খুব করুণ দেখাচ্ছে।

সিস্টার!

ক্লান্ত দৃষ্টিতে গীতা অণিমার দিকে তাকাল।

অণিমাদি, একুশ নম্বরের পেশেণ্ট জেগেছে। ব'লে সে উঠল।

জল খাব, ছেলেটি বলল।

গীতা ফিডিং কাপে ক'রে জল খাওয়াল ওকে।

জল খেয়ে ছেলেটি বলল, ওঃ, তুমি? তুমি কেন?

আমার যে ডিউটি! আমি ছাড়া আর কে আসবে?

ছেলেটি উঠে বসতে চাইল, তুমি যাও। ইনজেকশন ফুঁড়ে ফুঁড়ে তুমি আমাকে ঝাঁঝরা করে দিলে।

গীতা ওকে শুইয়ে দিল: উঠে বসে না। বসতে পারবে না।

তুমি যাও। তোমাকে দেখলেই আমার ভয় করে।

বেশ যাচ্ছি। তুমি ঘুমোও।

ঘুম নেই।

গীতা ওর গায়ে হাত দিল। বেশ জ্বর রয়েছে। থার্মোমিটার দিয়ে দেখল, একশো তিন।

এত জ্বর! তবু ছেলেটা ঘামছে।

গীতা আবার বলল, খোকন, এবার ঘুমোও।

ঘুম যে আসে না।

ব'সে ব'সে অণিমা সব শুনছিল। উঠে এসে বলল, গীতা, ওকে হস্টাস্‌ মিক্‌শ্চার দাও।

ওতে আমার কিচ্ছু হয় না। ফুঃ। তাচ্ছিল্য জানিয়ে ছেলেটি বলল।

গীতাকে সরিয়ে অণিমা বসল ছেলেটির পাশে। শুধাল, তুমি বসতে পারবে? তুলে দেব তোমাকে?

ছেলেটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অণিমার দিকে।

অণিমাকে দেখছে সে। দেখছে মুখখানা।

গোলাকৃতি মুখ। মাথাটা ক্যাপ দিয়ে ঢাকা। কালো দুটি ধনুক ভ্রূ। মমতা উপচে পড়ছে বড় বড় চোখ দু'টি থেকে। উন্নত নাকের বাঁশি দু'টি ঈষৎ স্ফীত: পাতলা ঠোঁটের ডান প্রান্তদেশের ওপরে নাকের বাঁশির সমান্তরালে একটা কালো তিল। ওটা ঠিক বিউটি স্পটের স্থান নয়। তবু ওই কালো দাগটা নিঃসন্দেহে অণিমার মুখশ্রীকে আরো লাবণ্যময় করেছে। তার

দেহের রূপ যেন ত্রিশটি গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের নয়। আরো কচি ব'লে মনে হয়।

দিনের বেলায় শুধু ঘুমিয়েছে। তাই বেশ তাজা লাগছে ওকে। অনেক সজীব।

অণিমা একটু হাসল, কি দেখছ অমন করে?

দেখছি তোমাকে। ছেলেটি বলল, কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে। দাঁড়াও, ভেবে দেখি।

ছেলেটি আবার চোখ বুঁজল।

অদ্ভুত একটা মমতায় অণিমার মনটা ভরে গেল।

বিনয় যদি তাকে একটা ছেলে দিয়ে যেতে পারত, তা হলে সেই ছেলে কি আজ এর মত হ'ত না?

ছেলে। সন্তান। দশমাস জঠরে থেকে দেহকোষের সারাংশটুকু নিংড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হবে ভ্রূণটি। তার পর মাকে জীবন-মরণ সমস্যায় ফেলে সে শিশু বেরিয়ে আসবে বাইরের পৃথিবীতে। ওঁয়া বলে কাঁদবে। শত যন্ত্রণার মধ্যেও মা তার সন্তানকে চিনে নেবে।

ঠিক এই মুহূর্তে বিনয়কে ভয়ঙ্কর স্বার্থপর বলে বোধ হ'ল অণিমার। নিজে ত গেলই; কিন্তু তার কোল ভরিয়ে দিয়ে গেল না। মিটাল না আকাঙ্ক্ষা। তা যদি মিটাত তাহলে সেদিনকার সেই ছোট্ট বিনয় আজ এই ছেলেটির বয়েসী হ'ত।

অণিমা মুখ নীচু করল। অনেকখানি নীচু করল। ছেলেটির কপাল পর্যন্ত।

ঠোঁটের স্পর্শতেই চোখ খুলল ছেলেটি। একটু হাসল। বলল, চিনেছি। এতদিন বাদে যেন খুঁজে পেয়েছি।

অণিমা কৌতুক বোধ করল। একটু হেসে বলল, আমাকে খুঁজেছ?

হ্যাঁ, তোমাকে। মুখের ওই তিলটাতে তোমাকে যা সুন্দর দেখায়—

তিল? রোগজীর্ণ ছোট্ট মুখের ওই সামান্য কথাটা যেন আঘাত হানল অণিমার বুকে। তার বর্তমান চেতনার অবলুপ্তি ঘটিয়ে দিল।

বিনয় যে তাকে বার-বার ওই কালো তিলটার কথাই বলত।

অণিমা জ্ঞান হারাল। সম্বিত হারিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। তার সেই স্বপ্নের মধ্যে এই হাসপাতালের চেহারা নেই। চব্বিশটা বেড উধাও। সেখানে রয়েছে শুধু সে, আর রোগশয্যায় বিনয়।

বিনয় কথা বলছে অনর্গল। বলতে বারণ, তবু সে কথা কইবেই।

বেদান্ত।

পিথাগোরাস, প্লেটো, কান্ট।

সোপেনহাওয়ার, লেসিং, ক্রুনো। দার্শনিক।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন। কবি।

ডাঃ জুলিয়াস মুয়েলের। দেবতাত্ত্বিক।

ভারতবর্ষ: মিশর: বেদান্ত।

প্রাচীন দার্শনিক অরিগেন।

আজকের এই রাতটা বিনয়ের।

শুধু যেন বিনয়কে ভাববার।

বিনয়-বেদান্ত-পুনর্জন্ম।

জীবনের শেষ ক'দিন বিনয় এই কথাই বলেছে। অণিমা সে সব কথা তখন বোঝেনি। কিন্তু আজ নিতান্ত অদ্ভুতভাবেই সেদিনকার প্রতিটি কথা মনে পড়ছে। তার কাছে শুনতে পাওয়া সেই নামগুলি বিস্মৃতির অতল থেকে কেন যে আবার চেতনার মধ্যে এল তা কে জানে।

বিনয় বলেছে, আমাকে মরতে হবে। এ দেহতে আত্মাটা থাকতে চাইছে না। অণু, আমার দেহটাকে তুমি ভালবাস,—তাই না?

অণিমা বিনয়ের মাথাটা জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে নিজের বুকের মধ্যে। বলেছে, ব'লো না, ব'লো না। অমন কথা তুমি ব'লো না।

হাসতে চেয়েছিল বিনয়। কিন্তু বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে তাকে আকুলি-বিকুলি করতে হয়, হাসবার ফুরসৎ তার মেলে না।

সে বলেছে, আত্মা অবিনশ্বর। এ দেহটাকে ছেড়ে চলে যাবে। আত্মাকে বহু জন্ম পার হয়ে শুদ্ধিলাভ করতে হয়। আমি আবার আসব। তোমাকে খুঁজে বের করব।

অণিমা কাঁদছিল। আর আজকের রাতে যে-রকম ভাবে এই বাচ্চা রুগীর মাথায় হাত বুলাচ্ছে, তেমনি হাত বুলাচ্ছিল বিনয়ের মাথায়।

অণু, হাঁপাতে হাঁপাতে বিনয় বলেছে, কেঁদো না। বেদান্ত পুনর্জন্মকে বিশ্বাস করে। তোমাকে ভালবাসার সাধ মেটেনি অণু। তোমার ছবিখানাও সম্পূর্ণ করে যেতে পারলাম না। আমাকে যে শিল্পী হ'তেই হবে। এ দু'টোর জন্যেই আবার আসব।

অণিমা ঘরের কোণে রক্ষিত ইজেলের উপরে অসমাপ্ত ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিনয় তার প্রতিমূর্তিকে ধ'রে রাখবে।

তুমি পুনর্জন্ম বিশ্বাস কর? অতি ধীর গলায় বিনয় প্রশ্ন করেছিল।

কান্নাধরা গলায় বলেছিল অণিমা, তুমি একটু চুপ কর। তোমাকে যে চুপ করে থাকতে হবে।

এ কথাগুলো যে সহ্য করা যায় না। তাকে কাঁদাবার জন্যেই যে বিনয় এই কথাগুলো বলছে। তাকে কাঁদিয়ে বিনয়ের কি লাভ হবে?

বিনয় প্রশ্ন করল, তুমি গীতা পড়েছ?

অণিমা কাকুতিতে ঝ'রে পড়ল, তুমি একটু চুপ করো। তোমার পায়ে পড়ি।

ধীরে ধীরে বিনয় সরিয়ে দিল অণিমার হাত, তোমাকে শুনতে হবে। তৈরী থাকবে। আমি যে আবার আসব। সেই আকাঙ্ক্ষা করছি। সব ব'লে না গেলে তুমি চিনতে পারবে না। আমি চিনব; একটুও কষ্ট হবে না। তোমার গালের ওই তিলটিকে কত সুন্দর লাগে!

একটু থেমে সে বলল, গীতায় রয়েছে, জীবনকালে যে বাসনাটা তীক্ষ্ণ হয়, মৃত্যুর পরেও আত্মার মধ্যে তা থাকে। সেই সুপ্ত বাসনাটা তার পরিপূর্ণতার জন্যে সৃষ্টি করে সূক্ষ্ম শরীর। তা থেকে আমাদের নতুন জীবন। আসলে আমরা পূর্বজন্মের চিন্তা, কাজ আর ইচ্ছা দিয়েই আমাদের ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করি। এ জন্মে যে বাসনা পূর্ণ হ'ল না, তাকে সফল করতে আবার আসতে হয় আত্মাকে। হয়ত সে জন্মে তা সফল হ'ল না; আবার শত শত জন্ম আসবে। ইচ্ছা পূর্ণ হবে তখন। অণু, আত্মা অনন্ত সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ; তার অভিব্যক্তিও তাই অনন্ত।

বিনয় হাঁপাচ্ছিল। নিশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। বুকে শব্দ। আর নাসারন্ধ্র এই বাচ্চা ছেলেটির মতই স্ফীত হচ্ছিল থেকে থেকে।

কিন্তু সেদিন আজ নেই। বদলে গেছে চিকিৎসার ধারা। গত কয়েক বছরের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কি অদ্ভুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের ক্যালেণ্ডারের এক-একটি দিন ভীষণ রকমের বড়। কোটি কোটি বছর নিয়ে তাদের কারবার। তাদের দিনপঞ্জীতে দশটা বছরের হিসাব নেই। এই দশটি বছর তাদের হিসেবে হয়ত মাত্র এক মিনিট আগেকার ঘটনা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই এক মিনিট সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে। মাত্র একটি মিনিট আগে এটা উঠলে বিনয় মরত না।

অণিমা ছেলেটির মুখের দিকে তাকাল।

হাসপাতালে কত রুগী আসে। নানা ধরণের পেশেণ্ট। কেউ মারা যায়, কেউ সুস্থ হয়ে ফেরে বাড়ী।

মারা গেলে তার বিছানাকে নীল কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।

এইখানে অমন পর্দা, অনেকবার অনেক বেডের চারিধারে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে কোন রুগীর কাছে থাকে নি। থাকতে ইচ্ছা করে না, থাকা যায় না। মনে পড়ে বিনয়ের রোগশয্যার দৃশ্য।

জীবনে ওই একটি মৃত্যুকেই প্রত্যক্ষ করেছে অণিমা। কি ভাবে আস্তে আস্তে মৃত্যু এসে গ্রাস করল। অক্সিজেন ইনহেলেশনের ক্যাথিটারটা ধ'রে তাকিয়ে ছিল বিনয়ের দিকে। এক সময় দেখল হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড। তার পর সর্বশেষ দেহ-সঞ্চালন। স্পষ্ট দেখল, গলাটা একটু দুলে মুখ হাঁ হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অণিমা তবু ক্যাথিটারটা ধ'রে রইল। জীবনের প্রথম দেখা মৃত্যুকে সে চিনতে পারে নি।

বিনয়ের মৃত্যুর পরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সচেষ্ট হ'ল। আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ হয়ে থাকার পক্ষপাতী নয়। তাদের সঙ্গে ছেদ ঘটেছে বিয়ের পরেই। শ্বশুর এবং পিতৃকুল, কেহই তাদের ভালবাসার বিয়েকে সুনজরে দেখে নি। তাই তাদের কাছ থেকে আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি পেয়েও অণিমা তা গ্রহণ করে নি।

ছেলেটি কিন্তু জেগেই আছে। সে বলল, তুমি ভাবছ?

অণিমা চুপ করে রইল।

আমাকে চেনা-চেনা মনে হয়?

সন্দেহের দৃষ্টিতে অণিমা তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি যে মনে করতে পারছি না, ছেলেটি বলল, অথচ যেন মনে হয় তোমাকে চিনি। সময়তে কিন্তু মনে আসে সব, আবার ভুলে যাই।

ডিলিরিয়াস্। অণিমা ভয় পেল না। রুগীর নাড়ীর অবস্থা ভাল বলেই মনে হয়। টেম্পারেচারও নামছে যেন। কিন্তু এত ডিলিরিয়াস কেন তা বুঝতে পারল না।

সে বলল, খোকন, অত বকতে নেই। ঘুমোও।

তা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। ছেলেটি চোখ বুঁজল।

পরম স্নেহে আর যত্নে অণিমা ওর চুলের ভেতরে তার সরু আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল।

ঠিক এই পদ্ধতি বিনয় ভালবাসত খুব।

কেন, যেন আজকের নিশুতি রাতে এই ছোট্ট

লেটিকে নিজের ছেলে ব'লে ভাবতে ভাল লাগছে। কিন্তু কতক্ষণ এই ভাললাগা? কতক্ষণ সে পারবে ব'সে থাকতে?

হাতঘড়ির দিকে অণিমা চাইল। রাত একটা। গরমের রাত্রি চারটাতে শেষ। ভোর হলেই তাকে চ'লে যেতে হবে। ভাললাগার সময় খুব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যায়। এইটুকুও চ'লে যাবে। অনুভব করতে পারবে না। মোটে ত তিনটি ঘণ্টা। বিনয়ের সঙ্গেকার তিনটি বছর অনুভব করতে পারে নি, তিন ঘণ্টা ত কোন্ ছার।

সত্যি তাই। বিনয়ের সঙ্গে পরিচয়, তার পর মৃত্যু, ব্যবধান তিন বছরের। অথচ এই তিনটে বছর যেন অতি দ্রুত চলে গেল। প্রথম বছর গেল পরিচয় নিবিড় হতে। তার পর বিয়ে। এ বিয়েতে ছু' তরফের কেউই সম্মতি দেয় নি। যার ফলে বিয়ের পরেই বিনয়কে বাড়ী ছেড়ে নতুন বাসা করতে হয়েছে অণিমাকে নিয়ে। বিনয় চাকরি করত। অবসর সময়ে আঁকত ছবি। ছু'জনার সংসারে চাকরির রোজগার যথেষ্ট বলেই বিনয় বিয়ের পরেও নিজেকে সঁপে দিতে পেরেছিল ছবি আঁকার ভেতরে। এটা নেশা। স্বপ্ন ছিল, মস্তবড় শিল্পী হবে। তার সৃষ্টি হবে জীবন্ত। ক্যানভাসের ভেতরে থেকেও সেই ছবি যেন কথা কইতে চাইবে, চাইবে হাত বাড়াতে; মনে হবে বুঝি থেকে থেকে পলক ফেলছে চোখের। ধীরে ধীরে খ্যাতিও আসছিল। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা ত্রুটি। সামান্য একটু রকমফের প্রয়োজন। অথচ সেইটুকু নিজের শিল্প-দৃষ্টিতে ধরতে পারছিল না।

অণিমা বলত, তাতে কি হয়েছে? সমঝদারের সমালোচনা? ওর দরকার রয়েছে গো! সমালোচকের চাবুকের আঘাতেই ত শিল্পীর প্রতিভার স্ফুরণ হবে। ধরা পড়বে দোষ-ত্রুটি। এতে মন খারাপ ক'রো না।

এই সময়েতেই সে আঁকতে আরম্ভ করেছিল অণিমার ছবি। শেষ করতে পারে নি। তার আগেই জীবনের উপরে পড়েছে যবনিকা।

এ এক সৃষ্টিছাড়া খেয়াল। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে ছাদে বসে রইল ঘণ্টাখানেক। কত বারণ করল অণিমা। খানিকটা বিরক্তও হয়ত বোধ করেছিল। যার অমন সর্দির ধাত, সে বৃষ্টিতে ভেজে কখনও?

বিনয় শোনে নি। না শোনার মাশুল দিল জীবন দিয়ে। শ্লেষ্মা আঁকড়ে ধরল ফুস্-ফুস্ ছুটো। শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ছাড়ল।

মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করল অণিমা। এ মৃত্যু তার নিজের ভালবাসার মৃত্যু। এ মরণ তার মাতৃত্ব-সম্ভাবনার মরণ।

সমস্ত ওয়ার্ডটা ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছে বারান্দার বাড়তি বিছানার রুগীরাও। গরমের দিন বলে ত্রিপলের পরদাগুলো তোলা রয়েছে। বর্ষণের সম্ভাবনা দেখলেই ওগুলোকে ফেলে দেওয়া হবে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরেটা। ব্লকটার সামনেই রাস্তা। রাস্তার ওধারে খানিকটা খোলা জায়গা। বড় বড় ঘাস। ছু-একটা ফুলের গাছ। তারও ওপাশে ইনডোর ডিস্‌পেনসারী। সামনে আলো জ্বলছে। হাসপাতালের কোথায় কোন ওয়ার্ড, কোথায় ফাঁকা জায়গা, কটি গাছ, এমন কি, এই ব্লকটার পিছনে টল্‌টলে পুকুরটা—সবই অণিমার মনে ছক কাটা রয়েছে। এ পরিবেশ তার ন' বছরের চেনা।

আরও খানিকক্ষণ ব'সে রইল অণিমা। হাতঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে রুগীর নাড়ীর গতি হিসেব করল। সেই সঙ্গে দেখে নিল রাত কত।

সমস্ত কলকাতা নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। ভারতের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত সহরটির রাতের রূপটা কেমন কে জানে? অণিমা দেখে নি। কোন-কোনদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছে হাসপাতালের সদর গেটটার কাছে। দেখেছে, নিথর নিশ্চুপ জনহীন রাজপথ।

কিন্তু গেটের ওধারে কোনদিন একটি পদক্ষেপও করে নি।

নিজের চেয়ারে ফিরে যাবার সময় অণিমা ওপাশের সারিটা দিয়ে গেল। আস্তে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় প্রতিটি রুগীকেই এক ঝলক দেখে দেখে সে চলল। থমকে দাঁড়াল এগার নম্বরের কাছে। শুকনো দেহটা যেন লেপ্টে রয়েছে বিছানার সঙ্গে। এমন শীর্ণ দেহ নজরে পড়ে না। মাথার কাছে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে ঝুলছে জেকন্ বাল্ব। রায়লস্ টিউবটি হেলতে-ছুলতে নেমে এসে ঢুকেছে পেশেন্টের নাকের ফুটোর ভেতরে। কৃত্রিম উপায়ে ওকে খাওয়ানো হচ্ছে।

অণিমা তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসল। গীতা ওধারে। একুশ নম্বর বেডটি কাছাকাছি। ছেলেটি ঘুমুচ্ছে। ও কি বাঁচবে?

প্রশ্নটিতে অণিমা নিজেই চমকাল। সংশয়, আশঙ্কা, ভয়। নিজেদের মধ্যে ওই একুশ নম্বর বিছানা নিয়ে আজ অনেক আলোচনা করেছে। অভিশপ্ত বিছানা। ও বিছানার পেশেণ্ট বাড়ী ফিরে যেতে পারে না। মাস ছয়েক আগে সে এই ওয়ার্ডে ডিউটি দিয়ে গেছে। অন্ততঃ

তখন এই অবস্থা ছিল। সে ট্রাডিশন এখনও চলছে কি না কে জানে।

কিন্তু এই ছেলেটিকে ওই বিছানায় না রাখলে এমন কি ক্ষতি হ'ত? আর কোন বিছানা কি খালি ছিল না?

এ প্রশ্নের জবাব দেবার কেউ নেই। কিংবা কাউকে জিজ্ঞাসা করাও যায় না; কিন্তু ওকে ভারি ভালবেসে ফেলেছে অণিমা। ওর তেমন কিছু হলে, ব্যাপারটা তার কাছেও মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে। বিনয়ের একটা ছেলে থাকলে সে যে ওর বয়সেরই হ'ত।

অনেক কিছু ভাবছিল অণিমা অনেকক্ষণ ধরে। চমক ভাঙল গীতার ডাকে।

অণিমাদি, বাচ্চাটা তোমাকে ডাকছে।

আমাকে? অণিমা তাকাল।

বিছানার কাছে যেতেই ছেলেটি বলল, বা রে, পালালে কেন তুমি? এ রকম ত আগে ছিলে না।

অণিমার কালো আর সুন্দর ভ্রূ দু'টি আপনা থেকেই কুঁচকে উঠল। পেশেণ্ট কি এখনও ডিলিরিয়াস? ডাক্তার মুখার্জী সাবধান করে দিয়ে গেছেন। তা হলে ওকে পাঁচ লাখ পেনিসিলিন দিয়ে দেওয়াই ভাল।

রুগীর পাশে বসে অণিমা পাল্‌স্ দেখল আবার। থার্মোমিটারে দেখলে টেম্পারেচার। একশো-তিন কিম্বা চার ডিগ্রি জ্বর হবার কথা।

একটা ধোঁকা। সংশয়। অণিমার দৃষ্টি ত খারাপ নয়। তবু সে তাপমান যন্ত্রটা নিয়ে আলোর নীচে দাঁড়াল। দেখল ভাল করে। যে উষ্ণতাটুকু ধরা পড়েছে, সেটুকু নিউমোনিয়ার ক্রাইসিস পিরিয়ড-এর ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা যায় না। তাই সে হাত ঝাঁকিয়ে পারদটুকুকে একেবারে নীচে নামিয়ে আবার ছেলেটির তুলতুলে ঠোঁট দু'টির মাঝে ঢুকিয়ে দিল।

ষাট সেকেণ্ড অতিবাহিত হ'তেই টেনে আনল সেটাকে। দেখল, পড়ল। আর অবিশ্বাস করল যন্ত্রটাকে। ওটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু থার্মোমিটার কি একটা? আরও অনেক রয়েছে। অণিমা নিয়ে এল অপর একটাকে। প্রয়োগ করে দেখল। একই ফলাফল। বুঝল, আগের যন্ত্রটাও ভাল।

টেম্পারেচার বিলো হানড্রেড।

ভাল ক'রে দেখল রোগীকে। গায়ে ঘাম নেই। এটা সুলক্ষণ। স্মরণ করে দেখল, সে ডিউটিতে আসা অবধি ছেলেটি জল খেতে চেয়েছে মাত্র বার-দুয়েক। তার মানে তৃষ্ণার ভাব কমেছে। খানিক আগে যে প্রস্রাব করেছে, তা-ও লাল নয়।

অণিমা বুঝল, আপাততঃ ভয়ের সম্ভাবনা নেই। তবু সে প্রশ্ন করল, খোকন, জল খাবে একটু? তেষ্টা আছে?

ছেলেটি অস্বীকার করল। বলল, কাছে বস একটু। মাথার কাছে।

অণিমা বসল। পরম মমতায় তাকাল ছেলেটির দিকে।

ছেলেটিও তার দৃষ্টিকে ওপরে তুলে তাকিয়ে রইল অণিমার দিকে। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, তুমি অণিমা, তাই না?

আমার নাম জানলে কি করে?

আমি যে তোমাকে চিনি। বহুদিন থেকে চিনি। তোমাকেই ত খুঁজছি।

আমাকে খুঁজছ? চমকে অণিমা প্রশ্ন করল—কি ভাবে চিনলে আমাকে?

কি ভাবে চিনলাম? আশ্চর্য্য! তোমার যে কিছুই মনে নেই। অথচ আমি মনে করতে পারছি।

খুব আস্তে কথা বলছে ছেলেটি। ফিস্‌ফিসিয়ে। দৃষ্টিটা যেন ঘোলাটে। বুঝি কোন স্বপ্নের দেশ থেকে কথা বলছে।

মনে পড়ে না তোমার? সেই যে ছোট্ট একখানা দোতলা বাড়ী। কলকাতার কোন্ দিকে তা ঠিক মনে করতে পারছি না। সেই ছোট্ট বাড়ীর দোতলায় তুমি আমি থাকতাম।

একটু থেমে ছেলেটি শুধাল, মনে পড়ে না তোমার?

অণিমা চেতনা হারাল। সে কথা মনে না প'ড়ে পারে? সেই মিষ্টি-মধুর দিনগুলির পরিসমাপ্তি বড় দুঃখের। বেদনার। তবু ত তা ভাবতে ভাল লাগে।

ছেলেটি বলে চলল, আমার ফেরার সময় হলেই তুমি এসে দাঁড়াতে ওপরের বারান্দায়। আমি তোমার জন্যে ফুল নিয়ে যেতাম। পরিয়ে দিতাম খোঁপায়।

সব মনে আছে, সব মনে আছে অণিমার।

বেদান্ত। পিথাগোরাস, প্লেটো, প্লাটিনাস, কাণ্ট। ভারতবর্ষ, বেদান্ত, পুনর্জন্ম।

মৃত্যুশয্যায় বিনয় বলেছিল, আত্মা অবিনশ্বর। তাকে বহুজন্ম পার হয়ে শুদ্ধিলাভ করতে হয়। অণু, আমি আবার আসব। তোমাকে খুঁজে বের করব।

বিনয় কি তা হলে সত্যি আবার এল? এই ছোট্ট

ছেলেটি, যে স্বচ্ছন্দে অণিমার সন্তান হ'তে পারত, সে বিনয় ?

অকস্মাৎ যেন রক্তস্রোত তার নরম শরীরটাকে একবার ঝাঁকিয়ে দিল প্রচণ্ড ভাবে। তার পরেই গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠল। চিরন্তনের একটা সংস্কারবশেই হয়ত।

অণিমা চারিদিক্‌টা দেখে নিল। গোটা ওয়ার্ডটার উপরে বুলিয়ে নিল দৃষ্টিটা। সমস্ত রুগীরাই ঘুমুচ্ছে: ওই ত গীতা বসে রয়েছে। 'বি' ওয়ার্ডে যাবার প্যাসেজটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওখানকার খানিকটা। আশে-পাশের সব কিছু ঠিক আছে। ওই ত সে দেখতে পারছে ইনডোর ডিস্‌পেনসারী। লেখাটাও পারছে পড়তে।

সবই ত ঠিক আছে।

নিজেকে সামলাতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগল না।

বিনয়, বিনয়, বিনয়। কিন্তু যুক্তি দিয়ে কি এই ঘটনাটাকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায়? ব্যাখ্যা করা যায় ?

জান, তোমার ছবি এঁকেছি। কথা ক'টি বলেই ছেলেটি তাকাল অণিমার দিকে।

আমার ছবি ?

হাঁ, হাঁ্যা। তুমি। তোমার মুখখানা আমার মনের পটে আঁকা হয়ে গেছে। নয়ত তোমাকে আঁকলাম কি করে ?

ফিস্‌ ফিস্‌ করে অণিমা বলল, তুমি আঁকতে পারলে ?

কত ছবি এঁকেছি। আমি যে শিল্পী হব। বড় শিল্পী। আমার আঁকা ছবিগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে কথা কইতে চাইবে।

সেই পুরানো কথা, আর বাসনা।

গীতা। বেশ মনে পড়ে, বিনয় গীতার উল্লেখ করেছিল সেদিন। বলেছিল, পূর্বজন্মের চিন্তা দিয়ে, ইচ্ছা দিয়েই নাকি আমরা ভবিষ্যৎ জীবনকে সৃষ্টি করি। এ জন্মে যে বাসনা পূর্ণ হ'ল না, তাকে সম্পূর্ণ করতেই নাকি আত্মাকে আসতে হয় পরবর্তী জন্মে। বাসনা পূরণ হ'তে শত জন্মেরও প্রয়োজন হতে পারে।

দুঃখ, মমতা আর বেদনা ছাড়াও, এই মুহূর্তে মৃত বিনয়ের উপরে যেন খানিকটা করুণাও অনুভব করল অণিমা। বিনয়ের অতৃপ্তির জন্যে। গত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বিনয় কি সফল হবে এ জন্মে ?

তাই হোক। ওর আশা যেন সার্থক হয়।

এতক্ষণ বাদে অণিমার খেয়াল হ'ল, বিনয়ের নতুন নাম জানা হয় নি। তাই জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি ?

বিনু, ছেলেটি হাসল—বিনয়।

বিনয়, বিনয়। এ জন্মেও সেই নাম! অণিমা উচ্চারণ করল নামটা। উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলল, চিনেছি, তোমাকে চিনেছি। এবার ঘুমোও। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

ব্যাকুল-আকুল হয়ে অণিমা নিজের মুখখানা ঘষতে লাগল রুগীর মাথার উপরে।

ছোট্ট বিনয় ঘুমুল। সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। আর অণিমা ঘুমুল জেগে-জেগে। স্বপ্ন দেখতে লাগল। তাদের ফুলশয্যার রাতের স্বপ্ন।

সেই স্বপ্নের ঘোর যখন কাটল, তখন তার ছোট্ট হাতঘড়ির ছোট্ট কাঁটাটা চারটার ঘর পেরিয়ে পরবর্তী ধাপের মাঝামাঝি এগিয়ে গেছে।

ভোর হয়েছে।

এবার তাকে উঠতে হবে। তাই উঠল। তারই আগে চারিদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ফেলে রুগীর কপালে চুমু দিল একটা। কার উদ্দেশে তা ভাবতেই অণিমার মুখে লাজুকতা ফুটে উঠল।

যেন সে নববধূ।

আর মনে হ'ল এগারো বছর আগেকার সেই ফুলশয্যার রাত যেন নবরূপে ফিরে এসেছিল সেই রোমান্স, অনুভূতি, স্পন্দন আর ছন্দ নিয়ে।

---

# অ্যালবার্ট শয়াৎসার ( Schweitzer ) ঃ একটি জীবন, একটি সাধনা

শ্রীগোপালচন্দ্র চৌধুরী

বর্ত্তমান যুগে রাজনীতি এমনই এক সর্ব্বাত্মক রূপ গ্রহণ করেছে যে বৃহৎ বা মহৎ কিছু ভাবতে গেলে রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবতে হয়। কোনও কিছু বড় কাজ করতে গেলে প্রথমেই শাসন-যন্ত্রকে কবলিত করার কথা চিন্তা করতে হয়, তা না হলে কোনও কাজই সুরু করা যায় না। কর্ম্মবীর বলতে আজকাল সর্ব্বপ্রথমে বড় বড় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কথাই আমাদের মনে পড়ে। এতে বিস্ময়ের বিষয় হয়ত তেমন নেই, কেননা সত্যই ত এই গণতন্ত্রের যুগে এক-একজন রাষ্ট্রনায়ক লক্ষ লক্ষ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার দায়িত্ব বহন করেন; বিগত যুগের মত উত্তরাধিকার সূত্রে আপনা-আপনি তাঁদের স্কন্ধে এ দায়িত্ব বর্ত্তায় না—সমগ্র জীবন দিয়ে, চিন্তা এবং কর্ম্ম দিয়ে, দেশের লোকের সব রকমের ইহলৌকিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে দায়িত্ব অর্জ্জন করতে হয়। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই এর প্রচার এত বেশী হয় যে, এ ছাড়াও আরও মহৎ কাজ যে মহত্তর কর্ম্মবীরের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে তা জনসাধারণের গোচরে ততটা আসে না। এবং সেই জন্যই বোধ হয় ডাঃ অ্যালবার্ট শয়াৎসারের জীবনব্যাপী সাধনার বিষয়ে আমরা ততখানি অবহিত নই, যতটা তাঁর অনন্যসাধারণ কর্ম্মযজ্ঞ সম্বন্ধে হওয়া উচিত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধেই ইওরোপ যে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছিল এ বিষয়ে দ্বিমত হবার অবকাশ নেই, যদিও সেই সঙ্গে এ কথাও মনে পড়তে বাধ্য যে, পৃথিবীর বৃহত্তর অংশ তখনও সেই সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোগী হওয়া ত দূরে থাক, উপকরণরূপেই ব্যবহৃত হচ্ছিল। এই পরিবেশে জন্মগ্রহণ ক'রে, প্রতিপালিত হয়ে এবং সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অবলীলাক্রমে সব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সুদূর আফ্রিকার এক গণ্ডগ্রামে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্য চিকিৎসকরূপে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণেই যে চমকপ্রদ নাটকীয় উপাদান রয়েছে তা আরও ঘনীভূত হয় যখন শুনি যে—যে শয়াৎসার জীবনের প্রথম ত্রিশ বছর ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র পঠনপাঠনে এবং সুরের মূর্চ্ছনার মধ্যে নিজেকে সার্থক করে তুলেছিলেন, তিনিই ত্রিশ বছর বয়সে নতুন ক'রে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করবার জন্য পুনরায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে অ্যালশেস প্রদেশের এক ধর্ম্মযাজকের গৃহে ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শয়াৎসার জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সেই পিতার নিকট পিয়ানো বাজানোয় তাঁর হাতে-খড়ি হয়, আট বছর বয়সে যখন কোন ক্রমে তাঁর পা অর্গ্যানের বেলোতে পৌঁছত তখন থেকেই তিনি অর্গ্যান বাজাতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতশিক্ষাও তাঁর জীবনে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল এবং ছাত্রজীবনের শেষে ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কাণ্টের দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক নিবন্ধ ( The religious philosophy of Kant from 'the Critique of Pure Reason' to 'Religion within the bounds of mere Reason' ) পেশ করে যখন ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন ( ১৮৯৯ ) তখনই তিনি পারীর বিখ্যাত অর্গ্যানবাদক উইডরের ( Charles Mary Widor ) নিকট সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ ক'রে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। দর্শনের উপাধি পাবার এক বছর পর তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের উপাধি ( Doctorate in Theology ) লাভ করেন 'যিশুখ্রীষ্টের শেষ নৈশভোজন' সম্পর্কিত সমস্যার উপর আলোকপাত করে প্রবন্ধ লিখে। ছাত্রজীবনের এই গৌরবময় কৃতিত্বের ফলে তিনি ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ধর্ম্মতত্ত্ব বিভাগে ( Theological Faculty ) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ধর্ম্মতত্ত্বের উপাধি পরীক্ষার জন্য তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে যিশুখ্রীষ্টের জীবনের একটি অধ্যায়ের উপরই আলোকপাত করা হয়েছিল, তাতে পরিতৃপ্ত না হয়ে যিশুখ্রীষ্টের সমগ্র জীবনচরিত আলোচনা ক'রে তিনি 'The Quest of Historical Jesus' এবং 'The Mysticism of Paul, the Apostle' নামে দু'টি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অধ্যাপনা এবং যিশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত সম্বন্ধে গবেষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর জার্ম্মান সুরকার J. S. Bach-এর সঙ্গীত সম্বন্ধে সমালোচনামূলক একটি পুস্তক ফরাসী ভাষায় রচনা করেন, কিন্তু জার্ম্মানীর সঙ্গীতমহলেও পুস্তকটি খুব সমাদৃত হওয়ায় তিনি জার্ম্মান

ভাষায় বইটি পুনর্লিখিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শয়াৎসারের জন্মভূমি কখনও জার্মান এবং কখনও ফ্রান্সের অধীনে থাকায় তিনি দ্বিভাষিক, যদিও মাতৃভাষা হিসাবে জার্মানকেই স্বীকার করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে Bach সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানী এবং ফ্রান্সে কি ভাবে অর্গ্যান বাদ্যযন্ত্র নির্মিত হয় সে সম্বন্ধে—'The Art of Organ Building and Organ playing in Germany and France'—নামে পুস্তকটি রচনা করেন। শুধু তাই নয়, অর্গ্যানবাদক হিসাবে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত যন্ত্রগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত যন্ত্রগুলির চেয়ে অধিকতর সঙ্গীতময়। যাতে প্রাচীন পদ্ধতি বর্ত্তমানেও অনুসৃত হয় তার জন্য তিনি রীতিমত আন্দোলন চালান এবং অর্গ্যান নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ ক'রে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত Congress of the International Musical Societyতে স্বীকৃত করান।

সফল সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে, সার্থক দর্শনশিক্ষক এবং ধর্ম্মতাত্ত্বিক রূপে ত্রিশ বছর বয়সেই তিনি সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে এ কথা প্রতীয়মান হয়েছিল যে, পৃথিবীর অগণিত লোক যখন মাত্র জীবনধারণের চেষ্টায় রোগ, শোক, আধি, ব্যাধি এবং অভাবজনিত দুর্ভাবনার তাড়নায় পর্য্যুদস্ত, তখন তিনি যে সুখের জীবন যাপন করছেন তাতে গা ঢেলে সময় কাটান অন্যায়। যারা দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের সামান্যতম সুখ-সুবিধাটুকু থেকেও বঞ্চিত তাদের চিন্তা তিনি কোনদিনই মন থেকে দূর করতে পারেন নি। আত্মজীবনের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—"১৮৯৬র এক সুন্দর নিদাঘ-প্রভাতে ঘুমভেঙে জেগে হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল যে, এই সুখের জীবন, যা স্বাভাবিক ভাবেই আমার করায়ত্ত হয়েছে, তা নিষ্ক্রিয়রূপে গ্রহণ করা আমার উচিত নয়, এর পরিবর্ত্তে আমার কিছু করা উচিত। এই চিন্তায় নিমগ্ন থেকে শয্যাত্যাগ করার পূর্ব্বেই আমি স্থির করে ফেলেছিলাম যে, জীবনের ত্রিশ বৎসরকাল বিজ্ঞান এবং কলার অনুশীলনে নিয়োজিত থাকা তবেই আমার পক্ষে সার্থক, যদি আমি জীবনের অবশিষ্ট সময় মানুষের প্রত্যক্ষ সেবায় নিয়োগ করতে পারি।"

কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে প্রত্যক্ষ সেবার আদর্শ বাস্তবে প্রতিফলিত করা সম্ভব হবে তা তিনি সহজে নিরূপণ করতে পারেন নি। একবার তিনি ভেবেছিলেন যে, ইউরোপেই কিছু করবেন, যেমন, অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশুদের ভার গ্রহণ ক'রে তাদের মানুষ করে তোলা এবং পরে তাদের, তাদেরই মত অসহায় শিশুদের ভার গ্রহণে সচেষ্ট করা; হয়ত একাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হ'ত, কিন্তু এই সময়েই (১৯০৪) দৈবাৎ তিনি পারী মিশনারী সোসাইটির এক কর্ম্ম-বিবরণী থেকে জানতে পারেন যে, বিষুবরৈখিক আফ্রিকার গ্যাবুন প্রদেশে যেখানে ঐ মিশনারী সোসাইটি তাঁদের কাজকর্ম্ম চালান সেখানে কর্ম্মীর, বিশেষ করে চিকিৎসকের তীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছে। তাই অনতিবিলম্বেই স্থির করেন যে, সেই দুর্গম প্রদেশেই তিনি চিকিৎসকরূপে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের প্রত্যক্ষ সেবার সংকল্প রূপায়িত করবেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কি দুর্দ্দমনীয় মনোবল থাকলে তবেই কোন ব্যক্তি ত্রিশ বছর বয়সে জীবনে অন্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কেবল তাঁর আদর্শ উপলব্ধি করার জন্য পুনরায় ডাক্তারী পড়া আরম্ভ করতে পারেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ ক'রে ডাক্তারী পড়া আরম্ভ করেন। ছ' বছর পর ১৯১১ সনের অক্টোবর মাসে তিনি ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা দিলেন, এর আগের মাসেই ম্যুনিখে অনুষ্ঠিত এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরীক্ষার ফি উপার্জ্জন করেছিলেন। এবার অর্থ সংগ্রহের সমস্যা। মহৎ কর্ত্তব্যের মহৎ আবেদনেই যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি সকলের বদান্যতায় পরিপূর্ণ হয়েছিল তা নয়। যে কাজ তখনও আরম্ভ হয় নি, ভবিষ্যতে হবে, তার ভরসায় এগিয়ে আসবে কে? তবু কিছু সংগৃহীত হ'ল তাঁর সহকর্ম্মী এবং ছাত্রদের আনুকূল্যে, বাকিটা পূরণ হ'ল অর্গ্যান বাজানোর অনুষ্ঠান করে। ১৯১৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সত্তরটি বাক্স ওষুধপত্তর এবং আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জামে পূর্ণ ক'রে বোর্ডো বন্দরে পাঠান হ'ল। শয়াৎসার তাঁর নব-পরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে করে ২৬শে মার্চ্চ বোর্ডো বন্দর থেকে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

পারী মিশনারী সোসাইটির কর্ম্মক্ষেত্র ছিল গ্যাবুন প্রদেশের ওগাউ জেলায়। ওগাউ নামে সাত-আটশ' মাইল দীর্ঘ একটি নদীও এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, কিন্তু নদীর মোহনা থেকে স্থলভাগের মধ্যে আড়াইশ' মাইল পর্য্যন্তই ( N. Djole অবধি ) ষ্টীমার করে যাওয়া যেতে পারে, আরও ভিতরের দিকে যেতে হলে নৌকা ছাড়া আর উপায় নেই ( রেলপথের কথা অচিন্তনীয় )। ন' গোমো, ল্যাম্বারেণে, সামকিতা এবং তালাগুগা এই চারটি জায়গায় সোসাইটির কেন্দ্র ছিল। শয়াৎসার ল্যাম্বারেণেতেই নিজের কর্ম্মস্থল নির্ব্বাচিত করেছিলেন।

মিশনারী সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর বাসের জন্য যে ঘর দিতে পেরেছিলেন সেখানে চিকিৎসা-কার্য্য চালান সম্ভবপর ছিল না, তাই প্রথম কয়েকদিন ডাঃ শয়াৎসার উন্মুক্ত আকাশের তলায় রোগীদের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু সামান্য ঝড় বা বৃষ্টিতে হাতের কাজ থামিয়ে সাজ-সরঞ্জাম ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে বড়ই অসুবিধা হ'ত, তাই তিনি স্থির করলেন হাঁস, মুরগী, প্রভৃতি যে ঘরে রাখা হ'ত সেখানেই হাসপাতালের গোড়াপত্তন করবেন। এ সব ছাড়া আরও অনেক অকল্পনীয় অসুবিধা তাঁকে জয় করতে হয়েছিল। আফ্রিকার আদিম অধিবাসী যাদের চিকিৎসা করতে তিনি গিয়েছিলেন তাদের ভাষা তিনি বুঝতেন না, যদিবা দোভাষীর সাহায্যে কোন ক্রমে সে অসুবিধা তিনি দূর করলেন, তখন মুস্কিল হ'ত—বার বার বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকান রোগীরা তাঁর নির্দ্দেশ যথাযথ পালন করে উঠতে পারছে না। ক্ষত চিকিৎসার জন্য তিনি হয়ত লাগাবার মলম এবং খাবার ওষুধ দিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল রোগী মলমটাই খেয়ে ফেলেছে এবং ক্ষতস্থানে খাবার ওষুধ লাগিয়ে এক নতুন বিভ্রাট বাধিয়েছে।

সকাল থেকে বেলা সাড়ে বারোটা অবধি রোগী দেখা শেষ করে আবার দুটো থেকে সন্ধ্যা ছ'টা অবধি চিকিৎসা-পর্ব্ব চলত তবু সকলকে দেখা শেষ হয়ে উঠত না—অনেককে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ত, কেননা সন্ধ্যার পর আলো জ্বেলে চিকিৎসা করা মশার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ত। যে সমস্ত তুচ্ছ জিনিসের কথা আমরা নিজেদের অভ্যাসগত পরিবেশে ভেবে উঠতেই পারি না, তার বিষয় শয়াৎসার এক জায়গায় বলেছেন—"How valuable bottles and boxes are from the civilised world, only he can rightly estimate who has had to get medicines ready in primeval forest for patients to take home with them."

হাসপাতাল পত্তন হবার পর প্রায় দেড় বছর পর আগষ্ট ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান নাগরিক হওয়ার দরুন শয়াৎসার অন্তরীণ হন। যদিও মেলামেশার আংশিক স্বাধীনতা তাঁর অব্যাহত ছিল তবু চিকিৎসার কাজ থেকে কিয়দংশে মুক্তি পাওয়ার ফলে যে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব তাঁর মনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপ ধারণ করছিল তা লিপিবদ্ধ করার সুযোগ তিনি এই অবসরে পেলেন। "Philosophy of Civilisation" নামক কয়েক খণ্ডে বিভক্ত যে বৃহৎ গ্র[ন্থ] তাঁর পরিণত মনীষার সুশৃঙ্খল দর্শন-চিন্তার প্রত্যক্ষ রূ[প] তা এই সময়েই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। তিন বছ[র] পর ইওরোপে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ফ[লে] তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তি লাভের পর সাত বছর ইওরোপে কাটি[য়ে] আবার তিনি ল্যাম্বারেণেতে ফিরে যান। এই সা[ত] বছর ইওরোপে তিনি যে কর্ম্মসূচী অনুসরণ করেন তা[র] মধ্যে প্রধান হ'ল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দান, ল্যাম্বারেণের হাসপাতাল এবং সেখানকার সেবাব্রত সম্বন্ধে ইওরোপীয় জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অর্গ্যান বাজানো এবং পুস্তক-রচনা। বিশেষ করে সুইডেনে অর্গ্যান বাজিয়ে এবং বক্তৃতা দিয়ে অর্থোপার্জ্জনের যে সাফল্য তিনি লাভ করেন তার ফলেই ল্যাম্বারেণেতে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। আফ্রিকায় যাবার পর দীর্ঘকাল ডাঃ শয়াৎসার কোনও প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে পেশাদার অর্গ্যানবাদক হিসাবে অবতীর্ণ হন নি, কিন্তু এই কয়েক বছরের অনভ্যাস সত্ত্বেও তিনি তাঁর পূর্ব্ব নিপুণতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। চিকিৎসক-জীবন সুরু করবার সময় তিনটি জিনিস তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল—অর্গ্যান বাজানো, গবেষণা ও বক্তৃতা দেওয়া এবং অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা; কিন্তু ইওরোপে ফিরে আসার পর দেখা গেল এই তিনটি বিষয়ের কোনটিই তাঁকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে হয় নি। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি তাই লিখেছেন: "যে তিনটি বিষয় আমি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম একমাত্র আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরাই জানতেন সেই বিষয়গুলি আমার নিকট কত প্রিয়।...(কিন্তু) আফ্রিকায় যাবার সময় প্যারীর বাক্ সোসাইটি গরম দেশের উপযোগী একটি পিয়ানো উপহার দেওয়ায় এবং বিষুবরৈখিক জলবায়ুতেও আমার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকায় আমি অর্গ্যানবাদনের পূর্ব্ব দক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই গভীর অরণ্যে সঙ্গীহীন অবস্থায় আমি যে অবসরটুকু পেতাম সেই সুযোগে Bach-এর সঙ্গীতের আরও গভীর মর্ম্মমূলে প্রবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পেশাদার থেকে সৌখীন সঙ্গীতজ্ঞে পরিণত হয়ে আমি ইওরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করি নি বরং এ দেখে আমি গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করলাম যে, সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে আমার সমাদর পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা করার সুযোগ হারাবার পরিবর্ত্তে ইয়োরোপের বিভিন্ন

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ পেয়ে সে ক্ষতিও পূরণ হয়ে গেল, এবং যদিচ সাময়িকভাবে আমি আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম, তথাপি এখন অর্গ্যান বাজিয়ে এবং বই লিখে সেই স্বাধীনতা আবার ফিরে পেয়েছি।" ১৯২৩ সনের শেষাশেষি 'Philosophy of Civilisation'-এর দুই খণ্ড—(১) The Decay and Restoration of Civilisation ও (২) Civilisation and Ethics প্রকাশিত হয় এবং সেই বছরই তাঁর আরেকটা বই প্রকাশিত হয়—Memoirs of Childhood and Youth.

১৯২৪ সনের এপ্রিল মাসে আবার ল্যাম্বারেণে। দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতি ও অযত্নে অব্যবহারযোগ্য হাসপাতাল আবার ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে কয়েক মাস কেটে গেল। তাঁর আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই দলে দলে রোগীরা ভিড় করে আসতে লাগল—সেবাব্রতের দ্বিতীয় পর্য্যায় আবার সুরু হ'ল। এবার কিন্তু রোগীদের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, শয়াৎসারকে ইওরোপ থেকে দু'জন ডাক্তার এবং দু'জন শুশ্রূষাকারিণীকে আহ্বান করতে হয়েছিল—আহ্বানে সাড়া দেবার মত লোকের অভাব হয় নি।

১৯২৫ সনের মাঝামাঝি ল্যাম্বারেণের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেখা দেয় আমাশয় রোগের মহামারী। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী রোগী আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে এসে জমায়েত হতে লাগল—একে সংক্রামক ব্যাধি তায় নিতান্ত স্থান অসংকুলান, তার উপর দুর্ভিক্ষের মধ্যে শত শত রোগীর খাদ্য সংস্থানের দায়িত্ব। ডাঃ শয়াৎসারের মত অসাধারণ পুরুষের পক্ষেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এই আমাশয় মহামারী কোনও ক্রমে নির্ম্মিত হাসপাতালের স্থানাভাব সম্বন্ধে ডাক্তার ও তাঁর সহকর্ম্মীদের সচেতন ক'রে তুলেছিল, তাই তাঁরা হাসপাতালটিকে বর্ত্তমান স্থান থেকে ওগাও নদীর আরও প্রায় দুই মাইল উপরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত করলেন। আবার নতুন করেই যখন হাসপাতালগৃহ নির্ম্মাণ করতে হ'ল তখন তিনি তাকে একটা স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আফ্রিকার ঐ অঞ্চলে ঘরের ছাদ 'রাফিয়া' নামক গাছের পাতা দিয়ে তৈরি হ'ত,তার পরিবর্ত্তে তাঁরা করোগেটেড শীট ব্যবহার করেন। প্রায় দেড় বছর ধ'রে এই গৃহনির্ম্মাণের কাজ চলার সময় শয়াৎসারকে স্বহস্তে বাস্তুকারের কাজ এবং আফ্রিকান শ্রমজীবীদের কাজের তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল। এই সময় চিকিৎসার ভার তাঁর সহকর্ম্মীদের উপর ন্যস্ত ছিল। আফ্রিকায় তাঁর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজকর্ম্মের বিবরণ তিনি 'More From the Primeval Forest' নামক বইটিতে দিয়েছেন যেমন তাঁর প্রথম পর্য্যায়ের কাজকর্ম্মের বর্ণনা 'On the Edge of the Primeval Forest' বইটিতে আছে। আফ্রিকানদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তা তাঁর প্রথমোক্ত বইয়ে উদ্ধৃত একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায়। একবার কয়েকটা কাঠের কুঁদো সরাবার প্রয়োজন হলে ডাক্তার পরিচ্ছন্ন বেশবাস পরিহিত এক নিগ্রো ষ্টেনোগ্রাফার যুবককে (যে তার কোন অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে এসেছিল) সাহায্য করবার জন্য আহ্বান করেন। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল—'I don't drag wood about. I am an intellectual." শয়াৎসারের প্রত্যুত্তর কিন্তু আরও উপভোগ্য—"How lucky you are! I tried to be an intellectual too, but didn't succeed." ১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাসে নবনির্ম্মিত গৃহে হাসপাতালটি স্থানান্তরিত হয় এবং সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত সেইখানেই আছে যদিও ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির ফলে তখনকার এবং এখনকার অবস্থায় প্রভেদ অনেক।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় শয়াৎসারকে প্রথমবারের দুর্ভোগ সহ্য করতে হয় নি, যদিও হাসপাতালটি রণাঙ্গনের মধ্যেই পড়েছিল। জেনারেল দ্য গল এবং ভিসির সৈন্যদলের মধ্যে ল্যাম্বারেণে অধিকার করার জন্য ১৯৪০ সনে যুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু উভয় পক্ষের সেনাধ্যক্ষগণ বৈমানিক সৈন্যদের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন হাসপাতালের উপর যেন বোমা বর্ষিত না হয়। এই নির্দ্দেশ যথাযথ পালিত হওয়ায় ল্যাম্বারেণে চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেক নিরপরাধ শান্তিকামী জনসাধারণের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে তিনি গভীর সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে ইউরোপ থেকে কোনপ্রকার সাহায্য প্রত্যাশা করা বৃথা, তাই তিনি আমেরিকান বন্ধুদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমেরিকাবাসীগণ তাঁর আবেদনে অচিন্তনীয়রূপে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সনের শেষ ভাগে আমেরিকায় The Albert Schweitzer Fellowship of America নামে এক সঙ্ঘ গড়ে ওঠে যার আনুকূল্যে হাজার হাজার টাকা সংগৃহীত হয়ে

যুদ্ধের মধ্যেও শয়াৎসারকে তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যাবার সামর্থ্য দান করে।

১৯৫২ সনে সুইডিশ নোবেল কমিটি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদানের জন্য তাঁকেই নির্ব্বাচিত করেন। এ পর্য্যন্ত যাঁরা শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শয়াৎসারই যে যোগ্যতম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাও থাকতে পারে। বর্ত্তমান জগতের দুই বিবাদমান শক্তিগোষ্ঠীর হুহুংকারের মধ্যে যে সর্ব্বনাশের বীজ নিহিত রয়েছে তা উপলব্ধি করে সর্ব্বপ্রকার nuclear test অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য যে যে চিন্তানায়কেরা অবিরাম সাবধানবাণী উচ্চারণ করে চলেছেন, শান্তিকামী শয়াৎসারের কণ্ঠ তার মধ্যে সবচেয়ে সরব। জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক Frank Moraes-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি সম্প্রতি বলেন—

"I have never mixed in politics uptil now, but I have been forced to out of a sense of duty because an atomic war will mean not only the destruction of nations, but of life itself. India speaks, but speaks too softly. I am not a Russian but truth compels me to recognise that the Russians were the first to suggest the banning of nuclear tests and they keep on doing it."

একটি মহৎ জীবনের মহৎ সাধনার আভাস দেওয়ার চেষ্টা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে করা হয়েছে—এর অসম্পূর্ণতা ততখানিই যতখানি এর বিষয়বস্তুর বিরাটত্ব। বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান ঝটিকাক্ষুব্ধ পরিমণ্ডলে যখন জ্ঞানের অন্ধকারে (!) দিগ্বিদিক্ আচ্ছন্ন, তখন নিবাত নিষ্কম্প জ্যোতির্শিখার মত পঞ্চ-অশীতিবর্ষ বয়স্ক ডাঃ শয়াৎসার যে আলোর উৎস উন্মুক্ত করে চলেছেন—আশা করা যাক, একদিন সেই আলোকের ঝরণা ধারায় অবগাহন করে পৃথিবী তার সমস্ত ক্লেদ-কলুষ-গ্লানি থেকে মুক্ত হবে।

# রাজপুত-বৈর

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

[ নাহং রক্ষ ন ভূতং রিপুরুধিরজল-প্লাবিতাঙ্গঃ প্রকাশম্।
নিস্তীর্ণোরুপ্রতিজ্ঞাত-জলনিধিগহনঃ ক্রোধেন
ক্ষত্রিয়োঽস্মি॥
বেণীসংহারম্

১

কুল, স্বভাব এবং ইতিহাস গৌরবে রাজপুত আদর্শ আর্য্য ক্ষত্রিয়, মহাভারতে বর্ণিত ক্ষাত্রধর্ম্মের ধারক ও বাহক। কুরুক্ষেত্রের বৈর-বহ্নি আজিও রাজস্থানের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। রাজস্থানের ইতিহাস যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণবর্জ্জিত মধ্যযুগের "মহাভারত"। এই মহাভারতে কুলাভিমানী বৈর-পরায়ণ রাজপুতের আদর্শ রুদ্রকর্ম্মা বৈরে ক্ষমাহীন ভীমসেন; এবং ত্যাগে ও শৌর্য্যে অপরাজেয় ধূমায়মান বৈশ্বানর ভীষ্ম পিতামহ। ক্ষমাশীল "ক্ষত্র-ব্রহ্ম" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিংবা অনাসক্ত পরমপুরুষ পার্থ-সারথীর স্থান রাজপুত মহাভারতে ছিল না এবং হইতেও পারে না; যেহেতু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইঁহারা আদর্শ ( typical ) ক্ষত্রিয় নহেন। কৌরব দাবাগ্নির ধূমশিখা পাঞ্চালী কৃষ্ণা যিনি স্বয়ম্বর সভাকে সন্ত্রস্ত করিয়া কর্ণকে মুখের উপর বলিয়াছিলেন, আমি সুত-পুত্রকে বরমাল্য দিব না; যিনি বৈরনির্জ্জিত যুধিষ্ঠিরের অহিংস নীতিকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "শমেন সিদ্ধির্মুনিনাং ন রাজ্ঞঃ" ( কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ); সেই মূর্ত্তিমতী ক্ষাত্র-গরিমা মানিনী দ্রৌপদী এবং রণরঙ্গিনী বীরমাতা যাদবী সুভদ্রাই রাজপুত-নারীর আদর্শ। রাজপুত-মাতা ত্যাগ ও ধৈর্য্যে পাণ্ডব-জননী কুন্তী; শোকে যাঁহার অশ্রু নাই, আনন্দে অধীরতা নাই, কর্ত্তব্য নির্ণয়ে মাতার দুর্ব্বলতা নাই। দ্রৌপদীর মুক্ত বেণী দেখিয়া বিস্মিতা ও পরিহাসপরায়ণা কৌরব-বধূগণকে পাঞ্চালীর দাসী শুনাইয়াছিল, "কৌরব বধূগণ মুক্তকুন্তলা না হইলে পাণ্ডুবধূ কেমন করিয়া কবরী বন্ধন করিতে পারেন? এইরূপ শঙ্কাবিহীনা মুখরা দাসীই সেকালে রাজপুতানীর মানরক্ষা করিত। বৈরপারঙ্গম রাজপুত যোদ্ধার উল্লাস মধ্যম পাণ্ডবের বীভৎস আত্মপ্রসাদেরই প্রতিধ্বনি; যে প্রতিধ্বনি আরাবল্লীর পর্ব্বত কন্দরে, মারবাড়ের মরুপ্রান্তরে চারণের গীতে মধ্যযুগে চৌহান রাঠোর ও যদুবংশী ভট্টি বিশেষ ভাবে শুনিতে পাইত। বৈরে নিহত রাজপুতের অমুক্ত আত্মা হন্তার উদরে শৃঙ্খলিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিত এবং হন্তাকে বধ করিয়া মুক্তি দেওয়ার জন্য ভাই, বন্ধু ও সগোত্রের কাছে অশরীরী বাণী প্রেরণ করিত। বৈর-প্রবণ রাজপুত ইহা বিশ্বাস করিত। রাজপুতের জীবন-দর্শন গীতার অধ্যাত্মবাদ নহে; "ততো যুদ্ধায় যুধ্যস্ব" ব্যতীত রাজপুত আর কিছুই ভাবে নাই।

পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রাজপুত পিতা পুত্র কামনা করে না। অনির্জ্জিত বৈরই রাজপুতের সাক্ষাৎ নরক, রৌরবাদি নরকের ভয় রাজপুতের নাই। স্বকীয় এবং পিতৃ-পিতামহ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈরের ঋণ উপযুক্ত পুত্রই শোধ করিবে, এই আশায় রাজপুত বহু পুত্র কামনা করিত। যে রাজপুত পিতা ভ্রাতা ও জ্ঞাতির রক্তপাত ও মাতার অপমাননার প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল না সে রাজপুত নহে; সে কুপুত, কুলাঙ্গার কাপুরুষ; সমাজ তাহার নামে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিত। রাজপুতের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ঋণ ছিল অন্ন-ঋণ। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য "অন্নদাতা"র ( রাজা অথবা বেতনদাতা প্রভু ) নিকট হইতে যে "ভৃতি" ( ভূমি কিংবা মুদ্রা ) রাজপুত যোদ্ধা গ্রহণ করিত উহাই তাহার অন্ন-ঋণ। অবিচারে প্রভুর আজ্ঞা পালন এবং প্রভুর কার্য্যে মৃত্যুবরণেই এই ঋণের পরিশোধ; ইহাই "মরণেকা ঋণ"। এই অন্ন ঋণের দায় মহাভারতের যুগ হইতে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষ রাজ-সেবকগণ নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়াছে। দুর্য্যোধনের দরবারে ভীষ্ম। দ্রোণাচার্য্যের মত রাজপুত চিরকাল আদর্শ ভৃতিভুক যোদ্ধা; হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অন্নদাতাকে রাজপুত সমান বিশ্বস্ততার সহিত সেবা করিয়া আসিয়াছে। স্বাধীন ভারতে অন্নদাতা নাই, প্রভু-ভৃত্য নাই নিমকহালালী কিংবা হারামী নাই। যেহেতু এখন সকলেই প্রভু; কেহ কাহারও অন্ন খায় না, কেবল চুক্তির ( Contract ) সর্ত্ত পালনের দায় আছে। সর্ত্ত পালন না করিলে কিংবা কাজে ফাঁকি দিলে এখন কেহ

নরকে যায় না, জেলখানায় গেলেও দশ জনের খরচে **শ্বশুরবাড়ীর আরামে থাকে!**

২

রাজপুতানায় প্রচলিত বৈর্ শব্দের দ্বারা সকল প্রকার "শত্রুতা" বুঝায় না। ইহার মুখ্য অর্থ পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা ( Vendatta ), এবং উক্ত শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়ার ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত অধিকার বুঝাইয়া থাকে। এই প্রকার "বৈর" শুধু রাজপুতের মধ্যে কিংবা ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। "কুল" ( Clan বা tribe ) কুলতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র এবং জাতি-বৈর লইয়াই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। অপমান ক্ষয় ক্ষতির সরাসরি প্রতিশোধ লওয়ার অধিকার মানব সমাজে আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কেহ অস্বীকার করিতে পারে নাই। সভ্যতার প্রারম্ভে হজরত মুসা ( Prophet Moses ) সর্ব্বপ্রথম আইন প্রণয়ন করিয়া হিংসা ও প্রতিহিংসার সংঘাতে উৎপন্ন লোকক্ষয়কর বৈরকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। মুসার আইন, অর্থাৎ কানের বদলে কান, প্রাণের বদলে প্রাণ, ইত্যাদি প্রায় সকলেরই জানা আছে। যাহার কান কাটা গিয়াছে সে তাহার শত্রুর কান না কাটিয়া চোখ নষ্ট করিলে মুসার আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইত। মুসলমান আইনে ইহাই কিসাস অর্থাৎ অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যক্তির বৈধ অধিকার হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক যুগে অপরাধীর দণ্ড বিধানের অধিকার রাষ্ট্রের করায়ত্ত হইয়াছে। বৈরের মুলনীতি "সমং সমেন শাম্যতি"। ইহাই Reprisal ( প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা ) রূপে সভ্যজাতির আন্তর্জাতিক আইনে ( International Law ) বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা মুসার আইন অপেক্ষা কম নৃশংস নহে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে "প্রতিশোধ" দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিচারে অপরাধী রাষ্ট্রের অসহায় নাগরিকের উপর গ্রহণ করা হয়, উহারা কারাদণ্ড ভোগ করে, সম্পত্তিচ্যুত হয়।

৩

রাজপুত সমাজ এবং রাষ্ট্র বৈর সাধনে ব্যক্তির উপর কোন বাধা নিষেধ আরোপ করে নাই। ধর্ম্মতঃ একটি বাধা ছিল, গোত্রহত্যা বা জ্ঞাতিবধ; কার্য্যতঃ কিন্তু রাজপুত ইহাও মানিত না। এক পরিবারের মধ্যে কিংবা এক গোত্রের মধ্যে বিবাদ "বৈর" নহে। এরূপ বিবাদ কুলপতি ( Patriarch ) এবং জ্ঞাতিমুখ্যগণ মীমাংসা করিতেন। রাজপুত-বৈর তিন প্রকার, কুল বা গোত্র-বৈর, ভূমি-বৈর এবং মান-বৈর। গৃহদাহক, সতীত্ব-নাশক, ব্যভিচারী, বিষদাতা, ভূমি-দারা-ধন অপহারক এবং কুলত্যজ্য ( out law ) ব্যক্তির "বৈরে" অধিকার নাই। এবম্বিধ দুষ্কার্য্যে ধৃত, নির্জ্জিত কিংবা নিহত ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ তাহার নিজ পরিজন কিংবা যে কুলে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই কুলের দায়িত্ব নহে। শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিহত রাজপুত সরাসরি স্বর্গে যায়। তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণ নাই, বৈর-প্রসূত রক্ত-তর্পণ আছে। দুই বিভিন্ন কুলের ( যথা রাঠোর ও চৌহান ) মধ্যে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের বৈর পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে। জ্ঞাতি-বন্ধুর অবমাননা ব্যক্তিগত নয় উহা সামগ্রিক। এই প্রকার "বৈর"-ই ( যথা কোন কুল হইতে প্রেরিত "নারিকেল" অর্থাৎ কন্যার বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ) মান-বৈর। এক পক্ষ কন্যা প্রার্থী হইলে অপর পক্ষ যদি কন্যাদানে অসম্মত হয় তাহা হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে "বৈর" উৎপন্ন হয়। রাঠোর রাজপরিবারে বাগদত্তা শিশোদিয়া কুমারীকে বরের মৃত্যুর পর কচ্ছবাহ রাজ প্রার্থনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং উদয়পুরের মহারাণা ভীমসিংহ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, এই অপরাধে রাঠোরগণ শিশোদিয়া এবং কচ্ছবাহ উভয় কুলের সহিত বৈর ঘোষণা করিয়াছিল।

রাজপুতের মান বড় ভয়ানক বস্তু। আত্মসম্মান সম্বন্ধে কৃষক হইতে ভূম্যাধিকারী "ঠাকুর" পর্য্যন্ত সকলেই সমান স্পর্শকাতর। এই বিষয়ে রাজপুতের জুড়ি আফগানিস্থানের উপজাতি এবং উহাদের বংশধর রোহিলখণ্ডের পাঠান। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাও অমর সিংহ রাঠোরকে মীর বক্শী সলাবত খাঁ দরবারের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তিরস্কার করিয়া "গোঁয়ার" বলিতে না বলিতেই সম্রাট্ শাহজাহানের সম্মুখে অমর সিংহের তরবারি মীর বক্শীর দেহ কাঁধ হইতে কোমর পর্য্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাহির হইয়াছিল, সম্রাট অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। "মান-বৈরে" যত রাজপুতের প্রাণ ও সম্পত্তি রাজপুতনায় নষ্ট হইয়াছে উহা রক্ষা পাইলে জাতির মান বাঁচিত, অন্ততঃ রাজস্থান মারাঠা ও পাঠান দস্যু আমীর খাঁর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইত।

রাজপুতের "ভুম্" যদি দুই বিঘা পৈত্রিক জমিও হয়, সে উহার মধ্যেই রাজা এবং তাহার মাটির ঘর কিংবা আকন্দপাতার ঝোপ্‌ড়া তাহার "রাওলা" ( ভদ্রাসন )।

রাজা ভূমি দান করিতে পারেন, কিন্তু মৌরসী ভূম্‌ হস্তান্তর করিতে পারেন না। রাজপুতের "মাটির ক্ষুধা" (Land hunger) ভূমি-বৈরের প্রধান কারণ। ভূমি-চ্যুত হইলে রাজপুত ডাকাতি করিবে, তবুও রাজপুত ভূমি-অপহারকের চাকরি করিয়া আত্মাকে অপমানিত করিবে না।

৪

মানুষের সহজাত হিংসাবৃত্তিকে যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য সমাজ সেকালে প্রতিহিংসামূলক বৈরকে নিষিদ্ধ না করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রতিহিংসার ভয় না থাকিলে মানুষ কোন কালেই হিংসা হইতে বিরত হইবার নয়। প্রেম প্রীতি দ্বারা হিংসাকে জয় করাই প্রকৃত প্রতিহিংসা। এই বাণী ভারতীয় দর্শন প্রাচীন কাল হইতে প্রচার করিলেও লোকে উহা কার্য্যতঃ গ্রহণ করে নাই। এই জন্য সমাজ ও সভ্যতা হিংসা-প্রতিহিংসার সংঘাতে একবার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আবার মাথা তুলিয়াছে, আবার ভাঙ্গিয়াছে—যেহেতু আগুন আগুনের দ্বারা নিবাইবার চেষ্টা আপদ্ধর্ম মাত্র, এক জায়গায় নিবিলে অন্যত্র দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিবার আশঙ্কাই বেশী। বৈদিক যুগ হইতে আমরা দেখিতে পাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত বৈরভারাক্রান্ত ছিল। আর্য্য ও অনার্য্যের বৈর, বিভিন্ন আর্য্য গোত্রের মধ্যে বৈর, সর্ব্বত্যাগী ঋষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কুলপতিগণের মধ্যে বৈর, লইয়াই বৈদিক যুগের ইতিহাস। পৌরাণিক যুগে দেবতাগণের "বৈর" উঁহাদের উপাস্য সম্প্রদায়গণের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষকে "ধর্ম্ম-বৈর" এবং "কুল-বৈর" হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। মহাযানী বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য বৈদিক দেবতাগণকে নির্জ্জিত করিয়াছে; পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া উহার তীর্থস্থানগুলি অধিকার করিয়াছে। প্রত্যেক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সুপ্ত "কুল-বৈর" ও "ভূমি-বৈর" সক্রিয় হইয়া সামন্ত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অখণ্ড রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। "বলং বলং ব্রহ্ম বলং" সত্য-ত্রেতায় থাকিলেও দ্বাপর-কলিতে "বলং বলং ক্ষাত্রবলং" বাণী ক্ষত্রিয়েতর বর্ণকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। ক্ষত্রিয় জাতি বৈরাগ্নিতে বার বার পুড়িয়াছে, ব্রহ্মবলের প্রভাবে বার বার নবকলেবর ধারণ করিয়াছে, ব্রহ্মবলকে উপেক্ষা করিয়া, দেশ ও ধর্ম্মরক্ষার কর্ত্তব্য ভুলিয়া আবার বৈর-ব্যামোহ-গ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বাহিরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ বৈর-ব্যাধিমুক্ত ছিল না। ইতিহাসে দেখা যায় "বৈর" তাহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে লইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষের মত ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেয় নাই। পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভূমি-বৈর এবং "বর্ব্বর" জাতির (অ-গ্রীক সুসভ্য ইরাণীয় প্রভৃতি) প্রতি প্রবল ঘৃণা ও "জাতি-বৈর" গ্রীক জাতিকে পূর্ব্বে বিতস্তা (Bias) নদী, পশ্চিমে সাহারা মরুভূমির প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল। হানিবলের ইটালী আক্রমণের ফলে ঐ দেশের সংকীর্ণ "কুল-বৈর" কার্থেজীয়গণের বিরুদ্ধে রাজনীতি-বিচক্ষণ রোম সাধারণতন্ত্র জাতিবৈরের (national) খাতে প্রবাহিত করিয়া প্রথম বিশ্বসাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল; দ্বিতীয় ফিলিপের ইংলণ্ড আক্রমণ ইংরেজ জাতির সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-বৈরকে দেশপ্রেমে পরিণত করিয়া রোম অপেক্ষাও মহান্ সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিল; জার্ম্মান জাতি বিজয়ী প্রথম নেপোলিয়নের অশ্ব-খুরে মর্দ্দিত হইয়া তাহাদের মজ্জাগত কুল-বৈর ও প্রাদেশ-বৈর ভুলিয়াছিল এবং সিডানের রণক্ষেত্রে ফরাসী-বৈরের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল; ইস্‌লাম আরব জাতির কুল-বৈরকে ধর্ম্মের রথচক্রে জুড়িয়া অর্দ্ধেক পৃথিবী জয় করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে কুল-বৈরের আগুনে ক্ষত্রিয় জাতি পুড়িয়াছে, প্রচণ্ড ক্ষাত্রশক্তিকে সংহত করিয়া কোন সৃষ্টিমূলক কার্য্যে নিয়োজিত করা হয় নাই। স্বয়ং ভগবান্ ক্ষত্রিয়-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য প্রথমে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া না কি একুশ বার ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; কুঠার ছাড়া বড় কিছু তিনি খুঁজিয়া পান নাই! ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসে ক্ষত্রিয়জাতি সমূল ধ্বংস করিয়া গিয়াছেন, একতাবদ্ধ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধদেব ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে বীতস্পৃহ হইয়া "পঞ্চশীল" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ অশোক "ধর্ম্মবিজয়" ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাঘ তখনও "শাকাহারী" হয় নাই; সুতরাং কোনটাই ক্ষত্রিয়ের মনঃপূত হইল না। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে হিংসাজীবী ক্ষত্রিয় ও ক্ষাত্রধর্ম্মের স্থান হইতে পারে না। ভবিষ্য পুরাণ মতে কল্কি অবতারে উত্তর প্রদেশে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ স্বয়ং ম্লেচ্ছনিবহ নিধন করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের অশ্ব, অসি ও রাজদণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইহাই বোধ হয় রাজপুত-বৈরের শোকাবহ পরিণতির শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বাভাস; কিন্তু এই ম্লেচ্ছ কাহারা?

রাজস্থানের সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় হিসাবে রাজপুত-বৈর এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। সমাজের পটভূমি ব্যতীত বৈর-বর্ণনা সম্ভব নহে। এই জন্য আমরা রাজপুতনার খ্যাত হইতে কয়েকটি সমাজ-চিত্র সম্বলিত বৈরের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

৫

যোধপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধার উত্তরাধিকারী রাও সুজা (রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৮৮-১৫০৮ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র নরাকে জয়সলমীর সীমান্তে ফলোদি পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। নরা-র মাতা রাণী লক্ষ্মা পুত্রের সঙ্গে ফলোদি দুর্গে থাকিতেন। ফলোদির কাছাকাছি পোহ্‌করণ দুর্গ খীবন্ বা খীবা নামক এক পরাক্রান্ত রাঠোর সামন্তের অধীনে ছিল। বর্ষাকালে একদিন কুমার নরা তাঁহার মা'র ঘরে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। এমন সময় জানালা খুলিয়া দাসী বলিয়া উঠিল, আজ পোহ্‌করণ দুর্গশীর্ষে বিজলী চম্‌কাইতেছে। এই কথা শুনিয়া হঠাৎ রাণী লক্ষ্মী বিমনা হইলেন; তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। নরা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মা, তুমি মন-মরা কেন? রাওজী কুশলে আছেন; তোমার দুই পুত্র বাঘা ও নরা বাঁচিয়া থাকিতে তোমার কী দুঃখ? রাণী লক্ষ্মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পুত্রের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যে কথা আজীবন তাঁহার প্রাণে শল্যের মত বিঁধিয়া থাকিলেও রাঠোর কুলে জ্ঞাতি-বৈর এবং পতি-পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই, উহাই মনের খেদে বলিয়া ফেলিলেন।

মাতৃহীনা লক্ষ্মীর মাতামহ স্বীয় দৌহিত্রীর জন্য পোহ্‌করণ দুর্গাধিপতি রাঠোর সামন্ত খীবনের সহিত বিবাহ-প্রস্তাব করিয়া মাঙ্গলিক "নারিকেল" প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশুভ মূলা নক্ষত্রে লক্ষ্মীর জন্ম বলিয়া ঐ নারিকেল ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরে লক্ষ্মীর এক ছোট মাসীর সহিত খীবার এবং রাও সুজার সহিত লক্ষ্মীরবিবাহ হইয়াছিল। "নারিকেল" ফিরাইয়া দেওয়া কন্যার প্রতি গুরুতর অপমান। লক্ষ্মীর মাতামহ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই। খীবার[১] প্রতি এই বৈর রাণী লক্ষ্মী পতিকুলে শান্তির জন্য নিজের মনে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। নরা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "মা, তুমি একটা কথা বলিলেই পোহ্‌করণ আমাদের জানিবে; তোমার মাসী খীবার ঘরে আছে বলিয়াই আমি এতদিন চুপ করিয়া আছি।"

ইহার কয়েক মাস পরে এক বৃহৎ বরযাত্রী দল পোহ্‌করণ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত খীবার ঘোড়া খামারের নিকট দিয়া যাইতেছিল। ঘোড়ার তদারক করিবার জন্য তিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে লোকজন সিপাহী সঙ্গে করিয়া পোহ্‌করণ হইতে খামারে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ দিন তিনি দাঁতন করিতে করিতে হঠাৎ কুমার নরার প্রসিদ্ধ জঙ্গী ঘোড়া "কোরিধ্বজ"-এর হ্রেষা শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন; তাঁহার মন অজ্ঞাত আশঙ্কায় অভিভূত হইল। নরা তাঁহার জ্ঞাতি এবং সীমান্ত প্রতিবেশী, সুতরাং মিত্র নহে। অধিকন্তু ফলোদি হইতে বহিষ্কৃত নরা-র পুরোহিতকে তিনি পোহ্‌করণ দুর্গে আশ্রয় দিয়াছিলেন; কিছুদিন থাকিয়া ঐ পুরোহিত কিছু না বলিয়া দুর্গ হইতে চলিয়া গিয়াছে; দুর্গে অল্প কয়েকজন মাত্র রক্ষী। খীবা সাত পাঁচ ভাবিয়া ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকজন অশ্বারোহীকে আদেশ করিলেন। ঐ খামারের নিকট দিয়া মারবাড় হইতে অমরকোট যাইবার রাস্তা। অশ্বারোহীগণ রাস্তা হইতে অল্প দূরে এক টিলার আড়ালে দাঁড়াইয়া যাত্রীগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। বরযাত্রী দল নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র তাহারা হাঁক দিল, কোন ঠাকুরের সওয়ারী চলিয়াছে? বরযাত্রী পক্ষ হইতে জবাব আসিল, নরা বীদাবত (বীদার পুত্র) বিবাহ করিবার জন্য অমরকোট যাইতেছেন। খীবার অনুচরগণ সন্দেহযুক্ত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, রাও সুজার পুত্র নরার "কোড়িধ্বজ" ঘোড়া তোমার দলে কেমন করিয়া আসিল? অপর পক্ষ বলিল, ঐ ঘোড়া বরের জন্য ধার লওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দলে ভারী আগন্তুকগণকে ঘাটাইতে সাহস না হওয়ায় অশ্বারোহী দল ফিরিয়া গিয়া খীবনকে জানাইল; এক ভারী "বরাত" অমরকোট যাইতেছে, সঙ্গে উট-বোঝাই হাতিয়ার; দলে সকলের বরের পোষাক, মাথায় "সেহরা" (মুকুট) পরিধানে "কেসরিয়া" (কুঙ্কুম) বস্ত্র তাহারা "খাম্বাইচ" (খাম্বাজ) রাগে বিবাহের গান গাইতে গাইতে চলিয়াছে; গতিক কিন্তু ভাল নয় মনে হইতেছে (কুছ্ দাল-মে কালা হ্যায়)।

ছদ্মবেশী বরযাত্রী দল অমরকোটের রাস্তা পাশ কাটাইয়া পোহ্‌করণ দুর্গে উপস্থিত হইল। নরা-র গুপ্তচর সেই পুরোহিত দ্বারপালকে হাঁক দিল, তোমার "কাটার" (তলোয়ার) এই লও। খিড়কী খুলিয়া হাত বাড়াইতেই নরা পিছন হইতে বর্শা মারিয়া দ্বারপালকে

১। খীবন বা খাবা রাও সুজার পুত্র উদয়সিংহের পুত্র।
দ্রষ্টব্য— খ্যাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭

ধরাশায়ী করিল। দুর্গ অধিকার করিয়া নরা অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরাণীকে বলিলেন, "নানীজী! তুমি এখন অন্যত্র যাইয়া কাঁটা কুড়া খাও, আমি এইখানে গেহুঁ (গম) খাইব!" নরা "নানী"-কে তাঁহার সেবক চাকর ও খীবা-র রক্ষীগণকে দুর্গ হইতে বিদায় করিলেন। তাহারা আশ্রয়লাভের জন্য মারবাড় রাজ্যের বাহড়মের পরগণার দিকে চলিল। এই দুঃসংবাদ পাইয়া খীবা আশীজন অশ্বারোহী এবং তাঁহার শুভচিন্তক চারণকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত পোহ্‌করণ দুর্গের দিকে চলিলেন। দুর্গের চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে পথিমধ্যে এক গড়রিয়ার (বাং গাড়ল) সহিত তাঁহার দেখা হইল। সে একটা ছাগল কাঁধে করিয়া যাইতেছিল। রাও খীবাকে ঐ ব্যক্তি ছাগলটা "ভেট" দিল, অজা-নন্দন অনাথ হইয়া ভে ভে করিতে লাগিল। খীবা চারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চারণ বাবা! ছাগলটা কি বলিতেছে? শাকুনবিৎ চারণ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে বলিলেন, ছাগল বলিতেছে আপনি এই স্থান হইতে যত ক্রোশ পথ চলিয়া ইহাকে ভোজন করিবেন তত বৎসর পরে নরাকে আপনি বধ করিবেন। খীবা মেষচারককে পাঁচ ছক্কর (ত্রিশ পয়সা) বক্‌শিশ দিয়া বাহড়মেরের দিকে চলিলেন এবং বার ক্রোশ দূরে ভিনীয়ানা গ্রামে ডেরা ফেলিয়া ছাগলের সদ্‌গতি করিলেন।

নরা এবং খীবার বৈর বার বৎসর পর্য্যন্ত চলিল, পোহ্‌করণ এলাকায় সোয়াস্তি রহিল না, খীবা সুযোগ পাইলেই নরার অধিকারে প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুট করিত, গবাদি পশু হরণ করিত। শেষ বার খীবা তাঁহার বার বৎসর বয়স্ক পুত্র লুঁকা এবং পিতৃব্য বরজাংগকে সঙ্গে লইয়া নরার জমিদারী হইতে অপহৃত পশুপালসহ ফিরেতেছিলেন; এমন সময় নরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। নরা ঘোড়া দৌড়াইয়া লুঁকাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধাবমান অবস্থায় লুঁকা পিছন ফিরিয়া নরার উপর তলোয়ারের এমন এক চোট্ হানিলেন যাহাতে নরার মাথা ঐখানেই নামিয়া গেল, কিন্তু সওয়ার অবস্থায় তাঁহার ধড় (কবন্ধ) আরও দুই শত কদম (পদক্ষেপ পরিমিত জমি) আগাইয়া মাটিতে পড়িল। নরার মৃত্যুতে বৈর শান্ত হইল না। পিতার মৃত্যুর পর নরার উত্তরাধিকারী গোয়ন্দ (গোবিন্দ) এবং বৃদ্ধ খীবার মধ্যে বৈর তীব্রতর হইয়া উঠিল; দুই পক্ষের সংঘর্ষে আবাদ বস্তি উজাড় হইতে লাগিল (ধরৃতী বসূনে না পাবে)। অবশেষে রাও সুজা তাঁহার পৌত্র গোয়ন্দ এবং খীবাকে ডাকাইয়া পোহ্‌করণ এলাকা উভয়ের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দিলেন। বিঃ সম্বত ১৫৫১ চৈত্র কৃষ্ণা পঞ্চমী (খ্রীঃ ১৪৯৫) নরার মৃত্যু হইয়াছিল। যেখানে নরার মাথা ভূমিতে পড়িয়াছিল উহাই উভয় পক্ষের অধিকার ও বৈর শান্তির সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হইল।২

৬

রাজপুতানার তথাকথিত ছত্রিশ কুলের মধ্যে রাঠোর কুল ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৈর-প্রবণ। লোভ, হিংসা, ক্রূরতা এবং পররাজ্যহরণে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত রাজপুতানায় কোন কুল রাঠোরকে অতিক্রম করে নাই। বীরমদেব সল্‌খাবত (রাও সল্‌খার পুত্র) এবং তাঁহার পুত্র গোগা এই হিসাবে রাঠোর বংশের কুলভূষণ "সপুত" (সুপুত্র), নৈন্‌সীর খ্যাত হইতে তাঁহাদের কীর্ত্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রাও সল্‌খার কনিষ্ঠ পুত্র বীরমদেব রাঠোর তরবারি মাত্র সম্বল করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন "ঠিকানা" (আবাস দুর্গ) কিংবা জায়গীর ছিল না। রাঠোর কুলের তৎকালীন রাজধানী মহেবার বাহিরে তিনি এক "গুঢ়া" (আত্মরক্ষার জন্য অস্থায়ী গ্রাম-দুর্গ) নির্ম্মাণ করিয়া ঐখানেই ঠাকুরাই করিতেন। যে কোন বংশের পলাতক অপরাধীগণ কোথাও আশ্রয় না পাইলে বীরমদেবের "গুঢ়ায়" আসিয়া সরণা (শরণ) লইত। বীরমদেব লড়াই ঝগড়ায় একাই একশ' ছিলেন; সেজন্য জ্ঞাতি বন্ধু কেহ তাঁহাকে ঘাটাইত না। বীরমদেব সল্‌খাবত যে গ্রামে থাকিতেন সেই এলাকায় ঠাকুর জগমালের হাত হইতে তিনি একবার নিরপরাধ পথযাত্রী দল্লা জোহিয়া ও তাঁহার স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বীরমদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাও মালাজীর পৌত্রগণের সহিত তাঁহার বিবাদ লাগিয়াই ছিল। এই জন্য তিনি মহেবা ত্যাগ করিয়া জয়সল্‌মীর চলিয়া গিয়াছিলেন। উগ্র ও পরস্বলোলুপ স্বভাবের জন্য ভট্টিরাজ্যে তিনি টিঁকিতে পারিলেন না। সেখান হইতে তিনি নাগোর চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ, গ্রাম লুটপাট ও উজাড় করিতে লাগিলেন। নাগোরের মুসলমান ফৌজদার তাঁহাকে ধরিবার জন্য জঙ্গল দেশ (বিকানীরের প্রাচীন নাম) পর্য্যন্ত তাড়া করিলেন।

২। দ্রষ্টব্য নৈনসী, খ্যাত পৃঃ ১৩৮-১৪৪ (নাঃ প্রঃ সভা সংস্করণ)
নৈনসী লিখিয়াছেন তাঁহার সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ১৭০ বৎসর পরেও ঐ সীমা উভয় কুলের মধ্যে অলঙ্ঘিত ভাবে চলিয়া আসিতে ছিল। বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশের রাজপুত প্রধান এলাকায় বৈর শান্তির এইরূপ স্মরণীয় স্থানকে পূর্ব্বে হাড়-পড়ী বলা হইত।

নিরুপায় হইয়া তিনি অবশেষে দল্লা জোহিয়ার দেশ জোহিয়াবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জোহিয়া রাজপুত মহাভারতের যুগে পরাক্রান্ত যোধেয় জাতির বংশধর। কুরু-জাঙ্গল ক্ষেত্রে জয়সল্মীর ও বিকানীরের উত্তরাংশে জোহিয়া-অধ্যুষিত ভুমি জোহিয়াবাটী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জোহিয়াবাটীর রাজধানী, রাজা কিংবা রাজবংশ ছিল না। উহাদের রাষ্ট্র প্রাচীন ভারতের কুলশাসিত সাধারণ তন্ত্রের ( Tribal Republic ) শেষ নিদর্শন। শাসক-গোষ্ঠির আভিজ্যাত্যাভিমানী স্ব স্ব প্রধান ঠাকুর এক এক বস্তির ( Canton ) উপর প্রভুত্ব করিতেন। বীরমদেবের মাতা ছিলেন জোহিয়া ধীরদেবের পুত্রী।৩ জোহিয়াগণ তাঁহাকে সমাদরে পরম আত্মীয় রূপে গ্রহণ করিল এবং জোহিয়া বসতি হইতে অনেক দূরে এক স্থানে তাঁহার বাসস্থান বা গুড়া তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল এবং তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জোহিয়াগণ গ্রামের রাজস্বের এক অংশ দান হিসাবে তাঁহার জন্য বরাদ্দ করিয়া দিল। বীরমদেব পশুপালন করিয়া নিজের অবস্থা আরও সচ্ছল করিলেন। স্বভাবগুণে কিছুকাল পরেই রাঠোর-ব্যাঘ স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতাগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। দল্লা জোহিয়ার প্রতি বীরমদেবের পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া জোহিয়াগণ তাঁহার অনেক উপদ্রব সহ্য করিয়াছিল। বীরমদেব দান উশুল করিবার নামে গ্রামের সম্পূর্ণ মালগুজারী জবরদস্তি করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন। বাঘ তাঁহার একটা ছাগী মারিলে তিনি জোহিয়াদের ১১টা ছাগী ধরিয়া আনিয়া বলিতেন, বাঘটা জোহিয়ার; সুতরাং বাঘের ক্ষতিপূরণ তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিব না কেন? একদিন ঢোল বানাইবার জন্য তিনি জোর করিয়া এক ব্যক্তির একটা গাছই কাটিয়া ফেলিলেন, জোহিয়াগণ চুপ করিয়া গেল।

জোহিয়াদের মামা এবং দিল্লীর সুলতানের শ্যালক আভোরিয়া ভাটি বুক্কন্‌কে জোর করিয়া মুসলমান করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বুক্কন্‌ প্রচুর ধনসহ পলায়ন করিয়া জোহিয়াগণের শরণার্থী রূপে ঐখানে বাস করিতেছিল। বীরমদেব বুক্কন্‌ ভাটির সহিত ভাব জমাইয়া তাঁহার নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণ আদায় করিলেন। নিমন্ত্রণের দিন তিনি তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গকে অস্ত্রসজ্জিত করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বুক্কনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বকল্পিত বিশ্বাসঘাতকতায় বীরমের হাতে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা প্রাণ হারাইল, তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। ইহার পরে বীরমদেব দল্লা জোহিয়াকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। দল্লা একটা হাল্কা গরুরগাড়ীতে (খরসল) একদিকে একটা বলদ এবং অন্যদিকে একটা ঘোড়া জুতিয়া বীরমদেবের গুড়ায় চলিলেন। বীরমদেবের স্ত্রী মাঙ্গলিয়ানী দুঃসময়ে দল্লার সহিত "ভাই" সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। তিনি পতির দুরভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। দল্লা পৌঁছিবার পর বীরম শিকার হাতে আসিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার লোকজনকে প্রস্তুত করিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে বীরমদেবের স্ত্রী এক লোটা জলের ভিতরে একটা দাঁতন রাখিয়া দল্লার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। দল্লা সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং বাড়ীর চাকরকে বলিয়া দিলেন পেট মোচড় দেওয়ায় তিনি "জঙ্গল" ( অর্থাৎ মলত্যাগ করিতে ) যাইতেছেন। অনেক দূর গিয়া দল্লা গাড়ীর ঘোড়াটা খুলিয়া উহার উপর সওয়ার হইয়া একজন "রাঠী" জাতীয় লোককে গাড়ী লইয়া আসিতে বলিলেন। দল্লা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরিল না দেখিয়া বীরমদেবের মনে সন্দেহ হইল হয়ত কোন আঁচ পাইয়া নিশ্চয়ই জোহিয়া পলাইয়াছে। তিনি দলবলসহ দল্লার অনুসন্ধানে চলিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন একটা মানুষ ও একটা বলদ একখানা "খরসল" গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

দল্লা প্রাণপণে ঘোড়া দৌড়াইয়া বাড়ী পৌঁছিয়াছিলেন। জোহিয়াগণ পরের দিন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া বীরমদেবের গরু ছাগল লুট করিতে আসিল। সংবাদ পাইয়া বীরমদেব সসৈন্য বাধা দিতে আসিলেন, উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। দল্লা জোহিয়া এবং বীরমদেব পরস্পরের আঘাতে সহমৃত হইলেন, রাঠোর এবং জোহিয়াগণের মধ্যে "বৈর" ঘোষিত হইল।

৭

বীরমদেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁহার তৃতীয় রাণীর গর্ভজাত পুত্র গোগাদেব প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জোহিয়াগণকে নানা প্রকারে বিব্রত করিতে লাগিলেন। সেকালের অদ্বিতীয় যোদ্ধা এবং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, সম্ভবতঃ তিনি গোরখপন্থী নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। শেষ অভিযানে তিনি জোহিয়াবাটী আক্রমণ করিয়া জোহিয়াগণকে প্রতারিত করিবার জন্য বিনা যুদ্ধে বিশ ক্রোশ পিছনে হটিয়া মরুভুমির মধ্যে আত্মগোপন করিলেন।

৩। খ্যাত, পৃঃ ১২৫, এই ধীরদেব দল্লা-র পূর্ব্বজ, দল্লার পুত্র ধীরদেব নহেন।

কিছুদিন পরে গোগাদেবের গুপ্তচরগণ খবর লইয়া আসিল দল্লা জোহিয়ার পুত্র ধীরদেব সৈন্যসামন্ত লইয়া পূগলের রাও "রাণগদে" (রণাঙ্গ দেব) ভট্টির কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য পুগল চলিয়া গিয়াছেন। গুপ্তচরেরা দল্লার শয়ন-গৃহের সমস্ত খবরও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। গোগাদেব এবং তাঁহার পুত্র উদা রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক খাটিয়ায় দল্লা এবং পাশের অপর খাটিয়ায় আর কেহ শুইয়া আছে। দুই জনকেই হত্যা করিয়া তাহারা পলাইয়া গেল; নিহতদের মধ্যে একজন ছিল দল্লার নাত্নি। দল্লার ভাইপো হাঁসু দল্লার পগাইয়া নামক নামী-ঘোড়ায় চড়িয়া শেষ রাত্রে পুগল পৌঁছিয়া গেল। নব-বধূর বাসর ঘরে শেষ রাত্রে অর্দ্ধ-জাগরিত ধীরদেব হঠাৎ নীচে পড়াইয়া ঘোড়ার চির-পরিচিত হ্রেষা রব শুনিয়া চম্‌কাইয়া গেলেন। হাঁসুর কাছে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া ধীরদেব বিবাহের "কাঁকণ ডোর" না খুলিয়াই গোগাকে ধরিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার শ্বশুর নিজ কন্যা ও ভট্টিসেনা সঙ্গে লইয়া ধীরদেবের সাহায্যার্থ চলিলেন।

গোগাদেব ফিরিবার পথে পদরোলা গ্রামের নিকট ডেরা করিয়াছিলেন। ঐখানে জলের সুবিধা ছিল। তাঁহার রাজপুতগণ ঘোড়াগুলি জঙ্গলে চড়িবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুকুরের ধারে আরাম করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে জোহিয়া ও ভাটি সেনার অগ্রগামী দল দূরে ঘোড়া দেখিয়া অনুমান করিল গোগা নিকটেই আছে। তাহারা ঘোড়াগুলি তাড়াইয়া লইয়া পিছু হটিল এবং ঘোড়া ও মানুষ সকলেই জলপান করিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে রাঠোরগণকে ঘিরিয়া ফেলিল। গোগা হাঁক দিলেন ঘোড়ী লাও। অশ্ব-রক্ষকেরা চীৎকার করিল জোহিয়া ঘোড়া লইয়া যাইতেছে। ঘোরতর যুদ্ধে অধিকাংশ রাঠোর নিহত হইল; গোগাদেব দুই উরুতে তলোয়ারের চোট খাইয়া মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, পাশেই তাঁহার পুত্র গতাসু উদা। গোগাদেব মাটিতে বসিয়া মানুষ-প্রমাণ দীর্ঘ তাঁহার তরবারি ঘুরাইতে লাগিলেন; কেহ কাছে আসিতে সাহসী হইল না। রাণগদে ভাটি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন; গোগা ডাকিয়া বলিলেন, রাওজী! আমার "নমস্কার" (যুদ্ধার্থ আহ্বান সূচক) লইয়া যাও। পূগল-পতি অবজ্ঞা ভরে বলিলেন, তোর মত বিষ্ঠার ডাকে জবাব দিয়া দিয়া ফিরিব নাকি? তিনি চলিয়া যাওয়ার পর দল্লা-পুত্র ধীরদেব ঐদিক হইয়া যাইতেছিলেন। ভূপতিত পিতৃহন্তাকে বধ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। গোগাদেব ডাক দিয়া ধীরদেবকে বলিলেন, ধীরদেব! তুই শূরবীর জোহিয়া। তোর "কাকা" (বাবা অর্থে) আমার পেটের ভিতর ধড়্‌ফড়্ করিতেছে। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্। ধীরদেব ঘোড়া হইতে নামিয়া গোগার সহিত তরবারি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং সাংঘাতিক আহত হইয়া গোগার পাশে পড়িয়া গেলেন, গোগা হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন। ধীরদেব বলিলেন, আমি তোমাকে মারিলাম এবং তুমি আমাকে—। ধীরদেব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার পর মুমূর্ষু গোগা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিলেন, রাঠোর কেহ যদি বাঁচিয়া থাক শুন। গোগাদেব বলিতেছে রাঠোর এবং জোহিয়া-র "বৈর" সমান সমান (সুতরাং সমাপ্ত) হইয়াছে। কেহ যদি পার মহেবায় গিয়া বলিবে, রাও রাণগদে ভাটি গোগা-কে "বিষ্ঠা" গালি দিয়াছে; সুতরাং এখন হইতে ভাটিকুলের সহিত রাঠোরের "বৈর" জানিবে।

ভাটি ও রাঠোরের এই বৈর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়াছে, রাঠোরের রোষাগ্নিতে পূগলে ভট্টিরাজ্য লোপ পাইয়াছে, জয়সল্মীর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছে। রাজপুতের সবকিছু গিয়াছে; শুধু কুলাভিমান ও বৈর-প্রবণতা এখনও আছে!

৮

সিরোহী (আবু) রাজ্যের চৌহান বংশীয় রাওর সহিত মহেবার রাঠোর ঠাকুর ধান্ধলের কন্যা সোনা বাইর বিবাহ হইয়াছিল। গরীব বাপ ভাই বিবাহে যথোপযুক্ত অলঙ্কার যৌতুক ইত্যাদি দিতে পারে নাই। এইজন্য সোনা বাই মন-মরা হইয়া থাকিত। তাহার এক সপত্নী আনা বাঘেলার কন্যা বাপের বাড়ীর যৌতুক ও বহুমূল্য অলঙ্কার দেখাইয়া দেখাইয়া সোনাবাইকে সর্ব্বদা খোঁটা দিত। একদিন দুই সতীনের ঝগড়া বাধিয়া গেল। বাঘেলী সোনা বাইকে হেয় করিবার জন্য বলিয়া উঠিল, আরে, তোর্ ভাই পাবু নীচজাত চুড়া-থোরীদের সঙ্গে খানাপিনা করে! রাঠোরী রাগে লাল হইল দেখিয়া রাও বলিলেন, চট কেন? বাঘেলী ঠিক কথাই ত বলিতেছে। সোনাবাই বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন ঠিক; কিন্তু আমার ভাই-এর কাছে যে থোরী আছে, তাহাদের সমান সাহসী রাজপুত আপনার নাই জানিবেন। রাও স্ত্রীর ধৃষ্টতার শাস্তিস্বরূপ সোনা-

বাইকে পাঁচ-সাত ঘা চাবুক মারিলেন। সোনাবাই আপন ভাই পাবু রাঠোরের কাছে অপমান ও প্রহারের কথা জানাইয়া তাহার বৈর-শোধের প্রার্থনা জানাইল।

এই স্থলে পাবু রাঠোর ও তাঁহার থোরী* অনুচরগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক।

রাজপুতানার লোকেরা থোরীদিগকে "ভূত" ও "শয়তানের বাচ্চা" বলিয়া থাকে। তাহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে, মানুষ ছাড়া তাহাদের অখাদ্য জীবিত মৃত কিছুই নাই এবং অসাধ্যও কিছু নাই। ইহারা বাংলা দেশের বাউড়ী, চূড়া ও ডোম জাতীয় রাজপুতানার প্রাক্-আর্য্য যুগের অনার্য্য আদিম অধিবাসী। মনিবের হুকুমে পিছনে ভরসা থাকিলে তাহারা অপ্রধৃষ্য শত্রুর মাথা কিংবা মাথার পাগড়ি যাহা ইচ্ছা অনায়াসে আনিয়া দিতে পারে। গোপন গতিবিধির সন্ধান এবং গুপ্তচরের কাজে তাহারা অত্যন্ত নিপুণ এবং অসমসাহসী পদাতিক যোদ্ধা। তাহাদের প্রধান অস্ত্র ধনুক ও কামঠা ( sling ) দুইটাতেই অব্যর্থ লক্ষ্য। স্বাধীনতা হারাইয়া তাহারা চোর ডাকাত এবং অস্পৃশ্য হইয়াছে।

গুজরাট সীমান্তে আনা বাঘেলার রাজ্যে অনেক থোরী বাস করিত। কোন সময় ঐখানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় থোরীগণ আনার গরু, উট, ইত্যাদি পশু চুরি করিয়া খাইতে লাগিল। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য আনা ফৌজসহ তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; থোরীদিগের সহিত যুদ্ধে আনার পুত্র নিহত হইল। থোরীদের মধ্যে এক মায়ের পেটের সাত ভাই, চাঁদিয়া, দেবিয়া, ইত্যাদি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দান্ত ছিল। আনার ভয়ে তাহারা ঐ রাজ্য ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র এবং পশুপাল লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বড় বড় গরু ও উটের গাড়ীতে ( গাড়া ) মানুষ, ছাগল, ভেড়া ও গৃহস্থালির জিনিস বোঝাই করিয়া এই যাযাবর জাতি মরুভূমির মধ্যে শত শত ক্রোশ ঘুরিয়া বেড়াইত। এইরূপ গাড়ীই ছিল থোরীদের ভ্রাম্যমাণ গৃহ। এক সময়ে প্রাচীন টিউটন জাতি ও ভারতীয় আর্য্যগণ এইরূপ গাড়ী-গৃহ আশ্রয় করিয়া রাজ্যজয় ও উপনিবেশ স্থাপনার্থ যুদ্ধাভিযান করিতেন।

পুত্র-শোকাতুর আনা পলায়মান থোরীদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সাত-ভাই থোরীর বৃদ্ধ বাপকে বন্দী করিলেন। বৈরের শপথ গ্রহণ করিয়া চাঁদিয়া, ইত্যাদি পলাইয়া গেল। পরাক্রান্ত আনা বাঘেলার ভয়ে কোন ঠাকুর তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইল না; কেহ কেহ বলিল ধান্ধল রাঠোরগণের কাছে যাও। ধান্ধল রাঠোরের পুত্র ঠাকুর বুঢ়া থোরীদিগকে তাঁহার ছোট ভাই পাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পাবু অত্যন্ত গরীব, ক্ষেত খামার শিকার করিয়া দিনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সে তখনও অবিবাহিত, কাছা-খোলা গোছের লোক এবং পরিবারের সকলের হাসি-ঠাট্টার পাত্র ছিল। চারণদিগের নিকট হইতে একটা তেজী বাচ্চা ঘোড়ী উপহার পাইয়া পাবু ঘোড়ীর উপর চড়িয়া তাহার বৌদিদি ঠাকুরাণীকে প্রণাম জানাইতে গিয়াছিল। ঠাকুরাণী ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, ঘোড়ায় তোমার কোন আবশ্যক ? খেতী কর, ঘরে বসিয়া খাও; ঘোড়ীর উপর সওয়ার হইয়া "ধাড়া" ( লুটমার্ ) মারিবে নাকি? পাবু বলিল, "ভাবজ ( ভ্রাতৃজায়া ), "তানা" ( খোটা ) দাও কেন? আমিও রাজপুত। ঘোড়া আবশ্যক হইলে ডোডোয়ানা দেশের ( অর্থাৎ তোমার বাপের বাড়ীর ) ঘোড়া ধরিয়া আনিতে পারি!" ঠাকুরাণী শুনাইয়া দিলেন, "যাও যাও! অতদূর যাইতে হইবে না; হয় আধা রাস্তায় মারা পড়িবে, না হয় আমার দেবর বলিয়া প্রাণে না মারিলেও ডোডা রাজপুত তোমার—দুইটি বাঁধিয়া লট্‌কাইয়া রাখিবে!" পাবুর রাঠোর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে বলিল, ডোডা কখনও রাঠোর মারিয়াছে?

পাবুর মনে ঠাকুরাণীর কথা শল্যের মত বিঁধিয়াছিল। সে তাহার নূতন থোরী অনুচরবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল দেবড়া ভগ্নীপতিকে শায়েস্তা করিবার পূর্ব্বে ঠাকুরাণীর ঠাট্টার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। কয়েক মাস পরে পাবু ডোডোয়ানায় (বর্ত্তমান ডীড়োয়ানা নাগোরের নিকটে) হানা দিয়া ডোড্ রাজপুতগণের পশুগুলি তাড়াইয়া লইবার জন্য থোরীদিগকে হুকুম দিল। কয়েকজন ডোড-সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া পাবু-র তীরের পাল্লার মধ্যে আসিতেই সে এক এক তীরে পর পর দশ জনকে ধরাশায়ী করিল। থোরীগণ কিছুদূর আগাইয়া গিয়াছিল। পাবু তাহাদিগকে ডাক দিয়া বলিলেন, যাহারা মরিয়াছে উহাদের ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া

---

* "*Tawuri, Thori* or *Tori*—These engross the distinctive epithet of *bhoot* or 'evil spirits', and the yet more emphatic title of 'sons of the devil.' Their origin is doubtful, but they rank with Bawuris, Khengars and other professional thieves, scattered over Rajputana, who will bring you either your enemy's head or the turban from it"!

Tod's *Annals*, ii, 312-313.

যাও। ইতিমধ্যে পাবুর দাদার শ্যালক ডোডিয়া ঠাকুর আর একদল রাজপুত সহ আসিয়া পড়িলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে ডোডিয়া ঠাকুর বন্দী হইলেন, তাঁহার হতাবশিষ্ট অনুচরগণ পলাইয়া বাঁচিল। পশুগুলি ছাড়িয়া দিয়া পাবু বন্দী ঠাকুরকে লইয়া রাত্রের মধ্যে নিজের গ্রাম কোহ্‌লু ফিরিয়া আসিল। তাহার হুকুমে থোরীরা ঠাকুর সাহেবের—ঢুটা বাঁধিয়া তাঁহাকে ঝরোকার নীচে লট্‌কাইয়া রাখিল, এবং পরের দিন সকালে তামাশা দেখাইবার ছল করিয়া পাবু ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া আসিল। ভাইকে ঐ অবস্থায় দেখিয়াই ঠাকুরাণীর চক্ষুস্থির। তিনি বলিলেন, পাবু, তোমার এটা কোন তামাশা? আমি ত হাসি-মজা করিয়া তোমাকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। পাবু শুনাইয়া দিল, ভাবজ! আমিও মজা (মজাক) করিয়াছি। রাজপুতকে কেহ এমন "তানা" (খোটা) দিয়া রেহাই পায় না; যে "কুপুত" (অপদার্থ) "তানা" সে সহ্য করিতে পারে। ঠাকুরাণী ভাইকে ছাড়াইয়া লইয়া তিন-চার দিন পরে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পরে পাবু আট জন সওয়ার এবং চাঁদিয়া প্রভৃতি থোরীকে লইয়া সিরোহী যাত্রা করিল। সিরোহীর রাস্তায় মধ্যপথে আনা বাঘেলার রাজ্য। উহার নিকটে পৌঁছিতেই চাঁদিয়া বলিল, আনা বাঘেলার সহিত আমাদের পূর্ব্ব-বৈরের শোধ চাই। নিকটে আনা বাঘেলার এক বাগান ছিল; থোরীরা বাগান উজাড় করিতে লাগিল। খবর পাইয়া আনা ছুটিয়া আসিলেন। যুদ্ধে আনা প্রাণ হারাইলেন তাঁহার পুত্র বন্দী হইল। পাবু মৃত আনার স্ত্রীর যাবতীয় পোষাক ও অলঙ্কার পণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুত্রকে মুক্তি দিলেন। পথে ভগ্নার জন্য এই যৌতুক যোগাড় করিয়া পাবু সিরোহীর কাছে ডেরা ফেলিল, এবং ভগ্নীপতির কাছে খবর পাঠাইল; সোনা বাইর পিঠে চাবুকের শোধ তুলিতে আসিয়াছি, সাহস থাকিলে সিরোহী-পতি গড়ের বাহিরে আসিবেন। রাঠোরের স্পর্দ্ধার সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য চৌহান রণসজ্জা করিয়া পাবুর ডেরার কাছে পৌঁছিল। ভগ্নী বিধবা হওয়ার আশঙ্কায় পাবু থোরীগণকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়াছিল রাওকে অক্ষত শরীরে বন্দী করিতে হইবে। চৌহান অশ্বারোহীগণ কূটযোদ্ধা থোরীর নাগাল পাইল না, তীর-বিদ্ধ হইয়া অশ্ব-আরোহী পিছু হটিতে লাগিল। চৌহান সেনা ছত্রভঙ্গ করিয়া থোরী পদাতিকগণ কৌশলে রাও-কে বন্দী করিল। যুদ্ধের খবর দুর্গে পৌঁছিতেই সোনা বাই স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় "রথে" (ঘেরাটোপ এক্কা গাড়ী) চড়িয়া আলুথালু লড়াইর ময়দানে ছুটিল, কারণ বৈরে রাঠোরের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। সোনা বাই অনেক কাকুতি করিয়া বলিল, ভাই! আমাকে "অমর-কাঁচলী" (অখণ্ড সৌভাগ্যের চিহ্ন বক্ষবস্ত্র কাঁচুলী) দাও, রাওজীকে মুক্ত কর।

বৈর শান্ত হইল; ভগ্নীপতির সহিত পাবু দুর্গে চলিল। সোনা বাইর যৌতুকের ক্ষোভ মিটিয়াছিল। আনা বাঘেলার স্ত্রীর বহুমূল্য আভূষণ পরিয়া রাঠোরীর বৈরের আর এক ঝলক চৌহান ও বাঘেলীকে দেখাইবার জন্য ভাই-বোন একত্র সতীনের ঘরে উপস্থিত হইল। সোনা বাই নিতান্ত সহজ ভাবে বলিল, বাই! তোমার বাপকে আমার ভাই মারিয়া ফেলিয়াছে। উঠ, "লোকাচার" কর।

ইহা শুনিয়া বাঘেলী "পদত্রা লইল" (অর্থাৎ প্রথামত দাসী সঙ্গে লইয়া বাপের জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে বসিল)।

ক্রমশঃ
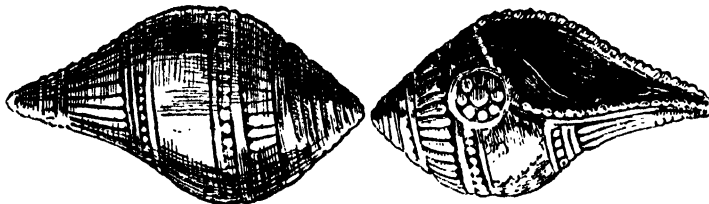
# কালভৈরব

( সত্য ঘটনা, প্রতিযোগিতায় মনোনীত )

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়া ভর্ত্তি হইয়াছি মধ্য-ইংরেজী স্কুলে। থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে আমার পিসীমার বাড়ীতে। পিসীমাকে কখনও দেখি নাই। আমার জন্মের বহু পূর্ব্বেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। পিসতুতো ভাই তিনজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার আচার্য্য গ্রামের মধ্য-ইংরেজী স্কুলের হেড পণ্ডিত। তাঁহার কাছেই আছি।

গ্রামের নাম সাচায়ানী। শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমায় ইহাই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত গ্রাম। উন্নত বলিতেছি এই কারণে যে, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে ইহার সমকক্ষ অন্য কোন গ্রাম তখন সমগ্র মহকুমায় আর ছিল না। গ্রামে বেশ কয়েক ঘর ছোট ছোট জমিদার আছেন। জমিদার সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ। অধিবাসী-দের মধ্যেও ব্রাহ্মণের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

আমি সাচায়ানী মধ্য-ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। গ্রামের হিন্দু জন-সাধারণ চাঁদা করিয়া কালভৈরবের বার্ষিক ভোগের আয়োজন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর এই রকম সময়ে কালভৈরবের বাড়ীতে এইরূপ ভোগের আয়োজন হইয়া থাকে।

কালভৈরব গ্রামের জাগ্রত দেবতা—ইহাই প্রবাদ। আমার পিসীমার বাড়ীর ঠিক পশ্চিমে একটি খালি বাড়ীতে একটি সুবৃহৎ বৃক্ষে এই দেবতা অধিষ্ঠিত বলিয়া সকলের বিশ্বাস। গাছের নীচে কালভৈরবের একটি পাষাণ-মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। নানাবিধ পুষ্পোপহারে মণ্ডিত এই মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য মস্তক যেন আপনা হইতেই অবনত হইয়া আসে।

গ্রামের লোকসংখ্যা অনেক এবং অধিবাসী সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ। তাহার উপর অধিকাংশ লোকই সমৃদ্ধ। সুতরাং স্বভাবতঃই চাঁদা উঠিয়াছে প্রচুর। খিচুড়ি, মিষ্টান্ন এবং মালপো—এই তিন প্রকার খাদ্য দ্বারা ভোগ দেওয়া হইল। অবশ্য ভোগের পূর্ব্বে যথারীতি পূজা, আরতি, কীর্ত্তন, ইত্যাদি হইয়াছে। প্রসাদ গ্রহণের জন্য গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নিমন্ত্রিত। বাড়ীতে পাহারা দেওয়ার জন্য এক একজন লোক ছাড়া বাকী সকলেই কালভৈরবের বাড়ীতে সমবেত।

পূজা, আরতি, কীর্ত্তন, ভোগ-নিবেদন, ইত্যাদিতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। ১০ বৎসরের বালক আমি; চোখে যেন ঘুমের পাহাড় চাপিয়া বসিয়াছে। কিছুক্ষণ পর পর আমার সঙ্গীরা আমার চোখে জল দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেছেন।

এই সময়ে প্রসাদ-বিতরণের জন্য কলাপাতা বিছানো আরম্ভ হইল। আমরা ছেলের দল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ঘুম যেন কিছুক্ষণের জন্য তেপান্তরের মাঠে নির্ব্বাসিত হইল। প্রসাদ গ্রহণের জন্য আমরা পংক্তিক্রমে বসিয়া পড়িলাম।

কালভৈরবের বাড়ী যেন এক বিশাল প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কোদাল দিয়া চাঁচিয়া প্রায় সমগ্র বাড়ীখানিকে অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল। কালভৈরবের বাড়ীতে যে এত জায়গা আছে, জঙ্গল থাকিতে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

সর্ব্ব-পশ্চিমের পংক্তিতে উত্তরাংশের একটি পাতায় আমি পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিয়াছি। আমার সামনের কলাপাতায় প্রথমেই পড়িল খিচুড়ি। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ক্ষুধায় যেন পেট জ্বলিয়া যাইতেছিল। সুস্বাদু গরম খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমার ঠিক ডানদিকে বসিয়াছিল আমারই সমবয়সী আর একটি ছেলে। সে এই গ্রামেরই বাসিন্দা। ছেলেটি আমাকে সাবধান করিয়া বলিল, "এই, শুধু খিচুড়ি দিয়াই পেট ভরিস না। মিষ্টান্ন, মালপো এইগুলোও আছে।"

তাহার কথা শুনিয়া একটু সাবধান হইলাম।

২

হঠাৎ দেখি, দক্ষিণদিকের রাস্তা দিয়া এক দীর্ঘকায় বিরাট্ পুরুষ কালভৈরবের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন। লোকটি উচ্চতায় প্রায় ছয় হাত। খোলা গায়ে তাঁহার বিশাল দেহ ও প্রকাণ্ড হাত-পাগুলি দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। ইনি কি মানুষ? না দেবতা কাল-ভৈরব মানুষের আকৃতি ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছেন?

শেষের কথাই সত্য বলিয়া মনে হইল। মানুষের দেহ কি এত বড় হইতে পারে? এতই বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিতে পারিলাম না।

কালভৈরব কিন্তু বাড়ীতে ঢুকিয়াই বলিলেন, "আমার একটু দেরী হইয়া গেল। যাক্, এই নাও থালা। প্রসাদটুকু দিয়া দাও।"

কণ্ঠস্বর ত নয়; যেন মেঘগর্জ্জন। এইরূপ উচ্চ গম্ভীর স্বর একমাত্র কালভৈরবের পক্ষেই সম্ভব।

চমকিয়া উঠিলাম তাঁহার কথা শুনিয়া। থালা! বলেন কি? কালভৈরবের হাতের এই বিশাল পাত্রটির নাম থালা?

হ্যাঁ, থালাই বটে। কাঁসার থালার একখানা সুবৃহৎ সংস্করণ। সম্ভবতঃ বিশেষ অর্ডার দিয়া তৈরী করানো। শ্রীহট্ট শহরে শাহজলালের ডেগ দেখিয়াছি। মনে হইল —কালভৈরবের থালা আর শাহজলালের ডেগের মধ্যেই শুধু একটা আকৃতিগত সামঞ্জস্য আছে।

একজন বলিষ্ঠ লোক সেই বিশাল থালাখানা খিচুড়ি দ্বারা ভর্ত্তি করিলেন। অনুমান করিলাম অন্ততঃ ১৫ জন লোকের পেট ভরিতে পারে, এই পরিমাণ খিচুড়ি প্রথম বারেই থালাতে দেওয়া হইল।

আমাদের সম্মুখের পংক্তির দক্ষিণদিকে আমাদেরই দিকে মুখ করিয়া কালভৈরব আহার করিতে বসিলেন। বিশাল হস্ত দ্বারা বিপুল গ্রাসে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই থালার সমুদয় খিচুড়ি তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তার পর পরিবেশককে ডাকিয়া বলিলেন, "দাও দেখি, আরও কিছু খিচুড়ি।"

আবার প্রায় ১০ জন লোকের উদরপূর্ত্তির উপযুক্ত খিচুড়ি কালভৈরবের থালায় পড়িল, এবং মিনিট কয়েকের মধ্যেই তাহাও অদৃশ্য হইল।

আমি আহার বন্ধ করিয়া কালভৈরবের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে যে আমার পাতায় আলুর দম, বেগুন-ভাজা এবং আরও কিসের তরকারি পড়িয়াছে, তাহা লক্ষ্যই করি নাই। হঠাৎ পরিবেশকের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিল।

পরিবেশক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে! খাচ্ছিস না যে কিছুই?"

"এই যে খাচ্ছি"—বলিয়া আবার খাইতে আরম্ভ করিলাম। চক্ষু দুইটি কিন্তু তখনও কালভৈরবের উপর নিবদ্ধ।

আমার ডানদিকে যে ছেলেটি বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি কে রে?"

ছেলেটি বিস্মিত হইয়া বলিল, "রামধন সিউড়ি। রামধন সিউড়িকে তুই চিনিস না?"

ওঃ! তাহা হইলে ইনি কালভৈরব নহেন। ইনিই সেই বিখ্যাত রামধন সিউড়ি। ইঁহার সম্বন্ধে বহু গল্প পূর্ব্বে শুনিয়াছি। ইঁহার বাড়ী যে সাচায়ানী গ্রামে, তাহাও জানিতাম। কিন্তু এই "ব্যূঢ়োরস্কঃ বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু-র্মহাভুজঃ" লোকটির সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই।

জানিতাম—রামধন সিউড়ি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং "সিউড়ি" ইঁহাদের বংশগত উপাধি। ইনি ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীতে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া একা ৩০।৪০ জন লোকের খাদ্য ভক্ষণ করিতেন এবং আহারের পর অন্ততঃ ১০।১৫ গুণ অধিক ভোজন-দক্ষিণা লইয়া ফিরিতেন।

একবার এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতেরা ডাকাতি করিবে বলিয়া চিঠি দিয়াছিল। দৈবক্রমে সেই দিন রামধন সিউড়ি এই বাড়ীতে অতিথিরূপে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। গৃহস্বামীর মুখে ডাকাতদলের আগমন সম্ভাবনার কথা জানিয়া রামধন সিউড়ি বলিয়াছিলেন— "রামধন একাই একশ ডাকাত তাড়াতে পারে।"

মধ্য রাত্রিতে ডাকাতেরা আসিয়াছিল। কিন্তু রাম-ধন সিউড়ির লাঠির আঘাতে ৩.৪ জন ডাকাত ধরাশায়ী হওয়ার পর তাহারা কোন প্রকারে আহতদিগকে লইয়া পলাইয়া বাঁচিয়াছিল। ডাকাতদের হাতের তীক্ষ্ণধার অস্ত্র রামধন সিউড়ির দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, কারণ তিনি হরিণের চামড়া ও বড় বড় কাপড় দিয়া সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।

৩

শুনিয়াছি—ইনি জালসুখার জমিদার-বাড়ীতে একটি সাধারণ চাকুরি লইয়া থাকিবার সময় সেখানে প্রজা-বিদ্রোহ হয়। একটি কাছারি বাড়ী হাজার হাজার বিদ্রোহী মুসলমান প্রজা আক্রমণ করে।

পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া পুরাতন নায়েব জমিদার-বাড়ীতে চলিয়া যান এবং একজন বিচক্ষণ নায়েবের সহিত রামধন সিউড়িকে তথায় পাঠান হয়। নূতন নায়েব আসিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে থাকেন, কিন্তু এক শ্রেণীর ধর্ম্মান্ধ মোল্লাদের প্ররোচনায় হিন্দু জমিদারের কাছারি বাড়ী ধ্বংস করিবার জন্য মুসলমান প্রজারা সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রিতে কাছারি বাড়ী ধ্বংস এবং নায়েব ও কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার জন্য বিদ্রোহীরা দিন স্থির করিয়া প্রস্তুত হইতে থাকে।

পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাইয়া প্রবীণ নায়েব তিনজন মাঝি ও দুইজন চাকরকে দ্রুতগামী নৌকাযোগে থানায় পাঠাইলেন সাহায্য প্রার্থনা করিয়া। এদিকে সুনামগঞ্জের সাবডিভিসনের অফিসারের নিকট আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করা হইল।

মধ্য রাত্রিতে 'আল্লা, আল্লা' রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া হাজার হাজার মুসলমান প্রজা রায়বাবুদের কাছারি বাড়ী আক্রমণ করিল। কাছারিতে তখন আছেন শুধু প্রৌঢ় নায়েব আর যুবক রামধন সিউড়ি। মাঝি ও ভৃত্যেরা তখনও থানা হইতে ফিরে নাই। এক দল লাঠিয়াল রক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। মুসলমান লাঠিয়ালেরা বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়াছে, আর হিন্দু লাঠিয়ালেরা করিয়াছে পলায়ন।

'আল্লা, আল্লা' ধ্বনির উচ্চতায় আক্রমণকারীদের সংখ্যা অনুমান করিয়া নায়েব ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। পলায়নেরও উপায় নাই, কারণ আততায়ীরা চারিদিক্ হইতে আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

রামধন সিউড়ির কিন্তু ভয় নাই। তিনি নায়েবকে সাহস দিয়া বলিলেন—"রামধন জীবিত থাকিতে কেহ কাছারিতে ঢুকিতে পারিবে না।"

অন্য সময় হইলে তাঁহার এই কথা শুনিয়া নায়েব হাসিতেন, কিন্তু এই দারুণ বিপদের সময়ে তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল না। শুধু বলিলেন—"এতগুলি সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে তুমি একা কি করিবে রামধন?"

দুর্দ্দান্ত কৌরববাহিনী যখন বিরাটরাজ্য হইতে গোধন হরণ করিতেছিল এবং বিরাটরাজ সৈন্যসামন্তসহ অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তরুণ রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া গোধন উদ্ধার করিবার জন্য একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন কৌরবদের বিশালবাহিনী দেখিয়া ভয়ে কম্পমান উত্তরকে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সাহস দিতে থাকিলে, রাজকুমার উত্তরও অর্জ্জুনকে অনুরূপ-প্রশ্নই করিয়াছিলেন। উত্তরের প্রশ্নে ক্ষুব্ধ হইয়া অর্জ্জুন পাল্টা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"খাণ্ডববন দাহন করিবার সময় কে আমাকে সাহায্য করিয়াছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যখন একা আমি শত শত বীর নৃপতির সহিত সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? নিবাতকবচ নামক দুর্দ্দান্ত অসুরদিগকে বিনাশ করিবার সময় কে আমার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল?"

রামধন সিউড়ি কিন্তু নায়েবকে আর কিছু বলিলেন না। তাড়াতাড়ি হরিণের চামড়া ও বহুসংখ্যক পুরু কাপড় সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া শক্ত রশিদ্বারা বাঁধিয়া লইলেন। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধিলেন। একটা শক্ত লাঠি বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে গুরুভার সুতীক্ষ্ণ খড়্গখানি টানিয়া লইলেন। তার পর কাছারির দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইলেন। নায়েবও কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া রামধনের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া শক্ত বাঁশ দিয়া কাছারি বাড়ীর চারদিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যেন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ। শুধু সামনের দিকে গমনাগমনের জন্য রহিয়াছে একটা সঙ্কীর্ণ দ্বার। এই দ্বারের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছেন রামধন সিউড়ি। দ্বারের প্রান্তভাগ এমনভাবে রচিত যে, বাহির হইতে কোন অস্ত্রদ্বারা ভিতরে আঘাত করা সম্ভব নহে।

দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের ন্যায় বিদ্রোহী প্রজারা আসিয়া দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রামধন দরজায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"তোমাদের আল্লার দোহাই। বাবারা, ফিরিয়া যাও। আমরা কর্ম্মচারী মাত্র। জমিদার বা জমিদারের পরিবারের কেহ এখানে নাই। আমাদের মারিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে? বাবা ডাকিয়া বলিতেছি—ফিরিয়া যাও তোমরা।"

এক মুহূর্ত্ত সব নিস্তব্ধ। তার পরই জনতার মধ্য হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল—"চালাও ভাই সব। ওই বেটাদের খুন করিয়া, কাছারি জ্বালাইয়া তবেই আমরা ফিরব; তার আগে নয়।"

'আল্লা, আল্লা' বলিয়া সম্মুখের দিকে ধাবিত হইল বিপুল জনতা। অন্ধকারের মধ্যেও তাহাদের বর্শার তীক্ষ্ণ ফলাগুলি চিক্ চিক্ করিতে লাগিল।

রামধন সিউড়ি উত্তেজিত স্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"এখনও বলছি বাপুরা ফিরিয়া যাও। কাছারিতে ঢুকিবার চেষ্টা করিলেই মরিবে।"

৪

বিদ্রোহীরা তখন ভীষণভাবে উত্তেজিত। সম্মুখের একজন বলিষ্ঠ লোক বর্শা উদ্যত করিয়া দরজার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। তাহার পশ্চাতে সারি বাঁধিয়া বাকী সকলেই ঢুকিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রামধন আর ইতস্তত: করিলেন না। বাম হাতের লাঠির এক আঘাতে আততায়ীর বর্শা ভূপাতিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের খড়্গদ্বারা তাহার মস্তকটি

স্কন্ধচ্যুত করিয়া দিলেন। এক সেকেণ্ডের মধ্যে কর্ত্তিত দেহটি বাম হাতে ধরিয়া দুর্গের ভিতর দিকে ফেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের খড়্গদ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তিরও শিরশ্ছেদ করিলেন। নিমেষ মধ্যে দ্বিতীয় দেহটিও ভিতর দিকে ফেলিয়া এক লাফে আসিয়া তিনি বাহিরে দাঁড়াইলেন। মাথায় যেন খুন চাপিয়াছে। সহস্র সশস্ত্র আততায়ীকেও বিন্দুমাত্র ভয় নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে আততায়ীদের আরও পাঁচটি মস্তক দেহচ্যুত হইল।

ঠিক এই সময়ে নদীর বাঁকে সার্চ্চলাইটের আলো দেখা গেল। সশস্ত্র পুলিসবাহিনী মোটর-লঞ্চযোগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

একদিকে রামধনের উদ্যত খড়্গ আর অন্যদিকে সশস্ত্র পুলিসের উপস্থিতি। আততায়ীরা ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। রামধন পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন না। দরজার ভিতরে ঢুকিয়া নায়েবের দিকে চাহিলেন।

এতক্ষণ নায়েবের বাহ্যজ্ঞান ছিল না। রামধনকে ভিতরে ঢুকিতে দেখিয়া এবং তাঁহার আহ্বান শুনিয়া এবার যেন তিনি নূতনভাবে চৈতন্য লাভ করিলেন।

রামধন বলিলেন—"পুলিস বোধ হয় আসিয়াছে। নদীতে সার্চ্চলাইটের আলো।"

নায়েবের শুষ্ককণ্ঠে যেন একটু রসসঞ্চার হইল। বলিলেন, "তবে হয়ত আজকের মত বাঁচিলাম।"

শবগুলির দিকে চাহিয়া রামধন আবার বলিলেন, "কিন্তু নায়েববাবু! আমি যে সাত সাতটা খুন করিয়া বসিলাম!"

"তাই ত!" এতক্ষণ নায়েবের এদিকে খেয়ালই ছিল না। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নদী হইতে আলো সহ পুলিসের লোকেরা উঠিয়া আসিতেছে। তাহাদের সম্মুখে তাঁহারই প্রেরিত ভৃত্য দুইজন। সর্ব্বনাশ! রামধন যে হাতে-নাতে ধরা পড়িবে। এখনও রামধনের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত।

ব্যস্ত হইয়া নায়েব বলিলেন, "রামধন! পালা। তুই শিগ্‌গির পালা। দূরে বহুদূরে চলিয়া যা। মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর দেশে আসিস না।"

রামধনও চমকিয়া উঠিলেন। ঠিক ত! এই অবস্থায় ধরা পড়িলে যে তাঁহার ফাঁসি অনিবার্য্য। একবার নায়েবের দিকে আর একবার পুলিসদের দিকে তিনি চাহিলেন। তার পর পুলিসেরা যেদিক্ হইতে আসিতেছে তাহার বিপরীত দিকের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সাতটি ছিন্নমুণ্ড এবং সাতটি কবন্ধ সহ নায়েবকে ধরিয়া লইয়া সদরে হাজির করা হইল।

নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য নায়েব যে পুলিসের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহারাই এখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিল। বিধাতার এমনই বিচিত্র বিধান।

জমিদার-সরকার মকদ্দমায় অজস্র অর্থব্যয় করিলেন। হত্যা কে করিয়াছে, কেহই বলিতে পারিল না। নায়েবের দেহে রক্তের কোন চিহ্ন নাই; সুতরাং তাঁহাকে হত্যাকারী বলা চলে না, অথচ প্রকৃত হত্যাকারীর নামও তিনি প্রকাশ করিলেন না।

নায়েবের এক কথা, কাছারি-বাড়ী আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কাজেই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

পুলিস যখন এরেস্ট্ করে, তখনও নায়েব মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

প্রজারা কেহই নায়েবকে হত্যাকারী বলিল না। রামধনের পরিচয়ও তাহারা জানিত না। তথাপি সাত সাতটা ব্রিটিশ প্রজা খুন। অমনি ত যাইতে পারে না।

বিচারকের ধারণা হইল—নায়েব হত্যাকারীর সহিত জড়িত এবং তিনি বিচারকের নিকট সত্য গোপন করিতেছেন। এই রকম আরও কয়েকটি অপরাধে বিভিন্ন ধারায় নায়েবের সাত বৎসরের জেল হইল।

আট বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া রামধন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে এই সংবাদ লোকমুখে জানাজানি হইল; কিন্তু তখন আর এই মামলার কোন রেশ নাই।

সেই গল্পের রামধনকে আজ সম্মুখে দেখিলাম।

৫

একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন, "রামধনদার খাওয়া যেন আজকাল কমিয়া গিয়াছে।"

রামধন উত্তর করিলেন, "এখন কি আর আগের তাকত আছে? ৬৫ বৎসরের উপর বয়স হ'ল। অৰ্দ্ধেক দিন আবার পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। খাওয়া না কমিবে কেন?"

কথাটি শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। যে লোকটি এই ৬৫ বৎসর বয়সেও প্রায় ৪০ জনের খোরাক খাইতে পারে এবং ইহাকে কম খাওয়া বলে, না জানি যৌবনে সে কত খাইতে পারিত!

আজ ভাবি, রামধন সিউড়িকে যে সেদিন কালভৈরব বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম, তাহা কি বাস্তবিকই ভুল? না ইনি কালভৈরবেরই অবতার ছিলেন?

এক্ষেত্রে বলিয়া রাখি, প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে রামধন সিউড়ি দেহরক্ষা করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিজের বলিতেও এখন আর কেহই জীবিত নাই।

# তারার ভাষা

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

শ্রীসংযুক্তা মিত্র

জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল আগুনের আলো দুই চোখে জ্বালিয়ে সত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য পূজার আসন ছেড়ে সোজা বেরিয়ে এলেন ঠাকুর-ঘর হতে। গলায় ঝোলান ও হাতে বাঁধা বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা খট্‌খট্‌ ক'রে নড়ে উঠল। পরনে তখনও লাল চেলীর পট্টবস্ত্র। গায়ে শাক্তমন্ত্রের বীজ-আঁকা নামাবলীর উত্তরীয়।

তারা! ব্রহ্মময়ী! মা! সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের এক বুকফাটা হুঙ্কার কণ্ঠ হতে যেন আপনা হতে বেরিয়ে এল তাঁর। সমস্ত বাড়ী খাঁ খাঁ করছে। কলতলায় উচ্ছিষ্ট বাসনের স্তূপে ভুক্তাবশিষ্টের ছড়াছড়ি। ঝি আসে নি এখনও। রান্নাঘরের দাওয়ায় গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে পাচক ঠাকুর। বহুদিনের অনুগত সেবক সে। ছেলের ঘরে এখন আলো জ্বালা। বৌমা হয়ত দুরন্ত শিশু সামলাতে, বিছানা পাল্টাতে ব্যস্ত। করুণাময়ীর ঘর কপাটরুদ্ধ। নিস্তব্ধ করুণ গম্ভীর এক নির্জ্জনতার ছায়া—গোটা পরিবারের উপর এসে পড়েছে আজ। রাহুগ্রাসের কবলে আবদ্ধ অসহায় একটা দুর্ভাগ্যের ভয়ঙ্কর পরিণতিতে আজ এ বাড়ী হাসতে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে সহজ নিঃশ্বাস নিতে। ভোরের আলোর এখনও অনেক বাকি।

ত্রিযামা যামিনী যথাবিধি কালী উপাসনা এ বংশের কৌলিকপ্রথা ছিল এককালে। সত্যকৃষ্ণ বৃদ্ধ। অশীতিপর না হলেও বার্দ্ধক্যের জরাগ্রস্ত। তাই অতটা তিনি পেরে ওঠেন না আজকাল। শেষ রাত্রে উঠে গঙ্গাস্নান সেরে এসে পূজায় বসেন। ওঠেন যখন সূর্য্য অনেক দূর এগিয়ে যায় তার আহ্নিক প্রদক্ষিণের পথে। শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ—এই একই নিয়ম। কোন দিন তার ব্যত্যয় নেই। নেই ব্যতিক্রম। আজ হঠাৎ সেই পঞ্চাশ বছরের ঘুণধরা নিয়মের আগল ভেঙে তিনি ছিটকে বেরিয়ে এলেন। মাথার মধ্যে প্রলয় আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে।

আজ আচমন সেরে প্রাণায়ামে বসেই যার কথা হঠাৎ বহুদিন পরে তাঁর অতর্কিতে মনে পড়ে গেছে, সেই বাল্যবন্ধু কাষ্টম-হাউসের অবসরপ্রাপ্ত বড়বাবু অবিনাশের সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। জেনে আসতে হবে লোভের বশে, মোহগ্রস্ত মনে কোন্ দুঃস্বপ্নের কালরাতির আয়োজন না জানি সেখানেও হয়ত করে দিয়েছেন। সে কথা না জানা পর্য্যন্ত স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। তারা! তারা! সত্যকৃষ্ণ খড়ম-পায়েই পথে নেমে পড়েন। শেষ রাতের তারা-জ্বলা প্রহরে নিভে-আসা আলোর সারির নীচে তাঁর পায়ের শব্দ বেজে বেজে ওঠে খট্‌ খট্‌ খট্‌ খট্‌।

ভিস্তিওয়ালা ফুটপাথের ধারের হাইড্রেন্টের জলে রাস্তায় জল দিচ্ছে। হোস-পাইপের মুখে প্রচণ্ড জলধারা সশব্দ তোড়ে বেরিয়ে আসছে। ঠুং ঠুং মন্দিরাতে ভোরের বৈতালিকে রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিয়ে শুনিয়ে বৈরাগী এবার গঙ্গাস্নানে চলেছে। সত্যকৃষ্ণের কালভৈরবের মত ধাবমান চেহারার দিকে তাকিয়ে সচকিত হয় তারা।

ভেবেছিলেন কাঁচামিঠে ভোরের ঘুম ভাঙিয়ে অনেক ডাকাডাকিতে অবিনাশকে জাগাতে হবে। মনে হয়েছিল, শেষরাতের আলস্য-জড়িত নিঝুম-নিস্তব্ধ বাড়ী তাঁর অতর্কিত আহ্বানে চমকে যাবে। কি বলবেন অবিনাশকে? কোন্ প্রশ্ন করবেন? কি জানাবেন? কেমন করে? এলোমেলো চিন্তার জটিলতায় বারে বারে উন্মনা হয়েছেন সত্যকৃষ্ণ। বারবার সেই শপথে নিজের মনকেই বুঝিয়েছেন, এবার সব কথা অকপটে স্বীকার করে, আত্মধিক্কার আর অনুতাপের অনলে অগ্নিশুদ্ধ হবেন তিনি। বারবার ক্ষমা চাইবেন বন্ধুর হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ভাই। এ মহাপাতকীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। জেনেশুনেই ত ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ-পত্রখানা তিনি সেদিন বন্ধুর হাতে গছিয়ে দিয়েছিলেন। না। একটুও হাত কাঁপে নি। সেদিন একটুও দ্বিধা জাগে নি তাঁর মনে। একটা দুরন্ত লোভের উল্লাসে সারা মন তাঁর শুধু কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। গুপ্তধনলাভের কোষাগার খোলার চাবির অধিকার একান্তভাবে তাঁরই। আর সেই অধিকারের প্রমত্ত গর্ব্বে রাজরাণীর পাটে বসাতে চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র কন্যা বড় আদরের কল্যাণীকে। আর আজ?

না, না, না, না। এ কথা মুখেও আনা যায় না। সত্যকৃষ্ণের পিতৃহৃদয় চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে বিন্দু বিন্দু। মনে পড়ছে সব কথাই। আর মনে পড়ছে বলেই, আজ এই মুহূর্ত্তে, হ্যাঁ, এখনই মনে পড়ছে

বিনাশকেও। না জানি, কোন্ দুর্ভাগ্যের শ্মশানে বাসনে বসে আছে সে-ও। তাকে বহুদিন পরে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বলতে হবে, এস বন্ধু, বুকে এস। দেখ, তোমার দুঃখের হোমে আজ আহুতি দিচ্ছি আমিও।

দেখা করতেই হবে···দেখা করতেই হবে। সত্যকৃষ্ণের পায়ের খড়মের তলায় বাজতে থাকে—মহানির্ব্বাণ রোড হতে পূর্ণদাস রোড—তার পর গড়িয়াহাটা রোড—তার পর ডানমোড় ফিরে ঢাকুরিয়া ঠাকুরবাড়ি রোড। সে দাঁড়ান গলির মুখে। কোন্ মুখে যাবেন? কি কথা শুনতে? আর কোন্ কথা শোনাতে?

কিন্তু এ কি? বিহ্বল ব্যাকুলতায় ছুটে-আসা সত্যকৃষ্ণের গতি তিন-এর দুই-এর সি নম্বরের হলুদে রঙের সেই পরিচিত পুরানো বাড়ীটার সামনে এসে হঠাৎ চমকে যায়। এ কি? এত আলো কেন? এত লোক আর এত গাড়ী? কোথায় নিঃশব্দ তন্দ্রা? এ যে সচকিত জাগ্রতা। সত্যকৃষ্ণ মুহূর্ত্তকাল ভাবলেন। তীক্ষ্ণসন্ধানী দৃষ্টির মাপে নিরীক্ষণ করলেন বারবার। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞ চোখে এ বাড়ীর কোন শোকের আভাস ধরা পড়ল না। তবে?

—কে? কে ওখানে? একজোড়া চটিজুতা দরজার দিকে এগিয়ে এল চেয়ার ছেড়ে। ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় তাঁর মুখ ভেসে উঠল—তিনি সত্যকৃষ্ণকে দেখে সহসা চকিত হয়ে মহা উৎসাহে পথে নেমে এসে হাত ধ'রে বললেন—কি আশ্চর্য্য! তুমি এখানে? এই সময়? কতকাল পরে দেখা বল ত? অথচ তোমাকেই সংবাদ দেবার কথা আমার সবার আগে মনে হয়েছে, তা জান?

সত্যকৃষ্ণ নীরব। সত্যকৃষ্ণ বিমূঢ়।

—আরে চল, চল, ভিতরে চল। কি ব্যাপার বল ভাই।—অবিনাশ পরম হৃদ্যতায় বন্ধুর হাত ধ'রে আকর্ষণ করলেন।

—কই, না। কিছু না। জানই ত ভোরে বেড়ান আমার চিরকালের বাতিক, আজ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এদিকে চলে এসেছি। আর এসেছি যখন, মনে পড়ল তোমার কথা। ভাবলাম একবার দেখা করেই যাই। —আত্মসংযত সত্যকৃষ্ণের কণ্ঠে অতি কষ্টে কৈফিয়তের স্বর ফোটে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আরে, তোমার জন্যই ত এ সব হ'ল ভাই। অথচ সেদিন দুশ্চিন্তাও কি কিছু কম হয়েছিল? ভাগ্যিস, আমাকে জোর করে বুঝিয়েছিলে! তুমি না হলে কি এমন হয়? চল, চল, ভিতরে চল। গিন্নী দেখলে খুব খুশী হবেন।—অবিনাশ অন্তরঙ্গতায় উত্তপ্ত হন, চঞ্চল হন।

বন্ধু! বন্ধুকৃত্য! আনন্দ?—সত্যকৃষ্ণের বুকের মধ্যে বজ্রের হাতুড়ি হৃৎপিণ্ডের উপর যেন প্রশ্নে, বিস্ময়ে, বিহ্বলতায় আছড়ে আছড়ে পড়ে। স্বপ্ন? না ত! তবে কোন্ আশঙ্কায় এমন পাগলের মত ছুটে এসেছিলেন? কি শুনছেন? সে কি ভুল? কই, তাও নয়!

—কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি তা ত বললে না। এত ভোরে এত লোক, এত আলো কেন?—সত্যকৃষ্ণ শুষ্ক প্রশ্ন করেন।

—কণিকা আর প্রদোষ যে আজ ইয়োরোপ রওনা হয়ে গেল কাকাবাবু। আমরা সকলে ওদের এরোড্রোমে সি অফ করতে গিয়েছিলাম। মাঝরাতে প্লেন ছাড়ল কি না।—অবিনাশের বড়ছেলে হিমাংশু খুশিতে উচ্ছল হয়ে এগিয়ে এসে বলে। এমন সময় পথে বাবা কার সঙ্গে আলাপ করছেন দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছিল সে।—তা কাকাবাবু ঘরে চলুন! কি যোগাযোগ বলুন ত। এতদিন পর ঠিক আজই আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন? এ সবই আপনার জন্যই ত হ'ল কাকাবাবু। চলুন, ভিতরে চলুন।—হিমাংশু সাগ্রহে বাপের পাশে এসে দাঁড়ায়।

তাঁরই জন্য হ'ল? হিমাংশুও তবে সে কথা সেদিন বিশ্বাস করেছিল? আর এদের এই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদানে সত্যকৃষ্ণ নিজে কি পেলেন? কেন পেলেন?—একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ব্যথা বুকের মধ্যে জেগে উঠল তাঁর। অতি কষ্টে নির্ব্বাক্ কণ্ঠে স্বর ফুটিয়ে তিনি বললেন, বেশ, বড় খুশী হলাম ভাই শুনে। আজ ত প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছি। আর একদিন আসব। আজ মোটেই সময় নেই।

কোন প্রতিবাদের অবকাশ না দিয়ে, বিস্মিত অবিনাশ আর হিমাংশুর মুখের সামনে থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে সত্যকৃষ্ণ আবার উল্টোমুখো হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগলেন। একটা পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে। মনে হচ্ছে, এতদিনের শিক্ষা, সাধনা আর সংস্কার দিয়ে গড়া তাঁর যে বালির প্রাসাদের সুখশয্যায় মহা নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তিনি ঘুমিয়েছিলেন তার ভিতটাই গেছে খসে। টুকরো টুকরো হয়ে সেটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। যদি সাধ্য থাকত, যদি সম্ভব হ'ত তবে সেই ছড়ান ভগ্নস্তূপ তিনি দু'পায়ে মাড়িয়ে দলে পিষে যেতেন। যাক্, সব যাক্। দূর হয়ে যাক্।

তোমারই জন্য। অবিনাশ বলেছে একথা তাঁকে। আপনার জন্যই হ'ল—হিমাংশুও সায় দিয়েছে। একটা

বাঁধভাঙা প্রবল অট্টহাসি বুকের পাঁজরা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যেন বার হয়ে আসতে চায়। সত্যকৃষ্ণের ইচ্ছা করে সে হাসির স্পন্দনে স্পন্দনে যদি শিউরে দিতে পারতেন সকলকে। আকাশ, বাতাস, আলো, হাসি, গান, ছন্দ, রং—সব। সব যদি সে হাসির আঘাতে চমকে যেত। কালো হয়ে যেত। যদি গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা সব—সব—সে হাসির ধমকে থেমে যেত। তবে? তবে কে বলতে পারে কি হ'ত সেদিন? না, না, বেশ হ'ত! খুব হ'ত। তাই ঠিক হ'ত। আবার সেই নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর এক ব্যঙ্গের হাসি সত্যকৃষ্ণের বুকে কেঁপে কেঁপে ওঠে। তিনি বুক চেপে ধরেন। তিনি কি পাগল হয়ে যাবেন?

ইতিমধ্যে শেষরাতের পাৎলা আঁধারের জালের আবরণ সরিয়ে আকাশে উঁকি দিচ্ছে রবির প্রথম কিরণ। উদয়ভানুর আগমনের সঙ্কেতে আলোর উৎসব জ্বলে উঠেছে আকাশে। মুঠো মুঠো আবির-রং ছড়িয়ে পড়ছে গাছের মাথায় মাথায়—শান্ত নিথর দীঘির অতল জলের স্বপ্নশয্যায়। পথে এরই মধ্যে ধীরে ভিড় বাড়ছে। স্বাস্থ্যান্বেষী পথচারীর।

রক্ত পট্টাম্বর পরা, নামাবলী গায়ে, রুদ্রাক্ষের মালা শোভিত রুদ্রভৈরবের মত রক্তচক্ষু সত্যকৃষ্ণের মুখের দিকে তাঁরা সকলেই যেন তাকান চকিত বিস্ময়ে। যেন সভয়ে পথ ছেড়ে দেন তাঁরা। হাঁটতে হাঁটতে সত্যকৃষ্ণ চলে যান লেকের অপর পারের জনহীন এক প্রান্তে। বিশাল বিশাল নিম, ছাতিম, বট, অশ্বত্থের সারি বাহু বিস্তারে ছায়াস্নিগ্ধ বিরামপীঠ রচনা করে রেখেছে সেখানে। তারই একটার নীচে শিশিরভেজা ঘাসের উপর সত্যকৃষ্ণ বসে পড়েন। একটু নিরিবিলি একান্ত কোণ তাঁর প্রয়োজন। আজ আর কারও সঙ্গে নয়। সবার প্রথমে তাঁর নিজের মনের সঙ্গেই এক প্রচণ্ড বোঝাপড়া আছে। কোন্ ছায়াহরিণের স্বর্ণকুহকে তাঁর নিজের বিশ্বাস ও নির্ভরতা এতদিন মুখ থুবড়ে পড়েছিল? কেন ছিল? কেন এমন হতে দিলেন তিনি? একটি একটি করে প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব তাঁর চাই। না হলে তাঁর অতি আদরের কন্যা কল্যাণীর কাছে কোন্ মুখ নিয়ে তিনি দাঁড়াবেন? তার নিরাভরণ বৈধব্যকরুণ শূন্য জীবনের সামনে গিয়ে কি শোনাবেন তাকে? কি বলবেন?

তোমার জন্যই ত!—অবিনাশের কণ্ঠস্বর আবার মনের মধ্যে পরিহাসতীক্ষ্ণ কশাঘাতের মত জেগে উঠল।

বড় বিচিত্র এই স্থূল জগৎপ্রপঞ্চ—মহারহস্যের আবরণে আবৃত এই পঞ্চভৌতিক মহামায়ার সংসার। কিন্তু তার চাইতেও রহস্যময় এই দৃশ্যমান পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পারে সূক্ষ্ম অদৃশ্য আর এক লোক। এও বহুগ্রাহ্য রূপরসগন্ধে ভরা মোহময় জগতের মতই সে সত্য। এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম নাড়ির যোগে অদৃশ্য বন্ধনে যে বাঁধা। বিশ্বলোক পরিব্যাপ্ত ক'রে যার ছায়াময় অস্তিত্বের সঞ্চার। অসীম, অনন্ত, নীলাম্বর দ্যুলোকের জ্যোতির্ময় গ্রহতারকা যার নিয়ামক নিয়ন্ত্রক। ইউরেনাস-জুপিটার-নেপচুন—শনি, বুধ, শুক্র—রাশি, গণ, মেল—কর্কট, বৃশ্চিক, মৎস্য, মীন—উদয়, অস্ত, অবস্থান—দুর্বোধ্য অথচ দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে আর সঙ্কেতের অলক্ষ্য অথচ দুর্বার বন্ধনের বেড়াজালে মানুষের ভাগ্যাকাশেও যারা ঐ অনন্ত নীলিমায় ভরা মহাকাশের মতই অবস্থিত। যাদের অঙ্গুলিহেলনে মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, কল্যাণ আর অকল্যাণ, সুখ আর দুঃখ, শোক আর তাপ অমোঘ শাসনের নাগপাশে জটাবদ্ধ। ভয়ার্ত্ত, বেদনার্ত্ত, অসহায় মানুষের মনে এ এক পরম রহস্যময় জিজ্ঞাসা। দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে লুকান মানুষের দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যসঙ্কেত—যার অপর নাম অদৃষ্ট।

বংশগত প্রথা অনুসারে সত্যকৃষ্ণ এই অদৃশ্য ভাগ্যলিপির উদ্ঘাটক। তাঁর কুলদেবতা শ্মশানবাসিনীর বেদীর নীচে প্রাচীন জামকাঠের এক সিন্দুর-চর্চ্চিত বাক্সের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে এই মন্ত্রগুপ্তি উদ্ধারের বীজমন্ত্র। উপাসনা অন্তে নিত্য সেবা পায় তুলট কাগজে লেখা, তালপাতার পুঁথিতে গাঁথা—তাদের বংশানুক্রমিক ভৃগুশাস্ত্রের সঞ্চিত জ্ঞান।

শোকে, দুঃখে, জন্মলগ্নে, মৃত্যুঅন্তে, বিবাহের প্রস্তুতিতে অসহায়ভাবে ছুটে আসে প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়, যজমানের দল। জ্যোতিঃশাস্ত্রী সত্যকৃষ্ণ প্রশান্ত-চিত্তে শোনেন তাঁদের আর্ত্তি, বোঝেন তাঁদের ব্যাকুলতা। তার পর পল ক্ষণ দণ্ড মিলিয়ে মিলিয়ে, রাশি, নক্ষত্র, গণ চিরে চিরে পাঠ করেন তাঁদের অদৃশ্য ভাগ্যলিপির রহস্যময় সংকেত। খুশি হয়, আশ্বস্ত হয়, সাবধান হয় সেই ভয়াতুর, শঙ্কিত আগতবৃন্দ। খুশি হন সত্যকৃষ্ণও। কারণ অন্যের খুশির ও আনন্দের অনুপাতে স্ফীত হয় তাঁর কাঞ্চন দক্ষিণার সঞ্চয়। আত্মপ্রসাদগর্ব্বিত সত্যকৃষ্ণের এই-ই কৌলিক ব্যবসায়।

প্রপিতামহ মোক্ষদাচরণ ভৃগুশাস্ত্রী সিদ্ধান্তবাগীশ ছিলেন মহাকৌলিক তান্ত্রিক উপাসক। পরম নিষ্ঠাবান। শুদ্ধাচারী। তাঁর ছেলে বামাপ্রসন্ন ন্যায়চঞ্চু। তাঁর ছেলে

জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ। তাঁর ছেলে সত্যকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন। বংশানুক্রমিক তান্ত্রিক উপাসনার উত্তর সাধক। দৈবজ্ঞ পণ্ডিত।

আজ এই সকালে লেকের পাড়ে গাছের ছায়ায় ব'সে শ্রান্ত, অবসন্ন, বিভ্রান্ত সত্যকৃষ্ণের একটি একটি করে সব কথাই মনে পড়ে। একটা গোটা ইতিহাস জ্বল জ্বল করে তাঁর চোখের সামনে। দূর আকাশের ঐ শুকতারাটির মতই। ধীরে ধীরে বেলা বাড়ে। মাঝে মাঝে সু-উচ্চ স্বরে বাঁশি বাজিয়ে পিছনের রেলপথ বেয়ে ছুটে যায় ঢাকুরিয়া কালিঘাটের লোক্যাল প্যাসেঞ্জার। মুহূর্ত্তের জন্য ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে নিস্তব্ধ বাতাসের বুক চিরে খান্ খান্ হয়ে যায়। ডানা ঝট্‌পট্ করতে করতে ঘুম-ভাঙা পাখীর দল মহাকলরবে ছড়িয়ে পড়ে আকাশের বুকে। কচিৎ পিছনের নতুন গড়ে-ওঠা উদ্বাস্তু কলোনীর কোন বউ ত্রস্ত পদে জলে এসে নামে বাসনের পাঁজা হাতে। সত্যকৃষ্ণের পাশ কাটিয়ে তালগাছের গুঁড়ি-বাঁধা ঘাটলায় গিয়ে থামে। কিছুক্ষণের জন্য উন্মনা হন তিনি। কিন্তু তার পরই আবার টুকরো হয়ে ছিঁড়ে-যাওয়া চিন্তার জালে গিঁট বাঁধতে বসেন সত্যকৃষ্ণ। অশান্ত পিপাসার বেদনায় তাঁর বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। শুকিয়ে আসে তাঁর কণ্ঠ ও তালু। তবু আজ নিশ্চল স্থাণুর মত ব'সে থাকেন সত্যকৃষ্ণ। হাজার ভীমরুলের আক্রমণের মত ভিড় করে আসে অসংখ্য হাজার চিন্তা। হ্যাঁ, মনে পড়ে। মনে পড়ে বৈকি। সব কথাই মনে পড়ে তাঁর।

আজ হতে বছর দুই-তিন আগে, পৌষের শেষ। এমনি তারা-নেভা আঁধারমেশা প্রভাতের বেলা। উপাসনা শেষে সত্যকৃষ্ণ তখনও নীচে নামেন নি। নীচের তলায় যজমান প্রশ্নার্থীর আপ্যায়নের জন্য আয়োজিত জাজিমপাতা বড় হলঘরটির জানালা খুলে সত্যকৃষ্ণের খাস চাকর যদু সবে ধুনো জ্বালিয়ে কোণে কোণে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরছে। এমন সময় সদরের কড়া নড়ে উঠল। মহা উদ্বেগের করাঘাত পড়ল দরজায়।

এই সাতসকালে কে এল বাপু? অপ্রসন্নমুখে যদু গিয়ে কপাট খোলে। প্রশস্ত গালিচায় সত্যকৃষ্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনের এক পাশে একটি স্থান নির্দ্দেশ করে। তার পর বিনীতভাবে বলে, আজ্ঞে আপনার কোথা হতে আসা হ'ল বলব?

আগন্তুক ভদ্রলোক উদ্বিগ্নমুখে বলেন, আমি অবিনাশ বাগচী। তোমাদের বাবুর বাল্যবন্ধু। খবর দাও। বলগে বড্ড জরুরী।

—আজ্ঞে, যাচ্ছি। তবে কর্ত্তার এখনও পূজো শেষ হয় নি। একটু অপিক্ষে করতে হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসেছি আমি। আমার নাম শুনলেই বাবু ছুটে আসবেন। তুমি যাও, খবর দাও। যাও, যাও। আগন্তুকের কণ্ঠে আবার উদ্বেগের অস্থিরতা। কোঁচা দিয়ে তিনি ঘাম মোছেন। এই শীতের ভোরেও কপালে তাঁর জমেছে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণিকা।

ধীরে-সুস্থে ঘণ্টাখানেক পর সত্যকৃষ্ণ সে ঘরে আসেন প্রস্তুত হয়ে। ততক্ষণে আরো দু'চারজন প্রশ্নার্থী এসে জমা হয়েছেন সেখানে। অবিনাশ তাঁকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বলেন, ভাই বড়ই অস্থির হয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি আজ।

—আরে বস, বস। অন্তরঙ্গ হৃদ্যতায় সত্যকৃষ্ণ বন্ধুকে আপ্যায়ন করেন। কি ব্যাপার বল।

অবিনাশ সত্যকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু। একই গ্রাম হতে উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ একদা বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আসন-পাতা এই শহর কলিকাতায় এসে বাসা বেঁধেছিলেন। সে আজ অনেকদিনের কথা। অবিনাশের পিতামহ হতে পিতা পর্য্যন্ত সকলেরই কৌলিক-বৃত্তি কবিরাজী। সকলেই তাঁরা ভেষগাচার্য্য। ব্যতিক্রম শুধু অবিনাশ নিজে। বাঁধা মোটা মাইনের আধুনিক মোহে লক্ষ্মীর কৃপাকণার প্রসাদপুষ্ট পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করে তিনি একদা অন্যান্য দু'চার জন সতীর্থবান্ধবের সঙ্গে একযোগে কাষ্টম-হাউসের চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন। তার পর ধাপে ধাপে সোনার সিঁড়ির অনেকগুলি অতিক্রম করে তিনি এখন পেন্‌সনের দ্বারে পৌঁছেছেন।

স্বভাবে, আচরণে ও জীবিকায় অবিনাশ ও সত্যকৃষ্ণের মধ্যে আদিগন্ত ব্যবধান। তবু আজো সেই দিগন্তের মাঝে তপ্ত নিবিড় বাতাসে বাল্যের প্রীতির ও অন্তরঙ্গতার ঘন সৌরভ খেলে যায়।

অবিনাশের তিনটি মেয়ে, দু'টি ছেলে। বড় দু'টি মেয়ের যথাসময় সুপাত্রে বিবাহ দিয়ে অবিনাশ তাদের সংসারজীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। ছেলে দু'টি উপযুক্ত। বাকি শুধু সবার ছোট কণিকা। আধুনিক যুগের মনোমত রুচিতে সে মানুষ হচ্ছে।

সত্যকৃষ্ণের এক মেয়ে কল্যাণী ও এক ছেলে অজয়-কৃষ্ণ। ছেলেটিকে তিনি বড় সরকারী চাকুরি গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। সে বাপের কৌলিক প্রথায় শ্রদ্ধা-শীল। অথচ আধুনিক জীবনের পক্ষপাতী। একমাত্র চিন্তা তাঁর মেয়েটি। বর্ত্তমানে মেয়েটিকে যোগ্যপাত্রে অর্পণ করতে তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন। কল্যাণী সুশ্রী, মধ্যম-

শিক্ষিতা, গৃহকর্ম্মনিপুণা। বিশেষতঃ এত বড় বংশের মেয়ে। ধনে-মানে-গৌরবে কোন অংশেই কম নয় সে। যে-কোন ব্রাহ্মণ বংশে সে বাঞ্ছনীয়া।

কিন্তু মুশকিল এই যে, যে অদৃশ্য ভাগ্যের লিপি সাদা-চোখে ধরা পড়ে না, সত্যকৃষ্ণ গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্কেত পাঠ করে করে সে ভাষা বোঝেন। সহজে ধরতে পারেন। আর পারেন বলেই তিনি শঙ্কিত হন। গণে মেলে ত রাশিতে মেলে না। রাশিতে মিল হয় ত নক্ষত্রদোষে সে বাতিল হয়ে যায়। ফলে বিবাহ প্রস্তাবক্ষেত্রে উভয়-পক্ষের আগ্রহ সম্মতি সত্ত্বেও কল্যাণী আজো অনূঢ়া। সত্যকৃষ্ণ তারার ভাষা অগ্রাহ্যও করতে পারেন না। চিরকাল এই তাঁর কৌলিক বৃত্তি। কাজেই সত্যকৃষ্ণের দিন ইদানীং বড়ই চঞ্চলতার মধ্যে কাটছে।

আপ্যায়নের প্রত্যুত্তরে অবিনাশ বললেন, ব্যাপার আর কি ভাই। জানই ত রাণু আর বেণুর বিয়ে কত সহজে হয়ে গেল। কোন হাঙ্গামাই প্রায় পোয়াতে হয় নি। লাখ কথায় বিয়ে—কথাই আছে। কিন্তু তুমি ত জান কেমন অনায়াসে বিনয় আর অশোকের মত পাত্তর পেয়েছিলাম।

—তা, সমস্যাটা কি হ'ল? সত্যকৃষ্ণের কণ্ঠ অসহিষ্ণু।

—হ'ল বৈকি ভাই, সমস্যা আমার ঐ ছোটটিকে নিয়ে।

—কি যেন তার নাম? প্রশ্ন করেন সত্যকৃষ্ণ।

—কণিকা, অবিনাশ জবাব দেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কণিকা। কিন্তু সে ত বেশ সুন্দরী। তুমি তাকে লেখাপড়াও শেখাচ্ছ। সত্যকৃষ্ণ যেন একটু অবাক্ হন। এমন মেয়েকে নিয়ে সমস্যা কোথায়?

—তাছাড়া কণি, বেশ ভাল গান, সেলাই-ফোড়াইও জানে। বেশ রান্না-বান্নাও জানে। খুব চট্‌পটে। অবিনাশ যোগ করেন।

—তবে? মুশকিলটা ক? বন্ধুকে আশ্বস্ত করতে চান সত্যকৃষ্ণ।

অবিনাশ বলেন, তা নয় ভাই। মেয়ের বিয়েতে আমি বেশ খরচা-পাতিও করব। এই আমার শেষ কাজ। কিন্তু বিভ্রাট কি হয়েছে জান?

—কি? কি? এবার উৎকণ্ঠিত হন সত্যকৃষ্ণ।

—ভাই, এবার বুঝি তীরে এসে তরী ডোবে। অবিনাশ ম্লান-বিমর্ষ মুখে বলেন।

সত্যকৃষ্ণ বন্ধুর বিপদে ব্যগ্র হন। বুঝতে পারেন, কি একটা কথা মুখ ফুটে বলতে অবিনাশ কুণ্ঠিত হচ্ছেন। সময়ের প্রয়োজন। প্রয়োজন একটু একান্ত অবসর। তাই সমাগত অন্য প্রশ্নার্থীদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, আপনারা আজকের মত যদি আমাকে মাপ করেন। আপনারা বরং বিকালের দিকে আসবেন। আজ না হয় সকাল সকাল বসব আমি।

সকলেই শ্রদ্ধান্বিত যজমান। সত্যকৃষ্ণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সবাই উঠে পড়েন। সকলে চলে যাবার পর সত্যকৃষ্ণ বন্ধুকে পরম আগ্রহে বলেন, বল কি ব্যাপার। খুলে বল দিকি?

বহুদিন পর দুই বন্ধু মুখোমুখী হয়েছেন। পিতৃহৃদয়ের একই সমস্যায় দু'জনেই সমব্যথী।

অবিনাশ তাঁর সমস্যা ও শঙ্কার সবটুকুই এবার ব্যক্ত করেন। সম্প্রতি বাগবাজারের ধনাঢ্য মুখুজ্যে বংশ থেকে কণিকার জন্য এক বিবাহ-প্রস্তাব চলছে। পাত্রের বাবা বহুদিন হতে সপরিবারে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী। পাত্রও সেখানেই চাকরি করে। ছেলেটি নাকি হীরের টুকরো। রূপে, গুণে, কৃতিত্বে এমন জামাই লাভ করা নাকি অবিনাশের পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্য। তারাও কণিকাকে দেখে পছন্দ করেছে। কিন্তু গোল তুলেছেন পাত্রের ঠাকুমা। গোড়া হতেই তিনি বলছিলেন যে, মুখুজ্যেবংশে বাগচীদের ঘর হতে মেয়ে আনা? কিন্তু আধুনিকপন্থী ছেলেদের সঙ্গে না পেরে তিনি এবার গোঁ ধরেছেন পাত্রীর কুষ্ঠির সঙ্গে মিল চাই।

—কি বিপদ্, ভাই বোঝ। আর যদি কুষ্ঠি না মেলে? —শঙ্কিত বন্ধুর বিপদ্ এবার বোঝেন সত্যকৃষ্ণ। গম্ভীর মুখে সত্যকৃষ্ণ প্রশ্ন করেন, দুটো কুষ্ঠিই তুমি এনেছ?

—হ্যাঁ, এই যে, এই দেখ।—অবিনাশ পকেট থেকে দুটো হলদে রঙের তুলোট কাগজ টেনে বার করেন। আঁকিবুকি কাটা আর টানা টানা আঁচড়ে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি লেখা।

এক পলক সেদিকে তাকিয়ে সত্যকৃষ্ণ বলেন,—এ দুটো এখন থাক্। তুমি বরং পরশু সকালে এস। আমি দেখে রাখব।

অবিনাশ উদ্বেগে ও শঙ্কায় অস্থিরভাবে সত্যকৃষ্ণের হাত চেপে ধরেন। পাত্রটি আমাদের সকলের বড় পছন্দ। ছেলেও মেয়ে দেখে মত করেছে। কাণের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে অবিনাশ মৃদুস্বরে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলেন—বৌমাদের কাছে শুনলাম কণি'রও নাকি মত। এখন তুমিই আমাদের ভরসা।

সত্যকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর। ঈষৎ হেসে বলেন,—ভরসা একমাত্র উপরআলা। আমি ত শুধু তাঁর আজ্ঞাবহ। দু'টি হাত জোড় করে তিনি কপালে ঠেকান।

আশায় ও আশঙ্কায়, উদ্বেগে ও ভরসায় দুলতে দুলতে অবিনাশ সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন।

কিন্তু তার পর? হ্যাঁ, তার পরের কথাও মনে আছে সত্যকৃষ্ণের। সূর্য্যের আলো এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বচ্ছ দিবালোকে পাতার ফাঁকের জালবিহ্নীর ছায়ার প্রতিফলন পড়েছে জলের বুকে। টুকরো টুকরো আলোর কণার ঝিকিমিকি সেখানে। সত্যকৃষ্ণ হঠাৎ উঠে গিয়ে সেই তালগাছের গুঁড়িতে-বাঁধা ঘাটলায় নেমে পড়েন। আঁজলা আঁজলা জল ছিটিয়ে দেন চোখেমুখে। গণ্ডূষ দুই পানও করেন। তার পর আবার ছায়ায় এসে বসেন তিনি। মনে পড়ছে। এক এক করে সবই মনে পড়ছে। জ্বরতপ্ত চিন্তার খেই ধ'রে আবার উজান সাঁতার কাটেন সত্যকৃষ্ণ।

সেদিন শেষরাতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই সত্যকৃষ্ণ ৺পূজার ঘরে ঢুকে কপাট রুদ্ধ করেছিলেন ভিতর থেকে। হাতে তাঁর শুধু অবিনাশের দেওয়া কুষ্টিপত্রের তুলোট নয়। আরও দু'টি কাগজ তিনি বাক্স খুলে সন্তর্পণে নিয়ে এসেছেন। তাঁর আদরিণী কন্যা কল্যাণী ও সাম্প্রতিক আর একটি প্রস্তাবিত পাত্রের ঠিকুজি। এই পাত্র প্রদোষ। যথেষ্ট যোগ্য। যদিও কণিকার ভাবী স্বামী অভয়ের সমতুল কোনমতেই নয়! অন্ততঃ সত্যকৃষ্ণের বিচারের যোগে। গভীর চিন্তায় বহুক্ষণ বহু মানসাঙ্কের যোগ-বিয়োগ মিলিয়ে মিলিয়ে, বহু হিজি-বিজি আঁচড়ের সঙ্কেত পাঠ করে করে তিনি বুঝলেন, অভয়ের মত হস্তরেখা শুধু বিরল নয়, দুর্লভও। অমিত সম্মান, অভাবিত অর্থ, অমেয় প্রতিষ্ঠার রাজসিংহাসন তার জন্য অপেক্ষিত। তীক্ষ্ণ সন্ধানী তাঁর দৃষ্টিতে অভয়ের মত পাত্র পাওয়া আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া যে একই কথা এটুকু বুঝতে তাঁর দেরি হ'ল না। আর প্রদোষ? না, সেও মন্দ নয়। কল্যাণী আর কণিকার দু'জনেরই কোষ্ঠিফল মধ্যম। যে কোন পাত্রের সঙ্গেই চলে।

তবে? উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন সত্যকৃষ্ণ। এমন দুর্লভরত্ন হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবেন তিনি? তাঁর কল্যাণী! কত আদরের কন্যা কল্যাণী! একমাত্র মেয়ে। কিন্তু···অবিনাশ কি বুঝতে পারবে? অবিনাশ কি সন্দেহ করবে? সন্দেহ? তাঁরই হাতে যে অক্ষয় বিশ্বাসের অধিকার সে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়ে গেছে। কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছে অবিনাশই। সত্যকৃষ্ণ উপযাচক হয়ে তার দ্বারে যান নি। এমন দুষ্প্রাপ্য ধন যেচে তুলে দিয়ে আসেন নি। কল্যাণীর জন্মলগ্নের অশুভ ইঙ্গিতের বন্ধন যদি কাটে তবে এমন কোহিনুর দিয়েই তা কাটবে। তার জন্য দায়ী কে?

একটা আদিম লোভের প্রচণ্ড লালসায় সত্যকৃষ্ণ অস্থির হলেন। একটা দুর্ম্মদ সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন তিনি। উন্মত্ত চিন্তায় দুটো রাত দুটো দিন কাটিয়ে আবার ভোরে তিনি নেমে এসেছিলেন তাঁর বসার ঘরে। আজ আর তাঁকে ডেকে আনতে হ'ল না। নিজেই অপেক্ষায় রইলেন।

যথাসময় অবিনাশ এলেন। আজ সঙ্গে তাঁর বড়ছেলে হিমাংশু। গভীর দুশ্চিন্তায় রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিজড়ান অবিনাশের মুখ। হিমাংশুও চিন্তিত ও বিষণ্ণ।

—কি দেখলেন কাকাবাবু? মিলে গেছে ত?—অবিনাশের পরিবর্ত্তে আজ প্রশ্ন করে হিমাংশু।

সত্যকৃষ্ণের মুখে কোন কথা নেই। চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি।

—তবে?—অবিনাশ এবার উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করেন।—কিছু অমিল পেলে না কি?

সত্যকৃষ্ণ মৌন উত্তরে মাথা নাড়েন। হ্যাঁ, অমিলই পেয়েছেন তিনি।

হিমাংশু অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়,—সে কি? এদিকে আমাদের মেয়ের গহনা পর্য্যন্ত করান প্রায় শেষ। মোটামুটি আয়োজনও চলছে। শুধু শেষকথার জন্য আপনার কাছে এসেছি। না হলে ওরা ত অমত করে নি। অভয় কণিকে পছন্দ করেছিল। কিন্তু ঠাকুমার কথা সে ঠেলতে পারে না। তিনিই গোঁ ধরেছেন যে, কুষ্টিতে না মিললে বিয়ের পাকা কথা বা আশীর্ব্বাদ হবে না।

—আমি কি করব বল? ভবিতব্য। সবই তাঁর ইচ্ছা। তারা, তারা!—সত্যকৃষ্ণ উদাস দৃষ্টিতে ব'সে থাকেন। স্তম্ভিত ও বাক্যহীন হয়ে বসে থাকেন অবিনাশ ও হিমাংশুও। মাথার উপর ফুল স্পীডে ফ্যান্ ঘুরতে থাকে বন্ বন্ করে। এই ভোরেও। একটা মাছি পড়লেও বুঝি তার শব্দ শোনা যায় এমনই একটা ছুঁচ-ফেলা নীরবতা।

অবশেষে হতাশ দীর্ঘশ্বাসে অবিনাশ সখেদে ব'লে ওঠেন—এখন উপায়?

হিমাংশু সায় দিয়ে বলে,—আপনিও ত মেয়ের বাপ, কাকাবাবু। সবই বোঝেন। মনোমত একটা পাত্র জোগাড় করা কি ভীষণ কাণ্ড। উঃ। আর অত সময়ই বা কোথায়? অনেক বলে ক'য়ে সাহেবকে রাজি করিয়ে মাসখানেকের ছুটির বন্দোবস্ত করেছিলাম।

—উপায় একটা করতেই হবে বাবা—সত্যকৃষ্ণ নির্লিপ্ত উত্তর দেন। আর খানিকটা মৌন অবসর কাটে। পরিশেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস টেনে সত্যকৃষ্ণ বলেন, - হাঙ্গামের কথা ত বটেই। তবে আমি একটা কথা বলতে পারি। তোমরা ভেবে দেখতে চাও ত দেখতে পার।—সত্যকৃষ্ণের কণ্ঠ আবার উদাসমন্থর।

—কি? কি? হাতে কোন ভালো পাত্রের প্রস্তাব আছে নাকি? অবিনাশ ও হিমাংশু একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন ও সাগ্রহ প্রশ্ন করেন।

তার পর ছেদ টেনে টেনে, একটু একটু অলঙ্কারের রং চড়িয়ে, আগ্রহ ও কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে সত্যকৃষ্ণ সেদিন প্রদোষের সম্বন্ধ দিয়েছিলেন উৎকণ্ঠিত পিতাপুত্রকে।

না, প্রদোষও ভালই। ভাল ছেলে। ভাল চাকুরি করে। বড় রকমের দায়িত্ব বন্ধনহীন। দেখতেও খারাপ নয়। তার স্বোপার্জ্জিত গুণে যদি কোন ঘাটতি থাকে তবে তা পূর্ণ হয়েছে পৈতৃক পরিচয়ে। অবিনাশ ও হিমাংশু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব সংবাদ নোটবুকে লিখে নিলেন। সত্যকৃষ্ণও বিশেষভাবে বোঝালেন।

অবশেষে আসল প্রসঙ্গে এলেন সত্যকৃষ্ণ। সবই গ্রহের ফের! কি আর বলব ভাই। তোমরা আবার কি মনে করবে।

—সে কি কথা কাকাবাবু, অদৃষ্টের উপর কার কথা চলে? বলুন কি বলবেন। হিমাংশু সাগ্রহে বলে।

—ছাখ, কুষ্ঠিতে যখন মেলে নি, তার উপর ত হাত নেই আমার—সত্যকৃষ্ণ মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করলেন। (কে বলে অদৃষ্ট? তিনি স্বচক্ষে স্পষ্টই দেখেছেন হীরের টুকরো ছেলে অভয়ের জলজ্বলে ভবিষ্যৎ। দীর্ঘ পরমায়ু। সুদীর্ঘ সুখের জীবন।) বলছিলাম কি—ইয়ে—আবার ইতস্ততঃ করেন সত্যকৃষ্ণ।

—অত দ্বিধা করছ কেন তুমি? কি বলতে চাও বলই না। অবিনাশ আশ্বাস দেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একটি পছন্দসই প্রস্তাব হাতে পাওয়াতে তাঁর মন অনেকটা শান্ত। ভাগ্যিস এসেছিলেন তাই না ফাঁড়া কাটল। তুমি কি কল্যাণীর সঙ্গে অভয়ের পাল্টা প্রস্তাব করতে চাও?

—কি করে আর বলি নিজমুখে ভাই—কুণ্ঠিত হন সত্যকৃষ্ণ।

—একেই বলে ভাগ্যের লিখন কাকাবাবু। কে খণ্ডাবে বলুন। হিমাংশু উল্টে সান্ত্বনা দেয় সত্যকৃষ্ণকে। কল্যাণী আমাদেরও বোন। ওদের যদি আপত্তি না হয় তবে কল্যাণীর সঙ্গে অভয়ের বিবাহ প্রস্তাব করু· এত খুব ভাল কথা।

—তুমি বাবা সাহায্য কর।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। দুই বাড়ীতে একই দিনে বি[illegible] লাগিয়ে দিন কাকাবাবু। খুব আনন্দের কথা হবে। আপনার ঘর, আপনার মেয়ে কি ফ্যালনা?

মনে আছে সেদিন সারা সকাল তিনজনে ব'সে এ[illegible] আলোচনাই হ'ল। অভয়ের সঙ্গে কল্যাণীর আ[illegible] প্রদোষের সঙ্গে কণিকার বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে। তার প[illegible] হিমাংশু আর অজয় দুই বাড়ি ছুটোছুটি করে এই পাল্[illegible] বিবাহ স্থির করেছিল। কোন পক্ষেই আপত্তি হয় নি[illegible] বরং এত বড় পণ্ডিত-বংশে কাজ করতে পেরে খু[illegible] হয়েছিলেন অভয়ের ঠাকুমা। মাঘী পূর্ণিমার শুক্লাতিথি[illegible] ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়, আলোতে, রসুনচৌকিতে, শঙ্খে গানে, আনন্দে দুই পরিবারে দু'টি বিবাহ সমাধা হ[illegible] গিয়েছিল। পরদিন গাঁটছড়া বেঁধে বিদায়ের আগে কল্যাণী আর অভয় যখন তাঁকে প্রণাম করতে এসেছি[illegible] তখন একটা দীর্ঘ তৃপ্তি আর আনন্দে তিনি বলে উঠে[illegible] ছিলেন - তারা, তারা, জয় মা!

তার মধ্যে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা কি সেদিন ছিল না? কোন গ্লানি, কোন সংশয়?

বেলা দশটা বাজে। আজ আর রান্না-খাওয়ার কো[illegible] তাড়াই যেন এ বাড়ীতে নেই। একটা কর্ম্মব্যস্ত চলমা[illegible] জীবন আজ তার সব গতি হারিয়ে এখানে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে সভয়ে। তবু নিতান্ত করণীয় প্রাত্যহিক কর্ম্মের চাকা কোনমতে ঠেলে ঠেলে মুখের গ্রাসের ব্যবস্থা করছে বাড়ীর বহুদিনের পুরানো পাচক ও ভৃত্য মিলে। বৌমা উমা জোর করে দরজা খুলিয়ে করুণাময়ীকে টেনে বার করেছে। সযত্নে তাঁর মুখ ধুইয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে, বিছানায় শুইয়ে পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হয়েছে। এখনও আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে কোন খবরাখবর করা হয় নি। টেলিফোনের ডায়রেক্টরী হাতে নিশ্চুপ নিথর হয়ে টেবিলের পাশের চেয়ারে অজয় বসে আছে। ফোনের উপর হাত দিয়ে। ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিচিত স্বজন-মহলে এ সংবাদ পরিবেশন করার মত মনোভাব বা মানসিক শক্তি কোনটাই যেন সে আর আজ খুঁজে পাচ্ছে না। কল্যাণী তার বড় আদরের বোন।

সকলেরই ধারণা ছিল, সত্যকৃষ্ণ পূজোর ঘরেই আছেন। থাকুন তিনি সেখানে যতক্ষণ খুশি। এ প্রচণ্ড শোকভার সহ্য করার অবকাশ তিনি গ্রহণ করুন যতক্ষণ পারেন। তাঁকে কেউ ডাকাডাকি করে বিরক্ত করতে চায় নি

প্রথমে। কিন্তু বেলা যখন ন'টা থেকে দশটা, তার পর সে ঘর ছেড়ে এগারটার ঘরের দিকে চলল তখন কর্ত্তাবাবুর জন্য উদ্বিগ্ন হ'ল যদু। একবার খোঁজ নিতে হয়। পূজো করতে করতে যদি মূর্চ্ছোই যান, কে জানবে?

পা টিপে টিপে উপরে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েই সে দুদ্দাড় করে নীচে নেমে আসে,—দাদাবাবু, দাদাবাবু গো! কর্ত্তাবাবু ঘরে নেই। ঘর খালি।

—সে কি রে? বলিস কি?—অজয় ধড়মড় করে উঠে পড়ে।—কোথায় যাবেন তিনি এত সকালে? বিশেষ করে আজকের দিনে?—অজয় চিৎকার করে ডাকতে থাকে,—ছোটে সিং! দারোয়ান! ড্রাইভার! ঠাকুর!

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে সকলে। না, না, কেউ দেখে নি তাঁকে। শুধু পাচক তাঁকে একবার ভোরবেলা নীচে নামতে দেখেছিল। যদু হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।—কি হবে দাদাবাবু? প্রচণ্ড এক ধমক দেয় তাকে অজয়। তার পর এক-একজনকে এক-একদিকে খুঁজতে পাঠিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে আদেশ করে গাড়ী বার করতে। নিজেও খুঁজবে সে। সে জানে কোথায় কোথায় তার বাবা প্রাতর্ভ্রমণে যান। কোন্ পথ দিয়ে। ঝিমিয়ে-পড়া নিস্তেজ শোকাচ্ছন্ন বাড়ীতে নতুন করে উত্তেজনা জাগে।

অবশেষে বহু খোঁজাখুঁজির পর মধ্যাহ্নবেলায় সত্যকৃষ্ণের সন্ধান পায় অজয় লেকের অপর পাড়ে। চোখ দুটো তাঁর আগুনের মত জ্বলছে। উস্কো-খুস্কো চুল। এক পাশে এক রাশ ঢিল জড়ো ক'রে একটার পর একটা তিনি জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছেন। আর কি যেন বকছেন বিড়বিড় করে।

ড্রাইভার ও চাকরের সাহায্যে একরকম পাঁজাকোল করে অজয় তাঁকে তুলে নিয়ে এল।

তার পর সারাটা দিন প্রলাপমত্ত রোগী, ডাক্তার, আইসব্যাগ, মর্ফিয়া করে পাগলের মত কাটল সকলের। বিকেলের দিকে শান্ত হয়ে সত্যকৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়লেন ওষুধের ঝোঁকে। নিরিবিলি জানালাবন্ধ ঘরে তাঁকে ঘুমোতে দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিলেন। যাবার সময় সান্ত্বনা দিয়ে বলে গেলেন,—মনে হচ্ছে আর কোন হাঙ্গামা হবে না। যদি হয় তৎক্ষণাৎ ফোন করবেন। বিদায় নিলেন ক্লান্ত প্রতিবেশীদের দল। আর সমব্যথী স্বজনেরাও। প্রতিবেশীরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের খবর দিয়েছিলেন। কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংবাদ বহন করে কল্যাণীর শ্বশুরবাড়ী হতে গতকাল সন্ধ্যায় মাত্র সেই অবিশ্বাস্য টেলিগ্রামখানা এসেছিল সে কথা আর নিজমুখে বলতে হয় নি অজয়কে। ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, মৌখিক সমবেদনার আহা উহু শুনে শুনে।

সন্ধ্যায়ও শান্ত হয়ে ঘুমোলেন সত্যকৃষ্ণ। অবসন্ন করুণাময়ীকে পাশে নিয়ে এক ধারে অজয় অন্য ধারে উমা সে রাতে বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড সোরগোল উঠল, আগুন! আগুন!

কোথায়? কোথায়? সচকিত ত্রস্ত পদে যার যার ঘর হতে বার হয়ে এল এ বাড়ীর সব ক'টি প্রাণী। কি সর্ব্বনাশ! বিছানায় সত্যকৃষ্ণ নেই। আগুন জ্বলছে এ বাড়ীরই ছাদের উপর। পাশাপাশি বাড়ীর সব ক'টি জানালা খুলে গেছে। ভয়ার্ত্ত, আতঙ্কিত পদে ছুটতে ছুটতে ছাদে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

বহ্ন্যুৎসব করছেন সত্যকৃষ্ণ স্বয়ং। পরেছেন সেই লাল পট্টাম্বর। শাক্ত-মন্ত্রের বীজ লেখা লাল নামাবলী তাঁর গায়ে। রুদ্রাক্ষের মালা হাতে, গলায়। যেন কালভৈরব বসেছেন শক্তি উপাসনায়। সামনে হোম-কুণ্ডের মত দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে। তারই প্রতিফলন তাঁর দুই চোখে। যত তন্ত্র, মন্ত্র, পুঁথি, গ্রন্থ একটি একটি করে সমিধ্ অর্পণের মত আহুতি দিচ্ছেন সেখানে। মুখে একটি মাত্র কথা—দু'য়ে দু'য়ে চার হয় না, পাঁচও হয়। কেন হয়?

ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে ঊর্দ্ধমুখে। উপরে সেই একই নীলাম্বর। গ্রহ আর নক্ষত্রের সার। স্তব্ধ নীহারিকা। তারারা নির্ব্বাক্।

তারা-রা কি বোবা হয়ে গেছে?

# বিস্মৃত-বাঙালী—আশুতোষ চৌধুরী

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্য করে যে কয়টি বাঙালী মনস্বীর সম্প্রতি কিছুটা স্মৃতি-আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রাক্তন বিচারপতি স্বর্গগত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটা দেশের বা জাতির স্মরণীয় চরিত্রগুলি ইতিহাসের একটি প্রধান উপাদান। এ সকল চরিত্র সেই কারণেই দেশের লোকের পক্ষে, বিশেষ করে যুব-সমাজের পক্ষে অবশ্য-অনুশীলনের বিষয়। জন্ম-শতবার্ষিকী এই প্রকার অনুশীলনের উপলক্ষ্য সৃষ্টি ক'রে থাকে।

দুঃখের বিষয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে যে সামান্য উৎসবটুকুর আয়োজন করা হয়েছিল সেটুকু এই বিস্মৃত মহৎ বাঙালীটির চরিত্রের প্রায় কোনও পরিচয়ই প্রকাশ করতে সক্ষম হয় নাই। আশুতোষ ছিলেন এই শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রাক্তন উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবতঃ সেই কারণেই নিতান্ত একটা দায়িত্ববোধ বশতঃই বর্ত্তমান পরিষদ-কর্তৃপক্ষ এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ বনেদী জমিদার ব্রাহ্মণ বংশ উদ্ভূত আশুতোষ ও তাঁহার কয়েকটি ভ্রাতা, সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে 'বীরবল' ছদ্মনামে প্রমথ চৌধুরী বাংলার সাহিত্যে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাহা বাঙালীর ও বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ্ ব'লে সযত্নে ও শ্রদ্ধাসহকারে আদৃত হবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহেরই অবকাশ নাই। আশুতোষ নিজে ছিলেন অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তখনকার দিনের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের রেওয়াজ অনুযায়ী তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় সুরু করেন। আইনজীবী হিসাবে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠা তৎকালীন সরকারী রীতি অনুযায়ী উত্তরকালে তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এটাও ছিল তাঁহার বাহিরের পরিচয় মাত্র।

আশুতোষের সত্যকার পরিচয় পেতে হলে ভারতের তথা বাংলা দেশের রাষ্ট্রচিন্তার জগতে আনুমানিক ১৯০০-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যে বিপ্লবের প্রথম উন্মেষ ঘটে সেই সময়কার ইতিহাসে প্রবেশ করা অবশ্য প্রয়োজন। আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা ধারণা প্রচলিত রয়ে গেছে যে, দেশের রাষ্ট্র-স্বাধীনতার সাধনা সুরু হয় ভারতীয় জাতীয় সংসদ বা Indian National Congress-এর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। অবশ্য আর একটি দল সিপাহী বিদ্রোহই যে ভারতের রাষ্ট্রস্বাধীনতার প্রাথমিক প্রচেষ্টা একথাও প্রচার করতে সুরু করেছেন। ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সিপাহী বিদ্রোহের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বস্তুতঃ তখনকার দিনের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও রাষ্ট্রচেতনা ব'লে কোনও বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং শিক্ষিত ভারতবাসী সাধারণতঃ মনেপ্রাণেই ছিলেন আন্তরিকভাবে ইংরেজের অনুরাগী ও সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের অনুকরণ-প্রয়াসী। যে নিখিল ভারতীয় সার্ব্বজনীন জাতীয়তাবোধের মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষ ভারতবাসীর মনে ঘটতে পারত তার সৃষ্টি যে তখনও হয় নাই এর ঐতিহাসিক প্রমাণের কোনও অভাব নাই।

বস্তুতঃ সিপাহী বিদ্রোহ দমন করবার পর ভারতের শাসনভার যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি স্বয়ং ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখনই ভারতে এক-জাতিত্বের প্রাথমিক উপাদানের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ রাজশক্তি সরাসরি এদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করবার পর দুইটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। এর প্রতিশ্রুতি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এ দেশের শাসনভার গ্রহণসূচক প্রচারপত্রে নিবদ্ধ ছিল দেখতে পাওয়া যাবে। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা দ্বারা ইংরেজের শাসনাধীন সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড কেন্দ্রীয় শাসন সংস্থার (unitary admini-

stration ) দ্বারা বিধৃত করা হয়। এ ভাবে একদিকে বিভিন্ন ভাষাভাষী, নানা ধর্ম্মমতাবলম্বী এবং বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান অনুসারী সকল ভারতবাসীকেই একটি অখণ্ড নিখিল ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ও প্রণালীর অধীন করে দেওয়া হয়। ভারতের পূর্ব্বেতিহাসে কখনও এমনটা ঘটে নাই। হিন্দু রাজত্বকালে কোনও কোনও সম্রাট বা রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে ভারতের বহু বিস্তৃত অংশ কখনও কখনও এক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সকালের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রণালী বা আদর্শ এমন ছিল যে, একটি অখণ্ড ও কেন্দ্রীভূত শাসন সংস্থা গ'ড়ে তোলবার সুযোগ বা অবস্থা ছিল না। মুসলমান আমলেও সাম্রাজ্য বিস্তারের কৌশল মূলতঃ প্রায় একই প্রকারের ছিল। ফলে ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে এদেশে একটা অখণ্ড নিখিল ভারতীয় শাসন সংস্থা দ্বারা সমগ্র দেশকে একসূত্রে বিধৃত করবার কোনও উপাদান বা সুযোগ গ'ড়ে ওঠে নাই।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রথম বিষয়টির অনিবার্য্য বিকাশ-রূপেও এই সময় থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি মাত্র সার্ব্বজনীন শাসনব্যবস্থার ( universal rule of law ) দ্বারা বিধৃত করা হয়। এই দুইটি ব্যবস্থা পরস্পর পরিপূরক এবং এর ফলে জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীই আইনের নিকট সমপর্য্যায়ভুক্ত ও সমকক্ষ বলে স্বীকৃত হন। এদেশের প্রধানতঃ বর্ণাশ্রম-অবলম্বী সমাজে এইটি ছিল সম্পূর্ণ নূতন ও অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা।

এই সঙ্গে আর একটি তৃতীয় ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরেজ রাজসরকারের আপন প্রয়োজনে ক্রমে ইংরেজী ভাষা সর্ব্বভারতীয় সরকারী ভাষা হিসাবে আবশ্যিক ভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে যে নূতন ব্যবস্থার ধারা ইংরেজ শাসনাধীনে এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় তার একটি বিশিষ্ট ফলস্বরূপ শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই অনিবার্য্যভাবে পরস্পরের অনেকটা নিকটে এসে পড়েন। এই নৈকট্যের গতিতে ইংরেজ আমলের প্রতিষ্ঠিত এদেশের নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিশিষ্ট অবদান ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এ দেশে বিলাতী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। এর পূর্ব্বে ইংরেজের আওতায় যে সকল শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন বিভিন্ন সময়ে করা হয় তার উদ্দেশ্য ও প্রণালী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিতে এ দেশে অবস্থিত ইংরেজদিগের এতদ্দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ক্রমে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতী শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও প্রচার এই দুইএর জন্যই একটা প্রবল চাহিদা জেগে ওঠে। এ দেশের মেকোলে প্রমুখ উচ্চপদস্থ ও উচ্চশিক্ষিত রাজ-কর্ম্মচারীদের মধ্যেও এই চাহিদার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া যায়। এই ভাবেই বিলাতী পার্লামেণ্টের দু-একটি বিশিষ্ট সদস্যের প্রবল প্রতিবাদ ও বাধা সত্ত্বেও এ দেশে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় যুগোপযোগী বিলাতী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমে এই ব্যবস্থা কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া নিখিল ভারতীয় বিস্তার লাভ করে।

বস্তুতঃ ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার বিচারে এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র-চেতনা ও স্বাজাত্যাভিমান গড়ে ওঠে ক্রমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন ও ইতিহাসের সহিত পরিচয় থেকে। বহু শতাব্দীর বিদেশী দাসত্বে অভ্যস্ত ভারতবাসীর মনে যে রাষ্ট্রচেতনা ও জাতীয়তাবোধ ইংরেজের আমলে ক্রমে গড়ে উঠেছিল তার পিছনে যে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রেরণা ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। বিলাতী শিক্ষা ও কৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটলে এ দেশে রাষ্ট্রচেতনা ও জাতীয়তাবোধ অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও সহজে গড়ে উঠত কি না নিতান্তই সন্দেহের বিষয়। তবে এ কথাও সত্য যে, ইংরেজ রাজত্বকালে সমগ্র ভারতবর্ষের এক শাসন ব্যবস্থা ও আইন শৃঙ্খলার বিধৃতি ও এক সরকারী ভাষা পারস্পরিক ব্যবহারের ফলে গড়ে-উঠা নৈকট্য এই রাষ্ট্রচেতনা ও জাতীয়তা-বোধ গড়ে তুলতে যে প্রভূত আনুকূল্য করেছে তাও অনস্বীকার্য্য সত্য। বস্তুতঃ এই তিনটি উপাদানের উপরেই মূলতঃ উত্তরকালে আমাদের অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনা ও জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদের জ্ঞান এতে আনুকূল্য ও সহায়তা করে।

কিন্তু এই চেতনা বোধ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যখন ভারতীয় জাতীয় সংসদের পত্তন করা হয় তখন ইহা যে রাষ্ট্রচেতনা বা স্বাজাত্যবোধের ফলে হয়েছিল তা কোনও মতে বলা চলে না। এর পূর্ব্বে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলিকাতা ছাত্রসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এরও পূর্ব্বে ভারতীয় জমিদারগোষ্ঠীর মুখপাত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। এর

পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথের দ্বৈত নেতৃত্ব ও প্রচেষ্টায় ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয় এবং এই ভারত সভার উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম জাতীয় সম্মেলন বা National Conference অনুষ্ঠিত হয়। যতদূর দেখা যায় এই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সম্মেলনেই প্রথম 'ন্যাশনাল' শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বোধ হয় খানিকটা এরই অনুসরণে দুই বৎসর পরে ভারতীয় জাতীয় সংসদের প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে অ্যালেন হিউম এর নামকরণ করেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। কিন্তু তখনও যে আমাদের দেশের লোকের মনে, শিক্ষিত নেতৃ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে কোনও সত্যকার রাষ্ট্রচেতনা ও জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হয় নাই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদেশী ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সমকক্ষতার একটা দাবী অবশ্যই গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল এবং একটা ক্ষীণ স্বাজাত্যাভিমানের বোধও গড়ে উঠেছিল কিন্তু এর কোনটাই একটা প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রচেতনার বা নিখিল ভারতীয় একজাতিত্বের বোধে বিকাশ লাভ করে নাই। বস্তুতঃ ইংরেজ রাজত্ব প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেকার সময়ের তুলনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক দূরত্ব অনেকটা কম হলেও ঘনিষ্ঠ নৈকট্যের সৃষ্টি তখনও হয় নাই। বহু বর্ণ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই দেশে ইহা সহজে হবারও ছিল না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় সম্মেলনের উপলক্ষ্যেই এদেশে সর্ব্বপ্রথম একটি নিখিল ভারতীয় সম্মেলন বা জমায়েতের অনুষ্ঠান হয়। পরে জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টির পর থেকে প্রতি বৎসরই এইরূপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আপনার সম্যক্ ও সামগ্রিক পরিচয় পেতে সুরু করে। একদিক্ দিয়ে একে রাষ্ট্রসাধনার পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরা চলে। কিন্তু ইহা প্রস্তুতিমাত্র, সাধনক্ষেত্রে পৌঁছতে তখনও অনেক বাকী ছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আনুমানিক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস সমগ্র শিক্ষিত ভারতবাসীর একমাত্র মুখপাত্র বলে বিনা প্রতিবাদে স্বীকৃত হয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে ইংরেজ রাজ-সরকারের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধাসূচক সম্বন্ধ স্থাপনের ও পরস্পরের গুণগ্রাহিতার ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই কালে কংগ্রেসের প্রায় সকল চেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল উপযুক্ত শিক্ষিত ভারতবাসীকে রাজদরবারে শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমকক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত করতে। এর খানিকটা ফলও ফলেছিল। ইংরেজাধীন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে এদেশী রাজকর্ম্মচারীদের সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠা উভয়েই ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কংগ্রেস প্রধানদের অন্যতম স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী আনুমানিক ঐ সময়েই বিলাতী পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচিত সদস্য হিসাবে ইংরেজদের খাস দরবারে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কোনও একটি বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীকে গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতির ( executive council ) সদস্য হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য আবেদন-নিবেদন করছিলেন ও তার সাফল্যের খানিকটা আশাও পেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন কংগ্রেসের নেতৃ-গোষ্ঠী প্রধানতঃ ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ। এরা প্রধানতঃ প্রবল শক্তিমান ইংরেজ রাজদরবারের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীর জন্য নূতন নূতন সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে ব্যস্ত ছিলেন। এদের এই আবেদন-নিবেদনের দীনতা যুবসম্প্রদায়ের নিকট ক্রমেই অধিকতর আপত্তি-জনক ও ঘৃণ্য বলে মনে হতে সুরু করেছিল। বাংলা দেশেই প্রথম কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুব-সম্প্রদায়ের এই প্রতিবাদ মূর্ত্ত হয়ে উঠতে সুরু করে। বস্তুতঃ এই প্রতিবাদকেই কেন্দ্র করে একটি নূতন চিন্তা-প্রবাহ একটি ছোট দলকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে সুরু করে। এই দলটির প্রায় মর্ম্মস্থলে ছিলেন দুইটি অসাধারণ ব্যক্তি আশুতোষ চৌধুরী ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব; এঁদের চিন্তার প্রকাশের বাহন ছিল বিপিন-চন্দ্র পালের ওজস্বিনী লেখনী! বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা ছিল এঁদের প্রচার বাহন। 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রথম প্রকাশ হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে রচনা প্রকাশ করা হয় তা তখনকার দিনের পক্ষে বিস্ময়কর ও অসীম সাহসের পরিচায়ক। এঁরা লেখেন —"এদেশে আমাদিগের নেতারা এবং তাহাদের লণ্ডন-বাসী প্রতিনিধিগণ ভিক্ষাবৃত্তির নূতন নামকরণ করিয়া-ছেন তাঁহারা ইহাকে বলেন 'অ্যাজিটেশন্।' আমরা বলি এই ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িতে হইবে। বস্তুতঃ আমরা প্রকৃতপক্ষে কি চাই তাহা স্পষ্ট ভাবে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমরা কি রাজদরবারে উচ্চপদ কামনা

করি? আমরা বলি, নহে। আমরা কি প্রার্থনা করি যে, ভারতবাসীকে প্রাদেশিক গবর্ণর কিংবা ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিয়োগ করা হোক? আবারও বলি—নহে। আমরা চাই সেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার অধিকার যাহার ফলে রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বা গবর্ণর এমন কি গবর্ণর জেনারেল যে নীতির অনুসরণে রাজকার্য্য চালাইতে বাধ্য হন সেই নীতিটুকু রচনা ও নিয়মিত করিবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্তাধীন হবে। এই ভাবে আমরা যদি নিজেদের ঘরের মালিক নিজেরাই হইতে পারি, ইংরেজ ভৃত্য নিয়োগ ও পরিচালনা করিতে আমাদিগের অসুবিধা হইবে না।"

(মূল ইংরেজী—"Our leaders here and their agents in London have given a new name to begging, they call it agitation, we must discard this method of political mendicancy. We must be clear in our minds as to what it is we really desire. Do we desire Indians to be appointed in high offices? We say, no. Do we desire Indians to occupy the position of Governors of provinces or that of Governor-General of India? We reiterate, no. We desire to earn the right to determine the policies that this high officers under Government, the Governors of provinces and the Governor-General of India have to carry out into effect. If we are masters in our own homes we can afford to employ British servants.")

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই ঘটনাটি ঘটে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হবার চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে। অরবিন্দ তখনও বরোদা ছেড়ে কলিকাতায় আসেন নাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে প্রবল রাষ্ট্র-চিন্তানায়কের গোষ্ঠী বাংলা দেশে গড়ে উঠছিল তার তখনও সৃষ্টি হয় নাই। বন্দেমাতরম্, যুগান্তর বা সন্ধ্যা পত্রিকার প্রকাশ তখনও সুরু হয় নাই। এই পরবর্ত্তীকালে দীপ্তিমান ঔজ্জ্বল্যের প্রথম বর্ত্তিকাপ্রজ্জ্বলিত করে এই 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা। এই নতুন চিন্তাপ্রবাহের ধারা যেই গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আপনাকে প্রকাশ ও বিস্তীর্ণ করতে সুরু করে তার মর্ম্মস্থলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রধান ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়। এক দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে এই সময়েই এবং 'নিউ ইণ্ডিয়া'কে কেন্দ্র করেই ভারতের সত্যকার রাষ্ট্রবোধ ও জাতীয়তার সাধনা সর্ব্বপ্রথম সুরু হয়। সেই দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আমাদের দেশের রাষ্ট্রসাধনার যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত গোষ্ঠীর প্রধানদের অন্যতম ছিলেন আশুতোষ।

এই সত্যটা আরও স্পষ্ট করে প্রতিভাত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে আশুতোষের ভূমিকায়। এই সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন আশুতোষ। তাঁর সভাপতির ভাষণে তিনি যে সকল কথা বলেন তার অধিকাংশই পরবর্ত্তীকালে আমাদের দেশের স্বদেশসেবার বীজমন্ত্ররূপে এবং সার্ব্বজনীন ভাবে শ্রদ্ধা সহকারে গৃহীত হয়। এই ভাষণে তিনি বলেন, "ভিক্ষা বা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কোনও জাতি আপনার স্বাধিকারে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। একমাত্র আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরশীলতার (Self-reliance and self-determination) দ্বারাই মানুষ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদিগকেও সেই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে।" তিনি আরও বলেন, "ভারতবর্ষের জীবনের মূল প্রতিষ্ঠিত আছে গ্রামাঞ্চলে। গ্রামবাসীদিগকে উপেক্ষা করিয়া ভারতের স্বাধীনসত্ত্বার প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব নহে অতএব আমাদিগের রাষ্ট্র সাধনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে গ্রামে। সমগ্র দেশকে লইয়া এই সাধনার পথে অগ্রসর হইলেই তবে সার্থকতার দরজায় পৌঁছানো সম্ভব হইবে।" মনে রাখতে হবে, যে কালে আশুতোষ এই ভাষণ দেন তখন পর্য্যন্ত এ দেশে সকল রাষ্ট্রচিন্তা বা কার্য্যকলাপ কেবলমাত্র শহুরে-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সমগ্র দেশের জনগণকে নিয়ে একত্রে এই সাধনায় অগ্রসর হতে হবে এমন উপলব্ধি পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনও কার্য্যকরী প্রণালী অবলম্বিত হতে দেখা যায় নাই। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে মহাত্মা গান্ধীই একমাত্র সর্ব্বপ্রথম আশুতোষের এই স্বপ্ন ও আদর্শ সার্থক করে তুলতে প্রয়াসী হন।

আশুতোষ মূলতঃ ছিলেন চিন্তানায়ক। সভাসমিতি বা আন্দোলনাদিতে তিনি কখনও কোনও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। সেই কারণেই সাধারণ্যে তাঁর পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকট হতে পারে নাই। যতদূর জানা যায়, রাষ্ট্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে বর্দ্ধমান সম্মেলনে সভাপতিত্বই সাধারণ্যে তাঁর একমাত্র ভূমিকা। স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও একমাত্র জাতীয় শিক্ষাপরিষদ

প্রতিষ্ঠার ব্যাপার ব্যতীত তাঁর আর কোনও জন-নেতৃত্বের ভূমিকা দেখা যায় না। আশুতোষের নেতৃত্ব ছিল চিন্তার নেতৃত্ব। আমাদের দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের ক্ষেত্রে যে সকল মনস্বী অন্তরালে থেকে আমাদের চিন্তাকে জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আশুতোষ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। সেই কারণে আশুতোষের জীবনী অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, তাঁর স্থান দেশের সত্যকার রাষ্ট্রগুরুদের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখও বিশেষ প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের চিন্তার সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী ও বাংলা দেশ সমগ্র ভারতবর্ষের উপর অবিসম্বাদী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এককালে সমগ্র ভারতবর্ষ এই সত্যটুকুকে সানন্দে ও শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আজ বাংলা দেশের সেই প্রতিষ্ঠা নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর সেই পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতির আলোচনা ও অনুশীলন আজও তাকে নূতন প্রেরণা ও শক্তি যোগাতে পারে। যাঁরা বাংলা ও বাঙ্গালীকে এই অসাধারণ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁদেরই বিশিষ্ট একজন ছিলেন আশুতোষ। আজ বাঙ্গালী যদি নূতন করে তাঁর ও অনুরূপ অন্যান্যদের চরিত্র কাহিনী শ্রদ্ধাসহকারে ও গভীর ভাবে অনুশীলন করে তবে হয়ত তাঁরা অগ্রসর হবার পথ খুঁজে পাবেন।

---

# বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

আমাদের দু'খানা পুস্তিকা (pamphlet) নিয়মিতরূপে প্রচারিত হ'ত—বাংলা ভাষায় 'স্বাধীন ভারত' নামে এবং ইংরেজীতে Liberty (লিবার্টি) নামে। ছাপা এবং সারা ভারতবর্ষে প্রচার সবই গোপনে হ'ত।

কলকাতার বর্তমান আমহার্ষ্ট রো'তে সুরেন্দ্র বসু নামে একজন অবস্থাপন্ন সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের সমিতির বিশ্বাসভাজন গৃহী-সভ্য বাস করতেন। তার সঙ্গে অনেক সময় আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। তার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা ছিল। কালীপদ রায় নামে (প্রকৃত নাম উপেন্দ্র রায় চৌধুরী) একজন গৃহত্যাগী সভ্যকে এখানে নিযুক্ত করা হয়। তিনিই ছাপাখানার তত্ত্বাবধান করতেন। আমাদের সমস্ত গোপন পুস্তিকাদিই এই ছাপাখানায় মুদ্রিত হ'ত। কালীপদবাবু পরে রাজাবাজার বোমার মামলায় ধৃত হন। মকদ্দমায় খালাস পান, বটে কিন্তু তাকে কারাগারেই পুনরায় অন্তরীণ করা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়ে বহু বৎসর সমিতির কাজ করেছিলেন।

'স্বাধীন ভারত' সমস্ত বাংলা দেশে এবং 'লিবার্টি' সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে একই তারিখে এবং একই সময়ে একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বিতরণ করা হ'ত। এতে সমিতির শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার পরীক্ষা হ'ত। সারা ভারতে একই দিনে 'লিবার্টি' প্রচারিত হওয়ায় সমিতির ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত এবং লোকের মনে সমিতির প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পেত। ফলে সমিতির সভ্যদের মনেও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হ'ত।

অনুশীলন-সমিতির মুখপত্র এই দু'খানা কাগজে সমিতির আদর্শ প্রচারিত হ'ত এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে আহ্বান করা হ'ত।

'স্বাধীন ভারতে' নিয়মিত প্রধান লেখক ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ও মাঝে মাঝে লিখতেন। 'লিবার্টি' কাগজে মাঝে মাঝে লিখতেন রাসবিহারী বসু। এই কাগজেই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের অনতিপূর্বে সমস্ত বিশ্বের রাজনীতি ও বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৈদেশিক ও সমর নীতির পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেন এবং সকলকে আগতপ্রায় বিশ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেছিলেন, জার্মানী ও তার মিত্রবর্গের সঙ্গে ব্রিটিশ ও তার মিত্রবর্গের

যুদ্ধ যে অনতিবিলম্বে ঘটবে তা অবশ্যম্ভাবী। এবং পরাধীন জাতিগুলিকে এখন থেকে আগতপ্রায় যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এই দুটি সমিতির মুখপত্র ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় সমিতির হাতে-লেখা কাগজ ছিল। সমিতির সভ্যরাই তাতে লিখতেন এবং সকলেই তা সমবেত বা পৃথক পৃথক ভাবে পাঠ করতেন।

কলকাতা থেকে বার হ'ত 'সাধক'। অনেক সভ্য ছাড়াও এ কাগজেও নলিনীকিশোর গুহই নিয়মিত লিখতেন এবং কাগজের তত্ত্বাবধান করতেন। এ কাগজের প্রচ্ছদপট আঁকতেন শ্রীযুক্ত অতুল বসু। তিনি তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র এবং অনুশীলন-সমিতির সভ্য। গুপ্ত-সমিতির কেন্দ্রে তিনি নিয়মিত আসতেন। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি অন্যতম এবং বোধ হয় সমিতি গঠন ব্যাপারে বাড়ীর লোকের কার্যকলাপ কোন কোন ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটিয়েছে তার কথাই এখন বলব।

লাঙ্গলকন্দ গ্রামে এক ধনী গৃহে ডাকাতি হয়—অংশ গ্রহণ করেন বীরেন চ্যাটার্জি, অমৃত সরকার, ললিত পাড়ুরী, তারাপ্রসন্ন দে, নলিনী ঘোষ, প্রভৃতি। এ গ্রাম নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী হওয়ায় সাবধানতার জন্য দু'জন লোককে এক রাস্তার মোড়ে রিভলবার নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত রাখা হয়। তারা লোক যাতায়াত বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

এই ডাকাতিতে প্রাপ্ত মাল—বিশেষ করে স্বর্ণালঙ্কার এবং বরিশাল বীরাঙ্গল গ্রামে ডাকাতিলব্ধ মাল এবং হিসাবপত্র ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযামিনী-মোহন দাশের উয়ারীস্থ বাসভবনে রাখা হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য জেলা থেকে প্রেরিত ত্রৈমাসিক বিবরণী এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্রও এ বাড়ীতে ছিল।

এই যামিনীমোহন দাশের বড় ছেলে সত্যেন্দ্রমোহন দাশ ও মেজ ছেলে গিরীন্দ্রমোহন দাশ সমিতির সভ্য ছিল। সত্যেন্দ্র অনেকদিন থেকেই সমিতির সভ্য, তা ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী। সুতরাং নিরাপদ মনে করে তার নামে সমিতির গুপ্ত চিঠিপত্র আসত। গোয়েন্দাদের সন্দেহ না জন্মে এজন্য সত্যেন্দ্র সমিতির সভ্যদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করত না এবং নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে ধূমপান করত এবং খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদে-লিপ্ত ছেলেদের সঙ্গে মিশত। এটা আমরা ভালই মনে করতাম। এ প্রসঙ্গে ঢাকার প্রসিদ্ধ বিপ্লবী খগেন্দ্র চৌধুরীর কথা মনে পড়ল। তিনিও ধূমপান করতেন এবং সমিতির ছেলেদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করতেন না, কেননা তার নামে চিঠিপত্র আসত এবং তার কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকত। তিনি সমিতির বলপ্রয়োগের কাজেও পরে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ সব যথাস্থানে লিখব।

যদিও সত্যেন ও গিরীন দু'ভাইই সমিতির সভ্য, কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির ফলে এক ভাই অপর ভাইয়ের সমিতির সভ্য হওয়ার খবর রাখত না। সে যাই হোক, যামিনী দাশ বদলী হয়ে ময়মনসিংহ সহরে চলে গেলেন। কিন্তু তার পরিবার ঢাকাতেই থেকে গেল। একে মস্ত বড় বাড়ী তায় যামিনী দাশ অনুপস্থিত, আমাদের কিছুটা সুবিধে হ'ল। এ উপলক্ষে কয়েকটা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হয়। প্রথমত অস্ত্রশস্ত্র ও কাগজপত্র একই বাড়ীতে রাখা হ'ল, দ্বিতীয়ত নিরাপদ ব'লে অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিতস্থানে নাম-জাদা বিপ্লবীদের যাতায়াত চলল। অবশ্য সত্যেনের নামে চিঠিপত্র আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

একদিন দুপুরবেলা যামিনী দাশের বাড়ীর একটা ঘর বন্ধ ক'রে রমেশ আচার্য ও আর একজন কিছু রিভলবার, পিস্তল মেরামত করছিলেন। যামিনী দাশের স্ত্রীর মনে কি কারণে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং গিরীন্দ্রের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে তার বাক্সে কি থাকে ইত্যাদি ব্যাপারের খোঁজ-খবরের জন্য স্বামীকে মিথ্যা তার করলেন সত্যেনের নাম দিয়ে—মা গুরুতর অসুস্থ শীঘ্র বাড়ী চলে এস (Mother seriously ill—come immediately)। বিচারালয়ে বসেই যামিনী দাশ এ তার পেয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে অবিলম্বে ঢাকা চলে এসে দেখেন তার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ। একান্তে ডেকে স্ত্রী যামিনী দাশকে তার সন্দেহের কথা বললেন। যামিনী দাশ গিরীনকে তলব করে তাকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকে বললেন—"তোর বাক্স খোল ত দেখব কি আছে?"

গিরীন চাবি খোঁজবার ছল করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়ে সোজা খগেন চৌধুরীর বাসায় এসে উপস্থিত হয়—চাবি অবশ্য তার সঙ্গেই ছিল। খবর পেয়ে আমি গেলাম। রমেশ চৌধুরী, মদন ভৌমিক, খগেন চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে প্রথম মনে হ'ল গিরীনকে আর বাড়ী না পাঠিয়ে গৃহত্যাগ করিয়ে গোপনে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু গিরীনের বাক্সে অনেক ডাকাতি-লব্ধ অলঙ্কার, সমিতির কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র আছে; এগুলি নিরাপদে সরিয়ে ফেলাই প্রথম কর্তব্য। ভাবলাম এগুলি ধরা পড়লে গিরীন কিংবা তার পিতার কারাদণ্ড অনিবার্য—যামিনী দাশের চাকুরি ত নিশ্চয়ই

থাকবে না। যামিনী দাশ অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট, সুতরাং সমস্ত ফলাফল তার ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং তিনি এগুলি হয় আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হবেন নয়ত নিজেই গোপনে নষ্ট করে ফেলবার ব্যবস্থা করবেন। চিন্তা হ'ল এই যে, কর্তৃপক্ষের হাতে পড়লে বহু লোক গ্রেপ্তার হবে, ব্যাপক খানাতল্লাসী হবে, এবং সম্ভবত একটা যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মকদ্দমাই হয়ত দায়ের করে ফেলবে। ভাবলাম, যামিনীবাবু তার বিশিষ্ট আত্মীয় এবং ঢাকার একজন শ্রেষ্ঠ উকিল মহেন্দ্র রায়কে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন। তিনি একজন দেশপ্রেমিক, সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি ধরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেবেন না —তা ছাড়া অন্যথা এই পরিবারেরই ঘোর বিপদ হতে পারে।

এই সমস্ত ভেবে গিরীনকে বলা হ'ল বাড়ী গিয়ে পিতাকে সব অবস্থা বুঝিয়ে ব'লে জিনিষগুলি ফিরিয়ে দিতে। জিনিষগুলি আনবার জন্য মদন ভৌমিক, রমেশ আচার্য এবং আরও দু'একজন গিরীনের সঙ্গে গেলেন। আমিও সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের পশ্চাতে গেলাম।

যামিনী দাশ বা তার স্ত্রী ছেলেদের কোন যুক্তিই মানলেন না। যামিনী দাশ কিছু বা নরম হলেও তার স্ত্রী অটল। স্থানীয় কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যামিনী দাশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে খবর দিলেন। সদলবলে বড় বড় অফিসাররা এসে পড়ল। খানাতল্লাসী করে পুলিস সব মালপত্র নিয়ে গেল। সঙ্গে গিরীন ও মদন ভৌমিক গ্রেপ্তার হ'ল। পরে মোকদ্দমায় গিরীনের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয়েছিল কিন্তু মদনবাবু মুক্তিলাভ করেন।

কাগজপত্র দেখে পুলিস ঢাকা ও বরিশাল জেলায় লোকের খোঁজ-খবর করতে লাগল। ষড়যন্ত্র-মকদ্দমায় রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য গিরীন্দ্র দাসকে পীড়াপীড়ি ক'রে অল্পে অল্পে ছয় মাসে পূর্ণ স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়।

ওদিকে বরিশালে সমিতির সভ্য রজনী দাশ তার ভগ্নিপতি জানকী দত্তের বাড়ীতে যায়। রজনীর পকেটে ছিল সমিতির প্রতিজ্ঞা পত্র। এটি জানকী দত্তের চোখে পড়ে এবং তিনি তা গোপনে তুলে নিয়ে বরিশালের উকিল শ্যামাচরণ দত্তের হাতে দেন। তিনি জানকী দত্তকে বিষয়টা গোপন রাখতে ব'লে রজনীকে নিয়ে ঢাকায় এসে একসঙ্গে এক হোষ্টেলে থাকতে লাগলেন। প্রতিদিন কিছু কিছু ক'রে রজনীর কাছ থেকে সংবাদ ও স্বীকারোক্তি আদায় করতে লাগলেন। কাজ সম্পূর্ণ হলে শ্যামাচরণ সোজা কলকাতা এসে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী হাচিন্ সন (Hatchin son) সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন—সরকার বলে যে, দেশের লোক বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কোন খবর সরকারকে দেয় না বা সাহায্য করে না। কিন্তু এই দেখ আমি কত সংবাদ নিয়ে এসেছি। শ্যামাচরণ তার পুরস্কার সম্বন্ধেও কথাবার্তা বলল।

অনুসন্ধানের জন্য সরকার গোয়েন্দা-ইন্স্পেক্টর কেদারেশ্বর চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করল। গিরীন দাশের বাড়িতে পাওয়া মাল এবং রজনী দাশের স্বীকারোক্তির মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য পাওয়া গেল।

বরিশালে আমরা চিঠি লিখতাম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র ঘোষের নামে। কেননা তখন পর্যন্ত তিনি পুলিসের তেমন সন্দেহভাজন ছিলেন না। কিন্তু গোয়েন্দা তার নামের চিঠিও গোপনে খুলে পড়তে আরম্ভ করল। পরে এগুলি আবার পিওনকে বিলি করার জন্য দিত। একবার এক প্যাকেট "স্বাধীন ভারত" পুস্তিকা বিতরণের জন্য পাঠাই। পুলিস একখানা রেখে বাকী বিলির জন্য দেয়। একখানা যে কম তা আমরা ভাবলাম যে হয়ত পাঠাবার সময়ই ভুল হয়ে থাকবে। নিষিদ্ধ পুস্তিকা বিতরণের সময় পুলিস হাতে হাতে গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নি।

বরিশাল সহরে সমিতির একটা বোর্ডিং হাউস ছিল। অবশ্য এটা যে সমিতির বোর্ডিং হাউস তা খুব গোপন ছিল। এখানে শুধু সমিতির সভ্য ও সহানুভূতিশীল লোকেরাই থাকতে পারত।

এই বোর্ডিং-এ একজন জ্যোতিষীর আবির্ভাব হয়। ঢাকায় আমাদের কাছে সংবাদ এলে, একে জায়গা দেওয়ার কারণ খোঁজ করলে শুনতে পেলাম যে, ইনি নিতান্ত নির্দোষ এবং একান্ত বিপন্ন হয়ে পড়ায় একে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধরপাকড় হওয়ার পর জানতে পারলাম এ গোয়েন্দা কর্মচারী নিশিকান্ত চক্রবর্তী। কেদারেশ্বর চক্রবর্তীই একে তার সহকারীরূপে এখানে বসিয়েছে। নিশি চক্রবর্তী রাশি-চক্রের আকারে ঠিকুজি তৈরি করে তাতেই তার রিপোর্ট দিয়ে পুলিসের বড়কর্তার কাছে পেশ করত। নিশির সাহস ও কৃতিত্বের তারিফ না ক'রে পারি নি। কেননা সামান্যতম সন্দেহ হলেও বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করত।

যাই হোক, ঢাকা কেন্দ্রে বসেই আমরা সন্দেহ করতে লাগলাম যে, বরিশালেই দলের কেউ বিশ্বাসঘাতক হয়েছে। সমিতির জেলা-কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পূজারিণী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

[ প্রবাসী কার্ত্তিক, ১৩৪৭ হইতে পুনর্মুদ্রিত

এরা কাজ করে

মাটির প্রদীপ

শিল্পী : শ্রীসুধীর খাস্তগীর
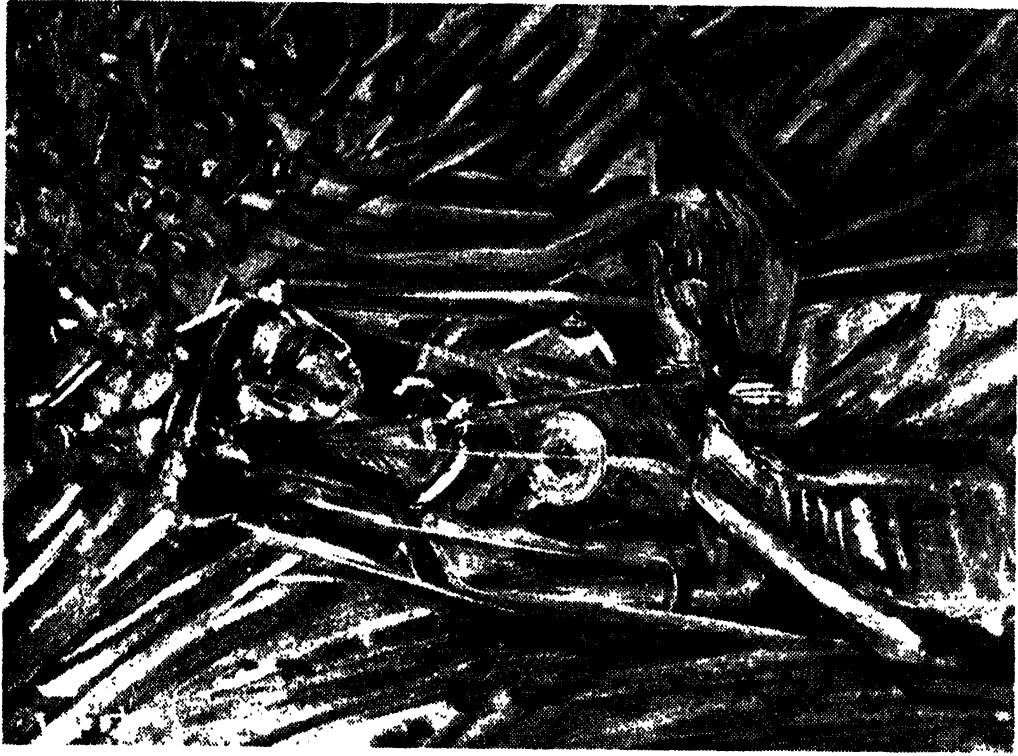
হয়ে প্রধান কেন্দ্রে নির্দেশের জন্য লিখলেন। নরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সন্দেহ না হয় এমন ভাষায় লিখে দিলাম যেন বিশ্বাসঘাতককে অবিলম্বে গুম-খুন করে ফেলা হয়। যথারীতি এই চিঠি দেবেন ঘোষের ঠিকানায় লেখা হয়। পুলিস ঐ পত্র পড়ে বিলির জন্য না দিয়ে সোজা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায়। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, অবিলম্বে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতে হবে। রজনীর প্রাণরক্ষার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। অবিলম্বে পুলিস ষ্টিমলঞ্চে একজন প্রহরীসহ রজনীর গ্রামে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে এনে বরিশাল জেলে একেবারে আলাদা করে রেখে দিল।

আমরা বুঝতে পারলাম যে, একটা ষড়যন্ত্র-মামলা দায়েরের সমস্ত আয়োজনই পূর্ণ হয়ে এল। যে কোন সময়েই এখন দেশব্যাপী গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী হয়ত সুরু হবে।

আমার মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল আমি লেখাপড়া শিখতে বিলেত যাই। প্রায়ই তিনি আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। মাত্র অল্পদিন পূর্বে আমার পিতৃদেবের মৃত্যু হয়, ভাইরা তখন বালক মাত্র—তা সত্ত্বেও তা ছাড়া তখনকার দিনে সমুদ্র-যাত্রা ছিল শাস্ত্রনিষিদ্ধ; যে যেত তাকে একঘরে হতে হ'ত। আমার ভগ্নিপতি মনোরঞ্জন-বাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেত আমেরিকায় গিয়ে মূকবধিরের শিক্ষাপ্রণালী শিখে এসে আমাদের দেশের পরম হিতকর কাজ করেছিলেন। কিন্তু তবু তাকে একঘরে হতে হয়েছিল। এমন কি তার কলকাতা চলে আসার পরও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপরাধে মনোরঞ্জনবাবুকে একঘরে হয়ে থাকতে হয়। আমার বোনের বিয়ের সময় মনোরঞ্জনবাবুর আত্মীয়রা জানিয়ে দিল যে, যামিনীবাবু এলে তারা এ কাজে যোগদান করবে না। সেই দিনেও মা'র প্রস্তাব শুনে অনেকে আশ্চর্য হয়েছিল। আমার মা গোঁড়া গুরুবংশীয় কন্যা হলেও মামারা বিলেত-ফেরতদের বর্জন করার বিরোধী ছিলেন এবং এজন্য তারাও বহুদিন সমাজবদ্ধ হয়েছিল।

যাই হোক, আমি প্রথমে রাজী হই নি, কেননা তখন ভাবলাম যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রায় সুরু হয়ে গিয়েছে। এমনি সময় আমার বিলেত গিয়ে ব'সে থাকা চলবে না। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলাম যে, বিদেশে গিয়েও কিছু করা সম্ভব হবে তখন যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন করতে এবং পোষাক-আষাক তৈরীর জন্য ১৯১৩ সনের এপ্রিল মাসে কলকাতা রওনা হলাম। কলকাতা এসে উঠলাম আমার আত্মীয় মূকবধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। কেননা তিনিই আমার বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন।

প্রসঙ্গত বলছি যে, অন্যান্য বার কলকাতা এসে উঠতাম ১০নং বাদুরবাগান সেকেণ্ড লেনের একটা ছাত্রাবাসে। এটা প্রধানত সমিতির লোক দ্বারাই পূর্ণ থাকত ব'লে কয়েক বৎসর এই ছাত্রাবাসটি সমিতির একটি প্রধান আড্ডায় পরিণত হয়েছিল।

কলকাতা এসেই সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে অমৃত হাজরার (তার নাম তখন শশাঙ্কবাবু) ও অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তখন থাকতেন বাদুরবাগান রো'র এক বস্তি-সংলগ্ন মাটির ঘরে।

এ ভাবে যখন তৈরী হচ্ছি তখন একদিন খুব সকাল-বেলা আমার এক আত্মীয় ঢাকা মেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে, ঢাকায় অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অনেকের বাড়ী খানাতল্লাসী হয়েছে। সরকার যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছে। আমার এবং আরও অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। আমাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে আমাদের বাড়ি তল্লাসী করেছে, মনোরঞ্জনবাবু, খুল্লতাত আদিত্য গাঙ্গুলী তাদের গৃহও বাদ যায় নি। মা আমার খরচের জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ইচ্ছে আমি যেন এই আত্মীয়ের সঙ্গে গিয়ে তাদের গ্রামের বাড়ীতে কিছুদিন নিরাপদে থাকি। পরে নিরাপদ বোধে অন্যত্র গমন করি।

এর মধ্যে দৈনিক খবরের কাগজও এসে গেল। তাতে দেখলাম এ সব খবর। আমার নামের সংবাদ বেশ বড় বড় হরফে ছাপান, যাতে সহসা আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সতর্ক হতে পারি।

অবিলম্বে শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে সব ব'লে জানালাম সেদিন সন্ধ্যাতেই ওর সঙ্গে থাকতে আসব। যামিনীবাবুর বাড়ী ফিরে বললাম, সন্ধ্যার পরই আমার আত্মীয়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ফিরে যাব।

বেশীক্ষণ তার বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নয় মনে ক'রে সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর কিছু আহারাদি ক'রে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর এসে যখন আমার আত্মীয় জ্ঞান চক্রবর্তীকে বললাম যে, তিনি ফিরে যান আমি যাব না; তখন তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কোন অনুনয়েই কাজ হ'ল না দেখে তার চোখে জল এসে গেল। বললেন, "তোমাকে ট্রাই দিতে গিয়ে যদি পুলিসের কাছে লাঞ্ছনা ভোগও করতে হয় তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। এ

ভাবে তোমায় ফেলে গিয়ে তোমার মায়ের সামনে কি ক'রে মুখ দেখাব!" আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, তার কোন ভয় নেই। মা সবই জানেন। শুধু তিনি যেন টাকা চেয়ে পাঠালে তা নির্দিষ্ট লোকের হাত মারফৎ পাঠিয়ে দেন এবং ভয় না পান। জ্ঞানবাবু চোখের জল ফেলতে ফেলতে ষ্টেশনের দিকে গেলেন আর আমি বাদুর বাগানের বস্তির দিকে পা বাড়ালাম।

আমাদের এই বস্তির ঘরখানা একটি বড় বাড়ীর মাঝ অংশের একটি ছোট ঘর। রাস্তার সামনে দরজা এবং খুব ছোট্ট একটি জানালার মত। আমাদের ডান পাশের ঘরে থাকত বাড়ীউলীর ছেলে, গুলিখোর এবং ঐ ঘরটা একটা গুলির আড্ডাই ছিল। বাঁ দিকের ঘরে থাকত বাড়ীউলীর এক যুবতী মেয়ে। স্বামীর ঘরে যেত না। যাকে বলে হাফ্ গেরস্তের মত থাকত। আর ছিল ঐ গুলিখোরের বালিকা বধূ। চারদিকের পরিবেশ ছিল নোংরা। সমস্ত বস্তিবাসীর জন্য মাত্র একটি কল ও চৌবাচ্চা। পায়খানার বন্দোবস্তও তথৈবচ। রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল যেখানে ময়মনসিংহের সুসুঙ্গের মহারাজা বাস করতেন। বর্তমানে এ বাড়ীতে প্রবাসী অফিস।

আমাদের পক্ষে এ বাড়ী মন্দ ছিল না। সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানা খুব কাছে থাকায় গুলিখোরের আড্ডায় হানা দিতে পুলিস মাঝে মাঝে আসত। কখন কখন আমাদের ঘরেও ঢুকে পড়ত। আর একটা মুস্কিল হ'ত ঐ মেয়েটির কাছে যারা আসত তারা রাত্রিতে ভুল ক'রে আমাদের ঘরের দরজায় টোকা দিত। ভয় হ'ত আমাদের জন্য পুলিস না কি!

শশাঙ্কবাবু এক সামান্য লোহার দোকানে হাতুড়ি পেটানর কাজ করতেন। ওখানে তিনি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। প্রথমে বস্তির লোকেরা আমাদের আসল রূপ জানত না। পরে যখন ধরপাকড় সুরু হয় এবং আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করে এবং আমাদের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহের জন্য পুলিসের আনাগোনা হতে থাকে তখন এরা আমাদের স্বরূপ চিনতে পেরেও পুলিসকে কোন সংবাদ দেয় নি। আমাদেরকে সনাক্ত করার জন্য এবং বোমার মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য অনেক লোভ ও ভয় দেখিয়েও এই মূর্খ, দরিদ্র, মেহনতী বস্তিবাসীদেরকে রাজী করাতে পারে নি। আইডেন্‌টিফিকেশন প্যারেডে এসেও এরা আমাদের চিনতে পারিনি ব'লে কবুল করেছে।

শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে আমরাও আহার করতাম পঞ্চানন ঘোষাল লেনের একটা বস্তির দরিদ্র হোটেলে। শশাঙ্কবাবুকে অনুকরণ ক'রে আমরাও হোটেলের মালিককে গিন্নীমা ব'লে ডাকতাম। খাওয়া খারাপ এবং পরিবেশ নোংরা। কিন্তু তবুও আমরা সেখানে যাওয়াই পছন্দ করতাম, কারণ গিন্নীমা ছিলেন অতি ভাল মানুষ, এবং মাত্র দু'আনা পয়সায় একবেলা খাওয়া হ'ত। অতি দরিদ্র শ্রেণীর লোকই সেখানে যেত যারা খাইখরচা চালিয়ে আবার পরিবার প্রতিপালনের জন্য দেশে টাকা পাঠাত। পুলিসের হাতে শত লাঞ্ছনা অত্যাচারেও গিন্নীমা, ঝি, গাঁজাখোর পাচক ঠাকুর, কেহই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় নি বা আমাকে চিনতে পেরেও সনাক্ত করে নি।

যে প্রসঙ্গে এত কথা বললাম তা হ'ল, কি ভাবে বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা (Conspiracy to wage war against the King-Emperor, and to deprive His Majesty of the Sovereignty of British India) দায়ের হ'ল। এই অভিযোগে বহু লোক গ্রেপ্তার হ'ল। এদের মধ্যে আছেন নরেন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, যতীন্দ্রনাথ রায় (ফ্রেণ্ড রায়), মণীন্দ্রভূষণ রায়, বুইরা (বোস), দাশগুপ্ত (ভগবান কবিরাজের নাতি), হেমেন্দ্র মুখোটি, নলিনীরঞ্জন মিত্র, দেবেন্দ্র ঘোষ এবং আরও অনেকে। ত্রৈলোক্যবাবু নাটোর থেকে, ঢাকা থেকে রমেশ চৌধুরী, খগেন চৌধুরী ও মদন ভৌমিক এসে উঠলেন এই বস্তির ঘরে ফেরারী হয়ে—গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় করে।

সে সময়ে সমিতির প্রসার এবং বিভিন্ন দিকে কাজ খুব দ্রুত আরম্ভ হয়েছিল। তখন চন্দননগরের মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ ও তাদের অনুগামী সকলের সঙ্গে আমরা একেবারে এক সংস্থা (organisation) হয়ে পড়েছি। তার ফলে সংগঠনের আকার ও কাজ-কর্ম বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশের উপরও সমিতির প্রভাব প্রসারের জন্য আমরা পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, সমিতির প্রধান কেন্দ্র কলকাতায় স্থাপিত করতে হবে। তখন কলকাতায় আমি, ত্রৈলোক্যবাবু, রবীন্দ্রমোহন সেন, নলিনীকিশোর গুহ, শশাঙ্কবাবু এবং আরও অনেক গৃহত্যাগী সভ্য স্থায়ীভাবে কলকাতায় আছি। সুতরাং চারদিকের নানা রকমের কাজ চালাতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

অথচ পূর্ববঙ্গই সমিতির প্রাণ-কেন্দ্র এবং কাজকর্মও সেখানে খুব বেশী। অর্থ ও লোক সংগ্রহ সেখানেই

প্রধান। এবং সমিতির অস্ত্রশস্ত্রও সেখানেই রাখতে হয়। সুতরাং সেখানকার ভার প্রধান পরিচালকদের মধ্যেই একজনকে নিতে হবে। ত্রৈলোক্যবাবুও অনেক পূর্বেই পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন; গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হওয়ার পর আমিও আর সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারি না—মাঝে মাঝে যেতে পারি মাত্র। সুতরাং রমেশ চৌধুরীকেই কার্য পরিচালনার জন্য পূর্ববঙ্গে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। তার গ্রেপ্তারের পর পূর্ব-বঙ্গের ভার যাতে সুদক্ষ হস্তে অর্পিত হয় এজন্য রমেশ চৌধুরীর সহকারী হলেন অনুকূল চক্রবর্তী।

ত্রৈলোক্যবাবুকে কলকাতা থেকেই প্রধানত কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং নলিনীকান্ত তাকে চট্টগ্রাম পরিচালনার কার্য থেকে সরিয়ে এনে উত্তরবঙ্গের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়—তার কর্মদক্ষতা দেখে। এভাবেই আমরা উপযুক্ত দক্ষ-সভ্যদের নানা কাজ ও দায়িত্বের মধ্য দিয়ে ছোট থেকে ক্রমে বৃহত্তর দায়িত্বে নিয়োগ করতাম যাতে ভবিষ্যতে তারা একদিন সমস্ত সংস্থার দায়িত্ব বহনে সমর্থ হয়।

খগেন চৌধুরীকে পাঠান হ'ল হুগলী জেলায় আসরারা গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ক'রে, অবশ্য ভিন্ন নামে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে।

মদন ভৌমিক ঢাকা সহরে সংগঠনের কাজ করতেন এবং ঢাকা প্রধান কেন্দ্রের অনেক কাজ ও নারায়ণগঞ্জের বারদী অঞ্চলের অনেক কাজ-কর্ম দেখতেন। তিনি সমিতির পুরাতন সভ্য এবং দক্ষতার গুণে প্রথম পংক্তিভুক্ত হয়েছিলেন। আমরা তাকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভার দিয়ে যশোহর জেলার ডিহি বাকরীর এক গ্রামে সমিতির সভ্য জনৈক কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠান হ'ল। সে বাড়ীতে তিনি কবিরাজী-শিক্ষার্থী ছাত্র পরিচয়ে থাকতেন। স্থির হয় যে, তিনি প্রথমে সেখান থেকে খুলনা সহর, দৌলতপুর ও যশোহরে প্রথম সমিতির প্রসার করে পরে অন্যত্র যাবেন। সেখানে তার কয়েক মাস কাজ-কর্মের পর আমি সেখানে যাই পরিদর্শনের জন্য। মদনবাবুর ভ্রাতা পরিচয়েই আমি কবিরাজ মহাশয়ের ওখানে গিয়ে উঠি—অবশ্য তিনি সবই জানতেন। মদনবাবু আমাকে নিয়ে খুলনা, দৌলতপুর কলেজের ছাত্রাবাস, যশোহর সহর, এবং ঝিনাইদহ, প্রভৃতি জায়গা ঘুরিয়ে সমিতির কাজ কি ভাবে আরম্ভ হয়েছে তা দেখালেন। যশোহরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তাকে বেশ ভুগতে হয়। সেই অসুস্থ শরীরেই এবং থাকা-খাওয়ার স্থানের অসুবিধার মধ্যেও তাকে কাজ-কর্ম করতে হয়েছে। সর্বোপরি অসুবিধা হ'ল যে, তখনও যশোহর-খুলনা অঞ্চল বিপ্লব আন্দোলনের দিক দিয়ে অগ্রসর ছিল না। এখানেও তার কাজ-কর্ম কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।

দৌলতপুর সমিতির কার্য পরিদর্শন করতে গিয়ে যে সব ছাত্র-সভ্যের সঙ্গে আমার দেখা হয় তার মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। এর আগে কলকাতা থাকার সময়ও তিনি সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি অনুশীলন-সমিতি পরিত্যাগ ক'রে অন্য দলভুক্ত হন। গ্রেপ্তারের পর তিনি স্বীকারোক্তি করেছিলেন ব'লে অনেকের ধারণা। কারণ তাকে ওয়াই শ্রেণী (Y Class) অর্থাৎ কম বিপদ-জনক (Less dangerous) ষ্টেট প্রিসনার (State Prisoner) করে; এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি বলেন যে, পাছে পুলিসের অত্যাচার সহ্য করতে না পারেন তার জন্যই এ কাজ করেছিলেন। কিন্তু অনেকের ধারণা যে স্বীকারোক্তি ক'রে অনুশোচনার ফলেই তার এই চেষ্টা।

কলকাতায় পলাতক ও গৃহত্যাগী সভ্যের সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। একই বাড়ীতে থাকলে সব নেতৃ-স্থানীয়দের এক সঙ্গে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় সবাই ছড়িয়ে থাকতে লাগল বন্ধু-বান্ধবের মেস, হোষ্টেল বাড়ীতে। আমারও ভোজন যত্রতত্র। এক বাড়ীতে দু-তিন রাত্রির বেশী কাটাই নি। এ প্রসঙ্গে তারিণী চৌধুরী, উপেন গুপ্ত প্রভৃতির নাম খুব মনে আছে। আমি যখন ঢাকায় মিনার্ভা হোষ্টেলে থাকতাম তখন তিনি সেখানে থেকে এম. এস. সি. পড়তেন। পরে বোধ হয় তিনি মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ঢাকার মিনার্ভা হোষ্টেলের ছাত্রাবাস আমি পছন্দ করেছিলাম এই কারণে যেন সমিতির পরিচিত সভ্য বা লোক না থাকে। কিন্তু প্রথমেই সাক্ষাৎ হয়েছিল সমিতির সভ্য হেমেন্দ্র রায়ের সঙ্গে। তিনি তখন এম. এস. সি. পরীক্ষা দেবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'ল। সকলেই সাগ্রহে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে। এই হোষ্টেলের অনেককেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করি নি কিন্তু অনেককেই অনেক বিষয়ে বিশ্বাস করতে পারতাম।

মিনার্ভা হোষ্টেল প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদারের কথা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি তখন এম. এ. পাস ক'রে 'ল' ফাইন্যাল' পরীক্ষার জন্য তৈরী

হচ্ছিলেন। তিনিই ছিলেন হোষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। একে ত তিনি মিশুক-প্রকৃতির ছিলেন না, তা ছাড়া অনেকেরই তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা থাকায় আমিও তার সঙ্গে বেশী মিশতাম না। কিন্তু তিনি আমায় আমার একান্ত অজ্ঞাতে হোষ্টেলের খাতায় অনুপস্থিত লিখতেন না। বছরের শেষে যখন সবাই হোষ্টেলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে এমন সময় তিনি আমায় তার ঘরে ডেকে দরজা বন্ধ ক'রে সব ব'লে বললেন—কি জানি অনুপস্থিত লিখলে হয়ত ক্ষতি হতে পারে, আর উপস্থিত লেখাতে সাহায্য হতে পারে। হয়েছিলও তাই। বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলায় রাজসাক্ষীদের বিবরণ অনেক মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। নানা বলপ্রয়োগের কাজে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে যোগদান করেছি, কিন্তু হোষ্টেলে উপস্থিত লেখা থাকার ফলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পলাতক অবস্থায় একদিন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে তিনি নিজেই রাস্তায় দেখতে পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এসে বলছি যে, আমার নামে ওয়ারেণ্ট বের হয় ১৯১৩ সনের এপ্রিল কি মে মাসে। বিভিন্ন স্থানে থাকবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে স্থির করলাম যে, বরিশাল মামলার আর একজন পলাতক যতীন ঘোষ ও আমি থাকব বাদুর বাগান সেকেণ্ড লেনের মেস বাড়ীতে। গ্রীষ্মের বন্ধে ওটা তখন খালি। লিজের ( Lease ) মেয়াদ না শেষ হওয়ায় মালিক তখনও দখল করে নি।

প্রথম দিনই দুপুরবেলা ষ্টোভে রান্না করে খেয়ে একই বিছানায় শুয়ে কথা বলতে বলতে কেমন করে জানি না ঘুমিয়ে পড়লাম। সাধারণত দিনেরবেলা ঘুমাই না। হঠাৎ তিন-চারজন লোকের কথায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ না খুলেই আগে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। সন্দেহ হ'ল এরা পুলিসের লোক। একবার সামান্য চোখ খুলে দেখলাম পুলিসের নয়, সাধারণ ভদ্রলোকের পোষাকে এসেছে। যতীন ঘোষের সঙ্গে কথা বলছে আবার বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে যেন কাকে কি বলছে।

এরা যে পুলিসের লোক তাতে আর সন্দেহ রইল না। যদি আমার জন্য এসে থাকে তবে আমারই উঠে এদের সঙ্গে কথা ব'লে গ্রেপ্তার বরণ ক'রে যতীন ঘোষকে রক্ষা করা উচিত হবে। পরন্তু ওর জন্য এসে থাকলে তারই এগিয়ে যাওয়া উচিত। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—"কার জন্য এসেছে।" "চুপ, আমার জন্য।" চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কি করা যায়!

আগন্তুকটি স্বয়ং গোয়েন্দা ডেপুটি-সুপার কেদারেশ্বর চক্রবর্তী। নাম জিজ্ঞাসা করলেন যতীন ঘোষকে। সে অপর এক নাম বলল। পুনরায় চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করল —আপনার নাম যতীন ঘোষ। সে তখনও অস্বীকার করলে বাইরের লোকটিকে ডেকে ভিতরে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখুন ত এই যতীন ঘোষ কি না।" এই ভদ্রলোক যতীনেরই আপন মামা। আগের দিন রাতে যতীন ঘোষ একবার তাদের বাড়ী গিয়েছিল। পুলিস সেখান থেকেই খবর নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, অনেকদিন দেখি নি, তবে সে রকম চেহারাই বটে। তখন কেদারেশ্বরবাবু যতীনকে বলল, আমাদের সঙ্গে আপনাকে একটু যেতে হবে। যতীন গ্রেপ্তার হ'ল।

আমিও তক্ষুণি গা মোড়ামুড়ি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে—যেন এই মাত্র ঘুম ভাঙ্গল, গামছা কাঁধে নীচের তলায় গেলাম। কোন লোক না দেখে একটু অবাক হলাম, মনে একটু আশাও হ'ল। তাই সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কয়েকজন পুলিস প্রহরী দেখে ফিরে এসে বাড়ীর চারদিক লক্ষ্য করে দেখলাম পালাবার কোন পথই নেই। সুতরাং কলতলায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে মুখ হাত-পা ধুতে লাগলাম। হঠাৎ কেদারেশ্বরবাবুর আবির্ভাব। জিজ্ঞাসা করল, "এখানে পায়খানা কোথায় মশাই।" দুর্জনকে দূরে রাখাই সঙ্গত মনে করে বললাম, "পায়খানা ত এখানে নেই। উপরে আছে।

কেদারবাবু মুখ ঘুরিয়ে রাগত স্বরে যেন কাকে বলল, "কোথায় পায়খানা? এখানে ত নেই!" তখন দেখি যতীন ঘোষ এগিয়ে এসে বলল, "ঐ যে ঐখানে।"

আমি ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "কি জানি আজই মাত্র এসেছি। এত বড় বাড়ী; কোথায় কি ঠিক জানি নে।"

আমি আবার উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম ঘর-তল্লাসী হয় নি। তাড়াতাড়িতে দু'একখানা বই ও সমিতি-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র সরিয়ে উপরের পায়খানায় গিয়ে বসলাম। হঠাৎ মনে হ'ল বড্ড ভুল করলাম ত! আমার ওদের কাছেই থাকা উচিত ছিল। যতীনের কাছে যদি আমার নাম জিজ্ঞাসা করে তবে অবশ্য সে আমার অন্য নাম বলবে, কিন্তু পরে যদি আবার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে ত নাম মিলবে না এবং

সন্দেহ হলে আমাকেও গ্রেপ্তার করবে। এই সমস্ত ভাবছি, তক্ষুণি বাইরে থেকে ডাক শুনতে পেলাম—"চক্রবর্তী মশায়, ও চক্রবর্তী মশাই।" যাক্, পদবীটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম। বাইরে এসে খুব বিনীত ভাবে বললাম, "আমায় ডাকছেন!" কেদারেশ্বর চক্রবর্তী পকেট থেকে নোটবই বার করে বললেন, "হ্যাঁ, আপনার নাম?"

—সুবোধচন্দ্র চক্রবর্তী।

—পিতার নাম?

—৺ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী।

—নিবাস?

—বেতকা। বিক্রমপুর।

—এখানে কবে এবং কেন এসেছেন?

—সম্প্রতি কয়েকদিন এসেছি। ইদানীং পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। হাইকোর্টে একটা মামলা আছে। আমাকেই সেজন্য আসতে হয়েছে।

—এ বাড়ীতে কি ক'রে এলেন? আর ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না?

আমি একজনের নাম ক'রে বললাম, "এর অতিথি হিসাবে আছি। সে ছুটিতে গেছে তাই আমি একা। বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না, কারণ লিজ এখনও ফুরোয় নি।" আমি প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছিলাম কেদারেশ্বর-বাবু বলবে, আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে। কিন্তু সে যখন হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললে, "এখন যাই, আপনাকে কষ্ট দিলাম," তখন অবাক্ না হয়ে পারলাম না। আমিও যথাযথ বিনয় নম্র হয়ে বললাম—"নমস্কার।"

কেদারেশ্বর চক্রবর্তী লোকজন নিয়ে চলে যাওয়া মাত্র আমিও দরজা বন্ধ ক'রে অতি সন্তর্পণে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলাম। পেছনটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে এ-গলি সে-গলি ঘুরে বাদুর বাগান লেনে শশাঙ্কবাবুর ঘরে গিয়ে উঠলাম। সব শুনে বিচক্ষণ গোয়েন্দার হাতে পড়েও গ্রেপ্তার না হওয়ায় সকলে অবাক্ হ'ল।

ক্রমশঃ
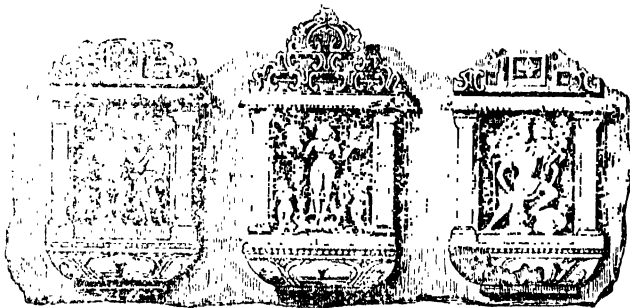
# আচার্য জগদীশচন্দ্রঃ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিদ্যার সাধনায় ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে যেমন শব্দ-তরঙ্গ, ইথর ও বৈদ্যুতিক বা আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, তেমনি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল প্রাণী-বিজ্ঞানের রহস্য। তার ফলে একদিকে যেমন আমরা শব্দের অনুভূতি পেয়েছি এবং জেনেছি—ইথর স্পন্দনেই আলোকের উৎপত্তি, দৃশ্য আলোক অদৃশ্য আলোক উভয়েই, তেমনি জেনেছি—নিখিল জীবলোকে উদ্ভিদ থেকে সুরু করে মানুষ পর্যন্ত এক অখণ্ড প্রাণধারা সর্বত্রই প্রবহমান; জীবলোকের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে এ এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য ঐক্য। জগদীশচন্দ্র বললেনঃ 'যে বাধা এতদিন আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দূর হইল। উদ্ভিদ ও প্রাণী একই জীবন-ধারার বহুমুখী বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এক মহাসত্যকে জানিতে পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরম রহস্যের যবনিকা ঘুচিয়া যাইবে না, বরং গভীরতর নিবিড়তর হইয়া উঠিবে। মানুষ যে তাহার অসমাপ্ত জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষম শক্তি লইয়াও অনির্ণীত-দিক্ মহাসমুদ্রে দুঃসাহসিক জয়যাত্রায় আপনার চিত্ত-তরণী ভাসাইয়া দিল, এ কি কম আশ্চর্যের কথা? সে অবর্ণনীয় রহস্য মুহূর্তকালের জন্য তাহার গোচরীভূত হইতে থাকে, এবং যে আত্মসর্বস্বতা এতকাল বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের প্রতি বিমুখচিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার মন হইতে মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়।'

উপনিষদ বলেনঃ

'এ ষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ॥'

অর্থাৎ, 'এই প্রাণই অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত, সূর্যরূপে প্রকাশিত; এই প্রাণই মেঘরূপে বর্ষণ করেন, ইন্দ্ররূপে দুষ্টের দমন ক'রে প্রজা পালন করেন; এই প্রাণই বায়ুরূপে প্রবাহিত; এই প্রাণই পৃথিবীরূপে সকলকে ধারণ করেন, চন্দ্রমারূপে সকলকে পোষণ করেন; এই প্রাণই স্থূল সূক্ষ্ম সবকিছুর আধার। মৃত্যুর পারে যে অমৃত জীবন, তাহাও এই প্রাণ।'

উপনিষদ আরও বলেছেনঃ 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম।' অর্থাৎ, 'জগতে এই যে প্রাণের ধারা বয়ে চলেছে, তা এক মহাপ্রাণ থেকে উৎসারিত হয়ে আবার প্রাণের মধ্যেই স্পন্দিত হচ্ছে।'

জগদীশচন্দ্রের চেতন ও অচেতন বা living ও non-living-এর অভিব্যক্তিতে এই কথারই আভাস পাওয়া যায়। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসের এক সন্ধ্যায় Royal Institute-এ তিনি 'The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেনঃ

'I have shown you this evening the autographic records of the stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.—It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that finds together all things—the note that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns—that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago.—They who behold the one, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.'

এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে ১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা নব-পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ লেখেনঃ 'আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি তো ধাতব পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিমটি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীব-শরীরের চিমটির সহিত যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি! জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক

নূতন বল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার 'পরিমাণ' শত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দন-রেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই। জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ী দ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনীশক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষ প্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।' ..

'৯০৩ সন থেকে জগদীশচন্দ্রের সাধনার নবপর্যায় শুরু। জীবের মধ্যে প্রাণের ও উদ্ভিদের জীবনীক্রিয়া প্রভৃতি, বিবিধ পরীক্ষায় তা এই সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ব্যাপৃত রইলেন। বিজ্ঞান-তত্ত্বকে কি করে সমগ্র জীবনের তত্ত্বরূপে গ্রহণ ও প্রকাশ করা যায়, তারই চেষ্টা চলেছে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাঁর কাছে এই বিজ্ঞান-তত্ত্ব আর কিছুই নয়, শুধু প্রাণতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব বা আনন্দতত্ত্বেরই নামান্তর মাত্র। প্রাণই ব্রহ্ম, প্রাণ থেকেই সমস্ত বস্তু উদ্ভূত হয়, প্রাণেই স্থিতি করে এবং প্রাণেই বিলুপ্ত হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূর্ত্তীভূত এই প্রাণ, এই প্রাণের স্পন্দনই জগদীশচন্দ্র অনুভব করেছেন সর্বত্র, বৃক্ষলতায়, এমন কি জড়বস্তুর মধ্যেও। তিনি বলেছেন: 'ভালোবাসিয়া দেখিলে অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আগে যখন একা মাঠে কিম্বা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম তখন সব খালি খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখী, কীটপতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছপালা কোন কথা বলে না, ইহাদের আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মত আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না, এখন বুঝিতে পারিতেছি।'

তিনি যে উল্লেখ করেছেন—'They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth,' তিনি নিজেই ছিলেন সেই অনন্ত এক ও তাঁকে খাসজ্ঞানিত সত্যের পূজারী। অপরাপর বিজ্ঞানীর মত তিনি নাস্তিক বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উন্নাসিক ছিলেন না, বরং তাঁর সমগ্র জীবনসাধনা ও আবিষ্কারের মধ্যে ঈশ্বরকেই তিনি বড় করে ভাবতেন। এই ভাবনাই ছিল তাঁর ধর্ম। এই জন্য তাঁর গবেষণাগারকে Institute

জগদীশচন্দ্র বসু

বা Museum নামে আখ্যায়িত করেন নি, তার নাম দিয়েছিলেন 'মন্দির'। 'বসু বিজ্ঞানমন্দির' প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলেছিলেন: 'আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবন-ব্যাপী সাধনার আবশ্যক। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।' এই মন্দির সত্যাশ্রয়ী মানুষ মাত্রেরই সাধন-মন্দির, জীবন-মন্দির। জগদীশচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাই সুন্দরভাবে বলেছেন:

—'সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপ হস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে

যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্তের চূড়ায় উড়ে।'...

সব-চাইতে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে, জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হয়েও বিজ্ঞানের মধ্যেই মাত্র নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি বৈজ্ঞানিক হয়েও কবি ছিলেন। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি ছিলেন দ্রষ্টা ও ঋষি। একদিকে বৈজ্ঞানিক সত্য, অপরদিকে কাব্যসত্য বা জীবনসত্যের স্রষ্টা ছিলেন জগদীশচন্দ্র। এবং এই জীবনসত্যের গভীরতম বোধই তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে স্বদেশপ্রীতির সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই তাই বলেছেন: 'বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশী ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দু'দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ, যেখানে ছিল তাঁর অতিনিবিড় দেশপ্রীতি।'

এই দেশপ্রীতি নিয়েই সারা ভারত তিনি ভ্রমণ করেছেন, জানতে চেয়েছেন—কোথায় কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে। এমনি করেই এদেশের মাটি, মানুষ এবং সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত রসমাধুর্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। সেই আবিষ্কারের কিছু অংশের স্বাক্ষর পাই তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থে। সহজ সরল বাংলায় এরকম বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ জগদীশচন্দ্রের পূর্বে আর কেউ রচনা করতে পারেন নি। এদিক্ দিয়ে সহজ বাংলায় বৈজ্ঞানিক বিষয় রচনার তিনি পথপ্রদর্শক সন্দেহ নেই। 'অব্যক্ত' গ্রন্থে মোট কুড়িটি প্রবন্ধ বা কাহিনী স্থান পেয়েছে। কোন কোন রচনা এমনও প্রমাণ করে যে, খাঁটি ব্রাহ্মসমাজবাদী হয়ে-হিন্দুধর্মের অন্তর-ভূমির আকর্ষণ তিনি কোথাও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 'অব্যক্তে' যে যে বিষয়ের আলোচনা আছে, তা হচ্ছে যুক্তকর, আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ, গাছের কথা, উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু, মন্ত্রের সাধন, অদৃশ্য আলোক, পলাতক তুফান, অগ্নিপরীক্ষা, ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে, বিজ্ঞানে সাহিত্য, নির্বাক্ জীবন, নবীন ও প্রবীণ, বোধন, মনন ও করণ, রাণা-সন্দর্শন, নিবেদন, দীক্ষা, আহত উদ্ভিদ, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ ও হাজির।

'হাজির'-এ তিনি নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন:..."কোনদিনও লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞায় 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম; পরে লিখাইল 'উদ্ভিদ-জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়ামাত্র।' জীবন সম্বন্ধে বেশী কিছুই জানিতাম না, কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না; ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—'এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি, ইহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা?' জবাব দিলাম, যে সব বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সেই সব কি করিয়া নির্ণয় করিব? তাহাদের অসংখ্য কল-কারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই; অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব? ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার, কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যে সব অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তাহা আমার কথা দূরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্যন্ত বিস্মিত করিল।"

এখানে এই 'ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল,' এই অজানা শক্তির অলৌকিকতাবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, জগতের যা কিছু ঘটনা, তার একজন নিয়ন্তা আছেন, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। তাই তাঁর সমুদয় বিজ্ঞান-কর্মের মূলে তিনি তাঁকেই স্মরণ করেছেন—যঃ একঃ, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'র মত রচনা বাংলা-সাহিত্যে বোধ করি দ্বিতীয়টি নেই। এর মূলে 'হিন্দু মাইথোলজি' জগদীশচন্দ্রের মনে যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করেছে। এই রচনাটির ভাব ও ভাষা অনবদ্য; তা একদিকে যেমন কবিত্বময়, তেমনি বিষয়ধর্মী। নদীকে উদ্দেশ ক'রে জগদীশচন্দ্র বলছেন: 'নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি। বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।'

'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র এই হচ্ছে মূলগত উৎস। বর্ণনার দিক্ দিয়েও এর অনবদ্যতা অনস্বীকার্য। গোড়াতেই জগদীশচন্দ্র লিখছেন : নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখন মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা ত কখনও ফিরে না, তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম : 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত : 'মহাদেবের জটা হইতে।' তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।"

টেক্‌নিকটা গল্পের অথচ বিষয়টা বিজ্ঞানের। এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ বাংলা-সাহিত্যে অভিনব। এরকম আর একটি কাহিনীমূলক রচনা 'পলাতক তুফান।' এক সময় 'এইচ বসু, পারফিউমার, দেলখোস হাউস, কলকাতা' প্রতি বছর বাংলার লেখকসম্প্রদায়কে গল্প-প্রতিযোগিতায় লেখা পাঠাবার আমন্ত্রণ জানাতেন এবং যাঁর লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'ত, তাঁকে নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হ'ত। এই পুরস্কার 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামে খ্যাত। ১৩০৩ সালে প্রথম বছর জগদীশচন্দ্র এই পুরস্কার লাভ করেন। লেখক হিসেবে সেই গল্পে তখন তাঁর নাম ছিল না। পুরস্কারদাতা গল্পটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করবার সময় লেখেন : 'এই উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুরস্কার (৫০৲ টাকা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছিল। সেই বৎসরের নিয়মাবলীতে রচনাকারীর নামোল্লেখ সম্পর্কে বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় আমরা বাধ্য হইয়া এই পুরস্কার দিয়াছিলাম।'

এই পুরস্কৃত গল্পটিই 'পলাতক তুফান।'

সহজ কথার আবেদনে ও সহজ ভাষার আশ্রয়ে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলিকে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাবে পরিবেশনের এই টেক্‌নিক জগদীশচন্দ্রই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে আনলেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রভৃতি এই টেক্‌নিকের ভিত্তিতেই বাংলায় বিজ্ঞানালোচনাকে সহজ করে তোলেন। তার প্রথম পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র। অথচ আশ্চর্য যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইংরেজি ভাষায় যাঁর বহু তথ্যবহুল গ্রন্থ সমগ্র পাশ্চাত্ত্যদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাঁর হাতে এমন সহজ-সরল কাহিনীসদৃশ বাংলা-ভাষায় সেই জটিল দুরূহ বিষয়গুলির অনবদ্য প্রকাশ কি করে সম্ভব হ'ল! বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর এমনই অদ্ভুত দখল ছিল জগদীশচন্দ্রের। তিনি একাধারে যেমন নিজে স্রষ্টা ছিলেন, তেমনি অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রেরণা-স্বরূপ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি প্রধানতঃ জগদীশচন্দ্রের প্রেরণাতেই গ'ড়ে ওঠে। তিনি একদিকে ছিলেন কবি ও কবি-সখা, অপরদিকে ছিলেন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে তিনি কোন ব্যতিক্রম বোধ করতেন না। এ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতবাদ যে কি ব্যাপক ও উদার ছিল তা তাঁর 'বসু বিজ্ঞানমন্দিরের' অষ্টম বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণের ভাষাতেই বলা যায় : 'জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে জগৎ কোন বিশেষ জাতির কাছে ঋণী, এ কথা বলার চেয়ে অসত্য আর কিছুই নেই। সমগ্র বিশ্ব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যুগের পর যুগ ধ'রে চিন্তাধারার অবিরাম প্রবাহ মানুষের উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করেছে। এই নির্ভরশীলতার উপলব্ধিই মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত করেছে এবং সভ্যতার গতি ও স্থিতি নিশ্চিত করেছে। বিজ্ঞান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কারুরই একার অধিকার নয়, বিশ্বজনীনতায় ইহা আন্তর্জাতিক। তথাপি ভারত মননশীলতায় এবং বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের জ্ঞানপ্রসারের ক্ষেত্রে মহান্ অবদানের অধিকারী। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বস্তুসমূহের মধ্যেও যে ভারতীয় কল্পনা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করতে পারে, যোগসাধনার সাহায্যে সে কল্পনাকে সংযত করতেও জানে। এই সংযমের জোরেই মন তার অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে থাকে। মনই আসল গবেষণাগার, যেখানে সবকিছু স্বপ্নের অন্তরালে সত্যের আভাস পাওয়া যায়। গাছপালায় জীবনের কাজ আবিষ্কার করতে হলে নিজেকেও গাছপালার মত হতে হবে, তবেই তার প্রাণস্পন্দন অনুভব করা সম্ভব হবে। এই প্রত্যক্ষ দর্শনকে পরীক্ষার সাহায্যে মাঝে মাঝে যাচাই করে নিতে হবে।'

এই উক্তির আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র আরও বেশী অন্তরঙ্গতায় ও বস্তুসত্যের চমৎকারিত্বে মহনীয়। তিনি এমন এক বীরশ্রেষ্ঠ, যিনি অজানা মহাদেশ জয় করেছেন এবং সেই জয়ের আনন্দ পরিপূর্ণ ভাবে তিনি ভারতকেই দিয়েছেন।

# রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

১

সংক্ষিপ্ত নাম মিস্টার আর. এন. সিদ্ধান্ত। কুলী, মজুররা সামন্ত সায়েব বলেই জানে, আর লেখাপড়া জানা বাবুরা আড়ালে বলে রাসভনিন্দিত সামন্ত। সেটা তাঁর খর্ব-পুষ্ট দেহভারের জন্য কি তাঁর কণ্ঠস্বরের অবলীলাক্রম ওঠা-নামার ছন্দলয়ের জন্য তা ঠিক জানা যায় না। তা হলেও নিষ্কাশনপুর কোলিয়ারীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যানেজারের ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

চারদিকে রুক্ষ বিরস রাঢ়ভূমি, প্রান্তর যেন একটা তরঙ্গে উঠেই হঠাৎ থেমে গেছে। কাছে দূরে গাছপালার শ্যামলিমার চিহ্ন মাত্র নেই, শুধু অনেক ব্যবধানে দুই-চারটি রিক্তপত্র পলাশ, অর্জুন খর বৈশাখের আগুনে ঝলসে দাঁড়িয়ে আছে। মাটির বুকে দগদগে ঘা-এর মত কয়েকটা চানক-এর অতিকায় হাঁ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে-ওখানে।

বড়ো চানকের কাছেই সারি সারি ঢেউ খেলানো ছাতের বাড়িগুলোতে কোলিয়ারীর দেড়শ বাবুর বাস। ম্যানেজার, এ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার ও আরও অভিজাত অফিসারদের বাংলো অন্য প্রান্তে। নিষ্কাশনপুর শহরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কোলিয়ারীর সাহায্যপুষ্ট নিষ্কাশনপুর ড্রামাটিক ক্লাবের প্রকাণ্ড একতলা বাড়ি।

বেলা প্রায় তিনটে।

লাঞ্চ খেয়ে ম্যানেজার সামন্ত সায়েব একটু আগে তাঁর আপিসে এসে বসেছেন। নিজের আপিসে বসে হেড এ্যাসিস্ট্যান্ট তাপস ভাদুড়ী কয়লা রপ্তানীর জরুরী হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। মাথার ওপর কলিং বেলটা দু'বার ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠতেই তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে উঠে ঠিক একটা বন্দুকের গুলীর মত বেগে সামন্ত সায়েবের খসখসের পর্দা ঘেরা ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা নরম্ আপিস ঘরে ঢোকে।

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে বাজখাঁই গলায় সামন্ত সায়েব বলেন, বসো ভাদুড়ী।

বাইশ বছরের চাকরী-জীবনে এমন অসম্ভব কথা কখনো শোনে নি তাপস। তাই নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে না পেরে দাঁড়িয়েই রইল।

"সিট্ ডাউন তাপস"—পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে সামন্ত সায়েব আবার বলেন নরম স্বরে।

চৌদ্দ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে ফেরার সময়ে আর কিছু আনুন বা না আনুন, পাক্কা সায়েবী মেজাজটা ঠিকই নিয়ে এসেছেন সামন্ত সায়েব। কারুর সঙ্গে বাংলায় কথাই বলেন না। কনভেন্টে পড়া তাঁর ছেলেমেয়েরাও সব সময়ে ইংরেজীতেই কথা বলে। আর তাঁর অধীনস্থ কোন কেরাণীকে তাঁর খাস আপিসে চেয়ারে বসতে বলাটা তো সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশনপুরের অভিধান-বহির্ভূত ব্যাপার।

তবু সায়েবকে পাইপ ধরাতে দেখে তাঁর মেজাজের একটা ঠিকানা পায় তাপস। সন্তর্পণে একটা চেয়ারের প্রান্তে বসে।

সব সময়ে টু দি পয়েন্ট কথা বলেন সামন্ত সায়েব। তাপস বসতেই বলেন, "ওয়েল, রবীন্দ্র সেন্টিনারী সম্বন্ধে কি ঠিক করেছ তোমরা—"

তাপসের বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। এ কি ব্যাপার! সায়েবের মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম! ঢোঁক গিলে বলে, "আমি তো স্যার কাজের চাপে সময়ই পাই না—"

"ওঃ, ডিস্‌গাস্টিং"—তড়বড় করে বলে ওঠেন সামন্ত সায়েব। টেবিলের ওপর মেলে-রাখা স্টেট্‌সম্যানখানা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেন তাপসের মুখের ওপর, "পড়ে দ্যাখ—ম্যারিকা, ইউ-কে, জার্মেনী, ফ্রান্স, রাশিয়া—এ সব জায়গাতেও রবীন্দ্র সেন্টিনারীর আয়োজন হচ্ছে। উই শুড্‌ন্ট্ ল্যাগ বিহাইণ্ড্, লেট আস ফর্ম্ এ কমিটি তাপস—"

চিরটাকাল কয়লার রেইজিং-এর টন, হন্দরের হিসেব করে চুল পাকিয়েছে তাপস। মগজটাও অবিকল কয়লার মতই কালো হয়ে গেছে। তবু আজ হঠাৎ সামন্ত সায়েবের মুখ থেকে পাইপের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট বিদেশী উচ্চারণে রবীন্দ্র কথাটি শুনে একটা অস্পষ্ট উল্লাস

অনুভব করে সে। বহুদূর থেকে ভেসে আসা গানের সুরের রেশ-এর মত রবীন্দ্রনাথের নাম তার মনের অস্পষ্ট চেতনার দ্বারে আঘাত করে। তাই উৎসাহের আতিশয্যে স্থান কাল ভুলে বলে ওঠে, "খুব ভাল হবে স্যার। আমার নাতিটাও সেদিন বলছিল বটে, যে বাংলাদেশের সব জায়গাতেই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন চলছে। আমাদের স্টাফে একজন নিউ হ্যাণ্ড এসেছে। লোকটা সাহিত্যিক—ওকেই সেক্রেটারী করে দেওয়া যাক—"

ভ্রূকুঞ্চিত করে সামন্ত সায়েব বলে, "হু ইজ হি?"

"সুশীল সান্যাল স্যার। এ জুনিয়ার ক্লার্ক। তবে শিক্ষিত ছেলে, বাংলায় এম-এ। বাংলায় পদ্য-টদ্য লেখে। দেশ-ফেশ কি সব বাংলা পত্রিকা আছে না? ওতেই বেরয় ওর পদ্য—"

গম্ভীর হয়ে যায় সামন্ত সাহেবের মুখ। জুনিয়ার ক্লার্কের মত একটা চুনোপুঁটি লোকের তাঁর অনুমতি ছাড়াই সাহিত্যকর্ম করাটাকে একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলেই মনে করেন তিনি। বলেন, "নো নো, আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট্ জুনিয়ার ক্লার্ক্স্ ইন দ্য কমিটি। তা ছাড়া যারা বাংলা পদ্য লেখে তাদের তো কোলিয়ারীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকাই উচিত নয়। ইজ হি এ টেম্পোরারী হ্যাণ্ড?"

ঘাবড়ে গিয়ে তাপস বলে, "নো স্যার, মাস দুই হ'ল কন্‌ফার্মড্ হয়েছে—"

"অল রাইট, আই উইল ডীল উইথ হিম লেটার। আজই একটা নোটিশ বার করে দাও। কোম্পানীর সিনিয়ার স্টাফ সবাই যেন আজ সন্ধ্যা সাতটায় নিষ্কাশনপুর ড্রামাটিক ক্লাবের হল-রুমে আসেন। আমরা রবীন্দ্র সেন্টিনারী কমিটি তৈরী করব।"

২

সন্ধ্যা সাতটা।

নিষ্কাশনপুর ড্রামাটিক ক্লাবের প্রকাণ্ড হলঘর প্রায় ভর্তি। কোলিয়ারীর সিনিয়র স্টাফ ছাড়াও নিষ্কাশনপুর শহরের ধনী, মানী সবাই এসেছে, এসেছে কয়লা শিল্পের ঠিকাদারেরা।

সামন্ত সায়েব আসেন নি এখনো।

কস্ট এ্যাকাউণ্টের বড় বাবু সুধাকর রায় বেতো রোগী। এটুকু পথ আসতেই তাঁর বেশ পরিশ্রম হয়েছে। চেয়ারে বসে পাশে বসা ভুবন সেনের সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলছিল, আর হাঁপানীর টান সামলে তার যথাসাধ্য উত্তর দিচ্ছিল ভুবন।

"বুঝলে ভুবন, এ সব রবি ঠাকুরকে নিয়ে মাতামাতি করাটা হচ্ছে ছেলে-ছোকরাদের কাজ আমাদের কি আর পোষায় এ সব? এই তো আর দিন কয়েক পরেই ছোট বৌমা আঁতুরে যাবে, আমার বাতের মালিশটা কে করবে সেই নিয়ে ভাবনা—

দম নিয়ে ভুবন বলে, "যা বলেছেন দাদা, রাসভ সামন্তের কি উচিত এ সবে নাক গলানো? তুই বাপু সায়েব মানুষ, দিশি কবিকে নিয়ে মাতবার দরকারটা কি তোর?"

পেছনের সারিতে মাথার চুলে, ভুরুতে আর গোঁফে পুরু করে কলপ লাগিয়ে সেণ্টের গন্ধে চারদিক্ আমোদিত করে বসেছে পুষ্পদল গন্ধ-বণিক্য, তার ওপাশে বসা গোপেন গাঙ্গুলীর চকচকে টাকে ইলেকট্রিকের আলো পড়ে দূরের দেয়ালে তার প্রতিচ্ছায়া ফেলেছে। তার ওপাশে তুলসার মালা গলায় বৈষ্ণবচরণ নামতীর্থ।

এ পাশে ঝুঁকে নামতীর্থ বলে, "আজ আমাদের মৃদঙ্গ সভার পালা-কীর্তন ছিল, সে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসতে হ'ল এখানে, কি গেরো বলুন দেখি—"

পুষ্পদলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গোপেন বলে, "রাসভের মাথায় আবার এ হুজুগ চাপল কি করে?"

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে পুষ্পদল বলে, "হুজুগ নয় হে, হুজুগ নয়। এটা একটা ফ্যাশান, রবীন্দ্র-ফ্যাশান। সিরুবুরু কোলিয়ারী, পালখাম্বাৎ কোলিয়ারী, হরিপুর কোলিয়ারী সব জায়গাতেই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী হবে, এখানে একটা কিছু না করলে রাসভের মান থাকে না তাই—"

গলা বাড়িয়ে নামতীর্থ বলে, "তা হলে আর আমাদের ডেকে এনে কষ্ট দেবার দরকারটা কি ছিল? ঐ সুশীল সাণ্ডেলই ত শুনেছি সাহিত্য-টাহিত্য করে, ওকে ডেকে ভার দিলেই ত ল্যাঠা চুকে যেত—আমার মেয়ে রেবা ত বলে সুশীলদা মস্ত সাহিত্যিক—"

"তাই ত হে—কিন্তু ছোঁড়াটাকে দেখছি না ত এখানে," মাথা ঘুরিয়ে গোটা হলঘর খুঁজে দেখে গোপেন বলে।

পেছন থেকে হেমদা গুপ্তভায়া বলে, "আমাদের কি আর কাব্যরস পান করবার বয়েস আছে—না কয়লার হিসেবে ঠাসা মগজে সে সব ঢুকবার ফাঁক পাবে,—যত্তো সব। কোথায় সন্ধ্যাবেলা প্রেমসে দু'হাত ব্রীজ খেলব, তা না…"

নামতীর্থ বলে, "তবে এলেন কেন?"

"চাকরী মশায় চাকরী। ম্যানেজার ডেকেছে, না এলে কি আর রক্ষে আছে?"

এমন সময়ে দি নিস্কাশনপুর বার এণ্ড রেস্তোঁরার মালিক মহেন্দ্র সিংহ, নিস্কাশনপুর জেনারেল স্টোর্স-এর মালিক বনোয়ারীপ্রসাদ সন্ধ্যালগ্ন শয্যাদ্রব্য স্টোর্স-এর মালিক দুর্জন রায় গট গট করে হলে ঢুকে সুমুখের সারির রিজার্ভড চেয়ারে এসে বসে।

সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। হল ঘরের লাগোয়া বারান্দায় তাপস ভাদুড়ী আর বৈকুণ্ঠ সেন, ড্রামাটিক ক্লাবের জয়েণ্ট সেক্রেটারী দু'জন পাইচারী করে চলেছে। এখনও সামন্ত সায়েবের দেখা নেই।

বৈকুণ্ঠ লোকটিকে বিশেষ পছন্দ করে না তাপস। লোকটি যেন গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে যায় কখন কোথায় সামন্ত সায়েব আসবেন। তার পর একবার দেখতে পেলেই হ'ল, আঠার মতো লেগে থাকবে সামন্ত সায়েবের সঙ্গে, জোড় হাতে সব সময়ে জল উঁচু ত জল উচু বলতেই আছে। সামান্য স্টক সেকশনের ইনচার্জ হয়েও হেড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট বলে তাপসকে মানতেই চায় না। সামন্ত সায়েবের প্রশ্রয়েই এতটা হয়েছে।

তাপসের চিন্তায় বাধা পড়ে। প্রচুর ধুলো উড়িয়ে একখানা শেষ মডেলের মিনার্ভা হলের সামনেকার পার্কে এসে থামে। তাপস পৌঁছুবার অনেক আগেই ছুটতে ছুটতে গাড়ীর কাছে গিয়ে সবগুলো দাঁত বার করে দরজা খুলে দেয় বৈকুণ্ঠ, মাথা ঘুরিয়ে তাপসের হতাশ মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়।

প্রসন্ন মুখে নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরা সামন্ত সায়েব নেমে আসেন, অন্য দরজা দিয়ে নামে এ অঞ্চলের লাখপতি কোল মার্চেণ্ট গোলকদাস ঘরপুড়িয়া।

তাপসের আনত বিনীত নমস্কারের উত্তরে মাথা হেলিয়ে সামন্ত সায়েব বলেন, "এভ্‌রিথিং অল্ রাইট তাপস?"

দু'হাত কচলাতে কচলাতে তাপস বলে, "ইয়েস স্যার, সবাই এসেছে স্যার, একে আপনার অর্ডার তার ওপর আবার বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন—"

সামন্ত সায়েব সদর্পে হলে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ায়।

সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে সামন্ত সায়েব বসেন, পাশের চেয়ারে ঘরপুড়িয়া বসে।

সভা আরম্ভ হয়।

প্রথমেই সামন্ত সাহেবের অনুরোধে গোলকদাস ঘরপুড়িয়া ভাষণ দিতে ওঠে। দশ আঙুলের দশটা হীরের আংটি বিদ্যুতের আলোতে ঝলমলিয়ে ওঠে। বিশাল ভুঁড়ির ওপর হাত দুটি আড়াআড়ি করে রেখে ঘরপুড়িয়া বলে:

সভাপতিজি ঔর দোস্তো, গুরুদেওর কোবিতা হামি ভি কুছু কুছু পঢ়িয়েসে, সে সোমোস্তো কথা মনে পড়লে বহুৎ আনন্দ মালুম হোয়। সেইজন্যে সামন্ত সাহেব যখন এ সভাতে ডাকলেন হামি রাজী হ'ল। রবীন্দরনাথ খুব বোড়ো কোবি ছিলেন সে বাৎ আপনারা সোবাই জানেন। হামি উনকা চার ফুট লম্বা ছোবি সোনার ফ্রেম দিয়ে বাঁধাই করে রেখেছি। খরচা পড়িয়েছে দশ হাজার টাকা। হামী রবীন্দর-প্রেমী আছে। হামী সৎ-বার্ষিকী সমিতিমে মোটা টাকা চন্দা দিব। নাচ আহুন, গানা আহুন, কলকত্তার বংগালী মেয়েরা ভালো নাচে, হামার খুব পছন্দ আছে।"

এটুকু বলতেই হাঁপিয়ে ওঠে গোলকদাস। বসে রুমাল দিয়ে কপাল, মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মোছে।

ঘরময় সমর্থনের গুঞ্জন ওঠে। সামন্ত সাহেব উঠে দাঁড়াতেই তা থেমে যায়।

সামন্ত সাহেব বলেন:

"অনেকদিন 'ম্যারিকায় থাকার ফলে বাংলা ভাষা প্রায় ভুলেই গেছি, তা ছাড়া ইংরিজি ভাষার কাছে বাংলা দাঁড়াতেই পারে না, সেজন্যই বোধ হয় শেষ বয়েসে নিজের ভুল ধরতে পেরে রবীণ্ড্রনাথও ইংরিজিতে গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন। সে যাক। ছেলেবেলায় রবীণ্ড্রনাথের গৃহদাহ পড়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা আজও আমার মনে আছে। তাঁর অগ্নিবীণা কাব্য এক সময়ে আমার মনেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বাংলা নাটক আমি দেখি না, তবে বহুকাল আগে স্টারে একবার তাঁর চন্দ্রগুপ্ত দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার বাড়ীতে এক আলমারী রবীন্দ্র রচনাবলী আছে, চীপ এডিশন নয়, বেশ দামী এডিশন, রেক্সিনে বাঁধাই। শান্তিনিকেতনে তিনিই প্রথম এদেশে কো-এডুকেশন প্রতিষ্ঠা করে চিরদিনের জন্য জাতিস্মর হয়ে আছেন। ফরেনে তাঁর সেণ্টিনারী নিয়ে প্রচণ্ড হৈ চৈ চলেছে, তাই আমি চাই এখানেও রবীণ্ড্র সেণ্টিনারী হোক। আসুন আমরা একটা শক্তিশালী কমিটি তৈরি করি।"

শ্রোতারা সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, "নিশ্চয় নিশ্চয়—".

এর পর সর্বসম্মতিক্রমে সামন্ত সায়েবকে দি নিষ্কাশনপুর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি করা হয়। সহ-সভাপতি হয় গোলকদাস ঘরপুড়িয়া, চীফ

ইঞ্জিনীয়ার ভি. রামমূর্তি অর্গানাইজেসন সেক্রেটারী, তাপস ও বৈকুণ্ঠ যুগ্ম-সম্পাদক, এবং চীফ এ্যাকাউণ্টেণ্ট কোষাধ্যক্ষ হয়। বিভাগীয় প্রধানরা কমিটি মেম্বার হয়।

খুশী হয়ে গোলকদাস পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিতে রাজী হয় এবং অনুষ্ঠানের দিন তার সোনার ফ্রেমে আঁটা দশ হাজার টাকা দামের রবীন্দ্রনাথের ছবি ধার দিতে রাজী হয়। কোম্পানীর তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিতে রাজী হন সামন্ত সায়েব।

সভায় স্থির হয় যে, টাকার জন্য ভাবনা না করে কলকাতা থেকে ভাল ডান্সপার্টি আনা হবে ৮ই মে তারিখে। তারা পর পর তিন রাত রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য পরিবেশন করবে। এ ছাড়া শান্তিনিকেতন থেকে কিছু সঙ্গীতশিল্পী এনে একটা বিচিত্রানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা হবে।

৩

কেন যে বাংলায় এম-এ পাস করে সুশীল সান্যাল নিষ্কাশনপুর কোলিয়ারীর জুনিয়ার ক্লার্কের কাজটা বেছে নিল তা তার অনুরাগী ছোট্ট দলটির কাছে একটা দুর্বোধ্য রহস্যই হয়ে আছে।

কোলিয়ারীর সিনিয়র স্টাফদের প্রায় সবাই নন-ম্যাট্রিক। জুনিয়ারদের মধ্যে কেউ কেউ কোলিয়ারী পরিচালিত স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ফেললেও বাপ-কাকাদের তাড়নায় কলেজের মুখ না দেখেই কোলিয়ারীতে ঢুকে অর্থোপার্জন ও বংশবৃদ্ধিতে লেগে গেছে।

এর ভেতর হঠাৎ বাইরে থেকে খানিকটা উজ্জ্বল আলো আর বাতাস নিয়ে এসে হাজির হয় সুশীল।

সুশীল কবিতা লেখে এবং সে সব কবিতা ভাল ভাল বাংলা পত্রিকায় ছাপা হয় এ খবরটা প্রচার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-ছোকরার মধ্যে কয়েকজন তার ভক্ত হয়ে ওঠে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা রেবাও তাদের একজন। সুশীলকে নিয়ে গর্বের অন্ত নেই তার। গল্প লিখতে বসে তার গল্পের নায়কের চেহারার সঙ্গে সুশীলের চেহারা মিলে মিশে এক হয়ে যায় বারবার।

দূরের একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে অল্প আগে। অন্ধকারের স্বচ্ছ পর্দাটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসছে।

কোলিয়ারীর আপিস থেকে বেশ কিছু দূরে একটা ছোট্ট টিলার ওপর শিমুল গাছের নীচে সুশীল আর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে জমায়েৎ হয়েছে। রেবার কালো চুলের নিপুণ-বদ্ধ কবরীতে একগুচ্ছ রক্তিম কৃষ্ণচূড়া যেন সূর্যাস্তের রংটুকু ধরে রেখেছে।

একটা নিশ্বাস ফেলে রেবা বলে,—"টাকা আর ক্ষমতা থাকলে এই দুনিয়ায় সবকিছুই হয়,—তাই না সুশীলদা?"

জবাবে কিছু বলে না সুশীল। পশ্চিমের আকাশের মেঘে প্রকৃতি যে সাতটি রং-এর বাটিই উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখে।

"উঃ, শেষটায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি হ'ল কিনা রাসভনিন্দিত সামন্ত। ভাবাও যায় না এ কথা—" আক্ষেপের সুরে সুরেশ বলে,—"লোকটা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতাও পড়েছে কি না সন্দেহ—"

এবার প্রতিবাদের সুরে সুশীল বলে,—"কেন পড়বেন না? ম্যাট্রিক পাস করতে হয়েছে না?"

"বাঃ, পাঠ্য বই-এর কবিতা পড়া, আর উপলব্ধির আলোতে কাব্য পাঠ করা কি এক কথা হ'ল?"

আহত সুরে সুরেশ বলে,—"তা ছাড়া ও ত কনভেণ্ট থেকে সিনিয়ার কেম্‌ব্রীজ পাস করেছে—"

"আর ঐ ঘরপুড়িয়া?—" জ্বলে উঠে বিনয় বলে,—"গরীবদের ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এখন লাখ টাকার মালিক হয়েছে বলে ও হ'ল সহ-সভাপতি।"

"আর কমিটি মেম্বাররাই বা কি।" আবার বলে ওঠে রেবা,—"হোন না তাঁরা আমাদের কাছে মামা, মেসো, পিসে, তা বলে হ'ক কথা বলব না? রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে কি পরিচয় আছে তাঁদের?"

"দরকারই বা কি?" মৃদুস্বরে সুশীল বলে,—"সেকশন ইনচার্জ না তাঁরা?"

ফুঁশে উঠে বিনয় বলে,—"না, না, ঠাট্টা কর না সুশীলদা। তোমাকে অন্ততঃ সম্পাদক করে নেওয়া উচিত ছিল ওদের—"

তার কাঁধে হাত রেখে শান্ত স্বরে সুশীল বলে,—"আমি যে জুনিয়ার ক্লার্ক ভাই, আমি যে ভারতের নব বর্ণাশ্রমে অন্ত্যজ, আমি কি করে সামন্ত সাহেব যে সভার সভাপতি সে সভায় চেয়ার পেতে বসব—"

সুশীলের কথায় রেবার চোখে জল এসে যায়। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে থাকে সে।

সুরেশ বলে,—"থাক, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। ঐ ঘোর গণ্ড দলের মধ্যে গিয়ে সুশীলদা কি-ই বা করতেন শুনি?"

"কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মদিনে আমরা কি শুধু ঐ সব সার্কাসই দেখব সুশীলদা? আমাদের কি করবার

আর কিছু নেই ?" আহত স্বরে রেবা বলে,—"হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব ?"

শান্ত সুরে সুশীল বলে,—"দরকার কি রেবা ? হাজার ধূমধাম করেও রবীন্দ্রনাথকে বেশী সম্মান দেখাতে পারব না আমরা! নেতা বেঁচে থাকেন তাঁর আদর্শে আর কবি বেঁচে থাকেন তাঁর রচনায়—"

"না না, ওসব বড় বড় কথা ছাড় সুশীলদা,—" বিনয় বলে,—"নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি খুব উচ্চস্তরের জিনিস হতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐ সাকার উপাসনাই ভাল। তোমাকে সভাপতি করে আমরা আলাদা শতবার্ষিকী কমিটি করব।"

ওদের কচি মনের জ্বলন্ত উৎসাহ সুশীলের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বলে,—"ঠিক আছে, রেবা হবে তার সম্পাদিকা, আর বাকী সবাই সদস্য, কেমন ?"

হৈ হৈ করে সমর্থন জানায় সবাই।

দুই চোখের মুগ্ধ দীপশিখাটি সুশীলের মুখের দিকে তুলে ধরে রেবা।

বিনয় বলে,—"কিন্তু শ্রোতা, সুশীলদা ?"

গভীর সুরে সুশীল বলে,—"শ্রোতা হবে আমাদের খাদের কুলি-মজুরেরা, তাদের বৌ আর ছেলেমেয়েরা—"

পূবদিগন্তে চাঁদের আভাস দেখা দিয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করে সুশীল :

'সাহিত্যের ঐকতান-সঙ্গীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।'

৪

দু' কান পাঁচ কান হয়ে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বৈকুণ্ঠের মারফৎ কথাটা সামন্ত সায়েবের কানে ওঠে।

শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন সামন্ত সায়েব। "হোয়াট্‌? এ্যানাদার কমিটি ? " রাগে সামন্ত সায়েবের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

আর পাঁচজন কেরাণীর সঙ্গে আপিসে বসে কাজ করছিল সুশীল। চাপরাশী এসে বলে,—"বড়া সাব বুলাতা—"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুশীল। গোটা আপিস তটস্থ হয়ে চেয়ে থাকে।

সামন্ত সায়েবের খাস কামরায় ঢুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সুশীল। ক্রুদ্ধ চোখের বিরাগভরা দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নেন সামন্ত সাহেব, বলেন, "হাউ ডু য়ু ডেয়ার"—

বাধা দিয়ে সুশীল বলে, "বাংলায় বলুন স্যার"—

লাল হয়ে ওঠে সামন্ত সাহেবের মুখ গনগনে আগুনের আঁচ বের হতে থাকে, বলেন, "তুমি নাকি অন্য একটা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি ফর্ম করেছ ? ইজ ইট্ ট্রু ?"

"হ্যাঁ, সত্যি—" নির্ভীক স্বরে সুশীল বলে।

"তোমার ত সাহস কম নয় ছোকরা, তুমি জান যে আমি নিজে সেণ্ট্রাল শত বার্ষিকী কমিটির প্রেসিডেণ্ট ?"

"হ্যাঁ জানি, আবার এও জানি যে রবীন্দ্রনাথ কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নন, তিনি সারা দেশের, সারা জাতির। তা ছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর সঙ্গে কলিয়ারীর অপিসের কাজের কোন সম্পর্ক নেই।"

চিবিয়ে চিবিয়ে সামন্ত সাহেব বলেন, "নিস্কাশন পুরে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কোন কিছু নেই, সব কিছুই কোম্পানীর ব্যাপার। তুমি ওসব মতলব ছাড়, তা না হলে—"

"তা না হলে ?"

"আই উইল স্যাক ইয়ু।" টেবিলে ঘুষি মেরে সিদ্ধান্ত সায়েব বলেন।

"বেশ তাই করবেন।"

মাথা উঁচু করেই বেরিয়ে আসে সুশীল। সামন্ত সাহেব কয়েক সেকেণ্ড সেদিকে তাকিয়ে থেকে রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকেন।

৮ই মে।

পাঁচ শ টাকা খরচ করে নিস্কাশনপুর ড্রামাটিক ক্লাবটিকে আগাগোড়া আলোকসজ্জায় সাজান হয়েছে। সহরের গণ্যমান্য, কেষ্টবিষ্টু সবাই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, প্রকাণ্ড হলঘরে লোক আর ধরে না।

করতালিমুখর প্রেক্ষাগৃহে বর্ণাঢ্য ড্রপসিন উঠে গেল। সুসজ্জিত মঞ্চের একেবারে পেছন দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোলক দাস ঘরপুড়িয়ার দেওয়া সোনার ফ্রেমে বাঁধান রবীন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড ছবিখানা।

উইংয়ের পাশ দিয়ে মঞ্চে এসে ছবিখানা আড়াল করে দাঁড়ালেন সামন্ত সায়েব। মাথার ফেল্ট হ্যাট থেকে সুরু করে টাই কোট ও ট্রাউজার্স নিখুঁত সাহেবী পোষাক। মাইকের সামনে এসে ঘোষণা করলেন যে বহু টাকার লোভ দেখিয়েও কলকাতা থেকে কোন রবীন্দ্র

থিয়েটার পার্টিকে আনা গেল না বলে তিনি বিশেষ দুঃখিত। তবে শ্রোতাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই, কারণ পরিবর্তে বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান কালচার ড্যান্স পার্টি এসে পৌঁছেছে। তারা সাপুড়ে নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু করবে এবং মৎস্য নৃত্যে শেষ করবে। বিউটিফুল গার্লস সব রয়েছে এদের পার্টিতে।

সামন্ত সাহেবের শেষ কথাটি শোনা মাত্র চটপট হাততালিতে হলঘর যেন ফেটে যায়।

নিস্কাশনপুর সহরের শেষ প্রান্তে সুশীলের নিরালা বাড়ি। বাইরের উঠানে প্রকাণ্ড বকুল গাছের নীচে একটি টেবিল পাতা। তার ওপর রবীন্দ্রনাথের একটি ফটো এক থাক রবীন্দ্র রচনাবলীতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করান। ছবির সামনে একটি প্লেটে একমুঠি বেলফুল। তার দু'পাশে দুটি ধূপকাঠি জ্বলছে।

গোটা উঠানটি ভরে গেছে উৎসুক জনতার ভীড়ে। খাদের কুলি কামিন, তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে ঠাকুর কবির কথা শুনতে। রুক্ষ কাঁকুরে মাটির ওপর জোড় হাতে বসে আছে সবাই। এতক্ষণ ধরে সুশীল, রেবা, সুরেশ, বিনয় ছোট ছোট সহজ কথায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটিয়েছে। রেবা গেয়েছে, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো'—রবীন্দ্রসঙ্গীতটি।

ঝুমরা মাঝি বাঁশী বাজায়, ঝমরু সর্দার ঢোলক বাজায়, একদল সাঁওতাল তরুণী সুরের তালে তালে নেচে কবিকে তাদের শ্রদ্ধা জানায়। আকাশের বিপুল চন্দ্রাতপের নীচে, উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবে শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালোবাসার অভাব থাকে না।

সব শেষে সঞ্চয়িতাখানা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুশীল, মৃদুস্বরে আবৃত্তি করে :

'কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান,
কোন দিকে তোর টান।
পাষাণ গাঁথা প্রাসাদ পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন যুথা অনাঘ্রাতা
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে যত্ন পুরা মাত্রা
সেথা আমার ছন্দোময়া, করবি কি তুই যাত্রা ?

গান তা শুনি…'

হঠাৎ দূর থেকে কে যেন হেঁকে ওঠে
—"সুশীল বাবু আছেন ?"
সাড়া দিয়ে সুশীল বলে, "কে ?"

"আমি কোম্পানীর চাপরাশী, একটা চিঠি আছে আপনার।"

চিঠি নিয়ে খাম ছিঁড়ে টাইপ করা দু'লাইনের চিঠিটা বার করে দু'বার পড়ে সুশীল।

তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে রেবা দেখে চাকরী খতমের নোটিশ, নীচে স্বয়ং সামন্ত সাহেবের সই।

চিঠি থেকে চোখ তুলতেই রেবার শান্ত স্নিগ্ধ দু'চোখে আটকে যায় সুশীলের দু'চোখ। কোন কথা না বলে নীরবে ডান হাতখানা বাড়িয়ে সুশীলের হাত চেপে ধরে রেবা।

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির সামনে এসে মাথা নত করে। কোল ভীল মুণ্ডা সাঁওতালের জনতা অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে থাকে তাদের।
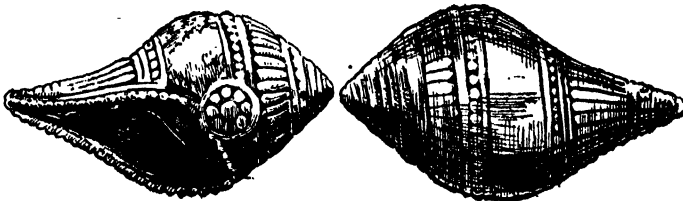
# একটি স্বদেশী যুগের গান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

"প্রবাসী" কর্ম্মকর্তা মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের "বিপ্লবীর জীবন-দর্শন" পড়ছিলাম। তাতে সেকালের স্বদেশী যুগের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গানের কথা রয়েছে। সেগুলি তখনকার 'বন্দেমাতরম্' ও 'বন্দনা' বইতে ছিল। সে বই যদি এখনও কারুর কাছে থাকে, হয়ত গানগুলি পাওয়া যাবে। তখন ত বইগুলো বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ওঁর লেখা পড়তে পড়তে এই সূত্রে সে সময়ের আর একটি প্রসিদ্ধ গানের কথা মনে পড়ল। সে সময়ের (শ্রীঅরবিন্দ-বারীন্দ্রের) 'যুগান্তরে' বেরিয়েছিল মনে হচ্ছে। তখন খুব ভালো লেগেছিল, তাই নিজের গানের সংগ্রহে লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু কার লেখা এবং কোন্ পত্রিকা সব নাম কেটে দিয়েছিলাম। আজ দেখছি, প্রতুলবাবুর রচনায় এ গানটিরও উল্লেখ আছে যেন।

গানটার প্রথম লাইন:

"না হইতে মাগো বোধন তোমার ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গলঘট।"

গানটা লুপ্ত হয়ে যাবে বিপ্লবীদের ইতিহাস থেকে—তাই মনে করে পাঠালাম আপনাদের কাছে। মনে হয় ত প্রকাশ করবেন। এই সঙ্গে সেই সময়ের আর একটি কবিতা শ্রীঅরবিন্দের (ইংরেজীর অনুবাদ) রচনা পাঠাচ্ছি। এও মনে হয় যুগান্তরেই পেয়েছিলাম। আর কোথাও এটা সংগ্রহ করা আছে কি না আমার জানা নেই।

যদি আপনাদের ভালো লাগে প্রকাশ করবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

না হইতে মাগো বোধন তোমার ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গলঘট।
জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আমার, আবার পূজিব চরণতট।
ওই গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া,
জবা বিল্বদল গেল শুকাইয়া,
পূজার সময় যায় যে বহিয়া, জাগো না কেন মা সময় নিকট।
অগুরু চন্দন ধূলায় ধূসর
ভূমেতে লুটায় চামর চাঁচর,
মঙ্গল শিখা গিয়াছে নিবিয়া,
বরণের ডালা দিয়াছে ফেলিয়া,
হ'ল না বুঝি মা পূজন তোমার, ভেঙেছে রাক্ষস বোধনঘট।
দৈত্য তেজ নাহি করি পরাভব
বিজয় শঙ্খ কেন মা নীরব,
নাশহ হুঙ্কারি প্রচণ্ড দানব, অট্ট অট্ট হাসে হাস মা বিকট।
এসো রণচণ্ডী এসো রণসাজে,
এসো মা নাচিয়া সন্তানের মাঝে,
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার শিখাও জননী সমর উৎকট।
নরমুণ্ড ছিঁড়ি পরাইব গলে,
সর্বাঙ্গ তোমার সাজাব কঙ্কালে,
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন,
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন,
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আমার, আবার পূজিব চরণতট

(১৩১৪ সনের 'যুগান্তর' থেকে।)

শ্রীঅরবিন্দের আলিপুর জেলে বাসকালে রচিত একটি কবিতা (ইংরেজী) আহ্বান (Invitation)*

[অনুবাদক—সন্তোষকুমার বসু]

১

প্রভঞ্জন অশনি হুঙ্কার
চারিদিকে আসিয়াছে ঘেরি,
বিশাল প্রান্তর অতিক্রমি'
আরোহিব পর্বত উপরি।
কে আসিবে মোর সাথে আজি
কে চলিবে মোর পায় পায়,
বক্ষে ভেদি' খর স্রোতস্বিনী
নাহি টলি তুষার ধারায়।

২

নগরের প্রান্ত রেখা মাঝে
ক্ষুদ্রহীন সীমার বন্ধনে,
শতেক দুয়ার দিয়ে ঘেরা
নাহি রহি প্রাচীর বেষ্টনে

ঊর্ধ্বে মম অনন্ত আকাশ
বিশ্বদেব অসীম সুনীল,
বিকট বিদ্রোহে সদা নাচে
মোরে ঘেরি প্রমত্ত অনিল।

৩

দূরে হেথা আলয়ে আমার
নির্জনতা সাথে আমি খেলি।
বিপদে ও দুঃখ দুঃসাহসে
বরণ করেছি বন্ধু বলি।
কে চাহে গো মুক্তির জীবন,
কে বাঁচিবে স্বাধীন সমীরে।
ঊর্ধ্বে হেথা এস তবে চলি
ঝটিকা-প্রহত গিরি শিরে।

৪

ঝঞ্ঝা বায়ু আমি তার রাণী,
শৈলমালা সেবক আমার।
আমিই তো স্বাধীনতা দেবী
প্রাণময়ী মূর্তি গরিমার।
লভি প্রাণ আমারি সম্পদে
যে রহিবে পার্শ্বে মোর ঘেরি,
নব বলে বাঁধিয়া হৃদয়
বিপদেরে লইবে সে বরি'।

* জ্যোতির্ময়ী দেবীর পুরাতন সংগ্রহ থেকে ( যুগান্তর, ১৩১৪ )।

# ইমারত

শ্রীকালিদাস রায়

১

ইমারতী শিল্পী যারা তারা পায় লয়,
শিল্পীদের চেয়ে বড় তাদের সে দান।
যদিও গিরির তুল্য চিরন্তন নয়
মানুষের চেয়ে কিন্তু ঢের আয়ুষ্মান্।

বাদশা বেগম কত এখন মৃন্ময়
ক্ষীণজীবী মানুষের কতটুকু প্রাণ।
ইমারতই তাদের ত দেয় পরিচয়,
তাজের মিনার দর্পে উড়ায় নিশান।

মানুষ দেখিতে কেহ দেশান্তরে যায়?
ইমারত ছাড়া কী বা দেখিবার আছে?
কবি ছাড়া প্রকৃতির পানে কেহ চায়?
নবীন সভ্যতা শুধু ইমারতে বাঁচে।
হইত মানুষ গড়া আশ্রম কুটীরে
এখন তা হয় গড়া প্রাসাদের শিরে।

২

শুধু কর্ম নয়, ধর্ম-সাধনার তরে
আমরা ভক্তির দানে ইমারত গড়ি।
শিক্ষার আশ্রম হর্ম্য গ্রামে ও নগরে
গড়ি জড়ো করি যত ভিক্ষালব্ধ কড়ি।

সমাধিস্থ ইমারতে করিয়া উদ্ধার
তাহার ধ্বংসাবশেষ রাখি যাদুঘরে,
গড়ে তুলি ইতিহাস কঙ্কালে তাহার
প্রাচীন সভ্যতা-লিপি তাহার পঞ্জরে।

দীনের সম্বল ঘর্মে ধরে হর্ম্য কায়া
শূন্য মাঠে যেন তুঙ্গ বল্মীকের স্তূপ,
কুটীর অরণ্য-মাঝে ধরে চারু রূপ
এ দরিদ্র দেশে রচে ঐশ্বর্যের মায়া।
ইমারতী আচ্ছাদনে প্রলেপের মত
ঢাকা থাকে কদর্যতা ক্ষয় ক্ষতি যত।

## প্রত্যাবর্তন

শ্রীরবি গুপ্ত

[ ইয়োসেফ ফন আইসেনড্রফ-রচিত মূল জর্মন থেকে অনূদিত ]

হেরি যা নয়নে নাহি রয় এক সকল ক্ষণে,
দিন হয় শেষ অস্ত-সূর্য-বর্ণ মাঝে ;
রয়েছে জড়ায়ে বীভৎসতা সে প্রমোদ সনে—
চির যবনিকা—বিরতি, মৃত্যু সবেরই আছে।

আসে মৃদু পায়ে দুঃস্বপ্ন আসে নীরবে,
জীবনের মাঝে আসে অগোচরে চোরের মত ;
আমায়—সবায় যেতে হবে ছেড়ে—বিদায় লবে—
এই পৃথিবীতে প্রিয় যা মোদের—স্বপন যত।

শত সংঘাত করিয়া ব্যর্থ কি র'বে হেথা ?
কে পারে বহিতে দুর্বহ শোক—দুঃখভার ?
মানবজন্ম পৃথিবীতে এই—সহিবে কে তা' ?
যদি না রাখিতে বিরচিয়া নীড় নভে তোমার !

ভেঙে ভেঙে দাও বিরচি যা কিছু—করুণা তব,
যে আচ্ছাদন—মাথার ওপরে যা কিছু গড়ি,
তাই তো নয়ন হেরিবারে পায় অসীম নভ,
বেদনার শেষ—মিছে অনুযোগ কেমনে করি !

## "কবিশেখরের" প্রতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সত্য বটে বদলে গেছ, অনেকখানি বদলে গেছ—
তবু পাণ্ডু চন্দ্রিকাতে হে সুধাকর ভালই আছ।
আমি নূতন দেউল চেয়ে—
ভালবাসি প্রাচীন যে হে,
মন্দিরই আজ দেবতা হয়ে মহিমাতে বেশ বিরাজো।

২

কেটে গেছে অভিনবের অভিনয়ের উজ্জল পালা—
টাটকা না হও—ঝুলন রাতের তুমি বাসিগুঞ্জমালা।
নিবেদিত ওই প্রসাদী—
মালার আমি কৃপাই সাধি'
জয়মালা আজ জপমালা—পুণ্য প্রভায় কুঞ্জ আলা।

৩

যুগের রসের কস লেগেছে, বল্‌ছি তোমায় চুপে চুপে—
রূপ গিয়ে যে ধীরে ধীরে মিশছে আহা অপরূপে।
আঁধার এখন, হয়ে ভূষা—
গড়ছে তোমার 'কেন্দ্র ঊষা'—
ভাব-দেহ যে যায় মিলায়ে আনন্দ সৎ-চিৎ-স্বরূপে।

৪

সুদীন বেশে দাঁড়িয়ে আছ, বিশ্বজিতের অবসানে—
হোমের ধূমে খিন্ন তনু, দেখে সবাই ধন্য মানে।
সাধকের ওই জীর্ণ দেহ—
জাগায় জগন্মাতার স্নেহ,
দেন কপালে হলুদ ফোঁটা, আশীষ করেন দূর্ব্বাধানে।

## অনুভব

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কি আশ্চর্য, এত সহ্য করবার শক্তি যে আমার
স্বভাবে নিহিত ছিল এতকাল বুঝিনি কখনো ;
এতকাল শুধু তীব্র অনিশ্চিত ওঠা ও নামার
দুর্গম সিঁড়িতে বসে ভেবেছি কোথাও বুঝি কোনো
স্থিতি আছে, শেষ আছে, অতর্কিত বিপন্ন বিস্ময়
সুন্দর শোভায় স্নিগ্ধ করবেই বিষণ্ন সংসার ;
প্রতিশ্রুত মৈত্রী প্রেমে জীবনের নিভৃত প্রত্যয়
শ্বেতপদ্ম ফোটাবেই শীতল গভীরে চেতনার।

অথচ এখনো দেখি সেই এক নির্মম প্রস্তুতি,
কোথাও বিন্যাস নেই কিংবা কোনো সৃজনী শৃঙ্খলা
শুধু আছে সহশক্তি, রক্তের প্রগাঢ় অনুভূতি,
গন্ধভরা স্নিগ্ধ পথে সেখানে হৃদয় চন্দ্রকলা।

•

যতই না নিষ্পেষিত বেদনার নিয়মে নিগড়ে,
কি অলোক সহশক্তি ক্রিয়াশীল রক্তের ভিতরে।

# রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানের শিক্ষা ব্যাপারে এক সময় বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রচলিত বিত্যালয়ে শিক্ষার ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ছোটবেলা থেকেই। তিনি মনে করতেন, পুঁথির শিক্ষায় আনন্দের অভাব, মুক্তির আনন্দরস তাতে নেই। 'প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে' ছেলেমেয়েদের তিনি মানুষ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে-শিক্ষা পেয়েছিলেন 'প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছ-পালা, আকাশ-আলোর সহযোগে,' সেই ছিল শিক্ষার সত্য পরিচয়। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই আনন্দ-উৎস থেকে চিরদিন বিচ্ছিন্ন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে-শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগাৎ রূপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলেছেন, তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুল মাষ্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়।' কি করে শিক্ষার মধ্যে প্রাণরসধারা বইয়ে দেওয়া যায়, তাই হ'ল কবির ভাবনা। প্রাণের ঐশ্বর্য লাভ করতে গেলে প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডারের অনুসন্ধান করা ছাড়া উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে মানুষ জন্মেছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব সংসারের মধ্যে; সুতরাং ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই দুইটির একত্র সমাবেশ করলেই হবে শিক্ষার পরিপূর্ণতা ও মনুষ্যজীবনের সম্পূর্ণতা; শিক্ষার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে ছেলেমেয়েদের কাছে তা হবে একান্ত ভার। ভারবাহী প্রাণী যেমন ভারই বহন করে, কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতা তার থাকে না, তেমনই প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন শিক্ষায় ছেলেদের মন পূর্ণতা লাভে বঞ্চিত। 'শিক্ষা শুধু সংবাদ বিতরণ নয়, মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে, তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।' জীবনের পূর্ণতালাভের নিদর্শন আছে সেকালের তপোবনের নির্জন তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে। রঘুবংশ, অভিজ্ঞানশকুন্তল ইত্যাদি গ্রন্থে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের চিত্র রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আদর্শ শিক্ষক প্রকৃতিকে নিয়েই যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মূলভিত্তি তা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বুঝেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমই শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের একমাত্র আদর্শ ভেবে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমকেই এ-বিষয়ে উপযুক্ত স্থান বলে মনে করলেন। পিতার কাছে গিয়ে মনের কথা জানালে মহর্ষি সানন্দে পুত্রের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তদনুসারে মনোমত বিদ্যালয় স্থাপন করে এর নাম দিলেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ তারিখে হ'ল এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামটির পরিবর্তে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নাম রাখা হয়।

ছয়টি বালক নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হয়, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই দুই পুত্র—রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ। ধীরে ধীরে দু-চারটি ক'রে ছেলে আসতে আরম্ভ করে; কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র, শিক্ষক, গুণী এসে জড় হ'ল শান্তিনিকেতনে। নিজ মাহাত্ম্যেই আশ্রম বিদ্যালয়টি পরিণত হ'ল বিশ্বজনীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবলেন যে, এই বিত্যালয়কে একটি বিশেষ স্থানের বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত হবে না। এই মনোভাব থেকেই তিনি বিশ্বের সকলের জন্যই এর প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। এইভাবে ২০ বৎসর পরে ১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ আশ্রম বিদ্যালয়টি বিশ্বভারতী নামে অভিহিত হ'ল এবং এই দিন আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা তাঁর বিদ্যালয়টিকে সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ করলেন। বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠার সূচনায় রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধ।

বিদেশে ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য জাতি পূর্ণ শক্তির অধিকারী হতে পারে নি। যে-আংশিক সত্যকে তারা লাভ করেছে, তার সঙ্গে সংযম বা আত্ম-সাধনা যুক্ত না হলে তাদের সেই শক্তির হবে অপচয়; কেবল তাই নয়, তাদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষবহ্নিও ক্রমশ বাড়তে থাকবে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে চাই আত্ম-সাধনার ক্ষেত্র—যেখানে হবে 'বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা।' 'মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত' করার জন্য রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন

তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়টিকে 'মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র'-রূপে পরিণত করতে। 'বিশ্বের সঙ্গে ভারতের' যোগসূত্র স্থাপনার পরিকল্পনাও ছিল কবিগুরুর মনে। 'বিশ্বজাতিক মহা-মিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা'র উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর বিদ্যালয়টিকে 'সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত' করে তুললেন। এইরূপে বিশ্বের সর্ব মানবের 'জয়ধ্বজা' প্রোথিত হ'ল শান্তিনিকেতন-আশ্রমে।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ভারতের মননশক্তির দীনতা। বৃক্ষের শাখাগুলি যদি মনে করে যে বৃক্ষের মূল বা কাণ্ডের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই, তারা একেবারেই স্বতন্ত্র, তবে তারা ডেকে আনবে বৃক্ষের ভাবী অনিষ্টপাত ও তাদের সর্বনাশকে ; ভারতের পক্ষেও রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ দৈন্যদশা লক্ষ্য করেছিলেন। জাতিগত বিশিষ্ট ভেদবুদ্ধিই ছিল এর মূলে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, প্রভৃতি সকলের মধ্যেই একতার অভাব দেখা দেয়। নিজের মত করে দান বা গ্রহণ করার শক্তি কারোরই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সকলের মধ্যে এই দীনতা দেখে বুঝেছিলেন যে, ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে—'বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত' করতে না পারলে সে শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ ও অসার্থক। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে সেই সমগ্র শিক্ষার প্রবর্তন করতে। বিদ্যা সৃষ্টি করাও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম মুখ্য কাজ। সৃষ্টি করার ক্ষমতা না থাকলে দানের কড়ি যায় দু-দিনেই ফুরিয়ে; সুতরাং কেবল বিদ্যা দান করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরকম সাধকেরই প্রয়োজন যাঁরা 'নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা' বিদ্যার অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে নিরত আছেন। নিজেদের আদর্শ ও প্রয়োজনের কথা না ভেবে কেবল বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণ করলে ভারতীয় বিদ্যার করা হবে অবমাননা। 'শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ' স্থাপনা না হলে সে শিক্ষা হবে দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্বজনীন করতে হলে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইত্যাদি বিদ্যাকে প্রয়োগ করতে হবে 'আপন প্রতিষ্ঠা স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে ;' কতকগুলি উকিল, ডাক্তার বা কেরাণী সৃষ্টি করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয় না। নিজেরা স্বতন্ত্র না থেকে চারদিকের মানুষের সঙ্গে যোগ স্থাপনা ক'রে কাজে অগ্রসর হতে হবে ছাত্র ও শিক্ষককে সম্মিলিত ভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে উন্নততর প্রণালীতে চাষ-আবাদ, গো-পালন, বস্ত্র-বয়ন, ইত্যাদি শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সমবায় প্রথার কথাও বার বার বলে গেছেন। শিক্ষার মধ্যে অন্যতম প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত সমবায় প্রথার অনুশীলনী, যাতে ছাত্র ও শিক্ষক চতুর্দিকবর্তী 'অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত' হতে পারে। রবীন্দ্র-নাথের মনে এসেছিল এইরূপ একটি সর্ববিদ্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে ; তার ফলেই বিশ্বভারতীর জন্ম।

নদীর যেমন পুষ্টি হয় বিভিন্ন উপনদীর সহায়তায়, ভারতীয় বিদ্যাস্রোতও পরিপুষ্টি লাভ করেছে মুসলমানী ও ইউরোপীয় ধারায়। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ইত্যাদি নানা বিষয়ে এর প্রকাশ রয়েছে। ভারতীয় বিদ্যাকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় 'বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, পার্সী বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুসঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এ কথা মনে রাখতে হবে, সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি একান্ত ভাবে কেবল ভারতকেই দেখা যায়, তবে ভারতদর্শনও যথার্থ হবে না ও তার সত্যদর্শন রইবে আবৃত। আবার এ বিষয়ও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের কোন অংশকে তার সমগ্র রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভারতকে জানা সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যা-অধিকারে সমগ্র পৃথিবীকেই ভারতবর্ষের স্বীয় অঙ্গনে আহ্বান করা কর্তব্য। 'ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ, পার্সী, খ্রীষ্টানকে এক বিরাট্ চিত্তক্ষেত্রে সত্য সাধনার যজ্ঞে সমবেত' করানই ভারতীয় বিদ্যা-য়তনের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্যে এই সত্যই নিহিত।

আত্মার মুক্তিতে স্বার্থ বিসর্জন অবশ্যম্ভাবী ; এর ফলে সমস্ত বন্ধন হয়ে যায় ছিন্ন। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই মুক্তি কখনই যেন 'কর্মহীনতা বা শক্তিহীনতার রূপান্তর' না হয়। এইরূপ মুক্তিলাভ কি করে আসবে 'তা কান দিয়ে শোনা ও সত্য বলে জানার একটা জায়গা'র সৃষ্টি করা দরকার। বিশ্বভারতী সেইরূপ মুক্তির সন্ধান দিতে পারবে বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন।

লোকে জীবিকার জন্য ছুটাছুটি করে অভাব হলেই ; তখন মুখ্য হয় জীবিকার প্রয়োজন মেটান ; কিন্তু জীবনের সার্থকতা বা তার পরিপূর্ণতা আনতে হলে কেবল তার অভাব মেটালেই হবে না। মনকে করতে হবে শান্ত, আর বিভিন্ন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য ও চিত্তবিক্ষেপ থেকে তাকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শান্তির মধ্যে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপন

করেন। বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বানই মুখ্য, 'ইস্কুল মাষ্টারের আহ্বান নয়।' শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা যতদূর সম্ভব মুক্তির আস্বাদন পায়, আর 'বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র বিশ্বপ্রকৃতি'ও তাদের মনে এনে দেয় অন্য মুক্তির স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ইচ্ছা ছিল ছেলেমেয়েদের মনকে দাসত্ব থেকে মোচন করা; কিন্তু আমাদের দেশকে যে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির জাল ঘিরে রেখেছে, তার থেকে আশ্রম বিদ্যালয়কে একেবারে মুক্ত করে আনা সম্ভব হয় নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তাঁকেও ছেলেদের তৈরী করে দিতে হ'ত; কিন্তু এর মধ্যেও তিনি যথাসাধ্য স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, যার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় আশ্রমটিকে একেবারে শাসনাধীনে আনতে পারে নি; কিন্তু এতেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের পরিসীমা ছিল না। তিনি মনে করতেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আশ্রমের শিক্ষায় দাসভাব বিদ্যমান থাকে। এই জন্যই তাঁর মনে হয়, স্বাধীন ভাবে আশ্রমে বিদ্যানুশীলনের চর্চা করতে। ফলে, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বন্মণ্ডলী আশ্রমে বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত হলেন স্বাধীনভাবে। কবিগুরুর মনে হ'ল, 'এই রকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য।' এই ভাবে বিশ্বভারতীর প্রথম বীজ বপন হয়।

প্রত্যেক বীজই যে অঙ্কুরিত হয়, তা নয়; তার মধ্যে প্রাণশক্তি থাকা প্রয়োজন; সেইরূপ সাধনার মধ্যে যদি সত্য লুকান থাকে, তবে সে সত্যের একদিন প্রকাশ হবেই। প্রথমে নানা অভাব দেখা দেয় বিশ্বভারতী পরিকল্পনার মধ্যে; কিন্তু শেষে সব অভাবেরই অবসান ঘটে প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের অলৌকিক ক্ষমতা বলে। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির পথ সুগম হয়ে ওঠে। আশ্রমের অধ্যাপকমণ্ডলীকে রবীন্দ্রনাথ কেবল উপযুক্ত আসন দিয়ে সংবর্ধনাই জানান নি, তাঁরা যাতে যোগ্যতর হয়ে ওঠেন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও গবেষণায়, সেদিকেও তিনি গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যথাশক্তি সাহায্য ও ব্যবস্থা করে দিতে যত্নের ত্রুটি করেন নি। বিশ্বভারতীর সূচনায় তিনি বলেছেন, 'আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী একটিতে বসেছেন, আর একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির, ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত, আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এণ্ডুজের চারিদিকে ইংরেজী-সাহিত্য-পিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান্ নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পার্সী ও উর্দু শিক্ষা দেবেন ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে। শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেই রকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-সুদ্ধ যদি কেউ জন্মায় তা হলে জানা যায়, সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে, বাড়াবে এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কোন কর্মী ও ছাত্রকে যোগ্যতর করার জন্য তথা আশ্রমের উন্নতিবিধানার্থ বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা বিদেশে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপন করে বিশ্বভারতীতে ফিরে এসেছিলেন এবং আশ্রমের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন।

১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব-তিথিতে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ দিনই বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। বিশ্বভারতী পরিচালনার জন্য রচিত সংস্থিতিও ঐ দিনেই সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। প্রথম অধিবেশনের দিন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।' আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরিষদের সভাপতি পদ অলংকৃত করেন। বহু বিশিষ্ট মান্যব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় স্যা

নীলরতন সরকার, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, ম্যাডাম লেভি ও সিলভ্যাঁ লেভি, উইলিয়ম পিয়ার্সন, প্রশান্ত মহলানবিশ, প্রভৃতি সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দের। রবীন্দ্রনাথ সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, 'যে সকল সুহৃদ্ আজ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালন-পালন করলাম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন।' পরে তিনি আচার্য শীল মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ ক'রে বললেন, 'তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারিবে না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন।...আনন্দের সঙ্গে তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।'

কবিগুরু মনে করেছিলেন যে, তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়টিকে তাঁর দেশবাসীর প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন; কিন্তু 'প্রাণের নিয়মে' যদি বৃক্ষ তার শাখা-প্রশাখা চারদিকে বিস্তৃত করে, তাহলে যেমন তাকে 'বীজের সীমার মধ্যে' আর ধ'রে রাখা সম্ভবপর হয় না, সে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে বিশাল শূন্যতার মধ্যে, সেই-রূপ রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়কে সমর্পণ করতে হ'ল বিশ্বজনের কল্যাণে। এখানে সত্য সন্ধানের সুযোগ পেয়ে বিশ্ববাসী যাতে কল্যাণের মূর্তি দেখতে পায়, তাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। 'যদি কোনো জাতি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশতঃ আপন ধর্ম ও সম্পদ্‌কে একান্ত আপন বলে মনে করে, তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদ্‌কে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায়, তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে যাচ্ছে।' সেই বিশ্ববোধে ভারতকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক কামনা। ভারতবর্ষ যাতে বিশ্বমানব-গৌরবের অংশ লাভ করে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে 'সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র' করে দিয়েছিলেন। এখানে যাতে সকলে সত্যের অনুশীলন করতে পারে, তাই ভেবে তিনি শান্তিনিকেতনকে প্রাচীনকালের তপোবনের আদর্শে গড়েছিলেন। বিশ্বসমাজে নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন বহুদিন থেকেই। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে এও একটি কারণ।

পূর্বকালে রাজাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল রাজস্বের ষষ্ঠাংশ দিয়ে আশ্রম রক্ষা করা। সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা, সন্ন্যাসের অনুশীলন, ইত্যাদি বিষয় ছিল মুখ্য; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে সে রকম কিছু করতে চান নি; সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের বিকাশ যাতে হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যা ও চরিত্রের সমন্বয়েই ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে ওঠে। আশ্রমবাসীর মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য তিনি যত্নের ত্রুটি করেন নি। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আজিও তাঁরা এখানে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্পর্শেই ইহা সম্ভব হয়েছিল।

কবি নিজে একজন ত্যাগবীর। তাঁর সংশ্রবে এসে অনেকে এই ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে। যে আশ্রমকে তিনি নিজের মনের মতন করে সন্তানের স্নেহে লালন করেছিলেন, সেই অতি আদরের সাধের প্রতিষ্ঠানটিকে জগতের কল্যাণে তিনি দান ক'রে গেছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'নিজেকে দিয়ে ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল।' মহাপুরুষদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাঁরা জগৎকে সর্বস্ব দান করে পূর্ণতা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই সত্য পরিলক্ষিত হয়।

পুরাণে পাওয়া যায়, অসুররাজ কংসের অত্যাচারে পৃথিবী অত্যন্ত পীড়িত হয়ে দেবতার শরণাপন্ন হন। এই পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা আজিও দেখতে পাওয়া যায় বলীয়ান জাতির শক্তির উন্মত্ততায় বা পররাজ্য-লোলুপতায়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে, সত্য সাধনার অভাবেই এই হিংস্রতা বেড়ে চলেছে। সেইজন্য তিনি সত্য সাধনার ক্ষেত্ররূপে বিশ্বভারতী সৃষ্টি করে জগদ্‌বাসীকে ডাক দিলেন। এখানে তিনি পূর্ব-পশ্চিমের কোন প্রশ্ন রাখলেন না। তিনি জানতেন, বুদ্ধদেবের সত্য আবিষ্কার ভৌগোলিক সীমা পার হয়ে সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল; সুতরাং বিশ্বভারতীর সত্যসম্পদের অংশীদার যাতে সবাই হতে পারে তাই কবিগুরু চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'চিরন্তন সত্যের কাছে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই।' তিনি মনে করেছিলেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যার আদান-প্রদান হবে এই বিশ্বভারতীতে, আর জগতের সমস্ত জ্ঞানধারা মিলিত হয়ে এক বিশাল জ্ঞান-

বারিধির সৃষ্টি হবে। সেই জ্ঞানসাগর মন্থনে উত্থিত সত্যামৃতই হবে সর্বকালের সর্বজাতির অমূল্য ধন।

ভারতের সত্যসম্পদ্ নষ্ট হয়ে গেছে ব'লে যাদের ধারণা, তারা মোহাচ্ছন্ন। সত্যবানের সত্য কখনও অপ্রকাশিত থাকে না। ভারতের সেই চিরন্তন সত্য প্রকাশের দায়িত্ব দিয়েই বিশ্বভারতীকে গড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলে গেছেন, 'বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদ্‌কে উপলব্ধি করুক যে, সম্পদ্‌কে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।' তীর্থযাত্রীর অকপট ভক্তিতেই তীর্থস্থান হয়ে ওঠে সত্য, তেমনই বিশ্বভারতীতে এসে সবাই যদি নিজের স্থানটি খুঁজে নিতে পারে, তবেই বিশ্বভারতীর সত্য প্রকাশিত হবে। এখানে যাঁরা সত্য উপলব্ধি করতে শ্রদ্ধা নিয়ে প্রত্যাশা করবেন, সেই শ্রদ্ধা ও প্রত্যাশায় বিশ্বভারতী হয়ে উঠবে সমুজ্জ্বল। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—এর মন্ত্র হবে প্রত্যাশার বিষয়। তীর্থস্থানে এসে লোকে যেমন সমগ্রতাকে দর্শন করে, তেমনই বিশ্বভারতীতে এসে সবাই যেন বলতে পারে, আ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শনলাভ করলাম'—এই মনে করেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে বার বার তীর্থ বলে গেছেন।

সংসারাবদ্ধ মানবের মুক্তিপথ সৃষ্টি করা বিশ্বভারতীর অন্যতম উদ্দেশ্য। 'নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হ'ল ছোট কথা; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সে জন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়।' পৃথিবীর যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ, রেষারেষি, মনকষাকষি, ইত্যাদির মূলে রয়েছে এই সত্যের অপলাপ। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' এই আর্য উক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহান হওয়ার ফলে পৃথিবীর আজ সর্বনাশ উপস্থিত। মানুষ মানুষকে হিংসা করে বা পীড়া দেয়—এমন পাপ বা অন্যায় চিন্তা করলেও স্তম্ভিত হতে হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই হিংসা, মারামারি, রক্তারক্তি পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে। মানুষের এই নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার চিন্তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই। বিশ্বের সমস্ত মানুষের 'যোগসাধনার সেতু' রচনা করা হয়েছে বিশ্বভারতীতে; অতিথিশালার দ্বার সেখানে থাকবে মুক্ত, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বলতে কোন দ্বিধা হবে না 'আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা'—এখানে সকল দিক্ থেকে সকলে আসুক এবং অমৃতত্বলাভ করে সত্য প্রতিষ্ঠা করুক। কবিগুরুকে বিদেশীরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভারত কি ঐশ্বর্য দিতে পারে। তার উত্তরে তিনি বলেন, 'ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায়; যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়—তাই তার সম্পদ্। সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে।'

(বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ অপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নাও হতে পারে—এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। 'এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতন হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান-বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে, এ সমস্তই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এ সমস্ত আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে।) আশঙ্কা হয়, পাছে যা ছোট তাই বড় হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের ক্ষেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোন বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্য-প্রকৃতির যে সত্য পরিচয় দেয়, সেইটেই তার বড় লক্ষণ।'

কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে বিশ্বভারতীকে চলতে হবে, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি কখনও চান নি যে, তিনি যে-ভাবে বিদ্যালয়টিকে প্রবর্তিত করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই তা চলতে থাকবে। 'সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে', যোগ স্থাপন করে বিশ্বভারতীকে এমন ভাবে চালিয়ে নিতে হবে যাতে এর সত্যের জয়যাত্রার পথ প্রতিহত না হয়। 'প্রতিমুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই' আশ্রমটির সজীব পরিচয়-প্রকাশের বাধা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। 'স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয়' দেবার ইচ্ছা যেন কখনও না হয়। তিনি বলেছেন, 'আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্ত সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন

বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে।' কালের ধর্ম হচ্ছে নিয়ত পরিবর্তনশীল। ভাবীকালের পথ তৈরী করে দিলেও গম্যস্থানকে নির্দিষ্ট দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে পাকা করে দেওয়ার চেষ্টা করলে সে চেষ্টায় ফল হতে পারে 'মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান।'

আজ থেকে ২৭ বৎসর আগে ১৩৪১ সালের ৮ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ বার্ষিক পরিষদ-সভায় আচার্যের ভাষণে বলেছিলেন যে, পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শিশুবিদ্যালয়টির রূপটিও পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে আশ্রমের মূল সত্যের যে কোন রূপ বদলায় নি, তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। 'জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত' করাই হচ্ছে সেই সত্যের পরিচয়। এই সত্য আশ্রম-জীবনে ব্যাহত হয় নি দেখে তিনি বড়ই প্রীত হয়েছিলেন। আশ্রমের আয়তন যখন ক্ষুদ্র ছিল, তখন আদর্শরক্ষা-করা ছিল সাধ্যের মধ্যে; কিন্তু তা হলেও 'সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সংগীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে; একতারার ভুল-চুকের সম্ভাবনা কম। তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন নয়। বরঞ্চ কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে, তখন তার সকল ভ্রম-প্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু-অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মত বিড়ম্বনা আর কি আছে।' কবিগুরুর এই উক্তিটি আজও সম্পূর্ণ সত্য। সে-সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এসেছে বিরাট্ পরিবর্তন। আশ্রমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিদান ও ভারত সরকার কর্তৃক আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ হচ্ছে অন্যতম প্রধান পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই পরিবর্তনকে স্বীকার করেছেন। আশ্রমের মূল সত্য জাগ্রত থাকলে এই পরিবর্তনে কারও ক্ষোভের কারণ হতে পারে না। সকলের শিক্ষা-দীক্ষা সমান নয়, রবীন্দ্রনাথের সময়ও তা ছিল না। কিন্তু তিনি সকলকে নিয়েই ত কাজ করতেন, কাকেও বাদ দিতেন না। কত ভুল-ত্রুটি হ'ত, কত বিরোধ ঘটত, কিন্তু কাউকে তিনি অসম্মান করেন নি। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলে গেছেন, 'আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করিনে।' তিনিও তাঁর সময়ে আশ্রমবাসীদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব দেখেছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে তিনি কাউকে অভিযুক্ত করেন নি। তিনি বলেছেন, 'আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনিই তৈরি হয়ে উঠেছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোন এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়', 'সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো—আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে। অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠেছে।' আশ্রমের মধ্যে গ্লানি জন্মাতে পারে বা নিন্দনীয় বিষয় থাকতেও পারে; কিন্তু সেইটিই ত বড় কথা নয়, 'তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়ে টিঁকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ।' রবীন্দ্রনাথ কামনা করে গেছেন যে, আশ্রমের জীবনে যেন 'অখণ্ড পরিপূর্ণতা'র প্রতিষ্ঠা হয়। আশ্রমের ভার কারা নিতে পারে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত হচ্ছে যে, যে-সব ছাত্র এখানে যা পেয়েছেন বা দিয়েছেন, তাঁরাই যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই আশ্রমের প্রাণ থাকবে সজীব। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়।' এই সত্যকে যথাযথ রক্ষার্থে আহ্বান করেছেন তিনি তাঁদেরই যাঁরা এক সময় আশ্রমজীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকে এর প্রাণধারাকে গতিশীল করে তুলেছিলেন এবং যাঁদের স্মৃতিতে বিরাজিত আছে আশ্রমের চিরন্তন সত্য রূপটি।

---

# কুবীর পঞ্চায়েত

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

জুলফিকার

এক

রেল লাইনের ওধার থেকে সুরু হয়েছে বরিন্দ। সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে জমি উঁচুতে উঠেছে, আবার ধাপে ধাপে নেমে গেছে। এই উঁচুনীচু ধূ ধূ জমির মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা খাত। বর্ষায় তার মাঝে ছুটে চলে খর-প্রবাহ, আর শীত শেষ হতে না হতেই শীর্ণ জলধারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উন্মুক্ত প্রান্তরে ছত্রভঙ্গ বাহিনীর মত অগণ্য তালগাছ। মাঝে মাঝে নাবাল জমিতে বিল। দল ঘাসের মাঝে ঘোড়া চরছে। জলের কিনারে দু'চারটে লুব্ধ বক, কোথাও বা একটা রঙীন মাছরাঙা।···আকাশের ছায়া প'ড়ে ফাঁকা জলের রঙটা সময় সময় অদ্ভুত নীল হয়ে ওঠে।

দূরে দূরে গ্রাম, সেখানে করঞ্জা, নিম, তেঁতুল, কপিত্থ, অশ্বত্থ গাছের নিবিড় সন্নিবেশ ছায়ানীড় রচনা করেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে টিনের চাল, মন্দিরের চুড়ো, হয়ত বা দেখা যায় কোন বর্দ্ধিষ্ণু জোতদারের নতুন পাকাবাড়ীর চিলেকোঠা। গ্রামের সীমান্তে উঁচু বাঁধের নীচে বিস্তীর্ণ দীঘি, পঙ্ক সঞ্চয়ে যার বুক আজ রুদ্ধ, জলের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে এসেছে। প্রশস্ত বাঁধা-ঘাটের ভগ্ন পঞ্জর বরেন্দ্রভূমের পালযুগের স্মৃতি বহন ক'রে চলেছে। এখনও পুকুরের ভরাট ধারগুলো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে কষ্টিপাথরের সপ্তাশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি বা পীনবপু, ক্ষীণমধ্যা মকরবাহিনী গঙ্গা,—মধ্যযুগের গৌড়ীয় শিল্প-রীতির অপূর্ব্ব নিদর্শন।

কাগজপত্রে নাম কবীরুদ্দিন আহম্মদ,—লোকে বলে, 'কুবীর পঞ্চায়েত।' বরিন্দ এলাকায় কুবীর পঞ্চায়েতের নাম শোনে নি, এমন লোক খুবই কম। দু'শ' চারশ' বিঘে নয়, প্রায় দু' হাজার বিঘে ধানী জমির মালিক। কোথায় নেই জমি কুবীর মিঞার?···রোহনপুর, নিশ্চিন্ত-পুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, গোদাগাড়ী, পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলার মহানন্দার ধার পর্য্যন্ত।

নানাভাবে জমি করেছে পঞ্চায়েত, তবে ঠিক অসদুপায়ে নয়। দেনার দায়ে মহাদেব মণ্ডলের জমি নিলেম হয়ে যাচ্ছে, শুনতে পেয়ে মহাদেবের হয়ে টাকা দাখিল ক'রে জমি রক্ষা করল কুবীর। তিনশ' বিরানব্বই টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা—আসল, সুদ মায় ডিক্রীর খরচা নিয়ে। কোথায় পাবে মহাদেব একসঙ্গে এতগুলো টাকা?···জমি পেল মহাদেব ঠিকই, তবে ভাগচাষী হিসাবে। জমিটা কবালা ক'রে দিতে হ'ল পঞ্চায়েতের বরাবর। আণ্ডাবাবুর জমির লাগাও, খুব সরেস জমি। জমিটা নেবার জন্যে বহুদিন থেকে ওৎ পেতে আছেন তিনি। কুবীর বলে, "জমি তুই রাখতে পারতিস্ নে মহাদেব। শেষটায় সুদখোর আণ্ডা চক্কোত্তির হাতে গিয়ে পড়তই ওটা। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল হ'ল, সব দিক্ দিয়ে। অন্য কাউকে কোনদিন এ জমি বিলি করব না, কথা দিচ্ছি তোকে। নিশ্চিন্ত মনে চাষ ক'রে যা তুই। ফসল ভাল তুলতে পারিস, তোর ন' আনা আমার সাত আনা, আর বীজ ধানটা না হয় আমিই দেব।"

হানিফ সেখ হজে যাবে। বুড়োর ছেলে নেই, দুই বিবিরই এন্তেকাল হয়েছে। দুই বেটী-জামাইদের সঙ্গে সদ্ভাব নেই হানিফের। হালে জমি প্রায় আড়াইশ' বিঘে। কুবীরুদ্দিনের দরজায় ধর্ণা দেয় হানিফ। সম্পত্তি ওর কাছে গচ্ছিত রেখে যেতে চায়। যদি ফিরে আসে আবার ভাল, আর যদি নাই ফেরে ( হজে মৃত্যু ত পরম সৌভাগ্যের ) তবে সম্পত্তির মোতোয়ালী হিসাবে যেন সব দেখাশোনা করে পঞ্চায়েত। পীরের স্থানে বাতি জ্বালায় জুম্মাদিনে মসজিদে অন্ধ আতুরদের জাকাত করে, ফীর্ণি খাওয়ায়, মৃত গরীবদের জন্য কাফনের কাপড় জোগায়।···

হজ থেকে হানিফ আর ফিরল না। জমি হয়ে গেল কুবীরের। ওয়াকফের কাঁচা একটা দলিল হয়েছিল বটে, তবুও, ওয়ারিশান ডালিম আর আঙুর বিবির টিপ এনে জমি কবালা করিয়ে নেয় পঞ্চায়েত, ওদের প্রত্যেককে পাঁচ-পাঁচশ' টাকা নগদ দিয়ে। হানিফের দামাদেরাই আমমোক্তার হিসাবে দলিল সম্পাদন ক'রে দিল। জমিগুলোর উপর ওদের লোভ বরাবরই। চরের এক লপ্তে অতখানি খাসা জমি আর কোথায় পাবে? কিন্তু পঞ্চায়েতের সঙ্গে কাজিয়া করতে সাহস করল না ওরা।

পঞ্চায়েতকে ভালই জানে ওরা, বড় দুর্দ্ধর্ষ লোক। রুকুনপুর চরের দখল নিয়ে লালগোলার রাজার দেড়শ' পাইককে হটিয়ে দিয়েছে মাত্র জনাবিশেক লোক নিয়ে, দু' হাতে দুই লাঠি ঘুরিয়ে। এ তল্লাটে পঞ্চায়েতের মত দক্ষ লাঠিয়াল দ্বিতীয় কেউ নেই। চরসরন্দাজপুরের ভৈরব বাগ্দীর সাগরিদ কুবীর—যে লাঠি ধ'রে বন্দুকের গুলী আটকাতে পারত।···পীরের দরগায় চেরাগ দিতে বা অনাথ আতুরদের দান-খয়রাত করতে কোনদিনই কার্পণ্য করে না কুবীর। বছর গেলে অন্ততঃ শ' পাঁচেক মণ ধান বেচে মসজিদে কাঙালী ভোজন করায়, শীতের চাদর-কম্বল বিলি করে।

নিঃসন্তান বেওয়া, সম্পত্তি পাছে দুষ্টু লোক ফুসলিয়ে আত্মসাৎ করে এই আশঙ্কায় পঞ্চায়েতের পরামর্শ চায়। মাসকয়েক যাতায়াতের পর দেখা গেল, পঞ্চায়েত তাকে দিব্যি নিকা ক'রে তার জোতজমির তত্ত্বাবধায়ক হয়ে বসেছে। দু'এক ক্ষেত্রে নিজেই এগিয়ে এসে বিত্তশালিনী অনাথার পাণিগ্রহণ করেছে।···ও যেন যাদু জানে, ওর কাছে বশ্যতা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।···বরিন্দ অঞ্চলে এইরকম বিবির ঘাঁটি আছে ওর গোটাকয়েক। ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চেপে ঘোরাফেরা করে পঞ্চায়েত। আজ বক্সগঞ্জের ফাতিমা বিবির খামারে, কাল মুণ্ডমালার জয়নাব মৃধানীর ওখানে, পরশু পোরশার সুফিয়া চৌধুরাণীর ফুফাতো বহিনের চকে, পঞ্চায়েতের ঘোড়ার বিরাম নেই।

কার জমিতে কত ফসল হ'ল, কার গোলায় কত ধান মজুত—সবই ওর নখদর্পণে। মুনিষ মাহিন্দরের বকেয়া রাখে না। ভাগের ও সাঁজার ধান ঠিক ঠিক আদায় ক'রে নেয়। ওজর-আপত্তি টিকে না ওর কাছে।···শুধু কি ধান! পাট আছে, আখ আছে, গম আছে, আছে তামাক, তিল, সরষে, কলাই, বুট, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ—কত কি! কোন্ জমিতে কত পাট, কত আখ, ক' মণ কলাই, ক' মণ সরষে ফলন হ'ল, সবই ওকে জানতে হয়। দম-দেওয়া লাট্টুর মত ঘুরে ফেরে পঞ্চায়েত। শুধুই কি মাঠের কাজের তদারক,—মামলা-মকদ্দমায় ছুটতে হয় একবার বালুরঘাট, একবার মালদ, কখনও বা দিনাজপুর সদর আদালতে, কখনও রামপুর বোয়ালিয়ার জজকোর্টে।···

দুই

একাদিক্রমে পঁচিশ বছর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। সরকারের দেওয়া কত ঘড়ি, ছড়ি, পেন, সনদ মজুত হয়ে আছে ওর বাড়ীতে।···আরও ত আছে প্রেসিডেন্ট বরিন্দ এলাকায়—আন্থানাথ চক্রবর্ত্তী, ইমরান আলী, আবদার রহমান চৌধুরী, বি-এ, ষষ্ঠীরাম মণ্ডল, গফুর বিশ্বাস। কই, কারও বোর্ডই ত ওর বোর্ডকে পিছে ফেলে যেতে পারে না! ট্যাক্স আদায় সেন্ট পারসেন্ট। গোটা জেলার মধ্যে ৩৭(খ) ধারার টাকা ওর বোর্ডেই সবচেয়ে বেশী। পাঁচটা প্রাইমারী ইস্কুল আর মক্তবেই সাহায্য দেয় বছরে পাঁচশ' টাকা। রণগস্তিতে ফাঁক পড়ে না। ওর ইউনিয়নের চৌকিদারী হাজিরা গোটা থানার মধ্যে সবচেয়ে ভাল। দফাদার চৌকিদারের বেতন কখনই বকেয়া প'ড়ে থাকে না।

সাধারণ চাষীঘরের ছেলে কবীরুদ্দিন। উত্তরাধিকারী সূত্রে মাত্র চল্লিশ বিঘে জমি পেয়েছিল, তা থেকে আজ প্রায় দু' হাজার বিঘে জমির মালিক। বেশ কিছু নগদ টাকাও জমেছে হাতে, মহবত সৌজন্যের ধার ধারে না। ভদ্রসমাজে প্রায় অচল, মনের সাথে চাতুরী করতে জানে না! স্পষ্ট কথা অপ্রিয় হলেও বলতে দ্বিধা নেই। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান প্রখর।···হাকিমদের সঙ্গে সময় সময় বেখাপ্পা ব্যবহার ক'রে বসে। ওর সাথে যাঁদের ভাল পরিচয় আছে তাঁরা অবিশ্যি কেউই ওর ব্যবহারের অসঙ্গতি গায়ে মাখেন না। একবার এক সার্কেল অফিসার নতুন এসেই ওর বোর্ড পরিদর্শনের সময় ওকে ধমকে কথা বলেছিলেন। আর যায় কোথায়,··· কবীরুদ্দিন গর্জ্জে ওঠে, খাঁটি দেশওয়ালী ভাষায়, "হাকিম ভেব্যেছ কি, মুন্ ল্যয় ত তুম্হার মত তিনঠো লুককে হামি নোকর রাখত্যে পারি।···তন্খা কত পাও জী?··· দশ গাঁয়ের মানুষ ভোট দিছেন তাই পিসিডেন হছি··· হাকিমদের ত্যাল্ দিয়ে লয়।"

বোর্ডের কাজ দেখবার সময় কই পঞ্চায়েতের? কাজ চালায় 'ভাই পিসিডেন' নিতাই হাঁসদা আর সেক্রেটারা কোরবান আলী। নিতাই ম্যাট্রিক পাস, গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারী করে। পল্লীর উন্নতির জন্য সদাই সচেষ্ট।··· কোরবান আই-এ পাস, মেধাবী ছেলে, অভাবের জন্য আর পড়াশুনো চালাতে পারে নি। আপিসের চিঠি-গুলোর জবাব ঝটপট লিখে ফেলতে পারে ইংরেজীতে। সত্যিই খুব কাজের ছেলে। মাইনে পায় চল্লিশ টাকা। আশেপাশের বোর্ডের কেরাণীদের বেতন দশ, পনের, খুব জোর বিশ। এস. ডি. ও. আর ডি. এম. সাহেবের আপিস থেকে হরদম চিঠি আসছে—এটা, ওটা, হরেক রকম খবর জানতে চায়। এবার রবি ফসলের অবস্থা কেমন, কত জমিতে পাট বোনা হয়েছে, কত জমিতে আলু, কোন্ কোন্ গাঁয়ে কৃষিঋণের দরকার? হালের

গরু কেনার টাকা যাদের দেওয়া যেতে পারে তাদের নামের লিষ্ট চাই। এ ছাড়া তদন্তের জন্য অনেক দরখাস্ত, অনেক কাগজ আসে প্রেসিডেন্টের কাছে,—কখনও এমনি খামে, কখনও শিলমোহর আঁটা লেফাফায়। কোনটাই প'ড়ে থাকে না—চটপট রিপোর্ট চ'লে যায়।

তিন

ছোট্টখাট্ট মাহুষটি। চিবুকের নীচে এক গোছা দাড়ি, রং ফর্সা, চোখে-মুখে একটা হাসির আমেজ লেগেই আছে সর্ব্বক্ষণ। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, মনে অফুরন্ত উদ্যম ও দুর্জ্জয় সাহস। ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই, সব ব্যাপারেই সোজাসুজি চলে। জিদের লড়াইয়ে পেছপা হয় নি কোনদিন পঞ্চায়েত।

করোগেট টিনের পারমিট চাই বড় মস্‌জিদের জন্য। ডিষ্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলারের আপিসে ধর্ণা দিতে দিতে হয়রান। গাদা গাদা দরখাস্ত এসে পড়ে আছে। কোটা শেষ হয়ে গেছে। নতুন এ্যালটমেণ্ট না পেলে আর টিন আনানো সম্ভব হবে না। অন্ততঃ আরও মাস দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে। এদিকে ত বর্ষা এসে যাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে।···পঞ্চায়েত ফতুয়ার পকেট থেকে এক গোছা নোট বার ক'রে রাখল টেবিলের উপর। "এই টাকা রইল—যা লাগে লাগুক, আমি চাই টিন সাত দিনের মধ্যেই, যে ক'রে হোক কলকাতা থেকে টিন আনানোর ব্যবস্থা করতেই হবে।"···যাক্, শেষ পর্য্যন্ত কুবীরেরই জিত হ'ল। স্পেশাল কোটা থেকে ছ' বাণ্ডিল টিনের পারমিট আদায় করে ছাড়ল পঞ্চায়েত!

সাফল্যের পিছনে ওর অসাধারণ জিদ, অদম্য কর্ম্মশক্তি ও বলিষ্ঠ অকপটতা।··ইমরান আলীও প্রেসিডেণ্ট, লম্বায় ছ' ফিট, খানদানী পাঠান বংশের ছেলে। জব্বর শিকারী, বন্দুক উঁচিয়ে উড়ন্ত পাখী গুলী ক'রে মাটিতে ফেলতে পারে। দারুণ স্মার্ট। পুলিস সাহেবের সঙ্গে দোস্তি। সাহেবকে নৌকোয় তুলে বিলে বুনো হাঁস শিকার করতে যায়। বাঘ মেরেছে কয়েকটা আর অনেকগুলো দাঁতাল শুয়োর।...বাসুদেব ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আবদুর রহমান কলেজে-পড়া ছেলে। সাহেব সুবোর সঙ্গে ইংরেজীতে বাতচিত চালাতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেট অনেকবার ডিনার খেয়েছেন ওর ওখানে। বিস্তৃত সম্পত্তির মালিক। দু' দুটো হাতী ওর দেউড়িতে।···গফুর বিশ্বাস বরিন্দ অঞ্চলের রকফেলার। শিয়ালদয় মস্ত ট্যানারী আছে তাঁর, গোদাগাড়ীতে জমজমে পাটের আড়ত। থাকেন কলকাতায়। বেলে-ঘাটায় বিরাট্ বাড়ী। তবে দু'তিন মাস অন্তর দু'চার দিন কাটিয়ে যান দেশের বাড়ীতে। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, হাইস্কুলের বহুদিনের সেক্রেটারী। সব দিকেই তাল দিয়ে চলতে জানেন গফুর মিঞা। এই সব মহারথী লোক থাকতে এ অঞ্চলে মুসলমান সমাজে নেতৃত্ব করতে ডাক পড়ে কিনা কবীরুদ্দিন মিঞার! অগাধ বিশ্বাস লোকদের ওর উপর। সবাই জানে, পঞ্চায়েত খাঁটি লোক, ইমানদার,—বিশ্বাসের মর্য্যাদা কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না তাকে দিয়ে। ইমান আর ইজ্জত রক্ষার জন্য সে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

চার

পঞ্চায়েতের দুই ছেলে,—ফেকু আর জেকু। বড় ছেলে ফকুরুল্লা জোয়ান বয়সেই মারা গেছে, সেও বহুদিন হ'ল। ছোটজন জেকুরুল্লা ক্যাম্বেল থেকে ডাক্তারী পাস করে, বাপের আপত্তি অনুরোধ সব উপেক্ষা ক'রে শেষ পর্য্যন্ত আসামে চ'লে গেছে চাকরি নিয়ে। কালেভদ্রে বাড়ী আসে। বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছে, ম্যাট্রিক পাস বৌ।···গ্রাম্য জোতদারের বাড়ী। উঠোনে হাঁস, মুরগী, ছাগল চরে বেড়ায়। দাওয়ার উপর গরুরগাড়ীর টপ্পর। বাড়ীতে ঢোকার মুখে মস্ত সার-গোবরের স্তূপ। পানায়-ভরা পুকুর। স্নানের ঘর বা শৌচাগার নেই। চেয়ার, টেবিল যে দু'চারখানা না আছে তা নয়—তবে ভারি, গোবদা, শ্রীহীন। সৌখীন শহুরে বধুর কাছে পাড়াগাঁয়ের এই পরিবেশ কি ভাল লাগে?

ছোট ছেলেকে পঞ্চায়েত খুবই স্নেহ করত। ফেকু-জেকুর মা,—পঞ্চায়েতের ছোট বিবি যখন মারা যান, জেকুর বয়স পাঁচ, ফেকুর দশ। সেই ছেলেদের বলতে গেলে বড় ক'রে তুলেছে কুবীর নিজের হাতেই। নিজে লাঠি খেলা শিখিয়েছে ওদের। স্ত্রী মারা যাবার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত কুবীর নতুন শাদি বা নিকা করে নাই (বড় বিবি আগেই গত হয়েছেন)। তার পর জেকু যখন জেলার স্কুলে পড়তে গেল, ধনবতী বিধবাদের নিকে ক'রে সম্পত্তি ঘরে তুলবার ফন্দী তখন থেকেই মাথায় এল ওর। এ কালকার বিবিদের কারুরই ছেলেপিলে হয় নি। অনেকেই মধ্যবয়স্কা, কারও কারও সন্তান ধারণের বয়স পেরিয়ে গেছে।

ধানের দর যখন আড়াই টাকা, সোনার ভরি বত্রিশ, তখনকার দিনে মাসে দেড়শ' টাকা খরচ ক'রে ছেলেকে কলকাতায় ডাক্তারী পড়িয়েছে পঞ্চায়েত। তখন এমন কি বা অবস্থা তার! শ' তিনেক বিঘে ধান জমি আর মাছকরে বন্দোবস্ত একটা বিল।

ছেলের কোন সাধই অপূর্ণ রাখে নি পঞ্চায়েত।

সোনার হাতঘড়ি, মোটর-বাইক, ক্যামেরা, গ্রামোফোন —যখনই যা চেয়েছে কিনে দিয়েছে। ছেলের টাকা জুগিয়ে কষ্টেই সংসার চলেছে তার। তবুও তারই ফাঁকে ফাঁকে নতুন জমি করেছে।

দামী গ্যাবার্ডিনের স্যুট, চেন লাগান রিমলেস্ চশমা, ম্যাকিনটশ, গ্লেজ্‌ড কিডসের জুতো, চুলের সুগন্ধি লোশন, স্নো, শেভিং ক্রীম, শ্যাম্পু—হরেকরকম কৌটো আর শিশি ভর্ত্তি প্রসাধন দ্রব্য! ওর রকম সকম দেখে পঞ্চায়েত প্রথম প্রথম পিতৃসুলভ স্নেহের হাসি হেসেছে।···ছুটিতে বাড়ী আসত কিন্তু দু'তিন দিন থেকেই আবার কলকাতায় পাড়ি দিত, হাসপাতালের কাজের দোহাই দিয়ে।···ওর ক্রমবর্দ্ধমান গৃহবিমুখতা পঞ্চায়েতকে শেষ-কালটায় শঙ্কিত ক'রে তুলল।...বহুদিন থেকেই ছেলের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ওর। মেয়েও ঠিক ক'রে রেখেছিল —আবদার রহমান চৌধুরীর ভাগনী, ন'ওগার আখন্দ-বাড়ীর মেয়ে। ওদের মত সম্ভ্রান্ত বাড়ীর মেয়ে ঘরে আনাটা কম ভাগ্যের কথা!

ছেলে কিন্তু বিবাহে একান্ত বিমুখ, অনুনয়, বিনয় সবই ব্যর্থ হয়েছে।···এর কিছুদিন পর একদিন ছেলেই হঠাৎ বাপের কাছে বিয়ের কথা পাড়ল। নিজের পছন্দ-করা মেয়ে। বাপ খান্‌সাহেব, রিটায়ার্ড, এঞ্জিনীয়ার। ভাই আসাম রেলের মস্তবড় কনট্রাক্টর—বছরে লাখ টাকা উপায় করে।

কলকাতায় মামাদের ওখান থেকে মেয়ে পড়াশোনা করে, কলেজে। ওর মামাতো ভাই জেকুর সহপাঠী।

কুবীর স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, কিন্তু সংস্কার ওর বুদ্ধিকে কখনও ঠিক আচ্ছন্ন করতে পারে নি। যুগের আবহাওয়াকে সে যতই কেন অপ্রীতিকর মনে করুক, দ্রুত-পরিবর্ত্তিত সমাজকে অস্বীকার করবার মত মূঢ়তা তার ছিল না। যখন পঞ্চায়েত বুঝল, ছেলে ঐ মেয়েকে বিয়ে করবেই, তখন বাধা দিতে গেলে এমন একটা অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যাতে কিনা পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ চিরদিনের মত ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, এই ভেবে সে চুপ করে গেল।···

ছেলের ব্যবহারে বড়ই আঘাত পেল কুবীর, কিন্তু সংসারে অনেক আঘাত পেয়ে হৃদয় তার ঘাতসহ হয়ে পড়েছিল, তাই সে ভেঙে পড়ে না।···পরাজয়ের গ্লানি তাকে ক্ষুব্ধ করল বটে, কিন্তু মৃতা পত্নীর শেষ অনুরোধ স্মরণ ক'রে সে নিজেকে সামলে নিল। জেকুর মা মরবার সময় ছোট্ট ছেলেটিকে তারই হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। অন্য কারও কাছ থেকে এতটা আঘাত পেলে সে হয়ত কঠোর ক্ষমাহীন হয়ে প্রতিহিংসার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠত।···

পাস করে হাসপাতালের ট্রেনিং শেষ হবার পর জেকু চাকরির জন্য ক্ষেপে উঠল। পঞ্চায়েত বলে, "যত টাকা লাগে দিচ্ছি, মনমত ডিসপেন্সরী খুলে বস্ দেশে। না হয় বিশ বিঘে জমিই বেচে দেব। কি দরকার তোর চাকরির? সাধ ক'রে গোলামি করতে যাবি কোন্ দুঃখে?···এমন কি আর মাইনে দেবে?···আচ্ছা আমিই না হয় দেব তোকে মাস মাস তিনশ টাকা, কিন্তু গরীব দুঃখীর কাছ থেকে ফী নিতে পারবি নে। সাত কোশের মধ্যে পাসকরা ডাক্তার নেই। তোরই আশায় ব'সে ছিলাম, কবে পাস করে বেরুবি।" সাত বছর লেগেছে ছেলের পাস ক'রে বেরোতে।

দীঘির পাড়ে শিমুল গাছের তলায় ছেলের জন্য দু-কামরার পৃথক্ একটা পাকা বাংলো ঘর তুলেছে পঞ্চায়েত, রাণীগঞ্জ টাইলে ছাওয়া। টিউবওয়েল বসিয়েছে, স্যানিটারী পায়খানা, বাথরুম। সেগুন কাঠের চকচকে পালিশ করা চেয়ার টেবিল, বেতের ইজি চেয়ার, মায় কেরোসিন-চালিত পাখা—গরমের দিনে হাওয়া খাবে বলে। সনৎবাবু উকিলের বাড়ী ওরকম পাখা দেখে কলকাতা থেকে কিনে এনেছিল তাঁকে দিয়ে।

কিছুতেই রাজী করতে পারল না ছেলেকে দেশে থাকতে। সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করবার ভয় দেখিয়েও টলানো গেল না ওকে। সম্বন্ধী রেল হাস-পাতালে কাজ জোগাড় করে দিয়েছে। চমৎকার কোয়ার্টার্স। বৌ ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে। শহুরে বৌয়ের প্রভাব তখন জেকুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পাঁচ

লড়াই লেগেছে। চড় চড় করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। চালের মণ পাঁচ টাকা থেকে বছর খানেকের ভিতর বাড়তে বাড়তে আট, দশ, বারো।

তার পর যখন জাপানের আক্রমণ সুরু হল, বার্ম্মা থেকে লোক দলে দলে পালিয়ে আসতে লাগল, তখন দর লাফাতে লাফাতে উঠছে,—বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ,—চল্লিশ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। ইংরেজীতে একেই বলে রকেটিং। চিনি কোথাও নেই। গুড় দিয়েই চা খাচ্ছে সবাই। কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য। প্রায় সব জিনিসেরই কনট্রোল। বিলেতী ওষুধ অগ্নিমূল্য, অনেক ওষুধ পাওয়াই যায় না। বাজার থেকে কুইনীন উধাও।

ফেকুর মেজ ছেলের কঠিন অসুখ। অনেক কষ্টে, অনেক পয়সা খরচ করে পঞ্চায়েত ইনজেকশান আনাল

বোম্বাই থেকে। ইনজেকশান দিয়েও নাতিকে বাঁচান গেল না, ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত এ্যাম্পুল পরীক্ষা করে জানা গেল, ওষুধ তাতে সামান্যই, বাকীটা স্রেফ জল।

নাতির মৃত্যুতে বড়ই শোক পেল পঞ্চায়েত। কয়েকদিন কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলল না কুবীর। উদ্‌ভ্রান্ত ভাব···রক্তনেত্রে কটমট করে চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। বড় ভালবাসত কুবীর ছেলেটাকে। ছোটকালে ওরই সাথে থাকত দিনরাত। সুশ্রী চটপটে, অসম্ভব মেধাবী ছাত্র। মাস্টারদের মুখে ওর আর সুখ্যাতি ধরত না। সেই বারই ম্যাট্রিক দেবার কথা ছেলেটার!

দেশের দুশমন কালোবাজারী অসৎ ব্যবসায়ীদের উপর দারুণ ঘৃণা ও আক্রোশ পঞ্চায়েতের অন্তরে পুঞ্জিত হয়ে ওঠে। থানার দারোগা ললিতবাবুর সামনে রোহণপুর বাজারে একদিন শীতলদাস মাড়োয়ারীকে এমনি অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে বসল, যে উপস্থিত সবাই থ মেরে গেল। অত বড় মানী লোক শীতলদাস বংশাল—রায় সাহেব, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, গবর্ণমেণ্টের ঘরে অত খাতির যাঁর? দশ হাজার টাকা যুদ্ধের চাঁদা দিয়েছেন। নিজের হাতে চিঠি লিখে লাট সাহেব তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রূপোর ফ্রেমে বাঁধান সে চিঠি তাঁর গদির দেওয়ালে টাঙান আছে।

শীতলবাবু চিনি কেরোসিনের হোলসেল ডিলার। পঞ্চায়েতের ইউনিয়নে মাসে দু' বস্তা চিনির বরাদ্দ। কয়েক মাস হয় এক বস্তার বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। এবার চিনির কোটা কম পাওয়া গেছে। ইউনিয়ন ডিলারকে সঙ্গে নিয়ে গেছল কুবীর।

অনেক অনুরোধ করেও যখন চিনি মিলল না তখন পঞ্চায়েতের নিরুদ্ধ রোষ ফেটে পড়ল।···দারোগা ওকে টেনে সরিয়ে নেন। "ক্ষেপে গেলেন নাকি, পঞ্চায়েত সাহেব?" আর একটু হলেই কুবীর শীতলবাবুর গায়ে হাত তুলত। দারোগার কাছে বাধা পেয়ে কুবীরের রাগ গিয়ে পড়ল তাঁর উপর। অনেকগুলি কটুকাটব্য শুনতে হয় তাঁকে। বিশ বছরের চাকরি ললিত বোসের, এর মধ্যে এমনি অপমানসূচক ব্যবহার কেউ কখনও করে নি তাঁর সঙ্গে। শীতলদাসবাবুর দোকানের সামনে দস্তুর মত ভিড় জমে গেছে কৌতূহলী জনতার। ললিত দারোগার মুখ-চোখ অপমানে লাল হয়ে ওঠে।

দেশের লোকের দুর্দ্দশায় পঞ্চায়েত বেশ বিচলিত হয়ে ওঠে। গবর্ণমেণ্টের উপর আস্থা আর তার নেই। দুর্গত জনসাধারণের খাওয়াপরার জন্য কি করছে গবর্ণমেণ্ট?···শুধু গোটাকত বড় মানুষের পকেটে টাকা ঢোকানোর ফন্দি চলছে? অনেক লোক না খেতে পেয়ে পথের ধারে মারা যাচ্ছে। কাপড়ের অভাবে গাঁয়ের মেয়েরা আত্মঘাতী হচ্ছে। কুইনীন না পেয়ে কতজনা ম্যালেরিয়ায় ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে গেল।···এর পরও মীটিং ক'রে জোর যুদ্ধের চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। চমৎকার যুক্তি—রাজা বাপ, প্রজা ছেলে; বাবার বিপদ, ছেলে সাহায্য করবে না? আর অনাহারে শুকিয়ে মরছে যে ছেলেরা সেদিকে খেয়াল কই বাপের?

যুদ্ধ-তহবিলের জন্য এক সভায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে উঠে বলল পঞ্চায়েত, "হুজুর আমি মুখ্যু মানুষ, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না কিছুতেই, কেন লোকে যুদ্ধের চাঁদা দেবে? প্রথমতঃ তাদের কারুরই প্রায় দেবার সামর্থ্য নেই। যাদের সামর্থ্য আছে, তারাই বা কেন দেবে? আজ ইংরেজের গোলাম আছে, কাল জার্ম্মানী জিতলে জার্ম্মানীর গোলাম হবে। গোলাম সে ত গোলামই থেকে যাবে।"

ম্যাজিস্ট্রেট ও-দেশী বাংলা কথা ভালই বুঝতেন। কুবীরের বক্তৃতা শুনে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

ছয়

নিশ্চিন্তপুরের ইদ্রিস দারোগার সঙ্গে রাস্তায় দেখা পঞ্চায়েতের। দু'পাটি দাঁত বার ক'রে হাসল ওকে দেখে। বলে, কথা আছে পঞ্চায়েত, খুব জরুরী! পঞ্চায়েত ঘোড়া থেকে নামল। অনেক দূর থেকে আসছে, আরও আট-ন' ক্রোশ রাস্তা যেতে হবে তাকে। বেলা সাড়ে দশটা বাজে, বারোটার আগে বাড়ী পৌঁছুতে পারবে না।

পথের পাশে একটা কয়েতবেল গাছের ছায়ায় টেনে এনে ফিস্ ফিস্ করে দারোগা বলল ওকে, "আপনার ছেলে ডাক্তার জেকরুল্লা আহাম্মদের নামে হুলিয়া বেরিয়েছে, আসাম গবর্ণমেণ্ট থেকে। চোরাই কুইনীনের কারবারে ধরা প'ড়ে ফেরার হয়েছেন তিনি। সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ীতে রোহনপুরের বড় দারোগা ললিত বোস। কাল বিকালে মালদ এস. পি.র আপিস থেকে জেনে এসেছি। হয়ত গিয়ে দেখবেন, এতক্ষণে খানাতল্লাসী আরম্ভ হয়ে গেছে। ওরা দেখতে চায়, ছেলে আপনার ওখানে লুকিয়ে আছে কি না আর চোরাই কুইনীনের কিছুটা মজুদ আছে কি না আপনার ঘরে।"

কুবীরের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠল। তাই ত, দিন-

চারেক আগে কোরবান বলছিল বটে জেকু আসছে, কি একটা গোপনীয় মিলিটারী কাজে। কিছুদিন হল আসাম সীমান্তে কোন একটা যুদ্ধের হাসপাতালের বড় ডাক্তার হয়েছে সে। চুপি চুপি বাড়ী ঘুরে যেতে চায় দু'একদিনের জন্যে। খবরটা খুব গোপন রাখতে বলেছে। পত্র কোথা থেকে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেল যে চিঠিতে কোন ঠিকানা দেওয়া নেই। টাইপ চিঠি, ওপরে সান্তাহার রেল পোষ্টাপিসের ছাপ।

ইদ্রিস সিগারেট ধরিয়ে বলল, "ললিত বোস দেখলাম আপনার উপর বিষম খাপ্পা। সেদিন শীতলদাসবাবুর গদিতে তাকে না কি একহাট লোকের মাঝে যাচ্ছেতাই অপমান করেছেন আপনি। এইবার বাগে পেয়েছে, সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না! বরিশালী গোঁ জানেন ত।...বলছিল, 'খুব ত ফুটানি ক'রে সেদিন একগাদা বড় বড় বুলি আউড়ে গেল পঞ্চায়েত, আজ তার নিজের ছেলে চোরা কুইনীনের কারবারে ধরা পড়ার ভয়ে ফেরারী। এইবার দেখি হাম্পাই-দাম্পাই কোথায় থাকে পঞ্চায়েতের'।"

কুবীরের আর কিছু শোনার মত অবস্থা নেই। সে উন্মাদের মত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, পিছন থেকে ইদ্রিস দারোগার গলা শুনতে পেল, "ঘাবড়াবেন না, পঞ্চায়েত। ছাড়ুন কিছু, এই হাজার তিনেকের মধ্যেই রফা করে ফেলতে পারব।...চাঁদির গুলীতে সব চিড়িয়াকেই ঘায়েল হতে হবে!"

উন্মুক্ত মাঠের মাঝে আঁকা-বাঁকা, উচু-নীচু পথ ধ'রে একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে কুবীর বাড়ী এসে পৌঁছুল যখন তখন মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে। দেখে, পুলিসের লোক ওর বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে। জিনিসপত্র তছনছ করে ভেঙেচুরে একাকার। বালিশ-বিছানা ছিঁড়ে বাইরে টেনে ফেলে দিয়েছে। উঠোনময় তুলো, নানা-রকম টুকিটাকি জিনিস ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ান। চোরাই কুইনীনের সন্ধান চলেছে।...

ওকে যেন চেনেই না ললিত দারোগা এমনি ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বাঁকা ঠোঁটে চুরুট চেপে মন্তব্য করে, "গোলার ধানের ভিতর লুকোন নেই ত?"

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো ধানের গোলা—প্রত্যেকটায় প্রায় দু' হাজার মণ ধান ধরে। একটা খালি, অন্যটায় আটশ মণ ধান খরিদ ক'রে ডি. পি. এজেণ্ট ওরই হেফাজতে রেখে গেছে।

পঞ্চায়েত ঠায় নিষ্পলক চোখে দাঁড়িয়ে দেখে। যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দেখে, তার শত্রু পাঞ্জাতন শেখ আর হলধর রায় দারোগার দু' ধারে বসা—শিবের পাশে যেন নন্দী-ভৃঙ্গী। মুখে ওদের বিষমাখান হাসি, দৃষ্টিতে বিদ্রূপ ক্ষরিত হচ্ছে। কিছু দূরে বিষণ্ন মুখে নিতাই হাঁসদা আর কেরাণী কোরবান আলী দাঁড়িয়ে। নবী দফাদার ছলছল চোখে মস্ত একটা তালপাখা দিয়ে দারোগা সাহেবকে হাওয়া করে চলেছে। পঞ্চায়েতের খুব বিশ্বাসী লোক নবী। ওর বাড়ীতে বহুদিন ধ'রে আছে।...দারোগা এসেই নবীর উপর এক চোট হুম্‌কী, ধমক ও মার চালিয়েছে। "বল্‌ শালা! কোথায় লুকিয়ে রেখেছে জেকু মিঞাকে? কোথায় আছে কুইনীন, বার করে দে, নইলে হাড়-মাস আলাদা করে ফেলব।"

পঞ্চায়েত সটান গিয়ে কাছারি ঘরের পিছনে নিমের ছায়ায় দড়ির খাটিয়ার উপর চিৎপাত শুয়ে পড়ল, আচ্ছন্নের মত।...ধান নামিয়ে কুইনীনের খোঁজ না পেয়ে পুলিসের লোক হতাশ হয়ে চ'লে গেল। ওরা যখন বিদায় হ'ল, বেলা তখন গড়িয়ে গেছে।

নিতাই আর কোরবান অনেক চেষ্টায় পঞ্চায়েতকে তুলে স্নান করাল, একটু কিছু খাওয়ালও।...কুবীর পঞ্চায়েতের দু' চোখ দিয়ে জল ঝরছে, কেবলই বলছে, 'হায় খোদা! এই ভাবে বেইজ্জত হবার আগে আমার মরণ হ'ল না কেন?'...

## সাত

জেকুর আসার খবর জানিয়ে দিয়েছে কোরবান চুপি চুপি। শুনে কুবীরের কোন ভাবান্তরই হ'ল না। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তখন। খাটের উপর উঠে বসে কুবীর। মুখ তার থম্‌-থমে, অপমানের জ্বালা তখনও জ্বলছে তার মনে। কি ভেবে ডাকল নবী দফাদারকে।

নিশ্চিন্তপুর পার হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে যে পঞ্চকোশী মাঠ ধূ ধূ করছে, বেহারী গয়লারা যেখানে গোরু-মোষের বাথান বসায় প্রতিবছর, সেখানে যেতে হবে আজ রাতেই। খুব তেজী দেখে দুটো বলদ যেন গাড়ীতে জোড়া হয়। দশ ক্রোশ রাস্তা—রাতে রাতেই যেন পৌঁছে যায়। দুটো শক্ত বাঁশের লাঠি, একটা বালতি, এক গাছা দড়ি, গজ কয়েক নতুন থান কাপড় (মসজিদের ভাণ্ডারে কিছু থান কাপড় সংগ্রহ করা আছে) সঙ্গে নিতে হবে। আর দীঘির পাড়ের চাঁপাগাছ থেকে মুঠোখানেক ফুল যেন ন্যাকড়ায় বেঁধে জলে ভিজিয়ে তুলে নেয় গাড়ীতে। (বছর তিনেক আগে ছুটিতে একবার জেকু বাড়ী এসেছিল, তখনই লাগিয়েছিল চারাটা, বাংলোর

সামনে দীঘির পাড়ে। নতুন জাতের চাঁপা, ভারী মিষ্টি গন্ধ, সৌরভে উগ্রতা নেই।)···

আর কারো সঙ্গে যাবার দরকার নেই, শুধু টুরকু মাঝি গাড়ী হাঁকিয়ে যাবে। আর গোস্ত, রুটি-হালুয়া যা তৈরী আছে তাও যেন তুলে দেয়। আজ বিকালে পঞ্চায়েতের আমহুরা যাবার কথা ছিল। রাতের খাবার তৈরী ক'রে এনে বেলা দশটায় এসে নবী দেখে, বাড়ীতে পুলিস গিস্ গিস্ করছে। বাড়ীর চাকরদের উপর তখন তম্বি-গম্বি মার-ধোর চলছে।···

মিঞা সাহেবের আজকের অবস্থা দেখে আমহুরায় কখন যাওয়া হবে সেটা জেনে নেবার সাহস হয় নি নবীর এতক্ষণ। পঞ্চায়েতের কর্ম্মসূচির পরিবর্তন খুব কমই হয়ে থাকে।

কি ভেবে ঝুঁকে প'ড়ে নবী দফাদারের কানে কানে কি যেন বলল কুবীর। শুধু শেষ কথাগুলো একটু জোরে বলে, '...ভুসণো আর গেঁদুকে এখনই ছুটিয়ে দে। দরকার হলে রণপা নিয়ে যায় যেন। সিধে মাঠে মাঠে চললে রাত বারোটার আগেই পৌঁছে যাবে ওরা।'

হুকুম পেয়ে চলে যায় নবী গাড়ীর ব্যবস্থা করতে। বৈঠকখানার আর আর চাকরদের আগেই বিদায় দিয়েছে কুবীর। ঘনায়মান অন্ধকারের মুখোমুখি অনেকক্ষণ বসে রইল সে। বুকের অন্তঃস্থল কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে। হাত দুটো বুকের উপর চেপে চোখ বুজে কিছুক্ষণ ঈশ্বরকে স্মরণ করল কুবীর। তারপর হঠাৎ উঠে বাড়ীর চারদিকে একবার চক্কর দিয়ে এল। কি ভেবে বৈঠকখানার পূবে কিছুদূর আগেই যেখানে আরম্ভ হয়েছে দুর্ভেদ্য বাঁশের জঙ্গল সেখানে এসে থমকে দাঁড়াল। শুনতে পেল অস্ফুট কেমন একটা খসখস আওয়াজ। পুলিসের লোক আজ দুপুরে বাঁশবনে ঢুকে অনেক খোঁজ করেছে ফেরারী জেকুরুল্লার আর অপহৃত কুইনীনের। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে লাঠির খোঁচা মেরে দেখেছে, কেউ লুকিয়ে আছে কি না বা ঠন্ করে টিনের গায়ে কোন শব্দ ওঠে কি না।

কুবীর বৈঠকখানার আলমারির মাথা থেকে ছ' ব্যাটারীর টর্চ্চটা নিয়ে এল। বোতাম টিপে আলো ফেলে দেখে, দূরে বাঁশবাগানের মাঝ দিয়ে সরু পথ বেয়ে এদিক্ পানেই যেন কে একজন এগিয়ে আসছে, ফকিরের মত আলখাল্লা গায়ে। এই প্রত্যাশাই করছিল কুবীর। আলো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কাছে আসতেই চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, "কে, ছোট মিঞা?"

"জী, আজ্ঞা।"

"চুপ্!" পঞ্চায়েত রুদ্ধ পরুষকণ্ঠে ধমকে ওঠে, "কেউ নই আমি তোর।" তার পর নীচু, সহজ সুরে জিজ্ঞাসা করে, "কখন আসা হল?" নিতান্ত আবেগহীন সুর; ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই, অভিমান নেই, নেই স্নেহের ছোঁয়া।

"কাল রাতে," জেকু উত্তর দেয়।

"ছিলে কোথায়?" পঞ্চায়েত যেন আদালতে সাক্ষীকে জেরা করছে। পঞ্চায়েতের ক্রোধকে বরাবরই এড়িয়ে এসেছে জেকু। পিতার স্নেহবর্ষণ প্রগল্‌ভতায় তার রুদ্র ভয়াল মূর্ত্তিকে সে বিস্মৃত হয় নি কোনদিন। জেকু জানত, ওর কীর্ত্তির কথা জানলে পঞ্চায়েত ওকে আস্ত রাখবে না, তা হোক না কেন সে ক্যাপ্টেন, হাসপাতালের বড় ডাক্তার।

বাপের নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর ওকে ভয়-লজ্জা-সঙ্কোচের বন্ধন থেকে মুক্তি দিল। সে ভাবতেও পারে নি এত সহজ ভাবে কথা বলতে পারবে বাপের সঙ্গে।

জেকু ব'লে চলে, "কোরবানদের বাড়ী ছিলাম কাল রাতে এসে। পুলিস এসেছে খবর পেয়ে শাহজী পীরের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম সারা দিন।"

কোরবানদের বাড়ীর পিছনে ঘন-জঙ্গলের ভিতর শাহজী পীরের আস্তানা। অতি প্রাচীন গম্বুজওয়ালা খিলান-করা কুঠুরি, মাটির নীচে এক হাঁটু বসে গেছে। অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে হলেও মেঝেটা বেশ পরিষ্কার। ওপরের ফোকরটা দিয়ে কিছুটা আলো-হাওয়া প্রবেশ করে। কারো মানত পূর্ণ হলে ঘরটায় ধূপ, ধুনো দেয়, সিন্নী দেওয়া হয়। কুঠুরিটার দেওয়ালের দু'ধার পত্রবহুল বন্যলতায় সমাচ্ছন্ন। একদিকে ঝুপসী কাঁটা-দুর্ভেদ্য জঙ্গল, অন্যদিকে প্রকাণ্ড একটা মহানিম গাছ। তারই নীচে পাথরের চৌকা বেদী—অনেকগুলো মাটির প্রদীপ, মোমবাতির টুকরো আর পোড়া-মাটির পুতুল ঘোড়া তার উপর। এইটেই পীরের আসন। বাইরে থেকে কুঠুরিটা চোখে পড়ে না, মনে হয় লতায়-পাতায় গড়া একটা স্তূপ, অন্ধকার, ভৌতিক পরিবেশ। দিনের বেলায় আসতেই গা ছম্‌ছম্ করে, রাতের বেলায় ত কথাই নেই।

## আট

জেকুকে উদ্দেশ করে' পঞ্চায়েত মৃদু স্বরে বলল, "উঠে বস গাড়ীতে। তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসব কেউ খোঁজ পাবে না।"

জেকরুল্লা গাড়ীতে উঠে এল, পিঠ পিঠ কুবীরও।

গাড়ী ছেড়ে দেয় টুরকু মাঝি। গ্রাম পেরিয়ে গাড়ী

যখন মাঠে পড়ল তখন পঞ্চায়েত জিজ্ঞাসা করে, "বউ ছেলেমেয়ে কোথায় ?"

"শিলচর।"

"কত টাকা আছে তাদের কাছে ?"

"মাস দুয়েক চলতে পারে।"

"কোথায় গেল টাকাগুলো ?" এবার পঞ্চায়েতের স্বর অনেকটা রুক্ষ শোনাল।

"যে মাড়োয়ারীর সঙ্গে কারবার করছিলাম, সেই মেরে দিয়েছে সব।"

কি করে এমনি সহজ ভাবে বাপের সঙ্গে কথা বলতে পারছে জেকুর নিজের কাছেই তা আশ্চর্য্য লাগে।

"বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করার মজা ত বুঝলি। কনট্রাক্টর শালা বলে কি ? কই, তারা এসে রক্ষা করুক না তোকে ? বাপের কাছে ছুটে এলি কেন মরতে ?" কুবীরের কণ্ঠে এইবার ঘৃণা আর বিদ্রূপ প্রকট হয়ে ওঠে। ফতুয়ার পকেট থেকে ছোট একটা খাতা বার করে (খাতার সঙ্গে কালো স্থতোয় বাঁধা বেঁটে একটা পেন্সিল) ছেলের হাতে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল পঞ্চায়েত, "ওদের ঠিকানা লিখে দে এতে।"

জেকু ঠিকানা লিখে বাপের হাতে খাতাটা ফিরিয়ে দিল।

"দু'দিন ধরে খাওয়া হয় নি, এই বার খেয়ে নাও।" পঞ্চায়েত গাড়ীর কোণায় রাখা খাবার দেখিয়ে দেয় ছেলেকে। জেকু অনুজ্জ্বল হারিকেনের আলোয় দেখে, প্লেটের উপর প্লেট চাপা এক গোছা পরোটা, একটা পাত্রে গোটা কতক আস্ত ডিমসিদ্ধ, বড় এক বাটি মাংস আর অন্য একটা পাত্রে খানিকটা হালুয়া। কুঁজোর জলে হাত-মুখ ধুয়ে আহারে মন দেয় জেকু।

খাওয়া শেষ করে মুখ ধুয়ে জিজ্ঞাসা করল জেকু, "কোথায় চলেছি আমরা, কামারগাঁয়ের খামার বাড়ীতে ?"

জেকু কামারগাঁয়ে যায় নি কখনো। শুধু জানে বড় নির্জ্জন সে জায়গা। চারপাশে দিগন্তপ্রসারী মাঠ আর জলা। মাঝে দ্বীপের মত ছোট ছোট সাঁওতালী গ্রাম। পঞ্চায়েতের সেখানে চাষ-ঘর আছে। আশে-পাশের প্রায় তিনশ' বিঘেয় ধান ওঠে সেখানে। ছেলের প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করে না কুবীর।

জেকুর চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে আসতে চায়। হঠাৎ এক ঝলক এলোমেলো হাওয়া বয়ে গেল। চাঁপা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। তাই ত, এই বৃক্ষহীন নির্জ্জন প্রান্তরে চাঁপার গন্ধ আসছে কোত্থেকে ? জেকুর কেমন ভয় ভয় করে। গাড়ীর ছই-এর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে অসীম আকাশ, অসংখ্য তারায় ভরা। মাইলের পর মাইল একটানা মাঠ। হঠাৎ কোথাও জমি অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছে কাছিমের পিঠের মত। আধো আলো আধো ছায়াতে ইতস্ততঃ আন্দোলিত ঘাসের ডগা দেখে মনে হয় একটা মহা সমুদ্রের মাঝ দিয়ে চলেছে ওরা—সে সমুদ্র গর্জ্জমান নয়, স্তব্ধ শব্দবিহীন। মাথার উপর কালপুরুষকে স্পষ্ট দেখা যায়। হাতে খোলা তলোয়ার, কোমরে তিন তারার বন্ধনী। পিছনে লুব্ধক—বিশ্বস্ত সারমেয়।

আবার হাওয়া বয়। চাঁপার গন্ধটা উগ্র হয়ে ওঠে। চাঁপাফুল জেকুর খুবই প্রিয়। কিন্তু এই অবস্থায়, এই পরিবেশে, এই অপ্রত্যাশিত সৌরভ নিরাবয়ব প্রেতের মত তার মনে শঙ্কা-শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

জেকু ভীত কণ্ঠে ডাক দিল, "বা'জান ! বা'জান !"

উত্তর নেই। পঞ্চায়েত গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। গাড়ী চালাচ্ছে টুরকুমাঝি—মূক ও বধির। ওর কাছে কোন প্রশ্নেরই জবাব মিলবে না।

নয়

সোজা পশ্চিমপানে চলেছে গাড়ী। সান্ধ্য আকাশে পূর্ব্ব দিগন্তের যে তারাগুলিকে ওরা পিছনে রেখে এসেছিল, এতক্ষণে তারা উঠে এসেছে মধ্য গগনে, মাথার উপর। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, একটা অজানা আশঙ্কা যেন ওৎ পেতে আছে কোথাও।

একটা অস্পষ্ট আলো দেখা যায়, দূরে। আরও একটু এগিয়ে এলে কাদের যেন গলা শোনা গেল। গাড়ী এগিয়ে আসে বাথানের চালা-ঘরটার কাছে। গয়লারা তাদের গরু-মোষগুলো সঙ্গে করে দেশে ফিরে গেছে। আবার আসবে বর্ষার পর, যখন নতুন ঘাসে ছেয়ে যাবে মাঠ। শীতের মরসুমটা ওরা এখানেই কাটাবে।

চালাঘরে মাচার উপর বসে ভুষণো আর গেঁদু, সঙ্গে আরও একজন। ঘণ্টা খানেক আগেই পৌঁছে গেছে ওরা, সঙ্গে করে এনেছে রাখহরিকে। মস্ত গুণীন রাখহরি রাজবংশী। ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্রহ্মদানব সবাইকে বশ করার মন্ত্র তার জানা। রাত করে পঞ্চকোশী মাঠে প্রাণ হাতে করে কে যাবে ? আজ পর্য্যন্ত কত লোক যে বেঘোরে মারা গেছে এ মাঠে পথ ভুলে নিশাচর প্রেতের কবলে তার ইয়ত্তা নেই। ভাগ্যিস্ রক্ষী হিসাবে রাখুকে এনেছে সঙ্গে, নৈলে কি হত ওদের কিছুই বলা যায় না।

জোয়াল থেকে বলদ দুটোকে খুলে দিল টুরকু। পঞ্চায়েত গাড়ী থেকে নেমে চালাটার দিকে এগিয়ে

আসে। জেকু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ভয় ও ক্লান্তির দোটানায় পড়ে সে সুপ্তির শরণ নিয়েছে।...গাড়ীটাকে বাঁশের ঠেকনায় আটকিয়ে সমান্তরাল করে রাখল টুরকু, মাটির সঙ্গে।

"কি রে ভুষণো, সব ঠিক ত?"

"হুজুর।" কুবীর এগিয়ে এসে ঝুঁকে কি যেন দেখল। "কতটা খুঁড়েছিস্?"

"এক বুক।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।...ও আবার কে তোদের সঙ্গে?" চমকে জিজ্ঞাসা করে কুবীর।

"বাখু, বাখহরি বাজবংশী।"

"ও, বাখু।" কুবীর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বাখু কুবীরের বিশেষ অনুগত।

"আচ্ছা, ফিরে যা তোরা, খুব জলদী যাবি, বাড়ী গিয়ে বলবি আমি গোয়ালিয়া যাচ্ছি, ফিরতে তিন-চার দিন দেরী হবে।" ফতুয়ার পকেট থেকে থলে বার করে দুটো টাকা দিল ওদের পঞ্চায়েত।

"এই নে ধর্, পচাই খাস। সূর্য্য উঠার আগেই যেন পৌঁছানো চাই। তোদের এখানে আসার কথা কেউ যেন টের না পায়, বুঝলি? বলবি নে কাউকে, ওস্তাদের কসম খাস।"

ওদের তিনজনাই পঞ্চায়েতের লাঠি-খেলার শিষ্য। দরকার হলে লাঠি নিয়ে ওস্তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিতে পারে। কুবীরের কথা শুনে ওরা তিনজনাই কপালে হাত ঠেকিয়ে, মাথা নীচু করে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে ওস্তাদকে আনুগত্য জানাল।

ঘাসের মাঝে শোয়ানো বাঁশের বণপাগুলো তুলে নে, তাতে চড়ে তিনজনা হন্ হন্ করে ছুটে চলল পূর্ব্ব দিগন্ত পানে। কুবীর অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদের পানে। আবছা-আলোতে তিনটি চলিষ্ণু ছায়ামূর্ত্তি দূর হতে দূরে সরে যায়।

গাড়ার কাছে গিয়ে ছেলেকে ডেকে তুলল কুবীর। ঘুম থেকে উঠে বসে জেকু বিস্মিত নেত্রে তাকায়। তাই ত! এই গভীর রাত্রে জনপ্রাণী শূন্য এই বিশাল পরিত্যক্ত গোচারণ ভূমিতে কেন এল ওরা?

## দশ

বাথানের গোয়ালারা চালার কাছেই একটা পাতকুয়া খুঁড়েছে। বার মাস জল থাকে তাতে। গাড়ী থেকে দড়ি, বালতি এনে জল তোলে পঞ্চায়েত। জল নিয়ে অজু করল। ফের জল তুলে ছেলেকে উদ্দেশ করে বলে, "এই পানি নে, অজু কর্।" জেকু যন্ত্র-চালিতের মত বাপের আজ্ঞা পালন করে। পঞ্চায়েত ওকে টেনে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল, বলল, "আয়, নামাজ পড়বি আমার সঙ্গে। পড়ে থাকিস্ ত নামাজ,...রোজ না হয়, জুম্মাবারে?...তাও না? ...হতভাগা, মরদূদ্...।"

অনেকক্ষণ ধরে নামাজ পড়ে পঞ্চায়েত। আর্ত্ত-হৃদয়ে ছেলের 'গোনাহ্'র জন্য বিধাতার মার্জ্জনা ভিক্ষা করে।

নামাজ সেরে পঞ্চায়েত ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল গর্ত্তটার কাছে। তার পর গাড়ী থেকে দু'খানা লাঠি নিয়ে এল, ছেলের আড়ষ্ট হাতে একখানা লাঠি গুঁজে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "নে, ধর্! আজ তোতে আমাতে লড়াই হবে, দেখি কে জেতে।...এ লড়াই হচ্ছে সাবেকী আমলের সঙ্গে হাল আমলের।"

জেকু স্বপ্নাহতের মত দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ লাঠি গাছটা ছুঁড়ে ফেলে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়, পঞ্চায়েতের পায়ের কাছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে অসহায় শিশুর মত, "আমাকে মেরে ফেল না আব্বা।"

"মাদোয়ান!" দাতে দাঁতে চেপে বলে ওঠে পঞ্চায়েত। হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয় ছেলেকে। কড়া সুরে বলে "লড়তে তোকে হবেই, ছাড়াছাড়ি নেই। তোর হাতে লাঠি আছে, পারিস্ ত দে-না আমায় সাবাড় করে।" ছেলের কান ধরে ঝটকা মারে পঞ্চায়েত।

হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় জেকুর সারা দেহে। অন্ধের মত মরিয়া হয়ে লাঠি ঘোরাতে লাগল।...আচমকা একটা লাঠির আঘাত পঞ্চায়েতকে ধরাশায়ী করে দেয়। চোটটা খুব জোরে লাগে নি। হঠাৎ সামলে নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে কুবীর। বন বন্ লাঠি ঘুরতে থাকে তার হাতে।

জেকু প্রাণপণ আত্মরক্ষা করে চলে। পঞ্চায়েতের লাঠি হঠাৎ এসে লাগে জেকুর হাতের কব্জীতে, ছিটকে তার হাতের লাঠি দূরে গিয়ে পড়ে। পরক্ষণেই ঘুরে এসে লাঠিটা প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল ওর মাথায়। জেকুর কাতর আর্ত্তনাদে নিশীথ রাত্রি শিউরে ওঠে।...ওর দেহটা মাটিতে আছড়ে পড়ে, বার কত ছট্‌ফট্ করে স্থির হয়ে যায়।

হাতের লাঠি ছুঁড়ে ফেলে কুবার ছেলের নিস্পন্দ দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার বুকে কান রেখে শোনার চেষ্টা করে হৃদস্পন্দন।

না, কিছুই শোনা যায় না।...সব শেষ।...

দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে

পঞ্চায়েত। তার রুদ্ধ অশ্রু-নির্ঝর যেন অকস্মাৎ উৎসারিত হয়ে ওঠে। নির্জ্জন নিশীথে পুত্রঘাতী বৃদ্ধের সেই অস্ফুট আর্ত্ত-বিলাপ শুনল শুধু আকাশের তারারা আর শূন্য প্রান্তরের অশরীরী প্রেতদল।

* * * *

কুয়া থেকে জল তুলে ছেলের দেহটাকে ভাল করে ধুয়ে, বাড়ী থেকে আনা নতুন কাপড়ে জড়িয়ে নিল পঞ্চায়েত। তার পর সেটা তুলে এনে গর্ত্তের মধ্যে আস্তে নামিয়ে দিল। বৃদ্ধ হলেও পঞ্চায়েতের শরীরে বলের অপ্রতুলতা ছিল না। ছেলের ভারী দেহটাকে অনায়াসে তুলে আনতে পারল সে। লাঠি দু'খানাও ফেলে দিল গর্ত্তের গহ্বরে। গাড়ী থেকে জলেভেজা চাঁপার কলিগুলি এনে ছড়িয়ে দিল ছেলের দেহের উপর। ওর আপন হাতে লাগানো চাঁপা গাছের প্রথম ফুল।...

মাটি চাপা দিতে দিতে কোরাণ আউড়ে চলে পঞ্চায়েত। বর্ষার জল পেলে ঘাস গজিয়ে সব ঢেকে দেবে, ঝুরো মাটির চিহ্ন মুছে যাবে। কিন্তু আজ রাতের স্মৃতি কোনদিন মুছে যাবে না পঞ্চায়েতের বুক থেকে—আরও যে ক'দিন বাঁচবে সে।

---

# আগা খাঁ প্রাসাদের বিষাদময় দিন

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

১৯৪২ সনের ৭ই এবং ৮ই আগস্ট তারিখের বোম্বাই অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং স্বভাবতঃই মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ করেন, এই প্রস্তাব অনুযায়ী সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে।

গান্ধীজী তখন তাঁর অবিস্মরণীয় ভাষণে বলেন, "এই সংগ্রাম পরিচালনায় আমি আপনাদের আজ্ঞাকারী নেতা নই, আমি এক দীন সেবকমাত্র। আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে সকল আঘাতের সমান অংশ গ্রহণ করতে চাই।" তিনি আরও বলেন যে, তাঁর অন্তরাত্মা অভ্রান্ত ভাষায় তাঁকে বলছে, "যতক্ষণ তুমি সাহসের সঙ্গে পৃথিবীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছ ততক্ষণ তুমি নিরাপদ, যদিও পৃথিবীর চক্ষু তখন রক্তরাঙা। সেই পৃথিবীকে দেখে তুমি ভীত হয়ো না, ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে এগিয়ে যাও।" মহাত্মা গান্ধী ব'লে যেতে লাগলেন—আজ যদি সমস্ত পৃথিবী আমার বিপক্ষে যায়, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষ আমাকে ভ্রান্ত ব'লে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে তবু আমি এগিয়েই যাব।

গান্ধীজী তখনও সংগ্রামের আহ্বান দেন নাই। তিনি চেয়েছিলেন, ভাইসরয়ের সঙ্গে তখনও একবার শেষ বোঝাপড়া ক'রে নিতে। কিন্তু ভাইসরয় সুযোগ দিলেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জুলাই মাস থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল যে, এবারে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করতেই তারা দেবে না। তারা জেলখানা, পুলিস এবং গুলী-বারুদসহ প্রস্তুত হতে থাকে।

জাপানীরা যেমন যুদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্ব্বেই ১৯৪১ সনের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবারে বোমা ফেলেছিল, ঠিক তেমনি ক'রে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও মনে করেছিল যে, যে-পক্ষ প্রথম আঘাত হানবে তারই জয় হবে। তাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজীর সংগ্রাম ঘোষণার আগেই, ৮ই আগস্টের রাত্রি প্রভাত হবার পূর্ব্বেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যুষ ৪॥টায় অতি চুপে চুপে, অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গান্ধীজীকে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তার এত দ্রুত হয়েছিল যে, অনেকে তাঁদের চশমা, মাণিব্যাগ, বই এবং কাপড়চোপড় নিতেও ভুলে গিয়েছিলেন।

গান্ধীজীকে পুণায় আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী ক'রে রাখা হয়। কস্তুরবা এবং মহাদেব দেশাই গান্ধীজীর পশ্চাতে পরম নির্ভয়ে আগা খাঁ প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সুশীলা নায়ার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও তাঁর সঙ্গে আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী ছিলেন।

দেশবাসীর পক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের অর্থই ছিল শত্রুপক্ষের বিনা ঘোষণায় প্রথম

আক্রমণ। প্রতিবাদে দেশবাসীও সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

১৯৪২ সনের আগস্ট আন্দোলন সুরু হয়ে যায়। সমগ্র দেশের মনে যেন বারুদ প্রস্তুত ছিল। আগুন লেগে গেল। শক্তিমান ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে নিরস্ত্র ভারতবাসী মরণপণ ক'রে শেষ সংগ্রামে লিপ্ত হ'ল, সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্বভার নিজেরাই গ্রহণ করল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান ক'রে, হাজার হাজার দেশসেবক কারাবরণ করেন, শত শত লোকের স্বাস্থ্য ও ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হয়, বহু দেশপ্রেমিক মৃত্যুবরণ করেন। যে সব নীরব সৈনিক সেদিন মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ ক'রে গেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বন্দী ছিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে আগা খাঁ প্রাসাদে। গান্ধীজীর প্রিয়তম, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু তাঁরা।

১৯৪২ সনের ১৫ই আগস্ট। অন্যদিনের মত সেদিনও মহাদেব দেশাই গান্ধীজীর সঙ্গে জেলের বাগানে প্রাতঃভ্রমণ ক'রে এলেন। তার পর হৈ হৈ ক'রে একসঙ্গে সকলে মিলে প্রাতঃরাশ গ্রহণ করলেন। রাজবন্দীরা আগা খাঁ প্রাসাদের জেলখানাকে আনন্দের স্বর্গে পরিণত করেছিলেন।

অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত হ'ল। বেলা প্রায় ৮টার সময় মহাদেব দেশাই জেলের ইনস্পেক্টার জেনারেল কর্নেল ভাণ্ডারী আই. এম. এস.-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ মহাদেব দেশাইর মাথাটা ঘুরতে লাগল। তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। কর্নেল ভাণ্ডারী তাঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। ডাঃ সুশীলা নায়ারও সেই প্রাসাদেই বন্দিনী। খবর পেয়ে তিনিও ছুটে এলেন। মহাদেব দেশাইর নাড়ী ক্ষীণ হয়ে আসছিল, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। হার্টের অবস্থা সতেজ করবার জন্য ইনজেক্‌সান দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু সবই বৃথা। ওপারের ডাক এসে পৌঁছে গিয়েছিল। মিনিট কুড়ির মধ্যেই মহাদেব দেশাই চিরবিদায় নিলেন।

আগা খাঁ প্রাসাদের অপর প্রান্ত থেকে গান্ধীজী যখন এসে পৌঁছলেন মহাদেব তখন পরপারে যাত্রা করেছেন। গান্ধীজী ডাকতে লাগলেন "মহাদেব, মহাদেব।" সাড়া নেই। কস্তুরবার গলা কাঁপছে, তিনি বলছেন, "মহাদেব, তুমি জবাব দিচ্ছ না কেন? বাপু যে তোমায় ডাকছেন!" প্রিয় শিষ্যের আত্মা তখন গুরুর আহ্বানের ঊর্ধ্বে যাত্রা করেছে। ২০ মিনিট মাত্র সময় দিয়েছিলেন তিনি। তার পর ৮-৪০ মিনিটে সব শেষ।

আগা খাঁ প্রাসাদ সেদিন শোকের বেলাভূমি। মহাদেব দেশাই শুয়ে আছেন ঘুমন্ত শিশু যেন। তাঁর পূত দেহকে গান্ধীজী নিজহাতে স্নান করাতে লাগলেন। হাত তাঁর থর থর ক'রে কাঁপছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে তিনি সেই শুভ্র-সুন্দর দেহখানিকে চন্দন মাখালেন। ফুল দিয়ে ঢেকে-দেওয়া দেহের পাশে ধূপ-ধুনোর সুগন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ। গান্ধীজী ও সুশীলা নায়ার শ্রীভাগবদ্গীতা পাঠ করছেন।

তার পর চিতায় তুলে দিয়ে গান্ধীজী নিজের হাতে আগুন জেলে দিলেন। একান্ত স্নেহের ধনকে ভস্মীভূত হয়ে যেতে দেখতে লাগলেন তিনি চোখের সামনে। চিতাভস্ম রেখে দিলেন তিনি মহাদেবের পত্নী দুর্গা দেশাই ও পুত্র বাব্‌লার জন্য। তৃতীয় দিনের শ্রাদ্ধ-কার্যও গান্ধীজীই জেলে সম্পন্ন করলেন।

মহাদেবের জীবনস্মৃতি বুঝি একটার পর একটা ভেসে উঠেছিল সেদিন চিতার আগুন ঘিরে। মাত্র ৫০ বছর বয়সে মহাদেব দেশাইর মৃত্যু হয়। তিনি সুরাট জেলার অলপাদ তালুকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এলফিন্‌স্টোন কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং আইন পরীক্ষায় পাস করেন। মহাদেব ছিলেন স্কলার। সাহিত্যে, ভাষাজ্ঞানে, বিদ্যানুরাগে বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে তিনি জীবনযাত্রা সুরু করেছিলেন। বাপুজীর দৃষ্টিতে পড়েন তিনি ১৯১৬ সনে। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মহাদেব। তার পর থেকে তিনি সবরমতী আশ্রমে আশ্রমজীবন যাপন করতে থাকেন। গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী-রূপে তাঁর নতুন জীবন আরম্ভ ও শেষ হয়। ১৯১৯ সনে তিনি "ইয়াং ইণ্ডিয়া" এবং "নবজীবন" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সনে তিনি "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" কাগজ সম্পাদনা করতে এলাহাবাদ যান। কিন্তু শীগ্‌গীরই তাঁকে অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করতে হয়। গান্ধীজী যখন বোম্বাইর যারবেদা জেলে তাঁর স্মরণীয় অনশন ব্রত পালন করেন তখন মহাদেব তাঁর সঙ্গে একই জেলে অবস্থান করছিলেন।

১৯৩১ সনে গান্ধীজীর সঙ্গে মহাদেব দেশাই ইংলণ্ডে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে যান। প্রায় ২৫ বছর যাবৎ মহাদেব দেশাই মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে এসেছিলেন। গান্ধীজী ভারতবর্ষময় যত পরিভ্রমণ করেছেন সমস্ত ভ্রমণে মহাদেব দেশাই ছিলেন তাঁর নিরলস সঙ্গী, নিকটতম বন্ধু।

হাজার হাজার প্রকৃতির নরনারী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। মহাদেব নিখুঁতভাবে লিখে

চলতেন সে সব সাক্ষাতের বিবরণ ও আলোচনা। যত জনসভায় ও ঘরোয়া আলোচনায় গান্ধীজী বক্তৃতা করতেন মহাদেব দেশাই লিখে গেছেন তার প্রতিটি কথার হুবহু রিপোর্ট। গান্ধীজীর অগণিত চিঠির উত্তর দেবার ব্যবস্থাও তিনিই করতেন।

খুব কম লোকেই মহাদেব দেশাইর মত সম্পূর্ণ ক'রে গান্ধীদর্শন উপলব্ধি করেছিলেন। গান্ধীজীর এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাস মহাদেবের মত আর কেউ বুঝি অর্জন করেন নাই। গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর দর্শনের ঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র মহাদেবই করতে পারেন। তাই তিনি মহাদেব দেশাইকে "হরিজন" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন। গান্ধীজীর প্রতি মহাদেব দেশাইয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল গভীর, নিঃস্বার্থ ও মধুর। গান্ধীজীর কাছে মহাদেব দেশাই ছিলেন সুযোগ্য শিষ্যেরও অধিক, আপন পুত্রেরও অধিক। বাপুজীর পক্ষে মহাদেবের মৃত্যু যে কি ছিল তা সাধারণের বুঝবার কথা নয়। দুস্তর সাগর এসে অতিপ্রিয় ধনকে বিপুল প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

মহাদেবের শ্মশানের সামনে ব'সে দিনের পর দিন বাপুজী তাঁকে ফেলে এগিয়ে-যাওয়া পুত্রাধিক প্রিয়কে ভেবেছেন এবং আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দীশালার বিষাদময় দুর্বহ দিনগুলি কাটিয়ে দিয়েছেন।

মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যুর ঠিক আঠার মাস পরে আগা খাঁ প্রাসাদেই আরেকটি মৃত্যু এসে গান্ধীজীকে বিমূঢ় বিহ্বল ক'রে দিয়ে চ'লে গেল। মৃত্যু এবার গান্ধীজীর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিল তাঁর চিরবন্ধু ও চিরসাথী কস্তুরবাকে।

কস্তুরবা অনেকদিন যাবতই ভুগছিলেন। জেলের মধ্যে কস্তুরবার অসুখের সময় অন্তিম দিনগুলিতে গবর্ণমেণ্টের নির্মম ব্যবহারে গান্ধীজী অসীম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হয়েছিলেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে ডাঃ জীবরাজ মেহতা কস্তুরবার চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু কস্তুরবার অসুখের অবস্থা সম্পর্কে কোন কথা ডাক্তারকে বলতে গান্ধীজীকে অনুমতি দেওয়া হয় নি। গান্ধীজী ছটফট করতে লাগলেন। আরেকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে কস্তুরবার জীবনের সঙ্কটজনক সময়ে রাত্রে আগা খাঁ প্রাসাদে থাকতে অনুমতি দেওয়া হয় নি। তাঁকে সারারাত্রি জেলের বাইরে মোটর গাড়ীতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল এই আশঙ্কায় যে, রাতে কিছু বাড়াবাড়ি হলে তাঁর ডাক পড়তে পারে। গান্ধীজীর মর্মবেদনার অবধি ছিল না। তিনি এতখানি মানসিক যাতনা ভোগ করছিলেন যে, তিনি চাইলেন, হয় কস্তুরবাকে সাময়িক ভাবে ছুটি দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হোক, অথবা গান্ধীজীকেই এই মর্মান্তিক দৃশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হোক।

১৯৪৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় কস্তুরবা আগা খাঁ প্রাসাদে গান্ধীজীর কাছেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সামনে আরও উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস এবং অন্যান্য অনেকে।

এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছিলেন গান্ধীজী ও কস্তুরবা। কস্তুরবা বয়সে কয়েক মাসের ছোট ছিলেন। ৭৪ বছর বয়সের অর্ধেক জীবন তাঁরা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততি, পারিবারিক ও আশ্রমিক পরিজন এবং সংখ্যাহীন দেশবাসীর প্রেম গান্ধীজী ও কস্তুরবাকে পরস্পরের প্রতি অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল। জীবনের সম্মান, জনগণের স্নেহ, কঠিন ত্যাগবরণ, প্রতি ক্ষেত্রেই কস্তুরবা গান্ধীজীর সত্যকার সঙ্গী ছিলেন।

জাতির পিতার সারাজীবনের সাধনার পরীক্ষাগুলি প্রথমেই চলত কস্তুরবার উপর দিয়ে। কঠিন আশ্রম-জীবনযাপনের পরীক্ষায় কস্তুরবা বীরের ন্যায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। গান্ধীজী নিজে কড়া প্রহরীর ন্যায় কস্তুরবাকে অহোরাত্র লক্ষ্য ক'রে চলেছিলেন, যেন তাঁদের পরিবর্তিত জীবনের 'অপরিগ্রহ' নীতির আদর্শ সঠিক ভাবে প্রতিপালিত হয়। সেখানে কস্তুরবার জন্য ক্ষমার স্থান ছিল না। কস্তুরবা মহত্তর জীবনে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি ধৈর্যের সঙ্গে, নম্র হৃদয়ে, মর্যাদার সঙ্গে পার হয়ে গেছেন। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ ছিল কস্তুরবার। স্বামীর আদর্শের মধ্যে নিজেকে তিনি বিলীন ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন তাঁর প্রভুর আদর্শ বিনা প্রশ্নে তাঁকে কাজে পরিণত করতে হবে, প্রয়োজন হলে সেজন্য হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। জীবন-সাধনার পরীক্ষায় উপবাসের দুর্যোগে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে সর্বত্রই গান্ধীজীর পাশে পাশে ব্যাকুল হৃদয়ে, আকুল আগ্রহ নিয়ে তিনি চলেছিলেন। স্বামীর আদর্শ রূপায়িত করতে কারাগারের মধ্যে, তাঁরই সামনে, মহাশিবরাত্রির পুণ্য দিনে কস্তুরবা মহাযাত্রা করলেন। একনিষ্ঠ যাত্রা তাঁর আজ থেমে গেল। জাতি তার মহীয়সী জননীকে বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রেম অন্তর থেকে নিবেদন করল।

তার পর, দিনের পর দিন মহাদেব দেশাই এবং কস্তুরবার শ্মশানের দৃশ্য, ঐ প্রিয়বিচ্ছেদের স্থান, গান্ধীজীর স্নায়ুকেন্দ্রকে চূর্ণ ক'রে দিতে লাগল। ধীরে ধীরে যখন

গান্ধীজীর ভগ্নমনে, জীর্ণদেহে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিতে লাগল তখন অকস্মাৎ ১৯৪৪ সনের ৬ই মে তারিখে তাঁর মুক্তির আদেশ এল। প্রথম যেদিন তিনি এই আগা খাঁ প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন ছিল এটা কারাগার, কিন্তু স্বর্গীয় সুষমায় স্নিগ্ধ। আর, আজ সেই কারাগার তাঁর কাছে সমাধিস্থান। মুক্তির মুহূর্তে প্রিয়-পরিজনের সমাধি তাঁকে যেন মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল। বিষাদে ছেয়ে গেল বিদায়ক্ষণ। গান্ধীজী এসেছিলেন পরিপূর্ণ আনন্দভরা, আজ ফিরে যাচ্ছেন শূন্য মনে, রিক্তহাতে। বিপুল জনতার মাঝখানে আসছেন নিঃসঙ্গ, একা এক মহাযাত্রী। হয়ত সেদিন হৃদয় তাঁর বলেছিল :

"চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে॥
ধরায় যখন দাও না ধরা হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহিরে॥

## বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা করতে পারে না

শরশয্যাশায়ী পিতামহ ভীষ্মদেবের দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হয়েছিলাম প্রায় এক যুগ আগে অন্ধ্রদেশের রাজমহেন্দ্রীতে।

গোদাবরী নদীর তীরে প্রকাণ্ড ভিড় দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা গাছের নীচে ধুনি জ্বালান, তার এক পাশে বহু সংখ্যক তীক্ষ্ণধার লৌহ-ফলক লাগান একটা অপরিসর তক্তার উপর গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে অস্থিচর্ম্মসার জটাধারী এক পশ্চিমা সাধু। ধুনির অপর পার্শ্বে ব'সে ছিল বিশালকায় সাজোয়ান আর-এক সাধুবাবা। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে অপূর্ব্ব বাংলা ভাষায় সে ব'লে উঠল "ও মোশাই, ও বাংগালীবাবু এ নোকশান নয়, আসোল শরশয্যা ও ভীষমজী আছে; বিসোয়াস্ না হোয তো পেরেকমে হাথ লাগিয়ে দেখুন।"

নমুনা দেখে 'পেরেকমে হাথ' লাগাবার সাহস হয় নি। কিন্তু অবাক্ হয়ে ভাবছিলাম, পিতামহ ভীষমজী যে ভাবে উত্তানশায়ী হয়ে দেহরক্ষা করে আছেন তাতে ত রক্তে 'শরশয্যা' একেবারে ছয়লাপ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু তার ত কোন লক্ষণ দেখছি না। পেরেক শয্যায় পরম আরামে নির্ব্বিকার ভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে একেবারে চিদানন্দ হয়ে আছেন যে! মুখে ত যন্ত্রণার কোন লক্ষণই নেই। ব্যাপারটা বড় রহস্যময় ঠেকেছিল, বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি।

বাংলা দেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার সময় গাজনের সন্ন্যাসীদের মধ্যে বাণফোঁড়া ইত্যাদি যে-সকল অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আছে সেগুলিও রীতিমত কৃচ্ছ্রসাধন। কোন কোন সম্প্রদায়ের হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা ধারাল হাতিয়ার দিয়ে জিভ এবং গাল বিদ্ধ করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাতে রক্তপাতও হয় না এবং যন্ত্রণাবোধের লেশমাত্র চিহ্নও তাদের মুখে ফুটে ওঠে না।

হঠযোগী খগানন্দ স্বামীর কাঁচের গুঁড়ো গলাধঃকরণ, নাইট্রিক এসিড পান ইত্যাদি অনেকেই হয়ত দেখেছেন। এমনি ধরণের কৃচ্ছ্রসাধনের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় ভারতের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুদের একটি অনুষ্ঠানে। সেই বিস্ময়োৎপাদক অনুষ্ঠানটি হ'ল খালি পায়ে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা। সুদূর ফিজি দ্বীপে পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। ভারতীয়দের দ্বারাই সেটি ওখানে প্রচলিত হয়। একটি খাত খনন ক'রে সেটি ভরতি করা হয় জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে, আর কয়েকজন লোক খালি পায়ে তার উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে হেঁটে চ'লে যায়।

কিন্তু ফিজি দ্বীপে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার আর একটি আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান আছে যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এবং ওখানকার অধিবাসীদের পুরোপুরি নিজস্ব জিনিষ। গাছের গুঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরি ক'রে তাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাকার প্রস্তরখণ্ড ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তপ্ত করা হয়। এবং অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণকারীদের তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হয়।

অগ্নিতপ্ত প্রস্তরকুণ্ডের প্রস্তুতি

সমগ্র ফিজি দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র একটি উপজাতীয় লোকেরা এই ধরণের গরম পাথরের উপর দিয়ে হাঁটার অনুষ্ঠান পালন করে। এটি তাদের নিকট ব্রত স্বরূপ এবং ব্রতচারাদের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করতে হয়। এবং অনুষ্ঠানের চারদিন আগে থেকে শুচিশুদ্ধভাবে থাকতে হয়। সুভার প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোট্ট মবেঙ্গা দ্বীপে এদের বাস।

দ্বীপটির আয়তন কোন দিকেই পাঁচ মাইলের বেশী নয়, কিন্তু এটি অত্যন্ত পর্ব্বতসঙ্কুল। সর্ব্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা এক হাজার ফুটেরও অধিক। এর তটভূমি বেষ্টনকারী শৈলমালা হচ্ছে লাভায় পরিপূর্ণ আগ্নেয়গিরি।

উৎসবের প্রস্তুতি-পর্ব্বের প্রাথমিক অঙ্গ হচ্ছে গাঁয়ের পেছন দিকে একটি 'লোভো' খনন করা। এই লোভো বা গর্ত্তের ব্যাস প্রায় পনের ফুট, এবং গভীরতা চার ফুট। এর চারদিকে স্তরে স্তরে রাখা হয় স্তূপাকার ভারী গাছের গুঁড়ি এবং কালো পাথরের বড় বড় চাই। কতকগুলি পাথর থাকে নীচেকার স্তরগুলিতে কিন্তু বেশীর ভাগই সাজানো হয় মাটি থেকে ছয় ফুট উপরে কাঠের স্তরের একেবারে শীর্ষদেশে।

আগুন জ্বালাতে হয় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঠিক আট ঘণ্টা আগে। ব্রতচারীদের খাতে নামতে হয় একটা অবধারিত শুভ দিনে দুপুরবেলা। কাজেই আগেকার দিন রাত পোহাবার কিছু আগেই আগুন ধরান হয়। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাথরগুলি উত্তপ্ত হওয়ার পর যখন প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হতে থাকে তখন কানে তালা লাগবার যোগাড় হয়। ঘণ্টা পাঁচেক পরে গাছের গুঁড়িগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং স্তূপীকৃত প্রস্তররাশি প'ড়ে যায় খাতের তলদেশে।

দুপুর হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই লোক-সমাগম হতে থাকে। লোভোর তৃণময় খাড়া পাড়ে কাতারে কাতারে তারা ব'সে পড়ে!

যথাসময়ে গ্রামপ্রধান এবং পুরোহিতের পরিচালনায় গাঁয়ের কেন্দ্রস্থল থেকে উৎসবসাজে সজ্জিত একদল লোক সারবন্দিভাবে নীরবে এগিয়ে আসতে থাকে খাতের দিকে।

পরনে তাদের লাল, সবুজ এবং পীত বর্ণে রঞ্জিত এক জাতীয় পাইন গাছের পাতার সরু সরু ফালিতে তৈরী পোশাক। গায়ে জড়ান গাছের ছাল দিয়ে প্রস্তুত কালো এবং সাদা রঙের ব্যাজ। গলায় ফুলের মালা, চুলে গোজা টুকরো টুকরো ক'রে কাটা এক জাতীয় গাছের পাতার মালা। নারিকেল তৈল নিষিক্ত তাদের পীত দেহগুলি চক্ চক্ করতে থাকে।

শান্তভাবে খাতের পাশ দিয়ে চ'লে যায় তারা। চোখ ফিরিয়ে রাখে কিন্তু খাত থেকে অন্য দিকে। কেননা খাতে প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রতচারীদের পক্ষে আগুনের দিকে তাকান নিষিদ্ধ।

এমনি ভাবে পরিখার সীমা অতিক্রমণের পর এগিয়ে চলে তারা এক গাছের নীচে পাতায়-ছাওয়া একটি ছোট কুঁড়েঘরের দিকে।

এই অনুষ্ঠানের কেবলমাত্র সাহায্যকারী যারা তারা কুঁড়েঘরটিকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ ক'রে লোভোর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু আগুনের উপর দিয়ে যাদের হাঁটতে হবে তারা সরাসরি ঢুকে পড়ে কুটিরাভ্যন্তরে। সকলের শেষের লোকটি ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। পুরোহিতের নির্দ্দেশে জনকয়েক লোক মিলে তখন খাতের উপর থেকে অদগ্ধ গাছের গুঁড়িগুলো সরিয়ে ফেলে। তার পর লোভোর কিনারের চতুষ্পার্শ্বে সদ্য সংগৃহীত সবুজ পাতার বোঝা বৃত্তাকারে রেখে দেয়। খাতটিকে ব্রতচারীদের অতিক্রমণের উপযোগী করতে এদের আধ ঘণ্টারও কম সময় লাগে। তার পর এরা খাতের চতুষ্পার্শ্বে পাতার বোঝাগুলির পাশে ব'সে পড়ে।

পুরোহিত তখন আবার পা বাড়ায় সেই কুঁড়েঘরটির পানে। কুটিরাভ্যন্তরের অন্ধকারে তখনও পর্য্যন্ত ঠায় বসে আছে ব্রতচারীরা। পুরোহিত কুটীরে উপনীত হয়ে উচ্চারণ করে একটিমাত্র অনুজ্ঞা-জ্ঞাপন শব্দ—"অভুথু"।

তার মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে কেমন একটা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তার পর সাময়িক বিরতি—অবশেষে কুটীর-দ্বার উন্মুক্ত হয়। ব্রতচারীরা তখন একটি মাত্র সার বেঁধে খাতের অভিমুখে ছুটে আসে।

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে ব্রতচারীদের নেতা প্রবেশ করে উত্তপ্ত প্রস্তরাস্তীর্ণ লোভোর মধ্যে। ধীরে ধীরে মাথা নোয়ায় সে সামনের দিকে, দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় পাথরের উপরে। পায়ে হেঁটে সে সুরু করে খাত পরিক্রমা, তার পেছনে পেছনে চলে অন্যেরা। প্রতিটি পদক্ষেপে নিক্ষেপ করে তারা দেহের সমস্ত ভার। খাত পরিক্রমা সমাপন করতে নেতাকে পদক্ষেপ করতে হয় প্রায় কুড়ি বার।

খাত পরিক্রমান্তে নেতা যেই যে স্থান থেকে হাঁটা শুরু করেছিল ঠিক সেই স্থানটিতে এসে পৌছয় অমনি লোভার চারিদিকে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট যোগানদারেরা পায়ের উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে ওঠে; পাতার বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেয় গর্ত্তের মাঝখানে। পরিক্রমণকারীরা সঙ্গে সঙ্গেই মাঝখানটিতে এসে পাতার স্তূপের উপরে পদক্ষেপ করে এবং বাহু দিয়ে পরস্পরের গ্রীবা বেষ্টনপূর্ব্বক একটি সুদৃঢ় গ্রন্থি রচনা করে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। দগ্ধ পত্রসম্ভার থেকে ধূম্ররাশি যেই তাদের চারদিকে আবর্ত্ত রচনা ক'রে ওপরে উঠতে থাকে অমনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তারা গান জুড়ে দেয়।

এবার অনুষ্ঠানের শেষকৃত্য। যোগানদারদের মধ্যে দুজনে এবার খাতের পাড়ে মাটিতে সংস্থাপিত পীতবর্ণ দ্রাক্ষালতাগুচ্ছ গর্ত্তের মধ্যে টেনে ফেলে দেয়। অন্যান্য সাহায্যকারিগণ প্রচণ্ড উৎসাহে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে খাতের মধ্যে ফেলতে থাকে। মধ্যস্থলে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান ব্রতচারীরা তখন ঐ মাটি পা দিয়ে মাড়াতে আরম্ভ করে, তাদের সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীত তখনও চলতে থাকে সমান তালে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়—পাথর, দ্রাক্ষালতা, পত্রসম্ভার সবকিছু। ধীরে ধীরে ব্রতচারীরা সব ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়—গর্ত্তের মধ্যে থাকে শুধু সদ্য-কাটা মাটির প্রশস্ত আস্তরণ—সেই উত্তপ্ত মৃত্তিকা থেকে তখনও কুণ্ডলাকৃত বাষ্প উত্থিত হতে থাকে।

মবেঙ্গার লোকদের এই অনুষ্ঠান চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক বিস্ময়ের বিষয়। নিউজিল্যাণ্ডে একবার একদল চিকিৎসকের সমক্ষে তারা এমনি ভাবে উত্তপ্ত প্রস্তরের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। যে ক্ষেত্রে গোটা পা পুড়ে যাবার কথা সেই ক্ষেত্রে কেন যে তাদের পায়ের চামড়া পর্য্যন্ত ঝলসে যায় নি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তার কারণ নির্দ্দেশ করতে পারেন নি।

মবেঙ্গার এই ব্রতচারীদের এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে কেউ বলে, ব্রতচারণের দিন সকালবেলা যখন উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে সে দৌড়য় তখন তার মনে হয় যেন তার দেহে একটা নূতন শক্তি প্রবেশ করছে, কেউ বলে তার এই অনুভূতি হয় যেন কোন দেবতা তার উদরের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছেন, আবার কেউ বা বলে তখন সব কিছুই দেখায় রহস্যময় এবং কুয়াশাচ্ছন্ন।

বিজ্ঞান আজও এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তবে কি দৈবশক্তির প্রসাদেই মবেঙ্গার লোকেরা অবলীলাক্রমে এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়? এই অনুষ্ঠান স্মরণ করিয়ে দেয় শেক্সপীয়ারের সেই অমর উক্তি: "দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন এণ্ড আর্থ..." ইত্যাদি।

সীল সমাবেশ

## লোবোস দ্বীপের ধ্বংসোন্মুখ অধিবাসী

উরুগুয়া উপকূল থেকে দশ মাইল দূরে পুন্তা দেল এস্ত-এর ( Punta del Este ) উল্টোদিকে দক্ষিণ আটলান্টিকের বুকে ছোট একটি দ্বীপ — নাম লোবোস। অতলান্ত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা সারাক্ষণ রুদ্ধ আক্রোশে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে এই দ্বীপের তটভূমিকে। এই দ্বীপের অধিবাসীরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের পথে। এরা মানুষ নয়, মানুষের শিকার।

এই দ্বীপের সমস্তটা জুড়েই সীল মাছের বাস —এ হল তাদেরই রাজ্য। এ রাজ্যের প্রত্যেকটি বর্গগজ পরিমিত স্থান তাদেরই এক-একটির দ্বারা অধিকৃত। তাদের সংখ্যাও কম নয়, আড়াই লক্ষের উপর।

এদের তুলনায় এই দ্বীপের বাসিন্দা মানুষের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র লোক বাস করে বাতি-ঘরের চতুষ্পার্শ্বে, সীল মাছের তেলই হল এদের জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র উপায়। এই তেল সংগ্রহ করবার জন্যে বছরে প্রায় দশ হাজার সীলকে হত্যা করা হয়। প্রতি বৎসর এমনি ভাবে ব্যাপক হারে সীলমেধযজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সীল গোষ্ঠীর জীবকুল কিন্তু লোবোস দ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় না, তারা ওখানকারই জল মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। মনের সুখে জল ছিটিয়ে সমুদ্রবক্ষে সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে রোদ পোহায়। থেকে থেকে অদ্ভুত সুরে ডেকে ওঠে, এ ডাক সীলদের বৈশিষ্ট্য,—এরা যে নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট, এ ডাকে যেন তারই অভিব্যক্তি।

Punta del Este-এর অবকাশ উপভোগেচ্ছু মানুষ সীল সমাবেশ দেখবার জন্যে নৌকা করে দ্বীপের অভিমুখে রওনা হন, কিন্তু সমুদ্র গর্ভোত্থিত বিপজ্জনক শৈলমালার প্রতিবন্ধকতায় নৌকাগুলির পক্ষে তটভূমির খুব কাছে ভিড়া সম্ভবপর হয় না। তাদের ফিরে আসতে হয় বিফলমনোরথ হয়ে— সীলেরাও থাকে নিরুদ্বিগ্ন। কিন্তু তা হলে কি হবে? লোবোস দ্বীপের তৈল-সন্ধানী মানুষের কবল থেকে তো তাদের নিষ্কৃতি নেই।

সাগর-চুম্বিত লোবোস দ্বীপের এই সীলবংশের জন্য উপযুক্ত রক্ষণ ব্যবস্থা না করলে ভবিষ্যতে তাদের মহতী বিনষ্টি অনিবার্য্য।

## অতিকায় কীট

আমাদের দেশে আমরা সচরাচর যে সকল কীট দেখতে পাই তাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হচ্ছে কেঁচো কোন কোনটির দৈর্ঘ্য দেড় ফুট পর্য্যন্ত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি শ্রীমতী মার্টে লাথাম নাম্নী নিউ ইয়র্কের এক মহিলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫,০০০ ফুট উঁচুতে এমন একটি কীটের সন্ধান পেয়েছেন যা লম্বায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের পর্য্যবেক্ষণের জন্যে এটিকে পাঠান হয়েছে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায়।

নিউজিল্যাণ্ডের লোকেরা কিন্তু কীটের এই দৈর্ঘ্যের কথা শুনে মোটেই অবাক্ হবে না। এই দেশে বহুবার এমন সব কীট পাওয়া গেছে যারা লম্বায় এগারো ফুটেরও বেশী।

এ ধরনের দীর্ঘকায় কীট যবদ্বীপেও বিরল নয়। বৃহত্তর ভারতের বৃহত্তম কীটের সম্মুখীন হলে আমাদের ভারতীয় মহীলতা লজ্জায় মহীতলে গা-ঢাকা দিতে চাইবে।

## যখন জল বাড়ে

প্রচুর বর্ষণের দেশ ব্যারোট্‌স্‌ল্যাণ্ড্ :—বৃষ্টির জল এখানকার আদিবাসীদের কাছে শুধু ভগবানের আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপও বটে। শস্যাদির বাড়তির জন্যে এই বৃষ্টিপাত অত্যাবশ্যক, কিন্তু বন্যার দরুণ যখন জল বাড়ে তখন ওখানকার বাসিন্দা ইন্‌ল্যুনারা বড় বিপন্ন হয়ে পড়ে।

গাঁয়ের ভিতর বানের জল ঢুকে যখন সবকিছু ভেঙে-চুরে তচনচ করতে থাকে, সবাই তখন ঐ ধরণের আপৎকালীন ব্যবস্থার জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরী ডোঙা নৌকাগুলোতে এসে ওঠে এবং পাড়ি জমায় সরাসরি লিমুলুঙ্গার উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছে আশ্রয় নেয় তারা উঁচু ডাঙার উপর। যে পর্য্যন্ত না তাদের গ্রাম থেকে বন্যার জল স'রে যায় সেই পর্য্যন্ত তারা এখানেই অবস্থান করে, তার পর যথাসময়ে ঘরে ফিরে আসে।

ব্যারোট্‌সল্যাণ্ডের রাজধানী লিয়ালুইয়ের বাসিন্দারা প্রায়শঃই বন্যার কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সাময়িক ভাবে নিজেদের বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। উপজাতীয় লোকেদের এই বাস্তুত্যাগের দৃশ্যটি করুণ হলেও রমণীয়।
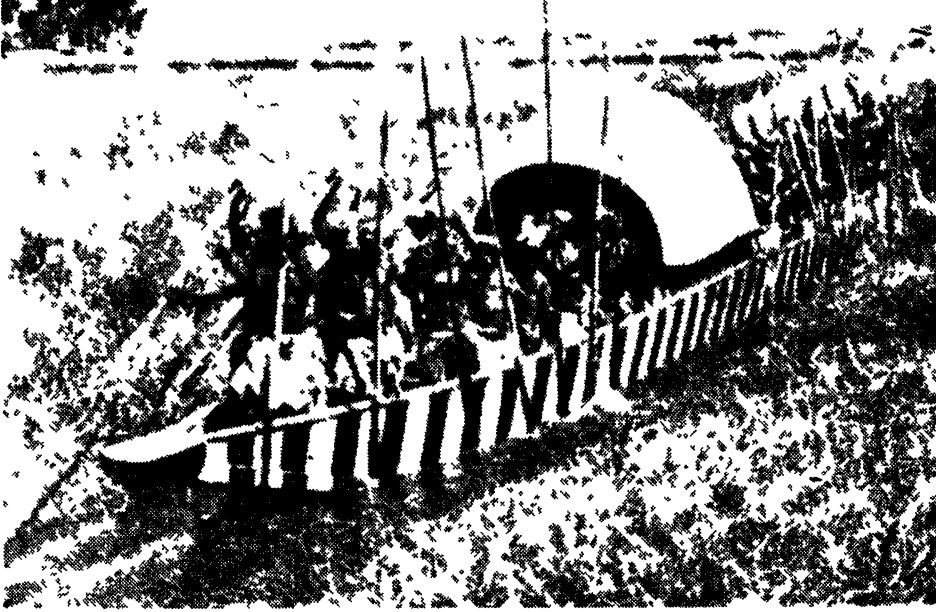
বাস্তুত্যাগী সর্দ্দারের নৌকাযাত্রা

প্রধান সর্দ্দার যে নৌকাটিতে আরোহণ করেছে সেটি আকারে যেমন বিরাট তেমনি সুদৃশ্য। যে সকল ইন্দুযানা এই নৌকা চালায় তারা মাথায় পরে নিজের কেশের তৈরী উষ্ণীষ। এদের জাতীয় প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই শিরস্ত্রাণ। নৌকার গলুইয়ের উপর বসে একজন লোক তার মাদল বাজাতে থাকে। তার মাদলের আওয়াজের দরুণ না কি উচ্ছ্বসিত জলরাশির উপদেবতাসমূহকে এড়ান যায়।

## হাতীর জলপান ও ধারাস্নান

হাতীর জলপানের প্রণালীটি বড়ই বিচিত্র। প্রথমে সে জলের ভিতর শুঁড় ডুবিয়ে শুঁড় ভর্ত্তি করে জল শোষণ করে নেয়, তার পর শুঁড়টা মুখের অনেকখানি ভিতরে নিয়ে গিয়ে সেই জল সবেগে গলার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। প্রত্যেক বার শুঁড়ে জল ভর্ত্তি হয় গড়ে প্রায়

হাতীর ধারাস্নান

হয় কুয়ার্ট পরিমাণ। তার মানে হাতীকে বহুবার গলার ভেতরে জল ঢোকাতে হয়। কেননা রোজ তার প্রায় পঞ্চাশ গ্যালন জলপানের দরকার। সময় সময় কিন্তু জলপানের পরিবর্ত্তে হাতী ধারাস্নান করে। দৃশ্যটি ভারি সুন্দর। দূরের থেকে দেখলে মনে হয়, কালো পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে যেন ঝর্ণার শুভ্র জলধারা।

## সারা পৃথিবীর কথ্যভাষার সংখ্যা কত

ভাষাতত্ত্ববিদেরা হিসাবকরে দেখেছেন যে, আজকের দিনে সারা পৃথিবীতে প্রধান প্রধান উপভাষা ( dialects ) সমূহ সহ মোট ৩,০০০টি কথ্যভাষার প্রচলন আছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিচ্ছিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ( **isolated groups of tribesmen** ) যে শত শত নিজস্ব ভাষা প্রচলিত আছে সেগুলিকে কিন্তু উপরোক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্তি করা হয় নি। ন্যাশন্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটির মতে সবচেয়ে বেশী লোক কথা বলে চীনা ভাষায় এবং ইংরাজী হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ভাষা।

## নারীর প্রসাধন-প্রীতি কত কালের

আজকের দিনে নারীরা প্রসাধনের জন্য মুখে স্নো, পাউডার, ঠোঁটে লিপষ্টিক, নখে নেল-পলিশ, ইত্যাদি কত কি ব্যবহার করেন। কোন্ স্মরণাতীত কালে মেয়েরা প্রথম প্রসাধিতা হতে সুরু করেছিলেন, আজ তা সঠিক ক'রে বলবার উপায় নেই। মহাকবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যে অলকার যক্ষবধূদের প্রসাধনের প্রসঙ্গে বলেছেন "নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ" - তখনকার দিনে মেয়েরা যে মুখে মাখতেন লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু এই শ্লোকাংশ থেকে তা অনুমান করতে পারা যায়।

এ ত গেল ঐতিহাসিক যুগের কথা। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে মেয়েরা বিবিধ অঙ্গরাগ ব্যবহার করতেন ইদানীং তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছে যে, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার একেবারে গোড়ার দিকেও মেয়েরা তাদের কেশপাশ রঞ্জিত করত, তখন তার হাতের আঙুলের নখে, হাতের তেলোয় এবং পায়েও রং মাখাত। ঐ রং তৈরি করত তারা হেন্না নামক সুগন্ধি সাদা পুষ্পযুক্ত একপ্রকার ছোট বুনো গাছ থেকে।

**ন. ভ.**

## মহাকাশ-পারের অশ্বমানব

অশ্বমানব

গ্রীক পুরাণের 'সেণ্টর', মানুষ ও ঘোড়া মিলিয়ে একটি জীব ; চারপাওয়ালা সলাঙ্গুল ঘোড়ার দেহ ; তার ঘাড়ের কাছ থেকে মানুষের ধড়, দুটো হাত আর মুণ্ড। ঘোড়া হিসাবে খুব বেশী সুদৃশ্য দেখতে হবার কথা নয়, মানুষ হিসাবে ত নয়ই। পৃথিবীতে ওরকম কোন জীবের অস্তিত্ব নেই ব'লে কোন মানুষ দুঃখ প্রকাশ করে নি এখন পর্য্যন্ত। ঘোড়াদের কথা বলা সহজ নয়। তবে মনে হয়, পেট ভ'রে দানাপানি পেলে আর কলিমুদ্দি মিঞার ছ্যাকড়া গাড়ী টানবার দায় থেকে মুক্তি পেলে, বিধিদত্ত দেহ, ঘাড় আর মুণ্ড নিয়ে তারাও বেশ খুশী মনেই জীবনাতিপাত করতে পারে।

কিন্তু আমরা, পৃথিবীর মানুষরা আর ঘোড়ারা চাই না বলেই যে ঘোড়া-মানুষের অস্তিত্ব কোথাও থাকবে না তার কি অর্থ আছে ?

'কোথাও' বলতে আজকের দিনে সাইবেরিয়া, পেরু, সাহারা বা দক্ষিণ মেরু অঞ্চল বোঝাচ্ছে না। এই অসীম বিশ্বের একটা অত্যন্ত নগণ্য যে অঞ্চলটাতে আমরা রয়েছি, তারই মধ্যে আমাদের নিরতিশয় দুর্ব্বল বুদ্ধি এবং তার চেয়েও দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও আমরা আমাদের এই সৌরমণ্ডলের মত কোটি কোটি গুণ এবং তারও বহুগুণ কোটি সৌরমণ্ডলের অস্তিত্বের পরিচয় পাচ্ছি। তাই আমরা আজ জানি, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য সীমিত বিশ্বের পরিধির মধ্যেও আমাদের এই জীবধাত্রী পৃথিবীর মত গ্রহ কোটি কোটি আরও রয়েছে।

প্রতিবেশ বিচারে এই সমস্ত গ্রহে জীবজীবনের অভিব্যক্তি নিশ্চয় বিভিন্ন রকমের হয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি গ্রহে বিভিন্ন বহু রকমের প্রতিবেশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এমন কোন জীবের অস্তিত্ব এই সব গ্রহের মধ্যে আমরা কল্পনা করব না, যা আমাদের জ্ঞানকল্পিত প্রতিবেশের মধ্যে সম্ভাব্য নয়।

'সেণ্টর' বা অশ্বমানব জাতীয় জীবের অস্তিত্ব, নিকট বা দূর যে কোন গ্রহেই থাকা সম্ভব, এই প্রকার মত প্রকাশ করেছেন উইলিয়াম হাওয়েলস্ নামক হার্ভার্ডের একজন অধ্যাপক। গ্রীক পুরাণের প্রতি অনুরাগ এই মত প্রকাশের কারণ নয়। অশ্বমানব জাতীয় জীবের বিবর্ত্তনের উপযোগী প্রতিবেশ বহু গ্রহে আছে ব'লে তাঁর বিশ্বাস। এত দৃঢ় তাঁর এই বিশ্বাস যে, তিনি বলেছেন, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি, মহাকাশপারের মনুষ্যধর্ম্মী যে জীবের পরিচয় আমরা প্রথম পাব, সে হবে চতুষ্পদ ও দ্বিহস্তসমন্বিত অশ্বমানব।"

মনুষ্যধর্ম্মী বুদ্ধিমান্ জীব কীটজাতীয় হওয়া সম্ভব নয়, কারণ কীটদেহের স্নায়ুসংস্থান বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগী হতে পারে না, যে-কারণে কীটেরা অনেক চমকপ্রদ কাজ করে, কিন্তু বুঝে-শুনে করে না, কেউ তাদের দিয়ে করায়, যার নাম **instinct** বা জৈব-প্রেরণা।

তাদের পক্ষে পক্ষিদেহ কিন্নর হওয়াও সম্ভব নয়। পাখীদের কিঞ্চিৎ নির্ব্বোধ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কলকাতার কাকদের ব্যবহার লক্ষ্য করলে হঠাৎ কথাটা মানতে ইচ্ছা না হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি! পাখীদের উড়তে হয় ব'লে তাদের মস্তিষ্কের অনেকখানি শক্তি সেই সংক্রান্ত পেশী-সঙ্কোচন-প্রসারণের কাজে ব্যয়িত হয়ে যায়।

**Mermaid** জাতীয় জলচর জীব তারা যে হতে না পারে তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ জলময় গ্রহ না হলে স্থলচর হওয়াই তাদের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক।

হাত তাদের থাকতেই হবে, কারণ হাত ছাড়া কোন কাজ হয় না। কাজ করতে পারে বলেই মানুষরা মানুষ, অর্থাৎ কাজই হ'ল আসলে মনুষ্যধর্ম্ম। হাত থাকতে হলে বাহু থাকতে হবে, এবং একটা মাত্র হাত থাকলে, বা তিনটে হাত থাকলে বেজোড়, বেমানান হয়। তাই তাদের দুটো হাত থাকবে ধ'রে নেওয়া যায়। চারটে বা ছ'টা বা কুড়িটা হাত থাকবে না এইজন্যে যে এত বেশী হাত সামলান শক্ত, আর তার দরকারও নেই।

হাত থাকলে আঙুলও থাকবে, আর তাও তাদের বোধ হয় পাঁচটা করেই থাকবে। কারণ আঙুলের সংখ্যা পাঁচটা হওয়াই বোধ হয় সুবিধের, তা না হলে কোটি কোটি বৎসর আগে পৃথিবীর স্থলচর জীবরা যে পাঁচ আঙুল নিয়ে সুরু করেছিল বহুবিবর্ত্তনের পরে আজকের দিনের মানুষের বেলাতেও সেই অবস্থাটাই বজায় থাকবে কেন?

এবারে পায়ের কথা। পৃথিবীর মানুষের পা দুটো। যে ভাবে তারা বিবর্ত্তিত হয়েছে তাতে তাদের হয় দুটো পা নিয়েই চলতে হয়, আর তা না হলে হাতের আশা ছাড়া দরকার। তাদের জীবচেতনা অনেক যুগ ধ'রে ভেবে দুটো পা নিয়েই খুশী থাকবে স্থির করেছিল, যদিও তাতে অসুবিধা বিস্তর। কুকুরের একটা পা ভাঙলেও সে দিব্যি ছুটতে পারে, মানুষের একটা পা গেলে সে প্রায় অচল হয়। তাছাড়া কোমরে, পিঠে ব্যথা, এ মানুষেরই একচেটে, দু' পায়ে খাড়া হয়ে চলতে হয় ব'লে।

মানুষের যে দুটোর বেশী পা থাকবে না তা স্থির হয়ে গিয়েছিল বহু কোটি বৎসর আগে যখন সে যুগের কিছু কিছু মাছ (তারাই আমাদের দূরতম পরিচিত পূর্ব্বপুরুষ) উভচর হয়ে বিবর্ত্তিত হবার সময় নিজেদের পাখনার (fin) অনেকগুলোকে বর্জ্জন ক'রে চারটিতে অবসিত করেছিল। এই সুরটিতে অন্য গ্রহগুলিতে বিবর্ত্তনের ধারা হয়ত একটু ভিন্ন খাতে বয়ে গিয়েছিল। হয়ত গ্রহান্তরবাসী সেই আদিম যুগের মাছরা ছ'টি পাখনা নিয়ে বিবর্ত্তিত হয়েছিল উভচর হয়ে। তার মধ্যে দু'টি পাখনা হাত হয়ে বাকী চারিটিই পায়ে রূপান্তরিত হয়ে বহু বিবর্ত্তিত মানবকে অশ্বমানবের রূপ দিয়েছে।

এই অশ্বমানবদের একমাত্র অসুবিধা এই যে, তাদের জুতোর খরচ আমাদের দুগুণ। কিন্তু সুবিধাগুলির তুলনায় এ কিছুই নয়। জীববিবর্ত্তন খুব বেশী সুবিধা-অনুসারী বলেই প্রোফেসার হায়ওয়েল্‌স্ বলেন গ্রহান্তরের যে মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটবে, তারা দ্বিপদ বা চতুষ্পদ হবে না। তারা হবে দ্বিহস্ত-চতুষ্পদ। অর্থাৎ অশ্বমানব।

স, চ,

**কমিউনিজম্ ও সমাজতন্ত্র**—কার্ল কাউট্স্কি, ভূমিকা সিডনি হুক। অনুবাদক প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন্ হাউস প্রাইভেট লিঃ, ২০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-১৩০ মূল্য ২·২৫ ন প।

আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রী নেতা কার্ল কাউট্স্কির নির্ব্বাচিত কতগুলি প্রবন্ধের অনুবাদ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইনি ছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীর নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং তাঁহার প্রবাস জীবনে লিখিত প্রবন্ধগুলি হইতে সমাজতন্ত্রের সহিত কমিউনিজমের যে (অহিনকুল?) সম্পর্ক তাহাই প্রকট হইয়াছে। রাশিয়ার কমিউনিজম্‌কে সমাজতন্ত্র বলিয়াই বাহিরের লোকের নিকট প্রচারিত হয়, আসলে ইহা একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে। আর একনায়কত্ব আর যাহা হউক সমাজতন্ত্র নহে। সেদেশে ষ্টালিনের দেওয়া নয়া গণতন্ত্রের "সংবিধান" সত্ত্বেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতি ও জনসংগঠন করিবার স্বাধীনতা, জনসাধারণের স্বাধীনভাবে আন্দোলন করিবার অধিকার বলিয়া কিছুই নাই। স্বাধীন নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে এখানে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচিত হয় না।

প্রকৃত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি গণতন্ত্রে। এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতার উপরেই নির্ভরশীল। মুষ্টিমেয় লোকের ক্ষমতা অধিকার দ্বারা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে—যেরূপ রাশিয়ায় হইয়াছে। সেখানে জারের স্বৈরাচার অন্যভাবে চলিয়াছে যদিও ইহার আদর্শ বিভিন্ন।

পুস্তকের বক্তব্য দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত যথা সমাজতন্ত্রের সূচনা, মার্কসবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, বলশেভিজেমের সূচনা, লেনিন ও ১৯১৭ সনের বিপ্লব, কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক, রাশিয়া কি সমাজতান্ত্রিক দেশ? কমিউনিজম্ সোস্যাল ডেমক্রেসী এবং জার্ম্মানীতে নাজীতন্ত্রের অভ্যুদয়, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র, ক্ষমতা লাভের পথ, যৌথ ফ্রণ্ট।

এই পুস্তক পাঠে কমিউনিজম্ ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের অনেক ভুল ধারণা দূর হইবে এবং একনায়কত্বের পথ যে সমাজতন্ত্রের পথ নহে তাহাও স্পষ্ট হইবে।

পুস্তকের অনুবাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ জড়তা থাকিলেও মোটের উপর বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

**শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ**—শ্রীপ্রতিভা গুপ্ত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে সারা দেশ যখন রবীন্দ্র-মননে উন্মুখ ঠিক সেই মাহেন্দ্রলগ্নে রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-সমন্বিত এই গ্রন্থখানির আবির্ভাবকে আমরা অভিনন্দিত করি। রবীন্দ্র-প্রতিভা দিগ্বিদিকে প্রসারিত। শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাতত্ত্বকে যিনি কেবলমাত্র আপন জীবনে পুঁথিগত বিদ্যা হিসাবে কোণঠাসা করিয়া রাখেন নাই তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে এতদ্দেশীয় শিক্ষাবিদেরা নিঃসংশয়ে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকর্ত্রী গ্রন্থখানিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। অধ্যায়গুলি হইল, প্রেরণা, আশ্রম, গুরু, ছাত্র, লক্ষ্য, পাঠ্য ও পদ্ধতি, শিশুসাহিত্য, লোকশিক্ষক এবং কর্মযোগী। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নারী অধ্যায়ের সামান্য পরিসরে সবটুকু বলা যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। তবুও স্বল্প পরিসরে আত্যন্তিক ক্রটিটুকুকে স্বীকার করিয়া নিয়াও এ কথা অসংশয়ে বলা যায় যে, গ্রন্থকর্ত্রী গ্রন্থখানিকে সুপাঠ্য, তথ্যবহুল এবং চিন্তা দৃঢ় করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছে ইহা তথ্যানুসন্ধিৎসু বোদ্ধা পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে।

রবীন্দ্রমানসের প্রেরণা ঐতিহ্যমণ্ডিত। সেই সুপ্রাচীন ঔপনিষদীয় প্রেরণাকে কবি যুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ নমনীয় প্রাজ্ঞ জীবনবোধের সহিত আধুনিক শিক্ষা-দার্শনিক ফ্রোয়েবেল ডিউঈ প্রমুখ মনীষীদের মতই তিনি গুরু-ছাত্রের সম্পর্কটুকুকে নতুন দৃষ্টিতে দেখিলেন। গুরু এবং ছাত্রের যুগাশ্রিত সম্পর্কটুকু কেবলমাত্র যে অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনার দ্বারা মণ্ডিত নহে, এই সহজ সত্যটুকুকে কবি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। ইহার জন্য তাঁহার সজ্ঞান প্রয়াসের অন্ত ছিল না। গুরু যে সচিৎ, গুরু যে গাতুভিৎ, বেদের এই মহৎ মন্ত্রটির কথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছিলাম। কবি পুনরায় এই তত্ত্বটুকু প্রচার করিলেন। বিদ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইলেন যে আজিও অতীত আশ্রম পরিবেশের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহজ সম্বন্ধটুকু সর্বপ্রকার কলুষ হইতে মুক্ত থাকিয়া আজিও অম্লান আলোক বিকীরণ করিতে সক্ষম। শিক্ষার সেই নিগূঢ় লোকে যেখানে শিক্ষার্থী শিক্ষকের পদপ্রান্তে জ্ঞানান্বেষণে সমাগত, সেখানে বিনয়, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানস্পৃহাই বলবতী। কবিগুরু এই আদর্শশিক্ষার মাধ্যমে নূতন করিয়া 'মানুষ' সৃষ্টির লক্ষ্যটুকু শিক্ষাবিদদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া বিদেশী কোম্পানীর সর্বকনিষ্ঠ কেরাণী হইবার জন্যই ত আমাদের দেশের ছেলেরা জন্মগ্রহণ করে নাই। বৃহত্তর সার্থকতার পথে তাহাদের চালিত করিতে হইবে। মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে আমাদের দেশের যুবশক্তিকে। তাইত রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার জন্য তাহার পাঠ্যতালিকা ও পাঠপদ্ধতি, শিক্ষার মাধ্যম প্রমুখ বিষয়ে আপন মত নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করিলেন। সেই প্রচারিত মতকে তিনি সত্যরূপ দিলেন তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। শুধু মৌলিক চিন্তার দ্বারাই কবির মানসিকতা চিহ্নিত নহে; নিরলস কর্মসাধনাও তাঁহার নিত্য সঙ্গী। যে লক্ষ্য তিনি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করিলেন তাহাকেই সত্য করিয়া তুলিবার জন্য তিনি কর্মযোগীর ভূমিকাও গ্রহণ করিলেন। কবির এই পরিচয়টুকুও মহত্ত্বের দাবী রাখে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির স্বল্প পরিসরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা—বাণী রায়, গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য সাত টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি শুধু যে মাইকেল মধুসূদনের জীবন আলেখ্য ইহা বলিলে ভুল হইবে। এই গ্রন্থে মধুসূদনের যাবতীয় রচনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং অনেকগুলি বিদেশীয় কবিতার সহিত তুলনা-মূলক ব্যাখ্যা ইহার প্রাণবস্তু। মধুসূদনের জীবনী বলিতে যা বুঝায় তা বড় একটা দেখা যায় না। কবি নিজেও আত্মকথা লিখিয়া যান নাই। শ্রীমতী বাণী রায় কবির রচনাবলী ও বিভিন্ন পত্রাদি হইতে তাঁহার চরিত্রের বিশেষ দিকটি ছাঁকিয়া লইয়াছেন। ইহা তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। বিশেষ করিয়া তিনি যে-দিকটি দেখাইয়াছেন তাহাকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না। কেন তিনি খৃষ্টান হইয়াছিলেন—ইহা কি ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ, না অন্য কিছু? খৃষ্টান হইয়াও তিনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, লেখিকা বিভিন্ন পত্রাদি তুলিয়া দিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে আর একটি বিশেষ অধ্যায় 'দাম্পত্য জীবন ও প্রেম।' মধুর জীবনে আমরা তিনটি নারীর সাক্ষাৎ পাই—দেবকী, রেবেকা ও আঁরিয়েত। দেবকীর সহিত অবশ্য তাঁহার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু রেবেকার সহিত হইয়াছিল। চারটি পুত্রের জননী হওয়ার পর কেন যে কবি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আঁরিয়েতকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা লেখিকা কবির চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ছিলেন, পুরুষ সিংহ, রমণীর হস্তচালিত ক্রীড়নক হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। লেখিকা একস্থানে বলিয়াছেন—"মধু সত্যই সংসারযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। প্রেমিক হইলেও পিতৃত্ব অথবা সংসারীভাব তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণ শিশুস্বভাবের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে নাই। সন্তানদের শিক্ষায় ব্যস্ত মধু তাঁহাদের হয়তো নিজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিতেন না দীর্ঘ দিনের মত, যদি তাঁহার বাৎসল্যরস তীব্র হইত। তাছাড়া, অত চিন্তাশীল পিতা তিনি ছিলেন না। সংসার তাঁহার কাছে অপ্রীতিকর সঙ্কট। তাই বারবার সংসারের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কাব্যজগতে আশ্রয় লইলেন। বিবাহ ও সংসারের পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন নিঃসন্দেহে।"

রেবেকাকে ত্যাগ করিবার মূলে আরও কারণ এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন: "অভাবক্লিষ্টা রেবেকা ও অসংযত চরিত্র মধুর মধ্যে অবশ্যই কলহ বিবাদ হইত। আমরা অনুমান করি গৌরদাসের বর্ণিত চরিত্র মধু রেবেকাকে ক্যাক্টাস বুঝিয়া সুদূর হইলেন ও কোমলস্বভাবা আঁরিয়েতের সহানুভূতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল ক্রমে ক্রমে। আঁরিয়েতের সঙ্গে সংযোগ হয়তো রেবেকাকে আরও উত্তপ্ত করিয়া তোলে এবং অনিবার্য ট্রাজিডির উদ্ভব ঘটে।...হয়তো স্বামী-স্ত্রীর অসন্তোষ এই নূতন সূত্র ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আত্মাভিমানিনী রেবেকা হয়তো দেশত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ক্রুদ্ধ মধু চিরদিনের খেয়ালী। হয়তো অনুরাগিণী আঁরিয়েতকে গ্রহণ করিয়া অপ্রিয় বিবাহের দায় তিনি তৎক্ষণাৎ অতিক্রম করিলেন।"

এইখানেই কবি মধুসূদনের জীবন-কথা আলোচনা করিতে গিয়া লেখিকা তাঁহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। "উচ্ছৃঙ্খল অসংযত জীবন ও অমিত ব্যয়। ফ্রান্সে বসিয়া ফরাসী সুন্দরীর প্রতি প্রীতি।...সর্বদা বন্ধু সঙ্গে পানভোজন ও বহির্ভ্রমণ। আঁরিয়েতের সঙ্গে সুখভ্রমণের ইতিহাস বড় একটা দেখা যায় না। হিন্দু গৃহিণীর মতই আঁরিয়েতের পৃথক অস্থিতি। যত ঋণ হোক, প্রিয়ার সাহচর্যে নূতন আশা ও উদ্যম দেখা যাইত। আঁরিয়েতের মুখ চাহিয়া নিজের দুঃখ ভোলা সম্ভব ছিল। মধুর জীবনীকার লেখেন যে, দ্বিপ্রহর বেলা বাটীর বন্ধ ঘরে বসিয়া একাকী মধু নির্জলা মদ্য পান করিতেছেন। মনোমোহন ঘোষের অনুযোগে মধু বলিলেন—অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা ক্লেশ কম বলিয়াই আমি অস্ত্রের পরিবর্তে সুরা ব্যবহার করিতেছি।......

তাঁহার আত্মনাশী হইবার বাসনায় বাধা দিবার পক্ষে কোন তীব্র আকর্ষণ তাঁহার জীবনে ছিল কি? গৃহিণী যদি মানসী হন, সন্তানের জননী যদি প্রেয়সী হন তবেই কবিমন সান্ত্বনার ক্ষেত্র পায়।"

মধু চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি কবি-চিত্তকে বার বার দিক্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। কবি আত্মকথা না লিখিলেও, তিনি তাঁহার রচনা ও পত্রাদিতে যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী বাণী রায় তাহার সুযোগ লইয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। যে অভিনব প্রচেষ্টায় কবিকে তিনি সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন তাহাকে এককথায় আবিষ্কার বলিতে পারি। বইখানি মূল্যবান নিঃসন্দেহে।

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য আট টাকা।

সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। লেখক বলিয়াছেন "জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত আছে বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির মধ্যে। আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি-সাধনাও বুদ্ধি ও হৃদয়মুক্তি-সাধনারই একটানা ইতিহাস।" তাই ডিরোজিও হইতে সুরু করিয়া গ্রন্থকার রামমোহন, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির কর্ম্ম-ধারাকেই কেন্দ্র করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে জাতির মানস-সম্পদ সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে বহু বিদেশী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, নহিলে সংস্কৃতি বিকাশের পথ এত সহজে সুগম হইত কি না সন্দেহ। তাঁহাদের মধ্যে ফাদার ইউজিন লাফো, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, রিচার্ডসন, উইলিয়ম কেরী, পাদ্রী ডাফ, জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন, ই বি হ্যাভেল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

'শুধু ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে নয়, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বিচারেও একথা অবিসম্বাদী সত্য—রামমোহন আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যে সংস্কারমুক্তি, সামাজিক আচার-বিচারের রাজ্যে যে উন্নত রুচিবোধ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে অদম্য প্রয়াস, এবং সাহিত্যে যে গভীর চিন্তার স্বাক্ষর আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ, রামমোহনের জীবন ও সাহিত্য সাধনায় তার প্রথম সূত্রপাত।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা ক্রমান্বিত ধারা লেখক যেভাবে দেখাইয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। সে যুগে ঈশ্বর গুপ্তও বড় কম কাজ করেন নাই।

তিনিই সর্ব্বপ্রথম নাগরিক ভঙ্গিতে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতে তিনিই বাঙালীদের সচেতন করিয়াছেন। এদিক দিয়াও তাঁহার দান উপেক্ষনীয় নয়। অবশ্য পরবর্ত্তী যুগে বিদ্যাসাগর অনেক কাজ করিয়াছেন। এক কথায় বাঙালাকে শিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন এই বিদ্যাসাগর।

ইহার পর গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন সাহিত্যের ক্রমবিকাশ। কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি গল্পে, কি নাটকে সবকিছুরই স্তর নির্ণয় করা হইয়াছে এই গ্রন্থে। শুধু স্তর নির্ণয়ই নয়, কাহার সহিত কোথায় কাহার পার্থক্য ইহা বিশ্লেষণ করিয়া লেখক তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

বস্তুতঃ প্রাক্ বঙ্কিম-যুগ আমাদের প্রস্তুতির যুগ। লেখক ঠিকই বলিয়াছেন "আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের দান অপরিমেয়। একজন মাত্র শক্তিধর স্রষ্টার প্রতিভাস্পর্শে বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের এত বড় জাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনে আর ঘটেনি।"

বাস্তবিক পক্ষে উনিশ শতকটি বাঙালীর অগ্রগতির যুগ। কি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। লেখক তাই কবি বিহারীলালকেই এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে লেখক তাঁহার শেষ কথা বলিয়া লইয়াছেন "আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসে তিনটি নাম আমাদের বিশ্লেষণী মনের তারে আঘাত করে: ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের মুখ্যতঃ পল্লীকেন্দ্রিক কবিতাকে নগরমুখী করে আধুনিকতার ভিৎ-পত্তন করলেন, মধুসূদন বাঙালী কবির প্রাচ্যদৃষ্টিকে বিশ্বাভিমুখী করে সেই আধুনিক চেতনায় বেগ সঞ্চার করলেন, আর শতাব্দী শেষে বিহারীলাল সেই বিশ্বমুখী কবিদৃষ্টিকে আত্মমুখী ক'রে আধুনিক কবির হৃদয়-গবাক্ষকে উন্মুক্ত ক'রে দিলেন। সেই অনাবৃত গবাক্ষের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙালী কবি দেখলেন মানব-হৃদয়ের রহস্যময় বহু কক্ষ। সেই কুহেলি-ঘেরা কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন-প্রচেষ্টাই আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস।

এইরূপ তথ্যবহুল বহু গ্রন্থ ইহার পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তুলনামূলক বিচারের দ্বারা যে ভাবে এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে লেখকের শক্তির পরিচয় রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্য ও সংস্কৃতি লইয়া এরূপ চিন্তাপূর্ণ আলোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বিদগ্ধজনের কাছে সমাদৃত হইবে।

শ্রীগৌতম সেন

লহ প্রণাম—বিভা সরকার। প্রকাশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পত্রাঙ্ক ৪১, মূল্য ১'২৫ টাকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখা এগারটি বিভিন্ন ছন্দের কবিতায় বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা মহিলাকবি নানাভাবে রবীন্দ্র-বন্দনা করিয়াছেন। এগুলি গতানুগতিক ভাবে রবীন্দ্র-প্রশস্তি নহে। প্রত্যেক কবিতার মধ্যে লেখিকার নিজস্ব মৌলিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ছন্দ সুন্দর ও ভাবানুসারী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচয় না থাকিলে এ ধরণের কবিতা লেখা যায় না। এ গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-

সাহিত্যের সূক্ষ্ম উপলব্ধির এক অনুপম অভিব্যক্তি। এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

**হারামণি**—পঞ্চম খণ্ড। মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত। বাংলা একাডেমীর সহযোগিতায় বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫.৫০ পয়সা।

দীর্ঘদিন ধরিয়া মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব বাংলার পল্লীগীতি সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত সঙ্গীতগুলি 'হারামণি' নাম খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমানে প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ডে ৩২৫টি গান স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২২৫টি লালন ফকিরের এবং ১০০টি পাগলা কানাইয়ের নামযুক্ত। পাগলা কানাইয়ের গানগুলির অধিকাংশ এবং লালন ফকিরের কতকগুলি গান ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব প্রকাশিত পাঠের সহিত আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত পাঠের পার্থক্য পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই পাঠভেদ আলোচনার ফলে মূলে গৃহীত পাঠের উৎকর্ষসাধন বা অর্থের সরলতা সম্পাদনের কাজ কতটা অগ্রসর হইতে পারিবে তাহা দেখান হয় নাই। ... ভবিষ্যৎ সমালোচক যাহাতে এ কাজ করিতে পারেন তাহার জন্য ভিত্তি রচিত হইয়াছে। এই ভিত্তি রচনার কৃতিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই মহোদয়ের। তাহা ছাড়া, গানগুলি বিষয়ানুসারে সজ্জিত করিয়া, গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রণয়ন করিয়া এবং দুরূহ ও পারিভাষিক শব্দের অর্থ সংকেত নির্দেশ করিয়া তিনি এই সংকলনখানি ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এখন গানগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও মূল্য নিরূপণের কাযে মনোনিবেশ করা দরকার। কেবল নির্বিচার সংকলনই যথেষ্ট নয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

**যুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র**—এডওয়ার্ড কারদেজ, অনুবাদক শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস, ২০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২২৬, মূল্য ৫.৭৫।

রুশদেশে সহিংস বিপ্লবের ফলেই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে সে দেশ সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে স্তরে পৌছিয়াছে, সে স্তরে পৌছিতে রাষ্ট্রনায়ক লেনিন ও ষ্ট্যালিনের বহু অবস্থা ও সমসাময়িক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কার্ল মার্কস-এর সূত্র ও বিপ্লবের আদর্শ কমনিষ্টগণের পক্ষে পালনীয় হইলেও সমসাময়িক দেশ ও কালে উহার প্রয়োগ সর্বত্র একরূপ হইতেই পারে না। এজন্য কার্ল মার্কস্ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি "মার্কসবাদী" নহেন অর্থাৎ কালের সঙ্গে এবং জাগতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁহার সূত্র ও আদর্শ যথাযথ সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া প্রযুক্ত হইবে, অন্যথায় গোঁড়ামী প্রকাশ পাইবে।

লেনিনের জীবিত কালেই সাম্যবাদ নিছক কোন একটি দেশে সম্ভব কি না এ বিষয়ে ট্রট্স্কির সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইয়াছে। ষ্ট্যালিনের সহিত ট্রট্স্কির বিবাদ ইহা লইয়াই। রুশিয়া কর্তৃক "স্থায়ী বিপ্লব এবং সর্বদেশে বিপ্লবের চেষ্টা।" এই আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ষ্ট্যালিন ও টিটোর সহিত দ্বন্দ্বও আদর্শের দ্বন্দ্ব হইতে। যুগোশ্লাভিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশ একই পথে আদর্শে পৌছিবে এই মতে বিশ্বাসী নহে। যুগোশ্লাভিয়া সমাজতন্ত্রী বিশ্ববিপ্লবে বা যুদ্ধদ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী নহে। যুগোশ্লাভিয়ার মতে শান্তির পথই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ। প্রত্যেক দেশেই সমাজতন্ত্র নিজের যোগ্যতা দ্বারা এবং আত্মচেষ্টায় কায়েম করিবে। পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী রাষ্ট্র উভয়ই পাশাপাশি থাকিতে পারে ইহাও যুগোশ্লাভিয়া বিশ্বাস করে। এই সকল কারণে রুশিয়া ও চীন হইতে স্বতন্ত্র হইলেও যুগোশ্লাভিয়া একটা কমুনিষ্ট রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

চীনের আদর্শ ইহা হইতে বিভিন্ন, অনেকটা ট্রট্স্কির মতের অনুরূপ। চীন হিংসা বা যুদ্ধ দ্বারা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। বর্তমান রুশনীতির সহিত এখানে চীনের পার্থক্য।

লেখক চীনের এই নাতিসংশ্লিষ্ট থিয়োরী বা মতবাদ এবং কার্য্যকলাপ বিশেষ করিয়া চীন কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়ার আদর্শ ও পন্থার নিন্দা, সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ বিস্তারের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করেন। লেখক মনে করেন যে যুগোশ্লাভিয়া প্রতি চীনের বর্তমান মনোভাব ও অপপ্রচার ঐতিহাসিক কারণেই হইতেছে কিন্তু ইহা বিশ্বশান্তি এবং প্রকৃত সাম্যবাদের বিরোধী। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা যুদ্ধ ব্যতীতই সম্ভব। মূল গ্রন্থের নাম নাম "Socialism and war" অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

"অনিবার্যকারণ বশতঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্তব্ধ প্রহর এ মাসেও গেল না।"

## প্রবন্ধ

প্রথম পুরস্কার ঃ— "বিশ্বতানের মিলন পথে"

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৩

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ— "সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে আরাকান"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ... ৭

তৃতীয় পুরস্কার ঃ— "সঙ্গীত রেণেসাঁসের যুগপুরুষ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর"

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৫

চতুর্থ পুরস্কার ঃ— "গণতন্ত্র গণতন্ত্রের সঙ্কট ও ভারত"

শ্রীতুলাল দেববর্ম্মণ ... ৪

পঞ্চম পুরস্কার ঃ— "বৌদ্ধভারতে গণতন্ত্র"

শ্রীনরেন ভট্টাচার্য্য ... ৩

এছাড়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দক্ষিণামূল্য দিয়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রবাসীতে আমরা ছাপতে ইচ্ছা করি। এজন্য লেখক-লেখিকাদের সম্মতিপত্রের প্রয়োজন। আশা করি অবিলম্বে তাঁরা তা পাঠিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করবেন।

অতিশব্দের ভূমিকা—শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়।

আকাশের রঙ—শ্রীরমেন কর।

"কৃষ্ণপ্রেম"—শ্রীমতী আভা পাকড়াশী।

কৌশানীতে সরলা বেন-এর লক্ষ্মী আশ্রম—শ্রীমতী আভা পাকড়াশী।

গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রমানসিকতা ও শিল্পকর্ম্ম—শ্রীসত্য বিশ্বাস।

গ্রহযাত্রার ভবিষ্যৎ—শ্রীঅশোককুমার দত্ত।

জনমত ও গণতন্ত্র—শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গের রেশমশিল্প ও তার ভবিষ্যৎ—শ্রীশক্তিময় বসাক।

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী—শ্রীমতী উষা বিশ্বাস।

ভারতসীমান্ত—শ্রীতরুণবিকাশ লাহিড়ী।

মৎস্যসহর থেকে উত্তর সাগর—শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবধর্ম্ম—শ্রীমতী তৃপ্তি রায় চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ—শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শকুন্তলোপাখ্যান চিত্রণে মহাভারত ও কালিদাস—শ্রীসমীরণ চক্রবর্ত্তী।

---

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গোপাল
শ্রীযামিনী রায়

[ প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৬৮

সংখ্যা

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ

আর অল্প কিছুদিন পরেই নূতন নির্ব্বাচনী পালার সোরগোল লাগিয়া যাইবে। নির্ব্বাচন অবশ্য সমস্ত ভারতেই—শুধু উড়িষ্যা ও কেরলে প্রাদেশিক নির্ব্বাচন এবার নাই। প্রত্যেক প্রদেশেই নানা প্রকার সমস্যা আছে, এবং কয়েকটি প্রদেশে প্রাদেশিক সমস্যার কিছু নূতন জটিল রূপ দেখা দিয়াছে, যথা পঞ্জাবে পাঞ্জাবী সুবা বিষয়ে ও আসামে আসামীয় বাঙালী বিদ্বেষজনিত ব্যাপারে। উপরন্তু কয়েকটি প্রদেশে প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত নানা বিষয়ে বাদানুবাদ ও নানা দাবীদাওয়া চলিতেছে। প্রত্যেক প্রদেশেই শিক্ষার মান নামিয়া গিয়াছে এবং বেকার সমস্যা প্রায় সর্ব্বত্রই কঠোর প্রশ্নে দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে প্রত্যেক প্রদেশেরই লোক চায় যে, তাহাদের প্রদেশে ভিন্ন প্রদেশের লোকের অন্ন-সংস্থান যেন আর না হয়, কিন্তু তাহাদের নিজ সন্তানেরা যেন সারা ভারতে অন্নবস্ত্রের খোঁজে বিনা বাধায় যাইতে পারে। এক কথায় সমস্যা অফুরন্ত।

এই নির্ব্বাচনে যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মুখপাত্র রূপে মনোনয়ন প্রার্থী, সাধারণ ভাবে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর লোকের উচিত তাঁহাদের নিকট এই সকল সমস্যা বিষয়ে সোজা কথায় মতামত ও প্রতিশ্রুতি চাওয়া। "শিক্ষার মান নামিয়া যাইতেছে, এ বিষয়ে আপনি কি জানেন বা বুঝেন এবং ইহার প্রতিকারে আপনি ও আপনার দল কি করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে ? বেকার সমস্যা ক্রমেই প্রবল হইতেছে কেন এবং এ বিষয়ে আপনি ও আপনারা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কি কার্য্যক্রম স্থির করিয়াছেন এবং আগামী পাঁচ বৎসরে কি ভাবে এই সমস্যা পূরণের জন্য চেষ্টা করিবেন ? এ দেশের লোকের স্বাস্থ্য, সঙ্গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে আপনি ও আপনারা গত দশ বৎসরে দেশের ও দশের জন্য কি করিয়াছেন ও আগামী পাঁচ বৎসরে কি করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন ?" এই জাতীয় প্রশ্ন ও তাহার সোজা উত্তর-দাবী, আমাদের উচিত এই প্রার্থী মহাশয় ও মহাশয়া-গণের নিকট উপস্থিত করা।

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, এ জাতীয় কিছুই করা হয় না। হয় শুধু পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ এবং পাড়ায় ও দেশের যত অপরিণত মস্তিষ্ক এবং অকালপক্ক "তরুণ ও তরুণী" জাতীয় "চ্যাংড়া" তাহাদের বিষম উৎপাত, যাহাতে চিন্তাশীল লোক এ জাতীয় কথা না তুলিতে পারে এবং সাধারণ লোকে বিনা চিন্তায় আবার পাঁচ বৎসরের মত সেই পুরাতন ফেরেববাজদিগকে পূর্ব্বেকার আসনে বসাইতে পারে। সে আসনে ইতিপূর্ব্বে বসিয়া তিনি কি করিয়াছেন, সে কথার কোনও উল্লেখের প্রয়োজন নাই—অন্ততঃপক্ষে ঐ সমর্থনকারীদের মতে। যাহারা এ বিষয়ে বিবেচনা করেন তাঁহাদের এই সম্পর্কে কথাও চাপা পড়ে প্রতি পল্লীর, গ্রামের ও নগরের অসংখ্য "সবজান্তা" মহাশয়গণের বিজ্ঞোচিত মন্তব্যের দাপটে। এবং উক্ত দুই প্রকারের উৎপাত—অর্থাৎ চ্যাংড়া রাজের ও সবজান্তা মন্ত্রীর—বাংলা দেশে অত্যধিক হওয়ায় আজ বাংলার এই দুর্দ্দশা।

একদিন আমাদের খ্যাতি ছিল চিন্তা ও বিবেচনাশীলতার জন্য। "যাহা বাংলা আজকার দিনে ভাবে, তাহাই ভারতের অন্য প্রদেশ ভাবিবে কালকে" এই বিখ্যাত বচন কোনও বাঙালী দ্বারা কথিত নহে। উহার সার্থকতা ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও সন্দেহের অতীত ছিল, কেননা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায়, দেশাত্মবোধে, দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিবেদনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে শোণিত তর্পণে, বাঙালী ছিল সারা ভারতের মধ্যে অগ্রণী।

কিন্তু আজ আমরা কোথায়? যদি স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা যায় তবে মনে হয় যে, নামিতে নামিতে আমরা শেষ ধাপে পৌঁছিয়াছি—ইহার পর আছে অবলুপ্তি! যদি বিশ্বাস না হয় একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কোথায় ও কতটুকু এবং ক্রমে সেই স্থান কি ভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইতেছে। অল্প কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেই বুঝা যায় আমরা ক্রমেই কোণঠাসা হইতেছি এবং শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা কোথায় দাঁড়াইবে তাহার নির্দ্দেশ এখনই স্পষ্ট দেখা যায়—যদি আমরা চক্ষু মেলিয়া দেখার সাহস রাখি।

বাঙালীর এরূপ ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কারণ কি? অবশ্য আমাদের সবজান্তা মহাশয়েরা বলিবেন যে, এই সব কিছুই বাঙালীর শত্রুদলের চক্রান্তের ফলে, এবং নাম করিয়া ও উদাহরণ দিয়া সেই শত্রুপক্ষের কারসাজির পূর্ণ বিবরণ দিতে তাঁহারা কোনও কসুর করিবেন না। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় যে, শত্রুপক্ষের হাতে এরূপ বাঙালীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসিল কিসের দরুণ এবং আমরাই বা এরূপ অসহায় কেন, তখন কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। যদি বলা যায় যে, আজ গণতন্ত্রের যুগে সংখ্যালঘুব অবস্থা এরূপ হইতে বাধ্য তবে প্রশ্ন আসে আসামের, উড়িষ্যার ও কেরলের। আমরা কি সংখ্যায় উহাদের অপেক্ষাও কম বা শিক্ষা ও প্রাদেশিক সঙ্গতির (অর্থাৎ সমস্ত প্রদেশের অর্থকারি সংস্থায় ও উপকরণ সমষ্টিতে) সমষ্টি হিসাবে উহাদের নীচে? এ বিষয়ে প্রাদেশিক প্রামাণ্য বিবরণ ও ও পরিসংখ্যান দেখিলেই বুঝা যায়, ঐ সকল বিষয়ে আমাদের স্থান অন্য বহু প্রদেশের উপরে। তবে আমরা এরূপ অসহায়ই বা কেন ও প্রতিকার লাভে এরূপ অসমর্থই বা কেন?

গণতন্ত্রে জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি অধিকার জাতিগত, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত, নির্ভর করে সেই জাতি, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সমষ্টির প্রতিনিধিবর্গের দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর এবং সেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন যদি আমরা "যথাপূর্ব্বং তথা পরং" করিয়া যাই, অর্থাৎ আমাদের প্রতিনিধি কে এবং কিরূপ তাঁহার বুদ্ধি বিচার ও দায়িত্বজ্ঞান সে বিষয়ে কোনও চিন্তা না করিয়া, দলীয় শ্লোগান বা জিগিরে অথবা ভুয়া কথার বাক্যজালে ভুলিয়া, কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া, আগের বারেরই মত পুরাতন ঘুঘুদের যথাস্থানে প্রেরণ করি তবে বাঙালীর ভিটায় ঘুঘু চরা নিশ্চিতের পর্য্যায়ে আগাইয়া চলিবে।

গত নির্ব্বাচনে যাঁহাকে আমরা মুখপাত্রের আসন দিয়াছি তিনি আমাদের জন্য মুখ খুলিয়াছেন কয়বার? নিজ স্বার্থে বা দলগত স্বার্থে মুখব্যাদান ইঁহারা সকলেই করেন, সুতরাং সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, কিন্তু বাঙালীর জীবনমরণের যে সকল সমস্যা আজ নিদারুণ রূপ ধরিয়াছে সে সকল সম্পর্কে ঐ মহাশয়েরা ভাবিবারও অবকাশ পাইয়াছেন কি? এ সকল কথা আমাদের এখনই চিন্তা করা প্রয়োজন নহিলে রক্ষা নাই।

বেকার সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, ঘরবাড়ী আশ্রয় সমস্যা, অন্নবস্ত্রের যাবতীয় সমস্যা, পথঘাটের সমস্যা, ইত্যাদি ত দিনেদিনে আরও উৎকট রূপ ধারণ করিতেছে। এ বিষয়ে চিন্তার ভার অন্যকে দিলে সমস্যাপূরণ কতদূর হয়, তাহা যদি আমরা এতদিনেও বুঝিতে না পারি তবে সেইদিনের জন্য আমাদের অসহায় ভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে যখন বাঙালী নামের সঙ্গে একটা অবহেলা ও উপেক্ষার সংজ্ঞা জড়াইয়া যাইবে এবং ভিক্ষা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনও অধিকার থাকিবে না।

বাঙালীর এই দুর্দ্দশার কারণ আমাদেরই নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা ও বিবেচনার অভাব। চিন্তা ও বিবেচনার শক্তিই ছিল আমাদের জ্ঞান ও গৌরবের মূলে এবং সেই উৎস হইতেই আমাদের সকল প্রতিষ্ঠা, সকল সাফল্য আসিয়াছিল। সেই চিন্তা ও মননশক্তি যে শুধু আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি তাহাই নহে উপরন্তু ঐ বাক্যবাগীশ ও বাচাল "সবজান্তা" নামক অপদার্থদিগের সংসর্গে আসিয়া যাহারা চিন্তাশীল তাহাদের হেয় জ্ঞান করিতেও পটু হইয়াছি। ইহাই ত সর্ব্বনাশের পথ।

## নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

বিগত ৭ই, ৮ই ও ৯ই পৌষে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বৎসরে, মহর্ষি-ভবনে ও রবীন্দ্রভারতীর প্রাঙ্গণে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ ভাবে সাহিত্য সম্মেলন যে ভাবে হয়,

অর্থাৎ আজকাল যাবতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহার সহিত এই সম্মেলনের কিছু পার্থক্য ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায় দুই-চারজন "কল্পতরু" জাতীয় উচ্চাধিকারি এইরূপ সম্মেলনে আসিয়া নানাভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন এবং তাঁহারা চলিয়া গেলে নাচ-গান অভিনয় ইত্যাদির মহড়া চলে। সেই কারণে ঐ জাতীয় সম্মেলনে দর্শক ও শ্রোতার মধ্যে সংস্কৃতি অপেক্ষা তাহার অভাবই অধিক লক্ষিত হয়। সহজ কথায় সংস্কৃতি, অর্থাৎ সাহিত্য জাতীয় নিগূঢ় রসের বাহক যে ইন্দ্রিয়াতীত প্রাণবস্তু, সেটা উপলক্ষ্য মাত্র দাঁড়ায়, মূল লক্ষ্য দাঁড়ায় স্থূলতর রসের পরিবেশন, যাহার মধ্যে অধিকারি মহাশয়কে দর্শন ও তাঁহার ভাষণ শ্রবণও একটা পদ।

এই সম্মেলনে সাহিত্যেরই নানা শাখা-প্রশাখার আলোচনাই ছিল মূল লক্ষ্য এবং সে সকল বিষয়ের নানাভাবে অবতারণাই করেন বিভিন্ন শাখার উদ্বোধক, সভাপতি ও অন্যান্য বক্তাগণ। শ্রোতাদিগের মধ্যেও সাহিত্যরসাস্বাদী জনেরই প্রাধান্য ছিল, যদিও কিছু সংখ্যক দর্শক আসিয়াছিলেন লঘুতর আনন্দের সন্ধানে।

কয়েকটি অভিভাষণে এবং আলোচনার মধ্যে বর্ত্তমান যুগসাহিত্যের অবস্থা ও দিক্‌-পরিবর্তন সম্পর্কে বক্তা ও আলোচকদিগের মতামত অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়। সেইরূপ আলোচনা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত বিচারেরই পরিচয় দেয়। অর্থাৎ বক্তার বিচারশক্তি অপেক্ষা তাঁহার নিজস্ব মনোবৃত্তির পরিচায়ক হয়, এখানে দুই-তিনটি বক্তা ও আলোচক ভিন্ন অন্য সকলেই ঐ দোস হইতে মুক্ত ছিলেন। ইহা অতি শুভলক্ষণ, কেননা বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখন ছোট বড় অনেকগুলি দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহাদের দলাদলি ও মনোমালিন্যের ফলে বঙ্গ-সাহিত্য ব্যাহত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সম্মেলনে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে দেখা যায় নাই—কি কারণে তাহা জানা যায় না। তবে কয়েকজন আমন্ত্রিত হন নাই একথা পরে আমরা শুনিয়াছি। বাংলা দেশে, বিশেষে কলিকাতায়, ঐরূপ না হওয়াটাই আশ্চর্য্য সুতরাং দলাদলি যে আরও প্রকট হয় নাই ইহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

মূল সভাপতি কালিদাস রায় মহাশয় প্রবীণ, বিচক্ষণ ও প্রকৃত রসবেত্তা এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁহার অভিভাষণ সুচিন্তিত এবং তাঁহার উদারতা ও রসজ্ঞতার পরিচায়ক। এদেশের সাহিত্যে দিক-পরিবর্ত্তনের যে চেষ্টা তাহার কারণ বিশ্লেষণ তিনি যদিও পূর্ণভাবে করেন নাই (বোধ হয় সময়ের অভাবে) কিন্তু নূতন ধারাকে তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন, যদিও তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত সাহিত্য ধারার অনুরাগী এবং সেই যুগের সমর্থকরূপে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি ও সমালোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিখ্যাত গুজরাটী সাহিত্যিক শ্রীউমাশঙ্কর যোশী। ইনি বাংলা ভাষা জানেন এবং বঙ্গ-সাহিত্যের রসগ্রহণে সমর্থ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় দীর্ঘ দিনের এবং তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি সম্পর্কে গবেষণার কিছু পথ নির্দ্দেশও ছিল, যাহা আমাদের মতে সমীচীন ও সমর্থন যোগ্য। অভিভাষণ ইংরাজীতে দেওয়া হয় এবং বোধ হয় সেই কারণে উহার সম্পর্কে কোনও বিশেষ বিচার হয় নাই। কিন্তু শ্রীযোশীর বক্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাণবস্তুর বিষয়ে যে অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বর্ত্তমান বৎসরের অসংখ্য রবীন্দ্র-পরিচিতি জাতীয় প্রবন্ধে ও পুস্তকে দুষ্প্রাপ্য।

তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন, তাঁহার বক্তব্য এই যে, কবিগুরুর সাহিত্যের নানাদিকের মধ্যে যে দিকটি তাঁহার কাছে সার্থকতম মনে হয় তাহা সমসাময়িক ভারতের আত্মার পূর্ণ পরিচয় দান, গানে ও সাহিত্যে। শ্রীযোশীর মতে এই পরিচয় দানে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে তাঁহার সমকক্ষ মাত্র আর তিনজন ভারতীয় কবি ছিলেন বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাস।

এই বিষয়ে তিনি যে ভাবে আলোচনা ও তথ্য পরিবেশন করেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও নূতন পথের ইঙ্গিতে পূর্ণ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্য দিকগুলির যদি ঐ ভাবে পূর্ণতর বিশ্লেষণ ও আলোচনার সূত্রপাত হয় তবেই রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব প্রকৃতপক্ষে সফল হইবে, যে কথা শ্রীযোশী তাঁহার অভিভাষণের আরম্ভেই বলিয়াছেন।

আড়ম্বর হিসাবে এখানের সম্মেলন বোম্বাইয়ের অপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াছে একথা ঐখানেই শুনিলাম। বোম্বাইয়ে সাহিত্য-চর্চ্চা কতটুকু হইয়াছিল এবং এখানে কতটা হইয়াছে তাহা বলিতে পারেন এই সম্মেলনের চালকবর্গ।

## রেলে ভ্রমণের বিপদাপদ

রেলগাড়ীতে যাওয়া-আসা এখন এক অতিশয় কষ্টকর ব্যাপার। টিকিট কেনা, দূর পথের যাত্রা হইলে শয়নের স্থান জোগাড়, ষ্টেশনে মালপত্র তোলা নামান ইত্যাদি ক্রমেই ব্যয়সাধ্য, শ্রমসাধ্য ও কঠিন, ব্যাপার হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু রেলের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের অবহেলার এবং যাত্রীদিগের নিরাপত্তার দিকে উপেক্ষার ফলে এখন রেলে যাতায়াতে প্রাণহানিরও নানা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এমনিই ত ছোটখাট ঘটনার কথা প্রায়ই শুনা যায়, উপরন্তু সম্প্রতি কয়েকটি বড় দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত ও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অবশ্য একটি বাদে (সেটি দিনের আলোয় এবং তাহাতে বিদেশী যাত্রী অনেক ছিল) সব কয়টিতেই রেল-কর্ত্তৃপক্ষ সাফাই গাহিয়া (সাবটাজ) নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নিশ্চিন্ত এই কারণে যে, 'সাবটাজ' অর্থাৎ অজানা দুর্বৃত্ত দলের কার্য্যকলাপের ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নহেন, যদি ক্ষতিগ্রস্ত, নিহত বা আহত ব্যক্তি রেলের কর্মচারী না হয়। বলা বাহুল্য যে, অনুসন্ধান ও তদন্তের ফলে এইরূপ সাফাই গাওয়ার সুযোগ হয় যদি সেই তদন্ত করেন রেল-কর্মচারী এবং করেন অতি সাধারণ ভাবে, অর্থাৎ মোটামুটি দেখিয়া একটা আন্দাজ করেন যে, কি কারণ দর্শাইয়া ইহাকে সাবটাজ বলা যায়। এবং সাবটাজ বলিয়া দিলে সেইখানেই তদন্তের ইতি, তা সাধারণ লোকে যাহাই ভাবুক ও যাহাই বলুক।

রেলে চুরি-ডাকাতি যে ভাবে হয় এবং যে পরি-প্রেক্ষিতে তাহা ঘটে, তাহাতে মনে হয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই রেল-কর্মচারীদের তাহার সহিত যোগসাজস আছে। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা কঠিন, কেননা প্রমাণকারীকে শুধু সকল খোঁজখবর রেলের লোকের বাধা বা উপেক্ষা ডিঙাইয়াই করিতে হইবে তাহা নয়, সে প্রমাণ বিচারালয়ে সরকারী উকীল-ব্যারিষ্টারদিগের সহিত লড়িয়া, অর্থাৎ বিলক্ষণ অর্থ ও পরিশ্রমের বদলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অন্য এক উপায় অবশ্য আছে, সেটা সংবাদ-পত্রের সাহায্য লাভে সক্ষম হইলে সম্ভব হয়, তাহা প্রচার অর্থাৎ 'পাবলিসিটি'। এই পথে সুফল লাভের সম্ভাবনা খুবই বেশী—বিশেষে যদি নির্ব্বাচনের সময় আসন্ন হয়।

অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে (৩১শে ডিসেম্বর) এখানের সংবাদপত্রে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ বাহির হয়। পাঁচজন রেলযাত্রী দেরাদুন এক্সপ্রেসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইবার সময় রাত্রে হাজারিবাগ ও কোডার্ম্মার মাঝে দুর্বৃত্তদলের হাতে আক্রান্ত ও ট্রেন হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া-ছিলেন। এবং ইঁহাদের মধ্যে দুইটি মহিলাও ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনকে পরদিন অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া লইয়া রেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তিনি এখনও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। আরও দুইজনকে অন্যত্র অচেতন অবস্থায় পাইয়া স্থানীয় গ্রামবাসীরা এক বৈদ্যুতিক মালবাহী ট্রেন থামাইয়া তাহার গার্ডকে বলে তাহাদের গোমো পর্য্যন্ত ব্রেকভ্যানে লইয়া যাইতে। গার্ড বোধ হয় রেলের উচ্চতম অধিকারী হইবার আশা রাখে সুতরাং সে ঐ আবেদন অগ্রাহ্য করে, এবং তাহার ফলে ঐ দুইটি বিপন্ন লোক প্রাণ হারায়।

খবরের কাগজে দেখা গেল যে, রেলের কর্ত্তৃপক্ষের টনক নড়িয়াছে এবং তাঁহারা এই গার্ডের আচরণ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচার করিতেছেন। অবশ্য ফল কি হইবে জানা নাই। যদি নির্ব্বাচন পার হওয়ার আগে এই বিষয়ে "তদন্ত" ও বিচার শেষ না হয় তবে কিছু হইবে কি না সন্দেহ।

অবশ্য এ সবকিছু দুর্নীতি, অনাচার ও অত্যাচারের মূলে দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা আছে। এবং তারও পিছনে আছে আমাদের এই নির্ব্বাচন বিষয়ে অন্ধ ও মূক-বধিরের ন্যায় অন্যের নির্দ্দেশে ও ইঙ্গিতে ভোট দান। তাহার প্রতিকার বিধাতার হাতে।

## শিক্ষা সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ

বিগত ২৬শে পৌষ দিল্লীতে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলন উদ্বোধন করার সময় পণ্ডিত নেহরু যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার মধ্যে কিছু প্রণিধানযোগ্য কথা আছে। পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা পাশ্চাত্য, বিশেষে ইয়োরোপীয়, সভ্যজগতকে লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহার অনেক কিছু আমাদের এই ক্ষুদ্র মহাদেশের প্রতি প্রযোজ্য। বক্তৃতার সারাংশ আমরা এই প্রসঙ্গের শেষে দিয়াছি, যাহাতে পাঠকেরা আমাদের মন্তব্যের পিছনের পটভূমি বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য প্রথমেই দিতেছি যাহাতে উহার কারণ সহজে বুঝা যায়।

পণ্ডিত নেহরু সহনশীলতার বিষয় যাহা অন্যদের বলেন, নিজের ঘরে ও পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট সেই কথা আরও জোরে বলা প্রয়োজন হইয়াছে। জব্বলপুরে যাহা ঘটিল তাহার কারণে পণ্ডিত নেহরু যতটা বিচলিত হইয়াছিলেন, আসামে কি তাহার অপেক্ষা অধিক "সহনশীলতা"র অভাব দেখা যাওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহরুর মনে কি কম প্রতিক্রিয়া হয় নাই?

বিশ্বের মঙ্গলচিন্তায় প্রণোদিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতি যদি বোঝাপড়া, সহনশীলতা, উদারতা ও তিতিক্ষার শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে তাহাতেই বিশ্বের মঙ্গল হইবে।" আমাদের দেশেও যত অমঙ্গল, যত অশান্তি, তাহার মূলেও প্রধানতঃ ঐ কয়টি গুণের

অভাব, জাতিগতভাবে, ব্যক্তিগতভাবে ও "পার্টিগত"-ভাবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে এই মনুষ্যত্বের ও মানবত্বের এরূপ অভাব যখন এখনও রহিয়াছে তখন বিদেশের মনীষীদিগের সম্মুখে এরূপ ভাষণ কিছু বিসদৃশ মনে হয় না কি?

অবশ্য ভাষণের মূল কথা ঠিকই। বিদেশের ও বিদেশীর কাছে অল্পদিন পূর্ব্বেও সারা জগৎ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। স্বাধীন ইয়োরোপীয় জাতিদিগের জগৎ এবং ইয়োরোপীয় অধিকৃত, প্রভাবিত বা অধ্যুষিত জগৎ। এখন দিনকালের বদল হইয়াছে এবং জগতের মানচিত্রেও একপ্রকার রূপান্তর আসিয়াছে। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের হাওয়ায় অনেক কিছু পুরাণো মতবাদের পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জাতিসকলের মনোবৃত্তির বিশেষ সেরূপ পরিবর্তন হয় নাই। পণ্ডিত নেহরু এত দেখিয়া এত ঠেকিয়াও সেটা বুঝেন নাই। তাঁহাকে সেকথা বুঝাইয়াছে ইয়োরোপ ও আমেরিকার তথাকথিত গণতন্ত্রবাদী জাতিগুলি গোয়ার মুক্তির ব্যাপারে।

গোয়ার মুক্তিতে সারা এশিয়াটিক ও আফ্রিকান জগৎ খুশী—শুধু দুইটি তাঁবেদার দেশ ছাড়া। কিন্তু কি চীৎকার, কি কর্দ্দম-নিক্ষেপ ইয়োরোপীয় ও মার্কিন কাগজে, যেন ভারতীয়েরা এক অসহায় দেবতুল্য, নিরীহ জাতিকে পাশবিক বলে নিষ্পেষিত করিয়াছে, এবং গোয়া যেন ইয়োরোপেরই অংশ। তাহার অধিবাসিগণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠা ভোগ করিতেছে! এই চীৎকার ও কুৎসাবাদ এতই প্রবল ভাবে হয় যে, বিদেশের বাসিন্দা ও এদেশীয়েরাও এক একজন অদ্ভুত মন্তব্যপূর্ণ চিঠিপত্র এদেশের কাগজে পাঠিয়েছেন, যেন এই পাপ কাজের কলঙ্কে তাঁহারাও নিজেদের কলুষিত মনে করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এতই জোর এই মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী ও ভণ্ড ইয়োরোপীয় জাতি-সমষ্টির মিথ্যাপ্রচারের (প্রোপাগাণ্ডার) স্রোতের।

অবশ্য ইহার পিছনে ছিল পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার সহযোগীবর্গের জগতকে উপদেশ দেওয়ার প্রতিক্রিয়া। সময়ে ও অসময়ে, কারণে ও অকারণে ইহারা সাধু-সন্তের মত জগতকে পঞ্চশীল ও অহিংসার বাণী শুনাইয়া, খোঁচা দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমরা অর্থাৎ ভারতীয়েরা—তোমাদের অপেক্ষা অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য জাতিবর্গ অপেক্ষা—ন্যায় ও ধর্ম্মপথে কত অগ্রসর। কাজেই শক্তিপ্রয়োগে দেশ অধিকার, যে দেশ পাশ্চাত্ত্য জাতি অধ্যুষিত হইয়া আছে আজ চারশত বৎসর, এ কাজ যে ভারতের পক্ষে কত গর্হিত, কত জঘন্য সে কথা বলিতে হইবেই। তা হউক না কেন সে দেশ ভারতের অংশ, হউক না কেন সে দেশবাসীর শতকরা ৮০ ভাগ কোঙ্কনি মহারাষ্ট্রীয় জাতির, এবং হউক না কেন পর্টুগীজ জাতির ভারতে কীর্ত্তিকলাপ যতই ঘৃণ্য নরপশুর মত!

সেই কারণেই আমরা বলিতেছি যে, নিজের ঘরে যে দোষে বিষময় ফল ফলিতেছে, সেই দোষের কথা অন্যকে বলা কেন? পণ্ডিত নেহরুর ভাষণের সারাংশ এইরূপ:

"এই আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমাকণ্টকিত বিশ্বে আন্তর্জ্জাতিক বুঝাপড়া এবং সহনশীলতাই একমাত্র উপায়। আজ আর কোন দেশের পক্ষেই অপর দেশের উপর তাহাদের খেয়ালের বোঝা চাপান সম্ভবপর নহে। অপরের উপর নিজেদের খেয়ালের বোঝা চাপানর রীতি যদি বন্ধ না হয়, তাহা হইলে বিপদ দেখা দিবে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতি যদি বোঝাপড়া, সহনশীলতা, উদারতা ও তিতিক্ষার শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহাতেই বিশ্বের মঙ্গল হইবে।"

প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন:—"ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ বিশ্বের অবশিষ্ট অংশে যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, এখন বিজ্ঞান, কারিগরি, শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তাহাদের সে আধিপত্য দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। তবে তাই বলিয়া এশিয়া ও আফ্রিকা যে ইউরোপের সেই গৌরবগাথার প্রশংসা করে না তাহা নহে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, আধিপত্য বিস্তারের রীতি এখন অচল। এখন এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব জাতি মাথা চাড়া দিতেছে, কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তার তাহারা কিছুতেই সহ্য করিবে না। এই কারণে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হইল পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি কর্ত্তৃক বিশ্বের অন্যান্য অংশের গুরুত্ব মানিয়া লওয়া।

"সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপকে এই সত্যসার উপলব্ধি করিতে হইবে যে, কোন দেশ বা কোন বিশেষ মতবাদ দিয়া অপর দেশকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক দেশই জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং এইদিক হইতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধরনে সম্পদশালী।

"ইউরোপীয় সভ্যতায় আপ্লুত বহু ব্যক্তি আজও একথা অনুধাবন করিতেছেন না যে, মানবসমাজ বিশ্বের অন্যান্য অংশের দানেও সমৃদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটি তাঁহাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, বিগত শতাব্দী বা অনুরূপ সময়ে বিশ্বের উপর ইউরোপের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা আর সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক জাতি ও

ব্যক্তির এ কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিটি দেশ কতকগুলি অবস্থার অধীন, তন্মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন জাতির অতীত ইতিহাসও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। এইসব অবস্থার কথা স্মরণে রাখিয়া বিশ্বের শিক্ষাব্রতীদের উচিত, সহযোগিতা, সদিচ্ছা এবং সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিমেয়। এই কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিক্ষক এবং ছাত্র বিনিময়ও প্রয়োজন। এইভাবে বিনিময়ের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রগণ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করিতে এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে।

"কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলনটি আমাদের নিজ নিজ দেশের পক্ষে ত মঙ্গলজনক বটেই, উপরন্তু ইহা সমগ্রভাবে কমনওয়েলথ এবং সমগ্র বিশ্বের পক্ষেও বিশেষ হিতকারী। কাজে বসিলে এমন অনেক বিষয় দেখা দেয়, যাহার জন্য খুব সতর্ক বিবেচনা প্রয়োজন হয়। শিক্ষার ব্যাপারে এই কথাটি সমধিক প্রযোজ্য, কারণ এই ব্যাপারেই মতপার্থক্য সর্ব্বাধিক। ভারতে ত শিক্ষার ব্যাপারে সমালোচনার অন্ত নাই! শিক্ষার ভাষা হইতে সুরু করিয়া বিষয়বস্তু পর্য্যন্ত সকল কিছু লইয়াই আমাদের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সমস্যা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য আমাদিগকে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।"

শ্রীনেহরু বলেন, "এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে, বিগত দশ বৎসরে ভারতের যে উন্নতি হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাধিক বৈপ্লবিক উপাদান হইল, শিক্ষা। এই কথাটি আমার সবসময় মনে হইয়াছে যে, বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতির একমাত্র পথ হইল শিক্ষা। প্রত্যেকেরই বেশ-খানিকটা শিক্ষা থাকা দরকার এবং এইসব শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যোগ্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষার বলেই আজ ভারতে চমৎকার সব তরুণ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগর সৃষ্টি হইয়াছে এবং এখনও এই সৃষ্টি অব্যাহত আছে। এই তরুণ সমাজই আমাদের আশার আলোক দেখাইতেছে। তবে, এইটুকু লইয়াই আমাদের পরিতৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদের তরুণ সমাজকে বিশ্ব-ব্যাপারের জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি তাহাদিগকে অন্যদের বুঝিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে হইবে। এইজন্যই আমরা আমাদের ছাত্রদের বিদেশে প্রেরণের জন্য উদ্‌গ্রীব। অবশ্য সর্ব্ববিষয়ে উন্নত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আয়ত্তগত। তরুণ বয়সেই পরিবর্ত্তনশীল জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সহজে অনুধাবন করা যায়। বয়স বেশী হইয়া গেলে যতই চেষ্টা করা যাউক না কেন, তরুণ বয়সের মত সহজে মনোধর্ম্ম বিকশিত করা সম্ভবপর নহে। এই কারণে পরস্পরকে বুঝার মনোভাব লইয়া দেশভ্রমণ বিশেষ হিতকারী।

"অনেক সময় অপরকে আমরা যতই বুঝি ততই আমাদের বিবাদ বাড়িয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ, গোড়ায় প্রকৃত বুঝাপড়ার অভাব।"

কমনওয়েলথে ইংরেজী ভাষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়া শ্রীনেহরু বলেন, "কমনওয়েলথে আমাদের মস্তবড় সুবিধা ইংরেজী ভাষা। আমাদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় এই ইংরেজী ভাষা বিরাট্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। 'আমার কাজকর্ম্মে আমি বড় বেশী ইংরেজী'—রাজ-নৈতিক এবং অন্যান্য বিভাগে আমার সহকর্ম্মীরা এই মর্ম্মে প্রায়ই আমার নামে অভিযোগ করেন। আর ইংরেজরা অভিযোগ করেন যে, আমি নাকি বড় বেশী জাতীয়তা-বাদী।"

ভারতের সমস্যাবলীর উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, "অবশ্য ভারতীয় সভ্যতার উৎস সংস্কৃত ভাষা। এই সভ্যতা আমাদের সহনশীলতা ও সহযোগিতার শিক্ষা দিয়াছে, আবার পরবর্ত্তীকালে ইহা হইতে উদ্ভূত কতক-গুলি বর্ণবাদ ও সামাজিক পাপও আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করিয়াছে। সমাজদেহ হইতে এইসব পাপ মুছিয়া ফেলার জন্য ভারত এখন সাধনা করিতেছে। সংস্কৃতের যুগে এইসব পাপ আমাদের সমাজে প্রবেশ করে নাই, সুতরাং এখন এগুলি নিশ্চিহ্ন করিতে না পারারও কোন কারণ নাই। অবশ্য, বিশ্বের সকল দেশেই একরূপে না হয় আর একরূপে এই জাতীয় পাপ প্রকাশ পাইয়াছিল। কোথাও বেশী, কোথাও কম। সে যাহাই হোক, এই অবস্থা খেদের বিষয়। শিক্ষাবিদদের এইসব সমস্যা সমাধানের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।"

বর্ত্তমান বিশ্বের অপর এক সমস্যার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, "জাতীয়তাবাদের নাম লইয়া কতকগুলি দেশ বড় বেশী তৎপরতা দেখাইতেছে। ইহার ফলে পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়ায় বিশেষ বিঘ্ন দেখা দিতেছে। বর্ত্তমান বিশ্বে এই অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই বিপদের হাত এড়াইবার জন্য সকল জাতি ও মানুষের মন সম্প্রসারণশীল হওয়া দরকার। এই মনোভাব প্রবর্ত্তিত হইলে বিশ্বে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা সুনিশ্চিত হইবে। বিশ্ব দিনে দিনে জটিল হইতে

জটিলতর হইয়া উঠিতেছে, এই অবস্থায় একটি মধ্যপন্থার উদ্ভাবনা বিশেষ প্রয়োজন। এই বিষয়টির প্রতিই আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। কারণ এই ভাবেই আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সহজতর হইবে।"

## শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ

পূর্ব্বে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এই চলন ইংরেজ আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির উপর অর্পিত ছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্য আছে, কিন্তু কোন রাজ্যের শিক্ষা-নীতি নির্দ্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী এ বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য অবশ্য খুব ধ্যানে ও ধীর ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাঁহার মতে শিক্ষা ব্যাপারে নীতি-নির্দ্ধারণের দায়িত্ব একযোগে কেন্দ্র ও রাজ্যের উপর অর্পিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার কেবল পরামর্শ দিতে পারেন, বড় জোর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে কতকগুলি সুপারিশ পাস করাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু সুপারিশ কার্য্যকর করা বা না-করা সম্পূর্ণই রাজ্য সরকারের ইচ্ছাধীন। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেকটি রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন কর্তৃত্ব ভারতীয় সংবিধানে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহা মানিয়া লওয়াই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। শিক্ষাক্ষেত্রে সব রাজ্যের সমস্যা, নীতি ও আদর্শ এক রকম নহে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার সহিত এক ছাঁচে ঢালাই করিতে গেলে অনর্থ সৃষ্টি হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র এবং রাজ্যের এজমালী বিষয় গণ্য করার প্রস্তাবটি আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ মনে হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে উহা নানা প্রকার নূতন সমস্যা এবং অসন্তোষ সৃষ্টি করিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এই প্রসঙ্গে জাতীয় ঐক্যের আদর্শের কথা বলিয়াছেন। শিক্ষাব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের এজমালী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেই জাতীয় সংহতির ষোলকলা কি ভাবে পূর্ণ হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এজমালী কর্তৃত্বের ভাগীদার হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার যতদূর অনুমান করা যায় বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দীর আধিপত্য বিস্তারে তৎপর হইবেন। একমাত্র হিন্দী চালু করা ছাড়া শিক্ষা-ব্যাপারে এমন কোনও বিষয় দেখা যায় না, যাহা বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থাপকগণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্ষম। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সংবিধানগত অধিকারে ভাগ না বসাইয়াও শিক্ষার পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ এতদিন চলিতে পারিয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এমন কোন গুরুতর ত্রুটি বা অসঙ্গতি দেখাইতে পারেন নাই যাহার জন্য সংবিধান সংশোধন করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাব্যাপারে যৌথ ভিত্তিতে কেন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধিকার অবশ্য প্রয়োজন।

দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্বের ভাগাভাগি জরুরী প্রশ্ন নয়, বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার মানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান না করিলে সর্বভারতীয় শিক্ষার আদর্শ উন্নত হইতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিই, প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন রাজ্যের ও অঞ্চলের শিক্ষা-পদ্ধতি ও প্রকরণে তারতম্য থাকা এমন কিছু ক্ষতিকর নয়। কিন্তু মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিবিধ পাঠ্য-বিষয় এবং পরীক্ষাপদ্ধতি সব রাজ্যেই মোটামুটিভাবে অনুরূপ হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া কোন কোন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার ফলেও শিক্ষার নানা রকম হেরফের ঘটিতেছে। এক রাজ্যের স্কুল ফাইন্যাল, ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ, এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণগণের সঙ্গে অন্য রাজ্যের অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্নদের গুণগত পার্থক্য দেখা যাইতেছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ-শিক্ষার মান দেশের সর্ব্বত্রই যাহাতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করে সেজন্য উদ্যোগী হওয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়।

যাহা হউক, শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর ভাগ-বন্দোবস্তে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে কোন রাজ্যই স্বেচ্ছায় সম্মতি দিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে শিক্ষার আদর্শ-পদ্ধতি এবং মাননির্দ্ধারণ বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহ-যোগিতার ব্যবস্থা যে আরও উন্নত সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিক করা প্রয়োজন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

## রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে নেপাল

নেপালে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। ইহার ভিতরের কথা জানা সহজ নয়, তবে যতটুকু অনুমান করা যায় তাহাতে মনে হয়, একটা বড় রকমের রাজনৈতিক

পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। রাজা মহেন্দ্র স্বহস্তে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত অনেকের মনে হইয়াছিল, নেপালী জনসাধারণ উহাতে বিশেষ বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ হয় নাই। সামরিক শক্তির সাহায্যে রাজা মহেন্দ্র যেভাবে শাসনক্ষমতা দখল করেন এবং শ্রীকৈরালা-গঠিত জনগণের নির্ব্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলীকে বন্দী করেন তাহা অবশ্য অনেকের নিকট ঘোর স্বেচ্ছাচার বলিয়া আপত্তিকর মনে হইয়াছিল। তবে নেপালী জনসাধারণের পক্ষে অবিলম্বে প্রতিবাদ করা তখন হয়ত সম্ভব হয় নাই। তাহার একটি কারণ কৈরালা মন্ত্রিসভার বিপর্য্যয়ে কোন কোন ক্ষমতাভিলাষী নেপালী রাজনৈতিক নেতা ও দলীয় সংগঠন রাজা মহেন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসনকে স্বাগত জানাইয়াছিল। নেপালী জনসাধারণ এবং কোন কোন রাজনৈতিক দল কিছুকাল পর্য্যন্ত ইহাও আশা করিয়াছিল যে, রাজা মহেন্দ্র পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইবেন। সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

নেপালের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া কৈরালা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নানারকম অপবাদ রটনা করিয়া রাজা মহেন্দ্র তাঁহার স্বৈরাচারী শাসন কায়েম রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নাই। কিন্তু গোঁজামিল দিয়া, জবরদস্তি করিয়া জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থন লাভ করা যায় না, রাজা মহেন্দ্রের তাহা উপলব্ধি করার সময় আসিয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসন বাতিল করিয়া স্বহস্তে ক্ষমতা লইবার সময় রাজা মহেন্দ্র কৈরালা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন।

একটি অভিযোগ ছিল, কৈরালা মন্ত্রিসভা জনসাধারণের কল্যাণ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বিতীয় অভিযোগ কৈরালা মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রনীতি নেপালের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অভিযোগ দু'টি সত্য হইলে তাহা অবশ্যই গুরুতর মনে করা যাইত। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র একটি অভিযোগ সম্পর্কেও প্রমাণ দিতে চেষ্টামাত্র করেন নাই। বরং তিনি রাজকীয় ক্ষমতাবলে সামরিক শক্তির অপব্যবহার করিয়া জনগণ নির্ব্বাচিত মন্ত্রিগণকে অতর্কিতভাবে কারারুদ্ধ করিয়া নেপালী রাজনীতিতে এক নূতন সঙ্কট সৃষ্টি করেন। কৈরালা মন্ত্রিসভার সত্য-মিথ্যা, দোষ-ত্রুটি, দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতা যাহাই থাকুক না কেন, গণতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী তাহা বিচার করার অধিকার স্বৈরাচারী রাজার নহে, নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ গঠিত পার্লামেণ্টের। রাজার মর্জ্জি ও হুকুম মত মন্ত্রিগণ বন্দী, পার্লামেণ্ট বাতিল এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ, এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আধুনিক যুগে কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। কাজেই রাজা মহেন্দ্রের স্বৈরাচারী-শাসন উচ্ছেদের জন্য গণ-আন্দোলন সুরু হওয়া খুবই স্বাভাবিক মনে করা যায়।

শাসন ক্ষমতা হাতে আসিবার পর জনসাধারণের উপকারের জন্য রাজা মহেন্দ্র নিজেও এমন কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগের পরিচয় দেন নাই। রাণাশাহীর অবসানের পর নেপালের শাসন ব্যবস্থা আধুনিককালের গণতান্ত্রিক রীতি ও নীতি অনুযায়ী নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্বৈরাচারী রাজা নানা অজুহাতে নেপালে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্ত্তনে অযথা বিলম্ব ঘটান। অবশেষে যখন গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী নেপালী কংগ্রেস নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়া কৈরালার নেতৃত্বে প্রথম জনগণ-নির্ব্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিল তখন রাজা মহেন্দ্র ও তাঁহার পরিষদবর্গ প্রমাদ গণিলেন। কৈরালা মন্ত্রিসভা ক্ষমতা লাভের পর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নেপালের শাসন-ব্যবস্থা পুনর্গঠনে উদ্যোগী হওয়ামাত্র রাজা মহেন্দ্র পদে পদে বাধা সৃষ্টি করিতে থাকেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় নির্ব্বাচিত মন্ত্রিগণকে বন্দী করেন। এহেন স্বৈরাচারী রাজা এখন জনগণের দোহাই দিলে লোকে তাহা শুনিবে কেন? রাণাশাহীর উচ্ছেদ যাহারা করিয়াছে তাহারা স্বেচ্ছাচারী রাজার শাসন নিশ্চয়ই মানিয়া লইবে না।

গোড়া হইতে রাজা মহেন্দ্র যে খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যও এখন আর গোপন নাই। কৈরালা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে রাজা মহেন্দ্রের অভিযোগ ছিল যে, কৈরালার পররাষ্ট্রনীতি নেপালের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু রাজা মহেন্দ্রের পররাষ্ট্রনীতির যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায়, তিনি ভারতের শত্রুদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতেছেন। রাজা মহেন্দ্রের চীন ও পাকিস্থান, লাসা হইতে কাটমুণ্ডু পর্য্যন্ত সড়ক নির্ম্মাণে চীনের সহিত চুক্তি, প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের প্রশস্তি, ইত্যাদি প্রত্যেকটি ঘটনাই তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি ঘটনাই দেখাইতেছে যে, রাজা মহেন্দ্র ভারতের সহিত মৈত্রী ও সহযোগিতা রক্ষার বিরোধী। নেপালী কংগ্রেস এবং কৈরালা মন্ত্রিসভা পররাষ্ট্রনীতি ব্যাপারে এবং আর্থিক উন্নয়ন চেষ্টায় ভারতের সহিত সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। প্রতিবেশী ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য ছাড়া নেপালে রাণাশাহীর উচ্ছেদ সম্ভব হইত না, নেপালের গণতন্ত্রী নেতারা তাহা কখনও ভুলিতে

পারেন না। চীন কিংবা পাকিস্থানের সঙ্গে মিতালী করায় স্বৈরাচারী রাজার ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হইতে পাবে—অবশ্য তাহাও সাময়িকভাবে, স্বল্পকালের জন্য। কিন্তু তাহা দ্বারা নেপালের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা যাইতে পারে না। রাজা মহেন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসনের সহিত নেপালের গণতন্ত্রী নেতাদের বিরোধের মূল সূত্র ইহাই। রাজা মহেন্দ্র যে-পথ ধরিয়াছেন, তাহা নেপালের এবং ভারতের উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক, বিপত্তিকর।

## কটকে ভারতীয় বিজ্ঞান-অধিবেশন

কটকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হইল। এই অধিবেশনে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ পারিজা একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সমাজ ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই প্রবীণেরা তাঁহাদের অর্দ্ধসমাপ্ত এবং অসমাপ্ত কাজের ভার নবীনদের হাতে তুলিয়া দেন এবং নবীনেরা আবার প্রবীণতায় পৌঁছিবার আগে সেই প্রত্যাশিত কাজের ধারাকে পরবর্ত্তী কর্ম্মীদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিয়া যান। ইহা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই। ইহার অর্থই হইল, যতটা আমরা করিয়াছি, উহাই সব নয়। তাহা যদি হইত, ইতিহাস সেইখানেই নিশ্চল হইয়া থাকিয়া যাইত।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পূর্ব্বগামীরা অনুজদের কখনও অবিশ্বাস, কখনও অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। সত্যকার শ্রদ্ধা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তাহাদের হাতে নিজেদের অসমাপ্ত কর্ম্মভার তুলিয়া দিয়া অবসর নিবার ঔদার্য্য তাঁহারা কদাচিৎ দেখাইয়া থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁহার বক্তৃতায় বিজ্ঞানের মহৎ দানগুলি অকৃপণহাতে সমাজ-উন্নয়নে প্রয়োগ করিয়া দেশকে দারিদ্র্যবিজয়ী হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

বক্তৃতায় শুনিতে ইহা ভালই লাগে। কিন্তু কেবলমাত্র আহ্বান ও উপদেশই ত পর্য্যাপ্ত নয়। গতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের শক্তিকে সার্থকভাবে নিয়োগ করিয়া দেশের সামাজিক অনগ্রসরতা ঘুচাইতে হইবে। জীব-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা ও প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রভাবে সুস্থ ও প্রাণবন্ত নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু তাহার আগে সমাজের অর্থনীতিক ব্যবস্থাপনা এমনভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে, যাহাতে বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও আবিষ্কারগুলি ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সব মানুষের ভোগে লাগিতে পারে। এ কাজ মূলগত সংস্কারের দ্বারাই সম্ভব এবং তা করার ক্ষমতা তাঁহাদের, যাঁহাদের হাতে শাসন কর্ত্তৃত্ব।

বক্তৃতায় শ্রীনেহরু বিজ্ঞান প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া দার্শনিকের অভিযোগের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিজ্ঞান শুধু শক্তি নয়, বিজ্ঞান মানুষকে প্রজ্ঞাও দান করিতেছে।

কথা হইতেছে, বিজ্ঞান সত্যই কি প্রজ্ঞা হইতে বিচ্ছিন্ন কোন তত্ত্ব? এমন দিন ছিল, যেদিন দর্শন এবং বিজ্ঞান একই জ্ঞানীর চিন্তার ও উপলব্ধির বিষয় ছিল। তবে সত্য বটে, কালক্রমে বিজ্ঞানকে দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে। আজিকার বিজ্ঞান বস্তুতঃ প্রাকৃতিক শক্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব। এ কথা মিথ্যা নয়, আজিকার বিজ্ঞানের মত শক্তিধর কোন জ্ঞান আর নাই। বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সমাজ-জীবনের উপর অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান রাজনীতির রূপ ও রীতিকেও বিপুলভাবে বদ্‌লাইয়া দিতেছে। এ সবই শক্তির খেলা। কিন্তু জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির প্রয়োজনে শুধু শক্তিই একমাত্র নহে। মানুষের জীবন বিজ্ঞানের নিকট হইতেও প্রজ্ঞার আনন্দ পাইতে চাহে।

অবশ্য বিজ্ঞান বলিতেই শুধু যন্ত্র-বিদ্যা ও কারিগরি কর্ম্ম বুঝায় না এবং যে-সমাজে প্রভূত উৎপাদন-ব্যবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে, গতিবেগে যে-সমাজ নিরতিশয় শক্তিশালী হইয়াছে, একমাত্র তাহাকেই উন্নতসমাজ বলিব না। কারণ সমস্ত গতি এবং স্ফীতির মধ্যেও চিত্তের মালিন্য, অপরিচ্ছন্নতা, অনুদারতা সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে। আর শুচিতাহীন, প্রেমহীন, আদর্শহীন সেই শ্রেণীর যন্ত্রবল-দৃপ্ত সমাজের মানুষেরা নির্ব্বিচারে মনুষ্যজাতির ধ্বংসও ডাকিয়া আনিতে পারে। কাজেই প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-বিজ্ঞানেরও পর্য্যাপ্ত অনুশীলন চাই এবং তাহার প্রভাবে মানুষের মানসিক সমুন্নতি ঘটান দরকার।

## পশ্চিমবঙ্গ কি অরাজক ?

পশ্চিমবঙ্গ কি গুণ্ডা, ডাকাত, নরঘাতক, চোর ও অন্যান্য শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তদের তাণ্ডব ভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে? প্রত্যহ সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইতে হয়। মজা এই, এই সকল অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রও কোন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, কলিকাতা, হাওড়া, বর্দ্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অঞ্চল এই সমাজবিরোধী দুর্ব্বৃত্তেরা

তাহাদের অত্যাচারের দ্বারা ত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্তের সম্ভাব্য অত্যাচারের আশঙ্কায় শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সর্ব্বদা আতঙ্কিত অবস্থায় থাকিতে হয়। এ অবস্থা যে নিতান্তই দুঃসহ, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। যে কোন সরকারের পক্ষেও এ অবস্থা নিতান্তই অগৌরবজনক। নিজেদের নিরাপত্তা বিধান ও সুশাসনের জন্যই নাগরিকেরা সরকারী তহবিলের রসদ জোগায়। সরকার যদি তাহাদের সেই নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করিতে অপারগ হন তাহা হইলে জনসাধারণের অর্থে বৃহৎ পুলিসবাহিনী পোষণ সার্থকতাহীন হইয়া পড়ে। পুলিস তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকিলে এবং সমাজ-বিরোধী-দের দমনে আন্তরিকতার সঙ্গে তৎপর হইলে দুর্ব্বৃত্তদের তাণ্ডব নিঃশেষে স্তব্ধ না হইলেও স্তব্ধপ্রায় হইতে পারে, পুলিসী দক্ষতার উপরে সে আস্থা আমাদের আছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, দুর্ব্বৃত্তেরা এ কথা অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, পুলিসের ঈগলচক্ষু সর্ব্বদা তাহাদের উপরে নিবদ্ধ থাকে না বা তাহাদের সন্ধানে নিরত থাকে না। কাজেই তাহারা অবাধে সমাজের বুকে তাণ্ডব চালাইতে ও দুষ্কার্য্য করিয়াও সমাজের বুকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। দুর্ব্বৃত্তদের এই ধারণাই তাহাদিগকে এত দুঃসাহসী ও বেপরোয়া করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে হয়। কিন্তু কোন সভ্য সরকার-শাসিত রাজ্যেই এ অবস্থা চলিতে পারে না, বা চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

যেভাবেই হউক, ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে। অবশ্য এ কথা আমরা স্বীকার করিব যে, জনসাধারণের সহযোগিতা না পাইলে শুধু পুলিসী তৎপরতায় দুর্ব্বৃত্তপনা দমন সহজসাধ্য হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই যে, পুলিসকে আন্তরিকভাবে তৎপর দেখিলে জনসাধারণ তাহাদের সহায়তায় স্বেচ্ছায়ই অগ্রসর হইয়া আসিবে। পুলিস তাহাদের কর্ম্মদক্ষতার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-বিরোধী দুর্ব্বৃত্তদের অবিলম্বে সায়েস্তা করিতে পারিয়াছে, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

## পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড

"বারাসাত বার্ত্তা" লিখিতেছেন:

"পূর্ব্বাপর বৎসরসমূহের সকল নজীর ম্লান করিয়া এবার পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ এক অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সনে পশ্চিমবঙ্গে পাট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২ লক্ষ মণ। তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬১ সালে দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ মণ।

"১৯৬০ সনে এ রাজ্যে মোট ৯৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। পাটের পুরাতন জমিতে একর পিছু ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমন নূতন জমিতেও পাটের উৎপাদন আশাতীতরূপে ভাল হইতেছে বলিয়া জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানান।

"ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অর্থকর শস্যের মধ্যে পাটের স্থান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এদেশের যে কয়টি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করা হয়, তন্মধ্যে পাট অন্যতম। দেশ বিভাগের পর কাঁচা মালের অভাবে যখন পশ্চিম বাংলার পাট শিল্পে সঙ্কট সৃষ্টি হয়, তখন রাজ্য সরকার পাটের চাষ বৃদ্ধির সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। অধিকতর লাভজনক বলিয়া পাট পশ্চিম বাংলার কোন কোন জেলায় ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় আগে পাটের চাষ কালনা ও জামালপুর থানায় সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এখন উহা সারা জেলায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুরে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। হুগলীর বিস্তৃত অঞ্চলেও এখন পাট চাষ হইতেছে। হাওড়া জেলায়ও পাট জন্মে। নদীয়ায় পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। মালদহে পাট অন্যতম প্রধান শস্য। জলপাইগুড়িতে পাট ক্রমেই উহার যোগ্য স্থান অধিকার করিতেছে। দার্জ্জিলিঙের তরাই অঞ্চলে প্রচুর পাট উৎপন্ন হইতেছে।"

সবই বুঝিলাম, কিন্তু যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এই পাট উৎপাদন করিল, কৃতিত্ব ত তাহাদেরই। তাহারা ইহাতে কতটুকু লাভবান হইল?

## কয়লা অভাবে সঙ্কট

আবার কয়লা-সঙ্কট দেখা দিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়লা পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব রেল-কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। অথচ দেখা যাইতেছে, তাহার নিজের প্রয়োজনেই কয়লা সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, অবিলম্বে কয়লার নিয়মিত চালান না আসিলে, ট্রেন চলাচল-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। তবে এই ঘটনার মধ্য দিয়া কয়লা সরবরাহের ব্যাপারে যে রকম অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুধু কল্পনাতীত নহে, অবিশ্বাস্যও বটে। নিয়মিতভাবে কয়লা সরবরাহ নির্ভর করে খনি মালিকদিগের এবং রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতার উপর। খনির মালিক সময়মত কয়লা উত্তোলনের পর মাল

গাড়ীতে বোঝাই করিয়া দেন। তার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব রেল-কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। এই দুইটি পক্ষের সহযোগিতা থাকিলে অন্ততঃ রেলপথে কয়লার সঙ্কট ঘটিতে পারে না। তবু এ রকম অবস্থা ঘটিল কি করিয়া? মাত্র দুইটি কারণে ইহা সম্ভব হইতে পারে। হয়ত খনির মালিকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়-তালিকা অনুসারে কয়লা বোঝাই করিয়া দেন নাই, কিংবা কয়লা স্থানান্তরের জন্য গাড়ী পাঠাইতে অথবা বোঝাই গাড়ীগুলি গন্তব্যস্থলে পাঠাইতে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ দেরি করিয়াছেন। শেষোক্ত সম্ভাবনাটি আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য। কারণ, নিজেদের ইঞ্জিন চালাইবার কয়লা আনিতে নিজেদেরই গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে গাফিলতি দ্বারা তাঁহারা এ রকম একটা অবস্থা আহ্বান করিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তবে কি খনি-মালিকদের দীর্ঘ-সূত্রতার জন্যই এরূপ সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে? এ বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি নির্ণয়ের পরে দায়ী ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এক সপ্তাহেরও অধিককাল যাবৎ রেলপথে এরকম সঙ্কট স্থায়ী হয় কি করিয়া—ইহাও একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। শুনা গিয়াছে, ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ বার বার উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের ও কয়লা-কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইহা সত্য হইলে অত্যন্ত দুঃখের কথা। কয়লা নিঃশেষ হইলে কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা নিশ্চয়ই কর্ত্তৃপক্ষের অজানা নাই। তথাপি তাঁহারা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়লা সরবরাহের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই কেন? এই ঘটনার মধ্য দিয়া রেলপথে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সংশোধন না করিলে যে কোন সময় অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

## চা-পাতার নানা গুণ

সোভিয়েট পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:

"পানীয় হিসাবে চায়ের ব্যাপক প্রচলন হয় প্রথম চীন দেশে। প্রাচীন কালেই চীনা পণ্ডিতরা চায়ের নানা গুণ বর্ণনা করে গেছেন: দেহের সজীবতা ও মনের স্ফূর্ত্তি ফিরিয়ে আনার কাজে চায়ের উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে চা-কে "বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পানীয়" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের কালে সারা পৃথিবীতে ১৫০ লক্ষেরও বেশী লোক নিয়মিত চা খেয়ে থাকে।

চায়ে যে দুই থেকে তিন শতাংশ ক্যাফিন থাকে, সেটাই স্নায়ুতন্ত্রের ও হৃদ্‌পিণ্ডের কাজকে সজাগ করে তোলে। ট্যানিন থাকে ১২ থেকে ১৬ শতাংশ যেটা রক্তবাহের দেওয়ালগুলিকে শক্ত রাখতে সাহায্য করে এবং দেহের নানা অংশের স্বাভাবিক কার্য্যকারিতার সহায়ক অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড সৃষ্টির অনুকূলতা করে। কিন্তু তা ছাড়াও চা-পাতার আরও অনেক গুণ আছে যেগুলি সম্পর্কে আজ পৃথিবীর নানা দেশে ব্যাপক গবেষণা চলেছে।

নিখিল-সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের অধীনে জর্জিয়ায় যে উদ্‌ভিদ-শারীরবৃত্ত গবেষণা ভবন আছে, সেখানকার দু'জন গবেষক চা-পাতার এমন একটি রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন যার ফল হবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী। এঁরা সবুজ চা-পাতা থেকে ক্যাটেখিন নামে যে জৈবপদার্থটিকে আলাদা করে বের করে নিতে সমর্থ হয়েছেন, সেটা ভিটামিন-পি-র একটি মূল্যবান ও প্রধান উপাদান। এই ভিটামিন-পি রক্তবাহকে শক্তিশালী করে তোলে এবং রক্তচলাচলের স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। ভিটামিন-পি তাই চিকিৎসকের কাছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস।"

## ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বিখ্যাত বিপ্লবী ও স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গত ২৫শে ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক, চিরবিপ্লবী ও জ্ঞানসাধক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় সিমলার প্রখ্যাত দত্ত বংশে ১৮৮০ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বনাথ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ এবং মধ্যম মহেন্দ্রনাথ।

ভূপেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের ছাত্র। ১৯০৩ সনে তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৭ সনে বাংলার বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'যুগান্তর'-এর সম্পাদকরূপে তিনি ১২৪-এ ধারায় অভিযুক্ত হইয়া কারাবরণ করেন। কারা-মুক্তির পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান। সেখানে তিনি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১২ সনে বি-এ ডিগ্রী পান। তার পর ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১৩ সনে

সমাজবিজ্ঞানে এম-এ পাস করেন। আমেরিকায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য তিনি বহু বিপ্লবী সংগঠনের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯২৫ সনে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং দুই খণ্ডে দেশ এবং বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্য্য-কলাপের ইতিহাস প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা এবং ইংরেজীতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ ভারতে মার্কসীয় দর্শনের প্রথম প্রচারক বলিয়া পরিচিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা।

## পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

গত ২৬শে ডিসেম্বর মহাপ্রাজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত মহা-মহোপাধ্যায় হরিদাস ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

ফরিদপুর জেলার উনশিয়া গ্রামে ১৮৭৬ সনের ২৪শে অক্টোবর হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার। পুত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতা-মহের নিকট তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পাঠশালায় বাংলা, কলাপ ব্যাকরণ ও টোলে সন্ধিবৃত্তির পাঠ শেস করিয়া তিনি ঐ গ্রামের আর্য্যশিক্ষা সমিতিতে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। এই পরীক্ষায় তিনি শব্দাচার্য্য উপাধি ও ছয় শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। এই বয়সে তিনি সংস্কৃতে 'কংসবধ' নাটক রচনা করেন এবং ১৮ বৎসর বয়সে তিনি 'জানকী বিক্রম', 'বিয়োগবৈভব', 'খণ্ডকাব্য' ও 'বৈদিকবাদ-মীমাংসার' ইতিহাস রচনা করিয়া বাংলা দেশে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। ইহার পর তিনি কাব্যের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দেন ও পিতার নিকট পুরাণ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। পরে তিনি আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতিতীর্থ ও ব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ করেন। কিন্তু পাঠানুরাগ তাঁহার প্রবল থাকায় ঢাকা সারস্বত সমাজের পুরাণ-শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা, স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা, সাংখ্যরত্ন উপাধি, সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি পরীক্ষাসমূহে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। বাংলা ১৩২৩ সালে কাশীধামের ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে 'মহোপদেশক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁহার এই অসামান্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাগ্মিতারও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ১৩১২ সালে তিনি কোটালিপাড়া আর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কিছুদিন কাজ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া ১৩৩৬ সালে তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদে হাত দেন। এবং উহা সমাপ্ত করেন ১৩৫৭ সালে। ৫৯ খণ্ডে সম্পাদিত মহাভারতের গবেষণামূলক অনুবাদে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

তিনি যখন খণ্ডাকারে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কাজে হাত দেন তখন তাঁহার ছয় শত গ্রাহকের মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি এই মহাভারত। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একক প্রচেষ্টায় মহাভারতের যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহাতে এক লক্ষ শ্লোকের মূল, তৎরচিত নূতন টীকা, ও বঙ্গানুবাদ এবং নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা ও শেষে মূলের পাঠান্তর দিয়া বাংলায় মূল মহাভারতের এক অভিনব সংস্করণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই কাজ সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার কুড়ি বৎসর দশ মাস সতের দিন সময় লাগিয়াছিল। নিরলস কর্ম্মসাধনার দ্বারা তাঁহার এই অসাধ্য সাধন ও সুমহান দানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার ও আজীবন কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিলাভ করেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে যে তিনি এই প্রভূত সম্মান পাইয়া গেলেন, ইহাই আনন্দের কথা। তবে এ মৃত্যু ত তাঁর দৈহিক মৃত্যু, তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

# বিশ্বতানের মিলন-পথে

( প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ )

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৭৮৫ সন থেকেও সুরু করা যায় এ কাহিনী। অর্থাৎ যার বছর চারেক আগে তরুণ সুরস্রষ্টা মোৎসার্ট ভিয়েনায় আস্তানা গেড়েছেন, খ্যাতি পেয়েছেন সম্রাট্ দ্বিতীয় জোসেফের সভায় ( যদিও আর্থিক অনটনে অচল মোৎসার্টের সংসার, অথচ সদ্য-পরিণীতা স্ত্রী হাসিমুখে স্বামীর সব অভাব ঘুচিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর )— এমন সময় কি না মোৎসার্ট ক'রে বসলেন অসমসাহসিক এক কাজ। নতুন তাঁর রচনা : C. Major কোয়ার্টেট : একদম সুরুতেই এমন উৎকট অভাবনীয় এক বেপর্দা ( discord ) তিনি ব্যবহার ক'রে ফেললেন যে, সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতজ্ঞ ও অনুরাগী মহলে তা সৃষ্টি করল প্রবল বিক্ষোভ, প্রচণ্ড বিস্ময়, গভীর আকস্মিকতা। কোয়ার্টেট্‌টার নামই হয়ে গেল সেই থেকে Dissonant Quartet! সমালোচকে সমালোচকে লেগে গেল দ্বন্দ্ব।

হতবুদ্ধি জনগণ পাচ্ছে না কোনও দিক্-নির্দেশ। এমন সময় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রবীণ সুরস্রষ্টা হাইডেন রায় দিলেন ( তিনিও কম হতবুদ্ধি হন নি মোৎসার্টের বৈচিত্র্যের বিদ্যুৎ-গতি অনুধাবন না করতে পেরে ) : 'মোৎসার্ট যদি এ-পথ ধ'রে থাকেন, নিশ্চয় তিনি সঙ্গীতের কল্যাণার্থেই তা করেছেন।'

প্রবীণ হাইডেনের কাছে তরুণ মোৎসার্ট স্বীকৃতি পাবার পর আশ্বস্ত হ'ল জনমন। অদ্বিতীয় উদ্ভাবনী প্রতিভাসম্পন্ন মোৎসার্ট, নিত্য-নতুনের জয়যাত্রার ছন্দে ভেঙে চললেন সংরক্ষণশীল সঙ্গীত-জগতের গতানুগতিকতা।

প্রগতির যেমন আদি নেই, অন্তও তার নেই। যে আকস্মিকতার স্বাদ মোৎসার্ট এনে দিলেন, সঙ্গীত-অনুরাগীরা তাতে অভ্যস্ত হতে না হতে, প্রখরতর প্রতিভার উচ্চৈঃশ্রবা ছুটিয়ে উপস্থিত হলেন বীতোফেন : নতুন দিগন্তের বার্তা ঘোষিত হ'ল তাঁর সোচ্চার শিঙারবে। ভেঙে দিলেন তিনি অর্বাচীনের পর্যায়ভুক্ত সঙ্কীর্ণতার সমস্ত প্রাচীর।

কালক্রমে বীতোফেনের সঙ্গীতের উগ্র সংঘাত-ধ্বনিতেও অনুরাগীরা কেবল অভ্যস্তই হয়ে গেলেন না, নবযুগের ছাড়পত্র নিয়ে ওয়াগনার কবুল করলেন : 'হৃদয়ে অবিমিশ্র শান্তি নেমে এলে অনুভূত হয় যে-নীরবতার লোকোত্তর মহিমা' তারই অমূল্যতায় ভরপুর বীতোফেনের সঙ্গীত।

অথচ সেই সঙ্গেই, এমনকি ওয়াগ্‌নারের হাতেও, সৃষ্ট হয়ে চলেছে বীতোফেনোত্তর সঙ্গীত!

যুগে যুগে এই ত প্রগতির ইতিহাস : কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি সঙ্গীতে, কি সমাজজীবনে—বিবর্তনের এই একই দুর্নিবার চারণ-ব্রত মানুষকে উন্নীত ক'রে চলেছে ঊর্ধ্বতর নবীনতর উপলব্ধির চড়াইয়ে। যুগে যুগে নতুন নতুন পথ-প্রদর্শক দেখা দিয়েছেন, নতুন পথের নিশানা আগামী যুগের পথ-প্রদর্শকের উদ্দেশ্যে এগিয়ে দিয়ে তাঁরা বিদায় নিয়েছেন পথের মোড়ে। এই ভাবেই মানবতা এগিয়ে চলছিল শতাব্দীর আরোহণী বেয়ে।

অথচ, ইতিহাসের এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের সমস্যা-জর্জর জগতের দিকে যদি তাকাই, দেখি, অত্যন্ত স্বতন্ত্র অশ্রুতপূর্ব এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি আমরা। সঙ্গীত-জগৎও তার ব্যতিক্রম নয়।

মাত্র কয়েক-দশক আগে—সঙ্গীতের অভিযানপথে যেদিন আবির্ভূত হ'ল জ্যাজ ( Jazz ), আমাদের মন কি সেদিন আঁৎকে ওঠে নি বিভীষিকার বিশৃঙ্খল পদক্ষেপে? সেদিন কি সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই বোধ হয় নি যে আমরা এসে পড়েছি রন্ধ্রহীন এক প্রাগৈতিহাসিক গুহার অতলে? রক্-এণ্ড্-রোল্ প্রভৃতি কবন্ধের নৃত্য আমাদের অবচেতনার কোন্ এক মুক্তিপথ দিয়ে রূপ নিল যে প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবের, সেখানে দাঁড়িয়ে তাকাই যদি ভবিষ্যতের দিকে—মেলে কি কোথাও নতুন আলোর নিশানা, নতুন দিগন্তের হাতছানি?

মুমুক্ষু মানব আজ খুঁজছে যেন নিষ্ক্রমণের পথ। খুঁজছে সে সুস্থ বলিষ্ঠ সেই যুগোপযোগী সঙ্গীতের সৌষ্ঠব যার মধ্যে ফিরে পাবে তার অন্তরের শ্রী-সম্পদ্।

বিশেষতঃ, আধুনিকতার কেন্দ্রস্থলে, পাশ্চাত্ত্য-মনে, জেগেছে যেন নতুন পথের ঐকান্তিক অন্বেষণ। মানুষের অগোচরেই জেগেছে আজ মনের আকাশমুখর-করা এক প্রশ্ন : কঃ পন্থা?

আর, আমরা দিন গুণছি, কবে পাশ্চাত্ত্য-মনে নেমে

আসবে সেই বোধির নিশ্চয়তা যার সাহায্যে পাওয়া যাবে নিষ্ক্রমণের পথ-নির্দেশ। আজও আমরা পাশ্চাত্ত্য-জগতের মুখাপেক্ষী: সেখানে যখন যে-অভিনবত্বের ঢেউ উঠবে তার সর্বশেষ গ্রহিতা হয়ে আমরা দুলে ওঠবার আগেই কিন্তু দেখা যায় উৎস-কেন্দ্রে আন্দোলিত হচ্ছে নতুন কোন অভিনবত্বের তরঙ্গ-কিরীট!

অথচ আজ থেকে বহু-বছর আগেই আমাদের মহান্ কবি উচ্চারণ ক'রে গিয়েছেন যে-মোহমুক্তির বাণী, হয়ত তা' সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য:

"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ্ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ-কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে। মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পারে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।"

(রবীন্দ্রনাথ: সভ্যতার সংকট)

পাশ্চাত্ত্যেও যে এ-বিশ্বাস আজ জেগেছে, তার একটি উদাহরণই নিঃসংশয়ে যথেষ্ট ব'লে মনে করি: কিছুকাল আগে পাশ্চাত্ত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালা-বাদক এহুদি ম্যানুইন একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, প্রথম তিনি যখন ভারতে আসেন, তখনই তাঁর মনে বাসনা জাগে আমেরিকায় ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার করবার। কারণ, ম্যানুইনের মতে, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই আজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; এখন, প্রেরণার আকাঙ্ক্ষায় পাশ্চাত্ত্যকে আবার হাত পাততে হবে প্রাচ্যের কাছে, তার লাভ হবে অনেক এলে ভারতের কাছে।*

ম্যানুইনের কথাটা কেবল প্রণিধানযোগ্যই নয়, প্রাচ্যের সঙ্গীতজ্ঞ-মাত্রকেই রীতিমত ভাবিয়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর উক্তিতে 'আবার' শব্দটি স্পষ্টই আভাস দেয় যে, অতীতেও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ঋণী হয়ে আছে প্রাচ্যের কাছে। কিন্তু, কবে? কি প্রকারে?

উত্তরের জন্য বেশী দূর যাবার প্রয়োজন দেখি না। খ্যাতনামা ফরাসী সঙ্গীতজ্ঞ আল্যাঁ দানিয়েলুর ধারণা, মিশরীয় সঙ্গীত যেমন, তেমনি গ্রীক সঙ্গীতও তার জনক-হিসাবে ভারতীয় সঙ্গীতের কাছে ঋণী।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর India and Her People গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন: প্লিনী, স্ট্রাবো, মেগাস্থিনিস, হেরোডোটাস প্রভৃতি ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৫০০ সাল অবধি ধর্মে, আধ্যাত্মিকতায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সঙ্গীতে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে ভারত এতদূর অগ্রসর ছিল যে, আর কোন জাতিই তার সমকক্ষ ছিল না।

কিন্তু মূলগত যত ঋণই ভারতীয় সঙ্গীতের কাছে থাক, ধীরে ধীরে নানা নিরীক্ষার পথ বেয়ে এত শতাব্দীর গবেষণার শেষে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত উপনীত হয়েছে স্বকীয় উৎকর্ষের যে-সার্থকতায়, তার সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের আপাতদৃষ্ট প্রভেদ অনেকখানি, যার প্রধান কারণ সুবিদিত: পাশ্চাত্ত্যের হার্মনি বা স্বরসঙ্গতি। আজ যুগধর্মের প্রভাবে, মনের অবচেতনে কোনও একটা অন্ধকারের ঢাকা খুলে যাওয়ার দরুণ বিভীষিকা যতই বিচ্ছুরিত হোক না কেন, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের আঙ্গিক ষোল-আনাই বিজ্ঞানসম্মত। আর বিজ্ঞানসম্মত ব'লেই, অন্ধকারের ওই ঢাকা খুলে যাবার মধ্যে দেখি ভবিষ্যৎ নির্মলতার বিরাট্ এক সম্ভাবনা; এ-যেন চিত্তশুদ্ধির (Catharsis)-ই এক পর্ব: আলোর, মুক্তির, উত্তরণের যে আকাঙ্ক্ষা অহরহ মানুষের হৃদয়ে মাথা কুটে মরছে, কতকটা যেন তারই নগ্ন নিরাবরণ বিকৃতরূপ। প্রচণ্ড প্রাণশক্তির শোণিতে উদ্দীপ্ত এক পথ-না-জানা আদিমতা খুঁজছে আজ বশ্যতা স্বীকার করবার অজুহাত। এই প্রাণশক্তিরই কেন্দ্র-স্বরূপ হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ যা উপচার: হার্মনি। চায় সে মেলডির আধ্যাত্মিকতার কাছে বশ্যতা মেনে নিতে।

কথাটার স্পষ্টতর রূপ পাই শ্রীমার একটি উক্তিতে। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত প্রসঙ্গে শ্রীমা বলছেন—

"The expression is always there, apart from some exceptions naturally; but it is almost always vital, because the source is very often purely vital. At times, as I said,

* "Today Western music has almost run through this experience of unbridled expression and stands to gain much from India and to receive inspiration from the East again."

it comes from high above, then it is really marvellous. At times, more rarely, it is psychic......"

এখানে Vital আর Psychic শব্দ দু'টি বিশেষ অর্থেই শ্রীমা প্রয়োগ করেছেন। প্রথম কথাটিকে বাংলায় বলা হয় প্রাণ-সত্তা, যা হচ্ছে বাসনা-কামনার, উৎসাহ ও উগ্রতার, সক্রিয় শক্তি ও নিদারুণ নৈরাশ্যের মত্তাবেগ ও বিদ্রোহের কেন্দ্র। "সবকিছু সে সচল ক'রে তুলতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে, সিদ্ধ করতে পারে; আবার সবকিছু ধ্বংস করতে, নষ্ট করতেও পারে," শ্রীমা বলেছেন প্রাণ-সত্তা সম্বন্ধে। আর দ্বিতীয় শব্দটিকে বাংলায় বলা হয় চৈত্যপুরুষ, যা হচ্ছে আমাদের অন্তঃকরণের কেন্দ্র, জীবনের সর্বোচ্চ সত্যের আসন এবং সেই সত্যকে জানতে ও সক্রিয় ক'রে তুলতে যে সাহায্যও করে।

আর ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছেন—

"Indian music, on the other hand, almost always, that is to say, when we have good musicians, has a psychic source...To listen you must concentrate, as it is something very thin, very fine and tenuous, having nothing of the vital vibration with its strong intense resonance."

এবং চেয়েছেন তিনি আত্মার এই সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রাণ-সত্তার সমন্বয়—

"If, however, along with tho psychic vibration there were also a vital force expressing it, the result would be interesting indeed."

সুন্দর রুচিসম্মত মেলডির আজ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে একান্ত অভাব। মেলডির দিক দিয়ে সেখানে যে-দৈন্য দেখা দিয়েছে, তারই পরিপূরকরূপে আধুনিক সুরস্রষ্টারা আমদানি করেছিলেন নিগ্রোদের আদিমতম ছন্দ, নিছক শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার অভিপ্রায়ে: আর তা-ই হ'ল আধুনিকতার অভিশাপ। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের উপাদান মাত্র তিনটি: হার্মনি, মেলডি আর ছন্দ। বাকি রইল হার্মনির সাহায্যে পরীক্ষা করা এবং সে-পথেও সোনা ফলল না বিশেষ। তাই সম্ভবত আজকের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্ত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পীর স্বগতোক্তিতে শুনি ভারতীয় সঙ্গীতের সুর-ভাণ্ডারের শরণ নেবার বাসনা। এ ত আনন্দেরই কথা। এই ভাবনার মধ্যে মেলে তামাম সঙ্গীত-জগতের বিরাট এক আশু পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি, ধ্বনিত হয় বিশ্বজনীন সঙ্গীতের আগমনী।

আমরা দেখেছি, যুগে যুগে, অজস্র পতন-অভ্যুদয়ের মধ্যেও ভারত বিচ্যুত হয় নি তার শাশ্বত সঙ্গীতের আদর্শ থেকে। ছন্দ আর মেলডিকেই সর্বোচ্চ আসন দিয়ে ভারতীয় সঙ্গীত উত্তরোত্তর তাদের শ্রীবৃদ্ধিই ক'রে এসেছে, দিয়েছে তাদের নিখুঁত-নিটোল অদ্বিতীয় সৌন্দর্য। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারই তুঙ্গতম প্রেরণা থেকে তার জন্ম: প্রতিটি রাগ-রাগিণীর মূলেই আছে দিব্য এক উপলব্ধির আনন্দ।

এককালে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতেও যে মেলডিই ছিল এক-মাত্র উপাদান তার প্রজ্জ্বলতম নিদর্শন মেলে মেলডি-সর্বস্ব গ্রেগরিয়ান চাণ্টগুলিতে যা প্রাচীনতম পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের উদাহরণ। এক অথবা একাধিক পুরুষ-কণ্ঠে মেলডির একটি-মাত্র ধারা গীত হ'ত; ছিল না কোনও সঙ্গতের বালাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক নাগাদ পোপ গ্রেগরি এগুলির সংস্কার করেন। এই চাণ্টগুলির মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব, বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আভাস। এ-প্রভাব থেকে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত কোনদিনই যে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারে নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে-কোনও উচ্চাঙ্গ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শুনলেই।

কালক্রমে মেলডি-সর্বস্ব পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতেই যদি দেখা দিয়ে থাকে তার অনবদ্য হার্মনি, তবে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতেও সে-হার্মনি রচনা করা সম্ভব হবে না কেন? কত সময় ত শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য সুরকারের কোনও সিম্ফনী বা ফিউগ বা কঞ্চার্টো শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, সুরস্রষ্টা যদি তাঁর বীজ-সুরটা (Theme) অমন মামুলি কোনও লোক-সঙ্গীত থেকে না নিয়ে ভারতীয় কোনও রাগ-রাগিণীর শরণ নিতেন, তবে না-জানি আরও কত সমৃদ্ধ, বিশ্বজনীন হয়ে উঠত এই সঙ্গীত!

আজ সে আক্ষেপ দূর হতে পারে, যদি সত্যিই, একাদিক্রমে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের প্রতি নাড়ীর টান নিয়ে, প্রচুর তত্ত্বজ্ঞান ও হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা নিয়ে তেমন-কোন সুরশিল্পীর প্রতিভা এ-পথে চালিত হয়, যদি সত্যিই পশ্চিমের হার্মনি-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় ভারতীয় সঙ্গীতকে।

হার্মনি বলতে কি বুঝি? সংক্ষেপে বলা যায়, হার্মনির ক্ষেত্রে আছে প্রধান দু'টি ধারা: পলিফোনিক (কাউণ্টারপয়েণ্ট), আর হোমোফোনিক (কর্ড) ব'লেই যাদের পরিচয়। ধারা-দু'টি আলোচনা-সাপেক্ষ।

দশম শতকের কাছাকাছি, মেলডি-সর্বস্ব পাশ্চাত্ত্য-

সঙ্গীতে দেখা দেয় নতুন এক রেওয়াজ (সম্ভবত তা মিশরের দান): একটি বা একাধিক মেলডির ধারা সঙ্গত দিতে থাকে মূল সুরের সঙ্গে। এই হ'ল কাউণ্টার-পয়েণ্টের প্রথম অবস্থা। লিয়োপোল্ড ষ্টকোভস্কি এর পরিণতিকেই বর্ণনা করেছেন:—

"...The sounding together of two or more melodies or successions of tones at the same time. Sometimes when a master combines two melodies, a third thing is produced—the two melodies can be made to illumine each other as if with brilliant and varicoloured light."

কাউণ্টারপয়েণ্ট থেকেই সূত্রপাত পলিফোনিক শৈলীর। সুরস্রষ্টাদের নেকনজর পড়ল এইভাবে একাদিক্রমে একাধিক সুর বাজানর দিকে।

যন্ত্রসঙ্গীতে এই পলিফোনিক শৈলী চরম পূর্ণতা পেল স্বনামধন্য সুরস্রষ্টা য়োহান্ সিবাষ্টিয়ান্ বাখ্-এর হাতে, আঠার শতকের গোড়ায়। বিশেষত তাঁর Fugue-গুলির মধ্যে আমরা দেখি, সুরের পর সুর এসে সুসঙ্গত ভাবে জড়ো হচ্ছে স্তরে স্তরে, কতক অতি-তারায়, কতক তারায়, কতক মুদারায়, কতক মন্দ্রে, কতক আবার অধিমন্দ্রেরই গম্ভীর উদাত্ত পর্দায়। শুনতে শুনতে তারার খেই হারিয়ে যায় মন্দ্রে, অধিমন্দ্রের সুরটি আত্ম-প্রকাশ করে অতি-তারায়, চলে সুরে সুরে লুকোচুরির খেলা।* ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন 'আস্থায়ী' বা 'মুখ'ই হচ্ছে বীজ-সুর, যার পরিণতি দেখি তানের শাখা-প্রশাখায়—তেমনি সার্থক ফিউগ-এও পাই একটি বীজ-সুর বা Theme-এর সন্ধান, যে-সুর ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য তান-জাতীয় স্বর-বিস্তারে।

আবার, আঠার শতকেই বাখ্-এর শৈলীকে ফেলে রেখে পশ্চাৎপটে উদ্ভাবিত হ'ল নতুন এক রীতি, যাকে বলা হয় হোমোফোনিক শৈলী। পলিফোনিতে দেখেছি আমরা অসংখ্য সুরেরই আনাগোনা,—কখনও সমান্তরাল-ভাবে একটা সুরের সাগরবুকে ছায়া ফেলছে শরতের মেঘের মত ভেসে-যাওয়া হাল্কা সুরের বলাকা; কখনও চড়াই-বরাবর উজিয়ে চলেছে সুরের তীর্থযাত্রীদল শৃঙ্গাভিমুখে; কখনও আবার উৎরাই বেয়ে ভেঙে পড়েছে সুরের শতধারা মন্দাকিনী। আবার কখনও কখনও দেখা দেয় উপরি-উক্ত সবক'টি দৃশ্যই, একত্রে, অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত হয়ে—সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও স্বচ্ছতা পূর্ণমাত্রায়ই বজায় রেখে। কিন্তু হোমোফোনিক শৈলীতে এত-সুরের যাতায়াত বরদাস্ত না ক'রে ঝোঁক দেওয়া হ'ল একটিমাত্র সুরের দিকে, যার অংশ-বিশেষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে নতুন নতুন chord এর মাধ্যমে।

একটু খুলে বলি—যদিও তা বাহুল্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। হার্মনিয়মে যখন আমরা সা, গা, পা, একত্রে বাজাই, সৃষ্ট হয় একটি chord-এর। সা থেকে র্সা অবধি একটি অক্টেভ; সা যদি হয় হার্মনিয়মের C-স্বরটি, সবক'টি সাদা পর্দা বাজানর পর আমি যখন র্সা-য় গিয়ে পৌঁছলাম, আমি বাজালাম সম্পূর্ণ C—Major Scale; প্রত্যেক স্কেলের প্রথম স্বরটি (আমাদের সা) টনিক ব'লে খ্যাত। এবং সা-গা-পা মিলে সৃষ্ট chord-টি হ'ল সি-স্কেলের Major Chord। গা-কে কোমল ক'রে যদি বাজাই সা-জ্ঞা-পা, সেটি হবে ওই স্কেলেরই Minor Chord; যদি বাজাই আমি সা-জ্ঞা-ক্ষা, সেটি হবে Diminished Fifth-এর কর্ড; যদি বাজাই সা-গা-দা, সেটি হবে Augmented Fifth-এর কর্ড। এমনিভাবে, এক-একটি স্কেলের নিজস্ব কর্ডসংখ্যা আজ অনেক: প্রত্যেক কর্ডের আছে বিশিষ্ট মেজাজ, বিশিষ্ট বর্ণ, বিশিষ্ট অবদান, কাজেই তার প্রয়োগবিধিও অত্যন্ত কড়া। একটি কোনও সুরে, বিশেষ-কোন পর্দার ওপর ঝোঁক দেবার, মনোযোগ আকর্ষণ করবার প্রয়োজন যখন আসে, তখন সেই পর্দার তলায় পরপর আরও অনেক পর্দা সাজিয়ে গেঁথে তোলা হয় কর্ডের সারি।* খিলান আর থাম গেঁথে সাঁকো গড়বার ছবি স্বতঃই মনে জাগে হোমোফোনিক সঙ্গীতের গঠন-কৌশল দেখে। য়োহান্ সিবাষ্টিয়ান্ বাখ্ ছিলেন অনন্যঅসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন; এই নতুন শৈলীতেও তিনি রেখে গেলেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর।

কালক্রমে পলিফোনিক আর হোমোফোনিক শৈলীর যুগপৎ সমন্বয়েই সৃষ্টি হ'ল পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত। উনিশ শতকের গোড়ায় এল পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ক্লাসিকাল যুগ, যার ভিত্তি ছিল হোমোফোনি। এই যুগেই যথার্থ মর্যাদা পেল সিম্ফনী, ষ্ট্রিং কোয়ার্টেট্ প্রভৃতি বিভিন্ন রচনা-মাধ্যম। এল তার পর রোমাণ্টিক যুগ। যন্ত্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা দিল পূর্ণতর প্রগতি। আবার, বিশ শতকের সুর-স্রষ্টাদের সঙ্গে ফিরে এল পলিফোনির প্রাধান্য, যার মুখ্য স্রষ্টা হলেন পল্ হিণ্ডেমিথ (১৮৯৫—), নাৎসি

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অভ্যুত্থানের সময় যিনি জার্মানী ত্যাগ ক'রে তুরস্কে যান সেখানকার সঙ্গীতকে সংস্কৃত কববার আমন্ত্রণ পেযে।

এখন, প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : মেলডি, হার্মনি, রাগ-রাগিণী, কাউণ্টারপয়েণ্ট, কর্ড, ভারতীয় সঙ্গীত, পাশ্চাত্য-সঙ্গীত—প্রভৃতি গালভবা কথায় ত চিঁড়ে ভিজবে না, হাতে-কলমে কোন্ পথ নেওয়া যায়?

পথ আছে একাধিক। তবে, মারি ত গণ্ডার দিয়ে সুরু করবার বিপদ্ যেহেতু অনেক, সহজ কিছুতেই আগে হাত পাকান দরকার। ভারতীয় সঙ্গীতেব সহজতম অধুনাতম প্রকাশ যে ঘটেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে, তাকেই হার্মনিব প্রথম উপজীব্য করা চলে। আপত্তি উঠবে, এই সোনাব পাথববাটি বানাতে কেন খামকা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ওপব খাঁড়া চালান?—এ যে সোনাব পাথরবাটি নয এবং অন্যথাও নয সে-রায রবীন্দ্রনাথ স্বযং দিয়ে গিয়েছেন: "য়োরোপীয় সঙ্গীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বর-সঙ্গতি আছে আমাদেব সঙ্গীতে তা চলবে কি না। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়, 'না, ওটা আমাদের গানে চলবে না, ওটা য়োরোপীয়!'...কিন্তু যেহেতু এটা সত্যবস্তু, এর সম্বন্ধে দেশকালেব নিষেধ নেই।..."

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথেব বর্তমানেই ঠাকুব-বাড়ীতে পাশ্চাত্য-রীতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানব যথেষ্ট নজির মেলে।

কেবল সহজ ব'লেই নয, পরিসরেব স্বল্পতা এবং আঙ্গিকের যুক্তিযুক্ত পরিণতির জন্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে হার্মনির প্রথম উপজীব্য করা চলে। রবীন্দ্রনাথেব বহু গানেব চাল এমনই স্বতন্ত্র যে, মনে হয বুঝি-বা রবীন্দ্রনাথ ওগুলো হার্মনিব জন্যেই রচনা করেছিলেন। ভারতীয রাগ-সঙ্গীতকে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মোহরাঙ্কিত ক'রে গিয়েছেন তাঁর গানে,—একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল এবং দিলীপকুমার ছাড়া আর কেউ বোধ হয তেমন সার্থক সৃষ্টির পরিচয় এ-শতকে দেন নি। সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশিই বাকি চারজন স্বনামধন্য সুরস্রষ্টার সঙ্গীতে যদি হার্মনির সুষ্ঠু প্রযোগ ঘটে, যে-কোন বিদগ্ধ-চিত্তই মেনে নেবে এই অভিনবত্ব। রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ এই সুরস্রষ্টাদেব রচনা থেকে হার্মনির উপযোগী প্রচুর গান যে মেলে তা আগেই বলেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু গানে, বিশেষতঃ তাঁর 'ধনধান্যপুষ্পে ভরা'-জাতীয় স্বদেশপ্রেমমূলক গানগুলিতে হার্মনির যে বিপুল অবকাশ আছে তা অনেকেই জানেন। আর আছে অতুলপ্রসাদের 'বল বল বল সবে'—শ্রেণীর গানে। আবার কাজী নজরুলের অসংখ্য গানও যেন রচিত হযেছিল স্বরসঙ্গতির দার্ঢ্য অবলীলাক্রমে বরণ করবার উদ্দেশ্যে। গজলের চপল চাল তাঁর সঙ্গীতের কতকাংশে এনে দিয়েছে কি-এক ইতালিয়ানা। এবং দিলীপকুমার নিজে পাশ্চাত্য সঙ্গীতেব পাঠ নিযে এসেছিলেন ত ইযোরোপে ব'সেই—অবশ্য তাঁর অভিসন্ধি ছিল যেন মেলডিকেই উন্নততর দৃঢ়তর সার্বজনীনতর ক'রে তোলা। তাই মেলডিকে নিয়ে যথেচ্ছভাবে তিনি ভেঙেছেন, গড়েছেন, দিয়েছেন তাকে প্রাঞ্জল উদাত্ত রূপ।

এঁদেব গানে হার্মনির প্রযোগ কত সুন্দর সার্থক হতে পারে, তা আমি ব্যক্তিগত গবেষণা থেকে উপলব্ধি করেছি এবং যদি তেমন উৎসাহী কোনও সঙ্গীতজ্ঞ তার স্বাদ পেতে চান, উপযুক্ত ব্যবস্থায তা পরিবেষণ করা সম্ভবও হবে, আমার ধারণা।

কিন্তু এ ত গেল সীমায়িত ব্যাকরণ-গ্রাহ্য সঙ্গীতের কথা। অর্থাৎ কিনা এভাবে আমরা বাঁধা প'ড়ে যাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল বা দিলীপ-কুমারের সঙ্গীত-মানসগত ব্যক্তিত্বের গণ্ডিতে: এঁদের গানে আমি যদি হার্মনি বসাই তবে আবার মুন্সিয়ানার স্বাধীনতা খর্ব হতে বাধ্য, কারণ আমায স্বীকার ক'রে নিতে হচ্ছে মেলডি-রচয়িতারই ভাব-প্রাধান্য: চলছি আমি তাঁরই মর্জিতে।

বিলক্ষণ। কিন্তু সার্থকভাবে এটুকু করতে পারবার কৃতিত্ব ও আনন্দ যে কতখানি, তা হাতে-কলমে যতক্ষণ না পরখ করা হচ্ছে ততক্ষণ ধারণাতীত।

আর, ওই একই বাধ্যবাধকতা থেকে যায, যদি আমরা হার্মনি প্রয়োগ করতে চাই আমাদের অতি-প্রিয় কীর্তনাঙ্গ গানে, বাউলে, ভাটিযালিতে, রামপ্রসাদী গানে, ভজনে অথবা শ্যামাসঙ্গীতে। অথচ প্রগতির পথ চেযে এদেব হার্মনি-সাধনও একান্ত প্রযোজন।

তা সত্ত্বেও, সৃজনধর্মী সুরারোপের পথে, হার্মনির পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি চান আপন স্বকীযতা প্রতিফলিত করতে, তারও অসংখ্য পথ খোলা আছে। এবং সে পথে চলতে যদি কেউ পারেন যথেষ্ট জ্ঞানের মূলধন নিযে, উন্নতশিরে—তবে বিশ্বসঙ্গীতেব সভায় তাঁর শিরোপা অবধারিত। অবশ্য হার্মনির পথে যিনিই চলতে চান না কেন, সরাসরি তাঁকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তালিম নিতে হবে ইংরেজী, ফরাসী বা জার্মান ভাষাতেই, আবার ভারতীয সঙ্গীতের উপরেও তাঁর থাকা চাই যথেষ্ট দখল। এক কথায তাঁকে হ'তে হবে অনন্যসাধারণ প্রতিভা-শালী। তবে তাঁর প্রথম প্রেরণা-স্বরূপ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দু-একটি আঙ্গিক সম্বন্ধে সামান্য আভাস এই সূত্রে দেওয়া চলে।

প্রথমেই যে আঙ্গিকটির কথা মনে আসে, সেই Fugue-এর আলোচনা আমি ইতিপূর্বেই করেছি পলিফোনিক শৈলীর প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় আঙ্গিকটি হ'ল কঞ্চার্টো (Concerto)। এক বা একাধিক ওস্তাদ স্বরশিল্পী প্রধান ভূমিকায় বাজিয়ে যাবেন তাঁর মর্জিমাফিক পথে, আর পশ্চাৎপটে তাঁকে সঙ্গত দেবে গোটা একটা অর্কেষ্ট্রা, যার যন্ত্র-সংখ্যা অনায়াসেই পঞ্চাশ থেকে একশ' হতে পারে: গোটা কুড়ি বেহালা, গোটা চারেক ভায়োলা, গোটা চার চেলো, দুটো দুটো ক'রে বাঁশি, ওবো, হর্ণ, বেস্থন, ক্ল্যারিনেট, একটা ট্রাম্পেট, একটা পিকোলো, ডবল্-বেস্থন, ট্রম্বোন্, কিছু কেট্‌ল্-ড্রাম, বেস্-ড্রাম প্রভৃতি এ-জাতীয় অর্কেষ্ট্রার অত্যাবশ্যক যন্ত্র।

আমাদের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে যেমন আছে চারটে তুক: আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আর আভোগ,—তেমনি কঞ্চার্টোয় থাকে সচরাচর তিনটি তুক বা মুভমেণ্ট। অবশ্য প্রতি মুভমেণ্টই আমাদের তুকের চেয়ে দীর্ঘ এবং অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

কঞ্চার্টোর প্রথম মুভমেণ্টটা হচ্ছে সোনাটা (Sonata) ধাঁচের, যা তিনটি অংশে গঠিত: প্রথমতঃ, আলাপ-জাতীয় কায়দায় (দ্রুতলয়ে যদিও) বীজ-স্বরগুলির (Themes) একটা পরিচয় দেওয়া হয়; দ্বিতীয়তঃ, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে বীজ-স্বরগুলিকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যাকে বলে variations; পরিশেষে, সাধারণতঃ প্রথম অংশেরই অনুবর্তন ক'রে যেন ঝালিয়ে নেওয়া হয় আরম্ভে যা ব্যক্ত করা হয়েছে (অনেকটা আস্থায়ীতে ফিরে যাবার মতই)। প্রথম অংশে বীজ-স্বর মোটামুটি দু'টি থাকে; প্রথমটি ধরুন যদি C-Major Scale-এ হয় (সা রে গা মা পা ধা নি র্সা), তবে দ্বিতীয়টি রচিত হবে তার Dominant (পঞ্চম)-কে খারজ ক'রে, অর্থাৎ G Major Scale-এ (প্ ধ্ নি্ সা রে গা হ্মা পা), নয়ত রচিত হবে মূল স্কেলের Relative Minor Scale-এ, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে A-Minor Scale-এ (ধ্ নি্ সা রে গা মা দা ধা), ধৈবতকে খারজ ক'রে। প্রথম মুভমেণ্ট সাধারণতঃ শেষ হয় একচোট ওস্তাদের 'মার' (cadenza) দিয়ে; তখন অর্কেষ্ট্রার সমস্ত যন্ত্র যায় থেমে, ওস্তাদের যতরকম কেরামতি জানা আছে, তা তিনি এই ফুর্সতে দেখিয়ে নেন মূল মেজাজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। এই কেরামতি দেখানটার সঙ্গে তুলনা করা চলে হয়ত তানের বৈচিত্র্যের বা স্বরবিহারের।

কঞ্চার্টোর দ্বিতীয় মুভমেণ্ট চলে অপেক্ষাকৃত ঢিমে-লয়ে। প্রচুর লিরিক-সম্পদে ভূষিত হয়ে একটি বীজ-স্বরের বৈচিত্র্য-সাধনই হয় এই মুভমেণ্টের প্রধান লক্ষ্য।

আর, শেষ মুভমেণ্টটায় আসে উদ্দাম প্রাণের উচ্ছলতা। অধিকাংশ সময়েই, কঞ্চার্টোর এই তৃতীয় মুভমেণ্টে মোৎসার্ট, বীতোফেন, ব্রাম্‌স্, শোপ্যাঁ প্রমুখ স্বনামধন্য স্বরস্রষ্টারা ব্যবহার করেছেন বহুবিদিত Rondo-আঙ্গিক। রণ্ডোর উৎপত্তি হয় ইউরোপীয় লোকনৃত্য থেকে, যার কাছে এর এই তীব্র প্রাণপ্রাচুর্য ঋণী। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রণ্ডো ব্যবহার করবার রীতি হ'ল: প্রধান বীজ-স্বরটিকে প্রথমেই মূল স্কেলে বাজিয়ে নিয়ে, দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে তার খারজ বদল ক'রে যাওয়া, আর প্রতিবারেই খারজ বদ্‌লে ফিরে আসা চাই মূল স্কেলে এবং তার সমাপ্তিও হওয়া চাই সূচনার সেই মূল স্কেলেই। অনেক ক্ষেত্রে এই রণ্ডোর শেষে স্বরস্রষ্টারা ছোট্ট ক'রে (মূল স্কেলেই) আর একদফা ওস্তাদের 'মার' দেখিয়ে দেন। এইভাবেই কঞ্চার্টোয় হয় মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কঞ্চার্টোর আঙ্গিক-মাধ্যমে গজল, ঠুংরি, টপ্পা, মায় খেয়াল পর্যায়ের সঙ্গীতও হার্মনি-সহযোগে বিতরণ করা নিঃসন্দেহে সম্ভব। গিটকিরি, জমজমা, মুর্কি প্রভৃতি যাবতীয় তান-কর্তব অলঙ্কারই স্বচ্ছন্দে শোভা পাবে এই শ্রেণীর সঙ্গীতে। আর পাশ্চাত্ত্যবাসীর চোখে বিস্ময়কর ঠেকে আমাদের যে তবলা, তার বিচিত্র ছন্দ-চাতুরীও যোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক এই বিশ্বতানের আসরে। তবে অত যন্ত্রের ভিড়ে তবলার স্বকীয়তা ফোটান যাবে কি না সে সংশয় যদি জাগেই, তবলার বোল অনুকরণে তবে বেঁধে দেওয়া যায় মন্দ্র-সপ্তকের (Bass) যন্ত্রগুলির স্বর-চালনা। প্রসঙ্গত ব'লে রাখা দরকার যে, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের যন্ত্রগুলিকে মোটামুটি চারটি দলে ফেলা যায়: সবচেয়ে খাদের যন্ত্রগুলিকে বলে Bass; তার ওপরেই Tenor; তার ওপরে Alto; এবং সবচেয়ে উঁচুতে Soprano যন্ত্রগুলি। এর মাঝে অবশ্য সূক্ষ্মতর অন্যান্য বিভাগও আছে।

কঞ্চার্টো-সূত্রে প্রশ্ন উঠবে: গজল, ঠুংরি, টপ্পা, মায় খেয়াল পর্যায়ের সঙ্গীতেও যদি হার্মনি প্রয়োগ করা চলে, তবে ধ্রুপদাশ্রয়ী সঙ্গীত কি দোষ করল? হার্মনির কি সে স্থান অগম্য?

উত্তরটি সম্বন্ধে আমার কোনও সংশয় না থাকলেও, আঠার আনা নিশ্চিত হবার লোভেই কথাটা একদিন তুললাম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিভাবক শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে। দ্বিধাহীন স্পষ্ট

ভাষায় তিনি আমায় জানালেন যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বলতে পারেন, অসাধারণ সাফল্যের সম্ভাবনা আছে যদি ধ্রুপদাশ্রয়ী সঙ্গীতে হার্মনি আরোপ করা হয়।

পর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাটা শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর খোলসা ক'রে বললেন: কলকাতায় কাসানোভা ব'লে গুণী একজন স্প্যানিশ সুরস্রষ্টার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কাসানোভা আবরদেশীয় সঙ্গীত কিছু কিছু চর্চা করেছেন, এবং শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরকে জানান যে, তিনি পরখ ক'রে দেখতে চান, ভারতীয় সঙ্গীতে হার্মনি কেমন ওৎরায়। তাই শুনে শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর ভৈরবে (যতদূর মনে প'ড়ে) একটি ধ্রুপদাঙ্গ রচনার স্বরলিপি ক'রে দেন কাসানোভাকে, পরখের নমুনা-স্বরূপ। অল্পকালের মধ্যেই, কাসানোভার আমন্ত্রণে, কি-এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলেন বীরেন্দ্রকিশোর কলকাতার বিখ্যাত এক সাহেবী হোটেলে। অভ্যাগতেরা টেবিলে ব'সে খাওয়া-দাওয়া করছেন। পার্টি খুব জ'মে উঠেছে। এমন সময় অর্কেস্ট্রায় বেজে উঠল অশ্রুতপূর্ব এক ঐকতান।... অভ্যাগতদের হাতের থেকেই খ'সে পড়ল আইসক্রীমের চামচ। স্তব্ধ সবাই ব'সে রইলেন যতক্ষণ না অর্কেস্ট্রা থামল। বীরেন্দ্রকিশোরেরই সেই ভৈরব-রচনাটিতে হার্মনি দিয়ে ঐকতানটি বেঁধেছিলেন স্বয়ং কাসানোভা!

তবে, আমার মনে হয়, বিশেষতঃ ধ্রুপদ-জাতীয় সঙ্গীতকে হার্মনির কাঠামোয় পরিবেষণ করবার প্রশস্ততম আঙ্গিক হচ্ছে সিম্ফনী। অর্কেস্ট্রার বৃহত্তম জটিলতম এই আঙ্গিকেই পাশ্চাত্ত্যের সুরস্রষ্টারা তাঁদের শ্রেষ্ঠ যা-কিছু রচনা ক'রে গিয়েছেন। অগাধ এ-আঙ্গিক সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, সিম্ফনীতে ভারতীয় সঙ্গীত বিতরণ করবার আগে যে-সাধনার দরকার, তার জন্যে পূর্বোক্ত জটিল দু'টি আঙ্গিকের (ফিউগ ও কন্সার্টোর) যে-কোনও একটির উপর একাগ্র হওয়া দরকার, এবং দু'টিতেই সফল হবার পরেই হাত দেওয়া যায় সিম্ফনী-অধ্যয়নে। এমন কি, কন্সার্টো-অন্তর্ভুক্ত যে ক্ষুদ্রতর আঙ্গিকগুলির উল্লেখ করেছি, স্বতন্ত্র ভাবে সেগুলির প্রত্যেকটি যদি মগ্ন করা যায়, তার ভবিষ্যৎও সমান উজ্জ্বল। অর্থাৎ Sonata, Variations কিংবা Rondo-তেও সৃষ্টি করা চলে স্মরণীয় সঙ্গীত।

এই সূত্রে কয়েকটি বিখ্যাত রচনার উল্লেখ করছি যার সাহায্যে উৎসাহী পাঠক ও সঙ্গীতজ্ঞেরা স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন আমার বক্তব্য।

উৎকৃষ্ট ফিউগ্-এর উদাহরণ-স্বরূপ য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্-এর Well-Tempered Clavichord অনবদ্য, বিশেষ ক'রে তাঁর Let Him Be Crucified কিংবা Saint Matthew Passion অপরিহার্য। হাণ্ডেল-এর Messiah-তে, And With His Stripes এবং Hallelujah অংশ দু'টিতেও ফিউগ পেয়েছে পূর্ণ মর্যাদা, যেমন পেয়েছে মোৎসার্টের Requiem অন্তর্ভুক্ত Kyrie অংশে, কিংবা বীতোফেনের Quartet in C-Major রচনায়।

রণ্ডোর প্রসঙ্গে করব জোসেফ হাইডেনের Gypsy Rondo র নাম, বীতোফেনের Fury Over the Lost Penny ( G-Major, Op. 129 ) প্রভৃতির নাম।

ভেরিয়েশান্স্-এর তালিকায় সর্বপ্রথম উচ্চারিতব্য যে নামটি তা হ'ল স্বনামধন্য বাখ্-এর Goldberg Variations, এটি সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালের এক সমালোচক বলেছেন যে, দারুণ অগ্নিকাণ্ডে যদি পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যেত আর কোনক্রমে টিঁকে থাকত বাখের এই রচনাটি, তবে তার সাহায্যে ভবিষ্যতের মানবতা পুনরুদ্ধার করতে পারত আমাদের সভ্যতার স্বরূপ। ভান্দা লান্দোভস্কা'র বাজানো হার্প্সিকর্ডে এই রচনার রেকর্ড যাঁরা শুনেছেন, কোনদিন তাঁরা ভুলবেন না রচনাটির কথা। হাণ্ডেল্-এর The Harmonious Blacksmith-ও কম পরিচিত নয়। হাইডেনের Variations in F Minor কিংবা প্রচলিত ফরাসী শিশু-সঙ্গীত Ah, vous dirai-je maman-র সুর নিয়ে মোৎসার্ট যে ভেরিয়েশান্স্ রচনা করেন, কিংবা বীতোফেনের Thirty-Two Variations অবিস্মরণীয়।

সোনাটা ( Sonata )-র উদাহরণ-স্বরূপও প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় স্বনামধন্য বাখ্-এর Sonata in G Minor রচনাটির, এবং তাঁরই পুত্র ফিলিপ এমান্যুয়েল বাখ্-রচিত F Minor Sonata প্রভৃতির। ফিলিপকেই ক্লাসিকাল সোনাটার প্রথম রচয়িতা ব'লে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার ক'রে গিয়েছেন হাইডেন্ ও মোৎসার্ট হেন সুরস্রষ্টারা। মোৎসার্টের Turkish March Sonata অত্যন্ত বিখ্যাত, তার রণ্ডো-অংশটুকু তিনি রচনা করেন সমসাময়িক তুর্কী সঙ্গীত অবলম্বনে। বীতোফেনের অতি করুণ Sonata Pathe'tique-এর ধারে-কাছে অবশ্য ঘেঁষতে পারে না আর-কোনও সোনাটা। যদিও তাঁরই Moonlight Sonata আর Kreutzer Sonata-ও কম বিখ্যাত নয়। এই ক্রয়েৎজার সোনাটা অবলম্বনেই উত্তরকালে টলস্টয় লেখেন তাঁর একটি জনপ্রিয় ছোট গল্প

বাকি রইল কঞ্চার্টো আর সিম্ফনীর উল্লেখ। করেলি-রচিত Christmas Concerto-র আদর পাশ্চাত্ত্যে সর্বত্র। তবে স্বনামধন্য দিক্‌পাল সুরস্রষ্টা বাখের ছয়-ছ'টি Brandenburg Concertos-ই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ব'লে সঙ্গীতজ্ঞরা বিশ্বাস করেন। মোৎসার্টের Concerto for Flute, Harp and Orchestra এবং পিয়ানোর জন্যে রচিত কুড়িটি কঞ্চার্টোর মধ্যে D Minor (K. 466), A Major (K. 488), এবং বেহালার জন্যে লেখা বহু কঞ্চার্টোই সুপরিচিত। বীতোফেনের Violin Concerto in D Major এপিক সুষমায় মণ্ডিত হয়ে যে-আসন লাভ করেছে তা অদ্বিতীয়। শোপ্যাঁ, ব্রাম্‌স্‌, চাইকভ্‌স্কি, লিস্‌ৎ প্রভৃতি অমর প্রতিভার হাতেও কঞ্চার্টো যে-শ্রী লাভ করেছে তার উল্লেখ না করলে আমার তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদিও প্রতিটি আঙ্গিকের তালিকা থেকেই বিখ্যাত অনেকানেক নাম বাদ দিতে হয়েছে প্রবন্ধের পরিসরের কথা স্মরণ ক'রে। কঞ্চার্টোর আধুনিকতম উদাহরণ হচ্ছে বিশ শতকের হাঙ্গেরিয় সুরস্রষ্টা বেলা-বার্টক্‌ রচিত Concerto for Orchestra, যার সাহায্যে সঙ্গীত-অনুরাগীরা আঁচ করতে পারবেন কঞ্চার্টোর বিবর্তন-ধারা।

প্রবন্ধের উপান্তে এসে কয়েক মুহূর্ত থামতে হচ্ছে সিম্ফনীর প্রসঙ্গে। ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যম (বাখের ছাড়া) এই সিম্ফনীর তালিকায়ও রচনা-সংখ্যা প্রচুর। তার মধ্যে যুগান্তকারী দু'একটিরই নাম শুধু করব। Symphony No. 92 এবং No. 94 (দুটোই G Major-এ রচিত) হাইডেনের সেরা রচনা। মোৎসার্টের Paris Symphony, Symphony No. 31 in D Major প্রভৃতি, প্রায় শেষ জীবনে রচিত চার-পাঁচটি সিম্ফনী বিশেষ পরিচিত। অবশ্য তাঁর সেরা রচনা হ'ল ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত উনচল্লিশ, চল্লিশ এবং একচল্লিশ নম্বরের সিম্ফনী তিনটি। তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে এগুলো তিনি রচনা করেন। কিন্তু শৈলীর চরম সার্থকতায় সর্বোচ্চ শিখরে বিরাজ করে বীতোফেনের নয়টি সিম্ফনী: তার মধ্যে আবার ষষ্ঠটি (Pastoral) এবং নবমটির বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। এর পরে আর-কোন নামের উল্লেখ করতে যাওয়া অসমীচীন হলেও শুব্যার-এর অসমাপ্ত সিম্ফনীটির নাম অপরিহার্য। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ বেয়ে সিম্ফনী অপ্রতিহত প্রগতির পরিণতি লাভ করতে করতে বিশ শতকে এসে পড়েছে; ফিন্‌ল্যাণ্ডের সিবেলিয়াস, সোভিয়েটের শোস্তাকোভিচ্‌ এবং প্রোকোফিভ, ইংল্যাণ্ডের ফন্‌ উইলিয়াম, অ্যামেরিকার আরন্‌ কোপ্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতির হাতে নতুন ভাষা পেয়েছে মহান্‌ এই জটিল আঙ্গিক।

পাঠক-মাত্রেই পুলকিত হবেন যদি একবার কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রে থাকেন, কি বিরাট্‌ সম্ভাবনার পরিকল্পনা আমি দিয়েছি। ধরুন, কঞ্চার্টোর কথাই। বিরাট্‌ মঞ্চের সম্মুখভাগে ব'সে আছেন আমাদের প্রবীণ ক্লারিনেট-শিল্পী শ্রীরাজেন সরকার অথবা যন্ত্রসঙ্গীতের প্রবীণতম যাদুকর ওস্তাদ আলাউদ্দিন: ওস্তাদের যন্ত্র-নিঃসৃত কাফী কিংবা রামকেলির মূর্চ্ছনায় ভ'রে উঠেছে প্রেক্ষাগৃহ, এমন সময় পশ্চাৎপট থেকে প্রতিধ্বনিত হ'ল, শ'খানেক শিল্পীর যন্ত্রে, সেই কাফী কিংবা রামকেলিরই দ্যোতনা! অসাধারণ রোমাঞ্চকর এই সঙ্গীতানুষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতেই হওয়া সম্ভব, যদি যথার্থই তৎপর হন আমাদের দেশের প্রতিভাবান্‌ সুরশিল্পীরা। এ-পথেই চলতে চেয়েছিলেন পাথুরেঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন, প্রদ্যোত ঠাকুর প্রভৃতি। এ পথেই, কাউণ্টারপয়েণ্ট ও কর্ডের সমন্বয় সাধন ক'রে, ভারতীয় সঙ্গীতকে অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিবেষণ করেছেন এক মহান্‌ বাঙালী সুরস্রষ্টা যাঁর পূর্ণ কদর আজও আমরা দিই নি: তিনি হচ্ছেন শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য। তাঁর 'বন্দেমাতরম্‌' বিশেষ ক'রে Brass-Band-এ যে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে তা' অনেকেই জানেন না হয়ত।

কিন্তু পরিসরের স্বল্পতা ভেঙে প্রকাণ্ড ক্যানভাসে আজও ফুটিয়ে তোলা হয় নি ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সেই সমন্বয়কে, যার মধ্যে একাধারে মিলবে উচ্চতম গভীরতম আধ্যাত্মিক রাগসম্পদ্‌, এবং উদ্দাম প্রাণের গতিবেগ-মূর্ত পাশ্চাত্ত্যের হার্মনি; যার মধ্যে সাধিত হবে সঙ্গীতের চরম পূর্ণতা। প্রথম যিনি এ-পথে সফল হবেন, নবযুগের ধ্বজাবাহীরূপে তাঁকে মানবতা কেবল স্বাগতই জানাবে না, তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সানন্দে এগিয়ে চলবে বহু-প্রতীক্ষিত এই নিষ্ক্রমণ-পথে। বর্তমান বিশৃঙ্খলার অন্ধকারে তিনি এনে দেবেন হঠাৎ আলোর যে স্বাগী উদ্ভাস, উদ্‌ঘাটন ক'রে দেবেন নতুন যে দিশা, তারই কল্যাণে আধুনিক সঙ্গীতের এই প্রাগৈতিহাসিক গহ্বরে নেমে আসবে নতুন চেতনার প্রসাদ, মরা গাঙে আসবে নতুন প্রেরণার জোয়ার, এগিয়ে যাবেন আজকের সঙ্গীতজ্ঞরা ভবিষ্যতের সঙ্গীত-সরণী উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে অনাগতের অনন্ত সম্পদ্‌ অভিমুখে।

# পরিশিষ্ট

## (১) পলিফোনীর উদাহরণ ঃ ফিউগ্

| রচনা | স্বরলিপি |
|---|---|
| য়োহান্ সিবাষ্টিয়ান্ বাখ্ | পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় |

( Goldberg Variations-থেকে একটি ক্ষুদ্রতম ফিউগ্-এর বাংলা স্বরলিপি )

| লাইন | Voice | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম লাইন | Soprano | II | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | |
| | Alto | II | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | |
| | Tenor | II | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | |
| | Bass | II | পা । পা -ান্ধপা | ধা ন্ধা রা ন্ধা | গা ধা ধ্া পা | ন্ধা গন্ধা রগা সরা | |
| দ্বিতীয় লাইন | Soprano | | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | |
| | Alto | | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | |
| | Tenor | | রা । রা -াসরা | গা সা ধ্া সা | ধা রা র্া সা | ন্া ধন্া পন্া ধসা | |
| | Rass | | ন্রা গন্ধা পা ন্া | সা । — ধ্া | ন্ধ্া । — র্া | প্া রা ন্া রা | |
| তৃতীয় লাইন | Soprano | | পা । পা -ান্ধপা | ধা ন্ধা রা ন্ধা | ন্া গা গ্া রা | ঋা ন্ঋা ধন্া ঋধ্া | |
| | Alto | | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | |
| | Tenor | | ন্ধা ন্া গা । | । ধা রা । | । ন্া গা । | ধা রা ঋা গা | |
| | Bass | | পা । — গা | ন্ধা । — রা | পা । — গা | ধা । — পা | |
| চতুর্থ লাইন | Soprano | | রা র্া রা । | । র্া রা । | । । ঋা । | রা । । । | II |
| | Alto | | ধা । ধা -াপধা | না পা গা পা | গা ধা ধ্া পা | ন্ধা গন্ধা রা । | II |
| | Tenor | | ধন্া ধপ্া ন্ধ্া । | প্া । — — | — গ্া ধ্া । | াধ্া পধ্া ন্ধ্া । | II |
| | Bass | | ন্ধা । — রা | প্া ন্া প্া গ্া | ধ্া । — ধ্া | রা । । । | II |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পঞ্চম লাইন | Soprano | II ক্ষা । ক্ষা-।গক্ষা | পা রা ন্া রা | সা মা ম্া গা | জ্ঞা ঋজ্ঞা ন্ঋা জ্ঞন্া II |
| | Alto | II — — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
| | Tenor | II — — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
| | Bass | II রগা ক্ষপা ধা সা | ন্রা গক্ষা পধা না | । ধদা ধা । | । ক্ষা না ধা |
| ষষ্ঠ লাইন | Soprano | গা গ্া গা । | গ্া । গা । | । । জ্ঞা । | গা । ।রা ঋান্া |
| | Alto | না । না-।ধনা | র্সা ধা হ্না ধা | ক্ষা না ন্া ধা | পা ক্ষপা গা । |
| | Tenor | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
| | Bass | পধা নধা পক্ষা পগা | ধনা র্সনা ধপা ধক্ষা | নধা পধা নধা নন্া | গন্া ধন্া পক্ষা প্গ্া |
| সপ্তম লাইন | Soprnao | ধ্া পা । মগা | মা । । গরা | গা । । ক্ষপা | সর্রা নর্সা ধা র্সা |
| | Alto | । — ধা । | । র্রা না পা | । সনা র্সা । | । । । র্সা |
| | Tenor | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
| | Bass | ঋা । ঋা-।ন্সা | রা ন্া প্া ন্া | সা গা ধ্া পা | ক্ষা গক্ষা রগা ক্ষরা |
| অষ্টম লাইন | Soprano | । নধা না ন্া | । ধন্া সা । | । ন্া ধ্া । | প্া । । । II |
| | Alto | না । — পা | গা । । ধপা | ক্ষা পা ক্ষা । | পরা সরা ন্া । II |
| | Tenor | রা । রা-।সরা | — সা ধ্া সা | ধ্া রা র্া সা | ন্া ধন্া প্া । II |
| | Bass | পা ধা না পা | সা । — ধা | রা । — রা | পা । প্া । II |

— = বিরাম-চিহ্ন ; । = এক মাত্রার চিহ্ন ; সা । = দুই মাত্রা

দ্রষ্টব্য : প্রথম দিকে শুধু বেশ (Bass) বাজবে ; ধীরে ধীরে টেনর, আল্‌টো ও সপ্রাণো আত্মপ্রকাশ করবে। উদারা, মুদারা, তারা প্রভৃতি ঠিক স্বরলিপি অনুসারে বাজানো দরকার ॥

স্বরলিপি

জোসেফ্ হাইডেন্ — পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

( String Quatret, Opus 20 6 থেকে একটি অংশ )

| লাইন | Instrument | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম লাইন | 1st Violin | র্সা | । | । | র্গর্সা | র্পর্গা | সপা | I | গসা | রগা | সাঃ | পরা | । | । | I |
| | 2nd „ | — | গা | গা | গা | । | — | I | — | — | ন্‌া | সা | । | — | I |
| | Viola | — | সা | সা | সা | । | — | I | — | — | প্‌া | প্‌া | । | — | I |
| | Cello | — | সা | সা | সা | । | — | I | — | — | প্‌া | সা | — | — | I |
| দ্বিতীয় লাইন | 1st Violin | র্সর্গা | — | — | র্পর্মা | র্মর্গা | র্মা | I | ধর্গা | — | — | র্সা | । | । | I |
| | 2nd „ | — | র্রা | রা | — | র্গা | র্গা | I | — | রা | র্রা | র্সা | — | — | I |
| | Viola | — | ধনা | ধনা | — | র্সা | র্সা | I | — | প্‌া | প্‌া | প্‌া | — | — | I |
| | Cello | — | প্‌া | প্‌া | — | স্‌া | স্‌া | I | — | ন্‌া | ন্‌া | স্‌া | — | — | I |
| তৃতীয় লাইন | 1st Violin | র্গর্সা | র্পর্গা | র্সপা | গসা | রগা | সাঃ | I | মধা | । | । | গপা | — | — | I |
| | 2nd „ | — | গা - | গা | গা | । | — | I | — | — | ন্‌া | সা | । | — | I |
| | Viola | — | প্‌া | প্‌া | প্‌া | — | — | I | — | — | প্‌া | প্‌া | । | । | I |
| | Cello | | | | | | | I | | | | | | | I |
| চতুর্থ লাইন | 1st Violin | রপা | নপা | র্পপা | র্গপা | গপা | সপা | I | রপা | নপা | র্পপা | র্গপা | গপা | সপা | I |
| | 2nd „ | — | ধা | ধা | — | পা | পা | I | । | মা | মা | গা | । | । | I |
| | Viola | — | সা | সা | — | গা | সা | I | রা | । | । | গা | । | । | I |
| | Cello | — | — | প্‌া | সা | — | — | I | — | ম্‌া | ম্‌া | — | সা | সা | I |
| পঞ্চম লাইন | 1st Violin | রপা | নপা | র্পপা | গা | । | । | I | — | — | — | — | — | — | I |
| | 2nd „ | মা | । | । | গা | । | । | I | মা | । | । | গা | — | — | I |
| | Viola | রা | । | । | গা | । | । | I | রা | । | । | গা | — | — | I |
| | Cello | ন্‌া | । | । | সা | । | । | I | ন্‌া | । | । | সা | — | — | I |

দ্রষ্টব্য: ন্‌্‌া—অতিমন্দ্র; ন্‌া—মন্দ্র; না—মুদারা; র্না—তারা।

# উত্তরণ

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

শ্রীমায়া বসু

প্রথমে ফিস্ ফিস্ আড়ালে আবডালে। তার পর আর একটু জোরে। অন্ততঃ যেটুকু জোরে বললে ভবনাথবাবুর কান পর্যন্ত পৌঁছয়।

পাড়া-প্রতিবেশী বললেন, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, শেষকালে কিনা এই কাণ্ড? একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এতকাল লুকিয়ে লুকিয়ে কি করেছে তাই বা কে জানে? পয়সা আছে কি না—যা করে তাই শোভা পায়। কিন্তু একটু লজ্জাও কি নেই ছাই! চোখের চামড়া?

আত্মীয়-স্বজন বললেন, ছি! ছি! ছি! অতবড় ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী থাকতে, তাদের চোখের উপরে—মাথাটা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে নাকি বুড়ো বয়সে? বৌমা মারা যেতে বয়সকালে অত ক'রে বলা হ'ল আবার বিয়ে করতে, তা সে কথা কানেও তোলা হ'ল না। এতকাল বাদে এখন লোক হাসাতে, মুখ পোড়াতে এতটুকু বাধছে না? ভীমরতি হয়েছে আর কি!

বন্ধুমহলে সুরু হ'ল জল্পনা-কল্পনা। অসম্ভবও সম্ভব হয়! ভবনাথের মত শক্ত প্রকৃতির চরিত্রবান্ মানুষেরও শেষকালে মতিচ্ছন্ন হ'ল? আশ্চর্য।

একজন বন্ধু বললেন, বহুদিনের অবদমিত তৃষ্ণার প্রকাশ হঠাৎ এভাবে হয়ে থাকে। আশ্চর্যের কিছু নেই। অস্বাভাবিকও নয়।

অপর একজন ডাক্তার-বন্ধু বিখ্যাত দেশী-বিদেশী মনঃসমীক্ষকদের উদ্ধৃতি তুলে ভবনাথ রায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যারা বয়স থাকতেও বিয়ে করে না, অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেশে না, এমন পরিবর্তন তাদেরই বেশি হয়ে থাকে। এতদিন স্ত্রী-সঙ্গ বর্জিত হয়ে থাকার ফল এটা। বরং ভবনাথ রায়ের মত লোকের টাকা-পয়সা সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এতদিন যে পদস্খলন হয় নি, সেইটেই আশ্চর্যের ব্যাপার।

গাড়ীটাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বিষণ্ণমুখে মানসী দোতলায় বাবার ঘরে উঠে এল। আজ অন্যদিনের মত বাড়ী ঢুকেই বৌদি বিভার সঙ্গে দেখা করল না।

বিভার মুখের ব্যঙ্গাত্মক হাসিটা বরদাস্ত করার মত মনের অবস্থা এখন তার নয়।

বাবার চরিত্র নিয়ে কানাঘুষোটা শ্বশুরবাড়ীতে এসেও পৌঁছেচে। কথাটা কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে, একমাত্র ভগবান্ই জানেন। এ এমন একটা ব্যাপার অতি সহজেই যা বিশ্বাস করে লোকে। অথচ কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাও করা চলে না বাবার কাছে, মেয়ে হয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের উদ্দেশে চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল? এতদিন বাদে? মা মারা যেতে বাবা যে ওদের বুকে ক'রে চোখের মণির মত মানুষ করেছিলেন? আবার বিয়ের জন্যে কি ধরাই না ধরেছিল সবাই—কিন্তু বাবা অটল অচল। বাবার পত্নী-প্রেমের গর্বে দশহাত বুক হয়েছিল মানসীর। মা'র প্রতি তাঁর তুলনাহীন ভালবাসা শেখরকে কতবার কতভাবে না শুনিয়েছে সে?

আর আজ? সেই বাবাই নাকি কোথাকার একটা মেয়েমানুষ নিয়ে উঠে প'ড়ে লেগেছেন। তার কাছে আসা-যাওয়া। তার অসুখে বড় বড় ডাক্তার দেখান, হাসপাতালে দেওয়া, প্রচুর খরচপত্র করা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা গুজবে আজ ভাই-বোনের মাথা হেঁট হয়ে গেছে চিরদিনের মত।

এর চেয়ে বারো-তেরো বছর আগে মাকে ভুলে বিয়ে ক'রে একটা সৎমা ওদের জন্যে আনলে বোধ হয় এত বড় নিদারুণ আঘাত আজ ওরা পেত না।

দক্ষিণ খোলা মস্ত বড় শোবার ঘর। মার্বেল পাথরের ঝকঝকে মেঝে। ঘরে ঢুকতেই একেবারে সামনের দেয়ালে টাঙ্গান পরমা সুন্দরী মায়ের প্রমাণ সাইজের অয়েল পেন্টিং। যেন জীবন্ত মূর্তি। হাসিমুখে চেয়ে আছে স্বামীর দিকে। প্রত্যেক দিনের মত আজও ব্যতিক্রম হয় নি টাট্কা ফুলের মালা দেবার। সুগন্ধ চন্দন আর ধূপের গন্ধে আজও সমস্ত ঘর ভ'রে আছে মায়ের নিঃশব্দ উপস্থিতির মতন।

সেই পুরানো দিনের মত সব আছে। কিন্তু আসল জায়গাটাই বুঝি একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। বাবার

মনের মণিকোঠায় মায়ের পুণ্যস্মৃতিটার উপরে কালি ঢেলে সেটাকে মুছে ফেলেছেন বাবা। আর সেই কালি দু'হাতে তুলে নিয়ে নিজের মুখে মাখছেন। এত বড় সুপ্রাচীন রায় বংশের মানমর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছেন। লজ্জা ঘৃণা ভয়, সর্বকিছু ত্যাগ ক'রে।

ভবনাথবাবু ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে ছিলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবার মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকাল মানসী। হঠাৎ ক'দিনের মধ্যে উনি যেন বড় ক্লান্ত, বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মুখের ভাবনার ব্যঞ্জনা, কপালের কুঞ্চিত রেখায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখের কোলে বেশ খানিকটা কালির ছোপ পড়েছে। যেন বড় রোগাও হয়ে গিয়েছেন, কঠিন রোগের পর সেরে উঠলে যেমন হয়।

সব ভুলে গেল মানসী। পাখীপড়া ক'রে ওকে সব কথা বলতে শেখর এখানে পাঠিয়েছিল। কি বলবে —কি করবে কোন কিছুই ঠিক করতে না পেরে, ছেলেবেলার মা-হারা মেয়েটার মতই বাবার কোলের কাছে বসে, তারই হাঁটুর উপর মাথা রেখে কেঁদে ফেলল। শুধু আর্দ্র কণ্ঠে শুধু ডাকল, বাবা!

মানু! চমকে উঠলেন ভবনাথবাবু। আর কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

চোখ মুছে আত্মসংবরণ ক'রে মানসী বলল, এ কি শুনছি বাবা? মায়ের শেষ কাজে নাকি তোমার একেবারেই মত নেই? তুমি নাকি সে সময় বাড়ীতে থাকছ না? এ কি সত্যি?

সোজাসুজি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে ভবনাথবাবু ম্লান হাসলেন। আমি না থাকলে কোন অসুবিধা হবে না মা। শেখর, মনোতোষ, বৌমা, তুই—তোরা ত সবাই রইলি। বাপ মা কি সবার চিরকাল থাকে। বুড়ো হয়েছি সংসার থেকে এবার তোরা ছুটি দে আমাকে। বয়সে আর ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পোষায় না।

ঝামেলা! ঝঞ্ঝাট! মা—মায়ের শেষ কাজ তোমার ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ব'লে মনে হ'ল বাবা? বেশ, তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি চুপচাপ নিজের ঘরে শুয়ে থেক। কত লোকজন আসবেন। দেশ থেকে আত্মীয়-স্বজন, এ বাড়ী ও বাড়ী কুটুম, তোমার বড়লোক সব বন্ধুরা, তুমি না থাকলে কখনও হয় বাবা?

অত্যন্ত কঠিন, স্পষ্টভাবে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন, হয় বৈকি মা? এ সংসারে সব হয়। এমন অসম্ভব ব্যাপারও হয়, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমি থাকতে পারব না। শেখর, মনোতোষ, ওরা আমার চেয়েও ভাল ক'রে সব কাজ পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে গেল মানসীর। না, আর কোন ভুল নয়। সব সত্য। কুয়াশার উপর সূর্যালোক পড়ার মত সবকিছু অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে গেছে। মায়ের পুণ্যস্মৃতি নিঃশেষে মুছে গেছে বাবার মন থেকে।

চোখের জল আপনা হতেই শুকিয়ে এল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বাবার কাছ থেকে। শুকনো গলায় বলল, যাই বাবা। বৌদির সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। আমায় আবার এখুনি বাড়ী যেতে হবে।

আবার চোখ বন্ধ করলেন ভবনাথবাবু। মেয়ের অভিমান ভরে চলে যাওয়ার দিকে ফিরেও তাকালেন না। ডাকলেন না। থাকতে বললেন না। যা কখনও করেন নি আজ তাই করলেন।

মানসীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর চোখ খুলে তাকালেন স্ত্রীর ফোটোখানার দিকে। একটা সুতীব্র ব্যঙ্গের হাসি ছুরির মত ঝলসে উঠল তাঁর ঠোঁটের পর।

শুধু মেয়ে নয়। মেয়ে-জামাই, ছেলে-বৌ, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকের কথা উপেক্ষা করার মত মনের জোর যদি তাঁর বারো বছর আগেও থাকত!

একেই বোধ হয় লোকে বলে অদৃষ্ট। নিয়তি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর প্রিয়তমা সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর শেষ কাজ করার অনুরোধ আজ যেভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন—যদি—যদি—!..

রাজপুরের বহু-প্রাচীন কুলীন-শ্রেষ্ঠ রায়বংশ। এক-কালে সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষরাই আধিপত্য করেছেন। বিরাট জমিদারী। প্রজা, জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবকিছুই ছিল।

সেই রায়বংশের আদি কুলপুরোহিতের উত্তরপুরুষ ইতস্ততঃ ক'রে, মাথা নিচু ক'রে সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, প্রয়াগ মহাসঙ্গমে মা-গঙ্গা সতীলক্ষ্মীকে কোলে টেনে নিয়েছেন। এতে অবশ্য অপঘাত মৃত্যুর কথাও ওঠে না। তবু হিন্দুধর্ম ব'লে ত একটা কথা আছে? ছেলেপুলে, সমাজ, ধর্ম নিয়ে বাস করা। নিয়ম রক্ষা করতেই হবে। বারো বৎসর পূর্ণ হ'ল। এইবার শ্রাদ্ধশান্তি স্বস্ত্যয়ন ক'রে মায়ের একটা কুশপুত্তলিকা দাহ করা উচিত। এতদিন ত কিছুই করা হয় নি। উপযুক্ত ছেলেমেয়ে, ভবনাথ রায়ের মত ধনবান্ স্বামী—তাঁদের কাজ এখন তাঁরাই করুন।

পাথরের মত অনড় হয়ে সব কথাই শুনে যাচ্ছিলেন ভবনাথ রায়। তবু যেন সব কথা ঠিক শুনতে পেলেন না, বুঝতেও পারলেন না। ভয়ানক ভাবে চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কুশপুত্তলিকা দাহ! সে আবার কি?

এবার ভাল ক'রেই ঠাকুরমশাই বুঝিয়ে দিলেন। গঙ্গায় ডোবার পর মায়ের দেহ পাওয়া যায় নি। শেষ কাজ, মুখাগ্নি সৎকার, কিছুই হয় নি। সেই সব কাজ-গুলো শাস্ত্রীয় মতে করতে হবে। মনোরমা মায়ের কুশের মূর্তি তৈরি ক'রে, মুখে আগুন দিয়ে সেটাকে নতুন ক'রে চিতায় তুলে পোড়াতে হবে।

ঠাকুরমশাই-এর সব কথা শেষ হবার আগেই উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্তের মত সবেগে চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ভবনাথবাবু। সমস্ত মুখের রক্ত নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। থর থর ক'রে কেঁপে উঠেছিল সর্বশরীর। না—না—না। এ হতে পারে না। এসব কাজে আমি নেই।

স্তম্ভিত হতবাক্ ঠাকুরমশাই আস্তে আস্তে তাঁর সম্মুখ থেকে চ'লে গিয়েছিলেন। আর হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত পুঁথিপত্রগুলোকে সেই মুহূর্তে পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল ভবনাথবাবুর।

বারো বছর ধ'রে তিনি যাকে তিলে তিলে প্রতিদিন পুড়িয়ে মারছেন, আজ তাকে আবার নিজের হাতে পোড়াতে হবে? স্বীকৃতি দিতে হবে সমাজকে, আত্মীয়-স্বজন, ছেলেমেয়েকে, তাঁর স্ত্রী মনোরমা সত্যই মৃত?

কিন্তু তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আজ আর কিছুই যায় আসে না। মনোরমা শুধু তাঁর স্ত্রী নয়। রায়বংশের বধূ। মানসী, মনোতোষ, দু'টি সাবালক ছেলেমেয়ের গর্ভধারিণী। তারা তাদের মাকে দেবী-প্রতিমার মতই ভালবাসে, ভক্তি করে। তাদের ইচ্ছাটাই এখন বড় কথা।

আজ এই অবর্ণনীয়, অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে?

দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরলেন। কাঁচা-পাকা চুল-গুলোকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হ'ল।

কি ভুল! কি ভয়ানক ভুলই না করেছিলেন তিনি সেদিন!

সেই মহাপাপের আর ভয়ঙ্কর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাঁকে করতেই হবে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। জামাটা গায়ে দিয়ে চাদরখানা হাতে নিয়ে অতি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। গারাজ থেকে গাড়ী বার করতে বললেন না। হেঁটেই পথে বার হলেন।

দোতলার জানলা থেকে শ্বশুরকে অমনভাবে ছুটতে দেখে বিভা মুখ বাঁকাল। একেই বলে ভীমরতি! এতটুকু চোখের চামড়াও নেই কি ছাই? শেষকালে দিনের বেলাতেও না খেয়েদেয়ে ছুটলেন? কি মেয়ে-মানুষের পাল্লায় পড়েছেন, বাবা রে বাবা! কথায় বলে পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই। পুরুষদেরও বিশ্বাস করা চলে না দেখছি কোন বয়সেও।

করুণাময়ী নারীকল্যাণ আশ্রমের পরিচালিকা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ভবনাথবাবুকে।—কাল হাসপাতাল থেকে ওঁকে এখানে আনা হয়েছে। অত্যন্ত দুর্বল। উঠতেও পারেন না। আপনি বরং ওঁর ঘরে গিয়ে দেখে আসুন।

আশ্রমের একজন সেবিকার সঙ্গে দোতলার ছোট্ট ঘরটায় ঢুকলেন ভবনাথবাবু। বিছানার কাছেই একখানা চেয়ারে ওঁকে বসিয়ে রেখে চ'লে গেল মেয়েটি।

সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। কপালে ফোঁটা। রোগজীর্ণ দেহ মিশিয়ে রয়েছে খাটের উপরে। অতুলনীয় সৌন্দর্যের ছাপ সর্বাঙ্গে। ভবনাথবাবুকে দেখে অসুস্থ ফ্যাকাশে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

গম্ভীর মুখে ভবনাথবাবু বললেন, ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি নাকি কিছুতেই ওষুধপথ্য খেতে চাইতে না? এতবড় কঠিন অসুখ তোমার সারবে কি ক'রে মনু?

সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল ঝরতে লাগল।—ও নামে আর ডেক না। সইতে পারি না। কেন আমায় হাসপাতালে দিলে? কেন বাঁচালে? এমনভাবে বেঁচে থেকে আমার লাভ কি? আত্মহত্যা মহাপাপ নইলে—নইলে কবে আমি মরতে পারতাম।

উত্তেজিতভাবে ভবনাথবাবু উত্তর দিলেন, তোমায় যে ক'রেই হোক বাঁচতে হবে আমার জন্যে। আমি প্রকাশ করব সব কথা। তোমাকে নিয়ে যাব বাড়ীতে। সবাই জানবে তুমি কে। আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করতে দাও মনু। রাজী হও। আর আমাকে দুঃখ দিও না। ক্ষমা কর আমাকে।

দুর্বল হাতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছল মনোরমা। বিদ্যুতের মত একটা ধারাল হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে।—আজ আর তা হয় না। এতদিন তুমি পার নি। আজ আমি পারব না। আজ আমি তোমার সংসার সমাজ সবার কাছে একটা স্মৃতিমাত্র। আজ বাদে কাল আমার আত্মার সদ্‌গতি করা হবে। কত ঘটা ক'রে। মুখাগ্নি, কুশপুত্তলিকাদাহ, শ্রাদ্ধশান্তি স্বস্ত্যয়ন। তোমার এতটুকু অসম্মান হতে দিতে আমি পারি না। তোমার ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, সংসার-

সমাজ, এ কালিমুখ নিয়ে সেখানে আজ আমি যেতে পারি না।

অধিকতর উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ভবনাথবাবু।—তোমার অভিমান ভাঙবে না, এ আমি জানতাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার নি—পারবে না তাও জানি। কিন্তু মান-সম্মান—আজ আর আমার কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ আমার দুর্নাম রটেছে। আমি চরিত্রহীন। আমি মেয়েমানুষ নিয়ে মেতে আছি, আরও কত কি। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার দিকে—নিজের দিকে তাকাই নি, আজ তার ফল পাচ্ছি। তোমার কাছে আসি ব'লে সবাই কি বলে তা জান মনোরমা?

—তুমি শান্ত হও। ফিরে যাও। আর এস না। আমি ত জন্মের মত চ'লে যাচ্ছি স্বামিজীর সঙ্গে। বারো বছর পূর্ণ হ'ল ব'লে তিনিই শেষবার আমাকে এখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। তোমার এমন দুনাম হবে জ'ললে তোমাকে কোন খবরই দিতাম না। দূর থেকে দেখে ফিরে যেতাম ওঁর সঙ্গে। আমি চ'লে গেলে সব মিটে যাবে। বেলা হয়েছে, তুমি বাড়ি চ'লে যাও। আর এস না এখানে। কখনও না।

এক মুহূর্তে বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেল ভবনাথবাবুর মুখ, —আমায় চলে যেতে বলছ! আসতে বারণ করছ! আর দেখা করবে না?

বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় মনোরমা বললে, না, এস না। এলেও আর আমি দেখা করব না। আমার জন্যে তোমার এতটুকু ক্ষতি, দুর্নাম যেন না হয়। আর আমি হয়ত বেশীদিন বাঁচব না। বেশ বুঝতে পারছি। একটু কাছে এস। শেষবারের মত পায়ের ধুলো মাথায় নেব।

একটা কথাও আর বলতে পারলেন না ভবনাথবাবু। গলার কাছটায় কি যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। সেই মনোরমা? একটা কথা যার মুখ দিয়ে বার হয় নি এতদিন, সেই আজ এত মুখরা হয়েছে? একদিন তিনি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজ মস্তবড় সুযোগ পেয়ে তাঁকেই তাড়িয়ে দিচ্ছে মনোরমা।

সেইদিনকার প্রতিশোধ! নিয়তির হাতের অদৃশ্য চাকাটা বুঝি এমন ক'রেই ঘোরে!

নির্বাক-নিস্তব্ধ ভবনাথবাবুর প্রায় অচেতন ক্লান্ত দেহটা অতিকষ্টে নুয়ে নুয়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেল। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল মনোরমা। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ। তার পর কান্নায় ভেঙে পড়ল বিছানার পর। শেষ দেখা, এই শেষ দেখা।

স্টপেজে দাঁড়িয়ে ভবনাথবাবু মনে মনে ভাবলেন, শেষ দেখা। এই শেষ দেখা। বার বছর আগেকার এক মিথ্যাকে চাপতে গিয়ে অসংখ্য মিথ্যার পাহাড় সাজিয়ে তার চূড়ার উপর ব'সে আছেন তিনি।

আজ সেখান থেকে নামবার ক্ষমতা তাঁর নিঃশেষ।

বাস্ এসে থামল। যন্ত্রচালিতের মত উঠে পড়লেন তিনি। আবার চলতে সুরু করল বাস্। ভয়ঙ্কর শব্দ ক'রে ঘুরতে লাগল তার বিরাট চাকাগুলো।

এমনি ক'রেই একদিন হঠাৎ একটা অদৃশ্য চাকার তলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাঁর আর মনোরমার জীবনটা।

বহু পুরাতন কুলীন ব্রাহ্মণবংশের একমাত্র সন্তান ছিলেন ভবনাথ। পূর্বপুরুষ রাজপুরের জমিদার ছিলেন। ঠাকুরদার আমলেই জমিদারীর শোচনীয় অবস্থা। বাবা যখন চোখ বুঁজলেন তখন সব গেছে। চারদিকে জ্ঞাতি-শত্রু। আর প্রচুর ধার দেনা।

তারমধ্যেই মা সাধ মেটালেন তাঁর। গরীব ন্যায়রত্ন মশাইয়ের নাতনী মনোরমাকে বিয়ে দিয়ে ঘরে আনলেন। বারো বছরের পরমা সুন্দরী মেয়ে। রাজার ঘরেই মানায়। লেখাপড়া শেখে নি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। তবে পুণ্যিপুকুর ব্রত, ইতুপূজো, সারা বোশেখ মাস ভোর গঙ্গাজল আর বেলপাতা দিয়ে শিবপূজো করেছে মনের মত স্বামী পাবার জন্যে।

জমিদারী বিক্রি ক'রে ধার-দেনা সব মিটিয়ে দিতে হ'ল। যদিও নানান শরিকের ভাগ হওয়া সম্পত্তি নাম-মাত্রই ভবনাথবাবুর অংশে ছিল। কলকাতায় দু'খানা ঘর ভাড়া ক'রে স্ত্রীকে নিয়ে এসে উঠলেন অসহায়ের মত।

দু' চোখে অন্ধকার দেখলেন। কোন কুলকিনারা নাই কোনদিকে। কি করে সংসার চলবে? চাকরিই বা কোথায়? একটি জমানো পয়সাও হাতে নেই তখন, এমন অবস্থা।

মনোরমার গায়ের গয়না বেচে সংসার চলছিল। এক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর পরামর্শে বাদবাকী গয়নাও খুলে নিয়ে ব্যবসায় নামলেন ভবনাথবাবু।

দাম্পত্য-জীবনের সব সুখ-সাধ তোলা রইল ভবিষ্যতের আশায়। একজন উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে বেড়াতে লাগলেন বাইরে, ব্যবসার উন্নতির জন্যে। আর মনোরমা একাধারে ঝি রাঁধুনী হয়ে দু' হাতে সংসার তুলে নিল মাথায়, ঘরে। স্বামী আর সংসার তার কাছে ইহকাল পরকাল।

ষোল বছরে কোলে এল মনোতোষ। আরও পাঁচ

বছর বাদে মানসী। আস্তে আস্তে সচ্ছল হ'ল সংসার। ছেলেমেয়ে দু'টি বড় হতে লাগল। কিন্তু মনোরমার লজ্জা সঙ্কোচ কাটল না তখনও। শাড়ি, গয়না, জমি, বাড়ি ওসব কিছুই তার চাই না।

চিরনির্বাক্‌ মনোরমা জোর গলায় ভবনাথবাবুর কাছে কোনদিনও মুখফুটে কিছু চাইতে পারল না।

সে বছরে ব্যবসাতে বেশ একটা মোটা টাকা হাতে এল। ভবনাথবাবু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে টাকাটা মনোরমার হাতে তুলে দিলেন।—মনু, তুমি আমার লক্ষ্মী। তোমার গয়না-বেচা টাকাতেই আমার ব্যবসা সুরু। এ টাকায় আবার গয়না গড়িয়ে নিও।

লজ্জিত আরক্ত মুখে মনোরমা টাকাগুলো আবার স্বামীর হাতেই ফিরিয়ে দিল।—ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। গয়না গড়িয়ে ওদের সামনে পরতে আমার ভারী লজ্জা করবে।

বেশ না পরো, তুলে রাখ। না হয় অন্য কিছু কর এ টাকায়। তুমি আশ্চর্য মেয়ে মনু। আমার কাছ থেকে কোনদিন কিছু চাও না। তোমার কি কিছুই পেতে ইচ্ছে হয় না?

অনেক সাধাসাধির পর মনের কথা খুলে বলল মনোরমা।

ও শুনেছে এবার না কি প্রয়াগে মহাকুম্ভ মেলা হবে। ওর বড় সাধ যোগে গঙ্গায় পুণ্য স্নান করবে। আর কিছু নয়। যদি ভবনাথ মনোরমাকে নিয়ে যান সেখানে—

ওর উজ্জ্বল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের অনিচ্ছা অসুবিধা কিছু প্রকাশ করতে পারলেন না ভবনাথবাবু। বিয়ের পর থেকে কোনদিনও ও মুখফুটে নিজের দুঃখকষ্ট বা সাধ-আহ্লাদের কোন কথাই তাঁকে জানায় নি। স্বল্পবাক্‌ মনোরমার এই প্রথম চাওয়া। কি ক'রে ওকে নিরাশ করবেন তিনি?

ছেলে মনোতোষ পনের বছরের। মানসী দশ বছরের। বাড়িতে ওদের আত্মীয়দের কাছে রেখে দু'জনে রওনা হলেন।

এলাহাবাদ। প্রয়াগসঙ্গম। লক্ষ লক্ষ যাত্রী। সাধু সন্ন্যাসী পুরুত পাণ্ডা চোর জোচ্চোর গুণ্ডা বদমাইসের রাজত্ব।

এরই মধ্যে, ঠিক যোগস্নানের সময়ই সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটা ঘটল।

খবরের কাগজে সবিস্তারে, সচিত্রে সবাই জানতে পারল, কি মহা সর্বনাশই না ঘ'টে গেছে কুম্ভমেলায়!

পুণ্যলোভী সহস্র সহস্র লোক একসঙ্গে হুড়োহুড়ি ক'রে জলে নামার ফলে নিখোঁজ হ'ল বহু লোক। বহু নৌকো ডুবল। অসম্ভব ভিড়ে নানা গণ্ডগোলে সৃষ্টি হ'ল এক নরকের মত অবস্থা।

অনেকের মত, মনোরমার দেহটারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

মা গঙ্গা কোলে তুলে নিয়েছেন ওকে, চিরদিনের মত।

হরিদ্বারের বিখ্যাত একটি সেবাশ্রমের স্বামিজী দলবল নিয়ে সেবা ক'রে বেড়াচ্ছিলেন মেলায়। শোকে উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা ভবনাথ ওঁকে খুলে বললেন সব কথা।

চিন্তিত হলেন বহুদর্শী বৃদ্ধ স্বামিজী। অনেক দেখেছেন শুনেছেন জীবনে। এই সমস্ত তীর্থের ধর্মের আড়ালে আর এক নরক! অনেক সুন্দরী মেয়েই অপহৃত হয় ঠিক এই ভিড়ের দুর্ঘটনার সুযোগে।

খোঁজ করা হ'ল অনেক। কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মেলা শেষ হয়ে গেল। অনেক বুঝিয়ে ভবনাথবাবুকে উনি পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সবাই জানল গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে মনোরমা যোগস্নানের সময়।

চোখের জল মুছে সবাই ধন্য ধন্য করল। সতীলক্ষ্মী। ভাগ্যিমানী। কত বড় পুণ্যের জোর থাকলে তবেই না এমন মহাতীর্থে স্বর্গলাভ হয়?

মনোরমার শোক ভুলতে ব্যবসাতে আরও বেশী ক'রে মন দিলেন ভবনাথবাবু। ছেলেমেয়ে দু'টিকে তুলে নিলেন বুকের মধ্যে। ওদের যেন মায়ের অভাবে কোন দুঃখকষ্ট না হয়।

মাস চারেক পর হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে চিঠি পেলেন স্বামিজীর। একবার যেতে লিখেছেন বিশেষ ক'রে। কারণ আছে।

বুকের মধ্যে কি দুরন্ত ঝড়ই না উঠেছিল সে চিঠি পেয়ে! কত ভাবনা চিন্তা—এতদিন পর হঠাৎ কেন এ চিঠি?

স্টেপেজের পর স্টেপেজে বাস্‌ থামছে। লোকজন নামছে। উঠছে। কাণ্ডাকটার চেঁচাচ্ছে। সব কিছু ছাপিয়ে বহুদিন আগেকার সমস্ত ঘটনাগুলো একে একে মিছিল ক'রে চ'লে যাচ্ছে যেন ভবনাথবাবুর চোখের সামনে দিয়ে।

আশ্রমে গিয়েই শুনলেন, মনোরমাকে পাওয়া গেছে মুমূর্ষু অবস্থায়। জীবনের কোন আশা ছিল না।

পথের ধার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ওকে হাসপাতালে দেওয়া হয়। জ্ঞান হবার পর কারও কাছে কোন পরিচয়ই দেয় নি। ওখানকার একজন ডাক্তার তাঁর প্রিয় শিষ্য। তিনি মনোরমার কথা কথায় কথায় বলেছিলেন স্বামিজীকে। বর্ণনা শুনে তাঁর মনে পড়ে ভবনাথবাবুর কথা। মনোরমার নামও তাঁর মনে ছিল। এ চার মাস গুণ্ডাদের হাতে নিদারুণ অত্যাচারের ফলেই ওর এই অবস্থা।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ওর যাবার আর কোন জায়গা নেই ব'লে তিনি ওকে এখানে এনেছেন। ওর সঙ্গে কথা ব'লেই ভবনাথবাবুকে চিঠিতে কিছু না লিখে এখানে এসে দেখা করতে বলেছিলেন। এবার স্ত্রীর যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করুন ভবনাথবাবু।

আশ্চর্য পৃথিবী! ততোধিক আশ্চর্য মানুষের মন! স্ত্রীকে মরণের মুখ থেকে ফিরে পেয়ে আনন্দ-উল্লাস—সবকিছুর বদলে যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল ভবনাথবাবুর।

এর চেয়ে মরল না কেন ও? অনেকেই ত মারা গেছে তখন? এত বড় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে কি ক'রে ফিরে এল ও গুণ্ডাদের কবল থেকে? বিষ না জুটুক, গলায় দড়ি দেবার মত শাড়িটাও ত ছিল পরণে?

কি ক'রে ওকে এখন সংসারে সমাজে এতদিন বাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি? যেখানে অহরহ সতীলক্ষ্মী মনোরমার পুণ্যের ধ্বজা উড়ছে? তাঁর বংশের প্রত্যেকে শত্রু-মিত্র সগৌরবে ধন্য ধন্য করছে তাঁরই মৃতা স্ত্রীকে? যেখানে পুণ্যবতী মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম না ক'রে জল গ্রহণ করে না তাঁর ছেলেমেয়েরা?

অপহৃতা, লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, চার মাসের উপর গুণ্ডাদের হাতে নিগৃহীতা মনোরমার সেই সংসারে আজ কতটুকু স্থান?

যতক্ষণ, যতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন মনোরমা মারা গেছে ব'লে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর স্মৃতিতে স্নেহে ভালবাসায় ভবনাথের হৃদয় পূর্ণ হয়ে ছিল। কিন্তু মনোরমা যখন অতি ধীরে আপাদমস্তক ঘোমটা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে ব'সে পড়ল, দয়ামায়া দূরে থাক, সেই মুহূর্তে লজ্জায়-ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল ভবনাথের মন। দোষ কার, দায়িত্ব কার কিছুই মনে ভাবলেন না। কঠোর ভাষায় ওকেই জিজ্ঞাসা করলেন, এখন এই অবস্থায় কি করবেন তিনি? খুলে বললেন বাড়ীর সব কথা। যেখানে পূজো হচ্ছে তার স্মৃতির সদাসর্বদা। সবচেয়ে বড় কথা ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। মানসীর বিয়ে দিতে হবে আর চার-পাঁচ বছর বাদেই।

না। সেদিনও কথা বলে নি মনোরমা। মুখ তোলে নি, উত্তর দেয় নি। মাথা হেঁট ক'রে বসেছিল নিঃশব্দে।

ভবনাথবাবুর কথা শেষ হলে, তাঁর পা না ছুঁয়েই দূর থেকে প্রণাম ক'রে মাথা হেঁট ক'রে ফিরে চ'লে গিয়েছিল আবার।

সেকথাও স্পষ্ট মনে পড়ে আজ!

মনোরমার সঙ্গে কি কথার পর স্বামিজী বললেন ভবনাথকে, মা জননী আমার কাছেই থাক। হরিদ্বারের কাছাকাছি যে আশ্রম আছে, তাতে অনাথ ছেলেমেয়ে ক'টার দেখা-শোনার জন্যে এই রকমই একটি মা তাঁর প্রয়োজন। না না খরচের কথাই ওঠে না। খরচ দিতে হবে না। মা জননী বরং এর জন্যে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক পাবেন। এর আর কি দরকার টাকা-পয়সায়? সন্ন্যাসিনী হয়েই ত থাকতে হবে এখন থেকে।

কান্নাকাটি নয়। এক ফোঁটা চোখের জলও নয়। স্বামী-সন্তানের জন্যে এতটুকু ব্যাকুলতা নয়। ভবনাথবাবুর জীবন থেকে নিজেকে নিঃশেষে দূরে সরিয়ে নিয়ে চ'লে গেল মনোরমা চিরদিনের মত।

আর এই এক যুগেরও উপর তাঁর জীবনটা কেটে গেছে একটা স্বপ্নের মত। তিনি এখন নামকরা শিল্পপতি। মস্ত বাড়ী, গাড়ী, ঝি-চাকর, লোকজন, ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী। আরাম-আয়েস ভোগও কম করেন নি এতকাল। বারো বছর আগেকার দারিদ্র্য-জর্জরিত জীবনটা যেন মনোরমারই প্রতীক। আজ তাকে ভাল ক'রে উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা তাঁর কি এতটুকু অবশিষ্ট আছে?

আজ তিনি মোটা মোটা চাঁদা দিচ্ছেন নিয়মিত নানা প্রতিষ্ঠানে। অবলা মন্দির, নারীকল্যাণ আশ্রম, ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত আছেন নানাভাবে। বড় বড় সভাসমিতি, অনুষ্ঠান তাঁকে বাদ দিয়ে কল্পনাও করা যায় না।

আর এই প্রায় তেরোটা বছর একবারও কি ভাল করে ভেবেছেন মনোরমার কথা? কি ভাবে কেমন করে কাটছে ওর দিনগুলি? নিজের চোখেই ত দেখেছেন, লালপাড় একজোড়া মোটা শাড়ি ছাড়া তৃতীয় বস্ত্র ওর নেই। একখানা কম্বল ছাড়া শোবার বালিশও ব্যবহার করে না। একবেলা ছাড়া ও খায় না।

বুকের ভিতর একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। পৃথিবীটা ঘুরতে লাগল চোখের সম্মুখে।

বিবেক, অনুশোচনা—আত্মগ্লানি? না না না—মনে-মনেই মাথা নাড়লেন ভবনাথবাবু। বহুদিন—বহুদিন আগে ভবনাথ রায়ের মন থেকে ওদের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে।

ঝাঁকানি দিয়ে বাস্ থেমে গেল। নেমে পড়লেন ভবনাথবাবু। দূর থেকেই দেখতে পেলেন ডেকোরেটার দলবল নিয়ে বিরাট্ প্যাণ্ডাল ক'রে বাড়ি সাজাচ্ছে।

অনেক লোকজন এসেছে। গাড়ীর উপর গাড়ী। লোকজন নিয়ে মনোতোষ বড় ব্যস্ত। কীর্তনের দল আসবে শান্তিপুর থেকে। ব্রাহ্মণ-বিদায়, কাঙালী-ভোজন, বস্ত্রদান, ইত্যাদি অনেক কিছু করা হবে। বিরাট্ আয়োজন করা হচ্ছে স্বর্গীয়া মনোরমার শেষ কাজে। দু' হাতে পয়সা খরচ করছে মনোতোষ, তার পুণ্যবতী মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে।

মাথা হেঁট ক'রে, কোনদিকে না তাকিয়ে সবার বিস্মিত, সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে সোজা দোতলায় নিজের ঘরে উঠে গেলেন ভবনাথবাবু।

* * * *

হাওড়া স্টেশন। গাড়ী ইন্ করেছে। ওয়ার্ণিং বেল প'ড়ে গেছে। স্বামিজী টিকিট কাটতে গেছেন। পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে গায়ে মাথায় চাদর ঢাকা দিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল মনোরমা।

অশক্ত অসুস্থ দেহ সহসা যেন অবশ অসাড় হয়ে এল। থামটা ভর ক'রে দাঁড়াবার জন্যে এক পা দু' পা এগিয়ে যেতেই কে যেন শক্ত হাতে ধ'রে ফেলল ওর হাতখানা। আমার সঙ্গে এস, গাড়ীতে।

একখানা খালি কামরায় মনোরমাকে উঠিয়ে ভবনাথবাবু আবার বললেন, শুয়ে পড়।

কথা বলবার মত শক্তিও ছিল না। নিঃশব্দে মনোরমা দু'চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল; তার প্রায় অচেতন দেহটার উপরে সযত্নে একখানা কম্বল চাপা দিয়ে দিলেন ভবনাথবাবু।

ঢং ঢং ঢং ঢং। সেকেণ্ড বেল্ পড়ল। সবাই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল। পান, চা গরম, বই চাই বাবু, খেলনা চাই—নানান গোলমালের মধ্যে অস্ফুট কণ্ঠে মনোরমা বলল, এক্ষুণি স্বামিজী আসবেন। তুমি চলে যাও।

হ্যাঁ, চ'লেই যাব মনোরমা। তুমি উঠো না। শুয়ে থাক।

গাড়ী ছাড়বার শেষ ঘণ্টা পড়ল। ঢং ঢং ঢং। চমকে উঠে বসল মনোরমা।—এ কি, স্বামিজী এখনও এলেন না? তা হোক, উনি পরের স্টেশনে আসবেন। তুমি চ'লে যাও, নেমে পড় গাড়ী থেকে—কেন এলে? কে তোমাকে আসতে বলেছিল?

আস্তে আস্তে চলতে সুরু ক'রে দিল দেরাদুন এক্সপ্রেস।

পিছনে মিলিয়ে যেতে লাগল বিরাট্ স্টেশন। অজস্র জনতা। আলোর রোশনাই।

কয়লা আর ধোঁয়ায় ভর্তি আকাশটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে এল।

অসুস্থ উত্তেজিত মনোরমা অধীর ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠল, নামো, শীগ্‌গির নেমে পড় গাড়ী থেকে। নামো, নামো—

ধীরেসুস্থে শক্ত হাতে মনোরমাকে নিজের পাশে বসালেন ভবনাথবাবু। দু'হাতে তার বিবর্ণ পাণ্ডুর মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন মুখখানা তুলে ধরলেন তাঁর নিজের দুই চোখের সম্মুখে। মনোরমার চোখের উপর দুই চোখ রেখে ঝাপ্‌সা গলায় তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, আর কত নামব? আর কত নীচে তুমি আমাকে নামাতে চাও—বলতে পার মনু?

গাড়ীর স্পীড আরও বাড়ছে। দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে দেরাদুন এক্সপ্রেস। সব বাধা পেরিয়ে।

# সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমি

শ্রীকালীপদ ঘটক

ভারতের আদিবাসী সমাজের মধ্যে অনগ্রসর সাঁওতাল জাতি মুসলমান শাসনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নানারূপ বিসদৃশ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে যে কঠোর যাযাবর জীবনযাপনে বাধ্য হইয়াছিল—তাহার বহু বিচিত্র ইতিকথা একদিকে যেমন সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক, অপরদিক্ দিয়া ঠিক ততখানি মর্মস্পর্শী। বর্তমান হাজারীবাগ জেলার চাইচম্পা নামক কোন এক অরণ্য প্রদেশে সাঁওতাল-জাতির বসবাস ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তৎপূর্বে হিহিরি পিপিরি নামক কোন এক পার্বত্য অঞ্চলে সাঁওতালদের আদি বাসভূমি ছিল বলিয়া কথিত। কিন্তু সে স্থান সম্বন্ধে সঠিক কোন ভৌগোলিক ধারণা পাওয়া যায় না। এইটুকু শুধু জানিতে পারা গিয়াছে যে, পূর্বোক্ত চাইচম্পা অঞ্চল একসময় সাঁওতাল রাজাদের অধীন ছিল। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন সাঁওতালরাজের নাম পর্যন্ত জানা গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে সাঁওতালরাজ কিস্কুর মৃত্যুর পর বীরহোড় বংশোদ্ভূত মাধোসিং নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি চম্পা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসে এবং কোন এক সাঁওতাল কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। বিজাতীয়ের হস্তে কন্যাদান সাঁওতালী সমাজবিধির ঘোর পরিপন্থী। সুতরাং চম্পাবাসী সাঁওতালগণ আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কুলকন্যার সম্ভ্রম রক্ষার্থে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে সদলবলে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই স্থান হইতেই তাহাদের অপরিমেয় দুর্ভাগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী যাযাবর জীবনের সূত্রপাত।

চাইচম্পা হইতে বহির্গত হইয়া নানারূপ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া পলাতক সাঁওতালগণ ক্রমে ক্রমে ছোটনাগপুর, মানভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার নানাস্থানে গিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং অবশেষে দামোদর নদ পার হইয়া তাহাদের বৃহত্তম দলটি সাঁওতাল পরগণার রাজমহল অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যায়। এই স্থানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উপরি-উক্ত স্থানগুলির প্রায় প্রত্যেক স্থানেই তাহারা ঘরবাড়ী জমিজমা প্রস্তুত করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বসবাস করিয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন স্থানেই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে নাই। হয় কোন সাঁওতাল রমণীর প্রতি বিজাতীয়ের লোলুপ-দৃষ্টি, কিম্বা কোন সভ্যতর জাতির প্রত্যক্ষ প্ররোচনা বা কূটকৌশলপ্রসূত অবাঞ্ছিত ধর্মান্তর সমস্যা বারে বারে এই ভাগ্যবিড়ম্বিত সাঁওতালসম্প্রদায়কে অতি নির্মমভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত করিয়াছে। অবশেষে তাহারা দামোদর নদ পার হইয়া উত্তরমুখে অগ্রসর হইয়া যায় এবং রাজমহল তিনপাহাড় সন্নিহিত দামিন-ই-কো নামক স্থানে গিয়া উপনীত হয়। হাজারীবাগের চাই-চম্পা হইতে সুরু করিয়া সাঁওতাল পরগণার এই পাহাড়িয়া অঞ্চলে গিয়া সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের প্রয়াস প্রায় পাঁচশত বৎসরের সুদীর্ঘ ইতিহাস। সাঁওতাল আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই দামিন-ই-কো অঞ্চলে একমাত্র মাল-পাহাড়িয়া ব্যতীত অপর কোন জাতির বসবাস বা প্রবেশাধিকার ছিল না। আকস্মিক এই সাঁওতালদের আবির্ভাব ও নূতনতর পরিবেশে তাহাদের অভিনব জীবন সংগ্রাম দামিন-ই-কোর ইতিহাসে অতি বিচিত্র এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

বহিরাগত এই সাঁওতালগণ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে পাহাড়িয়াদের জন্য সংরক্ষিত দামন অঞ্চলে প্রবেশ অধিকার লাভ করিল এবং এই দুর্গম ও জনবিরল পার্বত্য প্রদেশের নবরূপায়ণে সাঁওতাল জাতির অবদান কতখানি সে সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

ইংরেজ সরকারের নথিপত্রে দামিন-ই-কো অঞ্চলে সাঁওতাল জাতির প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মিঃ সাদারল্যাণ্ডের রিপোর্টে। পাহাড়িয়াদের জন্য সংরক্ষিত দামিন-ই-কোর সীমারেখার মধ্যে সে সময় পর্যন্ত সাঁওতালেরা প্রবেশ করিতে পারে নাই। উক্ত সীমার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অতি অল্পসংখ্যক সাঁওতালের সহিত মিঃ সাদারল্যাণ্ডের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাহাদের 'সন্তার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ওয়ার্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায়—ইতিমধ্যে দামিন-ই-কোর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অসংখ্য সাঁওতাল

আসিয়া সমবেত হইয়াছে। পরবর্তী চারি বৎসর কাল এইভাবে দামন অঞ্চলে সাঁওতালদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ওয়ার্ডের সহযোগিতায় সদলবলে তাহারা দামিন-ই-কোর অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সাঁওতালদের আগমনকাল পর্যন্ত যখন দেখা গেল যে, দামনবাসী পাহাড়িয়াগণ পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া পতিত ভূখণ্ডে চাষ-আবাদ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, তখন ইংরাজ সরকার বৃত্তিহীন এই যাযাবর সাঁওতালদিগকে দামন প্রদেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে পতিত ভূমি বণ্টন করিয়া রাজস্বাদি নির্দ্ধারণের যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ পণ্টেট নামক জনৈক ইংরাজ অফিসারকে দামিন-ই-কোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। মিঃ পণ্টেট অতি আন্তরিকতার সহিত দামিন-ই-কোর উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন এবং নবাগত সাঁওতালদের সহযোগিতায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই দামিন-ই-কোর যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হন।

দামিন-ই-কোর নূতন পরিবেশ সাঁওতালদের চোখে যেন স্বপ্ন আঁকিয়া দিল। একান্ত নিরালায় দুর্গম এই পর্বতসঙ্কুল অরণ্যানীর দেশে তাহাদের স্বাধীন জীবনযাপনে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে, তাহাদের চিন্তায় ও ধর্মবিশ্বাসে, আর হয়ত কোন স্বার্থপর অপর জাতি পদে পদে আসিয়া বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ঠিক এইরূপ একটি নির্জন ও শান্ত মনোরম পরিবেশ, সমাহিত আরণ্য আবাসভূমি, এতদিন ধরিয়া তাহারা যেন অন্বেষণ করিতেছিল। এই নূতন পরিবেশে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাঁওতালেরা কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ করিল। দামিন-ই-কোর বনজঙ্গল কাটিয়া কর্ষণযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করিবার জন্য তাহারা জীবনমরণ পণ করিয়া কাজে লাগিয়া গেল। সাঁওতালী কুঠার ও খননযন্ত্রের অমোঘ স্পর্শে চিরবন্ধ্যা বন্ধুর বনভূমি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইতে লাগিল শস্যশ্যামল উর্বর ক্ষেত্রে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই দামিন-ই-কোর বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল নবাগত সাঁওতালদের কর্মতৎপরতায়। শত শত মাইলব্যাপী সদ্যখনিত শস্যক্ষেত্রে সোনার ফসল ঝলমল করিতে লাগিল সাঁওতাল জাতির শ্রমলব্ধ নবার্জিত সম্পদরূপে। তাহাদের জনসংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল এবং সেই অনুপাতে দামিন-ই-কোর শ্রীসম্পদও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল আশাতীতরূপে।

সাঁওতালদের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাত লক্ষণীয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দামন অঞ্চলে প্রায় ৪০টি সাঁওতালী গ্রাম পরিদৃষ্ট হয়। আদিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার এবং সেই বৎসর সাঁওতালদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হয় দুই হাজার টাকা। মিঃ পণ্টেটের প্রচেষ্টায় আগন্তুক সাঁওতালদের জনসংখ্যার অনুপাতে রাজস্বের পরিমাণও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৫৫ সনের মধ্যে দামন প্রদেশে সাঁওতালী গ্রামের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৭৩টি, সাঁওতালদের জনসংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৮২৭৯৫ জন; এবং বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৪৩৯১৮ টাকা ১৩ আনা সাড়ে পাঁচ পাই। মিঃ পণ্টেট এ বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সহৃদয় ব্যবহার সাঁওতালদিগকে বিশেষ উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

সাঁওতালদের কায়িক শ্রমের ফল স্বরূপ এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল হইয়া উঠিল। খামার-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু-মহিষ ও রকমারি শস্য-সম্ভারে সাঁওতালদের ঘর ভরিয়া উঠিল। বহুকাল পরে সাঁওতালেরা আবার যেন ফিরিয়া পাইল চম্পার সুখসমৃদ্ধি। চিরাচরিত পাল-পার্বণ, আনন্দোৎসব ও আনুষঙ্গিক নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে দামিন-ই-কোর সাঁওতাল পল্লীগুলি কলমুখর হইয়া উঠিল। সেদিন কিন্তু অজ্ঞ, নিরক্ষর ও স্বল্পমতি সাঁওতালগণ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে স্বার্থলোলুপ মানুষের শয়তানী চক্র আবার তাহাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া অদূর ভবিষ্যতে জীবন তাহাদের বিষময় করিয়া তুলিবে। অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। সরল শ্রমজীবী নিরীহ সাঁওতালদের সুখসমৃদ্ধি অবিলম্বে চতুর ও স্বার্থপর বেনিয়া ও অর্থলোলুপ কুসীদজীবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সরলের সহিত কুটিলের, নির্বোধের সহিত অতিবুদ্ধির ভেল্কিবাজি সুরু হইয়া গেল সাঁওতাল অধ্যুষিত দামিন-ই-কো অঞ্চলে।

সাঁওতালদের এই আশাতীত অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী অবিলম্বে তৎপর হইয়া উঠিল। দূরদূরান্তর হইতে দলে দলে তাহাদের আগমন ঘটিতে লাগিল দামিন-ই-কোর অভ্যন্তরে। বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলা হইতে ময়রা, বেনিয়া ও অপরাপর ব্যবসায়ী জাতি সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাদের বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া। পশ্চিমা বণিক্-সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট রহিল না, সাহাবাদ ছাপরা বেতিয়া আরা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কিছুসংখ্যক ভোজপুরী ও ভাটিয়া মহাজনও আসিয়া

দামিন-ই-কোর একটি মহাজন পল্লী

সমবেত হইল দামিন-ই-কোর সাঁওতালী মুলুকে। সাঁওতালদের একেবারে বস্তির মধ্যে আসিয়া বেনিয়ারা আড়ৎ খুলিয়া বসিল। কুসীদজীবী মহাজনেরা সাঁওতাল-দের মধ্যে সুদে টাকা খাটাইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বেনিয়া বনাম মহাজন, কে কতখানি শোষণপটু তাহাই যেন প্রমাণ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়া গেল সাঁওতালদের কেন্দ্র করিয়া। অতি সস্তা মূল্যের নানারূপ বিলাসদ্রব্যে বিপণি সাজাইয়া মেলিয়া ধরা হইল সাঁওতালদের চোখের সামনে। নানান ভাবে ব্যবসায়িক আদান-প্রদান সুরু হইল দামিন-ই-কো অঞ্চলে। একখানি পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য যে কত সে সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা নাই সাঁওতালদের। ব্যাপারীগণ যাহা বুঝাইয়া দিল তাহাই তাহারা বিশ্বাস করিল। উক্ত বস্ত্রখণ্ডের জন্য সাঁওতাল খরিদ্দারকে কয়েক মণ ধান্য অথবা চাউল কিংবা তৈলবীজ হয়ত মাপিয়া দিতে হইল ব্যাপারীর বাটখারায়, এক ছটাক লবণ কিংবা ঠুনকো একটি ঝুমঝুমি খেলনার বিনিময়ে নধর একটি গোবৎস কিংবা একজোড়া ছাগল হয়ত মূল্য স্বরূপ ছাড়িয়া দিতে হইল বেনিয়াদের হাতে। শস্যাদি বিক্রয় করিবার সময় কি পরিমাণ শস্যের জন্য কি দরে তাহাদের কত মূল্য দেওয়া হইল সে সম্বন্ধে সঠিক ভাবে বুঝিয়া-পড়িয়া লইবার মত বুদ্ধি সাঁওতালদের ছিল না। তাহাদের সংখ্যাজ্ঞানের পরিধি ছিল করাঙ্গুলি গণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহা ছাড়া সাঁওতালেরা সহজে কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারিত না। যে যাহা বুঝাইয়া দিত তাহাই তাহাদের নিকট ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে হইত। তাহাদের এই সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া বেনিয়া দালাল ও মহাজন শ্রেণী পদে পদে তাহাদিগকে ঠকাইতে লাগিল।

ই. আই আর লুপ লাইনের বারহারোয়া স্টেশন হইতে ১৩ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বারহেট নামক স্থানে বহু বাঙালী মহাজন সাঁওতালদের সহিত কারবার করিবার জন্য বড় বড় আড়ৎ খুলিয়া বসিয়াছিল। এখান হইতে গো-গাড়ী যোগে সাঁওতাল-দের নিকট হইতে সংগৃহীত ধান চাউল সরিষা ও অন্যান্য তৈলবীজ তাহারা ভাগীরথী তীরবর্তী জঙ্গীপুর বাজারে গিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত এবং সেখান হইতে মুর্শিদাবাদ হইয়া উক্ত শস্য-সম্ভার কলিকাতায় গিয়া পৌঁছিত। কলিকাতার বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণ সরিষা ইংলণ্ড পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে রপ্তানি করা হইত। দুমকা মহকুমার কারিকুণ্ড নামক স্থানেও বহু ব্যবসায়ী সাঁওতালদের নিকট হইতে অতি অল্পমূল্যে ধান্য ও সরিষা ক্রয় করিয়া সিউড়ি শহরে চালান দিত। বিক্রয়ের নামে যে পরিমাণ শস্যাদি সাঁওতালদের ভাণ্ডার খালি করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইত সে তুলনায় মূল্য যাহা পাওয়া যাইত তাহা নিতান্তই সামান্য। এইভাবে শঠ ও

প্রতারক ব্যবসায়ী ও মহাজনদের শোষণনীতির ফলে সাঁওতালদের অবস্থা ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহাদের সেই ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া মহাজনেরা অত্যধিক সুদে সাঁওতাল-দিগকে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করিল। এমন কি বহু সাঁওতালকে অযাচিত ভাবে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য নানাভাবে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করিতে লাগিল মহাজনেরা। কোন রকমে একবার কিছু টাকা সাঁওতাল-দের হাতে গুঁজিয়া দিতে পারিলেই হইল। সে ঋণ আর সহজে তাহাকে শোধ করিতে হইবে না। সুদের সুদ ও তস্য সুদ উশুল দিতে দিতেই অধমর্ণ সাঁওতালের যথাসর্বস্ব বিকাইয়া যাইবে। খতের উপর মাত্র একটা টিপসহি—অর্থহীন হিজিবিজি একটু কালির আঁচড় মাত্র, ব্যস—ইহাই যথেষ্ট; আইনের চোখে পালাইবার আর উপায় রহিল না সাঁওতালের। এই ভাবেই তাহাদের বহু কষ্টার্জিত যাহা কিছু—অতি অন্যায় ভাবে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল মহাজনদের চক্রান্তে। প্রতিকারের কোন পন্থা নাই, ইহাই যেন তাহাদের জন্মার্জিত বিধি-লিপি। সাঁওতালেরা শেষ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় ক্রমশই ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতে লাগিল। মহা-জনের সুদের হার শতকরা পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত। মহাজনেরা বর্ষাকালে সাঁওতালদের অনটনের সময় কর্জ দিয়া শীতকালে শস্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সুদে মূলে আদায় করিতে লাগিল। ক্ষেত্রবিশেষে অধমর্ণ সাঁওতালকে দিয়া গরুর পরিবর্তে ঋণদাতা মহা-জনের কৃষিক্ষেত্রে লাঙ্গল টানান হইত। উত্তমর্ণ মহাজনের দৃষ্টিতে গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে সাঁওতালদের কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের জন্য প্রতারক ব্যবসায়ীর দল দুই রকমের বাটখারা ব্যবহার করিত। সাঁওতালদের নিকট হইতে প্রাপ্য শস্যাদি যে বাটখারায় ওজন করিয়া লওয়া হইত তাহা প্রচলিত বাটখারা অপেক্ষা ওজনে অধিক ভারী ছিল এবং নিজেদের পণ্যদ্রব্য সাঁওতালদের নিকট বিক্রয় করিবার সময় যাহা ব্যবহার করা হইত তাহা ছিল বাজার প্রচলিত নির্দিষ্ট ওজন অপেক্ষা অনেকখানি কম। প্রথমোক্ত বাটখারাকে বলা হইত 'কেনারাম' বা 'বড় বৌ' এবং শেষোক্ত বাট-খারার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'বেচারাম' বা 'ছোট বৌ'। এই 'বড় বৌ' বা 'ছোট বৌ'-এর ইতরবিশেষ সম্বন্ধে সাঁওতালদের কোন ধারণা ছিল না। ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের নিকট হইতে গব্য ঘৃত বা সর্ষপ তৈলাদি মাপিয়া লইবার সময় কলসী বা টিনের মুখে ফুটা পাত্র ব্যবহার করিত। সেই ছিদ্র পথ দিয়া অধিক পরিমাণ ঘৃত বা তৈল কেমন করিয়া যে সাঁওতালদের চোখে ধুলা দিয়া কৌশলে পাচার করিয়া লওয়া হইত—সরল বিশ্বাসী সাঁওতালগণ তাহার বিন্দুবিসর্গ টের পাইত না।

এইরূপে সাঁওতালেরা অতিমাত্রায় প্রতারিত ও সর্ব-স্বান্ত হইতে লাগিল এবং অবশেষে দৈন্যের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া শস্যক্ষেত্রে তাহারা সোনা ফলায়, কিন্তু ঋণের দায়ে যথা-সর্বস্ব মহাজনের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। ঋণগ্রস্ত সাঁওতালেরা শেষ পর্যন্ত মহাজনদের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়া গেল। লাঙ্গলের গরু ও অধমর্ণ সাঁওতাল, মহা-জনের চোখে প্রায় সমান হইয়া গেল। গরুকে খাইতে না দিলে সে যেমন লাঙ্গল টানিবে না, ক্ষেত-মজুর সাঁওতালকে সেইরূপ কিছু কিছু খাদ্য দিয়া বাঁচাইয়া না রাখিলে শারীরিক দুর্বলতা বশত কৃষিকার্যে সে অসমর্থ হইয়া পড়িবে এবং মহাজনের উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে—ঠিক এই বিবেচনায় এবং এইরূপ মনোভাব লইয়াই উত্তমর্ণ মহাজনেরা সাঁওতালদের কোন রকমে জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য-সংস্থানটুকু করিয়া দিয়া সম্বৎসর তাহাদিগকে পশুর মত খাটাইয়া লইত। নিজের ক্ষেতে পরের চাষ করিয়া এবং বহু ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত উত্তমর্ণের নিকট হস্তান্তরিত হইবার পর সেই পরের ক্ষেতে মজুর খাটিয়া এইভাবে সাঁওতালদিগকে দিনের পর দিন ও বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিতে হইত। জনৈক সাঁওতাল মহাজনের নিকট হইতে পঁচিশটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই ভাবে তিন পুরুষ ধরিয়া উশুল দিবার চেষ্টা করিয়াও সে ঋণ কোনদিন পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই। পিতার ঋণ পুত্রের নিকট এবং তৎপরে পৌত্রের নিকট হইতে আদায় করা হইত। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আইন-আদালত করিয়া এইসব বিষয়ের প্রতিকার করা নিরীহ সাঁওতালদের পক্ষে প্রায়ই সম্ভবপর হইত না। নিকটে কোন আদালত না থাকায় দামন হইতে সুদূর ভাগলপুর কিংবা দেওঘরে গিয়া মামলা দায়ের করা সে কালে অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। দুর্গম পথ ঘাট বন পাহাড় অতিক্রম করিয়া যদিও বা কেহ কেহ ভাগলপুর বা দেওঘরে গিয়া মহাজনদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের চেষ্টা করিত, তথাপি তাহাতে কোন ফল হইত না। ধূর্ত মহাজনেরা উৎকোচ দিয়া আদালতের আমলাতন্ত্রকে এমন ভাবে

দামিন-ই-কোর একটি নদী

দাঁড় করিয়া লইত যে, সাঁওতালদের পক্ষে সুবিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিত।

এইভাবে মহাজনেরা সাঁওতালদের মধ্যে একটা ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বহু সাঁওতাল মহাজনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্যন্ত ভিটামাটি ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। দামিন-ই-কোর তিনটি বৃহৎ সাঁওতালী উপনিবেশ অতি অল্পদিনের মধ্যে একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল। মহাজনেরা এই ব্যাপারে অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিল। চারিদিকে গুপ্তচরের সাহায্যে সাঁওতালদের উপর সব সময় একটা সজাগ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল। অধমর্ণ সাঁওতাল ঋণ পরিশোধ না করিয়া দামিন-ই-কো হইতে যেন কোনমতেই পলাইতে না পাবে।

জমিদার ও তাহাদের নায়েব-গোমস্তারাও সাঁওতালদের উপর উৎপীড়ন করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। খাজনা আদায়ের সময় তাহারা নানা অজুহাতে সাঁওতাল প্রজাগণের নিকট হইতে নির্দিষ্ট খাজনা অপেক্ষা বহু বেশি আদায় করিয়া লইত। সামান্য ছয় আনা খাজনার স্থলে ছয় টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চারিদিকে দুর্নীতি, বেনিয়া মহাজন জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী পুলিস পিয়াদা বরকন্দাজ পর্যন্ত সমান দুর্নীতিপরায়ণ। কোনদিক্ হইতে কিছুমাত্র প্রতিকারের আশা না দেখিয়া সাঁওতালেরা অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িল। দামিন-ই-কোর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের মধ্যে গভীর একটা অসন্তোষের ভাব ক্রমে ক্রমে চারদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অত্যাচারী মহাজন, জমিদার ও তাহাদের সহকারী নায়েব সুজাওয়াল প্রমুখ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মন তাহাদের অতিমাত্রায় বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এই বিজাতীয় বিদ্বেষের বিষবাষ্প ও পুঞ্জীভূত অসন্তোষবহ্নি ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হইতে লাগিল সাঁওতালদের মধ্যে। বিরাট একটা আগ্নেয়গিরি গৈরিক লাভাপ্রবাহে কখন বুঝি ফাটিয়া পড়িবে, দামিন-ই-কোর সেই অবস্থা।

সমসাময়িক আর একটি ঘটনায় সাঁওতালদের মনে বিক্ষোভ ও অসন্তোষবহ্নি দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। সেই সময় দামিন-ই-কোর উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত জুড়িয়া নূতন রেলপথ নির্মাণের জন্য ই. আই. আর. লুপ লাইনে প্রায় দুইশত মাইলব্যাপী মাটি কাটার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। রেলপথ বা বাষ্পীয় যান সম্বন্ধে সাঁওতালদের মনে সঠিক কোন ধারণা না থাকিলেও এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। এইটুকু তাহারা শুনিয়াছে যে, 'লোহার ঘোড়া' চালাইবার জন্য সাহেব লোকেরা রাস্তা বানাইতেছে এবং উক্ত উক্ত স্থানে কুলি-মজুরেরা মাটি কাটার কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছে। দামিন-ই-কোর সাঁওতালদের মধ্যে যাহারা

তখনও পর্যন্ত মহাজনের ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই তাহাদের কেহ কেহ ইতিমধ্যেই রাস্তাদির কাজে যোগদান করিয়াছিল। অতি অল্পদিন পরেই তাহারা ট্যাঁক ভরতি টাকা, স্ত্রীপুত্র-পরিবারের জন্য রঙিন কাপড় ও কিছু কিছু কাঁসা-পিতলের গহনা পর্যন্ত লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ঋণগ্রস্ত ও দৈন্যপীড়িত দামনবাসী সাঁওতালগণ তাহাদের প্রতিবেশীদিগের এই অভাবিত অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া রাস্তাবন্দির কাজে যোগ দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাদের অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের এমন সুবর্ণ সুযোগ সহজে হয়ত আর পাওয়া যাইবে না। দামিন-ই-কোর সাঁওতালগণ অর্থ উপার্জনের আশায় লুপ লাইন অভিমুখে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এত সহজে মহাজনেরা তাহাদের ছাড়িয়া দিবে কেন? নানারূপ আইনের মারপ্যাঁচ ও বহুবিধ নির্যাতনের ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া তাহাদের দামিন-ই-কোর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। রাস্তাবন্দির কাজে শ্রমিকের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এতদঞ্চলে ইতিমধ্যেই শ্রমিকের যথেষ্ট অনটন দেখা দিয়াছিল। এমত অবস্থায় যে কোন রকমে সাঁওতালদের আটকাইতে না পারিলে মহাজনদের সমূহ স্বার্থহানির সম্ভাবনা জানিয়া সাঁওতালদিগকে তাহারা সর্বতোভাবে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাঁওতালদের সহ্যের সীমা চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদের উৎপীড়িত অন্তরাত্মা চাপা একটা অন্ধ আবেগে মুক্তির উপায় খুঁজিতে খুঁজিতে দামিন-ই-কোর আকাশ-বাতাসে যেন গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল।

নির্যাতন শুধু একদিক্ হইতেই আসে নাই। মহাজনদের প্ররোচনায় স্থানীয় পুলিস ও জমিদারগণ সাঁওতালদের উপর বারে বারেই আঘাত হানিয়াছিল। সাঁওতালদের মধ্যে কেহ কেহ মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। কিন্তু পুলিস ও জমিদারের সহায়তায় তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়া কঠোরহস্তে দমন করা হয়। এইরূপ অবর্ণনীয় অবস্থা যখন চলিতে থাকে ঠিক সেই সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দুই-একটি চুরি-ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যায় এবং এই সকল দুষ্কার্যের জন্য সন্দেহ করা হয় দামিন-ই-কোর মুক্তিকামী কয়েকজন প্রভাবশালী সাঁওতালকে। বেপরোয়া নির্যাতন চলিতে থাকে তাহাদের উপর।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে লছিমপুরের পরগণাইত বীরসিংহ নামক এক সাঁওতালকে লিতি-পাড়ার ঈশরী ভগৎ ও তিনু ভগৎ, বাগশিসার জিতু কলু এবং দরিয়াপুরের কয়েকজন ময়রা ও অন্যান্য দিকুদের বাড়ীতে ডাকাতি করার অভিযোগে ধৃত করা হয়। এ বিষয়ে পুলিসের তৎপরতার অভাব দেখিয়া মহাজনগণ অম্বর পরগণার রাণী ক্ষেমঙ্করীর দরবারে গিয়া অভিযোগ পেশ করে। অম্বর এষ্টেটের দেওয়ান বাবু জগবন্ধু রায় (কাঞ্চনতলার জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা) এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য নায়েবের উপর ভার দেন। নায়েব মহাশয় বীরসিং সাঁওতালকে সদলবলে কাছারি-বাড়ীতে ধরিয়া আনিয়া তাহার উপর মোটা টাকা জরিমানা ধার্য করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা আদায় দিবার জন্য হুকুম জারি করেন। বীরসিং মাঝি অভিযোগ অস্বীকার করে এবং জরিমানার টাকা দিতে সে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়া জানায়। অতঃপর বীরসিংকে চরম অসম্মান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতে হয়। নায়েব মহাশয় বীরসিংকে কাছারি-বাড়ীতে আবদ্ধ করিয়া তাহার সঙ্গীদের সম্মুখে জুতা দিয়া তাহাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করেন। ধৃত বীরসিং মাঝি এই চরম অপমান নীরবে সহ্য করিয়া নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই ব্যাপারে সাঁওতালদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত সাঁওতালের দল হয়ত বা অম্বরের কাছারি-বাড়ী আক্রমণ করিতে পারে—এই আশঙ্কায় জমিদারের পক্ষ হইতে কিছুসংখ্যক সিপাহী ও সমশেরগঞ্জ (ধুলিয়ানের নিকট) হইতে কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠান আমদানী করিয়া কাছারি-বাড়ী সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

বারহেট বাজারের নিকট কুসমা নামক গ্রামে ময়রা জাতীয় কতগুলি অবস্থাপন্ন মহাজনের বাস ছিল। তাহাদের অভিযোগ-ক্রমে স্থানীয় পুলিসের দারোগা গচো মাঝি নামক জনৈক নির্দোষ সাঁওতালকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া চুরির দায়ে থানায় ধরিয়া লইয়া যায়। ইহা নিছক একটি ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। আসলে গচো মাঝিকে গ্রেপ্তার করা হয় সম্পূর্ণ একটি অন্য কারণে। গচো মাঝির অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। লোকমুখে প্রকাশ, কয়েক কলসী সোনার মোহর ("লাটসাহী টাকা") নাকি গচো মাঝির অধিকারে ছিল। তাহার এই সঞ্চিত গুপ্তধন যে-কোন উপায়ে হস্তগত করিবার জন্য মহাজনেরা বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিল এবং কোনরূপে কৃতকার্য না হইয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্য শেষে মিথ্যা চুরির অভিযোগে

বারহেট বস্তির একাংশ

গচো মাঝিকে তাহারা পুলিসের নিকট ধরাইয়া দেয়। থানার দারোগার নিকট এইভাবে অহেতুক লাঞ্ছিত হই। গচো মাঝি যাইবার সময় তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া যায় যে, এ অপমান সহজে সে ভুলিবে না এবং উক্ত দারোগার পক্ষে কতগুলি নিরপরাধ সাঁওতালকে এইভাবে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার মত বন্ধনরজ্জু সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, গচো মাঝি তাহা যাচাই না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। গচো মাঝিকে সে সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মহাজনদের প্ররোচনায় পুনরায় তাহাকে দলবলসহ গ্রেপ্তার করিয়া অতি অন্যায়ভাবে তাহাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

সাঁওতালেরা এইসব অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া মহাজন ও পুলিস কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া অঞ্চলে একটি ইস্তাহার প্রচার করে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াও কিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় নাই। ক্রমাগত ঘা খাইতে খাইতে সাঁওতালদের মন ক্রমশই বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। চারিদিকে মহাজনের গুপ্তচর, উত্তমর্ণের সতর্ক দৃষ্টি, জমিদারের পাইক-পিয়াদা বরকন্দাজ ও তাহাদের সহযোগী উৎকোচগ্রাহী দুর্নীতি-পরায়ণ পুলিস। প্রকাশ্যে কিছু বলিবার উপায় নাই, কিছু করিবার মত সাহস নাই; নিঃশব্দে মুখ বুজিয়া সবকিছু সহ্য করা ছাড়া সাঁওতালদের কোন গত্যন্তর নাই। মাতব্বর সাঁওতাল সর্দারগণ অতি সন্তর্পণে মাঝিথানে সমবেত হইয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে সাঁওতালদের গোপন বৈঠকে এই অসহনীয় অবস্থা হইতে কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করা যায়, তাহাদের এই বিড়ম্বিত দাস-জীবনের অবসান কোথায়, এই সকল প্রসঙ্গ লইয়া বহু চিন্তা ও গবেষণা, বহু যুক্তি ও পরামর্শ চলিতে লাগিল চিন্তাশীল মাতব্বর সাঁওতালদের মধ্যে। কিন্তু কোনদিক্ দিয়াই প্রতিকারের কোন উপায় তাহারা উদ্ভাবন করিতে পারিল না। ক্রমশঃ তাহাদের ধারণা হইতে লাগিল, হয়ত বা মানুষের হাতে ইহার কোন প্রতিকার নাই।

যুগ-যুগান্তের চিরন্তন ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। প্রতিকার অবশ্যই আছে। মানুষের উপর অমানুষের অত্যাচার যখন বর্বরতার চরম সীমায় গিয়া ঠেকে, প্রতিকারের পথ তখন আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, অচিন্ত্য এক আকস্মিকের ধাক্কায়। সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও স্বভাবসিদ্ধ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কথা নহে। সন্ধিক্ষণ ঘনাইয়া আসিতেছে। দামিন-ই-কোর সিদ্ধিদাতা গণেশ মসীপাত্রে লেখনী ডুবাইয়া মহাবিদ্রোহের ইতিহাস লিখিবার জন্য অলক্ষ্যে বুঝি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঈশান কোণে ঝড়ের সঙ্কেত। জীবনমরণ মহাসংগ্রাম বুঝি আসন্ন। নিপীড়িত মানবাত্মার অতি-আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায় মহাকাল যেন অধীর আগ্রহে কাল গুণিতেছেন। দামিন-ই-কোর আকাশে-বাতাসে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল তারই যেন অমোঘ আশ্বাস।

# সংস্কার

[ সত্য ঘটনা—প্রতিযোগিতায় মনোনীত ]

শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত

শিউরতনবাবু আমার বন্ধুও বটে, আবার আমার ওষুধের দোকানের মাল সরবরাহকারীও বটে। কাজেই তিনি যখন তাঁর ভাইপোকে হাজির করলেন একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের জন্য, আমি না বলতে পারলাম না। তবে ছেলেটিকে সার্টিফিকেট দিতে আমার ডাক্তারী বিবেকে কোন বাধাও ছিল না। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, বছর পঁচিশ বয়স—নাম গৌরীলাল। পাটনা ফ্লাইং ক্লাবে এরোপ্লেন চালনা করতে শিখেছে, তার উচ্চ নিদর্শনপত্র ওর কাছে আছে। এখন একটি উপযুক্ত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট হলেই ভারত গবর্ণমেণ্টের এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়াতে চাকুরি হতে পারে। আমি খুশী মনে বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রে শরীরের মাপ-জোখ নিয়ে রিপোর্ট লিখলাম।

বন্ধুত্ব স্থলে ফী নেওয়া চলে না, কিন্তু একটু সুবিধা আদায় করা চলে। আমি জীবনে কোনও দিন এরোপ্লেনে চড়ি নাই ব'লে চড়বার সখ ছিল। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনও দিন ফ্লাইং ক্লাবে গেলে আমাকে বিনা পয়সায় আকাশ-বিহার করতে দেবে কিনা। সে হেসে তৎক্ষণাৎ রাজী হ'ল। ঠিক হ'ল পনেরো দিন পরে ভোর সাতটায় আমি পাটনা ফ্লাইং ক্লাবে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেই সে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে।

গৌরীলাল বিদায় হবার পর আমি শিউরতনবাবুর সঙ্গে খানিকক্ষণ ব্যবসাসংক্রান্ত কথাবার্তা বললাম। কথায় কথায় গৌরীলালের প্রসঙ্গ উঠল। শিউরতনবাবু গোপনে আমাকে জানালেন, ছেলেটি দেখতে-শুনতে আচারে-ব্যবহারে খুব ভাল হলেও তার একটি মহৎ দোষ আছে। সে নিজে জাতে বানিয়া হয়েও একটি কায়স্থ মেয়ের ফাঁদে পা দিয়েছে। অথচ ঐ মেয়েটির চেয়ে রূপবতী ও গুণবতী হাজারো মেয়ে তার নিজের জাতেই আছে। বানিয়াদের মধ্যে বি-এ পাশ ছেলে খুব বেশী নাই, তাই নিজের সমাজে তার দর খুব বেশী। অনেক মেয়ের বাপ উপযুক্ত অলঙ্কার এবং যৌতুক সহ কন্যাদানে রাজী। কিন্তু ছেলেটির বিষম গোঁ, সে ঐ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী কায়স্থ কন্যাটি ছাড়া আর কারও দিকে ফিরেও তাকাবে না। এজন্য সংসারে মহা অশান্তি। ছেলেটির মা, বাবা, কাকা, দাদা সকলেই মনোকষ্টে আছেন, কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। পাড়ার ঐ কায়স্থ মেয়েটি নির্লজ্জা ব'লে কুখ্যাত, গৌরীলালকে কি ভাবে তুক করেছে সেই জানে! মা-মরা মেয়ে, বাপের কথা শোনে না। মেয়ের বাপও এজন্য অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত।

আমি ধৈর্য্য ধ'রে সমস্ত শুনে সহানুভূতি জানালাম। যদি শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের বিয়ে হয় তবে পরিবারবর্গের মনোভাব কিরূপ হবে জানতে চাইলাম। শিউরতনবাবু বললেন, হতভাগাকে ভিন্ন বাড়ীতে বাস করতে হবে। যৌথ পরিবারের মধ্যে থেকে ত এরূপ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কায়স্থ কন্যাকে বধূ হিসাবে পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করা অসম্ভব, আমাদের সমাজে তা চলবে না। এক ভরসা ও যদি পাইলটের চাকুরি পেয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। তার পর সে তার কায়েতিন "রাখেলী"কে নিয়ে যা খুসি করুক, আমাদের থেকে তফাৎ থাকলেই হ'ল।

আমি "রাখেলী" কথাটায় আপত্তি জানালাম। বললাম, আজকালকার আইনে ভিন্ন জাতের মধ্যেও বিবাহ হতে পারে। সুতরাং নীলা (মেয়েটির নাম) গৌরীলালের স্ত্রী হবে, তাতে আইনতঃ কোনও বাধা নেই। শিউরতনবাবু আমার এ কথাটার কোনও গুরুত্ব দিলেন না। তাঁর বক্তব্য হ'ল আইনের মারপ্যাঁচে "রাখেলী" কখনও স্ত্রী হতে পারে না। কারণ, বানিয়া সর্ব্বদাই বানিয়া এবং কায়স্থ কন্যা কায়েতিন—এই সহজ সরল কথাটা চ্যালেঞ্জ করা সম্পূর্ণ যুক্তিবহির্ভূত ব্যাপার। জাত জন্মগত ব্যাপার, আইনের দ্বারা তা বদলানো যায় না।

এদিকে পনেরো দিন পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাটনা ফ্লাইং ক্লাবে গেলাম। বাড়ীতে কাউকে বলে আসি নাই, কারণ আমার এরোপ্লেন চড়ার এডভেঞ্চার সকলে ভাল-চক্ষে নাও দেখতে পারেন। চুপি চুপি আকাশে বিহার ক'রে বাড়ী ফেরার মতলব ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-লালের প্রণয়-কাহিনীর আরও একটু খুঁটিনাটি জানব বলে কৌতুহলও ছিল। তার খুড়ার দৃষ্টিভঙ্গি ত জানি, এখন ভাইপোর বক্তব্য কি সেটা জানতে পারলেই পূর্ণাঙ্গ সংবাদ হবে।

কিন্তু ও হরি, আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষাই করছি, গৌরী-লালের দেখা নাই। কত এরোপ্লেন উড়ল আর কত নামল, আমার শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই সার। ঘণ্টাখানেক নিষ্ফল অপেক্ষা ক'রে শেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমি ফিরে এলাম।

ফেরার পথে গর্দ্দানিবাগ অঞ্চলে যেতেই একটা সোরগোল লক্ষ্য করলাম। ঐ অঞ্চলের রেললাইনে কে বা কারা নাকি ট্রেনে কাটা পড়েছে। তাদের হাস-পাতালে নিয়ে গেছে, মৃত না জীবিত তা জনরব থেকে ঠিক বোঝা গেল না। গর্দ্দানিবাগের রেললাইনে প্রায়ই আত্মহত্যার কথা শোনা যায়—এ অঞ্চলের লোক এসব কাহিনীতে চির অভ্যস্ত। আমিও আর বেশী সময় নষ্ট না ক'রে চ'লে এলাম।

সন্ধ্যাবেলায় কিছু মালপত্র নিয়ে শিউরতনবাবু এলেন। সর্ব্বপ্রথমেই তিনি জানালেন, বিষম কাণ্ড হয়ে গেছে। গৌরীলাল ও নীলা গর্দ্দানিবাগ রেললাইনে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু দৈববশতঃ নীলা রক্ষা পেলেও গৌরীলালের পা কেটে গেছে, তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

আরও প্রশ্ন করে বিস্তৃত খবর যা জানতে পারলাম তা হ'ল এই। নীলা ও গৌরীলাল যখন বুঝতে পারল তাদের আত্মীয়বর্গ কেউ তাদের মিলনে সম্মতি দেবে না, তখন তারা যুক্তি ক'রে রেললাইনে মাথা পেতে শুয়ে রইল। তখনও অন্ধকার, আপ ট্রেন যাওয়ার সময়। দু'জনে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া যায়। ট্রেন লেট থাকায় দু'জনকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া গেল। লাইনে কান পেতে তারা স্পষ্ট শুনতে পেল ট্রেন আসছে। ক্রমেই আওয়াজ স্পষ্টতর হতে লাগল, তবুও গৌরীলাল অবিচলিত ভাবে শুয়ে আছে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ আর একটু নিকটবর্ত্তী হতেই নীলার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। না, এ ভাবে রক্তাক্ত অপমৃত্যু বড়ই ভয়ঙ্কর! এদিকে ততক্ষণে গাড়ী এত কাছে এসে পড়েছে যে, ভাববার আর সময় নাই। দ্রুত ধাবমান যন্ত্রদানবের ক্রমবর্দ্ধমান গর্জ্জন এখন নীলার কানে হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হলে সবই নিষ্ফল! তড়িৎগতিতে সে উঠে পড়ল এবং গৌরীলালকে ঠেলল। গৌরীলাল তখনও অটল-অচল। নীলা প্রাণপণে ঠেলতে লাগল আর জেদী গৌরীলাল রেললাইন আঁকড়ে রইল, নীলার সাধ্য কি তাকে উঠায়। ইঞ্জিন তখন সত্যই কাছে এসে পড়েছে। কাছে, আরও কাছে—এইবার হুড়মুড়িয়ে গায়ের ওপর এসে পড়ল ব'লে। মরিয়া হয়ে তখন নীলা গৌরীকে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল বটে, কিন্তু তার পায়ের পাতা রেলের চাকায় কাটা পড়ল। সগর্জ্জনে আপ ট্রেন আহত রক্তাক্ত গৌরীলালের পাশ দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল।

তার পর দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য। থানা ও হাসপাতালে খবর গেল। পুলিস এল, এম্বুলেন্স এল। ওরা দু'জনে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হ'ল। নীলার শুধু শক্—কিন্তু গৌরীলালের পা এম্‌পুটেট করতে হ'ল। আশেপাশের ভিড়ের থেকে কেউ নীলাকে চিনতে পেরে তার বাপকে খবর দিল। তার পরই এই সংবাদ জানাজানি হয়ে পড়ল।

ব্যাপার শুনে আমি চমকে উঠলাম। চমকটা আমার নিজের জন্য। আত্মহত্যায় বদ্ধপরিকর এই যুবকের এরোপ্লেনে কি না আমি চড়তে যাচ্ছিলাম! যদি রেল-গাড়ীর নীচে চাপা না প'ড়ে এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় প্রাণ দেবার মৎলব থাকত, তবে কি হ'ত? হয়ত আমি আরোহী থাকা সত্ত্বেও ওরা দু'জন সহসা এরোপ্লেনের কণ্ট্রোল আমার হাতে তুলে দিয়ে জানালা টপকে লাফিয়ে পড়ত! উড়ন্ত এরোপ্লেনে একাকী নিঃসহায় ভাবে আমি কি করতাম? আমার দশা উপকথার মাঝি-রাজার বৈঠা বাওয়ার চেয়েও শোচনীয় হ'ত। উঃ কি ফাঁড়াই গেছে! এর পর কোনও দিন আবার যে এরোপ্লেনে চড়ার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারব তা মনে হয় না। হে যানশ্রেষ্ঠ, তোমাকে দণ্ডবৎ—দূরে থেকেই দণ্ডবৎ!

সর্ব্বাগ্রে নিজের প্রাণের কথা চিন্তা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে গৌরীলাল ও নীলার কথাও একেবারে ভুলতে পারলাম না। কি দুর্ব্বুদ্ধিই হয়েছিল ওদের! কি তার পরিণাম?

ওরা হাসপাতালে থাকতে থাকতেই ইণ্ডিয়া এয়ার ওয়েজের চিঠি এল। গৌরীলালের আবেদন মঞ্জুর, পাইলট হিসাবে তার চাকুরি হয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি? চাকুরীতে আবেদনের সময় যে ব্যক্তি কঠোর ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, চাকুরি মঞ্জুরীর সময় সে রুগ্ন, শয্যাশায়ী, পঙ্গু এবং মৃতপ্রায়; প্রাণে বাঁচলেও চিরদিনের মত হৃতস্বাস্থ্য, অক্ষম ও অপটু হয়ে থাকতে হবে।

ক্রমে ওরা হাসপাতাল ছাড়ল, কিন্তু কেউ বাড়ী গেল না। দু'জনে মিলে এক সামান্য খাপরার ঘর ভাড়া নিল। অদৃষ্টের ক্ষীণ অনুগ্রহে একটা কেরাণীর কাজও গৌরীলাল জুটিয়ে নিল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অফিস

যাওয়া ও সামান্য মাহিনায় তুষ্ট থাকা বই আর গতি ছিল না। অথচ এয়ার ওয়েজের চাকুরিতে আয় কত বেশী হ'তে পারত এবং এ দু'টি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও অসুবিধাই হ'ত না, উভয় পক্ষের আত্মীয়বর্গের বিরূপতা সত্ত্বেও।

টমাস হার্ডি লিখেছেন, মহাযুদ্ধের দারুণ উৎপাতের মধ্যেও প্রণয়ীর নীড় রচনাকার্য্য প্রায় সমভাবেই চলতে থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা, প্রাণক্ষয়ী যুদ্ধও কালক্রমে থেমে যায়, কিন্তু প্রণয়ী যুগলের বাসা বাঁধার কাজ আবার আগের মতই অব্যাহত থাকে। মৃত্যুর বিভীষিকা ও ভ্রূকুটিতেও এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং নানা বাধা সত্ত্বেও যেমন করে হউক গৌরীলাল ও নীলার সংসার কায়ক্লেশে চলতে লাগল। ক্রমে তাদের একটি বাচ্চা মেয়েও জন্মাল।

সুযোগ মত একদিন শিউরতনবাবুকে বললাম, আর কেন, এবার এ দু'টিকে নির্ব্বাসন থেকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনুন। মুখ বাঁকিয়ে তিনি বললেন, "সে কি ক'রে হয়?" কারণ কি জানতে চাইলে তিনি বোঝালেন, "ওরা ত বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ নয়। আমাদের ছেলেপুলের সংসারে ওরূপ জাজ্জ্বল্যমান অসদ্দৃষ্টান্ত আমদানা করি কি ক'রে?" আমি বললাম, "কেন, ওদের বিবাহ দিন।" তিনি পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "ভিন্নজাতের আবার বিবাহ?"

শিউরতনবাবুকে দোষ দিয়ে লাভ নাই, জাতিভেদ আমাদের মজ্জাগত সংস্কার। বানিয়া ও কায়স্থতে বিবাহ হতে পারে না—এটা আমাদের পক্ষে চিরপ্রচলিত স্বতঃসিদ্ধ, আজিকার ভুঁইফোড় নয়া আইন যাই বলুক। মজার কথা এই যে, এই মতবাদ শুধু গৌরীলাল ও নীলার মা, বাবা, আত্মীয়বর্গের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, তারা দু'জন নিজেও এই মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও খাঁটি সত্য। শত শত বৎসর ধ'রে এই মতবাদের মধ্যে আমরা আজন্ম প্রতিপালিত হয়েছি, আজ পার্লামেণ্টে নতুন আইন পাশ হলেই কি ক'রে তা রাতারাতি ত্যাগ করতে পারি? গৌরীলাল ও নীলাও জন্মাবধি রক্ষণশীল আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছে। তারাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বানিয়া কায়স্থ তরুণ-তরুণীর প্রেম পাপাচার ছাড়া কিছুই নয়। রিপুর তাড়নায় এ পাপ করতে বাধ্য হলেও তারা মনে মনে বোঝে যে নতুন আইনের পলস্তারা মেরে প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না।

গৌরীলালের সঙ্গে আলাপ করে তার মতামত যা বুঝতে পারলাম, তা সংক্ষেপে এই: "সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে আমরা পাপ-পঙ্কে ডুবেছি। তাঁদের মতামত যে ভুল, আমরা আমাদের চপল বুদ্ধিতে তা বলবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তাঁরা মহামান্য ব্যক্তি, সব সময়েই আমাদের নমস্য। সুতরাং তাঁরা যখন বলছেন আমাদের মিলন শাস্ত্র, নীতি, সমাজ এবং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তখন আমরা তা মানতে বাধ্য। এক্ষেত্রে রেজেষ্ট্রি অফিসে গিয়ে দু'টো সই করা আর গোমাংসে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করা—দুইই সমান নিরর্থক।"

এর পরেও আমি এদের সকলকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফল হয় নাই। যে ক্ষেত্রে সমাজ এবং সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত ব্যক্তি উভয় পক্ষই অপরাধ ও তার দণ্ডের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একমত, সেখানে তৃতীয় পক্ষ কি করতে পারে?
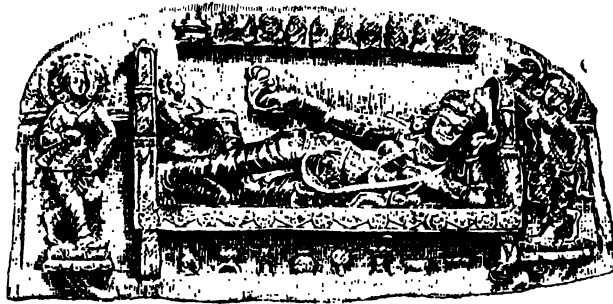
# সে নহি সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

এগার

আমেরিকা যাবার সময় দেববাণী একদিনও ভাবে নি দীর্ঘ দশ বছর তার বিদেশে কাটবে, জীবন এত অভিনব রূপে পল্লবিত হবে, অনাস্বাদিতপূর্ব সার্থকতার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। যে কাজ নিয়ে সে গিয়েছিল, সুফলপ্রসূ সাফল্য তাকে আরও বড় কাজের মধ্যে টেনে নিল; এমন সম্মোহনী আকর্ষণে বিজ্ঞান-সাধনায় সে ডুবে গেল যে, অতীত তাকে আর টানতে পারল না। কেমন করে মাসে মাসে বছর কাটল, বছরের পর বছর, তা সে টেরও পেল না। খোকনকে পাঠিয়ে দিল লণ্ডনে; চলল তার একাকী জীবনের নিশ্ছিদ্র সাধনা। বহুদূরে, দেশ-দেশান্তর, সাগর-সমুদ্রের ওপারে, দেববাণীর আশ্চর্য-বলিষ্ঠ জননী পরম আত্মত্যাগে তাকে উৎসাহ দিয়ে গেলেন, তার সার্থকতার গৌরবে তিনিও মেতে উঠলেন। তবু দেববাণী মা'র প্রতি পত্রে প্রচ্ছন্ন বেদনার, বিধাতার বিরুদ্ধে রুদ্ধকণ্ঠ নালিশের, সুর শুনতে পেত। দেববাণী বড় হচ্ছে, তার মান বাড়ছে, পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, বাসন্তী দেবী তাতে গর্বিত হলেও সুখী বা পরিতৃপ্ত নন। তাঁর অনেক আদরের, অনেক কামনা-ইচ্ছার প্রতিমূর্তি কন্যা যে সুখে, তৃপ্তিতে স্বামীর ঘর করতে পারল না, বিনা অপরাধে কঠিন কলঙ্ক চির-মলিন করে দিল তার শুচি-শুভ্র জীবনকে, বাসন্তী দেবী কিছুতে সে কথা ভুলতে পারেন না।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বছরে দেববাণী আংশিক সময়ের জন্যে জুনিয়র ক্লাসের টিউটর নিযুক্ত হল। দ্বিতীয় বছরে তার ডক্টরেট হয়ে গেল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবার সে পুরো সময়ের শিক্ষকতা পেল, সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রিসার্চের স্বকীয় দায়িত্ব। এক বছরে পেপের বিষ নিয়ে তার গবেষণা মার্কিন বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃতি পেল। চতুর্থ বছরে দেববাণী ম্যাসাচ্যুসেট্‌স্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার বৃহত্তর সুযোগ পেয়ে শিকাগো ত্যাগ করল।

তার মার্কিন প্রবাসের পঞ্চম বছরে হিমাদ্রি চলে গেল আমেরিকায়।

কলকাতা থেকে হিমাদ্রি দেববাণীর উল্লেখযোগ্য খবর নিয়মিত রাখত। চিঠিপত্রে তাদের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছিল। স্থাপিত হয়েছিল সুস্থির পারস্পরিক আস্থা ও নির্ভরশীলতা। কোন উচ্ছ্বাসের অতিরিক্ত উত্তাপ ছিল না তাদের বন্ধুত্বে। দেববাণী জানত, হিমাদ্রি তার পরম সুহৃদ্; নিজের কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ হিমাদ্রিকে সে পাঠাত। সমস্যায় পড়লে পরামর্শ চাইত। হিমাদ্রির অগোছাল পত্রের স্বল্প বাক্যগুলির মধ্যে দেব-বাণীর জন্যে অকৃত্রিম মমতা ঝিল্‌মিল্ করত। নিজের কথা হিমাদ্রি কখনও বিশেষ লিখত না। বরং তার 'খবর' দেববাণী পেত অনেক বেশি, মা ও দেবযানীর চিঠিতে। তাদের কাছে সে জানতে পেরেছিল, হিমাদ্রির সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজের কর্তৃপক্ষের বনিবনাও হচ্ছে না। হিমাদ্রিকে চিঠি লিখে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারে নি। কর্মব্যস্ত দিনরজনীর ফাঁকে ফাঁকে হিমাদ্রির জন্যে দুশ্চিন্তা একটুকরো কালো মেঘের মত তার মনের আকাশে জমা হয়ে উঠেছিল। এমন সময় একদিন দেব-বাণী 'তার' পেল হিমাদ্রির কাছ থেকে। সে নিউ ইয়র্কে আসছে। পৌঁছবার তারিখটাই কেবল জানিয়েছে হিমাদ্রি; দেববাণীকে ডাকে নি এয়ারপোর্টে দেখা করবার জন্যে। 'তার' পেয়ে দেববাণী অতিশয় উত্তেজিত হয়ে উঠল। উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে লাগল, হাঁটা-চলার গতি বেড়ে গেল, আচারে-ব্যবহারে কেমন ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখা দিল। ছাত্রছাত্রীরা অবাক্ হ'ল, কিন্তু নিজে সে বুঝতে পারল না, যতক্ষণ না একজন সহকর্মী বলে বসল, "আপনাকে একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে। নতুন কিছু আবিষ্কার করলেন নাকি?"

আবিষ্কার করল দেববাণী নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে। বিরাট্ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, বহু লোকের ভিড়। তাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে দেববাণী জায়গা নিয়েছে অপেক্ষমানদের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে। দশ-বারোখানা অতিকায় এরোপ্লেন বন্দরে দাঁড়াল, কোনটা ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, কোনটা কিছু আগে এসে নেমেছে। দেববাণীর মনে চাপা উত্তেজনা।

চতুর্দিকের জীবন্ত কোলাহলের কিছু তার কানে আসছে না; মানুষের দেহ-চাপা ভিড় তার কাছে অর্থ-

হীন। সে কান পেতে আছে আগত-প্রায় বিমানের উপস্থিতি ঘোষণার জন্যে। আকাশের বুকে উড়ন্ত বিমান খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চঞ্চল চোখ। হঠাৎ সে ঘোষণা শুনতে পেল সে-বিমান এক্ষুণি আসবে। ধূসর আকাশে আবিষ্কার করল তার সরব উপস্থিতি। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় কাটল আরও পাঁচ মিনিট। বন্দরের আকাশে বিমান দু'বার পাক খেল। তার পর চতুর্দিক্ কাঁপিয়ে নেমে এল ভূমিতে। দূর থেকে দ্রুত-গতিতে 'ট্যাক্সি' ক'রে বিমান এসে দাঁড়াল দেববাণীর অনতিদূরে। সিঁড়ি লাগল। যাত্রীরা একে একে নামতে সুরু করল। তাদের মধ্যে তিনজনকে হিমাদ্রি বলে ভ্রম করল দেববাণী। তার পর কম্পিত আনন্দে দেখল, সত্যিকারের জলজ্যান্ত হিমাদ্রি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে। মাথা-ভরতি এক ঝাঁক চুল, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, গলাবন্ধ মোটা পশমের কোট, দীর্ঘ ঋজু দেহ, ধীর, ভারী পদক্ষেপ।

হিমাদ্রি একবারও ভাবে নি ম্যাসাচ্যুসেটস্ থেকে দেববাণী নিউ ইয়র্ক আসবে তাকে স্বাগত করতে। তবু তার চোখ দু'একবার জনতার মধ্যে কার যেন অন্বেষণ করল। দেববাণীকে সে দেখতে পেলে না। হিমাদ্রি যখন একেবারে কাছাকাছি, দেববাণী তখন মুহূর্তে এক ভয়ানক নতুন সত্য হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল। আশ্চর্য আনন্দ, অসহ্য ব্যথা তার বুকে আচমকা জমে উঠে তাকে অভিভূত করে ফেলল। তার যুগপৎ ইচ্ছে হ'ল হিমাদ্রির কাছে, অনেক কাছে, গিয়ে দাঁড়ায়, হিমাদ্রির কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে, পালিয়ে যায়। ব্যথা-আনন্দের ভার বুক থেকে গলায় উঠে এল, দেববাণী বিস্মিত হয়ে দেখল, তার চোখ জলে ভরে গেছে। ভাগ্যিস্ হিমাদ্রি তাকে দেখতে পায় নি, তাই রুমালে চোখ মুছে ভিড় কেটে, সে নিঃশব্দে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

দেববাণীকে হঠাৎ দেখে এমন আশ্চর্য লাগল হিমাদ্রির যে, সহজে সে কথা বলতে পারল না। দেখতে পেল মুখের হাসি দেববাণীর চোখের জল সম্পূর্ণ গোপন করতে পারে নি।

দেববাণীর চোখে চোখ রেখে হিমাদ্রি অবশেষে বলল, "তুমি—আপনি এসে হাজির হলেন?"

"হলাম," আস্তে উত্তর দিল দেববাণী। "বিদেশে একা একা—" কথা শেষ করতে পারল না।

"শরীর ভাল আছে?" শুধাল হিমাদ্রি। "কবে ফিরতে হবে?"

"পরশু।"

"কাল তাহলে আছেন নিউ ইয়র্কে।"

"আজও আছি।"

"কোথায়? হোটেলে?"

"তিন শ' কুড়ি নম্বর ঈষ্ট ষ্ট্রীটে একটা ছোটমত হোটেলে উঠেছি। এরা বলে মোটেল।"

"আমি আপাতত ওয়াই. এম. সি. এ.-তে উঠব।"

"খুব দূরে নয়।"

"শরীর ভাল আছে?"

"কি মনে হচ্ছে দেখে?"

"ভালই ত মনে হচ্ছে। একটু যেন ফ্যাকাসে—"

"ফ্যাকাসে নয়, ফসা।"

"খোকন লণ্ডনে?"

"হ্যাঁ।"

"কাজকর্ম ত খুব ভাল চলছে, না?"

"মন্দ চলছে না।"

"দেশে ফেরার কথা মনে হয় না বুঝি?"

এবার হেসে ফেলল দেববাণী। বলল, "একবার 'তুমি' বলে ফেললে, 'আপনি' বলা কঠিন। তাই আপনি আমার সঙ্গে পরোক্ষে কথা কইছেন। আমাকে 'তুমি' বললে আপনার কোনও অন্যায় হবে না।"

হেসে ফেলল হিমাদ্রিও।

বলল, "তাই ভালো। অনেকদিন 'আপনি' বলেছি। এবার 'তুমি' সুরু করি। পরিচয় ত আজকের নয়।"

হাসি-খুশী দেববাণী প্রশ্ন করল, "এখানে চাকুরি নিয়ে এসেছেন?"

"তবে কি বেড়াতে? হার্ভার্ডে ভিজিটিং প্রফেসরের কাজ পাওয়া গেছে।"

"তবে নিউ ইয়র্ক নামলেন যে?"

"আমি লণ্ডনে যাঁর কাছে গবেষণা করেছি সেই প্রফেসর নভিট্‌নি এখন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে দেখা করে হার্ভার্ড যাব। কাজে যোগ দিতে আরও এক সপ্তাহ দেরি আছে।"

"তাহলে ম্যাসাচ্যুসেট্স্ হয়ে যান দু'এক দিনের জন্যে।"

"প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু কয়েকটা অসুবিধে আছে।"

"শুনি।"

"প্রথমত, ডলারের অভাব।"

"ইচ্ছের অভাব নেই ত?"

"খুব বেশি নেই," ব'লে হেসে ফেলল হিমাদ্রি।

"তাহলে তাই করুন। আমার কাজকর্ম একটু দেখে যান। শহরটাও বেশ। সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ হবে। তাছাড়া আমার একটি বান্ধবী আছে, নাম আইরীন, আইরীন পোর্টে। স্বামী ডাক্তার। শিকাগোয় আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এখন ওঁরাও এখানে। দুটো দিন আপনার ভালই কাটবে, কথা দিচ্ছি।"

"ভাল যে কাটবে তাতে সন্দেহ নেই।"

"তাহলে আসছেন ত?"

"এত তাড়া কিসের? এখনও ত পুরো দুটো দিন সময় আছে।"

"যান, আপনাকে ডাকছে। আপনার মালপত্র দেখা হয়ে গেছে। চলুন, তুলে নিয়ে বাইরে যাওয়া যাক। ওদের গাড়ীতেই শহরে পৌঁছান যাবে।"

হিমাদ্রি কাষ্টম্‌স্ দপ্তরে এগিয়ে গেল। দেববাণী হাসি চেপে ভাবল, 'তুমি' বলতে রাজী হয়েছে হিমাদ্রি, কিন্তু বলে নি এখনও।

প্রায় দুটো দিন নতুন আবেশে মুহূর্তে কেটে গেল দেববাণীর। হিমাদ্রিকে নিয়ে ট্যাক্সি ক'রে বিমান বন্দর ছাড়ার থেকে পরের দিন বিকেলে নিজের ম্যাসাচ্যুসেট্‌স্ রওনা হওয়া পর্যন্ত যতক্ষণ সম্ভব সে হিমাদ্রির সঙ্গে কাটাল। কত কথা বলল তার হিসেব নেই। এত কথা যে তার বলার ছিল, একজন মানুষকে এত কিছু যে বলা যায়, তা আগে কখনও দেববাণী জানত না। বিজ্ঞানের কথা, মার্কিন দেশের কথা, গোটা পৃথিবীর কথা সে বলে গেল অবিরাম। আর কত যে বলল নিজের কথা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে দেশের কথা অতৃপ্ত ক্ষুধায় সে জেনে নিল। মা'র ও দেবযানীর কথা শুনতে শুনতে চোখে জল এল দেববাণীর। হিমাদ্রি যখন বলল, "মাসীমাকে বললাম, আমার সঙ্গে চলুন, মেয়েকে দেখে আসবেন," সে পরম ব্যাকুলতায় বলে বসল, "সত্যি, নিয়ে এলেন না কেন?"

তার ছেলেমানুষিতে হিমাদ্রি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। "তিনি রাজী হলেন না।"

"মা এলে কিন্তু অতি সহজে মানিয়ে নিতে পারতেন।"

"পারতেন বৈ কি?"

"দেবযানীকে ফেলে আসেন কি করে?"

"শুধু কি দেবযানী? তোমার পাঠান টাকায় যে বাড়ী হচ্ছে তার ভারই বা কাকে দিয়ে আসবেন?"

"মা কি নিজেই সব দেখা-শোনা করছেন?"

"সব কিছু। আরকিটেক্ট নিযুক্ত করে প্ল্যান তৈরী থেকে নিজে দাঁড়িয়ে রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখা পর্যন্ত।"

"হাতিবাগান থেকে লেকের ধারে রোজ যেতে হচ্ছে তাহলে?"

"রোজ। স্কুল থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়েছিলেন এ জন্যে।"

"বাড়ীটা ত শেষ হয়েছে, না?"

"খুব সুন্দর দোতলা বাড়ী হয়েছে। গৃহ-প্রবেশের দিন আমি গিয়েছিলাম। মাসীমার সে কি রূপ! চোখে জল, মুখে হাসি।"

গম্ভীর হয়ে গেল দেববাণী। "মা বললেন না, যার ঘর-সংসার নেই, বিদেশে একা একা পচে মরছে, তার আবার বাড়ী!"

"ঐ ধরণের কিছু একটা বলেছিলেন, মনে পড়ছে।"

"দেবযানীর বিলেত যাবার সব ঠিক হয়ে গেছে?"

"এত দিনে হ'ল। মাকে একা ফেলে কিছুতেই যেতে চাইছিল না। তোমার তাগাদায় অনেক কষ্টে রাজী করান গেল।"

"বেচারী মা।" ভারী গলায় দেববাণী বলল, "একেবারে একা হয়ে যাবেন।"

"কিন্তু কি সৎসাহস! জোর করে দেবযানীকে রাজী করালেন শেষ পর্যন্ত!"

"আমার মা'র সত্যি তুলনা হয় না।"

"ওঁর খুব ইচ্ছে তুমি কলকাতা ফিরে যাও। কিন্তু কখন তা প্রকাশ করতে চান না। বলেন, দূরে আছে, বেশ আছে। এখানে এলেই—।"

বলতে পারল না হিমাদ্রি।

"জানি।" আস্তে আস্তে বলল দেববাণী। "আমাকেও তাই লেখেন। মা'র ধারণা, দেশে ফিরলে অতীত আমাকে আবার ঘিরে ধরবে। আত্মীয়-বন্ধুরা সবাই মিলে কিছুতেই আমায় ভুলতে দেবে না। আমার কাজকর্মের কোন মর্যাদা তারা দিতে চাইবে না। তাদের কাছে আমি হয়ে দাঁড়াব স্বামী-বিবর্জিতা অভাগা রমণী।"

"অমন কিছু একটা ভয় তাঁর আছে।"

"আমার আরও কি মনে হয় জানেন?" দেববাণী ধীরে ধীরে বলল। "মনে হয়, মা-ও আমার অতীতটাই বড় ক'রে দেখবেন। এ জন্যেও তিনি আমার দেশে ফেরবার পক্ষপাতী নন।"

হিমাদ্রি অন্যমনস্ক হয়ে মন্তব্য করল, "তা হবে।"

টাইম্‌স্ স্কোয়ারে বিকেল বেলা দু'জনে ব'সে কথা

হচ্ছিল। চতুর্দিকে নরনারীর মিছিল। ছেলেমেয়েরা বাহুতে বাহু বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা ভালবাসে তারা প্রকাশ্যে ভালবাসছে। এমনি একটি যুগল ওদের কাছাকাছি এসে বসল। বসবার একটু পরেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'ল।

দেববাণী হিমাদ্রিকে বলল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"করে ফেল।"

"আপনি কোনও দিন এ বিষয়ে কিছু বলেন নি।"

"কোন্ বিষয়ে?"

"আমার অতীত নিয়ে।"

"আমি?" হিমাদ্রি অপ্রস্তুত হ'ল। "আমি কি বলব?"

"আপনিও কি আমার অতীতকেই বড় করে দেখেন?

"না ত!"

"সত্যি বলছেন?"

"নিশ্চয় সত্যি বলছি। যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানর কোন মানে নেই। তা ছাড়া—"

"তাছাড়া কি?"

"তোমার অতীতের চেয়ে তুমি অনেক বড় হয়ে উঠেছ।"

"কি জানি?" মাটির দিকে চোখ রেখে দেববাণী আপন মনে বলল, "কি জানি? যে ভুল একদিন করেছি, তাকে ছাপিয়ে উঠবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তার জন্য দামও কম দিই নি। তবু বুঝতে পারি তার সব ক্ষতগুলি এখনও শুকোয় নি। হয়ত কোনও দিন শুকোবে না।"

রাত্রে ওরা একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় আহার করল। অনতিপ্রসর রেস্তোরাঁ, সহরের অপেক্ষাকৃত জৌলুসহীন অঞ্চলে। কাউণ্টারের ডান পাশে বাজনা বাজছে। কাছাকাছি উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে একটি স্বল্পবসনা মেয়ে গান গাইছে। বিভিন্ন টেবিল ঘিরে আন্তর্জাতিক মানুষের জটলা। একদল নরনারী গান ও বাজনার সঙ্গে নাচছে। দেববাণী ও হিমাদ্রির এসব কিছু চোখে পড়ছে না। তাদের কথা এখনও শেষ হয় নি।

"পৃথিবীটা কি ভয়ানক আশ্চর্য," হিমাদ্রি বলছে। "এই ত পরশু আমি ছিলাম কলকাতা। আজ আমি নিউ ইয়র্ক। এইটুকু মাত্র সময়ের ব্যবধান। অথচ কলকাতা আর নিউ ইয়র্ক, যেন দুই পৃথিবী।"

"আমারও এদেশে এসে তাই মনে হ'ত। মনে হ'ত, মানুষে মানুষে কত প্রভেদ, কত তফাৎ! পৃথিবীর এখনও বহু বছর লাগবে নিজেকে চিনতে, জানতে, বুঝতে। বিজ্ঞান হঠাৎ পৃথিবীকে অত্যন্ত ছোট ক'রে ফেলেছে, কিন্তু ভূগোলের দূরত্বই কমিয়েছে, মানুষের মনের দূরত্ব কমাতে পারে নি।"

"ইতিহাসের কতগুলি যুক্তিহীন নিষ্ঠুর নিয়ম আছে।" হিমাদ্রি বলল। "একটা হচ্ছে, মানুষ বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে মানুষকে যতটা জানে, তার চেয়ে বেশি জানে শত্রুতার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ যতটা পৃথিবীকে ছোট করেছে, শান্তি তার অর্ধেকও পারে নি। দেখছ না, আমেরিকা আর রাশিয়া শান্তিতে একে অন্যের চেয়ে হাজার হাজার মাইল তফাৎ ছিল, হঠাৎ যুদ্ধের চাপে মিত্র হ'ল। যুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পুনরায় মূষিক। কিন্তু ততক্ষণে এমন চমৎকার জানা-চেনা হয়ে গেছে যে, নতুন শত্রুতায় পর্যন্ত গা ঘেঁসাঘেঁসি না ক'রে উপায় নেই।"

"অথচ আমার বড় আশ্চর্য লাগে!" দেববাণী যোগ দিল, "দেশে দেশে, সভ্যতা-সভ্যতায় ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষে-মানুষে কিন্তু সুন্দর মিল হয়ে যায়। আমেরিকানদের কথাই ধরুন। ভারতবর্ষকে এরা জানে না, বোঝে না, জানবার ইচ্ছে নেই, বোঝবার ক্ষমতা নেই। ওরা রাশিয়া নিয়ে এমন মেতে আছে যে, সমগ্র পৃথিবীর দেশগুলোকে বিচার করবে মাত্র এক মাপকাঠিতে: রাশিয়ার পক্ষে, না বিপক্ষে। ভারতবর্ষকে ত এরা কম্যুনিস্ট ব'লে প্রায় বর্জন ক'রে রেখেছে। তবু আমি ভারতবর্ষের একটি মেয়ে, আমাকে এরা যে সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে তা সত্যি অভাবনীয়।"

"তোমার বুঝি অনেক বন্ধু-বান্ধবী হয়েছে এদেশে?"

"পাঁচ বছর আছি এদের মধ্যে। খুব একটা মেশবার সময় পাই নি, আগ্রহও অনুভব করি নি। কিন্তু তবু বন্ধু-বান্ধবী একেবারে নেই তা নয়। যাঁদের কাছে কাজ করেছি তাঁরা অকৃত্রিম স্নেহ, অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন; সহকর্মীরা কখনও বিশেষ নির্দয় হন নি, ছাত্র-ছাত্রীরা খুব একটা কষ্ট দেয় নি। আইরীন ব'লে যে মেয়েটির নাম করেছি, সে আমায় সত্যি ভালবাসে।"

"আমি দু'বছর লণ্ডনে ছিলাম। কলেজের বাইরে কারুর সঙ্গে ভাব হয় নি।"

"আপনার পক্ষে সব সম্ভব।"

"ইংরেজের সঙ্গে আলাপ হয় আবহাওয়া দিয়ে। ভাব জমাতে যে কাঠখড় পোড়াতে হয় তার বদলে ব্রিটিশ মিউজিয়মে সময় কাটান অনেক বেশি লাভজনক।"

"কোন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় নি আপনার?"

প্রশ্ন ক'রে দেববাণী ভাবল, নিউ ইয়র্কে ব'সেই এটা সম্ভব হ'ল। কলকাতায় হিমাদ্রিকে কোনও দিন এ প্রশ্ন সে করতে পারত না।

"কেন? মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তে যাবে কেন?"

"বাঃ। ছেলেদের ত মেয়েদের সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব হয়ে থাকে।"

"ও, সেকথা! না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি।"

"খুব একটা আপশোস থেকে গেছে দেখতে পাচ্ছি।"

"আপশোষ ক'রে লাভ নেই। সবার ভাগ্যে সব কিছু হয় না। আমার চেহারা দেখেই মেয়েরা ভয় পায়।"

"তা পেতে পারে।"

"তুমি কিন্তু খুব ভয় পাও নি।"

"আপনি কিচ্ছু জানেন না। পেয়েছিলাম।"

"ভয় ভেঙ্গে গেছে?" হেসে প্রশ্ন করল হিমাদ্রি।

"কি জানি? অন্ততঃ কলকাতা থেকে যেদিন চ'লে আসি সেদিন পর্যন্ত ভাঙ্গে নি।"

"কেন? ভয় কিসের? আমি ত নিজেকে ভয়ংকর মনে করি নে।"

"সে আপনি বুঝবেন না।"

হিমাদ্রি কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোনও কথা নেই। যখন সে কথা বলল, যেন সে অনেক দূরে।

"আমাকে ভয় করার মত কিছু নেই। আমি খুব একটা কারুর কাছে যেতে পারি নে। ছোটবেলা মা মারা যাওয়ার জন্যেই বোধ হয় আমি কেমন নিঃসঙ্গ, একা। বাবা আমাকে বড় ভালবাসতেন। কিন্তু কোনও দিন খুব কাছে টানেন নি। তিনিও আমার অল্প বয়সে মারা যান। তাই আমার নিঃসঙ্গতা কোনও দিন ঘুচল না। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি ভয়ংকর কিছু। সবার মত আমারও সব কিছু আছে।"

হিমাদ্রি যে এ ধরনের কথা বলতে পারে দেববাণীর জানা ছিল না। সে দেখল, হিমাদ্রির বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দু'টি কাঁপছে।

দেববাণী বলল. "আপনার মন যে কত বড় তা আর কেউ না হোক আমরা জানি। আমার জন্যে আপনি যা করেছেন তা আর কেউ করতে পারত না।"

"ওসব কোনও কাজের কথা নয়।" প্রতিবাদ করল হিমাদ্রি। "তোমার জন্যে আমি কিছু হয়ত করেছি। সেটুকু জীবনে তোমার পাওনা ছিল; আমি না করলে আর কেউ করত।"

"মা বলতেন, হিমাদ্রি তোর জীবনে ভগবানের আশীর্বাদ।"

"মা-রা ওরকম বলে থাকেন। আমার মা নেই, থাকলে তিনিও তোমার সম্বন্ধে অমনি কিছু একটা বলতেন।"

বুক কেঁপে উঠল দেববাণীর।

"আমার সম্বন্ধে? কেন? আমাকে নিয়ে ত বলার কিছু নেই! আপনি দিয়েছেন, আমি নিয়েছি। আমার কিছু দেবার নেই জেনেই আপনি দিয়েছেন। তাতে আমার ঋণ আরও বেড়েছে।"

"তোমাকে তুমি কিছুই জান না, দেববাণী।" হিমাদ্রি এই প্রথম দেববাণীকে নাম ধ'রে ডাকল। "তোমার দেবার অনেক কিছু আছে। তুমি কাউকে ঋণী কর নি।"

"কি বলছেন আপনি? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আজ না পারছ, কাল পারবে। চল রাত অনেক হ'ল। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

হিমাদ্রিকে ওয়াই. এম. সি. এ-তে পৌঁছে দিয়ে দেববাণী যখন হোটেলে ফিরল রাত তখন এগারটা। সারাদিনের ঘোরাঘুরি ও উত্তেজনায় তারও দেহমন ক্লান্ত। বিছানায় শুয়ে, তথাপি ঘুম এল না। পাঁচ বছর পর হিমাদ্রিকে কাছে পেয়ে মন তার পুলকিত, কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল, এ পুলক কেবল হিমাদ্রিকে পেয়ে নয়, হিমাদ্রির মধ্যে মা-কে পেয়ে, বোনকে পেয়ে, স্বদেশকে পেয়ে। হিমাদ্রি এসেছে ভারতবর্ষকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর আমেরিকায়। তার মধ্যে জীবন্ত সে নিজে, শহর কলকাতা, বাংলা দেশ, জননী বাসন্তী দেবী, দেবযানী। তার মধ্যে দেববাণী পেয়েছে ডাঃ বসাককে, অধ্যাপক ভাদুড়ীকে, আরও কত পরিচিত-পরিজনকে। রজনীর অন্ধকারে তারা সবাই নিদ্রাহীন দেববাণীকে ঘিরে দাঁড়াল। চোখের সামনে ভেসে উঠল একান্ত আপনার কত মুখচ্ছবি। সামনে এসে দাঁড়ালেন মা, পাশে দেবযানী, ঐ ত একটু দূরে চেয়ারে বসে ডাঃ বসাক, আর কি আশ্চর্য, সবাইকে ছাড়িয়ে সব কিছুকে আড়াল করে, দীর্ঘ-দেহ বিরাট পুরুষ হিমাদ্রি। লণ্ডন থেকে ছুটে এসে খোকন দাঁড়াল হিমাদ্রির পাশে, হাত ধ'রে। মনে মনে সুগভীর তৃপ্তির হাসি হাসল দেববাণী। পাঁচ বছরে কি ভীষণ বদলে গেছে হিমাদ্রি! কানের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে, কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে যে পরিবর্তন হিমাদ্রির, তা যেমন সুন্দর তেমন ভয়াবহ। দেববাণীর মনে হ'ল, পাঁচ বছর

পরে একটা বড় কিছু সংকল্প নিয়ে হিমাদ্রি এসে আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছে, চাকরি করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। প্রথম দিনেই দেববাণী তার মধ্যে নতুন উত্তেজনা লক্ষ্য করেছে, তার সঙ্গে নতুন কোন সংকল্পের সুস্থির আত্মবিশ্বাস। সে যেন হঠাৎ অনেক উঁচু থেকে মাটিতে নেমে আসতে চাইছে, দীর্ঘ দূরত্ব কাটিয়ে চাইছে কাছে আসতে। হিমাদ্রিকে রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ দেববাণী আজই যেন প্রথম ভাবতে পারছে। যাকে মনে হয়েছে হিমাচলের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মবলিষ্ঠ, সে যেন নিজে থেকে ধরা দিতে চাইছে তার এতদিনের গোপন-সংরক্ষিত সবটুকু দুর্বলতা নিয়ে। হিমাদ্রির এই নতুন পরিচয়ে দেববাণী যেমন পুলকিত হ'ল, তেমনি এক অজানা, অচেনা ভয় এসে তার মনে ভিড় করল। যার গম্ভীর দূরত্বে দেববাণী বিনা কারণে ব্যথিত হ'ত, তার কাছে আসার প্রেম ইঙ্গিতে আজ সে শঙ্কিত হ'ল। এতগুলি বছর কেটে গেছে কেবল কর্মের তাড়নায়, শুধু নিজের প্রতিষ্ঠা তৈরীতে, ব্যর্থ-ম্লান অতীতের আস্তিত্ব দূর ক'রে স্বকীয় মর্যাদায় পুনঃস্থাপিত জীবন গড়তে; এর মধ্যে নিজের নারী-চিত্তের সঙ্গে বোঝাপড়া'র সময় বা প্রয়োজন হয় নি। অনিবার্য নিয়মে নিভৃত-অবসরে মন তার যদি-বা কখনও কোন ঈষৎ চপল কল্পনায় সামান্য রঙিন হয়ে উঠেছে, সে কোমল বিলাসটুকু নিয়ে সংগোপনে আক্রমণের অবকাশ পর্যন্ত জোটে নি। অথচ আজ রাত্রির ফিকে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে দেববাণী দেখতে পেল, অবাধ্য চিত্ত তার গোপন অসংযমে কত কিছু প্রগলভ কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে! ক্রিস্ট্যাল আর গিনিপিগ্, সাপের বিষ আর লেবরেটরী, মোটা মোটা বই আর রাশি রাশি ম্যাগাজিন: এসবের বাইরেও যে দেববাণী নারী, তার আদিম মানবিক কামনা যে এখনও অতৃপ্ত, সে যে এখনও বৈজ্ঞানিক সার্থকতার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে নারী-জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে নীরব আগ্রহে অপেক্ষা করছে, এই কঠিন, নিষ্ঠুর, ভয়ানক সত্য আবিষ্কার ক'রে তার দেহ কম্পিত হ'ল, হৃদয় অশান্ত-অস্থির।

এক বছর ধ'রে দেববাণী নিজের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করল। এর মধ্যে তিন বার দেখা হ'ল হিমাদ্রির সঙ্গে; বন্ধুত্ব তাদের আরও জোরালো হ'ল। কিন্তু দুজনেই এক অদৃশ্য মতৈক্যে চরম সংঘাত এড়িয়ে গেল। এর মধ্যে ছ' মাসের নিমন্ত্রণে দেববাণী চলে গেল লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াতে। লণ্ডনে খোকনকে সে আবার কাছে পেল দীর্ঘদিন। রিজেণ্ট পার্কের কাছাকাছি একটি ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে খোকনকে সে নিজের কাছে রাখল। দ্রুত-বর্ধমান পুত্রের সঙ্গে নানা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে খোকনকে গভীর ভাবে বুঝতে চেষ্টা করল দেববাণী। কিন্তু যেখানে ভয়ে সে প্রবেশ করতে পারল না, সেই খোকনের সবচেয়ে নরম অবচেতন তার অজানাই রয়ে গেল। দেববাণী শুধু আতঙ্কের সঙ্গে অনুভব করল, তার মাতৃত্ব ও নারীত্ব একই ধারায় প্রবাহিত; হিমাদ্রিকে সে গ্রহণ করতে পারবে না, যদি খোকন তাকে গ্রহণ না করে। হিমাদ্রিকে খোকন ভালবাসে; কিন্তু দেববাণী জানে, হিংসাও করে। হিংসা করে মায়ের বন্ধু হিমাদ্রিকে। খোকনের বালক-মনে হয়ত ভয় জমে আছে, একদিন হিমাদ্রি মাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। এই কচি বয়সেই সে এমন সতর্ক যে, কখনও কথাবার্তায় এ ভয়ের আভাস মাত্র মাকে সে জানতে দেয় নি। অথচ মা'র মুখে হিমাদ্রির কথা শুনলেই তার চোখে-মুখে অঙ্গ-ভঙ্গিতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত কাঠিন্য ধরা পড়ত যে দেববাণীর বুকের স্পন্দন যেত থেমে, হাত-পা আসত অবশ হয়ে! অথচ নিজে সে হিমাদ্রির কথা বলতে ভালবাসত, হিমাদ্রির চিঠি দেববাণীকে পড়ে শোনাত, তার উপহার জার্মান ক্যামেরায় ছবি তুলতে উৎসাহের অন্ত ছিল না। লণ্ডন-প্রবাসে দেববাণী পরিষ্কার বুঝল, হিমাদ্রি যদি কোনও দিন তার চরম দাবী ঘোষণা করে, তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যে-বয়সে খোকন বুদ্ধিজাত ঔদার্যের সঙ্গে মা'র নিঃসঙ্গ জীবনের দারিদ্র্য বুঝতে পারবে, সেদিনের অপেক্ষায় দেববাণীর দেহে বার্ধক্য আসবে, জীবনের উত্তাপ যাবে স্তিমিত হয়ে।

খোকন যদি তার বাবার কথা মন খুলে জিজ্ঞেস করত, দেববাণীর পক্ষে হয়ত সম্ভব হ'ত তাকে সঙ্গে ক'রে হিমাদ্রির পাশে দাঁড়ান। কিন্তু দেববাণীর মনে পড়ে না, খোকন কোনও দিন তার বাবাকে নিয়ে প্রশ্ন করেছে। শিশু বয়সেই সে বুঝে নিয়েছিল, তার বাবাকে নিয়ে ভীষণ একটা গোলমাল; নিঃশব্দে সে অত বড় প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেছে। তার পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত কলকাতার বাসায় দেববাণীর জীবনে বিভীষিকার মত হঠাৎ উদয় হয়ে যে পুরুষটি সবকিছু লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে গেল, তার প্রসঙ্গ উত্তেজনা ও কটুভাষণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নি এমন দিন বড় যায় নি। খোকন সে-সব আলোচনা নীরবে শুনেছে; যতটুকু তার শিশুমন বুঝতে পেরেছে তাতে সে জেনেছে, তার বাপকে ঘিরে একটা ভীষণ

কুৎসিত কলঙ্ক জমাট হয়ে রয়েছে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে খোকন যে, তার পিতৃ-পরিচয় নেই, সে কেবল মায়ের সন্তান। হয়ত আরও বুঝেছে, যে-বাবাকে সে চেনে না, জানে না, তারই জন্যে মাকে পেতে হয়েছে নিদারুণ লাঞ্ছনা। সব বুঝে-শুনে সে নিজেই নিজের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করেছে। বাবার কথা কোনও দিন তোলে নি মা'র কাছে।

কিন্তু দেববাণী জানে, বাবার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত অস্তিত্ব খোকন বিস্মৃত হয় নি। শিকাগোয় একদিন দেববাণী কলেজ থেকে ফিরে হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল, খোকন একখানা ছবি নিয়ে তন্ময় হয়ে ব'সে আছে। ছবিটা দেববাণীর বিয়ের পরে তোলা, স্বামীর সঙ্গে। জীবন থেকে স্বামীকে পূর্ণ নির্বাসন দিয়েও কেন যেন ছবিটা সে ফেলতে পারে নি। নব-বিবাহিত নিজের আবেশ-ঘন পরিতৃপ্ত মুখখানাই বোধ হয় তাকে আকর্ষণ করেছে। ফেলতে গিয়ে মনে হয়েছে, থাক, এ ত আমারই জীবনের এক পরম মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি, যা একেবারে মিথ্যে হয়ে গেল তাও যে একদিন সত্যি ছিল, তার স্মারক হিসাবে এ ছবিটা থাক। আমেরিকা যাবার সময় একটা বই-এর মধ্যে ছবিটাকে সে রেখে দিয়েছিল। তার পর ভুলে গেছে। সে বই থেকে ছবিটা মেঝেয় পড়েছিল; দেববাণী ঘরে ঢুকে দেখল, খোকন তাই নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে।

প্রথম কিছুটা আঁৎকে উঠল দেববাণী, কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, অনেক দিন সে যে-সুযোগের সন্ধানে ছিল তার হঠাৎ উপস্থিতি ভালই হ'ল। যে বস্তুতে খোকন গভীর মনোনিবেশ করেছিল, দেববাণী তা নিয়ে কোনও কৌতূহল দেখাল না। আলতো আদরে খোকনকে একবারটি ডেকে সে সোজা স্নানঘরে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল, ছবি খোকন সরিয়ে ফেলেছে, অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

এ সময় রোজ দেববাণী খোকনকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসত। সেদিনও তাই করল। ফিরে এসে দেববাণী চটপট্ রাত্রের খাবার তৈরী ক'রে নিল। খোকনকে নিয়ে খেতে বসে হঠাৎ একসময়ে প্রশ্ন করল, "খোকন, তুমি কার ছবি দেখছিলে?"

দেবকুমার এমন হতভম্ব অপরাধী চোখে তাকিয়ে রইল যে, দেববাণীর বুক ব্যথায় টন্‌টন্ করল।

"ওটা কার ছবি তুমি জান?"

দেবকুমার মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে।

"নিয়ে এসো ত ছবিটা।"

স্পষ্ট অনিচ্ছায় দেবকুমার উঠে একটা বই থেকে ছবিটা নিয়ে এল।

ছবিতে নিজেকে লক্ষ্য ক'রে দেববাণী বলল, "একে চিনতে পারছ।"

দেবকুমার আবার ঘাড় নাড়ল।

"তোমার মা তখন কেমন কচি ছিল, না?" দেববাণী ব্যাপারটা লঘু করবার প্রয়াস পেল। "এখন কেমন বুড়ী হয়ে গেছে।"

দেবকুমার একবার ছবির দেববাণীকে আর একবার মাকে তাকিয়ে দেখল।

"ছবিতে অন্য লোকটিকে তুমি চেন?"

মাথা নাড়ল দেবকুমার। সে চেনে।

"কে বল ত?"

"বাবা।"

এমন আশ্চর্য অদ্ভুত লাগল ছেলের কণ্ঠে এই অনুচ্চারিত-পূর্ব শব্দ যে, দেববাণীর মুখে আর কোন কথা বেরুল না। খোকনের মুখে 'বাবা' ডাক প্রস্ফুটিত হবার আগেই দেববাণীকে স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে হয়েছিল। আজ সে প্রথম বুঝতে পারল, জীবনে কত বড় রোমাঞ্চ থেকে সে চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত হয়ে গেছে।

লণ্ডন থেকে দেববাণী বড় বিষণ্ণ মন নিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেল। তার আসল সমস্যা আরও জটিল হয়ে তাকে ঘিরে ধরল। জীবনের কোনও সমস্যা থেকে পালিয়ে যাবার মনোভাব তার ছিল না, তাই কর্মের অবসরে এ চরম সমস্যা তাকে পেয়ে বসল। শেষে এমন অবস্থা হ'ল দেববাণীর যে, নিজের মধ্যে নিজেকে সে আর আটকে রাখতে পারল না। হিমাদ্রির সঙ্গে বোঝাপড়া করার তাগিদে অস্থির হয়ে উঠল।

কি জানি কোন্ যাদুমন্ত্রে হিমাদ্রি বুঝি দেববাণীর অবস্থা জানতে পেরেছিল। তাই কোনও কিছু অগ্রিম সংবাদ না দিয়ে এক সপ্তাহ-শেষে এসে হাজির হ'ল দেববাণীর সামনে।

কলেজের লেবরেটরীতে কাজ করছিল দেববাণী। শনিবারের উত্তীর্ণ বিকেল। হিমাদ্রি সোজা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

অবাক্ হয়ে দেববাণী প্রশ্ন করল, "আপনি! আপনি এভাবে হঠাৎ?"

স্মিতমুখে হিমাদ্রি বলল, "হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল।"

"খুব ভাল করেছেন। ক'দিন ধ'রে আমি বড্ড ভাবছিলাম আপনার কথা।"

"অথচ আজ দেড় মাস হ'ল চিঠিও লেখ নি।"

"দেড় মাস ? আমি ত ভাবছিলাম দেড় বছর !"

"ব্যাপার কি ? তোমাকে এত ক্লান্ত, বিষণ্ণ লাগছে ন ?"

"জানি না। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।"

"কোথায় যাবে ?"

"আমার ঘরে চলুন। আপনার সঙ্গে আমার অনেক থা আছে।"

"চল। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা ছে।"

কলেজের কাছেই দেববাণীর দুই-কামরার ছোট্ট াট। পথে দু'জনে কোন কথা হ'ল না। লিফ্‌টে উঠে চতুর্দশ তলায় ওরা নিষ্ক্রান্ত হ'ল। দেববাণী চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলল।

ভেতরে ঢুকে বলল, "বসুন। আমি একটু মুখ-হাত ধুয়ে আসি।"

"দেরি ক'রো না।"

"আপনি কিছু খাবেন ত ? নিশ্চয় ক্ষিধে পেয়েছে।"

'ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত পেলে খাই।"

"পেলে আমিও ছেড়ে দি' না। আপাতত ফ্রিজ খুলে স্যাণ্ডউইচ্ নিয়ে নিন। আমি এসে কফি বানাব।"

"তুমি এস। একসঙ্গে যাহোক খাওয়া যাবে।"

দেববাণী স্নানঘরে গিয়ে শুধু হাত-মুখ ধুলো না, সাড়ীও বদল করল। আয়নায় তাকিয়ে দেখল, সত্যি বড় ক্লান্ত, শুকনো, মলিন হয়ে গেছে সে। মুখে মৃদু প্রসাধন করল।

ঘরে ঢুকে দেখল হিমাদ্রি জানলার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

"খুব দেরি হ'ল ?"

"অ্যাঁ! না, খুব আর কি ?"

"দাঁড়ান, কফির জল এক্ষুনি হয়ে যাবে।"

"তুমি যে বললে অনেক কথা আছে।"

"আছেই ত। তার আগে একটু কফি পান করা যাক। গায়ে জোর হবে।"

দু'জনে কফি খেল স্যাণ্ডইচের সঙ্গে। কিচেনে গিয়ে হিমাদ্রিও পেয়ালা-প্লেট ধুয়ে রাখল।

"বিদেশের আদব-কায়দা সব শিখে গেছেন দেখছি।"

"লঙ্কায় গেলে রাবণ হতে হয়, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি।"

বসবার ঘরে ফিরতে ফিরতে দেববাণী বলল, "আপনার যে একটা ছোটবেলা ছিল সহজে তা ভাবা যায় না।"

"আমি বুঝি জন্মেই ঘটোৎকচ ?"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে দেববাণী বলল, "না, না, তা বলছি না।"

দু'জনে হঠাৎ একসঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল।

নীরবতা ভেঙ্গে হিমাদ্রি বলল, "কি অনেক কথা আছে তোমার, এবার বল।"

দেববাণী উত্তর দিল, "আপনারও ত অনেক কিছু বলার আছে, আপনি আগে বলুন।"

দু'জনে আবার একসঙ্গে নীরব হ'ল।

হঠাৎ হিমাদ্রি গম্ভীর ভারী গলায় ব'লে উঠল, "তুমি যখন বলবে না, তখন আমিই বলি। অনেক কথা আমার বলবার নেই, দেববাণী। শুধু একটা কথা বলবার আছে। আজ বলব। আজকের জন্যে আমি বহুদিন, বহুবছর নিজেকে তৈরী করেছি। অনেক ভেবেছি, অনেক বিচার করেছি। ভেবে, বিচার ক'রে বুঝতে পেরেছি, না বলার কোন মানে হয় না। তাই আজ বলতে এসেছি।"

দেববাণীর শরীর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

হিমাদ্রি ব'লে চলল, "আমি আমার কথা যত না ভেবেছি, তোমার কথা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক বেশি। ভেবে ভেবে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, নিজেকে এমনি ক'রে আমার কাছ থেকে দূরে রাখবার অধিকার তোমার নেই। প্রয়োজনও নেই।"

দেববাণীর মনে হ'ল, আশ্রয় না পেলে সে এক্ষুনি এলিয়ে পড়বে। শক্ত ক'রে চেয়ারের হাতল সে চেপে ধরল।

হিমাদ্রি গুরু-গম্ভীর বেদনায় ব'লে চলল, "তুমি চ'লে আসবার পর পাঁচ বছর আমি তোমার কথা ভেবেছি। তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যেই আমি এদেশে চ'লে এসেছি! তাও আজ এক বছর হয়ে গেল। অনেকবার ভেবেছি তোমায় বলব ; কিন্তু তোমার কাছে এলে মনে হয়েছে, তুমি অন্তর্দ্বন্দ্বে কষ্ট পাচ্ছ, মীমাংসায় পৌঁছতে পার নি। তোমাকে আরও সময় দিয়েছি। এমনি ক'রে আমাদের জীবনের অবশিষ্ট মূল্যবান্ দিন-গুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ আমি এসে হাজির হয়েছি তোমার কাছে। আর নষ্ট করবার মত সময় নেই, দেববাণী।"

তার কামনা-কাতর চোখের পানে তাকিয়ে দেববাণী দুর্বল স্বরে প্রশ্ন করল, "কি চান আপনি ?"

"আমি তোমাকে চাই," মেঘমন্দ্রিত ধ্বনি করল হিমাদ্রি। "আমি তোমাকে চাই।"

দেববাণীর দু'গাল বেয়ে অশ্রু নামল।

"আমার কি আছে আপনাকে দিতে পারি ?"

"আমার কাছে তোমার সব আছে। আমি তোমার সবটুকু চাই। তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তোমার গৌরব, তোমার কলঙ্ক; তোমার বিজয়, তোমার পরাজয়। আমি তোমার কিছু বাদ দিয়ে তোমাকে নেব না, দেববাণী। তুমি এ নিয়ে কোনও সংশয় ক'রো না।"

"কিন্তু আপনি জানেন না, কি ভয়ানক নিঃস্ব, দরিদ্র আমি।" দেববাণী আর্তনাদ ক'রে উঠল। "মেয়েরা যা দিয়ে ধন্য হয় তার কিছু আমার নেই।"

"ওটা তোমার ভারতীয় সংস্কার, দেববাণী।" হিমাদ্রি নিঃসংশয়ে অভিমত দিল। "আজকের দিনে কুসংস্কার। এত বছর বিদেশে আছ, এখনও তোমার চোখ খুলল না ? জীবন কখনও একেবারে শেষ হয় না, দেববাণী। বার বার সে নতুন ক'রে পল্লবিত হয়। তোমার যা নেই, তা আমি চাই নে। তোমার যা আছে তাই চাই।"

দেববাণী বলল, "আপনি আমার আসল সমস্যা জানেন না।"

"জানি। তোমার আসল সমস্যা খোকন।"

"খোকন নয়, খোকনের মা। আমার বড় সমস্যা, আমি মা। আরও সমস্যা আছে, তাদেরও সমাধান আমি ক'রে উঠতে পারি নি। কিন্তু যখন, যদি-বা, পারব, তখনও এই বড় সমস্যা থেকেই যাবে।"

"খোকন আমাদের দু'জনের হতে পারে না, দেববাণী ?"

"পারে, কিন্তু হবে না। হতে চাইবে না।"

"কেন ? খোকন ত আমায় ভালবাসে !"

"বাসে। হিংসেও করে।"

"ওকি ওর—"

"বুঝতে পারি না। মুখ ফুটে বাবার কথা কখনও বলে না। কিন্তু মনে যে ওর কি, মা হয়েও আমি জানতে পারি না।"

"কিন্তু খোকন ত বড় হচ্ছে, আজ না হলে কাল সে বুঝবে। একদিন সে নিজেও যখন ভালবাসবে, বিয়ে করবে, তখন তোমার শূন্য জীবনের কথা ভেবে তার দুঃখ হবে। তুমি যদি খানিকটা পূর্ণতা পাও, আজ না হলেও কাল সে তোমায় পরিষ্কার মনে গ্রহণ করবে।"

"কিন্তু আজ ! একরত্তি শিশুকে আমি বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি। জন্মে অবধি ওর একান্ত আপনার বলতে কেবল মা। আমিই একমাত্র ওর স্নেহের বন্ধন। কোনও কারণে এ বাঁধনও যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে খোকন দাঁড়াবে কি ক'রে ? হয়ত সে নোঙরহীন হয়ে জীবনের স্রোতে ভেসে যাবে। ওর দেহে সর্বনাশের বীজ আছে। ওর রক্তে লালসা ও লোভের লুকান বীজাণু যদি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে ?"

"তাহলে ? তাহলে দেববাণী ?" ভাদ্র মাসের মেঘ-গর্জনের মত ব্যাথাতুর শোনাল হিমাদ্রির প্রশ্ন।

দেববাণী ব'সে ছিল হিমাদ্রির সামনে চেয়ার টেনে। দু'জনে দু'জনের পানে তাকিয়ে তারা কথা বলছিল। হিমাদ্রির কাতর-দুর্বল প্রশ্নের উত্তরে দেববাণীর মুখে কথা সরল না। দুহাতে মাথা রেখে সে ব'সে রইল। কিন্তু মন তার অনেক কথা ব'লে গেল। হিমাদ্রি একটি কথাও শুনতে পেল না।

দেববাণীর মন প্রগল্‌ভা ঝর্ণার মত নীরব কলতানে বলে উঠল : "বহুদিন, কতদিন তার বুঝি হিসেব নেই, মনে হ'ত তুমি অনেক উঁচুতে, আমার নাগালের একেবারে বাইরে। মনে হ'ত তুমি কত দূরে, কত ব্যবধানে আড়ালে। আজ আমি যা, তার প্রায় সবটুকু তোমার তৈরী। পদে পদে তুমি দয়া করেছ, সাহায্য করেছ, আমি হাত পেতে গ্রহণ করেছি। তুমি নিজের করুণা প্রচার কর নি, আমি সব বুঝেও প্রশ্ন করি নি। মনে হয়েছে, তুমি পাহাড়ের মত মহান্, মৌন, সমাহিত। তোমার কাছে সাহায্য নিতে আমার সঙ্কোচ হয় নি, কারণ, তুমি যা দিয়েছ, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বে সুবর্ণ ক'রে তবে দিয়েছ। বুঝতে পেরেছি, তুমি আমায় স্নেহ কর, আমার বিপদে তুমি নিজের থেকে এসে পাশে দাঁড়াও, সেখানে আমার সমস্যা সমাধান ক'রে দাও। তোমার কাছে দাঁড়াতে নিজেকে ক্ষুদ্র, দীন, দরিদ্র মনে হয়েছে ; মনে হয়েছে, সারা জীবন তোমার দানের বোঝা বইতে হবে, তোমাকে কিছু দেবার সুযোগ কোনও দিন হবে না।

"কলকাতা থেকে রওয়ানা হবার আগের দিন তুমি দেখা করতে এলে, বিদায় নেবার আগে বড় ইচ্ছে হয়েছিল তোমায় গড় হয়ে প্রণাম করি। ডাঃ বসাকের কাছে শুনেছিলাম, তুমি কত পরিশ্রম ক'রে আমার জন্যে এদেশে কাজ করার সুযোগ যোগাড় করেছিলে। তুমি সিঁড়ি দিয়ে নামলে, আমি তোমার পিছু পিছু এলাম প্রায় রাস্তা পর্যন্ত। কিন্তু তোমাকে প্রণাম করবার সাহস আমার হ'ল না। মনে হ'ল তুমি মহীরুহ, আমি ছোট্ট আগাছা; তোমাকে প্রণাম করেও বুঝি অধিকারের বাইরে চলে যাব। এদেশে এসে সবকিছু তুচ্ছ ক'রে কাজে ডুবে গেলাম, শুধু নিজেকে তৈরি করার

অসহ্য তাগিদে নয়, তোমার দানের পূর্ণ মর্যাদা দেবার বাধ্যতায়ও। বার বার আমার আত্মা আমায় কেবল বলেছে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটি নিষ্পাপ শিশু, এক দুঃখিনী জননী, আর একজন, যে মানুষের চেয়ে বড়, জীবনের মত রহস্যময়। যখন ধাপে ধাপে আমি সুনাম, প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি, প্রত্যেকটি নতুন সার্থকতা এক একটি নব-জাত ফুলের মত তোমাকে নীরবে উৎসর্গ করেছি। ভেবেছি, যাঁকে আমার কিছু দেবার অধিকার নেই, ক্ষমতা নেই, তাঁকে আমার সার্থকতা সঁপে দি'।

"কিন্তু বুঝতে পারি নি, গোপনে গোপনে আমার মনও লোভী হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারলাম, তুমি যেদিন নিউ ইয়র্ক বিমান বন্দরে প্লেন থেকে নেমে আমার কাছাকাছি এসেও আমাকে দেখতে পেলে না। আমি ধরা প'ড়ে গেলাম। নিজের সেই প্রলুব্ধ রূপ দেখে আমি কেঁপে উঠলাম, আমার যেন নতুন করে জন্ম হ'ল। আবার আমি ভালবাসলাম। আর সেই ভালবাসার চোখ নিয়ে তোমার দিকে তাকাতে তোমাকেও আমি নতুন ক'রে চিনলাম। তুমিও ধরা প'ড়ে গেলে আমার কাছে। দেখলাম, যে আলো আমার প্রাণ থেকে আচমকা ঝরছে, সে আলো প্রবাহিত হচ্ছে তোমার সমস্ত সত্তা থেকে। তুমি কেন এসে হাজির হয়েছ এই দূর দেশে, বুঝতে আমার দেরি হ'ল না।

"তোমার মত মানুষ বলেই তুমি এক বছরেরও বেশি নিজেকে ধ'রে রাখলে। আমি বুঝলাম, সময় দিচ্ছ তুমি আমাকে। নিজের সঙ্গে বোঝাবুঝি, হিসাব-নিকাশ ক'রে কূল-কিনারা পেলাম না। লণ্ডনে গিয়ে খোকনকে কাছে পেয়ে শুধু দেখলাম, আমার আসল সমস্যার কোনও সমাধান নেই। ফিরে এসে আরও বেশি অস্থিরতায় প'ড়ে গেলাম। বুঝলাম, আমার একমাত্র উপায় তোমাকে সব খুলে বলা। বিচার-সিদ্ধান্তের ভার তোমার ওপরে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু তুমি ত আমায় ডাক নি! তোমার ডাক না এলে আমি যাই কি ক'রে? তাই আজকের এই পবিত্র সন্ধ্যার জন্যে আমি অস্থির প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছিলাম। তুমি ডাকলে। আমি ধন্য হলাম। তুমি তোমার অনেক উঁচু থেকে আমার কাছে নেমে এলে। আমার প্রতীক্ষা সফল হ'ল। তুমি আমায় চাইছ। এই আমাকে তোমায় দিলাম। কিন্তু এখন থেকে সব কিছু নির্দেশ তোমাকে দিতে হবে। আমার দৈন্য, আমার শূন্যতা, দ্বিধা, সমস্যা, কলঙ্ক, অপচয় সব তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমার দেবকুমারকেও তোমার হাতে দিলাম তুলে। তোমার দাবী কখন কি রূপ নেবে আমি জানি নে। তোমার স্ত্রী হবার সৌভাগ্য হয়ত কোনও দিন আমার হবে না। এমনও হ'তে পারে যে, তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আমার বাকী জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু সে সব পরের কথা। আজ, এ মহাক্ষণে, তোমাকে শুধু বলতে চাই, আমি যা, আমার যতটুকু আমি আছি, তা তোমার।"

তন্ময় হয়ে দেববাণী শুনছিল, তার অন্তরে প্রবাহিতা ঝর্ণার কথা; বুঝতেও পারে নি সে, হিমাদ্রির প্রশ্নের জবাব পর্যন্ত দেয় নি; বসিয়ে রেখেছে নীরব প্রতীক্ষায়।

সে চমকে উঠল তার আনত দেহে হিমাদ্রির জ্বলন্ত স্পর্শে। তাকিয়ে দেখল হিমাদ্রি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরেছে। এ মৌন-সুস্থির হিমাদ্রি নয়। বিরাট পাহাড় হঠাৎ আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। হিমাদ্রির চির-প্রসন্ন মসৃণ ললাটে নীল শিরা ফুটে বেরিয়েছে, চোখ থেকে আগুন ঝরছে। বলিষ্ঠ দুই হাতে হিমাদ্রি দেববাণীকে চেয়ার থেকে তুলে কাছে টেনে নিয়ে কঠিন কর্কশ স্বরে বলে উঠল, "তোমাকে আমার চাই। যে প্রতিমা আমি নিজের হাতে গড়েছি, তা আমার, আর কারুর নয়।"

হিমাদ্রির বজ্র-কঠিন দেহে মিশে গেল দেববাণী।

যে মহা-লগ্নের কামনায় দেববাণীর দেহমন তার অজ্ঞাতে সংগোপনে প্রতীক্ষা করছিল তার এমন আকস্মিক আগমনে বিহ্বল হয়ে পড়ল দেববাণী।

কিন্তু শুধু ক্ষণিকের জন্যে। একটু পরেই শান্ত কণ্ঠে সে বলল, "ছাড়ুন। ছেলেমানুষি করবেন না।"

হিমাদ্রি তাকে ছেড়ে দিল। তার অসহায় মনুষ্যত্বের নগ্ন চেহারা দেখে পুলকিত হ'ল দেববাণী।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল হিমাদ্রি।

তার পর বলল, "আমি যাচ্ছি।"

"কোথায়?" মৃদু প্রশ্ন করল দেববাণী।

"রাত দশটায় প্লেন আছে।"

দেববাণীকে নীরব দেখে হিমাদ্রি যাবার জন্যে পা বাড়াল।

"একটু দাঁড়ান।"

ফিরে দাঁড়াল হিমাদ্রি।

দেববাণী গড় হয়ে প্রণাম করল।

"এর মানে?"

"মানে পরে বুঝবেন।"

নতজানু হয়ে দেববাণী হিমাদ্রির চোখে চোখ রাখল।

হিমাদ্রি চ'লে গেলেও সে ভাবেই ব'সে রইল দেববাণী।

বার

কাজে বেরুবার জন্যে দেববাণী তৈরি হচ্ছে এমন সময় আইরীণ ঘরে ঢুকল।

"তোমার যে দেখাই পাওয়া যায় না, বাণী," আইরীণ বলল অনুযোগের সুরে। "এখানে আছ তাই বোঝা যাচ্ছে না।"

"অপরাধ স্বীকার করছি," দেববাণী হাত ধ'রে আইরীণকে বসাল। "আমিও ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে দু'তিনদিন একেবারে দেখা হয় নি।"

"খুব ব্যস্ত আছ বুঝি?"

"বিনা কাজে ব্যস্ত। কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছি। কাজ কিন্তু খুব একটা এগোচ্ছে না।"

"তোমার সেই পেট্রোন এম. পি. কি করছেন?"

"তাঁর যা করবার তিনি করেছেন। বরং বেশিই করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি সমস্যাও আমার ওপর চাপিয়েছেন।"

"বা, বা। লেনদেন সুরু হয়ে গেছে? তাঁর কোন্ সমস্যার তুমি সমাধান করতে পারবে?"

"কন্যা-সমস্যা।"

"মেয়ের বর খুঁজে দেওয়া?"

"না, না, অত সহজ নয়। ওঁর একটি মাথা-বিগড়ানো কন্যা আছে। তার মাথা সহজ করে দেওয়া।"

"মাথা খারাপ?"

"তার চেয়ে কিছু কম নয়। স্পয়েল্ট চাইল্ড।"

"কেমন দেখতে বল ত!"

"বেশ সুন্দর দেখতে। লম্বা, ছিপ ছিপে, ফর্সা, বড় বড় চোখ।"

"বুঝলাম। গতকাল সে তোমার খোঁজে এসেছিল।"

"বল কি? সরোজা এসেছিল আমার খোঁজে?"

"নাম বুঝি সরোজা? হ্যাঁ, এসেছিল। তাতে অবাক্ হচ্ছ কেন? তার মা তাকে তোমার জিম্মায় দিয়েছেন, সে ত আসবেই।"

"অত সহজ মেয়ে সে নয়। তাছাড়া, আমার সময় কোথায় পরের মেয়ে নিয়ে মাথা ঘামাবার?"

"আরও একজন দু'তিনবার তোমার খোঁজ ক'রে গেছে।"

"কে?"

"বল ত কে?"

"আমি কি ক'রে বলব?"

"মিষ্টার লিওনার্ড হোপ।"

দু'জনে হেসে উঠল।

আইরীণ বলল, "নাম হোপ হ'লে কি হয়, মানুষটা একেবারে হোপলেস্।"

"নিজে কিন্তু বলে, আমি হোপ ইটরনেল।"

"ইটরনেল নয়, ইন্‌টরনেল। বর্তমানে এক্‌স্‌টরনেল কিছু চাইছে।"

"তোমার স্বভাব আর গেল না আইরীণ। সব কিছুতে রসের সন্ধান।"

"লিওনার্ড হোপের একটা কিন্তু বড় গুণ আছে। ভারতীয় মেয়েদের ওর ভয়ানক ভাল লাগে। বলে, তোমরা না কি রহস্যময়ী।"

"সর্বনাশ!"

"কাল সন্ধ্যায়ও এসেছিল। তোমার খোঁজ করল। তুমি নেই শুনে বড় দুঃখিত হ'ল বেচারা।"

"রাখো তোমার ফাজলামি।"

"সত্যি বলছি। ভেবেছিল তোমাকে কোথাও বেড়িয়ে নিয়ে আসবে।"

"যাই বল আইরীণ, হোপের সঙ্গে বেড়ান একেবারে নিরাপদ্।"

"যদি ওর বড় বড় কথাগুলি নিঃশব্দে সহ্য করতে পার।"

"শোন আইরীণ, তোমাকে দু'একটা কথা বলার আছে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ, তোমাকে। আমি বুঝতে পারছি না রিসার্চ সেণ্টারের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিরকম দাঁড়াবে। কোথাও কিছু একটা গোলমাল বেধেছে।"

"আবার গোলমাল কিসের?"

"ঠিক জানি না। কিছুদূর এগিয়ে সরকারী কল আর নড়ছে না। সাবিত্রী আম্মার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তিনিও আর কিছু করতে পারছেন না।"

"বব্ বলছিল, সরকারী সাহায্য না চাইলেই তুমি ভাল করতে। তোমরা সবকিছুতে গবর্ণমেণ্টকে কেন ডেকে আন বুঝতে পারি না।"

"তুমি ত জানই রিসাচ সেণ্টারের আইডিয়া আমার নয়, হিমাদ্রির। তার তৈরী প্ল্যান। হিমাদ্রির ধারণা, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় সরকারী সাহায্য, অন্তত আশীর্বাদ ছাড়া বড় কিছু করা অসম্ভব।"

"তাহলে হিমাদ্রিকেই লেখ না এখানে এসে তদ্বির করতে। নিজে ব'সে রইল ভিয়েনায়, আর তুমি

বেচারা তার প্ল্যান নিয়ে দিনরাত ঘুরে মরছ। বড় অন্যায়।"

"তোমাকে ব'লে রাখি, ঐ যে চিঠিটা দেখছ টেবিলে, ওতে হিমাদ্রিকে আসতে বলেছি।"

"চমৎকার। হিমাদ্রির আসা একান্ত দরকার।"

"চুপ কর। কাজের কথাটা বলতে দাও।"

"বল।"

"হিমাদ্রিকে লিখেছি, এখানকার বড় বড় কর্তা-ব্যক্তিরা মেয়েদের কথায় কাজ হাসিল করতে অপমানিত বোধ করেন। সুতরাং যদি রিসার্চ সেণ্টার তৈরী করা তার একান্ত ইচ্ছে, নিজে এসে চেষ্টা না করলে কাজ এগুবে না, আমার ছুটিও শেষ হয়ে আসবে।"

"ঠিক লিখেছ।"

"বব্ ত ট্যুরে গেছে। কবে ফিরবে?"

"পরশু।"

"দিন পনের পর আমাকে মাদ্রাজ যেতে হবে। ভাবছি মাকে নিয়ে যাব।"

"খুব ভাল হবে। ওখানে শীতও কম।"

"যদি হিমাদ্রি আসে, তাহলে এরই মধ্যে এসে যাবে। অন্তত আমি তাই লিখেছি।"

"বেশ ত।"

"এখন আসল কথায় আসা যাক্। মা'র সঙ্গে হিমাদ্রিকে নিয়ে তোমার কোনও কথাবার্তা হয়েছে?"

"কিছু হয়েছে।"

"মা তোমাকে কি ধরণের প্রশ্ন করেছেন তা আমি আন্দাজ করতে পারি। তুমি কি বলেছ জানতে পারলে ভাল হয়।"

"আমি বলেছি, মনের দ্বন্দ্ব না কাটলে তুমি হিমাদ্রিকে বিয়ে করতে পারবে না।"

"ধন্যবাদ। তুমি যে এ ধরণের কিছু বলবে তাতে আমার সন্দেহ ছিল না।"

"কিন্তু, বাণী, এ দ্বন্দ্ব ব'য়ে তুমি আর কতদিন বেড়াবে?"

"জানি না, আইরীণ। সত্যি আমি জানি না। নিজের জন্যে আমার ভাবনা হয় না। কিন্তু ওকে আমি বড় কঠিন শাস্তি দিচ্ছি। এ চিন্তা সব সময় আমায় পিষে মারছে।"

"তোমার সমস্যা আমি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, হৃদয় দিয়ে মানতে পারি না।"

"পারবে না। এ সমস্যা আমাদের দেশের, তোমাদের নয়।"

"তোমাদের দেশেরও ঠিক নয়। আমি অন্তত আধ ডজন ভারতীয় মহিলাদের জানি যাঁরা তোমার অবস্থায় নিশ্চিন্তে বিয়ে করেছে।"

"ওখানেই ত মুশ্‌কিল, আইরীণ। ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড যাদুঘর। এখানে প্রাগৈতিহাসিক থেকে অতি-আধুনিক যুগ একসঙ্গে বিরাজ করছে। তুমি যা দেখতে চাইবে, তাই পাবে দেখতে। এখানে এখনও উলঙ্গপ্রায় মানুষ সভ্যতার আদিম পর্যায়ে আটকে আছে, আবার এমন মানুষের অভাব নেই যাদের সবদিক্ থেকে বর্তমান সভ্যতার ফ্যাশন-দুরস্ত সন্তান ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। দেখছ না, দিল্লী শহরে অতি-আধুনিকা মেয়েদের, এরা তোমাদের চেয়ে কোনও অংশে কম যায় না। আমাদের স্ত্রীলোকরা মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, এম. পি., এমনকি পাইলট্ পর্যন্ত হচ্ছে। কিন্তু এ হ'ল ভারতবর্ষের একটা দিক্। আরও অনেক দিক্ আছে।"

"তুমি বৈজ্ঞানিক হয়ে পেছনের দিকে তাকাবে কেন? কেন অতীতের পচা সংস্কার তোমায় টানবে?"

"ভুল করলে আইরীণ। আমার মনে কোনও সংস্কার নেই। বিজ্ঞান ভালবাসি ব'লেই দ্বন্দ্বকে দূর করবার আমার এমন ব্যর্থ আগ্রহ। সমস্যার সমাধান না ক'রে বিজ্ঞান ক্ষান্ত হয় না। সমস্যার সঙ্গে গোঁজামিল দেওয়া বৈজ্ঞানিকের কাজ নয়। আমি যাকে বিয়ে করব আমার ছেলে যদি তাকে গ্রহণ করতে না পারে, আমার জীবনে অনেক জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি হবে। না পারব নিজে সুখী হতে, না পারব হিমাদ্রিকে সুখী করতে। হয়ত ভয়ানক আঘাত করব আমার ছেলেকে। আমার সমস্যা সংস্কার নয়, মানুষ।"

পূজা সমাপ্ত ক'রে বাসন্তী দেবী সাড়ী বদলাতে অন্য ঘরে গিয়েছিলেন। তিনি আসতে দেববাণী ও আইরীণ উঠে দাঁড়াল।

"বস তোমরা," সহাস্যে বাসন্তী দেবী বললেন। "মেয়েকে ত সারাদিন দেখতেই পাই নে, তোমাকেও দু'দিন দেখি নি," বললেন আইরীণের পিঠে হাত রেখে।

"মিঃ পোস্ট্ বাইরে গেছেন, আমি খুব আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছি।"

"তোর সময় হয়ে গেল না, বাণী?"

"হ্যাঁ মা, আমি এক্ষুনি বেরুব।"

"খাবি কোথায়?"

"লাঞ্চের ত নেমন্তন্ন আছে। বিকেলে এসে তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাব। চারটের পরেই চ'লে আসব।"

"কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?"

"দেখি কোথায় নিয়ে যাই। সাবিত্রী আম্মার বাড়ী একবার সন্ধ্যাবেলা যেতে হবে। তোমাকে নিয়ে যাব।"

"ওরে বাপ রে! ওখানে গিয়ে আমি কি করব?"

"কেন? আলাপ করবে?"

"না, না। মুখ্যু মানুষ, ওসব বড় বড় লোকেদের কাছে আমায় নিয়ে গিয়ে শেষটায় তুই লজ্জায় পড়বি।"

"কি যে ব'ল, মা।" ব্যাগ তুলে দেবরাণী বেরুবার জন্যে তৈরী হ'ল।

ইংরাজীতে কথা হচ্ছিল, সাবিত্রী বুঝতে পারল না। দেবরাণী বুঝিয়ে দিলে সে বলল, "দাদা ঠিক বলেছে, আপনাকে নিয়ে হোয়াইট হাউসেও যাওয়া যায়।"

"সে আবার কোন্ জায়গা?" প্রশ্ন করলেন বাসন্তী দেবী।

"হোয়াইট হাউস হচ্ছে আমেরিকান প্রেসিডেণ্টের বাড়ী।" দেবরাণী বুঝিয়ে দিল।

দেবরাণীর অনেকগুলি কাজ ছিল। নিজেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে দেখা করল মিঃ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। এর আগে একবার বিভাগীয় সেক্রেটারী ও দু'বার জয়েণ্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে দেবরাণীর কথাবার্তা হয়ে গেছে। রিসার্চ সেণ্টারের কাজ কিছুটা বেশ চটপট এগিয়ে গিয়েছিল। খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনার পর কিছু অদল-বদল ক'রে ফাইনাল প্ল্যান দাখিল হয়েছে। তা নিয়ে জয়েণ্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্ল্যান সম্বন্ধে তিনজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য চাওয়া হয়েছিল। দেবরাণী খবর পেয়েছে, তাঁরা মোটামুটি পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তার পর কি হ'ল, কোথায় কি কারণে কি আটকে গেল, দেবরাণী বুঝতে পারল না। এদিকে তার ছুটির দিনগুলি একে একে শেষ হয়ে আসছে, আর হিমাদ্রি চিঠির পর চিঠিতে খবরের জন্যে ব্যস্ততা প্রকাশ করছে। সাবিত্রী আম্মাও কেমন নিঃসহায় অপারগ হয়ে পড়েছেন। বলছেন, "আমার যা করবার তা ত করেছি, দেবরাণী, এবার ভগবানের ইচ্ছে।"

শ্রীবাস্তব সোনা-বাঁধান দাঁত বার ক'রে হাসিমুখে দেবরাণীকে বসতে দিলেন, চা আনিয়ে আপ্যায়ন করলেন, চোখ বুজে বেশ কিছু কথাও বললেন; কিন্তু আসল খবর কিছু দিতে পারলেন না, বা দিতে চাইলেন না। বললেন, ব্যাপারটা বিবেচনাধীন, আণ্ডার অ্যাকটিভ কন্‌সিডারেশন।

দেবরাণী বলল, "বিবেচনা করতে যে বড় বেশি সময় লেগে যাচ্ছে।"

শ্রীবাস্তব চোখ বুজে বললেন, "জনসাধারণের কাজ, সময় একটু লেগেই থাকে।"

"আমার ছুটি যে শেষ হয়ে আসছে।"

"তার আগে আশা করি আমরা আপনাকে নিশ্চয় কিছু জানাতে পারব।"

"ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কি মনে হয়? প্ল্যান অনুমোদিত হবে?"

"ব্যক্তিগত ভাবে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখি নি, ডাঃ রায়।"

"আপনি কি মনে করেন সেক্রেটারীর সঙ্গে আমি আবার দেখা করব?"

"এ সিদ্ধান্তও আপনাকে নিতে হবে। তবে, উনি আজকাল বড় ব্যস্ত আছেন।"

"ব্যস্ত ত আমিও আছি, মিঃ শ্রীবাস্তব," একটু উষ্মার সঙ্গে বলে উঠল দেবরাণী। "আমারও সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা কাজ।"

"তা ত নিশ্চয়," চোখ বুজে সায় দিলেন শ্রীবাস্তব।

"আচ্ছা, উঠি। আপনার সময় নষ্ট করে লাভ নেই; আপনিও ত ব্যস্ত মানুষ।" দেবরাণী উঠল।

লিফ্‌টের জন্যে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল দেবরাণী। শীতের পূর্বাহ্ণ। মোলায়েম রোদ দিল্লী শহর আরামে উপভোগ করছে। বাইরে এসে গাড়ীর দরজা খুলতে খুলতে দেবরাণী মনে মনে রেগে গেল। গাড়ীতে ব'সে চাবি লাগিয়ে ষ্টার্ট দিতে গিয়ে ভাবল, একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে হয়। এবার সে সোজা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকা চলে না। কয়েকদিন পরে তাকে মাদ্রাজ যেতে হবে; সেখান থেকে কলকাতা গিয়ে দু'চার দিন থাকতে না থাকতে ছুটি শেষ। হিমাদ্রি আসতে পারবে কি না কে জানে? চিঠি প'ড়ে দুঃখ পাবে হিমাদ্রি। ভাববে আমি অকর্মণ্য। অথচ কি শক্ত কাজের বোঝা আমার ওপর চাপিয়েছে তার কোনও খোঁজ সে রাখে না। এ ত আমেরিকা ইংলণ্ড নয়, যে যা হবার চটপট্ হবে, নয়ত হবে না। এখানে এক মাসে সপ্তাহ, এক বছরে মাস, এক যুগে বছর। মানুষ কথা ব'লে আর উপদেশ দিয়ে কাজের সময় পায় না। একটা লোককে একশ' বার ঘুরিয়ে মারবার মধ্যে যে মনুষ্যত্বের অবমাননা, তা এরা জানে না, বোঝে না। রিসার্চ সেণ্টার ত একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নয়, যে বছরে বছরে আমরা মুনাফা

লুঠব ? নিজেদের টাকায়, হিতৈষী বিদেশীদের সাহায্যে এমন একটা সংগঠন করতে চাইছি যা, তোমরা বলছ, দেশের সবচেয়ে প্রয়োজন। তোমরা বিজ্ঞান-চর্চার নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দিনরাত তারস্বরে চেঁচাচ্ছ। অথচ একটা বাস্তব জলজ্যান্ত কিছু করতে চাইছি, তোমরা কোথায় উৎসাহী হয়ে, কৃতজ্ঞ হয়ে বলবে, কর, জলদি কর, না কেবল ঘোরাচ্ছ আর টাল-বাহানা করছ। দেববাণী নিজেকে বলল, এ ব্যাপারের ভার নেওয়াই তোমার উচিত হয় নি। মেয়েদের কথা তোমার দেশের পুরুষরা যে অর্ধেক শোনে, অর্ধেক শোনে না, তোমার জানা উচিত ছিল।

সেক্রেটারিয়েট থেকে দেববাণী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গেল। দেবকুমারকে কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাতেও ঝামেলা কম নয়। পর পর তিনজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হ'ল। আসবার সময় দেববাণী কিছু ডলার সঙ্গে এনেছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে। তার থেকে কিছু স্টার্লিং পাঠাতে হবে দেবকুমারকে। তৃতীয় অফিসার সম্ভবতঃ তার সঙ্গে কাজটা প্রায় সব করে দিলেন। যেটুকু বাকী রইল, বললেন, দু-এক দিনে হয়ে যাবে।

"আবার আসতে হবে আমাকে ?" দেববাণী প্রশ্ন করল।

"না, না। আপনি পরশুর পরে কোনও দিন আমায় ফোন করবেন। আপনাকে বলে দেব যে টাকা লয়েডস্-এ চলে গেছে।"

এবার জি. পি. ও-তে গিয়ে দেববাণী চিঠি দু'খানা ডাকে দিল। কিছু ডাক টিকেট, এয়ারোগ্রাম কিনল।

গাড়ীতে ব'সে দেববাণী ব্যাগ থেকে নোট বই বার ক'রে একটা ঠিকানা দেখল। গাড়ী ঘুরিয়ে কনট্ সার্কাস হয়ে কার্জন রোডে পড়ল। দু' পাশে বাংলোগুলি দেখতে দেখতে কুড়ি নম্বরের ফটকে গাড়ী নিয়ে ঢুকল দেববাণী।

বিরাট বাংলো বাড়ী। সামনে প্রশস্ত সবুজ লন। ম্লান চন্দ্রমল্লিকার সারি সারি টব। শীতের ফুল ফুটেছে সগৌরবে বংশের বাহার প্রচার ক'রে। দেববাণী বাগানে চোখ বুলিয়ে সোজা সামনের বারান্দায় চ'লে এল। ঘড়িতে দেখল, এগারোটা চল্লিশ। দরজার গায়ে কলিং বেল। দেববাণী বেশ জোরেই বেল টিপল।

যে লোকটি মিনিট দুই পরে দরজা খুলল, দেববাণী তাকে জিজ্ঞেস করল, "ডাঃ ভগবানদাস আছেন ?"

"আছেন। আপনি বসুন। কি বলব ওঁকে ?"

দেববাণী ব্যাগ থেকে কার্ড বার ক'রে লোকটির হাতে দিল।

একটু পরে ড্রেসিং গাউনে দেহ আবৃত ছোটখাট এক বৃদ্ধ দ্বারপথে দেখা দিলেন। মাথা-জোড়া টাক, দেববাণী দেখল, একেবারে কেশহীন। ভাঁজ-পড়া মুখের চামড়ায় আশ্চর্য সজীবতা। ছোট ছোট চোখের ওপর দুই গুচ্ছ সাদা জ্র। বলিষ্ঠ সুগঠিত নাকের নীচে পাকা গোঁফ। নাকের দু' পাশ থেকে ওষ্ঠ বেয়ে চিবুক পর্যন্ত গভীর ভাঁজ।

দ্রুত পদক্ষেপে দেববাণীর কাছে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, "ডক্টর রয় ?"

দেববাণী আনত হ'য়ে নমস্কার করল।

"আসুন, আসুন। আমি আজ ক'দিন থেকে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করছি।"

"আমি পরশু ডাঃ বসুর চিঠি পেয়েছি।"

"মাত্র পরশু ! আমি ত সপ্তাহের বেশি হ'ল হিমাদ্রির চিঠি পেয়েছি।"

"অসময়ে এসে পড়লাম। আপনার স্নান-আহারের সময় নিশ্চয় এখন।"

"না, না। বুড়ো মানুষের কোনও সময়ই অসময় নয়, বা সর্বদাই অসময়," মিষ্টি হাসলেন ডাঃ ভগবান-দাস। "স্নান আমার হয়ে গেছে। একটার আগে কখনও খাই নে।"

ব্যস্ত হয়ে বললেন, "চলুন, রোদে বসা যাক্। ভেতরের উঠোনে আমি রোদেই বসে ছিলাম।"

লনে চেয়ার পাতা ছিল। দেববাণীকে বসালেন। নিজেও বসলেন।

দেববাণী বলল, "আপনার শরীর সুস্থ আছে ত ?"

"বুড়ো হয়ে গেছি," সহাস্যে বললেন ভগবানদাস, "এখন ও-কথার কোনও মানে নেই। শরীর যেটুকু ঠিক আছে তারই জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। বয়স ত কম হ'ল না। চুয়াত্তর পূর্ণ হয়ে পঁচাত্তর চলছে।"

দেববাণী দেখল, বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে কথাগুলি বললেন ডাঃ ভগবানদাস।

"ডাঃ বসুর চিঠিতে আপনি সব জেনেছেন। আপনাকে পেলে আমরা বড় উপকৃত হব।"

"হিমাদ্রি আমার ছাত্র ছিল," ভগবানদাস বললেন, "আমার সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের মধ্যে একজন। তার কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। হিমাদ্রি লিখেছে, সে ও আপনি দু'জনে মিলে দিল্লীতে একটা এ্যাডভান্সড্ সায়ান্টিফিক রিসার্চ সেন্টার খুলতে চাইছেন। আমাকে

তার চীফ ডাইরেক্টর হবার জন্যে হিমাদ্রি লিখেছে। তার —আপনাদের—প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে কি না, আপনি জানতে এসেছেন। কেমন ঠিক ত? অ্যাম আই রাইট্?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"রিসার্চ সেণ্টারের জন্যে আপনারা কিছু বেসরকারী বিদেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, প্রধানত আমেরিকান। আপনাদের প্ল্যান বর্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন। আপনারা সরকারের কাছে বিনামূল্যে জমি চেয়েছেন ইনষ্টিটিউটের বাড়ীর জন্যে। সরকার এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্ত দেন নি। তবে আপনাদের আশা আছে, সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যজনক হবে না। অ্যাম্ আই রাইট্?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"রিসার্চ সেণ্টারে স্নাতকোত্তর গবেষণা হবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, বিশেষত ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রিতে। আপনারা বাইরে থেকে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আনবার চেষ্টা করছেন। পিওর ও অ্যাপ্ল্যায়েড উভয় দিকেই আপনাদের কাজ চলবে। ইনষ্টিটিউটকে কালক্রমে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা আপনাদের চরম উদ্দেশ্য। অ্যাম্ আই রাইট?"

"ভারতবর্ষে একটাও সায়ান্স য়ুনিভারসিটি নেই।"

"জানি, জানি। ইংলণ্ডেও নেই। জার্মেনীতেও নেই। আমেরিকায় আছে, রাশিয়ায় আছে। শুনছি চীনেও হচ্ছে। কিছুদিন আগে চীনের একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। ওরা যেভাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছে আমরা তার অর্ধেকও করি নি।"

দেববাণী বলল, "আপনার পরিচালনা পেলে আমরা খুব বড় আনন্দিত হব।"

"তা ত হবেন, বুঝলাম," মৃদু হেসে বললেন ভগবানদাস। "কিন্তু এ বয়সে আমি আর কতটুকু দিতে পারব? তাছাড়া, আপনারা এ যুগের নতুন মানুষ। বুড়োদের ডেকে না এনে নিজেরাই দায়িত্ব নেন না কেন?"

"দায়িত্ব আমরা যতখানি সম্ভব নেব।" দেববাণী জবাব দিল। "ডাঃ বসু ভিয়েনার চাকরী ছেড়ে এখানে এসে আসবেন। আমিও হয়ত আসতে পারি। কিন্তু কিছু পরিচালনার অভিজ্ঞতা তা আমাদের নেই? আরও একটা কথা আছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হিসেবে সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনি আমাদের উদ্যোগের কর্ণধার হ'লে সহজে আমরা জাতে উঠব।"

হেসে উঠলেন ভগবানদাস। "আপনি ক'দিন হ'ল দেশে এসেছেন?"

"মাস খানেক।"

"নিশ্চয় অনেক দিন পর।"

"দশ বছর।"

"তাই এ কথা বলতে পারছেন। স্বদেশ সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই।"

"তা আমি অস্বীকার করতে পারি নে।"

"অস্বীকার করে লাভ হ'ত না। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার যেটুকু খ্যাতি, প্রায় সবটাই বিদেশে। দেশে নয়।"

"সে কি ক'রে সম্ভব?"

"দুনিয়ায় সবই সম্ভব। ভারতবর্ষ এখন একটা বিচিত্র লেবরেটরী। নানা বিষয়ের এক্সপেরিমেণ্ট চলছে। সে অবশ্য খুব ভাল কথা। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমি তাতে আনন্দিত। কিন্তু একটা বড় খুঁত থেকে যাচ্ছে আমাদের।"

"কিসের খুঁত?"

"যাঁরা এক্সপেরিমেণ্ট করছেন তাঁরা সবাই রাজনৈতিক মানুষ। কিংবা তাঁরা ব্যুরোক্র্যাট। রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে এঁদের এক্সপেরিমেণ্ট করবার পূর্ণ অধিকার আছে। ভুল হোক, ঠিক হোক, এঁরা কাজ করছেন, এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে দেশটা এগিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞান, মননশীলতার ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব বড় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দেশের জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে রকম বিশৃঙ্খলা, খুব কম দেশেই তা দেখতে পাবেন। অথচ রাজশক্তি যেমন গর্বিত ও দাম্ভিক, শিক্ষাবিদ্‌রা তেমনি দলে ভিড়বার জন্যে উৎসুক। আমার দুর্ভাগ্য, আমি এঁদের শিক্ষানীতি, বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান শিক্ষা-নীতির সঙ্গে মোটেই একমত নই। আমার মতামত আমি গোপন করি নি। ফলে আমি আজ যাকে ডিপ্লোম্যাটিক ভাষায় বলা হয়, পারসোনা নন্ গ্র্যাটা। অর্থাৎ আমার পাত্তা নেই কোথাও।"

"আমাদের ইনষ্টিটিউট ত সরকারী ব্যাপার হবে না," দেববাণী বলল, "সুতরাং আপনার চিন্তা করবার কারণ নেই।"

"ওখানে আপনি আবার ভুল করছেন। ভারতবর্ষে আজ কোনও কিছু সরকারী না হয়ে উপায় নেই। ...

কারণ খুব সোজা। আমাদের দরিদ্র অনগ্রসর দেশকে চটপট্ গ'ড়ে তুলতে হলে যে ব্যাপক ও বিরাট্ উদ্যোগের প্রয়োজন, সরকার ছাড়া তা হবার উপায় নেই। জন-কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে হলে গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই সক্রিয় ও সচেতন অভিভাবকদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এমন কি আমাদের সাধু-সন্তরা পর্যন্ত সরকারী আশীর্বাদ নিয়ে সঙ্ঘ তৈরি করেছেন। অমন যে রামকৃষ্ণ মিশন, তাঁদের কাজকর্মের প্রয়োজনীয় মোটা টাকা আসছে সরকারী তহবিল হতে; তাঁদের সভা-সমিতিতে পর্যন্ত সরকারী নেতার পৌরোহিত্য অবশ্য-প্রয়োজনীয়।"

"আপনার কি মনে হয় আমাদের রিসার্চ সেণ্টারে গবর্ণমেণ্ট প্রভাব বিস্তার করবেন?"

"কেন করবেন না? গবর্ণমেণ্ট জমি দেবেন। আজ না হ'লেও পরে আপনারা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্যও চাইবেন। আপনাদের ফাংশনেও, এখনকার প্রচলিত প্রথা মত, সর্বদাই আপনারা সরকারী নেতাদের ডেকে আনবেন। বৈজ্ঞানিক বা বুদ্ধিজীবী হয়ে আপনি যদি সরকারের দ্বারস্থ হতে লজ্জিত বোধ না করেন, গবর্ণমেণ্ট কেন আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবেন? যে কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট চাইবেন, বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করতে। আমাদের দেশে এ কাজটা যত সহজ অন্য কোন বড় দেশে তাও নয়। তার কারণ, আমরা, যারা বুদ্ধি খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করি, আমরা বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ্, লেখক, অধ্যাপক—আমরা সর্বদা যৎসামান্য সরকারী দাক্ষিণ্যের জন্যে হাত পেতে আছি।"

"সব ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর নাও হ'তে পারে।"

"পারে বৈ কি। ধরুন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সরকারী সাহায্য না হ'লে তাদের প্রসার অসম্ভব। কিন্তু এ সাহায্য কোন্ পথে আসবে তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। সরকারকে আমি একটুও দোষ দি' না। আমরা কোনও দিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পবিত্র মন্দির হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত নই। দেশ যখন পরাধীন ছিল, ইংরেজ সরকার এগুলোর ওপর সতর্ক প্রভাব বিস্তার ক'রে রাখত। তখন আমরা আমাদের আহত, অপমানিত আত্মসম্মান দিয়ে দাবী করতাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত—অ্যাকাডামিক ফ্রিডম্। কিন্তু স্বাধীন হবার পর সে দাবী আমরা আর করি নে। করি নে বলেই গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে অমন সহজে সক্ষম হয়েছেন। অথচ, দুঃখের বিষয়, এ প্রভাবও কোন প্ল্যান নিয়ে বিস্তৃত হচ্ছে না। কম্যুনিস্ট দেশগুলি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে। আমরা তা করি নি। আমরা কেবল ভেজাল মিশিয়েছি। কিন্তু এসব আলোচনা আপনার নিশ্চয় ভাল লাগছে না।"

"ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু আমি এসব বিশেষ জানি নে। আপনি বলুন।"

"বলার বিশেষ কিছু নেই। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রসার হ'ল না, এমন কথা আমি বলছি না। হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, উদ্যোগের বাইরের আড়ম্বর যত বড়, আসল কাজ তার চেয়ে অনেক কম। আমরা লেবরেটরী করবার আগে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে বিরাট্ অট্টালিকা তৈরি করি—ন্যাশন্যাল ফিজি-ক্যাল লেবরেটরীর সুন্দর প্রশস্ত অডিটোরিয়মে নাচ-গানের জলসা হয়। অথচ রাশিয়ায় দেখে এসেছি ছোট্ট ছোট্ট বাড়ীতে বিজ্ঞানের তন্ময় সাধনা চলছে। এক চীনে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, তাঁরা টিনের চালের ঘর তৈরি করে তাতে লেবরেটরী বসিয়েছেন। আমরা বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মোটা মাইনের ফাইল-ঘাঁটা ব্যুরো-ক্র্যাট করে তুলেছি। হাজার হাজার বিজ্ঞানের ছাত্র কেরাণীর ভাঙ্গা কলম পিষছে। আমাদের শিল্পপতিরা এখনও নিজেদের রিসার্চ লেবরেটরী তৈরি করার ধার দিয়ে যাচ্ছে না, আমরাও তাদের বাধ্য করছি না; অথচ আপনি জানেন, আমেরিকায় বিশেষ করে প্রত্যেক কারখানার সঙ্গে নিজস্ব লেবরেটরী আছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দেশে পলিটিশিয়ান এবং ব্যুরোক্র্যাট ছাড়া আর কেউ মানুষের সম্মান পায় না। আমরা দি' না।"

"আমার নিজের সামান্য অভিজ্ঞতাও অনেকটা ঐ রকম। বিদেশে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা ঐ একই কারণে দেশে ফিরে আসতে চান না।"

"জানি। কিন্তু, আবার বলছি, এজন্যে সরকারকে দোষ দেওয়া অন্যায়। রবীন্দ্রনাথ টাগোর শান্তিনিকেতনে বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করেও পুলিশ ঢুকতে দেন নি; ভাইসরয়কে বলে দিয়েছিলেন, পুলিশ নিয়ে বিদ্যায়তনে আসার চেয়ে না-আসা বরং ভাল। গান্ধীজী নেংটি পরে বাকিংহাম প্যালেসে ইংরেজ সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আজ এমন কোন ভাইস-চ্যান্সেলর আমা-দের দেশে নেই যিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারেন, পুলিশ পাহারা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার চেয়ে না-আসা ভাল। দেখতে পাই বুদ্ধিজীবীরা সর্বদা সরকারী

দাক্ষিণ্যের জন্যে হাত পেতেই রয়েছেন। এর ফলে বুদ্ধিজীবীদের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু আর বাকী নেই। গভর্ণমেণ্টের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলা বর্তমানকালে ভাগ্য-নির্মাণের সবচেয়ে সহজ রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুর মেলানয় আমার আপত্তি নেই; আমাদের দেশে সরকার অনেক ভাল কাজ করছেন, বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনের যোগ্য কাজ। সেখানে সমর্থন করতেই হবে। কিন্তু যেখানে তা করছেন না, বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক রিসার্চক্ষেত্রে, সেখানে বুদ্ধিজীবী যদি তাঁর নির্ভীক মতামত প্রকাশ না করেন, তাহলে দেশের মঙ্গল হবে কি করে?''

"একটা আশ্চর্য ব্যাপার আজকাল লক্ষ্য করছি," দেববাণী বলল, "পৃথিবীর প্রায় সব দেশে। তা হ'ল বুদ্ধিজীবীদের পতন। ডিক্লাইন্ অব দ' ইনটেলেকচুয়াল। আমেরিকায় বুদ্ধিজীবীরা কখনও খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেন নি, ওদেশে বুদ্ধিমান—'এগ্-হেড'—মানুষদের প্রতি কেমন একটা সন্দেহের ভাব। চালাক-চতুর কর্মবীর হবে, পয়সা রোজগার করবে, আরাম করবে, ফুর্তিতে দিন কাটাবে, এই হ'ল ওদের জীবন-দর্শন। কিন্তু য়ুরোপে পর্যন্ত কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপকদের প্রভাব ফুরিয়ে গেছে। এমন কোন বুদ্ধিজীবী নেই যাঁর কথা পলিটিশিয়ানরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে, দেশের লোক ভেবে দেখে, মানে। মার্কিন মুলুকে স্বাধীন জ্ঞানচর্চার কতগুলি সাবেকী বাধা আছে। আজকাল রাজনৈতিক কারণে আরও নতুন বাধার সৃষ্টি হয়েছে। রুজভেল্ট মারা যাবার পরে থেকেই সুরু হয়েছিল, এখন, রিপাবলিকান গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হবার পরে, আরও বেড়েছে। যাকে চলতি-ভাষায় রেড-হাণ্ট বলা হয়, তার নামে বহু বুদ্ধিজীবীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে। এর ফলে ক্ষতি সবচেয়ে বেশি যে আমেরিকার নিজেরই হচ্ছে, সে কথা যাঁরা জানেন, বোঝেন, তাঁরাও ভয়ে কিছু বলতে পারছেন না। ম্যাকার্থি নামে যে সেনেটর এই বুদ্ধিজীবীবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন, সবাই জানে তিনি দুষ্ট লোক, অথচ বলবার সাহস কারুর নেই। কিন্তু এও যেমন সত্যি, তেমনি অন্য একটা দিক্‌ও আছে। বৈজ্ঞানিকদের কথাই আমি বেশি করে জানি। এই আক্রমণে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কেউ কেউ পুরাতন 'পাপ' স্বীকার করে নতুন দাসখৎ লিখে দিয়েছেন; দু-চার-দশজন আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। খবরের কাগজে এঁদের কথা ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবীরা চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজী হন নি। অনেকের চাকরি গেছে, সমাজে তাঁরা অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছেন, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স'রে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আত্মসমর্পণ করেন নি।"

ডক্টর ভগবানদাস বললেন, "আমাদের দেশের অবস্থা একেবারে আলাদা; মার্কিন দেশের সঙ্গে তুলনা হয় না। মানুষের চরিত্র জানবার একটা সহজ নিয়ম আছে। দেখতে হয়: কিসে সে আঘাত পায়, কোন্ চ্যালেঞ্জ সে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করে, কি ভাবে সে তার মোকাবিলা করে। জাতি বা দেশকেও এই একই মাপে বিচার ক'রে তার আসল জীবন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অর্ধশতাব্দী ধ'রে আমরা পরাধীনতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম; প্রথমে আবেদন-নিবেদনে, পরে অনুনয়-বিনয়ে, সর্বশেষে ব্যাপক সংগ্রামে। পরাধীনতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা বুঝি সহজ ছিল। স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমরা সেভাবে গ্রহণ করি নি। আমি সরকারের কথা বলছি না, যতটুকু করার তাঁরাই করেছেন। আমি আমাদের প্রত্যেকের কথা বলছি। স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার যে একটা নতুন অর্থ আছে, আমাদের আচারে-ব্যবহারে, পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদানে, জীবন-দর্শনে, তার কোনও পরিচয় পাই নে। তার বদলে হঠাৎ জীবনটাকে লুটেপুটে উপভোগ করবার মাতলামি দেখা দিয়েছে। সবাই চাইছে বাস্তব আরাম আর একটু বেশি আয়ত্ত করতে। এতে অন্যায় নেই, ভাল করে বাঁচা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। কিন্তু অন্যায় এসে পড়ে, যখন আরামের লোভে আমরা চরিত্র হারিয়ে ফেলি। ব্যাপক চরিত্র-হানি দেশের যেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে তা হ'ল শিক্ষাক্ষেত্র। পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষাবিদ্‌রা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। তাঁদের মাইনে কম, তাঁরা অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে অবস্থা অবশ্য খুবই খারাপ। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের হঠাৎ জীবনে সহজ পথে 'সার্থক' হবার এমন প্রলোভন দেখা দিয়েছে যে, বিজ্ঞান, সাহিত্য, উচ্চতর জ্ঞানানুশীলন সব কিছুর মধ্যে ভয়ানক ভেজাল ঢুকে গেছে। সে জন্যেই দেশে এমন একজন বুদ্ধিজীবী নেই যাঁর নির্ভীক, নিষ্ঠাপূর্ণ সতর্কবাণী দেশের লোক কান পেতে শোনে।"

"আপনি ত এ গড্ডলিকা-প্রবাহ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন," দেববাণী বলল। "ডাঃ বসু লিখেছেন, দেশে সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে।"

"হিমাদ্রি হয় ত করে," হেসে বললেন ভগবানদাস। "সে আমার প্রিয় ছাত্র। শ্রদ্ধা আমায় কেউ করে না, এমন অকৃতজ্ঞ কথা আমি বলতে চাই নে। এই শ্রদ্ধাটুকু বাঁচাবার জন্যে আমি একেবারে রিটায়ার করেছি।"

"যদি মার্জনা করেন তবে বলি, এ কথা আপনার মত বৈজ্ঞানিকের মুখে শোভা পায় না।"

"ধন্যবাদ। অপ্রিয় সত্য শুনবার মত সৎসাহস আমার এখনও আছে। আমি বিজ্ঞান থেকে রিটায়ার করি নি। বাড়ীতে লেবরেটরী বানিয়েছি। গত বছরও রয়্যাল সোসাইটির জর্ণালে আমার অরিজিনাল কাজ-কর্মের বিবরণ ছাপা হয়েছে। রিটায়ার করেছি আমি এডুকেশনাল পলিটিক্স্ থেকে।"

"আমাদের সেণ্টারে পলিটিক্স্ আসবে না।"

"আসবে। হয়ত এরই মধ্যে এসে গেছে।"

"না, না," আতঙ্কিত হ'ল দেববাণী। "আসবে কেন?"

"ঐ যে বলেছি, ভারতবর্ষে এখন এমন কিছু নেই যা পলিটিক্সের বাইরে।"

"আমি তা মানতে রাজী নই।"

"আপনি জানেন না।"

"তাহলে আমাদের অনুরোধ আপনি রাখতে পারলেন না?"

"হিমাদ্রি ও আপনাকে হতাশ করতে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমি নিরুপায়।"

"সত্যি বড় হতাশ হলাম।"

"কিন্তু আমার সাহায্য আপনারা পাবেন। বাইরে থেকে যতটুকু পারি আমি আপনাদের নিশ্চয় সাহায্য করব।"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেববাণী আবার রাস্তায় বেরুল। ডক্টর স্যর ভগবানদাস বিশ্ববিদিত বৈজ্ঞানিক। হিমাদ্রিকে তিনি কেবল সামান্য কলেজে পড়ান নি, সে যখন লণ্ডনে, ডঃ ভগবানদাস অক্সফোর্ডে অধ্যাপক, তখনও হিমাদ্রি তাঁর কাছে রিসার্চ সাহায্য পেয়েছে। গাড়ী চালাতে চালাতে দেববাণী ভগবানদাসের কথা-গুলি মনে উল্টে পাল্টে দেখল। ভারতবর্ষের স্বাধীন মানস এখনও তার বহুলাংশে অজ্ঞাত। কিন্তু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জানে, সমালোচনা করা যত সহজ, হৃদয়ঙ্গম করা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। যে চ্যালেঞ্জ ও রেস্পন্স্ সম্বন্ধে ভগবানদাস এত বললেন, তিনি নিজেই তা এড়িয়ে যাবার অপরাধে অপরাধী। পঁচাত্তর বছর বয়সের অজুহাতে তিনি জীবনে নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইছেন না। দু'চারটে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করেছে। যে শ্রদ্ধা দেশে তাঁর আছে, বাদ-বিসম্বাদের বাইরে ব'সে সেটুকু তিনি উপভোগ ক'রে যেতে চান। তাই তাঁর কথায় ঝাঁজ বেশি, সার কম। দেববাণী ভাবল, দেশে এসে যাদের সঙ্গে সে কথা বলেছে, প্রায় সবাকার মধ্যে কেমন একটা ঝাঁজ। বর্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্তি নেই কোথাও। স্বাধীন গণতন্ত্র-সমাজের সুবিধে নিয়ে সবাই সবাইকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করছে। সংবাদ-পত্র থেকে সুরু করে বিদ্যায়তন পর্যন্ত সর্বত্র শান্ত শালীন বস্তু-নিষ্ঠার মর্মান্তিক অভাব। সবাই যেন সর্বদা ভারতবর্ষে জনসভায় বক্তৃতা করছে। বলছে বেশি, ভাবছে কম; বেশি বলতে গিয়ে এমন অনেক কিছু বলছে যার মানে নেই, যা পরস্পরবিরোধী, যা আয়ত্তের বাইরে। মার্কিন দেশে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দেববাণী অনেক কথার কোলাহলে অভ্যস্ত। কিন্তু আমেরিকা বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ; তার দৃষ্টিতে, মানসে, চিন্তাধারায় যুদ্ধরত সৈনিকের তরল একদর্শিতা। অন্যের কথা সে শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না, জানতে চায় না। তেমনি অপ্রিয় বাস্তবের দিকে, কোপেনহাগানে নেলসনের মত, আমেরিকা অন্ধ চক্ষু নিক্ষেপ করতে অভ্যস্ত। ভারতবর্ষ কিন্তু সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নয়। তার বিঘোষিত নীতি, দুনিয়ার সর্বত্র থেকে ভাল জিনিষ গ্রহণ করা। যে পর-সহিষ্ণুতা বিশ্বের দরবারে সে দাবী করছে, স্বক্ষেত্রে তার বর্দ্ধমান অভাব তাকে ভাবিয়ে তুলছে না। অসহিষ্ণু, অনুদার, উত্তেজিত বাতাবরণে, আর যাই হোক, দেববাণী জানে, জ্ঞানচর্চা হয় না।

ক্রমশঃ

# বিস্মৃত বাঙালীঃ অবিনাশচন্দ্র দাস
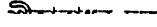
বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে ( ১৩০৮ ) প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা-দু'খানির আবির্ভাব ঘটে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ হতে এই মাসিক পত্রিকা দু'খানি প্রকাশ করেন। বস্তুত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর প্রকাশ এদেশের সাময়িক পত্র সম্পাদনার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্মনীতি, স্বাদেশিকতা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান—সকল বিষয়েই এই পত্রিকা-দু'খানি দেশ ও জাতিকে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিল। প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ তথা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা ইতিমধ্যেই নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন সংবাদপত্রসেবী। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্মবন্ধু' সম্পাদনাভার গ্রহণ করবার পূর্বেই তিনি সেকালের প্রগতিবাদী পত্রিকা সঞ্জীবনী, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, প্রভৃতি পত্রিকায় হাত পাকিয়েছিলেন। ১৮৯০তে রামানন্দ ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারেরও সহ-সম্পাদক হন। তখন ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সম্পাদক ছিলেন—শিবনাথ শাস্ত্রী। পরে হেরম্ব মৈত্রেয় মেসেঞ্জারের সম্পাদক হন। ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ সঞ্জীবনীর প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন। এর পর একে একে রামানন্দ 'দাসী' (১২৯৯), 'প্রদীপ' (১৩০৪) প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও রামানন্দের উদ্যোগে 'মুকুল' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হন শিবনাথ শাস্ত্রী এবং সহকারী সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসু ও লাবণ্যপ্রভা বসু। এর পর প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ ১৩৫০-এ রামানন্দের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ৫৫ বৎসরব্যাপী সংবাদপত্রসেবী জীবনের অবসান হয়। ব্রাহ্মপ্রচারক প্রথম 'ধর্মবন্ধু' সম্পাদক শশীভূষণ বসু, সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী, হেরম্ব মৈত্রেয় প্রভৃতি সেকালের কৃতবিদ্যজনের কাছে যে দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেন—প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে তারই চরম সাফল্য দেখা যায়। কিন্তু এখানে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর ইতিহাস বা তার ব্যাপক আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। সম্পাদক রামানন্দ তাঁর সারস্বত সাধনার পথে দেশ ও বিদেশের কত বিদগ্ধ জ্ঞানী মনীষীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আজ তাঁদের অনেকের কথাই এই দেশ ও জাতির ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। অবিনাশচন্দ্র দাস এ যুগে প্রায় বিস্মৃত। রামানন্দের বাল্যবন্ধু ও যৌবনের সঙ্গী ছিলেন এই অবিনাশচন্দ্র দাস। রামানন্দের দাসী পত্রিকার যুগ হতে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর অন্যতম বিশিষ্ট লেখক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র দাস। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ব্যাপক ছিল। রামানন্দের সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের যোগাযোগের কথা ও সেকালের সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথাই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

রামানন্দ ও অবিনাশচন্দ্র উভয়েই বাঁকুড়া জেলার সন্তান। অবিনাশচন্দ্রের জন্ম ১২৭৩ বঙ্গাব্দে—রামানন্দ এর কিছু পূর্বে জন্মান অর্থাৎ ইং ১৮৬৫, বঙ্গাব্দ ১২৭২ সালে। রামানন্দ অবিনাশচন্দ্রকে বাঁকুড়া জেলার গৌরব বলে পরবর্তী কালে উল্লেখ করেছেন। রামানন্দের বাল্য ও যৌবনের নিয়ত সঙ্গী ছিলেন অবিনাশচন্দ্র। বাঁকুড়ার পথ, প্রান্তর, বনভূমি একদা এই দুই বাল্যবন্ধুর নিয়ত পাদস্পর্শে মুখর থাকত। রামানন্দ-দুহিতা শ্রীমতী শান্তা দেবী এই রামানন্দ-অবিনাশচন্দ্রের স্মৃতিকাহিনী তাঁর একখানি গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। "বালক বয়সে এবং যৌবনকালেও দীর্ঘ পথ ভ্রমণে ছিল রামানন্দের বিশেষ উৎসাহ। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে সঙ্গে চিঁড়া-মুড়ি বাঁধিয়া লইয়া মামার বাড়ী হাঁটিয়া যাওয়া তাঁর মহা আনন্দের জিনিস ছিল। ছাতনা গ্রাম, পাঁচবাঘা গ্রামও ঘরের কাছে ছিল না, কখনও পূজার ফুল সংগ্রহ করিতে, কখনও বনভোজন করিতে তাঁরা এই সব গ্রামপ্রান্তের শালবনে যাইতেন। সঙ্গে থাকিতেন তাঁর বাল্যবন্ধু অবিনাশচন্দ্র দাস, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং দুই-চারি জন।"[১] বন্ধুবৎসল রামানন্দ তাঁর বাল্য, শৈশব ও যৌবনের বন্ধু অবিনাশচন্দ্রকে কখনও ভোলেন নি। বাল্যবন্ধু অবিনাশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে নূতনচটির পথে কবে কোথায় তিনি বনভোজনে কিংবা ফুল কুড়াতে গিয়েছিলেন, বন্ধু সুরেন্দ্রমোহনের মা ও দিদি কৃষ্ণভামিনী

---

১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা। পৃঃ ৯-১০।

তাঁকে কত আদর-যত্ন করতেন, এ সমস্ত গল্প বৃদ্ধ বয়সে রামানন্দ তাঁর পুত্র-কন্যাদের কাছে প্রায়ই করতেন। ইংরেজী ১৮৩৬ সনে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দে) অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যুতে রামানন্দ 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন,

"তাঁহার ও আমার উভয়ের জন্ম বাঁকুড়ায়। বাল্য-কাল ও যৌবন হইতেই, বিশেষতঃ যৌবনে আমাদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। আমরা একই সময়ে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন কলেজে, কলিকাতায় পড়িতাম। অবিনাশের বাড়ী যে নূতনচটি গ্রামটিতে, তাহা আমাদের বাল্যকালের বাঁকুড়া শহরের শেষ সীমানা হইতে আনুমানিক আধ ক্রোশ দূরে ছিল। এখন নূতনচটি গ্রামের ও বাঁকুড়া শহরের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন।

"অবিনাশ বর্দ্ধিষ্ণু, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরিনাথ দাস স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর, বিদ্বান ও শিক্ষাদানে দক্ষ ছিলেন। অবিনাশের স্বভাব-চরিত্র তাঁহার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। শানবাঁধা গ্রামের মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নূতনচটির হরিনাথ দাস প্রভৃতি বোধ হয় সেকালে বাঁকুড়ায় প্রথম ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।

"বাঁকুড়া জেলার যে শুশুনিয়া পাহাড়ে একটি গুহার গাত্রে প্রাচীন সংস্কৃত একটি লিপি খোদিত আছে, সেই পাহাড় দেখিতে যাইতে হইলে, আমাদিগকে অবিনাশের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাঙা রাজপথ দিয়া যাইতে হইত। বাল্য-কালে আমরা যখন সরস্বতী পূজায় ব্যবহারের নিমিত্ত চণ্ডীদাসের চরিত-কথার সহিত জড়িত ছাতনা গ্রামের সন্নিহিত শালবনে শ্বেত অরণ্যপুষ্প সংগ্রহ করিতে যাইতাম, তখনও অবিনাশদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হইত।

"কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় যখন নূতনচটির নিকটস্থিত পাঁচবাঘা গ্রামের বড় বাঁধের (পুষ্করিণীর) পাড়ের রাশি রাশি রক্তকরবী তুলিয়া আনিতাম এবং বাল্যে কখন কখন নূতনচটি ও পাঁচবাঘায় ভোজ খাইতে যাইতাম তখনও অবিনাশদের বাড়ী অতিক্রম করিয়া যাইতাম।

"যৌবনে যখন আমরা উভয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এম. এ. হইয়াছি, তাহার পরও মনে পড়ে, পাঁচ-বাঘা গ্রামের হিতলাল মিশ্রের সহধর্মিণীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ লবণ ভিক্ষা করিয়া লইয়া উভয়ে নিকটবর্তী বনে বনকুল তুলিয়া খাইয়াছিলাম। আরও কত কথা মনে পড়িতেছে।

"অবিনাশ আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন। সেজন্য মনে করিয়াছিলাম, আমার সন্তানদিগকে বলিয়া যাইব আমার মৃত্যুর পর আমার যৌবনকাল সম্বন্ধে তাহাদের কোন কৌতূহল হইলে, অবিনাশকে যেন জিজ্ঞাসা করে। তাহা আর হইল না। সুখের বিষয় আমাদের বন্ধু বাঁকুড়ার প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় সুস্থ ও জীবিত আছেন তিনি দীর্ঘজীবি হউন।"[২]

অবিনাশচন্দ্র ও রামানন্দের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার কথা রামানন্দের উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে বিধৃত আছে।

রামানন্দ ও অবিনাশ উভয়েই প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন বাঁকুড়ার পাঠশালাতেই। পরে অবিনাশচন্দ্র রাঁচিতে চ'লে যান। রাঁচি অবিনাশচন্দ্রের পিতা হরিনাথ দাসের কর্মস্থল ছিল। বাঁকুড়ার প্রথম ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি এই হরিনাথ। এই হরিনাথই প্রথম বাঁকুড়ায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এ সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র পরবর্তীকালে প্রথম যুগের প্রবাসীতে একটি নিবন্ধ[৩] প্রকাশ করেন। রাঁচি থেকেই অবিনাশচন্দ্র এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে পাটনা কলেজ হতে এফ্‌-এ, ও বি-এ পাস করেন। রামানন্দ-কন্যা শান্তা দেবী এ বিষয়ে লিখেছেন: "১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিটি কলেজ হতে বি-এ ইংরাজী অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন রামানন্দ। তাঁহার সহপাঠী সুরেশচন্দ্র সরকার, (ডাঃ) অবিনাশচন্দ্র দাস, (জাষ্টিস) বিপিনবিহারী, প্রভৃতিও এই বৎসরে বি-এ পাশ করেন।"[৪] এর পর অবিনাশচন্দ্র কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ ও ল অধ্যয়ন করতে থাকেন। ইতিমধ্যেই অবিনাশচন্দ্র ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে বুৎপন্ন হয়ে ওঠেন এবং বাল্মীকি রামায়ণের সীতা-চরিত্রের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সীতা-চরিত্র কীর্তনের প্রয়াসী হন এবং এর পাণ্ডু-লিপি তৈরী ক'রে ফেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে তাঁকে সীতা-গ্রন্থ প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেন। এম-এ, ও বি-এল পাস করার পর তিনি কিছুদিন বাঁকুড়া কোর্টে ওকালতী করেন। কিন্তু এই কর্ম তাঁর মনোরঞ্জন করে নি। অবিনাশচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশপ্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং সেকালের জাগৃতি ও জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। সুতরাং সরকারী চাকুরি মিললেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি Indian Mirror-এর সম্পাদক N. N. Sen-এর

২। প্রবাসী—১৩৪৩ (আশ্বিন)।
৩। বাঁকুড়ায় ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন।
৪। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা। পৃঃ ২৩।

সংস্পর্শে আসেন এবং উক্ত পত্রিকার অন্যতম লেখকরূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন। N. N. Sen-এর প্রভাবের ফলেই তিনি কলিকাতায় 'স্বদেশ' নামক একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'স্বদেশ' নামক একখানি পত্রিকা তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। এর পরে তিনি ধার্মিক শ্যামপ্রসন্ন পরমহংসের সহিত পরিচিত হন এবং ধর্মমূলক 'সনাতনী' পত্রিকাখানির প্রকাশ ও সম্পাদনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জে একজন জমিদারের বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করেন। ইনি জৈনধর্মাবলম্বী নাবালক বিজয়সিং দুধোরিয়া। এঁর সম্পত্তি তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। বিজয়সিং সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানেই ম্যানেজাররূপে কার্য করেন, পরে অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ঐ কার্যে ইস্তফা দেন। ইতিমধ্যে স্বদেশ প্রেসও নানা কারণে নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর তিনি আলিপুর কোর্টে ওকালতী করতে থাকেন, কিন্তু এখানেও তিনি অধিক দিন নিযুক্ত থাকতে পারেন নি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সেবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ভারত মুক্তি-সাধক রামানন্দের সংবাদপত্র সেবার আদ্যন্ত অনুসরণ করলে দেখা যাবে—বাল্যবন্ধু অবিনাশচন্দ্র সকল ক্ষেত্রেই বিরাজ করছেন। ১২৯৯ সালে রামানন্দ 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। দাসীর ৮ মাস পূর্বে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' বার করেন। সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য —দাসীর উদ্দেশ্য জনসেবা। প্রথম হতেই রামানন্দের দাসীতে অবিনাশচন্দ্র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। শ্রীমতী শান্তা দেবী লিখেছেন, "এই সময় হইতে 'দাসী'তে রাজনারায়ণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সখারাম গনেশ দেউস্কর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অবিনাশচন্দ্র দাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করেন।" তিনি অন্যত্র লিখেছেন, "১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় যে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম হইয়াছিল বিশ্ব-বিদ্যালয় বিষয়ক প্রস্তাবটি তার পূর্বেই লেখা। অবশ্য কিছুকাল হইতে ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার প্রতিষ্ঠা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। অবিনাশচন্দ্র দাসের 'পলাশ বন' উপন্যাস এই সময়েই দাসীতে প্রকাশিত হয়।"[৫] ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দাসীর প্রকাশ বন্ধ হয়। অবিনাশচন্দ্র প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পিতার প্রভাবে ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং বেদশাস্ত্র, বিশেষ করে ঋগ্বেদের সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে। তারই ফলস্বরূপ একক ১৫ বৎসরের সাধনায় তিনি Rigvedic India গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। এই সংবাদ স্যার আশুতোষের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি অবিনাশচন্দ্রকে ডেকে পাঠান। তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে স্যার আশুতোষ কেবল ভূয়সী-প্রশংসাই করেন নি—তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে Ph. D উপাধিতে ভূষিত ক'রে তৎকালীন প্রবর্তিত Ancient Indian History and Culture কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন। সে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫ বৎসর অধ্যাপনা করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর কর্মজীবনের অবসান ঘটে।

অবিনাশচন্দ্রের প্রথম সারস্বত অবদান 'সীতা'। গ্রন্থ-খানিকে তিনি জননী দেবীর পবিত্র নামে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৯০ ( বাং ১২৯৭ )। ১৩০৪ ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থের আরও দু'খানি সংস্করণ হতে দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের সীতার পর অবিনাশচন্দ্রের গদ্য-গ্রন্থ সীতা এদেশে সমধিক প্রচারিত ও প্রচলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি লেখেন, "এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রাধান্যকালে, পতিব্রতার অগ্রগণ্যা সীতা দেবীর অলৌকিক মহিমা কীর্তনকে কেহ অসাময়িক প্রসঙ্গ বা অসংলগ্ন প্রলাপ বলিবেন না। স্ত্রীশিক্ষা ও লোকশিক্ষা প্রয়োজনীয় কি না, সে বিচারের দিন বহুকাল গত হইয়াছে, কাহারও ইচ্ছা থাক বা নাই থাক, এই উভয়বিধ শিক্ষাই এখন এদেশে প্রায় সর্বত্রই প্রবেশ লাভ করিতেছে। সকলে যাহাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করা বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। সীতাকে স্ত্রীশিক্ষা ও লোকশিক্ষার উপযুক্ত করিয়াই রচিত করিয়াছি।"[৬] Indian Messenger সীতা গ্রন্থখানির সমালোচনা করে লেখেন :

"We regret we could not notice this charming Bengali work earlier. It deserves a longer review than we can here make. The style of the author is chaste, elegant and, where necessary,

৫। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা। পৃঃ ৪৪

৬। সীতা ( ১২৯৭ ), ভূমিকা।

full of vigour. In fact, considering that this is the author's first production, it is . . . remarkable that he has succeded so well as he has done. The book would do credit to the Bengali writers."

সেকালের বঙ্গবাণী, সঞ্জীবনী, নবযুগ, নব্যভারত, বামাবোধিনী, ভারতী, বালক, Hope, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পত্র-পত্রিকা অবিনাশচন্দ্রের প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। অচিরে সীতা Central Text Book Commitee কর্তৃক Middle Schools of Bengal-এর পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মনোনীত হয় এবং কমিটির নির্দেশ অনুসারে তিনি ইহার একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। সীতা গ্রন্থের এই সংস্করণ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে Hare Press থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

অবিনাশচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পলাশবন' (সামাজিক উপন্যাস) ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। লেখক নিজে ইহাকে উপন্যাস বলেন নি। ডক্টর সুকুমার সেন এই গ্রন্থখানিকে সুখপাঠ্য গল্পচিত্র ব'লে উল্লেখ করেছেন।৭ এই গ্রন্থখানি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। 'পলাশবনের' সমালোচনা ক'রে 'ভারতী' ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক নিবন্ধ প্রকাশ করে।৮ এ প্রসঙ্গে Unity and Minister, Englishman, Calcutta Gazette, Indian Mirror, বঙ্গবাসী, দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা, প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা 'পলাশবন' সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছিল তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে কলিকাতায় এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের সম্বর্ধনা উপলক্ষে তদানীন্তন ভাইস্-চেন্সেলর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে. টি., এম. এ., ডি. এল. মহাশয় পলাশবন উপন্যাসখানির উপর যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

"When you read you cannot do better than read, in the first place our great book, the *Gita*, you will not find it very difficult, barring the few passages in which the Vedanta Philosophy is sought to be explained. You may also read the Bengali novel *Palasban* by Babu Abinash Chandra Das or *Suto Duhita*. They are excellent novels and written in the present style. You may also read a book like Goldsmith's *Vicar of Wakefield*, *Lamb's Tales from Shakespeare,* you may also read a book like *Meditations of Aurelius,* a book which has some analogy with *Gita.*"

এর পরেই অবিনাশচন্দ্র বৈশ্য-জাতির স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন এবং এ বিষয়ে গবেষণা ক'রে নূতন আলোকপাত করেন। তদানীন্তন Census Commissioner বৈশ্য-জাতি সম্পর্কে তখন কতিপয় অশোভন মন্তব্য করেন—অবিনাশচন্দ্র এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদ করেন।

এ সম্পর্কে তাঁর 'The Census Commissioren and the Vaisyas of Bengal' শীর্ষক রচনা দু'টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা কলিকাতার একখানি বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।৯ এই সময়েই (১৩০৮-এ) অবিনাশচন্দ্রের প্রিয় বন্ধু রামানন্দ এলাহাবাদ হ'তে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং অচিরে অবিনাশচন্দ্র এই পত্রিকার লেখকশ্রেণীভুক্ত হয়ে যান। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে অর্থাৎ প্রবাসীর ১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ প্রভৃতি কতিপয় সংখ্যায় তিনি বৈশ্যবর্ণ শিরোনামায় কতকগুলি সুচিন্তিত গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করেন। পর বৎসরেই ১৯০৩ সনে তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ 'The Vaisya Caste' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থও সেকালের সুধীজনের প্রশংসাধন্য হয়। 'স্বদেশ' ও 'সনাতনী' সম্পাদনার পর ১৩১২ সালে অবিনাশচন্দ্র 'গন্ধবণিক্' নামক একখানি সামাজিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন—কিন্তু এক বৎসর পরেই এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়। ১৩২৮ সালে পুনরায় তিনি উক্ত পত্রিকাখানির প্রকাশ করেন এবং ১৩৪৩ অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'গন্ধবণিকে'ও তাঁর বহু সুচিন্তিত নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সম্পাদনা গুণে এই পত্রিকা সেকালের বিদ্বৎজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। রামানন্দ অবিনাশচন্দ্রের পত্রিকা থেকে বহু রচনা নির্বাচিত ক'রে নিজ পত্রিকা প্রবাসীতে মুদ্রিত করতেন। মাসিক 'বসুমতী'তেও 'গন্ধবণিকে' প্রকাশিত অনেক রচনার পুনর্মুদ্রণ দেখা যায়। ১৩৩০ সালে তিনি 'গন্ধ-বণিক্ জাতির প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পর বৎসর, 'চতুরাশ্রম সমন্বয়ের ইতিবৃত্ত' পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

অবিনাশচন্দ্রের কুমারী (উপন্যাস ১৩১৬), অরণ্য-

৭। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে (১৩৬৫), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯।
৮। ভারতী, ১৩০৩ জ্যৈষ্ঠ।

9. *Indian Mirror,* 28th Sept. 1901, 5th Oct. 1901.

বাস (উপন্যাস ১৩১৯), গাথা (কাব্য) দুর্গাবতী (রোমান্স), 'প্রভাবতী' ( নাটক ), 'রঘুবংশম্' ( এফ এ.-র পাঠ্য ), সুকথা, সাহিত্যবোধ, ঐতিহাসিক কথা, পুরাণের গল্প প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হ'ল। কুমারী উপন্যাসের কিয়দংশ প্রবাসীতেই প্রকাশিত হয়।১০ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখের বাঁকুড়া দর্পণে কুমারী উপন্যাস সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই উপন্যাসখানি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় সভাপতির অভিভাষণ দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অবিনাশচন্দ্রের 'অরণ্যবাস' গ্রন্থখানিও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। ১৩২০ সালের 'মানসী' অরণ্যবাস গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল—"অবিনাশচন্দ্রের অরণ্যবাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম কার্ষিক উপন্যাস।"

অবিনাশচন্দ্র যখন দ্রুত গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত—তখনও বন্ধু রামানন্দের সংশ্রব ত্যাগ করেন নি। এলাহাবাদ হতে প্রবাসী প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রামানন্দকে অভিনন্দনপত্রে অভিষিক্ত করেন। প্রবাসীর রচনা-সৌন্দর্যে ও তিনি মুগ্ধ হনই—তার মুদ্রণ ও চিত্রণ পারিপাট্যে অবিনাশচন্দ্র উল্লসিত হয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে শান্তা দেবীর গ্রন্থে দেখি—'অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাস লিখিলেন—প্রথমেই প্রবাসীর মলাট দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এমন সুন্দর মলাট কোন বাংলা কাগজে দেখি নাই। যাঁহারা দেখিতেছেন তাঁহারাই প্রশংসা করিতে-ছেন।" প্রথম যুগের প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে অবিনাশচন্দ্র স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, সুচিন্তিত তথ্যবহুল গবেষণামূলক রচনা, গ্রন্থ-সমালোচনা, প্রভৃতি দিয়ে তিনি বন্ধু রামানন্দের প্রবাসীকে সমৃদ্ধ করেছেন। মডার্ণ রিভিউতেও তাই। রামানন্দ জীবনচরিতে দেখা যায়—

"প্রথম যুগের M. R. পরিচালনায় তিনি যে সকল বন্ধুর বিশেষ সহায়তা পাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মেজর বামনদাস বসুর নাম সকলের আগে মনে পড়ে। সকলেই লেখক নহেন। যাঁর যে সম্পদ্ ছিল তিনি সেই সম্পদের সাহায্যেই বন্ধুহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখনকার লেখকদের মধ্যে সি ওয়াই চিন্তামণি, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লজপৎ রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, মহেশচন্দ্র ঘোষ, স্বর্গীয় Andrews, সন্ত নিহালসিং, বিজয়েন্দ্র সেন, তেজবাহাদুর সপ্রু, অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্রেয়, অবিনাশচন্দ্র দাস, যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি কত জনের নাম করা যায়।"১১

রামানন্দের 'দাসী'র যুগ হ'তে প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ পর্যন্ত অবিনাশচন্দ্রের সর্ববিধ রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত করলে অবিনাশচন্দ্রের অবদান সহজেই নির্দ্ধারিত হতে পারে। ভবিষ্যতে এইরূপ একটি রচনাপঞ্জী প্রণয়নের ইচ্ছাও আছে।

বঙ্গসাহিত্যের স্রষ্টা অবিনাশচন্দ্রের আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাঁর মনীষার জন্য। ঋগ্বেদ নিয়ে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন—তারই ফলে তাঁর খ্যাতি পাশ্চাত্ত্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি Rigvedic India গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এই সময়েই তিনি স্যার আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অবিনাশচন্দ্রের এই গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। Token of Sincere Admiration and Esteem এই কথা দিয়েই তিনি গ্রন্থখানিকে আশুতোষের নামে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থ ২৬টি সুলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহা প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ গ্রন্থ। Rigvedic India গ্রন্থ প্রকাশের পর এদেশের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের একখানি বহুখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল :

In his striking Birdwood Memorial Lecture last month Sir Edward Grigg said that in all form of research the patience and peculiar subtlety of the Indian Intellect promise great results These qualities are well displayed by the lecturer in Ancient Indian History and Culture to the Calcutta University in his further volume [12]

মনীষী তিলক প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিত-দের পরই অবিনাশচন্দ্র ঋগ্বেদের প্রাচীনতা—ও তার তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল। কিন্তু তাঁর সেই পাণ্ডিত্যকে অভ্রান্ত বলে কোথাও গর্ব প্রকাশ করেন নি, বরং বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন :

---

১০। প্রবাসী—১৩১১

১১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা। পৃঃ ১৩১

12. *The Times Literary Supplement,* May 12, 1921.

(গ্রন্থের অভিমত পত্র হতে গৃহীত।)

"The present small and unpretentious volume is a faint and feeble attempt at studying the ancient history of the Aryan race from the earliest record available, the *Rig Veda*, on these lines. How far will this attempt be found successful it is not for me to say. But I am fully conscious of my own shortcomings, in adequate equipments, and limited knowledge and powers, and would fain leave the task to abler hands. My only excuse, however, in understanding it is the necessity I strongly feel for the drawing the attention of *Vedic* scholars to the line of research adopted by me, which if properly worked and found scientifically correct, may yield valuable historical truths."[13]

Rigvedic India, এই গ্রন্থের পর তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থ 'Rigvedic Culture' প্রকাশ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বিতীয় সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর পিতার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

অবিনাশচন্দ্র তাঁর 'The Vaisya Caste' গ্রন্থখানিও পিতার নামে উৎসর্গ করেন। অবিনাশচন্দ্রের শিক্ষা ও চরিত্রাদর্শ যে বহুল পরিমাণে তাঁর পিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়—অবিনাশচন্দ্রের পিতৃশ্রদ্ধা হতেই তা অনুমান করা যায়। Rigvedic Culture-এর ভূমিকাতে[১৪] সেই সত্য অনুসন্ধিৎসার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও তিনি বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করেন :

"There is nothing like finality in views that are mainly based on mere intelligent guesses, surmises and probabilities rather than on positive and contestable historical proofs, and there should be room enough for a fresh view, based on fresh materials, in an arena where so many have struggled and are still struggling for existence and recognition. Truth can only be arrived at, not certainly by stifling any independent opinion, boldly expressed and formulated, but by encouraging it and giving it a patient hearing."

ঋগ্বেদের তত্ত্ব, প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র যে স্বকীয় মতামত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তা একেবারে অভ্রান্ত ছিল না। 'পরবর্তীকালে আরও উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলে আরও অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু অগ্রপথিক হিসাবে অবিনাশচন্দ্রের পরবর্তী বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁকে অন্যতম পথিকৃতের সম্মান থেকে বঞ্চিত করেন নি। আজও ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যাঁরাই আলোচনা করুন না কেন—অবিনাশচন্দ্রের নাম তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন। গ্রন্থ দু'খানি প্রকাশের পরই আমাদের দেশে তাঁর মতামতের প্রামাণিকতা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন। Calcutta Review, Historical Quarterly, প্রভৃতি পত্রিকায় তার নিদর্শন মেলে। সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য-পত্রে তখন তারাপদ মুখোপাধ্যায়, হরিহর শাস্ত্রী, প্রভৃতি পণ্ডিতজনে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। অবিনাশচন্দ্রের অভিমতের বিরুদ্ধে সেখানেও ঝড় ওঠে। বাদ-প্রতিবাদ চলে। "ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব" (প্রতি উত্তর) ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখিত এই রচনাতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটতে দেখা যায়।[১৫] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সাহিত্য পত্রের সম্পাদক। ১৯২৭ সনে অবিনাশচন্দ্র হরিদ্বার গুরুকুল বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসবে সভাপতির ভাষণ দেন এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিতের খ্যাতি অর্জন করেন। অবিনাশচন্দ্রের সারস্বত অবদানের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রামানন্দের মত অবিনাশচন্দ্রও বাঁকুড়া জেলাকে কখনও ভুলতে পারেন নি। বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরকে অবিনাশচন্দ্র তাঁর তীর্থস্থান বলে মনে করতেন। কারণ কোতুলপুরে তাঁর পিতামাতার জন্মভূমি এবং বাল্যের খেলাস্থল। এই অবিনাশচন্দ্রের অন্যতম জীবনী লেখক স্বর্গত ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ মহাশয় লিখেছেন—"মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবিনাশচন্দ্র বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা অল্পই ছিল। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনস্পেক্টর প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, মজঃফরপুরের উকীল জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়গণের সহিত তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রামানন্দের প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় তিনি নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।"[১৬] বাস্তবিকই রামানন্দের জীবনচরিতে অবিনাশচন্দ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁকে বাদ দিয়ে রামানন্দ-চরিত্র যেমন পূর্ণাঙ্গ নয়, রামানন্দকে বাদ দিয়ে অবিনাশ জীবনচরিতও খণ্ডিত। বাল্যবন্ধু রামানন্দ অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যুতে প্রবাসীতে লিখেছিলেন—"কলিকাতা বিশ্ব-

13. *Rig Vedic India*, (1921), (Preface, pp. XI—XII).

14. *Rig Vedic Culture* (1925). (Preface, p. VIII).

১৫। সাহিত্য—১৩২৮, ৯ম সংখ্যা।

১৬। সমাজ-বন্ধু অবিনাশচন্দ্র দাস (১৩৫৫।)

বিদ্যালয়ে ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে এবং বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন গণনীয় ব্যক্তির তিরোভাব হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইতে কিছু কম হইয়াছিল। সাহিত্যিক কৃতিত্বে ও পাণ্ডিত্যে তিনি বাঁকুড়া জেলার গৌরবস্থল ছিলেন। তিনি পলাশবন, অরণ্যবাস, কুমারী, সীতা, প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থের লেখক বলিয়া সুবিদিত। পদ্যও তিনি বেশ লিখিতে পারিতেন। তিনি গন্ধবণিক্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঋগ বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যে বিস্তৃত ইংরেজী নিবন্ধ পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক নিয়োগের কারণও ঐ গ্রন্থখানি। তিনি তাহা না লিখিলেও অন্য অনেক এম. এ., বি. এল. উপাধিধারীর মত অধ্যাপক হইবার যোগ্য ছিলেন। তিনি বেশ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ইংরেজী লিখিতে পারিতেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার বাংলা গ্রন্থগুলি অনাবিল এবং সেগুলির ভাষা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট।"[১৭] অবিনাশ সম্বন্ধে বন্ধু রামানন্দের এই উক্তি সর্বৈব সত্য। অন্যূন বিশ বৎসর পূর্বে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের তথা ভারত-সংস্কৃতির সর্ব অঙ্গে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আজ তাঁদের অনেকেই অবিনাশ-চন্দ্রের মত বিস্মৃত। বর্তমানে তাঁদের সুলিখিত গ্রন্থগুলির প্রচার ও মুদ্রণ হওয়া আবশ্যক। অবিনাশচন্দ্রের অসংখ্য বাংলা ও ইংরেজী নিবন্ধ অধুনালুপ্ত অনেক পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে তাঁর অগ্রন্থস্থ রচনার সংখ্যা ন্যূন নহে। এগুলি সঙ্কলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।*

১৭। প্রবাসী—১৩৪৩ (আশ্বিন।)

* শ্রীযুক্ত সাধনধন নাগ মহাশয় এই রচনার অনেক উপকরণ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

# কাল শত্তুর

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন

সৌদামিনী ওরফে সদুঠাকরুণ সন্ধ্যার ধূপ প্রদীপটা সবেমাত্র ঠিকঠাক করেছেন এমন সময় খিড়কি দরজায় আঁচড় পড়ল—বিশেষ জরুরী আঁচড়, দরজাটা এক্ষুণি না খুলে দিলে ভুলুয়ার যাবতীয় সম্পত্তি যেন নীলামে উঠবে।

"শুনেছি, একটু সবুর কর! এখন আমার ঠাকুর-দেবতাকে সন্ধ্যে না দেখিয়ে তোমার দরজা খুলতে যাই! কপালে এত জোটেও বাবা—" খনখনিয়ে উঠলেন সদু-ঠাকরুণ।

আর একবার আঁচড় পড়ল জীর্ণ আমকাঠের দরজায়, এবার বেশ অসহিষ্ণু ভাবেই।

"দরজাটা ভাঙবে যে! বলি অ শত্তুর? মরবার আর সময় পাও না? শুনতে পাচ্ছ কি বলছি?"

সদুঠাকরুণের সুমধুর কথাগুলো ভুলুয়া দিব্যি শুনতে পাচ্ছে কিন্তু কোনদিন ওঁর কথা গ্রাহ্য করেছে যে আজ করবে? ভুলুয়া আর একদফা আঁচড় কাটল বেশ অধীর ভাবে—অর্থাৎ রাখ তোমার ধূপ সন্ধ্যে!

"বাবাঃ—বাবাঃ—বাবাঃ! মুখপোড়ার জ্বালায় দেখছি আমার ধম্মকম্ম সব গেল! তক্ষুণি কত্তাকে বলে-ছিলাম ঐ ঘাটের মরা পুষো না! কিন্তু আমার কথা কবে বিকিয়েছে? এখন কে খুলবে দরজা? ওগো—শুনছ?"

কিন্তু সদর ঘরে-বসা 'শুনছ' চক্রবর্ত্তীর দায় পড়ে নি উত্তর দেবার। গৃহিণীর প্রতিটি 'শুনছ' মোতাবেক যদি ওঁকে দৌড়ে অন্দর আর সদর করতে হয় তাহলে কম ক'রে দিনে ওঁকে দশ মাইল পথ দৌড়াতে হয়!

ওদিকে ভুলুয়ার আকুলি-বিকুলির অন্ত নেই—

"যাচ্ছি—! আমার গুরুঠাকুর যেন! বলি অ কাল শত্তুর। বাড়ীতে তোমার কি এত রাজকার্য্য আছে শুনি? হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেলো মুখপোড়াটা! যাক—আজকের মত থাক এই বাড়ীতে—কাল সক্কালে ঝেঁটিয়ে বিদেয় না করি ত আমার নাম—" সদুঠাকরুণ গজ গজ করতে করতে মটকার শাড়িখানা ইজিপশিয়ান

মর্মির চাইতে বেশি নিপিট ভাবে নিজের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিলেন—কি জানি যদি একটা সুতোও অসাবধানে বেরিয়ে থেকে কুকুরটাকে ছুঁয়ে ফেলে দরজা খুলবার সময়।

"কাল শত্তুর সব! দরজা ছুঁয়ে আছিস না কি?—সরেছিস?" সদুঠাকরুণ উৎকট ভাবে তাবড়ে সাবধান করে দিলেন ভুলুয়াকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজার ফাটল দিয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে পরতাল করে নিলেন বাস্তবিক দরজাটা ছুঁয়ে আছে কি না। এইটুকু সাবধান না হওয়ার জন্য কতদিন যে সময়ে অসময়ে চান করতে হয়েছে ওঁকে।

খিলটা খুলেই একপাটি দরজা টেনে নিলেন—ভুলুয়া নিমিষের মধ্যে গলিয়ে গেল ভেতরে। যাঃ! ছোঁয়া পড়ল নাকি? ভুলুয়ার লেজটা মারাত্মকভাবে সদু-ঠাকরুণের হাঁটুর কাছ দিয়ে চলে গেল নাকি? সদু-ঠাকরুণ গুড়ি হয়ে শাড়িটি পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকেন ছোঁয়ার চিহ্ন যদি লেগে থাকে শাড়িতে! নাঃ ছোঁয় নি বোধ হয়!

খুঁতখুঁত করতে করতে দরজার খিলটা বন্ধ করতে যাচ্ছেন এমন সময় বাইরে বাঁশবাগানে ক'টা শেয়াল একযোগে চেঁচিয়ে উঠল—হুয়া—হুয়া—হুয়া!

ব্যস্! হুড়মুড় করে আবার সরবে এসে পড়ল ভুলুয়া কিন্তু ঠাকরুণ যে ইতিমধ্যে খিল এঁটে দিয়েছেন তা কে জানত! নিজের প্রচণ্ড গতিবেগ ভুলুয়া কিছুতেই সামলাতে পারল না এবং গিয়ে পড়ল একেবারে সদু-ঠাকরুণের গায়ের ওপরে। ছোঁয়া না-ছোঁয়ার সন্দেহটা সদুঠাকরুণের এখন আর একটুও থাকল না।

তুবড়িতে আগুন দিলে বিস্ফোরণ হতে বরং কিছুটা দেরি হয় কিন্তু সদুঠাকরুণের সেটুকু দেরিও হয় না—"হ'ল ত! বলি অ কাল শত্তুর? তোমার গতর এত বেড়েছে যে মানুষের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছ! বলি যম কি চোখের মাথা খেয়েছে? এই ভরসন্ধ্যে বেলায় আবার আমি ডুব দিয়ে মরি। বলি অ—" দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সদুঠাকরুণ কয়েকটা লাথি কষিয়ে দিলেন ভুলুয়ার মাংসল পিঠে।

সত্যি একটু অপ্রস্তুত হয়েছে ভুলুয়া, কিন্তু না আছে ওর লজ্জাবোধ, না আছে ব্যথার অনুভূতি! দরজার ফাঁক দিয়ে পরম আক্রোশে তাকিয়ে আছে বাঁশ বাগানের দিকে—পাড়ায় ত এত বাড়ী আছে কিন্তু শুধু ভুলুয়ার বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে শেয়ালগুলো যে তারস্বরে ডেকে চলেছে এর অর্থ ভুলুয়ার সারমেয়িক পৌরুষের প্রতি কটাক্ষপাত ছাড়া আর কি হতে পারে? ঠাকরুণের পায়ে পড়ছে ভুলুয়া—দরজাটা শুধু একটিবার খুলে দাও।

এদিকে কয়েকটা লাথি খাওয়াই হ'ল, ভুলুয়া কিন্তু লেজটা নেড়েই চলেছে—বিশেষ কৃতার্থ হয়েছে যেন লাথি খেয়ে। লাথি খাবার কাজ ভুলুয়া দিনে সাতবার করেই করে থাকে কিন্তু প্রাপ্তিযোগটা শুধু ঠাকরুণের শুচিবায়ের জন্য ঘটে উঠে না—আজ অনেক দিন পরে! ভুলুয়া লেজটা আর একদফা জোরে জোরেই নাড়ল।

"বেরো—বেরো—" সদুঠাকরুণ রাগের মাথায় দরজাটা খুলে দিতেই ছিলেছাড়া তীরের মত ভুলুয়া বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঁশবাগানে এতক্ষণ ধ'রে শেয়ালগুলোর যে ঐকতান পরমানন্দে চলছিল সেটা এক নিমিষে বন্ধ হয়ে গেল। সদুঠাকরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন ধাবক আর ধাবিতের ঘেউ ঘেউ—খ্যাঁকখ্যাঁকানি; শুকনো পাতার মরমরাণি—তার পর সব নিশ্চুপ!

"মর্—মর্! কাল শত্তুর! বাঁশ বাগানেই যেন ম'রে পড়ে থাকিস—পাঁচ পয়সার সিন্নি দোব! মর্—মর্—" সদুঠাকরুণ গজ গজ করতে করতে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আচ্ছা এক উৎপাত জুটেছে ওঁদের নিঃসন্তান সংসারে। তখন কর্ত্তাকে পই পই করে নিষেধ করে-ছিলেন যে ও ভুত পুষো না! তাছাড়া সত্যি কথা বলতে গেলে একটা রাত্রির মত আশ্রয় দিতে গিয়ে যে কাল শত্তুর চিরকালের মত থেকে যাবে তাই বা কে জানত! ভুলুয়া তখন এক মাসের বাচ্চা, ওর মা'র পেছু পেছু সদর রাস্তাটা পার হচ্ছিল—হঠাৎ এসে পড়ল একটা মাল-বোঝাই ট্রাক! ভুলুয়ার মা রাস্তাটা ঠিক পার হ'য়ে গিয়ে-ছিল কিন্তু ভুলুয়া তখনও পারে নি—ট্রাকের তলায় চারটে চাকার মধ্যে থেকে। ভুলুয়ার মা আবার ঘুরে একমাত্র সন্তানের চরম বিপদ্‌কালে কাছে আসতে চেয়েছিল কিন্তু আর আসতে পারে নি। চক্রবর্ত্তী মশাই অনাথ বাচ্চাটাকে একরাত্রির মত আশ্রয় দিতে গিয়েছিলেন, আর সেই থেকে কাল শত্রুটা—

দেহশুদ্ধির জন্য ঘটি ঘটি জল ঢেলে চলেছেন সদু-ঠাকরুণ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে এক-একটি বিশেষণে ভূষিত করে চলেছেন ভুলুয়াকে—"কাল শত্তুর—থাক থাক—আজকের রাতটা—ঝেঁটিয়ে বিদেয়—"

রাত্রির আহারের সময় চক্রবর্ত্তী মশাই তাঁর 'আদুরে' ভুলুয়ার বিরুদ্ধে নালিশের বিস্তারিত এজেহার এবং প্রতিকারের প্রার্থনা গৃহিণীর কাছ থেকে শুনলেন এবং নিরপেক্ষ বিচারক নিজের দাম্পত্য জীবনের ফ্যাসাদের

দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করে আসামী ভুলুয়ার নির্ব্বাসনদণ্ডের কঠোর রায় প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর দেখলেন না, কারণ, এই ছোঁয়াছুঁয়ির অপরাধ ভুলুয়া সপ্তাহে অন্ততঃ দু'তিন দিন করেই থাকে এবং গৃহিণীর নালিশ দায়েরও হয় ঠিক ঐ সংখ্যাতেই এবং যথারীতি ভুলুয়ার নির্ব্বাসনদণ্ডের রায়ও ইতিপূর্ব্বে বহুবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও আসামী ভুলুয়া ফেরার হওয়া ত দূরের কথা, বিচারকের চোখের সামনেই দিব্যি বাহাল তবিয়তে আজও থেকে গেছে।

নির্ব্বাসনদণ্ডের কথা আজ ভুলুয়া টের পেয়েছে কি না কে জানে? কিন্তু রাত্রির খাওয়া-দাওয়া প্রায় এক ঘণ্টা হ'ল চুকে গিয়েছে—কাল শত্তুরো এখনও দেখা নেই! সন্ধ্যার সময় সেই যে শেয়াল তাড়াতে গিয়েছে আর বাড়ী ফেরে নি। ভুলুয়ার নৈমিত্তিক আহার ডাল-ভাত একটা বাটিতে সাজিয়ে ঠায় বসে আছেন সদুঠাকরুণ। যদি রান্নাঘরে একবার তালা দিয়ে দেন তাহলে মরে গেলেও আর উঠছেন না ঠাকরুণ—থাকবি মুখপোড়া খালি পেটে! অনেক অপেক্ষা করেছেন, আর ঠিক পাঁচ মিনিট দেখবেন তার পর তালা দিয়ে চলে যাবেন ঘরে—

আরও আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল তবু দেখা নেই ভুলুয়ার। মশার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন সদু। ভুলুয়া আজ দু'বছর এখানে আছে কিন্তু রাত্রে বাড়ী না ফেরা ত কখনও হয় নি? আজ হ'ল কি কাল শত্তুরের? আর সদুঠাকরুণেরই বা এত দায় কিসের? কুকুর ত সদুর নয়, ও কুকুর কর্ত্তার; দিনে রাত্রে সদু বার-চারেক খেতে দেন এই মাত্র। এখন যার কুকুর সেই বুঝে নিক—

সদুঠাকরুণ দুমদুম করে চলে গেলেন শোবার ঘরের দিকে—কর্ত্তা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছেন।

"এই—শুনছ?—এই—শুন—ছ?"

আশ্চর্য্য ঘুম! নাক ডাকাটা বন্ধ হওয়া ত দূরের কথা—গৃহিণীর গলার স্বর শুনে নাক ডাকাটা বরং যেন আরও জোর ধরল!

না—থাক। সারাদিন বেচারী স্কুলে মাষ্টারি করে, এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কাল শত্তুরের জন্যে শুধু বিশ্রাম নেই সদুঠাকরুণের। রাগে দপ করে জ্বলে উঠল পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত। একটা বিশেষ শাস্তি ওকে দিতে হবে। হঠাৎ নজরে পড়ল দরজার পাশে মোটা হুড়কোটার দিকে। —ঠিক। ওর যা গতর, লাথিফাতির কম্ম নয়! সদু-ঠাকরুণকে যদি আবার এই রাত্রিতে চান করতে হয় তাও স্বীকার কিন্তু এই হুড়কোর ক'ঘা না দিয়ে ভাত ক'টা বেড়ে দেবেন ঐ কাল শত্তুরকে?

ভারী হুড়কোটা পাশে ফেলে রেখে কান খাড়া করে বসে রইলেন ভুলুয়ার প্রতীক্ষায়—ও আবার দরজা ঠেলে ঠিক মানুষের মত। নেহাত না খুললে আগে একটা মুড়ি দিয়েই ঢুকত। এখন গতর বেড়েছে—কাঁই কাঁই করে জ্বালাতন করে চলবে যতক্ষণ না খুলবেন—এমনি বজ্জাত হয়েছে কাল শত্তুরটা।

কিন্তু ভুলুয়া সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরল না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই সদুঠাকরুণ উঠানের বিশেষ স্থানটার দিকে দৃষ্টি দিলেন—ভুলুয়ার খাবারটা অভুক্তই পড়ে আছে। যেখানেই থাক, আজ ত বাড়ী আসতেই হবে, তখন ব্যবস্থা হবে ওর।

ক্রমে যতই বেলা বেড়ে চলল সদুঠাকরুণের মুখটা ততই গম্ভীর আর থমথমে হয়ে উঠল। চক্রবর্ত্তী মশাই বেশ বুঝতে পেরেছেন যে গৃহিণী যতই চেপে রাখুন না কেন, ভুলুয়ার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে ওঁর ভাবান্তরের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। কিন্তু সেকথা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে কার সাধ্যি?

ভাতখাবার সময় চক্রবর্ত্তী মশাই বলে বসলেন—"দেখ দেখি—ভুলুয়ার কাণ্ডটা—"

"কাণ্ড দেখতে হয়, যার কুকুর সেই দেখুকগে। বামুন পণ্ডিতে আবার কুকুর পোষে! আমার বাপ-কাকার বাড়ীতে ওসব রীত নেই—যত অনাছিষ্টি কাণ্ড এখানে! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি ঐ কাল শত্তুরের নাম আমার কাছে কর ত—" ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন সদুঠাকরুণ। কিন্তু ডালের বাটিটা সশব্দে নামিয়ে দিতে যা দেরি, তার পর সমানে বলে চললেন—"হাড়মাস জ্বলে গেল—তখন বলেছিলাম—আ মর্। দূর দূর, ওটা আবার কে—?" সদুঠাকরুণ তেড়ে গেলেন একটা অপরিচিত খেঁকটি কুকুরের দিকে। কখন চুপি চুপি এসে ভুলুয়ার জন্যে বাড়া ভাত ক'টা গব গব করে খেয়ে চলেছে—

ঠাকরুণের রে—রে শব্দে ছোঁড়া কয়লার ঘা খেয়ে কুকুরটা অবশ্য লেজ গুটিয়ে পালিয়ে নিস্তার পেল কিন্তু নিস্তার পেলেন না চক্রবর্ত্তী মশাই—

"ভুলুয়ার ভাত ক'টা খেলো ত? আমি কাল থেকে আগলে আগলে রাখলাম আর তুমি এক মিনিট নজরে রাখতে পারলে না? পুরুষ মানুষ—চারি চতুর্দ্দিকে নজর রাখবে—তা' কোথায়! অত বড় পদার্থটা যে বাড়ীতে ঢুকল সেটা আর পুরুষের নজরে ঠেকল না?

আমি একা আর কত দিক্ সামলাব ?—না—না আমার মরণই ভাল !

গৃহিণীর ওপর চটে উঠলেন চক্রবর্ত্তী মশাই। তার চেয়ে বেশী চটলেন ভুলুয়ার ওপর—ঐ হারামজাদাই যত অশান্তির মূল! ওর একটা ঠ্যাঙ না ভাঙেন ত ওঁর নাম হাবল চক্রবর্ত্তীই নয় !

ভুলুয়া সেদিনও বাড়ী এল না।

পরের দিন বিকালে স্কুল থেকে ফিরে চক্রবর্ত্তী মশাই দেখলেন, গৃহিণী গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। অন্যদিন এতক্ষণ উনুনে আঁচ পড়ে যায়, আজ তার কোন ব্যবস্থাই নেই। মধ্যাহ্নে গৃহিণী আজ আহার করেছেন কি না কে জানে !

"তুমি পাগল নাকি ? একটা কুকুরের জন্য মন খারাপ করার কোন মানে হয় ?"

"মন খারাপ ? ঐ মুখপোড়ার জন্যে আমার দায় পড়ে নি মন খারাপ করতে ! সর্দ্দিতে আমার নাক-তালু জ্বলে যাচ্ছে—একদিন সন্ধ্যেতে ডুব দিয়ে দেখ না কি হয় ! কাল শত্তুরটা নিজের থেকে বিদেয় হয়েছে, বেঁচেছি ! তুমি যেন আপত্তি করো না—ওকে ঝেঁটিয়ে—" সদু-ঠাকুরুণের চোখ দুটো চকচক্ করে উঠল, তার পর নাকটা ঝাড়লেন—যা সর্দ্দি হয়েছে !

সদুঠাকরুণের সর্দ্দি ! পাড়ার একটা খবরের যোগ্য। কিন্তু সে যাই হোক—ঐ হতভাগা কুকুরটার জন্যে চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের ভোগান্তি কেন ? ভগবানের ইচ্ছায় গিন্নীও যখন একমত, তখন ওটাকে আর এমুখো হতে দিচ্ছেন না—

সন্ধ্যা হয়ে এল—অন্দরে সদুঠাকরুণ সন্ধ্যার যোগাড় করছেন, সদর ঘরের বারান্দায় বসে বসে তামাক টানছেন চক্রবর্ত্তী মশাই,—হঠাৎ দুটো কুকুর সরবে কলহ করে উঠল—একটা যেন ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছে প্রাণের দায়ে। কে ? ওর মধ্যে একটা ভুলুয়া না ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভুলুয়াই ত। গলায় আবার বকলস পরেছে ! অন্যটা গত কালের সেই খেঁকটি কুকুরটা, বোধ হয় লোভে লোভে আজও আবার বাড়ী ঢুকবার চেষ্টা করছিল, পড়ে গিয়েছে ভুলুয়ার সামনে ।

ভুলুয়ার ওপর রাগে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল চক্রবর্ত্তী মশাই-এর—। প্রাণ থাকতে ওটাকে আর বাড়ী ঢুকতে দিচ্ছেন না। গিন্নীও মারমুখো—এমন দিন হয়ত আর আসবে না !

চক্রবর্ত্তী মশাই ঘরের কোণ থেকে ছড়িটা হাতে নিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন—আগে ঘা কতক দিয়ে তবে অন্য কথা। ঢুকুক না একবার এই দরজা দিয়ে—

কিন্তু ভুলুয়ার দায় পড়ে নি সদর ঘর দিয়ে বাড়ী ঢুকবার—ও ঠিক গিয়েছে খিড়কি দরজা দিয়ে। ভালই হয়েছে,—কর্ত্তার হাতে ত একটা পাতলা ছড়ি। অন্দরে গিন্নী কাল থেকে ঠিক করে রেখেছেন বিরাট্ এক হুড়কো—ওর এক ঘা খেলে বাছাধনের আর নিস্তার নেই।

কান খাড়া করে থাকলেন চক্রবর্ত্তী মশাই, একযোগে ভুলুয়ার আর্ত্তনাদ আর গৃহিণীর খনখনানির শব্দ এল বলে।

কিন্তু অন্দর থেকে না ভুলুয়ার না গৃহিণীর কারও সাড়াই ত পাওয়া গেল না—ব্যাপার কি ? টের পান নাই নাকি ভুলুয়ার আগমন ? না মারের ভয়ে আগে থেকেই সট্‌কে পড়ল ভুলুয়া ?

চক্রবর্ত্তী মশাই ছড়িটা হাতছাড়া করলেন না—ঘা কয়েক যদি দিতেই হয় তখন কোথায় পাবেন লাঠি ?

চক্রবর্ত্তী মশাই চললেন অন্দরের দিকে এবং দূর থেকে দেখলেন যে, মাঝ উঠোনে ভুলুয়া সাটপাট দিয়ে শুয়ে আছে আর লেজটা নেড়ে চলেছে সবেগে। গৃহিণী সান্ধ্যকালীন শুদ্ধ কাপড়েই ভুলুয়াকে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধছেন—কি জানি আবার যদি পালায়।

চক্রবর্ত্তী মশাই ছড়িটা কোঁচার আড়ালে লুকিয়ে নিঃশব্দে ফিরে এলেন নিজের সদর ঘরে। সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে—বিশ্বাসঃ নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু—

পরমুহূর্ত্তে অন্দরের কুয়োতলা থেকে শোনা গেল ঘটি ঘটি জল ঢালার শব্দ আর সদুঠাকরুণের উত্ত্যক্ত কণ্ঠস্বর—"ঠাকুর-দেবতা ধম্ম-কম্ম সব গেল—সব গেল ! বলি অ কাল শত্তুর—ভরসন্ধ্যে ছাড়া বাড়ী ঢুকতে পার না ?"

# পশ্চিমবঙ্গের রেশম শিল্প ও তার ভবিষ্যৎ

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত প্রবন্ধ

শ্রীশক্তিময় বসাক

বহু যুগ আগে থেকে আমাদের শিল্পধারা বয়ে এনেছে সুদূর অতীতের রূপমাধুরী। এ শিল্পধারা কবে সুরু হয়েছে কেউ জানে না; তবু একথা নিশ্চিত ক'রে বলা চলে, মানুষের ইতিহাস যত প্রাচীন এ শিল্পধারা তত পুরাতন। এ শিল্প-স্রোতের উৎস সন্ধানে বের হলে চলে যেতে হবে মহেঞ্জদাড়ো হরপ্পার যুগে; তার পর মিশর, ব্যাবিলন, বাইজেনটাইন সভ্যতার অব্যক্ত অতীতে।

বিভিন্ন যুগে বহু ভাবধারার মিলনে শিল্প প্রাণবন্ত হয়েছে। সিন্ধুনদের আর্যসভ্যতা জুগিয়েছে নূতন আঙ্গিক, বৌদ্ধ যুগ দিয়েছে পরম ভাবসম্পদ্, রাজপুত ও মোগল আমলে এসেছে রঙের খেলা। শিল্পীকে প্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের মহাকাব্য, ব্রত, উপকথা ও আচার-অনুষ্ঠান।

অতীত ভারতে শিল্পীরা সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় বয়নশিল্পীর বিশেষ আসন বরাবরই নির্দিষ্ট ছিল। সূত্রধর, কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কাংস্যবণিক, স্বর্ণকার, শঙ্খকার, চিত্রকর ও মালাকার, এই নয়টি শিল্পগোষ্ঠী ছিল শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ও ধারাবাহক। সকল কর্মপ্রবাহের মূলে ছিল সেকালের ধর্মীয় অনুশাসন, সমাজব্যবস্থা, রাজা-মহারাজা ও শিল্প-দরদীর প্রয়োজন ও চাহিদা। ভারতের মসলিন, রেশম প্রভৃতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি সেকালের সভ্য-জগতের দরবারে। বিস্ময়কর শিক্ষানৈপুণ্য, অপরূপ নক্সা, রঙ ও রূপের মার্জিত জৌলুসে ভারতের শিল্প বিশ্বের দরবারে সশ্রদ্ধ আসন অধিকার করেছিল।

যন্ত্রযুগ সুরু হবার পর থেকেই শিল্পীর জীবনে বিপর্যয়ের ছায়া নেমে এল। শিল্পীর আর্থিক বুনিয়াদ দুর্ব্বল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ম্লান হয়ে এল। পুরুষানুক্রমে পাওয়া যে ঐতিহ্য ও শিল্প-প্রতিভা ছিল শিল্পীর, সেই দক্ষতা হারিয়ে সে দিন-মজুরের পর্যায়ে নেমে এল। রাজা-বাদশাদের দিন ফুরিয়ে গেল, শিল্পী হারাল তার শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। দেশের লোকের রুচি পাল্‌টে গেল, রেশম শিল্প বাজার হারাতে বসল। আসন্ন বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় বহু শিল্পী পিতৃপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করল; যারা আঁকড়ে রইল, তারা শুধু বেঁচে রইল অবজ্ঞা ও অবহেলা মাথায় নিয়ে।

নিজের দেশের শিক্ষা, শিল্প ও ভাবধারা উপেক্ষা ক'রে বহুকাল আমরা বিদেশীয়ানাকেই বড় করে দেখেছি। আপন শিক্ষা ও ভাবসম্পদ্‌কে উপেক্ষা করে আমরা বিজাতীয় ধারাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। সুখের বিষয়, আজ পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। আজ আমাদের নিজস্ব সম্পদের দিকে আমরা আবার ফিরে তাকিয়েছি। সরকার অগ্রসর হয়েছেন রেশম শিল্পের উন্নয়নে। বিভাগীয় প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে রেশমের কাজ বেশী রকম সাফল্য লাভ করেছে। পেলব মাটির দেশ বাংলা, তার মাটিতে সোনা ফলে, তার শিল্পীমন প্রেরণা দেয় শিল্পসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ সাধনে। বাংলার শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় লুকিয়ে আছে বাংলার নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কুটিরে কুটিরে। বয়ন শিল্পে আজও বাংলার স্থান অক্ষুণ্ণ। বাংলার রেশম বাংলার শিল্প-মনীষারই পরিচয় বহন করছে।

লজ্জা ও শীত নিবারণ করার জন্য মানুষ নানা রকম জিনিষ থেকে কাপড় তৈরী করে। এই সকল জিনিষের কতক জীব-জন্তু থেকে এবং কতক বৃক্ষ-লতা থেকে পাওয়া যায়। বৃক্ষ-লতা থেকে যা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কাপাস তুলাই প্রধান। সাধারণতঃ সব দেশেই কাপাসের সূতার কাপড়েরই চলন বেশী। কিছুদিন থেকে কাঠ, গাছের ছাল, কাপাসের ঝুট প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গলিয়ে সূতা তৈরী হচ্ছে। এর নাম রেয়ন। একে পূর্বে মেকী রেশম বলা হ'ত। দুধ ও পাথর কয়লা থেকেও আজ-কাল সূতা তৈরী হচ্ছে—এদের নাম যথা-ক্রমে ল্যানিটান ও নাইলন।

জীব-জন্তু থেকে আমরা পশম ও রেশম পাই। গায়ের লোম থেকে যে জিনিষ তৈরী হয় তাকে পশম বলে। কয়েক জাতি পোকা নিজের মুখ থেকে সূতা বের ক'রে নিজেকে ঘুমন্ত অবস্থায় রক্ষা করবার জন্য ঘর তৈরী করে। এই ঘরকে গুটি বা কোয়া বলে। এই গুটি

থেকে স্থতা নিয়ে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী কাপড় তৈরী করতে পারা যায়। বহুকাল অবধি গুটিপোকার গুটি থেকে স্থতা বের ক'রে বস্ত্র বয়ন প্রথার প্রচলন আছে। —যে সকল পোকা থেকে এই স্থতা পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গে তাদের সাধারণ নাম পলু। পলু কয়েক প্রকারের আছে। তাদের গুটি থেকে বিভিন্ন প্রকারের স্থতা পাওয়া যায় এবং তাদের নামও ভিন্ন। যথা—

( ক ) রেশম—ইংরেজিতে ইহার চলতি নাম সিল্ক ( Silk ), বাংলা দেশে সাধারণতঃ গরদ, কোথাও কোথাও পাট। যে পলু থেকে ইহা পাওয়া যায় তারা তুঁত গাছের পাতা খায়।

( খ ) এণ্ডি—এরণ্ড, ভেরেণ্ডা বা রেড়ী গাছের পাতা খায় বলে এই পলুর স্থতার নাম হয়েছে এণ্ডি।

( গ ) তসর—এর পলু শাল, আসান, কুল, অর্জুন প্রভৃতি বন্য গাছের পাতা খায়।

( ঘ ) মুগা—এর পলুও তসর পলুর মত বন্য গাছের পাতা খায়।

রেশমের রং গাওথা ঘি বা ক্রীম বা জ্বাল দিয়ে ঘন করলে দুধের যে রং হয় সেইরূপ সামান্য হরিদ্রাভাযুক্ত সাদা। এক রকম সাদা রেশম উৎপন্ন হয় যাতে সামান্য সবুজের আভা থাকে। আবার এমন সাদা রেশমও পাওয়া যায় যাতে প্রায় কোন আভা থাকে না। চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, ইতালী, ফরাসী প্রভৃতি বহু দেশেও এই শিল্প প্রচলিত আছে। রেশম পলুই প্রধান এবং রেশম শিল্প বলতে রেশম পলু হতে গুটি ও স্থতা উৎপাদন ও তারই ব্যবহার বুঝায়।

পশ্চিমবঙ্গের রেশম শিল্প বহু পুরাতন এবং এক সময়ে ইহা দেশের প্রধান শিল্প সকলের মধ্যে গণ্য ছিল এবং বহু রেশম উৎপন্ন হ'ত। সে বেশীদিনের কথা নয়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে গুটি হতে রেশম স্থতা বের করার রেশম কাটাই কুঠিবাড়ী, বয়লার ইত্যাদি প'ড়ে আছে এবং রেশম উৎপাদন শিল্প কত বিস্তীর্ণ ছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রেশম শিল্পের তিনটি স্তর এবং প্রতি স্তরের কার্যপ্রণালী পৃথক্ এবং পৃথক্ শ্রেণীর লোকের পক্ষে উপযোগী। তা হ'লেও তিনটি স্তরই পরস্পরের উপর নির্ভর করে এবং শিল্পের উন্নতির জন্য তিনটি স্তরেরই উন্নতি প্রয়োজন। প্রথম স্তর হ'ল তুঁত পাতার চাষ এবং এই পাতা খাইয়ে পলু পালন এবং গুটি বা কোয়া উৎপাদন। দ্বিতীয় স্তর হ'ল গুটি হতে কাটাই ক'রে রেশম স্থতা বের করা। তৃতীয় স্তর হ'ল রেশম স্থতা দিয়ে বস্ত্র বয়ন।

প্রথম স্তর।—পলু পালন ক'রে গুটি উৎপাদন কুটির শিল্পরূপে কৃষক শ্রেণীর পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট উপশিল্প। পলুপালনকারী গৃহস্থকে পশ্চিমবঙ্গে বস্নী বলে। বস্নী অন্যান্য ফসলের সঙ্গে দুই-এক বিঘা এবং সমর্থ হলে আরও বেশী তুঁতের চাষ করে। পাতা হলে পলুর সঞ্চ বা বীছন সংগ্রহ করে এবং ঘরের ভেতরে ডালায় পলুগুলিকে রেখে ক্ষেত থেকে পাতা তুলে এনে খাওয়ায়। দিবারাত্রির মধ্যে তিন-চারবার পাতা দিলেই হয় এবং ডালাগুলি বদ্লে পরিষ্কার করে দিতে হয়। ২০।২২ দিনে কিংবা ঠাণ্ডার দিনে ৩০।৩৫ দিনেই পলু বড় হয়ে পেকে গুটি তৈরী করে। বস্নী গুটি বিক্রয় করে দেয়। পালনের উপযোগী ঋতুকে বন্দ বলে। বছরে চারিটি বড় বন্দ এবং কোথাও আরও দুই-তিনটি ছোট ছোট বন্দ পোষা হয়। সাধারণ বস্নী ১৬ ডালা বা ৩২ ডালা পলু এক সঙ্গে পোষে। এখনও মালদহ জেলায় কয়েক ঘর সম্পন্ন বস্নী আছে। পূর্বে এইরূপে পল্লীতে বহু পয়সার আমদানি হ'ত এবং প্রায় প্রত্যেক বস্নীর অবস্থা সচ্ছল ছিল। পলু পালনের অবনতির সঙ্গে সকলেরই দুরবস্থা ঘটেছে।

দ্বিতীয় স্তর—কাটাই বা রিলিং।—গুটি উৎপাদনের পর শিল্পের দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয়। কাটাই কারখানার মালিক বা কাটাইদারকে বস্নী গুটি বিক্রয় করে। কাটাইদার কারখানায় গুটি কাটাই ক'রে স্থতা উৎপন্ন করে। গুটিগুলিকে জলে সিদ্ধ ক'রে গরম ক'রে দিলে রেশমের খাই খুলে আসে এবং উঠিয়ে চরখীতে জড়ান হয়। পশ্চিমবঙ্গে যে চরখীর চলন আছে তা একজন পাকদার ঘুরায় এবং কাটানী গুটি সিদ্ধ ক'রে খাই ধরিয়ে গুছি মেরে যায়। নানা রকম রিলিং মেশিনের উদ্ভাবন হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেকেলে ধরণের চরখীই চ'লে আসছে। গুটি সিদ্ধ ক'রে প্রত্যেকটি যন্ত্র চালাবার ব্যবস্থাকে এক ঘাই বলে। রিলিং বা কাটাই কার্যের জন্য প্রয়োজন গুটি ক্রয়, ঘাই ও মেশিন সরবরাহ, এই সকল বসিয়ে কাজ করবার জন্য ঘর, কাটানী পাকদারের বেতন, গুটির পাইট ও শুকাবার ব্যবস্থা এবং রাখবার ঘর, স্থতা রাখবার ব্যবস্থা ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা। একটি-দুইটি কি পাঁচ-সাতটি ঘাই চালান যায়। এইরূপ ঘর ঘাই এখন চলছে। কিন্তু বাজারে চাহিদা হচ্ছে সমান মোটা স্থতা এবং একই প্রকারের বহু পরিমাণ স্থতা। এই কারণে অনেক কাটানী একস্থানে নিযুক্ত

করে এবং সব কাটানী একই রকম মোটা সুতা কাটছে কিনা সব সময়েই তাদের উপর নজর রেখে কাটাই করালে, তবে বেশী পরিমাণ সুতা উৎপাদন করতে পারা যায়। যে স্থানে এইরূপে অনেক কাটাইয়ের ব্যবস্থা হয় তাকে ইংরেজিতে ফিলেচার এবং আমাদের দেশে বানক বলে। বড় বানক না হলে বেশী পরিমাণ সমগুণসম্পন্ন সুতা উৎপাদন সম্ভব হয় না। আগে পশ্চিম বাংলার রেশম সুতাই প্রসিদ্ধ ছিল এবং বহু পরিমাণ বিদেশে চালান যেত। তার পর যখন চীনা ও জাপানী রেশম সুতা বাজারে উপস্থিত হ'ল, তখন থেকেই পশ্চিম বাংলার রেশম সুতার কাটতি কমতে লাগল। বানকগুলিও একে একে বন্ধ হয়ে গেল। বানকগুলি বন্ধ হওয়াতে পলু পালন কমে যায়। এই হ'ল পশ্চিম বাংলার পলু পালন ও রিলিং-এর অবনতির কারণ। তাহলেও যদি ভালভাবে কাটাই ক'রে ফিরান ও যাচাই ক'রে একই রকম মাল চালান দেওয়ার বন্দোবস্ত হ'ত তাহলে বাজার হারাত না।

কাঁচা রেশম সুতা কত মোটা তার মাপের নাম 'ডিনিয়র'। ইহা এক প্রকার ফরাসী ওজন—প্রায় পৌনে গ্রেণের সমান। প্রায় ৪৯২ গজ কাঁচা রেশম সুতার ওজন যদি ১ ডিনিয়র হয় তা হ'লে সেই সুতার মাপ ১ ডিনিয়র। এত মিহি সুতায় কোন কাজ হয় না। ১০।১১ ডিনিয়র থেকে আরম্ভ করে আরও মোটা সুতার ব্যবহার হয়।

বিলাতী বানকগুলিই এই শিল্পের স্তম্ভস্বরূপ ছিল। তারা বিলাত থেকে টাকা আনত, গুটি ক্রয় করত, বানক স্থাপন করে বহু কাটানী পাকদার, অন্যান্য কর্মচারী এবং গুটী ক্রয়ের জন্য দালাল পাইকার নিযুক্ত করে বানকের কার্য চালাত এবং উৎপন্ন রেশম সুতা চালান দিত। বানক বন্ধ হওয়াতেই পলুর পালন কমে গেল এবং ক্রেতারও অভাব হ'ল। বিলাতী বানক কোম্পানী উঠে যাওয়ার ফলে কেবল ঘর-ঘাই চলতে লাগল। কিন্তু ঘর-ঘাইয়ের চরখীতে সমগুণসম্পন্ন সুতা উৎপাদন করা কঠিন। বিদেশে চালান ছাড়া পশ্চিম বাংলার রেশম সুতা নাগপুর, সুরাট, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানেও ব্যবহৃত হ'ত। চীনা, জাপানী সুতা এসে সেই সকল স্থান দখল করেছে। ভাল সুতা উৎপন্ন করে সরবরাহ করতে পারলে এই সকল বাজারও আবার পাওয়া যাবে এবং এখনই নূতন বন্দোবস্তের ফল পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমানে দেখা যায় যে, মালদহ জেলাতেই বহু ঘর ঘাই চলছে এবং এই কারণে গুটি বিক্রয়ের সুবিধা থাকায় অপরাপর জেলা অপেক্ষা এই জেলাতে পলু পালনও বেশী। এর কারণ অবশ্য ঘর-ঘাইয়ের চলন। মুর্শিদাবাদ ও বীরভুম জেলাতে বানকের চলন ছিল। তারা সম্পূর্ণ রূপে বিদেশে মাল বিক্রয়ের উপর নির্ভর করত। বাঙালীদের যে সকল বানক ছিল তারা নিজেদের উৎপন্ন মাল বিলাতী কোম্পানীগুলিকে এখানেই বিক্রয় করত।

তৃতীয় স্তর।—বয়ন।—পশ্চিমবঙ্গে রেশমবস্ত্র বয়ন তন্তুবায় শ্রেণীর হাতে বরাবরই ছিল এবং এখনও আছে। পূর্বে বহু পরিমাণ বস্ত্র বিদেশে চালান যেত। সমগুণ-সম্পন্ন একই রকম বহুপরিমাণ সুতার উৎপাদনের অভাবে যেমন সুতার চালান বন্ধ হ'ল, সেরূপ সমগুণসম্পন্ন একই প্রকারের বহুপরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের অভাবে বস্ত্রের চালানও বন্ধ হয়। যে বস্ত্র চালান দিয়ে পশ্চিম-বঙ্গে বহু পয়সা আসত তা সাধারণতঃ "কোরা" নামে প্রসিদ্ধ। সাড়ী প্রভৃতি অপেক্ষা ইহার বয়ন সহজ। জাপান সকল বিষয়েই সমগুণসম্পন্ন এবং যেমন মোটা, পাতলা দরকার সেরূপ বস্ত্রের উৎপাদন ও সরবরাহের বন্দোবস্ত ক'রে পৃথিবীময় কোরার ব্যবসায় দখল করেছে। এরূপ বস্ত্রের জাপানী নাম "হাবুতাই।"

পশ্চিমবঙ্গে রেশমবস্ত্র বয়নকারী তন্তুবায় শ্রেণী সেকেলে-ধরণের তাঁত নিয়ে কাজ করে এবং পিতৃ-পিতামহের সময় থেকে ধুতি, চাদর, সাড়ী, থান বুনে আসছে। এই মাল প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গেই কাটতি হয়। বিদেশে বা ভারতের অপরাপর প্রদেশে কিরূপ মালের চাহিদা তার খোঁজখবর রেখে সেরূপ মালের উৎপাদন না করতে পারলে বয়ন শিল্পেরও বিস্তার হতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের রেশম সুতা উৎপাদনকারী বাঙালী বানকেরা যেমন বাইরের বাজারের সঙ্গে নিজেরা সংযোগ না রাখার দরুণ ব্যবসায় হারায় সেরূপ বস্ত্র-ব্যবসায়ীরাও ঐ একই কারণে ব্যবসায় হারায়।

এখন সহজেই বোঝা যাবে, পশ্চিমবঙ্গের রেশম শিল্পের প্রসার ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে—

(ক) বহুপরিমাণ রেশম সুতার কাটতি। ইহা দুই উপায়ে সম্ভব। প্রথম, সুতার বাইরে চালান এবং দ্বিতীয়, বহু পরিমাণ বস্ত্র বয়ন। বস্ত্রের চালান না হলে বয়নের বিস্তারেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব উৎকৃষ্ট সমগুণসম্পন্ন সুতা উৎপাদন করতে হবে, যাতে ইহার চাহিদা বাড়ে এবং উৎকৃষ্ট সমগুণসম্পন্ন চাহিদা-মাফিক বস্ত্র উৎপাদন করতে হবে যাতে বস্ত্রের চালান বাড়ে।

(খ) উৎকৃষ্ট সমগুণসম্পন্ন সুতা উৎপাদন ও সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজন—

(১) ভাল জাতির রেশম পলু যা লম্বা খাই ও বেশী পরিমাণ রেশমযুক্ত গুটি উৎপাদন করতে পারে।

(২) উৎকৃষ্ট তুঁতের চাষ যার পাতা খেয়ে পলু বাঁচবে, পুষ্ট হবে এবং ভাল গুটি বাঁধবে।

(৩) নীরোগ পলুর ডিম বা সঞ্চ উৎপাদন ও সরবরাহের বন্দোবস্ত।

(৪) গুটি থেকে সুতা কাটাই ক'রে বের করার জন্য ভাল রিলিং মেশিন এবং বড় বানক, যেখানে সমগুণসম্পন্ন সুতা বহুপরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে।

(৫) সুতা যাচাই ক'রে সমগুণসম্পন্ন হ'ল কি না তা দেখে সার্টিফিকেটসহ চালান দেবার বন্দোবস্ত।

(গ) উৎকৃষ্ট সমগুণসম্পন্ন বস্ত্রবয়ন ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজন—

(১) উৎকৃষ্ট সমগুণসম্পন্ন সুতা।

(২) উৎকৃষ্ট বয়ন প্রথা।

(৩) বাজারের চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদা-মাফিক সমগুণসম্পন্ন বস্ত্র বহু পরিমাণে উৎপাদন ও সরবরাহের বন্দোবস্ত।

সুতার কাট্‌তি যত বাড়বে পলু পালন ও গুটি উৎপাদন আপনা আপনিই তত বাড়বে। তবে ভাল জাতির পলু, ভাল তুঁত এবং নিরোগ সঞ্চ উৎপাদন ও সরবরাহের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। বসনীরা দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতাবশতঃ এই সমস্ত নিজেরাই কোন দেশে বন্দোবস্ত করতে পারে না। সরকার থেকে বন্দোবস্ত করে দিতে হয়।

উপরে যা বলা হ'ল তা থেকে স্পষ্টই বুঝা যাবে, শিল্পের সকল স্তর ও অংশের সমভাবে এবং একই সঙ্গে উন্নতির প্রয়োজন। গবেষণা এবং পরীক্ষা ব্যতীত ইহা অসম্ভব। জাপানে এক হাজারের অধিক বিশেষজ্ঞ শিল্পের নানা বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। এঁদের কার্যের ফলেই আজ জাপান রেশম শিল্পের অসাধারণ উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ মোটেই হতাশা-ব্যঞ্জক নয়। কেননা, রেশম শিল্পের বিশিষ্টতা এই যে, এতে দেশের দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী, সকল শ্রেণীর লোকে কাজ পায়। দরিদ্র কৃষক অন্যান্য কৃষির সঙ্গে কিছু তুঁত চাষ করে, এই তুঁতের পাতা তুলে এনে তার পরিবারের লোকে, বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পলু-গুলিকে খাইয়ে গুটি উৎপাদন করে। গুটি বিক্রয় হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পয়সা আসে। পলু পালন সকল দেশেই কুটিরশিল্প বা গৃহশিল্প বা কৃষির উপশিল্প। অনেকটা অবসর সময়ে পরিবারের লোক পালনকার্য করে।

রিলিং-এর কার্যে পল্লীর দরিদ্র বালক-বালিকা, স্ত্রীপুরুষ নিযুক্ত হয়ে রোজগার করে। মটকা প্রভৃতি কাটাই করেও বহু দরিদ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রোজগার করে। তন্তুবায় শ্রেণী রেশমবস্ত্র বয়নে নিযুক্ত থাকে। ধনিক শ্রেণী রিলিং কারখানায় এবং বস্ত্র উৎপাদনে পয়সা খাটায়। পলুর সঞ্চ ও ডিম উৎপাদনে, গুটি, সুতা ও বস্ত্রের লেন-দেন ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিযুক্ত থাকে। যাতে পল্লী ও শহরবাসী সকল শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকতে পারে এমন অপর কোন শিল্প নাই। তাছাড়া পল্লীর উপযোগী শিল্প এর তুল্য দ্বিতীয় নাই।

শিল্পের দ্বিতীয় বিশিষ্টতা এই যে, এর বেশীর ভাগ এবং গুটি উৎপাদনরূপ ভিত্তি দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর হাতে থাকায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এ শিল্প দাঁড়াতে এবং চাহিদা অনুযায়ী তুঁত, গুটি, সুতা ও বস্ত্রের উন্নতি ক'রে অন্যান্য দেশে উৎপন্ন মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকতে পারে না। যে দেশের গবর্ণমেণ্ট এর যত সাহায্য করেছে, সে দেশই এই শিল্পে তত বিস্তার ও উন্নতি লাভে সমর্থ হয়েছে।

এ শিল্পের আর একটি বিশিষ্টতা হ'ল যে, যদি তুঁতের বদলে অপর এমন ফসল পাওয়া যায় যার উৎপন্ন বিক্রয় ক'রে বেশী পয়সা হাতে আসে তা হলে তুঁত চাষ ও পলু পালন কমে বা উঠে যায়। এ কারণে যদিও এক সময়ে বাংলা দেশের প্রায় পঁচিশটি জেলায় পলু পালন হ'ত, বিশেষ করে পাটের প্রতিযোগিতাই বহু জেলা থেকে পলু পালন উঠে যাওয়ার কারণ।

অপর বিশিষ্টতা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই যে, বহু চক্রী পলু পালন ক'রে বৎসরে চার, পাঁচ বা ছয় বার পলু-পালকের হাতে পয়সা আসে। তুঁত পাতা ক্ষেতে থাকলে পলু পালন ক'রে গুটি উৎপাদন করতে মাত্র ২০।২৫ দিন সময় লাগে। অপর কোন ফসল নেই যা হতে এত সহজে এত শীঘ্র এবং বৎসরে এতবার পয়সা আসে। এই কারণে, যদি গুটি উৎপন্ন হওয়া মাত্র বিক্রয়ের বন্দোবস্ত থাকে তা হলে, দাম কম পেলেও পলু-পালনকারী কৃষক পলু পালন সহজে ত্যাগ করে না।

রেশম শিল্পের ইতিহাসে দেখা যায় নানা কারণে রেশমের দাম কয়েক বৎসর ধ'রে কমে আবার কয়েক বৎসর ধ'রে বাড়ে। এই বাড়া-কমার ধাক্কা রিলিং কারখানাকেই প্রধানতঃ সহ্য করতে হয়, কারণ, গুটি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পুষ্প-চয়ন

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

(প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩৪৯ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

দিল্লীতে শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক মেজর গ্যাগারিন ও তাঁহার পত্নীকে অভিনন্দন-জ্ঞাপন

কিনে ইহাকে রিলিং করতে হয়। অতএব পরে সুতার দাম কমে গেলে লোকসান হয়। এর প্রতিকার দুই উপায়ে সম্ভব। এক, ভবিষ্যৎ স্বল্পমূল্যের সময়ের জন্য সুসময়ে রিজার্ভ ফণ্ড গঠন ক'রে হাতে এমন সংস্থান রাখা যাতে ধাক্কা সামলাতে পারে, এবং দ্বিতীয়, বসনীদের সঙ্গে সহযোগে কাজ এবং সুতার মূল্যের অনুযায়ী গুটির দাম দেওয়া। সকল কাটাই কারখানারই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

উপরে যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হ'ল তা থেকে বোঝা যাবে যে, পশ্চিমবঙ্গের রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক ত নয়ই, বরং প্রকৃত চেষ্টার দ্বারা এর পুনরুদ্ধার প্রসার ও বৃদ্ধি সম্ভব। এখন এই শিল্পে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রবেশ বিশেষ আবশ্যক। তাঁরা অন্যান্য দেশের চেষ্টার খবরাখবর রেখে উন্নতিসাধনে সমর্থ হতে পারেন, পত্রিকা প্রচার দ্বারা বসনী, কাটাইদার ও বয়নে নিযুক্ত শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারেন, বাইরের বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে কাজ চালাতে পারেন, শিল্পের উন্নতি সাধন এবং রক্ষার জন্য সমিতি গঠন ক'রে গবর্ণমেণ্টকে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। ইংলণ্ড, আমেরিকায় শিক্ষিত শ্রেণী বয়নে নিযুক্ত আছে এবং তাদের সমিতি উত্তম তথ্যপূর্ণ পত্রিকা পরিচালনা করে এবং যেখানে আবশ্যক গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করে।

# রাজপুত-বৈর

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

৯

রাজপুত বংশ-বট কালক্রমে ঝুড়ি ফেলিতে ফেলিতে ঘনারণ্য সৃষ্টি করে। একই বংশতরুর বিভিন্ন শাখা কালের বাতাসে স্বার্থের ঝঞ্ঝায় পরস্পরের উপর আপতিত হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস না হইলেও হতশ্রী হয়, অরি-কুল আগাছার ন্যায় উহার রস শোষণ করিয়া বাড়িয়া উঠে। মেবাড় রাজ্যের 'চুণ্ডাবত ও শক্তাবত' কুলের বৈর, কচ্ছবাহ-বংশে আলোয়ারের নরুকা এবং আম্বেরের (বর্ত্তমান জয়পুর) পৃথ্বীরাজোত (রাজা পৃথ্বীরাজ কচ্ছবাহের বংশধরগণ); রাঠোর কুলে যোধপুরের 'যোধাবত,' মেড়তার 'বীরমদেবোত' ও বিকানীরের 'বীকাবত' শাখার মধ্যে বংশানুক্রমিক বৈরভাব রাজস্থানের চরম দুর্ভাগ্য।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ এবং সম্রাট বাবরের সমসাময়িক যোধপুরের রাও গাগা (গঙ্গা) ও তাঁহার খুল্ল পিতামহ বীরমদেবের* মধ্যে গৃহবিবাদ ছিল। গাগার বালকপুত্র মালদেবের দুর্জ্জয় অভিমান ও হঠকারিতার ফলে ঐ বিবাদ দারুণ বৈরে পরিণত হইয়া মারবাড়ের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল। দৌলত খাঁ নামক লোদী-বংশীয় পাঠানের সহিত এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাও

* বংশাবলী (টড)
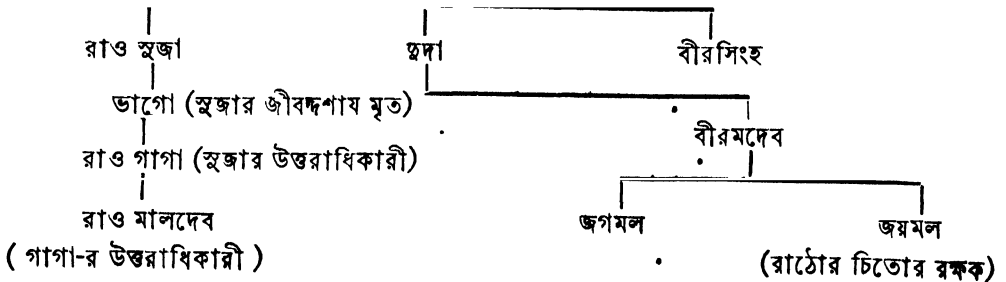
গাগা পাঠানের হাতী-ঘোড়া লুট করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে একটা হাতী বীরমদেবের মেড়তিয়া রাঠোরগণের এলাকায় পলাইয়া গিয়াছিল। যোধপুর রাজের প্রতি আনুগত্য মেড়তিয়া রাঠোরগণ নাম মাত্র স্বীকার করিত। মেড়তিয়া রাঠোর লড়াই ঝগড়ায় সর্ব্বদা অগ্রণী ছিল। মেড়তিয়া রাঠোরগণ ঐ হাতী ধরিয়া শহরের ফাটক ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকাইয়াছিল। রাও গাগা বীরমদেবকে হাতী ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। বীরমদেব ঝগড়া মিটাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেও মেড়তার সর্দ্দারগণ এই কার্য্য আত্মসমর্পণের তুল্য অপমানজনক মনে করিলেন। অবশেষে স্থির হইল কুমার মালদেব মেড়তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এইখানে আসিলে বিদায় উপঢৌকন স্বরূপ ঐ হাতী তাঁহাকে দেওয়া হইবে। মেড়তায় নিমন্ত্রণে আসিয়া পংক্তিতে আসন গ্রহণ করিতেই মালদেব বলিলেন, আগে হাতী চাই, পরে ভোজন। সকলে বলিল আপনি ভোজন আরম্ভ করুন, হাতী আসিতেছে, কিন্তু মালদেব কিছুতেই মানিবেন না। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহার এবং অন্যায় জিদ্‌ দেখিয়া সর্দ্দারগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। বীরমদেবের দেওয়ান সাহানী রায়মল দুদাবত শুনাইয়া দিলেন, কুমারজী! আপনার মত 'হঠিলা' (একগুঁয়ে) বালক আমাদের ঘরেও আছে; এই ভাবে হাতী দেওয়া যায়না, আপনি আসুন। মালদেব ক্রোধান্ধ হইয়া শাসাইলেন, হাতী পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু মেড়তা উজার করিয়া এইখানে যদি মুলার চাষ না করাই তবে আমার নাম মালদেব নয়। দুদা পিতার নিকট মেড়তা পরগণা জায়গীর পাইয়াছিলেন (Tod)। নৈন্‌সী লিখিয়াছেন, রাও যোধার পুত্র বীর সিংহ বিঃ ১৫১৬ (১৪৫৯ খ্রীঃ) মেড়তা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মালদেব চলিয়া যাওয়ার পরে রাও গাগা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বীরমদেবকে লিখিলেন, কাজটা ভাল হইল না; আমি চোখ বুঁজিলেই এই সন্তান আপনাদিগকে দুঃখ দিবে। বীরমদেব দুইটা ঘোড়া নজর স্বরূপ সঙ্গে দিয়া বিরোধীয় হাতী যোধপুর পাঠাইয়া দিলেন। গায়ের ঘা ফাটিয়া যাওয়ায় হাতীটা পথেই মারা গেল। গাগা পুত্রকে বুঝাইলেন, আমার রাজ্যে পৌঁছিয়া যখন হাতী মারা গিয়াছে হাতী আমরাই পাইয়াছি। মালদেব বলিলেন, আপনার প্রাপ্য আপনার হাতে আসিতে পারে, আমার পাওনা আসে নাই, যখন ক্ষমতায় কুলাইবে তখন আমি উশুল করিব!

ইহার এক বৎসর পরে রাও গাগার মৃত্যু হইল (১৫২৬ খ্রীঃ)। মালদেব যোধপুরের গদিতে বসিয়াই মেড়তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান করিলেন। মুষ্টিমেয় মেড়তিয়া রাঠোর অনেকদিন যুদ্ধ করিয়া দেশত্যাগ করিল (আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ), মালদেব প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন। মেড়তা ত্যাগ করিবার সময় বীরমদেব শপথ করিয়াছিলেন, মেড়তার বাবুল গাছের বদলে যদি যোধপুরের আম বাগান আমি না কাটাই আমার নাম বীরমদেব নয়। নানা স্থানে আত্মগোপন করিয়া বীরমদেব অবশেষে সম্রাট শের শাহ-র সাহায্যে মেড়তা উদ্ধার করিয়া যোধপুরের উপর শোধ তুলিলেন বটে, কিন্তু পাঠানেরা প্রায় সমগ্র মারবাড় অধিকার করিয়া বসিল। বীরমদেবের পরে জয়মল মেড়তার গদিতে বসিলেন। সুর-বংশের পতনের সময় ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মালদেব জয়মলকে বিতাড়িত করিয়া আবার মেড়তা অধিকার করিলেন। জয়মল মহারাণা উদয় সিংহের সেনাধ্যক্ষ রূপে চিতোর অবরোধের সময় আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পানিপত যুদ্ধের (১৫৫৬ খ্রীঃ) দশ বৎসরের মধ্যে মালদেবের হঠকারিতায় বিবদমান রাঠোর কুলের স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। অন্ধ বৈরের ইহাই ধ্রুব পরিণাম।

বৈর-সাধনের সুযোগ পাইয়াও রাজপুত প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া মহত্বের পরিচয় দিয়াছে, এইরূপ উদাহরণ অতি কম। নৈন্‌সীর 'খ্যাতে' যাহা পাওয়া গিয়াছে উহার উল্লেখ না করিলে রাজপুত-চরিত্রের প্রতি অবিচার করা হয়।

জালোরের ভূম্যধিকারী সোন-গড়া* বংশীয় চৌহান সামন্ত সিংহ মূলু রাঠোরের স্ত্রীকে শত্রুতার প্রতিশোধ স্বরূপ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। মূলু রাঠোর বৈর প্রতিশোধের জন্য শ্বশুরের এই কন্যাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া ঘরজামাই হইয়াছিলেন এবং ঐ স্ত্রীর গর্ভে তাহার এক পুত্রও জন্মিয়াছিল। কিছুদিন পরে মূলুর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে অপমানিত শ্বশুর এবং মূলুর অপর শত্রু সামন্ত সিংহ বৈর-শোধের জন্য এই কার্য্য করিয়াছিলেন। মূলু রাঠোর স্ত্রীপুত্র-অপহারক সামন্ত সিংহকে হত্যা করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। জালোরের ভূস্বামীকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার মত জনবল মূলুর ছিল না।

* পূর্ব্ব-পুরুষের নাম কিংবা উহাদের আদি নিবাসস্থান কুলের (sept of a clan) উৎপত্তি হয়। চৌহানগণের মধ্যে যাহাদের পুরনো "ঠিকানা" সোন্‌গড় [সোনাগড়] ছিল তাহারা সোনাগড় চৌহান নামে পরিচিত।

মুলু কুখ্যাত দস্যু, সুতরাং তাহার বৈর রাঠোর কুলের মান-বৈর নয়। মুলুর বৈর সাধনের সম্বল নিজের বাহুবল, দুর্জ্জয় সাহস এবং তস্করের তড়িৎ বুদ্ধি। সামন্ত সিংহের অন্তঃপুরের এক দাসীর সহিত ভাব জমাইয়া মুলু যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করিল, এবং একদিন সন্ধ্যাবেলা দাসীর সহায়তায় তুলসী মণ্ডপের নিকট আত্মগোপন করিয়া রহিল। সামন্ত সিংহ কিছু অধিক রাতে আহারে বসিয়াছিলেন, ঠাকুরাণী (মুলুর স্ত্রী) সামনে থালা রাখিয়া দিলেন। সামন্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, মুলুর ছেলে কোথায়? ঠাকুরাণী বলিলেন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সামন্ত সিংহ ঐ ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সর্ব্বদা উহাকে সঙ্গে বসাইয়া এক থালায় খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি ঠাকুরাণীকে বলিলেন, ছেলেকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া লইয়া আস। মুলু বড় সাহসী রাজপুত; তাহার ছেলে বাপের মত 'বাঁকা' (অসীম শৌর্য্যসম্পন্ন) রাজপুত হইবে।

ইতিমধ্যে খোলা তলোয়ার লইয়া সামন্ত সিংহকে হত্যা করবার জন্য মুলু আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল এবং সব ব্যাপার দেখিতেছিল, সব কথা শুনিতেছিল। মুলু হঠাৎ সামন্ত সিংহের সামনে ছুটিয়া আসিয়া অর্দ্ধোন্মত্তের ন্যায় চীৎকার ছাড়িয়া বলিল, তোমাকে আমি বধ করিব না, বধ করিব না, এবং এই বলিয়াই চোখের পলকে রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

১০

মেবাড়ের রাবত মেঘসিংহ চুণ্ডাবত তাঁহার নামে, মেজাজে, পোষাকে ও আওয়াজে যথার্থই 'মেঘ' ছিলেন, তবে শরতের শুভ্র মেঘ নয়, শ্রাবণের অশনিগর্ভ কুণ্ডলীকৃত কাল মেঘ যাহার আবির্ভাব রাজস্থানে ঝড়ের সূচনা করে। এই জন্যই লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল 'কালা মেঘ'। একবার কোন কারণে কথা কাটাকাটি হওয়ায় মহারাণা অমর সিংহ তাঁহাকে 'তানা' (খোঁটা) দিয়াছিলেন, আপনি মালপুরার পাট্টা লিখাইয়াছেন নাকি? রাবত মেঘসিংহ পুত্রকে লইয়া দেশত্যাগ করিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া খালসার অধীন (Crown Land) মালপুরা পরগণার (বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত) পাট্টা এবং চারশতী জাত ও দুই শত সওয়ারের মনসব্ বখশিস করিলেন; অধিকন্তু তাঁহার পুত্রকেও আশী সংখ্যক জাত বিশ সওয়ারের মনসব ও জায়গীর মালপুরা পরগণাতেই দিলেন (৬ই মার্চ্চ, ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে)। মেঘসিংহ বেশীদিন মোগল সরকারে চাকরি করেন নাই। তিনি ঐ সময়ে আজমীরের অন্তর্গত বখেরার মুসলমান কর্ত্তৃক ভগ্নদশাপ্রাপ্ত আদিবরাহ মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মেঘসিংহের এই স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

মোগল সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্বস্বীকার করিয়া মহারাণা সন্ধির সর্ত্তানুসারে (১৬১৫ খ্রীঃ ১১ই মে) মিবাড়ের যে অংশ মোগল অধিকারে ছিল উহা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সম্রাটের আশ্রিত সগরজীর পক্ষাবলম্বী শক্তাবত ও অন্যান্য সামন্ত বহু বৎসর মিবাড়ের ঐ সমস্ত পরগণায় জায়গীর ভোগ করিতেছিল। তাহারা মহারাণার অধিকার নামমাত্র স্বীকার করিলেও জায়গীর ছাড়িল না। মহারাণার সামরিক শক্তি এত ক্ষীণ হইয়াছিল যে, ঐ সমস্ত জায়গীরদারকে উচ্ছেদ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। সগরজীকে চিতোর হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া ব্যতীত মোগল সরকারও মহারাণাকে কোন সাহায্য করে নাই। অমর সিংহ নিরুপায় হইয়া কুমার করণকে বলিয়াছিলেন যে কোন উপায়ে রাবত মেঘসিংহ চুণ্ডাবতকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। একবার দিল্লী (আগ্রা?) হইতে উদয়পুরের পথে কুমার করণ মালপুরায় মেঘসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভোজনে বসিয়া কুমার মেঘসিংহকে বলিলেন, রাবতজী আমার সঙ্গে দেশে ফিরিবেন প্রতিজ্ঞা না করিলে আমি গ্রাস মুখে তুলিব না।

কথিত আছে মেঘসিংহ কুমারের সঙ্গেই দেশে ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু এক কথায় বাদশাহী মনসব ছাড়া যায় না, সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত কেহ স্থান ত্যাগ করিতে পারে না—যাহা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার; সুতরাং মেঘসিংহ কখন মেবাড় ফিরিয়াছিলেন বলা যায় না, অন্ততঃ কুমারের সঙ্গে নয়। যাহা হউক, মহারাণা অমর সিংহ মেঘসিংহকে বেগু ও রতনপুরের পাট্টা দিলেন। এই দুই পরগণার পাট্টা পূর্ব্বে মহারাণার প্রিয়পাত্র বল্লু চৌহানকে দেওয়া হইয়াছিল, বল্লুকে পরে উহার বদলে বেদ্‌লা জায়গীর দেওয়া হইল; যেহেতু বেগু তখনও কুমীরের পেটে। রাও নারায়ণদাস শক্তাবতের কবল হইতে বেগু উদ্ধার করা চৌহানের কর্ম্ম নয়। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী অমর সিংহের স্বর্গবাস হইল, কিন্তু মরণ কালেও কুবুদ্ধি তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। তিনি পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিলেন বেগু হাতে আসিলে উহা যেন বল্লু চৌহানকে দেওয়া হয়।

রাজ্যারোহণের পর মহারাণা করণ রাও নারায়ণদাস শক্তাবতের কাছে বেগু ত্যাগের হুকুমনামা সহ রাবত

মেঘসিংহকে পাঠাইলেন। চুণ্ডাবত ও শক্তাবতের উৎকট বৈরের উত্তারাধিকার রাবত মেঘসিংহ পাইয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে সাক্ষাৎ তমোগুণ হইলেও ভিতরে তাঁহার যে সাত্ত্বিক উদারতা ও অনর্থক রক্তপাতে যে বিতৃষ্ণা ছিল উহা মধ্যযুগের কোন রাজপুত চরিত্রে দেখা যায় না। তাঁহার পশ্চাতে চুণ্ডাবত কুলের প্রচণ্ড শক্তি ও মহারাণার সমর্থন সত্ত্বেও তিনি মজ্জাগত বৈর ভুলিয়া রাও নারায়ণদাস শক্তাবতের কাছে শান্তির প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণদাস বুঝিতে পারিলেন চুণ্ডাবতের এই শান্তির প্রয়াস সবলের হিতোপদেশ, দুর্ব্বলের ধর্ম্মের দোহাই নহে, ফাঁকা শাসানিও নহে। তিনি অনিচ্ছায় বেঙ্গু ছাড়িয়া দিলেন এবং উহার নিকটে মিবাড়ের সীমার বাহিরে ভিয়ানায় উঠিয়া গেলেন।

মেঘসিংহ বেঙ্গু অধিকার করিবার পরেও ছোট ছোট শক্তাবত ভুমিয়া ঠেঁাটামি করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া এক শক্তাবত গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিলেন। রাও নারায়ণদাসের শরণাপন্ন হইয়া শক্তাবতগণ নালিশ করিল, আপনি থাকিতে আমাদের এই দুর্দ্দশা? ধূমায়মান শক্তাবত বৈরবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল, নারায়ণদাস প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

১১

বিবাহ রাজপুতের একটা বাতিক, পৌত্রলাভের পরেও রাজপুত বাগ দানের "নারিকেল" গ্রহণে ইতস্ততঃ করে না। বিবাহে রাজপুতের কালাকাল, বয়সের বিচার নাই। ক্ষত্রিয় দুহিতার পক্ষে পতির রূপ কামনা গৌণ, কুল-খ্যাতি ও শৌর্য্যই মুখ্য; বয়সে বাপের বড় হইলেও আপত্তি নাই, লড়াই করিয়া যে আঁধা, কানা কিংবা অঙ্গহীন হইয়াছে, কিন্তু বাহাদুর রাজপুত বলিয়া যে লোকমান্য হইয়াছে (যথা, মারবাড়-রাজ অন্ধ নর্ব্বদ রাঠোর), রাজপুত্তানী তাহাকেও বরণীয় বলিয়া মনে করিয়াছে। চুল পাকিলেও রাবত মেঘসিংহ লোকচক্ষে বৃদ্ধ নহেন, যেহেতু রাজস্থানে "(দুর্গেশাণাং) ন খলু বয়ঃ যৌবনাদন্যমস্তি!" সম্ভবতঃ কোন দূরবর্ত্তিনী সৌদামিনীর কণ্ঠলগ্ন হইবার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য "কালা মেঘ" রাবত মেঘসিংহ বরবেশে সজ্জিত হইয়া বিবাহ যাত্রা করিলেন, দুর্গ রক্ষার ভার পুত্র নরসিংহ দাসের উপর রহিল।

রাও নারায়ণদাস শক্তাবতগণকে গোপনে একত্র করিয়া মেঘসিংহের অনুপস্থিতিতে বেঙ্গুর উপর অতর্কিত হানা দিলেন। নরসিংহদাস দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তাবতের সম্মুখীন হইলেন না। নারায়ণদাস দুর্গের চারিদিকে ঘোড়া দৌড়াইয়া একটিমাত্র হাতী লইয়া বিজয়োল্লাসে প্রস্থান করিলেন, লুটপাট করিয়া কোন ক্ষতি করিলেন না। ফিরিয়া আসিয়া রাবত মেঘসিংহ অপদার্থ পুত্রকে দুর্গের বাহির করিয়া দিলেন। চুণ্ডাবত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শক্তাবতের ভয়ে যে স্ত্রীলোকের মত দরজা বন্ধ করে সে ক্ষমার যোগ্য নহে। মেঘসিংহ শিশোদিয়া বংশের মঙ্গলের জন্য যে কুল-বৈরকে এতদিন সংযত করিয়াছিলেন নারায়ণদাসের আচরণে উহা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। তিনি শক্তাবতের ধৃষ্টতার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য চুণ্ডাবত কুলকে যুদ্ধার্থ আমন্ত্রণ জানাইলেন; শক্তাবত কুল রাও নারায়ণদাসের নেতৃত্বে চুণ্ডাবতের সঙ্গে বল পরীক্ষার জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

পাঁচ হাজার অশ্বারোহী লইয়া রাবত মেঘসিংহ নারায়ণদাসের জায়গীর ভিয়ানের সীমানায় উপস্থিত হইলেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তাবতগণ দুর্গ পৃষ্ঠভাগে রাখিয়া চণ্ডাবতগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। পরের দিন ব্যূহবদ্ধ হইয়া চণ্ডাবত সেনা শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল এমন সময় মেঘসিংহের বজ্রকণ্ঠ তাহাদের গতি স্তব্ধ করিল। তিনি আদেশ দিলেন যুদ্ধ হইবে না, চণ্ডাবত-শক্তাবত একই শিশোদিয়া বংশের সন্তান; আমি গোত্র-হত্যা করিব না; ফিরিয়া চল, লোকে যাহা বলে বলুক। অতঃপর মান্যাভিমানী ক্ষুব্ধ চণ্ডাবত প্রধানগণ মেঘসিংহকে যুদ্ধার্থ প্ররোচিত করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের নিকট মান-বৈরের সপক্ষে যত যুক্তি সমস্তই প্রয়োগ করিলেন। ভগবদ্‌গীতা শুনিবার জন্য সেকালে কোন রাজপুতের আগ্রহ ছিল না; তবুও ভাটের খ্যাতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের* প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাঁহারা বুঝাইলেন এই ব্যাপার একা মেঘসিংহের নহে, সমস্ত চুণ্ডাবত কুলের মান অপমান ইহাতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; যুদ্ধ না করিয়া শক্তাবতের কাছে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবার এই কলঙ্ক কোন দিন ঘুচিবে না, শক্তাবত টিট্‌কারী দিবে, রাজপুত সমাজ হাসিবে।

মেঘসিংহ অর্জ্জুন নহেন, যুক্তিতর্ক তিনি করিলেন না; শুধু এক কথা "গোত্র-হত্যা আমি করিব না, লোকে যাহা বলিবার বলুক।" তমোগুণী "কালা মেঘের" হঠাৎ এই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় না হইলে এই কুল-বিগ্রহে কয়েক

রাজার শিশোদিয়া অকাতরে অকারণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিত, মিবাড়ের ক্ষীণ ক্ষাত্রশক্তি ক্ষীণতর হইত।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মেঘসিংহের ভীমরতি ধরিয়াছে মনে করিয়া মহারাণা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, স্বর্গবাসী মহারাণা বেঙ্গুর জায়গীর বল্লু চৌহানকে দেওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। এই বার কালামেঘের আওয়াজে মহারাণার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। তিনি মহারাণার মুখের উপর শুনাইয়া দিলেন— লড়াই ঝগড়া করিবার জন্য চুণ্ডাবত, জায়গীর লইবার বেলা বল্লু? বেঙ্গুর জায়গীর হয় চুণ্ডাবত না হয় শক্তাবত পাইবে, চৌহান জায়গীর লইবার কে?

মহারাণা বুঝিতে পারিলেন ঝড়ের কালমেঘ সাদা হইবার বিলম্ব আছে; চুণ্ডাবতের পাগড়ির ভাঁজে মালপুরার পাট্টা ও মন্‌সবের গরম রহিয়াছে।

বেঙ্গু "ঠিকানার" মেঘাবত (মেঘসিংহের বংশধর) এখনও মহারাণার জায়গীর ভোগ করিতেছে।†

১২

মোগল সাম্রাজ্যের ছায়ায় ভারতবাসী আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সুযোগ পাইয়াছিল, দরবারে রাজপুত প্রাধান্য হিন্দুর প্রাণে যে আশা সঞ্চার করিয়াছিল, অনতিক্রম্য রাজপুত-বৈর উহা অসাফল্য ও নিরাশার আঁধারে ডুবাইয়া দিল। সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষ ভারতবাসীকে মৈত্রী ও মিলনের মন্ত্র দিয়াছিলেন, এক সুনির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য জাতির সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন,— রাষ্ট্রের কল্যাণে সকলের কল্যাণ, সকলের সমান লাভ ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। উদার শাসননীতি এবং ধর্ম্মে আপোষের মনোভাব সৃষ্টির দ্বারা এই মহান্ সত্য জাতিকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোল্লা সম্প্রদায় সম্রাটের সুলুহে কুল বা ধর্ম্মে সকলের সহিত আপোষনীতি ব্যর্থ করিয়াছিল, সম্রাট্ পররাজ্যে ইরাণ খোরাসানে এই নীতি প্রচার করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইলেন; মানবতার উচ্চ আদর্শ সাম্রাজ্যের মধ্যে জাতি-বৈর এবং ধর্ম্ম-বৈরের আবর্ত্তে ডুবিয়া গেল। স্বাধীন ভারতে উন্নততর "পঞ্চশীল" রূপে উহাই ভাসিয়া উঠিয়া আবার বৈর-সহস্রের ঘূর্ণীর মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে। সম্রাট্ আকবরের মুলনীতির অসাফল্যের জন্য রাজপুত-বৈরই কি অংশতঃ দায়ী নহে?

প্রথম কথা, রাজপুত পাকাপোক্ত হিন্দু, এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কাল হইতে হাল তারিখ পর্য্যন্ত হিন্দুর বৈরিতা কোনদিন অন্যের বিশেষ অনিষ্ট করে নাই, সর্ব্বদা স্বজাতির অনিষ্ট বিশেষরূপে করিয়াছে, অন্যেরা ইহার বিলক্ষণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান হইয়াছে। রাজপুতেরবৈর সম্বন্ধে ঐ এক কথা। সমগ্র রাজস্থান এক-যোগে আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, করিবার অবকাশও পায় নাই। মহারাণা প্রতাপের স্বাধীনতা-সংগ্রাম মানব-সভ্যতার বিবর্ত্তনে কাল-প্রগতির বিরুদ্ধে সনাতনের সর্ব্বস্ব-পণ সংঘাত। স্বাধীনতা এমন এক বস্তু যাহার জন্য যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেও অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ হয়, জয়ী হইলে বিশ্ববরেণ্য হইয়া থাকে। প্রতাপ নিঃসন্দেহ এই গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু কাল-প্রগতির রথচক্র তাঁহার জন্য তাভে স্তব্ধ হয় নাই, সনাতন কোণঠাসা হইয়াছে, বিজয়ী হয় নাই; এবং কখনও হইতে পারে না। প্রতাপ সেই যুগের আদর্শ ক্ষত্রিয় ছিলেন, রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি-প্রসার পৈত্রিক রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁহার চোখে মিবাড়ের বাহিরে পৃথিবী ছিল না; শিশোদিয়া ব্যতীত মানুষ ছিল না যাহাদের ভবিষ্যৎ তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পারে। এইখানেই প্রতাপ ও আকবর চরিত্রের মধ্যে মহান্ পার্থক্য। প্রতাপের বিরোধিতায় আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার ব্যাহত হয় নাই, শাসননীতি ব্যর্থ হয় নাই, রাজপুত প্রতাপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই; দীর্ঘকাল কিছু লোকক্ষয় ও অর্থহানি হইয়াছে। অন্যপক্ষে, প্রতাপের শক্তি সাফল্যের দ্বারা বর্দ্ধিত হয় নাই, দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে। প্রতাপ ক্ষুদ্র মিবাড়ে গো-ব্রাহ্মণ ও বেদ রক্ষা করিয়াছেন; আকবর রক্ষা করিয়াছেন তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে। আকবরের সাম্রাজ্যে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম-বৈর ও জাতি-বৈর থাকিলে প্রতাপের উদ্যম প্রশংসনীয় হইত, যেই শিবাজী রাজসিংহ দুর্গাদাস ও ব্রজমণ্ডলের জাঠ

---

*যথা:

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
অবাচ্য বাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্ত তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥

দ্রষ্টব্য: ওঝা-কৃত রাজপুতানেকা ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮০১ (পাদটীকা), ৮১৬ নৈনসী; খ্যাত প্রথম খণ্ড। কাহিনী ও ইতিহাসের একত্র সমাবেশ ও সামঞ্জস্যবিধান সহজসাধ্য নহে।

†মেঘসিংহের ব্যাপারে ওঝার মত বিচক্ষণ ঐতিহাসিকও অসঙ্গতি এড়াইতে পারেন নাই, নৈন্‌সী মালপুরার খোঁটা অমর সিংহের মুখে আরোপ করিয়াছেন। আমি নৈন্‌সীর বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছি; ওঝার সহিত এক মত হইতে পারি নাই।

জাতি এই উভয় বৈরের নূতন স্রষ্টা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করিয়াছিলেন। মানুষ আকবর এবং আকবর বাদশাহ এক ব্যক্তি হইলেও দুই স্বতন্ত্র সত্ত্বা ছিলেন। মানুষ আকবর প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলেন। বাদশাহ আকবর হলদীঘাটের যুদ্ধের পরে মিবাড়-বিজীগিষা সংযত করিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু করিতে পারেন নাই—যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও মানবতা পরস্পরবিরোধী। প্রতাপ সন্ধি করিতে পারেন নাই, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের "মান-বৈর" মানবতার ক্রন্দনে ধ্বংসের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

যাহা হোক্, "রাজপুতেষু বৈরঃ" ইতি "রাজপুত-বৈর" অর্থে সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী আকবর মোগল-দরবারে অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতিস্পর্দ্ধিত ব্যতীত ঐ বৈরকে অন্যত্র অনর্থ ঘটাইবার রাস্তা বন্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাটই একমাত্র ভূমির অধিকারী; বাদশাহী ফরমান্ ব্যতীত তলোয়ারের জোরে কোন কুল কর্ত্তৃক অন্যের জমি দখল করা দণ্ডনীয় অপরাধ, এবং শাস্তিদাতা স্বয়ং সম্রাট্; সুতরাং সাম্রাজ্যের মধ্যে রাজপুতের পূর্ব্বকালীন ভূম-বৈর রহিত হইল। কুল-বৈর রাজপুতানার গণ্ডির মধ্যে অশান্তি ঘটাইবার অবকাশ পাইল না; যেহেতু সকল রাজপুত কুলের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি এবং রাজন্যবর্গ দেশ হইতে বহু দূরে দূরে সাম্রাজ্যের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন; ছোটখাটো সংঘর্ষ কদাচিৎ ঘটিলেও উহা এক গোয়ালে বাঁধা দুই ষাঁড়ের মধ্যে ভূষির জন্য ঢুসাঢুসি অপেক্ষা বেশী গুরুতর গণ্য হইত না।

সম্রাট্ আকবর তাঁহার অবর্ত্তমানে হিন্দু-প্রজার ন্যায্য অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাজপুতের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। কুমার সেলিমের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহে আশঙ্কান্বিত হইয়া আকবর সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র, রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়, খানখানান্ আবদুর্ রহীমের জামাতা। এবং চরিত্রগুণে সকলের প্রিয় খসরু-কে উত্তরাধিকারী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেলিমের তৃতীয় পুত্র খুরম্ রাঠোরকুলের ভাগিনেয়, রাঠোরকুলের দোষ-গুণ তিনি সমস্তই পাইয়াছিলেন, কিন্তু ছোটকাল হইতে পিতা সেলিমের মত গোঁড়ামির দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল। মাতুলবংশের সহায়তার উপর ভরসা করিয়া খসরু দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার দুরাশা করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্বেই পিতা-পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল। সেলিম পিতার ইসলাম-বিরোধী কার্য্য ও শাসননীতি পরিবর্জ্জন করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া শৌর্য্যে রাজপুতের সমতুল্য বারহাবাসী সৈয়দগণকে নিজপক্ষভুক্ত করিলেন। রাঠোরগণের দুর্জ্জয় পণ, হিন্দুর ভাগ্যে যাহাই ঘটুক কচ্ছবাহকুলের ভাগিনেয়কে দিল্লীর সিংহাসনে বসিতে দিবে না। কচ্ছবাহকুলের মধ্যে মিল ছিল না। রাজা মানসিংহের উচ্চতর মনসবের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত রাজা রামদাস কচ্ছবাহ আগ্রা দুর্গের রাজকোষ-রক্ষক। তিনি কয়েক ঘণ্টা খসরু পক্ষীয়গণকে ঠেকাইয়া না রাখিলে কুমার সেলিম সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইতেন। ইহার পর খসরু বিদ্রোহী হইয়া পিতার হাতে চোখ এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা খুরমের হাতে প্রাণ হারাইলেন। রাজপুত-বৈরের জন্য ইহাই মোগল সাম্রাজ্যের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম ভাগ্যবিপর্য্যয়। সম্রাট্ শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধে মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহ ও মহারাজা যশোবন্তের কুলক্রমাগত বৈর দারার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটাইয়া হিন্দুকে "পুনর্মুষিকোভব" করিল। আওরঙ্গজেবের হাতে আকবরের সাম্রাজ্য তুলিয়া দিয়া মীর্জ্জা রাজা নিজে ডুবিলেন, এবং অবশেষে হিন্দুকেও মজাইলেন।

## ১৩

সার্ব্বভৌম মোগল শক্তি রাজপুতানাকে শোষণ করে নাই, রাজপুতকে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করে নাই। রাজপুতানার উপর কাগজে-কলমে যে রাজস্ব ধার্য্য ছিল উহা রাজপুত মনসবদারগণের বেতন জায়গীর ইনাম বাবত খরচ হইয়া বাদশাহী তহবিলেও টান পড়িত। মোট কথা, এই সময়ে রাজপুতানা পরোক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, রাজপুতানার বাহিরে রাজপুত আত্মপ্রসারের সুযোগ পাইয়াছে, মোগল সাম্রাজ্যের সামরিক উপনিবেশ হিসাবে পূর্ব্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে রাজপুত জায়গীরদারগণ সামন্তরাজ্য স্থাপন করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজস্থান তথা সমগ্র উত্তর ভারতে মারাঠা সার্ব্বভৌমত্বের নামে যে অরাজকতা, শাসনের নামে যে অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণ চলিয়াছিল উহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী রাজপুত। রাজপুতানায় মারাঠা প্রভুত্ব অশান্তি ও কুল-বৈরে ইন্ধন যোগাইয়াছে, রাজপুতকে অন্তঃসারশূন্য করিয়াছে। মহারাজাধিরাজ সওয়াই জয়সিংহ অতি কুক্ষণে নর্ম্মদা-তীর হইতে খাল কাটিয়া মারাঠা কুমীরকে সিপ্রানদীতে আনিয়াছিলেন; মহারাণা জগৎ সিংহ ১৭৪৭ খ্রীঃ জয়পুরের উপর শোধ তুলিবার জন্য কুমীরকে রাজপুতানায়

আনিলেন; কুমীর দেববিগ্রহ ব্যতীত রাজপুতানার সব-কিছু গ্রাস করিয়াও তৃপ্ত হইল না। অবশেষে মিবাড়ের মহালক্ষ্মী কৃষ্ণকুমারীকে বলি কামনা করিল।

১৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মিবাড়-মারবার, বুন্দী-জয়পুর এই রাজ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাচীন বৈর চরমে উঠিয়াছিল, প্রত্যেক রাজ্যের ভিতরে-বাহিরে নৃশংস রাজপুত বৈরের তাণ্ডব। চুণ্ডাবত এবং শক্তাবত কুলের বৈর লইয়াই মিবাড়ের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। বৈরের প্রধান কারণ, রাজদরবারে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অকর্ম্মণ্য মহারাণাগণের অনুগ্রহ বিতরণে বৈষম্য, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কুলের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, এবং মহারাণার জন্য প্রাণত্যাগে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিলেও জ্ঞাতিশত্রুর সহিত আপোষ-মীমাংসায় অনিচ্ছা। যে মিবাড়রাজ্য মোগল সম্রাটকে নগদ এক টাকা রাজস্ব দেয় নাই সেই রাজ্য হইতে কুল-বৈরের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মহারাণা দ্বিতীয় জগৎ সিংহের সময় হইতে দ্বিতীয় অরিসিংহের মৃত্যু পর্য্যন্ত ছাব্বিশ বৎসরে (১৭৪৭-১৭৭৩ খ্রীঃ)* নগদ দণ্ড এক কোটি একাশী লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক সাড়ে উনিশ লক্ষ টাকা আয়ের পরগণা মরাঠাগণ লইয়া গিয়াছিল।‡

নাবালক মহারাণা ভীমসিংহ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মিবাড়ের গদিতে বসিয়াছিলেন। চিতোর এই সময়ে চুণ্ডাবতগণের অধিকারে, চুণ্ডাবত সর্দ্দারগণ মহারাণার অভিভাবক, শক্তাবত প্রধানগণ চণ্ডাবতের বিরোধী। চুণ্ডাবতগণ ক্ষমতা হাতে পাইয়া শক্তাবতগণকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

মহারাণার আজ্ঞা পাইয়া কুরাবড় ঠিকানার রাবত অর্জ্জুন সিংহ শক্তাবতপ্রধান মুহকম সিংহের ভীণ্ডর দুর্গ অবরোধ করিলেন। অর্জ্জুন সিংহের অনুপস্থিতির সুযোগে রাবত লালসিংহ শক্তাবতের পুত্র সংগ্রাম সিংহ কুরাবড়ের পশুহরণ করিবার জন্য হানা দিলেন; যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের বর্শার আঘাতে অর্জ্জুন সিংহের পুত্র জালিম সিংহ নিহত হইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া অর্জ্জুন সিংহ মাথার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া বৈশ্যের দড়ি-পাকান কাপড়ের "ফেঁটা" বাঁধিয়া শপথ করিলেন যতদিন পুত্র-রক্তের বৈর শোধ না হয় ততদিন পাগড়ি বাঁধিবেন না। তিনি একদিন অতর্কিতে সংগ্রাম সিংহের অনুপস্থিতিতে তাঁহার গিরিদুর্গ শিবগড় আক্রমণ করিলেন। সংগ্রাম সিংহের বৃদ্ধ পিতা লালসিংহ অসি হস্তে বীরগতি লাভ করিলেন, সংগ্রাম সিংহের শিশুসন্তানগুলিকে ক্রোধান্ধ চুণ্ডাবত অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিলেন। চুণ্ডাবতের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছিল, ডুবিতে বিলম্ব হইল না। রাজমাতা সর্দ্দারকুঁয়ারী তাঁহার মন্থরা রামপিয়ারীর মন্ত্রণায় অন্তঃপুরের দেউরীরক্ষক সোমচাঁদ গান্ধীকে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রধান নিযুক্ত করিলেন। মহারাণা স্বয়ং ভীণ্ডর দুর্গে পদার্পণ করিয়া শক্তাবতকুলপতি মুহকম সিংহকে উদয়পুরে লইয়া আসিলেন। ইহার পূর্ব্বে মুহকম সিংহ বিশ বৎসর যাবত চুণ্ডাবত প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উদয়পুরের মুখ দেখেন নাই। রাজদরবারে শক্তাবতগণের জয়-জয়কার হইল এবং সোমচাঁদ গান্ধীর শাসন ক্ষমতা ও নীতিনিপুণতায় নিমজ্জমান মিবাড় কিছুদিনের জন্য মারাঠা কবল হইতে রক্ষা পাইল। সোমচাঁদ মারাঠাগণের বিরুদ্ধে রাজপুতগণকে সাময়িকভাবে একতাবদ্ধ করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লালসোটের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মাহাদজী সিন্ধিয়ার পরাজয় ঘটাইয়াছিলেন। চুণ্ডাবত ইহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে সাহস করে নাই। কিছুদিন পরে কুরাবড়ের রাবত অর্জ্জুন সিংহ এবং চাবণ্ড ঠিকানার চুণ্ডাবত ঠাকুর সর্দ্দার সিংহ রাজমাতার সহিত দেখা করিবার জন্য অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন। ঐখানে সোমচাঁদ গান্ধীকে একাকী দেখিতে পাইয়া চুণ্ডাবতদ্বয় পরামর্শ করিবার অছিলায় তাঁহাকে কিছু অন্তরালে লইয়া গেলেন। "আমাদের জায়গীর ছিনাইয়া লইবার সাহস তোমার কেমন করিয়া হইল?" এই বলিয়াই হঠাৎ দুইজনে দুই দিক্ হইতে তরবারির আঘাত করিয়া সোমচাঁদ গান্ধীকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। হত্যার পর রক্তাক্ত তরবারি হাতে অর্জ্জুন সিংহ মহারাণার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তিরস্কৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন (২৪শে অক্টোবর ১৭৮৯ খ্রীঃ)। মহারাণা ভীমসিংহ মৃত সোমচাঁদের ছোট ভাই সতীদাস এবং শিবদাস গান্ধীকে প্রধান এবং উপ-প্রধান নিযুক্ত করিলেন। শক্তাবত-গণকে সহায় করিয়া অহিংসাবাদী গন্ধবণিকদ্বয় চুণ্ডাবত-গণের উপর বৈরের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত মিবাড়ের গৃহ-বৈরে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন। চিতোরের নিকট এক যুদ্ধে শক্তাবত কুলচুণ্ডাবতগণকে পরাজিত করিল;

---

* ওঝা রাজপুতানেকা ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৯৮১

‡ মহারাণার রাজ্যারোহণ ১৭৩৪ খ্রীঃ মারাঠার সহিত সন্ধি ১৭৪৭ খ্রীঃ। জয়পুরের গদীতে নিজ দৌহিত্রকে অন্যায় ভাবে বসাইবার জন্য তিনি মারাঠাগণকে রাজপুতানায় ডাকিয়া আনিয়া সর্বনাশ ঘটাইয়া ছিলেন। ইহা রাজপুত-বৈরের শোচনীয় পরিণাম।

চুণ্ডাবতগণ পাল্টা আক্রমণ করিয়া খেরোদার নিকট পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলিল। তুল্যবল এই কুলদ্বয়ের বৈরাগ্নিতে মিবাড় উজাড় হইতে লাগিল, চাষা তাঁতি মজুরের দল দেশ ত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। সতীদাস বৈরান্ধ হইয়া চুণ্ডাবতগণকে দমন করিবার জন্য মাহাদজী সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন, মহারাণা কার্য্যতঃ সিন্ধিয়ার অধীন হইয়া গেলেন, সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি অম্বাজী ইংলিয়া শাসনকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে চুণ্ডাবতগণের উপর চৌষট্টি লাখ টাকা জরিমানা ধার্য্য হইল, উশুল হইলে আটচল্লিশ লাখ সিন্ধিয়া এবং ছত্রিশ লাখ মহারাণা লইবেন।

সরকারী ক্রোকশিদাদার শ্বশুরবাড়ী নাই, সুতরাং প্রথম চোটে মারাঠা প্রতিনিধি চুণ্ডাবত ও শক্তাবত উভয় কুলের নিকট হইতে যথাক্রমে বার লাখ ও আট লাখ টাকা জরিমানা আদায় করিয়া সিন্ধিয়ার তহবিলে জমা দিলেন, মহারাণা কিছুই পাইলেন না। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়া অম্বাজী ইংলিয়াকে উদয়পুর হইতে অন্যত্র বদলী করিয়া গণেশ পন্তকে উদয়পুরে প্রেরণ করিলেন। শক্তাবত নাঁদার সাহায্যে চুণ্ডাবত কুলের কুরাবড় ঠিকানা অধিকার করিয়া সালুম্বর দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। চুণ্ডাবত অজিত সিংহ অম্বাজীর শরণাপন্ন হইয়া মারাঠাদিগকে চুণ্ডাবতগণের পক্ষে আনিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চুণ্ডাবত পক্ষ ক্ষমতা হাতে পাইয়া সতীদাস এবং সোমচাঁদের পুত্র জয়চন্দ্রকে কারাবদ্ধ করে। এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চুণ্ডাবত প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ইতিমধ্যে শক্তাবতগণ মিবাড়ের মারাঠা সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে বিরোধের সুযোগ লইয়া উদয়পুর দরবারে আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সতীদাস গান্ধী প্রধান নিযুক্ত হইয়া সোমচাঁদের অপর হত্যাকারী রাবত প্রতাপ সিংহ চুণ্ডাবতের উপর প্রতিশোধ লইলেন। রাবত সর্দ্দার সিংহ বাকী বেতনের জামিন হিসাবে পাঠান সিপাহীগণের ডেরায় অবরুদ্ধ ছিলেন। সতীদাস ও জয়চন্দ্র পাঠানদের বেতন চুকাইয়া দিয়া সর্দ্দার সিংহকে কিনিয়া লইল এবং এক নদীর কিনারায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল, তিনদিন পর্য্যন্ত কাহাকেও লাস উঠাইতে দিল না। চাকা আবার ঘুরিল। কিছুদিন পরে চুণ্ডাবতগণ প্রবল হইয়া বন্দী সতীদাস ও পলাতক ভ্রাতুষ্পুত্র জয়চন্দ্রকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া রাবত সর্দ্দার সিংহের বৈরঋণ শোধ করিল।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের ইহাই ঐতিহাসিক পটভূমি।

১৫

যোধপুরের মহারাজা ভীমসিংহের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমারীর বাগদান হইয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভীমসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার শত্রু এবং পিতৃব্যপুত্র মানসিংহ রাঠোর যোধপুরের গদিতে বসিয়াছিলেন। ভীমসিংহের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে জয়পুরের মহারাজা জগৎ সিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বাগ্‌দান হইল, এবং জয়পুরের দূত বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উদয়পুরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত এই সময়ে দেনা-পাওনা লইয়া জয়পুরের সহিত বিবাদ চলিতেছিল। জগৎ সিংহের নিকট টাকা না পাইয়া জয়পুরকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য দৌলতরাও সিন্ধিয়া মহারাণাকে লিখিলেন, বিবাহের প্রস্তাব লইয়া জয়পুর হইতে যে দূত এখানে গিয়াছে তাহাকে পত্রপাঠ বিদায় দিতে হইবে। মহারাণা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় স্বয়ং দৌলতরাও সসৈন্য উদয়পুর আক্রমণ করিলেন। উদয়পুরের নিকট যুদ্ধে মহারাণা পরাজিত হইয়া দৌলতরাওর অপমানজনক সর্ত্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। একলিঙ্গজীর মন্দিরে মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দৌলতরাও চলিয়া আসিলেন। সিন্ধিয়া কেবলমাত্র জগৎ সিংহের নিকট হইতে মোটা টাকা আদায় করিবার জন্য এই ফিকির করিয়াছিলেন, টাকা আদায় হইলে এই বিবাহে মারাঠার অন্য আপত্তি ছিল না।

এই সময়ে যোধপুরের অধীন পোহকরণের বিদ্রোহী রাঠোর সামন্ত ঠাকুর সওয়াই সিংহ তাঁহার পৌত্রীর সহিত জয়পুরের মহারাজা জগৎ সিংহের সহিত বিবাহ প্রস্তাব করিবার জন্য এবং আরও গূঢ়তর উদ্দেশ্যে জয়পুরে আসিয়াছিলেন। এই খবর পাইয়া মহারাজা মানসিংহ রাঠোর ঠাকুর সওয়াই সিংহকে লিখিলেন, যদি পৌত্রীকে জয়পুর লইয়া গিয়া বিবাহ দাও তাহা হইলে রাঠোরকুলের মহা অপমান (হতক্) হইবে। প্রত্যুত্তরে সওয়াই সিংহ কড়া জবাব দিলেন, রাঠোরের বাগদত্তা কন্যাকে (কৃষ্ণকুমারী) কচ্ছবাহ নৃপতি বিবাহ করিতে যাইতেছেন, ইহাতে রাঠোরকুলের হতক্ নাই, আর আমার পৌত্রীর বেলা হতক্? পত্র পাইয়া মদান্ধ মানসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে বধূরূপে দাবী করিয়া রাঠোরসেনা-সহ বিবাহের সাজে উদয়পুর সীমান্তে পর্ব্বতসর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনুরূপ বরসজ্জায় মহারাজা জগৎ সিংহ এবং আমীর খাঁ পর্ব্বতসরে আসিলেন। যুদ্ধে রাঠোরের শোচনীয় পরাজয় হইল, পলাতক মানসিংহ যোধপুরের ফটক বন্ধ করিয়া রহিলেন। যুদ্ধের পর

বিচক্ষণ রাজনৈতিক জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী হরগোবিন্দ নাটানী পরামর্শ দিলেন প্রথমে উদয়পুরে বিবাহ সম্পন্ন করিয়া জয়পুরে ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। রাঠোরের প্রতি বৈরান্ধ কচ্ছবাহের ইহা মনঃপুত হইল না, আগে রাঠোরের সঙ্গে বহুদিন সঞ্চিত বৈরের হিসাব-নিকাশ, বিবাহ পরের কথা। ঠাকুর সওয়াই সিংহ রাঠোর জগৎ সিংহকে বুঝাইলেন, প্রধান প্রধান রাঠোর সামন্তের অপ্রীতিভাজন অত্যাচারী মানসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার এই উত্তম সুযোগ। যুদ্ধে মহারাজা জগৎ সিংহের দক্ষিণ হস্ত আমীর খাঁ পাঠান ভাবিলেন, উদয়পুরে বিবাহের বরযাত্রী হওয়া অপেক্ষা মারবাড় লুঠেই লাভ অধিক। আমীর খাঁ মারবাড় আক্রমণের পক্ষে মত দিলেন; জয়পুর বাহিনী যোধপুর অবরোধ করিয়া মানসিংহ রাঠোরের অবস্থা কাহিল করিয়া তুলিল। আমীর খাঁর দস্যু সেনার ভয়ে সামন্তগণ মানসিংহের সাহায্যার্থ আসিতে সাহসী হইল না, কয়েকদিনের মধ্যে যোধপুরের পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন গোপনে জয়পুর শিবির হইতে পিণ্ডারীর দল লইয়া আমীর খাঁ উধাও হইলেন। দুই দিন পরে তিনি জয়পুরের বাহিরে ডেরা করিয়া শহর দখল করিবার উপক্রম করিলেন। মহারাজা জগৎ সিংহের ভগ্নী কয়েক থালা আশরফী হীরা-জহরত সাজাইয়া উহার উপর নিজের ওড়নাখানা রাখিয়া দাসীগণের হাতে আমীরের কাছে পাঠাইয়া আবেদন জানাইলেন, আমীরের সঙ্গে লড়াই করিবার মত মরদ এখন জয়পুরে নাই, তাঁহার সম্মানার্থ কিছু নজর জয়পুরের তরফ হইতে পেশ করা হইল। আমীর খাঁ ইহা শুনিয়া কেবলমাত্র ওড়নাখানা থালা হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজের মাথায় বাঁধিলেন এবং রাজভগ্নীকে রাম রাম জানাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন—যেখানে মরদ আছে সেইখানে আমি লড়াইয়ের তালাশে চলিলাম; জয়পুরের কোন ভয় নাই, বহিনজী হুকুম করিলেই আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইব।

যেমন বিদ্যুৎ গতিতে আসিয়াছিলেন তেমনই ভাবে আমীর খাঁ জয়পুর হইতে যোধপুরে ফিরিয়া আসিলেন; ইতিমধ্যে জগৎ সিংহ যোধপুরের অবরোধ উঠাইয়া জয়পুর অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। আমীর খাঁ পূর্ব্বেই বিনা নোটিশে রাতারাতি জয়পুরের চাকরি ইস্তফা দিয়াছিলেন। ইহার জন্য নগদ মোটা টাকা ঘুষ দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাঁহার তোপখানা ও কয়েক হাজার সওয়ার সমেত তাহাকে জয়পুর অপেক্ষা অধিক বেতনে যোধপুর সরকারের চাকুরিতে লওয়া হইয়াছিল। আমীর খাঁ যোধপুরে ফিরিয়া নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং বহু উপঢৌকন পাইলেন; মহারাজা এবং রোহিলা আফ্রিদী পাঠান পাগড়ি-বদল "ভাই" হইলেন। আমীর খাঁ মিথ্যা দাবীদার (Pretender) ধনকুল সিংহের পক্ষকে নির্ম্মূল করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া নাগোরের দিকে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। নাগোর হইতে দশমাইল দূরে শিবির স্থাপন করিয়া তিনি নাগোরের পীর তর্খানের দরগা দর্শনের অজুহাতে ঐখানে গিয়া ধনকুল সিংহের অভিভাবক ও সর্ব্বেসর্ব্বা পোহকরণ সামন্ত সওয়াই সিংহের সঙ্গে দেখা করিলেন। ধনকুল সিংহকে আমীর খাঁ যোধপুরের গদিতে বসাইয়া দিলে বিশলক্ষ টাকা পাইবেন এই সর্ত্তে কথাবার্ত্তা করিয়া তিনি সওয়াই সিংহের পাগড়ি-বদল ভাই হইলেন এবং কোরাণ ছুঁইয়া ধনকুল সিংহের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। বিদায়ের সময় আমীর খাঁ সওয়াই সিংহ এবং সমস্ত রাঠোরগণকে তাঁহার ডেরায় পরের দিন এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। পাঁচশত রাঠোর সর্দ্দার সঙ্গে লইয়া সওয়াই সিংহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। নাচ গান শরাব আফিমে যখন সকলেই মশগুল তখন রাঠোরগণের মাথার উপর তাঁবু চাপা পড়িল, একজনও পলাইতে পারিল না (বিঃ ১৮৬৪, ১৯শে চৈত্র = ১৮০৮)। আমীর খাঁ মারবাড়ে কার্যতঃ পাঠান অধিকার স্থাপন করিলেন, এবং মন্ত্রী ইন্দ্ররাজ এবং রাজগুরু দীননাথের শত্রুগণের নিকট হইতে সাত লক্ষ টাকা লইয়া ঐ দুইজনের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহার পর মহারাজা মানসিংহের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। কিছুদিন পরে মানসিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বদমায়েশি করিতে গিয়া মারা পড়িল, মানসিংহ সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গেলেন। আমীর খাঁ এই পাগলের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দেওয়ার অজুহাতে বিরাট সেনা লইয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবাড় আক্রমণ করিলেন।

## ১৬

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমীর খাঁর পাঠান সেনা দুই দিক হইতে উদয়পুর আক্রমণ করিল। এক ভাগ স্বয়ং আমীর খাঁ অধীনে দেবারী গিরিবর্ত্মের পথে, অন্য ভাগ তাঁহার জামাতা জমশিদ খাঁর নেতৃত্বে চীরবার রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। আমীর খাঁ শাসাইলেন এগার লক্ষ টাকা না পাইলে একলিঙ্গজীর

মন্দির ধ্বংস করিবেন। কিন্তু একলিঙ্গজীকে রক্ষা করিবে কে? চুণ্ডাবতগণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শক্তাবতগণকে দরবারে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিল; একলিঙ্গজীর রক্ষার্থ শক্তাবতকুল চুণ্ডাবতের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবে না। রাঠোর ঝালা চৌহান ও চুণ্ডাবতকুলকে লইয়া মহারাণা ভীম সিংহ যুদ্ধে নামিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুর সহিত এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এগার লক্ষ টাকার দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন; অথচ রাজকোষ শূন্য। যাহাদিগকে জামিন দেওয়া হইয়াছিল উহাদের উপর কাবুলী জুলুম আরম্ভ হইল। চুণ্ডাবত অজিত সিংহ মহারাণার প্রতিনিধি হিসাবে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আমীর খাঁ অজিত সিংহকে জানাইলেন, কৃষ্ণকুমারীর হয় যোধপুরে বিবাহ, না হয় ভীম সিংহের কন্যার মৃত্যু ব্যতীত যুদ্ধবিরতি নাই, উদয়পুর ধ্বংসের পূর্ব্বে পাঠান সেনা মিবাড় ত্যাগ করিবে না। অজিত সিংহ এই দারুণ সংবাদ মহারাণাকে জানাইলেন। পাঠানের উৎপীড়ন ও সন্ধির কথাবার্ত্তা যুগপৎভাবে চলিতে চলিতে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। মহারাণা প্রতাপ কিংবা রাজসিংহের মত মহারাণা ভীমসিংহ আরাবলীর দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিলেন না কেন? ঐ পথ তখনও উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু মহারাণা কেবল নামে ভীম, সন্তান উৎপাদনে বাপ্পা রাওলের সমকক্ষ অর্থাৎ পাঁচ কম এক শত সন্তানের জনক। দ্বিতীয় কথা, ঐ অঞ্চল তখন সম্পূর্ণ শক্তাবত কুলের জায়গীর, মহারাণার সহিত চুণ্ডাবত সর্প-বিবরে প্রবেশ করিতে পারে, শক্তাবত কুলের আশ্রয়প্রার্থী হইতে পারে না। তৃতীয় কথা, আমীর খাঁ এমন করিয়া উদয়পুরের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে রাজপুত ভাবিবার অবসর পায় নাই।

২১ জুলাই (১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) উদয়পুর প্রাসাদে শেষ মীমাংসার জন্য দরবার বসিল। মহারাণা তাঁহার রাজকীয় ছুরিকা সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, এই ছুরিকার দ্বারা কৃষ্ণকুমারীকে কেহ হত্যা করিয়া শিশোদিয়া বংশের কুলমান রক্ষা করুক। ঘৃণা-লজ্জায় সকলে বিনানুমতিতে দরবার ত্যাগ করিলেন, তাঁহারা প্রাণ দিতে আসিয়াছিলেন, শত্রু ব্যতীত কাহারও প্রাণ লইতে আসেন নাই। মহারাণা তাঁহার নিকট জ্ঞাতি ভৈরব সিংহোত শাখার বৃদ্ধ মহারাজা দৌলত সিংহকে ডাকাইয়া তাঁহাকে এই কার্য্য সমাধা করিতে বলিলেন। ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া দৌলত সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—যিনি এই রকম আদেশ দিতে পারেন, তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলাই উপযুক্ত প্রত্যুত্তর। নিরপরাধ বালিকার উপর অস্ত্রাঘাত আমার কার্য্য নহে, ঘাতকের কাজ।

এই বলিয়া দৌলত সিংহ মহারাণাকে সমীহ না করিয়া চলিয়া গেলেন; অথচ বিলম্ব করিবার সময় নাই, আমীর খাঁর চর কৃতান্তের মত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহার পিতা দ্বিতীয় অরিসিংহের রক্ষিতা দাসীর পূর্ব্ব পতির ঔরসজাত পাপিষ্ঠ জবানদাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জবানদাস আজন্ম জল্লাদ অপেক্ষাও নরহত্যায় অধিক উৎসাহী। জবানদাস ছুরিকা গ্রহণ করিয়া অকম্পিত চিত্তে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিল, রাজমাতা সর্দ্দারকুঁয়ারীর করুণ ক্রন্দনে পাষাণ গলিলেও জবানদাসের হৃদয় গলিল না। তাঁহার উপর ব্রহ্মশাপ পড়িয়াছিল। তাঁহার কার্য্যের ফলে মিবাড়ের এই দুর্দ্দশা। স্বামীর বিশ্বস্ত প্রধানমন্ত্রী অমরচাঁদ বড়বাকে তিনি নিজের দাসী রামপিয়ারীর দ্বারা অপমানিত করিয়াছিলেন, বিষ প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করাইয়াছিলেন। তিনি নিজের নিরঙ্কুশ আধিপত্য রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্ববিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, পুত্রগণকে নিজের দুরাকাঙ্ক্ষার ক্রীড়াপুতুল করিয়া রাখিয়াছিলেন, একবার চুণ্ডাবত একবার শক্তাবতকে প্রশ্রয় দিয়া উভয় কুলের মধ্যে অহি-নকুল সংগ্রামের তামাসা দেখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী মহাকাল বধূর অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সাবলীল চরণক্ষেপে মহাযাত্রা করিলেন। ষোড়শী কৃষ্ণকুমারীর অপ্সরাদুর্লভ রূপচ্ছটায় উদ্ভাসিত শান্ত-সৌম্য বরাভয়দায়িনী মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া ঘাতক কিছুক্ষণ অসাড় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া গেল, ছুরিকা শ্লথমুষ্টি হইতে ভূপতিত হইল; উষার উদয়ে নিশান্তের অন্ধকারের মত জবানদাস কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল কেহ দেখিতে পাইল না। অমরীকে তবুও মরিতে হইবে। শূন্য দরবার গৃহে সংবাদের জন্য পিতা অস্থির, দুয়ারে শত্রুর দূত অসহিষ্ণু।

কৃষ্ণকুমারী ভিতরে আসিয়া মৃত্যুর বাসরশয্যায় বসিয়া বিষের পেয়ালার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, গগনভেদী ক্রন্দনের রোল তাঁহার কানে পৌঁছিল না, রোরুদ্যমানা জননীর কাতরতা দেখিয়া চোখে জল আসিল না, নির্ব্বাত, নিষ্কম্প দীপ শিখার ন্যায় তাঁহার আননশ্রী দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চাপোৎকট বংশীয়া (চাবড়া) জননীকে ক্ষত্রিয় দুহিতার উপযুক্ত প্রবোধ দিয়া, পিতাকে ভক্তি নিবেদন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিষের প্রথম পেয়ালা তিনি অমৃত জ্ঞানে সন্তোষের সহিত পান করিলেন। পাপের

বিষ কুমারীর পুণ্যদেহে অতিষ্ঠ হইয়া কিছুক্ষণ পরে বমির সহিত বাহির হইয়া আসিল। এই ভাবে তাঁহাকে পর পর তিনবার বিষ দেওয়া হইল, তিনবার বমি হইয়া গেল। অবশেষে বমন নিবারক ও শৈত্যগুণ বিশিষ্ট কুসুম্ভফুলের ( safflower ) রসের সহিত মারাত্মক পরিমাণে আফিম গুলিয়া কৃষ্ণকুমারীকে দেওয়া হইল; ম্লান হাসির সহিত উহা পান করিয়া তিনি ঢলিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণকুমারী রাজপুত-বৈর সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হলাহল পান করিয়া আজ হইতে ১৫২ বৎসর পূর্ব্বে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভারত-জননীর সর্ব্বাঙ্গ এখনও ভারত সন্তানগণের অন্তর্বৈর বিষে জর্জ্জরিত। ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে বৈর, নিত্য-নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্প্রদায় জন্মলাভ করিয়া কেবল বৈর বৃদ্ধি করিতেছে। "নাই" বলিলে না কি সাপের বিষও থাকে না; এই জন্য রামদাস বাবাজী সকলকে মহাশত্রুঘ্ন এই "নাই" মন্ত্র জপের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে ইতিহাস-চর্চ্চা উক্ত শত্রুঘ্ন মন্ত্রের বিদ্যাভারাক্রান্ত মৈত্রেয় টীকা ভাষ্য। আমাদের বৈর-মুক্তিকামনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী নির্জ্জিত বৈরের গুলীতে প্রাণ দিয়াছেন, তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে বৈর কিন্তু বাড়িয়াই চলিয়াছে। শাক দিয়া মাছ ঢাকা আর কতদিন চলিবে? বিক্রোমোর্ব্বশীয় নাটকের রাণী ঔশীনরীর ন্যায় দরবারী ঐতিহাসিকগণের "প্রিয়প্রসাদন" ব্রতের সমাপ্তি কতদিনে হইবে?

# গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্র-মানসিকতা ও শিল্পকর্ম

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত প্রবন্ধ )

শ্রীসত্য বিশ্বাস

## এক

গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্র-মানসিকতার স্বরূপ বুঝতে এবং তার উৎস সন্ধান করতে হলে, উপন্যাসখানির জন্মকালের দিকে তাকানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ কোন সার্থক সাহিত্যকর্মকেই—বিশেষতঃ তা যদি এমন একটি মহৎ উপন্যাস হয়—তার দেশ কাল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে তাকে খণ্ডিত ভাবেই দেখা হবে। তাতে তার প্রকৃত্যিকার রূপের তুলনায় তাকে অনেক ছোট ও নিষ্প্রভ মনে হবে। এবং তার পিছনে লেখকের মানসিকতার সত্য আবিষ্কারও নির্ভুল হবে না সম্ভবতঃ।

যদিও রবীন্দ্রনাথ গোরা উপন্যাস রচনা করেন ১৯০৭ সনে, অর্থাৎ তাঁর মধ্যবয়সে, তবু এখানে পৌঁছানর আগে যৌবনের প্রারম্ভ, মধ্যাহ্ন ও পরিণতির যে স্তরগুলি তিনি অতিক্রম ক'রে এসেছেন প্রথমে সেগুলির আলোচনা প্রয়োজন। কারণ, কালের পটভূমিতে, জীবনের পথযাত্রায় এবং চিন্তা ও অনুভূতির পরিণতির পথে ঐ স্তরগুলি হ'ল রবীন্দ্র মানসিকতার এক-একটি মাইল-ষ্টোন। কবির অনুভূতিপ্রবণ মনের প্রথম অনুভবের খরস্রোতা নদীগুলি তাদের গতিপথের দু'ধারে যে পলি বহন ক'রে এনে অবশেষে এক বিশাল বিশ্বমানবতার উপলব্ধির সমুদ্রসঙ্গমে লীন হয়ে গেছে, সেই পলি উর্বরতারই ফসল হ'ল উপন্যাস গোরা। তাই এই পলির অমূল্য সঞ্চয়ের মধ্যেই অন্বেষণ করতে হবে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির সৃষ্টিশীল উর্বরতা ও প্রজ্ঞাময় চিন্তার স্বর্ণকণা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের অনুভব আর পরিণত বয়সের চিন্তার ফলশ্রুতি এই গোরা উপন্যাস। তাঁর কৈশোর ও যৌবন, অর্থাৎ মনের আকাশে অনুভূতির প্রথম সূর্যোদয়ের কালটা অতিক্রান্ত হয়েছে একটা আশ্চর্য ভাবমণ্ডলের মধ্যে। এই আশ্চর্য ভাবমণ্ডল ছিল উনবিংশ শতাব্দীর উত্তর-ষষ্ঠ দশকের বাংলা দেশের চিন্তাকর্ম ও ভাবের পরিমণ্ডল। উনিশ শতকের সপ্তম দশকে চিন্তাকর্ম ও ভাবের সবচেয়ে বড় যোগফল হ'ল 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৬৭ সনের এপ্রিল মাসে নবগোপাল মিত্র কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়ায় একটি বাগানবাড়ীতে ঐ মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্‌যোগ ও উদ্যমের সঙ্গে মিলিত হয় ঠাকুর পরিবারের

আহুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা। এবং এই হিন্দুমেলার ভাবরূপের স্রষ্টা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার কিছুদিন আগে Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এবং তাঁর নিজের কথায় ('আত্মচরিত'), "ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান।" যৌবনের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ এই মেলার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। ১৮৭৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার নবম বার্ষিকীতে তিনি স্বরচিত কবিতা প্রথম পাঠ করেন। এই ঘটনাটি কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখছেন, "দেখিলাম সাদা ঢিলাঢালা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।…মধুর কামিনীলাঞ্ছন কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।" সেদিন সেই তরুণ কবির মনে পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলশব্দ যে ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছিল, তা তাঁর সেই 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতায় এক আশ্চর্য বেদনাময় শব্দব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত।

যদিও স্বদেশের যুবক-সম্প্রদায়ের বাহুবলের অনুশীলন, স্বদেশের বিপণিতে বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশে প্রস্তুত পণ্যের প্রচার এবং স্বদেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা—মোটামুটি এই উদ্দেশ্যগুলি নিয়েই হিন্দুমেলার জন্ম; তবু এটা দেশের মাত্র একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নামেই চিহ্নিত কেন—এই স্বাভাবিক কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হলে হিন্দুমেলার পটভূমির একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রয়োজন। মোটামুটি ভাবে একথা বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের ফলে সারা ইউরোপ জুড়ে নতুন ভাবের বন্যা বয়ে যায়। এই ইউরোপীয় রেণেসাঁসের ফসল সাম্য, মৈত্রী, মানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ, প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষার সেতুপথে বাংলা দেশে উপস্থিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। এবং এই নবযুগের আদর্শের সংক্রমণ সুরু হয় ঐ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ ও চতুর্থ দশকের সুরুর সময় থেকে। এই সংক্রমণের কাজে ডিরোজিওর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ডিরোজিও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি ১৮২৮ সনে হিন্দু কলেজের ইংরেজী ও নীতিবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। হিন্দু কলেজের তদানীন্তন বাঙালী ছাত্ররা ডিরোজিওর তথা ফরাসী বিপ্লবের উপরোক্ত আদর্শগুলির প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও অভিভূত হয়ে পড়েন। এ ছাড়া কলেজের বাইরে তিনি একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানে সাহিত্য, দর্শন, ইত্যাদির আলোচনা করতেন। এই সভা সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা; রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য, শ্রোতৃরূপে উপস্থিত থাকিতেন।" এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই পরবর্তী জীবনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই মোটামুটি একই উদারনৈতিক মনোভঙ্গির, যুক্তিবাদী মানসিকতার, একই আদর্শগত ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রের অংশীদার ছিলেন। তাই তাঁরা নবলব্ধ মানসিকতার স্বচ্ছ সত্য মানবিক দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন পৃথিবীকে, তাঁদের পারিপার্শ্বিক সমাজ ও ধর্মকে। দেখতে গিয়ে তাঁরা পদে পদে আবিষ্কার করতে লাগলেন যেন রক্ষণশীল সমাজ ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণে শৃঙ্খলিত মানবতার আত্মাকে। তখন মানুষের সবচেয়ে বড় পরাধীনতা ছিল ধর্মের কাছে। রেণেসাঁসের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এই যুবকদলের সমস্ত রকম সঙ্কীর্ণতা ও অমানুষিকতার শিকলভাঙার কাজ তখন থেকেই সুরু। এই নব্যশিক্ষিত যুবকদলটির দ্বারাই যেন উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের বাংলার শিক্ষা, চিন্তা, মনীষা ও যুবশক্তির সমগ্র রূপটি প্রতীকীকৃত। এঁদের মধ্যে সুপণ্ডিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অচলায়তন হিন্দুধর্মের উপর শূলপাণি বিদ্রোহে ধর্ম ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্যরা অমন প্রকাশ্য বিদ্রোহ না করলেও এই ধর্মীয় অন্ধত্বের প্রতিবাদে তাঁরা ছিলেন সোচ্চার।

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকে আর একজন নির্ভীক মানবপ্রেমিক (humanist) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিন্দু-সমাজের ভিতরে থেকেই এই সমাজ ও ধর্মের সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের স্বপক্ষে তিনি তখন কাজ ক'রে চলেছেন অক্লান্ত নিষ্ঠায় ও অক্লান্ত লেখনীতে।

এইভাবে যখন হিন্দুধর্মের অচলায়তন ভিতর-বাহিরের আঘাতে-প্রতিঘাতে কম্পমান তখন হিন্দু-

সমাজের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দল তাঁদের সমগ্র রক্ষণশীল শক্তি দিয়ে এই আঘাত প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু শশধর তর্কচূড়ামণি, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই সময় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির আর একজন ধারক বাহক ও প্রবক্তা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অবশ্য তিনি ধর্মীয় আচরণে ও ধর্ম-ব্যাখ্যায় গোঁড়া হিন্দু শশধর তর্ক-চূড়ামণির সমগোত্রীয় ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন বহুল পরিমাণে আলোকপ্রাপ্ত ও ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চিন্তাদর্শে উদ্বুদ্ধ। তখন ইউরোপীয় দর্শন কিছু পরিমাণে ফরাসী দার্শনিক কোঁত-এর প্রভাবে আচ্ছন্ন। কোঁত-এর দর্শনে ঈশ্বর, পরলোক, অতিপ্রাকৃতের স্থান ছিল না। স্থান ছিল শুধু মানুষের, মনুষ্যত্বের এবং এই মনুষ্যত্বের অপূর্ণতা হতে পূর্ণতার পথে উত্তরণ-প্রয়াসের ধর্মের। কোঁত-এর এই ধর্মের নাম বিশ্বমানব ধর্ম বা Religion of Humanity। বঙ্কিমচন্দ্র এই কোঁত-ধর্মের সঙ্গে হিন্দুর গীতোক্ত ধর্মের এক আশ্চর্য সমীকরণে হিন্দুধর্মের যে অভিনব রূপের সৃষ্টি করলেন, তাই বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম নামে পরিচিত। তাঁর দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, প্রভৃতি রচনাগুলি এই অনুশীলন ধর্মের শিল্পরূপ ও তত্ত্ব। তবু একথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন হিন্দুধর্মেরই একজন শক্তিধর সেনাপতি।

তখন বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই এক ধরণের ধর্মোন্মত্ততা দেখা দিয়েছিল। তাই একদিকে রক্ষণশীল ধর্মীয় অচলায়তনের ভিতরে-বাহিরে বন্দী মনুষ্যত্বের শৃঙ্খল-ঝন্‌ঝনা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সমাজোদ্ভূত স্বাদেশিকতার ভগীরথদের কণ্ঠে সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মন্ত্রোচ্চারণের ওঙ্কারধ্বনি—এই আশ্চর্য অর্কেস্ট্রার সুরমূর্চ্ছনার মধ্যে এবং এই বিচিত্র পটভূমিতেই হিন্দুমেলার জন্ম হয়েছিল। সেদিনের স্বাদেশিকতার বা দেশচর্যার আজকের মত ধর্মনিরপেক্ষ রূপ ছিল না। বিপিনচন্দ্র পালের দু'একটি উক্তি এই স্বাদেশিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয়। ১৯২১ সনে তিনি লিখছেন, "আজিকালি আমরা স্বাদেশিকতা বলিতে কেবল হিন্দুয়ানি বুঝি না। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ ভাবটা ফুটিয়া উঠে নাই।…আর এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়।…আর সে স্বাদেশি-কতার আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা করেন।"

এইসব উক্তি ও ইতিবৃত্ত থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, কেন হিন্দুমেলার মত চিন্তা, কর্ম ও ভাবের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল কীর্তিস্তম্ভ হিন্দুধর্মেরই নামে চিহ্নিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দুমেলার সম্পর্ক অগভীর ছিল না, এটা আগেই দেখা গেছে। তাই অনুভূতির সহজ সুকুমারত্বে ও সহজাত ধর্মপ্রবণতার জন্য কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যে সংগঠনটি আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার প্রস্তুতির দুর্গ ব'লে প্রতীয়মান হয়েছিল, রবীন্দ্র-মানসিকতার উপর তার প্রভাব একেবারে নগণ্য নয়।

সত্যি বলতে কি, ১৮৭৫ সন পর্যন্ত এদেশের মানুষের মনে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল খুবই ক্ষীণ, অস্পষ্ট, অপূর্ণাঙ্গ। যেটুকু ছিল, তা ছিল ধর্মচেতনার নিচে ভাবীকালের সম্ভাবনার গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার এই অপুষ্ট স্বাস্থ্যের কারণ ছিল, ইংরাজের সম্বন্ধে তৎকালীন বিদগ্ধ ও বুদ্ধিজীবী মহলেরও এক অংশের মনে একটা আশ্চর্য শ্রেয়ঃবোধ। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ-চরিত্রের পাওনার চেয়ে বেশী ও অনৈতিহাসিক এই শ্রেয়ঃবোধ তাদের মনের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশের পথে একটা অদৃশ্য অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। তখনকার ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্বদা নিজেদের মধ্যে স্কট, শেক্‌স্‌পীয়র, বায়রন, মিল্‌টনের কাব্য, উপন্যাস, নাটকের আলোচনা করতেন। সর্বদা বুঁদ হয়ে থাকতেন ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের নেশায়। এর ফলে তাঁদের মানসচক্ষে ইংরাজের শিল্পী-রূপ ও স্রষ্টা-রূপ যতটা ফুটে উঠেছিল, রাজদণ্ড হাতে প্রভু ইংরাজের ছবি ততটা ওঠে নি। এমন কি, ইংরাজ রাজের সুনীতি ও ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে মানুষের মনে এমনি মোহ ছিল যে, সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুবিচারের আশায় ইংলণ্ডে গিয়ে আবেদন জানিয়েও যখন ব্যর্থ হলেন তখন বাংলা দেশের মোহভঙ্গ হয়। সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফেরেন ১৮৭৫ সনে।

তাই দেখা যায়, ষষ্ঠ দশকের পর থেকে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ধর্মতত্ত্বের বাদ-প্রতিবাদের কলকণ্ঠে বাংলা দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত। ১৮৭২ সনে দেখা যায়, রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক বক্তৃতায় উচ্চকণ্ঠ। তাঁর এই বক্তৃতা ছিল হিন্দু পুনরুত্থান বা Hindu Revival-এর আদর্শ প্রচারের বাহন। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত, তবু তাঁর জন্মগত ও বংশগত হিন্দুত্ব-চেতনার ঐতিহ্য থেকে তিনি

যা চিন্তা করতেন সে সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, "আমরা ভারতবর্ষের লোক, বর্তমানে যতই অধঃপতিত হই না কেন, জগতের একটা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী বলিয়া মানবসমাজে আচার্যের আসনে আমাদের অধিকার আছে, চিরদিন রাজনারায়ণ বসুর এই বিশ্বাস ও অভিমান ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বক্তৃতা প্রদান করেন।" এই হিন্দু পুনরুত্থানের আদর্শ প্রচারে তাঁর আর একজন সুযোগ্য সহকর্মী ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি। এর দশ বছর পর ১৮৮২ সনে শোভাবাজার রাজবাটীর একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে ইংরেজ পাদ্রী হেষ্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিতর্ক সুরু হয়। হেষ্টি ছিলেন তদানীন্তন জেনারেল এসেমব্লী বা বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ। এই বিতর্কে সুপণ্ডিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের তত্ত্বের উপর এই সূক্ষ্ম কূট বিতর্কে ব্যবহৃত বঙ্কিমের যুক্তিগুলিই পরে Letters on Hinduism নামে সংকলিত হয়।

এই ধর্মতত্ত্বের কলমুখরতার মধ্যে, আধ্যাত্মিক মানস পরিমণ্ডলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের স্বর্ণযুগ সুরু ও অতিক্রান্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তখন এই ধর্মীয় আলোচনায় ও আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েন নি। তবু বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসুর উপর ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধাশীল যুবক রবীন্দ্রনাথ এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন রবীন্দ্র-মানস উপরোক্ত ঘটনাময় কালের অভিঘাত ও তার প্রতিক্রিয়ার ভাবতরঙ্গ থেকে পুরোপুরি আত্মরক্ষা করতে পারে নি নিশ্চয়ই। এ ছাড়া রবীন্দ্র-মানসিকতার উপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অসামান্য। পিতার চরিত্র, কর্ম ও ধর্মমতের উপর গভীরতম শ্রদ্ধার আধারেই এই প্রভাব চিরদিন বিধৃত ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। বাল্যকালের সেই ছবি তাঁর মনে চিরমুদ্রিত ছিল। সেই ছবি তাঁরই ভাষায় বর্ণনা না করলে তার সুষমা ক্ষুণ্ণ হয়।

সেই সময় দেবেন্দ্রনাথের হিমালয় যাত্রার সঙ্গী ছিলেন পুত্র রবীন্দ্রনাথ। অমৃতসর থেকে ডালহৌসী পাহাড়ের পথে বক্রোটায় তাঁদের বাসা ছিল একটা পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। রবীন্দ্রনাথ তারই স্মৃতিতে লিখেছেন, "আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ায় পাণ্ডুরবর্ণ তুষার-দীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।"

মনের মণিকোঠায় এই ছবির স্মৃতি ছিল রবীন্দ্রনাথের অমূল্য সঞ্চয়। চিরদিন এই ছবি তাঁর আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা হয়ে কাজ করেছে। তাঁর পরবর্তী জীবনে ধর্মচিন্তার ও আধ্যাত্মিকতার উদ্বোধন করেছে। বংশগত ঐতিহ্যে, দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রভাবে ও দৈনন্দিন জীবনে গায়ত্রী-আদি মন্ত্র জপতপের দরুণ রবীন্দ্র-মানসে উপনিষদের একটা স্থায়ী আসন তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাঁর সকল কর্ম, চিন্তা ও শিল্পসৃষ্টির উপর উপনিষদের কল্যাণছায়া দেখা গেছে, দেখা গেছে তাঁর বহু ধর্মব্যাখ্যায় উপনিষদের কল্যাণবাণী বার বার প্রতিবিম্বিত হতে।

তবু রবীন্দ্র মানসে অনুভূতির সহজাত বিশালতা ও প্রজ্ঞাপ্রবণতার জন্য রবীন্দ্রনাথ কোন একটি বিশেষ ধর্ম-গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। যৌবন কাল থেকেই তাঁর এই পথ খোঁজার, এই আশ্চর্য এষণার সুরু। এ সম্বন্ধে পরবর্তী কালে তাঁর Hibbert বক্তৃতামালার মধ্যে তিনি নিজেই সুন্দর ভাবে বলেছেন :

"At the outburst of an experience which is unusual, such as happened to me in the beginning of my youth, the puzzled mind seeks its explanation in some settled foundation of that which is usual, trying to adjust an unexpected inner message to the organised belief which goes by the general name of a religion."

আবার বলেছেন :

"At last I came to discover that in my conduct I was not strictly loyal to my religion, but only to the religious institution. This latter represented an artificial average with its standard of truth at its static minimum, jealous of any vital growth that exceeded its limits. I have my conviction that in religion, and also in the arts, that which is common to a group is not important. Indeed, very often it is a contagion of mutual imitation. After a long struggle with the feeling that I was using a mask to hide the living face of truth, I gave up my connection with our church."

রবীন্দ্রনাথের অন্তরের এই সত্যদৃষ্টি ও সত্যনিষ্ঠা তাঁর

ধর্মচেতনা ও আধ্যাত্মবোধকে আন্তর্জাতিক বিশালতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই তিনি বুদ্ধের ধর্মমতের উদারতায় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। মহাবোধি সোসাইটি হলের প্রতিষ্ঠাতা সিংহলী বৌদ্ধভিক্ষু ধর্মপালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রীতিময় সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে ১৮৯৫ সনে। প্রায় একই সময়ে ১৮৯৯ সনে এশিয়া সফর-রত জাপানী মনীষী ওকাকুরার প্রচারিত আন্তর্জাতিক মানবমৈত্রীর ধর্মমতও তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। রবীন্দ্র-মানসের আধ্যাত্মচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের হৃদয় চিরদিন এই উদার আন্তর্জাতিকার ( Universalism ) মধ্যেই মুক্তি পেয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মমন্ত্র' প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালের পৌষ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে'। তার পরের কয়েক বছরের 'বঙ্গদর্শন' খুললেই দেখা যাবে যে, ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে, একটা সূক্ষ্ম বিবর্তনের ধারায় রবীন্দ্র-মানসিকতার ধর্মচিন্তা একটা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ মনননির্ভর রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। এই বিবর্তনলব্ধ চিন্তার যোগফল তাঁরই পরবর্তীকালের একটি উক্তিতে অভিব্যক্ত। উত্তরকালে প্রোফেসর Albert Einstein-এর সঙ্গে কথপোকথনের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মচিন্তা ও ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"My religion is in the reconciliation of super-personal Man, the Universal human spirit, in my own individual being."

•

## দুই

যদি বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ধর্মচিন্তা গোরা উপন্যাসে একটা বিরুদ্ধ পরিবেশের পটভূমিতে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তাহলে কথাটা হবে একটা তথ্যগত অসঙ্গতি। তাই বরং বিপরীত দিক্ থেকে বলতে হবে যে, তাঁর বিশ্বজনীন আধ্যাত্মচেতনার বীজ ছিল এই উপন্যাসখানির শিল্পরূপের অন্তরালে। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ভাবে উদ্বুদ্ধ টেনিসন তাঁর বিখ্যাত Ulysses কবিতাটি রচনা করেন। এই Ulysses চরিত্র গ্রীক পুরাণের Odyssey নয়, এই Ulysses আধুনিক ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সেই অক্লান্ত কর্ম-সাধনার, রহস্যরাজ্যের উপর আবিষ্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়ানর, অজানাকে জানার সীমান্তবর্তী করার দুরন্ত এষণায় উন্মুখর, অস্থির, অক্লান্ত। এই Ulysses তার পৌরাণিক রূপকল্পের আধারে আধুনিক চারিত্রিকতায় ভাস্বর এবং টেনিসনের নিজস্ব সৃষ্টি। এই Ulysses-এর "I will drink life to the lees" এই বিখ্যাত উক্তিতে যেমন নবযুগের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সমগ্র ইউরোপীয় যুগ-মানস এবং তার কামনা-বাসনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গোরা চরিত্রও তার চিন্তায়, কর্মে ও মনোভঙ্গিতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের আধ্যাত্মিকতা, মনীষা, যুক্তিবাদ, স্বদেশ-প্রেম ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অভিব্যক্তি দিয়েছে। কারণ, যদিও 'গোরা' উপন্যাস রচিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ভিতরেই, তবু তার ঘটনার কাল হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম-নবম দশক। এমনি ক'রে ব্যক্তির মধ্যে যুগমানসকে এবং যুগমানসের আধারে চিরন্তনকে সংস্থাপন করাই, অর্থাৎ সীমার মাঝে অসীমের বংশীধ্বনিকে ধ্বনিত ক'রে তোলাই রবীন্দ্রনাথের সকল সার্থক শিল্পকর্মের প্রথম ও প্রধান সর্ত।

গোরার দেশপ্রেম ছিল অত্যন্ত প্রবল। এই দেশপ্রেম তার অন্তরের একেবারে গভীরতম প্রদেশের অকৃত্রিম অনুভূতি ও অনুরাগ। গোরার দেশচর্যা বা স্বদেশপ্রেম একটি বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই আদর্শের চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে জীবনের সব ক্ষেত্রে কতকগুলি সুনিয়ন্ত্রিত আচরণ পালন ক'রে চলতে হবে—এটাই গোরার দৃঢ়মত। এই আচরণে সূক্ষ্মতম ত্রুটির সঙ্গেও তার কোন আপোষ নেই। সেখানে হৃদয়ের আতিশয্য থাকবে না, আবেগ থাকবে না, থাকবে শুধু আচরণের আপাত-কঠিন নিখুঁত শৃংখল। যদিও গোরা একথা উপলব্ধি করে যে, তার মা অনন্যা, তার মায়ের মত মা সকলের হয় না, তবু এই মায়ের হাতেও তার আদর্শের আচরণের বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসতে দেয় নি। সেই কারণেই আনন্দময়ী যখন হিন্দু গোরার বন্ধু ও পুত্র-প্রতিম ব্রাহ্মণ বিনয়কে তাঁর নিজের ঘরে খাবার আমন্ত্রণ জানালেন তখন গোরা তাকে কিছুতেই যেতে দিল না এই অজুহাতে যে, আনন্দময়ীর পরিচারিকা একজন খ্রীষ্টান স্ত্রীলোক, নীতির শৃঙ্খলা মানতেই হবে। কারণ, এই মানার ব্যাপারে যদি কোথাও ক্ষুদ্রতম ফাঁকও থাকে তাহলে হয়ত একদিন মাকে মানতেও ভুল হবে—এই হ'ল গোরার দর্শন। এখানে আবেগকে সত্তা হতে দিলে চলবে না, এখানে হৃদয়কে বড় হতে দিলে চলবে না।

কিন্তু গোরার আচরণপদ্ধতির এই লৌহকঠিনতা বিনয়কে একটু ব্যথিত না ক'রে পারে নি। মোটের উপর বিনয় একটি হৃদয়বান্ যুবক। সে নীতি-নিয়মের উর্দ্ধে মানুষকে দেখে। "তাই তর্কের সময় সে একটা

মত উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে কিন্তু ব্যবহারের বেলায় মানুষকে তার চেয়ে বেশি না মানিয়া পারে না।" তাই সেদিন আনন্দময়ীর ম্লান মুখ তাকে বেদনা দিল। এই জন্যই সে আর-একদিন দুপুরে আনন্দময়ীর ঘরে ব'সে তাঁরই প্রসাদ খেয়ে তাঁর হাসিমুখ না দেখা পর্যন্ত আপন হৃদয়ের ভার লাঘব করতে পারে নি।

গোরার উপরোক্ত আচরণ তার তীব্র হিন্দুত্ববোধ-সঞ্জাত। অবশ্য গোরার সব জিনিষটাই এমনি তীব্রতার, বলিষ্ঠতার ঋজু রেখায় আঁকা। তার দেশপ্রেমেরও মূল বস্তু হ'ল এই হিন্দুত্ব-চেতনা। তবে একথাও সত্যি যে, তার এই হিন্দুত্ববোধ তার স্বদেশপ্রেমেরই পরিপূরক। এখানে দেশপ্রেম ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই, গোরা যে হিন্দু, সেটা তার গর্ব, তার সৌভাগ্য। এই বিশাল ভারতবর্ষে স্মরণাতীত অতীত থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু একটা উচ্চ সংস্কৃতির সৃষ্টি ক'রে চলেছে। একটা মহান্ সাধনার প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেছে তার তপোবনে, বেদমন্ত্রে, তার হোম যজ্ঞে, তার ঋষিদের প্রজ্ঞাময় বাণীতে। হিন্দুধর্ম একটা বিশাল সমুদ্রের মত। হিন্দুর এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষের এই বিপুল জনমানসের হাজারো বিভিন্নতাকে, বৈচিত্র্যকে স্নেহময়ী মায়ের মত বুকে নিয়ে লালন করছে এই হিন্দুধর্ম। গোরা হিন্দু, তাই হিন্দুর জাতিভেদ মানে। তার মতে জাতিভেদের আচরণের শিথিলতা আনা মানেই সমাজকে না মানা। আর সমাজকে অমান্য করার অর্থ হ'ল, যে ডালে সকলে ব'সে আছে, তাকেই কেটে ফেলা। এখানে কোনরকম শিথিলতাকে সে সূচ্যগ্র ভূমিও ছেড়ে দিতে রাজী নয়। যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিভূ হারাণবাবু দেশের মানুষকে পৌত্তলিক ব'লে, মূঢ় ব'লে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব'লে তার কর্মশক্তির উপর নেতিবাচক মন্তব্য ক'রে কটাক্ষ করেন, গোরা তখন স্বভাবসিদ্ধ তীব্রতার সঙ্গে তাঁকে ভৎর্সনা করে। তার যুক্তি, আগে দেশকে, দেশের মানুষকে ভালবাস, তাদের আপন ব'লে মনে কর, তাদের মূঢ়তাকে নিজের অনগ্রসরতা ব'লে ভাবতে শেখ তার পরে পাবে তাকে সংশোধন করার অধিকার। তার আগে নয়। এই প্রসঙ্গে সে সুচরিতাকে বলে, "আমাদের ধর্মতত্ত্বে যে মহত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্বে যে-গভীরতা আছে, শ্রদ্ধা প্রকাশের দ্বারা সেইখানেই আমার দেশের হৃদয়কে আমি জাগ্রত করতে চাই; যেখানে তার সম্পদ্ আছে সেইখানে তার অভিমানকে আমি উদ্যত ক'রে তুলতে চাই। আমি তার মাথা হেঁট ক'রে দেব না, নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়ে নিজের সত্যের প্রতি তাকে অন্ধ ক'রে তুলব না। এই আমার পণ।" এইটাই মোটামুটি গোরার স্বদেশপ্রেমের চেহারা ও তার স্বদেশকে দেখার ভঙ্গি। আবার হিন্দু হিসাবে গোরার পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে চিন্তাও আমরা লক্ষ্য করতে পারি, সুচরিতার উদ্দেশে তার আর একটি উক্তি থেকে। উক্তিটি এই, "ঠাকুরকে আমি ভক্তি করি কি না ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমি আমার দেশের ভক্তিকে ভক্তি করি। এতকাল ধ'রে সমস্ত দেশের পূজা যেখানে পৌঁচেছে আমার কাছে সে পূজনীয়।" এখানে দেখা যায়, একটা সুতীব্র স্বাদেশিকতা গোরার আধ্যাত্ম-চেতনাকে প্রভাবিত করেছে এবং হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের প্রতীক হিসাবে যে সব প্রতিমা ব্যবহার করা হয়, গোরার মতে, ঐ ঠাকুর ছোট্ট সীমার মধ্যেই অনির্বচনীয় অসীমের অভিব্যক্তি। সেই জন্যেই ত হরি-মোহিনীর মত মানুষ, যাঁর সকল পার্থিব সুখ ভস্মীভূত, তিনি ঐ ছোট্ট ঠাকুরটিকে আঁকড়ে ধ'রে শান্তি পেলেন পুনরায়। "ভাবের অসীমতা না হলে মানুষের হৃদয়ের ফাঁকা ভরে না।"

গোরার হিন্দুত্ববোধ এক-এক সময়ে খুবই তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে। যখন তার প্রিয়তম বন্ধু বিনয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মকুমারী ললিতার বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল, সে তখন বিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তার ধারণা, বিনয় এই বিবাহের দ্বারা "দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে নিজেকে পৃথক্ করে ফেলতে" চায়, অর্থাৎ হিন্দুর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এমন কি, আত্মীয়-বান্ধবহীন বিনয়ের বিবাহ-ব্যাপারে কল্যাণী আনন্দময়ীর মাতৃহস্ত যখন কাজ করতে উদ্যত তখন গোরা প্রাণপণ তীব্রতার সঙ্গে চেষ্টা করেছিল মাকে বাধা দিতে। এই তীব্রতার মধ্যেই গোরা চরিত্রের অসম্পূর্ণ-তার উৎস সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং গোরার এই অসম্পূর্ণতাকেই, সমস্ত ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধে বিচরণ-কারিণী, বিশালহৃদয়া, কল্যাণী ও আদর্শ মাতৃরূপা আনন্দময়ী পাগলামি বলে অভিহিত করেছিলেন।

গোরার চিন্তায় আর একটি অসম্পূর্ণতা ছিল। সেটা হ'ল ভারতের কর্মযজ্ঞে ভারতীয় নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে। গোরার মতে ভারতের কর্মযজ্ঞে পুরুষের ভূমিকা ব্যক্ত, নারীর অব্যক্ত। ভারতীয় নারী নিভৃতে থেকে তার সেবা দিয়ে, তার স্নেহ-মমতা দিয়ে বিশ্রামের রাত্রির মত পুরুষকে শক্তি দেবে, পুরুষের পরিশ্রমের ক্ষয় নিরাময় করবে। কিন্তু নারীকে যদি কর্মক্ষেত্রের প্রকাশ্য প্রান্তরে টেনে আনা হয়, তাহলে সমস্ত দিকেই অনিষ্ট হবে, অকল্যাণ হবে। কিন্তু বিনয়ের মতে, নারীকে তার

যথার্থ রূপে না দেখাই, তার সম্বন্ধে সঠিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতিই হ'ল অকল্যাণকর। নারীকে তার ঘর-কন্নার বাইরে ভারতের কর্মযজ্ঞের বিশাল উদার পট-ভূমিতে স্থাপন ক'রে বড় ক'রে না দেখলে, তাকে আমাদেব কর্মসঙ্গিনী করতে না পারলে সেই কর্মযজ্ঞ সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের মানসে ভারতের ধ্যান পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে পারে না। প্রথমে তর্কের খাতিরে বিনয়কে অস্বীকার করলেও বিনযের যুক্তি গোরার অন্তরে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন ক'রে দিল এবং তখন থেকেই তাব অবচেতন মনে এই দর্শনের ক্রিয়া সুরু হয়ে গেল। গোরা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এই দর্শনেব সত্যতা উপলব্ধি করেছে উত্তরকালে। উপলব্ধি করেছে যখন গোবার কারামুক্তির পর সুচরিতা একদিন আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সেদিন সেই মুহূর্তে সুচরিতাকে দেখে গোরার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই লিখছি, "এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবর্ষে যে স্ত্রীলোক আছে সেকথা গোরার মনে উদয়ই হয নাই। এই সত্যটি এতকাল পবে সে সুচরিতার মধ্যে নূতন আবিষ্কার করিল; একেবারে এক মুহূর্তে এতবড় একটা পুরাতন এবং প্রকাণ্ড কথাকে হঠাৎ গ্রহণ করিয়া তাহার সমগ্র বলিষ্ঠ প্রকৃতি ইহার আঘাতে কম্পিত হইয়া উঠিল।" এই প্রসঙ্গেই গোরার অনুভূতি বর্ণনায আর এক জায়গায় আছে, "গোরা নিজের মনে নিজে আশ্চর্য হইযা গেছে। যতদিন ভারতবর্ষের নারী তাহার অনুভব-গোচর ছিল না ততদিন ভারতবর্ষকে সে যে কিরূপ অসম্পূর্ণ করিয়া উপলব্ধি করিতেছিল ইতিপূর্বে তাহা সে জানিতই না।" গোরার জীবনে বিনয়ের দর্শনেরই ফলশ্রুতি হ'ল সুচরিতার উদ্দেশে তার এই উক্তি, আমার ভারতবর্ষের জন্য আমি পুরুষ তো কেবলমাত্র খেটে মরতে পারি, কিন্তু তুমি না হলে প্রদীপ জেলে তাঁকে বরণ করবে কে? ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না, তুমি যদি তাঁর কাছ থেকে দুরে থাক।"

সত্যি বলতে কি, গোরার মনে নারীর অনুপ্রবেশের কৃতিত্ব ও কৃতিত্ব হ'ল বিনয়ের। দুই বন্ধু যখন ভাদ্রের এক চন্দ্রাবলী রাতে উন্মুক্ত ছাদের উপর উদার আকাশের নীচে ব'সে রাত ভোর ক'রে দিল, তখনই বিনয় তার জীবনের এক পরম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা বলল সারা রাত ধ'রে। বলল যে, এক অনির্বচনীয়, আশ্চর্য অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার জীবনে এই অনুভূতির প্রেরণা যে নারী তার নাম সে উচ্চারণ করতে পারবে না, কিন্তু সেই অনুচ্চারিতনামা নারীর প্রাণের আভায় আভাসিত কপোলের কোমলতা, তার হাসির নির্ঝরে ঝলসিত অন্তরের আলোক, তার সুনিবিড় চক্ষুর পক্ষ্মছায়ায বিকশিত অনির্বচনীয়তা বিনযের অন্তবে এনে দিয়েছে একটা মহাপুলকের সংবাদ। এই সংবাদে পৃথিবীর সব-কিছু তার কাছে মধুময় হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর সকলের জন্যই আজ তার ভালবাসা বিচ্ছুরিত। পূর্বে অনেকবার গোরা এই ধরনের হৃদয়বত্তাকে কবিত্বের আবর্জনা ব'লে উপেক্ষা করেছে, কিন্তু আজ আর বিনযের অনুভূতির গভীরতা ও বিপুলতাকে সে অস্বীকার করতে পারল না। বরং প্রেমেব এই বিশাল অনুভূতি তার দেশপ্রেমের গভীরতাব স্বরূপ ও আস্বাদকে স্পষ্ট ক'রে তুলল। গোরা বিনয়ের কাছে স্বীকার করছে, "তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনদিন বুঝতে পারব কি না জানি না, কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্বাদ যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করছি।" তাছাড়া বিনযের জীবনের এই অনুভূতির অভিঘাত সমান্তরাল ভাবে গোরার মনে যে প্রতিক্রিযার সৃষ্টি করেছে, তারই ফলশ্রুতি হ'ল তার মনে নারীর অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশে, এই নতুন আবির্ভাবে তারও মনপ্রাণ যখন লীলাছন্দে নেচে উঠল তখন "সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, তাহার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব এবং ইহার কি প্রয়োজন।...সংগ্রাম করিযা ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে? এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল, অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন্ দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—কোন্ অনিন্দ্য-সুন্দর হাতখানির আঙ্গুলগুলি স্পর্শসৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল—গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হইযা উঠিল।"

এইভাবে গোরা চরিত্রে যেখানেই প্রাণ যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, সেখানেই হৃদয় দিযে তা সংশোধন ক'রে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতার দিকে, তমসার থেকে আলোকের দিকে, মাটির থেকে আকাশের দিকে এই উত্তরণের অভিসারই হ'ল রবীন্দ্রনাথের attitude towards life যা তাঁর অন্যান্য মহৎ শিল্প-সৃষ্টির মত গোরা উপন্যাসেও প্রতিধ্বনিত। কোন শিল্পীর এই attitude towards life বা জীবন সম্বন্ধে মনোভঙ্গিই হ'ল তাঁর শিল্পকর্ম বিচারের মূলকথা। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও স্বভাবতই এ কথা প্রযোজ্য।

গোরা চরিত্রে একটা আশ্চর্য স্ববিরোধ ছিল। গোরার

যে-সত্তা বলে, "ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা বৃহৎ ও গভীর ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে একদলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সংকোচ হয় না।...আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক; তারা আমার সকলেই আপন,..." সেই সত্তারই আবার অন্যরূপ দেখা যায়। আনন্দময়ীর পরিচারিকা লছমিয়া, যার অন্তরে গোরার স্থান পুত্রের চেয়ে অধিক, সে খ্রীষ্টান—এই অপরাধে গোরা মায়ের ঘরে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অথচ খ্রীষ্টান হলেও লছমিয়া তো ভারতীয়। আবার গোরার মত মহাপ্রাণ ঘোষপুর চরে হিন্দু নাপিতকে একটি মুসলমান বালককে লালন-পালন করতে দেখে ভর্ৎসনা করে। অথচ বালকটির পিতা সেই মুসলমানটি মানবতার ও স্বাধীনতার শত্রুদেরই সঙ্গীনের খোঁচায় পলাতক। আবার সেই নাপিতের পত্নী বাড়ির কাঁচা কুপ থেকে জল তুলে বালকটিকে স্নান করাচ্ছে—এই দৃশ্যেও গোরার হিন্দুসত্তা বিরক্ত হয়। গোরা বাস করে ভাবের একটা অত্যুচ্চ মানসস্বর্গে। সেখানে তার ধ্যানের মধ্যে আছে তার পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ। ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ধর্মে পূর্ণ। তার অনুভূতিতে "একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে—পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না।... সাধে আমি ভারতের সত্য মূর্তি, পূর্ণ মূর্তি কোনদিন ভুলতে পারি নে।" এই গোরা যখন ভারতের ধুলো-মাটির বাস্তব রূপকে দেখে, তখন সে স্বপ্নভঙ্গের (frustration) বেদনা বোধ করে। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র বিভেদ, হাজারো সংস্কারের নিকট বোধহীন অন্ধ আনুগত্য, মানুষের ব্যবহারে অমানুষিকতা এবং যা সকলকে সম্পদে বিপদে পাশাপাশি দাঁড় করাতে পারে এমন কোন বড় ঐক্যের অভাব—এই সমস্তই তার স্বপ্ন-ভঙ্গের উৎস। গোরার দেশপ্রেমের ভিত্তি তীব্র হিন্দুত্ব-বোধ যখন একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল, যখন সে জানতে পারল যে, সে হিন্দুসমাজের কেউ নয়, তখন স্বভাবতই সে একেবারে সর্বহারা নিঃস্ব হয়ে গেল। কিন্তু অনুভূতির স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণতায় সে উপলব্ধি করতে লাগল, আজ থেকে আর তাকে মাটির দিকে চেয়ে পদে পদে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না। আজ সে সত্যই হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে অন্নগ্রহণ করতে পারে। গোরার মহাপ্রাণের আধারে উপরিউক্ত স্ববিরোধ কখনও সত্যি হতে পারে না, শিল্পসম্মত হতে পারে না। তাই আজ সে মুক্ত হৃদয়ে এই স্ববিরোধের অবরোধ চূর্ণ ক'রে বলে, "আমি দিন রাত্রি যা হতে চাচ্ছিলাম অথচ হতে পারছিলাম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়।" মুক্ত হৃদয়ে গোরা আজ স্বীকার করে যে, তার ভাবের ভারতবর্ষের, স্বপ্নের ভারতবর্ষের রূপের সঙ্গে বাস্তব ভারতবর্ষের বৈপরীত্য দেখে, সত্য দৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে বার বার ফিরে এসেছে। বাংলার অনেক নীচ পল্লীতে আতিথ্য নিয়েও সকলের পাশে গিয়ে এক হয়ে বসতে পারে নি। একটা অদৃশ্য ব্যবধান রয়েই গেছে সর্বদা। এইজন্য তার মনের মধ্যে একটা শূন্যতা ছিল, কিন্তু এই শূন্যতাকে সে নানা উপায়ে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছে। সে আজ সমস্ত ভাবের খোলস ছিঁড়ে, ধর্মীয় বোধের স্বল্পপরিসর ঘেরাটোপ ভেঙে একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছে। তাই শুনি তার উপলব্ধির ভাষা, "আজ আমি সত্যকার দেশসেবার অধিকারী হয়েছি, সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতর-ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।"

আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই তার জাত। আজ সে সম্পূর্ণ নগ্ন চিত্তে ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখানেই গোরার আন্তর্জাতিকতা। এখানেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টির পূর্ণ প্রকাশ। এখানেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সেই "reconciliation of the Super-personal Man, the Universal human Spirit, in" one individual being—এর তত্ত্বের সার্থক শিল্পরূপ। অনেকে হয়ত প্রশ্ন করবেন, গোরার এই আমূল মানসবিবর্তন, এই জন্মান্তর হঠাৎ একদিনে কি ক'রে সম্ভব হ'ল? কিন্তু একদিনে নয়, গোরার স্ববিরোধের স্বীকৃতির মধ্যেই এই মানস-বিবর্তনের, এই জন্মান্তরের দৈনন্দিন প্রস্তুতির কথা বলা আছে। তার আত্মপ্রকাশটাই শুধু ঘটেছে একদিনে, অকস্মাৎ। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি আন্তর্জাতিকতার, তত্ত্ব ও শিল্পকলার, অনুভূতি ও প্রজ্ঞার মিলনে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-শিল্পের চরম উৎকর্ষের প্রকাশ।

# বিপ্লবীর জীবনদর্শন

## প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

রতীলাল গোয়েন্দা হত্যার পর ত্রৈলোক্যবাবু উত্তর-বঙ্গে গিয়ে সমিতির গঠনমূলক কাজ করেন। তিনি সে কাজ পরিদর্শনের প্রস্তাব করলেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে নাটোর গিয়ে উঠলাম শ্রীশবাবুর বাড়ী। প্রভাস লাহিড়ী, নরেন ভট্টাচার্য তখন সমিতির সভ্য। এরা পরে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রভাস গৌহাটির খণ্ড-যুদ্ধে আহত হয়। সেখান থেকে পাটুল গ্রামে গিয়ে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী সভ্য কালী মৈত্রের বাড়িতে যাই।

দিনাজপুর গিয়ে সেখানকার জিলা-পরিচালক অশ্বিনী মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ হয় এবং সমিতির বিশিষ্ট উৎসাহী সভ্য ছু'ভাই প্রফুল্ল বিশ্বাস ও প্রবোধ বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হই। এদের দুজনেরই তখন বয়স খুব কম। দু'জনেই পরবর্তী কালে গৃহত্যাগী সভ্য হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়। প্রবোধও গৌহাটির খণ্ডযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

পূর্ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় মালদহের কাজ খুব ভাল ভাবেই চলছিল। সেখানে বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন হংসগোপাল আগরওয়ালা। তার কাজ দেখে স্থির করলাম তাকে আরও বড় জায়গার ভার দিতে হবে। পরে তাকে কুমিল্লায় পাঠান হয় সেখানকার ভার দিয়ে। তার পর ঢাকা জেলার চার্জও তার উপর ন্যস্ত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সমিতির কাজ করতে গিয়ে নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে অনেকেই। ত্রৈলোক্য-বাবু বহুদিন কালীচরণ নামে পরিচিত ছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার ওয়ারেণ্ট বার হওয়ার পরই তিনি এ নাম গ্রহণ করেন। খুব বড় দাড়ি রাখতেন এবং নৌকোর মাঝিরূপেও তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সুতরাং কালীচরণ নামটা কোন অবস্থাতেই তার বেমানান হ'ত না। যাই হোক, তিনি উত্তরবঙ্গে এলেন দাড়ি কামিয়ে বিরজাকান্ত নাম গ্রহণ করে।

ত্রৈলোক্যবাবু সম্বন্ধে একটা কথা অনেক পূর্বেই উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। তার পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগের প্রায় বছর দেড়েক আগে ময়মনসিংহ সরিষাবাড়ী সুয়াই-এর গ্রামে এক ডাকাতি হয়। ডাকাতির পর বিপ্লবীরা যখন নানা দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে তখন ত্রৈলোক্যবাবু, গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য, শশধরবাবু ও আরও দুজনের দলটি রাস্তায় পুলিস ও গ্রামবাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এরা তখন চতুর্দিকে ছুটতে আরম্ভ ক'রে চারজন পালাতে সক্ষম হয়। গিরীন্দ্র হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়। তার নামে ডাকাতির মামলা রুজু হয় এবং সেসন পর্যন্ত যায়। কিন্তু বিচারে সে মুক্তিলাভ করে। এদিকে ত্রৈলোক্যবাবু একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় সরিষাবাড়ী থেকে মাণিকগঞ্জ, প্রায় আশী মাইল পথ, পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। এজন্য আমরা সবাই খুব আশ্চর্যান্বিত হই।

উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনের কিছুদিন পর পূর্ববঙ্গে সমিতির কার্য পরিদর্শনে যাই। প্রথমে নারায়ণগঞ্জ গিয়ে গভীর রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করি—এবং স্থির হয় যে তিনি সকলকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ পরিত্যাগ করে ঢাকায় বাসা করবেন। তিনি আমাকে পলাতক অবস্থায় ঘোরাফেরার জন্য কিছু অর্থ দিয়ে বললেন—"নিজের কর্তব্য কাজ করে যেও; আমাদের জন্য কোন চিন্তা কর না। কেবল বেঁচে আছ এ খবরটা মাঝে মাঝে জানিও। আর কোন সংবাদ জানাবার প্রয়োজন নেই। চিঠি লিখবার দরকার নেই; লোক মারফত খবর পেলেই চলবে। সমিতির ছেলেরা ত সর্বদাই আসে আমার কাছে।" পরে আশীর্বাদ করে বললেন—"যেন ব্রত সফল হয়।" স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বার বার বললেন। কারণ উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনের পর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক বৎসর কষ্ট পাই। জ্বরটা আসত সাধারণত সকাল বেলা। প্রথমেই ১০৫° জ্বর ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হ'ত। ভীষণ শীত আর কাঁপুনিতে হাড় যেন আল্‌গা হয়ে যেত। সন্ধ্যা নাগাদ যখন জ্বর ছেড়ে যেত তখন খুব দুর্বল হয়ে পড়তাম।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সমিতির বলপ্রয়োগ বিভাগের পরিচালন ভার ছিল ত্রৈলোক্যবাবুর উপর। কিন্তু তার পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগের পর এ ভার ন্যস্ত হয় অমৃত সরকার ও বীরেন্দ্র চ্যাটার্জির উপর। সেই সময়ের একটা ঘটনা যা সমিতির আদর্শ ও আত্মোৎসর্গের মহিমাকে অনেক উঁচুতে তুলতে সহায়ক হয়েছিল তা

উল্লেখ না করে পারছি না। আমার গৃহত্যাগের পূর্বেই এ ব্যাপার সংঘটিত হয়।

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত ধুলদিয়াতে একটা ডাকাতির পরিকল্পনা হয়। আমি তখন ঢাকায়, যে সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে এই পরিকল্পনা রচিত হয় তা অনুসন্ধান করে এবং রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে এ কাজ অনুমোদন করি। ত্রৈলোক্যবাবু উপস্থিত না থাকলেও অমৃত সরকার ও বীরেন্দ্র চ্যাটার্জির মত কৃতী লোকের পরিচালনায় আমাদের সবিশেষ আস্থা ছিল। আদিত্য দত্ত, কৃষ্ণ সাহা প্রভৃতি আরও অনেকের যাওয়া ঠিক হয়।

ডাকাতি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রান্ত বাড়ী ঘিরে ফেলল। দু'পক্ষেই বন্দুক চলতে লাগল। সিন্দুক ভেঙ্গে দেখা গেল এমন অপর্যাপ্ত ধনরত্ন আমরা খুব কম জায়গাতেই পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ সমিতির সভ্য যোগেন্দ্র ভট্টাচার্যের হস্তস্থিত রিভলবারের গুলী অমৃত সরকারের পা বিদ্ধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব গ্রহণ করল বীরেন চ্যাটার্জি। তাকে এ ভার অর্পণ ক'রে অমৃত সরকার বলেন, এত টাকা বড় কোথাও পাওয়া যায় নি। এ টাকায় সমিতির অনেক কাজ হবে। আপনারা আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যান যাতে শরীরটা সনাক্ত না হতে পারে। আমাকে রক্ষার কোন চেষ্টা না করে টাকাটা নিয়ে চলে যান।"

বীরেন্দ্র চ্যাটার্জি বলল, "টাকা তুচ্ছ, এমন মানুষকে আমরা মরতে দেব না।" সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক ভাঙ্গা, টাকা সংগ্রহ সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিলেন। চার দিকে ভাল ভাবে বন্দুকধারী প্রহরার ব্যবস্থা করে নিকটবর্তী একটা বাঁশ ঝাড় থেকে কয়েকটা বাঁশ কাটিয়ে আনিয়ে অমৃত সরকারকে বহন করার জন্য একটা ষ্ট্রেচার তৈরি করালেন। এদিকে উভয় পক্ষে গুলী সমানভাবেই চলছে।

এই গুলী বর্ষণের মধ্যেই ষ্ট্রেচারে শায়িত অমৃত সরকারকে ঘিরে সকলে বাধাদানকারী জনতা ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগল। অপর পক্ষ থেকে বর্শাও নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। অপর পক্ষ আর বেশীদূর এগিয়ে এল না। বিপ্লবীরা অনেক দূর গিয়ে এক জায়গায় থেমে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এবং অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে একদল অমৃত সরকারকে নিয়ে লোকের সন্দেহ এড়িয়ে চলতে সুরু করল। সাময়িক ভাবে নানা জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। রাত্রিতে কখনও কখনও গোয়াল ঘরে থাকতে হয়েছে। লোকের কৌতূহল মেটাতে হয়েছে, স্থানে স্থানে পুলিসের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। এভাবে প্রায় আশী মাইল পথ অতিক্রম করে গৌরীপুর পৌঁছে চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ঢাকায় সংবাদ পাঠানো মাত্র চাঁদসীর ডাক্তার মোহিনী-মোহন দাসকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। তার সুচিকিৎসায় অমৃত সরকার নিরাময় হয়ে উঠল।

অর্থলোভ পরিত্যাগ করে অমৃত সরকারের জীবন এ ভাবে রক্ষা করার জন্য বীরেন্দ্র চ্যাটার্জির এ কাজ আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমোদন করলাম এবং এর পেছনে তার কৃতিত্বের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করলাম।

এ সময়কালীন আরও দুটো ঘটনার উল্লেখ করছি। ফরিদপুর নিবাসী লালমোহন গুহ মেদিনীপুর ডেপুটি পুলিস সুপার হিসেবে অনেক বিপ্লবীদের উপর অত্যাচার করে কুখ্যাত হয়। প্রহরীবেষ্টিত হয়ে সে বাড়ী এসেছে খবর পেয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য লোক পাঠান হয়। কিন্তু তারা কৃতকার্য না হয়ে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় ঘটনা গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর শরৎ ঘোষের, যে পূর্বে একবার গুলীবিদ্ধ হয়েও বেঁচে যায়। তার বরিশাল আগমনের সংবাদ পাওয়া মাত্র চরম দণ্ডদানের জন্য যাদের পাঠানোর ব্যবস্থা হয় তার মধ্যে ছিল বরিশাল নিবাসী মতিলাল বিশ্বাস। কিন্তু কাজের জন্য যখন তারা বরিশাল শহরের এক বাড়ী থেকে বেরুতে যাবে সেই সময় মতি বিশ্বাসের হাতে অটোমেটিক পিস্তলের গুলী তার কোমর বিদ্ধ করে। এই গুলী তার আরোগ্য-লাভের পরও কোমরেই থেকে যায়। ফলে শরৎ ঘোষের উপর আক্রমণ হয় নি।

এদিকে মতি বিশ্বাস সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের পূর্বেই তার সমিতির কর্মস্থল ময়মনসিংহ শহরের জন্য রওনা হয়। নারায়ণগঞ্জ আসবার পথে মেঘনা নদীর মাঝখানে মতি বিশ্বাস চলন্ত বরিশাল ষ্টীমার থেকে পড়ে যায়। সে পড়ে সম্মুখ ভাগে। সুতরাং চাকার তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কায় গভীর জলে ডুব দিয়ে ষ্টীমারের তলা দিয়ে অপর দিকে জলের উপর ভেসে ওঠে। ষ্টীমার অবশ্য থেমে তাকে উদ্ধার করে জল থেকে।

ময়মনসিংহ শহরের কার্যভার তখন তার উপরই ন্যস্ত ছিল এবং যুবকমহলে সব চাইতে বেশী প্রভাবশালী ছিল। পরে সমগ্র জেলার কার্যভারও কিছুদিনের জন্য তার উপর অর্পিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমি পূর্ববঙ্গে সমিতির

কাজ পরিদর্শনের জন্য বেরিয়েছিলাম। গোয়েন্দাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে চিনত না। দু-তিন জন যারা চিনত আমিও তাদের চিনতাম। সুতরাং চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বনের কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। তা ছাড়া আমি বিলেত যাওয়ার জন্য কলিকাতা যাই আর ফিরে আসি না। এই সুযোগে বাড়ী থেকে প্রচার করে দেওয়া হয় যে, আমি ফ্রান্সে চলে গিয়েছি। গোয়েন্দারাও অনেক দিন অনুসন্ধান করেছে যে, আমি সত্যিই চলে গিয়েছি কি না। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, ষ্টীমারে কিংবা ট্রেনে পরিচিত কেউ জিজ্ঞেস করেছে, "কেমন আছেন প্রতুল-বাবু, অনেক দিন বাদে দেখা হ'ল।" আমি অসংকোচে বলতাম, "আপনি ভুল করেছেন। আপনি আমার দাদার কথা বলছেন; তিনি ত দেশে নেই। ফ্রান্সে চলে গেছেন।" বিস্মিত উত্তর পেতাম, "তাই নাকি? চেহারা কিন্তু একেবারে এক রকম! কথা বলার ভঙ্গিটি পর্যন্ত!" আমি হেসে জবাব দিয়েছি, "ঠিকই বলেছেন। আমরা দু'ভাই দেখতে এক রকম কি না, তাই এমনি ভুল অনেকেই করে!" অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি পলাতক এবং আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ময়মনসিংহের অনেক স্থানই সেবার পরিদর্শন করি। ...লাল বিশ্বাসের যে সমস্ত কর্মীসভ্য দেখলাম তার মধ্যে ...ম লাহা, বীরেন পাল ও অমূল্য অধিকারীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অমূল্যর বয়স তখন খুবই কম, কিন্তু ভবিষ্যতের বিরাট কর্মীকে সেদিনই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। গৌরীপুরের রমণী দাস মহাশয় এবং জমিদারের ম্যানেজার অন্নদাবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হয়। ময়মনসিংহ শহরে থাকাকালীন সময়ে কিশোরগঞ্জ গচিহাটার যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য এসে আমাকে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানায়। আমি তাকে আমার সঙ্গে করেই আমাদের ঢাকার বাসায় নিয়ে এলাম। অল্প দিনের মধ্যেই সে আমাদের বাড়ীর ছেলের মত হয়ে গেল। ভবিষ্যতে যোগেন্দ্র দিনাজপুর এবং আরও অনেক জায়গার ভারপ্রাপ্ত কর্মী হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে; এবং বিহারে সমিতি গঠনের কার্যে নিযুক্ত হয়ে নিজেকে বিহারবাসী রূপে পরিচয় দিয়ে মুঙ্গের এবং ভাগলপুরে সমিতি গঠনের কার্যে সাফল্য অর্জন করে-ছিল।

কুমিল্লায় গিয়ে পূর্ণ চক্রবর্তীর অসামান্য কৃতিত্ব দেখে খুবই উৎসাহ বোধ করলাম। কেবল যে কুমিল্লা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরেই বহু যুবক ও ছাত্রকর্মী সংগৃহীত হয়েছে তা নয়, গ্রামে গ্রামে সমিতির শাখা বিস্তার লাভ করেছে। এমন কি চরিত্রবান, সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছাত্র ও যুবক মাত্রই যেন সমিতির সভ্য হয়ে পড়েছিল। স্কুল-কলেজের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তখন সমিতির সভ্য। রেবতীলাল, প্রফুল্ল-রঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রবোধ সেন, মনোজ দাশগুপ্ত, পাগলা, অতীন রায়, যোগেশ চ্যাটার্জি, জিতেন ভট্টাচার্য, ব্রজেন ভট্টাচার্য, শিশির দত্ত প্রভৃতি তখনই খুব উৎসাহশীল সভ্য।

অতীন রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা একটু বিচিত্র। তখন সে খুব অল্পবয়স্ক স্কুলের ছাত্র। ট্রেনের কামরায় ওর চেহারা এবং পোষাকে বিলাসিতার অভাব দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে লক্ষ্য করলাম সে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত একখানা ধর্মপুস্তক পাঠ করছে। আমি আমার নিজের পরিচয় গোপন রেখে ওর সঙ্গে আলাপ করে ভাবলাম ও সমিতিভুক্ত হওয়ার খুবই উপযুক্ত। আলাপচ্ছলে কুমিল্লাতে ও যে পাড়ায় থাকে তাও জেনে নিলাম। পরে কুমিল্লায় ফিরে গিয়ে পূর্ণ চক্রবর্তীকে বললাম ওর কথা এবং সন্ধ্যাবেলা ধর্মসাগর পারে আমরা যখন বেড়াচ্ছিলাম তখন অতীনকে দেখে পূর্ণকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম। অল্পদিন পরে আবার যখন কুমিল্লায় গেলাম তখন দেখলাম অতীন সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত। পরবর্তী কালে অতীন গৃহত্যাগী সভ্য হিসেবে বহু দায়িত্ব-পূর্ণ কার্যে নিযুক্ত হয়ে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। ঢাকা বৈরাগী টোলায় একই সঙ্গে দু'জন গোয়েন্দা হত্যার কাজে অতীন ছিল। কলকাতায় এলগিন রোডে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তা বসন্ত চ্যাটার্জিকে যারা আক্রমণ ক'রে মৃত্যুদণ্ড দেয় তার মধ্যেও ছিল অতীন। সেই সঙ্গে ছিল মোহিনী ভট্টাচার্য, শিশির ঘোষ, প্রবোধ বিশ্বাস এবং সুরেশ চক্রবর্তী। প্রফুল্ল দাশগুপ্ত নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে এদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

চাঁদপুরে তখন বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে ছিল ক্ষেত্রমোহন সিং, শচীন সিংহ, শচীন কায়েত, প্রভৃতি। এদের বয়স তখন খুবই কম, কিন্তু সমিতির কাজে এরা দায়িত্ব-জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছে।

১৯১৩-১৪ সনের সমিতির কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই চট্টগ্রামের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। সেখানকার জেলা-সংগঠক তখন নলিনীকান্ত ঘোষ। কুমিল্লায় যেমন পূর্ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় সমিতি খুবই

শক্তিশালী হয়েছিল, তেমনি চট্টগ্রামেও নলিনী ঘোষের নেতৃত্বে সমিতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

কেবলমাত্র ছাত্র ও যুবক দলে টানতে পারলেই সমিতি সাফল্যমণ্ডিত হবে এ আমরা ভাবতাম না। অবশ্য এমনি কর্মীর সংখ্যা নিশ্চয় বেশী হবে। কিন্তু গৃহস্থ কর্মী, সমাজের প্রভাবশালী লোক তথা সর্বশ্রেণীর কর্মী ও সহানুভূতিশীল লোক থাকা চাই। কেননা যেখানে যত বেশী গৃহস্থ-সভ্য গৃহত্যাগীদের আশ্রয় দিতে সক্ষম হয়, এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতে সহায়ক হয় সেখানেই তত বেশী সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলা চলে। নলিনী ঘোষ এমনি সমিতিই গঠন করেছিল চট্টগ্রামে।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের একটি ধনী পরিবারের উল্লেখ না করে পারছি না। তখন আমরা বর্মা, মালয় তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমাদের সমিতির বৈপ্লবিক কর্ম-বিস্তারের সুযোগ অন্বেষণ করছিলাম। চট্টগ্রামের মাধ্যমে এ কাজ সম্ভব হতে পারে। কেননা এটি একটি সমুদ্রগামী জাহাজের বন্দর এবং বিদেশের সঙ্গে মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। এমতাবস্থায় নলিনী চট্টগ্রাম থেকে সুরেন্দ্র দাস নামে এক যুবককে গৃহত্যাগ করিয়ে ঢাকায় পাঠায়। সুরেন্দ্র ধনীর সন্তান। চট্টগ্রামে ছিল ওদের বিপুল সম্পত্তি, বড় ব্যবসায়, এমনকি বন্দরের মাল খালাসী ব্যবসায়ের সঙ্গেও ওদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং আমরা বিবেচনা করলাম যে, সুরেন্দ্রকে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে পরিবারের মধ্যেই রেখে সমস্ত পরিবারের ওপর প্রভাব বিস্তার করাই যুক্তিযুক্ত। ফলে সমগ্র পরিবার এবং তাদের ব্যবসায়কে আমাদের কাজে লাগাবার সুযোগ পাব।

যদিও সুরেন্দ্র দাস আর গৃহে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নয়, তবে সমিতির কাজের জন্য গৃহে থাকতে আপত্তি নেই। তারই প্রস্তাব অনুসারে নলিনী আমাকে জানায় যে, সে গৃহে ফিরে গেলে তার বাড়ী থেকে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। ভাবলাম ক্ষতি কি! স্থির হয় যে, সুরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করবে। কেননা আমি তখন পলাতক। প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে তার সঙ্গে দেখা হলে সে করজোড়ে আমার কাছে তার ভাইকে ফেরৎ চাইল এবং বলল যে, এজন্য তারা সমিতিকে কিছু টাকা সাহায্য করতে ইচ্ছুক। আমি বললাম, "আপনার ভাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব, কিন্তু তার মূল্যস্বরূপ টাকা চাই না। আপনার ভাই-এর দাম দু'এক হাজার টাকা নয়। তবে সমিতির বৈপ্লবিক কার্যে যদি আপনারা অর্থ সাহায্য করেন এবং এ বিষয়ে আর কারুর কাছে কিছু না বলেন তবে আপনাদের প্রদত্ত টাকা নিতে প্রস্তুত আছি।" পরে সুরেন্দ্র বাড়ি ফিরে যায়। এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজ হাতে নির্দিষ্ট স্থানে এসে গোপনে দু'হাজার টাকা দিয়ে যায়।

এই সুরেন্দ্র দাস পরে সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে খুব নাম করেছিল। কলকাতায় একটা সঙ্গীত শিক্ষালয় খুলেছিল। বেতারে কাজ করত এবং নিজেও একজন বেতার-শিল্পী ছিল। তার পিতার নাম বোধ হয় শ্রীপ্রাণহরি দাস।

চট্টগ্রাম থেকে সমিতির কিছু লোক বর্মায় গেল এবং কাঠের কারবারের উপলক্ষে আরাকান সীমান্তে এবং ভিতরেও গেল। খোঁজ খবর সুরু হ'ল চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে গোপনে বিদেশে লোক পাঠান যায় কি না, আকিয়াব ও তার চাইতেও দূরে লোক যাতায়াত করে সাম্পান যোগে ধানের ব্যবসা উপলক্ষে—এ সুযোগ আমরা কি ভাবে কাজে লাগাতে পারি। ভবিষ্যতে কোন বিদেশী শক্তি আমাদেরকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হওয়ার ফলে যদি জাহাজ যোগে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা যায় তবে সেগুলি সাম্পানে নামিয়ে চাল বোঝাই নৌকা ব'লে বন্দরেও হয়ত নিয়ে আসা যেতে পারে। চট্টগ্রাম পাহাড়ী জায়গা। পাহাড়ী রাস্তায় কোন্ কোন্ জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় সেদিকেও নজর গেল। বিপ্লব সুরু হলে এই পাহাড়ী অঞ্চল আমাদের খুব কাজে লাগবে —আত্মগোপন করে থাকার আশ্রয় এবং ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রামের সুবিধা। ওদিকে চন্দ্রনাথ-সীতাকুণ্ডের মোহান্তের পদে যদি আমাদের লোক বসাতে পারি তবে পাহাড়ীদের মধ্যেও আমাদের সমিতির প্রভাব বিস্তার করতে পারব।

চট্টগ্রাম থেকে নৌকায় অনেক দূর গিয়ে পরে পায়ে হেঁটে একটা ছোট পাহাড়ের উপর একটা ছোট মন্দির ছিল। সেখানে আমাদের কিছু লোক ছিল। বিপ্লবের সময় তা কাজে লাগান যাবে কি না তা দেখাবার জন্য নলিনী ঘোষ আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। জায়গাটাকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে তোলবার জন্য কিছু কিছু কাজ কর্মের কথা আলোচনা হয়েছিল।

চট্টগ্রামের উপর আমাদের আকর্ষণের আরও একটা কারণ ছিল। বিপ্লবের সময় এ. বি. রেলের একটি মাত্র লাইন এবং টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট করে দিলেই চট্টগ্রামের সঙ্গে যাতায়াত বিপর্যস্ত করা যাবে। বন্দরে জাহাজ-ঘাটায় আমাদের লোক বসান বা যারা চাকুরি করে তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে সমিতির সভ্য করার চেষ্টা

হতে লাগল এবং দু-একজনকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করাও গেল।

আমি চট্টগ্রাম থাকতে থাকতেই খবর পেলাম যে, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী নগেন্দ্র রায় চট্টগ্রামে আছে। দু'একজন বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ঘোরাঘুরি করে সমিতির বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহেরও চেষ্টা করছে। অনেক-দিন যাবতই ওদের দু'ভাই—নগেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু প্রতিবারই নানা অপ্রত্যাশিত কারণে তা সফল হয় নি। সুতরাং এবার স্থির হ'ল তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় আমি, নলিনী ও যোগেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য কিংবা মণীন্দ্র ভট্টাচার্য (ঠিক মনে নেই) সদর ঘাটের কাছে গেলাম। তখন নগেন্দ্র ও তার দুই বন্ধু একেবারে গা ঘেষাঘেষি করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সমিতিরই সভ্য একজন নগেন্দ্রের নতুন বন্ধু তাকে পেছন থেকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে সরে গেল। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে—রাস্তা, লোকজন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার উপর কার্য পরি-চালনার ভার ছিল। সুতরাং আমিই প্রথম গুলী করলাম এবং আমার পরে গুলী করল নলিনী। গুলীবিদ্ধ হয়ে একজন প'ড়ে গেল। কিন্তু আমাদের এই কার্যের মুহূর্তেই নগেন্দ্র ও তার বন্ধুরা চলতে চলতে তাদের স্থান হঠাৎ পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর থেকে ইঙ্গিতে সনাক্ত করাতেও ভুল হয়েছিল। মোটকথা পরে শুনতে পেলাম যে, নগেন্দ্র রায়ের এক বন্ধু নিহত হয়েছে। নগেন্দ্র রায় রক্ষা পেলেও প্রমাণ হ'ল যে, বিশ্বাসঘাতকের সাহচর্যও নিরাপদ নয়। উল্টো দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে, সমিতির সভ্য নয় এবং বিপ্লবমূলক কোন কার্যের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, কিন্তু কেবলমাত্র অজ্ঞাতসারে কোন এক গুপ্ত সমিতির সভ্যের সঙ্গে সখ্যতা আছে বলে কত লোক কারাবাস ও পুলিসের লাঞ্ছনা ভোগ করেছে!

নলিনী ঘোষ চট্টগ্রামে সাফল্য লাভ করলেও সে কিছু কিছু পরিচিতও হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সেখানে তার অবস্থান আর তেমন নিরাপদ নয়। তাছাড়া কেন্দ্রের কাজের জন্য ত্রৈলোক্যবাবুর কলকাতা অবস্থান এবং তার অসুস্থতা সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের কার্যের জন্য নলিনী ঘোষকে বদলী করে সেখানে পাঠান হ'ল এবং তার কর্ম-কেন্দ্র হ'ল পাবনা সিরাজগঞ্জে।

নলিনী ঘোষের স্থানে নিযুক্ত হ'ল যোগেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য। নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরে। পড়ত রাজসাহী কলেজে। সেখানে তার কৃতিত্বের জন্য গৃহত্যাগ করিয়ে আমার সঙ্গেই চট্টগ্রাম নিয়ে এসেছিলাম।

চট্টগ্রামে থাকতে আর যে সমস্ত সমিতির ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল তাদের মধ্যে মোহিনী গুহ এবং মনোরঞ্জন গুহ বৃহত্তর দায়িত্বের উপযুক্ত মনে হয়েছিল।

সে সময়ে বীরেন্দ্র চ্যাটার্জিও চট্টগ্রাম থেকে জ্যোতি প্রেসে কাজ করতেন। বলপ্রয়োগ ও বিপদজনক কাজে তার অসাধারণ দক্ষতা থাকা সত্বেও তাকে কেন প্রেসের সামান্য কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তার তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের একটা নীতির কথা বলা প্রয়োজন। যুবক মাত্রেরই উত্তেজনাপূর্ণ এবং বলপ্রয়োগের কার্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কেউ বেশী দিন এমনি কার্যে নিযুক্ত থাকলে পাছে তার ঝোঁক এসে পড়ে, এজন্য তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কার্যে নিযুক্ত করা হ'ত। যাদের এমনি কাজে আকর্ষণ খুব বেশী দেখতাম তাকে বলপ্রয়োগের কার্যে নিযুক্ত করতাম না। কেননা কারুর এমনি আসক্তি থাকুক বা সমিতির পক্ষে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করুক, এ আমরা চাইতাম না। সমিতির জন্য সর্বপ্রকারের কাজই শ্রেষ্ঠ কাজ। ময়মনসিংহ শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে হেঁটে যেতে হয় এমনি একটা নগণ্য গ্রামে পাঠশালার পণ্ডিতি করার কার্যে বীরেন্দ্র বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। অথচ বলপ্রয়োগের কার্যে তার দক্ষতা ছিল অপূর্ব।

বীরেন্দ্রবাবুর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এমন ধীর স্থির, নির্ভীক ব্যক্তি কম ছিল। সর্বদা হাস্যরসে মত্ত থাকতেন। ঘোরতর বিপদ সম্মুখে, আমরা হয়ত কি করা যায় ভেবে চিন্তান্বিত; কিন্তু তার পরিহাস রসিকতার তখনও কামাই নেই। সে অবস্থাতেও তার মত চাইলে তিনি রসিকতার মাধ্যমেই জবাব দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অননুকরণীয়। তিনি হয়ত কয়েকদিন সমানে রৌদ্রে পুড়ে, জলে ভিজে, গায়ের চামড়া উঠিয়ে নৌকো বেয়ে ফিরে এলেন; এসেই স্নান করে চুল আঁচড়ে জমকালো রেশমী পোষাক প'ড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের মধ্যে বিলাসিতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বীরেন্দ্রবাবুর বেলায় কেউ দোষ ধরত না; কারণ বিলাসিতা তাকে স্পর্শ করতে পারত না। প্রয়োজন হলে মুহূর্তে সমস্তকিছু জীর্ণ-মলিন বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে গামছা পরিধান করে নৌকোর হাল ধরতে বা দাঁড় টানতে পারতেন। ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ কর্ম থেকে নিতান্ত নিরানন্দময় ব্যাপারে নিযুক্ত হলেও তিনি তা স্বীকার করে নিতেন।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলতে হয় যে, বীরেন্দ্র

চ্যাটার্জিকে জ্যোতি প্রেসের কাজ ত্যাগ করে ঢাকায় যেতে নির্দেশ দিলাম।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে পরে কলকাতায় গেলাম। সে সময় আদিত্য দত্ত কারামুক্তি লাভ করেছে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে মাত্র দেড় হাত ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে জেল থেকে বেরিয়ে সারাদিন ঘুরে বিকেল বেলা কলেজ স্কোয়ারে এক সভ্যের সঙ্গে দেখা হয় এবং পরে আমাদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ-ক্রমে স্থির হয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমিতির কাজের জন্য আদিত্য দত্তকে পাঠাতে হবে। প্রথমে বর্মায় এবং পরে অন্যান্য স্থানে গিয়ে সমিতির শাখা-প্রশাখা স্থাপন করে তাদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে। যে বিশ্বসংগ্রাম আমরা আসন্ন মনে করেছিলাম তার সুযোগ ভারতবর্ষের বিপ্লবান্দোলনে কি ভাবে কাজে লাগানো যায় তার ব্যবস্থাও আদিত্য দত্তকেই করতে হবে বলে স্থির হয়।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক সাবধানতাও কম নয়। গোয়েন্দা পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়া এবং সেখানেও এদের সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে চলা। কাজেই আদিত্য দত্তের রোমান ক্যাথলিক হয়ে নেটিভ খ্রীষ্টানের বেশে যাওয়া স্থির হয়। খরচ চালাবার জন্য কোন বিশেষ অসুবিধেয় না পড়তে হয় এজন্য সে টাইপ করা ও শর্ট-হ্যাণ্ড শিখতে আরম্ভ করল এবং যে সব জায়গায় যাবে সেখানকার স্থানীয় ভাষাও কিছু কিছু শিখতে আরম্ভ করল।

আমি ও আদিত্য দত্ত তখন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এক সঙ্গে থাকি এবং নিজেরা রান্না করে খাই। ইতিমধ্যে খবর এল যে, নগেন্দ্র রায় আদিত্য দত্তের নাম বলেছে এবং তার নামে চট্টগ্রাম খুন সম্পর্কে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। অথচ এ খুনের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ!

এর অনেক পরে—তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, গ্রীয়ার স্কোয়ারে নরেন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র চ্যাটার্জি ও আদিত্য দত্ত গ্রেপ্তার হয়। আদিত্যকে বিচারের জন্য চট্টগ্রাম নিয়ে গেল। খুব বড় মামলা হয়। সরকার পক্ষের কর্ণধার হলেন প্রসিদ্ধ স্যার বি. সি. মিত্র, ব্যারিষ্টার। বিচারে অবশ্য আদিত্য দত্ত মুক্তিলাভ করে।

জেলের বাইরেও আদিত্য দু'জন অস্ত্রধারী পুলিস প্রহরায় থাকত। এই প্রহরাধীনে থেকেই সে ঢাকা গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে তার নিজের বাড়ী যায়। এবং সেখান থেকে এই পুলিস পাহারা এড়িয়ে পালিয়ে যায়।

অল্পদিন পরেই সে পুনরায় চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। তখন সে দেখল যে, খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং মসজিদে গিয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে, মুসলমানী আচার-আচরণ ও নমাজ পড়া শিখে ছদ্মবেশে দেশের বাইরে চলে গেল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু জায়গা ঘুরে সমিতির অনেক কাজ করে। পরে বর্মাতে গ্রেপ্তার হয়। সেখানকার জেলে অনেকদিন কাটিয়ে ভারতবর্ষের জেলে বদলী হয়। বর্মাতে আদিত্য রোমান ক্যাথলিক হয়ে দেশীয় খ্রীষ্টান পল্লীতে বাস করত। মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্টানই ছিল। পরে হিন্দু পরিচয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

ক্রমশঃ

# প্রাণের ঠাকুর

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

শ্রীশৈলেশ বসু

ললিতাকে আমি চিনতাম বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ আমার বিশেষ ছিল না। অন্ততঃ এ কাহিনী লেখবার মত ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে ছিল না। ললিতার গল্প আমি শুনেছিলাম তার মেজদা রমেনের কাছ থেকে। রমেন আমার কলেজের সহপাঠী। কলেজে তার সঙ্গে ভাব হবার পর প্রথম যেদিন তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম, সেদিনই ললিতাকে দেখেছিলাম।

ললিতা তখন বছর আষ্টেকের মেয়ে। গোলগাল আলুভাতে মার্কা চেহারা। বেশ ফর্সা রং, চাঁদের মত গোল মুখ, নাকটা ভোঁতা, টানা টানা ঢলঢলে চোখ, টৈবো-টৈবো গাল আর পাতলা রাঙা ঠোঁটে আহ্লাদী-আহ্লাদী ভাব মাখান। চার ভাইয়ের পর এক বোন ললিতা স্বভাবতই একটু আদুরে। তার ওপর, রমেনের বিরক্তিপূর্ণ মন্তব্য থেকে বুঝলাম, ঠাকুর্দা আদর দিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে মাথায় তুলেছেন।

ঠাকুর্দাকে দোষ দিতে পারি না। ললিতার চেহারাটাই এমন যে দেখলে আদর না ক'রে পারা যায় না। কাছে ডেকে একটু গাল টিপতে, একটু চটকাতে ইচ্ছে করে। আমিও তাকে কোলে টেনে তার সঙ্গে ভাব করেছিলাম। ললিতার নাকি ছেলেবেলা থেকেই চেনা-অচেনার বালাই ছিল না। প্রথম দর্শনে সে আমাকেও পর ভাবে নি। একান্ত অন্তরঙ্গ সুরে অনর্গল ব'কে ব'কে তার আট বছর জীবনের অনেক গোপনীয় তথ্য সে আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু এতখানি অন্তরঙ্গতা সেই প্রথম আর সেই শেষ। তার পর আরও অনেকবার রমেনদের বাড়ী গিয়েছি, ললিতার সঙ্গেও দেখা হয়েছে। ললিতা প্রায় আমার চোখের সামনেই বড় হয়ে উঠেছে, ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। মোটা ব'লে একটু তাড়াতাড়িই শাড়ী পরা আরম্ভ করেছে। আমাদের বয়সের ব্যবধানও কমে নি এবং মেজদার বন্ধু হিসেবে আমি তখনও তার শ্রদ্ধেয় গুরুজনই ছিলাম, তবু প্রথম দিনের মত তাকে আর কখনও কাছে পাই নি। দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি, ভাল আছ, ললিতা? সে নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েছে। তার পর ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্যে সেও পাল্টা প্রশ্ন করেছে, আপনি ভাল আছেন? তার সেই শান্ত দৃষ্টি আর নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে আমিও জুড়িয়ে গিয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছি, হাঁ।

ললিতার বড় হবার পর যখনই তাদের বাড়ি গিয়েছি, দেখেছি বাইরের ঘরে একটা ডেক চেয়ারে কিশোরী ললিতা এলিয়ে শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে কিম্বা বইটা কোলের ওপর খোলা পড়ে আছে আর সে শূন্য দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। পাশেই হাতের কাছে একটা ছোট তেপায়া টেবিলের ওপর রজনীগন্ধার গুচ্ছপূর্ণ ফুলদানি, কাচের গেলাসে ঢাকা জল আর একটা কলিং বেল। খানিকক্ষণ সে ফ্যালফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তার পর ধীরে ধীরে তার সুন্দর অলস চোখে পরিচয়ের আলো ফুটে উঠেছে। একটুখানি হেসে বলেছে, আসুন, মেজদা বাড়ী নেই। আর রমেন বাড়ী থাকলে বলেছে, বসুন, মেজদাকে ডেকে দিচ্ছি। বলে কলিং বেলটা দু'বার ঝন্ ঝন্ ক'রে বাজিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই কেতাদুরস্ত বেয়ারা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ললিতা সেই ভাবে এলিয়ে শুয়েই রমেনকে ডেকে দিতে আর আমার জন্যে চা-জলখাবার আনতে বলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেয়ারা চা-জলখাবার নিয়ে এসেছে। ললিতা একদিনের জন্যেও উঠে এসে আমার হাতে খাবারের প্লেটটা তুলে দেয় নি বা টি-পট থেকে আমার কাপে চা ঢেলে দেয় নি। সে এলায়িত অবস্থাতেই বেয়ারাকে হুকুম দিয়ে কাজ করিয়েছে, সে বেচারা কিছু ভুলচুক্ করলে চাপা সুরে তাকে ধমক দিয়েছে। আমার খাবার বা চা ফুরিয়ে গেলে জিজ্ঞেস করেছে, আর দোব? 'আর দোব' বললেও কিন্তু নিজে হাতে ক'রে দেয় নি, বেয়ারাকেই হুকুম করেছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের ভদ্র মেয়ে, আতিথেয়তার কোন ত্রুটি রাখে নি। তবু জলখাবার আমার মুখে বিস্বাদ লাগত, চা-টা তেতো হয়ে যেত। আমরা জাতে বাঙালী, নারীর সেবায় আমরা অভ্যস্ত। মেয়েদের সেবিকা রূপের আমরা শুধু মৌখিক প্রশংসা করি না, সে রূপ দেখতে আমাদের সত্যিই ভাল লাগে। বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছি, আর বন্ধুর সুস্থ-সবল কিশোরী

বোন ডেকচেয়ারে এলিয়ে শুয়ে বেয়ারার মাধ্যমে অতিথি-সেবা করছে, দেখে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যেত। এই কুঁড়ের বাদশা মেয়েটাকে একেবারে অসহ্য লাগত।

ললিতার মেজদা রমেনের মনোভাবও ঠিক তাই। রমেনের সঙ্গে দেখা হ'লেই সে ললিতার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। আগেই বলেছি, সাধারণ অবস্থায় ললিতার কাহিনী আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু রমেন ছেলেটা এমন কাছাখোলা স্বভাবের যে, ঘরের খবর রেখে-ঢেকে বলতে জানে না। একবার ললিতার নিন্দাবাদ আরম্ভ করলে তাকে থামান যেত না। রমেনের উচ্ছ্বসিত সমালোচনা থেকেই ললিতার কাহিনী ছাড়া ছাড়া ভাবে আমার চোখে রূপ পেয়ে উঠেছিল।

ললিতা একটু মোটা, কিন্তু তাই ব'লে এত মোটা নয় যে, দিনরাত শুয়ে শুয়ে বেড়াবে। সারাদিন একটু ন'ড়ে বসবে না। শুয়ে থাকলে বসতে চাইবে না, বসে থাকলে উঠে দাঁড়াবে না। নেহাৎই যদি কোন কাজ করতে হয় ত এমন করুণ মুখ ক'রে এত বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলবে যে, দেখলে মায়া হবে। যখন স্থাণুর মত চুপচাপ প'ড়ে থাকে, তখন কেউ কোন কাজ করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, পারব না। অথচ ললিতা মোটেই বেয়াড়া মেয়ে নয়। বাইরের লোকের সামনে ও যে ডেকচেয়ারে এলিয়ে পড়ে থাকে, তাও ঠিক অভদ্রতা নয়। আসলে মেয়েটা ভয়ানক কুঁড়ে। কুঁড়েমিটাকে সে যেন ফাইন আর্টের পর্য্যায়ে তুলে ফেলেছে। এই গতিশীল জগতে ললিতা একাই একেবারে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে চায়। কোন রকম পরিশ্রম, কোন রকম নড়াচড়া সে বরদাস্ত করতে পারে না। অবশ্য তার পরিশ্রমের কোন প্রয়োজন নেই। বাড়ী তাদের ঝি-চাকরে বোঝাই, ললিতারই একজন একেবারে নিজস্ব ঝি আছে। কিন্তু তাই ব'লে একটা সুস্থ-সমর্থ মেয়ে দিনরাত শুয়ে-ব'সে কাটাবে, চান করবার আগে নিজে তেলটা অবধি মাখবে না, কাপড়-জামাটা অবধি নিজে পরতে পারবে না, এই বা কি রকমের কথা? কিন্তু বাড়ীর লোকের সমস্ত গঞ্জনা ললিতার কুঁড়েমির বর্ম্মে ঘা খেয়ে বিফল হয়ে ফিরে যায়।

এই কুঁড়েমির জন্যেই ললিতার পড়াশুনা বেশী দূর এগোল না। অথচ সে নামকরা বৈজ্ঞানিক বংশের মেয়ে। ললিতার ঠাকুর্দ্দা আলিপুর টেষ্ট হাউসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছাড়েন নি। ললিতার বাবা প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিক্সের হেড্ অফ্ দি ডিপার্টমেণ্ট। তার চার দাদাও বিজ্ঞানের এক এক ক্ষেত্রে এক একটা উজ্জ্বল রত্ন। দুই বৌদিও কম যায় না। বড় বৌদি ফিজিক্সে এম.এস.সি. আর মেজ বৌদি অর্থাৎ রমেনের স্ত্রী গণিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট। এ হেন উচ্চশিক্ষিত বংশে ললিতাই একমাত্র গোলাপের কীটের মত হয়ে রইল। ম্যাট্রিকটা সে একেবারেই পাস করেছিল, কিন্তু আই.এস.সি.তে পর পর দু'বার ফেল ক'রে সে পড়াশোনায় ইতি ক'রে দিল। অথচ ললিতার বুদ্ধিও আছে, মাথাও আছে। তার অলস চোখের দৃষ্টির মধ্যে জড়ত্বের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু অগাধ কুঁড়েমি শুধু তার দেহটাকেই নিশ্চল করে রাখে নি, তার মস্তিষ্ককেও নির্ব্বীর্য্য করে তুলেছে। খাণিকক্ষণ মন দিয়ে পড়তে গেলে যদি হাই উঠে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় ত সে পড়বে কি ক'রে? একটানা লিখতে গেলে যদি ঘাড়পিঠ টন্‌টন্ ক'রে ওঠে ত বেশীক্ষণ লেখা চলে কি? এ অবস্থায় বিজ্ঞান ত দূরের কথা, কোন রকম জ্ঞানের চর্চ্চাই ললিতার পক্ষে সম্ভব নয়।

ললিতা পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ায় তার দাদা-বৌদিরা বিলক্ষণ চটে গেল। কিন্তু ঠাকুর্দ্দা একা সমস্ত ঝড়ঝাপটা থেকে তাঁর আদরের নাতনীকে আগলে রাখলেন। খুব ছেলেবেলায় ললিতা তার মাকে হারিয়েছিল। সেই থেকে সে ঠাকুর্দ্দার কাছেই মানুষ হয়েছে। ললিতার চরিত্রে কোন রকম নীচতা বা হীনতা নেই দেখে তিনি তাকে শাসন করবার চেষ্টা করতেন না। তার যাবতীয় খেয়ালে বা খামখেয়ালে তিনি নিজে ত কোন বাধা দিতেনই না, বাড়ীর কাউকেও বাধা দিতে দিতেন না। এখন ললিতার পাঠ সমাপ্তিতে তিনি পূর্ণ সম্মতি দিলেন। দাদারা প্রতিবাদ করল, 'আমাদের বাড়ীর মেয়ে গণ্ডমুখ্খু হয়ে থাকবে?'

ঠাকুর্দ্দা বললেন, 'থাকলেই বা। পড়াশোনা কি সকলের হয়?'

দাদারা বললে, 'কিন্তু লেখাপড়া না ক'রে করবে কি? দিনরাত শুয়ে-ব'সে থাকবে?'

ঠাকুর্দ্দা হেসে বললেন, 'শুয়ে-ব'সে থাকবার চেষ্টাতেই ত মানুষ সভ্য হয়েছে।'

দাদারা রাগ ক'রে বললে, 'দাদু, তুমি আদর দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছ।'

ঠাকুর্দ্দা উত্তর দিলেন, 'একটা মাত্তর নাতনী, তাকে মাথায় রাখব না ত কি পায়ে রাখব?'

বৌদিরা কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ে না। চাপা বিরক্তির সুরে বলে, 'দিনরাত শুয়ে শুয়ে কি যে ভাবে!'

ঠাকুর্দা কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলেন, 'রাজপুত্তুরের স্বপ্ন দেখে। তাই না দিদি?'

ললিতা ঠোঁট বেঁকিয়ে সংক্ষেপে মন্তব্য করে, 'আমার বয়ে গেছে।'

বৌদিরা ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে বলে, 'রাজপুত্তুর কি আপনার নাতনীকে নিয়ে পক্ষীরাজে চ'ড়ে খালি আকাশে আকাশেই ঘুরে বেড়াবে? তার ঘর নেই, না, সেই ঘরে কোন কাজ নেই?'

ঠাকুর্দা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। দৃঢ় স্বরে বলেন, 'যে ঘরে কাজ করতে হয়, সে ঘরে আমার দিদিকে পাঠাব কেন?'

ঠাকুর্দার সামনে আলোচনাটা এখানেই থেমে যায়। কিন্তু আড়ালে বৌদিরা অত সহজে ললিতাকে রেহাই দেয় না। চাপা হাসির সুরে বড় বৌদি বলে, 'রাজপুত্তুরের ঘরে একটা কাজ কিন্তু করতে হবে, ঠাকুরঝি।'

ললিতা অলস কৌতূহলে প্রশ্ন করে, 'কি কাজ?'

মেজ বৌদি চুপি চুপি বলে, 'মা হতে হবে যে।'

ললিতা চমকে উঠে জোর গলায় বলে, 'আমি কখ্খনো মা হব না।'

শুনে দুই বৌদিই খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। মেজ বৌদি বলে, 'তুমি হবে না বললে প্রকৃতি শুনবে কেন?' আর উচ্চশিক্ষিত বড় বৌদি প্রাকৃত ভাষায় একটা শ্লীলতাহীন রসিকতা করে।

মা হওয়ার সম্বন্ধে ললিতার ভীতি নিতান্ত অমূলক নয়। সে জানে, শিশু দেখতে অত ছোট হলেও সে কত বড় স্বেচ্ছাচারী। দিনরাত তার ক্ষিধে, দিনরাত তার ছত্রিশ রকমের বায়না। রাতে সে মাকে ঘুমোতে দেয় না, দিনে সে মাকে একদণ্ড স্থির হয়ে থাকতে দেয় না। বড়দার দুই সন্তানের বেলায় দেখেছে; এখন মেজদার বেলাতেও দেখছে। দেখছে, মেজবৌদি একটা তিন মাসের বাচ্চার অজস্র উৎপাতে দিনরাত কিরকম নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। ললিতা অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, মেজবৌদি, ওইটুকুন একটা ছেলের জন্যে এত খাটতে হয়?'

মেজবৌদি হেসে ফেলে বলে, 'দূর বোকা মেয়ে, একে কি খাটুনি বলে?'

ললিতা আরও আশ্চর্য্যের সুরে বলে, 'খাটুনি নয়! আমি স্পষ্ট দেখছি, তুমি এই শীতেও রীতিমত ঘেমে যাচ্ছ।'

মেজবৌদি ছেলেকে ভোলাতে ভোলাতে বলে, ললিতা শিউরে উঠে বলে, 'আমার অমন সুখে কাজ নেই।'

তাই বৌদিরা পরিহাসছলে বললেও ললিতা ব্যাপারটাকে অত হাল্কাভাবে নিতে পারল না। কি ক'রে মা হওয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই চিন্তাতেই সে সব সময় বিমর্ষ হয়ে রইল। শেষে কে যে তাকে সমস্যার সমাধান দেখিয়ে দিল কিম্বা সে-ই হয়ত সেজদার মেডিক্যাল জার্নাল থেকে সন্ধান পেল, কে জানে! একদিন সে খুব আবদেরে সুরে ঠাকুর্দার কাছে বায়না ধরল, 'দাদু, আমার একটা কথা রাখবে?'

কিছুমাত্র না ভেবেই ঠাকুর্দা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'নিশ্চয়ই রাখব।'

ললিতা সলজ্জমুখে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে, 'দাদু, আমি একটা ছোট্ট অপারেশান করাতে চাই।'

অপারেশান শুনেই ঠাকুর্দা চম্‌কে উঠলেন; তার পর যখন শুনলেন কি অপারেশান, তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে ললিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ললিতা বোঝবার মেয়েই নয়। ঠাকুর্দার সমস্ত যুক্তি-তর্কের উত্তরে তার সেই এক কথা, 'দাদু, তুমি কথা দিয়েছ।'

এতদিনে প্রথম তাঁর মনে হ'ল, প্রশ্রয় দেওয়ারও একটা সীমা থাকা দরকার।

ললিতা লাইগেশান্ করাতে চায়, এ খবরটা যখন ঠাকুর্দার কাছ থেকে দাদা-বৌদিরা জানতে পারল, তখন বাড়ীতে হুলুস্থূল প'ড়ে গেল। দাদারা শুধু ললিতাকে আচ্ছা ক'রে ধমক দিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না, নাত্‌নীটাকে লাই দিয়ে দিয়ে এইভাবে মাথায় তোলার জন্যে ঠাকুর্দাকেও তারা যথেষ্ট তিরস্কার করতে লাগল। মা হওয়া নিয়ে অনবরত ললিতার পেছনে লাগার ফলেই যে সে ক্ষুদে দানবদের হাত থেকে রেহাই পাবার এই উপায় ভেবে বার করেছে; বুঝতে পেরে বৌদিরা মনে মনে অনুতাপ করতে লাগল। তাদের ননদ-ভাজের নিরামিষ রসিকতার এই অস্বাভাবিক পরিণতি তাদের কল্পনাতীত ছিল। তারাও উঠতে বসতে ললিতাকে গঞ্জনা দিতে লাগল।

দাদা-বৌদিদের বিরোধিতা ললিতা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। সে সময়মত চোখের জল ফেলে এবং অনশন ধর্ম্মঘটের ভয় দেখিয়ে ঠাকুর্দাকে প্রায় রাজী করিয়ে ফেলল। তাঁর উপদেশেই সে সেজদাকে ধ'রে বসল,

সেজদা দৃঢ়স্বরে বললে, 'কুমারী মেয়ের ওপর লাইগেশান্ করতে কোন সার্জ্জেনই রাজী হবে না।'

ললিতা বললে, 'বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ডাক্তাররা অরাজী হবে কেন?'

সেজদা বললে, 'কারণ বিজ্ঞান অসামাজিক পন্থার পক্ষপাতী নয়। লাইগেশান্ আবিষ্কার হয়েছে অতিরিক্ত সন্তান-জন্ম রোধ করতে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রসূতির প্রাণ বাঁচাতে। বড়লোকের আহ্লাদী মেয়ের কুঁড়েমির রসদ যোগাতে কোন ডাক্তারই রাজী হবে না।'

ললিতা বিদ্রূপ ক'রে বললে, 'টাকার লোভ দেখালে ডাক্তাররা করে না এমন কাজ আছে নাকি?'

শেষ পর্য্যন্ত ললিতার কথাই সত্য প্রমাণিত হ'ল। টাকার লোভ দেখিয়ে সে সত্যিসত্যিই একজন উঠতি-নাম-করা সার্জ্জেনকে রাজী করিয়ে ফেলল। দাদারা প্রমাদ গণলো। শেষে বড়বৌদির মাথাতেই বুদ্ধি খেলে গেল। তার পরামর্শে বড়দা বাবার কানে কথাটা তুলল।

ললিতার বাবা এমনিতে আত্মভোলা নির্বিরোধী বৈজ্ঞানিক মানুষ। পড়াশোনা ও গবেষণা নিয়েই তাঁর সময় কেটে যায়। বাড়ীতে থাকলেও কি ঘটছে না ঘটছে, ছেলেমেয়েরা কে কি করছে না করছে সে-সব খবর রাখেনও না, রাখতে চানও না। কিন্তু তাঁর অদৃশ্য প্রভাব সারা বাড়ী ছেয়ে থাকে। তিনি এত রাশভারী লোক যে ঠাকুর্দ্দা পর্য্যন্ত ছেলেকে সমীহ ক'রে চলেন, দাদারা এখনও বাবার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারে না, আর ললিতা ত বাবার ধারেপাশেই ঘেঁষে না। সমস্ত শুনে তিনি ললিতাকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'ছেলে-মানুষী করিস্ নি।'

হেসে বললেও বাবার ওই দু'টো কথাতেই ললিতার সমস্ত উৎসাহ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

কুঁড়ের বাদশা ললিতা নিজে সহজে ন'ড়ে বসে না, কিন্তু বাড়ীতে সে সব সময় একটা না একটা আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে রাখে; নিজে নাচে না, কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ সকলকে নাচিয়ে বেড়ায়। লাইগেশানের পাগলামির পর মাস ছয়েক যেতে না যেতেই সে আবার একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল। একদিন একা একা চৌরঙ্গী পাড়ায় সিনেমা দেখতে গিয়ে ললিতা প্রেমে প'ড়ে গেল। ললিতা ট্রাম থেকে প'ড়ে গেছে শুনলেও বৌদিরা এত বিচলিত হ'ত না। অবশ্য ললিতার যে বয়েস এবং যেরকম অফুরন্ত তার অবসর, তাতে একবার কেন দশবার তার প্রেমে পড়া উচিত। আমিও প্রথমে ললিতার দাদা-বৌদিদের বিস্ময়কে নিছক বাড়াবাড়ি ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। রমেন তখন আধ ঘণ্টা ধ'রে আমাকে যে কথাটা বুঝিয়েছিল, তার সারমর্ম্ম এই যে, ললিতা এত কুঁড়ে যে প্রেমে পড়ার পরিশ্রমটুকুও সে স্বীকার করতে চায় না—ডেকচেয়ারে এলিয়ে শুয়েও না।

কথাটা অবশ্য সত্যি। ডেকচেয়ারে এলিয়ে শুয়েও ললিতা প্রেমে পড়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। তাদের বাড়ীতে উপযুক্ত পাত্রের আনাগোনার অভাব ছিল না। বাবার ছাত্রেরা এবং দাদাদের কোন কোন বন্ধুরা সম্পন্ন-ঘরের একমাত্র কন্যার দিকে সুনজর দিতে ভোলে নি। তারা বিত্তবান সকলে না হলেও রূপবান অনেকেই, গুণবান ত বটেই। তাদের মধ্যে একজনকে যদি ললিতা জীবন-সঙ্গী হিসেবে বেছে নিত ত কারুর কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তারা কেউই ললিতার আলস্যের দুর্গ ভেদ ক'রে তার অন্তরের নাগাল পায় নি। তাদের একান্ত উচ্ছ্বসিত আত্মনিবেদনের মাঝবরাবর ললিতা এমন বেফাঁস হাই তুলে বসত যে, অতি উৎসাহীরও শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটত। দাঁতে দাঁত চেপে 'হোপলেস্' ব'লে তারা মানে মানে স'রে পড়ত। এই সব হীরের টুকরো ছেলেদের স্রেফ হাই তুলে উড়িয়ে দিয়ে ললিতা কিনা প্রেমে পড়ল সামান্য এক আপার ডিভিশান্ কেরাণীর সঙ্গে। শুধু প্রেমে পড়ল না, তাকে বিয়ে করবার জন্যে একেবারে ক্ষেপে উঠল।

প্রেমে পড়ার খবরটা ললিতা বাড়ীতে জানায় নি, জানাল একেবারে বিয়ে করার সঙ্কল্পটা। সেই সঙ্গে বোধ হয় মজা দেখবার জন্যেই, সে নিজে থেকে যেচে সকলকে পাত্রের নাড়ীনক্ষত্রের খবর জানিয়ে দিল। পাত্র অনার্স গ্র্যাজুয়েট বটে, কিন্তু কেন্দ্র-সরকারের শিল্প-সরবরাহ বিভাগের সামান্য আপার ডিভিশান্ কেরাণী। চাকরি তখনও তার ঠিক পাকা হয় নি; আধপাকা আর পাকার মাঝামাঝি ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছে। বেতন সর্ব্ব-সাকুল্যে তখনও দুই শতকের মাত্রা ছাড়াতে পারে নি। কলকাতা শহরে অবশ্য তাদের পৈতৃক-বাড়ী আছে; কিন্তু সেটাকে পৈতৃক-বাড়ী না ব'লে পৈতৃক-ঘর বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। কেননা পাত্র ছ'ভায়ের মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ এবং বাকী পাঁচ ভাইও সপরিবারে সেই বাড়ীতেই বিরাজ করছেন। প্রত্যেক ভায়ের গড়ে চার-পাঁচটা ক'রে ছেলেমেয়ে—তার ওপর পাত্রের বুড়ী মা তখনও বেঁচে। বাড়ীটা এককালে হয়ত বড় বলাই চলত; কিন্তু

এখন এই রাবণের গুষ্টির স্থান সঙ্কুলান ক'রে ললিতাকে ঠাঁই দেবার মত যথেষ্ট জায়গা আর সেখানে আছে কি না সন্দেহ।

পাত্রের কুলজী শুনে দাদারা স্রেফ ক্ষেপে উঠল। তর্কাতর্কি, আলাপ-আলোচনা আর মন কষাকষিতে বাড়ীর আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য্য, দুই বৌদিই হঠাৎ ললিতার দলে ভিড়ে গেল। স্ত্রী-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তারা জোর গলায় বলতে লাগল, ললিতা যখন সাবালিকা হয়েছে, তখন সে যাকে খুশি তাকেই বিয়ে করতে পারে; পুরুষের বেছে-দেওয়া লোককেই বিয়ে করতে হবে এ ধরনের মধ্যযুগীয় অত্যাচার মেয়েরা অনেক সয়েছে, আর নয়; মেয়েদের ন্যায্য অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ তারা অন্ততঃ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বৌদিদের এই অপ্রত্যাশিত সমর্থনের পেছনে যে শুধু নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বা ননদের প্রতি নিছক শুভেচ্ছা নাই; ললিতাও যেমন তা সহজেই বুঝতে পারল, দাদাদেরও তেমনি তা বুঝতে বাকী রইল না। আসলে বৌদিরা এতদিনে তাদের আয়েসী ননদটাকে বাগে পেয়েছে। ওই বিরাট্ মধ্যবিত্ত সংসারে গিয়ে ললিতা আর দিনরাত শুয়ে-ব'সে-হাইতুলে সময় কাটাতে পারবে না। কাজের ধান্দায় কুঁড়ের বাদশা ললিতা কি পরিমাণ হাঁপাচ্ছে এবং অচিরাৎ কতখানি রোগা হয়ে যাচ্ছে তা মানসচক্ষে দেখেও বৌদিরা যেন আর আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। কিন্তু বৌদিরা পরের মেয়ে; তারা ললিতার ভাবী দুর্দশার কথা ভেবে যতই পুলকিত হয়ে উঠুক, দাদারা ত আর ছোট বোনটিকে এভাবে ভাসিয়ে দিতে পারে না। চার দাদা একযোগে ললিতাকে নিয়ে পড়ল। প্রথমে সস্নেহ অনুরোধ, তার পর তীব্র উপরোধ, তার পর প্রবল নিষেধ। ললিতা কিন্তু দাদাদের আক্রমণে একটুও বিচলিত হ'ল না। সে ডেকচেয়ারে এলিয়ে শুয়ে পিট পিট ক'রে তাকায়, আর দাদারা দম নেবার জন্যে একটু থামলেই ফিক ক'রে হেসে বলে, অমলকে আমি বিয়ে করবই। ললিতাকে বোঝাবার জন্যে রমেন একদিন আমাকেও টেনে নিয়ে গেল। আমি কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলাম না যে, এই নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের লোকের মাথা গলানো ভাল দেখায় না। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য রমেনই আমায় এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করল। আমাকে শিখণ্ডীর মত সামনে বসিয়ে রেখে সে নিজেই ললিতাকে আর এক দফা বোঝাবার মাঝে হাঁ হুঁ ক'রে সায় দিলাম। আমার অসহায় অবস্থা দেখে ললিতারই মায়া হ'ল, কলিং বেল টিপে সে বেয়ারাকে চা আনবার হুকুম দিল। দাদাদের আপত্তিটা কোথায় বুঝতে পারলাম। ললিতার পছন্দ-অপছন্দর ওপর সত্যিই তারা হস্তক্ষেপ করতে চায় না। কিন্তু যে মেয়ে নিজে নিজে চানটা পর্য্যন্ত করতে পারে না, তার কেন গরীবের ঘরে যাবার এই গোঁ? ললিতা ত নির্ব্বোধ নয়, তবে কেন সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে চাইছে? আমি মিহিস্বরে বলতে গেলাম, ললিতা হয়ত ছেলেটাকে সত্যিই ভালবাসে, কিন্তু দাদাদের সম্মিলিত হাসির জোয়ারে আমার ক্ষীণ প্রতিবাদ কোথায় ভেসে গেল। বৈজ্ঞানিক দাদারা প্রেমের বায়োলজিক্যাল মূল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল—তারা আমার ছেঁদো যুক্তিকে আমল দেবে কেন?

ঠাকুর্দ্দা কিন্তু আমার যুক্তিটাকে অত হাল্কা ভাবে নিলেন না। তিনি বৈজ্ঞানিক হলেও সেকেলে লোক; প্রেমের দেবতার অন্ধত্বের কথা না মানুন বেয়াড়াপনার কথা স্বীকার করেন। সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি আদুরে মেয়ের একটা সাময়িক খামখেয়াল ব'লে ধ'রে নিলেন। পাত্রের দারিদ্র্যের চেয়েও তাঁর বেশী ভয় ছিল ললিতার ভাবী শাশুড়ীকে। তিনি জানেন, অপ্রতিহত ক্ষমতার প্রভাব থেকে অশিক্ষিতা নারীও মুক্ত নন। এতবড় সংসারের যিনি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তিনি যে কি ভয়ঙ্কর চিজ্ হবেন, ঠাকুর্দ্দা তা সহজেই অনুমান করতে পারছিলেন। কোন কাজ করতে না পারার জন্যে ললিতাকে উঠতে-বসতে গঞ্জনা সহ্য করতে হবে এবং তাকে সংসারের কোন কাজ না শেখানর জন্যে ললিতার পিতৃকুলও তাঁর রসনার হাত থেকে রেহাই পাবে না। ললিতা যা মেয়ে, সে কি চুপ ক'রে বাপের বাড়ীর নিন্দে সহ্য করবে? ঠাকুর্দ্দা বেছে-বেছে কয়েকজন পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও লৌকিক দজ্জাল শাশুড়ীর কাহিনী ললিতাকে শোনালেন —ললিতা সমস্ত শুনে শুধু বললে, 'অমলকে একদিন নিয়ে আসব।'

মুস্কিল হ'ল অমলকে নিয়েই। তাকে দেখে সকলেরই খুব পছন্দ হ'ল। চমৎকার ছেলে; যেমন সুশ্রী, তেমনি ভদ্র আর বিনয়ী। সে শুধু গ্র্যাজুয়েট হলেও তার কথা-বার্ত্তায় শিক্ষার এমন একটা স্নিগ্ধ পালিশ আছে, যা চোখ ঝল্‌সে দেয় না বটে, কিন্তু অনিবার্য্য ভাবে মনকে আকৃষ্ট করে। কেরানীগিরির ঘানি ঘোরাতে ঢুকলেও সে এখনও কলুর বলদ হয়ে ওঠে নি। সাবর্ডিনেট্ অ্যাকাউন্টস্

ঝোঁক আছে। এখন থেকেই সে মন দিয়ে পড়াশোনা করছে, আশা আছে, দু'এক বছরের মধ্যেই এস.এ.এস. পরীক্ষায় বসতে পারবে। অমলকে দেখে বৌদিরা ননদের রুচির ঈর্ষাকাতর প্রশংসা না ক'রে পারল না, দাদারাও মাথা চুলকে আমতা-আমতা করতে লাগল।

সকলের মনের কথাটা মেজবৌদিই সংক্ষেপে বলে ফেললে, 'ছেলেটার সবই আছে, যদি পকেটটাও থাকত।'

ছোটদা ভেবে-চিন্তে একটা মতলব বার করল। বললে, 'অমল আর ললিতা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকলেই ত পারে।'

ললিতা বিয়েতে যে পরিমাণ যৌতুক পাবে, তাতে অমলের আর্থিক সামর্থ্যের প্রশ্নই ওঠে না। তাই ছোড়দার কথাটা সকলেরই মনঃপূত হ'ল, কিন্তু অমল মৃদুস্বরে আপত্তি করল, 'মা বেঁচে থাকতে আলাদা হই কি করে?'

দাদাদের অবস্থা টলটলায়মান হলেও ঠাকুর্দা অনড় হয়ে রইলেন। লাইগেশানের ব্যাপারে তিনিই একমাত্র ললিতার দলে ছিলেন, এখন তিনিই সবচেয়ে বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। দাদারা যত রাগই করুক বোনের ওপর জোর খাটাবার কথা ভাবতেই পারে নি। কিন্তু ঠাকুর্দা ছলে-বলে-কৌশলে তাঁর আদরের নাতনীকে চরম দুর্দ্দশার হাত থেকে বাঁচাতে চাইলেন। প্রথমে তিনি অমলের শরণাপন্ন হলেন। তাকে বিয়ে করলে ললিতার কি ভীষণ কষ্ট হবে তা বিশদ ভাবে বুঝিয়ে তিনি তাকে ললিতাকে বিয়ে করার বাসনা ত্যাগ করতে বললেন। বিনয়ী অমল সহজেই তাঁর যুক্তি ও আদেশ মেনে নিয়ে ললিতাদের বাড়ী আসা বন্ধ করল। ফল হ'ল এই—ললিতা নিয়মিত ভাবে অমলের বাড়ীতে আর অফিসে যাতায়াত সুরু করল। ঠাকুর্দা ক্ষেপে গিয়ে ললিতাকে বাড়ীতে অন্তরীণ ক'রে রাখলেন। ললিতাও দমবার মেয়ে নয়। সে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু ক'রে দিল।

আবার বাবার কাছে দরবার করতে হ'ল। বাবা ললিতাকে শুধু একটা প্রশ্ন করলেন, 'ছেলেটাকে খুব পছন্দ হয়?'

ললিতা সলজ্জমুখে ঘাড় নাড়ল। বাবা এবার সোজাসুজি ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে বললেন, 'তবে আর আপত্তির কি আছে?' ঠাকুর্দা মুখ নীচু করলেন। বাবা ললিতাকে পাশে বসিয়ে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কণ্বমুনি শকুন্তলাকে যে উপদেশগুলো দিয়েছিলেন মনে আছে?'

ললিতা চুপি চুপি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, মনে আছে।'

বাবা হেসে বললেন, 'মনে রাখিস সেগুলো—কাজে লাগবে।'

অমলের সঙ্গেই ললিতার বিয়ে হয়ে গেল। ঠিক মনে নেই, ললিতার বিয়েতে আমি নেমন্তন্ন গিয়েছিলাম কি না? খুব সম্ভব গিয়েছিলাম। কপালে চন্দন-আঁকা লাল চেলী পরা ললিতার একটা আবছা ছবি এখনও যেন মনে ভাসছে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অমলের মুখ মনে করতে পারছি না। যাই হোক, ললিতার বিয়ে নির্ব্বিঘ্নেই চুকে গেল। তার পর বাড়ীর সকলের মন আশঙ্কা আর উদ্বেগে ভ'রে রেখে ললিতা তার স্বামীগৃহের বিরাট গোষ্ঠীতে গিয়ে ঢুকল। আশঙ্কা আর উদ্বেগ কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। সত্যি, ললিতাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। সকলেই অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে লাগল, কবে ললিতার আকুল আবেদন ভরা চিঠি এসে হাজির হবে। ঐ বিরাট মধ্যবিত্ত সংসারের বধূ হওয়ার কষ্ট ললিতা যে বেশীদিন সহ্য করতে পারবে না, সে বিষয়ে কারুরই বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল, ললিতার কাঁদুনি-গাওয়া চিঠি আর এল না। অবশ্য চিঠি লেখবার দরকারই বা কি? বেশী দূর ত নয়, মোটরে দশ-বারো মিনিটের পথ। একজন না একজন দাদা প্রায় রোজই ললিতার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসে। ললিতা হাসি মুখেই দাদাদের অভ্যর্থনা করে, বলে, ভালই আছি। মুখের কথা নয়, সত্যিই তার চেহারা বা কথাবার্ত্তায় বিন্দুমাত্র কষ্টের ছাপ নেই। ললিতাকে কয়েকদিন বিশ্রাম দেবার জন্যে দাদারা ব্যাকুল হয়ে দু'-একবার তাকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছে, শাশুড়ীও মত দিয়েছেন, কিন্তু ললিতাই আসতে চায় নি। দাদারা হতভম্ব হয়ে গেছে। উনিশ বছর ধ'রে যে কুঁড়ের বাদশা বোনটিকে তারা চিনে এসেছে, প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, তার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্ভব হ'ল কি ক'রে?

বৌদিরাও আশ্চর্য্য হয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশী হতাশ হয়। অলস ননদের একান্ত দুর্দ্দশা কল্পনা ক'রে তারা অশুচি পুলকে দিন গুনছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল তত তারাও মনে মনে স্বীকার করল, ললিতার জব্দ হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ললিতার বিরুদ্ধে বৌ-দিদিদের মনে একটা অহেতুক তিক্ততা দেখা দিল—ললিতা যেন তাদের ঠকিয়েছে। তাদের কথায়-বার্ত্তায় এই তিক্ততা প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল।

বড়দা হয়ত মাথা চুলকে বললে, 'ললিতার ব্যাপারটা ত ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এতে বোঝবার কি আছে।' বড় বৌদি মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'মেয়েদের স্বভাবই এই।'

বড় বৌদি নিজেও যে মেয়ে, সে কথা আর বড়দা মনে

বিয়ে দেয় না। আশ্চর্য্যের সুরে শুধু বলে, 'মানে?'

বড় বৌদি বক্রসুরে উত্তর দেয়, 'মানে, নিজের সংসার পেয়ে তোমাদের বোনটি বেগমগিরি ভুলেছে।'

ঠাকুর্দা কিন্তু এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেন না। ললিতাকে তাঁর চেয়ে বেশী আর কে চেনে! তিনি ত জানেন, কুঁড়েমিটা তার পোজ নয়, তাঁরই প্রশ্রয়ে তার হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। ললিতা চেষ্টা করলেও সেই আলস্যের গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে পারবে না। সেই ললিতা এতদিন শ্বশুরবাড়ীতে টি‍ঁকে আছে কি করে? ঠাকুর্দার দুশ্চিন্তা যত হয়, কৌতূহল হয় তার চেয়ে বেশী। মাঝে মাঝে তিনিও ললিতার শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে হাজির হন। তাকে দেখে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন, সে দিব্যি আছে। শুধু তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ললিতার আহ্লাদী চোখের কোণে অস্পষ্ট কৌতুক ধরা পড়ে। কৌতুক কেন, তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনাতেই কি সে কৌতুক পায়? আরও আশ্চর্য্য, ললিতার দজ্জাল শাশুড়ী ছোট বৌমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

ললিতার শাশুড়ীর একটা কথার মর্ম্ম ঠাকুর্দা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। আড়াল থেকে প্রায়ই তিনি ঠাকুর্দাকে বিদ্রূপ করেন, 'অমন নাস্তিক বাড়ীর মেয়ের ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।' কথাটা যতবার শোনেন, ততবার ঠাকুর্দা বিস্মিত হন। কথাটা শুধু অদ্ভুত নয়, অবিশ্বাস্যও। ললিতার কর্ম্মে মতি কোন দিনই নেই, আর ধর্ম্মের সে জানেই-বা কি! শাশুড়ীর অভিযোগটা ত মিথ্যে নয়। ললিতার বাপের বাড়ী সত্যিই ঘোর নাস্তিক। তাদের বাড়ীতে কোন রকম ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই বালাই নেই। 'হিন্দু' পরিচয়টা শুধু তাঁদের ভোটিং রেজিষ্টারেই লেখা আছে। সারা বাড়ী খুঁজলেও একখানা দেব-দেবীর ছবি পাওয়া যাবে না। ললিতার বৌদিরা শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রী নয়, দাদাদের যোগ্য সহধর্ম্মিনী; ঠাকুর-দেবতায় তাদেরও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। এহেন আবহাওয়ায় যে মেয়ে মানুষ হয়েছে তার ধর্ম্মে মতি! কথাটা ভাববার বৈকি।

ললিতা নিজে থেকে কবে বাপের বাড়ী আসত কে জানে, এমন সময় একটা অঘটন ঘটল। একদিন কলেজ ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে ললিতার বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ডাক্তার বললে, করোনারি থ্রম্বোসিস্। এ-যাত্রা তিনি ধাক্কাটা সামলে নিলেন বটে, কিন্তু বাবার মারাত্মক ব্যাধি শুনে ললিতা আর স্থির থাকতে পারল না। বিয়ের প্রায় দশ মাস পরে সে প্রথম বাপের বাড়ী এল।

ললিতা আরও মোটা হয়েছে। দজ্জাল শাশুড়ীর সঙ্গে এতদিন ঘর করেও তার চোখের আহ্লাদী ভাবটা এখনও অটুট আছে। এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, সে বেশ সুখেই আছে।

মেজ বৌদি দরদ-ভরা গলায় বললে, 'জান ভাই, ছোট বোনটার কষ্টের কথা ভেবে দাদাদের রাত্তিরে ঘুম হ'ত না।'

ললিতা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'কষ্ট আবার কিসের! দাদাদের যত বাড়াবাড়ি।'

বড় বৌদি অন্তরঙ্গ সুরে বলে, 'তা যা বলেছ। অত-জন জা থাকতে আবার কষ্ট কিসের!'

ললিতার চোখ দুটো কৌতুকে নাচতে থাকলেও সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'অত জা থাকলে কি হবে। তাঁরা নিজের নিজের কাচ্চা-বাচ্চা সামলাতেই ব্যস্ত। সারাদিন আমি একটু দম নেবার ফুরসৎ পাই না।' ব'লে চেষ্টাকৃত বিমর্ষতার সঙ্গে সে তার সংসারের কাজের এক বিরাট ফিরিস্তি বৌদিদের শুনিয়ে দিল। বৌদিরা বোকা নয়। তারা স্পষ্টই বুঝতে পারে, ললিতা তাদের কৃত্রিম সমবেদনাকে উপহাস করছে। আর তারা রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে। বৌদিদের রাগের আরও খানিকটা কারণ ছিল। বাপের বাড়ী এসে অবধি ললিতা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেছে। দিনরাত শুয়ে শুয়ে কাটায়, মেজ বৌদির দেড় বছরের বাচ্চাটাকে পর্য্যন্ত একদণ্ড সামলাতে চায় না। মাঝে মাঝে শুধু বাবার ঘরে গিয়ে বসে, গল্পগুজব করে, কুশল-সংবাদ নেয়। বাকী সময়টা ঠিক আগেকার মতই নিভাঁজ আলস্যে শিথিলগ্রন্থি হয়ে ডেক-চেয়ারে প'ড়ে থাকে। আগে তবু কেউ কথা-বার্ত্তা বললে হাঁ-হুঁ করেও একটু-আধটু জবাব দিত। আজকাল সকাল-সন্ধ্যে এমন জড়ভরতের মত পড়ে থাকে যে, পঞ্চাশ বার ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না। এখন তাকে দেখলে কেউ বলবে না যে, এ-মেয়ে এক বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের সর্ব্বকনিষ্ঠ বধূ—এত কর্ম্মনিপুণা যে, শাশুড়ীর মুখে তার প্রশংসা ধরে না।

বড় বৌদি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ঘর জ্বালানে পর ভোলানে।' শুনে দাদারা রাগ করে বলে, 'ও দু'দিনের জন্যে একটু বিশ্রাম করতে এসেছে, তাতে তোমাদের চোখ টাটাচ্ছে কেন?' ললিতা চুপ করেই থাকে; শুধু বৌদিদের রাগ দেখে যেমন, দাদাদের সহানুভূতিতেও তেমনি ক্ষণিকের জন্যে তার বড় বড় চোখে কৌতুকের

ছায়া পড়ে। ললিতার চোখের কৌতুক ঠাকুর্দ্দার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তাই তিনি সহজে হাল ছাড়তে চান না। ললিতাকে একা পেলেই জিগ্যেস করেন, 'হ্যাঁরে, তোর শাশুড়ী ধম্মে-কম্মে মতির কথা বলে কেন?'

ললিতা তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, 'সে তুমি বুঝবে না, দাছ।'

কিন্তু একে সে মেয়েমানুষ—কতদিন আর পেটে কথা চেপে রাখবে—তার ওপর ঠাকুর্দ্দার কাছ থেকে সে কখনও কোন কথা লুকোয় না। একদিন ঠাকুর্দ্দার পীড়াপীড়িতে সে আসল কথা খুলে বলল।

ঠাকুর্দ্দার উদ্দাম উন্মত্ত হাসিতে বাড়ী গম্‌গম্ ক'রে উঠল। দাদা-বৌদিরা যে-যেখানে ছিল, ত্রস্তদস্ত হয়ে ছুটে এল। যে-বাড়ীতে করোনারি থ্রম্‌বোসিসের রুগী, সেখানে একি দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেমানুষী কাণ্ড! ডাক্তারের হুকুমে বাড়ীর লোকে পা টিপে টিপে হাঁটে, আস্তে আস্তে কথা বলে, চুপি চুপি হাসে, এমনকি বাচ্চা-দেরও একদম চেঁচামেচি করতে দেওয়া হয় না। আর ঠাকুর্দ্দা নিজেই কি না অর্ব্বাচীনের মত কাণ্ড করছেন! একবার প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠেই ঠাকুর্দ্দা নিজের অন্যায় বুঝতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আপ্রাণ চেষ্টায় হাসি চাপতে গিয়ে তাঁর দম আটকে যাবার উপক্রম হ'ল। দাদারা ঘরে ঢুকে দেখল, তাঁর অবস্থা শোচনীয়। চোখ কপালে উঠেছে, মুখ রাঙা, ঠাকুর্দ্দা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাঁপাচ্ছেন। ব্যাপার দেখে রমেন তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ফোন করতে যাচ্ছিল, তিনি হাত নেড়ে বারণ করলেন। খানিকক্ষণ পরে জল খেয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠাকুর্দ্দা তাঁর হাসির কারণ বললেন। বৃথাই বাড়ীশুদ্ধ লোক দিনের পর দিন ললিতার কষ্টের কথা ভেবে কাল কাটিয়েছে। তার বুদ্ধির কথাটা কেউ ভেবে দেখে নি। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ললিতা মোটেই জব্দ হয় নি, সে-ই বরং তার দজ্জাল শাশুড়ীকে জব্দ করেছে।

নিছক ফাঁকি দেবার মতলব নিয়ে ললিতা শ্বশুরবাড়ী যায় নি। অন্ততঃ অমলের মুখ চেয়ে সে সংসারের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করবে ঠিক করেছিল। কিন্তু গিয়ে দেখল, ভাবা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। ললিতার শাশুড়ী ভোর পাঁচটায় উঠে উন্থনে আগুন দেন। তার পর একে একে বৌদের ডেকে তোলেন। সব বৌয়েরই ছেলেমেয়ে আছে। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, কাচা-কুচি, কল নিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, ইত্যাদি সেরে সংসারের কাজে আসতে স্বভাবতঃই দেরি হয়ে যায়। আসলে এতদিন কাজের প্রথম ধাক্কাটা বুড়ীকে একাই সামলাতে হ'ত। এখন তাঁকে সাহায্য করবার ভার পড়ল ললিতার ওপর। সকালবেলা কাজের আর অন্ত নেই। ললিতা বৌদিদের যে লম্বা ফিরিস্তি শুনিয়েছিল, তা মনগড়া নয়। অমল ছাড়া তার আরও দুই দাদা অফিসে চাকরি করেন। ন'টার মধ্যে তাঁদের ভাত চাই। তার পর আছে ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের পালা। এরই ভেতর আবার ছোটদের জলখাবারের জন্যে লুচি-পরোটা বানাতে হয়। শাশুড়ী দোকানের খাবারের ওপর একেবারে খড়্গহস্ত। সকাল দশটা পর্য্যন্ত বলতে গেলে নিঃশ্বাস নেবারই সময় পাওয়া যায় না। রাত্তিরে তাড়া না থাকলেও কাজ নেহাৎ কম নয়। অতজন লোকের তরিতরকারি ত আছেই, তার ওপর খাওয়ারও রকমারি আছে। কেউ খায় ভাত, কেউ রুটি, কেউ পরোটা, কেউ লুচি। অবশ্য রাত্তিরে প্রায় সব বউ-ই কাজে আসতে পারে। তারই ভেতর বৌদের পালা ক'রে বাপের বাড়ী যাওয়া আছে। এক বউ এলে আর একজন যায়, সে এলে আর একজন। শুধু পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ী সমানে খেটে চলেন।

ললিতা দুটো দিন সংসারের কাজ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকালবেলাটাই তার সবচেয়ে মুস্কিল হ'ত। একে সে মোটা মানুষ, তাড়াহুড়ো করতে পারে না, তার ওপর কাজকর্ম্মের সে কিছুই জানে না। দু'দিনেই ললিতার ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে ব্যথা ধ'রে গেল। তৃতীয় দিন সকালে শাশুড়ী অনেক ডাকাডাকি করেও তার সাড়া পেলেন না। বড় বৌয়ের ছোট মেয়ে খোঁজ নিয়ে এসে বললে, 'ছোট্ কাকীমা ঠাকুর ঘরে।'

ললিতার শ্বশুরবাড়ীর চারতলায় ঠাকুরঘর। সেখানে বংশদেবতা নন্দদুলালের সোনার মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির পেছনে খানিকটা ইতিহাস অর্থাৎ কিম্বদন্তী আছে। অমলের প্র-প্রপিতামহ একবার মথুরায় তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়ে এক গাছ-তলায় মাটি খুঁড়ে এই সোনার নন্দদুলালের মূর্ত্তি উদ্ধার করেন। সেই মূর্ত্তি তিনি দেশের বাড়ীতে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর অমলের পিতামহ সরকারী চাকরি পেয়ে যখন দেশের পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় বাড়ী করেন, তখন নন্দদুলালকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। চার তলার ছাতে তিনি ঠাকুর ঘর তুলে দেন, পরে অমলের বাবা একটা সোনার সিংহাসনও গড়িয়ে দিয়েছেন। অমল চুপি চুপি ললিতাকে বলেছিল, সিংহাসনটাই খালি সোনার, নন্দদুলাল নাকি খাঁটি

পেতলের। অমলের পিতামহ অত্যন্ত নাস্তিক ধরনের লোক ছিলেন। দেশ থেকে কলকাতায় আসবার পথে (ইন্‌ট্র্যান্‌জিট) তিনি নাকি সোনার মূর্ত্তি বেচে দিয়ে পেতলের মূর্ত্তি বসিয়েছিলেন। কথাটা বাড়ীশুদ্ধ সকলেই জানে, কিন্তু বিশ্বাস করতে চায় না। শুনে ললিতা বলেছিল, স্যাকৃরা ডেকে যাচাই ক'রে নাও না কেন? অমল হেসে বলেছিল, ঠাকুর দেবতা যাচিয়ে নিলে পাপ হয় যে।

বাড়ীর সকলেই সকালে চান ক'রে উঠে আগে নন্দদুলালকে প্রণাম ক'রে আসে। শুধু বৌরা নয়, বাবুরাও। প্রথম দিন ললিতাকেও শাশুড়ী ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম ক'রে আসতে বলেছিলেন। ললিতা ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, 'কি ক'রে প্রণাম করব?' শাশুড়ী রেগে বলেছিলেন, 'ন্যাকামি কর না, বৌমা। বাপের বাড়ী যা করেছ তা করেছ, এখানে ওসব নাস্তিকতা চলবে না।' ললিতা করুণ মুখ ক'রে বলেছিল, 'আমি কোন মন্তর জানি না যে।' শাশুড়ী তখন নরম হয়ে বলেছিলেন, 'মন্তরের দরকার নেই, সকলের মঙ্গল কামনা কর।'

সেই থেকে ললিতা রোজই নন্দদুলালকে প্রণাম করতে যায়। সেদিন তখনও সে ঠাকুরঘর থেকে নাবছে না দেখেই শাশুড়ী তারে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। বড় বৌয়ের ছোট মেয়েটি খানিক পরে ঘুরে এসে আবার বললে, 'ও ঠাকুমা, দেখবে চল। ছোট্ট কাকীমার কি যেন হয়েছে।'

শাশুড়ী একটু উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কেন, কি করছে?'

মেয়েটি বললে, 'ঠাকুরের সামনে চোখ বুঁজে ব'সে আছে, ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না।

একটু অবসর পেয়ে শাশুড়ী নিজেই চাবতলায় দেখতে ছুটলেন। দেখলেন, ললিতা নন্দদুলালের দিকে মুখ তুলে চোখ বুঁজে হাত জোড় ক'রে ব'সে আছে। একেবারে স্থির নিশ্চল মূর্ত্তি—নিশ্বাস পর্য্যন্ত যেন পড়ছে না। শাশুড়ী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রহিলেন।

খানিক পরে পুরোহিত এলেন। অতি ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, নিজে আর বেশী পরিশ্রম করতে পারেন না। কিন্তু তবু ছেলেদের বা সহকারীদের হাতে নন্দদুলালের সেবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। লাঠি হাতে ভাঙা কোমর নিয়েই ঠুক্ ঠুক্ ক'রে চাবতলায় উঠে আসেন। অমল মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে বলে, 'ঠাকুর মশাই, আপনার জন্যে একটা লিফ্‌ট ক'রে দেওয়া দরকার।' পুরোহিত হেসে বলেন, 'না, বাবা, লিফ্‌টের দরকার নেই। যদ্দিন বেঁচে থাকব, ঠিক ওপরে উঠে আসব। তোমাদের ইলেকট্রিসিটির চেয়ে আমাদের নিষ্ঠার জোর কম নয়।' পুরোহিত দু'বেলাই ত আসেন। নন্দদুলালের আরতি হয়, ভোগ হয়। তিনি ললিতার দিকে তাকিয়েই বললেন, 'বৌমার সমাধি হয়েছে।'

সমাধি ভাঙবার পর ললিতা খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। তার পর আস্তে আস্তে যখন তার চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এল, তখন শাশুড়ী আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না। ব্যগ্রভাবে বললে, 'কিছু দেখলে, বৌমা?' ললিতা তখন বিহ্বল স্বরে কি কি দেখেছিল, ব'লে গেছল। রোজকার মত সেদিনও সে তাড়াতাড়ি প্রণাম সারতে গেছিল, কিন্তু প্রণাম সেরে মুখ তুলেই দেখল, সিংহাসনে নন্দদুলাল নেই। ঠাকুর ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও সে বিগ্রহের সন্ধান পেল না। হঠাৎ দরজার কাছে খিল খিল হাসি শুনে সে ফিরে দেখল, একটা ছোট্ট ছেলে নন্দদুলালকে নিয়ে পালাচ্ছে। ললিতাও তার পেছন পেছন ছুটল। অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও ছেলেটাকে ধরতে পারল না। তখন সে ভীষণ হাঁপিয়ে পড়েছে, সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সে আর পারল না, পথের ওপরই ব'সে প'ড়ে কেঁদে ফেলে বললে, 'আমার ঠাকুর দে ভাই, নইলে শাশুড়ী বড্ড বকবে।' ছেলেটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে খেলা করবে, বল?' ললিতা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। ছেলেটা তখন ফিক ক'রে হেসে কাছে এসে ললিতার হাত ধরল। আর কি আশ্চর্য্য, সে হাত ধরতেই ললিতার সমস্ত শ্রান্তি আর পিপাসা নিমেষেই লোপ পেয়ে গেল। ললিতা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় খেলা করবি?' ছেলেটা বললে, 'চল, তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাই।' তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ললিতা একটা নতুন জায়গায় এসে হাজির হ'ল। সেই জায়গাটার ছবি এখনও ললিতার স্পষ্ট মনে আছে। সে একে একে সেখানকার পথঘাট বাগান মন্দির সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে গেল। হঠাৎ মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা বেজে উঠল। ললিতা একটা মন্দিরে ঢুকতে যেতেই ছেলেটা রাগ ক'রে আবার ছুট দিল। ললিতাও আবার তাকে তাড়া করল। এই ঠাকুরঘরের দরজার কাছে এসে ছেলেটা কোথায় মিলিয়ে গেল, আর ললিতা যেন চৌকাঠের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। তার পরই সে চোখ চেয়েছে।

সমস্ত শুনে পুরোহিত মিনিট খানেক বিস্ফারিত চোখে ললিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ, বৌমা, তুমি কখনও বৃন্দাবনে যাও নি?'

ললিতা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললে, 'কই না।' পুরোহিত তখন ললিতার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে দিলেন, ছেলেটা ললিতাকে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিল, ললিতা বৃন্দাবনেরই নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে। শুনে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে শাশুড়ীর চোখ কপালে উঠল। পুরোহিত মৃদু হেসে ললিতাকে বললেন, 'এইবার আমি তোমায় একটা মজা দেখাব, মা।' ললিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইল।

পুরোহিত বললেন, 'আচ্ছা, মা, জ্ঞান ফিরে পেয়ে তুমি ত একবারও দেখলে না, সিংহাসনে নন্দদুলাল আছে কি না।'

পুরোহিতের কথামত সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে ললিতা আর্তস্বরে ব'লে উঠল, 'ওই ত সেই ছেলেটা।'

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। ললিতা কখনও বৃন্দাবনে যায় নি কথাটা সত্যি না হলেও ধরা পড়বার মত মিথ্যেও নয়। কেননা, তার বাড়ীর লোকেরাও জানত না, সে বৃন্দাবন দেখেছে। একবার সে তার এক সহপাঠিনীর পরিবারের সঙ্গে দেরাদুন বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকেই সে বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার ঘুরে এসেছিল। পাছে ঠাকুর্দ্দা বা দাদারা তার তীর্থ করা নিয়ে ঠাট্টা করে, তাই বাড়ীতে সে কোনদিন সে কথা জানায় নি। সুতরাং সমাধিস্থ অবস্থায় ললিতার অভিজ্ঞতা যে মোটেই অলৌকিক নয়, তা প্রমাণ করবার উপায় ছিল না। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা ললিতার আবার সমাধি হ'ল। তার পর থেকে সকাল-সন্ধ্যে ঠিক কাজের সময়টায় ললিতার সমাধি হতে লাগল। জায়েরা অনেক আশা করেছিল, ছোট বৌয়ের ঘাড়ে কিছু কাজ চাপিয়ে তারা একটু বিশ্রাম নেবে। কিন্তু ললিতার কাণ্ড দেখে হতাশ হয়ে তারা গজ গজ করতে লাগল। তারা অসন্তুষ্ট হ'ল, কিন্তু অবিশ্বাস করল না। ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে যে এভাবে খেলা করা যায়, এতখানি নাস্তিকতা তাদের অর্দ্ধশিক্ষিত কল্পনার অতীত। গেরস্ত বাড়ীর বৌয়ের পক্ষে এতখানি ভক্তির বাড়াবাড়ি তাদের কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগত। তারা ললিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, 'বড় লোকের মেয়ের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ঠাকুরকে ভক্তি আমরাও যেন করি না।' ললিতা রাগ করে, ঝগড়া করে না, শুধু মুখ নীচু ক'রে লজ্জিত ভাবে হাসেন। তার বিনীত ভাবটা জায়েদের ভাল লাগে। তারা কাছে স'রে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে অবাক বিস্ময়ে বলে, 'হ্যাঁ, ভাই, ঠাকুর সত্যি সত্যি তোমার সঙ্গে খেলা করেন?'

ললিতার প্রতি তার শাশুড়ীর মনোভাব একটু বিচিত্র রকমের। তার মধ্যে খানিকটা স্নেহ, অনেকটা শ্রদ্ধা এবং বেশ খানিকটা ঈর্ষা মেশান ছিল। তাঁর ষাটের ওপর বয়েস হয়েছে। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ পিতামাতার সন্তান। নিজেও সারাজীবন ধ'রে ধর্ম্মের সমস্ত অনুষ্ঠান নিখুঁত-ভাবে মেনে এসেছেন। অথচ একদিনও তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে পারলেন না। আর সেদিনকার একফোঁটা মেয়ে ললিতা, যে নাস্তিক মেয়ে একদিনের জন্যও ভগবানের নাম নেয় নি, সে কি না নিমেষের মধ্যে তাঁর এতখানি অনুগ্রহ লাভ করল। এটা ঠিক কি ধরনের বিচার তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

প্রায়ই তিনি ক্ষোভের সঙ্গে পুরোহিতকে বলেন, 'আচ্ছা ঠাকুরমশাই, ছোট বৌমা ত ঘোর নাস্তিকের মেয়ে। সে কি ক'রে দেবতাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করল?'

পুরোহিত মৃদু হেসে বলেন, 'এ প্রশ্নের জবাব কি আর মানুষে দিতে পারে? কে যে সত্যিকারের আধার, তা শুধু তিনিই চিনতে পারেন। ভেবে দেখ মা, দেশে ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না; তাদের ছেড়ে তিনি হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরের ওই আধপাগ্‌লা মির্গী রুগীটাকে দেখা দিতে গেলেন কেন?'

শাশুড়ী তবুও খুঁতখুঁত করেন। পুরোহিত তখন ভর্ৎসনার সুরে বলেন, 'দেবতার কৃপা নিয়ে ঈর্ষা করা চলে না।' ধরা প'ড়ে গিয়ে শাশুড়ী আমতা আমতা করতে থাকেন। পাশেই সমাধিমগ্না ললিতার পেট গুলিয়ে হাসি পেতে থাকে। হাসি চাপতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আর তাই দেখে পুরোহিত ভাবগদগদ মুখে ব'লে ওঠেন, 'আহা-হা!'

স্বয়ং নন্দদুলাল ললিতাকে তার খেলার সাথী ক'রে নিয়েছে দেখে পুরোহিত ঘোষণা ক'রে দিলেন, ললিতা-মা শাপভ্রষ্টা দেবী। এর পর থেকে ললিতা কাছে না থাকলে তিনি পূজায় বসতেই চাইতেন না। বলতেন, ললিতা-মাকে না দেখলে নন্দদুলাল ভোগ খেতে চায় না। ফলে, দু'বেলাই ললিতাকে ঠাকুর ঘরে হাজির থাকতে হ'ত। পূজার জোগাড়যন্ত্রও তাকে কিছুই করতে হ'ত না, পুরোহিত নিজেই সব ক'রে নিতেন। আর ললিতা কোন কাজ করবেই বা কি ক'রে? নন্দদুলালকে দেখলেই তার সমাধি হ'ত। শাশুড়ীর আদেশে সংসারের

কোন কাজও তাকে করতে হয় না। সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি পেয়ে নির্ভাঁজ আলস্যে কাল কাটিয়ে ললিতা শ্বশুর-বাড়ীতে দিব্যি আরামেই আছে।

ললিতার কাহিনী শুনে দাদারা একবাক্যে ছোট বোনটির বুদ্ধির তারিফ করতে লাগল। বৌদিরা রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল। বাবা ঠাকুর্দার উচ্চহাসি শুনেছিলেন। মেজবৌদি গিয়ে সবিস্তারে তাঁকে ললিতার কাণ্ড শুনিয়ে এল। শুনে তিনি ললিতাকে ডেকে পাঠালেন।

কাছে ডেকে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি তাকে সতর্ক ক'রে দিলেন, 'ঠাকুর নিয়ে খেলা করিস নি, মা।'

ললিতা চমকে উঠে বললে, 'কেন বাবা?'

বাবা ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলেন, 'তোর শরীরে যে আর্য্যরক্ত আছে। তিন হাজার বছরের সংস্কার দু'এক পুরুষের নাস্তিকতায় লোপ পায় না, মা।'

কয়েকদিন পরে আর একটা খবর জেনে বৌদিরা বিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠল। ললিতা মা হতে চলেছে। বাবাও খুব খুশী হলেন; ঠাকুর্দা ত আনন্দের আতিশয্যে কেঁদেই ফেললেন। বৌদিদের উল্লাসটা অবশ্য অবিমিশ্র নয়। তাদের ভাবটা এই, ললিতা এইবার ঠিক জব্দ হবে। মেজবৌদি ত ব'লেই ফেলল, 'নন্দদুলালের বুজরুকি দিয়ে শাশুড়ীকে ভুলিয়েছ, নিজের দুলালকে কি ক'রে ভোলাও, এইবার দেখব ঠাকুরঝি।' কিন্তু শাপভ্রষ্টা দেবীর ওপর ভগবানের করুণা যে কতরকম ভাবে প্রকাশ পেতে পারে, তা বৌদিদের জানা ছিল না। একদিন ললিতা শাশুড়ীর সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল। ফেরবার পথে রিক্‌শাওলাটা কলার খোসায় পা পিছলে প'ড়ে গেল। ললিতা আর তার শাশুড়ী দু'জনেই ঠিকরে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। রিক্‌শাওলাটার একটা হাত আর একটা পা ভাঙল, বুড়ী শাশুড়ীর মাথা ফাটল; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে একটু শক্ লাগা ছাড়া ললিতার কোন ক্ষতি হ'ল না। সে তখন সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা। সেদিন রাত্তির থেকেই তার ব্যথা উঠল; অমল তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে রেখে এল। আটচল্লিশ ঘণ্টা লেবার-পেন সহ্য ক'রে ললিতা এক মৃত অপরিণত সন্তান প্রসব করল। ডাক্তারদের হিসেবমত ললিতারও বাঁচবার কথা নয়। তিনদিন ধ'রে সে জীবনমৃত্যুর সীমানায় ঘোরাঘুরি করল। শেষে আধুনিক বিজ্ঞানেরই জয় হ'ল; ডাক্তার নার্সে মিলে ধস্তাধস্তি ক'রে যমের কবল থেকে ললিতাকে ফিরিয়ে আনল। ক্রাইসিস কেটে

পার্মানেন্ট্‌লি ড্যামেজড্‌ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আর সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লাইগেশানের কথা শুনে শাশুড়ী প্রথমে প্রবল আপত্তি করলেন। একে সেকেলে লোক, অপারেশানের কথা শুনলেই ভয় পেয়ে যান; তার ওপর খোদার ওপর এ ধরনের খোদকারি কল্পনাও করতে পারেন না। অমল, অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে একে একে তাঁর সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করল। বুঝিয়ে দিল, লাইগেশান সামান্য অপারেশান, এখন করিয়ে নেওয়াই ভাল। বললে, 'আমার ছেলে হওয়ার ওপর ত আর বংশ-রক্ষা নির্ভর করছে না। আর নাতি-নাতনীর মুখও তুমি যথেষ্ট দেখেছ। তবে শুধু শুধু ললিতার প্রাণ সংশয় করা কেন?'

অগত্যা শাশুড়ী মত দিলেন। ললিতার লাইগেশান হয়ে গেল। বৌদিরা গালে হাত দিয়ে বললে, 'ধন্যি মেয়ে বাবা।' এর পর ললিতার কাহিনীর ধারাবাহিকতায় কিছুটা ছেদ পড়ল। আমি বছর দেড়েকের জন্যে কলকাতার বাহিরে চ'লে গেলাম। কিছুদিন ললিতার জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা শোনবার আর সুযোগ রইল না। অবশ্য রমেন মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখত। কিন্তু বাক্যবাগীশ লোকেরা সাধারণতঃ ভাল লিপিকার হয় না। তবু তার অগোছালো চিঠি থেকে ললিতার খবর কিছু কিছু পেতাম।

হাসপাতাল থেকে ফিরে কিছুদিন বাপের বাড়ীতে কাটিয়ে ললিতা আবার শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে গিয়েছিল। রমেনের চিঠি থেকে জানলাম, সে আজকাল বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। অবশ্য ললিতার কথা বলতে গেলে 'বাড়াবাড়ি'টা রমেনের কথার মাত্রা ছিল। কিন্তু এবারে রমেন কথাটা নিছক অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ললিতা সত্যিই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। সংসারের কাজ থেকে রেহাই পাবার পর ইদানীং ললিতা সমাধির ভড়ং অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। শুধু কৌশলটা বজায় রাখবার জন্যে মাসের মধ্যে চার-পাঁচ বার তার সমাধি হ'ত। আজকাল আবার ঘন ঘন তার সমাধি হওয়া আরম্ভ হয়েছে। আজকাল নাকি সে আর একটা নতুন কায়দা শিখেছে। সমাধি ভাঙবার পর ক্লান্ত হবার ভান ক'রে সে ঘুমিয়ে পড়ে। তার চেহারা নাকি খানিকটা খারাপ হয়ে গেছে। খুব চুল উঠে যাচ্ছে, ভাল হজম হয় না, রাত্তিরে ঘুম হয় না। সারা রাত্তির পায়চারি ক'রে বেড়ায়। অমল জিজ্ঞেস করলে বলে, সারা শরীর দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। ভয় পেয়ে অমল ডাক্তার

হয়ে যাবে—লাইগেশানের পর কারুর কারুর কিছুদিন এরকম হয়।

ইতিমধ্যে ললিতার বাবা মারা গেলেন; দ্বিতীয় অ্যাটাক আর সামলে উঠতে পারলেন না। ললিতাকে আবার বাপের বাড়ীতে আসতে হ'ল। রমেন লিখল, ললিতা কিরকম যেন হয়ে গেছে। রমেন অবশ্য এভাবে এক কথায় লেখে নি, পুরো চার পাতার একখানা চিঠি লিখেছিল। তাতে বাবার মৃত্যু-সংবাদ মাত্র এক লাইন, বাকী সমস্ত চিঠিটা ললিতার কথায় ভর্ত্তি। আমি জানতাম, একমাত্র বোন ব'লে ললিতাকে তার দাদারা খুবই ভালবাসে। রমেনের অবিশ্রাম সমালোচনার মূলেও ছিল এই স্নেহের আতিশয্য। এ চিঠিটার কিন্তু সমালোচনা ছিল না, ছিল রমেনের ব্যাকুল ভ্রাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ আর বেদনা। কিন্তু সেই চারপাতাব্যাপী অসংবদ্ধ প্রলাপ বার বার পড়েও আমি বুঝতে পারলাম না, ললিতা ঠিক কি রকম হয়ে গেছে।

দেড় বছর পরে আমি যখন কলকাতায় ফিরলাম, তখন ললিতার জীবনে আবার এক প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। অমল পর পর তিনবার এস. এ. এস. পরীক্ষা দিয়েছিল। তৃতীয় বারের চেষ্টায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হ'ল। তার কিছুদিন পরেই মাদ্রাজ অফিসে সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ পেল। অমল সেখানে কোয়ার্টার্স'ও পাচ্ছে; সুতরাং একেবারে ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে সে কাজে যোগ দিতে পারবে। অমলের উন্নতিতে শুধু তার বাড়ীর লোকে নয়, ললিতার বাপের বাড়ীর সকলেও আনন্দিত হ'ল। একে ত ঠাকুর্দা অমলকে বেশ পছন্দ করতেন, তার ওপর এতদিনে ললিতা নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের সংসারে যেতে পারবে ভেবে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—অমল এখন অনায়াসেই ঠাকুর-চাকর দুই-ই রাখতে পারবে, আর ললিতাকে ঠাকুর ঘরের মিথ্যাচার করতে হবে না। কিন্তু সকলেই যখন অমলকে অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত, তখন ললিতা বেঁকে বসল। বললে, আমি মাদ্রাজ যাব না।

ললিতা প্রথমটা না যাওয়ার কোন কারণ বলে নি। বড়লোকের আদুরে মেয়ের অহেতুক খেয়াল ভেবে জায়েরা একটু সস্নেহ রসিকতা করল। শাশুড়ী তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'পাগলী মেয়ে, কেন যাবে না বল?'

ললিতা লজ্জিত মুখে চুপি চুপি বললে, 'আমি নন্দদুলালকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

শাশুড়ী স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বললেন, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম।'

ললিতা আকুল আগ্রহে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, 'তবে ত আমাকে যেতে হবে না, মা?'

শাশুড়ী ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তাই কি হয়, মা! মেয়ে হয়ে জন্মেছ, স্বামীর চেয়ে বড় দেবতা তোমার কেউ নয়। নন্দদুলালকে ছেড়ে থাকতে যতই কষ্ট হোক, স্বামীর সঙ্গে যাওয়া তোমার কর্ত্তব্য।'

অনেক চেষ্টা করেও ললিতাকে বোঝাতে না পেরে শাশুড়ী পুরোহিতের সাহায্য চাইলেন। পুরোহিত সস্নেহ তিরস্কারের সুরে বললেন, 'ললিতা মা, তোমার মনে ত এই দ্বন্দ্ব আসা উচিত নয়।'

ললিতা চমকে উঠে বললে, 'কি দ্বন্দ্ব, ঠাকুরমশাই?'

পুরোহিত মাথা দোলাতে দোলাতে রহস্যময় সুরে বললেন, 'এই যে শুনছি, তুমি স্বামীর সঙ্গে যেতে চাইছ না, এতে ত তুমি ঈশ্বরের প্রতিই অবিশ্বাস প্রকাশ করছ।'

ললিতা বিমূঢ়ভাবে বললে, 'সে কি!'

পুরোহিত গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভক্তের ওপর কি ভগবানের টান নেই, মা? তুমি নন্দদুলালকে ছেড়ে যাচ্ছ ব'লে তিনি কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবেন?'

সোনার সিংহাসনে, অমলের মতে, পেতলের নন্দদুলাল মূর্ত্তির দিকে ললিতার চোখ গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে বৃদ্ধ পুরোহিত এবার হেসে ফেললেন। বাধা দিয়ে বললেন, 'ওদিকে কি দেখছ, মা? ওটা ত একটা পুতুল।'

চকিতে ললিতার তার পিতা-পিতামহের ব্যঙ্গোক্তি মনে পড়ল। কিন্তু তাঁরা ত নাস্তিক। অথচ এই একান্ত ভগবদ্ভক্ত বৃদ্ধও এখন সেই একই কথা বলছেন। ললিতা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

ললিতার বিহ্বলতা দেখে পুরোহিত আর হাসলেন না, ধীরে ধীরে তাকে বোঝাতে লাগলেন, 'ভেবে দেখ, মা, আমরা পুতুল খেলি কখন্। শৈশবে ত? বড় হয়ে আমাদের আর পুতুল খেলার প্রয়োজন হয় না, কেননা তখন আমরা প্রকৃত জিনিস লাভ করি। কিন্তু তাই বলে শৈশবের পুতুল খেলাটাও ত নিছক ছেলেমানুষী নয়, সেটা ভবিষ্যৎ জীবনেরই দীক্ষা। তেমনি ঈশ্বরভক্তির শৈশবেও পুতুলের প্রয়োজন হয়। তার পর যখন ভক্তির উচ্চ মার্গে উঠে যাই অর্থাৎ ভক্তিতে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হই, তখন পুতুলটা হয়ে যায় গৌণ। ঈশ্বর তখন আমার অন্তরে সতত পরিদৃশ্যমান্ হয়ে থাকেন।'

একটু দম নিয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'আমরা পুতুল পূজো করি ব'লে সাহেবরা আমাদের বিদ্রূপ করে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের বহির্মুখী মন আমাদের পৌত্তলিকতার আসল মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে না। হিন্দুর মত এতবড় একটা প্রাচীন জাতি হাজার হাজার বছর ধ'রে শুধু পুতুল নিয়েই ভুলে আছে, তারা আমাদের এতখানি নাবালক ভাবে কি ক'রে বুঝি না। ঈশ্বরকে আমরা কখনও ভয়ঙ্কর, কখনও সুন্দর, কখনও বা শিশুর মত সরল মূর্ত্তিতে কল্পনা করি, কেননা আমরা তাঁকে একান্ত আপনার করে পেতে চাই। মানুষের সীমাবদ্ধ মন, তাই তাকে রূপের মধ্যে দিয়েই অরূপের সাধনা করতে হয়। কিন্তু তবু বলব, মা, রূপটা আসলও নয়, শেষও নয়। স্বয়ং ঈশ্বর যখন খেলার সাথী রূপে তোমার অন্তরে ধরা দিয়েছেন, তখন ও প্রতীকটা নিয়ে তুমি কি করবে?'

ললিতা মৃদু স্বরে বললে, 'কিন্তু ঠাকুরমশাই, আমি ত ভক্তিতে এখনও নাবালিকা, আমার পুতুল না হলে চলবে কেন?'

পুরোহিত হেসে বলেন, 'কি যে বল, মা। আমি যদি তোমার ভক্তির এক কণাও পেতাম ত আমার আজীবনের সাধনা ধন্য হয়ে যেত।'

ললিতা কিন্তু এবার চুপ করে পুরোহিতের কথা মেনে নিল না, সমানে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। অনেক অনুরোধ ক'রে, অনেক ধমক দিয়েও ললিতাকে মাদ্রাজ যেতে রাজী করান গেল না। শ্বশুরকুলের সকলে যখন হার মেনে গেল, তখন ললিতার পিতৃকুলে খবর গেল।

ললিতার বাবার মৃত্যুতে ঠাকুর্দ্দা বড় বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। নাস্তিক মানুষ—ঈশ্বরেও বিশ্বাস করেন না, পরলোকেও বিশ্বাস করেন না। একা একা শোকের ভার বহন করতে গিয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। বাড়ী থেকে সাধারণতঃ বেরতেন না, প্রায় শয্যাগত হয়েই ছিলেন। তবু ললিতার বেয়াড়াপনার খবর পেয়ে লাঠি হাতে কষ্টেসৃষ্টে নিজেই এসে হাজির হলেন।

ললিতা সত্যিই আজকাল কি রকম হয়ে গেছে। ঠাকুর্দ্দাকে সে বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসত। অথচ সেই ঠাকুর্দ্দা অসুস্থ হয়ে বার বার ললিতাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তবু সে একবারও যায় নি। এখনও সে তাঁর কুশল জানতে চাইল না। সতর্কস্বরে বললে, 'দাদু; তুমি যে হঠাৎ।'

ঠাকুর্দ্দা হেসে বললেন, 'পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে না যায়, মহম্মদকেই পর্ব্বতের কাছে আসতে হয়।'

অন্য সময় হলে ললিতা রসিকতা ক'রে বলত, আমি কি পর্ব্বতের মত মোটা? ঠাকুর্দ্দাও ললিতার কাছ থেকে এই উত্তরই আশা করছিলেন। তাই ললিতা যে নিরুত্তর আছে, তা খেয়াল না করেই বলে চললেন, 'না, দিদি, তোকে আর পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তুই অনেক রোগা হয়ে গেছিস্। তোর যে কি হচ্ছে, আমাকেও আজকাল বলতে চাস্ না।' ললিতা তবুও চুপ করে আছে দেখে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গলা ঝেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, দিদি, তুই আবার কি কাণ্ড বাধিয়েছিস! অমলের সঙ্গে যেতে চাইছিস না কেন?'

ললিতা আস্তে আস্তে বললে, 'আমি নন্দদুলালকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

ঠাকুর্দ্দা হেসে ফেলে বললেন, 'তোর শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের ওই কথা বলিছিস্ ব'লে আমাকেও ওই ছুতো দেখাবি? আসল কারণটা আমায় চুপি চুপি খুলে বল্ না।'

ললিতা চকিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'বললাম ত কারণ।'

ঠাকুর্দ্দার সকল অনুনয়-বিনয়ের উত্তরে ললিতার সেই এক কথা, আমি নন্দদুলালকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

শেষে ঠাকুর্দ্দা চ'টে উঠলেন। বললেন, 'ফের যদি এরকম একগুঁয়েমি করবি ত আমি সব কথা ফাঁস ক'রে দেব।'

ললিতা মুখ তুলে বললে, 'কি কথা?'

ঠাকুর্দ্দা চড়াগলায় বললেন, 'জানিস্ না, কি কথা? সংসারের কাজে ফাঁকি দেবার জন্যে নন্দদুলালকে নিয়ে খেলা, মিথ্যে সমাধির ভড়ং, সব ব'লে দেব। তখন সবাই বুঝবে, ছোট বৌমার ধর্ম্মে-কর্ম্মে কিরকম মতি।'

ললিতা একটু অদ্ভুত হাসির সঙ্গে বললে, 'বেশ, ব'লে দাও।'

ঠাকুর্দ্দাকে কিন্তু ব'লে দিতে হ'ল না। সেজ বৌয়ের একটু-আধটু আড়িপাতা স্বভাব ছিল। সে কি কাজে দরজার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, ঠাকুর্দ্দার চড়াগলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু'একটা কথা কানে যেতেই সে দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে সমস্ত কথা শুনে ফেলে। তার পর ছুটতে ছুটতে গিয়ে শাশুড়ীকে ললিতার কীর্ত্তিকলাপ শোনায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নাস্তিক মেয়েটার স্পর্দ্ধিত প্রতারণার খবর বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়ে।

শাশুড়ী এসে ললিতাকে প্রশ্ন করলেন, 'বৌমা সব কথা সত্যি?'

ললিতা মুখ নীচু ক'রে বললে, 'হাঁ।'

শাশুড়ী রুদ্ধস্বরে আবার বললেন, 'তুমি সত্যি সত্যি এতদিন ঠাকুর নিয়ে খেলা ক'রে এসেছ?'

ললিতা এবারও সংক্ষেপে বললে, 'হাঁ।'

শাশুড়ী সংযমের বাধা হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমার লজ্জা করে না, বৌমা?'

ললিতার নতমুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। এ-অবস্থায় ললিতাকে হাসতে দেখে ঠাকুর্দাও ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'আপনাদেরই বউ। আপনারা যত খুশি, যা খুশি শাস্তি দিন, আমরা আপত্তি করব না।'

তারপর ললিতার ওপর যে ঝড় ভেঙে পড়ল, বাইরের লোক হ'য়ে আমার পক্ষে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে আমি জানি, অশিক্ষিত মেয়েদের ধর্মান্ধতায় আঘাত লাগলে তারা কতখানি উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে। সেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় শুধু যে তাদের আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাই নয়, মুখ দিয়ে যে ভাষা বেরোয়, তা শ্রাব্যও নয়, লেখার যোগ্যও নয়। ললিতার শাশুড়ী রাগে, ক্ষোভে উগ্রচণ্ডা হ'য়ে উঠলেন। ঠাকুর নিয়ে খেলা করার চেয়েও ললিতার বড় অপরাধ, সে নেহাৎ বাচ্চা মেয়ে হয়েও এই অভিজ্ঞ প্রবীণাকে এতদিন ধ'রে বোকা বানিয়ে এসেছে। তিনি যেন নিজের চোখেই হাস্যাস্পদ হয়ে পড়েছেন। ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়ত তিনি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমা করতে পারতেন, কিন্তু অহমিকা-বোধে এই আঘাতে তিনি চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ললিতা কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। সকলের লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা সে নতমস্তকে নীরবে সহ্য ক'রে গেল।

শাশুড়ী নিজে হাতে ক'রে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে ঠাকুর ঘর ধুয়ে ফেললেন। তিনি যেন নাস্তিক মেয়েটার অশুচিস্পর্শ নিশ্চিহ্ন ক'রে পুঁছে ফেলতে চাইলেন। সংস্কারের বাধা না থাকলে নন্দদুলালের বিগ্রহও হয়ত তিনি গঙ্গাজলে চুবিয়ে নিতেন। শেষে কড়া হুকুম দিলেন, ললিতা যেন ঠাকুর ঘরের ত্রিসীমানাতেও না আসে।

ললিতা এইবার ভেঙে পড়ল। শাশুড়ীর পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে বললে, 'দোহাই মা, আমায় যত খুশি মারুন-ধরুন, কিন্তু আমার ঠাকুর ঘরে যাওয়া বন্ধ করবেন না।' নাস্তিক মেয়েটার ন্যাকামি দেখে বিদ্রূপের হাসিতে বাড়ী ভ'রে উঠল।

বৃদ্ধ পুরোহিত কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না—ললিতার নিজের মুখে শুনেও না। তিনি দিশাহারা হ'য়ে বার বার বলতে লাগলেন, 'না মা, না। তোমাদের কোথায় যেন হিসেবের ভুল থেকে যাচ্ছে।'

শাশুড়ী রুখে উঠলেন, 'কি ভুল?'

পুরোহিত কম্পিত স্বরে বললেন, 'বুঝছ না, ললিতা মা তোমাকে আমাকে বোকা বানাতে পারে, কিন্তু ঠাকুরকে বোকা বানাল কি ক'রে। আমি যে দেখেছি, ললিতা মা ঘরে ঢুকলেই ঠাকুরের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।'

জায়েরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। এবার ওঁকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করুন।'

পুরোহিত তবু দু'বেলাই পুজো করতে আসেন। ললিতাকে ঘরে না দেখে বার বার তাঁর মন্ত্র ভুল হয়ে যায়। আরতি শেষ ক'রে নন্দদুলালকে ভোগ খাওয়াতে গিয়ে বৃদ্ধ কেঁদে আকুল হন। চীৎকার ক'রে বলেন, 'ওগো, তোমরা একবার দেখে যাও, নন্দদুলাল আমার হাতে ভোগ খাচ্ছেন না। দোহাই তোমাদের, নিজেদের গোঁ রাখতে গিয়ে ঠাকুরকে অনাহারে রেখ না।'

কিন্তু হিন্দু-নারী শুধু স্বামী-পুত্রকে নয়, দেবতাকেও বশে রাখতে জানে। শাশুড়ী তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দেন, 'সহজে খেতে না চায়, গলা টিপে গিলিয়ে দিন।'

এতদিন অমল চুপ ক'রে ছিল। সে বাড়ীর ছোট ছেলে। সুতরাং নন্দদুলালের সেবা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই—সে তার চাকরির ভাবনাতেই ব্যস্ত। ললিতাকে নিয়ে হট্টগোলের ফলে তাকে মাদ্রাজে যাবার দিন ক্রমাগত পেছতে হচ্ছিল। এইবার সে শান্তমুখে দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিল, ললিতা নিজে থেকে যেতে না চাইলে সে তাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে না।

শাশুড়ী প্রমাদ গণলেন। তিনি তাঁর ছোট ছেলেটিকে খুব ভালই চেনেন। যতই শান্তভাবে বলুক, তার 'না'-কে 'হাঁ' করানো একরকম অসম্ভব। তিনি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখলেন। আবার ললিতার ঠাকুর্দাকে ডেকে পাঠালেন। ঠাকুর্দার সামনেই তিনি ললিতাকে শেষ কথা শুনিয়ে দিলেন, 'বৌমা, তুমি যদি অমুর সঙ্গে মাদ্রাজ না যাও ত এ বাড়ীতে আর তোমার ঠাঁই হবে না।'

ঠাকুর্দাও সঙ্গে সঙ্গে যোগ ক'রে দিলেন, 'বাপের বাড়ীতেও না।'

ললিতা অবিচলিত ভাবে শুধু বললে, 'বেশ।'

ললিতার এই সংক্ষিপ্ত 'বেশ' কথাটা সকলেই তার সম্মতির লক্ষণ ব'লে ধ'রে নিল। অমল শুনল, ললিতা না কি নিজে থেকেই যেতে রাজী হয়েছে। অমল ললিতাকে প্রশ্ন ক'রেও কোন সদুত্তর পেল না। অন্ততঃ ললিতা সোজাসুজি অস্বীকার করল না। ভাসা-ভাসা ভাবে বললে, 'সবাই ত তাই বলছে।'

পুরোহিত শুভদিন দেখে দিলেন। বুধবার বিকেলের ট্রেনে অমল আর ললিতার মাদ্রাজ যাওয়া ঠিক হ'ল।

ললিতা যন্ত্রের মত সমস্ত গোছগাছ ক'রে নিল। সে আর কোনরকম বিদ্রোহ করছে না দেখে সকলেই আশ্বস্ত হ'ল।

বুধবার ভোরবেলা উঠে অভ্যেসমত সদরে জল-ছড়া দিতে গিয়ে শাশুড়ী দেখলেন সদরদরজা খোলা। মুহূর্ত্তের জন্যেও তিনি চোর-ডাকাতের কথা ভাবলেন না বা চেঁচামেচি ক'রে সকলকে জাগিয়েও তুললেন না। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি দ্রুতপায়ে দোতলায় উঠে গেলেন। অমলের ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকে দেখলেন, খাটের ওপর অমল একা শুয়ে আছে।

তাকে ডেকে তুলে চুপিচুপি বললেন, 'ছোট বৌমা কোথায়?'

অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়াতে বিরক্ত হয়ে অমল বললে, 'আমি কি জানি!'

অমলের হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে তিনি ধমক দিলেন, 'তুই জানিস না মানে?'

অমল হাই তুলে নিশ্চিত ভাবে বললে, 'বৌ ত ঘরে শোয় না।'

তিনি আর্ত্তস্বরে ব'লে উঠলেন, 'সে কি!'

অমল তখন সব কথা খুলে বলল। পুরোহিতের মত সেও ললিতার ছলনায় বিশ্বাস করে নি। ঠাকুর ঘরের চাবি রাত্তিরবেলা তার কাছেই থাকে। শাশুড়ীর হুকুমে এবং জায়েদের কড়া পাহারায় ললিতা দিনের বেলা ঠাকুর ঘরে যেতে পেত না। রাত্তির বেলা অমলের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সে ঠাকুর ঘরেই রাত কাটাত। পাছে সে কোন আত্মঘাতী কাণ্ড ক'রে বসে তাই অমল মাঝে মাঝে ওপরে গিয়ে দেখে আসত। রোজই দেখত, নন্দদুলালের সঙ্গে ললিতার মান-অভিমান চলছে। ললিতা বার বার বলছে, দুলাল আমার, আমায় একবার শুধু ব'লে দে, আমি কি করব। কাল রাত্তিরেও অমল উঁকি দিয়ে দেখে এসেছিল। দেখেছিল, ললিতা উত্তেজিত ভাবে নন্দদুলালকে শাসাচ্ছে, 'বেশ, আমিও তোকে জব্দ করব। পথের ধুলোয় ফেলে রাখব, ভিক্ষে ক'রে নিজে খাব তবু তোকে খেতে দেব না। দেখব, ওই হাসি তোর কদ্দিন থাকে।'

শুনেই শাশুড়ী অমলকে চমকিত ক'রে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে চারতলায় ছুটলেন। কিছু না বুঝলেও অমলও তাঁর পেছন পেছন এল। দু'জনেই এক সঙ্গে ঠাকুরঘরের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল, ভোরের সূর্য্য-কিরণে শূন্য সোনার সিংহাসনটা চকচক ক'রে জ্বলছে।
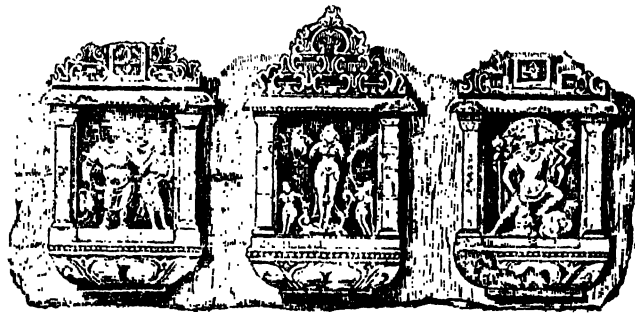
# পরজন্মে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হে জলাঙ্গী, আবার যেন আসি তোমার তীরে
ছোট্ট হয়ে। আবার তোমার কাকচক্ষু নীরে
দল বেঁধে সেই জলখেলা! পানকৌড়ির মতো
ডুবসাঁতারের পাল্লা চলে—দম আছে কার কত!
সাঁতরে করি এপার ওপার, ঝাঁপিয়ে পড়ি জলে,
কাঁপিয়ে তুলি আকাশ-বাতাস তুমুল কোলাহলে।
বালুর চরে গড়াগড়ির সেই যে দুপুরগুলি!
মনের বনে আজও তারা নাচে পেখম তুলি!

পরজন্মে তোমার তীরে আমার মাটির ঘর!
চারদিকে তার জবার বেড়া—ফুল ফোটে সুন্দর!
পরিচ্ছন্ন আঙিনাতে ধানের গোলা দুটি!!
শঙ্খধবল গোবৎসটি করছে ছুটাছুটি;
'ভোলা' কুকুর ঘুমিয়ে আছে ডালিমগাছের তলে;
কাজল-পরা দামাল ছেলে চল্‌তে গিয়ে টলে।
ঝিরঝিরিয়ে বইছে বাতাস, বৈরাগী গায় গান;
সে গানে কোন্ দূরের ব্যথায় ডুকরে কাঁদে প্রাণ!
স্বর্ণচাঁপার শাখায় খাসা 'বউ-কথা-কও' ডাকে!
অবিশ্রান্ত গুন্‌গুনানি মৌমাছিদের চাকে!
ঘুঘুর স্বরে হিয়ার মাঝে এমন করে কেন?
কুলঝুটিদের কণ্ঠে বাজে জলতরঙ্গ যেন!
এবার যারে পেলাম সাথী দুঃখে এবং সুখে—
ঘরের লক্ষ্মী হ'য়ে আবার সেই এসেছে বুকে।
সন্ধ্যারে সে শঙ্খরবে জানায় স্বাগতম্;
তুলসীতলায় প্রদীপশিখায় মুখটি অনুপম!
ক্ষুধায় অন্ন দেয় সে সুডোল কাঁকন-পরা হাতে।
আশার বাণী শোনায় কানে ব্যথার কালো রাতে!
ভালোবাসার কাজল-পরা মুগ্ধ-আঁখি দিয়া
ধরণীতে নিত্য হেরি বাসরঘরের প্রিয়া!

আমার পেশা কথকথা; ব্রাহ্মণ সন্তান;
দেশ-বিদেশে গেয়ে বেড়াই রামায়ণের গান।
নধরকান্তি; গলায় শুভ্র যজ্ঞ-উপবীত;
ললাট চন্দনে লিপ্ত; কণ্ঠ সুললিত।
গাঁয়ের কথকঠাকুর আমি, রাজা-উজীর নই;
রামের দিব্য জীবনকথা গানের সুরে কই!
মাথায়-পরা কাঁটার মুকুট, দুঃখজয়ী বীর!
স্বর্ণলঙ্কা, অশোকবনে কান্না জানকীর!
শক্তিশেলে জীবনহারা অনুজ লক্ষ্মণ!
গন্ধমাদন স্কন্ধে হনুর সমুদ্র লঙ্ঘন!
চৌদ্দ বছর পরিক্রমা বনে বনান্তরে।
ফিরে এলেন দাশরথি অযোধ্যানগরে!
রাজা হলেন রামচন্দ্র, সীতা দেশের রাণী!
ঘরে ঘরে সুরু হোলো কখন্ কানাকানি।
লোক নিন্দায় ভীত রাজা সহধর্ম্মিণীরে
পাঠিয়ে দিলেন বনবাসে। সেথায় নদীতীরে
যমজ ছেলের জন্ম হোলো শান্ত তপোবনে;
মানুষ করেন মাতা বনের মৃগপক্ষী সনে।
আদি কবি যত্নে তাদের শেখান রামায়ণ;
প্রাণকাঁদানো গানের সুরে গলে পাষাণ মন!
সে গান শুনে সীতার চোখে অশ্রুধারা ঝরে!
পঞ্চবটির মধুর স্মৃতি কেবল মনে পড়ে!
তার পরে সেই করুণ ছবি! মর্ম্মান্তিক দুখে
সোনার সীতা মুখ লুকালেন বসুমতীর বুকে!
সজল চোখে যে যার ঘরে ফিরে নর-নারী;
মুক্তহাতে দক্ষিণাতে আমার থালা ভারী।

সারা বোশেখ গানের পালা; জৈষ্ঠ্যে ফিরি ঘরে;
কোথায় ছিল ন্যাংটো ছেলে—জাপ্‌টে এসে ধরে।
ঠোঁট দুটিতে গোলাপ কুঁড়ি, কোঁকড়া চুলে সোনা,
হাসিতে তার উপ্‌চে পড়ে ফুট্‌ফুটে জ্যোছ্‌ছোনা!
স্কন্ধে আমার মাথা রেখে চুপ্‌টি ক'রে থাকে;
বাপ এসেছে—এ আনন্দ কোথায় সে আজ রাখে?
আমায় ফেলে গিয়েছিলে কেন অনেক দূর?—
ক্ষুদে দাঁতের কামড়ে এই অভিমানের সুর!

বারান্দাতে গিন্নী রাখেন গামছা এবং গাড়ু;
একটু পরেই রেকাবিতে নারিকেলের নাড়ু;

জামবাটিতে মুড়ি শসা, কৌটো-ভরা পান।
অতঃপর তৈল মেখে অবগাহন স্নান
'জলাঙ্গী'তে। স্নানের শেষে ভোজন পরিপাটি ;
আউশ চালের গরম ভাতে গব্যঘৃত খাঁটি ;
সোনামুগের ডালের সাথে ভাজা তিলের বড়ি ;
ইক্ষু-গুড় আর ঘরের দধি,—হায় রে মরি ! মরি !

ঘরে আছে 'মঙ্গলা' গাই, দুধের অভাব নাই !
আমবাগানের ল্যাঙড়া দিয়ে নিত্য ফলার খাই !
ধান্য যোগায় পুবের মাঠের বিঘে দশেক জমি ;
শান্ত সরল গ্রাম্য-জীবন ! দয়াল, তোমায় নমি।
জন্মে জন্মে এমনি ক'রেই দিন যেন মোর যায় !
শেষের ক্ষণে 'হে রাম' ব'লে নিই যেন বিদায় !

# আমি

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

আমার সমগ্র সত্তা আজো যেন সেই পঞ্চতপা
যুগান্তের কৃচ্ছ্র সাধনায় !
লেলিহ হিংস্র শিখা অগ্নিকুণ্ডে ফুঁশিছে উন্মাদ,
অসম্বৃত ধূম্র যন্ত্রণায়,—
চৌদিকে জ্বলন্ত চুল্লী, শ্মশানের বিসর্গ বিচ্ছেদ,
নীলিম আয়ুধ-ছিন্ন নিদাঘের নিষিক্ত নির্ব্বেদ,
ফেনায়িত খর-বায়ু তরঙ্গের পুঞ্জ-পুঞ্জ ক্লেদ
সূময়ের অবতংসতলে
দোলে নিত্য অহর্নিশ—কোথা যেন ভাসে আর্ত্তনাদ
কষায়িত কার অশ্রুজলে !

আমার নির্ম্মোকে আমি আকুঞ্চিত কার্ম্মুকী-বিপাকে
ক্রূর কূট ফণা-বিস্ফারণে—
গরল জর্জ্জর যত চিত-চৈত্য—কামরুদ্ধ ফল,
অমঙ্গল অরিষ্ট লগনে ;—
লক্ষ গিরি-লঙ্ঘনের দুর্নিরীক্ষ্য প্রচণ্ড প্রয়াস,
সর্ব্ব সিদ্ধি-চয়নের আশাবরী অর্ব্বুদ আশ্বাস,
রণ-ক্ষত বাসনার কলঙ্কিত মৌন ইতিহাস
অঙ্গনার লগ্ন এলোচুলে
কাজল-কটাক্ষে যার নাচে মধু-বিষময় ছল,
আলিঙ্গন-লিপ্সা বাহুমূলে !

আমার প্রকৃতি আজো প্রশ্নভরা অপূর্ব্ব নিহ্নবা
সংঘাতের বিচিত্র মিশ্রণে,—
আজো তাই আমা হতে বিতাড়িত আমি বহুদূরে,
আশাহত, দৃপ্ত আকিঞ্চনে !—
তবুও মন্থন চলে অতলান্ত শর্ব্বরী-পাথারে,
দুঃখ-কালো তমিস্রায় শুধু যেথা ওঠে বারে বারে
ব্যথা-দগ্ধ মরুজ্বালা, দিশাহারা তৃষা-হাহাকারে
দহনান্ত ভস্মময় বুকে,
হু-হু-করা ব্যবধান বাষ্পঘন বিষ-মন্ত্র-সুরে,
মরণের কঠিন কৌতুকে !—

ধরি' সেই রুদ্র-পান অঞ্জলিতে রাখি দিব্য ফাঁকে,
টলোমল তরল অনল,
কে করিবে অপব্যয় আকাঙ্ক্ষিত এ-মাদক রস,
মৃত্যুসুরা—কামনা-গরল !
—জাগিয়া উঠুক্ তবে দেহপিণ্ডে সুপ্ত স্মরহর,
বিপ্লবী জিহ্বায় তার দিই তবে ঢালি' তেজস্কর
এই বহ্নি রসায়ন—দগ্ধ হোক্ ক্ষুব্ধ ওষ্ঠাধর
সৃষ্টি-সুখ দুর্ম্মর চুম্বনে,
ঘূর্ণি-লাগা জৈব-রাগ যাতে হবে মুহূর্ত্তে বিবশ—
নির্ব্বিশেষ জীবন-মরণে।

## পিরামিডের পরমায়ু

মিশরের পিরামিডগুলি তৈরী হয়েছিল ৪,৭০০ বছর আগে। আজও পর্য্যন্ত এরা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, পিরামিডগুলি এমনি ভাবেই আগামী আরও বহু সহস্র বৎসর টিঁকে থাকবে। চিওপস-এর ( cheops ) পিরামিডটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং বৃহত্তম। কালের স্থূল হস্তাবলেপে এর শীর্ষদেশটুকু মাত্র ধ্বসে পড়েছে এবং চূণাপাথরের সূক্ষ্ম অলঙ্করণের কাজও কিছু কিছু নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া এই বিরাট সমাধি-স্তূপের বাকি সবটাই এখনও অভগ্ন এবং অটুট অবস্থায় আছে।

## কার মস্তিষ্কের ওজন বেশী : পুরুষের না স্ত্রীলোকের

পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন নারীর মস্তিষ্কের চেয়ে কয়েক আউন্স বেশী। গড়পড়তা মানুষের মগজের ওজন প্রায় তিন পাউণ্ড। ওজনের এই ন্যূনতার জন্যে মেয়েদের মনে অবশ্য হীনতাভাব ( inferiority complex ) সৃষ্টি হওয়ার কোনো হেতু নেই। কেননা বুদ্ধিবৃত্তি, বোধি ( intuition ) এবং এই জাতীয় অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সঙ্গে মস্তিষ্কের আয়তনের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, প্রকাণ্ড মগজের মালিকরাও আকাট মূর্খ হতে পারে।

যথোচিত অনুশীলনের ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নারীরাও যে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারেন তার নজীর হিসাবে প্রাচীন ভারতের বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, বৌদ্ধসূক্ত বা থেরী গাথার রচয়িত্রী অম্বপালী, খনা, লীলাবতীর কথাই শুধু নয়, বর্ত্তমান যুগের কয়েকজন বিদুষী পাশ্চাত্য মহিলার কথাও বলতে পারা যায়। যেমন : মাদাম কুরি, পার্ল বাক, সেল্‌মা লাগেরলফ, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা প্রভৃতি। এঁরা চারজনই নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী।

## মার্কিন কুকুর ও দেশী কুকুর

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পোষা কুকুরদের এক পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, মার্কিন নরনারীর কুকুর পোষার সখ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে আমেরিকায় এখন ( ১৯৬১ সনে ) পোষা কুকুরের সংখ্যা দুই কোটি ষাট লক্ষ—১৯৩০ সনের চেয়ে চারগুণ বেশী। এই বিপুলসংখ্যক কুকুর পোষ্য হিসাবে থাকে ১৮,০০০,০০০টি পরিবারে। এদের খাদ্যের জন্য বছরে খরচ হয় ৩৫০,০০০,০০০ ডলার ( ১ ডলার = প্রায় ৫৲ টাকা ), ওষুধের জন্য ১২০,০০০,০০০ ডলার এবং এদের ব্রাশ, চামড়ার রজ্জু, কলার ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের জন্য ব্যয়িত হয় মোট ২৫,০০০,০০০ ডলার।

এই রাজভোগ খাওয়া সারমেয়কুলের সঙ্গে একবার আমাদের দেশের হতভাগ্য পথবাসী, উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরদের অবস্থার তুলনা করুন। বিত্তশালী লোকের বাড়ীতে পোষ্য অবস্থায় থাকবার সৌভাগ্য হয় মুষ্টিমেয় কতকগুলি কুকুরের। বেশীর ভাগই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এই পথবাসী কুকুরদের জন্য একজন বরণীয় বাঙালী মনে গভীর বেদনা অনুভব করতেন। তিনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অনুরাগী এক যুবকের পিতা ছিলেন কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলবিশেষের চেয়ারম্যান। তিনি যাতে সি, এস, পি, সি-এর কর্ত্তাদের ব'লে ঐ সকল পথবাসী কুকুরদের জন্যে স্থায়ী আস্তানা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করে দেন সেজন্যে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র তাঁকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এ হ'ল ১৯৩৮ সনের কাছাকাছি সময়কার কথা। ভবঘুরে কুকুরদের জন্য একটি মঠ করার সঙ্কল্পও নাকি শরৎচন্দ্রের ছিল। কিন্তু কুকুরদের দুর্গতি লাঘবের জন্য তিনি যে সকল পরিকল্পনা করেছিলেন তাদের মধ্যে কোনটাই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কাজেই আমাদের দেশের কুকুরদের অবস্থা ২৩ বছর আগে যে রকম ছিল আজও ঠিক তেমনি ধারাই আছে।

## শয়তানের দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে রমণীয় দ্বীপমালার মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটি দ্বীপ—আজ Devils Island বা শয়তানের দ্বীপ নামে এর পরিচিতি, কিন্তু প্রকৃতি এই দ্বীপটির পরিকল্পনা করেছিল বুঝি পৃথিবীতে স্বর্গের একটি সৌন্দর্য্যচ্ছবি সৃষ্টির জন্যেই।

অনেকে বলেন, সারা পৃথিবীতে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আবহাওয়া এবং প্রীতিকর উষ্ণতা ( temperature ) আর কোথাও হতে পারে না। নিরত প্রবহমান মৃদু বাতাসের দরুণ এখানকার জমি থাকে শুকনো। জলাভূমি এবং বদ্ধ জলাশয় নেই বলে এখানে মশারও উৎপত্তি হয় না।

স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্যের জন্যে এই দ্বীপপুঞ্জ একদা 'আইল্‌স্ দু সালত' নামে পরিচিত ছিল। তার পর একদিন এখানে এল শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই স্বর্গকে কারাগারে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে। তার পর ক্রমে "ডেভিল্‌স্ আয়ল্যাণ্ড" এই দু'টি শব্দ সারা পৃথিবীতে কুখ্যাতি অর্জন করল।

ফরাসী দণ্ডবিধি অনুসারে যাদের অপরাধী বলে গণ্য করা হ'ত তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে নির্ব্বাসিত করা হত এই শয়তানের দ্বীপে। এমনি ভাবে শেতাঙ্গরা প্রকৃতির এই স্বর্গলোকে নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করল। এখানকার ভিতরের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা বলেন, স্থানীয় অধিবাসী ক্রিয়োলরা যে সুরু থেকেই শ্বেতকায় জাতিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিল এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আজও পর্য্যন্ত কাউকে চূড়ান্ত রকমের অপমান করবার ইচ্ছে হলে তারা ফিলস্ দ্য ব্লাঁক্ষ ( সাদা আদমির ছেলে ) এই কথাগুলি ব্যবহার করে।

আজ অবশ্য কোন অপরাধীকে এখানে নির্ব্বাসিত করা হয় না। যারা সাজা পেয়ে এখানে এসেছিল তাদের সকলেরই দণ্ডভোগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য এই শয়তানের দ্বীপের প্রভাব যে, তারা কেউই আর য়ুরোপে ফিরে যাবার জন্য মোটেই ইচ্ছুক নয়।

মুণ্ডশিকারীর যুদ্ধনৃত্য

এই অপরাধীদের অতীত ছিল—কিন্তু ভবিষ্যতের কোন আশা-ভরসা নেই। ফরাসী গায়েনার ক্যায়েন-এর ধূলিময় রাস্তার উপর আজও তারা অকারণে ঘুরে বেড়ায়। তাদের মনে কোন অহঙ্কার নেই, আত্মসম্মান-বোধও নেই। কিছু কিছু কাজকর্ম্ম তারা করে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই কাটে তাদের কুঁড়েমি করে, তাস খেলে, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে। সময় সময় কোন এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে তারা প্রচুর পরিমাণে 'টাফিয়ার' (এক প্রকার দিশী মদ) সদ্ব্যবহার করতে থাকে। তাদের কাছে এই পৃথিবীর কোন প্রয়োজন নেই, কেন না তারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে যে, সংসারের পক্ষে তারাও অকেজো এবং অপ্রয়োজনীয়।

মনুষ্য-সমাজের তলানিদের জীবনের এই শোচনীয় পরিণতি, ইংরেজ-কবির একটি বিখ্যাত উক্তিই শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়: "হোয়াট ম্যান্ হ্যাজ মেড্ অব ম্যান্"।

## আদিবাসীদের তাণ্ডব নৃত্য

আসামের আদিবাসী নাগারা আঙ্গামী, আও, রেঙ্গমা, লোটা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। এরা সকলেই একদা ছিল নরমুণ্ড-শিকারী। লোটা নাগারা ভিনগাঁয়ের বিপক্ষদলের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে শত্রুর মুণ্ডগুলি কাপড়ের টুকরোয় জড়িয়ে নিয়ে নিজেদের গ্রামের দিকে রওনা হ'ত। গ্রামের প্রান্তসীমায় এসে তারস্বরে চেঁচিয়ে তারা বলে উঠত—"ও শেমাসারি"—অর্থাৎ আমরা দুশমনদের নিকাশ করেছি। তাদের স্বাগত করবার জন্যে স্ত্রী পুরুষ সবাই "ও ইমাইয়ালি" (আমরা খুশী হয়েছি) এ-কথা বলতে বলতে ছুটে আসত। মুণ্ড-শিকারীরা তখন মিছিল করে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে গোটা গ্রামখানি প্রদক্ষিণ করত। নাগাদের মধ্যে নরমুণ্ড শিকারের প্রথা আজ আর নেই সত্য, কিন্তু তাদের যুদ্ধ-নৃত্যে সেই আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি অভিব্যক্ত হয়ে উঠে। সে নাচ দেখলে হৃদয়ে রীতিমত ভীতির উদ্রেক হয়।

আগেকার দিনে নাগাদের এই পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে উস্কানি দিয়ে জাগিয়ে তুলত মেয়েরা। যে পুরুষ একটি মাত্রও নরমুণ্ড শিকার করতে পারে নি তার পক্ষে পাত্রী জোটাই হত মুশ্‌কিল।

জোরগেন বিশ (Jorgen Bisch) সম্প্রতি "উলু দি ওয়ার্ল্ডস্ এণ্ড" নামে, বোর্ণিও দ্বীপে তাঁর ভ্রমণ-সংক্রান্ত যে বইখানি প্রকাশিত করেছেন তার থেকে জানা যায় যে, ঐ দ্বীপের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের আদি-বাসীদের মধ্যেও একদা নরমুণ্ড শিকারের রেওয়াজ ছিল। ধারাল

থ্যাম থামতে দেয় না

হাতিয়ার নিয়ে যোদ্ধাদের 'নরমুণ্ড শিকারীর' নৃত্যানুষ্ঠান আজও সেই বীভৎস এবং পৈশাচিক প্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বোর্ণিওর আদিবাসী মেয়েরা অপরূপ সুন্দরী। সভ্য-জগতের যে-কোন সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় সেরা সুন্দরীদের সঙ্গে তারা একই পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য। হয়ত নাগাদের ন্যায় বোর্ণিওর আদিবাসীরাও সুন্দরী কুমারীদের প্রসাদলাভের জন্যে কখনও কখনও নরমুণ্ড শিকারে প্রবৃত্ত হ'ত।

সম্প্রতি মিসেস ক্যারোল নাম্নী এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা নিউ মেক্সিকোর টাওস অঞ্চলের আদিবাসীদের যুদ্ধ-নৃত্য দেখে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন। ধারাল বর্শা ঘোরাতে ঘোরাতে এবং রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে যখন তারা তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিল তখন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আদিম বর্ব্বরতাই যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল।

নৃত্যানুষ্ঠানের পর শিমতী যখন কয়েকজন নাচিয়ের সঙ্গে খেতে বসলেন তখন দেখেন তাদের আর এক রূপ তখন তারা শান্ত, সন্তুষ্ট, পরিবারের প্রতি স্নেহাসক্ত, রীতিমত ভাল মানুষ।

## থ্যাম

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব ফিজিসিয়ান্‌স্ এণ্ড সার্জ্জনস্'-এর ছোট ছোট ল্যাবরেটারিগুলিতে একদল বৈজ্ঞানিক এমন একটি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ (chemical compound) নিয়ে কঠোর পরিশ্রম সহকারে কাজ করছেন, ক্লান্তি দূরীকরণে যার ক্ষমতা আশ্চর্য্যজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতিরিক্ত খাটুনির দরুণ কেউ যখন ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন তার রক্তে এই ওষুধ ইঞ্জেকশন করলে সে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং আরও দীর্ঘকাল একটানা শারীরিক পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ফিরে পায়।

বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত এই মহৌষধির পুরো নামটি কিন্তু রীতিমত দাঁতভাঙ্গা: ট্রিস্ (হাইড্রোক্সি মেথিল) এমিনোমিথেইন—সংক্ষেপে একেই বলা হয় 'থ্যাম'। ভেষজ-বিজ্ঞানে এই ঔষধের আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রথম এমন একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হ'ল যা মানুষের গোটা দেহের কোষগুলির অম্ল উপাদান সমূহকে (acid contents) দ্রুত এবং পুরোপুরি ভাবে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অম্ল উপাদানই ক্লান্তির আসল হেতু।

ক্লান্তিহর ভেষজ হিসাবে ভবিষ্যতে থ্যামের এত বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে শত শত বৈজ্ঞানিক এর সম্বন্ধে আরও তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। কিছুকাল আগে নিউইয়র্ক একাডেমি অব টেকনিক্যাল সায়েন্স কর্ত্তৃক ৪০০ পৃষ্ঠার যে বই বেরিয়েছে তাতে থ্যামের কার্য্যকারিতা বিশদভাবে বলা হয়েছে।

বিশেষ্য সাফল্যের সঙ্গে যাঁরা থ্যাম সম্বন্ধে গবেষণা করছেন, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন কলম্বিয়া কলেজ অব ফিজিসিয়ান্‌স্ এণ্ড সার্জ্জনস্-এর 'ডিপার্টমেণ্ট অব এনেস্থেসিয়া'র ডিরেক্টর ডাঃ গ্রেব্রিয়েল নাহাস। চল্লিশ বৎসর-বয়স্ক এই ভেষজ-বিজ্ঞানী জাতিতে ফরাসী, কিন্তু ইদানীং তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। গত তিন বৎসর যাবৎ এই যৌগিক পদার্থটি নিয়ে তিনি গবেষণা ও পরীক্ষা করছেন।

দৌড়-প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী, সশস্ত্র বাহিনীর সৈনা, মুষ্টিযোদ্ধা, হাতের কাজ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনকারী এবং আর যে-কোন শ্রেণীর লোককেই বহুক্ষণ একটানা শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, সে-ই থ্যাম ইঞ্জেকশন দ্বারা উপকৃত হবে। মানসিক এবং প্রক্ষোভজনিত ক্লান্তিতে (emotional fatigue) যারা ভেঙে পড়েছে, থ্যাম ব্যবহারে তাদের কিন্তু কোন উপকার হবে না।

থ্যামের কার্য্যকারিতার কথা ইদানীং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিল্পের (industry) ক্ষেত্রে এর ব্যবহার চালু আছে আজ কুড়ি বৎসর যাবৎ। সেই অবস্থায় এই জিনিষটি বিষাক্ত। একেই বিশোধিত করে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

প্রায় দশ বৎসর যাবৎ বহু গবেষক শিল্পে ব্যবহৃত থ্যাম নিয়ে টেষ্ট টিউবে পরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু মানুষ বা পশুর ওপর এর প্রয়োগের চেষ্টা তাঁরা করেন নি।

১৯৫৮ সনের গ্রীষ্মকালে আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষ একদল বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করলেন ক্লান্তিনাশক একটি ঔষধ আবিষ্কারের কাজে। এই সময়েই থ্যাম গবেষণায় এগিয়ে এলেন ডাঃ নাহাস। তখন তিনি ওয়াশিংটনের 'ওয়াল্টার রীড আর্মি মেডিক্যাল সেণ্টারে' মৌলিক গবেষণার কাজ করছিলেন। অবসন্ন মাংসপেশীগুলিকে আবার সতেজ করে তুলতে পারে এমন একটি যৌগিক পদার্থের সন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিশোধিত থ্যাম নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন।

ডাঃ নাহাস আবিষ্কার করলেন যে, দ্রুত স্পন্দমান হৃদ্‌পিণ্ডকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার ব্যাপারে এই ঔষধের ক্রিয়া রীতিমত বিস্ময়কর। এর পর ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রয়োগ ক'রে চমৎকার ফল লাভ করলেন ডক্টর নাহাস। অবশেষে তিনি নিজের উপর এর পরীক্ষা করলেন।

ডাঃ নাহাস এবং তাঁর বন্ধু ডক্টর রবার্ট গালাঘোস স্থির করলেন যে,

ওয়াশিংটনের রক ক্রীক পার্কের ভেতর দিয়ে দৌড়াবার সময় তাঁরা থ্যামের কার্যকারিতা সম্বন্ধে মৌখিক পরীক্ষা ( oral trial ) করবেন। ডি সি. থ্যাম অত্যন্ত বিস্বাদ। কাজেই পার্কে গিয়ে তাঁরা গিলে ফেলার বদলে, ষ্টমাক-টিউবের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থ্যাম পাকস্থলীর ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা দেখে এক পুলিশ-পুঙ্গবের ত চোখ ছানাবড়া—ভাবলে, এরা দু'জনেই ঝানু নেশাখোর। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাদের পানে তাকিয়ে রইল। ডাঃ নাহাস ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললেন, সে কিন্তু মোটর-কারে চেপে কিছু সময় ধাবমান্ 'থ্যাম'-গবেষকদ্বয়ের পশ্চাদনুসরণ করল।

ডক্টর নাহাস ও তাঁর বন্ধুর এই পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, থ্যাম গলাধঃকরণ করলে তাতে ক্লান্তি দূর হয় না। এ নিয়ে আরও গবেষণা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ইঞ্জেকশনের সাহায্যেই এই ঔষধ দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

আজ ডাঃ নাহাস এবং আরও বার জন বিজ্ঞানী অন্ততঃ আটটি 'থ্যাম রিসার্চ প্রোজেক্ট'-এ কাজ করছেন। এঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হচ্ছে আকস্মিক 'শক্'। কোন মারাত্মক এবং প্রচণ্ড আঘাতের ফলে সহসা জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় অনেকের মৃত্যু হয়। এই 'শক্'-জনিত মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারেন নি। দেখা যাক এক্ষেত্রে থ্যামের হিম্মত কতটুকু।

শুধু ক্লান্তিহর ভেষজ রূপেই নয়, আরও নানা ভাবে থ্যাম মানুষের উপকারে আসবে। অস্ত্র-চিকিৎসার পরে, মস্তিষ্কের টিউমার, বহুমূত্র রোগীদের বেলায়, এক জনের শরীর থেকে অপরের দেহে রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে থ্যাম ব্যবহারে বিশেষ সুফল লাভ করা যাবে—বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা একথা বলছেন জোরগলায়।

আজ অবশ্য আমার এবং আপনার পক্ষে কাছেপিঠের কোন ভেষজালয়ে এমন কোন ক্লান্তিনাশা 'থ্যামবটিকা' পাবার সম্ভাবনা নেই যা গিলে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্ত দেহ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে যে-ভাবে, শুধু ডক্টর নাহাসের গবেষণাগারে নয়, অন্যত্রও ক্রমাগত পরীক্ষণ চলছে, তাতে এই আশা পোষণ করা অসঙ্গত নয় যে, অচিরেই থ্যামের এমন একটি 'মৌখিক সংস্করণ' ( বটিকার আকারেই হোক বা অন্য যে আকারেই হোক ) বাজারে পাওয়া যাবে যা আমরা সহজেই চিবিয়ে অথবা গিলে গলাধঃকরণ করতে পারব।

কিন্তু কখন? সাবধানী বিজ্ঞানীরা বলেন, এ শুধু আরও কিছু সময় এবং গবেষণা-সাপেক্ষ ব্যাপার।

সেদিন যখন বাস্তবিকই আসবে, তখন প্রচুর শারীরিক পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে আপনি যখন একেবারে নেতিয়ে পড়বেন তখন থ্যাম আবার চেতিয়ে তুলবে আপনাকে। লোক সভায় এবং বিধান সভায় আসন-লাভের জন্যে সম্প্রতি যাঁরা ভোট সংগ্রহে আদাজল খেয়ে লেগে গেছেন, বাস্তবিকই তাঁদের অনেকের "পানে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই।" কিন্তু পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে আসন-প্রার্থীরা যখন থ্যাম খেয়ে তাল ঠুকে আসরে নামবেন তখনকার কথা ভাবুন। অবিশ্রান্ত এবং অক্লান্ত ভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করেও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বেন না তাঁরা, শক্ত থামের মতই খাড়া হয়ে থাকবেন।

## ব্যাধির বিচিত্র গতি

কতকগুলি ব্যাধির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্প্রতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এক আশ্চর্য্য তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, সেগুলির নাকি যৌন পক্ষপাতিত্ব আছে। কতকগুলি আক্রমণ করে পুরুষকে, আর কতকগুলো গিয়ে চড়াও হয় মেয়েদের উপর।

'দি আর্থরাইটিস্ এণ্ড রিউমাটিজ্‌ম্ ফাউণ্ডেশনে'র রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 'রিউমাটয়্‌ড স্পণ্ডিলাইটিস' নামক মেরুদণ্ডের এক জাতীয় বাত- যা অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়- নারীদের উপেক্ষা করে এবং গ্যাট হয়ে চেপে বসে পুরুষের পিঠে। এই রোগাক্রান্তদের আনুপাতিক হার হচ্ছে—পুরুষ ১০ : স্ত্রীলোক ১। রিউমাটয়্‌ড আর্থ-রাইটিস-এর বেলায় কিন্তু উল্টো ব্যাপার—এই অসুখে যারা ভোগে তাদের মধ্যে শতকরা আশীজনই হচ্ছে স্ত্রীলোক। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি এমনি ধরণের আর একটি রহস্যময় তথ্য প্রকাশ করেছেন। ঠোঁট, জিহ্বা, ইত্যাদির ক্যান্সারে মৃত্যুর আনুপাতিক হার হচ্ছে—পুরুষ ৪ : স্ত্রীলোক ১। কিন্তু ফুস্ফুস্ এবং গলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে সাতজন পুরুষের মৃত্যু হয় সে ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক মরে মাত্র ১ জন। পক্ষান্তরে বুকের ক্যান্সারে প্রতি বৎসর ২৪,০০০ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। আর এতে পুরুষ মারা যায় মাত্র ২৫০ জন।

কিন্তু ব্যাধির এই যৌন পক্ষপাতিত্বের সবচেয়ে মারাত্মক রূপ দেখা যায় করোনারি হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে। এই ব্যাধিতে স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের মৃত্যুর হার ১০ থেকে চল্লিশ গুণ পর্য্যন্ত বেশী।

উচ্চ রক্তচাপের কিন্তু মেয়েদের উপরেই নেকনজর বেশী। আনুপাতিক হার হচ্ছে—স্ত্রী ২ : পুরুষ ১। গবেষণার ফলে কিন্তু দেখা গেছে যে, এতে পুরুষের চেয়ে কম ক্ষতি হয় স্ত্রীলোকের।

মেয়েদের কোন কোন ব্যাধির আর একটি বিচিত্র প্রকৃতি দেখা যায় তখন—যখন তাঁরা গর্ভধারিণী হন। যে সকল স্ত্রীলোক হাঁপানি, বিভিন্ন রকমের আর্থরাইটিস্ অথবা এই ধরণের অন্য কোন ব্যাধিতে ভোগেন, গর্ভধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য হয়ে তাঁরা দেখেন যে, রোগের সব লক্ষণ দূর হয়ে গেছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আবার দেখা দেয় যাবতীয় লক্ষণ।

ব্যাধি নিরাময়ে নারী এবং পুরুষের যৌন হর্ম্মোনের ( Sex hormones ) উপযোগিতা আজ সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং শরীর-বিজ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক একবাক্যে স্বীকৃত এবং পরীক্ষিত। ১৯৫৬ সনে সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল প্রোফেসার অব মেডিসিন ডাঃ জেসি মারমোরষ্টোন ঘোষণা করেন যে, হৃদ্-রোগে আক্রান্ত পুরুষদের বেলায় স্ত্রীলোকের হর্ম্মোন বিশেষ কার্য্যকর হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ডাঃ মারমোরষ্টোন প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রথমে লস এঞ্জেলেসের প্রত্যেকটি হাসপাতালে গিয়ে হৃদ্‌রোগাক্রান্তদের ছয়টি ক'রে প্রশ্ন করেন। তাঁর তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই আশা পোষণ করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, নারীর যৌন হর্ম্মোন ব্যবহারের ফলে পুরুষের হৃদ্‌রোগজনিত মৃত্যুহার হ্রাসপ্রাপ্ত হবে।

তাঁর তথ্যানুসন্ধান এবং গবেষণা যতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তা থেকে চিকিৎসকেরা এই মত প্রকাশ করছেন যে, নারীর যৌন হর্ম্মোন ( Female sex hormone ) ব্যবহারের ফলে পুরুষদের হৃদ্-রোগজনিত মৃত্যুহার হ্রাস পেতে পারে এবং হৃদ্‌রোগের আক্রমণে যে পুরুষ একেবারে কাবু হয়ে পড়েছেন তিনি সুস্থ সবল হয়ে দীর্ঘজীবী হতে পারেন।

ন. ভ.
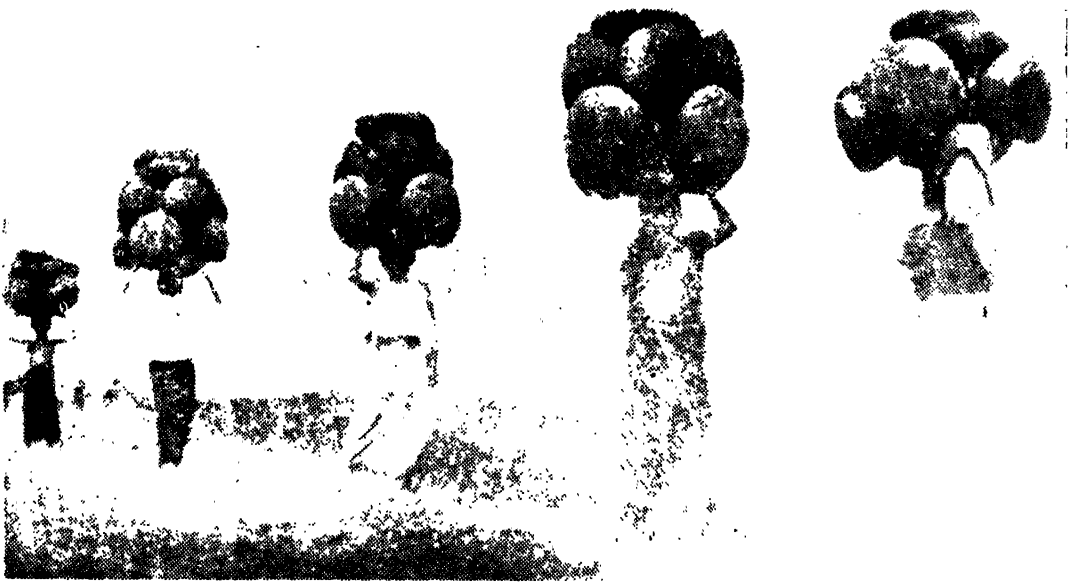
বলিদ্বীপের পসারিণী

## মাথা লাগানো

আমাদের দেশের কুলী-কামিন মেয়েরা মাথায় ক'রে মোট বয়, অবশ্য পাহাড়ী অঞ্চলের মেয়েরা ছাড়া। বৃহত্তর ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকায় এবং আফ্রিকার উপকূল-সংলগ্ন দ্বীপগুলিতেও মেয়েরা মাথায় ক'রে মোট বয়। হাইতি-দ্বীপ ও বলি-দ্বীপে মোটঘাট বওয়ার কাজটা প্রধানতঃ মেয়েরাই ক'রে থাকে। আমাদের দেশে অবশ্য তা নয়। কাজটার ভাগ পুরুষরা নেয়, এবং সম্ভবতঃ বেশীর ভাগটা তারাই করে। তবে তারাও মোটগুলোকে মাথায় ক'রেই বয়।

উপরি-উক্ত অঞ্চলগুলিতে ভারবহনের কাজে মাথার মধ্যেকার শাঁসটাকে না লাগিয়ে তার খোলাটাকেই কেন কেবল লাগানো হয়, ভারবাহী পশুদের অনুকরণে পৃষ্ঠ বা স্কন্ধদেশের ব্যবহার কেন করা হয় না, এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

ভারত, দ্বীপময় ভারত, আফ্রিকা ও আফ্রিকার উপকূলের নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলির অধিবাসীদের নিত্যকর্ম্মাচরণের মধ্যে আরও কিছু কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। যেমন, আসন-পিঁড়ি হয়ে বসা, খাদ্যবস্তুতে হাতের আঙুল লাগিয়ে আহার করা, সেলাই-না-করা বা অংশতঃ সেলাই-করা বস্ত্র পরিধান। অথচ এই বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষগুলি সভ্যতার যে ঠিক একই স্তরে অবস্থিত, তাও সত্য নয়।

স. চ.

## ডাইনে বাঁয়ে

মোটামুটি অনুমান করা যায় সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ২০ কোটি লোক ন্যাটা অর্থাৎ তাহারা যাবতীয় কাজকর্ম্ম, যাহা সাধারণ লোকের দাক্ষণ হস্তের কর্তব্য, তাহা বাম হস্তে করিয়া থাকে। হস্তাক্ষর-বিশারদেরা বলেন, ন্যাটার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। একটি দেশের হিসাবে দেখা যায়—২৫ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে ক্লাসে প্রতি শত ছাত্রদের মধ্যে

হাইতি-দ্বীপের পসারিণী

মাত্র ৩ জন বাম হস্তে লিখিত ; এখন সেখানে তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে প্রতি শতে ১১। পূর্ব্বে এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ন্যাটা শিশুদের জোর করিয়া ডান হাত চালাইবার অভ্যাস করাইতেন। এখন তাঁহারা বড় একটা তাহা করেন না। Human Engineering Laboratory-র এক জরীপে দেখা গিয়াছে, উত্তর-আমেরিকার এক-চতুর্থাংশ লোকই প্রথমতঃ ন্যাটা ছিল ; কিন্তু বাপ-মায়ের ধমকে আর শিক্ষকগণের হুমকিতে তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের স্বাভাবিক প্রবণতা (natural tendencies) পরিহার করিয়া ডান হাত চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এরূপ জোর করিয়া স্বাভাবিক প্রবণতার বিরুদ্ধে চালানো হইলে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ বিকাশ লাভ করে না। যদিও এই মতের স্বপক্ষে খুব বেশী প্রমাণ নাই তথাপি আজকাল সকলেই অল্প-বিস্তর ঐ মত অনুসারেই চলিয়া থাকেন ; অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক ভাবে যে যে-হাতেই কাজ করুক না কেন তাহাকে জোর করিয়া অন্য জিরাফের হৃৎযন্ত্র ধরাইবার চেষ্টা করা হয় না।

একটা প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগা সম্ভব—জিরাফের হৃৎপিণ্ডটি কি খুবই বৃহৎ ? কারণ পশুটির গলা সাধারণতঃ ১২ ফিট লম্বা হয়। এই দীর্ঘ পথ রক্ত চলাচল সুগম করিবার জন্য নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী একটি pump দরকার ; নচেৎ হৃদপিণ্ড হইতে এতটা দীর্ঘপথ বহিয়া রক্তস্রোত কেমন করিয়া মস্তিষ্কে গিয়া পৌছিবে ? হৃৎপিণ্ডই প্রাণীদেহে রক্ত চলাচলের নিয়ামক। কাজেই জিরাফের বক্ষস্থলের অভ্যন্তরে বিধাতা এক অতি বৃহৎ ও শক্তিশালী হৃৎপিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, জিরাফ মাথা নীচু করিলে যাহাতে হৃৎপিণ্ড হইতে সকল রক্ত হঠাৎ বেগে ধাওয়া করিয়া গিয়া মস্তিষ্কের শিরা বিদীর্ণ করিয়া না দিতে পারে সেই জন্য রক্ত চলাচলের নালীতে উপযুক্ত স্থানে একটি শক্ত কপাট (valve) আছে, যাহাতে সেই পথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্তপ্রবাহ না হইতে পারে। আবার যখন জিরাফ মাথা উঁচু করে তখন যাহাতে সকল রক্ত মস্তিষ্ক ছাড়িয়া হঠাৎ নীচের দিকে নামিয়া না আসিতে পারে সেজন্য উক্ত কপাটটি সেখানেও সতর্ক প্রহরীর কাজ করিয়া থাকে।

হ. প্. ম.

# ত্বরণ

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প)

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ঘরে-বাইরে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে। যেন অসামাজিক কিছু করে ফেলেছি। সাইকোলজির অধ্যাপক আমার সহকর্মী বিজনবাবু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, স্ত্রীকে সবদিক্ থেকে খাটো করে রেখে পুরুষ নাকি এক রকমের তৃপ্তি পায়। আমার মধ্যে সে-রকম একটা সেকেলে পুরুষ আত্মগোপন করে ছিল।

মফঃস্বল শহরের ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা করি। সুতরাং মোটামুটি লেখাপড়া-জানা একজন কাউকে বিয়ে করব, এই ছিল সকলের ধারণা। কলেজের ছাত্রীরাও দু'একজন বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। প্রথম প্রথম শিক্ষকোচিত মর্যাদা রক্ষা করে চা-ও খাইয়েছি। বৌদি তাই নিয়ে মাঝে-মধ্যে কটাক্ষও করেছে। বলেছে, 'ওদের কাউকে যদি মনে ধরে ত বিয়ে করে ফেল না?' আমি চুপ করে থেকেছি। আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, কোন ছাত্রীকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে আমার রুচিতে বাধে। কলেজের পাঠ আর জীবনের পাঠ যে এক নয় একথা বৌদিকে বোঝাবার অপচেষ্টা করি নি। কিন্তু আমার নিরুত্তরের সুযোগ নিয়ে বৌদি অনেক কথাই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। অনার্স ক্লাসের ছাত্রী কণিকা নাকি আমার প্রেমে পড়েছে, আমাকে দেখবার জন্যই তার আনাগোনা, এমনি আরও কত কি! স্থূল ঠাট্টা করে বৌদি বলেছে, 'ভাই ঠাকুরপো, কণিকাকে তুমি ঘরে নিয়ে এস, তা হলে রোজ রোজ আর ও বেচারাকে এত কষ্ট করতে হয় না।'

কণিকা ভাল মেয়ে। বুদ্ধিমতী সন্দেহ নেই। কিন্তু ও-ও বোধ হয় একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছিল। ওর একতরফা বাসনাকে রং চড়িয়ে ছাত্রীমহলে এমনভাবে প্রচার করেছিল যে, আমাকে জড়িয়ে বেশ মুখরোচক একটি প্রেমোপাখ্যান রচিত হয়েছিল। সহকর্মীরাও কেউ কেউ দু'একটি হালুকা মন্তব্য করেছিলেন। লজ্জায় মুখ তুলতে পারি নি আমি। শুধু বিজনবাবুকে বলেছিলাম, 'যে প্রেম পরিণয়ে পরিণত হয় না, তাতে আমার শ্রদ্ধা নেই।'

'প্রেম যদি হয়ে থাকে, পরিণয় হবেই।'—মৃদু হেসে বলেছেন বিজন সেন।

'না।' দৃপ্ত উত্তর আমার। 'পরিণয় অসম্ভব বলেই প্রেমে আমি নিরুৎসাহ বোধ করছি বিজনবাবু। একে আপনি ফাঁকা আদর্শবাদই বলুন, আর ফাঁপা আবেগই বলুন—ছাত্রী ছাত্রীই, অধ্যাপকের স্ত্রী সে হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।'

নিজেও একান্তে ভেবে দেখেছি। কণিকা সুন্দরী, সপ্রতিভ। কোন দিক্ থেকেই আমার অযোগ্যা নয়। তবু কিছুতেই ভাবতে পারি না, যে সলজ্জ সশ্রদ্ধ ছাত্রী একটি নির্দিষ্ট আসনে ব'সে প্রতিদিন মুগ্ধ হয়ে আমার কাছে সাহিত্যের পাঠ নেয়, সে আবার জীবনের সঙ্কীর্ণ দৈনন্দিনতার মধ্যে এসে পড়বে। অধ্যাপকের আটপৌরে জীবনটা দেখে তার মুগ্ধতা নিঃশেষে মুছে যাবে; অভাব-অভিযোগ নিয়ে অধ্যাপকের কণ্ঠে আসবে তিক্ততা, ছাত্রীর শ্রদ্ধা মুছে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের দাবী। এমনি আরও কত কি ভেবেছি।—ছাত্রী ও স্ত্রী নারীর দু'টি স্বতন্ত্র সত্তা। আমি স্ত্রী চাই, প্রেম চাই। স্ত্রী আসবে স্ত্রী হয়েই। তার কাছে আমার চাওয়া একটুও ব্যাহত হবে না পুরণো দিনের কোন একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের স্মৃতিতে।

তবু অধ্যাপকের স্ত্রীর আর একটু লেখাপড়া জানা উচিত ছিল, অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাস হলেই শোভন হ'ত, ভেবেছে সবাই। শোভনা তখন ম্যাট্রিক দিয়েছে। বিয়ে হয়ে গেল আমার সঙ্গে। কলেজের সম্মান বাঁচাতে গিয়েই বিয়েটা ক'রে ফেললাম। আমি কিন্তু একটুও অগৌরব বোধ করি নি। বরং মনে হয়েছে যেন কলেজের ছাত্রীদের প্রতি নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের প্রমাণ দিতে পেরেছি।

শোভনা শুনেছে সবই। লজ্জার সীমা নেই ওর। সর্বক্ষণ যেন সঙ্কুচিত হয়ে আছে। বন্ধুবান্ধবেরা আসেন শোভনা চা-জলখাবার দেয়, স'রে যায়। ছাত্রীরা আসে, কণিকাও, তেমনি দূরে দূরে থাকে শোভনা। প্রথম প্রথম ভালই লাগত। কিন্তু ক্রমশই যেন মনে হতে লাগল শোভনা বড় বেশী আত্মনিষ্ঠ। কিছুতেই যেন সামাজিক হতে পারছে না।

কতদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখেছি কণিকা ব'সে

গল্প করছে শোভনার সঙ্গে। শোভনা শুধু শ্রোতা। মনে মনে বিরক্ত হয়েছি। দুটো কথা বলতেও পারে না!

কণিকা কত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে। এক একদিন আমাকে দেখে শুধোয়, 'আপনার থিসিসের কত দূর হ'ল?' আলোচনা আরম্ভ হয়। স'রে যায় শোভনা।

ভালোভাবেই ম্যাট্রিক পাস করল শোভনা। খবরের কাগজে রেজাল্ট বেরুল। নিজেই একটা কাগজ কিনে খবরটা দেখলাম। খুশী হলাম। খুশী হ'ল শোভনাও। বাড়ি ফিরে খবরটা দিয়েই বললাম, 'কি খাওয়াবে বল?'

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ঘরে কেউ নেই। যে উত্তরটা মুখে কথা না বলেও দেওয়া যেত (অন্ততঃ কণিকা হলে তাই দিত), শোভনা সেদিক্ দিয়েই গেল না। বললে, 'কণিকা ওরা আসুক, রসগোল্লা আনাব'খন।'

মনে হ'ল, শোভনা সব দিতে পারে না, কেননা সে সব জানে না। বড় কম জানে সে।

আগের মত তেমনি আসে কণিকা। পড়ে, আলোচনা করে। বি.এ.তে ফার্ষ্ট ক্লাস পাবে আশা করছে। তাই আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

সেদিন কণিকা চলে যেতেই শোভনা বললে, 'তোমার হাতে ত সময় রয়েছেই, আমাকে একটু পড়াবে?'

ওর কথায় বোধ হয় একটু খোঁচা ছিল, তাই প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই পড়াব। পড়লে তুমি নিশ্চয়ই পাস করবে।'

শোভনার উৎসাহে আমি খুশী হলাম। প্রতিদিন যথাসময়ে ঠিক পড়তে বসে। আমি এলেই এক কাপ চা দিয়েই পড়ায় মন দেয়। বুঝতে পারি, দুপুর থেকেই পড়ছে। তখন যেখানে-যেখানে ঠেকেছে এখন তার মানে, ব্যাখ্যা জেনে নেয়।

কোনদিন হয়ত বলি, 'রোজই ত পড়ছ, চল না আজ একটু গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'গঙ্গার ধারে! চল।'—আবেগহীন নিরুৎসাহ শোনায়। প্রস্তুত হয়ে নেয় শোভনা।

এপার থেকে গঙ্গার ওপারের আলোগুলো দেখায় যেন তারার মালা। ঢেউয়ের উপর জেলে-ডিঙ্গির আলো প'ড়ে চিকমিক করে।—'কি সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ!'

'সত্যি!' শোভনা বলে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকেই বলে, 'আজ আর নয়, চল। আজ সন্ধ্যেয় কিচ্ছু পড়া হ'ল না।'

ফিরতে হয়।

মাঝে মাঝে বিরক্ত হই। ঘরে ফিরে পাই না একান্ত আপন হাতের পরিচর্যা। আবার ভাবি, সামনেই পরীক্ষা, আহা, পড়ছে পড়ুক। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ি। পাশের খাটে শোভনা পড়ে। যখন যেটা দরকার ডাক দিয়ে জেনে নেয়। কয়েকদিন ধ'রে ইণ্টারমিডিয়েট টেষ্ট পেপার কষছে। পাতার পর পাতা উত্তর করে রাখে, শুয়ে শুয়ে দেখি। বুঝলাম পরীক্ষায় ভালই করবে শোভনা। করলও।

এবারও রেজাল্ট নিয়ে এলাম আমি। ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে শোভনা। খবরটা পেয়ে খুব খুশী। খুশীর মাত্রা আমারও কিছু কম নয়। নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়েছি শোভনাকে।

যাক্, এই দীর্ঘ কয়েকমাস গেল পড়া-পড়া নিয়ে। আজ শোভনাকে পাওয়া যাবে নিবিড় ক'রে। বিছানায় শুয়ে কি একটা বই দেখছি আর ভাবছি, আজ এ ঘরে আসতে যেন বড় বেশী দেরি করছে শোভনা। খুট্ করে দরজায় আওয়াজ হতেই পাশ ফিরে দেখলাম, ও এল। মুখের খুশির ভাবটা এখনও অম্লান। নিজের বিছানার দিকে যেতে গিয়েও ফিরে এল শোভনা। সব আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করেও নির্বিকার থাকবার ভান করে আছি। বিছানায় আমার পাশে এসে বসল শোভনা। মিষ্টি হেসে বললে, 'তোমার আজ খুব আনন্দ হয়েছে, না?'

শোভনাকে ঝপ্ ক'রে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই।' হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলাম। আদরে সোহাগে ওকে বিব্রত করে জিজ্ঞেস করলাম, 'বল, তুমি কি চাও? যা চাইবে তাই দেব।'

ধীরে ধীরে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললে শোভনা, 'আমি অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ব।'

বাহুবন্ধন যেন আমার শিথিল হয়ে গেল। ছাত্রীকে ঘরের স্ত্রী করে আনি নি, কিন্তু ঘরের স্ত্রী যে ছাত্রী হয়ে গেছে!

# স্তব্ধ প্রহর

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আট

বাস্ থেকে নেমে হাঁটাপথে আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে শোভনা একটু দ্রুতপদেই হাঁটছিল। ফিরতে একটু বেশী দেরি হয়ে গেছে। রাত্রের রান্নার কাজ ত আছেই, তা ছাড়া আশুবাবু নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে থাকবেন।

আশুবাবুর তার জন্যে এই ব্যস্ত হওয়াটাই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে শোভনার নিজেকে একটু অপরাধীই মনে হয় অবশ্য। যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার অভাবটা তার নিজেরই চরিত্রের ত্রুটি ভেবে মনকে সে শাসন করবার চেষ্টা করে না এমন নয়। কিন্তু সে শাসনে কোন ফল হয় ব'লে মনে হয় না। আশুবাবু প্রতিদিন নতুন কি স্নেহের পরিচয় দেবেন এইটেই যেন তার মনের নাতিস্ফুট একটা আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, একথা সে অস্বীকার করতে পারে না।

দুপুরে বেরিয়ে আসবার সময় আশুবাবুকে জানিয়ে আসবার দরকার হয় নি। তিনি তখন বিশ্রাম করছিলেন। সময়মত বেলাবেলি ফিরতে পারলে কোন-রকম জবাবদিহির দায়ে পড়তে হ'ত না। এখন আর তার নিষ্কৃতি বোধ হয় নেই। আশুবাবু বাড়ীর বাইরেই পায়চারি করছেন কি না কে জানে? কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করলে শোভনা অবশ্য অর্ধসত্য বলবার জন্যেই তখন প্রস্তুত। পুরোণ এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিল এইটুকুই জানাবে। আশা করা যায় তার বেশী কৌতুহল এর পর আর আশুবাবু প্রকাশ করবেন না।

তার সম্বন্ধে আশুবাবুর ব্যস্ততা কেন যে খারাপ লাগে, শোভনা অবশ্য মনে মনে বোঝে। এটা আশুবাবুর বিষয়ে ব্যক্তিগত কিছু বিরূপতা নয়। আসল কথা, স্নেহ, মায়া, প্রেম যা কিছুই সে জীবনে পেয়ে থাক তার জন্যে কোন বন্ধন সে অনুভব করে নি এর আগে। স্নেহ-প্রীতির হলেও কোন শাসন তাকে স্বীকার করতে হয় নি কখনও, স্বীকার সে করেও নি। চিরকালই স্বাধীনতা তার অক্ষুণ্ণ। মা'র ত এ ধরণের রাশ ব'লে কিছু ছিলই না, বড়মামা কয়েকদিন চেষ্টা করেও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর অনুপম? অনুপমের ত শাসনের কোন দাবীই ছিল না কোনদিন। শোভনাকে সে কোন বন্ধনে কখনও বাঁধবার চেষ্টা করে নি। নিজেই সে অসংলগ্ন ছিল ব'লে কি? তার উদারতা এখন ঔদাসীন্য ব'লে সন্দেহ হয়।

এত দুর্ভাবনা তার বৃথা, আশুবাবুর কাছে কোন জবাবদিহি দেওয়ার আজ দরকার হ'ল না। আশুবাবু বাড়ীতে নেই। কে একজন আগন্তুক এসে তাঁকে কোথায় ডেকে নিয়ে গেছে। তাঁর বদলে নিখিল বক্সী তার অপেক্ষায় পায়চারি করছে তারই ঘরের সামনে উঠোনে।

এই এতক্ষণে এলেন? কতক্ষণ আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন জানেন?—নিখিলের কণ্ঠস্বরে অভিযোগ।

ঘরের দরজার তালাটা খুলতে খুলতে শোভনা একটু শুষ্কস্বরেই বললে,—আপনার দাঁড়াবার কথা ছিল তা ত জানতাম না। জানলে নিশ্চয় এমন অপরাধ করতাম না।

এ বিদ্রূপের খোঁচা নিখিল বক্সীর কাছে ব্যর্থ। শোভনা দরজা খুলে ভেতরে ঢোকবার সঙ্গে নির্বিকার ভাবে সেও ভেতরে এসে বললে,—সোজা কথা অমন উল্টো ক'রে ধরেন কেন বলুন ত! সন্ধ্যে হয়ে এল তবু ফিরছেন না দেখে ভাবছিলাম। অথচ আপনাকে এগুলো না দিয়েও যেতে পারছি না।

কি ওগুলো?—নিখিলের হাতের কাগজগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে শোভনা যথাসম্ভব নিরুৎসুক ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে।

পড়েই দেখবেন'খন।—কাগজগুলো শোভনার হাতে প্রায় জোর ক'রে গুঁজে দিয়ে নিখিল ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার এখন বুঝিয়ে বলবার সময় নেই। একটা ঠিকের চাকরি আজ আবার জুটে গেছে কি না! যা দেরি করিয়ে দিলেন, চাকরি না হতেই হয়ত গিয়ে দেখব দরজা বন্ধ।

দেরি তাহলে করলেন কেন? শোভনা এবার না হেসে পারল না,—এগুলো ত পরে দিলেই পারতেন! আর না দিলেই বা কি হ'ত!

বাঃ না দিলে কি হ'ত! আপনার জন্যে কত ক'রে সংগ্রহ করেছি তা জানেন?

নিখিল বক্সী শোভনার অবিবেচনায় দারুণ ক্ষুণ্ণ হয়ে আরও কিছু হয়ত বলত, কিন্তু শোভনাই তাকে বাধা

দিয়ে হেসে বললে,—থাক, এখন আর কিছু জানতে চাই না। আপনার চাকরিটা আগে সামলান গিয়ে।

হ্যাঁ, যা বলেছেন! দরজার চৌকাঠটা পেরিয়েই আবার নিখিল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে,—কিন্তু মজা কি জানেন, দেরি করি আর নাই করি, সত্যি সত্যি এ চাকরি যাওয়া শক্ত। আমার যত গরজ, মনিবের গরজ তার চেয়ে কম নয়। সুতরাং মুখে যাই বলি, চাকরির জন্যে ভাবনা নেই।

আপনার না থাক আমার আছে! শোভনা এবার দরজার পাল্লা দুটো ধ'রে বন্ধ করতে করতে হেসে বললে, দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই! আপনি যান।

হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি ত! কাগজগুলো কিন্তু পড়বেন।

নিখিলের শেষ কথাগুলো দরজা বন্ধর শব্দেই হয়ত চাপা পড়ল।

নিখিলকে তাচ্ছিল্য কি অবজ্ঞা করবার জন্যে শোভনা তার মুখের ওপর অমন ক'রে দরজা বন্ধ করে নি। নিখিলকে বিদায় করা প্রয়োজন ত বটেই, তা ছাড়া সত্যিই তখন তার নিজেরই তাড়া। কাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি হেঁসেলে না গেলে নয়। বাড়ি ঢোকার পথে মধুর কাছে শুনে এসেছে যে আশুবাবুকে কে একজন অচেনা লোক খুঁজতে এসেছিল। তার সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে গেছেন। এতক্ষণে ফিরে এসেছেন কি না কে জানে! মধুকে দিয়ে ডাকতে পাঠাবার আগেই সে তাই যেতে চায়।

বাইরের কাপড় ছেড়ে ঘর থেকে বেরুবার মুখে বিছানার ওপর রাখা নিখিলের দেওয়া কাগজগুলোর ওপর একবার চোখ পড়ল। ব্যাপারটা কি জানবার একটু কৌতুহল না হ'ল এমন নয়। কিন্তু সময় নেই। তা ছাড়া নিখিল বক্সীকে যতটুকু চিনেছে তাতে তার কোন কথায় বা কাজে খুব গুরুত্ব দেবার দরকার আছে ব'লে মনে হয় না। বিছানার উপর থেকে কাগজগুলো তুলে একটা বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রেখে সে ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

আশুবাবু তখনও ফেরেন নি এই ভাগ্যি। শোভনা নিশ্চিন্ত হয়েই রান্নাবান্নার কাজে লাগল। কিন্তু রান্না-বান্নার কাজ শেষ করবার পরেও আশুবাবুকে ফিরতে না দেখে নিশ্চিন্তর বদলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল একটু। আশুবাবু ত সন্ধ্যের দিকে ঘর থেকে বারই হন না। এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

রান্না শেষ ক'রে শোভনা আশুবাবুর অপেক্ষায় তাঁর ঘরেই এসে বসেছিল। পুরোণ কালের দেওয়াল ঘড়িটায় আশুবাবুর মতই হাঁপানি কাশি-ধরা গলায় টানা সুরে একটা ঘণ্টা বাজতে সে চমকে উঠল। সাড়ে নটা বেজে গেল তা হলে! বৃদ্ধ হাঁপানি রোগী। আশুবাবুর রাস্তায় কোন বিপদ্-আপদ্ হয় নি ত? নইলে এত দেরি করার কি কারণ থাকতে পারে?

কিছুই অবশ্য এখুনি তার করবার নেই। আশুবাবু কোথায় কি কাজে গেছেন কিছুই জানে না। জানলেই কিছু করা কি তার পক্ষে সম্ভব?

ব্যাপারটা হয়ত এমন কিছুই গুরুতর নয়। আশু-বাবুর পক্ষে এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বটে, কিন্তু এমন ব্যতিক্রম অসম্ভব কিছু নয়। কোথাও কোন কারণে বোধ হয় আটকে পড়েছেন অপ্রত্যাশিত ভাবে। খানিক বাদেই ফিরবেন।

নিজের মনের এই ভাবনাগুলোই বিচার ক'রে দেখবার মত ব'লে হঠাৎ তার মনে হয়। আশুবাবু সম্বন্ধে এই উদ্বেগের মধ্যে সাধারণ শ্রদ্ধা-প্রীতি-কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ছাড়া আর কি কিছু নেই? আশুবাবুর নিরাপদ্ থাকার সঙ্গে জড়িত নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অস্ফুট অনিশ্চিত একটা আশঙ্কা? তার গ্রাসাচ্ছাদনের আশু সমস্যা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে মিটেছে ব'লে সচেতন মন তার হয়ত একটু ক্ষুব্ধ, আশুবাবুর অহেতুক অনার্জিত স্নেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার জন্যে কোথায় তার একটা অস্বস্তি, কিন্তু এ সবের অন্তরালে অচেতন মনের একটা নির্ভরতা কি গ'ড়ে ওঠে নি ইতিমধ্যে?

আশুবাবুর কিছু একটা হলে আবার একমুহূর্তে সে নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, এই চিন্তাটাই মনের গভীরে তাকে দোলা দিচ্ছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আশুবাবু সত্যিই বৃদ্ধ হয়েছেন। কিছুই হয়ত তাঁর হয় নি আজ। কিন্তু হওয়া অসম্ভব এমন ত নয়!

মৃত্যুর অতর্কিত অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপের পরিচয় সে ত আগেও পেয়েছে। পেয়েছে সেই তার বড়মামার বেলা। তার পর মায়ের।

মায়ের মৃত্যুটাই সেদিন সবচেয়ে বিহ্বল বিমূঢ় ক'রে দিয়েছিল।

শুধু দুঃখে-শোকে নয়, একটা যুক্তিহীন আশঙ্কায়। চরম সহায়হীনতার একটা স্তম্ভিত উপলব্ধিতে।

আজ তার মনের অতলে তেমনি একটা অনুভূতিই যেন উঁকি দিচ্ছে।

সে নিজে তখন মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছে। দুরন্ত রোগের

সব লক্ষণই তখন ধরা পড়েছে। চিকিৎসা চলছে তাদের ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব।

তারই মধ্যে মাকে হারাবার সেই আকস্মিক দুঃসহ আঘাত।

অনুপমকে বিয়ে ক'রে আলাদা সংসার পাতবার পর অনেক অনুরোধ-উপরোধ ক'রেও মাকে সে তাদের সংসারে এসে থাকতে রাজি করাতে পারে নি। মা সেই পুরোণ বাসাতেই একটি ঘর নিয়ে একা থাকতেন। তাঁকে সাহায্য করবার ক্ষমতা শোভনাদের ছিল না, থাকলেও তিনি সে সাহায্য নিতেন না শোভনা জানত।

কি ক'রে যে তিনি দিন চালাতেন তিনিই জানেন। শোভনা ইচ্ছে ক'রেই সে কথা কখনও জিজ্ঞাসা করে নি। জিজ্ঞাসা করে নি মা'র চরিত্র তার অজানা নয় ব'লে।

হাজার অনুরোধেও যাঁকে তাঁর একা থাকার সঙ্কল্প থেকে নড়ানো যায় নি, তিনি কিন্তু শোভনার অসুখের খবর পাবার পর নিজে থেকেই তাদের সংসারে এসে উঠেছিলেন শোভনাকে শুশ্রূষার জন্যে।

শোভনা তখন শয্যাশায়ী। এমনিতেই অনুপম অসহায়, অপটু। শোভনার এই সর্বনাশা অসুখে সে যেন আরও দিশাহারা জড়ভরত হয়ে গেছে।

মা'র সেই আশ্চর্য আর এক রূপ সেদিন দেখেছে শোভনা।

রীতিমত অভাবের সংসার। কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে শোভনা তার আঁচটুকু পর্যন্ত পায় নি। মা'র মুখের সেই অম্লান হাসিটুকু, তাদের সেই সঙ্কীর্ণ ছোট খোলার চালের ঘরটুকু আর তার নোংরা পরিবেশকে কি আশ্চর্য যাদুতে শুচিস্নিগ্ধ প্রসন্ন ক'রে দিয়েছে যেন।

দুখা বোদের পাড়া ছেড়ে তখন তারা আরেক অঞ্চলে বাসা নিতে বাধ্য হয়েছে।

এ বাসার সব দোষ ত্রুটি অসুবিধার মধ্যে একটি সৌভাগ্যের জন্যে তখন সে কৃতজ্ঞ।

তার ঘরের ছোট খুপরি জানলাটা খুললে খানিকটা পোড়ো জমি দেখা যায়। সেখানে আশেপাশে তাদের চেয়েও দরিদ্র বাসিন্দারা তাদের গুল ঘুঁটে শুকোতে দেয়। দু' একটা ছাগল-গরু চরতে আসে ধুলোয়-ঢাকা আগাছার শুকনো ঝোপে কিছু এক-আধটা সরস কচি পাতার সন্ধানে। বিকেলে ছেলের দল আসে খেলতে।

ওই জানলাটুকুর মুক্তি আর মা'র অম্লান মুখের হাসিটুকুই তখন শোভনাকে জোর দিয়েছে জীবনের জন্যে যোঝবার।

নেহাৎ সঙ্কীর্ণ ঘর। একটা ছোট তক্তপোশেই প্রায় সবটা জুড়ে যায়। তক্তপোশের তলাতেই সংসারের যা কিছু জিনিষপত্র রাখা হয়েছে, মায় রান্নার সরঞ্জাম পর্যন্ত।

রান্না অবশ্য হয়েছে ঘরের কোলের সরু রকটিতে। অনুপমের সেইখানেই শোবার ব্যবস্থা। মা সেই সঙ্কীর্ণ ঘরের মেঝেতেই শুয়ে কাটিয়েছেন।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই শোভনার তখন প্রায় সমস্ত দিনরাত কাটে। জোর করে উঠতে চাইলেও মা তাকে পারতপক্ষে উঠতে দেন নি।

কিন্তু রোগের কথা বা তার জন্যে কোন দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার ছায়াও কখনও তাঁর মুখে দেখা যায় নি। সবটাই যেন নিতান্ত সহজ-স্বাভাবিক ব্যাপার। অনায়াসে যেন এ সব কিছু তাচ্ছিল্য করা যায়।

মাকে ভালো করে জেনেও রোগের গ্লানিতে বিকৃত মনে এক-একবার শোভনার মনে হয়েছে, মা বোধহয় একেবারে নির্বিকার নির্লিপ্ত। তাঁর কর্তব্যই তিনি শুধু ক'রে যান, কিন্তু শোভনার এই জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব যেন তাঁকে বিচলিতই করে না।

দুঃখ দুর্ভাবনার বদলে মা'র মুখে সেই কৌতুক পরিহাসের সুরই শোনা গেছে যখন-তখন।

সেই কৌতুকের সুর নিয়েই মা হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে বিমূঢ় বিহ্বল ক'রে বিদায় নিয়ে গেছেন এ জীবন থেকে।

সেদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে শোভনা জেগে উঠে মাকে ডেকেছে। এরকম তার প্রায়ই হয় তখন। মাকে ডাকলে তিনি উঠে গা মুছিয়ে দরকার হলে জামা বদলে দেন।

সেদিন মাকে ডেকে কোন সাড়া পায় নি। না পেয়ে একটু বিস্মিতই হয়েছে। মা'র ঘুম অত্যন্ত সজাগ। বিশেষ ক'রে তার এই অসুখের মধ্যে মা তার সামান্য একটু নড়াচড়ার শব্দও যেন টের পান ঘুমের মধ্যে।

প্রথম বার সাড়া না পেয়ে শোভনা পর পর ক'বার ডেকেছে। শেষে রাগ ক'রেই জোর ক'রে উঠে ব'সে বলেছে—এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না মা!

মা তাহলে বাইরে গেছেন, মনে হয়েছে একবার। কিন্তু তাও নয়।

ঘরে তার অসুখের জন্যে তখন বাতি রাখা হয় না। হারিকেনটা বাইরের রকেই থাকে।

বাইরে সেদিন বুঝি একটু জ্যোৎস্না ছিল। জানলার ফাঁকে-আসা তারই আলোয় মা নিচেই শুয়ে আছেন, শোভনা দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু তবু সাড়া নেই কেন?

উদ্বিগ্ন হয়ে শোভনা অনুপমকে ডেকেছে—ওগো শোন, বাতিটা নিয়ে এস শীগ্‌গির।

তার পর নিজেই তক্তপোশ থেকে নেমে পড়েছে।

অনুপম তার ডাকে জাগে নি। কম্পিত পায়ে শোভনা নিজেই টলতে টলতে বাইরে থেকে হারিকেনটা নিয়ে এসেছে। সলতেটা তুলে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে মা'র দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেছে।

মা জেগেই আছেন। একটা হাত বুকের ওপর রেখে কি একটা দুঃসহ যন্ত্রণা যেন চাপতে চেষ্টা করছেন।

কি হয়েছে মা! কি হয়েছে? শোভনা মা'র বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ওই যন্ত্রণার মধ্যেই মার মুখে যেন কি এক কৌতুকের রেখা ফুটে উঠেছে শুষ্ক হাসির মত।

প্রায় চুপি চুপি অস্পষ্ট স্বরে যা বলেছেন, তা ভাল বোঝা যায় নি। মনে হয়েছে যেন বলেছেন,—এবার আর কে হারায়!

বাইরে কার পায়ের শব্দ আর গলা শোনা যাচ্ছে। আশুবাবুই কি ফিরলেন?

ক্রমশঃ

**ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর**—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা-গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭, হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৫০, মূল্য ৫'৫০।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের এই পুস্তকে তিনি তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। আবাল্য তিনি তাঁহাকে মহামনীষী ও পণ্ডিতাগ্রগণ্যরূপেই জানিতেন ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগে তাঁহার জীবনের অনেক তথ্য এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এগুলি শুধু যে বর্তমানকালের পাঠকবর্গের নিকট অমূল্য-সম্পদরূপে গৃহীত হইবে তাহা নহে, আগামী কালের পাঠকেরাও ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। বাংলা ভাষায় রচিত জীবনচরিতগুলির মধ্যে এ পুস্তকখানি যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মহত্ত্ব সম্বন্ধে এই পুস্তকখানির ঐতিহাসিক মূল্য সর্ববাদীসম্মত।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

**যবনিকা**—নীরেন গুপ্ত। ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ২বি. শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৭৯, মূল্য আড়াই টাকা।

এ পুস্তকে চারিটি ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা নাটিকা আছে। আধুনিক সমাজ-সমস্যা পরোক্ষে থাকলেও প্রত্যক্ষে এগুলিতে চিন্তার খোরাক যথেষ্ট আছে। পড়ে পড়বার সময় ( কারণ, অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয় নি ) লেখকের পাকাহাতের পরিচয় অনেক স্থলেই পেয়েছি। চরিত্রগুলি একটু বেখাপ্পা মনে হলেও লেখকের রচনানৈপুণ্যে সেগুলি এক উপভোগ্য পরিণতির সৃষ্টি করেছে। প্রথম নাটিকা "যবনিকা"র কথাই ধরা যাক্। নিজের স্বামীগৃহে ব'সে স্বামীর ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আধুনিকা তরুণী অলকা তার কুমারী-জীবনের প্রেমিক নিরঞ্জনকে বলছে, "তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে···আমার স্বামী তোমার আমার মধ্যে যা সম্পর্ক তা জানতে পারবে না,—জানতে দোব না।··· তোমাকে আমার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নি।" দু'জনার অনেক রসাল কথাবার্তার পর যখন তার গোবেচারা স্বামী সুললিতের আবার আবির্ভাব হ'ল তখন অলকা কি ভাবে স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে সব জিনিষটা মানিয়ে নিয়ে নিরঞ্জনকে পর্যন্ত আশ্চর্য করে তুললে, লেখকের কলানৈপুণ্যে সে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সার্থক হয়ে উঠেছে। "[illegible]" ও "ত্র্যী" নাটিকা দু'টিতে সূক্ষ্ম রস সৃষ্টির প্রয়াস আছে, কিন্তু সে রস সাধারণ পাঠক বা দর্শকের জন্যে নয়। শেষ নাটিকা "সকলি গরল ভেল" অস্বাভাবিক মনে হলেও এর আশ্চর্য গতিবেগ, চমকপ্রদ বাক্‌বিন্যাস ও কৌতুকময় পরিবেশ দর্শককে শেষ পর্যন্ত ধ'রে রাখবার ক্ষমতা রাখে। পাশ্চাত্ত্য শ্রেষ্ঠ লঘু কৌতুক নাটিকাগুলির মধ্যে যে ধরণের কলাকৌশল দেখতে পাওয়া যায়, লেখক যে তার কিছুটা আয়ত্তে আনতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

**উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম**—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত। সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা, ৬৪৪; মূল্য ষোল টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র পথিকৃৎ। শুধু উপন্যাসই নহে, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্র যে দান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার উত্তরসূরীরা শ্রদ্ধার সহিত নিত্য স্মরণ করে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই বহুমুখী সৃষ্টির উল্লেখ করিয়া একদা বলিয়াছিলেন যে, বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন। বহুমুখী সৃষ্টির জনক হইলেও বঙ্কিম মূলতঃ ঔপন্যাসিক। বাংলার স্কট বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি সমকালে দিকদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল সেই খ্যাতি আজিও মরে নাই। যুগান্তর তাঁহাকে উপন্যাস সাহিত্যের প্রধানের সম্মাননা দিয়াছে। তিনি সেই সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা আপন শক্তি ও সাধনার বলে অর্জন করিয়াছেন।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস হিসাবে মর্যাদা লাভ করিলেও মতান্তরে ইহা তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস। অবশ্য ইংরেজী উপন্যাস 'Rajmohan's wife'-কে হিসাবের মধ্যে ধরিলে দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিম রচিত তৃতীয় উপন্যাসের আসন লাভ করে। এই দুর্গেশনন্দিনী 'একদিন পাঠক সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের কারণ ইহার অভিনবত্ব।' অবশ্য বিমুখ সমালোচকেরা স্কটের 'আইভানহো' উপন্যাসের ছায়াপাত দুর্গেশনন্দিনীর চরিত্র-চিত্রণে ও ঘটনা সমাবেশের পারম্পর্যের উপর লক্ষ্য করিলেও তাহাতে যে দুর্গেশনন্দিনীর রস-উৎকর্ষের হানি ঘটে নাই, একথা বিদগ্ধ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমপূর্ব যুগে রচিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ' এবং রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী' উল্লেখ্য। ইহাদের সৃষ্টি চাতুর্য ও রচনা-কৌশলের প্রশংসা করিয়াও বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের সৃষ্ট ঐতিহ্যকে অতিক্রম করিয়া বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নবতর ধারার প্রবর্তনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে আমরা প্রধানতঃ (১) ঐতিহাসিক উপন্যাস, (২) সামাজিক উপন্যাস, (৩) ক্ষুদ্রাকার রোমাণ্টিক প্রণয় কাহিনী, (৪) সমস্যামূলক উপন্যাস ও (৫) তত্ত্বমূলক উপন্যাস, এই পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীতে রহিয়াছে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছে বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল। তৃতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছে রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়। চতুর্থ শ্রেণীতে রহিয়াছে কপালকুণ্ডলা এবং পঞ্চম শ্রেণীতে রহিয়াছে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। যে সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রসাদগুণে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র বঙ্গ-ভাষাভাষী সমাজের হৃদয়হরণ করিয়াছিলেন সেই প্রসাদগুণটির চিত্রমূলক বর্ণনা সমালোচকের অসাধ্য হইলেও অধ্যাপক দাশগুপ্ত পরম প্রযত্নে ও একান্ত নিষ্ঠার সহিত বঙ্কিম-প্রতিভার দিক্‌দর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন। উপন্যাসের ঐতি-হাসিকতা, সমাজশক্তির প্রতিক্রিয়া, উচ্চতম জীবনবোধের প্রভাব। হিন্দুর নৈতিক আদর্শবাদ, এ সকলই বঙ্কিম উপন্যাসের রূপনিরূপণে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রবুদ্ধ অধ্যাপক দাশগুপ্ত মহাশয়

তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থে এই সকল শক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বাংলা-সাহিত্যের পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে পূর্বসূরীরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যের যে সব খণ্ড আলোচনা করিয়াছেন তাহার পূর্ণাঙ্গ এবং সংস্কৃত রূপটি আমরা আলোচ্য গ্রন্থটিতে পাইয়াছি। সুদীর্ঘ গবেষণা এবং একাগ্র মননলব্ধ এই অসামান্য গ্রন্থটিকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। নিঃসংশয়ে ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনা শাখায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমরা ইঁহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

**দাস শ্রমিক**—অনুবাদিকা শ্রীমতী প্রিয়া নন্দী, ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২১, মূল্য ১৲।

রোগার বল্ডিন প্রণীত 'New Slavery Forced Labour' পুস্তকের অনুবাদ।

অতি প্রাচীনকালের সভ্যজাতির দার্শনিকেরাও মনে করিতেন দাস পথা সমাজের একটি মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান। কালে কালে এই মতবাদ ও ধারণা লোপ পাইয়াছে। সভ্যমানুষ আর দাস প্রথায় বিশ্বাস করে না কিন্তু এই নির্মম প্রথা দূর করিতে দেশে দেশে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। বর্তমানকালে এই হীন প্রথা আবার নূতন ক'রে আমাদের সমাজদেহে এবং রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছে—বিশেষতঃ একনায়ক রাষ্ট্রসমূহে। লোক বা রাষ্ট্র হিতের বুলি তুলিয়া বিরুদ্ধবাদীর এবং ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীর স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে গোলামে পরিণত করা হইতেছে। 'লৌহ যবনিকার' বাহিরে এই সকল সংবাদ খুব কম আসে তবে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা ভয়াবহ।

পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে এই নূতন রাজনৈতিক হাতিয়ারের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, এবং নয়াচীনের দাস শ্রমিক ও উহার ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ চিত্রই সংশ্লিষ্টদেশের পলাতকভুক্ত জেলা-নাগরিকের ব্যক্তিগত বর্ণনা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সাতটি দেশের দাস শ্রমিক সম্পর্কিত আইন আলোচিত হইয়াছে। আইনসঙ্গত ভাবে এই বর্বর প্রথা চলিতেছে।

সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল চিত্র পৃথিবীতে প্রচার করে তাহাতে নিপীড়িত মানুষ স্বতঃই উহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কি মূল্যে যে উন্নতি ক্রয় করা হইতেছে এই পুস্তক পাঠে কিছুটা বুঝা যাইবে।

**মানবতাবাদ**—শ্রীবসুধা চক্রবর্তী প্রণীত, প্রকাশক দীপায়ন, ২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, পৃষ্ঠা ২২৭, মূল্য সাত টাকা।

গ্রন্থকার মানব সভ্যতার ইতিহাসের পটভূমি অবলম্বনে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। লেখক সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী। তিনি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং নিছক যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টির সাহায্যে যে সকল সত্যে উপনীত হইয়াছেন তাহাই চিন্তাশীল পাঠক-সমাজে উপহার দিয়াছেন। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'মুক্তবুদ্ধি পাঠক-পাঠিকা আমার সব বক্তব্য গ্রহণ করতে পারুন বা না পারুন, সত্যের অভিসারে এগিয়ে যাবেন—এই আমার একমাত্র কামনা।'

গ্রন্থকারের মতে মানবিকতাবাদ ও মানবতাবাদ এক জিনিষ নহে প্রথমটির মধ্যে রয়েছে পরপারের প্রেরণা ও প্রবৃত্তি, ইহাতে মানুষ হিসাবে মানুষের পূর্ণ স্বীকৃতি নাই। দ্বিতীয়টির অর্থাৎ মানবতাবাদের গোড়া কথা সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। সত্যই নাই অতিপ্রাকৃতিক, অতিমানবীয় কেউ নাই, কিছু নাই। এজন্য ইহাতে পরমাত্মার স্থানও নাই। যদিও আত্মার স্থান আছে—তাহা মানবাত্মা সৃষ্টির আদি হইতে বহু যুগ ধরিয়া ক্রমবিকাশের ফলে যেমন মানুষ-দেহ বিকশিত হইয়াছে বা গড়িয়া উঠিয়াছে তেমনি আত্মাও বিকশিত হইয়াছে তাহার ভিতরের এই আত্মা একটা পৃথক কিছু নহে। শরীরের অপর সকল অংশের মত একটা অংশ বা পদার্থ মাত্র। শরীরকে বাদ দিয়া তাহা ভাবা যায় না, কেহ কখনও ভাবিতেও পারে নাই। শরীর নিরপেক্ষ আত্মা থাকিতেও পারে না। ইহাকে সাধারণতঃ জড়বাদ বা মেটিরিয়ালিজম বলা হয়। তবে গ্রন্থকারের জড়বাদ ঠিক তাহা নহে। অনেকের নিকট নৈতিক জ্ঞান প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের বা অতিপ্রাকৃতের স্বীকৃতি প্রয়োজন। কিন্তু লেখক বলেন যে, মানুষে বা মানব-দেহে তথাকথিত জড়প্রকৃতি হইতেই নৈতিক জ্ঞান প্রভৃতি বিকশিত হইয়াছে। এজন্য সত্যিকার মানুষ নীতিহীন নহে কারণ তাহার পূর্ণ বিকাশ তথাকথিত অধ্যাত্ম ও জড়, উভয়কে লইয়া হইয়াছে। 'জড়পদার্থ একটা বিশেষ স্তরে পৌছুলেই প্রাণের সৃষ্টি হয়', যেদিন ইহা জানা গেল সেই দিনই 'জীব বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষে আবির্ভাবের সূত্র আবিষ্কৃত হ'ল।'

গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে গ্রীক চিন্তাধারা প্রাচ্য চিন্তা, খৃষ্টধর্ম, রেণেসাঁ, রিফর্মেশন, সংস্কৃত সাহিত্য, ফরাসী এনলাইটমেণ্ট ও ফরাসী বিপ্লব এবং মার্ক্সবাদ প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন। মার্ক্সবাদ মানবতাবাদের শেষ কথা বলিতে পারে নাই। তাঁহার জড়বাদী দর্শনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'নয়া মানবতাবাদ।' 'বুদ্ধি অনুসারী জ্ঞানই মানবতাবাদের প্রাণ—মুক্তবুদ্ধি তার একমাত্র অবলম্বন।'

গ্রন্থকার মুক্তবুদ্ধির পথে পাঠককে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, অধ্যাত্মবাদী আত্মা, পরমাত্মা ভগবানে বিশ্বাসী এবং সাধারণ পাঠক সকলের জন্যই এই আহ্বান। বর্তমান যুগের নূতন দর্শন এই 'নয়া মানবতাবাদ' চিন্তাশীলের অবশ্য পাঠ্য।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

**সিস্টার মিস্ মিত্র**—শেফালি নন্দী। পপুলার লাইব্রেরী। ১৯৫।১বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ২'৫০।

লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতা নন। মৌলিক এবং অনুবাদ উভয় ক্ষেত্রেই এঁর সুনাম আছে। সমালোচ্য পুস্তকখানি মৌলিক রচনা। সামাজিক উপন্যাস। সিষ্টার মিস্ মিত্র আসলে মিত্র নয়—এটা তাঁর ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামেই মিস্ মিত্র নার্সের কাজ করেন। জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কিন্তু তাঁর বর্তমান জীবনের পিছনে আর একটা জীবন আছে যাকে তিনি অস্বীকার ক'রে চলে এসেছেন কিন্তু তাঁর স্বামীকে অস্বীকার করা সম্ভব হলেও সন্তানকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তার দায়িত্বও তিনিই পালন করছেন কিন্তু আপন সন্তানরূপে নয়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে পুনরায় স্বামীর সাক্ষাত তাঁর মেলে। স্বামী তাঁর পুত্রকে দাবি করে। পুত্রকে তার হাতে না দিলে আদালত করবার ভয়ও দেখান হয়। মিস মিত্র ভয় পেলেও ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। এখান থেকে সকলের অগোচরে আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু

মনস্থির করে বাধা পেলেন, নিজের মনের কাছে যে মন বহু পূর্বেই হারিয়ে বসে আছেন। ডাক্তার অমিতকে কেতকী মিত্র প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন আর এই ভালবাসাই আবার নতুন করে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল। ভালবাসাটা একতরফা নয়--ডাক্তার অমিত হয়ত এই কারণেই সব জেনেশুনেই মিস্ মিত্রের (সন্তানসহ) সকল দায়িত্ব গ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মিস্ মিত্রও ডাক্তারের কাছে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হ'লেন।

মোটামুটি উপন্যাসখানি এইরূপ। মাঝে মাঝে কিছু অস্পষ্টতা থাকলেও পুস্তকখানি শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

**ভেঙ্গেছে দুয়ার**—জ্যোতির্ময় রায়। গ্রন্থপীঠ। ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা--৬। দাম ২'৫০।

অল্প লিখেও যে ক'জনা লেখক খ্যাতি অর্জন করেছেন, স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় রায় তাঁহাদের অন্যতম। প্রবন্ধ, গল্প এবং উপন্যাস রচনায় তিনি সমভাবে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সমালোচ্য পুস্তকখানি চিত্রধর্মী উপন্যাস। সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সাসপেন্স বজায় রেখে লেখক কাহিনীকে সহজ এবং অনবদ্য ভাষায় টেনে নিয়ে গেছেন।

মাধুরী অনাথ আশ্রমে লালিত-পালিত একটি শিক্ষিতা মেয়ে জমিদার দিব্যেন্দু চৌধুরীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখান থেকেই আরম্ভ কিন্তু আরম্ভেই এ বাড়ীর পুরাণো চাকর বিপিন থেকে সুরু করে একের পর এক আর যারা মাধুরীর চোখে পড়েছে তাদের যেন কতকটা যন্ত্রচালিত মানুষ বলে তার মনে হ'য়েছে। এদের চলা ফেরা, কথা বলা, হাসা সবই যেন কোন অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে ছোট একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেল "বড়দি"র মধ্যে আর তার ছাত্রী "মিঠু"র মধ্যে। জমিদার দিব্যেন্দুকে প্রথম থেকেই কতকটা দুর্ভেদ্য, কতকটা উদ্ধত আর খামখেয়ালী বলে মনে হ'য়েছিল কিন্তু মাধুরীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে তাকে আমরা ভিন্নরূপে দেখতে পাই। ক্রমে ক্রমে তার চরিত্রের এক একটি পাপড়ি ফুটিয়েছেন লেখক। আর তা মাধুরীকে কেন্দ্র ক'রে। এই শিল্পকার্য্যে তিনি কোথাও কষ্টকল্পনার সাহায্য নেন নি। একটি সাধারণ প্রেমের কাহিনী অথচ লেখার গুণে, পরিবেশ সৃষ্টির চাতুর্য্যে, ঘটনা সংস্থাপনের মাধুর্য্যে তা অসাধারণ হয়ে উঠেছে। প্রকৃত জাত-শিল্পীর এইটিই আসল পরিচয়।

ছাপা, প্রচ্ছদ সুন্দর।

**তিনটি একাঙ্ক নাটক**—অটল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশ করেছেন দীপালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ সি, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা--৬। দাম এক টাকা।

বহু সমস্যা-জর্জরিত ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ে লেখা তিনটি একাঙ্কিকা। সমাধানের ইঙ্গিত কোথাও না থাকলেও এই সমস্যা যে সাধারণের মধ্যে কত গভীরভাবে প্রবেশ ক'রে তাদের বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে এই চিত্রগুলিই লেখক এঁকেছেন। নাটকীয় সংঘাতের চেয়ে ছোট গল্পের মালমশলাই বেশী করে চোখে পড়ে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

**আলিম্পন**—প্রতিভাবালা বর্দ্ধন, ব্লক নং ডি ৩১, সি, আই, টি, বিলডিং। ৩১, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৸০ টাকা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বাংলা দেশে পূজা-পার্বণে যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এই 'আলপনা' ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ইহার অঙ্কন-পদ্ধতি অতি সুন্দর। ইহা একটি গার্হস্থ্য আর্ট। সভ্যতা-সংকটে ইহার কিছুটা অবলুপ্তি ঘটিলেও, এদিকে সম্প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রতিভাবালা কয়েকটি অঙ্কনের নিদর্শন দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, ইহার চর্চা এখনও চলিতেছে। ইহা অতীব সত্য, ইহার একটি সাংস্কৃতিক মূল্য আছে।

লেখিকা এই গ্রন্থে কয়েকটি আলপনা আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উহার ব্যবহার বিধি--কোন্ মঙ্গল-কর্মে কিরূপ আলপনা ব্যবহার করা উচিত তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাও ঐ সঙ্গে করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি দেখিয়া এই কথাই মনে হইয়াছে, এই প্রচারের প্রয়োজন ছিল। কারণ লোক-কলা হিসাবে ইহার মর্যাদা অনেকখানি।

**সীমারেখা**—অজিতকুমার, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা--১২। মূল্য চারি টাকা।

এই উপন্যাসে লেখক যে চরিত্রগুলি আনিয়াছেন, সেই চরিত্রগুলির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। চরিত্র-চিত্রণে যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ লেখক করিয়াছেন তাহাই উপন্যাসকে মর্যাদা দান করিয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্র যেন কথা বলিয়াছে অকারণে কেহ আসে নাই। নরেশই এই গল্পের নায়ক। নায়িকা হিসাবে দেখিলাম গায়ত্রীকে। যাহার ব্যক্তিত্ব এবং দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। নরেশকে তাহার ভাল লাগে। সে ভালবাসা, কি ভাল-লাগা ইহা বুঝিতে নরেশকে বেশ খানিকটা বেগ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু যখন সে ধরা পড়িল, তখন সে নরেশকে বিবাহ করিতে পারিল না। কারণ পূর্বে সে একজনকে ভাল বাসিয়াছে এবং তাহাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়া রাখিয়াছে। সে-সত্য রক্ষা করিতে সে বাধ্য। গায়ত্রীই তাহাকে বলিয়াছে, "নরেশ জীবনের পনের আনাই যখন ছাড়তে পারলাম, কিম্বা ছাড়তে বাধ্য হলাম, তখন আর ওই এক আনা নিয়ে মারামারি করব না। এটাকেও হাসি মুখে ত্যাগ করব। আমি আমার স্বাধীন সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছি। এখানে আমার বিরাট্ পরাজয়।"

গায়ত্রী সমরকে বিবাহ করিতেছে বটে, কিন্তু নরেশের প্রতি ভাল-বাসার কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেহাতীত প্রেম বোধ হয় ইহাকেই বলে। গায়ত্রীই এই প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়াছে--"একটা কথা শুধু জেনে রেখ নরেশ, বিবাহ ও প্রেম সব স্থানে এক নয়। বন্ধনহীন প্রেমই হয়ত শাশ্বত! বিরহই প্রেমের অভিব্যক্তি, তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেম চিরসুন্দর ও শাশ্বত! তুমি এত বোঝ, এটুকু বোঝ না? তোমার দেওয়া সে ফুলের মালা আমার কাছে চিরসুন্দর রূপ-রস-গন্ধভরা চিরজাগ্রত! বাহিরের আবরণ আমার যাহাই দেখ না কেন, অন্তর দীপ অনির্বাণ।"

গায়ত্রীর এই প্রেম 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যকে মনে করাইয়া দেয়। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ব্রজগোপালবাবু একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছেন। ইহা ছাড়াও ছায়াছবির মত যে দু'টি চরিত্র বিশেষ করিয়া মনে দাগ কাটে, তাহার মধ্যে রহিয়াছেন, সুপ্রভা দেবী ও সবিতা।

বইটির আখ্যানভাগ সুন্দর ও সাবলীল। লেখকের ভাষাও বেশ স্বচ্ছ সরল--কোথাও কষ্টকল্পনা নাই। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে। গ্রন্থের নামকরণ যথাযোগ্য হইয়াছে। উপন্যাস হিসাবে ইহা একখানি সার্থক রচনা।

গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজ অঙ্কিত চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা (প্রবাসী ষষ্টি-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৬৮ | ৫ম সংখ্যা

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার পর্য্যালোচনা এবং তাহার ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ সার জন সার্জ্জেণ্টকে নিযুক্ত করেন। সার জন সার্জ্জেণ্ট ব্রিটিশ আমলে, ভারতবিভাগের সময় পর্য্যন্ত অবিভক্ত ভারতের শিক্ষা-বিষয়ক উপদেষ্টা ও উচ্চ অধিকারী ছিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এই দুই জনেরই শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত বিষয়ে বিশেষভাবে পরিপ্রেক্ষণ করেন এবং জনশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপে গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাপদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ও ব্যাপক পর্য্যালোচনা করিতে বলেন। সার জন সেইমত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়, এই চার স্তরেরই শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সম্প্রতি রাজ্য সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট দিয়াছেন।

সেই রিপোর্টে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্ত্তনকে সুপারিশ করা হইয়াছে। সার জনের মতে সমস্ত প্রাথমিক ও অষ্টমশ্রেণী পর্য্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বুনিয়াদি শিক্ষার অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং রাজ্য সরকার একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ পন্থা প্রবর্ত্তনের জন্য যাহাতে ব্যবস্থা করেন তাহাই রিপোর্টে বলা হইয়াছে। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদিগকে বেসিক ট্রেনিং জন্য অন্ততঃ দুই বৎসরের মত সময় দেওয়া উচিত এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থলে দুই-তিনটি ট্রেনিং-এর কেন্দ্র স্থাপনাও অবিলম্বে করা উচিত।

সার জনের মতে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা আরও প্রসারিত করিয়া বর্ত্তমান ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে আনা উচিত এবং ঐরূপ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণ যাহাতে দুই বৎসরে ডিগ্রী কোর্স শেষ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কলেজে প্রবেশ করার পন্থা হিসাবে তিনি বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরোধী। এখন যে ভাবে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ব্যাপক-ভাবে একই পরীক্ষা দেয় এবং তাহারই ফলাফলে প্রাপ্ত শ্রেণী ও নম্বরের বশে সকল কলেজেই প্রবেশের দরখাস্ত করিতে পারে, তাহা সার জনের মতে ঠিক নয়। তিনি বলেন, প্রত্যেক কলেজের উচিত ঐরূপে উত্তীর্ণ বিদ্যার্থী-দের কম মার্ক বা নিম্ন শ্রেণীর জন্য প্রবেশ নিষেধ না করিয়া পুনরায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া, সেই পরীক্ষার ফলাফলের বশে বিচার করিয়া লওয়া উচিত। কলেজের ছাত্র সংখ্যা কয়েক হাজার এবং দুই-তিন শিফ্টে পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিলে সে কলেজের শিক্ষা ঠিক হয় না ইহাই তাঁহার মত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী সংখ্যা ছয় হাজারের অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তিনি মনে করেন। এবং তাঁহার মতে প্রত্যেকটি বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই (শিক্ষা ও গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে) বিশেষত্ব থাকা উচিত অর্থাৎ শিক্ষার ও জ্ঞানবৃদ্ধির কোনও বিশেষ অঙ্গের দিকে ঝোঁক দেওয়া উচিত।

কার্য্যকরী বিজ্ঞান—যথা ইঞ্জিনীয়ারিং—বিষয়ে শিক্ষা

সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী হওয়া উচিত। ইঞ্জিনীয়ারিং-শিক্ষিত ও পরীক্ষা-উত্তীর্ণ স্নাতকের সংখ্যা দেশের চাহিদা অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নয়। দেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পলিটেকনিক জাতীয় স্কুল আরও অনেক স্থাপনার প্রয়োজন এবং সেগুলিকে দেশের যাবতীয় শিল্প ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে স্কুলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ প্রতিষ্ঠানে হাতেকলমে শিক্ষা পূর্ণ হয়।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর ব্যবহার সম্পর্কে সার জন কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। তবে জাতীয় শিক্ষার প্রাচীন সম্পদ হিসাবে এবং বিদেশে শিক্ষালাভের উপায় হিসাবে অনেক ভারতীয়কেই এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে তিনি মনে করেন।

এই রিপোর্টে নির্ব্বাচনী পালা সাঙ্গ না হইলে রাজ্যের মন্ত্রীসভায় বিবেচিত হইবে না, তবে মন্ত্রীসভার বর্ত্তমান সদস্যদের মতামত লইবার জন্য উহা তাঁহাদিগের নিকট পৃথকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

সার জন সার্জ্জেণ্ট প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ এবং এ দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। সেই কারণে এই রিপোর্টের গুরুত্ব অনেকখানি। কিন্তু তাঁহার সুপারিশের প্রত্যেকটি অংশ ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। কোন স্তরে কি প্রকার শিক্ষা প্রয়োজন বা প্রার্থনীয় সে কথা তাঁহার রিপোর্টে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে কিন্তু তাহাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে কি কি প্রয়োজন এবং কোথা হইতে কি ভাবে সেই প্রয়োজন মিটান যাইবে, এক স্তরের সহিত অন্য স্তরের যোগরক্ষার জন্য কি কি নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কোন স্তরে—স্তরের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যার্থী কি ভাবে তাহার শিক্ষাকে জীবনযাত্রার পথে সহায়রূপে ব্যবহার করিতে পারিবে, এই এই জাতীয় বিষয়গুলির বিশদভাবে আলোচনা না হইলে এই রিপোর্টে এ দেশের সাধারণের কোনও লাভ হইবে না।

ঐরূপ আলোচনা সম্যক, বিশদ ও সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ করিতে হইলে বিভিন্ন স্তরের প্রবীণ ও বিচক্ষণ শিক্ষাব্রতীদের ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরাগী "elder statesman" জাতীয় প্রাজ্ঞ মনীষীদের লইয়া এক স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা সমিতি বা পরিষৎ স্থাপন করা উচিত, কেননা শিক্ষা বিষয়ের সমস্যা এই প্রদেশে ক্রমেই জটিলতর এবং শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই শিক্ষা পরিষৎ সরকারী সমর্থন ও সাহায্য বিনা হইতে পারে না কিন্তু ইহা সরকারী বা রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রভাবযুক্ত হইলে উহাতে কোনও কাজ হইবে না।

বুনিয়াদি শিক্ষার উচ্চতম সোপান এবং উচ্চতম শিক্ষার নিম্নতম সোপানের মধ্যে বর্ত্তমানে যে ব্যবধান রহিয়াছে সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর কয়জন কি ভাবে পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ তাহা আমরা জানি না। এমন কি ঐরূপ পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ কেহ যে সরকারী মহাকরণগুলির কোথায়ও আছেন সে বিষয়েও আমরা শুধু সন্দেহমাত্র প্রকাশ করিতে পারি।

এইরূপে প্রতি স্তরেই বিশেষ বিচার্য্য অনেক কিছুই আছে। মন্ত্রিগণও তাহাদের সহকারী এবং শিক্ষা বিভাগের সচিব ও কর্ম্মচারিগণ নিজেদের আটপৌরে কাজেরই কূল পাইতে অসমর্থ। এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও বিচার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইলে রিপোর্টটি ধামাচাপা—অর্থাৎ ফাইল চাপা অবস্থায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তই হইবে।

আমরা সার জন সার্জ্জেণ্টের পূর্ণ রিপোর্ট দেখি নাই সুতরাং তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা সম্ভব নহে, কিন্তু যাহা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই বশে কিছু বলা প্রয়োজন, কেননা বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় শিক্ষাসঙ্কট ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। সেই কারণেই রাজ্য সরকার ঐ বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌কে অবস্থা ও ব্যবস্থা বিষয়ে পর্য্যালোচনা ও মত প্রকাশ করিবার জন্য আনাইয়াছেন এবং তাঁহার রিপোর্টে ঐ পর্য্যালোচনারই বিশদরূপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। তবে ফুলস্কাপের বারো পাতায় শিক্ষার চারটি প্রধান স্তরের বিস্তারিত আলোচনা বা প্রশস্ত ব্যবস্থা নির্দ্দেশ, কোনটাই সম্ভব নয়। সে কাজ করিতে হইলে তাহার আয়োজনও অনুরূপ হওয়া দরকার।

সার জন প্রথম স্তরে শৈশব হইতে চতুর্দ্দশ বয়স পর্য্যন্ত একই ধারায়—অর্থাৎ বুনিয়াদি শিক্ষা অনুযায়ী শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছেন। বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য দেশে যেরূপ বাধ্যতামূলকভাবে চৌদ্দ বৎসর কিশোর-কিশোরিগণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা আছে তাহারই "বুনিয়াদি শিক্ষা" সংস্করণের কথা তিনি ভাবিয়াছেন। এবং সেই কারণেই এখানে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে যে ভাবে ছেলেমেয়েদের চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহাতে যদি

কেহ ঐ পর্য্যন্ত পড়িয়া লেখাপড়ায় সাঙ্গ দেয় তবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে সাধারণ লেখাপড়ার কাজ চালাইবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না, অর্থাৎ সাধারণজনের জীবনযাত্রার সহায়করূপে ঐ চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা পর্য্যাপ্ত। যদি কেহ চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর যান্ত্রিক বা কারিগরি কৌশল শিক্ষার জন্য কোনও কলকারখানায় বা কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-কর্ম্মী (apprentice) রূপে নিযুক্ত হইতে চাহে, তবে ঐ কলকৌশল বা কারিগরি নৈপুণ্য ব্যবহারিকভাবে অর্জ্জন করিতে হইলে, অর্থাৎ সে বিষয়ে যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে যেটুকু ঐ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান ও বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও সেই চৌদ্দ বৎসরের শিক্ষায় তাহার আয়ত্তে আসে। সহজ ভাষায় লেখা যন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদির বই, সাধারণ মাপজোপের অঙ্ক, সাধারণভাবে নক্সা বুঝিবার জ্ঞান, কলকারখানার চলতি কাজের মোটামুটি হিসাব এসব বুঝিবার মত বিদ্যা তাহার থাকে।

অন্য দিকে সে যদি বিদ্যালয়ের আরও উপরের স্তরের শিক্ষা লাভ করিতে চাহে, অর্থাৎ সার জন সার্জ্জেণ্টের পর্য্যালোচনায় যাহাকে দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা বলা হইয়াছে সেই স্তরে পড়িতে চাহে, তবে সে একই ধারায় উচ্চতর মানে উঠিতে পারে। সাধারণ ক্লাস প্রমোশনের প্রস্তুতি ও পরীক্ষা তাহার সেটুকু অগ্রগতির জন্য পর্য্যাপ্ত। উচ্চতর মানে উঠিবার জন্য পৃথকভাবে নূতন কিছু শিখিবার প্রয়োজন তাহার হয় না। সে যতদূর পর্য্যন্ত যাহা কিছু পড়িয়াছে, তাহাই তাহার যথাযথভাবে আয়ত্ত হইয়াছে কি না তাহাই তাহার পরীক্ষার বিষয় থাকে।

আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, সার জন সার্জ্জেণ্টের প্রস্তাব অনুযায়ী চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বুনিয়াদি-শিক্ষাদানের প্রথায় পাশ্চাত্ত্য দেশের মত বিদ্যার্থীকে উভয় পথের জন্য সমানভাবে যোগ্য করা যায় কি না। আমরা যতদূর জানি বর্ত্তমানে যে ধারায় বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ঐ দুই পথের কোনটাই বুনিয়াদি-শিক্ষাপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে সুগম নহে—বরঞ্চ সাধারণ স্কুলে-পড়া ছেলেমেয়েদের চাইতে অধিক দুর্গম। সুতরাং বুনিয়াদি শিক্ষার আয়তন প্রসারিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে উপযোগী করিতে হইবে যাহাতে উহার উচ্চতম সোপান ও দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার নিম্নতম সোপানের মধ্যে দুরারোহ ব্যবধান না থাকে এবং ঐ বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে সাধারণ আয়করী শিক্ষার পথ সহজ ও সুগম হয়।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয় স্তরের চরম সোপানে কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর উভয় বিভাগের সমান শিক্ষা দিতে হইবে। অতএব প্রথম স্তরের শিক্ষা (যাহা বর্ত্তমান অষ্টম মানের সমান হইবে বলা হইয়াছে) শেষ হইলে, দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ সহজ করিতে হইলে দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। অন্য দিকে পলিটেকনিক বা সান্ধ্য বিদ্যালয় ইত্যাদিতে আয়করী শিক্ষা লাভ করার মত মনের বিকাশ ও বিদ্যালাভ এই দুই-ই ঐ প্রথম স্তরের আয়তনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

তার পর দ্বিতীয় স্তরের কথা। এই দ্বিতীয় স্তরের শেষে কলেজে প্রবেশের পালা আসে এবং এই কলেজ শুধু সাধারণ ডিগ্রী কলেজ মাত্র নহে উপরন্তু মেডিকেল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিও বটে। সুতরাং এই দ্বিতীয় স্তরেই ঐ বহু পথে যাইবার উপযোগী বিভিন্ন ধারার শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে দ্বিতীয় স্তর হইতে উত্তীর্ণ বিদ্যার্থী ইচ্ছা ও যোগ্যতা মত তৃতীয় স্তরের বিভিন্ন পর্য্যায়ে ও বিভাগে সহজে প্রবেশ করিতে পারে।

ইহার অর্থ এই যে, দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা তিন বৎসরে শেষ করিতে হইলে প্রথম স্তরের শিক্ষা আরও অনেক উচ্চ-মানের সমান করিতে হইবে। অন্যথায় দ্বিতীয় স্তরে পাঁচ বৎসর শিক্ষা দিতে হইবে। জানি না সার জন সার্জ্জেণ্ট কিভাবে কতদিন শিক্ষা দেওয়ার কথা তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন। রিপোর্টে যাহাই থাকুক, দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষায়তনগুলির গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান শিক্ষার পরীক্ষাগার (Laboratory) প্রশস্ত ও উচ্চমানের হওয়া প্রয়োজন, নহিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করা হইবে।

এই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা যাহাতে যথাযথ হয় সেইজন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রয়োজন। এই দুই স্তরের শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে একথা স্মরণ রাখিয়া ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে, কেননা শিক্ষক ও শিক্ষিকা যদি শিক্ষাদানে অপারগ বা অনিচ্ছুক থাকেন তবে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতা অনিবার্য্য। শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনা ও যোজনা হয় ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে এবং বিদ্যার্থীর চরিত্র ও জীবন গঠনে প্রয়োজনীয় যাহা কিছু শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাওয়ার কথা, তাহাও আসে প্রধানতঃ ঐ দুই স্তরে থাকার সময়কালে। সেই জন্য ঐ দুই স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষিকার উপযোগিতার উপর নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ।

আজকার দিনে পশ্চিম বাংলার শিক্ষাসঙ্কট যে এতই ব্যাপক ও জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহার অন্যতম কারণ এই যে, শতকরা ৯৮ বা ৯৯ জন শিক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর ভিত্তি কাঁচা। এইরূপ অবস্থার দরুণ শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় শেষ হইতে চলিয়াছে এই দেশে, যেখানে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও শিক্ষা-দীক্ষায় প্রগতির দৃঢ় পদক্ষেপ অধিকাংশ বিদ্যায়তনগুলিতে শোনা যাইত, সেই বিদ্যায়তনগুলি আজও আছে, সেখানের বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রীরাও পূর্ব্ব দিনের ছাত্রছাত্রীদেরই নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত—ভাষায়, রক্তে ও মাংসে এবং সমাজ সম্পর্কে। কিন্তু শিক্ষার মান ক্রমেই নীচে নামিতেছে এবং প্রত্যেক স্তরে সেই অধোগতি আরও নিদারুণ হইতেছে। এই রোগের প্রতিকার আংশিকভাবে ঐ বিদ্যার্থীদের অভিভাবক-দিগের হাতে এবং অধিকতর অংশে বিদ্যায়তনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর ন্যস্ত আছে। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষিকা-গণকে শিক্ষাদানের রীতিনীতি অভিজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন না করিতে পারিলে জাতীয় শিক্ষাপ্রকরণের সকল পরিকল্পনা বা যোজন ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বুনিয়াদি শিক্ষায় ট্রেনিং দিবার সময় সার জন এক বৎসরের বদলে দুই বৎসর করিতে বলিয়াছেন কিন্তু সেই ট্রেনিং কিভাবে দেওয়া হইবে ও কাহারা দিবে সে বিষয়ে কি কিছু বলিয়াছেন? শিক্ষকের যদি ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন দায়িত্বজ্ঞান না থাকে তবে শিক্ষার পদ্ধতি বদলে কি উপকার হইবে? সেই দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা শিক্ষকের মনে-প্রাণে আনিতে হইলে, একদিকে তাহার জীবনযাত্রা পথ নানাভাবে সরল করিতে হইবে এবং অন্যদিকে তাহার মনকে ছাত্রকল্যাণ-বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে এই দুই বিষয়েই নিদারুণ অভাব দেখা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সেই কারণে শিক্ষকের আদর্শবাদ বিকৃত ও বিকল হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরাও বিদ্যার্জ্জনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে রিপোর্টে কি আছে জানি না।

তার পর আসে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের কথা। প্রথম দুই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা সম্যকভাবে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দুই স্তরের কোনও পরিবর্ত্তন বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে না ইহা নিশ্চিত। কাঁচা ইট, পলকা লোহা, ফাটা কাঠ ও ভেজাল চুন ও সিমেণ্টে গগন-চুম্বী অট্টালিকা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা বাতুলতা মাত্র। নীচের অংশ যদি দৃঢ় শক্ত হয় তবেই তাহার উপরের অংশের কথা চিন্তা করা যায়, অন্যথায় নয়। সুতরাং কলেজে হাজারের বেশী শিক্ষার্থী না লইলে কতশত নূতন কলেজ কোথায় কি ভাবে খোলা হইবে এবং সেই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ স্নাতকমণ্ডলী কয়টি নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কি ভাবে স্থান পাইবে সে কথার বিচার অন্যভাবে ও যথাক্রমে করিতে হইবে। জানি না নির্ব্বাচনে উত্তীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমহাশয়রা অতদূর চিন্তা করিতে রাজী বা সমর্থ হইবেন কি না।

সার জন সার্জ্জেণ্ট তাঁহার রিপোর্টে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা যে কিরূপ বিকল ও অসন্তোষজনক অবস্থায় আছে সে বিষয়ে স্পষ্টই ইঙ্গিত রহিয়াছে। এ বিষয়ে সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই তাঁহার সহিত একমত হইবেন। তবে প্রতিকার ব্যবস্থায় তিনি যে যে কথা বলিয়াছেন তাহা সম্যক বিচার-সাপেক্ষ। আমরা শুধু সাধারণভাবে সে বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিলাম।

## সাধারণতন্ত্র দিবস

বিগত ১২ই মাঘ ১৩৬৮, ইং ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬২ স্বাধীন ভারতের ত্রয়োদশ সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়। স্বাধীন ভারতের সরকার ১৯৫০ সনে ঐ দিবসে নূতন সংবিধানের প্রবর্ত্তন করেন, এই কারণে এইবারের সাধারণতন্ত্র দিবসকে ত্রয়োদশ সংখ্যক বলা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজের শাসনকালীন ভারতে ঐদিনকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দিবসরূপে পালন করার ঘোষণা করেন ২রা জানুয়ারী ১৯৩০ সনে। তাহার পূর্ব্বদিনে, ১লা জানুয়ারী, লাহোরে লাজপত নগরের কংগ্রেস অধিবেশন স্থলে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিয়া তাহার নীচে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। পরের দিন ইহা ঘোষিত হয় যে, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩০ সারা দেশে, গ্রামে ও নগরে স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালিত হইবে। সেই হিসাবে এবারের সাধারণতন্ত্র দিবস ঐ সঙ্কল্পের ৩৩শতম পালন উৎসব দিবস।

সাধারণতন্ত্র দিবস নয়াদিল্লীতে ও প্রতি রাজ্যের রাজধানীতে প্রচলিত প্রথায় নানা আড়ম্বরের সহিত পালিত হইয়াছে। ঐদিনে নানা মুখপাত্র নানা কথা বলিয়াছেন ভাষণে ও "বাণী" দানে। উহার মধ্যে উপ-রাষ্ট্রপতির বেতারযোগে প্রদত্ত ভাষণে কিছু প্রণিধান-যোগ্য কথা ছিল। নীচে আনন্দবাজারে প্রদত্ত ঐ ভাষণের বিবৃতির অধিকাংশ উদ্ধৃত হইল:

"আমাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ; শুধু সেই

ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলার জন্য আমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। জীবন ধারণের পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণা না থাকিলে জীবন নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়িয়া তুচ্ছ ও ব্যর্থ হইয়া যায়। আসুন, আজ আমরা এই সঙ্কল্প গ্রহণ করি, নৈতিক ভিত্তির উপর নূতন ভারত গড়িয়া এক নূতন জগৎ সৃষ্টির ব্রতে আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করিব।"

উপরাষ্ট্রপতি বলেন, "অতীতের রেষারেসি ও বিদ্বেষ দ্বারা ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে আমরা যেন নষ্ট না করিয়া দেই।"

দেশে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের উল্লেখ করিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই যে, প্রার্থীগণ ও ভোটদাতারা আচার-আচরণে মর্য্যাদাবোধ ও সৌজন্যের পরিচয় দিবেন। নির্ব্বাচনে জয়-পরাজয় বড় কথা নয়, আমরা ভদ্র ব্যবহার করিয়াছি কিনা তাহাই বড় কথা।"

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার ভাষণে গোয়াবাসীদের প্রতি বিশেষ অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, "এইবার প্রথম গোয়াবাসিগণ প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে যোগদান করিতেছেন। তাঁহারা ভারতীয় সমাজের অংশ হইলেও বহু বৎসর রাজনৈতিক দিক দিয়া স্বতন্ত্র ছিলেন। সেই স্বাতন্ত্র্যের অবসান হইয়াছে। আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সম্ভাষণ জানাইতেছি।"

উপরাষ্ট্রপতি বলেন, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর চলিতেছে। এই বৎসর আমাদের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের আশা আছে যে, পরিকল্পনাকালের শেষে আমরা লক্ষ্য সাধন করিতে পারিব। আমাদের মধ্যে যেসব নর-নারী সজীব, কর্ম্মঠ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং জনকল্যাণে নিজ নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত তাঁহাদের দ্বারাই আমাদের অগ্রগতি সম্ভব হয়। আমরা শিল্পের বহু শাখায় কিরূপ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করিয়াছি তাহার পরিচয় সম্প্রতি শিল্পমেলার ভারতীয় বিভাগে পাওয়া গিয়াছে। গত দশ বৎসরের প্রচেষ্টার ফলে আমাদের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে আত্মপ্রসাদের কারণ নাই। আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী এখনও এমন অবস্থায় রহিয়াছে যাহা কোন প্রকারেই সন্তোষজনক নয়। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহে ঠাণ্ডা লাগিয়া যেভাবে লোকের মৃত্যু হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় আমাদের সম্মুখে কি বিপুল কর্ম্মভার রহিয়াছে। মাতা ধরিত্রী দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে মুক্তহস্তে সূর্য্যালোক, বায়ু ও বারি দিতেছেন। সেইভাবে আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সমভাবে বণ্টন করা উচিত। দেশবাসীকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য বা অপরের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হইবে না। বর্ত্তমানে যে অর্থনৈতিক বিপ্লব চলিতেছে তাহার গতি আমাদিগকে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন অপেক্ষা সামাজিক পরিবর্ত্তন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দুই-তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের জীবনযাত্রায় ফিরিয়া যাইতে পারি না। আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান হইতে সরিয়া যাইতে পারি না। আমাদিগকে যেসব সামাজিক রীতিনীতি দাস করিয়া রাখিতে চায় সেগুলির অবসান ঘটাইতে হইবে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ আন্তর্জাতিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা সংঘর্ষ ও উদ্বেগের মধ্যে রহিয়াছি। আমরা পরস্পরকে উপলব্ধি করিবার জন্য স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য ধীরতা অবলম্বন করিব। কর্কশ বাক্য ও ক্রুদ্ধ অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত হইলেও কোন দিকেই সহায়তা করে না। মানুষ এশিয়ার হউক বা আফ্রিকার হউক, ইয়োরোপের হউক বা আমেরিকার হউক তাহার মধ্যে শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের ভাব আছে। এই সকল ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে।"

উপরাষ্ট্রপতি প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, "বিদেশে জাতির প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের সম্মান রক্ষা, আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করা এবং আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী ও নীতি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান বিতরণ করার এক গুরু দায়িত্ব আপনাদের উপর রহিয়াছে।"

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ যথার্থই বলিয়াছেন যে, "আমাদের মধ্যে যে সব নরনারী সজীব কর্ম্মঠ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং জনকল্যাণে নিজ নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত তাঁহাদের দ্বারাই আমাদের অগ্রগতি সম্ভব হয়" কিন্তু ঐ জনকল্যাণে স্বার্থ-বিসর্জ্জনকারীদের বর্ত্তমান ভারতে কি স্বীকৃতি, কি সম্মান, কি পারিতোষিক দেওয়া হয় সে বিষয়ে কিছুই তিনি বলেন নাই। যাঁহারা ঐভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের ও তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততির শোচনীয় অবস্থা আমরা নিত্যই দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সুতরাং উপরাষ্ট্রপতির এই ভাষণ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন আমরা বলিব।

সকল দেশেই জনসাধারণ ঐরূপ সজ্জনকে স্বীকৃতি

দিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না। দেশের নেতৃবর্গ ও কর্ণধারবর্গই ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং স্বীকৃতি ও উপযুক্ত মান সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা দানে ঐরূপ আত্মনিবেদনকারীর আদর্শকে দেশের লোকের সম্মুখে উচ্চে ধরিয়া তুলেন। আর আমাদের দেশে বর্ত্তমানে কি হইতেছে?

আজ সমাজের প্রত্যেক স্তরেই স্বার্থসর্বস্ব লোকের প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিতেছে। নিঃস্বার্থ সৎলোক ত সর্বত্রই উপহাসের পাত্র। অধিকারিবর্গের মধ্যে উচ্চতম যাঁহারা—মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাজনৈতিক দলনেতা, শিল্পপতি, ধনকুবের ইত্যাদি—তাঁহাদের মধ্যে আদর্শবাদের বা ন্যায়ধর্ম বা সমাজকল্যাণ চিন্তার লেশমাত্র কয়জনের মধ্যে আছে? অতিঘৃণ্য ও নীচ পন্থায় অর্জ্জিত অর্থের বলে আজ যাহারা প্রতিষ্ঠিত তাহাদের পক্ষে আজিকার দিনে এদেশের কোন অধিকার বা সম্মানের আসন প্রাপ্তি অসম্ভব? একথা কি উপরাষ্ট্রপতি জানেন যে তিনি তাঁহার ভাষণে স্বার্থবিবর্জ্জিত কর্ত্তব্যপরায়ণতার কথা বলিয়াছেন?

তিনি দরিদ্রজনের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই যথার্থ। কিন্তু সমাজের মেরুদণ্ড যাহা এতদিন ছিল সেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চরম দুর্গতির কথা কি তাঁহার মনে আসে নাই? এ দেশ যাহাদের আত্মনিবেদন, স্বার্থবিসর্জ্জন, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও প্রখর দেশাত্মবোধের ফলে আজ স্বাধীন, তাহারা সকলেই তো ঐ মধ্যবিত্ত স্তরের সন্তান। আদর্শবাদ, ন্যায়ধর্ম্ম ও দায়িত্বজ্ঞান ত তাহারাই তুলিয়া ধরিয়াছে দেশের লোকের সম্মুখে—শুধু কথায় নয়, কাজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে। তাহারা ত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে দ্রুতবেগে যদিও দেশে যেটুকু কর্ত্তব্যপরায়ণতা সততা, দায়িত্বজ্ঞান বা আদর্শবাদ আজও আছে তাহা ঐ মধ্যবিত্ত সন্তানদিগের মধ্যেই। এবং ইহাও সত্য যে, তাহাদের মধ্যে যে আদর্শভ্রষ্ট ও দুর্নীতি কলুষিত হইয়া অসৎ উপায়ে অর্থাগম করিতে সমর্থ, সে আজিকার দিনে সমাজে পতিত না হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। দেশের কর্ণধারগণ সমাজপতিবর্গ এবং নেতৃবর্গ—সকল দলের—এমনই অবস্থা করিয়াছেন দেশের ও সমাজের।

নির্বাচন সম্পর্কে উপরাষ্ট্রপতি যাহা বলিয়াছেন তাহা বিভিন্ন দলের দলপতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথিত, কেননা এই নির্বাচনের জুয়ায় দেশের জনসাধারণের পরাজয় সর্বক্ষেত্রেই। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নির্বাচনসমস্যা হইল অকল্যাণ ও বৃহত্তর অকল্যাণের মধ্যে, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Choice between Evils

## পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ছাত্র বিক্ষোভ

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী (২৩শে মাঘ) ঢাকায় এক বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার প্রতিবাদে শোভাযাত্রা বাহির করিতে গেলে পুলিসের সঙ্গে তাহাদের সংঘর্ষ হয়। পরদিনের কলিকাতার দৈনিকে ঐ সংবাদ যে ভাবে প্রকাশিত হয় তাহাতে মনে হয় যে, ঐ বিক্ষোভে ঢাকায় যুবমহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

সংবাদটি এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে:

"ঢাকা, ৬ই ফেব্রুয়ারী—আজ ঢাকা শহরে সারাদিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিসের লাঠি চালনার ফলে সাতজন ছাত্র আহত হয়। তন্মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর।

"সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে। প্রবল বিক্ষোভকারী ছাত্ররা পুলিসের সহিত সারাদিন ধরিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্ররা পুলিসের উপর ইষ্টক বর্ষণ করিবার ফলে পাঁচজন পুলিস আহত হয়।

"পূর্ব্বাহ্নে ছাত্ররা অসময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিবার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে শোভাযাত্রা বাহির করিতে চাহিলে পুলিস তাহাদের বাধা দেয়। ইহা হইতেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

"ছাত্র সংখ্যা প্রথমে তিনশতের মত ছিল। তাহারা শোভাযাত্রা সহকারে প্রেসিডেণ্ট ভবনের দিকে অগ্রসর হয়। বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

"একটু পূর্ব্বে তাহারা একটি প্রাইভেট লরীতে অগ্নিসংযোগ করে। লরীতে পুলিস পার্টি যাইতেছিল।

"জিন্না এভিন্যুর প্রবেশ-মুখের নিকটে পুলিস ছাত্র শোভাযাত্রাকে বাধা দেয়। পরে তাহারা পুরাতন শহরের রেলওয়ে ক্রশিং-এর নিকটে জমায়েত হয়।"

পাকিস্থানের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ও লীগ আমলের বাংলার লীগপন্থী মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দ্দীকে আয়ুব খাঁ সম্প্রতি গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণ করাইয়াছেন। পাকিস্থানবিরোধী কার্য্যকলাপ করার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ "সতর্কতামূলক" ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহাই আয়ুব খানের ফতোয়ায় বিবৃত ছিল।

জানা যায় যে, গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে সুরাবর্দ্দী পূর্ব্বপাকিস্থান সফর করিয়াছেন এবং ইহাও নিশ্চিত যে, ঐ

সফরের উদ্দেশ্য ছিল আগামী নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি। অবশ্য আগামী নির্ব্বাচন কবে ও কিভাবে হইবে তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। তবে সুরাবর্দ্দীকে গ্রেপ্তার করায় মনে হয় পাকিস্থানে হয়ত বা নির্ব্বাচন জাতীয় কিছু একটা ঘটিবে। না হইলে আয়ুব খাঁ নিজের অধিকার অটুট ও সুরক্ষিত করার জন্য এই সকল ব্যবস্থা করিতেছেন কেন? অবশ্য ছাত্র-বিক্ষোভ মানেই পাকিস্থানে একনায়কত্বের শেষ নয়। কিন্তু মার্কিনী সামরিক ও আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট প্রায় সকল প্রাচ্য দেশেই একনায়কত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে উৎখাত সহজে হয় না। যেখানে যেখানে ঐরূপ একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়াছে—যথা দক্ষিণ-কোরিয়ায় ও তুর্কীদেশে সেখানে ছাত্র-বিক্ষোভই তাহার পূর্ব্বাভাষরূপে দেখা দিয়াছে।

হয়ত ঐ কারণেই আয়ুব খানি সরকার সময় থাকিতে ব্যবস্থা করার জন্য ঐরূপ "সতর্কতামূলক" কার্য্যকলাপ করিতেছেন। জানি না পাকিস্থানের সদ্যজাত সংবিধানে আগামী নির্ব্বাচন-পর্ব্বের জন্য এইরূপ প্রস্তুতির ব্যবস্থা আছে কি না। তবে প্রস্তুতিপর্ব্বে ঢাকা শহরে সৈন্যদলের টহল ও প্রহরায় মনে হয় যে, সমগ্র পাকিস্থানে না হউক পূর্ব্ব-পাকিস্থানে অন্ততঃ সাধারণতন্ত্রবাদের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা যুবজনের মনে জাগিয়াছে। সুরাবর্দ্দী কি করিয়াছেন বা কি বলিয়াছেন তাহাও আমরা জানি না, কিন্তু এইরূপে তাঁহার কণ্ঠরোধ ও স্বাধীনতা খর্ব্ব করাকে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের যুবজন তাহাদের স্বাধীনতার উপরই হস্তক্ষেপ মনে করে বুঝা যায়। বিক্ষোভের মূল কারণ সেখানেই, যদিও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার ফলে উহা এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ঘটনা অতি সামান্য আকার-প্রকারে দেখা দিয়াছে এবং একনায়কত্বের দেশে উহার বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি আশ্রয় করিয়া ব্যবস্থা করিলে তাহার বিরুদ্ধে লিখিবার বা বলিবার সাহস ঐ যুবজনের মধ্যে ছাড়া আর কোথায়ও আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং এখন এ বিষয়ে আর আলোচনা করা বৃথা। তবে সকল দেশেই সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয় এইরূপ।

এই বিক্ষোভ এখন ব্যাপক ভাবে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ছড়াইয়াছে, এই সংবাদ এখন পাকিস্থানী সরকার স্বীকার করিতেছেন। পশ্চিম-পাকিস্থানের ছাত্রগণও পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থানের ব্যবহারজীবিগণ সম্মিলিতভাবে সুরাবর্দির বিরুদ্ধে সকল অভিযোগের উন্মুক্ত বিচারালয়ে বিচারের দাবী জানাইয়াছেন, এ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং অবস্থা এখন ঘোরালো এই কথা বলা যায়।

## বারাসত-বসিরহাট রেললাইন

কলিকাতার সহিত চব্বিশ পরগণার একটি বৃহৎ অংশের এবং সেই সঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান যোগসূত্র ছিল, আগেকার দিনের বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে। উহা স্বর্গতঃ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশে মার্টিন কোম্পানী ১৯০৫ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে চালু করেন। উহা প্রথমে বারাসত হইতে বসিরহাট এবং ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া ১৯১৪ সনে কলিকাতা বেলগাছিয়া অঞ্চল হইতে পাতিপুকুর, বারাসত ও বসিরহাট এবং সেখান হইতে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত লাইট রেল চালান হয়। সেই সময় হইতে ১৯৪৮ সন পর্য্যন্ত ঐ লাইন মার্টিন কোম্পানীর হাতে ছিল। তাহার পর এন. এল. রায় এণ্ড কোম্পানী নামে এক বাঙালী লাভের আশায় উহা সস্তাদরে মার্টিন কোম্পানী হইতে ক্রয় করেন। মার্টিন কোম্পানী উহাতে বিশেষ লাভের আশা নাই বুঝিয়াই উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন, কেননা লাইন, ইঞ্জিন, গাড়ী সবই তখন পুরাণো এবং নূতন করিয়া সমস্ত বদলাইতে হইলে যে খরচ হইবে তাহা সুদ সমেত উসুল হইলে উদ্বৃত্ত লাভ কিছু থাকিবার সম্ভাবনা কম, একথা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

এন. এল. রায় কোম্পানীর রেলচালনায় অভিজ্ঞতা ছিল না, অন্যদিকে ঐ লাইনে বিনা মাশুলে মাল ও বিনা ভাড়ায় যাত্রী চলাচল ক্রমেই বাড়িয়া চলে। ফলে ঘরের কড়ি গুনিয়া রেল চালাইবার মত অবস্থা আসে। অন্যদিকে ভাড়া ও মাশুলের বদলে "গণআন্দোলন" চালু হয় তীব্রতর বেগে। কোম্পানীর ট্রেন চালনের ব্যবস্থায় ক্রমেই অবনতি দেখা দেওয়ায় ভারত সরকার এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া উহা চালাইবার ভার এক পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করেন, মার্টিন কোম্পানী সেই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অবস্থার কোনও উন্নতি হইল না—অর্থাৎ বিনা মাশুলে মাল চালান ও বিনা ভাড়ায় যাত্রী বহনের "গণআন্দোলন" সমানে চালু রহিল। শেষে ১৯৫৫ সনের জুলাই মাসে ঐ লাইনের অন্তিম দশা উপস্থিত হয়।

অপরদিকে ঐ অঞ্চলের লোকজনের পক্ষে এই লাইন বন্ধ হওয়া এক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মত হইল। এই যোগসূত্র ছিল ওখানকার অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন। উপরন্তু ঐ অঞ্চলের সীমান্ত পাকিস্থানের

সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবেও একটি রেললাইনের গুরুত্ব অত্যধিক। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার নূতন যোগসূত্র হিসাবে একটি ব্রডগেজ লাইন স্থাপন মনস্থ করেন। এবং সেইমত জমি জরীপ ও দখলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জরীপ ও দখল ব্যবস্থা সুরু হইতেই নানা বাধা ও জটিল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ায় কাজ মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। শেষে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও রেল-কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করায় কাজ এতদিনে শেষ হইয়াছে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পূর্ব্ব রেলপথের এই নবনির্ম্মিত অংশে যাত্রীপূর্ণ একটি ট্রেন বারাসত হইতে সাড়ম্বরে হাসনাবাদ যাত্রা করে। যাত্রার উদ্বোধন পর্ব্ব সম্পর্কে আনন্দবাজার লিখিয়াছেন—

"বারাসত ষ্টেশনের কিছু দূরে কলিকাতা হইতে ষোল মাইল দূরে নূতন রেলপথের ধারে এক মণ্ডপে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। 'লাইনটি চালু হইল'—এই ঘোষণা করিয়া রেলমন্ত্রী বলেন যে, নূতন রেলপথ ঐ অঞ্চলের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিবে তিনি এই আশাই করেন।

"সাত বছর আগে বারাসত-বসিরহাট লাইট রেল-পথ উঠিয়া যাইবার এতদিন পরে বারাসত হইতে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩ মাইল দীর্ঘ ব্রড-গেজ লাইনটি চালু হওয়ায় ঐ এলাকার জন-সাধারণ যে আনন্দিত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ অনুষ্ঠানে তাঁহাদের বিপুল উপস্থিতি ও উৎসাহে। অনুষ্ঠান মণ্ডপটিও যেন ফুলে-মালায় সাজিয়া নব-বসন্তের উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলমল করে।

"বক্তারা এই আশা প্রকাশ করেন যে, কলিকাতার সঙ্গে সহজ যোগাযোগের ফলে ঐ এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতি দৃঢ় হইবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঐ নূতন রেলপথ স্থাপিত হওয়ায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু রেল-কর্তৃপক্ষ ছাড়া অনুষ্ঠানের প্রত্যেক বক্তা সেই সঙ্গে এই মন্তব্যও করেন যে, শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত সরাসরি 'থ্রু' ট্রেন চালু না করা হইলে যাত্রীসাধারণের অসুবিধা হইবে। ইহা ছাড়া তাঁহারা ঐ শাখায় ডবল লাইন পাতার এবং উহাতে বৈদ্যুতি-করণের ব্যবস্থার দাবি জানান।

"বারাসত-বসিরহাট যাত্রী ইউনিয়ন, কম্যুনিষ্ট পার্টির বারাসত স্থানীয় কমিটি এবং বনগাঁ শাখার রেলযাত্রীদের পক্ষ হইতে রেলমন্ত্রীকে যেসব স্মারকলিপি দেওয়া হয় সেইগুলিতে 'থ্রু' ট্রেন এবং অন্যান্য বিষয়ে ঐ সব দাবি উত্থাপিত হয়।

"রেলমন্ত্রী শ্রীরাম অবশ্য সোজাসুজি ঐ দাবিগুলির কোন জবাব দেন নাই। তবে তিনি একাধিকবার বলেন যে, যেদিনই সামর্থ্য হইবে সেইদিনই এক পলক দেরি না করিয়াই ঐ দাবি অনুসারে 'থ্রু' ট্রেন চালান হইবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ শাখাটির বৈদ্যুতিকরণ হইবে বলিয়াও তিনি আশা দেন।

"শ্রীরাম দুইটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন না হওয়ার ফলে অসুবিধা হয়। তাহা ছাড়া দেশের কল্যাণের জন্য মালপত্র চলাচল অথবা যাত্রী পরিবহন কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে তাহা প্রায়ই এক সমস্যা হইয়া উঠে। তবে সর্ব্বদাই জনসাধারণকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দান রেল কর্তৃপক্ষ এবং কর্ম্মীদের লক্ষ্য বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন।"

বলা বাহুল্য বিনা ভাড়ায় যাত্রী ও বিনা মাশুলে মাল চালানের উৎসাহ যদি পুনর্ব্বার জাগরিত হয় তবে ঐ অঞ্চলের দাবি-দাওয়া সবই উপেক্ষিত হইবে। রেলমন্ত্রী যে "সামর্থ্যের" কথা বলিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে, 'ফেল কড়ি মাখ তেল'।

## অষ্টগ্রহ সমাবেশ

আমাদের দেশে এক এক সময়ে গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু ইত্যাদির প্রলয়ঙ্করি প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গুজব ছড়াইতে আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একদল ফন্দিবাজ লোক ঐ সুযোগে নিরীহ সাধারণজন ও অল্পশিক্ষিত ধনাঢ্য লোককে ভুলাইয়া দু'পয়সা হাতাইবার ব্যবস্থা করে। কুসংস্কারের প্রভাব শুধু দুই-চারিটা পরীক্ষায় পাস করার ফলে সকল সময় দূর হয় না সুতরাং হুজুগ বাড়িলে পরে অনেক শিক্ষিত লোকও বিচারবুদ্ধি হারাইয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই আতঙ্ক আরও ছড়াইয়া পড়ে যখন কয়েকজন তথাকথিত বিজ্ঞব্যক্তি কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত ভেজাল মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা ঐ প্রলয়ঙ্কর দুর্য্যোগের ভবিষ্যৎ বাণীকে সমর্থন করেন, অথবা কোনও মহাজ্ঞানী একাধিক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডের সহিত ঐরূপ গ্রহ নক্ষত্র বা ধূমকেতুর বিনাশকারী সংযোগের কথা ফলাও করিয়া প্রচার করিতে থাকেন।

বহুদিন পূর্ব্বে হেলীর ধূমকেতুর সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় এদেশে ঐ প্রকার এক আতঙ্কের প্লাবন দেখা

দেয়। ঐ ধূমকেতু ৭০।৭২ বৎসর অন্তর সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। উহা কবে সাধারণ জনের চক্ষুগোচর হইবে, প্রথমে নভোমণ্ডলে কোন্ দিকে তাহাকে দেখা যাইবে, সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করার পর সে কোন্ পথে চলিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে চলিয়া যাইবে তাহার আকার আয়তন ইত্যাদিতে সূর্য্য ও গ্রহরাজির আকর্ষণের প্রভাব কি ভাবে প্রতিফলিত হইবে, এই সকল কথা সেই সময়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সারা জগতে প্রচারিত হইল।

আমাদের দেশে ধূমকেতু অমঙ্গলবাহী জ্যোতিষ্ক বলিয়া পরিচিত। সুতরাং ঐ প্রসিদ্ধ ধূমকেতুর অশুভ প্রভাবের নিদর্শনের জন্য ইতিহাসের পাতায় খোঁজ করিতে লাগিলেন একদল মহাপণ্ডিত এবং বলা বাহুল্য কিছু তথ্য জোগাড়ও হইল। সাধারণজন জ্যোতিষী-দিগের নিকট আসন্ন বিপদের নানা ব্যাখ্যা-বিচার শুনিয়া উপায় কি হইবে জানিতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য নগদ মূল্যে প্রতিকারের ব্যবস্থা হইল, যদিও জ্যোতিষীরা একেবারে অভয়বাণী দিলেন না—কেননা তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতার সীমা ও জ্ঞানের সীমান্ত এই দুই বিষয়ে অবগত হইলেও হেলীর ধূমকেতুর শুভ বা অশুভ ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন। মোটের উপর আতঙ্ক ছড়াইল ও ছোটবড় যাগযজ্ঞ ও গ্রহশান্তি প্রক্রিয়া দিকে দিকে আরম্ভ হইল। এমন সময় এক বিজ্ঞান-সম্মত সংবাদ এদেশে পৌঁছাইল যে, ঐ ধূমকেতুর পুচ্ছ ক্রমে প্রসারিত হইয়া পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িবে, এবং উহাতে ঘন পদার্থ কিছু বিশেষ স্থূল ভাবে নাই ও উহা গ্যাস এবং অতি সূক্ষ্ম পদার্থে নির্মিত হওয়ায় আমাদের এই নিরেট পৃথিবী ঐ পুচ্ছের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইবে। পুচ্ছটি পৃথিবী হইতে বহু শতগুণ আয়তনে বড় হইলেও উহার ওজন এতই কম এবং উহা এতই ফাঁপা যে, পৃথিবী ঐ সময়ে "ল্যাজের ঝাপটা" অনুভবও করিবে না। ঐ পুচ্ছে কি কি পদার্থ কতটুকু আছে তাহারও এক বিবৃতি প্রকাশিত হইল যাহার মধ্যে দেখা গেল যে, সায়া-নোজেন নামক বিষাক্ত যৌগিক গ্যাস উহাতে রহিয়াছে। ব্যস্, আর যায় কোথায়, আমাদের ভেজাল বৈজ্ঞানিকের দল লাফাইয়া উঠিলেন, এই ত মনুষ্যজগতের ও প্রাণী-জগতের ইতি শেষ! সমস্ত বায়ুমণ্ডল ঐ বিষাক্ত গ্যাসে আপ্লুত হইবেই এবং যেখানে সেটা বেশী হইবে সেখানে কোনও প্রাণীর প্রাণ থাকিবে না।

সাধারণ জনে ঐ বিষাক্ত গ্যাসের নামও শোনে নাই সুতরাং গ্রহবিপ্র ও জ্যোতিষিবর্গকে দুই-চার পয়সা বা টাকা দিয়া তাহারা দিনগত পাপক্ষয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত রহিল। কিন্তু আমাদের মনে আছে সেই সময় আমরা দার্জ্জিলিঙে ছিলাম। সেখানে মহাকালের মন্দিরের লামাগণ অসম্ভব উপার্জ্জন করে এবং যখন পুচ্ছযোগের সময় নিকটে আসিল তখন বহুলোক নামিয়া দেশে চলিয়া গেলেন আত্মীয়স্বজনের সহিত সহমরণের ইচ্ছায়!

এবারের অষ্টগ্রহ সমাবেশের ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে, তবে এবার নির্ব্বোধজনই (অধিকাংশই অবাঙালী) লুণ্ঠিত হইয়াছে অধিক পরিমাণে। তবে যে ভাবে কয়েকটি সংবাদপত্রে ইউরোপের অতি সাধারণ ঝড়ঝঞ্ঝাকে ফলাও করিয়া প্রচার করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় অষ্টগ্রহের আতঙ্ক শিক্ষিতজনের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল।

বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতিষে বলে যে, ঐ অষ্টগ্রহের মধ্যে পাঁচটি গ্রহ, একটি উপগ্রহ, একটি নক্ষত্র এবং শেষটি সম্পূর্ণ অবাস্তব—কল্পনাপ্রসূত অমঙ্গলের প্রতীক। উপরন্তু বিজ্ঞান বলে যে, এই গ্রহ সমাবেশ হইয়াছে কুম্ভরাশিতে। কেননা প্রকৃত রাশিচক্রে সৌরমণ্ডলের স্থান সরিয়া সরিয়া যায় এবং বর্ত্তমানে আমাদের হিসাব প্রকৃত হিসাব হইতে ২৩ ডিগ্রী পিছাইয়া আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদের মতে ২১শে জানুয়ারী মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে গমন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই ত বাস্তব ভিত্তি ও কল্পিত অট্টালিকার মধ্যে ব্যবধান। এবং ইহারই বশে লক্ষ লক্ষ লোক আতঙ্কিত ও প্রতারিত!

## রাউরকেলা ইস্পাতের কারখানায় গোড়ায় গলদ

রাউরকেলা ইস্পাতের কারখানা লইয়া বার বার গোলযোগের সৃষ্টি হইতেছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, গলদ আগাগোড়া। টাকার অপচয় ত হইয়াছেই, উৎপাদনেরও ব্যাঘাত হইতেছে। ইস্পাতের কারখানাগুলির উপর আমাদের অনেক আশা। সেগুলি যদি ঠিকভাবে গড়িয়া ওঠে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের দ্রুত শিল্পায়নের পথে একটি কঠিন বাধা দূর হইবে। সেইজন্যই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে ইস্পাত উৎপাদনের উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, এইজন্য পৃথিবীর তিনটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ সহায়তা করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছে প্রয়োজনীয় মূলধন, যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ যোগাইয়া। এবং সেটি নির্ম্মাণ করিয়াছে পশ্চিম জার্ম্মানী। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় জার্ম্মানদের কৃতিত্ব

সর্ব্বজনবিদিত। তবে এরূপ হইল কেন? রাউরকেলার এই বিপত্তি সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। কেহ বলিতেছেন, মূল নক্সাতেই গলদ আছে—যন্ত্রপাতি বসান নিয়মমত হয় নাই। অপরপক্ষ বলিতেছেন, এ ধরনের জটিল ও অতি আধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত কারখানা পরিচালনা করিবার মত কুশলী যন্ত্রবিদের অভাব এদেশে রহিয়াছে। সেটা পূরণ না হইলে, কারখানার কাজ ভালভাবে চলা অসম্ভব। কোন্ পক্ষের কথা যে সত্য সেটা বুঝা কঠিন। হয়ত সত্য দুই দলের অভিযোগের মধ্যেই আছে। কারখানা পত্তনের সময়ই হয়ত কাজে ত্রুটি ছিল, যাহা এতদিন পরে ধরা পড়িতেছে। কিংবা হয়ত অনভিজ্ঞ যন্ত্রবিদের হাতে পড়িয়া সূক্ষ্ম যন্ত্র বিকল হইয়াছে। কিন্তু ফল দাঁড়াইতেছে একই—রাউরকেলায় উৎপাদনের কাজ রীতিমত চলিতেছে না, উৎপাদন ব্যবস্থা সেখানে পর্য্যুদস্ত হইবার উপক্রম দেখা দিয়াছে।

ইহার আশু প্রতিকার যে প্রয়োজন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। অথচ নয়াদিল্লীর যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহারা যে বুঝিতেছেন, তাহার কোনও লক্ষণ নাই। আরও দুই-একটা কমিটি করিয়া তাঁহারা হয়ত দায় সারিবার চেষ্টা করিবেন। আমরা বলিব, সকল গোলযোগের মূল হইতেছে নয়াদিল্লীর মনোভাব। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন, ইস্পাতের কারখানা পরিচালনা করা আর জমিদারী চালান একই ব্যাপার। খানিকটা তেজ দেখাইলেই হইল, পুঁথিপত্র পড়িবার অথবা হাতে-কলমে শিক্ষা লইবার কিছুমাত্র দরকার নাই। অতএব ইস্পাতের কারখানাই হোক, কিংবা যন্ত্র-নির্ম্মাণের উদ্যোগই হোক, একজন জবরদস্ত হাকিমের হাতে দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলেই পরিচালনার কাজ সুন্দররূপে চলিবে। কিন্তু তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে জার্ম্মানী, ব্রিটেন, রাশিয়া হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইবার কোনও প্রয়োজন হইত না, নয়াদিল্লীর সচিবের দলই দেশের বিরাট্ কর্ম্মকাণ্ডের যোগ্য আচার্য্য হইয়া বসিতে পারিতেন। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, স্তাবক-অনুচরের দল বিভিন্ন কারখানায় পরিচালকের আসন উজ্জ্বল করিয়া বসিতেন এবং উৎপাদনের রথ বায়ুবেগে চলিত। সেটা যে হয় না তাহার প্রমাণ রাউরকেলা।'

অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়াতে প্রাথমিক কাজেই গলদ রহিয়া গিয়াছে। কারখানা সুচারুরূপে চলিবার পূর্ব্বেই বিদেশীদের বিদায় দেওয়া হইয়াছে এবং এমন লোককে বিদেশে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালাভের জন্য পাঠান হইয়াছে, যাহার না আছে শিক্ষা, না আছে শিখিবার ইচ্ছা। ইহার পরও যদি রাউরকেলা অচল না হয়, তবে হইবে কিসে? যতদিন পর্য্যন্ত নয়াদিল্লীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন না হইতেছে, যতদিন না সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তার দল যোগ্যতার মূল্য দিতে শিখিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াও আমরা উপযুক্ত ফল পাইব না।

## পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহা ভয়াবহ।

'পশ্চিম বাঙলায় বেকার সমস্যা যে কিরূপ গুরুতর হইয়াছে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের সাম্প্রতিক রিপোর্টে তাহার এক ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম তালিকাভুক্ত করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলি যে নাম পাঠান তাহার প্রায় শতকরা ৪০ জন প্রার্থীরই চাকুরী হয় না।

"১৯৬১ সালে পশ্চিম বঙ্গের ১৯টি কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে ৩,০৭,৩৭৬ জন কর্ম্মপ্রার্থী নাম তালিকাভুক্ত করেন। তাহার মধ্যে মাত্র ২৩,০২০ জন চাকুরী পাইয়াছেন। ১৭,৮২৩টি চাকুরীর জন্য এখনও প্রার্থী পাঠান হয় নাই। ১৯৬১ সনে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে মোট ৫৯,৫৯৪টি সংবাদ আসে। ইহার মধ্যে দক্ষ কারিগর বা ইঞ্জিনীয়ারিং সকল প্রকার চাকুরীই আছে। ১৯৬০ সালে মোট ২,৭৯,৮৭৬ জন নাম তালিকাভুক্ত করেন। তাহার মধ্যে ১৫,৯৯৫ জনের চাকুরী হয়।

"বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মখালির ক্ষেত্রেও কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রকে বিজ্ঞপ্তি দিবার রীতি ১৯৬১ সনের জুন মাসে বিধিবদ্ধ হয়। ইহার ফলে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে কাগজে-কলমে চাকুরীর সংবাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে চাকুরীর সংখ্যা বাড়ে নাই। শতকরা প্রায় ৪০টি ক্ষেত্রেই কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের প্রেরিত প্রার্থীর চাকুরী হয় নাই। ১৯৬০ সনে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে ৪১,৪০২টি চাকুরীর সংবাদ আসে, ১৯৬১ সনে সেই সংখ্যা ৫৯,৫৯৪তে দাঁড়ায়। ১৯৫৯ সনে কর্ম্মসংস্থানকেন্দ্রে মাত্র ২২,৬৫৬টি চাকুরীর খবর আসে। ১৯৫৯ সনে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,১৪,১৫৮।

"বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে বাঙালী নিয়োগ না করিবার নীতি এখনও অনুসরণ করা হইতেছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহলে জানা যায়। যে সমস্ত কাজের জন্য নিজ

নিজ রাজ্যের লোক পাওয়া যায় না ঐ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ সেই সব ক্ষেত্রেই কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রপ্রেরিত লোক গ্রহণ করেন। কিন্তু অদক্ষ শ্রমিক, কেরাণী অথবা তত্ত্বাবধায়কের কাজের ক্ষেত্রে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের শতকরা প্রায় ৮০ জন প্রার্থীকেই লওয়া হয় না বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহল মন্তব্য করেন।

"গ্রামের লোক কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে আসেন না বলিলেই হয়। এক একটি কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রকে বিস্তৃত এলাকায় কাজ করিতে হয়। এই জন্যও অনেকে দূরের পথ অতিক্রম করিয়া কেন্দ্রে আসিতে চান না। কর্ম্মসংস্থান অফিসের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া আরও অধিক সংখ্যক লোককে তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা চলিয়াছে। ১৯৫০ সনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ছয়টি কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র ছিল। ১৯৬১ সনে হইয়াছে ১৯টি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এই সংখ্যা আরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

"১৯৫০ সন হইতে ১৯৬১ সন পর্য্যন্ত এই বার বৎসরে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলি মারফৎ মোট ২,৩৮,৯০২ জনের চাকুরী হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।"

## পাঠ্যপুস্তকের মূল্য

বর্ত্তমানে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া একরূপ অসম্ভবই হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ পাঠ্যপুস্তকের দাম ক্রয়-মূল্যের বাহিরে। যেখানে বিনামূল্যে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা চালু করা হইতেছে, সেখানে এই অব্যবস্থা কেন? সরকার কি ইহার কোন খবরই রাখেন না? পাঠ্য-পুস্তকের দাম যে সাধারণ পুস্তকের মূল্যমানের অনুপাতে কম হওয়া উচিত, ইহাও কি সরকারকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে? শিক্ষার সুবিধা এবং সুযোগ সাধারণের অর্থ-সঙ্গতির আয়ত্তযোগ্য করিতে হইলে পাঠ্যপুস্তকের দাম অবশ্যই সুলভ করিতে হইবে। ভারতে বিদ্যালয়ের ছাত্রের এই বড় দুর্ভাগ্য যে, পাঠ্যপুস্তকগুলি দামের দিক দিয়া অধিকাংশের আর্থিক সঙ্গতির অনুপাতে দুর্লভ সামগ্রীর পর্য্যায়ে রহিয়াছে।

ইহার প্রতিকারের কথা আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশন এবং বিক্রয় রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেই সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া যাইবে কিনা তাহাও একটি বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সরকার যদি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারে প্রকাশকদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন তবে পাঠ্যপুস্তকের দাম অবশ্যই সুলভ করা সম্ভব হইবে। এক্ষেত্রে পুস্তকের দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার সঙ্গত অধিকারও সরকার পাইতে পারিবেন। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটিস প্রেসের ডিরেক্টর শ্রী এ. এইচ. ডাডলে টাস কলিকাতায় সাংবাদিকদের নিকট এ বিষয়ে ব্রিটেনের যে নীতির কথা বলিয়াছেন, তাহা ভারতেও সরকারের শিক্ষাগত আদর্শের একটি নীতি হিসাবে গৃহীত হইলে ফল ভাল হইবে বলিয়াই মনে করি। ব্রিটেনের সরকার পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশনে প্রকাশকদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। পাঠ্যপুস্তকের দাম কম করিবার ইহা একটি সার্থক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির গুরুত্ব ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বীকৃত হওয়া উচিত।

## সজনীকান্ত দাস

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী স্বনামখ্যাত সজনীকান্ত দাস পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের একজন দিক্‌পালের অন্তর্দ্ধান হইল। তিনি শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, নির্ভীক সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

সজনীকান্ত ইংরেজী ১৯০০ সনের ২৫শে আগষ্ট বাঁকুড়া জেলার বেতালবনে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃভূমি বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে। তাঁহার পিতা হরেন্দ্রলাল দাস সাব-ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। সজনীকান্ত বি. এস-সি পাস করিয়া মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িবার জন্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। কিন্তু তাঁহার ভাল না লাগায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এম. এস-সি পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পড়া সম্পূর্ণ হইবার আগে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র সহিত জড়িত হইয়া পড়েন এবং

সাহিত্যকে ভালবাসিয়া ফেলেন। এই 'শনিবারের চিঠি' ও সজনীকান্ত এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা। সাহিত্য-প্রেমিক হওয়া মানেই দারিদ্র্যকে বরণ করা। তাই তাঁহাকে সে সময় একাধিক সাময়িকপত্র ও দৈনিক পত্রিকার সহিত যুক্ত হইতে হয়। সজনীকান্ত বহুদিন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-এর সহিতও যুক্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সব্যসাচী ছিলেন। উপন্যাসও যেমন লিখিয়াছেন তেমনি লিখিয়াছেন কাব্যগ্রন্থ, গীতি-কাব্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যাত্মক রচনা, চিত্র-নাট্য, গান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বিবিধ গল্প ও প্রবন্ধ।

বাংলাসাহিত্যে সজনীকান্ত স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। এক বৃহৎ সাহিত্য-গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতিরূপে। 'শনিবারের চিঠি'র কর্ণধার হইয়া যেদিন তিনি আসিলেন, সেই-দিন হইতেই সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। 'শনিবারের চিঠি' সেদিন শুধু কঠিন সমালোচনাই করে নাই, সত্যকার গঠনমূলক কাজও সে করিয়াছে। বাংলা ভাষাই শুধু নয়, বাঙালী জাতির মর্য্যাদাকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরার ব্রতও সে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সমালোচনার ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদ। তিনি জাতির কল্যাণের জন্যই কলম ধরিয়াছিলেন। এজন্য হয়ত তাঁহাকে অনেকেরই অপ্রিয় হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি বিচলিত হন নাই। তাঁহার এই অকুতোভয় পৌরুষ লক্ষ্য করার মত। সজনীকান্তের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর-কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়িল। অনেক বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিকের গ্রন্থমালা সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁহার মত বন্ধুবৎসল ও সহৃদয়তা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর বয়স হয় নাই—দুঃখ আমাদের সেইখানেই।

## হেমপ্রভা মজুমদার

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের নির্ভীক নেত্রী হেমপ্রভা মজুমদার গত ৩১শে জানুয়ারী ৭৪ বৎসর বয়সে পর-লোক গমন করিয়াছেন। যে যুগে নারী ছিল পর্দ্দানশীন এবং পুরুষরা ব্রিটিশ সরকারের ভয়ে ত্রস্ত, সেই যুগে হেমপ্রভা পর্দ্দার বাহির হইয়া আসেন এবং দীপ্তকণ্ঠে বাণী প্রচার করেন।

নোয়াখালি জেলার খিলপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ চৌধুরী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লার প্রখ্যাত নেতা বসন্তকুমার মজুমদার ছিলেন তাঁহার স্বামী। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়া তাঁহারা উভয়ে বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতা এককালে সমগ্র বাংলাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। তাঁহাদের কর্ম্ম-কীর্ত্তি অবিস্মরণীয়। হেমপ্রভা ছিলেন বাঙালী পরিবারের গৃহবধূ, সরল, অমায়িক, সদাপ্রফুল্ল গৃহলক্ষ্মী বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহাকে দেখিলে তাহাই মনে হইত। ললাটে বৃহৎ সিঁদুরের টিপ পরিয়া তিনি যখন জনসভায় ভাষণ দিতেন, তখন সেকালের মহিলামহলেও উহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিত। সাত বৎসর কাল তিনি বাংলার আইনসভার সদস্যা এবং বহুদিন কলিকাতা কর্পো-রেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন।

—০*০—

# সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে আরাকান

( প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ )

ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

১

সপ্তদশ শতাব্দীতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর অর্থাৎ ১৬২২ হইতে ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে রোমান্টিক বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলে আরাকানের তদানীন্তন রাজা ও তাঁহাদের রাজ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারা যায় এবং পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের কিছু কিছু সত্যতাও নির্ধারিত হয়। এই নূতন তথ্যানুসন্ধানে দুইজন মাত্র প্রধান বঙ্গীয় কবির কাব্যের আলোচনা প্রয়োজন। এই দুইজন কবির নাম দৌলৎ কাজি ও আলাওল। ইঁহারা উভয়েই সুফীমতাবলম্বী ধার্মিক মুসলমান ছিলেন। নিতান্ত দৈববশেই এই দুই কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গ ( সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম ) হইতে গিয়া আরাকানের রাজসভায় উপস্থিত হন এবং কাব্য রচনা-ক্রমে সে সময়কার আরাকানের রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন।

উক্ত দুইজন কবির মধ্যে সময়ের দিক্ দিয়া প্রথম হইতেছেন দৌলৎ কাজি। দৌলতের একখানি মাত্র গ্রন্থের কথা আমরা জানি। এই গ্রন্থখানির নাম "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী।"১ কবি দৌলতের এই একটি মাত্র গ্রন্থ আবার অসমাপ্ত, কারণ কবি অর্ধেক মাত্র লিখিবার পর অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। দৌলতের মৃত্যুর ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর পরে দ্বিতীয় কবি আলাওল কর্তৃক গ্রন্থখানি সমাপিত হয়।

দৌলৎ তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভে আরাকানের তদানীন্তন রাজধানী, রাজা ও তাঁহার প্রধানমন্ত্রী এবং সাধারণ জনগণের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, দৌলৎ-কথিত এই যে প্রধানমন্ত্রী, তাঁহার নাম ছিল আশরফ খান এবং যাঁহার হস্তে সমস্ত রাজ্য পরিচালনার ভার বেশ কিছুকালের মতই ন্যস্ত ছিল, তাঁহার সম্বন্ধে ইতিহাস কোন খবরই রাখে না।

দৌলৎ কাজি ও আলাওল উভয় কবিই আরাকানের রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন রোসাঙ্গ বলিয়া। আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহং নগরকেই কবিরা 'রোসাঙ্গ' এই সংস্কৃত নাম দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ আরাকান-রাজ নরমেইখ্‌লার ( ১৪৩৩ খ্রীঃ) রাজ্যকাল হইতে প্রায় চার শতাব্দী ধরিয়া ম্রোহং-ই আরাকানের রাজধানী ছিল।২

দৌলৎ কাজি আরাকানরাজ থিরিথুধম্মের ( ১৬২২-১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ ) রাজত্বকালে তাঁহার কাব্য রচনা করেন। এই থিরিথুধম্মকে কবি সংস্কৃত রূপ দিয়া শ্রীসুধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইতিহাস অনুসারে রাজা থিরিথুধম্মের রাজ্যাভিষেক দীর্ঘ বারো বৎসর কাল স্থগিত ছিল, কারণ রাজজ্যোতিষ গণনা করিয়া বলেন যে, রাজ্যাভিষেকের এক বৎসরের মধ্যেই রাজার মৃত্যু ঘটিবে।৩ দৌলৎ কাজির কাব্যেও এই ঘটনার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে দৌলৎ লিখিতেছেন—

মহারাজ আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ মন।
তান৪ হস্তে রাজনীতি কল্য সমর্পণ॥

ইহার পর দৌলৎ লিখিয়াছেন যে, থিরিথুধম্মের

১। এই প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত।

২। H Bur. (H), পৃঃ ১৪০।

৩। ঐ, পৃঃ ১৪৪; C. H. I., IV, পৃঃ ৪৭৯; এখানে বলা আবশ্যক যে, এক্ষেত্রে জ্যোতিষের গণনা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয় নাই, কারণ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যে নহে তৃতীয় বৎসরে নিতান্ত সন্দেহজনক অবস্থায় রাজা থিরিথুধম্মের মৃত্যু ঘটে ( ১৬৩৮ খ্রীঃ )—H. Bur. (P), পৃঃ ১৩৯। এই ধরণের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী তখনকার দিনে আরাকান রাজসভায় নিতান্ত সাধারণ ঘটনা ছিল। রাজা নরমেইখ্‌লাও (১৪০৪—১৪৩৪ খ্রীঃ ) এইরূপ সতর্কবাণী শুনিয়াছিলেন এবং তাহা গ্রাহ্য না করায় গণনা অনুযায়ী যথার্থই অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন [ H. Bur. ( H ), পৃঃ ১৩৯ ]। মনে হয় রাজপ্রাসাদের গোপন ষড়যন্ত্রের ফলেই রাজহত্যার পূর্বে এই ভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীর অভিনয় করা হইত। ( এইরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে প্রবঞ্চনার একটি চিত্র রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসে পাওয়া যায়। )

৪। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী আশরফ খানের।

অনভিষেককালে রাজ্যভার সম্পূর্ণরূপে আশরফ খানের হস্তেই ন্যস্ত হয় এবং এই রাজ্যভার অর্পণে প্রধানা মহিষীরও (যিনি ইতিহাসে নাট্‌শিন্‌মে নামে উল্লিখিত হইয়াছেন) সম্মতি ছিল, কারণ তিনি রাজপুত্র অপেক্ষা আশরফ খানকেই অধিকতর উপযুক্ত মনে করিলেন। দৌলৎ-কথিত এই রাজপুত্রই হইতেছেন ইতিহাসোক্ত মিন্‌সানি যিনি থিরিথুধম্মের মৃত্যুর পর মাত্র ২৮ দিনের জন্য আরাকানের সিংহাসনে বসিয়া অকালে প্রাণ হারান।৫

ইতিহাস অনুসারে রাজা থিরিথুধম্মের পালি ভাষার একটি পদবী ছিল "শ্বেত হস্তীর প্রভু, রক্ত হস্তীর প্রভু" এবং ইহা রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রায় খোদিত দেখা যায়।৬ দৌলৎও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন:

মহামত্ত ঐরাবতে দেখি কীর্তি যশ।
শ্বেত রক্তে সুধর্মের হৈল পদবশ ॥

দৌলৎ তাঁহার কাব্যে শ্রীসুধর্মের (থিরিথুধম্ম) রাজত্বকালে রাজধানী রোসাঙ্গের যে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের চিত্র দিয়াছেন তাহা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। কবি লিখিতেছেন:

কর্ণফুল নদী পূর্বে আছে এক পুরী।৭
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি ॥
তাহাতে মগদ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার ॥
প্রতাপে প্রভাত-ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥

*　　*　　*

পঞ্চ শত হস্তী যার বহয় আদেশ।

*　　*　　*

রাজ্য সব উপশম কৈল সুবিচার।
কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার ॥

*　　*　　*

সংসারের লোক কেহ নাহিক দুঃখিত।
মহারাজ প্রসাদে সকল আনন্দিত ॥

*　　*　　*

মহামাত্য করিলেন আশরফ খানেরে।

*　　*　　*

সৈন্য সনে অভিষেক করিল রাজন।
মহামাত্যে করিলেক রাজ্যের ভাজন ॥

*　　*　　*

শ্রীআশরফ খান লস্কর উজির।
যাহার প্রতাপ-বজ্রে চূর্ণ অরিশির ॥

*　　*　　*

একদিন ইচ্ছা হৈল সুধর্ম রাজার।
সসৈন্য সমস্ত চলে বিপিন-বিহার ॥
ধবল অরুণ কালা লাল বর্ণ গজ।
আকাশ ছাইয়া চলে নানা বর্ণ ধ্বজ ॥
অযুতে অযুতে সৈন্য অশ্ব নাহি সীমা।
ক'নে বা বুঝিতে পারে নৌকার মহিমা ॥

*　　*　　*

দশ দিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়।
সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায় ॥

*　　*　　*

দেব সিংহাসনে যেন ইন্দ্র শোভা করে।
দীপ্তিমন্ত নৌকা যেন বিজলি সঞ্চারে ॥
মরকত স্তম্ভ সব রজতের ছানী।
নবরঙ্গ থোপা যেন মুকুতা খেচনি ॥

*　　*　　*

বিশ্বকর্মা গর্ব প্রায় নৌকার গঠন।
পবন গমন নৌকা সমুদ্র বাহন ॥

*　　*　　*

খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবন।
সঙ্গে আশরফ খান আদি পাত্রগণ ॥

*　　*　　*

যাহার যেমত যুক্ত শিবির রচিয়া।
তাহাতে রহিল সৈন্য আনন্দ করিয়া ॥
নৃপের সভাত নানা যন্ত্র সুললিত।
নানা পাখী নাদে যেন বন কল্লোলিত ॥

*　　*　　*

রাজার সভাত নিত্য গাহন্ত সুস্বরে।
পুষ্পের ডালেত যেন কোকিলা কুহরে

*　　*　　*

সৈন্য সমুদিত রাজা আটোপ করিয়া।
চারি মাস রহে তথা হরষিত হৈয়া ॥

৫। পরবর্তী অংশে দ্রষ্টব্য।

৬। J. A. S. B. XV. 1846, পৃঃ ২৩৪।

৭। কর্ণফুলি নদীর বর্তমান অবস্থান হইতে বুঝা শক্ত সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজধানী ম্রোহংের অবস্থিতি নদীপ্রসঙ্গে ঠিক কিরূপ ছিল। দৌলতের বর্ণনা হইতেও ঠিক বুঝা যায় না রোসাঙ্গ কর্ণফুলির পূর্বে ছিল, না কর্ণফুলি ইহার পূর্বে ছিল। পূর্ব অর্থে সম্মুখ ভাগও হইতে পারে।

তবে মহাপাত্র আশরফ মহামতি।
আপনা সভাত আইলা রাজ অনুমতি ॥৮
নানা জাতি লোক সবে ধরিল যোগান।
সভাত বসিলা শ্রীআশরফ খান ॥
সৈয়দ সেখ আদি মোগল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর ॥
... ... ...
শ্রীযুক্ত আশরফ খান অমাত্য প্রধান।
ষোল-কলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান ॥
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রস চয়।
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয় ॥৯

২

আরাকান রাজসভার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন আলাওল। তাঁহার আসল বা পুরা নাম জানা যায় নাই। আলাওল তাঁহার ছদ্ম নাম হইতে পারে। যদি এটি ছদ্ম নামই হয় তাহা হইলে মনে হয় এটি জায়সীর "পদ্মাবৎ"১০ কাব্যে যেখানে সুলতান আলাউদ্দীনকে আলাওল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সেখান হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। কবি আলাওলের নিবাস ছিল ফতেহাবাদ পরগণার অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে। এখানে তাঁহার পিতা স্থানীয় জমিদার মজলিশ কুতুবের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী (অমাত্য) ছিলেন। এই মজলিশ কুতুবের কথা বাংলার ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ আছে।১১

আলাওল সর্বসমেত ছয়খানি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে তাঁহার প্রথম রচনা 'পদ্মাবতী' কাব্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই 'পদ্মাবতী' কাব্য হিন্দী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচিত।১২

আরাকানরাজ থদো মিন্তরের (১৬৪৫-১৬৫২) রাজত্বকালে তদীয় প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল তাঁহার 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। কেহ কেহ সন্দেহ করেন এই মাগন নিজেও কবি ছিলেন; তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কঠিন, কেননা আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগনের পূর্ণ পরিচিতি আজও রহস্যময় রহিয়াছে।১৩ আলাওলের বর্ণনা অনুসারে মাগন আরাকান রাজসভায় একজন বিশিষ্ট মহান্ ব্যক্তি ছিলেন এবং রাজপরিবারের সহিত তাঁহার অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আরাকানরাজ নরপতিগ্যির (১৬৩৮-১৬৪৫) মৃত্যুর পর ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে থদো মিন্তর যখন সিংহাসনে বসেন তখন নূতন রাজার "প্রথম যৌবন-কাল"১৪ এবং বিধবা মহারাজ্ঞীর মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনার আসল ভার এই মাগনের উপরেই ন্যস্ত হয়।১৫ এমন কি পরবর্তী রাজা সান্দথুধম্ম (১৬৫২-১৬৮৪) আরাকানের সিংহাসনে বসিবার পরেও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে মাগনের বিশিষ্ট প্রভাব ছিল তাহাও আলাওল লিখিয়াছেন।১৬

ইতিহাসে এই মাগন ঠাকুর সম্বন্ধে কোথাও কোন প্রকারের উল্লেখ নাই এবং থদো মিন্তর ও তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধেও লিপিবদ্ধ ইতিহাসের জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এদিকে আলাওল এই সময়কার আরাকান রাজ্য সম্পর্কে শুধু যে মাগনের বিশিষ্ট স্থান ও প্রভাবের কথাই লিখিয়াছেন তাহাই নহে, থদো মিন্তর ও তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধেও দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। আলাওল নৃপতি থদো মিন্তরের উজ্জ্বল চিত্র দিয়া বহু ঐশ্বর্য-বিলাসে পরিপূর্ণ তাঁহার রাজধানী, রাজপ্রাসাদ ও রাজসভার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। বঙ্গীয় কবি লিখিতেছেন—

থদো মিংতার নাম রূপে গুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অতিরেক।

৮। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে নৃপতি তখনও পর্যন্ত অনভিষিক্তই ছিলেন এবং রাজসভাদি পরিচালনার ভার আশরফ খানের উপরই ছিল।

৯। সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী—সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পৃঃ ৪৫-৪৮।

১০। ১২ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১১। H. B. (J), II, পৃঃ ২৫২-২৫৩, ২৫৯-২৬০।

১২। মালিক মুহম্মদ জায়সী মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। সুফীমতাবলম্বী ধার্মিক মুসলমান কবি জায়সী ৯২৭-৯৪৭ হিজরি অর্থাৎ ১৫২০-১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবৎ' রচনা করেন। অবধী ভাষায় এই কাব্য রচিত হয়। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' কাব্যের (১৫৭৫ খৃঃ) ভাষাও এই অবধী। মনে হয় তুলসী তাঁহার রামায়ণের কিছু কিছু রূপকের জন্য জায়সীর নিকটও ঋণী ছিলেন।

১৩। বস্তুতঃ এই মাগন মুসলমান কি হিন্দু ছিলেন তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কারণ আলাওল তাঁহার বর্ণনায় মাগন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'দেবগুরুভক্ত…।'

১৪। প (শা), পৃঃ ১৬।

১৫। ঐ, পৃঃ ১৯।

১৬। B. S. R. I. B L, পৃঃ ৬৭, ২০১।

দেখিতে সুচারু মুখ লোকের নয়ান সুখ
যেন পূর্ণচন্দ্র পরতেখ ॥
... ... ...
যেই ক্ষণে নরপতি আখেটে করয় গতি
রত্ন চতুর্দোলে আরোহণ।
ক্ষণে চড়ি করি-স্কন্ধে চালায়ন্ত নানা ছন্দে
যেন ঐরাবত মঘবান ॥
... ... ...
নানা দেশী নানা লোগ শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী মিশরী স্যামী তুরকী হাবসি রুমী
খোরাসানী উজ্বেগী সকল ॥
... ... ...
মগেদের নিজ সৈন্য সব রণে অগ্রগণ্য
সংখ্যা নাহি কটক অপার।
... ... ...
শুনি নৃপতির যশ দেবতা হউক বশ
শত্রুহীন হউক জগত ॥১৭

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, আলাওল থদো মিন্তরকে "শ্বেত রক্ত মাতঙ্গ ঈশ্বর"১৮ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; থদো মিন্তরের নামাঙ্কিত মুদ্রাতেও রাজার এই পদবী পাওয়া যায়। এই মুদ্রাতে নৃপতিকে বলা হইয়াছে, "Lord of the Red Elephant, Lord of the White Elephant।"১৯

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে আলাওল বলিয়াছেন যে, নরপতিগিগ্যি আরাকানের সিংহাসনে বসিবার সঙ্গে সঙ্গে (অর্থাৎ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্বতন রাজা মিনবিনের (১৫৩১-১৫৫৩) বংশ লোপ পাইল। আলাওলের এই উক্তি ইতিহাসের দিক্ দিয়াও খাঁটি সত্য। কারণ নরপতিগিগ্যি রাজা থিরিথুধম্মের প্রধানা মহিষী বা পাটরাণী নাটশিন্‌মের প্রণয়ী বা উপপতি মাত্র ছিল এবং রাজবংশের সহিত তাহার কোনরূপ সংস্রব ছিল না। বস্তুতঃ নরপতিগিগ্যিই নাটশিন্‌মের সহিত মিলিয়া জ্যোতিষের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া থিরিথুধম্মকে হত্যা করেন বা করান এবং স্বয়ং সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসিবার পূর্বে অবশ্য থিরিথুধম্মের সদ্য সিংহাসনারূঢ় পুত্র মিন্‌সানিকেও (যিনি মাত্র ২৮ দিন রাজত্ব করেন) সরাইতে হয় এবং ইহাও যে নরপতিগিগ্যিরই কাজ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই; কারণ নরপতিগিগ্যি সিংহাসনে বসিয়াই প্রণয়িনী নাটশিন্‌মেকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন এবং সম্ভবতঃ হত্যাও করান।২০

এই প্রসঙ্গে আলাওল আরও লিখিয়াছেন যে, এই নরপতিগিগ্যির একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল এবং ইহাদের মধ্যে পুত্র থদো মিন্তরই নরপতিগিগ্যির পর (১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এদিকে লিখিত ইতিহাসে নরপতিগিগ্যির কন্যার কথার কোথাও উল্লেখ নাই এবং থদো মিন্তরকে পুত্র না বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র (nephew) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রচলিত ইতিহাস ও সমসাময়িক কবির উক্তির মধ্যে এই যে প্রভেদ রহিয়াছে ইহাও বিশেষ অনুসন্ধানের যোগ্য।

৩

ইতিহাস হিসাবে আলাওলের অধিকাংশ রচনাই বিশেষ মূল্যবান্। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার সয়ফুল মুলুক বদিওজ্জমাল২১ কাব্যখানির কথা বলা যাইতে পারে। লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ (historical record) হিসাবে আলাওলের এই কাব্যখানি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা এই গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা শাহ সুজার শেষ জীবনের একটি যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে ইতিহাসের ধারণা আজ অবধি অস্পষ্ট ও রহস্যময়।২২

সকলেই জানেন যে শাহ সুজা ভ্রাতা আওরঙ্গজেব কর্তৃক পরাজিত ও তাড়িত হইয়া ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের কিছু পরে আরাকানে আসিয়া উপস্থিত হন। আলাওলের বর্ণনা অনুসারে আরাকানের তদানীন্তন রাজা সান্দথুধম্ম২৩ (যাঁহাকে কবি চন্দ্রসুধর্ম

১৭। সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিমের অপ্রকাশিত পুঁথি। তুঃ প (শ), পৃঃ ১৩-১৮।

১৮। প (শ), পৃঃ ১৪।

১৯। J. A. S. B., XV, 1846, পৃঃ ২৩৫।

২০। H. Bur. (H); পূর্বাংশেও দ্রষ্টব্য। এরূপ অনুমানও প্রাসঙ্গিক যে, এই নরপতিগিগ্যি নিষ্কণ্টক হইবার জন্য সম্ভবতঃ থিরিথুধম্মের একমাত্র বিশ্বাসভাজন প্রধান অমাত্য আশরফ খানকেও অপসারিত করে, এবং কে বলিতে পারে যে আশরফ খানের প্রিয়তম বন্ধু কবি দৌলৎ কাজির আকস্মিক মৃত্যুতেও তাহার হাত ছিল না!

২১। আরব্যোপন্যাসের এই নামেরই প্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে এই দীর্ঘ কাব্যখানি রচিত (প্রথমাংশের রচনাকাল ১৬৫৮ এবং দ্বিতীয়াংশের ১৬৭০ খ্রীঃ।)

২২। Sh. H. A. (J), পৃঃ ৯৮-৯৯; I. G. I., II, পৃঃ ৪০২।

২৩। ১৬৫২-১৬৮৪।

বলিয়া বারবার অভিহিত করিয়াছেন) শাহ সুজাকে প্রথমে ভাল ভাবেই অভ্যর্থনা করেন। আলাওল নিজেও এই সময় আরাকানে ছিলেন এবং দৈববশে শাহ সুজার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু নিয়তির চক্রে পড়িয়া এই বন্ধুত্বের জন্য তাঁহাকে অতিশয় বিপন্ন হইতে হয়। ব্যাপার হইতেছে যে, আরাকানে আসিবার অল্প কিছুকাল পরেই সুজা দৈবদুর্বিপাকে রাজা সান্দথুধম্মের অনুগ্রহলাভ হইতে সহসা বঞ্চিত হন এবং রাজকোপে পড়িয়া সপরিবার সাহচর নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।২৪ রাজরোষ এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। সুজার যত বন্ধু ও সঙ্গী-সাথী ছিল সকলকেই দারুণ শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছিল। এমন কি আমাদের বাঙালী কবিকেও মির্জা নামে এক ব্যক্তির বিদ্বেষপ্রসূত মিথ্যা অভিযোগের ফলে রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারহীন হইয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

দুঃখের বিষয় আলাওল খুলিয়া লিখিতে সাহস করেন নাই, কি কারণে আরাকানরাজ সান্দথুধম্ম প্রথমে শাহ সুজাকে প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা জানাইয়া সহসা তাঁহার উপর এমনিই ক্রুদ্ধ হইলেন যে, অবশেষে হতভাগ্য মোগল যুবরাজকে পরিজনবর্গের সহিত প্রাণ দিতে হইল। আলাওলের কাব্য হইতে প্রাসঙ্গিক বর্ণনা এখানে কবির নিজের জবানিতেই গদ্যাকারে দেওয়া হইল—

..."দৈববশেই আমি রোসাঙ্গ নগরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম!...কিছুকাল পরে শাহ সুজা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।...রোসাঙ্গরাজের সহিত তাঁহার (সুজার) বিরোধ উপস্থিত হইল এবং সুজার দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল।...যে সমস্ত মুসলমান সুজার পক্ষে ছিলেন সকলকেই রোসাঙ্গরাজের হস্তে প্রাণ দিতে হইল। মির্জা নামে একজন রাজকর্মচারী (নিশ্চয়ই গুপ্ত পুলিস বিভাগের) আমার (আলাওল) নামে রাজার কাছে অভিযোগ আনিল যে, আমিও একজন রাজদ্রোহী। ইতিপূর্বেই এই মির্জার সহিত আমার অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল, সুতরাং সুবিধা পাইয়া সে এখন আপন উদ্দেশ্য সাধিত করিল। আরাকানরাজ আমার সম্পর্কে এই দুষ্ট লোকটির মিথ্যা চক্রান্তের কথা জানিতেন না, তাই ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। অবশেষে কিন্তু নৃপতি আসল ব্যাপার সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই পাষণ্ড মির্জাকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিলেন ও বিচারের পর চরম শাস্তি দিলেন।...এই পাষণ্ড বহু নির্দোষ ব্যক্তির জীবন নষ্ট করিয়া শেষে আপন কৃতকর্মের ফলস্বরূপ রাজাদেশে শূলে চড়িয়া প্রাণ দিল।...আমি সম্পূর্ণ বিনা দোষেই কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম।"২৫

উপরে উদ্ধৃত অংশ হইতে এইটুকুমাত্র অনুমান হয় যে, খুব সম্ভব সুজাকেও রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী করা হইয়াছিল। তবে সুজার বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ ইহা সত্য কি না বলা কঠিন। মনে হয় যেন মির্জার অধীনস্থ রাজার গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারীদের মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত অভিযোগের ফলেই সুজার পরিণাম এমন শোচনীয় হয়। সুজা কি তবে পাষণ্ড মির্জার কোন গুপ্ত চক্রান্তের ফলেই ধ্বংস হন? সুজার পশ্চাদ্ধাবক আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা প্রদত্ত উৎকোচের বশবর্তী হইয়াই কি মির্জা এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়? খুব সম্ভব তাই। তাহা না হইলে যে রাজকর্মচারী রাজদ্রোহের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া রাজাকে আসন্ন সর্বনাশ হইতে রক্ষা করে, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া নিয়মিত বিচারের পর শূলে দেওয়ার অর্থ কি?

ইতিহাসের মতে আরাকানরাজ সান্দথুধম্মই আরাকানের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন।২৬ আলাওলও তাঁহার 'সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল' গ্রন্থে এই নরপতির জয়গান করিয়া যে সুদীর্ঘ-প্রশস্তি লিখিয়াছেন তাহাই তাঁহার লেখা দীর্ঘতম রাজপ্রশস্তি। আলাওলের মতে রাজা সান্দথুধম্মের সহিত তুলনা করিলে আরাকানের পূর্ববর্তী রাজারা নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যদিও তিনি 'পদ্মাবতী' কাব্যে সান্দথুধম্মের অব্যবহিত পূর্বের নরপতি থদো মিন্তরের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন, 'সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল' কাব্যে তিনি যখন সান্দথুধম্মের প্রশস্তি গাহিতেছেন তখন থদো মিন্তর সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের সুর কিছু ভিন্ন ও রহস্যাচ্ছন্ন। এখানে কবি যেন রাজা থদো মিন্তর-কৃত এমন কোন্ কার্যের ইঙ্গিত করিতেছেন যাহার ফলে দেশের বহু লোক আতঙ্কে দেশত্যাগী হইয়াছিল। অতঃপর রাজা সান্দথুধম্ম সিংহাসনে উপবেশন করিলে দেশে নিরাপত্তার ভাব

২৪। সুজার জীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অথবা উক্ত বৎসরের গোড়াতেই—[Sh. H. A. (J), পৃঃ ৩০৯]। সমস্ত পরিজনবর্গের সহিত যে সুজাকে হত্যা করা হইয়াছিল তাহা আলাওল সুস্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, যদিও এই সমাপ্তির অবিকল রূপ সম্বন্ধে ইতিহাস সুনিশ্চিত নহে: (I. G. I. II, পৃঃ ১৭৬-১৭৭)।

২৫। স-মু-ব, পৃঃ ১৭৩-১৭৭।

২৬। H. Bur. (H) পৃঃ ১৪৫।

ফিরিয়া আসে এবং পলাতক দেশবাসীরা প্রত্যাবর্তন করে। কবি লিখিতেছেন যে, বহু দুঃখ পাইয়া যাহারা পূর্ব রাজার (থদো মিন্তরের) ভয়ে দেশান্তরে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল, রাজা চন্দ্র সুধর্মের (সান্দথুধম্মের) মহত্ত্বের কথা শুনিয়া তাহারা যেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল এখন সেখানেই ফিরিয়া আসিল। এখানে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন জাগে—দেশে থদোর সময়ে কি এমন গোলমাল দেখা দিয়াছিল এবং ইহার কারণই বা কি? দুঃখের বিষয় আরাকানের ইতিহাস আজও নিতান্তই অসম্পূর্ণ, তাই কেবল এই প্রশ্নটিরই নয়, আরাকান সম্পর্কে আরও বহু প্রশ্নের উত্তরই আজও পাওয়া যায় না।২৭

সান্দথুধম্মের নামাঙ্কিত মুদ্রায় দেখা যায় যে, তাঁহার পালি পদবী ছিল "The Moonlike Righteous King"২৮ (চন্দ্রমার মত ধর্মপরায়ণ রাজা)। আলাওলের রচনাবলীতেও এই পদবীর উল্লেখ আছে—"সুধর্মের ধর্ম যেন চন্দ্রমা উজ্জ্বল।"২৯ রাজা সান্দথুধম্মের মুদ্রায় রাজার আরও একটি উপাধি ছিল "Lord of the Golden Palace"৩০ (সুবর্ণ প্রাসাদের অধীশ্বর)। আলাওলের 'সপ্তপয়কর' নামক কাব্যে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে: "হাটক বেষ্টিত গড়।"৩১ অর্থাৎ রাজার দুর্গ সুবর্ণ নির্মিত। কবির অন্য গ্রন্থেও এই পদবীর ইঙ্গিত মিলে, যেমন, 'সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল' কাব্যে আলাওল রাজা সান্দথুধম্মকে "হেম নৃপ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও লিখিয়াছেন যে, ইঁহার সময়ে পৃথিবী সুবর্ণনির্মিত ছিল।

২৭। ইংরাজী ১৯২৩ সনে (জে) ষ্টুয়ার্ট সাহেব আরাকানের ইতিহাসের এই দৈন্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন: J. Bur. R. S. XIII. part II, পৃঃ ৯৫।

২৮। J. A. S. B., XV, 1846, পৃঃ ২৩৬।

২৯। সতী ময়না (আলাওল লিখিত অংশ), পৃঃ ১০৫।

৩০। J. A. S. B., XV, 1846, পৃঃ ২৩৫।

৩১। সপ্ত পয়কর, পৃঃ ৭।

আলাওল এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, থদো মিন্তরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে থদোর পুত্র (সান্দথুধম্ম) ও কন্যা উভয়ে মিলিত হইয়া মাগনের সহযোগে রাজ্য পরিচালনা করেন।৩২ রাজ্য পরিচালনায় রাজকন্যার এই কৃতিত্বের কথা আরাকানের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং মাগন প্রভৃতি অমাত্যদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ইতিহাসের কোন সংবাদ জানা নাই। এতদ্ব্যতীত মাগনের অপর এক বন্ধু সোলেমানও সান্দথুধম্মের রাজত্বকালে অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন এ কথাও আলাওল লিখিয়াছেন।৩৩ এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর দুইজন বাঙালী কবি আরাকানের রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত মূল্যবান্ সংবাদ দিয়াছেন সেগুলি অজ্ঞাতপূর্ব এবং আরাকানের উল্লিখিত কালের ইতিহাসে সেগুলি যে নূতন আলোকপাত করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংক্ষেপ ব্যাখ্যা:

1. B.S.R.I.B.L.......Beginning of Secular Romance in Bengali Literature by Satyendranath Ghoshal.
2. C.H.I.......Cambridge History of India.
3. H.B.(J)......History of Bengal by Jadunath Sarkar.
4. H. Bur (H)......History of Burma by G. E. Harvey (1925).
5. I.G.I.......Imperial Gazetteer of India (1908).
6. J.A.S.B.......Journal of Asiatic Society Bengal.
7. J. Bur R.S.......Journal of Burmese Research Society.
9. প (শ) পদ্মাবতী—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
8. স-মু-ব সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল—আলাওল (বটতলা সংস্করণ)।
10. Sh. H.A. (J)......Short History of Aurangzeb by Jadunath Sarkar.

৩২। স-মু-ব, পৃঃ ৮।

৩৩। ঐ, পৃঃ ৮-৯।

# কলঙ্কী চাঁদ

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মৌলিক

ঘোষ বংশের রঞ্জন যেদিন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দু'বার দিয়েও পাশ করতে না পারার খবর নিয়ে এসে ঘোষ বংশের সমস্ত চাপা গর্ব্ব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল, সেদিন মেজদা অঞ্জনের বকুনি চরমে উঠল। উল্লুক, গাধা, ওর দ্বারা জীবনে কিচ্ছু হবে না। এত বড় ষ্টুপিড ছেলে আমি জীবনে কোথাও দেখি নি। দু'বারেও পাশ করতে পারল না, ইডিয়ট্ কোথাকার!

—আর একবার দেখ কিছু করতে পারে কি না, মা সান্ত্বনার সুরে বলেন।

—থাম তুমি, ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে অঞ্জন। তোমাদের জন্যেই ত ও গোল্লায় গেল, অমানুষ হ'ল। এক পয়সাও আমি ওর জন্যে খরচ করতে পারব না। বলে দিও তোমার ছেলেকে—এ-বাড়ীর ভাত খেতে হলে পয়সা দিয়ে খেতে হবে। এ-বংশের কলঙ্ক ও।

যে-বংশের বড়দা-মেজদা স্কুল-জীবনে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় কোনদিন হয় নি—প্রথম শ্রেণীর স্নাতক আর অন্যান্য ছোট ভাই-বোনরাও লেখাপড়ায় ততোধিক ভাল—সেখানে রঞ্জনই কিনা এরকম গবেট্। অতএব ওকে বংশের কলঙ্ক ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? কিন্তু বাপ-মায়ের স্নেহ-ভালবাসার পরিমাণটা এই গবেট্ ছেলের প্রতিই একটু বেশী ছিল। তাই পঁচাত্তর বছর বয়সের অক্ষম বাপ নীলমণি ঘোষ আর অঞ্জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। বাদানুবাদে কথা বেড়েই চলে। আজ এই বাদানুবাদের সুযোগে অঞ্জনের চাপা জ্বালার কথা ফেটে বেরয়।—আমি পারব না আপনার সংসার চালাতে। পৃথক্ হয়ে আমি চলে যাব।

বৃদ্ধ বাপও সপ্তমে গলা চড়িয়ে বলেন, যা তুই আমার বাড়ী থেকে চলে। আজই আমার সামনে থেকে দূর হ। বড়টা গেছে—তুইও যা। খাব না, খাব না তোদের ভাত!

মা এসে তাড়াতাড়ি বাধা দেন, আঃ, যা তা কি বলছ তুমি? পাগল হলে নাকি?

—না, ও ভেবেছে কি? কামাই ক'রে খাওয়ায় ব'লে দিনরাত ভয় দেখায় চলে যাব—চলে যাব? যা, এই মুহূর্ত্তে আমার বাড়ী থেকে চলে যা। না খেয়ে মরব, তবু আর তোর ভাত খাব না। উত্তেজনায় নীলমণি ঘোষের সর্ব্বশরীর কাঁপে।

উত্তর দেয় অঞ্জন, হ্যাঁ, তাই যাব।

চোখে সবাই ঝাপসা দেখে। আষাঢ়ে-আকাশের থমথমে মেঘের মত গুম্ হয়ে থাকে সবাই। কিন্তু দু'দিন পর মেজদা অঞ্জন যখন সত্যি সত্যিই আলাদা বাসা ভাড়া ক'রে বৌ-মেয়ে নিয়ে চলে গেল, সংসারের সবাই চোখে তখন অন্ধকার দেখতে লাগল। কারও মুখে কথা নেই, কিন্তু সবার মনে একই প্রশ্ন—তাই ত, এ কি হ'ল! এই কি হওয়ার ছিল! এখন উপায়?

ঘুটঘুটে অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া সিঁড়ি কেউ হাতড়িয়েও খুঁজে পায় না, কিন্তু মনের প্রশ্নের উত্তর সবাই মনেই খুঁজে পায়। উপায় আর কি? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। না খেয়ে মরা! একসঙ্গে সবাই শিউরে ওঠে—সর্ব্বনাশ! সবার প্রশ্ন এক ক'রে উপরের দিকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসার তীর ছোঁড়ে, হায় ভগবান্! তুমি যাদের মার—তাদের কি এমনি করেই মার?

মা এসে বাবার কাছে কেঁদে পড়েন, এ কি করলে তুমি? কেন ওকে তুমি তাড়ালে? এখন কি হবে?

নীলমণি ঘোষ বোকা বনে গেছেন নিজে। এরকম ঝগড়া বাপে-ছেলেতে ত হয়েই থাকে কিন্তু তাই ব'লে ও সত্যি সত্যিই এ ভাবে সবাইকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে? কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে উত্তর দেন, বাড়ী বিক্রী করব।

যার জন্যে সবাই আজ ক্ষিদের আগুনে পুড়ে মরে, যার জন্যে সমস্ত বাড়ীতে অশান্তির আগুন আজ ধূমায়িত হ'ল, সমস্ত কিছুর মূল রঞ্জনকে বাড়ীর সবাই ধিক্কারের পাথর ছুঁড়ে মারে। মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা নিয়ে ক্ষত-বিক্ষত মনে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে আসে রঞ্জন। বাড়ী বিক্রী হয়ে যাবে। এখন খাই আর না খাই, মরি আর বাঁচি—যা হবার তা নিজেদের বাড়ীতেই হবে। আর বাড়ী বিক্রী হয়ে গেলে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও থাকবে না। যে-ক'টা টাকা বাড়ীর দামস্বরূপ পাওয়া যাবে, সে ক'টা টাকায় দু'দিন মোটে চলবে—

তার পর পথে পড়ে মরতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা—এ-বাড়ী তাদের তিন পুরুষের। কত লোকের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার স্মৃতি এ-বাড়ীতে জড়িত। এই রকম প্রায় হাজারখানেক চিন্তা মাথায় নিয়ে এ-রাস্তা সে-রাস্তা টো টো ক'রে ঘুরল। একদিন দু'দিন ক'রে গড়িয়ে গড়িয়ে সাতদিন কেটে গেল। কোন কিছু পেল না। কিছু পাওয়ার আশার আলোও চোখের সামনে ভেসে উঠল না। কেউ কোনরকম আশার বাণী ওকে শোনাল না। চারিদিকে হতাশা, চারিদিকে ব্যর্থতা, চারিদিকে অন্ধকার। বাড়ীতে কারও সঙ্গে কোন কথা বলতে সাহস পায় না। বাড়ীতে পা গুণে গুণে তাকে চলতে হয়। এই ক'দিনে পেটের তাগিদে কয়েকটা অপ্রয়োজনায় আসবাবপত্র বিক্রী করতে হয়েছে। বাবাকে বাড়ী বিক্রী করতে দেয় নি। দশ দিনের মাথায় খবর পেল—কোন এক অফিসে একটা পিয়নের চাকরি খালি আছে। খোঁজ-খবর নিয়ে অফিসে গিয়ে, বড়বাবুর বাড়ীতে ধর্ণা দিয়ে, হাতে-পায়ে ধরে কেঁদে-কেটে অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে আশী টাকা মাইনের এই পিয়নের কাজ যোগাড় করল। কঠিন বাস্তব জগতের সংস্পর্শে এসে দেখল রঞ্জন, সাত-মাথার সংসারে এই আশী টাকা বিরাট মরুভূমিতে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জলের মত কয়েকদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই বাবা-মা'র জবানী দিয়ে বড়দার কাছে পর পর কয়েকটা চিঠি লিখল, সংসারের সমস্ত কিছু জানিয়ে।

রেলের বড় চাকুরে বড়দা—বিলাসপুরে থাকেন বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে। খানসাতেক চিঠি পাওয়ার পর একটার উত্তর দিলেন তিনি, বর্ত্তমানে আমার বাড়ীর সবাই অসুখে ভুগছে। কাজেই আমি এখন কিছুই তোমাদের সাহায্য করতে পারব না। পরে চেষ্টা করে দেখব।

কিন্তু পরে টাকা পাঠাতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন কি না জানা গেল না, তবে টাকা আর এল না, চিঠিও এল না। অতএব সংসারের আরও কিছু জিনিষ বিক্রী করা হ'ল, কিছু জিনিষ বন্ধক রইল। সংসারের এমনাবস্থায় সুস্থমস্তিষ্কের কোন মানুষ ঠিক থাকতে পারে না। তাই স্কুল-ফাইনাল পরাক্ষার্থী সন্তু মাকে বলে, মা, আমিও ন'দার মত কোন একটা কাজ খুঁজে দেখি। এ ভাবে আর ক'দিন চলবে?

ছোট ভাই-বোনরা সবাই রঞ্জনকে ন'দা বলে ডাকে। রঞ্জন সন্তুর কথা শুনে বলে ওকে, না না, তা কি হয় নাকি? তুই কোথায় কাজ পাবি? আমার মাথা নেই বলে আমার লেখাপড়া হ'ল না, তাই বলে কি তোরও হবে না? তোর মাথা আছে, বুদ্ধি আছে, লেখাপড়ায় তুই ভাল। আর তুই···। না না, তোকে পাশ করতেই হবে।

—কিন্তু ন'দা, এ ভাবে আর ক'দিন চলবে, বল?

—ও-সব তোর ভাবতে হবে না। দেখি, আমি আরো কিছু করতে পারি কি না।

সত্যিই রঞ্জন দেখে, লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ, খোঁজ-খবর ছাড়া প্রত্যেক দিন ভোরে খবরের কাগজের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে চোখ বুলোয়· ওর শিক্ষাপো-যোগী কোন কাজ পাওয়া·যায় কি না। কাগজ দেখে প্রত্যেক দিনই নিরাশ হয়। হঠাৎ একদিন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সকালে আংশিক সময়ে একটা কাজ। প্রেসের মেসিনম্যান। ভোর ছ'টা থেকে সকাল ন'টা। প্রথম মাস তিনেক পনেরো টাকায় শিক্ষার্থী হিসেবে থাকতে হবে, তার পর পঁচিশ টাকা। কাজটা ওর উপযোগীই বটে, তবে এখন পাওয়া গেলে হয়। যে চিলের রাজ্য, হয়ত এখনই কেউ ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তখনই জামাটা গায়ে দিয়ে 'দুর্গা দুর্গা' নাম করতে করতে রওনা হ'ল। যতখানি ভেবেছিল, ততখানি নয়। রাজ্যের চিলেরা বোধ হয় এখনও সন্ধান পায় নি। রঞ্জনই প্রথম প্রার্থী আর কাজটা হ'ল ওরই। কিন্তু তাতেই কি হয়? যে-সংসারে মেজদার তিন-চারশ টাকাতেও অকুলান হ'ত, সেখানে মোটে এই শ'খানেক টাকায় কি হবে? বিশাল সাহারাতে কয়েক ফোঁটা জল। কিন্তু রাজ্য চালাবার ভার ভগবান্ যার হাতে ছেড়ে দেন, রাজ্য চালাতে হয় কি ভাবে—এ বুদ্ধিও বোধ হয় ভগবান্ তার মাথায় দিয়ে দেন। রঞ্জনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। একদিন রাত্তিরে রঞ্জন এক গাদা খবরের কাগজ বাড়ীতে নিয়ে এসে হাজির। মা জিজ্ঞেস করেন, এ দিয়ে কি হবে রে রঞ্জু?

—ঠোঙা তৈরী হবে, উত্তর দেয় রঞ্জু। বুঝলে মা, এতে বেশ কিছু পয়সা আসবে।

কলঙ্কের কালিমা মাখানো রঞ্জন রাত জেগে ঠোঙা তৈরী করে। ভাইকে পড়াতে হবে ত! সংসার চালাতে হবে ত। কতদিন রাত্তিরে মা সংসারের সমস্ত কাজ সেরে এসে দেখেন, এক গাদা কাটা কাগজের মধ্যে তাঁর ক্লান্ত ছেলে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের অবসন্ন দেহ ঠোঙা তৈরী করতে করতে এলিয়ে দিয়েছে। কপালে মুখে কয়েকটা মশা বসেছে। মা ছেলের কপালে মাথায়

হাত বোলাতে বোলাতে নীরবে চোখের জল ফেলেন, হায় ভগবান্! ওর কপালে এও ছিল ?

ধার-কর্জ্জ করে সন্তর স্কুলফাইনাল পরীক্ষার ফী জমা দিয়েছে। যে-ছাত্র বৃত্তি পাওয়ার সে বৃত্তি পেল না, তবে প্রথম বিভাগেই পাশ করল। সন্ত মাকে বলল, মা, এবার আমি কাজের সন্ধান করি।

এবারও রঞ্জনের বাধা। সন্ত পড়া-শোনা ছেড়ে দিয়ে কাজ করবে—এতে রঞ্জনের ঘোর আপত্তি। আর তা ছাড়া সরকারী চাকরি পাওয়ার বয়সও সন্তর হয় নি। নানা জায়গা থেকে টাকা যোগাড় করে ভাইকে কলেজে ভর্ত্তি করাল। যেদিন সন্ত ফার্ষ্ট ডিভিশনে আই-এ পাশ করল, সেদিন রঞ্জন টাকা ধার করে বিরাট্ এক মাছ কিনে বসল—যা বছর-তিনেকের মধ্যে এ-বাড়ীতে আনা হয় নি। মাকে বলে রঞ্জু, মাছের মাথাটা কার পাতে দেবে জান ত মা ?

—তুই-ই বল, মাছ কাটতে কাটতে মা উত্তর দেন।

—তোমার এই রত্নের পাতে, সন্তকে দেখিয়ে বলে রঞ্জন।

—না মা, ন'দাকে দেবে, মৃদু আপত্তি জানায় সন্ত।

—আরে, তোকে খাওয়াচ্ছি কি সাধে, এর পেছনে স্বার্থ আছে, বলে রঞ্জু। দেখিস্, তুইও যেন আবার বড়দা-মেজদার মত আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাস নে।

সন্ত ছোট এক হাতুড়ির আঘাত পায় বুকে। ছল্‌ছল্ করে ওঠে ওর চোখ—বলে, ন'দা, তুমি আমাকে এত···।

—আরে না না, আমি তোকে এমনি বললাম, সন্তর কথা সমাপ্তির পূর্ব্বেই বলে রঞ্জন। আমি জানি তুই আমাকে ছেড়ে কোনদিন যেতে পারবি নে।

কিন্তু তা ত হ'ল—এর পর ? এর পর সন্ত জীবন-যুদ্ধে নামতে চায়, এবারও রঞ্জনের প্রচণ্ড বাধা। না না, তোকে আরও পড়তে হবে। আমার মাথা নেই বলে আমার লেখাপড়া হ'ল না—আর তুই বড়দা-মেজদার চেয়েও মেধাবী হয়ে শুধু আই-এ পাশ হয়ে থাকবি ? না না, তা হবে না। তোকে আরও পড়তে হবে। আরও এগিয়ে যেতে হবে তোকে। বড়দা-মেজদাকে আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, তাঁদের সাহায্য ছাড়াও আমরা বড় হতে পারি। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

—কিন্তু আর যে চলছে না ন'দা, উত্তর দেয় সন্ত। তোমার একার উপর এত চাপ !

—চলছে না জানি, বলে রঞ্জন। ভাল-মন্দ কোন কিছু খাওয়াতে-পরাতেও পাচ্ছি নে। তবু এর ভেতর থেকেই আমাদের দাঁড়াতে হবে।

—কিন্তু চাকরি করেও ত পড়া যায় ন'দা। সন্তর এ কথায় বাড়ীর সবাই সায় দেয়।

—বেশ, তাই হোক, উত্তর দেয় রঞ্জন। তুমি একবেলা একটা টিউশনি কর, কলেজ কর, আর এর মধ্যে যদি কোনও চাকরি জুটে যায়, তখন ক্লাসটা নাইটে করিয়ে নিলেই হবে।

তাই হ'ল। মাঝে মাঝে সন্ত চাকরির দরখাস্ত দেয় রঞ্জনকে—অফিসে দিয়ে আসবার জন্যে অথবা ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে যাবার জন্যে। মাসের পর মাস চলে যায় কিন্তু কোন জায়গা থেকেই সন্তর কোন 'ইণ্টারভিউ লেটার' আসে না। এ সম্বন্ধে সন্ত কোন প্রশ্ন করলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় ন'দা, আরে দূর, এ যুগে পেছনে কোন খুঁটির জোর না থাকলে কি কিছু হয় ?

যাই হোক—প্রেসে আর অফিসে দু' জায়গাতেই রঞ্জনের মাইনে কিছু বেড়েছে। ঠোঙার ব্যবসাও ভালই চলছে—আরও কয়েকটা নতুন দোকান পেয়েছে। খুব ভোরে উঠে স্নান ক'রে ভাই-বোনদের ঘুম থেকে ওঠার আগেই মা'র হাতে গড়া রুটি আর চা খেয়ে ঠোঙার দুটো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায় রঞ্জন। প্রেস থেকে বেরিয়ে কি খায় না খায়—ওই জানে, তার পর অফিসে যায়। অফিস থেকে বেরিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে ঠোঙা দিয়ে কাগজের দাম নিয়ে ভাঙ্গা-বাজারের অবশিষ্ট কিছু তরিতরকারি কিনে হেঁটে ফিরতে রাত এগারটা বেজে যায়। মা ছেলের জন্যে ভাত নিয়ে বসে থাকেন। নীরবে চোখের জল ফেলেন আর মনে মনে বলেন, হা ভগবান্! কত অল্প বয়সে এই অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে ওকে সংসার চালাতে হচ্ছে! একটু মুখ তুলে চাও ঠাকুর—একটু মুখ তুলে চাও।

সত্যি, কি অদম্য উৎসাহ, কি অদ্ভুত মনের জোর রঞ্জনের। কিন্তু সব সময় মনের জোরের সাথে দেহ পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না। তাই এর মাঝে দু'একবার ছোট-খাট অসুখে ভুগে উঠেছে।

নানা জায়গা থেকে টাকা ধার-টার করে চেয়ে-চিন্তে সন্তর বি. এ. পরীক্ষার ফী জমা দিয়েছে। পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রঞ্জন টিফিন দিতে আসে সন্তকে। লেখাপড়ায় না পারার দুর্ব্বলতায় কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকতে সাহস পায় না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ দেখে, সন্ত লাফাতে লাফাতে আসে—বলে, ন'দা, ন'দা, আমার পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছে ন'দা, খুব ভাল হয়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে প্রশ্ন-পত্রটা এগিয়ে দেয় সন্ত ন'দার দিকে, দেখ দেখ ন'দা দেখ, খুব ভাল কোশ্চেন হয়েছে, দেখ।

মুখ কাঁচুমাচু করে উত্তর দেয় রঞ্জন, আমি কি দেখব ধল—আমি ত কিছু বুঝব না।

সন্তর বুকে কে যেন লজ্জার চাবুক মারল। লজ্জায় সন্ত মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল—ধরা গলায় বলল, ওঃ, কিছু মনে ক'রো না ন'দা। খুব ভুল হয়ে গেছে! হঠাৎ বলে ফেলেছি। তুমি কিছু মনে ক'রো না।

—না না, আমি কি মনে করব, উত্তর দেয় রঞ্জন, আয় এদিকে আয়।

নিরালায় একদিকে নিয়ে এসে সন্তকে টিফিন দিতে যায় রঞ্জন। সন্ত আপত্তি জানায়, না ন'দা, এ হবে না। তুমি নিজে না খেয়ে হেঁটে এসে আমাকে খাওয়াবে—তা আমি খেতে পারব না।

—নে নে, খা, বলে রঞ্জন, মা ত আর তোকে পয়সা-টয়সা দিতে পারেন নি?

সন্ত তবু আপত্তি জানায় কিন্তু রঞ্জনের স্নেহের ধমকের কাছে ওর আপত্তি টেকে না। সন্তর বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে। সেদিন কি একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ সারা বাড়ী তোলপাড় করেও খুঁজে পায় নি সন্ত। তাই নিষেধ-না-মানা তালাহীন ন'দার স্যুটকেসে জিনিষটি খুঁজতে গিয়ে দিদিকে ডেকে আর একটি জিনিষ দেখায়। এতদিন ধরে সন্ত চাকরীর যে সমস্ত দরখাস্ত করেছিল তার একটিও জমা দেওয়া হয় নি। সব ক'টা স্যুটকেসে। প্রত্যেকটি খামের উপর লেখা, "থার্ড ক্লাস গ্র্যাজুয়েটদের চেয়ে ফার্ষ্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক-আই. এ. পাশ করা ছেলেদের চাকরি পেতে বেশী সুবিধে। জানি, এগুলো জমা দিলে এর ভেতর যে কোন একটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি হবেই। কিন্তু চাকরি হলে পড়া হবে না, পড়া হলেও পরীক্ষায় ভাল ফল হবে না। অতএব এগুলো জমা দিলাম না।" দুই ভাই-বোনের চোখ ছলছল্ করে ওঠে। তাদের অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ন'দার পায়ে নিঃশেষ করে দিতে চাইল, হায় ন'দা! তুমি এত মহৎ, এত উদার, এত ভালবাস তুমি, এত ত্যাগ তোমার, এত উঁচু তোমার মন! তোমায় শতকোটি প্রণাম ন'দা, তোমায় শতকোটি প্রণাম! কৃতজ্ঞতায় দুই ভাই-বোনের চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল পড়ে।

বছর চারেক পর বড়দার একটা চিঠি এল। লিখেছেন, মা, প্রমোশন পেয়ে কলকাতায় আমি বদলী হয়ে যাচ্ছি, প্রস্তুত থেক। যথাসময়েই বড়দা এলেন। তিনি এসে মেজদার মান ভাঙ্গিয়ে তাকেও বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলেন। অনেকের চোখ দিয়েই কয়েক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। জীবন-নদীর জোয়ার-ভাঁটায় অনেক কিছুই ওলট্‌পালট্ হয়, অনেক কিছুই বেঠিক ঠিক হয়, অনেক অসহ্য সহনীয় হয়, অনেক সহনীয় অসহনীয় হয়। বড়দা-মেজদা সংসারে কর্ত্তা। তাদের কল্যাণ-হস্তস্পর্শে বাড়ী ঘরদোরের শ্রী ফিরল। বড় বড় টাকার লোকের বড় বড় কথা, বড় বড় কাজ। এখন আর রঞ্জনের পিয়নগিরির টাকা, প্রেসের কালিঝুলি মাখা-টাকা আর ঠোঙা বিক্রীর টাকার মুখাপেক্ষী হয়ে কারও বসে থাকতে হয় না। বাবা মা ছোট ভাই-বোন রঞ্জনকে ভালবাসলেও এ সংসারে এখন ওর আর কোন কর্ত্তৃত্ব নেই। খায়-দায়, যায় আসে, শোয় থাকে, এই পর্য্যন্তই। ছোট বোন রিতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ছেলে কোথাকার কি করে, কি বৃত্তান্ত—কিছুই সে জানে না। উড়ো-উড়ো কথা কানে এসে লাগে আর মা যা বলেন—তাই শোনে। বিয়েতে বিপুল আয়োজন করা হবে। বাবা মাকে উপলক্ষ্য করে দুই দাদা আর তাঁদের বিদুষী দুই ভার্য্যার মধ্যে যুক্তি-শলাপরামর্শ চলে। বাবা-মা 'হুঁ' 'না' 'না' 'হুঁ' করে কেবল সংক্ষিপ্ত উত্তরে ঠেকা দিয়ে যান। রিতার এসব ভাল লাগে না। ভীষণ বিসদৃশ ঠেকে ওর কাছে। মাকে বলে, মা, বড়দা, মেজদা কি ন'দার সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করতে পারে না? কেন ন'দা কি কেউ নয়?

—চুপ কর রিতা, উত্তর দেন মা, ওদের টাকা, ওরা যা খুশি তাই করুক।

রিতা গুমরে গুমরে থাকে—মুখে কিছু দাদাদের বলতে পারে না।

সন্তর বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ফল জেনে প্রথমেই সন্ত ন'দার কাছে আসে, ন'দা, ন'দা—আমি 'অনার্স' পেয়েছি ন'দা।

রঞ্জনের চোখ আনন্দে ছলছল্ করে ওঠে,—সত্যি?

—হ্যাঁ ন'দা।

—আমি জানতাম তুই অনার্স পাবি, ঠিক পাবি—ঠিক পাবি।

ন'দার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায় সন্ত। বাধা দিয়ে রঞ্জন বলে, আরে দূর, প্রণাম করতে হবে না। আজকালকার ছেলেরা কি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে? সন্তর দুই চোখের কোণে জলের রেখা দেখা দেয়, বলে,

আমার প্রণাম তুমি নেবে না—ন'দা? আমায় তুমি বাধা দেবে?

—আচ্ছা, নে নে, কর, উত্তর দেয় রঞ্জন।

ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে ন'দা। সন্তর বুকে এক ফালি মেঘ জমেই ছিল—এতক্ষণ পর তা ঝিরঝির্ করে ঝরে পড়ে, এ পাস আমার নয় ন'দা, এ পাস তোমার। এ জয় আমার নয়, এ জয় তোমার। তোমার ভালবাসা, তোমার উদারতা, তোমার মানবতার নাগাল আমরা কেউ কোনদিন পাব না। তুমি···। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সন্ত।

সন্তর চোখের জল মোছাতে মোছাতে বাধা দিয়ে বলে রঞ্জন, হ্যাঁ রে, বাবা-মা-বড়দা-মেজদা ওনাদের জানিয়েছিস্ ত?

—না ন'দা, তোমার কাছেই প্রথমে এসেছি।

—যা যা, শীগ্‌গির যা, বলে সন্তকে পাঠিয়ে দেয় রঞ্জন।

সন্তর এ সংবাদে বাড়ীতে যেন আনন্দের তুফান ছোটে। বিকেলে রঞ্জন চা খেতে ঢুকবে এমন সময় দাদা-বৌদিদের আলাপ-আলোচনা শুনে থমকে দাঁড়ায়। বড়দার গলা শোনা যায়, হ্যাঁ, সন্তই দেখিয়ে দিল বটে! এত অভাব-অনটনের মধ্যে ইংরেজীতে 'অনার্স' নিয়ে পাস করা কি যা তা কথা?

—আমরা হলে কিন্তু কেউই পারতাম না, মেজদা সায় দেয়।

ঘর থেকে আবার ভেসে আসে, রঞ্জনটাই মানুষ হতে পারল না। ওটা মূর্খই রয়ে গেল চিরকাল। ভীষণ আঘাতের বিরাট্ এক হাতুড়ির ঘা রঞ্জনের বুকে মারল বড়দা।

আবার ঘর থেকে ভেসে আসে, আরে, আজকাল অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেট না হলে কি ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেওয়া যায়, না ভদ্রসমাজে ওঠা-বসাই করা যায়? ওই আমাদের নাম ডোবাল। এবারে বড়দা ধিকারের পাথর ছুঁড়ে মেরেছে রঞ্জনকে।

টপ্ টপ্ করে রঞ্জনের চোখ দিয়ে জল পড়ে। চা খেতে না ঢুকে মুখ লুকিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে চলে আসে। নদীর ধারে এসে বসে। বড়দার কথাগুলো ওর মনের তরঙ্গে অনবরত ওঠানামা করছে। সত্যিই ত রঞ্জন ওদের সংসারের নাম ডুবিয়েছে। ওর ভাইরা উচ্চ-শিক্ষিত। বড়দা-মেজদা বড় চাকুরে। আর রঞ্জন? নন-ম্যাট্রিক, করে পিয়নগিরি, ভদ্রসমাজে বাসের অযোগ্য সে। হাঁটুর উপর মাথা রেখে রঞ্জন ডুকুরে ডুকুরে কাঁদে। কিন্তু আঘাত খাওয়ার বেদনার যে বিরাট্ পাথর ওর বুকে চেপে আছে—তা কি আর এই কান্নায় যাবে? একটা পাল-তোলা নৌকো আস্তে আস্তে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। রঞ্জনের ক্ষত-বিক্ষত মন সেই অদৃশ্য হয়ে-যাওয়া নৌকোর সাথে কোন্ এক অজানা দেশে চলে যায়। সূর্য্যের আলো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। সন্ধ্যাদেবী তাঁর ছায়া-আবরণে ধরণীকে আবৃত করে ফেলেন। উঠে পড়ে রঞ্জন। মনে তার দুঃখ-বেদনার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘরাশি স্তরে স্তরে জমা হয়ে আছে, যে মেঘে আছে শুধু কান্নার ঢেউ। যেমন ভাবে মুখ লুকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তেমনি ভাবেই সে ঘরে ঢুকল।

রাত্তিরে রিতা, সন্ত খেতে ডাকে, ন'দা খাবে চল।

—না রে, আজ খাব না, শরীরটা বিশেষ ভাল না—উত্তর দেয় ন'দা।

—জ্বর-টর হয় নি ত?

—না, এমনিই ভাল লাগছে না।

—তুই খাবি নে কেন রে রঞ্জু? কি হয়েছে তোর?—মা এসে সাধাসাধি করেন।

—শরীরটা আজ ভাল লাগছে না মা।

—জ্বর-টর কিছু হয় নি ত, দেখি? গায়ে-কপালে হাত দিয়ে মা পরীক্ষা করেন।

—না মা, ওসব কিছু না।

—তবে চ' এক মুঠো খাবি চ' বাবা, তোর কোন খারাপ হবে না, মা তবু পীড়াপিড়ি করেন ছেলেকে।

—বিশ্বাস কর মা, সত্যিই আমার শরীরটা আজ ভাল লাগছে না।

ছেলেকে মা এতদিন বিশ্বাসই করে এসেছেন। অগত্যা আর কিছু তিনি বলেন না। তবে মায়ের মন বুঝতে পেরেছিল যে, নিশ্চয়ই তাঁর অভিমানী ছেলের কিছু হয়েছে; তাই যখন ভোরবেলা তাঁর অভিমানী ছেলে রঞ্জন কাকপক্ষী ডাকার আগেই সদর দরজা খুলেই বেরিয়ে যায়—তখনই মা জেগে ওঠেন। রঞ্জনকে তিনি বেরিয়ে যেতে দেখেও কাউকে ডাকতেন না—যদি তার বিছানায় অভিমানী ছেলের চিঠি তিনি না পেতেন।

মা,

তোমার সংসারের সবাই উচ্চশিক্ষিত। বড়দা, মেজদা, সন্ত—তোমার কৃতী সন্তান। শুধু আমিই তোমার মূর্খ, অকৃতী, অমানুষ সন্তান। মানুষ হতে পারলাম না। রিতার বিয়েতে বহু জ্ঞানী-গুণী আত্মীয়-স্বজন আসবেন, তাঁদের কাছে আমার পরিচয় দিতে তোমরাই লজ্জা পাবে, আমি যে তোমাদের সংসারের কলঙ্ক মা। তাই এ লজ্জার হাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই

আমি চলে যাচ্ছি। আজ তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জাও নেই—বাধাও নেই যে, আমার টিফিন খাওয়ার পয়সা থেকে চার-ছয় পয়সা করে বাঁচিয়ে একশ' টাকা জমিয়েছিলাম। তোমার বিছানার তলায় রেখে গেলাম। মূর্খ-পিয়ন ন'দার এই ক্ষুদ্র আশীর্ব্বাদ রিতাকে দিও। ওকে বুঝিয়ে বলো—ও যেন দুঃখ না করে।

জানি মা, তুমি দুঃখ পাবে। কিন্তু কি করব বলো, শিক্ষিত-কৃতী সন্তানের মাঝে অকৃতী-অমানুষ সন্তান আমি স্থান পাব না—তাই যাচ্ছি। যদি কোন অপরাধ করে থাকি তবে এই অমানুষ সন্তানকে ক্ষমা ক'রো, মাগো। আমার বুকের ব্যথা, আমার চোখের জলই আমার পরিচয়। আমার ব্যথা আমি কাউকে কোনদিন বোঝাতে পারব না মা! প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার অকৃতী, অমানুষ, মূর্খ সন্তান রঞ্জন।

চিঠিখানা পড়েই মা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন, ওরে, আমার রঞ্জু চলে গেল, চলে গেল। ওকে ফিরিয়ে এনে দে তোরা, আমার রঞ্জুকে তোরা ফিরিয়ে এনে দে।

মা'র বুকফাটা কান্নায় সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সবাই মায়ের কাছে ছুটে আসে, কি হয়েছে মা—কি হয়েছে? মাকে বলতে হয় না। চিঠিখানা পড়েই সবার মাথা ঘুরে যায়—তাই ত, এ কি হ'ল? রিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তুমি আমায় এত কঠিন শাস্তি কেন দিলে ন'দা, এত কঠিন শাস্তি কেন দিলে? ফিরে এস ন'দা, ফিরে এস, তোমার দু'টি পায় পড়ি, দু'টি পায় পড়ি।

কলঙ্কের কালিমা-মাখান রঞ্জন প্রত্যেকের মন রাঙিয়ে দিয়ে চলে গেল। বাড়ীর সবাই রঞ্জনের জন্য ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে। যে বড়দা-মেজদা পরীক্ষার খাতায় সবাইকে হারিয়ে দিয়ে ফার্স্ট হ'ত, জয়ী হ'ত—আজ সেই বড়দা-মেজদা জীবনের চরম পরীক্ষায় রঞ্জনের কাছে হেরে গেছে। মাথা নত করে মনে মনে এ পরাজয় তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে। শুধু মা-বাবা আত্মীয়-স্বজনের কাছেই নয়—সমস্ত বিশ্বের কাছে আজ তারা অপরাধী হয়ে গেছে। রঞ্জনের চলে যাওয়াটাই তাদের ভেতরের মানুষকে শপাং শপাং করে চাবুক দিয়ে চাবকাতে লাগল। এই বিশাল পৃথিবীতে হারিয়ে-যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করার যতরকম পন্থা থাকতে পারে, বড়দা-মেজদা-সন্তু সব রকম পন্থাই অবলম্বন করেছে কিন্তু তারা রঞ্জনকে খুঁজে পায় নি। বৃদ্ধ নীলমণি ঘোষের চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরে পড়েছে। শেষে একদিন অন্ধ লোকের হারিয়ে-যাওয়া লাঠি চারিদিকে হাতড়িয়ে খুঁজতে খুঁজতে কূপের মধ্যে পড়ে মারা যাওয়ার মত তিনিও মারা গেছেন।

দুই

ঘোষ-বাড়ীর রূপের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। ইট বের করা, চুণ-সুরকী-বালি ঝরে ঝরে পড়া বাড়ীটা এখন ঝকঝকে তকতকে বিরাট্ অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। বাড়ীর সামনে সুন্দর ফুলের সাজান বাগান। দু'তিনটে মটরগাড়ী রাখবার গারাজ। প্রকাণ্ড গেটের উপর লেখা আছে "ঘোষ-লজ"।

মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি, ঘাড় অবধি ঝুলে-পড়া লম্বা লম্বা চুল, পরণে আধা ছেঁড়া আধা ময়লা জামা-কাপড়, পায়ে ছেঁড়া চটি, হাতে ছোট্ট একটি পুঁটুলী নিয়ে দীর্ঘ আট বছর পর রঞ্জন সেই বিরাট্ অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল। অনেক ইতঃস্তত করে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে যায়, হঠাৎ—হঠ্ যাও, হঠ্ যাও হিঁয়াসে, হঠ্ যাও—ব'লে মেদিনী কাঁপান চীৎকার করে সাড়ে সাত ফুট লম্বা এক বিশাল বপুর দারোয়ান এসে রঞ্জনের পথরোধ করে—কেয়া মাঙ্তা তোম্—হঠ্ যাও হিঁয়াসে—হঠো—হঠো—ব'লে রঞ্জনকে বাড়ীর প্রাঙ্গনের বাইরে বার করে দেয়।

যে-বাড়ীকে বুকের রক্ত তিল তিল করে ক্ষয় করে একদিন সে রক্ষা করেছিল—আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সে-বাড়ীতে তারই প্রবেশের কোন অধিকার নেই। রঞ্জন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক অনুনয়-বিনয় করেও বাড়ীতে ঢোকবার ছাড়পত্র পায় না। একটা চাকর বাইরে এলে তাকে সন্তুর কথা জিজ্ঞেস করে। চাকরটি উত্তর দেয়—ছোটবাবু ত কলেজে—বলেই হন্ হন্ করে তার কাজে চলে যায়।

সন্তু নাম-করা এক কলেজের প্রফেসর হয়েছে। কিছুক্ষণ পর গাড়ীতে করে বাড়ীতে ফেরে। গাড়ী থেকে নামতেই রঞ্জন তার সমস্ত দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে ডাক দেয়—স-স—সন্তু—সন্তু।

অবাক্ হয়ে যায় সন্তু। তাকে এ-ভাবে নাম ধরে অনেক দিন এ-বাড়ীতে কেউ ডাকে না। সবাই তাকে ছোট বাবু বলেই ডাকে। পেছন ফেরে। দেখে। কিন্তু চিনতে পারে না। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে—কে আপনি?

—তোর ন'দাকে চিনতে পারছিস্ না, সন্তু? আমি রঞ্জন—করুণ হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে।

—হ্যাঁ—ন'দা?—ভীষণ এক অবাকের ধাক্কা খেল সন্তু। ওর মনে হ'ল—জগতে এখন এর চেয়ে আশ্চর্য্য যেন আর কিছুই হতে পারে না। দীর্ঘ আট বছর ধরে বহু ভাবে, বহু জায়গায় খুঁজেও যাকে পায় নি—আজ সেই-ই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই দোরে এসে দাঁড়িয়েছে? এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য? এগিয়ে গেল—আরও কাছে সে এগিয়ে গেল। রঞ্জনের লম্বা লম্বা দাড়ি-ভর্ত্তি মুখখানা ধ'রে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল। এবার চামড়ার চোখের কাছে তার মনের চোখ হার মানল;—হ্যাঁ—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই···, হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই ত ন'দা—এই ত ন'দা—এই ত ন'দা—চীৎকার করে বাগানের সমস্ত নীরবতা-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সমস্ত বাগান কাঁপিয়ে তুলল সন্তু। বাগানে ফুলের গাছগুলো হাওয়ার ঢেউয়ে ধানের শীষের দোল খাওয়ার মত দোল খাচ্ছে—নাচছে। আর সন্তু আনন্দের ঢেউয়ে বৈশাখী এলোমেলো পাগলা হাওয়ার মত মেতে উঠল,—ছোটা-ছুটি করতে লাগল। একবার বাড়ীর অর্দ্ধেক পথ চীৎকার করতে করতে ছুটে যায়—মা—মা,—ন'দা—ন'দা···। আবার রঞ্জনের কাছে ছুটে এসে তার হাত ধরে টানে—এসো—এসো—ন'দা—এসো—এসো। আবার কিছুদূর চীৎকার করতে করতে ছুটে যায়—মা—মা,—ন'দা—ন'দা—মা—ন'দা—মা—ন'দা, মা···। আবার ছুটে এসে রঞ্জনের হাত ধরে টানে—এসো—এসো—ন'দা—এসো—চলো—চলো—চলো। আবার কিছুদূর চীৎকার করতে করতে ছুটে যায়—মা—মা—বড়দা—মেজদা——বৌদি—ন'দা—ন'দা...মা—বড়দা,···ন'দা···।

ঘুমন্ত বাড়ীতে আগুন ধরে গেলে—সেই বাড়ীর লোক জেগে যাওয়ার পর যে-রকম সোরগোল হয়—সেই রকম সোরগোলে সমস্ত 'ঘোষ-লজ' বাড়ীটা সরগরম হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু পরেই সবাইকে হতাশ হতে হয়—এ কি চেহারা হয়েছে রঞ্জনের! একটু লম্বা হয়েছে কিন্তু দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে—গায়ে এক ফোঁটাও রক্ত নেই—গায়ের রং একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—চামড়া দিয়ে শুধু হাড়গুলো ঢাকা।

মা রঞ্জনকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, এই ছেলের জন্যেই কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দুই চোখে ছানি পড়ে গেছে, চোখে দেখতে পান না। ছেলের গায়ে তিনি হাত বুলিয়ে দেন আর বলেন, তুই মুখে দাড়ি রেখেছিস কেন বাবা? তুই সন্নেসী হয়েছিলি, কোন্ দুঃখে তুই সন্নেসী হয়েছিলি রে?

আরও অনেকে রঞ্জনকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিল, এতদিন কি করছিল—ইত্যাদি। কিন্তু রঞ্জন কোন উত্তর দেয় না—শুধু ওর ঠোঁটের কোণে একটু করুণ হাসি ফুটে ওঠে। যাক গে—এতদিন পর যে রঞ্জন ফিরে এসেছে—এইটেই যথেষ্ট সবার কাছে, তাই বাড়ীতে আনন্দোৎসবের আয়োজন চলছে। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এই উৎসবায়োজন—সে কিসের একটা প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে ক্ষণগুলো গুণে চলেছে। খক্ খক্ করে কাশে। মা ছেলের বুকে হাত বুলিয়ে দেন, বলেন, তোর কাশি হয়েছে বাবা, দাঁড়া তোর বুকে আমি তেল মালিশ করে দিই।

বাধা দিয়ে রঞ্জন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, না মা, ওসব দরকার নেই। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও—আমি চলে যাই মা—আমাকে ছেড়ে দাও তুমি।

—না না, আবার তুই কোথায় যাবি, ব'লে আরও জোরে ফিরে-পাওয়া হারানো ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন মা।

খবর পেয়ে রিতা শ্বশুরবাড়ী থেকে ছুটতে ছুটতে এতদিনের তার অদর্শিত ন'দাকে দেখতে আসে। কিন্তু নিমেষেই তার আনন্দ কর্পূরের মত উপে যায়, এ কি হয়েছে ন'দা, তোমার চেহারা? একটু পরেই মেঝেতে নজর পড়তেই রিতা আর সন্তুর মাথায় যেন সমস্ত আকাশটা ভেঙ্গে পড়ল, এ কি? রক্ত! এত রক্ত!

রঞ্জন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ভীত কণ্ঠে বলে, ও-ও আমার রক্ত, আমার রক্ত—আমাকে কাল রোগে ধরেছে রে সন্তু, মাকে আমি এত বলছি—তাও মা কিছুতেই ছাড়বে না, মাকে একটু বুঝিয়ে বল না রিতা—আমি চলে যাই এখান থেকে—আমি চলে যাই।

এবার রিতা আর সন্তুর দু' চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল, এ কি করেছ—ন'দা? এ ভাবে কেন তুমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিলে? কেন—কেন—কেন তুমি নিঃশেষ করে দিলে এ ভাবে নিজেকে?

ন'দার মুখে শুধু একটু করুণ হাসি ফুটে ওঠে, যে হাসি কাউকে বোঝাতে হয় না—দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ হাসি কত দুঃখ ব্যথা বেদনা মিশ্রিত।

উৎসবমুখর বাড়ীতে দুঃখের কালো ছায়া নেমে আসে। রিতা ছুটে চলে আসে ওর শ্বশুরবাড়ীতে স্বামীর কাছে। ওর স্বামী অমল বসু শহরের এক নামকরা ডাক্তার। তিনি এসে দেখে বলেন, এ যে শেষ সময় রিতা!

রিতা তার সমস্ত সোনা-গয়না সিন্ধুকের চাবি সমস্ত কিছু তার স্বামীর পায়ে ফেলে দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল,

যে করেই হোক—যেখান থেকেই হোক—যত টাকা লাগে ভাল ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসে দেখাও, ন'দাকে যে বাঁচাতেই হবে—তোমার ছু'টি পায়ে পড়ি, ন'দাকে বাঁচাও—ন'দাকে বাঁচাও।

ডাঃ অমল বসু জানতেন, যেখানে সাড়ে পনের আনাই যমের হাতে চলে গিয়েছে—সেখানে পৃথিবীর এমন কোন ডাক্তারই নেই যিনি আধ আনা শ্বাসের আশের রুগীকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বাঁচাতে পারেন। তবু বড়দা-মেজদা-রিতা-সন্তুর আকুতি-মিনতি অনুরোধে অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁকে বলতে হয়, কাল ভোরে ভিয়েনা থেকে একজন ডাক্তার land করছেন, তিনি প্রথমেই যাতে ন'দাকে দেখেন সে ব্যবস্থা আমি করছি।

বড়দা-মেজদার মনে আর এক অপরাধে অপরাধীর আশঙ্কার বাসা বাঁধে। তারা যদি রঞ্জনকে বাঁচাতে না পারে—তবে তারা সমস্ত জীবন রঞ্জনের কাছে ঋণী থেকে যাবে—যে ঋণ চিরদিন অপরিশোধ্য। তাদের মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপরাধের বোঝা তাদের ব'য়ে যেতে হবে। বড়দা-মেজদা-সন্তু প্রত্যেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করল তাদের সমস্ত অর্থ গাড়ী বাড়ীর বিনিময়েও রঞ্জনকে বাঁচাতে।

যে ছেলে সমস্ত জীবন অমানুষিক পরিশ্রম করে কোনদিনও কাউকে মুখ খুলে বলে নি আমার কষ্ট হচ্ছে, আজ সামান্য একটা ইন্‌জেকশন দিতে গিয়ে সেই ছেলের মুখ দিয়ে একথা উচ্চারিত হ'ল, আর কেন ডাক্তারবাবু শুধুশুধু আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন? রঞ্জনের মুখে আবার সেই দুঃখ-বেদনামিশ্রিত হাসি ফুটে ওঠে।

কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিটার এক-একটা ক্ষণ যেন এক-একটা ঘণ্টা হয়ে পেরচ্ছে। রাত্রি ভোর হতে এখনও ঘণ্টা তিনেক বাকি। কিন্তু বড়দা-মেজদা প্রত্যেকের মনে হচ্ছে—সেই তিন ঘণ্টা পেরতেই যেন তিরিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে। দুঃখের রাত্রি যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

ফুরফুর করে বসন্তের হাওয়া বইছে। রাত্রি ক্ষণগুলো এক এক ক'রে পার করে দিয়ে, বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছল। ভোরের আলো দেখা দিতে লাগল। কিন্তু রঞ্জনের জীবন-প্রদীপের আলোর শক্তিও আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। অনেক কষ্টে মাকে ক'টা কথা বলল, মা মা, আমার দুঃখের রাত্রি শেষ হ'ল মা!

সবার মনে হ'ল কে যেন তাদের হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। মা ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা বন্ধ করে দেন। রঞ্জনের শ্বাস উঠতে আরম্ভ করে। বড়দা-মেজদা রঞ্জনের দুই পাশে এসে দাঁড়ায়। রঞ্জনের হাত ধ'রে অতি কষ্টে ধরা-গলায় তারা বলে, রঞ্জু, রঞ্জু, বলে যা ভাই—বলে যা—তুই আমাদের ক্ষমা করেছিস—আমাদের ক্ষমা করেছিস তুই?

কি যেন রঞ্জু বলতে চায়, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে যায়। রঞ্জনের শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ীতে কান্নার রোল ওঠে। বড়দা-মেজদা অবাক্ হয়ে রঞ্জনের ফ্যাকাশে-শুকনো মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। সন্তু তার এক বন্ধুর সঙ্গে ভোরে ভিয়েনা-আগত ডাক্তারকে আনতে গিয়েছিল। সেদিনের খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই হঠাৎ সন্তুর দৃষ্টি আটকে গেল, অ্যাঁ, এ যে ন'দার ফটো!

বন্ধুকে সেখানে বসিয়ে রেখেই সন্তু ছুটতে ছুটতে বাড়ী আসে। বাড়ীর গেটের কাছে আসতেই কান্নার শব্দ তার কানে যায়। উন্মত্তের মত ছুটতে ছুটতে এসে ন'দার বুকে আছড়ে পড়ে। মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে ন'দাকে বুকে টেনে নিয়ে চীৎকার করে ওঠে—ন'দা, ন'দা,—তুমি বাংলা দেশের কৃতী সন্তান—তুমি ইউনিভার্সিটির কৃতী সন্তান—জেনে যাও ন'দা—তুমি এম. এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট—ন'দা তুমি এম. এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট—জেনে যাও ন'দা—জেনে যাও—ন'দা—ন'দা—ন'দা গো···ন'দা···!

ন'দা এ-খবর জেনে যেতে পারে নি, ততক্ষণে ন'দা এ-লোক ছেড়ে অন্য লোকে চলে গেছে—যেখানে ব্যথা-বেদনা-দুঃখ কিছু নেই—আছে শুধু ঘুম আর ঘুম···।

এতক্ষণ পর বড়দা-মেজদার মনের চাপ চাপ মেঘ মুষল ধারে ঝরে পড়তে লাগল। তারা নিজেরাও জানত না যে, এ ভাবে তারা কোনদিন কাঁদতে পারে! কাঁদছে সবাই, কাঁদছে···। এমন কি প্রকাণ্ড "ঘোষ-লজ" অট্টালিকাটার প্রতিটি ইঁট, চুণ, সুরকী, বালির প্রতিটি কণা ডুকুরে ডুকুরে কাঁদছে। অশান্ত সমুদ্রও তার ঢেউ হয়ত থামাতে পারে কিন্তু তারা এ কান্নার ঢেউ কোনদিন থামাতে পারবে কি না তা তারাই জানে!

—

# রাখসী থানের বলি

( সাঁওতাল বিদ্রোহের এক অধ্যায় )

শ্রীকালীপদ ঘটক

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ব মুহূর্ত। রাজমহল ও তিন পাহাড় অঞ্চল সন্নিহিত বর্তমান সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই-কো প্রদেশে ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর অমানুষিক শোষণ-নীতির ফলে সাঁওতালদের মধ্যে যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার তিক্ততম ইতিহাস পুরাতন পুঁথির পাতায় কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। সেই সঙ্গে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার দৌর্বল্য ও দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্ধ আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচারী মনোভাব সাঁওতালদের মধ্যে জটিলতম এক দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তোলে। শঠ ও প্রতারক ব্যবসায়ীশ্রেণীর অতি-বুদ্ধির ঘোরপ্যাঁচের ফলে সরলপ্রাণ সাঁওতালদের বহুকষ্টার্জিত শস্যভাণ্ডার দেখিতে দেখিতে একেবারেই নিঃশেষ হইয়া গেল। কুশীদজীবী মহাজনকুল ছলে কলে কৌশলে নানান ভাবে সাঁওতালদের প্রলুব্ধ করিয়া একে একে তাহাদের অযাচিত ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। অবস্থার পাপচক্রে পড়িয়া উত্তমর্ণের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়া গেল দামনবাসী অধিকাংশ সাঁওতাল। শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যভূমিকে কর্ষণযোগ্য শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়া নিজের দৈহিক শক্তির সাহায্যে যে সাঁওতাল মাটির বুকে একদিন সোনা ফলাইয়াছিল, নিজের হাতে-গড়া দায়বদ্ধ সেই স্বর্ণপ্রসূ-শস্যক্ষেত্রে নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উদয়াস্ত দিনমজুর খাটিয়া শেষ পর্যন্ত সে মহাজনের ঋণ শোধ দিতে বাধ্য হইল। সে ঋণের কোন হিসাব-কিতাব নাই। যৎসামান্য ঋণের দায়ে সাঁওতাল অধমর্ণের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়া জীবন তাহাদের বিষময় করিয়া তুলিল শঠ ও প্রতারক উত্তমর্ণ ধনী-সম্প্রদায়। চারিদিক্ হইতে উৎপীড়ন ও অত্যাচারের নির্মম আঘাতে ক্রমশই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল দামনবাসী সাঁওতালের অদম্য পৌরুষ। পূর্বের সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ-উল্লাস, মুক্ত প্রাণের সে স্বতঃস্ফূর্ত অনাবিল উচ্ছ্বাস, কোথায় যেন মিলাইয়া গেল শোষক-শ্রেণীর নিষ্পেষণ যন্ত্রের চাপে। কোথায় গেল সাঁওতালের খামার-ভরা ধান আর গোয়াল-ভরা গরু, বুকভরা আশা আর দু'চোখ-ভরা স্বপ্ন। গ্রামে গ্রামে সঙ্গীতের আখড়াগুলি বন্ধ। দিনান্তে একটিবার মাদলে আর চাঁটি পড়ে না। স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বাঁশীর সুর, নৃত্যগীত-পটিয়সী সাঁওতাল রমণীর কাজলটানা কালো দু'টি চোখের পাতায় দুঃস্বপ্নের করাল ছায়া। পীড়ন এবং শোষণনীতির যূপকাষ্ঠে রজ্জুবদ্ধ বলির ন্যায় অতি অসহায় ভাবে দিন

এই বটবৃক্ষের মূলে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় রাখসী দেবীর পূজা হয়

গুণিতে লাগিল দামনবাসী সাঁওতাল সমাজ। দিনান্তে একমুষ্টি ক্ষুধার অন্ন, সেও যেন ক্রমশই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, অতিলোভী উত্তমর্ণের শোষণ-নীতির ফলে। জীবন্মৃত সাঁওতাল দুঃসহ এই গ্লানিকর অবস্থার নাগপাশ হইতে মহামুক্তির পথ খুঁজিতে লাগিল। এতটুকু পথ কিন্তু খোলা নাই চোখের সামনে। চারিদিকে শুধু চক্রান্তকারী শোষকদের দল। সাঁওতালদের

শ্রমশক্তিকে নিঃশেষে দোহন করিয়া নিজেদের মধুভাণ্ড পূর্ণ করিতে লাগিল স্বার্থান্ধ এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। মূর্খ ও নিরক্ষর স্বল্পমতি সাঁওতাল-সমাজকে মানুষ বলিয়া তাহারা গ্রাহ্যই করিত না। এই ভাবে ক্রমাগত ঘা খাইতে খাইতে সাঁওতালেরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মিল, মানুষের হাতে হয়ত বা ইহার কোন প্রতিকার নাই। দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও স্বার্থপর শয়তানী চক্রের হৃদয়হীন এই উৎপীড়ন মুখ বুজিয়া সহ্য করাই বুঝি সাঁওতালদের একমাত্র বিধিলিপি। আর কোন পথ নাই।

সাঁওতালদের এই হতাশাব্যঞ্জক বদ্ধমূল ধারণা কিন্তু অবিলম্বে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল। মানুষের দ্বারা এ অত্যাচারের কোন প্রতিকার যখন সম্ভবপর হইল না তখন বিচারকের শাসন-দণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দামিন-ই-কো অঞ্চলে হঠাৎ আবির্ভূত হইলেন স্বয়ং মারাং বুরু, সাঁওতালদের ভগবান্। চারিদিকে জনরব রটিয়া গেল—মারাং বুরুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সাঁওতালদের দুঃখের দিন অবসান-প্রায়, চিন্তার আর কারণ নাই।

মানুষের মন স্বভাবতই কিয়ৎ পরিমাণ ঈশ্বরমুখী। অদৃশ্য ঐশী শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রায় সব মানুষই অল্প-বিস্তর সজাগ, ও বিশ্বাস-প্রবণ। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঈশ্বরবাদ বা আস্তিক্যবুদ্ধি ধর্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ মানব-সভ্যতার আদিকাল হইতেই মানুষের মনে একটা অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। তাই সাঁওতালদের মধ্যে মারাং বুরুর আবির্ভাবের কথা লোক-পরম্পরায় চারিদিকে যখন ছড়াইয়া পড়িল—তখন সাঁওতালেরা অতিমাত্রায় উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল নূতনতর এক সম্ভাবনার উদ্দীপনায়।

বারহেট বাজার হইতে মাইলখানেক দূরে ভগ্নাডিহি নামক গ্রামে সিধু ও কানু নামক দুই সাঁওতাল বীরের সহিত মারাং বুরুর নাকি সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে এবং সাঁওতালদের পরিত্রাণের জন্য উক্ত সিধু ও কানু নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে সুবাবাবু (সুবেদার) মনোনীত করিয়া দেশে সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মারাং বুরু স্বয়ং নাকি আদেশ দিয়া গিয়াছেন—এইরূপ একটা প্রবল জনরব লোকের মুখে মুখে চারিদিকে হঠাৎ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল।

ভগ্নাডিহি গ্রামের মুর্মুবংশীয় চুনার মাঝি নামক জনৈক সাঁওতালের চারি পুত্র—সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। উক্ত চারি ভ্রাতার মধ্যে সিধু ও কানু সাঁওতাল-সমাজে তেজস্বী ও শক্তিমান্ বলিয়া সমধিক পরিচিত ছিল। লোকপরম্পরায় প্রচারিত হইয়া গেল যে, সাঁওতালদের প্রধান দেবতা মারাং বুরু নাকি সিধু ও কানুর নিকট উপর্যুপরি সাত দিন ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হইয়া উক্ত সাঁওতাল বীরদ্বয়কে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে আকাশ হইতে অবতীর্ণ একখণ্ড মেঘরূপে। দ্বিতীয় দিন অগ্নিরূপে। তৃতীয় দিন কুয়াসায় আচ্ছন্ন শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক মূর্তিরূপে। চতুর্থ দিন প্রখর সূর্যকিরণের মধ্যে প্রতিভাত এক ছায়ামূর্তিরূপে। পঞ্চম দিন ভূপৃষ্ঠ হইতে আকস্মিক উত্থিত এক পর্বতরূপে। ষষ্ঠ দিন পাদপহীন এক উন্মুক্ত প্রান্তরে অকস্মাৎ উদ্ভূত বিশাল এক শালবৃক্ষরূপে। সপ্তম বা শেষ দিবস তিনি আবির্ভূত হন সাঁওতালদের ন্যায় ভেগুয়া (কটিবাস) পরিহিত শ্বেতকায় এক মানবরূপে। শেষ বার আবির্ভূত হইবার সময় মারাং বুরু সিধু ও কানুর হস্তে একখানি পবিত্র গ্রন্থ দিয়া যান। তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হয়, উক্ত মসী-চিহ্নহীন অলিখিত গ্রন্থের পত্রগুলি সাঁওতালদের মধ্যে বিতরণ করিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার জন্য।

দীর্ঘকাল বন্দী-জীবনযাপন করিবার পর সাঁওতালদের সম্মুখে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের শুভ সন্ধিক্ষণ বুঝি সমাগত। অলিখিত গ্রন্থপত্রে অনিবার্য মুক্তির সঙ্কেত। জীবন-সংগ্রামে মরণপণ প্রস্তুতির উদাত্ত আহ্বান। অপঠিত বাণীর অচিন্ত্য রহস্য সাঁওতাল জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল কল্পিত এক নবজীবনের অধীর প্রতীক্ষায়। কি যে তাহাদের করিতে হইবে কিছুমাত্র জানা নাই, কিন্তু একটা কিছু যে করিবার সময় আসিয়াছে, সে বিষয়ে তাহাদের মনে কিছুমাত্র আর সন্দেহ রহিল না। অবিলম্বে ভগ্নাডিহির ডাক আসিয়া পৌঁছিল দামনবাসী সাঁওতাল-দের দ্বারপ্রান্তে। শালবৃক্ষের ডাল ফিরাইয়া দিকে দিকে প্রচার করা হইল মারাং বুরুর প্রিয় শিষ্য সিধু ও কানু সর্দার ভগ্নাডিহির প্রান্তরে সাঁওতালদের সমবেত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছে। ব্যস্—এইটুকুই যথেষ্ট, সুবাবাবুর ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহার অধিক আর কিছু জানিবার বা বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। দলে দলে সাঁওতালগণ বিপুল উৎসাহে ভগ্নাডিহির পথ ধরিয়া চারিদিক্ হইতে পঙ্গপালের মত ছুটিয়া চলিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল ভগ্নাডিহির ময়দানে গিয়া সমবেত হইল। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে এই বিরাট্ সমাবেশে সাঁওতালদের

ভাগ্যনির্ণয়কল্পে নানারূপ আলাপ-আলোচনা ও শলা-পরামর্শ আরম্ভ হইল। যে কোনরূপ চরমপন্থা গ্রহণ করিবার জন্য সাঁওতালেরা প্রস্তুত। সুবাবাবুর (সিধু ও কানু) নিকট হইতে নির্দেশের অপেক্ষা মাত্র। সভায় সর্ববাদীসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল—সুদখোর মহাজনদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে, জমিদার ও পুলিস-পিয়াদার অত্যাচার চোখ বুজিয়া আর সহ্য করা হইবে না; লাঙ্গল পিছু খাজনার হার দুই আনা মাত্র ধার্য করিতে হইবে। যে-সকল অতি-বুদ্ধি স্বার্থান্বেষীর দল সাঁওতাল জাতির উপর ক্রমাগত উৎপীড়ন চালাইয়া দৈনন্দিন জীবন তাহাদের বিষময় করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া সাঁওতালদের পক্ষ হইতে যে কোনরূপ সক্রিয় প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হউক, এই বলিয়া সাঁওতালেরা একবাক্যে তাহাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিল। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালগণ জীবনমরণ পণ করিয়া যে কোন সঙ্গিন অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পূর্ণিয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ভাগলপুরের কমিশনার সাহেব ও বীরভূমের কালেক্টার প্রমুখ সরকারী কর্তৃপক্ষগণের নিকট কয়েকবার অভিযোগপত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে এ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। সিধু ও কানু সর্দার বাধ্য হইয়া শেষ পর্যন্ত স্থির করিল—কলিকাতায় গিয়া লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাঁওতালদের দুরবস্থার কথা তাঁহাকে সবিস্তারে জানাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রতিকারের আর কোন আশা নাই। সুতরাং কলিকাতা যাওয়াই স্থির। কিন্তু কোথায় শহর কলিকাতা, দামিন-ই-কো হইতে দূরত্ব তার কতখানি, কেমন করিয়া লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, পথে তাহাদের এতগুলি লোকের খাদ্য জোগাইবে কে—সে সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ কোন চিন্তা করিল না। যেমন করিয়া হউক স্থির লক্ষ্যে আগাইয়া যাইতে হইবে, এইটুকুই শুধু জানা হইয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে ধনী জমিদার ও প্রভাবশালী সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে রসদসংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়ত খুব কঠিন হইবে না—সাঁওতালদের মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা করা হইয়াছিল। কারণ তাহারা ত কোন অন্যায় করিতেছে না, পরন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পেই তাহাদের এই দলবদ্ধ অভিযান। সুতরাং সর্বসাধারণের নিকট হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা তাহারা অবশ্যই আশা করিতে পারে, ইহাই তাহাদের ধারণা।

ভগ্নাডিহি সাঁওতাল পল্লীর একাংশ

ভগ্নাডিহির প্রান্তরে সমবেত সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তাহাদের প্রত্যেকে মাত্র দুই-এক দিনের খাদ্যবস্তু সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছিল। ইতিপূর্বেই তার শেষ দানাটি পর্যন্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় খাদ্যাভাবে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভগ্নাডিহি গ্রামে সেই সঙ্গিন অবস্থার সৃষ্টি হইল। সমবেত সাঁওতালদের

দল খাদ্যাভাবে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল অনিবার্য ক্ষুধার তাড়নায়। এতগুলি লোক একস্থানে সমবেত হইতে হইলে তাহাদের আহার ও বাসস্থান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা কিরূপ ভাবে করিতে হয় তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এ সম্বন্ধে তাহারা পূর্ব হইতে কেহ কোন চিন্তাই করে নাই। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা হাতের কাছে বন্য ফলমূল যাহা কিছু পাইল তাহাই একে একে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল, এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্যসংগ্রহের আর কোন উপায় না দেখিয়া গাছের পাতা পর্যন্ত খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এত দুঃখেও সাঁওতালরা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। মনের মধ্যে তাহাদের দুর্জয় সঙ্কল্প, যদি বাঁচিতে হয়—মানুষের মত বাঁচিতে হইবে। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে ভগ্নাডিহি হইতে তাহারা সদলবলে রওনা হইয়া গেল অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে। কল্পনায় তাহাদের সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার বুকভরা স্বপ্ন। অভিযান আরম্ভের পূর্বে দেবতার তুষ্টিসাধন মানসে প্রথমে তাহারা যাত্রা করিল পাঁচকেঠিয়ার রাখসী থানে দেবীপূজা সম্পন্ন করিবার জন্য।

সাঁওতালদের এই দলবদ্ধ অভিযানে দামিন-ই-কোর মহাজনশ্রেণী অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত ও ভীত হইয়া পড়িল। থানায় গিয়া তাহারা সংবাদ দিল—চারিদিকে লুঠতরাজ করিবার জন্য সাঁওতালরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, অবিলম্বে তাহাদের দমন করিতে না পারিলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। নিজেদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় মহাজনেরা প্রচুর উৎকোচ দিয়া দীঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্তকে অবিলম্বে হাত করিয়া ফেলিল এবং সাঁওতালদিগকে চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইল। নয়জন সিপাহী ও কয়েকজন বরকন্দাজসহ দারোগা মহেশলাল সঙ্গে সঙ্গে রওনা হইয়া গেল সাঁওতালদের অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য। সিধু ও কানু সর্দারের নেতৃত্বে পরিচালিত কয়েক শত সাঁওতালের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল মহেশলালের। সিধু সর্দার মহেশলালকে তাহাদের উদ্দেশ্যের কথা অকপটে জানাইয়া মহাজন ও বর্দ্ধিষ্ণু দিকুদের নিকট হইতে অভিযানকারী সাঁওতালদের খাদ্যসংস্থানের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। দারোগা মহেশলাল সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করিল না, উপরন্তু সাঁওতালদিগকে চৌর্যাপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হইবে বলিয়া হুমকি দেখাইতে লাগিল। সিধু ও কানু কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া দারোগাকে শুধু এই কথাই জানাইল যে, সত্যই যদি তাহারা চুরি-ডাকাতি কিছু করিয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা সে অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। সাঁওতালদের মধ্যে কোনরূপ উত্তেজনার ভাব না দেখিয়া মহেশলাল আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং পূর্বের ন্যায় তাহাদের অবলীলাক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় চালান দেওয়া অতি সহজসাধ্য বলিয়াই তাহার মনে হইল। এইখানেই একটু ভুল করিল মহেশলাল। হঠকারিতার বশবর্তী হইয়া হঠাৎ সে সিপাহীদিগকে আদেশ দিয়া বসিল, ডাকু লোককো পাকড়ো। এই আদেশ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালের দল তৎক্ষণাৎ ঘিরিয়া ফেলিল মহেশলাল ও সহকারী তাহার পুলিসদলকে। লহমার মধ্যে সিধু সর্দারের হস্তধৃত বলুয়া অস্ত্রে দারোগা মহেশলালের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল। সূর্যদেবের উদ্দেশে মহেশলালকে খুঁটায় পরাইয়া বলিদান দেওয়া হইল পাঁচকেঠিয়ার রাখসী থানে প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষের তলায়। হতভাগ্য দারোগা এই মহেশলাল সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম বলি। তাহার সহকারী অপর নয়জন সিপাহী ও কয়েকজন অভিযোগকারী মহাজনকেও অব্যাহতি দেওয়া হইল না। একে একে তাহাদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়া মহেশলালের আশেপাশে তাহাদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলি রাখসী থানের সবুজ মাঠে লুটাইয়া দেওয়া হইল।

এই সময় আর একটি আকস্মিক দুঃসংবাদ হঠাৎ যেন দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল সাঁওতালদের মধ্যে। ঠিক এই সময় বর্দ্ধমান হইতে পাকুর, তিন পাহাড়, সাহেবগঞ্জ হইয়া ভাগলপুর পর্যন্ত লুপলাইনে রেলপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গেল লুপ লাইনের রাস্তাবন্দির সাহেবেরা (ইংরাজ অফিসারগণ) তিনজন সাঁওতাল রমণীকে জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, উক্ত রমণীগণকে ধর্ষণ করিবার পর সেইখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলা হয়। এই সংবাদে সাঁওতালেরা অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রবল একটা ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। জাতিগত এই অসম্মানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল বিক্ষুব্ধ সাঁওতালের দল। ব্যবসায়ী-মহাজন, জমিদার, পুলিস ও ইংরাজ কোম্পানীর নারীলোভী কর্মচারিগণ সকলেই আজ সাঁওতালদের নিকট সমান অপরাধী।

আজ তাহারা সাঁওতালদের পরম শত্রু। যে ভাবেই হউক একে একে তাহাদের নির্মূল করিতে হইবে, সাঁওতালেরা এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠিল। কি যেন এক আসুরিক উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল বিক্ষুব্ধ সাঁওতালের দল। ধূমায়িত একটা অগ্নেয়গিরির মত প্রচণ্ড বেগে হঠাৎ যেন ফাটিয়া পড়িল। মহেশলালকে হত্যা করার পর হইতেই তাহাদের উন্মাদনা যেন ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া হঠাৎ তাহারা দলবদ্ধভাবে চারিদিকে লুণ্ঠন ও নরহত্যা আরম্ভ করিয়া দিল। তীর ধনুক টাঙ্গি বর্শা ঢাল তরোয়াল প্রভৃতি নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে হানা দিয়া ফিরিতে লাগিল উন্মত্ত সাঁওতালের দল। অবিলম্বে তাহারা চারিদিকে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বিরাট্ একটা বারুদের স্তূপ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিল। আকস্মিক স্ফুলিঙ্গস্পর্শে হঠাৎ যেন তাহা সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সহস্র শিখায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিপ্লবের আগুন ঝড়ের মুখে যেন ছড়াইয়া পড়িল সমগ্র দামিন-ই-কো অঞ্চলে। দলে দলে সাঁওতালেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অভিযান সুরু করিল দিকে দিকে। স্থানীয় ধনী মহাজনদের প্রধান ঘাঁটি বারহেট বাজার অবিলম্বে আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়া গেল। কুশীদজীবী মহাজনদের ধরিয়া নির্মমভাবে তাহারা একে একে হত্যা করিতে লাগিল, লুণ্ঠন করিতে লাগিল তাহাদের পাপার্জিত ধনসম্পদ্। মহাজন ও বর্দ্ধিষ্ণু দিকু-অধ্যুষিত গ্রামগুলি জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে লাগিল। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং অন্যান্য গ্রামবাসিগণ তাহাদের যথাসর্বস্ব পিছনে ফেলিয়া স্ত্রীপুত্র-পরিবারসহ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে শুধু হাহাকার ও ভীতিবিহ্বল ক্রন্দন ধ্বনি। দূর দূরান্ত পর্যন্ত জনরব রটিয়া গেল—সাঁওতাল ক্ষেপিয়াছে, আর বুঝি কাহারও পরিত্রাণের উপায় নাই। পথে-ঘাটে শুধু পলায়মান জনতার বিভ্রান্ত মিছিল। ইহাই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের স্মরণীয় সাঁওতাল-ভীতি। গ্রাম্য ভাষায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'হুই-পালান্'।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১২৬২ সালের ১৬ই শ্রাবণ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:

"জিলা ভাগলপুর ও বীরভূমের অন্তঃপাতী পর্বত সকলে সাঁওতাল নামে অগণ্য বন্যজাতি বাস করে। অতি অল্প দিবস হইল রাস্তাবন্দির সাহেবেরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতিদিগের তিনজন স্ত্রীলোককে বলপূর্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্র হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে। অন্য অন্য স্থানের রাস্তাবন্দির সাহেবরা ইহাতে ভীত হইয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে পলায়ন করেন। এমত জনশ্রুতি যে ঐ সাঁওতালদিগের মধ্যে একব্যক্তি নারকেলবেড়ের সরার অধ্যক্ষ তিতুমিয়ার ন্যায় বুজরুক হইয়া আপন শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করে যে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আমারদিগের রাজ্য হইবেক। অতএব তোমরা সাহসপূর্বক অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কর্তার এই বাক্যে

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রারম্ভে এই পল্লীর পাঁচজন ময়রাকে রাখসী স্থানে বলি দেওয়া হয়

বিশ্বাস করিয়া সাঁওতালেরা নাগরার দ্বারা পর্বতস্থ সমস্ত জাতিদিগের মধ্যে এই আদেশ প্রচার করিবাতে তাহারা ক্রমে ২০।২৫ হাজার লোক দলবদ্ধ হইয়া জিলা বীরভূম আক্রমণ মানসে আগমন করিতেছে ইত্যাদি।"

এই সময় বিদ্রোহী সাঁওতালের সংখ্যা যে কত ছিল সঠিক ভাবে তাহা বলা যায় না। দামিন-ই-কোর স্থায়ী অধিবাসী সাঁওতালের জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষের কিছু কম। তাহা ছাড়া চুরি, ডাকাতি ও নানারূপ কল্পিত অপরাধের অভিযোগে দামিন-ই-কোর সাঁওতালদের উপর ব্যাপক ভাবে যে অত্যাচার চলিতেছিল তাহার বিশদ বিবরণ বহুদূর পর্যন্ত অন্যান্য সাঁওতালদের মধ্যেও রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং এই সকল অত্যাচার হইতে সাঁওতাল-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য গোপনে গোপনে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ছোটনাগপুর, হাজারীবাগ, প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও এই সময় দামিন-ই-কো অঞ্চলে বহু সাঁওতালের সমাগম হয়। এই সকল বহিরাগত সাঁওতালদের মধ্যে অনেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং ইহাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। শুনিতে পাওয়া যায় প্রায় ত্রিশ হাজার সশস্ত্র সাঁওতালকে সাঁওতাল বিদ্রোহের অধিনায়ক সিধু ও কানু সর্দারের দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

বিদ্রোহের প্রারম্ভে সাঁওতালেরা তিনটি বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সিধু ও কানুর দল লাটবাহাদুরের সাক্ষাৎ মানসে কলিকাতা রওনা হইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। দ্বিতীয় দল কমিশনার সাহেবের নিকট গিয়া আর্জি পেশ করিবার জন্য ভাগলপুর অভিমুখে রওনা হইয়া যায়। অপর দলটি দামিন-ই-কোর পূর্ব সীমান্তে মুরারই অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর ও রঘুনাথপুর অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

যতদূর মনে হয়, বিদ্রোহ আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত সাঁওতালদের মনে দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য কিছু ছিল না। হয়ত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার প্রর্থনা করাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল। অভিযানের সূচনায় নিদারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হইয়া সাঁওতালেরা হঠাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং ভগ্নাডিহি পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় অবস্থায় হঠাৎ তাহাদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে এবং কিছু কিছু বিশৃঙ্খলাও দেখা দেয়। অতঃপর পাঁচকেঠিয়ার রাখশী থানে পুলিসদলের সহিত তাহাদের প্রথম সংঘর্ষ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালেরা অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং চারিদিক্ হইতে বিরাট্ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তোলে। ইহা যেন ধূমায়িত বিরাট্ একটা আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড এক আকস্মিক বিস্ফোরণের মত। নূতন করিয়া আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না, সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানাইতে হইল না, স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দামিন-ই-কোর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত অকস্মাৎ যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সাঁওতালেরা অস্ত্রশস্ত্রসহ ছোট-বড় নানা দলে বিভক্ত হইয়া দিকে দিকে অভিযান সুরু করিল। মাদল নাগরায় বাজিয়া উঠিল সাঁওতালী রণবাদ্য। কোথায় তখন কোম্পানীরাজ, কিসের বা থানা পুলিস, কে তাহাদের উত্তমর্ণ, কোথায় বা সেই মহাজন ও জমিদারের দাপট। সব কিছুই সাঁওতাল-দের নিকট ভুয়া—তুচ্ছাতিতম তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দেশে আর রাজা নাই, সাঁওতালেরা নিজেরাই নিজেদের রাজা। রাজা তাহাদের নির্বাচিত করিয়া দিয়াছেন স্বয়ং মারাং বুরু, রাজা তাহাদের সুবাবাবু, ভগ্নাডিহির সাঁওতাল বীর সিধু ও কানু মাঝি। উন্মত্ত সাঁওতালগণ দিকে দিকে প্রচার করিতে লাগিল—সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে উচ্চরবে ধ্বনিত হইতে লাগিল—জয় সুবাবাবুর জয়, সাঁওতাল-বীর সিধু-কানুর জয়। দেশব্যাপী এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল বিদ্রোহী সাঁওতালের দল। অবাধে চলিতে লাগিল লুণ্ঠন, নরহত্যা ও গৃহদাহ। উত্তেজনার আতিশয্যে বিবেকবুদ্ধি আচ্ছন্ন। বহু লাঞ্ছিত উৎপীড়িত সাঁওতালের চোখে আজ যেন সমগ্র দুনিয়াটাই তাহাদের দুষমন হইয়া উঠিয়াছে।

ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি দামিন-ই-কোর তত্ত্বাবধায়ক মিঃ জেম্‌স্ পন্টেট এই ভয়াবহ ঘটনার সংবাদ পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলের উদ্দেশে রওনা হইয়া যান এবং অভিযানকারী এক সাঁওতালদলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হন। সাঁওতালদের নিকট ইনি 'পন্টিন সাহেব' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরেজ সরকারকে সাঁওতালেরা চিনে না, তাহারা যে কে—কি তাহাদের স্বরূপ—কিছুমাত্র জানা নাই; কিন্তু পন্টিন সাহেবকে তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে। এই বন-পাহাড়ের দেশে সাঁওতালদের সুখ-দুঃখে পন্টিন সাহেবের সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার বহুক্ষেত্রে তাহারা বারে বারেই অনুভব করিয়াছে। পন্টিন সাহেবকে তাই সাঁওতালেরা সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। হঠাৎ তাঁহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া উন্মত্ত বিদ্রোহীদল শান্ত ভাবে কিছুক্ষণ

থমকিয়া দাঁড়াইল। মিঃ পন্টেট সাঁওতালদিগকে এই অমানুষিক অভিযান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, বহু প্রকারে তাহাদিগকে বুঝাইলেন, কিন্তু তাঁহার কথার সারবত্তা কোন মতেই সাঁওতালদের বোধগম্য হইল না। আর তাহারা কোন কথাই নূতন করিয়া বুঝিতে চাহে না। তাহারা শুধু চিন্তিত হইয়া পড়িল পন্টিন সাহেবের নিরাপত্তার জন্য। পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিল অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য। কারণ তাহারা জানে বিদ্রোহী সাঁওতালদের যে পরবর্তী দলটি তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতেছে সে দলে উগ্র-প্রকৃতির অল্পবয়সী সাঁওতাল যুবকদের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের সম্মুখে পড়িলে পন্টিন সাহেবের যে বাঁচিবার কোন আশা নাই, সে সম্বন্ধে তাহারা নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে মিঃ পন্টেটকে তাহারা বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিল এবং অবিলম্বে নিরাপদ্ স্থানে গিয়া আত্মগোপন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। মিঃ পন্টেট কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, উপরন্তু তিনি পরবর্তী দলটির সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সাঁওতালেরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া পন্টিন সাহেবকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল নির্জন একটি পার্বত্য গুহায়, এবং বিদ্রোহ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহী সাঁওতালদের হাতে মিঃ পন্টেটের জীবন যাহাতে বিপন্ন হইয়া না পড়ে তজ্জন্য তাহারা জোর করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। মিঃ পন্টেট অবশ্য সেখান হইতে তাহাদের অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইতে সমর্থ হন। সাঁওতালদের এই পন্টেট-প্রীতি তাহাদের উদার মনোভাব ও মনুষ্যোচিত হৃদয়বৃত্তির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানবিক মহত্ত্বের ইহা যেন এক অবিস্মরণীয় অপূর্ব অধ্যায়।

সাঁওতালদের এই আকস্মিক অভ্যুত্থান ও দেশব্যাপী হাঙ্গামা সৃষ্টির কথা ঝড়ের বেগে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকে দূর দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িল। যে অসভ্য ও বর্বর জাতি সম্বন্ধে কাহারও মনে এ পর্যন্ত বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল অবধি যাহাদের নাম পর্যন্ত অনেকে শুনে নাই, যে অখ্যাত সাঁওতাল জাতি এতাবৎকাল তাহার নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া নির্জীব ইতর প্রাণীর ন্যায় অতি নির্বিকার চিত্তে সম্পূর্ণ অনাদৃত ও অবহেলিত জীবনযাপন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে এরূপ অভূতপূর্ব জাগরণ যে কেমন করিয়া সম্ভব—এ কথা চিন্তা করিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রিচার্ডসনের নিকট লোকপরম্পরায় প্রথম যখন এই হাঙ্গামার সংবাদ গিয়া পৌঁছে তখন তিনি উক্ত বিষয়টির প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা মোটেই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু তৎপর দিন
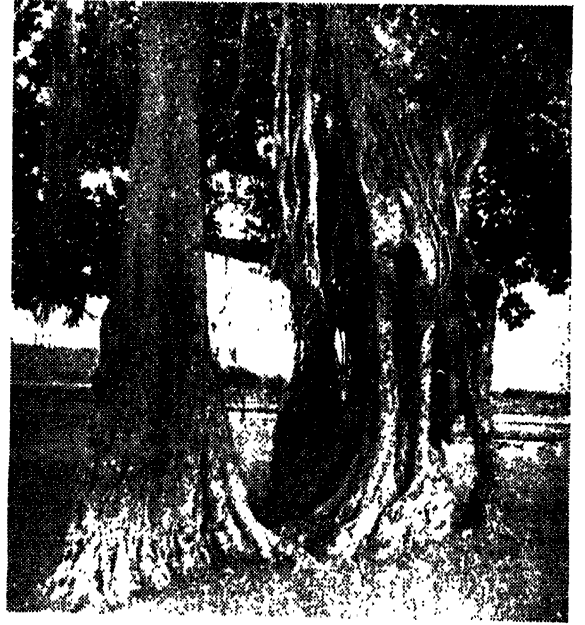
সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম বলি
দারোগা মহেশলাল দত্তকে এইখানে বলি দেওয়া হয়

পুনরায় যখন অনুরূপ ভয়াবহ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল তখন আর নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া মিঃ রিচার্ডসন অবিলম্বে রাজমহল অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন এবং ৬ই জুলাই তারিখে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময় মিঃ সি. এফ. ব্রাউন ভাগলপুরের কমিশনার ছিলেন। চারিদিক হইতে উপর্যুপরি তাঁহার নিকট গুরুতর হাঙ্গামার দুঃসংবাদ আসিয়া পৌঁছিতে থাকে। মিঃ ব্রাউন আর কালবিলম্ব না করিয়া দানাপুর সৈন্যাবাস হইতে রাজমহলে কিছু সৈন্য পাঠাইবার জন্য মেজর বারোজকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পাহাড়িয়া সর্দার, জমিদার, পরগণাইত, সরবারী পুলিস ও কোম্পানীর অনুগত অন্যান্য ব্যক্তি-বর্গের নিকট এই হাঙ্গামা দমনে সর্বপ্রকার সহায়তা

করিবার জন্য এক আদেশপত্র প্রচার করিলেন। ভাগলপুর জেলে আবদ্ধ সাঁওতাল কয়েদীদের নিকট হইতে কোনরকমে জানিতে পারা যায়, সাঁওতালেরা নাকি ভাগলপুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মিঃ ব্রাউন ভাগলপুর সুরক্ষিত করিবার জন্য শহর-পুলিসের সাহায্য-কল্পে ভাগলপুরেও কতকগুলি সৈন্য আমদানী করিলেন। বিদ্রোহীদের কার্যকলাপে ভাগলপুর হইতে মুঙ্গের পর্যন্ত ডাকবিভাগের যোগাযোগ বিশেষরূপে ব্যাহত হয় এবং ৮ই জুলাইয়ের পর রাজমহল হইতে ভাগলপুরে কোন ডাক পাঠান সম্ভব হয় নাই। মিঃ বার্নেস নামক জনৈক ইংরেজ নীলকর কলগাঁও হইতে মিঃ ব্রাউনকে সংবাদ পাঠান যে, উক্ত অঞ্চলে সাঁওতালেরা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানকার থানাদারের নিকট হইতেও সংবাদ পাওয়া যায় যে, পিয়ালপুর (কলগাঁও হইতে ১১ মাইল পূর্বে) চৌকির ভারপ্রাপ্ত জমাদার সাহেব সাঁওতালদের ভয়ে ফাঁড়ি হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এইরূপ একের পর একটি করিয়া আরও বহু দুঃসংবাদ আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।

সাঁওতালদের অভিযানের কথা ইতিমধ্যে সুদূর কলিকাতা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ৭০ মাইল দূরে অশ্রুতপূর্ব অজ্ঞাত এক অসভ্য জাতির অভ্যুত্থানেও বিভীষিকা সৃষ্টির কথা ক্রমে ক্রমে নানারূপ গুজবের আকারে কলিকাতাবাসী তথা বাংলা গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ভাগলপুরের কমিশনার মিঃ ব্রাউন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে বাংলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট হাঙ্গামার বিশদ বিবরণ দিয়া হাঙ্গামা-সৃষ্টিকারী সাঁওতালদের দলপতিগণকে যাহারা ধরাইয়া দিতে পারিবে তাহাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিবার (প্রত্যেক দলপতির জন্য ১১০ টাকা, মতান্তরে ৫০০ টাকা) অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট মেজর ভিনসেণ্টের অধীনে একদল সৈন্য ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত সৈন্যদল নবনির্মিত রেলপথে বর্দ্ধমান পর্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে পদব্রজে সিউড়ি অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

মেজর বারোজ ১৬০ জন সৈন্যসহ ১০ই জুলাই তারিখে রাজমহল অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু নৌকা অভাবে জলপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় কলগাঁও পর্যন্ত গিয়া ১১ই জুলাই তারিখে সেইস্থানেই অবস্থান করিতে বাধ্য হন। ভাগলপুরের কমিশনার সাহেব ১২ই জুলাই তারিখের পত্রে মিঃ রিচার্ডসনকে অবিলম্বে পিয়ালপুর ক্যাম্পে গিয়া মেজর বারোজের সহিত মিলিত হইবার আদেশ দেন এবং বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারীবাগ, ছোটনাগপুর, সিংভূম, পূর্ণিয়া ও মুঙ্গেরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকেও চারিদিক হইতে বিদ্রোহদমনে সচেষ্ট হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। এই সময় পিরপৈঁতি ও পিয়ালপুরের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল ব্যাপিয়া হাঙ্গামা গুরুতর আকার ধারণ করে। দারুণ বর্ষায় সৈন্যদলের পক্ষে বিদ্রোহদমনে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় সরকার-পক্ষ হইতে হস্তী সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে থাকে এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সৈন্যদলের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি বহন করিবার জন্য কতকগুলি হস্তীও আমদানী করা হয়। পিরপৈঁতির নিকটবর্তী এক গ্রামে কয়েকজন রেলওয়ে কর্মচারীর সহিত বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ বাধে এবং তিনজন রেলওয়ে কর্মচারী গুরুতররূপে আহত হয়। অবশেষে রেলওয়ে-কর্মীদল বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হইয়া স্থানত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহিগণ এই ভাবে চারিদিকে প্রবল বিক্রমে হানা দিয়া বেড়াইতে থাকে। কিষুজীবন সিং নামক জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর সংবাদে জানা যায় যে, ১৩ই জুলাই তারিখে কাঠিকুণ্ডে প্রায় পাঁচ শত, পাকরাপাড়ায় চারি শত ও তৎপরদিন কেন্দুয়া ও পারগাডির মধ্যবর্তী একস্থানে প্রায় দেড় হাজার সাঁওতালকে সে সমবেত হইতে দেখিয়াছিল। গোড্ডা মহকুমার বারকোপ এস্টেটের রাণীসাহেবার দেওয়ান চিৎপৎ সিং কমিশনার সাহেবের নিকট যে বিবরণ দেন তাহাতে জানা যায় যে, ১৪ই ও ১৫ই জুলাই তারিখে তিনি আমদোহা ও চুনাখালির মধ্যবর্তী কোন একস্থানে যে সাঁওতাল দলটিকে সমবেত হইতে দেখিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারের কাছাকাছি।

কমিশনার মিঃ ব্রাউন ১৫ই জুলাই তারিখে দানাপুরের অধ্যক্ষের নিকট অতি সত্বর আরও কিছু সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। দানাপুর হইতে মেজর-জেনারেল লয়েড পাঁচ শত সৈন্যের এক শক্তিশালী দল মেজর শাকবুর্গের নেতৃত্বে ভাগলপুরে পাঠাইয়া দেন। মেজর শাকবুর্গ তাঁহার সৈন্যদলের কিয়দংশ সঙ্গে লইয়া 'মেঘনা' নামক ষ্টীমার যোগে ১৭ই জুলাই সকালবেলা ভাগলপুরে আসিয়া পৌঁছেন এবং সেইদিন অপরাহ্ণে অবশিষ্ট সৈন্যগণ 'বেনারস' ষ্টীমার যোগে তথায় গিয়া উপস্থিত হয়।

পিরপৈঁতির নিকট একদল সশস্ত্র সাঁওতালের সহিত ১৬ই জুলাই বেলা দুই ঘটিকার সময় মেজর বারোজের সৈন্যদলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে এবং এই যুদ্ধে মেজর সৈন্যদলের অতি শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই সংঘর্ষে নৈক রেলওয়ে অফিসার কোয়ার্টার-মাস্টার-সার্জেন্ট মিঃ ব্র্যাডন ও কয়েকজন দেশীয় অফিসার ও প্রায় ২৫জন সিপাহী বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হয়। বিদ্রোহীদল শক্তি দৃঢ়তার সহিত তীরধনুক ও টাঙ্গি লইয়া সিপাহী-দলের সহিত বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই যুদ্ধে শুধু হস্তের দ্বারাই তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই, মাঝে মাঝে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া দুই পায়ের সাহায্যে ধনুক হইতে এক-একবার কয়েকটি করিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়া সিপাহীদলকে বিব্রত ও ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তোলে এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া সেখান হইতে পিরপৈঁতি ও তথা হইতে নৌকা-যোগে কলগাঁও অভিমুখে রওনা হইয়া যায়। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য তীরধনুক-অস্ত্রধারী সাঁওতাল জাতির জন্মগত তীরন্দাজ-খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

এই সময় বিদ্রোহীদল কর্তৃক কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাও নিহত হন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। জনৈক রেলওয়ে রোড-ইন্‌স্‌পেক্টারের পত্নী ও তাঁহার এক শ্যালিকা নাকি নিহতদের অন্যতমা। এই সকল হানাহানি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে রেলওয়ের যাবতীয় কাজকর্ম সাময়িক ভাবে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বিদ্রোহীদল ক্রমশঃ ভাগলপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ১০ই জুলাই তারিখে ভাগলপুর হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরবর্তী বারকোপ, ধর্মা, ভুড়িয়া, প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং উক্ত স্থানসমূহ হইতে ভাগলপুর কর্তৃপক্ষের নিকট ক্রমাগত নানারূপ কুসংবাদ গিয়া পৌঁছিতে থাকে। ভাগলপুরের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য কর্তৃপক্ষগণ যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন। লেঃ ফ্যাগানের নেতৃত্বাধীনে পার্বত্য সেনাদলকে ( Hill Rangers ) ভাগলপুরের ট্রেজারি, জেলখানা ও কাছারি রক্ষার ভার দেওয়া হয়। মেজর শাকবুর্গ তাঁহার সৈন্যদলের কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ ভাগলপুরেই রহিয়া যান এবং মেজর বারোজকে ভাগল-পুর রক্ষার জন্য তাঁহার পার্বত্য সেনার কিয়দংশ ভাগলপুরে পাঠাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিশনার সাহেব ১৮ই জুলাইয়ের পত্রে মেজর-জেনারেল লয়েডের নিকট হইতে আরও কিছু সৈন্য চাহিয়া পাঠান এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টকেও ষ্টীমারযোগে জলপথে সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কলিকাতা হইতে ১৫ই জুলাই তারিখে ভাগলপুরের কমিশনারের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় তাঁহাকে জানান হয় যে, বহরমপুর হইতে রাজমহলে সৈন্য পাঠাইবার ভরসা যেন তিনি না করেন এবং সেখানকার জন্য অফিসার নিয়োগাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার সবকিছুই যেন ভাগলপুর হইতে ব্যবস্থা করা হয়। ১৫ই জুলাইয়ের টেলিগ্রাম ১৮ই জুলাই তারিখে কমিশনার সাহেবের নিকট আসিয়া পৌঁছে এবং তদনুযায়ী তিনি ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন। এই সময় বিদ্রোহ দমনকল্পে গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষ হইতে প্রচুর অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক প্রধান দলপতির জন্য দশ হাজার টাকা, সহকারী দলপতির জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং নাতিপ্রধান বা নিম্নতর দলপতির জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই পুরস্কার ঘোষণায় কিছুমাত্র ফল হয় নাই। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত সাহস কাহারও ছিল না। এই ভাবে বিদ্রোহের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সদ্যজাগ্রত নিপীড়িত সাঁওতালজাতি চারিদিকে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্য-সাধক শিবরতন মিত্র মহাশয় কয়েকজন প্রত্যক্ষ-দর্শীর নিকট হইতে সাঁওতাল বিদ্রোহের বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে ভাবে তাহারা ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছিল, স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় ঠিক সেই ভাবেই তাহাদের নিজস্ব ভাষায় বর্ণিত বিবরণগুলি হুবহু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। আমরা এই স্থলে তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সাঁওতাল বিদ্রোহের গতি, প্রকৃতি ও তাহার ভয়াবহতা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকা-গণ এই বিবরণী হইতে সুস্পষ্ট একটা ধারণা লাভ করিতে পারিবেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারের বৃত্তিভোগী পাহাড়িয়াগণ বিদ্রোহদমনে সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের সহায়তায় ক্যাপটেন ফ্যাগান দামিন-ই-কোর পাহাড়িয়াদের লইয়া 'হিল রেঞ্জার্স' নামে যে সৈন্যদল গঠন করেন, গোড্ডা মহকুমার কুসুমঘাটা-নিবাসী চাঁদ পাহাড়িয়া নামক এক ব্যক্তি সেই দলে সৈনিক ও গুদাম-রক্ষকের কার্য করিয়াছিল। ৭০ বৎসর বয়স্ক উক্ত চাঁদ পাহাড়িয়া প্রদত্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

১। "এক পক্ষকাল কোনরূপ বাধা-বিপত্তি না পাইয়া

মাঝিরা পথে লুটপাট, খুন-জখম করিয়া সিমড়ার নিকট রাঙ্গামেটেয়ার পাহাড়ের তলদেশস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া জমা হইল। তাহার পর তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইল—চতুর্দিকস্থ লোকের ঘর-বাড়ী লুটপাট করিতে লাগিল। তাহারা এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরবর্তী গোড্ডা মহকুমার অন্তর্গত মাহাগামার রাজবাটি লুঠ করে। পরে লাহাটি গ্রামের (পিরপৈঁতি ষ্টেশনের ২৪ মাইল দক্ষিণে) এবং নিকটস্থ মহাদেব বাথান গ্রামের করমগাছ তলায় আসিয়া সমবেত হয়। পরে এখান হইতে দুই মাইল মধ্যে তাহারা গামরিয়া গ্রাম লুঠ করে। তৎপরে তাহারা চারি মাইল দূরবর্তী বারকুপ গ্রাম লুঠ করিতে যায়। এখানে দারোগা সাহেবেরা আসিলে সিধু, কানু তাঁহাদিগকে এবং সাঁওতালদিগকে তাহাদের নিকট আসিতে বলে। সাঁওতালেরা আপন ভাষায় কথা কহিতে থাকিলে, দারোগা সাহেবেরা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এদিকে সিধু হুকুম দিল যে তাঁহাদিগকে ধরিয়া যেন অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা হয়। তখন বেলা অবসান—সকলে 'দারোগাটিকে ত নিলাম—এবার ঐ দারোগার গাঁকে লুঠ করিব' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা চীৎকার করিতে করিতে বারার নিকট পথলাপুরে আসিল। ইহার পর তাহারা পাথরগাঁওয়া লুঠ করিতে যায়। এদিকে সিধু, কানু স্বগ্রামে ভগ্নাডিহিতে ফিরিয়া আইসে। পাথরগাঁওয়ার ধামসাই থানার দারোগা সাহেব তাহাদের নিকট আসিলে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলে। ইহার পর তাহারা সুন্দরা নদীর তীরবর্তী পূর্বোক্ত পালারপুরে ফিরিয়া আইসে। ইতিমধ্যে ভাগলপুর হইতে পিরপৈঁতি হইয়া এক সহস্র সৈন্যের এক পল্টন আইসে। পালারপুরে লড়াই হয়। বন্দুকে ভালরূপ আওয়াজ হইল না। ইহাতে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া গেল। পূর্বেকার বন্দুক এখনকার মত ছিল না। বারুদ জলে ভিজিয়া গিয়াছিল বলিয়া বন্দুকের ভালরূপ কাজ হয় নাই। এইজন্য সাঁওতালেরা অনেক সিপাহী মারিবার সুবিধা পাইয়াছিল। একজন সাহেব আহত হইয়া ভাগলপুরে পলাইয়া গেলে, তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া উঠে এবং উন্মত্ত হইয়া তাহারা মহাদেব বাথানে আইসে।

"সাঁওতালেরা পল্টন দেখিয়া সুন্দরা নদী পার হইয়াই লাহাটি গ্রামে আসিল। পল্টন, বেলা ১১টার সময় এই গ্রামের ধারে সুন্দরা নদীর উত্তর তীরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং করমগাছ সন্নিহিত উত্তর-পশ্চিম প্রান্তরে তাঁবু ফেলে। সাঁওতালেরা নদীর অপর তীরে বসিয়া পল্টনের কার্যকলাপ দেখিতে থাকে। আমি (চাঁদ পাহাড়িয়া) ক্যাপটেন কোপি সাহেবের আদেশে অপর তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকারপূর্বক তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম—'কেন তুই লড়ছে? কেন তুই হুলমাল করছে? আপনার বুতুরু-বাতরা নিয়ে ঘরে থাক।' কিন্তু তাহারা এই চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া কেবল তরবারি ঘুরাইয়া দেখাইয়াছিল। ইহার পর সাহেব সিপাহীদিগকে রসি দুই পশ্চিমে ভাগারডাঙ্গায় লইয়া যায়। তখন বেলা দুইটা। সাঁওতালেরাও নদীর তীরে তীরে পল্টনের সঙ্গে গিয়াছিল। সাঁওতালদিগকে আবার বোঝান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা শুনে নাই; বলিয়াছিল—'পুড়খানা (সাদা সাহেব লোক) সব কাট।' সাঁওতাল-সর্দার একহস্তে ঢাল লইয়া ও অপর হস্তে তরবারি ঘুরাইয়া অপর সাঁওতালদের সহিত সমস্বরে বলিয়াছিল 'পুড়খানাকে সব কাটব নদীর গর্তে।'

"এই কথা শুনিয়া সাহেব গুলী চালাইতে আদেশ দেন। ইহাতে ১৬।১৭ জন সাঁওতালের প্রাণ বিনাশ হয়। সাঁওতালেরা 'সাতরা' 'নাগরা' বাজাইতে বাজাইতে ৪ মাইল দক্ষিণে চুনাখালিতে পলাইয়া যায়। তৎপর পল্টন পালাপুরের তাঁবুতে ফিরিয়া আইসে।

"ইতিমধ্যে সাঁওতালেরা চুনাখালিতে লুটপাট করিয়া পাথরুলের রাজার ১০টি হাতী লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখে। পালারপুরে দুই দিন অবস্থান করিলে পর পল্টন তৃতীয় দিবসে এক গোয়ালার নিকট চুণাখালির লুটের সংবাদ পাইয়া বেলা ১২টার সময় সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হয় এবং নিকটস্থ পাহাড়ের নিকট বন্দুকে বারুদ পুরিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি (চাঁদ পাহাড়িয়া) তাহাদিগকে অনেক প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই হয় নাই। তখন ক্যাপটেনের আদেশ মত তাহাদের উপর গুলী নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতে প্রায় দেড় সহস্র সাঁওতাল মারা পড়ে।"

২। গোড্ডা মহকুমার অন্তর্গত লাহাটি গ্রামনিবাসী ৭৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র দাস নিম্নরূপ বিবৃতি দিয়াছিলেন:

"সিধু, কানু, ভৈরব ও চাঁদ—ইহাদের ছেলেপিলে এখনও আছে। আর ভাইদের একজন এখনও বর্তমান। জাতি মুর্মু ঠাকুর, রাজা গোষ্ঠী। সাঁওতালেরা আনা-গোনা করে ও খবর পাঠায় এবং বলে আমি রাজা হইয়াছি। তোমাদিগকে হালপিছু মোটেই দুই আনা করিয়া লইয়া জমি বন্দোবস্ত করিব। পরগণাইতকে

১৫ বার চিঠি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। শেষে লিখিল যে আমার নিকট কাঁড়, ধনুক ও হাতিয়ার লইয়া উপস্থিত হও।

"সিধু, কানু মালখান পরগণাইতকে পরোয়ানা দিল—'পরগণাৎ' বারে বারে তোমাকে যে হুকুম দিয়াছি সে সমস্ত শেষ করিয়া অবিলম্বে হাজির হও। তুমি কিছুতেই শুনিতেছ না কেন? আমি অগ্রে গিয়া তোমাকে কাটিব, পরে অন্য কথা। আমি (নবীন দাস) নিজে কেড়তে এই পরোয়ানা প্রথমে পাঠ করিয়া পরগণাইতকে শুনাইয়াছিলাম।

"আমরা পাঞ্জয়ারার নিকট একটি গ্রামে আসিয়া শ্বশুরবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। কারণ এদিকে শুনিলাম যে, পূর্ব ভাগলপুরের পল্টনে হইবে না—পশ্চিম হইতে পল্টন আসিলে পর সাঁওতালদের সহিত লড়াই হইবে। এদিকে গোড্ডার নিকট সাহেবগঞ্জে সাঁওতালেরা জমা হইল। এইখানে পাঁজয়ারার রাজার সিপাহীর সহিত লড়াই হইল। হাতী প্রভৃতি পলাইয়া গেল। কিন্তু শেষে রাজা মারা পড়িল। বাকী সিপাহী পলাইয়া গেল।

"পরে, আমরা আমাদের আদি বাসস্থান সারেট সারজল পার হইয়া ভাগবান্দে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে জামতাড়ার নিকট বেউঢ়া গ্রামে পল্টনের সহিত লড়াই হইল। ভয়ে জামতাড়ার রাজা প্রভৃতি সকলে পলাইয়া গিয়াছিল। সাঁওতালেরা বরাকর পার হয় নাই বলিয়া পাঁড়রার রাজা পলাইয়া যায় নাই। করোর বর্গীরাজা পলাইয়া গিয়াছিল। এখানে লড়াই হইয়াছিল। সাপচালায় যত মুলুকের সাঁওতাল জড় হইয়াছিল। এই লড়াই বড় জবর লড়াই। অত বড় পাহাড়কে হাতাহাতি পল্টনেরা ঘিরিয়াছিল। সাঁওতালদের মেয়েদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিল—ছেলেদিগকে রেহাই দেয় নাই। কানু সাপচালায় ধরা পড়ে। সিধু পূর্বেই ধরা পড়িয়াছিল।"

৩। লাহাটি গ্রামের অপর এক অধিবাসী বৃদ্ধ বনয়ারী সাওয়ের উক্তি:

"ব্রাহ্মণ সূর্যের পাঁঠা; আর সূর্য সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা। ডোম, কলু, নাপিত, কামার, গোয়ালা, কাহাল, ইত্যাদিকে সাঁওতালেরা রেহাই দিত, কাটিত না। কারণ ইহাদের দ্বারা সাঁওতালদের উপকার হইত। সাঁওতালেরা বলিত—বন্দুকের ধুমাকে জল করিয়া দিব। জমি বাড়ুক তবে জমা বাড়িবে, বাপ-দাদা বন কাটিয়া জমি তৈয়ারি করিয়াছে, ইত্যাদি। তাহারা মহাজনদিগকে পায়ে হইতে কাটিতে কাটিতে বলিত যে এই জাড়ুই, রোদাড়ী, ইত্যাদি নেও। দেশে এক বৎসর ধরিয়া মনুষ্য ছিল না—দেশ জঙ্গলময় হইয়া গিয়াছিল। তখন রেল হয় নাই, পরেই রেলের সুরু হয়।

"পালারপুরের উত্তরে মহাদেব বাথানে সিপাহীরা তাঁবু খাটাইল। ভাগার মাঠে লড়াই হইল। পশ্চিমে সাহেব, পূর্বে সাঁওতাল। সাহেব বলিল—আমাদের সহিত পারিবি না, ঘর যাও। সাঁওতালেরা বলিল আমরা পারিব—আমরাই রাজা। ইহার পরই যুদ্ধ হইল। ইহাতে বহু সাঁওতাল নিহত হয় ও অনেকে বনেজঙ্গলে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে।"

৪। ডেও গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতালের বিবৃতি:

"হুলমালের কারণ ইয়াদ নাই। সিধু কানু ভগ্নাডিহি গ্রামে জন্মাইয়াছিল। ইহারা সুভা ঠাকুর হইল। কারণ রাতেই লোক বড় হয়, রাতেই লোক ছোট হয়। সেইজন্য সিধু কানু দেবতা। যথা—কেউ হাকিম, কেউ কোটবাবু—যদিও সেই একই লোক। আমাদের ২ গাড়ী চাউল ও ৩।৪ কুড়ি মহিষ ও গরু কোন্‌দিকে কি হইয়া গিয়াছিল। আমার বয়স তখন ১৪।১৫ বছর।"

৫। নয়ান দাস নামক জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতির সারমর্ম:

নয়ান দাস স্বচক্ষে সাত গাড়ী সাঁওতালেদের মুণ্ড লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল। সাঁওতালেরা মহাজনদের এক-একটি করিয়া আঙ্গুল কাটিয়া বলিত যে, এমনি করিয়া টাকা বাজাস। পরে গলা কাটিয়া ফেলিত। দাড়িওয়ালা লোককে ভাল পাঁঠা বলিয়া কাটিয়া দেবতাকে মুণ্ড উপহার দিত। হাঙ্গামার শেষে সাঁওতালদের সাওয়া ঘাস খাইতে হইয়াছিল। তাহারা ২।৪টি ধান খুঁটিয়া বাহির করিয়া ১ হাঁড়ি জলে ফেলিয়া অন্নের জল প্রস্তুত করিয়া খাইয়াছিল। এক টাকা দামের কুঠার /১ এক সের চাউলে বিক্রয় হইয়াছিল। পেটের জ্বালায় ওলের গাছ খাইত। ৪ মাস ধরিয়া লবণ পাওয়া যায় নাই। অনেক লোক অন্নাভাবে মরিয়া গিয়াছিল। এইজন্য পর পর দুই বৎসর জমি আবাদ হয় নাই। লোকের ভীতি অনেককাল যায় নাই, ইত্যাদি।

উপরি উক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে সাঁওতাল বিদ্রোহের গতিবিধি ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা লাভ করিতে পারি। ইহার তীব্রতা ও ব্যাপকতা সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করিয়া শতবর্ষ পূর্বে ব্যাপকতর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন হিসাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব ও দুঃসাহসিকতা বহুদিক্ দিয়াই অনুধাবনযোগ্য।

# রাঁচীতে ও গিরিডিতে

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত ব্যক্তিগত
অভিজ্ঞতামূলক রচনা )

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

জীবনের সন্ধ্যাকালে পৌঁছে জীবনের উষাকালের স্মৃতিটুকু মধ্যাহ্ন-বিস্মৃতির আচ্ছন্নতা মুক্ত হয়ে বড়ই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল! সন্ধ্যাবেলাকার তারকাটির দর্শন স্মরণ করিয়ে দিল—মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিলাম কোন্ এক শুভ প্রাতে প্রভাতী তারাটি। একই রূপ, একই উজ্জ্বলতায় ভরা, একই রকম রহস্যপূর্ণ মধুর আকর্ষণী পলকভঙ্গিমা! বুঝি বা একই সে তারা।

রাঁচীতে ছিলেন আমার এক পূজনীয় আত্মীয়—সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে যাই একটা ছুটিতে। প্রতি প্রাতে বাড়ীর বারান্দায় ব'সে দিগন্তপ্রসারী রাঁচীর পাবর্ত্য সৌন্দর্য দেখতাম। আর দেখতাম, প্রতিদিনই মুগ্ধ হয়ে সুন্দর একটি দেবোপম মনুষ্য-মূর্তি চলেছেন বাড়ীর সামনেকার রাস্তা দিয়ে একটি পরিপাটি ঘরোয়া-রিক্সায় চ'ড়ে। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর মনে একদিন ক্ষোভ জেগেছিল, "দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায়, কিন্তু জাহাজ চালায় না" ব'লে, তিনি তখন জাহাজ চালানর পর্ব সাঙ্গ করে নিরালায় এই রাঁচীতে ব'সে লেখনীই চালিয়ে চলেছেন।

কলকাতায় সেকালে সুকুমার রায় 'সন্দেশ' চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই সদলবলে চালাতেন 'আলোক' নামে একখানি ধর্মসংক্রান্ত কাগজ। তাঁর দলে আমিও গিয়ে জুটেছিলাম এবং বিদেশে গেলেও যোগ রক্ষা করতাম। একদিন এক খেয়াল হ'লঃ মনে করলাম 'আলোকের' জন্যে একটা লেখা জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর কাছ থেকে আদায় করবার অছিলায় গিয়ে সাক্ষাৎ ভাবে ঠাকুর দর্শন করে আসি। লেখা পাই ভাল, না পাই দর্শন লাভ ত হবে।

তাঁর নিজ বাড়ী ছিল শহরের পূর্বপ্রান্তে মোরাবাদী পাহাড়ের শিখরপ্রদেশের এক ধাপ নিচে। আর পাহাড়টার পাদদেশে ছিল তাঁর 'লতাবিতান'—স্নিগ্ধ নিবিড় শ্যামলিমায় আচ্ছন্ন। পাহাড়টার অঙ্গ ঘিরে বিসর্পিত পথে সন্তর্পণে পা বাড়াতে বাড়াতে উঠে যখন গিয়ে তাঁর আশ্রমে পৌঁছলাম তখন সূর্য পশ্চিম গগনে ঢ'লে পড়েছে। আশ্রমের দিকে তৃষিত নয়নে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই একজন পরিচারক এসে বললে—কর্তা সেখানে নেই, আছেন আরও উপরে, অর্থাৎ পাহাড়টার একেবারে চূড়ায় যে সূর্যমন্দির আছে সেইখানে।

আবার উঠতে লাগলাম। উঠে গিয়ে যে অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম তা জীবনভোর আর ভুলতে পারলাম না। মন্দির তা ঠিক নয়—চন্দ্রাতপ বলা চলে, চতুর্দিক্ খোলা। দেখলাম, সেই চন্দ্রাতপের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান দীর্ঘ দেবমূর্তি অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে। সান্ধ্য-সূর্যের রক্তিম কিরণ সে শুভ্র দেবমূর্তিকে গেরুয়া রঙে ভূষিত করেছে। আজানুলম্বিত হস্তদ্বয়ের করপুট সংযুক্ত। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ যে এই দেবমূর্তি দেখছিলাম তা খেয়াল ছিল না। দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেছে, পশ্চিম আকাশ রক্তিম ছটা বিকীর্ণান্তর ম্লান হয়ে এসেছে কিন্তু মূর্তি তেমনি নিশ্চল, নিথর।

মহর্ষিকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সেদিন তাঁর ঋষিপুত্রের ঋষিমূর্তি দর্শন করে নয়ন সার্থক হ'ল। দূর থেকেই নমস্কার করে বিদায় নিলাম সেদিনকার মত। পরদিন গেলাম অন্য সময়ে এবং দেখা পেলাম তাঁর ঘরেই। তিনি তখন 'প্রবাসী'র জন্য একখানা মূল ফরাসী বই-এর তর্জমায় রত ছিলেন। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই আমার মুখের দিকে যে স্থিরদৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন, মনে হ'ল তা আমার অন্তস্তল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ জাগল।

বললেন—আলোকের জন্যে লেখা? তা তোমরাই, এই তরুণেরাই ত আলোক দেখাবে আমাদের। আমাদের চোখের আলো ত নিবে আসছে। এখন তোমরাই দেখাবে পথের আলো। শুনে আমার মনে হ'ল, ডাকঘরের অমল যখন বলছে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি, তখন ঠাকুরদা বলছেন—তোমার মত অমল

নবীন চোখ ত আমার নেই, তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

লেখা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে যখন ফিরে আসছি তখন তিনি বললেন—আর একটু বস, তোমার একটা ছবি এঁকে নিই। অন্তরে একটা আত্মপ্রসাদের ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই পেন্সিল দিয়ে স্কেচ্ ক'রে নিলেন। যেমন সঙ্গীতে, সাহিত্যে তেমনি চিত্রকলায় অপূর্ব প্রতিভা ছিল তাঁর। পরে শুনেছি এমনি ভাবে ছবি এঁকে নেন তিনি প্রায় সকলেরই যাঁরা নতুন যান তাঁর কাছে।

২

এবার একটি বিষাদের কাহিনী। রাঁচী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছুটিতে থাকার দরুণ ডেপুটিবাবুকে কিছুদিনের জন্যে তাঁর কাজ অফিসিয়েট করতে হয়। এখন, এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁকে দারুণ একটা অপ্রিয় কর্তব্যের কবলে পড়তে হয়; একটা খুনী আসামীর ফাঁসি তাঁকে বসে দেখতে হয়। এই কর্তব্য সেরে বাড়ী ফিরে এলেন ভগ্ন দেহমন নিয়ে। বললেন—রুদ্ধ নিশ্বাসের কি যে যন্ত্রণা সর্বাঙ্গে হতে লাগল লোকটার, তা চোখে দেখা যায় না। অথচ ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্তব্য, তা চোখে দেখতেই হবে বসে।

এই ঘটনাটা আমার তরুণ মনে বড়ই আলোড়ন সৃষ্টি করল। আমার মনে হতে লাগল আমেরিকায় চরম শাস্তির ব্যবস্থা। বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রাণদণ্ডে হয়ত এই যন্ত্রণা হয় না যা ফাঁসিতে হয়ে থাকে। কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা কি এড়ান যায় তাতেও? কেউ ত সেভাবে ম'রে গিয়ে ফিরে এসে সাক্ষ্য দেয় নি!

এই প্রশ্নটা ভূতের মত আমায় পেয়ে বসল বেশ কিছুদিন ধ'রে। এদিকে আমাকে রাঁচী ছেড়ে যেতে হ'ল গিরিডিতে। সেখানে গিয়েও এই ভৌতিক প্রশ্নটা আমাকে রেহাই দিল না। এমন সময় এক আকস্মিক ঘটনা আশ্চর্য ভাবে প্রশ্নটার মীমাংসা ক'রে দিল। ব্যাপারটা এইবার বলি। আমি ছিলাম বাড়ীতে একলা একদিন বিকালবেলা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। এমন সময় কড়্ কড়্ ক'রে একটা বাজ পড়ল, চোখ ঝল্সে আর কানে তালা লাগিয়ে। মনে হ'ল, খুব কাছে পড়ল বাজটা। কারণ বিদ্যুতের চমকানি দেখবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গর্জনটা শুনতে পেলাম। বাইরে তাকিয়ে দেখি, বিদ্যুতের পাকান লেজটা তখন দূরে পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে গুটিয়ে গেল। আর পাহাড়ের পায়ের তলা দিয়ে উশ্রী নদীর পাগলপারা ক্ষিপ্র ধারা এঁকেবেঁকে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। পরপারের ঘন শালবীথি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। সূর্য অস্তে গেল কি না বুঝতে পারছি না—পশ্চিম আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। ভাবছি, কি করা যায়? মনে হ'ল একটা বই পড়ি। এই ভেবে দেয়ালের গায়ে-আঁটা একটা শেল্‌ফ্ থেকে একটা বই নিতে হাত বাড়িয়েছি--এই পর্যন্ত আমার মনে আছে, তার পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

যখন জ্ঞান হ'ল, ফিরে দেখি আমি ঠাণ্ডা আদুড় মেঝের উপর প'ড়ে আছি, যেন ঘুম থেকে উঠছি! বুঝতে পারছি না, আমি কখন এবং কেনই বা এভাবে ঘুমিয়ে-ছিলাম। উঠতে গিয়ে দেখি একটা পা প্রায় অবশ, আর মাথাটাও ঝিম্ ঝিম্ করছে! হঠাৎ বাজটার কথা ভেবে তখন মনে হ'ল, বুঝি বা আমার মাথায় আর একটা বাজ পড়েছে। যেই এই মনে হওয়া অমনি কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে চেঁচাতে লাগলাম—বাজ পড়েছে, বাজ পড়েছে, আমার মাথায় বাজ পড়েছে! চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এল। মাথায় বাজ পড়লে কি কেউ বেঁচে থাকে? হ্যাঁ, সত্যিই বাজ পড়েছিল, কিন্তু ঠিক আমার মাথায় না, পড়েছিল আমাদের বাড়ীটাতেই বটে। প'ড়েই বিদ্যুৎ-প্রবাহটা নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। আর প্রধান ধারাটা পাশের ঘরে প্রবেশ ক'রে অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। ভাগ্যিস্ প্রধান প্রবাহটা আমার মাথা স্পর্শ করে নি। আমায় ছুঁয়েছিল শুধু একটা ক্ষীণ ধারা, তাইতেই ঐ দশা। যাঁরা ছুটে এসেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ লেগে গেলেন আমার শুশ্রূষায়, আর সবাই ছুটলেন পাশের ঘরের আগুন নেবাতে। অল্পকালের মধ্যেই ঘটনাটা রটে গেল সারা শহরময়। আর গিরিডি ঝেঁটিয়ে লোক এল মৃত্যুঞ্জয়ী আমাকে দেখতে।

যাই হোক, এই ব্যাপারটাতে পরিষ্কার বুঝলাম—আমেরিকার বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থায় হতভাগ্যদের এইটুকু সৌভাগ্য যে, মৃত্যুযন্ত্রণা না পেয়েই মৃত্যু হয়ে থাকে। আমি কোন যন্ত্রণা না পেয়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যদি বৈদ্যুতিক প্রবাহটা প্রবলতর হ'ত তবে কোন যন্ত্রণা না পেয়েই আমি ম'রে যেতাম।

# বন্দী-দরদী রবীন্দ্রনাথ

স্বামী জ্ঞানানন্দ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৫শে বৈশাখ প্রায় গোটা দুনিয়াই যে তুমুল ও ব্যাপক উৎসব হইয়া গেল, সারা বিশ্বের অগণিত নরনারী কবির উদ্দেশে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইয়া ধন্য হইল। সেই বিবিধ ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের শত সহস্র প্রচারের মধ্যেও বন্দী-দরদী-রবীন্দ্রনাথের কোন উল্লেখ আজ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই, আমি আশা করিতেছিলাম অন্তত বাংলার কোন মনীষী, জন-নায়ক বা কর্মী রবীন্দ্র-জীবনের বন্দী-দরদের প্রতিও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিবেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু ছিলেন, কিন্তু তিনি যে একজন বন্দী-দরদীও, সে কথা আজও কেহ বলিলেন না; বা লিখিলেন না, অথচ কবির "চার অধ্যায়ের" সমালোচনা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

কারান্তরালের বন্দীদের ও দ্বীপান্তরিত আন্দামান কয়েদীদের জন্যও যে রবীন্দ্রনাথের অন্তর কাঁদিত, সেই সংবাদ আর যেই ভুলুক, বাংলা তথা বাঙালী ভুলিতে পারে না। তাই আজ 'প্রবাসী'র মাধ্যমে ক্ষুদ্র অথচ তুচ্ছ নহে—এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিবেদন করিতে চাই যে, সহস্র প্রতিভায় ভাস্বর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বন্দী-দরদীও। ব্রিটিশ শাসনের জগদ্দল পাথরকে ভারতের বুকের উপর থেকে বলপূর্বক অপসারিত করার প্রয়াসে যে সকল বাংলা তথা ভারতের দীর্ঘ মেয়াদী বীর আন্দামান জেলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাদের আপন আপন প্রদেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য "আন্দামান বন্দী সাহায্য সমিতির" উদ্যোগে সারা বাংলায় যে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, সেই আন্দোলনকে বলিষ্ঠ সমর্থন জানাইয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম স্বাক্ষরকারী। আমি যখন একটি আবেদনপত্রের খসড়া লইয়া "আন্দামান-বন্দীর সাহায্য সমিতির" পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ও আশীর্বাদলাভের জন্য শান্তিনিকেতনে যাই এবং প্রথম দিন অতিথিশালায় আহার ও বিশ্রাম করিয়া পরদিন 'গুরুদেবের সহিত "উত্তরায়ণে" সাক্ষাৎ করি, সেই দিনটি আমার কর্ম-জীবনে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আহ্বান করিয়া বসিতে বলিলেন এবং আন্দামানের বন্দীদের সম্বন্ধে কত দরদ দিয়াই যে সংবাদ জানিতে চাহিলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, আমাদের টাইপ-করা আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পূর্বক তিনি যখন স্বাক্ষর করিলেন এবং যখন যাহা ঘটে তাহা তাঁহাকে জানাইতে বলিয়া বিদায় দিলেন, সেই দরদী ভাষা ও ভাব প্রকাশের সামর্থ আমার নাই, আমি কেবল এইটুকুই গভীর ভাবে অনুভব করিলাম যে, অপরিমেয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঐ মহাপুরুষটি কেবল বিশ্বকবিই নন, মানব-দরদী নন, শিশু-দরদীই নন, বন্দী-দরদীও। বলা বাহুল্য আমাদের আবেদনপত্রের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে কবির অভিপ্রায় অনুসারে শ্রদ্ধেয় চারুবাবুও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

অবশ্য আলাপের প্রথম ভাগে কবি একবার অভিমানের সুরে বলিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশ কি আমার কথা ভাবে? তাঁহার কথা অর্থাৎ তাঁর আরব্ধ ব্রত, তাঁর মিশনের কথা, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের কথাই বাংলা দেশ চিন্তা করে কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এইজন্য যে, বিশ্বভারতীর তখন আর্থিক অনটনের দিন চলিতেছিল। সে বিষয়ে বাংলা ও বাঙালীর ঔদাসীন্য কবিকে কিছুটা ব্যথিত করিয়াছিল, কিন্তু তাঁর এই অভিমান ছিল ক্ষণিকের, অবিলম্বে আমাদের সাক্ষাৎকারের বিষয় লইয়া কথাবার্তা আরম্ভ হইল এবং তিনি তাঁর সমগ্র অন্তর দিয়া আবেদনপত্র পাঠ করিলেন, সংগে সংগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকার চাইলেন। আমরা ত মূল বিষয়বস্তুর সহিত যে কোন সর্তে তাঁর স্বাক্ষর পাইলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি। বলা বাহুল্য কবি-কৃত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বন্দী মুক্তির আবেদনপত্রকে সমধিক সুন্দর, শোভন ও শক্তিশালী করিয়াছিল। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন এই ভাবিয়া লজ্জা অনুভব করিলাম যে, এই মহাপ্রাণ কবির "চার অধ্যায়" লইয়া আমরা দেউলী বন্দীশালায় কত বিরূপ সমালোচনাই না করিয়াছি। যাই হোক আমরা কবি-সংশোধিত বন্দী-মুক্তির আবেদনপত্রটি ৺আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র, ৺সরোজিনী নাইডু, ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ভারতের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সম্বলিত করিয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিই।

# ত্রিঝঞ্ঝা

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

শ্রীশিশিরকুমার দাস

১

চৈত্র মাসের গাজন উৎসব। মাসের শেষ চারদিন উৎসবের আনন্দে, ঢাকের বাজনায় গ্রাম মুখরিত থাকে। পাথরের কূর্মাকৃতি শিবকে সারা বৎসর জলে ডুবিয়ে রাখা হয়, মাঠের মাঝখানে শিবপুকুর, বট, অশ্বত্থ, আমলকি গাছে ঘেরা। চৈত্রের শেষ চারদিন গ্রামের প্রান্তে বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায় শান-বাঁধান আটনে শিবকে স্থাপন করা হয়। লোকে সারাদিন ধ'রে শিবের উদ্দেশে গঙ্গা-জল, ডাবের জল, আম, ফলমূল নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে আসে। প্রসাদ নিয়ে গঙ্গাজল পান ক'রে বাড়ী ফেরে।

সকাল বেলা, সূর্য উঠেছে। কিরণ তখনও তত প্রখর হয় নি। ঝলকে ঝলকে মিঠে হাওয়া বইছে। সামান্য দূরে ব্রহ্মণী নদী। শিবের আটনের অশ্বত্থ ছায়ায় বসে বসে গ্রামের জনকতক নামজাদা গোঁড়া ব্রাহ্মণ প্রতি বৎসরের মত এবারও শিবের মাহাত্ম্য, প্রাচীন কিংবদন্তী এবং সেই সঙ্গে পূর্ব-পুরুষদের ধর্মপরায়ণতার কথা আলোচনা করছিলেন।

হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় বললেন, "বুঝলে বিষ্ণুপদ, সে দিন আর নেই, তবে কি না পাপ চিরদিন থাকবে না, আমি নিশ্চয়ই বলছি কলির পর ভগবান্ কল্কীরূপে জন্মগ্রহণ করবেন, আবার সত্য যুগ আসবে।"

বিষ্ণুপদ ঘোষাল সমর্থন করে বললে, "তা আপনি ঠিকই বলছেন দাদা, পাপ সংসারে টি'কবে না, সে ত বার বার প্রমাণ হয়েছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র একাকার হয়ে গেল দাদা, তবে ভগবান্‌ও বলেছেন, ধর্ম স্থাপনের জন্য তিনি বার বারই অবতীর্ণ হবেন।"

হৃষীকেশ ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বললেন, "জাতি-ভেদের প্রয়োজন নেই—একথা যারা বলে তারা মহামূর্খ। জাতিভেদ না থাকলে সমাজের আর থাকল কি? জাতিভেদ আছে বলেই ত দেশ রক্ষা পেয়েছে। নইলে ত দেশ অনাচারে ভরে যেত।"

ফণী বাঁড়ুজ্যে এক পাশে বসেছিল। সে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা দাদা, এখন যে-সব শুনছি জাতিভেদ নাকি সমাজের পক্ষে বড্ড খারাপ, ও না উঠে গেলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। তা কোন্ মতটা ঠিক বলুন ত? অনেক দিনের মানুষ আপনি, শিক্ষিত বয়োজ্যেষ্ঠ, কিছু বলুন আমরা শুনি।"

হৃষীকেশ মৃদু হেসে বললেন, "ফণী, শোন বলি, আরে জাতিভেদ ছিল বলেই ত সমাজ এতদিন টি'কে আছে, আর আজ নতুন কথা, জাতিভেদ না গেলে না কি সমাজ যাবে!"

তিনি মাথা নেড়ে, টিকি দুলিয়ে বললেন, "আমি জোর করেই বলছি জাতিভেদ উঠে গেলে সমাজ ব্যাভিচারে, পাপে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা তা বুঝতেন, বুঝলে?"

এমনি সব কথা। তাদের দোষ নেই, একে যুগ-যুগান্তরের রক্তে বয়ে আসা সংস্কার। তার উপরে আধুনিক ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় নেই, নিজের সংসার, সমাজ এবং গ্রামটিকে আপনার পৃথিবী ও জগৎ বলে মনে করে। তাদের আলোচনা এমন হবেই ত। গ্রামে একটি মাত্র ছেলেদের মাইনর স্কুল, শহর এখান থেকে দশ মাইল দূরে। পথ কাঁচা, গ্রামে ধূলি-ধূসর, বর্ষায় দুর্গম কাদা। আলোচনা চলছিল কখনও উত্তেজিত ভাবে, কখনও পরনিন্দার জন্য নিম্ন স্বরে। ক্ষুদ্র আলোচনা সভাটির সভাপতি মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার হৃষীকেশ। তাকে সভাপতি বলে ঘোষণা করতে হয় নি। গ্রামের সর্বত্রই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এই আসন আছেই।

গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ নৈবেদ্য ও কাংস-ঘটে গঙ্গাজল নিয়ে আসছে-যাচ্ছে। একটি স্ত্রীলোককে দেখে হঠাৎ তাঁরা চমকে উঠলেন। বাস্তবিকই চমকে উঠলেন। একটি চল্লিশ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোক হাতে নৈবেদ্যের থালা নিয়ে আটনে উপস্থিত হ'ল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বলেই মনে হয়। চেহারার বাঁধুনি এবং পরিপুষ্টিতে যৌবন এখনও অচঞ্চল রয়েছে। তার পরনে চওড়া নক্সা-পাড়ের দামী শাড়ী, সাদা জমি। দুই মনিবন্ধে রাশিখানেক চুড়ি, চুড়, বালা প্রভৃতির গোছা। গলায় একটা মোটা বিছে হার। সুপ্রচুর এবং রুক্ষ চুলের বাঁধা খোপা অল্প ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। নাক টিকোলো, মুখটি ঈষৎ লম্বা ধরনের

সুন্দর, চিবুকটি অপূর্ব-ভঙ্গিতে মুখটিকে আরও সুন্দর করেছে। সুশ্রী চেহারা, গৌরী। মাথার দীর্ঘ সিঁথি সিঁদুরহীন শুভ্র।

সে এসে তার নৈবেদ্য পুরোহিতকে ধ'রে দিল। পুরোহিত গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণরা স্থির এবং নির্বাক্ হয়ে বসে রইলেন। তাঁদের ভঙ্গিতে মনে হ'ল যেন আজকের সকাল বেলাটা তাঁদের কাছে অকস্মাৎ অত্যন্ত তিক্ত এবং ম্লান হয়ে গেল। এমন কি হৃষীকেশ, যিনি নিজেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাষী এবং তেজী মনে করেন তিনিও সামনের দূর নীল দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে বাঁ-হাত দিয়ে টিকিতে পাক দিতে লাগলেন।

স্ত্রীলোকটি অনিন্দ্য কণ্ঠস্বরে পুরোহিতকে বললে—"বিনয়, তোর পালা শেষ হলে দেরি না করে বাড়ী ফিরিস।"

বিনয় বললে, "আমি একটু পরেই যাচ্ছি, মাসীমা।"

স্ত্রীলোকটি অপরূপ ভঙ্গিতে তার রূপ-যৌবনের উচ্ছলিত তরঙ্গ তুলে, স্থির গতিতে ব্রাহ্মণ-সমাজকে যেন না দেখেই ধীরে ধীরে চলে গেল। হৃষীকেশের কোন সম্পর্কে আত্মীয়া স্ত্রীলোকটি। তিনি নীরব হয়েই রইলেন। ক্ষণ-পূর্বের সে উত্তেজিত অবস্থা আর রইল না। কেমন যেন হঠাৎ ম্লান এবং গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

ফণী বাঁড়ুজ্যে বললেন, "বিষ্ণুপদ, এ কে গো? রাধা নয়?"

বিষ্ণুপদ জবাব দিলে, "হ্যাঁ, রাধাই বটে, গাজনে এসেছে এবার।"

—"ওঃ, আজ কুড়ি বছর পরে গ্রামে এল। নিজের গ্রাম দেখতে ইচ্ছে হয় বৈকি।"

কেউ কোন জবাব দিলে না। বিষ্ণুপদ ও হৃষীকেশের বাড়ী রাধাদের পাড়াতে। ফণী অন্য পাড়ার। এ গ্রামে তিনটি বামুন পাড়া।

ফণী বলেই চলল, "সেই যে কুড়ি বছর আগে বর্ষার রাত্রিতে গেল আর ফেরে নি। উঃ, সে বছর সেই দিনটাতে কি দুর্যোগই গিয়েছে। জলে, ঝড়ে একেবারে তুফান বয়ে গেল। বাড়ী ভাঙল, গাছ উপড়োল, মানুষ-গরু মরল। সেই রাত্রে আশু সাহার সঙ্গে সেই যে গিয়েছিল আবার এতদিনে এসেছে।"

সেও চুপ করে গেল। বিষ্ণুপদ বললে, "থাক ফণী, আশুর কথা আর বলে কাজ নেই, হয়ত সে বড়লোকই বটে, মদ বেচে বড়লোক হয়েছে, তাই বলে এত অহঙ্কার আর পাপ ভগবান্ সইবে না। দেখো তুমি, ওর কুঠ হবে।"

ফণী বাঁড়ুজ্যে, আশু সাহার বন্ধু লোক—সে বললে, "তা যাই বল দাদা, লোকটার দিল্ আছে। স্কুলকে ঘড়ি দিয়েছে, আলমারি দিয়েছে, আবার হাজার টাকা দানও করেছে। তোমাদের গাজনে, হরিসেবায় সবচেয়ে বেশী চাঁদা দেয় সে।"

কথা শুনে বিষ্ণুপদর গা জ্বলে গেল। তবুও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সে নিজেও খারাপ—সঙ্গে পড়ে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আশু সাহার টাকার সাহায্যেই কারাদণ্ডের পরিমাণটা কিছু কম হয়েছিল। সে বললে, "তা বটে, তবে ঐ যে গ্রামে এসে বন্দুক নিয়ে পাখী শিকার করে বেড়ান, ঘোড়ায় চড়ে গাঁয়ের রাস্তায় ঘোড়দৌড় করা, বুড়ো বয়সে এসব আর মানায় না। ছিঃ।"

ফণী বললে, "পাখী ত ও অনেক দিন থেকেই মারে না, তবে সৌখীন মানুষ, ছেলেপুলে বৌ মরেছে, এখন নানারকম নিয়ে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু দিল্ আছে বটে। এত বড় গাঁখানায় টাকা ত আরও অনেকের আছে, অমন প্রাণ ক'জনার আছে বল দিকি নি।"

একটু থেমে কি ভাবলে ফণী। তার পর বললে, "সেদিন মাঠে যাচ্ছিলাম, কাহারদের বুড়োশিব বললে, আশু সাহা একখানা লগন-চাঁদা পুরুষ বটে। বামুনের মেয়ে—" বলেই চুপ করে গেল, যেন নিজেকে সামলে নিলে তাড়াতাড়ি। নিজে লজ্জিত হ'ল এবং বিষ্ণুপদ ও হৃষীকেশের বিব্রত এবং বিবর্ণ মুখ দেখে বুঝলে, ও সম্পর্কে আলোচনা করা ঠিক হয় নি। সেও নীরব হয়ে গেল।

সুসজ্জিত নানান জাতির নর-নারীর আসা-যাওয়ার বিরাম রইল না। শিব দেবতা সার্বজনীন দেবতা। তিনি স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জ্ঞান করেন না। হাড়ি, বাগদি, কাহার সকলের অধিকার আছে শিবের কাছে। শিব তাই গণেশ, জন-গণ-মন দেবতা!

* * * *

কুড়ি বছর আগের একটি ঝঞ্ঝামত্ত রাত্রে রাধা আশু সাহার সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল। এতদিন সে গ্রামে আসে নি। এবার কুড়ি বৎসর পরে গ্রামের মমতা তাকে টেনে এনেছে। কালেরও পরিবর্তন হয়েছে। সমাজে, গ্রামে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। গ্রামের মাইনর স্কুলটা এক্সটেণ্ডেড এম. ই. স্কুল নাম নিয়ে এবার সপ্তম শ্রেণী খুলেছে। তাই এতদিনে রাধা গ্রামে আসতে সাহস পেয়েছে। লজ্জা তার আর নেই। লজ্জার মাথা সে খেয়েছে।

২

আজ থেকে ২৭ বৎসর পূর্বে রাধার বয়স তখন তের,

তার বিয়ে হয়েছিল গ্রামান্তরের এক পুরোহিত যুবকের সঙ্গে। অত্যন্ত দরিদ্র। একখানি খড়ো ঘর এবং কিছু যজমান তার সম্বল ছিল। আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ তার ছিল না। রাধার বুড়ো বাবা মেয়েটিকে নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। জমি বিঘে পাঁচেক। পুরোহিতের কাজে সামান্য আয় আর সংসারের পোষ্য অনেকগুলি। স্ত্রী, দু'টি বেকার অশিক্ষিত পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা। লেখাপড়া কেউ শেখে নি। ছেলে দু'টির পড়ানর খরচ তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্তও যোগাড় করতে পারেন নি। রাধা বড় মেয়ে। রাধার বিয়ের জন্য তিনি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বহু চেষ্টা-চরিত্র করে অবশেষে রামকৃষ্ণ মুখুয্যের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। অন্য চারটি মেয়েও তখন ভীতিকর ভাবে খেয়ে না খেয়ে অভাব-দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েও বেড়ে উঠেছে।

রামকৃষ্ণ মুখুয্যে মানুষ ভাল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার এক দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। বিয়ের পর একটি বছর তাদের বেশ কেটেছিল। স্বামী সারাদিন পূজো ক'রে ফিরত। রাধা রাঁধত। তার পরে তাদের দু'জনের ছোট্ট সংসার নিভৃত আনন্দে ভ'রে উঠত। দারিদ্র্য এবং অভাব ছিল, কিন্তু কামনা বেশী ছিল না। তাছাড়া জাদুকরী যৌবন ছিল। তাই দুঃখও ছিল না। রাধা রাঙা শাড়ী পরত, সিঁথিতে সিঁদুর লেপত এবং স্বামীর আদরে ও সোহাগে পুলকিত হয়ে উঠত।

তার পর বছর খানেক না যেতেই গ্রীষ্মকালে দুপুর রৌদ্রে গ্রামান্তর থেকে পূজো সেরে ফিরতে ফিরতে রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কেমন যেন হয়ে গেল। ঘামতে ঘামতে বহু কষ্টে রৌদ্র-দগ্ধ শূন্য প্রান্তর পার হয়ে গ্রামে ফিরল, বাড়ী ঢুকতে ঢুকতে ডাকলে, "রাধা একটু জল, দাওয়া।" ব'লে দাওয়ায় ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল। চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। মুখ রাঙা, ঘামে সারা দেহ ভিজে গেছে। তার শরীরটা কিছুদিন থেকে ভাল ছিল না। রাত্রে অল্প অল্প জ্বর হ'ত। গ্রাহ্য করে নি। হাঁপাতে হাঁপাতে রামকৃষ্ণ হঠাৎ রক্তবমি করলে। দলা পাকান তাজা লাল রক্ত তার মুখ দিয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করে ঝলকে ঝলকে বার হয়ে এল, এবং এই রক্ত-বমনের শেষ পরিণাম ঘনিয়ে এল মাস তিন পরে শ্রাবণের এক দুর্যোগময়ী কালো রাত্রিতে। সে রাত্রিটা তার সমস্ত রকম ভীষণতা এবং নিষ্ঠুরতা নিয়ে রাধার মনে একেবারে কেটে কেটে বসে গিয়েছিল। বহুদিন সে ভুলতে পারে নি। আজ হয়ত সে স্মৃতি ঝাপসা, বিক্ষুব্ধ স্মৃতির ঘোলা জলের নীচে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সে রাত্রিতে বৃষ্টি এবং ঝড়ের বিরাম ছিল না। একটানা শাঁ শাঁ শব্দ আর তারই সঙ্গে বারিধারার ঝম্ ঝম্ শব্দ মিলে এক আশ্চর্য কোলাহলের সৃষ্টি করেছিল। দরজা বন্ধ করে রাধা তার স্বামীর কাছে বসে ছিল। একটা হারিকেন আলো জ্বলছিল টিম্ টিম্ করে। কাঁচে কালি পড়ে, আলো উজ্জ্বল ছিল না। প্রাচীন দিনের জানালাবিহীন সেই ঘরের মধ্যে থেকেও বাইরের উন্মাদ-প্রকৃতির ভীষণতা তাদের অগোচর ছিল না। দরজা প্রবল ঝাপটাতে মচ্ মচ্ করে উঠছিল এবং জলের ধারা স্থানে স্থানে দেওয়ালের গা বেয়ে ঝরছিল। রামকৃষ্ণ রোগশয্যায় পড়ে আছে গত সাতদিন ধ'রে। অসহ্য যন্ত্রণা। ওষুধের তেমন কোন ব্যবস্থা হয় নি। গ্রামে ভাল ডাক্তার নেই। থাকলেও ডাক্তার আনবার সামর্থ্য নেই। বুড়ো কবিরাজ কিসব ওষুধ দিয়েছিলেন, আশা নেই জেনেও।

মধ্যরাত্রি। প্রবল বৃষ্টি এবং ঝড়ের মধ্যে রাধার মনে হ'ল সমস্ত বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে যেন তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সে ভয়ে শিউরে উঠছিল। রামকৃষ্ণ রক্তবমি করছিল। ভোর রাত্রের দিকে সে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল, "রাধা, তোমার এই এত অল্প বয়েস, তোমার কি হবে সেই ভেবে আমার মরেও শান্তি নাই।" সে মরেছিল, মরে বেঁচেছিল। তার পরের দিন সকালে সূর্য উঠল, বর্ষণ-স্নাত পৃথিবী, গাছপালা, ঘাসপাতা সবুজ বর্ণে ঝলমল্ করছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণকে বেঁধে কাটোয়াতে শ্মশানে দাহ করতে হরিবোল দিয়ে নিয়ে চলে গেল, রাধা বুক-ফাটা চিৎকার করে মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদলে। এবং চোদ্দ বছর বয়সে যৌবন প্রবেশের শুভক্ষণে তার মাথার সিঁদুর মুছে ফেলে, হাতের লোহা খুলে, ইট দিয়ে ঠুকে ঠুকে শাঁখা দুটো ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে, রাঙা শাড়ী ছেড়ে ধুতি পরলে এবং তার পর বাপের বাড়ী ফিরে এল।

* * * *

পিতৃগৃহে ফিরে দেখলে বাবা এক বছরে আরও তিনটি মেয়েকে কুকুর বিড়ালের মত বিদায় করেছেন। বড়দাদা বেতাল গ্রামের কোন দোকানে হিসেবের কাজ পেয়েছে, ছোট ভাই ননীতাল পাড়ায় দরিদ্র পরিবারের ছোট ছোট ছেলেগুলোকে নিয়ে একটা পাঠশালা খুলেছে। তাদের চার-আনা করে মাসিক মাইনে। তা-ই তাগাদা দিয়ে দিয়ে ছেলেদের বাবার কাছ থেকে

আদায় করতে হয়। এমনি করে আগের চেয়ে একটু ভাল ভাবে সংসারটা চলছিল। তারই মধ্যে সেও এক রকম করে মিশে গেল।

তার বাবা আরও বছর তিনেক বেঁচে ছিলেন। তিনি দরিদ্র হলেও অত্যন্ত জেদী মানুষ ছিলেন। অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যেও মনের জোর হারান নি। তাঁর সংসারে শাসন ছিল। ছেলে দুটো অশিক্ষিত হলেও প্রকাশ্যে অনাচারী হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেল।

৩

বছর তিনেক পরে।

দাওয়ায় বসে বসে সন্ধ্যাবেলায় গল্পসল্প হচ্ছিল। আশু সাহা, রাধার মা আর বেতাল। আশু সাহা এ পরিবারের সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই পরিচিত। রাধার বাবা তাকে নিজের ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। রাধার মা বলছিলেন, "তোমার সেই আগেকার কথাগুলো মনে পড়ে আশু, সেই কাটোয়ায় গঙ্গা নাইতে গিয়ে কাঁঠাল কিনে আনা। আকাশে চাঁদ উঠেছে—গাড়ী নিয়ে আমরা গাঁয়ে ফিরছি।"

আশু জবাব দিলে, "কি দিনই ছিল বৌদি, আমি ত কতদিন রাধাকে কাঁধে নিয়ে কাটোয়াতে গঙ্গা নাইতে গিয়েছি। তখন ছোট ছিল, কি আব্দারটাই করত। ওকে পুতুল, খেলনা সব কিনে দিলে তবে ওর ঝোঁক থামত।"

নিজেই খানিকটা হা হা করে হেসে ফেললে, তার পর যোগ করলে—"এতটুকুনি মেয়ে, রাগ করে বলেছে, আমাকে কাপড় কিনে দাও। আমি বললাম, আমাকে বিয়ে করিস যদি তাহলে কিনে দেব।

"তা বললে, হ্যাঁ বিয়ে করব দাও।"

আশু আবার হেসে উঠল।

মা বললেন, "ছোটবেলাতে ও বড্ড বাপ-সোহাগী ছিল, প্রথম মেয়ে যেমন আদুরী, তেমনি ঝোঁকা।"

রাধা ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল। আশুর কথাটা শুনে মনে মনে লজ্জিত হ'ল। এতদিনে পুরাণো দিনের সেই কথাগুলো কেমন যেন ভাল লাগল না। ইদানীং আশু সাহার চোখের দৃষ্টিতে কি এক রকম ভাবও যেন ফুটে ওঠে, সে লক্ষ্য করেছে।

সে নীরবে শুয়েই রইল।

মা বললেন, "বেতালের একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করে দাও বাবা, ওর একটা কিছু না হলে সংসার যে অচল হয়ে গেল।"

বেতালের দিকে তাকিয়ে আশু জবাব দিলে—"বেতালকে আমি ত বলছি, আমি টাকা দিচ্ছি, তুই এখানে হোক, কাটোয়াতে হোক, যা হোক একটা ব্যবসা কর্। নিজে খাটলে উন্নতি করতে পারবে। ঐ দেখ না, দত্তদের ছেলেটা কি উন্নতিটাই করছে, সে ত পূর্ণিয়াতে বাসনের ব্যবসা করেই?"

বেতাল উত্তর দিলে না। তার মনোগত ইচ্ছা নয় গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও যায়।

মা বললেন, "আশু যা বলছে তাই না হয় কর্, বেতাল।"

বেতাল ঝাঁঝিয়ে উঠল—"তুমি ত সব বোঝ, তোমাকে বকতে হবে না, যাও।"

মা একটু আহত হয়ে ধীরে কণ্ঠে বলে চললেন, "ঘরের ধান ছ-মাস যেতেই শেষ হয়ে যায়। পরণে কাপড় নাই, রাধির সেই কবে কাপড় ছিঁড়েছে আজও বেচারা ছেঁড়া কাপড় পরে কাটাচ্ছে, বাইরে বেরবার উপায় নাই। তোর জামাও ছিঁড়েছে। ননার ত কথাই নেই, গামছা পরে কাটায়। টাকা উপায়ের একটা ভাল পথ ত চাই, তোর কাজটাও ত গেল।"

বেতাল কোন উত্তর দিলে না। চুপ করে বসে থাকল।

আশু হঠাৎ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বললে, "তোমাদের কাপড় নেই তা আমাকে বল নি কেন, আমি ত মরি নি।"

—"তুমি ত কতই দিচ্ছ বাবা, তোমাকে আর কত বলব? আর তুমি কত কালই বা দেবে? বড় বড় সমর্থ ছেলেদের ত কিছু করা দরকার।"

আশু সে কথা গ্রাহ্য না করে বললে, "রাধার জন্যে কি ধুতি কিনতে হবে? ভারি অন্যায় কিন্তু বৌদি, ঐটুকু মেয়ে, এই ত সবে সতের হ'ল—এই বয়সে ধুতি পরবে সে কেমন কথা।" একটু থেমে বললে, "রঙিন না পরে, সাদা শাড়ী পরুক।"

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তাই ত বটে, এই বয়সে ধুতি পরতে দেখলে আমারই কেমন লাগে, কিন্তু উপায় কি বল? লোকে দেখলে নানা রকম বলবে, তার দরকার নেই।"

রাত্রি ক্রমশঃ বেশী হচ্ছিল, আশু উঠে বললে, "আজকে আমি আসি বৌদি!"

মা বললেন, "বেতালের চাকরির একটা উপায় যা হোক কর বাবা, তোমার ত অনেকের সঙ্গে জানাশোনা আছে।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আমাকে আর আর বলতে হবে না, আমি দেখব"—তার পর একটু থেমে বললে, "রাধা কোথায়, ঘরে নাকি?"

মা জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, শুয়ে আছে।"

আশু উচ্চ কণ্ঠে ডেকে বললে, "রাধা, ঘুমুলি নাকি, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়া দেখি, তেষ্টা যা পেয়েছে।"

রাধা খানিক পরে হাতে একটা জলের গ্লাস নিয়ে দোরের কাছে এসে দাঁড়াল। অপরূপ সুন্দরী মূর্তি! পরনে ধুতি, মুখের মধ্যে সুস্নিগ্ধ কমনীয় মাধুর্য, রুক্ষ-চুলের অবাধ্য গুচ্ছ কপালে গালে এসে পড়েছে, হারিকেনের স্বল্প আলোতে তার এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট শীর্ণ সুন্দর মূর্তি দেখে আশু অবাক্ হয়ে গেল। যখনই সে আসে তখনই রাধা প্রায়ই নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে, তাই স্পষ্ট ভাবে তার চেহারাটা আশু এতদিন দেখতে পায় নি। আবছা দেখেছে। আশু মুগ্ধ হয়ে গেল। কবে বার বছর আগে মেয়েটাকে সে কাঁধে করে কাটোয়াতে গঙ্গা নাইতে নিয়ে যেত, তখন তাকে দেখতে সুন্দর ছিল; কিন্তু আজ যৌবনে বিধবা বেশে এ তার কি আশ্চর্য রূপ হয়েছে! রাধার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে মিনিট কয়েক সে চাইলে। তার পর জুতা পায়ে দিয়ে মচ্‌মচ্‌ শব্দ করে ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বার হয়ে গেল।

৪

দিন দুই পরে, আশু সাহা কাপড়ের একটা মস্ত গোছা নিয়ে সন্ধ্যাবেলা রাধাদের বাড়ী এসে ঢুকল। বাড়ীর উঠানে একটা জাম গাছ। ম্লান চন্দ্রালোক জাম গাছের শাখা-প্রশাখার ফাঁক দিয়ে পড়ে, উঠানে আলোছায়ার আল্পনা রচনা করেছিল। দাওয়ার উপরে রাধা, রাধার ছোট বোন পদ্মা আর তার মা বসে ছিল। ননীতাল ও বেতাল তখনও বাড়ীতে ফেরে নি। আশু সাহা ইচ্ছা করেই সন্ধ্যার পর এসেছিল, কারণ সে জানে লোকে নিন্দা করতে ভালবাসে। বাড়ীতে সমর্থ বিধবা মেয়ে আছে। তাকে কাপড় নিয়ে যেতে দেখলে মেয়েটার নামে কলঙ্ক রটাবে। সে নিজের কলঙ্কে ভয় পায় না। জীবনে অনেক কলঙ্ক সে গ্রহণ করেছে। তার কিছু সত্যি, কিছু-বা নয়। নারী তার ভাল লাগে, তাই বলে সে নিষ্ঠুর নয়, কাম এবং লোলুপতা তার জীবনে সর্বস্ব হয়ে ওঠে নি।

সে কাপড়গুলো তাদের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, "কালকে কাটোয়া গিয়েছিলাম, কাপড় নিয়ে এসেছি, দেখ পছন্দ হয় কি না?"

মা নিরুপায় হয়ে আশুর কাছে গ্রহণ করতেন, কিন্তু মনের সঙ্কোচ কাটে না। আগে আশু দিত, উপকারও গ্রহণ করত—সে একদিন ছিল, আজকে আর এক অবস্থা।

বললেন, "পছন্দ হবে বৈকি বাবা, তবে এত কাপড় তুমি কেন এনেছ আশু, দরকারের বেশী জিনিষ নেওয়া কি ঠিক?"

আশু বললে, "বৌদি, আমাকে তুমি পর ভেব না। তোমাদের সঙ্গে অনেক দিনের সম্পর্ক। নিজের সংসারে কেউ নেই, দিলামই বা, তাতে তোমরা নিজেকে ছোট ভেব না। তোমরা কি চেয়েছ?"

সে দাওয়ার উপর ব'সে কাপড়গুলো এক এক করে খুলে দেখাতে লাগল। মা'র জন্যে চারখানা ধুতি, রাধার জন্যেও চারখানা ধুতি আর দুটো সাদা শাড়ী; সরু কাল পাড়।

শাড়ী দুটো হাতে তুলে রাধাকে দেখিয়ে বললে, "কি রাধা, পছন্দ হয়?"

রাধা কিছু বললে না, মা বললেন, "শাড়ী এনেছ, শাড়ী ও কি করে পরবে আশু?"

—"ঐ ত সবাই পরছে বৌদি, ও কি দোষ করেছে, কখনও-সখনও পরবে তাতে দোষ কি? ইচ্ছাও ত হয়। এতটুকু বয়সে নিরামিষ খেয়ে, ধুতি পরে, কি করে কাটায় বল ত? আর দু'দিন পরে ত অমন সুন্দর চুলগুলোও ছোট করে দেবে।"

রাধা এবার কথা বললে, "না, আমি চুল কাটব না।"

আশু মৃদু হাসল, বললে, "রাধা, কাটতে কি কেউ চায় গো, জোর করে যে করায়, মানুষের জীবনকে এরা যে হত্যা করে, জীবনটাই মাটি করে দেয়।"

কেউ কোন উত্তর দিলে না। খানিকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকল। শেষে আশুই নীরবতা ভঙ্গ করে বললে, "আমি বোধ হয় কালকেই আসানসোল চলে যাব। আবার কতদিনে যে আসব ঠিক নেই।"

মা বললেন, "এবার এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ যে, কিছু হয়েছে নাকি?"

—"হ্যাঁ, ওখানকার দোকানে হঠাৎ একটা চুরি হয়ে গিয়েছে, আমাকে ম্যানেজার তাড়াতাড়ি যেতে লিখেছে।"

একটু থেমে বললে, "আসানসোল থেকে আবার

কলকাতায় যাব। কলকাতাতে মেডিকেল কলেজে আমার ভাইপো রয়েছে। সে কেমন আছে খোঁজ নিতে হবে, টাকা-কড়িও দিয়ে আসতে হবে। যেদিকে না দেখব বৌদি সেই দিকেই একটা কিছু হয়ে থাকবে, টাকার অভাবে ওদের হয় ত দারুণ অসুবিধা হচ্ছে।”

—“তোমাকে কি আমরা চিনি নে আশু, সে কথা ত সবাই জানে।”

আশু বললে, “আসানসোলে আমার বাড়ীর কাছে একটা গরীব বুড়ী থাকে, গত মাসে তাকে টাকা দেওয়া হয় নি, সে কেমন আছে তাই বা কে জানে?”

আশু কথাটা বলে চিন্তিতমুখে বসে রইল। অন্য সকলেও কথা বললে না। শুধু রাধার মনে হ'ল, লোকটা সত্যিই ত খারাপ নয়, সে পরপোকারী, তার অর্থের উপর আসক্তি নেই, চরিত্রহীন তার অখ্যাতি তার আছে। তবে গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টির কথা শোনা যায় নি। রাধা শুনেছে, আশু সাহা বন্ধুবৎসল। গরীব মানুষ তার কাছে হাত পেতে ফিরে যায় না।

সহসা মুখ তুলে আশু সাহা হারিকেনের আলোতে রাধার মুখটা পড়বার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই অনুমান করতে পারলে না। তার শুষ্ক ওষ্ঠাধর, বিষণ্ণ মুখ দেখে আশুর মনের ভিতরটা এক অজ্ঞাত অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। সে একটা দুর্জয় আসক্তির আভাস পেলে তার মনের মধ্যে। সে অন্যমনস্ক ভাবে রাধার শান্ত-মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়েই রইল। তার বয়স এখন চল্লিশ, রাধার বয়স সতের। তার কন্যার বয়স ৩। তবু দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাকে পীড়ন করে কেন? কেন একটা বন্য অনুভূতি তার মনকে বিদ্রোহী করে দেয়?

কোন কথা না বলে আশু উঠে দাঁড়াল, এবং গম্ভীর ভাবে ধীর পদক্ষেপে বাইরের দরজার দিকে চলতে লাগল।

মা বললেন, “আশু, চলে যাচ্ছ?”

—“হ্যাঁ, আমি যাই বৌদি।”

দরজার কাছে এসেছে এমনি সময়ে বেতাল টলতে টলতে বাড়ী ঢুকল। তার মুখের গন্ধে আশু জানতে পারল, বেতাল মদ খেয়ে এই রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী ফিরেছে। সে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলে, বেতাল বললে, “কে, আশু কাকা, এখনি যাচ্ছ যে, একটু বস না!”

আশু জবাব না দিয়ে বার হয়ে গেল। বেতাল টলতে টলতে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালে। তার মূর্তি দেখে বিস্ময়ে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। মা কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। রাধাও নতমুখে স্থির হয়ে রইল। বেতাল সামনের কাপড়গুলোর দিকে চেয়ে বললে, “এ কাপড় কে দিলে?” একটু থেমে বললে, “মুখে সব রা নাই যে, কে দিলে বল?”

মা জবাব দিলেন—“আশু!”

—“আশু? শালা শুঁড়ির এত দরদ কেন? রাধি, ওর কাছ থেকে কাপড় নিতে তোর লজ্জা করে না? জানিস, লোকে তোর নামে কত কি বলতে লেগেছে। সব আমাকে শুনতে হয়। আমি সব তাড়াব বলছি, ওসব ছ্যাচড়ামি আমার বাড়ীতে চলবে না।” সে স্খলিত কণ্ঠে টলে টলে কথাটা শেষ করলে।

রাধা জবাব দিলে, “আমি কি কাপড় চেয়েছি নাকি?”

—“না চেয়েছিস ত, ও সাহস করে দেয় কেমন করে?”

—“তার আমি জানব কেমন করে?”

মা বিব্রত হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত চঞ্চল হয়ে কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না।

বেতাল এবার দারুণ রেগে গেল। কণ্ঠস্বর একবার পরিষ্কার করে নিয়ে গর্জন করে বলে উঠল—“না চেয়েছিলি ত ফিরিয়ে দিলি না কেন? ওকে চিনিস না তুই, কিন্তু আমি চিনি, এক নম্বরের পাজি হারামজাদা, শুঁড়ি হয়ে বামুনের মেয়ের দিকে চোখ পড়েছে।”

সে গর্জাতে লাগল। রাধা ধীরে উঠে গিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ল। বেতাল দারুণ রাগে সেই মত্ত অবস্থাতেই বকতে লাগল—“আমি দেখে নেব, আমিও বাপের বেটা।”

৫

দারিদ্র্য মানুষকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে। ভগবান্ যদি থাকেন, তাহলে তিনি মানুষকে সব দিয়েছেন, এ সুন্দরী পৃথিবী, সবুজ তৃণলতা, গাছ-পালা, আকাশ-বাতাস, জল-ফল। ধরণী মা তার বুকের অমৃতস্বাদী ফসল জুগিয়ে চলেছেন তাঁর সন্তানদের জন্যে। তবু কেন এত কষ্ট, এত বেদনা, এত বীভৎস ভীষণ প্রবৃত্তি। মানুষের পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে। সে আগুন ইঞ্জিনের বয়লারের চেয়েও ভীষণ। জীবনের, মনের কিছু সুন্দর ও মধুর—তাকে নিঃশেষে দগ্ধ করে ও অগ্নি। ঐ অগ্নির জ্বালাতে মানুষ চিরজীবন দগ্ধ হ'ল, ঘুরে ঘুরে হয়রান হ'ল। কি আগুনই বিধাতা দিয়েছে! আর আছে কামনা, রিপুরাজ কাম। ও প্রবৃত্তি যার মধ্যে জেগেছে, তার রক্তকে দিয়েছে ফুটিয়ে। সে

জানোয়ারের চেয়েও হীন হয়ে যায়। সে সুন্দরকে অপমান করে, সত্যকে, কল্যাণকে পদদলিত করে।

বেতাল অহঙ্কার করে বলেছিল, সে "বাপের বেটা।" কিন্তু বাপের বেটা কে নয়? মা'র স্বামীই কি বাপ? না, জন্মদাতাই বাপ? বাপ ত প্রত্যেকেরই থাকতে হবে। কিন্তু দারিদ্র্যের চোয়ালের পেষণে পড়লে বাপের বেটারা যে সব দর্প হারিয়ে ফেলে। তখন তার কাছে কর্তব্য-বোধ, মানবতা, সব যে একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। সে দারিদ্র্যের রূপ যে ভয়ঙ্কর—কল্পনাতীত। সে দারিদ্র্য হ'ল অনশন। যারা সারাজীবন ধ'রে ঠিকমত দু'বেলা খেতে পেয়েছে তারা বুঝবে না কি মর্মান্তিক সে জ্বালা, পেটের মধ্যে সমস্ত নাড়িভুড়ি কেমন করে জ্বলে, মাথার মধ্যে সমস্ত অনুভূতি কেমন করে তাল পাকিয়ে যায়।

মাসখানেক পরের কথা। বেতাল সারাদিন ঘুরে ঘুরে বাড়ী ফিরে এল। মা চুপ করে বসে ছিলেন। রাধাও শান্তভাবে ঘরের মধ্যে বসে কি ভাবছে। মা বেতালকে দেখে বললেন, "কি কিছু পেলি না?"

বেতাল ক্লান্তভাবে দাওয়াতে বসে পড়ল বললে, "ধার করতে গেলাম তা ধার দিতেও কেউ চায় না, মনে করছে টাকা দেব না বুঝি। শেষে অজিত একটা টাকা এমনিই দিলে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, "তা আর বসে রইলি কেন বাবা, তাড়াতাড়ি দোকান থেকে যা হোক চাল চারটি কিনে আন্, ক'দিনই যে দু'বেলা পেট ভরে কেউ খায় নাই'রে?"

বেতাল বললে, "তা যাচ্ছি মা, কিন্তু জমি এক বিঘে না বেচলে আর চলবে না।" বেচে বেচে পাঁচ বিঘেতে ঠেকেছে। ও জমিটা আর বিক্রি করার ইচ্ছে মা'র ছিল না। তা ছাড়া পদ্মাটারও বিয়ে দিতে হবে।

একটু থেমে তিনি জবাব দিলেন, "যা ভাল হয় কর্, তবে জমি ক'বিঘে বেচলে তখন সারা বছরটাই ত উপোষ দিতে হবে।"

বেতাল কোন উত্তর দিলে না। মূর্তিমান শ্রীহীনতা। পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে। মুখের বিরল দাড়ি এখানে-ওখানে বেরিয়ে একেবারে বিশ্রী লাগছে। চুলগুলোতে তেলও পড়ে নি। অশিক্ষিত, অসংস্কৃতের একটা ছাপ যেন তার সমস্ত দেহটাতে। সে উঠে বাড়ী থেকে বার হয়ে গেল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে জমি বিক্রি করবার জন্যে ক্রেতার সন্ধানে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মা বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস এই দুপুর রোদে?"

বেতাল উত্তর দিলে, "দেখি, উত্তর মাঠের জমিটার দাম কি রকম হবে, এমনি করে আর চলবে ক'দিন। উপোষ দিয়ে ত বাড়ীসুদ্ধ লোককে টাঙিয়ে রাখতে পারি না?"

মা কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করে শুনলেন। তাঁর দেহটা ক্রমশঃ কঙ্কালসার হয়ে পড়ছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য পরিচয়ে মনের মধ্যে আশার বাষ্পমাত্র নেই। কেবল ছেলেমেয়েদের দু'বেলা দু'মুঠো যেন খেতে দিতে পারেন এই তাঁর একমাত্র কামনা। ঐ দু'মুঠো ভাতের জন্যে দিনের মধ্যে লক্ষ বার ভগবানের নাম করেন, কোন সাড়া পান না। তাঁর করুণার কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না। ভাবেন, তাঁর নিজের কর্মফলে সব হচ্ছে। কেঁদে কেঁদে বলেন, "ভগবান্, গত জন্মে কত পাপই করেছি, কত অভাগার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি তাই আজ এই শাস্তি।"

৬

জমি বিক্রি হয়ে গেছে। কাটোয়াতে রেজিষ্ট্রী করে সেই দিন সন্ধ্যেতে বেতাল বাড়ী থেকে বার হয়ে গেল। মদের দোকানে গিয়ে মদ খেয়ে কাছাকাছি একটা আড্ডাতে আড্ডা দিয়ে স্খলিত কণ্ঠে গান গাইবার চেষ্টা করে রাত্রি দশটার সময় মুচিপাড়ার দিকে গেল। সেখানে সম্প্রতি সে একটি প্রেয়সী জোগাড় করেছে। সেও দরিদ্র পরিবার। স্বামী তার বৌকে খাওয়াতে পারছে না, তাই বৌ রোজগার করছে। কে জানে মুচির মেয়ে দারিদ্র্যের পীড়নে দেহদান ক'রে মনের দুঃখে কাঁদে কি না? সে রাত্রে হাতে টাকা ছিল ব'লে বেতালের মেজাজটা একটু বেশি রকম উত্তেজিত ছিল। সে বাড়া-বাড়ি করাতে পাড়ার লোকে তাকে মেরে কান ধ'রে বাড়ী থেকে বার করে দিলে। বেতাল কাঁদতে কাঁদতে ফুলো চোখ-মুখ নিয়ে রাত্রি দুটোর সময় বাড়ীর সামনে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

"দরজা খোল, দরজা খোল নাকি ছাই।" ননীতাল এসে দরজাটা খুলে দিলে। বেতাল টলতে টলতে বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। তার চীৎকার শুনে বেতালের মা ও রাধা বাইরে বেরিয়ে এল। রাধার হাতে আলো ছিল। সেই আলোতে বেতালের ক্ষত-বিক্ষত মুখটা দেখে সে শিউরে উঠে বললে, "তোমার মুখ অমন হ'ল কি ক'রে?"

—"সে খোঁজে তোর কাজ কি? আমার মুখ আমি বুঝব।"

—"তা ত বুঝলাম। রাত্রি দুটোতে ত বাড়ী ফিরলে, মার-টার খেয়ে আস নি ত? শুনছি ত আজকাল মুচিপাড়াতেও-যাওয়া হচ্ছে।"

তার কথা শুনে মাতাল বেতাল কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললে। বলে বসল, "তুই আর পোড়া মুখ দেখাস নে, তোর নামে গাঁয়ে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গেল। বাইরে গিয়ে শোন্ গে একবার, দেশশুদ্ধ ছোঁড়ারা তোর রূপ নিয়ে আলোচনা করছে।"

কথা শুনে রাধা বিস্মিত হয়ে গেল। তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "পুরুষ মানুষ লেখাপড়া না শিখলে ঐ দশাই হয়, মাতাল!"

—"তুই চুপ করবি হারামজাদী, এক্ষুণি বাড়ী থেকে বার করে দেব। দয়া করে জায়গা দিয়েছি, আবার চোখ রাঙান হচ্ছে।"

স্খলিত কণ্ঠে গোটা কয়েক অশ্লীল গাল উচ্চারণ করে সে উঠানে শুয়ে পড়ল।

রাধা মর্মান্তিক ভাবে আহত হয়ে ঘরে ঢুকল এবং বিছানায় মুখ লুকিয়ে আকুল ভাবে কেঁদে উঠল। মা কিছু বলতে পারলেন না। শুধু রাধার মাথাতে হাতটা বুলিয়ে দিয়ে আবার ওপাশে তাঁর শয্যাতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাধা কাঁদতেই লাগল।

৭

রাধা বিকালের দিকে একটু সকাল সকাল সেদিন গা ধুতে গিয়েছিল। কোন সখীকে সঙ্গে না নিয়েই রোদ থাকতেই সে রাণীদীঘির বাঁধা ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এবং গুটি কয়েক দীর্ঘ সোপান অতিক্রম করে বিরাট বড় দীঘিটার গহন গভীর কালো জলে গিয়ে গা ডুবিয়ে দিলে। অপূর্ব ঠাণ্ডা আর সুন্দর জল। ঐ শিবের আটনতলা ওপারে। এপার থেকে ওপারের মানুষ চেনা যায় না। ধারে ধারে শালুক আর কাঁসাতালির কাচের মত ডাঁটা আর পাতা। পানকৌড়িরা ডুবে ডুবে সাঁতার কেটে কেটে খেলছে এবং একপাল বালিহাঁস ঝাঁক বেঁধে জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। দীঘির পাড়ের গাছের ছায়া পড়েছে কাজল-কালো জলে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে রাধা গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে স্থির হয়ে রইল। মাথার অজস্র চুলের কয়েকটা চূর্ণ গুচ্ছ জলে সিক্ত কপালের উপর লেপটে রইল। মুখটাও জলসিক্ত। কত কি সে ভাবছিল। রামকৃষ্ণের কথাটা এখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এই শান্ত দুপুরে, নির্জনে একাকী জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হ'ল তার মত একাকী কেউ যেন নেই সংসারে। তার যেন কেউ নেই। মা'র মধ্যে সেই পুরাণো দিনের ভালবাসার স্বাদ আজ আর নেই। দাদার দুর্ব্যবহার ত সে প্রতিদিনই দেখছে। একবেলা দু'মুঠো ভাত জোটে না ঠিকমত, মনের এতটুকু আনন্দ নেই। জগৎ সংসার পৃথিবী সব যেন শূন্য, ধূ ধূ করছে। সে অবাক্ হয়ে গেল ভেবে যে, এত নির্জনতায়, এত একাকী এবং আনন্দহীনতার মাঝখানে মানুষ বাঁচে কেমন করে? তার যেন সহসা মনে হ'ল, কেউ কারও নয়। প্রকৃত ভালো সংসারে কেউ কাউকে বাসতে পারে না—আর তাই যদি না পারে, মানুষ বাঁচে কি করে? মানুষ নিজের পাগল আর চঞ্চল মন নিয়ে কেমন করে নিজেকে সহ্য করে? আজকাল সে আর আয়নাও দেখে না। চেহারাটা কেমন হয়েছে তাই বা কে জানে? মুখটা? হাত দুটো তুলে তাকিয়ে দেখলে একবার। রিক্ত দু'খানি ধবধবে সুন্দর হাত। একটু যেন শিরা বেরিয়ে গিয়েছে। কঠিন নীল রেখা কয়েকটা চোখে পড়ছে। বড় দুঃখ হ'ল, মনে হ'ল, এমন কি করেছি যে, এত সুন্দর হাত দুটোতে দু'গাছা কাচের চুড়িও পরা চলবে না? স্থির হয়ে সে ওপারের দিকে তাকিয়ে রইল। মন চলে গেল কোথায়—অনেক—অনেক দূরে। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার কথা মনে হ'ল, পঞ্চাননতলার মেলার কথা মনে হ'ল। অতীত জীবনের খণ্ড খণ্ড এলোমেলো দুটো-একটা সকাল-সন্ধ্যা, বর্ষা-বসন্তের স্মৃতি হঠাৎ চকিতে মনে পড়ে গেল, বিদ্যুৎস্ফুরণের মত। তার পর সে নিজেও জানলে না কি ভাবছে সে। সে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেল। বিষণ্ণ বিবাগী অনুভূতিতে সে পাথর-প্রতিমার মত স্থির হয়ে গেল।

হঠাৎ চমকে উঠল। প্রথমে বুঝতে পারল না কেন? তার পর শুনতে পেলে পিছনে ঘাটের উপর থেকে কে বলছে—"জলে এই দুপুর বেলা কে গো?"

রাধা মুখটা ফেরালে, এবং একটা বিচিত্র শিহরণ তার জলতলে শীতল-করা দেহের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। বুকের ভিতরটা দ্রুততম স্পন্দনে নেচে উঠল। কোন জবাব দিলে না, আকণ্ঠ ডুবিয়েই রইল। আবার ঘাটের উপর থেকে কথা বললে, "কে, রাধা? এই দুপুরে চারিদিক থমথম করছে, এই সময়ে চান করতে এসেছিস কেন রে? একা একা, ব্যাপার কি?"

রাধা হঠাৎ বড় মুগ্ধ হ'ল। প্রকৃত স্নেহের স্পর্শ অনুভব করে মনের বিষণ্ণতা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। বললে, "একাই এলাম, লোক আর ভাল লাগে না, মনে হ'ল একলাই থাকি।"

—"তাই নাকি? একলা থাকবার এত সখ! কিন্তু রাধার হঠাৎ বিরহ জাগল নাকি? তাই কাল জলে একা একা কেষ্টর খোঁজে আসা হয়েছে, আবার এত ব্যথার কথা।"

রাধার মাথায় দুষ্টুমি জাগল; বললে, "হ্যাঁ গো আমি রাধাই ব'টি, তুমি যেন কেষ্ট ঠাকুর, তোমার বিরহেই গহন জলে গা জুড়তে এসেছি।" খিল খিল করে হেসে উঠল কথা শেষে।

গম্ভীর শান্ত প্রকৃতির মেয়েটার এই কথা শুনে ত সে থ' মেরে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলে, "তা হলে কুল আর শ্যাম দুই রাখার চেষ্টা না করে, শ্যামকেই বরণ করে নাও।"

—"কি আমার শ্যাম রে! শ্যামের হাতে বাঁশী থাকে, বন্দুক থাকে না।"

—"কিন্তু এ কালের রাধাকে ছিঁড়ে আনতে গেলে বাঁশীতে হয় না গো, বন্দুক কাঁধে যেতে হয়। বাঁশের বাঁশী নয়, লোহার বাঁশীর গর্জনে কাজ হয় বেশী।"

এবার রাধা ভ্রূকুটি করলে। বিচিত্র ছন্দে দু'টি দীর্ঘ ঘন ভুরু নেচে উঠল একবার। তার পর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল।

—"কি হ'ল? অমন করে চাইছ যে?"

—"না, ও কিছু না, কেমন করে মেয়েমানুষকে ভোলাও তাই ভাবছি।"

হেসে উঠল অপর জন। কথা বললে না।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, "বন্দুক নিয়ে এত বেলাতে ফিরছ যে?"

—"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম নতুন গাঁয়ের বিলে, ফিরতে দেরি হয়ে গেল।"

—"কি শিকার করলে, দেখি।"

মাটি থেকে গোটা পাঁচেক পাটল বর্ণের মৃত হাঁস হাতে তুলে নিয়ে সে দেখালে। দীর্ঘ-কণ্ঠ পাখীগুলির গলা ঝুলে পড়েছে, হলদে হলদে পাগুলোতে দড়ি বাঁধা।

রাধা শিউরে উঠল, চোখ বুজলে। বললে, "তুমি এত নিষ্ঠুর, লোকে যে বলে তোমার দয়ার প্রাণ, মায়া লাগে না তোমার? এতগুলো নিষ্পাপ পাখীকে মেরে ফেললে, ওরা তোমার কি করেছিল? জানো, ওদেরও আত্মীয়স্বজন প্রিয়-পরিজন আছে?"

রাধা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মুখের রেখায় রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে বেদনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

উত্তর এল, অপরাধীর মত, "তুমি কষ্ট পাও এতে? বেশ, নিষেধ করলে আর জীবনে পাখী মারব না। সত্যি বলছি, পাখী আমি আর মারব না।"

দু'জনেই চুপ করে থাকল। রাধা ভাবতে লাগল, বেশ ত মানুষটা! ওর এক কথায় এতদিনের সখের অভ্যাস ছেড়ে দেবে। ও যে একটা বিরাট নেশা, সে শুনেছে।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসার স্বরে বললে, "তুমি আমার একটা কথাতে এতদিনের সাধের অভ্যাস ছেড়ে দেবে?"

—"হ্যাঁ তা-ই দেব, নিষেধ যারা করতে জানে তাদের কথা না শুনে যে পারা যায় না। তোমার মুখে কষ্টের ছায়া যে আমি দেখলাম রাধা!"

রাধা হঠাৎ বলে উঠল, "তবে এ অভ্যাসও ছাড়।"

—"কি অভ্যাস?"

—"এই মেয়েমানুষ চান করলে ঘাটে এসে দাঁড়ান।"

এক মুহূর্ত উত্তর এল না। তার পর টেনে টেনে উত্তর এল, "বেশ, আজ থেকে এ অভ্যাসও ছাড়লাম। আর কখনও কোন মেয়ের দিকে চাইব না, অবশ্য তুমি ছাড়া।" বলেই মৃদু হেসে উঠল সে।

রাধা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, "যাও, চলে যাও, আমি উঠব।"

—"হ্যাঁ যাচ্ছি, কিন্তু এমন সময় ঘাটে এস না, কাছেই মদের দোকান, মাতালরা চান করতে নামে এই সময়।"

রাধা জবাব দিলে না।

—"আমি চলি তা হলে। এখন আপাতত: বন্দুকের দরকার নেই।" বলেই আশু সাহা ডান হাতে হাঁসগুলো ঝুলিয়ে, বাঁ কাঁধে বন্দুকটা ফেলে বাড়ীর দিকে চলে গেল। কাছেই তার দোতলা পাকা বাড়ী—জনশূন্য।

রাধা তাড়াতাড়ি উঠে এল। কাপড়টা ঠিক করে নিলে। নিংড়ে নিলে প্রান্তগুলো, আঁচলটা। তার পর অজস্রভাবে কুঞ্চিত, দেহের সঙ্গে মিশে যাওয়া কাপড়-খানাতে নিজেকে যথাসম্ভব ঢেকে দ্রুতপদে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে নির্জন পল্লীপথে বাড়ী ফিরে গেল। ভাবলে, আশু সাহা কবে এসেছে কে জানে? সেই ত মাস পাঁচেক আগে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ লোকটাকে বেশ লাগল। ভারী ভদ্র আর সুন্দর মানুষ বলে মনে হ'ল। সে দাঁত দিয়ে অধর দংশন ক'রে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

৮

দিন চার গত হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা মা গিয়েছেন পদ্মাকে নিয়ে গোঁসাই পাড়ায় রাধামাধব দর্শন করতে।

বলে গিয়েছেন আরতি দেখে ফিরবেন। বেতাল এবং ননীতাল এখনও বাড়ী ফেরে নি। তারা দু'জনেই আজকাল বেশ রাত করে বাড়ী ফেরে। বেতাল ফিরবে কি না কোন নিশ্চয়তা নেই।

রাধা দাওয়ার উপরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে আছে। সামনের জাম গাছটার উপরে গোটাকতক জোনাকি সবুজ আলো অবিরাম জ্বালছে আর নেভাচ্ছে। এই আলোর চিহ্ন দিয়েই নাকি ওরা প্রিয়জনকে কাছে ডাকে। রাধার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বিচিত্র সে হাসি। কি ভাবলে কে জানে। সহসা সে বাইরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলে এবং তাকিয়ে দেখলে আশু সাহা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এ দিকেই আসছে। আশু সাড়া দিয়ে বললে, "বেতাল আছিস নাকি?"

রাধা জবাব দিলে, "না, বাড়ীতে নেই।"

আশু তবুও ধীরে ধারে এসে জুতোটা খুলে দাওয়ায় উঠে এক পাশে বসে পড়ল।

রাধা বললে, "মাটিতে ব'স না, আমি আসন দিই।"

—"থাক, থাক আসনে দরকার নেই।"

রাধা উঠে গেল এবং একটা চটের আসন এনে তার পাশে পেতে দিলে। আশু টেনে নিয়ে ভাল করে বসল।

তার পর জিজ্ঞাসা করলে, "বৌদি আর এরা সব কোথায় রাধা?"

—"মা রাধামাধবের বাড়ীতে আরতি দেখতে গিয়েছে।"

আশু প্রশ্ন করলে, "আর ননী বেতাল এখনও আসে নি?"

একটু থেমে আবার বললে, "তুমি এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীতে একা রয়েছ?"

রাধা একটু বিরক্ত হয়ে বললে, "তাতে কি হয়েছে, আমি ত মাঠে নাই, রাণীদীঘির ঘাটেও নাই।"

—"না, তা নেই, তবে এমনি একা একা···।"

—"হ্যাঁ, আমার একা ভাল লাগে"—রাধার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা জোর প্রকাশ পেল। দু'জনেই হঠাৎ কোন কথা বললে না। রাধা গম্ভীর হয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে নারবে বসে রইল। আশু জাম গাছটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। তাদের মাঝখানে একটা হারিকেন স্থির হয়ে জ্বলছে। আশু সাহা হঠাৎ অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করে বসল—"রাধা, একটা কথা বলব।"

—"বল।"

—"আচ্ছা, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত সবদিন হয় না, না?"

—"কেন?"

—"এমনি জিজ্ঞাসা করছি, লোকের মুখেও শুনলাম। আরও শুনলাম, বেতাল নাকি দেশসুদ্ধ লোকের কাছে ধার করেছে, আবারও ধার চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছে।"

রাধা নিস্পৃহ গলায় জবাব দিলে, "তা হবে হয়ত।"

—"সত্যি, আমার ভারি দুঃখ হয়, তোমার শরীরটা কি যে হয়েছে কি বলব? মুখ-টুখ শুকিয়ে কি হয়েছে?"

এই অত্যন্ত স্নেহার্দ্র কথাটাও রাধার কাছে অত্যন্ত শ্রীহীন মনে হ'ল। সে ধীরকণ্ঠে জবাব দিলে, "আমার শরীরের ভাবনা, তোমাকে ত ভাবতে হবে না।"

আশু ব্যথিত স্বরে এবার জবাব দিলে, "আমি বুঝতে পারছি না, তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলছ কেন? আমি কি এমন কিছু বলেছি যাতে তোমার অপমান করা হয়?"

রাধা একটু লজ্জিত হ'ল, ভাবলে সত্যিই ত এমন ভাবে কথা বলার কোন কারণ ত নেই, সে ত অন্যায় কিছু করে নি, তবুও কোন উত্তর না দিয়ে মৌনী হয়ে থাকল।

আশু বলতে লাগল, "তুমি যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলি।"

—"বল, কি বলবে?"

—"গোটা কয়েক টাকা তুমি নাও। তোমার নিজের জন্যে নয়, তোমাদের সংসারের জন্যে। আমি বলছি তোমাকে, এর মধ্যে পাপ কিছু নেই, আমি নিষ্পাপ মনে তোমাকে দিচ্ছি।"

রাধা কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলে, তার পর বললে, "তোমার টাকা আমরা নেব কেন? এখনও ত বিঘে কয়েক জমি আছে।" একটু থেমে বললে, "তা ছাড়া যদি দিতেই হয় দাদাকে দাওগে, আমাকে কেন?"

আশু হঠাৎ রেগে গিয়ে বললে—"ওর কথা আর বল না, টাকা নিতে গেলে হাত পেতে নেবে হয়ত কিন্তু পরে আবোল তাবোল বকবে। তুমি এটা জান, আশু সাহা এত ছোট নয় যে, মাতালের গাল মন্দ সহ্য করবে।" একটু থেমে বললে—"তুমি নাও, তোমার নিজের কাজে লাগিও না, ভাই-বোনেদের ত দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে হবে। কেউ জানতে পারবে না, অপমানের কোন কথাই উঠবে না।"

রাধার উত্তরের জন্যে আশু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কয়েকটি মুহূর্ত অত্যন্ত ধীরে অতিবাহিত হয়ে

গেল। রাধা ধীরকণ্ঠে জবাব দিলে—"তোমার কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নেওয়া আমার উচিত হয় না, আমি নিতেও পারব না। শুকিয়ে মরে গেলেও পারব না।"

আশু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললে, "রাধা, ভাল আমি কোন মেয়েকে জীবনে বাসি নি, কেবল লালসা আর কামনা নিয়েই তাদের দেখেছি, একটা দারুণ জ্বালা আর ঝাঁঝাল ভাব!"—তার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। একটু থেমে অত্যন্ত ধীর ভাবে টেনে টেনে আবার বললে, "বলতে আমার লজ্জা করে, বলা উচিতও নয়, তবু বলছি তোমাকে আমি ভালবেসেছি। তুমি বিশ্বাস কর, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র পাপ নেই, কামনা নেই, তোমাকে আমি চাই না, কিন্তু এমনি ভাবে দিনের পর দিন উপবাস করে করে তুমি কষ্ট পাও একথা আমি ভাবতে পারি না।"

একটু থেমে আবার বললে, "কালকে নিশুতি রাত্রে একলা রাণীদিঘির ঘাটে বসে বসে ভেবেছি, কেন আমার এত ভাবনা হয়েছে রাধার জন্যে? সংসারে কত লোকই ত অমন ভাবে দিন কাটায়, তাদের জন্যে ভাবি নি কোনদিন। তবে রাধার জন্যে এত ভাবছি কেন, সে উপবাসে অভাবে দিন কাটাচ্ছে তাতে আমার কি?" একটু থেমে ফের বললে, "কিন্তু মনকে বোঝাতে পারলাম না, অনেক ভেবে, মনে মনে কথা কাটাকাটি করে তোমাকে টাকা দিতে এসেছি।"

রাধা এবারও কোন কথা বললে না। নিরুত্তরে পাথর-মেয়ের মত দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইল। তার শান্ত ও পাংশু মুখের উপর কোন প্রকার অনুভূতির চিহ্ন বোঝা গেল না। সে এমনি নিথর এবং এতই শান্ত।

আশু সে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে চলল, "আমি ভেবে দেখেছি, আমার টাকা আছে তোমার নেই, তাই তোমাকে কিছু দিতে যাওয়া খুবই খারাপ লাগে। তোমাকে ছোট করে দেওয়া হয়, কিন্তু তাছাড়া আমার হাতে আর ত উপায় নেই, আমার কি যে হয়েছে!"

আশুর কণ্ঠ হঠাৎ ভারী হয়ে গেল। সে নিজেকে সংযত করতে চুপ করে গেল। তার পর বললে, "তোমাকে মিনতি করে বলছি তুমি এই টাকা ক'টা নাও, আমি জীবনে আর তোমার চোখের সামনে আসব না। আমাকে দেখতে তোমার যদি ঘেন্না হয়, আমি চিরদিনের মত এখান থেকে চলে যাব। এখানে আমার আছে কে? আসানসোলে থাকব।"

আশু তার পকেট থেকে একটা চামড়ার মানিব্যাগ বার করে সামনে নামিয়ে দিলে। হারিকেনের আলোতে ব্যাগের উপরকার লতাপাতা ও কারুকার্য চক্ চক্ করে উঠল। কিন্তু রাধা চোখ বন্ধ করেই থাকল, তাকালে না। "নাও, নেবে না তুমি?"

এতক্ষণে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে রাধা বললে, "কত দিতে চাও।"

ইতস্ততঃ করে জবাব দিলে আশু, "এক হাজার মাত্র।"

রাধা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। জীবনে অত টাকা সে চোখে দেখে নি। সম্ভবও ছিল না। কি সে বলতে গেল কিন্তু বলতে পারলে না। অসংবরণীয় আবেগে তার অধর থর থর করে কাঁপতে লাগল। সে দাঁত দিয়ে অধর চেপে ধরল। বললে, "তুমি, তুমি যাও, নিয়ে যাও, আমি চাই না, চাই না, আমাকে তুমি বাঁচতে দাও, আমার পথ বন্ধ ক'রো না।" সে চোখ বন্ধ করে নিজেকে কঠিন ভাবে সংযত করে স্থির হয়ে রইল, এবং অকস্মাৎ তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বড় বড় ফোঁটায় গাল অভিষিক্ত করে ঝরে পড়ল। আশু দেখলে, হারিকেনের ম্লান আলোতে সে অশ্রু মুক্তার মত টল্ টল্ করে ঝ'রে পড়ছে এক দুই করে অনেক অনেক।

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। মানিব্যাগটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে আশু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মা আর পদ্মা উঠানে এসে দাঁড়ালেন, রাত্রে নির্জনে অমনি ভাবে দু'জনকে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে মা দারুণ বিরক্ত হলেন। বিরক্তির ভাব কিছুমাত্র গোপন না করে বললেন, "পদ্মা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ঘরে ঢুকে মটকার কাপড়টা ছেড়ে আয়।"

বিব্রত আশু ব্যথিত হ'ল। তবু শান্ত ভাবে বললে, "বৌদি, ভাবলাম, যাই তোমাদের দেখে আসি, এসে দেখলাম তোমরা আরতি দেখতে গিয়েছে, তাই একটু বসলাম।"

মা বাধ্য হয়ে জবাব দিলেন, "বেশ করেছ, তা ভাল আছ ত, অনেক দিন ত আস নি?" তাঁর কণ্ঠস্বরে অপ্রসন্নতার আভাস অপ্রকাশ রইল না। মা বলতে লাগলেন, "কি অবস্থাই আমাদের হয়েছে! বেতাল ত মদ খেয়ে খেয়ে কি কাণ্ডই করছে, যেমন কপাল আমার।" একটু থেমে বললেন, "বেতাল পথে আসছে দেখলাম, আজ বোধ হয় বেশি খায় নাই, টাকা-কড়িও হাতে নাই। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বল,ত আশু।"

—"বোঝালে কি কেউ বোঝে বৌদি, আমি তার কে যে সে আমার কথা শুনবে?"

—"তুমি অমন কথা কেন বলছ?"

—"না বৌদি, সত্যিই বলছি, আমি তোমাদের কি সর্বনাশ করেছি যে, বেতাল দেশসুদ্ধ লোকের কাছে আমার নিন্দে করে বেড়ায়।" একটু থেমে বললে, "আমি আর তোমাদের বাড়ীতে আসব না বৌদি, আমার আসাতে সত্যিই তোমাদের কোন মঙ্গল নেই, আজকে শেষ আসা, তাই তোমার জন্যে একটু অপেক্ষা করেছিলাম।"

মা মর্মাহত হলেন। আশুর কোন দোষ সহসা তিনি দেখতে পেলেন না। বললেন, "অমন কথা তুমি ব'লো না। তোমাকে আমি কোনদিন কিছু বলেছি আশু?"

—"না, না, তুমি আমাকে বলতে যাবে কেন বৌদি। আমি নিজেই ভেবে দেখেছি, আমার আসা উচিত নয়, গাঁয়ে আমার সুনাম ত নেই। লোকে আমাকে মানে টাকা আছে ব'লে, কিন্তু টাকায় কি হবে বল, গুণ না থাকলে।" সে উঠে দাঁড়াল বললে, "আমি বিদায় হই বৌদি, রাত হ'ল, বেতালের সঙ্গে গোটা কতক কথা ছিল, দেখি তাকে পাই কি না।"

সে আর অপেক্ষামাত্র না করে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। পথে পা দিয়ে দেখলে বেতাল আসছে। বেতাল বললে, "কে, আশু কাকা?"

—"হ্যাঁ, শোন একবার।"

—"কি বলছ?" সে কাছে এসে দাঁড়াল। পল্লীগ্রাম। একটু রাত হতেই প্রায় সব শান্ত হয়ে গিয়েছে। দুটো একটা কুকুর অকারণ চীৎকার করছে। সামনে শিবতলার অশ্বত্থ গাছটার নিচেটা ঘোর অন্ধকার হয়ে আছে। আশু এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বললে—

"তোর কত টাকা দরকার বেতাল?"

—"কেন?"

—"জিজ্ঞাসা করছি, বল, কত টাকা ঋণ হয়েছে?"

—"শ' পাঁচেক হবে।"

—"আচ্ছা এই ক'টা টাকা রাখ্। ধারটা কালই শোধ করে দিস, বাকীটাতে পারিস ত জমি কিনিস, না হয় ভাল করে ব্যবসা-ট্যবসা করিস। মদ খেয়ে উড়িয়ে দিস না। ক'টা ত টাকা, ওর আর পরমায়ু ক'দিন।"

আশু তাকে দিয়ে দিলে। রাধা কৌতূহলী হয়ে উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। আশু বা বেতাল কেউ তাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু রাধা সবই দেখল। মানিব্যাগটা বেতালের হাতে দিয়ে আশু দ্রুতপদে প্রস্থান করলে, বেতাল ব্যাগটা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকল।

মা বকছে, "ছি-ছি-ছি, বামুনের মেয়ে, তার কাছে শুঁড়ি হয়ে পীরিত করতে আসে গো। তোর লজ্জা-পিত্তি বলেও কি কিছু নেই? লোকে দিনরাত যা-তা বলছে, আমি ভাবি মিথ্যে কথা, আজ ত নিজের চোখে দেখলাম। তোর মত মেয়ের মুখে আগুন।"

রাধা বললে—"মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। একটা মানুষ এসে বসলে আমি কি তাকে তাড়িয়ে দেব?"

—"হ্যাঁ তাড়িয়েই দিবি, সে কে, যে তাকে বসিয়ে আদর করতে হবে? আর এই রাত দুপুরে বাড়ীর মধ্যে? বলি পাড়ায় কি মানুষ নেই, তাদের কি চোখ নেই, তারা বলবে কি? তোর মাথাটা যে কালকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে তখন?"

জ্বালাময় স্বরে মা বলে চললেন—"শতেকখরী, তোর শতেক খোয়ার হবে, নিজের স্বামীর মাথা খেয়েছিস, বাপের মাথা খেয়েছিস, এবার সকলের মুখে কালি লেপে দিয়ে একটা কাণ্ড করে বস্ আর কি?"

—"মা তুমি আমাকে অমন করে ব'লো না, আমি সত্যিই দোষ কিছু করি নি।"

—"না দোষ করবে কেন? কিছু কর নি? মুখ-পুড়ী, মুখ পুড়িয়ে তবে তুমি ছাড়বে, তোর সাহস ত বলিহারি যাই, এই রাতে, নির্জনে ওর সঙ্গে ব'সে ব'সে এতক্ষণ তুই কাটালি কি ক'রে?"

মা'র কথা আর শেষই হয় না।

ক্রমশই সে কথা বিষমাখা হুল ফুটিয়ে সর্বাঙ্গ জ্বালায় ভরিয়ে দিলে। রাধা আর কথা না বাড়িয়ে সহ্য করে গেল। বেতাল হঠাৎ বললে, "থাম ত মা, থাম, যা হয়েছে, হয়েছে, ও নিয়ে আর বকতে হবে না, খেতে দাও।"

বেতালের মনটা আজ হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। অনেক দিনের পর মনের ভারটা তার কেটে গেল।

সে আবারও মাকে বললে, "থাক, ওকে আর ব'কো না, চুপ কর।"

মা বেতালের কথা শুনে অবাক্ হলেন। হঠাৎ বেতাল রাধার উপর এত সদয় হয়ে উঠল কি করে? তিনি বেতালের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তার পর রাধার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করে চলে গেলেন।

৯

বিকেলে আকাশে মেঘ উঠেছে, তাই সন্ধ্যে বলে মনে

হয়। ক'দিন থেকেই আকাশে মেঘেদের আসা-যাওয়াব বিবাম নেই। আজ সকাল থেকে সারাদিনটাই প্রায় বিষণ্ণ হয়ে বয়েছে। বিকেলেব দিকে অকস্মাৎ প্রবল ভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী প্রবাহিত হ'ল। ছোট ছাট ঘাসেব মাথাগুলো পর্যন্ত নুইয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ বাতাস প্রবল বেগে বইতে লাগল, এবং সমস্ত আকাশটা দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত এক প্রকার পাঁশুটে কাল বঙেব মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিকাল বেলাতেই চাবিদিক্ অন্ধকার হয়ে গেল।

বেতাল গ্রামেব পথ দিয়ে বাড়ী ফিবছিল। হঠাৎ সদ্‌গোপপাড়াব বাস্তায় হবকালিব সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হবকালি সঙ্গে সঙ্গে তাব গলায় গামছা দিয়ে তাকে ধ'বে চাব বাস্তাব মোড়ে নিয়ে এসে হাজিব কবলে। তাব পর বললে, "বল্ শালা, তুই আমাব টাকা দিবি কি না?"

বেতাল জবাব দিলে, "দেব।"

—"দিবি, তা কবে দিবি? শালা, নেবাব সময় ত খুব মা বাবাব দিব্যি কবে টাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এখন ত টিকি দেখবাব জো নাই।"

বেতাল উত্তব দিলে, "বিশ্বাস কব, আমাব হাতে টাকা নাই, না হলে এক্ষুনি তোমাকে টাকা আমি দিয়ে দিতাম।"

—"টাকা নাই, মদেব টাকা ত দিন জোটে, মুচি-পাড়াতে যাবাব সময়, তখন ত টাকাব অভাব হয় না?"

চাবিদিকে লোক জমে গিয়েছে, তাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে এবং অনেকে বেতালেব বিরুদ্ধে দু'একটা সবস মন্তব্যও প্রকাশ কবছে।

—"বাবুব এদিক্ নাই ওদিক্ আছে, পবণে আবাব সনগুপ্ত।"

কে একজন বললে—"ও আশু সাহা শালাকে দিয়েছে।"

বেতালকে একটা ঝাঁকি দিয়ে হবকালি বললে, "কি, টাকা দিবি? না, ভিজে বেড়ালের মত চুপ কবে থাকলেই চলবে?"

বেতাল মিনতির স্বরে বললে, "বিশ্বাস কর ভাই, টাকা থাকলে তোমাকে বলতে হ'ত না, আমি এখনি দিয়ে দিতাম।"

—"টাকা না থাকলে সংসার চলছে কি করে? বামুনের ছেলে, নইলে তোকে আজ আমি দেখে নিতাম। পিছনে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেলাম, দেখা আব পাই না।" একটু থেমে বেতালের মুখের দিকে তাকিয়ে হবকালি দারুণ রেগে গেল। চাপা গর্জন করে ব'লে উঠল "শালা, বোনটাকে আশু সাহাব কাছে বেচে ত অনেক টাকা কামাচ্ছ, সেগুলোব কব কি? মদ আব মেয়ে-মানুষ?"

বোনেব উল্লেখে বেতাল ধৈর্য হাবিয়ে ফেললে। বাস্তবিক গত একটা বছব ধ'বে নানা ভাবে তাব অপমান আব লাঞ্ছনাব সীমা ছিল না, সে আব সহ্য কবতে পারলে না। বাব দুই তাব ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল, তার পর বললে, "শালা চাষা, এত বড় কথা বলতে তোব মুখে আটকাল না, টাকা যদি তোব এতই দবকাব হয় নিজেব বোনকেই না হয় বেচগা। না, সে বেচা টাকা ফুবিয়েছে?"

হরকালি হঠাৎ এতবড় কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেল। বেতাল তাব কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবাব তাকেই চোখ বাঙিয়ে কথা বলবে, এতটা সে আশা কবতে পাবে নি। সে তার বলিষ্ঠ হাতে ধাঁ কবে বেতালেব গালে একটা চড় কষিয়ে দিলে। বললে, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।" চড় খেয়ে বেতাল বসে পড়ল এবং কয়েকটা অশ্লীল গাল উচ্চাবণ কবলে। তাব লাঞ্ছিত মুখেব তোতলামি কথা শুনে সমবেত লোক হা হা কবে হেসে উঠল। কিন্তু হবকালি রাগে জ্বলে উঠল। বেতালেব জামাব কলাব ধবে তুলে সে তাব বুকে মুখে যেখানে পাবলে ঘা কতক ঘুঁষি চালিয়ে দিলে, তাব পব হিড় হিড় কবে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘাড় ধ'বে সজোবে ঠেলে দিলে— "যা, হাবামজাদা, বামুন বংশেব কুলাঙ্গাব—আজ তোকে ছেড়ে দিলাম, তবে টাকা তুই কি করে মাবিস দেখে নেব।"

বেতাল মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। উপবাসে অত্যাচাবে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সহসা সে হু হু করে কেঁদে ফেললে এবং কোন কথা না বলে চোখ মুছতে মুছতে অবসন্ন দেহে চলতে লাগল। কেউ কোন কথা বলতে আব সাহস কবলে না, কিন্তু কেউ আব হাসলও না। অপমানিত লাঞ্ছিত এই ব্রাহ্মণ যুবককে স্থিব হয়ে দেখতে লাগল।

বেতালের বুকেব মধ্যে কি এক প্রকাব সীমাহীন যন্ত্রণাব বিবাম বইল না। সে জীবনে আদব সম্মান কখনও পায় নি, পড়াশুনা কবতেও পাবে নি, যে তাব মধ্যে থেকে কোন আনন্দ আহবণ কবতে পাববে। পল্লী-গ্রামেব হীন পবিবেশের মধ্যে উচ্চতব কোনকিছুর দিকেও তার দৃষ্টি পড়ে নি, তাই মান-অপমান জ্ঞানও তার মধ্যে তত তীব্র ছিল না, তবুও আজকে হরকালিব

অব্যক্ত জ্বালাতে জ্বলে পুড়ে গেল। নিজের বোন সম্পর্কে অশ্লীল ভাষাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারলে না। তীব্র বেদনা তার বুকের মধ্য দিয়ে ঝলকে ঝলকে উদ্গত হয়ে তার কণ্ঠ বার বার রুদ্ধ করে দিলে। মার খেয়ে টলতে টলতে সে মদের দোকানে উপস্থিত হ'ল এবং পকেট শূন্য করে একটা বোতল কিনে ঢক্ ঢক্ করে গিলে নিলে। উপবাসী নাড়ী। পেটের অন্ত্রগুলো ঝাঁঝাল মদের জ্বালাতে জ্বলে উঠল এবং ওষ্ঠাধর থেকে বুকের ভিতরটা যেন বহ্নিস্পর্শে পুড়ে পুড়ে গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, আকাশে মেঘের সীমা নেই, এখনই বৃষ্টি এল বুঝি। সে দ্রুতবেগে স্খলিত চরণে বাড়ীর দিকে চলল। রাধার উপর রাগে তার সমস্ত মাথাটা ধ'রে গেল। রগের দুই পাশের শিরাগুলো উষ্ণ রক্ত প্রবাহে গব গব করছে। সেই শিরার মধ্যবর্তী ফুটন্ত রক্ত প্রবাহে তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

* * * *

রাধা ফিরছিল প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে। ওদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটা পার হতে যাবে এমনি সময়ে আশু সাহার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। আশু ঐ পথ দিয়ে দ্রুতপায়ে চলছিল, আকাশে মেঘ উঠেছে দেখে। সে রাধাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি, হঠাৎ এই সন্ধ্যাবেলায় মেঘ মাথায় ক'রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি?"

—"ঐ ওদের বাড়ী।"

—"তাস খেলতে বুঝি।"

—"হ্যাঁ।"

আশু মৃদু হেসে চলে গেল। রাধা মুখ তুলে তার গমন পথের দিকে একবার তাকিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলে। মা দাওয়ার উপরে কঠিন মুখে বসে ছিলেন। রাধা তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "এই সন্ধ্যে পর্যন্ত পাড়া বেড়িয়ে এলে ত? কোথা যাওয়া হয়েছিল?"

রাধা জবাব দিলে, "বীণা জোর করে ধরে নিয়ে গেল, কিছুতেই শুনলে না।"

—"কেন?"

—"ওদের জামাই এসেছে, তাই তাস খেলবার জন্যে।"

—"আজ নয়ত ওদের জামাই এসেছে, কিন্তু রোজ দিনই ত যাস দেখি, আর কখন গিয়েছিস হুঁস আছে? ভাত খেয়ে বারটার সময় বেরিয়েছিস আর ফিরলি রাত লাগিয়ে।"

রাধা অপরাধীর মত জবাব দিলে, "কিছুতেই ছাড়লে না যে।"

—"কেউ তোমাকে কিছুতেই ত ছাড়ে না, আজ বীণার বর ছাড়লে না, কাল আশু শুঁড়ি ছাড়ে নাই। ছাড়বে কেন, রূপ আছে যে।"

এই অত্যন্ত অশিষ্ট ইঙ্গিতটা রাধাকে চাবুকের ঘায়ের মত আঘাত করল। সে বিস্মিত হয়ে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মায়ের বড় মেয়ে সে, কী ভালই মা তাকে বাসত। সেই মায়ের মুখে এমনি ধরনের তিক্ত কঠোর কথা শুনে তার সমস্ত অনুভূতিগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। মা এবং বেতাল আশু সাহাকে নিয়ে ইঙ্গিত করে তাকে অপমান করেছে। কিন্তু আজকের আক্রমণ তার সমস্ত হৃদয়টা অপমানের জ্বালায় জর্জরিত করে দিলে। অন্তরটা তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলে জ্বলে উঠল। সে মা'র মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "মা, তুমি আমাকে এত বড় কথাটা বলতে পারলে?"

"কিছু জান না একেবারে? বিকেলে গা ধুতে যাওয়া হ'ল না, বাড়ীর কাজকর্ম নাই, পরপুরুষের সঙ্গে তাস খেললেই চলবে, না? যাও, তাই খেল গে, কে তোমাকে খেতে দেয় দেখি।"

—"কাজের কি বিরাম আছে, আমি দিনরাতই ত কাজ করছি, আমি সারাক্ষণ আর পারব না।"

—"তা হলে খাস না, পিণ্ডি না গিললেই কেউ আর কিছু বলবে না।"

—"না, পিণ্ডি তোমাদের আমি কিছু না করে গিলব না মা, সে ভয় নাই।"

সহসা অত্যন্ত বিষাক্ত কণ্ঠে মা বললেন, "খুব হয়েছে, এইবার যাও, রাত তিন পহরে রাণীদীঘির ঘাটে ঢলামি করে এস গে। ছি-ছি-ছি, বামুনের ঘরের বিধবা সমথ মেয়ে, সে না কি এমনি হয়?"

—"কেন, কি হয়েছে কি?" রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠল রাধা।

—"কি হয়েছে? যাও রাণীদীঘির ঘাটে গিয়ে সুখ্যাতি শুনে এস গে, গাঁখানাসুদ্ধ লোক তোমাকে নিয়ে কি কথা বলে বেড়াচ্ছে, শোন গিয়ে।" একটু থেমে বললেন, "তুই কবে রাণীদীঘির ঘাটে দাঁড়িয়ে আশু সাহার সঙ্গে হেসে কথা বলেছিস?"

রাধা নিরুত্তর হয়ে রইল।

—"কি, জবাব দে।"

—"আমি জানি না।"

—"জানিস না? অঃ, লোকে তা হলে মিথ্যে বলে না

ত? আজ ঘাটে গা ধুতে গিয়ে যে যা পারলে আমাকে তাই শুনিয়ে দিলে, তোর জন্যে যে আমাদের মুখ দেখান ভার হ'ল, রাধি?"

রাধা বলে উঠল, "কি আমি করেছি যে, তোমাদের মুখ দেখান ভার হ'ল, তাও ত বুঝি না। কোনদিন আমি কোন কথা তোমাকে বলি না মা, আর নিত্যি তোমরা আমাকে যা-তা বল, আমি কি করেছি তা-ই বল?" অশ্রুভারে তার কণ্ঠ বুজে এল। কিন্তু তাতে মা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে, তেমনি ভাবে বসে থেকেই বিরক্ত হয়ে বললেন, "আর কচি খুকীর মত কাঁদতে হবে না। কিছু জান না ত, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জান না। তখন পই পই করে বললাম, রাধি, সাবধানে চল্, সাবধানে চল্। তা আমার কথা অগ্রাহ্য করা হ'ল, এবার দাও, গাঁয়ের লোকের মুখ চাপা দাও। ছি-ছি-ছি, আমি কি করব গো।"

মা যেন রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে পড়লেন, বললেন, "আমি বলছি রাধি তোর শতেক খোয়ার হবে, তোর দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে। এখন অঙ্গে রূপ আছে তাই লোকে এত ভালবাসতে আসে, রূপ-যৌবন চের-কাল থাকবে না, তখন কি করবি? তখন যে ভিক্ষে করতে হবে।"

রাধা বললে, "মা তুমি আমাকে অমন করে শাপ আর দিও না। কপালে যা আছে তা ত হবেই।"

—"না, অভিশাপ দেব কেন? বিধবা মেয়ে, তোর কিছু হলে কি করে আমরা সমাজে বাস করব, গাঁয়ের লোক তখন যে গায়ে থুতু দেবে।"

রাধা কোন কথা না বলে ধীর পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মা মুখ রাঙা করে বলেই চললেন, "ঘাটে আজ কম কথাটা আমাকে শুনতে হ'ল, মুখুয্যেদের গিন্নী বললে, 'বেতালের মা, শুনলাম তোমাদের রাধা নাকি আশু হাহার ভালবাসাতে পড়েছে, আশু বুঝি তোমাদের বাড়ী গিয়ে কাপড়-গয়না সব দিয়ে আসে?' আমি বললাম, 'না মা, না।' তা কে আমার কথা শোনে, বললে, 'না বললে হবে কেন মা, আমরা ত জানি ওর সঙ্গে তোমাদের যা দরম্-মরম্।'"

একটু থেমে তিনি অত্যন্ত করুণ ও ভীত কণ্ঠে অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, "আমি কি করব গো, কি করব, পোড়ামুখী এমনি করেই সবার মুখে, বংশের মুখে কালি দিতে হয়?"

ঠিক এমনি সময় বেতাল টলতে টলতে উঠানে এসে গিয়েছে। সেই আলোতে বেতালের মূর্তি দেখে মা শিউরে উঠলেন। বেতাল অত্যন্ত কর্কশ ভাবে গর্জে উঠল, "রাধি কোথায়?"

ঘরের ভিতরে পদ্মার সামনে অত্যন্ত ম্লান মুখে বসে বসে রাধা কাঁদছিল। বেতালের কর্কশ কণ্ঠস্বরে সে চমকে উঠল। এবং হঠাৎ ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। মুখটা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আবার ও শুনতে পেলে বেতাল বলছে, "কি রে, কথা শুনতে পাস না, চেঁচিয়ে মরছি।" রাধা মৃতের মত স্থির হয়ে বসেই রইল। বেতাল স্খলিত সশব্দ পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে ঢুকল এবং রাধার চুলের মুঠিটা বাঁ হাতে ধরে তাকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। তীব্রভাবে সজোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, "কি, শুনতে পাস না, কানের মাথা খেয়েছিস?" বেতাল টানতে টানতে তাকে রান্না-ঘরের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে চেলাকাঠ ছিল, তাই একটা হাতে তুলে নিয়ে রাধাকে মারতে আরম্ভ করলে। রাধা কাঁদলে না, প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে রাখল, কেবল দাঁত দিয়ে দারুণ জোরে সে তার অধর চেপে ধরে রাখল। মা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। পদ্মাটা কেবল কেঁদে ফেললে—

"মা, দিদিকে মেরে ফেলবে।"

বেতালের যেন কোন জ্ঞান ছিল না। কাঠটা দিয়ে নির্মম ভাবে তাকে মারতে লাগল। রাধার সর্বাঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল। সে উঠানে মাটিতে পড়ে গেল। চুলের মুঠিটা ধরে ভীষণ ভাবে একটা ঝাঁকি দিয়ে বেতাল তাকে মেরেই চলল।

বৃষ্টি আসতে দেরি ছিল না, সহসা বড় বড় ফোঁটায় ভীষণ বৃষ্টি এসে গেল। রাধা উঠানের কাদাতে মাখামাখি হয়ে গেল। কিন্তু বেতাল থামলে না, সে অশ্লীল গাল উচ্চারণ করে বলেই চলল, "হারামজাদী, তোর্ লজ্জা করে না? কেন তোর নামে লোকে আমাকে যা তা বলে?"

ননীতাল ছুটতে ছুটতে বাড়ীতে ঢুকল। ব্যাপারটা দেখে প্রথমে কিছু ঠাওর করতে পারলে না, তার পর ছুটে গিয়ে বেতালকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে, বেতালের চুলের মুঠিটা ধ'রে তাকে টানতে টানতে বাড়ীর বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে। এতক্ষণে রাধা মর্মান্তিক চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সে কান্না শুনলে দেহের তন্ত্রী ঝন্ ঝন্ ক'রে অসীম যন্ত্রণায় কেঁপে উঠবে।

মৌসুমী বাতাসের সঙ্গে এসে রাধাকে অসীম করুণায় অভিষিক্ত করে দিলে। সে কাঁদতেই লাগল কাদাতে মাখামাখি হয়ে। মা আর ননীতাল তাকে ধরে ধরে তুলে ঘরে নিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে বৃষ্টি এবং ঝড়ের বিরাম ছিল না, সমস্ত রাত্রি বিদ্যুৎ চমকে আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বার বার ঝলসিত হয়ে গেল। এবং ভীষণ মেঘ-গর্জনে কালো রাত্রির রূপ আরও ভয়ঙ্কর করে দিলে।

রাধা তার বিছানাতে শুয়ে ছিল। মধ্য-রাত্রি, ওপাশে তার মা ও বোন ঘুমুচ্ছে। অনেকক্ষণ তারা জেগে ছিল, কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, রাধার গা আর মুখ যন্ত্রণায় জলে যাচ্ছিল। কাঠের খোঁচাতে অনেক জায়গা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। সে আবার কেঁদে ফেললে। মনে হ'ল, কি হবে এমনি করে থেকে? দিনের পর দিন উপবাস, আধপেটা খাওয়া, তার উপরে বেতালের জঘন্য কথা। আজ তাকে এমনি নির্মম ভাবে সে মেরেছে। মায়ের অকরুণ, কঠিন মুখটাও তার মনে পড়ে গেল। ঘৃণায় বেদনায় ও কি একটা ভীষণ জ্বালাতে তার অন্তঃকরণটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মনে হ'ল, সংসারে কেউ ত তাকে ভালবাসে না। কেন সে বাঁচবে? সে আত্মহত্যা করবে। সহসা আশু সাহার সে দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল, কি করুণ তার মিনতি। ও লোকটা ত তাকে ভালবাসে। কি হবে তুচ্ছ জাত-অভিমানে। এই ত বামুন জাতের ছেলেকে সে দেখলে, আশু তাদের চেয়ে ত হীন নয়। তার এত বড় ভালবাসার সে কোন মূল্যই দেবে না? যে তাকে ভালবাসে সে তারই কাছে যাবে। সে সেখানে স্থান পাবে। এত অপমান তাকে সইতে হবে না। তার বুকের ভিতরটা অশেষ, অব্যক্ত যন্ত্রণায়, বেদনা, ঘৃণা, লজ্জা ও অপমানে বার বার রুদ্ধ হয়ে গেল। সে নিশ্বাস নিতেও যেন পারছে না, মনে হচ্ছে ডাক ছেড়ে কাঁদে, নিজের টুঁটি টিপে নিজেকে হত্যা করে ফেলে।

দরজা খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল রাধা, দরজাটা দিয়ে দিলে, হঠাৎ কড় কড় শব্দ করে ভীষণ ঝড়ের মুখে উঠানের জাম গাছটা পড়ে গেল। বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টির যেন শেষ হবে না। শানানো তীরের মত বৃষ্টির কণাগুলো! শাঁ শাঁ বাতাসের গর্জন। এবং বার বার বিদ্যুৎ-চমকে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রাধা কোনও কিছু লক্ষ্য করলে না, ছুটে উঠানে নেমে গেল। সদর দরজা খুলে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ নির্জন পল্লীপথে ছুটতে লাগল এবং মিনিট কুড়ি পরে আশু সাহার বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কিছুমাত্র চিন্তা না করেই ধাক্কা দিতে লাগল, তার কথা বলবার সামর্থ্য ছিল না, কেবল পাগলের মত ধাক্কা দিয়েই চলল। দরজা খুলে গেল। গেঞ্জি গায়ে উৎকণ্ঠিত আশু সাহা বার হয়ে এল এবং বিদ্যুৎ-চমকে রাধাকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। বললে, "কে, রাধা? এখন, এই বেশে? কি হয়েছে?"

—"না, কিছু না।"

—"ভিতরে এস।"

রাধা ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

—"দাঁড়াও, আলো জ্বালি।" আলোতে আশু সাহা দেখতে পেলে রাধার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সুদীর্ঘ পর্যাপ্ত চুলের গোছা থেকে, কাপড় থেকে জল ঝরে ঝরে মেঝে ভিজে গেছে। সে শীতে থর থর করে কাঁপছে। রাধার গালে ও কপালে কয়েকটা লাল লাল রেখা দেখে সে চমকে উঠল, "এ কিসের দাগ? বেতাল মেরেছে?"

—"হ্যাঁ, তুমি এখুনি আসানসোলে যাবার ব্যবস্থা কর, আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

—"সে কি?"

—"হ্যাঁ, আমি যাব।"

—"এই বৃষ্টি, দুর্যোগ, গাড়ী চাই, স্টেশন কাছে নয়।"

—"তা হোক, তুমি যেমন করে হোক ব্যবস্থা কর।" চীৎকার করে উঠল রাধা।

১০

স্থানটা আসানসোল থেকে দূরে। গোটা দুই কলিয়ারী আছে। সেখানকার কর্মচারা এবং মজুরদের প্রয়োজনে আশু সাহার আবগারী দোকান। প্রচুর বিক্রি। এ অঞ্চলের বিখ্যাত দোকান। একটা ছোট শহর, দূরে-অদূরে ছোট বড় সব পাহাড়, এবং অত্যন্ত নিকটে একটা ছোট নদী প্রবাহিত। তারই ওপার হতে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত শাল গাছের জঙ্গল। দুর্গাপুর অরণ্যের বিস্তৃতি।

আশু সাহার বাড়ীটা একেবারে শহরের শেষে। সেখান থেকে পাহাড়, নদী, বন দেখা যায়। সামনে কোন অবরোধ নেই।

আজ দেড় মাস হ'ল রাধা এখানে এসেছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনে সে গ্রাম ছেড়ে আশুর সঙ্গে চলে এসেছে। আজ শ্রাবণের মাঝামাঝি। এখানে এসে থেকে রাধা এবং আশু দু'জনে দোতলার দু'টি ভিন্ন ঘরে রাত্রিযাপন করে। আশু রাধাকে কোন প্রকারেই কষ্ট দেবার চেষ্টা মাত্র করে নি। যাতে রাধার মনের বেদনার

ও ভারটা অপসারিত করা যায় সে জন্যে তার চেষ্টার সীমা নেই। কোন কারণে রাধা যদি পীড়িত বোধ করে, এই ভেবে সে রাধার সঙ্গে এতদিন ভালভাবে কথা বলতেও সাহসী হয় নি। আষাঢের প্রথম দিনের সেই দুর্যোগের পর এতদিনেও অত ভীষণ বৃষ্টি আর হয় নি। এবার কে ত বৃষ্টির বিশেষ কোন লক্ষণই নেই। বিকেলে ও সন্ধ্যার দিকে অল্পমাত্র বৃষ্টি হয়, আঁধি হয়। শ্রাবণের মধ্যদিনে আজ হঠাৎ বিকালের দিকে আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, এবং মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-ঝলকে সামনে পাহাড়ী শোভা, শাল অরণ্য, নদীজল আলোকিত হয়ে উঠছিল। রাধার রাত্রে ঘুম আসে না। অন্যদিন একাকী নির্জন ঘরে নীরবে শয্যাতে পড়ে পড়ে কাঁদে। আজ জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গভীর রাত্রি, প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক সেই রাত্রির মত। সামনের অরণ্য বিদ্যুৎ-চমকে বারংবার দেখা যাচ্ছে। জলে-ভেজা গাছগুলো প্রবল বাতাসে দুলছে, বিদ্যুৎ-আলোতে তাদের আশ্চর্য উদ্দাম এবং ভীষণ মনে হচ্ছে। রাধার চোখের সামনে সহসা তার গ্রাম, তার অতীত জীবনের নানা কথা ও ছবি ভেসে উঠল। আজকের এই ভীষণ রাত্রিতে স্বামী রামকৃষ্ণের কথা মনে হ'ল। তার কথা মনে হতে মনে মনে সে তাকে প্রণাম জানালে। বললে, "আমাকে তুমি বাঁচাও।" তার চোখ দিয়ে জল এল। তার মনে পড়ল, মা'র কথা, ননীতালের কথা, পদ্মার কথা। পদ্মার কচি মুখটা মনে পড়ল। সে মুখের পরে ঘৃণার প্রকাশ এতদূর থেকেও সে যেন স্পষ্টই দেখতে পেল। বেতালের উপরেও যেন তার কোন অভিযোগ রইল না, বরং কেমন একটা করুণা এবং মায়া হ'ল। সহসা গ্রামের কত কথাই মনে হ'ল। সে দেখতে পেলে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশী, গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ তার কথা নিয়ে আলোচনা করছে। লোকে পথে-ঘাটে ছিঃ ছিঃ করে মুখ বিকৃত করছে, মা'র বুকেই শুধু শেল বিঁধছে। সে ফিরে যেতে চাইল তার বাড়ীতে, তার শ্রী-গৃহের নিভৃত কোণটিতে। তার মনে হ'ল, সে বাড়ীতেই আছে, যেন স্বপ্ন দেখেছে এতদিন। কিন্তু কোন উপায় নেই, একবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে কুলটার দলে সে পড়ে গেল। কোন দিনই তার ও সমাজে আর স্থান হবে না। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে মেঘগর্জন হ'ল, কোথায় বাজ পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে রাধা সহসা হু হু করে কেঁদে উঠল। সে জানালার কাছে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। আলুলায়িত অযত্ন-রুক্ষ চুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বুক চাপড়িয়ে অস্পষ্ট করুণ বিলাপ করে রাধা কাঁদতেই লাগল।

সে কান্না, সে বিলাপের হাহাকার বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে অন্ধকার রাত্রির হাওয়াতে মিলিয়ে গেল। রাধা অসীম উন্মাদনায় বুকের বসন ছিঁড়ে ফেললে। বাইরে থেকে ছাট এসে তার চুল, তার দেহের অর্দ্ধাংশ অভিসিক্ত করে দিলে। শীতে তার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ রইল না। বাইরে মত্ত প্রকৃতির সীমাহীন পাগলামির বিরাম রইল না এবং তার বিরামহীন বুকফাটা চীৎকার রাত্রির অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়ে দুরান্তরে ঐ মেঘ ও পর্বতপুঞ্জের কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ রাধা সচেতন হয়ে উঠল। শুনতে পেলে রুদ্ধ দরজার উপর বাইরে থেকে কে বারংবার ধাক্কা দিচ্ছে।

—"রাধা, রাধা, দরজা খোল।"

—"রাধা, রাধা, আমি আশু। শোন, দরজাটা খোল।" তার কণ্ঠস্বরে উন্মত্তের উচ্ছৃঙ্খলতা।

—"না, তুমি যাও, আমি দরজা খুলব না।"

—"একবার খোল, কেন কাঁদছ তুমি, কেন জেগে আছ? খোল একবার।"

বিরামহীন ভাবে ডাকাডাকি চলতেই লাগল; কণ্ঠস্বর বেদনা, উন্মাদনা এবং উত্তেজনায় কাঁপছে।

সে রাত্রে রাধাকে দরজা খুলতে হয়েছিল।

# সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

ডাঃ ভগবানদাসের পরিণত-বয়সের পলাতকী সার্থকতা-বিলাস দেববাণীকে হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দিল যে, ভারতবর্ষে এই স্বল্প দিনের অবস্থানে বার বার সে পুরাতন গৌরবে নিরুপদ্রব বিশ্রামের ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা দেখতে পেয়েছে। অথচ বিদেশে অতীত গৌরবের দোহাই বড় একটা কানে বাজে নি। মার্কিন জাতটা আধুনিক, তার স্বকীয় অতীত নেই, সুতরাং পুরাকালের ছায়া পড়ে নি তার মানসে। কিন্তু ইংরেজ, ফরাসীর অতীত আছে, রাজনৈতিক নেতারা মাঝে-মধ্যে অতীত-গৌরবের গুণগান করেও থাকেন; সাধারণ মানুষ, তা হলেও, ক্বচিৎ কখনও অতীতকে স্মরণ করে। ভারতবর্ষে একেবারে অন্য ব্যাপার। এখানে সর্বদা, প্রতিদিন, বহু কণ্ঠে অতীত কালের জয়গান, যে-অতীত রোজ মরছে, দিনের পর দিন আরও বেশি অতীত হচ্ছে। স্বল্পচিহ্ন অতীতের দিকে এই সংঘবদ্ধ পিছু-টান দেববাণীকে বিস্মিত করে। এর একটা কারণ হয়ত বর্তমানের দারিদ্র্য; কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ সংগ্রাম-বিমুখ ভাববিলাস। রাজনৈতিক নেতারা প্রতিদিন অতীত, প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদীমূলে ফুলচন্দন দিয়ে তাঁদের অফুরন্ত বক্তৃতা সুরু করেন; তাঁদের দেখাদেখি বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত অতীতের অন্ধকার পক্ষপুটে আশ্রয় খোঁজেন। এককালে ভারতবর্ষের সুমহান্ সভ্যতার কাছে পৃথিবী মাথা হেঁট করেছিল কি না দেববাণীর জানা নেই, করে থাকলেও সে পৃথিবী আজ প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের বিষয়; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ যে-পরিমাণ অতীত-বিলাসী তাতে দেববাণী খুশী হতে পারে না। অতীতের এই দুরপনেয় প্রভাবের জন্যেই, দেববাণীর মনে হয়, স্বল্প সার্থকতায় ভারতবাসী এত সন্তুষ্ট। জীবন-নদীতে ভাসতে ভাসতে কোনও একটা আশ্রয় জুটে গেলেই হ'ল, তার পর আবার নদী-পাড়ির প্রশ্ন উঠবে কেন? একবার ভাগ্যলক্ষ্মী সাফল্যের মালা পরিয়ে দিলেই সংগ্রামের পথ সমাপ্ত। জীবন যে অফুরন্ত সংগ্রামের চিরন্তন আহ্বান, প্রত্যেক বন্দরে যে অন্য বন্দরের অনুপেক্ষনীয় টান, স্বাধীন ভারতবর্ষে তার প্রমাণ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গ ডাঃ ভগবানদাসের বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেববাণীর মন জুড়ে ছিল; মধ্যাহ্ন আহারের অনুকূল সমাবেশে তার আলোচনা আরও জোরালো হয়ে উঠল।

দেববাণীকে মধ্যাহ্ন আহারের নেমন্তন্ন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিভাগের অধ্যাপক সমীর ঘোষ। কনট প্লেসের একটি মাঝারি অভিজাত রেস্তোরাঁয় উপস্থিত হয়ে দেববাণী দেখতে পেল সমীর ঘোষ আরও চারজনকে ডেকে এনেছেন। এঁরা সকলে কমবয়সী অধ্যাপক। সমীর ঘোষ তাঁদের সঙ্গে দেববাণীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শশধর চট্টোপাধ্যায় অর্থনীতি পড়ান দিল্লী স্কুল অব ইকনমিক্স্-এ; সন্তোষ ভাটিয়া ইংরেজী পড়ান সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজে; মহীতোষ দত্ত বাংলা পড়ান মিরান্দা হাউসে; আর শিবশংকর ত্রিপাঠি রাজনীতির অধ্যাপক দিল্লী কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার সময় সমীর ঘোষের সঙ্গে দেববাণীর আলাপ হয়েছিল; পরেও দু' তিনবার দেখা হয়েছে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়েরই কৃতী ছাত্র, বর্তমানে স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা যাবার চেষ্টায় আছে, দেববাণীর কাছে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছে। শশধর চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন য়ুনিভারসিটির ডক্টর, লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় প্রশস্ত টাক, দেখলে মনে হয় বয়স পঁয়তাল্লিশ, আসলে আটত্রিশ। সন্তোষ ভাটিয়া কেবল ইংরেজী সাহিত্য পড়ায় না, ইংরেজীতে কবিতা লেখে, তার একখানি কাব্যগ্রন্থ ম্যাকমিলন কোম্পানী প্রকাশ করেছে। চেহারাও কবি-সুলভ, মাথায় একরাশি অশাসিত চুল, বড় বড় চোখে আকাশচারী কল্পনা। শিবশংকর ত্রিপাঠি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, স্থূল দেহ, গোলগাল মুখখানা থমথমে গম্ভীর। মহীতোষ দত্ত, বলা বাহুল্য, কলকাতার মানুষ, মুখের আদলে কোমলতা, একটু লাজুক-লাজুক স্বভাব।

এঁদের সঙ্গে আহারে বসে দেববাণীর ভাল লাগল। পরিচয়ের পর্ব শেষ হলে মনে মনে সে বলল, আমার দেশের এই বুদ্ধিজীবীদের আমি কতটুকু জানি? কলকাতায় আমার অধ্যাপক-জীবন এত সংক্ষিপ্ত যে, এঁদের মত বন্ধুবান্ধব নেই বললেই চলে। দিল্লী এসে এ পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গে সময় কেটে গেল তাঁরা অন্য জাতের

…ুষ। এঁরা আমার জাতের। এঁদের সঙ্গে আমার …দ্ধি ও হৃদয়ের যোগাযোগ। ভারতবর্ষকে জানবার …রা হলেন প্রশস্ত পথ। দেববাণীর মনে অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে উজিয়ে উঠল।—আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে …ঠছি, একটু লজ্জা পেয়ে নিজেকে সুস্থির করল দেববাণী।

সমীর ঘোষ বলল, "আপনার রিসার্চ সেন্টারের প্ল্যান কতদূর এগোল?"

"কিছুটা এগিয়ে আর এগচ্ছে না," দেববাণী উত্তর দিল। "সরকারী কাজে বড় সময় লাগে দেখতে পাচ্ছি।"

"পার্কিনসন সাহেবের ব্যুরোক্রেসী-নীতি যদি কোনও দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে সে হচ্ছে স্বাধীন ভারতবর্ষ," শিবশংকর ত্রিপাঠি মন্তব্য করল।

"পার্কিনসন্‌স্ ল কথাটা আমি শুধু শুনেছি। আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই," বলল দেববাণী।

"ব্যাপারটা খুব সহজ।" ত্রিপাঠি গলা পরিষ্কার করে বলল। "ব্যুরোক্রেসীর স্বভাব হ'ল নিজেকে বিস্তার করা। কাজ না থাকলে কাজ বাড়িয়ে নেওয়া। ব্যুরোক্রেসীর আসল কাজ যত কম, সে তত অপ্রয়োজনীয় কাজ বাড়িয়ে নেয়।"

"পার্কিনসন্‌স্ ল বর্তমান যুগের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়," যোগ দিল শশধর চট্টোপাধ্যায়। "বিদ্রূপের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার চলে, বুঝে দেখতে সাহায্য করে না।"

"তা ছাড়া," মহীতোষ দত্ত বলল, "আমাদের দেশে সরকারের কাজ বা অকাজ, যত বাড়ে তত ভাল। তাতে বেশি লোকের চাকরি হয়।"

"তা বটে," সায় দিল সন্তোষ ভাটিয়া। "প্রতি পাঁচ বছরে যত মানুষ চাকরি পায় তার বেশির ভাগই সতত-প্রসারমান সরকারী অপকার্য-ক্ষেত্রে।"

"যাই বলুন আপনারা," সমীর ঘোষ বলল, "আমার এ বিষয়ে নিজস্ব একটা মত আছে। গণতন্ত্র গজেন্দ্রগতি। তাতে মোটামুটি প্রজার ভাল বই খারাপ হয় না। গবর্ণমেণ্ট হ'ল দেশের সম্মিলিত ক্ষমতার কেন্দ্র। গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট অসংখ্য নিয়ম-কানুন বিধি-বিধানের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় নিজের পায়ে পরিয়ে রাখে। তাতে তার মঙ্গল করার ক্ষমতা যেমন স্তিমিত হয়, অমঙ্গল করার শক্তিও তেমনি ব্যাহত থাকে। চট করে আপনাকে সে সুখী করতে পারে না, সামান্য দাক্ষিণ্যের জন্যে তার দ্বারে হানা দিয়ে আপনার জুতার সোল ক্ষয়ে যায়; তেমনি চট করে আপনার গভীর অমঙ্গলও সে করতে পারে না।"

খাবার এসে গিয়েছিল। আলুভাজা ও মটর সেদ্ধর সঙ্গে মাছভাজা খেতে খেতে সন্তোষ ভাটিয়া উত্তর দিল, "যত সম্ভব কম শাসনের যুগে আপনার থিয়োরীটা খেটে যেত। কিন্তু এ হচ্ছে যত সম্ভব বেশি শাসনের যুগ। সরকার এ যুগে বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আমাদের চলবার জো নেই। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তার খবরদারী সুরু, ম'রে তবে সে খবরদারী থেকে রেহাই। এ অবস্থায় তার গজেন্দ্রগতি আমাদের সবাইকে ধীর-মন্থর অথবা একেবারে স্থবির-স্থাণু করে রেখেছে।"

দেববাণী মজা পেয়ে বলল, "মিঃ ভাটিয়া ঠিক বলেছেন। ভারতবর্ষকে আপনারা বড় বেশি সরকারী-নির্ভর করে রেখেছেন। গবর্ণমেণ্টের হাত ধরে হাঁটতে শেখার বিপদ্ আছে; হাত খসে গেলে আছাড় খাবার ভয়ে পা আর চলতে চায় না।"

সমীর ঘোষ বলল, "তা ছাড়া উপায় কি, বলুন! ভারতবর্ষকে হাঁটতে শেখাবার পেশাদার অভিভাবকের অভাব ছিল না। তাঁরা সবাই বললেন, বাছা, তুমি দুর্বল, বেশি শ্রম ক'রো না, ভেঙে পড়বে। চাষ-বাস কর, তোমার এতকালের পুরাণো কৃষি, আমরা না হয় তোমাকে কিছু রাসায়নিক সার এনে দেব। স্কুল-কলেজ খোল—সবার আগে গ্রামে স্কুল বসাও, অজ্ঞানতা দূর কর। রোজকার ব্যবহারের জিনিষপত্রও চাও ত কিছু বানাও, তাতে তোমাদের মেয়েরা খুশী হবেন। কিন্তু বড় বড় শিল্প-কারখানায় হাত দিও না, অত মেহনত তোমার সইবে না। আমরা দশজন আছি, তোমার সব চাহিদা মেটাতে পারব। তা ছাড়া অমন প্রাচীন তোমার সভ্যতা, তাকে আধুনিক কলকারখানা বসিয়ে নষ্ট করলে পৃথিবীর সমূহ ক্ষতি হবে।"

সমীর ঘোষের বলার ভঙ্গিতে সকলে হেসে উঠল।

সে বলে চলল, "দেশে যাঁরা খবরদারী করতে চেয়েছিলেন তাঁরা সায় দিয়ে বললেন, লড়াই-এর আমলে যা দু'পয়সা করেছিলাম তা এখনও আছে। ছোট-খাট কারখানা ত আমরাই তৈরী করতে পারব। বিদেশী মূলধন ডেকে আনব। বড় কিছু করতে হ'লে, এক-আধটু অংশ আমরা নিশ্চয় পাব। তাতেই গ'ড়ে উঠবে ভারতবর্ষের জাতীয়-বিজাতীয় মিশ্রিত শিল্প। তা ছাড়া আমাদের সাবেকী ব্যবসা 'ত সব রয়েইছে—ভেজাল ঘি আর মানুষের ক্ষুধা। এ অবস্থায়," সমীর ঘোষ এবার দেববাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এ অবস্থায় সরকার

এগিয়ে না এলে ভারতবর্ষের যেটুকু সমৃদ্ধি দেখছেন তাও তৈরী হ'ত না।"

দেববাণী বলল, "হয়ত ঠিক আমি এসব কম জানি। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার অমঙ্গলটাও ত আছে!"

শশধর চট্টোপাধ্যায় বলল, "আমরা আপাতত মঙ্গলটাই বেশি দেখছি। মজা কি জানেন? এদেশে যারা সরকারী প্রচেষ্টার সবচেয়ে তীব্র সমালোচক, উপকৃত হয়ে থাকে তারাই সবচেয়ে বেশি। সরকারী সাহায্য পেয়ে তাদের সমৃদ্ধি এত বেড়েছে যে তারা এখন রীতিমত একটা সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হ'তে পেরেছে। তারা যা উৎপাদন করে তাই বিক্রী হয়—মাল তাদের যত বাজে হোক না কেন। অথচ তারাই সর্বদা ঘরে-বাইরে সরকারী উদ্যোগের মুখরতম নিন্দুক হয়ে উঠেছে।"

দেববাণী বলল, "তাদের কথা ছাড়ুন। আমি যা জানতে চাই তা হচ্ছে আপনাদের কথা। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সরকারী উদ্যোগ কি মঙ্গলকর হয়েছে? আমরা কি বহু ভাবে সরকারী দাক্ষিণ্য পাবার জন্যে অতিরিক্ত লোভী হয়ে উঠি নি? তাতে আমাদের চরিত্রের অবনতি হচ্ছে না? আমাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও মতবাদের ওপর কি সরকারী প্রভাব বড় বেশি এসে যায় নি?"

সন্তোষ ভাটিয়া জবাব দিল, "দেখুন, ডাঃ রায়, ভারতবর্ষের মত দেশে বুদ্ধিজীবীদের মাথার চেয়ে পেটের দায় বেশি। সরকারী উদ্যোগে পেটের দায় কিছুটা মেটাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আমরা আপাতত বিচারবুদ্ধি ও মতবাদ স্থগিত রেখে পার্থিব জীবনটাকে একটু আস্বাদ করবার চেষ্টায় আছি।"

সমীর ঘোষ বলল, "আপনি মার্কিন মুলুকে বহুদিন কাটিয়েছেন, য়ুরোপও আপনারা অজানা নেই। ওসব দেশের মহল, রাজনীতি তাদের যাই হোক না কেন, শাসনতন্ত্র হোক না নানা রকমের, জীবনের আদিম কতগুলি সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলেছে। ক্ষুধায় কেউ মরে না, সর্বহারা কেউ আর নেই। সকলেই কাজকর্ম করে, বেকারেরা সরকারী সাহায্য পায়। অশিক্ষা আছে, নিরক্ষরতা নেই; মাথা পাতবার ঘরের অভাবে রাস্তায় কেউ রাত কাটায় না। ধনী-গরীবে তারতম্য নিশ্চয় আছে, আমেরিকায় য়ুরোপ থেকে অনেক বেশি; কিন্তু আমাদের দেশের মত এত দরিদ্র ও এমন ধনী বোধকরি আর কোথাও নেই। বুদ্ধিজীবীরা ওসব দেশে ভদ্র জীবনযাপনের উপযুক্ত রসদ থেকে বঞ্চিত হয় না; পড়াশোনার সুযোগ, রিসার্চের ব্যবস্থা, ভদ্রোচিত বেতন, সবকিছু তাদের বুদ্ধিকে পরিপুষ্ট করে। আমাদের দেশে অবস্থা একেবারে আলাদা। এখানে বুদ্ধিজীবীদের দাম নেই, তারা পদে পদে প্রবঞ্চিত। স্বাধীন হবার পরে স্বক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠা বাড়ে নি, কিন্তু যারা উদ্যোগী তাদের এরই মধ্যে কিছু একটু গুছিয়ে নেবার সুযোগ হয়েছে। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার নিশ্চয় অন্যায় নয়।"

"স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা বাড়ে নি কেন বলছেন?" দেববাণী প্রশ্ন করল। "অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, স্কুল-কলেজ বেড়েছে প্রচুর। উচ্চশিক্ষার সুযোগও কম বাড়ে নি। একমাত্র আমেরিকায়ই দু'হাজারের বেশি ভারতীয় ছাত্র পড়ছে।"

"প্রতিষ্ঠা বাড়ে নি মানে এই নয় যে, চাকরির ক্ষেত্র প্রসারিত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে নিশ্চয়—যদিও আমাদের দেশের চেয়ে ইংলণ্ডেও এখন বিশ্ববিদ্যালয় বেশি—অনেকের চাকরিও হচ্ছে আগেকার চেয়ে অনেক সহজে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার বা প্রফেসর হওয়া সম্ভব। মাইনে, মাগ্‌গিভাতাও কিছু নিশ্চয় বেড়েছে। কিন্তু এসব নিয়েও আমাদের প্রতিষ্ঠা হয় নি। আমরা এখনও সমাজের উপেক্ষিত হয়ে রয়েছি। রাজনীতি ঢুকেছে বিদ্যায়তনের আনাচে-কানাচে; মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ছাড়া আমাদের সামান্যতম অনুষ্ঠানও অচল; শিক্ষিত হিসাবে আমরা দুর্বল ও অকেজো, ছাত্রদের কাছে আমাদের সম্মান নেই, মূল্য নেই। অপর্যাপ্ত রোজগারের দৈন্য থেকে পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে আমরা সকাল-সন্ধ্যা ছাত্র পড়াই, সস্তা নোট লিখি, নয়ত সংবাদপত্রের দপ্তরে রচনা প্রকাশের জন্য ধর্ণা দি বা বেতারে প্রবন্ধ পড়বার উমেদারী করি। অবসর পেলে তাস খেলি, রাজা-উজির মারি, অথবা (সন্তোষ ভাটিয়ার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে) কবিতা লিখি।"

শশধর চট্টোপাধ্যায় বলল, "বুদ্ধিজীবীদের পতনের কথা আপনি যা বললেন তা কেবল ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সব দেশে দেখতে পাচ্ছি। এ যুগ বুদ্ধি পরম কুবুদ্ধির যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও আদর্শবাদ অনেকখানি বেঁচে ছিল। অনেক বুদ্ধিজীবী বিশ্বাস করত, আর বুঝি যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটবে না। রাশিয়ায় বিপ্লব হ'ল, তাতে হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী নেচে উঠেছিল। বার্ণার্ড শ, রোলাঁ, জিদ, আইনষ্টাইন, টাগোর, এদের কথা মানুষ কান পেতে শুনত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আদর্শবাদ ব'লে আর কিছু রইল না। মনে করে দেখুন, আজ পর্যন্ত সে-যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ঘটল না; গরম যুদ্ধ না থামতে শীতল যুদ্ধ সুরু হ'ল; মানুষের মনে আদর্শবাদ জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এ যুগ হ'ল পরমাণু

শক্তির চিরন্তন হুমকির যুগ। চোখ বুজলে পৃথিবীর যে ভয়াবহ চিত্র দেখতে পায় মানুষ, সে হচ্ছে আণবিক বোমায় পুড়ে-ছাড়খার মহাশ্মশানের ছবি। একজন বুদ্ধিজীবী আছেন আজকার পৃথিবীতে, যাঁর কথা মানুষ একটু থেমে শুনতে চায়? সন্তোষ ভাটিয়া মাপ করবেন, কবিতার বই বাংলা দেশের বাইরে আজকাল আর বিক্রী হয় কি না সন্দেহ। বিদেশে কবিতা পত্রগুলি একে একে উঠে যাচ্ছে। সাহিত্য নোবেল প্রাইজ পান হয় উইনষ্টন চার্চ্চিল, নয় এমন সব লেখক যাঁদের নাম কেউ শোনে নি, যাঁরা ভাল লেখক হ'লেও মহান্ লেখক নন। বৈজ্ঞানিকরা হয় পৃথিবী ধ্বংসের জন্য যে বিরাট্ আয়োজন হচ্ছে বিশ্ব-শান্তির নামে তাতে হাত লাগাচ্ছেন, নয়ত নিজেদের ছোট্ট ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে পরিতৃপ্ত জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। পৃথিবীর এই মরু-মধ্যাহ্নে বুদ্ধিজীবীর কোনও স্থান নেই।"

দেববাণী সন্তোষ ভাটিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি মিঃ চ্যাটার্জির অভিযোগ মানি না। কবি হিসাবে আপনি মানেন কি?"

"আগে আপনার উত্তরটা শুনি," বলল সন্তোষ ভাটিয়া।

"আমার উত্তর সহজ। আজকালকার আণবিক বিজ্ঞানকে মানুষের হঠাৎ-কিছু আবিষ্কার ব'লে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। পরমাণু-শক্তির সন্ধান বহুকাল ধ'রে চ'লে এসেছে। সে শক্তির সন্ধান দিয়ে বিজ্ঞান মানব-সভ্যতার অনন্ত বিকাশের পথ খুলে ধরেছে। এ শক্তির ব্যবহার ধ্বংসের জন্যে হবে না নির্মাণের জন্যে হবে তার দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের নয়। সে দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের। আমরা প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হলে রাজনৈতিক নেতাদের সাধ্যি নেই পৃথিবীকে ধ্বংস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলি। ওদেশের প্রত্যেক নাগরিক যদি দাবী করে আণবিক শক্তি পৃথিবীকে নতুন পথে গড়বে, ধ্বংস করবে না, তাহলে সরকারের সাধ্য কি অন্যপথে দেশকে চালিত করে? বিজ্ঞান চিরদিন মানুষের হাতে নতুন শক্তি এনে দিয়েছে। সে শক্তির ব্যবহার মাঙ্গলিক কি অমাঙ্গলিক তাও বলে দিয়েছে। যারা রাষ্ট্রের নামে সে শক্তিকে ব্যবহার করেছে যুদ্ধে, ধ্বংসে, তারা বৈজ্ঞানিক নয়। পরমাণু-শক্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত হলে তার ফল যে কি ভয়ানক হবে সে কথাও বৈজ্ঞানিকরা পরিষ্কার ক'রে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর বেশি তাঁদের আর কি করার আছে? তবু তাঁরা এর বেশিও করেছেন, করছেন। আমেরিকায় হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক একত্র হয়ে আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন গ'ড়ে তুলেছেন। য়ুরোপেও এমনি আন্দোলনে বহু বৈজ্ঞানিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বর্তমান কালের আদর্শহীনতার জন্যে বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া পলাতকী মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আসল কথা হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আজকাল আর আদর্শবাদ নেই। সমাজের নিকৃষ্ট মানুষরা সব রাজনীতি করতে আসছেন। তাঁদের বুদ্ধি কম, বিচার-শক্তি অপ্রচুর; চরিত্র দুর্বল। ছোট ছোট মানুষের হাতে অনেক বেশি শক্তি এসে পড়ছে, কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব। তাঁরা সামলাতে পারছেন না।"

সন্তোষ ভাটিয়া বলল, "আমি অনেক সময় ভাবি, ভারতবর্ষ যে আজ পেছিয়ে আছে, সে যে ইয়োরোপ-আমেরিকার মত এগিয়ে যায় নি, সে আমাদের সৌভাগ্য। পেছিয়ে আছি বলেই এগিয়ে যাব কি না ভেবে দেখবার সময় আমাদের এখনও আছে। আমি ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াই আর ভাবি এই যে, এখনও আমাদের দেশে আধুনিকতা সর্বগ্রাসী হয়ে জাঁকিয়ে বসে নি, তা বুঝি বিধাতার পরম আশীর্বাদ। এখনও আমাদের সময় আছে পূর্ণ চাঁদের মায়ায় নিঃশব্দে ভেসে যাবার; ভোরের রাত্রে তারার সঙ্গে কথা বলার। এখনও আমাদের জীবনে দুর্দমনীয় তাড়া আসে নি দিনরাত্রির প্রতিটি মহামূল্য মুহূর্তকে তথাকথিত কাজের চাপে গলা টিপে মারার। বিধাতার আশীর্বাদ, আমাদের মেয়েরা এখনও লাজুক, তারা নগ্নপ্রায় হয়ে সমুদ্রের তীরে রৌদ্রচর্চা করে না; ভালবাসা এখনও তাদের লজ্জারুণ করে, বুকের কথা এখনও তারা মুখে আনতে রক্তিম হয়। সৌভাগ্য আমাদের, প্রেম এখনও তাদের হৃদয় কাঁপায়; আরও সৌভাগ্য, তারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত পাল্লা দিয়ে চলে না। তাই আমাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায় না। ভগবানের আশীর্বাদ, সন্ধ্যায় তুলসীতলায় আমাদের বধূরা প্রদীপ জ্বালে; গৃহকোণে দেবতার কাছে মায়েরা সকল সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। আমরা এখনও আকাশ-ছোঁওয়া দালান তুলে সূর্যকে আড়াল করি নি; মোটর গাড়ীতে আমাদের দেশ এখনও ভ'রে যায় নি, আমাদের দেশের মানুষের পা এখনও মাটির স্পর্শ পায়; চাষী চলমান গরুর গাড়ীতে ব'সে মেঠো সুরে গান ধরে। অন্ধের মত এগিয়ে গিয়ে ওরা সভ্যতার ভারে দম আটকে মারা যাচ্ছে; আমাদের অনগ্রসরতার মধ্যে সুযোগ রয়েছে দেখেশুনে পা ফেলবার। বৈজ্ঞানিক

সভ্যতার কতটুকু চাই বা না চাই, ভাববার সময় এখনও আমাদের রয়েছে।"

দেববাণী আকৃষ্ট হয়ে সন্তোষ ভাটিয়ার কথা শুনছিল। সে কি বলছে তার জন্যে যতটা নয়, ততটা তার বলার ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে। এবার সে বলল, "কিন্তু সত্যিই কি আমরা ভেবেচিন্তে পা ফেলছি? আমাদের সাধ্যমত পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ করছি না? আমাদের দশ বছরের স্বাধীনতায় মৌলিক সৃষ্টি কতটুকু? দেশ-গঠনে আমরা পশ্চিমের পথ অনুসরণ ক'রে বিজ্ঞান-বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করছি, কিন্তু তারও মধ্যে যতটুকু ভারতীয় রূপায়নের সুযোগ ছিল তাও ত আমরা ব্যবহার করি নি। অন্যসব বাদ দিয়ে, রোজ যা চোখে পড়ে সেই আমাদের গৃহনির্মাণ-শিল্পই ধরুন না কেন? দিল্লী শহর ত স্বাধীনতার পরে ধরতে গেলে নতুন ক'রে নির্মিত হচ্ছে! অথচ স্থাপত্যশিল্পের দিক্ থেকে এমন কুৎসিত, জগা-খিচুড়ি, ব্যক্তিত্ব-বর্জিত নকলনবীশ শহর পৃথিবীর কোথাও বোধ করি আপনার চোখে পড়বে না। আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সামান্য, কতটুকুই বা দেশের আমি জানি? তবু আমি যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে, স্বাধীন ভারতবর্ষ উর্ধ্বশ্বাসে যে-কোন রকমে পশ্চিমী সভ্যতার সস্তা, নিম্নস্তর সংস্করণ হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।"

শিবশঙ্কর ত্রিপাঠি এতক্ষণ কথা বলে নি। এবার বলল, "ভারতবর্ষ নিয়ে চট ক'রে কোনও সিদ্ধান্ত দিতে যাওয়া অন্ধের হস্তাদর্শন নয় কি? এত বড় দেশে এত বিভিন্ন মানুষের বাস, এমন বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও তার সমাজ, এত বিভিন্ন তাদের চিন্তাধারা, যে আমাদের বিচার সহজে ভ্রান্ত হতে পারে। বর্তমানে কেবলমাত্র একটা কথা খানিকটা জোর দিয়ে বলা যায়। পুরাতন প্রাচীন-স্থবির ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের আঘাতে সবেমাত্র নতুন ক'রে জাগতে সুরু করেছে। তার প্রাচীন অবরোধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। নতুন রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিমানপথ, শিল্প-কারখানা, সকল রকম গঠন-উদ্যোগে প্রকৃতির সুপ্রাচীন অবরোধ ভাঙ্গছে, ভারতবর্ষকে সর্বপ্রথম নিজের বিভিন্নতার সঙ্গে নতুন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। মুষ্টিমেয় ইংরেজী-জানা মধ্যবিত্তের বাইরে ভারতবাসী এখনও তার দেশকে চেনে না, জানে না; যেটুকু জানে তা কেবল প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের অবক্ষয়িত ভগ্নাবশেষ দিয়ে। আমাদের সমাজ এখনও প্রধানত উপজাতীয়; ব্যক্তিগত ভাবে আমরা এখনও কমবেশি আঞ্চলিক। পঞ্জাব-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ এখনও পুরোপুরি ভারতবর্ষ হয় নি। আজকের সংগঠন ও নির্মাণের যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় আদর্শবাদে প্রভাবিত এঁদের সংখ্যা ক্রমে কমে আসছে। এর পরে যাঁরা আসছেন তাঁরা আঞ্চলিক নেতা, তাঁদের দৃষ্টি এখনও সর্বভারতীয় নয়। আঞ্চলিকতার এই বর্ধমান প্রভাব আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হ'ত যদি-না বিজ্ঞান প্রতিদিন এর শিকড় না খেয়ে নিত। মজা হচ্ছে এইখানে। আঞ্চলিকতা নিয়ে আমরা সর্বভারতীয় মানস ও ব্যক্তিত্ব তৈরী করছি, প্রধান অস্ত্র আমাদের বিজ্ঞান। প্রত্যেকটি বড় শিল্প আমাদের আঞ্চলিকতাকে দুর্বল করছে, ভারতবর্ষের বিভিন্নতাকে খর্বিত করছে। তা ছাড়া রয়েছে বাইরেকার পৃথিবী। প্রতিদিন সে আমাদের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা সম্বন্ধে বার বার সতর্ক ক'রে দিচ্ছে। এখনও আমরা এমন স্তরে এসে পৌঁছই নি যেখানে আমাদের মৌলিক আত্মস্ফূর্তি সুরু হতে পারে। এখনও অনেক-দিন আমরা অনুকরণ করব, অনুসরণ করব; অন্যের বৈভব দেখে আমাদের হিংসে হবে, ক্ষুধার্ত মানুষের মত যা পাব তাই তুলে মুখে দেব। অনেক যুগ পর প্রথম বাঁচবার সুযোগ পেয়ে আমরা এখন লোভী, অসংযত, বেসামাল হয়ে পড়েছি। যে কোন উপায়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারলেই আপাততঃ আমরা পরিতৃপ্ত। একদিন এই লোভ আমাদের কাটবে।"

মহীতোষ দত্ত যোগ দিল, "এই যে জীবন গুছিয়ে নেওয়ার দেশব্যাপী জীবন-দর্শনের কথা অধ্যাপক ত্রিপাঠি আপনাকে বললেন, তার মধ্যে যদি কোথাও ফাঁক থাকে, তা বাংলা দেশ।"

দেববাণী উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল, "কেন? একথা কেন বলছেন?"

"ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ালে দেখতে পাবেন অধ্যাপক ত্রিপাঠির বক্তব্য মোটামুটি ঠিক। সকল প্রদেশের লোকেরা জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে চাইছে। শুধু আমরা বাদে। বাংলা দেশের ভারতবর্ষ থেকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নভাবের কথা আমি তুলছি না। তার ঐতিহাসিক কারণ আছে। আজকাল তা আবার কমেও আসছে। আমি বলছি বাঙালীর সংগ্রাম-বিমুখতার কথা। জীবনের নিত্য-নূতন সুযোগ আমাদের সামনে অন্যরা তুলে নিচ্ছে, কেবলমাত্র জান্তব বলিষ্ঠতার দাবীতে। পাঞ্জাবী যেভাবে স্বাধীন ভারতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার নজির ইতিহাসে খুব কম। সুদূর আন্দামানে, বিপদ্-সঙ্কুল নাগা পর্বতে, হিম-শীতল লাদকে জীবিকার জন্যে সে ছুটে গেছে; ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে দু'হাত ভ'রে বর

য়েছেন। আর আমরা বাংলার বাইরে পশ্চিম বাংলার চেয়েও বড় এক বাঙালী উপনিবেশ গ'ড়ে তোলবার এ রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়েও ঘরের বার হ'তে রাজী নই। এ মনোবৃত্তির সপক্ষে যতই যুক্তি থাকুক না কেন তার আসল কারণ আমাদের জীবন-তৃষ্ণার অভাব। আমাদের সাহিত্যে আমরা দারিদ্র্য, অক্ষমতা, ব্যর্থতা, পঙ্গু-জীবনের সব রকম দুর্বলতাকে রোমান্টিক রং লাগিয়ে ক্ষয়িষ্ণু মানুষের আত্ম-প্রতারণার অপূর্ব উপাদানে পরিণত করেছি। সাহিত্যের মাধ্যমে কল্পনাপ্রবণ ভাববিলাসী একটা জাতিকে কেমন ক'রে জীবন-যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করা যায়, আমরা বোধ করি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ কি বঙ্কিমচন্দ্রে, কি রবীন্দ্রনাথে, কি বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দে, আমাদের সাহিত্যিক-ঐতিহ্য জীবনের কাছে জয়লাভ করা, হেরে যাওয়া নয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে সুরু হ'ল দুর্ভিক্ষ, অনাচার, হাহাকার ও পতনের সাহিত্য—যাতে মানুষ কেবল মার খায়, উল্টে মারে না; কেবল হারে, কখনও জেতে না। দুর্ভিক্ষে যেমন আমরা নীরবে লক্ষ লক্ষ লোক কঙ্কালসার হয়ে রাস্তায় মরলাম, সাহিত্যেও তেমনি আমরা কেবল হারলাম, ভেঙ্গে পড়লাম। তার পর এল দাঙ্গা, এল দেশ-বিভাগ, লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা বেরিয়ে পড়ল নতুন জীবনের সন্ধানে। এসব বিরাট্ ঘটনা-সংঘাত থেকে মহান্ সাহিত্য বাংলা দেশে তৈরী হ'তে পারত। কিন্তু আমাদের লেখকরা গল্পের রসদ পেলেন রিফিউজি পরিবারের স্খলিত নীতিতে, হঠাৎ ধনীর নারীদেহ-লোভে; জীবনের ব্যাপক ক্ষয়িষ্ণুতায়। এ সাহিত্য পাঠ ক'রে বাঙালীর মন ভেঙ্গে গেল, জীবন তার কাছে নিষ্ঠুর-নির্মম প্রতারণা হয়ে উঠল, আমরা তা ভেবে দেখলাম না।"

সন্তোষ ভাটিয়া বলল, "সাহিত্যিকরা হঠাৎ এমন ডেকাডেণ্ট হয়ে গেলেন কেন? তারও নিশ্চয় কোনও সামাজিক কারণ আছে।"

"নিশ্চয় আছে," বলল মহীতোষ দত্ত। "কিন্তু বড় সাহিত্যিক সামাজিক কারণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না, তার ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়ান।"

দেববাণী বলল, "আপনি যে জীবন-জয়ী সাহিত্যের কথা বলছেন তা আজ পশ্চিমেও বিশেষ লেখা হচ্ছে না। অবশ্য সাহিত্য বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা ধৃষ্টতা।"

"লেখা হচ্ছে বৈ কি," মহীতোষ দত্ত বলল, "দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকের আদর্শবাদ এই পঞ্চম দশকে চলবে না, বলা বাহুল্য। কিন্তু পশ্চিমের কোনও বড় সাহিত্য জীবনের কাছে ক্লীব পরাজয় স্বীকার পায় নি, আজও পায় না। মানুষের ধর্ম হ'ল সে লড়বে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, অন্য মানুষের বিরুদ্ধে, নিজের বিরুদ্ধে। অল্পে সে তৃপ্ত হবে না। তার আরও চাই, যা আছে তা ছাড়া আরও অনেক কিছু। পশ্চিমের আর আমাদের অবস্থা এক নয়। ওরা জৈবিক সমস্যাগুলির প্রায় সমাধান ক'রে ফেলেছে। না খেয়ে মরে না, বেকার থাকে না, বিনা চিকিৎসায় প্রাণ যায় না, গৃহের অভাবে রাস্তায় রাত কাটায় না। ওদের সংগ্রাম এখন অন্য স্তরের। ওরা অস্তিত্ববাদ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে, রাষ্ট্রের রীতি-নীতি নিয়ে পরিহাস করতে পারে, আন্তর্জাতিক কূটনীতি নিয়ে উপন্যাস লিখতে পারে। ওরা স্থাপত্য-নীতি নিয়ে মতবিরোধকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্য রচনা করলে তাকেও সংগ্রামী সাহিত্য বলব। আমাদের জীবনের আসল সমস্যা এখনও জৈব। নুট হামসুন ওদের দেশে এখন জন্মাতে পারেন না, কিন্তু আমাদের দেশে পারেন। আমাদের দেশে এমিল জোলারও স্থান আছে, ওদের দেশে আর নেই। আমাদের সাহিত্যে যদি জীবনের শ্রেষ্ঠতা, বলিষ্ঠতা, অতৃপ্ত তৃষ্ণা ফুটে না ওঠে তাহলে সাহিত্যিকের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা ছাড়া আর কি বলা যায়?"

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেববাণী হাত-ঘড়ি দেখল, প্রায় তিনটে বাজে। এবার তাকে উঠতে হবে। সাড়ে তিনটেয় আর একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা।

কফির পাত্র শেষ ক'রে দেববাণী বলল, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমার অনেক লাভ হ'ল।"

সমীর ঘোষ বলল, "আশা করি আপনি দিল্লী ত্যাগ করার পর আরও দেখা হবে আমাদের।"

"নিশ্চয় হবে," দেববাণী সায় দিল। "আমার বাসায় আপনারা একদিন চা খেতে আসুন সবাই। আগামী সপ্তাহে একদিন আসুন। আমি ফোনে আপনার সঙ্গে ঠিক করব।"

ত্রিপাঠি বলল, "কিছুদিন আছেন ত আরও?"

"কি জানি?" দেববাণী উঠতে উঠতে জবাব দিল। "সব নির্ভর করছে গবর্ণমেণ্ট কি বলেন, তার ওপর।"

এবার দেববাণী কনট সার্কাস থেকে বার হয়ে পুরাতন শহরের পথ ধরল। ভিড়ের মধ্যে গাড়ীর গতি বাড়ান যায় না, অথচ হাতে সময় কম। দরিয়াগঞ্জ, রেড ফোর্ট, কাশ্মীরী গেট পার হয়ে সে যখন মেইডেন্স হোটেলে হাজির হ'ল তখন সাড়ে তিনটে বেজে আরও দশ মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

রিসেপশন কাউণ্টারে দেববাণী প্রশ্ন করল, "মিঃ তালুকদার আছেন?"

যে-কমবয়সী মেয়েটি ঠোঁটে রং মেখে, পুরুষের-মত-ছাঁটা-চুলের হালকা মাথা দুলিয়ে তার নাম জানতে চাইল, দেববাণী লক্ষ্য করল, তার পরনে আঁট-সাট পাঞ্জাবী কামিজ ও সালোয়ার, চোখ সুর্মায় কৃষ্ণায়িত, বড় বড় দুটি ভ্রূ পেন্সিলে অঙ্কিত।

টেলিফোন নামিয়ে মেয়েটি বলল, "তিনশ' বারো নম্বর স্যুইট। তিন তলা। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। লিফ্‌ট্‌ ঐ বাঁ দিকে।"

তিন তলায় উঠে তিনশ' বারো নম্বর স্যুইট খুঁজে পেতে দেরি লাগল না। দরজায় মৃদু আঘাত করতে ভিতর থেকে আহ্বান এল, "আসুন।"

ভিতরে ঢুকে দেববাণী প্রথমেই বলল, "মাপ করবেন, দেরি হয়ে গেল।"

গম্ভীর মুখে মৃদু হেসে তালুকদার বললেন, "খুব নয়। বসুন।"

ঘরখানা তালুকদারের আপিস। মস্ত বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলে কাগজ-পত্র দোয়াত-কলম সুসজ্জিত। তিনি নিজে রিভলবিং চেয়ারে উপবিষ্ট। মোটা-সোটা গোলগাল দেহ, চুলে পাক ধরেছে, পুরু ডবল-ভাঁজ চিবুক। দামী শীতের পোশাকে দিল্লীর শীত থেকে সযত্নে আত্মরক্ষা করছেন নাম করা বিদেশী সলিসিটরস্‌ ফার্মের প্রতিনিধি এ্যাটর্ণী সরোজকুমার তালুকদার। তাঁর মুখোমুখী দেববাণী বসল।

তালুকদার বললেন, "আমি সিগার খেলে আপনার অসুবিধা হবে না ত?"

"কিছু মাত্র না," দেববাণী জবাব দিল।

"আপনি স্মোক্‌ করেন?"

"না।"

সিগার জ্বালিয়ে তালুকদার বললেন, "আপনার চিঠিমত হেড আপিস আমার কাছে কাগজপত্র পাঠিয়েছেন। এখন বলুন আপনার কি করতে হবে?"

"ডাঃ বসুর চিঠি পেয়েছেন?"

ফাইল থেকে একটা চিঠি বার ক'রে, তার ওপর চোখ রেখে তালুকদার বললেন, "পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, আপনি যা বলবেন সেইমত কাজ করতে, তাতেই তাঁর পূর্ণ সম্মতি। চিঠিটা দেখবেন?"

"না, দরকার নেই," দেববাণী বলল। "লেকের ধারে যে বাড়ীটা তৈরী হয়েছে তা আমাদের দু'জনের টাকায়। ওটা দু'জনের নামে রেজিষ্ট্রি করতে হবে।"

"তা করা যাবে।"

"জি. টি. রোডের ওপর পাঁচ একর জমি আপনারা যা কিনেছেন, আমি দেখে এসেছি। সেটাও দু'জনের নামে রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে, না?"

"ঠিক তাই।"

"আমাদের কিছু টাকা এখনও উদ্বৃত্ত আছে। সেটা ডাঃ বসুর ইচ্ছে আপনারা ভাল কোন কোম্পানীর শেয়ারে ইন্‌ভেষ্ট করেন।"

"তা করা যাবে। সরকারী সার্টিফিকেটও কিনতে পারেন। কত টাকা?"

"হাজার চল্লিশ হবে।"

"আপনি কি চান? সরকারী সার্টিফিকেট না কোম্পানীর শেয়ার?"

"ডাঃ বসুর ইচ্ছে ভাল কোম্পানীর শেয়ার।"

"উনি লিখেছেন আপনার ইচ্ছে মত কাজ করতে।"

"আমারও তাই ইচ্ছে," হেসে ফেলল দেববাণী। "আসলে, আমি এসব কিছু বুঝি নে। উনি তবু এক-আধটু বোঝেন।"

"তাই করা যাবে। টাকাটা আপনি দিয়ে যাবেন?"

"চেক নিয়ে এসেছি।"

হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে দেববাণী চেক বার ক'রে তালুকদারের হাতে দিল।

তালুকদার গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন, "আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে।"

"করুন।"

"আপনারা এখনও বিয়ে করছেন না কেন?"

"অসুবিধা আছে।"

"এ ভাবে একসঙ্গে সম্পত্তি তৈরী করছেন, বিয়ে আপনাদের ত করতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি করেন তত ভাল।"

"যদি না করি?"

"তাহলে সম্পত্তি নিয়ে ভবিষ্যতে ঝগড়া হ'তে পারে।"

দেববাণীর বুক কেঁপে উঠল।

"কেন, ঝগড়া হবে কেন?"

তালুকদার হেসে বললেন, "সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া না হ'লে আমাদের ব্যবসা একদিনও চলত না।

"না না। তা বলছি না। আমি বলছি, আমরা ঝগড়া করব কেন?"

"মানুষ ঝগড়া করে। আপনারা মানুষ। আপনা-

...রও ঝগড়া হ'তে পারে। আপনাদের এ্যাটর্ণী হিসেবে ...বিষয়ে সতর্ক ক'রে দেওয়া আমার কর্তব্য।"

"বুঝতে পারছি।"

"বিবাহ হয়ে গেলে অন্যরকম। এভাবে চললে একদিন সামান্য কারণে মনের অমিল সুরু হতে পারে। ...ন যদি দু'জনে মামলা-মকদ্দমা সুরু করেন—"

"না, না।" আতঙ্কে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল দেববাণী। "সে কি কথা?"

"সব চেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটা ভেবে রাখা দরকার," তালুকদার গম্ভীর হয়ে বললেন। "এমনি আপনারা বন্ধু আছেন, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু একসঙ্গে বাড়ী ক'রে, জমি কিনে, শেয়ার কিনে আপনারা দু'জন ব্যবহারিক-জীবনে একত্র আবদ্ধ হচ্ছেন। অথচ এ বন্ধনের কোন সামাজিক ও আইনগত রূপ নেই। এটা কেবল বিসদৃশ নয়, ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনকও।"

"কেন? বিপদ্ কিসের?"

"দেখুন, সেক্সপীয়র বলেছেন, যেখানে প্রেম বেশি, সেখানে ভয় ও সন্দেহ বেশি। ভালবাসার মত বন্ধন নেই। যেমন শক্ত, তেমন হালকা। আপনাদের এত দিনের বন্ধুত্ব সামান্য কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ভালবাসাকে সামাজিক ও আইনগত রূপ দিতে হয়। তার নাম বিবাহ। আপনারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করেও বিবাহ করছেন না কেন আমি বুঝতে পারছি না।"

দেববাণী আরক্ত হয়ে বলল, "আমরা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করছি না। ও-রকম সম্পর্ক আমাদের হয় নি।"

তালুকদারের বিরাট্ মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "আপনি বলতে চান, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, অর্থাৎ দৈহিক সম্পর্ক, আপনাদের হয় নি?"

"না।"

"আমি বুঝতে পারছি না। তা হলে একসঙ্গে বাড়ী করলেন কেন?"

"ইচ্ছে হ'ল, তাই।"

"তার মানে, বিবাহের ইচ্ছে আপনাদের আছে।"

"সম্ভাবনা আছে, বলতে পারেন।"

"দেখুন ডাঃ রায়, আপনাকে আমি অনেকদিন জানি। হাইকোর্টে আপনার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার সময় থেকে। আপনি মানুষ হিসাবে কোন্ জাতের আমার অজানা নেই। জীবনে আপনি নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাতে আরও অনেকের মত আমিও আনন্দিত। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। ডাঃ বসুকেও আমি জানি। আপনারা দু'জনে দু'জনের যোগ্য জীবন-সঙ্গী। আপনার ভালর জন্যে বলছি, ইচ্ছে পোষণ করেও বিবাহ না করার কোনও মানে নেই। তা ছাড়া, সম্পত্তি নিয়ে ভবিষ্যতে যথেষ্ট গোলমালের সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার কথা ভেবে দেখব। ডাঃ বসু সম্ভবতঃ এখানে আসছেন।"

"আরও একটা দিক্ আছে", তালুকদার নিবে-যাওয়া চুরুটে অগ্নি-সংযোগ করে বললেন, "আপনার ছেলের দিক্।"

চমকে উঠল দেববাণী।

"কেন? তার জন্যেই ত—"

"বুঝেছি।" সামান্য হাসলেন তালুকদার। "ছেলের জন্যে আপনি বিবাহ করতে পারছেন না। ভাবছেন, সে অন্য একজন পুরুষকে তার মা'র স্বামী হিসেবে দেখতে পারবে না। তাই কি?"

"অনেকটা তাই। সে তার বাবাকে ভোলে নি।"

"খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি তাকে কম সাহায্য করছেন না।"

"আমি সাহায্য করছি? কেন? কেমন করে?"

"নিজে অবিবাহিত থেকে। আপনি তাকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তার বাবার স্থান আর কেউ পূর্ণ করতে পারে না।"

দেববাণী চুপ করে রইল।

"সে বিদেশে মানুষ হচ্ছে। ষ্টেপ্-ফাদার ব্যাপারটা তার নিশ্চয় অজানা নেই। আপনাকে একা একা দেখে সে নিশ্চয় ভাবছে তার বাবা এমন একজন ছিল, এমন কুলোক, যার স্মৃতি আপনি নিজেও ভুলতে পারছেন না, তাকেও ভুলতে দিচ্ছেন না। আপনি যদি স্বাভাবিক ভাবে ডাঃ বসুকে বিবাহ করতেন, সে নিশ্চয় আপনার জীবনের পরিপূর্ণতায় খুশী হ'ত। এ পরিপূর্ণতা তার জীবনকেও নানা ভাবে স্পর্শ করত।"

দেববাণী কিছু বলল না।

"তার ওপর," তালুকদার বলে চললেন, "আপনারা দু'জনে বাড়ী বানিয়েছেন, সম্পত্তি তৈরী করছেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতে সে যাতে আপনার টাকা-পয়সা স্থাবর সম্পত্তি না পেতে পারে তার সম্ভাবনাও তৈরী করে রাখছেন।"

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল দেববাণী।

"তা কি করে হ'ল?"

"ডাঃ রায়," তালুকদার হেসে বললেন, "বৈজ্ঞানিক হলেও আপনারা দু'জনেই দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ।

গবেষণাগারে মাথা খাটিয়ে নিজেদের জীবনটাকে মাথা দিয়ে দেখবার সময় পান না মনে হচ্ছে। একদিন যদি সম্পত্তি নিয়ে আপনাদের ঝগড়া হয় তা হলে যে কেলেঙ্কারী হবে, তার মধ্যে আপনার নির্দোষ ছেলেও এসে পড়বে। তা ছাড়া, আপনাদের অবর্তমানে ডাঃ বসুর আত্মীয়রা কি এ সম্পত্তি দাবী করবেন না? তখনও ত মামলা হবে, এবং সে মামলায় আপনার ছেলের কি জুটবে না জুটবে আজ তা কেউ বলতে পারে না।"

দেববাণী আস্তে আস্তে বলল, "এসব কথা আমি ভেবে দেখি নি।"

"তা ত বুঝতেই পারছি," তালুকদার বললেন। "এবার নতুন করে সব ভেবে দেখুন। ডাঃ বসু আসছেন, খুব ভাল কথা। আপনারা দু'জনে না হয় একদিন আসবেন আমার কাছে। প্র্যাকৃটিক্যাল দৃষ্টিতে সব ব্যাপারটা আপনাদের দেখতে হবে। যে ভয় আপনি পাচ্ছেন, আমার ধারণা, তার কোন ভিত্তি নেই। দু'জনে আসবেন একদিন।"

"দু'জনকে নিয়ে সমস্যা নয়," মৃদু হেসে দেববাণী বলল। "সমস্যা একজনকে নিয়ে। যত সংশয়, যত ভয় সব তার।"

নিজামুদ্দিনে ফিরবার পথে দেববাণীর মন বলে চলল, যত সংশয়, ভয় সব আমার, কেননা আমি জননী ও নারী। শুধু তাই নয়, আমি প্রেমিকা। আমার মাতৃত্ব ও আমার প্রেম একপথে পরিপূর্ণতা পেল না কেন? কেন যাকে ভালবাসি, তার সন্তানের জন্ম দিয়ে জায়া ও জননী রূপে আমি একই পথে পূর্ণতা পেলাম না? কেন এই বিরোধ আমার মধ্যে জননীকে জায়া হতে দিচ্ছে না?

তালুকদারের কথাগুলি বার বার দেববাণীর মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সত্যিই কি আমি দেবকুমারকে নিয়ে অযথা ভয় পাচ্ছি? জীবন থেকে পূর্ণ-অপসৃত পিতাকে নিয়ে ভাববিলাসের সুযোগ সত্যি কি আমিই তাকে দিয়েছি? সে যে জন্মদাতা সম্বন্ধে একটা কথাও বলে না তার মূলে কি কোনও প্রচণ্ড অপরাধের নীরব উত্তরাধিকার? দেবকুমার কি মনে মনে নিজেকে অপরাধী করে রেখেছে তার পিতার হাতে মায়ের লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচারের জন্যে? তাই কি সে কখনও প্রকাশ্যে বাবার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না? মায়ের জীবনকে নিরানন্দ শূন্য দেখে দুর্বিসহ অপরাধের বোঝা সে কি অহরহ নিজের মধ্যে বহন করে বেড়াচ্ছে? একমাত্র আত্মজকে এতখানি না-চেনার দুঃখে দেববাণীর বুক টন্‌টন্ করে উঠল। মনে হ'ল, আমার কি সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে। দেবকুমারের সঙ্গে কোনও দিন এ বিষয়ে পরিষ্কার কথাবার্তা না বলে তার মনে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে রাখার সম্ভাবনায় দেববাণী অস্থির হয়ে উঠল। দেশদেশান্তরের দূরত্ব অপসৃত হয়ে গেল। চলমান গাড়ীতে বসেই দেববাণী মুহূর্তে বহু দেশ, সমুদ্র পেরিয়ে পুত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, বাছা, তোর কোন দোষ নেই, অপরাধ নেই; যে আমার জীবনে কেবলমাত্র অমঙ্গল এনেছিল, তার একটি মাত্র মঙ্গলদান তুই, তার কোন অপরাধ তোকে স্পর্শ করে নি। তুই তার উত্তরাধিকারী ন'স, তুই কেবল আমার উত্তরাধিকারী।

বাড়ী পৌঁছে বড় ক্লান্ত লাগল দেববাণীর। মাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে বলে গিয়েছিল তাই গাড়ী বাড়ীর বাইরে রাস্তার ধারে রেখে সে ধীরে ধীরে পা ফেলে ওপরে উঠে এল। ইচ্ছে হ'ল চেয়ারে গা ছেড়ে ব'সে পড়ে, কিন্তু মা কি ভাববেন মনে হওয়ায় সোজা শোবার ঘরে চলে এল। বাসন্তী দেবী বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলেন; নীরবে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল দেববাণী।

উঠে বসলেন বাসন্তী দেবী। বললেন, "কি হয়েছে রে, বাণী?"

"কিছু নয় ত, মা।"

"তোকে এত ক্লান্ত লাগছে যে?"

"সারাদিন ঘোরাঘুরি—"

"না, আরও কিছু? মুখে তোর কালি পড়েছে। কোনও খারাপ কিছু ঘটে নি ত?"

"না, মা।"

"কাজ এগল কিছু?"

"বিশেষ নয়।"

বিছানার পাশে আরাম-কেদারায় ব'সে পড়ল দেববাণী।

বলল, "আমি আর পারি নে। হিমাদ্রিকে লিখে দিয়েছি। এবার সে এসে নিজের কাজ ক'রে নিক।"

বাসন্তী দেবী মেয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হলেন। শুধু বললেন, "বেশ করেছিস্।"

"চল, মা। তোমায় নিয়ে একটু বেড়াতে যাই।"

"আজ না হয় থাক। তোর মন ভাল নেই।"

"তোমাকে নিয়ে একেবারে বেড়াবার সময় পাই না। এখানে এসে ঘরে বন্দী হয়ে আছ। আমার মন ঠিক আছে। চল, বেরিয়ে পড়ি।"

"কোথায় যাবি?"

"চল, এমনি একটু ঘুরে বেড়াই। তার পর ইচ্ছে হলে সাবিত্রী আম্মার ওখানে যাব।"

"তাঁকে বলে রেখেছিস্?"

"বলার দরকার নেই। যদি দেখি ব্যস্ত আছেন বা বেরিয়ে গেছেন, ভালই হবে, চলে আসব।"

"তোর মন আজ স্থির নেই। কেন শুধু শুধু বেরবার কথা বলছিস্?"

"ঘরে বসে আরও খারাপ লাগবে। এখানে লেবরেটরী নেই যে কাজে লেগে যাব। অলস সময় কাটাবার একেবারে অভ্যাস নেই, মা। মনটা কেমন ভারী হয়ে ওঠে।"

"চা খাবি নে?"

"খাব। আমি চটপট চা তৈরি করছি। তুমি কাপড় বদলে নাও।"

"আগে তুই স্নান-ঘরে যা। আয়নায় দেখ গে কেমন দেখাচ্ছে তোকে।"

"আগে এক কাপ গরম চা খেয়ে নি, মা।"

ষ্টোভে দেববাণী চটপট চা তৈরী ক'রে নিল। বাসন্তী দেবীকে দিয়ে নিজে চুমুক দিল চায়ের পেয়ালায়। বলে উঠল, "আঃ।"

টেলিফোন বেজে উঠল বারান্দায়। চায়ের পেয়ালা হাতে করেই দেববাণী গিয়ে রিসিভার তুলল।

অন্য প্রান্ত থেকে নারী-কণ্ঠ ভেসে এল, "ডাঃ রায়?"

"বলছি।"

"আমি সরোজা।"

"হ্যালো সরোজা, ভাল আছ ত? কি খবর?"

"আপনার সঙ্গে কাল দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

"শুনেছি। তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দুঃখিত। কোনও জরুরী কাজ আছে?"

"কাজ কিছু নেই।"

"তবে?"

"একটা খবর আছে আপনাকে দেবার।"

"বল।"

"আপনার গবেষণাগার হবে না।"

"হবে না?"—দেববাণীর কণ্ঠে কৌতুক।

"না।"

"কেন? তুমি কি ক'রে জানলে?"

"যে জমি আপনি চেয়েছেন, সে জমি আপনি পাবেন না।"

"তাই নাকি?"

"আমাদের কাগজের মালিক সে জমি কিনে নিচ্ছেন।"

দেববাণী এবার আর হালকা থাকতে পারল না।

"কিন্তু ও জমি ত বিদ্যায়তনের জন্যে নির্দিষ্ট।"

"নির্দিষ্টকে সব দেশে সব কালে অনির্দিষ্ট করা সম্ভব।"

"তোমার খবর পাকা?"

"তাই ত মনে হচ্ছে। আমি কাল জানতে পেরে আপনার কাছে গিয়েছিলাম।"

"তোমার মা জানেন?"

"না। জানলেও তাঁর কিছু করার নেই।"

"তোমার কাগজের মালিক কে?"

"ওটা আর কাউকে জিজ্ঞেস করবেন।"

"তাঁর বুঝি খুব দাপট?"

"তিনি ক্ষমতাবান্ লোক।"

"আর কিছু খবর আছে?"

"আর কিছু খবর নেই।"

"ধন্যবাদ। তোমার নিজের খবর কি?"

"ভাল। আচ্ছা চলি। গুড নাইট।"

"গুড নাইট, সরোজা। ধন্যবাদ।"

টেলিফোন নামিয়ে দেববাণী কয়েক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। সরোজা বিশ্বাসযোগ্য কিছু না জানলে খবর দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হ'ত না। নানা দিক্ থেকে বাধা আসছে, দেববাণী ভাবল। আমার আর ভাল লাগছে না। আসল কথা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নিজের দেশকে চিনি না, জানি না, বুঝি না, এখানে কাজ করব কি ক'রে? কি নিয়মে, কোন্ লিখিত-অলিখিত বিধানে ভারতবর্ষ চলছে আমি তার কতটুকু জানি? কিসে কাজ হয়, কিসে হয় না, কোন্ অদৃশ্য শক্তি গোপনে স্বার্থ গুছিয়ে নেয়, বিঘোষিত নীতি কর্মক্ষেত্রে কোথায় কতখানি অপচয়ের পথে নেমে আসে, এসব বোঝবার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই। হিমাদ্রির আছে কি না জানি না। অন্তত আমার চেয়ে নিশ্চয় বেশি আছে। সে আসুক, এসে দেখুক তার পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে কি না। সে আসুক। তার আসা দরকার। ভারতবর্ষের প্রাচীন মাটিতে তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একবার তাকে দেখতে চাই। যে-দৃষ্টিতে বিদেশে তাকে দেখেছি, যে-মন নিয়ে বিদেশে তাকে চিনেছি, দেশের মাটিতে তার কতটুকু সত্যি, কতটুকু কল্পনা তার বিচার হয়ে যাক। সে আসুক। আমার চিঠি পেয়ে সে যদি না আসে? তাকে আজ কেবল্

পাঠাতে হবে। "তুমি যত শীঘ্র সম্ভব চলে এস। চিঠিতে সব লিখেছি। তার পরে যা ঘটেছে তাতে তোমার আসা আরও দরকার।"

চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে দেববাণী দেখল, ঠাণ্ডা জল। নামিয়ে রাখল। স্নানঘরে ঢুকে হিমাদ্রির আসন্ন আগমন কল্পনা ক'রে দেববাণী আরও অনেক কিছু ভাবল: যখন বেরিয়ে এল, দেববাণী রীতিমত উত্তেজিত। সাড়ী ভাল ক'রে পরে নি, শুধু গায়ে জড়ান। পেটিকোট ও ব্লাউজ ছাড়া আর কিছু নেই। অত শীতেও দেববাণীর দেহ গরম, মন অস্থির। চট্ ক'রে টেবিলে ব'সে কলম তুলে সে কেব্‌ল্ রচনা করতে লাগল। তিন বার খসড়া করবার পর রচনা মনোমত হ'ল দেববাণীর। চাকরকে ডেকে তার-ঘরে পাঠিয়ে দিল তক্ষুনি।

দেববাণী হিমাদ্রিকে আহ্বান জানাল: "তোমার এখানে উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন। পত্রে যা লিখেছি তা ছাড়াও জরুরি কারণ আছে। পথে জেনিভায় নেমে দেবকুমারকে নিয়ে আসবে। আগামী সপ্তাহে তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে আশা করব। কবে আসছ 'তার' ক'রে জানাবে।"

দেববাণীর মনে বার বার গুঞ্জরিত হতে লাগল দু'টি শব্দ; ওরা আসুক। নিজেকে সে বার বার বুঝিয়ে বলল: ওরা দু'জনে একসঙ্গে আসুক। ওদের একসঙ্গে স্বদেশে না দেখলে আমি বুঝতে পারছি না ওরা আর আমি এক কি না, আমরা তিনজনে এক কি না। ওদের একত্র দেখলে আমার মনের সন্দেহ কাটবে, প্রশ্নের জবাব মিলবে। পৃথিবী আমাদের একত্র করতে পারে নি, দেখি ভারতবর্ষ পারে কি না। ক্রমশঃ

—০✻০—

# মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন—মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি অসামান্য মেধা ও পুরুষকারের অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন সুবক্তা, সুলেখক, সুষ্ঠু ঐতিহাসিক, স্বদেশপ্রাণ এবং সুনিপুণ রাজকর্ম্মচারী। উচ্চ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি এত অধিক সময় ও সামর্থ্য স্বজাতির কল্যাণে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন যে, চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার বহুমুখী-প্রতিভা জাতীয় জীবনের বহু দিকেই নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে, এবং এইরূপে অনেক বিষয়েই তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। চারণ-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যেরূপ সঙ্গীত ও নাটকের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন, স্বদেশপ্রাণ রমেশচন্দ্রও সেইরূপ তাঁহার লেখার ভিতর দিয়াই দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাস রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ও মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত এবং ঐতিহাসিক অমূল্য গ্রন্থগুলি বিজাতীয় শাসন ও শোষণে নির্বীর্য্য, নিষ্পিষ্ট ও সম্বিৎহারা জাতিকে জাতীয়তাবোধ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। স্বদেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করায় তিনি স্বদেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন এবং কর্ম্মনিপুণতার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পরম বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে অনেক বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় সাধন হইয়াছিল। তিনি ছিলেন আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ গৃহী, আদর্শ প্রতিবেশী, এবং দেশমাতৃকার আদর্শ সন্তান। তিনি জীবনের সকল স্তরে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। এরূপ লোক প্রতি শতাব্দীতে আসেন মাত্র কয়েকজন। এরূপ লোকের জীবনী যত আলোচিত হয়, এবং তাঁহাদের আদর্শ যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। আমরা সেই কারণে রমেশচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি দিক সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতায় রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ছিলেন একজন সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী এবং মাতৃদেবী থাকমণি ছিলেন অশেষ গুণসম্পন্না মহিলা। দুই জনেরই অকালমৃত্যু ঘটিলে রমেশচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল তাঁহাদের পিতৃব্য শশীচন্দ্র দত্তের উপর। শশীচন্দ্র বিদ্যানুরাগী এবং ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন করিয়া তোলেন। তাঁহার নিকট হইতেই রমেশচন্দ্র পান জ্ঞান সঞ্চয়ের অদম্য পিপাসা এবং ইংরেজী সাহিত্য ও কবিতার প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ।

পনের বৎসর বয়সে সিমলার মাতঙ্গিনী বসুর সহিত রমেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অনুরূপ কৃতিত্বের সহিত এফ.এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তিনি দুইটি কন্যার জনক। বাল্যবিবাহ তাঁহার লেখাপড়ায় কোনরূপ বাধা উৎপাদন করিতে পারে নাই। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা মার্চ্চ তিনি তাঁহার আবাল্য-সুহৃৎ বিহারীলাল গুপ্ত এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত গোপনে বিলাতযাত্রা করেন। অসীম উচ্চাভিলাষ এবং দুঃসাহসিক কার্য্যের অনুপ্রেরণায় তিনি এ কাজ করিতে সাহসী হন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার অনেক আশঙ্কা ছিল। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন, "গোপনে গৃহ ছাড়িয়া একটা অসম্ভব সাফল্যের আশায় সর্ব্বস্বপণ করিয়া, কোনরূপ যুক্তি না মানিয়া এই সুকঠিন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। জানি না আমরা সফলতা লাভ করিব কি না। কিংবা নিরাশ হইয়া ম্লানমুখে দেশে ফিরিব। দেশের লোক আমাদিগকে সমাজচ্যুত করিবে, উপদেষ্টারা ভর্ৎসনা করিবেন এবং বন্ধুবর্গ দুঃখ প্রকাশ করিবে।"

বিলাত যাত্রাকালে রমেশচন্দ্রের মনে যতই আশঙ্কা ও সন্দেহ জাগুক না কেন, তিনি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য 'বারে' যোগ দিয়াও তিনি আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দেশে ফিরিয়া তিনি আলিপুরে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। দেশপ্রাণতার জন্য রমেশচন্দ্রকে চাকুরিজীবনের প্রথমাবস্থায় অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে তাঁহাকে অনেক দিনই কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই, অবশেষে অপূর্ব্ব দক্ষতা ও সহজ সাধুতার গুণেই তিনি কর্ম্মস্থলের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেন। বাখরগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করেন। প্রথমে তিনি উড়িষ্যায় সহকারী কমিশনার নিযুক্ত হন। তদানীন্তন নিয়মানুসারে উড়িষ্যার রাজপুত্রদিগের তত্ত্বাবধান ও শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এই কাজে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুনজরে পড়েন। ইহার পর তিনি বর্দ্ধমানের ডিভিশনাল কমিশনার নিযুক্ত হন। চারি বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত তিনি উক্ত পদের কাজ পরিচালনা করেন। তৎপূর্ব্বে কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে ঐরূপ উচ্চপদ লাভ হয় নাই। যখন যেখানেই তিনি কাজ করিতেন দেশের কল্যাণকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া জনসাধারণের প্রভূত কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেন। ইউরোপীয় সহকর্ম্মিগণ এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। কারণ তিনি বিনীত ছিলেন, অথচ চাটুকার ছিলেন না, স্বাধীনচেতা ছিলেন, কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতি ছিলেন না। সকল সময় দেশী ও বিদেশীদিগের মধ্যে একটা সহযোগিতার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া চলিতেন।

ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য রমেশচন্দ্রকে অসময়েই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সেই সম্মেলনে তিনি যে সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই ভাষণে তিনি ভারতের স্বাধীনতা ও ইংরেজ শাসনের অনেক তথ্যপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করেন। সেই আলোচনায় সংগঠনমূলক কার্য্যেরই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল, উহাতে কোন উগ্র বৈপ্লবিক পন্থার তিনি নির্দ্দেশ দেন নাই।

সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ "ইউরোপে তিন বৎসর" ( Three years in Europe ) ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে "বাংলার কৃষক" ( The Peasantry of Bengal ), এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে "বাংলার সাহিত্য" (Literature of Bengal) প্রকাশ লাভ করে। 'বাংলার কৃষক' পুস্তকে তিনি বাংলা দেশের কৃষক-সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াস পান। "বাংলা সাহিত্যে" তিনি সাহিত্য যুগকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রতি ভাগের বিশদ আলোচনা করেন। প্রথম ভাগ : জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস যুগ, ১২শ হইতে ১৫শ শতাব্দী ; দ্বিতীয় ভাগ : চৈতন্য-কৃত্তিবাস-রঘুনাথ যুগ, ১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দী ; এবং তৃতীয় ভাগ : পাশ্চাত্ত্য প্রভাবযুক্ত সাহিত্য যুগ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন দত্ত-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগ। এই তিন যুগের সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাস এবং প্রতি যুগের বৈশিষ্ট্য তিনি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থখানি ইংরেজীতে লিখিত হইলেও বাংলা ভাষার ইতিহাসের ইহাই প্রথম গ্রন্থ। তৎপূর্ব্বে ভারতের কোন প্রদেশেই কোন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয় নাই। ভাষা ও সাহিত্য ইতিহাসের ইহা পথিকৃৎ।

১৮৭৪ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রমেশচন্দ্র

চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। "বঙ্গ-বিজেতা" ও "মাধবীকঙ্কণ" সম্রাট আকবর শাহের সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে ভিত্তি করিয়া রচিত। "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা" স্বনামধন্য বীর রাণা প্রতাপের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত। "মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত" ছত্রপতি শিবাজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহারাষ্ট্রের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত। "সংসার" ও "সমাজ" নামে দুইখানি সামাজিক উপন্যাসও প্রকাশ করেন। এই দুইখানি সামাজিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ। "মাধবীকঙ্কণের" ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়, উহার নাম দেওয়া হয়, "The slave girl of Agra"; "সংসারে"রও ইংরেজী অনুবাদ "The Lake of Palms" নামে প্রকাশিত হয়।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্তের "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা" (Civilisation of Ancient India) নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহার প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং উহা সর্ব্বত্রই সমাদৃত হয়। ১৯০২ সালে "ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস" (Economic History of British India) রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানিও পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। শুনা যায় এই সময় "India and Her People" রচনা কালে পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ-জীকে রমেশচন্দ্র দত্ত অনেক ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বামীজীর এই পুস্তকখানি ব্রিটিশ ভারতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষে উহার প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। ভারত স্বাধীন হইবার পর ঐ পুস্তকখানি ভারতে আবার প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যালয় পাঠ্য "Brief History of India" (সংক্ষিপ্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস) একখানিও রমেশচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দের নির্দ্দেশে ভগিনী নিবেদিতা যখন বাগবাজারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকা হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন তখন পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে রমেশচন্দ্র দত্ত নিবেদিতাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দেন, এবং The Web of Indian Life নামক ভারতীয় সংস্কৃতিধারা-বিষয়ক পুস্তক প্রণয়নকালে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্যও করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে ১৭নং বোসপাড়া লেনে ভগিনী নিবেদিতা যখন বাস করিতে থাকেন, এবং সেখানে যখন ভারতের নব জাগরণের উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হয় রমেশচন্দ্র প্রায়ই সেখানে উপস্থিত হইয়া আলোচনা সভায় নিবেদিতাকে অনেক সুপরামর্শ দিতেন। এই সময়েই বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে রমেশচন্দ্র দত্ত নিবেদিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ভগিনী নিবেদিতা রমেশচন্দ্রকে "ধর্ম্মপিতা" বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহাকে পিতার ন্যায়ই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। রমেশচন্দ্রও নিবেদিতাকে নিজ কন্যার মত স্নেহ করিতেন এবং প্রয়োজন মত অনেক সদুপদেশ দিতেন। পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নিবেদিতা রমেশচন্দ্রের নিকট সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন, এবং ছাত্রদিগকে তাঁহার অর্থনীতির ইতিহাস পাঠ করিতে বলিতেন। এই সময়ই প্রবাসী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটে এবং 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে নিবেদিতার অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন।

রমেশচন্দ্র রাজনৈতিক মতবাদে 'নরমপন্থী' (moderate) ছিলেন। আলাপ-আলোচনা ও আবেদন-নিবেদনে শাসননীতির পরিবর্ত্তন সম্ভব ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। ধনীদিগের দ্বারা বিভিন্ন কল-কারখানা গড়িয়া তোলা ও নানাপ্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, এবং আইনসভা গঠন, প্রভৃতি শাসন-সংস্কার বিষয়ে নিবেদিতার সহিত রমেশচন্দ্র পত্রালাপ করিতেন এবং ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন। নিবেদিতাও বিশেষ উৎসাহের সহিত ঐ সকল পরিকল্পনা সমর্থন করিতেন। রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও অর্থনৈতিক গবেষণার প্রতি নিবেদিতা আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই রমেশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থ দুইখানি প্রতীচ্য জগতে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করে। এই গ্রন্থ দুইখানি ব্যাস ও বাল্মীকির মহাভারত ও রামায়ণের সামগ্রিক অনুবাদ নহে। এই দুই মহাকাব্যের প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া মহাকাব্যেরই আদর্শে দ্বাদশ খণ্ডে অনুষ্টুপ ছন্দের অনুরূপ 'লকসলী' ছন্দে (Locksly meter) চারি হাজার পদে (couplets) উহারা রচিত। মূল রামায়ণ মহাভারতের চিন্তাধারা ও বর্ণনা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে রমেশচন্দ্র সর্ব্বস্থলেই চেষ্টা করিয়াছেন। অনুবাদ কার্য্যে এই বিষয়টি বেশ দুরূহ। শুধু অনুবাদ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কাব্য দুইখানির ভূমিকায় উহাদিগের

সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিবারও বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। লর্ড মেকলের Lays of Ancient Rome (প্রাচীন রোমের গাথা)-এর অনুসরণে ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম কাহিনী ভারবীর কিরাতার্জ্জুনীয় ও কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্য হইতে নির্ব্বাচিত অংশের ইংরেজী অনুবাদ "Days of Ancient India" (প্রাচীন ভারতগাথা) নামে একখানি খণ্ড কাব্য রচনা করেন। ইহার মধ্যেও মূল গ্রন্থের রচনা-সৌকুমার্য্য ও বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহারও কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ঋকবেদের বাংলা অনুবাদ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে উহা পরিবেশন করিবার মানসেই রমেশচন্দ্রের এই সকল অনুবাদ প্রচেষ্টা। কথিত আছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রমেশ-চন্দ্র বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি লিখিতে আরম্ভ করেন।

শুধু সাহিত্যালোচনা ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার প্রথম সভাপতি। সাহিত্য পরিষদ গৃহে "রমেশ-ভবন" তাঁহার স্মৃতি বুকে করিয়া রাখিয়াছে।

অবসর গ্রহণের কিছুকাল পরেই কর্ম্মবীর রমেশচন্দ্র বরোদার গায়কোয়াড়ের আহ্বানে তাঁহার রাজ্যের দেওয়ান বা রাজস্বসচিবের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি এই রাজ্যের অনেক হিতকর সংস্কারসাধন করেন। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া তিনি বরোদার প্রজাবর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বিকেন্দ্রীয় করণের জন্য তিনি রাজকীয় কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ভারতবাসীর পক্ষে সে যুগে এরূপ সম্মানলাভ বিশেষ শ্লাঘার বিষয় ছিল। ১৯০৯ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং কয়েক মাস কলিকাতার নিজ বাটীতে নিরুপদ্রব বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনরায় বরোদা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। অল্প কিছুদিন পরেই ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার চিন্তা করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে বেশী দিন রোগ ভোগ করিতে হয় নাই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর ৬১ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। রমেশচন্দ্রের তিরোধানে উনবিংশতি শতাব্দীর ভারতের অন্যতম মনীষীর তিরোভাব ঘটে।

সকল মহাপুরুষের ন্যায় রমেশচন্দ্রের জীবনেও অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে হরাইয়া ফেলেন নাই। চাকুরীর ভিতর নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দেন নাই। সুশৃঙ্খলার সহিত সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেও, তিনি কর্ম্মের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন নাই। তাই মাঝে মাঝে চাকুরী হইতে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়া দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই ভ্রমণের মধ্যে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিপুল আনন্দ লাভ করিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যুগ্মধারা তাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছিল। উহার ফলে তাঁহার পরিবারের মধ্যে সকলেই যেরূপ অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ জাতীয় সংস্কার ও পারিবারিক নীতি মানিয়া চলিতেন। স্বাধীন-চিত্ত হইয়াও আচার-ব্যবহারে কেহই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না। অল্প বয়সে রমেশচন্দ্র মাতৃ-পিতৃ-হারা হন। পিতামাতার অবর্ত্তমানে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার আবাল্য সুহৃৎ বিহারীলাল গুপ্তকে নিজের সহোদরের ন্যায় ভাল-বাসিতেন। তাঁহার পাঁচটি কন্যা, একটি পুত্র এবং কয়েকটি নাতি-নাতনী ছিল। তাহাদিগকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত অতি মধুর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নাতি-নাতনীদের সহিত ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় মাধুর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিত। তিনি যে সকল পত্র লিখিতেন তাহার ভাষা এত আবেগ-মধুর ও আন্তরিকতাপূর্ণ হইত যে, যিনিই তাঁহার কোন পত্র পাইতেন, তিনিই উহা পড়িয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে আর একখানি অপূর্ব্ব পত্রসাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই সকল কারণে তাঁহার গৃহ সুখ ও শান্তির আগার ছিল। তিনি তথাকথিত দেশনেতা ছিলেন না বটে, কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই জীবনে অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী, সুষ্ঠু ঐতিহাসিক, সুসাহিত্যিক এবং নীরব দেশপ্রেমিক ছিলেন। মানবতার আদর্শেই নিজের জীবন গড়িয়া তুলিয়া সেই আদর্শেই সকলকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়।

—০*০—

# ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

পঞ্চম খণ্ড

[ভারত হইতে চম্পা, তাম্রলিপ্তী ও যবদ্বীপ হইয়া চীনে প্রত্যাবর্তন]

চম্পা

গঙ্গাতীর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ১৮ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ফা-হিয়েন উক্ত নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত চম্পারাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এই রাজ্যে অসংখ্য স্তূপ বিদ্যমান। যে স্থানে মঠপ্রান্তে বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন এবং যে সকল স্থানে তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ জন বুদ্ধ উপবেশন করিতেন, তাহাদের প্রত্যেকটির উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিটি স্তূপসংলগ্ন বিহারে শ্রমণেরা বাস করেন।

তাম্রলিপ্তী

পূর্ব্বাভিমুখে আরও প্রায় ৫০০ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তিনি তাম্রলিপ্তা (বর্ত্তমান তমলুক) বন্দরের দেশে পৌঁছিলেন। এই দেশে ২২টি মঠ আছে এবং প্রত্যেকটি মঠে শ্রমণেরা বাস করেন। এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ-গৌরবে বিরাজিত। এই স্থানে দুই বৎসর থাকিয়া ফা-হিয়েন সূত্রগুলি লিখিয়া লইলেন এবং মূর্ত্তিগুলির চিত্র অঙ্কন করিলেন।

সিংহল

অতঃপর তিনি একখানা বৃহৎ বাণিজ্য জাহাজে উঠিয়া সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। তখন শীতকাল আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং বাতাস অনুকূল ছিল। চৌদ্দ দিন দিবারাত্রি জাহাজ চালাইয়া তাঁহারা সিংহল দেশে পৌঁছিলেন। ফা-হিয়েন লোকমুখে শুনিয়াছেন—তাম্রলিপ্তী হইতে সিংহলের দূরত্ব ৭০০ যোজন।

পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫০ যোজন এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩০ যোজন বিস্তৃত এক বিশাল দ্বীপের উপর এই রাজ্যটি অবস্থিত। এই দ্বীপের চারিপার্শ্বে আরও প্রায় ১০০টি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপগুলির পরস্পরের দূরত্ব কোথাও ১০ লি কোথাও ২০ লি এবং কোথাও বা আরও বেশী। ইহাদের সর্ব্বাধিক ব্যবধান ২০০ লি। সমুদয় দ্বীপই মূল দ্বীপের অধীন। অধিকাংশ দ্বীপে মুক্তা ও নানাজাতীয় মূল্যবান্ রত্ন পাওয়া যায়। প্রায় ১০ লি পরিধিবিশিষ্ট একটি দ্বীপে অতি উজ্জ্বল বিশুদ্ধ মুক্তা উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রত্ন ও মুক্তাগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য রাজপুরুষেরা নিযুক্ত আছেন। সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে রাজা ঐ সকল মুক্তা ও রত্নের শতকরা ৩০ ভাগ রাজকররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে এই দেশে কোন মানুষ বাস করিত না। তখন ইহা ছিল ভূত, প্রেত এবং নাগদের দ্বারা অধ্যুষিত। সেই সময়েও বণিকেরা এই দেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক রাখিত। রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হওয়ার পর আর ভূত, প্রেতদিগকে দেখা যাইত না। তখন তাহারা নিজ নিজ মূল্যবান্ দ্রব্যের উপর লেবেল আঁটিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া যাইত এবং ব্যবসায়ীরা নির্দ্দিষ্ট মূল্য যথাস্থানে রাখিয়া দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিত।[১]

ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের ফলে বিভিন্ন দেশের লোকেরা এই দেশের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সংবাদ অবগত হইল এবং তখন হইতে দলে দলে লোক আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করিতে লাগিল। এইভাবে কালে এখানে একটি বিরাট্ জাতি গড়িয়া উঠিল। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। শীত এবং গ্রীষ্মকালের আবহাওয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ফল-মূল, শাক-সব্জী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অধিবাসীরা যখন খুশি কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে; ইহার জন্য কোন বিশেষ ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই।

বুদ্ধ যখন নাগদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে

---

১। বিভিন্ন শ্রেণীর অনার্য্যজাতীয় লোকেরাই এখানে ভূত, প্রেত, নাগ, প্রভৃতি শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে। ইহারা দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে নানাজাতীয় দ্রব্য লইয়া বিক্রয়ার্থ বন্দরে আসিত, কিন্তু সকল সময় বৈদেশিক বণিক্‌দের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ না হওয়ায়, বিশেষতঃ ঐ সকল বণিক্‌দের ভাষা তাহাদের অবোধ্য থাকায় কোন বহুভাষাবিদ্ আড়তদারের গুদামে তাহাদিকে নিজ নিজ মাল বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া যাইতে হইত। একজনের মালের মূল্য যাহাতে অন্যকে দেওয়া না হয়, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দ্রব্যের উপর মালিকের নাম, ঠিকানা এবং উক্ত দ্রব্যের মূল্য লিখিয়া রাখা হইত। এই সকল স্থানীয় লোকের সহিত বৈদেশিক বণিক্‌দের সাক্ষাৎ হইত না, ফলে তাঁহারা ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কাল্পনিক ধারণা পোষণ করিতেন।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ]

গুরু গোবিন্দ ও গুরু নানক

কাল্পনিক প্রাচীন চিত্র

( প্রবাসী, ১৩৩৮ ফাল্গুন হইতে পুনর্মুদ্রিত )

ভারতীয় সৈন্য গোয়া অভিমুখে
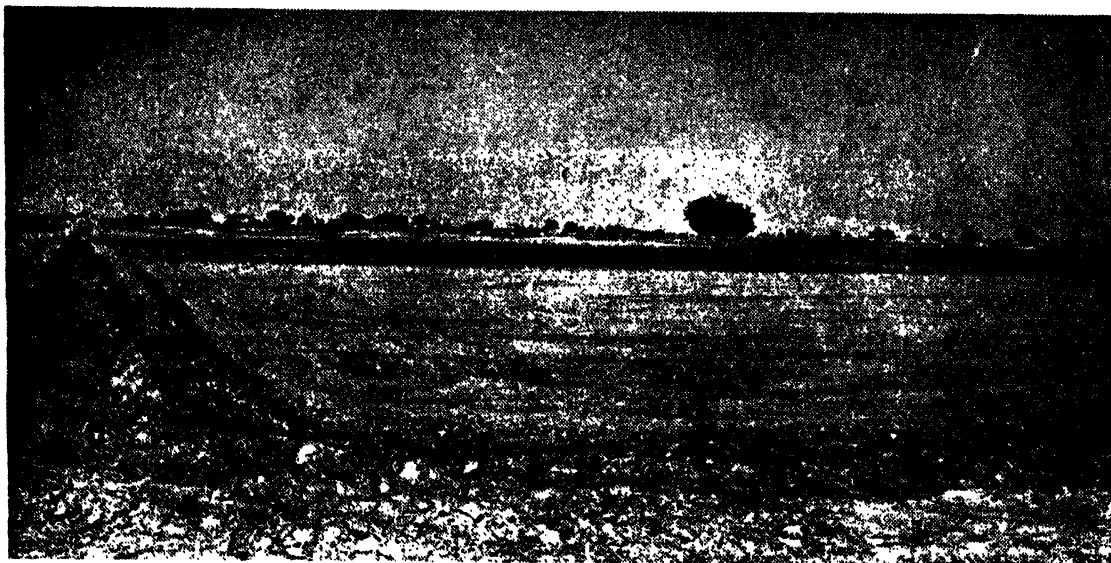
রাজস্থানের এক মরুময় ভূমিকে সম্প্রতি কর্ষণযোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে

এই দেশে আগমন করেন, তখন তিনি অলৌকিক শক্তি বলে তাঁহার একটি পা রাজধানীর উত্তর প্রান্তে রাখিয়া অন্য একটি পা ১৫ যোজন দূরবর্ত্তী একটি পর্ব্বতের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন।২ রাজধানীর উত্তর-প্রান্তস্থিত পদচিহ্নের উপর এখানকার নৃপতি কর্ত্তৃক একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপটি ৪০০ হাত উচ্চ। ইহা স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা মণ্ডিত এবং ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে সর্ব্ববিধ মূল্যবান্ পদার্থ ব্যবহৃত হইয়ছিল।

অভয়গিরি মঠ

স্তূপের নিকটে রাজা একটি মঠও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অভয়গিরি নামক এই মঠে ৫০০০ ভিক্ষু বাস করেন। ইহার অভ্যন্তরে বুদ্ধের জন্য যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্য শোভা পাইতেছে। সপ্ত ধাতু-নির্ম্মিত বিবিধ সামগ্রীও এই কক্ষে বিদ্যমান। এই কক্ষে ২০ হাত উচ্চ একটি সবুজবর্ণের বুদ্ধমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। এই মূর্ত্তিটি বিবিধ মূল্যবান্ ধাতুদ্রব্যাদিদ্বারা বিমণ্ডিত এবং ইহার শোভা ও গাম্ভীর্য্য বর্ণনাতীত। এই বুদ্ধমূর্ত্তির দক্ষিণ করতলে একটি অমূল্য মুক্তা দীপ্তি পাইতেছে। ফা-হিয়েন দেখিলেন—এই সবুজবর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে দাঁড়াইয়া একজন বণিক্ শ্বেত রেশমের পাখা ও অন্যান্য পূজোপকরণ নিবেদন করিতেছে; বণিক্ ভাবে অভিভূত এবং তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

এই দেশের একজন প্রাক্তন নৃপতি মধ্য ভারত হইতে একটি পত্রবৃক্ষের চারা আনাইয়া বুদ্ধমন্দিরের পার্শ্বে রোপণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহা ২০০ হাত উচ্চ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষটি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে রাজা ইহাকে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার নিম্নে ৮।৯ হাত পরিধিবিশিষ্ট একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বৃক্ষটি এই স্তম্ভে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং স্তম্ভের প্রান্তভাগে নূতন নূতন শিকড় গজাইয়া উঠিয়াছে। এই সকল শিকড়ের কোন কোনটির পরিধি প্রায় ৪ হাত। বর্ত্তমানে যদিও উক্ত স্তম্ভটির মধ্যভাগ ফাটিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা শিকড় দ্বারা সুদৃঢ় থাকায় ইহাকে সরানো হয় নাই। উক্ত বৃক্ষের নীচে একটি মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মঠে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছে এবং ভিক্ষু ও জনসাধারণ সকলেই অনলসভাবে ইহার সেবা করিয়া থাকে। নগরীর অভ্যন্তরে বুদ্ধের দন্তের উপর আর একটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয় বিহারই মূল্যবান্ ধাতব পদার্থরাজিদ্বারা সুসজ্জিত।

রাজার লোভ

রাজা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতেন, এবং রাজধানীস্থিত জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তিও ছিল অতি উচ্চস্তরের। রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর হইতে কখনও এদেশে দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, বিদ্রোহ বা কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের ধনাগারে বহু মূল্যবান্ প্রস্তর এবং অমূল্য মণি রহিয়াছে।

এক সময়ে এখানকার এক নৃপতি মঠ পরিদর্শনে আসিয়া এই সকল অমূল্য রত্নসম্ভার দেখিতে পান। ইহাতে রাজার মনে লোভ জন্মে এবং তিনি বলপূর্ব্বক ঐগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই রাজার মনে সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং তিনি মঠে গিয়া শ্রমণদের পদতলে পতিত হইয়া এইরূপ অন্যায় চিন্তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাজা নিজের লোভের কথা প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রমণদিগকে অনুরোধ করেন—তখন হইতে যেন এরূপ নিয়ম করা হয় যে, ভবিষ্যতে কোন রাজা এই সকল রত্নসম্ভার দেখিতে পারিবেন না। যে সকল ভিক্ষু অন্ততঃ ৪০ বৎসর মঠে বাস করেন নাই, তাঁহাদিগকেও যেন এইগুলি দেখিতে দেওয়া না হয়।

রাজধানী

এই রাজধানীতে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত বৈশ্য এবং বিদেশী বণিক্ বাস করেন। ইহাদের বাড়ীগুলি প্রাসাদতুল্য এবং মনোরম। এখানকার ছোট-বড় সকল রাস্তাই পরিস্কৃত রাখা হয়। বড় বড় রাস্তার চৌমাথাগুলিতে এক-একটি সভাগৃহ নির্ম্মিত আছে। প্রতি মাসের ৮ম, ১৪শ এবং ১৫শ দিবসে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা-পূর্ণিমায়?) এই সকল সভাগৃহে কার্পেট বিছানো হয় এবং দূরদেশাগত শ্রমণেরা এখানে আসিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

সাধারণ খাদ্য-ভাণ্ডার

জনশ্রুতি হইতে জানা যায়, এই রাজ্যে ৬০ হাজারের মত বৌদ্ধ-ভিক্ষু আছেন। ইহারা সকলেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত রাজা নিজেও অন্যান্য স্থানে আরও ৪।৫ হাজার ভিক্ষুর

২। এখানে পা শব্দটি নিশ্চয়ই গৌণার্থে প্রযুক্ত। তাৎপর্য্য এই যে, নগরীর উত্তরপ্রান্তে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহার শিষ্যদের জন্য একটি মঠের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবার পর পুনরায় ১৫ যোজন দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের উপর আর একটি মঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মানুষ যেমন নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকে, বৌদ্ধেরাও তেমনি এই দুইটি মঠে আশ্রয়লাভ করিত বলিয়াই মঠ দুইটিকে তাঁহার পা (বা পদচিহ্ন) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জন্য আহার্য্যের ব্যবস্থা করেন। যখন ভিক্ষুদের প্রয়োজন হয়, তখনই তাঁহারা বৃহৎ ভিক্ষাপাত্র লইয়া বহির্গত হন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে উহা খাদ্যরাশিদ্বারা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসেন।

ঘোষণা

প্রতি বৎসর তৃতীয় (আষাঢ় ?) মাসের মধ্যভাগে বুদ্ধের দন্ত বহির্গত করা হয়। এই উৎসবের ১০ দিন পূর্ব্বে রাজা একটি সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে একজন লোককে বসাইয়া প্রচারোদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই লোকটি রাজকীয় পোশাক পরিধানপূর্ব্বক ঢক্কানিনাদ সহযোগে ঘোষণা করিতে থাকে—

"বোধিসত্ত্ব তিনটি অসংখ্যেয় কল্পে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি রাজত্ব, রাজধানী, এমন কি পত্নী ও পুত্রকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। নিজের চক্ষু উৎপাটন করিয়া অপরকে দিয়াছেন। একটি কপোতকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ দেহমাংস উৎসর্গ করিয়াছেন। স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া উহা ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষা দিয়াছেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নিজ দেহ উৎসর্গ করিয়াছেন। নিজ দেহের মজ্জা এবং মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পরের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই ভাবে অসংখ্য উপায়ে তিনি জীবজগতের কল্যাণের জন্য নিজে দুঃখবরণ করিয়াছেন। বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি ৪৯ বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন ধর্ম্ম। তাহারই ফলে দুঃখীদের দুঃখ দূর হইয়াছে এবং বিধর্ম্মীরা পাইয়াছে ধর্ম্মের আস্বাদ।

"জীবজগতে ধর্ম্মপ্রচার সমাপ্ত করিয়া তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। সেই সময় হইতে ১৪৯৭ বৎসর৩ ধরিয়া জগতের আলো নির্ব্বাপিত আছে; এবং দীর্ঘকাল যাবৎ মানুষ নানাবিধ দুঃখভোগ করিতেছে।

"আজ হইতে ১০ দিন পর বুদ্ধের দন্ত সর্ব্বসমক্ষে আনীত হইবে। উহা স্থাপন করা হইবে অভয়গিরি বিহারে। এই উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ছোট-বড় প্রতিটি রাস্তা পরিষ্কার এবং সুসজ্জিত করেন এবং বুদ্ধের অর্চ্চনার জন্য প্রচুর পরিমাণে পুষ্পধূপাদি লইয়া আসেন।"

শোভাযাত্রা

উল্লিখিত ঘোষণার পর রাজা বোধিসত্ত্বের ৫০০টি বিভিন্ন আকৃতি এমনভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাস্তার উভয়পার্শ্বে স্থাপন করেন যে, মনে হয় যেন ইঁহারা প্রত্যেকেই জীবিত। কোথাও থাকে তাঁহার সুদান (সুদত্ত) রূপ, কোথাও সামরূপ। কোথাও তিনি যূথ-পতিরূপে, আবার কোথাও বা হরিণ বা অশ্বরূপে স্থাপিত হন।

এইরূপ নগর-সজ্জার পর বুদ্ধের দন্তসহ একটি শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া রাস্তাগুলির মধ্যস্থল দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে সর্ব্বত্র ইহার উপর বিবিধ উপহার নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই ভাবে ইহা অভয়গিরি বিহারে পৌঁছে। সেখানে শ্রমণেরা অন্যান্য লোকজনসহ সমবেত থাকেন। তাঁহারা ধূপ-দীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া বিধি-অনুসারে দিবারাত্রি অনবরত পূজার্চ্চনা করিতে থাকেন। নয় দিন ধরিয়া এইরূপ পূজা চলিবার পর পুনরায় ইহাকে রাজধানীস্থিত বিহারে লইয়া যাওয়া হয়। উপবাসের দিনগুলিতে উক্ত বিহারের দ্বার উন্মুক্ত থাকে এবং যথাবিধি উৎসব-সহকারে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

ধর্ম্মগুপ্ত

অভয়গিরি মঠের পূর্ব্বদিকে ৪০ লি দূরে ক্ষুদ্র একটি পর্ব্বতের উপর আর একটি মঠ আছে। এই মঠের নাম 'চৈত্য'। এখানে দুই হাজারের মত ভিক্ষু বাস করেন। এই চৈত্যে ধর্ম্মগুপ্ত নামে একজন মহাজ্ঞানী শ্রমণ বাস করেন। তিনি ৪০ বৎসরের অধিককাল যাবৎ একটি শিলাগৃহে বাস করিয়া আসিতেছেন। মৃদুতাগুণে তিনি এতই ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার সম্মুখে সর্প ও ভেক পরস্পরকে হিংসা না করিয়া একই কক্ষে বাস করে।

মহাবিহার

নগরীর দক্ষিণ দিকে ৭ লি দূরে মহাবিহার নামে একটি বিহার আছে। এখানে ৩০০০ ভিক্ষু বাস করেন। এই মঠে একজন পরম ধার্ম্মিক, অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ, মহা-পণ্ডিত শ্রমণ অবস্থান করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সদ্‌গুণাবলীর জন্য লোকে তাঁহাকে অর্হৎ বলিয়া থাকে। এই ব্যক্তির মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসেন। নৃপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রমণেরা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, ইনি একজন অর্হৎ। অতঃপর ইনি দেহত্যাগ করিলে অর্হৎদের মতই ইঁহার শবদেহের সৎকার করা হইয়াছিল।

৩। বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের পর হইতে ফা-হিয়েনের সময় পর্য্যন্ত এত বেশী বৎসর হয় না, সুতরাং এখানে বৎসরের সংখ্যাটি নিশ্চয়ই ভুল।

### অর্হতের শবদাহ

উল্লিখিত বিহারের পূর্ব্ব দিকে ৪।৫ লি দূরে একটি জ্বালানী-কাষ্ঠের স্তূপ রাখা হইল। এই স্তূপটি দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং উচ্চতায় প্রত্যেক দিকেই ৩০ হাতের অধিক ছিল। স্তূপের উপর চন্দন, অগুরু এবং অন্যান্য সুগন্ধি-কাষ্ঠ স্থাপন করা হইয়াছিল। স্তূপে উঠানামা করিবার জন্য ইহার চারিদিকে সিঁড়িসমূহ রাখা হইল। রেশমের ন্যায় পরিস্কৃত শুভ্র বস্ত্রদ্বারা শবটিকে আচ্ছাদন করা হইল। শব বহনের জন্য যে বৃহৎ শকটটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সর্প অথবা মৎস্যের চিত্র ছিল না।

শবদাহের সময় চারিদিক্ হইতে বহুসংখ্যক নৃপতি ও সাধারণ লোক আসিয়া শবের উদ্দেশে পুষ্প-ধূপাদি অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। শবটিকে শ্মশানে লইয়া যাওয়ার সময়ও রাজা নিজে তাহাতে পুষ্প ও ধূপ নিবেদন করিয়াছিলেন। পুষ্পধূপাদি নিবেদনের পর শবাধারটিকে কাষ্ঠ-স্তূপের উপর স্থাপন করিয়া সমগ্র কাষ্ঠ-স্তূপের উপর সুগন্ধি তৈল সেচনপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সমবেত সকলেই পরম ভক্তির সহিত নিজ নিজ উত্তরীয়, ছত্র ও ব্যজন দূর হইতে চিতাগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; উদ্দেশ্য অগ্নি-প্রজ্বালনে সাহায্য করা। দাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে তাহারা অস্থিসংগ্রহকরতঃ তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিবার জন্য চলিয়া গেল। এই শ্রমণের জীবদ্দশায় ফা-হিয়েন তথায় আসিতে পারেন নাই; তিনি কেবলমাত্র এই দাহকার্য্যটিই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

### মহাসভা ও ভূমিদান

এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী নৃপতি একটি নূতন বিহার নির্ম্মাণের জন্য পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে এক মহাসভা আহ্বান করেন। ভিক্ষুদিগকে একবেলা ভাত খাওয়াইয়া তিনি তাহাদিগকে বিবিধ উপহার প্রদান করিলেন। এক জোড়া বাছাই করা ষাঁড় সংগ্রহ করিয়া তাহাদের শৃঙ্গগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান্ ধাতুদ্বারা আবৃত করা হইল। অতঃপর একখানা সোনার লাঙ্গল আনিয়া রাজা স্বয়ং প্রস্তাবিত মন্দিরের চারদিক্ বেড়িয়া লাঙ্গল দ্বারা একটি রেখাপাত করিলেন। ইহা করা হইলে রাজা ধাতুর পাতে লিখিয়া এই অঞ্চলের এক বিরাট্ ভূখণ্ড তত্রত্য মনুষ্য ও গৃহাদি সহিত শ্রমণদিগকে দান করিলেন। দানপত্রে ইহাও লিখা হইল যে, অতঃপর নৃপতি বা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী বা অন্য কেহ এই দান পত্র অমান্য করিতে পারিবেন না।

### ভিক্ষাপাত্রের ইতিহাস

এই দেশে ফা-হিয়েন একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র প্রথমে ছিল বৈশালীতে এবং ইহা এখন আছে গান্ধারদেশে। কয়েকশত বৎসর পরে ইহা পশ্চিম তুর্কীস্থানে চলিয়া যাইবে। আরও কয়েকশত বৎসর পরে ইহা খোটানে, তৎপর আরও কয়েকশত বৎসর পরে হান (চীন) দেশে যাইবে। অবশেষে আরও কয়েকশত বৎসর পরে ইহা সিংহলে আসিবে এবং আরও কয়েকশত বৎসর পরে মধ্য ভারতে চলিয়া যাইবে। অতঃপর ইহা তুষিত স্বর্গে আরোহণ করিবে এবং মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ইহাকে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'শাক্যমুনি বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র আসিয়াছে'।[৪]

তিনি অন্যান্য দেবগণের সহিত এই ভিক্ষাপাত্রে সাত দিন ধরিয়া পুষ্প-ধূপাদি উপহার নিবেদন করিতে থাকিবেন। এইরূপ অর্চ্চনালাভের পর ইহা জম্বুদ্বীপে চলিয়া যাইবে এবং তথায় নাগরাজ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া নাগরাজের প্রাসাদে স্থানলাভ করিবে। মৈত্রেয়ের বুদ্ধত্বলাভের সময় উপস্থিত হইলে এই ভিক্ষাপাত্র চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বীণা (বিন্ধ্য?) পাহাড়ের শিখরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এই স্থান হইতেই ইহা প্রথম আসিয়াছিল।

মৈত্রেয়ের বুদ্ধত্বলাভের পর দেবতাদের চারিজন রাজা পুনরায় বুদ্ধ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। ভদ্রকল্পের সহস্র বুদ্ধ প্রত্যেকেই একই ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার করিবেন। এই ভিক্ষাপাত্রের তিরোধান ঘটিলে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মও ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে। এইভাবে ধর্ম্মের বিলুপ্তি ঘটিলে মানুষের আয়ুও কমিতে কমিতে পাঁচ বৎসরে আসিয়া পৌঁছিবে। এই পাঁচ বৎসর পরমায়ুর সময়েও অন্ন, ঘৃত, তৈল, প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব ঘটিবে এবং মানুষ অত্যন্ত পাপাচারী হইয়া উঠিবে। বৃক্ষ-তৃণাদি তাহাদের স্পর্শমাত্র তরবারি, গদা, প্রভৃতি অস্ত্রে পরিণত হইবে[৫] এবং এইগুলি দ্বারা

---

৪। ভিক্ষাপাত্রটি বিভিন্ন দেশে মনুষ্য কর্ত্তৃক নীত হইতে পারে, কিন্তু ইহার স্বর্গারোহণের কথাটি নিশ্চয়ই কাল্পনিক।

৫। মানুষের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব ঘটিলে তাহাদের নীতিজ্ঞানও নষ্ট হয় এবং তাহারা প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থসর্ব্বস্ব হইয়া পরস্পর হানাহানি করিয়া মরে। বৃক্ষতৃণাদি দ্রব্য তাহাদের স্পর্শমাত্র গদা তরবারি প্রভৃতিতে পরিণত হইবে— কথাটির তাৎপর্য্য সম্ভবতঃ এই যে, এই সময়ের মানুষ হাতের কাছে যাহা কিছু পাইবে, তাহা দ্বারাই মারণাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া অপর মানুষের বিনাশ-সাধনে যত্নশীল হইবে।

তাহারা পরস্পর হানাহানি করিয়া মরিবে। ইহাদের মধ্যে যে সকল ধার্ম্মিক লোক থাকিবেন, তাঁহারা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যাইবেন এবং দুর্ব্বৃত্তেরা ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন-করতঃ পরস্পর বলাবলি করিতে থাকিবেন :

"পূর্ব্বকালের লোকেরা অতি দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন, কিন্তু মানুষ অত্যন্ত পাপাচারী হইয়া উঠার ফলে বর্ত্তমানে তাহাদের পরমায়ু কমিয়া মাত্র পাঁচ বৎসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য—সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্ম্মাচরণ এবং সৎকার্য্যসাধনের দ্বারা হৃদয়ের প্রশস্ততা সম্পাদন, এইরূপে যদি মানুষ পুনরায় রীতিমত ধার্ম্মিক হইয়া উঠে তাহা হইলে পুনরায় তাহাদের আয়ুঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, এবং ক্রমে ইহা ৮০ হাজার বৎসরে পৌঁছিবে। মৈত্রেয় যখন পৃথিবীতে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিবেন, তখন তিনি প্রথমেই শাক্যমুনির অনুগত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিবেন ; কারণ ইঁহারা নিজ আত্মীয়বর্গকে ত্যাগ করতঃ ত্রয়ীর৬ আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচটি নিষিদ্ধ৭ এবং আটটি৮ পরিহার্য্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া মাত্র তিন জনের৯ উদ্দেশে উপহার নিবেদন করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাসী কর্ম্মবাদীদিগকেও উদ্ধার করিবেন।"

ফা-হিয়েন উল্লিখিত ভক্তের ভাষায় এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভক্ত বলিলেন যে, ইহা কোন সূত্র-গ্রন্থ হইতে গৃহীত নহে, তিনি কেবলমাত্র তাঁহার নিজের মনের কথাগুলিই বলিয়াছেন।

## পুস্তক সংগ্রহ

এই দেশে দুই বৎসর বাস করিয়া ফা-হিয়েন মহীশাসক-সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিনয়-পিটকের একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘাগম-সূত্র, সম্যুক্তাগম-সূত্র এবং সম্যুক্ত-সঞ্চয়পিটকের এক একখানা প্রতিলিপিও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ চীনদেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

## স্বদেশের পথে

উল্লিখিত সংস্কৃত পুস্তকগুলি সংগ্রহ করার পর একটি বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া ফা-হিয়েন স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উক্ত জাহাজে দুই শতাধিক লোক ছিল এবং বৃহৎ জাহাজটির সঙ্গে আর একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছিল ; উদ্দেশ্য—বড় জাহাজখানার কোন আকস্মিক বিপদ্ ঘটিলে লোকেরা ছোট জাহাজে আশ্রয় লইতে পারিবে।

অনুকূল বাতাস দেখিয়া তাঁহারা পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন ; কিন্তু তিন দিন চলিবার পর তাঁহাদিগকে এক প্রবল ঝটিকার সম্মুখীন হইতে হইল। ঝড়ের আঘাতে চড়ায় লাগিয়া বড় জাহাজখানিতে ফাটল দেখা দিল এবং জাহাজে প্রবল-বেগে জল ঢুকিতে লাগিল। বিপদ্ দেখিয়া নাবিকেরা সকলেই ছোট জাহাজে আশ্রয় লইবার জন্য ছুটিয়া চলিল। কিন্তু ছোট জাহাজের নাবিকেরা বহু লোকসমাগমে নিজেদেরও বিপদ্ ঘটিবে ভাবিয়া দড়িটি কাটিয়া দিল এবং বড় জাহাজের লোকেরা মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। জাহাজখানা যাহাতে অবিলম্বে ডুবিয়া না যায়, এই উদ্দেশ্যে তাহারা জাহাজের ভারী মালগুলি একে একে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ফা-হিয়েন নিজেও তাঁহার কলসী, স্নানাধার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। নাবিকেরা তাঁহার পুস্তক এবং বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিও ফেলিয়া দিতে পারে—এইরূপ আশঙ্কায় তিনি কেবলই কোয়ান-শি-ইম্১০ এর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহের জন্য বহু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ ভ্রমণ করিয়াছি। তোমার লোকাতীত শক্তিবলে আমাকে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দাও।"

দিনের পর দিন এই প্রবল ঝড় দিবারাত্রি ব্যাপিয়া বহিতে লাগিল। ত্রয়োদশ দিবসে জাহাজখানা একটি দ্বীপের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে ফাটলটি বন্ধ করতঃ পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করা হইল।

সমুদ্রে জলদস্যুরা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকারের পরিণাম—নিশ্চিত মৃত্যু। সমুদ্রের বিস্তার অপরিসীম। স্বাভাবিক ভাবে তাহাতে দিঙ্-নির্ণয় করা অসম্ভব। কেবলমাত্র সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দেখিয়া তবেই দিঙ্-নির্ণয় করা সম্ভব। বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার দরুন অন্ধকার থাকিলে নাবিকেরা জাহাজ চালান বন্ধ রাখে, এবং ঝড়ের বেগে জাহাজ অনির্দ্দিষ্ট

৬। ত্রিপিটক।

৭। সম্ভবতঃ মিথ্যাভাষণ, চৌর্য্য, জীবহিংসা, প্রভৃতি (পঞ্চশীলের বিপরীত) পাঁচটির কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

৮। অসম্যগ্-দৃষ্টি, অসৎধর্ম্ম, অসদ্‌বার্ত্তা, অসৎ-সঙ্কল্প, অসাধু-প্রচেষ্টা, অসৎ-জীবন, অসৎ-স্মৃতি এবং অসৎ সমাধি - এই আটটির কথাই সম্ভবতঃ বলা হইয়াছে।

৯। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ?

১০। অবলোকিতেশ্বর। (The Chinese name is a mistranslation of the Sanskrit word Avalokitesvara—James Legge : The Travels of Fa-Hien : Page- 46, foot note-5.)

দিকে চলিয়া যায়। অন্ধকার রাত্রিতে কেবলমাত্র দেখা যায়—উন্নত ঢেউগুলি একটির উপর আর একটি আছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং তখনকার মত সামুদ্রিক জন্তুগুলির দেহস্থিত আলোকরাশি স্থানে স্থানে অগ্নির মত জ্বলিতেছে।

এই অবস্থায় কোন্ দিকে যাইতেছে—বুঝিতে না পারিয়া নাবিকেরা ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। জাহাজের তলদেশে সমুদ্র ছিল অত্যন্ত গভীর এবং কোথাও নঙর করিবার মত উপযুক্ত স্থান তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অবশেষে আকাশ পরিষ্কার হইলে তাহারা দিঙ্-নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া যথাভিমত পথে যাত্রা করিল। জাহাজ যদি কোন অদৃশ্য পর্ব্বতের উপর আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে আর তাহাদের রক্ষার কোন উপায় থাকিত না।

এই ভাবে ৯০ দিনেরও অধিক চলিয়া তাঁহারা যবদ্বীপ নামক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অত্যধিক প্রাবল্য ছিল, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। এখানে ৫ মাস থাকিয়া ফা-হিয়েন অন্য একখানা জাহাজে চড়িয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। এই জাহাজেও দুই শতের অধিক লোক ছিল। তাঁহারা ৫০ দিনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যসামগ্রী লইয়া চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিবসে যাত্রা করিলেন।

ফা-হিয়েন জাহাজে চড়িয়া 'কোয়াং চোঃ'-এর উদ্দেশে উত্তর-পুর্ব্বদিকে চলিতে লাগিলেন। মাসাধিক কাল পরে একদিন রাত্রিকালে দ্বিতীয় বারের ঘণ্টা বাজিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং নাবিকেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ফা-হিয়েন এবারও কোয়ান-শি-ইন্ ও চীনদেশীয় শ্রমণদের উদ্দেশে আত্মনিবেদন করিলেন। এবং তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে রহিলেন।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা[১১] সম্মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"এই শ্রমণটিকে জাহাজে তোলার ফলেই আমাদের পুনঃ পুনঃ বিপদ্ ঘটিতেছে। ইহাকে কোন একটা দ্বীপে নামাইয়া দেওয়া যাক। একজন লোকের জন্য এতগুলি মানুষ ধ্বংস হইবে—ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।"

ফা-হিয়েনের একজন সমর্থক বলিল—"তোমরা যদি এই ভিক্ষুটিকে নামাইয়া দিতে চাও তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও নামাইয়া দাও, আর যদি আমাকে নামাইতে না চাও, তাহা হইলে আমাকে হত্যা কর। যদি তোমরা এই ভিক্ষুকে নামাইয়া দাও তাহা হইলে চীনদেশে পৌঁছিয়া আমি রাজাকে ইহা জানাইব। রাজা নিজেও বৌধর্ম্মাবলম্বী এবং তিনি ভিক্ষুদিগকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখেন।" এই কথা শুনিয়া বণিকেরা দ্বিধাগ্রস্ত হইল এবং ফা-হিয়েন জাহাজেই রহিলেন।

এই সময়ে আকাশ অধিকতর মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকার হইল এবং নাবিকেরা পথ ভুল করিতে লাগিল। এইভাবে ৭০ দিনেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হইল এবং খাদ্য ও পানীয় প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল। নাবিকেরা সমুদ্রের লোনাজলদ্বারা রান্না করিতে লাগিল এবং পানীয় জল জনপ্রতি দৈনিক মাত্র ২ পাইণ্ট করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিল। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও শীঘ্রই খাদ্য ও পানীয় শেষ হইল এবং নাবিকেরা সম্মিলিত হইয়া বলিল—"স্বাভাবিক নিয়মে পথ চলিলে যতদিনে আমরা কোয়াংচোতে গিয়া পৌঁছিতাম, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। নিশ্চয়ই আমরা ভুল পথে চলিয়াছি।"

তখনই তাহারা জাহাজ ফিরাইয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল এবং দিবারাত্রি জাহাজ চালাইয়া বার দিন পর 'লাও' পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল। এই স্থানটি চাংকোয়াং প্রদেশের সীমান্তবর্ত্তী। এখান হইতে তাহারা প্রভূত পরিমাণ বিশুদ্ধ জল ও ফলমূল সংগ্রহ করিল। তাহাদের উপর দিয়া বহু বিপদ্ ও অনেক দুঃখ-কষ্ট গিয়াছে এবং দীর্ঘকাল তাহারা দারুণ দুর্ভাবনায় কাটাইয়াছে। এক্ষণে এই তীরভূমিতে আসিয়া অন্যান্য ফলমূলের সহিত লেই ও কোহ[১২] দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, চীনদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এখানকার কোন অধিবাসীর সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ না হওয়ায় স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান তাহারা বুঝিতে পারিল না। কেহ কেহ বলিল—তাহারা কোয়াংচোতে আসিয়া পৌঁছে নাই; আবার অন্যেরা বলিল—তাহারা উহা অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

১১। ফা-হিয়েন যে সময়ের কথা বলিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং এই ব্রাহ্মণ শব্দদ্বারা লেখক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বৈশ্য ব্যবসায়ীদের কথাই বলিয়াছেন।

১২। লেই ও কোহ দুইটি বিভিন্ন প্রকার ফল বা সব্জীর নাম।

এইভাবে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া তাহাদের কয়েকজন একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া লোকালয়ের সন্ধানে যাত্রা করিল, উদ্দেশ্য—কোন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা স্থানটির পরিচয় জানিতে পারিবে। অবিলম্বে দুইজন শিকারীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইলে উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহারা জাহাজে ফিরিয়া আসিল এবং তাহাদের সহিত আলাপের জন্য ফা-হিয়েনকে দোভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত করিল।

ফা-হিয়েন প্রথমে শিকারীদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া পরিষ্কার ভাষায় তাহাদিগকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের পরিচয় কি?" তাহারা উত্তর করিল—"আমরা বুদ্ধের শিষ্য।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পর্ব্বতে তোমরা কিসের অনুসন্ধান করিতেছ?"

তাহারা মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিল১৩ এবং বলিল—"আগামীকল্য সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস। আমরা বুদ্ধের নিকট নিবেদন করিবার জন্য কিছু পিচ-ফলের অনুন্ধান করিতেছিলাম।"

ফা-হিয়েন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা কোন্ দেশ?" তাহারা উত্তর করিল—"ইহা চাংকোয়াং প্রদেশের সীমান্তভূমি—সিন (চীন?) রাজের শাসিত সিংচো রাজ্যের একাংশ।"

এই সংবাদ শুনিয়া বণিকেরা এতই আনন্দিত হইল যে, তৎক্ষণাৎ তাহারা নিজেদের অর্থ ও দ্রব্যাদির একাংশ-সহ কয়েকজন লোককে চাংকোয়াং নগরে পাঠাইল।

রাজপ্রতিনিধি 'লি-ই'র ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস। তিনি যখন শুনিলেন যে, একজন শ্রমণ জাহাজে করিয়া বহু পুস্তক ও বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দেহরক্ষীদলসহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং পুস্তক ও মূর্ত্তিগুলি লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর বণিকেরা 'ইয়াংচো' অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফা-হিয়েন সিংচোতে উপস্থিত হইলে একটি শীত ও একটি গ্রীষ্মকাল তথায় অবস্থান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল।

গ্রীষ্মাবসানে ফা-হিয়েন চাংগণ যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি স্বকীয় আচার্য্যগণের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া আছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য হাতে থাকায় তাঁহাকে দক্ষিণাভিমুখে রাজধানীতে যাইতে হইল। সেখানে ধর্ম্মগুরুদের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি তাঁহার সংগৃহীত সূত্র ও বিনয়ের প্রতিলিপিগুলি প্রদর্শন করিলেন।

চাংগণ হইতে যাত্রা করিয়া মধ্যভারতে পৌঁছিতে ফা-হিয়েনের ৬ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করায় তাঁহার আরও ৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তনকালেও সিংচোতে পৌঁছা পর্য্যন্ত তাঁহার আরও ৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি যে সকল দেশ ভ্রমণ করেন, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ।১৪

১৩। নাবিকগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া শিকারীরা সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিল যে, জলদস্যুরা তাহাদিগকে ধরিয়াছে। অবশেষে দোভাষীর পোশাক দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে বৌদ্ধশ্রমণ বলিয়া চিনিতে পারে এবং শ্রমণের সহানুভূতি উৎপাদনের জন্য নিজাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেয়।

১৪। মূল চীনাভাষার গ্রন্থে ইহার পরেও আরও কিছু কথা লেখা আছে, কিন্তু ঐ অংশে ভ্রমণবৃত্তান্ত না থাকায় আমরা আর তাহার অনুবাদ করিলাম না। আমরা যে অংশের অনুবাদে বিরত রহিলাম, তাহাতে আছে শুধু ফা-হিয়েনের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগের বর্ণনা এবং ফা-হিয়েনের বর্ণনা ও ভ্রমণক্লেশের জন্য তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশংসামূলক কথা।
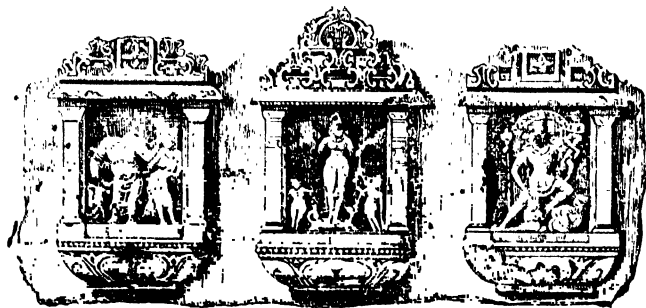
# মিথ্যার সাফাই

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়

মানব-বিদ্বেষী দার্শনিক ডায়োজেনিস্ একবার লণ্ঠন-হস্তে অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন, কোথাও একটি সত্যকার সাধু-সজ্জন ব্যক্তি খুঁজিয়া পান কিনা দেখিতে। বলা বাহুল্য, তাঁহার সেই অভিযান নিস্ফল হয়াছিল। সে আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। কিন্তু এতদিনেও লোকের মৌলিক বৃত্তির তেমন কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি John Edward Raid নামে একজন নিষ্ঠাবান গবেষক (মিথ্যা কথা ধরার ব্যাপারে ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা) আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিকাগোর পঁচিশ হাজার শ্রমিককে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে একজনও এমন লোক পান নাই যাহাকে সম্পূর্ণ সত্যবাদী বলা যাইতে পারে।

আমরা সকলেই মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি; কারণ সকল ব্যাপারেরই যেরূপ ছবিটা আমাদের ভাল লাগে এবং অপরেরও ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, আমরা সেইরূপেই সাধারণতঃ তাহা অপরকে পরিবেশন করিতে চাই। কয়েক বছর আগে Alfred Politz নামে একজন জনমত-পরীক্ষক একটি কৌতুকপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কেহ যদি বহুসংখ্যক লোককে তাঁহাদের শিক্ষার বহরের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, এত লোক নিজেদেরে স্নাতক (graduate) বলিয়া পরিচয় দেন, বাস্তবিক স্নাতক-সংখ্যা যাহার অর্দ্ধেকও নয়।

Alfred Politz ও অন্যান্য গবেষকদের পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, বহু লোকই দাবি করেন, তাঁহারা এত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন যতসংখ্যক পুস্তক প্রকাশিতই হয় নাই; আবার কেহ কেহ দাবি করেন তাঁহারা উচ্চাঙ্গের রেকর্ড এত শুনিয়াছেন যত রেকর্ড আদৌ বাজারে বাহির হয় নাই। মদ্যপানের বিষয় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত; একটি অঞ্চলের সমস্ত মদ্যপায়ীদেরে যদি তাঁহাদের মদ্যপানের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করেন তবে দেখিবেন তাঁহারা সকলে মিলিয়া যেটুকু মদ্যপান করেন বলিয়া স্বীকার করেন, শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যবিক্রয়ের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। Politz আরও দেখিয়াছেন, নিউ ইয়র্কে যত লোক টাইমস্ পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক বলিয়া দাবি করেন, উক্ত পত্রিকার প্রকাশকদের হিসাবের খাতায় গ্রাহকসংখ্যা মাত্র তাহার এক-তৃতীয়াংশ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত যে অসত্য লুকাইয়া আছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। মোটর-যানের মালিকেরা অনেকেই সাধারণতঃ যত পেট্রোল খরচ করেন বলিয়া বলেন, বাস্তবিক খরচ হয় তাহা অপেক্ষা আনুমানিক এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত কম। কোন কোন শহরের পুলিস কর্ম্মচারীদের অভিজ্ঞতা এই যে, কাহারও বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতি হইলে গৃহস্বামী সাধারণতঃ লোকসানের পরিমাণ বাড়াইয়া বলিয়া থাকেন, কারণ লোকসান সামান্য হইলে লোকে ভাবিবে তাঁহার গৃহে ধন-সম্পত্তি তেমন কিছুই থাকে না। তাহা স্বীকার করা গৃহস্বামীর পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কারণ।

মিথ্যাভাষণ সাধারণতঃ দুই প্রকারের। সচরাচর যে মিথ্যা আমরা দেখিতে পাই তাহার মূলে অনেক ক্ষেত্রেই কোন অনিষ্ট বুদ্ধি নাই (benign lie); এরূপ মিথ্যা-ভাষণে বক্তা একটু নির্দ্দোষ আনন্দ পান মাত্র। যেমন ধরুন, কেনেডি সাহেব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকেই দাবি করিতে লাগিলেন তাঁহারা কেনেডি সাহেবের সহিত এক সঙ্গে নৌবহরে কাজ করিয়াছেন। এইরূপে কেনেডি সাহেবের নাবিক-জীবনের সহকর্ম্মীর সংখ্যা দাঁড়াইল এমন, যাহা দ্বারা একটি বিরাট নৌবাহিনীর কাজ চলিয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকারের মিথ্যাভাষণ অনিষ্ট বুদ্ধিপ্রণোদিত (malignment lie)। ইহার মূলে দুষ্টবুদ্ধিটি হইতেছে অপরের ক্ষতি করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া। বিষয়-সম্পত্তির দালাল ও যৌথ ব্যবসায়ের উদ্যোক্তারা অনেক সময় এরূপ মিথ্যার আশ্রয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ লোকসানের সম্ভাবনার দিকটা একেবারে চাপিয়া গিয়া কেবলমাত্র লাভের দিকটাই ফলাও করিয়া দেখান। নিজের কাজ গুছাইয়া লওয়ার পক্ষে ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। এরূপ মিথ্যার চরম অভিব্যক্তি হয় কোন কোন

দেশনেতার আচরণে—যাহার ফলে দেশ উচ্ছন্ন ও জাতি ধ্বংস হইয়া যায়।

দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত মিথ্যাভাষণ ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া একটি দুরন্ত ব্যাধিতে পরিণত হয়। মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকেরা ইহাকে pseudologia **phantastica** বলিয়া থাকেন এবং একটি সাংঘাতিক ব্যাধি বলিয়া মনে করেন। এই ব্যাধি-পীড়িত লোকদের বাস্তব-ভীতি এত প্রচণ্ড যে, তাহারা কখনও তাহার সম্মুখীন হইতে চাহে না; সর্ব্বদাই একটি প্রতারণার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। একটা সময় আসে যখন তাহারা সত্যাসত্যের বিভেদও বুঝিতে পারে না। মাদকদ্রব্য বা নিদ্রাকর্ষক ঔষধের ( narcotics ) প্রতি আত্মঘাতী আশক্তির মত মিথ্যা-ভাষণের আকর্ষণও তাহাদিগকে বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। অতি সামান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও তাহারা এত বিরাট মিথ্যার আশ্রয় লয় যে, তাহাতে আশ্চর্য্য না হইয়া পারা যায় না।

পেশাদার প্রতারকদের মধ্যে অনেকেই এই পর্য্যায়ে পড়ে। বুদ্ধি ও দক্ষতার সাহায্যে তাহারা জীবনে আরও অনেক বেশী সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিত, কিন্তু এই কালব্যাধির কবলে পড়িয়া তাহারা সম্মুখে প্রতারণা ছাড়া আর কোন পথ দেখিতে পায় না। এমনও দেখা গিয়াছে যেখানে সত্যভাষণে তাহাদের নিজেদেরই সুবিধা হইত সেখানেও তাহারা মিথ্যারই আশ্রয় লইয়াছে।

এক জাতীয় মিথ্যা কথা অনেকেই সচরাচর বলিয়া থাকেন—যাহা আসলে একটি নির্দ্দোষ প্রগল্‌ভতা ছাড়া আর কিছুই নয়; ইংরেজীতে ইহাকেই 'white lie' বলে। ইহা একপ্রকার সৌজন্য-সংযুক্ত কপটতা—সামান্য অতিশয়োক্তির দ্বারা নিজের গর্ব্ববোধে একটু সুড়সুড়ি দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রেই আবার অপরকে কোন মানসিক আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্যও ইহা একটি সাধু প্রচেষ্টা।

Dr. Benjamin Karpman ওয়াশিংটনের একজন প্রধান মানসিক ব্যাধি চিকিৎসক। তাঁহার মতে আধুনিক জীবনযাত্রায় একটু-আধটু মৌখিক প্রবঞ্চনা প্রায় অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্জ্জলা সত্যাশ্রয়ীকে একমাত্র বিশৃঙ্খলার মধ্যেই জীবন কাটাইতে হয়। তিনি বলেন, আপনি একজনের বিষয় মনে মনে যাহা ভাবেন, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া তাহা যদি তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলেন এবং তিনিও যদি সরাসরি তাহার পাল্টা জবাব দেন তবে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

বাজারে বহুপ্রকারের মোটর গাড়ী বিক্রয় হয়। সব গাড়ীরই পরস্পরের তুলনায় কিছু সুবিধা অসুবিধা উভয়ই আছে। আপনি একরকমের গাড়ীর বিক্রেতা। আপনি যদি নিজের গাড়ীর অসুবিধার কথাগুলিই অকপটে বলিয়া যান এবং অন্য কোম্পানীর গাড়ীগুলির পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করিতে থাকেন তবে আপনার খোরাক জুটিবে কি? নিজের মক্কেলের জন্য লড়িতে গিয়া বিচারালয়ে খুব কম আইন ব্যবসায়ীই কেবলমাত্র নির্জ্জলা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া মকদ্দমা জিতিবার আশা পোষণ করেন। তাঁহার মক্কেলের স্বপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা বেশ সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া পেশ করা তাঁহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারের মধ্যে বলিয়া গণ্য করেন। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে আপনি একটি নির্ব্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছেন। আপনি যদি একান্ত বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের গুণাবলীর বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হন এবং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর গুণাবলীর ফিরিস্তিই কেবল দিতে থাকেন—তবে ফলে আর যাহাই হউক, আপনার জয়ের পথ যে সুগম হইবে না তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিবে কি?

বাস্তবিক একটু-আধটু ছোট-খাট মিথ্যার সাহায্যে যে আমাদের জীবনযাত্রার পথ কেবল সুগম হয় তাহাই নয়, সমাজে বাস করিতে গেলে মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় পড়িতে হয় যে সত্য ভাষণ তখন অত্যন্ত রূঢ় ও মর্ম্মান্তিক হইয়া পড়ে। ধরুন, আপনার একটি বন্ধু সম্প্রতি বিবাহ করিয়া নূতন সংসার পাতিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী আনকোরা কলেজের মেয়ে—ঘর-গৃহস্থালিতে একেবারে অনভিজ্ঞা। বন্ধুটি একদিন আপনাদের কয়েকজনকে সপরিবারে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বাড়ীতে একটিমাত্র ছোকরা চাকর; সে রান্না-বান্না ও বাসন মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া হাট-বাজার সবই একা করে। নব-দম্পতির ছোট সংসার তাহাতেই চলিয়া যায়; তাঁহারা এখন নূতন প্রেমে মশগুল; খাওয়া-দাওয়াটা তাঁহাদের কাছে অতি গৌণ ব্যাপার। আজ আপনারা ৪ জন বন্ধু, আপনাদের প্রত্যেকের স্ত্রী এবং তার মধ্যে ২ জনের কোলে ২টি শিশু,—সকলে মিলিয়া দশজন অতিথির সমাগম হইল। বন্ধুর বাড়ীতে পদার্পণ করা মাত্রই রন্ধনশালা হইতে একটা কটু গন্ধ আসিয়া আপনাদের নাকে প্রবেশ করিল; আপনারা একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন; বুঝিলেন, ভোজন ব্যাপারে আজ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নয়। তাহার উপর সেদিন ছিল দুঃসহ গরম; বন্ধুর বাড়ীতে

বিজলীর ব্যবস্থা নাই, হাত-পাখারও অভাব ;—একখানা মাত্র হাত-পাখা তাহা রান্নাঘরে ও বসিবার ঘরে টানা-পোড়েন করিতে লাগিল, কারণ রান্নাঘরেও উনান রাঁকিয়া বসিয়াছে, ব্যজন ব্যতিরেকে বহ্নিসঞ্চার হইতেছে না। এদিকে শিশুরা গরমে কান্না জুড়িয়া দিল ; অথচ আহার্য্য প্রস্তুত হইতে তখনও বেশ দেরি। বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর আন্তরিকতা ও আপ্যায়নের অভাব নাই। আপনাদের তৃপ্তি বিধানের জন্য বন্ধু আজ নিজে বাজারে গিয়া প্রচুর অর্থব্যয়ে ভাল ভাল মাছ, মাংস, তরকারি, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি যোগাড় করিয়াছেন। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে একটু তাসেরও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নব-দম্পতির অনভিজ্ঞতার জন্য এত আয়োজন প্রায় সবই পণ্ড হইবার অবস্থা। ভোজনে বসিয়া কোন কোন আহার্য্য রন্ধনের ত্রুটিতে আপনারা গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ লুকাইয়া নিজ নিজ ঘড়ি দেখিতে লাগিলেন—কতক্ষণে উঠা যায়। কিন্তু সত্য সত্যই যখন বিদায়ের সময় আসিল, তখন কি আপনারা এই বলিয়া বিদায় লইলেন যে আহার্য্য সামগ্রী গলাধঃকরণ করিতে আপনাদের খুব কষ্ট হইয়াছে? শিষ্টতার খাতিরে নিশ্চয়ই আপনারা তাঁহার সমস্ত আয়োজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন ; বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী কোন ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করা মাত্র আপনারা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। এখানে এই যে একটু সামান্য মিথ্যার আশ্রয় লইলেন, ইহা কেবল নির্দ্দোষ নয়, ইহা সৌজন্যপ্রসূত এবং সমাজের সুখ-শান্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। আপনারা সকলেই জানেন, আপনাদের সহায়তায় এই নব-দম্পতিও অচিরেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া নিপুণ সংসারী হইবেন। কিন্তু আজ যদি আপনারা কেবল সত্যের দিকই দেখিতেন এবং আপনারা যে অসুবিধা ভোগ করিলেন সেই কথাটাই বুঝাইয়া দিয়া আসিতেন তাহাতে তাঁহারা যে মানসিক আঘাত পাইতেন তাহার ফলে তাঁহাদের পক্ষে সুখের সংসার রচনা করা কোন দিনই সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া সহানুভূতিশীল চিকিৎসককেও একটু-আধটু মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। তাহার সম্মুখে মৃত্যুবিভীষিকার ছবি সুস্পষ্ট করিয়া ধরিলে তাহার ক্লেশের মাত্রা সাধারণতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; কাজেই তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত আশা-ভরসা দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তাহার ক্লেশ লাঘবের চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ। ইহার মধ্যে একটু কপটতা থাকিলেও তাহা সৌজন্যপ্রসূত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ Dr. Erving Goffman খোলাখুলিই বলেন, সমাজে নির্ব্বিবাদে বাস করিবার যোগ্য হইতে হইলে শিশুদের একটু একটু মিথ্যাভাষণ বা কপটাচার শিখিতেই হইবে। তাঁহার মতে মিথ্যাভাষণের সবচেয়ে শক্তিশালী সঞ্চালক (motive) হইতেছে অপরের মনে আমাদের বিষয়ে একটা সম্ভ্রম জাগাইয়া তোলা এবং সেই ভাবটিকে পুষ্ট করা। ইহা আমাদের সকলেরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার।

মিথ্যা বা কপটাচার কোনও জাতি বা ধর্ম্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। কখনও কখনও দেখা গিয়াছে ধর্ম্মবুদ্ধি-রহিত লোক যেখানে কপটাচারে দ্বিধা বোধ করিয়াছে, এক ধর্ম্মধ্বজ ব্যক্তি আসিয়া সেখানে মিথ্যার সাহায্যে অতি সহজে সমস্যা সমাধান করিয়া দিলেন। তবে এটা খুব খাঁটি সত্য যে, এই ব্যাপারে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকার প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়, কারণ কপটাচারকে ফল-প্রসূ করিতে হইলে কথাবার্ত্তা ও চালে-চলনে এমন একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য থাকা চাই, যাহা আর্থিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যাঁহারা একটু উচ্চ স্তরে আছেন তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব।

বহুকাল হইতে স্ত্রীলোকদের বিষয়ে একটি অপবাদ চলিয়া আসিতেছে তাঁহারা নাকি এইরূপ সামান্য-প্রতারণায় বা মিথ্যাভাষণে বেশী অপরাধী। অবশ্য এই অপবাদ পুরুষের দেওয়া। মানসিক ব্যাধি চিকিৎসক Cesare Lombroso বলেন নারী-সুলভ স্বাভাবিক ব্রীড়ার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীলোককে অনেক সময় বেশ নিপুনতার সহিত সত্য গোপন করিতে হয় ; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অথবা মাসিক ঋতু বা স্ত্রী-ধর্ম্মের সময় এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ;—বিবাহের বাজারে বয়স গোপন করা ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। নারী-বিদ্বেষী জার্ম্মান দার্শনিক শোপেন্‌হাওয়ার (Schopenhowr) বলিতেন—স্ত্রীলোকেরা সম্ভবতঃ সত্যের প্রতি এত উদাসীন যে, রাজদ্বারে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য পুরুষের এই অভিযোগ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মিথ্যাভাষণ পুরুষ বা নারী কাহারও একচেটিয়া নয়। তবে North Western বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ-তত্ত্ব-বিদ্ John Larson-এর মতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে মিথ্যাভাষণের বা কপটাচারেরও

একটু প্রকার ভেদ হয়। যেমন, পুরুষেরা মিথ্যাকথা বলেন সাধারণতঃ আর্থিক ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, আর স্ত্রীলোকেরা সত্যের অপলাপ করেন পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। কর্ম্ম হইতে পদচ্যুত হইলে অনেক পুরুষ বলিয়া থাকেন, তিনি চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছেন,—নচেৎ তাঁহার মর্য্যাদা হানি হয়; একই কারণে তিনি তাঁহার উপার্জ্জনের পরিমাণ বা কার্য্যক্ষেত্রে পদমর্য্যাদা একটু বাড়াইয়া বলেন অথবা কি করিয়া তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতা দ্বারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহার সবিস্তার ও সালঙ্কার বর্ণনা করিয়া (যাহার কতকাংশ কাল্পনিক) আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই ধরণের কপটতায় সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের কোন স্বার্থ নাই। তিনি হয়ত একটু রস ঢালিয়া বলিবেন কত পুরুষ তাঁহার প্রেমে পাগল হইয়া তাঁহাকে জীবনসঙ্গিনী করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানদের বুদ্ধি-বৃত্তির বিষয়ে এবং তাঁহার জামা-কাপড়ের মূল্য বিষয়ে একটু বাড়াইয়া বলিতে পারিলে তিনি যেন একটা কৌলিন্য গর্ব্ব বোধ করেন। সাধারণ মূল্যের জামা-কাপড়ে জমকালো ও আভিজাত্য পূর্ণ দোকানের লেবেল আঁটিয়া লোককে দেখান স্ত্রীলোকদের একটি অতি সাধারণ অপকৌশল।

আজকাল কিছু কিছু যন্ত্রপাতি বাহির হইয়াছে যাহার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা মিথ্যাভাষণ ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু এমন দুর্দ্ধর্ষ মিথ্যাচারীরও অভাব নাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও যাহাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। ঐরূপ মিথ্যাচারীরা সমাজে বেশ ভাল ভাবেই আছে বলিয়া মনে হয়। মিথ্যাচার যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে খ্যাতিসম্পন্ন অনেক রাজনীতি-বিশারদ মিথ্যার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছেন। মার্কিন দেশে কোনও রাজ্যসংসদের একজন সভ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন মিথ্যাভাষণ যেন আইনতঃ দণ্ডনীয় না হয়। তাঁহার মতে মিথ্যাভাষণ মনুষ্যমাত্রেরই একটি মৌলিক অধিকার।
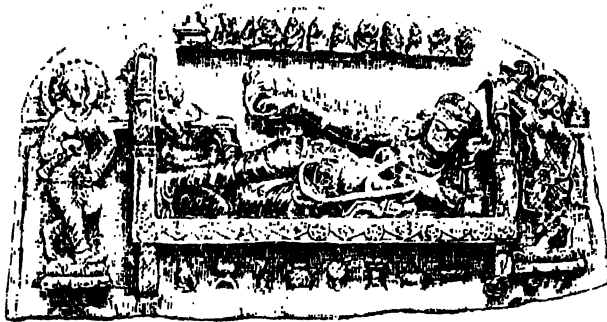
# বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

যাহাই ঘটুক না কেন চুপ করে বসে থাকলেত চলবে না। পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রীয় কার্য পরিদর্শনের জন্য কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা গিয়ে সেখান থেকে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত আসাম বেঙ্গল রেলের ষ্টেশন কসবার নিকটবর্তী পাহাড় অঞ্চলে একটা প্রসিদ্ধ কালী মন্দিরে গিয়ে সেখানকার মোহান্ত, স্বত্বাধিকারী এবং সন্ন্যাসী সর্বানন্দের সঙ্গে দেখা করে জায়গাটা ভাল করে দেখলাম। মন্দিরটী ছিল একটী অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। স্বামীজি শুধু যে আমাদের সমিতির অনুরাগী ছিলেন তা নয়, তিনি সমিতির সভ্যই ছিলেন। এই মন্দিরে অনেক সময় পলাতক গৃহত্যাগী সভ্য এসে বাস করত। সুতরাং এ মন্দির সমিতির আর কি কি কাজে লাগতে পারে এ সমস্ত সর্বানন্দজীর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হয় যে এখানে পলাতক, গৃহত্যাগী, এবং পরিচিত বিপ্লবীদের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়ে এখানে পাহাড় জঙ্গলে মাটির নীচে একটা প্রকোষ্ঠ তৈরী করতে হবে অস্ত্রশস্ত্র রাখবার জন্য। এ বিষয়ে সামান্য কিছু অগ্রসর হওয়ার পর সমিতির উপর নানা ঝড় ঝঞ্ঝা এসে পড়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ মন্দিরের বা স্বামী সর্বানন্দের বিষয় পুলিশ কখনই কিছু জানতে পারেনি।

নোয়াখালিতে গেলে খগেন্দ্র কাহিলী নগেন সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেবারই সে জেনারেল স্কলারশীপ পেয়ে মেট্রিক পাশ করেছিল। জমিদারের পুত্র। মুসলমানপাড়া বোমার মামলায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

নিয়মানুবর্তিতার জন্য গৃহত্যাগী গঙ্গাচরণকে শাস্তি বিধান করে আমার অনুমোদনের জন্য ঘটনাটি বললেন। গঙ্গাচরণ যখন নোয়াখালিতে প্রেরিত হয় তখন খগেনবাবু ইচ্ছে করেই দেখা করলেন না। নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন যে তাকে একটী সাধারণ বেনের দোকানে থাকতে হবে অশিক্ষিত লোক হিসেবে। চলাফেরা, পোষাক, আচরণ সমস্তই তেমনি হবে। অথচ গঙ্গাচরণ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য খগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক চেষ্টা করে। খগেনবাবু ওকে পরীক্ষা করছিলেন।

একদিন খগেনবাবু সে দোকানে গেলেন যেন সাধারণ ক্রেতা। ইচ্ছে করেই সঙ্গে একখানি খবরের কাগজ নিয়ে গিয়েছিলেন। দোকানদার তাকে যত্ন করে বসিয়ে তামাক খেতে দিলেন। খগেনবাবু একটা সংবাদের উল্লেখ করে দোকানদারদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। গঙ্গাচরণ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নগেন বাবুর ঘাড়ের উপর দিয়ে খবরের কাগজ পাঠ করল। এটা তার পক্ষে ঘোরতর অন্যায়। কেননা এদ্বারা সে প্রমাণ করল যে, সে অশিক্ষিত সাধারণ লোক নয়। এই অপরাধে খগেনবাবু তাকে তাড়িয়ে দিয়ে শাস্তি দিলেন। আমাকে বললেন—"এমনভাবে পথ খরচ দিয়েছি যে ওকে এখান থেকে অনেক মাইল পায়ে হেঁটে গিয়ে তবে ষ্টিমার ধরতে পারে। যাওয়ার পথও নির্দেশ করে দিয়েছি।"

ঢাকায় ফিরে এসে নেত্রকোণা সহরের নিকট একটা স্থানে ডাকাতির পরামর্শ হয় রমেশ চৌধুরী, অমৃত সরকার, বীরেন চ্যাটার্জি, এবং অনুকূল চক্রবর্তীর সঙ্গে। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে স্থির হয় যে বহুদূরবর্তী বাজিতপুরের নিকট মেঘনা নদী থেকে নৌকা নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং অতদূর থেকে নেত্রকোণা পর্যন্ত পথও চিনে রাখতে হবে। পথে দুটো প্রকাণ্ড বিল পড়বে—"গণেশের হাওড়", আর "বড় হাওড়"। ভরা বর্ষা, জলে থৈ থৈ। এপার ওপার দেখা যায় না। দিক ঠিক রেখে চলাই কঠিন, অথচ আমাদের সম্ভবমত দ্রুত গতিতেই যেতে হবে। ঝড় উঠলে নৌকো রক্ষা করা যাবে না। এ ঝুঁকি না নিয়েও উপায় নেই, কারণ নেত্রকোণা পর্যন্ত এখনও রেল লাইন যায় নি। ফেরার পথে একটা ছোট নদী দিয়ে এগিয়ে এসে একটা থানা অতিক্রম করতে হবে। এদের কাছে সংবাদ পৌঁছার কথা এবং তাদের বাধাদানেরও সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং আমরা স্থির করলাম যে পুলিসের সঙ্গে বন্দুকের লড়াই করতে করতেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

টেলিগ্রাফ তার কাটা ছাড়া নেত্রকোণা থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ত্রিশ মাইল পথে সশস্ত্র লোক রাখতে হবে যাতে সদরে কেউ খবর না দিতে পারে।

কাজটা ছিল খুবই বিপদ-জনক। যতদূর সম্ভব বাছাই করা পরীক্ষিত লোক ও বেশী পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং যদিও পরিকল্পনা গ্রহণের পর আমার কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল। "ঠিক সকালেই

আমার যাওয়ার জন্য বললেন। আমি নিজেই পরিচালক নিযুক্ত হলাম। আরও স্থির হ'ল যে লোক আসবে নানা দিক থেকে এবং বিভিন্ন স্থানে বড় নৌকোয় আরোহণ করবে। আমরা কয়েকজন ময়মনসিংহ থেকে হেঁটে নেত্রকোণা শহরে গিয়ে কোন সুবিধাজনক জায়গায় বড় নৌকোয় উঠব।

এই কার্যে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে করতে পারছি তাঁরা হচ্ছেন—অমৃত সরকার, বীরেন চ্যাটার্জি, রমেশ চৌধুরী, আদিত্য দত্ত, নগেন্দ্র দত্ত, কিষ্ট সাহা, ক্ষীরোদ ঘোষ, অনুকূল চক্রবর্তী, যোগেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। সব মিলে বোধ হয় ত্রিশজন ছিলাম।

এই কার্য পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় এবং বহু সহস্র টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমাদের অর্থ সংগ্রহের প্রণালী এবং মানব চরিত্রের একটা দিক আলোচনা না করে পারছি না। অর্থের সন্ধানের জন্য বা সিন্দুকের চাবি আদায় করতে বাড়ির লোকদের শারীরিক যন্ত্রণা দেয়া নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য ভয় দেখান হ'ত যে সবাইকে খুন করে ফেলব বা পুড়িয়ে মারব। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে প্রাণের চেয়েও অর্থের মায়া অনেকের বেশী। এই ডাকাতির সময় দেখেছি শিশু পুত্রকে তরবারির আঘাতে কেটে ফেলা হবে এই ভয় দেখিয়ে—এমন কি একেবারে গলার কাছে তরবারী ধরেও পিতামাতাকে অর্থের সন্ধান বা চাবি দিতে বাধ্য করা যায় নি। সুতরাং শারীরিক পীড়ন না করে সিন্দুক ভেঙ্গেই অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

কার্য সমাধা হওয়ার পর আমরা ফিরে চললাম। পথে নির্দিষ্ট স্থানে প্রাপ্ত অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারাদি ছোট নৌকোয় ( Delivery Boat ) দিতে হবে, এবং বিপদজনক এলাকা পার হয়ে গিয়ে কিছু কিছু লোককেও নামিয়ে দিতে হবে। সুতরাং কিছুদূর যাওয়ার পর যার কাছে যে যে অস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য বা অর্থ আছে তা আমার সামনে জমা দিতে নির্দেশ দিলাম। সমস্ত জমা হলে একজন বয়োকনিষ্ঠ সভ্যকে আমার শরীর ভাল করে তল্লাস করতে বললাম, পরে সকলের শরীরই তল্লাসী করান হ'ল। তার পর প্রাপ্ত অর্থ ও অলঙ্কারাদি ওজন করে নিয়ে রাখলাম, ওজন করার ক্ষুদ্র যন্ত্র সঙ্গেই ছিল। সমস্ত ধন-রত্ন থলের মধ্যে বন্ধ করে তা গালা দিয়ে শিল মোহর করে রাখা হ'ল।

আমরা সবাই একে অপরকে প্রাণ দিয়েও বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীর তল্লাসী করা প্রয়োজন এজন্য যে যদি ভুলে কেউ কিছু সঙ্গে নিয়ে যায় তবে ধরা পড়লে তা ডাকাতির সঙ্গে সম্পর্ক বেড়িয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কাউকে লোভের সুযোগ না দেওয়াই ভাল মনে করতাম।

যাই হোক, ফেরার পথে যখন থানার পাশ দিয়ে যাই তখন প্রধানদের মধ্যে অনেকে হাল ধরে কিংবা দাঁড় টানায় নিযুক্ত হয় এবং কয়েক জনের হাতে থাকে বন্দুক। আর সবাইকে নৌকোর ভিতর শুয়ে থাকতে বললাম যাতে পুলিসের গুলীর আঘাত না লাগে। দিক নির্ণয়ের জন্য যে কম্পাস সঙ্গে রেখেছিলাম তাই আমাদের খুব কাজে লাগল রাত্রির অন্ধকারে হাওড়ের ( বিলের ) কূলহীন জলরাশির উপর দিয়ে ঠিক পথে আসতে।

কিশোরগঞ্জ শহরে এসে আমি, নগেন দত্ত এবং আরও দু'এক জন নেবে গিয়ে হেঁটে সতের মাইল দূরে গফরগাঁও ষ্টেশনে ট্রেনে চেপে ঢাকায় গেলাম। নগেনবাবুকে পাঠালাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কিছু অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। তাঁর বয়েস আমাদের চাইতে বেশী ছিল এবং চেহারেতেও ধনী বলে মনে হত। তখনকার দিনে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইউরোপীয়ান কিংবা খুব বিত্তশালী ভারতীয় ভিন্ন যাতায়াত করত না।

নগেন দত্তকে তখন ঢাকা কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল প্রধান কেন্দ্রের নানা বিভাগে কাজকর্ম করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য যাতে আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি সমস্ত সংস্থারই ভার বহন করতে পারেন। নেত্রকোণা ডাকাতির সময়ও আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম কাজেকর্মে তাঁর দায়িত্ববোধ, দক্ষতা, এবং বুদ্ধিমত্তা কেমন। আমাদের গ্রেপ্তারের পর নগেনবাবু প্রধান পরিচালকদের অন্যতম হয়েছিলেন। উত্তর ভারতে উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে সৈন্যদলের সহায়তায় সমগ্র ভারতে যে বিপ্লবায়োজন প্রথম যুদ্ধের সময় হয়েছিল তাতে তিনি, রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যালের সহকর্মী ও পরিচালক হিসেবে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে কাশী যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলায় শচীন সান্যাল প্রভৃতির সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ড লাভ করেন। এ মামলায় রাসবিহারী বসুর নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছিল। নগেন্দ্র দত্ত বন্দী অবস্থাতেই আগ্রা জেলে নির্যাতনের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর বাড়ী ছিল আসামের সিলেট জিলায়।

ঢাকায় ফিরে এসে একদিন খবর পেলাম যে বসন্ত চ্যাটার্জি ঢাকায় এসেছে। ঢাকা কেন্দ্রে এ বিষয়ে খবর

দিয়ে রমেশ চৌধুরীকে বললাম তারা যেন এ বিষয়ে খোঁজ খবর নেয় এবং সতর্ক থাকে। বসন্ত চ্যাটার্জির চেহারার বর্ণনা যতটা জানতাম তাও জানিয়ে দিয়ে আমি চলে গেলাম কলকাতায়।

কলকাতা এসে চিঠি পেলাম কেদার গুহর - জার্মানী থেকে। নানা কথার মধ্যে লিখেছেন আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং লিখেছেন যে যদি মত থাকে তবে যেন পথ খরচের টাকা পাঠিয়ে দিই। এ খবর পেয়ে একটা বড় ডাচ্ ব্যাঙ্কের মারফত টাকা পাঠিয়ে দিলাম।

জার্মানী থেকে লিখা কেদার বাবুর পত্র ছিল সাঙ্কেতিক ভাষায়। তিনি জানিয়েছিলেন যে জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ অনিবার্য এবং তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে এবং আমাদেরও সুযোগ আসবে। কারণ জার্মানী নিজের স্বার্থেই ব্রিটিশের অধীনস্থ স্বাধীনতা পিপাসু জাতিসমূহকে সাহায্য করতে চাইবে যাতে ইংরেজ নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই ব্যস্ত থাকে, এবং তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিসমূহের সহায়তা না পায়। আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং সমিতির কাজকর্ম সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখেছিলেন—এ সব পরে লিখব। ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসেই আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব করে লিখেছিলেন কেদারবাবু।

এর কিছুদিন পরেই ঢাকা থেকে বীরেন চ্যাটার্জি কলকাতা এলেন অনেক দুঃসংবাদ নিয়ে। ঢাকায় বসন্ত চ্যাটার্জির সম্বন্ধে খোঁজ খবর করে এবং সতর্ক দৃষ্টি রেখে অনেক সাংঘাতিক সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। বসন্ত চ্যাটার্জির সঙ্গে আমাদের সমিতির সভ্য রামদাস এবং আরও কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিসকে ঢাকায় নদীর ধারে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। রামদাস প্রহরী বেষ্টিত হ'য়ে ঘুরছে আমাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। রামদাস বহুদিন পলাতক গৃহত্যাগী সভ্য থেকে দলের অনেক উৎসাহী নিষ্ঠাবান সভ্যকে চিনেছিল, অনেক খবর জানে, এবং বহু আশ্রয়স্থল তাহার পরিচিত। সুতরাং বিষম সঙ্কট উপস্থিত। এ ব্যাপারে কিংকর্তব্য স্থির করতেই বীরেন চ্যাটার্জি কলকাতা এসেছিলেন।

এ সময়েই আমরা খবর পেলাম যে রামদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশু দাসকে গোয়ালন্দে দেখা যায়। মনে হয় সে ষ্টেশনে খোঁজ খবর করে। গোয়ালন্দ তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গে যাতায়াতের একমাত্র পথ, সুতরাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আশু দাসও সমিতির পুরাতন সভ্য এবং অনেককেই চিনে। কাজেই গোয়ালন্দ দিয়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ হলে আমাদের খুবই অসুবিধে হবে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে দৃষ্টি রাখবার জন্য নিযুক্ত হয়েছে রামদাসের অপর এক বন্ধু সত্যেন।

রামদাসের আসল নাম উমেশ। সে এক জমিদার বাড়ি থেকে অনেকগুলি বন্দুক চুরি করার সহায়তা করে এবং ফলে তার নামে ওয়ারেণ্ট বার হয়। সে ছিল জমিদারের বিশ্বস্ত চাকর।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তার কিছুদিন পুর্বেই আমরা খবর পাই যে রামদাস, আশু দাস, সত্যেন ও যতীন চ্যাটার্জি সমিতির মধ্যে থেকেই দলের বিরুদ্ধে কাজ করছে কিছু, অস্ত্রশস্ত্র সরিয়েছে, এবং নির্দোষ সভ্যদের সাহায্যে ডাকাতিও করেছে। পরে মাদারীপুরে অনেক লোক এদের দলভুক্ত হয়, এবং বিক্রমপুরের দিকে কয়েকটা ডাকাতি করে।

রামদাস একবার সিলেট গিয়ে সেখানকার জেলা পরিচালক রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে। তার মতলব বুঝতে পেরে রমেশ চৌধুরী তাকে নানা কথায় ভুলিয়ে সিলেটে রেখে দিয়ে আমাকে চিঠি লিখল তাকে হত্যা করা হবে কিনা অথবা কি করা কর্তব্য। আমি লিখে জানালাম যে সে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে এবং নিজেও অধঃপাতে গেছে। এমন লোক দল ছেড়ে ভালই করেছে। সে আর কি অনিষ্ট করবে। তাকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই, ছেড়ে দিয়ে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করাই ভাল, রামদাস কিন্তু সর্বদাই মনে করত যে তাকে হত্যা করা হবে। এ কথা সে একদিন আমার কাছে প্রকাশ করেছিল রাস্তায় হঠাৎ দেখা হওয়ায়। তার মাদারীপুরের বন্ধুরা সকলেই পরে জানতে পেরেছিল যে রামদাস, আশু দাস প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য লোক নয়।

সে যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে কলকাতা বসে আমরা পরামর্শ করে স্থির করলাম যে যদি প্রয়োজন হয় তবে জীবন দিয়েও রামদাসকে হত্যা করা বাঞ্ছনীয় হবে। মুস্কিল এই যে সে সকলকেই চিনে। এ কার্যে উপযুক্ত অথচ তার অপরিচিত এমন লোক কোথায় পাওয়া যায়। স্থির হয় যে নদীর ধারে বাকল্যাণ্ড বাঁধের রাস্তায় কিছু ভিক্ষুক বসে। সেই দলে মুসলমান ভিক্ষুকের বেশে কেউ দুটি বোমা নিয়ে অপেক্ষা করবে। রামদাস তার সঙ্গীদের সহ নিকটে আসামাত্র একটার পর একটা বোমা তাদের উপর নিক্ষেপ করতে হবে। বোমার আঘাতেও যদি বেঁচে যায় তবে রিভলবার নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করতে হবে। যে যাবে তার গ্রেপ্তার, ফাঁসি বা

তৎক্ষণাৎ গুলিতে নিহত হওয়া অনিবার্য। কিন্তু কাকে এই কার্যের জন্য পাঠান যায়। আমার মনে আছে যে নলিনীকিশোর গুহ মহাশয় যেতে প্রস্তুত আছেন বলে জানালেন। কিন্তু আমরা সম্মত হতে পারলাম না, কেন না তার একটা পা খোঁড়া, এবং তিনি প্রখর বুদ্ধিশালী ভাল লেখক; সুতরাং তার কর্মক্ষেত্রও অন্য রকমের ছিল। তাছাড়া মহারাষ্ট্র দেশে সমিতি বিস্তারে নলিনীবাবু ছিলেন যোগসূত্র। সে যাই হোক না কেন, নলিনীবাবুর আত্মদানের প্রস্তাব আমরা খুবই প্রশংসনীয় মনে করলাম।

বীরেন চ্যাটার্জির সঙ্গে দু'টি বোমা পাঠিয়ে দিলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী অথবা যদি সম্ভব হয় তবে প্রহরীর বেষ্টনী ভেদ করেও রিভলবার দিয়ে রামদাসকে হত্যা করতে হবে। বসন্ত চ্যাটার্জি কিংবা আর কারুর উপর নজর দিবে না। রামদাসই আসল লক্ষ্য, আর কেউ নয়। তাকে নিহত করার পর যদি সময় ও সুযোগ থাকে তবে অবশ্য বসন্ত চ্যাটার্জিকে হত্যা করবে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খবর পেলাম যে সন্ধ্যার একটু আগে বহু ভ্রমণকারীর চোখের সামনে ঢাকা নদীর ধারে নর্থ ব্রুক হলের সম্মুখে প্রহরী বেষ্টনী ভেদ করে রামদাসকে হত্যা করা হয়েছে এবং আর একজন গোয়েন্দা কর্মচারীও আহত হয়েছে। বসন্ত চ্যাটার্জি ভরা বর্ষার কূল ছাপানো বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবল স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণরক্ষা করে। এই সঙ্গে আর একজন খুব বড় গোয়েন্দা কর্মচারী ছিল সতীশ মজুমদার। তিনিই পরে বর্মায় গিয়ে আদিত্য দত্তকে গ্রেপ্তার করেন।

গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়াটার্স রামদাসের এই ব্যাপারটা ঢাকার স্থানীয় পুলিসের কাছেও গোপন রেখেছিল, এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। সমস্ত বিষয় খুব গোপন রেখে কয়েকজন বিশ্বস্ত বড় গোয়েন্দা কর্মচারী রামদাসকে নিয়ে ঢাকায় এক নৌকা ভাড়া করে বাস করত। শহরে আর কারুর সঙ্গেই মিশত না, কেবল নির্দিষ্ট সময়ে রামদাসকে নিয়ে বার হ'ত। তাই যখন "ঢাকা হেরাল্ড" (Dacca Herald) কাগজে বেরুল "A man named Ramdas murdred" (রামদাস নামীয় একজনকে খুন করা হয়েছে) তখন পুলিস এই ভেবে আশ্চর্য হ'ল খবরের কাগজ কর্তৃপক্ষ রামদাসের নাম জানতে পারল কি প্রকারে! তখন হেরাল্ডের সংবাদদাতাকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখে কয়েক বৎসর। অথচ পরেশ গুহ ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ—কিছুই জানত না। শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের বাসার আড্ডায় আসত খবর সংগ্রহের জন্য। সেখানে আমাদের লোকজনও যাতায়াত করত। রামদাসের হত্যার পর কথাপ্রসঙ্গে তার নাম জানতে পেরেছিল পরেশ গুহ।

রামদাসের হত্যার পর আশু দাস আর গোয়ালন্দে দাঁড়াত না এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনেও আর সত্যেনকে দেখা যেত না। উভয়ে নিরুদ্দেশ—অর্থাৎ সরকারই তাদেরকে কোন দুর্গম দূরদেশে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল।

রামদাসকে যারা হত্যা করতে যায় তারা হচ্ছেন অনুকূল চক্রবর্তী, অমৃত সরকার ও ভুবন বসু। কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, রামদাস ও তার সাথী পুলিসের উপর নজর রাখে।

রামদাস ও তার সহকর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ গ্রহণ করে একটা বিরাট যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে বহুলোককে কারাগারে প্রেরণের যে ষড়যন্ত্র গোয়েন্দা পুলিস করেছিল তা রামদাসের হত্যার ফলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

ক্রমশঃ

# ত্রিনিনাদ

শ্রীপরিমলকান্তি রায়

শেষটায় কিশোরীমোহনবাবু তাঁর চারকাঠাওয়ালা বসতবাটির একটা ফালিতে ভাড়াটে বসিয়ে দিলেন স্ত্রী ও ছেলেদের কারও মতামতের অপেক্ষা না করেই। বলতে গেলে একপ্রকার রাতারাতি দখল দিয়ে দিলেন শহরের নামজাদা উকিলের মুহুরি দীননাথকে। লরী থেকে দুম্ দাম্ বিছানা বাক্স তোরঙ্গ বাহিরের ঘরে নামাবার শব্দ শুনে মনোরমা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং আন্দাজ করে নিল সংসার-অনভিজ্ঞ স্বামীর হঠাৎ-আসা সাংসারিক বুদ্ধিটা। চটে গেল বেজায়, কিন্তু প্রকাশ করে কোন লাভ হবে না জেনে শুধু বলল—'মাধবের মতামত নিলে ঠিক হত না কি?—রাঘবও ত আসছে সামনের সপ্তাহে; সাধনের কথা নাহয় ভুলেই গেছ, সে ত আর এ-বাড়ির কেউ নয়, কিন্তু যারা রয়েছে তোমার হোটেলে—'

কথা কেটে দিল কিশোরীমোহন 'আর,—তোমার ঐ রত্ন দু'টির মতামত বেদখল করলুম ভাড়াটেকে বাইরের ঘরটা দখল দিয়ে। ওরা বসাত আড্ডা, আমি বসালাম ভাড়াটে; ওদের আড্ডার খরচা,—চা-চিনি-দুধ-বিড়িতে কমসে কম মাসে পাঁচ টাকা, আর আমি আয় করলাম মাসে ৫০ টাকা। ওদের মত নিতে গেলে নির্ব্বিবাদে মাসে মাসে আসত ৫০ টাকা?—চুলগুলো অমনি পাকে নি, সব পাকা-পোক্ত বন্দোবস্ত আমার, আগাম দু'মাসের ভাড়াও আদায় করে নিয়েছি, রান্নার একটা চাটাই—ছাউনি তুলে দিতে হবে ত!'

'সে না হয় তুললে; কিন্তু চাটাই-ছাউনিটা উঠবে কোথায়— বাগানে—?

'বাগান! ওটা বাগান হ'ল কবে থেকে? ঘাস আর যত রাজ্যের কাঁটাগাছের বন—গরু-ছাগলের রাজত্ব।'

'ঐ কাঁটাবন থেকেই নিত্য ঠাকুরপূজোর ফুল আসে গন্ধরাজ, চাঁপা, বেলফুল আরও অনেক।'

'ফুল মাথায় থাক, বিনে ফুলে পূজো হয় না? যেমনি তোমার ঠাকুর তেমনি আমি। তিন পুরুষের জাগ্রত বিগ্রহ, কই আমার বেলায় ত জাগল না? মাধবটা চারবার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হ'ল, মানত করেছিলাম চার-চারবার জোড়া পাঁঠা—। —রাঘবের বেলায়? কিছু না। কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে তিন-তিনটে পাশ দিলে। তাতে লাভ হ'ল কি? একটা পয়সা ঘরে তুলেছে? সব বেইমান; সব শা—'

মনোরমা স্বামীর খেদোক্তি থামিয়ে দিলে শঙ্কিতা হয়ে, 'ঠাকুর-দেবতার নামে অমন কথা মুখে আনতে আছে! সর্বনাশ হবে যে, ছিঃ ছিঃ।'

মনস্কামনা পূরণ করলে না যে দেবতা তাঁর প্রতি ভক্তির মাত্রা কমতে পারে কিন্তু ভয়টা পুরোপুরি থেকে যায়। কিশোরীমোহনও মনে মনে শঙ্কিত হয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু মনোরমা বুঝলে অন্যরকম। সে ভাবলে, স্বামী হয়ত বা বাগানটা রক্ষা করার কথাই ভাবছে। বললে সে, 'ঠাকুরের দয়ায়ই মাধব পাশ না করে রোজগার করছে ব্যবসার খাতিরে, লোকজনও আসে তার কাছে হরদম—এলে বসবে কোথায় শুনি?'

'কেন, জামগাছ তলায়। বাঁশের মাচান বেঁধে নেবে—বেশ বসা চলে ওতেই। আসত সব বিড়ির ব্যাপারীরা, ওদের জন্য জামগাছ তলাটাই চমৎকার বৈঠকখানা হবে। বংশের কুলাঙ্গার, চাটুজ্যের ছেলে বাঁধছে বিড়ি—ওর নাম ব্যবসা? ছোঃ, আমার চৌদ্দ পুরুষে কেউ এ কাজ করে নি।' ব'লে কিশোরীমোহন দীননাথের মালপত্রের তদারক করতে চলে গেল; মনোরমা ঠাকুরঘরে ঢুকে গৃহ-বিগ্রহের নৈবেদ্য সাজাতে সুরু করলে।

কিশোরীমোহনের একপাল পোষ্য ঠেসে আছে ছোট্ট বাক্সের মত বাড়ীটায়। এমনিতেই ফাট ফাট, তাতে গাদলো আরও একটা সংসার; ছালা হলে নির্ঘাৎ ফেটে যেত কিন্তু ইঁটের দেয়াল বলেই সে ভয় নেই। বেচারা কিশোরীমোহন নিরুপায়—পেন্‌শন নিয়েছে এই সেদিন, আয় অর্দ্ধেক হয়েছে কিন্তু ব্যয় কমে নি। তদুপরি জীবনের একমাত্র সহায় লালমুখো মনিবরা সব এদেশের মাটির মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে তাদের আশা-ভরসা। এতকাল আশা ছিল তিনটে ছেলের মধ্যে অন্ততঃ দুটোকে ডাকবিভাগের একটা কিছুতে ঢোকাতে পারবেই—নিজের চাকরির

মেয়াদটাও যে চোখ বুজে আরও পাঁচ বছর টেনে নেওয়া যাবে, সেটা সে ধ'রে নিয়েছিল সাহেবের ছোটখাট রসিকতায়। 'কাছোরী! ইউ আর গুড্! টু গুড্ এ কাউ—এ কী টু দি ফাইল্‌স্।' অফিসে ঝড় বয়েছিল—একটা জরুরি ফাইল পাওয়া যাচ্ছিল না। কিশোরীবাবু চট করে উঠে গিয়ে ফাইলটা টেনে বের করে সাহেবের টেবিলের ওপর রেখেছিল। তার পরই উক্ত মন্তব্য করেছিল মনিব। কিশোরীবাবু কায়দা বুঝে ওরকম ফাইল লুকিয়ে রেখে লুকোচুরি খেলত—এই খেলার মাধ্যমে পদোন্নতি হয়েছিল ধাপে ধাপে। প্রথম জীবনের প্রথম ধাপ ৪০৲ টাকা থেকে শেষ ধাপ তিন শ' টাকায়। পর পর সকল লালমুখো মনিবরাই একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন—'কাছোরী ইজ এ কী টু দি ফাইল্‌স্।'

কিন্তু 'কী টু দি ফাইল্‌স্' হয়েও কোনও লাভ হ'ল না। সে অযোধ্যা আছে কিন্তু রাম নেই, মনিব আছে মনিবত্ব নেই, নেই মনিবের বাদশাহী খেয়াল-খুশি বকশিস লাভ। যারা এল তারা অতি আটপৌরে ধরণের চেহারায় ও কায়দায়। স্যর বলতে ইচ্ছে করে না। এঁরা 'কাছোরী' বলে প্রিয় সম্ভাষণ জানিয়ে পরম উপাদেয় চতুর্থপদের সঙ্গে সমতুল সম্মান দিয়ে দ্বিপদের মর্য্যাদা বাড়িয়ে তোলে না, লুকোচুরির রহস্যটাও ধ'রে ফেলে মুচকি হেসে বলে, 'যে ক'দিন চাকরিতে আছেন একটু কেয়ারফুলী চলবেন মিঃ চাটার্জি।'

জীবনের বিপর্য্যয় এল ঠিক ফসল তুলবার সময়ে, অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার ছ'মাস পরেই পেনশন আর বেকার ছেলেদের নিয়ে ঘরে বসতে হ'ল। কাজেই বাড়ীর একটা ফালি ভাড়া দিয়ে রোজগারের চেষ্টা।

সন্ধ্যায় মাধব তার বিড়ির ফ্যাক্‌ট্রি থেকে বাড়ী ফিরে এসে দেখে কাণ্ড। চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করে একটা অনর্থ ঘটাতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে গেল। বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল অচেনা তরুণী; ডাগর চোখের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি মাধবের হঠাৎ-আসা ক্রোধটা জল করে দিল, সাপের উদ্ধত ফণা নুয়ে পড়ল সাপুড়ের বাঁশী হাতে দেখেই—শুনে নয়। মেয়েটি দীননাথের ভাইঝি। কাকার বাড়ীতে আজন্ম মানুষ। দীননাথ পালিতা ভাইঝিকে পাত্রস্থ করেছিলেন পাঁচ বছর আগে, কিন্তু সুপাত্রটি ফুলশয্যার রাত্রেই উধাও হয়েছিল। গত পাঁচ বছরের মধ্যে সে স্ত্রী বা শ্বশুরকুলের কারও কোন খোঁজ-খবর নেওয়া প্রয়োজন বোধ করে নি। বহুদিন পরে লোক-পরম্পরায় জানা গেল, সত্যি সে সাধু হয়ে যায় নি—পরমমোক্ষ চাকরি লাভের আশায় কলকাতার রাস্তায় ফ্যে ফ্যে করছে। তরুণীটির নাম টেপী। দেহের মানান সই নামটি। কেউ যেন টিপে টিপে, মেপেজুখে তার শরীরটি গড়েছে। কোথায়ও ফাঁক নেই। চরিত্রেও কোন ফাঁক নেই—দেখে যা বোঝা যায় ঠিক তাই। স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েও জীবনটা ফাঁকা করে দেয় নি। দক্ষিণা বাতাস হু হু করে বয়ে হৃদয়দ্বারে আঘাত করে নি। কাজেই টেপীর জীবনযাত্রায় বিবাহের পরও বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। বিয়ে একটা ঘটনামাত্র, জীবনে স্থায়ী কিছু রেখে গেল না। টেপী খায় দায়, মাঝে মাঝে রান্না করে, সাজ-সজ্জা করে, সকাল-সন্ধ্যায় স্নো-পাউডার মাখে, হাসে খেলে গল্প করে। বলবে হয়ত, কেন, স্বামীর মুখখানা কি দিনান্তে একবারও মনে পড়ে না? হয়ত পড়ে: কিন্তু জীবনে এমন কত লোকের মুখই ত কত সময়ে মনে পড়ে, কিন্তু তার জন্যে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় কই?

বার বার চার বার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হলে কি হবে, মাধব কাজের ছেলে, যাকে বলে করিৎকর্ম্মা। এমন অনেক লোক আছে যারা গলার হাঁকডাকে, কাজ-কর্ম্মে নিজেরাই হয়ে পড়ে কর্ম্মকর্ত্তা, তাদের গলবস্ত্র হয়ে ডেকে আনতে হয় না ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ীতে। উৎসব শেষে কে কোথায় শোবে, তাদের জন্যে মশারি এবং মশারি খাটিয়ে দিয়ে নিজে চেটাই বিছিয়ে পড়ে থাকে উৎসবক্লান্ত বাড়ীর এক কোণে। মাধব হচ্ছে উক্ত প্রকার কর্ম্মকর্ত্তাদের দলেরই একজন। আজকে উৎসব না হলেও উৎসবের প্রারম্ভ মনে করে নিলে মাধব। অগোছাল বাড়ীটা যেন তারই হাতের স্পর্শের অপেক্ষায় বসে আছে, বিশেষ করে ঐ মেয়েটি; এসেই শুনেছে মনোরমার কাছে মাধবের কথা। শুনেছে, সে কি দিয়ে কি করে ফেলে মুহূর্ত্তে। মনোরমা টেপীকে বলেছিল—'কিচ্ছু ভেব না, মাধব বাড়ী আসুক, সব গুছিয়ে দেবে।' দীননাথের স্ত্রী কমলা চিররুগ্না, কাজেই ভাই-ঝিকেই সংসারের ঝামেলা টানতে হয়।

ঘনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া—যাকে বলে বাড়ীর লোক হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা মাধবের অসাধারণ। দিনে দিনে নয়—প্রথম দিনেই। ভাড়াটের সুবিধে, নিজেরই সুবিধে, সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে ঘর-দোর মেরামত করিয়ে দিলে, চুণকাম করালে, রান্নাঘর তুলে দিলে। বড় ঘরটায় পার্টিশন দিয়ে টেপীর নিজস্ব কামরা তৈরি করে দিলে। টেপীর ঘরের খাটটা, বিয়ের খাটটা, নড়বড়ে ছিল, সেটাকে মিস্ত্রি ডেকে মেরামত করালে, আর নিজের হাতে লাগিয়ে দিলে বার্নিশ। এমনি ছোট-বড় আরও কত কি দিয়ে

মাধববাবু হয়ে পড়ল মাধবদা—পরে বড়দা। তার পর? সেটাই বলছি।

লোকে বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন কিন্তু মাধবের স্ত্রীরত্ন লাভের আগেই ধনপ্রাপ্তি ঘটল—বেশ একটা মোটা টাকা, পাঁচ হাজার! লটারীতে নয়, ব্ল্যাকমার্কেট নয়, চুরির টাকাও নয়, সরকারী সাহায্য। স্বাধীনতা লাভের পর, সরকার উঠে প'ড়ে লেগেছিল দেশটাকে রাতারাতি জাপান-জার্ম্মানীতে পরিণত করতে। দু'হাতে টাকা বিলাচ্ছিল শিল্পোন্নতি কল্পে। হরির লুটের বাতাসার মত টাকা ছিটাচ্ছিল সরকার নির্ব্বিচারে। সেই লুটের বাতাসা মাধবের ভাগ্যেও পড়েছিল। বিড়ি তৈয়ার খাঁটি কুটিরশিল্প, একেবারে আদিম ও অকৃত্রিম কুটিরশিল্প, গণশিল্পও বলা যেতে পারে—জনগণের প্রাণের চাহিদা মেটায় বিড়ি—সিগারেট নয়। কাজেই এহেন শিল্পের পতি মাধবের সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা ও যুক্তি রয়েছে, শুধু তাই নয়, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জেল না খাটলেও কিছুদিন খদ্দর পরেছিল সে, 'খদ্দরিষ্ট' বলে বালুরঘাট শহরে তার নাম আছে। মাধবের 'স্বরাজ-বিড়ির' নাম ছড়িয়েছিল দিনাজপুর-সীমান্তের বাইরেও, গ্রাম-গ্রামান্তরে, বর্ডারের পরপারে। এমনি তেজাল বিড়ি।

সরকারী সাহায্যের টাকাটা ব্যবসায় না খাটিয়ে প্রায় সবটাই খাটাল নিজের জন্যে। কিনলে একটা সেকেলে ফোর্ড গাড়ী; সেটা চালালে সবগুলো 'পার্টস্' নানা শব্দের 'কন্‌সার্ট'-এ বেজে ওঠে, কেবল বাজে না 'হর্ণটা'। তা হোক, মোটর গাড়ী ত বিড়িবাবুর মোটর গাড়া। চারটেখানেক কথা নয়।

ঐ ভাঙা ফোর্ডের দৌলতে মাধব টেপীকে আরও নিকটে টেনে নেওয়ার সুযোগ পেল। টেপীর সান্নিধ্য ছোট্ট বাড়ীর সীমানা পেরিয়ে বাইরে বহুদূরে বিস্তৃত হ'ল।

প্রায়ই টেপীকে কেন্দ্র করে দুই সংসারের সবাইকে ঠেসে বসিয়ে নেয় গাড়ীটায়—মাধব গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতেই মফঃস্বলের শহরতলী-পাড়াটা সচকিত হয়ে ওঠে শব্দে—ফট্ ফট্ ফট্—ঠাস্‌...। ফট্ ফট্ ফট্—ঠাস্‌...। ফট্ ফট্ ফট্—ঠাস্‌...। শব্দ ক'রে থেমে যায় বারে বারে। কিন্তু শেষটায় গাড়ী চলে আট-দশ মিনিট পর, পিছন থেকে কেউ ঠেলে দিলে। কিন্তু এতে গাড়ীর আরোহীদের কারও আনন্দের লেশমাত্র কমতি নেই। গাড়ীতে চড়েছে এই ত যথেষ্ট, চলুক না থেমে থেমে শব্দে কান ঝালাপালা ক'রে। সদানন্দ মাধবও এ-সব তুচ্ছতম ব্যাপারে মেজাজ খারাপ করবার পাত্র নয়। গর্ব্বে স্ফীত বুকের ছাতিটা আধ ইঞ্চি পরিমাণও সঙ্কুচিত হয় না। বরঞ্চ অনেক কসরৎ করে গাড়ীটা যখন সে ষ্টার্ট লওয়ায়, চালু গাড়ীর ফট্ ফট্ শব্দটা তার কানে মিষ্টি লাগে—যেন বলছে, হট্, হট্! হট যাও সামনেওয়ালা। কাজেই হর্ণটা বদলাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। বলে, থাক ওটা, স্বরাজবিড়ির নাম ফাটুক।

দিন কেটে যায়। এমনি সময় মাধবের ছোট ভাই রাঘব এসে উপস্থিত হ'ল। সে গিয়েছিল সিমলা, মামার বাড়ীতে বেড়াতে। টেপী তখন সবে কাপড় কেচে স্নোর কৌটাটা হাতে নিয়েছে। খোলা জানালাটা দিয়ে চেয়ে দেখলে, ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমে আসছে এক যুবক। হাতে তার বড় একটা সেতার।

বাড়ী ঢুকেই রাঘব দেখলে সকল রকমের স্থানাভাব। তার থাকার ঘরটা দখল করেছে দাদা। আর দাদার ঘরটা জুড়ে বসে আছে কোন অচেনা লোকের বিছানা-পত্তর বাক্স-তোরঙ্গ; কি ব্যাপার! কারা এল পঙ্গপালের মত চড়াও করতে। বাড়ীটাকে করে ফেলেছে একটা হোটেল। রাঘব এসে রকে-পাতা চেয়ারটায় চুপচাপ বসে রইল। এমন সময় দেখলে টেপীকে। মা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এলেই রাঘব একটা অনর্থ ঘটাবে বলে মনে মনে কত কথা আওড়াচ্ছিল, সে সব গেল ভুলে। শুধু বলল, 'মা, আমি তবে থাকব কোন্ ঘরে?' আর কোনও কথা মুখে এল না। তখন মনটা তার এমন রাজ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে যেখানে এ রাজ্যের স্থানাভাব অতি তুচ্ছ। সকল উষ্মা মনের তলে তলিয়ে জেগে উঠল একটা জিজ্ঞাসা—কে মেয়েটি? মিষ্টি চেহারা, ডাগর চোখদুটো যেন কথা কয়!

মনের প্রশ্ন থেকেই জবাবের মহীরুহের অঙ্কুর বেরয়। রাঘবের সে জবাব পেতে বেশী দিন লাগল না। অঙ্কুর পল্লবিত হ'ল।

রাঘব বেকার হলেও বাবা তার ওপর রুষ্ট নয়। তিনটে পাস ত দিয়েছে—চাটুয্যে বংশের ইজ্জতটা রেখেছে; পেটের ভাত জুটবেই আজ নাহয় কাল। কাজেই সে গান-বাজনা ও প্রসাধন নিয়ে দিন কাটায়। মেজে-ঘষে চেহারাটা ধোপদুরস্ত করে তুলবার চেষ্টায় সদা ব্যস্ত, কাজেই চাকরির ধান্দায় ঘুরবার সময় অতি অল্প। রাঘবের সবই আছে, শুধু নেই তার টাকা। টাকার অভাবটা হঠাৎ যেন জেগে উঠল। ঐ একটার অভাবে আর সবকিছুই যে মূল্যহান হয়ে যায় এই পরম

সত্যটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মাধবের ওপর টেপীর টানটা।

তবুও সে ভাবে টেপীর সঙ্গে কি ভাবে আলাপ জমান যায়? কেমনধারা মেয়ে কে জানে? নাম ত টেপী, ভাব-ভঙ্গিতে যা বোঝা যায়, একদম ক্ষেন্তমণি বলে মনে হয় না, আবার বালিগঞ্জের কেটি মিটারের মতও নয়। সে যা হোক, টেপীর সঙ্গে রাঘবের আলাপের সূত্রপাত হ'ল ঝগড়া দিয়ে। রাঘবের ছোট বোন বুড়ী এসে একদিন জানাল—'দাদা, টেপীদি কি বলেছে শুনেছ? বলেছে, তোদের বাড়ী সেদিন কে এল রে? জিজ্ঞেস করলাম, কেন কি হয়েছে? বললে, ভারি অসভ্য, আমার দিকে ভীষণ তাকায়।'

শুনে রাঘব চটে গিয়ে বোনকেই দিলে এক ধমক—'যেমন তুই হাবা, বলবে না! দাদার নিন্দে কান পেতে শুনেই এলি, একটা জবাব দিতে পারলি নে?'

'কি বলব আমি, তুমি কেন ওর দিকে তাকাও?'

'ভাগ্ পেতনী! বললেই পারতিস, তোমার দিকে চেয়ে তোমাকে কৃতার্থ করেছে, তোমার যা রূপ! আমিও ত বলতে পারি আমার দিকে সে-ই বা কেন তাকায়! ভারী অসভ্য মেয়ে।'

'কি যে বল দাদা, তোমার দিকে তাকালে তোমার কি ক্ষতি?'

'আর ওর দিকে তাকানটাই বুঝি ক্রিমিন্যাল? যা, যা, তোদের সঙ্গে কথা বলা চলে না; মিছিমিছি লেখা-পড়া শিখছিস। জানিস, ওদের দেশে কোনও মেয়ের দিকে কোনও ছেলে যদি না চেয়েই চলে যায়, তাতেই ওরা অপমান বোধ করে।'

'কাদের দেশে দাদা?'

'মানুষের দেশে, যেখানে মানুষ থাকে, বিলেতে। আস্ত একটা ইডিয়ট তুই, বললে ত কিছু বুঝবি নে, যা এখন।'

রাঘব সমস্ত নারীজাতটার ওপর চটে গেছে। Actress, born actress; এদের ছায়া মাড়ানও অন্যায়। ভেবে দেখল, যখনই সে টেপীর দিকে চকিতে চেয়েছে, দৃষ্টি-প্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হয় নি সে। ঘরে বসেই যাতে ওকে দেখা যায়, নানা ভাবে ও ভঙ্গিতে সে রয়েছে। কিন্তু কোনও অভদ্র আচরণ আজও করে নি সে। রাঘবের ইচ্ছে হ'ল, নীচে গিয়ে মেয়েটাকে দেয় দু'কথা শুনিয়ে। আবার ভাবলে, না, থাক, এসব ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটিতে দু'পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা চেঁচিয়ে উঠল; এ অন্যায়, অসহ্য, একে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। রাঘব বারান্দায় এসে দ্রুত পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখতে পেল, টেপী আর বুড়ী নিরালায় কি বলাবলি করছে।

রাঘব চটির আওয়াজটা চড়িয়ে দিয়ে ওদের সামনে গিয়ে টেপীর উদ্দেশে বললে, 'আমি নাকি আপনার দিকে তাকিয়ে থাকি, এ কথায় আপনি কি বোঝাতে চান?'

টেপী স্মিতহাস্যে কি বলতে যাচ্ছিল; তাতে রাঘবের মনটা গেল একটু দমে কিন্তু কথার ঝাঁজ কমল না, একটু থেমে বললে, 'তা আপনাকেও ত আমি সে কথাই বলতে পারি।' রাঘব হন্ হন্ ক'রে চলে এল, জবাব শোনবার অপেক্ষা করলে না। রাঘব বিছানায় ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল, যাক, দিয়েছি শুনিয়ে, শিক্ষা হোক, এখন থেকে জিবের লাগামটা একটু ক'সে ছোটাবে।—কিন্তু, চুপ করে থাকলেই বুঝি ভাল হ'ত, মেয়েটা যদি চ'টে গিয়ে বাবার কাছে লাগায়, কিছু অসম্ভব নয়, যে রকম—

'আপনি যে আমায় অমন একটা সাঙ্ঘাতিক কথা ব'লে এলেন, সেটা কি আপনার উচিত হয়েছে?'

রাঘব ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে টেপীকে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে অভ্যর্থনা করলে, 'বসুন'। টেপী গেল ঘাবড়িয়ে, এমনধারা সম্বর্দ্ধনার সঙ্গে সে পরিচিত নয়। সে দাঁড়িয়েই রইল, বসল না। রাঘব যতই পীড়াপীড়ি করে, সে ততই জড়সড় হয়ে পড়ে। ওর গলার স্বর গেল শুকিয়ে, মুখের কথা গেল ফুরিয়ে—এমন ভাবে ঝগড়া করতে আসা ঠিক হয় নি, না এলেই ছিল ভাল। রাঘব জবাব দিলে, 'আমাকেই কি আপনার অমন কথা বলা ঠিক হয়েছে ভেবে দেখুন ত।'

'আপনি যে কথাটা বলে এলেন তাতে আমার কেমন লাগে?'

'আমারই বুঝি খুব ভাল লেগেছে?'

'যাক, এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।'

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'এ ক্ষেত্রে দু'জনই এক নৌকায়।'

'বুড়ীর কথা কিন্তু একটুও সত্যি নয়, আমি বলেছিলাম কি—'

'থাক সে সব কথা, বুড়ী যদি মিথ্যে বলে থাকে তবে এ ঝগড়ার সব দোষ তার। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। এখন ওর সঙ্গে বুঝুন গিয়ে।'

'আমার ওপর আবার চটে থাকবেন না যেন।'

রাঘব হেসে ফেললে, 'চটবার কিছু নেই, আমার লজ্জা হচ্ছে যে, পরিচয় আরম্ভ হ'ল একটা বিশ্রী ব্যাপারে

...ত্রপাতে। বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে, ভারি আক্ষেপ হচ্ছিল। কি জানি ভাববেন আমাকে?'

'তা আর হবে না কেন, দাদারই ত ভাই।'

রাঘব ভাঙ্গাগলায় জবাব দিলে 'হাঁ—।' সে বুঝে নিলে, টেপীর দরদ তার দাদারই ওপর। সেজন্যই বুঝি ঝগড়ার গতি এমন দ্রুত চলল বন্ধুত্বের দিকে। দাদার ওপর বিদ্বেষটা পূর্ব্বাপেক্ষা বেড়ে গেল। হা অদৃষ্ট, তাকে মাপা হচ্ছে মাধবের মানদণ্ডে, যার নেই কোন শিক্ষা, কালচার, টেষ্ট, আছে শুধু দুটো পয়সা, এ ছাড়া জীবনে আর কি সম্পদ্ আছে তার? নাই রূপ, নাই refinement, আর নাই বয়স। রাঘবের একবার ইচ্ছে হ'ল, ঘরের সেলফটা দেখিয়ে দিয়ে বলে যে, সব বইগুলো তার পড়া।

দিন যায়, রাঘবও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হয়ে সে এইটেই বোঝে বিশেষ ক'রে যে, দাদা যে ব্যূহ রচনা ক'রে ফেলেছে তা ভেদ করা দুঃসাধ্য, সব যেন মাধবময়।

ক'দিন থেকে রাঘব অনেক রাত পর্য্যন্ত সেতার বাজাতে আরম্ভ করেছে। রাত গভীর হয়ে আসে কিন্তু ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে মাধব হঠাৎ দেখতে পায়, কে যেন অন্ধকারে রকে ব'সে তার ঘরের দিকে চেয়ে আছে। কে, টেপী? হাঁ, টেপীই বটে! রাঘবের শরীরটা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। রাঘবের সেতার বেজে যায় যেন কোন অনাহত আঘাতে। ঘরে-বাইরে, অদূরের ঐ মাঠটা, বাড়ীগুলি, সব যেন ঘুমুচ্ছে এই ঘুম-পুরীতে, কেবল জেগে আছে একটি সুর—

একরাতে বুকের অনেক ঢিপঢিপানি নিয়ে রাঘব টেপীর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কি, ঘুমাতে যান নি যে?'

টেপী তড়াক ক'রে নিঃশব্দে উঠে চলে যায়। কথার কোনও জবাব দেয় না। রাঘব ত চটে আগুন!—কি ন্যাকামো! বাজনা যার রাত জেগে শুনতে পারলে তার সঙ্গে কথা বলতে এমন কি দোষ? রাঘব আশা করেছিল, টেপী হয়ত বলবে, ভারী মিষ্টি হাত ত আপনার! হয়ত বলে বসতেও পারে, শেখাবেন আমায় একটু? তা না, তিনি তড়াক ক'রে চলে গেলেন। না হয় মোলায়েম করে দু'টো মিথ্যে কথাই বলত, তাতে এমন কি অন্যায় হ'ত। ভদ্রলোকেই মিথ্যা বলতে পারে, কারণ তারাই অভ্যস্ত, প্রয়োজনও তাদেরই বেশী। এমনি চলল কয়েকদিন, কিন্তু রাঘবও নাছোড়বান্দা; একরাতে টেপী রাজী হয়ে গেল তার কাছে সেতার শিখতে।

ঠিক হয়েছিল, সন্ধ্যায় টেপী শিখতে আসবে বাজনা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, সেতারের ঝঙ্কারের চাইতে টাকার ঝনঝনানি অনেক মধুর হয়ে বেজেছে টেপীর কানে। কড়া আকের রস খেতে যার লাগে ভাল, চিনির পানা তার কাছে পানসেই লাগবে।

সন্ধ্যা হলেই মাধব নিয়ে আসে তার বিড়িকোম্পানীর ভাঙ্গা ফোর্ড গাড়ীটা। সবাইয়ের সঙ্গে টেপীও গিয়ে ঠেসে বসে, যেন চালের বস্তা। শহরতলীর নীরব পাড়াটাকে সচকিত ক'রে, মাধব, টেপী, বুড়ী, কাকী ও আরও দু'একজন চলে যায় সিনেমায় আর নয়ত বেড়াতে। সেতারটা রেখে দিয়ে ব্যর্থ রোষে রাঘব নির্জ্জন বাড়ীটায় পাইচারি করে।

এমন দিনে রাঘবের মেজদাদা সাধন বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল। বাপ-মা তাড়ান ছেলে পাঁচ বছর পর বাড়ী ফিরেছে: যেন একটা ঝড়োকাক; গতরাত্রের ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুঝে ক্লান্ত হয়ে গাছের ডালে বসতে এসেছে ভোরের আলো ভোগ করবে ব'লে।

কালো সুন্দর রোগা মুখ! প্রশান্ত ললাটের দু'প্রান্ত ঊর্দ্ধে উঠে গেছে, তাতে লেখা আছে গত জীবনের অনাহার ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

এ বাড়ীতে সাধনের স্থানাভাব চিরকালই ছিল। এখন ত কথাই নেই। চ্যাটার্জ্জি-বাড়ীর পরিবেশে ও কিশোরীমোহনের বিচারে সাধন বহু দোষে দোষান্বিত। প্রথমতঃ কলেজের কোটায় কোন প্রকারে গিয়ে উঠেছিল কিন্তু ডিঙ্গোতে পারে নি। তারই নাকি গাফিলতি। সে নোট মুখস্থ না করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ ক'রে তাই আবৃত্তি করত অষ্টক্ষণ, আবার লেখাটেখারও বাতিক। কাজেই বার বার দু'বার ফেল করার পর কিশোরীমোহন বললে 'কাজ নেই আর কলেজে গিয়ে, এখন নিজের পথ দেখ।' মাধবের মত কাজের ছেলে সে নয়, অকেজো, অলস, দুর্ব্বল ও বাচাল। কিন্তু বাবার অন্নছত্রে গঞ্জনা সহ্য ক'রে প'ড়ে থাকবার পাত্রও নয়। হঠাৎ এক রাত্রে টিনের সুটকেসটা হাতে করে বাড়ী ছেড়ে বাবার নির্দ্দেশ মত নিজের পথ খুঁজতে লাগল। বিগত পাঁচ বছর অনেক কিছুই করেছে পেটের ধান্দায়, অলসতা, দুর্ব্বলতা ও বাচালতা আর নেই। সম্প্রতি কলকাতার এক খবরের কাগজের অফিসে একটা চাকরিও জুটিয়েছে। অকেজো ছেলে কাজ জুটিয়ে বাড়ী ফিরে এল সগর্ব্বে। কিন্তু কারও মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন না দেখে দমে গেল। এমন কি তার যে দু'খানা উপন্যাস ছাপা হয়েছে সে বিষয়েও কারও সামান্য ঔৎসুক্য বা উৎসাহ নেই!

সাধন বারান্দায়-পাতা চেয়ারটায় বসে আছে। ক্লান্তি ও তৃপ্তিতে শরীরে ও মনে এমনি একটা জড়তার আমেজ এসে গেছে যে, নেহাৎ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেহটাকে টেনে তুলতে পারছে না স্নান-ঘরমুখো। একরাশ দাড়ি-গোঁফ, উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, নোংরা জামা-জুতো নিয়ে বসেই আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

'কখন এলি, ডেকে পাঠালেই পারতিস, কাজ-কর্ম্মের কিছু হ'ল, অসুখ করেছিল নাকি?'

সবগুলো প্রশ্নের জবাবে একটা ক্ষুদ্র 'না' বলেই চুপ করে রইল। মাকে উঠে একটা প্রণামও করল না।

—'দাদা, তোমায় অমন দেখাচ্ছে কেন? চান করলে না যে, খাবে না, উঠে এস।'

জবাবে শুধু মাথা নেড়ে জানালে 'হাঁ'।

কামিয়ে, স্নান করে খেয়ে এসে ইজিচেয়ারটায় ব'সে পড়ল। হেমন্তের দিন-শেষের আলো বাড়ীর সামনে বাঁশঝাড়ে এসে পড়েছে। ধীর-মন্থর শহরতলীর প্রান্তে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। বসে বসে সাধন ভাবে পাঁচটা বৎসর, মাত্র পাঁচ বছর; কালচক্রের এই ক'টা মাত্র আবর্ত্তনে এই বাড়ী—আবাল্যের লীলা-ক্ষেত্র, এখান থেকে সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখানে আজ সর্ব্ব ব্যাপারে সে অনাহূত। কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনের দুটো দিন সে নির্ব্বিবাদে কাটাতে চায়, নিদ্রাহীন বহুরাত কেটেছে তার, পাইস হোটেলের পচা ডাল-ভাতে পেট ভরিয়েছে। মা'র হাতের দু' মুঠো গরম ভাত আর একটি ছোট্ট পাতা বিছানা, যেন বহু যুগের ভুলে-যাওয়া স্মৃতি হয়ে মনে আসে ঐ হেমন্তের কুহেলি-সন্ধ্যার মত।

সে কারোর কুশল-প্রশ্ন শুনতে চায় না; কি ভাবে বিগত পাঁচটা বৎসর কেটেছে তাও বলতে চায় না; শুনতে চায় না সে কারোর উপদেশ, কি আক্ষেপ। একা বসে বসে ভাবছে। মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোকে শুতে দেব কোন্ ঘরে?'

'ঘর লাগবে না, রকেই বিছানা পেতে নেব'খন।'

'ঠাণ্ডা লাগবে যে?'

'সয়ে গেছে, অনেক সয়েছে।' বিগত দিনের দুঃখের ইতিহাস বেরিয়ে আসতে চায় বাঁধভাঙা জলের মত। মা চলে যান।

দু'দিন কেটে গেছে, সপ্তাহ হতে চলল; সাধন পড়ে লেখে, লেখে পড়ে, ভাবে। তার মনটা কেবলই তাগিদ দিচ্ছে, এখন যেতে হবে, বেশ ত জিরনো গেল। ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে।

টেপী একদিন বুড়ীকে বললে, 'ঐ রোগা কালো লোকটা মাধব দাদার সরকার বুঝি, ওর নিজের বাড়ী থাকে না কেন রে?'

'কে?'

'ঐ যে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে কেবল দিনরাত লেখে?'

'দূর, সে ত আমার মেজদাদা, ভারী বোকা তুমি দিদি।'

'সত্যি! বসে বসে এত কি লেখে রে?'

'বই লেখে।'

'যে সব বই ছাপা হয়! পড়ার বই, তাই লেখে?'

'হ্যাঁ, দেখবে—পড়বে দাদার লেখা বই?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে আয় না তোর দাদার লেখা বই, দেখি পড়ে কেমন লিখতে পারে। তা' ওকে দেখতে অমন কেন? চাটুজ্জে বাড়ির ছেলে বলেই মনে হয় না।'

'কেন, কি হয়েছে?

'দেখিস না কেমন রোগা, বেজায় কালো, ভোঁদা ভোঁদা—ভারী বিশ্রী দেখতে। আচ্ছা, ওর একটা বই নিয়ে আয় না।'

বুড়ী সাধনের কাছে একটা বই চাইলে টেপীদির নাম করে। সাধন একখানা উপন্যাস বের করে দিলে। বই-এর নাম 'স্বর্ণালোক', কালো মলাটের তিনশ' পাতার একটি বিনীত সংস্করণ, কাগজ ভাল নয়, ছাপা অস্পষ্ট, ছবি নেই, খ্যাতনামা লেখকের ভূমিকা বিবর্জ্জিত। দরিদ্র জীবনের জীবন্ত ছবি, নায়ক সে নিজেই। রচনায় মুন্সিয়ানা নেই, কিন্তু আছে জীবন-দর্শন। জীবনটাকে যে সে দেখেছে সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

টেপী বইটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'তোর দাদার কি মাথা খারাপ?'

'কেন, কি করেছেন তিনি তোমার?'

'দেখ দিকিন, এসবও নাকি কেউ বই-এ লেখে? একটা লোক খেতে পাচ্ছে না ইনিয়ে-বিনিয়ে কেবল সে-কথা। কোনও গল্প নেই, বাজে। একটু প্রেমে প'ড়ে মরুক, একটা খুন পর্য্যন্ত নেই। আমি ত কমপক্ষে দুশ' গল্পের বই পড়েছি কিন্তু প্রেম আর খুন প্রত্যেক-টাতেই আছে। কুলবধূ পড়েছিস? পড়ে দেখবি কি চমৎকার। মেয়েটা তিন-তিনটে খুন করার পর ধরা পড়ল। আচ্ছা, আর কি আছে ওর লেখা, সব নিয়ে আয় গিয়ে, বলবি আমি চেয়েছি।'

সাধন মনে মনে অনেকবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে যে, কিসের টানে সে বাড়ী ছাড়তে পারছে না? যাত্রা

ঘুরে আছে সে কতদিন হ'ল, কিন্তু মনের মধ্যে সে চলার বেগ সঞ্চয় করতে পারে নি। অথচ ছুটিও ফুরিয়ে গেল —আর দেরি করলে কোন অজুহাতই টিকবে না।

বাবা, ভাইয়েরা ও মা সবাই ভাবে, হাভাতেটা আবার বুঝি বসল গেঁথে। নিশ্চয়ই চাকরি-বাকরি কিছু নেই। ছুটিতে এসে চাকুরেরা বাড়ীতে কাটায় ক'দিন? এক মাসের উপর হ'ল এসেছে, যাবার নামটি নেই।

সাধনের সঙ্গে টেপীর আলাপ জমল নেহাৎ সোজা ভাবে—সে এসেছিল বুড়ীর সন্ধানে, চমকে ফিরে যাচ্ছিল, 'কি, চলে গেলেন যে, কাকে খুঁজছিলেন?'

'বুড়ীকে; আপনার বইগুলো ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম।'

'পড়া হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'ও আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, আপনাকে দিয়েছি। দিন, আপনার নাম লিখে দিচ্ছি, আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি থাকবে কেন, দিন না।'

'কেমন লাগল পড়তে, বলুন ত সত্যি করে?'

টেপী মাথা নীচু করে টিপে টিপে হাসতে লাগল।

'ও, বুঝেছি, ভাল লাগে নি বুঝি, ক'বার পড়েছেন?'

'কেন, ক'বার পড়তে হয় আবার!'

'তাই বলুন। আচ্ছা অনুমতি দিন ত, আর যদি সময়ে কুলোয়, আপনাকে তবে উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলি, তার পর যদি দয়া করে আর একবার পড়েন তবে আরও ভাল লাগবে আশা করি। বলব?'

'বেশ ত, বলুন না, গল্প করতে আমার ভালই লাগে।'

সাধনের মুখ খুলে যায়। সে অনর্গল বলে যায় প্রাণের দরদ দিয়ে। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহস্র ঝর্ণা সে খুলে ধরে। বলে যায় সে আত্মবিস্মৃত হয়ে, পাত্র-অপাত্রের জ্ঞান তার পেয়েছে লোপ। নিজের জীবনকে স্বপ্নকে সে উৎসারিত ক'রে দিতে চায়। তার বাণী যেন তাকে ছাড়িয়ে কোন্ উর্দ্ধলোকে চলে যায়।

শ্রোতা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বক্তার মুখের দিকে যেন কোন অজ্ঞাত সম্মোহনের আকর্ষণে। চির অন্ধকারারুদ্ধের সামনে যদি সহস্র আলোর ঝর্ণা খুলে ধরা যায় তবে যেমন সে প্রথমটায় কিছু দেখতেই পায় না টেপীরও তাই হ'ল। সম্মোহনের ভিতর দিয়ে তার কানে গেল কতকগুলো শব্দ, একটা অজ্ঞাত শক্তি প্রাণের আবদ্ধ গুহার দ্বারে হাতুড়ি পিটোতে লাগল।

টেপী আজকাল ভাবতে আরম্ভ করেছে সাধনকে, জীবনকে, সংসারকে একটা নতুন আলোতে। আর সাধন বসে গেছে একটা উপন্যাস লিখতে, নাম দেবে তার তিনগ্রহ। সে উপন্যাস উৎসর্গ করবে টেপীকে, কারণ প্রেরণা পেয়েছে তার কাছ থেকেই। টেপী এসে সময়ে-অসময়ে শুনে যায় নূতন উপন্যাসের কতটা লেখা হ'ল।

এমনি চলে। টেপী তিনটে বিভিন্ন গ্রহের টানে উড়ে বেড়ায় মঙ্গল হ'তে বুধে, বুধ হতে শনিতে। শনি তাকে টেনে নিয়েছে জ্ঞানের কোন্ উর্দ্ধলোকে, এক অজ্ঞাত স্বপ্নময় রাজ্যে, অমনি সেতার উঠল বেজে, নেমে আসে সে বুধে,মঙ্গলের কাছাকাছি আলোছায়ার অস্পষ্টালোকে, তারপর বেজে ওঠে মোটারের হর্ণ, চলে যায় সে মঙ্গলে। খুশিতে প্রাণ উপচে ওঠে, বলে—'এই ত পেয়েছি—এই ত জীবন।'

কিন্তু এমনি তিনগ্রহের মাঝপথে হঠাৎ একদিন স্বামীটি এসে উপস্থিত; টেপীকে নিয়ে যাবে। একটা চাকরি জুটিয়েছে সে, ফ্রি-কোয়ার্টার সমেত। টেপী যেন এগিয়েই ছিল। আর বসে থেকে সময় নষ্ট করার মেয়ে সে নয়।

এখন শুনছি, লক্কড় ফোর্ডের গিয়ার-বাক্সটা একেবারেই গেছে বিগড়ে, সেতারের তারে জমছে ধুলো, 'তিনগ্রহ' উপন্যাসটা শেষ না করেই সাধন আবার নিরুদ্দেশ। আর সেই আগাম দু'মাসের ভাড়া দেওয়ার পর দীননাথ বাড়ীভাড়া দেয়নি পাঁচ মাস।

# নর্মকথা

( তোটক ছন্দ,—'কতকাল পরে বল ভারত রে'—র মত )

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

হিম-শীতল-ফেনিল-সোমরসে
পরিপূরিত চিত্রিত পাত্র 'পরে
মকরন্দ বশে, মধুমক্ষি পশে
তব তামরসে সখি মজ্জি মরে।

হেরি মুগ্ধ ধরা হয় মুগ্ধতরা
শুভ-শুভ্র-শুচিস্মিত-হাস্যঝরা,
সরসীর জলে, অরবিন্দ-দলে,
সুরসাল রসাঞ্জন নেত্র ভরা।

কত রত্ন ঝলে, ঝলকে মেখলা,
মণি-কিঙ্কিণি কঙ্কৃত মন্দ মৃদু
কিল-কিঞ্চিত-ভাব-বিলাস-কলা
মুখখানি বিনিন্দিত কোটি বিধু।

দুটি রক্ত সরোরুহ ফুল্ল পদে
পুলকাঞ্চিত কাঞ্চি নিনাদ তুলি
নব-যৌবন-সম্পদ-পূর্ণ-মদে
নিজ-সৌরভ-গৌরবে বিশ্ব ভুলি।

নব-বঞ্জুল-মঞ্জরি-ফুল্ল-দলে
হল সপ্তনরী ফুল মাল্য গাঁথা,
সখি! দুল্‌ল সে মালিকা কণ্ঠতলে
মণিবন্ধে পদে ফুলবন্ধ বাঁধা।

নব-চম্পক-লাবণি-বহ্নি-শিখা
শরদিন্দু-বিনিন্দিত-কান্তিমতী,
বুঝি দিগ্বিজয়েরি বিবৃত্তি লিখা
বিজিতেরা সবে কৃত কৃত্য মতি।

দুটি পদ্মের কুটমল বক্ষে করি
নবনীত-সুকোমল-বৃন্ত 'পরি
নমনীয় বলে, কটি মধ্য টলে,
যুব-চিত্ত চলে চরণাঙ্ক ধরি।

মুখে লোধ্র রেণু দুটি গণ্ড ঘিরে
গুণ গুঞ্জরিয়া কত ভৃঙ্গ ফিরে
সুতনু তনিমা, অতনুর সীমা,
মহিমা পরিমাণিত সিন্ধু নীরে।

হেরি কাম-শরাসন-ভঙ্গি-ভুরু
অনবদ্য রূপে কাঁপে বক্ষ দুরু,
কভু ব্রীড়াভরে, কভু ক্রীড়াভরে,
মুনি মানস নৈবচ ধৈর্য ধরে।

মম মঞ্জিলে মঞ্জুল কুঞ্জবনে
মধু মাসে মধুৎসবে দেবী হবে
মলয়ানিল-সেবিত সে-পবনে
মম মর্ম-কথা ক'ব কর্ণে তবে।

# অজন্তার চিত্রদর্শনে

শ্রীকালিদাস রায়

এ চিত্রটি বিশ্বে অতুলন
গোপা এনেছেন ভিক্ষা ভিখারীরে করিতে অর্পণ ;
রাহুলের হাত দিয়া। আপনার প্রাসাদ দুয়ারে
এ ভিখারী তথাগত সমাগত ভিক্ষা মাগিবারে।
আর এক চিত্র পড়ে মনে,
সে চিত্র-ও অপূর্ব ভুবনে।
আপন সতীর কাছে ভিক্ষুপতি অন্নমুষ্টি যাচে
পাতিয়া করোটি-পাত্র। সে চিত্রও ম্লান এর কাছে।
পরিপূর্ত এতে ত্রিশরণ,
ত্রিশরণে করি জয় এ যে দীপ্ত করে ত্রিভুবন।
সে কোন শ্রমণ শিল্পী যেবা দীর্ঘ তপ আচরণে
দিব্যশক্তি প্রজ্ঞাদৃষ্টি লভিল নয়নে।
এই চিত্র করিয়া অঙ্কন
অর্হত্ত্ব করিল লাভ জীবন্মুক্ত হ'ল যেই জন।
আপন পঞ্জর তলে এ ভারত রাখিয়াছে ভরি'
বহু বহু বর্ষশত ধরি,
অতুল ঐশ্বর্য ত্যর সর্বাঙ্গের তাও তুচ্ছ গণি
এই চিত্রে ভাবি তার প্রাণ বজ্রমণি।

ভারতে চিনিতে যদি হয়,
এই চিত্র দিবে তার বিশ্বমাঝে পূর্ণ পরিচয়।
নহে চৈত্য, নহে মঠ, নহে স্তম্ভ, স্তূপ,
ভারতের গূঢ় মর্ম এই চিত্রে লভিয়াছে রূপ।
সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে—অশ্রুজলে ভরে দু'নয়ন
কারুণ্য বিস্ময় শমে মিলাইল কোন রসায়ন?
কোন রসতত্ত্ব আজো পায়নিক তাহার সন্ধান,
সর্বরসাতীত রস দেহ আত্মা করে মুহ্যমান।
এই কি সাত্ত্বিক রস যাহা ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর?
ঊর্ধ্ব পানে ধায় কেন পাখা মেলি এ জড় অন্তর?
তুচ্ছ মনে হয় এই সমারোহ-স্পর্ধিত সভ্যতা।
তুচ্ছ ভায় শতরাষ্ট্র উত্থানের পতনের কথা।
লুপ্ত পুর জনপদ, শূন্য ভায় ঐশ্বর্য সুষমা,
সেই শূন্যে জাগে শুধু সুগতের বদন-চন্দ্রমা।
এই চিত্র বিশ্বে অতুলন,
নত করে উদ্ধতেরে শ্লথ করে ভবের বন্ধন।

# পশ্চাদ্দৃষ্টি

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

বিখ্যাত বাংলা মাসিক "প্রবাসী"র হীরক জয়ন্তী সংখ্যা (ষষ্টি-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ) প্রকাশিত হইয়াছে। গত পৌষ মাস হইতেই ইহার সূচনা দেখিয়া আসিতেছিলাম যে, ইহাতে বিশেষরূপে বিগত ষাট বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে নানা দিকে যে সকল প্রগতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাদের বিশদ বিবরণ থাকিবে। ইহা দেখিয়া আমি স্বভাবতঃই ঐ গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হই, কারণ আমার নিজের বয়সও প্রায় ঐ সঙ্গেই ষাট পূর্ণ হইয়াছে এবং বিগত জীবনে যাহা কিছু দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহাদের পুনরালোচনাতে একটা আনন্দ অপেক্ষিত ছিল। সুতরাং আমি অবিলম্বে অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া প্রত্যাশিত গ্রন্থের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ি। প্রকাশিত হইলে দেখিলাম বিরাটকায় গ্রন্থ বহুবিধ প্রবন্ধ, গল্প-কবিতা চিত্রাদি দ্বারা শোভমান, যাহার মূল্য উহার গুণের তুলনায় সামান্য।

গল্প-উপন্যাসাদি বাদ দিলেও যে অংশ শুধু গত ষাট বৎসরের প্রগতির আলোচনা করিয়াছে, তাহাও অতি বিস্তৃত। শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গত ষাট বৎসরের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন যথাক্রমে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত। তাহা ছাড়া গদ্যে, পদ্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, রাষ্ট্রচেতনায়, সমাজসেবায় ও শিল্প-কলায় বাংলার প্রগতি সম্বন্ধেও অনেক লেখক আলোচনা করিয়াছেন।

আমি ষাট বৎসরের বৃদ্ধ ও জীবনের দীর্ঘ ৩৭ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিতেছি, সুতরাং আমার নিজের অভিজ্ঞতা কিছু কিছু শুনাইলে পাঠকদের কিছু উপকার হইতে পারে মনে করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। তবে একটা কথা আগেই বলিয়া রাখি অধিকাংশ বৃদ্ধের ন্যায় আমিও good old days-এর স্বপ্ন দেখিলেও আমি এরূপ বলি না যে, যাহা কিছু পুরাতন তাহা সবই ভাল। অনেকগুলি পরিবর্ত্তন এখন মানব-সভ্যতার বিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হইবার পরে এখন আর কেহ হাতে পুঁথি নকল করার কথা চিন্তা করে না অথবা এই রেল-তারের যুগেও কেহ অশ্বপ্রেরিত ডাক বা Stage Coach-এর যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহিবে না।

পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তানরূপে আমার জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশেষ মাসে। পিতৃদেব রংপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে কাজ করিতেন এবং সেখানকার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই আমার বিদ্যারম্ভ হয়। আমার বর্ণজ্ঞান নাকি খুব অল্প সময়েই হয়। সংবাদপত্রে তখন চিত্রসহ রুশ-জাপান যুদ্ধের সমাচার প্রকাশিত হইত এবং আমিও তাহা পড়িতে চেষ্টা করিতাম। স্কুলে শুধু বাংলা ও অঙ্ক শিখান হইত। শিক্ষাবিভাগ হইতেই বোধ হয় কিণ্ডারগার্টেন রীতিতে শিক্ষাদানের নির্দ্দেশ ছিল। বিশেষ প্রকারের সচিত্র পুস্তকের সাহায্যে বস্তু ও সংখ্যার জ্ঞান দেওয়া হইত। ঘর হইতে কাঠি লইয়া যাইতাম যাহা জুড়িয়া অক্ষর প্রস্তুত করিতে হইত। দুই বৎসর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর আমরা দেশে (ঢাকা জেলা) ফিরিয়া আসি। এক বৎসর দাদা ঘরেই ইংরেজী, বাংলা ও অঙ্ক পড়ান ও পরে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে (চাঁচরতলা, সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুল) ভর্ত্তি করিয়া দেন।

ইংরেজী স্কুলের নামে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি দাদা-দিদিরা করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের মত অমনোযোগী ছেলেদের যে সেখানে 'মেরে ছাল তোলা হয়' তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিয়াই দেখি যে, ক্লাসের Standard আমার শিক্ষার অনেক নীচে। ইংরেজীতে এক Spelling Book হইতে শুধু বানান শিখান হইত। বাংলা পণ্ডিত মশায় যে রীতিতে পড়াইতেন তাহাতে 'বিশ্বাস' মানে কি প্রশ্নের উত্তরে 'প্রত্যয়' বলিতে হইত, তা তাহার অর্থ ছেলেরা বুঝুক বা না বুঝুক। পরে শুনিয়াছি যে সংস্কৃতেও "সূর্য্যস্য টীকা ভানুঃ" বলিয়া একটা প্রবাদ আছে।

শৈশবে আমাদিগকে খাগের বা খাগড়ার কলমে (reed pens) কলাপাতাতে লিখিতে হইত। হাই স্কুলেও ৪।৫ বৎসর শ্লেটে ও পাকের কলমে (quill pens) লিখিয়াছি। নিজেরা ব্যবহার না করিলেও বৃদ্ধদের

...কী ও চাউল পোড়া হইতে কাল কালি প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি। পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত শ্লেটে ও মুখে মুখে পরীক্ষা দিতে হইত। শ্লেটে শুধু একটা শ্রুতিলিখন লিখিতে হইত। বাকী প্রশ্নগুলি মৌখিক হইত এবং এক একটি করিয়া ছাত্র ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইত। আমাদের পরের বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতেও লিখিত পরীক্ষা চালু হইয়া যায়, কিন্তু আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রথমে 'কাগজে' পরীক্ষা দেই। একটা অতিরিক্ত নিবের কলম রাখিলেও তখন বেশীর ভাগ পাখের কলমেই লিখিতাম এবং তাহাতে যে একটা অব্যক্ত কচ্ কচ্ শব্দ উঠিত তাহাতে বেশ আরাম অনুভব করিতাম।

সপ্তম শ্রেণী হইতেই আমাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি ইংরেজীতে পড়িতে ও লিখিতে হইত। প্রথম প্রথম কিছু মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিলেও ও বিদ্যাটা আমি কখনও আয়ত্ত করিতে পারি নাই এবং নিজের ইংরেজীতে লিখিয়াও ইতিহাসাদিতে ভালই নম্বর পাইতাম। আমার হাই স্কুল-জীবনে প্রধান শিক্ষক চার বার বদল হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদা গাঙ্গুলী মহাশয় দুই বৎসর মাত্র থাকিলেও ছাত্রদের চরিত্র নির্ম্মাণের জন্যই অধিক যত্নশীল ছিলেন এবং শাসন অপেক্ষা মিষ্ট-বাক্যের সাহায্যেই আমাদের হৃদয় জয় করিতেন। শ্রীবসুধাকুমার গুহ ও শ্রীবিধুভূষণ হাজরা আমাদের স্কুলে স্থায়ীভাবেই ছিলেন। উভয়েই শুনিয়াছি বি. এ. ফেল, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধিতে এখনও তাঁহাদের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছি এমন দুঃসাহস আজও মনে হয় না। ইংরেজীতে বাবুর বসুধা এবং অঙ্কে বিধুবাবুর অপূর্ব্ব দক্ষতা ছিল যদিও তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ও সাফল্যের সহিত পড়াইতেন। তাঁহাদের ব্যবহারও মধুর ছিল। সে যুগে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য বেশী কঠোর প্রায় কোন শিক্ষকেরই হইতে হইত না। ছাত্রেরা তাঁহাদের প্রতি যে ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ করিত, তাহাতেই কাজ চলিত। আমাদের স্কুলে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষক মহাশয়ই একমাত্র গ্র্যাজুয়েট ছিলেন, পরে বিপদবারণ সরকার নামে এক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং অস্থায়ীভাবে আরও কয়েকজন আসেন। বিপদবারণবাবুকে তাঁহার বরিশালের উচ্চারণের জন্য আমরা পরোক্ষে ব্যঙ্গ করিতাম বটে কিন্তু স্বীয় চরিত্রগুণে তিনিও আমাদের অসীম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিই গীতা হইতে আমাদের উপদেশ দিতেন এবং আমাদিগকে গীতাপাঠে উৎসাহ দিতেন। আমি গীতা-পাঠের ইচ্ছা জানাইলে তিনি আমাকে একখানি গীতা দেন ও মধ্যে মধ্যে উহাতে আমার প্রগতি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিতেন। উত্তরকালে গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি নাকি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। তিনি বোধহয় এখনও জীবিত আছেন, কারণ চার বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। আমার লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ (যদিও হিন্দী মাধ্যমে লিখিত) উপহার পাইয়া তিনি পরম পুলকিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তাহাতে তাঁহারই প্রদত্ত কয়েকটা উদাহরণের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি।

বাল্যকালে মা'র নিকট অসংখ্য গল্প শুনিয়াছি ও দিদির কাছে মহাভারতের গল্প শুনিয়াছি। এই গল্প-শুশ্রূষাই উত্তরকালে গল্পের বই পড়ার উৎসাহ জুটাইয়াছিল। আমাদের সময়ে পাঠ্যের বাহিরে পুস্তক খুব কম পাওয়া যাইত, কিন্তু হাতের কাছে যাহা পাইতাম তাহা প্রায় বাদ দিতাম না। রাজা রামমোহন রায় নাকি বাল্যকালে একদিনে কৃত্তিবাসের রামায়ণ শেষ করিয়াছিলেন। এজন্য সারাদিন অনাহারে একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন—বহু খোঁজেও তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। ঠিক অতটা না হইলেও আমি ৮।১০ বৎসর বয়সে নিত্য মৃতা পিসীমার ঘরে কয়েক ঘণ্টা আবদ্ধ থাকিয়া অল্পদিনেই তাঁহার রামায়ণখানা শেষ করিয়াছিলাম। দাদাদের ভয় করিতাম, কিন্তু তবু তাঁহাদের অনুপস্থিতে তাঁহাদের পাঠগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া দেখিতাম তাঁহাদের পাঠ্য বা অপাঠ্য বই-গুলিতে কি আছে। আমাদের ছেলেবেলায় "মুকুল", "তোষিণী", "সন্দেশ", "বালক" প্রভৃতি ছোটদের পত্রিকা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এরূপ সাহিত্য পাইবামাত্রই পড়ার ঝোঁক আমার যেমন তখন ছিল তেমন এখনও আছে। "মুকুল" আমাদের বাড়ীতেই আসিত। তাহাতে ইউজিন স্যাণ্ডোর জীবনী, হ্যানসেনের মেরু আবিষ্কারের কাহিনী, জামসেদজী তাতার লৌহ কারখানা স্থাপন প্রভৃতি কতগুলি কথা এখনও স্মরণ আছে। ৺দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমা'র ঝুলি ও ঠাকুরদাদার ঝুলি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করি। ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছবি ও গল্প, ৺ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী প্রভৃতি সানন্দে পড়িয়াছিলাম এবং বড়দের নজর বাঁচাইয়া বঙ্কিমবাবুর প্রায় সব উপন্যাসই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। স্কুল লাইব্রেরীতে চমকদার চিত্রশোভিত Nursery Tales-এর পুস্তক পাওয়া যাইত। দাদাদের ও শিক্ষকদের

উপদেশে তাহা আনিয়া পড়িতাম। তন্মধ্যে Cinderalla, Puss in Boots, Jack and the Beanstalk, Jack the Giant-killer, Beauty and the Beast, Sleeping Beauty নাম কয়টা মনে আছে। কৈশোরে পৌঁছিয়া Arabian Nights, Folk Tales of Bengal ও Grimm's Popular Stories-এর বাছা বাছা গল্প পড়িয়াছি। ইংরেজী বড় বড় বইগুলি পড়ার ধৈর্য্য আমার থাকিত না তাই অনেক বই আংশিক পড়িয়া ছাড়িয়া দিতাম। কিন্তু ঐ যুগের বড় ছাত্রদিগকে Students' Manual, Uses of life, Secrets of Success, Smiles Selections প্রভৃতি কঠিন বিচারাত্মক পুস্তকও পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের অনেকে বিতর্ক-সভায় ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতাও করিতেন। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর দুই-তিনটি ভাল ছেলেকে ডবল প্রমোশন অথবা হাফ-ইয়ারলি প্রমোশন দেওয়া হইত।

যদিও আমরা খুব গরীব ছিলাম না, ছেলেবেলা আমরা দিনে দুই বার খাইতাম। একবার ভাত খাইয়া স্কুলে যাইতাম এবং আবার সন্ধ্যায় খাইতাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইতে মা তাড়া দিতেন কিন্তু সন্ধ্যা পড়িয়া গেলে তাহা পার না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। আহারের পরে ছালা পাতিয়া ২।৩ ঘণ্টা পড়িয়া শুইয়া পড়িতাম। সকালে যেদিন মুড়ি, পান্তা বা ফেন-ভাত খাইতে পাইতাম সেদিন ত ভাগ্যই মনে করিতাম। এখন ছেলেমেয়েরা সকালে চায়ের সঙ্গে জলযোগ, স্কুলের সময় ভাত, স্কুলে লাঞ্চ, স্কুল হইতে ফিরিয়া জলযোগ বা ভাত এবং রাত্রিতে রুটি বা ভাত— এত বার খাইয়াও তাহার বেশী কার্য্যক্ষম হইতেছে কি? আমাদের সময় টিউশন-পড়া একটা দুর্লভ বিলাসিতা ছিল। বিদেশী শিক্ষকেরা থাকা-খাওয়ার সুবিধার জন্য কোন বড়লোকের বাড়ী থাকিতেন ও বদলে ২।১টি ছেলে পড়াইয়া দিতেন। কাহারও বাড়ী গিয়া শিক্ষাদান বা শিক্ষালাভ আমাদের সে যুগে দেখি নাই।

বড়দাদা আমাদের গ্রামের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। ছুটিতে বাড়ী আসিলেই গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত। শিক্ষিতদের ধরিয়া কিছু জ্ঞানলাভের চেষ্টা করার রীতি সে যুগের অশিক্ষিতদের মধ্যে ছিল। তখন স্বদেশী যুগ। বড়দাদাকেও দেখিয়াছি একখানা ভারতের মানচিত্র লইয়া লোককে বুঝাইতেন যে, এই আমাদের দেশ—ইহা কিরূপে পরাধীন হয়, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি এবং আরও নানা কথা। আমাদের ও পাড়ার ছেলেদের একত্র করিয়া কখনও কুমীর কুমীর খেলিতেন, কখনও পুকুরের পাঁক হইতে marsh gas বা কয়লা হইতে coal gas সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যাবেলা আতসবাজীর ন্যায় জ্বালাইতেন। একবার দুইটি সমান ছায়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়া উঠানে দ্রাঘিমা-রেখা অঙ্কিত করেন এবং ওলন-দড়ির ছায়া ইহার সহিত মিলিতেই ১২টা ১৬ মিনিট হয় কি না দেখিয়া নূতন ঘড়ির বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেন। এই সকল প্রক্রিয়া দেখিয়া আমাদের প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা মিলিত।

বিদ্যার্থী-জীবন আরম্ভ করিতেই সেই যুগের "বন্দে-মাতরম্" ও অন্যান্য বহু চিত্তোন্মাদক স্বদেশী গান শুনিয়া শুনিয়াই মুখস্থ করিয়াছিলাম। সে সকলের একখানা সংগ্রহ যদি এখনও প্রকাশিত হয় ত বঙ্গসাহিত্যের এক বিস্মৃত সর্গের পুনরুদ্ধার হয়। রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের দিন বড়দের সঙ্গে শোভাযাত্রায় সারাদিন ঝাণ্ডা লইয়া ঘুরিতাম। মা শিশুদিগকে ভাত খাওয়াইতে চেষ্টা করিলেও আমরা কিছুতেই খাইতাম না। আমাদের গ্রামে অনুশীলন-সমিতির এক শাখা স্থাপিত হইয়াছিল যাহাতে লাঠিখেলা ও কুস্তি শিখান হইত। তাহাতে ছোড়দার নাম ছিল, কিন্তু কয়েক দিন সেখানে না যাওয়ার খবর পাইয়া একদিন মেজদাদা তাঁহাকে প্রহার করেন। হঠাৎ একদিন 'পুলিস আস্‌ছে', 'পুলিস আসছে' রব শুনিলাম, সমিতির শিক্ষকসহ গ্রামের কয়েকজন গ্রেপ্তার হইলেন ও সমস্ত আন্দোলন যেন নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। যদি আন্দোলন বন্ধই করিতে হইবে ত এতদিন বৃথা কেন হৈ চৈ করা হইল তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ সেই শৈশবেও সমর্থন করিতে পারি নাই। কিন্তু আন্দোলন যে যথার্থই শান্ত হয় নাই তাহা টের পাইলাম কয়েক বৎসর পরে। প্রথমে কিছু বয়স্ক ছাত্রের মাধ্যমে আমাদের হাতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য, অশ্বিনীবাবুর ভক্তিযোগ, জীবনী সংগ্রহাদি পুস্তক আসিয়া আমাদের ধর্ম্মভাব জাগ্রত করে। তাঁহাদের প্রেরণায় পরমহংসের জন্মোৎসবে কীর্ত্তনাদিসহ গ্রাম-পরিক্রমা প্রভৃতিতে আমরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি। অনেক সংস্কৃত ও বাংলা স্তব শুনিয়া শুনিয়াই মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। পরে এক Nursing Party-তে ভর্ত্তি করিয়া আমাদিগকে সেবাধর্ম্ম শিখান হয়। বৈশাখে ৺সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে বিরাট মেলা বসিত—তাহাতে যে জলছত্র বসিত তাহাতেও আমরা কাজ করিতাম। অবশেষে কিছু বাজেয়াপ্ত বই আমাদের হাতে আসিতে লাগিল, যথা—দেশের কথা, স্বাধীনতার ইতিহাস, টডের রাজস্থান, সিপাহী বিদ্রোহ, মাৎসিনি, গারিবল্ডি ও নেপোলিয়নের

[illegible]রিনী ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে আমাদিগকে গুপ্ত সমিতির সভ্য করিয়া কিছু প্রতিজ্ঞা করান হয়। সভ্যদের ডায়রী লিখিতে হইত যাহাতে দৈনিক আত্মসংযম, পাঠ, ব্যায়াম ও উপাসনাতে চ্যুতি হইলেই তাহা অকপটে নোট করিতে হইত। জনসেবার নামে আমরা মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিতাম কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই জাতীয় (স্বদেশী) কোষে যাইত। ঘর হইতে চাউল ও বাজার খরচ হইতে পয়সা 'সংগ্রহ' করিয়াও চাঁদা দিতাম। দেশের জন্য চুরি করাতে নাকি পাপ নাই। কোন কোন সভ্যকে নাকি টাকা ও অলঙ্কার সংগ্রহেরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইত। আমি রুগ্ন ও বয়সে ছোট ছিলাম বলিয়া বেশী বিপজ্জনক কাজে আমার ডাক হইত না। ১৯১৬ সনে যখন আমরা দশম শ্রেণীতে পড়ি, আমাদের সঙ্গী ও ছাত্রনেতা সীতাংশুকে এক ডাকাতির চার্জ্জে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণ করা হয়। পুলিস আমাদেরও ডাকাইয়া কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে। আবার কিছুদিন সমিতির কার্য্যকলাপে ভাঁটা পড়ে। কিন্তু আমাদের জীবনে তখনই ইহার যবনিকাপাত হয় যখন প্রবেশিকা পাস করিয়া কলেজে পড়ার জন্য আমরা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ি। আশ্চর্য্যের বিষয় অনুমানে এক-আধ জনকে বুঝিলেও, বাহির হইতে কাহারা গুপ্ত-সমিতির ও নিষিদ্ধ পুস্তকের লাইব্রেরীর পরিচালনা করিতেন, তাহা কিছুই জানিতে পারিতাম না। এ বিষয়ে আমাদের যাবতীয় শিক্ষা বয়স্ক ছাত্রদের মাধ্যমেই হইত। কতগুলি গুরু-শিষ্য পরম্পরা ছিল যাহাতে শিষ্যেরা শুধু তাহাদের নিজের গুরুকে চিনিত এবং আমিও ঐরূপ একটি শিষ্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম।

এই দীর্ঘ জীবনে কি কি পরিবর্ত্তন দেখিলাম তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি। অনেক কথাই বৃদ্ধ লেখকেরা উক্ত 'স্মারক গ্রন্থে' লিখিয়াছেন কিন্তু যে সব বাদ পড়িয়াছে তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি। আমাদের বাল্যকালে যদিও ম্যাচিস পাওয়া যাইত (১ পয়সায় ২টা বড় জাপানী বাক্স), বৃদ্ধারা গন্ধকের দীপশলাকা পছন্দ করিতেন। পাটকাঠির বিঘৎ পরিমাণ টুকরাটার দুই প্রান্তে গলিত গন্ধক লাগাইয়া আঁটি বাঁধিয়া রাখা হইত। একটি মৃৎপাত্রে তুষের আগুন সারাদিন জ্বলিত যাহাতে শলাকার প্রান্ত ডুবাইয়া দিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠিত। বোমাকাণ্ড প্রকাশিত হইলে বাজারে গন্ধকের বিক্রী নিষিদ্ধ হয় ও গন্ধক-শলাকার ব্যবহার উঠিয়া যায়।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের লোকের উল্লেখ করিয়া কোন কোন লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপক (mass) শিক্ষার এক পরিণাম যেমন বেকারী সেইরূপ অন্য পরিণাম একান্নবর্ত্তী পরিবারের লোপ। "সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ…"প্রভৃতি উক্তি এখন অতীতের স্মৃতি হইয়া গিয়াছে। চাহিলেও সকল শিক্ষিত ভাইদের একস্থানে কার্য্য জোটে না। উদরান্নের জন্য কে যে যাইবেন হাজারীবাগ ও কে কানপুর, তাহার স্থিরতা থাকে না। ভাইয়েরা স্ব স্ব কার্য্যস্থলে পরিবার লইয়া বাস করেন। ছুটিতে কেহ বাড়ী আসেন কেহ বায়ু পরিবর্ত্তনে যান। সকলে একসঙ্গে বাড়ী আসিলে প্রায়ই থাকার জায়গা হয় না, ম্যালেরিয়ার ভয়ও আছে। দেশ বিভাগের ফলে অনেকের স্বাভাবিক বাড়ী বলিয়াও কিছু নাই। এইরূপ যৌথ পরিবারের ভঙ্গ এখন পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতেই ঘটিতেছে। কোথাও বিধবা মাতা পালাক্রমে এক এক পুত্রের বাড়ী গিয়া বাস করেন (ভাগের মা) তদপেক্ষা অস্বাভাবিক ব্যাপার যাহা আজকাল কোথাও ঘটিতেছে তাহা এই যে, স্বামী হয়ত কুচবিহারে অধ্যাপক ও স্ত্রী মেদিনীপুরে শিক্ষিকা। অন্য চাকুরিতেও আজকাল বহু মহিলা প্রবেশ করিতেছেন এবং করিয়া পুরুষদের মধ্যে বেকার সমস্যা আরও বাড়াইয়াছেন। ইহারা সকলেই যে নিরুপায় হইয়া চাকুরিতে ঢুকিয়াছেন তাহা নয়—ছাত্রজীবনে গৃহকর্ম্ম শিখেন নাই বলিয়া অথবা 'আমরাই বা পুরুষের চেয়ে কম কিসে' মনোভাব হইতে। বহুক্ষেত্রেই ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের ২।৩টা বিষয় বেশী শিখিতে হয়, যথা—সিলাই, গান, নাচ। এ সবে ব্যস্ত দেখিয়া মাতারা তাহাদের গৃহকর্ম্মে ডাকিতেও সাহস করেন না। ফলে বাংলার রন্ধনশিল্প যাহা আমার মতে জগতে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা আজ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্বে ১০ বৎসর বয়সেই ইহাতে শিক্ষারম্ভ হইত, কিন্তু এখন বৃদ্ধাদের হাঁড়ি-ঠেলার অতিরিক্ত পরিশ্রমেও সাহায্য করিবার কেহ নাই এবং বৃদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্প লুপ্ত হইবে বলিয়া শঙ্কা হয়। এখন শিক্ষিত মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গিয়াও রান্না শেখার চেয়ে চাকুরি করাই বেশী পছন্দ করেন ও তজ্জন্য দূরেও চলিয়া যান। যে ভৃত্যেরা পূর্ব্বে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শও করিতে পারিত না, তাহারাই combined handরূপে হোঁসেলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলার নিজস্ব রান্না—সুক্ত, চচ্চড়ি, ঘণ্ট, ডালনা প্রভৃতিকে ডক্টর সুনীতি চাটার্জ্জী বাংলা সংস্কৃতির এক মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গ বলিয়াছেন যাহা বাঁচানো প্রয়োজন। প্রবাসীর 'স্মারক গ্রন্থে' "দ্রৌপদী" শীর্ষক লেখায় যত চর্ব্বচোষ্যের উল্লেখ হইয়াছে সকলের সহিত আমরা পরিচিত, যদিও উঁহারা আজ

নিতান্তই দুর্লভ। শুধু রান্না নয়, পরিবেশন ও খাওয়াটাও আর্ট যাহা শিখিতে হইত। বাঙালীদের আর একটি লুপ্তপ্রায় কলা পিষ্টক-শিল্প। পুলি, কাটাপুলি, ভাজা-পুলি, রসপুলি, চন্দ্রপুলি, রসবড়া, কলার বড়া, তালের বড়া, পাটিসাপটা, চসি, চিতই ( আস্কে ) প্রভৃতি নানা-বিধ পিঠার প্রস্তুত-প্রণালী প্রাচীনারা জানিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণ সংক্রান্তি ও পৌষ সংক্রান্তি প্রধান পিঠা-পর্ব্ব ছিল। প্রথমে তাল ও কলার ও দ্বিতীয়ে নারিকেল ও খেজুর গুড়ের অধিক ব্যবহার হইত। ঘি, ময়দা, চিনি ও দুধের পরিবর্ত্তে গরীবেরা তেল, পিটুলী, গুড় ও জলের সাহায্যেই এরূপ সুখাদ্য প্রস্তুত করিতেন যাহার স্মরণে আজও রসনা জলসিক্ত হয়। উৎসব ছাড়াও জামাই বা সম্মানিত অতিথি ঘরে আসিলে মোয়া, নাড়ু ও নানাবিধ পিষ্টকে তাহাদের অভ্যর্থনা হইত। সেস্থলে আজ বাজারের মিঠাই আনার রীতি হইয়াছে। আমার মনে হয় শহরের হাজার মিঠাইর দোকানের সঙ্গে ২।৪টা পিষ্টকের দোকান খুলিলেও সেখানে লোকে অল্পব্যয়ে অধিক পরিতৃপ্তি লাভ করিত।

স্কুল-কলেজের শিক্ষার আর একটা কুফল এই যে, ভদ্রশ্রেণীর সংখ্যা বাড়িতেছে, নিম্নশ্রেণীর কমিতেছে। প্রতি বৎসর বহু চাষার ছেলে ভদ্রশ্রেণীতে উন্নীত হইতেছে, কিন্তু কোন ভদ্রলোকের ছেলেই শ্রমিকশ্রেণীতে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত নয়। প্রত্যেক সমাজেই বোধ হয় বুদ্ধিজীবীর চেয়ে শ্রমিকই অধিক সংখ্যায় প্রয়োজনীয়। আমি বিহারের একটা গ্রামাঞ্চলের স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এখানে ছাত্রদের মধ্যে কৃষকের ছেলেই বেশী। আজকাল পাঠ্যক্রমের মধ্যে সপ্তাহে ২।১ ঘণ্টা কৃষি ও শ্রমের কার্য্যও যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ছেলেরা যে সময় পিতার নিকট কাজ শিখিতে পারিত আমরা স্কুলে টানিয়া তাহাদের সে অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি। আমি নিজে যে বিদ্যা জানি না তাহা কাহাকেও শিখাইতে চেষ্টা করা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। আর সফল কৃষক বা সফল শ্রমিক হওয়ার উদ্দেশ্যে কোন পিতা ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠান না—বাবু করিতেই পাঠান। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান ও প্রধানতঃ গ্রামের দেশ। কিন্তু প্রতি প্রদেশে (শহরে অবস্থিত) ২।১টি কৃষি-বিদ্যালয় আছে আর গ্রামাঞ্চলে স্কুলের লক্ষ লক্ষ ছেলেকে আমরা কৃষির বদলে জ্যামিতি ও ভূগোল শিখাই। শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারী দূর করিবার জন্য কিছু বিকাশ-কেন্দ্র খোলা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সহস্র সহস্র বুভুক্ষু জীবের সম্মুখে মুষ্টিমেয় দানা নিক্ষেপের মত। জানি না শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার যে আশঙ্কা আছে, তাহার পরিণাম কি হইবে। পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবস্থার দোষে আজ ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর পুত্রদের শিক্ষাই জীবিকার একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু অবৈ-তনিক শিক্ষা ও চাকুরিতে অগ্রাধিকারের দরুণ নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের নিকট তাহারা ক্রমশঃই পরাজিত হইতেছে। অন্যদিক হইতে মেয়েরাও আসিয়া চাপ দিতেছে।

আমার দিদিরা কখনও স্কুলে পড়েন নাই যদিও প্রায়ই বাংলা কবিতার অর্থ আমি তাঁহাদের নিকটই বুঝিয়া লইতাম। পরে গ্রামে মেয়েদের একটা পাঠশালা স্থাপিত হয়। এখন এখানে ( বিহার ) আমার গ্রাম্য স্কুলেই ৬ ক্লাসে ১৬টি মেয়ে পড়ে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের একত্র পড়া বোধ হয় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে কেহই কল্পনা করিতে পারিত না। ১৯২১ সনে যখন এম. এ. পড়িতে প্রথম কলিকাতা যাই, তখন ট্রামে-বাসে কখনও মেয়েদের চড়িতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এখন রেলে female compartment খালি থাকিলেও মেয়েরা পুরুষদের গাড়ীতেই বেশী চড়েন। ইহা বেআইনী কিনা জানি না তবে আমার মতে ঐ নিরর্থক female compartmentগুলি এখন তুলিয়া দিয়া প্রত্যেক compartment-এর এক-তৃতীয়াংশ বেঞ্চ LADIES মার্কা হওয়া উচিত যাহা শুধু মহিলাদের অনুপস্থিতিতেই পুরুষেরা ব্যবহার করিবেন। যেমন রেলবিভাগ for Hindus, for Muhammadans রাখা আর আবশ্যক মনে করে নাই, ঐরূপ for Ladies রাখাও এখন অনাবশ্যক হইয়াছে।

কেহ যেন মনে না করেন যে আমি স্ত্রীলোক ও হরিজনদের শিক্ষার বিরোধী। যাহারা শিক্ষার অধিকারী, যাহাদের কাছে দেশ কিছু আশা করে জাতিধর্ম্মলিঙ্গ নির্ব্বিশেষে তাহাদের শিক্ষার সুবিধা দিতে হইবে এবং তাহা রাষ্ট্রের খরচে হইলেই ভাল হয়। আজ স্কুলে যত ছেলেমেয়ে পড়ে তাহাদের অর্দ্ধেক অনধিকারী, যদিও তাহাদের মধ্যেও পাস করে। অনাথা, বিধবা অথবা যাহাদের সেবা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর চাকুরিও তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যদি পাস ছাড়াও লোকের অন্নসংস্থান হইত এবং বিবাহও হইত ত আজ কেন পাস ছাড়া হইবে না? যুদ্ধে বা খেলায় যেমন জয়-পরাজয়ের মধ্যে একটা হইবেই, পরীক্ষায়ও পাস-ফেলের একটা হইবেই! সকলেই পাস করিলে পাসের কোন মূল্য থাকে না সুতরাং ফেল করিলেই যে জীবন বিফল হইল ও আত্মহত্যা ছাড়া গতি

নাই, এ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই পাসের মোহেই বহু দেশী শিল্প লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আবার ফেলের মধ্যেও যে কত রবীন্দ্রনাথ, বার্ণার্ড শ, এডিসন ও ফ্যারাডে পড়িয়া আছেন কে জানে? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, রাজেন্দ্রনাথ ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় ফেল করেন। পাস করিলে বড় জোর ৫০০ টাকা মাহিনায় এক সরকারী চাকুরি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত, আজ কর স্যার আর. এন. মুখার্জ্জী হতে পারতেন না।"

পুরাতন যে সকল বস্তুর ব্যবহার লুপ্ত হইতে চলিয়াছে তন্মধ্যে হুঁকা, কোট, ধুতি, দোয়াত-কলম, জেব-ঘড়ি, দাড়ি, প্রভৃতির নাম করা যায়। শুনিয়াছি হুঁকার জলে তামাকের নিকোটিন-বিষ দ্রব হইয়া যাইত ও ধোঁয়াকে ঠাণ্ডা রাখিত, কিন্তু এখন চাকরেরাও বিড়ি পছন্দ করে। ঠাণ্ডা (হুতি) কোট এখন প্রায় নাই, সে স্থলে বুশ-সার্ট হইয়াছে। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে শুধু বৃদ্ধেরাই এখনও ধুতি ব্যবহার করেন। চাকুরির খাতিরে যাঁহারা অফিসে কোট-প্যাণ্ট পরিতেন তাঁহারাও বাড়ী আসিয়াই 'ধড়াচুড়া' ছাড়িয়া ধুতি না পরা পর্য্যন্ত স্বস্তি পাইতেন না, কিন্তু এখন যুবকেরা অফিসে ও ভ্রমণে কোট-প্যাণ্ট (বা শার্ট-প্যাণ্ট) ও বাসায় পায়জামা বা লুঙ্গি পরেন। আমাদের বাল্যকালে ছোট ছেলেমেয়েরাও ছোট ধুতি ও ছোট শাড়ী পরিত। এখন বাজারে ছোট ধুতি বা শাড়ী পাওয়াই যায় না। দারুণ গরমেও ছোট মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গ ২৪ ঘণ্টা ফ্রকে আঁটিয়া রাখা কখনও স্বাস্থ্যনীতিসঙ্গত নয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ধাক্কায় যাঁহারা অতিরিক্ত 'সাহেব' হইয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা মদ্যপান এবং গৃহলক্ষ্মীদিগকে গাউন ও সিগারেট ধরানটাকেও সভ্যতার অঙ্গ বিবেচনা করিতেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে 'মেম' বলার রীতি বিস্তৃত হইতে পারে নাই। বিলাত-প্রবাসী কোট-প্যাণ্টধারী বাঙালী স্বামীর পার্শ্বে শাড়ীধারিণী স্ত্রীকে ইংরেজেরা কি নজরে দেখে জানি না। সম্ভবতঃ এই যে, "ইহারা আমাদের নকল করিতে চেষ্টা ত করিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ পারিয়া উঠেন নাই।" শাড়ী নাকি আজ বিশ্বের সৌন্দর্য্যবোধের দৃষ্টিতেও সার্টিফিকেট পাইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় স্বাস্থ্যকামিনী টেনিস ও সন্তরণে নিপুণা মহিলাদের free movements-এর পক্ষে শাড়ী বাধকই হইয়া দাঁড়ায়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মণদের ধূম্রপান দূষণীয়, কিন্তু কায়স্থাদির মধ্যে উহা স্ত্রী-পুরুষে সমভাবে প্রচলিত। আমি বাঙালী মহিলাদের ইহা অনুকরণ করিতে বলি না, কিন্তু আধুনিক মহিলারাও যখন ইংরেজীশিক্ষিতা তবে আধুনিক রুচি অবলম্বন ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষে এই বৈষম্য কেন? তাহার চেয়ে সকলেই গরম দেশের অনুকূল পুরাতন দেশীয় রীতিই কেন গ্রহণ করে না?* আজকাল শিশুরাও ফাউণ্টেন পেন দাবী করে সুতরাং দোয়াত-কলম উঠিয়া যাইতেছে। ঐরূপ হাতঘড়ির আগমনে জেবঘড়ি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছাড়া বহু সম্ভ্রান্ত পুরুষই দাড়ি রাখিতেন। হয়ত সপ্তম এডোয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ্জ, লর্ড মেয়ো, লর্ড রিপণ, প্রভৃতি তাঁহাদের আদর্শ ছিল। 'চাপ দাড়িতে চশমা' নাকি এক সময় ফ্যাশন দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের শিক্ষকদের প্রায় অর্দ্ধেকের দাড়ি ছিল। বহু পুরাতন নেতা ও সাহিত্যিকের প্রতিকৃতি হইতে সে যুগের রুচি প্রমাণিত হইবে যাহার শেষ অবশেষের নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। গোঁপ-লোপের পূর্ব্বে শুধু দাড়িই লুপ্ত ছিল। জুড়ি গাড়ী, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতি আভিজাত্যের আড়ম্বর এখন পেট্রোল ও ইলেক্‌ট্রিকের যুগে লুপ্ত হইয়াছে। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন বা চৌষট্টি ব্যঞ্জন সাজাইয়া অতিথি-সৎকারের রীতি আর নাই। আধুনিক ডিনারের রীতিতে ও অতিথিদের অজীর্ণরোগে তাহা অন্তর্হিত 'দ্রৌপদী'দের বংশধরেরা আজ পেঁয়াজকুচি, লবণ ও মসলার গুঁড়া সহ ডিনার খাইয়া পরিতৃপ্ত। ধাপে ধাপে যে সকল বিষয়ে প্রগতি হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু মুর্গীর উদাহরণ দিতেছি। (১) হিন্দুরা মুর্গী খান না, (২) হিন্দু যুবকেরা লুকাইয়া মুর্গী খান, (৩) তাঁহারা প্রকাশ্যেই মুর্গী খান, বাড়ীর চতুঃসীমার বাহিরে, (৪) বাড়ীর ভিতরেই মুর্গী রান্না-খাওয়া চলে, শিশুরা ও বৃদ্ধেরা তাহাতে যোগ দেন, (৫) বাড়ীতে মুর্গী পালা হয়, কুমারী ও সধবারা এই খাদ্যে যোগ দেন। আজ যখন "পল্লীমঙ্গলের আসরের" 'মোড়লের' কণ্ঠে মুর্গীপালন-বিধি শুনি তখন ভাবি যে, ইনিই কি কিছু পূর্ব্বে ভাগবত-কথা বলিতেছিলেন?

* বিলাতী পোষাকের স্বপক্ষে একটা কথা বলা যাইতে পারে। আজকাল পৃথিবী সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং দূরের দেশও প্রতিবেশী হইয়াছে। সর্ব্বদা নানাদেশে আদান-প্রদান হইতেছে। শুভেচ্ছা দল ও আন্তর্জ্জাতিক সভা অনেক বাড়িয়াছে। এক্ষেত্রে একটা আন্তর্জ্জাতিক পোষাক দরকারী। চাউ এন লাই যখন ভারতে আসেন তখন তাঁহার গায়ে 'ঢিলা চীনা কোট' দেখি নাই তিনি পুরাপুরি সাহেবই ছিলেন। আফ্রিকান নেতা ও নেত্রীরাও বিলাতী পোষাকেই আসেন। এই যুগে কেবল উ নু ছাড়া কোন রাষ্ট্রের নেতাই স্বজাতীয় পোষাক পরেন না।

আশা করা হইত যে, স্বাধীনতা লাভের পরে বিলাতী রীতি বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়া সে স্থলে দেশী রীতি ফিরিয়া আসিবে। ফল কিন্তু বিপরীত হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে অত লোক বিলাতী পোষাক পরিত না, যেমন এখন। তখন ইংরেজী স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে বহু সংস্কৃত টোল ও বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল। এখন ইংরেজী পড়ান হয় না এমন স্কুল দুই-একটা খুঁজিয়া পাইলেও তাহাতে প্রায়ই ছাত্র দেখা যায় না। বর্ত্তমান যুবকেরা ভাল ইংরেজী না জানিলেও কথাবার্ত্তায় ইংরেজী বুকনী অধিক ব্যবহার করেন।* হাডুডু প্রভৃতি দেশী খেলা লুপ্ত হইয়াছে। কবিরাজের সংখ্যা অতি অল্প এবং থাকিলেও কেহ তাহাদের ডাকে না। আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড প্রভৃতির আশ্রয়ে কিছুসংখ্যক বেতন-ভুক্ কবিরাজ এখনও আত্মরক্ষা করিয়া আছেন। যে সব কবিরাজ এখনও আছেন সকলেই কিছু ডাক্তারী ঔষধও সঙ্গে রাখেন এবং ইন্‌জেকশন দেন। অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের হাতে পড়িয়া যাওয়াও আয়ুর্ব্বেদের পতনের এক কারণ। এখন রাষ্ট্রপতির হাতে সাড়ম্বরে আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন দ্বারাও তাহাতে ছাত্র পাওয়া যায় না বা আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়া আসে না। ঐরূপ রেডিও সাহায্যে কথকতা, যাত্রা, তরজা, পল্লীগীতি, রাগপ্রধান প্রভৃতির পুনর্জ্জাগরণের চেষ্টা হইলেও সিনেমার যুগে আর ঐগুলি জনপ্রিয় হইতেছে না। যাহাদের ঐ সকল পেশা ছিল তাহাদের ছেলেরা বোধ হয় এখন কলেজে পড়ে। পূর্ব্বে লোকে বাবা, কাকা ও দাদাদিগকে 'আপনি' বলিত, এখন 'তুমি' বলে। কিছু নবযুবক (গুরুজনের সম্মুখেও) স্ত্রীকে নাম ধরিয়া ডাকে। ইহাও যদি বিলাতী রীতির অনুসরণ হয় তবে তদনুসারে স্ত্রীরাও যদি তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে তবে ঐ নবযুবকেরা প্রীত হইবে কি? পূর্ব্ব রীতি ("উনি বলছিলেন···") স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্ভ্রমরক্ষার পক্ষে খুবই সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

অতঃপর বিগত ষাট বৎসরে বাংলা ভাষার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সকলেই জানেন বাংলা সাহিত্যে দুইটি ভাষা প্রচলিত—সাধু ও চলিত। সাধুভাষা সমস্ত বঙ্গদেশে একমাত্র লিখিত ভাষারূপে গণ্য ছিল এবং চলিত ভাষা, যাহা শুধু ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী অঞ্চলের ভাষা, শুধু নাটকাদিতে "পরবাক্যে" ও বক্তৃতাদিতে ব্যবহৃত হইত। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি "গোপাল ভাঁড়ের" ন্যায় লঘুসাহিত্যও সাধুভাষায় লিখিত হইত। অতঃপর বিশেষতঃ হাল্‌কা সাহিত্যে এবং পরে ক্রমশঃ গল্প, উপন্যাস এবং গভীর বিষয়েও চলিত ভাষা চলিতে থাকে—সাধু ভাষা শুধু পাঠ্যপুস্তক, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি ও সংবাদ সাহিত্যে (সম্পাদকীয়) আত্মরক্ষা করিতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখা হইতে তিনটি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, একই লেখকের ভাষাতেও কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথম নমুনায় "নিজবাক্য" ও "পরবাক্য" উভয়েই সাধুভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে "নিজবাক্যে" সাধুভাষা ও "পরবাক্যে" চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয়ে "নিজবাক্য" ও "পরবাক্য" উভয়েই চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩০৯—বিহারী কহিল, "সেজন্য তো হঠাৎ নূতন করিয়া ভাবিবার কোন দরকার ছিল না। তিনি ত ইচ্ছা নানাপ্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।" (চোখের বালি)

১৩১৬—সতীশ লাফাইয়া উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিল এবং কহিল, "হাঁ মা বিনয়বাবুকে যেতে দিয়ো না, উনি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকবেন।" (গোরা)

১৩৩৬—উপরে উঠে তার শোবার ঘরের সামনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, "আমি এখনই আসছি, দেরী করব না।" (যোগাযোগ)

একই লেখক যে সময়ানুকূল ভাষা পরিবর্ত্তিত করেন তাহার উদাহরণ "পরশুরাম" (তুঃ "গড্ডলিকা" ও "আনন্দীবাঈ") প্রভৃতি অনেকে। প্রবাসীর উক্ত স্মারক গ্রন্থেই নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত স্মারক গ্রন্থে কবিতা ও নাটক বাদে ১১৫টি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে মাত্র ২৮টিতে সাধুভাষা ব্যবহৃত ও তাহারও তিনটি পুরাতন লেখার অনুবৃত্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আজ

---

* ইংরেজী ভাষার ব্যবহার জারী রাখার আমরা বরাবরই পক্ষপাতী—এখন আন্তর্জাতিক ভাষারূপে। ইয়োরোপে আদিযুগে গ্রীক, পরে ক্রমশঃ লাটিন, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী সাধারণ ভাষার মর্য্যাদা পায়। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় সারা ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রেঞ্চভাষা (lingua franca) বোধগম্য ছিল। মুসলিম ও হিন্দুজগতে ঐরূপ যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃতের আধিপত্য ছিল। ইয়োরোপের বিদ্যালয়গুলিতে যেমন এখন লাটিনের স্থান গৌণ হইয়া পড়িয়াছে, ঐ একই স্বাভাবিক কারণে ভারতে সংস্কৃতের স্থান গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সাড়ম্বরে 'সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াদি' স্থাপনেও লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না। এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না যে, ইংরেজীও চিরকাল আন্তর্জাতিক ভাষা থাকিবে। হয়ত ভবিষ্যতে রুশ ভাষা এই পদ পাইবে। "

শতকরা ২০।২২টি মাত্র লেখায় সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ধুতি-দাড়ি-হুঁকার ন্যায় সাধুভাষাও এখন লোপের পথে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোন ভাষার পক্ষপাতী নই, কিন্তু মনে হয় আরবী-ফারসী শব্দে ভরা ঢাকাই ভাষাকে যে "পাকিস্তানী বাংলা" করার চেষ্টা হইতেছে তাহা এই কলিকাতার ভাষারই প্রতিক্রিয়া। বাংলার এই নানা মূর্ত্তি ইহার অখিল ভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হওয়ার পক্ষে বাধক। পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে সব শুদ্ধরূপ চলিতেছে (নিন্দা, মিঠা, সিধা, পূজা, জুতা, মুর্দা, উপর, ভিতর), দুই কোটি বাঙালী হিন্দুর অনুরোধে কেহ তাহাদের চব্বিশ পরগণার বিকৃত রূপ (নিন্দে, মিঠে, সিধে, পুজো, জুতো, মুদ্দো, ওপর, ভেতর) গ্রহণ করিবে না। রবীন্দ্রনাথ একবার "প্রবাসীতে" লিখিয়াছিলেন, "ওপর, ভেতর আমি লিখিনে" কিন্তু যাঁহারা গুরুর উপরে যান তাঁহারাই না শিষ্য! হিন্দী ও উর্দূকে দুইটি ভাষা বলা হয়, কিন্তু উহাদের construction সম্পূর্ণ এক। যথা: য়হ্ সুনকর রামনে কহা, "ওএ কল হী আ রহে হেঁ, আপ ভী আবেঙ্গে।" এই দুই ভাষার এক রূপ স্থলে বাংলা দুই রূপ লইয়াছে—(১) ইহা শুনিয়া রাম বলিল, "তাহারা কালই আসিতেছেন, আপনিও আসিবেন", (২) এ শুনে রাম বলল, তাঁরা কালই আসছেন, আপনিও আসবেন। একই মাসিকের এক পৃষ্ঠায় দেখিব সাধুভাষা ও পূর্ব্ব বানান এবং অপর পৃষ্ঠায় অসাধু ভাষা ও অ-পূর্ব্ব বানান। এইরূপ একই দেশে একই কালে দুইটি ভাষা চলিলে ছাত্রেরা গোলে পড়িবে, কোন্ ভাষায় রচনা লিখিবে আর কোন্ ভাষায় ইতিহাস এবং কখনও ত দুই ভাষার মিশ্রণও করিয়া দিবে—যাহা (পদ্যে ছাড়া) নিশ্চয়ই একটা দোষ।

# রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্যে বিজ্ঞান

শ্রীচিত্রপর্ণা রায়

সাহিত্য আর বিজ্ঞান—বৈপরীত্যের ভাবভূমির উপরে এদের অধিষ্ঠিতি। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—দু'টি বিষয়ের মধ্যেই আছে এক সূক্ষ্ম যোগসূত্র। কল্পনা-অনুভূতিকে অসীমের প্রতি বিস্তৃত করে দেওয়ার ক্ষমতা সাহিত্যের যেমন আছে, বিজ্ঞানেরও আছে তেমনই। তবে বিজ্ঞানের কল্পনা প্রত্যক্ষের বিচারমূলক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই স্বাধর্ম্ম আছে বলেই বিজ্ঞান অনেক সময়েই সাহিত্যিকের মানসলোকে স্থান পায়। কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্যেও তাই বিজ্ঞান এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বিশ্বের প্রতি অসীম বিস্ময়বোধ তাঁর অন্তর্লোকে বিশ্বকে বিশেষ ভাবে জানার আগ্রহ জাগিয়েছে আর ফলস্বরূপ সৃষ্ট হয়েছে তাঁর বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা। এই বিজ্ঞান রচনাগুলির সাহিত্যিক মূল্য ও বৈশিষ্ট্য এবং বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে তাদের স্থান—এ দু'টি বিষয়ে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান-বিষয়ক গদ্য-রচনা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে খুব বেশী নেই। কিন্তু সংখ্যায় অপ্রচুর হলেও, সেগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষ দিকটি উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত রচনাগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়:

১। বালক, সাধনা, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত তার বিজ্ঞান-সংবাদ।

২। "পাঠপ্রচয়" [১৩৩৬ সাল] গ্রন্থে প্রকাশিত তার কতকগুলি বিজ্ঞান, যেমন:

(ক) "পাঠপ্রচয়" [২য় ভাগ] গ্রন্থে "সূর্য্যের কথা", "একটি অপূর্ব্ব বাড়ী," "বৃষ্টি"

(খ) "পাঠপ্রচয় [৩য় ভাগ] গ্রন্থে "রোগশত্রু" ও "ছায়াপথ"।

৩। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রগুচ্ছ: "চিঠিপত্র" [ষষ্ঠ খণ্ড]।

৪। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উপলক্ষ্যে লিখিত প্রবন্ধ—

"জড় কি সজীব" [শ্রাবণ ১৩০৮, বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়)]

৫। "বিশ্ব পরিচয়"—বিজ্ঞান গ্রন্থ—প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪ সাল।

শুধু গদ্যেই নয়, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন যুগের কবিতায়ও বিজ্ঞানের নব নব রূপের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

"জ্যোতির্বিজ্ঞান" ও "প্রাণবিজ্ঞান" প্রধানতঃ এ দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-রচনাগুলি লিখিত। রবীন্দ্রনাথের মনে এ দু'টি বিষয়ের প্রবণতা ছিল বেশী। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছিলেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান—কেবলই এই দু'টো বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।"

—"বিশ্বপরিচয়", ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথের মানসভঙ্গিতে বিজ্ঞানের এ দু'টি শাখার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের ধারা অনুসরণ করে দেখতে গেলে নির্ভর করতে হবে "জীবনস্মৃতি"র স্মৃতিচিত্র ও "বিশ্ব-পরিচয়" গ্রন্থের ভূমিকার উপরে। রবীন্দ্রবিজ্ঞান-সাহিত্য আলোচনা করতে গেলে এই ইতিহাস আলোচনা করারও প্রয়োজন আছে। কারণ বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগই কবিকে বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের মনেও এই অনুরাগ জেগেছিল তাঁর শিশুকাল হতেই। শৈশব ও বাল্যের এই স্মৃতিকথা রবীন্দ্রনাথ কৌতুকচ্ছলে বলেছেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গভীর বিজ্ঞানানুরাগ।

অতি শিশুকাল হতেই প্রাণবিজ্ঞানের প্রকাশে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। ছোট্ট আতার বীজ হ'তে যে সত্যিকারের আতাগাছের জন্ম হয়—এ চিন্তা তাঁর ছোট্ট মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তুলেছিল। "জীবনস্মৃতি"তে তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন, "আতার বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয় কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর বিস্ময় অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। সেটা আতার বীজের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ।" প্রাণবিজ্ঞান সম্বন্ধে এ বিস্ময় তাঁর বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। "রবীন্দ্র-জীবনী ও সাহিত্যপ্রবেশক"-এর প্রথম খণ্ডে লেখক প্রভাতকুমার বলেছেন, "...বাল্যকালে আমের আঁটি আর আতার বীচির পরীক্ষার কথা লইয়া নিজেকে ঠাট্টা করিয়াছেন কিন্তু পরযুগে কৃষি লইয়া তিনি যে কতরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত আলোচনা কেহ এখনও করেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে আমের চারাকে লতাকে গাছ করিবার জন্য তাহার যে উদ্যম দেখিয়াছি, তাহা কেবল বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব।

বাল্যকালে বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হ'ত—এ কথাও "জীবনস্মৃতি"তে আমরা জানতে পারি। এগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্তের "বস্তু বিচার" সম্বন্ধীয় বই [সম্ভবতঃ "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার"] এবং সাতকড়ি দত্ত [মতান্তরে ঘোষ] প্রণীত "প্রাণীবিচার।" তবে শুধু-মাত্র যে গ্রন্থপাঠেই বিষয়ে অনুরাগ জন্মায় এ কথা সব ক্ষেত্রে মানা চলে না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ-বধ কাব্য" পাঠে রবীন্দ্রনাথের মনে যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের উদয় হয়েছিল এ কথাই অনেক সমালোচক বলেন। তবে এ কথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। গৃহ-শিক্ষক সীতানাথ দত্তের পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষা—উত্তপ্ত জলের লঘুত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে যে কতখানি বিস্ময় আর আনন্দের সৃষ্টি করত তার মধুর বর্ণনা আছে—"জীবনস্মৃতি"তে। বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য্য পরীক্ষা তাঁকে এমন মুগ্ধ করত যে, "যে রবিবারে তিনি [সীতানাথ দত্ত] না আসিতেন সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।"

বাল্যকালে এই বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার মূল্য নিরূপণ ক'রে জীবনী-লেখক প্রভাতকুমার বলেছেন, "বাল্যকালের এই সব বিদ্যায়োজনকে রবীন্দ্রনাথ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, আমাদের মতে বিজ্ঞানের প্রতি কবির আজীবন অনুরাগের বুনিয়াদ গড়ে এই বাল্যদিনে, এই সামান্য শিক্ষার ভিতর দিয়া।"

বিজ্ঞানের ভয়াবহতাও সেই শিশুকালেই রবীন্দ্র-নাথকে ব্যথিত করেছিল। অঘোর মাষ্টারের হাতে মানুষের কণ্ঠনালী। মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদের দৃশ্য—এ সব ঘটনা তাঁকে যে কি গভীর আঘাত দিয়েছিল—তারও বর্ণনা আছে "জীবনস্মৃতিতে।"

জ্যোতির্বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপনয়নের পরে পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণকালে তিনি নক্ষত্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। "...পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন, সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্ব্বতের স্বচ্ছ আকাশে—তারাগুলি আশ্চর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।" —"জীবনস্মৃতি।"

"বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থের ভূমিকায়ও এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশে স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত।"

রবীন্দ্রজীবনী [প্রথম খণ্ড] হতে জানা যায় যে, এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর R. A. Proctor [1887-88] রচিত "Half hours with the Telescope অথবা "The Orbs" [1872] গ্রন্থ হতে রবীন্দ্রনাথকে পাঠ দিতেন। সূর্য্য থেকে গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব, প্রদক্ষিণের সময় প্রভৃতি তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ পিতার মুখেই জেনেছিলেন আর এই আলোচনা মনে করেই তিনি সেই বালক বয়সে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

"এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা আর সেটা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে।" রবীন্দ্রনাথের অনুমান অনুযায়ী এটি তাঁর বার বছর বয়সের রচনা। তাঁর অধিকাংশ বাল্যরচনার মত এই রচনাটিও অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই গভীর অনুরাগের বশবর্ত্তী হয়ে রবীন্দ্রনাথ এর পরে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহু দেশী-বিদেশী বই পাঠ করেছিলেন। "বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থের ভূমিকা হতে জানা যায় যে, স্যার রবার্ট বল, নিউকোম্বস, ফ্লামরিয় প্রভৃতি অনেক লেখকের বই রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন, বইগুলির "গাণিতিক দুর্গমতা"কে এড়িয়ে গিয়ে। প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হাক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালাও তিনি পড়েছিলেন। জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র যুগের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন —এ সময়ে "বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থপাঠে রবীন্দ্রনাথের অসীম আনন্দ, ইংরেজী ও বাংলা উপন্যাস, সাহিত্য সমালোচনা ত পড়েনই, ইহার সংগে আছে বিজ্ঞানের গ্রন্থ।......জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ বিশেষভাবে তাঁহার ভাল লাগে। ইংরাজীতে যাহা পড়েন বাংলায় তাহা লিখিতে চান—কিন্তু পরিভাষার অভাবে বক্তব্য-বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিতে বাধা পান পদে পদে।"

এই সমস্ত গ্রন্থশিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ "পাকাশিক্ষা" বলেন নি, বলেছেন···"ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।"···"বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থের ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের ইতিহাস মোটামুটি এই। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী বলে উল্লেখ করলেও আমরা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বেতারভাষণ [প্রবাসী ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ] সংখ্যায় প্রকাশিত হতে জানতে পারি যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়েও তাঁর প্রচুর পড়াশুনা ছিল। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথের পঠিত যে সব বিষয়ের সুদীর্ঘ তালিকা তিনি দিয়েছেন তার মধ্যে আছে History of Medicine; Astrophysics, Geology; Bio-chemistry; Plant-grafting প্রভৃতি বিজ্ঞানের বহু শাখার নাম।

শেষ বয়সেও বিজ্ঞানের গ্রন্থের প্রতি তাঁর অনুরাগ অটুট ছিল। "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে জানা যায় "এই সব বই-ই আমার ভাল লাগে—সায়েন্সের বই।···কি আশ্চর্য্য রহস্যময় এই জগৎ, আরও আশ্চর্য্য তার এতটুকু এতটুকু উদ্ঘাটন।......"

সুতরাং শিশুকাল হতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের যে প্রবল অনুরাগ ছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। এই অনুরাগই তাঁকে বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রেরণা দিয়েছিল। আর সে জ্ঞানও তাঁর গভীর ছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের অন্য কারণ হচ্ছে যে, তাঁর কল্পনা-বিহারী কবি-প্রকৃতি এই দু'টি ক্ষেত্রেই তার অনির্দ্দেশ কল্পনার উপাদান পেতে সক্ষম হয়েছিল। সাধারণতঃ কবি ও সাহিত্যিক বিজ্ঞানের এ দু'টি শাখার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান-রচনাগুলি আলোচনা করলে এ সত্য প্রতিপন্ন হবে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মত তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলিও সাময়িক পত্রিকাকে আশ্রয় করেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। এ যুগের সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রধানতঃ ঠাকুর পরিবারের স্ত্রী-পুরুষদের রচনা দ্বারাই সমৃদ্ধ ছিল। এগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে "ভারতী" পত্রিকার [প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১২৮৪] বিজ্ঞান-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচিত ছোট ছোট দু'একটি প্রবন্ধ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও এ পত্রিকায় বিজ্ঞান প্রবন্ধের নিয়মিত রচয়িতা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"ভারতীর" পরে প্রকাশিত হয় "বালক" পত্রিকা [প্রথম প্রকাশ ১২৯২]। এ পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিজ্ঞান সংবাদ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রচনার গুণে এগুলি সাহিত্যিক মর্য্যাদা লাভ করেছে।

"সাধনা" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে এ পত্রিকায় ঠাকুরবাড়ীর অনেকেই বিজ্ঞান রচনা লিখে-ছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য" [পৌষ ১২৯৮] ও "গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়" [পৌষ ১২৯৮], এ দু'টি প্রবন্ধেই উন্নত সাহিত্যের লক্ষণ দেখা যায়। বিজ্ঞানের নীরস তত্ত্ব এখানে সরস সাহিত্য হয়ে উঠেছে। "গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়" প্রবন্ধ হতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে এ কথা পরিস্ফুট হবে।

"তাহারা বলেন, আমরা কি করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও ইন্দ্রিয় তত্ত্ব জানা যায় নাই। একটা গাড়ী যদি কোনওরূপ ঝাঁকানি না দিয়া সমভাবে সরস পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ী যে চলিতেছে তা আমরা বুঝিতে পারি না—পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু গাড়ী যদি ডাহিনে কিংবা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতি পরিবর্ত্তন অনুভব করিবার উপায়।"—

"গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়"

এইরূপে অতি সহজ দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

"সাধনার" তৃতীয় বর্ষে, রবীন্দ্রনাথের একটি বিজ্ঞান রচনা দেখতে পাওয়া যায়—"ভূগর্ভস্থ জল ও বায়ুপ্রবাহ"। এ প্রবন্ধে ভূগোলের প্রাকৃতিক নিয়মের সুন্দর অথচ প্রাঞ্জল আলোচনা পাওয়া যায়।

এমনই ভাবে আমরা দেখতে পাই এ যুগের বিজ্ঞান রচনাগুলি নিছক বিজ্ঞান সংবাদকে আশ্রয় করে রচিত হলেও এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

"পাঠপ্রচয়" গ্রন্থের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি প্রধানতঃ শিশুদের শিক্ষাদানের উপযোগী করে রচিত। তাই এগুলিতেও যথাসম্ভব সরল ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তত্ত্বের দুরূহ জটিলতাকে এখানে রবীন্দ্রনাথ পরিহার করেছেন।

জগদীশচন্দ্রকে লিখিত পত্রগুচ্ছকে [১৮৯৯ সনের মে মাস হতে ১৯০৬ সন পর্য্যন্ত লিখিত] ঠিক বিজ্ঞান-বিষয়ক গদ্যরচনা বলা চলে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পত্রেই প্রবন্ধের গুণ দেখা যায়—তাই তাঁর পত্র-সাহিত্যকেও তাঁর গদ্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

জগদীশচন্দ্রের সংগে রবীন্দ্রনাথের গভীর সখ্য—বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবির মিলন—ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু এ বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তার পেছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের গভীর বিজ্ঞানানুরাগ। বিজ্ঞানকে গভীরভাবে ভাল-বেসেছিলেন বলেই বিজ্ঞানীও তাঁর একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা—এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। কারণ এ তত্ত্ব জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব। বিদেশে এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ জগদীশ-চন্দ্রকে অনেক উৎসাহ দান করেছিলেন। এমন কি জগদীশচন্দ্রকে অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থাও তিনি করে-ছিলেন। প্রায় প্রতিটি পত্রেই এই উৎসাহের প্রাচুর্য্য দেখা যায়:

"গবর্ণমেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়—যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।" [৭নং পত্র]

জগদীশচন্দ্রের বিজয়ের সংবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন···[১২নং পত্র] "বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর। তোমার জয় হউক। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক। নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোক শিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।"

এ প্রশংসার অর্ঘ্য যে শুধু জয়ী বন্ধুকে উৎসর্গ করা হয়েছে তা নয়, এখানে প্রধান লক্ষ্য—বিজয়ী বৈজ্ঞানিক।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত দু'টি তত্ত্বের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথই প্রথম সহজ ক'রে দেশবাসীর কানে পৌঁছে দেন। বঙ্গ-দর্শন পত্রিকায় [নবপর্য্যায় ১৩০৮ শ্রাবণ] প্রকাশিত "জড় কি সজীব" প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই দু'টি আবিষ্কারের কথাই বলেছেন। এ প্রবন্ধ লিখতে তিনি "ইলেকট্রিশ্যান" পত্রিকার সাহায্য নিয়েছিলেন। সহজ ভাষায় তিনি কেমন করে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এ প্রবন্ধে—

"সেই আবিষ্কার ঈশ্বরতত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তারহীন টেলিফোন যন্ত্রের কার্য্যোপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছে।"···এখানে জগদীশচন্দ্রের প্রথম আবিষ্কারের কথা তিনি বলেছেন।

দ্বিতীয় আবিষ্কার সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে বলেছেন, "জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানীগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্বকে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানানুরাগের এক বিশেষ প্রকাশ বলা চলে—

"বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থটিই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক রচনাগ্রন্থ। তাঁর বিজ্ঞান-সাহিত্যের সব লক্ষণগুলিই এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু গ্রন্থখানিই নয়—এর ভূমিকাটিও মূল্যবান। বিজ্ঞান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধারণার পরিচয় এতে পাওয়া যায়।

১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে বইখানি প্রকাশিত হয়, বইটি রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ আলমোড়ায় গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করছিলেন।

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী করে তিনি গ্রন্থটিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সঞ্চিত বিজ্ঞানের রস তাঁর "যথালাভের ঝুলি" থেকে সাধারণকে বিলিয়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাও আমরা এ ভূমিকা থেকে জানতে পারি—

"...প্রকাশ লোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ লোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই।"

...এই সাধনাই বিজ্ঞান।

গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, কারণ এ গ্রন্থ তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিজ্ঞান আর সাহিত্য এই দুই দিক থেকে তিনি এ গ্রন্থের মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি।"

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিকেও রবীন্দ্রনাথ সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন "তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও সংখলন ক্ষমা করে না।"

"বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয়—জ্যোতির্বিজ্ঞান। এতে মোট পাঁচটি প্রবন্ধ আছে—পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোক।

"পরমাণুলোক" প্রবন্ধে সৌরজগতের কথা দিয়ে আরম্ভ করে ক্রমে পরমাণুর কথায় তিনি এসে পৌঁছেছেন। সূর্য্যের বিরাটত্ব, আলোর গতি, সূর্য্যের সাত রং, অণু-পরমাণু—বিজ্ঞানের এই সূক্ষ্মমতবাদগুলিকে তিনি সুনিপুণভাবে এ প্রবন্ধে সাজিয়েছেন।

"নক্ষত্রলোক" প্রবন্ধে আছে নক্ষত্রজগতের বিস্তৃত বর্ণনা "সৌরজগৎ" এ বিশ্বলোকের বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা, গ্রহলোকে গ্রহের জন্ম-ইতিহাস আর ভূলোকে এই মাটির পৃথিবীর ইতিহাস—"বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থের মোটামুটি এই সম্পদ।

এ প্রবন্ধগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এখানে বিষয়ের অতি দ্রুত অবতারণা করা হয়েছে। "পরমাণু-লোক" প্রবন্ধে মানুষের অনুভূতি দিয়ে আরম্ভ করে কল্পনাকে বিস্তৃত করেছেন অণুপরমাণুর লোক পর্য্যন্ত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এমন সুনিপুণ সমাবেশ বইটিকে হৃদয়-গ্রাহী করেছে।

বিষয়বস্তুর জটিলতাকে রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। "পরমাণুলোক" প্রবন্ধে আলোর গতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

"আলোর ব্যবহার থেকে মোটামুটি জানা গেছে ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু মানুষের মনকে হয়রান করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়ি খবর তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হ'ল, জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে, অতি ক্ষুদে ছিটেগুলির মত ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উল্টো খবরের মিলন হ'ল কোনখানে, তা ভেবে পাওয়া যায় না।"

"বিশ্বপরিচয়"-এর সরল অথচ কাব্যময় ভাষা এর অন্য বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক জটিল পরিভাষাকে তিনি সম্ভব স্থলে পরিষ্কার করেছেন। Corona—কিরীটিকা, ultra-violet-ray—বেগনীপারের আলো, Infra-Red Ray—লাল উজানী আলো প্রভৃতি এমন কয়েকটি কথা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দকে তিনি ঠিকই রেখে দিয়েছেন—যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন আম্‌ব্রা, পেনাম্‌ব্রা ইত্যাদি। বিজ্ঞানের পরিভাষার সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল:

"বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্ব্য জাতের জিনিষ। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য।" এই কথা মনে করেই তিনি সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছেন।

"বিশ্বপরিচয়"-এর ভাষার মধ্যে কোথাও কোথাও উন্নত সাহিত্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। "পরমাণুলোক" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

"যত এগোতে লাগল গুপ্ত আলোর সন্ধান, ততই সাতরঙা দলের আসন হ'ল খাটো। বিজ্ঞানের জরীপে আলোর সীমানা আজ সাতরঙ, রাজার দেশ ছাড়িয়ে গেছে শতগুণ।"...সব দিক বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, এর সাহিত্যিক মূল্য খুবই বেশী। সুনির্ব্বাচিত উদাহরণ, মনোজ্ঞ ভাষা ও আশ্চর্য্য স্বচ্ছ ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি নীরস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে তিনি সরস করে তুলেছেন।

তবে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কবি এখানে আত্মপ্রকাশ না করে থাকতে পারেন নি। "ভূলোক" প্রবন্ধে আদিম পৃথিবীর বর্ণনায় তাঁর কবি-দৃষ্টিই বড় হয়ে উঠেছে। অসীম আর সীমার তত্ত্বের বর্ণনায় রবীন্দ্রকবিমানস ধরা দিয়েছে।

এ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকের সাহায্য নিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ হতেও তথ্য তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। কিন্তু সব তথ্য আর তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের দর্শনের মধ্য দিয়ে নবরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রমহাশয় এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবাসীতে লিখেছিলেন [ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ৩৪৫ ]:

"প্রাচ্য সংস্কৃতির পাঞ্চজন্যে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ফুৎকারে কি গম্ভীর সুর উদ্গীরিত হয় তার স্বরলিপি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে আছে।" এ কথা "বিশ্বপরিচয়" পড়লেই বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক গদ্যগুলির পরিচয় মোটামুটি এই।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এর পথ প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন শ্রীরামপুরের ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকেরা। উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী প্রথম এই কর্ম্মে ব্রতী হন। এঁদের রচনায় সাহিত্যিক গুণ খুব বেশী ছিল না। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যকে প্রথম গ'ড়ে তোলেন অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০—১৮৮৬]। তাঁর "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার", "চারুপাঠ", "পদার্থ বিদ্যা" প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম দেখা গেল সংযত দৃষ্টিভঙ্গী, যথাযথ তথ্য সন্নিবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষা। উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-সাহিত্যের পক্ষে এগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়।

অক্ষয় দত্তের পরে নাম করা যায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮১৩-১৮৮৫ ], ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র [১৮২২-১৮৯১] ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের [১৮২৭-১৮৯৪]। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের সরস ক্ষেত্রে এঁরা সার সংযোজন করেছিলেন। সরস অথচ বলিষ্ঠ ভাষার চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখা গেল প্রথম বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। এর অধিকাংশ বিজ্ঞান প্রবন্ধই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা [ ১২৭৯-১২৮২ ]।

বৈজ্ঞানিক বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা দেখা দেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার মধ্যে। গভীর মননশীলতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি এবং মৌলিক চিন্তাধারার একত্র সমাবেশ দেখা দিল তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্যে। অন্য লেখকেরা বিজ্ঞানের জটিল দিক্‌কে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর সেই তত্ত্বগুলির গভীরে গিয়ে সেগুলি সহজভাবে বর্ণনা করেছেন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক—এই দুই দৃষ্টিই তাঁর মধ্যে মিশেছিল। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁকে বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছিলেন জগদানন্দ রায়। বিজ্ঞান সাহিত্যে এঁর দানও খুব অসামান্য। প্রকৃতি পরিচয় "প্রাকৃতিকী", "বৈজ্ঞানিকী", "বাংলার পাখী" প্রভৃতি বহু বই তিনি লিখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে ইনি গুরু ব'লে স্বীকার করলেও তাঁর মত গভীরতা জগদানন্দের মধ্যে ছিল না, তবে এঁর রচনা খুব মধুর ছিল।

রবীন্দ্রনাথের অল্প কয়েকটি বিজ্ঞান রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। বিজ্ঞান সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথেরও যে একটি বিশেষ স্থান আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

—

# ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত প্রবন্ধ )

শ্রীঊষা বিশ্বাস

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী এই যুগের দুই বিশ্বরেণ্য মহামানব—যাঁদের জন্যে তাঁদের মাতৃভূমি ভারত আজ ধন্য। এঁরা দু'জনেই ছিলেন "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি—স্বদেশের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও কল্যাণসাধনই ছিল যাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র। সেই সঙ্গে বিশ্বশান্তি, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বকল্যাণও ছিল এঁদের কাম্য। কবিগুরু দু'হাত ভ'রে তাঁর দেশকে দিয়েছেন ভাব ও ভাষার অতুল সম্পদ। তাঁর প্রতিভা ছিল বিরাট্ ও বহুমুখী। অজস্র চিন্তার বিচিত্র ঐশ্বর্যে ও সাহিত্যের নানাক্ষেত্রে তাঁর বিপুল দানসম্ভারে তাঁর দেশকে তিনি তাই করেছেন অশেষ সমৃদ্ধ। গান্ধীজী দেশকে দিয়েছেন তাঁর নিজ জীবনের জ্বলন্ত আত্মত্যাগের সুমহান দৃষ্টান্ত এবং জুগিয়েছেন তাঁর অফুরন্ত কর্মপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর জীবনের কর্মক্ষেত্র ও কর্মপন্থা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদর্শগত এক নিবিড় গভীর মিল ও ঐক্যই এঁদের দু'জনকে পরস্পরের প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। মতবিরোধ বা সাময়িক মতানৈক্যও তাঁদের পরস্পরের প্রতি সেই অসীম অকৃত্রিম শ্রদ্ধাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। দেশবাসীর গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' নাম দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। তিনি বলেছেন—"এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়, তিনিই মহাত্মা।......মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালকে যিনি আপনার ভাল বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান।" মহাত্মা গান্ধীও অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন ক'রে কবিগুরুকে "গুরুদেব" বলেছিলেন। কবিবরের কয়েকটি বিশেষ গানও তাঁর খুবই প্রিয় ছিল—যা তাঁর জীবনের চরম সঙ্কটমুহূর্তে অনন্ত প্রেরণার উৎস স্বরূপ ছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বের পরে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন একান্তই মানুষের কবি—"পৃথিবীর কবি"। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার
> যত উঠে ধ্বনি
> আমার বাঁশির সুরে, সাড়া তার
> জাগিবে তখনি।"

তাই দেশে-বিদেশে যখনি যা ঘটেছে তার প্রতি কবি মোটেই নিরাসক্ত ও উদাসীন থাকতে পারেন নি। গান্ধীজী বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ হলেও তিনি কোনও দিন ধর্ম থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। তাঁর সত্যসাধনায় ধর্ম ও রাজনীতি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত ছিল। তাঁর অহিংস নীতি ও সত্যের প্রতি অচঞ্চল নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেছেন—"এই একটি লোক যিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাততঃ সুবিধে হোক বা না হোক তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যলাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন।" "মরব, তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব"—নিজ মনুষ্যবোধের দ্বারা অপর পক্ষের মনুষ্যত্ববোধকে উদ্‌বোধিত করতে হবে, ন্যায়ের দ্বারা অন্যায়কে জয় করতে হবে—মহাত্মা গান্ধীর এই অপূর্ব নীতি কবিগুরুর কাছে 'একটা মস্ত বড় কথা', 'একটা বাণী' বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর নিজেরও স্থির বিশ্বাস ছিল মানুষের আত্মিক বলের কাছে তার পাশবিক বলকে একদিন না একদিন পরাভব মানতেই হবে। তাই তিনি মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে পরম বিশ্বাস ভরে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পেরেছিলেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।" গান্ধীজী ভারতের জনসাধারণকে "রাষ্ট্রীয় মুক্তির দীক্ষা"র সঙ্গে সত্য ও অহিংসার দীক্ষা দিতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তহীন শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তবুও মহাত্মা গান্ধী যখন দেশব্যাপী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive resistance) ও

সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাতে মনস্থ করেছিলেন তখন আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে যে গভীর সংশয় জেগেছিল তা গান্ধীজীকে লিখিত তাঁর সেই সময়কার একখানি পত্র থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর সেই চিঠিখানির কয়েকটি লাইনের মর্ম হচ্ছে—"আমি জানি ন্যায়ের দ্বারা অন্যায়কে জয় করতে হবে—এই শিক্ষাই আপনি ভারতের অগণিত জনগণকে দিতে চান। কিন্তু আমার বিশ্বাস এইরূপ সংগ্রাম কেবল বীরদেরই উপযোগী—এ সাধারণ মানুষের জন্যে নয়, যারা ক্ষণিক উত্তেজনা ও হৃদয়াবেগের দ্বারাই চালিত হয়। এক পক্ষের অন্যায় অপর পক্ষের অন্যায়কে প্ররোচিত করে—অবিচার থেকেই উদ্ভব হয় হিংসার, অপমানই করে প্রতিহিংসাপরায়ণতার উদ্রেক।" গান্ধীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় অনতিবিলম্বে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, তিনি একটি হিমালয়তুল্য বিরাট্ ভুল করে ফেলেছেন। মহামতি দীনবন্ধু অ্যাণ্ডরুজ—যিনি আজীবন এই দুই মহাপুরুষের সঙ্গে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন—এঁদের দু'জনের মধ্যে চরিত্রগত এক আশ্চর্য মিল ও সাদৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি উভয়ের মধ্যেই লক্ষ্য করেছিলেন—একই প্রকার অনমনীয় স্বাধীনচিত্ততা, অপূর্ব সাহস ও নির্ভীকতা, অত্যাচারীর প্রতি দুর্জয় ঘৃণা, নিজ মত বা কার্যের ফলাফলের প্রতি পূর্ণ ঔদাসীন্য, কর্তব্যের জন্যে জীবন পণ করবার দৃঢ়, অটুট সঙ্কল্প, সুগভীর দেশাত্মবোধ এবং মাতৃভূমি ভারতের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও স্বদেশের সুনাম রক্ষা করবার জন্যে অশ্রান্ত প্রয়াস।

জাতীয় সংহতি ও জাতীয় ঐক্যসাধন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ও মহাত্মা গান্ধীর উভয়েরই সমান অভিপ্রেত ছিল। ভারতের, তথা বিশ্বমানবের মিলন-স্বপ্নে বিভোর বিশ্বকবি বলেছেন—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থ
জাগো রে ধীরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।"

মহাত্মা গান্ধীও—যিনি ভারতের ঐক্যসাধন-হোমানলে নিজ জীবন আহুতি দিয়েছিলেন—তাঁর স্বদেশবাসীকে এই ঐক্যমন্ত্রেই দীক্ষা দিতে চেয়ে গেয়েছিলেন—"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম।" তাঁকে "জাতির জনক" (Father of the Nation) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যুগস্রষ্টা হলেও তাঁকে এই অভিধায় ভূষিত করা চলে না, কেননা, ভারতের অখণ্ড একজাতীয়ত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জাতির সমাবেশে ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে। এখানে আছে 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'। এই 'বিবিধের মাঝে' মিলন বা সামঞ্জস্য স্থাপন করাই তার লক্ষ্য। কিন্তু এই ঐক্যসাধন রাষ্ট্রের দ্বারা কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। রাষ্ট্র বলপূর্বক দেশের বিভিন্ন জাতির মিলন ঘটাতে চেষ্টা করলেও তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। যাদের জোর করে মিলান হয়েছে সুযোগ পেলেই তারা আবার জোর করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই মিলনসাধন একমাত্র সমাজের দ্বারাই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মতে—"আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি।...কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে 'নেশন' গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।" তিনি আরও বলেছেন—"হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।...'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না।" "বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন"ই হচ্ছে ভারতের "অন্তর্নিহিত ধর্ম"—তার চিরন্তন আদর্শ। ভারতবর্ষ কোনও দিনই "রাষ্ট্রগৌরব লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য" বলে মনে করে নি। "পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত" করবার চেষ্টাই হচ্ছে য়ুরোপীয় "পলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি"। কিন্তু "পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা" ভারতবর্ষের "ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি"। সেই জন্যে "য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধ-মূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটি-ক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না।" কবির মতে তাই ভারতবর্ষ চিরদিনই "বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।" নানা ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য-সাধন—ভারতের এই চিরপুরাতন আদর্শটিকেই তিনি নূতন করে জগতের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে, এই "ঐক্য-মূলক সভ্যতা"ই "মানবজাতির চরম সভ্যতা"।

রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর—উভয়েরই স্বাধীনতার আদর্শটি অতি উচ্চ ও মহান। তাঁরা দুজনেই স্বাধীনতাকে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন, এবং তাকে এক নূতনতর ও মহত্তর সংজ্ঞা দিয়েছেন—যার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তাঁদের এই আদর্শ স্বাধীনতা দ্বেষাত্মক বা হিংসাত্মক নয়—যা মানুষের পাশবিক বলের দ্বারাই অর্জনীয়। কবিগুরু বলেছেন, "য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন।" এই আত্মিক স্বাধীনতা 'রিপুর বন্ধন' থেকে মুক্তিই হচ্ছে ভারতীয় সাধনার চরম লক্ষ্য। এই মুক্তির সংগে য়ুরোপের দানবীয় 'ফ্রীডম' বা স্বাধীনতার তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর; তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলই অন্যকে আঘাত করে, এই জন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে-চর্মে অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে; তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে; তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় 'ফ্রীডম' কোন কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম লক্ষ্য ছিল না। এখনও আধুনিক কালের ধিক্কার সত্ত্বেও এই 'ফ্রীডম' আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না।" গান্ধীজীর স্বরাজের আদর্শও কতকটা অনুরূপ। এই স্বরাজ সম্পূর্ণরূপে আত্মিক বলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ বাইরের কোনও শক্তির দ্বারা লভ্য নয়। তাঁর মতে এই আত্মিক স্বাধীনতাই হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বরাজ বা স্বাধীনতার মূলে—যা একমাত্র আত্মিক বল বা আত্ম-শাসনের ( self-rule ) দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। রাষ্ট্রীয় স্বরাজ বা স্বাধীনতাও এই একই উপায়ে—আত্মিক বলের দ্বারাই অর্জন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "মানুষ যে-কোন সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না—কিছুতেই না! স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী—উভয়েই ছিলেন স্বদেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক, অথচ মানবতার একনিষ্ঠ পূজারী। তাঁদের সুগভীর দেশাত্মবোধও তাঁদের সেই বিশাল মানবতাবোধকে লেশমাত্র খর্ব করতে পারে নি। এঁদের দু'জনের কাছেই মানবতাবোধ ছিল স্বদেশপ্রেমের চেয়েও বড়। গান্ধীজী ছিলেন এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা—যাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় ও শক্তিই ব্যয়িত হয়েছিল ভারতের রাষ্ট্রিক মুক্তি সাধনায়। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে এনেছিলেন যুগান্তর—বিশ্বজগতকে দেখিয়েছিলেন এক সম্পূর্ণ নূতন ও মহৎ পথ। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ কখনও মানববিদ্বেষে কলুষিত হয়ে ওঠে নি। তাঁর উদার জাতীয়তাবাদের সংগে আন্তর্জাতিকতার কোনও বিরোধ ছিল না। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ দূষনীয় নয়—এর হীনতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও বর্জননীতিই পরিহার্য। আজকের দিনে জাতীয়তাবাদের এই দুর্নীতিগুলিই আধুনিক জাতিপুঞ্জের অভিশাপস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তিনি চেয়েছিলেন ভারতের জাতীয়তাবাদীরা এই সব দোষ বর্জন করে বিশ্বকল্যাণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে স্থাপন করবে এক উদার মহান আদর্শ। তিনি বলেছিলেন, "আমার স্বদেশপ্রেম বর্জনমূলক নয়। এ সর্বমানবীয় এবং মানব-ধর্মাশ্রয়ী। জগতের অপরাপর জাতির দুঃখ বা শোষণই যে স্বাজাত্যবোধের প্রধান উপজীব্য তাকে আমি স্বীকার করি না।" মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথও স্বাজাত্যবোধের যূপকাষ্ঠে মানবতাবোধকে বলি দেবার ও স্বদেশপ্রেমের নামে মানবধর্মে জলাঞ্জলি দেবার বিশেষ বিরোধী ছিলেন। তাঁর "চার অধ্যায়" উপন্যাসখানি মনুষ্যত্ব-বিরোধী এই তথাকথিত স্বাদেশিকতারই তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলাদলির হীনতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও মিথ্যাচারিতা চিরদিনই তাঁকে পীড়া দিয়েছে। দেশের জাতীয় আন্দোলন থেকে তাঁর স'রে দাঁড়াবার এইটেই হচ্ছে মূল কারণ। বিশ্বমানবিকতার 'উদার ছন্দে' বাঁধা কবির চিত্তকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অনুদারতাক্লিষ্ট না করে পারে নি। তিনি বলেছেন, "আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্‌বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোন প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোন বাণী না থাকে তা হ'লে তাতে আমাদের

দীনতা প্রকাশ করবে।" তিনি "সমস্ত বিশ্বের সংগে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপটিকেই" দেখতে চেয়েছেন। তাকে জাতীয়তাবাদের আদর্শের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে সীমায়িত ও ছোট করে দেখতে চান নি। এক সময়ে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন কেবলই "পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্য ত্রুটি স্মরণ" করিয়ে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ আমরা যখন রাজনীতিকে সেই "পরপরায়ণতা" থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছি তখন আর "পরের অপরাধ-জপের দ্বারা" আমাদের বর্জননীতিকেই পরিপোষণ করা সংগত নয়। এতে করে আমাদের যে মনোভাব ক্রমশঃই প্রবল হয়ে উঠছে তা "আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগত থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে।" ফলে "আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোট, তার দীপ্তি নেই, সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনও কোন বড় জিনিসকে সৃষ্টি করে নি।"

ভারত-পথিক রামমোহন রায়ের সুযোগ্য উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন—"ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ" করবে। তিনি বুঝেছিলেন 'পশ্চিমের সম্বন্ধ' থেকে বঞ্চিত হলে ভারতকে অসম্পূর্ণই থেকে যেতে হবে। য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখনও জীবন্ত ও চলমান—তার "প্রদীপের মুখে" আজও শিখা জ্বলছে। সেই অনির্বাণ দীপশিখা থেকেই আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে নিয়ে আমাদের আবার কালের যাত্রায় অগ্রসর হতে হবে। এই বৃহত্তর ও সার্থকতর ভারত-সৃজনে কবিগুরুর আদর্শ ছিলেন রাম-মোহন রায়—যিনি য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সেতু-বন্ধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন—যিনি ভারতের চিত্তকে "সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ" না ক'রে তাকে দেশে কালে প্রসারিত করবারই স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর "প্রতিষ্ঠা-ভূমি" ছিল তাঁর নিজ মাতৃভূমি—ভারতবর্ষ। তারই মাটির উপরে দাঁড়িয়ে তিনি বাইরের সামগ্রী আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন ভারতের প্রকৃত সম্পদ কোথায় এবং তার দৈন্যই বা কোথায়। তাই তিনি যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন তাকে তিনি একেবারে নিজস্ব করে নিতে পেরেছিলেন। কতখানি গ্রহণ করতে হবে এবং কতখানি বর্জন করতে হবে তা বিচার করবারও নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁর হাতে ছিল। সেই জন্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জৌলুস তাঁকে মোহাভিভূত করতে পারে নি। গান্ধীজীও পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণের সমর্থক ছিলেন না। তিনি বলেছেন, দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করাই হবে তাঁর পরিকল্পিত স্বরাজের প্রধান লক্ষ্য। বিদেশের কাছ থেকে আমরা কোনও ঋণই গ্রহণ করব না, যদি না সেই ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করতে পারি। তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করতে চান নি, যদিও দরিদ্র ভারতের জনগণের প্রতীকস্বরূপ তিনি নিজে কৌপীন ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমাদের ঘরের দরজা-জানালাগুলি সর্বদাই খোলা রাখতে হবে, যাতে ক'রে বাইরের মুক্ত নির্মল বায়ু প্রবেশে বাধা না পায়। কিন্তু প্রবল বাত্যার তাড়নায় আমরা যেন স্বস্থানচ্যুত না হই সেদিকেও আমাদের সমুচিত দৃষ্টি রাখতে হবে। এ বিষয়ে গান্ধীজীর অভিমত কতকটা যেন রবীন্দ্রনাথের মতেরই প্রতিধ্বনি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী উভয়েই ছিলেন সাম্যের অনুরাগী। জগতের সকল অসাম্য ও অবিচারই চিরদিন তাঁদের অন্তরে বেজেছে। ভারতের উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতীয়দের প্রতি ঘৃণা ও অবিচারে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে তার মনুষ্যত্বের যে ঘোর অবমাননা করা হয়েছে সেই অপরাধের অপরিসীম গ্লানি কবির অন্তরকে নিদারুণ পীড়িত করেছিল। বেদনামথিত চিত্তে তাই তিনি বলেছেন:

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

কবি তাঁর সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন এই "ভেদবুদ্ধির অভিশাপে" আমাদের "রাষ্ট্রিক মুক্তি সাধনা" একদিন না একদিন ব্যাহত হবেই। তিনি তাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—

"যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে
পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

তাঁর "কালের যাত্রা" নাটিকাটিতে রথের দড়ি কিছুতেই নড়ল না যতক্ষণ না শূদ্রের দল এসে তাতে টান দিল। তাই দেখে কবি বললেন—

"ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল
অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে
দিলেন কাত করে।

সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।"

কবির এই কথাগুলির মধ্যে আবার যেন শুনতে পাই তাঁর আগেকার কথারই প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নাটিকায় বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ অস্পৃশ্যা চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির কাছে তৃষ্ণার জল চেয়ে বললেন, "যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।" মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে তিনি হলেন ধন্য। আর মানুষের মর্যাদা পেয়ে সেই চণ্ডালিনী মেয়ে প্রকৃতিও যেন নবজন্ম লাভ করল—যার আজন্মের সংস্কারাচ্ছন্ন মন এতদিন তাকে ভুলিয়ে রেখেছিল তার অস্পৃশ্যতার অগৌরবকেও। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কবিগুরু অভিযান চালিয়েছেন তাঁর অনুপম ভাষার মাধ্যমে, গদ্যে, ছন্দে, কাব্যে, রূপকে, নাটকে ও প্রবন্ধে। তেমনি গান্ধীজীও চালিয়েছেন সেই অভিযান—জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে। তাঁর ধ্যানের স্বাধীন ভারত থেকে এই অস্পৃশ্যতা পাপ সম্পূর্ণ বিদূরিত হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। হিন্দু সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের প্রতিবাদকল্পে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৯ সনে ৪ঠা আশ্বিন আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। "রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দু সমাজকে দ্বিখণ্ডিত" করবার এই অপচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করেছিলেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনে গান্ধীজী কবিগুরুর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। কবি সেই সময়কার তাঁর এক ভাষণে মহাত্মাজীর ঐ "অহিংস্র" আত্মত্যাগের শান্ত প্রয়াসকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে বলেছিলেন—"জয় হোক সেই তপস্বীর, যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে।" দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ সেদিন উদাত্তস্বরে বলেছিলেন—"তোমরা জয়ধ্বনি কর তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছাক তাঁর আসনের কাছে। বল, 'তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।'...অপরাধের অবসান হোক, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক। মানুষকে গৌরব দান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।" আমাদের দেশে নারীর প্রতি যে অবিচার যুগ যুগ ধ'রে হয়ে এসেছে তার প্রতিবাদও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ও মহাত্মা গান্ধীর উভয়ের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি ইংরেজী প্রবন্ধের এক জায়গায় যা বলেছেন তার তর্জমা কতকটা এই রকম দাঁড়ায়—'নারী ও পুরুষের সম্বন্ধ-নিয়ামক আমাদের অনেক আইন ও সামাজিক বিধিই এক বর্বর যুগের নিদর্শন—যখন একচেটিয়া অধিকারের পাশবিক দম্ভ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধগুলিকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছিল—যেমন পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। এর হীনতা নারী পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধ বন্ধনে আজও রয়ে গেছে। নারীর অর্থ উপার্জনে অক্ষমতাই এর কারণ।' মহাত্মা গান্ধীও বলেছেন, সামাজিক প্রথা ও আইনের দ্বারা মেয়েদের যে দমিয়ে রাখা হয়েছে তার জন্যে পুরুষই সম্পূর্ণ দায়ী। এইগুলির প্রণয়নে ও প্রবর্তনে মেয়েদের সেদিন কোনও হাতই ছিল না। তাঁর মতে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে নারীর পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। তাঁর এই উক্তিটি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় কবিগুরুর "সবলা" কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিটিকেই—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা।
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি'
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব। কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।"

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, পুরুষেরা চিরদিন নিজেদের মেয়েদের প্রভু বলেই মনে করে এসেছে। তারা তরুণী নারীদের শুধু নর্মসহচরীই ভেবেছে—তাদের কখনও বন্ধু ও কর্মসহচরীরূপে দেখে নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়ে পুরুষের কাছে নারীর এই চিরন্তন দাবীটি তুলেছেন—

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর' সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর উভয়ের কাছেই স্বদেশ-প্রেম নিছক ভাববিলাসমাত্র ছিল না। তাঁদের অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষণা দেশের নানা উন্নয়নমূলক কাজে বাস্তবরূপ

পরিগ্রহ করেছিল। গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে তাঁরা উভয়েই স্বদেশের প্রকৃত সেবায় নিজ শক্তি ও অমূল্য সময় নিয়োজিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা দুজনেই বুঝেছিলেন দেশকে যথার্থ উন্নত করতে হলে তার অগণ্য অসংখ্য গ্রামগুলিকেও ভুলে থাকলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে পৈতৃক জমিদারী কার্য-পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন তখনই তাঁর বাঙলার পল্লী-বাসীদের দুঃসহ দুঃখ, দুর্দশা, দৈন্য, অভাব ও অজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এই অজ্ঞ, বঞ্চিত, দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষগুলির অশেষ দুঃখ, ব্যথা, দৈন্য, অভাব, অজ্ঞতা ও অশিক্ষা কবির হৃদয়ে অপার বেদনার সঞ্চার করেছিল। এদেরই অন্তহীন অভাব ও গভীর মর্মব্যথা উপলব্ধি ক'রে তিনি বলেছিলেন—"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।" এই দৈন্যের মাঝে তিনি তাই স্বর্গ থেকে "বিশ্বাসের ছবি" নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর "স্বদেশী সমাজ" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি বাংলার পল্লী সংস্কারের উপায় সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত পদ্ধতি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। তিনি পল্লীবাসীদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং গ্রামের জনকল্যাণকর সকল কাজে সাহায্যের জন্যে সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে গ্রামবাসীদের যথাসম্ভব সব বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন---"ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে।" তাঁর মতে "যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দ-বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর একটা দীপের শিখা জ্বালান কঠিন হবে না ; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।" এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনাটিকে একটি সার্থক বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করলেন শান্তিনিকেতনের সন্নিকটে সুরুল গ্রামে নিজ-প্রতিষ্ঠিত গ্রামোদ্যোগকেন্দ্রে—'শ্রীনিকেতনে'। এখানে কৃষি ও গ্রামবাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে নানা ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হল। কুটিরশিল্পের প্রবর্তন, সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির দ্বারা পল্লীবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টাও চলতে লাগল। জনশিক্ষা ও গ্রামের লোকদের আনন্দবিধানের জন্যে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করবার কথাও কবি ভোলেন নি। সেই উদ্দেশ্যে তিনি পল্লীর মেলাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ উৎসাহিত হলেন। তাঁর মতে "এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে।" আগেকার দিনে এই মেলাগুলিই ছিল দেশে জনশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রধান উপায়। এই উপলক্ষ্যে যাত্রা, কবি-গান, কীর্তন, কথকতা, পাঁচালি ইত্যাদির যে আয়োজন করা হ'ত তা শুনতে দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসত। এখানে নানা পল্লী-শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদিরও প্রদর্শনী হ'ত। তখনকার দিনে এইসব উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমেই জনসাধারণের মধ্যে আনন্দ ও সাহিত্যরস পরিবেশন করবার রীতি প্রচলিত ছিল। সেই সঙ্গে লোককে ধর্মশিক্ষা দেওয়াও ছিল এই অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। জনশিক্ষার সহায়ক হিসাবেও কবি এই মেলাগুলির পুনঃ প্রচলনের জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবছর এইরকম একটি মেলার আয়োজন করা হয়। পরবর্তী কালে রাশিয়ার বিপুল জনশিক্ষা ব্যবস্থা কবিকে কিরূপ মুগ্ধ করেছিল তা তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" পড়লেই জানা যায়। মহাত্মা গান্ধীও চেয়েছিলেন ভারতের গ্রামগুলি স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েই গ'ড়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করবে, নিজেদের বস্ত্র তারা নিজেরাই প্রস্তুত করবে। পল্লীর রাস্তাঘাট সংস্কার ও সেগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পুকুর, কূপ পরিষ্কার করা ও উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি জনস্বাস্থ্যমূলক কাজের ভারও পল্লীবাসীদের উপরেই ন্যস্ত হবে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ স্থাপন ক'রে এবং সেইগুলির সাহায্যে গ্রামবাসীরা আপন আপন ঘরোয়া কলহ-বিবাদের মীমাংসা নিজেরাই করবে—ছোটোখাটো ব্যাপারে তাদের আর সরকারী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে না। স্বরাজের ভিত্তি এইরকম করে গ্রামেই স্থাপিত হবে। দেশের শিক্ষিত লোকদের গ্রামবিমুখতা দূর করতে চেয়ে গান্ধীজী তাঁদের আবার গ্রামেই ফিরে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। চরকাখদ্দর প্রচলনের দ্বারা এবং গ্রামের অন্যান্য কুটিরশিল্পগুলির পুনরুদ্ধারের দ্বারা তিনি পল্লীবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতেও চেষ্টা করেছেন। মাদকতা

ন্ধন, গোরক্ষা, সমবায়প্রণালীতে পশু পালন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তিনি গ্রামবাসীদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। জনশিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষাও তাঁর গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।

দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ও মহাত্মা গান্ধীর অবদান অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয়। তাঁরা দুজনেই দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী দেশের শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। বিদেশ থেকে আমদানী করা শিক্ষাবিধির দ্বারা যে দেশের ছেলে-মেয়েদের প্রকৃত উপকার সাধিত হতে পারে না একথা তাঁরা দুজনেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। কি উপায়ে শিক্ষাকে শিশুদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না করে তাকে কার্যকরী, আনন্দদায়ক এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী করে তোলা যায় সে সম্বন্ধে উভয়েই অনেক চিন্তা করেছিলেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলি সম্বন্ধে কবি নিজে বাল্যে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তার বেদনাময় স্মৃতিই বিশেষ করে তাঁকে পরিণত বয়সে শিক্ষাসংস্কারে প্রণোদিত করেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, "ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্য আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা।" শিক্ষা যেন 'ক্লাস নামধার' শুধু একটা 'খাঁচার জিনিস'ই না হয়ে ওঠে, সেটা যেন ছেলেমেয়েদের প্রতিদিনকার জীবনেরই নিকট অঙ্গ হয়, তাই কবি চেয়েছিলেন। কর্মব্যস্ত শহরের জনকোলাহল থেকে দূরে পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে শান্তিনিকেতনে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'—কতকটা প্রাচীন তপোবনের আদর্শেই। এখানে মুক্ত উদার আকাশের তলে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় ব'সে ছেলেমেয়েরা গুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বিদ্যাচর্চায় নিরত থাকবে এই ছবিটিই ছিল কবির ধ্যানে। এই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হবে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের দেহমনে যে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত শিক্ষা বিস্তার করে, তাও। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা যেন তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে, খেলাধূলায়, গানে, শিল্পে "প্রাণময়ী প্রকৃতি"র স্পর্শ অনুভব করতে পারে তাই কবি চেয়েছিলেন। ত্যাগ, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সংযম ও শুচিতার আদর্শেই গ'ড়ে উঠবে এই বিকচোন্মুখ নবীন জীবনগুলি, এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। এই আশ্রমের জীবনযাত্রা তাই হবে সরল, অনাড়ম্বর ও উপকরণ-বাহুল্যবর্জিত। আশ্রমের কেন্দ্রে থাকবেন গুরু বা শিক্ষক—ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে থাকবে যাঁর "প্রাণগত স্পর্শ"। সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপন করাই হবে এই আশ্রমশিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং শিক্ষককেও হতে হবে "সক্রিয়"ভাবেই একজন মানুষ। "নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ" জিনিসটিই আশ্রমজীবনের সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান শিক্ষা। শিক্ষকের অন্তরটি হবে সদাই সরস ও সজীব। তাঁর অন্তরের মধ্যে বিরাজ করবে এক "চিরশিশু"—যে শিশু-দের ডাকে স্বতঃই সাড়া দেবে, যাতে করে শিশুরাও তাঁকে "স্বশ্রেণীর জীব" বলে চিনে নিতে ভুল না করে। তিনি হবেন অশেষ ধৈর্যবান, সহনশীল ও স্নেহপরায়ণ। পরস্পরের সেবা ও আদর্শ পরিবেশ রচনার দ্বারা ছেলে-মেয়েরা যেন নিজেদের চেষ্টায় আপনাদের চারদিককে "সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একত্রবাসের সতর্ক দায়িত্বে" বাল্যকাল থেকেই অভ্যস্ত হয়, এই ছিল আশ্রমের লক্ষ্য। কবি তাদের আত্মকর্তৃত্ববোধকে জাগিয়ে তুলে তাদের আত্মশক্তিমূলক শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন। শিশুদের রসপিপাসু মন যেন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার থেকে রস আহরণে নিয়ত রত থাকে তাও তাঁর কাম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের উপাসক—রূপস্রষ্টা কবি, শিল্পী। ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যক্ষুধা ও সৃজনস্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করাও তাঁর মতে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাসূচীতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই স্থান পায় নি। তিনি তার মধ্যে সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি ললিত কলাচর্চাকেও একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিলেন। শিশুদের মনে একটি আনন্দ-লোক সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত—যেখানে তাদের মন সৃষ্টির উদ্যমে ও আপন সৃজন আনন্দেই পূর্ণ থাকবে। তিনি জানতেন, তাদের "প্রাণকোরকের গোপনমর্মস্থলে" আছে "বিকাশবেদনা"র সুগভীর আকুতি। সেজন্যে তাদের আত্মপ্রকাশেরও প্রচুর অবকাশ দেওয়া প্রয়োজন। বিশ্বমানবিকতার বিশালতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিগুরু তাঁর "ব্রহ্মচর্যাশ্রম"টিকে পুরে "বিশ্বভারতী"তে রূপায়িত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর এই প্রতিষ্ঠানটি হবে বিশ্বের বিদ্যা ও সংস্কৃতির যথার্থ মিলনকেন্দ্র—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্"—যেখানে বিশ্বের ভাবের ও

সংস্কৃতির হবে আদান-প্রদান। এখানে "মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রেখে" ভারতীয় বিদ্যাকে বিচার করতে হবে। আমাদের দেশে "বর্তমান কালে শিক্ষার যতকিছু সরকারী ব্যবস্থা আছে তার পনর আনা অংশ পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা।" কবি চেয়েছিলেন ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে "অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক।" তার ধনসম্পদ না থাকলেও তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরেই সে 'বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।' মহাত্মা গান্ধীও সবরমতীতে ও সেবাগ্রামে প্রাচ্য আদর্শ অনুযায়ীই ছেলেমেয়েদের আশ্রমজীবনভিত্তিক জীবন্ত শিক্ষা দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাদের প্রাত্যহিক-জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্রটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর শিক্ষার আদর্শটি ছিল নিতান্তই বাস্তবধর্মী। তিনি শিশুদের শিক্ষার মধ্যে দিয়েই তাদের বাস্তব জীবনের অন্নবস্ত্রের সমস্যাটিরও সমাধান করতে চেয়েছেন। তিনি সেইজন্যে শিক্ষাকে প্রথম থেকেই স্বাবলম্বী করে জীবনের সুরু থেকেই শিশুদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন তা না হ'লে এই দরিদ্র-দেশের দারিদ্র্য-অভাবগ্রস্ত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রবর্তিত 'নয়া তালিমে' বা বুনিয়াদী শিক্ষায় কায়িক শ্রম ও হাতের কাজকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে শিশুদের শিক্ষা হবে মূলতঃ শিল্পকেন্দ্রিক। একটি শিল্পের মাধ্যমেই তারা হাতে-কলমে কাজ ক'রে সব বিষয় শিক্ষা করবে এবং তাদের নিজ-হাতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থেই তাদের নিজ শিক্ষার ব্যয়ভার অন্ততঃ আংশিকভাবেও নির্বাহিত হবে। ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপজীবিকার উপযোগী করে গ'ড়ে তোলাই গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। অসাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষাদানও তাঁর আশ্রমশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথও ধর্মকে আশ্রমের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেন নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ১৫ মিনিট কাল ছেলেমেয়েরা নীরব প্রার্থনার জন্যে একত্র মিলিত হবে এবং তাদের নিত্যনৈমিত্তিক দৈনন্দিন কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের ধর্ম ও নীতিবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা আশ্রমের আদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কবিগুরু ও মহাত্মাজী উভয়েই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ও সহশিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯৪০ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধী কস্তুরবাই সহ শান্তিনিকেতনে কবিগুরুকে দেখতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ভগ্নস্বাস্থ্য। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর জীবনের আর বেশী দিন অবশিষ্ট নেই। এই সময়ে তাই তিনি গান্ধীজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর অবর্তমানে তাঁর মানসী-কন্যা "বিশ্বভারতী"র ভার গ্রহণ করতে। তিনি গান্ধীজীর মধ্যে চিনে নিয়েছিলেন তাঁর যোগ্যতম উত্তরাধিকারীকে—একমাত্র যিনিই তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটির আদর্শকে অম্লান, অক্ষুণ্ণভাবে সঞ্জীবিত রাখতে পারবেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ও মহাত্মা গান্ধীর উভয়েরই নশ্বর জীবনের আজ অবসান ঘটেছে। কিন্তু মৃত্যু হয় নি আজও তাঁদের আদর্শের—যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ভারতের শাশ্বত বাণী—সত্য, ঐক্য, ত্যাগ ও অহিংসার বাণী। বিশ্বকবির অমর ভাষাতেই আজ উভয় মহামানবের উদ্দেশ্যে বলি—

"তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হয়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর তরে
ভারতের ধন।"

—

## শূকরাধম

জঘন্য প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষকে যেমন বলা হয় নরাধম তেমনি এমন এক শ্রেণীর শূকর আছে যারা এরূপ কদাকার, হিংস্র ও নীচ প্রকৃতির যে, এদেরও বলা চলে শূকরাধম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি পার্বত্য অঞ্চলে এরা অবাধে বিচরণ করে। এদের গড়পড়তা ওজন ২২৫ পাউণ্ড, কোন কোনটির ওজন কিন্তু চারশ পাউণ্ড এবং উচ্চতা তিন ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। চেহারার মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাচের গুটিকার মত দুটি ছোট ছোট কালো চোখ আর ক্ষুরের মত ধারাল এক জোড়া দাঁত। একজন শিকারী বলেছেন যে, এদের দাঁতগুলো দেখলে বাস্তবিকই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যে র‍্যাটল সাপকে বনের সকল প্রাণী ভয় করে, এই জাতীয় শুয়োরের তা অতি প্রিয় খাদ্য। র‍্যাটল সাপ যখন বনের ভেতর দিয়ে চলতে থাকে তখন তার লেজের গাঁটগুলির দরুণ ঝম ঝম ক'রে এক প্রকার আওয়াজ হয়, তা শুনে অন্যান্য প্রাণীরা পালিয়ে যায়, কিন্তু বেপরোয়াভাবে এগিয়ে আসে এই বুনো শুয়োর, ধারাল ক্ষুর দিয়ে চেপে ধ'রে তাকে পিষে মেরে ফেলে এবং সেখানে দাঁড়িয়েই সাপটাকে উদরস্থ করে।

শূকরাধম

আরণ্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, জীববিজ্ঞানী পেরি জোন্স উত্তর ক্যারোলিনার পার্বত্য অঞ্চলের এই সকল শূকরের ধরণধারণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি বলেন "এদের প্রত্যেক কাঁধের ওপর কোমলাস্থির (Cartilage) পুরু স্তর আছে। শিকারী কুকুর তাতে দাঁত বসাতে পারে না, এমন কি যে কোন ছোট আকারের রাইফেলের গুলী তা ভেদ করতে পারে না।

এই বুনো শুয়োরেরা নিশাচর। রাত্রিবেলাই হচ্ছে এদের খাদ্য-সন্ধানের প্রশস্ত সময়। একাকী অথবা ছোটখাটো দল বেঁধে কখনও কখনও এরা এক রাতে বার মাইল পর্যন্ত চ'রে বেড়ায়।

একদা বিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ছিল এদের আস্তানা, কিন্তু দীর্ঘকাল হ'ল সেখানে তাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। য়ুরোপে এখন এই জাতের শূকরেরা রাশিয়া, জার্মানী, স্পেন এবং অষ্ট্রিয়ার বনময় পর্বতে ও জলাভূমির নিকটে বাস করে। আরণ্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকায় এই জাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শূকর-যূথ (১,১০০) বাস করে টেনেসি ও উত্তর ক্যারোলিনার প্রান্তসীমায় অবস্থিত পর্বতমালার ঢালু জায়গায়।

আমেরিকায় এই শূকর-উপনিবেশের পত্তন হ'ল কেমন করে সে এক আশ্চর্য কাহিনী।

১৯০৯ সনের কথা। উত্তর ক্যারোলিনার পাহাড়ের চূড়ার উপরে শিকারীর স্বর্গ রচনায় হাত দিয়েছেন জর্জ গর্ডন মূর। সেখানে ৫,৪০৯ ফুট উঁচুতে দুটি খোঁয়াড় তৈরী করলেন তিনি, একটি মোষের এবং অপরটি শুয়োরের জন্য।

১৯১২ সনের এপ্রিল মাসে পৃথিবীর বৃহত্তম এবং হিংস্রতম শূকরদের বাসভূমি, রাশিয়ার উরাল পর্বত থেকে, জাহাজে ও ট্রেনে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে ১৪টি বন্য শূকর এসে পৌছল মূর সাহেবের 'শিকারীর স্বর্গলোকে'। পাহাড়ের মাথার উপরকার খোঁয়াড়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল। নীচেকার গ্রাম থেকে কিছু লোক [illegible] অ[illegible] দেখবার জন্য পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠেছিল। শূকরগুলোকে যেই চাঙ্গারি থেকে বের করা হ'ল অমনি তাদের রকম দেখে দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ লাফিয়ে গাছের উপর চড়ে বসল। দিনকতক তাদের মুখে এই রাশিয়ান শুয়োরের হিংস্রতা ছাড়া আর কোন কথা ছিল না।

এই শূকরপালের তত্ত্বাবধায়করূপে গারল্যাণ্ড "কটন" ম্যাকগুয়ার নামে একটি পাহাড়ী ছেলেকে মূর নিযুক্ত করলেন। ম্যাকগুয়ার ৩১ বৎসর পাহাড়ের মাথায় সাধকের ন্যায় জীবন কাটিয়ে গেছেন। রাশিয়ান শূকর সম্বন্ধে তিনি শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হন।

কটন ম্যাকগুয়ার এই সকল বুনো শূকরকে আদৌ পছন্দ করতেন না। শিকারী কুকুরের ঘেউ ঘেউ চীৎকার এরা গ্রাহ্যও করে না। সবচেয়ে সাহসী কুকুরই কেবলমাত্র জীবন বিপন্ন ক'রে এদের সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়াতে পারে। পাহাড়ের উপর প্রথম শূকর-শিকারের যে বড় অভিযান হয় তাতে দুটি শূকর গুলীতে নিহত হয় সত্য, কিন্তু তাদের আক্রমণে এক ডজন কুকুর মারা যায়।

কটন ম্যাকগুয়ার পরলোক গমন করেন ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ৬১ বৎসর বয়সে। সারা পৃথিবীর মধ্যে জঘন্যতম এই শূকরাধমদের স্বভাবের আসল

স্বরূপ বুঝিয়েছেন তিনি একটি মাত্র বাক্যে "এই বন্য শূকরগুলি বাস্তবিকই ঘৃণ্য।"

## যোগ (+) ও বিয়োগ (−) চিহ্নের জন্মকথা

যতদূর জানা যায়, যোগ এবং বিয়োগ চিহ্ন ব্যবহারের রেওয়াজ প্রথমে শুরু হয় হল্যাণ্ডে পঞ্চদশ শতকে। মালের বস্তায় ওজনের কমতি অথবা বাড়তি চিহ্নিত করবার জন্য এ ছিল এক ধরণের সাঙ্কেতিক লিখন। যেমন : যে বস্তার ওজন চার সেণ্টনার (৪০০ পাউণ্ড) হবার কথা সেটি যদি হত আরো পাঁচ পাউণ্ড বেশী তাহলে বস্তটির গায়ে 4c+5 এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হত আর ওজন যদি সম পরিমাণে কম হত তাহলে 4c 5 এভাবে চিহ্নিত করা হত। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে লিপজিগে প্রকাশিত একটি গণিতের বইয়ে অনুরূপ অর্থে এই চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়। পরের শতকের মাঝামাঝি সময়ে যোগ এবং বিয়োগ কথার নির্দেশক চিহ্ন হিসাবে এগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

এফ-আই রকেট ইঞ্জিন

## চাঁদে মানুষ কবে পৌঁছবে ?

রাশিয়ার গ্যাগারিন এবং টিটভ তো মহাকাশ পরিক্রমা করে আবার মর্ত্তলোকে ফিরে এলেন বহাল তবিয়তে এবং খোশ মেজাজে। মানুষের চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন কিন্তু এখনো বাস্তবে পরিণত হয় নি। অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগে যে, মানুষ কবে গিয়ে পৌঁছবে চন্দ্রলোকে।

সম্প্রতি আমেরিকায় নেশন্যাল এরোনটিকস এণ্ড স্পেস্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নামক সংস্থার অধীনে 'নর্থ আমেরিকান এভিয়েশন রকেট-ডাইন ডিভিশনে'র উদ্যোগে একটি অভিনব রকেটের নির্ম্মাণকার্য্য চলছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার এড্ওয়ার্ডস এয়ার ফোর্স বেস-এ একটি পরীক্ষণের সময় এই এফ-আই রকেটে এঞ্জিন ১,০০০,০০০ পাউণ্ড বাষ্প উদ্গীরণ করে। আজ পর্য্যন্ত মহাকাশযানের যত এঞ্জিন তৈরী হয়েছে তন্মধ্যে এই এফ্-আই রকেট এঞ্জিনটি সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এঞ্জিনের পরীক্ষণে উনিশ বার অগ্নিসংযোগের ফলে এটি ১,৬৪০,০০০ পাউণ্ড বাষ্প উৎপন্ন করেছে। উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টি চন্দ্রলোকের উদ্দেশ্যে মনুষ্য-বাহী মহাকাশযান প্রেরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে এমন আটটি এফ-আই রকেট সমষ্টি (cluster) প্রস্তুতির পরিকল্পনা করেছে যা একদল অভিযাত্রী সহ চাঁদে গিয়ে নামবে খুব সম্ভব ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।

## জলে ডাঙ্গায়

সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর চক্রযান 'ল্যাণ্ডরোভা'র চলছে প্রচণ্ড গর্জ্জনে স্থলপথের উপর দিয়ে। চলতে চলতে এসে পৌছল এক জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে। সামনে বিরাট নদী, তার উপরে পারাপারের জন্যে কোন পোল নেই। অনেক রাস্তা অতিক্রম করে এসেছে চক্রযানটি, এখন ত আর পিছনে ফিরে গেলে চলবে না, কাজেই সেটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হল মাটিতে বিছানো একটি ক্যানভাসের তেরপলের ওপরে এবং তেরপল দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া হল খুব আঁটসাট করে। তার পর
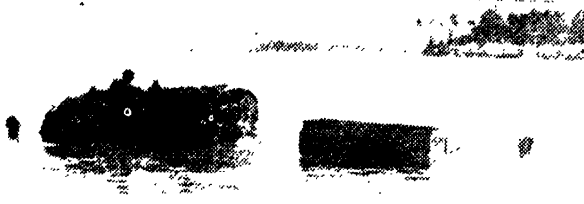
সারা-গা-ঢাকা, 'মোটর-চালিত' ট্রেলারযুক্ত গাড়ীটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল এবং ছজন মিলে তাকে ঠেলে নিয়ে চলল ওপারের দিকে।

১২০০ টাকার মোটরগাড়ী

## সস্তায় মোটরগাড়ী

এই তিনচাকার দুজন বসবার মতন মোটর গাড়ীটিকে ভাঁজ করে কিংবা টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলে মুটের মাথায় চাপিয়ে বা অন্য গাড়ীর লগেজ বক্সে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পাহাড়ের পথের চড়াই উৎরাই করবার শক্তি রাখে এই গাড়ী এবং সমতল ভূমিতে ঘণ্টায় ১৮ মাইল বেগে চলতে পারে স্বচ্ছন্দে। যখন গাড়ীর কাজ থাকে না, বসবার সীটটিকে খুলে নিয়ে বাগানে গাছের তলায় পেতে বসা চলে। আমেরিকায় গাড়ীটির দাম ১২০০ টাকার মত।

স. চ.
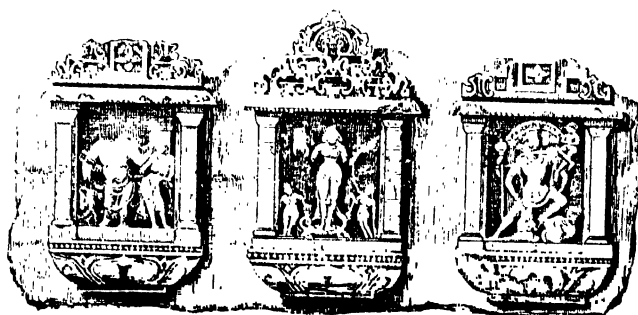
# স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

নয়

হ্যাঁ, আশুবাবুই ফিরেছেন। কিন্তু একলা নয়। সঙ্গে আরও দু'একজন যেন আছে।

আশুবাবু তাঁদের যা বলছেন তা শুনতে পেয়ে কিন্তু শোভনাকে একটু বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়েই উঠে দাঁড়াতে হ'ল।

আশুবাবু কুণ্ঠিত স্বরে বলছেন,—থাক, আর আমায় ধরতে হবে না। এটুকু আমি নিজেই যেতে পারব। আপনাদের কষ্ট দিলাম ব'লে সত্যি লজ্জা পাচ্ছি।

সে কি বলছেন!—অপরিচিত কণ্ঠে প্রতিবাদ শোনা গেল,—কষ্ট আমাদের কিসের! আপনাকে একটু ধ'রে এনেছি মাত্র, আর ত কিছু করি নি। না, চলুন, একেবারে আপনাকে ঘরে না পৌঁছে দিয়ে ফেরা আমাদের উচিত হবে না।

আশুবাবুর মৃদু প্রতিবাদ খাটল না, বোঝা গেল।

শোভনা দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে যেতে গিয়েও দ্বিধাভরে পারে নি। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। এখন আশুবাবুকে ধ'রে দু'টি অপরিচিত ভদ্রলোক বারান্দার ওপর উঠে আসায় সে ভেতরে স'রে গেল।

অপরিচিত দু'জন দরজার কাছে এসেই বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। একজনের হঠাৎ শোভনার দিকে দৃষ্টি পড়ায় কর্তব্যের খাতিরে আশ্বাস দেওয়া প্রয়োজন মনে করেই বোধ হয় ব্যাপারটা তিনি একটু বুঝিয়ে বললেন। —তেমন কিছু হয় নি। ভয় পাবেন না। শুধু এখন দু'চার-দিন বেরুতে দেবেন না।

কিছুই না বুঝলেও শোভনাকে নির্দেশটা মানবার প্রতিশ্রুতি হিসেবে মাথাটা একবার হেলাতে হ'ল। ভদ্রলোকের কাছে বিশদ বিবরণ জানবার উৎসাহ বা প্রয়োজন তার নেই। ব্যাপারটা যে গুরুতর কিছু নয় তা শুনে ও আশুবাবুকে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দেখেই কতকটা সে নিশ্চিন্ত। এখন যা জানবার আশুবাবুর কাছেই জানতে পারবে।

ভদ্রলোকেরা চ'লে যাবার পর আশুবাবু কিন্তু ব্যাপারটা তাচ্ছিল্যভরেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

—কিছু হয় নি মা। কিছু না। অনেকটা হেঁটে একটু ক্লান্ত হয়েছিলাম কি না? তাই মাথাটা একবার একটু ঘুরে গিয়েছিল। তাও প'ড়ে যাই নি। বারান্দার রেলিংটা ধ'রে একটু ব'সে পড়েছিলাম।

তেমন কিছু না হলে ওঁরা আপনাকে ধ'রে আনবেন কেন?—শোভনা সত্যিকার একটু উদ্বেগ নিয়েই প্রশ্ন করলে। আশুবাবু ব্যাপারটা এমন হাল্কা করবার চেষ্টা না করলে সে বোধ হয় তেমন ভাবিত হ'ত না।

আশুবাবু কিন্তু কিছুতেই নিজের অসুস্থতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। হেসে বললেন,—ওই ত বুড়ো হওয়ার শাস্তি মা। হয় লোকে উপদ্রব মনে করে, নয় অসহায় অক্ষম ভেবে করুণা করতে চায়। কত বললাম, কিছু আমার হয় নি, আমি নিজেই যেতে পারব, তা কিছুতে শুনলে না। বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে ছাড়লে না।

সেটা ওঁদের অপরাধ ব'লে ত ভাবতে পারছি না। মাথা ঘুরে আপনি প'ড়ে গিয়েছিলেন এটা ত ঠিক।

সে কি জোয়ান ছেলেরাও কখনও যায় না?

তা যাবে না কেন?—শোভনা এবার বৃদ্ধের অযৌক্তিকতায় না হেসে পারল না—তাদের বেলাতেও সেটা অসুখ ব'লেই ধরা হয়। আর জোয়ানদের সঙ্গে আপনার ত আকচা-আকচির সম্পর্ক নয় যে, তাদের দিকে টেনে বললে হিংসে হবে। অনেকটা হেঁটে ক্লান্ত হওয়ার দরুণ মাথাটা ঘুরে গেছল বলছেন। এত রাত পর্যন্ত এতখানি ঘুরেছেনই বা কেন?

প্রশ্নটা করেই নিজের গলার স্বর ও বলার ধরণ সম্বন্ধে শোভনা যেন সবিস্ময়ে প্রথম সচেতন হয়ে উঠল।

আশুবাবুর সঙ্গে এ ভাবে কথা সে বলছে কিসের জোরে? সম্পর্কটা এই কয়েক দিনের সংসর্গে অনেকটা সহজ হয়ে এলেও এই সুরে ত কখনো পৌঁছয় নি! তার প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার মধ্যে কৃত্রিমতা না থাক, অভিভাবিকার অধিকারে এমন শাসনের সুর নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠে এল কি ক'রে? আশুবাবু কি মনে করছেন কে জানে?

কিছু মনে করা দূরে থাক, আশুবাবুই অত্যন্ত যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। বেশ ইতস্তত: করে বললেন, —মানে, একটা জরুরী ব্যাপার ছিল কিনা, তাই একটু···

প্রসঙ্গটা এতদূর এনে ফেলে আর থেমে যাওয়া যায় না। শোভনা তাই সুরটা ভৎর্সনা থেকে মৃদু অনুযোগে নামিয়ে এনে বললে, যত জরুরীই হোক এত রাত পর্যন্ত ঘোরা আপনার খুব অন্যায় হয়েছে। আর অমন মাথা ঘুরে প'ড়ে যাওয়াটা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়। কালই আপনাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

বেশ ত! বেশ ত! তাই না হয় দেখাব, তা হলেই ত হ'ল। আশুবাবু যেন শোভনাকেই সন্তুষ্ট ক'রে তার সমর্থন আদায় করতে ব্যস্ত—কিন্তু জরুরী ব্যাপারটার জন্যে যাওয়া মোটেই অন্যায় হয় নি। না গেলে এমন পাকা খবরটা পেতাম!

আশুবাবু কেমন একটু বিজয় গর্বেই শোভনার দিকে চেয়ে এবার হাসলেন।

এই পাকা খবরটা কি, সে বিষয়ে প্রশ্ন করার আমন্ত্রণ বুঝেও শোভনা ইচ্ছে করেই সে ধার দিয়ে গেল না। অনিচ্ছায় নিজের অধিকারের সীমা যেটুকু সে একবার লঙ্ঘন করেছে তাই যথেষ্ট। আর সে ভুল তার হবে না।

অনেক রাত হয়ে গেছে। খেতে দিচ্ছি আসুন। ব'লে আশুবাবুর ইচ্ছাটা না বোঝার ভান ক'রেই সে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

হ্যাঁ যাচ্ছি। যাচ্ছি। বলে আশুবাবুই তাকে ডেকে থামালেন—কই, পাকা খবরটা কি তা জানতে চাইলে না?

চাওয়া কি আমার উচিত! শোভনাকে একটু হেসে বলতেই হ'ল।

বা! তোমার খবর আর তুমি জানতে চাইবে না!

আমার খবর! শোভনা সত্যিই বিস্মিত।

তোমার মানে তোমারই দরকারী খবর। আশুবাবু আর নিজেকে যেন চেপে রাখতে পারলেন না,—কি জন্যে আজ বেরিয়েছিলাম জান?

শোভনাকে চমকে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার সময়টুকু দিতেই বুঝি একটু থেমে আশুবাবু নিজেই আবার বললেন, অনুপমের ঠিকানা বার করতে।

শোভনা বিস্ময়ে সত্যিই নির্বাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

আশুবাবু নিজের উৎসাহে ব'লে চললেন, তোমায় ত কিছু বলি নি। দেখেছ কি না জানি না প্রায় ফি রবিবার আমার পুরোন এক বন্ধু উমেশ রক্ষিত একটু গল্পগুজব করতে, কখনও বা দাবার ছকটা নিয়ে বসতে আসে। তোমায় আনবার আগে অনুপম যখন ঘরটা ভাড়া ক'রে কদিন একলা ছিল তখন উমেশের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। আগের রবিবার উমেশ না আসায় একটু ভাবনায় পড়েই সেদিন তার কাছে দুপুরে গেছলাম খোঁজ নিতে বয়স ত হয়েছে দুজনেরই, একেবারে বড় তলব না হোক অসুখ-বিসুখ ত হ'তে পারে। উমেশ কিন্তু আমায় দেখে অবাক্। আমায় নাকি রবিবারে অন্য কাজের দরুন আসতে পারবে না ব'লে সে খবরই পাঠিয়েছিল। কাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল জিজ্ঞাসা করাতে বললে কি জান?

উত্তর পাবার জন্যে এ প্রশ্ন নয় বুঝে শোভনা নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আশুবাবুর দীর্ঘ বর্ণনা কোন্ অপ্রত্যাশিত উদ্ঘাটনের অপেক্ষায় প্রশ্নের ছলে এখানে থেমেছে তা নির্ভুলভাবে অনুমান করতে পেরেও তার কোন চাঞ্চল্য নেই কেন? সে কি ভেতরে-বাইরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ব'লে?

আশুবাবুর কাছে সেই আশাতাত খবরই এবার পাওয়া গেল। তিনি শাখা-প্রশাখা ও পল্লবের কিছু বাদ না দিয়ে সবিস্তারে যা বললেন, তার সার হ'ল এই যে, অনুপমের ঠিকানা পাওয়া গেছে। আশুবাবুর বন্ধু উমেশ রক্ষিত তাঁদের পাড়ার একটি স্টেশনারি দোকানে কি কিনতে গিয়ে তাকে দেখেন ও সে এখনও আশুবাবুর ভাড়াটে মনে ক'রে তার মারফৎ আশুবাবুর কাছে খবর পাঠান। সেদিনটা বৃহস্পতিবার ও দোকানের ছুটির দিন ব'লে উমেশবাবুকে নিয়ে আশুবাবু আর অনুপমের খোঁজে যান নি। সে দোকান চেনে উমেশবাবুর জানা এমন একটি লোককে আজ বিকেলে এখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে আসতে বলেছিলেন। দোকানে গিয়ে অনুপমকে অবশ্য পাওয়া যায় নি। কদিন ধ'রে সে দোকানে নাকি আসছে না জেনেছেন। দোকান থেকে তার বাসার ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আশুবাবু সেই বাসার খোঁজ করতেও বেরিয়েছিলেন। শুধু ঠিকানার কিছু গোলমালের জন্যে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারেন নি।

সমস্ত বিবরণ সাঙ্গ ক'রে আশুবাবু আশ্বাস দিয়ে হেসে বললেন, আর ভাবনা করো না মা। একবার যখন খেই পেয়েছি। ও ঠিকানা আমি খুঁজে বার করবই।

শোভনা তখনও নীরব। তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন একটা বুঝে আশুবাবু আবার বললেন, তুমি আর একটা বিষয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পার। উমেশ বা কাউকে, আসল কথা আমি কিছু বলি নি। উমেশ ত ভেবেছে, বাকি পাওনা আদায় করবার জন্যেই আমার অনুপমকে খোঁজার এত গরজ!

আশুবাবু নিজের মনেই হেসে উঠলেন।

শোভনা কিছু না ব'লে এবার ঘরের মধ্যে আসন পেতে রান্নাঘর থেকে খাবার আনতে গেল।

শোভনা খাবার সাজিয়ে দেবার পর আসনে ব'সে আশুবাবু একটু ক্ষুণ্ণ স্বরেই এবার বললেন, এত কথা শুনে তুমি ত কিছুই বললে না। অনুপমের খোঁজে যাওয়া কি আমার অন্যায় হয়েছে মনে কর?

শোভনাকে এবার একটা উত্তর দিতেই হ'ল। ম্লানভাবে একটু হেসে বললে, খোঁজ করতে গিয়ে নিজের শরীরটা যে পাত করতে বসেছিলেন সেটা অন্যায় বই কি?

অমন ক'রে কথা এড়াবার চেষ্টা ক'রো না। আশুবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, খোঁজ করতে যাওয়াটা আমার যদি অনধিকার চর্চা মনে কর ত তাই স্পষ্ট ক'রে বল।

বৃদ্ধের উত্তেজনা শান্ত করবার জন্যে শোভনা জোর করেই একটু হেসে বললে, বেশ, স্পষ্ট করেই বলছি, অনধিকার চর্চা আমি মনে করি না।

আশুবাবু কিন্তু তাতে ক্ষান্ত হলেন না। অসন্তোষের স্বরেই বললেন, তবে? তবে চুপ ক'রে থাকার মানে?

চুপ ক'রে থাকা ছাড়া কি আমি বলতে পারি বলুন। আপনি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছেন. তার ওপর আমারই নিরুদ্দেশ স্বামীর খোঁজ করতে গিয়ে আজ নিজেকেই শেষ করতে বসেছিলেন। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু আজকের ব্যাপারে আপনার জীবনে এমন উপদ্রব হয়ে ওঠার জন্যে নিজেকে একান্ত অপরাধীই মনে হচ্ছে। তাই চুপ ক'রে আছি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো ব'লে শোভনা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। দু' চোখের উদ্গত অশ্রু লুকোবার জন্যেই বোধ হয়।

আশুবাবুই এবার একেবারে অপ্রস্তুত। অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে এলোমেলো ভাবে বললেন, কৃতজ্ঞতা, অপরাধ, ও সব কথা আসছে কোথা থেকে! মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল ব'লে আমি কি মারা গেছি নাকি! সে ভয় নেই। এ পাকা হাড় অত সহজে যাবার নয়! কিন্তু আমি বলছি কি, এ ব্যাপারে—মানে এই খোঁজ পাওয়ার খবর শুনে তোমার একটু আগ্রহ দেখলে ত মনটা খুশী হয়। এমন ত আর নয় যে, অনুপমের খোঁজ করতেই আর তুমি চাও না?

হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে শোভনা সোজা আশুবাবুর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বললে, যদি বলি তাই!

মানে? আশুবাবু বিমূঢ়।

মানে, তাকে খোঁজ ক'রে লাভ কি বলতে পারেন? আপনার কথাতেই ত বোঝা যাচ্ছে সে অসুখে পড়ে নি, মারা যায় নি, বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ-কর্ম করছে। তা সত্ত্বেও নিজে থেকে যে নির্বিকারভাবে স'রে যায়, এই শহরে থেকেও যে দেখা হবার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় তাকে খুঁজে বার করবার জন্যে ব্যাকুল আমি হব কেন!

কেন? আশুবাবু আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আর কিছু না হোক তাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে। বিয়ে-করা স্ত্রীকে যে অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায় তার রীতিমত শাস্তি হওয়া উচিত।

শাস্তিই না হয় হ'ল, তাতে আমার কোন্ ক্ষতি-পূরণটা হবে! ব'লে শোভনা আর সেখানে বসতে পারলে না। উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপদে সোজা তার নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিলটা এঁটে দিলে।

কি বুঝে বলা যায় না, আশুবাবু সে রাত্রে অন্ততঃ তাকে আর ডাকতে আসেন নি।

ক্রমশঃ
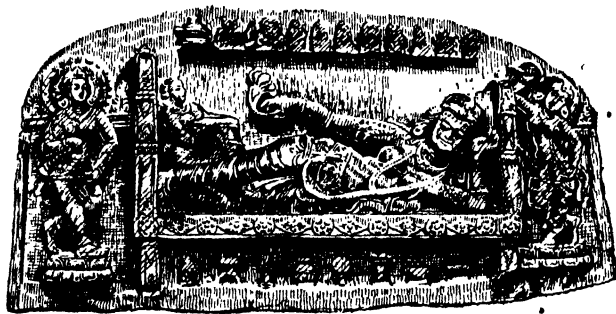
**মহামায়া**—(উপন্যাস) সীতা দেবী; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২, পৃঃ ৩১৭, মূল্য ছ' টাকা।

**ক্রৌঞ্চ-নিষাদ**—(উপন্যাস) অজিত দাশ, তিন-সঙ্গী প্রকাশনী, পি ৪৬, রায়পুর, কলিকাতা ৩২; পরিবেশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ, লিঃ, কলিকাতা ১২, পৃঃ ৩২০, দাম ছ' টাকা।

**মানুষের ছবি**—(উপন্যাস) সমীর মুখোপাধ্যায়, নিউ যুগের বাণী, কলিকাতা-৬, পৃঃ ২০০, দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

তিনখানা উপন্যাস একত্র আলোচনা করা একদিক্ থেকে যেমন দুঃসাধ্য, অন্যদিকে তেমন লাভজনক। সীতা দেবী কবে তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছিলেন বর্ত্তমান নতুন মুদ্রণে তার উল্লেখ নেই (এ একটি অবাঞ্ছিত ত্রুটি); কিন্তু এ উপন্যাস যে "আধুনিক" নয় তা ব'লে দেবার দরকার নেই। অজিত দাশ ও সমীর মুখোপাধ্যায় দুজনেই আধুনিক অর্থাৎ এ-কালের নতুন লেখক; অজিত দাশের গ্রন্থে যতখানি দৃষ্টি ও বর্ণনার পারিপাট্য আছে, সমীর মুখোপাধ্যায়ের বই-এ তা নেই। তথাপি এ তিনখানা উপন্যাস একসঙ্গে পড়লে বাংলা কথা-সাহিত্যের সাধারণ প্রসার ও প্রগতি সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন জাগে। সীতা দেবী-রা যে-যুগে গল্প-উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন তখন সমাজে যে সব পরিবর্ত্তনের গোড়াপত্তন হয়েছিল বর্ত্তমানকালে সেগুলি কেবল পাকাপোক্ত হয় নি, সেকালের "নতুন" একালে "পুরাতন" হ'য়ে গেছে। বর্ত্তমানকালের উপন্যাসিকদের কাছে জীবন দেখা দিয়েছে নবতর জটিল সমস্যা নিয়ে, যে-সব সমস্যার পূর্ণ অর্থ লেখকরা নিজেরাই সম্যক বুঝতে পারেন না। সেকাল ও একালের সাহিত্য, তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে, লেখকের পক্ষে একটি প্রধান মানে পৃথক। সেকালে ছাপার অক্ষরে লেখা সহজে প্রকাশিত হ'ত না, লেখকগণ অর্থ পেতেন যৎসামান্য, অনেক ক্ষেত্রে পেতেনই না। সুতরাং লেখায় এত আশ্চর্য্যরকম নিষ্ঠা ছিল তাঁদের; তাঁরা যা জানতেন না তা লিখতেন না। এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে, কম লিখতেন। একালে বই-এর চাহিদা বেশি, বাজারে প্রকাশকের অন্ত নেই, লেখকগণ সহজে বই ছাপতে পারেন, পয়সা পান। ফলে, সাহিত্যকর্ম্ম থেকে নিষ্ঠা বিদায় নিয়েছে, অতি-উৎপাদনের ফলে উৎপন্ন দ্রব্য দুর্ব্বল ও বিবর্ণ; বিষয়বস্তু, সমস্যা, সংঘাত ইত্যাদির সম্যক পরিচয়ের অভাবে সাহিত্য পঙ্গু। এমন কি ভাষার ব্যবহারেও আমাদের কালের লেখায় এমন স্বেচ্ছাচারিতা বিশৃঙ্খলা ও যত্নের অভাব,—যা মার্জ্জিত রুচি, ব্যাকরণ সচেতন পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

সীতা দেবীর "মহামায়া" উপন্যাসের কাহিনী সুগঠিত, সুবিন্যস্ত, সুলিখিত। ধর্ম্মান্ধ গোঁড়ামি ও উদারপন্থী আধুনিকতার সংঘাত হ'ল কাহিনীর অন্তঃপ্রবাহী আইডিয়া। আমাদের এ কালের বুদ্ধিকে তা বিশেষ স্পর্শ করে না, যদিও এ সংঘাত সমাজে এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু উপন্যাস একমাত্র গল্প বলার জোরে কতখানি সুখপাঠ্য হ'তে পারে, আলোচ্য গ্রন্থখানি তার একটি পূর্ণ নিদর্শন। নিরঞ্জন ও সাবিত্রীর সংঘাত দুই ধর্ম্মের সংঘাত নয়, দুই কৃষ্টির; এ সংঘাতের বিন্যাস-বুদ্ধিকে সজাগ না করলেও মন ভ'রে দেয়, এবং তথাকথিত বিদগ্ধ পাঠকেরও রসগ্রহণ সম্ভব করে। মহামায়া নিরঞ্জন-সাবিত্রীর একমাত্র সন্তান। পিতৃপরিত্যক্ত গোঁড়া হিন্দু দুঃখিনী-জননীর প্রভাবে প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত উপনীত হ'য়ে সে উদার পশ্চিম-পন্থী রেঙ্গুন-প্রবাসী পিতার একমাত্র অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়াল এবং স্ত্রীসুলভ চতুরতার সঙ্গে অনায়াসে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিল। এ বিবর্ত্তন সীতা দেবী নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। নব-বিধানের মহামায়া পূর্ণ বিকসিত হ'ল প্রেমের স্পর্শে। কিন্তু সচেতন মানসের পুরাতন মাতৃপ্রভাব ও নব-উন্মেষিত অসবর্ণ প্রেম, এ দু'এর কঠিন সংঘাতে একদিন সে সংজ্ঞা হারাল, এবং চেতনা ফিরে পেলে দেখা গেল তার "আধুনিক" জীবনের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন, সাময়িকভাবে সে আবার "পুরাতনে" ফিরে গেল। অবশ্য এ ব্যাধি তার বেশিদিন রইল না। অল্পদিন পরে সে লুপ্ত স্মৃতি ফিরে পেল। তখন দয়িতের সঙ্গে মিলনে আর কোনও বাধা রইল না।

সীতা দেবীর ভাষা সাবলীল, সুখবহ, অনাড়ম্বর, বাহুল্যবর্জ্জিত। তিনি জানেন কি তাঁর প্রতিপাদ্য, কি তাঁর বক্তব্য; তিনি ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন তাঁর চরিত্রগুলিকে, জানেন তাদের সমস্যা ও সংঘাত। পশ্চিম-বঙ্গের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তথাপি এ উপন্যাসে কয়েকটি ত্রুটি রয়ে গেছে, আমার মতে, যা অনায়াসে দূর করা যেত। প্রথমতঃ মহামায়ার মুখে প্রেমালাপ অত্যন্ত বে-সুরো, ভারিক্কী, এককথায় "পাকা" যেখানে আমরা কোমল, মধুর, স্নিগ্ধ, "লাজুক, রোমাঞ্চিত কথোপকথন আশা করেছিলাম, সেখানে পেলাম: "ও জিনিষ কি আর শেষ হয়ে যায়? আমাদের ছোটবেলার পড়া ছড়ার মত ভালবাসা এমনই জিনিষ যা, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" প্রকৃতপক্ষে ৩০৭ হতে ৩১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মহামায়া ও দেবকুমারের বাক্যালাপ আরও কোমল, স্নিগ্ধ, অব্যক্ত হতে পারত। মহামায়ার স্মৃতিলোপ দুর্ঘটনাটা মেনে নিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু তার গোঁড়ামিতে

পদাবতন ও প্রভাসকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ব্যাপারটাও আমার মনে হয় আর একটু নরম পর্দায় রাখলে অধিকতর পঠনমধুর হ'ত। নবক্রন রেঙ্গুনে ব্যবসা ক'রে ধনী হয়েছিল। উপন্যাসের অনেকখানি রেঙ্গুন-কেন্দ্রিক হলেও বর্ম্মা দেশের যেমন বিশেষ নামগন্ধ নেই তেমনি বর্ম্মীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাসূচক একটা কথাও নেই। আসলে উপন্যাসের রেঙ্গুনকে ভিন্নদেশ ব'লে জানবার উপায় নেই। এ দোষে সেকালে অনেকেই দোষী ছিলেন, এমন কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্য্যন্ত।

কিন্তু এগুলো হবে বিস্তারিত আলোচনা। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "মহামায়া" বহু আগের লেখা হলেও বর্তমানকালের অনেক উপন্যাস থেকে অধিকতর সুখপাঠ্য। যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, নৈপুণ্য নিয়ে এ উপন্যাস রচিত হয়েছে আজকালকার নামী লেখকদের রচনাতে সর্ব্বদা তা দৃষ্ট হয় না।

"ক্রৌঞ্চ-নিষাদে"র আখ্যানভাগ একেবারে একালের, এবং লেখক শ্রীঅজিত দাশ সমসাময়িক জীবনের অন্যতম জটিল ও প্রধান সমস্যাকে উপন্যাসে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টার জন্যে ধন্যবাদার্হ। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে দুর্ভাগ্য-বিতাড়িত একদল উদ্বাস্তু নদীয়া জেলার বন্দীপুর গ্রামে নতুন কলোনী ক'রে ভাঙ্গা জীবনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে, এই হ'ল উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। ছিন্নমূল মানুষ আবার বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করে জীবনকে গুছিয়ে নেবে, এই জীবন সংগ্রাম আমাদের চোখের ওপর ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, অথচ এত বড় মহাকাব্যিক সংঘাত এখনও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বলিষ্ঠ কোনও রূপ পায় নি। উদ্বাস্তু-জীবনের গলিত-চরিত্র অবশ্য আমরা নর্দ্দমার পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যে টেনে এনেছি, কিন্তু তার নীরব আস্ফালনহীন যুদ্ধজয়ের কাহিনী আমাদের মর্ম্মে পৌছয় নি। নুট হামসুনের Growth of the Soil-এর মত মহান্ উপন্যাস রচিত হবার সম্ভাবনা নীরবে অবসিত হয়েছে। অজিত দাশের উপন্যাস প'ড়ে আমার মনে হ'ল, তিনি তাঁর কাহিনীর মূল পথ থেকে বড় নিষ্ঠুর ভাবে স'রে গিয়েছেন, এবং সে জন্যেই এ উপন্যাস সুখপাঠ্য হলেও কালোত্তীর্ণ হ'তে পারে নি। তাঁর কাহিনীর আসল চরিত্র যারা, সেই উদ্বাস্তুরা বড় নিস্প্রাণ; উপন্যাসে তাদের জীবন-সংগ্রামের চিত্র বড় দুর্ব্বল, তারা অত্যন্ত অসহায়, তাদের জীবন-তৃষ্ণা বড় ক্ষীণ, তারা অতি সহজে দুষ্ট মানুষের হাতের পুতুল, লোভের শিকার। তাদের পুনর্ব্বাসনের ভার যার ওপর সেই যুবক ছেলে সুকুমারও কেমন নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, সংগ্রাম-বিমুখ অর্থাৎ অবক্ষয়ের দিকেই গ্রন্থকারের মন প'ড়ে আছে। পুনর্গঠনের গম্ভীর সৃজনশীল চেহারা তাঁর মনে জেগে ওঠে নি। সে কারণে উপন্যাসের রামবাবু একটি অনবদ্য সৃষ্টি। গ্রামের এই নতুন জাতের ধনী আজকার ভারতবর্ষে যেমন বাস্তব তেমনি ভয়ঙ্কর। সরকারী প্রচেষ্টায় গ্রাম-কল্যাণের সারটুকু এরা চুষে নেয়, সবকিছুতে এদের মতলববাজী, এবং এরাই নতুন গ্রামীণ ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ। রামবাবু চরিত্রকে রসোত্তীর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ কলমে ফুটিয়ে তোলার সার্থক ক্ষমতা অজিত দাশ সম্বন্ধে বিস্তর আশা জাগায়। কিন্তু সংগে সংগে তাঁকে সতর্ক করতে হয় যে, তাঁর হাতের নারী চরিত্র এখনও অপরিপক্ব, অতি-নাটকীয়। এ উপন্যাসের একটি স্ত্রী-চরিত্রও মনে রেখাপাত করে না, প্রত্যেকটিকেই অলীক ও অবাস্তব মনে হয়। ভবিষ্যৎ উপন্যাস-রচনে অজিত দাশকে অবশ্য এ বিষয় অবহিত হতে বলব। তাঁর ভাষা ঋজু ও সাবলীল। বক্তব্য পরিষ্কার। নিশ্চয় সুলেখক হবার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু নারীচরিত্রের সঙ্গে হয় তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় সীমিত নয়ত তিনি ইচ্ছে করে স্টাণ্ট-এর আশ্রয় নিয়েছেন। উভয়ক্ষেত্রেই পরিহার্য্য।

আগেই বলেছি, এ উপন্যাসে অনেকখানি সৃষ্টিশীলতা আছে যা পাঠকের মনে রেখাপাত করবে।

প্রকাশকদের অনুরোধ, উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁরা যথাসম্ভব কম বিশেষণ ব্যবহার করবেন। বস্তুতপক্ষে প্রকাশকদের "বক্তব্য" এ গ্রন্থের দুর্ব্বলতম বিজ্ঞাপন। পরবর্ত্তী সংস্করণে এটা বাদ দিলে রুচিবান পাঠকরা, অনুমান করি, সন্তুষ্ট হবেন।

সমীর মুখোপাধ্যায়ের "মানুষের মন" নিয়ে আলোচনা করা সহজ নয়। একটি পঙ্গু, ক্লীব পুরুষকে নিয়ে লেখা এ কাহিনী। আশেপাশের সবাই হয় অত্যন্ত নোংরা নয় অস্বাভাবিক। লেখক তাঁর (অনুমান করি) প্রথম উপন্যাসের উপাদানের জন্য এমন শ্রীহীন বিকৃত চরিত্রের আশ্রয় নিলেন কেন বোঝা কঠিন। এরই মধ্যে বুড়ো মাষ্টার, রাধা, সুবোধের মা এবং তার যুবতী স্ত্রীর চরিত্র-অঙ্কনে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সমীর মুখোপাধ্যায়ের ভাষা তাঁর সাহিত্যের প্রধান অন্তরায়। যে রচনা-শৈলী তিনি গ্রহণ করেছেন, তা রপ্ত করতে হলে যতটা ভাষাজ্ঞান দরকার তা তাঁর আছে বলে মনে হ'ল না। উপন্যাসে যে কেবল বহু বানান ভুল রয়ে গেছে তা নয়, অনেক বাক্য আছে যার কোনও অর্থ হয় না। যেমন "সেই গভীর অন্ধকারের সবাক নিঃশব্দতায় অগণিত হাত দেখতে পাওয়া গেল জলে ধূসর হাওয়ায়" (পৃঃ ৫৩)। এমন অনেক আছে। তাঁর বাক্য-বিন্যাস উপন্যাসের উপযোগী নয়। যেমন:

[ হলুদ বিকেল।

[ দুপাশে তখনো রূপের শোভা।

[ পুকুর। টাবুটুবু জল তাতে।

[ এখানে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা।

[ তাই গাছপালাগুলো ভারী সতেজ আর সবুজ সবুজ।

[ কতো বাঁশঝাড়। তার ভেতর দিয়ে বাতাসের আনাগোনা

[ পাখী। তার পাখার শব্দ। তার ওড়াওড়ি।

[ কাঁচা মাটির গন্ধ।

[ মধুর মধুর। (পৃঃ ৯৩),

এ আবেগোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সায় দিতে না পারার জন্যে মার্জ্জনা চাইছি।

চানক্য সেন

**শ্রীশ্রীনিবাস চরিতামৃত**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসগুপ্ত। শ্রীনবনীরদ দাশগুপ্ত কর্তৃক নূতনগঞ্জ, বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত, পত্রাঙ্ক ২৪৩, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাশগুপ্ত প্রণীত শ্রীশ্রীনিবাস চরিতামৃত গ্রন্থখানি যে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাহারা গল্প, উপন্যাস, কাব্য ছাড়া অন্য কিছুকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহা যে নিতান্ত ভুল ধারণা তাহা আশা করি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মনে পড়ে, একবার কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক কলিকাতায় আসিয়া বাংলা দেশের সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিচয়লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে কোন বিশিষ্ট প্রকাশকের দক্ষিণ কলিকাতাস্থ বাস-ভবনে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করা হয়। পরিচয় গ্রহণের সময়ে যখন উক্ত পাশ্চাত্য লেখক জানিতে পারিলেন, বাংলা দেশে যাহারা শুধু গল্প, উপন্যাস, কাব্য লিখিয়াছেন তাঁহারাই সাহিত্যিক নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সে কি! এই বাংলা দেশে যাহারা ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, ধর্ম্ম, সংবাদ, মহাপুরুষজীবন প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করেন ও লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহাকেও এখানে আমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন? তাঁহারা কি এ দেশে সাহিত্যিকরূপে গণ্য ন'ন?" এই প্রশ্নের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল, তাহাতেই পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যের পরিধি কত বিস্তৃত, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

কথাটা বলিলাম এইজন্য যে, আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক ও বহু তথ্যপূর্ণ। ইহার সাহিত্যমূল্য যে অনস্বীকার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখকের বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিতে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার স্থলবিশেষে তাৎপর্য্যমূলক আলোচনা ও সুসঙ্গত উদ্ধৃতি সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। যাহাতে সকলে "আচার্য্য প্রভুর অনুপম লীলামাধুরী আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি" লাভ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্য লইয়াই লেখক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সে উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে ইহা অকুণ্ঠভাবে বলা চলে।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

**ফা-হিয়েনের দেখা ভারত**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ফার্ম্মা কে, এল্, মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা ১২, মূল্য ৩৲ পৃষ্ঠা ৮৩।

প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত অভিমুখে স্থলপথে তাহার তীর্থযাত্রা সুরু করেন। মধ্য এশিয়ার দুর্গম পথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বিবরণীতে খোটান, খালজ, পামীর ওদর্দ, গান্ধার, তক্ষশীলা, পুরুষপুর, নগরহার রাজ্য, মথুরা, কান্যকুব্জ, শ্রীবস্তী, কপিলাবস্তু, লুম্বিনী, বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির সমসাময়িক অবস্থা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাম্রলিপ্ত হইতে তিনি সিংহলে যান এবং সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া যবদ্বীপের পথে স্বদেশে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে পদার্পণ করেন। জলপথে দুইবার তিনি যে সামুদ্রিক প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়িয়াছিলেন উহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের অমর কাহিনী পড়িলে যে কোন ভারতবাসী গৌরব অনুভব করিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদ-গ্রন্থের একটা সুন্দর মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা সরল, সাবলীল ও সুখপাঠ্য। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এই পুস্তক রাখা প্রয়োজন। উপন্যাসের মতই এরূপ গ্রন্থ জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

**বঙ্গ সংস্কৃতির রূপরেখা**—বিনয় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২৲ পৃষ্ঠা ৭৭।

লেখক অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক পত্র 'সংস্কৃতি'তে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ইংরেজ কর্ত্তৃক পলাসী বিজয়ের পর হইতে বাংলার সমাজে ও বাঙ্গালী চরিত্রে যে বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে অর্থাৎ রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ— প্রায় এই দুই শত বৎসরের সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন এই আলোচনার বিষয়বস্তু। পর পর রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯২৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জাতীয় সংস্কৃতিতে দান বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। অন্যান্য মনীষীগণের কার্য্যাবলী খুব সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।

সরল, সুন্দর আবেগময়ী ভাষায় এই পুস্তকখানি জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

**সমন্বয় মার্গ**—শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·৫০ টাকা।

কেশবচন্দ্র যে নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, এক কথায় তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করাই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থখানিকে সংক্ষেপে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকাশ ও গতি, নববিধানের পথে বৌদ্ধধর্ম্ম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমন্বয়-সাধনা, নববিধান সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম।

এই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কেশবচন্দ্রের মনে অনেকখানি ক্রিয়া করিয়াছে। যাহার ফলে কোন সংকীর্ণতাই তাঁহার মনে স্থানলাভ করে নাই। একথা অতীব সত্য, পূর্ণধর্ম লাভের উদ্দেশেই কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সমন্বয় কি? সর্বধর্মের সমন্বয়-সাধন। বিভিন্ন ধর্ম ও তাহার বিভিন্ন পথ লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া, ঐতিহাসিক অনেক তথ্য তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, কি ধর্মে, কি সমাজে, কি লৌকিক আচার-আচরণে অনেক কু-সংস্কার রহিয়া গিয়াছে। সেইগুলি দূর করিয়া যাহা সত্য, তাহারই সাধনায় তিনি নিজেও যেমন জীবন উৎসর্গ করেন, অপরকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ না করিলে তাঁহার বিপ্লবী-মনের পরিচয় পাইব না। তিনি বলিয়াছেন, "কেশবচন্দ্রের জীবনে অনেকগুলি বিভিন্ন ধারা এসে মিলিত হয়েছিল। সেগুলি তাঁর জীবনের বাইরে দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে, প্রেরণার আকারে তাঁর সজীব মনে সমন্বয়ের ধারায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর পিতৃকুল বৈষ্ণব, মাতৃকুল শাক্ত। তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন কলিকাতা সহরে, পাশ্চাত্ত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে, ইংরাজ অধ্যাপক এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কাছে। তাঁর পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন ছিলেন রক্ষণশীল, অথচ এদেশীয় এবং বিদেশীয় বিদ্বজ্জনের মিলনস্থল। নূতনের আহ্বান কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর আকর্ষণ করে আনে। সেখানে তিনি রাজা রামমোহনের ইস্‌লামিক ভাব এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবের সংস্পর্শে আসেন। ...ব্রাহ্মসমাজের সংস্কৃত ব্রহ্মোপাসনা, সংস্কৃত জীবন ও মহর্ষির ব্যক্তিত্ব নিয়েই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে অগ্রসর হন। সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যব্রত, প্রচারের কাজ, জনসেবা ও শিক্ষার উন্নতিসাধনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে এবং নারীজাতির ভিতর শিক্ষার ও ব্রহ্মোপাসনার প্রভাব বিস্তার করার কাজেও অগ্রসর হন। ...কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রেও নীতির প্রভাব বিস্তার করলেন। রাজা রামমোহনের জ্ঞানে যুক্তিবিচারের বিকাশ হয়; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ে অধ্যাত্ম জীবনকে সহজ করে; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিশ্বাস-বিবেক-বৈরাগ্যে-গড়া নূতন নীতির পথ দেখালেন। ...নীতির সঙ্গে সঙ্গে, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, উদার সার্বভৌমিকতা এবং বিশ্বপ্রেম স্বতই অধিকার বিস্তার করলো। ধর্মের বহিরঙ্গ ছেড়ে অন্তরঙ্গ সাধন আরম্ভ হ'ল। সম্প্রদায়, মন্দির, তীর্থ, শাস্ত্র ও ধর্মমত হাট হয়ে গেল; বিশ্বই মন্দির দাঁড়াল, চিত্তই তীর্থ হ'ল। সত্যই এবং বিশ্বাসই সমস্ত সাধনার মূল; প্রীতি ও স্বার্থনাশের দ্বারা লিত হয়ে সকল সাধন ও সকল কার্য করাই তাঁদের পথ হ'ল। সমাজের জীবনে, ভিতর থেকে, এই প্রথম বিপ্লব দেখা দিল।"

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যেখানে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের স্রষ্টা সেখানে কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করিলেন কেন? কারণ, তাঁহাদের ধর্মনীতি ঔপনিষদিক পরিধির ভিতর আবদ্ধ ছিল, কেশবচন্দ্র সেই অর্গল খুলিয়া দিলেন। বৌদ্ধধর্ম হইতে যে নীতি কেশবচন্দ্র আহৃত করিয়াছেন তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ভিত্তি করিলেন। 'কেবল প্রকৃতির ভিতর বা ইতিহাসের ভিতর বা সাধুদের জীবনের ভিতর সমন্বয় নয়, স্ব স্ব আত্মার ক্রিয়ার ভিতর যোগ, ভক্তি, কর্ম; জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা; বৈরাগ্য প্রেম, পুণ্য; নির্বাণ, প্রেম, বাধ্যতার ভিতর কেশবচন্দ্র সমন্বয় দর্শন ও সাধন করেন।'

একটা সুগভীর প্রত্যয় ও সক্রিয় ধর্ম-চেতনা ছিল কেশবচন্দ্রের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে। কর্ম-প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রগাঢ় ধর্মবোধের সমন্বয়ে তিনি গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন একটি বলিষ্ঠ সংস্কৃতি। পৃথিবীর সকল ধর্মমতের ভিতর যে শাশ্বত সত্য আছে, সেই সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্ব-জীবনে গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ অনুপ্রাণিত করিল কেশবকে 'নব বিধান' পরিকল্পনায় ও তার প্রচারে। কেশবচন্দ্র আশা করিয়াছিলেন, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক—অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনের ভিত্তিতে রচিত এই উদার ধর্ম ভারতবাসীর পক্ষে হইবে পরম কল্যাণকর। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসী নিজের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সীমাকে অতিক্রম করিয়া ব্যাপকভাবে এ উদার ধর্মমত গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে, লেখক এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের দিকদর্শন করাইয়াছেন। কেশবচন্দ্রের জীবনী অনেক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ধর্মাচরণের মর্মকথা এমনভাবে আর কেহ শোনান নাই। সুতরাং সেদিক দিয়া এই গ্রন্থটি মূল্যবান। ইহার প্রচার বাঞ্ছনীয়।

গৌতম সেন

**স্বপ্ন যমুনা**—ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

স্বপ্ন যমুনা ভ্রমণ-কাহিনী নয় ইহা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আরও স্বীকার করিয়াছেন তিনি অবসর-বিনোদনের জন্য মধ্যে মধ্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান। এমনি করিয়া তিনি একদা গভীর অরণ্যে গিয়া পড়েন এবং সেই বন-মধ্যে এক বাড়ীতে আশ্রয় ল'ন। সেইখানে এক পঙ্গু বালিকার সাক্ষাৎ পান, পরে যাহার সহিত পরিচয় হইল সে বৃন্দাবন। এ বৃন্দাবন কে এবং কেনই-বা এই গভীর অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে, তাহারই কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। বৃন্দাবনই তাহার কাহিনী বলিয়া যাইতেছে। সমগ্র কাহিনীটিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এক আরণ্যক পরিবেশ। বৃন্দাবনও অরণ্যের মানুষ, তাই এমন করিয়া সে আপন কাহিনী বলিতে পারিয়াছে। এই উপন্যাসের তিনটি প্রধান চরিত্র। সে নিজে এবং তাহার স্ত্রী যমুনা ও আফ্রিকী সাহেব। কালো হইয়াও যমুনা আফ্রিকী সাহেবের মন জয় করিয়াছিল।

এই মন জয় করাই হইল কাল। আফ্রিকী সাহেবকে জয় করিবার নেশাই যমুনাকে পাইয়া বসিয়াছিল, প্রেমান্ধ হইয়া সে এরূপ কার্য করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ বৃন্দাবনকে ত্যাগ করিবার কল্পনা সে কোন দিনই করে নাই। বৃন্দাবনের অবস্থা? তাহার নিজের কথাতেই বলি, "যা হয়ে দাঁড়াল তা সসেমিরার মত, গিলে ফেলতেও পারি না, উগরে ফেলতেও পারি না। যমনাকে আমি ধরে রাখতেও পারি না, ছেড়ে দিতেও পারি না। বাঁধতেও পারি না, বাঁধন খুলতেও পারি না।"

বৃন্দাবনের এই একটি কথাতেই তাহার প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

ইহার পর তিনজনের প্রেমের সংঘর্ষ গ্রন্থকার যেরূপ নিপুণ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা খুব সিদ্ধহস্ত না হইলে সম্ভব হইত না। পশুপতিবাবুর লেখার এই বৈশিষ্ট্যই পাঠককে আকর্ষণ করে। চমৎকার তাঁহার লেখার সহজ সরল ভঙ্গিটি। গল্প বলিতে জানা লেখকের সব চাইতে বড় গুণ। এই গুণ তাঁহার আছে বলিয়াই চরিত্রহীনা যমুনাকে কাহারও ভাল না লাগিয়া উপায় নাই।

একটি পঙ্গু কন্যা রাখিয়া যমুনা মরিয়াছে। আফ্রিকী সাহেবও চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যমুনার স্বপ্ন লইয়া বৃন্দাবন এই বাড়ীতে পড়িয়া আছে। পঙ্গু কন্যা তাহার নয় জানিয়াও, শুধু যমুনার দান বলিয়া তাহাকে লালন করিতেছে।

একটি সুন্দর গল্প লেখক পরিবেশন করিয়াছেন। আজকাল যাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থের নামকরণও সুন্দর হইয়াছে। এরূপ একখানি ভাল বই নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করিবে।

শিক্ষাবিচিত্রা—শ্রীঅখিলরঞ্জন রায়। প্রকাশক ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৫, মূল্য ৪.৫০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধের সংকলন। উনিশটি বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ পুস্তকখানি সুলিখিত। আলোচনার অপূর্ণতা স্বীকার করিয়া লইলেও এটুকু অসংশয়ে বলা যায় যে, বিভিন্ন আলোচনায় প্রধান শিক্ষাবিদের সুদীর্ঘ মননের ছাপ রহিয়াছে। আলোচনা কখন কখন দার্শনিকজনসুলভ প্রত্যক্ষ চিন্তায় বিশেষ অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে আবার কখন বা প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদের সুচিরসঞ্চিত অভিজ্ঞতা শিক্ষাসমস্যার আলোচনায় নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষাযুগের দুই প্রাপ্ত পুরুষ' সুলিখিত প্রবন্ধ। মনস্বী দার্শনিক প্লেতো ও শিক্ষাচার্য জন ডিউঈ। উভয়ের শিক্ষাদর্শনই সমস্যা-কণ্টকিত এ যুগে পরম প্রণিধানের বস্তু। প্লেতো নানান সমস্যার আলোচনায় যে দূরদর্শন ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় তাঁহার অসংখ্য রচনায় রাখিয়া গিয়াছেন তাহার যতই আলোচনা হইবে, আমাদের সামগ্রিক কল্যাণ ততই বর্দ্ধিত হইবে। প্লেতো লিখিত মহাগ্রন্থ Republic-এর এক-পঞ্চমাংশ হইল শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা। গ্রন্থকার পাশ্চাত্ত্য দর্শনের জনক মহামতি প্লেতো ও নব্য শিক্ষাদার্শনিক জন ডিউঈর শিক্ষাদর্শনের যে ব্যাপক আলোচন করিয়াছেন তাহা সত্যই হৃদয়গ্রাহী।

মানুষের মন বিচিত্রধর্মী। বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, এ সকলই মনকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে। সে মন কখন বা শিশুমন আবার কখন বা তাহা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আপাতঃ পরিণত মন। এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী বয়ঃপর্যায়ের মনঃপর্যায়ও অসংখ্য। এই সংখ্যাহীন বিভিন্ন প্রবণতা-সমৃদ্ধ মনকে শিক্ষিত করিবার সমস্যাই শিক্ষাবিদের সমস্যা। সমুদ্রের জলরাশি পরিমাণ করা যেমন দুঃসাধ্য, মানুষের মানবধর্মিতার সম্যক পরিচয় লাভ করাও তেমনি সাধ্যাতীত। শিক্ষা এই মনকে জানিবার প্রয়াস পায়। এই মনের প্রবৃত্তির প্রাবল্যকে সে সীমিত করিতে চাহে, তাহার আন্তর শক্তির সীমাহীন ঐশ্বর্যটুকুকে প্রভাবিত করিতে চাহে বিশ্ববাসীর নিকটে। কেমন করিয়া ব্যক্তি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিব, কোন পথে সমাজ এবং স্বজনের সহিত মিলনের সেতুবন্ধ করিব, কেমন করিয়া আত্মস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্ব-জনীনতাকে সম্মিলিত করিব—এই সবই হইল শিক্ষাসমস্যার কথা। আর এই শিক্ষাসমস্যার সমাধান যদি কোন ভাবে একবার সঙ্ঘটিত করা যায় তাহা হইলে সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক সমস্যাই সমাধান করা যাইবে। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার মানুষের শিক্ষা সমস্যার এই মৌল রূপটুকু অন্তরে ধারণ করিয়া শিক্ষা ও মনের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধটুকু নিরূপণ করার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'শিক্ষা ও মনের মুক্তি', 'শিক্ষা সৃজনধর্মী', 'শিক্ষা ও অবসর', 'শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য', 'সর্বজনীন শিক্ষার তাগিদ', 'শিক্ষক ও সমাজ' প্রমুখ প্রবন্ধগুলির প্রতি বৌদ্ধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

পরিশেষে একটি কথা নিবেদন না করিয়া পারি না। আলোচ্য গ্রন্থে 'কাব্যে আধুনিকতার আস্বাদ' প্রমুখ দু'একটি প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না করিলেই ভালো হইত। গ্রন্থের মূল বক্তব্যের সহিত এই ধরণের প্রবন্ধগুলির কোন সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হয় না। জানি না ইহার জন্য গ্রন্থকার অথবা প্রকাশক কাহাকে দায়ী করিব? গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ও গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধির দিকে প্রকাশক দৃষ্টি দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু গ্রন্থকার পুস্তকের আত্যন্তিক মূল্যায়নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরবর্তী সংস্করণে অপ্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলি বর্জন করিলে পুস্তকখানির মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই মনে করি।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬৮

৬ষ্ঠ সংখ্যা

# বিবিধ প্রসঙ্গ

## খড়্গপুরে ডাঃ জাকির হোসেনের ভাষণ

বিগত শনিবার ২৬শে ফাল্গুন খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির সমাবর্ত্তন সভায় বিহার রাজ্যপাল ডাঃ জাকির হোসেন যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। উহা প্রণিধানযোগ্য দুই কারণে। প্রথমতঃ, ডাঃ হোসেন অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা শুধু দীর্ঘদিনের নয় উহা বিস্তৃতক্ষেত্রে প্রসারিতও ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার চিন্তা কেবলমাত্র সূক্ষ্ম ও অমূর্ত্ত বিদ্যা ও জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, উহার লক্ষ্য ছিল মানবত্বের দিকে। এই দুই কারণে তিনি ঐ ভাষণে বিজ্ঞান ও তাহার প্রয়োগের যে বর্ত্তমান চিত্র দিয়াছেন তাহা সত্য ও বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন। 'যুগান্তর' ঐ ভাষণের যে সারাংশ দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

"ডাঃ জাকির হোসেন বলেন যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে বিকৃতির ফলে গত কয়েক শতাব্দীতে অন্তহীন ভাবে ব্যক্তিগত মুনাফা সংগ্রহই অর্থনৈতিক প্রয়াসের মূল লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানের যুক্তি-ভিত্তিক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও গতিশীল প্রয়োগবিদ্যা সেই বিকৃতিকেই সহায়তা করিয়াছে।

"তিনি বলেন যে, এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল প্রয়োগ-বিদ্যা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জ্জনের ব্যাপারে প্রতিযোগিদের পরাভূত করিতে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের সহায়তা করিয়াছে এবং অতিরিক্ত মুনাফা অর্জ্জনই এই প্রতি-যোগিতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কথা। আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রয়োগবিদ্যা, এই দুই যমজ ভগ্নী-নীতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়া নিরপেক্ষ ; ভাল-মন্দ, বাঞ্ছনীয়-অবাঞ্ছনীয় সকল প্রকার কাজেই ইহাদের নিয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা শিল্পপতিদের মুনাফা অর্জ্জনের অন্তহীন লালসারই সহায়ক হইয়াছে এবং ইহার ফলে অকথ্য শোষণ চলিতেছে। ইহাই কি চলিতে থাকিবে ?"

ডাঃ হোসেন বলেন, "আমরা এই দেশে ন্যায়সম্মত, স্বাধীন ও সুষ্ঠু জাতীয়-জীবন গড়িয়া তোলার পথে অগ্রসর হইতেছি। প্রয়োগবিদ্যা শুধু লক্ষ্যহীন ভাবে একাধারে সমাজের ক্ষতিকর ও সমাজের প্রয়োজনীয়, কু ও সু উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে থাকুক, ইহা আমরা হইতে দিতে পারি না। ভবিষ্যতে সমাজ-তান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে প্রয়োগবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্য সম্পর্কে সম্ভবতঃ বাধানিষেধ আরোপের প্রয়োজন হইবে। জনগণের ধর্ম্মীয়, সামরিক ও রাজনৈতিক জীবন তাহাদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, তাহাদের শিল্প, শিক্ষা ও বিজ্ঞান এবং তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই গবেষণার কি ফলাফল দেখা দিবে সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না।"

এই ভাষণের অন্য বিবরণে আমরা একথাও পাই যে, ডাঃ জাকির হোসেন বিজ্ঞান ও তাহার প্রয়োগবিদ্যার ফলাফল সম্পর্কে বর্ত্তমানে তাহার জনকল্যাণবিমুখী গতির দিকে দৃষ্টি এই ভাবে আকর্ষণ করিয়া বলেন যে,

এই সকল বিজ্ঞান প্রয়োগবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রদের প্রয়োগবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ সম্পর্কে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাদের মনে হয় যে, এই প্রস্তাব অত্যন্ত সমীচীন।

## রাষ্ট্রপতির বিদায়ভাষণ

বিগত ২৮শে ফাল্গুন দিল্লীর সংসদভবনে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার বিদায়ী ভাষণ দিয়াছেন। আর দুই মাস পরে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবসর গ্রহণ করিবেন। তাহার পূর্ব্বে নূতন নির্ব্বাচনের পরের সংসদের যুক্ত অধিবেশনে উদ্বোধন ভাষণ দিবেন।

এবারের ভাষণে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিদায় সম্ভাষণ ও নির্ব্বাচনে বিফলকাম সদস্যগণকে আশ্বাস ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ও অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়। তবে পররাষ্ট্র ব্যাপারে ভারতীয় নীতি জ্ঞাপন ছাড়াও এবার কয়েকটি বিষয় রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্থান পাইয়াছে। দেশের অগ্রগতি সম্পর্কেও রাষ্ট্রপতির ভাষণে এইবার আত্মসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্কীকরণ রহিয়াছে। মোটের উপর বুঝা যায় যে, দেশের অবস্থা সম্পর্কে রাজেন্দ্রবাবুর মতে, সাবধান ও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পররাষ্ট্র সম্পর্কে রাজেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার 'যুগান্তর' দিয়াছেন নিম্নরূপে :

"ডাঃ প্রসাদ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ভারত চীনকে তাহার আক্রমণাত্মক নীতি বর্জ্জন করিতে এবং পুরাপুরি পঞ্চশীল মানিয়া চলিয়া শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া ফিরাইয়া আনিতে আহ্বান করিয়াছে।

তিব্বত সম্পর্কে ১৯৫৪ সনের চীন-ভারত চুক্তির স্থলে নূতন চুক্তির আলোচনা চালাইতে চীন সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, রাষ্ট্রপতি সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনোভাবের পুনরুল্লেখ করেন। তবে নূতন চুক্তির জন্য আলোচনা আরম্ভ করিতে চীনের যে অনুরোধপত্র তিন দিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, তিনি স্পষ্টতর তাহার উল্লেখ করেন নাই।

ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন যে, পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধবর্জ্জন করার জন্য ভারত বারংবার প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্থান সৈন্যাপসারণের জন্য ভারতের সহিত যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পালন করে নাই, যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করে নাই। কিংবা কাশ্মীরের ভিতরে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপে সাহায্য দানে বিরতও হয় নাই। তাহার উপর কাশ্মীর সম্বন্ধে বিতর্ক ঘটাইবার জন্য আবার স্বস্তি পরিষদের দ্বারস্থ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সপ্তাহে জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে যে আলোচনা আরম্ভ হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহার ফল শুভ হইবে বলিয়া আশা করেন। ভারত ১৮ সদস্যযুক্ত নিরস্ত্রীকরণ কমিটির একজন প্রতিনিধি।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, পৃথিবীতে উত্তেজনা হ্রাসের জন্য যত দিক দিয়া সম্ভব, ভারত সরকার চেষ্টা করিবেন। বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এই আলোচনার ফলে একদিন পৃথিবী যুদ্ধবর্জ্জিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

কঙ্গো সম্পর্কে তিনি বলেন যে, স্বীয় প্রয়োজনে ভারত যদিও কঙ্গো হইতে সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছুক তবুও সরকার মনে করেন যে, যে উদ্দেশ্যে ভারত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল তাহা অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। তবে কঙ্গো লইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচয় দেখা দেওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি আশা করেন যে, স্বাধীন আলজিরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ত্তমান ফরাসী-আলজিরীয় আলোচনা সফল হইবে।

গোয়ার মুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কোন কোন দেশ ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের কার্য্যের নিন্দা করিলেও বাকী সকলেই ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে।"

চীন সরকারকে ভারত যে শান্তিপূর্ণ পথে বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতির সমাধান করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, চীন যে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এই সংবাদ পরে প্রকাশিত হইয়াছে। পাকিস্থান পুনর্ব্বার স্বস্তি-পরিষদে কাশ্মীর বিতর্ক তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিবেশী এই দুই রাষ্ট্রেই জনমতের কোনও মূল্য নাই। চীনকে পরিচালনা করিতেছে একদল অতি ক্রূর প্রকৃতির রাজনীতিবিদ্, যাঁহারা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা বা পঞ্চশীল ইত্যাদি ভূয়া কথার কোনই মূল্য কখন দেন নাই, ন্যায়, নীতি, ধর্ম্ম, ইত্যাদি প্রাচীন কুসংস্কারের উপরেও তাঁহাদের কোনও আস্থা কোনও দিন ছিল এই অপবাদ কখনও শোনা যায় নাই। সুতরাং ইহাদের সঙ্গে আপোষ করার অর্থই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া ঘাড় পাতিয়া মার খাওয়া। চীন বুঝে কেবল সামরিক শক্তিতে জয়-পরাজয়, অবশ্য ছলে-বলে-কৌশলে অন্যের সম্পত্তি অধিকারেও কোনও স্পৃহার অভাব নাই। এরূপ

নাকে মনে মনে আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই সকল হত্যাকাণ্ডের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার মূলে রহিয়াছে বাংলা দেশের শাসনকর্তাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতা, আধুনিক জীবনযাত্রার নিয়ম ও আইন-কানুন সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং সাধারণের মধ্যে সংযত, সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিবার ইচ্ছা জাগ্রত করিবার চেষ্টার অভাব। এই যতগুলি শিশু ও পূর্ণবয়স্ক লোকের অকালমৃত্যু ঘটিতেছে গাড়ী চাপা পড়িয়া, ইহার প্রায় প্রত্যেকটিই হইতে পারিত না, যদি না—

(১) গাড়ী-চালকগণ উদ্দাম ভাবে গাড়ী চালাইতেন,

(২) পথিকদিগের রাস্তা চলিবার ও পার হইবার রীতি যথাযথরূপ হইত,

(৩) গাড়ীগুলির কলকব্জা ঠিক ভাবে রাখা হইত,

(৪) গাড়ীর চালক ও পথিকজন নিজ নিজ পথে যথাযথ ভাবে নিয়ম মানিয়া চলিতেন,

(৫) এবং শিশুদিগের পিতামাতাগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠিক ভাবে করিতেন। কিন্তু বাংলার পুলিস প্রাইভেট মোটর গাড়ীর চালক ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি কোনও আইন প্রয়োগ করা প্রয়োজন মনে করেন না। তাহাও আবার ঠিক, বেঠিক স্থানে গাড়ী থামাইয়া রাখা (পার্কিং) লইয়াই যত মাথাব্যথা পুলিসের। এবং শুধু মাত্র যে যে স্থলে নিজেদের উপরওয়ালাদিগের যাতায়াত আছে অর্থাৎ ক্লাব, সিনেমা ও বড় বড় অফিস মহলে মাত্র। দেশের ও সহরের অপর সকল অংশ আইনের বাহিরে বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। রিকশ, ঠেলাগাড়ী, সাইকেল ও পায়দল পথিকদিগের সম্বন্ধে রাস্তা চলার ও অপরের চলার বাধা সৃষ্টি করা সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই। বড় বড় অফিস ও দোকানপাটের কেন্দ্রে অর্থাৎ চৌরঙ্গী, পার্কষ্ট্রীট কিম্বা ডালহাউসি স্কোয়ারে কিছু কিছু আইন দেখা যায়; কিন্তু কলিকাতার বাকি সকল পথই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ অর্থাৎ সে সকল পথে শিশুরা অভিভাবকহীন ভাবে অবাধে বিচরণ করে, রিকশ গাড়ী যত্রতত্র আরোহীশূন্য ভাবে অপরের যাতায়াতে বাধা দিয়া ঘোরাফেরা করে, সাইকেলচারিগণ মধ্যপথে দাঁড়াইয়া আড্ডা জমাইয়া থাকেন ও মাঝে মাঝে লরিচালকগণ ভাঙ কিম্বা তাড়ি খাইয়া তীব্রগতিতে নিজ মতলবে ছুটিয়া চলে। হয়ত দুই-একজন শিশুকে চাপাও দিয়া যায়। তাহাদিগের গতিবেগ কদাচ ৪০।৫০ মাইলের (ঘণ্টায়) কম হয় না। শুনিয়াছি আমাদিগের পুলিসের কর্ম্মচারিগণ ট্যাক্সদাতার অর্থ ধ্বংস করিয়া কখন কখন সুইজারল্যাণ্ড অথবা ফ্রান্সে রাজপথের যানবাহন প্রভৃতির চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ-কার্য্য শিক্ষা করিতে যাইয়া থাকেন। তাঁহারা কোন্ কোন্ নৈশ-আমোদের কেন্দ্রে গমন করিয়া নিজ কার্য্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার চেষ্টা করেন তাহা আমরা জানি না; কিন্তু মনে হয় অধিক সময়ই তাঁহারা উক্তরূপ আসরেই ব্যয় করিয়া আসেন নতুবা ভুল করিয়াও কিছু শিখিতে পারেন না কেন। মনে হয় যেন কলিকাতা, তথা বাংলার রাজপথে কোন আইন কানুন নাই। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডেতে লরি চালকগণ ৫০,৬০ মাইলের কম বেগে গাড়ী চালাইতেই চাহে না; এবং কোন কোন তৈলবাহক ট্রাক ৭০,৭৫ মাইল বেগেও চলিয়া থাকে। ইহা একেবারে হিসাব করা সত্য কথা, আন্দাজের কথা নহে এবং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের যত দুর্ঘটনা ঘটে তাহার শতকরা ৯৯টিই লরি-চালকদিগের গতিবেগের ফলে ঘটিয়া থাকে। বাংলার পুলিস কর্ম্মচারিগণ একথা জানিয়াও জানেন না। যেমন কলিকাতায় তাহারা রাজপথগুলিকে খালি-রিকশ ঘুরাইবার জন্য রাখিয়াছেন তেমনি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড রাখিয়াছেন লরির ও তৈলবাহক ট্রাকের রেস খেলার জন্য।

বাংলার জনসাধারণের কর্ত্তব্য বাংলার পুলিসের উপর হাইকোর্টে নালিশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করা। নতুবা কাহার সন্তান কোথায় কোন লরি বা বাসের তলায় পড়িয়া প্রাণ হারাইবে তাহা কে বলিতে পারিবে? এতগুলি শিশু ও অপরাপর লোকের প্রাণ যাইতেছে অথচ সরকার বাহাদুর শুধু চৌরঙ্গীতে সাদা দাগ টানিয়া নিজ কর্ত্তব্যপালন শেষ করিতেছেন মাত্র, এইরূপ কর্ত্তব্যে অবহেলার শাস্তি প্রয়োজন। অন্তত পুলিসের উচ্চপদস্থ কয়েকজন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি অপঘাত-হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইলে পরে "করোনারের" অনুসন্ধানের ফলাফল কি হয় তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের রিপোর্টারদিগের কর্ত্তব্য ঐ সকল অনুসন্ধান-সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার বিষয় জনসাধারণকে সকল কথা জানান। আমাদিগের জনসাধারণেরও কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি আছে। তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে গাড়ী-চালককে প্রহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিষয়টা আইন-কানুন ঠিক ভাবে প্রযুক্ত না হইবার ফল এবং সাধারণের উচিত সর্ব্বক্ষেত্রে ট্যাক্সি, বাস, লরি

প্রভৃতি যাহাতে আইন মানিয়া চলে তাহার ব্যবস্থার চেষ্টা করা। ট্যাক্সি-চালকগণও বহুলোকের মৃত্যুর কারণ হইয়া আছে এবং তাহাদিগের উদ্দামতা দমনের কোনও চেষ্টা পুলিস করেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। বাংলার নূতন মন্ত্রিসভাতে এই কথার আলোচনা প্রয়োজন। শুধু অজ্ঞান দেশবাসীর বুকের উপর বসিয়া পরস্পরের পিঠ চাপড়াইলেই দেশশাসন কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না।

## দেশের লোকের আয়বৃদ্ধি

নানান প্রকার সংখ্যা প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, দেশবাসীর আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। মোট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয়—এই দুই প্রকার আয় বাড়িয়াছে বলিয়া রটনা। আমরা কিন্তু দেখিতেছি যে, দেশের লোকের ব্যক্তিগত কাজ-কারবার সরকারী প্রতিবন্ধক "পলিসির" ফলে ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরও খারাপ হইতেছে। চাকুরির ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আয়ের তুলনায় ব্যয়বৃদ্ধি হইয়া মানুষের অবস্থা খারাপের দিকেই যাইতেছে। এবং চাকুরির বাজার প্রসার লাভ করিতেছে না, বরঞ্চ আকারে ক্ষুদ্রতরই হইতেছে। শুধু যে সকল লোক আইন ভাঙ্গিয়া চলিতেছে তাহারাই বৃহৎ বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অতি উচ্চ ভাড়ায় সেগুলি বিদেশীদিগকে বাস করিতে দিয়া থাকে। আমাদিগের যে সকল বৃহৎ বৃহৎ কারবার গড়িয়া উঠিতেছে সেগুলির জন্য কারণে বিনা কারণে বিদেশীয়দিগকে আনিয়া দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। বিদেশীমাল ক্রয় বহুক্ষেত্রে অকারণে হইতেছে এবং বিদেশীদিগের হস্তে খরচের ভার থাকিতেছে। বিদেশিগণ টাকায় পাঁচ টাকা হারে খরচ বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের এবং নিজেদের ভারতীয় বান্ধবদিগের আর্থিক সুবিধা করিয়া দিতে ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সকল অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই শুধু "খরচ" হইতেছে এবং আয় যাহার হইতেছে সে আয়টি স্বীকার করিতেছে না অথবা আয়-ট্যাক্স দিতেছে না। টাকাগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে জমা থাকিতেছে এবং তাহা কি ভাবে কাহার ভোগে লাগিতেছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। ভারতের এই যে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ইহার ফলে কোন ব্যক্তিই ন্যায্য মূল্যে কোন বাঞ্ছনীয় বস্তু পাইতে সক্ষম হইতেছেন না। কলিকাতায় জমির মূল্য ১৫০০০৲ হইতে ৩০০০০৲ টাকা কাঠা প্রতি দাঁড়াইয়াছে এবং আইনত কেহ কোন মাল-মশলা না পাইলেও বৃহৎ বৃহৎ বাড়ীঘর উঠিয়া চলিতেছে সহজে ও অবাধে। এই অবস্থায় দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলা চলে না। আবার হয় নাই তাহাও বলা চলে না। দিনে ৭৫ টাকা দিয়া শত শত লোক হোটেলে বাস করিতেছে কোম্পানীর অথবা গভর্ণমেণ্টের খরচে। কোথাও খাইতে বসিলে মাথাপিছু ২০।২৫ টাকা খরচ হয়। গোপনে আনিয়া যে সকল প্রসাধনের সরঞ্জাম বিক্রয় করা হইতেছে তাহার মূল্য ১০০-৩০০ টাকা অবধি হইতেছে। যাহার সচরাচর মূল্য হইত ৫-২০ টাকা মাত্র। স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের ঐশ্বর্য্য দুই ধারায় চলিয়াছে। আইনত ও বেআইনি ভাবে। আইনের ধারায় আমাদিগের অবস্থার উন্নতি হয় নাই। বেআইনি পথের পথিকদিগের ঐশ্বর্য্য খুবই বাড়িয়াছে বলিয়া দেখা যায়। অ

## শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়ার কথা

বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় গলদ কোথায় ইহা লইয়া আলোচনা বহু হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। নানাজনের নানামত সংগ্রহ করিয়াও কোন সমাধানেই পৌঁছান সম্ভবপর হইতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, আমরা কেহই নিজের মত করিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। আমরা ইউরোপের বিভিন্ন ধারার অনুসরণ করিতে প্রয়াসী। এদেশের আদর্শ, আচার-আচরণের কথা তথা ভারত-ধর্ম্মকে ভুলিয়া ছেলেদের শিক্ষার কথা ভাবিতেছি। পূর্ব্বে শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, এখনই বা কিরূপ ইহা বিচার করিলে, মান যে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভাল-মন্দ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকগণ অনেক কিছু বলিতে পারেন। স্কুলের শিক্ষা-পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও নিঃসন্দেহে যথেষ্ট। তবে বলিতে পারেন, শিক্ষার প্রকরণ ও পদ্ধতি স্থির করা ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকদের কোনও হাত নাই। পাঠক্রম, বিষয়-সূচী ইত্যাদি স্থির করার ভার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার রাজ্যের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের। শিক্ষকদের বেতনের হার, স্কুলের জন্য সরকারী অর্থসাহায্যের পরিমাণ ইত্যাদি স্থির করার দায়িত্বও শিক্ষা দপ্তরের। প্রধান শিক্ষকগণকে এই সমস্ত বিধি-নিষেধ ও নির্দ্দেশের গণ্ডির মধ্যে স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালন করিতে হয়। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং মতামত শিক্ষা-ব্যবস্থাপকগণের নিকট যথোচিত মর্য্যাদা অথবা বিবেচনা লাভ করে কি না সন্দেহ। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা-নীতি ও পদ্ধতি স্থির করা

ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকদের অনেকখানি স্বাধীন ভূমিকা আছে। আমাদের দেশে তাহা নাই। এই নাই বলিয়াই তাঁহারাও এ লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইতে চাহেন না। পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সম্মেলনে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথাও আছে। তাঁহারা বলিতেছেন, আগের তুলনায় প্রতি ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা অনেক বেশী, কাজেই ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। এই জন্য দরকার শিক্ষক সংখ্যা বাড়ান। শিক্ষা-পর্ষদ এ বিষয়ে নীরব। ইহার উপর আছে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। তবে কেবল ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া লাভ নাই, শিক্ষকগণ যদি নিজেরা তাঁহাদের আচরণ সংযত না করেন, তাহা হইলে ছাত্ররা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইবেই। শিক্ষাক্ষেত্রে যে ব্যবসায়ী-সুলভ মনোবৃত্তি ও নীতি ভ্রষ্টতা প্রবল হইয়াছে তাহার জন্য শিক্ষকগণের দায়িত্ব কম নয়। শিক্ষার মান অবনত হইবার একটি প্রধান কারণও ইহাই।

স্কুলে ঠিকমত লেখাপড়া যে হইতে পারিতেছে না, সেজন্য পাঠ্যবস্তুর ভারবৃদ্ধিও অনেক পরিমাণে দায়ী। বিশেষত উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের নূতন পাঠক্রমে পুঁথির বোঝা অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়ান হইয়াছে। গোড়ায় কথা হইয়াছিল, ইংরাজীর উপর অতটা জোর না দিয়া, মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী ছেলে-মেয়েদের ও ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের বোঝা অযথা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে অতগুলি পুস্তকের প্রয়োজন হয় না। যে ছেলে-মেয়েরা তখনও ভাল করিয়া ইংরাজী লিখিতে বা বলিতে শিখে নাই, পরীক্ষার সময় তাহাদেরকেই ইংরাজীতে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয়। জানা বিষয়ও তাহারা ভাষার জটিলতায় উত্তর দিতে পারে না। ছেলেরা কেন ইংরাজীতে ফেল করে—ইহার পর তাহা না বলিলেও চলে।

উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের নূতন পাঠক্রমে পুঁথির বোঝা অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়ান হইয়াছে, যাহা ছাত্রদের পক্ষে পড়িয়া আয়ত্ত করা খুবই কঠিন, স্কুলেও শিক্ষকগণের পক্ষে এগুলি রীতিমত পড়াইয়া শেষ করা অসম্ভব প্রায়। ফলে দেখা গিয়াছে, পরীক্ষার আগের দিন পর্য্যন্ত মাষ্টারমশায় বই শেষ করার তাগিদে নূতন পড়া পড়াইতেছেন। আগে দেখিয়াছি, কি করিয়া ছেলেরা বুঝিতে পারিবে সেই চিন্তাই শিক্ষকদের প্রধান ছিল। এখন বুঝাইবার বালাই নাই, বই শেষ করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহার নিষ্কৃতি। কাজেই ছেলেরা শিখিবে কোথা হইতে?

শুনিতেছি, বাঁধাধরা পুঁথিগত বিদ্যার সুযোগ কমাইয়া বিবিধ বৃত্তিকরি ও কারিগরি বিদ্যাদানের আয়োজন করা হইতেছে। এই সঙ্গে এই পরামর্শই দিব, পুঁথির সংখ্যা কমাইয়া, বাহিরের জ্ঞান যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ মৌখিক পঠন পাঠনের কিংবা একটি রিডিং-রুমের সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

## দণ্ডকারণ্যে কেহ যাইতে চাহে না কেন?

দণ্ডকারণ্যে কেহ যাইতেছে না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাংলাদেশের মাটিতে যাহারা পালিত বর্দ্ধিত, আবাল্য যে জলবাতাসের সহিত তাহারা পরিচিত, আজ সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে যাইতে তাহাদের বাধিবে বই কি! গাছের বীজ নয় য, এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় পুঁতিয়া দিলেই গাছ হইবে। কিন্তু মানুষ—তাহার রক্ত-মাংসের দেহ, তাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে—সবচেয়ে বড় কথা তাহার সমাজ আছে, পরিবেশ আছে, সব ছাড়িয়া এক কথায় নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়িয়া অন্যত্র যাইতে তাহার প্রাণ কাঁদিবে বই কি।

আরও একটা দিক তাহারা দেখিতেছে, সেখানে গিয়া খাইবে কি? কৃষি ব্যতীত জীবকানির্ব্বাহের আর কোন ব্যবস্থা সেখানে নাই। সকলেই ত চাষী নয়, তাহারা করিবে কি? মানুষ গরু-ভেড়া-ছাগল নয় যে, তাহাদের সকলকেই এক খোঁয়াড়ে রাখিয়া দিবে। কিন্তু সরকার তাহাই করিতেছেন। এই আতঙ্কই মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ কি? মাথা গুঁজিবার মত একটা জায়গা হইলেই কি তাহারা নিশ্চিন্ত হইল? যদি তাহারা বাঁচিবার মত বাঁচিতেই না পারিল তবে সেখানে গিয়া লাভ কি? ছেলেদের মানুষ করিতে হইবে, তাহাদের লেখাপড়া শিখাইয়া একটা স্থিতি করিয়া দিতে হইবে—এসব চিন্তাও যে তাহাদের মাথা গুঁজিবার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। সরকার অত বোঝে না সে ফাইলের নির্দ্দেশ মানিয়া চলে—ছক বাঁধা আছে, ছক অনুযায়ী কাজ কর, না পার সরিয়া পড়। ইহাই সরকারী নীতি। বুদ্ধি বিবেচনা বিচার করিবার দিকটাও সরকার ঐ ফাইলের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

বার বার দণ্ডকারণ্যের নোংরা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে ইহা যেমন শোভনও নয় তেমনি নিন্দার্হ। এবারে শোনা যাইতেছে, তদন্ত করার জন্য দণ্ডকারণ্য

উন্নয়ন সংস্থার একজন প্রতিনিধি একত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়া উদ্বাস্তুদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন। এটা একটা সুখবর সন্দেহ নাই। কারণ, উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যাইতে অনিচ্ছুক এই অজুহাত দেখাইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ নিষেধ নোটিশ লটকাইয়া এবং থিয়েটার রোডের আপিসে তালা ঝুলাইয়া শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না প্রমুখ কর্তাব্যক্তিগণ তাঁহাদের নোংরা হাত পশ্চিমবঙ্গের গায়ে মুছিয়া ভাল মানুষের মত একদিন দিল্লীতে গিয়া বসুন, এ আমরা চাই না। আমরা আগেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা যাহাতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে উদ্বুদ্ধ হয়, যাহাতে সেখানকার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে উদ্বাস্তুদের সত্যকারের কোন অভিযোগ থাকিলে তা শুনিয়া সযত্নে তার প্রতিকার করা হয়, দণ্ডকারণ্যে যে সুযোগ উপস্থিত আছে তার চিত্রটি যাহাতে উদ্বাস্তুদের সম্মুখে ঠিক ভাবে তুলিয়া ধরা হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সততা ও আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করা উচিত। কেননা, হাজার হাজার মানুষ বছরের পর বছর ক্যাম্পের অস্বাভাবিক জীবনযাপন করিবে এবং দিনের পর দিন তিলে তিলে দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক বৃত্তি ও নৈতিক বোধ হারাইতে থাকিবে, এই অবস্থাটাকে আমরা নিরুপায় ভবিতব্য বলিয়া আর মানিয়া লইতে পারি না। ইহার পর আর কতটুকু মনুষ্যত্ব এদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকিবে? এই সকল ক্যাম্পে যেসব তরুণ-তরুণীকে আমরা দেখিতেছি, তাহারা জ্ঞান হওয়া অবধি সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবারের নিরাপদ আশ্রয় হইতে বঞ্চিত। যে ঘরের মাথার উপর আচ্ছাদন নাই তাহাকে যেমন ঘর বলা চলে না। বহু বৎসরের অবহেলার পর সরকার অবশেষে দণ্ডকারণ্যে সত্যিকারের একটি বৃহৎ পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা সুরু করিয়াছেন এবং বহু প্রাথমিক প্রশাসনিক বিভ্রাটের পর এখন পরিকল্পনাটি অন্ততঃ অনেকটা পরিচ্ছন্ন রূপ পাইয়াছে। উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যের আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া দেয় নাই একথা সত্য, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, সেজন্য সরকারী মহল হইতে কতটুকু চেষ্টা করা হইয়াছে? একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, যতখানি চেষ্টা করা উচিত ছিল ততখানি করা হয় নাই। শুধু তাই নয়, কে কৃষিজীবী, কে নয়, কে সত্যিকারের ক্যাম্পবাসী, কে ডেজার্টার, সরকারী সংজ্ঞা অনুসারে কে উদ্বাস্তু, কে ভবঘুরে এসব তর্ক তুলিয়া দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার আগ্রহকে অনেক স্থলে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে। একথাও অনুমান করার কারণ আছে যে, ক্যাম্পবাসীদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইতে না দিবার মধ্যে একদল সরকারী কর্ম্মচারীর স্বার্থ ছিল। আজ যদি নূতন চেষ্টার সূত্রপাত হয়, যদি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটা নূতন কোন্দল বাধাইয়া কাজ ভণ্ডুল করিবার মৎলব না থাকে তাহা হইলে এই যৌথ তদন্তের ব্যবস্থাটা প্রশংসার যোগ্য।

## চাউলের মূল্যবৃদ্ধি

নির্ব্বাচন শেষ হইবার পর হইতেই দেখা যাইতেছে সর্ব্বত্র চাউলের দর মণকরা দু-তিন টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি বাজারে ধানের অভাব কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। কেননা, এ সময় নূতন চাউলের আমদানি হওয়ার ফলে বাজারে প্রাচুর্য্যই দেখা যায়। দাম এ সময় বাড়ে না, বরং কমে। এমনই চলে বর্ষা পর্য্যন্ত। বর্ষার পর মজুত চাল ফুরাইয়া আসে এবং বাজারে ঘাটতি দেখা দেয়। চালের দাম তখন ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। তার পর যখন নূতন ফসল ওঠে, তখন আবার দাম পড়িতে থাকে। ইহাই নিয়ম। কিন্তু এবারে দেখিতেছি ব্যতিক্রম। নিয়মবহির্ভূত ঘটনা অস্বাভাবিক বটে, তবে সম্পূর্ণ অকারণ নয়। ফাল্গুন মাসে চাউলের মূল্যবৃদ্ধিকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। তবে যখন সেটা ঘটে তখন তাহার পশ্চাতে একটা হেতু থাকে। যে বৎসর অজন্মা দেখা দেয়, সে বৎসর বার মাসই চাউলের দর চড়াই থাকে—কখনও নামে না। আবার অজন্মা না হইলেও, যদি যথেষ্ট পরিমাণে চাউল উৎপন্ন না হয় সেক্ষেত্রেও দাম বাড়িবে, ইহাও নূতন কথা নয়।

অকালে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি যোগান ও চাহিদার মধ্যে সমতা থাকিলে এমনটা হইতে পারে না। অবশ্য যোগান ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্য সবসময় যে প্রাকৃতিক কারণে হইবে এমন কোনও কথা নাই। সেটা কখনও কখনও কৃত্রিমও হইতে পারে। মজুতদারেরা যদি চাল ধরিয়া রাখিয়া একটা সংকটের সৃষ্টি করে তাহা হইলেও দর বাড়িবে। তবে সত্যই যদি চাউলের উৎপাদনে ঘাটতি না থাকে তাহা হইলে সেটা করা সহজ নয়, এবং অনেকক্ষেত্রে সম্ভবও নয়—বিশেষ করিয়া সরকার যদি সজাগ থাকেন।

বর্ত্তমানে চাউলের দর যে বাড়িতেছে সেটা কখনই অহেতুক নয়। আর হেতুটা যে চাহিদা ও যোগানের

মধ্যে অসামঞ্জস্য—সেটা বুঝিবার জন্য অর্থনীতিতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এ অসামঞ্জস্য ঘটিল কেন? হঠাৎ কেন তাহার লক্ষণ ফাল্গুনের মাঝামাঝি দেখা যাইতেছে? পশ্চিমবঙ্গ চাউলের উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। বাহির হইতে চাউল এ-রাজ্যে আমদানী করিতেই হয়। যোগান ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান এ-রাজ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, নিয়মই। তাহার উপর এ বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ফলন কম। কাজেই যোগান ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধানটা আরও বাড়িয়াছে। অতএব অর্থনীতির সূত্র অনুসারেই চাউলের দর এ-রাজ্যে চড়িবার কথা। ব্যবসায়ীরা তাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতেছে, সরবরাহ চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। অতএব দাম তাহারা ইতিমধ্যেই বাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তথাপি এখানে একটা বিরাট্ 'কিন্তু' থাকিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে না হয় চাউলের ফলন তত ভাল হয় নাই, কিন্তু অজন্মাও ত এখানে দেখা দেয় নাই। যে ঘাটতি এ-রাজ্যে আছে, সেটা বাহির হইতে চাউল আমদানী করিয়া অনায়াসে পূরণ করা সম্ভব। এ-রাজ্যে উৎপাদন প্রচুর না হইলেও, উড়িষ্যায় ও অন্যত্র হইয়াছে। সারা দেশ ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে, পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতিটা এমন বেশী নয় যে, তাহাতে চাউলের দাম বাড়িতে পারে। উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে যদি চাউলের ফলন ভাল না হইত তাহা হইলে না হয় মানিতাম, অবস্থাটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তেমন হইবার কিন্তু কোনও কারণই নাই। যে ফলন হইয়াছে তাহাতে দাম যদি নাও কমে, সেটা বাড়িবার পক্ষে কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দাম এ সময়ে অপরিবর্তিত থাকাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। অথচ কেন যে সেটা হইতেছে না, সে সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গে চাউল সরবরাহ হয় প্রধানত উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলি হইতে। সে অঞ্চলগুলির দূরত্ব এ-রাজ্যের চাউলের বাজার হইতে খুব দূরে নয়। যোগাযোগের সূত্রও উড়িষ্যার সহিত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষীণ নয়। তবে এ মূল্যবৃদ্ধি কেন? অবশ্য চাউলের আমদানীর জন্য ওয়াগনের প্রয়োজন। তাহার অভাব যদি সত্যই হইয়া থাকে, তবে সে ব্যবস্থাই বা হইতেছে না কেন? এই অ-ব্যবস্থার ফলে আবার যে একটি মন্বন্তরের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা কি তাঁহারা ভাবিতেছেন না? পরিবহন-বিভাগের এই শৈথিল্য দেশের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। সরকারের সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

## ব্রহ্মে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অবসান

ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নু বিদায় লইলেন। ভারতবর্ষে আমরা যখন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, ব্রহ্মদেশে সেই সময়েই এরূপ একটি বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। তবে সুখের বিষয়, সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখলের ঝটিকা সংগ্রামে বিশেষ কোন রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে নাই। প্রধানমন্ত্রী উ নু সহ ৮৫ জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নিঃশব্দে ভাল মানুষের মতই গ্রেপ্তার বরণ করিয়াছেন। জেনারেল নে উইন যেমন অনায়াসে পুনরায় ব্রহ্মের শাসন-ক্ষমতা দখল করিলেন, তাহাতে রাজনৈতিক মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার হইলেও এইরূপ একটা কাণ্ড যে ঘটিবে সাম্প্রতিক কালে ব্রহ্মের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী হইতেই তার আঁচ পাওয়া গিয়াছিল। ২রা মার্চ্চ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিবামাত্র দুই তিন দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মের সংবিধান পরিবর্ত্তন করিয়া ফেডারেল ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবীতে রেঙ্গুনে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিদের একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী উ নু ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরা যেভাবে অংশ গ্রহণ করেন তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, ব্রহ্মের বর্ত্তমান সংবিধান রক্ষার মত যথেষ্ট শক্তি ও দৃঢ়তা বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলীর নাই। অথচ স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ব্রহ্মে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও গোলযোগ মীমাংসা করা সম্ভব হয় নাই এবং ইহার ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আশানুরূপ অগ্রগতির পরিচয় ব্রহ্ম সরকার দিতে পারেন পারেন নাই। এই অবস্থায় এককেন্দ্রিক শাসক-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে ফেডারেল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কতখানি যুক্তিসঙ্গত সে সম্পর্কেও রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকমহলের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সংবিধানের বিপদ—এই তিনটি কারণ দেখাইয়াই জেনারেল নে উইন ক্ষমতা দখল করিয়াছেন। তবে একটা আশার কথা এই যে, জেনারেল নে উইন অন্যান্য সামরিক ডিক্টেটরদের মতো ক্ষমতাশীল নহেন। পূর্ব্বে ১৯৫৮ সনে অনুরূপ রাজনৈতিক সংকটকালে উ নুর আহ্বানে তিনি ক্ষমতার ভার লইয়াছিলেন এবং পনের মাসকাল শাসন চালাইয়া আবার সে ক্ষমতা উ নু-র হাতেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এবারেও তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাজনীতিকগণ গত দশ বৎসর যেভাবে

সমস্যাবলী সমাধানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই সেনা-বাহিনীকে এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ব্রহ্মের সংবিধানের কতকগুলি গুরুতর ত্রুটিও সংশোধন করা প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া তিনি ইঙ্গিত দিয়াছেন।

আশার কথা এই যে, জেনারেল নে উইন ব্রহ্মের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তন করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উ নু সরকার প্রবর্ত্তিত সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণার ফলে ব্রহ্মের মিত্র রাষ্ট্ররূপে ভারতবর্ষ কিছুটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যে, ব্রহ্ম ভারতবর্ষের মতই বহু জাতি ও ধর্ম অধ্যুষিত দেশ। তাহার উপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়-ঝাপটায় ইহার আভ্যন্তরীণ শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মের মুক্তিদাতা প্রথম প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আউঙ সান এবং তাঁর মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য ফ্যাসিষ্ট গুপ্তঘাতকের গুলীতে নিহত হন। সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তৎকালীন পার্লামেন্টের স্পীকার উ নু দেশকে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের কবল হইতে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধার হন। উ নু রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারিলেও, ইহা অনস্বীকার্য্য যে, তিনি ছাড়া আর কোন ব্যক্তিবিশেষ দশকে ব্রহ্মের মত সমস্যাজটিল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌম অখণ্ডতা রক্ষা করিতে পারিতেন না। সারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় যখন ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী ঔপনিবেশিকতাবাদীদের দৌরাত্ম্যে গৃহযুদ্ধ, রক্তপাত এবং রাষ্ট্র ভাঙা-গড়া চলিয়াছে, চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ও নাশকতার অগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়া উ নুই সে সময়ে ব্রহ্মের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতিকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্ম স্বাধীন হইবার পর হইতেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই নির্বান্ধব অবস্থাতেও ব্রহ্ম কোন শক্তিজোটে যোগ দেয় নাই কিংবা বৈদেশিক ঋণে দেশের অর্থনীতিকে জর্জ্জরিত করে নাই। বিশেষতঃ এশিয়ায় উ নু রাজনীতিক হিসাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র। ভারত-চীন বিরোধ কিংবা ভারত-নেপাল মনোমালিন্যের অবসানকল্পে উ নু আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সময়ে ব্রহ্মের রাজনৈতিক মঞ্চ হইতে তাঁর বিদায়গ্রহণ এবং ব্রহ্মে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান নিশ্চয়ই খুব সুখকর নহে।

## প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি কৃষ্ণনগরে পড়াশুনার জন্য আসেন। তার পর কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৯৯ সনে বি. এ. পাস করিয়া এম. এ. পড়েন এবং পরে রিপণ কলেজে আইন পড়িতে থাকেন। অল্প বয়সেই তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এণ্ট্রান্স পাস করার পর তাহার প্রথম কবিতা পুস্তক 'উচ্ছ্বাস' প্রকাশিত হয়। কলেজে পড়ার সময় তাঁহার চারখানি উপন্যাস বাহির হয়। সে সময়ে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রে তাঁহার বহু ছোট গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত করিয়া চারি বৎসরকাল উহার পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি 'সাপ্তাহিক বসুমতী' ও 'বঙ্গবাসী'তে নিয়মিত লিখিতে থাকেন। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই তিনি 'প্রতিবেশী', 'সন্ধ্যা' ও তৎকালীন 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে লেখক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। অতঃপর তিনি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সনে 'দৈনিক বসুমতী'র প্রথম প্রকাশ হইতেই তিনি উহার সম্পাদনা করিতে থাকেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুতে সংবাদপত্র-জগতের উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রধানতম সংযোগসেতু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন 'আপনাতে আপনি পূর্ণ' এবং আপন স্বাতন্ত্র্যে ও প্রতিভায় অন্য সকলের চেয়ে পৃথক। তিনি ছিলেন জীবন্ত 'এনসাইক্লোপিডিয়া'। কি সংগ্রহই না তাঁর ছিল! কোন সাংবাদিকের মধ্যে এরূপ নিষ্ঠা দেখা যায় না। বহুজনের বহু সংশয় তিনি নিরসন করিয়াছেন। আজ তাঁহার এই মৃত্যুতে সাংবাদিক মাত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

# য়ুরোপীয় আর্টের দার্শনিক বিচার

অসিতকুমার হালদার

চিত্রে প্রকৃতির হুবহু নকল করার সংস্কার য়ুরোপে এসেছিল বহু যুগ পূর্বে এ্যারিসটোটলের সময় থেকে (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২), কেন্টের শিক্ষার ফলে। এ্যারিসটোটল বলেন: নকল করাটা মানুষের অনিবার্য সংজ্ঞা। শৈশব থেকেই মানুষের এই নকল করার ইচ্ছাটা জাগে—অন্য জন্তুদের চেয়ে মানুষ তাই বড়। আর মানুষই দুনিয়ার প্রাণিগণের মধ্যে নকুলে, সব কিছু শেখে গোড়াতে নকল করার দ্বারা। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকলায় প্রকৃতির নকল করায় বিশেষভাবে তাই য়ুরোপ বল পেয়েছিল।

য়ুরোপের কাব্য ও কলার ভিত্তি হোরাসের "ut Picturer Poesis"—সব চিত্রই কাব্য এই কথায় আর সিমোনিডেসের "চিত্রই মূক কাব্য এবং কাব্যই প্রগল্‌ভ চিত্র" এই কথাগুলিতে মুক্তি পেয়েছিল। কাব্যকে চিত্রকলা থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল তার রচনা-রীতির ও পদ্ধতিতে, কিন্তু প্রকৃতির নকল করার বেলায় একই স্থান তাদের ছিল। অবশ্য এই সব দার্শনিকদের বিচারে শিল্পী ও কবিদের বিশেষ শক্তি এবং গুণের বিশেষত্বকে মানতে হয়েছে বিভিন্ন রচনার মধ্যে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা আবার এক ভাবনায় পড়েছেন আর বলছেন, "প্রকৃতির নকলই যদি আর্টের উদ্দেশ্য হয়, তবে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির ভাবনাটাই ভীষণ জিজ্ঞাস্য বস্তু হয়ে ওঠে; কেননা আমাদের আদর্শকে তার উপর চাপাব কি করে যদি তাকে বিকৃত না করি? প্রাকৃতিক বস্তুর আরও ঊর্দ্ধে আমরা উঠব কি করে সত্যের নিয়ম নিগড়কে আমরা যদি না ভাঙি?"

কিন্তু এই প্রকৃতির নকল করার দার্শনিক বিচার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধেক পর্যন্ত চলেছিল নির্বিবাদে।

রুশো আর্টের নব-ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্য ও বিচারকে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর পক্ষে আর্টের দ্বারা কোন বিষয়-বস্তুর বর্ণনা থাকার প্রয়োজন নেই; কিম্বা দুনিয়ার অভিজ্ঞতার ছায়াও থাকবে না—কেবল তা ইন্দ্রিয়গত ভাবের আতিশয্যের প্রতীক স্বরূপ হবে। এর পর থেকে প্রকৃতির নকল করার প্রবৃত্তি যা বহু শতাব্দী থেকে চলেছিল তার প্রতিরোধ হ'ল এবং তার পর থেকে বিশেষ চরিত্রগতভাবের আর্টের অবতারণা হ'ল।

জার্মান-কবি গ্যেটে বললেন, আর্ট সৌন্দর্যপূর্ণ হবার পূর্বেই রূপায়িত হতে থাকে অর্থাৎ বর্ণনার বিষয় মনে এনে দেয়, আসলটা তবুও সত্য হয়। আর মহান আর্ট অতি সত্যরূপে প্রতিভাত হয়—সৌন্দর্যপূর্ণ আর্টের অপেক্ষা। মানুষের প্রকৃতিতে থাকে রূপায়িত করার শক্তি, তাই ফুটে ওঠে তার কাজে, যখন তার নিজের অস্তিত্ব কায়েম হয়।

তেমনি তিনি বলেছেন, জংলী মানুষে নবতরভাবে গড়ে তাদের বুনো রুচি অনুসারে বিকট আকার উগ্র রঙে তার টোটেমে মাথার পালকে এবং দেহের উল্কিতে এঁকে রাখে। যদিও এই সব রূপ কল্পনায় বীভৎসতা থাকে, মাপজোপের সঠিক কিছু রাখতে পারে না তবুও তার কাজের সমষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখে, কেননা একটি অন্তর্নিহিত প্রেরণাই এই বিশেষ ধরণের রূপ প্রকাশ করেছে।

এই বিশেষভাবের আর্ট তখন মেনে নেওয়া যায় আর্টের আসল গুণ-সম্বলিত আছে ব'লে। অন্তরে, বাহিরে, বিশেষত্বে মৌলিকত্বে, স্বাধীন চিন্তায় এবং অসম্বদ্ধ অজ্ঞতায় যার ভিতর এই গুণ আছে—তা বর্বরের হাতের কাজেই হোক্ তাকে এই আর্টের শ্রেণীতে ফেলে দেওয়া যায়।

রুশো (Rousseau) এবং গ্যেটে (Goethe) সৌন্দর্যরুচির এই এক নতুন 'থিওরী' স্থির করলেন বিশেষভাবের (characteristic art) আর্ট ক্রমে। এটা আবার বিশেষভাবে জয়লাভ করল প্রকৃতির হুবহু নকলের আর্টের স্থানে। আর্ট প্রকাশশীল, কিন্তু তার আকারপ্রাপ্তি প্রণালীকে বাদ দিলে চলে না; আর এই আকার প্রাপ্তির প্রণালী চালনা হয় কোন একটি ইন্দ্রিয়বোধের মধ্য দিয়ে (sensuous medium)। গ্যেটে বলেন, "যেই সে (শিল্পী) ভাবনা-চিন্তারহিত এবং ভীতিরহিত হয়—স্রষ্টা উপদেবতা শান্ত থাকে এবং তার (শিল্পীর) চারপাশে ঘোরে-ফেরে বস্তুটির জন্যে, যার মধ্যে সে তার রস পায়।" ("As soon as he is free from care and fear, the demigod creative in repose grops round him

for matter into which to breath his spirit."
—An essay of man by Ernest Cassiver দ্রষ্টব্য )

এর পর য়ুরোপের দার্শনিক মনোভাব শিল্পের পক্ষে হ'ল মনঃসংজ্ঞা (Intuition)। দার্শনিক ক্রুশে ( এবং অন্যান্য দার্শনিকেরা যাঁরা তাকে মানেন ) বস্তুতান্ত্রিক ভাবের (characteristic art) বিষয় ভুলে গেলেন বা কমিয়ে দিলেন তার মূল্য। ক্রুশের দার্শনিক মতে বস্তুর স্পিরিটের মধ্যেই সব গুণ বর্তমান এবং তিনি আর্টের বেলায়ও তার অধ্যাত্মভাবের (spirit) উপরই ঝোঁক দিলেন। তবে এই অধ্যাত্মভাবের শক্তি ক্রমবর্দ্ধিত হয় মনঃসংজ্ঞার প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই। ক্রুশে তাই বলেছেন, "মনঃসংজ্ঞা লাজুক, সহজে সুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী যদি অতিরিক্ত সতর্কভাবে তাকে দেখা যায়" ( Intuition is a shy thing apt to disapear if looked into too closely )।

অন্যদিকে য়ুরোপের ক্রিটিকরা বস্তুতান্ত্রিকভাবে আর্টকে দেখতে ভুলছেন না। বলছেন তাঁরা, "কিন্তু বড় শিল্পীর পক্ষে, বড় সঙ্গীতজ্ঞ বা কবির পক্ষে, রং, রেখা, শব্দ, ছন্দ কেবলমাত্র রচনারীতির যন্ত্রমাত্র নয়—সেগুলি প্রয়োজনীয় মূর্ত রচনারীতির পক্ষে। প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টিতে আমরা পাই সঠিক একটি রচনা-রীতির ছাঁদ।

অন্য সব প্রতীক আকারের ( symbolic forms ) মত আর্ট কোন একটা তৈরী বাস্তব, কেবল প্রতিলিপি নয়। এটা একটা পথ যা বাস্তব ভাবের ( objective view ) বস্তুতে এবং মানবজীবনের মধ্যে বিকাশ পায়।

য়ুরোপের আর্টের দার্শনিক বিচার খুবই চুল চিরে করা হয়েছে এবং তার বিষয়-গ্রন্থের অভাব নেই। আরও একটা সূক্ষ্ম বিচার হ'ল—নাটকীয় যাতে বিয়োগান্তক বা মিলনান্তক ঘটনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে এবং তা তাতেই সম্পূর্ণতা পায়; ঐতিহাসিক একটা যুগের যাবতীয় ঘটনা সমষ্টি যতই বিচ্ছিন্ন থাকুক না কেন, একত্র করে নিয়েই লেখেন, কিন্তু এইভাবে দেখলে দেখায় সৌন্দর্য বা সত্যকে ক্লাসিক্যালভাবে তারা বহুর মধ্যে ঐক্যের মধ্যে প্রকাশ করে। ( a unity in the manifold ) বহুর মধ্যে একে দেখা এবং পরিবেশন করার বিষয় ভারতের কাব্য ও শিল্পেরও প্রধান কথা। কবি কালিদাস, বাল্মীকি, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের রচনায় বহুর মধ্যে একের রসগ্রহণ করেছেন এবং পরিবেশিত করেছেন।

য়ুরোপীয় দার্শনিকরা বলেন ভাষা ও বিজ্ঞান বাস্তবের সংক্ষিপ্তসার; আর্ট আরও ঘনতর রূপ দেয় বাস্তবের ভাষা ও বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ভাব আসে একই উপায়ে আর আর্ট হচ্ছে সংক্ষেপ করার ক্রমধারা বিশেষ। শিল্পীর ততটাই প্রকৃতির আকার আবিষ্কার করেন বৈজ্ঞানিকরা যতটা প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ার বিষয় সত্য অনুসন্ধান করেন।

এ বিষয় মহান শিল্পীরা বিশেষভাবে সজাগ থাকেন তাঁদের কর্তব্যের বিষয় এবং আর্টের মধ্যে দানের বিষয়। পৃথিবীর মধ্যে একজন বড় শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক লিওনারডো-দা-ভিনিচি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকলার উদ্দেশ্য বিষয়ে বলেছেন : "saper vedere"। তাঁর মতে চিত্রকর ও ভাস্কর সবচেয়ে বড় শিক্ষক। এই দৃশ্য-জগতের মধ্যে বিশুদ্ধ আকারের জ্ঞান কেবল একটা সংজ্ঞাবোধে জন্মায় না, প্রকৃতির দান।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতীয় কলার এইখানে বিশেষ দ্বন্দ্ব। বিশুদ্ধ আকারের জ্ঞান কেবল একটা সংজ্ঞাবোধে জন্মায় না ( For the awareness of pure forms of things is by no means an instinctive gift, a gift of nature ), এ কথা ভারতীয় শিল্পের কথা নয়। ভারতের শিল্পীরা সকল বিশুদ্ধ ও নির্ভুল আকার চিত্রে দিতে পারেন ধ্যান-সংজ্ঞায় উপলব্ধি ক'রে। চোখে দেখার প্রয়োজনই হয় না। য়ুরোপের বস্তুতান্ত্রিক পথ এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক পথের এই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

য়ুরোপীয় দার্শনিক বলেন, ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের পারিপার্শ্বিক সাধারণ ও সনাতন রূপের আকৃতিকে। সৌন্দর্যরুচির অভিজ্ঞতা তার তুলনায় খুবই ধনী। এর মধ্যে অঙ্কুরিত থাকে সংখ্যাতীত সম্ভাবনা—যা আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে গ্রাহ্য হয় না। শিল্পীর কলা-সৃষ্টিতে সেগুলি গোপন স্থান থেকে—একেবারে বাইরে আনা হয় প্রকাশের দ্বারা এবং তার সঠিক রূপ দেওয়া হয়। বস্তুর সকল ভাবের এই অফুরন্ত প্রকাশ আর্টের একটি গুণ এবং অন্য একটি গুণ, তা গভীরভাবে সকলের মন মুগ্ধ করে।

য়ুরোপের দার্শনিক বিচারে দেখতে গেলে বস্তুতান্ত্রিক ভাব ( objective ) এবং আধ্যাত্মভাব ( subjective ) আর্টে একইকালে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের দেশে এই ভাবনাটা অন্য প্রকারের রূপ নিয়েছে। কেননা আধ্যাত্ম ( subjective ) ধ্যানে দেখে বাস্তবিক ( objective ) রূপ দিয়েছে শিল্পীরা সর্বদা। মডেল বসিয়ে বস্তু দেখে তার বাস্তব রূপ দেয়

নি। এখানেও য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের আদর্শ ভিন্নপন্থী।

### আর্টে শুচি-ভাব ( Puritan Views )

য়ুরোপে পেগান ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে 'শুচিবাই' ভাব বেশী ছিল। তাই দেখা গেছে প্লেটো ( Plato ) থেকে টলস্টয় ( Tolstoi ) পর্যন্ত বহু শতাব্দী ধরে আর্টের দ্বারা ভাব-প্রবণতার ( emotion ) উদ্রেক হয় ব'লে জীবনের নৈতিক ( moral ) সামঞ্জস্য নষ্ট হয় মনে করতেন। টলস্টয় আর্টের মধ্যে এই নৈতিক অবনতির ছোঁয়াচ পেতেন। তাঁর মতে কেবল খারাপ ছোঁয়াচ নয় বরং যত বেশী খারাপ ভাব থাকবে আর্টে সেই আর্ট ততই বড় বলে মান্য হবে। ("Not only Infection, a sign of art, but the degree of infectiousness is also the sole measure of excellence in art") টলস্টয়ের এই বাণীকে সকল য়ুরোপীয় দার্শনিক সমর্থন করেন নি। একজন বলেছেন, "এতে গলদ স্পষ্ট আছে। টলস্টয় চাপ দিচ্ছেন আর্টের সৃষ্টির মূল মুহূর্তটিকে,—রূপায়িত করার মুহূর্তটিকে।" য়ুরোপ দেখেছেন, ইন্দ্রিয়-ভোগের সকল কামনাকে বস্তুতান্ত্রিকভাবে বোঝাতে আর আর্টের দ্বারা উপশান্ত করতে। মূক শান্তশিল্পে কাজের ভাব অসম্ভব হলেও সচল,—অচল শান্ত নয়। ( The calmness of the work of art is, Paradoxically, a dynamic, not a static calmness )। আর্ট আমাদের দেয় মানব-আত্মার প্রগতি আর তার সব রকমের গভীরতা এবং বৈচিত্র্য। আমরা আর্টে যা অনুভব করি তা কেবল একটি সাধারণ ভাব-গুণ নয়—এটা জীবনের সচল ( dynamic ) নিয়ম। এতে থাকে ধারাবাহিক দোলা। দুই বিপরীত দিকের—সুখ-দুঃখের; আশার-ভয়ের; উন্নতি ও পতনের। আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগের এই গুণগুলিকে সুরুচির আধ্যাত্মবোধের প্রকাশ করতে গেলে তাদের পরিণত করতে হয় আর্টের সক্রিয় স্বাধীন ভাবের দ্বারা, শিল্পীর কাজে ইন্দ্রিয়-ভোগের ক্ষমতাকেই সৃজনীর আদি সক্রিয় ভাব বলে মেনে নিতে হবে।

আর্ট সকল দুঃখ এবং জীবনের অত্যাচারকে ধ্বংস-বৃদ্ধি ও কঠোর বৃত্তিকে স্বকীয় মুক্তির পথ করে এবং তাদের আন্তরিক স্বাধীনতা দেয়, যা অন্য কিছুতেই ঘটতে পারে না। ( **Art turns all pains and outrages, these cruelties and atrocities, into a means of self-liberation, thus giving us an inner freedom which cannot be attained in any other way.**" )—An Essay of Man by Ernest Cassiner.

দার্শনিক হিউম ( Hume ) বলেছেন আবার,—"জিনিষের মধ্যে কোন সৌন্দর্যের গুণ থাকে না; এটা কেবল মানুষের মনের চিন্তার মধ্যেই বিরাজ করে—" ( Beauty is no quality in things themselves, it exists merely in the mind which contemplates them )।

আধুনিক দার্শনিক Ernest Cassiner বলেছেন হিউমের কথা অসম্বদ্ধ ও প্রমাণযোগ্য নয়। কেননা যদি আমরা হিউমের কথামত আমাদের মনকে দেখি, তবে আমাদের জিনিষ দেখার মধ্যে স্থায়ী ভাবের একটা বিরাট স্তূপের সৃষ্টি হবে। তার ভিতর থেকে সৌন্দর্য নির্বাচনও অসম্ভব হবে। "অনুভূতি প্রেষচি" (Pericipi) এর সূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব। বিচার করতে হবে তাহলে মানসিক সক্রিয়তার মধ্যে অনুভূতির জাগরণের মধ্যে এবং তার বিশেষ ধরণের ভাব মনে আসার মধ্যে। এতে অচল মনোভাবের ধারণা নেই। এটাতে একটা প্রকৃতি, একটি প্রণালী ধারণা করার পক্ষে আছে মাত্র। এই প্রণালী কেবল ভাবাত্মক ( Subjective ) নয়, বরং এটা আমাদের মনঃসঞ্চার একটি অবস্থা যা দুনিয়ার বস্তুতে ( Objective ) আছে। শিল্পীর চোখ সক্রিয় চোখ—অক্রিয় নয়, তা গ্রহণ করে এবং রাখে যে-ভাব সে যখন পায়। এই চোখ নির্মাতার চোখ, সৃষ্টিকার্যের দ্বারাই আমরা আবিষ্কার করি প্রকৃতির অন্তরের সৌন্দর্যকে।

### আধ্যাত্মবোধ ও আর্ট ( Spiritualistic Theory )

আধ্যাত্মবোধের ভাব দিয়ে দেখলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে জানা যায় তার প্রকটতা রূপে। ক্রুশে বলেন, সুন্দর নদী বা বৃক্ষ কথাটা একটা বানানো কথা মাত্র। প্রকৃতি ক্রুশের নিকট, আর্টের তুলনায় মৃত। প্রকৃতি মূক—কেবল যখন মানুষ তাকে কথা বলায় তখনই সে মুখর হয়। এই প্রতিবাদকে বোঝা যায় যখন বেশ খুঁটিয়ে প্রাকৃতিক ( Organic ) সৌন্দর্য এবং রস সৌন্দর্যকে ( Aesthetic ) বিশ্লেষণ করে দেখা যায়।

য়ুরোপের যত প্রকার শৈলীর ( School ) মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে তাদের সবাইকে সৌন্দর্যরুচির বিশেষ পরিকল্পনার ক্ষমতাকে কিছু-না-কিছু মেনে নিতেই হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন শৈলী এর ক্ষমতার বিপরীতভাবে মূল্য ধার্য করেছে। ক্ল্যাসিকাল এবং নব ক্ল্যাসিকাল মনোভাবে

পরিকল্পনার স্বাধীনতা দেয় নি। তাঁদের মতে পরিকল্পনা শিল্পীদের একটা বিরাট শক্তি, কিন্তু এ শক্তিও সন্দেহজনক। আর্ট বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে, ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে, কেবল রেখা ও রঙের অদ্ভুত প্যাটার্নের কসরতে পরিণত হতে চলেছে। এই খেলাবাদীদের তত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের (Psychological) একটি বিশেষ রস বিচার।

তাঁরা বলেন, আমাদের সৌন্দর্য বিচারে আমরা তিন প্রকারের পরিকল্পনা দেখতে পাই, (১) মৌলিক রচনার ক্ষমতা, (২) প্রকৃষ্টভাবে মূর্ত করার ক্ষমতা, (৩) আর উচ্চ যৌন রসের অবাস্তবকে বাস্তব আকার দেবার শক্তি।

তাঁরা বলেন, শিল্পী খেলা করেন শুধু আকার নিয়ে রেখায় নক্সাকারী ছন্দ দ্বারা, আর শিশু খেলা করে খেলনা নিয়ে। আর্টের দ্বারা রচনা ক'রে তোলা হয় এবং গভীরভাবে দেখতে গেলে তা সৃষ্টিকার্য। কিন্তু আসলে শিল্পী কঠিন বিষয়কে তাঁর পরিকল্পনার তন্দুলে গলিয়ে তোলেন, ফলে আবিষ্কার করেন নবীন বিশ্বকবিত্বপূর্ণ, আত্মময়, এবং ঘনায়িত ( Plastic ) আকার। ঠিক কথা বলতে গেলে বেশীর ভাগ শিল্প-রচনা এই প্রকার গুণ প্রকাশ দ্বারা সন্তোষ দিতে পারে না। ললিতকলায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বিচার ( Aesthetic Judgment ) দরকার কিম্বা দরকার শিল্পীযোগ্য রস বিচার ( Artistic taste )। সত্যিকারের শিল্পকলা আর অন্যান্য যা, তা যখন-তখন করা চিত্র যা খেলার বস্তুর মত প্রস্তুত হয় বা যা আমোদ-প্রমোদের চাহিদার জন্য অনুপ্রাণিত, তার বিচারের কোনও পথ নেই।

সৌন্দর্য বিচারের ইতিহাসে শিলার ( Schiller ), ডারউইন ( Darwin ) এবং স্পেনসার ( Spencer ) সাধারণত আর্টকে খেলার বস্তু ব'লে ধার্য করে গেছেন। ডারউইন ও স্পেনসারের তত্ত্বের মধ্যে আছে জীবাণুতত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক তত্ত্বের ভাব। ডারউইন এবং স্পেনসার মনে করেন খেলা ও সৌন্দর্য একটা সাধারণ অলৌকিক নিয়ম ( Phenomena )। আর শিলার দুনিয়ার মধ্যে স্বাধীন প্রবৃত্তি বলেই এ দুটোকে ঘোষণা করেছেন। শিলার বলেছেন, 'ছেলেদের খেলার মধ্যে একটি গভীর অর্থ আছে।' সৌন্দর্যকে তিনি জীবন্ত আকৃতি ( Living form ) বলেছেন। তাঁর মতে এই জীবন্ত আকৃতির বোধই প্রথম এবং অপরিহার্য পথ যা ক্রমে স্বাধীনতার অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। শিলার বলেন, সৌন্দর্যানুভূতির চিন্তা বা প্রতিচ্ছায়া মানুষের বিশ্বের প্রতি প্রথম দার্শনিক ( Boileau ) নিজে তা অস্বীকার করেন নি। মনস্তত্ত্ব হিসাবে (Psychologically) বলতে গেলে, পরিকল্পনার শক্তি না হলে চলে না শিল্পীর বা কবির। কবিত্ব ভাবের পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত এবং ধারণ ক'রে রাখতেই হয় বিবেচনার দ্বারা এবং তারই নিয়মের বন্ধনে। প্রত্যেক যুগে মহান শিল্পী উদয় হন এবং পরিকল্পনার চালনা করেন নানা আকৃতিতে এবং নবীন বলে বলীয়ান হয়ে।

কিন্তু এই আবিষ্কারের ক্ষমতা নিয়ে এবং বিশ্ব জগতের সচল ভাবের মধ্যে আমরা আর্টের কেবল একটি গর্ভগৃহেই বাস করি। শিল্পী কেবল বিষয়বস্তুর অন্তরের বাণীকে ( inward meaning ) অনুভব করবেন না, আর তার চারিত্রিক বৃত্তিটুকু দেখবেন না, তিনি তাঁর সব ভাবকে বাইরে প্রকাশ করে দেবেন তাঁর সৃষ্টিতে। এরই মধ্যে সবচেয়ে বড় শিল্প-সৃষ্টির গুণ এবং পরিকল্পনার শক্তি প্রকাশ পায়। ভাস্কর্য, চিত্র, কাব্য এই সকল আর্টের বিশেষত্বপূর্ণ ধরণ ( বা Idiom ) আছে। যার ভিতর ভ্রান্তি বা হেরফেরের উপায় নেই। আর্টের ভিত্তি রচনায় এই বিশেষ ধরণই পরিপূর্ণতা দেয়।

আর্ট অনন্তস্পর্শী গুণ ( Metaphysical approach )

একদল য়ুরোপের শিল্পী বলছেন, অনন্তই আর্টের প্রকৃষ্ট বিষয়বস্তু। সৌন্দর্যভাবনা আর কিছুই নয় অনন্তের প্রতীক রূপের প্রকাশমাত্র। দার্শনিক ফ্রেডরিক শেলেগেল ( Friedrich Schlegel ) বলেন—"আর্টিষ্ট সেই হবে যার নিজের একটি ধর্ম আছে, অনন্তের মৌলিক চিন্তা যিনি রাখেন।"

এই ভাবনার মধ্যে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ভাব রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাস্তবিকতাবাদীরা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উক্ত ভাবনার বিরোধী হয়েই প্রকৃতির হুবহু নকল করাকেই আর্টের বড় জিনিষ বলে দেখেছেন। আবার দেখা যাচ্ছে, এই সঠিক প্রকৃতির অনুকৃতির ধারার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-গুণের পরিচয় দিচ্ছে কেবলমাত্র আকার দিয়ে—বিষয়বস্তুর প্রকাশকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে। বস্তুতান্ত্রিক নিয়মে কেবলমাত্র আকার বা প্যাটার্ণ সর্বস্ব হয়ে পড়ছে আর্ট।

তার কারণ আর্টকে অনন্তস্পর্শী করতে হলেও চাই বিষয়বস্তুর প্রকাশ। কেবল শূন্যতা অনন্তের রূপ—তা' প্রকাশের বাইরের জিনিষ—আর্ট সেখানে কাজে লাগতে পারে না। যদিও কোন কোন য়ুরোপীয় দার্শনিক খাঁটি আকারে ( Pure form ) দেখেন অনন্তের মধ্যে। কিন্তু হিন্দু বৌদ্ধ দার্শনিক মতে অনন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। কোন আকারই দেওয়া চলে না তাতে।

## আর্টের প্রতীকরূপ (Symbolism)

আরনেষ্ট ক্যাসিরর ( Ernest Cassirer ) মানছেন যে, আর্ট সত্যই প্রতীক কিন্তু আর্টের প্রতীককে জানতে গেলে যা অবশ্যম্ভাবী তাকেই দেখতে হয় যা জ্ঞানের অতীত ( Transcendental ) তার মধ্যে পাওয়া যায় না। শেলিং এর ( Shelling ) মতে নিরাকার অনন্তকে আকারে পরিণত করাই হ'ল আর্ট।

গ্যেটে ( Goethe ) এ বিষয় দ্বিধা না করেই বলেছেন আর্ট অনৈসর্গিকের গভীরতা প্রকাশ করার বাহানা দেখায় না, এতে কেবল প্রাকৃতিক রীতির (phenomena) বাইরের প্রকাশই ব্যক্ত হয়। ভারতীয় রীতিতে অনন্তের রূপ কল্পনায় প্রতীকের প্রভাব খুব বেশী থাকে।

## মনস্তত্ত্ব ও আর্ট ( Psychological Theory )

য়ুরোপে এই মনস্তত্ত্ববিদের মাপকাঠিতে আর্টের সমালোচনা আধুনিক কালে খুব বেশী চলেছে। তাঁদের মতে আধ্যাত্ম বা অনৈসর্গিক ভাবের চেয়ে এই মনস্তত্ত্বের দিকে আর্টকে যাচাই করার সুবিধা বেশী। এই মনস্তত্ত্ববিদেরা সৌন্দর্যের একটা বাঁধা নিয়ম মানেন না। তাঁদের বিচার খুবই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, তাঁরা সৌন্দর্যের কারণ জানতেই ব্যস্ত এবং তার চুলচিরে দেখার ( analysis ) পক্ষপাতী। মনস্তত্ত্বের বিচারে তাঁরা গোড়াতেই দেখতে চান চুলচিরে ভাগ ক'রে কত-প্রকারের প্রাকৃতিক রীতি (Phenomena ) আছে এবং আমাদের সৌন্দর্যবোধ তার কোন্ কোঠায় পড়ে।

আরনেস্ট কাসেরর বলছেন, "উক্ত প্রকার বিচারের মধ্যে অসুবিধা অনেক আছে। এই সব সৌন্দর্যরুচির ভাল-মন্দ বিচারের বিশেষত্বের মধ্যে দোষ লক্ষিত হয়। আনন্দ আমাদের সম্ভোগের অব্যবহিত অবস্থা মাত্র; কিন্তু যখন মনস্তত্ত্বের নিয়ম দিয়ে দেখা যায়—এর অর্থ অস্পষ্ট এবং অত্যন্ত অসম্ভব বলেই মনে হয়।"

সানটায়ানার সমসাময়িক দার্শনিক বিচারে আনন্দ যে সবচেয়ে বড় (hedonism) তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়েছে সৌন্দর্যগুণ বিচারে। সানটায়ানার মতে, সৌন্দর্যই আনন্দ এবং তাহা সকল বস্তুর গুণ বলেই মেনে নেওয়া হয়; আনন্দকে বাস্তব করে' ধরা হয়। বিজ্ঞান সত্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতিক্রিয়া আনে। আর আর্ট প্রতিক্রিয়া আনে মানুষের মনে আনন্দ দেবার। এক্ষেত্রে সত্য অনুপ্রবেশ করে উপায় স্বরূপে পরিণতি আনার জন্য। অরিস্টটলের মতে কেবল আমোদের জন্য নিজের চেষ্টা মনে হয় আহাম্মকি এবং একেবারে ছেলেমানুষী। ( To exert oneself and work for the sake of amusement seems silly and utterly childish)।

বড় চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞকে বিশ্লেষণ করা যায় না তার রং বা শব্দের সূক্ষ্মরস গ্রহণের ক্ষমতার জন্যে। কিন্তু দেখতে হয় তার স্থবির বস্তুতে চলন্ত জীবনের আকার দেবার ক্ষমতার। এই ভাবে, কেবল আমরা আর্টের আনন্দকে দেখতে পাই—'আনন্দবস্তুতে পরিণত' (Pleasure objectified) হওয়ার দরুণ। এরই মধ্যে তাই আর্টের সমস্ত তত্ত্ব অল্পের মধ্যে পেতে পারি।

## স্বপ্নভাব ও আর্ট ( Dream experience in art )

য়ুরোপের আধুনিক আর্টের বাহনদের আর একটা মত হ'ল, শিল্পীরা অবসুপ্তচেতনা-( somnambulist ) যুক্ত এবং অবশ্যই এমন পথ ধরে চলছেন যে, তার উপর কোন আধিপত্য বা বিবেচনার সক্রিয়তা থাকবে না। আর্ট তাঁদের পক্ষে একটা মুক্তি, দুনিয়ার ক্ষুদ্র নিয়ম-পদ্ধতির হাত থেকে। এঁরা বলেন, তাতে আদি-প্রকৃতির মুলধারার দিকে নিয়ে যাবে। যদি আদি-প্রকৃতি (Reality) সৃষ্টির পরিণতি (creative evolution) হয়, তবে আর্টের সৃষ্টিস্তরের ভিতরেই আমরা খুঁজব তার সাক্ষী, মূল ধাতুর প্রকাশের এবং জীবনের—রচনাশক্তির গুণের মধ্যে। বার্গসঁর মতে আর্টের পক্ষে মন-সংজ্ঞা সক্রিয় প্রণালী নয়। এটা গ্রহণ করার একটা উপায় মাত্র—সহজসাধ্যও নয়। সৌন্দর্যবোধের সংজ্ঞাও বার্গসঁ বলেন 'অ-সক্রিয়' ক্ষমতা—সক্রিয় আকার তাতে নেই।

আরনেস্ট ক্যাসিরর বলেন, মহান আর্ট সকল কালেই উদয় হয়েছে দু'টি বিপরীত শক্তির সূক্ষ্ম বিচারে। একটি হ'ল গোপন যৌন-পূজার ( orgiastic ) ঝোঁক থেকে, অন্যটি হ'ল ধ্যানস্থ ভাব ( visionary ) থেকে। কেননা শিল্পীর অনুপ্রাণনা নেশা নয়, শিল্পীর পরিকল্পনা স্বপ্ন বা মোহজাল নয়। সব বড় আর্টের ভিতর গঠনের একটা ঐক্য অনুভূতি থাকে যাকে ছন্দ বলা হয়।

## খেলাধুলা ও আর্ট

য়ুরোপের আর্টের আদর্শবাদ ও থিওরীর অন্ত নেই। বহু প্রকারের আর্টের থিওরী এখন গজিয়ে উঠেছে যার দ্বারা আর্টের প্রকৃতিকে 'খেলার' কোঠায় নামান হয়েছে। এই আর্টক্রিটিক খেলাবাদীরা বলেন, অকেজো আর্টের সঙ্গে খেলার কোন তফাৎ তাঁরা অনুভব করেন না। তাঁরা ঘোষণা করেন আর্টের মূল ভাবের মধ্যে এমন-কিছু নেই যা খেলার মধ্যে নেই এবং খেলার মধ্যেও যে ভাব

আছে তাও আর্টে সুস্পষ্ট। এই তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানঘটিত তত্ত্ব। মনোবিজ্ঞানের বিচারে খেলা ও আর্টের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। এ দুটোই অকেজো এবং নিত্য-ব্যবহারিক কাজের সঙ্গে একেবারেই যোগযুক্ত নয়। খেলা একটা ধোঁয়াটেরূপ দেয়। আর্ট দেয় নবীন সত্য ভাব যা কেবল যাচাই করা সত্য নয় তাতে থাকে খাঁটি আকার (Pure form) মাত্র।

এই খাঁটি আকার নিয়েই আধুনিক য়ুরোপীয় স্বাধীন মনোবৃত্তি।

### অমানবতা ও আর্ট ( Dehumanization )

ভবিষ্যতের জন্য নবতরভাবে বিচারের যে বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ব ( Prognostic Psychology ) আধুনিক য়ুরোপের পণ্ডিতেরা পেয়েছেন তাতে ভালমন্দ—অরূপ-কুরূপ বলে কিছুই নেই। সব শাশ্বত জ্ঞানকে কামাল-পাশার মত ভেঙ্গে দিচ্ছে এই অপরূপ মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞান। অরটেগে গ্যাসেঁ ( Ortegay Gasset ) একটি কেতাবে লিখেছেন, "আর্টে অবমানবতার গুণ বর্তাবেই।" এই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে তিনি বলেছেন, "ক্রমে আর্ট প্যাটার্ণের বাহন হয়ে এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যখন তার মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের পরিচয় থাকবে না।" [ La dezhumanization detarte by Ortegay Gasset ( Madrid, 1925 ) ]।

### আর্টের গুণ

য়ুরোপের কলারসিকেরা উক্ত অমানবতার পক্ষে রায় দেন নি। আই, আর, চি, ( I. R. Chichard ) বলেন, আমরা যখন ছবি দেখি, কাব্য পাঠ করি, সঙ্গীত শুনি এই সব কাজে আমরা রকমারি কিছুই করি না— প্রত্যেক আর্টে মনঃসংজ্ঞার একটা কাঠামো আছে, যাকে বলা যেতে পারে বিবেচকদের চরিত্র গুণ।

অবশ্য আর্ট তা বলে বড়াই করে না জিনিসের বা ঘটনার সততার জন্যে। আর্ট ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যবোধের কানুন ভাঙতেও পারে যাকে আর্টের একমাত্র কানুন বলা হয়েছে পূর্বে। আর্টে হয়ত অত্যন্ত কিম্ভূত ভাব দিতে পারে এবং তারই মধ্যে তার বিবেচনা ও সততাও গ্রথিত থাকতে পারে, হয়ত সেটা কেবলমাত্র আকারের সততা। গ্যেটে বলেছেন, আর্ট দ্বিতীয় প্রকৃতি, হেঁয়ালী হলেও কিন্তু বোঝবার পক্ষে খুব সহজ, কেননা আকার পায় বোঝারই মধ্যে। ( Art a Second nature; mysterious too, but more understandable, for it originates in the understanding )।

বিজ্ঞান আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে; চরিত্র-গুণ আমাদের কাজে শৃঙ্খলা দেয়; এবং আর্ট আমাদের সুছন্দ দেয় দৃশ্যবস্তুতে, গ্রহণযোগ্য জিনিসে ও শ্রুতিযোগ্য সঙ্গীতে।

### ভাষা এবং আর্ট

য়ুরোপের দার্শনিক বলছেন আবার, আর্টকে প্রতীক ভাষা ( Symbolic language ) বলে অভিহিত করা যায়। ক্রুশে ( Croce ) বলেন, "ভাষার সঙ্গে আর্টের কেবল একটা যে মিল আছে তাই নয়, উভয়ই একেবারে এক। ক্রুশের মতে যে কেহ ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন আর সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত—উভয়ই এক পথের পথিক।

অন্য একটি য়ুরোপীয় দার্শনিক প্রতিবাদ করে বলেছেন, ভাষা ও আর্টে অভ্রান্ত বিরোধ আছে। আর্ট থাকে প্রতীক, তা লিখিত ভাষায় থাকে না—স্পষ্ট ব্যক্ত থাকে ভাষাতে। উদ্দেশ্য ও ধরণ দু'টিরই ভিন্ন, একই উপায়ে তার প্রকাশও নয় বা উভয়ের চরম কথাও এক নয়। উভয়ই বস্তুর বা বিষয়ের অনুকৃতি নয়—রূপ দেয়।

### আর্ট ও শোভা

বহু শিল্পরসিকদের দেখা যায় যে, তাঁরা আর্টকে গৃহ-সামগ্রীর অলঙ্কারের মতই বিবেচনা করেন। কৃষ্টির মধ্যে যে বড় স্থান আর্টের আছে তাকে তাঁরা এই ভাবে নামিয়ে দিতে চান। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে আমরা দেখতে পাই ইন্দ্রিয়ানুভূত দুনিয়াকে তার সর্বপ্রকার সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যের মধ্যে। এই অসংখ্য বিশ্বসৃষ্টির গুণকে আমরা কি করে অনুভব করব যদি চিত্রকর বা ভাস্কর তার রূপ না ধ'রে দেন। সত্যিকার আর্ট কেবল প্রকৃতির জাল করা ( নকল ) নয় আমাদের জীবনের আন্তরিক প্রকাশ-বেদনার পরিচয় তাতে থাকে।

আর্টকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি দাঁড়াতে পারে না। গ্রীক, মিসর, চীন, ভারতের আর্টের জীর্ণ কঙ্কালের মধ্যেই আজও সভ্যতার নিদর্শন আমরা পাই। আর্টের পরিচয় যে দেশের নেই সে দেশের অস্তিত্বের কোনও গুণই বর্তমান নেই।

### বিজ্ঞান ও আর্টের গভীরতা

য়ুরোপীয় দার্শনিকেরা বলেন, যতদিন আমরা ইন্দ্রিয় উপলব্ধির দ্বারা প্রাপ্ত দুনিয়াতে বাস করি কেবল তার দ্বারা আদি-সত্যের ( reality ) বাইরেটাই স্পর্শ করি

ক্ষেত্রে ঐ বিরোধ মীমাংসার কোনও সহজ পথ নাই। যদি সংবাদপত্রের গুজব সত্য হয় অর্থাৎ সোভিয়েট সরকার এই বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চাপ দিতে থাকেন তবে হয়ত সমস্যার সমাধান কিছুটা হইতে পারে, কেননা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে—এমন কি আণবিক অস্ত্র নির্মাণের চেষ্টায়—চীনকে এখন সোভিয়েটের উপর, ষোল আনা না হইলেও, পনের আনা নির্ভর করিতে হয়। তবে সোভিয়েটের পরামর্শের ফল যাহাই হউক, চীনের সহিত ভারতের শত্রুতা ততদিনই পূর্ণমাত্রায় থাকিবে—মুক্তরূপে বা প্রচ্ছন্ন ভাবে যতদিন ঐ দেশের বর্ত্তমান কর্ণধারদ্বয় ক্ষমতার আসনে আছেন। এবং সেই কারণে ভারতের বহির্দেশে আমাদের বিরুদ্ধে শয়তানি ও চক্রান্ত সমানে চলিবে যেমন এখন নেপালে চলিতেছে, এবং ভারতের ভিতরে পঞ্চমবাহিনী নির্মাণে ও গুপ্তচর স্থাপনে চীনের অর্থসামর্থ্য এখনকার মতই থাকিবে।

পাকিস্থানেও জনমতের মূল্য কাণাকড়ি নাই, আছে একনায়কত্বের। দেশ চলে সেখানে মার্কিন সাহায্যের বলে ও ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জিগীরে। সেখানে আপোষের অর্থ কি তাহা উ থাণ্ট ও তাঁহার উপাখ্যানে দেওয়া আছে। সেখানেও অগ্রসর হওয়ার অর্থই ক্ষতি ও মানমর্য্যাদার অপচয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণে সেখানেও ভারতের শান্তিকামনার চেষ্টায় ব্যর্থতার ইঙ্গিত রহিয়াছে। পররাষ্ট্র ও বহির্জগৎ সম্পর্ক তাঁহার ভাষণে আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের বিষয়ে এতকাল আমরা রাষ্ট্রপতির ভাষণে শুধু কংগ্রেস সরকারের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যের কথাই শুনিতাম। এই প্রথম সতর্কবাণীর আভাস পাওয়া গেল। মনে হয় দিল্লীর রাজসিক আড়ম্বরের মোহ ও ঝলক বোধ হয় শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ এবার পিছনে ফেলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছেন, সেইজন্যই কাণ্ডারীবর্গকে হুঁসিয়ারির ডাক দিয়া গেলেন।

## পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রিসভা

গত রবিবার ২৭শে ফাল্গুন, কলিকাতা রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আনুগত্য ও সংগুপ্তির শপথ গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ১৬ জন মন্ত্রী রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর নিকট এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের তালিকা চূড়ান্তভাবে স্থির না হওয়ায় তাঁহাদের শপথগ্রহণ আপাততঃ স্থগিত আছে। নূতন মন্ত্রিসভার সম্পর্কে আনন্দবাজার বলেন :—

"পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে এই নির্ব্বাচনের পর যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই মন্ত্রিসভাটি পঞ্চম। ১৯৫৭ সনে চৌদ্দজন পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীবিমল সিংহ এবং হেমচন্দ্র নস্কর পরলোকগমন করেন। শ্রীআব্দুস সত্তার ও শ্রীভূপতি মজুমদার এবারকার নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। ডঃ খাঁর আমেদ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্যের নূতন এই মন্ত্রিসভায় উপরোক্ত পাঁচটি পদ পূরণ করিয়া আরও দুইজন নূতন মন্ত্রী লওয়া হইতেছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কার্য্যকলাপ ও দায়িত্ব বহু বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই মন্ত্রী-সংখ্যা এবার বৃদ্ধি করিয়া ষোলজন করা হইয়াছে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলে উল্লিখিত হয়।

নূতন মন্ত্রিসভার ১৬ জন মন্ত্রীর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিদায়ী মন্ত্রিসভার ৮ জন সদস্য আছেন। বিদায়ী মন্ত্রিসভার ৩ জন রাষ্ট্রমন্ত্রীকে পূর্ণ মন্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়া নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয়। বাকি ৫ জন এইবার নূতন মন্ত্রী হইয়াছেন। তাহার মধ্যে অবশ্য একজন, ডঃ জীবনরতন ধর, ডঃ রায়ের পূর্ব্বের এক মন্ত্রিমণ্ডলীতে রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। গত মন্ত্রিসভার একজন সদস্য শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণকে নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয় নাই।

বিদায়ী মন্ত্রিসভার ৮ জন সদস্যের মধ্যে আছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জি, শ্রীঈশ্বরদাস জালান, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ।

রাষ্ট্রমন্ত্রী হইতে পূর্ণ মন্ত্রীর পদে উন্নীত ৩ জন হইতেছেন—শ্রীজগন্নাথ কোলে, শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জ্জি। ৫ জন নূতন মন্ত্রীর মধ্যে আছেন—ডঃ জীবনরতন ধর, শ্রীশৈলকুমার মুখার্জ্জি, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীমতী আভা মাইতি ও শ্রীফজলুর রহমান।

মন্ত্রীদের নাম এবং ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন পরিচালনা, রাজনৈতিক বিষয়, পরিবহন, সংবিধান ও নির্ব্বাচন, স্বরাষ্ট্র বিভাগের দুর্নীতি দমন এবং এনফোর্সমেণ্ট শাখা, অর্থ, উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, মৎস্য এবং গৃহনির্ম্মাণ।

(২) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—খাদ্য, কৃষি এবং সরবরাহ; (৩) শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি—পুলিস, প্রতিরক্ষা, পাসপোর্ট এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রেস শাখা; (৪) শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পূর্ত্ত; (৫) শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জি—সেচ ও জলপথ; (৬) শ্রীঈশ্বরদাস জালান—আইন; (৭) শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা, (৮) শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, বন এবং সমবায়; (৯) শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়—কারা এবং সমাজ কল্যাণ; (১০) শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য—ভূমি ও ভূমি রাজস্ব; (১১) শ্রীজগন্নাথ কোলে—স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রচার শাখা, আবগারী এবং পরিসর্দায় কার্য্যকলাপ; (১২) ডঃ জীবনরতন ধর—স্বাস্থ্য; (১৩) শ্রীশৈলকুমার মুখার্জ্জি—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং পঞ্চায়েৎ, সমাজ উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, উপজাতি কল্যাণ; (১৪) শ্রীমতী আভা মাইতি—উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন এবং রিলিফ; (১৫) শ্রী এস, এম, ফজলুর রহমান—পশু পালন ও পশু চিকিৎসা; (১৬) শ্রীবিজয়সিং নাহার—শ্রম।"

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের "কার্য্যকলাপ ও দায়িত্ব" অনেক বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই মন্ত্রিসংখ্যা এবার বৃদ্ধি করিয়া ষোলজন করা হইয়াছে, একথা "ওয়াকিবহাল মহলে" কে বলিয়াছেন জানি না। কিন্তু তাহাই একমাত্র কারণ বা প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয় না। যদি তাহা হইত তবে কয়েকজন সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য মন্ত্রীকে তাঁহাদের পুরাতন দপ্তর হইতে সরাইয়া দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত কাহাকেও সেখানে দেওয়া হইত। উপরন্তু বিভাগীয় সচিব ও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও কর্ম্মীবৃন্দের কাজে নিদারুণ অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা—যাহার দরুণ প্রত্যেকটি দপ্তরের "কার্য্যকলাপ" বিষম ত্রুটিপূর্ণভাবে ও অসম্ভব দেরীতে চলিতেছে—দূর করিবার জন্য অন্য কোনও পথ সরাসরিভাবে গ্রহণ করার লক্ষণ দেখা যাইত। মন্ত্রীসংখ্যা চৌদ্দ হইতে ষোল বা বত্রিশ এবং একশত সাতান্ন করিলে কোনও দপ্তরের কোন বিভাগ অধিকতর কার্য্যতৎপর হওয়া সম্ভব নয়—বরঞ্চ বিপরীত ব্যবস্থাই ঘটিবে। অবশ্য যদি নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যগণ দেশের লোকের অবস্থা ও মনোভাব সম্পর্কে প্রকৃতরূপে অবগত থাকেন তবে হয়ত তাঁহারা নিজ নিজ দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন ও সজাগ থাকিবেন।

প্রাক্তন মন্ত্রীদের মধ্যে দুইজনের দপ্তর বদল হইয়াছে, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ কুটীর, ক্ষুদ্রশিল্প এবং বন ও সমবায় এই কয়টি বিভিন্ন দপ্তর লইয়াছেন। শ্রীঈশ্বরদাস জালান আইনদপ্তর লইয়াছেন। দুইজনেই কর্ম্মঠ লোক তবে শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের দপ্তরগুলি অশেষ খুঁটিনাটি ও বিভিন্ন প্রকার সমস্যায় পূর্ণ। বাংলার কৃষক ও দরিদ্র সাধারণের উন্নয়নের একমাত্র উপায় সমবায় ব্যবস্থাকে বলিষ্ঠ ও সম্প্রসারিত করা এবং সে কাজে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন অসাধু অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারী ও সদস্য বিতাড়ন। প্রথমটি অর্থাৎ কর্ম্মচারী সম্পর্কিত ব্যবস্থা মন্ত্রী দৃঢ়চেতা হইলে সম্ভব হইতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টি "পার্টি" নামক প্রতিষ্ঠানের অংশ—যেখানে ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়। কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প এদেশে খুবই সম্প্রসারিত হইতে পারে, কিন্তু সেখানেও ঐ দুই দোষ এখন ব্যাপক হইয়া চলিতেছে—একই কারণে। শ্রীঈশ্বরদাস জালানের দপ্তরেও ঝঞ্চাট অনেক, তবে শ্রীজালান স্থিরবুদ্ধি ও প্রবীণ লোক।

নূতন যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের আমরা শুভেচ্ছা জানাই এই বলিয়া যে, তাঁহারা যেন দলীয় গর্ত্তের কূপমণ্ডুকের অস্তিত্বে সন্তুষ্ট না থাকেন। পুরাতন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের বিষয়ে অধিক কিছু বলা বৃথা তবে তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর না হইয়া সতেজ হউক এই ইচ্ছা আমরা জানাই।

মুখ্যমন্ত্রীর "কর্ণেন পশ্যতি" রোগ হইতে মুক্তিকামনা জানাইয়া এই অবান্তর প্রসঙ্গ শেষ করি।

## রাজ্যপালের ভাষণ

বিগত ২৯শে ফাল্গুন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, নির্ব্বাচনোত্তর বিধানসভা ও পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিয়াছেন। ঐ বক্তৃতার যে সকল বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার সময়কালে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তবৃত্তান্তই প্রধানতঃ পাইয়াছি। খাদ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টার কথায় তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে একরপ্রতি গড়ে ১৫ মণ চাউল উৎপাদনকে ২৭ মণ করিতে পারিলে এই চেষ্টা সফল হইবে, কেননা তাহাতে আবাদী জমির অর্দ্ধেক চাষ করিলেই এই রাজ্যের চাউলের চাহিদা সম্পূর্ণ ভাবে মিটান যাইবে। বাকী জমিতে নগদমূল্যে বিক্রয়ের শস্যাদি চাষ করিলে চাষীর ও শিল্পের উন্নয়নপথ মুক্ত থাকিবে। এই চাউলের ফসল বৃদ্ধির জন্য যাহা প্রয়োজন সে বিষয়ে রাজ্যপালের বিবৃতির সারাংশ আনন্দবাজার নিম্নরূপে দিয়াছেন:

"রাজ্যপাল বলেন, এই রাজ্যে প্রাপ্ত গোবরের এক-চতুর্থাংশও যদি সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়

তাহা হইলে ৭০ লক্ষ একর জমিতে সার দেওয়া যায়। পল্লী-এলাকায় বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থার জন্য এই রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি নিম্নতাপের কারবনীকরণ কারখানা স্থাপনের কথা চিন্তা করা হইতেছে। সরকার দুর্গাপুরে বাৎসরিক প্রায় এক লক্ষ টন ইউরিয়া উৎপাদন-ক্ষম একটি ফার্টিলাইজার কারখানা স্থাপন করিতে চান। এ বিষয়ে একটি বৈদেশিক সংস্থার সহিত আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

তৃতীয় যোজনাকালে ৩০০০ গভীর নলকূপ বসানর প্রস্তাব আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ইতিমধ্যেই বসান হইয়াছে। ইহাদের মাধ্যমে জল সরবরাহের দরুন বহুস্থানে এক-ফসলী এলাকা দ্বি-ফসলী, এমনকি ত্রি-ফসলী এলাকায় পরিণত হইয়াছে। বিদ্যুৎশক্তিতে এই নলকূপগুলি চালান হইবে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তি গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য কাজে লাগান যাইবে। ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা আছে। কংসাবতী প্রকল্প সম্পূর্ণ হইলে ৮ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ হইবে। ২ লক্ষ একর জমিতে জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হইতেছে।"

শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে রাজ্যপাল কোনও আশার ইঙ্গিত দিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে নূতন ধারা চলিতেছে তাহাতে দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নহে। বুনিয়াদ কাঁচা, মাঝের নির্ম্মাণ ও গঠন খেলো ও খাপছাড়া, তাহার উপর গগনচুম্বী প্রাসাদতল গাঁথিবার প্রয়াস কখনই সফল হইতে পারে না। আমরা আশা করি রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও অধিক মনোযোগ দিবেন। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় যাহা ভাষণে আছে তাহা আশাপ্রদ। দেশের শিশুসন্তানের শতকরা ৮০টি যদি প্রাথমিক শিক্ষা পায় ত ভালই। অন্য সকল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

## কলিকাতার উন্নতিসাধন

কলিকাতার উন্নয়ন প্রয়োজন এ কথা সর্ব্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। এখানের পথঘাটের অবস্থা শোচনীয় কেননা এতদিন মেরামতের নামে চুরি ও জোড়াতালি দেওয়াই হইয়াছে, সম্প্রতি ট্রাম লাইন যুক্ত রাজপথগুলিতে মেরামতের কাজ চলিতেছে—তবে অতি মন্থর গতিতে এবং খামখেয়ালির তালে। রাত্রে এই পথঘাটগুলিতে আলো দেওয়ার নামে ছায়াবাজী দেখাইবার ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ অঞ্চলে আলো অতি সামান্য, ছায়া কিছু অধিক এবং বাকি সবই অন্ধকার। বৈদ্যুতিক বাতি যেখানে আছে সেখানে সাধারণতঃ পাশের বাড়ীর তেতলা ও চার তলার ঘরগুলিতে তীব্রতম আলোর ঝলক আসে, বাকি আলোর অধিকাংশই যায় আকাশে, পথে সামান্য আলোর দেখা পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি রাজপথে বৈদ্যুতিক বাতিগুলি গাছপালার মধ্যে এমন ভাবে বসান আছে যে, রাত্রে সেই পথগুলিতে বিজলীর আলোর চাইতে তারার আলোই বেশী উজ্জ্বল মনে হয়। গ্যাসের আলো যে-সকল পথে ও গলিতে আছে সেখানে গ্যাস-বাতি নিরীক্ষণ করার জন্য টর্চ্চ-বাতির প্রয়োজন। কেননা অধিকাংশ গ্যাস-বাতিই জ্বলে কিন্তু আলো দেয় না। টর্চ্চের আলোয় বাতির মুখ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটি ক্ষীণ শিখা জ্বলিতেছে। আবার গ্যাসের আলোর অঞ্চলে শতকরা বিশ-পঁচিশটি "আলোক স্তম্ভ" ঘনীভূত অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ সেখানে স্তম্ভের উপরে আলোর কোনও ব্যবস্থাই নাই, উপরের অংশ 'লোপাট" বা "পাচার" হইয়াছে, স্তম্ভগুলি আছে ফুটপাথের পদচারী-দিগের রাত্রের অন্ধকারে "হোঁচট" খাইবার জন্য কিংবা রাত্রের পাহারাওয়ালা পুলিসের ঠেস দিয়া নিরাপদে ঘুমাইবার জন্য।

দিনের আলোয় দেখা যায় পথের পাশে বিরাট জঞ্জলের স্তূপ, দোকানের সারি এবং ফুটপাথের উপর ফেরীওয়ালার বেসাতি এবং পথে যানবাহনের অবিশ্রান্ত গতি। তাহার মাঝে পথিক চলিতেছে ঠেলাঠেলি করিয়া, লাফাইয়া, ডিঙাইয়া ও আঁকাবাঁকা গতিতে পাশ কাটাইয়া। পথ পার হইতে হইলে তাহাদের মধ্যে কেহবা চক্ষু মুদিয়া পার হয়, কেহবা একসঙ্গে চতুর্দ্দিকে দেখিতে চেষ্টা করায় বিফল হইয়া "ধুত্তোর" বলিয়া সোজা পার হয়। আগেকার দিনে বড় পথগুলি দিনে দুইবার ধোওয়া হইত, ছোট পথ ও গলি একবার। এখন বড় পথগুলিতে "হাইড্রাণ্টের জল" পড়ে সপ্তাহে দুইবার কি তিনবার, অন্যগুলিতে পড়ে বর্ষার জল। আবার সেই বর্ষার জল কখনও বা পথঘাট প্লাবিত করিয়া ভাসাইয়া আনে কাদামাটিমিশ্রিত নগরের দুর্গন্ধ ক্লেদ, এবং তাহারই এক স্তর পড়ে সর্ব্বত্রই। যাহা পরের বর্ষণে ধুইয়া না যায়, তাহা ধুলার আকারে নগরবাসীর অন্নে, বস্ত্রে ও পানীয় জলে মিশিয়া আশীর্ব্বাদ জানায় নাগরিককে সংক্রামক রোগের স্পর্শে।

কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব—

সাধারণ বাঙালীর পক্ষে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্ছেদ কলিকাতায় যেমন হইয়াছে তেমন বোধ হয় ভূ-ভারতে কোথায়ও হয় নাই। অবশ্য পণ্ডিত নেহরুর Socialistic pattern of State-এ মধ্যবিত্তের কোনও স্থান নাই, যদি তার "পার্টি"র সঙ্গে কুটুম্বিতা না থাকে।

এ নগরের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক কল্যাণ-ব্যবস্থা একদিন ভারতবিখ্যাত ছিল। আজ তাহার বিপরীত অবস্থাই আসিয়াছে এবং কুখ্যাতিও সেইজন্য জগদ্বিদিত। অথচ আমাদের কর্ণধারদিগের অধিকাংশের মতে পশ্চিমবঙ্গ বলিতে কলিকাতাই বুঝায়—নির্ব্বাচনী পালা সাঙ্গ হওয়ার পর। সেই কারণেই বোধ হয় নির্ব্বাচিত কংগ্রেস সদস্যদিগের সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এই কলিকাতারই বিষয়ে আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন। যুগান্তর বলেন :

"চাঁদনিচকে শ্রীঅশোক সেন ও শ্রীবিজয় সিংনাহারের সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, কলিকাতার সমস্যা ও চাহিদা দুই-ই বেশী। কলিকাতার জন্য উন্নত ধরনের জলনিকাশন ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন। মহামারী রোগের জন্য সাকল্য ব্যবস্থার দরকার; বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পল্লী বাংলায় কলেরা মহামারী নাই। কিন্তু কলিকাতায় আছে এবং কলিকাতায় উহার উৎস হইল বস্তিগুলি। প্রায় সাত লক্ষ লোক বস্তিগুলিতে বাস করে। বস্তিবাসী-দের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে না পারিলে কলিকাতার উন্নতি হইবে না ও উহার দুর্নাম ঘুচিবে না।

"তিনি বলেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরে কলিকাতার এ সমস্যাগুলি দূর করার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা তাহা দূর করার কাজে হাত দিয়াছেন। আগামী পাঁচ বৎসরে কলিকাতার অনেক সুপরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া তাঁহার আশা আছে। তবে এই পরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতাকে বাড়াইতে হইবে এবং বাড়াইবার কাজে নাগরিকদের মাঝে মাঝে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। নিজেদের স্বার্থে জনগণ যাহাতে অসুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া সরকারের সঙ্গে সহ-যোগিতা করেন, তজ্জন্য তিনি আবেদন জানান।

"তিনি বলেন যে, ব্যক্তিবিশেষ যতই শক্তিশালী হউক না কেন জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁহার পক্ষে জনকল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব হয় না।"

এখানে আমাদের প্রশ্ন মাত্র দুইটি। প্রথম এই যে, সম্প্রসারণে কলিকাতার সমস্যা জটিলতর হইবে কি না। নয়াদিল্লী নির্ম্মাণে জমির দাম প্রায় কিছুই লাগে নাই প্রথমদিকে এবং তখন নির্ম্মাণের ব্যয়ও ছিল কম। এবং এখন নয়াদিল্লী চলে শুধু সারাভারতের অর্থবলে নয়, পৃথিবীর অনেক দেশের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত নানা বিভাগের অর্থসাকুল্যে। কিন্তু তাহাতে পুরাটা দিল্লীর বা দিল্লীর প্রাচীন নাগরিকদের সন্তানদিগের কি উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে বা তাহাদের কি লাভ হইয়াছে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়া যে দুইটি বড় রেলপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের দুইপাশে যে সকল ছোট-বড় নগর আছে, সেগুলির উন্নয়ন করিলে এবং সেখানে নূতন ভাবে কর্ম্মের সংস্থান করিলে কলিকাতামুখী জনস্রোতের কিছুটা ভিন্নপথে চলে কি না? এই প্রদেশের বৈদ্যুতিক সরবরাহ ও রেলপথের বৈদ্যুতি-করণ ত এই পাঁচশালা যোজনার মধ্যেই আছে। যদি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব রেলপথগুলির পূর্ণভাবে বৈদ্যুতি-করণ হয় ও বোম্বাইয়ের মত বৈদ্যুতিক রেলের ব্যবস্থা হয় তবে বহুলক্ষ পরিবার কলিকাতার বাহিরে যাইয়া ধনে-প্রাণে বাঁচিবে ও সত্যসত্যই কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার অবসর পাইবে। এ বিষয়ে কি কিছুই করা যায় না? বিদেশের প্রায় সকল বিরাট নগরীতে কর্ম্মীদল বাহিরে থাকে। নগরে তাহাদের কর্ম্মস্থল মাত্র, সেখানে তাহারা আসে রেলপথে, মোটরে বা দ্রুতগামী ট্রামে।

"কল্যাণীর" কল্যাণব্রত আটকাইয়াছে রেলপথের ব্যবস্থার অভাবে। ডাক্তার রায়, কলিকাতার নীচে সুড়ঙ্গপথে রেল চালাইবার পূর্ব্বে ঐ দিকে যদি তাঁহার পূর্ণদৃষ্টি কিছুকালের জন্য দান করেন তবে বহুলোক উদ্ধার হয়। বারাসাত-বসিরহাট রেলপথ চালু হওয়ায় সে অঞ্চলের নৈরাশ্য অনেক দূর হইয়াছে। অন্য অঞ্চলেও অনুরূপ উপকার ও উন্নয়ন সম্ভব মনে হয়।

## হত্যা নহে কি ?

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সকল খবরের কাগজে এক জাতীয় খবর ক্রমাগত বাহির হইতেছে। এই খবরগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বাংলা দেশের বিশেষ করিয়া কলিকাতার রাজপথে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা-দিগকে লরি অথবা বাস চাপা দিয়া হত্যা করা একটি অতি সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও কৈলাস বোস ষ্ট্রীটের চৌমাথা অথবা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের কোন অংশে এক বা একাধিক শিশুকে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। প্রত্যহই ঐরূপ ঘটিতে পারে এবং ঘটনাস্থলে কিছু উত্তেজনার সঞ্চার হইলেও বাংলার নরনারী ঐ প্রকার

মাত্র। বস্তুর অন্তরের গভীর সত্যের উপলব্ধির জন্য চাই সৃষ্টির সক্রিয় উৎসাহ। এতে আছে মানুষের অনুভূতির গাম্ভীর্য এবং কেবল দৃষ্টির গভীরতা। প্রথমটি আবিষ্কার করে বিজ্ঞান, অন্যটি প্রকাশ করে আর্ট। প্রথমটি আমাদের সাহায্য করে সব বস্তুর মূল কারণ বিষয় বোঝাবার আর দ্বিতীয়টি দৃশ্যবস্তুর আকার দেয়। বিজ্ঞানে আমরা সন্ধান করতে চাই অলৌকিক সৃষ্টির আদি থেকে সাধারণ নিয়ম ও রীতির বিষয়। আর্টে আমরা মুহূর্তে যা দেখি তার রূপকেই রূপায়িত করি আর তার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যকে এবং বৈচিত্র্যকে আমরা সম্ভোগ করি। আর্ট এক বিশেষ প্রকারের জ্ঞানের উপলব্ধি দেয়। শেফটসবারি ( Shaftasbury ) বলেন, "সব সৌন্দর্যই সত্য" ( all beauty is truth )।

সৌন্দর্যের সত্য—বস্তুর প্রতি সহানুভূতির মানস চিন্তার মধ্যে আছে। যদিও বিজ্ঞান ও আর্ট দু'টি ভিন্ন পথের যাত্রী। কিন্তু একটি অন্যকে সরাতে পারে না। অনুভূতির ব্যাখ্যা যা বিজ্ঞান দেয় তা আর্টের মনঃসংজ্ঞার ব্যাখ্যাকে স্থানচ্যুত করাতে পারে না। উভয়েরই বিশেষ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং প্রত্যেকের বিশেষত্বও আছে।

আর্ট আমাদের মানসে নির্মাণ করার ( visualize ) ক্ষমতা দেয়। কেবল মাত্র ভাবনায় পরিবেশিত করে না। চাক্ষুষ করে ধ'রে দেয় আদিবস্তুর ( reality ) উজ্জ্বলবর্ণ ও আকার দিয়ে। আর্টে—গভীর দৃষ্টি দেয় বস্তুর বাইরের কাঠামোর মধ্য দিয়ে অন্তরের রূপকে প্রকাশ করার দ্বারা। মানুষও আদিপ্রকৃতিকে ধরার জন্যে একটা বাঁধা পথ নিয়ে থাকতে পারে না—আর্টে তাই তার রূপ ধরে বহুতর বিচিত্র ভাবে।

বৈজ্ঞানিকের সত্যে থাকে ইন্দ্রিয়গত দ্রব্যের বাইরের বর্ণনার সততার মধ্যে। শিল্পীর সত্য মনঃসংজ্ঞার সহানুভূতির দ্বারা অভিজ্ঞতা অনুরূপ স্পষ্ট প্রকাশের মধ্যে ( The principles of aesthetics-De with 4 parker )।

### নবভাবে আদিমকল্প ( Neo-Primitiveism )

যুরোপের দার্শনিক বিশ্লেষণের পালা আজও শেষ হয় নি আর্টের ব্যাপারে। আর্টের মধ্যে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যুরোপ দেয় নি। দিয়েছে তার বাস্তব ভাব ফোটাবার টেক্‌নিকের দিকে এবং ক্রমশঃ কেবল আকারের প্রতি। টলষ্টয় থেকে আরম্ভ ক'রে "আর্ট কেবল আর্টেরই জন্য" ( art for art sake ) এই মত পোষণ করে আসছে যুরোপ। ফলে তার বিষয়বস্তুর নির্বাচন, পরিকল্পনা এবং পরিবেশনের মধ্যে যে গুণ আছে তা একেবারেই উপেক্ষিত হয়েছে।

আদিম গুহাবাসীদের ছবি আঁকার প্রচেষ্টার মধ্যে নব-আদিভাবের ( Neo-Primitive ) উন্মেষ হ'ল যুরোপে। আর্টের সংগত শিক্ষিত ও বলিষ্ঠ পরিকল্পনা রীতির উন্নতি অব্যবহিত পূর্বপুরুষ করে গেছেন তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া এখন একেবারে মানা হয়ে গেছে। আদি-পুরুষের অভিজ্ঞতা না নিয়ে আদিমানবের অপটুত্বকেই ফিউচারিষ্ট ( Futurist ) এবং সুর-রিয়া-লিষ্টরা ( surrealist ) বরণ করলেন। যা প্রিমিটিভ (আদিম) তা আবার 'নিও'—অর্থাৎ নবীনতর কি করে হয় ? কিন্তু যুরোপের বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে যে Prognosis ভাবে নবতর বিচারে আদি সত্যকে ভাঙ্গা হচ্ছে তার কে জবাব দেবে ?

### যুরোপে আদি ভাব আসার মুল কারণ

যুরোপে আদি ভাব আসার মুল কারণ—(১) খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ থেকে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চিত্রকলা ব্যায়, জান্তাইন বা গথিক শৈলীতে জীবন্ত করে মন থেকে আঁকা না হওয়ায়; (২) রেনেসাঁর আদি থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সামনে মডেল বসিয়ে জীবন্তভাবে আঁকার প্রবর্তন হওয়ায়; (৩) যুরোপে এই অতি-বাস্তব-ভাবে প্রকৃতিকে চিত্রপটে ( দর্পণে প্রতিবিম্বের মত ) হুবহু ফলানর রীতি যখন খুবই অগ্রসর হয়েছে তখন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ফটোগ্রাফী আবিষ্কার হওয়ায় এখন এইরূপ নবতর বিচারে আর্ট প্রিমিটিভে নেমে গেছে যুরোপে।

মানুষকে ষ্টুডিও কামরায় বসিয়ে নানা ভঙ্গিতে একভাবে স্থির রেখে আঁকার ফলে মডেলের আড়ষ্ট ভাব যুরোপের সর্বত্র চিত্রকলায় থেকে গেছে। ভঙ্গিগুলিতেও স্বাভাবিক বেঁক নেই—অভিনয়ের আড়ম্বর ভাবই ফুটে আছে। যুরোপ সে কথা বুঝেছে ফটো আবিষ্কার হবার পর। ভারতবর্ষে মোগল আমল পর্যন্ত মন থেকে ছবি আঁকা হ'ত বলে মডেলের এই দোষ তাতে কোথাও বর্তায় নি। আধুনিক যুরোপে আর্টে বিষয়বস্তুর নাগপাশ ছিন্ন করার বিশেষ কারণ হ'ল সিনেমা। সিনেমায় ক্যামেরার সাহায্যে চলচ্চিত্রে বহু গল্প বর্ণনা করা যায়, কিন্তু চিত্রকলায় নভেল-নাট্যকের চিত্র আঁকলে তা কেবল Illustrationই হয়, আর্ট হয় না। ইটালীর রেনেসাঁ স্কুল থেকে নিয়ে বহু শতাব্দী ধ'রে খ্রীষ্টধর্মের [illegible]

চিত্র আঁকা শেষ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের মত পৌরাণিক গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার নেই। প্রতীকেরও বাড়াবাড়ি নেই। তাই ললিতকলা যা বিষয়বস্তুর ভাব নিয়েই রস পরিবেশন করেছে তাকে একেবারে পণ্য-বিজ্ঞাপনী চিত্রের মূক-প্যাটার্ণে ঢেলে সাজানর ব্যবস্থা হয়েছে আধুনিক ভাবের আর্টে। ছবি তাই আর কথা বলে না, একেবারেই মূক। তাছাড়া এই প্রকার মূক-প্যাটার্ণ আর্টে হওয়ায় তার দেশকাল পাত্রের বিচারও চলে না। এমনকি কোন শিল্পীর হাতে-আঁকা প্যাটার্ণ সবচেয়ে ভাল, তারও বিচার করা চলে না। প্যাটার্ণটা এক এক শিল্পীর হাতে অভ্যাসবশতঃ বহু রচিত হয়। তাতেই যেটুকু তফাৎ দেখা যায় কিন্তু তার স্থায়ী গুণ কোনটিতেই বর্তমান থাকে না। বিজ্ঞাপনের দ্বারা আধুনিক আর্টিষ্টকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়—তার কাজের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

একটা যে-কোন আধুনিক আর্টের প্রদর্শনী দেখার পর দর্শক যে কি দেখলেন তাও তাঁর মনে ছাপ রেখে দেয় না। বিষয়বস্তুর গুরুত্বযুক্ত পরিকল্পনা-প্রধান চিত্র কলার বর্ণিত বিষয় মানুষের মনে ছাপ রেখে দেয়; প্রদর্শনীতে ছবি দেখার পর সমস্ত জীবন কোন কোন চিত্রকে মনে রাখতে পারেন দর্শক। দি ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে কলিকাতায় যে সব বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা ছবি প্রদর্শিত হ'ত তা যাঁরা দেখেছেন এ কথা স্বীকার করবেন।

অবনীন্দ্রনাথের 'তাজের স্বপ্ন', 'গণেশজননী', 'দারা-শিকো', 'চাঁদনী রাতের জলসা'; ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'তমালতলে রাধা'; সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর 'কার্ত্তিক', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'; শৈলেন্দ্রনাথ দে'র 'বিরহী যক্ষ'; সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'আলোকে-পতঙ্গ'; হাকিম মহম্মদের 'লয়লা মজনু' প্রভৃতি ছবি আজও তাই আমাদের চোখে ভাসছে। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপের নকলে শত শত প্রদর্শনী আজকাল দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বেতে দেখে ফিরে এসে তার কোন স্মৃতির চিহ্নও নেই। মডার্ণ আর্টের এই এক বিরাট্ সুবিধা সেটা কেবল 'দেখন্-হাসি' মনকে ভালবাসায় আকর্ষিত ও অভিভূত করে না—মনেও থাকে না তার রূপ।
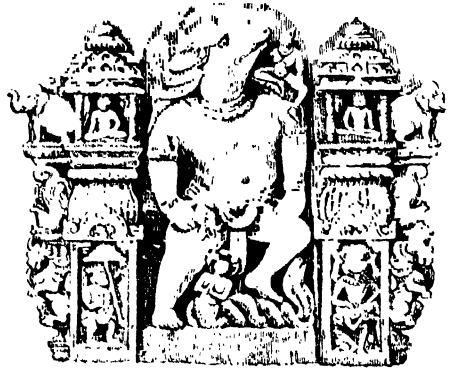
# আবিষ্কার

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

গিয়েছিলাম একবার ছুটিতে বেহারে মেজমামার বাড়ী। মেজমামা বেহারী নন, হাজারীবাগ জেলার ছোট একটা শহরে বহুকাল বাস করছেন তাই চারপাইতে শয়ন, অড়হরদাল ও রামতরই-এর তরকারি খেতে ভালবাসেন, আমাকে দেবেন্দ্র ব'লে না ডেকে হাঁক দেন দেবেন্দর ব'লে। ধূলিময় সরু পথের দু'ধারে ছোট ছোট দোকান, উঁচু-নীচু মাঠ, দূরের পাহাড় আর শালবন, এখানকার সবই যেন রহস্যময় মনে হ'ত।

মেজমামা চিরকুমার, তাঁর সংসারে একমাত্র চাকর পরসাদ আর গোটাদুই কুকুর ছাড়া আর কেউ নাই। লোকালয় থেকে দূরে মাঠের মাঝখানে বাড়ী, ঘরের জানালা খুললেই চোখে পড়ত দক্ষিণ দিকে ছোট ছোট পাহাড় একের পর এক নিশ্চল তরঙ্গের মত দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের কোলে ছিল একখানা গ্রাম, ঘরগুলো দেখাত খেলাঘরের মতই ছোট ছোট। মাঠের মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলার পথ এঁকেবেঁকে সেই গাঁয়ের দিকে চলে গেছে। প্রায়ই দেখতাম লালশাড়ী-পরা মেয়ে মাথায় মস্ত পোঁটলা আর কাঁখালে ছেলে নিয়ে চলেছে আগে, পাগড়ি বাঁধা, হাতে লাঠি মরদ চলেছে পাছে পাছে। মনে হ'ত এ যেন এক ছবির দেশ, ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে সাজান রয়েছে কতরকম ছবি। দুপুরবেলা ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ে এসে পড়ত বাগানে, কি সুন্দর তাদের গায়ের রং, সবুজ বললে তা সবটা বলা হয় না। যেমন হঠাৎ আসত তেমনি হঠাৎ উড়ে চ'লে যেত পাহাড়ের দিকে।

ভেবেছিলাম এই শুকনো পাথরের দেশে দু'চার দিনের বেশী ভাল লাগবে না, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই পাহাড় আর শালবনের রহস্য মনকে অভিভূত ক'রে ফেলতে লাগল। দিনেরবেলা প্রায়ই মেজমামার দেখা পাই না, তিনি এখানকার একজন মাতব্বর ব্যক্তি, হরেকরকম কাজে সারাদিন বাইরে ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যাবেলা কাজের শেষে বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে যখন এসে বসেন, পরসাদ এক প্লেট আলুভাজা আর এক পট চা এনে পাশে রাখে তখন তাঁর মত সুখী দুনিয়ায় আর কেউ থাকে না। আমিও এসে বসি পাশে, সুরু হয় সাহিত্য আলোচনা। মেজমামা আধুনিক সাহিত্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন, আমি প্রাণপণে বাধা দি, তিনি যদি অগ্নিবাণ মারেন ত আমি মারি বরুণবাণ। এইভাবে লড়াই চলতে থাকে অনেক রাত পর্যন্ত।

সেদিন সন্ধ্যা লাগতেই দেখি আকাশে খণ্ডচাঁদ উঠেছে, ক্ষীণ জ্যোৎস্না চারিদিকে একটা রহস্য সৃষ্টি করেছে। চুপচাপ ব'সে আছি এমন সময় মেজমামা কর্ম-অন্তে বাড়ী ফিরলেন, ইজিচেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে বললেন, "এত গম্ভীর কেন?"

বললাম, "আপনাদের এই জংলা জায়গাটার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেছি।"

মেজমামা সিধে হয়ে বসে বললেন, "এ জায়গাটাকে তুই জঙ্গল বলছিস্?"

বললাম, "জঙ্গল নয়ত কি?"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মেজমামা বললেন, "এক সময়ে এটা জঙ্গল ছিল, পাড়াগাঁ ছিল, এখন শহর হয়েছে।"

অবাক্ হয়ে বললাম, "শহর কোথায়?"

মেজমামা বললেন, "কেন, ঐ যে স্টেশনে যাবার সড়কের দু'দিকে কলকাতার বাবুদের বাগানওয়ালা বড় বড় বাড়ী আর ডি. ভি. সি.-র বিজ্লী—শহরের সারবস্তু ত ঐ দু'টি।"

আমি বললাম, "বাড়ীগুলোর দরজায় ত তালা ঝুলছে দেখি—লোকের সাড়াশব্দ পাই না।"

মেজমামা হাত নেড়ে বললেন, "আসিস্ একবার পুজোর সময়, তখন দেখতে পাবি ঐ সব ইন্দ্রপুরীর দ্বার খুলে গেছে, বিজ্লীর আলো জ্বলে উঠেছে, ঘরে ঘরে রেডিও বাজছে, রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে মোটরগাড়ী ছুটো-ছুটি করছে, বাজারে কচু কাঁচকলা থেকে সুরু ক'রে কাঁচি ক্যাপ্স্টান পর্যন্ত সব জিনিষের দাম বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, গ্রাম ছিল চল্লিশ বছর আগে যখন আমরা এখানে প্রথম এসে বাড়ী করি।"

মেজমামার আর একটু কাছে সরে এসে উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, "তখন কিরকম ছিল, মেজমামা?"

প্রশ্ন শুনে মেজমামা উৎসাহে উঠে বসলেন, বললেন, "তখন পাকাবাড়ী বলতে এখানে ছিল দু'খানা, আমাদের বাড়ী আর স্টেশনের ধারে কাঠের ব্যবসাদার রামসিংয়ের বাড়ী। বড় রাস্তায় তখন বয়েলগাড়ীও চলত না, মোটর-গাড়ীর কথা ছেড়ে দে। বাড়ীর সুমুখে মাঠের মাঝখানে ঐ যে বাঁকা মহুয়াগাছটা একা দাঁড়িয়ে আছে ঐখান থেকে সুরু হয়েছিল শালবন, এই বারান্দায় ব'সে হরিণ চরছে দেখতাম।"

সামনের ফাঁকা মাঠটার দিকে তাকালাম, মনে হ'ল যেন অতীতে ফিরে গেছি, বড় বড় শালগাছ আমাকে ঘিরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মেজমামাকে বললাম, "আচ্ছা মেজমামা, আপনি ত এই অরণ্যলোকে বহুদিন বাস করছেন, আপনার জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্য যে ঘটনা এখানে ঘটেছে সেটা আজ বলুন।"

মেজমামা বললেন, "আশ্চর্য ঘটনা! কাকে বলি আশ্চর্য ঘটনা! সে আমলে পথ চলতে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ ঘটেছে, সে সব আর আশ্চর্য বলব না।"

একটু হতাশ হয়ে বললাম, "তা হলে আশ্চর্য কিছুই কি ঘটে নি?"

মেজমামা অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে থাকলেন যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন, তার পরে হঠাৎ উঠে বসে বললেন, "হ্যাঁ, একটা ঘটনা ঘটেছে, তবে তাতে সাক্ষাৎভাবে জড়িত আমি নই, আর একজন। যদি শুনতে চাস্ ত সে ঘটনা বলতে পারি।"

আমি আর একটু কাছে ঘেঁসে এসে বললাম, "সুরু করুন।"

মেজমামা বলতে সুরু করলেন, "তিরিশ-পঁইতিরিশ বছর আগে আমরা যখন প্রথম এখানে আসি তখন ছোট স্টেশনটার ধারে পাঁচ-সাতখানা বাড়ী, দুটো মুদির দোকান, রামসিংয়ের কাঠের গোলা আর চারদিকে জঙ্গল ছিল। সন্ধ্যা লাগতে লাগতে ঘরের দরজা বন্ধ হ'ত, দিনে যে পথে মানুষ চলত রাত্রে সে পথে বাঘ-ভালুক চলত। এই সময়ে হঠাৎ একদিন এখানে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন, নাম উমেশ চৌধুরী, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, লম্বা চেহারা, ফরসা রং, স্বাস্থ্য চমৎকার। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে পরিষ্কার কিছু বলতেন না। প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম কোথাও চুরি-ডাকাতি ক'রে পুলিসের চোখ এড়াবার জন্যে এই জঙ্গলে পালিয়ে এসে আছেন। কিন্তু একটু মেলামেশা হতেই দেখা গেল ভদ্রলোক বেশ শিক্ষিত, তখন সন্দেহ হ'ল বিপ্লবীদলের লোক ব'লে, এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর খাতির বেড়ে গেল। আমি তখন কলেজ ছেড়ে সবে এসেছি, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন ভীষণ ভক্ত, কবির বিখ্যাত কবিতাগুলো অনর্গল মুখস্থ ব'লে যেতেন। কাজকর্ম ধরাবাঁধা কিছু করতেন না, বলতেন ব্যবসা করতে এসেছি। থাকতেন স্টেশনের ধারে মুদির দোকানে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। কিছুদিন রামসিংয়ের সঙ্গে কাঠের ব্যবসা শিখবার অজুহাতে বনে-জঙ্গলে ঘোরাফেরা করলেন, তার পরে কিছুদিন জাপানে হরিতকী চালান দেবেন ব'লে কোথায় হরিতকীগাছ বেশী আছে তা দেখে বেড়াতে লাগলেন। এইভাবে বছরখানেক কেটে গেল। কার্তিক মাস, শীত পড়তে সুরু করেছে এমন সময় একদিন এসে বললেন, "কাঠের ব্যবসাই বল আর হরিতকীর ব্যবসাই বল, তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার উপায় ও নয়। ছোটনাগপুর দেশটা হচ্ছে খনির দেশ, তাই ঠিক করেছি খনির সন্ধানে বেরুব, যদি একটা টিনের বা অভ্রের খনি পেয়ে যাই ত কথাই নাই, সাধারণ একটা কয়লার খনি পেলেও রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাব।" কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, পরদিন কিছু জিনিসপত্র একটা লোকের মাথায় চাপিয়ে উমেশদা হাজারীবাগের অরণ্য-লোকে প্রবেশ করলেন।

মাঘ শেষ হয়ে ফাল্গুন পড়েছে, প্রচণ্ড শীতের পর বাতাসের উষ্ণতা ভারী উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, দূরে অরণ্যের রং বদলাতে সুরু করেছে, এমন সময় একদিন বিকেলবেলা বারান্দায় ব'সে আছি, হঠাৎ দেখি সামনের ঐ পথ দিয়ে লাঠিহাতে একটা লোক আমাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। ময়লা কাপড়-পরা রোগা লম্বা লোকটা ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম, এ যে উমেশদা, এ কি রুগ্ন শীর্ণ চেহারা! তাড়াতাড়ি উঠে হাত ধ'রে এনে তাঁকে আরামচেয়ারে বসিয়ে দিলাম, বললাম, "ব্যাপার কি উমেশদা, কবে এলেন?"

মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে তিনি বললেন, "এইমাত্র আসছি, তোমাদের বাড়ীতেই প্রথম পদার্পণ।"

চাকরকে কিছু খাবার আনতে ব'লে প্রশ্ন করলাম, "শরীরের এ অবস্থা কেন?"

বললেন, "অসুখ করেছিল, ফেরবার মুখে কাছাকাছি একটা গ্রামে পনর দিন জ্বর হয়ে পড়েছিলাম। জ্বর ছাড়তেই কোনরকমে চ'লে এসেছি।"

"সঙ্গের লোকটা কোথায় ?"

উত্তর দিলেন, "আমার অসুখ দেখে সে পালিয়ে গেছে।"

এক বাটি গরম দুধ খেয়ে উমেশদা একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন, তার পরে পা দু'টি ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে আরাম ক'রে বসলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘণ্টাখানেক পরে এসে দেখি উমেশদা জেগে উঠেছেন। সন্ধ্যা ততক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। পাশে একখানি চেয়ার টেনে ব'সে বললাম, "কেমন আছেন ?"

হেসে বললেন, "চমৎকার, এ যাত্রা বাঁচব মনে হচ্ছে।"

প্রশ্ন করলাম, "কাজ কিছু হ'ল, খনিটনি কিছু আবিষ্কার করলেন ?"

উমেশদা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "না, খনি আবিষ্কার করতে পারি নাই।"

দুঃখিত হয়ে বললাম, "কেবল পরিশ্রমই সার হ'ল।"

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "না, পরিশ্রম বৃথা হয় নি, কয়লার বা অভ্রের খনি আবিষ্কার করতে পারি নাই ঠিকই কিন্তু আর একটা যা আবিষ্কার করেছি তা সোনার খনির মত দামী।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম, "সেটা আবার কি ?"

চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ বসে থাকলেন উমেশদা, তার পর বলতে লাগলেন, "তবে শোন। খনির সন্ধানে ত বেরিয়ে পড়লাম কার্তিকের মাঝামাঝি, সিধে দক্ষিণ দিকে চলতে সুরু করলাম, ম্যাপে দেখেছিলাম ঐ দিকটা পাহাড়ী এলাকা। একটা গ্রামে গিয়ে আস্তানা ফেলি, দু'একদিন থাকি, আশেপাশের বন-জঙ্গল ঘুরে দেখি, তার পরে সেখান থেকে আস্তানা তুলে আর একটা গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হই। এইভাবে চলতে চলতে দক্ষিণ দিকের পাহাড়ী এলাকাটা দেখা শেষ হয়ে গেল। তখন ঘুরলাম পশ্চিমে। কার্তিক মাস শেষ হয়ে গেল, দেখতে দেখতে অগ্রহায়ণ মাসও শেষ হয়ে গেল, পৌষের মাঝামাঝি, ভীষণ শীত পড়েছে, আমরা এসে পড়লাম আর একটা পাহাড়ী এলাকায়। যদি অরণ্যের সৌন্দর্য দেখতে চাও তবে যাও সেখানে। অনেক ছোট-বড় পাহাড়, সেই সব পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে উঠেছে বড় বড় শাল, শিশম আর অর্জ্জুন গাছ, পাহাড়-তলীতে মহুয়া আর পলাশের নিবিড় কুঞ্জ; মাঝে মাঝে বয়ে গেছে বালুময় আঁকা-বাঁকা নদী। শহর থেকে অনেক দূরে বলে শীকারী-পুঙ্গবরা এখনও পৌঁছান নাই, তাই গাছের ডালে ময়ূর নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে, হরিণের দল সাঁজ-সকালে নদীতে নেমে জল খায়, গভীর রাত্রে বাঘ হাঁক পাড়ে। এদিকে বড় গ্রাম নেই, আছে ছোট ছোট গ্রাম, তাতে বিশ-পঁচিশখানা মাত্র ঘর, বাসিন্দা—আদিবাসী, ঘাটোয়ার আর কুরমী। তুমি ত জান, এটা গরাবের দেশ, সবাই গরীব, তার মধ্যে ঘাটোয়ার আর কুরমী সবচেয়ে গরীব। তাদের ক্ষেত-খামার নাই, মরদেরা কাতরাসের কয়লার খাদে কাজ করে, আবার কখনও কখনও মেয়েপুরুষ দল বেঁধে বিদেশে কুলীর কাজ করতে যায়।

একদিন দুপুরবেলা একটা গ্রাম থেকে আস্তানা তুলে চলেছি, চলতে চলতে দুপুর গড়িয়ে বেলা পড়ে এল, অথচ কোন গ্রাম পেলাম না; সন্ধ্যাও লেগে আসছে, অরণ্যও যেন গভীর হয়ে আসছে, একটু ভাবনায় পড়লাম, চলতে লাগলাম তাড়াতাড়ি। পায়ে-চলার পথটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে, খানিকটা এগোতেই দেখি পাহাড়ের কোল-ঘেঁষে একখানা গ্রাম। পাশেই নেমেছে একটা ঝরণা, বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে সরু জলধারা বয়ে গেছে পাহাড়তলির দিকে। পরিবেশটা সুন্দর হলেও গ্রামের অবস্থা ভাল নয়, দারিদ্র্যের ছাপমারা খান-পনের ঘর। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, রাতের আশ্রয় খুঁজবার জন্যে গাঁয়ের সবচেয়ে বড় বাড়ীটার দিকে এগিয়ে গেলাম, বাড়ীর মালিক ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে, থাকবার জায়গা চাইতে ঘাড় নেড়ে পত্রপাঠ বিদেয় করে দিল। গেলাম আর একটা বাড়ীর দিকে, মালিক একটি বুড়ো, বললে, "একখানা ঘর বাবু, গরু-ছাগল সবাই সেই ঘরে থাকি, জায়গা নেই।"

যেখানেই যাই এক কথা "জায়গা নেই।" মহা মুশকিলে পড়লাম, একে পৌষের শীত, তার উপরে বাঘ-ভালুকের ভয়, সারারাত বাইরে থাকা অসম্ভব। কি করব ভাবছি এমন সময় দেখি মাথায় জলভরা কলসী নিয়ে ছোট একটা ছেলের হাত ধ'রে একটি স্ত্রীলোক আসছে। সে এসে সামনে দাঁড়াল, আমাকে এক নজর দেখে নিয়ে বলল, "বাবু, তুমি কি বাঙালী ?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, আমি বাঙালী।"

সে বলল, "তোমাকে দেখেই আমি বাঙালী বলে চিনেছি। এ জঙ্গলে এখন কেন এসেছ ?"

বললাম, "দরকার আছে তাই এসেছি, কিন্তু তোমাদের গাঁয়ে থাকবার জায়গা পাচ্ছি নে।"

সে আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে বলল

"এস বাবু, আমার সঙ্গে এস, আমার বাড়ীতে থাকবে। আমরা গরীব মানুষ, ফালতু ঘর ত কারও নেই তাই বাইরের লোককে জায়গা দিতে পারি নে, তা ছাড়া, তুমি আবার নতুন মানুষ। আমার বাড়ীর বারান্দায় তুমি থাকবে। এস আমার সঙ্গে।"

হাতে যেন স্বর্গ পেলাম, স্ত্রীলোকটি আগে আগে চলল, আমরা তার পিছনে চললাম। মাটির প্রাচীর-ঘেরা ছোট আঙ্গিনায় ঢুকলাম, সামনে ঘর, একপাশে একটা চালা, সেই চালাটা দেখিয়ে দিয়ে সে বলল, "বাবু ঐখানে তোমাদের থাকতে দেব।"

উপরে চাল, চারিদিকে প্রাচীর, এর চেয়ে নিরাপদ্ স্থান আর কি হতে পারে? কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, "তুমি দয়া করে আশ্রয় দিলে, তা না হলে কি বিপদেই না পড়তাম।"

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে হাঁক দিল, "ওগো, বেরিয়ে দেখ অতিথি এসেছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এক গৃহকর্তা, বেঁটে খাট জোয়ান মানুষ, বলল, "অতিথি আবার কে এল গো?"

বৌটি বলল, "বাঙালী বাবু, কেউ রাত্রে থাকবার জায়গা দিচ্ছিল না, আমি নিয়ে এলাম সঙ্গে।"

গৃহকর্তা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে আমাদের দেখল, তার পর বলল, "বাবুজীর এখানে থাকতে কষ্ট হবে না?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "কষ্ট কেন হবে, খুব আরামেই থাকব।"

ঘরে জলের কলসী রেখে এসে বৌটি আঙ্গিনার কোণ থেকে কিছু কাঠকুঠো এনে দিয়ে বলল, "ঐখানে একটা চুলো আছে, তোমরা রান্না করে খাও, আমরা গরীব মানুষ, তোমাদের খেতে দেব সে শক্তি আমাদের নেই।"

বিব্রতভাবে বললাম, "সে সব আমরা ব্যবস্থা করে নেব, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না।"

ময়লা কেরোসিন তেলের একটা ঢিবড়ি ধরিয়ে দিয়ে বৌটি নিজের কাজে ঘরে চলে গেল।

খেয়ে দেয়ে বসেছি এমন সময় ছেলে কোলে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বৌটি বলল, "বাবু, তোমাদের খাওয়া হয়েছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হয়েছে। দু'খানা রুটি সেঁকে নিয়েছি।"

কোলের কাছে ছেলেকে টেনে নিয়ে সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। ঢিবড়ির সামান্য আলোয় আমি দেখলাম একখানা কালো শীর্ণ মুখ, এক সময় সুন্দর ছিল, এখন দারিদ্র্য এবং বয়সের গভীর ছাপ পড়েছে তাতে। একটু ইতস্তত: করে আমি প্রশ্ন করলাম, "তোমার কি নাম গো?" সে বলল, "সামরী।" একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলল, "তোমাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম বাবু, তুমি বাঙালী।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন করে চিনলে?"

সে হেসে বলল, "আমি বাংলা মুলুকে গিয়েছি যে।"

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, "তাই নাকি? কোথায় গিয়েছিলে?"

সামরী একটুখানি ভেবে বলল, "সে অনেক দিনের কথা, নামটাম মনে নাই। আমার বয়স তখন অল্প, বাপ-মা'র সঙ্গে বাংলা মুলুকে গিয়েছিলাম।"

শুনে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, বললাম, "তার পর?" সামরী বলতে লাগল, "আমার বাপ-ভাইরা ইঁট পাড়তে জানত, একবার একজন ঠিকাদার এসে গাঁয়ের অনেককে বাংলা দেশে নিয়ে গিয়েছিল ইঁট পাড়াতে। একটা মস্তবড় নদীর ধারে আমাদের ডেরা ছিল, মস্তবড় নদী বাবু, এপারে দাঁড়ালে ওপার দেখা যায় না, কেবল জল আর জল।"

আমি বললাম, "বড় নদী যখন বলছ তখন গঙ্গানদী হবে।"

মাথা নেড়ে সামরী বলল, "না, গঙ্গানদী নয়, নামটা মনে পড়ছে না, কি যেন ভারি সুন্দর নাম, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পদ্মা—পদ্মানদী।"

অবাক্ হয়ে বললাম, "পদ্মা? সে যে অনেক দূর, অত দূরে গিয়েছিলে তুমি?"

সামরী হেসে বলল, "হ্যাঁ বাবু, গিয়েছিলাম, সত্যিই গিয়েছিলাম। আমি তখন ছিলাম খুবই ছোট, সাত-আট বছর বয়স হবে। দু'বছরের ভাই মহুয়াকে সঙ্গে নিয়ে কতবার নদীর ঘাটে যেতাম, ভাইকে উঁচু পাড়ে বসিয়ে রেখে আমি জলের ধারে নেমে থালা আর লোটা মাজতাম, বেশ মনে আছে।"

প্রশ্ন করলাম, "আর কি মনে আছে তোমার?"

সে একটু ভেবে বলল, "ঘাটের কাছে একখানা বড় নৌকো বাঁধা থাকত, ঠিক যেন কোঠাবাড়ী, তার দরজা ছিল, খিড়কী ছিল। একজন বাবু, কি সুন্দর দেখতে, বড় বড় চুল-দাড়ি, থাকত নৌকোতে। লোকে তাকে বলত রাজাবাবু। নৌকোর খিড়কী দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সে আমাকে দেখত, আমার কিন্তু ভয় হ'ত তাকাতে। তার পরে একদিন—" এই পর্যন্ত বলে সামরী

হেসে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসলে কেন? কি হয়েছিল একদিন?"

হাসি থামিয়ে সামরী বলল, "খুব মজা হয়েছিল। একদিন বিকালবেলা মহুয়াকে পাড়ে বসিয়ে নদীতে নেমে লোটা মাজছি, এমন সময় হঠাৎ সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। লোটা ফেলে ছুটে উপরে গিয়ে দেখি একটা ছাগলের বাচ্চা তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ভয় পেয়ে সে কাঁদছে। তাড়াতাড়ি মহুয়াকে কোলের কাছে টেনে নিলাম, ছাগলের বাচ্চাটাকেও টেনে নিলাম কাছে, আদর করে দু'জনের ভাব করিয়ে দিলাম। একবার নৌকোর দিকে নজর পড়তেই দেখি আমাদের কাণ্ড দেখে বাবু হাসছে। সেই থেকে আমার ভয় ভেঙ্গে গেল, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, বাবু সারাদিন লেখাপড়া করত।"

ওর গল্প শুনতে শুনতে আমি যেন মশগুল হয়ে উঠলাম বললাম, "তার পরে।"

সামরী বলল, "তার পরে একদিন সকালবেলা নৌকো খুলে বাবু চলে গেল। আমি তখন ঘাটেই ছিলাম, বাবু খিড়কীর ধারে ব'সে আমার লোটা মাজা দেখছিল। নৌকো ধীরে ধীরে অনেক দূরে চলে গেল, আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, বাবু তখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে।"

আমি বললাম, "বাবু আর ফিরে এল না?"

সে বলল, "না, আর ফিরে এল না, আমরাও কাজ শেষ হলে দেশে চলে এলাম।"

প্রশ্ন করলাম, "তার পরে আর বাংলা দেশে যাও নি?"

সে বলল, "না, আর যাই নি।"

রাত অনেক হয়ে গেছে দেখে সামরী এবার উঠে পড়ল। বিছানা বিছিয়ে আমরাও শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চোখে আজ আমার ঘুম এল না, ঘুরে ঘুরে সামরীর কথাগুলো মনে পড়তে লাগল, পদ্মানদীর ধারে কুলীরা ইঁট কাটছে, ঘাটে বড় নৌকো বাঁধা, একটা কচি মেয়ে ছোট ভাইকে সঙ্গে করে বারে বারে ঘাটে আসছে ঘটি-বাটি মাজতে। নদীতীরের এই ছবিটা যেন আমি স্পষ্ট দেখতে লাগলাম, মনে হতে লাগল যেন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কতবার নিজের চোখে দেখেছি এই দৃশ্য। কেন এমন মনে হ'ল তা বুঝতে পারলাম না। রাত ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল, অন্ধকারে অরণ্যলোক নিঝুম, অনেক দূরে একটা জানোয়ার দু' একবার ডেকে থেমে গেল। আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি—পদ্মানদীর ঘাটে বজরা বাঁধা, একটি ছোট মেয়ে জলের ধারে নেমে ঘটি-বাটি মাজছে। উঁচু পাড়ের ওপর বসে আছে তার ছোট ভাই। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মনে পড়ে গেল :

> নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
> পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরই ছোট মেয়ে
> ঘাটে করে আনাগোনা ; কত ঘষামাজা
> ঘটি-বাটি-থালা লয়ে, আসে ধেয়ে ধেয়ে
> দিবসে শতেকবার ; পিত্তল কঙ্কণ
> পিতলের থালি পরে বাজে ঠন ঠন—
> বড়ো ব্যস্ত সারাদিন, তারি ছোট ভাই,
> নেড়া মাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
> পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
> বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
> স্থির ধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে
> বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
> ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি,
> কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম, সামরী কি সেই পশ্চিমী মজুরের মেয়ে, পদ্মার ঘাটে রবীন্দ্রনাথ যাকে দেখে "দিদি" কবিতাটি লিখেছিলেন! সামরা কি সেই!! উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম। আকাশে তারা ঝলমল করছে, অন্ধকারে ছোট গ্রামখানি ঘুমিয়ে আছে, আমার চোখে ঘুম নাই, আমি কত কি ভাবছি। হঠাৎ আবার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের আর একটা কবিতা :

> একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
> ধূলি 'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
> ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
> দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
> অদূরে কোমল-লোম ছাগবৎস ধীরে
> চরিয়া ফিরিতেছিল নদী তীরে তীরে।
> সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
> বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
> বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে
> দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।
> এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
> দু'জনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
> পশু-শিশু, নর-শিশু, দিদি মাঝে প'ড়ে
> দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।

এই গল্প কাল সন্ধ্যায় আমি সামরীর মুখে শুনেছি। আর সন্দেহ নাই, সামরী সেই, সামরী সেই।

চোখে আর ঘুম এল না, সামরীর ছোট আঙ্গিনার মাঝখানে বসে আবৃত্তি করলাম রবীন্দ্রনাথের আরও একটা কবিতা:

বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতিদিন
ছোট মেয়ে খেলাহীন, চপলতা-হীন;
গম্ভীর কর্ত্তব্যরত,—তৎপর চরণে
আসে যায় নিত্য কাজে; অশ্রুভরা মনে
ওর মুখ পানে চেয়ে হাসি স্নেহভরে।
আজি আমি তরী খুলি যাব দেশান্তরে;
বালিকাও যাবে কবে কর্ম্ম-অবসানে
আপন স্বদেশে; ও আমারে নাহি জানে
আমিও জানিনে ওরে; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি
কোন অজানিত গ্রামে, কোন দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে
তার পরে সব শেষে—তারো পরে হায—
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়!

পদ্মার ঘাটে যে ছোট মেয়েটিকে দেখে রবীন্দ্রনাথ তার ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছিলেন, লিখেছিলেন: "কোন অজানিত গ্রামে, কোন দূর দেশে, কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে" এই তার দূর দেশের অজানিত গ্রাম, এই তার ঘর, সে আজ বধূ, সে আজ মাতা। সামরীর সামান্য ভাঙা ঘর আমার চোখে অসামান্য হয়ে দেখা দিল, চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম, দেখে যেন আর আশ মেটে না।

ভোর হ'ল, সামরী বেরিয়ে এল তার ভাঙা ঘরের দরজা খুলে, ভোরের আলো পড়ল তার রুক্ষ চুলে, শুকনো শীর্ণ মুখে। আমি অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সে বিব্রত হয়ে ছেঁড়া আঁচলটা মাথার উপর টেনে দিয়ে বলল, "কি দেখছ বাবু।"

আমি আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলাম, "দেখছি তোমাকে, তুমি অমর, সামরী তুমি অমর। গরীবের মেয়ে তুমি, গরীবের বউ তুমি, গরীবের মা তুমি। এই গ্রামের লোক ছাড়া তোমাকে কেউ চেনে না; একদিন এই ভাঙা ঘরে মৃত্যু হবে তোমার, তবু তুমি বেঁচে থাকবে। কত দেশের লোক কত ভাষায় তোমার কথা পড়বে, মহাকবি তোমাকে অমর করে গেছেন।"

সামরী মাটির কলসীটা মাথায় নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "কি বলছ বাবু, তুমি পাগল হলে নাকি?"

ছেলের হাত ধরে ঝরণায় জল আনতে চলে গেল সামরী। আমিও সে গ্রাম ছেড়ে চললাম আর এক গ্রামের দিকে।

দুর্ব্বল শরীরে অনেকক্ষণ ধরে কথা ব'লে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন উমেশদা। এই পর্য্যন্ত বলে চোখ বুঁজে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। আমি অবাক্ হয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। খানিক পরে উমেশদা উঠে বসলে প্রশ্ন করলাম, "সে গাঁয়ের নাম কি উমেশদা, কোথায় কোন্ দিকে সে গ্রাম?

উমেশদা হেসে বুকের পকেটটা চেপে ধরে বললেন, "সব খবর এইখানে রয়েছে, আমার নোট খাতায় লেখা রয়েছে। জ্বরে ভুগে দেহযন্ত্রটা বড়ই বিকল হয়েছে। কিছুদিন তাকে তোয়াজ করতে হবে, আমি তাই কাল সকালের গাড়ীতে কলকাতা যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সামরীকে আবার দেখতে যাব।"

পরদিন উমেশদা কলকাতা চলে গেলেন। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, এক বছর গেল, দু'বছর গেল, দশ বছর গেল তিনি আর ফিরে এলেন না। তাঁর বাড়ী-ঘরের ঠিকানা জানা ছিল না, খবর নিতেও পারি নি।

মেজমামা কথা শেষ করে চুপ করে বসলেন। চাঁদ অনেকক্ষণ অস্ত গেছে, বাইরে অন্ধকার ঘনতর হয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সামরী! আমার ভিতরটা হায় হায় করে উঠল।

—০—

# রবীন্দ্রকাব্যে সাধারণ মানুষ

শ্রীভূপেশ দাশ

বাংলার সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তাঁর কাব্যপ্রভায় বাঙালী তথা বিশ্বমানস নির্মল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝরের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও বহুমুখিত্ব। মানবচিন্তাধারার এমন খুব কম দিকই রয়েছে যা বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে আলোচিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের কবি। আধুনিক যুগের লক্ষণীয় বিশেষত্বই হচ্ছে সাহিত্যের রাজ্যে সাধারণ মানুষের সিংহাসন লাভ। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য দেবতা ও দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাজরাজড়াদের কীর্ত্তি-কাহিনীতেই মুখরিত। সেখানে সাধারণ লোক সাধারণ অবস্থাতেই চিত্রিত। আধুনিক যুগেই সে নায়কের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং তার সুখদুঃখ-জীবনযাত্রা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও আমরা দেখি সাধারণ মানুষেরই জয়জয়কার।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিচিত্র বিভাগে সাফল্যের সঙ্গে পদার্পণ করেছেন। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব, সংগীত ইত্যাদি যা কিছুতেই রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছেন তাতেই সাফল্যের সোনা ফলিয়েছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। রবীন্দ্রকাব্যে সাধারণ মানুষ—এই পরিবেষ্টনীতেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

সংস্কৃতে কবি শব্দের অর্থ কবিতালেখকই শুধু নয়; ঋষি, সত্যদ্রষ্টা, জ্ঞানী—এই সমস্ত অর্থেও কবি শব্দটির প্রয়োগ আছে। রবীন্দ্রনাথ কবি শব্দের বৃহত্তর ব্যঞ্জনা-ভূয়িষ্ঠ অভিধায় আখ্যায়িত হবার যোগ্য। মানুষের প্রতি মানুষের যে সহজাত প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ্য ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উদার ও বিস্তৃত হৃদয় সকলের জন্যই খোলা ছিল। তাই তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে আপামর জনসাধারণের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদের পরিচয়বাহী স্বাক্ষর। সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী আনন্দবাদী কবি আপাতবৈচিত্র্যহীন সাধারণ মানুষের জীবনে খুঁজে পেয়েছিলেন বিচিত্র রসের উৎস। নিজের দরদী মনের মাধুর্য্য মিশিয়ে তিনি তাকে করে তুলেছিলেন আরো হৃদয়গ্রাহী, আরো স্বাদিষ্ট। রবীন্দ্রকাব্যে সাধারণ মানুষের ভূমিকা তাই এত ব্যাপক ও এত দৃঢ়মূল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ, হাসিকান্না, প্রেম-বিরহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের শিল্পীহাতে চিত্রিত হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যে মর্ত্ত্যের মানুষ অমর্ত্ত্যলোকে উন্নীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের গোড়ার দিকে ভাবাবেগের প্রাধান্য। তাই সেখানে বাস্তবজীবনের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপস্থিতি নেই। 'মানসী' থেকে যেমন সাধারণতঃ তাঁর কাব্যজীবনের সার্থক রূপায়ণ ধরা হয় তেমনি আমরাও মানসী থেকেই জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর বাস্তব দৃষ্টিপাতের উন্মেষ বলে ধরতে পারি। মানসীর বহু কবিতায় সাধারণ মানুষ বিষয়বস্তুরূপে স্থান গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা বধূ, নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি প্রভৃতি অনেক কবিতার উল্লেখ করতে পারি।

নতুন ও হৃদয়হীন পরিবেশে একটি বালিকা বধূর মর্ম্মবেদনা আমাদের মনকে ছলছল করে তোলে 'বধূ' কবিতায়—

> কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে,
> খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।
> হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
> কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে॥

এই সাধারণ বধূটি কবির সহানুভূতি ও সমবেদনার স্বীকৃতি পেয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

'চিত্রা' কাব্যের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় এক কেরাণী জীবনের দুঃখদুর্দ্দশাময় জীবনের মাঝখানে প্রেমের অমরাবতী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যদিও

> হেথা আমি কেহ নহি,
> সহস্রের মাঝে একজন—সদা বহি
> সংসারের ক্ষুদ্রভার, কত অনুগ্রহ
> কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।

কিন্তু প্রেম সব কিছু অপমান-অবহেলা মুছে দেয় নিঃশেষে। তাই—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট ; পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবির উপচিকীর্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে কবি ঘোষণা করেন—

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ;

কবি জীবন্মৃত জনসাধারণের জন্য কিছু কাজ করে যেতে চান। যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বোবা পশুর মত অশেষ দুঃখভোগই করে গেল, যারা "কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া" তাদের জন্য কবির মর্ম্মবেদনা সহানুভূতি ও প্রীতির স্পর্শে স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করেছে :—

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু।
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥

সাধারণ মানুষের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, উপরের এই উদ্ধৃত অংশই হচ্ছে তার সর্বোত্তম প্রমাণ।

'পুরাতন ভৃত্যে'র কেষ্ট ও 'দুই বিঘা জমি'র উপেন আমাদের মনে অক্ষয় হয়ে আছে ও থাকবে। পুরাতন ভৃত্য কবিতাটিতে প্রভু-ভৃত্যের মানবিক সম্পর্কের এক অদ্বিতীয় রসোত্তীর্ণ চিত্র রয়েছে। কেষ্ট মরেও অমর হয়ে আছে আমাদের মনে।

'চৈতালী' কাব্যের অনেকগুলি সনেটই সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ছোট ছোট চিত্রে উজ্জ্বল। এতে জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশগুলো চিত্রিত হলেও কবির সপ্রীতি-দৃষ্টিসম্পাতে তা পূর্ণতার আস্বাদে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে।

'পলাতকা' কাব্যের মুক্তি, ফাঁকি, নিষ্কৃতি প্রভৃতি কবিতায় নারীজীবনের ব্যর্থতার চিত্র অতি করুণ ও সার্থকভাবে এবং কোথাও কোথাও ব্যঙ্গ-শ্লেষের মাধ্যমে কবি সুনিপুণ হাতে এঁকেছেন। আমাদের সমাজ-পরিবেশের উৎকট ও হৃদয়হীন সংস্কার-ব্যবহার কবির মনকে দীর্ঘকাল ধরে পীড়া দিয়েছে। কবি সুযোগ পেলেই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত করেছেন তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনীর সাহায্যে। সাধারণ মানুষ যে কত অসহায়, অত্যাচারীর হাতে সে যে প্রতিনিয়তই শোষিত ও সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে সেদিকে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

'পুনশ্চ' কাব্যের প্রায় সবগুলো কবিতাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বা পরিচিত পরিবেশের এবং ছোটখাট আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখদুঃখের কাহিনীতে অনবদ্য আস্বাদ-সমৃদ্ধ। এই কাব্যখানাকে সাধারণ মানুষের জীবনবেদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এইখানেই দেখি 'আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোন ভেদ নেই'; এখানে এক সাধারণ মেয়ে অসামান্য হয়ে ওঠে সহৃদয় কবির লেখনী সংস্পর্শে ; এখানে ছেলেটা তার সব রকম দৌরাত্ম্য ও খেয়ালিপনা নিয়ে অসাধারণ-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাঠকের মনে।

পুনশ্চ কাব্যে সাধারণ জীবনকে ঘিরে একটি অসাধারণ বাতাবরণ সৃষ্ট হয়েছে কবির সহৃদয়তার স্পর্শমাণ প্রভাবে। যাদের আমরা ছোট, নীচু বলি, যাদের মধ্যে আমরা বাইরে থেকে কিছুই বিশেষত্ব দেখতে পাই না, যারা অবহেলিত ও পরিত্যক্ত কবি তাদেরই এ কাব্যে নায়কের আসনে বসিয়েছেন এবং তাদের জীবনকে মহৎ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় এই লক্ষ্যেরই পূর্ব্বাভাষ রয়েছে—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।

এবং আরেকটি কবিতায়ও অনুরূপ অভিব্যক্তিই ধ্বনিত হয়েছে আত্মগর্ব্বী উন্নাসিকদের লক্ষ্য করে—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান.
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এক শ্রেণীর লেখক যেমন সাধারণ মানুষ বলতে বিশেষ-ভাবে শ্রমিক, মজুর প্রভৃতির জীবনচিত্র নিয়েই বিশেষ এক ধরণের সাহিত্যচর্চ্চায় মেতেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই ধরণের মনোবৃত্তি নিয়ে সাহিত্যের আসরে নামেন নি। তাই তাঁর দ্বারা আর যাই হোক শ্রমিক-সাহিত্য সৃষ্ট হয় নি, যা হয়েছে তা সাধারণ মানুষেরই সাধারণ সুখদুঃখের মহিমময় কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের গজদন্তমিনারের অধিবাসী বলে কোন কোন তরফ থেকে

মন্তব্য ওঠে। কিন্তু এই ধরণের সমালোচনা যে কতখানি অসত্য তা রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা নিবিড় পরিচয়ের মাধ্যমেই বোঝা যায়।

জনদরদী কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঘোষিত হয়েছে জনগণের জয়, জনতার জয় নয়। জনতাকে কবি সসঙ্কোচে এড়িয়ে গেছেন, হৃদয়ে আসন দিয়েছেন জনগণকে। জনগণ-অধিনায়ক কবির কাব্যে তাই সাধারণ মানুষেরই জয়জয়কার।

# রূপান্তর

শ্রীআভা পাকড়াশী

( প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প )

মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য্য তখন অস্তমিত-প্রায়। সেই সময় নজরৎ হুসেন শা' নামে একজন বাদশা ছিলেন। তাঁর সুশাসন আর সুবিচার অনেককেই অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিত। সেই দুর্দ্দিনে যদিও তাঁর হারেমে ছিল পাঁচ হাজার বেগম, তবুও তিনি ছিলেন প্রজানুরঞ্জন ধর্ম্মপ্রাণ বাদশা। সকালের আজানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সপরিষদ মতি মসজিদে যেতে দেখা যেত। তার পর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ানই-আম্‌এ শোনা যেত নকীবের পুকার। সভা বসত। বিচার সুরু হ'ত।

কখন কখন সৌম্যদর্শন প্রশান্ত-বয়ান এক তরুণ দরবেশ তসবি-হাতে দেখা দিতেন এই নবাবের দরবারে। বাদশা তখন শশব্যস্তে নিজের সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই শেখ সাহেবকে খোয়াবাত করতেন। শেখ সাহেবও দু'হাত দিয়ে নবাবের স্কন্ধদেশ স্পর্শ ক'রে সস্নেহে তাঁকে নিজের পাশেই বসাতেন।

তবে প্রজাদের এই সুখ সৌভাগ্য বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না, এই যা দুঃখ। একদিন শেখ সাহেব সবে নামাজ পড়ে উঠছেন, সেদিন আবার নওরোজের দিন। এমন সময়ে কয়েকজন উজির-নাজির নিজেদের খানদানি বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এসে আভুমি সালাম জানিয়ে কুর্নিস করলেন শেখ সাহেবকে। তার পর তাঁর অনুমতিতে আসন গ্রহণ করলেন দরগার আঙ্গিনায়।

প্রসন্ন হাস্যে শেখ সাহেব প্রশ্ন করেন, কি কারণে আজ আপনারা এই দীনের কুটিরে পদার্পণ করেছেন পেশ করুন। ওঁরা সকলেই প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করেন। তার পর একে একে নিজেদের বক্তব্য বলতে থাকেন।

প্রথমে প্রধান উজির সাহেবই বলেন, কি আর বলব বলুন, বড়ই আফশোসের কথা। এখন সবই আপনার কৃপা। আপনি হলেন বাদশা নজরৎ হুসেন শা'র শেখ সাহেব। পারলে আপনিই পারবেন।

শেখ সাহেব বলেন, কি ব্যাপার তাই ত আমি এখনও পর্য্যন্ত সমঝে উঠতে পারছি না। আপনারা নির্ভয়ে সব কথা আমার কাছে পেশ করুন, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।

ওঁরা অবনতমুখে মাথা হেঁট করে বলেন, আপনি কি কিছুই জানেন না? কোন কথাই কি এই পর্য্যন্ত আপনার কাছে এসে পৌঁছয় নি? হায় আল্লা! কোন মুখে বলি সেই শরম-কি বাত? আমাদের সেই প্রজানুরঞ্জক বাদশার বিরাট্ পরিবর্ত্তনের কথা কিছুই কি আপনার কর্ণগোচর হয় নি?

এবার দ্বিতীয় উজির গম্ভীর স্বরে বলতে আরম্ভ করেন, আশা করি আপনি কিছুটা আন্দাজ করেছেন। আমাদের সেই সদাহাস্যময় বিবেচক নবাবের পদস্খলনের মূলে আছে এক কঞ্জীর নাচনেওয়ালী।

এবার অন্যরাও যোগ দেন কথায়। কেউ বলেন, তার নাচ এক অদ্ভুত জিনিস। মনে হয় বেহেস্তের হুরী মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে। আবার একজন বলেন, কি তার গলার মিঠে আওয়াজ, যেন বাগিচার বুলবুল গজলের তান ছাড়ছে। কি মীড়, কি গমক, যেন শান দেওয়া তলোয়ারের ঝিলিক। বাদশার আর দোষ কি, তিনিও ত ইনসান।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে সব শোনার পর শেখ সাহেব

ধীর স্বরে বলেন, হুঁ, তা এ চীজটিকে কে আমদানি করলে?

ওঁরা সসম্ভ্রমে উত্তর দেন, বাঁদী-বাজার থেকে এক হাজার আসরফি দিয়ে ঐ বাঁদিকে কিনে এনে একজন ওমরাহ শাহী দরবারে নবাবকে ভেট চড়িয়েছেন। তবে আমরা এও জানি যে, হুজুর বাদশার সবচেয়ে বড় দুষমন যদি কেউ থাকে তবে সে হচ্ছে ঐ আমীর আলি। এই বাঁদাকে সেই ওস্তাদ রেখে তালিম দিইয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে। তবে এ বাঁদা আসলি সোনা, তায় আবার পালিশ পড়েছে। তাই আফতাবের মত তীক্ষ্ণ করোজ্জ্বলে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বাদশার। এখন ঐ কঞ্চীর যা বলছে তাই হচ্ছে। ওর রোষে কত বেগুনা সৎলোককে শূলে চড়ান হচ্ছে, আবার ওর খুশিতে কত বেহদ বদমাস লোকের ফাঁসি মকুব হচ্ছে। এখন আর বাদশা পাঁচ ওক্ত নামাজও পড়েন না বা শাহীতক্তে ব'সে নালিশ ফরিয়াদও শোনেন না। সারা দিনরাত ঐ নাচ আর গান আর শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। এর ওপর সবচেয়ে বড় নেশা ঐ তয়ফাওয়ালির খুবসুরতি ত আছেই। এদিকে শাসনের অভাবে রাজ্য ছারখারে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি নির্বিকার, কোনদিকেই কোন লক্ষ্য নেই তাঁর। অথচ আগে এই বাদশাই প্রজাদের দুঃখকষ্ট মোটেই সইতে পারতেন না।

এবার আস্তে আস্তে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে শেখ সাহেব বললেন, তা আপনারা আমাকে কি করতে বলেন?

এবার সকলেই একবাক্যে বলেন, আমরা নিরুপায় হয়েই আপনার কাছে এসেছি, এখন আপনি যা হয় উপায় করুন। গুরুবাক্য ফেলতে পারবেন না নিশ্চয়ই শাহেন শা। সেই ভরসাতেই আপনার কাছে আমরা এসেছি। এবার আমাদের দায়িত্ব শেষ। এই বলে তাঁরা একে একে কুর্নিস করতে করতে পেছু হেঁটে বেরিয়ে এলেন শেখ সাহেবের কুটির থেকে।

ধর্মপ্রাণ শেখসাহেব যদিও শাহেন শা'র গুরু, তবু তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনই করেন। কোনরকম বিলাস-ব্যসনেই তিনি অভ্যস্ত নন। এই শেখ বংশ বহুকাল থেকে বংশপরম্পরায় এই বাদশাহদের গুরুগিরি করছেন। যদিও ইনি বাদশার গুরু, তবুও বয়সে নবীন। সেজন্য পুরো তিনদিন পানাহার ত্যাগ করে সর্বাগ্রে আল্লার দোয়া ভিক্ষা করলেন নিজের চিত্তশুদ্ধির জন্য, মনে দৃঢ়তা আনবার জন্য। চতুর্থ দিন প্রত্যুষে উঠে তিনি চললেন শাহী দরবারে। তিনি পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন, সবাই তাঁকে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করছে। সালাম জানাচ্ছে। আরব থেকে ঘোড়া এসেছে শাহী আস্তাবলের জন্য। উট এনেছে বস্তরখান থেকে। তারা সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী। কত বিচারপ্রার্থী এসেছে কত দূর নগর থেকে। লাল কিংখাবের পর্দা-ঢাকা শাহী দরবার দেওয়ানী-আম্ গম গম করছে। আট হাজারী; দশ হাজারী মনসবদাররা নিজেদের অলঙ্কৃত করে বসে আছেন। আমীর, ওমরাহ, উজির, নাজির সবাই যে যার মত হাজির, শুধু শাহীতক্ত শূন্য পড়ে আছে। সিংহাসনে কেউ বসে নেই। খবর নিয়ে জানলেন, এই ঘটনা ঘটে প্রত্যহ। নিত্যনৈমিত্তিক এই মোগল মসনদ শূন্য পড়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন নকীবের পুকার শোনা গেল না তখন অসহিষ্ণু শেখসাহেব নিজের আগমন-বার্তা পাঠালেন অন্দরে। তাঁর আগমন-সংবাদ পৌঁছবামাত্র বাদশা তাঁকে তাঁর নিজের খাসমহলে সসম্মানে ডেকে পাঠালেন।

খোযাবগার দ্বারে অপেক্ষারত মন্ত্রীমহাশয় একরাশ কাগজপত্র হাতে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন শেখসাহেবকে দেখে। শেখসাহেব প্রশ্ন করেন, এ কি! দরবারকক্ষ ছেড়ে আপনি এখানে কেন?

মন্ত্রীমহাশয় কুর্নিশ করে বিনীতভাবে উত্তর দেন, হুজুরে আলার মর্জি। তিনি এখানে বসেই অতিরিক্ত জরুরী কাগজপত্রে দস্তখত দেন আর না হলে বলেন, শাহীপাঞ্জা দিয়ে কাজ চালান। অগত্যা বেশীর ভাগ খত বা দলিলে মোহর মেরেই কাজ চালাচ্ছি। দিল্লীর মসনদ এমনি করে আর ক'দিন টিঁকবে শেখসাহেব? দুঃখিত স্বরে বললেন, বড় খারাপ দিন এসেছে হুজুর। সবই আমাদের বদ নসিব। আমাদের ভাগ্য মন্দ না হলে অমন ন্যায়পরায়ণ বাদশা এমন হবেন কেন? পারেন ত কিছু উপায় করুন, না হলে ওদিকে আমীর আলি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে কোনদিন সিংহাসনচ্যুত করবে বাদশাকে। তখন ত আমীর আলিই হবে দিল্লীর অধীশ্বর। মুছে যাবে এই মোগল সাম্রাজ্যের নাম। শাহেনশা আকবর বাদশার গড়ে-তোলা সেই বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও এবার হারাতে হবে শেখসাহেব। আর আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে তাই দেখব দাঁড়িয়ে। সেই ভূরা দিন আসার আগে আপনি একটা বিহিত করুন হুজুর, বাঁচান প্রজাদের। মিনতিতে করুণ হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠ।

এমন সময়ে বাদশাহের খাসবান্দা এসে সালাম জানায় শেখসাহেবকে। বলে, আপনি আসুন, হুজুর

আপনার দর্শনপ্রার্থী। মন্ত্রীমহাশয়কে অভয় দিয়ে বলেন শেখসাহেব, দেখি কি উপায় করতে পারি। তবে সবই খোদাতালার মর্জ্জি। অন্দরের খাস কামরার দিকে চলেন শেখসাহেব, সঙ্গে আছে খোজা প্রহরী। একটির পর একটি অলিন্দ পার হয়ে চলেছেন পীরসাহেব, আশে-পাশে পাথরের জালিকাটা ঝরোখা। সেই ঝরোখার মধ্যে দিয়ে কোন নীলনয়না বা খঞ্জননয়না চকিতে এক একবার চুরি করে দেখে নিচ্ছেন শেখসাহেবকে। তাঁদের পেশোযাজের খস্‌খস্‌, চুড়ীর রিনঝিন, চাপাকথার ফিসফাস সব মিলে একটা গুঞ্জন তুলেছে। এবার একটি কামরার সামনে এসে সসম্মানে পর্দা তুলে দাঁড়ায় বান্দা। চতুর্দ্দিকে সবুজ কিংখাবের পর্দা-মোড়া ঘর। সবুজ আলো ঢাকছে বেলজিয়ান কাচগ্লাসের তৈরী বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠন। পায়ের পাতা ডুবান সবুজ পারস্য গালিচা-পাতা ঘর। ও ঘরে মোহময়ী রাত্রি যেন এখনও থমকে আছে। বাইরের কোলাহল দুঃখ-দারিদ্র্য সব ভুলিয়ে দেয় এই স্বপ্নাবেশ-মাখা কামরাখানির আবহাওয়া। মস্তবড় মখমলের ফরাস। তার উপর সাচ্চাজরীর কাজের তাকিয়া, আতরদান রাখা রয়েছে, আর রয়েছে নানা আকারের হরেকরকম বাদ্যযন্ত্র। যেন ঐ সব বাদ্যের স্বরলহরী এখনও এই ঘরের আনাচেকানাচে তার রেশ ছড়িয়ে রেখেছে। এই তবে বাদশার সবুজমহল? মনে মনে বলেন শেখসাহেব। বাদশা শশব্যস্তে সেই ফরাস থেকে উঠে এসে বন্দেগী করেন গুরুকে। জরীর কাজের নতুন মখমলের আসন আসে তাঁর বসার জন্য। বিনীত-ভাবে বাদশা বলেন, আপনি আসন গ্রহণ করুন শেখ-সাহেব, আরাম করুন। এই অসময়ে আজ আপনি কেন কষ্ট করে তসরিফ্‌ নিয়ে এসেছেন পীরসাহেব? এত্তেলা পাঠালে এ বান্দা নিজে গিয়ে হুজুরে হাজির হ'ত।

সৌম্য সহাস্যবদন শেখসাহেব ধীর গম্ভীর ভাবে সামান্য একটু শ্লেষের সঙ্গে উত্তর দেন, তাই ত জাঁহাপনা, বড় গলতি হয়ে গেছে। এই তিন-চার মাসের মধ্যে আপনি ত একবারও আমার খোঁজ করেন নি, বা ইয়াদও করেন নি তাই সাহস করি নি। যাই হোক, উপস্থিত আপনার কাছে আমার একটি আর্জ্জি আছে।

বাদশা বলেন, সে কি? আপনি ওভাবে কথা বলছেন কেন? আপনি আর্জ্জি পেশ করবেন কেন? আপনি হুকুম করুন দেখুন সে হুকুম তামিল হয় কি না?

এবার মৃদু শির সঞ্চালনের সঙ্গে শেখসাহেব বলেন, বহুত খুশ, বড়ই প্রীত হলাম শুনে। আচ্ছা আপনার সেই কথা ইয়াদ আছে কি? যখন আপনি আপনার অপুত্রক চাচার মৃত্যুর পর শাহীতক্তে বসার অধিকারী হলেন। মাথায় তাজ পরে দিল্লীশ্বরোবার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন সকলেই আপনার কাছ থেকে প্রচুর তওফা উপহার উপঢৌকন পেয়েছিল। আপনি আমাকেও ঐ সময় কিছু দিতে চেয়েছিলেন। বলে-ছিলেন, অন্ততঃ আমার পীরের দরগাটিকে সংস্কৃত করে সুন্দর একটি মসজিদই না হয় প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। কিন্তু আমি অস্বীকার করেছিলাম। বলেছিলাম, খোদা আমার কোন অভাব ত রাখেন নি। তবুও যদি কিছু দরকার হয়, যখন সময় হবে তখন আমি নিজে থেকেই তা চেয়ে নেব আপনার কাছে, যা আমার খোয়াইস্‌। আজ সেই দিন এসেছে জাঁহাপনা। আজ আমি আমার সেই যাচ্ঞা পূরণ করতে এসেছি। আপনি এবার আমার প্রার্থিত বস্তু আমাকে প্রত্যর্পণ করুন জাঁহাপনা।

বাদশা ব্যস্ত হয়ে বলেন, বলুন গুরুদেব বলুন, কি আপনার যাচ্ঞা? এত ইতস্ততঃ করছেন কেন? আমার সাধ্যাতিরিক্ত না হলে আমি আপনার সে খোয়াইস নিশ্চয়ই পূরণ করব শেখসাহেব। আমার সব ইয়াদ আছে। এখনও অতটা আত্মবিস্মৃত হই নি।

এবার শেখসাহেব বাদশার মুখের ওপর পূর্ণদৃষ্টি তুলে ধরলেন—দেখলেন, বাদশার চোখের নীচে পড়েছে গভীর কালিমা। চক্ষু দু'টি শরাবের নেশা তখনও কাটাতে পারে নি। সারা শরীরে যেন কত দিনের কত ক্লান্তি আর অবসাদ মাখান। নবাব বাদশার সেই পবিত্র উৎফুল্ল ভাব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নত করলেন বাদশাহ। এই অন্তর্ভেদী সন্ধানী দৃষ্টির তীব্রতা তিনি সইতে পারলেন না। শেখসাহেব কিন্তু তেমনি ঋজু ভঙ্গিতে স্থির হয়ে বসে, শান্ত অথচ তীব্রস্বরে বললেন, তাহলে আপনি আপনার ঐ নাচনেবালি কঞ্জীর হাসিনাবাঈকে আমায় দান করুন জাঁহাপনা।

কক্ষে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় বাদশা এতটা চমকিত হতেন না। সমস্ত মুখ তাঁর নিমেষে শাদা কাগজের মত নিরক্ত হয়ে উঠল। তিনি স্বগতোক্তি করেন, ইয়া আল্লা! এ কি অদ্ভুত যাচ্ঞা তোমার? তুমি যে আমার দিনের সূর্য্য আর রাতের চন্দ্র কেড়ে নিয়ে আমাকে ঘোর আন্ধেরায় ফেলে দিচ্ছ প্রভু। এ কেমন খোয়াইস তোমার? শেখসাহেব কিন্তু তেমনি ভাবলেশহীন মুখে বাদশার মুখের রং বদল নির্নিমেষ নেত্রে লক্ষ্য করছিলেন। এবার ধীরে ধীরে বাদশা বলেন, বেশ আপনার যা অভিরুচি। তবে এই সব দিলরুবা, সারেঙ্গী, সেতার, ঐ যে আরও বাদ্যযন্ত্র, এই মহলের এই সব আসবাব এবং

হরেক রকম নাচের পোশাক পেশোয়াজ, পাজামা, চুন্নী, ওড়নী সব, সবকিছু নিয়ে যান আপনি। নাহলে—নাহলে এই সব আসবাব আমার মনের জ্বালা আরও বাড়িয়ে দেবে পীরসাহেব। ব্যথায় গলা বুজে আসে বাদশার। মনে হয় যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে তাঁর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

কিন্তু পীরসাহেবের নিবাত নিষ্কম্প স্বর। গম্ভীর ভাবে তিনি বলেন, না শাহেনশা, আমার পর্ণকুটীরে এই সব নবাবী আসবাব খাপ খাবে না। তার চেয়ে কোন গরীব দুঃখীকে ওগুলি দান করে দিন, তারা বিক্রি করে রুপেয়া পাবে আর তাতে আল্লাও আপনার ওপর খুশ থাকবেন। আচ্ছা এবার আমি যাব। আমার নমাজের সময় হ'ল। আপনি শুধু একটা তাঞ্জামে ঐ হাসিনাবানুকে আমার সঙ্গে আমার হাভেলিতে পাঠিয়ে দেবার ইন্তেজাম করুন জাঁহাপনা।

বাদশার হুকুমে হারেমের মধ্যে থেকে একটি তাঞ্জাম বেরিয়ে এল। ফকিরসাহেব ভাবলেশহীন মুখে অনুসরণ করেন সেই তাঞ্জামের।

শাহেনশার মুখে ফুটে উঠেছে সর্ব্বহারার মত সর্ব্বস্ব হারানর বেদনা। কিন্তু তিনি যে কথা দিয়েছিলেন পীরসাহেবকে। জান যাবে তবু মান যাবে না। সেই মরদকা বাত হাতীকা-দাঁত এর প্রবাদ বাক্য রাখতে গিয়ে জান যায় সেও স্বীকার। এ ত আর যে-সে মরদকা বাত নয়; এ যে স্বয়ং বাদশা নজরৎ হুসেনশার জবান। তাঞ্জাম চোখের আড়াল হতেই বাদশা ছিন্নমূল তরুর মত লুটিয়ে পড়লেন ফরাসের ওপর। মুখে শুধু ফুটে উঠল, হাসিনাবানু, মেরে পেয়ারী, মেরে আঁখোকে সিতারে, হায় তু মেরা কলিজা ফার লে গয়ী। হায় খোদা, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া।

এদিকে সেই তাঞ্জাম এসে নামল পীরসাহেবের মাটির দাওয়ায়। তাঞ্জামের কিংখাবের পর্দা সরিয়ে অতি ধীরে প্রথমে মাটি স্পর্শ করল দু'টি সাচ্চাজরীর লাল নাগরা। তার পর দুলে উঠল সোনালী রং-এর গুলবসান সবুজ রং-এর পেশোয়াজ, এবার ঝিলিক হানল জাফরানী রং ওড়না। শেখসাহেবের দৃষ্টি কিন্তু এখনও ভূমি স্পর্শ করে আছে। যেন তিনি কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। সত্যিই চিন্তা করছেন না আত্মসংবরণ করছেন? প্রশ্ন ফোটে হাসিনাবানুর উদ্ধত দৃষ্টিতে। এত অবহেলা তার প্রস্ফুটিত যৌবনকে? সাম্রাজ্ঞীর মত রূপকে? কে ঐ ফকির? এবার সে তার মোতিবসান কারু-কার্য্যময় মাথার তাজে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকের প্রকটিত দারিদ্র্য নিরীক্ষণ করে কঠোর স্বরে পীরসাহেবকে প্রশ্ন করে, কেন আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন? আমার দ্বারা আপনার কোন স্বার্থ সাধি[illegible] হবে ফকিরসাহেব?

সচমকে দৃষ্টি উত্তোলন করেন পীরসাহেব, তাঁর শান্ত সমাহিত চিত্তে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে ঐ তাচ্ছিল্যপূর্ণ স্বর। তাই তার কথার উত্তর না দিয়ে ঐ অপরূপ রূপসী নারীকে চরম উপেক্ষা দেখিয়ে, তিনি তাঞ্জামবাহকদের আদেশ দেন, শাহাতাঞ্জাম যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এবার একটি ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে হাসিনাবানুকে বলেন, যাও, ঐ তোমার কামরা, বিশ্রাম কর ওখানে।

কামরা? একে বলে কামরা? চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কঞ্জীর হাসিনাবানু। কি বিশ্রী ঘর! না আছে কোন আসবাব, না কিছু। শুধু জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাই আছে এখানে। মেঝেতে একটি চাটাই বিছান, বোধ হয় নমাজ-পড়ার কাজে আসবে। আর রাত্রে নিদ্রা যাবার জন্য আছে একটি দড়ির চারপাই। ঐ পাশে ঝুলছে একটি দড়ির আলনা। তাতে টাঙান রয়েছে দু'টি সস্তাদরের সালোয়ার কামিজ আর ওড়না। ওগুলি নতুন বলেই মনে হচ্ছে। আর এক পাশে একটি টুলের ওপর রয়েছে জলের বদনা ও তার পাশে একটি তানপুরা। ছোট্ট খিড়কির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে ধুলো-ওড়া একটি রুক্ষ মাঠ। হাসিনাবানুর মেজাজও অমনি রুক্ষ হয়ে ওঠে। এবার সে সশব্দে নিজের কোঠরির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে শিকলি এঁটে দেয়। মনেও তার উঠেছে ঐ ধুলোর মত চিন্তার ধোঁয়া। কোথায় সেই আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসের উপকরণে সজ্জিত বাদশাহের সবুজমহল। আর কোথায় এই পীরসাহেবের মাটির কুঁড়ে?

দরজা আর খুললই না হাসিনাবানু। বুড়ি আঈ শেখসাহেবের নির্দ্দেশে কতবার ডাকাডাকি করে ফিরে গেল রুটি আর পানি নিয়ে। পণ করেছে হাসিনাবানু, দরজা সে খুলবে না, শুকিয়ে মরবে সেও ভাল, তবু খাবে না এই নিরন্নের অন্ন। কেন? কি দরকার? যদি সে তার প্রতিজ্ঞাই না পুরো করতে পারল ত কি দরকার তার এই ছার জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার। খাদ্য দিয়ে ঘৃণ্য শরীরটাকে পুষ্ট করার? উপবাসক্লিষ্ট মুখে প্রতিহিংসা-কুটিল দৃষ্টি ধক্‌ধক্ করে জ্বলে ওঠে তার দু'টি জ্বালাময় চোখে। রাত হলেই সে পালিয়ে যাবার ফিকির খোঁজে। কিন্তু ঠিক তার পাশের কামরাতেই যেন কে[illegible]

শুতি সুমধুর স্বরে গজল গাইছে বা কোরাণশরিফ পাঠ করছে শুনতে পায়। সারা রাতই প্রায় ঐ গান আর পাঠ চলতে থাকে। ঐ পাঠ থামার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত হাসিনা।

দু'দিনের দিন আঈ দুম দুম শব্দে দরজায় ধাক্কা দেয় আর বলে, এ তোমার কি রকম ব্যবহার বাহু? নিজেও খাচ্ছ না আর আমাদের পীরসাহেবকেও উপোস করিয়ে মারছ? তুমি তাঁর মেহমান, তুমি রুটি পানি ফিরিয়ে দিলে তিনি কি করে আহার করেন? এমনি করে সাধু-ফকিরকে তকলিফ দিলে দোজখেও ঠাঁই হবে না তোমার। নাও, দোর খোল খুব রাগ রুঠাই দেখান হয়েছে। বার বার তিন বার ডেকে গেল আঈ। কিন্তু হাসিনাবানু দুই কানে হাত চাপা দিয়ে তেমনি কাঠ হয়েই পড়ে রইল চারপাইতে।

শেখসাহেবের হয়েছে মহা জ্বালা। এতদিন নারীসঙ্গ-বর্জ্জিত সংযমী জীবনযাপনেই অভ্যস্ত তিনি। মেয়েদের মনের গতি তিনি কি জানেন? ভাবছেন, এই বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন নারীকে কি ক'রে বশীভূত করবেন তিনি। এ যে তাঁকে কোন কথা বলারই সুযোগ দিল না। তবে কি সত্যি ও বাদশাকে এতই ভালবাসে? যার জন্য বাদশার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে আনায় অমন বিরহ-ব্যাকুলা হয়ে পড়েছে? কে জানে কেমন এই ভালবাসা? তবে তিনিও ত চান যে ও বাদশাকে ভালবাসুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাদশার বাদশাহীকেও ভালবাসুক। আর বাদশা যখন একেবারে ওর হুকুমবরদার, তখন ও সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর দ্বারা রাজ্যের মঙ্গলসাধন করুক। তাঁকে কার্য্যে প্রেরণা দিক। শুভবুদ্ধি দিক। তা না হয়ে এ কেমন সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা ওর? তাতে যে রাজ্য ছারখার হয়ে গেল? তা কি বুঝছে না ও? অমন বীরপুরুষ আলীজাকে যে একেবারে মেষ বানিয়ে রেখেছে ও। ছিঃ, এ কেমন নারী যার মধ্যে নেই কোন কল্যাণীর বিকাশ?

গভীর রাত্রে আকাশ অন্ধকার ক'রে আঁধি উঠেছে। থেকে থেকে বিজলীর ঝিলিক আকাশটাকে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত চাঁদির চাবুক মেরে মেরে যেন চিড় ধরিয়ে দিচ্ছে। জানলার ধারে খাটিয়াটাকে টেনে এনেছিল হাসিনাবানু, একটুখানি বাতাসের আশায়। অবসাদগ্রস্ত আচ্ছন্নের মত প'ড়ে ছিল খাটিয়াখানায়। বিদ্যুতের ঝিলিক চোখে লাগতে গুঙিয়ে ওঠে চাপা কান্নায়—আতঙ্কগ্রস্তের মত অস্ফুটে আর্ত্তনাদ করতে থাকে;—ও স্বপ্নে দেখে ওর জীবনের সেই কালরাত্রির বিভীষিকা।

একটি মধ্যবিত্ত মারাঠী পরিবার। মা, বাপ, ভাই-বোন। এই চারটি প্রাণীর সুখের সংসার ছিল তাদের। ঐদেশীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বাধল মোগল সম্রাটের। দলে দলে মারাঠা যুবক দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে জীবন বলি দিল। মোগলেরা এবার নাজেহাল হয়ে বলের পরিবর্ত্তে নিল ছলের আশ্রয়। শান্তির নিশান উড়িয়ে যুদ্ধে বিরত হ'ল তারা। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে সুরু হ'ল তাদের জঘন্য নৃশংসতা। লুঠতরাজ, ধর্ষণ ক'রেও ক্ষান্ত হ'ল না, একটির পর একটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল তারা। অসহায় লোকেদের আর্ত্তচিৎকারে খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল রাত্রির নিস্তব্ধতা। যুবতী মেয়ে পার্ব্বতী ঘরের মাচার ওপর লুকিয়ে থেকে ভয়ার্ত্ত চোখে ঘুলঘুলি দিয়ে দেখছিল বাইরের সেই নারকীয় দৃশ্য। আগুনের লেলিহান শিখা উঠেছে আকাশপানে। আর সেই আগুনের আলোয় পলায়নরত ও আক্রমণরত লোকেদের ছায়াগুলো যেন এক-একটা নিশাচর প্রেতের মত দেখাচ্ছে। হঠাৎ একটা হল্লা উঠল তাদের বাড়ীর মধ্যে। উঃ ভগবান্! ওরা কি মানুষ না পশু? পশু না হলে কি ক'রে ঐভাবে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল তার বুড়ো বাবাকে—মা বাধা দিতে গেলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল তাঁকে। তাঁর দেহটা এসে আছড়ে পড়ল তারই মাচার নীচে। পারল না সে আর লুকিয়ে থাকতে। মাচায়-রাখা টাঙ্গি দু'টো দু'হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের মধ্যে। দেখল, তার ভাই পেয়ারেলাল উঠোনের একপাশে লড়াই করছে তিনজন সেপাইয়ের সঙ্গে। যতক্ষণ ওর জ্ঞান ছিল লড়েছিল ও সেই টাঙ্গি নিয়ে। কিন্তু পারবে কেন অতগুলো অসুরের সঙ্গে লড়াই করে? তারা তার সবকিছু নিল লুঠ ক'রে। উঃ কি অসহ্য যন্ত্রণা! একের পর এক মেটাল তাদের লালসার ক্ষুধা। বেহুঁস হয়ে গিয়েছিল সে। জ্ঞান হতে দেখে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে চলেছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে উঠেছিল, চেঁচিয়ে বলেছিল, পানি, পানি, একটু পানি দাও আমায়। যে-সিপাহী নিয়ে যাচ্ছিল তাকে, সে এক মুখ থুথু দিয়েছিল তার মুখে। তার পর দিয়েছিল তাকে বাঁদীবাজারে বিক্রি ক'রে। এই অকথ্য অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে না সে? নেবে বৈকি। মোগল রাজ্য ছারখার ক'রে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে তারা। এই প্রতিজ্ঞাই করেছিল তারা দুই ভাই-বহিন মিলে। ঐ আমীর আলি মানে তার ভাই পেয়ারেলাল; তাকে

দেখতে পেয়ে বাঁদীবাজার থেকে কিনে এনেছিল। ঐ মুসলমানেরা তার ভাইয়ের মুখে জোর ক'রে গোমাংস ঠুসে দিয়ে ওকে দিয়ে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করেছিল। তার পর দুই ভাই-বোনে যুক্তি করে কিভাবে সর্ব্বনাশ করা যায় এই মোগল সাম্রাজ্যের। ওর ভাই নিজের কর্ম্ম-দক্ষতায় আলিজার বিশ্বস্ত অনুচর ও সৎপরামর্শদাতা বন্ধু সেজেছে। এবার নাচ-গান শিখে, তালিম নিয়ে ও গেল বাদশার হারেমে। মান-ইজ্জত যখন আর কিছুই নেই তখন এই ছার দেহটা দিয়ে ও সব ছারখার ক'রেই ছাড়বে, এই পণ ক'রেই গিয়েছিল বাদশার হারেমে। ভাইয়ের কথামত তার অবাঞ্ছিত লোকেদের সরিয়েও দিয়েছিল ইহজগৎ থেকে। তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ হওয়ার আর অল্পই বাকি ছিল। বাদশার গাফিলতিতে দেশে অরাজকতাও সুরু হয়ে গিয়েছিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই দেশে একটা বিরাট লড়াই বাধিয়ে দিতে পারত তারা। কিন্তু মাঝখান থেকে বাদ সাধল এই ফকির। কিন্তু উঃ! এ যে আবার তেমনি আগুন জ্বলছে—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে। পানি! পানি!—একটু পানি! ঠাণ্ডা শীতল জলের স্পর্শে আচ্ছন্নভাব কেটে যায় হাসিনাবানুর, চমকে উঠে ব'সে বিদ্যুতের আলোয় দেখে, খিড়কির ফ্রেমে-আঁটা একখানি ক্ষমাসুন্দর মুখ। বদনা দিয়ে জল ঢেলে দিচ্ছিল তার তৃষ্ণার মুখে।

দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়ে মনে পড়ে তার বর্ত্তমান অবস্থা। আবার উদ্ধতভাবে সেই একই প্রশ্ন করে শেখসাহেবকে, কেন আপনি আমাকে এখানে এনেছেন? আমার দ্বারা আপনার কোন্ খোয়াইস্ পুরো হবে?

শেখসাহেব উত্তর দেন, তুমি এখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, আগে খানা খাও তার পর বলব।

উত্তেজিত স্বরে হাসিনাবানু বলে, না না, আমি জানতে চাই, শুনতে চাই, আজই—এক্ষুণি আবার আমাকে বাদশার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসুন। আমি থাকব না এখানে। না হলে আমি জল স্পর্শ করব না।

বেশ, তোমাকে আমি বাদশার কাছেই পৌঁছে দেব। তবে এখন নয়, সাত দিন পরে। এই সাত দিন যদি তুমি আমার নির্দ্দেশ মেনে চল, পালাবার চেষ্টা না কর, তবেই আমি আমার বাত রাখব। প্রথম কথা কাল ফজিরে তুমি আহার গ্রহণ কর। তোমার এই অহেতুক রোকটা ভঙ্গ কর। রাজী আছ?

ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি তুলে হাসিনাবানু আক্রোশের সঙ্গে বলে, আচ্ছা, মঞ্জুর!

ভোর হতেই শেকল খুলে বেরিয়ে এল হাসিনাবানু। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে জল তুলে স্নান করল আগে। তার পর চারদিক্ ঘুরে দেখতে লাগল। ওদিকে একটা মক্তব রয়েছে। এই ক'দিন তা হলে ঐ ছেলেদেরই গুঞ্জন শুনেছে সে। তার পর ঐ মক্তবের পাশেই রয়েছে পীরের দরগা। সব জায়গাই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কুয়োর পাড়ে রয়েছে দেশী ফুলের গাছ। ফুটেছে বেলা, চামেলি, সন্ধ্যামণি। এদিকে গোয়ালঘরে কয়েকটি গাই প্রসন্ন মুখে জাবর কাটছে বা তাদের নধর বাছুরগুলির দেহ লেহন করছে। মনে পড়ে যায় তাদের গ্রামের বাড়ী। এমনি মাটির উঠোন সেখানেও ছিল! তাতে এই সব ফুলের চারা সে লাগিয়েছিল নিজের হাতে। তাদেরও গরু ছিল গোয়ালে। হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি মনে পড়ায় নিমেষেই মনটা উদাস হয়ে ওঠে। ঘরে এসে একে একে সব জেবর গহনা খুলে ফেলে, আলনা থেকে টেনে নেয় সেই সস্তা ছিটের সালোয়ার কামিজ; ভিজে চুলের রাশ এলিয়ে দেয় পিঠে। ঘরের দরজায় খটখট আওয়াজ উঠতে চমকে ওঠে সে, দেখে শেখসাহেব নিজের হাতে এক গেলাস দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ক'দিনের উপবাসে দেহটার সঙ্গে মনটাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন। মনে পড়ে যায় কাল রাত্রের দেওয়া সেই জবান। হ্যাঁ, সাত দিন ধ'রে এঁর নির্দ্দেশ মেনে চলতে হবে। বিনা বাক্যব্যয়ে হাত পেতে দুধের গেলাস নেয় হাসিনাবানু—এই ক'দিনের উপবাস পীরসাহেবকেও যে ক্লিষ্ট করেছে সেটা লক্ষ্য ক'রে হাসিনাবানুর নারী অন্তঃ-করণ বেদনার্ত্ত হয়ে ওঠে। বলে, আপনিও উপবাস ভঙ্গ করুন শেখসাহেব। এই সদ্যস্নাতা, প্রসাধনবর্জ্জিতা, নিরাভরণা রমণীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠ ক্ষণিকের জন্য উন্মনা ক'রে তোলে নবীন সন্ন্যাসীকে।

হাসিনাবানু শেখসাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে অবাক্ হয়ে যায়! ঐ একটিমাত্র বুড়ি আঈয়ের সাহায্যে মক্তবের অতগুলি ছাত্রের রুটি পাকান, গরুর পরিচর্য্যা, বাগানের গাছপালার যত্ন সবদিকে সামাল দিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। তার পর ছাত্রদের পড়ান। অদ্ভুত পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান্ মানুষ এই পীরসাহেব। তাকে বলেন, যাও, পীরের দরগা সাফ করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দাও। ও চমকে ওঠে, বলে, সে কি? আমি যে নাচনেবালি কঞ্জীর? আমি কি করে ছোঁব পীরের দরগা? স্মিত হেসে পীরসাহেব বলেন, যাই হও, তুমি ত ইনসান? আমি আর কিছু মানি না; মানি ইনসানিয়তকে, মনুষ্যত্বকে। তাছাড়া পাপপুণ্যের

মালিক ত খোদা। সব কিছু তাঁর কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও তুমি।

হাসিনাবাগু ভাবে, দৈত্যকুলে এ কোন্ প্রহ্লাদ? ঐ খল মুসলমান জাতের মধ্যেও তবে এমন লোকও আছে? এবার নমাজ পড়তে হবে। মারাঠী ব্রাহ্মণের মেয়ে পূজোই করেছে, নমাজ ত পড়ে নি। পীরসাহেব বলেন, ও কি, তুমি নমাজ পড়তে জান না? কে তুমি? কি তুমি? মাথা নীচু করে নিরুত্তর থাকে হাসিনাবাগু। একটু পরে আবার ফকিরসাহেব বলেন, যাক, তুমি যাই হও, এই মন্ত্র বল, আর এই আমার মত করে নমাজ পড়, দেখ মনে শান্তি আসবে। ও অনুকরণ করে যায়। এবার মক্তবের ছাত্রেরা এসেছে তাদের সিধে নিয়ে। এরা বড় গরীব, তাই এই সামান্য সিধের বিনিময়ে শেখসাহেব এদের খাদ্য এবং বিদ্যা দুই-ই দান করেন।

পরদিন ওকে টাঙ্গা করে নিয়ে চললেন শহরে। ওরা পৌঁছল একটি আতুরালয়ে। সব রোগীরাই পীরসাহেবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে করল আসালাম আলেকুম। এদের বেশীর ভাগই পড়ে আছে মাটিতে। আতুরালয়ে বড়ই স্থানাভাব, কারণ এটি অসম্পূর্ণ। ওরই মধ্যে ঘুরে ঘুরে পীরসাহেব যতটা সম্ভব রুগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলেন। এবার টাঙ্গায় ওঠার সময় হাসিনাকে বললেন, এই অসম্পূর্ণ আতুরালয় এতদিনে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হয়ে যেত। রোগীরা আরও স্বাচ্ছন্দ্য পেত। কেন হয় নি জান? মোহাচ্ছন্ন বাদশার গাফিলতির জন্য। এরপর ক'দিন ধ'রে দেখালেন যমুনার ওপরের ভগ্ন সেতু। স্থানীয় লোকেরা কত কষ্টে পারাপার হচ্ছে। কত অসম্পূর্ণ কুয়া, যা থেকে পথচারীর তৃষ্ণা নিবারণ হ'ত। তার পর দেখালেন একটি অর্দ্ধসমাপ্ত মসজিদ। সেটি শেষ হলে বহু সাধু-ফকিরের নিবাসস্থল গ'ড়ে উঠত। এ ছাড়াও দেখালেন বহু ভাঙ্গা সড়ক, যা মেরামতির অপেক্ষায় পড়ে থেকে পথচারীর বিপদ্ ঘটাচ্ছে। তার পর বলেন, এ ত অতি সামান্য দৃষ্টান্ত। আমাদের শাহেনশা তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা, তাঁর এই গাফিলতির জন্য সারা হিন্দুস্থানের কত লোক যে তকলিফ ওঠাচ্ছে তা কেইবা দেখতে যাচ্ছে। আর শাহেনশার এই গাফিলতির মূলে আছে তোমার সর্ব্বনাশা মোহ। তাছাড়া শাসন ব্যবস্থা শ্লথ হলে দেশে দস্যু লুঠেরার উপদ্রব বেড়ে যায়। কত লোক যে তাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আন্দাজ করতে পার কি তুমি? অথচ তুমিই আবার ঠিক এর উল্টোটি করতে পার। বাদশাকে উৎসাহ দিয়ে দেশের দশের উপকার করতে পার। আর তুমি তাই করবে এই আমি চাই। খোদা তোমাকে অসামান্য রূপ দিয়েছেন, অমন সুমধুর কণ্ঠ দিয়েছেন, তুমি তাঁর এই দান তাঁরই কাজে লাগাও। তাঁরই সৃষ্ট জীব মানুষের ভাল কর তবে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। তুমি বলছিলে তুমি পাপী। পাপের বাসা ত মনে। মন উন্নত কর। অন্যকে শান্তি দেবার চেষ্টা কর। তবেই নিজে শান্তি পাবে। নিজের আনন্দটাই বড় করে দেখো না, অন্যের আনন্দে নিজের আনন্দ মিশিয়ে দাও, দেখবে তোমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যাবে। তাছাড়া তুমি জাঁহাপনাকে ভালবাস, তিনিও তোমার বাধ্য, তোমার পক্ষে ত খুবই সহজ হবে এই কাজ। যাকে ভালবাস তার হিত চিন্তা করাই তোমার উচিত। বোরখার তলায় হাসিনাবাগুর দুনয়নে তখন অশ্রু ঝরছে অবিরল ধারায়। আর কোন কথাই তার কানে যাচ্ছে না। সে নিষ্পন্দ হয়ে বসে আছে, আর অবাক্ হয়ে ভাবছে, কি করে ইনি তার মনের কথা টের পেলেন। যা সে ভেবেছিল তা ত নয়। অগাধ পাণ্ডিত্য আর জ্ঞান আছে এঁর।

বুড়ি আঙ্গী-এর অসুখ করায় কদিন শেখসাহেবকে সমস্ত কাজে সাহায্য করছে হাসিনাবাগু। আর সন্ধ্যে বেলার নমাজের পর তানপুরা নিয়ে একটির পর একটি গজল গেয়েছে পীরসাহেবের দরগায় বসে। সে ক্লান্ত হলে পীরসাহেব তান ধরেছেন, পুরিয়া, কেদারা, আড়ানার ঢেউ বয়ে গেছে। মনে তার অদ্ভুত প্রশান্তি ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে, সার্থক হয়েছে তার গান শেখা। কি দরাজ গলা ঐ পীরসাহেবের। ছোটবেলা থেকে উনি এই সুরের মধ্যেই ডুবে ছিলেন। তার পর আব্বাজানের মৃত্যুর পর তাঁর অসম্পূর্ণ কর্ম্মের ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন। বড় শান্তি পেয়েছে হাসিনা। এখানে তার অভিনয়-চাতুর্য্য ছলাকলা দেখাতে হয় না, বা ক্ষণে ক্ষণে বিলোল কটাক্ষ হানতে হানতে সিরাজির পেয়ালাও ভরতে হয় না। সুরাসক্ত নবাবের কামার্ত্ত চাহিদায় নিজেকে বলিও দিতে হয় না। নারী তাকেই জয় করে আনন্দ পায় যে অজেয়। যাকে আয়ত্তে আনা কঠিন, অধিকার করা দুরূহ, তার প্রতিই নারীর চিরকালের লোভ, আকর্ষণ। অমন হাজারটা পদলেহী কামার্ত্ত বাদশা তার রূপের প্রশংসা বা নাচ-গানের অজস্র তারিফ করলেও তার মন ভরবে না; ঐ সমস্তই দরিয়ার জলে ভেসে যাবে, যদি সত্যিই কোন মানুষের মত মানুষ, কোন সাঁচ্চা ইনসান, তার কদর বুঝে, আপন ভুলে মুগ্ধ স্বরে শুধু বলে একটি 'আহা।' তখন আর গিটকিরি গমকের বা ঘন ঘন তান ছাড়ার দরকার হয় না, দরকার হয় না

নিজের কারিগরি কালোয়াতি প্রকাশের, গান তখন ঝরণা ধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে প্রাণের গভীর কন্দর থেকে আপনি উৎসারিত হয়ে গায়ক ও শ্রোতাকে এক স্রোতে বিলীন করে দেয়।

ভোরের সূর্য্য দেখা দিতে দু'জনেরই চমক ভাঙল। আজই সাত রোজের মেয়াদ শেষ। একটু পরেই এল বাদশাহী তাঞ্জাম। শেখসাহেব আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। আজ জুম্মাবার। মক্তবের ছুটি। ছেলেরা নিজেরাই নিজেদের রুটি পাকাচ্ছে। শেখসাহেব হাসিনাবানুকে বলেন, নাও, তুমি তৈরি হয়ে নাও হাসিনাবানু! চল, তোমাকে হুজুর সাহেবের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ও বলে, সে কি? আগে আপনি নমাজ পড়ে নাস্তা করে নিন, তবে ত যাবেন।

না, তুমি জান না হাসিনাবানু, আজ আমি পীরের দরগায় সিন্নি মেনেছি। আজ সন্ধ্যার আগে ত আমি উপবাস ভাঙব না। আজ আমার চরম পরীক্ষা ও দায়মুক্তির দিন। বল তোমাকে তোমার প্রিয়তম বাদশার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমরা দু'জনেই আমাকে নিষ্ঠুর বেরহম ভেবে মনে মনে কত অভিসম্পাত দিচ্ছ। কিন্তু আশা করি এখন তুমি আমার উদ্দেশ্য বুঝেছ। বাদশাকে যেমন ভালবাস, আবার তাঁর সঙ্গে তাঁর বাদশাহীকেও তেমনি ভালবাস এই আমি চাই হাসিনাবানু।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হাসিনাবানু তার বোর্খার নকাবটি নামিয়ে দেয় মুখের ওপরে। ফকিরসাহেব আর তার মুখ দেখতে পান না। শুধু প্রশ্ন করেন, তোমার সে বেশ কই? যা পরে এসেছিলে সেই পোশাক পরে এস। আর হাতের ঐ পুঁথি রেখে এস। ওটি সংস্কৃত পুঁথি। ওটি আমার হিন্দু-গুরুর দেওয়া। তাঁর কাছেই আমি প্রথম নাড়া বেঁধেছিলাম।

এবার বোর্খার মধ্যে থেকে ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর আসে, আজ সাত রোজ খতম হয়ে গেছে শেখসাহেব, তার সঙ্গে আমার প্রতিজ্ঞাও শেষ হয়েছে। আর আমি আপনার সব বাত মানতে বাধ্য নই। এই বলে সেই পোশাকেই গিয়ে তাঞ্জামে ওঠে হাসিনাবানু। আর শেখের বুক কাঁপিয়ে পড়ে একটি দীর্ঘশ্বাস।

তাঞ্জাম হারেমে নামিয়ে বান্দারা সরে যেতেই বাদশা নিজে এসে তাঞ্জামের ঢাকা তুলে হাত ধরে সাদরে নামাতে যান হাসিনাবানুকে, বলেন, মেরী প্যায়ারী, মেরে বুলবুল, এতদিনে আবার ফিরে পেলাম তোমাকে। উঃ, এই কয়দিনে যেন কত সাল কেটে গেছে। আমার বুকটা বিশ মণ পাথর হয়েছিল।

কিন্তু যার জন্য এত উচ্ছ্বাস সে আর আগের মত কলহাস্যে ওঁর গায় ঢলে পড়ল না বা তাঁকে একটা সালামও দিল না। নিস্তব্ধ হয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যাবেলা শেখসাহেবের কুটিরে পীরের দরগায় দীপ জ্বলছে। বুড়ি আঈ সিন্নির উপকরণ সাজিয়ে দিয়ে একপাশে বসে ঢুলছে। শেখসাহেব উন্মনাভাবে উঠানে পায়চারি করছেন। কিছুতেই মনের প্রশান্তি ফিরে আসছে না তাঁর। মন স্থির না হলে কি করে নমাজ পড়বেন, আর কি করেই বা সিন্নি চড়াবেন। মনে মনে খোদার কাছে দোয়া চাইছেন চিত্তশুদ্ধির জন্য। কিন্তু অন্তরের মধ্যে ডুব দিলেই একটি গীতরতা মুদিতচক্ষু রমণীয়া রমণীর ভাবাবেশমাখা মুখচ্ছবি চিত্তপটে ভেসে উঠছে। নিজেকে শাসন করছেন—ছিঃ, কেন ওকে ভাবছি? ও ত বাদশার পেয়ারী। মন থেকে জোর করে তাকে সরিয়ে দিতেই আবার সেই নারীই তার কর্ম্মব্যস্ত চঞ্চলমূর্ত্তিখানি নিয়ে মানসপটে ফুটে উঠছে। অশান্ত মনে তাই চক্কর কেটে কেটে উঠানের মাঝে ঘুরেই চলেছেন শেখসাহেব। মসজিদে মসজিদে আজানের আওয়াজ উঠছে। পাখীরা কলরব করে কুলায় ফিরছে। সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলেছেন। কিন্তু শেখসাহেব সেই একই চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় একটা হুম্‌হুম্ শব্দ উঠতে চমকে ওঠেন তিনি। এ কি? নবাবের তাঞ্জামবাহকদের আওয়াজ না? কোথায় চলেছে এরা এই পথ দিয়ে? এদিকেই যে আসছে ওরা। তাঞ্জাম নামিয়ে দিতে তার মধ্যে থেকে ধীর পায় বেরিয়ে এল হাসিনাবানু। হাতে সেই সংস্কৃত পুঁথি। বাহকরা তাঞ্জাম উঠিয়ে চলে গেল। শেখসাহেব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে ভাবছেন খোদার এ কি মর্জ্জি? একে কি তাঁর কৃপাই বলবেন না প্রহসন? যার জন্য চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, অনন্তর যাকে দেখার তিয়াস উঠছে মনের মধ্যে সে যদি অযাচিতভাবে এমনি করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়, তার জন্য তিনি কি তাঁর আল্লাকে ধন্যবাদ দেবেন? না ওর দ্বারা দেশের যে মহৎ উপকার সাধন করার চেষ্টা করেছিলেন সেটা বিফল হওয়ায় দোষারোপ করবেন খোদাকে?

ওদিকে হাসিনাবানু নববধূর মত সলজ্জ চরণে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় শেখসাহেবের সামনে। চোখে তার ঘৃণা ও ঔদ্ধত্যের বদলে ফুটে উঠেছে আত্মসমর্পণপূর্ণ সপ্রেম দৃষ্টি। ঐ দৃষ্টিই ভুল ভেঙে

দেখ শেখসাহেবের, তাঁরও চোখে ফুটে ওঠে ঐ একই ভাব। প্রেমপূর্ণ গভীর দৃষ্টিতে অপলক নয়নে চেয়ে থাকেন—এই শুভদৃষ্টির মাধ্যমেই হয় তাঁদের আত্মিক মিলন। এবার একেবারে হিন্দু মেয়ে পার্ব্বতীর মতই শেখসাহেবের পায়ের ওপর ভেঙে পড়ে হাসিনাবানু—বলে, আমায় ক্ষমা করুন, আপনার কথা রাখতে পারি নি, ফিরে এসেছি। ভেবে দেখলাম, আমি শাহেনশার দৃষ্টির আড়ালে গেলেই তাঁর মোহ ভঙ্গ হবে। তাছাড়া আমি আমার সত্য পরিচয় দিয়ে ও আমার কি জঘন্য উদ্দেশ্য ছিল সবই তাঁকে বলে এসেছি। এতদিন মিথ্যে ভালবাসার অভিনয় করেছিলাম তাঁর সঙ্গে, একথা বলে তাঁর ভুল ভেঙে দিয়ে এসেছি। তিনি বিবেচক। তাই আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। সব শুনেও শাস্তি দেন নি। বলেছেন, তোমার অনুতাপানল তোমায় শুদ্ধ করবে। তুমি যেখানে শান্তি পাবে সেখানেই যাও। আমি জানি শেখসাহেব তাঁর এই ইনসানিয়ৎ, এই মনুষ্যত্ববোধই আবার রাজ্যে নিয়ম আর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে। তবে আমি কিন্তু আর এখান থেকে কোথাও যাব না শেখসাহেব। আপনার কাছে এসে আমি জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছি। না হলে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত এই ছার দেহটাকে আগুনে আহুতি দিতাম।

শেখসাহেব এবার সস্নেহে তার হাত ধরে তুলে বলেন, ছিঃ, আত্মহত্যা মহাপাপ। শোন, তোমার ভাই আমীর আলি এসেছিল তার অনুচরবর্গ নিয়ে। তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হত্যা ক'রে তোমাকে উদ্ধার ক'রে আবার বাদশার কাছে সমর্পণ করা। পরে আমি নিজেই তোমাকে বাদশার কাছে ওয়াপস করেছি জেনে ও আমার ব্যবহারে অভিভূত হয়ে তোমাদের অতীতের কাহিনী ও উদ্দেশ্য সবই বলে গেল। আমি তাকে বলেছিলাম, তোমার ভগ্নী যদি স্ব-ইচ্ছায় ফিরে আসে তবে কি হবে? সে বলল, তা হলে বুঝব সে ব্রাহ্মণ্যতেজ হারিয়ে সত্যই যবনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি তাকে কাল আসতে বলেছি তুমি তাকে মিষ্ট কথায় তার বিপদ বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সাবধান করে দিও। চল, এবার শান্ত মনে পীরসাহেবের দরগায় গিয়ে সিন্নি চড়াই। আমি জানতাম, তোমার ঐ উদ্ধত রূপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এমনি কল্যাণী মূর্ত্তি। যেমন প্রদীপের উজ্জ্বল শিখার ঠিক নীচেই থাকে তার স্নিগ্ধতার ছায়া। নারীকে আমি অন্যভাবে কল্পনাই করতে পারি না। না হলে তোমরা হিন্দুরাই কি আর ঐ বীভৎস কালীমূর্ত্তিকে পূজো করতে পারতে? যদি না তাঁর ঐ ভয়াল রূপের আড়ালে দেখতে পেতে করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ? তবে একটা কথা, বাদশার ঐ আড়ম্বরপূর্ণ সবুজমহল ছেড়ে তুমি এই গরীবের গরীবখানায় থাকতে পারবে ত হাসিনাবানু?

পার্ব্বতী মালা গাঁথতে গাঁথতে মৃদুকণ্ঠে বলে, ও কথা আর কেন ফকিরসাহেব? আমাদের পুঁথিই যখন পড়েছেন তখন এও নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের ঋষি-বধূরা তাঁদের আশ্রমেই শান্তি খুঁজে পেতেন। তাঁরা কখনই রাজমহিষী হওয়ার জন্য লালায়িত থাকতেন না। তা ছাড়া আমার ভাইয়া একটু ভুল বলেছে, আমি প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে সত্যিই যবনী হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনার দয়ায় ব্রাহ্মণের ক্ষমাগুণ ফিরে পেয়ে আবার ব্রাহ্মণীতেই রূপান্তরিতা হয়েছি শেখসাহেব।
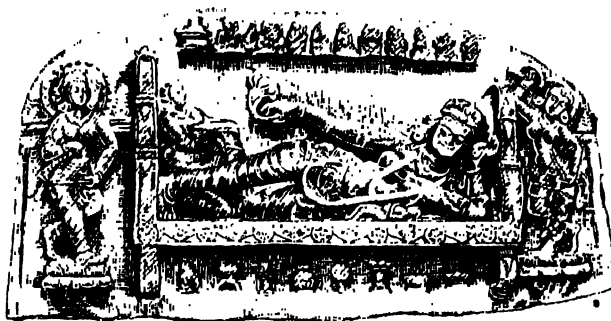
# পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

## সাধক, কবি, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে বঙ্গভূমি যেন বিশেষ ভাবে রত্নগর্ভা হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে যে কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি প্রধান। নবীন বাংলার শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ ভাবে এঁদেরই সৃষ্টি। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজ-সংস্কার ও সাহিত্যসাধনার চতুরঙ্গ প্রয়াসে বাঙালীর অন্তর্নিহিত ভাবমূর্তিকে এঁরা বাস্তবমূর্তি দান করেছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই সারস্বত কর্মযোগীদের অন্যতম। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত থেকে এই কথাই বার বার মনে হয় যে, সরস্বতীর ভাবপ্রসাদ ও স্বভাবকর্মীর বাস্তুদৃষ্টি এই মনীষীর জীবনে যেন সম্মিলিত হয়েছিল।

উচ্চশ্রেণীর মনীষা ও অসাধারণ কর্মোদ্দীপনার একত্র সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। যাঁদের জীবনে এ দু'টির একত্র সমাবেশ ঘটে, সমাজ-লক্ষ্মীর তাঁরা অমূল্য অলঙ্কার। এমনি বিপরীত ভাবসমন্বয় তৎকালীন আরও একজন বিশিষ্ট বাঙালীর চরিত্রে ঘটেছিল। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিবনাথ ও বিদ্যাসাগর—দু'জনেরই জন্মপরিস্থিতিতে এবং চরিত্রে নিগূঢ় একটা ঐক্য আছে। দু'জনেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করে চারিত্র্যের প্রচণ্ড বেগে বংশের ও সংস্কারের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে যে বিরাট্ মানবলোক আছে, সেখানে উত্তীর্ণ হ'তে সমর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য সৃষ্টি করে গেছেন, কিন্তু এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর অলিখিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অলব্ধ কীর্তি মানবকল্যাণকর কর্মের পায়ে তিনি সমর্পণ করে গেছেন। অমিতকীর্তি বিদ্যাসাগরের এই ত্যাগস্বীকারই শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শিবনাথ সম্পর্কেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

তৎকালীন সাহিত্যরথীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ দু'চারজনকে বাদ দিলে এমন প্রভূত সাহিত্যিক প্রতিভা আর কার ছিল? শিবনাথের রচনাগুলি তাঁর জটিল কর্মজীবনের কচিৎ অবসরের দুর্লভ ফল। রবীন্দ্রনাথের তা দৃষ্টি এড়ায় নি। ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে তাঁকে লেখেন: '...বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না - কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।' কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মানবসেবা ও কর্মের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে মানবসেবার মধ্যে শিবনাথ প্রধানতঃ শেষোক্ত পন্থাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর দ্বিপন্থী-প্রতিভা যুগপৎ বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসমাজের উপর আপন অবিনশ্বর মুদ্রা চিহ্নিত করে রেখে গেছে।

ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, নারীসমাজের উন্নতি ও অনুন্নতদের প্রগতিবিধান প্রভৃতি যতগুলি কর্মসূচি ও কর্মসূত্র তৎকালীন বাংলা দেশে ছিল, তার সবগুলির সঙ্গেই তিনি অনায়াসে কর্মযোগ স্থাপন করে নিয়েছিলেন। এমনটা যে সম্ভব হয়েছিল, তার প্রধান কারণ, কর্মকে তিনি কর্তব্যমাত্ররূপে দেখতেন না, কর্ম ছিল তাঁর কাছে মানব-বৎসলতার প্রধানতম পন্থা। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানব-বৎসলতা। মানুষের ভালমন্দ, দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালবাসিবার শক্তি খুব বড় শক্তি। যাঁহারা শুষ্কভাবে, সঙ্কীর্ণভাবে কর্তব্যনীতির চর্চা করেন, তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুইই ছিল—এইজন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না। তাঁহার আত্মজীবনী পড়িতে পড়িতে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে হয়। তিনি ছোট ও বড়, নিজের সমাজের ও অন্য সমাজের নানাবিধ মানুষের প্রতি এমন একটি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা হইতে বোঝা যায়, তাঁহার হৃদয় প্রচুর হাসিকান্নায় সরস-সমুজ্জ্বল ও সজীব ছিল, কোনও ছাঁচে ঢালাই করিয়া কঠিন আকারে গড়িয়া তুলিবার সামগ্রী ছিল না। তিনি অজস্র গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন—মানব-বাৎসল্য হইতেই এই গল্প তাঁহার মনে কেবলই জমিয়া উঠিয়াছিল। মানুষের সঙ্গে যেখানে

ার মিলন হইয়াছে, সেখানে তার নানা ছোট-বড় কথা, নানা ছোট-বড় ঘটনা আপনি আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে এবং চিরদিনের মত তাঁর মনের মধ্যে তাজা থাকিয়া গেছে। অথচ এই তাঁর মানব-বাৎসল্য প্রবল থাকা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁকেই পদে পদে মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে। আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকে ত আঘাত করিয়াছেনই, তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহাদের চরিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁর বিশেষ প্রবল ছিল, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও বার বার তাঁকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা মানব-প্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে সমীরিত।'

মানুষকে যিনি ভালমন্দ সবশুদ্ধ মিলিয়ে সমগ্রভাবে দেখেন—তাঁর কাছে মানব-কল্যাণের কোন কর্মই তুচ্ছ নয়, কোন কর্মই বর্জন করবার মত নয়। এবারে বুঝতে পারা যাবে, তাঁর বিচিত্র কর্মোৎসাহের প্রকৃত উৎস কোথায়? তা শুষ্ক কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যে নয়, জাগ্রত প্রাণশক্তির মানবকল্যাণের অদম্য আকাঙ্ক্ষার মধ্যে—তাঁর সুগভীর মানবপ্রেমের মধ্যে এই কর্মপ্রবাহিনীর উৎস।

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর জীবনকেন্দ্র আর বর্তমান বাঙালী সমাজের জীবনকেন্দ্র বিভিন্ন বিন্দুর উপরে স্থাপিত। বর্তমান সমাজকেন্দ্র ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে বহির্মুখী ও বহিরাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে; উনিশ শতকের জীবনকেন্দ্রের স্থিতিবিন্দুটি ছিল আত্মশক্তি ও আত্মাশ্রয়। এখন আমরা যেভাবে সংঘ, সংগঠন, শাসনযন্ত্র ও নানারকম পরিকল্পনার উপরে নির্ভর করি—আমাদের পিতামহদের সমাজ তেমনটি করত না। সে সমাজ প্রধানতঃ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উপর ও আত্ম-চরিত্রের উপর নির্ভর করত, তাই স্বভাবতঃই এখনকার চেয়ে তৎকালীনেরা অনেক বেশী আত্মস্থ ছিলেন। এই আত্মস্থ ভাবের অপর নাম ধর্মবোধ। অনেক সময় সেকালের বিচার করতে ব'সে আমরা তৎকালসুলভ ধর্মবুদ্ধিকে বিস্মৃত হই—কাজেই সেকালকে বুঝতে পারি না, পদে পদে অবিচার ক'রে বসি। এই ধর্মবোধের বিন্দুতেই শিবনাথের জীবনচক্র স্থিতিশীল। তাই তাঁর সকল কর্মপ্রয়াসের মূলেই ধর্মের সুর ধ্বনিত। রাজনীতি, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নারী-সমাজের উন্নতিবিধান—সবকিছুই তাঁর কাছে ধর্মের অঙ্গ। তাই শিবনাথ ও তাঁর ধর্মবন্ধুদের ব্রাহ্মসমাজ সংকীর্ণভাবে ধর্মসাধনার মন্দির মাত্র ছিল না, ব্যাপক-ভাবে জীবনধর্মপালনের সমাজ ছিল। এই মূল ভাবটি না বুঝলে তাঁকে ভুল বোঝারই আশঙ্কা থেকে যাবে। অর্থাৎ তাঁর সমগ্রজীবনের বিকাশই প্রার্থনার ব্যাখ্যা ছিল।

পৃথিবীতে দু'শ্রেণীর মহাপুরুষ দেখা যায়। এক-শ্রেণীর মহাপুরুষ জীবনের আরম্ভ থেকে অনুকূল পরি-বেশের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পান; আর একশ্রেণীর মহাপুরুষকে কঠিন দারিদ্র্য ও সংগ্রামকে বরণ ক'রে নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হ'তে হয়। শিবনাথ ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মহা-পুরুষ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রভূত অর্থোপার্জনের সম্ভাবনাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে তিনি দারিদ্র্য ও কঠিন সংগ্রামকে গৃহদেবতার ন্যায় বরণ ক'রে নিয়েছিলেন এবং যখন যা সত্য ও কর্তব্য ব'লে মনে করেছেন, অকুণ্ঠচিত্তে তা ক'রে গেছেন। তাঁর জীবন ও সাধনাকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—শিক্ষক, সেবক, প্রচারক ও লেখক। শিক্ষকতায় ছিল তাঁর কৌলিক অধিকার। তিনি অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষাদানের অধিকারকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলেছিলেন। সেবক হিসেবে তিনি ছিলেন স্বদেশ ও সত্যের সেবক। ব্রাহ্ম-সমাজ ছিল তখনকার দিনে দেশের সমস্ত কিছু প্রগতি-মূলক আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ। শিবনাথ এই ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্য দিয়ে নির্ভীক দেশপ্রেমের আদর্শ ও সত্যের বাণী প্রচার করেছিলেন।

সেই অনুপাতে ছিল তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও ধর্ম-ব্যাখ্যাতা। কুড়ি বছর বয়সে তিনি প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নির্বাসিতের বিলাপ' রচনা করেন। এই কাব্যগ্রন্থ তখনই স্কুলে স্কুলে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে নিহিত ভাবের রসধারা মানুষের মন-প্রাণকে বড় করুণ ক'রে তুলত। তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে রচিত 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের 'ডাকেন জননী নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই' প্রভৃতি পংক্তির অনির্বচনীয় ভাবরস ও ছন্দঝংকার আজও সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। তাঁর উপন্যাস 'মেজবৌ' বাঙালী-সমাজে প্রায় ...

করেছে। যখন তাঁর 'যুগান্তর' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তখন সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যথা—নির্বাসিতের বিলাপ ( খণ্ডকাব্য ), পুষ্পমালা ( পদ্যসংগ্রহ ), এই কি ব্রাহ্মবিবাহ, মেজবৌ ( উপন্যাস ), গৃহধর্ম, জাতিভেদ ( বক্তৃতা ), হিমাদ্রি-কুসুম ( কাব্য ), বক্তৃতা স্তবক, পুষ্পাঞ্জলি ( কাব্য ), ছায়াময়ী পরিণয় ( রূপক কাব্য ), যুগান্তর ( সামাজিক উপন্যাস ), নয়নতারা ( পারিবারিক উপন্যাস ), মাঘোৎসবের উপদেশ, মাঘোৎসবের বক্তৃতা, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রবন্ধাবলী, উপকথা ( অনুবাদ ), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ধর্মজীবন ( ৩ খণ্ড ), বিধবার ছেলে (উপন্যাস), ঐ দ্বিতীয় সংস্করণ 'উমাকান্ত' নামে প্রকাশিত, আত্মচরিত, History of the Brahmo Samaj (vols. I & II), Men I Have Seen, প্রভৃতি। শিবনাথের বহু গ্রন্থ আজ লোকচক্ষুর অগোচরে থাকলেও তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত' আজও নবীন-প্রবীণ সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে বিশেষভাবে আদৃত। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধও যে কতখানি সাহিত্যিক উৎকর্ষে উজ্জ্বল হতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর 'ধর্মজীবন'-এর বিভিন্ন উপদেশাত্মক প্রবন্ধাবলী, যেমন—

'অনন্ত বায়ুস্রোত যেরূপ সর্বদা প্রবাহিত, সেইরূপ ভাগবতী শক্তি দ্যুলোকে-ভূলোকে, জড়ে-চেতনে, অন্তরে-বাহিরে সবদাই কার্য করিতেছে। তিনিই মানবহৃদয়ে থাকিয়া ধর্মকে উৎপন্ন করিতেছেন, সেতুস্বরূপ হইয়া মানব সমাজকে ধারণ করিতেছেন। তিনি যেমন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া গ্রহগণকে সূর্যের সহিত, পরমাণুকে পরমাণুর সহিত বাঁধিয়া রাখিতেছেন, তেমনি ধর্ম নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া জনসমাজকে নিজের সহিত, মানুষকে মানুষের সহিত বাঁধিয়া রাখিতেছেন এবং পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান করিতেছেন। বায়ুস্রোতের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছাস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে। আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়, সেই স্রোত তোমাকে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইবে। সাধনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরেচ্ছার সহিত সম্মিলিত হওয়া, প্রার্থনার উদ্দেশ্য অমিলন দূর করা, তপস্যার উদ্দেশ্য ঈশ্বরেচ্ছাকে নিজ হৃদয়ে প্রবল হইতে দেওয়া; অতএব উভয়েরই কার্য এবং প্রয়োজনীয়তা আছে।'

শিবনাথের উপদেশাবলীর ভাষা ছিল এ রকম অনুপম সাহিত্যরসাশ্রয়ী। শুধু মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টি করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁর জীবনের আর একটি বৃহত্তর কর্ম হচ্ছে সাময়িকপত্র প্রযোজনা ও সম্পাদনা। কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারতসংস্কার সভা'র সভ্যরূপে ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে তিনি 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, পরে কেশব-চন্দ্রের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধের ফলে তাঁর সংস্রব ত্যাগ করে চাঙ্গড়িপোতায় গিয়ে 'সোম-প্রকাশের' সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। কলকাতায় ফিরে তিনি দ্বিভাষীপত্র 'সমদর্শী' ও সাপ্তাহিক 'সমা-লোচক' সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পাদিত শিশু মাসিকপত্র 'সখা'র সম্পাদক হন। পরে তিনি নিজে 'মুকুল' নামে একখানি কিশোর মাসিকপত্র প্রকাশ করেন।

গ্রন্থকার এবং সাময়িকপত্রের সম্পাদক হিসেবে তিনি যে মনীষার পরিচয় রেখে গেছেন, সেকালে অনুরূপ পরিচয় অন্যের ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। তাঁর সকল সাহিত্যকর্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধই ছিল প্রবল। তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল একদা প্রকৃতই বলেছেন—'শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন, ভগবদ্‌ভক্তও নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিকও নহেন, মুমুক্ষু সাধকও নহেন, কিন্তু অসাধারণ শব্দসম্পত্তিশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি। এক সময়ে শব্দযোজনার কুশলতায় শিবনাথ বাঙালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিক্ দিয়া বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ।'

# মোরগ

শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

একটা মোরগ ডেকে উঠল—কক্-ককর-কক্।

এবারে ভোর হয়েছে। সারা রাত ছটফট ক'রে শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে দু'জনেই। পটল চোখ কচলাতে কচলাতে রাধার দিকে চেয়ে দেখে। ছেঁড়া ত্রিপল আর চট দিয়ে তৈরী বিছানা জলে সপসপে। তার ওপরেই রাধা ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে। ঘুমাক। সারা রাত ও ঘুমাতে পারে নি। এক-একবার তন্দ্রা এসেছে পটলের আর রাধার কাতরানিতে তা ভেঙে গিয়েছে। কি যন্ত্রণা! চোখের ওপর দেখা যায় না। তাই পটল একবার তাঁবুর বাইরে এসেছে—দূরে এদিক-ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখেছে কোথাও আলোর নিশানা পাওয়া যায় কি না? সারাদিন তার ঐ কাজ। রাত্রেও বুঝি এর বিরাম নেই।

নিস্তার নেই তাঁবুর বাইরে এসেও। অমনি রাধা নাকি সুরে চেঁচাতে সুরু করেছে—শুনছ—বাবা গো!

কি শুনবে! দু'দিন ধ'রেই ত শুনে আসছে। সে ছাড়া মাথা খুঁড়ে ম'রে গেলেও তার যন্ত্রণার কথা আর দ্বিতীয় প্রাণীকে শোনান যাবে না। এ নতুন পৃথিবীতে তারা দু'জনে ছাড়া আর যে আছে সে বাঘা।

বাঘা মানুষ না হলেও বুঝি বুঝতে পারে রাধার যন্ত্রণার কথা। পটল যখন নৌকোর খোঁজে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন বাঘা পটলের দায়িত্ব নিয়ে জলের ধারে গিয়ে ঘেউ ঘেউ সুরু করে। দূরে কোন নৌকা দেখলে বাঘার চিৎকার বাড়ে। সে একবার এগোয় আবার পিছোয়। সময়ে জলেও নেমে পড়ে। ডাকে নৌকোর আরোহীদের। বাঘার চিৎকার শুনে পটলও ছুটে আসে। তার পর দূরের নৌকাটা স্রোতের টানে আরও দূরে চলে গেলে তার ডাকা আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়ে শেষে বন্ধ ক'রে দেয়। পটলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কখনও তাঁবুর কাছে গিয়ে লেজ নাড়তে থাকে। জানিয়ে দেয়—হ'ল না—নৌকাটা এল না!

—কক্-ককর-কক্।

মোরগটা আবার ডেকে ওঠে। তাঁবুর বাইরে আসে পটল। দাঁড়ায় উন্মুক্ত আকাশতলে। বর্ষণক্লান্ত আকাশটার কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। লক্ষ মাণিক জ্বল জ্বল করছে ওপরে। চারিদিকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা—কেবল কল কল ছল ছলাৎ জলের শব্দ ছাড়া।

—কক্-ককর-কক্।

ডানা ঝট্‌পট ক'রে উঠল মোরগটা। আশ্চর্য, মোরগটা এল কোথা থেকে! কোথায় ব'সে ডাকছে। চারিদিকে জল—শুধু জল! ডাঙ্গা কোথায়।

আবছা অন্ধকার। দেখা যায় না ভাল ক'রে। শুধু পূব আকাশটার নীচে ফর্সা হয়ে আসছে।

আবার ডাকল মোরগটা। এবারে বোঝা যাচ্ছে পাশে চালাটার ওপরে ব'সে ও ডাকছে। কদু সেখের মোরগ। ওরা চলে গিয়েছে। ও পাহারা দিচ্ছে পড়ো-ভিটেটা। ঘর ত মাটিতে প'ড়ে মুখ থুবড়ে। জলের ওপর চালাটা জেগে। চালার মরকোচায় ব'সে ও ডাকছে।

বাঁচল পটল। সকলের সঙ্গে না গিয়ে মরমে মরে ছিল ও। আসন্নপ্রসবা বৌ নিয়ে রূপ-রস-গন্ধে ভরা পৃথিবী থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে এই দ্বীপের মধ্যে বাস করবে কেমন ক'রে ভাবছিল। এখন মনে হচ্ছে পড়শী পেল সে একঘর। মোরগটা শুধু পড়শী নয় বন্ধুও। সারা রাত যন্ত্রণায় ককায় রাধা। আর তার সঙ্গে যন্ত্রণা ভোগ করে পটলও। রাত্রি পোহায় না। দুখের রাত্রি বুঝি এমনি দীর্ঘ হয়।

কিন্তু আর ভাবনা নেই। মোরগটা তাকে সকালেই ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার পর সুরু হয় পটলের নৌকার সন্ধান করা। আর নয়। পালাতে হবে। মোরগ আর একটা কুকুর নিয়ে মানুষ বাঁচে না। চারদিকে জল—শুধু জলের শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। মানুষের কলরব নেই। ঝগড়া-বিবাদ নেই। দু'টো সুখ-দুঃখের কথা বলারও উপায় নেই। মনুষ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই মৃত্যুদ্বীপে সে নির্ব্বাসিত। চারদিকের ঘোলা জল যেন তাদের গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে ক্রমাগত। সারা রাত তার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শোনা যায়। তীব্র আস্ফালনের ভাষা পটল বোঝে।

সূর্য উঠছে। মোরগটা আর ডাকছে না। খাবার খুঁজছে। তিন হাত মাত্র জমি। তার মধ্যে পোকা-

মাকড় খুঁজছে। খাবে। বাঁচবে। ঐ তিন হাত জমিটুকু ঘিরেই তার সংসার, পৃথিবী। মোরগটাও তাদের মতই একা। তবু বাঁচতে চায়।

বাঁচতে চেয়েছিল পটলও। ভেবেছিল ডাঙ্গায় গিয়ে কি হবে। জানোয়ারের মত গাদাগাদি ক'রে একটা ঘর নয়ত তাঁবুর মধ্যে থাকতে হবে। কাদের সঙ্গে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। কি খাবে। সারাদিন ভিক্ষে ক'বে একমুঠো চাল মিলবে। কুকুরের মত বাবুদের করুণার দ্বারে হাত পাততে হবে। কেউ দেবে, কেউ খেঁকিয়ে উঠবে। বলবে—এঁ্যা ডাঙ্গায় এসে আমাদের মাথা কিনে নিয়েছ। যা—এখন ভাগ্! সরকারী হুকুম না এলে চাল বিলি হবে না।

—বাবু! না খেয়ে আছে কোলের ছেলেটা!

খেঁকিয়ে উঠল বাবুরা—না খেয়ে আছে ত আমি কি করব! আমি নিয়ে এসেছি তোদের!

না, এই ভাল। এখানে কারও দয়া ভিক্ষা করতে হবে না। না খেয়ে থাকলেও মুখনাড়া দেবার কেউ নেই।

তাঁবুর মধ্যে রাধা ককায়—বাবা গো—আর যে পারি না।

পটলও আর পারে না। পাগল হয়ে যাবে সে। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মাথামুড় খুড়লেও মানুষ মিলবে না একটি। একটু সমবেদনার কথা বলবে না কেউ। আশ্বাস নেই, ভরসা নেই।

মোরগটা। মোরগটা পাক দিয়ে দিয়ে খাবার খুঁজছে। ওর ত কেউ নেই। ওর মা-বাবা কিংবা বাচ্চা নেই। ও কি ক'রে বাঁচবে। ও পাখী হয়ে বাঁচবে আর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়ে বাঁচবে না সে।

বাঁচতেই হবে তাকে। সে ত ঐ মোরগটার মত একা নয়। রাধা আছে, বাধা আছে আর আছে তার ভাবী সন্তান যে মাতৃগর্ভে অপেক্ষা করছে পৃথিবীর আলো-বাতাসে চোখ মেলবার। তাকে বাঁচাবার জন্যও তার বাঁচতে হবে।

কিন্তু বাঁচতেই যদি হবে তবে কেন গেল না সে। চোখের উপরে সব দেখেও কেন প'ড়ে রইল এই নির্বান্ধব মৃত্যুদ্বীপে, উঃ কি সাংঘাতিক কাণ্ড। বাবু সেখের বৌয়ের কথা মনে হলে গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বান থেকে বাঁচবার জন্যে নৌকায় গাদাগাদি ক'রে উঠেছে। সঙ্গে ছাগল, মুরগি, হাঁড়ি-কলসী, কাঁথা-বালিস থেকে শিল-নোড়া পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় জিনিস।

নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত নৌকা চলেছে তীরবেগে। ছকিনা বিবি বসতে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—আমার ছেলে—আমার ছেলে কই! বড় ছেলের বৌ এক হাত ঘোমটা টেনে ব'সে। তাড়াতাড়ি সে ঘোমটা সরিয়ে খুঁজতে লাগল নৌকার ভেতর!

—ও হারামজাদি! বলি আমার ছেলে কই? হাউ মাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল ছকিনা বিবি। অ-লো ভাল-খেগির মেয়ে; আমার ছেলেটাকে ঘরে ফেলে নিজেরটা নিয়ে এয়েছ! ওগো—কি হবে গো! কি সব্বনাশ হ'ল গো!—আমার ছেলে কো-তা-য় গে-ল-গো!

ছকিনা বিবি জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল আর কি?

স্রোতের টানে কয়েক সেকেণ্ডের পথ আধ ঘণ্টায় উজিয়ে নৌকা ফিরে গেল ওদের ভিটেয়। ছেলেটা মাচানের ওপর শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। আর তার পাহারায় আছে একটা রোগা খেঁকী কুকুর যাকে জোর ক'রে ফেলে এসেছে সবাই।

পটল ভাবে এ দেখেও তার পালাতে মন চায় নি। মা ছেলে ফেলে বানের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচে এই দৃশ্য দেখার পরও পটল কেন পালায় নি তাই ব'সে ভাবে।

মোরগটা খাবার পাচ্ছে না। দু'বার ডানা ঝটপট ক'রে উঠল। পটল চেয়ে রইল সেদিকে। মোরগটাও পালাতে পারে নি। সেও কি ফনু সেখের খেঁকি কুকুরটার মত ঠাঁই পায় নি নৌকায়। না কি পটলের মত স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায় এইটুকু তিন হাত জমির মধ্যে।

জলের দিকে চেয়ে থাকে পটল। ভয় হয়। জল যেভাবে বাড়ছে বিশ্বাস নেই। ব্রহ্মাণ্ড ডোবাবে। এর মধ্যে বসে বসে শুধু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা। কোথায় নৌকা। আপন আপন জীবন বাঁচাতে সবাই ব্যস্ত। জলের দিকে চাইলে প্রাণ উড়ে যায়। কল কল শব্দে পাক খেয়ে ঘোলা জল আছড়ে পড়ছে পাড়ের ওপরে। উন্মত্ত সফেন জলরাশি গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। বুকের কাঁপুনি বাড়ছে পটলের। কি করবে সে।

জলের ধারে কাঠি পুঁতে রেখেছিল কে। ভোরবেলায় সূর্য উঠবার পর দেখে কাঠিটার দু' আঙুল জলের নীচে ডুবে। কোন সময় রাধা উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশেই। তার শিথিল হাতটা রেখেছে ওর কাঁধের

ওপর। চম্‌কে উঠেছে পটল! চেয়েছিল দূরে জলের দিকে নৌকার আশায়। বলে—উঠে এলি যে?

—ভাল লাগে দিনরাত শুয়ে থাকতে।

যন্ত্রণা নেই বোধ হয় এখন। কথা বলে না কেউই। দু'জনে চুপ ক'রে জলের শব্দ শোনে। ফেনিল জলরাশি দামাল ছেলের মত খল্ খল্ হাসিতে এগিয়ে আসছে নাচতে নাচতে। অজগর সাপের মত ফুঁসতে ফুঁসতে আসছে তাদের গ্রাস করতে। কোথাও ডাঙ্গা নেই। দু'চারটে গাছ মাথা জাগিয়ে খাড়া আছে। নদী চেনা যায় না। গ্রাম নদী পথ ঘাট সব একাকার।

—মোরগটা কোথায় গো? দেখতে পাচ্ছি না!

ম্লান হাসল পটল—বোধ হয় আমাদের মত নৌকার সন্ধানে ঘুরছে।

—কি ভাবছিলে?

—কি আর ভাবব। শালার নৌকো একখানা দেখা যায় না!

—তখন গেলে না?

সত্যিই ভারী ভুল হয়েছে। পাটের জাগ ধরবে। বেশ পয়সা হবে। কোথায় জাগ! যদি ভেসেই যায় তারা কি হবে পয়সা দিয়ে! এখনই যদি জাগ ভেসে যায় ধরতে পারবে সে। তাকেও ভেসে যেতে হবে না জাগের সঙ্গে!

অনুশোচনা বাড়ে। ছটফট করে পটল। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করে। নৌকা যাবার সময়ও সাধনবাবুরা বলল—আমরা আর আসব না! চলে এস! জল যেভাবে বাড়ছে থাকতে পারবে না! এর পর চেঁচিয়ে মাথা খুঁড়ে মরলেও কাউকে পাবে না!

রাধা বলেছিল—চল যাই। সবারই যা দশা আমাদেরও তাই!

পটল চেয়ে চেয়ে দেখেছে। দশজনের যে নৌকায় ঠাঁই হয় না সেখানে তিরিশ জনের গাদাগাদি। জীবন বাঁচাতে হবে। হুড়োহুড়ি মারামারি।

নৌকাটা কুটোর মত ভেসে যেতেই মনটা হাহাকার ক'রে উঠল। ফনু সেখ চ'লে গেল সব নিয়ে। কেবল ঐ মোরগটাকে ফেলে গিয়েছে। যাক্ সে ত আর মানুষ নয়।

মোরগটাকে দেখা যায় না নিথর হ'য়ে আছে বুঝি জল দেখে। দেখছে কেমন করে জল ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে পাক খেতে খেতে।

জলের ধারে বসেই থাকে পটল। বসে বসে সেও জল দেখে। নৌকার খোঁজ করে। অনেক দূরে তারই মত কারা চীৎকার করছে। নৌকা ডাকছে বুঝি। তার ক্ষীণ আওয়াজ জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে প্রতিধ্বনিত হয়ে। কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। শুধু চারদিকে বাঁকা জল খেলা করছে আপন মনে। গ্রাস করছে গ্রামের পর গ্রাম।

—বাঘা!

লেজ নাড়তে নাড়তে বাঘা এল পটলের কাছে। —দেকচিস্ কুকুরটা কেমন রোগা হ'য়ে গিয়েছে। ওকে একমুঠো ভাত দিতে গেলাম তুই দিতে দিলিনে। ও কত কাজ করে বল!

এবারে রাধা অন্য মূর্তি ধরে। বলে—দিলেই পারতে নিজে না খেয়ে! নিজের জোটেনা কুকুরকে দেবে! কাল কি খাবা ঠিক আচে! ঘরে আর একদানাও নেই! শুধু কুকুর কেন মোরগটাও নিয়ে এস। তাকেও খাওয়াও।

—কি বললি চাল নেই আর!

—দেখ না হাঁড়িতে।

মাথা ঘুরে গেল পটলের! শুধু নৌকা নৌকা করে দিনরাত ভেবেছে। এখানে থাকলে বাঁচবেনা। পালাতে হবে। এ পর্যন্ত শুধু বানের ভয়ে নৌকা খুঁজেছে। জল বাড়ছে। ভেসে যেতে হবে। সব ভাসছে। জলের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এখন আবার রাধি আর এক ভাবনা বাড়াল। চাল নেই।

রাধা ঘরে গিয়ে শোয়। বেশীক্ষণ বসতে পারে না। রাধা পাশে থাকলে ভাল লাগে। ও চলে গেলেই চিন্তা বাড়ে। কি করে বাঁচবে। নৌকা না পেলে এখানেই ত থাকতে হবে। খাবে কি?

দুপুর বেলায় জল যেন শান্ত হয়ে আসে। সে দিকে তাকিয়ে থাকে। স্রোতে কত কি ভাসছে। পানা থেকে সুরু করে কত কি! কাল দেখেছে একটা ঘরের চাল ভেসে যাচ্ছে। মরা গরু বাছুর। কত বাড়ী ঘর ভেঙে ভাসিয়ে নিচ্ছে। একটা নতুন দরজা ভেসে যেতে দেখে পটল নেমে পড়েছিল আর কি! রাধি নামতে দেয়নি।

ভাল লাগে না। দেখতে ভাল লাগে না। কত ঘর ভেঙেছে। শুধু ভেঙেছে।—আর চমকে ওঠে পটল! জাগ ভেসে যাচ্ছে না। হাঁ, পাটের জাগই বটে।

পটল ত জানে মনে মনে এই জাগ ধরে সে বাঁচবে ভেবেই রাধির বারণ শুনে এখানে ছিল। এই পাটের জাগ ধরে কার্তিক গতবারে অনেক পয়সা উপায় করেছে। ধার দেনা শোধ দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে

কার্তিক। তারও মনে ঐ বাসনাই ছিল। কিন্তু রাধার চীৎকার আর জলের তোড়ে সব ভেসে গিয়েছিল। এখন আবার মনে হয়েছে!

রাধা তাঁবুতে। নেমে পড়ল পটল মরিবাঁচি করে। জাগটা বোধ হয় বড়। ধরতে পারলে আধমন পাট হলেও হ'তে পারে। উঃ! কুড়ি পঁচিশটা টাকা।

একবার বুঝি ভয় করল নামতে। না জল শান্ত এখন। অশান্ত থাকলেই বা কিঃ খেতে হবে না। রাধার ত ঐ অবস্থা। কখন কি হয়।

—জয় মা! ঝাঁপ দিল জলে। উঃ কি ঠাণ্ডা। কেউ যেন কাটারি দিয়ে হাত পা গুলো কেটে নিচ্ছে। কি স্রোতঃ ওপর থেকে দুপুরে বোঝার উপায় নেই! টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেন।

বাঘা পটলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল জলের ধারে। শুরু করল চীৎকার। মোরগটা ডানা ঝট পট করে উড়ে বসল চালের ওপর। ভয় পেয়ে গেল বুঝি একমাত্র মানুষটার বিপদে—কি হ'ল! রাধা ককাতে ককাতে বেরিয়ে এল।

—ওমা! কি হবে গো! ওগো শুনচঃ জলে নামলে কেন? শুনচো! ফিরে এস—যেও না! পটল তখন ভেসে চলেছে। জাগের দিকে!

গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠ্ল রাধা। ভুলে গেল দেহের যন্ত্রণা! সেই সঙ্গে কুকুরটাও!

—ওগো ফিরে এস! আমাকে ফেলে কোতায় চললে গো! রাধার চীৎকার জলের ওপর দিয়ে দিক্ দিগন্তে ভেসে গেল।

জাগটা ধরে ফিরে এল পটল হাঁপাতে হাঁপাতে। বেজায় ভারী হয়েছে ভিজে। অতবড় জাগটাকে টেনে আনা সহজ নয়। স্রোতে ঠেলে নিয়ে যায় পটলকে। প্রাণপণ করে এগিয়ে এল স্রোত ঠেলে। ডাঙায় উঠে হাপসে পড়ল। শুয়ে পড়ল মাটিতে।—কি হবে গো!

আঁচলের খুট দিয়ে জল মুছিয়ে দিল রাধা। কান্না থামায়নি তখনও। শুধু চীৎকারটা কমছে।

—কেন নেমেছিলে জলে? কে বলেছিল? এই স্রোতে মানুষ নামে! যদি ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

—তুই চুপ কর রাধি! দেকেচিস কতবড় জাগ। হাঁপাচ্ছে তখনও পটল। বুকটা উঠা নামা করছে।

কক্-ককর কক্।

আবার ভোর হয়েছে। জলের ধারে এল পটল। খাড়াই আধ হাত জল বেড়েছে। কিন্তু জাগটা গেল কোথায়। এইখানে পোঁতা ছিল যে। তন্ন তন্ন করে খুঁজল কোথাও নেই। কার ভেসে আসা জাগ আবার গিয়েছে।

বসে পড়ল পটল মাথায় হাত দিয়ে। উপায় নেই। বাঁচবার কোন উপায় নেই। ঘরে খাবার নেই। পারা নেই নৌকার। কি হবে।

শরীরটা দুর্বল দুর্বল লাগছে। কাল রাত্রে খায় নি। রাধা তখন যন্ত্রণায় ককাচ্ছে। সেও খায় নি। খেতে চায়নি। চাইলে কি হোতো।

চারিদিক অন্ধকার দেখে পটল। কি ভুলই করেছে এখানে থেকে। ডাঙ্গায় গেলে এত ভাবতে হ'ত না। ভিক্ষে ত পেত। আতপ চাল, ডাল, খিঁচুড়ি চিঁড়ে। এত ভয় ভাবনা থাকত না। মরলে মরত সকলের সঙ্গে। একসঙ্গে। কালোশশী ছিল। এ অবস্থায় রাধাকে সেই ত দেখাশুনা করত। এই যে যন্ত্রণা রাধার। এ যন্ত্রণায় পুরুষ হয়ে সে কি সাহায্য করবে। যদি এখনই কিছু হয় তবে কি করবে। কদিন ধরেই ব্যথা খাচ্ছে বৌটা। একটু আহা বলারও কেউ নেই। তার ব্যথা বেদনা বোঝাবে কে? বোঝবার সময় কোথায়! সে কেবল ব্যস্ত নৌকার জন্য। রাধার ব্যথা বোঝার জন্য কালোশশী যদি থাকত। এই সব ব্যাপারে কালোশশীই ত পাড়ার ভরসা।

বেলা বাড়ে। মোরগটা দিনের বেলায় ডাকে না। কেবল খাবার খোঁজে। চালাটার মরকোচায় বসে জলের দিকে চেয়ে থাকে পটলের মত। একটা শকুন ভেসে চলা মরা গরুটার ওপর বসে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। যার ওপর বসে আছে তাকেই করেছে খাদ্য।

—ও বাবা গো! আবার বোধ হয় যন্ত্রণা সুরু হ'ল। একটানা চীৎকারের পরই বিরাম। ভয় পেয়ে গেল পটল। রাধা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে থেমে গেল যে—

ছুটে গেল পটল। এ কি! চম্‌কে উঠল দেখে। রাধা পড়ে আছে মাটিতে। পাশে ছোট্ট একটা রক্ত মাংসের মানুষ নড়ছে!

বিস্ময় আর আনন্দে হতবাক হয়ে রইল পটল। একটু পরেই সম্বিৎ ফিরে পেল। কিন্তু কি করবে। কি করতে হয় কিছুই জানে না। রাধার জ্ঞান নেই। বাচ্চাটা নড়ছে। অন্ধকারের গর্ভ থেকে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করেছে নূতন মানুষ। সমুদ্রের মধ্যে মৃত্যু-দ্বীপে আবির্ভাব এক নূতন জীবনের।

কি করবে। কি খাওয়াবে রাধাকে। কি খাবে বাচ্চাটা। কে পরামর্শ দেবে। সাহায্য করবে কে?

তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালল পটল। সেঁকতে হবে। কাকে সেঁকবে, মাকে না ছেলেকে। কোথায় বসবে।

হাত দিল বাচ্চাটার গায়ে। হাঁ করছে খাবে। কি দেবে, দুধ আছে। দুধ ত নেই। তবে, মধু। তাও নেই; জল—সেও ত ঘোলা!

—রাধি—রাধি!

রাধা নড়ে না। কি করবে। ওকেও ত খাওয়াতে হবে। কাল রাত্রি থেকে ও খায় নি। সেই জন্যই বুঝি কথা বলতে পারছে না। রাধাকে খাওয়ালে সে কথা বলবে, বাঁচবে। ও বাঁচলে শিশুটাও বাঁচবে।

চারদিকে খুঁজছে কি! বাঘা তাঁবুর মুখে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। মোরগটা চালের ওপর নিরাপদে বসে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে।

পটল পাগলের মত এল বেরিয়ে! কোথায় কি পাবে। আবার ঢুকল তাঁবুতে। হাতড়াতে লাগল হাঁড়িকুড়ি। চালের হাঁড়িটা খালি সত্যিই, কয়েকটা দানা পড়ে আছে। কি খেতে দেবে রাধাকে।

আবার এল বাইরে। কুকুরটাও পিছু নিল কুঁই কুঁই শব্দ করে। আনন্দে লেগে রইল পটলের পায়ে পায়ে।

—আরে মল! লাথি মারল কুকুরটাকে সজোরে। আমি মরছি আমার জ্বালায়—

লাথি খেয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে সরে গেল ও।

পটল অস্থির ভাবে পায়চারি সুরু করল পাগলের মত। কি পাবে? খাওয়াবে কি রাধাকে! উঃ কি যন্ত্রণা, কেউ নেই! কার কাছে পরামর্শ নেবে। সমুদ্রের মাঝখানে সে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত। রাধা ছিল, সে পড়ে আছে অজ্ঞান অবস্থায়। আর কেউ নেই!

জলের দিকে চাইল। নৌকা যদি আসে একখানা। চাল নিয়ে আর ওষুধ নিয়ে। নেই—শুধু কচুরি পানা আর শ্যাওলা যাচ্ছে ভেসে।

মোরগটা হঠাৎ ডানা ঝট্‌পট্ করে চালে বসল। সেদিকে ফিরে চাইল পটল!

আছে। তার পড়শী আছে এক ঘর। কিন্তু কি পরামর্শ দেবে ও। কোথায় খাবার পাওয়া যাবে বলতে পারবে কি? ও নিজেই ত…

কি করবে পটল! ছেলেটা ত কাঁদছে! রাধা, রাধা না খেলে বাঁচবে না। কি খাবে।

মোরগটার দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টে। তার পড়শী সকালে ঘুম ভাঙায় রোজ! নৌকার সন্ধান করতে ঐ ত সাহায্য করে সকালে।

কি করা যায়—মোরগটাও তার দিকে চেয়ে! কিছু বলছে যেন! বলছে আমি ত আছি! আমিই ত খাবার!

পাগল নাকি। পাগল হয়ে গিয়েছে ও। জীব-জগত থেকে বিচ্ছিন্ন সে। প্রাণী ত ঐ বাঘা আর মোরগটা! ঐ মোরগকে…

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে পটলের। ভাবতে পারছে না। সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে আসছে।

—বাবা গো!

রাধার জ্ঞান হয়েছে। খেতে চাইবে। উপায় নেই। এক দানা খাবার নেই কোথাও। আর কিছু মনে আসছে না। অন্যায়! হউক অন্যায়। ন্যায়-অন্যায় ভাবতে পারছে না সে। মানুষ নয় সে। মানুষ নেই। বাঁচবে! রাধাকে বাঁচান যাবে। ভাববে না। সে কি মানুষ! মানুষ নয় সে। মানুষ নয়! নোয়ার মত নূতন এক জীব-জগৎ সৃষ্টি করবে ভেবেছিল সে। পারল না। মানুষ হয়েও হেরে গেল সে।

—রাধি, রাধি।

রাধা এবারে সাড়া দেয়। চোখ মেলে তাকায়।

—এখন শরীর কেমন লাগছে! এটা খেয়ে নে দিকিনি!

রাধা অনেক কষ্টে মাথা তোলে। পটলের হাতের বাটির দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়। বলে, কি এনেছ?

—খেয়ে নে! ভারী ভাল জিনিস। শরীরে বল পাবি।

রাধা খাবে কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে পটলের দিকে চেয়ে থাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—কোথায় পেলে, কিসের মাংস?

—মুরগীর!

—মুরগীর! বাটিটা ঠেলে ফেলে দিল রাধা। চিঁ চিঁ করা গলায় ককিয়ে উঠল। তুমি ঐ মুরগীটাকে কাটলে! উঃ কি তুমি! তুমি মানুষ!

কেঁদেই ফেলল রাধা। তার পর দারুণ আবেগে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরল।

মাথা নীচু করে বসে রইল পটল। সত্যি ভারী অন্যায় হয়েছে। কিন্তু কি করবে সে। কোন উপায় ছিল কি?

রাধা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে ও। বাইরে উদার উন্মুক্ত আকাশ! আলো হাওয়া। তাঁবুর ভেতরে কি অন্ধকার।

ছেলেটা কেঁদে উঠল— ট্যাঁ—ট্যাঁ করে।

ছেলের কান্না শুনে অবসান কেটে গেল পটলের। তার ছেলে। বাঁচাতে হবে। বাঁচাতেই হবে ওদের।

বাঘা এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগল ওর সুমুখে। একটু আগে লাথি খেয়েছিল কুকুরটা ভুলে গিয়েছে।

কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে একটু আদর করল পটল। তার পর বলল, তুই থাক, তুই ওদের দেখিস বাঘা! আমি আসছি গ্রাম থেকে, খাবার নিয়ে আসি।

পরনের কাপড়টাকে মাথায় জড়িয়ে গামছা পরে জলের ধারে এগিয়ে গেল পটল। তার পর কি ভেবে ওখান থেকেই চেঁচিয়ে রাধার উদ্দেশ্যে বলল, আমি এখুনই আসছি রাধি! ভাবিস নে যেন!

জলে নামতে গিয়ে একটু থম্‌কে দাঁড়াল। কল্ কল্ করে স্রোত বয়ে চলেছে ভীষণ বেগে।

ছেলেটা আবার বুঝি কেঁদে উঠল।

না, আর দাঁড়াবার সময় নেই। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পটল। সমুদ্র সাঁতরে তাকে ডাঙ্গায় যেতেই হবে। নূতন শিশুকে বাঁচাতে হবে। আর ত কেউ নেই। এক ঘর পড়শী ছিল। সেও আর নেই।

---

# রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধারণ মানুষের স্থান

শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একশ্রেণীর পণ্ডিতম্মন্য সমাজকে অভিযোগ করতে শোনা গেছে—'উনি অভিজাত সমাজের লোক, রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন; তাই ওনার সাহিত্যে অভিজাত সমাজের স্বরূপই উদ্ঘাটিত হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের কথা, দারিদ্র্য-দুঃখপ্রপীড়িত অসহায় জনসাধারণের কথা স্থান পায় নি।' এমনকি জননেতা বিপিনচন্দ্র পালও রবীন্দ্র-সাহিত্যকে 'বস্তুতন্ত্রতা-বিহীন' বলেছেন। কিন্তু এই সব অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন—রবীন্দ্র-সাহিত্যই তার জীবন্ত নিদর্শন। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করলে দেখা যাবে যে, অভিযোগকারীদের অভিযোগ আপাত-অজ্ঞতাজনিত। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশিষ্ট সাহিত্যিকের কথাতেই বলি—'যে সময় অন্যান্য লেখকরা বড় বড় চিন্তা নিয়ে বড় কিছু রচনা করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ সাধারণের মধ্য থেকে অতি সাধারণ ঘটনা নিয়ে ছোট কিছু রচনা করেছেন।' রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধারণ মানুষের স্থান, কিংবা তারা তাঁর কাছ থেকে কি পেয়েছে একথা জানার পক্ষে কেবলমাত্র ১৮৯১ সন থেকে ১৮৯৫ সন পর্যন্ত অর্থাৎ ঐ চার বৎসরে রবীন্দ্রনাথের কলমনিঃসৃত গল্পগুলিই যথেষ্ট। তাঁর ঐ সময়ের লেখা গল্পগুলির মধ্যে ফেরীওয়ালা আছে, মধ্যবিত্ত কেরাণী আছে, আছে চাষী আর খেটে-খাওয়া দিনমজুর। এমনকি যার কোন আশ্রয় নেই সেই অনাথও আশ্রয় পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে।

'সাক্ষী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দরিদ্র, সাধারণ মানুষ রামকানাইয়ের যে ধর্মভীরু, সত্যনিষ্ঠ চিত্রটি এঁকেছেন তা আপন চারিত্রিক গুণে বিশিষ্ট, মহিমোজ্জ্বল। যার চরিত্রের নির্বুদ্ধিতাটাই কেবল বড় ক'রে চোখে পড়ে—রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যেই শাশ্বতবাণী সমন্বিত 'বিত্ত হতে চিত্ত বড়' এই মহৎ রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন।

'কাবুলিওয়ালা'কে আমরা বাহির হতেই দেখি; তাকে আমরা নিষ্ঠুর তাগাদাদার বলেই জানি কিন্তু তার দীর্ঘ দেহের মস্ত ঢিলা জামার মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্র হাতের পাঞ্জার ছাপ লুকিয়ে রয়েছে—সেকথা আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যায়। সে যে শুধু পাওনাদারই নয়, প্রবল পিতৃস্নেহবলে আরেকটি পরিচয়ের অধিকারী—যে পরিচয়ের বলে তাহার সহিত সম্ভ্রান্তবংশীয় বিজাতীয় বাঙালী মিনির পিতার কোন পার্থক্য নেই—একথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বোঝালেন। তাঁর অনুপম সৃষ্টিমাধুর্যে সাধারণ মানুষ আর অভিজাত মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের প্রাচীর অন্তর্হিত হয়েছে।

তাঁর 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে দেখতে পাই, নগণ্য পল্লী-গ্রামের সামান্য বেতনের পোষ্টমাষ্টার আর তার সঙ্গী

রতনের এক বাস্তববাদী করুণরসমিশ্রিত চিত্র। পিতৃ-মাতৃহীনা অনাথা বালিকা রতন সাধ্যমত প্রবাসী দাদা-বাবুর কাজকর্ম করে দেয় আর দাদাবাবু তাকে প্রথম ভাগ পড়ায়। মনিবের অসুখের সময় নারীজীবনের সহজাত সেবাধর্মে রতনের আত্মতৃপ্তি, মনিবকে আরও আপনবোধ, সে বোধের বশে পোষ্টমাষ্টার চলে যাওয়ার সময় সেও মনিবের সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব করে কিন্তু মনিবের অসম্মতিতে তীব্র এক হৃদয়বেদনা আর ক্ষীণ আশা লইয়া রতন পোষ্ট অফিসের চারিপাশে কেবল ঘুরতে থাকে আর সেই সঙ্গে চলে অশ্রুবিসর্জন। সামান্য কাহিনীর সামান্য পল্লীবালিকা রতনের হৃদয়াবেগের মূল্য আরও সামান্য। রবীন্দ্রনাথ এই সামান্য নগণ্য গ্রাম্য-বালিকার মধ্যে এক অসামান্য দুঃসহ হৃদয়বেদনার সঞ্চার করেছেন। তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্পই অসহায়, উপেক্ষিতের প্রতি এমনি সমবেদনায় পরিপূর্ণ। তাই দেখি, কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলার প্রতি তাঁহার গভীর সমবেদনা। সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছে যাওয়ার দুঃখে কবিও দুঃখী।

'দৃষ্টিদান' গল্পের সেই মুহূর্তটির কথায় আসা যাক্। স্বামী পতিব্রতা বধূটিকে ত্যাগ করে অন্যত্র বিবাহ করতে চলেছে দেখে সে বলছে, 'আমার বুকের ভিতর চিরিয়া দেখ। আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বৈ কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড় করিয়া তুলিও না—আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।' রবীন্দ্রনাথের শিল্পচাতুর্যে সামান্য এক অন্ধ নারীর মূক-বেদনা নারীমনের চরম আকুতি নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় জীবনে ভারতীয় নারীর কাছে বিবাহের মূল্য যে কতখানি—এ গল্প দিয়েই তা অনুভব করা যায়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে দেখি রবীন্দ্রনাথ এক বাঙালীবধূর জাগ্রত আত্মবোধের সঙ্গে বাঙালীজীবনের দ্বন্দ্বের চিত্রটি পত্রাকারে বিবৃতির মাধ্যমে সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। বৃহত্তর মানবজীবনের একটি দ্বন্দ্বের বিষয়কে একটি সাধারণ বাঙালীবধূর জীবনের দ্বন্দ্ব করে তুলে রবীন্দ্রনাথ যে শিল্পভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব, অভিনব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, সাধারণ মানুষ সেখানেও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। অস্পৃশ্য, তথাকথিত নীচু জাতের মানুষও কবিদরদে 'উছলি' উঠেছে। 'আত্মপরিচয়ের' এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নর-দেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার ভেদ-বুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়ানুভূত এই বোধের দ্বারা বিশ্ব-মানবকে অন্তরের মধ্যে আহ্বান করেছেন। তাঁর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের অভ্যর্থনাও এই বোধের একটি বিশেষ প্রকাশস্বরূপ। কারণ, এই সাধারণ মানুষই পৃথিবীর সকল মানুষ। দেশে বিদেশে এই বিপুল মানবসাধারণকেই কবি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি এই সর্বব্যাপী সাধারণ মানুষকেই বলেছেন মহামানব, আখ্যা দিয়েছেন নর-দেবতা। তাই তাঁর কণ্ঠেই শোনা গেছে 'নমি নর-দেবতারে'। তবে জন্মভূমির জনসাধারণই তাঁর সাহিত্যে অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। তাদের দুঃখ-দুর্দশা, আবার তাদেরই অন্তরালবর্তী সংস্কৃতি ও ঐক্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, পেয়েছে কবিগুরুর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি।

সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথের সুন্দর কেবল সুরম্য হর্ম্যে বাস্তবতার সংস্পর্শশূন্য হয়ে কল্পনার খেয়াল-খেলায় মেতে নেই। তিনি বলেছেন, 'দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশিত হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।' তাই চাষের ক্ষেতে চাষীর মধ্যে, নদীর বুকে মাঝির প্রাণে, কর্মরত মুটে-মজুরের মাঝখানে সেই সুন্দর উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে—

> 'ওরা চিরকাল
> টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
> ওরা মাঠে মাঠে
> বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
> ওরা কাজ করে
> নগরে প্রান্তরে।'

শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবির অন্তরের যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করার মত। তিনি বলেছেন, 'জীবনে জীবনে যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।' কবির দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সংবেদনশীল। তাই তাঁর প্রাণে বেদনা এত গভীর।

'ছেলেটা' কবিতায় এক বাপ-মা হারা চালচুলোহীন লক্ষ্মীছাড়া অসভ্য ছেলে কবির মনকে গভীর মমতায় আবদ্ধ করেছে। 'মর্মান্তিক দুঃখেও কোনদিন জল

হাড় জিরজিরে পোষা কুকুরটার অপঘাত মৃত্যুতে ক'দিন লুকিয়ে কাঁদল, অন্নজল গ্রহণ করল না তার একমাত্র ব্যথিত সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ। সকলের মনকে স্পষ্ট করে পাঠ করে তার না-বলা কথাটিকে ভাষা দেওয়ার দায়-দায়িত্ব যেন কবির একলার। মনে হয়, দেশের সমস্ত সাধারণ লোক যেন ঐ 'ছেলেটা'; আর কবির উপর তাদের যেমন দাবী এমন আর কারুর নয়। 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য', 'নিষ্কৃতি', 'পরিচয়', 'বিসর্জন' প্রভৃতির ছন্দে-পদে, রেখায় রেখায় সেই সাধারণ লোকেদেরই দাবী ফুটে উঠেছে। এদেরই লক্ষ্য ক'রে, এদের মূক মুখে ভাষা জোগাবার প্রয়াস পেয়েছেন কবি 'এবার ফিরাও মোরে' সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে।

মানুষের সৃষ্টি মনগড়া সমাজে নানা রকম আচার-বিচার, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ কবির মনকে পীড়া দিয়েছে। তাই তিনি 'শুচি' কবিতায় 'লোকস্মৃতির বেড়া' তুলে উচ্চ-নীচ শ্রেণী সৃষ্টিকারী রামানন্দের সমস্ত অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছেন। 'ত্রাণ' কবিতায় ভগবানের কাছে তিনি আকুতি জানিয়েছেন— 'আজ আমরা জাতির ভেদাভেদ সৃষ্টি করে যে অন্যায় করেছি তা তুমি তোমার চরণের আঘাতে চূর্ণ করে দাও আর অস্পৃশ্য যারা তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি দাও।'

সাধারণ মানুষকে কবি ভগবানের মর্যাদা পর্যন্ত দিয়েছেন। দেবতা চার দেয়ালের মন্দিরে থাকেন না। তিনি বিরাজ করেন শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে, ধূলায়।

তিনি থাকেন—'যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।'

'সাহিত্য এক রকম শিল্প আর সাহিত্য-শিল্প হৃদয়ের সম্পদ্। মানুষের হৃদয়গত ভাব ও অভাবের কথাই সাহিত্যে স্থান লাভের যোগ্য। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা ক্ষণিক ও সাময়িক হতে পারে এবং তার সমাধানের চাবিকাঠি মানুষেরই হাতে কিন্তু হৃদয়ের সমস্যায় ধনী, দরিদ্র, সাধারণ-অসাধারণের কোন ভেদ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের যে চিত্রাঙ্কণ করেছেন, তাতে তার অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশাকে অতিক্রম করে এই হৃদয়-সমস্যাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এইজন্য সামাজিক স্তরভেদে বিন্যস্ত যে সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে বাস্তব পরিচয়ের দ্বারা পরিচিত, রবীন্দ্র-সাহিত্যে সে তার সমস্ত বাহ্যিক তুচ্ছতাকে অবহেলা করে তার শ্রেণী-পরিচয়কে পশ্চাতে রেখে হৃদয়ের মূল্যে 'মানুষ' হিসাবে প্রকাশিত। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বলে, "সত্যরক্ষাপূর্বক বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনই লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।"* কারণ দেখিয়ে কবি বলেছেন, 'সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে।...প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান।'

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল বাংলা দেশের লোক-সমাজ। তাই তাঁর কথাসাহিত্যে বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের চিত্রই স্থান লাভ করেছে। কিন্তু তাহলেও সর্বদেশের অনুভূতিশীল পাঠকের কাছে এই সকল মানুষের একটা আবেদন আছে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে কবির আরেকটি ধারণার উল্লেখ আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'সাহিত্যের বিচারকের' এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোন একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষীসংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বর্তমানকালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।' সাহিত্যে সাধারণ মানুষের চিত্রণে কবির লক্ষ্য তাই বর্তমানকালকে অতিক্রম করে সর্বকালের দিকেই নিবিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে বাংলা দেশের যে জনসমাজকে অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের চিত্রাঙ্কণ করেছিলেন সাহিত্যে সেই সমাজ আজ নেই, সামাজিক সমস্যারও পরিবর্তন হয়েছে আজ, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে যে মানুষ স্থান লাভ করেছে—তার অন্তর্নিহিত সত্য আজও অপরিবর্তিতই রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন—দেশের সাধারণ মানুষের জীবনধারায় ও হৃদয়বৈশিষ্ট্যের সত্য পরিচয় বিধৃত হতে পারে লোকসাহিত্যে। তিনি মনে করতেন লোক-সাহিত্য সৃষ্টি করবেন যিনি তিনি হবেন সাধারণ মানুষেরই একজন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত রচনায় সাধারণ মানুষের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটবে, তা আর কোন শিক্ষিত সাহিত্যিকের প্রকাশসাধ্য নয়। তাই তিনি জন-

* সাহিত্যের বিচারক, পৃঃ ২১, ৩য় সং, '৬১।

সাধারণের সত্যবাণীকে প্রকাশ করবার জন্য সেই কবিকে আহ্বান জানিয়েছেন বার বার—'যে আছে মাটির কাছাকাছি।' সেই অনাগত ব্যক্তিটিকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

'কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের
বাণী যেন শুনি
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন
আপনার খ্যাতি,
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।'

বিদগ্ধ-সমাজের চেতনার খোরাক জোগাবার জন্য দেশে দেশে সর্বকালে জন্মগ্রহণ করেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত-জনেরা। সাধারণ মানুষ কোনদিন তাঁদের মনীষার নাগাল পায় না। কিন্তু তাদের পেছনের চেতনায় সত্য-সুন্দরের জন্য যে অন্তহীন বাসনা ও ভাষাহীন বেদনায় নিশিদিন গুমরে মরে, সে অপেক্ষা করে থাকে এই রকম একজন স্রষ্টার জন্য। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তা পেয়েছি। খ্যাতির শীর্ষাসন থেকে, আভিজাত্যের প্রাসাদচূড়া থেকে নেমে এসে রবীন্দ্রনাথ আলিঙ্গন করেছে সাধারণ মানুষের চিরন্তন স্বপ্নকে। জীবনের এমন একটি দিক্ নেই, মনন-চিন্তনের এমন একটি গবাক্ষ নেই, যেখানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ করাঘাত করেন নি। আজ আমাদের গানে তিনি, জ্ঞানে তিনি, প্রাণে তিনি, গর্বে ও গৌরবের মূলেও তিনি। আমাদের চিন্তাজগতের নবনির্মাতা তিনি। তাঁরই সৃষ্টির সোপান বেয়ে আমরা, সাধারণেরা মহীয়ান্ হয়েছি, গরীয়ান্ হয়েছি, দীক্ষিত হয়েছি প্রাণানন্দে, মুক্তির নবীন মন্ত্রে, উঠে এসেছি সম্প্রতি জগতের সম্মুখে উন্নত শিরে—

'লোকালয়ের বাহিরে পেয়েছি আমার
নির্জনের সঙ্গী,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্য শুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েছি।
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে'।

হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে—
'আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।'
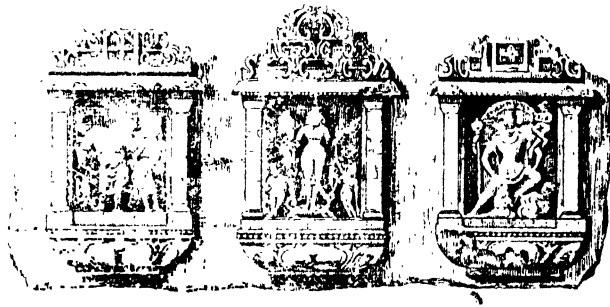
# কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে ?

আলোচনা

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

গত বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে ( পৃঃ ৬২-৬৫ ) পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের লেখা 'কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে ?' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে ডঃ শহীদুল্লাহ্ কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র আলোচনা সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে, সেগুলি নীচে সংক্ষেপে নিবেদন করছি।

প্রথমত, ডঃ শহীদুল্লাহ্ "বেদানুজ মহারাজা"র সঙ্গে কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহ ওঝার সম্পর্ক সম্বন্ধে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী-আবিষ্কৃত পুঁথির সাক্ষ্যকে গ্রাহ্য করেন নি, ঐ পুঁথিতে লেখা আছে নারসিংহ ওঝা "বেদানুজ মহারাজা"র পুত্র। ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, "কুলজীতে নারসিংহ ওঝার পিতা শিব বা শিবো। সুতরাং 'পুত্র' পাঠ ভ্রান্ত।" কিন্তু কুলজীগ্রন্থগুলি অনেক পরবর্তী কালে লেখা এবং এদের বহু উক্তিই ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। কুলজীগ্রন্থের কোন উক্তির পিছনে অন্য কোন তথ্যের সমর্থন না থাকলে তাকে নিঃসংশয়ে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং নারসিংহের পিতার নাম যে 'শিব বা শিবো' ছিল, 'বেদানুজ মহারাজা' ছিল না, সে সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, "আদিত্যের জন্ম ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে," কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেন নি। ডঃ শহীদুল্লাহ্ "পরলোকগত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির গণনানুযায়ী কৃত্তিবাসের জন্মকাল" বলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪৮ ভাগ, ১০৫ পৃঃ থেকে চারটি তারিখ উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু ঐ গণনা পরলোকগত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির নয়। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির গণনা ১৩২০ ও ১৩৪০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তৃতীয়ত, ডঃ শহীদুল্লাহ্ কৃত্তিবাসের পৌত্রস্থানীয় সুষেণ পণ্ডিতের জন্মকাল ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে ধরেছেন এবং তাঁর থেকে কৃত্তিবাস ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে স্থির করেছেন। সুষেণ পণ্ডিত সম্বন্ধে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, তিনি ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় জীবিত ছিলেন। তাঁর জন্মকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করার মত কোন উপকরণ নেই, সুতরাং এই ভাবে কৃত্তিবাসের আনুমানিক জন্মকাল নিরূপণ করা যায় বলে মনে হয় না। ডঃ শহীদুল্লাহ্ ধ্রুবানন্দের মহাবংশের রচনাকাল ও মেল বন্ধনের সময় যথাক্রমে ১৪০৭ শক ও ১৪০২ শক ধরেছেন এবং ধ্রুবানন্দের মহাবংশে মেল বন্ধনের তারিখ পাওয়া যায় বলেছেন; কিন্তু আসলে এই দুই তারিখই পাওয়া যায় বংশীবদন বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলকারিকায়; ধ্রুবানন্দের মহাবংশে কোন তারিখ মেলে না, এই দুই তারিখ যে সঠিক, তারও কোন প্রমাণ নেই।

চতুর্থত, ডঃ শহীদুল্লাহ্ কেদার রায় সম্বন্ধে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তির উপর নির্ভর করেছেন। উক্তিটি এই, "কথিত আছে যে, ভৈরবেন্দ্রের পরামর্শে গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি কেদার রায় মিথিলারাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।" কিন্তু রাখালদাসের এই উক্তির একমাত্র ভিত্তি দণ্ডবিবেকের প্রথম পৃষ্ঠার ৪নং শ্লোক ( বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২০২, ৬৫ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য ), যে শ্লোকটি আমি 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' বইয়ের ৪০শ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছি। এই শ্লোকটিতে ভৈরবেন্দ্রের পরামর্শে গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি কেদার রায়ের মিথিলারাজের পক্ষ অবলম্বন করার কোন কথা নেই, এতে শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে, রাজা ভৈরবসিংহ গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি কেদার রায়কে স্ত্রীলোকের মত জ্ঞান করতেন :

গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ (?)
কেদাররায়মবগচ্ছতি দারতুল্যম্ ॥

সুতরাং রাখালদাসের ঐ উক্তির উপর নির্ভর করে যে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ ভৈরবেন্দ্র বা ভৈরবসিংহের রাজত্বকাল নির্ণয়ের জন্য দু'টি উপাদানের উপর নির্ভর করেছেন. (১) ধীরসিংহের রাজত্বকালের ৩২১ লং সং ও ৩২৭ লং সং

শব্দের লিপি, এবং (২) নরসিংহের "শরাশ্বমদনঃ" শকাব্দের শিলালিপি। প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে বলা যায়, ২২১ লং সং ও ৩২৭ লং সং যে কত খ্রীষ্টাব্দের সমান, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন, এ সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মনোমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ গবেষকদের সিদ্ধান্ত আর এখন টিঁকছে না; আমার 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি যে, লং সং অর্থাৎ লক্ষ্মণসেন-সংবতের প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল এবং মিথিলার বিভিন্ন জায়গায় একই সঙ্গে নানা ধরণের লং সং প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের ৩৮০ বছর থেকে সুরু ক'রে ১১২৯ বছর অবধি পার্থক্য থাকত। দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ নরসিংহের শিলালিপি একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান; এর তারিখ "শরাশ্বমদনঃ" শকাব্দ "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" নীতি অনুসারে ১৩৭৫ শকাব্দ (=১৪৫৩-৫৪ খ্রীঃ) হবে। কে. পি. জয়সোয়াল "শরাশ্বমদনঃ" শকাব্দের অর্থ করেছিলেন ১৩৫৭ শকাব্দ এবং ডঃ শহীদুল্লাহ্ তাঁর মতই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়সোয়াল "শরাশ্বমদনঃ"-র এক অংশে "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" নীতি লঙ্ঘন করে এবং অন্য অংশে ঐ নীতি অনুসরণ ক'রে ১৩৫৭ শকাব্দ পেয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। নরসিংহ যখন ১৩৭৫ শকাব্দ বা ১৪৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করছিলেন, তখন তাঁর পুত্র ভৈরবসিংহের রাজত্বকাল তার কিছু পরবর্তী হবে। সুতরাং তিনি যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব রুকনুদ্দীন বারবক শাহ যে কেদার রায়কে ত্রিহুতে নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, এবং গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি যে কেদার রায়কে রাজা ভৈরবসিংহ "স্ত্রীলোকের মত জ্ঞান" করতেন, তাঁরা দু'জনে যে অভিন্ন লোক, তাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই।

পঞ্চমত, ডঃ শহীদুল্লাহ্ তাঁর আলোচনার দু' জায়গায় ভরত মল্লিককে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমসাময়িক ব'লে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪১৯-৩১ খ্রীঃ।" কিন্তু জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন, অবশ্য মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন। যা হোক, ভরত মল্লিক জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমসাময়িক নন, তিনি অনেক পরবর্তী কালের—সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক। ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' ১৫৯৭ শকাব্দে (=১৬৭৫-৭৬ খ্রীঃ) এবং বিখ্যাত অমরকোষটীকা ১৫৯৯ শকাব্দে (=১৬৭৭-৭৮ খ্রীঃ) রচিত হয় (সা. প. প., ১৩৪৮, পৃঃ ১৯৬ দ্রষ্টব্য)। ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'য় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পরিকর মুকুন্দ, তাঁর পুত্র রঘুনন্দন এবং তাঁদের অধস্তন কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বংশলতা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ভরত মল্লিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক হতে পারেন না। ডঃ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, "ভরত মল্লিক যে জলালুদ্দীনের সভাসদ্ ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত।' কিন্তু একথা মোটেই সর্ব্ববাদিসম্মত নয়, তাঁর আগে কেউই একথা বলেন নি। ভরত মল্লিক প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু-ভূস্বামী প্রতাপনারায়ণের সভাসদ ছিলেন; তিনি নিজেকে "প্রজাধীশ্বরবীরপ্রতাপনারায়ণসৎসদস্যঃ" বলেছেন। এই প্রতাপনারায়ণের অন্যতম প্রজা রামদাস আদক "বেদ বসু তিন বাণ শকে" (=১৫৮৪ শক=১৬৬২-৬৩ খ্রীঃ) ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন যে, জলালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ "ভরত মল্লিককে নানা উপহারসহ বৃহস্পতি ও রায়মুকুট এই দুই উপাধি দিয়েছিলেন।" কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর নাম (উপাধি নয়) বৃহস্পতি এবং তিনিই গৌড়ের রাজার কাছে "রায়মুকুট" উপাধি পেয়েছিলেন; অনেকের মতে এই রাজা জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তবে বৃহস্পতি যে জলালুদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই (রাজা গণেশের আমল, পৃষ্ঠা ৭২-৮৭ দ্রষ্টব্য)। ভরত মল্লিক জাতিতে বৈদ্য কিন্তু "রায়মুকুট" বৃহস্পতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তিনি মহিন্তা বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ভরত মল্লিককে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমসাময়িক ধ'রে নিয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, "সুতরাং নারায়ণেরও জলালুদ্দীনের সভাসদ হওয়া সম্ভব।" কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহ্ লক্ষ্য করেন নি যে, ভরত মল্লিক যে নারায়ণের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁর দুই পুত্র মুকুন্দ ও নরহরি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত ছিলেন। নারায়ণকে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সভাসদ বলে ধরলে বলতে হবে, তিনি চৈতন্যদেবের জন্মের ৫৩।৫৪ বছর আগেই রাজসভাসদ হবার মত বয়সে উপনীত হয়েছিলেন; কিন্তু এরকম ধরার অনুকূলে কোন যুক্তি নেই। হোসেন শাহের লস্কর পরাগল খানের পিতা রাস্তি খান যখন

রুকহুদ্দীন বারবক শাহের কর্মচারী ছিলেন, তখন হোসেন শাহের চিকিৎসক মুকুন্দের পিতা "রাজবৈদ্য" নারায়ণ যে বারবক শাহেরই চিকিৎসক ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বলা চলে। মোটের উপর, কৃত্তিবাস যে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সভায় গিয়েছিলেন, তা ডঃ শহীদুল্লাহ্ প্রমাণ করতে পারেন নি।

ষষ্ঠত, ডঃ শহীদুল্লাহ্ কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত গন্ধর্ব রায় ও কুলজীগ্রন্থে উল্লিখিত গন্ধর্ব খানের অভিন্নতা স্বীকার করেন নি, কারণ গন্ধর্ব খানের ভ্রাতা পুরন্দর খান "নাকি সুলতান হোসেন শাহের সময় ( ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ ) রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন।" কিন্তু পুরন্দর খান যে হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন, এই ধারণার অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই, কুলজীশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নগেন্দ্রনাথ বসু এই ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন ( কৃত্তিবাস পরিচয়, পৃঃ ৪৩-৪৪ দ্রষ্টব্য )। মালাধর বসু যে বারবক শাহের কাছে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেছিলেন, একথাও ডঃ শহীদুল্লাহ্ মানতে চান না। তিনি লিখেছেন, "যিনি মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন, তিনি বারবক শাহের পরবর্তী সুলতান শমসুদ্দীন ইয়ুসুফ শাহ ( ১৪৭৪-৮২ খ্রীঃ )। এই উপাধি নিশ্চয়ই তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচনার জন্য। ঐ গ্রন্থের সমাপ্তি ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে। বারবক শাহের সময়ে তাহার আরম্ভ হইলেও, সমাপ্তির পূর্বে তাহার প্রসিদ্ধি এবং তজ্জন্য উপাধিলাভ অবিশ্বাস্য।" কিন্তু মালাধর বসু বারবক শাহের রাজত্বকালে রচনা সুরু করেন এবং কাব্যের সুরু থেকেই তাঁর 'গুণরাজ খান' নামে ভণিতা দিয়েছেন। তিনি যে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার জন্য গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে গুণরাজ খান উপাধি পেয়েছিলেন, একথা কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। মালাধর বসু তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি, রাজসেবা অথবা অন্য কোন কারণে গৌড়েশ্বরের কাছে এই উপাধি পেতে পারেন। কোন বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা না করেও তখনকার দিনে এই ধরণের উপাধি পাওয়া যেত। সুবর্ণবণিকবংশীয় কুলধর কিছু না লিখেও বারবক শাহের কাছ থেকে 'সত্য খান' ও 'শুভরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। মালাধর বসুর পুত্রও কোন বই না লিখে 'সত্যরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। আর কাব্যমোদী সুলতান বারবক শাহ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'এর আরম্ভের অংশ শুনে খুশী হয়ে তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন, এরকম ব্যাপারও অসম্ভাব্য নয়।

সপ্তমত, ডঃ শহীদুল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কৃত্তিবাস গুরুর আজ্ঞায় রামায়ণ রচনা করেন নি, রাজার আজ্ঞাতেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে ডঃ ভট্টশালী-আবিষ্কৃত পুঁথির সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য ক'রে হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠকেই ( দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক উদ্ধৃত ) অভ্রান্ত বলে মনে করেছেন। কিন্তু ডঃ ভট্টশালীর পুঁথিটি বহু লোকেই স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তার আলোকচিত্রও প্রকাশিত হয়েছে, পক্ষান্তরে হারাধন দত্তের পুঁথিটি একমাত্র হারাধন দত্ত ছাড়া আর কেউই দৃষ্টিগোচর করেন নি; সুতরাং তার যে পাঠের সমর্থন ডঃ ভট্টশালীর পুঁথিতে পাওয়া যায় না, তাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা চলে না। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর উভয় পুঁথির পাঠেই এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্য অনেক পুঁথিতে কৃত্তিবাসের গুরুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অতএব গুরুর আজ্ঞায় কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন, এই অভিমতকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এখানে সংক্ষেপে নিবেদন করতে চাই। এ সম্বন্ধে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

(১) কৃত্তিবাসের পৌত্রস্থানীয় সুষেণ পণ্ডিত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। পিতামহ ও পৌত্রের সময়ের স্বাভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এই ব্যবধান ৫০ বছরের বেশী বা কম হতে পারে। কিন্তু যেখানে এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেখানে গড়পড়তা হিসাব অনুযায়ী প্রতি পুরুষে ২৫ বছর ব্যবধানই ধরতে হবে। এই হিসাবে সুষেণ পণ্ডিতের পিতামহস্থানীয় কৃত্তিবাসকে ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত পাওয়া যায়। ঐ বছরে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন।

(২) কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তার সভাসদদের মধ্যে কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায় অন্যতম ছিলেন বলে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের কেদার রায় নামে একজন কর্মচারী ছিলেন, যাকে তিনি ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিহুতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন; এরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক যে ত্রিহুতে যাবার আগে অথবা ত্রিহুত থেকে ফেরার পরে বারবক শাহের সভায় বসতেন, তাতে সংশয়ের কোন কারণ নেই। নারায়ণ বারবক শাহের আমলে "রাজবৈদ্য" বা "অন্তরঙ্গ" ছিলেন। বারবক শাহের সমসাময়িক কবি মালাধর বসুর

কাতি গন্ধর্ব খান আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত গন্ধর্ব রায়ের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন। সুতরাং আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত অন্তত দুজন এবং খুব সম্ভবত তিনজন রাজ-সভাসদকে বারবক শাহের রাজত্বকালেই পাওয়া যাচ্ছে।

(৩) রুকনুদ্দীন বারবক শাহ যে বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তার প্রমাণ নানা সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ছোটখাট প্রমাণেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃত্তিবাসের সমসাময়িক গৌড়েশ্বর কবির পিতৃব্যস্থানীয় নিশাপাতকে ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন বলে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়। এই ঘোড়া উপহার দান বারবক শাহের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বিভিন্ন লোককে তিনি হাজার হাজার ঘোড়া দান করেছিলেন (Social History of the Muslims in Bengal by Dr. Abdul Karim, p. 78 দ্রষ্টব্য)। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত কেদার খাঁ-র প্রকৃত নাম কাদার খাঁ হতে পারে বলে আমি আগে অনুমান করেছিলাম। আলোচ্য সময়ে কাদার খাঁ নামে বাংলার সুলতানের একজন কর্মচারীর নাম পাওয়া গিয়েছে, যিনি ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহের কিওয়ারজোর গ্রামে একটি মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন ( Bibliography of the Muslim Sultans of Bengal by Dr. A. H. Dani, pp. 136-137 দ্রষ্টব্য )।

এই সমস্ত প্রমাণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তিনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ভিন্ন আর কেউ নন।

# বর্ম্মী পান্না

শ্রীমিহির সিংহ

১৯৪২-এর জানুয়ারী। চারিদিকে নানা রকমের গুজব আর আতঙ্ক। এর মধ্যে বীরেনবাবুর কাছে বর্ম্মা থেকে চিঠি পৌঁছল। লিখছেন ছোট ভাই ধীরেনবাবু। বীরেনবাবু কলকাতায় পৈত্রিক ব্যবসাকে যতদিনে বড় করে তুলেছেন ততদিনে ধীরেনবাবু রেঙ্গুনে কাঠের ব্যবসা পত্তন করেছেন। ধীরেনবাবু লিখছেন যে, তাঁর সংসারে মা-মরা মেয়ে ধীরা ছাড়া আর কেউ নেই। বীরেনবাবু যদি তার দায়িত্ব নেন, তবে ধীরেনবাবু জাপানী-বোমার রাজত্বে ভাগ্য-পরীক্ষার কাজে একটু নিশ্চিন্ত মনে নাবতে পারেন। ব্যবসা ছেড়ে দেশে পালানোর প্রবৃত্তি তাঁর নেই।

বীরেনবাবু যদিও মুখে বলেন যে, মহা হাঙ্গামে পড়া গেল, তবু মনে মনে খুব খুশী হলেন। তাঁরও আপন বলতে বিশেষ কেউ নেই। দূর-সম্পর্কের ভাগ্নী শিবানীকে পালন করেছেন শিশুকাল থেকে। সে বি. এ. পাস করে এম. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছে। প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বাবলম্বী। স্ত্রী গত হয়েছেন অনেক দিন। প্রচুর পয়সা ব্যয় করার উপলক্ষ্য যদিই বা থাকে, প্রৌঢ় হৃদয়ের স্নেহ-পাত্রের অভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। ভাবলেন ধীরুর মেয়ে, সে ত নিজেরই মেয়ের মতন। সতেরো বছরের মেয়ে বিদেশ থেকে আসছে। বাংলা দেশে পা ঠেকায় নি কখনও। আহা, জ্যেঠার আদরে থাকবে না ত থাকবে কোথায়? শুধু মনের কোণায় দুঃখ হল, আরও ছেলেবেলায় যদি আসত মেয়েটা ত ভাল হত, বাড়ীতে শিশু-কণ্ঠ শোনা যায় নি বহুদিন।

খবরের কাগজের পাতায় যখন উদ্বিগ্ন বীরেনবাবু চোখ আর ফেলতে পারেন না, এই রকম সময়ে একদিন সকাল বেলায় দমদম থেকে বালিকা-কণ্ঠে টেলিফোন এল—জ্যেঠামশাই, আমি আপনার ভাইয়ের মেয়ে ধীরা, এখুনি এসে পৌঁছেছি।

বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সরকার-মশাই কোঁচার খুঁট গুঁজতে গুঁজতে ছুটোছুটি সুরু করলেন, ঘর ঠিক করবার জন্যে। শিবানী আর বীরেনবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে কাপড় ছেড়ে দৌড়ালেন এয়ারপোর্টে। যখন পৌঁছলেন তখন ঐ রকমই কয়েকজন রিফিউজি ছাড়া আর কোনও যাত্রী বিশেষ নেই। থাকলেও অবশ্য ধীরাকে চিনে বার করতে অসুবিধা হত না। একটি মাত্র সুটকেশ পাশে নিয়ে চুপচাপ বসেছিল এক পাশে একটি কোচে। শ্যামলা রঙ, মুখে-বেশে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। কিন্তু সব মিলিয়ে যেন একটি দুর্লভ পান্না। দেখা মাত্র ভালবেসে ফেললেন

বীরেনবাবু। শিবানী বেচারী কিন্তু অতটা ভালবাসতে পারল না।

ভাল না বেসে থাকা অবশ্য মুস্কিল ওরকম মেয়েকে। মুখের আদলে নেহাৎই বাঙালী কিশোরী। কিন্তু কর্ম্ম-পটুতায় বর্ম্মী-মেয়ের সঙ্গেই তুলনা মেলে। কথাবার্ত্তায় কলকাতার মেয়ে শিবানী মূল্যবান কাঁচের মতনই উজ্জ্বল আর ধীরা যেন নবোদ্ভিন্ন তরুশিশুটির মতন ব্রীড়াহীন, অকৃত্রিম। চাকর-বাকর কি সরকার মশাই তাকে দু'দিনের মধ্যে গৃহকর্ত্রী হিসাবে মেনে নিন তাতে শিবানীর আপত্তি ছিল না। এমন কি কোমল হৃদয় বীরেনবাবু যে অপত্য স্নেহে দ্রব হয়ে যাবেন তাও সে গোড়া থেকেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল সেখানে —চিরকাল ধরে মুস্কিল হয়ে এসেছে সেইখানেই।

রঞ্জন ঠিক এ বাড়ীর ছেলে না হয়েও এ বাড়ীর ছেলে। তার বাবা বীরেনবাবুর দেশের সম্পর্কে ভাই। রঞ্জনের কলকাতায় পড়াশুনা করতে আসার সময় থেকেই ধীরেনবাবু তার অভিভাবক। বয়সে সে শিবানীর প্রায় সমবয়সী। ছেলেবেলা থেকে তারা বড় হয়েছে একই সঙ্গে—এবং বাঙালী সমাজে এমতাবস্থায় যা হয়ে থাকে —সকলেই ধরে নিয়েছে দু'জনের বিয়ে হবে এবং বীরেন-বাবুর সম্পত্তির যুগ্ম অধিকারী হবে তারাই। তাদের নিজেদের মধ্যে যে সম্পর্কটা খুব প্রেমের তা নয়, বরং ভাই-বোনের মত সহজ। তবু ভবিষ্যতে যে তাদের পরস্পরকে নিয়ে সংসার পাততে হবে এটা তারা সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু বার্ম্মা থেকে পান্না আমদানী হওয়ার পর থেকেই লাগল গোলমাল। রঞ্জন প্রথম দিকটায় ধীরার দাদা হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে এত চট করে সফল হয়ে গেল যে শিবানীর ঈর্ষাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। মান অভিমান ও মিট-মাটের পালা যখন শেষ হ'ল তখন দেখা গেল শিবানী আর রঞ্জন দু'জনের তরফেই বেশ বোঝাবুঝির বোঝা জমে আছে। শুধু ধীরার মধ্যেই কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না আপাত দৃষ্টিতে।

ঘড়ির কাঁটা, ক্যালেণ্ডারের পাতা আর জাপানীদের সামরিক অভিযান—সবই খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। এই রকম এক সন্ধ্যায় শিবানী বসেছিল কাব্যে উপেক্ষিতার মনোভাব নিয়ে। ইতিহাস যেন তাকে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে তার নাগালের বাইরে। সমস্ত বাড়ীটা চুপচাপ। কর্ত্তা গিয়েছেন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে, সঙ্গে গিয়েছে ধীরা। শরীর খারাপ চলছে শিবানীর—তাই সে যায় নি। তা ছাড়া তার যেন মনে হয় সবাই তাকে দেখছে একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে—সবাই যেন বুঝতে পেরেছে যে ধীরার কাছে সে হেরে গিয়েছে। শিবানীর হাতে একটা গল্পের বই। কিন্তু তার সমস্ত মনটা পড়ে রয়েছে সামনের টেবিলের উপরে রাখা একটা চিঠির উপরে। ঠিকানাটা লেখা যে হাতে তা শিবানীর কাছে অপরিচিত নয় মোটেই। তবে ও হাতে লেখা চিঠি সে পায় নি কোনও দিনই। এত কাছাকাছি তারা মানুষ হয়েছে যে চিঠি লেখার অবকাশ বিশেষ মেলে নি—বন্ধ খামে ত নয়ই। শিবানীর যদি শিক্ষা-দীক্ষা কম হত—যদি সে গ্রাম্য মেয়ের মতন আচরণ করতে কুণ্ঠিত না হত, ত কেটলির ভাপ লাগিয়ে কিম্বা চুলের কাঁটা চালিয়ে আলৃত করে খামটা খুলেই ফেলত এর মধ্যে। কিন্তু টেনিস খেলোয়াড় শিবানী, ল কলেজ সোশ্যালের অধিনেত্রী শিবানীর হাত নিশ্‌পিশ্‌ করা কৌতূহল দমন করা ছাড়া কিই বা করার আছে?

ধীরারা ফিরল সাড়ে ন'টার পরে। দোতলায় বসে বসেই শিবানী শুনল বীরেনবাবুর আর ধীরার খুশীভরা গলা। বীরেনবাবু সোজা শোবার ঘরে চলে গেলেন, দরজা দিয়ে শিবানীর প্রতি একটা গুড নাইট ছুঁড়ে দিয়ে। আরও একটু পরে ধীরা এসে ঢুকল। শিবানী বলল তুমি বেরনোর পরেই চিঠিটা এসেছে তোমার নামে। ধীরা ড্রেসিংটেবিলের থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কার? শিবানী অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, কি আশ্চর্য। হাতে নিয়েই দেখ না। তোমার রঞ্জনদাদার। ধীরা বলল, ও আবার কি লিখেছে?—খোলনা দিদি। শিবানীর কৌতূহলটা এত বেশী হয়েছিল যে সে একটু চটেই গেল এই প্রলোভনে। কিন্তু তার প্রতিবাদে ধীরার জেদ চড়ে গেল। সে বলল, রঞ্জনদাদার এমন কিছু আমাকে লেখার দরকার নেই যা তুমি পড়তে পার না। তুমি যদি না পড়তে চাও ত ফেলে দাও ও চিঠি। আমারও দরকার নেই পড়ে।

ধীরা বসেছিল ড্রেসিং টেবিলের ধারে। শিবানী এতক্ষণ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার অপ্রস্তুত হেসে বলল বেশ, খুলছি। কিন্তু আমাকে দোষ দিও না বাপু পরে। চিঠিটা প্রথমে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একবার পড়ে নিল শিবানী। ধীরা তখন আয়নার মধ্যে নিজের গাল আর ঠোঁট আর চোখের সম্বন্ধে কিছু একটা নিগূঢ় তত্ত্বকথা আবিষ্কারে বোধ হয় ব্যস্ত। শিবানী তার দিকে তাকিয়ে একবার ভুরু কুঁচকিয়ে কি ভাবল। তার পরে বলল, রঞ্জন লিখছে তোমাকে। তোমার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী দরকার। আশা করি তুমি কিছু মনে

করবে না। তুমি এই চিঠি পাওয়া মাত্রই যেখানে থাক, যেভাবে থাক আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। যত রাতই হোক তোমার আসার প্রতীক্ষায় থাকব।

শিবানী চিঠিটা পড়ছিল যেন অত্যন্ত শারীরিক কষ্ট করে। পড়া শেষ করেই লম্বা একটা দম নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, দেখ ভাই তোমার চিঠি আমি পড়তেই চাই নি। তুমি ওভাবে আমাকে বললে বলেই আমাকে পড়তে হ'ল। এখন আমার ভারী বোকা বোকা লাগছে। তুমি ভাই মনে কর যেন আমি পড়ি নি ও চিঠি। আমি যাই শুতে।

আধ মিনিট বাদে শোনা গেল শিবানী তার ঘরের দরজা বন্ধ করল।

ধীরা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এবার উঠে বসে প্রথমে খামটা হাতে নিয়ে দেখল। তার পরে তার থেকে চিঠিটা বার ক'রে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বোলাল। তার পর নাকের কাছে নিয়ে একটু শুঁকে দেখল। ত্রস্ত হাতে শাড়ী জামা ঠিক করে নিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে চুপি চুপি রাস্তায় নেমে গেল। যাওয়ার আগে খামটা ব্যাগে ভরে নিয়ে।

ব্ল্যাক-আউটের রাস্তা। পাড়াটা এমনিতেই নির্জ্জন। এখন প্রায় একেবারেই জনমানব শূন্য। ট্রাম-রাস্তায় এসে মোড়ের উপরেই প্রায় রঞ্জনের বাড়ী। ধীরা বিনা দ্বিধায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল তিনতলায়। দরজায় টোকা দিতে রঞ্জন এসে দরজা খুলে দিল। হাতে একটা পত্রিকা, ঠোঁটের সিগারেটটা লম্বা হয়ে ঝুলছে। সিঁড়ির আলোয় ব্ল্যাক-আউটের ঠুলী লাগান। ধীরাকে দেখে রঞ্জন কেমন যেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাতের থেকে পত্রিকাটা সশব্দে মাটিতে পড়ল। ধীরা অধৈর্য্য হয়ে এক পা এগিয়ে এসে বলল, হাঁ করে দেখছ কি? আসতে বলেছ এসেছি। এবার বল কি ব্যাপার তোমার।

এতক্ষণ রঞ্জনের যেন সম্বিৎ ফিরল। বলল, আসতে বলেছি তাই এসেছ? ধীরা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠে বলে, সত্যি রঞ্জনদা তুমি একটা আজব। ভেতরেও ত আসতে বলতে পার?

রঞ্জন এবার এক আজব কাণ্ডই করে বসল। এক ছোঁ মেরে ধীরাকে চৌকাঠ পার করে টেনে নিয়ে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে তাকে একেবারে জাপটে ধরে বলল, ধীরা, প্লিজ একটা চিমটি কাট ত। ধীরা প্রাণপণে এমন এক বর্ম্মিজ চিমটি কাটল যে রঞ্জন এক লাফ দিয়ে সিলিং স্পর্শ করে বলল, তা হলে ত স্বপ্ন দেখছি না। কিন্তু—রঞ্জন বিহ্বল ভাবে বলল—তুমি আমার চিঠি পেয়ে এসেছ? চিঠিটা কি সঙ্গে আছে তোমার? ধীরা ব্যাগ হাতড়ে সেটা বার করতে রঞ্জন একবার সবটা পড়ে নিয়ে ধীরাকে বলল, তোমাকে বিয়ে করতে চাই, আজ রাত্রেই। ধীরা বলল, বিয়ে করতে আপত্তি নেই, কিন্তু এখন কি পুরুত পাবে? রঞ্জন বলল, আইনজ্ঞ পুরুত পাওয়া যাবে—রেজিষ্ট্রার রায়চৌধুরী, অশোকের মামা। তুমি একটু বস আমি ফোন করে আসি।

মিনিট দশেক বাদে রঞ্জন যখন ফিরল তখন ধীরা নিবিষ্ট মনে একটা বিলিতি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। রঞ্জন তার দিকে একটা দীর্ঘ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, অশোক আর ওর বৌ আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়বে। বললে, মামাকে এত রাত্রে টেনে আনা অসম্ভব। তবে কাল ভোরেই যাতে রেজিষ্ট্রেশন হয় তার ব্যবস্থা করবে। আর বলল, আজ রাত্রে থাকবে এখানে আমাদের পাহারা দেবার জন্যে।

ধীরা বলল, অশোকদার স্ত্রী আসছেন? আমার ভারী লজ্জা করছে এখন। আর কাল বাড়ী ফিরে জ্যেঠামশাইকে কি বলব। উনি যদি কান মলে দেন? রঞ্জন একটা কেট্‌লীতে ক'রে জল বসাতে বসাতে বলল, তুমি আজকের টেলিগ্রাফটা দেখেছ? রেঙ্গুনের খবর দিয়েছে। ধীরা বলল, আজ ত শীলেদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম সন্ধ্যার আগেই। রঞ্জন বলল, ঐখানে কাগজটা আছে, জোরে জোরে পড় না আমিও শুনি।

ধীরা হঠাৎ একটু কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, এই রঞ্জনদা একটা কথা বলব? তুমি রাগ করবে না ত? রঞ্জন হিটারটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে করতে বলল, রাগের কথা হলে এই বেলায়ই বলে ফেল। এর পরে আর রাগ করতে পারব না। ধীরা বলল, না ফাজলামী নয়। তোমার কাছে আমার একটা জিনিষ সত্যই বলবার আছে। আমি অবশ্য তোমাকে বলবই ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি এমন হুড়োতাড়া করলে যে বলতে সময়ই পেলাম না। রঞ্জন বলল, ব্যাপারটা কি? ধীরা বলল, রঞ্জনদা আমি একটা বিশ্রী! আমি লিখতে জানি না, পড়তে জানি না, আমি একেবারে মুখ্যু। বলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। রঞ্জন তাকে জড়িয়ে ধরে বলল; আরে ছি ছি তাতে তুমি কাঁদছ কেন? আমি তোমাকে সব শিখিয়ে নেব। আর আমি ত জানতামই তুমি পড়তে জান না। ধীরা বলছিল যে বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আর জঙ্গলে আর কাঠের গদিতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে লেখাপড়া করার

অবকাশই কখন হয় নি ছেলেবেলা থেকে।—এবার অবাক হয়ে বলল, আমি পড়তে জানি না তা তুমি কি করে জানলে? রঞ্জন টেবিলের উপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে বলল, এটা তোমায় কে পড়ে দিয়েছিল? ধারা বলল, শিবানী দিদি। রঞ্জন বলল, কি লিখেছিলাম জান আসলে?—প্রিয় ধারা, তোমার কাছে একটা কথা মুখে বলা অসম্ভব বলেই লিখে জানাচ্ছি। তোমার সম্বন্ধে আমার দুর্ব্বলতা ঠিক ভাগ্যবানের মতন নয়। অত আমি বলতে গেলে বাক্‌দত্ত অন্যের চোখের জল আমি ফেলতে পারব না। কর্ত্তব্য করতে যাচ্ছি বলে তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমি চেষ্টা করব তোমার সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে আনতে। ইতি

রঞ্জন

বেচারী বাণীদিদি বলে ধারা আবার কেঁদে ফেলল।

---

# বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের নাম ১৯১০।১১ সন থেকেই জানি। শ্রীঅরবিন্দের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুবার পর তিনি অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করেন এবং চন্দননগরে মতিবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁরই সাহায্যে গোপনে ফরাসী-অধিকৃত পণ্ডিচেরী চলিয়া যান। শ্রীঅরবিন্দের পরিচালিত বিপ্লবী দলের পরিচালনার ভার মতিবাবুর উপরই অর্পিত হয়। শ্রীশ ঘোষ ও রাসবিহারী বসু ছিলেন প্রধান কর্মী ও নেতা।

ওদিকে ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি ও অত্যাচারের মধ্যেও অনুশীলন-সমিতির সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন জোরের সঙ্গেই এগিয়ে চলছিল। ১৯০৮-এর শেষ কিংবা ১৯০৯-এর প্রথম দিকে অনুশীলন-সমিতি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার সময় থেকেই কলিকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে মতিবাবু ও তাঁর পরিচালিত বৈপ্লবিক সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আমি তখন ঢাকাতেই বেশী থাকতাম, এবং ঢাকাই ছিল সমিতির প্রধান কেন্দ্র। ক্রমে সমিতির কেন্দ্রে সংগঠন সংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত থাকায় এবং তার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হওয়ায় কলিকাতা কেন্দ্রের কাজ-কর্মেরও সমস্ত খবর রাখতাম; কাজেই, তখনও মতিবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না হইলেও বৈপ্লবিক কাজ-কর্মের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে উঠছিল তাতে তাঁকে আপনজনই মনে করতাম। অস্ত্র সংগ্রহ, বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত ও পরস্পর সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের দু'দল খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং দু'দল এক হয়ে যাওয়ার দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের কলকাতা কেন্দ্রের তখনকার প্রধান কর্মী অমৃত হাজরার ( দলীয় নাম শশাঙ্কবাবু ) সঙ্গে মতিবাবুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের খরচ নির্বাহের জন্য আমরা অনুশীলন-সমিতির তহবিল থেকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম।

১৯১৩ সনে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় ধরপাকড় ও আমার এবং ত্রৈলোক্যবাবুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হওয়ার পর আমরা কলকাতা চলে আসি এবং মতিবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের সংস্পর্শে এলাম।

কলকাতা বাদুড়বাগান রো'র বস্তিতে একটা খোলার ঘরে মতিবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। এই ঘরে এবং পরে রাজাবাজার বস্তির খোলার ঘরে মতিবাবু, রাসবিহারীবাবু, এবং শ্রীশবাবু প্রভৃতির সঙ্গে কত দিন কত আলোচনা করেছি, এক সঙ্গে রাত্রি-বাসও করেছি, এবং বোমা, পিস্তল এবং রিভলবার রেখেছি।

প্রথম আলাপেই তাঁর কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পেলাম যা অতি দুর্লভ—বিশেষতঃ রাজনীতিতে। সেদিন তাঁর সঙ্গে রাজনীতি সম্বন্ধে বেশী আলাপ হয় নি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনা, ভারতের বৈপ্লবিক সাধনার অন্তরতম আদর্শ, গীতোক্ত আত্মসমর্পণযোগ ও সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা এ সব বিষয়েই বেশী আলাপ হয়।

তার পরেও তার সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে এ সমস্ত বিষয়েই বেশী আলোচনা হ'ত। মতিবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী কানাইলাল দত্তের ফাঁসীর মঞ্চে আত্মোৎসর্গের মধ্যে ভারতের বৈপ্লবিক সাধনার মর্মকথাটি কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তাও তিনি ব্যাখ্যা করতেন। গীতার তত্ত্ব কিভাবে কানাইলালের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছিল তা আমাদের মধ্যে আলোচিত হ'ত। বাস্তবিক, আমাদের সেদিনের বিপ্লবী যুবকদের আমরা গীতার এই আদর্শই বুঝাতে চেষ্টা করতাম—নিষ্কাম কর্ম, আত্মসমর্পণ যোগ, সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ, ন হন্যতে ন হন্যমানে শরীরে; মৃত্যু জীর্ণ বস্ত্রের মত দেহত্যাগ···ইত্যাদি।

মতিবাবুর সঙ্গে আলাপের পরই চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, মণীন্দ্র নায়েক, অরুণ দত্ত, যতীনবাবু, নলীন দত্ত, নরেন সরকার, রামেশ্বর দে এবং আরও অনেকের সঙ্গে নানা কর্মোপলক্ষে বৈপ্লবিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ জন্মে এবং আমরা একই দলের সহকর্মী হয়ে পড়ি। কেননা অল্প কিছুদিন আলাপ-আলোচনার পরই আমাদের এই দুই দল—অনুশীলন-সমিতি ও চন্দননগরের দল একেবারে একদল হয়ে যায়।

মতিবাবুর স্ত্রী ছিলেন আমাদের মত পলাতক বিপ্লবীদের মাতৃস্বরূপা। মতিবাবুর চন্দননগরের গৃহকে আমরা আপন গৃহই মনে করতাম।

শ্রীশ ঘোষের মত রাজনীতিজ্ঞ, আদর্শনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্লবী নেতা আমাদের দেশে বেশী ছিল না। জটিল বিষয়ে তার মত এমন বিশ্লেষণ ক্ষমতা বেশী দেখিনি। অনুশীলন-সমিতির কেদারেশ্বর সেনগুপ্তের রোগজীর্ণ কঙ্কালসার দেহের মধ্যে এই দুর্লভ বস্তুটি দেখেছি। রাজাবাজারের বস্তির ঘরেই শ্রীশবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভারতে সৈন্যদল সহ সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজনের সর্বপ্রধান নেতা ও পরবর্তী কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কারামুক্ত করার প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সংগঠনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ববর্তী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটি ভুলবার নয়। চন্দননগরে মতিবাবুর বাড়ীতেই আলাপ হয়। রমেশ চৌধুরীও আমার সঙ্গে ছিলেন। প্রথম মিলনেই মনে হ'ল তাঁকে একজন খাঁটি বিপ্লবী—তেজ, উদ্যম, উৎসাহ ও বুদ্ধি তাঁর মধ্যে যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর সঙ্গে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল তা নানা অবস্থার মধ্য দিয়েও অটুট রয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মালয় থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে সাব-মেরিনে আগত এবং ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পবিত্র রায়ের কাছে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে শুনতে পেলাম যে, পেনা'-এর সমুদ্রের বেলাভূমিতে কতদিন রাসবিহারী বসু আমার, ত্রৈলোক্যবাবুর ও অন্যান্যের পুরোনো কথা বলতে বলতে, এবং স্বাধীন ভারতে ফিরে এসে আবার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবেন এ আশায় উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে উঠতেন। বৃদ্ধ বয়সেও যেন যুবোচিত উৎসাহ উদ্যম তার মধ্যে ফিরে আসত।

রাসবিহারী বসু যখন দেরাদুনে ফরেষ্ট অফিসে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকুরি করতেন তখন তিনি উত্তর ভারতে—পাঞ্জাব, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশে বিপ্লবের আয়োজন করছিলেন। পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা লালা হরদয়াল তখন সরকারী বৃত্তি নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী দলের পরিচালনভার অর্পিত হয় রাসবিহারী বসুর উপর। এবং এদিক থেকে অনুশীলন-সমিতি রাসবিহারী বসুর মাধ্যমে হরদয়াল পরিচালিত বিপ্লবী দলের সঙ্গে এক দল হয়ে গেল। দিল্লীর আমীরচাঁদ ছিলেন এ দলের একজন বিশিষ্ট নেতা। এ ছাড়া আবদবিহারী, বালমুকুন্দ, বালরাজ, হনুমন্ত সহায় প্রভৃতি ছিলেন বিশিষ্ট সভ্য।

শিখ, মুসলমান, রাজপুত, ডোগরা, জাঠ প্রভৃতি ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচারে রাসবিহারী বসু কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে ভারতীয় সৈন্যদলকে সঙ্গে পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে খুব আশা জন্মাল। কতকগুলি সৈন্যদলের কেউ কেউ আমাদের দলের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'ল এবং সৈন্যদলের মধ্যে পরস্পর বৈপ্লবিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এ সময়ের একটা মজার ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। বোমার আঘাতে আহত হয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন দেরাদুনে চিকিৎসাধীনে ছিলেন তখন এই বোমা নিক্ষেপের তদন্তের ভার নেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ ( Central Intelligence Bureau )। তখন তার কর্তা ছিলেন বোধ হয় স্যার চার্লস্ ক্লিভল্যাণ্ড। তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন বাঙ্গালী গোয়েন্দা সুশীল ঘোষ। লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে তিনিও দেরাদুন গিয়েছিলেন।

সে সময় দেরাদুন ফরেষ্ট অফিসের কর্মচারীবৃন্দ এক সভা ক'রে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপের নিন্দা করে, তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে। এই সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন রাস-

বিহারী বসু। তিনিই কিন্তু বোমা নিক্ষেপের নেতৃত্ব করেন! তথাপি নিজের রূপ ঢাকবার জন্যই তিনি এ কাজ করেন। ফলও পাওয়া গেল। সুশীল ঘোষ তার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং আলাপে তাকে খুব বিশ্বাসী রাজভক্ত এবং ব্রিটিশ রাজত্বের কল্যাণকামী মনে ক'রে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুশীল ঘোষ বলেন, —"এই বোমা বাংলা দেশ থেকে এসেছে; বাঙ্গালীরা এর ভেতরে আছে। সন্দেহ হয় চন্দননগর এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। আপনি চলুন বাংলা দেশে আমাদিগকে সাহায্য করবেন।" রাসবিহারীবাবু রাজী হলেন। গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে বনবিভাগ (Forest Department) রাসবিহারীবাবুকে প্রথমে ছয় মাস এবং প্রয়োজন মত যতদিন ইচ্ছা ছুটি, মঞ্জুর করে। তিনি সুশীল ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় এসে সুশীল ঘোষ একটা অফিস খুলে বসলেন এবং রাসবিহারীবাবু প্রায়ই তাঁর কাছে গোপনে রিপোর্ট দিয়ে আসতেন। তখন রাসবিহারীবাবু, আমি, ত্রৈলোক্যবাবু, অমৃত হাজরা প্রভৃতি প্রায়ই সারাদিন একসঙ্গে কাটাতাম। বস্তির ঘরে রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে কত রাত্রে শয়নও করেছি। রিপোর্ট লিখে তিনি আমাকে দেখাতেন। আমার সম্বন্ধেও তাঁকে খবর দিতে হ'ত, কেননা আমি তখন পলাতক, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং পুরস্কার ঘোষণা ছিল। চন্দননগর মতিবাবুর সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে খবর দিতে হ'ত কে কে তাঁর বাড়ী যায়, বাড়ীতে কি আছে, কোন ষড়যন্ত্র চলছে কি না ইত্যাদি। আমার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট যেত তা হ'ত এমনি—আমি যখন কলকাতায় তখন আমি কলকাতার বাইরে গেছি, আবার যখন কলকাতার বাইরে তখন আমাকে কলকাতায় দেখা গেছে!

যাতে তাঁর স্বরূপ বেরিয়ে না পড়ে এজন্য তাঁকে খুব সাবধানে চলতে হ'ত। সামান্য ভুলে তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং প্রতি বার সুশীল ঘোষের কাছে যাওয়ার সময়ই তাঁর আশঙ্কা থাকত সেখানেই না গ্রেপ্তার হন।

এ সময়ে (১৯১৩) উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল কলকাতায় আসেন। তিনি প্রথম থেকেই অনুশীলন-সমিতির 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সভ্য ছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় যখন অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়, সমিতির শাখাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন শচীনবাবু সমিতির যোগসূত্র সন্ধান করতে একবার কলকাতায় আসেন এবং মামলার সাহায্যের জন্য উত্তর ভারত থেকে কিছু টাকাও সংগ্রহ করে আনেন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় বহু গ্রেপ্তারাদির সংবাদ পেয়ে তিনি পুনরায় কলকাতা এলেন দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে। সবই খুব গোপন হয়ে পড়ায় তাঁকে আমাদের খোঁজ পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়। অবশেষে কলেজ স্কোয়ারে শশাঙ্কবাবুর (অমৃত হাজরা) সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি আমাদের রাজাবাজার বস্তির ঘরের ঠিকানা পান। এবং এ ঠিকানাতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলের সাক্ষাৎ হয়।

তখন শচীনবাবু উত্তরপ্রদেশে সমিতির শাখা স্থাপন করবার জন্য কাজ করছিলেন। যেহেতু তখন আমরা সকলেই সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে, সৈন্য-দলকে সঙ্গে নিয়ে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজনে ব্যস্ত, সুতরাং রাসবিহারীবাবু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যালের এক সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। তাই আমি ও শশাঙ্কবাবু শচীনবাবুকে মতিবাবু, রাসবিহারীবাবু ও শ্রীশবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এঁদের সকলে এবং ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, প্রথমে শচীনবাবুর সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণ করে ওদিককার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, আয়োজন, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, কর্মীদের মানসিক অবস্থা এবং চিন্তাধারা প্রভৃতি তথ্য ও তত্ত্ব সকলকে জানাতে হবে। পরে রাস-বিহারীবাবু তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে শচীনবাবুর পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং একযোগে সেখানে কাজ করতে থাকবেন।

এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ও শচীনবাবু ১৯১৩ সনেই কাশী যাই। সেখানে গিয়ে তাঁদের বাঙ্গালীটোলার বাসাতেই থাকতে লাগলাম। তাঁর ছোট ভাইরা তখন সকলেই বালক মাত্র। কিন্তু এঁরা সকলেই পরবর্তীকালে সমিতির কার্যে আত্মনিয়োগ করে বহু বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন সান্যাল উত্তর ভারতে নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন এবং সর্দার ভগৎ সিং প্রভৃতির সঙ্গে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। ভূপেন সান্যাল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় এবং রবীন্দ্র সান্যাল প্রথম কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। শচীনবাবুর মাতৃদেবী ছিলেন একজন মহীয়সী মহিলা। তিনি শচীনবাবুর বৈপ্লবিক কাজকর্মের কথা জানতেন এবং সমর্থন করতেন। নিজের ছেলেদের দেশসেবায়

সর্বদা উৎসাহ দিতেন, এবং আমাকেও তিনি সস্নেহে ও সাদরে গ্রহণ করেন।

কাশীতে শচীনবাবু বিজয় সঙ্ঘ নামে একটা প্রকাশ্য গঠন করেছিলেন। সেখানে শারীরিক ব্যায়াম ও ড্রিল হ'ত এবং একটা পাঠাগার ছিল। সঙ্ঘের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়েই স্থানীয় যুবকদের আকর্ষণ করা হ'ত তাদের মধ্য থেকে সমিতির সভ্য সংগ্রহ করবার জন্য।

কাশী এমন একটি শহর যেখানে ভারতের সমস্ত প্রদেশের লোকই আসে এবং অনেকে বাসও করে। সুতরাং শচীনবাবুর রিক্রুটদের মধ্যে গুজরাতি, মারাঠি এবং পাঞ্জাবীও ছিল। সমিতির সভ্যদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাদের সঙ্গে শচীনবাবু আমাকে পরিচিত করালেন। কাশী থেকে অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও আগ্রা যাই। শেষের দিকে শরীর বিশেষ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতায় ফিরে যাই, এবং দলীয় নায়কদের নিকট বক্তব্য বলার পর স্থির হয় যে, রাসবিহারীবাবু শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে নিজের সহকারী করে বিপ্লবের আয়োজন করতে থাকবেন ও উত্তর ভারতে কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে কার্য-পরিচালনার জন্য বাংলা দেশ থেকে আমরা উপযুক্ত লোক পাঠাব। এই নীতি অনুসারেই পরে নগেন্দ্র দত্ত ( গিরিজাবাবু ) এবং আরও কয়েকজন উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কার্যের জন্য গিয়েছিলেন।

১৯১৩ সনে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিপ্লবীদের সমাগম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দাদের আনাগোনাও খুব বৃদ্ধি পায়। ওরা যেমন আমাদের উপর নজর রাখত তেমনি আমরাও ওদের খোঁজখবর, কি করে না করে এসব দিকে নজর রাখবার ব্যবস্থা করলাম। আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে ওরা যেমন ফটো তুলে রাখত তেমনি আমাদেরও একটা বিভাগ ছিল যারা অতি গোপনে গুপ্তচরদের ছবি তুলত। ঢাকা শহরে এ ব্যবস্থা ভাল ভাবেই চালু ছিল; কলকাতাতেও কোথাও এ ব্যবস্থা করা হয়।

এ সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানতে পারলাম যে, গোয়েন্দাদের মধ্যে নলিনী মজুমদার, নৃপেন ঘোষ, সুরেশ মুখার্জি, এবং হরিপদ দে সবচেয়ে বেশী তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। নানা রিপোর্ট মিলিয়ে দেখা গেল যে, যদিও হরিপদ দে খুব উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত নয়, তথাপি কলেজ স্কোয়ারে সেই সবচেয়ে বেশী তৎপর। আমাদের অনেক সভ্যকে চিনে ফেলেছে এবং নতুন গোয়েন্দাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং হরিপদর মৃত্যুদণ্ড সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্থির হ'ল যে, সন্ধ্যার সময় যখন বহু গোয়েন্দা কলেজ স্কোয়ারে আসে তখন হরিপদও সেখানে উপস্থিত হয় তাদের সঙ্গে; এবং তাকে সেখানেই গুলী করতে হবে। এ কার্যের জন্য ঢাকা থেকে তিনটি রিভলবার আনাবার ব্যবস্থা করলাম।

দুপুর বেলা আমি ও রাসবিহারীবাবু আমাদের বাদুরবাগান রো'র বস্তির খোলার ঘরে বসে কথাবার্তা বলছি, তখনই একজন একটা চামড়ার ব্যাগে করে তিনটি রিভলবার দিয়ে গেল। রাসবিহারীবাবু ব্যাগ খুলে রিভলবার বার করে যন্ত্র ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য যেমন ট্রিগার টেনেছেন অমনি একটা গুলী সশব্দে আমার কানের কাছ দিয়ে হুস্ করে চলে গেল। তাকিয়ে দেখি রক্ত। কিন্তু কোথা থেকে এই রক্ত, কে আমাদের মধ্যে আহত হয়েছে তা প্রথমে বুঝতে পারলাম না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতাম যে, গুলী বিদ্ধ হওয়া মাত্রই বেদনা অনুভূত হয় না। কেমন একটা অসাড় ভাব হয়। বাররা ডাকাতির সময় ক্ষীরোদ ঘোষ যখন নৌকোর দাঁড় টানছিল তখন পুলিসের গুলী তার হাতের কব্জি বিদ্ধ করে। সে কিন্তু প্রথমে বুঝতেই পারে নি কি হ'ল! সে যাই হোক, দেখা গেল যে, গুলী রাসবিহারীবাবুর হাতের একটা অঙ্গুলী ভেদ করে গেছে! একে আমাদের ঘরটা রাস্তার একেবারে উপরে, তায় সুকিয়া ষ্ট্রীট থানাও খুব সামনে। গুলীর শব্দে লোক আসতে পারে, ঘর খানা-তল্লাসী হতে পারে এবং আমরাও গ্রেপ্তার হতে পারি; সুতরাং তক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়া দরকার। রাসবিহারীবাবু আহত হাত একটা চাদরে জড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন, এবং আমিও ব্যাগের মধ্যে রিভলবার তিনটি পুরে সঙ্গে নিয়ে বার হলাম। দু'জনে ভিন্ন ভিন্ন পথে গেলাম। আমি বর্তমান আমহার্ষ্ট রো'র সুরেন বসু মহাশয়ের নিকট ব্যাগ সহ রিভলবার-গুলি রেখে আমার রাজাবাজার বস্তির ঘরে চলে গেলাম। রাসবিহারীবাবুও অতি সন্তর্পণে পায়ে হেঁটে এখানে এলেন এবং তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পরে তাঁকে তাঁর চন্দননগরের নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেই। ঢাকায় খবর পাঠিয়ে চাঁদশীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাসকে আনিয়ে নিলাম। তিনি রাসবিহারীবাবুকে কয়েকদিন চিকিৎসা করে গেলেন।

এ ঘটনা অনেকেই জানত না। সুতরাং পরবর্তী কালে যখন রাসবিহারীবাবু জাপানে চলে গেলেন, তখন তাঁর কাছে কোন লোক পাঠাতে হলে অঙ্গুলী আহত

হওয়ার খবর বলে দিতাম যাতে তাঁর বিশ্বাস হয় যে, সে লোকটিকে আমিই পাঠিয়েছি।

রাসবিহারী বসু আহত হলেও কলেজ স্কোয়ারে গোয়েন্দা হত্যার কাজ বন্ধ রইল না। স্থির হয় আমিই এ আক্রমণ পরিচালনা করব। ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি, রবীন্দ্রমোহন সেন ও নির্মল রায় এ কার্যে গেলাম। প্রথম আমাকেই আক্রমণ ও গুলী করতে হবে, রবীন্দ্রবাবুও সঙ্গে সঙ্গে গুলী করবেন। নির্মল রায় আমাদের পাহারা দেবে।

সন্ধ্যার সময় কলেজ স্কোয়ার জনাকীর্ণ থাকে এবং অনেক গোয়েন্দাও উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মর্মর মূর্তির সামনেকার খাটের উপর আসা মাত্র হরিপদকে গুলী করি এবং আমাদের কার্য সমাধা করে কলেজ স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে মির্জাপুর ষ্ট্রীট পার হয়ে রাধানাথ মল্লিক লেন দিয়ে চলে গেলাম। সে রাত কাটালাম আমাদের সভ্য ডাঃ সতীন্দ্র সেন, এম্ বি মহাশয়ের ঘরে। তিনি তখন কলেজ ষ্ট্রীটের একটা মেসে। পরদিন চন্দননগর গিয়ে মতিবাবু, রাসবিহারীবাবু, এবং শ্রীশবাবুর কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলাম।

কাজ শেষ করে যখন আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম তখন নির্মল রায় দৌড়ে আমাদের পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে যায় দেখে তাকে ডেকে থামিয়ে বললাম যে, দৌড়বার প্রয়োজন নেই, তাতে অনর্থক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া একের সঙ্গে অপরের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং গ্রেপ্তারের ভয় বেশী। একসঙ্গে থাকলে আত্মরক্ষার সুযোগ বেশী।

আমাদের অনুসরণকারী পুলিসের ধারণা হয়েছিল যে, আমরা একটা রিভলবার গোলদীঘির জলে ফেলে এসেছি। সরকার ওটার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করে। আমরা কিন্তু কোন রিভলবারই ফেলে আসি নি।

১৯১৩ সনের মাঝামাঝি দামোদর নদের প্রলয়ঙ্কর বন্যায় বর্দ্ধমান জেলার বহু স্থান ভেসে যায়। অগণিত লোক অন্নবস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, এক কথায় সর্বহারা হয়ে অসীম দুর্গতির মধ্যে পতিত হয়। বন্যার্তদের সাহায্য উপলক্ষ করে যুবকদের মধ্যে সেবাকার্যের অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্যম দেখা দেয়। বিপ্লবীরা তাদের গুপ্ত অস্তিত্ব থেকে বাইরে এসে বন্যার্তদের সেবার ভার গ্রহণ করল। এ সেবাকার্যের মাধ্যমে দেশের যুবকগণের মধ্যে নতুন প্রাণ জেগে উঠল, বিপ্লবীরাই এর নেতৃত্ব করল, এবং তাদের শক্তি ও প্রভাব অনেকটা বৃদ্ধি পেল তা বৃটিশ সরকার বুঝতে ভুল করল না। সে সময় এবং অনেক পরেও যখনই যে গ্রেপ্তার হয়েছে তাকেই গোয়েন্দা পুলিস জিজ্ঞেস করেছে যে, সে বর্দ্ধমান বন্যায় সেবাকার্য করেছে কি না। ১৯১৪ সনের শেষের দিকে আমার গ্রেপ্তারের সময়ও এ কথা জিজ্ঞেস করেছিল। বন্যা সেবাকার্যের প্রধান নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন। শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ও নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন।

সে সময় কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনাধীনে "শ্রমজীবী সমবায়" নামক দোকানটি বিপ্লবীদের একটা বিশেষ মিলন স্থান ছিল। স্বদেশী দ্রব্য বিশেষত স্বদেশী বস্ত্র বিক্রীই এ দোকানটির প্রধান কাজ ছিল। যতীন মুখার্জি (বাঘা যতীন), মাখনলাল সেন এবং আরও অনেক বিপ্লবী-প্রধান এখানে নিয়মিত আসতেন। পুলিস দোকানটিকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং বিপ্লবী-প্রধানদের উপস্থিতিতে দোকানটির সামনে পুলিসেই ভর্তি থাকত। আমার নামে তখন ওয়ারেণ্ট। তথাপি মাখনবাবু, যতীনবাবু, অমরবাবুর মত সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীদের সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপের জন্য সেখানে মাঝে মাঝে না গিয়ে পারতাম না।

যতীন মুখার্জির বিপ্লবী দল ছিল। তার প্রেরণাতেই সামশুল আলম নামক এক ডেপুটি সুপার হাইকোর্টে নিহত হয় এবং হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ছিলেন তিনি আসামী। তাঁকে তখন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা বলেই জানতাম। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিপ্লবী তাঁর দলে ছিলেন। অতুলবাবুর সঙ্গে আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁকে আমরা বিশ্বাস করতাম। তাঁর দর্জিপাড়ার বাড়ীতে অনেকবার গেছি এবং রাত্রিবাসও করেছি। তিনি আমাদের সমিতির অনেক সভ্যের সঙ্গে মিশে পড়েছিলেন এবং বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাঁকে আমরা খানিকটা নিজেদের লোকই মনে করতাম, এবং তাঁর খুব ইচ্ছাও ছিল যে, আমাদের দুই দল একত্রিত হয়ে কাজ করি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রস্তাবানুসারেই আমি যতীন মুখার্জির সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন থাকতেন তাঁর মামা ডাঃ হেমন্তকুমার চ্যাটার্জির ২৭৫নং আপার চিৎপুর রোডের বাসায় (শোভাবাজারের নিকট)।

প্রথম দিন আলাপ করেই মনে হ'ল যতীন মুখার্জি

মহাশয় একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা, এবং অসামান্য মানসিক শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রথম দিকে নিজের প্রকৃত নাম প্রকাশ করি নি কিন্তু অচিরেই নিজের আসল: পরিচয় দিতে দ্বিধা করি নি। কথা প্রসঙ্গে এক সময় যখন ব্রাহ্মণত্ব ও কৌলিন্যকে খুব গৌরবজনক বলে মনে করি না বললাম, তখন তিনি বললেন, "না, আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং কুলীন। এই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করবেন এবং নিজের চারিত্রিক শক্তিতে ও মহত্ত্বে তা প্রতিষ্ঠিত করবেন।" প্রতিদিন ভগবানের উপাসনা ও সম্পূর্ণ গীতা মুখস্থ করার কথা তিনি আমায় বিশেষ করে বলেন এবং এ দু'টি কাজ করার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

তার পর তাঁর সঙ্গে আমার অনেক বার দেখা ও আলাপ হয়েছে আমাদের কাজকর্ম ও দু'দল একত্রিত হওয়া সম্বন্ধে। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমরা চন্দননগরের মতিবাবুদের (তখন বাংলা দেশে শ্রীঅরবিন্দের দল বলতে এ দলকেই বোঝাত) সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছি। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে মতিবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

এর অনেক পরে যুদ্ধের মধ্যে যখন ভারতবর্ষে সমস্ত দলের একসঙ্গে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কথা হয় তখন আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে রাসবিহারী বসু, গিরিজাবাবু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল একত্র কাজ করা সম্বন্ধে যতীন মুখার্জি মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করেন। আমি ও ত্রৈলোক্যবাবু তখন জেলে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে অমিল হওয়ায় তাঁদের এই আলাপ ফলপ্রদ হয় নি। যতীনবাবুদের অভ্যুত্থান নির্ভরশীল ছিল বৈদেশিক সাহায্য তথা জার্মানী প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রাদির উপর। বাংলা দেশে সংগ্রাম আরম্ভ করাই ছিল পরিকল্পনা। আর অনুশীলন, চন্দননগর, উত্তর ও মধ্যভারতের অন্যান্য দল, বিশেষতঃ হরদয়াল প্রতিষ্ঠিত দল ও শিখ বিপ্লবী দল প্রভৃতির মিলিত অভ্যুত্থান নির্ভরশীল ছিল ভারতে সৈন্যদলের বিদ্রোহ ও সেই সঙ্গে সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশ, উত্তর ও মধ্যভারতে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটায়।

রংপুরে অনুশীলন-সমিতি ছাড়াও শ্রীঅবিনাশ রায়ের পরিচালনায় আর একটি দল ছিল। এ দলের শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকারের সঙ্গে আমাদের প্রফুল্ল বিশ্বাসের খুব বন্ধুত্ব হয়। সে সূত্রে আমাদের সঙ্গে ক্রমে তা দলীয় সৌহার্দে পরিণত হয়। শ্রীভগীরথ ব্রহ্মচারী নামক একজন সন্ন্যাসী ছিলেন এ দলের শ্রদ্ধাভাজন গুরু। তাঁর সাধনার স্থান ছিল সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ের গুহায় ঝরিয়া কাত্রাসগড় কয়লা খনি থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে। এই দলেরই নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত শশধর করের সঙ্গে এ সমস্ত স্থান পরিদর্শনে যাই।

প্রথমে যাই ঝরিয়া কাত্রাসগড় খনি অঞ্চলে, বাঙালী নিয়ন্ত্রিত খনি কর্তৃপক্ষের আতিথ্য গ্রহণ করি। আমার নামে তখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা; সুতরাং আসল পরিচয় গোপন করেছিলাম। ইউরোপীয় পরিচালিত খনিও দেখলাম। তাদের তুলনায় আমাদের দেশীয় খনির বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বোধের অভাব বড়ই চোখে লাগল। তবুও দেশীয় মধ্যবিত্ত লোকেদের মধ্যে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করবার মত হৃদয়ের আভাস অনুভব করে বুঝলাম যে এখানে সমিতির লোক নিযুক্ত করতে পারলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় অনেক কাজ করা যেতে পারবে। নিকটস্থ পাহাড় অঞ্চল বেশ ভাল আশ্রয়-স্থল পরিগণিত হতে পারবে এবং মাঝে মাঝে বাইরে এসে আক্রমণ করা যেতে পারবে। শশধরবাবুদের দলভুক্ত এক বাঙালী ডাক্তার নারায়ণ মুখার্জি থাকতেন পাহাড়ের নীচে একটা গ্রামে। এখান থেকে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে—অধিকাংশই সাঁওতাল, তাদের মানসিক গঠন পর্যবেক্ষণ করি।

ভগীরথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম ছিল এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে একটা পাহাড়ের টিলার উপরে। একখানা মাত্র ছোট ঘর ও রান্নার জন্য একটা চালাঘর। বাসগৃহের মধ্য দিয়ে একটা অন্ধকার গুহা ছিল। বসে বা হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হ'ত এবং পা ছড়িয়ে শোওয়া যেত না। শুধু বসে থাকার মত ব্যবস্থা। সে সময়ে একমাত্র ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কোন লোকজন ছিল না। এখানে বাঘের ভয় ছিল খুব। সন্ধ্যার পর আশ্রম ঘর পরিত্যাগ করে বাইরে আসা ছিল বিপদজনক। গুপ্ত জায়গা হিসেবে এ স্থানটি বেশ নিরাপদ মনে হ'ল।

এখানে ছিলাম প্রায় দিন দশ-বার। কোন খবরের কাগজ আসে না এ জায়গায়। সুতরাং কোন কিছুর খবরই আর এর মধ্যে জানতে পারি নি। প্রথমে খোঁজ-খবর নিয়ে নিজেদের আড্ডায় যাওয়া প্রয়োজন। মেছোবাজার স্ট্রীটের একটা মেসবাড়ীতে থাকত আমাদের সত্য যোগেশ রায়। ঘরে ঢুকে কুশল প্রশ্ন করতেই হাতকড়ির মত দুটো হাত দেখিয়ে জানাল যে আমাদের রাজাবাজারের আড্ডা ২১শে নভেম্বর (১৯১৩)' খানাতল্লাসী হয়েছে। বহু বোমার খোলস ও কাগজপত্র হস্তগত করেছে। অমৃত

হাজরা, সারদা গুহ, দীনেশ দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে এবং আরও দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। ত্রৈলোক্যবাবু ওখানে উপস্থিত না থাকায় ভাগ্যক্রমে ধরা পড়েন নি।

ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে গৃহত্যাগী ও পলাতকদের থাকবার জন্য নতুন বাড়ী ভাড়া করা হ'ল। এক সঙ্গে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা রোধের জন্য আমার থাকবার জায়গা হ'ল আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা তিনতলার বাড়ীর একটা ঘরে, অন্যের সঙ্গে। ত্রৈলোক্যবাবু থাকবেন বরানগরের এক বাড়ীতে খগেন চৌধুরীর সঙ্গে।

রাজাবাজারের ঘর খানাতল্লাস করে পুলিস ব্লটিং কাগজের অক্ষর পরীক্ষা করে সুরেশ চৌধুরী, ভাসতারা, হুগলী এই নাম ঠিকানা উদ্ধার করে। খগেন চৌধুরীই সেখানে ছিলেন সুরেশ নামে। পুলিস সুপার খানাতল্লাস করে খগেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তায় বেরিয়ে রেল স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললেন। কিছু দূর এগিয়ে পুলিস অফিসার খগেনবাবুকে নমস্কার করে বললেন, "আচ্ছা যাই, বড্ড কষ্ট দিলাম, মাফ করবেন।" খগেনবাবুও অবাক! তিনি ভাবছিলেন গ্রেপ্তার হয়েই তিনি পুলিসের সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁদের প্রহরাধীনে। কথা শুনে বুঝলেন গ্রেপ্তার হন নি। বাসায় ফেরামাত্রই কিন্তু একটি ছাত্র এসে খবর দিল, "স্যার, ওরা ফিরে আসছে।" খগেনবাবুও অন্যপথে অনেক পথ হেঁটে এক রেল স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেন ধরলেন।

খগেন চৌধুরীর জিনিসের মধ্যে একখানা চিঠি পুলিস পায় যাতে লেখা ছিল—"হিমাংশুবাবুর জ্বর সেরেছে, তিনি ভাল আছেন। ইতি—বিরজাকান্ত।" সুতরাং আমি হিমাংশু নাম ত্যাগ করলাম এবং ত্রৈলোক্যবাবু বিরজাকান্ত নাম পরিত্যাগ করে শশিকান্ত নাম গ্রহণ করলেন।

রাত্রিতে আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে খগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি তাঁর কথা বলে কি ব্যাপার তাই জিজ্ঞেস করলেন। আরও বললেন, রাজাবাজার বস্তিতে গিয়ে কি ভাবে পালিয়ে এসেছেন। অমৃত হাজরাদের গ্রেপ্তারের পর পুলিস ও-বাড়ীর দোতলা ঘরে সাধারণ পোশাকে লুকিয়ে থাকত যদি কেউ না জেনে আসে! দোতলায় উঠে ঘরের সামনে আসতেই লোকগুলি পাকড়ো, পাকড়ো বলে ধরতে গেলে খগেনবাবু পড়ি কি মরি ক'রে নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কিছু দূর দৌড়ে বস্তিরই আর একটা গলিতে ঢুকে পড়লেন। বস্তির লোক আমাদের উপর খুবই খুশী ছিল। তাই কেউ তাঁকে ধরিয়ে দিতে এগিয়ে আসে নি। তাঁকে আমি বাদুরবাগান রো'র বস্তির ঘরেও যেতে মানা করলাম। সেখানেও পুলিস খানাতল্লাস করে আমাদের সব জিনিস নিয়ে গেছে।

খগেনবাবু ভাল ফুটবল খেলতে পারতেন ও খুব দ্রুত দৌড়তেন। এক হাত দূরে টের পেলেও পুলিস তাঁকে ধরতে পারত না।

পুলিস ত আমাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল! আমার মাঝে মাঝেই ম্যালেরিয়ার জ্বর! ত্রৈলোক্যবাবুর হাঁপানি। একখানা হিতবাদী বা বঙ্গবাসী পেতেই আমাদের শুতে হ'ত। কাঁপুনি এলে ত্রৈলোক্যবাবু বা আর কেউ আমাকে চেপে ধরত। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল একবার গিয়েছিলাম শিয়ালদহ স্টেশনে খুব সকালে ঢাকা মেল এটেণ্ড করার জন্য। গোয়েন্দা ডেপুটি সুপার কেদারেশ্বর চক্রবর্তীকে চিনিয়ে দিতে হবে আমাকেই অপর দু'জন সঙ্গীকে। কিন্তু গাড়ী পৌঁছবার মুহূর্তে আমার ভীষণ কম্প দিয়ে জ্বর এসে গেল। সঙ্গীরা আমাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেল। কেদারেশ্বর চক্রবর্তীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই আমাদের ইচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে আর হয়ে উঠে নি।

রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার এক প্রধান সেনাপতির নাম ছিল ক্রুপোট্‌কিন। মুকুডেনের এক যুদ্ধে ঘেরাও হলেও তিনি ধরা পড়েন নি। আমাদের খগেনবাবুও নিজের ঢাকার বাড়ীতে এবং পলাতক অবস্থায় নানা ভাবে পলায়ন করতে বিশেষ পটুত্ব অর্জন করেছিলেন এবং স্বভাবতই খুব সাবধানী ছিলেন বলে তাঁর সুরেশ নাম ত্যাগ করিয়ে রাখলাম ক্রুপোট্‌কিন।

আমি আর ত্রৈলোক্যবাবু কলকাতা-মফঃস্বল করে যাযাবরের মত থাকতে লাগলাম। এক জায়গায় তিন দিনের বেশী শুতাম না। আমার আর ত্রৈলোক্যবাবুর জায়গায় যে দু'টি ছেলে থাকত দীনেশ বিশ্বাস, ও মতিলাল ( ওরফে হর্ষনাথ ) তারা খুবই কর্তব্যনিষ্ঠ স্বল্পভাষী, আড়ম্বরহীন ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র ছিলেন তখন কলকাতায় খুব প্রসিদ্ধ পুলিস-কর্মচারী। গোড়া থেকেই স্বদেশী দমনে ইংরাজের কাছে খ্যাতি অর্জন করে। প্রথম আলিপুর বোমার মামলায় যাতে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি আসামী ছিলেন, তাতে তাঁর খুব কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে। আমি যখনকার কথা বলছি ( ১৯১৩-১৪ ) তখন তিনি থাকতেন বর্তমান সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের একটা বাড়ীতে। বহু সংখ্যক পুলিস এই বাড়ীটি পাহারা দিত

রও হতেন রীতিমত প্রহরী বেষ্টিত হয়ে। তাঁকে দণ্ড দেওয়া স্থির হয়। তিনদিন বোমা পিস্তল নিয়ে র অপেক্ষায় থাকা হ'ল, আমিও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু তিনি বাড়ীর বার হলেন না। পরে তাঁর উপর আর আক্রমণ হয় নি।

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, যখন যার উপর আক্রমণ হওয়ার কথা তখন যদি সে কাজ সমাধা না হয়ে থাকে তবে আর বড় একটা সে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয় নি। হয়ত কালক্রমে তার প্রাধান্য আমাদের কাছে কমে গেছে এবং অন্য কোন অধিক অনিষ্টকারীর দণ্ড দেবার প্রয়োজন হয়েছে, কিংবা সমিতির অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে মনোনিবেশ করতে হয়েছে।

১৯১২-১৩ সনে নলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ের প্রভাবে কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক অনুশীলন-সমিতির সভ্য হন। এদের মধ্যে কেশব হেডগেয়ার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সরল, সৎ, নিষ্ঠাবান, আন্তরিক কর্মী বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ইনি ছিলেন নাগপুর অঞ্চলের লোক। পরবর্তীকালে এঁরই কর্মশক্তির ফলে এবং নেতৃত্বে সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক দল গঠিত হয় সারা ভারতে। তিনিই হন এর গুরুজী। এর আগে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ১৯১০-১১ সনে।

১৯০৯-১০ সনের পর বোম্বাই প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও বেরার অঞ্চলে বিপ্লবী দলের কাজকর্ম একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৭ সনে বালগঙ্গাধর তিলকের অনুপ্রেরণায় এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র দেশে বিপ্লবী দল গড়ে উঠে। নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনের হত্যার পর এক ষড়যন্ত্র মামলা হয়। বিলাতে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিস ভারতবর্ষের দিকে রওনা হয়। পথে তিনি ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে জাহাজ থেকে লাফিয়ে উপকূলে উঠে পালিয়ে যাওয়ার সময় ফরাসী পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ফরাসী সরকার প্রথম তাঁকে ব্রিটিশের হাতে দিতে অস্বীকার করে। পরে অবশ্য ব্রিটিশের হাতে সমর্পণ করেন। কেননা জার্মানীর ভয়ে ফ্রান্স তখন ভীত ও ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী।

লণ্ডনে কার্জন ওয়ালীওলালকার হত্যার পর মদনলাল ধীংরা গ্রেপ্তার হন ও তাঁর ফাঁসী হয়। সাভারকর এ সম্পর্কেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বহু লোক গ্রেপ্তার ও তাদের সাজা হওয়ায় মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী দল কিছুকালের জন্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

সাভারকরের দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম, নেতৃত্বশক্তি ও ব্যক্তিত্বে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। বিলাতে থাকাকালীন তিনি ছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মেধাবী। পরে লালা হরদয়ালও বিলাতে সর্বাপেক্ষা ভারতীয় মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হন। সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকরও দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বিনায়ক সাভারকর ইউরোপে ভারতীয় বিখ্যাত বিপ্লবী নেতৃ মাদাম কামার সঙ্গে একযোগে বিপ্লববাদা কার্য করতেন। আমাদের প্রেরিত কেদারেশ্বর গুহ এই মাদাম কামার সঙ্গে প্যারীতে যোগ স্থাপন করেন।

মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী দল যখন সাময়িক ভাবে নিস্তেজ হয় তখন পূর্বোল্লিখিত মহারাষ্ট্র বন্ধুদের মাধ্যমে বিপ্লব পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেছিলাম।

( প্রথম খণ্ড শেষ )

## ডাবলু, বি, ইয়েট্‌স অবলম্বনে

সুনীলকুমার নন্দী

যখন বার্ধক্য আসে, পক্ব কেশ, ঘুমের শরণ,
আগুনের পাশে ব'সে মাথা নাড়ো, সঙ্গী শুধু বই,
নেড়েচেড়ে পড়ো ধীরে, কল্পনায় ভাসে নম্র ওই
যা ছিলো একদা চক্ষে, তার ছায়া গভীর এখন ;

অনেকেই ভালোবাসলো যা তোমার লাস্যে সমুজ্জ্বল,
ছলনা অথবা তপ্ত প্রেমে ছিলো সৌন্দর্য বোধন,
তীর্থযাত্রী আত্মা কিন্তু ভালোবেসেছিলো একজন,
তোমার বদলানো মুখে ফুটে ওঠা বিষণ্ণ আদল ;

এবং আনত হ'য়ে চুল্লীটির লাল সিকাভায়,
ঈষৎ বিষাদে মিশ্র মৃদু কলধ্বনি তোলে, প্রেম
কেমনে উধাও হলো, শৈলচূড়া ক'রে অতিক্রম,
তার মুখ লুকায় নক্ষত্রমধ্যে নক্ষত্রমেলায় ।

—

যাবো আজ, আমি যাবো ইনিস্‌ফ্রী দ্বীপে,
গড়বো মাটি ও বাখারিতে এক ছোট্ট কুটীর :
সেখানে থাকবে নয় সারি বিন, মৌচাক হবে কুঞ্জশাখায়,
মৌমাছিদের গুঞ্জনরোলে নির্জন বাস, ছায়াবীথিকায় .

সেখানে হৃদয় কুড়বে শান্তি, শান্তি ঝরবে মন্থর পায় বিন্দু বিন্দু,
বিন্দু বিন্দু ঝরে ঝিঁ ঝিঁ গাওয়া প্রভাতের অবগুণ্ঠন থেকে,
ঝরে মাঝরাতে নম্র আলোয় এবং দুপুরে নীলাল আভায়,
লিনেট পাখির পাখায় জড়ানো ভরা সন্ধ্যায় ।

যাবো আজ, আমি সারা দিনরাত
শুনি তীরে লাগা হ্রদের জলের মৃদু ছল ছল ;
হোক রাজপথ অথবা ধূসর পায়ে চলাপথ যেখানে দাঁড়াই
হৃদয় গহনে তারই সুর শুনি, তারই ধ্বনি পাই ।

## রোগ-শয্যায়

হেনা হালদার

মুঠো মুঠো তাজা ফুল বদ্ধঘরে বাসি বিছানাতে
কখন গিয়েছো রেখে : আরোগ্যের কামনা জানাতে,
অথচ বল নি কিছু ।

নিদ্রিত ছিলাম শয্যাতলে
কৃতজ্ঞতা চেয়ে নিতে কোনো ছলে অথবা কৌশলে
পাতো নি অঞ্জলি ।

তাই তুমি চুপি চুপি এসেছিলে ।
মনে মনে তোমাকেই ডেকে বলি : জানি যত দিলে
কবোষ্ণ প্রীতির স্পর্শ, হৃদ্যতায় না-বলা কথার
অপার রহস্য রসে পরিবৃত । সে-নীরবতার
অশ্রুত রাগিণী বুনে রেখে গেছ ।

তাকে মনে মনে
কেবলি বাজাই সুরে । অকারণে বিনা প্রয়োজনে
বিষণ্ণ বিস্ময়ে ।

আর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবি :
অসুখের সুখে ডুবে : ছিল না তো সামাজিক দাবী
বদান্যতা করে তাই নাসপাতি কিংবা মুসাম্বির
প্রচলিত প্রথা বয়ে আনো নি তো ।

নির্জ্জন হাম্বির
বাজালো কোমল ছন্দে সখ্যতার নম্র দিলরুবা
প্রাণের গভীর সত্যে ।

ডালা ভরে পাঠাতে নতুবা
ফলের প্রত্যাশা নিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ নীলাভ আঙুর
সোনালী আপেলে ভরে স্বাধিকার-মত্ততার সুর ।

আলুতো আলোর মতো ছড়িয়েছো বালিশের পাশে
প্রচ্ছন্ন মমতা শুধু : ভরে দিতে নিরস্ত আশ্বাসে ।

সন্ধ্যার জ্যোতি
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

# সে নহি

# সে নহি
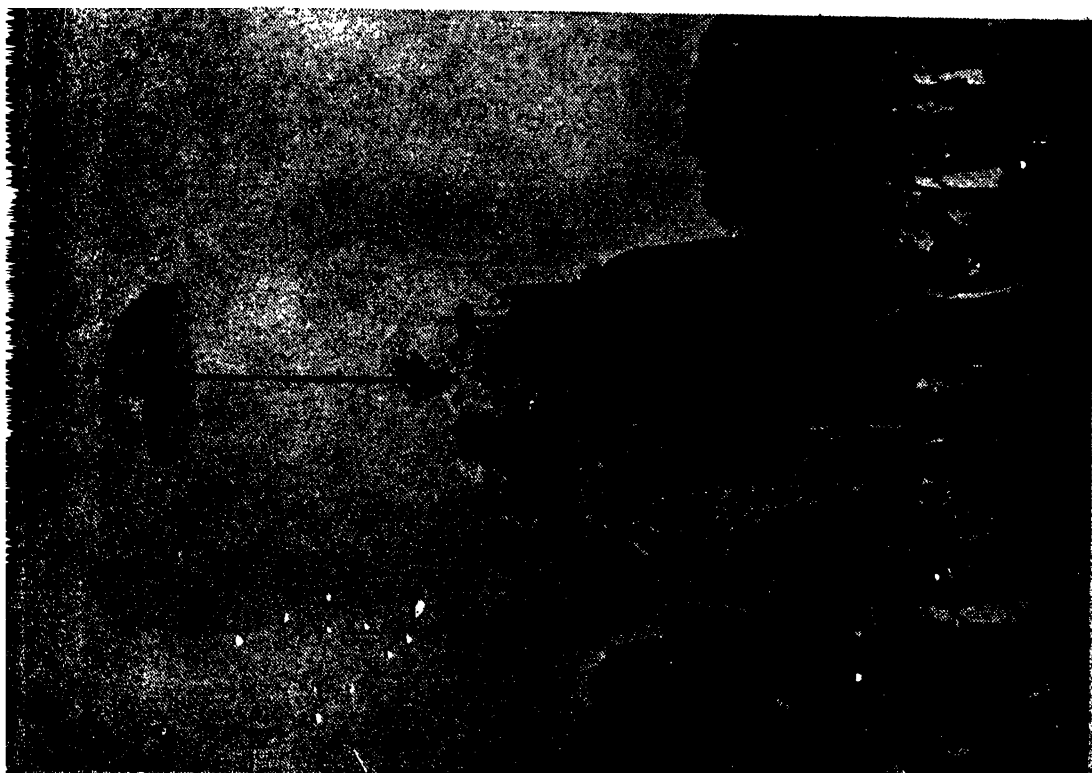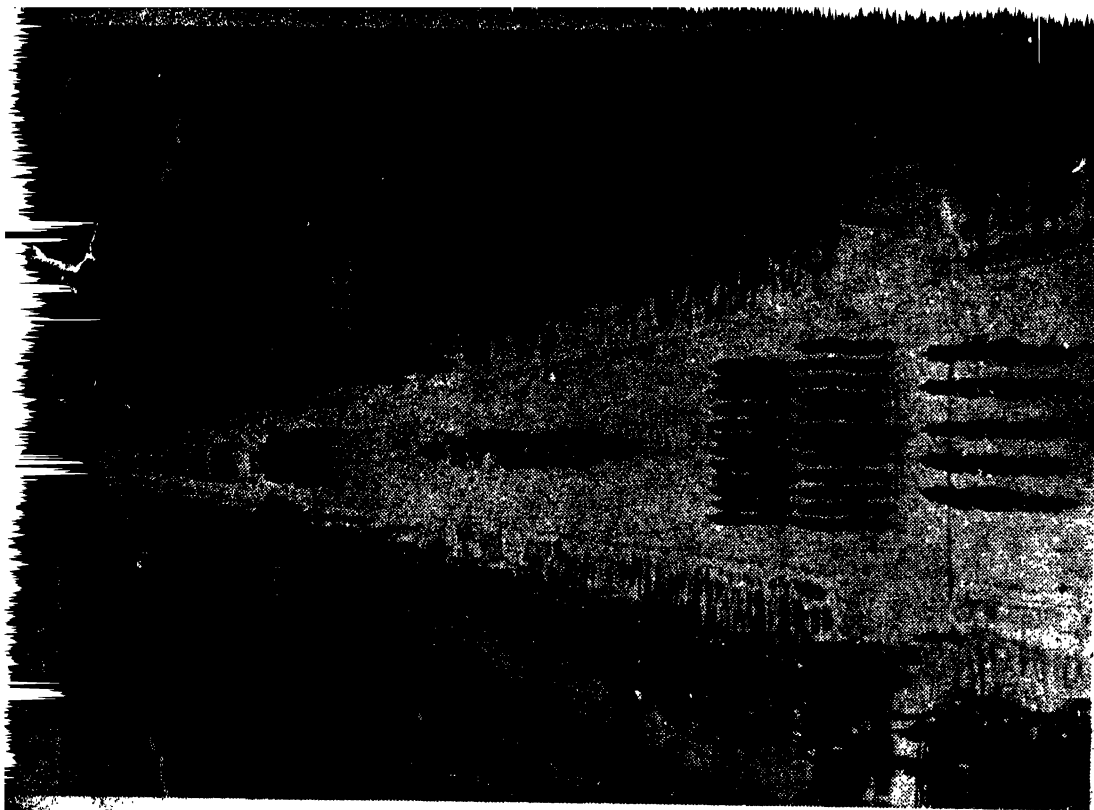
শ্রীচাণক্য সেন

তের

বাসন্তী দেবীকে নিয়ে দেববাণী যখন বেরিয়ে পড়ল তখন অন্তিম শীতের স্বল্পস্থায়ী বিকাল সন্ধ্যার আসন্ন আবছা অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে। নিজামুদ্দিন থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের সমাধি-সৌধে এসে পৌঁছল দেববাণী। দিল্লীর মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হুমায়ুনের সমাধি। যাকে নিয়ে সমাধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে করতে দেববাণীর মনে আর একবার সরোজার কাছে সদ্য-প্রাপ্ত দুঃসংবাদ খচ ক'রে জেগে উঠল। সাবিত্রী আম্মার কাছে আজই একবার যেতে হয়, নিজেকে বলল দেববাণী; সরোজার খবরের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তার মধ্যে কতখানি বিপদ্ লুক্কায়িত, সাবিত্রী আম্মা বলতে পারবেন। রিসার্চ সেণ্টারের জন্যে জমি অবশ্য অন্যত্র নেওয়া যায়, কিন্তু বাড়ীর প্ল্যান তাহলে আবার নতুন ক'রে বানাতে হয়। তার মানে আরও সময়, দীর্ঘতর বিলম্ব। ইন্দ্রপ্রস্থ এষ্টেটে বর্তমান জমিটি দেববাণীর খুব পছন্দ হয়েছিল; পুরাতন ও নতুন দিল্লীর সংযোগস্থলে রিসার্চ সেণ্টার সবচেয়ে ভাল হ'ত। সে শুনেছে এই নতুন-গ'ড়ে-ওঠা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কালে একাধিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপিত হবে; সেদিক্ থেকেও স্থানটি লোভনীয় লেগেছিল। এ জমি হাতছাড়া হয়ে গেলে পছন্দমত নতুন জমি পাওয়া-না-পাওয়ার সমস্যার অজুহাতেই ইচ্ছে হ'লে রিসার্চ সেণ্টারের সমস্ত পরিকল্পনাকে অনিশ্চিত ক'রে দেওয়া কারুর পক্ষে কঠিন হবে না। সব তথ্যের সন্ধান না পাওয়া গেলেও দেববাণী বুঝতে পেরেছিল, তাদের প্রস্তাব সর্ব-সমর্থিত নয়; নেপথ্যে, দৃষ্টি ও গোচরের বাইরে, তা শক্তিমান্ কোনও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা অর্জন করেছে। এ গোষ্ঠী কাদের নিয়ে দেববাণী জানে না, কতখানি তাদের ক্ষমতা তাও তার অজানা; কেউ তাকে পরিষ্কার ক'রে কিছু বলতে চায় না। কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তা-দের হঠাৎ-শীতল ব্যবহারে, সাবিত্রী আম্মার নিরুপায় নিষ্ক্রিয়তায় দেববাণী বুঝতে পেরেছিল সহজে তাদের উদ্যোগকে সার্থক ক'রে তোলা সম্ভব হবে না। অথচ, সমাধি-মন্দিরের প্রাচীন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে দেববাণী দেখল, এ জন্যে যে-পরিমাণ উৎসাহ নিয়ে লড়াই-এ নামা দরকার ততটা তার নেই।

বাসন্তী দেবীর মন বর্তমানের বেড়া ভেঙে তখন বহু-দূরের অতীতে চ'লে গেছে। তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন পূর্ব-বৈভব মুঘল-রাজদরবার, দুর্গ-সংরক্ষিত অট্টালিকার ঘরে ঘরে বাদশাহী জীবনের বহুবর্ণ উচ্ছলতা। তাঁর কানে বেজে উঠছে সশস্ত্র সংঘাতের ভয়ানক কোলাহল; আহতের আর্ত চাৎকার; বিজেতার পাশব জয়োল্লাস, বিজিতের করুণ আর্তনাদ। কল্পনায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন সপ্ত দিল্লীর ধূসর পাথুরে মাটিতে সাম্রাজ্যের গঠন, উত্থান, পতন। অদূর-প্রবাহিনী ক্ষীণ-স্রোতা যমুনার বুকে সুদীর্ঘ নীরব ইতিহাসের মুখর নির্বাক্ স্বাক্ষরগুলি একে একে ভেসে উঠছে বাসন্তী দেবীর চোখে। হঠাৎ তিনি যেন দেখতে পেলেন, প্রায় একশ' বছর আগে সিপাহী বিদ্রোহের শেষ-অধ্যায়ে মুঘলের সর্বশেষ স্বপ্নের চিরসমাধির মর্মন্তুদ দৃশ্য। বৃদ্ধ অন্ধ বাহাদুর শাহ্ এই হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরের সংলগ্ন কোন অধুনা-নিশ্চিহ্ন প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এখানেই, ঐ প্রাচীন দ্বারপথের অদূরে ইংরেজের কাছে তাঁর দুই পুত্র আত্মসমর্পণ করেছিল। ইংরেজ তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েও লাল কিল্লায় নিয়ে যাবার পথেই তাদের হত্যা করেছিল। ভারতবর্ষের শেষ 'সম্রাট্' বাহাদুর শাহ্‌কে নির্বাসিত ক'রে ইংরেজ শতবর্ষব্যাপী যে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল আজ তাও অতীত ইতিহাস। ভারতবর্ষ আর এক অভিনব পরীক্ষার দীক্ষা নিয়েছে, যার তাৎপর্য বাসন্তী দেবী কেমন যেন বুঝে উঠতে পারেন না। হুমায়ুনের কবর বর্তমান ভারতবর্ষের কাছে প্রাচীন ইতিহাসের স্মারকচিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়; দেববাণীর মনে যে তার কোনও প্রভাব পড়ছে না, তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। ভারতবর্ষের কোনও কিছুই কি বর্তমানের মানসকে প্রভাবিত করছে? বাসন্তী দেবী এ প্রশ্নের জবাব পান না। স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌ও দেখেছিলেন; সে-স্বপ্ন বাস্তব হ'তে আরও একশ' বছর প্রায় কেটে গেল। স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্পষ্ট স্বপ্ন

বাসন্তী দেবীর যৌবনকালে আরও অনেকে দেখেছিল—তাদের মধ্যে একজনের গম্ভীর মুখচ্ছবি ইংরেজের হাতে বন্দী বাহাদুর শাহের পুত্রদের মুখের চেহারার সঙ্গে আজকার এই ম্লান সন্ধ্যায় যেন একাকার হয়ে গেছে। তারা সব পুরাতন। আজ ভারতবর্ষ আবার নতুন। তার নতুন-জীবনের অন্যতম প্রতীক বাসন্তী দেবীরই সন্তান, দেববাণী। অথচ এই সামান্য কয়েকটা বছরের ব্যবধানে বর্তমান ভারতবর্ষের মানস এমন ক'রে বদলে গেল কিসের প্রভাবে? কেন তিনি নিজের সন্তানকে পর্যন্ত জানেন না, বোঝেন না, তার অন্তর্দ্বন্দ্বে সাহায্য করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই!

"মা!"

দেববাণীর ডাক শুনে বাসন্তী দেবী সচেতন হলেন।

"কি রে?"

"তোমার খুব ভাল লাগছে, না?"

ভাল লাগছে? কি জানি? একে কি ভাল লাগা বলে? অতীত ও বর্তমান একাকার হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

মেয়ের কথার জবাব দিলেন না বাসন্তী দেবী।

দেববাণী আবার প্রশ্ন করল, "কি ভাবছ তুমি, মা?"

"বুড়ো মনের এলোমেলো ভাবনা, তার আরম্ভ নেই, শেষ নেই।"

"তার মানে তুমি বলবে না।"

"সব কিছু কি বলা যায়, বাণী!" বাসন্তী দেবী মৃদু হাসলেন। "তুই কি তোর সব কথা আমায় বলিস?"

দেববাণীর নিঃশ্বাস মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল।

"আমি তোমাকে যত কথা বলি মা, খুব কম মেয়েই মাকে ততটা বলে।"

"তা হলেও সব কিছু ত বলিস না!"

"কি বলি নি বল ত?"

"কি বলিস নি, বলতে চাস নে বা পারিস নে, তা তুই-ই জানিস সবচেয়ে বেশি। হয়ত বলার মত অবস্থায় এসে পৌঁছস্ নি। হয়ত ভাবিস, আমি আর এক-কালের লোক, তোর সমস্যা বুঝতে পারি নে।"

"তা নয় মা। বুঝতে তুমি হয়ত পার। কিন্তু কতগুলি সমস্যা আছে যা আমাদের একান্ত নিজের; তারা কিছুতেই অন্য কারুর কাছে ধরা দিতে চায় না।"

"তবু, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলে মন হাল্কা হয়, সমাধান অনেক সময় সহজ হয়ে ওঠে! এমন অবস্থায় মানুষ পড়ে যখন নিজের সমস্যা মেটাতে না পেরে সে অন্যের শরণাপন্ন হয়।"

"সে অবস্থা আমার এখনও আসে নি, মা," স্বরে দেববাণী বলল।

"তোকে একটা কথা বলি বাণী। মানুষ যখন হয়, তার দৃষ্টিতে অনেক কিছু নতুন রহস্য ধরা পড়ে। অনেক কালের মন নিয়ে বর্তমান কালের সমস্যার পানে তাকালে তার ধার বেশ কম মনে হয়। কালে কালে আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক পরিবর্তন হলেও মানুষের প্রধান সমস্যাগুলি মূলতঃ এক। তা না হ'লে মহাভারত-রামায়ণ পড়ে আমাদের এখনও ভাল লাগত না। কালিদাস এ যুগে কেউ পড়ত না; অতীতের মনীষা বর্তমানের দুয়ারে একেবারে পাত্তা পেত না। আমার কি মনে হয় জানিস, বাণী! আমার মনে হয়, তোর সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের মেয়েদের বুঝি বিশেষ প্রভেদ নেই। তাই তোকে বলি, তুই আমাদের প্রাচীন সাহিত্য প'ড়ে দেখ্।"

"কাদের কথা বলছ, মা? কোন্ মেয়েদের?"

"উপনিষদ্-মহাভারতে যে মেয়েদের কাহিনী বিবৃত রয়েছে। তাদের অনেককে যে ধরনের সমস্যা জয় করতে হয়েছিল তার থেকে তুই বোধ করি অনেকখানি মনের বল পেতে পারিস।"

"আমার মনের বল নেই তুমি ভাবলে কি ক'রে?"

"উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির উপাখ্যান প'ড়ে দেখিস। দুই স্ত্রী নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্যধর্ম পালন করছিলেন; অর্থ-বিত্তের অভাব ছিল না তাঁর। বৃদ্ধ হলে তিনি সঙ্কল্প করলেন, গৃহ-সংসার ত্যাগ ক'রে বনবাসী হয়ে ভগবানের ধ্যান করবেন। দুই স্ত্রীকে বললেন, এস, তোমাদের সম্পত্তি ভাগ ক'রে দি। স্ত্রীদের মধ্যে কাত্যায়নী কেবলমাত্র গার্হস্থ্য জীবনে নিরত ছিলেন; মৈত্রেয়ী সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করতেন। স্বামী সংসার ত্যাগ ক'রে অরণ্যে যাবেন, আর তাঁকে দিয়ে যাবেন কেবলমাত্র সম্পত্তির অর্ধাংশ, এই প্রস্তাব শুনে মৈত্রেয়ীর অন্তর বিদ্রোহ ক'রে উঠল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, পৃথিবীর সমস্ত ধন ও অর্থ যদি আমার হয়, তবে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব? স্বামী উত্তর দিলেন, না; বিত্ত দ্বারা কখনও অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। মৈত্রেয়ী অনেক চিন্তা করলেন। তার পর স্বামী যেদিন সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, যাতে আমি অমৃত হব না, তা দিয়ে আমি কি করব? তুমি আমাকে অমৃতের পথ ব'লে দিয়ে যাও। যাজ্ঞবল্ক্য বুঝলেন, মৈত্রেয়ী এমন স্ত্রী যে তাঁকে সংসারে বাঁধবে না, মুক্তি দেবে। তিনি আর সংসার ত্যাগ

করলেন না ; স্ত্রীর সঙ্গে একত্র অমৃতের সাধনা করতে লাগলেন।"

দেববাণী মন দিয়ে শুনছিল, কিন্তু হাল্কা ভাবে বলল, "আমি ত মৈত্রেয়ী নই, মা। আমি অমৃতের সন্ধান করছি না।"

"তাই যদি হ'ত, বাণী, তাহলে তোর দ্বন্দ্ব-দ্বিধা কিছু থাকত না। চোখের ওপর অনেক মেয়েকে দেখছি, জীবনকে ভোগ করবার সুযোগ তারা দু'হাতে গ্রহণ করছে। আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনে অমৃত কেবল ব্রহ্মা নন, বাণী, অমৃত হ'ল বড় কিছুর সন্ধান। তুই যে শান্তি ও সমন্বয়ের খোঁজ করছিস, যা দৈনন্দিন জীবন-ভোগের চেয়ে বড়, তাতে নিশ্চয় অমৃতের স্পর্শ রয়েছে। যদি না থাকত তাহলে সে তোকে এমন ভাবে ব্যথা দিত না, এমন অস্থির ক'রে তুলত না। তাই বলছিলাম, মৈত্রেয়ীর মত মনের বল তোর নেই। মৈত্রেয়ী বিনা সংশয়ে কি চাই তা বুঝে নিয়েছিল, যা চাই তা পেতে সে ইতস্তত করে নি। স্বামীকে সে পরম নিশ্চিন্ত সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছিল, যাতে আমি অমৃত হব, তাই আমাকে দাও। তুই কি তেমনি ক'রে কাউকে বলতে পারিস?"

বুকে কি যেন দুরু দুরু বেজে উঠল দেববাণীর। মুহূর্তে তা গলা পর্যন্ত উঠে এল। মুখে তার কথা সরল না। মনে শতস্বরে প্রশ্ন ঝঙ্কৃত হ'ল: আমি কি বলতে পারি হিমাদ্রিকে, যাতে আমি অমৃত হব, সে পথ আমাকে দেখিয়ে দাও? হিমাদ্রি জানে সে পথ? বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অমৃত হবার কি কোনও পথ আছে? জীবনকে পূর্ণ উপলব্ধি করার পথ কি আজও খোলা আছে? পশ্চিমে নেই, দেববাণী খুব ভাল ক'রে দেখে এসেছে। ওরা বিজ্ঞান-দানবকে বশ ক'রে জীবন-ভোগের সবটুকু মাল-মশলা জোগাড় ক'রে নিয়েছে, কিন্তু জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারে নি। তাই বার বার ওরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম ক'রে আবার যুদ্ধের আগুন জ্বালায়। তাই বিজ্ঞানের বৃহত্তম শক্তিকে ওরা ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত করেছে। পশ্চিম জীবনের পূর্ণতা হারিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষেই কি তার সন্ধান পাওয়া যাবে? এখানেও কি জীবন ভোগের লোভে ভয়ঙ্কর লোলুপ হয়ে ওঠে নি? দ্বন্দ্বের অবসানে যে সুগভীর সুশান্ত সমন্বয়, ভারতবর্ষ কি আজও তার সন্ধান রাখে?

বাসন্তী দেবীকে নিয়ে দেববাণী যখন সাবিত্রী আম্মার বাড়ী পৌঁছল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে থেকে ওরা দেখতে পেল সাবিত্রী আম্মার ঘরে আলো জ্বলছে। দেববাণী বেল্ টিপে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রামস্বামী এসে দরজা খুলল। দেববাণী ও বাসন্তী দেবীকে পাশের ঘরে বসিয়ে সে গেল সাবিত্রী আম্মাকে খবর দিতে।

বাসন্তী দেবী নিচু গলায় বললেন, "খবর না দিয়ে এসে গেলি, যদি ওঁর অন্য কাজ থাকে?"

"তাহলে চলে যাব," দেববাণী নিশ্চিন্তে জবাব দিল। "মনে হচ্ছে, কাজকর্ম বিশেষ নেই আজ। বাইরের লোকজন ত কাউকে দেখছি না।"

"আমি কিন্তু বেশি কিছু বলতে পারব না।"

"তোমাকে আগেও বলেছি, মা, আবার বলছি, ইংরেজী না জানা মানুষের একটা অপরাধ নয়। পরাধীন ভারতবর্ষে যদি-বা ছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষে নিশ্চয় নয়। তুমি বাংলায় বলবে যা তোমার বলার ইচ্ছে, আমি ইংরেজী ক'রে দেব। ওঁর কথা বুঝতে ত তোমার অসুবিধে হবে না!"

রামস্বামী এসে ওদের সাবিত্রী আম্মার ঘরে নিয়ে গেল। দেববাণী ঢুকল আগে, দেখল সাবিত্রী আম্মা কম্বল গায়ে জড়িয়ে বিছানায় ব'সে আছেন, মুখে হাসি, কিন্তু বড় বড় চোখ দু'টিতে যেন ক্লান্তি জমে রয়েছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় হাসিটিও যেন ম্লান মনে হ'ল দেববাণীর কাছে। কিন্তু কেবল মুহূর্তের জন্য। দেববাণীর পেছনে বাসন্তী দেবীকে দেখতে পেয়ে সাবিত্রী আম্মা ওঠবার চেষ্টা করলেন, মুখখানা আরও হাস্যমুখর হ'ল। দু'হাত তুলে নমস্তে ক'রে হিন্দীতে বললেন, "আসুন, আসুন। দেববাণীকে কতবার বলেছি মা'কে একদিন নিয়ে এস। এতদিনে সময় হ'ল।"

বাসন্তী দেবীকে চেয়ারে বসিয়ে দেববাণী বসল। সে বলল, "মা'রও খুব আসবার ইচ্ছে ছিল। তবে সঙ্কোচও বোধ করছিলেন। বলছিলেন, ভাল ইংরেজী বলতে পারি নে।"

"তাহলে ত আপনার আরও বেশি ক'রে এখানে আসা উচিত," সাবিত্রী আম্মা বাসন্তী দেবীকে বললেন।

"ইংরেজী আমিও বিশেষ জানি নে। তার চেয়ে বরং গান্ধীজির কাছে বহুদিন কাটিয়ে হিন্দীটা ভাল জানি।"

"বাণীর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি," ইতস্তত ক'রে বাসন্তী দেবী বললেন। "আপনাকে দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল।"

"দেববাণী তার মা'র কথাও আমায় কম বলে নি।"

"মেয়েরা মা'দের কথা ত ব'লেই থাকে," বাসন্তী দেবী যোগ দিলেন।

"থাকা ত উচিত," বলতে বলতে মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন সাবিত্রী আম্মা।

"সরোজা কোথায়?" প্রশ্ন করল দেববাণী।

"এখনও ফেরে নি," সংক্ষেপে বললেন সাবিত্রী আম্মা।

পরক্ষণে দেববাণীকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কাজ কতদূর এগোল?"

"কোথায় আর এগোচ্ছে?" দেববাণীর কথায় ক্লান্তি ফুটে উঠল, কিছুটা নৈরাশ্যও। "কোথায় যে আটকে আছে তাও বুঝতে পারছি না।"

"খোঁজ-খবর করছ না?"

"যতটা পারি করছি। কেউ কিছু বিশেষ বলতে চাইছেন না।"

"এবার তুমি মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে দেখা কর।"

"তাই ভাবছি।"

"ভেবে বেশি সময় নষ্ট ক'রো না।"

"কেন? আপনি কি কিছু শুনেছেন?"

"উড়ো কথা কানে আসে, দেববাণী।"

"আমি আজই খবর পেয়েছি যে, আমরা যে জমিটা চেয়েছি তা নেবার জন্যে আরও একটা পার্টি চেষ্টা করছে।"

"সরোজার খবর ত?" মৃদু ম্লান হাসি ফুটে উঠল সাবিত্রী আম্মার মুখে।

"হ্যাঁ।"

"সে আমাকেও বলেছে।"

"খবরটা তাহলে ঠিক?"

"হ'তে পারে। তার মানে এই নয়, জমিটা তোমরা পাবে না।"

"শুনেছিলাম, ও জমিটা কোন বিদ্যায়তনের জন্যে নির্দিষ্ট।"

"কালচারেল বা এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট। তার মধ্যে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানকেও চেষ্টা করলে আনা যায়।"

"সংবাদপত্র ত শিল্প। দস্তুর মত বড় ব্যবসা।"

"তা হ'লেও।"

"প্রতিপক্ষ মনে হচ্ছে প্রতিপত্তিশীল।" দেববাণী অনেকটা নিজের মনে বলল।

"সুতরাং, তোমাকে আরও জোরের সঙ্গে কাজে নামতে হবে," সাবিত্রী আম্মা বললেন।

"আপনাকে বলতে পারি তাই বলছি," দেববাণী ম্লান স্বরে যোগ দিল, "আমি নিজেই যেন তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না। আসল কথা, আমার কেমন ভয় করছে।"

সাবিত্রী আম্মা হেসে বললেন, "ভয়? কিসের ভয়?"

ঠিক জানি নে। মনে হচ্ছে, স্বদেশকেই যেন আমি ভয় করছি। দশ বছর আগে যেদিন কলকাতা ত্যাগ ক'রে বিদেশে গিয়েছিলাম, ভারতবর্ষের কিছুই আমার জানা ছিল না। আজ ফিরে এসে দেখছি, আমার অজ্ঞানতা অপরিসীম। বাইরের পৃথিবীকে যদি বা একটু চিনি, নিজের দেশকে আমি একেবারে জানি না। স্বাধীনতা আমাদের মনের বন্ধন কেটেছে, বহু পথে আমরা ধাবিত হচ্ছি, আমার সবকিছু কেমন গোলমেলে লাগে, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা অলীক, বুঝতে পারি না। তাই মনে হচ্ছে, দেশকে না জেনে, না চিনে, এত বড় একটা কাজে হাত দিয়ে যদি শেষ পর্যন্ত সামলাতে না পারি?"

"তোমাদের মার্কিন মুলুক আর য়ুরোপ থেকে বিদেশীরা ভারতবর্ষকে ত দেখতে পায়, এক-নজরে চিনে নেয়। এ দেশের সাতটা সহরে একমাস কাটিয়ে তারা সব ভারত-বিশেষজ্ঞ হ'য়ে ফিরে যায়। আর তাদের সারগর্ভ রচনা আমাদেরই সংবাদপত্রে ফলাও ক'রে ছাপান হ'য়ে থাকে।"

"যারা তা পারে তারা অন্য জাতের লোক।"

"তোমার পার্টনার কি বলছেন?"

দেববাণী হঠাৎ লজ্জা পেল। মৃদু স্বরে বলল, "তাঁকে সব খুলে লিখেছি।" একটু থেমে যোগ দিল, "তাঁকে আসতে লিখেছি।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "ভালো করেছ।"

"রিসার্চ সেণ্টার তৈরী করবার প্ল্যান তাঁরই," দেববাণী যেন কৈফিয়ৎ দিল, "উৎসাহ তাঁরই বেশি। তিনি স্বদেশকে জানেন, বোঝেন। তাঁর নিজেরই উপস্থিত থেকে সব কিছু বিবেচনার পর কর্তব্য নির্দেশ করা উচিত।"

"আমিও তাই মনে করি," সাবিত্রী আম্মা বললেন।

বাসন্তী দেবী এতক্ষণ নীরবে শুনছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "আপনি হয়ত ভাবছেন, আমি কেন দেববাণীকে আর সাহায্য করতে পারছি না।"

বাসন্তী দেবী ব'লে উঠলেন, "না, না। আপনি ওকে যে অনেক সাহায্য করেছেন তা আমি জানি।"

দেববাণী বলল, "আপনার কাছ থেকে উৎসাহ ও

সাহায্য না পেলে আমি কিছুই হয়ত করতে পারতাম না।"

ম্লান হাসির সঙ্গে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "পারতে। আমি না হ'লে অন্য কেউ তোমায় উৎসাহ দিত, এগিয়ে দিত। সংসারে, দেববাণী, ভাল লোকের অভাব নেই। যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছে তারা সবাই একথা বলবে। পথের প্রতি মোড়ে তোমাকে সাহায্য করতে, এগিয়ে দিতে একজন কোন বন্ধুকে ভগবান্ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তারা তোমার কেউ নয়, অথচ তাদের কাছে তুমি যা পেয়েছ, এমন নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাও নি। আমার জীবনে বার বার আমি বিধাতার এ আশীর্বাদ পেয়ে এসেছি।"

"আমিও," আস্তে সায় দিল দেববাণী।

"তোমাকে আমার প্রথম দিনেই কেন ভাল লেগেছিল, বলি। বুঝতে পেরেছিলাম, আমি ও তুমি এক পথের যাত্রী। সে পথের বাইরেকার চেহারা বদলেছে, কিন্তু আসলে তা এক। আমি এ শতাব্দীর প্রথমকার, তুমি মধ্যেকার। কিন্তু আমিও এগিয়ে যাবার যে দুর্দম্য জ্বালা নিয়ে জীবনের পথে একেবারে নিঃসহায় নির্বান্ধব যাত্রা সুরু করেছিলাম, সে জ্বালাই অন্য রূপে তোমাকে হারতে দেয় নি। আমি ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের পুরাতন, তুমি পরিণত নূতন।"

"আপনি যে অবস্থায়, যে বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, আমাদের তুলনায় তা আরও ভীষণ। আপনার মত শক্তি আমাদের কোথায়?" দেববাণী বিনীত স্বরে বলল।

"সমাজের অবস্থা নিশ্চয় আরও প্রতিকূল ছিল," সাবিত্রী আম্মা বললেন। "তোমার মা তা খুব ভাল জানেন। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ ক'রে তামিলনাদে, সমাজ অত্যন্ত গোঁড়া ও নিষ্ঠুর ছিল। সেদিক্ থেকে আমি যা করেছিলাম তা দুঃসাহস বৈ কি—তোমাকে ত একদিন সে গল্প করেছি। কিছু একটা মস্ত বড় জিনিস আমাদের ছিল, যা তোমাদের নেই। আমরা এক বড় অগ্নিসম্ভব যুগে বেড়ে উঠেছিলাম। সে ছিল ভাব-বিপ্লবের যুগ, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মত্যাগের যুগ। আমি যদি অ্যানি বেসান্তের সংস্পর্শে না আসতাম, তাহলে আমার কি পরিণতি হ'ত ভাবতে পারি না। তোমরা বুঝবে না, গান্ধীজির শিষ্যত্ব পাওয়ার মানে কি ছিল সেদিন। আমাদের ক্ষুদ্রত্ব, আমাদের দুর্বলতা, অনেকখানি তিনি দূর ক'রে দিয়েছিলেন। বাংলায় যেমন স্বামীজির সংস্পর্শে এসে একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গ'ড়ে উঠল, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে এক দল অসমসাহসী দেশকর্মী, তেমনি গান্ধীজি আমাদের মধ্যে বড় কিছুর আলো এনে দিলেন। তা ছাড়া, স্বদেশীর একটা উদাত্ত মাদকতা ছিল। দেশকে মা বলে জানতে পারা, বিদেশী প্রভুদের আয়ত্ত থেকে তাকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখা, দ্রুত-বেড়ে-যাওয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়া, এসবের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাদের টেনে নিয়ে গেছে লক্ষ্যের দিকে। তোমরা বেড়ে উঠেছ অন্য যুগে। এ হ'ল প্রভাতের পর নিদাঘ দিনের তপ্ত পূর্বাহ্ণ। ভারতবর্ষে আজ আর কোন জীবন্ত আদর্শ নেই। গণতন্ত্রের এমন কোনও উত্তাপ নেই যা মানুষের মনকে জ্বালিয়ে দিতে পারে, যতক্ষণ-না আমরা গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত হই। তোমরা বেড়ে উঠেছ আত্মত্যাগের যুগে নয়, আত্ম-সম্ভোগের যুগে। এখন আমাদের স্লোগান হচ্ছে, জীবন-মান উন্নত ক'র; অর্থাৎ ভোগের সামগ্রী সবাইকে আরও অনেক বেশি ক'রে এনে দাও। গান্ধীজির সব ছিল, তবু তিনি ভিখিরির সাজ গ্রহণ করেছিলেন; আজ আমরা কাউকে ভিখিরি রাখতে রাজী নই। ভেব না, আমি একালের নিন্দে করছি। যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে, তা হবেই। শুধু বলছি, এ যুগে নীতিবোধ বাঁচিয়ে চলা অনেক বেশি কঠিন।"

বাসন্তী দেবী বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন।"

সাবিত্রী আম্মা ব'লে চললেন, "আমরা আদর্শের তাপে বেড়ে উঠেছিলাম ব'লে এ যুগে যেন একেবারে হারিয়ে গেছি। অনেক সমস্যা, দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনেও ছিল, তার বোঝা আমাদের বয়ে বেড়াতে হয়েছে। কিন্তু বার বার সংগ্রামের বন্যা এসে আমাদের জীবনের অনেক জঞ্জাল ধুয়ে দিয়ে গেছে। তবু, দেববাণী, আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই এসে তীরে পৌঁছতে পারি নি। তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, তবুও বলছি, বর্তমান ব্যবস্থায় আমার কিছু করবার ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। রাজনীতি মানেই দলাদলি, ক্ষমতার লড়াই, শক্তি অর্জন করা ও রক্ষা করার জন্যে কুটিল, জটিল সংঘাত। এর মধ্যে যে নিজের স্থান ক'রে নিতে পারে নি, তার ক্ষমতা নেই, সে নিঃসার। দেশ স্বাধীন হবার পর অনেক দিন বাদে আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম, আমার আর কিছু করবার নেই। গত ক'বছর ধ'রে এ অনুভূতি আরও বেশি ক'রে আমায় পেয়ে বসেছে।"

"সে কথা কেন বলছেন?" দেববাণী প্রতিবাদ করল। "আপনি আপনার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে যাচ্ছেন। বহু লোক আপনার দ্বারা উপকৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে।"

"নদীকে, দেববাণী, যদি ছোট্ট চৌবাচ্চায় পরিণত ক'র, দু'চার জনের তৃষ্ণা সে মেটাবে, কিন্তু নিজের কাছে সে তার নিঃশেষিত জীবনের ফাঁকি লুকতে পারবে না।"

বাসন্তী দেবী বললেন, "ফুরিয়ে যেতে সবারই কষ্ট হয়। তবু তা অনিবার্য। আমাদের শাস্ত্রে শেষ হয়ে যাওয়াকে শান্ত হৃদয়ে, উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সে কথাই আমি নিজেকে বলি। চারদিকে জীবনের বিচিত্র বহুবর্ণ ছবি দেখতে পাই। সবচেয়ে যেটা আমার মনকে বিহ্বল করে তা হচ্ছে ভারতবাসীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার দুর্দম প্রয়াস। দেখতে পাই সারা দেশে মানুষ জেগে উঠেছে, জীবনের দাবী বেজে উঠেছে বিরাট্ কলতানে। এর সবটাই সুস্থ, সুশ্রী নয়। অনেক কুৎসিত ক্ষুধা সমাজের গোপন অন্দর থেকে সোজাসুজি চোখের সামনে উঠে এসেছে। আবার এমনও কেউ কেউ আছে, জীবন যাদের কাছে অর্থহীন, যারা কোনও পথের সন্ধান পায় নি। কিন্তু গ্রামে, শহরে, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, ভারতবর্ষ যে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দেখতে পাই আজকালকার মেয়েরা কত নীরব সাহসের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করছে। বড় আনন্দ হয়। ভাবি, আজকার এই দেশব্যাপী উন্মেষের জন্যে আমিও হয়ত একবিন্দু কিছু করতে পেরেছি। দুঃখ, ব্যথা, ব্যর্থতা আমাদের ছিল, তোমাদেরও আছে, মানুষের চিরদিন থাকবে; পূর্ণতার প্রয়াস চিরদিন অপূর্ণতায় নিজের অন্তিম দীনতা আবিষ্কার করবে। কিন্তু তবু পথ-চলারই নাম বেঁচে থাকা, অচল হওয়া মানে মরে যাওয়া। (বাসন্তী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন) উপনিষদে সেই 'চরৈবেতি' শ্লোকগুলির কথা ভাবুন—আদিকাল থেকে মানুষের মূলমন্ত্র, চল, এগিয়ে যাও, লক্ষ্য হ'তে লক্ষ্যান্তরে, এক অপলক সন্ধ্যাতারার আহ্বানে অন্য অনিমেষ নক্ষত্রের পানে।"

বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সাবিত্রী আম্মা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। দেববাণী দেখতে পেল তাঁর ওষ্ঠাধর পাংশু, শুকনো, চোখের নীচে ক্লান্তির কালিমা।

"আপনার শরীরটা ভাল নেই মনে হচ্ছে," সে বলল। "আজ বরং আমরা উঠি।"

"বস, বস," হেসে উঠলেন সাবিত্রী আম্মা। "এ বয়সে শরীর নিয়ে অত মাথা ঘামালে চলে না। বরং একা একা থাকতে হলে আরও খারাপ লাগে।"

বাসন্তী দেবীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "একদিন একপথে আমরা ভারতবর্ষের জন্যে সংগ্রামে নেমেছিলাম আজ অন্য পথে, অন্য দিন দেববাণীরা নেমেছে। ওকে দেখে আমার মনে হয় এ যেন একই নদীর বিচিত্র প্রবাহ। (দেববাণীকে) মনে ক'রো না, আমরা পরাধীন ভারতে রাজনীতি করেছি। দেশকে স্বাধীন করার যে সংগ্রাম তার নাম রাজনীতি নয়। রাজনীতি সুরু হয়েছে দেশ স্বাধীন হবার পর। আজ তাতে সংগ্রাম নেই, আছে কলহ, ঝগড়া, কোলাহল। আজকের সংগ্রাম ভারতবর্ষকে গ'ড়ে তোলবার; তোমাদের জীবনকে নানাভাবে পল্লবিত, প্রস্ফুটিত ক'রে তোলবার। নবাগত, অনাগত নাগরিকদের জন্যে সমৃদ্ধতর জীবন-সম্ভার গ'ড়ে তোলবার। ভারতবর্ষে এক মহান্ নাটকের ওপর যবনিকা উঠেছে, দেববাণী। তাই আজ তোমার মা'র উপস্থিতিতে তোমাকে একটি উপদেশ দি। যদি দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ বোধ কর তা হলে এ নাটকের বিরাট্ মঞ্চে নেমে যাও, এর থেকে দূরে থেক না।"

"আপনি আমাকে দেশে ফিরে আসতে বলছেন?"

"ফিরে আসতে শুধু নয়, কাজে লেগে যেতে।"

"আসতে ত চাইছি। কিন্তু দেখুন না, রিসার্চ সেন্টারের ব্যাপারটা এগোচ্ছে না।"

"ওটা বন্ধ হলেই তোমার সব রাস্তা ফুরিয়ে যাবে না। তবু তুমি ফিরে আসতে পারবে, কাজ করবার সুযোগ পাবে।"

"বাইরে থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক দেশে এসে হতাশ হয়ে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।"

"তাঁরা পালিয়েছেন। এসে দেখতে পেয়েছেন দেশে মাইনে কম, আরামের অভাব, সম্মানের আরও গুরুতর অভাব। তুমিই একদিন বলেছিলে, দেশে এখন কেবল প্রশাসকদের প্রভুত্ব। কেবল রাজনীতির দাপট। সব মানি। এখনও বহু বৈজ্ঞানিক কাজ পাচ্ছে না, যারা পাচ্ছে তাদের কাজের অন্তরে অতৃপ্তি, অসন্তোষ। এ সব মেনে নিলেও আসল কথাটা অনুক্ত থেকে যায়। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের দেশ। তাকে আমরা সবাই যেমনি গড়ব, সে তেমনি তৈরী হবে। সুতরাং পালিয়ে যাবার কোনও মানে হয় না। যারা পালায় তারা হয় ভীরু, নয় স্বার্থপর। তোমরা সবাই দেশে এসে যদি নিজেদের মর্যাদা আদায় ক'রে না নাও তা হলে কেউ তা তোমাদের দেবে না।"

তা হলে ত রাজনীতি করতে হয়", দেববাণী বলল।

"করতে যদি হয় ত করবে", জোর দিয়ে বললেন

সাবিত্রী আম্মা। "বিজ্ঞানের, বিদ্যার মর্যাদা স্থাপনের জন্যে যে-রাজনীতি তাতে কোনও দোষ নেই, দেববাণী।"

"সত্যি কথা বলতে কি, ফিরে আসতে কেমন যেন ভয় করে।"

"অর্থাৎ যে মর্যাদা, অর্থ, কাজের সুযোগ বিদেশে পাচ্ছ, তা যদি দেশে না পাও! তা ত পাবেই না। ওরা অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা মাত্র আরম্ভ করেছি। কিন্তু তৈরী সুযোগ পাওয়ার চেয়ে সুযোগ তৈরী ক'রে নেওয়াতে কি বেশি আনন্দ নেই?"

"আছে, যদি তৈরী ক'রে নেওয়া যায়। সে সুযোগেরও যে অভাব। শুনতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজনীতির অন্ধকারে জ্ঞানের আলো হারাতে বসেছে। একদিকে শিক্ষকরা ক্লান্ত, অপরিচিত; অন্যদিকে ছাত্ররা অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক নেতারা বিদ্যায়তনেও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছেন। দলাদলির মধ্যে ভিড়তে না পারলে ভাল ক'রে পড়াবার সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।"

"হয়ত তাই। সৌভাগ্যক্রমে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। তবু দেখতে পাই, মন্ত্রীদের ডক্টরেট দেবার জন্যে তাদের মধ্যে যেন প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। গলদ অনেক আছে, কিন্তু, দেববাণী, সদিচ্ছা, সম্ভাবনারও অভাব নেই। এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। শিক্ষার সুযোগ ও আয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে। উপযুক্ত মানুষের পক্ষে ভারতবর্ষ এখন বিরাট্ কর্মভূমি। চল্লিশ কোটি মানুষ জেগে উঠেছে, তাদের মনের চাহিদা একবার ভেবে দেখেছ? যেদিকে তাকাও সেদিকে দেখবে করবার কত কিছু আছে, শুধু লোক নেই, সংকল্প নেই, আদর্শের দৃঢ়তা নেই।"

"করবার যে অনেক কিছু আছে তা আমারও মনে হয়েছে।"

"তা হলে লেগে যাও।" একটু থেমে, বড় নিঃশ্বাস নিয়ে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "আরও একটা কথা তোমায় বলি। তোমার জীবনের সমস্যা আমি যা একটু বুঝতে পেরেছি তার সমাধানও ভারতবর্ষেই সম্ভব।"

দেববাণী নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সংসারটা সবার জন্যে শান্তির নীড় নয়, দেববাণী। কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায় আমাদের গোছাল জীবন, কোথা থেকে দম্‌কা হাওয়া এসে সব তচ্-নচ্ ক'রে দেয়। যাদের হয় না, যারা রুটিন-বাঁধা বেঁচে থেকে জীবনের আস্বাদ না পেয়েই মরে যায়, তারা ভাবে সব জীবনই বুঝি তাদের মত রুটিন মেনে চলবে। তারা জানে না, বেঁচে থাকা যেমন দীর্ঘ, জীবনের মাদক আস্বাদ তেমনি ক্ষণিক। আমার এই দীর্ঘ বেঁচে-থাকায় জীবনের আস্বাদ যে ক'বার পেয়েছি আজও পরিষ্কার মনে আছে। সেই যেদিন অ্যানি বেসান্তের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদে নতুন ক'রে বাঁচবার সুযোগ পেলাম, সেদিন জীবনের প্রথম উন্মাদনা টের পেলাম। আর একদিন মাদুরাই শহরে গান্ধীজির পায়ে প্রণাম করবার সময় জীবনকে নতুন ক'রে পেয়েছিলাম। স্বদেশী ক'রে প্রথম জেলে যাবার দিন জীবন বড় আলোক-উজ্জ্বল মনে হয়েছিল। তাই ভাবি, তিলে তিলে বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু জীবন উপলব্ধি করা যায় না। সে সুযোগ কদাচ কখনও আসে। এলে তাকে ফেরান উচিত নয়। কি বল তুমি?"

"আপনি বলুন, আমি শুনছি।"

"অনেক ত বললাম; আর কি বলব। ভারতবর্ষের একটা মহান্ গুণ হ'ল সে সব কিছুকে গ্রহণ করে, বিভিন্ন বিরোধে সমন্বয় আনবার চেষ্টা করে। তাই বলছিলাম, দ্বন্দ্ব মেটাবার মত পরিবেশ এদেশে যেমন, অন্যত্র বোধ করি কোথাও তেমন নেই। তোমার অন্তরে যে দ্বন্দ্ব তাও ভারতবর্ষেই মিটতে পারে। তবে একটা কথা মনে রেখ। জীবন আমাদের সঙ্গে সর্বদাই একটু ছলনা করে। আমরা যা হতে চাই কেউ তা হতে পারি নে। তার চেয়ে অন্য রকম, ছোট বা বড় হয়ে যাই। তুমি আদর্শের পেছনে সারা জীবন ঘুরে ঘুরে অন্তিম সায়াহ্নে দেখতে পাবে, যা পেলে তার জন্যে এত ঘোরাঘুরির দরকার ছিল না। যে প্রেম না পেয়ে তুমি অস্থির, তা পেয়ে মনে হবে কোথাও বুঝি একটু ঠকে গেলে। যে ব্যথা এড়াবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কর, সে ব্যথা যদি পেতেই হয় ত দেখবে এমন অসহ্য তা নয়। বাস্তবকে কল্পনার রসে মজিয়ে আমরা অনেক বড় ক'রে ভাবনার রাজ্য গ'ড়ে তুলি। তুমিও যে সমস্যার কথা ভাবছ তার অনেকখানি হয়ত তোমার ভাব-বিলাস। বাস্তবে যদি তাকে পরিপূর্ণ উপস্থিত না দেখ, বোধ করি তুমি দুঃখই পাবে, কেননা তোমার ভাবনা-বিলাসে বাধা পড়বে।"

হঠাৎ সাবিত্রী আম্মা সতর্ক হয়ে কান পাতলেন। দরজা খুলে হাই হিলের শব্দ তুলে সরোজা নিজের আগমন ঘোষণা করল। একটু পরে দ্বারপথে এসে সে দাঁড়াল।

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সরোজা, ইনি দেববাণীর মা।"

দেববাণীকে লক্ষ্য ক'রে বলল, "খবরটা ঠিক কি না যাচাই করেছেন ?"

"দরকার আছে কি ?" দেববাণী হেসে প্রশ্ন করল।

"তা আপনি বুঝবেন।"

"ও জমি না পেলে রিসার্চ সেণ্টার হবে না, একথা তুমি ভাবলে কি ক'রে ?"

"এমনি ভাবলাম।"

"অন্য জমি নেই ?"

"সে জন্যে আপনাকে বছরখানেক দিল্লী শহরে অবস্থান করতে হবে।"

"তাই না হয় করব। আমি ত ভাবছি চাকরি নিয়ে দিল্লী চলে আসব। যতদিন না ইনষ্টিটিউট গ'ড়ে ওঠে ততদিন নড়ব না।"

"বিদেশে বড় চাকরি করছেন তাই দেশে এসে খাতির পাচ্ছেন। দেশে ফিরে আসুন, দেখবেন মানুষের দাম কি সস্তা। শ্রীবাস্তব সাহিব পাঁচ ঘণ্টা বাইরে দাঁড় করিয়ে পিয়ন দিয়ে বলে পাঠাবেন, আজ দেখা হবে না।"

তার কথা বলার ধরনে দেববাণী হেসে উঠল।

বলল, "পাঁচ ঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার লোক আমি নই।"

সরোজা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মাকে বলল, "তোমাকে না ডাক্তার চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলেছেন ? খুব বুঝি কথা বলছ ?"

সাবিত্রী আম্মা জবাব দিলেন না।

সরোজা বলে উঠল, "যাদের আর কিছু করবার নেই তারাই নিজের কথা বলবার লোভ সামলাতে পারে না। শূন্য কলস বড় বেশি বাজে। তোমার কাছে কাল থেকে ভিজিটর্স বারণ।"

কারুর পানে না তাকিয়ে সে দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলে গেল।

সাবিত্রী আম্মাকে বিবর্ণ বিব্রত দেখে দেববাণী বলল, "আপনাকে বড় ভালবাসে সরোজা।"

"ওকে নিয়ে—"

তাঁকে থামিয়ে দেববাণী বলল, "ওর মনে গলদ নেই। কিন্তু সত্যি আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে। আপনি যে অসুস্থ তা ত বলেন নি।"

"ও কিছু নয়। প্রেশারটা কিছুদিন থেকেই বেশি যাচ্ছে।"

"তা হলে আপনার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।"

"বিশ্রামেই ত আছি।"

"আজ আমরা আসি।"

বাসন্তী দেবী উঠে দাঁড়ালে, সাবিত্রী আম্মা দাঁড়িয়ে তাঁর হাত নিজের হাতে নিলেন। হেসে বললেন, "আর একদিন আসবেন। আজ ত আমিই কেবল বললাম। আর একদিন আপনার কথা শুনব।"

যাবার সময় দেববাণীকে বললেন, "ডাঃ বসু এলে একদিন নিয়ে এস।"

"আসব", কথা দিল দেববাণী। "নিশ্চয় আসব।"

## চোদ্দ

পরের দিন সকালে সংবাদপত্র খুলে প্রথম পৃষ্ঠার দক্ষিণ প্রান্তে দেববাণী দেখতে পেল পার্লামেণ্টের সদস্য সাবিত্রী আম্মা মধ্যরাত্রে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সরকারী নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সেদিন ছিল বুধবার। শুক্রবার অপরাহ্নে সাবিত্রী আম্মার মৃত্যু হ'ল।

## পনর

দুটো দিন বড় ব্যস্ত ছিল দেববাণী। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করছেন, তার প্রুফ দেখতে হ'ল; মাদ্রাজে আসন্ন বক্তৃতার খসড়া তৈরির কাজও সে আরম্ভ ক'রে দিল। হিমাদ্রির কেবল্ এসে গেল, সে আসছে, জেনিভায় নেমে খোকনকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করবে। ওরা এলে বাসস্থানের পরিবর্তন দরকার, তাই দেববাণী কাছাকাছি একটা ছোট ফ্ল্যাটের খোঁজ সুরু করল। হিমাদ্রির জন্য ভাবনা নেই, দিল্লীতে তার জানা-চেনা অনেকে আছে, তা ছাড়া হোটেল ত আছেই। মা, দেবকুমার ও দেববাণী, তিনজনের জন্যে দু'খানা ঘর অবশ্য দরকার; তা ছাড়া, শিহরিত দেববাণী ভাবল, হিমাদ্রিও অনেকটা সময় নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে কাটাবে, একটু নির্জনতা চাই।

সংবাদপত্রে সাবিত্রী আম্মার হৃদরোগের খবর প'ড়ে দেববাণী ফোন করেছিল, জবাব পায় নি। বিকেলে সে নার্সিং হোমে গিয়ে খবর করল। সাবিত্রী আম্মার ঘরের বাইরে অনুচিত ভিড় জমে আছে, দেখে দেববাণী রীতিমত বিস্মিত হ'ল। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগীকে একেবারে নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশে রাখা দরকার। সে দেখল, জনকুড়ি লোক বারান্দায় জড়ো হ'য়ে নানা বিষয়ে সরব আলোচনার পীড়াদায়ক ঐকতান তুলেছে। ভিড় বাড়াবার ইচ্ছে হ'ল না দেববাণীর। সাবিত্রী আম্মার ঘরের দরজার কাছে দু'চার মিনিট সে দাঁড়াল, কি করবে

ভেবে না পেয়ে, তিনি কেমন আছেন জানবার আশায়। দেখল, ঘরের মধ্যেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লোক। তাকে দরজায় দেখে একজন নার্স এগিয়ে এসে বলল, ভেতরে আসার চেষ্টা যেন সে না করে, তাতে রোগীর অসুবিধা হবে।

দেববাণী আস্তে বলল, "ভেতরে আমি যাচ্ছি না। উনি কেমন আছেন?"

"কিছু বলা যায় না এখনও।"

"ওঁর মেয়ে সরোজা আছে এখানে?"

"আছে।"

"তাকে একটু ডেকে দিন। বলুন, দেববাণী ডাকছে।"

একটু পরে সরোজা বাইরে এল। তাকে হঠাৎ দেখে বড় ভাল লাগল দেববাণীর। অনিদ্রায় তার মুখ ম্লান, চোখ ক্লান্ত; গৌরবর্ণ দিনের শেষ আলোর মত কোমল।

সরোজার মুখেচোখের উগ্রতা আজ যেন তাকে না বলেই ছুটি নিয়েছে।

তাকে মনে হচ্ছে শান্ত ক্লান্ত চিন্তিত একটি দক্ষিণী তরুণী।

দেববাণীকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল সরোজা।

সরোজা কাছে আসতে দেববাণী তার হাত ধরল। হাত ছাড়িয়ে নিল না সরোজা।

"আমি আজ কাগজে দেখলাম। বড় দুঃখের কথা। কখন অসুস্থ হলেন?"

"রাত্র একটার পর।"

"কাল সন্ধ্যায় অত কথা বলা ঠিক হয় নি। আমি একেবারে বুঝতে পারি নি।"

সরোজা কিছু বলল না।

"এখন কেমন?"

"ভাল নয়।"

"ডাক্তাররা কি বলেন?"

"একটা বড় ও একটা ছোট এ্যাটাক হয়ে গেছে। এবার যদি বড় এ্যাটাক হয় তাহ'লে বিপদ্।"

"তোমার বাবা এসেছেন?"

"আজ রাত্রে আসছেন বোধ হয়।"

"এত ভিড় কেন?"

"আমার মা একজন বিখ্যাত মহিলা, তাই।"

"ভিড় জমতে দেওয়া উচিত নয়। এরা ত আলাপ-আলোচনার আসর খুলে বসেছে।"

"এঁরা বেশির ভাগ হয় পার্লামেণ্টের মেম্বর, নয় রাজনৈতিক সহকর্মী।"

"ওঁদের চলে যেতে বলা যায় না?"

"মাকে ডাক্তাররা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। জেগে থাকলে তিনিও চাইতেন, এঁরা থাকুন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত থাকুন।" তীক্ষ্ণ ধারাল হাসি ফুটে উঠল সরোজার ওষ্ঠাধরে।

একটু ইতস্তত: করে দেববাণী বলল, "তুমি ছুটি নিয়েছ?"

সরোজা বড় বড় চোখে সোজা তাকাল দেববাণীর দিকে।

বলল, "ছুটি না নিয়েই কামাই করছি।"

পরের দিন দেববাণী মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। যথেষ্ট সৌজন্যের সঙ্গে তিনি তাকে গ্রহণ করলেন। কথাবার্তায় কিন্তু দেববাণী খুব খুশী হ'ল না। পরিষ্কার ভাষায় মন্ত্রী কিছু বললেন না, তথাপি দেববাণী বুঝল বিদেশী সাহায্যের প্রস্তাবে সরকারী সম্মতি অনিশ্চিত। মন্ত্রী-মহাশয় দেববাণীকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণা সম্প্রসারণের জন্যে সরকারী উদ্যোগ যে ব্যাপক হয়ে উঠছে সে কথাটা বার বার বললেন। দশ-বারটি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। উচ্চতর টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্যে কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউট দু'টি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দু'টি আরও হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারে বিদেশী সহযোগিতা দরকার, তা গ্রহণে সরকারের আপত্তি ত নেইই, বরং আগ্রহ আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিদেশী সাহায্য সরকারের পক্ষেই গ্রহণ করা সুবিবেচনার কাজ। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশী সাহায্য নিয়ে গঠনে নীতিমূলক আপত্তি নেই; কিন্তু প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে সত্যিই তার প্রয়োজন আছে কি না। দেশের বিত্ত অপ্রচুর, তার অপচয় যেমন অবাঞ্ছনীয়, একই উদ্যোগের প্রতিলিপি তেমনি পরিহার্য। তাছাড়া, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাইরে কোনও বড় কিছু হঠাৎ করতে যাওয়া সব সময় সহজ হয়ে ওঠে না।

দেববাণী বুঝল রিসার্চ সেণ্টারের ব্যাপারটি বেশ শক্ত ক'রে আটকা প'ড়ে গেছে। দু'চারটে প্রশ্ন ক'রে সঠিক কোথায় বাধা দেখা দিয়েছে জানবার চেষ্টা করল দেববাণী। সুবিধে করতে পারল না।

মন্ত্রীমহাশয় সাগ্রহে দেববাণীর নিজস্ব কাজকর্মের খবর নিলেন। দেববাণী দেখল, বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ প্রচুর, সাধারণ জ্ঞান

প্রশংসার যোগ্য। পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলিতে বড় বড় কাজকর্মের খোঁজখবরও তিনি বেশ রাখেন।

দেববাণীর কর্মজীবনের কিছুটা পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন, "আপনি কি দেশে ফিরে আসতে চান?"

দেববাণী সবিনয়ে উত্তর দিল, "আমাদের ইনষ্টিটিউট তৈরি হ'লে আসতেই হবে।"

"না হ'লে আসবার ইচ্ছে নেই?"

"ঠিক বলতে পারি নে।"

"যদি আসতে তৈরি থাকেন, দেশে ভাল কাজকর্মের সুযোগ সম্ভবতঃ আপনাকে ক'রে দেওয়া যায়।"

ধন্যবাদ জানিয়ে দেববাণী জানতে চাইল, কি ধরণের সুযোগ পাওয়া সম্ভব।

মন্ত্রীমহাশয় সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষে নতুন-তৈরি বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সুযোগ উল্লেখ করলেন।

"যদি কিছু না মনে করেন, আমি দু'একটা স্পষ্ট খবর পেতে চাই।"

"কি রকম খবর?"

"আমি দেশে এলে সন্তোষজনক কাজের ব্যবস্থা আপনি ক'রে দিতে পারবেন?"

"তা নির্ভর করবে, প্রথমত, সন্তোজনক বলতে আপনি কি বোঝেন, ও দ্বিতীয়ত, যখন আপনি আসবেন তখন আমাদের হাতে কি থাকে না থাকে, তার ওপর।"

দেববাণী চুপ ক'রে গেল।

তিনি বললেন, "এমনি ক'রে ত কাজ হয় না! আপনি যদি দেশে কাজ করতে চান, আমাদের লিখুন, কি ধরণের কাজ আপনি চান, আমরা ক্ষেত্রবিশেষে আপনার জন্যে কাজের ব্যবস্থা করেও দিতে পারব।"

একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, "কত টাকা মাইনে হলে আপনার চলবে?"

"এখনও ভেবে দেখি নি", উত্তর দিল দেববাণী। "পরে জানাতে পারি।"

"তাই করবেন।"

আপাততঃ, রিসার্চ সেন্টার প্রস্তাবটা আপনি অনুমোদন করছেন না, মনে হচ্ছে।" দেববাণী মরিয়া হ'য়ে বলল।

"তা ত বলি নি," তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। "শুধু বলেছি, এ ব্যাপারটা চট্ ক'রে হবার নয়। আপনি চাইছেন দু'তিন সপ্তাহে আমরা 'হ্যাঁ' বলি। সেটা বড় শক্ত কাজ হবে মনে হচ্ছে। সব দিক্ ভেবেচিন্তে আমরা হয়ত অনুমোদন করতেও পারি। কিন্তু একটু সময় নেবে।"

অসন্তুষ্ট মন নিয়ে দেববাণী ফিরে এল বাসায় বিকেল বেলা। যা হবার নয় তার পেছনে পণ্ডশ্রমের কোনও মানে নেই। আমার ছুটি শেষ হয়ে আসছে। হিমাদ্রিও এ নিয়ে তদ্বিরের জন্যে অনিশ্চিত কাল দেশে ব'সে থাকতে পারবে না। সুতরাং এ যাত্রা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট তৈরি করার সঙ্কল্প এখানে সমাপ্ত মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতে নতুন সুযোগ হয়ত আসবে, হয়ত আসবে না। দেববাণী ভেবে যুগপৎ বিরক্ত ও বিস্মিত হ'ল যে, দেশে সবাই তাকে 'চাকরি' করবার জন্যে ডাকছে, নিজের উদ্যোগে বড় কিছু করার উৎসাহ দিচ্ছে না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সাবিত্রী আম্মা; তাঁর কাছে দেববাণী সত্যিকারের উৎসাহ পেয়েছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক নন। বিধি-নিষেধ বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে জীবনপথে নিজে এগিয়েছিলেন ব'লে তাঁর বার্ধক্য-শান্ত রক্ত এখনও অ্যাডভেঞ্চারের নামে মেতে ওঠে। সাবিত্রী আম্মার কথা মনে পড়তে দেববাণীর মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। মাত্র একদিন আগে দেখা তাঁর শ্রান্ত-স্মিত মুখখানা, তাঁর আন্তরিকতায় আবেদন-মুখর কথাগুলি বার বার মনে পড়তে লাগল। সত্যিই কি সাবিত্রী আম্মা ও দেববাণী একই নদীর বিভিন্ন ধারা? যে জীবন-সংগ্রাম ওঁরা আরম্ভ করেছিলেন, সত্যিই কি আমরা তাকেই পূর্ণতর বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দেশে এসে কাজে লেগে যাবার উপদেশ দেববাণীর কানে বার বার বেজে উঠল। সত্যিই কি আমার, আমাদের সবাকার আসল কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ? "বিদেশে তুমি টাকা পাবে, কাজ পাবে, স্বীকৃতিও হয়ত জোর ক'রে আদায় করতে পারবে, কিন্তু নিজের ব'লে কিছু খুঁজে পাবে না। ওরা আমাদের শ্রদ্ধা করে না দেববাণী, এমন কি গালিও দেয় না। ওরা চায় আমাদের উপেক্ষা করতে, দয়া করতে।" কথাগুলি দেববাণী সত্যি ব'লে মানতে পারল না, আবার একেবারে মিথ্যে ব'লে উড়িয়েও দিতে পারল না। মনে পড়ল সাবিত্রী আম্মার দৃঢ়বিশ্বাস কথা, "ভারতবর্ষে তোমার জীবনের দ্বন্দ্ব কেটে যাবে।" পশ্চিমে অমিলের অন্ত নেই, সে অনায়াস স্বীকৃতি পায়, তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ব্যক্তির স্বাধীনতা এত বেশি স্বীকৃত যে, তার মাধুর্যটুকু কেমন যেন শুকিয়ে যায়। ভারতবর্ষে অমিলকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা আছে, যতক্ষণ সে মিলছে না ততক্ষণ যেন আমাদের মনে শান্তি নেই। আমার জীবনের অমিল কি দেশে এলে মিলবে? সাবিত্রী

আমার জীবনের অমিল কি কোনও দিন মিলেছিল? সেই অমিলের মূর্তিমতী অবদান সরোজা। সে কি কোনও দিন কোনও কিছুর সঙ্গে মিলে যাবে?

'দেববাণী বাড়ী ফিরে দেখল, বাসন্তী দেবী চিঠি লিখছেন। দু'চারটে কথা হ'ল। বাসন্তী দেবী জানতে চাইলেন মন্ত্রীমশাই কি বললেন। দেববাণী বলল, আশাপ্রদ কিছু নয়। মা জানতে চাইলেন, আর কি কি ক'রে এল মেয়ে সারাদিন। দেববাণী সংক্ষেপে উত্তর দিল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে বলঘরে ঢুকল। বাসন্তী দেবী বললেন, "চট্‌পট্ হাতমুখ ধুয়ে আয়। চা করছি।"

চা খাবার পর দেববাণী মাদ্রাজে বক্তৃতার খসড়া নিয়ে বসল।

ঘণ্টাখানেক পর এসে উপস্থিত হ'ল লিওনার্ড হোপ।

আজ হোপকে পেয়ে দেববাণীর ভালই লাগল। মনটা হালকা কথা বলার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। দেববাণী দেখল, আরও একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। দিগন্ত-বিস্তৃত রাজপথ দিয়ে আশি মাইল বা একশ' মাইল গতিতে গাড়ী চলবে, আর দেববাণীর মন থেকে জটিল-গ্রন্থি চিন্তা সব যাবে হাওয়ার সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে।

লিওনার্ড হোপকে দেববাণী মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সে জোড় হাতে ভারতীয় কায়দায় নমস্কার করল। বাসন্তী দেবী শোবার ঘরে চলে গেলেন। ওরা বারান্দায় বসল।

"আপনি বড্ড ব্যস্ত আছেন।" লিওনার্ড বলল, "দু'বার খোঁজ ক'রে দেখা পাই নি।"

"সেজন্যে বড় দুঃখিত। আপনি খোঁজ করেছিলেন, খবর পেয়েছি। ব্যস্ত আর কৈ? অকাজে ঘোরাঘুরি।"

"শুনলাম, রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্ল্যানটা অনেকখানি এগিয়েছে।"

"কোন্ আশাবাদী আপনাকে খবর দিল? প্ল্যান ত সমাপ্ত। কিন্তু কাগজে-কলমে। বাস্তবে রূপায়িত হবার আশা কম।"

"আমি এরকম কিছু আগেই আন্দাজ করেছিলাম। আপনি দুঃখ পাবেন ভেবে বলি নি।"

"যাক গে ওসব কথা। এ নিয়ে আর কথাবার্তা ভাল লাগে না। শুনেছিলাম, আপনি দেশে যাচ্ছেন। তার কি হ'ল?"

"শীতটা কাটুক। শীতের দিল্লী পৃথিবীর সবচেয়ে মনোরম শহর।"

"আইরীন বলছিল আপনি কোনও ভারতীয় মেয়েকে ভালবাসেন। যদি ধৃষ্টতা মাপ করেন, মেয়েটি কে জিজ্ঞেস করতে পারি?"

লিওনার্ড হঠাৎ কেমন বিব্রত হয়ে উঠল। "না ত," সে বলল, "এমন কিছু ত আইরীনকে আমি বলি নি। ও নিশ্চয় বানিয়ে বলেছে।"

"কিছু নিশ্চয় বলেছেন। সবটা ত আর বানাতে পারে নি আইরীন!"

"আমি শুধু বলেছিলাম, এ দেশের মেয়েদের আমার ভাল লাগে।"

"তাই নাকি! এ ত মস্ত সুখবর। এ দেশের কোন্ মেয়েদের আপনার ভাল লাগে, মিঃ হোপ?"

"তার মানে?"

"কেবল ভারতীয় মেয়ে বললে ত কিছু বোঝায় না! ভারতবর্ষে অনেক ধরণের মেয়ে আছে। পাঞ্জাবী মেয়ে আর বাঙ্গালী মেয়ে কি এক? আবার দক্ষিণ ভারতের মেয়েরা আলাদা। মারাঠি মেয়ে ও গুজরাটি মেয়েতে প্রভেদ অনেক। রাজস্থানী মেয়ে আর আসামের খাসিয়া মেয়ে যেন দু' দেশের কন্যা। তা ছাড়া, ভারতে সাবেকী মেয়ে আছে, অল্প-আধুনিক, অতি-আধুনিক মেয়েও আছে। স্ল্যাক্‌স্ প'রে পুরুষের মত চুল ছেঁটে বয়-ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে হল্লা-করা মেয়েও আছে, আবার শান্ত, নরম, লাজুক, শ্যামলা মেয়েরও অভাব নেই। এদের কাকে আপনার ভাল লাগে?"

লিওনার্ড হোপ অত ভেবে দেখে নি। গম্ভীর হয়ে ভেবে বলল, "আপনি যে প্রাদেশিক প্রভেদের তালিকা দিলেন, আমাদের মত সাময়িক অতিথির চোখে তা ধরা পড়বার কথা নয়। সাধারণতঃ আমরা আধুনিক ভারতীয় মেয়েদের সংস্পর্শে আসি।"

"এবং নিশ্চয় দেখে আশ্চর্য হন যে, তারা সবদিক্ থেকে সম্পূর্ণ আধুনিক।"

"কেউ কেউ খুব মডার্ণ আউটলুক দেখিয়ে থাকেন। আমার নিজের অবশ্য অতটা ভাল লাগে না। আমি লোকটা সিরীয়স ব'লে জীবনকে গাম্ভীর্য ও দায়িত্ব-শীলতার সঙ্গে গ্রহণ করে এমন মেয়ে পছন্দ করি।"

"সে রকম মেয়ে আপনার দেশে অনেক আছে।"

"নেই তা ত বলি নি। তবু ওরিয়েণ্টাল মেয়েদের মধ্যে কেমন একটা শান্ত স্থিরতা আছে যা আমাদের সমাজ থেকে বড় তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছে। সেজন্যই বোধ করি হাজার হাজার আমেরিকান জাপানী মেয়ে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেছে।"

"আমাদের সৌভাগ্য, মিষ্টার হোপ, আপনারা যে

দলে দলে এখনও ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করতে সুরু করেন নি।"

দেববাণী লঘু হাসির সঙ্গে কথাটা বলল। কিন্তু লিওনার্ড একটু আঘাত পেল।

"সৌভাগ্য কেন বলছেন?"

"মার্কিন জামাই পেয়ে আমাদের বাবা-মা'রা বিপদে পড়তেন। এদেশে জামাই-আদর ব'লে একটা সাবেকী ব্যাপার আছে।"

"অনেক ভারতীয় মেয়ে কিন্তু আজকাল বিদেশী বিবাহ করছে।"

"অনেক নয়, কেউ কেউ।"

"আপনি ত বহুদিন আমাদের দেশে ছিলেন। মার্কিন পুরুষদের আপনার ভাল লাগে নি?"

"কেন লাগবে না?"

"কারুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয় নি?"

"নিশ্চয় হয়েছে।"

"না, না। সাধারণ বন্ধুত্বের কথা বলছি না।"

"আপনি কি জানতে চাইছেন কোনও আমেরিকান পুরুষের সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে কি না?"

"হয়েছে?"

"স্পষ্ট ক'রে বলছেন না কেন? না, মিঃ হোপ, সে সৌভাগ্য হয় নি।"

"আশ্চর্য্য!"

"কেন? আশ্চর্য্য হবার কি আছে?"

"মার্কিন চরিত্রে একটা দৃঢ়-ভিৎ আদর্শবাদ আছে। আমরা যাকে বলে বিদগ্ধ তা নই। সিনিসিজম্ আমাদের মধ্যে খুব কম দেখতে পাবেন। আমরা সব কিছুর মধ্যে নীতি খুঁজে বার করি। সে জন্যে পৃথিবীর চোখে আমরা ছেলেমানুষ, অপক্ক। আপনার মত মেয়ের অনেক আমেরিকান যুবকদের কাছে সহজে শ্রদ্ধা পাওয়া উচিত।"

"কিন্তু আপনি ত জানেন, শ্রদ্ধা ও আধুনিক প্রেম এক নয়।"

"শ্রদ্ধা না হলে প্রেম গভীর হয় না।"

"বড্ড অ-মার্কিন কথা বলছেন আপনি।"

"একটু প্রভিন্সিয়াল শোনাচ্ছে বোধ হয়। কিন্তু আমি এ বিশ্বাস নিয়েই বড় হয়েছি। আমার বাবা পাদ্রী ছিলেন। শুধু তাই নয়, খুব গোঁড়া নীতি-বোধ ছিল তাঁর। আমার মা স্যালভেশন আর্মিতে কাজ ক'রে মেজর হয়েছিলেন। আমার একটি বড় বোন আছে। সে চীনে বহু বছর কাটিয়েছে মিশনারী কাজে। এখন আছে থাইল্যাণ্ডের এক গ্রামে, কুষ্ঠরোগীদের জন্যে হাসপাতাল চালাচ্ছে।"

"শুধু আপনি অধার্মিক কাজ করছেন দেখতে পাচ্ছি।"

"আমি যে পাদ্রী হলাম না তার জন্যে দায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ছাত্রজীবন শেষ না হতে আমাকে যুদ্ধে নামতে হ'ল। আমার প্রথম পোষ্টিং হ'ল ইংলণ্ডে। বছরখানেকের মধ্যে আমাকে এমন কাজে লাগান হ'ল যার সঙ্গে রাজনীতি ও কূটনীতির সম্বন্ধ খুব বেশি। গোপনে আমি ফ্রান্সে চ'লে এলাম। আমার কাজ হ'ল ফরাসী পার্টিজানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। যুদ্ধ শেষ হলে আমাকে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট চাকরি দিতে চাইল, আমি রাজী হয়ে গেলাম।"

"ভারতবর্ষে ক'দিন আছেন?"

"আড়াই বছর।"

"কেমন লাগছে?"

"ভাল এবং মন্দ।"

"আপনাদের দেশেও আমার তাই লাগে

প্রথম প্রথম আমার বেশ খারাপ লাগত। আজকাল বেশ ভালই লাগে।"

"আমার ঠিক উল্টো। প্রথম প্রথম বরং ভাল লাগত। এখন আর তেমন ভাল লাগে না।"

"কেন বলুন ত!"

"আমি গিয়েছিলাম পড়তে, শিখতে। প্রথম বছরগুলি পড়াশোনায় কাজকর্মে বেশ কেটেছিল। অন্য কিছু ভাববার, বুঝবার, দেখবার, শোনবার সময় ছিল না আমার। য়ুনিভারসিটিতে, লেবরেটরীতে বেশির ভাগ লোকের সহৃদয় সাহায্য আমি পেয়েছি, মন সর্বদা কৃতজ্ঞতায় ভরা থাকত। কাজের স্বীকৃতি যা পেয়েছি তাই মনে হ'ত অনেক। এমনি ক'রে বহুদিন কেটে গেল। আপনাদের দেশের সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চার বাইরে আমার বিশেষ পরিচয় পর্য্যন্ত হ'ল না। এ পরিচয় সুরু হ'ল যখন চাকরিতে ঢুকলাম। সব কথা ব'লে কাজ নেই, কিন্তু এটুকু বুঝতে বাকী রইল না যে, আপনারা আমাদের সাহায্য করতে, অনুগ্রহ করতে যতটা আগ্রহী, সমান ভাবে গ্রহণ করতে ততটা নন। চাকরিতে ঢুকে আপনাদের দেশ, সমাজ, জীবনযাত্রার দিকে ভাল ক'রে তাকাবার সুযোগ ও সময় আমি যেন প্রথম পেলাম। যা দেখলাম, তাতে আমার মন খুশী হ'তে পারল না।"

লিওনার্ড হোপের মুখে কালো ছায়া নেমে আসতে দেখে দেববাণী বলল, "হয়ত এই নিয়ম। আমাদের দেশেই ধরুন না কেন। 'ছোট' জাতের লোকেদের মঙ্গল,

উপকার, উন্নতি আমরা অবশ্য চাই; সে জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করি নে। কিন্তু ওরা আমাদের সমান হয়ে দাঁড়ালে, আমাদের চেয়েও বড় হ'তে চাইলে আমরা আর উদার থাকতে পারি নে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাই। পশ্চিমের মানুষরা অন্য মানুষের চেয়ে এত আগে, এত বেশি এগিয়ে গেছে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তারা এত দৃঢ়-সচেতন যে, উদার ভাবে পৃথিবীর বাকী লোকেদের উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে তারা অনেকটা প্রস্তুত, কিন্তু তাদের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গ্রহণ করতে সহজে মন ওঠে না। আপনারা নিজেদের বড় বেশি নির্ভুল মনে করেন; অন্য দেশের স্বার্থ ও চিন্তাধারা যে আলাদা হতে পারে, মানতে চান না। এক কথায়—কিছু মনে করবেন না—আপনারা শুধু একটা দেশকে শ্রদ্ধা করেন। তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।"

লিওনার্ড বলল, "যা বললেন তার কিছুটা নিশ্চয় ঠিক। এ কথা অনেক দেশে, অনেকের মুখে আমরা শুনে থাকি।"

"তবু যে আপনারা এর পুরো সত্য মানতে চান না, তাতে প্রমাণ হয় কত গভীর আপনাদের আত্মপ্রেম।"

"আত্ম-সন্দেহ থেকে এক-একটা জাতির আত্ম-বিনাশ ঘটে থাকে। য়ুরোপে যা হচ্ছে। নিজের ওপরে বিশ্বাস হারাবার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের পতন আরম্ভ হয়েছিল। আজ য়ুরোপে কোনও আদর্শবাদ নেই। কোনও বড় কিছুর জন্যে য়ুরোপ বেঁচে থাকছে না। আমার মনে হয় আত্ম-সন্দেহের চেয়ে আত্ম-প্রেম অনেক ভাল।"

"কিন্তু, মিঃ হোপ, আত্মপ্রেমী লোকেরা নাকি অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে না।"

"ভুল।"

"ভুল কেন?"

"আমাকে আপনি আত্মপ্রেমী মনে করেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় মনের মত কাউকে পেলে ভালবাসতে পারি।"

লিওনার্ড হোপের মুখখানা রঙিন হয়ে উঠতে দেখে দেববাণী প্রশ্ন করল, "মনের মত কাউকে নিশ্চয় খুঁজে পেয়েছেন?"

"তেমন কাউকে পাই নি। আমি বড় সহজে খুশি হই নে। খুঁতখুঁতে নই, কিন্তু স্বল্পে সন্তুষ্ট নই।"

"আপনাকে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। খুব অসাধারণ মেয়ে।"

"ভারতীয় না বিদেশী?"

"শুধু ভারতীয় নয়, দক্ষিণ-ভারতীয়।"

"শুনেছি ওরা অত্যন্ত রক্ষণশীল।"

"যার কথা বলছি সে নয়।"

"খুব আধুনিক?"

"যে-অর্থে এ শব্দটি প্রচলিত, সে-অর্থে নয়।"

"সুন্দরী?"

"খুব।"

হঠাৎ লিওনার্ড উঠে দাঁড়াল। বলল, "চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।"

দেববাণী সহজে রাজী হ'ল। মা-কে ব'লে চটপট তৈরী হয়ে নিল। যাবার সময় বাসন্তী দেবী মনে করিয়ে দিলেন, "সাবিত্রী আমার খোঁজ নিয়ে আসিস।"

দেববাণী বলল, "আসব।"

গাড়ীতে ব'সে দেববাণী বলল, "পালামের রাস্তায় চলুন। আমার ইচ্ছে করছে খুব বেগে গাড়ী চালাতে।"

"আপনি চালাবেন," উঠবার ভঙ্গিতে লিওনার্ড প্রশ্ন করল।

"না। আপনিই চালান।"

নিজামুদ্দিন থেকে মথুরা রোড দিয়ে গাড়ী বেরিয়ে রিং রোডে পড়ল। স্পীডোমিটারে তখন পঞ্চাশ উঠেছে। রিং রোড দিয়ে উধাও হ'য়ে মতিবাগ পেরিয়ে গাড়ী ধওলা-কুঁয়ায় পাক খেয়ে পালামের রাস্তা ধরল। লিওনার্ড এবার সত্তর মাইলে উঠল।

দু'দিকে সবুজ মাঠ, লোকালয়, গাছ-পালা, পথের সব উন্মত্ত হাওয়ার বেহিসাবী বেগের সঙ্গে মিলে মিশে খিচুড়ি হয়ে গেছে। চোখের নিমেষে উধাও রাস্তার সঙ্গে বার বার নেমে আসা আকাশ কেমন এক চক্রাকারে ঘুরতে লেগেছে। গাড়ীর গতি এখন আশি মাইল। শীতের প্রকোপ আর নেই, তবু হাওয়া ঠাণ্ডা। দেববাণী দরজার কাচ খুলে দিয়ে সে দুরন্ত ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনের গ্লানি উড়িয়ে দিতে চাইল। ভীষণ বেগের মধ্যে খুঁজল এমন কিছু উত্তেজনা যা মন্দগতি জীবনে দুষ্প্রাপ্য।

পালাম ছাড়িয়ে রাস্তা সোজা চলে গেছে পঞ্জাবের গুরগাঁও শহরে। লিওনার্ড এক সময় বলল, "আরও স্পীড বাড়াব?"

"দেখবেন যেন অ্যাক্সিডেন্ট করবেন না।"

"তা হলে এই থাক।"

ফিরবার পথে লিওনার্ড গাড়ী আস্তে চালিয়ে আনল। পালাম ছাড়িয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে আসবার সময় সে দেববাণীকে প্রশ্ন করল:

"ডক্টর রায়, আপনাকে আমি নাম ধ'রে ডাকতে পারি?"

"নিশ্চয়।"

"তা হ'লে আপনিও আমায় লিওনার্ড বলবেন।"

"বেশ ত।"

একটু পরে লিওনার্ড আবার জিজ্ঞেস করল, "বাণী, তুমি কাউকে ভালবাস, না?"

দেববাণী হেসে বলল, "এ কথা কেন?"

লিওনার্ড বলল, "তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি বড্ড সুস্থির, সুশান্ত। নোঙর-করা জাহাজের মত।"

দেববাণী বলল, "তাই বুঝি?"

লিওনার্ড বলল, "আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না যে?"

দেববাণী বলল, "সব প্রশ্নের জবাব নেই।"

লিওনার্ড বলে উঠল, "তুমি যদি কাউকে ভাল না বাসতে তা হ'লে তোমাকে একটা কথা বলতাম।"

দেববাণী বলল, "ও কথা আর কাউকে ব'লো।"

"তাই বলতে হবে," লিওনার্ডের কণ্ঠে ব্যথা বেজে উঠল।

ওয়েলিংটন ক্রিসেণ্ট দিয়ে গাড়ী তালকোতারা বাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেববাণী অনুভব করল লিওনার্ড ডান হাতে তার একখানা হাত তুলে নিয়েছে।

বাধা দিল না দেববাণী।

বলল, "নার্সিং হোমে নামতে হবে। তুমি কি আসবে?"

লিওনার্ড বলল, "আসতে পারি।"

নার্সিং হোমে নেমে সাবিত্রী আম্মার ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। তখনও বেশ কিছু লোকের ভিড়, তেমনি কলরব।

নার্সের কাছে খবর পেয়ে সরোজা বেরিয়ে এল। দ্বিতীয় রাত্রির অনিদ্রায় তার মুখখানা আশ্চর্য করুণ দেখাচ্ছে। উগ্র স্বভাবটা যেন তার হঠাৎ মোলায়েম হয়ে গেছে।

"কেমন আছেন?" দেববাণী প্রশ্ন করল।

"ভাল নয়।"

"আবার এ্যাটাক্ হয় নি ত?"

"একবার হয়েছিল। খুব বড় নয়।"

"কথা বলছেন?"

"আজ আর বলছেন না।"

গলা কেঁপে উঠল সরোজার।

"ডাক্তাররা কি বলছেন?"

"আশা দিচ্ছেন না।"

"তোমার বাবা এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

লিওনার্ড হোপ এক দৃষ্টিতে সরোজাকে দেখছিল। সরোজাও দু'তিনবার তাকিয়ে দেখল।

দেববাণী বলল, "ইনি লিওনার্ড হোপ। আমার এক আমেরিকান বন্ধু।" লিওনার্ডের দিকে তাকিয়ে, "ইনি সরোজা। এঁর কথাই তোমাকে বলছিলাম।"

লিওনার্ড সুন্দর ভাবে 'বাউ' করল। বলল, "আপনার মা'র অসুখে বড় দুঃখিত।"

"হার্ট এ্যাটাক্," বলল সরোজা।

"বুঝেছি।"

একটু পরে লিওনার্ড বলল, "আমি কিছু করতে পারি কি?"

সরোজা বলল, "ধন্যবাদ।"

পথে দেববাণী লিওনার্ডকে সরোজার কথা আরও কিছু বলল, আর বলল সাবিত্রী আম্মার কথা।

বাসার কাছাকাছি এসে লিওনার্ড বলল, "আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি নেই ত, বাণী?"

"কিছুমাত্র নেই। মোষ্ট ওয়েলকাম।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার মুখে আইরীন এসে ধরল।

"কি হ'ল আজ? মিঃ হোপকে বড় বেশি গম্ভীর দেখলাম।"

দেববাণী হাই চেপে বলল, "লোকটা মন্দ নয়।"

"নট এ্যাট অল্।"

"গাড়ী বেশ ভাল চালায়।"

"খুব ভাল।"

"কথা একটু বেশি বলে।"

"এবং বড় বড়।"

"বেশ সভ্য।"

"অতিশয়।"

"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুটা শ্রদ্ধা আছে।"

"এবং ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহল ও উৎসাহ।"

"এসব দেখে-শুনে সরোজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।"

"অ্যাঁ।"

"বেচারীর মা মৃত্যুমুখে। বড় একা প'ড়ে যাবে। যা মন-মেজাজ, দেশী ছেলে-ছোকরারা কাছে ঘেঁষতে সাহস করে ব'লে মনে হয় না। লিওনার্ড হোপের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না।"

"কিন্তু বাণী," আইরীন চেঁচিয়ে উঠল, "ওর যে অন্যদিকে নজর ছিল!"

"তাই বলছিল, বেচারা," দেববাণী গম্ভীর হয়ে বলল, "কিন্তু কি করা যায়? বলল, প্রথম দর্শনেই আমি তার প্রেমে পড়েছি। কিন্তু স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সে এত সুখী, তাকে বলবার মত সাহস পর্য্যন্ত আমার নেই।"

কয়েক মুহূর্ত আইরীন বুঝতে পারল না। তার পর বুঝতে পেরে দেববাণীকে মারতে উঠল।

"পাজি মেয়ে, দুষ্টু মেয়ে, মিথ্যুক মেয়ে!"

হাসতে হাসতে দেববাণী ওপরে উঠে গেল।

বাসন্তী দেবী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "সাবিত্রী আম্মা ভালর দিকে বুঝি?"

হাসির রেশ তখনও ফুরোয় নি। দেববাণী বলল, "না, মা। অবস্থা বেশ খারাপ।"

বাসন্তী দেবী অবাক্ হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু পরে দেববাণী স্নান ঘরে গেল। শুনতে পেলেন সে মৃদু সুরে গান গাইছে।

গানের আড়ালে দেববাণীর মনে একটি সুন্দর সুর-মুখর উপলব্ধি গুঞ্জরিত হচ্ছিল। সে সত্যি একজনকে ভালবাসে। আমি নিরাপদ, নির্ভীক, কারণ আমি ভালবাসি। আমি সুশান্ত, সুস্থির।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

# চিত্রশিল্পে মহিলার অবদান

শ্রীহাসিরাশি দেবী

ছবি দেখতে আমরা সকলেই ভালবাসি, তবে কম আর বেশীর তুলনা বাদ দিয়ে যদি ধরা যায়, তা হলে দেখতে পাই—শুধু রং নয়, শুধু রেখাও নয়—এই দুইয়ের মাধ্যমে মনের যে সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশ লাভ ঘটে, তার সমাদর করি আমরা সকলেই, আর এর যে রসানুভূতি, তাকেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি যাঁরা করতে পারেন, ছবির জগতে তাঁরাই হন সমঝদার।

আমি সেই সমঝদার নই, সাধারণ দর্শক। আর দেখে দেখে যেটুকু মনে হয়েছে, সেইটুকুই বলতে পারি কেবল।

বাংলা দেশের মেয়েদের ছবি আঁকা বলতে বেশীর ভাগ দেখেছি এই কলকাতা শহরে, আর এরই একটু এপাশে-ওপাশে; অর্থাৎ যাঁরা এ বিষয়ে শিক্ষালাভ ক'রে কাজের জন্যেই হোক কিম্বা অন্য কোন সুবিধা-অসুবিধার দরুনই হোক, কলকাতার আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদের তৈরী কাজ আর আঁকা ছবি।

কিন্তু এগুলি দেখেও আমাদের ঠাকুরমা কি তাঁর ঠাকুরমা-দিদিমাদের ছবি আঁকা সম্বন্ধে কোন ধারণাই স্পষ্ট করে তুলতে পারি নি। এটা অবশ্য খুব দুঃখের কথা বলে মনে হয়েছে আমারও, যেমন আরও অনেকের হয়ে থাকে। আর সেই জন্যেই সেই সব প্রবীণাদের আমল অর্থাৎ প্রায় একশো-দেড়শো বছর আগের মেয়েরা বাংলার যে সমাজে বাস করতেন সেই সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

মেয়েদের পক্ষে আত্মগোপনের ইচ্ছাকে তখন যেভাবে সম্মানিত করেছিলেন বাংলার জন সমাজ, সেই সম্মানকে উপেক্ষা করে বাংলার কোন মেয়ে যে নিজের শিল্পচর্চ্চাকে স্থায়িত্ব দান করবেন কিংবা তার অনুশীলনে সময় কাটাবেন এ আশা দুরাশা। তাই আজকে বাংলার মেয়েদের চিত্রচর্চ্চার বাঁধাধরা কোনও ইতিহাস লেখা নাই; যেটুকু অনুমান করে নিতে হয় তাও এমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত যে, সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে রাখা প্রায় অসম্ভব। তবু মুখে মুখে আজও শোনা যায়—তাঁদের শিল্প-প্রীতি ও শিল্প-রচনার কথা।

যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুতে চারুশিল্পের বদলে কারুশিল্পের চর্চ্চাই বেশী বলে মনে হয়। অবশ্য তার অন্য কারণও আছে।

শোনা যায় এক সমাজের মেয়েরা জীবিকা হিসাবে ছবি আঁকার চর্চ্চা করতেন; তাঁদের বলা হ'ত 'পটুয়া'। বাংলা দেশের 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ'-এর সঙ্গে যে চিত্রশিল্প জড়িত, তার আলপনা, বরণডালা, ফুলচিত্র, ইত্যাদি ছাড়াও প্রতিমা পূজার চালচিত্র রচনা প্রভৃতি কাজে এঁদের সহায়তা ত ছিলই; তা ছাড়াও তখনকার সময়ে পটুয়ারা তাঁদের আঁকা পট দেখিয়ে জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতে পারতেন, এবং এই ভাবেই হ'ত তাঁদের জীবিকার্জ্জন।

কাজেই ছবি আঁকতে হ'ত, আর তা যাদের দেখাবার জন্যে আঁকা হ'ত তারা সকলেই লেখাপড়া শিখবার সুযোগ-সুবিধা হয়ত পেত না, কিন্তু 'পট-চিত্রের' মাধ্যমে শাস্ত্র বা পুরাণের উপদেশ আর কাহিনী জানতে পারত।

আমার মনে আছে, মুর্শিদাবাদের একটি সাধারণ কাঁসারী ঘরের মেয়েকে এই ভাবে তার স্বামীর কাজের সম্পূর্ণ সহায়তা করতে দেখেছি। গ্রামের কুমোর পাড়াতেও দুই-চার জন মেয়েকে দেখেছি এই ভাবে চর্চ্চা করতে।

কিন্তু তা ছাড়া আর বিশেষ কোনও সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছাতে পারি নি; শুধু মনে হয়েছে, তাঁদেরও শিল্পী-মানস ছিল, সেখানেও প্রতিফলিত হ'ত সুন্দরের রূপ। আর সে রূপের আলেখ্য রচনা করতেন তাঁরা নানা উপায়ে।

আজ তাঁদের রচনাশৈলী আমাদের চোখে পড়ে কমই, ব্যক্তিবিশেষের নামও লেখা নেই কোথাও। তবু এর জন্য কাউকেই দায়ী করা যায় না; কারণ দেশ, কাল এবং সমাজ শিল্প-সৃষ্টির পোষকতা করেছে বরাবর, আজও তাই।

বরাবর কালের ইতিহাসের লেখন-পাঠে জানা যায়, দেশ, কাল এবং সমাজই নিয়ন্ত্রিত করেছে শিল্পকে—তা সে চারুশিল্পই হোক, কিংবা কারুশিল্পই হোক—এই তিনের হাত এড়িয়ে কেউই কোনদিকে যেতে পারে নি।

বাংলার পলিমাটিতে জন্মে যে মেয়েরা ছবি আঁকতেন খড়ি, কাঠ-কয়লা আর গেরিমাটি গুলে—তাঁদেরই মত আর একদল মেয়ে পাথর-বালি আর চুণ-সুরকীতে গাঁথা ইমারতের কঠিন দেওয়ালে আঁকলেন ফুল, পাতা, আর বিচিত্র ধরনের পশু-পাখী। সে ছবি দেখে এসেছি ইতমত উদৌলায়, ফতেপুর সিক্রীর মরিয়ম-মহলে। শুনেছি মুঘল অন্তঃপুরে পুরুষ-চিত্রকরের প্রবেশ নিষেধ ছিল। তাই এই ছবি এঁকেছিলেন মেয়েরাই এবং নূরজাহান ও জেবউন্নিসার বিভিন্ন বয়সের বাস্তবরূপ চিত্র দেখা যায় কেবল এই কারণে।

পৌরাণিক ভারতে ও রাজ অন্তঃপুরিকাদের যে নিজস্ব চিত্রশালার কাহিনী শোনা যায়, তা থেকে মনে করা সহজ যে, তখনকার যুগেও মানুষের মনে শিল্প-প্রীতি ছিল,—এবং তাঁরা তার চর্চ্চাও করতেন; তবে, এ চর্চ্চার সুযোগ এবং সুবিধা পাওয়া খুব সম্ভব জন-সাধারণের পক্ষে সহজ ছিল না। সুখের কথা যে, আজকের দিনে সে সুযোগ ও সুবিধা আমরা পেয়েছি। আনন্দের সঙ্গে স্বীকারও করতে পারি যে, শিল্প-শিক্ষালয়ে আজকাল মেয়েরাও শিক্ষালাভ করছেন যথারীতি। কলকাতার এই শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা খুব বেশীদিনের নয়, এবং তার প্রথমদিকে মেয়েরা এখানে শিক্ষালাভ করতে এগিয়েও যান নি, কিন্তু ঘরে থেকেই যে ছবি আঁকতেন, সে কথা শুনেছি অনেক জায়গায়। বিশেষ ভাবে জেনেছি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী এ বিষয়ে পারদর্শিনী ছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করার পথে এগিয়ে চলেছিল।

কিছুদিন আগে স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর আঁকা কিছু ছবি দেখার সুযোগ লাভ করেছিলাম। গিরীন্দ্র-মোহিনী স্বর্ণকুমারীর সমসাময়িক একজন কবি, এবং শুনেছি তাঁদের মধ্যে যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, সেই সূত্রেই গিরীন্দ্রমোহিনীর মনে এই ছবি আঁকবার প্রেরণা জাগে, ছবি আঁকেন।

মনে আছে ছবিগুলি যদিও পুরাণাশ্রিত সাহিত্য অবলম্বনে আঁকা, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও 'পট' রচনার ছায়াপাত দেখি নি, দেখেছি মূর্ত্তিচিত্রের বাস্তব প্রতিফলন। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে তার রূপারোপ, বর্ণলেপন ও আঙ্গিকে বৈদেশিক শিল্প-সংস্কার নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট।

পরবর্ত্তী যুগে দেখি স্বর্গীয়া সুনয়নী দেবীর আঁকা ছবি। সে ছবি দেখা দিয়েছে এক অভিনবত্ব নিয়ে। মনে হয়েছে, সে ছবি গতানুগতিক পথে নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় সুপ্রতিষ্ঠ। রং এবং রেখার রহস্যময় সে রূপায়ন ভাবের রাজ্যেও গত একশত বছরের মহিলা শিল্পীদের শিল্পরচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।

এরপরে দেখি শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও, শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী ও শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর আঁকা ছবি।

শ্রীযুক্তা রাও এবং শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীর আঁকা ছবি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দেখবার সৌভাগ্য ঘটেছে অনেকেরই, কিন্তু শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর আঁকা

ছবি কোনদিন প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু জানি যে, তিনি বহুকাল চিত্রাঙ্কন সাধনা করেছিলেন নানা প্রণালীতে।

আজকের শিল্পী-সমাজে যে সমস্ত কৃতী মহিলারা স্থানাধিকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে অমৃত শেরগিলের নাম সকলের আগে মনে পড়ে। নানা দেশ ঘুরে, নানা পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ ক'রে যাঁরা ফিরেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শীলা অডেন, কমলা রায়চৌধুরী, হৈমন্তী সেন, যামিনা আঁদে, প্রভৃতি।

আঁকবার এবং দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য্য ঘটিয়েছেন এঁরা। দৃষ্টিপাতের যে নতুন ভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন, দ্রষ্টব্যে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তুলির লিখনেও। পুরাতনী থেকে এঁরা এগিয়েছেন নূতনের দিকে, অনুসরণের পক্ষেও দেখিয়েছেন ব্যতিক্রম; হয়ত তাই একশ্রেণীর সমালোচক এঁদের নামকরণ করেছেন—'অতি-আধুনিক'।

এঁরা ছাড়াও আর কয়েকজন মহিলার আঁকা ছবি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। শুধু রং আর রেখায় নয়, অন্তরের গভীর থেকে গভীরতর হয়ে যে ভাবদৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, তাকেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়, বরঞ্চ বেশ কঠিন। সহরের সমস্ত প্রদর্শনীতে হয়ত এঁদের জায়গা হয় না, কিম্বা এঁরা ইচ্ছে করেই সে-সব স্থান গ্রহণ করেন না, কিন্তু দেখলেই মনে হবে, এ চিন্তাধারার সঙ্গে দর্শকেরও পরিচয় যেন মজ্জাগত।

জীবনের কোন অবহেলিত তারে যেন হঠাৎ একটা অজানা সুর বেজে ওঠে; মনে হয় কেবলমাত্র বাইরের রূপ নয়, অন্তরেরও রূপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যাকে হয়ত সবসময়ে সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলতে কুণ্ঠা জাগে, কিন্তু সত্যকে স্বীকার করতে বাধে না, কারণ, সত্যের অপলাপ সেখানে নাই, বরঞ্চ আছে জীবনবোধের গভীর ও কঠিন পরিচয়। বিভিন্নমুখী মানব-মনকে নানাদিক্ থেকে দেখে প্রকাশ করা যদি শিল্পীর ধর্ম্ম হয় তা হ'লে আজকের শিল্পী-মহিলারাও সে ধর্ম্মপথ থেকে দূরে সরে যান নি, বরঞ্চ তাঁদের পদক্ষেপ আরও দৃঢ়, সংযত, সবল।

তবে, অবুঝের ভিড় সকল দেশে আর সব সময়েই আছে। তারা যদিও খুঁজবে এর কারণ, কিন্তু রসিক জনমন কোনওদিন বলবে না যে, "এটা তুমি কি এঁকেছ, আর কেনই বা এঁকেছ?"

মোটকথা ছবি যেই দেখুক, আর যখনই দেখুক, শিল্পী সেই দেখার অপেক্ষায় ব'সে থাকে না, 'বাহবা' পেলেও আঁকে না সে, এ বিষয়ে তার মতামত চিরস্বাধীন, এই তার বৈশিষ্ট্য। মনে সে চিরদিনের মত উন্মুক্ত। স্বাধীনতার এই বাণী তাই সে বহন করছে মানব-সভ্যতার আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত।

ভবিষ্যৎ যদিও দৃষ্টির বাহিরে, তবুও রসিক মন চিরদিন সেইদিকে তাকিয়ে থাকবে অপার প্রত্যাশায় আর কোনও নূতন দিক্ দেখার জন্যে।
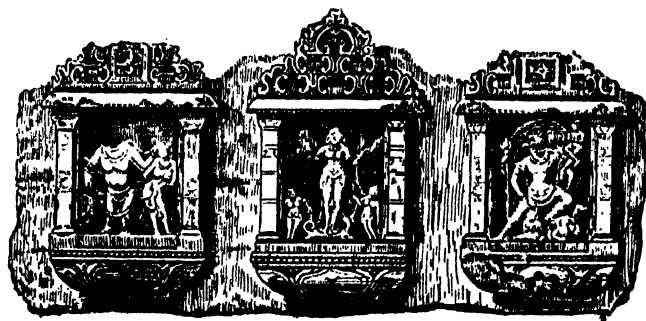
## খাওয়া-দাওয়া

ইউরোপের পোল্যাণ্ডে, এশিয়ার ভারতবর্ষে, চীনদেশের কতকাংশে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিতে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে জনগণ যা আহার করে তাতে তাদের দেহের সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন হয় না, আহার্য্যে প্রোটিন নামক পুষ্টিকর পেশীবর্দ্ধক বস্তুটির মারাত্মক অভাব থাকে ব'লে। এর মধ্যে ভারতবর্ষের বহু লোক মাছ মাংস খায় না, আমিষাহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব'লে; যাদের সে জাতীয় বাধা নেই তাদেরও অনেকে এত দরিদ্র যে, মাংস সংগ্রহ করাই তাদের পক্ষে অসাধ্য। দারিদ্র্যবশতঃই চীনেরও বহু লোক মাংস খেতে পায় না। দক্ষিণ আমেরিকার ও দক্ষিণ আফ্রিকার কতকাংশে ও বস্তুটি এমনিতেই দুষ্প্রাপ্য। প্রোটিন-সমৃদ্ধ সয়া-বীন, চীনেবাদাম প্রভৃতি সহজলভ্য উদ্ভিজ্জাত খাদ্য মাংসের অভাব অনেকটাই পূরণ করতে পারে, এ বিষয়ে উপরি-উক্ত অঞ্চলগুলির জনগণকে সচেতন করা আবশ্যক.

## ভূগোলের যৎকিঞ্চিৎ

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন ভূমি-পৃষ্ঠ দুয়েরই অবস্থিতি এশিয়াতে। প্রথমটি হিমালয়ের এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ, দ্বিতীয়টি জর্ডান নদীর উপত্যকা।

পৃথিবীর ব্যাপকতম পর্ব্বতমালা এ্যাণ্ডিস, বিস্তৃততম নদী এ্যামাজন, বিশুষ্কতম মরুভূমি এ্যাটাকামা এবং বিশালতম অরণ্যানী ব্রাজিল এবং অন্যত্র, এ সমস্তই দক্ষিণ আমেরিকাতে.

দৈর্ঘ্যে এ্যামাজন নদীর বিস্তৃতি প্রায় ৩৯০০ মাইল, বহুশত উপনদীর দ্বারা এর পরিপুষ্টি। পৃথিবীর অন্য কোন নদনদী এত বেশী জল সমুদ্রসঙ্গমে বহন করে নিয়ে যায় না

## সিন্ধুজল কি সর্ব্বত্রই লবণাক্ত ?

না: উপরি-উক্ত এ্যামাজন নদীর মোহনা থেকে সমুদ্রাভ্যন্তরের কিঞ্চিদধিক ১০০ মাইল জুড়ে সিন্ধুজল পানযোগ্য,- লবণাক্ত নয়। আমরা এইখানে একটু মন্তব্য জুড়ে বলতে পারি, নদীজল কি সর্ব্বত্রই পানযোগ্য? না। গঙ্গার মোহনা থেকে কিঞ্চিন্যূন ১০০ মাইল পর্য্যন্ত নদীজল বিশেষ পানযোগ্য নয়,—লবণাক্ত।

## শিশুরা আঙুল চুষলে কি তাদের দাঁত খারাপ হয় ?

না। কয়েক হাজার আঙুলচোষা ছেলেমেয়ের পরবর্ত্তী জীবন-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে, তারা আঙুল চুষত ব'লে, তাদের দাঁতের কোন অসুখ কিংবা দন্তসংস্থানের কোন ইতরবিশেষ হয় নি। আঙুলচোষা ছেলেমেয়েদের পিতামাতারা আশ্বস্ত হতে পারেন। আঙুলে কুইনিন মাখিয়ে শিশুগুলিকে অযথা উৎপীড়ন আর তাঁরা করবেন না।

## মোটকা

যসব শিশুরা ওজনে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক রকম ভারি হয়ে জন্মায় পরিণত বয়সেও তারা একটু মোটকা এবং বাঁটকুল হয়ে থাকে দেখা গেছে। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে যদিও বা তাদের ওজন কখনও কিছু কমে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আবার তারা ভারি হয়ে যায়, কোনরকম চেষ্টাতেই স্থায়ীফল প্রায় আর কিছু হয় না।

এজন্যে মনে হয়, ওদের খাওয়া কমিয়ে ওদের ওপর অত্যাচার না ক'রে ওরা যেমন আছে তেমনি থাকতে দেওয়াই কর্ত্তব্য

## মনপবনের না'

এই গাড়ীটিতে চড়ে আপনি যেখানে খুশি যেতে পারবেন। বরফ, কাদামাটি, পাহাড়, নদীনালা, কিছুই আপনার পথরোধ করতে পারবে
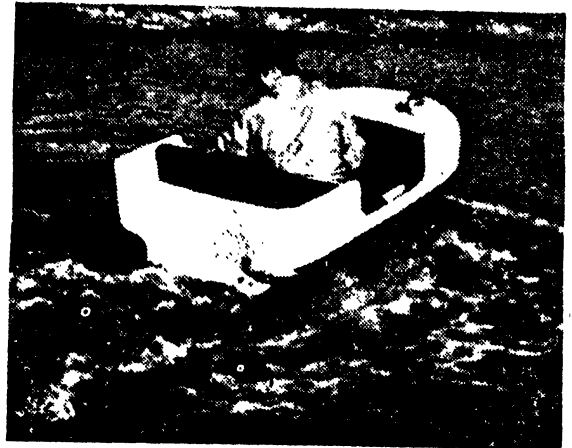
অবাধগতি গাড়ী 'বডি'র উপর ভাসছে
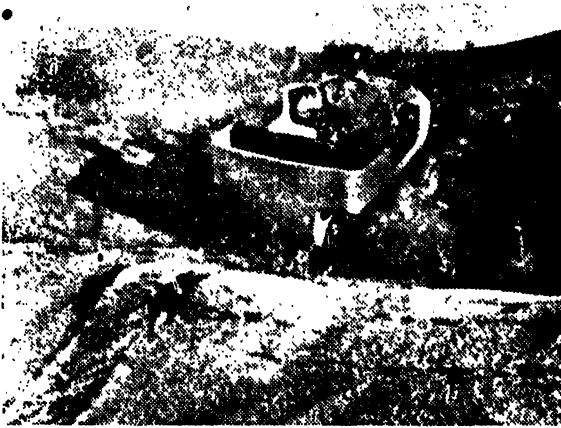
অবাধগতি গাড়ী পাহাড়ে চড়ছে

অবাধগতি গাড়ী চাকার উপর ভাসছে

না। ২২৫ মণ ওজনের জিনিষ নিয়ে (নিজের ওজনটাও দেয়া করে হিসেবে ধরবেন) এই গাড়ীতে আপনি পাহাড়ে চড়তে ও নদী পাড়ি দিতে পারবেন। এর হাওয়া-ভরা টায়ারগুলো জলে একে ভাসিয়ে রাখে; কপাল যদি খুব খারাপ হয় এবং সব ক'টা টায়ার ফেঁসে যায় একসঙ্গে, তবু আপনি ডুবে মারা যাবেন না ভয় নেই। এই গাড়ীর 'বডি'—ওটাকে আমরা 'দেহ' বলব কি?—এমন ভাবে তৈরি যে সেটাই গাড়ীটাকে ভাসিয়ে রাখবে।

## বিচিত্র পরিবেশে রেস্তোরাঁ

সুইডেনের ওরেব্রো সহরে জলসরবরাহ কেন্দ্রের রিজার্ভয়ারটি একটি টুপির আকারে তৈরি। এতে ক'রে রিজার্ভয়ারটি নীচের জমির খুবই কম জায়গা জোড়ে। শুধু তাই নয়, রিজার্ভয়ারটির উপরে জায়গা করা হয়েছে একটি রেস্তোরাঁর। দু'টি লিফ্‌ট্ এবং খানিকটা সিঁড়ির সাহায্যে এই রেস্তোরাঁতে পৌঁছনো যায়।
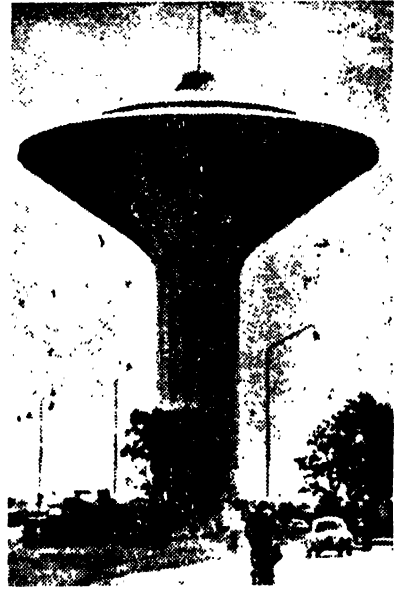
বিচিত্র রেস্তোরাঁ

পৃথিবীর ধূলিকর্দ্দম এবং কোলাহল থেকে মুক্ত এই রেস্তোরাঁটি অপূর্ব।

## বীমার দালালি

১৯৭৫ সনে, অর্থাৎ আজ যারা বালক তাদের যখন জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হবার মত বয়স হবে, তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাদের জন্যে যে সমস্ত 'উপজীবিকা'র পথ খোলা থাকবে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি হবে বীমার দালালি।

বীমার দালালরা সে দেশে কাজ সুরু করবার সময় থেকে আজকের দিনেই মাসে ১৫০০৲ টাকার মত রোজগার করেন। এমন অসংখ্য বীমার দালাল সে দেশে আছেন যাঁদের মাস গেলে ৩০০০৲ টাকা থেকে ১৫০০০৲ টাকার মত আয় হয়। অল্পসংখ্যক এখনও কেউ কেউ আছেন যাঁদের মাসিক আয় ৭৫,০০০৲ টাকাও ছাড়িয়ে যায়।

আমাদের দেশে বীমার দালালরা নিজেদের প্রাপ্য দালালির অনেকটাই বীমাকারীদের ছেড়ে দিয়ে কাজ সংগ্রহ করেন ব'লে বীমার কাজে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও ভাল ক'রে হয় না। এজন্যে শুধু বীমার দালালি ক'রেই জীবনাতিপাত করেন এমন লোকের সংখ্যা এদেশে মুষ্টিমেয়। জীবনবীমার ব্যবসায় সরকারের হাতে চ'লে যাবার পর দালালির টাকা নিয়মিত ভাবে পাওয়াও দালালদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত কারণে এদেশের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা বীমার দালালদের কন্যাসম্প্রদান করতে যে কিঞ্চিৎ দ্বিধাবোধ করেন, তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু নেই।

## ডাগ্ হামারশোল্ডের রসিকতা

ডাগ হামারশোল্ড খুব হাসতে এবং হাসাতে পারতেন। তবে তাঁর হাসির গল্পগুলিতে রাজনীতির ঝাঁজ একটু থাকত। যেমন নীলনদের এই কাঁকড়া বিছে ও কচ্ছপের গল্পটি।

কাঁকড়া বিছে: আচ্ছা ভাই কচ্ছপ, তুমি ত জান আমি সাঁতার জানি না, তোমার পিঠে ক'রে এই নদীটা আমায় পার ক'রে দেবে ভাই।

কচ্ছপ: আমাকে বলছ? তেমন বোকা আমাকে পাও নি। আমি বেশ জানি, অর্দ্ধেক পথ যেতেই তুমি আমাকে কামড়াবে আর আমি মরব।

কাঁকড়া বিছে: আরে রাম! কি যে বল। তোমায় বলি নি কি, আমি সাঁতার জানি না? মাঝনদীতে তোমাকে কামড়ে আমি কি আত্মহত্যা করব? তোমার সঙ্গে আমিও ডুবে মরব যে।

কচ্ছপ কথাটাকে অনুধাবন করল কিছুক্ষণ।

তার পর—.

কচ্ছপ: সে একটা কথা বটে। ভাবি নি এটা আমি। আচ্ছা, এস, চড় আমার পিঠে।

কাঁকড়া বিছেকে পিঠে চড়িয়ে কচ্ছপ ত ভাসলেন জলে। নদীর মাঝবরাবর গিয়েই কাঁকড়া বিছে দিলে এক কামড় বসিয়ে কচ্ছপের ঘাড়ে।

কচ্ছপ: (খাবি খেতে খেতে) কাঁকড়া বিছে! তুমি মিথ্যে কথা বলেছিলে আমাকে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তুমি সাঁতার জানো।

কাঁকড়া বিছে: (আর এক কামড় বসিয়ে) না ভাই কচ্ছপ, এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, সাঁতার আমি মোটেই জানি না।

কচ্ছপ: (শেষ নিঃশ্বাস নিতে নিতে) তাহলে কেন করলে এমন কাজ, যাতে দু'জনেই আমরা শেষ হতে চলেছি?

কাঁকড়া বিছে: আরে ভাই, ভুলে গেছ? এটা যে মধ্য-প্রাচ্য।

## নিশ্চক্রযান

দেখতে, এবং কাজেও খানিকটা, এরোপ্লেনের মত এই চক্রবিহীন
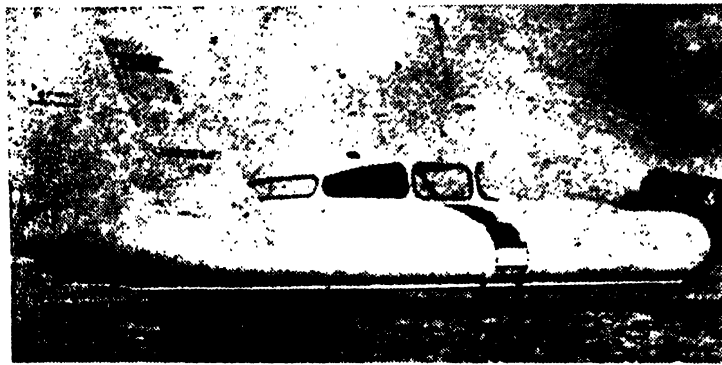
নিশ্চক্রযান

মোটরগাড়ীটি আমেরিকাতে বর্ত্তমানে পরীক্ষিত হচ্ছে। এরোপ্লেনের পাখার মত পাখা চালিয়ে এর নীচে তোশকের মত হাওয়ার একটি স্তর তৈরী করা হয়, যার উপর দিয়ে এই গাড়ী ভেসে চলে। এই হাওয়ার তোশক উঁচুতে এক ফুট,—গাড়ীতে দুজনে ভারি মালপত্র বেশী না থাকলে দুফুট পর্য্যন্ত হয় এবং স্থলেজলে এর কোন ব্যতিক্রম হয় না।

এই গাড়ী ৫৫ মাইল বেগে চলতে পারে—সাধারণ অবস্থায়, এবং দশজন আরোহীর স্থান হয় এতে স্বচ্ছন্দে। আরোহীদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্যে গাড়ীটিকে বহুদূরযাত্রী এরোপ্লেনের মত Pressurize করা হয়েছে।

## চীনেবাদাম

উপরে আহার্য্যে প্রোটিনের অভাব সম্পর্কে চীনেবাদামের কথা বলা হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যদিও প্রোটিন-সমৃদ্ধ মাংসের অভাব বা মাংস সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, কোনটাই নেই তবু সে দেশের লোকেরা সিনেমা, সার্কাস, থিয়েটার ও খেলার মাঠে ব'সে বহু কোটি টাকার চীনেবাদাম প্রতি বৎসর গলাধঃকরণ করে।

একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের খাদ্যবস্তুতে দৈনিক যতগুলি ক্যালরির প্রয়োজন হয়, চারটি পেয়ালা ভরতি খোসা-ছাড়ানো চীনেবাদামে তা পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন ছাড়া এ, বি ও সি ভিটামিনও বেশ অনেকটা ক'রে থাকে চীনেবাদামে।

ফরাসী দেশে খোসাশুদ্ধ চীনেবাদাম নুনজলে ডুবিয়ে রেখে পরে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। খোসা ছাড়িয়ে খেলেই নোনতা স্বাদ পাওয়া যায়। দুর্গন্ধ তেলে বা দালদায় লবণাক্ত করে ভাজতে হয় না।

চীনেবাদামের খোসা নানারকম কৃত্রিম তক্তা তৈরির কাজে লাগে। এর তেলে সাবান তৈরী হয়। বিশুদ্ধীকৃত তেলে রান্না করা চলে। এ ছাড়া সূক্ষ্মমাপের যন্ত্রপাতি ঘষার কাজে, পোলিও রোগীদের মালিশে এই তেল ব্যবহার করা হয়। তেল নিষ্কাশন হয়ে যাবার পর যে খ'ল অবশিষ্ট থাকে, হাঁস, মুরগী ইত্যাদির পক্ষে তা অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

সবচেয়ে বড় কথা, অদূরবর্ত্তী যুগে যে সব মহাকাশচারীরা চাঁদে যাতায়াত করবেন, চীনেবাদাম থেকে তৈরি সারীভূত খাদ্যেরই উপর হয়ত তাঁদের নির্ভর করতে হবে।

স. চ.

## ডিম্বেশ্বরী

রাণী হলেও জীবন কাটাতে হয় তাকে বন্দীদশায়। সান্ত্রীদের দ্বারা সুরক্ষিত ক্ষুদ্র এক কক্ষে রাজার সঙ্গে অবস্থান ক'রে বিরাট রাজ্য পরিচালনা করেন রাণী। কিন্তু ইচ্ছামত বেরুবার অধিকার তাঁর নেই, বাইরের আলো বাতাসের স্পর্শলাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত তিনি।

এই বন্দিনী রাণী সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত লেখক বলেছেন, "গোলাকার পুঁটলির মত চেহারা—ঠিক যেন সাদা মাংসের কাবাবের মত, দেখলে গা ঘিন ঘিন করে!"

এই কুরূপা রাণীর জন্ম কিন্তু মনুষ্যকুলে নয়, ইনি সাদা পিঁপড়ের রাণী।

ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বাস করে সাদা পিপীলিকাদের এক একটি পৃথক গোষ্ঠী। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তারা অনেক যাতায়াত-পথের সাহায্যে—তার দৈর্ঘ্য একশ' ফুট পর্য্যন্ত হয়ে থাকে।

আফ্রিকার এই জাতের কোন কোন পিঁপড়ে যে-সকল মাটির ঢিবি তৈরি করে সেগুলি কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়। সাধারণতঃ এগুলি কাদা তৈরি। অবশ্য এই নরম মাটির গায়ে মিশান থাকে মরা কাঠের কুচি, আঠালো লালা, ইত্যাদি।

যে পুরুষ এবং স্ত্রী সাদা পিঁপড়ে প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী হয়

দের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হয় একটি আভ্যন্তরীণ কক্ষ— চারপাশের কক্ষগুলির চাইতে এটি আকারে অনেক বড়, এর দেয়ালগুলিও অপেক্ষাকৃত পুরু। পাছে রাণী এবং রাজা এই মৃৎ-প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যান সেজন্যে এর প্রবেশ ও নির্গম পথগুলিও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

এই বন্দিনী রাণীর রাজ্যে কিন্তু কর্ম্মব্যস্ততার অন্ত নেই। কেন্দ্রস্থ কক্ষে শত শত কর্ম্মী পিপীলিকার অবিশ্রাম আনাগোনা। রাজ-দম্পতির কাছে খাদ্য নিয়ে ভেতরে যাচ্ছে তারা, আবার ফেরবার সময় মুখে ক'রে নিয়ে আসছে রাণীর পাড়া ডিম।

রাণীর পেটে যে কত ডিম—তার আর লেখাজোখা নেই। এই ডিম্বাধিক্যের দরুণ রাণীর পেট ফুলে গিয়ে বেয়াড়া আকারের হয়ে যায়।

এই রাণীকে ডিম্বেশ্বরী আখ্যা দিলে অসঙ্গত হয় না। শ্বেত-পিপীলিকা-কুলে তার এত যে কদর সে ঐ ডিমের জন্যেই। মাত্র একদিনে সে কয়েক হাজার ডিম পাড়তে পারে এবং এই বিপুল পরিমাণ ডিম্ব-উৎপাদন ক্রিয়া চলে পর পর কয়েক মাস ধ'রে।

কর্ম্মী পিঁপড়েদের কাজ হ'ল রাজ-দম্পতির দেখাশোনা করা, তাদের প্রয়োজন মেটান, একটি সুরক্ষিত জায়গায় ডিমগুলিকে রাখা। এ ছাড়া আছে সৈন্যবাহিনী—অন্য কীটপতঙ্গ যাতে বাসার ভেতরে ঢুকতে না পারে সেদিকে সর্ব্বদা তাদের সতর্ক দৃষ্টি—রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব তাদের উপর।

ডিম ফুটে প্রথম যখন শূক (larva) বেরোয় তখন তারা চোখে দেখতে পায় না—কর্ম্মীরা সে অবস্থায় তাদের খেয়ে ফেলে। কতকগুলি লার্ভাকে কিন্তু পিঁপড়েরা খায় না—ভবিষ্যতে যাতে তারা রাণী ও রাজা হয়ে রাজ্যশাসন করতে পারে সেজন্যে তারা তাদের বাঁচিয়ে রাখে। দিন কতক পরে শূক-রক্ষণাগার থেকে তাদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শীঘ্রই তারা উড়তে শেখে।

শ্বেত-পিপীলিকাপ্রিয় পাখীরা প্রায়শঃই পিঁপড়ের মাটির বাসার উপরে কড়া নজর রাখে, বাচ্চাগুলো বাসা থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাদের ধ'রে খেয়ে ফেলে।

যে-সকল পিপীলিকা এই প্রাথমিক বিপদ্ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়, উড়ে চলার পালা সাঙ্গ ক'রে তারা অবশেষে অবতরণ করে পিঁপড়েদের গর্ত্তের নিকটে। সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মীদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে যায়, তৎপরতার সঙ্গে তৈরি করে তারা আর একটি গর্ত্ত এবং এমনি ভাবে প্রতিষ্ঠা হয় নূতন উপনিবেশের।

শ্বেত পিপীলিকাদের শ্রেণীভেদ আছে দুই শতেরও অধিক। পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেই মুখ্যতঃ এদের বাস, যদিও দক্ষিণ ইউরোপে কোন কোন জাতির সাদা পিপীলিকা দেখতে পাওয়া যায়।

খাবার জন্যে যেখানে প্রচুর পরিমাণ মরা কাঠ পাওয়া যায়, প্রায়ই সেখানে গাছের গুঁড়িতে তারা বাসা তৈরী করে। এরা অসাধারণ পরিশ্রমী এবং মাটির ঘর নির্ম্মাণে এদের বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যও প্রকাশ পায়।—গৃহস্থ হ'লে পর যতদূর থেকেই হোক না কেন বাড়ীতে খাবার বয়ে আনতে তারা পিছপা হয় না।

## কৃত্রিম হ্রদ ও প্রাচীন কীর্ত্তি

নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করার ফলে প্রাচীন স্থাপত্য কীর্ত্তি জলমগ্ন হয়ে যাবার সমস্যা আমাদের দেশে দাক্ষিণাত্যে মহাবলিপুরমে দেখা দিয়েছে। মিশরের আসোয়ান ড্যাম-সংক্রান্ত এই সমস্যা বহুগুণ বড়। ২২৫ ফুট উঁচু এই বাঁধ নীলনদের জল ধরে রেখে ৩০০ মাইল লম্বা একটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করবে। আর এই জল উচ্চতার যে স্তরে এখন আছে, তা ছাড়িয়ে আরও ২০০ ফুট উঁচুতে উঠবে। যে বিরাট ভূমখণ্ড জলমগ্ন হবে, তার মধ্যে রয়েছে মিশরের একটি শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্ত্তি, ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসেসের বিরাটাকার মূর্ত্তি সম্বলিত আবু সিম্বেলের দুটি জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির।

পর্ব্বতগাত্রে ২০০ ফুট ভিতর পর্য্যন্ত খোদাই করে তৈরী এই দুটি মন্দির। বড় মন্দিরটির উচ্চতা ১০২ ফুট এবং প্রস্থ ১২৪ ফুট। মন্দিরের ভেতরের মূর্ত্তিগুলির সাধারণ উচ্চতা ৩০ ফুট, বাইরের মূর্ত্তিগুলির ৬৭ ফুট, আর এই সব মূর্ত্তিও পাহাড়ের গা খুঁড়েই তৈরী।
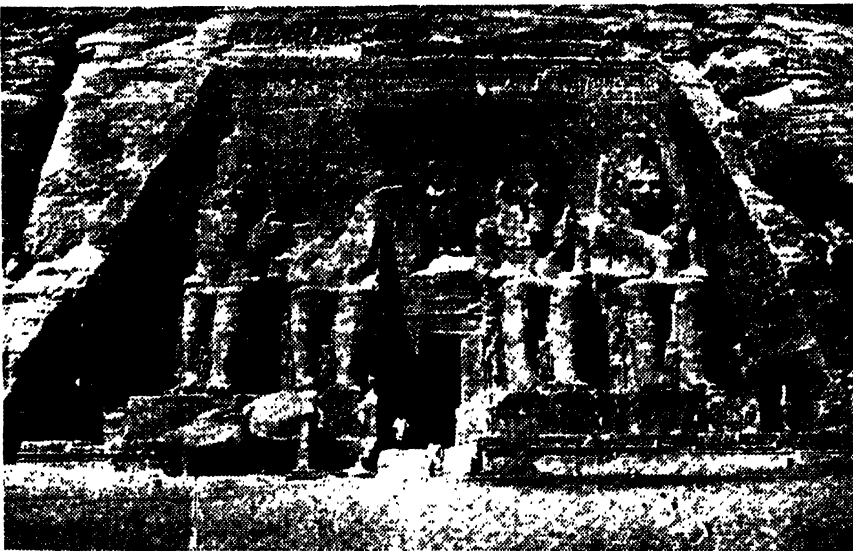
মিশরের যে অতিকায় মন্দিরটিকে অখণ্ড অবস্থায় স্থানান্তরিত ক'রে পাহাড়ের উপর তুলে নেওয়া হবে তার সম্মুখভাগ

এই সব মূর্তিসমেত গোটা মন্দিরদুটিকে হ্রদের জলের উচ্চতার সীমানার ঊর্দ্ধে তুলে নিয়ে স্থাপন করবার পরিকল্পনা করেছেন ইটালীর কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার। মন্দির দুটির ওজন হবে তিন লক্ষ টন।

পরিকল্পনাটির বিশদ বর্ণনা এরপরে কোন এক সময় দেবার ইচ্ছে আমাদের রইল।

ন. ভ.

## আদিমতম মানব

পৃথিবীতে সত্যিই এখনও কিছু আদিম মানুষের অস্তিত্ব আছে। মিঃ ডগ্‌লাস লকউডের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ্যালিস স্প্রিং-এর উত্তর-পশ্চিমে গ্র্যানাইট এবং তানামির দিকে এক অজ্ঞাত মরুভূমিতে এই জাতীয় লোকের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। চারিদিকে ধূ ধূ বালুকারাশি এবং মধ্যে মধ্যে কাঁটা ঝোপ ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যায় না।

মা

খোকা

খুকু

তাদের মধ্যে 'ওয়েলত্রি' এবং 'পিন্টুবি'রাই প্রধান। ৫০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী জনশূন্য ভূমিতে তারা বাস করে। তিনি বলেন যে, কোন সভ্যজাতির পক্ষেই ঐ জায়গায় বাস করা সম্ভব নয়।

খাবার আর কিছু না পাওয়ায় তারা এই জনশূন্য ভূমির উপর দিয়ে যখন ধায় তখন যদি কোন মরু-ইঁদুর দেখতে পায়, তক্ষুণি সেটাকে ধ'রে-খেয়ে ফেলে। মিঃ লকউড এই রকমই করতে দেখেছিলেন দু'জন আদিম

মানুষকে। তারা একটা ঝোপের মধ্যে একটা ইঁদুরের শুধু কান দুটো দেখতে পেয়েই তাকে ধরতে ছুটেছিল। তার পর ঘন কাঁটা ঝোপের পরোয়া না করেই ঝোপের মধ্যে গিয়ে সেটাকে ধরে এবং বিজয়োল্লাসে সেটাকে ভক্ষণ করতে থাকে।

উলঙ্গপ্রায় এই জাতীয় লোকেদের সঙ্গে বর্শা এবং একরকমের কাঠের জলপাত্র ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ভীষণ ক্ষুধার্ত্ত এই লোকেরা মিঃ মকড়ুগেলের দেওয়া খাবারগুলো নিমেষের মধ্যে শেষ করে ফেলেছিল।

ওয়েলব্রিদের অধিকৃত বেশীর ভাগ জায়গা এখন অষ্ট্রেলিয়া সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকায় তাদের খুব সুবিধে হয়েছে। মরুভূমির প্রান্তদেশে সরকারের যে আস্তানা পড়েছে সেখানে গিয়ে তারা কল খুললেই জল পায়।

সরকার থেকে তাদের টিনে করা 'বুলি বীফ' দেওয়ায় তাদের আর ইঁদুরের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

কিন্তু ভীরু পিন্টুবিরা মরুভূমিতেই থেকে গেছে। মনে হয় এদের ভেতর প্রাক্-প্রস্তর যুগের মানুষের রক্ত বিশেষ ভাবে প্রবাহিত।

মরু-ঝড় থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তারা বালিতে গর্ত্ত খুঁড়ে, গর্ত্তের পাড়ে প্রাচীরের মত তৈরী করে। সেই প্রাচীরে লেগে হাওয়া ঘুরে যায়। আবার রাত্রিতে ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে তারা ঐ প্রাচীরের পাড়ে উলঙ্গ অবস্থাতেই গুঁড়ি মেরে বসে থাকে।

আবার কোন কোন জায়গায় দেখা যায় যে, আদিম উপায়ে আগুন তৈরী করে সেই আগুনের চারিদিকে বালিতে, মুখ ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ চাপা দিয়ে তারা শুয়ে থাকে।

পুরুষের পর পুরুষ ধ'রে তারা মুলা ইঁদুর খেয়ে কাটায়। প্রচণ্ড রকমের জলাভাবের জন্যে খরগোস কি ক্যাঙারুও তারা দেখতে পায় না। যখন ইঁদুর দুষ্প্রাপ্য হয় তখন তারা মুলগা ঝোপের আঠা আর ইয়াল ইয়াম দিয়েই খাদ্য ও পানীয়ের কাজ চালায়। এদের দেশে যদি কোন লোক কোন আগন্তুককে জলের খোঁজে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়, তখন তার একমাত্র শাস্তি হ'ল মৃত্যু।

সারা জীবনেও তারা জানতে পারে না স্নান কি জিনিষ। সরকার পক্ষের লোকেরা যখন তাদের হাতে আয়না দেয় এবং নিজেদের চেহারা দেখতে বলে, তখন আয়নাতে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে তারা সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

'পিন্টুবি'রা এতই আদিম প্রকৃতির যে, তারা প্রস্তর যুগ পর্য্যন্তও অগ্রসর হয় নি। অর্থাৎ তারা যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করে প্রস্তর যুগে সে সমস্তের চল ছিল না।

এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের সাংস্কৃতিক জ্ঞান অনেক উঁচু। এ সম্বন্ধে মিঃ টেড্ ইভান্স যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি যাদের দেখেছিলেন, দারুণ রকমের দুরূহ জীবনযাপন করা সত্ত্বেও তাদের ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল ছিল।

সরকারের উদ্দেশ্য যে এই জাতীয় লোকেরা এতদিন যে ভাবে বাস করে এসেছে সেই ভাবেই বাস করুক। তার জন্যে সরকার থেকে এদের যথেষ্ট সাহায্যও করা হচ্ছে।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে পিন্টুবিরা পৃথিবীর আদিমতম মানুষের সরাসরি বংশধর এবং সভ্যজগতের অগ্রগতির সঙ্গে তারা মোটেই অগ্রসর হতে পারে নি।

দেখা যায় যে, এদের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির যথেষ্ট মিল আছে। এদের নানা রকম উৎসবও আছে এবং এই সব উৎসবে এরা তাৎপর্য্যপূর্ণ নাচও নেচে থাকে। এদের উৎসবের মধ্যে মুখ্য উৎসবটি আমাদের ফসল-কাটা উৎসবের সমান।

২১ বছর বয়সেই তাদের প্রাপ্তবয়স্কের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। কিন্তু আজ সেই সংখ্যা কমে এসেছে ৪৬ হাজারে।

আমাদের দেশে যেমন বিজ্ঞান-কংগ্রেস ইত্যাদি নানা জাতীয় সম্মেলন হয়, এদেরও তেমনি নানারকম সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়। প্রতি বছর একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আর তারা নানা জায়গা থেকে এসে সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মত এখানেও বর্শা ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা এবং শারীরিক প্রদর্শনী হয়।

এরা যেখানে বাস করে সেইখানেই তাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা অর্থাৎ প্রাক্-প্রস্তর যুগের লোকেরা বাস করত। চতুর্দ্দিকে সভ্যতার আলো থাকা সত্ত্বেও তাদের খুব সুখী মনে হয়, বিশেষ করে তখনই যখন তারা বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে অতীতের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে।

এই ভাবেই পিন্টুবিরা সেই মরুভূমিতে বাস ক'রে এসেছে এবং আজও করছে।

স. না.

# বাংলা চর্যাপদের ছন্দ

শ্রীআনন্দমোহন বসু

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালায় ১৯০৭ সনে যে চর্যাপদের পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন এবং 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে ১৯১৬ সনে প্রকাশ করেন তার পদ বা গীতগুলিকে 'বাংলা চর্যাপদ' নামে অভিহিত করা গেল। এই গীতগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। চর্যাগীতি যে শুধু বাংলা দেশেই প্রচলিত ছিল তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চর্যাগীতির প্রচলন ছিল এবং এই চর্যাগীতিকে 'অধ্যাত্মগোচর' সংগীত বলা হ'ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংগীতশাস্ত্র-রচয়িতা শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থে চর্যাগীতির বর্ণনা করেছেন। শার্ঙ্গদেব ছিলেন গুজরাটের অধিবাসী। তাঁর পক্ষে সেকালে বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতির সন্ধান রাখা সহজসাধ্য ছিল না, তাই বাংলার বাইরেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চর্যাগীতির প্রচলন ছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয়।

নেপাল রাজদরবারের পুঁথিতে যে বাংলা চর্যাপদগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যদি কোন চর্যাগীতি আবিষ্কৃত হয়, তবে তা বৌদ্ধ-অধ্যাত্মগীতি না হয়ে অন্য কোন বা যে-কোন অধ্যাত্মগোচর সংগীত হতে বাধা নেই। দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে চর্যাগীতির উল্লেখ থাকায় শৈবপ্রধান দক্ষিণীসমাজেও একপ্রকার চর্যার প্রচলন ছিল বলে অনুমান করা যায় এবং তা বৌদ্ধগীতি না হলেও দোষের হবে না, অধ্যাত্মগোচর হলেই চলবে। 'চর্যা' কথাটিকে সে ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

সংগীত-রত্নাকর রচয়িতা শার্ঙ্গদেব তৎকাল ও তদ্দেশ প্রচলিত চর্যার ছন্দকে 'পদ্ধড়ী' বা 'পজ্ঝটিকা ছন্দ' বলে উল্লেখ করেছেন,—

> পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দা: পাদান্তপ্রাসশোভিতা:।
> অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্‌দ্বিতীয়াদিতালত:॥
>
> চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়, সূত্র ২৯২।

সংগীত-রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ 'পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দা:' কথাটির অর্থ করেছেন, 'পদ্ধড়ীপ্রভৃতীনি ছন্দাংসি যস্তা: সা।' অর্থাৎ 'পদ্ধড়ী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ যার সে।' এর দ্বারা স্পষ্টত: বোঝা যায় যে, শার্ঙ্গদেবের সময় চর্যা শুধুমাত্র পদ্ধড়ী ছন্দে রচিত হ'ত না, 'পাদান্তপ্রাসশোভিত' অন্যান্য ছন্দেও রচিত হ'ত; পদ্ধড়ী চর্যার একটি মুখ্য ছন্দ ছিল। সংগীত-রত্নাকরের অন্যতম টীকাকার সিংহভূপালের ব্যাখ্যা থেকে একথা অধিকতর পরিস্ফুট হবে। তিনি পদ্ধড়ীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, 'পদ্ধড়ীতি রাহড়ীমুখ্যানি ছন্দাংসি।'—অর্থাৎ 'রাহড়ী আদি ছন্দ হচ্ছে পদ্ধড়ী।' অভিনবপুররাজ হরিপাল চর্যার বর্ণনা দিয়েছেন,—

> প্রান্তপ্রাসা নিবদ্ধা স্যাৎ প্রবন্ধৈ: পদ্ধড়ীমুখৈ:।
> দ্বিতীয় প্রমুখৈস্তালৈর্গেয়াধ্যাত্মোপযোগিণী।
> যোগিভির্গীয়তে চর্যা প্রকারৈর্বহুভিস্তুসৌ॥[১]

হরিপালের এই বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, চর্যার একটি মুখ্য ছন্দ ছিল পদ্ধড়ী, যোগীরা এই চর্যা গান করতেন, এবং বহুপ্রকার চর্যা ছিল।

পদ্ধড়ী ছন্দের লক্ষণ সম্বন্ধে টীকাকার কল্লিনাথ বলেন,

> ষোড়শ মাত্রা: পাদে পাদে
> যত্র ভবন্তি নিরস্তবিবাদে।
> পদ্ধড়িকা জগণেন বিমুক্তা
> চরমগুরু সা সদ্ভিরিহোক্তা॥

—অর্থাৎ যার পাদে পাদে ষোড়শ মাত্রা, যাতে জগণ (মধ্যগুরুগণ) থাকবে না, সেই পদ্ধড়িকা ছন্দ।

পদ্ধড়ী বা পজ্ঝটিকা ছন্দে চারটি করে 'পাদ' দেখা যায়; প্রতি পাদে অন্ত্যানুপ্রাস এবং ষোল মাত্রা থাকে। তাই পদ্ধড়ীর চার পাদ মিলিয়ে পাওয়া যাবে চৌষট্টি মাত্রা। ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাস পজ্ঝটিকার উদাহরণ দিয়েছেন,—

০ ০ ০ — ॥ — — — — ০ ০ ০ ০ — ০ ০ ॥ ০ ০ — —
তরলবতংসা শি ষ্ট স্ক ন্ধ | শ্চসতর পজ্ঝটি কাকটি ব ন্ধ:।|

॥ ০ ০ ০ ০ ০ ০ — ০ ০ — —
মৌলি চ পলশিখি চন্দ্রক বৃ ন্দ: |

॥ ০ ০ ০ ০ ০ ০ — ০ ০ — —
কালি য়ণি রসি ন ন র্ত্ত মুকু ন্দ:॥|[২]

---

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'চর্যাগীতি' প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

২। ছন্দোলিপিতে ব্যবহৃত চিহ্ন,—

গঙ্গাদাস পজ্ঝটিকার আর একটি লক্ষণ দিয়েছেন, 'নবমগুরুত্ববিভূষিতগাত্রা'—অর্থাৎ 'নবম মাত্রায় গুরু ( অক্ষর ) সন্নিবেশিত হবে।'

আমাদের আলোচ্য সাতচল্লিশটি বাংলা চর্যাপদের ছন্দ বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই, এর মধ্যে সাঁইত্রিশটির একই রীতির ষোল মাত্রার পংক্তিবিশিষ্ট ছন্দ, এবং বাকী দশটির পংক্তি দীর্ঘ। শার্ঙ্গদেব অবশ্যই এই ষোল মাত্রার পংক্তিবিশিষ্ট চর্যাগুলিকে পদ্ধড়ী ছন্দে রচিত বলেছেন। এখন পদ্ধড়ী ছন্দের লক্ষণগুলির সঙ্গে বাংলা চর্যাপদের ছন্দের কতটুকু মিল আছে তা বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে, এগুলি অন্ত্যানুপ্রাসশোভিত এবং ছন্দোপংক্তিতে ষোল মাত্রা যুক্ত। যেমন,—

### ১ সংখ্যক চর্যা

| ॥ ॥ | ০ ০০০ | — ০ ০ | ॥ — | |
|---|---|---|---|---|
| কা আ | তরুবর \| | পঞ্চবি | ডা ল \| | (৮+৮=১৬) |
| — ০ ০ | ॥ ॥ | — ॥ | ॥ — | |
| চঞ্চল | চা এ \| | পই ঠো | কা ল \| | ৩ |

এখন দেখতে হবে 'ষোড়শ মাত্রাঃ পাদে পাদে' কথাটির অর্থ কি? সংস্কৃতে 'পদ্য' কথাটির অর্থ যার চারটি পাদ আছে, 'পদ্যং চতুষ্পদী।' এখানে পাদ ( চরণ ) কথাটি ছন্দোপংক্তি অর্থে প্রযুক্ত। সে হিসাবে চর্যার ছন্দোপংক্তিকে পাদ ধ'রে বিচার করলে বাংলা চর্যাকে চতুষ্পদী বলা চলে না এবং পদ্ধড়ীর চৌষট্টি মাত্রাও মেলে না। দ্বিতীয়তঃ বাংলা চর্যাপদে প্রতি আট মাত্রার পরে সুস্পষ্ট যতি পড়ছে; ফলে ষোল মাত্রার ছন্দোপংক্তি ৮+৮ ভাগের দু'টি পর্বে বিভক্ত হচ্ছে। তৃতীয়তঃ বাংলা চর্যায় সর্বত্র নবমগুরু অক্ষর ব্যবহৃত হয় নি, যেখানে নবমগুরু আছে তাও আকস্মিক। অতএব পদ্ধড়ী বা পজ্ঝটিকার সঙ্গে বাংলা চর্যাপদের মিল অতি সামান্য।

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে শার্ঙ্গদেব চর্যাকে মুখ্যতঃ পদ্ধড়ী ছন্দে রচিত বললেন কেন? তার উত্তরে আমার পূর্ব সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করতে পারি যে, তৎকালে বংলা দেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চর্যাগীতি প্রচলিত ছিল। সেই সব চর্যা প্রধানতঃ পদ্ধড়ী ছন্দে রচিত হ'ত। বাংলা দেশে যে-চর্যা রচিত হয়েছিল তাতে প্রধানতঃ ষোল মাত্রার ছন্দোপংক্তি ব্যবহৃত হলেও, তাকে পদ্ধড়ী বা পজ্ঝটিকা বলা সঙ্গত নয়।

চর্যার ছন্দালোচনায় পদ্ধড়ী ছন্দ ছাড়া প্রাকৃত-অপভ্রংশের ষোল মাত্রার আর একটি ছন্দ বিশেষভাবে আলোচ্য। এই ছন্দটি হচ্ছে 'পাদাকুলক।' পাদাকুলক ছন্দের পরিচয় 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলম্'-এ পাই,—

> লহুগুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা,
> পঅ পঅ লেক্‌খউ উত্তমরেহা।
> সুকই ফণিন্দহ কণ্ঠহ বলঅং,
> সোরহমত্তং পাআকুলঅম্॥ ১।১২৯

অর্থাৎ, 'যেখানে লঘুগুরু ( অক্ষর ব্যবহার ) সম্বন্ধে একটি নিয়মও নেই, যার প্রতি পাদে উত্তমরূপে ( লঘুগুরু অক্ষর ) ব্যবহৃত হয়, সেই ষোল মাত্রার পাদাকুলক সুকবি ফণিন্দ্রের কণ্ঠবলয়।'

এখানে দেখতে পাই, চর্যাপদের ছন্দ পজ্ঝটিকা অপেক্ষা পাদাকুলকের অধিকতর নিকটবর্তী; কারণ পাদাকুলক-এ অক্ষর সন্নিবেশ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, 'লহুগুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা।' পাদাকুলক পজ্ঝটিকার মত 'জ-গণেন বিবর্জিতা' এবং 'নবমগুরু' অক্ষরবিশিষ্ট নয়।

পিঙ্গল ছন্দঃশাস্ত্রম্-এও পাদাকুলক-এর পরিচয় অনুরূপ, এষাং পঞ্চানাং মধ্যে যৈঃ কৈশ্চিদপি চতুর্ভিঃ পাদৈঃ 'পাদাকুলকং' নাম। মাত্রাসমকস্যৈকেন পাদেন, দ্বাভ্যামুপচিত্রায়াঃ, বিশ্লোকস্যৈকেন 'পাদাকুলকম্'। ৪।৪৭

—অর্থাৎ, 'এই পাঁচটি ( পাদের ) মধ্যে যে কোন চারটি পাদের দ্বারা পাদাকুলক ছন্দ হয়। মাত্রাসমকের এক পাদ, উপচিত্রার দুই পাদ, এবং বিশ্লোকের একটি পাদের দ্বারা পাদাকুলক হয়।'

এখানে পাদাকুলকের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ 'চতুর্ভিঃ পাদৈঃ' বা 'চারটি পাদের দ্বারা'। পাদাকুলকের এই চতুষ্পদ চৌষট্টি মাত্রা রূপটি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'বৃত্তমণিকোশ'-এর ২১৬,৭ শ্লোকে,—

> চতুষ্পদানাং পাদস্তু ষোড়শারভ্য মাতৃকাঃ।
> দ্বাত্রিংশদ্ভিঃ পরিমিতশ্চরিতার্থো বিভাতি নঃ॥
> যদি দ্বাত্রিংশতোঽপ্যধ্বং মাত্রাঃ পাদে নিয়োজিতাঃ।
> ধবন্যাদিসংজ্ঞং গীতং সান্ন তদ্বত্তং প্রশস্যতে॥

অর্থাৎ, 'চতুষ্পদ ( পাদাকুলক ) ছন্দের প্রত্যেক পাদে সাধারণত ষোলটি মাত্রা থাকে। কোন কোন স্থলে ষোল থেকে বত্রিশ মাত্রা পর্যন্ত দেখা যায়। যদি বত্রিশ

'০' মুক্তদল (open syllable) এক মাত্রা; '॥' মুক্তদল ( গুরুস্বর ) দুইমাত্রা; '‿' মুক্তদল ( গুরুস্বর ) সঙ্কুচিত এক মাত্রা এবং রুদ্ধদল closed syllable) সঙ্কুচিত এক মাত্রা; '—' মুক্তদল ( লঘুস্বর ) প্রসারিত দুইমাত্রা এবং রুদ্ধদল দুই মাত্রা।

৩। প্রাচীন ছন্দসূত্রে 'পাদান্তস্থং বিকল্পেন'—পাদান্ত লঘু অক্ষর বিকল্পে দীর্ঘ হয়ে দুই মাত্রাবিশিষ্ট হয়।

মাত্রার বেশি কোন পাদে প্রয়োগ করা হয় তবে তা' ধ্বনি প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাকে ছন্দরূপে গ্রহণ করা উচিত হবে না।'

প্রাকৃত-পৈঙ্গল, পিঙ্গল ছন্দশাস্ত্র, বৃত্তমণিকোশ, প্রভৃতি ছন্দশাস্ত্রানুসারে পাদাকুলক একটি চতুষ্পদী ছন্দ। কিন্তু বাংলা চর্যাপদে যে ষোল মাত্রার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা দ্বিপদী, অর্থাৎ দুইটি ছন্দোপংক্তিবিশিষ্ট। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দে 'পাদ' বা ছন্দোপংক্তি ছন্দ পরিমাপের মানদণ্ড, কিন্তু **বাংলা ছন্দে চর্যাপদের যুগ থেকেই পাদ নয়, পর্বই প্রধান উপাদান রূপে স্বীকৃত হয়েছে।** তাই সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের পজ্ঝটিকা ও পাদাকুলক ছন্দ ষোলমাত্রা-বিশিষ্ট 'পাদ' দিয়েই রচিত হয়, কিন্তু বাংলা চর্যাপদের ষোল মাত্রার পাদে আট মাত্রার পর্ব দু'টির প্রধান উপাদান। এখানে আট মাত্রার পরে যতি স্থাপনের দ্বারা পর্বগঠিত না হয়ে বিভিন্ন পাদে (ছন্দোপংক্তিতে) ভিন্ন ভিন্নরূপ হলে ছন্দপতন অনিবার্য।

২

প্রাকৃত-অপভ্রংশের শেষ যুগে যখন বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, প্রভৃতি ভাষাগুলি ক্রমে স্বরূপ প্রাপ্ত হচ্ছে, তখনই বাংলা চর্যাপদগুলি রচিত হয়েছিল। তাই এই চর্যাপদগুলিতে প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দের প্রভাব পড়েছে, একথা অনস্বীকার্য; কিন্তু বাংলা ছন্দের নিজস্ব রূপটিও এই সময় থেকেই গ'ড়ে উঠছিল, তার সুস্পষ্ট পরিচয় বাংলা চর্যাপদগুলির মধ্যে আছে। এই সময় বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় স্তবক-গঠন ও ছন্দোপংক্তি রচনার ক্ষেত্রে। প্রাকৃত-অপভ্রংশে যেখানে ছন্দ চতুষ্পদী, বাংলায় সেখানে দেখি দ্বিপদী। তাই ষোল মাত্রার পদ্ধড়ী ও পাদাকুলক ছন্দ যথাযথভাবে বাংলায় ব্যবহৃত হতে পারে নি। তা ছাড়া বাংলা ছন্দের একটি প্রধান উপাদান **'পর্ব'** এই সময় থেকেই রূপ নিয়েছে। অপর-দিকে আবার অক্ষর ব্যবহারের শিথিলতা দেখা দিয়েছে, লঘুগুরু অক্ষরের তারতম্য স্বীকৃত হচ্ছে না। তাই চর্যাপদে ব্যবহৃত ষোল মাত্রার ছন্দের কাঠামো পদ্ধড়ী কিম্বা পাদাকুলক যাই হোক না কেন বাংলা চর্যাপদের ছন্দ আর পদ্ধড়ী, অথবা পাদাকুলকের কোনটিই রইল না, বাংলা দ্বিপদী ছন্দ আদিরূপ গ্রহণ করল।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, ৪৭টি চর্যার মধ্যে ৩৭টি ক্ষুদ্রপাদবিশিষ্ট এবং ১০টি দীর্ঘপাদবিশিষ্ট। ক্ষুদ্রপাদ-বিশিষ্ট চর্যাগুলির অধিকাংশই ষোল মাত্রার পাদ ও আট মাত্রার পর্বে রচিত; দুই-একটি ক্ষুদ্রতর পাদবিশিষ্ট; মাত্রাসংখ্যা দশ থেকে চৌদ্দর মধ্যে। তবে প্রত্যেক পাদে দু'টি করে সুস্পষ্ট যতি পাত এবং পর্ববিভাগ" লক্ষ্যণীয়। এর কোন কোনটিতে 'দোহা' ছন্দের কিঞ্চিৎ প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। এই ক্ষুদ্রতর পাদবিশিষ্ট চর্যাগুলি যেন বাংলা এগার ও বার মাত্রার 'একাবলী' রীতির ছন্দের, আর ষোল মাত্রার পাদবিশিষ্ট চর্যাগুলি বাংলা পয়ারের প্রাচীন সংস্করণ। ক্ষুদ্রতর পাদবিশিষ্ট চর্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৪৪ ও ৪৬ সংখ্যক গীতি দু'টি।

**৪৪ সংখ্যক চর্যা**

সুনে সুন | মিলিআ জবেঁ | (৬+৭ মাত্রা)
সকল ধাম | উইআ তবেঁ | (৬+৭)

**৪৬ সংখ্যক চর্যা**

পেখু সুঅনে | অদশ জইসা | (৭+৭)
অন্তরালে | মোহ তইসা | (৭+৭)
মোহ বিমুক্কা | জই মাণা | (৭+৬)
তবেঁ তুটই | অবণা গমণা | (৬+৮)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পাদের মাত্রাসংখ্যা যথাসম্ভব বাড়িয়েও চৌদ্দর বেশি করা যায় নি।

'দোহা' ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখতে পাই দীর্ঘ পাদ-বিশিষ্ট কয়েকটি চর্যায়। এগুলিকে ত্রিপদীরীতিতেও পড়া চলে, তবে কোন কোনটির ত্রিপদীরূপ অপেক্ষা দোহারূপই অধিক পরিস্ফুট। যেমন,

**১৬ সংখ্যক চর্যা**

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে |
অণহ কসণ ঘণ গাজই | (১৩।১২)
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে
সঅ মণ্ডল সএল ভাজই | (১৩।১৩)

**৪১ সংখ্যক চর্যা | ভুসুকু | (অংশবিশেষ)**

আই অণুঅনা এ জগ রে |
ভাংতিএঁ সো পড়িহাই | (১৩।১১)
রাজসাপ দেখি জো চমকই |
যারে কিং বোড়ো খাই | (১৩।১১)

'দোহা'-রীতির ছন্দের লক্ষণ সম্বন্ধে 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলম্'-এ বলা হয়েছে,—

তেরহ মত্তা পঢম পঅ,
পুণু এআরহ দেহ।
পুণু তেরহ এআরহই,
দোহা লক্‌খণ এহ। ১।৩৮

—অর্থাৎ, 'দোহা ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে তের মাত্রা, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে এগার মাত্রা করে থাকবে।' সূত্রটিও দোহা ছন্দে রচিত।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, দীর্ঘপাদবিশিষ্ট চর্যাগুলির মধ্যে একদিকে যেমন 'দোহা' ছন্দ লক্ষ্য করা যাবে, তেমনি আবার 'বাংলা ত্রিপদী'-রূপও প্রত্যক্ষ করা যাবে। যেমন—

১৪ সংখ্যক চর্যা

কবড়ী ন লেই | বোড়ী ন লেই |
সুচ্ছড়ে পার করেই | (৮।৮।১২)
জো রথে চড়িলা | বহিবা ন জাই |
কুলে কুল বুড়ই | (৮।৮।১০ মাত্রা)

অথবা, ৪১ সংখ্যক চর্যা

রাউতু ভণই কট | ভুসুকু ভণই কট |
সঅলা অইস সহাব | (৮।৮।১২)
জই তো মূঢ়া | অচ্ছসি ভান্তী |
পুচ্ছ তু সদ্গুরু পাব | (৮।৮।১২)

—এগুলির মধ্যে ৮।৮।১২ (২৮), অথবা ৮।৮।১০ (২৬) মাত্রার ত্রিপদীলক্ষণ সুপরিস্ফুট।

একদিকে দীর্ঘপাদবিশিষ্ট চর্যাগুলিতে যেমন বাংলা ত্রিপদীলক্ষণ পরিস্ফুট, তেমনি ষোল মাত্রার পাদবিশিষ্ট চর্যাগুলিতে বাংলা পয়ারের ৮।৬ মাত্রার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এবং চর্যাগুলিতে স্থানে স্থানে এরূপ ৮।৬ ভাগের চরণ ছড়িয়ে আছে। অবশ্য এগুলির ছন্দোলিপিতে দীর্ঘস্বর ও যুক্তাক্ষরকে দ্বিমাত্রিক মর্যাদা দিলে চলবে না। বাংলা পয়ারেও দীর্ঘস্বর ও যুক্তাক্ষরের সে মর্যাদা নেই। চর্যায় অনুরূপ পয়ারের নিদর্শন,—

কমল-কুলিশ ঘাণ্টে | করহুঁ বিআলী | (৪ চ)
তরঙ্গেতে হরিণার | খুর ন দীসঅ | (৬ চ)
অবণাগবণে কাহ্নু | বিমন ভইলা | (৭ চ)
সহজ নলিনীবন | পইসি নিবিতা | (৯ চ)
নগর বাহিরেঁ ডোম্বি | তোহোরি কুড়িআ (১০ চ)
আলো ডোম্বি তোএ সম | করিবে ম সাঙ্গ | (ঐ)

চর্যাপদকারদের মত পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি জয়দেবও তাঁর গীতগোবিন্দে ১৬ ও ২৮ মাত্রার সমমাত্রিক পাদ (চরণ) ব্যবহার করেছেন। জয়দেবের ষোল মাত্রার চরণকে ৮.৮ ভাগের দুই পর্বে বিভক্ত করা খুবই সহজ, কারণ এগুলিতে চার মাত্রার চারটি করে 'গণ' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতে ছন্দোপংক্তি বা 'পদ'-ই ছন্দ পরিমাপের মানদণ্ড, তাই পর্ব নির্দেশ এখানে সঙ্গত হবে না। জয়দেবের ষোল মাত্রার চরণ,—

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত লজ্জা |
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ‖

জয়দেবের ২৮ মাত্রার চরণবিশিষ্ট একটি প্রসিদ্ধ গীত:

রতিসুখসারে | গতমভিসারে | মদনমনোহর | বেশম্ |
ন কুরু নিতম্বিনি | গমনবিলম্বন | মনুসর তং হৃদ | য়েশম্

—এখানে সাতটি করে চতুষ্কল গণ ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতি পাদে ২৮ মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে। জয়দেব এইরূপ অনেকগুলি গীত রচনা করেছেন। এগুলি ২৮ মাত্রার চরণবিশিষ্ট চর্যাগুলির সঙ্গে তুলনীয়। অনুরূপ ৪১ সংখ্যক চর্যার দৃষ্টান্ত পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে; ৩৪ সংখ্যক চর্যা থেকে একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল:

কিন্তো মন্তে | কিন্তো তন্তে |
কিন্তো রে ঝাণবখানেঁ | (৮।৮।১২)
অপইঠান ম | হা সুহলীণে |
দুলখ পরমণিবাণেঁ | (৭।৮।১১)

বাংলা চর্যার ছন্দ সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি আনতে চাই যে, চর্যাগুলি যখন রচিত হয়েছিল তখনও বাংলা ছন্দ নিজস্ব পথ ঠিক মত খুঁজে পায় নি; আবার সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দের বাঁধা সড়ক দিয়েও চলতে চাইছে না। বাংলা ছন্দের এই অনুসন্ধানের যুগের পরিচয় পাই বাংলা চর্যাপদগুলিতে। তাই বাংলা ছন্দালোচনার ক্ষেত্রে চর্যাপদের ছন্দের একটি বিশিষ্ট স্থান অবশ্যস্বীকার্য।

# গোমুখের পথে

শ্রীভক্তি বিশ্বাস

যমুনোত্রী দেখে উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীর পথে চলেছি। গঙ্গার কূল ধরে ধরে পথ চলেছে—কখনও চড়াই কখনও উৎরাই। আবার কখনও গঙ্গার ওপরের বিরাট্ চওড়া ধবধবে সাদা বালুচর পেরিয়ে যাচ্ছি। এখানে-ওখানে দূরে দূরে হিমালয় থেকে কতশত ধারা নেমে এসে গঙ্গার কলেবর বৃদ্ধি করছে। এই অদৃষ্ট-পূর্ব সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পথ চলার কষ্ট আর কষ্ট বলেই মনে হচ্ছে না। কোনটা বা চওড়া, প্রচুর স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারা নিয়ে বিপুল গর্জনে নেমে আসছে। অগণিত বিপুলকায় পাথরও এই জলধারার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না—কেবল বাধা দিয়ে ফেনার সৃষ্টি করছে—উপচে উপচে পড়ছে তাদের উপর দিয়ে জল। আবার কোথাও বা সফেন শুভ্র জলধারা উচ্চশৃঙ্গ থেকে লাফিয়ে পড়ছে সহস্র ফুট নিচে—সগর্জনে গঙ্গার অনর্গল ধারায় মিলিত হতে।

পথ বেয়ে চলেছি। পাইন, ফার, দেওদার গাছের বন বুকে নিয়ে চলেছেন হিমালয় তাঁর তুষার-কিরীট মাথায় দিয়ে গঙ্গার দুই কূল ঘেঁষে। গঙ্গার উপর দিয়ে একটা নড়বড়ে ঝোলান পুল পেরিয়ে এলাম। পাহাড়ের গা কেটে কেটে পথ তৈরী হয়েছে। সে পথ সর্বত্র অসমান। গঙ্গা ভয়ঙ্কররূপে বাঁ পাশ দিয়ে গর্জন করে চলেছে। প্রতিটি মুহূর্ত চলতে হচ্ছে সতর্ক পদক্ষেপে। লাঠিটি শক্ত করে ধরে রেখেছি। হাতের লাঠিই এখন যা ভরসা। নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করতে হ'লে না থেমে উপায় নেই।

অবিরাম এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে পথ। খানিকটা ঢালু। ঢালুর পরেই একটা কাঠের সরু পুল। কাঠের পুল ত নয়। কয়েকটা গাছের ডাল কেটে কেটে লতা দিয়ে বাঁধা হয়েছে—আর দু'পাড়ে বড় বড় পাথর উঁচু করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নিচ দিয়ে যে সুন্দরী ঝর্ণা বয়ে চলেছে তার কোলে পড়লে আমাদের যে খুব সুখবোধ হবে তা মনে হয় না।

ঝরণাটিকে ভাল করে দেখব ব'লে পুলটির কাছে এসে থেমে গেলাম। নির্বাক্ বিস্ময়ে দেখলাম অপরূপ রূপ। দু'টি পাহাড়ের কোল দিয়ে সরু গাঢ় নীল জল এগিয়ে এসে শতধা বিভক্ত হয়েছে যেখানে, সেখানে ছড়িয়ে আছে অজস্র পাথর। তাদের জড়িয়ে জড়িয়ে জল আরও ছড়িয়ে পড়ছে। রঙেরও ঘটেছে পরিবর্তন। নীল জলধারা রূপান্তরিত হয়েছে শ্বেত-শুভ্রে।

ভাটোয়ারী, গংনানী, শুক্কি পেরিয়ে এসেছি। এখন চলেছি ধরালীর দিকে। গঙ্গা এখানে সমতলভূমির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে—কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে। বাঁ দিকের পাহাড়ের গায়ে পথ—খাঁজে খাঁজে কাটা। গঙ্গার বুক থেকে বেশী উঁচু নয়। সামনে, পাশে, পেছনে হিমালয়ের মাথার ওপর বরফে রোদ প'ড়ে ঝক্‌ঝক করে জ্বলছে।

দু'জন বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা হ'ল পথে। এঁদের মধ্যে একজন সাধু। থেমে গেলাম।

"গঙ্গোত্রী থেকে ফিরছেন?" প্রশ্ন করি। "গোমুখ গিয়েছেন?" রুদ্ধশ্বাসে আবার প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ"—দু'জনেই খুশী হয়ে হেসে বলেন।

"কেমন পথ? যাওয়া যাবে—আমরা যেতে পারব?" দু'জনে একটু চোখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। গৃহী ভদ্রলোক বলেন—"অসম্ভব! খুব খারাপ পথ। আসলে কোন পথই ত নেই। পাথরের ওপর দিয়ে 'ধসা' পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হয়। লাফিয়ে লাফিয়ে ঝরণা পেরোতে হয়—ঝুলে ঝুলে পাথরের গা বেয়ে নামতে হয়। আমরাই হিমসিম খেয়ে গেছি। মেয়েদের পক্ষে অ-স-ম্ভ-ব।"

মনটা দমে গেল। দুর্বল আমরা—তবুও মনের সাহস কি কিছুই নয়? আর—দুর্বার আকাঙ্ক্ষা?

সাধুটি বোধ হয় একটু বুঝতে পারলেন।—"ক'জনা আপনারা?"

—"চারজন।"

—"আপনার মত ক'জন? অর্থাৎ মেয়ে?"

—"দু'জন।"

এবার বলেন—"কুলির পিঠে চড়তে পারবেন? দরকার হ'লে কোলেও উঠতে হবে—পারবেন? কষ্টকর জায়গা আমাদের কোলে বা পিঠে করে বয়ে এনেছে গাইডরা—পারবেন?"—মাথা দোলান ভদ্রলোক।

মনে ভরসা জেগে ওঠে। জোর দিয়ে বলি—"দরকার হ'লে নিশ্চয়ই পারব।"

গোমুখী চলার পথে

—"তা হ'লে এক কাজ করুন। গঙ্গোত্রী পৌঁছেই সাধু সুন্দরানন্দজী এবং দিলীপ সিং গাইডের খোঁজ করুন। এঁরা দু'জন যদি আপনাদের সঙ্গে থাকেন তবে আপনারা চ'লে যেতে পারবেন সহজেই।"

মুহূর্ত দেরি করলাম না। এবার পথ চলেছি যেন উড়ে উড়ে। সম্ভাবনার আনন্দে মন ভরপুর। হয়ত বা গোমুখ যেতে পারব। সে রাত্রি ধরালীতে রইলাম।

পরদিন ভোরে উঠে ৯ মাইল হেঁটে পৌঁছলাম "ভৈরবঘাটি"—৯৩০০ ফুট উঁচু। পথে গঙ্গা "জাহ্নবী" হয়েছেন। ভগীরথ চলেছেন শাঁখ বাজাতে বাজাতে আর গঙ্গা চলেছেন তাঁর পেছনে নাচতে নাচতে। পথে জহ্নু মুনির আশ্রম। গঙ্গার স্রোতে আশ্রম ভেসে গেল—মুনি গেলেন চটে। এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান ক'রে ফেললেন। এদিকে গঙ্গার শব্দ না পেয়ে ভগীরথ পেছন ফিরে দেখেন গঙ্গা নেই। মুনিকে অনেক স্তব-স্তুতি করাতে তিনি তাঁর উরু ভেদ করে গঙ্গাকে বের হয়ে যেতে দিলেন।

পথের এইখানে গঙ্গা হারিয়ে গেছেন। পাহাড়ের কোলে দেখা যায় না তাঁকে—শব্দও প্রায় নেই বললেই হয়। হঠাৎ আবার বের হলেন, পাহাড়ের আবরণ সরে গেল। তাই তিনি "জাহ্নবী"। গল্পচ্ছলে গঙ্গার নিখুঁত রূপ বর্ণনা করে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা।

ভৈরবঘাটিতে মন টেঁকে না। ২ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হয়ে প্লেনে সাত মাইল পথ হেঁটে পৌঁছলাম গঙ্গোত্রী। তখনও সন্ধ্যা হয় নি। গঙ্গোত্রীতে গঙ্গা সগর্জনে বয়ে চলেছে—দু'পাশে শুভ্র বেলাভূমি, অজস্র পাথর ছড়ান।

ধরমশালার দোড়গোড়ায় আমার ভাগ্নে এবং তার কমলা মাসী দাঁড়িয়ে। কথা হচ্ছিল—দিলীপ সিং-এর নজরে পড়েছে আমাদের দলটি।

"এ বাঙ্গালী বাবুলোগ জরুর গোমুখ যায়েগা। জ্ঞানানন্দ যাও—খবর লেও।" জ্ঞানানন্দ দিলীপের সাগরেদ। সম্পর্কে ভাই হয়। সে পাকড়াও করেছে ভাগ্নেকে।

"মামা ত এসে পৌঁছন নি এখনও। এলে কথা কইতে হবে। সন্ধ্যেবেলা ধরমশালায় এসে দেখা ক'রো আমাদের সঙ্গে।"

"বেশ তাই হবে।"—ব'লে জ্ঞানানন্দ চ'লে যায়। দুরু দুরু বক্ষে সকলেই অপেক্ষা করি। কি স্থির হবে কে জানে! সন্ধ্যেবেলা সাধুজি, দিলীপ, জ্ঞানানন্দ, হরচাঁদ এসে বসল আমাদের ঘরে। যে খবর শুনলাম তাতে ত আমাদের চক্ষুস্থির।

সাধুজিকে আর দিলীপকে আজই এক স্বামী-স্ত্রী দখল করে নিয়েছে। কালই ভোরে তাঁরা গোমুখ রওনা হচ্ছেন।—তবে? কি হবে? আমাদের যাওয়া হবে না? না—তা নয়। আমরা যদি কাল তাঁদের সঙ্গে যেতে পারি তবে আমাদের গাইড হিসাবে জ্ঞানানন্দ ও

হরচাঁদ যাবে বটে, তবে সাধু সুন্দরানন্দই দলপতি হিসেবে সবাইকে একত্র নিয়ে যাওয়ার ভার নেবেন।

কিন্তু—আমরা যে ঠিক করেছিলাম একদিন বিশ্রাম নেব। না—তা আর হবে না। আমাদের শরীর অবসন্ন, হাত-পা আর নড়তে চায় না। আমরা কি যেতে পারব? আমাদের সামর্থ্যে কি কুলোবে?

সাধুজি চঞ্চল হয়ে উঠলেন।—"নিশ্চয়ই পারবেন। আর আমরা ত আছিই সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছে আছে ত?" দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলি—"ইচ্ছেতে যদি যাওয়া যেত তবে ত আমরা চলেই গিয়েছি। কিন্তু—ইচ্ছেই কি সব?"

"হ্যাঁ"—দৃঢ়স্বরে সাধুজি বলেন, "ইচ্ছেই সব।" আর সঙ্গে সঙ্গে সবারই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। বোধ হয় বুঝে নিতে চেষ্টা করেন তাঁর দায়িত্ব কতখানি।

দিলীপ সিং ইতিমধ্যে আমাদের চারজনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে নিয়েছে—তার ছোট্ট ছোট্ট চোখ দিয়ে পাহাড়ী নজরে। সুন্দরানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে দিলীপ বলে—"হাঁ, সব কোই চলা যায়েগা লেকিন বাবুজীকা থোড়া কষ্ট হোগা।" বাবুজী মানে উনি।

দিলীপের মুখে কোন ভাবের ব্যঞ্জনা নেই। কেবল তার স্বর দৃঢ় ও স্থির।

কয়েক মুহূর্ত আমরা চুপ করে ব'সে থাকি। শরীর যে অচল—নড়ব কি করে আমরা! এ দিকে একদিনের বিশ্রামের অর্থ সুন্দরানন্দ ও দিলীপকে হারানো। অর্থাৎ গোমুখ যাওয়া আর হ'ল না। মনের ভেতর এক অভূতপূর্ব আলোড়ন।

অবশেষে শরীরের সব অবসাদকে জয় করি মনের জোরে।—বেশ, কালই সকালে আমরা যেতে রাজী। দেখাই যাক না যেতে পারি কি না।

খুশিতে ঝলমল করে ওঠে সুন্দরানন্দজীর মুখখানা। খুশি যেন ঝ'রে পড়ে তাঁর সর্বাঙ্গে। বলেন—"আপনারা আপনাদের মালপত্র গুছিয়ে ধর্মশালার তত্ত্বাবধানে রেখে দেবেন। সকালে দিলীপ এসে সঙ্গে নেবার জিনিষ গুছিয়ে নিয়ে যাবে। সঙ্গে তিন দিনের দশজনের খাবার যাবে—সে ব্যবস্থা আমি করব। দু'খানা ক'রে কম্বল নেবেন জনপ্রতি—আর স্নানের জন্য সামান্য ব্যবস্থা। গরম জামা যত পারেন প'রে নেবেন। ভাল জুতো প'রে নেবেন। লাঠিটাও চাই।" এমনি সব অনেক কিছু নির্দেশ দিয়ে যান সুন্দরানন্দজী আগামীকালের জন্য।

আমাদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। ভয়ে, শঙ্কায়, আনন্দে, উত্তেজনায় আমরা অভিভূত।

প্রত্যূষে উঠে সুন্দরানন্দজীর নির্দেশমত জিনিষপত্র দিলীপের জিম্মাতে দিয়ে দিই। তবুও দিলীপ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বার বার। সঙ্গে যেন কোন জিনিষ বয়ে নেবার চেষ্টা না করি। সবই যেন ওদের কাছে দিয়ে দিই। নিজেরা চলতে পারলেই ঢের হবে। ওনার still camera ও cine camera-টিও দিলীপ নিজের জিম্মায় জমা রাখল।

গঙ্গোত্রীর গঙ্গা পূব থেকে পশ্চিমে বয়ে চলেছে। উত্তর পাড়ে গঙ্গার মন্দির, ধরমশালা, দোকানপাট। দক্ষিণ পাড়ে কেদারের পাহাড় থেকে কেদারগঙ্গা ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। তার দু'দিকেই সাধুদের কুটির। পেছনের পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঝক্ ঝক্ করছে তুষারমণ্ডিত ভৃগু-শিখর—গঙ্গার মন্দিরের দিকে যেন তাকিয়ে আছে। পাশে পূর্বদিকে আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে দেবঘাট পর্বতশ্রেণী—সূর্যালোকে উজ্জ্বল। গঙ্গার উপর উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা কাঠের নড়বড়ে সেতু আছে—নতুন করে আবার তৈরি হচ্ছে। দক্ষিণ পাড় ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

প্রস্তুত হয়ে আমরা এই সেতু পেরিয়ে এসে ন'টার সময় ওপারে ছড়ানো শিলাসনে বসে রইলাম। সুন্দরানন্দজীর পাত্তা নেই—নতুন সঙ্গীযাত্রী দু'জনারও দেখা নেই। দিলীপ, জ্ঞানানন্দ এবং হরচাঁদ আমাদের কাছে বসে গল্প করতে লাগল। তাদের কাছেই শুনলাম সঙ্গী দু'জনা এখনও তৈরি হতে পারেন নি। সুন্দরানন্দজী তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

গল্প করতে করতে জ্ঞানানন্দ বলল—"আপনারা স্বামীজি মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছেন?"

স্বামীজি মহারাজ কে? কোথায় থাকেন তিনি? আমরা জানতে চাই।

—"এই ত একটু উপরেই তাঁর আশ্রম।" দিলীপ জানায়। "স্বামীজি মহারাজ 'অবধূত' ব'লে সবাই বলে। যারা গোমুখ যায় সবাই এঁর আশীর্বাদ নিয়ে যায়। দেখা করে আসুন।"

উঠে গেলাম। সামান্য উপরেই সাধুজীর কুটির। কুটিরের সামনে ছোট্ট একটু উঠোন। সেখানে দু'চার জন যাত্রী ব'সে আছে স্বামীজি মহারাজের সামনে। বিরাট লম্বা দেহ, একটি কৌপিন মাত্র পরণে। রোদে পোড়া কালো চামড়া কোঁচকানো—ভস্মমাখা দেহ—বয়স কিছুই বোঝা যায় না। সদানন্দ মূর্তি—কথায় আত্মীয়তার ছোঁয়াচ!

গঙ্গোত্রীর মন্দির

প্রণাম করে বললাম—"আমরা এখন গোমুখ যাচ্ছি।"

—"ক'জনা যাচ্ছ? মেয়েরা আর কেউ আছে?"

—"যাচ্ছি আমরা ছ'জন—তার ভেতর তিনজন আমরা মেয়ে।

—"সঙ্গে যাচ্ছে কে?"

—"সুন্দরানন্দজী আর দিলীপ সিংজী সঙ্গে আছেন। আরও দু'জন গাইড আছে সঙ্গে।"

স্মিত হাস্যে বললেন—"বেশ বেশ। সুন্দরানন্দজী আর দিলীপ সিং যখন সঙ্গে আছে আর কোন ভাবনা নেই। ঠিক দেখে আসবে। ওরা দু'জন না গেলে আমি তোমাদের যেতেই দিতাম না। বেশ—বেশ—বেশ হয়েছে। ভাল হয়েছে যাও—চলে যাও। কিছু চিন্তা ক'রো না।"

চিন্তাটুকু যা অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু যেন মুছে গেল এই পরম আশ্বাসবাণীতে। প্রণাম করে চ'লে এলাম।

বেলা প্রায় দশটায় আমরা রওনা হলাম। গঙ্গার বালুভূমির ওপর পাথর পঁড়ে আছে,তার ওপর পা ফেলে চলেছি সাবধানে। একটু পরে সামান্য উঠে পাইন বনের ভেতর দিয়ে খানিকটা দূর চলে গেলাম। উত্তর পাড়ে দেখলাম ছোট্ট একটি কুটির। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে দু'জন সাধু বসে আছেন কুটির-সংলগ্ন ছোট বারান্দাটিতে। ওপার দিয়ে পিঁপড়ের সারির মত যাত্রী চলেছে—সাধু-সন্দর্শনে দক্ষিণ পাড় থেকে দিলীপ প্রণাম জানাল তাঁদের। আমাদের গোমুখ যাত্রার কথা ইশারায় জানিয়ে দিল। তাঁরাও দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

ধীর পায়ে এগোচ্ছি। এবার ধ্বসা পাহাড় সুরু। এখানটায় পাহাড়ের খুব উঁচু থেকেই বালি, ছোট পাথর ও কাঁকর গড়িয়ে আসছে। অর্থাৎ সর্বদাই পাহাড় ধ্বসছে। তাছাড়া বিনা বিজ্ঞপ্তিতে বড় পাথর গড়িয়ে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। নীচে প্রচণ্ডবেগে প্রবহমানা গঙ্গা—এক পলকের অসাবধানতায় মৃত্যু অনিবার্য। এ পথে গাইডরা এক দণ্ডও থামতে দেয় না যাত্রীদের এইজন্য।

এই দিকের পাহাড়ের রাস্তায় দেখি শিস্ দিয়ে নজর আকর্ষণ করাটাই পদ্ধতি। হঠাৎ শিস্ শুনে আমাকে থামিয়ে এক লাফে এগিয়ে গেল দিলীপ। কি ব্যাপার দেখবার জন্য পায়ের দিক্ থেকে মুখ তুলি। সুন্দরানন্দজীর সঙ্গে চলছিলেন কমলাদি। ধ্বসা পাহাড়ে বেকায়দায় পা ফেলে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। একটু হলেই ফসকে যাবেন। সাধুজী একা সামলাতে পারছেন না। দিলীপ ত্বরিতে পাহাড়ের নীচের দিকে গিয়ে কোমর ধ'রে ঠেলে কমলাদিকে তুলে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল।

আবার চলতে সুরু করি আমরা। খানিকটা ধ্বসা পাহাড় পেরিয়ে এসে থেমে বিশ্রাম নিতে ব'সি সকলে।

সুন্দরানন্দজী সহাস্য মুখে তাকালেন সবাইর মুখের দিকে। আমরাও পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। মিনিট কয়েক বিশ্রামের পরই আবার রওনা হই।

এবার আর ধ্বসা পাহাড় নয়। বিরাট্ বড় বড় পাথর গড়িয়ে এসে গঙ্গার তীরে জমা হয়েছে। তার ওপর পা ফেলে ফেলে—ব'সে ব'সে—হামাগুড়ি দিয়ে, লাফ দিয়ে, হেঁচড়ে—অর্থাৎ চলবার সবরকম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে চলতে থাকি। একটু চলি আর বিশ্রাম নি। গাইডরা সঙ্গে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে কোন্ পাথরে পা দিলে যেতে সুবিধে হবে।

এদিকে বাঁধাধরা কোন পথ নেই। গাইডরা পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে কোথাও কোথাও পথের চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। এ পথে চলায় অভ্যস্ত ব'লে নিজেরাই পরামর্শ ক'রে ঠিক করে নিচ্ছে কোন্ দিক্ দিয়ে যেতে হবে। মোট কথা গঙ্গার কূল ধ'রে ধ'রে যেতে হবে। আজ যেখান দিয়ে চলা গেল, কাল হয়ত সেখানকার পাথর ধ্বসে পথ বন্ধ হয়ে যাবে। নতুন পথ খুঁজতে খুঁজতে গাইড আমাদের নিয়ে চলেছে।

কোথাও কোথাও চলবার পথ পাওয়া যাচ্ছে না, তাই নেমে যেতে হচ্ছে গঙ্গাগর্ভে। সেখানে জলের ওপর বড় বড় পাথর মাথা জাগিয়ে আছে। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলছি সেই পাথরগুলির অগ্রভাগে, মুখে কারও ভাষা নেই। কেবল এক-একটি বিপজ্জনক পথ পার হই—আর পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি ক্ষণকাল।

মাঝে মাঝে ঝরণা নেমে এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। টলটলে জল—আঁজলা ভ'রে পান করি। তৃষ্ণা নিবারণ শুধু হয় না—শান্ত হয় শরীর ও মন। আবার তেজের সঙ্গে রওনা হই।

এবার আবার ধ্বসা পাহাড় সুরু। কষ্টের যেন আর শেষ নাই। সুন্দরানন্দজী বলেন—"আর অল্প দূর গিয়ে আমরা চা তৈরি করে নাস্তা খেয়ে নেব।"

আশা পেয়ে যেন একটু আশ্বস্ত হই। জিজ্ঞেস করি আগ্রহভরে—"সে কোথায়? আর কতদূর?"

"এই ত একটু আগেই—ওই ত ঐ যে গাছ" ইত্যাদি উৎসাহব্যঞ্জক কথায় কথায় সুন্দরানন্দজী আমাদের আরও এক মাইল পথ নিয়ে এলেন। অবশেষে আমরা থামলাম এসে ভূর্জগাছের জঙ্গলের মধ্যে। কিছু দূরে একটা ঝরণা এসে গঙ্গাতে মিশেছে। তার কাছাকাছি বসে দিলীপ সিংরা শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বেলে চা তৈরি করছে। আমরা পাথরে মাথা রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ি। দেহ অসাড়, মন অনুভূতিশূন্য। তখন বেলা সাড়ে বারটা। আরও সাড়ে চার মাইল পথ বিকেলের মধ্যেই যেতে হবে। বেশীক্ষণ থামবার সময় নেই। চা, মণ্ডামিঠাই খেয়ে দেহে বল সঞ্চয় করি। সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে মন। যে বিপুল সুদূরকে দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি এই পথে তারই জন্য মন আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে, উঠে পড়ি চট্‌পট্। কিন্তু এদিকে আর এক বিপদ্। উনি আর পাথরের শয্যা ছেড়ে উঠতে চান না। বলেন—"তোমরা যাও, আমি এখানেই থাকি। ফিরে যাওয়ার সময় কুড়িয়ে নিয়ে যেও।"

সর্ব-বিপদে অভয়দাতা সুন্দরানন্দজী মোক্ষম ভয় দেখান এবার। বলেন—"এদিকে ভালুক আছে। সন্ধ্যে হলেই জল খেতে আসে। একেবারে ভালুকের পেটে যেতে হবে।"

উনি আর কি করেন। তাড়াতাড়ি উঠে ধুঁকতে ধুঁকতে চলতে সুরু করেন।

চলবার পথে পড়ছে ছোট্ট ছোট্ট গাছে নানা রঙের ফুল। কোনটা হলদে, কোনটা বেগুনী, কোনটা আগুন রঙের, কোনটা বা সাদা। চেনা কোন ফুলের সঙ্গে তাদের মিল নেই। মিল কেবল আনন্দ দেবার শক্তিতে। কয়েকটি আগুন রঙের ফুল তুলে নি—পরি নিজের চুলে, আর পরাই সঙ্গিনীদের খোঁপায়। সাথীদের কোটে পরিয়ে দি। সুন্দরানন্দজী তক্ষুণি মেয়েদের নামকরণ করেন—গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী। নির্মল আনন্দে সবাই হেসে উঠি।

চলছি ত চলছিই। পথশ্রমে ক্লান্ত আমরা। কয়েকজন পিছিয়ে পড়ি। জ্ঞান আর হরচাঁদ আমাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে চলছে। কিছুদূর গিয়ে দেখি দিলীপ দাঁড়িয়ে। কি ব্যাপার। এগিয়ে দেখি, পথ খুব বিপজ্জনক, গড়ানে ব'লে পার হওয়া খুব অসুবিধে। দিলীপ সাহায্য করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কষ্টকর পথটুকু আমাদের হাত ধ'রে টেনে পার করে নিলে। পেরিয়ে দেখি অগ্রগামী দল বিশ্রাম নিচ্ছে। দিলীপ তাদেরও পার করে দিয়েছে আর আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে!

শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও যেন সাড় হারিয়ে ফেলছে। দেহটুকুর সামর্থ্য নেই একটুও—গাইডদের হাতেই সেটার

গোমুখে ভাগীরথী

ভার তুলে দিয়েছি। তারাই ইচ্ছেমত চালাচ্ছে। আরও এগিয়ে দেখি সবাই, যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তবে কি পথ এখানে খুবই খারাপ? কল্পনা করবারও শক্তি নেই। ওরা যা বলছে সেই আদেশ পালন করি সম্মোহিতের মত। এখানে পাহাড়ে খানিকটা ভাঙা—অর্থাৎ ১২।১৪ ফুট ওপর থেকে নীচে নামতে হবে সোজা। নীচে বড় বড় পাথরের যেন মেলা বসিয়েছে কে! ভাঙা জায়গাটার ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করি। নিচেই সুন্দরানন্দজী দাঁড়িয়ে আদেশ করছেন, পাশে দিলীপ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বললেন—"পা ঝুলিয়ে ব'সে পড়ুন। বাঁ পা দিয়ে একটা পাথরের খাঁজ পাবেন, তাতে পায়ের ভর দিন।"

কিন্তু কোথায় পাথর? বলি—না কিছু ত পাচ্ছি না; মনে হয় বোধ হয় পা পৌঁছুচ্ছে না পাথরের খাঁজ পর্যন্ত। সুন্দরানন্দজী বলেন—"আচ্ছা ডান পা'টা একটু ঝুলিয়ে একটা ছোট্ট পাথরের কোণ পাবেন, সেটায় ভর দিন—এবার বাঁ পা'টা আরও নাবিয়ে দিন।"

ভয়ে ভয়ে নীচের দিকে তাকাই। খাড়া পাহাড়—তার গায়ে ঝোলানো আমার ডান পা একটা পাথরের কোণায় ঠেকেছে। সেটি এক ইঞ্চি পরিমাণ বেরিয়ে আছে। বাঁ পা আরও ইঞ্চি ছুয়েক ঝুলিয়ে দিতে দেড় ইঞ্চি চওড়া পাথরের খাঁজে পৌঁছুল।

"এবার হাত ছেড়ে দিন।"

ঝুপ ক'রে পড়লাম একেবারে দিলীপ সিং-এর কোলে। একটি শিশুকে নেবার মত করে, দিলীপ কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে নাবিয়ে দিল। বড় দেখে একটা পাথরে ব'সে পড়লাম পূর্বগামীদের পাশে। তাদের মুখে ভয়-বিস্ময়-আনন্দ মেশান হাসি। কথা ফুরিয়ে গেছে আগেই।

সহাস্য মুখে মাথা দুলিয়ে সুন্দরানন্দজী বলেন, "এবার চলুন।" আবার পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলা। নানা রঙের কালো, সাদা, হলদে, মেটে লাল মেশান ছিট ছিট পাথর। কিছুক্ষণ পর আবার ধ্বসা পাহাড়!

এবার দূরে দেখি, গঙ্গার বুক চওড়া হয়েছে। তার তীরে জঙ্গল। ওখানেই আশ্রয় নিতে হবে আজ। এখনও দু'মাইল পথ বাকি।

গঙ্গার বুক এবার চওড়া হয়েছে। আমরা বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি—কিছু বালি কিছু পাথরের ওপর দিয়ে। চীর গাছের জঙ্গল এগিয়ে এসেছে। পথও সহজ হয়েছে অনেকটা। গাইডরা অঙ্গুলি নির্দেশে দেখায়, ওপারের পাহাড়ের নীচে ভোজ ও চীর গাছের জঙ্গলের মধ্যে এক সাধুর কুটির।

সুন্দরানন্দজী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। আমরা ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। পথ ভুল হওয়ার আর কিছু নেই। দূরে দেখা যাচ্ছে চিরবাসা ধর্মশালা।

—•—

( আগামীবারে সমাপ্য )

# সঙ্গীত রেণেসাঁসের যুগপুরুষ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

[ ১৮৪০-১৯১৪ খ্রীঃ ]

উনিশ শতকে ভারতীয় সংস্কৃতির যে রেণেসাঁস্ বা পুনরভ্যুদয় বাংলা দেশে ঘটে, ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতও ছিল তার বিশিষ্ট অঙ্গ। নব জাগরণের প্রেরণা তখন জাতির মর্মমূলে এবং তার ফলস্বরূপ সংস্কৃতির নানা শাখায় আত্মপ্রকাশে উন্মুখ। নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতি এই মহান্ জাগৃতির ক্ষেত্রে পুরোধারূপে দেখা দিয়েছে। সংস্কৃতিগত-প্রাণ বাঙ্গালী তখন বিভিন্ন বিভাগে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর চিহ্নিত করছে। বাংলা দেশে যাঁরা নব নব ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন করছেন, তখন বৃহত্তর ভারতীয় পটভূমিতেও তাঁরা পরিগণিত হচ্ছেন পথিকৃৎরূপে।

শিক্ষা বিস্তারে, সমাজ সংস্কারে, ধর্ম আন্দোলনে, গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিতে, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায়, নাটক রচনায়, ইত্যাদির মতন উনিশ শতকে রাগসঙ্গীত চর্চায়ও সৃজনশীল বাঙ্গালী প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে বাংলা দেশে এবং তার প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়েছে—কলিকাতা। সাংস্কৃতিক নব জাগৃতির প্রাণকেন্দ্র—রাজধানী কলিকাতা।

এই সঙ্গীত-রেণেসাঁসের সঙ্গে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের জীবন চিরবিজড়িত। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন এই নবজাগরণেরও একাধিক মুখপাত্র ছিলেন। যথা, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে বহুমুখী অবদানের জন্যে শৌরীন্দ্রমোহনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতীয় সঙ্গীতের নতুন করে প্রচার ও প্রচলনের জন্যে যাঁদের কীর্তি সর্বাগ্রগণ্য, তাঁদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে অন্যতম। এ সম্পর্কে তাঁর সমগ্র কার্যাবলী যুক্ত করে দেখলে মনে হয় একক অবদান তাঁর সর্বাধিক। সঙ্গীতের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যেই যেন তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

সেই উজ্জীবনের যুগে সঙ্গীতক্ষেত্রে যত প্রকারের কার্যধারার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, শৌরীন্দ্রমোহন অগ্রসর হয়েছিলেন তার সর্বক্ষেত্রে। সেই ধারাগুলির উল্লেখ করলে তাঁর সঙ্গীতকৃতির একটি রূপরেখা পাওয়া যাবে। যথা,—

(১) বিশিষ্ট গুণীদের কাছে তাঁর রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষা।

(২) প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রাদির পুনরুদ্ধার এবং মুদ্রণ প্রকাশের প্রচেষ্টা।

(৩) সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে এবং পদ্ধতিগত ভাবে সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্যে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন।

(৪) সর্বভারতীয় সঙ্গীতগুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশনের দ্বারা উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের প্রচলন ব্যবস্থা।

(৫) ইংরেজীতে পুস্তকাদি রচনার দ্বারা পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার ও তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

(৬) বাংলা ভাষায় মূল্যবান্ সঙ্গীত সাহিত্য রচনা এবং সঙ্গীতের একাধিক বিষয়ে প্রথম পুস্তক-প্রণয়নের পথ প্রদর্শন।

(৭) ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী পরিকল্পিত ও রচিত প্রথম স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচারে সাহায্য এবং স্বয়ং বহুল পরিমাণে স্বরলিপি রচনা ও প্রকাশন।

(৮) ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রাদির সংগ্রহশালা স্থাপন, দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন রাগরূপের চিত্রাবলী অঙ্কন, প্রতিভাবান্ শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত গুরুর নিকট সঙ্গীত-শিক্ষার সুব্যবস্থা, ইত্যাদি।

উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটির এখানে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হ'ল। অবশিষ্টাংশ তাঁর জীবনকথায় বিবৃত করা হবে।

ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর প্রথম এবং সম্ভবত প্রধান গুরু ছিলেন সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। "আমার হিন্দু-সঙ্গীতের অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী"—শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর একটি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল গোস্বামী মহাশয়ের শিক্ষা

ও সাহচর্য্য লাভ করেন তিনি। সঙ্গীতগ্রন্থাদি রচনার সময়েও ভারতীয় সঙ্গীতের নানা তথ্য ও তত্ত্বের জন্যে ক্ষেত্রমোহনের অনেক সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন। আবার তিনিও উপযুক্ত শিষ্যরূপে গোস্বামী মহাশয়কে বিশেষ সাহায্য করেন শেষোক্তের কোন কোন গ্রন্থরচনার বিষয়ে।' গ্রন্থরচনাদির বিষয়ে তাঁদের দু'জনের মধ্যে এতখানি সহযোগিতা ছিল যে, তাঁদের এই সম্পর্কে প্রচেষ্টাকে পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়। যেমন, তাঁর "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা"র রচনায় ক্ষেত্রমোহনের অনেকখানি সাহায্য ছিল, তেমনি ক্ষেত্রমোহনের "সঙ্গীতসার" প্রণয়নে তাঁরও সবিশেষ সহযোগিতার কথা গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং স্বীকার করেছেন "সঙ্গীতসার"-এর অনুক্রমণিকায়: "শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণপূর্বক আমি প্রথমে রাগের আলাপ, তাল, লয়, গ্রাম, গমক, মূর্ছনা, শ্রুতি প্রভৃতির লক্ষণ ইত্যাদি অনেকটি স্থূল স্থূল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। পরে উক্ত শ্রীযুক্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (আমি যাঁহাকে সঙ্গীতশাস্ত্রের ছাত্র বলিয়া অভিমান করি) সেই আয়ুষ্মান শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় মৎপ্রণীত সেই পুস্তকদৃষ্টে আদরাতিশয্যে উৎসাহ প্রদানপূর্বক আমাকে সাধারণের নিকট প্রস্তুত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়া অপরিমিত যত্ন ও পরিশ্রম প্রাচুর্য স্বীকারকরত নানা সংস্কৃত, ইংরেজী ও পারস্য প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়া তত্তৎ গ্রন্থের সারাংশ ও প্রমাণ, প্রয়োগাদি সমুদয় সংগ্রহপূর্বক আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রভূতরূপে পল্লবিত করিয়াছেন এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে আমাকে সেই ধনকুবের বদান্যবর মহোদয় সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্যও করিয়াছেন, ফলে তাহা হইতেই আমি এই দীর্ঘকলেবর সঙ্গীতসার গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা ও প্রকাশকর্তা হইয়াছি।"

তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু হলেন বারাণসীর প্রসিদ্ধ বীণাবাদক লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র। এই মিশ্র পরিবারের কাছে বাঙ্গালী সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে বিশেষ ঋণী। লক্ষ্মীপ্রসাদের অপর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদাসহায় এবং গোপালপ্রসাদের কাছে বিখ্যাত টপ্পা ও খেয়ালগায়িকা রুক্মিণি এবং খ্যাতনামা ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (নুলো গোপাল নামে সুপরিচিত) যথাক্রমে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ অনেক দিন শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত দরবারে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর কাছে রাগবিদ্যা ও যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়ে শৌরীন্দ্রমোহন বিশেষ লাভবান হন। ক্ষেত্রমোহন "সঙ্গীতসার" গ্রন্থ রচনার পূর্বে শৌরীন্দ্রমোহন (এবং যতীন্দ্রমোহন) ভারতীয় নেতৃস্থানীয় গুণীদের সঙ্গীত বিষয়ে মতামত নেবার জন্যে তাঁদের যে সম্মেলন পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে আহ্বান করেছিলেন, বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ছিলেন তার প্রধান হোতা। শৌরীন্দ্রমোহনের তৃতীয় সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য সেতার ও সুরবাহারবাদক সাজ্জাদ মহম্মদ। সাজ্জাদ মহম্মদ হলেন সুরবাহার যন্ত্রের প্রবর্তক ওস্তাদ গোলাম মহম্মদের পুত্র ও শিষ্য। তানসেনের কন্যাবংশীয় গুণী ওমরাও খাঁর শিষ্য উক্ত গোলাম মহম্মদের দুই ভারতবিখ্যাত শিষ্য সাজ্জাদ মহম্মদ (পুত্র) এবং মহম্মদ খাঁ (সুরবাহার-গুণী জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতগুরু) বহুদিন বাংলা দেশে ছিলেন এবং কয়েকজন বাঙ্গালী তাঁদের কাছে বিশেষ ভাবে সঙ্গীতশিক্ষা করবার সুযোগ লাভ করেন। সাজ্জাদ মহম্মদ তাঁর শেষ জীবনে দীর্ঘকাল শৌরীন্দ্রমোহনের আশ্রয়ে বাস করেছিলেন এবং শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর কাছে সেতার শিক্ষা করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় আসবার আগে সাজ্জাদ মহম্মদ অনেক দিন রাণাঘাটের পাল চৌধুরী মহাশয়দের আবাসে ছিলেন এবং সে সময় বাংলার আর এক গুণী সেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য তাঁর কাছে সেতার ও সুরবাহারের তালিম পেয়েছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনের কোন শিষ্যধারা বর্তমান নেই। কিন্তু সাজ্জাদ মহম্মদের অপর কৃতী শিষ্য বামাচরণের পুত্র, পৌত্রাদি জিতেন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য ক্রমে এবং তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্য ধারায় সাজ্জাদ মহম্মদের বাদন-পদ্ধতি আজও বাংলা দেশে বর্তমান আছে।

শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতশিক্ষার প্রসঙ্গে আরও একটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত বিষয়েও তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি যে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ভালভাবে শিক্ষা করেছিলেন তা তাঁর "Universal History of Music" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায়। সত্যই এ বিষয়ে তাঁর শিক্ষা ছিল। জনৈক জার্মান সঙ্গীতজ্ঞের কাছে তিনি পিয়ানোর পাঠ নিয়েছিলেন অনেকদিন ধরে। তা ছাড়া ইউরোপের নানা দেশ থেকে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের বহুমূল্য পুঁথিপুস্তক সংগ্রহ করে চর্চা করতেন। ইউরোপের দেশে দেশে তাঁর সঙ্গীতবেত্তারূপে মর্যাদা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের কথা পরে বর্ণিত হবে।

ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে যে তিন জন গুণীর কাছে তাঁর সাক্ষাৎ শিক্ষালাভের কথা বিবৃত হ'ল, তাঁরা ছাড়া অন্যান্য বহু গুণীর সাহচর্য তিনি লাভ করেছিলেন,—অবশ্য শিষ্যরূপে নয়। ভারতের যত খ্যাতনামা গায়ক-

বাদকদের কলকাতায় আগমন ঘটেছে, তাঁদের অনেকেরই আসর হয়েছে তাঁদের পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদে। লক্ষ্ণৌর নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতার কথা শোনা যায়। সেকারণেও মেটিয়াবুরুজ দরবারের অনেক গুণীর আগমন হয়েছে পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতাসরে। এমনি ভাবে যে সমস্ত কলাবত ও সঙ্গীতবিদের সঙ্গীত পরিবেশন শৌরীন্দ্রমোহনের আসরে হয়, তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায়। যথা: বারাণসীর ধ্রুপদী জোয়ালাপ্রসাদ ও কমতাপ্রসাদ, ধ্রুপদী মুরাদ আলী, বেতিয়া ঘরাণার ভ্রাতৃদ্বয় শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র, ধ্রুপদ (ও খেয়াল) গায়ক আলী বক্স, তানসেনের পুত্রবংশীয় বলে কথিত মহাগুণী রবাবী বাসৎ খাঁ, লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁ, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং সাজ্জাদ মহম্মদ, আসাদুল্লা খাঁ কৌকভ (সরদ ও ব্যাঞ্জোবাদক স্বনামধন্য কৌকভ খাঁ) প্রভৃতি। বাঙালীদের মধ্যে উক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ভিন্ন ধ্রুপদী যদুভট্ট, মৃদঙ্গী কেশবচন্দ্র মিত্র, সেতার ও সুরবাহারবাদক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও পাওয়া যায়।

এমনি ভাবে একদিকে যেমন তিনি রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করেন এবং বহু কলাবতদের সঙ্গীতধারায় পরিপুষ্ট হয় তাঁর সঙ্গীত মানস, তেমনি আবার তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চা। অনেক প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি তিনি বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন করেন। তার মধ্যে কয়েকটি তিনি মুদ্রিত ও প্রকাশিতও করেছিলেন। যেমন, "সঙ্গীত দর্পণ", "সঙ্গীতসার সংগ্রহ," ইত্যাদি। সঙ্গীততত্ত্ব চর্চার এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে সঞ্চিত হয় তাঁর সঙ্গীতের জ্ঞান-ভাণ্ডার। এ জন্যেই তিনি তাঁর গ্রন্থাবলীতে ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা এবং তার মূল সূত্রগুলি প্রচার করতে সমর্থ হন। প্রায় একশ' বছর আগে প্রকাশিত তাঁর সমস্ত মতামত ও গবেষণা বর্তমানে নির্ভুল প্রতিপন্ন হবে না, কিন্তু সেজন্যে তাঁর গৌরবের কোন হানি নেই। গবেষণার ক্ষেত্রে চিরদিনই নতুন নতুন আলোকপাতে পুরাণো ধ্যান-ধারণা কিছু কিছু পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, বিশেষ আদি-যুগের গবেষণার ক্ষেত্রে। শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন আধুনিক কালের প্রথম যুগের অন্যতম প্রধান গবেষক এবং সঙ্গীতের কোন কোন বিভাগের আলোচনায় ও গবেষণায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। সঙ্গীত-সাহিত্যে তাঁর বিরাট অবদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হবে। এখানে শুধু এই কথা বলা যায় যে, গবেষণা ক্ষেত্রের সেই আদি যুগে বিপুল সঙ্গীত-সাহিত্য রচনার জন্যে তিনি চিরশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শৌরীন্দ্রমোহন সেতারবাদনে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সেতারবাদক-রূপে তাঁর গুণপনার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হ'ল জনৈক বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পীর বিবৃতি থেকে। তিনি হলেন তৎকালীন ইউরোপের স্বনামধন্য বেহালাবাদক, হাঙ্গারীর এডওয়ার্ড রেমিনা, যিনি বেহালাবাদনের ক্ষেত্রে "রাজা" বলে আখ্যাত ছিলেন (King of Violin)। অধ্যাপক রেমিনী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় কয়েক দিনের জন্যে আসেন। সে সময় শৌরীন্দ্রমোহনের সেতারবাদন ও সঙ্গীতবিদ্যার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেন তিনি। শৌরীন্দ্রমোহন স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে তাঁর এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারবাদন অধ্যাপক রেমিনীকে শোনান। তাঁদের সেই দ্বৈত সেতারবাদন শুনে এডওয়ার্ড কি রকম মুগ্ধ হন সেকথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'Englishman' পত্রিকায়। সেই বিবরণী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হ'ল:

"Fortunately for me, a few days ago, I received a pressing' invitation from the Raja Sourindra Mohan Tagore to pay him a visit and to hear some real ancient Hindu Music. This was indeed a welcome invitation, as I had heard a great deal about the musical Raja. . . . . The Raja played upon a kind of hybrid Hindu Setar' Babu Kali Prasanna Banerjee had a genuine Hindu Setar in his hands, as long in shape as the one which the Goddess of Hindu Music and Learning Saraswati is represented as holding, and I may say also that it seemed to me that the legendary Hindu Goddess spread her protecting wings over the heads of the two musicians while executing that rhapsody. I was simply charmed and gave free expression to my pleasure. I listened with the greatest attention to this genuine music—music untouched by foreign influence—and everything became perfectly clear and intelligible to me. . . . . To my utter amazement I discovered during their fine performances, that Hindu Music is founded absolutely on the same basis as our own European Music, which by the way came also from the East. . . . . In conclusion, I have only to express my sincere thanks to the Raja Sourindra Mohan Tagore and Babu Kali Prasanna Banerjee for the musical revelation

with which they delighted me and which I am sure will yet delight many a musical scholar in critical Europe. . . . . ."

সংক্ষেপার্থ: "দিন কয়েক আগে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আমন্ত্রণে সত্যকার ভারতীয় (হিন্দু) সঙ্গীত শোনবার জন্যে তাঁর প্রাসাদে যাই। ইতিপূর্বে আমি এই সঙ্গীতজ্ঞ রাজার বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছিলাম। তাঁর এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার একত্রে শুনলাম। তাঁদের বাজনা শোনবার সময় আমার মনে হচ্ছিল যেন এই দুই সঙ্গীতবাদকের সুরসৃষ্টির সময় হিন্দু সঙ্গীত ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী তাঁদের রক্ষা করবার জন্যে তাঁর পক্ষ বিস্তার করে রয়েছেন। বিদেশী-প্রভাব-বর্জিত তাঁদের এই বিশুদ্ধ সঙ্গীত আমি একান্ত মনোযোগে শুনলাম। শুনে আমি সত্যই মুগ্ধ হয়েছি। সে সঙ্গীতের কিছুই আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হ'ল না। তাঁদের সেই চমৎকার সঙ্গীত পরিবেশনের সময় আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, হিন্দু সঙ্গীত আমাদের ইউরোপীয় সঙ্গীতের মতন একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের এই সঙ্গীতও ত প্রাচ্য থেকেই এসেছে। রাজা শৌরীন্দ্র-মোহন ও কালীপ্রসন্নকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই সুরলোকের আবিষ্কারের জন্যে। আমার নিশ্চিত ধারণা, সমালোচক ইউরোপের অনেক সঙ্গীত-বেত্তাই এঁদের সঙ্গীতে পরিতৃপ্ত হবেন।"

এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। অধ্যাপক রেমিনী বিদেশী হলেও যথার্থ সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেন বলে বাদকদ্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মস্পন্দন অনুভব করেছিলেন।···

বাংলায় স্বরলিপি রচনার বিষয়েও শৌরীন্দ্রমোহনের নাম স্মরণীয় থাকবে। প্রথমে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, তার পর শৌরীন্দ্রমোহন এবং পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে স্বরলিপি প্রণালী প্রবর্তন করেন, তাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল পদ্ধতি এক। সেই স্বরলিপি বাংলা দেশে আকারমাত্রার পদ্ধতি নামে পরিচিত ও প্রচলিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শৌরীন্দ্রমোহনের কিছু আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও স্বরলিপি রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে কাজে উদ্‌যোগী হয়ে আত্মনিয়োগ করেন নি। এ প্রসঙ্গে আর একটি জ্ঞাতব্য কথা হ'ল যে, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইউরোপীয় রেখামাত্রা প্রণালীতে স্বরলিপি রচনা করেন শৌরীন্দ্র-মোহনেরও পূর্বে এবং কৃষ্ণধনের প্রথম পুস্তক "বঙ্গৈকতান" বাংলায় মুদ্রিত ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আদি স্বরলিপি গ্রন্থের গৌরবের অধিকারী (যদিও ক্ষেত্রমোহন তার প্রায় দশ বছর আগে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম ভারতীয় অর্কেস্ট্রা প্রবর্তনের সময়ে সেখানকার বাদকদের জন্যে প্রথম স্বরলিপি রচনা করেন, কিন্তু তা তখন মুদ্রিত হয় নি, মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ক্ষেত্রমোহনের "ঐকতানিক স্বরলিপি" গ্রন্থে)। কৃষ্ণধন-বাবুর রৈখিক প্রণালীর স্বরলিপি এদেশে প্রচলনের প্রচেষ্টা সফল হয় নি প্রধানত ক্ষেত্রমোহন' ও 'শৌরীন্দ্র-মোহনের পদ্ধতির উপযোগিতার জন্যে। ক্ষেত্রমোহনের স্বরলিপি প্রচারে শৌরীন্দ্রমোহন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি নিজেও তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে বহুসংখ্যক স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। স্বরলিপি প্রচলন তাঁর সঙ্গীতজীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি।···

শৌরীন্দ্রমোহন বিভিন্ন রাগে কয়েকটি বাংলা গানও রচনা করেছিলেন। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ রূপে কলকাতায় আসেন, সে সময় তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে বেলগাছিয়াতে একটি সম্মেলন হয় এবং সেই উপলক্ষে শৌরীন্দ্রমোহন-রচিত একটি গান সেই সভায় গীত হয়েছিল বিশুদ্ধ রাগে। বাংলায় দু'টি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত সঙ্কলন গ্রন্থ "বাঙ্গালীর গান" ও "সঙ্গীতসার সংগ্রহ"-তে যথাক্রমে তাঁর ৬টি ও ৫টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল।

ভূপালী—ঢিমা তেতালা

তোমার কটাক্ষে, নাথ, হয় সৃষ্টিস্থিতি লয়।<br>
পরাৎপর পরমাত্মা তুমি কর বেদ চয়॥<br>
চারিমুখে পদ্মাসন, পঞ্চাননে পঞ্চানন,<br>
করি তব গুণগান হয়েন আনন্দময়॥<br>
দুরাত্মা দেবেন্দ্র ছলে সতীত্বরত্ন হরিলে<br>
গৌতমের কোপবলে হয়েছি পাষাণকায়॥<br>
একবার পদাম্বুজ পরশে অর্ধ মনুজ<br>
হয়েছি অহে রজ, দেহ পদ পুনরায়॥

তিনি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলির একটি বিচিত্র সংগ্রহশালা তাঁর ভবনে স্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নানা স্থান থেকে আনিয়ে এবং বিচক্ষণ কারিকর সাহায্যে প্রস্তুত করিয়ে তিনি এই সংগ্রহকার্য সম্পন্ন করেন। এই অপূর্ব সংগ্রহশালা সঙ্গীতজগতের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। বহু বিশিষ্ট ভারতীয় ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ দেখতে আসতেন তাঁর সঙ্গীতযন্ত্রের এই বিচিত্র সংগ্রহ। তাঁর সংগৃহীত যন্ত্রগুলির কতকাংশ নিয়ে

পরবর্তীকালে কলকাতার মিউজিয়মের প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের বিভাগটি গঠিত হয়।

ভারতীয় চিত্রকলার রাজপুত পদ্ধতি প্রভৃতিতে বিভিন্ন রাগরূপের ধ্যানমূর্তি অঙ্কিত হয়েছিল। আধুনিককালে শৌরীন্দ্রমোহনেরও এ বিষয়ে কিছু দান আছে। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনাগুলির চিত্র অর্থাৎ রাগের ধ্যানরূপ দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কন করিয়েছিলেন। যেমন, "ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী" ইত্যাদির ছবি। বাংলা দেশে এও এক অভিনব প্রচেষ্টা। বিভিন্ন রাগের ধ্যান-চিত্র প্রস্তুত করিয়ে তিনি সম্ভবত মুদ্রণের যুগে প্রথম প্রচার করেন।

তাঁর সঙ্গীতপ্রিয়তার এবং সঙ্গীত-সম্পর্কিত কার্যধারার এমনি নানা পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দিক্ থেকে তিনি সেবা করেছেন ভারতীয় সঙ্গীতের। সেই সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞদেরও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক। গুণীদের যেমন তিনি অর্থ সাহায্য করতেন, প্রতিভাবান্ শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত গুরুর কাছে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতেন—যেমন করেছিলেন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সঙ্গীতের কত ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই তাঁর আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ পেত, মনে করলে বিস্মিত হতে হয়।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের হরকুমার মহোদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম হয় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। শৌরীন্দ্রমোহনের জননীর নাম শিবসুন্দরী দেবী, সুবিখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর পিতৃস্বসা। শৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম হয় তাঁদের পৈত্রিক ভবন, ৬৫, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে। এখানেই তিনি আমৃত্যু বাস করেন এবং এখানেই উদ্‌যাপিত হয়েছিল তাঁর অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সঙ্গীত-সাধনার ব্রত।

তাঁর প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা হয় বাড়ীতে। তার পর ৮ বছর বয়সে তিনি প্রবেশ করেন হিন্দু কলেজে। সেখানে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত পাঠ করেন। বিদ্যালয়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল ভূগোল ও ইতিহাস। হিন্দু কলেজে তিনি ভূগোল ও ইতিহাস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি যে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাও এই দুই বিষয়ে—"ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত।" তার পরের বছর তিনি "মুক্তাবলী নাটক" প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সঙ্গীতবিষয় ছাড়া নাটক ইত্যাদি নানা বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী, মৌলিক ও অনূদিত, ২০টিরও বেশি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, যেগুলি সঙ্গীত বিষয়ক নয়। যথা—রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাট্যকার) সহযোগে "মালবিকাগ্নিমিত্র," "মণিমালা," (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), "মানস পুজনম্," "কবিরহস্য," "Twenty principal Kavyakaras of the Hindus" (1883 A. D.), "Hindu Drama" (1880 A. D.), "Taravati" (English Translation), "The Dramatic Sentiments of the Aryas", ইত্যাদি এই সমস্ত পুস্তক ভিন্ন তাঁর সঙ্গীত গ্রন্থাবলীর পরিচয় পরে দেওয়া হবে।

সাধারণ সাহিত্য কিম্বা নাট্যশালা সম্পর্কে তাঁর কার্যাবলীর (জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সহযোগে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়" প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি) বর্ণনা না করে শুধু তাঁর সঙ্গীত-জীবনেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

অল্প বয়স থেকেই শৌরীন্দ্রমোহনের মন সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সঙ্গীত-প্রীতি লাভ করেছিলেন বলা যায়। তাঁদের পরিবার সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে বহু-বিখ্যাত। শৌরীন্দ্রমোহনের পিতামহ এবং পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরগোষ্ঠীর জনক দর্পনারায়ণ ঠাকুরের (১৭৩১-১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬১-১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্গীতক্ষেত্রে বিশেষ গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। গোপীমোহনের সঙ্গীতসভার সঙ্গে যেসব গুণী যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। যথা, মৃদঙ্গাচার্য লালা কেবলকিষণ, বিখ্যাত টপ্পাগায়ক ও গীতরচয়িতা কালী মীর্জা (রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতগুরু), গায়ক সজ্জু খাঁ, অন্ধগায়ক লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, প্রভৃতি। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীত-চর্চার পরিবেশ গোপীমোহন গঠন করেছিলেন। তার পর তাঁর পঞ্চম পুত্র হরকুমার (১৭৯৬-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) শুধু সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, সেতারবাদনেও চর্চা করতেন শোনা যায়। হরকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহন অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতসভার পত্তন করেন এবং তা ছিল কলাবতদের একটি প্রসিদ্ধ মিলনভূমি।

সুতরাং এই পরিবারের উত্তরসাধক শৌরীন্দ্রমোহন সঙ্গীতের আবহের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তা সহজেই ধারণা করা যায়। বাংলার ও পশ্চিমের নানা গুণী গায়কবাদকদের সঙ্গীতকৃতির সঙ্গে তাঁর অল্প বয়স থেকেই পরিচয়ের সূত্রপাত।

শৌরীন্দ্রমোহন সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন ১৭ বছর বয়সে। ১৬ বছরে তিনি হিন্দু কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে

তার এক বছর পর থেকে সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গীতশিক্ষার বিষয়ে তাঁর মনে প্রথম থেকেই ছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা। তিনি সে বছর দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন প্রতিমার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বর প্রার্থনা করেছিলেন যেন সঙ্গীতসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর মানসিক প্রবণতা কোন্ দিকে ছিল এবং তাঁর সত্ত্বাকে কেমন অধিকার করে রেখেছিল সঙ্গীত।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখদের কাছে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গীতের ক্রিয়াংশ নিয়ে শুধু তিনি তৃপ্ত রইলেন না। উপপত্তিক বিষয় আয়ত্ত করবার কাজেও আত্মনিয়োগ করলেন। সেজন্যে সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করতে লাগলেন সঙ্গীতশাস্ত্র। সংস্কৃত পুঁথি-পুস্তক বহু অর্থব্যয়ে তিনি আনয়ন করালেন কাশী, কাশ্মীর, নেপাল ও নানা দেশ-বিদেশ থেকে। মূল্যবান্ ও দুর্লভ সঙ্গীত গ্রন্থাবলী পাঠ করে তিনি সঙ্গীত-বিজ্ঞানের মর্মোদ্ধারে ব্রতী হলেন। বিশ্বসঙ্গীতের ইতিহাস, সঙ্গীত-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাবলী এবং সঙ্গীতকলা—এই তিন দিকের চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। সেই নিরলস সঙ্গীত-চিন্তা ও সঙ্গীত-জিজ্ঞাসার সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীত প্রচারের জন্যে তাঁর নানা কার্যাবলী যুক্ত হ'ল। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য—উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে পদ্ধতিগত শিক্ষার জন্যে সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান্ পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা। যে দু'টি সংস্কৃত গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ করেন তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হিন্দীতে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন—"গীতাবলী," কণ্ঠ-সঙ্গীত বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা। তাঁর বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থাবলীর তালিকা নিবন্ধের শেষ ভাগে দেওয়া হবে। তাঁর পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে একটি সংবাদ লিপিবদ্ধ করা এখানে আমরা কর্তব্য বিবেচনা করি। সেই ব্যয়-বহুল মুদ্রণ ও প্রকাশনের যুগে তিনি তাঁর রচিত ও প্রকাশিত সমগ্র গ্রন্থাবলী উপযুক্ত পাত্রে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন, কখনও বিক্রয় করেন নি। (রাজা রাধাকান্ত দেব যেমন তাঁর ৭ খণ্ডে প্রকাশিত সংস্কৃত অভিধান "শব্দকল্পদ্রুম" দান করেছিলেন।)

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহন "বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে, বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায় এবং প্রণালীবদ্ধ ভাবে এই প্রথম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত দুয়েরই শিক্ষা দেওয়া হ'ত এখানে। শিক্ষাদান করতেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, গুরুপ্রসাদ মিশ্র (পরে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর সঙ্গীতগুরু), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ মুখোপাধ্যায় (বেহালাবাদক এবং বাংলা ভাষায় বেহালাবাদন সম্পর্কে রচিত প্রথম গ্রন্থ "বাহুলীন তত্ত্ব" প্রণেতা), রামপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন (সেতারবাদক), প্রভৃতি। পরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অব্ মিউজিক" সঙ্গীত-শিক্ষাদান বিষয়ে আরও অগ্রসর হয় এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্তন করে। "বেঙ্গল মিউজিক স্কুল" (প্রথমটির ইংরেজী নাম) ও "বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অব মিউজিক" বাংলা দেশে রাগসঙ্গীতচর্চায় বিশেষ সাহায্য করেছিল। দুটি প্রতিষ্ঠানই তদানীন্তন সরকারের অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তা লাভ করে, যদিও শৌরীন্দ্রমোহন বিদ্যালয়গুলির জন্যে বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। শৌরীন্দ্র-মোহন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কয়েকজন কৃতী ছাত্র পরবর্তী জীবনে খ্যাতনামা হয়েছিলেন। যথা, সেতার-বাদক ও নাট্যকার বৈকুণ্ঠনাথ বসু (পরে রায় বাহাদুর), Blue Ribbon অর্কেষ্ট্রার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক দক্ষিণাচরণ সেন, ধ্রুপদী কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্যের পিতা এবং অমরনাথের প্রথম সঙ্গীত শিক্ষাদাতা), প্রভৃতি। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গীত বিদ্যালয়ে বেহালা-বাদন শিক্ষা করেন।

শৌরীন্দ্রমোহনের এই সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলির কথাই সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব ভাষায়: "ওদিকে আমার মেসোমশায় পাথুরে-ঘাটার ছোটরাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালোয়াতি গানের রীতিমত চর্চা করছেন। নর্মাল স্কুলে সঙ্গীতের ক্লাস খুললেন। ছোকরার দল—আমার সঙ্গীরা—সবাই সেখানে গান শিখছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, নুলো গোপাল—বড় বড় সঙ্গীতকার তাঁর আসরে গান করেন।..."

শৌরীন্দ্রমোহন ৩০ বছর বয়সে সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত করেন। বইখানির নাম "জাতীয় সঙ্গীতবিষয়ক প্রস্তাব।" এটি তাঁর একটি বক্তৃতার অনুলিপি। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাংলা ভাষায় সঙ্গীত বিষয়ে এইটিই প্রথম বক্তৃতা। তাঁর পূর্বে অন্য কেউ সঙ্গীত সম্পর্কে কোন বক্তৃতা করেন নি।

তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন ৩৫ বছর বয়স থেকে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে "ডক্টর অব মিউজিক" উপাধি দেন ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। তার পর রোমের

পোপ ত্রয়োদশ লিও শৌরীন্দ্রমোহনকে আমন্ত্রণ করেন সঙ্গীত-সম্পর্কিত উপাধি গ্রহণ করবার জন্যে। কিন্তু তিনি প্রাচীনপন্থী মনোভাবের জন্যে কখনও সমুদ্রযাত্রা বা বিদেশগমন করেন নি, সেজন্যে পোপের আমন্ত্রণেও তিনি রোমে উপস্থিত হন নি। তার পর বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড তাঁকে পদক উপহার দেন। তা ছাড়া, গ্রীসের রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েল, জার্মান-সম্রাট প্রথম উইলিয়ম এবং ইতালীর রাজা প্রথম হাম্বার্ট শৌরীন্দ্রমোহনকে তাঁদের নিজেদের ছবি উপহার দেন। ফ্রান্স, ইতালী, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, পোর্টুগাল, ইরান, চীন, শ্যাম, নেপাল, প্রভৃতি দেশ থেকেও তিনি সম্মান লাভ করেন। দেশবিদেশ থেকে তিনি এই সমস্ত সম্মান ও উপাধি লাভ করেছিলেন সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্যে এবং সেই কারণেই এগুলি উল্লিখিত হ'ল। রাণী ভিক্টোরিয়া যে তাঁকে কে. সি. এস্. আই. উপাধি দেন তাও তাঁর সঙ্গীতক্ষেত্রে অবদানের জন্যে। তার পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ডক্টর অব্ মিউজিক" প্রাপ্ত হন্ in absentia (উপস্থিত না থেকে)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর পূর্বে অন্য কোন ভারতীয় উক্ত উপাধি লাভ করেন নি। এ প্রসঙ্গে ইতালী ও ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত দু'টি বিশ্ব-গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করতে হয়। একখানি হ'ল, ফ্লোরেন্সের ওরিয়েণ্টাল একাডেমীর সম্পাদক অধ্যাপক এ্যাঞ্জেলো দ গিউবারনেতিস সঙ্কলিত Biographical Directory with portraits of three hundred eminent men of the world. এই গ্রন্থে শৌরীন্দ্রমোহনের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। দ্বিতীয়, প্যারিসের এম্, এমিলি আর্তান্দ প্রকাশিত Pelfege Universal Dictionary। এই পুস্তকে পৃথিবীর ৫০ জন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহনের নামও আছে এবং তাঁর রচিত একটি গৎ (স্বর সপ্তশতী) মুদ্রিত আছে পৃথিবীর অন্যান্য সুরকারদের সুরসৃষ্টির সঙ্গে।

সঙ্গীতে গুণপনার জন্যে, এবং তাও উনিশ শতকে, এতখানি আন্তর্জাতিক খ্যাতি কম গৌরবের কথা নয় এবং এই সমস্ত সম্মান তিনি অর্থের খাতিরে লাভ করেন নি, এমন বিশ্বাস করবার কারণ আছে। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার এই বৈদেশিক স্বীকৃতির প্রধান কারণ, তাঁর ইংরেজীতে লিখিত মূল্যবান্ সঙ্গীত-গ্রন্থাবলী। বিদেশের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মকথা প্রচার করবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর অবদানের জন্যে বিদেশের বিদ্বান্ সমাজে ভারতীয় সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভারতীয় সঙ্গীত লাভ করেছিল আন্তর্জাতিক মর্যাদা।

নেপাল দরবার থেকে তিনি লাভ করেন "সঙ্গীত নায়ক" ও "সঙ্গীত সাগর" উপাধি। তৎকালীন ভারত সরকার থেকে তিনি যে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন, তাও তাঁর সঙ্গীতচর্চার জন্যে, অর্থসম্পদের জন্যে নয়।

লণ্ডনের 'রয়াল কলেজ অব্ মিউজিক' প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক টাকা দান করেছিলেন। সেখানে তাঁর এই দানের একমাত্র সর্ত ছিল যে, ভারতীয় কোন ছাত্র বা ছাত্রী সঙ্গীতে বিশেষ গুণপনা প্রদর্শন করলে এই অর্থ থেকে প্রতি বছর একটি করে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে।

সঙ্গীত সম্পর্কে রচিত শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-গ্রন্থাবলীর নাম ও কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবার দেওয়া হ'ল। একটি কথা বলা সঙ্গত হবে যে, এই তালিকা সম্পূর্ণ কি না, অর্থাৎ এখানে উল্লিখিত হয় নি তাঁর এমন পুস্তক আছে কি না, সেবিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।—

১। জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৭৫ পৃঃ। ভূপালী, পূরিয়া ইত্যাদি রাগের কয়েকটি ধ্রুপদ গানের স্বরলিপি এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা।

২। যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা—"সেতার শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ।" ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৪২৩ পৃঃ। সেতার যন্ত্রের অবয়ব পরিচয়; বিভিন্ন তালের কথা; আশ, মীড়, মূর্ছনা, কৃন্তন, ইত্যাদি সাধনের প্রণালী বর্ণনা; বিভিন্ন ছন্দের রূপভেদ সম্পর্কে আলোচনা; নানা রূপের ৯৪টি গতের স্বরলিপি, ইত্যাদি। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত। বাংলা ভাষায় সেতার সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। এই পুস্তক রচনায় ক্ষেত্রমোহন তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং ৯৪টি গতের স্বরলিপির মধ্যে ৭১টি গোস্বামী মহাশয় কৃত।

৩। মৃদঙ্গ মঞ্জুরী—"মৃদঙ্গ শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ।" ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১৮৬+২০ পৃঃ। "সঙ্গীত বৃক্ষের বাদ্যরূপে যে একটি মহতী শাখা আছে, মৃদঙ্গ মঞ্জুরী গ্রন্থখানি তাহার মঞ্জুরী রূপে কল্পিত হইয়াছে।" মৃদঙ্গ যন্ত্রের উৎপত্তি, নির্মাণ প্রণালী ও পরিচয়, বিভিন্ন তালের কথা এবং বহু বোলের লিপি আছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীকে উৎসর্গীকৃত। বাংলায় মৃদঙ্গ বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

৪। হারমোনিয়ম সূত্র—১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৭৭ পৃঃ। হারমোনিয়ম সম্পর্কে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত

প্রথম গ্রন্থ। "হারমোনিয়মের পরিভাষা, স্বরবিবেক, স্বরগ্রাম, মাত্রা নিয়ম, উপবেশন, হস্তের নিয়ম, ভস্ত্রা সঞ্চালন ও অঙ্গুলি সঞ্চালনের নিয়ম" ইত্যাদি এবং বিভিন্ন রাগ ও তালের কয়েকটি গৎ ও গানের স্বরলিপি আছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীকে উৎসর্গীকৃত।

৫। যন্ত্রবোধ—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ভারতীয় ও ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রাদির বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ অভিধান জাতীয় গ্রন্থ। নানা প্রকার বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশী, সারঙ্গী, এসরাজ, শানাই, তব্‌লা ইত্যাদি ভারতীয় এবং প্রায় যাবতীয় ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় কথা; হিন্দু, পারসীক, আসীরীয়, ইহুদী এবং মিশরী ঐকতানবাদন সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনা। দেশ-বিদেশের বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বাংলায় প্রকাশিত প্রথম পুস্তক।

৬। ভিক্টোরিয়া গীতিমালা—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১৪১ পৃঃ। রাণী ভিক্টোরিয়ার সম্রাজ্ঞী হওয়া উপলক্ষ্যে রচিত। ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত কয়েকজন ব্রিটিশ রাজের বিষয়ে স্বরচিত বাংলা গানের বিভিন্ন রাগে স্বরলিপি।

৭। গীত প্রবেশ—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম খণ্ড। ৪০ পৃঃ। কণ্ঠসঙ্গীতের উপক্রমণিকা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেঃ এ্যাণ্ডাসন সাহেবের অনুরোধে বাংলা দেশের বিদ্যালয়গুলিতে সঙ্গীতশিক্ষা দানের পরিকল্পনা অনুসারে রচিত প্রাথমিক গ্রন্থ। রাগ ও তালে সন্নিবেশিত কয়েকটি গান।

৮। সঙ্গীতশাস্ত্র প্রকাশিকা—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৫৩ পৃঃ। সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থের অনুসরণে সঙ্গীতের সূত্রাবলীর আলোচনা।

৯। নৃত্যাঙ্কুর—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ২৬ পৃঃ। সঙ্গীতের অঙ্গরূপে এবং ভারতের নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে লিখিত নৃত্য সম্বন্ধে বাংলায় প্রকাশিত প্রথম পুস্তক। এই পুস্তিকা রচনার যুগে বাংলার শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে নৃত্যের চর্চা কিম্বা আলোচনা প্রচলিত ছিল না, এ বিষয়টি লক্ষ্যণীয়।

ইংরাজীতে রচিত সঙ্গীত গ্রন্থাবলী :—

(১) English verses set to Hindu Music—In honour of His Highness, the Prince of Wales. ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১৫৬ পৃঃ। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের আগমন উপলক্ষ্যে রচিত। কয়েকটি ইংরেজী কবিতায় ভূপালী, পরজ, বসন্ত, সাহানা, যোগীয়া, আলাহিয়া, হিন্দোলা, ললিত, সারঙ্গ, বেহাগ, ইত্যাদি রাগের প্রয়োগ এবং সেই স্বরগুলির স্বরলিপি।

(২) Six Principal Ragas—with a brief view of the Hindu Music. ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১৩০ পৃঃ। সচিত্র। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা এবং ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত, শ্রী, মেঘ ও নট-নারায়ণ এই ছয় রাগের পরিচয়, ধ্যান, এক-একটি চিত্র ও ইংরেজী স্বরলিপি। শেষে জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের দু'টি গান নাগরী লিপিতে মুদ্রিত এবং তাদের ইংরেজী স্বরলিপি। "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে···" বসন্তবাহার, মধ্যমান এবং "পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্..." সারঙ্গ, "শ্লথ ত্রিতালী।"

(৩) Short Notices of the Hindu Musical Instruments. ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৬৯ পৃঃ। বীণা, প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রাদির পরিচয়।

(৪) A Few Lyrics of Owen Meredith set to Hindu Music. ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১০০ পৃঃ।

(৫) A Vedic Hymn. ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। কুকুভা, খাম্বাবতী ও সৌরভী রাগে তিনটি বেদগানের ইংরেজী স্বরলিপি। ফুলস্ক্যাপ ৬ পৃঃ।

(৬) Fifty Tunes. ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৬০ পৃঃ।

(৭) A Few Specimens of Indian Songs. ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১১৩ পৃঃ। কয়েকটি হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্-খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রী, ভজন, রাগমালা ও বাংলা গানের স্বরলিপি।

(৮) Indian Music's Address to Lord Lytton. ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৬৭ পৃঃ।

(৯) Eight Tunes. ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১৮ পৃঃ। ভূপালী, কেদারা, হাম্বির, শঙ্করা, ঝিঁঝিট, গৌড়-সারঙ্গ, ইত্যাদি রাগের স্বরলিপি।

(১০) Hindu Music From Various Authors. ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

(১১) Musical Scales of the Hindus. ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১১৮ পৃঃ। ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্বগুলি দেখাবার উদ্দেশ্যে রচিত। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতিতে 'হারমনি' (বা 'বহুমিলন') প্রয়োগ কতখানি পর্যন্ত সম্ভব হতে পারে তারও আলোচনা আছে। তা ছাড়া আছে—সম্পূর্ণ, ওড়ব ও খাড়ব ঠাটের কয়েকটি রাগের স্বরলিপি।

(১২) Twenty-two Musical Srutis of the Hindus. ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৫১ পৃঃ।

(১৩) Seven Principal Musical Notes of the Hindus. ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৫২ পৃঃ।

(১৪) Indian Ragamala. ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ২৮ পৃঃ।

(১৫) Universal History of Music—together with various original notes of Hindu Music. ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ৩৫৪+২০ পৃঃ। শৌরীন্দ্রমোহনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় গ্রন্থ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সঙ্গীত-ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে শৌরীন্দ্রমোহনের Magnum Opus বলা যায়। এতে ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলমান ও বৃটিশ আমলে সঙ্গীতের কথা; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, মহীশুর, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা, ইত্যাদি প্রদেশ ও নেপালের সঙ্গীতের পৃথক্ আলোচনা এবং নিম্নলিখিত দেশগুলির সংক্ষিপ্ত সাঙ্গীতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে: চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, পারস্য, আরব, এশীয় তুর্কী। ইউরোপীয় তুর্কী, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ইতালী, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং মাদাগাস্কার। অষ্ট্রেলেশিয়া, মলয়েশিয়া, পলিনেশিয়া, ইত্যাদি।

(১৬) Srimad Victoria Mahatyam—Sanskrit poems set to music with an English translation and 63 illustrations. ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ২৯৯ পৃঃ। কেদারা, ধানশ্রী, মালশ্রী, পাহাড়ী, রামকেলী ইত্যাদিতে সংস্কৃত গানের এবং কানাডা প্রভৃতি বৃটিশ উপনিবেশের সঙ্গীতের স্বরলিপি।

শৌরীন্দ্রমোহনের এই গ্রন্থাবলী থেকে ধারণা করা যায় সঙ্গীতের ইতিহাস ও তত্ত্ববিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা। সে পাণ্ডিত্য গভীর ও ব্যাপক ছিল বললেও যথেষ্ট হয় না। বিচিত্র বিশ্বের দেশ-বিদেশের সঙ্গীত-ধারায় অবগাহন করেছিল তাঁর সঙ্গীতমানস। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার বিশ্বদৃষ্টির অধিকারী, বিশ্বসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মূলসূত্রের সন্ধানী।

তাঁর ইংরেজীতে সঙ্গীতগ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যের কথা আগে একবার বলা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতীয় রাগের ইউরোপীয় স্বরলিপি প্রচার করে, ভারতীয় সঙ্গীতের সূত্রাবলী ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করে—তিনি ইংরেজী ভাষাভাষী জগতে রাগসঙ্গীতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীরা যাতে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মগ্রহণ করতে পারে সেজন্যে তিনি অর্থ ও সামর্থ্যের চূড়ান্ত করেছিলেন। বিশ্বসঙ্গীতের গুণগ্রাহী হলেও বিদেশী সঙ্গীতের কোন বিভাগ যেখানে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানে তিনি ছিলেন শেষোক্ত পক্ষের অতন্দ্র সেবক। সম্ভবত সেজন্যেই তিনি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত ইউরোপীয় পদ্ধতির রেখা-মাত্রার স্বরলিপি প্রচারের বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলেন।

শৌরীন্দ্রমোহনের বিপুল কর্মপূর্ণ সঙ্গীত-জীবনের পূর্ণ বিবরণ একটিমাত্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। সে বিষয়ে সব তথ্যও হয়ত উদ্ধার হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের একটি কাঠামো মাত্র উপস্থাপিত করা হ'ল।

শৌরীন্দ্রমোহনের প্রিয় রাগ ছিল, ভূপালী। অনেক গায়ক-বাদকদের তিনি ভূপালী শোনাবার জন্যে ফরমায়েস করতেন, শোনা যায়। তাঁর রচিত স্বরলিপি গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটিতে ভূপালী স্থান পেয়েছে। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত "তোমার কটাক্ষে নাথ···" গানটিতেও তিনি সুর দিয়েছিলেন ভূপালী।

তাঁর কোন সঙ্গীতশিষ্য ছিল না। তবে জানা যায় যে, তিনি তাঁর অন্যতমা ভ্রাতুষ্পুত্রী, যতীন্দ্রমোহনের কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে যন্ত্র-সঙ্গীতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীমতী মনোরমা দেবী (১৮৫৬-১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) শৌরীন্দ্র-মোহনের কাছে শিক্ষা করেন সুরকানন (হার্পের অনুকরণে গঠিত) ও পরে সেতার বাদন।···

শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতপ্রিয়তার একটি নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। তাঁর বাসভবনের বিপরীত দিকে পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের উপর উত্তরমুখী তাঁর আর একটি বাড়ীর বহির্ভাগ তিনি বিচিত্র ও অভিনব কারুকার্যে সজ্জিত করিয়েছিলেন। বাড়ীটির সামনের দিকে ফ্রেস্কো ধরণের কারুকর্মে গঠিত করিয়েছিলেন নানা ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং বাদকদের মূর্তি। তার একতলার, দোতলার বহিরঙ্গে এবং সর্বোচ্চ প্রাচীরে এই সমস্ত সঙ্গীতযন্ত্র এবং যন্ত্রীদের মূর্তি খোদাই করা ছিল।···হস্তান্তরিত এবং হত-গৌরব এই বাড়ীখানি তার বর্তমান জীর্ণ রূপ সত্ত্বেও মূর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্মরণ করিয়ে দেয় এক মহান্ সঙ্গীতপ্রেমীর প্রিয় পরিকল্পনা।···

এমনই ভাবে সঙ্গীত-জীবনযাপন করে, শৌরীন্দ্রমোহন ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। শেষ ৬ মাস তিনি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যু হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন। শেষ যাত্রার সময় তাঁর শিয়রে স্থাপিত রাখা হয় তাঁর আজীবন-প্রিয় সঙ্গীতযন্ত্র—একটি সেতার। সঙ্গীতৈকপ্রাণ শৌরীন্দ্রমোহনের এই শেষ দৃশ্য সেদিন দেখেছিল পাথুরিয়াঘাটায় সমবেত শোকাচ্ছন্ন জনমণ্ডলী।

তাঁর মৃত্যুতে ভারতবিখ্যাত স্বরোদী কৌকভ খাঁ "আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা"তে যে শোক প্রকাশ করেছিলেন, তা উদ্ধৃত করে আমরা উপসংহার করি : "ভারতের প্রায় অধিকাংশ দরবারে ঘুরিয়া আসিয়া আজ প্রায় ৮ বৎসর হইল কলিকাতায় আসিয়াছি। এখানে আসিয়া তাঁহার (যতীন্দ্রমোহনের) দরবারে আমার প্রথম চাকুরি হয়। সেইখানেই রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সহিত প্রথম আলাপ হয়, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, 'ছোট রাজার' মত সঙ্গীতজ্ঞ বাংলায় এমন কি সমগ্র ভারতে বুঝি আর নাই …তাঁহাকে শুনাইয়া মনের যে তৃপ্তি হইত বুঝি তাহা আর হইবে না।…"

# রবীন্দ্রনাথের দুইনারী-তত্ত্ব

শ্রীসুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন যে, সীমা ও অসীমের মিলনসাধনাই তাঁর সারাজীবনের কাব্যসাধনার পালা। সীমা ও অসীম বা জগৎ ও ব্রহ্মের মিলনসাধন তাঁর যেমন নিজস্ব একটি তত্ত্ব, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তেমনি তাঁর অতি প্রিয় একটি ভাবনা হ'ল "দুইনারী"-তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা, উৎস ও ফলশ্রুতি সম্বন্ধে যে ক'টি প্রত্যয়ের কথা বার বার বলেছেন জীবনদেবতাবাদ, সীমা-অসীম-বাদ আর 'দুইনারী'-বাদ তাদের অন্তর্গত। আবার ব্যাপক ব্যঞ্জনায় গ্রহণ করলে জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতাকে সীমা ও অসীমের প্রতীক যেমন ধরা যায় তেমনি দুইনারী-তত্ত্বের একজনকে (জননী) সীমা ও অপরজনকে (প্রিয়া বা উর্বশী) অসীমের রূপকরূপে ব্যাখ্যারোপ করে ঐ এক সীমা-অসীমের পালাসাধনার মধ্যে সার্বভৌম সমন্বয়ী পূর্ণতার কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা দর্শন করতে পারি।

"দুইনারী"-তত্ত্বটি যে কেবল উপন্যাস বা ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে তা নয়, বরঞ্চ উপন্যাসের বাস্তবক্ষেত্রে (practical application) প্রয়োগের পূর্বে এই তত্ত্বটিকে আমরা তাঁর কাব্যক্ষেত্রে বার বার লাভ করেছি। বিশেষ করে "চিত্রা"য় জীবনদেবতাবাদের পাশাপাশিই "দুইনারী"-বাদও স্থান লাভ করেছে।

এই দুইনারীর একটি হ'ল প্রেয়সী, আর একটি শ্রেয়সী, একটি কল্যাণাসত্তা যার প্রতীক লক্ষ্মী; আর একজন হলেন নারীর লীলাবিলাসী প্রিয়াসত্তা যার প্রতীক উর্বশী। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, মেয়েরা হ'ল দু'জাতের—একালে জন্ম থেকেই সেবাময়ী শান্তবিনম্র করুণার প্রতিমূর্তি, তাদের মধ্যে আযৌবন মমতাময়ী সেবাব্রতা কল্যাণা লক্ষ্মীসত্তাই মহিমময় ভাবে পরিস্ফুট। অপর এক জাতের মেয়ে আছে যারা আজীবন যৌবনমদিরাবিভোর, লীলামধুরা নৃত্যচপলা, সৌন্দর্যময়ী প্রিয়ারূপিনী। "দুইবোন" উপন্যাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর "দুইনারী"র স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন :

"সাধারণভাবে মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুইয়ের মিশোল।" প্রিয়ারূপিনী উর্বশী আর মাতৃরূপিনী কল্যাণী লক্ষ্মী—এই যে দু'জাতের নারী, রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞা দিয়েছেন তাঁর "চিত্রা"র "উর্বশী" কবিতায়। যদিও "উর্বশী" বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসত্তার (Intellectual Beauty-র) অভিব্যক্তি, তথাপি রবীন্দ্রনাথের কথামতই তা একেবারে অমূর্ত নয়, তার মধ্যে নারীত্বের প্রকাশও কিছু আছে :

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী"—

তবে উর্বশী কি? তাঁর অমূর্ত সৌন্দর্যসত্তার কথা

বাদ দিয়ে বলা যায় সে—প্রেয়সী, নারীর চিরন্তন লীলা-বিলাসী প্রেয়সীসত্তার প্রতীক সে। "দুইনারী"র জাতের একটি সে। এই শ্রেণীর নারীরা কারও গৃহিণী বা জননী বা প্রাত্যহিক ঘরকন্নার জন্য নয়, এরা পুরুষের চিত্তবিনোদনের, প্রেরণার ও নর্মসহচরীরূপে সঞ্চরমানা। এদের বিপরীত স্বভাবের আর এক ধরনের মেয়ে আছে যারা পুরুষের সেবা ও কল্যাণই ব্রত বলে জানে আর পুরুষের জন্য নিঃশেষে আত্মনিবেদন ও ত্যাগই নারীত্ব বলে মানে। রবীন্দ্রনাথ "উর্বশী" কবিতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এক চিঠিতে বিষয়টি বেশ সহজ করে বুঝিয়ে বলেছেন :

"আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে The Beautiful, এক ভাগে The Good পড়ে। 'উর্বশী' কবিতায় প্রথমোক্তটির জয়গান আছে; 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় দ্বিতীয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়।"

[ 'চিত্রা'র গ্রন্থপরিচয় দ্রঃ ]

The good-এর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধার শেষ নাই এবং জননী-জাতীয়া নারীই বেশির ভাগ পুরুষ হয়ত জীবন-সঙ্গিনীরূপে কামনা করে, কিন্তু পুরুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা প্রিয়ারূপিনীদের জন্যও কম নয়। বিশেষতঃ "এমন পুরুষও নিশ্চয়ই আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালই বাসে না। তারা চায় যুগলের অনুসঙ্গ।"

( "দুইবোন"-ভূমিকা দ্রঃ )

এই শ্রেণীর পুরুষের লালসা বা বাসনা উর্বশীশ্রেণীর নারীর পিছনে ঘুরে বেড়ায়। তবে সাধারণ ভাবে নারী এবং পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই বাস্তব সত্যটি হ'ল পুরুষের উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর নারীই প্রয়োজনীয়, এবং আকাঙ্ক্ষনীয় এবং একই নারীর মধ্যে উপরোক্ত 'দুইনারী'র সমভাবে উপস্থিতিও অসম্ভাব্য নয়। "চিত্রা"র 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় পুরুষ ও নারী উভয়েরই এই দুইরূপ চমৎকার ভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে :

"রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—"

নারী-পুরুষ সম্বন্ধে এই-ই হ'ল পরম ভাবসত্য। কিন্তু বস্তুসত্য এতে আছে কি না বা কতটা আছে সংশয়নীয়। রবীন্দ্রনাথের "দুইনারী"-তত্ত্বের একটি সামঞ্জস্য এই কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে: এখানে দেখান হয়েছে যে, একই নারীর মধ্যে সময় ও প্রয়োজনমত নারীর উর্বশী ও কল্যাণী ভক্তিমতী পূজারিণী দেবীমূর্তি লাভ করা যায়।

"চিত্রাঙ্গদা" নাটকেও কবি তাঁর 'দুইনারী-তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেখানেও "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতার মত নারীর দুই রূপের সঙ্গতি একই মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। (সার্থক হয়েছেন কি না তা এখানে বিবেচ্য নয়)।

কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিপ্রিয় প্রত্যয় কল্পনা "দুইনারী"-তত্ত্বের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য সন্ধানও করেন নি, প্রতিষ্ঠাও করেন নি। তিনি পূর্বালোচিত দু'জাতের মেয়েদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র-পরায়ণা বলে ধরে নিয়েছেন; অর্থাৎ মেয়েরা হয় পুরুষের চিত্তবিনোদিনী নর্মসহচরী ক্রীড়াকৌতুকময়ী প্রেয়সী, নয় সেবাময়ী সর্বস্বসমর্পিতা সর্বত্যাগিনী কল্যাণী জননী। এই দুই শ্রেণীর নারীর মধ্যে বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর "দুইবোন" ও "মালঞ্চ"-এর মত উপন্যাস। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রোপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের "চোখের বালি, গোরা, ঘরেবাইরে" উপন্যাসে বা "রাজা ও রাণী"নাটকে আমরা এই "দুইনারী-তত্ত্বের"বা দুইজাতের মেয়েদের সমস্যা দেখেছি। বিনোদিনী, বিমলা, ললিতা, উর্বশী বা প্রিয়া টাইপের চরিত্র আর আশা, সুচরিতা, সুমিত্রা দেবী বা জননী টাইপের চরিত্র। কিন্তু এই বৃহৎ উপন্যাসগুলিতে পুরুষের চিত্তে এই দুই ধরণের দু'টি করে প্রতিনিধিস্থানীয়া নারী যে ত্রিভুজ প্রেমাবেগের টানা-পোড়েনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে উপন্যাসগুলির মধ্যে, লেখকের সামাজিক দায়িত্ববোধ সক্রিয় থাকায় এবং বৃহত্তর পটভূমি, বস্তুভূমি ও জীবনপর্যালোচনা থাকায় শেষ পর্যন্ত গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে শেষরক্ষা হয়েছে। কিন্তু "দুইবোন" ও "মালঞ্চের" মত নিতান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ-বহির্ভূত সঙ্কীর্ণ পরিসরনিবদ্ধ উপন্যাসে কাহিনী মোটেই মুখ্য নয়, এখানে এই তত্ত্বটাই প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। এ দু'খানি উপন্যাসে যে রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য তত্ত্বটির ভাষ্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগ, লেখক ত স্বয়ংই ভূমিকাতে তা বলে দিয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যতই বলে থাকুন, "মালঞ্চ"কে কবির প্রিয় প্রত্যয় "দুইনারী"-তত্ত্বের ঔপন্যাসিকরূপ বলে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ "দুইনারী"-তত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা যায় যে, এই প্রত্যয় কতটুকু মননিষ্ঠ এবং ধ্রুব? নারীর মধ্যে স্বতন্ত্র দু'টি শ্রেণী না মনে করে একই নারীর মধ্যে বয়স, পরিবেশ ও সময় অনুযায়ী এই দুই রূপের প্রকাশ ঘটে। এটাই যথার্থ সত্য। কৈশোরে ও বয়ঃসন্ধিকালে বা বিবাহের পূর্ব বা বিবাহের কিছুদিন পর পর্যন্ত সব নারীই কম-বেশি প্রেয়সী, চিত্তবিনোদিনী

লীলাসঙ্গিনী। অবশ্য রক্ষণশীল পারিবারিক পরিবেশে ও সামাজিক প্রতিকূলতায় হয়ত নারীর এই প্রেয়সীরূপ ততটা স্ফূর্তি পায় না। আধুনিককালে যে নারীর প্রেয়সী বিনোদিনী মোহিনী মূর্তি বেশি আত্মপ্রকাশ করেছে তার কারণ এখন পরিবেশের আনুকূল্য আসছে। অপরপক্ষে পূর্বে বিবাহের পরদিন থেকেই বধূকে সেবাময়ী জননীরূপে দেখা গেছে শাশুড়ী ননদিনী অধ্যুষিত সামাজিক আদর্শ অনুযায়ীই। দ্বিতীয়তঃ মাতৃত্ব লাভ না করা পর্যন্ত সব মেয়েই প্রেয়সী থাকে, মাতৃত্ব লাভ করলে তাদের বাৎসল্য স্বামী-পুরুষটিকেও সন্তানের স্তরে নামিয়ে আনে। এ সবই স্বাভাবিক নারাত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত বিকাশ। মাতৃত্ব অর্জিত না হলেও কোন কোন মেয়ে স্বভাব-জননীসুলভ আচরণ করে থাকে, কিন্তু তাও কতকটা বেশি বয়সে। সুতরাং একই নারীর মধ্যে অবস্থানুযায়ী না বিকাশানুযায়ী পূর্বোক্ত দুই নারীর সত্তা বা মূর্তি আবির্ভূত হয়—তত্ত্ব হিসাবে এইটাই ঠিক। রবীন্দ্রনাথ "চিত্রাঙ্গদা" ও "চিত্রা"র কবিতায় এই তত্ত্বই ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু উপন্যাস দু'খানিতে এদের দুই বিরোধী সত্তা দু'জন পৃথক নারীতে আরোপ করে ত্রিভুজপ্রেমের সমস্যা সৃষ্টি করেছেন।

"মালঞ্চের" দুইজন নারী হ'ল নীরজা ও সরলা। পুরুষটি হলেন নীরজার স্বামী আদিত্য। দশ বৎসর অত্যন্ত সুখের দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করে নীরজা প্রথম মৃত সন্তান প্রসব করল এবং সেই সঙ্গে নিজেও মৃতপ্রায় হয়ে চিরজীবনের পঙ্গুত্ব নিয়ে শয্যালীন হয়ে রইল। সংসার ও আদিত্যের মালঞ্চের কাজে সাহায্য করার জন্য আদিত্যের যৌবনকালের বান্ধবী দূরসম্পর্কের বোন সরলা এল। এই সুযোগে সরলা আদিত্যের অবাধ মেলামেশার সুযোগে পুরানো বন্ধুত্ব নূতন তাৎপর্য লাভ করল। দশ বৎসর ধরে স্বামীকে অজস্র অপরিমিত ভালবাসা দিয়ে, ভালবাসা পেয়ে, একাধারে তার নর্ম ও কর্ম সহচরীরূপে জীবন কাটিয়ে এসে আজ যখন নীরজা ক্রমে ক্রমে নিজের আসনে সরলাকে দেখল এবং নিজের স্বামীর নির্মম ঔদাসীন্য ও নিষ্ঠুর আচরণ পেতে লাগল, তখন সে চেষ্টা সত্ত্বেও সরলাকে দাক্ষিণ্য ও ঔদার্য দিতে পারল না। মর্মান্তিক মর্মজ্বালায় ও অপরিসীম বেদনায় তার চিত্তের সমস্ত রস ও মাধুর্য শুকিয়ে গেল। অথচ কেউ তাকে এতটুকু করুণা করল না। সরলা বা আদিত্য কারই এতটুকু বিবেকদংশন বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই তাদের নির অমানুষিক আচরণের জন্য; উল্টে তারা সকলে নীরজাকেই তার উদারতার অভাব এবং ঘরে তাদের মিলনের পথ খুলে দিতে দেরি করার জন্য দোষারোপ করছে। অবশেষে সত্যই নীরজার অন্তিমমুহূর্ত এল, কিন্তু কি শোচনীয়, কি মর্মান্তিক সেই পরিণতি। বিকারগ্রস্ত প্রেতিনীর মত সে উঠে দাঁড়াল, সরলাকে ক্ষমা করে যেতে পারল না।

এই হ'ল "মালঞ্চে"র কাহিনীসার। রবীন্দ্রনাথের 'তত্ত্ব' অনুযায়ী নীরজা জননী ও সরলা প্রেয়সী শ্রেণীর নারী। "দুই বোন" উপন্যাসের কাহিনী, ভাব, ভাষা, ভঙ্গি, তত্ত্ব—সবই "মালঞ্চে"র অনুরূপ, বলা যায় "মালঞ্চ" "দুই বোনে"র পরিবর্তিত সংস্করণ। "দুই বোনে"র উর্মিমালা ও শর্মিলা যথাক্রমে প্রেয়সী ও জননীর প্রতীক, কিন্তু শর্মিলার সঙ্গে নীরজার চরিত্রের ব্যাপক ব্যবধান। শর্মিলা বাস্তবিকই জননী জাতীয়া নারী, স্বামী বা পুরুষের কল্যাণকামনাই তার স্বভাব, তাই নিজের আসনে নিজেরই বোনকে প্রতিষ্ঠিত দেখে জীবনের শেষ অঙ্কে স্বামীর প্রেমবঞ্চিতা হওয়ার অপরিসীম মর্মজ্বালা ও বেদনা চেপে রেখে সে অন্তিমমুহূর্তে স্বামীর হাত ধ'রে বলতে পেরেছিল—"উর্মিকে দিয়ে গেলাম তোমার হাতে। তার মধ্যেই আমাকে পাবে, আরও অনেক বেশি পাবে, যা আমার মধ্যে পাও নি।" (অথচ একথা বলার আগেই সে ব্যথায় নিষ্পেষিত অন্তরে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেছে—মিথ্যে, মিথ্যে; ঠাকুর, তুমি মিথ্যে।)

শর্মিলার এই মহত্ত্ব ও কল্যাণধর্মবোধ বা প্রেয়সী-সত্তা নীরজার ছিল না। তাই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথও তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন নি। শর্মিলাকে 'অসাধারণ', 'এ পৃথিবীর নয়' ইত্যাদি ব'লে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তার বদলে নীরজার বেলায় নিষ্ঠুরতার পরিচয়ই দিয়েছেন। নীরজার চরিত্র কিন্তু অধিকতর বাস্তব ও সম্ভাব্য, মনোবিজ্ঞানসম্মতও বটে। তবে কিনা, নীরজা মোটেই জননীজাতীয়া নারী নয়। আসলে নীরজাও প্রেয়সী শ্রেণীর মেয়ে। মাতৃত্বলাভ করলে সে কিরূপ হ'ত বলা যায় না, কিন্তু দশ বৎসরের দাম্পত্যজীবনে সে আদিত্যের মালঞ্চের মোহিনী নর্মসখা মালিনীই ছিল। উর্মির সঙ্গে শর্মিলার বিরোধ প্রকাশ্য হয় নি, শর্মিলার বাস্তবিক জননী লক্ষ্মীসত্তার জন্য আর সরলার সঙ্গে নীরজার শুষ্ক ভয়ঙ্কর সংঘাতের হেতু তারা দু'জনেই আসলে একজাতের মেয়ে, তাই ত নীরজা সরলাকে স্বামীর কল্যাণের জন্যও ক্ষমা করতে পারে নি। সুতরাং "মালঞ্চ" উপন্যাসের সঙ্গে "দুই বোনে"র কাহিনী-বিন্যাস-গত যতই ঐক্য থাক, "দুই বোনে"র "দুইনারী"-তত্ত্ব কোনমতেই "মালঞ্চে" প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অবশ্য নীরজার

নিজের ভিতরের দ্বন্দ্বকে আমরা একই সত্তায় নারীর উপরোক্ত 'দুইরূপের দ্বন্দ্ব ব'লে গ্রহণ করতে পারি। যে নীরজা আপ্রাণ চেষ্টা করছে অন্তত: অন্তিম সময়ে সরলাকে স্বীকার ও ক্ষমা ক'রে নিতে সে তার লক্ষ্মী-কল্যাণী সত্তা আর যে কিছুতেই তাতে সমর্থ হ'ল না সে তার প্রেয়সী-সত্তা। সরলা কুমারী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও (কোন সমালোচক বলেছেন) আসলে সে মায়ের জাতের, তার কোমলতা, অচপলতা, ভীরুতা, সেবাপরায়ণতা ও নীরব প্রেমের কল্যাণবোধ লক্ষ্মীরূপেরই আভাস দেয় ইত্যাদি। কিন্তু একথা স্বীকার করতে বাধে। সরলার মধ্যে যদি একটুও কল্যাণবোধ থাকত তাহলে সে স'রে যেত, নীরজাকে এত বড় প্রবঞ্চনা করত না। তার প্রেম ভীরুও নয়, নীরবও নয়। নীরজার প্রতি তার নিষ্ঠুরতাই দেখেছি বাহ্য অনুকম্পার আড়ালে।

সব শেষে রবীন্দ্রনাথের "দুইনারী"-তত্ত্ব এবং "মালঞ্চে" তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন তোলা যায়। যে দু'টি উপন্যাসে লেখক তাঁর প্রিয় প্রত্যয়টি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেলেন তার একটিতেও তাঁর কোন নায়িকা সন্তানসম্ভবা বা সন্তানের জননী নয়। নীরজার সন্তানটিকে তিনি বাঁচিয়ে রাখলেন না কেন? নীরজা মাতৃত্ব অর্জন করলে "মালঞ্চ" উপন্যাসের সমস্যা অন্যরূপ হ'ত নিশ্চয়। "চিত্রাঙ্গদা"য় দুইনারী-তত্ত্বের মীমাংসা হয়েছে যখন চিত্রাঙ্গদা কুমারসম্ভবা হয়েছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, যতক্ষণ মাতৃত্ব অর্জন না হয় ততক্ষণই মেয়েরা উর্বশী বা প্রেয়সী থাকে। অবশ্য শর্মিলার মত মেয়েরা 'মাতৃত্ব' অর্জন না করেও মাতৃভাবাপন্ন; কিন্তু নীরজা তার মত নয়। অপরপক্ষে তার নিজের মধ্যেই দুই নারীসত্তার দ্বন্দ্বের যে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে তাতেও প্রেয়সীসত্তারই হয়েছে জিত। তাই এ কথা বলা যায় যে, "মালঞ্চে" "দুইনারী"-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বরঞ্চ "তিন সঙ্গী" গল্প সঙ্কলনে "দুইনারী"-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোহিনী উর্বশী বা প্রেয়সী নারী-শ্রেণীর সার্থকতম দৃষ্টান্ত। তার কারণ সে মাতৃত্ব অর্জন করেছে – সে নীলার মা। কিন্তু এই মাতৃত্ব সে যেমন বৈধভাবে পায় নি তেমনি কন্যার প্রতি তার বাৎসল্যের মাতৃত্বের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয়ও দেয় নি। যাকে খাঁটি 'নহ মাতা, নহ কন্যা নহ বধূ' জাতের মেয়ে, বলে যারা বিবাহিত ও মাতৃত্বলাভ করেও জননীত্বের চেয়ে প্রেয়সীত্ব ও আজীবন লীলাচপল মোহিনীরূপের ব্যক্তিত্ব নিয়ে থাকে মোহিনী তাদের প্রতীক। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রিয় "দুইনারী"-তত্ত্ব কোথাও যদি যথার্থ প্রতিপন্ন হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে "তিন সঙ্গী"তে। [ বিভা ও অচিরাকে নারীর জননীরূপ ধরে নেওয়া যায় ] "মালঞ্চে" সে প্রয়াস অসার্থক!
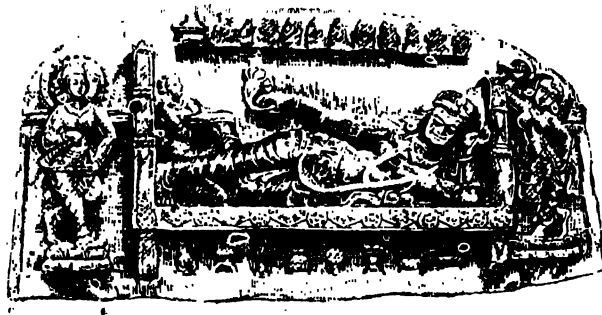
# লোকসঙ্গীত-সাহিত্যে মহিলার দান

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

াংলার লোকসঙ্গীত বলতে আমরা গ্রাম্য গানকেই বুঝে থাকি।

লোক শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। আর এই সাধারণ ানুষ দেশের মাটির মানুষ। গ্রামে-ঘেরা যে দেশ—যে-দেশের জনসাধারণ মাটির কোলে লালিত-পালিত, তারাই হচ্ছে ব্যাপক অর্থে জনসাধারণ। আমাদের দেশের এই জনসাধারণ অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং নদী-ত্বক দেশের মাঝি-মাল্লা। আর এদের বাস মাটির কোলে, নদীর জলতরঙ্গে। গ্রামের গেরুয়া মাটির পথে, বুজ ধানের ক্ষেতে, নদী এবং গহ্বরের বিস্তার জল-রাতে—এই সাধারণ মানুষ কাজ করে। কঠিন রিশ্রমের বিনিময়ে দিনের অন্ন সংস্থান করে।

এই কঠিন কাজে তারা শ্রমিক; কিন্তু গ্রামের বারিত প্রান্তর, নীল আকাশের রৌদ্র-মেঘের লীলা, দীর ছল ছল জলধারা, আর গ্রাম্য প্রকৃতির মধুর রিবেশ—কাজের মানুষকেও টানে। তাই কণ্ঠে তাদের । নিরক্ষর মনে স্বভাব-কবির গীতি-রচনার আবেগ। ই সুরে-ভরা আবেগ-ধন্য গানই হচ্ছে বাংলার লোক-গীত।

মুখে মুখে গান রচনা করে, স্বভাব-সিদ্ধ পরিবেশ-ফিক সুর সংযোজনায় যে সব গান পল্লী-প্রকৃতির স্পর্শ য়ে সাধারণ পল্লী-মানুষের ঘরে ঘরে প্রচলিত, তার া বংশানুক্রমে চলে আসছে। মাঠের কঠিন কাজে ভ'রে দেবার জন্যে ধান কাটার গান, গোচারণ ক্ষেত্রে খের সুশীতল ছায়ায় একটু বিশ্রাম লাভের জন্যে যে রাখালী গান, নদীর বুকে মাঝি-মাল্লাদের সারি, রি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, গৃহ-নির্মাণে ছাদ পেটার —এগুলি সবই শ্রমসঙ্গীত। অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রমের কে ফাঁকে মনকে অবকাশ রঞ্জনের মাধুর্যে ভরিয়ে লার গান। বহিপ্র্রকৃতির সঙ্গে অন্তর্প্রকৃতিও গান । বার মাসে বাংলা পল্লীর তের পার্বণ, সেই সব ব-উৎসারের গান, ধর্মগত সংস্কার থেকে উদার তির উদাত্ত আহ্বানে উধাও যে সব লোক-গীতি, াৎ বাউল, ফকির, মুর্শীদ, গুরুবাদ, বৈষ্ণব-গীতি তি জাতীয় গান অন্তর ধর্মময়।

বাংলা লোকসঙ্গীতের এই সব ঐতিহ্যের পাশে সাধারণ পল্লী-মেয়েদের যে সব গান—তারও একটা মস্ত পরিচয় আছে। গ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ—স্ত্রী এবং পুরুষের স্বভাব-সিদ্ধ মনের যে সব গীতি-রচনা এবং সুরারোপ তা নদী-মাতৃক দেশে নদী-সঙ্গমের মুক্তবেণীই রচনা করেছে। এই সব গান কবে থেকে সুরু হয়েছে আর এর ধারাবাহিক ইতিহাসই বা কি, তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

যে প্রকৃতি ফুলে-ফুলে শোভিত, যার আকাশে সপ্ত রঙ, যার নদীতে ঢেউ-এর পর ঢেউ, যার ধান্য-মঞ্জরীতে আনন্দের হিল্লোল, যার ঋতু-পরিবর্তনে নিত্য নব রূপ, তার রসের ভাণ্ডার অফুরন্ত। সেই অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার থেকেই অমৃতস্য পুত্রাঃ—অমৃতের সুর আহরণ করেছে।

শিক্ষিত সমাজের যে সাহিত্য, তার মাঝে পরিবর্তন আছে, পরিবর্ধন আছে; কিন্তু সহজ প্রকৃতির যে সব মানুষ—তাদের পরিবর্তনে শিক্ষা বা রুচির ছাপ নেই। তাদের ট্র্যাডিশন একটি ধারাকেই বহন করে চলেছে। যেমন একটি প্রবহমান নদী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে কাল হতে কালে। কিন্তু ভৌগোলিক পরিবর্তনে হয়ত কিছু গতির হেরফের থাকে—এই সব গ্রাম্য-গানেও তেমনি হয়ত কিছু পরিবেশের রদ-বদল দেখা যায়। কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এই সব গান পুরাতন পদ্ধতিকেই অনুসরণ করে চলছে।

বাংলা দেশে পল্লী-মেয়েদের মধ্যে যে সব পল্লীগান প্রচলিত, সেগুলি প্রায়শঃ মেয়েদেরই রচনা এবং তার সুরকারও তারা নিজেরাই।

মাটির অঙ্গনে যে অজস্র ফুল, আকাশের নীলিমায় যে রঙের আমেজ, গৃহকর্মের পরিশ্রমকে সুরের ছোঁয়ায় আনন্দময় করে তোলার যে প্রয়াস, বার-ব্রতে, উৎসব-কথা-উৎসারে ধর্ম, সমাজ ও প্রীতিময় যে পরিবেশ—তাই নিয়েই পল্লী-মেয়েদের গান, ছড়ার কল-কাকলী, কত উপকথার সম্ভার।

এই সব কথা ও সুর শিল্পের রচয়িতা বাংলা দেশের

পল্লী-মেয়েরাই। বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রাথমিক প্রকাশ তার ধর্ম-সংস্কারকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মমত প্রচার। এই ধর্ম থেকেই উৎসব-উৎসারের গান—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'Festival songs'.

মেয়েলি গ্রাম্য-গানেও এই ভাবকে দেখা যায়। বার-ব্রত থেকে আরম্ভ করে নানা মেয়েলিধর্ম এবং সামাজিক উৎসবের গান বাংলা দেশের সর্বশ্রেণীর মেয়েরা করে থাকেন। ধনী-দরিদ্র, সমাজের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সকল জাতের মেয়েদের মধ্যেই বার-ব্রতের প্রচলন।

ব্রত হচ্ছে মেয়েলি মনের কামনা। সুখের সংসার, ঐহিক থেকে পারলৌকিক মাঙ্গল্যকে আকাঙ্ক্ষা করা হয় ব্রতের ছড়ায়, আলপনার রেখা-অঙ্কনে। শাস্ত্র থেকে লোকাচার, ধর্ম থেকে সমাজ, ঈশ্বর থেকে প্রকৃতি, সমষ্টি থেকে ব্যক্তি—নানা ব্রতের নানা ছড়ায় ব্যক্ত হয়। ছড়ার প্রকৃতি হিসাবে সম্পূর্ণ অর্থ-সামঞ্জস্য এই সব ছড়ায় হয়ত নাও থাকতে পারে, কিন্তু ব্রতের উপকরণ আর রীতি-নীতিতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় মেয়েদের মনের কামনা, প্রকৃতির সৌন্দর্য-চিত্র, সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত। এই সব ব্রত-ছড়ার রচনায় যেমন সহজ প্রাণের আবেগ, সৌন্দর্য-বুদ্ধির প্রকাশ, সুরের মূর্চ্ছনাতেও তেমনি ছন্দের লালিত্য, প্রকৃতি প্রিয়চিত্তের কলতান, সহজ গাতি-পদ্ধতি। ভাদ্রের ভরা-নদীকে বন্দনা জানায় নদীমাতৃক দেশের পল্লী-মেয়েরা।

'এ নদী সে নদী একখানে মুখ
ভদ্রালী ঠাকরুণ ঘুচাবেন দুখ।'

ভরা ভাদরে ছল ছল নদীর একটি চিত্র। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবেকার সেই সমাজ-ব্যবস্থা। উদরান্নের সংস্থানে দূর বাণিজ্যে গেছেন সওদাগর স্বামী, শ্বশুর, ভাই। নদী-পথে বাণিজ্য-তরণী ভরা-নদীর জলে পাড়ি দেয়। ভাদুলী ব্রতে তারই চিত্র পরিস্ফুট।

'নদী নদী কোথায় যাও
বাপ-ভাইয়ের খবর দাও :
নদী তুমি কোথায় যাও
শ্বশুর-স্বামীর খবর দাও !!'

কত দূরান্তরের পথ, কত অজানা বন্দর, আর কত না বিঘ্নসঙ্কুল অরণ্যানী—সেই সব দেশে বাণিজ্যিক যাত্রা—

'কাঁটার পর্বত সোনার চূড়া আর উদয়গিরি,
আমার বাপ, ভাই, স্বামী, শ্বশুর কোথায় দেশান্তরী !
বাপ গেছেন, ভাই গেছেন, গেছেন কোন ব্রতে,
স্বামী গেছেন, শ্বশুর গেছেন, বাণিজ্যের খোঁজে।'

ভাদুলী ব্রতে এঁদের সুমঙ্গল যাত্রার মঙ্গল কামনা করে বাংলার পল্লী-মেয়ে—

'ভাদু দেবী, ভাদুলী দেবী তোমার পূজা করি
বাপ, ভাই, স্বামী, শ্বশুর আসেন যেন ফিরি !'.

নদী থেকে সমুদ্রে বিপদ-আশঙ্কা আরও বেশী। ভাদুলা ব্রতে ব্রতিনীরা তাই সমুদ্র বন্দনা করে। সাত সমুদ্র-তের-নদীকে প্রসন্ন অর্ঘ প্রদান করে সমুদ্রের সঙ্গে প্রাণের মিতালী পাতায়—

'সাগর সাগর বন্দি,
তোমার সঙ্গে সন্ধি !'

ব্রতের শেষে কামনা করা হয় স্বামী, শ্বশুর, বাপ, ভাই, পরিজনবর্গের নির্বিঘ্ন প্রত্যাগমন। তখন নৌকা বন্দনা করে ভাদুলী ব্রত শেষ করা হয়।

'এ গলুইয়ে চন্দন দিলাম
ও গলুইয়ে চন্দন দিলাম
বাপ পেলাম, ভাই পেলাম।'

প্রাচীন বাংলার এই চিত্রের সঙ্গে আধুনিক বাংলার সমাজ-জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ব্রতের মিষ্টি সুর আর ছড়ার কল-কাকলী, প্রকৃতি-বন্দনার সৌন্দর্য-বুদ্ধি পল্লী-বাংলার মেয়েলি-সাহিত্যকে আজও অপরি-বর্তনের মাঝে সেই আদিকালের প্রবহমান নদীর ধারার মতনই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বার মাসে এমনি অনেক ব্রত, কামনায় সৌন্দর্যে, সুরের কলতানে আজও উজ্জ্বল।

সেকালের মেয়েদের এই শিল্প-রচনার সঙ্গে আধুনিক কালের মেয়েদের রচনায় প্রকৃতির ছোঁওয়া আছে। সমাজ-পরিবর্তনের কিছু আভাসও আছে। তাই আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার টুসুর ছড়ায় পল্লী-মেয়ের রচনায় দেখা যায় আধুনিক সমাজ-চিত্রের টুকরো অংশ।

'ভেসে ভেসে চলে যাবো জুয়াচোরের বাজারে।'

ধান-ভানার গানে আজকের মেয়েলি কণ্ঠে শোনা যায়—

'ধান ভানতে গেল বেলা
হাতে পোলা কাঁখে পোলা।'

লোকসঙ্গীতে যেমন ধর্ম থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র-চেতনায় বর্তমানকালে প্রগতিশীল; মেয়েলি পাল-পার্বণ, ছড়া এবং গানের টুকরো কথায় বাংলা দেশের আজকের নিরক্ষর পল্লী-মেয়েরাও সমাজ-চেতনায় তেমনি মুখর। প্রাচীন বাংলার যে-সব মেয়েলি ব্রত, আধুনিক পল্লীগ্রামে এখনও তার প্রচলন। এখনও শোনা

যার ব্রতের ছড়ার মিষ্টি গানে সেকালের ঠাকুমাদের গান :

'বাড়ীর কাছে পাট বোনেতে জোনাকি টিপ জ্বালা
চাঁদ উঠেছে উদয় নিয়ে
বামুন পাড়ার পাশটি দিয়ে
বামুন মেয়ে লো কেন রে আছো শুয়ে ?
পৈতে যোগাও আজকে চাঁদের বিয়ে।'

মেয়েলি ছড়া গানে সমাজ-জীবনের চিত্র আজও টুকরো কথায় সাজান হয়।

'ও পারেতে দুইখানি পিঁড়ি ঘি মউ মউ করে
তারই উপর বাপ খুড়ো কন্যাদান করে।'

ধান্য-লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করার সানন্দ সুর আজও পল্লী-বাংলায় ঘরে ঘরে নবান্ন-উৎসবে মেয়েলি কণ্ঠে ব্যক্ত হয়।

'ধান এসো ছালা ছালা
তাই তুলতে এত বেলা।'

কিংবা :

'রাত্তেশ্বর দিল বর
ধান দিয়ে গোলা ভর।'

এমনি অসংখ্য মেয়েলি ছড়ায় পল্লী-বাংলার উৎসব-অঙ্গন আজও সুরে সুরে ভরা থাকে।

সামাজিক উৎসবে বিয়ের গান মেয়েলি-গানের একটি বিশেষ পর্ব। বিয়ের গান সবিশেষ পূর্ববঙ্গেই প্রচলিত। বিবাহের সকল প্রকার ক্রিয়া-কলাপ এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানকে নিয়েই বিয়ের গান। এই গানে হর-পার্বতী, কৃষ্ণ-রাধা এবং রাম-সীতা বাংলা দেশের এই সব লৌকিক দেব-দেবীর কথা শোনা যায়। অভিজাত্য পরিবার থেকে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সকল শ্রেণীর মহিলা সমাজেই এই গান প্রচলিত।

তখনকার দিনের কনে সাজানর গানের সঙ্গে আজকের কালের কনে সাজানর বিশেষ তারতম্য দেখি না।

'সীতার সুন্দর অঙ্গেতে চেলেনীর কোঁচাতে
সাজে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর মস্তকে সুন্দর বেণীটি
বেঁধেছে সীতা সুন্দর খোঁপাটি।
সীতার সুন্দর আঙুলে সোনার অঙ্গুরী
পর সীতা আভরণ হে !!'

অথবা,

'চল সজনী দেখে আসি সীতা সাজাবার বাকী কি।
আমরা বকুল বনে যাই,
বকুল ফুল টোকাই,
বকুল ফুলের মালা গেঁথে আমরা রাম-সীতা সাজাই !!'

বিয়ের গান, পুত্র-কন্যার অন্নপ্রাশনের গান থেকে ঘুম-পাড়ান গানে বাঙালী মেয়েদের অন্দর-মহল এবং সামাজিক উৎসব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পল্লী-শিক্ষা বিস্তারে নিরক্ষর থেকে আক্ষরিক জ্ঞান-সম্পন্ন, উচ্চ হতে মধ্য এবং মধ্য হতে নিম্নশ্রেণীর পল্লী-রমণীদের মধ্যে আজও এসব গানের প্রচলন দেখা যায়।

বারমাস্যা গান বা seasonal songs-এ ঋতু-বৈচিত্র্যের যে আস্বাদ—তার সঙ্গে বিরহের একটি দ্যোতনা পল্লী সুরের পল্লী গানের একটি বৈশিষ্ট্য।

'আসাঢ় তো মাসে তেরে বরিষার জল ঝরে
বৈদ্যাশেতে সাধুর লাইগা প্রাণ কান্দিয়া মরে
বিস খাবো, জহর খাবো, ওরে বাপ ভাই
পারনিরে আনিয়া দিতে সাধুর দেখা নাই !'

এই সব গানে পল্লী-প্রকৃতির ষড়-ঋতুর চিত্রের সঙ্গে শুধু মাত্র নায়িকার বিরহের ভাবকে প্রকাশ করা হয়; আর এই সব পল্লী-গানের রচনায় বহু পল্লী-মহিলা গায়েনের স্বাক্ষর আছে।

ছেলে ভুলান ছড়ায় নির্দিষ্ট কাল নেই। শিশু মনকে সুরে, স্বপ্নে, কল্পনায় ভরিয়ে তোলার চিরন্তন ভাব এবং বস্তু বাংলা দেশের ছেলে ভুলান ছড়াগুলিতে। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনটির কোন কালে কোন রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্ব গুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।'

'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুর বাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজি-ফুল কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুমঝুম প-ঝুমঝুম সীতারামের খেলা॥'

'ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে।...ঘটনাগুলি স্বপ্নের মত অদ্ভুত, কিন্তু স্বপ্নের মত সত্যবৎ।'

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান॥'

'এই শিবঠাকুর কি কস্মিন্‌কালে কেহ ছিল এক-এক বার এ কথাও মনে উদয় হয়। হয়ত বা ছিল। হয়ত এই

ছড়াব মধ্যে পুবাতন বিস্মৃত ইতিহাসেব অতিক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে।'

'খোকা মানিক ধন,
বাড়ি-কাছে ফুলের বাগান, তাতে বৃন্দাবন।'

শিশুমনকে নিজেব মনে সুবে সুবে ভবিয়ে তুলে এই সব ছড়াব সৃষ্টি।

'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি আমাব বাড়ি এসো।
সেজ নেই মাদুব নেই, পুঁটির চোখে বসো।
বাটা ভবে পান দেব, গাল ভবে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব, ফুড়ৎ করে যেয়ো॥'

'বহুকাল হইতে আমাদের দেশেব মাতৃ-ভাণ্ডাবে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিযাছে, এই ছড়াব মধ্যে আমাদেব মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ ও সংগীতস্বব জড়িত হইযা আছে, এই ছড়াব ছন্দে আমাদেব পিতৃপিতামহগণেব শৈশব নৃত্যের নূপুর-নিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে।'

সামাজিক পবিবর্তনেব স্রোতে এই ছড়াগুলিব মধ্যে কিছু কিছু পবিবর্তনেব ছোঁয়াকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু কালেব রুচিতে এগুলি অরুচিকর হয়ে ওঠে নি এখনও। আব ভবসাব কথা এই মনোভাবকে ভিত্তি কবেই আজও মাতৃমন পুবাতন ছড়া স্মবণ ক'রে নতুন ছড়ায নতুন কালেব বর্গী, টিযাকে আহ্বান জানায।

লোক-সাহিত্যেব এই বৃহৎ অংশটি পল্লী-মাযেব বচনা। পল্লী থেকে শহবে, উত্তবকাল হতে পববর্তী-কালে এই টুকবো কথাব ফুলঝুবি, এই স্বপ্ন-কথাব সুব-বহতা নদীব কলতান তুলে চিব প্রবাহিনী ধাবায বযে চলেছে।

কবিতা, ছড়া, গান এবং সুবে পল্লী-বাংলার মেযেলি গান যেমন সমৃদ্ধ, প্রাচীন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত তাব গতি অপ্রতিহত; তেমনি কথা-সাহিত্যেও মেযেলি-গল্প, কথা-উপকথাব আদি-অন্ত নেই।

রূপকথায় রূপক গল্পগুলি, সাত-সমুদ্র তের-নদীর বর্ণনা, পক্ষীরাজ ঘোড়া, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, বাজপুত্র-রাজকন্যা, পাতাল-পুরী, দৈত্য-দানব থেকে আবম্ভ কবে শিয়াল পণ্ডিত ( animal story ), ভূতেব গল্প ( ghost story ), পবীব গল্প ( fairy tale ) -যে কত অসংখ্য পল্লী-মেযেব রচনা—তার সংখ্যা নির্ণয় কবা অসম্ভব। কত অসম্ভব, অবাস্তব কথা-কাহিনীব পায়ে মাথা কুটে এই সবকে সম্ভাব্য এবং বাস্তব-প্রিয কবে তোলার দুঃসাধ্য সাধনা পল্লী-মহিলা কথাকাববা করে গেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয।

সাহিত্য-বোধেব সংজ্ঞা যাঁদেব নেই, শুধুমাত্র স্বভাব এবং প্রবৃত্তিকে, স্নেহ এবং ভালবাসাকে অবলম্বন কবে পল্লী-নিবক্ষরা ঠাকুবমা, দিদিমাব দল যে অপরূপ লোক-সংস্কৃতি সৃষ্টি কবে গেছেন—বংশপবম্পবায় তা অমর। তাকে বামাযণ, মহাভাবতেব সঙ্গে তুলনা কবে কালোত্তব সাহিত্য বলতে পাবি।

আজকেব দিনের স্বল্প এবং উচ্চ শিক্ষিত মাতৃ-মনেও এব বিকাব নেই, বসেব খনি আজও শুষ্ক নয। ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ, এ্যাডভেঞ্চাবেব নতুন সংযোজন হচ্ছে বটে গল্প, কথা ও কাহিনীতে, কিন্তু মাযেব কণ্ঠেব গান, মাযেব মুখের গল্প, দিদিমা-ঠাকুবমাব ছড়া আব রূপকথা সেই পল্লী-মহিলা লোক-সাহিত্যেব টেক্‌নিক্‌কেই অনুসরণ কবে চলেছে। বিজ্ঞানেব প্রভাব, অর্থনীতিব কৌটিল্য, সমযেব স্বল্পতা, বিশাল অরণ্য, আকাশ-চুম্বী গিরিচূড়া এবং প্রবহমান নদীকে একেবাবে বিস্মবণেব অতল জলে ডুবিয়ে দেবে—এমন আশঙ্কা আমবা কবি না।

বিগতকাল থেকে অনেক সঞ্চয় করেছি আমরা, বর্তমানকালকে ভবিষ্যতেব সোনার সম্ভাবনায় ভবিযে তুলতে পল্লী-বাংলাব মেযেবা এবং আধুনিক শিক্ষারুচি-সম্পন্না শহবে মহিলাবা কি পিছিয়ে থাকবেন?

—

# বাংলা গীতিকাব্য ও রামপ্রসাদ

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া

বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভা সাধারণতঃ গীতিকবিতাধর্মী। তাই গীতিকাব্যের মধ্য দিয়েই বাঙালী-কবি আত্মপ্রকাশের সহজ পথ খুঁজে পেয়েছে। মনে হয় বাংলার মাটির সঙ্গে যেন গীতিকাব্যের একটা সহজ নাড়ীর যোগ আছে, বাংলা কাব্যের প্রাণোচ্ছল সুরের আবেগ এত প্রবল যে, বাংলা আখ্যান-কাব্যের প্রাণবস্তুটিও আসলে লিরিক। তাই মধুসূদন-নবীনচন্দ্রের আখ্যান-কাব্যের মধ্যেও বয়ে চলেছে লিরিকের ফল্গুধারা। এমন কি আমাদের মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেও কোন কোন সময়ে গীতিকাব্যের আভাস পাওয়া যায়।

বাংলা গীতিকাব্যের আদিম উৎস বলতেই আমাদের চর্যাপদগুলির কথা মনে পড়ে। এই পদগুলিকে এখন আমাদের হেঁয়ালির মত মনে হলেও তখনকার দিনে মুখে মুখে যাঁরা এই বাংলা বলতেন, তাঁরা লিরিকের মত এর রসাস্বাদন করতে পারতেন।—

গঙ্গা যমুনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী যোইলা লীলা পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।

—পথে বেলা হ'ল; পাড়ে যাবার জন্য কবির যে ব্যাকুল আর্তি তার মধ্যে ফুটে উঠেছে লিরিক মাধুর্য। কিন্তু চর্যাপদগুলির প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবির স্বাভাবিক হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করার চেয়ে তাঁদের সাধন-সংকেতের প্রতি ইংগিত বেশি। আবার অনেক সময় ভাষার কুহেলিকায় কাব্যরস যায় মিলিয়ে। নিছক তত্ত্বের পরিবেশন কাব্যের লক্ষ্য হতে পারে না। গীতিকাব্যের ভিত্তি ব্যক্তিক অনুভূতি; সামান্য বিষয় নিয়ে আরম্ভ করে এখানে হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়। কিন্তু চর্যাগীতিতে দেখা যায়, এই ব্যক্তি-হৃদয়ের অনুভূতির গণ্ডি ডিঙিয়ে বিশেষ একটি ভাবগোষ্ঠীর তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে অস্পষ্ট হেঁয়ালির ধরণে। কাজেই চর্যাপদকে ঠিক গীতিকবিতার পর্যায়ে উন্নীত করা যায়'না।

বাংলা গীতিকবিতা বলতে গেলে প্রকৃতপক্ষে জয়দেব থেকে আরম্ভ করতে হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দকে বাংলা গীতিকাব্যের উৎস বলা যেতে পারে। গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা হলেও বাংলারই অধিকতর নিকটবর্তী। এই কাব্যে যে গীতিকবিতা বা পদাবলীর ধারা সুরু হ'ল, সে ধারা পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে অনুপম রস ও শক্তি সঞ্চয় করে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারারূপে পরিণত হয়েছিল। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রার্থনার পদগুলিতে কবির আপন ভক্তহৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে একটা জিনিষ মনে রাখা দরকার। এগুলি একটি বিশেষ ভাবগোষ্ঠীর রচনা। বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের ভাবসাধনার অন্তরালে ব্যক্তি-বিশেষের আত্মলোপ হওয়াতে পদগুলি অধিকাংশ স্থলেই গতানুগতিক হয়ে পড়েছে। এখানে কবির নিজের ভাবসাধনা বা উপলব্ধি—পাশ্চাত্য আদর্শে যাকে Subjectivity বলা হয় তা প্রায় ক্ষেত্রে নেই। অবশ্য চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস প্রমুখ মহাজনদের বেলায় এর কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গীতিকাব্যের ধারা হতে আধুনিক গীতিকাব্যের ধারা স্বতন্ত্র। আধুনিক গীতিকাব্য একান্তভাবে ব্যক্তিক অনুভূতিকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত। এই ব্যক্তিক অনুভূতিতে আপনাকে বিকশিত করে যে সৌরভ উঠেছে তা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক আধুনিক গীতিকবিতার সার্থক ও সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায় সর্বপ্রথম বিহারীলালের কাব্যে। ঊনবিংশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের সাহিত্য একটি নূতন রূপ পেল। শেলী, কীট্‌স্ প্রমুখ রোমান্টিক কবিদের ভাবধারার সংস্পর্শে এসে আমাদের কাব্যসাহিত্য গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশের একটি নূতন পথ খুঁজে পায়। এই পথে বিহারীলালই সর্বপ্রথম বাংলা গীতি-কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয়, কবির নিজের কথা" (আধুনিক সাহিত্য)। প্রাচীন কবিদের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মাধ্যমেই কবির অনুভূতি প্রকাশিত। এখানে ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতির একান্ত প্রত্যক্ষ প্রকাশের অবকাশ রচিত হয় নি। কিন্তু বিহারীলাল নিজস্বসুরে একান্তভাবে ব্যক্তিক অনুভূতিকেই প্রকাশ করেছেন। আধুনিক কবিদৃষ্টি ও কল্পনাদর্শ অনুযায়ী গীতিকবিতা রচনার পদপ্রদর্শক হিসাবে এখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

আধুনিক গীতিকবিতা রচনার প্রথম যুগে যে কয়জন গীতিকবির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিহারীলালের কল্পনাদর্শ এঁদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু বিহারীলালের পূর্বেও মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে আধুনিক গীতিকবিতার একটা অস্ফুট আভাস পাওয়া যায়। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কবি বিষয়কে অবলম্বন করে নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন: "With this key Shakespear unlocked his heart." আমরা মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী সম্বন্ধেও বলতে পারি, With this key Madhusudan unlocked his heart. তবে এই কবিতাগুলির চৌদ্দ লাইনের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে কবির আত্মাভিব্যক্তি সম্যকভাবে হতে না পেরে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। বিহারীলালের কাব্যে কবির আত্মপ্রকাশ যে সহজ সাবলীল পথ খুঁজে পেয়েছে মধুসূদনের চতুর্দশপদীর বাঁধা গণ্ডির মধ্যে তেমন সুস্পষ্টতা নেই।

মধুসূদনেরও পূর্বে বাংলা আধুনিক গীতিকাব্যের একটা আভাস পাওয়া যায় রামপ্রসাদের পদাবলীতে। রামপ্রসাদ এমন এক সন্ধিযুগের কবি, যখন বাংলা সাহিত্য কি ভাবের দিক থেকে, কি প্রকাশের দিক থেকে একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করছে। সে যুগে মঙ্গলকাব্য প্রথার মূল অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। বাঙালী-মনের স্বাভাবিক ভক্তিরসের স্রোত মঙ্গলকাব্যের ক্ষীণ-ধারা পরিত্যাগ করে ব্যক্তিক সাধনা ও অনুভূতির নূতন ধারায় প্রবাহিত হতে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও সে যুগ প্রাচীনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। সেই প্রাচীনযুগেও রামপ্রসাদ আধুনিক গীতিকাব্যের সুর শোনালেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার পূর্বেও রামপ্রসাদের রচনাতে আধুনিক গীতিকবিতার আভাস পাওয়া গেল। সাধকরূপে তিনি প্রাচীন তন্ত্রসাধনা পদ্ধতির অনুসরণ করলেও কবিরূপে তাঁর প্রকাশরীতি ও অনুভূতির স্বকীয়তা আধুনিকতার পরিচয় দেয়। তাঁর আত্মনিবেদনমূলক রচনায় আধুনিক গীতিকাব্যের প্রাণধর্মের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। রামপ্রসাদের রচনা গতানুগতিক কোন সাধারণ ভক্তের কথা নয়, একান্তভাবে রামপ্রসাদেরই কথা। একে কোন সাম্প্রদায়িক ছাপ দেওয়া চলে না। এই আত্ম-নিবেদনমূলক প্রার্থনা-পদে প্রার্থনাকে অতিক্রম করে রয়েছে তাঁর আত্মাভিব্যক্তি। অন্যান্য শাক্ত ও বৈষ্ণব পদকারদের সঙ্গে রামপ্রসাদের পার্থক্য এখানেই। বিদ্যাপতিও প্রার্থনা-পদ রচনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি অভীষ্ট দেবতাকে উদ্দেশ করে যা বলেছেন তা প্রধানতঃ গতানুগতিক। এখানে প্রার্থনাটাই বড়, বিদ্যাপতিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামপ্রসাদের একান্তভাবে মাতৃপদে আত্মনিবেদন সাধারণ পদকারদের মত গতানুগতিক নয়। তাঁর পদাবলীতে মানবিক আবেগ-আকূতি এবং হৃদয়ের গভীরতম আবেগের প্রকাশ তাঁর ব্যক্তি-মানসেরই অভিব্যক্তি। সেজন্য এগুলি আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তাছাড়া গীতিকবি হওয়ার জন্য কাব্যে যে সুরধর্মিতার প্রয়োজন তা রামপ্রসাদের ছিল। তিনি বিদ্যাপতির মত প্রধানতঃ চিত্রধর্মী কবি নন।

'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রামপ্রসাদ গভীর আন্তরিকতার সহিত যে মাতৃমূর্তি রচনা করেছেন তা অন্য শাক্ত-পদকারদের মধ্যে দেখা যায় না। অন্যান্য পদকারগণ অনেক ক্ষেত্রে মাতৃরূপিনী বিশ্বশক্তির ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন। মায়ের সঙ্গে তাঁদের এখানে ভয়ের সম্পর্ক। হয়ত ভক্তিও আছে। কিন্তু রামপ্রসাদের সঙ্গে মায়ের যে সম্পর্ক তা' স্নেহ প্রীতির। তিনি মায়ের মূর্তি আঁকতে গিয়ে আপন হৃদয়ের বেদনামধুর আর্তিকেই মূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর আত্মনিবেদন, আবদার, অভিমান, এমন কি মায়ের সঙ্গে বিবাদ—প্রভৃতি অনুভূতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমনের এবং সাধকমনের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। রামপ্রসাদ শিশুর ন্যায় মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল। আবার মায়ের উপর তাঁর অভিমানেরও সীমা নেই।—

"মা মা বলে ডাকিস্ নারে মন,
মাকে কোথা পাবে ভাই
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।"

তাই—

"দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না।"

এই যে স্নেহের অভিমান, তা' নিতান্ত অন্তরঙ্গ না হলে আর কে করতে পারে? আবার মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ব্যাকুল কান্নাও শুনতে পাই।—

"বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥
* * * * * * * * *
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।"

এখানে যে ব্যক্তিহৃদয়ের মানবিক আবেগ আকূতির

প্রকাশ পেয়েছে তাতে ব্যক্তিত্বজ্ঞাপক আধুনিক গীতি-কবিতার সুর শোনা যায়। কাজেই আমরা দেখতে পাই, রামপ্রসাদই বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক গীতিকবিতার সুর এনেছেন। এদিক থেকে আধুনিককালের বাংলা গীতিকাব্য রামপ্রসাদের নিকট ঋণী।

রামপ্রসাদ একদিকে যেমন জয়দেব থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটি যুগসাধনার পরিণতি, অন্যদিকে বাংলা গীতিকাব্যেও প্রথম আধুনিকতার সুর আনেন তিনি। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আধুনিক গীতিকবিগণের আগমনী সংগীত রামপ্রসাদই গেয়েছিলেন।

# নব্যবঙ্গের গৃহে ভারতপ্রেমিক জর্জ টম্পসন

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

সাম্প্রতিক কালে বাঙ্গালীর নবজাগরণের ইতিহাস নিয়ে বহু আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। সে ইতিহাস সৃষ্টিতে ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, বেথুন প্রভৃতি ভারতপ্রেমিক বিদেশীর প্রকৃত ভূমিকা কি সে সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনাও হয়েছে কিন্তু যে উদারপ্রাণ মানবতা-বাদী ইংরেজ নব্যবঙ্গকে রাজনীতি চর্চায় অনুপ্রাণিত ক'রে সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর জন্য প্রথম রাজনৈতিক সংস্থা—'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠার গৌরবভাগী হয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ পর্যন্ত কোন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক করেন নি। সেজন্য বাঙ্গালীর ইতিহাস-পাঠকের কাছে জর্জ টম্পসন এখনও প্রায় অপরিচিত।

অথচ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতার মাটিতে পা দেবার আগেই সমকালীন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী এবং উদার-নৈতিক এ রাজনীতিবিদের সাহচর্যলাভের আশায় রাজ-নীতিসচেতন নব্যবঙ্গ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। নব্যবঙ্গ তখন কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশের যুবকদের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা করছেন, 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামক দ্বৈভাষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে দেশের অপরাপর বাস্তব সমস্যা আলোচনার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনাও সুরু করেছেন। সে অবস্থায় জর্জ টম্পসনের ভারতের আসার সংবাদ শুনে নব্যবঙ্গের মুখপত্র 'দ বেঙ্গল স্পেকটেটর' ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সংখ্যায় সংবাদ বিভাগে লিখলেন—

"It is said that Mr. George Thompson, one of the zealous members of the British India society and enthusiastic advocate for the interest of the natives, will be requested to deliver some lectures at the Mechanic's Institution, on his arrival here. He is coming with Baboo Dwarkanath Tagore to mature his acquaintance with Indian affairs, that he may be better able to agitate the grievances of this country when he returns to England."

জর্জ টম্পসন কলকাতায় উপস্থিত হলে কোন রাজ-নৈতিক সভার অভাবে নব্যবঙ্গ তাঁকে প্রথমে নিমন্ত্রণ করলেন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি বিশেষ অধিবেশনে। জর্জ টম্পসন স্বাভাবিক আবেগতপ্ত ভাষায় ভারতে আসার কারণ বর্ণনা করে সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে সে সভায় সাধারণ ভাবে আলোচনা করলেন। নব্যবঙ্গ তাঁর আন্তরিক ভারতপ্রীতিতে মুগ্ধ হলেন। তার পর নব্যবঙ্গের সর্বজনশ্রদ্ধেয় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উল্লেখযোগ্য চন্দ্রশেখর দেব জর্জ টম্পসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের স্বগৃহে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় জর্জ টম্পসন বক্তৃতা দেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের গৃহে তার অব্যবহিত পরেই তিনি নব্যবঙ্গের সংগে মিলিত হন। তবে কোন্ তারিখে মিলিত হন সে তারিখের কোথাও উল্লেখ নেই। চন্দ্রশেখর দেবের গৃহে তিনি উপস্থিত হন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী—'বেঙ্গল

স্পেকটেটরে' তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন এ দুই নব্যবঙ্গের গৃহে উপস্থিত হয়ে ভারতপ্রেমিক জর্জ টম্পসন যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তাই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

জর্জ টম্পসন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের গৃহে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন, তাঁর দেশবাসী যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে বা যে দেশ জয় করেছে সে দেশের অধিবাসীকে সাধারণতঃ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তাঁর নিজের এমন কোন শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কার নেই। যে ধর্মে তিনি বিশ্বাসী সে ধর্ম বলে যে, ভগবৎ-সৃষ্ট যে কোন দেশের বা যে কোন বর্ণের মানুষকে পার্থক্যের দৃষ্টিতে দেখা মানেই হ'ল ভগবানের কাছে অপরাধ করা। মানুষকে তিনি সম্মান করেন তাঁর অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণ ও বুদ্ধির মাপকাঠিতে, এবং যে অবস্থার মধ্যে মানুষ থাকতে বাধ্য হয় সে অবস্থা বিচারেই মানুষের মূল্য নির্ধারণ করেন। জন্মসূত্রে অসুবিধার জন্য যদি কেউ অজ্ঞ বা অবনত হয় তাকে তাচ্ছিল্য না করে বরং সহৃদয় দৃষ্টিতে দেখা দরকার। সবলের শক্তির ওপর দুর্বলের একটা পবিত্র দাবী আছে। ব্যক্তিই হোক জাতিই হোক—যদি কেউ অজ্ঞ-অসহায়ের উপর সুযোগ নিয়ে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হয়—তা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

সাধারণ ভাবে এ নৈতিক ও মানবতাবাদী মনোভাব ব্যক্ত করে জর্জ টম্পসন স্বদেশবাসীর সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির সমালোচনায় অগ্রসর হলেন। তিনি বল্লেন—এটা তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর স্বদেশবাসী বারে বারে তাঁদের কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হয়েছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য তাদের রাজ্য ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা। যাদের ওপর তারা অধিকার বিস্তার করেছে তাদের সুখ-শান্তি বা উন্নতি বিধানের দিকে তাদের মন নেই।

জর্জ টম্পসনের এ প্রাথমিক বক্তব্যের ভেতর তাঁর ব্যক্তিত্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ, তাঁর সমসাময়িক অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের মত বিজিত জাতি সম্পর্কে তার কোন শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান নেই। দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্টধর্মের উচ্চ জীবননীতির ওপর তার বিশ্বাস দৃঢ়। তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ-নীতির তিনি বিরোধী।

তার পর জর্জ টম্পসন তাঁর এ দেশে আসার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন: জনজীবনে আমার সমস্ত প্রয়াস নিযুক্ত হয়েছে, রাষ্ট্রের অবিভাজ্য অঙ্গ হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষকে তার রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের প্রতি সচেতন ক'রে তোলা। ইংলণ্ডে এ রাষ্ট্র-সচেতনতার প্রয়োজনবোধ হয় সব চাইতে বেশী। কারণ, সেখানে বড় বড় সরকারী কর্মনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় যে শক্তির দ্বারা তাকে এককথায় বলা চলে জনমত।

তার পর জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে বোঝালেন,—ইংলণ্ডের যে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দেশের শাসননীতি পরিবর্তন করতে সক্ষম সে পার্লামেণ্ট জনসাধারণের প্রতিনিধি-গঠিত। সে প্রতিনিধিদের দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তাঁরাই দেশ শাসনের জন্য মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বুদ্ধিদীপ্ত দেশ জনসাধারণ যদি কোন সংহত জাতির ন্যায্য রাজনৈতিক দাবীকে জাতিসমূহের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সভায় উপস্থিত করেন তাহলে তা কখনও উপেক্ষিত হতে পারে না। ভারতবর্ষের শাসন-কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যের প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত না করে তিনি একথা বহুদিন থেকে অনুভব করছেন যে, ভারতবাসীর স্বার্থের জন্য ইংলণ্ডের সহযোগী প্রজারা যেন আরও বেশী আগ্রহান্বিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা যদি পর্বতপ্রমাণ হয় তাহলে তারা কখনও ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হতে পারে না। এ অজ্ঞতার জন্য কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তিনি নিজে ভারতের স্বার্থে কোন কথা বলতে পারেন নি বা লিখতে পারেন নি।

ভারত শাসন ব্যাপারে ভারতীয় প্রজার প্রতি যে অবিচার হয় তার সংশোধনের জন্য তিনি ইংলণ্ডের রাজনীতি-সচেতন প্রজাপুঞ্জের জনমন জাগ্রত করে তুলবার জন্য ভারতীয় প্রজার প্রতি আবেদন করলেন। কিন্তু এ পরনির্ভরতার দ্বারা একটি পরাজিত জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ কখনও সম্ভব নয়—জর্জ টম্পসন পরমুহূর্তেই সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে বল্লেন: ভারতে এসে আর একটি উদ্দেশ্য সাধন তিনি করতে চান। সে হ'ল আইন প্রণয়নের দ্বারা যে সমস্ত অভাব-অভিযোগ দূর করা সম্ভব—শিক্ষিত ভারতবাসী যেন সে সমস্ত অভাব-অভিযোগ নিজেরাই সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। ভারতের অগণিত জনসাধারণের মনে বিদ্রোহ বা অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি মনে করেন 'ইংলণ্ডবাসীরাই ক্রমশঃ ভারতের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। ভারতবাসী যদি বিজ্ঞোচিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারে তাহলে ইংলণ্ডবাসীও ভারত সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগী হবে—যে মনোযোগের ফল হবে ভারতবর্ষের পক্ষে সুবিস্তৃত কল্যাণের পরিণতিবাহী।

জর্জ টম্পসনের এ উক্তি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তৎকালীন ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার তিনি অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। কিন্তু সে সংস্কারের দাবী আসে যেন শিক্ষিত ভারতীয়দের নিকট থেকে। রাজনৈতিক দাবী-দাওয়ার জন্য জনমত গঠনের ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেছেন তিনি। পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতীয় নেতারাও এ জনমত গঠনকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অস্ত্র বলে মনে করেছেন। এর ভেতর জর্জ টম্পসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধিকার লাভের জন্য ভারতীয় প্রজাকে তিনি বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পথে অগ্রসর না হয়ে নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারের পথ গ্রহণ করতে বলেছেন। এ নিয়মতান্ত্রিকতার পথ শুধু বিদেশী রাজনৈতিক টম্পসনের নয় রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি রাজনীতি-সচেতন সে যুগের বাঙালী নেতৃবৃন্দও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য এ নিয়মতান্ত্রিকতার পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ মনে করতেন।

দেশবাসীর বুদ্ধি এবং শিক্ষা যেন স্বদেশপ্রেমের দিকে নিযুক্ত হয় সে জন্যও তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। জর্জ টম্পসন বললেন, দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সর্বপ্রথম সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। তার পর সে অবস্থার বিবরণ পাঠাতে হবে স্থানীয় সরকারের কাছে। দেশীয় সরকার দেশের প্রকৃত অবস্থা জেনেও শাসন-সংস্কারে মনোযোগী না হলে সে অবস্থার কথা জানাতে হবে ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে—সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে এর চাইতে উৎকৃষ্ট স্বদেশসেবার উপায় আর হতে পারে না বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁদের এ লক্ষ্যের পথে সাহায্য করবার জন্য যদি তাঁকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে হয় তাতেও তাঁর দ্বিধা নেই। নিজেকে এদেশবাসী বলে পরিচয় দিতে পারলে তিনি এ দেশবাসীর কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারবেন এবং তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে নির্ভীক আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। দেশের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় তার জন্য কাজ করে অপরকে সেদিকে প্রবৃত্ত করাই হ'ল তাঁর ইচ্ছা। দেশের জন্য যাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে অনুভব করেন তাঁদের মধ্যে স্থান লাভ করবার জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত—যাতে এ দেশবাসীও ক্রমশঃ বুঝতে পারে দেশের কাজ করতে গিয়ে কত মহান লক্ষ্যের দিকে তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা নিযুক্ত হতে চলেছে।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে জর্জ টম্পসনের এ বক্তৃতার ভেতর কোন সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক কর্মপন্থার নির্দেশ হয়ত নেই, কিন্তু তাঁর সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে আন্তরিকতার যে সুর এবং ভারতবর্ষের জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবার যে ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে তাতে উপস্থিত নব্যবঙ্গ কেউ সন্দেহ করলেন না।

জর্জ টম্পসনের অনর্গল বক্তৃতার পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বক্তাকে সভার কৃতজ্ঞতা জানাতে উঠে প্রথমে ভারতবর্ষের অতীত কুশাসনের কথা উল্লেখ করেন। তার পর তিনি সমকালীন সরকারের শাসনকালে রাজস্ব ও পুলিশ ব্যবস্থার কথা বলে দেশীয় প্রজার স্বার্থরক্ষার দিকে সরকারী ওদাসীন্যের পরিচয় দেন। এ অবস্থায় জর্জ টম্পসন এত আগ্রহ নিয়ে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে এসেছেন বলে তিনি সভার পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী অন্যতম নব্যবঙ্গ চন্দ্রশেখর দেবের গৃহে উপস্থিত হয়ে জর্জ টম্পসন বলেন, তাঁর যে কোন লক্ষ্যসাধনের অন্যতম অস্ত্র হ'ল প্রসারিত জ্ঞান এবং নৈতিক শক্তি। জনসাধারণের বুদ্ধি এবং সদ্বৃত্তির প্রভাবই হ'ল সে লক্ষ্যসাধনের সহায়ক। প্রথমেই অবশ্য তিনি সকলকে অবহিত হতে বললেন যে, তাঁর লক্ষ্যবস্তু রাজানুগত্যকে অতিক্রম করে নয় এবং তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় হবে শান্তিপূর্ণ।

জর্জ টম্পসনের এ প্রাথমিক ঋজু বক্তব্যের ভেতর তাঁর রাজনীতি-চর্চার পথ যে শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার পথ সে কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য নব্যবঙ্গকে তিনি বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পথে আহ্বান করেন নি। সে সংহত ব্রিটিশ-শক্তির যুগে রাজনীতিজ্ঞানহীন সহায়সম্বলহীন ভারতবাসীকে যদি তিনি বিদ্রোহের পথে আহ্বান করতেন তা হ'ত নেহাৎ অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তবে সর্বময় রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী বলে ভারতীয় সরকার যাতে অসহায় ভারতীয় প্রজার ওপর অমানুষিক বর্বরোচিত ব্যবহার না করতে পারে, শিক্ষিত ভারতবাসী যাতে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্যে সে অধিকার আদায় করে নিতে পারে—সেদিকেই তিনি নব্যবঙ্গের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষিত নব্যবঙ্গকে তিনি তাই সে ধরনের জ্ঞান এবং প্রভাব আয়ত্ত করতে বললেন, যার সাহায্যে তাঁরা দেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় সক্ষম হবেন। বাস্তবিকই শিক্ষিত

প্রজা এবং নাগরিক হিসেবে তাদের পবিত্র দায়িত্বও হ'ল জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করা। নব্যবঙ্গকে তিনি জানালেন, এ ধরনের একদল ভারতীয়ের সহযোগিতা ইংলণ্ডে এখন বিশেষ প্রয়োজন। যে 'চার্টারে'র সাহায্যে ভারতবর্ষ শাসিত হয় সে চার্টারের ধারাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়তে তিনি নব্যবঙ্গকে উপদেশ দিলেন। সে চার্টারে ভারতবাসীকে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দানের কথা উল্লিখিত হয়েছে—তা দৃঢ়ভাবে দাবী করতে তিনি নব্য-বঙ্গকে বললেন। এ ছাড়া দেশের সমস্ত সম্পদ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করবার জন্য এবং অগ্রগতির পথে বাধা কি তা নির্ণয় করবার জন্যও তিনি নব্যবঙ্গকে উপদেশ দিলেন।

বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পথে আকর্ষণ না করলেও সমকালীন ভারত শাসনের দুর্বলতার মূল ধ'রে নাড়া দিতে চাইলেন জর্জ টম্পসন ভারতীয় চার্টারের ধারানুযায়ী সমস্ত প্রজাধিকারের দাবী করবার জন্য নব্যবঙ্গকে উপদেশ দিয়ে।

জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা যারা শিক্ষিত এবং প্রতিপত্তিশালী—তোমরা স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা কর। তা হ'লে তোমাদের কোন বন্ধুর অভাব হবে না। নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হ'লে তোমরা স্বদেশ এবং সরকারেরও উন্নতি করবে, যে সমস্ত মানবতাবাদী তোমাদের উন্নতির জন্য আগ্রহশীল তাদেরও শক্তিবৃদ্ধি করবে। এর ফলে তোমরা বর্তমানে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছ তার চাইতে ক্রমশঃ আরও অনেক উন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাকে যদি বিশ্বাস কর তা হ'লে আমি বলব আমি শুধু তোমাদের বন্ধু বা ভ্রাতা হিসেবে এ দেশে আসি নি—তোমাদের দেশের অতি দীন এবং অতি দরিদ্র যারা—তাদেরও বন্ধু হিসেবে আমি এখানে এসেছি। শুধু এ দেশে থাকতে নয়, এ দেশ থেকে আমি যখন চলে যাব তখনও—এক কথায় আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তোমাদের সাহায্য করব। আমার সাধ্যমত তোমাদের বন্ধু বলে পরিগণিত হতে এবং ভারতের প্রতি ন্যায়ের প্রবক্তা হতে আমি কখনও ক্লান্ত হব না।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'বেঙ্গল স্পেকটেটরে' দেখা যায়, এ সভার সভাপতি ছিলেন রাজা বরদাকান্ত রায়বাহাদুর এবং অন্যূন বত্রিশ জন দেশীয় ভদ্রলোক এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জর্জ টম্পসনের বক্তৃতার পরে ভারত-বন্ধুদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। এ আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের সমর্থনে এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন প্রসন্নকুমার মিত্র এবং সমর্থন করেন রায় মথুরানাথ চৌধুরী। এ প্রস্তাবটিও সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি হ'ল এই :

"That it appears expedient and necessary in the present state of the country that a society should be formed to co-operate with the British Indian Government and the friends of our country in Great Britain and elsewhere, in all peaceable and constitutional measures for the improvement of the condition of Hindustan".

সমিতির আলোচ্য বিষয় এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক বলে স্থির করা হয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে।

প্রস্তাবিত কমিটির সভ্যদের নাম

রাজা বরদাকান্ত রায় বাহাদুর, রায় মথুরানাথ চৌধুরী, নন্দলাল সিংহ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামধন ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, সাতকড়ি দত্ত।

এ প্রস্তাব উপস্থিত করেন রামগোপাল ঘোষ এবং সমর্থন করেন নন্দগোপাল সিংহ। এ প্রস্তাবটিও সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আর একটি প্রস্তাবে জর্জ টম্পসনকে কমিটির সভায় সাধ্যমত উপস্থিত হয়ে তাঁর উপদেশ এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা সাহায্য করতে অনুরোধ করা হয়। তারপর পরবর্তী সোমবার সন্ধ্যা পণ্ডিত সভার কার্য স্থগিত রাখা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে নব্যবঙ্গের রাজনীতিচর্চা কিভাবে একটা সংহত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রূপ লাভ করবার চেষ্টা করছিল তার পরিচয় মিলে চন্দ্রশেখর দেবের গৃহে জর্জ টম্পসনের বক্তৃতার পরে গৃহীত এ সমস্ত প্রস্তাবগুলিতে।*

---

* জর্জ টম্পসনের বক্তৃতা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতামালা থেকে ও অপরাপর সংবাদ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' থেকে গৃহীত। জর্জ টম্পসনের বক্তৃতার স্বাধীন ভাষান্তর লেখকের—লেখক।

# স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

দশ

সারারাত সেদিন শোভনা ঘুমোয় নি। বিছানায় শোয় নি পর্যন্ত।

অনেক রাত পর্যন্ত তক্তপোশের গায়েই হেলান দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, তারপর আশুবাবুর ডাকতে আসার সম্ভাবনা আর নেই যখন মনে হয়েছে তখন খিল খুলে দরজার বাইরের সঙ্কীর্ণ রোয়াকটুকুতে গিয়ে বসেছে।

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া হবে। ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ কখন পশ্চিম আকাশে একটু দেখা দিয়েই ডুবে গেছে। চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন গাঢ় অন্ধকার।

এই অন্ধকার তার হৃদয় মন চেতনাকেও যদি ঢেকে দিতে পারত, ভেবেছে শোভনা। মনের ভেতরকার অসহ্য দুর্বোধ এক জ্বালা যদি পারত ভুলিয়ে দিতে।

অনুপমের ফিরে আসা সম্বন্ধে সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যেদিন এ বাড়িতে এসেছিল সেদিনকার মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ।

সেদিন হতাশা ও বিমূঢ়তার মধ্যেও ছিল কেমন একটা কঠিন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। হার মানবে না সে, হার মানবে না। এই কথাটাই মন্ত্রের মত জপ ক'রে সে নিজেকে সজাগ ক'রে তুলেছে বার বার।

আজ সে মন্ত্রও যেন নিরর্থক হয়ে গেছে কি এক সমস্ত শরীর মন বিষ-করে-তোলা তিক্ততায়!

অনুপম আর ফিরবে না যেদিন নিশ্চিত ভাবে বুঝেছিল সেদিন একটা গভীর বেদনাতেই কাতর হয়েছিল শুধু।

আজ অনুপম এই শহরেই তাকে ছলনায় ভুলিয়ে পরিত্যাগ ক'রে লুকিয়ে আছে জেনে একটা নিদারুণ অপমানের জ্বালাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

ভাগ্যেরও যেন এ একটা নিষ্ঠুর পরিহাস।

কি দরকার ছিল অনুপমের এই খবরটুকু আশুবাবুর নিঃস্বার্থ হলেও নিরর্থক হিতৈষণার দরুণ পাওয়ার। নিজের মনকে সে তৈরীই ক'রে নিয়েছে অনেকখানি। যবনিকা টেনে দিয়েছে সেই ছিন্ন সম্পর্কের ওপর। আজ আকস্মিক ভাবে সে যবনিকা আবার তুলে ওঠার পর কি সে করবে?

এক হিসেবে অনুপমের সংবাদ এভাবে পাওয়াটাই শুধু অপ্রত্যাশিত, নইলে তা বিস্ময়কর বা কল্পনাতীত কিছু নয়। অনুপম হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে বা আহত অক্ষম হয়ে তার সঙ্গে আর দেখা করতে আসতে পারছে না, এ সম্ভাবনার কথা ক্ষণিকের জন্যে মনে উদয় হলেও শেষ পর্যন্ত সে মিথ্যা ব'লেই জেনেছে। মনের গোপনে সে তখন থেকেই জানে যে, অনুপম স্বেচ্ছায় তাকে পরিত্যাগ করেছে। এই কলকাতায় না হোক, অনুপম যে অন্য কোথাও আছে তাও বুঝতে তার বাকি ছিল না।

আঘাতটা আজ অত তীব্রভাবে লেগেছে শুধু সেই ধোঁয়াটে সম্ভাবনাটা সত্য ব'লে জেনে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ায়। এই প্রমাণটুকু এখনই না পেলে কি চলত না!

যে ভাবে আশুবাবুর কাছ থেকে আজ উঠে এসেছে তাতে আশুবাবু যদি অত্যন্ত ক্ষুন্ন হয়ে থাকেন তা হ'লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হয়ত তার মানসিক অবস্থা বুঝে তার প্রতি মমতাতেই তিনি আজ আর তাকে কিছু বলতে আসেন নি। সেই না-আসার সঙ্কল্পের পেছনে আহত অভিমানও একটু থাকা স্বাভাবিক।

আজকের এ রাত শেষ হবে। আজ কিছু না বলুন আশুবাবু কাল এ বিষয়টা একেবারে মন থেকে মুছে দেবেন না। মুখে তিনি কিছু বলুন বা না বলুন, শোভনা এ ব্যাপারে কি করবে তা দেখবার জন্যে তিনি উৎসুক ও উদ্বিগ্ন থাকবেন নিশ্চয়।

যা আজ জানা গেছে তা অস্বীকার ক'রে নির্লিপ্ত নির্বিকার হয়ে থাকাও শোভনার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্ততঃ আশুবাবুর আশ্রয়ে থেকে ত নয়ই।

এ খবর পাবার পর একটা কিছু তাকে করতেই হবে। কি করবে সে? আশুবাবুর সঙ্গে গিয়ে অনুপমকে তার অজ্ঞাতবাস থেকে পাকড়াও করবে? কথাটা ভাবতেই যে দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাতে ঘৃণায় লজ্জায় গ্লানিতে সমস্ত শরীরটা শিউরে ওঠে।

শেষ যে পাড়ায় সে হাসপাতালে যাবার আগে ছিল, মা যেখানে মারা যান, সেই পাড়াতে এমনি একটা ঘটনার কথা তার মনে প'ড়ে যায়।

ব্যাপারটা এক হিসেবে একই জাতের। পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা শুধু ভিন্ন। প্রকাশভঙ্গিটাও আলাদা।

সেখানে স্বামী এসেছে পলাতকা স্ত্রীর খোঁজ পেয়ে আত্মীয়বন্ধুর সাহায্যে তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে।

মা তখনও জীবিত। শোভনার মাথার দিকের যে জানলাটি দিয়ে মুক্তির আস্বাদ সে পেত সেই জানলাই সেদিন বীভৎস এক জীবন-নাট্য মেলে ধরেছিল।

জানলার বাইরের সেই পোড়ো জমিটিতে লোকে লোকারণ্য। সমবেত সকলের গোলমাল ছাড়িয়ে একটি তীক্ষ্ণ নারী-কণ্ঠ আকাশ যেন বিদীর্ণ করছে। নারী-কণ্ঠটি পলাতকা স্ত্রীরই। ভাষাটা বাংলা না হলেও বুঝতে কষ্ট হয় নি যে, স্বামিত্বের দাবী নিয়ে যে এসেছে তার বিরুদ্ধেই বিষোদ্গারণ চলছে। স্বামীর ভূমিকায় অবাঙালী একজন গোয়ালা। দেশ থেকে যাকে রীতিমত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ক'রে সে বিবাহ করে এনেছিল সে স্ত্রী কিছুদিন বাদেই গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। স্বামী অনেক খোঁজ-খবরের পর বছর দুই বাদে আজ সেই নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীর খবর পেয়েছে। জেনেছে যে তারই দেশোয়ালী আরেক জনের সঙ্গে তার নিরুদ্দিষ্টা পত্নী সুখে-স্বচ্ছন্দে এই শহরেই ঘরকন্না করছে। সে তাই সদলবলে এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। স্ত্রী কিন্তু যেতে রাজী নয়। গোয়ালা-স্বামীর স্বামিত্বই সে স্বীকার করতে চায় না। বাঙালী-অবাঙালী মিলে সমবেত জনতা তখন দু' পক্ষে ভাগ হয়ে গেছে। একটা রক্তারক্তি বুঝি হয় হয়। কিন্তু সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয়ে যতটা নয়—যাকে কেন্দ্র ক'রে এই কুরুক্ষেত্রের সূচনা সেই স্ত্রীর কুৎসিত গালাগালির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অভিযোগ শুনতে শুনতে শোভনার কেমন যেন একটা অসহ্য অনুভূতি হয়েছিল। মনের যন্ত্রণাটা শারীরিক হয়ে উঠেছিল তীব্রভাবে। নারী-পুরুষের সম্বন্ধের এমন নগ্ন বীভৎস বিচার তার কল্পনার বাইরে ছিল।

মা বাইরে কি কাজে গেছলেন। ঘরে এসে গোলমাল শুনে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শোভনা তাও দিতে দেয় নি। কি একটা অসহ্য যন্ত্রণাময় আকর্ষণ তাকে ওই জানলার জান্তব জীবন-নাট্যের দিকে টেনে রেখেছে।

ঝগড়ার শেষ মীমাংসা কিছু হয় নি। স্বামীর পক্ষ আদালত পুলিশের ভয় দেখিয়ে চ'লে গিয়েছিল। পোড়ো জমির জটলাও ভেঙে গিয়েছিল ধীরে ধীরে।

রোগের স্বাভাবিক অবসাদ ও গ্লানি দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে শোভনা সারা বেলা বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারে নি।

না, এরকম উৎকট কিছু অনুপমকে খুঁজতে গিয়ে হবে না নিশ্চয়। কিন্তু যা হবে তাও ত কম অসহ্য নয়।

আশুবাবু চেঁচামেচি করবার মানুষ নন। অনুপমকে তিনি খুঁজে বার ক'রে হৈচৈ নিশ্চয় কিছু করবেন না। তাকে বাইরে কোথাও ডেকে নিয়ে যেতেই চাইবেন।

অনুপম যদি না যেতে চায় তাঁর সঙ্গে? কারুর সামনাসামনি এরকম বেঁকে দাঁড়ানো তার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও বেকায়দায় পড়লে কে যে কি করে তা ত বলা যায় না।

অনুপম সেরকম কিছু বেয়াড়া হয়ে উঠলে আশুবাবু নীরবে তা মেনে নিশ্চয় নেবেন না। তখন পাড়াপ্রতি-বেশীর ডাক পড়বে। জটলা হবে। অভিযোগ বিচার ব্যাখ্যা কিছুই বাদ যাবে না। কৌতূহলী জনতার সামনে দাঁড়িয়ে শোভনাকে সেই সবই সহ্য করতে হবে।

কথা কিছু উঠলে বিরুদ্ধ পক্ষ একটা দাঁড়াবেই। তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলবার লোকেরও নিশ্চয় অভাব হবে না।

সেই আলোচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠবার কথা ভাবলেই সমস্ত মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে।

আশুবাবুর মনের ইচ্ছা যদি পূরণ করতে হয় তাহলে ত তাঁর সঙ্গে সত্যিই ওই অবস্থায় না গিয়ে প'ড়ে উপায় নেই।

আশুবাবুকে শেষ যা ব'লে এসেছে তাতে তিনি নিজে থেকেই সমস্ত ব্যাপারটার ওপর দাঁড়ি টানতে পারেন। কিন্তু তাই যদি টানেন মনে মনে খুব খুশী নিশ্চয় হবেন না। শোভনার মনের গতিটা বুঝতে পারবেন কি না তাও সন্দেহ।

তাঁর কাছে ব্যাপারটা বোধ হয় সোজা অঙ্কের মত। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজ পেলে স্ত্রীর কর্তব্য তাকে আর পালাতে না দেওয়া। আর স্বামী যদি তবু নিজের দায় এড়াতে চায় তাহলে তাকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা দরকার।

অমন সোজা অঙ্কের মতন ব্যাপারটা বুঝলে অনেক আগেই ত একটা মীমাংসার রাস্তা শোভনা নিতে পারত।

কিন্তু সে অনুপমকে আর খোঁজ ক'রে গিয়ে ধরতেও চায় না, তার অপরাধের জন্যে শাস্তি দিতেও।

তবে—হ্যাঁ, 'তবে' একটু আছে। সে 'তবে' হ'ল একটা ঈষৎ বেদনাময় কৌতূহল। কেন, কি কারণে

অনুপম এমন ক'রে তাকে ফেলে যেতে পারল তা জানবার একটা আগ্রহ মনকে এখনও যে পীড়িত করে তা অস্বীকার করতে পারবে না। এ শুধু অসমাপ্ত একটা কাহিনীর শেষ ব্যাখ্যাটুকু জানবার নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধ কৌতূহল ব'লে মনকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। এই কৌতূহলটুকুর মধ্যেই ছিঁড়ে ফেলতে চাওয়া সম্বন্ধের রক্তাক্ত একটা ছ'টো শিরা এখনও স্পন্দিত হচ্ছে।

এই কৌতূহলকেও সে প্রশ্রয় না দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

একটা উপায় তাই তার বার করা দরকার, আশুবাবুকে আহত না ক'রে এই অপ্রত্যাশিত সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার।

আশুবাবুর আশ্রয় ছেড়ে চ'লে গেলে সব সমস্যার অবশ্য সমাধান হয়ে যায় এখুনি।

কিন্তু কাল সকালে উঠেই তা যে সম্ভব নয় তা শোভনা ভাল ক'রেই জানে। এক বস্ত্রে এ আশ্রয় ছেড়ে যাওয়া যদি সম্ভবও হ'ত তাহলেও আশুবাবুকে জানিয়ে বা না জানিয়ে চ'লে যাওয়ার মত অকৃতজ্ঞ নির্মম সে হতে পারবে না কিছুতেই।

কাল সকালবেলা আশুবাবুর সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে। আশুবাবু নিজে থেকে যদি কিছু নাও বলেন তবু এ ব্যাপার সম্বন্ধে নীরব হয়ে থাকা তার চলবে না।

প্রথম উত্তেজনার ঢেউটা শরীর মনের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে একটা গভীর অবসাদ এখন রেখে গেছে।

রাত কত হয়েছে কে জানে।

আকাশ কখন ঘন মেঘে ঢেকে গেছে। একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি তার গায়ে এসে পড়ল।

না, আর এমন ক'রে ব'সে থাকা যায় না।

শোভনা ধীরে ধীরে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে।

দরজা এতক্ষণ হাট হয়েই ছিল। অভ্যাসের দরুণই আলোটা একবার জ্বেলে ঘরটা দেখে নেবার কথা মনে হ'ল। ক্লান্ত ঔদাসীন্যে সে উৎসাহ আর হ'ল না। কি হবে আর দেখে! তার ঘরে চোর এসে লুকিয়ে থাকবে না নিশ্চয় নেহাৎ আহাম্মক না হলে।

বিছানা না পেতেই সে তক্তপোশটার ওপর গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল। পিঠের কাছে কি একটা ঠেকায় চমকে আবার উঠে বসল। অন্ধকারে হাত দিয়ে ধরতেই মনে প'ড়ে গেল নিখিল বক্সীর দেওয়া কাগজগুলো বিছানার ওপর রেখে গিয়েছিল। ক্রমশঃ

# পুস্তক-পরিচয়

**রবীন্দ্রায়ণ**—দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন। বাক্‌সাহিত্য, (কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' যে শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী, এ সম্পর্কে 'সহৃদয়-সামাজিক মহলে মতৈক্য দেখা গেছে। প্রথম খণ্ডে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পরিক্রমা লিপিবদ্ধ, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর মনীষার সর্বাঙ্গীন পরিচয়দানের প্রয়াস স্পষ্ট। আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্রে কবি ও মনীষী যুগ্মসত্তারূপে বর্ণিত পাশ্চাত্ত্যে গোটে, তলস্তয় বা দা ভিঞ্চি যার দৃষ্টান্ত। কবি ও মনীষী পরিচয়ের বাইরেও রবীন্দ্রনাথের পদচারণা বিস্ময়কর সেখানে তিনি বিশ্বকর্মা মন নিয়ে সংগীত, নৃত্য ও চিত্রশিল্পে নিজেকে ক্রমপ্রসারিত করেছেন। সম্পাদক যে রচনার্ঘ দ্বিতীয় খণ্ডে নিবেদন করেছেন তার বৈচিত্র্য ও গভীরতা বিদগ্ধ-সমাজের শ্রদ্ধা অর্জনক্ষম।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবন ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সমান সংখ্যায় বিধৃত। তাঁর কৈশোর আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্‌বোধনের যুগ। হিন্দুমেলা, জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী সভা, ভারত সংগীত, ইলবার্টবিল, জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির যুগে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম অতীত ইতিহাসের মহিমময় উজ্জীবন প্রার্থী। রবীন্দ্রনাথ প্রথাসিদ্ধ পথে ইতিহাসের আলোচনা করেন নি, তিনি তাঁর নিজস্ব রীতিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্মানুসন্ধান করেছেন, তার মহাভাষ্যরচনা করেছেন। এভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। (অবশ্য বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ আমাদের সেই জাতীয়-মানসভাব-উদ্দীপ্ত যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের নব ব্যাখ্যাদান করেছিলেন।) কিন্তু শুধু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নয়, মধ্যযুগের ও আধুনিক যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও তিনি নতুন দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের রচনা দু'টি রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য রচনা। এই রচনা দু'টির পরিপূরক হয়েছে শ্রীগোপাল হালদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগচেতনা।' রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ইতিহাসকে, তার বিভিন্ন রূপান্তরকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরতে পেরেছিলেন যুগের চেতনা কি ভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বে অঙ্গীভূত হয়েছিল লেখক সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করে দেখিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার কথা মনে আসে। সহজ কারণেই বাংলা দেশের গ্রামীন অর্থনীতিকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আবর্তিত হয়েছে। কৃষি ব্যবস্থা, ঋণপ্রথা, জমিদারি প্রথা, সমবায় ধন প্রভৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অর্থশাস্ত্রী শ্রীভবতোষ দত্ত। তাঁর 'আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করেছেন।

পূর্বপ্রসঙ্গের সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্মৃতি' রচনাটি মিলিয়ে পড়া দরকার। কবি শিলাইদহ—পতিসর অঞ্চলে চাষী ও জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতির যে বিবিধ প্রচেষ্টা করেছিলেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত রূপ এই রচনাটিতে মেলে। রবীন্দ্রনাথের কর্মীজীবনের গঠনকামী দেশপ্রেমিক জীবনের এক বিস্ময়কর অধ্যায় এখানে উন্মোচিত হয়েছে। আমরা কতনই বা জানতাম যে, "নোবেল প্রাইজের আসল টাকা সেইজন্য কৃষি ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পারে নি।"

পল্লীর আর্থিক জীবনকে যেমন রবীন্দ্রনাথ খুঁটিয়ে জেনেছিলেন, সেই সঙ্গে প্রকৃত দেশপ্রেমী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গ্রামীন সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা ও উপাদানকে তিনি গভীর অনুরাগের সঙ্গে বিচার করেছিলেন। শ্রীবিনয় ঘোষ 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধে লোকসাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য, লোকসঙ্গীতের সুর ও ছন্দ কি ভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রতিফলিত ও অনুশীলিত হয়েছে তার তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গঠন-কাজের মহত্তম দান তাঁর শিক্ষাদর্শ ও সেই আদর্শকে স্থায়ী রূপদান। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকে যাঁরা অকারণে পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাবিদদের মতের সঙ্গে মিল দেখিয়ে তুলনামূলক আলোচনা না করে তৃপ্ত হন না তাঁরা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রবীন্দ্র শিক্ষানীতির মূলকথা' রচনাটি যেন পড়েন। প্রসঙ্গ ও প্রকরণে এমন অনবদ্য রচনা সচরাচর চোখে পড়ে না। উদ্ধৃতি, ফুটনোট বর্জন করে তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে লেখক পাঁচ ভাষায় দেখিয়েছেন কবি শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ, জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি, শ্রমের সঙ্গে কর্তব্য, শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করে নতুন মানুষ গড়বার পথে কেমন করে অগ্রসর হবার প্রয়াসী। শিক্ষানীতির আলোচনার সঙ্গে শ্রীপরিমল গোস্বামীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' রচনাটি পঠনীয়। আভিধানিক অর্থে বিজ্ঞানী না হলেও, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ বিজ্ঞানবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত—এই দিকটি লেখক নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক পরিচিত তথ্য ছাড়াও অপরিচিত তথ্যও তিনি কিছু দিয়েছেন এবং প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তিকায় পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য সম্পর্কে গতানুগতিক পন্থা বর্জন করে শ্রীশঙ্খ ঘোষ আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী' রচনাটি পরিচ্ছন্ন চিন্তার সাক্ষ্য দেয়। তিনি ঠিকই লিখেছেন 'সাহিত্যে বা ব্যক্তি-সম্পর্কে তিনি গোপন নেপথ্যের নগ্ন উদ্‌ঘাটনে বিশ্বাসী নন, পরিণত সুসম্পূর্ণ রূপই তাঁর প্রয়োজন।' অবশ্য এই রচনাটির রবীন্দ্রায়ণের প্রথম খণ্ডে স্থান পাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ', শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্ররচনায় মুক্তির রাষ্ট্রদর্শন' ও শ্রীশচীন সেনের 'রাষ্ট্র বনাম সমাজ' প্রবন্ধগুলিও সুলিখিত।

মননচর্চামূলক প্রবন্ধের প্রসঙ্গ সেরে আমরা যখন তাঁর চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্য বিষয়ক সমালোচনাগুলির দিকে ফিরি তখন এই রচনাগুলির ঐশ্বর্যে তৃপ্ত হই। চিত্রশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আচার্য নন্দলাল বসু, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী। আচার্য বসুর রচনাটিতে শ্রীযামিনী রায়ের মন্তব্যের ('রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন য়ুরোপীয় স্টাইলে') বিরোধী মতের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি বরং দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রশিল্প থেকে ঐতিহ্যভ্রষ্ট নন। রচনাটি প্রত্যেকের পড়া উচিত। (শ্রীকানাই সামন্তের অনুবাদ-কর্মদক্ষতার প্রশংসা করতে হয়)। বিনোদবাবুর প্রবন্ধে আচার্য বসুর মতের সঙ্গে কিছু মত-পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু দু'টি প্রবন্ধ মিলিয়ে পড়লে বিষয়টি সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী মহাশয়ের রচনাটি (ইংরেজী

... দুর্বোধ্যপ্রায়।

সংগীতের বিষয়ে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার সূচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব' একটি অসামান্য রচনা। শ্রীরাজেশ্বর মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথের সংগীত চিন্তা' রচনাটিতে রাগ সংগীত ও কাব্য সংগীত উভয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সংগীত চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। স্বর্গত বিমলচন্দ্র সিংহের রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রবন্ধটি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হবার সময়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ যোগ্যকাজ হয়েছে।

এই সংকলন গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রসম্পদে। এর আর একটি আকর্ষণ কবি শৈশব থেকে যে ভবনগুলিতে বাস করেছেন ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সেগুলির আলোক চিত্রলিপি। শ্রীহিরণকুমার সান্যালের 'তিন পুরুষ' রচনাটি সুখপাঠ্য। শ্রীমতী ...না দেবীর 'কবির সংস্পর্শে' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পরিচয়কে নিকটতর করে। শেষে সম্পাদক যে 'স্মরণ' অংশ যোগ করেছেন তার যথার্থ প্রয়োজন ছিল। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিমলচন্দ্র সিংহের নিজেদের বক্তৃতা উৎকলন করে পুণ্যকর্ম করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অ-প্রকাশিত পত্র।

সম্পাদক এই গ্রন্থ সম্পাদনায় যে-দুর্লভ নিষ্ঠা, উন্নত রুচি, মার্জিত বোধ ও সুমিত সৌন্দর্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমরা তাঁকে ভূয়সী সাধুবাদ উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। 'রবীন্দ্রনাথের নাটক' আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে আজও পর্যালোচিত হয় নি। তিনি 'রবীন্দ্রনাথের নাটক' নিয়ে রবীন্দ্রায়ণের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করুন। আশা করি প্রকাশক এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন এবং শ্রীপুলিনবিহারী যেন আমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখবেন না।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

**শতাব্দী-শতক**—সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২। দাম : চার টাকা।

কবিতাকে বোধহয় পানীয়ের সংগে তুলনা করা অনেকখানি বাস্তবানুগ, কারণ ধীরে ধীরে, রয়ে-সয়ে, মেজাজ ও মনোভঙ্গি অনুযায়ী স্বাদগ্রহণেই এ-দুয়ের সার্থকতা। তাই, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে কবিতার সংকলন অধিকতর বাঞ্ছনীয়, তা সে একক কবিরই হোক অথবা সমগ্র কবিবৃন্দের হোক। অধিকন্তু, বিশেষ কোন যুগের সমগ্র রূপটি পাঠক-সমক্ষে তুলে ধরতে হলে সংকলন অপরিহার্য, এবং বিভিন্ন কাব্য সংকলনের জনপ্রিয়তা এর স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। 'শতাব্দী-শতক' বাংলাকাব্যের একটি বিশেষ যুগের সামগ্রিক রূপের তাৎপর্য পরিস্ফুট করার একটি উজ্জ্বল প্রয়াস।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই কাব্য-সংকলনটি তার পূর্বসূরীদের অপেক্ষা অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল থেকে একশো বছর সময়ের মধ্যে আবির্ভূত একশো জন কবির একশোটি কবিতার সংকলন 'শতাব্দী-শতক'— যার আদিতে মধুসূদন আর অন্তে এক তরুণতম সাম্প্রতিক কবি। বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে এই যুগ আধুনিক

নামে খ্যাত। বস্তুত, মধুসূদন বাংলাকাব্যে আধুনিকতার জনক, ইংরেজী সাহিত্যে যে অর্থে চসার। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদকের কথায়, কাব্যসাহিত্যের নিরবধিকালের সমুদ্রের এমন দু'টি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ যার নীলকান্ত দীপ্তির বিচ্ছুরণে সমগ্রভাবে আধুনিক [illegible] কবিতার দূর-দিগন্ত উদ্ভাসিত। প্রথমজন বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] সামান্য [illegible] বাংলা সাহিত্যকে প্রকৃত সং-সাহিত্যের স্তরে উন্নত করেছেন; দ্বিতীয়জনের হাতেই ষাট বছরের অধিককালের নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা কবিতার এবং সমগ্রভাবে বাংলাসাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদালাভ সম্ভবপর হয়েছে।

[illegible] এই স্বাতন্ত্র্যময় [illegible] সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটনের মানসে এই কাব্যসংকলনের সামগ্রিক [illegible] অনস্বীকার্য। তবে, [illegible] জিনিসটা [illegible] জেনেও কবি এবং কবিতার সংখ্যার [illegible] সীমা টানা হয়েছে সেটার মূলে রয়েছে [illegible] উপলক্ষ্য যেহেতু [illegible] জড়িত তাই সবাইকেই [illegible] গণ্ডিভুক্ত করা বিপুল অর্থব্যয় না-ও হতে পারে [illegible] কবির সংখ্যা [illegible] বেশী হলে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হ'ত না বলেই মনে হয়। [illegible] কবিতার সংখ্যাধিক্য হ'লে সংকলনের কলেবর বৃদ্ধি হ'ত নিঃসন্দেহে কিন্তু সংখ্যা-সীমার নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতা কাটিয়ে [illegible] সম্ভব হ'তো। প্রত্যেক কবির একটি করে কবিতা নির্বাচনের মধ্যে এক মারাত্মক ঝুঁকি আছে, সুতরাং কোন কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা কোনটি সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকবেই [illegible], একাধিক কবিতা তুল্যমূল্যের হওয়াও অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত সংকলনের উদ্দেশ্য যেহেতু [illegible] কাব্যের বহুমুখী পরিচয় [illegible], [illegible] একটি কবিতা কোন কবির সামগ্রিক পরিচয় না হ'তেও পারে।

[illegible], এতৎসত্ত্বেও সংকলনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। [illegible] ত্রুটি [illegible] সংকলকদ্বয় [illegible] সংকলনের [illegible] সজাগ ছিলেন। [illegible] সংকলকদ্বয় [illegible] আধুনিক কবি; একজন [illegible] কবিদের অগ্রস্থানীয়। প্রত্যেক কবির একটি কবিতা নির্বাচনের অতি দুরূহ কাজে তাঁরা প্রায় সার্থক [illegible] অনুপস্থিতি [illegible] পারেন [illegible] এমন কবির কবিতা [illegible] উৎকলিত [illegible] অনুরূপ সংখ্যার অন্য কবিকুলের [illegible] এ গ্রন্থের আকর্ষণ [illegible] সহায়ক হ'ত।

[illegible] মুদ্রণ, [illegible]

প্রণব মজুমদার

**পাঁচুর পাঁচালী**—[illegible] দাস। প্রকাশক কালিদাস দাস [illegible] ১৪ [illegible] প্রাপ্তিস্থান মনমোহিনী প্রেস। ১১২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩'০০।

ভূমিকায় লেখক যা বলেছেন তাতে মনে হয় স্বর্গীয় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] পাঁচালী'র পরিচয় পেয়েই তিনি পাঁচুর পাঁচালী লেখার প্রেরণা পান। কিন্তু তিনি কৃতকার্য হ'তে পারেন নি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

**প্রণয় গোস্বামীর গল্প**—প্রণয় গোস্বামী। পুস্তক। ৮।১ বি [illegible] চরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম ২'৫০।

চোদ্দটি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই ছোট এবং সত্যিকারের ছোট গল্প হ'য়েছে। লেখার মধ্যে যে প্রসাদ গুণ থাকলে গল্প জমাটি হয় তা লেখকের আয়ত্তাধীন। ছোট ছোট তুলির [illegible] আঁচড়ের সাহায্যে এক একটি গল্প বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে 'নতুন মালিক'। "অনুপমা", "ট্যাংরা", "সহোদরা" গল্পগুলির মধ্যে লেখক রচনাশৈলীর পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের ভাষার মধ্যেও একটি নিজস্ব ধারা প্রবহমান।

**দিনের পর দিন**—রামগোপাল নাথ। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৮।বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ২.

সমাজের নীচু তলার মানুষদের নিয়ে লেখা ছোট একখানি উপন্যাস 'বিলাস', বাদল, বড় মিস্ত্রী, ঠাকুর প্রসাদ এই চারজনই প্রধান এবং গল্পকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন যোগ্য ক'রে তুলতে আরও অনেক ছোট ছোট চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে। বিলাসকে ভাল লেগেছে, বড় মিস্ত্রী আর বাদল খানিকটা অস্বাভাবিক। ঠাকুর প্রসাদ যথাযথ। উপন্যাসখানিতে সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সে সম্ভাবনাকে ঠিকমত কাজে লাগান হয় নি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

**বিয়ের ফুল**—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থপীঠ, ২।৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩'০০।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসখানি আজ অনেকদিন পরে নবতম সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। সেকালে চারুচন্দ্রের গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ছিল। তখন গল্প-লিখিয়েদের মধ্যে চারুচন্দ্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আজ অনেক বই তাঁহার পাওয়া যায় না, গ্রন্থপীঠ সেদিকে নজর দেওয়ায়, দুইটি কালের পরিচিতি পাঠক-সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহার লেখার সহিত আজকের তরুণদের কতটুকুই বা পরিচয় আছে। রোমান্টিক গল্প রচনায় এমন হাত আর কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

'বিয়ের ফুল' উপন্যাসের গল্পটি অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু লেখার কৌশলে ইহা একটি অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের নূতন করিয়া সমালোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। শুধু বলিব, আজকের দিনে তাঁহার গ্রন্থগুলির প্রচার আবশ্যক।

গৌতম সেন

**কোপাই নদীর মেয়ে**—সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রকাশক ... ঘোষ, ৫৫ বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৫৫, মূল্য পাঁচ টাকা।

শক্তিমান লেখক বাংলার পল্লীতে আধুনিক প্রগতিমূলক সমাজ-... যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছেন ও তাহারই পটভূমিকায় রাজনৈতিক দল ও দলগত স্বার্থের যে সংঘাত তাঁহার লেখনীমুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচায়ক অন্যদিকে তাহাকে উপন্যাসের স্বল্পপরিসর গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য। আধুনিক অনেক নামকরা উপন্যাসে যেমন বিদেশী নভেলের ছককাটা আবেগপ্রধান প্রায়-অবান্তর সংলাপ ও প্রায় অবাস্তব ... গতানুগতিকতা দেখা যায়, আলোচ্য উপন্যাসখানিতে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। পল্লীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সেইভাবে-... মানব-চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব লেখক অতি নিপুণভাবে ... করিয়াছেন। মানুষের জীবন-সমস্যা-সমাধানের যে প্রয়াস নগর ও পল্লীর সর্বত্র একইভাবে বর্তমান, লেখক তাহার কদর্যতা ও ... বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। পল্লী-সমাজদেহের দুষ্টব্রণগুলি ক্রমশঃ কিরূপ ... হইয়া উঠিতেছে ও রাজনৈতিক আবহাওয়ায় নির্বাচন ... কলকোলাহলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কিরূপ ... ও বিড়ম্বিত হইয়া পড়িতেছে, লেখক তাহা আমাদিগের ... পরিস্ফুট করিয়াছেন। সুবিধাবাদী নারী-সন্ধানী, সঙ্গের ... 'প্রদীপ' বাবু ও রাজনীতি-বিলাসিনী নানা প্রদেশ সঞ্চারিণী আধুনিকা ... 'পঙ্কজী' এক বাস্তবধর্মী রূপ লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। গ্রাম-সেবিকা ... রামের পত্নী বাসনা 'কলি' (কৃষ্ণকলি)র মধ্যে যে কর্মনিষ্ঠা, নম্রতা, ... উদার মনোভাবের পরিচয় পাই তাহা লেখকের লেখনী-মুখে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হইয়াছে। পুষ্কর ও কৃষ্ণকলির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন প্রেম, তাহা কোথাও সর্বাচর সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই। দিদি-... কিশোর 'সজল'র চরিত্রটি এত স্বভাবসুন্দর হইয়াছে যে, তাহার ঔৎসুক্য, তাহার কল্পনাপ্রবণতা, তাহার আলাপ-মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ না করিয়া পারে না। ..., করিম, ..., শক্তিপদ, গোপাল, ভৈরব ও মণিশঙ্কর যেন লেখকের জীবন্ত সৃষ্টি। ..., ..., বৌদি, সুধাদি প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্র জীবনের ... আবৃত হইলেও নারীত্বের মহিমায় ভাস্বর। লেখকের ভাষা সাবলীল ও আবেগমধুর, অথচ কোথাও ... পীড়া দেয় না। ... স্বাভাবিক, ... মধ্যে চিন্তাশীলতার ছাপ আছে। তবে একটা কথা, সর্বশেষে পুষ্করের ... পরিণতির দিক দিয়া কতটা বিচারসহ তাহা বলা কঠিন ... রাখিয়া ঘটনাস্রোতকে অনায়াসে লইয়া যাওয়া শক্তিমান লেখকের পক্ষে হয়ত অসমীচীন হইত না। যাহা হউক, 'কোপাই নদীর মেয়ে' উপন্যাস-খানি যে বাংলা কথা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

---

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

( রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য )

| | |
|---|---|
| ১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান— | কলিকাতা ( পশ্চিমবঙ্গ ) |
| ২। কিভাবে প্রকাশিত হয়— | প্রতি মাসে একবার |
| ৩। মুদ্রাকরের নাম— | শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস |
| জাতি | ভারতীয় |
| ঠিকানা | ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ |
| ৪। প্রকাশকের নাম | ঐ |
| জাতি | ঐ |
| ঠিকানা | ঐ |
| ৫। সম্পাদকের নাম | শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় |
| জাতি | ভারতীয় |
| ঠিকানা | ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ |
| ৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম | প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড |
| ঠিকানা | ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ |
| এবং | |
| (খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা— | ১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯<br>২। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯<br>৩। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯<br>৪। শ্রীমতী সুনন্দা দাস<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯<br>৫। শ্রীমতী ইশিতা দত্ত<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯<br>৬। শ্রীমতী নন্দিতা সেন<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯<br>৭। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯<br>৮। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯<br>৯। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯<br>১০। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯<br>১১। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়<br>১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ |

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য।

তারিখ—১৫।৩।৭২ ইং

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়